বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

২২শ বর্ষ

(২৭শ সংখ্যা হইতে ৩৯শ সংখ্যা পর্যন্ত)

২২ বর্ষ ২৭ সংখ্যা

২৩ বৈশাখ ১৩৬২

DESH

SATURDAY, 7TH MAY, 1955.

২৫শে বৈশাখ স্মরণীয় দিবস। মহাপুণ্যময় এই দিন। আমরা রবীন্দ্রনাথকে এইদিন নিজেদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। মহামানবের আবির্ভাব সব যুগে, সকল দেশে ঘটে না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে বিরল। এই হিসাবে সত্যই আমরা সৌভাগ্যবান্। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তিনি বিশ্বজগতের, ইহা সত্য; কিন্তু সেই সংগে একথাও সত্য যে, কবি একান্তভাবে আমাদের আপনার, আমাদের নিজেদের। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের অবদানের অমৃতে আমরা অনুদিন সঞ্জীবিত হইতেছি এবং আমাদের জীবন বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহারই ভাবধারায় আমরা ডুবিয়া আছি। রবীন্দ্রনাথের সাধনার অমল উজ্জ্বল বিভায় আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যাহা কিছু গৌরবের কবিগুরুর নিকট হইতেই আমরা পাইয়াছি। বর্তমান যুগ রবীন্দ্রযুগ। এ যুগের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত না হইতেন, তবে আজ আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম, এই বিপর্যয়ের মধ্যে বাঙ্গালী জাতি কোথায় গিয়া পড়িত, কল্পনা করিতেও ভয় হয়। ২৫শে বৈশাখের সূর্যোদয় সত্যই বরাভয়ময়।

আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির মূলে ধ্রুবজ্যোতিঃস্বরূপ, এমন যিনি কবি, তাঁহার আবির্ভাব দিবসে তাঁহার জয়ধ্বনি সর্বত্র উত্থিত হইবে, তাঁহার স্মৃতিপূজার জন্য জাতির প্রাণধর্ম উচ্ছ্বসিত হইবে, ভাবের আবেগ ফুটিবে ছুটিবে, ইহা অস্বাভাবিক নয়। ফলত রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহামানবের স্মৃতি-পূজার ভিতর দিয়া জাতি আত্মসত্তার সন্ধান পায় এবং আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবন দিয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাণীকে তিনি বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কবিগুরু তাঁহার জীবনব্যাপী তপশ্চর্যায় সাহিত্যের পরম সম্পদ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। সেই তপস্যার, সে যজ্ঞ-সাধনার ভার আজ আমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহার জীবনাদর্শে উদ্দীপিত সাহিত্য-সাধনার বর্তিকা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সেই আলোকে নিত্য নবসৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কবির প্রকৃত মর্যাদা এইভাবেই রক্ষিত হইতে পারে। সাহিত্য-সাধনার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, জীবন দিয়া তাহাকে সম্প্রসারিত এবং আমাদের সমগ্র প্রাণের রস নিংড়াইয়া দিয়া তাহাকে উজ্জীবিত রাখিতে হইবে, সেই সাধনায় নিজেদের বিকাইয়া বিলাইয়া দিতে হইবে। কবির প্রতি এই কর্তব্য আমাদের রহিয়াছে, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমাদের সেই কর্তব্য খুবই কঠোর। প্রত্যুত সাহিত্য-সাধনা আরাম বিলাসের বস্তু নয়। ত্যাগের বলে এই পথে অগ্রসর হইতে হয়। এ ব্রত মহা-ব্রত। কারণ দেশ ও কালের গণ্ডীতে ইহা সীমায়িত নহে এবং একান্ত শ্রদ্ধাবলে যাঁহারা বৈশারদী বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই ক্ষেত্রে ব্রতচারী হইবার অধিকারী।

কিন্তু কঠোর হইলেও এই সাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত হইতে হইবে; দুশ্চর হইলেও এই মহাব্রতে নিজেদের বিনিয়োগ করিতে হইবে, তবেই কবির স্মৃতিপূজার পবিত্র প্রতিবেশ আমরা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইব এবং তাঁহার জীবনাদর্শের আলোকে তবেই জাতির অগ্রগতি সুনিশ্চিত হইবে। দুর্গত আমরা, আমাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠার এই পথ।

সৃষ্টির পূর্বে সমগ্র জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এখন প্রজাপতি ব্রহ্মার কানে মহাকাশ হইতে তপঃ তপঃ তপঃ এই মহামন্ত্র ধ্বনিত হইয়া নবসৃষ্টির উদ্বোধন করে এমন কথা আমরা শুনিয়াছি। ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর মহদাবির্ভাবের আলোকে উদ্দীপিত বাংলার আকাশে বাতাসে নবসৃষ্টির চেতনা জাগাইয়া সেই মন্ত্রই ধ্বনিত হইতেছে—তপঃ তপঃ তপঃ। প্রজ্ঞানময় সেই ধ্বনিতে আমরা প্রাণের বিলাস উপলব্ধি করিতেছি কি?

হে কবি তোমার বাণী জয়যুক্ত হোক্। আমাদের মনে তাহা প্রতিষ্ঠিত হোক্। ব্রতপতি তুমি, আমরা তোমার ব্রত আচরণ করিব। তুমি শক্তি দাও। তোমার আবির্ভাব সার্থক হোক্। প্রণাম, তোমাকে প্রণাম।

ONE WORLD
The human world is made one, all the countries are losing their distance every day, their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establishing trade relationships. But my mission is to urge for a world-wide commerce of heart and mind, sympathy and understanding and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of individual profits or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness.
—RABINDRANATH TAGORE
THE AIR OCEAN UNITES ALL PEOPLES
KLM
ROYAL DUTCH
AIRLINES

কাব্য সংকলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯৩৮ সালে) রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কবিতার সংকলন পুস্তক "বাংলা কাব্য পরিচয়" প্রকাশিত হয়। এই সংকলন-গ্রন্থের 'নিবেদন'এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

কোনো একটিমাত্র সংস্করণে এরকম কাব্য-সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হোতেই পারেনা। বাংলা কাব্য-পরিচয়ের এই প্রথম সংস্করণে নিঃসন্দেহেই অনেক অভাব রয়ে গেছে। অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর হোতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।

আধুনিক কবিতার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, সুতরাং তার সংগ্রহ ভাবী সংস্করণে পূর্ণতা ও উৎকর্ষলাভ করবে এই প্রত্যাশা সংকলনকর্তার মনে রইল।

রবীন্দ্রনাথের এই জবাবদিহি সত্ত্বেও বাংলার পাঠক-সাধারণ এই সংকলন-গ্রন্থ পেয়ে তুষ্ট হন না। "বাংলা কবিতার এমন নিকৃ[ষ্ট] নির্বাচন আর পূর্বে কখনো হয় নাই" "ব্যবস[া] বুদ্ধির চাপে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভ[ার] নিদারুণ অবমাননা" "আমাদের মতে এই গ্রন্[থ]খানির প্রচলন অচিরেই বন্ধ করা উচিত"- এই রকম প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

অনেক যোগ্য কবির কবিতা এ সংকলনে স্থান পায় না এবং অনে[ক] অযোগ্য কবির কবিতা সংকলনে গৃহীত হয়—অভিযোগের মূল কার[ণ] এই। একটি পত্রিকা মন্তব্য করেন—"যেস[ব] কবিদের ভিতর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যাঁহাদের পরিচিতি লাভ করিলে বাংলার কাব্যে রূপ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়—তাঁহারা 'বাংলা কাব্যপরিচয়ে' স্থান পাইবার যোগ্য

গ্রন্থ-পার্বণ সম্পর্কে আবেদন

শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এই রবীন্দ্র জন্মোৎসবকে গ্রন্থ-পার্বণে পরিণত করার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা পেশ করেছেন—এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত তাঁর **গ্রন্থ-পার্বণ** প্রবন্ধে। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে রবীন্দ্রপক্ষকে আরো উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সম্পদের সার্থকতা দান করার জন্য আমরা পাঠকপাঠিকাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিকল্পনা - অনুসৃত একটি আবেদন আনন্দবাজার পত্রিকার 'সাহিত্যজগৎ' বিভাগেও গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আশা করি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যসংস্থার প্রচেষ্টায় ২৫শে বৈশাখ ক্রমশ এমন একটি পার্বণে রূপায়িত হবে যখন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা পরস্পরকে বই উপহার দিয়ে এক নিবিড়তর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবেন। —সম্পাদক দেশ

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ কে এল এম বিমানে পারস্য পরিভ্রমণ করেন। বিমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম। তেহেরাণের বিমানঘাটিতে নেদারল্যান্ড কনসাল জেনারেলের পত্নী ও বিমান পরিচালকের সহিত কবিকে দেখা যাইতেছে
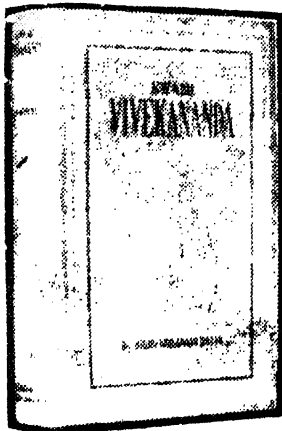
সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে জীবিত কবিদের ভিতর যাঁহারা স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশ অযোগ্য। কিন্তু এই কলঙ্কের জন্য দায়ী সেইসব অযোগ্য কবিগণ নহে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে সম্মুখে রাখিয়া 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' প্রকাশ করিয়াছেন বাংলা সাহিত্যের অবমাননার জন্য দায়িত্ব তাঁহাদের।"

বিভিন্ন দেশী কাগজে এইরূপ রূঢ় মন্তব্য তো করা হয়ই, সে সময় Statesman পত্রিকাও তাঁদের ২৩ জুলাই ১৯৩৮ সংখ্যায় Bengal's Poetry শীর্ষক প্রবন্ধে এইসব অভিযোগ সমর্থন করেন।

রবীন্দ্রনাথ যাঁদের উপর নির্ভর করে এই সংকলন-গ্রন্থের সঙ্গে সম্পাদকরূপে নিজের নাম যুক্ত করতে সম্মত হয়েছিলেন, তাঁদের বিচারবুদ্ধির ও দূরদর্শিতার অভাবের দরুণই রবীন্দ্রনাথকে এইরূপ অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। তখনই ঠিক হয়, এই বইয়ের প্রচার বন্ধ করা হবে, এবং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অচিরেই বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ থেকে সমুদয় কপি উঠিয়ে নিয়ে এর প্রচার বন্ধ করা হয়।

এখানে রবীন্দ্রনাথের যে রচনাটি প্রকাশিত হল, 'বাংলা কাব্যপরিচয়ে'র ভূমিকা-রূপে তা লিখিত। এই রচনাটি অন্যত্র কোথাও আর প্রকাশিত হয় নি।

—সম্পাদক দেশ।]

ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি এই বচনটা পুরাতন। কথাটা যদি নিতান্তই সত্য হোত তাহলে সাহিত্য বা শিল্পের কোনো অর্থই থাকত না। রুচির ভেদ যেন নদীর বাঁকের মতো, ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে দেখলে মনে হয় তার চলনের মিল নেই—বড়ো ম্যাপের মধ্যে তার ঐক্য ধরা পড়ে। এক শিক্ষা এক সংস্কৃতির মধ্যে যাদের মন বেড়ে উঠেছে মোটামুটি তাদের রুচি এক। এর মধ্যেও প্রকৃতিভেদে ব্যক্তিগত যে রুচিভেদ ঘটে সেটা এতটা একান্ত পরস্পরবিরোধী নয় যাতে সাধারণের মধ্যে মানসিক ব্যবহার অসাধ্য হয়ে ওঠে। বাঙালী বাড়ির ভোজে অসংকোচে বাঙালীকে নিমন্ত্রণ করা চলে, অথচ যাদের জন্যে পাত পাড়া হয় তাদের মধ্যে রুচির নিছক সাম্য প্রত্যাশা করা যায় না। মোটের উপর তাদের রসনার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি এক রকম ব'লেই খেতে বললে মারতে ওঠা সাধারণত সম্ভব হয় না।

কাব্য সংকলন সেই রকম ভোজের নিমন্ত্রণ। যে সাহিত্যে আমাদের মন অভ্যস্ত, যে শিক্ষায় সেই সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে, সেই সাহিত্য এবং শিক্ষার ধারাই আমাদের মনের স্বাদবোধের পথকে প্রতিদিন গভীর করেছে। সেই আশ্বাসেই এরকম যজ্ঞে সকলকে সাহস ক'রে ডাকা যায়। কিন্তু তবুও নির্বিশেষে সকল অভ্যাগতেরই মধ্যে মেজাজ ও মর্জির ষোলো আনা মিল আশা করা যায় না। এখানে সেখানে এর ওর পংক্তিতে কিছু কিছু মুখ-বিকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই নিমন্ত্রণ কর্তাকে আপন কর্তব্যে প্রবৃত্ত হতে হয়। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

যিনি সাহিত্যের বাছাই করার ভার নেন তাঁকে অগত্যা ধরে নিতে হয় যে তাঁর রুচি সাধারণ রুচির পরিচায়ক, কিন্তু আর একদিকে তাঁর রুচির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও সম্পূর্ণ আত্মগোপন করতে পারে না। এই বিশেষত্বের পথে পরিচিত সাহিত্যকে কিছু নূতন করে দেখার অবকাশ ঘটে। এতে যে কৌতূহলের উদ্রেক করে তার মধ্যে দিয়ে কিছু নতুন আবিষ্কারের পথ পাওয়া যায়। নতুন আবিষ্কার বলতে সকল সময়ে এ বোঝায় না যে পাঠক পূর্বে যা দেখতে পাননি তা দেখতে পান, তাঁর পূর্ব দেখার জিনিসকে আর এক-জনের দেখার মধ্যে দিয়ে পাওয়াও আবিষ্কার।

ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি কেউ কেউ আমার এই অধ্যবসায়ের প্রতি পূর্ব হতেই অবজ্ঞা অনুভব করেছেন। ইংরেজী কাব্য সংকলনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখেই বোধ করি তাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত করেন। আমি বারে বারে অনুভব করেছি এই তুলনা করবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের নেই। তার প্রধান কারণ ইংরেজী কাব্যসংগ্রহের প্রতি তাঁদের মনের মোহদৃষ্টি আছে। বাল্যকাল থেকেই আমরা ইংরেজের ছাত্র, অভিভূত মন নিয়ে বিশুদ্ধ সত্যের বিচার চলে না।

বর্তমান এই কর্তব্য উপলক্ষে ইদানীং আমাকে অনেক ইংরেজী কাব্যসংকলন পড়তে হয়েছে। তুলনায় খুব বেশি সংকোচ বোধ করিনি। বর্তমান যুগের বিরাট বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল থেকে আমরা দূরে আছি, আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশাল ও প্রবল জীবনের ভূমিকায় যথেষ্ট অভাব; নব নব বিপ্লব-ক্ষুব্ধ পরীক্ষার ও সৃষ্টিতৎপর দ্বন্দ্ব-

'নাভানা'র বই

ভারত রাষ্ট্রের পুরস্কারপ্রাপ্ত

১৯৪৭-৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা বই

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥

এ-পর্যন্ত প্রকাশিত জীবনানন্দর ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী ও সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থগুলির বিশিষ্ট কবিতাসমূহ এবং অনেকগুলি অপ্রকাশিত নতুন রচনা এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। সূচনা থেকে পরিণতির বিচিত্র ধারাবাহিকতায়, অনন্যব্রত কবির সমগ্র রচনার সুশৃঙ্খল পরিচয়সাধনে 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' একমাত্র সার্থক সংকলন গ্রন্থ ॥ পাঁচ টাকা ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥

এ-পর্যন্ত প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ (প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ) থেকে বিশিষ্ট কবিতা-সমূহ, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি নতুন রচনা এবং বিচিত্র স্বাদের কিছু অনুবাদ এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। মুদ্রণ-পারিপাট্যে ও গ্রন্থন-সৌষ্ঠবে অতুলনীয় ॥ পাঁচ টাকা ॥

শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর ॥

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর সচল কাব্যধারার যে-উৎসটি সর্বদাই সুস্পষ্ট তা হচ্ছে জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা। যৌবন-বন্দনা যেমন উদ্দীপ্ত ভালোবাসার কবিতা, যৌবনান্ত জীবনও তেমনি বসন্ত-বন্যার মতো পরিপূর্ণ ভালোবাসারই উজ্জ্বল রচনা। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতার গ্রন্থনে 'শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর' পরিণতির আর-একটি সুউচ্চ সোপান ॥ আড়াই টাকা ॥

বন্ধুপত্নী ॥

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সত্য ও সুন্দরের মামুলি তত্ত্বকথার চাইতে আধুনিক জীবনের সমস্যাপীড়িত প্রসঙ্গেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মুন্সিয়ানা। জটিলতর জীবনের গহনতম রহস্যেই তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দৃঢ় রেখায় আঁকা বিচিত্র চরিত্রগুলি নিতান্তই মানুষ, সুন্দর ও সুসম্পূর্ণে মনুষ্যত্বের দিক্‌ভ্রান্ত সন্ধানী। ছয়টি বড়ো গল্পের সংগ্রহ ॥ আড়াই টাকা ॥

শ্রেষ্ঠ কবিতা পর্যায়ের

নতুন গ্রন্থ

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥

আধুনিক বাংলা কাব্য বিষ্ণু দে-র বিশিষ্ট স্বকীয়তা ও সিদ্ধিতে ঐশ্বর্যবান। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ (উর্বশী ও আর্টেমিস, চোরাবালি, পূর্বলেখ, সাত ভাই চম্পা, সন্দ্বীপের চর, অন্বিষ্ট, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার) থেকে উৎকৃষ্ট কবিতাসমূহ, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি নতুন রচনা এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। যামিনী রায় -অঙ্কিত প্রচ্ছদ-চিত্র ॥ চার টাকা ॥

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥

বুদ্ধদেব বসুর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ থেকে বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কবিতাসমূহ বর্তমান সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। এ-ছাড়া যে-সব অপ্রকাশিত রচনা, বিচিত্র স্বাদের অনুবাদ ও ছোটোদের কবিতা এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে তার সব ক'টিই কবির শাণিত স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ॥ পাঁচ টাকা ॥

সব-পেয়েছির দেশে ॥

বুদ্ধদেব বসু

বিশ্বমানবের সংস্কৃতির মিলনভূমি শান্তিনিকেতন যাঁদের প্রিয়, জীবনসম্রাট রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের জন্য অনুপম রচনা। বাংলা গদ্য যোগ্য লেখকের হাতে কত স্বচ্ছন্দগতি ও উজ্জ্বল হ'তে পারে 'সব-পেয়েছির দেশে' তার সার্থক দৃষ্টান্ত। মুদ্রণ-পারিপাট্যে ও গ্রন্থন-সৌষ্ঠবে অতুলনীয়। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী -অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র ॥ আড়াই টাকা ॥

মাধবীর জন্য ॥

প্রতিভা বসু

ছোটোগল্পের কারুশিল্পে প্রতিভা বসুর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত।......নারীর বিশেষ দৃষ্টি এবং নারী-হৃদয়ের, বিশেষভাবে বাঙালি নারী-হৃদয়ের পরিবেদনশীল সূক্ষ্মতা 'মাধবীর জন্য'-র গল্পগুলিতে সুস্পষ্ট। কোমল মধুর অনুভূতিশীল কয়েকটি নতুন প্রেমের গল্পের মনোজ্ঞ সংকলন ॥ আড়াই টাকা ॥

নাভানা

॥ নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ ॥

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

পরায়ণ অধ্যবসায়ের নির্ঘোষে দূরের থেকে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, তার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করবারও চেষ্টা করি, কিন্তু উদ্যোগী হিসাবে বা দর্শক হিসাবে, বা স্থানীয় ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে সমাজে বা রাষ্ট্রে সে আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয় নয়। এই জন্যে বিচিত্র বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের বাণীর প্রেরণা দুর্বল। এই অনিবার্য দৈন্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। কিন্তু দেখতে পাই কাব্য বা শিল্প রচনায় বাঙালীর কল্পনাবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও লীলানৈপুণ্য আছে।

এরই ওজন রাখবার জন্যে কর্মক্ষেত্রেও তার সেই পরিমাণে মুক্তির পথ থাকা উচিত ছিল। যে কারণেই হোক কর্মের দিকে আমাদের অপেক্ষাকৃত অকৃতিত্বের প্রমাণ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা এখানকার আলোচ্য নয়। একথা বলতেই হবে রস-রূপ সৃষ্টি করতে মানুষের যে-কল্পনা-বৃত্তি আনন্দ পায় বাঙালীর তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই সংকলনে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইংরেজীর সংগে তুলনা করবার সময় বাংলাসাহিত্যে কল্পনার সেই স্বাভাবিক আবেগ-স্রোতের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই, পুঞ্জিত সামগ্রীর প্রতি নয়। ইংরেজী সংকলন গ্রন্থে মাঝারি শ্রেণীর বিস্তর মাল বোঝাই দেখতে পাই। তার মধ্যে অনেক লেখাই দেখা যায় যার উপভোগ্যতা ইংরেজের অভ্যস্ত সংস্কারের উপর নির্ভর করে। এদেশে সেগুলির প্রতি যাঁদের ধৈর্যের বা শ্রদ্ধার অভাব দেখিনে, তাঁরা যখন বাংলাকাব্যের যাচাই-খানায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন তখন সেটাকে আমি প্রণিধানের যোগ্য মনে করিনে।

এই সংকলন গ্রন্থকে আমি বাংলা কাব্য পরিচয় নাম দিয়েছি। মাইকেল মধুসূদন লিখেছেন 'বিরচিব মধুচক্র।' প্রত্যেক জাতির কাব্যসাহিত্য তার মধুচক্র। এই মৌচাকের সঞ্চয়ের মধ্যে থাকে তার একটি বিশেষ পরিচয়, সে জানিয়ে দেয় বিশ্ব-জগতে কোন্ কোন্‌খানে তার মন খুঁজে পেয়েছে আপ্ মধু। তার এই মৌচাকে জমা হয় শরৎ বসন্ত বর্ষার বিচিত্র দান। 'মধু দৌঃ, মধুমৎ পার্থিব রজঃ'—আকাশে আছে মধু, পৃথিবীর ধূলিও মধুময়,—মন মধু আহরণ করে স্বপ্ন থেকে আকাশ-কুসুমের মধু, পৃথিবীর ধূলিও ভুঁই-চাপা ফোটায়, তার থেকেও মধুর সন্ধান মেলে। বাঙালী কী পেয়েছে কী চেয়েছে যার মধ্যে আছে অনির্বচনীয়ের স্বাদ, যাকে সে আপন অন্তরের রসে মিশিয়ে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছে এইটি পাওয়া যায় তার কাব্য থেকে। পদ্মও হতে পারে তার আকাঙ্ক্ষিত মধুর আধার, গ্রামের পথপার্শ্বে ভাঁটি ফুলও হতে পারে।

এই সংকলন গ্রন্থে পরিচয়ের একটি প্রধান অংশ অসম্পূর্ণ। এর থেকে আদি-রসের কবিতা বাদ পড়েছে। তাতে অনেক ভালো রচনার অভাব ঘটল সে কথা মানব। কিন্তু তাতে লাভের বিষয় এই যে, এ বই অসংকোচে ও নির্বিচারে সর্বজনের হাতে দেওয়া যেতে পারবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্যে সাহিত্য আলোচনার যে প্রয়োজন আছে তার সুযোগকে যথাসম্ভব অবাধ ও ব্যাপক করে দিলে দেশের সংস্কৃতির সাধনার বৃহৎ ভূমিকা করে দেওয়া হয়। আদিরসবর্জিত এই কাব্য-সংগ্রহে উপভোগ্যতার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়নি, যদি হতো তবে সেটাকে সাহিত্যের দৈন্যের লক্ষণ ব'লে মানতে হতো। মানুষের যে প্রবৃত্তি সহজেই অত্যন্ত প্রবল, পাঠকের মন অল্পেই তাতে সাড়া দেয়, তাকে স্বাদু করে তুলতে অধিক নৈপুণ্যের দরকার হয় না। এই কারণেই গৃহিণীর রন্ধনবিদ্যার যথার্থ গুণপণা প্রকাশ পায় তাঁর নিরামিষ রান্নায়।

যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে একটি কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুইভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এ সব জিনিস ন্যাশনাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে এ সব কাব্য স্বভাবতই বাঙালী জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না এর অংকুর, উঠলে শিকড় সুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে, বলা বাহুল্য তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আদি ফসলটা আদিম উৎপত্তি হিসাবে ন্যাশন্যাল নয়, কিন্তু ন্যাশন্যাল জমিতে এর প্রা

চাষ চলছে এবং ন্যাশন্যাল ভোজে সাবেক দিশী আলু জাতীয় ভোজ্যকে বহুগুণে গেছে ছাড়িয়ে। ন্যাশন্যাল কুলশীলের দোহাই দিয়ে সেকালের পাঁচালি কবিতার যতই গুণকীর্তন করি না কেন কোনো দেশাত্মবোধী সব ছাড়িয়ে বিশেষভাবে এই পাঁচালিই ন্যাশন্যাল বিদ্যালয়ে চালাবার হুকুম করেন না। নদীর স্রোত আপনার পথ আপনিই কেটে নেয়, রাজকীয় বিভাগের খাল কাটা পথ তার পথ নয়। আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ নিয়ে নিবেদন করেছিলেন বাংলা ভাষা ভারতীকে। বলা বাহুল্য তার ভাব তার ভঙ্গী তার ছাঁচ ইংরেজি সাহিত্যের অনুবর্তী। পণ্ডিতেরা তার ভাষারীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, সমাজদরদীরা তাকে নিন্দা করেছেন এই বলে যে, সামাজিক রীতি পদ্ধতি থেকে এই সব গল্প দেশের মন ভুলিয়ে নিয়ে তাকে অশুচি করে তুলেছে। কিন্তু দেখা গেল প্রবীণ নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরাও পুত্রবধূদের অনুরোধ করতে লাগলেন এই সব বই তাঁদের পড়ে শোনাতে। বটতলায় ছাপা পুরাণ-কথা থেকে তাঁদের দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমা ক্রমশই পথান্তরিত হয়েছে। এ-সমস্ত বিদেশী আমদানী ভালো লাগা উচিত নয় বলে এদের প্রতি অরুচি জন্মাতে কেউ পারলে না।

সকলের চেয়ে দুঃসাহসিকতা দেখালেন আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী মাইকেল মধুসূদন। তিনি যে মিলটনি বন্যায় দুরূহ শব্দ-তরঙ্গে বাংলা ভাষা তরঙ্গিত করে তুললেন তার মতো অপরিচিত অনভ্যস্ত আবির্ভাব বাঙালী পাঠকের কাছে আর কিছুই ছিল না। এ যদি সত্যই সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব হতো, তাহলে এ জিনিসটাকে বাঙালী সর্বান্তঃকরণে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিত। কিন্তু নতুন শিক্ষার জোরে ইংরেজী সাহিত্যরসে বাঙালীর তখন মৌতাত জমে গেছে। তখনকার ইংরেজী বিদ্যায় পরিপক্ক বাঙালীর কাছে মিল্‌টন শেক্‌সপিয়রের আদর আজকের দিনের

চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাই বাংলাভাষার মন্দ্রে মিলটনীয় মীড় মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে তারা বাহবা দিয়ে উঠল। মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভায় বাংলা ভাষার কাব্য-রঙ্গভূমিতে প্রথম প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটা সম্ভব হল।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তনা যে এত দ্রুতগতিতে নানা পথে নানা রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালীর মনকে বাঁধা গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণশক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নূতন করে আবিষ্কার করতে উদ্যত।

সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্বেল হয়ে চলেছে। এই প্রাণশক্তির জিয়নকাটি একদিন সমুদ্র পার হয়ে বাংলাভাষাকে স্পর্শ করলে। বন্দিনী যেমন দ্রুত সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশে এমন ঘটেনি। তারপর থেকে বাঙালীর ভাবপ্রবণ মনের পরিপ্রেক্ষানিকা সাহিত্যসৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল; আজ তার রচনাধারা নানা শাখায় দিগন্ত উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। এই জাগরণের যুগে বাঙালী চিত্তের সৃষ্টি-ক্ষেত্রে যে সকল রসরূপের উদ্ভাবন হয়েছে এই সংকলন গ্রন্থে তার আকার ও প্রকারের পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, দেখা যাবে তার সৃষ্টি প্রয়াসের আবেগ। কেননা যে-সৃষ্টি প্রাণবান মনের, কোনো একটিমাত্র ঋতুতে তার ফুলের শেষ ফসল অবসিত হয় না। নূতন ঋতু আসবে, নূতন রূপের বিকাশ হবে এই আশ্বাসবাণী আমাদের পাওয়া চাই; নূতন আবির্ভাবের ভালোমন্দর বিচার পাকা হতে দেরি ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে বলে মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, ফের গ্রহণ করে আর জন্মের দেহ; তেমনি মানুষের মন এককালের সংস্কার পেরিয়ে বাঁধা পড়ে আর এক কালেরই সংস্কারে; যাকে সে আধুনিক বলে সেও তার নতুন খোলস, সে খোলসও জীর্ণ হয়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমনি মোচনও করে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকার প্রবেশ ব'লে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমন প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্য ও কলাসৃষ্টিতে টি'কে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়—পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, অভ্যাস দিয়ে ঘেরা স্বাদবোধের দ্বারাও নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন তার যতি ভাগের অমিতি এবং মিলের অভাব সত্ত্বেও কাব্যের পংক্তিতে চলে গেছে গদ্যকাব্যও যে তেমন চলবে না কারো মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষররীতির বহুদূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরো বাইরে পদক্ষেপে যে তার চিরনিষেধ, অন্তঃপুরচারিনী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজির দেখলে বোঝা যায় একথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না। বস্তুত নৈবচ বলবার শেষ অধিকার আজ তাদের নেই, হয়তো আছে কালকের লোকের।...

গ্রন্থ-পার্বণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কোনো এক বিদেশী লেখকই যেন কোথায় আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে এই বলে গাল দিয়েছেন যে, এ সভ্যতা ছন্দহারা বলেই ছন্নছাড়া। সুস্থ সভ্যতা তাঁর মতে গানের ছন্দে দোলানো। উৎসব ও আনন্দ তাতে কাজের অঙ্গ। সুস্থ সুখী চাষী ধান বুনতে গান করে গান গায় ধান কাটতে। নতুন ধান ঘরে এনে সে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে। কলের গাড়ির সঙ্গে যন্ত্রযুগের চাকা সবেগে ঘুরতে শুরু করার আগে পর্যন্ত মানুষের যা কিছু কাজ যা কিছু দায় সবই আনন্দ-উৎসবের সুরে বাঁধা ছিল। দুঃখ দুর্দশা তখনও ছিল নিশ্চয়, হয়ত বেশীই ছিল, কিন্তু কাজ তখন সাজা ছিল না।

সেই আনন্দের সুর কলের চাকাতেই কি গেল কেটে?

দোষটা সত্যি কলের নয় কালেরও না। কলই আমাদের কাল নয়, আমরাও কিছু কলের চাপেই বিকল হয়ে পড়িনি। আমাদের প্রাণে সুর এখনও আছে, আনন্দের উৎস এখনও যায়নি শুকিয়ে শুধু নতুন কালের সঙ্গে তালটা এখনো আমরা মেলাতে পারছি না।

শুধু রেডিও কি গ্রামোফন, সিনেমা কি স্টেজ দিয়ে সে তাল মেলাবার চেষ্টা অবশ্য বৃথা। মধুর অভাব মেটাতে এগুলো গুড়ও নয়।

আসল কথা যন্ত্র দিয়ে যে যুগে আমরা পৌঁছে গেছি তারও উৎসব আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, প্রাণের ছন্দে তাকে মিলিয়ে নতুন করে সুর দিতে হবে তার পালায়।

অনেক দেবতা আমাদের ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনেরই নানা প্রভাব ও প্রেরণার প্রতীক। চরিত্র ও প্রকৃতি অনুসারে নানা বাহনে আমরা তাঁদের বসিয়েছি। আমাদের আধুনিক জীবনে বিরাট বেগ-মূর্তি নিয়ে যে দেবতা আবির্ভূত যন্ত্রই তাঁর বাহন। এই যন্ত্র-বাহন দেবতারও বীজমন্ত্র আছে নিশ্চয়। সেই বীজমন্ত্র আবিষ্কার করতে পারলে এই দেবতার চেহারাতেও বিভীষিকা কেটে গিয়ে বরাভয় দেখা দেবে।

আমাদের অন্তরের মধ্যেই এ বীজমন্ত্র আছে অনুচ্চারিত হয়ে। নতুন যুগকে ঠিক তার যথার্থরূপে ধারণা করতে চেষ্টা করলে সে মন্ত্র আপনিই আসবে বেরিয়ে,—আসবে নতুন উৎসবে অনুষ্ঠানে, আসবে নতুন পালা পার্বণে।

সত্যিকার পুজো বলতে যা বুঝি, তা একলার, কিন্তু পার্বণ ব্যাপারটা সকলের। যেখানে আমরা সকলের সেখানে আমাদের সমষ্টিগত মন এই পার্বণের ভেতর দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে ও সমৃদ্ধ হয়। অল্পবিস্তর কুসংস্কার গোঁড়ামি মেশানো থাকলেও সব দেশের আগেকার সব পালা-পার্বণেরই সমষ্টি-মনের আনন্দ-পিপাসা থেকে জন্ম। নিছক প্রয়োজনের শ্রীহীন রূঢ়তাকে সেই পিপাসা মধুর করে তুলেছে। ফসল কাটার দায় নবান্নের উৎসবে সার্থক হয়েছে।

পার্বণ ব্যাপারটা গায়ের জোরে অবশ্য গড়ে তোলা যায় না। সমবেতভাবে আমাদের মনে ও বাইরের পরিবেশে তার প্রস্তুতি অন্তত থাকা দরকার। সেই প্রস্তুতি যেখানে আছে, সেখানে অনুকূল

জলহাওয়ার ব্যবস্থা করলে তা সহজেই পল্লবিত মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে।

আধুনিক যুগের এমনি একটি পার্বণের সুর আমাদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে বলে আমার মনে হয়। পঁচিশে বৈশাখ আমাদের কাছে এখন ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল তারিখ শুধু নয়, আমাদের জীবনেও একটি গভীর মহৎ ইঙ্গিত প্রতি বৎসর তা বয়ে আনে।

এই পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে, তাকে কেন্দ্র করে একটি অপূর্ব উৎসব অনায়াসেই গড়ে তোলা যায় না কি? কবিগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার মামুলি পন্থা অনেক রকমের আছে। সভা করে বক্তৃতা দিয়ে গানের জলসা বসিয়ে সে সব অনুষ্ঠান যেমন হয় হোক। কিন্তু কবিগুরুর পুণ্য স্মৃতি আমাদের মধ্যে অটুট ও জাগ্রত রাখতে গেলে তাকে আমাদের জীবনযাত্রার ছন্দে মিশিয়ে দিতে হবে। যেমন করে কার্তিকের কুহেলি ঢাকা আকাশে আমরা আকাশ-প্রদীপ তুলে ধরি ঋতুচক্রের আবর্তনে এই বিশেষ দিনটিকে অবলম্বন করে একটি পার্বণ তেমনি গড়ে তুলতে হবে।

নতুন যুগের এ নতুন পার্বণ গ্রন্থ-পার্বণই হোক না কেন! হাতে লেখা পুঁথির যুগ চলে গেছে, মুদ্রিত গ্রন্থই বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি। পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে সাতটি দিন পরস্পরকে গ্রন্থ উপহার দেওয়ার রীতি যদি প্রবর্তন করা যায়, কেমন হয়। পৌষের প্রাচুর্যকে আমরা মিষ্টান্ন পিষ্টক খেয়ে খাইয়ে সার্থক করি, ঋষি-কবির আবির্ভাব-সপ্তাহ বিদ্যার দীপ্তি ও রসের মাধুর্য আদান-প্রদানে অভিনন্দিত করে তোলার চেয়ে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন আর কি হ'তে পারে!

অন্ন-জল-বায়ুর মত বই আমাদের বর্তমান জীবনে অপরিহার্য। যন্ত্র-যুগের এই মহাসম্পদ নতুন কালের এক অপরূপ উৎসবের উপকরণ হয়ে উঠুক।

এ উৎসব এ গ্রন্থ-পার্বণের জন্যে মনের আবহাওয়া আমাদের তৈরী হয়ে আছে বলেই আমার ধারণা। পুজোয় যেমন পুরোহিতের এই নব-পার্বণের জন্যে তেমনি দেশের জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত রসিক-দের কাছে শুধু বিধান ও সম্মতিটুকু আমাদের পাওয়ার অপেক্ষা।

বাংলা সাইক্লোপিডিয়া

রাজশেখর বসু

অষ্টাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি কয়েকজন ফরাসী পণ্ডিত Diderot, D'Alembert, Voltaire, Euler ইত্যাদি) Encyclopedie নাম দিয়ে একটি গ্রন্থমালা রচনা করেন। নামটি গ্রীক থেকে উদ্ভূত, মৌলিক অর্থ--বিদ্যাপরিবৃতি, অর্থাৎ সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী তে প্রকাশের জন্য সম্পাদকগণ তখনকার রোমান ক্যাথলিক ধর্মনেতাদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন, রাজদণ্ডও ভোগ করেছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরে ইংরেজী Encyclopedia Britannica সংকলিত হয় এবং এ যাবৎ তার অনেক সংস্করণ হয়েছে। এই প্রকাণ্ড বহুখণ্ড বহুবার সংশোধিত গ্রন্থে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের লেখা যে সকল বিবৃতি আছে তা প্রামাণিক বলে গণ্য হয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক আরব্ধ মহাকোষ' গ্রন্থের উদ্দেশ্য উক্ত দুই গ্রন্থের অনুরূপ। নানা বিদ্যার ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতিসংবলিত কোষগ্রন্থের সম্পাদন একজনের সাধ্য নয়, বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন প্রামাণিক সংকলন অসম্ভব। নগেন্দ্রনাথ যা সমাপ্ত করেছেন এবং অমূল্যচরণ যার কয়েক খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন, তা অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা যেমন বিখ্যাত ব্রিটিশ জাতি আর ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনে রচিত, নগেন্দ্রনাথ আর অমূল্যচরণের গ্রন্থ তেমনি বাঙালী আর বাংলা ভাষার প্রয়োজনে রচিত।

কয়েকটি বৃহৎ বাংলা শব্দকোষে ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্য এবং জীবনচরিত আছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বহু বৎসর পূর্বে যে বাঙ্গালাশব্দ-কোষ' রচনা করেছিলেন তাতে এদেশের খনিজ, বনজ, কৃষিজ দ্রব্য, প্রাণী, নৌকাদি যান, শিল্পসাধিত্র যথা তাঁত ঢেঁকি ঘানি, মাছ-ধরা জাল, গৃহোপকরণ এবং তাস পাশা দাবা প্রভৃতি খেলার বিবরণও আছে। অন্য কোনও বাংলা শব্দকোষে এসব পাওয়া যায় না। যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থ সংস্কৃতেতর বাংলা শব্দের অভিধান, সেজন্য তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ প্রায় বর্জিত হয়েছে, তথাপি কয়েকটি সংস্কৃত নামযুক্ত বিষয়ের বিবৃতি আছে, যেমন সংগীতের তাল ও রাগ-রাগিণী। তাঁর শব্দকোষ এখন পাওয়া যায় না। নব সংস্করণের জন্য তিনি গ্রন্থের আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, শুনেছি তৎসম শব্দ যোগ করে অভিধানও পূর্ণাঙ্গ করেছেন। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে এই বহু তথ্যপূর্ণ অদ্বিতীয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের আয়োজন হচ্ছে।

বহুমূল্য কোষগ্রন্থ কেনা সকলের সাধ্য নয়, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন প্রকাণ্ড গ্রন্থ নাড়াচাড়া করাও অসুবিধাজনক। ইংরেজীতে বড় মাঝারি ছোট অনেক রকম সাইক্লোপিডিয়া আছে। ছোটগুলির দাম বেশী নয়। তাতে যে বিবৃতি থাকে তা খুব সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি কাজ চলে। বাংলায় এই রকম ছোট কোষ রচনার চেষ্টা কয়েকজন করেছেন, কিন্তু ইংরেজী গ্রন্থের সঙ্গে কোনওটির তুলনা হয় না।

একটি ছোট সুসংকলিত প্রামাণিক বাংলা সাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন আছে। হাজার বার শ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ যদি পনরো-কুড়ি টাকার মধ্যে পাওয়া যায়

...র বোধ হয় ক্রেতার অভাব হবে না। ...রেজীর নকলে এই ছোট গ্রন্থের নাম ...শবকোষ' বা ওই রকম কিছু দিলে ...তিরঞ্জন হবে। 'বিষয়কোষ' নাম চলতে ...রে। শব্দকোষ বা অভিধানের প্রধান ...দ্দেশ্য—শব্দের রূপ অর্থ ও প্রয়োগ-...ধির নির্দেশ। বিষয়কোষের উদ্দেশ্য—...ষয় (subject), অর্থাৎ পদার্থ, জাতি ...lass), ব্যক্তি (individual), স্থান, ...না প্রভৃতির বিবৃতি। শব্দকোষ যেমন ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সহায়, বিষয়কোষ সেইরূপ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন ও জ্ঞান লাভের সহায়।

যে কোষগ্রন্থের প্রস্তাব করছি তার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার গৌরব বর্ধন নয়, শুধুই উপস্থিত প্রয়োজন সাধন। সাধ্যের অতিরিক্ত সংকল্প করলে কাজ অগ্রসর হবে না, হয়তো পন্ড হবে। এমন একটি গ্রন্থ চাই যা থেকে ছাত্র শিক্ষক লেখক পাঠক সাংবাদিক রাজনীতিক ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই দেশীয় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর পান। যা ইংরেজী গ্রন্থে পাওয়া যায় তা দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না, তাতে সম্পাদনের শ্রম আর প্রকাশের খরচ অনর্থক বাড়ানো হবে। আমরা এখনও ইংরেজী ভাষার চর্চা করি। যখন ইংরেজী বর্জন করব, তখন বিষয়কোষের পরিধি বাড়ালেই চলবে, যাতে বিদেশী গ্রন্থের দরকার না হয়। আপাতত পাশ্চাত্ত্য কোনও বিষয় জানতে হলে ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়াই দেখব। যা তাতে নেই, যা নিতান্ত এদেশের, শুধু তার জন্যই বাংলা বিষয়-কোষের প্রয়োজন।

শব্দকোষের মতন বিষয়কোষ বর্ণানুক্রমেই সংকলিত হওয়া আবশ্যক। বিষয়ের শ্রেণী অনুসারে ভাগ করলে (অর্থাৎ বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প জীবন-চরিত ইত্যাদি পৃথক পৃথক দিলে) সুবিধা হবে না। প্রস্তাবিত গ্রন্থে আল্পস্, লণ্ডন, পিরামিড, তড়িৎতত্ত্ব, সাইক্লোট্রন, ব্যাক-টিরিয়া, বাওবাব-বৃক্ষ অনাবশ্যক, কিন্তু অবিভক্ত ভারতের নগর পর্বত নদী মন্দিরাদি, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, শাল, সেগুন, ধান, যব, গম, আম, কাঁঠাল, কলা থাকবে। এদেশের চটকল, কাপড় কল, কাগজ, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, লোহা, তামা, এঞ্জিন, টেলিফোন, বন্দুক কামান বারুদ প্রভৃতির কারখানা, দামোদর পরি-কল্পনা ইত্যাদির কথাও থাকবে। সীজার, শেক্সপীয়র, মার্কস, স্তালিন, চার্চিল, ফরাসী-বিপ্লব, ইওরোপীয় দর্শন সাহিত্য ও কলা বাদ যাবে; চন্দ্রগুপ্ত কালিদাস তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথ, বরাহমিহির, গান্ধী, সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতীয় দর্শন সাহিত্যকলা দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাদ যাবেন, আলেকজান্ডার, হিউএন্‌ত্‌সাং, মহম্মদ ঘোরি, অলবেরুনি, ভিক্টোরিয়া থাকবেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটেছিল। কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ থাকবেন, বিদেশী হলেও জরথুস্ত্র খৃষ্ট মহম্মদ সেন্ট টমাস থাকবেন, কারণ এঁদের সঙ্গে বহু ভারতবাসীর ধর্মীয় সম্বন্ধ আছে; কিন্তু আখেনাটেন সেন্ট পল মার্টিন লুথার বাদ যাবেন। কংগ্রেস মোসলেম লীগ

হিন্দু মহাসভা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি ভারতীয় রাজনীতিক দল থাকবে, কিন্তু বাৎসী বলশেভিক কুমেনটাং প্রভৃতি বাদ যাবে।

কিউবা কোথায়? প্লেটোর প্রধান রচনাবলী কি কি? ক্যাসানোভা কে? আইফেল টাওয়ার কি? ইভোলিউশন থিওরি কি? জেসুইট কোয়েকার মরমন কারা? এই সব প্রশ্নের জন্য আমরা ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়া দেখব। বাংলা বিষয়কোষে দেখব—মাণ্ডি রাজ্য কোথায়? ভাস কবির প্রধান রচনা কি কি? পরাগল খাঁ কে? যন্ত্রমন্ত্র কি? নব্য ন্যায় কি রকম? মিতাক্ষরা আর দায়ভাগের প্রভেদ কি? নাথপন্থী কর্তাভজা ওআহাবী কারা?

এই রকম একটি বিষয়কোষ রচনা করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সমবেত চেষ্টা চাই। তাঁরা এক বা একাধিক সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে লিখবেন অথবা তথ্য যোগান দেবেন। বাংলা দেশে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের তুল্য অশেষজ্ঞ পণ্ডিত দ্বিতীয় নেই। বয়স ছিয়ানব্বই হলেও তাঁর নানা বিষয়ে আগ্রহ আছে, এখনও তিনি লেখেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থের সম্পাদনের ভার তাঁকে দিতে বলছি না, লেখার জন্য কিছুমাত্র পীড়ন করতেও বলছি না। বিষয়কোষ যাঁরা রচনা করবেন তাঁদের কর্তব্য হবে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ রাখা, তাঁর উপদেশ নেওয়া, এবং তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। নানা বিদ্যায় তাঁর অধিকার আছে, ভারতীয় জ্যোতিষ উদ্ভিদ প্রাণী এবং চিরাগত শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান, এমন অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে যা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা জানেন না। এদেশের লোকাচার এবং ব্রত-পূজাদি সম্বন্ধেও তিনি অনেক জানেন। তিনি বর্তমান থাকতে তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে যদি তথ্য আহরণ না করি, তবে আমরা বঞ্চিত হব।

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ কে করবেন? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ জড়ত্ব লাভ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় নিত্য কর্ম আর শিক্ষার সংস্কার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, নূতন কিছুতে হাত দেবেন মনে হয় না। উত্তর ও মধ্য প্রদেশের সরকার নিজ ভাষার উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করছেন, শুনেছি একটি ছোট হিন্দী সাইক্লোপিডিয়া রচনারও আয়োজন হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র-পুরস্কার ছাড়া বাংলা ভাষার জন্য কিছু খরচ করেন কি না জানি না। নানা পরিকল্পনা আর বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য তাঁরা অজস্র টাকা যোগাতে পারেন। যাতে এদেশের শিক্ষার সাহায্য হয়, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলাভ হয়, এমন একটি উদ্দেশ্যের জন্য তাঁরা কি কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে পারেন না? রাধাকান্ত দেব, মহাতাব চাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের তুল্য কোনও বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তি বা ধনী বাঙালী ব্যবসায়ী যদি সাহস করে গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেন, তবে তাঁদের ক্ষতি না হয়ে লাভেরই সম্ভাবনা।

গ্রন্থ রচনার জন্য এমন একদল লোকের প্রয়োজন হবে যাঁরা ভূগোল ইতিহাস পুরাণ দর্শন বিবিধ বিজ্ঞান, কৃষি গোপালন খনিকর্ম শিল্প চিকিৎসা স্বাস্থ্য-তত্ত্ব আইন রাজনীতি অর্থনীতি পরি-সংখ্যান প্রত্নতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব লোকাচার সাহিত্য চারুকলা স্থাপত্য, বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়, খ্যাত লোকের জীবনচরিত, ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ। যাঁরা শুধু পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাই শিখেছেন তাঁরা বেশি কিছু করতে পারবেন না। এদেশের ঐতিহ্য প্রকৃতি আর আধুনিক শিল্পোদ্‌যোগ সম্বন্ধে যাঁরা খবর রাখেন তাঁরাই এই কাজের যোগ্য। খ্যাতিমান সাক্ষীগোপাল বা অতি বৃদ্ধ অক্ষম লোককে সম্পাদনের ভার দেওয়া বৃথা। যিনি (বা যাঁরা) কর্মঠ ও বহুজ্ঞ, এমন লোককেই সম্পাদকপদে বরণ করতে হবে। সম্পাদক এবং সহকর্মী সকলকেই পরিমিত পারিশ্রমিক দিতে হবে, বেগারে কাজ চলবে না।

যদি জনকতক উৎসাহী সুশিক্ষিত লোক অগ্রণী হন তবে এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হতে পারবে। দু শ বৎসর আগে ফ্রান্সে কয়েকজন পণ্ডিত যার উদ্যোগ করেছিলেন এবং চার্চের বশংবদ রাজশক্তির প্রবল বাধা সত্ত্বেও যা সমাপ্ত করেছিলেন, তার চাইতে অনেক ছোট একটি গ্রন্থ রচনা কি এই যুগের বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব?

সবুজপত্রের আড্ডা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর চিঠিতে সবুজ-পত্র গোষ্ঠীর কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠী বলে কিছু ছিল না এবং সবুজপত্রে সে রকম গোষ্ঠী তৈরী হয়ে ওঠেনি। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সবুজপত্রের প্রাণ। তাঁর চারিপাশ ঘিরে লেখকেরা জমা হ'ত। তাঁর সংগে তুলনায় তাঁরা ছিলেন নাবালক—বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে। তাঁর চারি পাশ ঘিরে একটা দল তৈরী হয়েছিল যাকে প্রমথ চৌধুরীর গোষ্ঠী বলা যায়, সবুজ পত্রের গোষ্ঠী বলা চলে না।

আশ্রমিক সংঘের সংগে সবুজপত্রের যোগ কোথায়? সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের যোগ। রবীন্দ্রনাথকে কোন গোষ্ঠীতে জায়গা দেওয়া যায় না, তিনি ছিলেন সমস্ত গোষ্ঠীর। তবু বলব রবীন্দ্রনাথ না থাকলে সবুজপত্র থাকত না।

বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রের স্থান কোথায়—সবুজপত্রে যাঁরা লিখতেন তাদের বলায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। ইতিহাসে তার কি স্থান হবে ভবিষ্যতকালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তার বিচার করবে, যাঁরা সবুজপত্রের লেখার সংগে পরিচিত তাঁরা তার বিচার করবে, আমাদের কথার কোন মূল্য নেই। বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রের স্থান কোথায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে বাইরে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে হবে, যাঁরা সবুজপত্রের সংগে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মতামত গ্রাহ্য নয়। সবুজপত্রের বাইরে দু-একটা দল ছিল—যাদের মন এর চিন্তাধারাকে পছন্দ করতো না। সুরেশানন্দবাবুর কাছে কিছু চিঠি আছে—তার থেকে কিছু খবর আপনারা পাবেন।

সবুজপত্র যখন প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমি কলকাতার বাইরে ছিলাম। সবুজপত্র কিছুদিন চলার পর আমি এখানে আসি। কিভাবে সবুজপত্র প্রথম আরম্ভ হয়, কেন আরম্ভ হয়, এ সব কথা চৌধুরী মহাশয় আমাদের কাছে অনেকবার বলেছেন। তিনি বলেছেন—নূতন ভাবধারা প্রকাশের জন্য একখানি মাসিক পত্রের দরকার; এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন—প্রমথ চৌধুরী যদি সম্পাদক হয়, তাহ'লে তিনি সবুজপত্রের সংগে যুক্ত থাকতে রাজী আছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন—এ ছিল একটি আড্ডা। এই আড্ডা ছিল মস্ত বড় আকর্ষণের বস্তু। সবুজপত্র ছিল আনুসংগিক, আড্ডাটা ছিল জমকাল। আড্ডা বসত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায়। সেখানে বহুলোক জমা হ'ত। যাঁরা সবুজপত্রে লিখতেন না এমন অনেক ব্যক্তির সেখানের নিত্য আনাগোনা ছিল। আমি যখন প্রথম যাই, তখন আড্ডাটা খুব জমে উঠেছিল। আমি যাই আমার আত্মীয় কিরণশংকরের সংগে। যে একবার যায়, অসম্ভব না হ'লে সে না যেয়ে থাকতে পারত না। সেখানে নানারকম আকর্ষণ ছিল। গান-বাজনা ছিল, খাওয়া-দাওয়া ছিল, আলোচনা ছিল। গুরুগম্ভীর আলোচনা নয়—আড্ডায় যা হয় তাই হ'ত। তার ভিতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, নানা দেশের সাহিত্যের কথা, প্রথম যুদ্ধের আরম্ভের সময় যে সাহিত্য চলছিল সে সম্বন্ধে ক্রমাগত আলোচনা হ'ত। ভাষার তর্ক তখন আরম্ভ হয়েছে, কথ্যভাষা ও লেখ্যভাষা নিয়ে আলোচনা হ'ত। ধূর্জটিপ্রসাদ যে আবহাওয়ার কথা বলেছেন সে আবহাওয়া ছিল তার ভিতর। একটি প্রধান ব্যাপার ছিল—কোন কথাকেই না বাজিয়ে মেনে নেওয়া হবে না। বাংলার ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা, অনেক সমালোচনা হয়েছে। তার সংগে এই একটি কথার যোগ ছিল প্রাচীনকে যদি আমরা সমালোচনা করি, নবীনকেও সমানভাবে সমালোচনা করব, না বাজিয়ে কোন জিনিসকে আমরা গ্রহণ করব না। প্রাচীনকালে যা হয়েছে তাকে যদি বাজিয়ে নিতে হয়, তবে আধুনিককালকেও সমানভাবে বাজিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ আপ্ত প্রমাণে কোন জিনিসকে আমরা গ্রহণ করব না। এই ছিল মূল ধারা। প্রাচীন আচার্য বলেছেন বলেই তাকে যদি না মেনে নিই তবে নূতন আচার্য বলেছেন বলে তাকে না বাজিয়ে নিতে পারি না। আলোচনা ছিল ঘরোয়া, কিন্তু সমস্ত রকম আলোচনাই হ'ত।

চৌধুরী মহাশয়ের লেখা যখন সবুজপত্রে বেরুতে আরম্ভ হ'ল তখন তার প্রকাশের ধরন ছিল বাংলা সাহিত্যে নূতন জিনিস। আজ আপনারা বাংলা লেখা যদি পড়েন এবং সবুজপত্রে পূর্বযুগে যাঁরা লিখতেন, তাঁদের লেখা যদি পড়েন, তাহ'লে প্রভেদ বুঝতে পারবেন। যে রকম যত্নে চৌধুরী মহাশয় লিখতেন, সেটা বাংলা সাহিত্যে নূতন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের লেখা যদি ছেড়ে দেন, যারা প্রতিভাবান লেখক নয়, অথচ যাদের লেখবার ক্ষমতা আছে, তাদের লেখা যদি দেখেন এবং তার সংগে এখনকার লেখকদের যদি তুলনা করেন, তাহ'লে দেখবেন

সে লেখা কত স্পষ্ট, কত যত্নশীল। সবুজ-পত্রে যাঁরা লিখতেন, তাঁদেরকে তিনি বরাবর বলেছেন—লিখবে যত্ন ক'রে। যা মনে আসবে সেটা প্রকাশের ভাষা একেবারে যুগিয়ে যাবে এটা মনে করা ঠিক নয়। এক আনা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ লেখক; তাঁদের কথা আলাদা। তাদেরকে ছেড়ে দিলে যে পনর আনা লেখক বাংলা সাহিত্যে থাকে তারাই আমাদের ভাষাকে নিত্য উজ্জ্বল প্রবাহমান করেছে, যে-কোন লেখায় এখন সেটা দেখতে পাবেন। যা লিখবে অল্প কথায় সেটি প্রকাশ করবে—এ ছিল চৌধুরী মহাশয়ের শিক্ষা। তিনি পুনঃ পুনঃ সে কথা বলেছেন। আমাদের মধ্যে একজন লেখক ছিলেন, তিনি এ-সভায় আসতে পারেননি, চৌধুরী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য। একদিনে আট লাইন লেখা হ'লে তিনি মনে করতেন বেশী লেখা হয়েছে। এটা চৌধুরী মহাশয়ের শিক্ষার চরম পরিণতি। যা' তা' করে মনের কথা প্রকাশ করতে হবে তা নয়। যতদূর সম্ভব অল্প কথায় ভাব প্রকাশ করতে হবে এবং ঠিক জায়গায় শব্দ বসাতে হবে— এটা তিনি শিষ্যদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আমি বাঙালী লেখকদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন চৌধুরী মহাশয়ের লেখা মন দিয়ে পড়েন। তাঁর প্রকাশের যে ভঙ্গিমা সেটা তাঁর নিতান্ত নিজস্ব ছিল। অনেকে তার নকল করতে চেষ্টা করেছেন, ফল খারাপ হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর রসিকতা নকল করতে চেষ্টা করেছেন—সার্থক হননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রসিকতা ছিল আধুনিক ও প্রাচীন দেশী ও বিদেশী সব বিষয় নিয়ে। তাঁর লেখা আজকের দিনে যাচাই করবার সময় এসেছে। তিনি বহু জিনিসের আলোচনা করেছেন। প্রাচীন

A. 43

কালের কথা আলোচনা করেছেন, যে-মন নিয়ে আজকের ব্যাপার তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সব আলোচনার মধ্যে যে ধারা, তাঁর যে-মন প্রকাশ পেয়েছে তাকে জানা দরকার। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে মুশকিল। প্রথম যে যুগ সেটা ছিল আড্ডার যুগ। তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ তত ছিল না। আমি দূরে দূরে থাকতাম। সবুজ পত্রের প্রথম যুগ চলে' যাওয়ার পর যখন সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নানান জায়গায়, তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ খুব জমে ওঠে। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার যে পরিচয় হয়, সে ছিল গভীর। আমি ছিলাম তখন সেই সঙ্ঘের একমাত্র অবশেষ। চৌধুরী মহাশয়কে তখন আমি নিবিড়ভাবে জানতে পেরেছি। তাঁর মন ছিল তখন দেশ-বিদেশের সাহিত্যের মধ্যে মগ্ন। চৌধুরী মহাশয় আর আমি অনেক আলোচনা করেছি। সে আলোচনায় সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা ফিরে ফিরে আসত। এমন সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম যিনি সাহিত্যকে জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্য ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান। তাঁর লাইব্রেরীতে অনেক বই ছিল, ফরাসী বই-এর সংগ্রহ ছিল খুব বেশী। যত্ন করে তিনি ফরাসী বই বাঁধিয়ে রাখতেন। তাঁর দাদা আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তাঁর লাইব্রেরির সব বই কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। দাদার অনুসরণে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর ফরাসী ভাষার পুস্তক সংগ্রহ ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সকল বই-এর পক্ষে যে খুব উপযুক্ত স্থান ছিল মনে হয় না। আর কিছু দিয়েছেন শান্তি-নিকেতনে। আশা করি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকেরা তার সদ্ব্যবহার করছেন।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমার জীবনের বড় পরিচয় হয় তাঁর শেষ কয় বৎসরে। মরণের সময় আমি কাছে ছিলাম না। আমি ছাড়া তাঁর কথা তখন বড় কেউ বুঝতে পারত না।

সে যুগটা ছিল আমাদের সবার পক্ষে জীবনের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সে যুগের টুকেরী কথা যদি আপনারা শুনতে চান—অনেকে আছেন যাঁরা আসতে পারেন নি। ইন্দিরা দেবী হচ্ছেন তাঁদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। সবুজ পত্রের তুচ্ছ কাগজপত্রও বোধ হয় তিনি রেখেছেন—খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। গল্পচ্ছলে চৌধুরী মহাশয় যা বলতেন, তারও কাগজপত্র বোধ হয় তাঁর (ইন্দিরা দেবীর) কাছে আছে। আড্ডায় মাঝে মাঝে বড় বড় গান-বাজনার মজলিশ হত। কলেজ জীবনে আমরা গান শুনতে ভালবাসতাম। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সভাপতি হতেন। তাঁকেও আমরা ছাড়তাম না। তিনি বলতেন—সভাপতির গান গাওয়া অশোভন। আমরা শুনতাম না। পুরানো ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক সভায় রবীন্দ্রনাথ একবার সভাপতি হলেন। আমরা তাঁর গান শুনবার জন্য বসে রইলাম। গুরুদাসবাবুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের পক্ষ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন। ইন্দিরা দেবীকেও আমরা গানের ফরমাস্ করেছি। সে সব দিনের কিছু চিঠিপত্র আমার কাছেও ছিল—কিন্তু আমি যত্ন করে রাখিনি। অনেকে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের যে সব চিঠিপত্র বিশ্বভারতী থেকে বের হচ্ছে, তার থেকেও সবুজ পত্রের যুগের অনেক কথা পাবেন। রবীন্দ্রনাথ একবার চীন থেকে ঘুরে এলে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রমথবাবু আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—ধূর্জটি যে কোন ব্যক্তির নাম হতে পারে, এ আমার ধারণা ছিল না। আমি মনে করেছিলাম, প্রমথই ঐ নামে লিখছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ উপস্থিত থাকলে অনেক কথা বলতে পারতেন। সম্ভবত তাঁর কাছে অনেক চিঠিপত্রও আছে। প্রমথ চৌধুরীর লেখা চিঠি সত্যেনবাবু, হারিতবাবুর কাছেও থাকতে পারে। সুরেশানন্দবাবুর কাছে ২।১ খানা চিঠি আছে, এখন তিনি সেগুলি পড়বেন।*

---

* শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৯৫২ সালে 'সবুজপত্রী'দের এক সম্বর্ধনা সভা হয়। সেই সভায় শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীইন্দুকুমার চৌধুরীর অনুলেখন অনুসারে সে-আলোচনা প্রস্তুত হল।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

অন্নদাশংকর রায়

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর কাছে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করেছিলুম যে, ভারতের সংস্কৃতি হচ্ছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মতো তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রাচীন আর্য বা হিন্দু। মধ্যযুগীয় মুসলিম বা সারাসেন। আধুনিক ব্রিটিশ বা ইউরোপীয়।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটি বেণী ছাঁটা হলো। ইংরেজের সঙ্গে তখন আমাদের শত্রুতা চলছে। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি যে তাদের সংস্কৃতির কাছে ঋণী, এ চিন্তা আমাদের অসহ্য লাগত। ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে ইউরোপের দান বাদ দিলে যা থাকে, তা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পদ। গঙ্গা-যমুনার যুক্ত বেণী। সরস্বতী একদম লুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের এটা ভালো মনে হয়নি। কিন্তু কে শোনে তাঁর প্রতিবাদ। আমরা তখন নিশ্চিত জেনেছি যে, গোটা ইংরেজ আমলটা আমাদের ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত। ওটা আমাদের উপর গায়ের জোরে চাপানো হয়েছে। আমরা যদি ওর দ্বারা সম্মোহিত হই, তবে আমাদের সেটা দাস মানসিকতা। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাইকে আমরা দাস মানসিকতায় দাগী করে আত্মপ্রসাদ বোধ করলুম। কেবল ছাড় দিলুম সিপাহী বিদ্রোহের নায়কদের এবং তাঁদেব মানসিকতায় দীক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের। খেয়াল ছিল না যে, ইংরেজের উপর রাগ করে আস্ত আধুনিক যুগটাকেই বর্জন করছি।

তার পরে বেধে গেল হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। প্রথম প্রথম তার পিছনে আমরা একমাত্র ইংরেজের হাত দেখতে পেলুম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর আমাদের চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। মুসলমানের উপর রাগ যতই বাড়তে থাকল, ততই আসতে লাগল মুসলিম ধারা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা। একটু একটু করে আর একটি বেণি ছাঁটা গেল। সেটা মুসলমানেরও ইচ্ছায়। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝলুম মুসলিমবর্জিত। তার মানে একাদশ শতাব্দীর পূর্বে। যখন সোমনাথের মন্দির কলুষিত হয়নি। আর ও'রা বুঝলেন হিন্দুবর্জিত। তার মানে আরব-ইরান প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত দেশের। যেখানকার রাষ্ট্র নাকি ইসলামী রাষ্ট্র।

পাকিস্তান হাসিল হবার পর অনেকে আশা করেছিলেন যে, হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠা হবে। সেখানকার সংস্কৃতিতে কেবলমাত্র গঙ্গাই থাকবে গঙ্গাজলের শুদ্ধতা নিয়ে। যমুনা থাকবে না। সরস্বতী থাকবে না। ইতিহাস থেকে প্রায় হাজার বছর কাটা পড়বে। কিন্তু ইংরেজীর বদলে হিন্দী শিখতে হবে শুনে টনক নড়ল। তখন ইংরেজীর খাতিরে ইংরেজ আমলটাকে কোন রকমে হজম করা গেল। অন্তত ইংরেজী শিক্ষাটাকে। ইংরেজ আমলটা যত খারাপ হোক না কেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনটা বেশ ভালো কাজ হয়েছিল। তবে তাতে রামমোহনের বাহাদুরি নেই। তিনি যে মুসলমানদের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন। সেটা নিষ্ঠাবান হিন্দুদেরই সুকৃতি। রামমোহন গেলে রবীন্দ্রনাথও যান। ব্রাহ্মসমাজ যায়। থাকেন তা হলে 'শশধর, হাকসলী ও গুজ্'। ইংরেজ আমলে ঐটুকুই আমাদের লাভ। আর সব লোকসান।

এই কয় বছরে মাথা অনেকটা সাফ হয়েছে। তবে যবনবিদ্বেষ এখনো বিদ্যমান। সরস্বতীকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যমুনাকে না। উত্তর প্রদেশ—যেখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—সেখান থেকে যমুনাকে সর্বতোভাবে সরাতে হবে। শাসনতন্ত্রে উর্দু পড়ানোর বিধান আছে, তবু উর্দু পড়ানো চলবে না। মুসলমান যদি থাকে তো হিন্দী পড়তে বাধ্য। তাও যদি সে পড়ল, তবে তার ...র খাওয়া বন্ধ করতে হবে। এবার দেখ... বে কেমন করে সে থাকে। তা সত্ত্বেও যদি থেকে যায়, তবে অন্য কোনো ...ায় খুঁজতে হবে। নইলে শুদ্ধি কেমন করে সম্ভব হবে?

সংস্কৃতিকে শুদ্ধ করতে হবে; এ ...ত নামতে চায় না। যা হাজার বছর ...লা মিশ্র, আজ তাকে অমিশ্র করার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। হাজার বছর? তার আগেও কি মিশ্র ছিল না? শক হূন কুশান ইত্যাদি কি বাইরে থেকে এসে গঙ্গাপ্রবাহে মধ্য এশিয়ার বারিধারা মেশায়নি? আরো আগে আর্য দ্রাবিড় মঙ্গোল কোল ইত্যাদি? বৈদিকের সঙ্গে বৌদ্ধ, ষড়্-দর্শনের সঙ্গে আরো ছয়টি দর্শন, আস্তিক্যের সঙ্গে নাস্তিক্য? সংস্কৃতির স্বভাবই এই যে, তার মধ্যে বহু স্বতঃ-বিরোধ, স্ববিরোধ থাকে। যে সংস্কৃতি নানা বিবাদী সুরকে সঙ্গতি দিতে জানে না, সে তার শুদ্ধতা নিয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়। আমাদের সংস্কৃতি যে এখনো বিলীন হয়নি, তার কারণ বৈচিত্র্যকে অশুদ্ধ বলে বর্জন করা যৌবনকালে তার স্বভাব ছিল না। এ-ভাব এসেছে বৃদ্ধ-বয়সে। জরাকে যৌবনে পরিণত না করলে সে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকেও জরাগ্রস্ত করবে।

সংস্কৃতির মধ্যে কেবল একটি নয়, একাধিক ধারার স্বর-সঙ্গতি রয়েছে। কি ভাষা, কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত, কি চিত্রকলা, কি ভাস্কর্য, কি স্থাপত্য, কি বেশভূষা, কি রন্ধনকলা, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি সমাজতত্ত্ব—যেদিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ত্রিবেণীর জল। শুদ্ধ গঙ্গাজল নয়। এমনকি, ধর্মেও সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। ইদানীং অবশ্য আর শোনা যায় না যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর খৃষ্টীয় ও মুসলমান মতের সাধনা। অবিকল রামমোহন যা চেয়ে-ছিলেন। গান্ধী যা চেয়েছেন। খৃষ্টধর্ম প্রায় উনিশ শতাব্দী ধরে ভারতের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়েছে। ইসলাম প্রায় হাজার বছর ধরে। ভারতের মাটির গুণে তাদেরও পরিবর্তন ঘটেছে, তারাও

রিবর্তন ঘটিয়েছে। তার ফলে বিশুদ্ধ ন্দু বা বিশুদ্ধ মুসলমান বলে কেউ ই। বিশ্বাসের দিক দিয়ে সকলেই ল্পাবিস্তর মিশ্র।

তিনটি বেণীর মধ্যে গঙ্গা চিরদিনই ড় ছিল, চিরদিনই বড় থাকবে। তা বলে মুনা ও সরস্বতী উড়ে যাবে না। রাজ-নৈতিক মনোমালিন্য থেকে যে বর্জনশীল নোভাব আসে, তা শেষ পর্যন্ত আপনাকেই বিড়ম্বিত ও বঞ্চিত করে। ইংরেজী পড়ব না, উর্দু শিখব না, দেড়শো ছরকে অবহেলা করব, হাজার বছরকে অবজ্ঞা করব, এতে আমাদেরই ক্ষতি। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ আত্মখন্ডন করে না। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই প্রকৃতিস্থ অবস্থা, যা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ছিল। এর জন্যে ইংরেজের বা পাকিস্থানী কর্তাদের শুভবুদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকা যায় না। যা সত্য, তা স্বয়ংক্রিয়। তা অন্যের মুখ চেয়ে নিষ্ক্রিয় নয়। ভারতের সংস্কৃতি যদি ত্রিবেণীসঙ্গম হয়ে থাকে, তবে তা এই কয়েক বছরের দুর্ঘটনার ফলে দ্বিধা বিভক্ত হতে পারে না। আমরা যা হয়েছি, তা বহু সহস্র বছরের বিবর্তনে হয়েছি। তার মধ্যে ... হাজার বছরও পড়ে। গত দেড়শো ব... পড়ে। মুসলমান আমল ও ইংরেজ আ... অকারণে হয়নি, অকারণও হয়নি। শা... ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ... অবশ্যম্ভাবী প্লাবন আমাদের জাতি... জীবনের ঊষরতম মুহূর্তে ঘটেছে ... উর্বরতা বিধান করেছে। ভাঙন অপ্রীতি... কর, পলিমাটি প্রীতিকর। ভাঙনের কথা মনে পুষে রাখব না. পলিমাটির উপর নতুন ফসল ফলাব।

ত্রিবেণীর সঙ্গে আমি আর একটি বেণী যোগ করতে চাই। সেটি ভারতেরই চিরউপেক্ষিত লোক-সংস্কৃতি। গঙ্গা-যমুনা সরস্বতী আমাদের সকলের দৃষ্টি জুড়েছে, দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে ফল্গু। লোক-সংস্কৃতির চর্চার জন্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তার ধার ধারে না। মাঝে মাঝে গ্রামের গায়কদের শহরে এনে গান করানো হয়, সেটা তাঁদের স্বস্থান নয়, সেখানে তাঁদের উপযুক্ত আবহাওয়া নেই। মাঠের রাখালকে এনে মঞ্চে দাঁড় করালে সে মাঠের অভাবে মিঠে বাঁশি বাজাতে পারবে না। সাঁওতাল সঙ্ সাজবে। বাউল বৈল্লিক হবে। এদের চরিত্রভ্রষ্ট করে কার কী লাভ! লোক-সংস্কৃতির দিকে মন যাচ্ছে, এই যা সুফল। কিন্তু এতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এটা চতুর্থ একটা ধারা। অথর্ব বেদের মতো সবচেয়ে পুরাতন অথচ সবচেয়ে নতুন। এর ইতিহাস কেউ জানে না, অথচ সকলের ইতিহাস এর মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে। এক একটি রূপকথা প্রায় প্রাক্-ঐতিহাসিক। এক একটি ছড়ার বয়সের গাছপাথর নেই। অথচ মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে তা নিত্য নবীন।

ভবিষ্যতে যারা সংস্কৃতির গর্ব করবে তাদের এই চারিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বৈদিক বৌদ্ধ সংস্কৃতির ম্যাট্রি-কুলেশন, মুসলিম সংস্কৃতির ইণ্টার-মিডিয়েট, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বি-এ আর লোক-সংস্কৃতির এম-এ। ইচ্ছা করলে উল্টো দিক থেকেও পাশ করা যায়। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যাবে, যদি এর কোনো একটি অঙ্গ বাদ পড়ে। চারটি অঙ্গ মিলেই আমাদের সংস্কৃতি চতুরঙ্গ।

গেরাসিম স্তেপানোভিচ্ লেবেদিয়েভ্

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে প্রথম নাম এক ইউরোপীয়ের। কলিকাতা-প্রবাসী এই রুশীয় পণ্ডিত গেরাসিম্ স্তেপানোভিচ্ লেবেদিয়েভ্, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর একখানি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন। ইহার পূর্বে কোন বাংলা নাটক কোন সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছে বলিয়া এযাবৎ জানা যায় নাই। সুতরাং আমাদের নাট্যশালার ইতিবৃত্তে লেবেদিয়েভের এই প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। তিনিই প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয়ের উদ্যোক্তা যদিও তাঁহাকে ঠিক প্রথম বাংলা নাট্যকার বলিতে পারি না। কারণ অভিনীত নাটকখানি এক ইংরেজী নাটকের অনুবাদ—অনুবাদক স্বয়ং লেবেদিয়েভ্। এ-নাটক মুদ্রিত হয় নাই—ইহার পাণ্ডুলিপিও লুপ্ত। এই পাণ্ডুলিপি বা এই সম্বন্ধে তথ্যের অনুসন্ধানে রুশ সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করিয়া জানিয়াছি যে, এই নাটকের কোন চিহ্ন সে দেশে নাই। তবে এই পত্রালাপের ফলে লেবেদিয়েভ্ সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সম্পৃক্ত সেই তথ্যনিচয়ই এ প্রবন্ধের বিষয়।

লেবেদিয়েভের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সম্বন্ধে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাঃ গ্রীয়ার্সন ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। তারপর এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন ডাঃ সুশীলকুমার দে ১৯২৫ সালে ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিশেষ তথ্যবহুল প্রবন্ধে। শুনিয়াছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত লেবেদিয়েভের "A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects" গ্রন্থখানি ডাঃ দে-ই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সহিত লেবেদিয়েভের সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে নিবদ্ধ।

লেবেদিয়েভের ভারতে অবস্থান ও ভারতীয় বিদ্যার অনুশীলন সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার উল্লিখিত বইখানির

БАГУАТ-ГЕТА,

или

БЕСѢДЫ

КРИШНЫ

съ

АРЖУНОМЪ,

съ примѣчаніями,

Переведенныя съ подлинника писаннаго на древнемъ Браминскомъ языкѣ, называемомъ Санскрита, на Англїйской, а съ сего на Россїйской языкъ.

МОСКВА,

Въ Университетской Типографіи у Н. Новикова.

1788.

গীতার রুশীয় অনুবাদের নামপত্র

ভূমিকায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন। বস্তুত এযাবৎ এ ব্যাপার লইয়া যত গবেষণা হইয়াছে, তাহার প্রধান উপজীব্য এই ভূমিকা। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় লণ্ডনে ১৮০১ সালে। কিন্তু আট বৎসর পূর্বে মস্কোর এক পত্রিকায় এই রুশ ভারতীয়-তত্ত্ববিদ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে এমন অনেক সংবাদ পাই যাহা উল্লিখিত বইয়ের ভূমিকায় পাই না এবং যাহা আমাদের কাছে একেবারে নতুন। অধ্যাপক স্টাইনবার্গ লিখিত এই প্রবন্ধের এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীত্রিদিব চৌধুরী সম্পাদিত ক্রান্তি"র" প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় চৈত্র—১৩৫৪। এই বাংলা প্রবন্ধের মৎকৃত এক ইংরাজী অনুবাদ একটি ক্ষুদ্র ভূমিকাসহ পর বৎসর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে লেবেদিয়েভের ব্যাকরণখানির নামপত্রের একটি প্রতিলিপিও ছাপাইয়াছিলাম।

যাহা হউক, অধ্যাপক স্টাইনবার্গের প্রবন্ধের কয়েকটি সূত্র ধরিয়া লেবেদিয়েভের ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে নতুন তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং এই বিষয়ে নয়াদিল্লীর রুশীয় দূতাবাসের মারফৎ মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রালাপ শুরু করি। রুশ সরকারের মহাফেজখানায় লেবেদিয়েভের একখানি দীর্ঘ চিঠি রক্ষিত আছে। এই চিঠিখানি কলিকাতা হইতে লণ্ডনে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভোরন্‌সভের নিকট লিখিত। ১৮৮০ সালের ভোরনসভ্ রেকর্ডের চতুর্বিংশ খণ্ডে ইহা মুদ্রিত হয়। অধ্যাপক স্টাইনবার্গের প্রবন্ধে এই সংবাদটি পাইয়া চিঠিখানির একটি নকল মস্কো হইতে আনাইয়াছি। এই পত্রে লেবেদিয়েভের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাই। ইহার দুই-একটি কথা অবশ্য স্টাইনবার্গ তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই পত্রের সব কথাই আমাদের শোনার মত কথা—বিদেশীর বাংলা চর্চার ইতিহাসে ইহার মূল্য সমধিক। চিঠিখানির তারিখ ২৬শে জুলাই—১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ; এবং ইহার প্রধান কথা—আমি বহু পরিশ্রম করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সার্থক অনুশীলন করিয়াছি এবং এই অনুশীলনের ফল আমি এখন আমার স্বদেশে প্রচার করিতে উৎসুক; কলিকাতার স্বার্থান্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ ইংরেজগণ আমার এই শুভ প্রচেষ্টার ব্যাঘাত করিতে তৎপর; তুমি আমাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে সাহায্য কর। চিঠিখানির মূল বক্তব্য এই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কোন বিদেশী ইহার পূর্বে এত আগ্রহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহার পূর্বে

কোন মেয়েগুলি সব
চেয়ে সুন্দরী?
আর জিতে
নিন্
প্রবেশমূল্য লাগবে না
২০০০০
টাকা
রেক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা
শেষ তারিখ—
১৬ই মে,
১৯৫৫ সাল
আপনাকে যা ক'রতে হবে তা হোল, একটী প্রবেশপত্র যোগাড় করা আর তাতে যে নয়টী সুন্দরী মেয়ের ফটো দেওয়া আছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা। তারপর আপনার মত অনুযায়ী এদের সৌন্দর্য্য ও শোভা'র যথাযথ পারম্পর্য্যে বসিয়ে যেতে হবে।
আপনার পছন্দ যদি বিশেষ বিচারকমণ্ডলীর নির্দ্ধারিত ক্রমের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে আপনি প্রথম পুরস্কার পেয়ে যাবেন। এর কোন প্রবেশমূল্য নেই—কেবল একটী রেক্সোনা সাবানের মোড়ক প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠালেই হোল।
একটী সাধারণ আকারের রেক্সোনা সাবনের মোড়ক (কিম্বা তিনটী ছোট সাইজ সাবানের মোড়ক) প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠান—একটী বড় সাইজের মোড়ক আপনাকে দুইটী সমাধান পাঠাবার অধিকার দেবে।
প্রত্যেকেই যোগ দিতে পারেন (বোম্বাই রাজ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া)
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
Rexona
রেক্সোনা বিক্রেতার কাছ থেকে
একটী প্রবেশপত্র চেয়ে নিন্।
A B C D E F J M K
RP. 129-X52 BG

জন ইংরাজ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়া, বাংলা অভিধান সঙ্কলিত করিয়া, বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া এবং আইন গ্রহের বাংলা অনুবাদ করিয়া ইংরেজের বাংলা ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রসারে, বিশেষভাবে বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তনে ইঁহাদের চেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিয়াও বলিতে পারি, ইঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাষা শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা নয়। বস্তুত হ্যালহেড্, ডানকান, এড্‌মনস্টোন, ফর্স্টার, আপজন মিলার প্রভৃতির বাংলা চর্চার ইতিহাস বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রজাবর্গের ভাষা শিক্ষার ইতিহাস। ইহাতে বাংলা সাহিত্যের কথা নাই। লেবেদিয়েভের চর্চার বিষয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দুইই। তিনি ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়া তাহা মঞ্চস্থ করেন এবং সেই অভিনয়ের সঙ্গে সেযুগের প্রধান কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যের নির্বাচিত অংশ সুর সংযোগে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করেন। স্টাইনবার্গ বলেন, তিনি রুশ ভাষায় নাটক লিখিয়া তাহা আবার নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেন। এবং ভোরনসভের নিকট লিখিত পত্র হইতে জানিলাম, তিনি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই এবং ইহার পাণ্ডুলিপিরও কোন খোঁজ নাই। তবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি যে, ইহার পূর্বে কোন বাংলা গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় নাই।

যাহা হউক, ভোরনসভের নিকট লিখিত লেবেদিয়েভের পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিয়া উহার এক অনুবাদ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ ভাষার অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অনুগ্রহ করিয়া চিঠিখানির এক ইংরাজী অনুবাদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং এই বাংলা অনুবাদ সেই ইংরাজী তর্জমার অনুসরণেই লিখিতঃ

কলিকাতা, ১৫।২৬ জুলাই, ১৭৯৭
মহামহিমান্বিত কাউণ্ট ভোরনসভ্ বরাবরেষু,
প্রিয় মহোদয়,

আশা করি, আপনার নিকট পত্র লিখিবার আমার এই দুঃসাহসিকতা শুধু মার্জনা করিবেন না, পক্ষান্তরে আমি সাধ্যানুসারে রুশ সাম্রাজ্যের রাজভক্ত প্রজাকুলের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে ব্যগ্র বুঝিয়া আমাকে আপনার কৃপার যোগ্য বলিয়া গণ্য করিবেন। জ্ঞানত ও অজ্ঞানবশত নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়া হিন্দুস্থানের বিবিধ ভাষা আয়ত্ত করিয়া আমি এদেশে যে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছি, সে সংবাদ 'রাইনেল-সারলট্' নামক জাহাজের নাবিকের মারফৎ প্রেরিত পত্রে আপনাকে জানাইয়া ধন্য হইতে ভুলি নাই। যদিও এই জাহাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে আমার পত্রসমূহ আপনার হস্তগত হইয়াছে কিনা, এখনও জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনি এখনও লণ্ডনে অবস্থান করিতেছেন এবং রাজকীয় অশ্বারোহী দলের প্রধান কর্তৃক ইংলণ্ডের মহারাণীর নিকট নীত হইয়াছেন জানিয়া আনন্দিত বোধ করিতেছি। মহারাণী যে আপনাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আপনি পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে যত্নশীল, রাশিয়ার বিস্তৃত জনসমাজ আপনার গৌরবময় পুণ্য জীবনে ধন্য এবং আপনি জারের প্রতিনিধি ও প্রতিমূর্তি। সুতরাং আশা করি, আমি আমার পিতৃভূমির প্রতি অনুরাগবশত বাংলা ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছি এবং বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে যেসব বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছি, তাহা আমাকে আপনার পুত্র জ্ঞান করিয়া আমার দেশবাসিগণের মধ্যে প্রচার করিতে আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি সুবিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক রচিত বর্ধমানের রাজকন্যার

The Honorable Sir John Shore ... Governor General
of Supreme Council
of Fort William
in Bengal

Honorable Sir

The situation of my affairs in combination with ...

I am Honorable Sir
with great respect
Your most obedient
And very humble servant
Gerasim Lebedeff

23rd ... 1797

লেবেদিয়েভের একখানি চিঠির প্রতিলিপি

বাটানগর কারখানায় রবীন্দ্রনাথ

াহ সম্বন্ধে কাব্যখানি অনুবাদ রিয়াছি, একখানি বাংলা অভিধান, এক-নি বাংলা কথোপকথনের গ্রন্থ, বীজ-ণিত সম্বন্ধে গ্রন্থ ও বাংলা পঞ্জিকার ক ভাগ রচনা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত রোপে এ পর্যন্ত অজ্ঞাত সংস্কৃত, লা ও মিশ্র হিন্দুস্থানী ভাষার ক্যাবলীর এক সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছি।

আশা করি, আমার এই পরিশ্রম ও ্যবসায়ের কথা সম্রাট ও সরকারের চরীভূত করিয়া আপনার ন্যায় সদ্বিদ্বান মাকে উৎসাহিত করিবেন। আপনি হাদের স্মরণ করাইয়া দিতে পারেন যে, মার এই রচনাবলী শুধু সাহিত্যের মগ্রী নয়, পরন্তু রাশিয়ার কাছে এ র্যন্ত একেবারে অপরিচিত নানা জাতির ংগে সম্পর্ক স্থাপনে ইহার উপযোগিতা ধিক। যদিও তৈমুরলং মস্কো পর্যন্ত াসিয়াছিলেন, তথাপি এই সকল দেশ ও াতির সংগে রাশিয়ার যে এযাবৎ কোন-প সম্পর্ক ছিল না, তাহা আপনিই শেষভাবে অবগত আছেন। এ পর্যন্ত ান রুশীয় হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত কান গ্রন্থ অথবা প্রাচ্যের কোন দেশের ান গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া-ন বলিয়া জানি না। আমার নিজের ভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, সলমান ও ইউরোপীয় শাসনের ফলে দেশে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইয়াছে, াহাতে এখানকার ভাষা ও অন্যান্য অনেক ছুই এক মিশ্র রূপ ধারণ করিয়াছে। হার ফলে এদেশের আখ্যানসমূহ াহাদের মৌলিক রূপ হইতে এত দূরে রিয়া আসিয়াছে যে, এখন একমাত্র তিভাসম্পন্ন পণ্ডিতগণই এই সকল চনা শোধন ও সংগ্রহ করিতে পারিবেন। গ্র লোভের তাড়নায় যাহারা শৃগালের ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা পশুর ন্যায় বল শিকার অনুসন্ধান করে, তাহাদের ারা এ-কাজ কোনমতেই সম্ভব হইবে না।

এদেশের প্রাচীন দর্শন ও ধর্মানুষ্ঠান ম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে ামি আমার সমস্ত অর্থব্যয় করিয়া কেবারে নিঃস্ব হইয়াছি; এ দেশ সম্বন্ধে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা দ্বারা আমি খন আমার দেশ ও সমাজের সেবা করিতে ই। আমি বিশ্বাস করি, এদেশের যে চিত্র আমি আমার দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিব, তাহা দেখিয়া সকলে প্রীত হইবে। এই ধরনের মূল্যবান অনুবাদকার্যের জন্য এখানে বাৎসরিক বেতন এক হাজার পাউন্ড এবং অনুবাদকগণ বেতন বৃদ্ধির সংগে সংগে উচ্চতম পদের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি বাৎসরিক পাঁচ হাজার রুবল বেতনের এবং যথোচিত মর্যাদাপূর্ণ একটি পদ পাইলেই খুশি হইব। নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমি এই অর্থই আয় করিতাম।

আশা করি, আপনি বিশ্বাস করিবেন যে, আমি শ্রম স্বীকার করিয়া অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়া ডিজ্‌গাইজ্‌ নামে এক ইংরেজি কমেডির বাংলা অনুবাদ করিয়াছি। তারপর কোম্পানীর ম্যানেজার আমাকে কোন নাট্যশালা ব্যবহার করিবার অনুমতি না দেওয়ায় আমি অবশেষে নিজেই সাহস করিয়া চারিশত দর্শকের উপযোগী এক নাট্যশালা নির্মাণ করি। এই নাট্যশালাতেই একমাত্র আমার চেষ্টায় ও ব্যবস্থায় দুই রাত্রি বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা বৃহৎ দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে উক্ত কমেডিখানা অভিনীত হয়। এখানকার পরশ্রীকাতর নাট্যশালাধ্যক্ষগণ যদি আমাকে না ঠকাইতেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অর্থশালী হইতে পারিতাম। এখন আমি ইঁহাদের চক্রান্তের ফলে সর্বস্বান্ত হইয়া

A
GRAMMAR
OF THE
PURE AND MIXED EAST INDIAN DIALECTS,
WITH DIALOGUES AFFIXED,
SPOKEN IN ALL THE EASTERN COUNTRIES,
Methodically arranged at Calcutta, according to the Brahmenian System,
OF THE
SHAMSCRIT LANGUAGE.
COMPREHENDING
LITERAL EXPLANATIONS OF THE COMPOUND WORDS, AND CIRCUMLOCUTORY PHRASES,
NECESSARY FOR THE ATTAINMENT OF THE IDIOM OF THAT LANGUAGE, &c.
Calculated for the Use of Europeans
With remarks on the errors in former grammars and dialogues of the Mixed Dialects called Moorish or Moors, written by different Europeans; together with a refutation of the assertions of Sir William Jones, respecting the Shamscrit Alphabet; and several specimens of Oriental Poetry, published in the Asiatic Researches.

[illegible]

BY HERASIM LEBEDEFF.
London:
[illegible]
1801.

লেবেদিয়েভ রচিত A Grammer of the Pure and Mixed East Indian Dialects গ্রন্থের নামপত্র। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে)

পড়িয়াছি। এদেশের আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষকদের নিকট হইতে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া তাহা পাই নাই। নতুন তথ্য হিসাবে অথবা এদেশের ভাষার সার্থক অনুশীলন হিসাবে যাহা ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা আমি কলিকাতায় প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ আমি বিদেশী বলিয়া আমার এদেশীয় ভাষা চর্চার বৈজ্ঞানিক প্রণালী এখানকার অনুবাদকদের কাছে অগ্রাহ্য, বণিক সম্প্রদায়ের কাছে অপ্রীতিকর এবং এখানকার শাসকবর্গ তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদেশীয়দের কার্যে নানা বাধার সৃষ্টি করিতে বিশেষ তৎপর। রাশিয়ায় যে বিদেশীরা বিশেষ উৎসাহ পাইয়া থাকেন, ইহা পৃথিবীতে সুবিদিত এবং ইহার প্রমাণের অভাব নাই এবং আমি ইহাও হয়ত বলিতে পারি যে, আমাদের দেশেরও কোন শ্রেণীর লোক এই দাক্ষিণ্য হইতে বঞ্চিত হয় না। সম্রাট পল, তাঁহার সহধর্মিণী এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে কয়জন পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি প্যারিস ও মম্বিলার্ডে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সৌজন্য ও স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম; একথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সর্বজনসমক্ষে প্রচার করিতে পারি। এ-অনুগ্রহের প্রশংসা করিয়া আমার অনেক কিছুই লিখিবার ইচ্ছা; কিন্তু এই দূর প্রাচ্য দেশে আমার এই প্রচেষ্টায় কে আমাকে সাহায্য করিবে?

বাস্তবিকই আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার পদ ও বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের সেবা করিয়া আমি ধন্য হইব। এই অনুগ্রহ পাইলে আমি লোভী ও কুখ্যাত ব্যবসাদার ও নীচ-স্বভাব রাজকর্মচারীদের কবল হইতে রক্ষা পাই। এই কর্মচারীদের মিথ্যাচার ও কুৎসিত আচরণ অন্যদেশের মানুষ ও দেবতার নিকট সমভাবে ঘৃণার্হ। এই হীন-স্বভাব লোকগুলি মোরগ যেরূপ চড়াই-পাখীর সামনে উচ্চকণ্ঠে তাহার নিন্দা করিয়া পরে তাহাকে আরসুলা গিলিবার ন্যায় গিলিয়া ফেলাকে এক গৌরবের কাজ মনে করে ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। কেন ইহারা এরূপ করে, তাহা কে বলিবে? আমি যতদূর জানি ইহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সত্যকার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মুক্তাবলীও ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না।

যদিও আমি এখন একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি আমি একমাত্র রুশীয় প্রজা যে এ দেশে স্বীয় অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। আপনার নিকট দুখানি দুই-মাস্তুল বা তিন-মাস্তুল জাহাজের ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি—জানি না, ইহা একান্ত দুরাশা বলিয়া মনে করিবেন কিনা। আমার ইচ্ছা রাশিয়ার পতাকা চিহ্নিত এই জাহাজ দুইখানি ভারতের অনুমতি লইয়া আমি গঙ্গা হইতে যাত্রা শুরু করিয়া ভূমধ্যসাগর ও অন্যান্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এবং বল্টিক-সাগর অতিক্রম করিয়া নেভা নদীতে প্রবেশ করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সত্বর জাহাজ দুখানি পাঠাইলে বাধিত হইব।

আশা করি জাহাজ ও জিনিসপত্র কিনিতে অর্থব্যয় হইবে না বলিয়া এবং ইহাতে রাজকোষ শুল্কের অর্থে পুষ্ট হইবে, বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার পথ সুগম হইবে এবং আরও অনেক রকমে দেশ লাভবান হইবে দেখিয়া আপনি সদয় হইয়া আমাকে এই জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন

আপনার ন্যায় রাজভক্ত ও দেশ-হিতৈষীর নিকট এই পত্র প্রেরণ করিয়া আমি আপনার করুণা ও স্নেহশীলতার উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। এই পত্রের উত্তর প্রার্থনা করি; আপনার উপদেশ ও পরামর্শের উপরই আমার মঙ্গল একান্তভাবে নির্ভর করে।

আমি নিয়ত আমার পিতৃভূমির কল্যাণ কামনা করি। ইতি—আপনার বিনীত সেবক—গেরাসিম্ লেবেদিয়েভ্।

লেবেদিয়েভের ভারতীয় জীবনের কথা লেবেদিয়েভের মুখেই শুনিলাম। তাঁহার কাহিনী শুনিবার মত বলিয়াই মনে হয়। তিনি বাংলা গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, ইংরেজী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, নিজে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করিয়াছেন এবং এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার পথে ইংরেজ দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছেন। এ সমস্ত কথাই অষ্টাদশ

তাব্দীর শেষ অংশের কথা—ভারতচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যবর্তী যুগের কথা। খন মাত্র কয়েকখানা বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত ইয়াছে—কোন বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত য় নাই—তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সবে ঘাষিত হইয়াছে—কলিকাতা শহর তখন নানা দিক দিয়া প্রসার লাভ করিতেছে।

যাহা হউক, লেবেদিয়েভের সম্পর্ক বঙ্গীয় নাট্যশালার সঙ্গে—বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁহার কোন প্রভাব নাই। তবে তাঁহার বাংলা সাহিত্যের চর্চার ফলে সমকালীন রুশ সাহিত্যে আমাদের সাহিত্যের কোন ভাব, আখ্যান বা অন্য কিছু প্রবেশ করিয়াছে কিনা অনুসন্ধানের বিষয়। সে অনুসন্ধান একমাত্র রুশ ভাষাভিজ্ঞ বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত দ্বারাই সম্ভব। এই প্রবন্ধ এ সম্বন্ধে নীরব। এখন প্রশ্ন হইতেছে লেবেদিয়েভকে আমরা বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা বা জনক বলিয়া গণ্য করিতে পারি কিনা। তিনিই যে প্রথম রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ প্রস্তুত করিয়া, অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া এবং তাহাদের অভিনয় লিখাইয়া, একখানি ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়া, টিকিট বিক্রয় করিয়া বৃহৎ দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে একখানি বাংলা নাটক উপস্থিত করেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তন করিলেন কিনা তাহাই বিচার্য। আমার মতে সমস্ত দিক বিচার করিয়া আমরা লেবেদিয়েভকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভ লেবেদিয়েভের কথা দিয়া। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে মনে হয়, তিনি লেবেদিয়েভকে বঙ্গীয় নাট্যশালার জনক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই: "প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ সনে। ইহার সহিত পরবর্তী নাট্যশালার কোন যোগ নাই। কারণ এই নাট্যশালার বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটক অভিনীত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন।" লেবেদিয়েভ বাঙালী ছিলেন না মাত্র এই কারণে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করিতে পারি না, এ যুক্তি তেমন অকাট্য বলিয়া মনে হয় না। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ অন্য যুক্তিও দেখাইয়াছেন এবং সে যুক্তি বাস্তবিকই বিচারবিশ্লেষণের বিষয়: "প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল না; তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। লেবেডেফের ইংলণ্ড-প্রয়াণের পরই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর বাঙালী জীবনে একটা যুগ পরিবর্তনের সময়।" ব্রজেন্দ্রনাথ এখানে মূলত দুটি কথা বলিতেছেন। প্রথমত, লেবেদিয়েভের নাট্যশালা বাঙালীর জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য এবং দ্বিতীয়ত, সে নাট্যশালার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যশালার কোন ধারাবাহিক সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ লেবেদিয়েভের নাট্যশালার বিজাতীয়তা ও ক্ষণস্থায়িত্ব এই দুই কারণে ব্রজেন্দ্রনাথ লেবেদিয়েভকে বঙ্গীয়

নাট্যশালার জনক বলিয়া মানিতে পারেন নাই, ইহাই মনে হয়। বাস্তবিকপক্ষে যে নাট্যশালায় মাত্র দুই রাত্রি অভিনয় হইয়াছিল বলিয়া জানি তাহার স্রষ্টাকে দেশের রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা বলিয়া মানিতে যে আমরা কিছু দ্বিধা বোধ করিব তাহা স্বাভাবিক। এবং লেবেদিয়েভের নাট্যশালায় যে দুই-বারের বেশী নাট্যাভিনয় হয় নাই, তাহা লেবেদিয়েভেরই কথায় জানিতে পারি। ১৭৯৭ সালের পত্রে তিনি দুইবার অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ১৮০১ সালে প্রকাশিত ব্যাকরণের ভূমিকায়ও সেই কথা।

তবে এই নাটক বা ইহার অভিনয় কোনভাবে বিজাতীয়তা দোষে দুষ্ট বলিয়া নাট্যশালাটি উঠিয়া গেল ইহা বোধহয় ধরিয়া লইতে পারি না। ভোরন্‌সভের নিকট লিখিত পত্র হইতে জানিতেছি যে, ইংরেজী নাট্যশালার কর্তৃপক্ষদের ঈর্ষা-প্রণোদিত প্রতিকূলতার ফলেই লেবেদিয়েভ তাঁহার নাট্যশালা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিয়া তিনি যে সুবিচার পান নাই, তাহাও তিনি এই পত্রে লিখিয়াছেন। তাঁহার নাট্যশালায় দুইদিনই যে বিশেষ দর্শক সমাগম হইয়াছিল, তাহা ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থে উদ্ধৃত ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতেই বুঝিতে পারি। তাই মনে হয় এ নাট্যশালা উৎসাহী দর্শকের অভাবে শুকাইয়া মরে নাই; স্বার্থান্বেষী ইংরেজ নাট্যশালাধ্যক্ষের আঘাতেই বিনষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা বিদেশী নাট্যশালা বলিয়া উঠিয়া যায় নাই; দেশীয় নাট্যশালা বলিয়া ইহা বিদেশী নাট্যশালার হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। লেবেদিয়েভ তাঁহার নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে ব্যাকরণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় ইহার মধ্যে কোন বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। প্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে, এই নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় দুই-ই বাঙালী পণ্ডিতের সাহায্যে ও উৎসাহে সম্ভব হইয়াছে। এ বিষয়ে লেবেদিয়েভের নিজের উক্তিই শুনিতে পারি। ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন:

"when my translation was finished, I invited some learned pundits, who perused the work very attentively and I then had the opportunity of observing those sentences which appeared to them most pleasing, and which most excited emotion; and I presume I do not much flatter myself, when I affirm that by this translation the spirit of both the comic and serious scenes were much hightened, and which would in vain be imitated by any European who did not possess the advantages of such an instructor as I had the good fortune to procure."

দেখিতেছি, লেবেদিয়েভ্ তাঁহার বাংলার শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সাহায্যেই এই অনুবাদকার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয় অনুবাদ-খানি তিনি একাধিক বাঙালী পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিলেন। তারপর ইহার প্রত্যেকটি কথা যাহাতে বাঙালীর চিত্ত স্পর্শ করে, সে বিষয়েও দেখিতেছি তিনি যত্নশীল। লেবেদিয়েভের এই উক্তি হইতে ইহাও বুঝিতে পারি যে, তাঁহার এ বাংলা নাটক ঠিক মূলানুগ অনুবাদরূপে লিখিত হয় নাই। এখানে "imitate" শব্দটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ শব্দটি এক বিশেষ ধরনের অনুবাদ অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। ড্রাইডেন তিন রকম অনুবাদের কথা বলিয়াছেন—metaphrase, paraphrase এবং imitation এবং imitationকে ইংরাজ কবি স্বাধীন অনুবাদ বলিয়াছেন। ড্রাইডেনের বোকাচোর অনুবাদ স্বাধীন অনুবাদ। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোপের Imitations of Horace ও এইরূপ স্বাধীন অনুবাদ। লেবেদিয়েভ্ এই অর্থে imitate শব্দ এখানে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তিনি বলিতে চান—আমি যে রকম সুষ্ঠুভাবে একখানা ইংরেজী নাটককে একখানি বাংলা নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছি সে রকম অন্য কোন ইউরোপীয় পারিবে না। আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন সুযোগ্য বাঙালী পণ্ডিতের সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোলোকনাথ দাসই এই নাটকখানি অভিনয় করিবার কথা প্রথম উত্থাপন করেন এবং তিনিই বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া দেন। একথাও লেবেদিয়েভেরই মুখে শুনিতে পারি:

"After the approbation of the pundits Golucknat-dash, my Linguist, made me a proposal, that if I chose to present this play publicly, he would engage to supply me with actors of both sexes from among the natives: with which idea I was exceedingly pleased".

অবশ্য এ অভিনয়ের দর্শক যে অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ ছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। এবং লেবেদিয়েভও ইংরেজ দর্শক ও ভারতীয় দর্শক উভয়ের জন্যই এই উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেনঃ--

"I therefore, to bring to view my undertaking, for the benefit of the European public, without delay, solicited the Governor-General—Sri John store, (now Lord Teignmouth) for a regular licence, who granted it to me without hesitation."

তবে দর্শক যে দেশীয় লোকই হউন না কেন, লেবেদিয়েভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একখানা বাংলা নাটক বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা মঞ্চস্থ করা। এ উদ্দেশ্য সর্বাংশে সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যে বাঙালী দর্শকের রুচি সম্বন্ধেও সজাগ ছিলেন, তাহাও ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন:

"After these researches, I translated two, English dramatic pices, namely, The Disguise, and Love is the Best Doctor, into the Bengal language; and having observed that he Indians preferred mimicry and drollery to plain. grave solid sense, however purely expressed—I therefore fixed on those plays, and which were most pleasantly filled up with a groups of watchmen, chokey-dars; savoyards, canera; thieves, ghonia; lawyears, gumosta; and among the rest a corps of petty plunderers."

দেখা যাইতেছে যে, লেবেদিয়েভ্ যে রুচির কথা ভাবিয়া এ নাটক উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে রুচি বিশুদ্ধ বা উন্নত রুচি নয়। কিন্তু বোধ হয় ইহা কোনক্রমেই সে যুগের বাঙালীর রুচি নয়, একথা বলা ভুল হইবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার বিবিধার্থ সংগ্রহের এক প্রবন্ধে (১৮৫৮) খেঁউড়ের যুগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাঙালীর রুচি সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। লেবেদিয়েভ্ যে উন্নত ধরনের নাটক রচনা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তিনি যে নাটক মঞ্চস্থ করিয়াছিলেন, তাহা বাংলা নাটক এবং যে নাট্যশালায় ইহা অভিনীত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গীয় নাট্যশালা।

এখন বিচার করিতে হইবে এই নাট্যশালার সঙ্গে পরবর্তী নাট্যশালার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। অর্থাৎ লেবেদিয়েভের নাট্যশালায় যাহার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যশালায় তাহা পরিণতি—এরূপ বলিতে পারি কিনা। সমস্ত দেশেই নাটকের ইতিহাস ও নাট্যশালার ইতিহাস পরস্পর সম্পৃক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বাংলা নাটকের প্রথম যুগ এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চেরও এ প্রথম যুগ। সেই সময় হইতে বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের এক ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ। এ কয়টি কথা মনে রাখিলে লেবেদিয়েভের প্রথম প্রচেষ্টা এই ধার

ইতে যে কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়-ন হইবে, তাহা একান্ত স্বাভাবিক। কন্তু যাহা সময়ের দিক হইতে বিচ্ছিন্ন তাহা যে কোন প্রভাবই রাখিয়া যায় নাই, তাহা বলিতে পারি না। প্রথম কথা, বাঙালী প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার আদর্শ খন ছিল কলিকাতার ইংরাজদের নাট্যশালা খন লেবেদিয়েভের নাট্যশালাকে আমাদের াদি নাট্যশালা বলিব। ইহা অস্বীকার রা অনৈতিহাসিকতার অপরাধ। ব্রজেন্দ্র-নাথ তাঁহার গ্রন্থে ১৮২৬ সালে প্রকাশিত সমাচার চন্দ্রিকার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সে যুগের বাঙালী বিদেশী রঙ্গালয়ের অনুকরণে দেশীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করিতেন। এই প্রবন্ধের এক ইংরেজী অনু-বাদ ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে Asiatic journalএ প্রকাশিত হয়;- তাহাও ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থ হইতেই জানিলাম। এই প্রবন্ধে যদি লেবেদিয়েভের নাট্যশালার উল্লেখ থাকিত, ইহার ঠিক পরবর্তী যুগের রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁহার রঙ্গালয়ের একটি যোগসূত্র স্পষ্ট দেখান যাইত। তবে এই অনুল্লেখে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, লেবে-দিয়েভের রঙ্গালয়ের কথা কেহই আর কোন দিন মনে করিয়া রাখে নাই।

লেবেদিয়েভের নাট্যশালার ও নবীন-চন্দ্র বসুর নাট্যশালার (১৮৩৩) মধ্যে আটত্রিশ বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে বাংলা নাটকও রচিত হয় নাই এবং বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য বিদেশী রঙ্গ-মঞ্চের অনুকরণে কোন রঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হয় নাই। ১৮২২ সালের কলির যাত্রা বা ঐ বৎসরেই অভিনীত নলদময়ন্তী যাত্রাকে ঠিক নাটকাভিনয়ের মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। অনুমান করিতে পারি, নানা বাধা-বিঘ্নের জন্য লেবেদিয়েভ যদি তাঁহার নাট্যশালাটি উঠাইয়া দিতে বাধ্য না হইতেন তাহা হইলে আরও বাংলা নাটক ঐ নাট্য-শালার জন্যই রচিত হইত। লেবেদিয়েভের নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের কোন কোন অংশ গীত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নাট্য-শালাটি আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে হয়ত বিদ্যাসুন্দরের আখ্যান লইয়া রচিত এক নাটক এখানে অভিনীত হইত। এবং এখানে স্মরণ করিতে পারি যে, নবীন বসুর রঙ্গালয়ে (ইহাই বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য প্রথম বাঙালী প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়) বিদ্যাসুন্দরের এক নাট্যরূপ অভিনীত হয়। লেবেদিয়েভের রঙ্গালয়ের ন্যায় এই রঙ্গালয়েও বাঙালী স্ত্রীলোকদের দ্বারা স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হইত। অথচ যে হেতু এই রঙ্গালয়ও স্থায়ী হয় নাই এবং এখানে অভিনীত নাটকের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্যের সম্পর্ক বড় নিকট নয়, নবীন বসুকেও পণ্ডিতগণ ঠিক বাংলা রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিতে চান না। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বস্তুরই প্রতিষ্ঠা মাত্র একের চেষ্টায় হয় না। নানা অবস্থার মধ্যে, নানা অনুকূল প্রভাবে একাধিক লোকের কল্পনা ও কর্মের ফলস্বরূপ একটি জিনিস ক্রমে গড়িয়া ওঠে। তবে যখন ইতিহাসের পাতাগুলি গুছাইয়া মনে ধরিয়া রাখিতে চাই, তখন বিশেষ বিশেষ লোকের প্রথম প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া

মর্যাদা দিয়া থাকি। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে সে মর্যাদা লেবেদিয়েভের প্রাপ্য বলিয়া মনে করি।
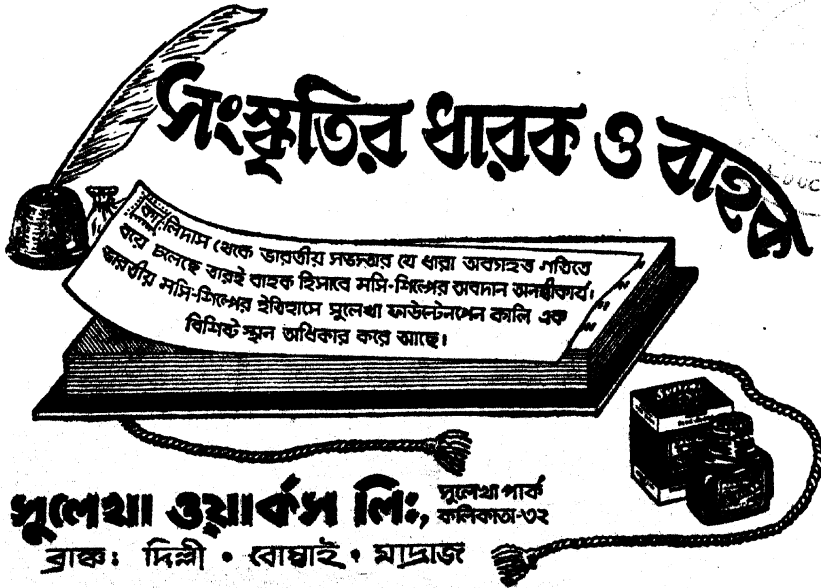
রুশভাষায় লিখিত লেবেদিয়েভের যে গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতিলিপি মস্কো হইতে আনাইয়াছি। এ গ্রন্থখানির এক জার্মান অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানিরও অনুসন্ধান করিতেছি। এই গ্রন্থেও লেবেদিয়েভ তাঁহার ভারতীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। ভিন্ন প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। একশত ঊননব্বই পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি লেবেদিয়েভের ভারতীয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কি শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া তিনি আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, রীতিনীতি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়।

লেবেদিয়েভ্ রুশ দেশের প্রথম সংস্কৃতের পণ্ডিত। গীতা রুশভাষায় অনুবাদিত হয় ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে—কিন্তু ইহা ইংরেজী অনুবাদের রুশীয় অনুবাদ। শকুন্তলার কিয়দংশের রুশীয় অনুবাদের তারিখ ১৭৯২ এবং ইহাও ফস্টারের জার্মান অনুবাদের অনুবাদ। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রুশভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য দেখাইয়া একখানি গ্রন্থ রুশ ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের রচনা। অনুমান করিতে পারি লেবেদিয়েভই ইহাদের সংস্কৃতচর্চায় প্রবৃদ্ধ করেন। লেবেদিয়েভ যে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রুশভাষায় লিখিত তাঁহার গ্রন্থখানিতে একখানি দুর্গার ছবি পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। সেকালের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় যে কয়টি বাঙালী পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নামও দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষে প্রথম রুশ পরিব্রাজক আফানাসি নিকিটিন্ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। Journey Beyond the Three Seas নামে ইহার এক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। চার বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের সারাংশ দিল্লীর এক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মূল রুশ গ্রন্থের এক সংস্করণ ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণে ভ্রমণকাহিনীটির ভিত্তিতে রচিত একখানি কাব্যও সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু এ গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্য কি দর্শনের উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। তাই লেবেদিয়েভকে প্রথম রুশীয় ভারতীয় তত্ত্ববিদ্ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বাংলাদেশের সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের রুশীয় অনুবাদটি বা তাহার বাংলা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইলে তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিত কর্তৃক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার এক মূল্যবান নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কোট খুলে রাখতে লজ্জা করে
মোহন কোট খুলছেনা কেন ?
শুনছ ! কোট খুলে ফেল !
আমি পারব না !
কেন কি হ'য়েছে ?
আমার শার্ট যে ছেঁড়া… আর কেনবার মাত্র ২ মাস পরে !
হুঁঃ। নিশ্চয়ই ঠিক-মত কাচা হয়নি !
কিন্তু আমার স্ত্রী ত যথারীতি আছড়ে কাচে।
যা বলছি শোনো, আছড়ে কাচলে যে কোনও কাপড়েরই সুতা কেটে যায় আর তা ফেঁসে ও ছিঁড়ে যায়। না আছড়ে সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনায় কেচে দেখ, কখনই অত শীগ্‌গির ছিঁড়বে না।
আছড়ে কাচার ফল
বাধিত হলাম, ভাই !
মিসেস মোহন
সানলাইটে সত্যিই না আছড়ালেও কাপড় সাদা ও ঝকঝকে ক'রে কাচা যায়। এখন আমাদের কাপড়চোপড় টেঁকেও বেশীদিন। সানলাইট পয়সা ও পরিশ্রম বাঁচায় বটে !
SUNLIGHT SOAP
Rs.10,000 Reward!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে

229-X52 BG
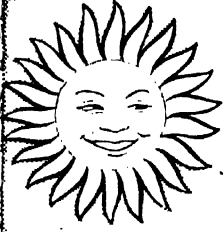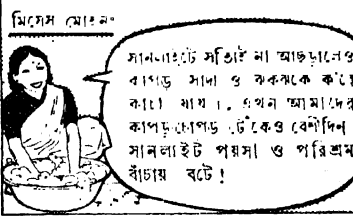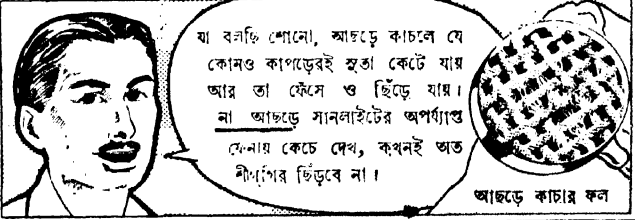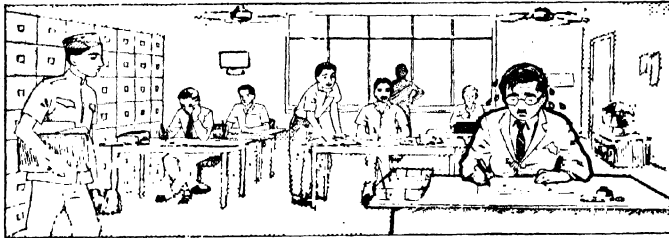
বাংলার সংস্কৃতি ও মিশনরী

পিয়ের ফালোঁ এস জে

বঙ্গ সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাসে বিদেশীয় ধর্মপ্রচারকদের স্থান এবং এই সংস্কৃতির সংগঠনে ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁদের অবদান সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমরা বিদেশী বটে। বিদেশে জন্মগ্রহণ ক'রেও এই দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি, এই বঙ্গদেশের সামাজিক জীবন, আচার ব্যবহার ও জাতীয় রীতি নীতিকে যথাসাধ্য বরণ করেছি ব'লে আমরা যে আর সম্পূর্ণভাবে বিদেশী নই, আপনাদের সাংস্কৃতিক জীবনে আমাদেরও যে স্থান তার জন্যে আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বর্তমানকালে বাংলা দেশে বহু দেশের মিশনরী কাজ করছেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা, বেলজিয়াম, ইতালি, জার্মানী, যুগোশ্লাবিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আগত বহু নরনারী ভগবান খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করছেন। তাঁরা সকলে একই দেশ কিংবা জাতির লোক নন, তাঁরা কোনও দেশ বা জাতির প্রতিনিধি হিসাবে এখানে আসেন নি; নিজেদের দেশ ও জাতি ছেড়ে এই বঙ্গদেশকে তাঁরা আপন দেশরূপে বরণ করেছেন, এমন কি তাঁরা অনেকেই নিজেদের দেশের সংগে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে এই স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়েছেন। তাঁরা কোনও বিদেশীয় বা বিজাতীয় সংস্কৃতির বাহক ও প্রচারক হিসাবে এই দেশে আসেন নি, তাঁদের আগমনের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ভগবান খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করা। খ্রীষ্ট আমাদেরও নন, আপনাদেরও নন, তিনি বিশ্ব মানব জাতির মুক্তিদাতা; তাঁর নাম ও বাণী কোনও জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নয়, সেই খ্রীষ্টীয় বাণী বিশ্বজনীন, এই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা দেশে-বিদেশে তাঁদের প্রচারকার্যে ব্যাপৃত হয়ে থাকেন। তাঁদেরই ধারণা, প্রত্যেকটি দেশ ও জাতির বিশেষ সংস্কৃতি সেই খ্রীষ্ট-বাণীর জীবনদায়ী প্রভাবে আপন বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ রক্ষা ক'রে নূতন সমৃদ্ধি লাভ করবে।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মিশনরীদের অবদান কতখানি, এই কথা আলোচনা করবার পূর্বে আর একটি কথা এখানে বলতে চাই। ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে কিংবা শিক্ষা বিস্তারের দিক থেকে তাঁদের অবদান যা-ই হোক না কেন, তাঁরা এই দেশের বহু উৎসাহী ও মেধাবী সহকর্মীর নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। কেরী সাহেবের কথা বলব, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার তাঁর সহকর্মী না হলে তিনি তো তাঁর মহৎ কার্য কোনদিন সম্পাদন করতে পারতেন না। ডফ্ সাহেবের কথা বলব, শিক্ষা বিস্তার কার্যে তিনি যা করেছিলেন এবং তাঁর পরে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মারফতে বিদেশীয় মিশনরীরা এখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের জন্যে যা করেছেন, তাঁদের বহু সংখ্যক বাঙালী খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টান সহকর্মীর অক্লান্ত কর্ম ছাড়া তা কোনভাবে সম্ভবপর হত না। এইজন্য মিশনরীদের অবদান নির্ণয় করতে হলে মিশনরীদের দেশীয় সহকর্মীদের কথাও বলতে হবে, সকল মিশনরী তাঁদের সহকর্মীদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

ভারতবর্ষে ভগবান খ্রীষ্টের বাণী বহুদিন থেকে প্রচারিত হয়ে আসছে। দক্ষিণ ভারতে যীশুখ্রীষ্টের সাক্ষাৎ শিষ্য সাধু টমাস যীশুর বাণী প্রচার করেছিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় খ্রীষ্টান বাস করেন, সংস্কৃতির দিক থেকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যভাব থেকে মুক্ত। উত্তর ভারতবর্ষে তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করা হয় নি। বঙ্গদেশে প্রথম খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচারক হয়েছিলেন আর্মানী খ্রীষ্টানেরা। পোর্তুগীজ আগমনের আগেও বাংলার নানা স্থানে সেই আর্মানী খ্রীষ্টানদের সন্ধান ও পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পোর্তুগীজ বণিকেরা এই দেশে আসতে লাগল। তাদের সংগে কয়েকজন খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীও এসেছিলেন। বিদেশীয় বণিকেরা নানা অত্যাচার করত ব'লে সেই খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা তাদের যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছিলেন। এই দেশের আইনকানুন মেনে চলতে তাদের উপদেশও দিয়েছিলেন। সম্রাট আকবর মিশনরীদের এই আচরণে যারপরনাই প্রীত হয়ে তাঁদের দরবারে আহ্বান করেছিলেন। পরবর্তীকালে কাথলিক মিশনরীরা পূর্ববঙ্গের নানা

নে ধর্মপ্রচার করেন। ১৫৯৯ সালে জা প্রতাপাদিত্যের বিশেষ আমন্ত্রণে য়কজন জেসুইট মিশনরী শ্রীপুর, কলা, চাঁদেকান প্রভৃতি স্থানে যীশু-খৃষ্টের নাম প্রচার করেছিলেন এবং য়কটি গির্জাও স্থাপন করেছিলেন। ই সময়ে অগস্তিনীয় ধর্মসংঘের য়কজন কাথলিক মিশনরীও পূর্ব-বঙ্গে ধর্মপ্রচার করেন। তখন থেকে ওয়াল পরগণায় ও ঢাকার নিকটবর্তী ঞ্চলে এবং পূর্ববঙ্গের আরও কতকগুলি নে বহু বাঙালী খৃষ্টান বাস করেন। ডেল ও চন্দননগরেও গির্জা স্থাপন করা হয়েছিল। সেই সময়কার দুজন বিদেশীয় মিশনরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফাদার মানোয়েল-দা-আসুম্পসাঁউ-র লিখিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত হয়, ফাদার মনোয়েল ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত নাগরী গ্রামে বাস করতেন; এই বইখানি হল প্রথম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ। চন্দননগরের ফরাসী মিশনরী ফাদার পোঁস অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা ও গ্রীক লাটিন প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে।

কিন্তু বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হয়েও সেই মিশনরীরা বঙ্গ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ কোন কাজ করতে পারেন নি। কেরী সাহেবের আগমনের পূর্বে কোন মিশনরীর 'অবদান' তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উইলিয়ম কেরীর অপূর্ব অবদানের কথা এখন বলছি।

কেরী সাহেব ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। চল্লিশ বৎসর ধ'রে তিনি শ্রীরামপুর ও কলিকাতায় অক্লান্তভাবে বহুবিধ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের শেষদিকে তিনি এই কথা লিখেছিলেন ঃ

> "আমি হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।"

কথাটি সত্যই বটে। অনেক বাঙালী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের মতে, কেরী সাহেবের যত্নে ও উৎসাহে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' রামগতি ন্যায়রত্ন নিজে লিখেছেন ঃ—

> "খৃষ্টধর্ম প্রচার করা যদিও সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্য-রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"

রামগতি ন্যায়রত্ন কেবল উইলিয়ম কেরীর কথা না ব'লে আরও বহু পাদরী সাহেবের দান উল্লেখ করেছেন। বস্তুত কেরীর সঙ্গে টমাস, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ফেলিক্স কেরী ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁদের সম্মিলিত কার্যপ্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশনের অসাধারণ কার্যসাফল্য সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল।

তাঁরা অনেকে ইংরেজ হয়েও ইংল্যাণ্ডের

গভর্নমেণ্ট কিংবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা বঙ্গদেশে প্রেরিত হন নি। তাঁরা এসেছিলেন সরকার ও কোম্পানির নির্দেশ অমান্য ক'রে, এবং বহুদিন তাঁরা কলিকাতায় কোন কাজ করতে পারেন নি। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মগত, রাজনীতিগত নয়।

গোড়া থেকে রামরাম বসু টমাস সাহেব ও উইলিয়ম কেরীর প্রথম ভাষাগুরু ও প্রধান সহকর্মী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যখন স্থাপন করা হয়, তখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ব্যক্তি কেরীর সহকর্মী হয়েছিলেন। কেরী নিজে বাংলা শিখেছিলেন বহুবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে। কোন মুদ্রিত পুস্তক তখন ছিল না, গদ্য ভাষাও তখন তার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে নি। একদিকে আদালতী ভাষা ফারসী ও আরবী শব্দপ্রাচুর্যের ব্যবহারের দরুণ তার স্বধর্ম হারাতে চলেছিল। অপরদিকে পণ্ডিতী ভাষা সংস্কৃতবিড়ম্বিত হয়ে মৌখিক ভাষা থেকে দূরে গিয়ে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়েছিল। মৌখিক ভাষার প্রদেশে প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যেত। কেরী সাহেব তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিচলিত কাণ্ডজ্ঞানের ফলে ঐ সকল বাধা অতিক্রম করেছিলেন। বঙ্গদেশে আসার ৬—৭ বৎসর পরে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা বাইবেলের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। বাংলা বাইবেলের নাম শুনেই অনেকে হয়ত হাসবেন। "ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, তাঁহার একজাত পুত্র..." ইত্যাদি বাক্যগুলি নিয়ে পাদরী সাহেবদের বাংলা অনুবাদ-চাতুর্যকে অনেকে যথেষ্ট ঠাট্টা করেছেন, আজও করছেন। খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যেও সেই প্রথম অনুবাদের ভাষা অনেকে সমালোচনা করেছেন, সেই ভাষার সংশোধন ও সংস্কারও নানা সময়ে নানাভাবে ইতিমধ্যে হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে কেরী সাহেবের কৃতিত্ব উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁর ভাষা আদালতী ভাষার মত ফারসী ও আরবীর ন্যায় বিজাতীয় নয়। টোলের পণ্ডিত মহাশয়দের ভাষার মত আড়ষ্ট ও সংস্কৃত-ঘেঁষাও নয়। এই কথা জোর ক'রে বলা যেতে পারে যে, কেরী সাহেব এমন পথ

খিয়ে গিয়েছেন যে-পথে পরবর্তী কালের ংলার সাহিত্যিকেরা চলেছেন। তিনি চাই আধুনিক গদ্য ভাষার প্রথম বর্তক।

তবু বাইবেলের অনুবাদ কেরী হেবের প্রধান কীর্তি নয় ব'লে মনে রি। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগঠন উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে তাঁর আরও পূর্ব কীর্তি আছে।

ওয়ার্ড সাহেবের সাহায্যে শ্রীরামপুরে ছাপাখানার ব্যবস্থা করা হয়, সেই পাখানা থেকে অসংখ্য বাংলা বই কাশিত হতে লাগল। কেরী ও তাঁর হকর্মীরা বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বহু যয়ে বহু রকমের বাংলা গ্রন্থ রচনা রতে লাগলেন। এই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের ধারা ই দেশে বাংলার মাধ্যমে প্রবাহিত ক'রে াঁরা ক্ষান্ত হন নি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাশীরাম দাসের মহাভারত তাঁদের দ্বারা রামপুরের ছাপাখানায় সর্বপ্রথম মুদ্রিত য়েছিল। রামরাম বসু তাঁর প্রতাপাদিত্য রিত রচনা ক'রে এদেশের নিজস্ব ইতিহাসের মূল্যবান সম্পদকে জনসাধারণের হাতে তুলে দেন। মিশনরীদের নির্দেশ ও পরামর্শ অনুসারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকা, বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ ইত্যাদি সম্পাদনা ক'রে এদেশের প্রাচীন গণ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। ইতিমধ্যে কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা অধ্যাপনার ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অপরদিকে মিশনরীদের প্রচেষ্টায় বাংলার স্থানে স্থানে বহু বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। কেরী মার্শম্যান প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের মূলে ও ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার সঙ্গে বাংলাই হবে শিক্ষাদানের একমাত্র মাধ্যম। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মার্শম্যান খুলেছিলেন তাঁর প্রথম বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয় পরবর্তীকালে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে আজ বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত 'শিক্ষাসংঘে' পরিণত হয়ে এসেছে।

কেরী সাহেবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখযোগ্য—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "সমাচার-দর্পণ" নামে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনে, সংবাদপত্রের প্রকাশে, বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদান প্রচলনে, গদ্যরচনার প্রথম ভিত্তিস্থাপনে সত্যই কেরী সাহেবের কীর্তি অবিস্মরণীয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিদেশীর মিশনরীদের এই অবদান তুচ্ছ নয় বটে। তবুও গত শতাব্দীতে বিদেশীয় মিশনরীরা আরও অন্যভাবে এদেশের সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে সহযোগিতা করেছিলেন---পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আলেকজান্ডার ডফ-এর নাম উল্লেখ করা দরকার।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে অনবরত তর্কবিতর্ক ও আন্দোলন চলত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে। একদিকে গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মসভার দল, অপরদিকে রামমোহন রায়ের প্রগতি-

শীল দল। তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালোকে প্রবুদ্ধ হয়ে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক্য ও জড়বাদের মিথ্যা মোহে মুগ্ধ হতে চলেছিল। ধর্মসভার দল তাদের বাড়াবাড়ি দেখে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাচ্ছিল। রামমোহন রায় তখন নিরাশ হয়ে পড়তেন যদি সেই সময়ে ডফ্ সাহেব না আসতেন।

ডফ্-এর কীর্তি কেরীর অপেক্ষা আরও মহৎ ব'লে মনে করি। তিনি যে কাজ করেছেন তার ফলে বাংলা দেশের সংস্কৃতির যে কত লাভ হয়েছে তা সংক্ষেপে বলতে পারব না। অনেকে এই অভিযোগ করেছে যে, ডফ্ প্রভৃতি বিদেশীয় মিশনরীদের পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে চিরাচরিত বঙ্গীয় সংস্কৃতির পশ্চাদ্‌গতি হয়েছিল। এই কথা ঠিক নয় কিন্তু। রামমোহন রায়ের মত ডফ্ সাহেব বুঝেছিলেন যে, এখানকার নিজস্ব সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক। তিনি নিজে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে, সাময়িকভাবে বাংলার মাধ্যমে নয়, ইংরেজীর মাধ্যমেই শিক্ষাবিস্তার করতে হবে। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল-এর নাস্তিক্য ও জড়বাদ-দূষিত শিক্ষা তিনি বিস্তার করতে নারাজ ছিলেন, তাই ধর্মীয় আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বঙ্গদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করতে চেয়েছিলেন প্রকৃত ও সত্যকার পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেম্ব্লি ইনস্টিটিউসন (পরবর্তীকালে যে মহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজ) তিনি আরম্ভ করেন। প্রথম দিনে রামমোহন রায়ের সামনে ডফ্ সাহেব বাংলা ভাষায় ভগবানের নাম উচ্চারণ ক'রে প্রার্থনার পর তাঁর নূতন কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন।

৫০ বৎসরের মধ্যে মিশনরী স্কুল-কলেজের বিস্তার ও উন্নতি সত্যই অসাধারণ। এই কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, উনিশ শতাব্দীর অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী কোন-না-কোন মিশনরী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে ১৫০,০০০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১২০,০০০ হাজার মিশনরী স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করছিল। ইতিমধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রভৃতি আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যাঁর কাছ থেকে বিজ্ঞানচর্চার প্রথম প্রেরণা লাভ করেন, সেই বহুজনপ্রিয় ফাদার লাফোঁ এই সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেই অধ্যাপনা করতেন।

বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমন্বয় ও উদারতা। গত শতাব্দীতে রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান সৃষ্টিকর্তা যাঁরা, তাঁরা সকলে সেই সমন্বয়ের আদর্শ রক্ষা করেছেন। ইংরেজী শিক্ষা ও ভাবধারা এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আয়ত্ত ক'রে তাঁরা স্বকীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কত সমৃদ্ধ করেছেন তা সকলেই জানেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, মিশনরীদের শিক্ষাপদ্ধতি ও কার্য-প্রচেষ্টা ছাড়া সেই সমন্বয়ের আদর্শ তেমন দৃঢ়রূপে হয়তো প্রতিষ্ঠিত হত না।

ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষাবিস্তার, এই দুটি দিক থেকে বিদেশীয় মিশনরীদের দান উল্লেখযোগ্য।

বাঙালী সমাজজীবনেও মনে হয় তাঁদের দান তুচ্ছ নয়। যে সেবা ও ধর্মের আদর্শ তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে, সেই আদর্শের প্রেরণায় বাঙালীর মধ্যে বহু ধর্মপ্রাণ ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তি নানাবিধ উল্লেখযোগ্য কার্যে ব্যাপৃত হয়েছেন। বিস্তারিতভাবে এই কথা আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি দুটি ব্যক্তিগত কথা ব'লে নিতে চাই।

আমি প্রায় ২০ বৎসর আগে এই বাংলা দেশে এসেছিলাম। বাংলা ভাষা শিখবার জন্যে আমি এক বৎসর কাটিয়েছিলাম পাড়াগাঁয়ে এক মিশন স্কুলে। সেখানে গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলাম গ্রাম্য চাষার কাছে। কবির লড়াই ও পুতুল নাচ, যাত্রা ও কথকতার সঙ্গে সেখানে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। রাত্রির পর রাত্রি কত রূপকথা, কত "ইতিহাস", কত কীর্তনগান শুনেছিলাম। সেই গ্রামের লোকেরা সকলে খৃষ্টান ছিল কিন্তু খৃষ্টান হয়েও তারা খাঁটি বাঙালী ছিল। তাদের ধর্মবিশ্বাস ও খৃষ্টভক্তি তারা প্রকাশ করতে বাংলা ভাষায়, চিরাচরিত গ্রাম্য সংস্কৃতির আদর্শ অনুসারে। সেখানে আমি প্রথম স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পেরেছিলাম যে, মিশনরীর কাজ খৃষ্টের বাণী প্রচার করা, কিন্তু সেই অমর বাণীর নূতন নূতন দেহ গ্রহণ হবে নূতন নূতন দেশ ও সমাজে। এদেশের সংস্কৃতি যে অতি সুন্দর, অতি মূল্যবান রূপ ও কলেবর ধারণ ক'রে এসেছে আমি বিশ্বাস করি সেই রূপ ও দেহ গ্রহণ করে যীশুর বাণী অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এই বঙ্গদেশে আরও সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

HVM. 238-X52 BG

মন-কণিকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১১।৮।১৯৪৮

পৃথিবীতে এক জাতীয় মানুষ আছে, যাহারা কাজ করিবার অদম্য স্পৃহা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। অন্য জাতীয় লোক, অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কাজ করে না, তাহারা এইসব কাজের লোককে দেখিয়া অবাক হইয়া যায়।

পৃথিবীতে কাজের লোক একান্ত প্রয়োজন, তাহারাই পৃথিবীটাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা যদি আজ হাত গুটাইয়া বসে, তবে মন্বন্তর অনিবার্য। তাই এইসব কর্মবীরদের সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় নাই।

কিন্তু কাজের নেশায় মত্ত হইয়া থাকার একটা অসুবিধা আছে। যেখানে কাজের প্রেরণা বড় বেশী, সেখানে কাজটা অকাজ কি সুকাজ, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর থাকে না। বস্তুত কাজের লোকের জীবনে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যায়। একটা কাজ তাহার কর্মফল সৃষ্টি করে, তখন কর্মপরম্পরার আবর্তে পড়িয়া মানুষ প্রায় অবশে কর্ম করিয়া যায়।

তাই, যে মানুষ একবার কাজের যন্ত্রে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই, কাজের momentum তাহাকে শেষ পর্যন্ত চালাইতে থাকিবে।

যাহারা কাজে ফাঁকি দিয়া চিন্তা করিবার সময় করিয়া লইয়াছে, তাহারা অন্তত স্বাধীন।

২৪।৮।৪৮

যাঁহারা বর্তমানকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আশ্রয় করিয়া গল্প-উপন্যাসাদি লেখেন, অকস্মাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে তাঁহাদের বড় অসুবিধা হইয়াছে। পটভূমিকা এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে, নূতন আসরে পুরাতনের পালা আর জমিতেছে না। এ যেন রঙ্গমঞ্চে দেওয়ানী খাসের পট পড়িয়াছে, কিন্তু অভিনয় হইতেছে—রাবণ-বধ।

লেখকের মন নূতন বাতাবরণের সঙ্গে আপস করিতে কিছু সময় লইবে। এখন অনতিপূর্বকালও ইতিহাসের পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে, তাই বর্তমান ও সদ্য-অতীতকে যে-লেখক ঐতিহাসিকের চক্ষু দিয়া দেখিতে পারিবেন, তাঁহার রচনাই সার্থক হইবার সম্ভাবনা।

ক্রান্তিকাল বা transition periodয়ে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তিকালের পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। ১৯১৪ হইতে পৃথিবীতে যে মহা-ক্রান্তিকাল আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইয়া আবার Settled times ফিরিয়া আসিতে এখনও অনেক দেরী। সুতরাং এখন মহা-প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব আশা করা যায় না।

২৫।৮।৪৮

বিজ্ঞান বলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ তাপমৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জগতে যত কিছু জড়বস্তু ও জ্যোতিঃ (radiation) আছে, তাহার শেষ পরিণাম তাপ; জড় জ্যোতিতে পরিণত হয়, জ্যোতির অন্তিম অবস্থা তাপ। যাহা একবার তাপে পরিণত হইয়াছে, তাহা আর উচ্চতর radiationয়ে বা জড়ে রূপান্তরিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন—'ভাব হতে রূপে অবিরাম আসা যাওয়া'—তাহা চরমে সত্য নয়। একটা অবস্থা আছে যাহার পর আর প্রত্যাবর্তন নাই।

সুতরাং কথাটা দাঁড়াইল এই যে, শেষ পর্যন্ত জগতের যাহা কিছু সমস্তই তাপে পরিণত হইবে, আর কিছু থাকিবে না—জগতের গড়পড়তা তাপমাত্রা একটু বাড়িবে মাত্র।

কিন্তু জগতে যদি কোনও বস্তুই না থাকে, তবে কিসের তাপ বাড়িবে? যেখানে কিছুই নাই, সেখানে তাপ বাড়িতেও পারে না, কমিতেও পারে না। অতএব তাপও আর থাকিবে না।

দর্শন বলে, যাহা নাই তাহার সৃষ্টি হইতে পারে না, যাহা আছে তাহার বিনাশ নাই। বিজ্ঞানের যুক্তি অনুযায়ী জগৎ যদি সম্পূর্ণরূপে 'নস্যাৎ' হইয়া যায়,

তবে বলিতে হইবে জগৎ কোনওকালেই ছিল না।

শেষ পর্যন্ত সেই বেদান্ত।

২৬।৮।৪৮

ইতিহাসে দেখা যায়, মোগল আমলে সম্রাট আকবরের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদজ্ঞান প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল। আকবর জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়াছিলেন, ধর্মগত প্রভেদ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তিনি স্বীকার করেন নাই।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, আকবরের রাজত্বকালে মোগল রাজশক্তি যে প্রচণ্ড প্রতাপ অর্জন করিয়াছিল, আকবরের পূর্বে বা পরে তাহা করিতে পারে নাই। জৈব নিয়মে হিন্দুর প্রতি মোগলের অত্যাচার করার এই উপযুক্ত সময়, কিন্তু তাহারা অত্যাচার করে নাই।

ভেদবুদ্ধি আবার দেখা দিল ঔরংজেবের সময়ে। আবার জিজিয়া কর আসিল। মোগলশক্তি এ পর্যন্ত অটুট ছিল, একজন অপরিণামদর্শী রাজার সঙ্কীর্ণতার ফলে তাহার ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরিল। অথবা মোগল রাজশক্তি ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হইয়াছিল, তাই ভেদবুদ্ধি আপনি ফিরিয়া আসিল, ঔরংজেব উপলক্ষ্য মাত্র। মোট কথা, ইতিহাস বলে, যেখানে দুর্বলতা সেই-খানেই ভেদবুদ্ধি এবং যেখানে ভেদবুদ্ধি সেইখানেই সর্বনাশ।

২৭।৮।৪৮

মুরগীদের জীবনযাত্রা অনুধাবন করিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে সাম্য-বোধ নাই। যেখানে দশটি মুরগী আছে, সেখানে উচ্চ-নীচ বোধ আছে; একটি মুরগী অন্য একটিকে ঠুকরাইয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করে, দ্বিতীয়টি তৃতীয় মুরগীকে ঠোকরায়—এইভাবে ধারাবাহিক পরম্পরা নামিয়া আসে। মোরগদের তো কথাই নাই, এক দলে কখনও দুটি মোরগ থাকে না, যে সর্বাপেক্ষা বলবান, সে আর সকলকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।

আমার পোষা মুরগীদের মধ্যে দুটি মুরগী আছে, তারা দুই বোন। প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের একটি অপরটির অধীন হওয়া উচিত, কিন্তু এই দুটি বোনের মধ্যে বড় ভাব। তাহারা কখনও ঝগড়া করে না, একসঙ্গে চরিয়া বেড়ায়, একসঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া থাকে। দুজনে একসঙ্গে ডিম পাড়িলে তাহারা পালাপালি করিয়া এ উহার ডিমে তা দেয়। সম্প্রতি তাহাদের একটিমাত্র বাচ্চা ফুটিয়াছে। আশ্চর্য ব্যাপার! দুজনে একটি বাচ্চা লইয়া সর্বদা একসঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাচ্চার মাতৃত্ব লইয়া বিবাদ করে না।

পণ্ডিতেরা বলেন, পশুপাখীরা instinctয়ের উপর কাজ করে, তাহাদের বোধশক্তি নাই।

এ কি রকম instinct?

৩০।৮।৪৮

সংস্কৃত কাব্যে মাঝে মাঝে দুই একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যাহাতে অজ্ঞাত বা অর্ধজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা

লক্ষিত হয়। কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলায় লিখিয়াছেন—'রম্যাণি বীক্ষ্য—' ইত্যাদি। কোনও সুন্দর বস্তু দেখিলে বা মধুর শব্দ শুনিলে সুখী মানুষেরও মন উন্মনা হয়, বোধ হয় পূর্বজন্মের প্রণয়ের কথা তাহার অবচেতন মনে জাগরূক হয়। কালিদাস এইভাবে এই উৎকণ্ঠার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্য উদাহরণও আছে—'যঃ কৌমারহরঃ—' এই শ্লোকটি একজন স্ত্রী-কবির রচনা। ইহাতে কবি বসন্তকালে প্রণয়-বিহার উপলক্ষে বলিতেছেন—সবই তো আগের মতই আছে, সেই প্রিয়তম, সেই বসন্ত-রজনী, সেই মলয় মারুত সেই রেবার তীরে বেতসীর কুঞ্জ—তবু চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই স্ত্রী-কবি একটি কথা লিখিয়াছেন, যাহার তুল্য মধুর বাক্য পৃথিবীর রস-সাহিত্যে দুর্লভ। কবি স্ত্রীলোক তাই তাঁহার এই উক্তি রসের গভীরতায় অনির্বচনীয়। নিজের পতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন—যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ—। অর্থাৎ যিনি আমার কৌমার্য হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার প্রিয়তম।

১।৯।৪৮

আজ সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভ। এই মাসেই কোনও তারিখে মীরারাণী মাতৃত্ব-পদে অধিরূঢ়া হইবেন। উৎকণ্ঠিতভাবে শুভসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছি।

জীবনের কয়েকটি সন্ধিক্ষণ আছে, নাতি-নাতিনীর জন্মক্ষণ তাহার একটি। এই সময় জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইয়া নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়, বার্ধক্য যেন জীবনের পৃষ্ঠার উপর জতুদ্রব ঢালিয়া তাহার উপর শিলমোহর ছাপিয়া দেয়, Official বৃদ্ধত্ব আরম্ভ হয়।

আমি কিন্তু মনের মধ্যে বার্ধক্য অনুভব করিতেছি না। জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে বটে কিন্তু চমকপ্রদ উপন্যাস যতই শেষের দিকে যায় ততই হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিতে থাকে, আমার এই তথাকথিত বার্ধক্যও অনেকটা সেইরকম। গল্প যত শেষের দিকে যাইতেছে ততই জমাট বাঁধিতেছে। এখন ইহা বেশ একটি তৃপ্তিকর পরিসমাপ্তিতে উপনীত হইলে আর কোনও খেদ থাকে না।

যৌবনও ভ্রান্তি, বার্ধক্যও তাই, আসল বস্তু—পরিপূর্ণতা। Shakespeare বলিয়াছেন—Ripeness is all.

৩।৯।৪৮

অনেকদিন পরে আবার কালিদাসের শকুন্তলা পড়িলাম। মনে আছে, কলেজের পাঠ্য হিসাবে অনিচ্ছাভরে পড়িতে আরম্ভ করিয়া শকুন্তলায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। কুড়ি বছর বয়সে যে অপূর্ব রস পাইয়াছিলাম আজও তাহার স্বাদ মনে লাগিয়া আছে।

ত্রিশ বছর পরে আবার পড়িলাম—এতদিনে 'পাঠকের মৃত্যু' হওয়ার কথা, কুড়ি বছরের মানুষটি এখন আর নাই—কিন্তু দেখিলাম শকুন্তলার রস ফিকা হয় নাই, বরং আরও গাঢ় হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্ক পড়িয়া চোখ দিয়া জল বাহির হইল...

ইহাকেই বলে কাব্যের অমরত্ব। আমার যৌবনকালে যে-সব লেখকের রচনা ভাল

লাগিত এখন আর তাহাদের ভাল লাগে না. অথচ শকুন্তলা আমার বয়সের পরিবর্তন তুচ্ছ করিয়া তেমনিই চিত্তবিজয়িনী হইয়া আছে। কালিদাস কেন অমর কবি তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

এবার আর একটা বস্তু নূতন করিয়া চোখে পড়িল, তাহা কালিদাসের হাস্যরস। বর্তমানকালেও উহা পরশুরামের রসিকতার মতই উপভোগ্য। আরও আশ্চর্য, কালিদাসের লেখায় আদিরসের ছড়াছড়ি, কিন্তু রসিকতায় কামগন্ধ নাই।

৫।৯।৪৮

চিন্তা করিতে ভাল লাগে, মানুষের যদি অন্নচিন্তা না থাকিত তাহা হইলে সে কী করিত। মানুষ যদি হাত বাড়াইলেই অন্ন পাইত, প্রয়োজনীয় সকল বস্তু পাইত, তবে তাহার জীবনের প্রেরণা কী হইত? কোনও উচ্চতর বৃত্তি আসিয়া ঐহিক চিন্তার স্থান অধিকার করিত কি?

দেখা গিয়াছে, যে-সব মানুষের অন্নচিন্তা নাই তাহারাও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। অবশ্য বেশীর ভাগ অকর্মা বড় মানুষই ইন্দ্রিয়সেবা ও আত্মসুখের চিন্তায় মগ্ন থাকে, কিন্তু এমনও দেখা যায়, অন্নচিন্তাহীন মানুষ নিছক পরহিতব্রতে বা স্বার্থহীন কাজে নিযুক্ত আছে। মোটকথা মানুষ নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, যখন অন্নসংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না তখনও ভাল হোক মন্দ হোক একটা কাজ লইয়া থাকে।

অর্থই কর্মের একমাত্র প্রেরণা একথা সত্য নয়। মানুষ নাকি power ভালবাসে, power-এর জন্য সব করিতে পারে। এ কথাও আংশিক সত্য। কালিদাস অর্থ বা power-এর জন্য কাব্য লেখেন নাই, অথচ তাঁহার কাব্য দেড় হাজার বছর ধরিয়া মানুষের চিত্তে সুধাবৃষ্টি করিতেছে। Watt যখন steam power আবিষ্কার করেন তখন ঐহিক লাভের চিন্তা তাঁহার মনে ছিল না।

সমাজবিধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্নচিন্তা যেমন কমিয়া যাইবে, নিরাসক্ত কর্মপ্রেরণাও বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করা অন্যায় নয়।

৮।৯।৪৮

আজ বিকালে পাটনা হইতে তার পাইলাম--Grandson born to you...

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা!

২২।৯।৪৮

Capitalism-এর বিরুদ্ধে প্রথম এবং প্রধান আপত্তি এই যে, উহা হিংসাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়া থাকে। ধনবাদ জঙ্গলের নীতিকে মনুষ্য সমাজে টানিয়া আনিয়াছে এবং বলিতেছে, Competitionই বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়।

এই উক্তি যদি সত্য হয় তবে বুদ্ধ যীশু প্রদর্শিত মানুষের মুক্তিপথ মিথ্যা। এই সব সাধুরা হিংসাকে জয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন; বুদ্ধ বলিয়াছেন—হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়। সুতরাং হিংসার চর্চা করিলে কালক্রমে উহা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া সমস্ত মানব-জাতিকে গ্রাস করিবে।

Competition কথাটা শুনিতে নিরীহ কিন্তু কার্যকালে মারাত্মক। প্রতি-যোগিতা না থাকিলে সমাজের উন্নতি হয় না, ধনবাদের এই উক্তি মিথ্যা। বর্তমান কালে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যে উন্নতি হইয়াছে একমাত্র বিজ্ঞান তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নব নব আবিষ্কার করিয়াছে একথা সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক সাধক সত্য-পিপাসায় প্রণোদিত হইয়া প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। Eienstein যখন theory of relativity আবিষ্কার করেন তখন কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু আবিষ্কার হইবার পর ধনবাদীরা তাহা হইতে আণবিক বোমা প্রস্তুত করিয়াছে।

২৩।৯।৪৮

যীশু বলিয়াছেন—

It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of Heaven.

আপাতদৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিহীন অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। ধনী স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না কেন? ধনী কি সৎ হইতে পারে না? আমরা বহু ধনী ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যাঁহারা প্রকৃত ধার্মিক এবং সজ্জন। তবে তাঁহারা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশের অনধিকারী কেন?

যীশুর স্বর্গরাজ্য কী তাহা বুঝিতে হইবে। এই স্বর্গরাজ্য পরলোকের কোনও কাল্পনিক রাজ্য নয়, ইহজগতেরই আদর্শ রাজ্য। যীশু বলিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার আদর্শ রাজ্যে কেহ ধনী থাকিবে না। সকলের আর্থিক অবস্থা সমান হইবে। যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবস্থার তারতম্য থাকিবে না তখনই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দু'হাজার বছর আগে যীশু যে কথা বলিয়াছিলেন আজও আমরা তাহার মানে বুঝি নাই। এখনও ধনবাদীরা বলে—ধনানর্জয়ধ্বং ধনানর্জয়ধ্বম্। যে তাহার প্রতিবেশীর অপেক্ষা ধনী সেই স্বর্গলাভ করিয়াছে। পরিহাস এই যে, ধনবাদীরা অধিকাংশই যীশুর শিষ্য। ইহাদেরই বলে গুরু-মারা চেলা।

G B S একজন নাস্তিক। তিনি তাঁহার Intelligent Woman's Guide পুস্তকে যীশুর ধনসাম্যের ওকালতি করিয়াছেন। নিরীশ্বর কম্যু-নিজমও অনেকটা সেই কথাই বলে।

মানুষের মতন এমন paradoxical জীব জগতে দুর্লভ।

২৪।৯।৪৮

আধুনিক বিজ্ঞান এখন আর কার্যের সহিত কারণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করে না; Planck সাহেবের Quantum theory গোতম মুনির হাড় নড়বড়ে করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু causation যদি গেল, logic তবে কোথায় রহিল? ন্যায়শাস্ত্র যদি না থাকে তবে সমস্ত চিন্তাই যে অচল হইয়া যায়। বিজ্ঞান বলে, চিন্তার কাজ চালাইবার জন্য আর একটা আইন আছে, তাহকে বলে law of statistical avarages; অর্থাৎ গড়পড়তা বেশী যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই logic-এর ভিত্তি করা যাইতে পারে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে law of causation অত্যাবশ্যক নয়; ধূম দেখিয়া পর্বতকে বহ্নিমান মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু বহ্নি ধূমের কারণ ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কার্যকারণ সম্বন্ধ অবান্তর। ইহা আমাদের মনের বিকারও হইতে পারে।
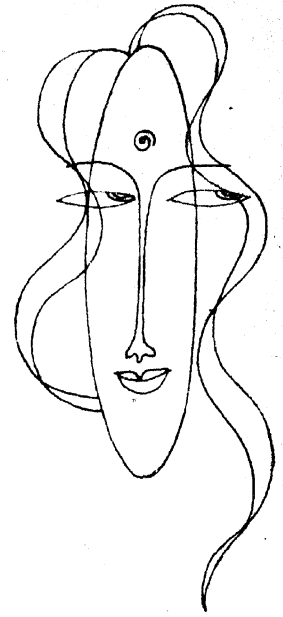
গীতার মূল কথা—মা ফলেষু। নিস্পৃহভাবে কর্ম করিয়া যাও, ফলের আশা করিও না। বিজ্ঞানের সহিত এই উক্তির কোনও বৈষম্য নাই; কারণ কর্মের সহিত ফলের যদি নিত্যসম্বন্ধ না থাকে তবে কর্ম করিলেই যে ফল ফলিবে তাহার স্থিরতা কি? অতএব ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকাই ভাল।

কিন্তু মানুষের এমন স্বভাব, কাজ করিবার আগেই ফলের জন্য হাত বাড়ায়। ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি কেহ আছে কি?

২৭।৯।৪৮

অহৈতুকী প্রীতি জগতে দুর্লভ। এবং অহৈতুকী বলিয়াই তাহা তর্কের অতীত। কিন্তু যে-প্রীতির হেতু আছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে।

অধিকাংশ মানবীয় প্রীতির ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা যায় তাহার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ আছে। মানুষ তাহাকেই প্রীতি করে যাহার সংস্পর্শে স্বার্থসিদ্ধির আশা আছে। ইহা যে সব সময়েই প্রবঞ্চনা তাহা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনাও আছে। আমরা যখন যুবতী স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হই তখন স্বার্থটা মনের অগোচরেই লুকাইয়া রাখি। দুই সাহিত্যিকের মধ্যে যখন গাঢ় বন্ধুত্ব দেখা যায় তখন তাহার কতটা প্রীতি এবং কতটা স্বার্থবুদ্ধি তাহা পরিমাপ করা দুষ্কর; তবে স্বার্থ যে আছে তাহা না বলিলেও চলে।

কখনও কখনও গুণের আদর প্রীতি রূপে দেখা দেয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার প্রীতি গুণের আদর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু সংসারে বাস করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরও অনেক লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহাদের সকলের গুণ সমান নয়। সুতরাং গুণের অনুপাতে প্রীতির পাত্র নির্বাচন করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র বলিয়া মনে হয়।

অথচ যে-প্রীতি সহেতুক তাহার হেতু যত জোরালো ও নিঃস্বার্থ হয় ততই ভাল। এইরূপে হেতু কী হইতে পারে?

২৮।৯।৪৮

শ্রদ্ধা নামক মনোভাব আজকাল বড়ই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রদ্ধেয় মানুষের অভাব বশত এরূপ হইয়াছে তাহা নয়; নবীন সমাজে একটা ধারণা জন্মিয়াছে, কাহাকেও শ্রদ্ধা দেখাইলে নিজেকে খাটো করা হয়।

অথচ অহৈতুকী প্রীতি যখন আমাদের চেষ্টাধীন নয়, তখন এই শ্রদ্ধাকে যদি আমরা ব্যবহারিক প্রীতির হেতু করিতে পারিতাম তাহা হইলে কত ভালই না হইত! শ্রদ্ধা স্বভাবতই গুণাপেক্ষী, যেখানে গুণ নাই সেখানে সে সহজে ন্যস্ত হইতে চায় না। এইরূপে শ্রদ্ধা ও প্রীতি যদি একই স্থানে অর্পিত হয় তাহা হইলে প্রীতি নামক মনোভাবের একটা মর্যাদা থাকে।

কুকুরকে শ্রদ্ধা করিতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না, কিন্তু অনেকেরই কুকুর-প্রীতি আছে। শিশুকে আমরা প্রীতি করি, শ্রদ্ধা করি না ইংরেজের বিষয়বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করি, প্রীতি করিতে পারি কৈ? কিন্তু এত জটিলতার প্রয়োজন নাই। মোট কথা, প্রীতিকে যদি স্বার্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রদ্ধার সহিত মিলাইতে পারি তবে মিলনটা বড়ই সুখের হয়।

১।১০।৪৮

যাহার ভালবাসা একবার পাইয়াছি তাহাকে চিরদিনের জন্য নিজস্ব সম্পত্তি মনে করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক। মানুষের মন কনসারভেটিভ, তাই যাহা পাইয়াছে তাহা সে চিরস্থায়ী মনে করে। ভালবাসাও যে কলসীর জলের মতো ঢালিতে ঢালিতে একদিন ফুরাইয়া যাইতে পারে একথা সহজে কেহ কল্পনা করিতে পারে না। হঠাৎ একদিন যখন চোখে পড়ে যাহার ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম সে আর ভালবাসে না তখন বিস্ময় ও মর্মপীড়ার আর অবধি থাকে না।

কিন্তু ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবে কেন? একদিন যে আমাকে ভাল বাসিয়াছিল তাহার চোখে তখন রঙীন নেশা ছিল, যৌবনের নৈসর্গিক স্নেহ-প্রবণতা ছিল; আমিও হয়তো ভালবাসার অধিক যোগ্য ছিলাম। এখন হাওয়া বদলাইয়াছে, চোখের রঙীন নেশা কাটিয়াছে, আমিও আর সে আমি নই। তবে ভালবাসা থাকিবে কেন?

এক মাতাল রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল হাতীর পিঠে রাজা যাইতেছেন। মাতাল হাত তুলিয়া বলিল,—'দাঁড়াও, আমি হাতী কিনিব।' রাজা মাতালকে বাঁধিয়া রাখিবার হুকুম দিলেন। পরদিন মাতালের নেশা ছুটিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হাতী কিনিবে?' মাতাল হাসিয়া বলিল, 'মহারাজ, হাতীর খরিদ্দার চলিয়া গিয়াছে।'

আমরাও মাতাল, কিন্তু হাতীর খরিদ্দার কখন চলিয়া যায় তাহা জানিতে পারি না।

জাতীয় গ্রন্থতালিকার ভূমিকা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বৎসর ভারত সরকার এমন একটি আইন প্রণয়ন করেছেন যার ভূমিকা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে। সে আইনটি হলো 'ডেলিভারি অব্ বুক্স্ (পাব্লিক লাইব্রেরিজ্) অ্যাক্ট, ১৯৫৪।' এই নতুন আইনটির কথা বলতে গেলে স্বভাবতঃই মনে পড়ে ১৮৬৭ সালের 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স্ অ্যাক্ট'-এর কথা। দু'টি আইনের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও কম নয়। পার্থক্যের প্রধান কারণ দু'টি আইনের উদ্দেশ্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

পুস্তক প্রকাশনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ইংরেজ শাসকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। যে ইংরেজদের প্রায় আমন্ত্রণ করে এনে সিংহাসনে বসানো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হঠাৎ ভারতীয়েরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কেন? ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ল কোন পথে? শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করলেন যে, নব প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাগুলি থেকে যে-সব বই ও পত্রিকা ছাপা হচ্ছে তাদের মারফতেই হয়তো বিপ্লবের বার্তা প্রচারিত হয়। তখন বাঙলা দেশে সবচেয়ে বেশি পুঁথি-পত্র প্রকাশিত হতো। সুতরাং বাঙলা ভাষায় অভিজ্ঞ রেভারেন্ড লঙ্ সাহেবকে এবিষয়ে তদন্ত করে সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করবার জন্য বলা হলো। লঙ্ সাহেব ১৮৫৭ সালে মুদ্রিত সকল পুঁথি-পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে রিপোর্ট দিলেন যে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতির চিহ্ন তিনি এদের মধ্যে দেখতে পাননি।

তথাপি সরকার স্থির করলেন যে মুদ্রাযন্ত্রের উপর চোখ রাখা ভালো। জনসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তারের শক্তি পুঁথি-পত্রের মতো আর কারো নেই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৬৭ সালে 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স্ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করা হয়। আইনের ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রের মালিককে তার ছাপাখানায় সংবাদপত্র ছাড়া যা-কিছু ছাপা হবে তার এক বা একাধিক কপি গভর্নমেন্টকে দিতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে গভর্নমেন্ট কপির সংখ্যা স্থির করে দেবেন। পুঁথি-পত্র গভর্নমেন্টের হাতে এসে পৌঁছলে রাজদ্রোহিতা, সরকারের সমালোচনা এবং আপত্তিকর অশ্লীল কিছু আছে কিনা তা বিচার করা হতো। তাছাড়া সাধারণভাবেও পুঁথি-পত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের যে মনোভাব ব্যক্ত হয় সরকারের পক্ষে তা জানবার প্রয়োজন আছে।

লণ্ডনে ভারতে প্রকাশিত পুস্তক

লণ্ডনে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি স্থাপিত হওয়ায় ভারতীয় বিদ্যার চর্চা সম্বন্ধে বৃটেনে

আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ভারতে প্রকাশিত পুঁথি-পত্র নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করবার কোন সুযোগ ছিল না। বিশেষ করে ভারতীয় ভাষার বইয়ের খবর পাওয়া এবং তা সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। অথচ এদের বাদ দিয়ে ভারতীয় বিদ্যার কোনো সংগ্রহই সম্পূর্ণ হতে পারে না। 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' পাশ হবার পর এই অসুবিধা দূর হলো। গভর্নমেন্ট এই আইনের বলে পুঁথি-পত্র সংগ্রহ করে ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ও বৃটিশ মিউজিয়ামে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। এদেশ থেকে প্রথম প্রথম যা-কিছু ছাপা হতো সবই যেত ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে। অথচ এদের অধিকাংশই গ্রন্থাগারে স্থান পাবার যোগ্য নয়। ক্রমশ অনাবশ্যক পুঁথি-পত্র স্তূপীকৃত হয়ে ওঠায় ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ বিব্রত হয়ে পড়লেন। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য কয়েক বৎসর পরে ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ডাঃ রস্ট প্রস্তাব করলেন যে, বইগুলি সরাসরি না পাঠিয়ে প্রত্যেক প্রদেশের সরকার যেন তাঁদের এলাকায় প্রকাশিত পুস্তকের ত্রৈমাসিক তালিকা ছাপিয়ে পাঠান। এই তালিকা পরীক্ষা করে যে বইগুলি লাইব্রেরিতে রাখবার উপযোগী বলে বিবেচিত হবে শুধু সেগুলিই লন্ডনে পাঠাতে হবে। এর পর থেকে প্রধান প্রধান প্রদেশগুলি প্রকাশিত পুস্তকের ত্রৈমাসিক তালিকা প্রণয়ন করে আসছে। তালিকায় প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবরণ ইংরেজী ভাষায় দেওয়া হয়। সর্বাপেক্ষা বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বাঙলা দেশের ত্রৈমাসিক তালিকা থেকে। আমাদের তালিকা বোধ হয় সবচেয়ে পুরনো; আইন পাশ হবার কিছুকাল পর থেকেই এই তালিকা কলকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স্ অ্যাক্ট' একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিধিবদ্ধ হলেও পরোক্ষে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহায়ক হয়েছে। এই আইনের সাহায্যে ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ও বৃটিশ মিউজিয়ামে ভারতে প্রকাশিত পুঁথি-পত্রের সুসমৃদ্ধ সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। একমাত্র ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতেই আছে প্রায় সওয়া লক্ষ ভারতীয় পুস্তক। পরাধীনতার জন্য এদেশে এরূপ কোনো সংগ্রহ গড়ে ওঠবার সুযোগ হয়নি। সান্ত্বনার কথা এই যে, বইগুলি স্বদেশে না থাকলেও প্রয়োজন হলে লন্ডনের সংগ্রহ দু'টির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ভারতের বহু গবেষক ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ও বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ভারতে প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহ দ্বারা প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স্' সাহায্য না করলে এ দু'টি অমূল্য সংগ্রহ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। বর্তমান কালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক মূল্যবান নিদর্শন চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যেত।

এদেশে একমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরি) এই আইনের সাহায্যে কিছু উপকৃত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ বাঙলা সরকার বাঙলা দেশে প্রকাশিত

পুঁথি-পত্রের এক কপি জাতীয় গ্রন্থাগারকে সংগ্রহ করবার সুযোগ দিয়েছেন। তার ফলে বাঙলা দেশের পুঁথি-পত্রের একটি সুন্দর সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে। দুঃখের বিষয় বিনামূল্যে পাবার সুযোগ সত্ত্বেও বৃটিশ আমলে অনেক বাঙলা বই সংগ্রহ করা হয়নি।

প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট-এর আর একটি পরোক্ষ দান হলো ত্রৈমাসিক পুস্তক তালিকাগুলি। প্রায় পঁচাশি বছর ধরে প্রকাশিত এই তালিকাগুলি ভারতীয় প্রকাশনার একমাত্র নির্ভরযোগ্য দলিল। ভারতীয় সাহিত্যের গবেষণায় এসব তালিকার সাহায্য অপরিহার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙলা সাহিত্যের উপর যে-সব মৌলিক গবেষণা হয়েছে, বাঙলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাহায্য ছাড়া তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতো না।

জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ

স্বাধীনতা লাভের পর বিলেতে বই পাঠানো বন্ধ হলো। এদেশেই সংস্কৃতি ও ইতিহাসের নিদর্শনস্বরূপ পুঁথি-পত্রগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এত বড় দেশ, একটি সংগ্রহ-কেন্দ্র থাকলে গবেষকদের অসুবিধা। সুতরাং স্থির হয়েছে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে চারটি জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করে ভারতে প্রকাশিত প্রত্যেক পুঁথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার তো রয়েছেই; শুধু পুঁথিপত্রগুলি সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু নতুন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। অন্য তিনটি গ্রন্থাগার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। দেশে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত করবার জন্য এ ধরনের জাতীয় গ্রন্থাগার অত্যাবশ্যক। শুধু পুঁথিগত গবেষণার কথা বলা হয়নি। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি যে-সব সমীক্ষার প্রয়োজন তা এরূপ সংগ্রহ ছাড়া করা সম্ভব নয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য পুঁথি-পত্র সংগ্রহ কি উপায়ে করা হবে? ভারতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই, সাময়িক পত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি যা-কিছু ছাপা হয় তা বইয়ের দোকান অথবা এজেন্টের মারফৎ সংগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ কোথায় কি ছাপা হচ্ছে তার সংবাদ রাখবার কোন উপায় নেই। মোট মুদ্রিত পুঁথি-পত্রের এক সামান্য অংশমাত্র বিজ্ঞাপিত ও আলোচিত হয় এবং বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দলের প্রচার-পুস্তিকা, থিয়েটারের প্রোগ্রাম পুস্তিকা, কোনো সমিতির তিন-চার পৃষ্ঠার কার্যবিবরণী ইত্যাদি দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে না। অথচ পরবর্তীকালে এসব তুচ্ছ পুস্তিকাগুলি গবেষকদের তথ্য নির্ধারণে সাহায্য করবে। দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারে শুধু ভালো বইয়ের সংগ্রহ থাকবে না; আজ যা তুচ্ছ ও অনাবশ্যক মনে হয় পঞ্চাশ বছর পরে তা হয়তো একটি অমূল্য দলিল বলে স্বীকৃত হতে পারে। এখন থেকে সঞ্চয় করে না রাখলে এগুলি ভবিষ্যতে কোথাও পাবার সম্ভাবনা থাকবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বৃটিশ মিউজিয়ামে বইয়ের প্রচ্ছদগুলি সঞ্চয় করে রাখবার ফলে পুস্তক ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে গবেষণায় সাহায্য হচ্ছে। পুস্তকের প্রচ্ছদের উপরেই সম্প্রতি একটি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

আইনের সহায়তা

অর্থের বিনিময়ে ব্যাপক ও ত্রুটিহীন সংগ্রহ সম্ভব নয় বলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারই আইনের সাহায্যে দেশের গণ্ডীর মধ্যে মুদ্রিত প্রত্যেকটি পুঁথি-পত্র সংগ্রহ করে। গ্রেট বৃটেনের মতো ছোট দেশেও ছয়টি জাতীয় গ্রন্থাগার আছে। প্রকাশকদের ছয় কপি করে বই দিতে হয়। বৃটেনে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা লাইব্রেরির জন্য ব্যয় করবার ব্যবস্থা আছে। বই কেনার টাকার অভাব নেই। টাকা বাঁচাবার জন্য কপিরাইট আইন করা হয়নি; সংগ্রহকে পূর্ণাঙ্গ করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট'এর সাহায্য নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করবার লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। কারণ, এই আইনের উদ্দেশ্য ভিন্ন; সুতরাং জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির

প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন আইন প্রণয়ন করা দরকার। কিন্তু যতদিন নতুন আইন বিধিবদ্ধ না হয় ততদিন পুরনো আইন অনুসারে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে আদেশ দেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে এই আদেশ দেবার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজার পুঁথি-পত্র পাওয়া গেছে।

নতুন আইনে প্রকাশক ও জাতীয় গ্রন্থাগার

১৯৫৪ সালের মে মাসে নতুন আইন 'দি ডেলিভারি অব বুক্‌স্‌ (পাবলিক লাইব্রেরিস) অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে ভারতে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত) প্রকাশিত সকল পুঁথি-পত্র, ম্যাপ, নকসা, স্বরলিপি ইত্যাদি প্রকাশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে প্রকাশকের নিজের খরচায় কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগারগুলিতে পেঁাছে দিতে হবে। সংবাদপত্র এই আইনের আওতায় পড়বে না। প্রকাশক যে বই দেবে ছবি, ম্যাপ, নকসা, বাঁধাই ইত্যাদি বিষয়ে তা পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। প্রথম সংস্করণের বই লাইব্রেরিতে দেবার পর যদি কোন পরিবর্তন না করে' সে বইএর পুনর্মুদ্রণ হয় তাহলে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে না দিলেও চলবে। প্রত্যেকটি পুঁথি-পত্রের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ দেবেন। কোনো প্রকাশক যদি বই জমা না দেয় তা'হলে আদালতের বিচারে তার পঞ্চাশ টাকা এবং জমা-না-দেওয়া বইয়ের দামটা দণ্ড দিতে হতে পারে।

প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট এবং বর্তমান আইনের মধ্যে তুলনা-মূলক আলোচনা করলেই দু'টি আইনের প্রভেদটা স্পষ্ট হবে। প্রেস অ্যান্ড রেজি-স্ট্রেশন অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট-এর প্রধান উদ্দেশ্য সরকারের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব জানা এবং পুঁথি-পত্রের প্রভাবে অপ্রীতিকর রাজনৈতিক অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে সরকারকে সাহায্য করা। 'ডেলিভারি অব বুক্‌স্‌ (পাবলিক লাইব্রেরিস) অ্যাক্ট'-এর নাম থেকেই দেখা যাবে এর উদ্দেশ্য হলো দেশে লাইব্রেরির সংগ্রহ সমৃদ্ধ করে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ প্রসারিত করে দেওয়া।

পুরনো আইনে মুদ্রাকর সরকারের নিকট দায়ী; কিন্তু বর্তমান আইনের শর্ত পালনের দায়িত্ব পড়েছে প্রকাশকের উপর। মুদ্রাকর অবাঞ্ছিত পুঁথি-পত্র ছাপিয়ে ব্যবসায়কে বিপদগ্রস্ত করতে দ্বিধা করবে; সুতরাং প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট'এর ধারা অনুসারে তাকে দায়ী করায় সরকারের উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু পুস্তক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রচিত আইনে প্রকাশককে দায়ী করা ঠিকই হয়েছে। কারণ, বইয়ের বিজ্ঞাপনে এবং সমালোচনায় প্রকাশকের নাম উল্লেখ করা থাকে, মুদ্রাকরের নাম থাকে না। সুতরাং আইন লঙ্ঘন করলে প্রকাশকের সন্ধান পাওয়া সহজ।
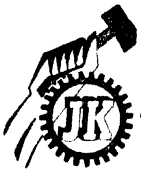
প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্ অ্যাক্ট' অনুসারে বই জমা দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে। রাজ্য সরকারের মারফৎ বই লাইব্রেরিতে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কখনো কখনো দু'তিন বছরও দেরি হয়। এতে পাঠকদের নতুন পুঁথি-পত্র পেতে বিলম্ব ঘটে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য 'ডেলিভারি অব বুক্‌স্ অ্যাক্ট'-এ প্রকাশের এক মাসের মধ্যে লাইব্রেরিতে সরাসরি বই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

নতুন আইনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করা হয়েছে সরকারী দলিলপত্র সম্বন্ধে। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দলিলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ কিংবা অশ্লীলতার অভিযোগ আসতে পারে না। সুতরাং প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্ অ্যাক্ট-এ সরকারী পুঁথি-পত্র জমা দেবার নির্দেশ নেই। ডেলিভারি অব বুকস্ অ্যাক্ট' সরকারী প্রকাশনকে রেহাই দেয়নি। বর্তমানে ভারতের কোথাও এমন একটি সংগ্রহ নেই যেখানে গভর্নমেণ্টের দলিলগুলি গবেষণার জন্য পাওয়া যেতে পারে। অথচ দেশ ও জাতি সম্বন্ধে যে কোনরূপ গবেষণায় এগুলি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য দলিল। অনেক দেরিতে হলেও এবার থেকে যে সরকারী (ভারত ও রাজ্য সরকার) দলিলের সুষ্ঠু সংগ্রহ গড়ে উঠতে আরম্ভ করবে সেটা আশার কথা।

ডেলিভারি অব বুক্‌স্ (পাবলিক লাইব্রেরিস্) অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হবার পরও 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্ অ্যাক্ট' অনুযায়ী পুস্তক সংগ্রহ বন্ধ হবে না। কারণ দু'টি আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। রাজ্য সরকার আপাতত ত্রৈমাসিক পুস্তক তালিকাও প্রকাশ করবেন। জাতীয় গ্রন্থাগার এই তালিকা থেকে মিলিয়ে দেখতে পারবেন কি কি বই পাওয়া যায়নি। অবশ্য লেখক ও প্রকাশকদের শুভবুদ্ধি এবং বিদ্যোৎসাহিতার উপরই জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পূর্ণতা নির্ভর করবে। 'ডেলিভারি অব্ বুক্‌স্ অ্যাক্ট'-এর ন্যায় কোনো ব্যাপক আইনই জনসাধারণের সমর্থন ছাড়া সফল হতে পারে না।

'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব

বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট' অনুযায়ী যে কপি সংগৃহীত হবে তার সাহায্যে রাজ্যের নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলা দেশে মুদ্রিত পুস্তকের কপিগুলি সাহিত্য পরিষদে দেবার ব্যবস্থা করলে আমরা নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার পেতে পারি।

জাতীয় গ্রন্থ তালিকা

জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির ভাণ্ডার পুষ্ট করেই 'ডেলিভারি অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট'-এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে না। পরোক্ষে এই আইনের সাহায্যে আরো একটি বড় কাজ করা সম্ভব হবে। সেটি হলো জাতীয় গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন। আজকাল সকল দেশই জাতীয় গ্রন্থতালিকা প্রকাশ করে। এই তালিকা থেকে সে দেশে যত বই প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের এরূপ কোনো তালিকা নেই। তার ফলে ভারতের কোথায় কি বই বেরুচ্ছে তার খবর পাওয়া কঠিন। এমন দেখেছি যে কলকাতায় প্রকাশিত বইয়ের সংবাদ প্রথম পাওয়া গেছে লণ্ডনের কোন তালিকা থেকে। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির জন্য এবং জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যবিধানের জন্য ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি অত্যাবশ্যক।

দেশের সকল পুঁথি-পত্র এক স্থানে নিয়মিতভাবে সংগৃহীত না হলে জাতীয় গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। 'ডেলিভারি অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট' এই তালিকা প্রস্তুতের জন্য ভূমিকা তৈরি করে দিয়েছে। এবার জাতীয় গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যতদূর আলোচনা হয়েছে তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, ভারতে প্রকাশিত পুঁথি-পত্রের একটি বিষয়ানুসারে বর্গীকৃত মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই বিভিন্ন সংখ্যাগুলি বৎসরের শেষে একত্রিত করে ছাপানো হবে বার্ষিক তালিকা। যে-সব বই একান্ত অনাবশ্যক মনে হবে সেগুলি জাতীয় গ্রন্থ তালিকায় স্থান পাবে না। বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের তারিখ, দাম, সংস্করণ, আকার, ইত্যাদি বিবরণ তালিকা থেকে পাওয়া যাবে। আর দেওয়া থাকবে দশমিক বর্গীকরণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন; তা থেকে পুস্তকের বিষয়বস্তুর নির্দেশ পাওয়া যাবে।

বৎসরে আনুমানিক চল্লিশ হাজার পুঁথিপত্র জাতীয় গ্রন্থাগারে আসবে বলে আশা করা যায়। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক হবে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুঁথিপত্র।

সমস্যা দেখা দেবে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে। অন্য কোনো দেশে এ সমস্যা নেই। এতগুলি বিভিন্ন ভাষার বইয়ের বিবরণ একটি তালিকায় ব্যবহারোপযোগী করে গ্রথিত করা সহজ নয়। রোমান হরফ ব্যবহার করলে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের যত বই প্রকাশিত হবে তাদের জাতীয় গ্রন্থ তালিকায় এক জায়গায় পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি বইয়ের নিচে কোন্‌ ভাষায় বইটি লেখা সে সম্বন্ধে
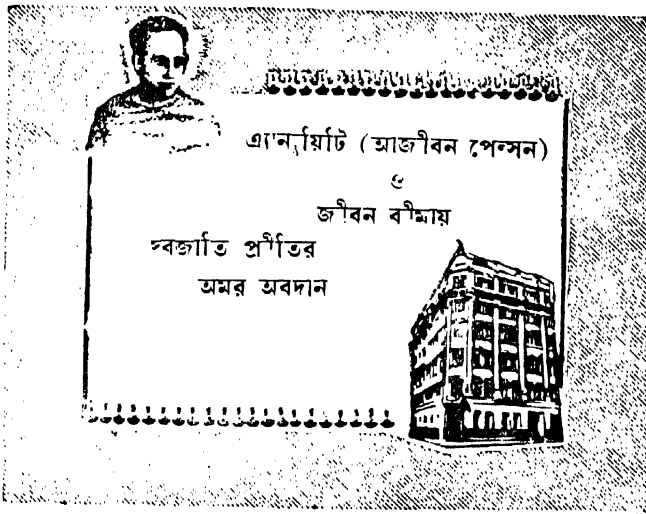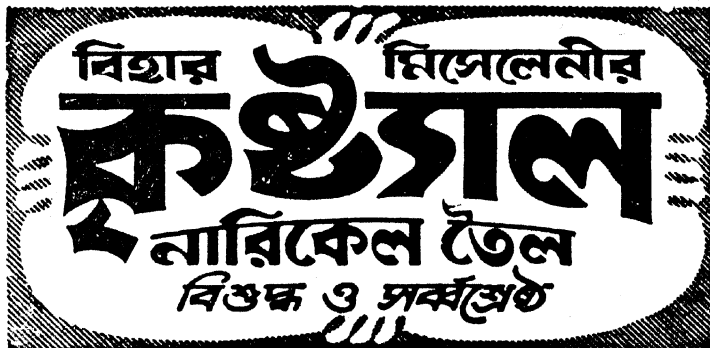
একটি সংক্ষিপ্ত টীকা থাকলে রোমান হরফ ব্যবহারের অসুবিধাটুকু আর থাকবে না। তালিকার শেষে লেখক সূচী, নাম সূচী প্রভৃতি যোগ করলে ব্যবহারকারীদের বিশেষ সুবিধা হবে।

ধরা যাক্, বাঙলা ভাষায় কোন বিষয়ে কি বই বেরুচ্ছে তার একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা হাতের কাছে থাকলে কত সুবিধা! লেখক, পুস্তক বিক্রেতা, গবেষক প্রভৃতি সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে এই তালিকা হবে অপরিহার্য। নতুন নতুন বইয়ের সংবাদ পাওয়া যাবে; যে-সব গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নেই সেখানেও জাতীয় গ্রন্থ তালিকার সহায়তায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুস্তক বর্গীকরণ ও তালিকাকরণ (ক্যাটালগ) সম্ভব হবে। অনেক অসাধু প্রকাশক অন্য অঞ্চলের লেখকের বই অনুমতি ছাড়া অনুবাদ করে লাভবান হয়। মূল লেখক এবং প্রকাশকের নিকট এই প্রতারণা ধরা পড়বার ভয় থাকে না বলে এমন কাজ করতে সাহসী হতে পারে। জাতীয় গ্রন্থ তালিকা প্রকাশিত হলে কে কোথায় আসল মালিককে ঠকিয়ে বই ছাপাচ্ছে তা আর অজানা থাকবে না।

'ডেলিভারি অব বুক্স্ (পাবলিক লাইব্রেরিস) অ্যাক্ট' পার্লামেন্টে আলোচনা হবার সময় একজন সদস্য প্রকাশকদের কাছ থেকে এভাবে বই নেওয়া সংগত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রধান মন্ত্রী নেহরু বুঝিয়ে বলেন যে এতে লেখক ও প্রকাশকদের ক্ষতি হবে না, বরং তাঁরা লাভবান হবেন। জাতীয় গ্রন্থ তালিকার মারফৎ পুঁথি-পত্রের যতটা প্রচার হবে, বিজ্ঞাপনে তা সম্ভব নয়। দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এই তালিকা যাবে। বিদেশের বড় বড় গ্রন্থাগার ভারতীয় প্রকাশনগুলির এই তালিকা দেখেই বই কিনবে। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থাগার নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু বাঙলা বই কেনে। কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনের একটি গবেষণা কেন্দ্র 'দেশ' পত্রিকার পুরনো সেট চড়া দামে সংগ্রহ করেছে বলে শুনেছি। অবশ্য এখন পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত ইংরেজী ভাষার বইয়েরই বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে। বিদেশের কথা একেবারে বাদ দিলেও জাতীয় গ্রন্থতালিকা এদেশে নতুন প্রকাশন প্রচারে যেরূপ সাহায্য করবে অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

জাতীয় গ্রন্থ তালিকার মূল্য সাময়িক নয়। এগুলো সযত্নে রক্ষিত হবে। পরবর্তীকালে বই সম্বন্ধে সন-তারিখ-সংস্করণের তর্ক মীমাংসা করতে হবে এই তালিকার সাহায্যে। জাতীয় গ্রন্থ তালিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে জাতির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শুভ সূচনার ইঙ্গিত করে।

পুরস্কার প্রসঙ্গ

উত্তমপুরুষ

(১)

নেপোলিয়ন একবার কার কাছে যেন শুনেছিলেন ফ্রান্সে কবির অভাব ঘটেছে। কুপিত হয়ে বলেছিলেন, স্বরাষ্ট্র সচিব বসে বসে কী করছেন। একটা বিহিত করতে পারছেন না?

সাহিত্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠা-দিবসে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন গল্পটি বলেন। শ্রোতারা কৌতুকাবিষ্ট হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কাব্যকে দিগ্বিজয়ী ফরাসি বীর ঠিক কী সামগ্রী ভাবতেন জানিনে। তবে যব-গম-তিসি বা অনুরূপ কোন ক্ষেত্রজ পণ্যের মতো বোধ হয় নয়। তাহলে কৃষিমন্ত্রীর উপর বরাত দিতেন। পাঁচসালা প্ল্যানিংয়ের ফ্যাশনটাও তখন চালু হয়নি। হলে বন্দুক-বারুদ এবং টন-টন কয়লা-ইস্পাতের মতো কয়েক লক্ষ শ্লোকও অবশ্য-উৎপাদ্য দ্রব্যের ফর্দে উঠত। ওঠেনি। কলির বণিক-রাষ্ট্র আত্ম-কাম, বলির বরপ্রাপ্ত বামনের মতো ক্রমবিসারী। মুনফা তার মন্ত্র, বাকি যা কিছু অব্যাপারেষু ব্যাপার, সে সবে সহজে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। যারা রাশি রাশি মিল জড়ো করতে চায় করুক, আমরা দেশ-বিদেশে পণ্য আর সৈন্য চালান দিই, ভাবখানা এই। সহৃদয় কোন কোন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বড়ো জোর কিছু কিছু ছড়াকারের জন্যে মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, কবি সৃষ্টি করতে যাননি। সেই 'লেসেফেয়ারিয়ানা'র মূলে কথা ছিল, কবিতা ফরমায়েসে তৈরি হয় না। আমরা কতবার না শুনেছি, কবিরা জাতমাত্র কবি। দ্বিজত্বও সংস্কারবলে অর্জন করতে হয়, কিন্তু কবিত্ব নয়।

ধারণাটাকে সেদিন স্বতঃসিদ্ধবৎ মেনে নিয়েছি। যাচাই করে দেখিনি এর কতটা খাঁটি। ভেবে দেখিনি উৎকৃষ্ট কাব্যও ফরমাসপ্রসূত হতে পারে। যথা, ফিরদৌসীর শাহনামা। মনে পড়েনি কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো কবিত্ব-শক্তি সকলের সহজাত নয়, অন্তত আদি কবি বাল্মীকি কবি হয়ে ভূমিষ্ঠ হননি। ভারতী আর চপলাকে বরাবর সপত্নী বলে জানতুম। কাব্য রাজদ্বারে উপেক্ষিত ছিল।

তবু সে যে মরেনি, তার প্রথম কারণ তার দুর্বার প্রাণশক্তি। দ্বিতীয়তঃ রাজ-কণ্ঠের মুক্তামালা যদিও জোটেনি, তবু সাধারণের মনের আঙিনায় কবির যাতায়াত ছিল অবারিত। কথঞ্চিৎ শিক্ষা প্রসার এবং মুদ্রাযন্ত্রকে সেজন্যে ধন্যবাদ দেব। এই-ভাবেই দিন হয়ত যেত, যদি—

বণিক-সভ্যতার হৃদয় পরমাণু বোমার আঘাতে দীর্ণ না হত। রাজনীতি, অর্থ-নীতি এবং বিজ্ঞানে আমরা যুগান্তর প্রত্যক্ষ করলুম। শাসন কত কলোনির আয়ত্ত হল, রূপান্তর ঘটল পরাক্রান্ত কত দেশের। স্টেট মানে এখন শুধু রেগুলেশন লাঠি নয়। জানমালের খবর-দারিও নয়। যদিদং কিঞ্চ অধুনা রাষ্ট্রপ্রাণময়ং। ব্রহ্মের মত রাষ্ট্রশক্তি সর্বভূতে প্রত্যক্ষ। কোন কোন দেশে শুধু গণতন্ত্র শব্দটিতে কুলোয় না, 'পীপ্‌ল' উপসর্গটি জুড়ে রাষ্ট্রের প্রকৃতি-পরিচয় দিতে হয়। অন্যত্র 'ওয়েলফেয়ার' কথাটিকে ডেকে আনি। অর্থাৎ রাষ্ট্র শুধু তৈলতণ্ডুলইন্ধন যোগাবে না, কল্যাণকৃৎও হবে। পাকস্থলীর দাবীও যেমন মেটাবে, হৃদয়-মনকেও উপেক্ষা করবে না, এই পণ। সাধারণকে 'মেকানিকস্ অভ্ লিভিং' এবং ' আর্ট অভ্ লিভিং' দুই-ই শেখাবে।

উদ্দেশ্যটা মহৎ, কিন্তু উপায়ের সঙ্গে তার সমন্বয় নিয়েই সংশয়। কেননা, চিন্তা, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষ মুক্ত।

"No great literature can be produced unless men have the courage to be lonely in their minds....Freedom
lnely in their minds....Freedom
of human spirit is the first essen-

tial of any kind of creative literature."

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণন)।

কাজটা আদৌ সুসাধ্য নয়। শিক্ষার বিস্তার করব, সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেব, সাধারণের মন উচ্চতর স্তরে তুলব, অথচ অন্তরস্থ স্বাধীনতাকে স্পর্শ করব না, এ-পথ ক্ষুরধারা নিশিত। এর চেয়ে জলে নেমে শরীর না ভিজিয়ে উঠে আসা সহজ। উপমাটা আরও কাছাকাছি হবে, যদি বলি লাগাম না পরিয়েই ঘোড়াকে ঠিক রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যাব।

অনেকে বলবেন, অসম্ভব সে অসম্ভব। এর ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী। পতনের নজীর কোন কোন সর্বাত্মক রাষ্ট্রের সংস্কৃতির ইতিহাসে আছে।

প্রধান মন্ত্রী নেহরুও প্রথমে ইতস্তত করেছিলেন। আকাদেমি, তাঁর ইচ্ছা ছিল, উপর থেকে না চাপিয়ে নীচে থেকে গড়ে তোলা হোক। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত সকলের মতে সায় দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের তিনটি প্রধান ফল হল তিনটি আকাদেমি। এদের মধ্যে জন্ম-পত্রিকানুসারে সাহিত্য আকাদেমি দ্বিতীয়। তিনটি স্বতন্ত্র হয়েও পরস্পরের সহযোগী।

(২)

প্লেটো কদাচ ভাবেননি, তাঁর শিক্ষাশ্রমটি লুপ্ত হয়ে যাবার বহু শতক পরেও নানা দেশে বেঁচে থাকবে, গ্রীক বীর 'আকাদেমাস' এমন মৃত্যুঞ্জয় হবেন। বিচার করলে হয়ত দেখব নামটুকুই শুধু বেঁচেছে, কালান্তরে 'আকাদেমি' শব্দটির অর্থান্তরও ঘটেছে। উদ্বোধন-ভাষণে মৌলানা আজাদ বলেছিলেন, এক কথায় আকাদেমির ব্যাখ্যা করা শক্ত। এ কি একটা স্কুল? না। গবেষণা মন্দির? না। তবে কি লেখকদের সংস্থা? তা-ও না। অথচ তিনেরই কোন না কোন লক্ষণ আকাদেমিতে বর্তমান রয়েছে। আকাদেমি এই তিনের সমাহার তো বটেই, আরো কিছু বেশি।

গ্রীসে আকাদেমিগুলির প্রায় সহস্রবর্ষ পরমায়ুর অবসান ঘটে জাস্টিনিয়ানের এক ডিক্রীতে। মাত্র কায়িক অবসান। দেশান্তরে তার আদর্শের পুনরুজ্জীবন হয়েছিল। এমন পাশ্চাত্য দেশ আজ বিরল, যেখানে এক বা একাধিক জাতীয় আকাদেমি নেই। সেই অমর বীজ ভারতের মাটিতেও উপ্ত হল।

সতেরো শতকে চতুর্দশ লুই যখন ফরাসি আকাদেমি স্থাপন করলেন, তখন এর সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ। এখনো তাই আছে। এই দুশো বছরে একটিও বাড়েনি। সেখানে আকাদেমির আসন বহু বর্ষের সাধনার ধন। জনগণের মনে যাঁদের স্থান স্থায়ী, তাঁদেরও আকাদেমির সদস্য পদের জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়। 'লে মিজারেবলের' লেখককে দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং দোদে, মপাশাঁ বা জোলার কপালে এই সম্মান-তিলক জোটেইনি।

ভারতের পক্ষে ফরাসী রীতি গ্রহণীয় হবে না, মৌলানা সাহেব স্বীকার করেছেন। অমরত্বের ছাড়পত্র দেখিয়ে আসন সংগ্রহ করতে পারেন ক'জন লেখক? জীবদ্দশায় কেউ না। সুতরাং সদস্য পদে নির্বাচনের মান কিছু নীচু

-রতে হয়েছে। জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে কিছু না কিছু দান করলেই আমাদের দরকার সন্তুষ্ট। অন্তত সদস্য হতে কোন বাধা থাকে না। মহত্তর শিল্পীদের জন্যে আছে 'ফেলোশিপ'। অর্থাৎ গুণকর্ম-বিভাগশঃ দুটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে—'ফেলোশিপ' এবং মেম্বরশিপ। প্রধান মন্ত্রী নেহরু এই আকাদেমির কেন্দ্রমণি। পদাধিকারবলে নয়, চিন্তানায়ক এবং লেখক হিসাবেও তাঁর আসন সুধিসমাজের পুরোভাগে। আকাদেমির সভাপতিত্ব তারই স্বীকৃতি।

(৩)

আকাদেমির বয়স এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সম্পাদককৃত বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেছি। এইটুকু বুঝেছি প্রতিষ্ঠানটি এখনও শিশু, উঠতে বসতে সময় লাগবে, চলাফেরা শিখতে আরো কিছু। কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের এক কোণে ছোট একটি ঘর, জাতীয় সাহিত্যের মিলন তীর্থের পক্ষে নিতান্তই অল্প-পরিসর। অন্যান্য বাধা বিঘ্নও প্রচুর। প্রায় সমবয়সী আর দুটি আকাদেমির অন্তত আত্মপ্রচারের অসুবিধা নেই, একটি নাট্যোৎসব, সংগীত-সম্মেলন বা চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারলেই হল। ভাবের লেনদেনের পথও অনেকটাই খোলা। কিন্তু রঙ-রেখা বা সুরের মুক্তি কথার নেই, সাহিত্য নিতান্ত চাষের জমির মতো, ভাষার আলে ভাগকরা, আগে অপরিচয়ের গণ্ডী মিশিয়ে দিতে হয়, তবে সেচের জলে মাটি ভেজে। দুটি প্রদেশের লেখককে যদি একত্র করাও যায়, তবে নমস্কার বিনিময়ের পর তাঁদের আর কিছু কাজ থাকে না, কেননা একে অপরের সাহিত্যকৃতির প্রায় কোন খবরই রাখেন না।

প্রতিকার কি নেই। আছে। আকাদেমি সেই কথাই ভাবছেন। এঁদের কর্মসূচীর অন্যতম হল বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যগ্রন্থের একটি পঞ্জী-প্রণয়ন। বিভিন্ন ভাষায় প্রতিনিধিস্থানীয় সুধীবৃন্দ এ কাজের ভার নিয়েছেন। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী আকাদেমিকে যথাপ্রয়োজন সাহায্য করবেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের ইতিহাস রচনা এবং কাব্য-সংকলন প্রকাশের সংকল্পও আকাদেমির আছে। ভারতীয় লেখকদের পরিচয়-সম্বলিত Who's Who তৈরির কাজে আকাদেমি হাত দিয়েছেন, 'নখ-দর্পণের' পাঠকেরা জানেন। কর্মসূচীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই প্রবন্ধের পরিসরে ধরবে না, পরে এ-সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। আপাতত এই প্রবন্ধের শিরোনামা 'পুরস্কার প্রসঙ্গে' ফিরে আসি।

(৪)

সাহিত্যকৃতির জন্যে পুরস্কারদান এখন পর্যন্ত আকাদেমির শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গত বছর ভারত সরকার ঘোষণা করেন, মুখ্য চৌদ্দটি ভাষায় পূর্ববর্তী তিন বছরে প্রকাশিত গ্রন্থসমষ্টি থেকে একটি করে বেছে নিয়ে পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা। সর্বোত্তম চৌদ্দটি বই বাছাই করার ভার নেন সাহিত্য আকাদেমি। শেষ পর্যন্ত স্থির

হয় পূর্ববর্তী তিন বছর নয়, স্বাধীনতার পরে প্রকাশিত সব গ্রন্থেরই পুরস্কার-যোগ্যতা বিচার করা হবে। আকাদেমির নির্বাচনের ভিত্তি বিভিন্ন আঞ্চলিক বোর্ডের সদস্যদের সুপারিশ।

সংস্কৃত এবং ইংরাজী পুরস্কার তালিকা থেকে বাদ গেছে। স্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতে এ দু'টি ভাষায় যত বই বেরিয়েছে তার একটিকেও আকাদেমি উপযুক্ত মনে করেননি। বাকি রইল বারোটি।

বারোজন পুরস্কৃত লেখকের মধ্যে তিনজন—জীবনানন্দ দাশ, মহাদেব দেশাই এবং সুরবরাম প্রতাপ রেড্ডী—অধুনা পরলোকে। একটি বিষয় লক্ষণীয়, কবিদের প্রতি বিচারকদের পক্ষপাত। উত্তর-স্বাধীনতাকালের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-রূপে চিহ্নিত রচনার মধ্যে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি সমাজ, সাহিত্য বা সংস্কৃতির ইতিহাস, একটি দার্শনিক আলোচনা, একটি ডায়েরি, একটি নিবন্ধ-সংগ্রহ এবং মাত্র একটি উপন্যাস। বিচারকদের কাজ সহজ ছিল না। প্রতিটি পরিণত সাহিত্যে গত সাত-আট বছরে বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের বিষয়বস্তুও বিচিত্র। মাত্র একটিকে বেছে নিতে হলে যুক্তির বদলে ঝোঁক প্রাধান্য পায়, অন্তত কোন-কোন ক্ষেত্রে দোটানায় পড়তেই হয়। আঞ্চলিক বোর্ডের সদস্যরাও, অনুমান করি, পড়েছেন। যে-সাহিত্য যত পরিণত, সেই সাহিত্যে নির্বাচন তত দুরূহ এবং অবিচারের আশঙ্কা তত বেশি। বাংলা-দেশের সুপ্রবীণ এবং সর্বমান্য একজন সাহিত্যিক সম্ভবত এই কারণেই আকা-দেমিকে তাঁর অভিমত জানাতে চাননি। শুনেছি তিনি লিখেছিলেন উত্তর-স্বাধীনতাকালে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের একটিও পুরস্কার পাবার মতো নয়। আশা করি এটা তাঁর অন্তরের কথা নয়। মতান্তর পরিহার করবেন বলেই তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। নতুবা এই কালেই প্রকাশিত বহু উপন্যাস-রম্যরচনা-গল্প-গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা নানা সাময়িকীতে দেখেছি। সে সব কি তবে শুধু মনরাখা কথা। গত কয়েক বছরে বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিজের দানও সামান্য নয়। পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি রস-বোধ এবং অপরূপ প্রাঞ্জল লিখনভঙ্গির দুর্লভ সমাবেশ তাঁর আধুনিক রচনাতেও দেখেছি। সেই অগ্রণী লেখক আপন সাহিত্যের সমকালীন ঐশ্বর্যকে অকিঞ্চিৎকর বলে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন।

যতদূর জানি, তাঁর নিজেরও একটি বই বিচারকদের সমুখে ছিল। নিরস্ত থাকার এই কারণটি দেখালে সবচেয়ে শোভন হত। অসমীয়া কবি যতীন্দ্রনাথ দুয়ারা তাই করেছেন। ইনি আসামের পরামর্শদাতা বোর্ডের সদস্য। এঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বনফুলে'র নাম অন্যান্য সদস্য আকাদেমির কাছে পেশ করেছেন জেনে ইনি নিরপেক্ষ ছিলেন।

অসমীয়া ভাষায় আকাদেমি-পুরস্কার পেয়েছে 'বনফুল', প্রবীণ কবির সম্ভবতঃ সর্বাধুনিক কাব্য সংকলন। যতীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯২ সালে শিবসাগরে। ইনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, এখন ডিব্রুগড়ের একটি কলেজে অসমীয়া ভাষার অধ্যাপক। ১৯২৯ সালে "ওমর-তীর্থ"—ওমর খৈয়ামের তর্জমা-প্রকাশেই এঁর কবিখ্যাতির সূচনা। ছন্দে নির্ভুল দখল, কিন্তু গদ্যকাব্য ("কথা-কবিতা"১৯৩৪) রচনা করে দেখিয়েছেন প্রচলিত নিয়মভঙ্গেও ইনি সমান উৎসাহী। "কথা-কবিতা"র কিছু অংশে তুর্গেনেভ থেকে অনুবাদ। এঁর মৌলিক কাব্য সংগ্রহ দু'টি—"আপোন সুর" (১৯৪৯) এবং "বনফুল" (১৯৫১)। "যদু" এই ছদ্মনামেও ইনি লেখেন।

কুললক্ষণে "বনফুলের" কবিতাগুলি রোমাণ্টিক। বিষণ্ণ, তবু মধুর। প্রবাহের উজানে গেলে বিশুদ্ধ আবেগের উৎসটিকে খুঁজে পেতে দেরি হয় না। সেই ছায়াচ্ছন্ন, পত্রমর্মরিত উৎসমুখে কান রাখলে সহৃদয় পাঠক শুনতে পাবেনঃ

> "মোর চির জনমর চির চনেহর
> যত অপূরণ আশা
> হয়ত কাবোবা মধু পরশত
> পাব কোতিয়ারা ভাষা।"

হিন্দী সাহিত্যে পুরস্কৃত গ্রন্থটিও কাব্য, পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদীর "হিম-তরঙ্গিনী"। জীবিত হিন্দী কবি-দের মধ্যে চতুর্বেদীজী একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, এঁর কাব্যের মূল সুর দেশাত্মবোধ। 'হিম-তরঙ্গিনীর' অধিকাংশ কবিতা লেখকের কারাবাস-কালীন রচনা, "এক ভারতীয় আত্মা" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশপ্রেমের সঙ্গে কোন কোন কবিতায় হৃদয়াবেগের বিস্ময়কর মিশ্রণ ঘটেছে, এই দিক থেকে কবি বাংলার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তুলনীয়। চতুর্বেদীজী হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি এবং মধ্য-প্রদেশের "কর্মবীর" পত্রিকার সম্পাদক। ইনি শুধু নিজে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেননি, কয়েকজন যোগ্য শিষ্যও তৈরি করেছেন। এঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত লেখকদের মধ্যে সুভদ্রা চৌহান, "নবীন" এবং "দিনকর" উল্লেখযোগ্য। "কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধ," "শিশুপালবধ," "হিমকিরিটিনী মাতা" এবং "সাহিত্য দেবতা" পণ্ডিত চতুর্বেদীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ বই। শেষেরটি গদ্য কবিতার সংকলন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পুরস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে উপন্যাস একটিই—"অমৃতর সন্তান"। এটি **ওড়িয়া** ভাষায় রচিত। লেখক শ্রীগোপীনাথ মহান্তি সরকারী চাকুরির খাতিরে কিছুকাল কোরাপুট জেলায় ছিলেন এবং আদি-বাসী-অধ্যুষিত এই অঞ্চলের জীবনধারা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। আদিবাসী জীবন নিয়ে তাঁর পূর্বরচিত দু'টি উপন্যাসও প্রশংসা পেয়েছিল, কিন্তু "অমৃতর সন্তান" পরিসরে বৃহত্তম (পৃঃ সংখ্যা ৮৩১) এবং সর্বাধুনিক।

ওড়িয়া সাহিত্যে আদিবাসীদের কথা অবশ্য শ্রীযুক্ত মহান্তির রচনাতেই প্রথম শোনা যায়নি। এই রাজ্যে সবশুদ্ধ

বিয়াল্লিশটি উপজাতির বাস, সুতরাং সাহিত্যে তাদের বিপুল-বিচিত্র জীবনের ছায়া বারবারই পড়েছে। অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর আগে গোপীবল্লভ দাস "ভীম ভূইয়া" উপন্যাসটি রচনা করেন। তবে শ্রীযুক্ত মহান্তি পরবর্তী হিসাবে আধুনিকতর এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অধিকারী।

"অমৃতর সন্তান"র পটভূমি কোরাপুট পার্বত্য অঞ্চল, পাত্রপাত্রী কোঁদ উপজাতি-ভুক্ত। সরল, আদিম জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি। গ্রামের নাম মিনিয়াপায়ু, অরণ্যের গভীরে, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায়। সেই অচলায়তনেও পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। হরগুণা নামক চরিত্রটি নূতন জীবনের প্রতীক। সে কোরাপুটের গঞ্জে গিয়ে দেখে এসেছে নূতন সভ্যতার রূপ। তার স্বপ্ন, সেও স্থায়ী, শক্ত, পাকা বাড়ি তৈরি করবে, গুদামে রাখবে শস্য, গোরুর গাড়ি-বোঝাই জিনিসপত্রের লেন-দেন করবে। তেলেগু সাহুকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস তার আছে। আরেকটি বিচিত্র চরিত্র— "পিওতী"। এই পার্বতীর জীবনের সতেরো বছর কেটেছে সমতল অঞ্চলে, তার বেশে, ভূষায়, কথায়, আদিম জীবনের এতটুকু স্পর্শ নেই। একদিন তাকে ফিরে আসতে হল গ্রামে, কিন্তু আরণ্য জীবনের সঙ্গে কিছুতে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। সে না জানে "কুভি" ভাষা, না পারে অন্যান্য কোঁদ মেয়েদের মতো নাচতে। সমতল তাকে অহরহ টানে।

অনেকের মতে খুঁটিনাটির উপরে অত্যন্ত বেশি জোর দেবার ডিকেন্সীয় দোষে বইটি ভারাক্রান্ত। লেখক কোঁদ উপজাতির পরব, সামাজিক কাঠামো, ধর্ম-বিশ্বাস, চাষবাসের ধরণ ইত্যাদির দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না বইটির মুখ্য আকর্ষণ এর মূল কাহিনী নয়, বিচিত্র মানুষ এবং অপরিচিত পটভূমি। আদিবাসীর জীবনের নানা দিকের রেখাচিত্র উপন্যাসটিকে মূল্যবান করেছে।

কানাড়ী ভাষার অগ্রগণ্য লেখক কে ভি পুটাপ্পা ('কুভেম্পু') মহাকাব্য 'শ্রীরামায়ণ-দর্শনম' রচনা করে পুরস্কৃত হয়েছেন। "কুভেম্পু" শুধু কবি নন, সব্যসাচী। উপন্যাস - গল্প - নাটক - প্রবন্ধ - জীবনী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। এঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে, তার-পর থেকে আজ অবধি অন্যূন চল্লিশটি গ্রন্থ লিখেছেন। রক্ষণশীল কানাড়ী ভাষায় নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন "কুভেম্পু" এবং অরবিন্দদর্শনপ্রভাবিত তাঁর সমকালীন অন্যান্য কয়েকজন লেখক।

'শ্রীরামায়ণদর্শনম' মহাকাব্যটিও (৮৭৭ পৃষ্ঠা) অরবিন্দদর্শনে অনু-প্রাণিত। আদিকবির রচনাকে লেখক নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। তাঁর রামচরিত্র রাজণ্যরিমাত্র নয় Supraconsciousness-এর প্রতীক।

লেখকের মতে এটা হল পূর্ণদৃষ্টি,

সমন্বয় এবং সর্বোদয়ের যুগ; ত্রেতার সীতাপতি চরিত্রকল্পনায় অসম্পূর্ণতা ছিল। খণ্ডদৃষ্টির ছাপ ছিল। লেখক তাকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন। এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ সম্পর্কে কানাড়া সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এ এন মূর্তি রাও বলেছেন, **"It is the most sustained poetic effort in Kannada in recent times . . . ."**

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে 'কুভেম্পুর' পরিচয় ঘনিষ্ঠ। এঁর "গুরুবিনোদনে দেবরাড়িগে" বাংলা থেকে অনুবাদ, এবং রচিত গ্রন্থাবলীর দুটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী।

পাঞ্জাবী ভাষায় পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থ "মেরে সেইয়াঁ জীও"-র লেখক ভাই বীর সিংকে কবি না বলে প্রতিষ্ঠান বলাই সমীচীন। শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী এই সাহিত্যসাধকের প্রায় ষাট বৎসরের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে পাঞ্জাবী ভারতীয় সাহিত্যের মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছে। ভাই বীর সিং "খালসা সমাজ" স্থাপন করেন ১৮৯৪ সালে। গত শতাব্দীর শেষভাগেই ইনি পাঞ্জাবী ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। বিষয়বস্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আহৃত, অর্থাৎ বাংলার "দুর্গেশ-নন্দিনী"র মতো পাঞ্জাবের প্রথম উপন্যাসটিও ঐতিহাসিক। কবি হিসাবে ভাই বীর সিং রহস্যধর্মী, দাদু ও কবিরের উত্তরসাধক। কিছুকাল পূর্বে এই মহাকবিকে একটি "অভিনন্দনগ্রন্থ" উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। সুমুদ্রিত, পরিচ্ছন্ন এই গ্রন্থটি দেখেছি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং দেশদেশান্তরের নানা নায়কস্থানীয় মহাজন এই মনীষীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। ভাই সাহেবের রচনা বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। একটি নমুনা এখানে তুলে দিলুম:

"Out of the dust
  with a heavenward thrust,
I rise and rise and
  turn my eyes
Thirstily to the Lord of
  the skies;
My blossoms opened,
My boughs unfurled."

(হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ)।

মরাঠী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ রচনার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন তর্কতীর্থ লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী। শাস্ত্রীজীর সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি শুধু গভীর-বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়, রাজনৈতিক আত্মত্যাগের জন্যেও। জীবনে ইনি একাধিকবার কারাবরণ করেছেন এবং মানবেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন।

অনুরাগী-মহলে শাস্ত্রীজীর নাম "শাস্ত্রীবুয়া"। এঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ ১৯২৮ সালে প্রকাশিত "আনন্দ-মীমাংসা," উপনিষদ-সাহিত্য। 'জড়বাদ' আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কিন্তু শাস্ত্রীজীর মহত্তম কীর্তি হ'ল "ধর্ম-কোষ"--সংস্কৃত শাস্ত্রসার সংগ্রহ। এই মহাসংকলনের চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, আরও কয়েকটি প্রকাশিতব্য। বলা-বাহুল্য এই "কোষ" সম্পাদনায় শাস্ত্রীজী ভক্তিকে আমল দেননি, যুক্তিকে নির্ভর করেছেন। যে গ্রন্থটি পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, তার নাম 'বৈদিক সংস্কৃতিচ বিকাশ', বৈদিক যুগের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চিত্তাকর্ষক বিবরণী।

লক্ষ্মণশাস্ত্রীজী সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার জন্যে "প্রাচ্য পাঠশালা" নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেছেন এবং "নবভারত" নামক উন্নতধরণের মাসিক-পত্রের সম্পাদক। গত বৎসর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মরাঠী সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

পুরস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থাগুলি প্রবন্ধ-সংগ্রহ। সংক্ষেপে এদের পরিচয় দেব।

মলায়লম ভাষা ও সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস "ভাষা সাহিত্য চরিত্রম্"। পৃষ্ঠাসংখ্যা দ্বিসহস্রাধিক। বাংলা ভাষার দীনেশচন্দ্র, সুনীতিকুমার প্রভৃতির কাজ কেরলের শ্রীনারায়ণ পানিক্কড় একাই করেছেন। লেখক মলয়ালম সাহিত্যের আদিপর্ব থেকে শুরু করে আধুনিক কাল অবধি পৌঁচেছেন, প্রসঙ্গতঃ সংস্কৃত এবং তামিল সাহিত্যের আলোচনাও করেছেন। অধ্যায়ন এবং অধ্যবসায়ের নির্ভুল স্বাক্ষর বহন করছে এই মহাভারততুল্য ইতিহাস। এর শেষ খণ্ড ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

উর্দু লেখক জাফর হুসেন খাঁ লখনউ-নিবাসী মনীষী। পুরস্কৃত গ্রন্থ "মাল ঔর মশিয়ৎ" দার্শনিক আলোচনা। খাঁ সাহেব ইসলামের বাণীর সঙ্গে "অস্তিত্ববাদের" সম্বন্ধসূত্রনির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। এই বইটি সুপারিশ করেন স্বয়ং মওলানা আজাদ। তাঁর মতে প্রাপ্ত পুস্তকাদির মধ্যে এই একটিই পুরস্কার-প্রাপ্তির উপযুক্ত গুণসম্পন্ন।

তেলুগু ভাষায় লিখিত 'অন্ধ্রুল সংঘিত চরিত্র' অন্ধ্রজাতির সামাজিক এবং নৃতত্ত্বমূলক ইতিহাস। পরলোকগত সুরবরম প্রতাপ রেড্ডী এর উৎপাদন সংগ্রহ করেছিলেন সাহিত্যের ভিতর থেকে। তিনি বিশ্বাস করতেন একটা জাতির বৈশিষ্ট্যের সন্ধান তার সাহিত্যেই মেলে, তথ্যের জন্যে তাম্রলিপি বা প্রস্তরশাসন খুঁজে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই।

প্রতাপ রেড্ডীর লোকান্তর ঘটেছে ত বছর, ষাট বৎসর বয়সে। ইনি শুধু াবন্ধিক ছিলেন না, ছোট গল্প এবং টকাদিও লিখেছেন, এবং দক্ষিণ ারতের নানা ভাষায় এ'র রচনা নূদিত হয়েছে। সাহিত্য ছাড়া ংবাদিকতা ছিল এ'র অন্যতম নেশা—ায় পঁচিশ বছর ধরে 'গোলকণ্ডা পত্রিকা' ম্পাদনা করেছিলেন। হিন্দুধর্ম, হিন্দু-ার্ব এবং যুবজাগরণ নিয়েও কয়েকটি ল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তামিল লেখক সুপণ্ডিত আর পি শেতু পিলে বয়সে প্রবীণ, এ পর্যন্ত পনেরোটি গ্রন্থ লিখেছেন, এবং পুরস্কৃত "তামিল ইনবামের" মত সব ক'টিই প্রবন্ধসংগ্রহ। শ্রীযুক্ত পিলে মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তামিল ভাষার অধ্যাপক, এবং সাহিত্য আকাদেমির আঞ্চলিক বোর্ডের সদস্য। এ'র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিবিধ, কাম্বরামায়ণ, কন্দপুরাণ, ভাষাতত্ত্ব থেকে শুরু করে সাহিত্য বিষয়ে সাধারণ আলোচনা। "তামিল ইনবাম্" শেষোক্ত শ্রেণীর; ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত, এ-পর্যন্ত তিনটি সংস্করণ হয়েছে। ১৯৪৫ সালে শ্রী পিলে "তামিল বীরত্ব" নামে অনুরূপ একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তী গ্রন্থ "খৃষ্টব তামিল থণ্ডার"ও উল্লেখযোগ্য, এটি তামিল সাহিত্যে খৃষ্টান পণ্ডিতদের দানের আলোচনা।

গুজরাতী ভাষায় "মহাদেব ভাইনি", অর্থাৎ মহাদেব দেশাইয়ের ডায়েরীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সম্ভবত প্রকাশ সালের হিসাবে (এটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত)। নতুবা এই সিদ্ধান্তের বিশেষ কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। স্মরণ রাখতে হবে দেশাইজী লোকান্তরিত হয়েছেন ১৯৪২ সালে, এবং এই পুরস্কারদানের মুখ্য উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সাহিত্য-সাধনাকে উৎসাহদান। বলা বাহুল্য দেশাইজীর রচনার সাহিত্যমূল্য বা সরসতা সম্পর্কে কোন কটাক্ষ করছি না, এবং জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর সহচর এই আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ দেশ-সেবকের অতুলনীয় দানের কথাও বিস্মৃত হইনি। তাঁর রচনার বহুলপ্রচার অবশ্যই কাম্য, কিন্তু তার উপায় স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র-নাথ বা শরৎচন্দ্রের অধুনা প্রকাশিত পত্রাদিরও সাহিত্যমূল্য অসীম; এই নবাবিষ্কৃত রচনাসমষ্টি আদরণীয় কিন্তু পুরস্করণীয় নয়। অতীতকে শ্রদ্ধা করব, সম্পদ জ্ঞান করব, কিন্তু উৎসাহ দেব বর্তমানকে, কেননা আমরা তার মধ্যেই আছি। পুরস্কার-দাতারা গুজরাতী সাহিত্যের সাম্প্রতিক ধারার প্রতি সুবিচার করেননি।

অন্যতম পুরস্কৃত গ্রন্থ "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা" এই-আলোচনার বিষয়বস্তু করিনি। "বনলতা সেনের" স্রষ্টার জীবনবোধ এবং প্রতীতি নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় নিবিড়, যোগ অন্তরের। আরেকটি অনুচ্ছেদ রচনা বাহুল্য হত।

সাহিত্যের মড়ক ও মেরুদণ্ড

হরপ্রসাদ মিত্র

বাহাত্তর বছর আগেকার কথা। 'সাবিত্রী লাইব্রেরি'র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে (১১ই চৈত্র, ১২৯০) 'অকাল কুষ্মাণ্ড' নামে একটি প্রবন্ধে তখনকার বাংলা দেশের সাময়িক সাহিত্যের প্রাচুর্য বিষয়ে কটাক্ষ . এবং তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঘটনার বছর তিনেক আগে ১২৮৭ সালের অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শন' (বঙ্কিমচন্দ্র), 'আর্যদর্শন' (যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ), 'বান্ধব' (কালীপ্রসন্ন ঘোষ) ও 'ভারতী' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর),—এই ক'খানি পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন এবং 'পঞ্চানন্দ নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক" ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি লিখেছিলেন, "চিহ্নিত সিবিল সার্বাণ্ট হইতে সামান্য স্কুল মাস্টার পর্যন্ত বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।...এখনও একটি কথা বাকি আছে। যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতেছেন তাঁহারই অন্য ব্যবসায় আছে, ...কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটি ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই...। ...আমার বোধ হয়, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।" এই দূরবস্থা সত্ত্বেও শাস্ত্রী মহাশয় নৈরাশ্য স্বীকার করেননি। তাঁর মন্তব্য প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মতো— "আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত।" 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তৎকালীন বাংলা সাময়িক সাহিত্যের এই আশা-ভরসার দিকটিতে বেশি জোর দেননি। তিনি দেখেছিলেন এর বিপরীত দিক। সাময়িক পত্রিকার অতিরিক্ত প্রাচুর্য যে দেশের যথার্থ সাহিত্য-পিপাসার ফল নয়, বরং এক রকম অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ, এই ছিলো তাঁর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। বাংলা ১২৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ, অল্পমূল্যে, ফালতু-কথার বাড়াবাড়ি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন। ইংরেজিতে এই ধরনের বাচালতার নাম 'ক্যাণ্ট'। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, "ভাব যখন স্বাধীনতা হারায়, দোকানদারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে, তখন তাহাই 'ক্যাণ্ট' হইয়া পড়ে। য়ুরোপের বুদ্ধি ও ধর্ম-রাজ্যের সকল বিভাগেই 'ক্যাণ্ট' নামক একদল ভাবের শূদ্রজাতি সৃজিত হইতেছে।"

১২৯০ থেকে ১৩৬২ সাল বেশ দীর্ঘ ব্যবধান, সন্দেহ নেই। দেশের অবস্থা বদলেছে ইতিমধ্যে। সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও গুণগরিমাও বেড়েছে বৈকি। আজকাল প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি সবরকম বাংলা লেখার জন্যই কিছু কিছু পারিশ্রমিকও পাওয়া যায়। সাহিত্যকর্মের এই ব্যাপক উৎসাহের দিনে রবীন্দ্রনাথের সুদূর অতীতের সেই 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধটির কথা তবুও অবান্তর নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাতে সম্পাদক ও সমালোচকের দায়িত্বের কথা তুলেছিলেন। তাঁর নিজের একটি উক্তি লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হবে। আমাদের এই একান্ত সাম্প্রতিক সাহিত্য-প্রাচুর্যের দিনে সেই পুরনো মন্তব্য পুনর্বার স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন, "প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে

শতকরা কত কত ভাব হৃদয়হীন কলমের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ও কপট কৃত্রিম রসনাশয্যার উপরে হাত পা খিঁচাইয়া ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মরিতেছে তাহার একটা তালিকা কে প্রস্তুত করিতে পারে! এমনতর দারুণ মড়কের সময় অবিশ্রাম চুলা জ্বালাইয়া এই শত সহস্র মৃত সাহিত্যের অগ্নিসৎকার করিতে কোন্ সমালোচক পারিয়া ওঠে!"

অবশ্য, পত্র-পত্রিকার ক্রমবর্ধমান ভিড় তিনি তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যেই দেখে গেছেন। কিন্তু এই ধরনের তীব্র তিরস্কার আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেন নি। তা থেকে একথা অনুমান করা অনুচিত নয় যে, লেখার চর্চা ব্যাপক হোক, এ-বাসনা তিনি পোষণ করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে অল্পমূল্য বহু সংখ্যক লেখার বহুব্যাপক রেওয়াজ যে অকাট্য যুক্তিতর্কের খর-শরবর্ষণেও ক্ষান্ত হয় না, এ-অভিজ্ঞতা তিনি সেই ১২৯০ সালেই নীরবে গ্রহণ করেছিলেন।

তীব্র না হলেও, মৃদু ভর্ৎসনা এই ঘটনার পরেও কয়েকবার শোনা গেছে। সে রকম একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার 'পরিচয়'এ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন,—"প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগুলার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী।" তার পরের সংখ্যার (কার্তিক) 'পত্রিকা' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানি ('শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু') ছাপা হয়, তাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র প্রশংসা ছিল এবং সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত লঘু ও গম্ভীর দুটি দিকেরই অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখক-পাঠক-সম্পাদক সমাজকে তিনি অবহিত হতে বলেছিলেন। সাময়িক পত্র সম্পাদনা ও পরিচালনা সম্বন্ধে অন্যান্য কয়েকটি কথার পরে ঐ চিঠিতে মন্তব্য ছিল ঃ—"আমার বলবার কথা এই সাধারণের মন না রেখে সাহিত্যের বিশিষ্টতা রাখবার দায়িত্ব কোনো না কোনো জায়গায় থাকা চাই। নইলে দেখতে দেখতে সাহিত্য অন্ত্যজ-বর্ণের রূপ ধরবেই।" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন 'বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করে একটি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে' তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে বলেছিলেন, "তুমি যে কাগজ বের করবে তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড়ো কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তার চেয়েও বড়ো কথা। সে দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়,—কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে দাবী থাকবে। সে-চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ ক'রে সাবধান করে, লেখায় অপরিচ্ছন্নতা, শৈথিল্য, চিন্তার দৈন্য আপনিই সংকুচিত

হয়; অন্তত আপন উত্তরীয়টাকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চরিত্রবৈশিষ্ট্য থাকা চাই—অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তার তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি করে তুলবে।"

'সবুজ পত্রের' সম্পাদনায় এই তপস্যা ও সৃষ্টির যাথার্থ্য লক্ষ্য করে তিনি খুশী হয়েছিলেন। বিশেষভাবে প্রমথ চৌধুরী এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তের এই সামর্থ্যের কথা তিনি বার বার স্মরণ করেছেন।

মুদ্রিত সাহিত্যের ইতিহাসে সকল যুগেই সমকালীন পত্র-পত্রিকার দ্বারা লঘু ও গম্ভীর উভয় শ্রেণীরই রচনাদর্শ কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের উনিশের শতক থেকে সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের মধ্যে এই অবশ্যস্বীকার্য সম্পর্কটি বার বার অনুভব করা গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র—তার-পর, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও উত্তরবর্তী নানা গণ্যমান্য সম্পাদক সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আপন-আপন ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণী প্রভাব রেখে গেছেন। সেই সঙ্গে লেখার জন্য রজতমূল্যে দেবার সামর্থ্যের কথাটিও অবশ্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সন্দেহ নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে সেকালের সম্পাদক-সমাজকে একথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—'আজিও গবর্নমেণ্টের চাকুরীতে যাইবা-মাত্র অন্ততঃ ৭৫ কি ১০০ টাকা (একজন ভাল গ্রাজুয়েট) পাইতে পারেন। যতদিন সাহিত্য-ব্যবসার প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, ততদিন উৎকৃষ্ট শিক্ষিত লোক সাহিত্য-ব্যবসায়ে সর্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না।' এই উক্তির পরেও এরকম আরো অনেক উক্তি বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে ফণীন্দ্রনাথ পালের কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের একাধিক চিঠিতে 'যমুনা'-র তো বটেই, তাছাড়া 'সাহিত্য', 'বঙ্গবাসী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার উল্লেখ দেখা যায়। 'বিষয়বুদ্ধি' উপেক্ষা না করে 'প্রবাসী'র আদর্শ মনে রেখে তিনি ফণীন্দ্রনাথকে 'যমুনা'র উন্নয়ন-সাধনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'যমুনা'তে ভালো সমালোচনা চালু করবার কথা তাঁর মনে জেগেছিল। Herbert Spencer সম্পর্কে তিনি নিজে আলোচনা করবার কথা ভেবেছিলেন। অনুযোগের সুরে বলেছিলেন,—"আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না।" বলা বাহুল্য, এ-অনুযোগ ঐতিহাসিক সত্যের

স্বীকৃতি নয়। কারণ, নানা প্রসংগের পরিবেশনভার সেকালে একাধিক সম্পাদক স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' তো বটেই—তারপর 'ভারতী'-তেও সে দায়িত্ব পালিত হতে দেখা গেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের কালের সেই বিশেষ পর্বের পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্য বা সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁর সংগত আশংকা প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। মূলত গল্প-উপন্যাসের লেখক হয়েও প্রবন্ধের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকার সংগে তাঁর অপ্রীতিকর সম্পর্কের কথা সকলেরই সুবিদিত। তবু সে-কাগজের সাহিত্য প্রবন্ধ ছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধও তিনি খ'ুটিয়ে পড়তেন। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উড়িষ্যার খোন্দজাতি সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়ে তিনি সে-লেখার তথ্যগত ত্রুটিবিচ্যুতি দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবার অল্পকাল আগে ১৩১৯ সালের চৈত্র-মাসে লেখা আর একখানি চিঠিতে তিনি জানিয়ে-ছিলেন—"দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া grandভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন।"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমলে বাংলার সাধারণ সাহিত্যিক এবং সাহিত্য পাঠকের মধ্যে যে নিছক-দাক্ষিণ্য মাত্র সম্পর্ক ছিল এখন সে-অবস্থার অবসান ঘটেছে। অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয় যে-অবস্থা ঘটিয়ে তোলবার পরামর্শ দিয়েছিলেন সে-অবস্থা এখনো ঘটেনি। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের বদান্যতার ফলে গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কিছু উৎসাহ ছড়িয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের বিশিষ্টতার চর্চায় সে বদান্যতার প্রতিক্রিয়া এখনো বিতর্কসাপেক্ষ। কবিতার মর্যাদা বেড়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। কিন্তু প্রবন্ধ?—বিশিষ্ট সাহিত্যগুণান্বিত প্রবন্ধ?

প্রবন্ধের বিষয়ের বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে বটে, তথ্য-তত্ত্বের উদ্ঘাটনে পর্যালোচনায় অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। বিশুদ্ধ গবেষণার দিকেও ঝোঁক বেড়েছে। আবার এর বিপরীত প্রবণতারও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তথাকথিত রম্য-রচনার জন-প্রিয়তায়। কিন্তু জনপ্রিয় রম্য-রচনায় শৈথিল্য পরিহার করে, পণ্ডিতপ্রকীর্তিত গবেষণামুখ্য রচনার নীরসতা এড়িয়ে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ প্রবন্ধের মর্যাদা বাড়াবার দায়িত্ব রয়েছে একালের বাংলা সাহিত্যের পত্র-পত্রিকার পরিচালক সাহিত্যনিয়ন্তাদের সবলা সুবিবেচনার প্রতীক্ষায়। বলা বাহুল্য, বেশির ভাগ প্রবন্ধের বই-ই সাহিত্য হিসেবে অপাংক্তেয়। একজন বিদেশী সমালোচক এ-কালের বহু-বিচিত্র ইংরেজি প্রবন্ধের বই সম্পর্কে লিখছেন:

The greater part of this literature is not literature at all in the aesthetic sense of the term.. Some of it deals with subjects which may be treated didactically, primarily with a view to giving information, as in historical or sociological text-books; such books may be elevated into literature by the vision of the writer.

এযুগের বাংলা সাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশেষ vision-এর প্রেরণা সঞ্চার করা এবং পাঠকসমাজের এই রুচি উদ্রিক্ত ও পোষণ করাবার মতো অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করবার লগ্ন এসে গেছে। সে লগ্ন সার্থক করে তোলবার সামর্থ্য অবশ্য কেবলমাত্র লেখকের নয়,—কেবলমাত্র সম্পাদকেরও নয়। লেখক-পাঠক-সম্পাদকের সহযোগিতা চাই। সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ রুচি সৃষ্টির ব্যাপারে এই তিন পক্ষের অনস্বীকার্য সহযোগিতার দান সকলেরই সুবিদিত সত্য। এ-তিনের অতিরিক্ত যে চতুর্থ পক্ষ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে কাজ করেন, তিনি হলেন দুর্জ্ঞেয় বিধাতা। আমার বিশ্বাস, তিনিই প্রবলতম পক্ষ। তিনি যন্ত্রী, অন্য সবাই যন্ত্র। কিন্তু অলৌকিক প্রতিভার কথা উহ্য রাখলে পাঠকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণের কাজে লেখকের তুলনায় সাধারণত সম্পাদকসমাজই হলেন সমর্থতর যন্ত্র। ১৩৬২ সালের বৈশাখ মাসে বাংলা সাহিত্যের লেখক-পাঠকের সাধ ও সাধনার কথা ভাবতে বসে আমাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সুখ ভাবনার সূত্রে অদৃশ্য বিধাতার বহুক্ষম যন্ত্র সেই সম্পাদক-বিধাতার কথাই সর্বাধিক মনোযোগ দাবী করে। সাহিত্যের আপাতপ্রত্যক্ষ সমৃদ্ধির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'মড়কের' সম্ভাবনা নিহিত থাকে। সেই মড়কের মার থেকে সাহিত্যের যাঁরা স্বাস্থ্যরক্ষা করেন, তাঁরা সমাজের নমস্য। সুস্থ, উদার, কল্যাণকাম, স্থিতপ্রজ্ঞ সম্পাদকের 'তপস্যা' ছাড়া কোনো যুগেই সাহিত্যের মেরুদণ্ড কঠিন হয় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কথাই দ্বিধাহীন স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। আজ সেই পুরোনো কথা পুনর্বার মনে পড়ছে।

রবীন্দ্রচর্চা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এই সংখ্যায় অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহের একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ তালিকা পূর্ণাঙ্গ না হইলেও প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অন্তত উল্লেখযোগ্য সমস্ত পুস্তকের নাম ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। পুস্তক সংখ্যা ১৮০ বা তাহারি ধারে কাছে। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এগুলির প্রকাশ। মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত অথচ এখনো গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয় নাই এমন প্রবন্ধাদির সংখ্যা সুপ্রচুর। এখন এই দুই জাতীয় রচনা যোগ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের কি অপরিসীম কৌতূহল ও আগ্রহ। তারপরে প্রতি বছরেই এ বিষয়ে নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, পরিবর্ধিততর বেগে এই ধারা এখনো দীর্ঘকাল প্রবাহিত হইতে থাকিবে নিঃসন্দেহ। এই সমস্ত গ্রন্থ তিন শ্রেণীর, (১) রবীন্দ্রনাথের জীবনী ,(২) রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা এবং (৩) রবীন্দ্র জীবনের স্মৃতিকথা বা বিচ্ছিন্ন তথ্যপুঞ্জ।

বলা বাহুল্য সবগুলি গ্রন্থের মূল্য সমান নহে। তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থের অনেক গুলিই সুখপাঠ্য এবং কবিজীবনের অনেক অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলি এবং যে-সব সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রসঙ্গত যে-সব আলোচনা আছে, সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে আনিব না। প্রথম দুই শ্রেণীর গ্রন্থ উপলক্ষ্য করিয়াই আমাদের বক্তব্য বিষয় বলিতে চেষ্টা করিব। সে বিষয়টি হইতেছে রবীন্দ্র চর্চার ভবিষ্যৎ প্রকৃতি ও ধারা।

রবীন্দ্র জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী অবিসম্বাদীরূপে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, চতুর্থ বা শেষ খণ্ডও অচিরে প্রকাশ হইবে। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বৃহত্তম জীবনী, শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির জীবনকথার যোগ্য বাহন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে প্রভাতবাবু যে অসীম অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও তথ্য সংগ্রহ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত হইতেছে বিশ্বভারতীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত বঙ্গীয় শব্দ কোষ। বিশ্বভারতী গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের এ দুটি বৃহত্তম নিদর্শন। কাল নিরবধি কাজেই কালক্রমে প্রভাতবাবুর রচিত জীবনীর চেয়েও অধিকতর মূল্যবান রবীন্দ্রজীবনী হয়তো লিখিত হইবে, কিন্তু সেই ভাবী কালের অনির্দিষ্ট লেখককেও প্রভাত বাবুর গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইবে। এই আকর গ্রন্থকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যিনিই রবীন্দ্রজীবনী লিখুন না কেন তাঁহাকে প্রধানত এই 'বরাকর' হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। সাধারণ পাঠক গ্রন্থখানিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু এখন যাঁহারা রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় নিরত সেই বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থখানিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। এই বইয়ের সাহায্য না লইয়া রবীন্দ্র চর্চাকারীর পক্ষে এক পা অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব। রবীন্দ্র-সান্নিধ্য, শান্তিনিকেতনবাস ও তথায় সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় যাবতীয় উপাদানের পূর্ণতম সদ্ব্যবহার প্রভাতবাবু যে করিয়াছেন ,তাহার প্রমাণ এই অতিকায় গ্রন্থ।

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধানত্বের দাবী সম্বন্ধে তর্ক উঠিবে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' ও কাব্য-পরিক্রমা প্রধান না হইলেও প্রথম বটে। (তৎপূর্বে কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও নগণ্য)। প্রভাতবাবুর গ্রন্থ যেমন অতিকায়, অজিতবাবুর গ্রন্থ দু'খানি তেমনি ক্ষীণকায়। কাব্যপরিক্রমা তো কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু পরবর্তী রবীন্দ্র আলোচনার উপরে ইঁহাদের প্রভাব

বিচার করিলে বিস্ময় বোধ হয়, গ্রন্থের কায়িক ক্ষীণতা সেই বিস্ময়কে আরো বর্ধিত করে। অজিতবাবুর গ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে (অনেকে দোষ মনে করিতে পারেন) রবীন্দ্রকাব্যের রসবিচারের চেয়ে তত্ত্ববিচারের দিকেই লেখকের বেশি ঝোঁক। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 'জীবন দেবতার' আলোচনায় যে পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহার অনেকটাই নিরর্থক কেন না, বস্তুসম্পর্ক হীন। আর তাঁহার প্রদর্শিত সূত্র অনুসরণ করিয়া পরবর্তী অনেক সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যে যত্রতত্র জীবন-দেবতার আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন। বর্তমান লেখকের মতে এই সূত্র ও সূত্রানুসরণ দুই-ই ভ্রান্ত, কিন্তু ইহা যে অজিতবাবুর প্রভাবের, শক্তির পরিচায়ক তাহাতে ভুল নাই। যাই হোক, অজিতবাবুর পরিকল্পিত তত্ত্বসূত্র যতদিন পাঠক ও বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন ততদিন তাঁহার গ্রন্থ দুখানির প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে।

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, কবির কাব্য, নাটক ও উপন্যাস সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। তাঁহার গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কম, আর তাঁহার গদ্যরীতি সম্বন্ধে আলোচনা কিছুই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ পরিমাণ বিচারে তাঁহার গদ্য সাহিত্যের পরিমাণ পদ্য ও নাটকের চেয়ে বেশি বই কম নয়। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে অবশ্য উপন্যাস, ছোটগল্প ও অনেক নাটক পড়ে। সেই পরিমাণে গদ্য সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে আলোচনা গদ্যের বা গদ্যরীতির আলোচনা নয়, উপন্যাস, ছোটগল্প বা প্রাসঙ্গিক নাটকগুলির আলোচনা। গদ্য সাহিত্যের বিশুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যাইবে তাঁহার প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিতে। নাটকে বা উপন্যাসে গদ্যরীতি কাহিনীর উপরে ভর দিয়া দণ্ডায়মান, কাজেই সেখানে তাহার বিশুদ্ধ মূর্তি সব সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যপক্ষে প্রবন্ধে গদ্যই গদ্যের নির্ভর, অবশ্য Idea আছে, কিন্তু Idea নিজেই অশরীরী, সে অপরের ভারসহ নয়, বরঞ্চ সে নিজেই ভর করিবার জন্য আশ্রয় খোঁজে, গদ্যরীতি সেই আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যরীতির আলোচনায় এখন বিশেষজ্ঞগণের মনোনিবেশ আবশ্যক। প্রথম কারণ সে আলোচনা বেশি হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রমনীষার অনেক রত্ন ঐ প্রবন্ধগুলিতে নিহিত, তাহার উদ্ধার করিলে রবীন্দ্রনাথের আর একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। তার পরে আমাদের জাতি এখন নূতন পথের সন্ধানে নিযুক্ত; সেই পথের সন্ধান, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ও জাতীয় যাত্রাপথের অনেক চোরাবালি ও কানাগলির সতর্ক বাণী প্রবন্ধগুলিতে বিন্যস্ত। নিপুণ বিশ্লেষণায় সেগুলি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইলে জাতীয় চরিতার্থতার পথ সুগম হইবে। আর গদ্যরীতির বিশেষ আলোচনার কারণ এই যে আমাদের বর্তমান সাহিত্য ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য প্রধানত গদ্যাশ্রয়ী হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। গদ্যাশ্রয় গদ্যরীতির অপেক্ষা রাখে; গদ্যরীতির বিশ্লেষণ ও আলোচনায় গদ্যরীতি সম্বন্ধে লেখকগণের ধারণা স্পষ্ট হইলে তাঁহাদের লেখনীর পথ সুগম হইবার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রপ্রবন্ধ ও রবীন্দ্রগদ্যরীতির বিশেষ আলোচনার ফলে জাতি ও
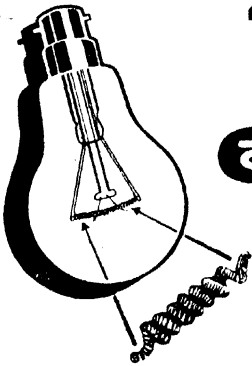
সাহিত্য দুয়েরই মঙ্গল হইবে মনে হয়। কাজেই এদিকে রবীন্দ্র সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি পড়া আবশ্যক।

২

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে-সব গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্র সাহিত্যের যে-স্থান তাহাতে ব্যক্তিগত প্রয়াসের চেয়েও কিছু বেশি আবশ্যক। কোন ব্যক্তি কি লিখিবেন তাহার নির্দেশ দেওয়া চলে না। লেখক তাঁহার শক্তি ও অভিরুচি অনুসারে কাজ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেভাবে কাজ চলিলে রবীন্দ্রচর্চার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভীষ্ট পথে উন্নতি না হইতেও পারে। প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ মন্তব্য খাটে না। প্রতিষ্ঠানের শক্তি ব্যক্তিগত শক্তির চেয়ে ব্যাপক এবং তাহার অভিরুচিকে নির্দিষ্ট পথে চালানও সম্ভব। এখন যদি প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে, তবে রবীন্দ্রচর্চাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রয়োজন অনুসারে চালনা করা যাইতে পারে। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যা-বিতরণী প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। ইঁহাদের অধিকাংশই রবীন্দ্রচর্চা সম্বন্ধে উদাসীন-প্রায়। সত্য বটে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্র অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উক্ত অধ্যাপক পদে প্রবীণ ও গুণী ব্যক্তি সমাসীন। কিন্তু তিনি যাহাতে সর্বতোভাবে রবীন্দ্রচর্চায় ও রবীন্দ্রচর্চা পরিচালনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী। ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু সেরূপ প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী ছাড়া আরও আছে, যদিচ তাহাদের শক্তি ও কৌলিন্য বিশ্বভারতীর সহিত তুলনীয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের চর্চা আরও ব্যাপক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বভারতীতে যে রবীন্দ্র সদন আছে সেখানে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রভৃত উপাদান সঞ্চিত আছে বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু কি আছে না আছে বাহিরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। রবীন্দ্র-সদনে সংগৃহীত উপাদানসমূহের একটি বিবরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে দেশে রবীন্দ্রচর্চার পথ প্রশস্ত হইবে। রবীন্দ্র সদনের একটি ক্যাটালগ প্রকাশ অবিলম্বে বাঞ্ছনীয়। এতদিনে কাজটি হওয়া উচিত ছিল। অন্য কিভাবে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-চর্চার পথ সুগম করিতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁহারা উদাসীন নহেন। তবু কথাটা মনে করাইয়া দিলাম। রবীন্দ্রচর্চার ভার বিশেষভাবে বিশ্বভারতীর উপরে ন্যস্ত সে কথা খুলিয়া বলাই বাহুল্য।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ রবীন্দ্র-রচনাবলী ও অপ্রকাশিত রচনা উদ্ধার ও প্রকাশকল্পে যে প্রভূত পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য তাঁহারা গবেষণা বা Research গৌরবের দাবী করেন না বটে, কিন্তু যে

কাজ তাঁহারা নিত্য করিতেছেন, তাহা সত্যই গবেষণা এবং যে-কোন গবেষকের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এ পর্যন্ত এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানই নামে না হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচর্চায় নিযুক্ত আছেন—আর তাহারই ফলস্বরূপ পাঠকসমাজ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃত অংশের পরিচয় পাইতে-ছেন। রচনাবলীর সঙ্গে যুক্ত 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ রবীন্দ্রচর্চাকারিগণের কাজ যে কত সহজ করিয়া দিয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় রবীন্দ্রভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রবীন্দ্রচর্চা উক্ত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। কিন্তু উহার কর্ম-পদ্ধতি এখনো অপ্রকাশ। তবে আশা করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ চর্চাই উহার কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত হইবে। রবীন্দ্রভারতী কর্তৃপক্ষের প্রথম কর্তব্য হইবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ। দ্বিতীয় কর্তব্য হইবে বিশেষজ্ঞ-গণের নায়কতায় নির্দিষ্ট সূচীতে রবীন্দ্র-চর্চার উদ্দেশ্যে ছাত্রগবেষক নিয়োগ। এরূপ গবেষণায় আড়ম্বর বা জলসার জৌলুস নাই বলিয়া আশা করি ইহাকে অর্থের অপ-ব্যয় তাঁহারা মনে করিবেন না। রবীন্দ্রচর্চা প্রভৃত অধ্যবসায় সাধ্য—দীর্ঘকালের নিরলস চেষ্টা ব্যতীত সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান সে ভার গ্রহণ করিবেন ইহা অন্যায় আশা নয়।

তারপরে আছেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। জ্ঞানানুশীলনের এই উদার প্রতিষ্ঠানটিতে বিশেষভাবে রবীন্দ্রচর্চার স্থান হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে কোন্ কর্মপদ্ধতি অবলম্বনীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহা স্থির করিবেন। আপাতত দুটি বিষয় মনে হইতেছে, রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ সৃষ্টি ও ছাত্রগবেষক নিয়োগ। রবীন্দ্র সাহিত্য জাতীয় সম্পদ। সমগ্র জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য রবীন্দ্রচর্চার সহিত জড়িত। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে কেবল সাহিত্যের নয় সমস্ত জাতীয় জীবনের মান উন্নীত হইবে। ইহাই তো জাতির বর্তমান আকাঙ্ক্ষা বস্তু। তাহা যদি হয়, তবে অর্থাভাব, কিম্বা সময় বা সুযোগের অভাব এসব অজুহাত একে-বারেই অচল। লোকসভা ও বিধানসভা-সমূহ যে দায়িত্ব একভাবে সম্পন্ন করিতেছে রবীন্দ্র সাহিত্যের যথোচিত চর্চা তাহাই অন্যভাবে, লেখকের মতে অধিকতর স্থায়ীভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে। দেশের নূতন যাত্রার সূচনায় এবং পৃথিবীর এই সংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্র সাহিত্য যুগপৎ আমাদের আশার ও ভরসার প্রধান কারণ। একবার এই সত্যটি স্বীকার করিয়া লইলে বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য বুঝিতে বা 'কর্ম-পদ্ধতির ইঙ্গিত স্বীকার করিয়া লইতে কাহারও কষ্ট হইবে না।

রবীন্দ্রপরিচয়গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত

রবীন্দ্রসাহিত্যের আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা, এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধিশীল। এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনাগ্রন্থের একটি সূচীর প্রয়োজন অনেকে অনুভব করেন। সেই প্রয়োজন কিছু পরিমাণে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই তালিকা প্রকাশ করা গেল।

বাংলা সমালোচনা ও জীবনী সাহিত্যের অন্য অংশের সঙ্গে তুলনা করিলে রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যের আলোচনাগ্রন্থে এই তালিকা দীর্ঘ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, এই দৈর্ঘ্য, এই গ্রন্থসমষ্টির সাহিত্য মূল্যের সর্বথা অনুপাতী নয়—এই সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখক ও পাঠক-সাধারণের শ্রদ্ধার বিস্তারই বিশেষভাবে সূচিত করে।

যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়াই রচিত, তবু বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে কোনকালেই তাঁহার গুণানুরাগীর অভাব ছিল না, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেও না—রবীন্দ্রনাথের যৌবনকাল হইতে বাংলা সাময়িক পত্রগুলি দেখিলেই তাহা জানা যায়। এই সকল গুণালোচনা অবশ্য গ্রন্থাকারে সামান্যই সংগৃহীত হইয়াছে: আদি রবীন্দ্রপরিচয়-পুস্তকগুলির মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের স্থান সর্বোচ্চে, বস্তুতঃ পরবর্তী কালেও অনেক সমালোচককেই এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁহার নিয়ত সঙ্গলাভ রবীন্দ্রকাব্য-প্রেরণার উৎস-সন্ধানে লেখকের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল।—এই গ্রন্থেরও পূর্বে রচিত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব': দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন অভিযোগ করেন যে, সোনার তরী কবিতার ভাব অস্পষ্ট তখন ইনি (এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়) সোনার তরীর অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

কবির শেষ জীবনে, এবং তাঁহার পরলোকযাত্রার পর তাঁহার প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই গভীর অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও অভিনিবেশ-প্রসূত। চার খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ আকরগ্রন্থ 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রকাশও সমাপ্তপ্রায়।

এই কালে, রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্বে যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে মূল্যবান স্মৃতিকথা প্রকাশ করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থল, প্রতিমা দেবী, 'নির্বাণ'; মৈত্রেয়ী দেবী 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'; সীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি'। পাঠকসাধারণ প্রত্যাশা করেন, অমিয় চক্রবর্তী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এবং প্রশান্তচন্দ্র ও রাণী মহলানবিশ, তাঁহাদের সুদীর্ঘ রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের বিবরণ একদা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিবেন—এ যাবৎ তাঁহাদের স্মৃতিকথা সাময়িক পত্রে খণ্ডরচনার আকারেই সীমাবদ্ধ।

এই সকল গ্রন্থ হইতে বিশেষ মূল্যবান পুস্তকগুলি নির্বাচন করিয়া একটি স্বতন্ত্র তালিকা রচনার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সূচীপ্রণেতার উদ্দেশ্যে অন্যবিধ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকার সূচী সংকলন। —এরূপ তালিকা সম্পূর্ণ হইবার বাধা সংকলয়িতার পরিজ্ঞাত কোনো গ্রন্থাগারেরই এই বিষয়ক সংগ্রহ সম্পূর্ণ নয়; অপরপক্ষে কতকগুলি পুস্তক দীর্ঘকাল ছাপা নাই। বর্তমান তালিকার অধিকাংশ গ্রন্থ, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রবীন্দ্রসদন ও গ্রন্থনবিভাগের সংগ্রহে প্রাপ্তব্য—পুরাতন দুষ্প্রাপ্য বই ও পুস্তিকাগুলি অধিকাংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। বাজেয়াপ্ত 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' দেখিতে দিয়াছেন, শ্রীসজনীকান্ত দাস। যে স্থলে প্রথম সংস্করণের বই সংগ্রহ করা যায় নাই সে স্থলে যে-সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিমলকুমার দত্ত পুস্তকসন্ধানে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের নিকট হইতেও সাহায্য পাইয়াছি।—তালিকাটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা যে বিশে

বিজ্ঞানসম্মত এমন নহে, এক বিভাগের কোনো কোনো বই অন্য বিভাগেও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তবে এই অসম্পূর্ণ বিভাগেও পাঠকের কিছু সুবিধা হইতে পারে।

আরও কয়েকটি অধ্যায় পরে এই তালিকাতে যোগ করিতে হইবে—১। যে সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নয়, কিন্তু এক বা একাধিক অধ্যায়ে বা প্রবন্ধে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আলোচিত; দৃষ্টান্তস্থল অন্নদাশঙ্কর রায়, "জীবনশিল্পী"; কাজী আবদুল ওদুদ "শাশ্বত বঙ্গ"; কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, "গীতাঞ্জলির ভাবধারা"; প্রমথনাথ বিশী, "বাংলা সাহিত্যের নরনারী"; প্রিয়নাথ সেন, "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি"; বুদ্ধদেব বসু, "সাহিত্যচর্চা"; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, "ত্রয়ী"; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"; হুমায়ুন কবীর, "বাঙলার কাব্য" ২। বঙ্গেতর ভাষায়, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাজি, যথা

Edward Thompson, **Rabindra Nath Tagore, Poet and Dramatist;** Ramananda Chatterjee (Ed), **Golden Book of Tagore;** Sachin Sen, **Political Thought of Tagore;** Sarvapalli Radhakrishnan, **Philosophy of Rabindranath.**

৩। মাসিক পত্রাদির বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যার যথা

The Visva-Bharati Quarterly Tagore Birthday Number, May-October 1941, Edited by Krishna Kripalani; The Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, September 13, 1941, Edited by Amal Home;

কবিতা, রবীন্দ্র-সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত; পরিচয়, রবীন্দ্র-সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত; শনিবারের চিঠি রবীন্দ্র-সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪৮, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

অনুমান হয় এই তালিকাতে কোনো কোনো পুস্তক-পুস্তিকা-অভিভাষণের **নাম** অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছে। এই ত্রুটি যাঁহাদের লক্ষ্যগোচর হইবে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক সংকলয়িতাকে তাঁহার ঠিকানায় সে-বিষয়ে জানাইলে অদূর-ভবিষ্যতেই ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য হয়। শ্রীপুলিনবিহারী সেন ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭

অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ (কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা)। ইণ্ডিয়ান পাবিলিশং হাউস। লেখকের নিবেদনের তারিখ ৮ পৌষ ১৩১৯। পৃ ১০৫।

বিশ্বভারতী সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৩। মূল্যে এক টাকা। "কবিবর স্বয়ং তাঁহার নূতন সংস্করণের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটিকে গ্রহণ করিয়া আমাকে আশাতীতরূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন।" '১৩১৮ সালের ২৫ বৈশাখ কবিবর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার উপলক্ষে জন্মোৎসবের জন্য লিখিত হইয়াছিল এবং শান্তিনিকেতনে পঠিত হইয়াছিল।'

"বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে; সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়......কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার এই ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকেই আমি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।'

—লেখকের 'নিবেদন'

সন্ধ্যাসংগীত হইতে খেয়া পর্যন্ত কাব্যের আলোচনা; প্রসঙ্গক্রমে রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, গোরা, রাজা প্রভৃতির আলোচনাও আছে। জীবনদেবতা-তত্ত্বের আলোচনা (পৃ ৩৮-৫৩) এই গ্রন্থের একটি প্রধান অংশ।

অজিতকুমার চক্রবর্তী। কাব্যপরিক্রমা। সাধনা লাইব্রেরী ঢাকা। দশ আনা। পৃ ১২৩।

সূচী। জীবন-দেবতা, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ধর্মসংগীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য।

অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪০) 'রাজা' ও 'জীবন-দেবতার পরিশিষ্ট' এই দুইটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়।

বিশ্বভারতী সংস্করণ, কার্তিক ১৩৫১। পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০, মূল্য দুই টাকা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী। ব্রহ্মবিদ্যালয়। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ বিভাগ দ্রষ্টব্য

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। ঘরোয়া। বিশ্বভারতী। মূল্য দুই টাকা। আশ্বিন ১৩৪৮। পৃ ১৭১।

অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা। সম্পূর্ণ বইখানি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে না হইলেও,

একটি উল্লেখযোগ্য
দ্বন্দ্ব
উপন্যাস
প্রদোষ সেন
মূল্য ঃ আড়াই টাকা মাত্র

মালোচিত অন্যান্য বিষয়ও প্রাসঙ্গিক— াকুরবাড়ির কাহিনী। এই হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ প্রণীত জোড়াসাঁকোর ধারে'ও উল্লেখযোগ্য)।

পরলোকগমনের মাসাধিক পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঘরোয়া গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শুনিয়া অবনীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

"এক দিন ছিল যখন সকল বিভাগে প্রাণে পরিপূর্ণ ছিল তোমাদের রবিকাকা। তোমরাই তাকে অন্তরঙ্গভাবে ও বিচিত্র-রূপে নানা অবস্থায় দেখতে পেয়েছ। তোমাদের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আজ তাকে যদি না জাগিয়ে তুলতে তবে তার অনেকখানি দেশের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যেত। আজকে যখন দিনান্তের শেষ আলোতে মুখ ফিরিয়ে দেশ তার ছবি একবার দেখে নিতে চায় তখন তোমার লেখনী তাকে পথনির্দেশ করে দিলে এ আমার সৌভাগ্য......।" ২৯ জুন ১৯৪১।

অপর পত্রে—

কী চমৎকার—তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠল। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি-চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে—এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয় এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে—এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে। ২৭ জুন ১৯৪১।"

অমরেন্দ্রনাথ রায়। রবিয়ানা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য বারো আনা। 'ভূমিকা'র তারিখ ২৬ শ্রাবণ ১৩২৩। পৃ ৮৭।

"কবিবর রবীন্দ্রনাথের মত নিতুই নব। তাঁহার নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যনীতি প্রভৃতি সকল রকম নীতিতেই কবিবরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। এই সকল কথাই এই পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।...এই পুস্তকের নামকরণের জন্য আমি পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের নিকট ঋণী।"—ভূমিকা

গ্রন্থখানি চিত্তরঞ্জন দাশকে উৎসর্গীকৃত।

সূচী॥ কবিতায় 'গন্ধ'; বাস্তব; কঠোর সমালোচনা; সদুপায়; অভিভাষণ; সমাজ-সংস্কার; কঠোর সমালোচনা (পরিশিষ্ট); বিবিধঃ কবি-জীবনী, সীতাদেবী, রামচন্দ্র, হিন্দুসভ্যতা, ইতিহাস।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ('বিজ্ঞাপন'এর তারিখ, ১২ পৌষ ১৩২৫) নূতন একটি প্রবন্ধ—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—যুক্ত হয়। "আড়াই বৎসরের মধ্যে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ যে সব বিকাইয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই।...... ......জগৎ-জোড়া যাঁহার যশ, তাঁহার মতের বা লেখনীর বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে লোকে শুনিবে কি না, সন্দেহ হইয়াছিল।

আমার লেখা সার্থক হইয়াছে।"—দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন, গ্রন্থকার।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত। ঋষি রবীন্দ্রনাথ। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। মূল্য তিন টাকা। অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬১। পৃ ১১০।

"ব্রহ্ম যে আছেন ইহাই প্রমাণ করা যায় না। আর সেই ব্রহ্মকে কেহ জানিয়াছেন কি না, ইহা আমরা প্রমাণ করিব কি উপায়ে?...বিশেষ একটি পথ আমাদিগকে নির্বাচন করিতে হইয়াছে—সাধকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিশ্লেষণ। এই উপলব্ধিকে একমাত্র উপনিষদের কষ্টিপাথরে ঘষিয়াই আমরা ইহার বিচার ও মূল্য নির্ধারণ করিয়াছি। সাধকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং শাস্ত্রবাক্য—এই পথই আমরা অনুসরণ করিয়াছি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। ...তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা আমরা করিয়াছি।...অপর কোন কিছুকে সাক্ষ্য হিসাবে বিচারক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত করি নাই, একমাত্র 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া। গীতাঞ্জলিকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাধনার বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।...রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ইহাই আমরা ঘোষণা করিয়াছি।...

অনেকেই প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবন কি?

বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, মুক্তপুরুষ, মহাপুরুষ, মহাযোগী ইত্যাদি বলিতে প্রশ্নকর্তাদের মনে যে ধারণা আছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন তাহার সঙ্গে খাপ খায় না ইহাই তাঁহাদের অভিমত বা সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও 'রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ' এই ঘোষণার কোন ইতরবিশেষ ঘটে না।...ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনযাত্রার কোন ধরা-বাঁধা ছক নাই।"—পৃ ১০৪-০৬

অমিয়কুমার সেন। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। মূল্য তিন টাকা। ৭ পৌষ ১৩৫৪। পৃ ২৪৪।

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সমগ্রতাকে উপভোগের সীমার মধ্যে ধরতে গেলে

আমাদের চোখে বড়ো হয়ে ওঠে...সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূলে কবির জীবনে এক সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতির পরিচয়।...এই ঐক্যের উপলব্ধি তাকে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজীবনের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের প্রতি সচেতন করে তুলেছে, কারণ দুইই হচ্ছে এক অখণ্ড সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই অখণ্ড সত্তাই কবির বিশ্বদেবতা।...প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র সৃষ্টির এই ঐক্যানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির মধ্যে একটি পৃথক্ সত্তার সন্ধান লাভ করে তার সংগে ব্যক্তিগত প্রেমের সম্পর্কও তিনি স্থাপন করেছেন কিন্তু এই সত্তাটিকে বিশ্বসৃষ্টির অসীম সত্তার একটি প্রকাশরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই সম্পর্কটি গভীরতর সার্থকতা লাভ করেছে।"—সূচনা

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। কবিগুরু। ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস। মূল্য তিন টাকা বারো আনা। ১৩৫৮। পৃ ১৭৪

সূচী॥ প্রস্তাবনা; কবিগুরু; রবীন্দ্রকাব্যের মর্মবাণী; রবীন্দ্রনাথের সাধনা; রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশ; পরিশিষ্ট: রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'।

অশোক সেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পর্ব। এইচ সরকার এণ্ড সন্স। মূল্য তিন টাকা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। পৃ ১৩৮।

সূচী॥ ১। সৌন্দর্যের পূজারী—চিত্রা, ২। গতিবেগ—কল্পনা ও বলাকা, ৩। পূরবী।

উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থসমূহের কতকগুলি কবিতার বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

অশোক সেন। রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় পর্ব। এ মুখার্জি এণ্ড কোং। মূল্য চার টাকা। পৃ ২১৯।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলির বিশ্লেষণ; তৎসহ য়ুরোপীয় সাংকেতিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা।

অশোক সেন। কল্পনা (রবীন্দ্রনাথ)। জুবিলিয়া পাবলিশিং হাউস। মূল্য পাঁচ টাকা। অগ্রহায়ণ ১৩৫৬। পৃ ৫৮।

কল্পনা গ্রন্থের কতকগুলি কবিতার ব্যাখ্যা।

কাজী আবদুল ওদুদ। রবীন্দ্রকাব্য-পাঠ: মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ। ১৩৩৪। মোসলেম পাবলিশিং হাউস। মূল্য পাঁচ সিকা। পৃ ১২৮।

তিন পর্যায়ে কড়ি ও কোমল হইতে পলাতকা পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বর্তমানে লেখকের শাশ্বত বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব। লোটাস লাইব্রেরী, ৫০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। মূল্য দুই আনা।

'রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনখানি কাব্য—নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি' অবলম্বনে আলোচনা। '১৩১৭ সালের ৬ই পৌষ "দেবালয়ে" এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।'

উপেন্দ্রকুমার কর। "গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা (প্রতিবাদ)। মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট, চন্দ্রনাথ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। 'কৈফিয়ৎ'-এর তারিখ ১ আশ্বিন ১৩২১। পৃ ১০৪।

শিলচর হইতে প্রকাশিত 'সুরমা' পত্রে মুদ্রিত "রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি" শীর্ষক বিরূপ সমালোচনার উত্তর।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা। প্রথম খণ্ড, কাব্য। বুক হাউস। মূল্য বারো টাকা। ১৩৫৪। পৃ ২১৬।

"রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, কবিতার পূর্ণ অর্থবোধই সাধারণ পাঠকের রসোপলব্ধির মূল ভিত্তি। আভাস বা ইঙ্গিত রসিক ও বিদগ্ধজনের পক্ষে পর্যাপ্ত, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম। অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-সংকেত বা স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এই পুস্তকে তিন শতাধিক কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাবধারার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।"

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ—সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী রচনা, সন্ধ্যাসংগীত হইতে শেষ লেখা পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। মূল্য বারো টাকা। শ্রাবণ ১৩৬০। পৃ ৬৭১।

রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিক্রমা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সংস্করণ। "কবিত্বোন্মেষের সময় হইতে শেষরচনা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য ও ক্রমপরিণতি আলোচিত হইয়াছে এবং প্রায় চারিশত প্রধান প্রধান কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা মর্মার্থ দেওয়া হইয়াছে।"

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। মূল্য দশ টাকা। বৈশাখ ২৩৬১। পৃ ৫৬২।

সূচী॥ রবীন্দ্র-নাট্যের স্বরূপ; গীতিনাট্য; কাব্যনাট্য; রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি; রূপক-সাংকেতিক নাটক; সামাজিক নাটক; কৌতুকনাট্য; ঋতুনাট্য; নৃত্যনাট্য।

"রূপক-সাংকেতিক নাটক বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব শিল্পসৃষ্টি—কবির একান্ত নিজস্ব দান। এ জাতীয় নাটক রবীন্দ্র-পূর্ব যুগেও বাংলা-সাহিত্যে রচিত হয় নাই, রবীন্দ্রোত্তর যুগেও হয় নাই, ভাবীকালে হইবে কিনা জানি না। নানা দৃষ্টিকোণ হইতে এই নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে॥"—ভূমিকা

মৌলবী একরামদ্দীন। রবীন্দ্র-প্রতিভা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। মূল্য এক টাকা। ১৯২১ [১৩২১] **ভূমিকার তারিখ ১৪ জুলাই ১৯১৪। পৃ ১২৯।**

বিসর্জন নাটকের আলোচনা।

১৩২১ চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীর পুস্তক-পরিচয়ে স্বীকৃত।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি-পরিক্রমা। এ মুখার্জি। দুই টাকা। ২৫ বৈশাখ ১৩৬০। পৃ ১৩২।

সূচী॥ কৈশোরক পর্যায়ের রচনা; সীমা ও অসীম; প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ; রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ; রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবতা; রাজা ও রাণী; পাশ্চাত্ত্য প্রভাব; রবীন্দ্রনাথ ও জর্জিয়ান কবিগণ; রবীন্দ্র-কাব্যে রোমাণ্টিসিজম্; অচলায়তন নাটকে গান।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কোলকাতা প্রকাশনা নিকেতন। মূল্য দেড় টাকা। জানুয়ারী ১৯৩৯। পৃ ১২২।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সহিত লেখকের কোনো কোনো বিষয়ে কথোপকথনের অনুলিপি লিপিবদ্ধ আছে।

ক্ষিতিমোহন সেন। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। এ মুখার্জী এণ্ড কোং। মূল্য সাড়ে চার টাকা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। পৃ ২১৮।

সূচী॥ নিবেদন; 'বলাকা'র জন্মকথা; 'বলাকা'র ছন্দ; 'বলাকা'-গ্রন্থ-ভূমিকা; কবিতা-ব্যাখ্যা।

"'বলাকা'র যে-সব আলোচনা কবির মুখে শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল, সেইগুলিই যথাসাধ্য ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তবে সবগুলি আলোচনা একই সময়ে ধারাবাহিকভাবে হয় নাই। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে সাহিত্যের ক্লাসে বলাকা সবন্ধে কবির একটি আলোচনা কিছুদিন ধরিয়া চলে। শ্রীমান প্রদ্যোতকুমার সেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তখন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সেইসব আলোচনা মুদ্রিত করেন।...ইহা ছাড়াও তাহার পরে তাঁহার কাছে ছিলাম বলিয়া প্রায় বিশপঁচিশ বৎসর ধরিয়া নানা জনের সঙ্গে 'বলাকা' সম্বন্ধে তাঁহার যেসব আলোচনা শুনিয়াছি, তাহাই একত্র করিয়া এখন সকলের কাছে উপস্থিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি।...'নিবেদন' ও 'বলাকার জন্মকথা'তে আমাকে বাধ্য হইয়া কিছু বলিতে হইয়াছে। আর সব প্রকরণেই কবিগুরুরই কথা।"

ক্ষুদিরাম দাস। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়। পুথিঘর। দশ টাকা। আশ্বিন ১৩৬০। পৃ ৪৭৯।

সূচী॥ প্রস্তাবনা; অপ্রকাশের কালঃ বনফুল থেকে কড়ি ও কোমল; প্রতিভার উন্মেষঃ মানসী ও সোনার তরী; প্রতিভার বিকাশ, প্রথম পর্যায়—চিত্রা; দ্বিতীয় পর্যায়—চৈতালি থেকে নৈবেদ্য; তৃতীয় পর্যায়—অরূপানুভূতির প্রারম্ভঃ নৈবেদ্য থেকে শারদোৎসব; চতুর্থ পর্যায়— অরূপানুভূতির পূর্ণতাঃ গীতাঞ্জলি থেকে গীতালি; প্রতিভার পরিণাম—জীবন ও অরূপের সমন্বয়ঃ গীতালি বলাকা ফাল্গুনী পূরবী মহুয়া মুক্তধারা রক্তকরবী; গোধূলি-পর্যায়ঃ পরিশেষ থেকে শেষ লেখা।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-কথা। জয়শ্রী পুস্তকালয়। মূল্য পাঁচ টাকা। ১৩৪৮। পৃ ৪৮২।

সূচী। জন্ম ও আবেষ্টনী; রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশ; যুবক রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গীত আলোচনা; গার্হস্থ্য-জীবন; শিক্ষা-ক্ষেত্রে; জমিদার; ব্যবসায়ে; সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে; বিদেশে; কবির রচনা; বিবিধ প্রসঙ্গ; দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ;

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু। রবীন্দ্র কাব্য।

[আ]চারে ও ধর্মে; রবীন্দ্র-জয়ন্তী; [সা]হিত্যব্রতীদের সেবায়; রবীন্দ্রনাথের [ব্য]ক্তিত্ব; সমাবর্তন ও দীপাচ্ছাদন

[রবীন্দ্র]-জীবনী ও পারিপার্শ্বিক [স]ংক্রান্ত বহু তথ্যে পূর্ণ।

স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী। ১৯৪৮। পৃ ৬৩। দেড় টাকা।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি-রশ্মি। পূর্বভাগে কবিত্ব-উন্মেষ হইতে কল্পনা পর্যন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৮। পৃ ৪২৩।

বনফুল হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পনা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ও নাট্য-কাব্য সকলের ব্যাখ্যান এই খণ্ডে আছে।

রবি-রশ্মির প্রধান বিশেষত্ব, লেখকের নিকট প্রেরিত বহু পত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ব্যাখ্যা—পত্রগুলি গ্রন্থে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। "যখন যেখানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার [কবির] গোচর করিয়াছি এবং তিনি...... সংশয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এই-রূপে তাঁহার অনেক কবিতা ও কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; এবং আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক স্থানে কবির ভাষাই পরিগৃহীত হইয়াছে। কবি-গুরুর কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণের জন্য অনেক স্থানে তাঁহারই অন্য রচনার সাহায্য লইয়াছি, একটি কবিতাকে অন্য কবিতার বা প্রবন্ধের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।"—লেখকের ভূমিকা।

'পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ'। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং। মূল্য ৭৷৷০। লেখকের পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'সম্পাদিত ও পুনর্বিবৃত।' পৃ ৫০০।

"রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি [লেখক] নিজের মতামত, কাব্য ও কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকাটিপ্পনী তাঁহার ব্যবহারের চয়নিকার মধ্যে এবং বিভিন্ন রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে সর্বদাই বিশদ করিয়া বিস্তৃতভাবেই লিখিয়া রাখিতেন। সেই সকল উপকরণ লইয়া রবি-রশ্মি রচিত হয়। কিন্তু ঐসব আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির কোন কোন অংশ রবি-রশ্মির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়া পিতার সংগৃহীত ও লিখিত উপকরণ লইয়াই আমি রবি-রশ্মির বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনা করিলাম। এতদ্ভিন্ন লেখকের... 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিচিতি' ... পুনর্মুদ্রিত না করিয়া উহার অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধকেও রবি-রশ্মির এই সংস্করণে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম।"—চতুর্থ সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদন।

রবি-রশ্মি। পশ্চিম ভাগে—ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৩৯। পৃ ৩৭২।

এই খণ্ডে ক্ষণিকা হইতে বিচিত্রিতা পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থের ও আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রকাশিত অনেকগুলি নাটকের আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা; রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমণ; রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান সুর; রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম; রবীন্দ্র-পরিচয়। —গ্রন্থ-শেষে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডারের গুটিকয়েক চাবি' সংকলনে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে লিখিত অনেকগুলি বই ও প্রবন্ধের নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। কনক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। এ মুখার্জী এণ্ড কোং। মূল্য ৭৲ টাকা। পৃ ৩৯৪।

পরিশিষ্টে যোগাযোগ ও শেষের কবিতা সম্বন্ধে লেখকের প্রবন্ধ ও মিস্টিসিজ্‌ম্ সম্বন্ধে আলোচনা যুক্ত হইয়াছে। পূর্বতন পরিশিষ্টের কোনো কোনো অধ্যায় বর্জিত।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচিতি। বোস মুখার্জী এণ্ড কোং। মূল্য দেড় টাকা। ভূমিকার তারিখ আশ্বিন ১৩৪৯। পৃ ১৩৪।

সূচী। কাব্যের স্বরূপ, সৃজনী-প্রতিভা, সৌন্দর্যবোধ, মিস্টিসিজ্‌ম্, জীবন-দেবতা, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, পঞ্চভূত।

জগদীশ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-কাব্য-গোধূলি। বঙ্গবাসী কলেজ বাঙলা সাহিত্য সমিতি। মূল্য চারি আনা। পৃ ৩০।

"প্রান্তিক হইতেই রবীন্দ্র-কাব্য-গোধূলির আরম্ভ।"—প্রান্তিক হইতে জন্মদিনে পর্যন্ত কাব্যের আলোচনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী। রবীন্দ্র-মানস। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। মূল্য তিন টাকা। আষাঢ় ১৩৫৯। পৃ ১৬৬।

সূচী॥ কবির জীবন-দর্শন; রবীন্দ্র-সাহিত্য ও উপনিষৎ (বিশ্বদেবতা); রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব সাহিত্য; রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী; রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিসর্গ; রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান; কবির স্বদেশপ্রেম; রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু ও কিশোর; সাহিত্যের সামগ্রী।

"রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি হইলেও তাঁহার অনুভূতির উৎস এই দুই

শতাব্দীর ভিতরে সীমাবদ্ধ নহে এবং য়ুরোপের ভাবধারার সঙ্গে ইঁহাদের সগধর্মিতাও নাই, বরং অনেকক্ষেত্রে বিরোধ রহিয়াছে। অন্য কারণ ছাড়াও কেবল এই কারণে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যকে পাথেয় করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমায় অগ্রসর হইলে রবীন্দ্র-প্রতিভার ভুল ব্যাখ্যার যে আশঙ্কা থাকে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই গ্রন্থে দিয়াছি।" —ভূমিকা।
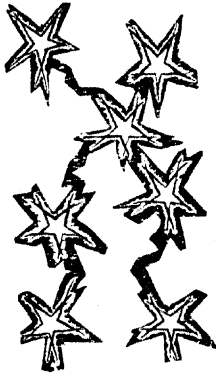
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। **বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ।** **শ্রীগুরু লাইব্রেরী।** মূল্য আড়াই টাকা। পৃ ২৪০।

'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের বিরাট কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।'

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। **কবিগুরুর রক্তকরবী।** **সাধনা-মন্দির, কলিকাতা ৮।** মূল্য তিন টাকা। ভূমিকার তারিখ ফাল্গুন, ১৩৫৯। পৃ ১৫০।

সূচী। ভাব-বস্তু; শিল্প-ভঙ্গী; নাট্য-ভঙ্গী; নাট্য-কাহিনী; প্রকাশ-ভঙ্গী; যক্ষপুরী; রাজার বিদ্রোহ; নন্দিনী—মানবী ও রক্তকরবী; বিশু।

দক্ষিণারঞ্জন বসু। **শতাব্দীর সূর্য।** এ মুখার্জী। দুই টাকা। পৃ ১৯২।

সূচী॥ রবীন্দ্র-জীবনী; রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি; কবিতা; গান; ছোট গল্প; উপন্যাস; নাটক; ছবি; সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ; শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ; বিশ্বভারতী; উপসংহার।

দেবজ্যোতি বর্মণ। **রবীন্দ্রনাথ।** **কুলজা সাহিত্য-মন্দির।** মূল্য পাঁচ সিকা। শ্রীপঞ্চমী ১৩৪৮। পৃ ১২৩+৩।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী।

নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম। **কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার রূপ ও রস।** **সরস্বতী লাইব্রেরী, শিলচর।** মূল্য বারো আনা। ভূমিকার তারিখ ৭ পৌষ ১৩৩৮। পৃ ১১১।

ননীলাল ভট্টাচার্য। **রবীন্দ্রনাথের কাব্য।** **দাস এণ্ড কোং।** আট আনা। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩২। পৃ ৪০।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। **কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ।** **বেঙ্গল পাবলিশার্স।** মূল্য দেড় টাকা। মাঘ ১৩৫০। পৃ ১২৯।

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ও গ্রন্থ-সম্পাদকরূপে লেখকের সৌভাগ্য হইয়াছিল কবিকে তাঁহার প্রাত্যহিক পরিবেশের মধ্যে দেখিবার। কবির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতা ও সহ্যশক্তি, পত্রোত্তরদানে অকৃপণতা, আহারের অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, পড়াশুনার পদ্ধতি ও বিষয়, বাসা-বদল ও স্থান-বদলের ঝোঁক, আলাপ-রীতি, ব্যবহারে সৌজন্য, আবৃত্তি ও বক্তৃতার বিশেষত্ব প্রভৃতির বিষয় আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠির সারাংশ ও চারি ছত্র কবিতা আছে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। **অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ।** **জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড**

পাব্লিশার্স। মূল্য আড়াই টাকা। পৌষ ১৩৫২। পৃ ১৮৪।

সূচী॥ রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভূমিকা, কবিতা ও গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, গদ্য-সাহিত্য, পত্র-সাহিত্য, শিশু-সাহিত্য, ইংরেজী রচনা, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা গান, শনিবারের চিঠি ও রবীন্দ্রনাথ, চেতন-অবচেতন, গদ্য-কবিতা, "কালান্তর", "সাহিত্যেব পথে", বাল্য-কবিতা, "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র"। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সুধাংশু-শেখর সেনগুপ্ত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ব্যানার্জী ব্রাদার্স। দেড় টাকা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ ২০৭।

সূচী॥ জীবন; সাহিত্য; তত্ত্ব; গ্রন্থসূচী।

নলিনীকান্ত গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ। রামেশ্বর এণ্ড কোং, চন্দননগর। শ্রাবণ, ১৩৪৯। পৃ ১২৮। **পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮, কালচার পাবলিশার্স, দুই টাকা।**

সূচী॥ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষা, দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারা, অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ।

নীহাররঞ্জন রায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য সাড়ে সাত টাকা। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ ৪৭৯।

দুই খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ, ২২ শ্রাবণ ১৩৫১। তৃতীয় মুদ্রণ ২২ শ্রাবণ ১৩৫৩। বুক এম্পরিঅম। প্রথম খণ্ড পৃ ৪৯৫; দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪২৪ দুই খণ্ডের মূল্য দশ টাকা।

প্রথম খণ্ডের সূচী॥ কবি রবীন্দ্র-নাথ; রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন; কাব্য-প্রবাহ।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী॥ নাটক ও নাটিকা; ছোট গল্প; উপন্যাস।

"আমার আলোচনা কালানুক্রমিক; রবীন্দ্র-মানসের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিবর্তন এই কালানুক্রমিক পাঠ ও আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া আমার বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, আমি সর্বত্রই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, কবির ব্যক্তিজীবন ও সম-সাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার ধারণা, এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার সুবিধা হয়।" —ভূমিকা।

নৃপেন্দ্রকুমার বসু। আমাদের বিশ্বকবি। কো-অপারেটিফ বুক ডিপো। বারো আনা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ ১১২।

পৃথ্বীশচন্দ্র রায়। "স্বদেশী সমাজ" ব্যাধি ও চিকিৎসা। চেরী প্রেস। ভূমিকার তারিখ ৫ ভাদ্র ১৩১১। পৃ ৪৮

"গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় **'স্বদেশী সমাজ—ব্যাধি ও চিকিৎসা'** শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত করিয়া এই পুস্তিকায় পুনর্মুদ্রিত করিলাম।"—লেখকের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

প্রতিমা ঠাকুর। নির্বাণ। বিশ্বভারতী। মূল্য এক টাকা। ১ বৈশাখ ১৩৪৯। পৃ ৭৬।

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বর্ষের চিত্র।

প্রতিমা দেবীর লিখিত রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো চিঠি ও 'আশ্রম-বাসীদের প্রতি তাঁর শেষ আশীর্বাদ'-ভাষণ (১ বৈশাখ ১৩৪৮) এই গ্রন্থে মুদ্রিত আছে, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।

প্রফুল্লকুমার সরকার। জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী। মূল্য দুই টাকা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫২। পৃ ১১৪।

"রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী এবং তাঁহার সম-সাময়িক জাতীয় আন্দোলনকে না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝা যায় না, আবার রবীন্দ্র-নাথ এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যকে না বুঝিলে বাঙলার জাতীয় আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনকেও সম্যক বুঝা যায় না। বর্তমান গ্রন্থে আমরা সেই দিক দিয়াই বাঙলার জাতীয় আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।" —লেখকের ভূমিকা

প্রবাসজীবন চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ। সংস্কৃতি বৈঠক। মূল্য দেড় টাকা। ভূমিকার তারিখ ১৪ বৈশাখ ১৩৫৬ পৃ ৮২।

সূচী॥ সাহিত্যের মূল; সাহিত্য ও মানুষ; সাহিত্য ও আত্মদর্শন; সাহিত্য ও সত্য; সাহিত্য ও বিজ্ঞান; সাহিত্য ও সৌন্দর্য; সাহিত্য ও মঙ্গল; সাহিত্যের উপকারিতা; সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য; সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও আধারের

সম্বন্ধ; সাহিত্যে মনোবিনিময়; সাহিত্য-প্রতিভা; কাব্য ও ছন্দ

প্রবোধচন্দ্র সেন। বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং। মূল্য চারি আনা। রচনাশেষে মুদ্রিত তারিখ ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮। পৃ ২৮।

জয়ন্তী-উৎসর্গে প্রকাশিত প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ-পরিবর্তিত পুনর্মুদ্রণ।

প্রবোধচন্দ্র সেন। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। মূল্য আড়াই টাকা। ১ আষাঢ় ১৩৫২। পৃ ২১৫।

'বাংলা কাব্যে যে অজস্র ছন্দের ব্যবহার চলছে তার প্রায় সবগুলিই হয় রবীন্দ্রনাথের রচিত, না-হয় তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত; তাঁর নিজের উদ্‌ভাবিত ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা তো বলাই বাহুল্য, প্রাক্ রবীন্দ্র যুগেরও এমন কোনো ছন্দ নেই যা তাঁর স্বাভাবিক ছন্দপ্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে উজ্জ্বলতর ও নবতর রূপ ধারণ না করেছে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যতরকম ছন্দ প্রচলিত আছে তার মধ্যে কোন্‌গুলি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্‌ভাবিত ও প্রবর্তিত শুধু তাই দেখিয়ে এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই আমি নিরস্ত হইনি। রবীন্দ্র-ছন্দের ক্রমবিকাশ তথা অন্যান্য কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের তুলনা এবং বাংলা ছন্দের বিবর্তনে তার স্থান নির্ণয়, ইত্যাদি ঐতিহাসিক আলোচনাতেও প্রয়াসী হয়েছি।'—লেখকের 'নিবেদন'। 'পরিশেষ' অংশে ছন্দ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সহিত লেখকের আলাপ-বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রবোধচন্দ্র সেন। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের পক্ষে পূর্বাশা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। পৃ ৭০

'রবীন্দ্রনাথের জন-গণ-মন-অধিনায়ক গানটি...ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংগীত বলে গ্রহণ করা উপলক্ষে...গানটির সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। অভিযোগগুলি চতুর্বিধ। প্রথমত, গানটি বস্তুত রাজবন্দনাগীত, ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জকে লক্ষ্য করে রচিত ও গীত। দ্বিতীয়ত, এটি আসলে ভগবদ্‌বন্দনা অর্থাৎ ধর্মসংগীত, সুতরাং জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেতে পারে না। তৃতীয়ত, গানটি সর্বভারতীয় নয়; তাতে কোনো কোনো প্রদেশের নাম নেই, সুতরাং সব প্রদেশ এটিকে জাতীয় সংগীত বলে স্বীকার করতে পারে না। চতুর্থত, গানটির ঐতিহ্যগৌরব নেই; সেদিক থেকেও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা এর প্রাপ্য নয়।' লেখক গানটির সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন ও অভিযোগগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক। প্রথম খণ্ড ১২৬৮—১৩১৮। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চার টাকা ও পাঁচ টাকা। ১৩৪০। **পৃ** ৫০৫।

দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩১৯-১৩৪৩। **লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।** ১৩৪৩। **মূ[ল্য]** তিন টাকা। পৃ ৪৭৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ। বস্তুতঃ বহু পরি[বর্ধিত] বর্ধিত পুনর্লিখিত বা নূতন গ্রন্থ।

প্রথম খণ্ড ১২৬৮-১৩০৮। **বিশ্ব[ভারতী]**। **বৈশাখ** ১৩৫৩। **মূল্য সাড়ে আট টাকা। পৃ** ৩৮২।

দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০৮-১৩২৫। **মূ[ল্য] দশ টাকা।** মাঘ ১৩৫৫। **পৃ** ৪৯৯।

তৃতীয় খণ্ড ১৩২৫-১৩৪১। **মূ[ল্য] দশ টাকা।** ১৩৫৯। **পৃ** ৩৮৭।

বিরাটাকার এই গ্রন্থের সম্বন্ধে এ

কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এইরূপ উপকরণসম্ভার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এযাবৎ আর কোনো গ্রন্থে সমাহৃত বা ব্যবহৃত হয় নাই—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রায় সব প্রকাশিত তথ্য এবং বহু অপ্রকাশিত উপকরণের এই গ্রন্থরচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা অনেকের নিকট বন্ধুর মনে হইবে, সাহিত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গে লেখকের নানা মন্তব্যের সহিত অনেকে একমত হইবেন না, সন-তারিখের ত্রুটিও কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম ভবিষ্যতে যাঁহারা গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিবেন তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ ব্যবহার না করিয়া উপায়ান্তর থাকিবে না।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এপ্রিল ১৯৩৯। পৃ ২৭০।

"রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের মূল সূত্র... রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রধান ধর্ম, ইহার মানবমুখিতা; কালিদাসের পরে এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ...লৌকিক কবিদের মধ্যে প্রতিভার সাধর্ম্যে ও বিরাটত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়; সে ধর্মটি মানবমুখিতা।...আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, মানবমুখিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রধান ধর্ম হইলেও...তিনি সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষত্রুটি-বহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই।...তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমানের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, আভাসে যেটুকু পাইয়াছেন তাহার দ্বারা ভিতরের জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানবের সংসারের গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন।...আমার তৃতীয় বক্তব্য এই, রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিণাম কোথায়?...রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ওয়ার্ডসওআর্থ প্রকৃতির মধ্য দিয়া জগৎ-সত্তাকে জানিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানবপ্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন। বাল্য ও কৈশোরের স্বাভাবিক প্রকৃতি-প্রীতি পরিণত বয়সে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া কবির জীবনে দেখা দিয়াছে; জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ওঠা-পড়া ও মূর্ছনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুদিন পরে সমে ফিরিয়া আসিয়াছে।" —লেখকের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থ পরিবর্ধিত ও দুই খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ড। সন্ধ্যাসংগীত হইতে নৈবেদ্য। আষাঢ় ১৩৫৫। মূল্য চার টাকা। পৃ ১৯০। মিত্রালয়।

দ্বিতীয় খণ্ড। স্মরণ হইতে বলাকা। ২২ শ্রাবণ ১৩৫৬। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। পৃ ১২২। মিত্রালয়।

সন্ধ্যাসংগীত হইতে বলাকা পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থাবলী লেখক চারি পর্বে ভাগ করিয়াছেন—সন্ধ্যাসংগীত পর্ব, সোনার তরণী পর্ব, খেয়া পর্ব, বলাকা পর্ব। প্রথমে ঐ পর্বগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া পরে উহার অন্তর্গত কাব্যগুলি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি শেষে আছে—রবীন্দ্রনাথ ও শেলি, কীটস্, কালিদাস; রবীন্দ্রকাব্যে দ্বিধা : তথ্য ও সত্য; রবীন্দ্রকাব্যে সমন্বয় : প্রকৃতি ও লীলারস; রবীন্দ্রকাব্যে দোষ : অতিকথন ও সামান্য কথন।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রকাব্যনির্ণয়। জেনারাল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। মূল্য তিন টাকা। আষাঢ় ১৩৫৩। পৃ ১১০।

"রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের অন্তর্গত কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কবিতা ও কাব্যগুলির আলোচনা।" সূচী। রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক; বন-ফুল; কবি-কাহিনী; ভগ্নহৃদয়; শৈশবসংগীত।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ। প্রথম খণ্ড। এ মুখার্জি এন্ড কোং। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। পৌষ ১৩৫৫। পৃ ১৭২।

সূচী ॥ গীতিনাট্য : বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা। কাব্যনাট্য : বিদায়-অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তী সংবাদ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী। নৃত্যনাট্য : শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা। ঋতুনাট্য : শেষবর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, নবীন, শ্রাবণগাথা। ঋতুচক্র : গ্রীষ্ম-বর্ষা — অচলায়তন; বর্ষা-শরৎ—বিসর্জন; শরৎপ্রারম্ভ—শারদোৎসব, ঋণ-শোধ; শরৎ-শেষ—ডাকঘর; শীতকাল—রক্তকরবী; বসন্ত—রাজা ও রাণী, রাজা, ফাল্গুনী, তপতী। মূল কাহিনীর রূপান্তর।

দ্বিতীয় সংস্করণ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। মূল্য চার টাকা। রথযাত্রা ১৩৬০। পৃ ১৭৭।

দ্বিতীয় সংস্করণে 'রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়যোগ্যতা' প্রবন্ধ যুক্ত হইয়াছে।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ। দ্বিতীয় খণ্ড। তত্ত্বনাট্য। মিত্রালয়। মূল্য চার টাকা। সেপ্টেম্বর ১৯৫১। পৃ ২৩৭।

"এই পর্যায়ের নাটকগুলিতে নানা জনে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রূপক, সাংকেতিক, প্রতীকী, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিচিত্র নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু...ইহাদের কোন একটি নামের দ্বারা সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি বর্ণনা সম্ভব নয়।...'তত্ত্বনাট্য' সেই অভাব দূর করি[তে] পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।...ই[হা] এই শ্রেণীর নাটকের সামান্য বা সাধা[রণ] লক্ষণ। ...রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যগু[লি] তিন পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে। প্র[থম] পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ। দ্বিতীয় প[র্বে] শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাক[ঘর] এবং তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তধা[রা] রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ ও কবির দীক্ষা।"—ভূমিকা। উক্ত নাটকগুলি[র] স্বতন্ত্র আলোচনা ব্যতীত নিম্নলিখি[ত] প্রবন্ধগুলি আছে—

তত্ত্বনাট্যের রূপান্তর ও নামান্তর; মূলে ইনীর রূপান্তর; তত্ত্বনাট্যের প্রতীক; ন্দ্রতত্ত্বনাট্যে দোষ।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-বিচিত্রা। রয়েণ্ট বুক কোম্পানী। মূল্য চার না। ২২ শ্রাবণ ১৩৬১। পৃ ২০৮।

সূচী॥ রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর; ীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস; শেষের বতা; রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র; রবীন্দ্র-হিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস; বাঁশরী কার; রবীন্দ্রকাব্যে একটি প্রতীক; বিনস্মৃতি ও ছেলেবেলা [রবীন্দ্র কাব্য-ঝর গ্রন্থের 'রবীন্দ্রকাব্যের পারি-শ্বিক' প্রবন্ধের সংশোধিত রূপ]; নপত্রের কবি; রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি বাদৃত কবিতা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথের াট গল্প। মূল্য চার টাকা। ভাদ্র ৩৬১। পৃ ১২৯+তথ্যপঞ্জী পৃ ৭২।

"রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলির রেই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ সাবে তাঁহারই ছোট গল্পগুলির স্থান। নেই তিনি ছোট গল্পের ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছেন, একেবারে স্বক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন, অপরের জমিতে আধি-চাষ করিয়া রাজস্ব জোগাইবার দায় বহন করেন নাই।...সেই হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত ছোট গল্পের ধারা বহন করিয়া আসিয়াছেন;...সে ধারা তাঁহার গান ও কবিতার ধারার সঙ্গে সমান্তরালতা রক্ষা করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সেইজন্যই দেখিতে পাইব যে, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে যে সব পরিবর্তন ও ছায়ালোকপাত ঘটিয়াছে, সে সমস্তই চিহ্নিত হইয়াছে তাঁহার ছোট-গল্পগুলিতে। কাজেই, যে মাপকাঠিতে তাঁহার কবিতার বিচার করি সেই মাপ-কাঠিখানা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে...সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়।...সেইভাবে বিচার করিবারই আজ ইচ্ছা।"

তথ্যপঞ্জীর সূচী॥ গল্পগ্রন্থের সূচী; গল্পের সূচী॥ সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী; রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থে, গল্পের প্রকাশসূচী; উৎস ও ব্যাখ্যান॥ রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন।

'শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ' বিভাগ দ্রষ্টব্য।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। কথা বনাম কাজ। প্রকাশক অনুকূলচন্দ্র বসু। মূল্য দুই আনা। পৃ ২১।

[১৩১২] "১৭ই ভাদ্র রামমোহন লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির হলে লেখক কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।"

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোনো কোনো রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধের সমালোচনা।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস। রবীন্দ্রনাথ। সেন ব্রাদার্স। ১৪ বৈশাখ ১৩৪০। পৃ ২১৭।

সূচী। রবীন্দ্রনাথ ও গীতি-কবিতা, ঊষালোকের কবি, সৌন্দর্যের কবি, প্রেমের কবি, কবির প্রণয়িনী, কবির বিশ্ব-প্রেম, কবির কাব্যে প্রকৃতি।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-নাথের ছন্দ। মানসী প্রেস, কলিকাতা। ১৩২৯। পৃ ৬৪।

"রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত-পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আবহমান কাল হইতে মাত্র কয়েকটি পুরাতন ছন্দই চলিয়া আসিতেছিল।...রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ
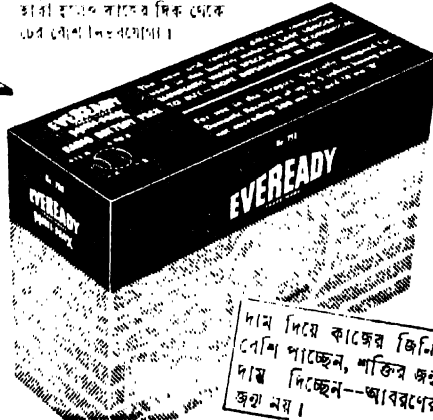
কয়েকটি নূতন ছন্দ বাংলা সাহিত্যকে দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পরে প্রচলিত সমস্ত ছন্দগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া বাড়াইয়া কমাইয়া এক অপরূপ মাধুর্য দান তো করিয়াছেনই, পরন্তু অসংখ্য নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন..."। এই পুস্তিকায় লেখক "এই নূতন ছন্দগুলির শ্রেণী ও রচনা কৌশল দেখাইতে চেষ্টা" করিয়াছেন; এই শ্রেণীগুলির নামকরণ লেখকের কৃত।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। প্রভাতরবি। প্রকাশনী। মূল্য আড়াই টাকা। 'নিবেদন'-এর তারিখ ভাদ্র ১৩৫০। পৃ ২৪৬।

"রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষব্যাপী জীবনের প্রথম চতুর্থাংশকে প্রভাতকাল ধরিয়াছি।...সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া তিনি এই কালের সমস্ত রচনাকে বর্জন করিয়াছিলেন। সেই কারণে সেকালের কাব্যকে ভুলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে কবিকেও ভুলিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষ ও উৎসারণের ইতিহাস অঙ্কে ধারণ করিয়া যে "গুপ্তযুগ" আমাদের স্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে, কবি নিজে যতই অবজ্ঞা করুন, আমাদের কাছে তাহার মূল্য অপরিমেয়। সে যুগকে আমরা ব্যক্ত দেখিতে চাই। বর্তমান গ্রন্থে তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।"—গ্রন্থকারের 'নিবেদন'।

গ্রন্থের একখানি 'প্রবেশিকা-পাঠ্য' সংস্করণ পরে (কার্তিক ১৩৫১) প্রকাশিত হয়।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ। নব্য সাহিত্যভবন। মূল্য পাঁচ সিকা। ভূমিকার তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১। পৃ ১০৫।

গ্রন্থখানি ইংরেজ-সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ। চৈত্র ১৩৫৫। বেঙ্গল পাবলিশার্স। মূল্য দুই টাকা। পৃ ১১৯।

পরিশিষ্টে 'বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ' রচনাটি এই সংস্করণে যুক্ত হইয়াছে। "'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' কানে একটু নূতন শোনায় বটে, কিন্তু সে কেবল বিদ্রোহী কথাটির অর্থ সঙ্কীর্ণভাবে লইয়াছি বলিয়া। বিদ্রোহী সে-ই, মিথ্যা জীর্ণ সংস্কারকে যে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিত্তে নব নব চিন্তাধারা আনিয়া দিয়াছেন। সেই সকল চিন্তা সতেজ সবল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভয়ঙ্কর।... রবীন্দ্রনাথকে এইদিক দিয়া আমি বিদ্রোহী বলিয়াছি।—প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের যে কপি দেখিয়াছি তাহাতে, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তাক্ষরে মুদ্রিত, গ্রন্থের বক্তব্য সমর্থন করিয়া লিখিত, একখানি চিঠি আঁটিয়া দেওয়া আছে।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ। নবজীবন সংঘ। মূল্য এক টাকা। ১৩৪৩। পৃ ৯৬।

দুই বোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা গ্রন্থের আলোচনা।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী-চিত্র। নবজীবন পাবলিশিং হাউস। মূল্য বারো আনা। আষাঢ় ১৩৪৫। পৃ ৭৪।

সূচনায় রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র মুদ্রিত আছে ("প্রতিদিন অন্তহীন চিঠি লেখালেখি...২৬-৬-৩৮")।

[বিনয়কুমার সরকার]। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী। স্টুডেন্টস লাইব্রেরি। মূল্য দশ আনা। ফাল্গুন ১৩২০। পৃ ১৫০।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল - পুরস্কার-প্রাপ্তির পর প্রকাশিত। প্রথমে গৃহস্থ পত্রে মুদ্রিত।

সূচী। রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়; কাব্য-রচনা ও স্বদেশসেবা; কবিবরের উক্তি; ভারতবাসীর নোবেল প্রাইজ লাভ; বিদেশে পূজালাভ; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মারপ্যাঁচ; স্বদেশের স্বর্ণ-সিংহাসন; রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণবের ভক্তিযোগ; ভক্তিতত্ত্বে প্রকৃতিপূজা; কবিবরের শান্ত ভাব; পরং ত্যাগবলং বলম্; কাব্যে বিপ্লবতত্ত্ব বা আদর্শবাদ; প্রকৃতিপূজা বা স্বাধীনতার গান; কার্যকরী ভাবুকতা; মিস্টিসিজম্ বা অধ্যাত্মবাদ; রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব; বিশ্বচিন্তায় ভাবুকতা; কালিদাসের পরিপূর্ণ হিন্দুজগৎ; রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা; শেষ কথা।

বিশ্বপতি চৌধুরী। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স। মূল্য দুই টাকা। ভূমিকার তারিখ শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৭। পৃ ২১৮। 'দ্বিতীয় সংস্করণ', মিত্র ও ঘোষ, সাড়ে তিন টাকা।

সূচী। রূপ-জগৎ—নিসর্গ; রঙ্গ-জগৎ—নারী; অরূপের পথে; অরূপ।

বিশ্বপতি চৌধুরী। কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। তিন টাকা। পৃ ১১৫।

সূচী। [উপক্রমণিকা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ], বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, দুই বোন, চার অধ্যায়।

বুদ্ধদেব বসু। সব পেয়েছির দেশে।

কবিতা-ভবন। মূল্য দেড় টাকা। আগষ্ট ১৯৪১। পৃ ১০৬।

সূচী॥ প্রথম খণ্ড ঃ শান্তিনিকেতন। পূর্বস্মৃতি; রতনকুঠি ও অন্যান্য বাড়িঘর; ছুটি! ছুটি!; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শিশু; আঁধার রাতে একলা পাগল; সব-পেয়েছির দেশ; পলায়ন?; রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড ঃ রবীন্দ্রনাথ। গীতময় ইন্দ্রধনু; হে নূতন!; ছবি ও গান; জীবনসম্রাট; মধুময় পৃথিবীর ধূলি; প্রত্যাবর্তন।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকযাত্রার কয়েক মাস পূর্বে প্রায় দুই সপ্তাহকাল শান্তি-নিকেতনে বাসকালে লেখক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাহারই বৃত্তান্ত ও চিত্র।

গ্রন্থশেষে বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র মুদ্রিত আছে।

ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ। রক্তকরবীর মর্মকথা। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১৩৩৩। আট আনা। পৃ ৫৩।

মৈত্রেয়ী দেবী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। ডি এম লাইব্রেরি। 'নিবেদন'-এর তারিখ এপ্রিল ১৯৪৩। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। পৃ ২৯৯।

১৯৩৮ সালে, ১৯৩৯ সালে দুইবার ও ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য স্বীকার করিয়া-ছিলেন। এই সময়কার আলাপ-আলোচনা, দিনচর্যার বিবরণ লেখিকা সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সূত্রে, রবীন্দ্র-নাথের আনন্দ-উজ্জ্বল অন্তরঙ্গ একটি চিত্র, তাঁহার বহু রচনা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য, অনেক লেখার ইতিহাস, বহু বিষয়ে তাঁহার মতামত, সুরক্ষিত হইয়াছে।

তৃতীয় মুদ্রণ। মূল্য চার টাকা। অভিযান পাবলিশিং হাউস।

মৈত্রেয়ী দেবী। কবি সার্বভৌম। অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ৯৩।১-এ, বহুবাজার স্ট্রীট। মূল্য তিন টাকা। ১৩৫৮। পৃ ১৮৫।

প্রবন্ধসমষ্টি। অনেকগুলি প্রবন্ধে কবির সম্বন্ধে লেখিকার স্মৃতি বিবৃত হইয়াছে। ৮ পৃষ্ঠায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র মুদ্রিত আছে।

মোহিতলাল মজুমদার। রবি-প্রদক্ষিণ। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, মহিষ-রেখা, হাওড়া। মূল্য ছয় টাকা। পৌষ ১৩৫৬। পৃ ১৯১।

"কোন কবির কবিশক্তির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হইলে তাঁহার শক্তির দুই দিকই দেখিতে হয়; রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে, তিনি যে কারণে রবীন্দ্রনাথ, ঠিক সেই কারণেই তিনি যে আর কিছু নহেন, অর্থাৎ অন্যবিধ কবিশক্তি তাঁহার নাই, ইহাও নির্দেশ করা সমালোচকের কাজ। ......রবীন্দ্র-কবির আলেখ্য-রচনায় আমি আলো ও ছায়া দুইয়েরই সমাবেশ করিয়াছি।"

সূচী॥ রবীন্দ্রনাথ; বাংলার নবযুগ ও রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্র-কাব্যের কবি-পুরুষ; মৃত্যুর আলোক রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্র-কাব্য-প্রসঙ্গ ১। চিত্রাঙ্গদা, ২। উর্বশী, ৩। এবার ফিরাও মোরে, ৪। রবীন্দ্র-কাব্যে ট্র্যাজেডি; 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'; ভাষা-সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ; রবি-প্রদক্ষিণ; বাংলার রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্র-কাব্যে আদর্শ ও বাস্তব। পরিশিষ্ট॥ রবীন্দ্র-জন্মদিনে; রবীন্দ্র-বিয়োগে; পদ্মাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ; শিলাইদহে রবীন্দ্র-স্মৃতি।

রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে এই গ্রন্থ-সংকলন পর্যন্ত মোহিতলাল নানা প্রসঙ্গে ও উপলক্ষ্যে যত রকমের আলোচনা করিয়াছিলেন, 'রবি-প্রদক্ষিণ' তাহার সংগ্রহ। এগুলি এতদিন তাঁহার অন্য কয়েকখানি গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল।

মোহিতলাল মজুমদার। কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য। প্রথম খণ্ড। মূল্য সাড়ে

পাঁচ টাকা। ১৩৫৯। পৃ ১৮২। **দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য ছয় টাকা।** ১৩৬০। পৃ ২২১। **কমলা বুক ডিপো।**

"এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' নামক কাব্য-সংগ্রহের কবিতাগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার কবি-প্রতিভার স্বরূপ-সন্ধান এবং সেই সঙ্গে অধিকাংশ কবিতার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা থাকিবে। ......আমি রবীন্দ্র-কাব্যের এই যে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি, তাহাতে কবির ব্যক্তিগত ভাব-জীবনের ধারা অনুসরণ করা আমার কর্তব্য হইবে না; আমি মুখ্যতঃ কাব্য-পাঠই করিব, কবিকে পাঠ করিব না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের মত আত্মস্বতন্ত্র কবির কাব্যরস বিচারে, কাব্যের অন্তরালে কবি-মানসের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ......কবির ব্যক্তিধর্ম যেমনই হোক, তাঁহার সেই ব্যক্তি-জীবনের ভাবনা ও চিন্তা, সংশয়-বিশ্বাস যেমনই হোক, সেই সকলের ভাষ্যরূপে কবিতা পাঠ করিব না; অথবা কবিতার মধ্যে তাহারই সন্ধান করিব না। তৎপরিবর্তে আমি দুইটি কাজ করিব—(১) কবিতার ভাব হইতেই কবি-প্রকৃতি তথা কবি-মানসের পরিচয় করিব; (২) কবিতার রস-নিবেদন ও বাণীরূপ দর্শন করিব।...কেবল কতকগুলি কবিতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিচার থাকিবে, বিশেষত প্রথম বয়সের কবিতাগুলির; তাহার কারণ, সেইগুলি হইতেই আমি রবীন্দ্র-কাব্য-পরিচয়ের কয়েকটি মূল সূত্র নির্ণয় করিব।"...প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়।

প্রথম খণ্ডে "প্রথম পর্বে", ভানুসিংহের পদাবলী, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত-সংগীত, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল আলোচিত হইয়াছে। "পর্বশেষে" এই পর্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। "দ্বিতীয় পর্বে", "প্রথম অধ্যায়ে" মানসী সম্বন্ধে আলোচনা ও "মানসী-পাঠান্তে" মন্তব্য আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে "দ্বিতীয় অধ্যায়ে" সোনার তরী সম্বন্ধে আলোচনা, সোনার তরী পাঠান্তে মন্তব্য, বিদায়-অভিশাপ সম্বন্ধে আলোচনা আছে; "তৃতীয় অধ্যায়ে" চিত্রা ও চৈতালি সম্বন্ধে আলোচনা, চৈতালি পাঠান্তে ও পর্বশেষে মন্তব্য আছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী। রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য। আশুতোষ লাইব্রেরী। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা বারো আনা। ১৩৫৬। পৃ ১০৭।

সূচী॥ সে যুগের কথা ও রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচনা-সাহিত্য; কবি-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ; শূন্য শিলাইদহে পঁচিশে বৈশাখ দিল ডাক। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহনের কতকগুলি কবিতা। প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখকের দীর্ঘ পরিচয়ের স্মৃতি গ্রথিত হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। দেব সাহিত্য কুটীর। ভূমিকার তারিখ ১ আষাঢ়, ১৩৫৫। পৃ ৯৪।

যোগেশচন্দ্র বর্মণ রায়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। প্রথম খণ্ড, পরম তত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব। কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। ১৩৩৯। পৃ ২০৪

গ্রন্থশেষে রবীন্দ্রনাথের পত্র (৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) উদ্ধৃত।

রাইহরণ চক্রবর্তী। কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৩৫০। পৃ ৪০।

রাইহরণ চক্রবর্তী। মর্ত্যের রবীন্দ্রনাথ। আদিল ব্রাদার্স, পটুয়াটুলি, ঢাকা। মূল্য এক টাকা। ১৩৫৩। পৃ ৬০।

রাধাচরণ দাস। কবির স্বপ্ন। পাবনা রজনীকান্ত পুস্তকাগার। মূল্য চারি আনা। আশ্বিন, ১৩২৯। দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৭। প্রকাশক সন্তোষকুমার রায়। ৮-এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ। মূল্য দশ আনা। পৃ ৪৮।

খেয়া কাব্যের আলোচনা।

রামকানাই দেবশর্মা। রবীন্দ্র-গীতা। প্রথম অর্ঘ্য। শ্রীমন্দির, ১৯১।১, বহুবাজার স্ট্রীট। মূল্য দুই টাকা। আশ্বিন, ১৩৫৯। পৃ ১২৪। দ্বিতীয় অর্ঘ্য। মূল্য এক টাকা। শিবচতুর্দশী ১৩৬০। পৃ ৮৬।

গীতাঞ্জলির ব্যাখ্যা। "শ্রীমন্দিরে যাঁকে ঠাকুর বা সাধু বলা হয়, তিনি নিজেই বলে যান বা লেখেন আর অন্যের নামে প্রকাশ করেন। বহু জ্ঞানী গুণী এবং পন্ডিত তাঁর কাছে আসেন এবং নানান প্রশ্নের সমাধান গ্রহণ করেন; দৈনন্দিন কত জটিল রোগব্যাধিগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহোদয় যে তাঁর কাছে আসেন, তার ইয়ত্তা নাই।" —প্রথম খণ্ডের 'পরিচিতি'।

ব্যাখ্যার নিদর্শন—

"জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে?

[ব্যাখ্যা]

মানুষের মন উদার না হলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য দর্শন হয় না। উদরপূর্তি না হলে আবার মনেরও উল্লাস-আনন্দ জাগে না, মনের খোরাকে উদর পূরণ না হলেও আবার মনের প্রসারতা আসে না। তাই মনের সঙ্গে উদরের জোড় দেওয়া আছে। উদরের জোর যার যত বেশী বা খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক শক্তি যার যত বেশী, সে ততই বলিষ্ঠদেহী বা সুন্দর স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে। উদরই তাই মানবদেহের একমাত্র বিশিষ্ট পরিবেশক। উদর আমাদের যেরূপ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, মনও আমাদের তেমনিভাবে সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে জোড়া দিতে পারে।...আমাদের দেহ-জগৎকে এই উদরই সর্বরূপে পুষ্টিপ্রদান করতে পারে। উপর হতেই মনের গঠন হয়। তাই...দেবভোগ্য খাদ্যে মনের ঔদার্য জোড়া দিতে থাকে। সূর্য যেমন জগৎ জুড়ে আলো দিতে পারে, আলোবাতাসগ্রাহী সাধকগণও তেমনি জগতে সাম্যভাব দর্শন করতে পারে আর উদার সুরে কৃষ্ণের বাঁশি বাজাতে পারে।" ইত্যাদি

রামনারায়ণ কর। কাব্য-সাহিত্যে 'আমি'র কথা। ইউ এন দাষ এণ্ড কোং। ১৩২৬। পৃ ৮১।

রামনজ [রামানুজ?] মিশ্র। স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত। ৪০১।৯, অপার চিৎপুর রোড। মূল্য এক আনা। পৃ ১৬।

শ্রীমতী রেণু মিত্র। রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স। মূল্য দুই টাকা। ১৩৫১। পৃ ১০৪।
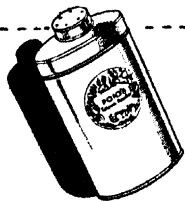
শচীন সেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়। ... সি সরকার অ্যান্ড সনস্‌। মূল্য তিন ...কা। আশ্বিন, ১৩৪৬। পৃ ২৪৫।

সূচী॥ রবীন্দ্র-কাব্যের ভূমিকাঃ ...ন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল, রবীন্দ্র-কাব্যের ...চিত্রতা, জীবন-দেবতা, গতিধর্ম, ...বৈকান্যভূতি, প্রকৃতির সহিত যোগ, ...ত্যু ও জীবনের সম্বন্ধ, প্রেম-সাধনা, ...ব-প্রভাব, স্বাদেশিকতা, কাব্য-...হিত্যে আধুনিকতা; ডাকঘর; ফাল্গুনী; ...ন্যাস।

'এই গ্রন্থখানি পড়িয়া লেখককে ...খিত কবির পত্র' (১৮।১০।৩৯) গ্রন্থ-...চনায় কবির হস্তাক্ষরে অনেকগুলি ...পিতে মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ [১৯৪৭] এ ...মুখার্জি অ্যান্ড কোং, মূল্য সাড়ে তিন টাকা, পৃ ২৫২। এই সংস্করণে 'রবীন্দ্রনাথের 'চিন্তা-প্রবাহ' প্রবন্ধ যুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ, রীডার্স কর্ণার, মূল্য সাত টাকা। বৈশাখ ১৩৬২। পৃ ৩০৪।

"এই তৃতীয় সংস্করণে নাটক পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত বিয়োগান্ত ও সাংকেতিক নাটকের আলোচনা দেওয়া হইল। 'সাহিত্যজিজ্ঞাসা' নামে আর একটি নূতন অংশে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধীয় চিন্তন ও দর্শনের আলোচনা সন্নিবেশিত হইল।"—ভূমিকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ। আশুতোষ লাইব্রেরী। এক টাকা। ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৯। পৃ ১২৪। তৃতীয় মুদ্রণে নূতন কাহিনী, শ্রীনন্দলাল বসু অংকিত কয়েকখানি সমসাময়িক চিত্র যুক্ত হয়। পঞ্চম মুদ্রণ। দুই টাকা। ১৩৬০।

"এ পুস্তিকায় জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতকগুলি ছোট ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে......প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের কতকগুলি কাহিনী, যার থেকে তাঁর প্রজা-বাৎসল্য ও কৌতুকপ্রিয়তা ফুটে উঠেছে। আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়, পুণ্যাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রবর্তিত নববিধানে।......এতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি দিক লোকের চোখের সম্মুখে ধরা হয়েছে,—যা লেখক ভিন্ন অপর কারো পক্ষে জানবার সম্ভাবনা খুব কম।......... ছোটখাট বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সুলভ মহত্ত্ব ও সহজ মনুষ্যত্ব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অনেক বড় জীবনীতেও তা হয় না।" —প্রমথ চৌধুরী, ভূমিকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ। আশুতোষ লাইব্রেরী। এক টাকা বারো আনা। ১৩৫২। পৃ ১২০। চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৫৬, দুই টাকা।

লেখকের 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ-'এর অনুরূপ আরো কাহিনীর সংগ্রহ।

'জমিদারী কাগজে রবীন্দ্রনাথের হুকুম'এর একখানি প্রতিলিপি আছে। শ্রীনন্দলাল বসু অংকিত কয়েকখানি সমসাময়িক চিত্রও আছে।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। সেকালের রবীন্দ্র-তীর্থ। পূরবী পাবলিশার্স। বর্তমানে গুপ্তপ্রেস। মূল্য দুই টাকা। আশ্বিন, ১৩৫৩। পৃ ১১৪।

লেখকের সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ-এর অনুরূপ বিবিধ কাহিনী। 'জানকী রায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে।

শশিভূষণ দাস। রবি অস্তমিত (মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ)। সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌। ২৩৩, মানিকতলা মেন রোড। মূল্য এক আনা। পৃ ১৬।

কবির পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।

শিবকৃষ্ণ দত্ত। রবীন্দ্র-সাধনা (কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা)। প্রাপ্তিস্থান, বরেন্দ্র ও গুরুদাস লাইব্রেরী। মূল্য এক টাকা। আষাঢ়, ১৩৩৬। পৃ ১২৪।

শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রবি-সভাজন। প্রকাশক, শ্রীইন্দিবর মুখোপাধ্যায়, 'ভুবন-ভবন', খড়দহ। ভূমিকা, আশ্বিন, ১৩৪৮। পৃ ৩১।

'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধানে সম্পূজন।'

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ। দেশবন্ধু বুক ডিপো। আড়াই টাকা। ১৩৫২। পৃ ১২৮।

সূচী॥ এশিয়ার বৈজয়ন্তী, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে, প্রাচীর বাণী, সমালোচকের দৃষ্টিকোণে, বিদেশে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ রচিত ও রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। অন্তর্লোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশক, সৌম্যেন্দ্রভূষণ রায়, ৩৩, হিন্দুস্থান রোড। মূল্য এক টাকা। আশ্বিন, ১৩৫৫। পৃ ৬০।

শৈলেশ বসু। জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। বারো আনা। ১৯৪৭। পৃ ৭৫।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশক, প্রভাতকুমার মিত্র, ৩৬।১, বেনেটেলো লেন। চারি আনা। ভাদ্র, ১৩২৮। পৃ ৩৬।

১৩২৮ সালে বিদেশ হইতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ গান্ধী-আন্দোলন সম্বন্ধে যে-সকল বক্তৃতা দেন, তাহার বক্তব্যের প্রতিবাদ।

সরসীলাল সরকার। রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী-পরিকল্পনা। বিশ্বভারতী। মূল্য এক টাকা। আশ্বিন, ১৩৪৮। পৃ ১২৮।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার এই একটি বিশেষত্ব লেখকের চোখ পড়িয়াছিল—তাঁহার অনেক কবিতাতেই প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত পর পর আছে। এই সূত্র ধরিয়া মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার প্রধান বিষয়—কবিতার সহিত স্বপ্ন-চৈতন্যের গভীর সংযোগ; তাল, গান ও গতি কোনো বিশেষ গূঢ় ভাবের প্রতীকরূপে স্বতঃস্ফূর্ত; এই গূঢ় ভাবের মর্মকথা ও উৎস উপনিষদের 'অদ্বৈতম্' বাণী 'শান্তম্ শিবম্'—এই বাণীকে কেন্দ্র করিয়াই কবির সমস্ত রচনা একটি অখণ্ড তাৎপর্যে গ্রথিত হইয়া বিচিত্ররূপে ক্রমবিকশিত।

এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে লেখক ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা, অনিলকুমার বসুর "রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ" প্রবন্ধে (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৫) লিপিবদ্ধ আছে।

সরোজকুমার বসু। রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস। হিন্দুস্থান বুক ডিপো। মূল্য দুই টাকা। আষাঢ়, ১৩৫৭। পৃ ১০০।

সূচী॥ ভূমিকা; ব্যঙ্গ; কৌতুক; খাপছাড়া জাতীয় রচনা; হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান; বিরুদ্ধ সমালোচনার পুনরালোচনা; উপসংহার।

সাধনা কর ও সুধীর কর। আমাদের গুরুদেব। ৩২ শ্রাবণ, ১৩৪৮। পৃ ১৯।

রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধদিবস উপলক্ষ্যে প্রচারিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। সাধনা কর লিখিত একটি প্রবন্ধ ও সুধীরচন্দ্র কর লিখিত কবিতা।

সীতা দেবী। পুণ্যস্মৃতি। মূল্য দুই টাকা বারো আনা। শ্রাবণ, ১৩৪৯। **পৃ** ৫২৮।

বাল্যকাল হইতেই লেখিকা রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যন্ত, সেই পরিচয়সূত্রে সাক্ষাৎ-জ্ঞাত রবীন্দ্র-জীবনীর নানা ঘটনা দিনলিপি ও স্মৃতির সাহায্যে লেখিকা বিবৃত করিয়াছেন।

সুকুমার সেন। বাংগলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মডার্ণ বুক এজেন্সী। মূল্য সাড়ে সাত টাকা। সংস্করণ ১৩৫৯, ১৯৫২। **পৃ** ৩৯০।

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডের এই সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের আলোচনাতেই পর্যবসিত ......কয়েকটি প্রস্তাব ও অধ্যায় নূতন যোজনা, কয়েকটি পরিবর্ধিত। এই বইয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির সাধ্যানুসারে সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া হইল। সে কারণে বইটির নামান্তর রহিল 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।"

সূচীপত্র॥ ১। কাব্য ভূমিকা, কৈশরোক, সঙ্কোচের বিহ্বলতা, পূর্বরাগ, যৌবন-স্বপ্ন, অনুরাগ, উৎকণ্ঠা, অভিসার, ক্ষণ-মিলন, ভাবনা, অন্তঃপুর, প্রতীক্ষা, হৃদয়বীণা, মানসোৎক, অন্তরাগ। ২। নাট্য। সাধারণ ও কাব্য-নাট্য, গীত ও ভাব-নাট্য। ৩। কথা। ছোটগল্প, উপন্যাসঃ ব্যক্তি ও ব্যক্তি: উপন্যাসঃ ব্যক্তি ও সংসার;

উপন্যাসঃ ব্যক্তি ও আদর্শ প্রবন্ধ। ৪। গান। গানে গানে কথার আভা। পুনশ্চ।

সুধীরচন্দ্র কর। জনগণের রবীন্দ্রনাথ। সিগনেট প্রেস। মূল্য আড়াই টাকা। আশ্বিন, ১৩৫৫। পৃ ১৫২।

সূচী॥ জনগণের রবীন্দ্রনাথ; জনগণ ও রবীন্দ্র-সংগীত; রবীন্দ্র-কাব্যে লোকবাণী; রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যে লোকসমাজ; কবির দৃষ্টিতে জনগণ; রবীন্দ্র-সাহিত্যে জনগণের একটি দিক; জনগণের মাঝে রবীন্দ্রনাথ।

সুধীরচন্দ্র কর। কবিকথা। সুপ্রকাশন। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। ১৯৫১। পৃ ২০৩।

লেখক দীর্ঘকাল "কবির খাস দপ্তরের কাজ" করিয়াছিলেন। এই সময়ে কবির সম্বন্ধে নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় লেখক এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "এ সবের ঘটনাকাল মোটামুটি কবির জীবনের শেষ চৌদ্দ বছর।

সূচী॥ কবি ও শান্তিনিকেতন; ব্যক্তিগত পরিবেশ ও অভ্যাস; রচনা-প্রসঙ্গ; মানব রবীন্দ্রনাথ; দেখা-সাক্ষাৎ; বিচিত্রের দূত রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্রনাথের আসর; শেষ অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দ্বীপময় ভারত। বুক কোম্পানি। মূল্য চারি টাকা। আশ্বিন, ১৩৪৭। পৃ ৩৬৯।

লেখক ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সহিত মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত; রবীন্দ্রনাথের 'জাভা-যাত্রীর পত্রের' সহিত অবশ্যপাঠ্য।

রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের এই রচনাপ্রসঙ্গে "জাভা-যাত্রীর পত্রে" (যাত্রী) লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-

ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেইঃ তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় ,যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। ......সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি। ...এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি; এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম্; বর্ণনা-সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি।"

"সুনীতির যেমন দর্শন-শক্তি, তেমনি ধারণা-শক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ, তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যাকিছু তাঁর চোখে পড়ে, সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট যে হয় না—সে দু দিক থেকেই—রক্ষণে এবং দানে। ......বুঝতে পারচি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।"

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ। পি ঘোষ এ্যান্ড কোং। তিন টাকা। নিবেদনের তারিখ ২৫ মাঘ, ১৩৪১। পৃ ৩৯৯।

সূচী॥ অবতরণিকা; প্রেমের কবিতা; স্বদেশঃ নবীন ও প্রাচীন ভারত; প্রকৃতি-গাথা; জীবন-দেবতা; শিশু; পলাতকাঃ লিপিকাঃ পুনশ্চ; নাটক ও নাটিকা; রূপক; ছোটগল্প; উপন্যাস; রসতত্ত্ব

'তৃতীয় সংস্করণ', [১৩৫৯], এস সি সরকার অ্যান্ড সনস, মূল্য পাঁচ টাকা। ইহা প্রধানত দ্বিতীয় সংস্করণের অনুরূপ; দ্বিতীয় সংস্করণে 'সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত পরিচ্ছেদটি পুনরায় লিখিত হইয়াছে। শেষ পর্যায়ের কবিতা সম্বন্ধে দুইটি পরিচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে এবং ছোট গল্প বিষয়ক পরিচ্ছেদটি পরিবর্ধিত হইয়াছে।'

সুমথনাথ ঘোষ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। বুক ইনডাস্ট্রিজ। চৌদ্দ আনা। ডিসেম্বর ১৯৪১। পৃ ১১০

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। রবি-দীপিতা। মিত্র এন্ড ঘোষ। আড়াই টাকা। [অক্টোবর ১৯৩৮]। পৃ ২৪৮।

সূচী॥ কড়ি ও কোমল, ফাল্গুনী, বলাকা, রবীন্দ্রসাহিত্যে কান্তাপ্রেম, কান্তাপ্রেম—মহুয়া।

দ্বিতীয় সংস্করণ [১৯৪৫] পৃ ৩২৯। সাড়ে চার টাকা। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি যুক্ত হইয়াছে—মহুয়ার পরবর্তী যুগ, বনবাণী, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, শেষ সপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, জন্মদিনে, সেঁজুতি, রোগশয্যায়, আরোগ্য, শেষলেখা, আর্ট ও রবীন্দ্রনাথ।

স্বদেশরঞ্জন দাস। সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি। প্রকাশক নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৪ বি কলেজ রো। মূল্য চারি আনা। পৃ ২২।

"কবির......অনুযোগ রাশিয়ার ওপর এই যে, সেখানে 'জবরদস্তির সীমা নেই।' ..... কবি ত রাশিয়া দেখে অবাক হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন, এদেশেও ঐ রকমটি চান, কিন্তু কোন্ উপায়ে তা করবেন?

কবিকে বলছি তার ঈপ্সিত ফললাভ করতে হ'লে force and violence দ্বারাই করতে হবে।...অস্বীকার করলে তাঁর ঈপ্সিত ফললাভ আট বছরে কেন কস্মিন্ কালেও হবে না।......

কবি আজ ভারতকে যে জিনিস শোনাচ্ছেন তা'র গভীরতা, তা'র প্রবলতা তা'র বেদনা দেখে মনে হয় তাঁর মনের কোণে বহুদিনের যে ঈপ্সিত রূপটি এতদিন অসহায়ভাবে লুক্কায়িত রেখেছিলেন আজ রাশিয়াতে গিয়ে জীবনের শেষ-প্রান্তে দাঁড়িয়েও অকস্মাৎ জেগে উঠেছেন ......বুর্জোয়া মনোভাব, পুরাতন সংস্কার, নীতিপদ্ধতি সব কিছু তিনি আজ ঝেড়ে ফেলে দেবেন।......তাঁর অন্তরে বিপ্লব বেধেছে। তিনি রাশিয়াতে 'রক্তকরবীর ঝঙ্কার' শুনেছেন। সেখানকার 'নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন,' কিন্তু বহু যুগের বুর্জোয়া মনোভাব তাকে ধরতে দিচ্ছে না—রেগে উঠছেন'। কিন্তু যেদিন তিনি বুর্জোয়া মনোভাবের 'জটিল জালাবারণের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে বুর্জোয়াদের 'যে ধ্বজার অজেয় শল্যের একদিক পৃথিবীকে অন্যদিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে তাকে ভেঙে ফেলে, তার কেতনকে ছিন্ন করে ভাঙার পথে' চলবেন সেই দিনের অপেক্ষায় পরিপূর্ণ আশা নিয়ে দিন গুণছি......।"

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা। সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানী। মূল্য তিন টাকা। [১৩৫৩]। পৃ ১৫৪।

সূচী॥ আত্মপরিচয়; গুণস্মৃতি; পূর্বস্মৃতি; 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গের' পরিশিষ্ট; রবীন্দ্রকথা সংগ্রহ; বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ; ব্রহ্মবিদ্যা ও তন্মূলক ধর্মোপাসন; 'বৈষ্ণব কবিতা'; 'পূজার সাজ', 'কাঙালিনী', রবীন্দ্রনাথের বংশলতায় অসঙ্গতিমূলক ভ্রম; রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার্থ প্রস্তাবান্তর; বঙ্গীয় প্রাদেশিক

শব্দকোষ; সভাপতির অভিভাষণ; ব্রহ্মচর্যাশ্রম; ভক্তির শেষ অঞ্জলি। পরিশিষ্টে: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের দুই-খানি পত্র মুদ্রিত আছে।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির কথা। কাহিনী, ১৬।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। মূল্য আড়াই টাকা। আশ্বিন ১৩৬১। পৃ ৭৬

সূচী॥ প্রথম ভাগ—শান্তিনিকেতনের ইতিহাস, মৃণালিনী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ও বহুবর্ণাশ্রম, রবীন্দ্রনাথের বিষয় দুই একটি কথা। দ্বিতীয় ভাগ—গান ও গীতি-নাট্য, রামায়ণ ও বাল্মীকিপ্রতিভা, রবীন্দ্র-নাথের দর্শন, 'বৈষ্ণব কবিতায়' বৈষ্ণব-ধর্মের কথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্র, প্রকৃতির প্রতিশোধ, পরশপাথর।

হরিপদ কেরানি **[কানাই সামন্ত] শাজাহান। প্রকাশক রামেশ্বর দে, চন্দননগর। অ-বিক্রেয়। মুদ্রণসংখ্যা ২০০। রবীন্দ্রপক্ষ ১৩৬০। পৃ ৪৬।**

'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই', এই রবীন্দ্র-উক্তির ব্যাখ্যা উপলক্ষে, এই গ্রন্থে বলাকা কাব্যের অন্তর্গত 'শা-জাহান', নৌকাডুবি উপন্যাসের 'কমলা' ও শ্যামা নৃত্যনাট্যের 'উত্তীয়', এই কয়টি জীবনের ও চরিত্রের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে উত্তীয়ের চরিত্রে কিভাবে কবির নিজের জীবন প্রতিবিম্বিত।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-দর্শন। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। মূল্য দুই টাকা। আশ্বিন ১৩৫৭। পৃ ৮২।

[হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ]। কবীন্দ্র রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর। বসুমতী। পৃ ৮৪।

বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের বিবরণ এই পুস্তকের প্রধান অংশ।

লেখকের নাম উল্লিখিত নাই। মলাটের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় ইহা বসুমতী প্রেসে মুদ্রিত। মলাটে পুস্তকের নাম 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', প্রথম পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

ডক্টর সুকুমার সেন এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানি দেখিতে দিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও এক কপি আছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ। বুক কোম্পানী। মূল্য বারো আনা। ১৩৪৮। পৃ ৮৯।

এই পুস্তকে রবীন্দ্র-জীবনী-সংক্রান্ত মূল্যবান কতকগুলি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য উপকরণ মুদ্রিত আছে, যথা—

রাধারমণ করকে লিখিত রবীন্দ্র-নাথের পত্র। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিতর্ক উপলক্ষ্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ও সে সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্পাদকের মন্তব্য। বালক পত্রের কার্যাধ্যক্ষতা ও ভারতীর সম্পাদকতা ত্যাগ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিবেদন। নাইট-উপাধি ত্যাগপত্রের কবি-কৃত বঙ্গানুবাদ। ঐ পত্র সম্বন্ধে ইংলিশ-ম্যান পত্রের মন্তব্য। ইত্যাদি।

রবীন্দ্র-সংগীত ও নৃত্য ॥ সংগীত

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী সংগম। বিশ্বভারতী। মূল্য বারো আনা। ১৫ পৌষ ১৩৬১। পৃ ৩২।

"রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কি রকম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন—চলিত কথায় যাকে আমরা তাঁর গান ভাঙা বলি—তার পরিধি কত বিস্তৃত এবং তাতেও কি রকম অপরূপ কারিগরি

দেখিয়েছেন তার একটি স-দৃষ্টান্ত আলোচনা...। গান ভাঙা দু'রকমে হতে পারে—এক, পরের সুরে নিজের কথা বসানো; দুই, পরের কথায় নিজের সুর বসানো। এক্ষেত্রে পরের সুরে নিজের কথা বসাবার দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়।" —গ্রন্থশেষে এইরূপ 'ভাঙা গানের তালিকা' মুদ্রিত হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি। হিন্দু-সংগীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সংগীত পরিষদ বিদ্যালয়। ৬৭।৯ বলরাম দে স্ট্রীট। ১৩২৫। পৃ ৬০।

রামমোহন লাইব্রেরিতে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে পঠিত সংগীতের মুক্তি প্রবন্ধের ইহা প্রতিবাদ। বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য বনের পথে পথে বাজিছে বায়", "যে কাঁদনে হিয়া কাঁদনে কাঁদিছে", "ব্যাকুল বকুলের ফুলে", "কাঁপিছে দেহলতা থরথর" এই কয়টি গানের, সংগীত পরিষদের ভাইস প্রিন্সিপাল যাদুমণি দেব্যা প্রদত্ত সুরে কৃষ্ণধন ভট্টাচার্যকৃত স্বরলিপি পুস্তিকার শেষে মুদ্রিত। মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে প্রেসিডেন্সী থিয়েটারে (৭ ডিসেম্বর ১৯১৭) পঠিত।

জয়দেব রায়। রবীন্দ্র-গীতি। বুক হাউস। মূল্য তিন টাকা। ২৫ বৈশাখ ১৩৬০। পৃ ২৪০।

সূচী॥ বাংলা গানের ইতিহাস; বাংলার গীতিচর্চা; রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমবিকাশ; পরিবেশ; প্রেরণা; বাণীর প্রাধান্য; রবীন্দ্রনাথের সুর; সংগীতের বন্ধন ও মুক্তি; ভানুসিংহ ঠাকুরের গান; কৈশোরকের গান; রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য; রাগ-সংগীত; সংগীতে রূপানুশীলন; রবীন্দ্রনাথের বাউল গান; কীর্তন; কৌতুক সংগীত; উদ্দীপনার গান; কাব্যগীতি; নৃত্যনাট্য; রবীন্দ্র-সংগীতের রস; রবীন্দ্রনাথের গীতিরীতি; রবীন্দ্র-সংগীতের পরিবেশন পদ্ধতি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কথা ও সুর। বিশ্বভারতী। মূল্য দুই টাকা। ভাদ্র ১৩৪৫। পৃ ৮৮।

সূচী॥ উপক্রমণিকা; মতামত; রবীন্দ্র-সংগীত; রসোপভোগ; ধ্রুপদ ও লোক-সংগীত; কথা ও সুর; নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা।

নীহাররঞ্জন সেন। রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমপর্যায়। জাতীয় নাট্য পরিষদ। [২৪ জুলাই ১৯৫০]। পৃ ২০।

প্রতিমা দেবী। নৃত্য। বিশ্বভারতী। মূল্য তিন টাকা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। পৃ ৩১। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত নৃত্যচ্ছন্দের ছয়খানি চিত্র সম্বলিত।

সূচী॥ নৃত্য; চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য; চণ্ডালিকা।

শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্র-সংগীত। বিশ্বভারতী। ৭ পৌষ ১৩৪৯। পৃ ১৬৪। সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৬। বিশ্বভারতী। মূল্য চার টাকা। পৃ ২৮৮।

সূচী॥ সংগীত সাধনা; শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংগীত; শিল্পীমন ও বাস্তব-জীবন; ভারতীয় সংগীতের প্রকৃতি ও বাঙলা গান; বাল্যজীবনে সংগীতের প্রভাব; সুরধর্মী কবিতা ও গান; হিন্দী সংগীতের প্রভাব; গান রচনার বিভিন্ন পদ্ধতি; গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য; উদ্দীপক বা উল্লাসের গান; কাব্যগীতি; স্বদেশী গান; বাউল গান; ছন্দ॥ তাল; মন্ত্রগান; কয়েকটি তথ্য; প্রয়োজনা; শান্তি-নিকেতনের নৃত্যধারা; পরিশিষ্ট: রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বৎসর। সূচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তাক্ষরে একটি চিঠি মুদ্রিত আছে। গ্রন্থমধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র ও 'শিশুতীর্থ' নৃত্যাভিনয়ের বিষয়সংক্ষেপ মুদ্রিত আছে।

শুভ গুহ ঠাকুরতা। রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা। দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ। মূল্য পাঁচ টাকা। বৈশাখ ১৩৫৯। পৃ ২১৩।

সূচী ॥ ভূমিকা: রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমবিকাশ; সংগীত রচনার ৬১ বৎসর; পরিবেশন প্রণালী; অলংকরণ নীতি; উচ্চারণ প্রণালী; সঠিক শ্বাস গ্রহণ পদ্ধতি; কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন সাধন; ছন্দ-বৈচিত্র্য; গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য; রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যধারা; বেদগান; অন্যের রচনায় সুরযোজনা; বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংগীত রচনা; ব্যবহৃত তাল; তালফেরতা; ছন্দান্তর ও সুরান্তর; রূপানুবর্তন; ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী; অপ্রচলিত রবীন্দ্র-সংগীত; **রবীন্দ্র-**সংগীতের ধারা: এই বিভাগে রবীন্দ্র-সংগীতকে সতেরটি ধারায় ভাগ করিয়া তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

শেফালিকা শেঠ সংকলিত। রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গ। প্রকাশক বারীন্দ্রনাথ শেঠ, ২১৫ পার্ক স্ট্রীট। পৃ ২৮।

এই পুস্তিকায় তিনটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সংগীতে রবীন্দ্রনাথ; রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে

...ন্দ্র-সংগীতের স্থান; শেফালিকা ...র, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীত।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের ...ন। অভিযান পাবলিশিং হাউস। মূল্য ...ড় টাকা। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৯। পৃ ৫৬।

সূচী॥ রবীন্দ্র-সংগীতের ক্রমবিকাশ; বর্ষণ; রবীন্দ্র-সংগীতে সুর-বৈচিত্র্য।

সংগীত প্রসংগে নিম্নলিখিত গ্রথখানিও উল্লেখযোগ্য—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সুর ও সংগীত। ভারতী ভবন। মূল্য এক টাকা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পত্রাবলীর ইতিহাস'-এর তারিখ ১ শ্রাবণ ১৩৪২। পৃ ১০২।

সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রাবলী। [১৯৩৫ সালে] জানুয়ারী মাসে "তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) সংগীত সম্বন্ধে অন্তত একটি পুস্তিকা লেখবার তাগিদ দিতে শুরু করি। স্বাস্থ্যের ও সময়ের অভাবে তিনি পুস্তিকা লিখতে পারেননি। আমাকে চিঠি দিতেন, আমিও উত্তর দিতাম, প্রশ্ন করতাম।...বাংলা দেশের সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই যে, বাঙালী অনুকরণ করতে পারবে না, সে সৃষ্টি করবেই করবে এবং তার সংস্কৃতি অনুসারে সে চলবেই চলবে। বাংলা দেশের সংগীতের ধারাই হ'ল সুর ও কথার সমন্বয় সাধনে সৃষ্টি।" ... ধূর্জটিপ্রসাদের বিবৃত 'ইতিহাস'।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা

মনোরঞ্জন গুপ্ত। রবীন্দ্র-চিত্রকলা। সরস্বতী লাইব্রেরি। মূল্য ছয় টাকা। ১৯৪৯। পৃ ৬২+রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ২০ খানি চিত্র।

সূচী॥ রবীন্দ্রনাথের কলাচর্চা; রেখা ও রূপের ছন্দ; রবীন্দ্র-চিত্রকলার টেকনিক ও বিষয়বস্তু; কলার বিচার ও রসানুভূতি; রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে অভিমত।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য। এসিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস সিন্ডিকেট। মূল্য এক টাকা। পৌষ ১৩৫৯। পৃ ১৫।

সম্মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি

কবি-পরিচিতি। কান্ত পাবলিশিং হাউস। সপ্ততিতম রবীন্দ্র-জন্মতিথি। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮। মূল্য দুই টাকা। পৃ ২০৪।

সূচী॥ প্রমথ চৌধুরী, চিত্রাঙ্গদা: সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প; সোমনাথ মৈত্র, ছিন্নপত্র; রাধারাণী দত্ত, ঘরে-বাইরে; নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন; গিরিজা মুখোপাধ্যায়, বলাকার যুগ।

প্রেসিডেন্সী কলেজ রবীন্দ্র পরিষদে (প্রতিষ্ঠিত ১৯২৭) পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহ।

গ্রন্থের নামকরণ কবি-কৃত। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত ও উপহৃত।

সূচীতে উল্লিখিত রচনাগুলি ব্যতীত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভূমিকা', রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'অর্থ কিছু বুঝি নাই' 'রবীন্দ্র পরিষদে কবির অভিভাষণ' ("কবির স্বকৃত লিখিতানুবৃত্তি") ও

রবীন্দ্র-পরিষদ সভায় সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে কবির আলোচনার কবি-কর্তৃক লিখিত রূপ 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ শেষে মৈত্রেয়ী দেবীর স্বাক্ষরহীন কবিতা 'কর্ম যত সৃষ্টি যত' এই সংকলনে স্থান পাইয়াছে।

কবি-প্রণাম। সম্পাদক নলিনীকুমার ভদ্র, অমিয়াংশু এন্দ, মৃণালকান্তি দাশ, সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। বাণীচক্র-ভবন, শ্রীহট্ট। মূল্য দেড় টাকা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ ১১২+পরিশিষ্ট পৃ ৩২।

সূচী॥ প্রমথ চৌধুরী, ছড়া; সতীশচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রস্মৃতি; বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথের গদ্য; জগদীশ ভট্টাচার্য, তিন পুরুষ; ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথ; শান্তিদেব ঘোষ, ভারতীয় নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ; নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-কাব্যে ভূলোক ও দ্যুলোক; সৈয়দ মুজতবা আলী, গুরুদেব; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রপরিক্রমা; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের পুরানো কথা; লীলাময় রায়, সন্ধ্যা ও প্রভাত; প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্ররচনার নেপথ্যধ্বনি; সুপ্রভা দেবী, নারীমনের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ; নলিনীকুমার ভদ্র, যোগাযোগ; সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ; সত্যভূষণ সেন, গৌহাটিতে রবীন্দ্রনাথ; হেম চট্টোপাধ্যায়, শিলঙে রবীন্দ্রনাথ; যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ; রাধানন্দ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও শিবধন বিদ্যার্ণব। মৃণালকান্তি দাশ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীরচন্দ্র কর, রসময় দাশ, সাধনা কর, গোপাল ভৌমিক লিখিত কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অপ্রকাশিত পত্র ও কবিতা ও শ্রীহট্টে প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা—'বাঙালীর সাধনা' ও 'আকাঙ্ক্ষা'।

কবি-প্রশস্তি। রবীন্দ্র-জয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদ্। উৎসব-পরিষদ পক্ষে শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। ১৩৩৮। পৃ ৮৫।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে "বাংলা-দেশের ছাত্র-ছাত্রীগণের অর্ঘ্য"। সূচী॥ বুদ্ধদেব বসু, 'তবু শূন্য শূন্য নয়' (কবিতা); প্রমথনাথ বিশি, চৈতালি; শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের ছবি; পুলিনবিহারী সেন, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়; অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, মাটির কবি রবীন্দ্রনাথ; নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রণাম (কবিতা); বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ; শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, রবীন্দ্র সাহিত্যে স্বদেশীয়তা; জগদীশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র-বন্দনা (কবিতা); সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপক নাটকে রবীন্দ্রনাথ। এতদ্ব্যতীত, সূচনায় কবি-অভিনন্দন মন্ত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর হাসান সুরাবর্দি'র রচনা ও পরিশেষে, উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র, ও রবীন্দ্রানুষ্ঠান সূচী—প্রেসিডেন্সী কলেজ রবীন্দ্র-পরিষদ, ময়মনসিংহ রবীন্দ্র-সংসদ ও শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র পরিচয় সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

গীতবিতান বার্ষিকী। সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। গীতবিতান। মূল্য তিন টাকা। মাঘ ১৩৫০। পৃ ২১৪।

সূচী॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমাদের পারিবারিক সংগীত-চর্চা; কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরলিপি-সমস্যা; ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, স্বরলিপি-পদ্ধতি; ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলা সংগীতাচার্য; প্রতিমা দেবী, নাট্যধারা; প্রমথ চৌধুরী, পূর্ব-স্মৃতি; অজয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রসংগীত ও শিল্পীর দায়িত্ব; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতীতের স্মৃতি; আর্নল্ড বাকে, রবীন্দ্রনাথের গান, বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথের গদ্য-গান; শান্তা দেবী, গানের রাজা; নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শিশু ও সংগীত; বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষা; নীহারবিন্দু সেন, শান্তি-নিকেতন-পরিবেশে বাইরে রবীন্দ্রসংগীত; প্রতিভা বসু, রবীন্দ্রসংগীতের সুর; হেমেন্দ্রলাল রায়, গীতকার রবীন্দ্রনাথ ও বর্নস্; দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, নৃত্যে রবীন্দ্রনাথের রূপ পরিকল্পনা; জ্যোতির্ময় রায়, শব্দলোক ও রবীন্দ্রনাথ; সরলা দেবী, গানের ভিতর দেবদর্শন; ফণী বন্দ্যো-পাধ্যায়, কবিগুরুর গান; হিমাংশুকুমার দত্ত, রবীন্দ্রসংগীতে বৈচিত্র্য; অমিয় চক্রবর্তী, গানের গান; সুজিতরঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসংগীতের দ্বি-ধারা; অসিতকুমার হালদার, রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় নয়ন ও মন; সাধনা কর ও সুধীরচন্দ্র কর, শান্তি-নিকেতনের বিচিত্র অনুষ্ঠান; কালিদাস নাগ, নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ; সীতা দেবী, অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ; নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা; প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ; অনাদিকুমার দস্তিদার রবীন্দ্রসংগীতের গ্রামোফোন রেকর্ড তালিকা। অনাদিকুমার দস্তিদার, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ও শৈলজা-

রঞ্জন মজুমদার কৃত যথাক্রমে 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে', 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না', শুনি ঐ রুণু ঝুনু পায়ে পায়ে' গানের স্বরলিপি এবং হেমন্তবালা দেবী ও বাসন্তী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি চিঠি ছাপা হইয়াছে।

জয়ন্তী-উৎসর্গ। রবীন্দ্র-পরিচয়সভা কর্তৃক প্রকাশিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা। ১১ পৌষ ১৩৩৮। পৃ ৪৯৯।

শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসিগণ কবির কাব্যালোচনার উদ্দেশে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা গঠন করেন এবং কবির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বাংলা দেশের বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সংগ্রহ আরম্ভ করেন। সেই রচনাগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পঁচিশে বৈশাখ। সম্পাদিকা মৈত্রেয়ী দেবী। বুক হাউস। মূল্য তিন টাকা। পৃ ১৩০।

গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথের তিনখানি চিঠি মুদ্রিত আছে, সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর চিঠিতে দুইখানি। 'পরিহাসিকা' বিভাগে মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ও ছয়টি কবিতা-পত্র মুদ্রিত আছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমল হোম, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, চিত্রিতা দেবী, নবগোপাল দাস, নরেন্দ্র দেব, প্রতিমা দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশি, বুদ্ধদেব বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, সজনীকান্ত দাস, সু দেবী, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, হরপ্রসাদ মিত্র, সি এফ এণ্ড্রুজ, আর জে ক্যাম্বেলের রচনা আছে। মলাটে রবীন্দ্রনাথ ও সুপ্রভা দেবী অঙ্কিত চিত্র।

পঁচিশে বৈশাখ। সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। খড়্গপুর, অতুলমণি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৭। পৃ ১২।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের রচিত রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধীয় রচনার সংগ্রহ।

বাইশে শ্রাবণ। ছিতেন ঘোষ সম্পাদিত। খড়্গপুর অতুলমণি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। মূল্য আট আনা। ২২ শ্রাবণ, ১৩৫৭। পৃ ১৪।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধীয় রচনার সংগ্রহ।

রবীন্দ্র-বিয়োগে রবি-সভাজন। ১ ভাদ্র, ১৩৪৮।

মহীয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক, ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রগণ কর্তৃক লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধের সংগ্রহ।

রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্বাশা। সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। পূর্বাশা প্রেস। মূল্য দেড় টাকা। পৃ ১২০।

সূচী॥ প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্র-স্মৃতি; ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, **রবীন্দ্র-সৃষ্টি;** অজয় ভট্টাচার্য, **রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা;** নীলিমা দেবী, **রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিকতা;** মহেন্দ্রনাথ সরকার, **শান্তি না প্রেম;** প্রবোধচন্দ্র সেন, **রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার ছন্দ;** প্রভু গুহঠাকুরতা, **বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ;** শচীন সেন, **রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি;** লীলাময় রায়, **রবীন্দ্রনাথের অপরাধ?;** প্রেমেন্দ্র মিত্র, **ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ;** মোহিতলাল মজুমদার, **রবীন্দ্র-কাব্যের কবি-পুরুষ;** নীহাররঞ্জন রায়, **শেষ অধ্যায়;** হুমায়ুন কবির, **রবীন্দ্রনাথ;** অচিন্ত্য-

কুমার সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ (কবিতা); জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ (কবিতা); সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'নির্ঝরের স্বপনভঙ্গ'। গ্রন্থসূচনায় একটি কবিতা আছে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি ও একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে।

সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। পৃ ১০৫।

সূচী॥ বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা; হেমেন্দ্রকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথের গান; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ; যতীন্দ্রমোহন বাগচী, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য; কালিদাস রায়, রবীন্দ্র-কাব্যবিচারের ভূমিকা; প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'; রাধারাণী দেবী, ঘরে বাইরে; কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি সংগ্রহ, যেমন 'রবীন্দ্র-মঙ্গল', রবীন্দ্র-নামা', কবিতা ও নাট্য বিভাগে উল্লিখিত হইয়াছে।

কবিতা ও নাট্য

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রবীন্দ্র-প্রতিভা। কমলা বুক ডিপো। মূল্য পাঁচ-সিকা। পৃ ৪৪।

এই গীতিনাট্যে "লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে আদি কবি বাল্মীকিই বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

কালীকিংকর সেনগুপ্ত। রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তী। প্রকাশক শ্রীইন্দুমাধব সেনগুপ্ত, ৪৫।১বি বিডন স্ট্রীট। ৩ আশ্বিন, ১৩৪৮। পৃ ১৬।

[**কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ**] ইহা **কড়িও নহে, কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠেকড়া। রাহু-রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে, শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্তৃক মুদ্রিত। সন ১৩০১। মূল্য এক আনা মাত্র। ষষ্ঠ সংস্করণ।** ১৩২২। **হিতবাদী পুস্তকালয়। মূল্য এক আনা। পৃ ২৪।**

রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণ (১২৯৩) সম্বন্ধে ব্যঙ্গকবিতার সমষ্টি।

কবিতার দৃষ্টান্ত—

"উড়িস্‌নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক্ ঢাকা।
তোর বক্ বকম্ আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা!
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হ'ল
নগদ মূল্য এক টাকা!!! **—রাহু"**
..."চুনোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে।।
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে
রবিঠাকুর লেখে। **—রাহু"**

১৯০২ সালে এই পুস্তিকার **'পঞ্চম** সংস্করণ' প্রকাশিত হয়। **পঞ্চম ও ষষ্ঠ** সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীসুকুমার সেনের নিকট।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত। পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্র সংসদ, পাবনা। মূল্য চারি আনা। পৃ ২২।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবিতা-সংকলন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। আনন্দ-বিদায় (প্যারডি)। বেংগল মেডিকেল লাইব্রেরী। [১৬ নভেম্বর ১৯১২]। মূল্য আট আনা। পৃ ৬৪।

"একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষত যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমংগলকর বিবেচনা

করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপই চাবকাইয়াছিলেন এবং Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byronকে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন। যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু, এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করেন না।"

—গ্রন্থকারের ভূমিকা

নাট্যচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের 'দুর্নীতি'পূর্ণ কবিতা ও তাহার অনুকারীদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ। আনন্দর পুত্র নেপাল রবীন্দ্রশিষ্য—"আমার কবিগুরু রবিবাবু"—"তাঁর নকলে" নেপাল একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন—এই নাট্যপ্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানেরও প্যারডি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের রচনা-নিদর্শন—

তৃতীয় দৃশ্য

নেপাল ও তাঁহার কলিকাতার পুরুষ ও নারী ভক্তগণ।

১

আমি একটা উচ্চ কবি—
এমনি ধারা উচ্চ,
যে মাইকেল রবি হেমচন্দ্র—
আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে
স্বর্গ থেকে টসকে,
জন্মেছি এ বঙ্গদেশে
বিধাতার হাত ফসকে।

ভক্তগণের কোরস্।—
মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ
কুইলের কলম হস্তে—
কে তুমি হে মহাপ্রভু—
নমস্তে নমস্তে!

২

আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য
মানবজাতির জন্যে—
নিজেই বুঝি না তার অর্থ
বুঝবে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং
আজকাল যা সব লিখ্‌ছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে
আমিই অনেক শিখ্‌ছি।
কোরাস্।—মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৩

আমি যতই দেখ্‌ছি ভেবে
আমার কাব্যসূত্র
দেখ্‌ছি যে জন্মেছি আমি
বাণীর বরপুত্র।
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি
কাব্য বস্তা বস্তা—
পাবে গুরুদাসের নিকট—
ওজন দরে সস্তা।
কোরাস্।—মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে
বোঝাতে এক তত্ত্ব;
যদিও না থাকতে পারে
তাহার নূতনত্ব।
যে "ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড
অখণ্ড পদার্থ—"
আমি না বোঝালে তাহা
কয়জন বুঝতে পার্ত্ত?
কোরাস্।—মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম,
অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম—
তোমাদিগের মঙ্গল হোক্—
ভো ভো ভক্ত শিষ্য।
এখন কর গৃহে গমন—
নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে
এখন একটু ভাব্‌ব।
কোরাস্।—মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

[প্রস্থান

১ম ভক্ত। উঃ! এঁর কাব্য দিন দিনই বেশী বোঝা যাচ্ছে না।
২য় ভক্ত। এ কবিত্ব কি প্রত্নতত্ত্ব, কি শ্রাদ্ধের মন্ত্র ঠাওরানো শক্ত।
৩য় ভক্ত। কি ভয়ানক আধ্যাত্মিক!
৪র্থ ভক্ত। বেজায়! প্রায় রবিবাবুর মত!
৫ম ভক্ত। প্রায়! মত!—তুমি ভক্তর দল ছেড়ে যাও! ভক্ত হ'তে পার্বে না। মত?
১ম ভক্ত। শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে উঠলেন?
২য় ভক্ত। এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P.D. হ'য়ে আসবেন।
৩য় ভক্ত। P.D. কি?
২য় ভক্ত। Doctor of Poetry.
৩য় ভক্ত। ইংরেজরা কি বাঙ্গলা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝবে?
৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝার ত দরকার নাই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজিতে অনুবাদ ক'রে নিলেই হোল।
২য় ভক্ত। তারপর রয়টার দিয়ে সেই খবরটা এখানে পাঠালেই আর Andrew-এর একটা certificate যোগাড় কর্লেই P.L.
৩য় ভক্ত। P.L. কি?
২য় ভক্ত। Poet Laureate.
১ম ভক্ত। ইত্যবসরে একখানা মাসিক বের কর, মাসিক বের কর। আমরা ইত্যবসরে এঁকে একদম ঋষি বানিয়ে দেই।
[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

সত্যেন্দ্রনাথ জানা। রবি-তর্পণ। প্রবর্তক। মূল্য দেড় টাকা। শ্রাবণ ১৩৫১। পৃ ৭৭।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে পাঁচটি কবিতা ও তিনটি নাটিকা—'পঁচিশে বৈশাখ', 'বাইশে শ্রাবণ' ও 'স্বপ্নদাদু'।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য। রবীন্দ্র মঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩২৮। পৃ ২১।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্ধনা (১৯ ভাদ্র ১৩২৮) উপলক্ষে "প্রীতিসম্মিলন"-এর কার্যসূচী। কবিতা ও গানগুলি এই প্রোগ্রামে ছাপা আছে।—কার্যসূচী মুদ্রিত হইল—

গান। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত
আশীর্বচন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
মাল্য ও চন্দন দান। **লীলা ও ইলা দেবী**
গান। ঐ
কবিতা—
রবি-প্রশস্তি—যতীন্দ্রমোহন বাগচী
নমস্কার—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
রবীন্দ্র-মঙ্গল—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের প্রতি—মহারাজকুমার যোগীন্দ্রনাথ রায়
গান। যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত কবিতা।
রবীন্দ্রনাথের প্রতি—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী
আবাহন—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
গান। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত
বরণ—কালিদাস রায়
স্বাগত—মানকুমারী বসু
পরিষদের পক্ষ হইতে উপহার প্রদান। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতির অভিভাষণ
রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ
গান। নির্মলচন্দ্র বড়াল-রচিত।

শ্রীসজনীকান্ত দাস। পঁচিশে বৈশাখ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। বৈশাখ ১৩৪৯। **এক টাকা চারি আনা।** পৃ ৬১।

শ্রীচরণেষু, রবীন্দ্রনাথ, গাঙ্গেয়, প্রণাম, যন্ত্র, মানুষ ও কবি, মারণ, আশ্বাস, মর্ত্য হইতে বিদায়, ব্যক্তিগত, বোধন, বোলপুর, 'ক্ষণিকা', পঁচিশে বৈশাখ ও প্রবেশক কবিতা—রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে ও প্রসঙ্গে এই চৌদ্দটি কবিতা আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯। এই সংস্করণে **'মারণ'** বর্জিত ও 'রবিচক্র' ও 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠে' নূতন মুদ্রিত। পৃ ৬৪।

তৃতীয় **সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা।** কার্তিক ১৩৫০। **"বাইশে শ্রাবণ কবিতাটি বর্তমান সংস্করণে নূতন সংযোজন।"**

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। চিত্রভানু। প্রাপ্তিস্থান কবিতাভবন ও শান্তিনিকেতনে লেখকের নিকট। ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯। **চার আনা।** পৃ ১৪।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে তেরোটি কবিতা।

প্রভাত বসু সম্পাদিত। রবীন্দ্রনামা। বুক্‌ম্যান। দেড় টাকা। মাঘ ১৩৫৩। পৃ ৭৭।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রিয়ম্বদা দেবী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

নরেন্দ্র দেব, হেমলতা ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কালিদাস রায়, জীবনময় রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, অমল হোম, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, অমিয় চক্রবর্তী, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রাধারাণী দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, অজয় ভট্টাচার্য, হুমায়ুন কবীর, সুধীরচন্দ্র কর, নিবারণ পণ্ডিত, অশোকবিজয় রাহা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রভাত বসু, সরোজকুমার দত্ত, আহসান হাবীব, অবন্তী সান্যাল, বেণু গুপ্তা ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি উৎসবে শরৎচন্দ্র রচিত মানপত্রও মুদ্রিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন আশ্রম। থ্যাকার স্পিংক। এক টাকা। ১৩৫৭। পৃ ১১৬।

"অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমের সুরুতে আশ্রমধারী ছিলেন।" ১২৯৫ হইতে ১৩০৪ পর্যন্ত তিনি কর্মভার লইয়া ছিলেন। তাঁহার লিখিত ও এই পুস্তকে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' রচনায় তিনি 'আশ্রমের ভার গ্রহণ করার সময় পর্যন্ত লিপিবন্ধ করতে পেরেছেন।' অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই আশ্রমের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। পিতার 'ডায়ারি, চিঠিপত্র ও আমার নিজের স্মৃতি হতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পূর্বকথা এবং প্রসঙ্গক্রমে আশ্রম-বিদ্যালয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' তিনি এই গ্রন্থে 'শান্তিনিকেতনের কথা'য় লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী। ব্রহ্মবিদ্যালয়। প্রকাশক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১৩১৮। পৃ ৫৯।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাস। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ-বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে এই গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ হয়—বিশ্বভারতী, ৭ পৌষ ১৩৫৮, মূল্য এক টাকা বারো আনা, পৃ ৭২। "গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ-প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন আশ্রমের মহর্ষিকৃত ট্রস্টডীড ও রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র,...বর্তমান সংস্করণে নূতন যোগ করা হইয়াছে।"

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী। মূল্য আড়াই টাকা। ১৫ আষাঢ় ১৩৫১। পৃ ১৯০।

"এ বই আর যাই হোক আমার জীবনী নয়, বা শান্তিনিকেতনের ইতিহাস নয়, শান্তিনিকেতনের ভালো-মন্দর আলোচনা নয়, এমন কি তার ধারাবাহিক কাহিনীও নয়। ইহা আমার মনের উপরে শান্তিনিকেতনের ছাপ।...এই বইয়ে লেখকের নিজের কথাই বারংবার বলিতে হইয়াছে, তাই বলিয়া লেখক ইহার নায়ক নহে।...

যদি ইহার নায়ক কেহ থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ; আর তাঁহার সঙ্গে আছে বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ শান্তিনিকেতনের মাঠে অবারিত।...এই দ্বৈতের মহিমা প্রকাশই এ বই রচনার উদ্দেশ্য; লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতির দণ্ডখানি এই দ্বৈতের ঝুলন টাঙাইবার একটা নীরস উপলক্ষ্য মাত্র।...লেখকের ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণে দুইটি অধ্যায় যুক্ত হইয়াছে। তৃতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, মূল্য চার টাকা।

বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই অধ্যায়গুলি আছে—রবীন্দ্রসান্নিধ্য; রবীন্দ্রনাথের অভিনয়; নোবেল প্রাইজ; রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ; শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ; আরও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ; রচনাপাঠ; **রবীন্দ্রনাথের গান।** বহু অধ্যায়েই অল্পবিস্তর **রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ** আছে।

ভারতপরিব্রাজক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মযজ্ঞ-শান্তিনিকেতন। ধর্ম ও কর্ম কার্যালয়। মূল্য ছয় আনা। ১৩২১। পৃ ৪২।

সাধনা কর। শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়। সুপ্রকাশন। মূল্য আট আনা। ১ পৌষ ১৩৬০। পৃ ৩৪।

সূচী ॥ পত্রিকা-পরিচয়; শিক্ষা; সাহিত্য; সংবাদ। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি হইতে শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা চিত্তাকর্ষক, প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য তথ্য এই পুস্তিকায় সংকলিত হইয়াছে।

সুধীরচন্দ্র কর। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ। প্রকাশক, জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস। ১৩৩৬। মূল্য দুই আনা। পৃ ২৭।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট প্রভৃতি হইতে সংকলিত বিবরণ। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ এই পুস্তিকায় প্রথম গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ, **সাতই পৌষে রবীন্দ্রনাথ** নামে। দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখযোগ্য যোজনা, অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত "সাতই পৌষ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ"-এর উপস্থিতি ও ভাষণাদির সূচী। পৃ ৩১। মূল্য চার আনা। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। সাড়ে তিন টাকা। আশ্বিন ১৩৬০। পৃ ২৮৪।

'এই গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের পূর্ব-ইতিহাসের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিপত্র যা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, বহু ঘটনা ও বিবরণ যা বিস্মৃত-প্রায়, তা এতে সংকলিত হয়েছে।'—ভূমিকা

সূচী ॥ শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ; শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ঐতিহ্য; রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোক; শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষ; পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতন; শান্তিনিকেতনে নববর্ষ; শান্তিনিকেতনের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি; শান্তিনিকেতন ও বিশ্বশান্তি; রবীন্দ্রনাথের

শিবমদ্বৈতম্"; বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা; পরিশিষ্ট ঃ রামানন্দ রায় মহাশয়ের পত্র; শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ; নন্দ- মহাশয়ের পত্র।

...রঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ। ...নিকেতন আশ্রমিক সংঘ। পৃ ৮

বিশ্বভারতী বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ। ৮ পৌষ ১৩৬০। শান্তি-নিকেতন প্রসঙ্গে সমাবর্তন উৎসবের অন্যান্য অভিভাষণগুলিও উল্লেখ করা যাইতে পারে—১৩৫৯, রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিভাষণ; ১৯৫৪ (১৩৬১), বিধানচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলি দ্রষ্টব্য—প্রাক্তনী; আশ্রমের রূপ ও বিকাশ; বিশ্বভারতী; শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

এই বিভাগে উল্লিখিত সকল গ্রন্থে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ না থাকিলেও, রবীন্দ্র-পরিবেশের পরিচায়ক বলিয়া এই তালিকায় উল্লিখিত হইল।

বিবৃতি
অভিভাষণ ইত্যাদি

অমল হোম। কেরাণী রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-সভার সভাপতির অভিভাষণ। প্রকাশক শ্রীরাধারমণ রায় চৌধুরী, সম্পাদক, কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী সংঘ। শ্রাবণ ১৩৪৮। পৃ ২৪।

"কেরাণী রবীন্দ্রনাথ মানে আমি এই করেছি যে, রবীন্দ্রনাথ কেরাণীকে কি চোখে দেখেছেন, কি রূপে এঁকেছেন,—তাঁর সৃষ্টিতে কেরাণীর ছবি ফুটেছে কি রকম।"

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। সভাপতির অভিভাষণ। ২৫ বৈশাখ, ১৩৫১, ডায়মণ্ডহারবার। পৃ ৭।

প্রবোধচন্দ্র সেন। হবিগঞ্জ ত্র্যশীতিতম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সমিতির পক্ষে শ্রীরণেন্দ্রমোহন পালিত কর্তৃক প্রকাশিত। হবিগঞ্জ, ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৯। পৃ ১১।

মোহাম্মদ আজিজুল হক। রবীন্দ্র-স্মরণে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। [অগস্ট] ১৯৪১। পৃ ৩৪।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত স্মৃতি-সভায় পঠিত, ১৮ অগস্ট, ১৯৪১।

নরেন্দ্রনাথ লাহা। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের ৮১তম জন্মোৎসবে সভাপতি ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার অভিভাষণ। নিখিল ভারত রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতি। কলিকাতা ১৩৫৬। পৃ ২২।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কেন রবীন্দ্র-নাথকে চাই। For Private Circulation only। রচনাশেষে তারিখ ১৫ মার্চ ১৯২১। পৃ ৫২।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে নির্বাচন করিবার প্রস্তাব উপলক্ষে সমাজের মধ্যে একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।" এই প্রস্তাবে যে-সকল আপত্তি হইয়াছিল, নানা তথ্য ও উদ্ধৃতি সহযোগে এই পুস্তিকায় সেগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। —রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে সংখ্যাধিক্যে সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শরৎকুমার রায় (দীঘাপতিয়া)। রবীন্দ্র-স্মৃতি। প্রকাশ প্রেস। ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট। পৃ ১০।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লিখিত রবীন্দ্র-নাথের একখানি পত্র এই পুস্তিকায় মুদ্রিত আছে।

(বংগীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত একখানি খণ্ডিত কপি হইতে এই বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। পুস্তিকার নাম ইত্যাদি তাহাতে পাওয়া যায় নাই—তাহা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী হইতে গৃহীত)।

শরৎচন্দ্র বসু। পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষড়শীতিতম জন্মদিবসে সভাপতির অভিভাষণ। [নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, কলিকাতা]। ২৫ বৈশাখ, ১৩৫৩। পৃ ৬।

[শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়]। **রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। সভাপতি ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ। [নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি। কলিকাতা,** ১৩৫৭] ২৫ **বৈশাখ** ১৩৫৭। পৃ ৭।

নিখিল বংগ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, দক্ষিণী কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন প্রভৃতি প্রচারিত বিবরণ পুস্তক, প্রতিবেদন প্রভৃতির কোন কোনটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্জী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী। বিশ্বভারতী। মূল্য আট আনা।

সঞ্চয়িতা (পৌষ ১৩৩৮) পর্যন্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কালানুক্রমিক সূচী।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বর্ষপঞ্জী। রবীন্দ্র-জয়ন্তী। ২৫ বৈশাখ, ১৩৩৮। প্রকাশক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পৃ ১৭। **মূল্য চারি আনা।**

"রবীন্দ্রনাথের জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা ও প্রকাশিত সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। ২ পৌষ, ১৩৪৯। সাহিত্য-নিকেতন। মূল্য আট আনা। পৃ ৭১।

১৮৭৮ হইতে ১৯৪২-এর মধ্যে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা পুস্তকের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। "সমস্ত পুস্তক স্বচক্ষে দেখিয়া এবং বেংগল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকার সহিত মিলাইয়া কালানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া এই পঞ্জী আর কেহ করেন নাই।"—ভূমিকা, শ্রীসজনীকান্ত দাস। পরিশিষ্টের সূচী॥ **প্রথম মুদ্রিত কবিতা;** রবীন্দ্রনাথের **স্বাক্ষরযুক্ত** প্রথম রচনা; **রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত** গান; হিন্দু-**মেলায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের** দ্বিতীয় **কবিতা;** ম্যাক্‌বেথের বঙ্গানুবাদ। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১০ মাঘ, ১৩৫০। পৃ ৯২। মূল্য দশ আনা। এই সংস্করণের পরিশিষ্টে ম্যাক্‌-বেথের বঙ্গানুবাদের সহিত, কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদও যুক্ত হইয়াছে, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে সংকলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গান' পরিশিষ্টে প্রদত্ত তথ্য, নূতন পরিশিষ্ট 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচনা'তে সংশোধন করিয়া, এ বিষয়ে নূতন তথ্যও যোগ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে ১৯৪৩ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা সংকলিত হইয়াছে।—প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকখানি বই সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আত্মকথা

জীবন-স্মৃতি। প্রকাশক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিলাইদহ। ১৩১৯। পৃ ১৯৫। **নূতন সংস্করণ। বিশ্বভারতী। সাড়ে তিন টাকা। অগ্রহায়ণ** ১৩৫০। পৃ ২১৪।

এই নূতন সংস্করণে বহু পাদটীকা ও সুদীর্ঘ গ্রন্থপরিচয়ে রবীন্দ্র-জীবনীর বহু উপকরণ যোগ করা হইয়াছে, বহু অপরিজ্ঞাত বা বিচ্ছিন্ন তথ্য দুর্লভ সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ হইতে একত্র সমাহরণ করিয়া রবীন্দ্র-জীবনীর আলোচ্য যুগের চিত্র সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই সংস্করণ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত সংস্করণে (বিশ্বভারতী, পাঁচ টাকা, পৃ ২৯৩) গ্রন্থ-পরিচয় (পৃ ১৯১-২৯১) বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে।

ছেলেবেলা। বিশ্বভারতী। মূল্য দেড় টাকা, দুই টাকা। ভাদ্র ১৩৪৭। পৃ ৮৭।

"ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা...।" "এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে।...এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা। সরোবরের সঙ্গে ঝরণার তফাতের মতো। এ হোলো কাহিনী, এ হোলো কাকলি,

সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে।"...ভূমিকা

আত্মপরিচয়। বিশ্বভারতী। মূল্য দেড় টাকা। ১ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ ১২৭

"এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৩১১) প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্র-লালের যে বিরোধ একসময় বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই একরূপ তাহার সূচনা হয়।...রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে......বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতা টাউন হলে কবিসংবর্ধনা করেন। এই অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে একটি আনন্দসম্মেলন (২০ মাঘ ১৩১৮) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সেখানে পঠিত হয়।......রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের কোনো একটি সমালোচনার উত্তরে এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধটি লিখিত হয়। ......সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের...অনুলিপি এই গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ...। সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্রজয়ন্তী (১১ পোষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই উৎসবে পাঠ করিবার জন্য এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধটি ["প্রতিভাষণ"] লিখিত...।

"আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে" প্রবেশ উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধটি ["জন্মদিনে"] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন। ...১৩১৭ সালে...রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন...তাহা গ্রন্থ-পরিশেষে মুদ্রিত হইল।"

শিশু ও কিশোরপাঠ্য

শ্রীঅনাথ রায়। আমার দেশের মানুষ। ২য় খণ্ড। নিউ বুক হাউস। মূল্য আড়াই টাকা। ভূমিকার তারিখ ১৪-১২-৫৩। পৃ ১৬২।

"কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনী।"

অনিলচন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ। প্রেসি-ডেন্সি লাইব্রেরী। পৃ ২৪। মূল্য তিন আনা। ১৯৪০।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র জীবনকথা। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশরস। ২৫ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ ১৬৬।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা প্রকাশনা। মূল্য দশ আনা। অক্টোবর ১৯৫০। পৃ ৪৯।

"আট থেকে বার তের বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা। ...বইখানিতে পুরো একটি জীবনের মোটামুটি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। ছেলেমেয়েরা কম বুদ্ধির দরুণ বুঝতে পারবে না ভেবে মূল তথ্য-গুলি এড়িয়ে যাইনি।"—লেখকের নিবেদন।

চন্দ্রকান্ত দত্ত। কিশোরদের বিশ্বকবি। পৃ ১৬৮। নালন্দা প্রেস। মূল্য দুই টাকা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। বাংলার সোনার ছেলে। কিং হাফটোন কোং। আট আনা। পৃ ৫২।

প্রথমার্ধে গদ্যে, দ্বিতীয়ার্ধে পদ্যে রবীন্দ্রকথা বর্ণিত হইয়াছে।

দীনেশ মুখোপাধ্যায়। ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ভাদ্র ১৩৪৮। দশ আনা। পৃ ১০৭।

১০৭ পৃষ্ঠায়, শেষ জীবনে রবীন্দ্র-নাথ কর্তৃক মুখে মুখে রচিত দুইটি ছড়া মুদ্রিত আছে।

দেবনারায়ণ গুপ্ত। তোমাদের রবীন্দ্র-নাথ। পৃ ৪২। এইচ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং।

ল্যে আট আনা। 'নিবেদন'-এর তারিখ য়োলয়া ১৩৪৮। 'পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ' মূল্যে এক টাকা।

নির্মলেন্দু ঘোষ। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ। পৃ ৮৯। গ্রন্থবিতান। মূল্যে এক টাকা চার আনা।

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ। দেব সাহিত্য কুটীর। ১৩৪৯। পৃ ৪৮। দাম তিন আনা।

বিমল ঘোষ। শিশু রবি। পৃ ৪২। 'নিবেদন'-এর তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮। মধুচক্র। ছয় আনা।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলে-বেলা' অবলম্বনে কিশোরদের অভিনয়ের জন্য লিখিত নাটিকা।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। কিশোর রবি। দেব সাহিত্য কুটীর। মূল্যে এক টাকা। ভূমিকার তারিখ ২৫।১।৫৪। পৃ ৬৮।

"জীবনচরিত-মূলক নাটক।" "ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য।"

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও ফণীভূষণ সরকার। অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ। মিলন পাঠাগার, বগুড়া। পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২২ শ্রাবণ ১৩৫০। পৃ ১৮।

কিশোরদের দ্বারা অভিনয়ের জন্য লিখিত নাটিকা। একটি বালকের মনের উপর রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে লোকসেবায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে, কাহিনীটি এই।

মনোরম গুহ ঠাকুরতা। আমাদের কবি। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭। বৃন্দাবন ধর বুক হাউস। পৃ ১২০। মূল্যে দেড় টাকা।

যামিনীকান্ত সোম। ছেলেদের রবীন্দ্র-নাথ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। বারো আনা। ১৯২৬। পৃ ১২৭।

সূচী॥ সূচনা, মনের খেলা, বংশ-পরিচয়, লেখাপড়া, বাড়ীর বাহিরে, বাড়ীর শিক্ষা, বিলাতে, মিলনের সুর, গানের রাজা, স্বর্ণমুকুট, বিশ্ববিজয়, পূর্ব এশিয়ায়, শান্তিনিকেতন। পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্ধিত।

যামিনীকান্ত সোম। ছোট্ট রবি। রীডার্স কর্নার। মূল্যে এক টাকা চার আনা। প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, পুন-র্মুদ্রণ মাঘ ১৩৫৭। পৃ ৮৪।

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের শৈশবকাহিনী

সুধীন্দ্রনাথ রাহা। রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশক সুবোধচন্দ্র সুর, ২৫ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ। মূল্যে বারো আনা। ১৩৫৩। পৃ ৫৫।

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাংলার রবি। দেশপ্রিয় গ্রন্থালয়। মূল্যে পাঁচ সিকা। ভূমিকার তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৫২। পৃ ৭৯—রবীন্দ্রকুণ্ডিকা ৵০।

হারিমোহন দে, প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ। এম এল দে অ্যান্ড কোং। মূল্যে আট আনা। পৃ ১৬। লেখকের উল্লেখ নাই।

সতীকুমার নাগ। হাজার বছর পরে আমাদের কবি। পৃ ১৬। অশোক লাই-ব্রেরী। মূল্যে পাঁচ আনা।

শিশুপাঠ্য নাটিকা।

রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন

নিম্নোক্ত পুস্তক পুস্তিকাগুলি রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে লিখিত নহে, প্রধানতঃ রবীন্দ্র-রচনা সংকলন, সেই হিসাবে রবীন্দ্র-নাথের গ্রন্থসূচীরও অন্তর্গত করা যাইতে পারে। তবুও কোনো-কোনো গ্রন্থে সংকলয়িতার মন্তব্য দ্বারা রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-উক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে; সংকলন দ্বারা অধিকাংশক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এই কারণে বর্তমান তালিকাভুক্ত করা হইল। পূর্বে উল্লিখিত, ক্ষিতিমোহন সেনের বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা গ্রন্থও এই তালিকাভুক্ত হইতে পারে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। বৈশাখ। বিশ্বভারতী। [১৩ বৈশাখ ১৩৬২] পৃ ৩১।

আত্মোদ্বোধক রবীন্দ্রবাণী-চয়ন। বৈশাখ মাসের প্রত্যেকদিনে একটি করিয়া রচনাংশ উদ্ধৃত।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কর্তৃক সংকলিত। রবীন্দ্র-বাণী। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। ৭ ভাদ্র ১৩৪৮ রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বিশেষ উপাসনায় বিতরিত। পৃ ৩২।

সংকলনটি এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত —ভারতবর্ষের সাধনা; মানবধর্ম; বিশ্বানি দুরিতাক পরাসুব; ধর্মের নবযুগ। বর্ষোৎসব। যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ। গান। কবিতা।

ভারতচন্দ্র মজুমদার। জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী কার্যালয়। মূল্য এক টাকা। পৌষ ১৩৩৮। পৃ ৯৪।

"রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবধারা তাঁর নিজস্ব ভাষায় পাঠকসমাজে পৌঁছিয়ে দেওয়াই...প্রধান উদ্দেশ্য"; উদ্ধৃতিগুলি লেখকের ভূমিকার দ্বারা পরস্পর গ্রথিত। এই কয়টি ভাগ আছে—দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ; সমাজ ও সভ্যতায় রবীন্দ্রনাথ; শিক্ষাবিস্তারে রবীন্দ্রনাথ; উপসংহার। —গ্রন্থাকারে অপ্রচলিত বহু দুষ্প্রাপ্য রচনা হইতেও উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে।

রাণী চন্দ। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। মূল্য দুই টাকা। ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ১৭৬।

"নিজের খেয়ালখুশিমতো ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা [৭ জুলাই ১৯৩৪—১২ জুলাই ১৯৪১] খাতার পাতায় কখনো কখনো রেখে দিতুম। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত কথা বা প্রশ্নের উত্তর নয়, এর মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু পাবেন এই ভেবেই এ যেমন ছিল তেমনিই সবার সামনে এনে দিলুম।"—ভূমিকা। সাহিত্য, শিল্প, জীবন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তি এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে।

সুনীতি দেবী কর্তৃক সংকলিত। রবীন্দ্র জন্মতিথি। প্রকাশক বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৩৩।১-সি ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ইংরেজি Birthday Book অনুসরণে, বৎসরের প্রত্যেকদিনের তারিখ, তন্নিম্নে কবিতার অংশ (স্বাক্ষরের স্থান সহ) মুদ্রিত হইয়াছে।

বিবিধ

অনিলরঞ্জন বিশ্বাস। বিদায় গোধূলি।

এ এন এম বজলুর রশীদ। ছোটদের রবীন্দ্রনাথ।

গায়ত্রী দেবী। রবীন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সী বুক ডিপো। দশ আনা।

অনিলচন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ। পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। শ্রাবণ ১৩৬০। —এই পুস্তকের ভূমিকায় অনিলচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন—"১৩৩৮ সাল, দেশব্যাপী চলছে রবীন্দ্র-জয়ন্তী।...দুই বন্ধু মিলে লিখলাম এই জীবন-আলেখ্য—আমি আর অনিল দাস। অনিল ঢাকা জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে—সে অমানুষিক নির্যাতনের কথা আজও অনেকের স্মরণ আছে। 'গায়ত্রী দেবী' ছদ্মনামে বইটি বের হয়।"

ধীরেন্দ্রলাল ধর। আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ।

স্বপনবুড়ো। গগনে উদিল রবি।

হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রংপুর।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-আরতি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবিতার সমষ্টি নহে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ রবীন্দ্র পরিষদে গঠিত কোনো কোনো প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিবার সুযোগ হয় নাই। সেগুলি সবই এই তালিকায় উল্লিখিত কবি-পরিচিতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই

২৭ বৈশাখ ১৩৬১ হইতে ১ বৈশাখ ১৩৬২

[গত এক বৎসরে বাঙলা ভাষায় উল্লেখ-যোগ্য যে সমস্ত সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, এখানে তাহার একটি সুনির্বাচিত তালিকা দেওয়া হইল। প্রতি বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সংখ্যক নূতন বই প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে অনুমোদনযোগ্য গ্রন্থগুলিকে নির্বাচন করা যথেষ্ট দুরূহ কার্য, সে-কারণে কোন কোন গ্রন্থের নাম অনবধানবশত বাদ পড়িয়া থাকিতে পারে। তজ্জন্য আমরা ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইতেছি।

বাঙলা দেশে সাহিত্য-পাঠকের অভাব নাই, প্রকাশিত গ্রন্থও সংখ্যায় অনেক। সুতরাং বৈশিষ্ট্য, গুণ ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাহার ভিতর হইতে উল্লেখযোগ্য পুস্তকসমূহের একটি তালিকার সহিত পাঠকদিগের পরিচয় সাধনের প্রয়োজন আছে। প্রতি বৎসরই এই বিশেষ সংখ্যাটিতে এক বৎসরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হইবে। আশা করা যায়, সুধী পাঠক এবং সাধারণ পাঠাগার উভয়েরই গ্রন্থ নির্বাচনে এই তালিকাটি বিশেষ সহায়ক হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থসমূহেরও একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস আমরা পাইয়াছি। তালিকাটি পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। —সম্পাদক দেশ]

কবিতা

অনুপূর্বা	...	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	মিত্র ও ঘোষ
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা	...	প্রমোদ মুখোপাধ্যায়	...	নতুন সাহিত্য ভবন
কলরোল	...	অনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	সোয়ান বুক্‌স

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	নাভানা
তিমিরাভিসার	হরপ্রসাদ মিত্র	এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লি
দক্ষিণ নায়ক	অরবিন্দ গুহ	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
নীল নির্জন	নীরেন্দ্র চক্রবর্তী	সিগনেট
প্রতিধ্বনি	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	”
মুস্কিল আসান	দিলীপ রায়	জিজ্ঞাসা
শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর	বুদ্ধদেব বসু	নাভানা
সমর সেনের কবিতা	...	সিগনেট

উপন্যাস

অকূল কন্যা	প্রভাত দেবসরকার	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
অচিন রাগিণী	সতীনাথ ভাদুড়ী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অবিশ্বাস্য	সৈয়দ মুজতবা আলী	”
আচমকা	জ্যোতির্ময় রায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
এক বিহঙ্গী	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কৃশানু	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	”
গৌড়মল্লার	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স লিঃ
চাঁপাডাঙার বউ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ত্রিপদী	বিমল কর	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
দূরের মিছিল	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
নতুন দিন	প্রফুল্ল রায়	ঈস্ট লাইট
নব দিগন্ত	অ-কু-রা	ডাক প্রকাশনী
নির্জন পৃথিবী	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ
নীল ভুঁইয়া	অমিয়ভূষণ মজুমদার	নাভানা
নীলমণির স্বর্গ	প্রমথনাথ বিশী	ডি, এম, লাইব্রেরি
পদসঞ্চার	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স লিঃ
প্রথম প্রহর	রমাপদ চৌধুরী	ডি এম লাইব্রেরি
বিবাহিতা স্ত্রী	প্রতিভা বসু	নাভানা
মোমের পুতুল	সন্তোষকুমার ঘোষ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মৃত্তিকার রং	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	ডি এম লাইব্রেরি
লক্ষ্মীর আগমন	বনফুল	”
সুবর্ণা	সুশীল রায়	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
শঙ্খবিষ	দীপক চৌধুরী	এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ
হরফ	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্য জগৎ

গল্পগ্রন্থ

অপরিচিতা	সতীনাথ ভাদুড়ী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
আবছায়া	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	মিত্র ও ঘোষ
কামিনী কাঞ্চন	অন্নদাশঙ্কর রায়	এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ
চার ইয়ার	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	উত্তরায়ণ লিঃ
ধূপকাঠি	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	সত্যব্রত লাইব্রেরি
নতুন নায়িকা	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
নব মঞ্জরী	বনফুল	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স লিঃ
বাস্তব ও অবাস্তব	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স
বিচিত্ররূপিণী	শিবরাম চক্রবর্তী	নিউ এজ
ভারত প্রেমকথা	সুবোধ ঘোষ	শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
মনে মনে	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	ক্যালকাটা বুক ক্লাব

রাণী সাহেবা	বিমল মিত্র	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প	গোপালচন্দ্র রায়	সিগনেট
সংকরী	রঞ্জন	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
স্ব-নির্বাচিত গল্প	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	,,
স্ব-নির্বাচিত গল্প	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
স্ব-নির্বাচিত গল্প	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	,,
স্ব-নির্বাচিত গল্প	প্রতিভা বসু	,,
স্ব-নির্বাচিত গল্প	প্রেমেন্দ্র মিত্র	,,

ছোটদের সাহিত্য

অভিশপ্ত	রবীন্দ্রলাল রায়	অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
আবিষ্কারের অভিযান	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
একে তিন তিনে এক	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
কাকাবাবুর কাণ্ড	শিবরাম চক্রবর্তী	কলিকাতা পুস্তকালয়
গাছপালার কথা	তপতী রায়চৌধুরী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
চিত্রবিচিত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ছুটির দিনে মেঘের গল্প	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	শিশু সাহিত্য সংসদ
ঝিলম নদীর তীর	যাযাবর	নিউ এজ
পেনাঙের পাহাড়ে	দক্ষিণারঞ্জন বসু	বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
পোনুর চিঠি	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
বাজ ধরবার ফাঁদ	দেবীদাস মজুমদার	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বিচিত্র কাহিনী	তুষারকান্তি ঘোষ	এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

হাসি	...	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	বিশ্বভারতী
রঙিন হাসি	...	সুনির্মল বসু	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
রোগজয়ের কাহিনী	...	অভিজিৎ	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
হেমেন্দ্রকুমারের গল্প-সঞ্চয়ন	...	...		অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

রম্যরচনা

অন্য জন্ম	...	ইন্দ্র মিত্র	...	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
অবিস্মরণীয় মুহূর্তে	...	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে	...	কালকূট	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
চা-বাগানের কাহিনী	...	চা-কর	...	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
নাটক নয় নভেল নয়	...	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	নবভারত পাবলিশার্স
বৃষ্টি এল	...	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	নিউ এজ
মাঝারি	...	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
মুখর লণ্ডন	...	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
সাত-সাততে	...	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	...	উত্তরায়ণ লিঃ

নাটক

উল্কা	...	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	...	বিমলারঞ্জন প্রকাশনী
নতুন ফৌজ	...	বরেন বসু	...	সাধারণ পাবলিশার্স
সাতটা থেকে দশটা	...	শম্ভুনাথ ভদ্র	...	সোয়ান বুকস

অনুবাদ

অঙ্কুর (এমিল জোলা)	...	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	...	সাহিত্য জগৎ
অনাবাদী জমি (ইভান তুর্গেনিভ)		আবুল কালাম শামসুদ্দীন	...	ভারতী লাইব্রেরি
অন্তরতম (আঁদ্রে জিদ)	...	অশোক গুহ	...	আনন্দ পাবলিশার্স
অন্তরালে (এমিল জোলা)	...	মৃত্যুঞ্জয় রায়	...	হাউস অব বুকস
আমার ছেলেবেলা (ম্যাকসিম গর্কি)		অমল দাশগুপ্ত	...	কারেন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স
গল্পসংগ্রহ (ম্যাকসিম গর্কি)	...	...		র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
ঝড়ো পাতা (লিনউটাং)	...	নির্মল মুখোপাধ্যায়	...	সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোং
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স (ডুমা)	...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	দেব সাহিত্য কুটির
দুই নগরের গল্প (চার্লস ডিকেন্স)		শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	...	সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোং
দুই বোন (রমাঁ রলাঁ)	...	...		র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
নরকে এক ঋতু (র‍্যাঁবো)	...	লোকনাথ ভট্টাচার্য	...	নাভানা
নানা লেখা (ম্যাকসিম গর্কি)	...	সরোজ দত্ত	...	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
নোংরা হাত (জাঁ পল সার্ত্র)	...	শিবনারায়ণ রায়	...	নিউ গাইড
পাতালপুরীর ছোট্ট মেয়ে (হ্যান্স অ্যান্ডারসেন)	...	অমিয়কুমার চক্রবর্তী	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
ভোলগা থেকে গঙ্গা (রাহুল সাংকৃত্যায়ণ)	...	অসিত সেন ও সুধীর দাস	...	মিত্রালয়
মাদাম আঁরিয়েৎ (গী দ্য মপাসাঁ)	...	প্রফুল্লকুমার বসু	...	বুক এম্পোরিয়ম
রাজসূয় (স্টিফান জাইগ)	...	শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়	...	টি কে ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং
শিক্ষা প্রসঙ্গ (বার্ট্রান্ড রাসেল)	...	নারায়ণ চন্দ	...	কলিকাতা পুস্তকালয়
সান্তা লুসিয়া (জন গলসওয়ার্দি)		নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	...	নবভারতী

গল্প-সংকলন

অষ্টাদশী	শ্রীসাগরময় ঘোষ সম্পাদিত	টি কে ব্যানার্জ্জি অ্যান্ড কোং

চরিত্র-চিত্র

কথায় কথায়	রূপদর্শী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কন্যাপক্ষ	বিমল মিত্র	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
স্মৃতিরঙ্গ	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	নাভানা

স্মৃতিকথা

আত্মস্মৃতি	সজনীকান্ত দাস	ডি এম লাইব্রেরি
চলমান জীবন (২য় পর্ব)	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
যখন পুলিস ছিলাম	ধীরাজ ভট্টাচার্য	নিউ এজ
যারা হারিয়ে গেল	মনোরঞ্জন গুপ্ত	ডি এম লাইব্রেরি
রক্তের অক্ষরে	কমলা দাশগুপ্ত	নাভানা
হাসির অন্তরালে	নলিনীকান্ত সরকার	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

ভ্রমণ-কাহিনী

অবিস্মরণীয় চীন	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

দেশ

ইউরোপের অগ্নিকোণে ...	বিমল ঘোষ ...	মিত্র ও ঘোষ
দেশে দেশে চলি উড়ে ...	দিলীপকুমার রায় ...	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
দেশে দেশে মোর ঘর আছে ...	স্বপনবুড়ো ...	সোয়ান বুক্‌স

শিকার-কাহিনী

মায়ামৃগ ...	হীরালাল দাশগুপ্ত ...	ডি এম লাইব্রেরি

সাহিত্যালোচনা

আধুনিক বাংলা কাব্য (প্রথম পর্ব)	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় ...	...
আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ...	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	দীপায়ন
কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা ...	ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী ...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স লিঃ
প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য	ডঃ সতী ঘোষ ...	জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
প্রমথ চৌধুরী ...	জীবেন্দ্র সিংহরায় ...	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
বাংলার লোকসাহিত্য ...	আশুতোষ ভট্টাচার্য ...	ক্যালকাটা বুক হাউস
বাংলা সাহিত্যে নজরুল ...	আজহারউদ্দীন খান ...	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক ...	রমেন চৌধুরী ...	বি সেন অ্যান্ড কোং
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ...	গোপাল হালদার ...	এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ
মহাভারতে বিদুর ও গান্ধারী ...	ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ...	,,
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ...	প্রমথনাথ বিশী ...	মিত্র ও ঘোষ
শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ...	গোপালচন্দ্র রায় সংকলিত ...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স লিঃ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ	হরপ্রসাদ মিত্র ...	ইস্ট এন্ড কোং

ইতিহাস

অশোকলিপি ...	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন ...	ইন্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ...	যোগেশচন্দ্র বাগল ...	বিশ্বভারতী
বিপ্লবী বাংলা ...	তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী ...	মিত্রালয়
ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি (২য় খণ্ড)	ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ...	বর্মণ পাবলিশিং হাউস

জীবনালেখ্য

কবির কথা ...	শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	কাহিনী
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৩য় খণ্ড)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ...	সিগনেট
পরিব্রাতা বিজয়কৃষ্ণ ...	ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ...	দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
মুক্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ...	শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ ...	প্রাচ্যভারতী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান ...	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ...	....
শ্রীশ্রীচরিতমাধুরী ...	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী ...	....
সবার মা সারদা ...	শ্রীঅতুলানন্দ রায় ...	নবগ্রন্থ নিকেতন
সারদা-রামকৃষ্ণ ...	শ্রীদুর্গাপুরী দেবী ...	শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

সংগীত ও স্বরলিপি

রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণীসংগম ...	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ...	বিশ্বভারতী
রাগপরিচয় ...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ...	বসুচক্র
সংগীত অনুসন্ধিৎসা ...	শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ...	....
সন্ত কবীর ...	শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদার ...	সংগীত প্রচারণী
স্বরবিতান (৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০তম খণ্ড) ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	বিশ্বভারতী

বিবিধ প্রবন্ধ

অপরাধ বিজ্ঞান (৭ম ও ৮ম খণ্ড)	পঞ্চানন ঘোষাল ...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স
উড়ন্ত চাকীর রহস্য ...	অভিজিৎ ...	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
কয়লা ...	গৌরগোপাল সরকার ...	বিশ্বভারতী
গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বইয়ের যত্ন	রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ...	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
চীনা শিল্পের কথা ...	প্রভাতকুমার দত্ত ...	"
ডার্কটিকিট ...	অমরেন্দ্রকুমার সেন ...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
নিরীক্ষা ...	ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ...	মিত্র ও ঘোষ
পেট্রোলিয়াম ...	মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ...	বিশ্বভারতী
পোর্সিলেন ...	হীরেন্দ্রনাথ বসু ...	"
পৌরাণিক উপাখ্যান ...	যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি ...	এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
বাংলা দেশের নদ নদী ও পরিকল্পনা	কপিল ভট্টাচার্য ...	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী লিঃ
বাংলার সাধনা ...	ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ...	বিশ্বভারতী
ভারত-আত্মার বাণী ...	শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ ...	প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
মানুষের রহস্য	নারায়ণ চন্দ ...	কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ
শিল্পায়ন ...	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	সিগনেট
সহজ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ...	কুমুদরঞ্জন সিংহ ...	কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ
সৌন্দর্যদর্শন ...	প্রবাসজীবন চৌধুরী ...	বিশ্বভারতী

অভিধান

বিজ্ঞান-ভারতী (বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান) ...	দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ...	এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

গ্রন্থাবলী

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)		বসুমতী সাহিত্য মন্দির
বঙ্কিম-রচনাবলী (২য় খণ্ড)		সাহিত্য সংসদ
শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)		এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী		বসুমতী সাহিত্য মন্দির
হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী		বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

ধর্মগ্রন্থ

দীঘনিকায় (৩য় খণ্ড)	ভিক্ষু শীলভদ্র	মহাবোধি সোসাইটি
প্রজ্ঞার আলো	ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার	প্রবর্তক পাবলিশার্স

পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য বই ॥ ১৩৬১—'৬২

উপন্যাস

কাশবনের কন্যা	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা

গল্প

একটুকরো মেঘ	শহীদ সাবের	ওয়ার্সী বুক সেণ্টার, ঢাকা
ভাঙা বন্দর	মবিন উদ্দীন	মালিক লাইব্রেরী, ঢাকা
তাস	সৈয়দ সামসুল হক	এসমান পাবলিশার্স, ঢাকা।

কবিতা

সঞ্চরন	আজিজুল হাকিম	ইস্টার্ন বুক সেণ্টার, ঢাকা
বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর	আজিজুল হাকিম	"
কাব্য বীথি	সম্পাদনাঃ আবদুল কাদির	'মাহেনও', ঢাকা

অনুবাদ

মা (পার্ল বাক)	আবদুল হাফিজ	মালিক লাইব্রেরী, ঢাকা

গবেষণামূলক

জমিদার দর্পণ	(মীর মশাররফ হোসেন) সম্পাদনা আশরাফ সিদ্দিকী	ওয়ার্সী বুক সেণ্টার, ঢাকা

শিশুসাহিত্য

ছোটদের আলীবাবা	রাশিদা বারী	....
এতিমখানা	শওকত ওসমান	ওয়ার্সী বুক সেণ্টার, ঢাকা
খাইবারের ভয়ংকর	কাজী আফসার উদ্দীন	"
দস্যু তারিক	কুয়াসা	কুয়াসা প্রকাশনী, ঢাকা

বিজ্ঞান সাহিত্য

উড়তে শেখালো যারা	আবু হেনা	মালিক লাইব্রেরী, ঢাকা

ভ্রমণ কাহিনী

ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র	ইব্রাহিম খাঁ	কমরেড পাবলিশার্স, ঢাকা

রবীন্দ্র সংগীতের বৈশিষ্ট্য

শান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ১৫।১৬ বৎসর বয়স থেকে গান রচনা শুরু করেন আর তা শেষ হয় তাঁর মৃত্যুর দু-এক মাস আগে। অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বৎসর ধরে তিনি একটানা যত গান রচনা করে গেছেন সংখ্যায় তা হবে দু' হাজারের কিছু বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কেবল গীতকার-রূপেই আমাদের কাছে পরিচিত নন। বিচিত্র ধারায় তাঁর জীবন প্রকাশিত। গান হল তাঁর সেই প্রকাশের একটি দিক মাত্র। তিনি যেমন গীতকার, তেমনি তিনি কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা, শিক্ষক, অধ্যাত্ম সাধনার সাধক, দেশ-প্রেমিক বা মানবপ্রেমিক কর্মী ও চিত্রকর। প্রত্যেক দিকেই তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করে গেছেন যে, বহু যুগ পর্যন্ত এর প্রভাব বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে বিরাজ করবে। তাঁর এই জীবনটি ছিল পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের জীবন। আজ তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবনের একটি দিক, অর্থাৎ তাঁর গানের জীবনকে, সকলের সামনে ধরবার চেষ্টা করবো। একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, ভারতের ইতিহাসে আর একজনও গীতকারের সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি রবীন্দ্রনাথের মত একাধারে এত-দিক থেকে নিজের জীবনকে সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ করে যেতে পেরেছেন।

আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দী গানে রবীন্দ্রনাথের গানের স্থান কোথায়। এই বিষয়টি নির্বাচন করবার কারণ হল রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগী একদল বলছেন যে, এ সংগীত হিন্দি উচ্চাঙ্গ গানের আসরে সমান স্থান পাবার যোগ্য, অথচ সেই সম্মান একে দেওয়া হয় না। আবার আর একদল বলছেন, সেই সম্মানের আসন পেতে হলে এ গানকে উচ্চাঙ্গের হিন্দি গানের গীতরীতিতে সাজিয়ে নিতে হবে, কারণ তার সাদাসিধে সহজ গীতরীতি উচ্চাঙ্গ সংগীতে সমান আসন পাবার প্রতিবন্ধক।

আমাদের এই বিরাট দেশের যাবতীয় সংগীতকে মূল দুটি ভাগে ভাগ করে-ছিলেন প্রাচীনেরা। তার একটিকে তাঁরা বলেছিলেন, মার্গ অপরটিকে বলেছিলেন "দেশী"। মার্গ সংগীত বলতে তাঁরা বুঝতেন যে, যে-সুরগ্রাম, জাতি, মূর্ছনা ও শ্রুতি সাহায্যে গঠিত রাগ অবলম্বনে গীত হতো বা ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সংগীতকে লোক-সংগীত থেকে পরিশুদ্ধ বা সুসংস্কৃত করেছিলেন ও নাট্যশাস্ত্রকার ভরত পরে লোকসমাজে প্রযুক্ত অর্থাৎ সুশৃংখল করে প্রচার করেছিলেন। মার্গ সংগীত ছিল সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণাপূর্ণ পদ্ধতির সংগীত।

আর শ্রুতিমধুর ও লোকের মনোরঞ্জক, দেশ বা স্থানভেদে যা ভিন্ন হতো, নিয়মের তথা বিধিনিষেধের কোন বালাই থাকত না যাতে, অথবা অনুরাগের সঙ্গে স্বেচ্ছায় স্ত্রীলোক, বালক, রাখাল ও রাজা সকলে যে গান নিজ নিজ দেশে গাইতেন, তাকেই বলা হতো "দেশী" সংগীত।

এই দুই ধারা কোন দিনই পরস্পর বিরোধী বা বিচ্ছিন্ন ছিল না। এক ছিল আর একটির পরিপূরক। যে কো দেশী সংগীতের ভাল সুর মার্গ সংগীত পন্থীদের যখনি কানে এসেছে তখনি তাঁ তাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে তার মূল স্ব গঠন প্রণালীটিকে বের করেছেন আর সে সঙ্গে স্থির করে দিতেন তার আরোহ অবরোহী স্বর, বাদী সম্বাদী বিবাদ বা বর্জিত স্বর এবং পকড় বলতে : বোঝায়, সেই সব স্বরগুলিকে এইভা দেশী সুরের মূল গঠন-পদ্ধতিটিকে জে নিয়মে বেঁধে, পরে রাগ বা রাগিণ হিসেবে তার নামকরণ করেছেন। প আলাপের পদ্ধতিতে সেই সুরের রূপটি বজায় রেখে বিস্তারিত করে গাইে তাঁদের আর কোন বাধা থাকত না। না প্রকার ছন্দে, তানে, বিস্তারে, সেই সুরে বিচিত্র সাজে সাজিয়ে গাইলেও তার মূ রূপটি ঠিক থাকত।

আবার এও দেখা গেছে যে, দিশ সংগীতের কাছে পাওয়া রূপান্তরিত সে একই রাগিণী পুনরায় দেশী পদ্ধতি গান রচনায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের অন প্রাণিত করেছে। তখন তাঁরা আলাপ, তা সুরবিস্তার ইত্যাদির নিয়মাধীন অলংকা বাদ দিয়ে ঐ রাগিণী বা সুরকে পূর্বে

ায় কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন। অর্থাৎ কই সুর যখন যেভাবে রূপ নিচ্ছে, খনই তাকে সংগীতে "মার্গ" বা "দেশী"-র লে ফেলা হচ্ছে।

শ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ইরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ রেছেন তাঁর "হিন্দুস্থানী সংগীতে নসেনের স্থান" নামক গ্রন্থে। ঊনবিংশ তকের প্রথমার্ধে তানসেন বংশধর সংগীতগুণী প্যার খাঁ কি করে তিলক-মোদ রাগিণীটির সৃষ্টি করেন, সেই টনাটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

"একদিন প্যার খাঁ গ্রাম্যপথে বিচরণ রছিলেন—কোনও কুটিরে একটি গ্রাম্য-স্ত্রীলোক গ্রাম্য সুরে একটি ছড়া গাইতে াইতে যাঁতাতে গম পিষছিলেন। সেই রটি প্যার খাঁ সাহেবের কানে বড় ভাল লেগে গেল। তিনি দেখলেন যে, সেই সহজ মেঠো সুরে বড় বড় রাগিণীর এক অযত্নসুলভ মিশ্রণ রয়েছে—তাই অবলম্বন ক'রে তিনি তিলককামোদ রাগিণী তৈরী করলেন। দেশ, বেহাগ, ও কামোদ মিশ্রিত ক'রে তিলক-কামোদের সৃষ্টি হল। তিলককামোদ সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে রইলো। এই রাগিণীতে প্যার খাঁ উৎকৃষ্ট আলাপের পথ খুলে দিলেন ও উৎকৃষ্ট সব ধ্রুপদ এই রাগিণীতে রচনা ক'রে জগতে নিজ সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দিলেন।"

প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত মালব, গুর্জরী, রামকিরি বা রামগিরী, কর্ণাটি, গান্ধার, গোড়ী, বৃন্দাবনী, সিন্ধুরো বা সিন্ধু, ভূপালী, গোণ্ডকরী, পাহাড়ী, মহারঠা, বঙ্গাল, কোড়াদেশ, প্রভৃতি সব প্রাচীন রাগ-রাগিণীগুলিকে দেশজ নানা সুর থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল তার পরিচয় তার ঐ নামেতেই প্রকাশ পাচ্ছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, আজ যাকে আমরা উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান বলি, যেমন ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি গান এক এককালে ছিল উত্তর ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের "দেশী" গান। কিন্তু যেদিন থেকে ওস্তাদরা তাদের মার্গ সংগীতের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন সেদিন থেকেই তাদের দেশীত্ব ঘুচে গেল। আর যেসব গানকে ওস্তাদেরা আজও মার্গ আদর্শে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়ে নিতে পারেন নি, তারা গজল, কাওয়ালী, ভজন, গীত, ধুন, পদ, দোঁহা, চৈতী, কাজরী ইত্যাদি নানা নামে দেশী সংগীতের দলেই রয়ে গেল। তবে তারা যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের দলে স্থান পাবার জন্যে চেষ্টা না করছে তা নয়। ওস্তাদদের মুখে ঐ গানগুলি শুনলে চেষ্টার কথা অনুভব করা যায়। এবং এই চেষ্টা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন থেকে।

মার্গ সংগীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হিন্দী গানে দেখি, সুর বা রাগিণী, তাল বা ছন্দের অলংকৃত বিস্তারেরই প্রাধান্য। কথার ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে এই গানে সুর বা রাগিণী বসানো হলেও সেই সুরকেই নানারূপে অলংকারে প্রকাশ করাই হল এর ধর্ম। তার কারণ হল কথাহীন সুরের সাধনার অতি প্রাচীন একধারা ভারতে চলে আসছে মার্গ সংগীতের মাধ্যমে। কথাহীন কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের আলাপ হল তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই সংগীত গভীর সাধনাসাপেক্ষ বলেই যারা কথাহীন রাগ-রাগিণীর আলাপে পটু, তাদের আমরা ভারতীয় সংগীতের সবচেয়ে বড় শিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধা করি। মতঙ্গ মুনি তাঁর সংগীতগ্রন্থে বলেছেন—উত্তম, মধ্যম ও অধম নামে তিন শ্রেণীতে দেশ থেকে উৎপন্ন রাগগুলিকে ভাগ করা যায়। কিন্তু তার মাধ্যমে যে রাগ নিয়ে আলাপ করা যায়, সেই হল উত্তম শ্রেণীর। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে, আলাপের স্থান সেই যুগে খুব উঁচুতেই ছিল।

উচ্চাঙ্গের উত্তর ভারতের হিন্দি গান ও দক্ষিণ ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্ণাটি সংগীত হল প্রকৃতপক্ষে ঐ কথাহীন সুরের সাধনাপুষ্ট মার্গ সংগীত ও দেশী সংগীতের সমন্বয়ে রচিত একটি বিশেষ ধারার সংগীত।
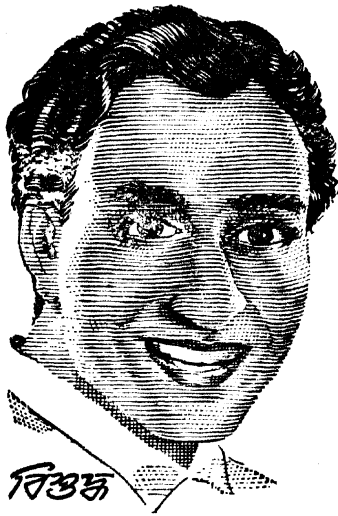
দেশী সংগীত হল কথাপ্রধান। রাগিণী ও ছন্দ তার সঙ্গে সমান স্থান গ্রহণ করে কথার রসকে আরো প্রাণবান করে তোলে মাত্র। সাধারণ ভাষায় বা কবিতার ছন্দে মানুষ তার হৃদয়াবেগ প্রকাশ করে। অনেক সময় দেখা যায়, সেই ভাবে প্রকাশ করেও তাদের মন তৃপ্ত হয় না। তখন তাঁরা খোঁজে সুরের বা রাগ-রাগিণীর সাহায্য। দেশী সংগীতের এই-খানেই হল বৈশিষ্ট্য। তাই এ গানে সুরের বিচিত্র বিস্তার অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ হিন্দি গানের মতো সুরবিহারের প্রয়োজন এতে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের গান হল "দেশী" সংগীত পদ্ধতির গান এবং সেই একই আদর্শে রচিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কথায় বাঁধা নানা প্রকার হৃদয়াবেগকে রাগিণী বা সুরে বেঁধে দিলেন তাকে আরো মর্ম-স্পর্শী করে তোলবার জন্যে। তাই এতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মত সুরবিহারের স্থান হল না। দেশী আদর্শে রচিত বলেই আজ তা বাংলাদেশে জনসাধারণের গানে পরিণত হতে চলেছে।

পূর্বেই বলেছি যে, দেশী ও মার্গ সংগীতের আদর্শ ভিন্ন হলেও এর একটি অপরটির পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথের গান দেশী সংগীতের আদর্শ গ্রহণ করেও কি-ভাবে নিজেকে উচ্চাঙ্গ হিন্দি গান থেকে পরিপুষ্ট করেছেন তাই দেখা যাক।

সুর যোজনায় ও ছন্দের বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ-রাগিণী ও ছন্দ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন। হিন্দি উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিশুদ্ধ-মিশ্র, প্রচলিত অপ্রচলিত প্রায় একশো'র উপর রাগ-রাগিণীর সাহায্যে যেমন তিনি গান রচনা করেছেন, তেমনি নানা তালের ছন্দও তিনি পেয়েছিলেন সেখান থেকে। কিন্তু তার সব ক'টিরই গীতপদ্ধতি হল "দেশী" গানের মত। যেমন তাঁর হিন্দীভাঙ্গা বাংলা গানগুলি। মূলে গানের রাগিণী, সুরগঠন, প্রণালী, তালের ছন্দে তা এক হলেও গাইবার বেলায় সাদাসিধেভাবে গাইতে হয়, কারণ হিন্দি গানের মত করে গাইতে গেলে তার রসের বিকৃতি ঘটবেই। তিনি অন্য প্রদেশ ও ইউরোপ থেকে সাহায্য নিয়ে তাঁর গানের ভাণ্ডার পূরণের চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু সেখানেও দেখি, তাদের

সাজানো হয়েছে বাংলার নিজস্ব দেশী পদ্ধতিতে। তালের বেলায়ও ঘটেছে এই এক অবস্থা। মূলে ঠেকা বা ছন্দের সঙ্গে গানটি মিলল বটে, কিন্তু হিন্দি গানের মত তালের জটিল অলংকারের সঙ্গে মিলিয়ে কথা বা সুর যোজনা করা হল না। বিভিন্ন তালের মূল ছন্দের রসটিকে গানের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে গেয়ে যেতে পারলেই এ গান সফল।

নিরবচ্ছিন্ন সুরের সাধনায় সমৃদ্ধ আলাপ সংগীত বা উচ্চাঙ্গ হিন্দি গানের স্থান ভারতীয় সংগীতে খুব উচ্চ হলেও কথা ও সুরে মিশে এক হয়ে সহজ সরল-ভাবে ফুটে উঠল যে সব দেশী গান, তারও সার্থকতা আর একদিক থেকে কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের গান থেকে উচ্চশ্রেণীর সংগীত গুণীরা কিভাবে উপকৃত হতে পারেন এবং বাংলা দেশের সংগীত-জগতকে এই গান কিভাবে সমৃদ্ধ করলো তা নিয়ে সংক্ষেপে এইবার একটু আলোচনা করতে চাই।

যেভাবে আগের দিনের সংগীত গুণীরা নানারূপ দেশী সংগীতের সুর থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান থেকেও সেই রকমের অনেক নতুন রাগিণী তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেন। এই সুরগুলি উচ্চাঙ্গ সংগীতের নানা রাগরাগিণীর মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। আবার কতগুলি হয়েছে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে বাংলার দেশী সুরের মিশ্রণে। কতগুলি রচিত হল কেবলমাত্র বাউল ও কীর্তন নামে এক ধরনের দেশী সুরের মিশ্রণে। এই সুরগুলিকে নিয়ে ওস্তাদেরা যদি আগের দিনের গুণীদের মত বিচার করে এর মূল গঠন পদ্ধতিটিকে আবিষ্কার করতে পারতেন তা হলে উচ্চাঙ্গের রাগ-সংগীতের ভাণ্ডার যে আরো নতুন রাগ-রাগিণীতে ভরে উঠতো, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এবং ঐ রাগিণীগুলি মতঙ্গমুনির আদর্শে উত্তম শ্রেণীর রাগিণীর দলেও স্থান পেত। কারণ প্রত্যেকটিকে নিয়ে আলাপের ঢংএ গাইবারও সুবিধা এতে যথেষ্ট আছে।

তালের দিক থেকেও তিনি কয়েকটি

নতুন দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছেন—এখন উচ্চাঙ্গ সংগীতের গুণীরা তাকে ছন্দের অলংকারে সাজিয়ে কি করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের দলে তুলে নিতে পারেন সে কথাই তাঁদের ভাবতে বলি।

রবীন্দ্রনাথের গান ভাল করে চর্চা করার দ্বারা বাংলার সাধারণ সংগীত-পিপাসুমন কিভাবে উপকৃত হয় এবার তাই দেখা যাক্।

এটা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, রবীন্দ্রনাথের গান ভাল করে চর্চা করার দ্বারা ধীরে ধীরে মনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি অনুরাগ বেড়ে যায়। ঠিক তেমনি মন আকৃষ্ট হয় গ্রামে প্রচলিত দেশী সংগীতের প্রতি। উচ্চাঙ্গ রাগ-সংগীত সাধনা সাপেক্ষ বলে সংগীত-পিপাসুমন সাধারণের পক্ষে তার রস গ্রহণ করা কঠিন হয়। কিন্তু সেই অসুবিধা দূর করার জন্য দেশী আদর্শে গান রচিত হয়ে এসেছে বাংলা দেশে। হিন্দি উচ্চাঙ্গ রাগ-সংগীতের সাহায্যে চিরকাল। রবীন্দ্রনাথের গানও সেদিক থেকে সাধারণকে সেই রকমেই সাহায্য করছে। এই খানেই রবীন্দ্রনাথের দেশী আদর্শে রচিত নানা সুরের ও ঢং-এর গানগুলির বড় সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের গানের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তার বিষয় বৈচিত্র্য। বাংলা দেশে গান রচনা করে গত দুশো বছরের মধ্যে গীতিকাররূপে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের রচনাকে আলাদা করে বিচার করলে দেখা যাবে যে, স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের গানে বিষয়ের বৈচিত্র্য খুব কম। তাঁরা প্রায় সকলেই দু-একটি বিষয় নিয়ে গান রচনা করে গেছেন। তাও যে সব সময় সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা বলা চলে না। লৌকিক প্রেমের গান রচনায় যিনি বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর হয়তো ভগবদ্ভক্তি বা পুজার গান তেমন জমেনি। ভক্তি বা পূজার গানের ভাল রচয়িতার হাতে লৌকিক প্রেমের গান সার্থক হল না। বিষয়ের দিক থেকে তাঁদের প্রায় সকলেরই রচনা এইভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। তাঁর গান কেবল দু-একটি বিষয়েই শেষ হয়নি। ভাবের দিক থেকে তা বহুমুখী এবং তার অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে। কেবল বাংলা দেশ কেন, বিষয় বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের গান ভারতের যে কোন যুগের ও যে কোন প্রদেশের সংগীত রচয়িতাদের গানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। এত বিচিত্র ভাবের গানের সঙ্গে এত বিচিত্র রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ ভারতের আর কোথাও কোন একজন সংগীতকার করতে পেরেছেন বলে শুনিনি। তাঁর ধর্ম বা অধ্যাত্ম অনুভূতির গান, নানা রসের প্রেমের গান, জাতীয় সংগীত, ঋতু সংগীতগুলি বাংলা গানে চিরকালের সম্পদ হয়ে রইল। এ ছাড়া ছটি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য—যেমন বাল্মীকি প্রতিভা, কাল-মৃগয়া, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা রচনা করে বাংলা সংগীতে তিনি যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই গীতিনাট্যগুলি বহুদিন পর্যন্ত বাংলা সংগীতের প্রেরণার বিষয় হয়ে থাকবে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আরো কতকগুলি বিষয় নিয়ে গান রচনা করে গেছেন। যেমন খেলার গান, চলার গান, পথের গান, জন্মদিনের গান, বিবাহ উৎসবের গান, মৃত্যুর বেদনায় সান্ত্বনার গান, হাসির গান, চাষ করার গান, ধান-কাটার গান, গৃহ প্রবেশের গান, বৃক্ষ-রোপণ, নববর্ষ, বর্ষ শেষ ইত্যাদি নানা উৎসব অনুষ্ঠানের নানা প্রকারের গান তাঁর রচনায় আমরা পাই। এক কথায় সাধারণ মানুষের এই নিরস বাস্ত জীবনকে নানা দিক থেকে তিনি সংগীতে রসে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা করে গেছে তাঁর গানের সাহায্যে।

আজ আমরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছি ও শিখছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর গানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যে পথে ঘটা উচিৎ ছিল, তা ঘটেনি। আমরা তাঁর সংগীত রসের পূর্ণতায় আজও পৌঁছুতে পারিনি। অর্থাৎ যে অনুভূতির মাধ্যমে ঐ গানের প্রকৃত রস গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হত সেই অনুভূতির গভীরতায় আমরা আজও প্রবেশ করতে পারলাম না। একদল আছেন, যাঁরা তাঁর গানের কথাকেই বা কথার ভাবকেই বড় করে দেখেন, কিন্তু রাগিণীর রস ও গানের ছন্দে মেশা সেই কথার যে একটি স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ রূপ আছে সেটিকে তারা লক্ষ্য করেন না। অন্যদিকে আমরা, যাঁরা কেবল রবীন্দ্রনাথের গানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছি, সেই আমাদের মধ্যেও আর একটি ত্রুটি প্রকাশ পায়। আমরা বড় করে দেখি এই গানের সুর ও তার তাল বা ছন্দকে। বা এই গানে হিন্দি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল বা টপ্পার ছাপ কতটা পড়েছে সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য বড় হয়ে ওঠে। আমাদের মধ্যে আবার আর একদল উপরোক্ত হিন্দি গানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের গানকে সাজিয়ে নিয়ে গাইবার জন্যে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমরা যদি গানের ভাবকে পিছনে রেখে গানের সুরবিহার বা তার ছন্দ বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ি তা হলে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গানের মধ্যে যে ভাবরূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাব। এ গান ক্রমে ক্রমে উচ্চাঙ্গের হিন্দি গানের আদর্শে গঠিত ভিন্ন প্রকারের গানে পরিণত হবে। রবীন্দ্রনাথের গানের কাব্যরস ও ভারতীয় সংগীতের রাগিণী রসের একত্র অনুভূতির উৎকর্ষের দ্বারা যাঁরা পূর্ণ গান হিসেবে একে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারবেন তাঁরাই হবেন এর প্রকৃত রসিক। তখনি বলতে পারবো যে, এতদিনে গানের পথে রবীন্দ্রনাথকে আমরা সত্যিকারের চিনলাম।

পূর্ব পাকিস্থানের গদ্য সাহিত্য

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ ভাগ হওয়ার পর গত ক'বছরে পূর্ব পাকিস্থানের লেখকদের মধ্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলার একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা থেকে শুরু করে জীবনী, ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস. রম্যরচনা অনুবাদ প্রভৃতি কোন বিষয়ই তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আমরা অবশ্য এখানে উপন্যাস গল্পের উল্লেখ করছি না। এই প্রচেষ্টার মূলে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, এইভাবে ভাষা চর্চার ফলে বাংলা সাহিত্য কিছুটা লাভবান হয়েছে এবং পাকিস্থানের তরুণ লেখকদের গদ্য-রচনাশৈলীও বেশ উন্নত হয়েছে।

অবশ্য নানা বিষয়ে গদ্যরচনার প্রয়াস দেখা গেলেও বস্তুত সমালোচনা এবং রম্য-রচনার ক্ষেত্রেই তাঁদের সাফল্যের সমধিক পরিচয় পাওয়া গেছে। গত কয়েক বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্য রচনা অপেক্ষা রম্য রচনা লেখার যেমন হুজুগ পড়েছে পূর্ব বাংলার লেখকেরা সে রকম কোন হুজুগে না মেতে উঠলেও নূরুল মোমিন প্রমুখ দু'একজন লেখক এদিকে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে রসবোধের সহজ সংমিশ্রণের ফলে নূরুলের লেখা ইংরেজী সাহিত্যের ভাল Personal essay-র সমধর্মী হয়ে উঠেছে। তাঁর 'ঢাকার সমাজ চিত্র' নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। একটা নির্লিপ্ত অথচ জাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে লেখক ঢাকার সমাজ-জীবনের যে চিত্র প্রতিফলিত করেছেন তা যেমন বাস্তবধর্মী তেমনি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। মোমিনের ব্যঙ্গও মর্মভেদী।

সাহিত্যের আলোচনায় বহু শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লেখকই হাত দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ডক্টর শহীদুল্লাহ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ কয়েকজন খ্যাত-নামা লেখক প্রাচীন সাহিত্য সপর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। আবার আলি হোসেন ইত্যাদি লেখক আধুনিক সাহিত্যের সমস্যাদি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এঁরা সকলেই শক্তিশালী লেখক কিন্তু এঁদের লেখা আলো করলে বোঝা যায় যে পূর্বপাকিস্থ বাংলা সাহিত্যের উপাদান এবং রচ পদ্ধতি সম্বন্ধে এঁরা ভিন্ন ভিন্ন পোষণ করেন। মোসলেম রাষ্ট্রাদর্শকে করে দেখার ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প পাকিস্থানে যে সংকট দেখা দিয়েছে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করে এখানে প্রসঙ্গক্রমে শুধু তার উল্লেখ ক হ'ল।

গত সাত বছরের মধ্যে পূর্ব পাকি স্থানে সাত-আটখানিরও বেশি বড় জীব লেখা হয়েছে। তার মধ্যে আব্দুল রহ যাঁর লেখা মোসলেম মহাপুরুষদের দু' জবনী এবং ফজলুল করিম রচিত ক ইকবাল এবং নজরুল ইসলামের জীব দু'টিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে এই যে, পূর্ব বাং মোসলেম রাষ্ট্র হলেও মোসলেম সাধকদে জীবনীর তুলনায় কবি-জীবনীই সেখা বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য লেখা ত্রুটিও এর অন্যতম কারণ হ'তে পারে ঠিক একইভাবে সূফী ধর্মমত সম্বন্ধে লেখা একটি বই-এর চেয়ে আসানুল্লা খাঁ-এর আত্মজীবনী বেশি সমাদ পেয়েছে। আসানুল্লাও সূফী ধর্মের ক লিখেছেন কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত থেকেই সূফী ধর্ম সাধনার কথা ব্য

করেছেন। ধর্মমতের প্রচার অপেক্ষা সেই ধর্মমতের আকর্ষণে তাঁর মানসিক পরিবর্তনের কাহিনীই জনগণের মনে রেখাপাত করেছে। সুফীধর্মমত সম্বন্ধীয় একখানি বই বাংলায় অনুবাদও করেছেন শামসুল হক। মূল গ্রন্থটির লেখক হচ্ছেন আশরফ আলি।

গোলাম মুস্তাফা পূর্ব পাকিস্থানের একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক। তিনি দু'টি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তার একটিতে ইসলাম ধর্মে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, অপরটিতে কম্যুনিজম সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। মুস্তাফার আলোচনা অগভীর নয়। অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী না হয়ে তিনি দু'টি মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামধর্মের সঙ্গে কম্যুনিজমের মূলগত পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন। দর্শন, রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক দিয়েও তিনি এই দু'টি মতবাদের বৈপরীত্য প্রমাণ করেছেন।

আব্দুর রহমন সুবৃহৎ কোরানের বঙ্গানুবাদ করেছেন। মিশকৎ-এরও অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু পাকিস্থানে এখন পর্যন্ত ভাল ধর্মগ্রন্থ বা তার অনুবাদ বিশেষ হয়নি। কেউ কেউ বলছেন যে তার কারণ যারা ভাল গদ্য লেখক তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। রচনাগত ত্রুটিই যদি একমাত্র কারণ হয় তাহলে অবশ্য আশা করা যায় অল্প সময়ের মধ্যে শক্তিশালী লেখকের হস্তক্ষেপের ফলে এই ত্রুটি সংশোধিত হবে। সম্প্রতি তরুণ লেখকদের মধ্যে বাংলাভাষায় ইসলামধর্ম ও আদর্শের কথা প্রচার করার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

বাংলা ভাষায় দার্শনিক শব্দের পরিভাষা এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত নয়। তবু পূর্ব বাংলায়ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। শাহাদাৎ হোসেন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতবাদ সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। প্রস্তুতির যুগে তরুণ লেখকদের এই উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

'চলে মুসাফীর'—কবি জসিমউদ্দীনের নতুন বই। বইখানাতে কবি তাঁর ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষা সহজ, বর্ণনভঙ্গীও তেমনি রসাত্মক।

ঐশ্লামিক আদর্শ অনুযায়ী পাকিস্থানের সংবিধানের একটা আদর্শ খসড়া তৈরি করেছেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। মৌলানা সাহেব ঐশ্লামিক আদর্শ ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং একজন ভাল গদ্য লেখকও বটে। তাঁর মতে আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব বর্জনের নীতি অনুসারেই পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত। ঐশ্লামিক বিচারে মানুষের প্রথম আনুগত্য মানুষের কাছে নয়, রাষ্ট্রের কাছেও নয়, একেবারে ঈশ্বরের কাছে। আধুনিক কোন কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রের মত সর্বাত্মক কর্তৃত্বের অধিকার দিতে রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করতে হলে পাকিস্থানে ইসলামের মূল নীতিকেই বিসর্জন দিতে হয়। সুতরাং মোসলেম রাষ্ট্র হিসাবে সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রাদর্শ পাকিস্থানের কাম্য হতে পারে না।

ভারতে যেমন রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে

পকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্হাস লেখার কাজ আরম্ভ হয়েছে কিস্থানে আঞ্চলিক ভিত্তিতেও এখন িত সেরকম কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। স্তুগতভাবেও ইতিহাস চর্চা সেখানে শেষ হয়নি বলা যায়। ওয়ালিউল্লার খা 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম'কে ইতিহাস া হলেও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার চেয়ে র লেখায় পক্ষপাতিত্বই বেশি ফুটে ঠেছে। লেখক অবশ্য ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোচনা ের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ র পরবর্তীকালের ইতিহাস লিখতে লে যে পরিমাণ মানসিক সংযম, সত্য-ষ্ঠা এবং নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা য়োজন তা নেহাৎ সহজসাধ্য কাজ নয়। ত্য কথা বলতে কি কোন সাধারণ খকের সে দায়িত্ব গ্রহণ না করাই শ্রেয়। র্বাদীসম্মত প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং সত্য-ষ্ঠ ঐতিহাসিকেরই সেই দায়িত্ব গ্রহণ রা উচিত। ইতস্তত কয়েকটি ঐতি-াসিক প্রবন্ধও লেখা হয়েছে বিভিন্ন ষয়ে। এই প্রবন্ধগুলিতে ইসলামের াচীন ইতিহাস, মোসলেম পণ্ডিতদের ীবনী এবং চিন্তানায়কদের বাণী ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

একেবারে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নিয়েও কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ব বাংলার ভাষা-বিভ্রাট, পাকিস্থানের উদ্ভব প্রভৃতি রাজ-নৈতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্যের বিচারে এই জাতীয় রচনা যথার্থ না হলেও নবগঠিত ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের প্রধান ও তরুণ লেখকেরা নানা বিষয়ে যা লিখেছেন তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনন এবং চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর সাত বছর পার হয়ে গেছে। এই সাতবছরে সেখানকার লেখকেরা যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে শুধু বর্তমানের নয়, পূর্ব-পাকিস্থানের সমাজ ও সাহিত্যের অনাগত পরিণতিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতি-বেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আামাদের পূর্ব পাকিস্থানের সেই জাতীয় চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া কর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের ইহা একটি অপূরণীয় ক্ষতি যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যজীবন বা ব্যক্তিগত জীবনের কোনও ইতিহাস বা সেই ইতিহাস রচনার কোনও উপকরণ রাখিয়া যান নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র দ্বিতীয়ার্ধ যাঁহার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাঁহার ব্যক্তিস্বরূপ কিরূপ ছিল, সমসাময়িক সাহিত্যিকবৃন্দের সহিত তাঁহার সম্পর্কই বা কিরূপ ছিল, ইহা জানিতে কাহার না ঔৎসুক্য হয়? অথচ সেই ঔৎসুক্য-পরিতৃপ্তির কোনও উপায়ই নাই! আত্মজীবনী রচনার প্রতি বঙ্কিমের একটা স্বাভাবিক ঔদাস্য ছিল। 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার **'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ'** শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে বঙ্কিমের স্বকীয় মত উল্লেখ করিয়াছেন—

"আমি বলিলাম, আমার ইচ্ছা আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক কতক নোট এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি? বঙ্কিমবাবু হাসিলেন, বলিলেন আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা ত সহজ নয়। জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সেগুলি বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল।' —সাধনা, ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৮।

'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িলে বঙ্কিমের ব্যক্তিজীবনের একটা স্থায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস যেন আমরা কিছুটা পাই। এই গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁহার আত্মজীবনী রচনার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে আমরা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর একটি অপূর্ব আলেখ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

বর্তমান প্রসঙ্গে বঙ্কিমের জীবনীর উপকরণ লইয়া ব্যাপকভাবে আলোচনার অবকাশ নাই। আমরা কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অস্তোন্মুখ বঙ্কিমচন্দ্র ও উদীয়মান রবীন্দ্রনাথ—বাংলার সাহিত্য গগনের দুই প্রধান জ্যোতিষ্কের যে নাতিদীর্ঘকালের জন্য পরস্পর সান্নিধ্য ঘটিয়াছিল তাহা লইয়াই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'The Religion of an Artist' শীর্ষক প্রসিদ্ধ এক ইংরাজী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

"I was born in 1861, that is not an important date of history, but it belongs to a great epoch in Bengal, when the currents of of three movements had met in the life of our country. One of these, the religion was introduced by a very great hearted man of gigantic intelligence, Raja Rammohan Roy . . . . . .

"There was a second movement equally.. important. Bankim Chandra Chatterjee who though much older than myself was my contemporary and lived long enough for me to see him, was the first pioneer in the literary resolution which happened in

Bengal about that time . . .
ere was yet another movement
rted about his time called the
tional . . . I was born and
ought up in an atmosphere of
 confluence of three movements, all of which were revolutionary."
Contemporary Indian Philosophy, edited by S. Radhakrishnan and H. Muirhead 1936).

ঠাকুর পরিবারের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ক্তিগত সম্পর্ক যে ছিল ইহা সমসাময়িক হিত্য হইতে অবগত হইতে পারা যায়। বনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া'য় ঠাকুর-ড়িতে অনুষ্ঠিত অভিনয় উপলক্ষ্যে ঙ্কমচন্দ্রের উপস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত থচ হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়াছেন—

"প্রথম বাড়িতে গেল আরম্ভ হল জ্যোতি-কাকা মশায়ের প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না' 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ইত্যাদি...... তখন ওই রকম ছোটোখাটো প্রহসনই হত বড়োদের নিয়ে। ছোটোরা তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না। এ-বাড়ির খড়খড়ি টেনে দীপদার নিচের বৈঠকখানা বেশ দেখা যায়। আমরা সেই খড়খড়ি টেনে মাঝে মাঝে দেখতুম, মা-পিসিমারাও রাত বিরেতে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। রাত্রির অন্ধকারে কে আর আমাদের দেখতে পাচ্ছে। বঙ্কিমবাবুও আসতেন সে-সময়ে। একদিন দেখি বঙ্কিমবাবু মাথায় পাকানো চাদরের পাগড়ি বেঁধে লাঠি ঘুরিয়ে কী যেন করছেন। আর তাঁর চেহারাও ছিল অতি সুন্দর। ওই তাঁর এক রূপ আমার মনে আছে। ও-সব ছিল নিছক বৈঠকখানার ব্যাপার।"

—'ঘরোয়া', পৃঃ ৬০—৬১।

এইখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'বালক' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার একখানি রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়া প্রকাশ করেন এবং বঙ্কিমের আকৃতির সহিত তাঁহার ধীশক্তি ও প্রতিভার সম্বন্ধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন। সমসাময়িক সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আকৃতির এইরূপ নিখুঁত বর্ণনা অত্যন্ত দুর্লভ। তাই প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"কপাল যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধি দুইরকম। একটি হচ্ছে খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার ক্ষমতা। আর একটি—আলোচনা ও চিন্তা করিবার ক্ষমতা।

কপালের উপর ভাগে চিন্তা শক্তি অবস্থিত।

চিন্তা শক্তি—অর্থাৎ তুলনা করিবার শক্তি, বস্তু সকল পৃথক করিয়া দেখিবার শক্তি, শ্রেণী বিভাগ করিবার শক্তি এবং কার্য দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিবার শক্তি। যাহাদিগের কপালের উপর দিকটা উঁচু—তাহাদিগের এই চিন্তাশক্তি প্রবল। কপালের নীচের ভাগে, খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ শক্তি অবস্থিত। এই শক্তি যাহাদিগের প্রবল তাহাদিগের সমস্ত পৃথিবী দেখিবার ইচ্ছা হয়, বিজ্ঞান শিখিতে ইচ্ছা হয়, ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয় এবং সকল তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার ইচ্ছা হয়।......

"এক্ষণে, আমাদের দেশের খ্যাতনামা দুই ব্যক্তির চিত্র দেওয়া যাইতেছে। রাজনারায়ণবাবু ও বঙ্কিমবাবু। যাঁহার দাড়ি গোঁফ আছে, তিনি রাজনারায়ণবাবু, যাঁহার দাড়ি গোঁফ কামান দেখিতেছ তিনি বঙ্কিমবাবু। আমরা বঙ্কিমবাবুর যে ছবি আঁকিয়াছিলাম লিপিকর তাহার ঠিক অনুকরণ করিতে পারে নাই, তাই বঙ্কিমবাবুর চোখ ও মুখের ভাব অবিকল হয় নাই। ইঁহাদের কপাল লক্ষ্য করিয়া দেখ। উভয়েরই কপাল উৎকৃষ্ট।...

"বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোট ছোট জিনিস খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইঁহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ শক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানবচরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। এবার নাকি কেবল কপালের বিষয় এ প্রস্তাবে লিখিবার কথা। তাই চোখ মুখ নাকের বিষয় বলা গেল না; বঙ্কিমবাবুর এই চিত্রের প্রসঙ্গে দুই একটা কথা সে বিষয়ে না বলিয়াও থাকা যায় না। বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজ্‌লাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে। রাজনারায়ণবাবুও তাঁহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটিকে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত খাটিয়াছেন তাহাও তাঁহার নাকের জোরে। ইঁহার নাকেও মনের বল প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্যকরী বুদ্ধি—সূক্ষ্মরুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায় এবং রাজনারায়ণবাবুর চোখে অন্তর্দৃষ্টি ও স্বপ্নভাব প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চেহারায় নেপোলিয়নের মুখের কিছু আভাস পাওয়া যায়। নেতার লক্ষণ ইঁহার মুখে জাজ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গনাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম বুঝিতে পাবে। বঙ্কিমবাবুর নাকের নিম্নদেশ যেরূপ ঝুঁকিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহার চিবুকের নীচে যেরূপ ফুলা দেখা যাইতেছে ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জন স্পৃহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাইতেছে। বঙ্কিমবাবুর চরিত্রের সহিত আমাদের একথা মেলে কিনা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।"

['মুখচেনা' 'বালক'। ১ম ভাগ। বৈশাখ ১২৯২। ১ম সংখ্যা। পৃ ৫২—৫৬]

রবীন্দ্রনাথের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের যে বর্ণনা আমরা পাই, তাহাতেও বঙ্কিমের অলৌকিক প্রতিভাব্যঞ্জক মুখাবয়বের বিশেষভাবে উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র কিশোর রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক রচনা হইতে তাহার সাক্ষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমবাবুকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ রিয়ুনিয়ন্‌ নামক মিলন সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি

আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখের উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবণতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ-মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে-রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

"বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।"

—সাধনা ৩য় বর্ষ, ১ম ভাগ, ৫৫৯-৬০

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বঙ্কিম-বাবুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা প্রায় অনুরূপ ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই প্রথম দর্শনের পর কিশোর রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিণত প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমশ তাঁহাদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের ন্যায় একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 'জীবন-স্মৃতি'তে ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে মাত্র—

"তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ্য ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ

কপালের উপর ভাগে চিন্তা শক্তি অবস্থিত।

চিন্তা শক্তি—অর্থাৎ তুলনা করিবার শক্তি, বস্তু সকল পৃথক করিয়া দেখিবার শক্তি, শ্রেণী বিভাগ করিবার শক্তি এবং কার্য দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিবার শক্তি। যাহাদিগের কপালের উপর দিকটা উঁচু—তাহাদিগের এই চিন্তাশক্তি প্রবল। কপালের নীচের ভাগে, খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ শক্তি অবস্থিত। এই শক্তি যাহাদিগের প্রবল তাহাদিগের সমস্ত পৃথিবী দেখিবার ইচ্ছা হয়, বিজ্ঞান শিখিতে ইচ্ছা হয়, ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয় এবং সকল তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার ইচ্ছা হয়।......

"এক্ষণে, আমাদের দেশের খ্যাতনামা দুই ব্যক্তির চিত্র দেওয়া যাইতেছে। রাজনারায়ণবাবু ও বঙ্কিমবাবু। যাঁহার দাড়ি গোঁফ আছে, তিনি রাজনারায়ণবাবু, যাঁহার দাড়ি গোঁফ কামান দেখিতেছ তিনি বঙ্কিমবাবু। আমরা বঙ্কিমবাবুর যে ছবি আঁকিয়াছিলাম লিপিকর তাহার ঠিক অনুকরণ করিতে পারে নাই, তাই বঙ্কিমবাবুর চোখ ও মুখের ভাব অবিকল হয় নাই। ইঁহাদের কপাল লক্ষ্য করিয়া দেখ। উভয়েরই কপাল উৎকৃষ্ট।...

"বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোট ছোট জিনিস খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইঁহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ শক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানব-চরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। এবার নাকি কেবল কপালের বিষয় এ প্রস্তাবে লিখিবার কথা। তাই চোখ মুখ নাকের বিষয় বলা গেল না; বঙ্কিমবাবুর এই চিত্রের প্রসঙ্গে দুই একটা কথা সে বিষয়ে না বলিয়াও থাকা যায় না। বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজলাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে। রাজনারায়ণবাবুও তাঁহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটিকে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত খাটিয়াছেন তাহাও তাঁহার নাকের জোরে। ইঁহার নাকেও মনের বল প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্যকরী বুদ্ধি—সূক্ষ্মরুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায় এবং রাজনারায়ণবাবুর চোখে অন্তর্দৃষ্টি ও স্বপ্নভাব প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চেহারায় নেপোলিয়নের মুখের কিছু আভাস পাওয়া যায়। নেতার লক্ষণ ইঁহার মুখে জাজ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গনাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম বুঝিতে পারে। বঙ্কিমবাবুর নাকের নিম্নদেশ যেরূপ ঝুঁকিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহার চিবুকের নীচে যেরূপ ফুলা দেখা যাইতেছে ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জন স্পৃহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাইতেছে। বঙ্কিমবাবুর চরিত্রের সহিত আমাদের একথা মেলে কিনা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।"

['মুখচেনা' 'বালক'। ১ম ভাগ। বৈশাখ ১২৯২। ১ম সংখ্যা। পৃ ৫২—৫৬]

রবীন্দ্রনাথের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের যে বর্ণনা আমরা পাই, তাহাতেও বঙ্কিমের অলৌকিক প্রতিভা-ব্যঞ্জক মুখাবয়বের বিশেষভাবে উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র কিশোর রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক রচনা হইতে তাহার সাক্ষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমবাবুকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ রিয়ুনিয়ন নামক মিলন সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি

আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখের উদাত্ত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ম প্রবণতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ-মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে-রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

"বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়ন দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।"

—সাধনা ৩য় বর্ষ, ১ম ভাগ, ৫৫৯-৬০

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বঙ্কিম-বাবুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা প্রায় অনুরূপে ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই প্রথম দর্শনের পর কিশোর রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিণত প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমশ তাঁহাদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের ন্যায় একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 'জীবন-স্মৃতি'তে ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে মাত্র—

"তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ্য ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ

করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভাল করি নাই।"

—জীবনস্মৃতি পৃ. ২৬০—৬১

আবার—

"বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "প্রচার" বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচার-এ একটি গান ও কোনো বৈষ্ণবপদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি।

"এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্বে হইতে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি কিছু কথা-বার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশী হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।" —ঐ পৃঃ ২৬২

'সাধনা'য় প্রকাশিত 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের কিছু কিছু বিবরণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন (১৮৮৩-৮৪ সাল) বহুবাজারের বাসাতে থাকেন; রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই সেখানে যাইতেন। —"২৬শে চৈত্র সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎকালে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'রবীন্দ্র কাল এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমার (অর্থাৎ 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার) পরিবারের সংবাদ পাই।'

এই সময়েই একদিন প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহা বেশ কৌতুককর। শ্রীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

"রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন। উত্তর—পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চ দরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সেকথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশী "গিফ্‌টেড্‌" কিন্তু "পুকোসাছ্‌", এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সেদিন রবিকে বলেছি। রবি বল্লেন, আপনিও ত' অল্প বয়সে "দুর্গেশনন্দিনী" লেখেন। আমি যখন "দুর্গেশনন্দিনী" লিখি, তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর।......আমি বলিলাম এই বয়সে দুইবার ইয়ুরোপ ভ্রমণে যাওয়াও আমার বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ সুবিধা। উত্তর—"তাতে উপকার হয়েছে কিনা জানি না। আমার ইচ্ছা আছে, পেন্‌সেন লইয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া একবার ইউরোপ যাব।"

—সাধনা, ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হইবার পর 'রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে সাক্ষাৎকার হয় তাহার উল্লেখ রবীন্দ্র-

নাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং 'জীবন-স্মৃতি'তে আছে—
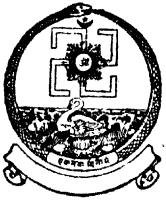
"একদিন আমার প্রথম বয়সে কোন নিমন্ত্রণ সভায় তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন।"

—সাধনা, ৩য় বর্ষ, ১ম ভাগ

"সন্ধ্যা সংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চৈঃস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোন প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ই'হারই প্রাপ্য—রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন "না"। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যা-সংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

—জীবনস্মৃতি, পৃঃ ২২২—২২৩

রবীন্দ্রনাথের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক যদিও গোড়া হইতে মধুর ছিল, কিন্তু অল্পকালের জন্য ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা লইয়া উভয়ের মধ্যে মতবৈষম্য ঘটে। 'প্রচার' পত্রিকার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯১ অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতেই বিরোধের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধের উত্তরে বঙ্কিম-চন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখদুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এপর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। এবার উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে।...... কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ-স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষত তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কৈফিয়ৎ' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেন—

"আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিম-বাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই।"

বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রের এই প্রবীণ ও নবীন প্রতিভাশালী লেখকদ্বয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমাগুণে অপসারিত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে এই বিরোধের ও উহার পরিসমাপ্তির অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করিয়াছেন—

"ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্ল-ভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি। সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা

বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।......এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় তাঁহার যে স্মৃতিতর্পণ করেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অনবদ্য ভাষায় নিবেদন করিয়াছেন, উহার মধ্যে কিছুমাত্র সংকীর্ণতা বা কপটতার লেশমাত্র নাই—

"একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনও নিমন্ত্রণ সভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চায় প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদর বাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব করিলে, ভরসা করি, সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন।......সেই সকল উৎসাহ বাক্য সাহিত্যপথযাত্রার মহামূল্য পাথেয়স্বরূপে আমার স্মৃতিভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল; তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।"

'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩০১ জ্যৈষ্ঠ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

"**সাধনা**—বৈশাখ। এবারকার সাধনায় সর্বপ্রধান প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বঙ্কিমচন্দ্র"। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে এপর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন রবীন্দ্রবাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু, বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্তির উজ্জ্বল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্রবাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।

বঙ্কিমচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের স্মৃতিরক্ষার্থে নানা প্রকার উদ্যোগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণের উদ্দেশ্যে যে শোকসভার আয়োজন হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব তাহার বিরোধিতা করেন। 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'শোকসভা' শীর্ষক প্রবন্ধে মৃতের প্রতি স্মৃতি-তর্পণের যে সার্থকতা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা নানা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করেন। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও উদ্ধারযোগ্য—

"আমরা আমাদের মহৎ ব্যক্তিদিগকে দেবলোকে নির্বাসিত করিয়া দিই। তাহাতে আমাদের মনুষ্যলোক দরিদ্র ও গৌরবহীন হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যদি রক্তমাংসের মনুষ্যরূপে সুনির্দিষ্ট পরিচিত হন, সহস্র ভালমন্দের মধ্যেও আমরা যদি তাঁহাদিগকে মহৎ বলিয়া জানিতে পারি তবেই তাঁহাদের মনুষ্যত্বের অন্তর্নিহিত সেই মহত্ত্বটুকু আমরা যথার্থ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, তাঁহাকে ভালবাসি এবং বিস্মৃত হই না।

"এ কাজ কেবল বন্ধুরাই করিতে পারেন। এবং বন্ধুগণ যখন প্রস্তরমূর্তি স্থাপনে উদাসীন পাবলিককে অকৃতজ্ঞ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন তখন পাবলিকও তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ আনিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা বঙ্কিমের নিকট হইতে কেবলমাত্র উপকার পান নাই, বন্ধুত্বও পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল রচনা পান নাই, রচয়িতাকে পাইয়াছেন। অর্থ থাকিলে প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা সহজ, কিন্তু বঙ্কিমকে বন্ধুভাবে মনুষ্যভাবে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করা কেবল তাঁহাদেরই প্রীতি এবং চেষ্টাসাধ্য। তাঁহাদের বন্ধুকে কেবল তাঁহার নিজের স্মরণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যথার্থ বন্ধুঋণ শোধ করা হইবে না।"
—**সাধনা**, ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ, পৃ ৩৬—৩৭

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে উপকরণের এতই অভাব যে, আমরা তাঁহার কোনও সুস্পষ্ট মূর্তিই আমাদের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া উঠিতে পারি না—আমরা শুধু 'রচনা'কেই পাইয়াছি, 'রচয়িতা'কে পাই নাই। সমসাময়িক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার ঔৎসুক্যবশেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক সম্পর্কের এই খণ্ড ইতিহাসের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যেই যেন মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের উষ্ণ স্পর্শ এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

নাটক ও নাটকীয়তা

পংকজ দত্ত

দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার নিত্যকার অনুষ্ঠান-সূচীর স্তম্ভে আজকাল নাট্যাভিনয়ের আকর্ষণ থাকে অনেক। কলকাতায় এখন স্থায়ী পেশাদার মঞ্চ ক'টি সমেত নাটক অভিনয়োপযোগী পাকা মঞ্চ পাওয়া যায় গুটি আটেক। সপ্তাহের প্রায় কোনদিনই তার একটিও খালি পড়ে থাকে না। মোটামুটি একটা হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছিল গত বছর ঐ আটটি পাদপীঠে অপেশাদার বা শৌখিন দলের চোদ্দ শ'রও বেশী নাট্যাভিনয় হয়েছিল। এছাড়া স্কুল-কলেজ-অফিসের হলে বা সামিয়ানা খাটিয়েও অভিনয় যে কতো শত শত হয়েছে তার হিসেব রাখা সম্ভব নয়। হিসেবের মধ্যে যা পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় যে যতো নাটক অভিনীত হয়েছে তার পনের-আনা ভাগই হচ্ছে আগের আমলের পুরনো নাটক। এটা ভাববার কথা।

অপেশাদার দলের উদ্যোক্তাদের সংগে এবিষয়ে আলাপ করে জানা গেল যে তাদের মতে নতুন নাটক পাচ্ছেন না বলেই তারা পুরনো নাটকই মঞ্চস্থ করতে বাধ্য হচ্ছেন। পেশাদার মঞ্চেরও ঐ একই অভিযোগ, নতুন নাটক পাওয়া যায় না। এ একটা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার, অন্তত বাঙলা দেশের ক্ষেত্রে। বাঙলা উপন্যাস গল্প কবিতা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির পর্যায়ে অধিরোহন করেছে, অথচ বাঙলাতে নাটক হচ্ছে না বা হয় না, সত্যিই সেটা ভাববারই কথা। কেন নাটক হয় না? সাহিত্য-প্রতিভা যারা রয়েছেন তারা নাটক লিখতে পারেন না, এ যুক্তি বিশ্বাস করতে মন চায় না। বরং তারা নাটক লিখতে চাইছেন না বলেই নাটকের অভাব এই যুক্তি মনে ধরে নিয়ে আলোচনায় এগিয়ে যাওয়া সহজ।

নাটক লিখতে না চাওয়ার পিছনে অর্থনীতিক কারণটাই আসল। কারণ গল্প কি উপন্যাসের একটা নিজস্ব বাজার আছে: কেউ তাদের চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করুক না করুক, নাটকাকারে গ্রথিত করে অভিনয় করুক না করুক সে-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। গল্প গল্প বলেই, এবং উপন্যাস উপন্যাস বলেই কদর পায়, অপর কোন কিছুর ওপরে তাদের সার্থকতা নির্ভর করে না। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তা নয়। নাটক পড়বার জিনিস নয়, অভিনয় করে দেখাবার জিনিস; নাটকের পাঠক থাকে না, থাকে দর্শক। কাজেই দর্শকের কাছে সমাদর লাভের ওপরেই নাটকের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। এবং নাটক মঞ্চে সাফল্যমণ্ডিত হলে তবে তার গ্রন্থ সংস্করণটিরও বাজার পাওয়া যায়। আবার, সে বাজারও থাকে কেবলমাত্র অভিনয়োৎসাহী লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রন্থাকারেও তাই গল্প উপন্যাসের মতো নাটকের চাহিদা প্রচুর কোনক্রমেই হতে পারে না। উপরন্তু নাটক লিখলেই যে সে নাটক মঞ্চস্থ হবেই, এবং মঞ্চস্থ হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করবেই তারও কোনও স্থিরতা নেই। তর্কের সুবিধের জন্যে যদি মেনে নেওয়া যায় যে, যিনি স্রষ্টা তার আনন্দ সৃষ্টিতে; ফলাফলের ওপর তার লক্ষ্য থাকে না—এ কথার উত্তরে বলতে হয় যে, গল্প উপন্যাসের মতো নাটক লিখে ছাপিয়ে ফেলতে পারলেই সৃষ্টির সাধারণ্যে প্রকাশ সিদ্ধ হয়ে যায় না। মঞ্চস্থ না হলে নাট্য-সৃষ্টির রূপটা কোনক্রমে প্রতিভাত হতে পারে না, সাধারণে তার প্রকাশ বাকি থেকে যায়। অথচ, ইচ্ছে করলেই লেখবার ক্ষমতা যার আছে তিনি গল্প উপন্যাস প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করার ইচ্ছেটা সম্পূর্ণরূপে অপরের। নাটক পড়ে ভালো লাগলেও মঞ্চস্থ হওয়া সহজ নয়। তার কারণ, পেশাদার মঞ্চ গুটি চারেকের বেশী নেই

যেখানে নাটক ভালো হলে দীর্ঘকাল চলার আয়ু অর্জন করতে পারে, এবং পয়সার দিক থেকে যদি নাও হয় তো, নাট্যকারকে সৃষ্টির সাফল্যের আনন্দ উপভোগ করিয়ে দিতে পারে। স্রষ্টার কাছে এইটাই বড়ো আনন্দ। কিন্তু তারও তো অবাধ সুযোগ নেই। স্টারে 'শ্যামলী' চলছে প্রায় দু'বছর হতে চললো; রঙমহল 'দূরভাষিণী'-র পর উল্কা' দিয়েই বছর প্রায় পার করে এনেছে। অর্থাৎ জনপ্রিয় এই প্রেক্ষাগৃহ দুটিতে গত বারো মাসে নতুন দুখানির বেশী নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেনি। তাছাড়া সব নাটকই 'শ্যামলী'র মতো শত শত রজনী ধরে চলুক এটা নাট্যকারও চান, প্রেক্ষাগৃহের মালিকও চান, কলা-কুশলী-শিল্পীরাও চান এবং দর্শকদের কাছেও তার মর্যাদা অপরিসীম হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় সাহিত্যিক কিসের আকর্ষণে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হবে? নাম, যশ অর্থ তো নেই-ই, এমনকি নাটক লিখলে তা মঞ্চস্থ হওয়া সম্পর্কেও কোনই নিশ্চয়তা নেই।

তবুও নাটক যে একেবারেই লেখা হচ্ছে না, তা নয়। পত্র-পত্রিকার 'পুস্তক-সমালোচনা' বিভাগ থেকে দেখা যায় বছরে পঞ্চাশোধিক নতুন নাটক লেখা হয়ে চলেছে। প্রায় সবই অখ্যাত নতুন লেখক-দের লেখা। এসব নাটকগুলিতে কখনো কখনো আখ্যানবস্তুর দিক থেকে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে গুণের ফলে ঘটনা ও চরিত্রাবলির কথোপকথনের মধ্যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয় তা প্রায় সব রচনাতেই অনুপস্থিত। নাটকীয়তার সৃষ্টি হয় বাচনিক ও আঙ্গিক অভিব্যক্তির একটা সুসমঞ্জস আতিশয্যের মধ্যে দিয়ে; চলতি কথায় যাকে নাটুকেপনা বলে অভিহীত করা হয়। স্বাভাবিকতার মাত্রাকে অতিক্রম করে মনের বিবিধ অনুভূতিকে আবেগ ও গতিশীলতার দিকে উচ্ছ্বসিত করে তোলাই হচ্ছে এই নাটুকেপনা। বাড়াবাড়ি থাকবে কিন্তু তার মধ্যে থাকবে একটা সামঞ্জস্য; মানানসই ছন্দোবন্ধ অতিশয়তা। একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, চলচ্চিত্রের প্রভাব এসে এই অতিশয়তাকে পরিহার করার চেষ্টা করছে; এবং সেই ধারাকেই বাস্তবানুগ অভিনয় বলে চালাবার দিকে ঝোঁক পড়েছে বেশীর ভাগ দলের। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে যেমনভাবে কথা বলা হয় বা কোন মনোভাবকে অভিব্যক্ত করা হয় ঠিক সেই মতো কথোপকথন বা ভাবাভিব্যক্তি চলচ্চিত্রে চলে কিন্তু মঞ্চে চলে না। তার কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে মঞ্চের অভিনেতাকে এমনভাবে কথা ও ভঙ্গী অভিব্যক্ত করতে হয় যা অনেকখানি দূরের লোকেরও চোখে-কানে গিয়ে পৌঁছতে পারে এবং অভিনেতার উদ্গত ভাবের দ্বারা দর্শক প্রভাবিত হতে পারে। এদিকটা উপেক্ষা করলে নাট্যাভিনয় চলে না। এখন যেমন অনেক দলকে দেখা যায় এমনভাবে অভিনয় করতে যে, কথা বা অভিব্যক্তি সামনের দু'তিন সারির পর আর পৌঁছয় না। বর্তমানে মঞ্চে চলচ্চিত্র থেকে শিল্পী সংগ্রহ করায় ' এইরকম দুর্বলতা এসে পড়েছে। চলচ্চিত্রে খুবই কাছে মাইক এবং ক্যামেরার লেন্সের সামনে অভিনয় করতে হয় বলে কথা ও অভিব্যক্তি মৃদু হলেও

ক্ষতি নেই, কারণ পরে তা পর্দা ও স্পীকারের সহায়তায় বড়ো ও জোরালো করে পরিব্যস্ত করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মঞ্চের সে সুযোগ নেই, এবং তা না থাকায় এমন স্বরে কথা বলতে হয় বা আঙ্গিক অভিব্যক্তিকে এমন দীপ্তভাবে প্রকাশ করতে হয় যা শেষ সারির দর্শকের কাছেও অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য না হতে পারে। মঞ্চাভিনয়ে তাই স্বর ও ভঙ্গী একটা বিশেষ উঁচু মাত্রা ধরে চলে। মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে সেইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক মাত্রা; মঞ্চাভিনয়ের এইটাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রভাব মঞ্চকে এই বৈশিষ্ট্য থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। আর তাই মঞ্চের অভিনয় এখন জমতে পারছে না।

মঞ্চাভিনয়ের ছন্দোবন্ধ আতিশয্যমূলক বাচনিক ও আঙ্গিক অভিব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ হতে বাধ্য করে ভাষা, যাকে নাটকের ভাষা বলে অভিহিত করা হয়। গল্প, উপন্যাস, কাব্যের ভাষা এ নয়; এদিক থেকেও নাটকের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষাই হচ্ছে ভাবপ্রকাশের দ্যোতনা। ঘটনা ও চরিত্রের ভাবটা যথাযথ উচ্চকিত ও মূর্ত করে তোলার দায়িত্ব নাটকের ভাষার। ভাষা সেরকম না হলে অভিনয় করার উদ্দীপনাই জাগে না। নিজেকে পাঁচজনের সমক্ষে তুলে ধরার চেতনা থেকেই অভিনয়ের প্রতি মানুষের ঝোঁক দেখা দেয়। নিজেকে অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বকে মূর্ত করে তোলার উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় ভাষা থেকে। আজকাল নতুন নাটক যাওবা রচিত হচ্ছে তার অধিকাংশই এদিক থেকে অতীব দুর্বল। অভিব্যক্তি উৎসারিত করে তোলার অবলম্বনটা আসে ভাষা থেকেই, এবং নতুন নাটকে তা পাওয়া যাচ্ছে না বলেই সমাদৃতও হচ্ছে না। বস্তুত আজকাল যে শত শত অভিনয় হয়ে চলেছে সারা দেশ জুড়ে তার মধ্যে কেন পনের আনা ভাগই হয় পুরনো আমলের নাটক এই থেকেই তার কারণ নির্ণয় করা যায়।

পুরনো আমলের নাটকগুলির অনেকের বিষয়বস্তু এমন যা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানুষের মনকে অভিভূত

করতে সক্ষম হলেও এখন নতুন দিনে সেসব অনুভূতির অনেকখানিই প্রশমিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও অভিনয় ক্ষেত্রে সেই সব নাটককেই আজও নাট্যোৎসাহীদের কাছে প্রিয় দেখা যায়। তার কারণটা হচ্ছে বিষয়বস্তু ও প্রকৃতির দিক থেকে এসব নাটকের মঞ্চস্থ হওয়াটা দর্শকদের কাছে অভিপ্রেত বলে প্রতীয়মান যদি নাও হয়, তবুও অভিনয়-শিল্পীরা এইসব নাটক অভিনয় করতে নিজেদের দক্ষতা প্রকাশে উদ্দীপনা লাভের প্রকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া যায় বলে মনে করেন। কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়। যেমনঃ—

"রঘুঃ আশীর্বাদ কর মহামতি! আর আমি
নহি প্রভু, ব্রাহ্মণের নিরীহ সন্তান
বিশ্বনাথ জনক আমার। আমি পুত্র তার
শুধু মাত্র অভ্যস্ত সংহারে।
দেখ প্রভু, শমন মূরতি
ফিরাতে পাপের গতি,
করিতে কেবল ধ্বংস,
শূলী শম্ভু শিয়রে আমার!
সংহার!—সংহার!
হের বক্ষে মুক্তকেশী—
অট্টহাসি অসিতাবরণা ভীমা—
ধ্বংসরূপা দানবদলনী!
দেখো দেখি চিনিতে কি পারহে ব্রাহ্মণ?"
(রঘুবীরঃ ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

ওপরে রঘুবীরের উক্তি একটা দৃশ্য থেকে একাংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া। কিন্তু ভাষাটাই এমনি যে কেউ সোজা পড়ে গেলেও কথার গাঁথনির মধ্যে থেকে ভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেই। এই ধরনের সংলাপের সহায়তায় শিল্পীর পক্ষে তার অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতাকে খাটিয়ে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিংবা মাতৃরূপ বর্ণনায় চাণক্য পণ্ডিতের সেই বিখ্যাত অংশঃ—

"চাণক্যঃ মা জানো না! নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিঃশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল—তারপর পৃথক হয়ে এলে—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মতো; মা যে তার দেহের রক্ত নিঙড়ে নিভৃতে, বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী করে তোমায় পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিষচুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহ-মন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনের প্রভাত-সূর্যের মতো কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিবাদ চায় না, উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়, এ সেই মা!" (চন্দ্রগুপ্তঃ ডি এল রায়)।

এই মাতৃরূপ বর্ণনার পাশে আধুনিক একখানি নাটকের থেকে কিয়দংশ উধৃত করে দেওয়া গেলঃ

"যুবকঃ চমৎকার! মার ছবি নিয়ে বন্ধু-বান্ধব ঠাট্টা করতো? যে যেমন তার তেমন বন্ধু জোটে!

বিপুলঃ না না! আমার মার সম্বন্ধে কোন অসম্মানের কথা তারা বলতো না। তারা বলতো এমন দেবীর মতো মায়ের পেটে এমন জানোয়ার জন্মেছে। আত্মসম্মানে আঘাত লাগতো তাই ছবি সরিয়ে

ফেললুম। মাকে সবাই ভালবাসতো আর তারই জন্য জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছি।

যুবকঃ আমার মাকে কেউ ভালবাসে না—আর তারই জন্যে জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছি।

বিপুলঃ ছিঃ, ওকি কথা! জননী বলে কথা! মনে কর ত' যখন ছোট ছিলে তখন কত অসহায় ছিলে—তোমাকে লালনপালন করতে, খাইয়ে দাইয়ে বড়ো করতে তোমার মাকে কত দুঃখ কষ্ট করতে হয়েছে মনে করতে পার?" (দুঃখীর ইমানঃ তুলসীদাস লাহিড়ী)।

উধৃত দুটি অংশ দুখানি ভিন্ন প্রকৃতির নাটকের বিভিন্ন স্থান কাল ও পাত্রপাত্রীকে নিয়ে রচিত। কিন্তু এ থেকে শুদ্ধমাত্র ভাষায় নাটকীয়তা প্রকাশের তারতম্যটা উপলব্ধি করা যায়। নাটকের ভাষারই যতি, সম এমনভাবে বাক্যতে খেলিয়ে দেওয়া থাকে যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। এখনকার নাটকে এদিকটা একেবারেই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। পরিবেশ সৃষ্টিতেও সংলাপের যথাযথ গাঁথুনী যে কি পরিমাণ সহায়ক হতে পারে তার একটা উদাহরণঃ

"বিশেশ্বরঃ না, আমি এইখানেই শেষ কর্ব। আর পারি না। কিন্তু আত্মহত্যা! মা দুর্গা! আমার সর্বাঙ্গে সূচ বিঁধিয়ে মার্বে, আর যদি তা আমার অসহ্য হয় ত' অমনি পাপ! তা যদি হয়, তা'হলে মানুষকে দানবের শক্তি দাওনি কেন? এই ক্ষুদ্র শরীরটার মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র দিয়েছিলে কেন রাক্ষসী? কিন্তু জীবনের শেষ অঙ্কে একটা মহাপাপ করে মর্ব! (ছোরা টেবিলের উপর রাখিলেন; নিজে তাহার পাশে বসিলেন) না, কাজ নাই। (উঠিয়া কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন) ওঃ! আর পারি না। তিলে তিলে —এও তো মর্চ্ছি! তার চেয়ে—কিসে পাপ! আমাকে এজীবন দিয়েছ—এ আমার সম্পত্তি। আমি রাখি, ছুঁড়ে ফেলে দেই, তাতে তোমার কি! কর্ব! (টেবিলের কাছে যাইয়া ছোরা লইলেন, করতলে গড়াইতে লাগিলেন) না, কাজ নাই। (পুনরায় তাহা রাখিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন; পরে সহসা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন) ওকি! কে আমায় সেই পুরাতন পরিচিত স্বরে ডাকে! মৃত্যুর পরপার থেকে তুমি আমায় ডাকছো দিদি! ঐ যে আবার! দূরে না, নিকটে! আরও উচ্চে আরও প্রাণমাতানো সুরে ডাকছে। এই যাই দিদি! (ছোরা গ্রহণ) কৈ! আবার সব স্তব্ধ! (জানালায় কান দিয়া) কৈ! স্তব্ধ রাত্রি। কেউ জেগে নাই। একা আমি জেগে। কেউ দেখছে না। দেখছে কেবল ঐ পূর্ণিমার চাঁদ; স্থির হয়ে দেখছে! ঐ চাঁদের পাশে কে! সরযূ না? ঐ যে আমায় হাত বাড়িয়ে ডাকছে। না। কৈ! কেউ নাই ত; কল্পনা! (বসিলেন সহসা উঠিয়া) ঐ যে আবার ডাকল! আবার! আরও কাছে। না। এ কল্পনা নয়। সরযূ আমায় ডাকছে। ঐ আবার! একি! তার স্বর কি রাত্রির আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে! ঐ যে আবার। এই যাই দিদি! ক্ষমা করো দয়াময়ী! (নিজের বক্ষে ছোরা মারিলেন)।" (পরপারেঃ ডি এল রায়)।

একটা স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত আবেগময় পরিস্থিতি গড়ে তোলা হয়েছে উদ্ধৃত অংশটির সাহায্যে। আজকালকার কোন নাটকে ঠিক এ ধরনের অংশ বড়ো একটা দেখা যায় না। দীর্ঘ স্বগতোক্তি কিন্তু এমনভাবে বাক্য সাজানো যে একঘেয়েমী ধরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা বরং মনকে ক্রমশই উদ্বেলিত করতে করতে পরিণতিতে পৌঁছয়। বাস্তবানুগ স্বাভাবিক বাক্যের সাহায্যে নাটকীয় আবেগ গড়ে তোলায় শরৎচন্দ্রের অপরিসীম

ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেলঃ

"দেবদাসঃ লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, তোমাদেরই ঘরে জমে থাকে পৃথিবীর সব অন্ধকার, সত্যের আলো, ন্যায়ের আলো, ধর্মের আলো, এই অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এমনি অন্ধকারে আত্মগোপন করে, সব ভুলে থাকতে চাই বলেই এখানে এসে মদ খাই, তোমার আকর্ষণে তোমার বাড়ী আসি না। বুঝলে রূপসী চন্দ্রমুখী?

চন্দ্রমুখীঃ কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বললে, শুনতে মন্দ লাগলো না। কিন্তু সত্যি কথা যে বলা হলো না তা স্বীকার করতো?

দেবদাসঃ কি বলতে চাও তুমি?

চন্দ্রমুখীঃ কলকাতায় রূপ বেচাকেনা কেবল আমার ঘরটিতেই হয় না। আমার ঘরের চেয়েও অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে অনেক রূপের ফিরিউলি, অনেক অভাগী, বড় দুঃখে দিন গুজরান করে, তাদের কারু ঘরে না গিয়ে আমারই ঘরে আস কেন?

দেবদাসঃ ওরে রাক্ষুসি, তোকে দেখে যে আমার আর একজনের কথা মনে পড়ে!

চন্দ্রমুখীঃ দেবদাস! দেবদাস! তোমার পায়ে পড়ি দেবদাস, আমার সঙ্গে তার তুলনা করো না।

দেবদাসঃ সেই তেজ, সেই দর্প; সেই তাচ্ছিল্য,, আমার গর্বের সামগ্রী। তেমন আর একটি নারীর অস্তিত্ব আমি কোন মতে সইতে পারি না। দেখতে পেলেই অপমানভরে ঘৃণা ঢেলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই!"

(দেবদাসঃ শরৎচন্দ্র)

কথাগুলির উচ্চারণ আপনা থেকেই মনকে উচ্ছল করে তোলে। ঘটনার প্রকৃতি ও চরিত্রের মানসিক ছন্দকে সহজ শব্দের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার এমন দৃষ্টান্ত কমই পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করা চলে বলে সকলেরই গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। এর প্রধান বাধা হয় সংলাপ গঠনে। অনেক ক্ষেত্রে তা দেখাও গিয়েছে। গল্প উপন্যাসের পাঠকের মনে গতি ও ঘটনার পরিসর উপলব্ধিতে আসে এক পথ ধরে; নাটক দর্শকের ক্ষেত্রে আসে আর এক পথ ধরে। কাজেই উপন্যাসে চরিত্রদের মুখে যে সংলাপ থাকে তা নাটকের রূপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমজোরি বা বিসদৃশ লাগা স্বাভাবিক। ঠিকমতো নাটকীয় রেশ গড়ে তোলায়ও অক্ষম হয়। সংলাপের জোর অর্থে ঝঙ্কার বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ নয়, অত্যন্ত সরল কথার সাহায্যে যে কি চূড়ান্ত নাটকীয়তা সৃষ্টি করা যায়, রবীন্দ্রনাথে রয়েছে তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণঃ

"নেপথ্যেঃ আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজা-পূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসবো। আমাকে দুর্বল করো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনীঃ বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যেঃ নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনীঃ আমি চাই সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে আমি ঘৃণা করি।

নেপথ্যেঃ ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূর্ণ করবো। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনীঃ পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বারোদ্ঘাটন) ওকি! ওই কে পড়ে! রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজাঃ কি বললে। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনীঃ হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজাঃ ও কেন বললে না ওর নাম। কেন এমন স্পর্ধা করে এল।

নন্দিনীঃ জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা ও জাগে না কেন!

রাজাঃ ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক তোরা, সর্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।"

(রক্তকরবীঃ রবীন্দ্রনাথ)

উপরের উদাহরণগুলির সাহায্যে চরিত্র ও ঘটনার ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সংলাপে নাটকীয় রেশ জাগিয়ে রেখে দেওয়ার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। নাটকের বিশেষ প্রকৃতির সংলাপ গঠনের আরও বহু উদাহরণ আগেকার অনেক নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় যতো নাটক অভিনীত হচ্ছে তার নব্বুই ভাগই 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন,' 'কর্ণার্জুন,' 'রঘুবীর,' 'সীতা,' 'আলমগীর' বা 'শেষরক্ষা,' 'নিষ্কৃতি,' 'চরিত্রহীন,' 'দেনাপাওনা' ইত্যাদি আগেকার নাটকাবলী।

বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধচন্দ্র সেন

পঁচিশে বৈশাখ বাঙালির জাতীয় পুণ্য দিবসে পরিণত হয়েছে। বাঙালির জাতীয় জীবনে ঐ দিনটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ও মর্যাদা আছে। একজন শ্রেষ্ঠ কবির জন্মদিন বলেই যে ওই দিনটি বিশেষ গৌরব অর্জন করেছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি বা মনীষীমাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঙালির মনোজীবনেরই স্রষ্টা। বাঙালির জাতীয় জাগরণের প্রথম উদ্‌বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর পূর্বে কেউ সমগ্র বাংলা দেশকে আহ্বান করে বলেন নি, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাঙালি জাতি সর্ব-প্রথম নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছে। খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাংলা তাঁর সাধনার ফলেই তার জাতীয় জীবনের অখন্ডতাকে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ঘটেছিল বাংলার উদ্‌বোধন, আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাংলার অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে বাঙালি শুনেছে তার জীবনযজ্ঞের ঋক-মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনেছে তার সামগান। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের ঋষি, সে মন্ত্রের সংহত রূপ 'বন্দে মাতরম্'; আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা, সে মন্ত্রের পূর্ণরূপ হচ্ছে রাখিসংগীত—বাংলার মাটি বাংলার জল। এই রাখিমন্ত্র হচ্ছে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রেরই কাব্যভাষ্য। এই রাখিমন্ত্রের যোগেই তিনি বাঙালির দেহে পরিয়েছিলেন রণ-ক্ষেত্রের রক্ষাকবচ, তার হাতে বেঁধেছিলেন অচ্ছেদ্য মিলনসূত্র, আর তার জীবনাকাশে এনেছিলেন তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়। এই মন্ত্র দর্শনের পঞ্চাশ বৎসর পরে পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষ্যে আজ ওই মন্ত্রটির পুনরুচ্চারণ করছি।—

> বাঙালির পণ বাঙালির আশ।
> বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
> সত্য হউক সত্য হউক
> সত্য হউক হে ভগবান্।
> বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
> বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
> এক হউক এক হউক
> এক হউক হে ভগবান্॥

এই বঙ্গমন্ত্র আজ আমাদের কণ্ঠে প্রকাশ্যে উচ্চারিত না হলেও আমাদের অন্তরের তন্ত্রীতে নিয়তই অনুরণিত হচ্ছে। আজ আমাদের কানে এই সাম-গীতির সুর ধ্বনিত না হলেও আমাদের প্রাণে চলেছে তার অবিরাম অনুপ্রাণনা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই মন্ত্র বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তার

মর্মে। আর আজও আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হচ্ছে এই মন্ত্রের ছন্দেই। এইকথা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে বলেই বাঙালি তার কবির মধ্যেই পেয়েছে তার স্রষ্টাকে এবং কবির জন্মদিবসকেই নিজের জন্মদিবস বলে অনুভব করে। এইজন্যই বাংলার নগরে গ্রামে যেখানেই আত্মো-পলব্ধির কিছুমাত্র স্ফুরণ ঘটেছে সেখানেই এই কবিপুণ্যাহের উৎসব-অনুষ্ঠান আপনা থেকেই দেখা দিচ্ছে। কবির এই জন্ম-পুণ্যাহ বাঙালি জাতিরই জন্মপুণ্যাহ। বাংলা দেশের এই জাতীয় দিবসের পুণ্যানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বাঙালির জাতীয় জীবনস্পন্দনের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিজীবনের হৃৎস্পন্দনের ঐক্য স্থাপনেব মহান্ কর্তব্য থেকে বিরত থাকতে চাই না। তাই আমিও আমার সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে এই পুণ্য ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে চাই।

শুধু যে কর্তব্য হিসাবেই বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে উদ্যত হয়েছি তা নয়। ব্যক্তিগত-ভাবে আমার অন্তরের প্রেরণাও রয়েছে এর পিছনে। তখন আমার বয়স আট বৎসর। পূর্ববঙ্গের কোনো একটি ছোটো শহরে থাকি; নিজের ক্ষুদ্র পরিবারের বাইরে বৃহৎ দেশ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। অবশ্য পাঠশালায় ছাত্রজীবনের কিছু কিছু স্বাদ পেয়েছি। এমন অবস্থায় পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে গিয়েছি মাতুলালয়ে, একটি অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র গ্রামে। হঠাৎ একদিন দেখলাম বাড়িতে বহু লোকজনের যাতায়াত, আলাপ-আলোচনায় প্রবল উৎসাহ। সে উত্তেজনার স্মৃতি এখনও মনে রয়েছে। শুনলাম বিকালে কি একটা অনুষ্ঠান হবে, বহু লোকসমাগম হবে, সে অনুষ্ঠানে আমারও ডাক পড়বে। আমার হাতে একখন্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হল; তাতে ছিল একটি কবিতা, সেটি মুখস্থ করে বিকালে জনসমক্ষে আবৃত্তি করতে হবে। আরও একটা অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। জীবনে এই প্রথম দেখলাম বাড়িতে রান্না হল না; সকলেই খই চিঁড়ে মুড়ি দুধ দই কলা খেয়ে দিন কাটালাম। আর সকলের হাতেই হলদে সুতো বেঁধে দেওয়া হল; আমার হাতেও। বিকালে আমার

কল্পনার অতীত সংখ্যায় সমবেত জনের সমক্ষে বালককণ্ঠে আবৃত্তি করে গেলাম—বাংলার মাটি, বাংলার জল ইত্যাদি কবিতাটি। দেখলাম সকলের হাতেই কবিতাটি মুদ্রিত আছে একখণ্ড সুদৃশ্য কাগজে। তার পরে অনেকে উঠে অনেক কথা বললেন। তবে একজন বিশেষ বক্তা ফুলের মালা গলায় বহুক্ষণ ধরে প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। তার কোনো কোনো কথা আজও ভুলতে পারি নি। শুনলাম কেন আমাদের সকলেরই বিলেতি কাপড়, চিনি, নুন ও সিগারেট ছাড়া প্রয়োজন। সেই আমার হৃদয়ে সর্ব-প্রথম অঙ্কুরিত হল বাংলাবোধ, স্বদেশ ও স্বজাতি-বোধ এবং দেশী-বিলাতি-পার্থক্যবোধ। সে বোধ তখন যতই অস্পষ্ট থাকুক না কেন সে অঙ্কুর কখনও শুকিয়ে যায় নি, যুগধর্মের প্রভাবে তা কালে কালে পল্লবিত ও পুষ্পিতই হয়েছে।

বলা বাহুল্য আমার এই বাল্যস্মৃতির উপলক্ষ্য হচ্ছে ১৩১২ সালের ৩০এ আশ্বিন অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরে বাংলা বিভাগ এবং একতাবদ্ধ অখণ্ড বাংলার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ। বাংলার জাতীয় জীবন সম্বন্ধে এই আমার প্রথম স্মৃতি। তার পূর্বে অবশ্য ৭ই অগস্টের (১৩১২ শ্রাবণ ২২) আলোড়নের কিছু কিছু ঢেউ গায়ে লেগেছিল। কিন্তু তার তাৎপর্য কিছুই বুঝিনি, শুধু ওই তারিখটার কথা পুনঃ পুনঃ কানে এসেছিল সে কথা মনে আছে। কিন্তু তিরিশে আশ্বিনের স্মৃতিই আমার জীবনে স্বদেশ সম্বন্ধে প্রথম স্মৃতি ও গভীরতম স্মৃতি। পরবর্তী জীবনের আর কোনো স্মৃতিই গভীরতায় বা তাৎপর্যের মহত্ত্বে এই প্রথম স্মৃতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

আমার জীবনে মন্ত্রের মতো কাজ করেছে যে কবিতাটি সেটি হচ্ছে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। তার পূর্বে অবশ্যই বাংলা পদ্যরচনা কিছু কিছু পড়ে থাকব, কিন্তু আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে তার কোনোটাই সঞ্চিত থাকে নি। কিন্তু সেখানে রত্নের মতো জ্বল জ্বল করছে বাংলার রাখিসংগীতটি। কিন্তু এই মন্ত্রের রচয়িতা কে, আমার হৃদয়ে বঙ্গানুভূতির

উদ্‌বোধক কে, সে কথা জেনেছি অনেক কাল পরে।

অতঃপর ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকে একটি কবিতা পড়লাম যা আমার হৃদয়কে অবিস্মরণীয়রূপে মুগ্ধ করল। কবিতাটির প্রথমেই আছে—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে;
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে॥

বঙ্গভূমিকে মাতৃ সম্বোধন! সে যে কি আলোড়ন তুলেছিল, কি অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল আমার হৃদয়ে,—ভক্তি প্রীতি না বিস্ময়?—তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। কবিতাটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। আমার চিত্তে বঙ্গানুভূতি গভীরতর হল এবং তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে থাকল রবীন্দ্রনাথের নাম।

১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগকে প্রতিরোধ করবার সংকল্প নিয়ে বাঙালি জাতি দেশে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তাকে আন্দোলন মাত্র বললে ইতিহাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। সে আলোড়নের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে বিপ্লব। এই বঙ্গ বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, এক হিসাবে বলা যায় তিনিই ওই বিপ্লবের অন্তরে যথার্থ প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছিলেন। বঙ্গ বিভাগের প্রতিরোধ চেষ্টা স্বভাবতঃই প্রবাহিত হচ্ছিল একমাত্র রাজনীতির খাতে। রবীন্দ্রনাথ তাকে সবলে আকর্ষণ করে চালিত করলেন সর্বাঙ্গীণ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পথে—সাহিত্যে সংগীতে শিল্পে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, এক কথায় বাংলার সমাজ-জীবনে। নিছক রাজনীতির সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে যখন সে জলস্রোত বন্যার রূপ ধরে বাংলার সামাজিক জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে প্রবাহিত হল তখনই সে আন্দোলন বিপ্লবে পরিণত হল। এই বিপ্লবে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষত সক্রিয় যোগ রক্ষা করেছিলেন অতি অল্প দিনই—১৯০৫ সালের কয়েক মাস মাত্র। কিন্তু স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তিরূপে ওই বিপ্লবে শক্তি জোগাচ্ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি"। শুধু বিশ্বভুবন নয়, স্বদেশকেও তিনি সত্যরূপে চিনেছিলেন গানের ভিতর দিয়েই এবং তাঁর স্বদেশবাসীকেও তিনি গানের দৃষ্টি দিয়েই স্বদেশকে চিনিয়েছিলেন। বঙ্গবিপ্লবের যুগে তিনি যে-সব গান রচনা করেছিলেন তার ভিতর দিয়েই বাঙালি সর্বপ্রথম অন্তর দিয়ে স্বদেশকে অনুভব করতে শিখেছিল।

এক সময় ছিল যখন তিনি নির্জীব নিষ্ক্রিয় বাঙালিকে ধিক্‌কারের আঘাতে জাগাবার চেষ্টা করতেন; আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার ব্রতই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।......
মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে॥
(—বঙ্গভূমির প্রতি, কড়ি ও কোমল)

বাঙালিকে ধিক্কার দিয়ে বললেন—

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা॥

(—বঙ্গবাসীর প্রতি, কড়ি ও কোমল)

তার এই বেদনার কারণ এই।—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙালি কই?
(—আহ্বান গীত, কড়ি ও কোমল)

অতঃপর বাঙালিকে জাগাবার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করলেন—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।......
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি॥
—ঐ, ঐ

মানসী কাব্যের যুগেও দেখি দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর প্রভৃতি কবিতায় 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব' বলে 'কথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান'কে অজস্র ধিক্কার দিচ্ছেন। তার কারণ এই।—

দূর হোক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভান,
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনাভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয় তলে
মরমতাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান॥
(—দেশের উন্নতি, মানসী)

সোনার তরীর যুগেও ওই একই বেদনা একই ভাবনা কবির চিত্তকে আলোড়িত করেছে।—

জগৎ মাতানো সংগীত-তানে
কে দেবে এদের নাচায়ে?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দেবে এদের বাঁচায়ে?......
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ?
(—বিশ্বনৃত্য, সোনার তরী)

এর পরেও বহুকাল 'শীর্ণ শান্ত সাধু' প্রকৃতির নির্জীব বাঙালি-চরিত্র তাঁর হৃদয়কে পীড়া দিয়েছে। তাই তিনি স্বদেশকে সম্বোধন করে বলেছেন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিও না ধরে।
(—বঙ্গমাতা, চৈতালি)

এই রচনাটিতেই বাঙালি চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। 'রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি' এই উক্তির মধ্যেই দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্ষোভ ও বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কল্পনা কাব্যের যুগেও দেখি বঙ্গলক্ষ্মী, মাতার আহ্বান, সে আমার জননীরে প্রভৃতি রচনাতে ওই একই দুঃখ গভীরতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

অবশেষে বাংলার মুমূর্ষু দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা দিল, বাঙালির স্রোতোবেগহীন জীবনধারায় জোয়ার এল বঙ্গ-বিভাগ-প্রতিরোধের সংকল্পকে উপলক্ষ্য করে। বলা বাহুল্য এ ঘটনা আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। তার আয়োজন চলছিল দীর্ঘকাল ধরেই। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বহু কণ্ঠের আহ্বানে বাঙালির জাতীয় জীবনে জাগরণের লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছিল। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠের প্রভাব কারও চেয়ে কম ছিল না। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার যোগে বাঙালিকে স্ব-রূপে দর্শনে প্রবৃত্ত করেছিলেন। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘ মাঝে অস্ত যাবার পরে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই নূতন পরিবেশে তিনি বঙ্গদর্শনের সহায়তায় বাঙালিকে বঙ্গের নূতন রূপ দর্শন করাতে প্রবৃত্ত হলেন। এমন অবস্থায় বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ্যে বাঙালির চিত্তে জীবনের ধারা প্রবাহিত হল বন্যার বেগ ধরে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের ক্ষোভ দূরে হল; উল্লসিত চিত্তে তিনি বাঙালির জীবন-জোয়ারে বেগ সঞ্চার করতে লাগলেন। তিনি গান ধরলেন—

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি॥

এক সময় ছিল যখন সাত কোটি কুসন্তানের জননী দীনহীনা দুঃখিনী বঙ্গমাতৃকার মঙ্গলমূর্তি দেখে তাঁকে লজ্জিতচিত্তে বলতে হয়েছিল 'নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল'। কিন্তু ১৯০৫ সালের বাঙলার নূতন রূপ দেখে তাঁর হৃদয়ভার লঘু হয়ে গেল। এই প্রথম তিনি পরিপূর্ণ আনন্দের আবেগে গান ধরলেন—

...স্টিফান জাইগ

অলোকসামান্য প্রতিভাধর সব্যসাচী লেখক—গর্কি-রোলাঁর সহযাত্রী, মানবপ্রেমিক, শান্তিবাদী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদ্গাতা। কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ আত্মজীবনী জীবনী-সাহিত্য সাহিত্য-সমালোচনা দর্শন ইতিহাস ভূগোল—সাহিত্য-সংস্কৃতির হেন শাখা নেই যেখানে অনুপস্থিত তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। "......জাইগ অমানিশায় আচ্ছন্ন ইউরোপের শেষ মানব-সত্য-সন্ধানীদের প্রধানতম একজন সাহিত্যাচার্য। যে-ইউরোপ চিরকাল সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবে তাকে জানতে হলে জাইগের সঙ্গে পরিচিত আমাদের হতেই হবে।" —বলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

• • বাংলায় অনূদিত জাইগের কয়েকটি উপন্যাস • •

সেই আশ্চর্য রাত

TRANSFIGURATION ॥ জনতা-জীবন কী বিচিত্র, বহুধাবিস্তৃত! জীবন্ত এই জীবনের সান্নিধ্যে অহমের দুর্গে অন্তরীণ এক মানুষের জীবনায়নের রহস্যনিবিড় কাহিনী। দু'টাকা ॥

• বেঙ্গল পাবলিশার্স •

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সেতুবন্ধ

FEAR ॥ পরপুরুষে আসক্তা এক জননী-জায়ার অন্তর্দ্বন্দ্বের মিলনান্ত ইতিকথা। প্রেম যদি থাকে দাম্পত্যের মূলে, কী তাহলে আসে-যায় সাময়িক পদস্খলনে! দু'টাকা ॥

• ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং •

৭, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রিয়তমেষু

LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN ॥ প্রেমে ব্যর্থ জীবনে বঞ্চিত এক নারীর বেদনামথিত অশ্রুসিক্ত ইতিহাস। ছায়াচিত্রে রূপায়িত। অভিনব পদ্ধতিতে মুদ্রিত প্রচ্ছদ। উপহারে অনন্য। আড়াই টাকা ॥

• ক্যালকাটা বুক ক্লাব •

৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

রাজসূয়

THE ROYAL GAME ॥ নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের পটভূমিকায় মনস্তত্ত্বমূলক অসাধারণ উপন্যাস। বিশ্বসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে সর্বজন-স্বীকৃত। দু'টাকা ॥

• টি কে ব্যানার্জি এণ্ড কোং •

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অন্তর্জ্বালা

THE BURNING SECRET ॥ কৈশোরের কুয়াশা অতিক্রম করে যৌবনে উত্তরণের বেদনামধুর বিচিত্র কাহিনী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা সম্বলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। দু'টাকা চার আনা ॥

• লেখাপড়া •

১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গোধূলির গান

AMOK ॥ ভালোবাসা ও ঘৃণা, জীঘাংসা আর জীবন-প্রেমের অত্যাশ্চর্য শিল্পায়ন। পাশবিক এক প্রেমের অতি-মানবিক কাহিনী। অনুবাদকের বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত। দু'টাকা ॥

• ক্যালকাটা পাবলিশার্স •

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়...

একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী। নিজেও মৌলিক স্রষ্টা বলে তাঁর অনুবাদ হয়ে ওঠে অনুপম এক-একটি শিল্পকর্ম। উপরিউল্লিখিত বইগুলি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। তাই না সমালোচকরা একবাক্যে বলেন—কিন্তু সমালোচকদের কথায় কাজ কী, নিজে পড়ুন ঃ বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে আপনিও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠবেন।

আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী?...
কোথা সে তোর দরিদ্রবেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি,
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও তরণী।
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে,
হৃদয়-হরণী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে
আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেল
সোনার মন্দিরে॥

বঙ্গ-বিভাগের দুর্দিনে বাঙলাদেশের শক্তিমূর্তি দেখে, 'নিদ্রারসে ভরা' বাঙালীর জাগ্রত ও উদ্যত রূপ দেখে তিনি উল্লসিত-চিত্তে সেই বঙ্গ-বিপ্লবের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করতে লাগলেন তাঁর গান দিয়ে, তাঁর বাণী দিয়ে। সে গান ও বাণীর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা সংগত যে, ওই বিপ্লবের বহু কার্যকলাপ তিনি পছন্দ করেননি, ফলে দেশনায়ক হিসাবে তিনি তার সংগে সক্রিয় সংযোগ রাখেন নি। কিন্তু ভুল হক, ভ্রান্তি হক, তবু বাঙালী যে জেগেছে, তাতেই তাঁর আনন্দ, তাতেই তাঁর কবিচিত্ত পরিতৃপ্ত। ফলে দেখতে পাই একদিকে তিনি সমালোচকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তখনকার দিনের কার্য-ক্রমের বিচার-বিশ্লেষণ করছেন, সফলতার সদুপায় সম্বন্ধে পথনির্দেশ করছেন, দেশের মধ্যে আত্মশক্তি জাগাবার ও স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করছেন এবং অপরদিকে বিপ্লবযুগের কবি-নায়কের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে জাতীয় অভ্যুত্থানের পালে ঝড়ের বেগ জুগিয়ে চলেছেন। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে ডেকে বললেন—

এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা
হাতে হাতে ধর গো,
আজ আপন পথে ফিরতে হবে,
সামনে মিলন-স্বর্গ। ...
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে,
দেরি কেন করিস তবে,
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে,
মরতে হয় তো মর গো॥

নির্যাতিত দেশকর্মীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "বাঙলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাঙলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে ভূষিত করিয়াছে। ...তাঁহাদের জীবন সার্থক।"

অতঃপর বাঙলার বিপ্লবপ্রবাহ যখন রুদ্ররূপ ধারণ করল, তখনও তাঁকে দৈবত

বাণী উচ্চারণ করছেন, দেশকে সত্যপথের নির্দেশ দিচ্ছেন, আর দেশের সম্মুখে তুলে ধরছেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর আদর্শ। পক্ষান্তরে দূরে ঈশানের কোণে আকাশে ঘন-ঘোর মেঘোদয় দেখে তাঁর কবিচিত্তে শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো বিকশিত হয়ে উঠল। স্মরণীয় 'দুর্দিন' কবিতাটি। --

ঐ আকাশ-পরে আঁধার মেলে
কি খেলা আজ খেলতে এলে,
তোমার মনে কি আছে তা জানব না।
আমি তবুও হার মানব না, হার মানব না।
তোমার সিংহভীষণ রবে,
তোমার সংহার-উৎসবে,
তোমার দুর্যোগ-দুর্দিনে
তোমার তড়িৎশিখায় বজ্রলিখায় তোমায় লব চিনে;
কোনো শঙ্কা মনে আনব না গো আনব না।
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে
কিম্বা পড়ি মাটির পরে
তবুও হার মানব না, হার মানব না।
আজ আঁধারে ঐ শূন্য ব্যেপে
কণ্ঠ আমার ফিরুক কেঁপে,
জাগিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা ঝড়ের ঝঞ্ঝনা॥

অরবিন্দের কারাবরণ উপলক্ষে তাঁকে অকুণ্ঠ কণ্ঠে নমস্কার জানিয়ে বললেন—

দেবতার দীপ-হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র-দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা। ...
তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণ-পিঞ্জর টুটি, বজ্র-গর্জরব
ভেরীমন্দ্রে মেঘপুঞ্জে জাগায় ভৈরব,
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ-মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে তিনি দেশবাসীকে শোনালেন—

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।
অঙ্গ বেড়ি দিল বেড়ী
বিনা দামের অলঙ্কার।
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর॥

এই অভয় সঙ্গীতেরই আর এক রূপ এই—

ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই;
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি
দেখি নাই।
তুমি দু'হাত তুলে আকাশপানে
মেতেছে আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারী
যাই॥

'মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে'র যে কবি একদিন পঞ্জাব-মহারাষ্ট্রের কাহিনী অবলম্বন করে বাঙালির সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন বন্দী বীরের আদর্শ—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'—সে কবি আজ বাঙলাদেশের পূর্ব-গগনে দুর্দিনের মেঘগর্জন শুনে তাকেই 'সুপ্রভাতের রাগিণী' বলে বরণ করে নিলেন, আর বাঙালীকে শোনালেন নব-যুগের অভয়মন্ত্র—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,—
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।
হে রুদ্র তব সঙ্গীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী,
মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়-ডমরু বাজাবো,

ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাবো॥

এসব বাণীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। এসব বাণী এককালে বাঙালির হৃদয়ে কি অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তা আজ আর অবিদিত নাই। যে বাঙালিকে একদিন তিনি 'চিরশিশু' ও অ-মানুষ বলে ধিক্‌কার দিয়েছিলেন, ১৯০৫ সাল থেকে সেই বাঙালিকেই তিনি চালনা করলেন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমরত্ব লাভের পথে।

সেই ১৯০৫ সালের পরে পঞ্চাশ বৎসর বিগত হয়েছে। অর্ধ-শতাব্দী পরে আজ বঙ্গ-বিভাগ প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ বাঙালি জাতির কবিনায়ক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। বাঙলার আজ বড়ই দুর্দিন। এখন বাঙলা দ্বিধাবিভক্ত নয়, বহুধা-বিভক্ত। এই দুর্দিনে বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতাকে—"Thou shoulds't be living at this hour" বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলব না। কারণ তাঁর বাণী এখনও আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর প্রেরণা এখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নি। বর্তমান বৎসরে তাঁকে স্মরণ করবার তিনটি দিন প্রশস্ততম। এক, তাঁর জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ, যে কবি-নায়ক আমাদের শুনিয়েছেন 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ', তাঁর জন্মদিন বাঙালী জাতিরই জন্মদিন বলে স্বীকার্য। দুই, ৭ই অগস্ট বা ২২এ শ্রাবণ। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে এই দিনেই বাঙালি বিভাগ প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করে। আবার এই দিনেই রাখি-পূর্ণিমার অবসানে রাখি-বন্ধনের প্রবর্তক ও বঙ্গমন্ত্রের দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। তিন, ১৬ই অক্টোবর বা ৩০এ আশ্বিন। এই দিনেই বিদেশী সরকারের হুকুমে বাঙলা বিভক্ত হয় এবং এই দিনেই বাঙালী পরস্পরের হাতে মিলনসূত্র বেঁধে দিয়ে ও সমবেত কণ্ঠে বাঙলার ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করে বিভাগ প্রতিরোধের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে বঙ্গ-কবি নিজে জেগে উঠে মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুকে প্রাণ দিয়েছিলেন, বাঙলার প্রাণদাতা সেই কবির জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

শিবনারায়ণ রায়

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করার পথে দুটি মস্ত বাধা আছে। প্রথমত, সাধারণ রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে খুব কম লোক তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচিত। ফলে তাঁর বিশেষ বিশেষ ছবি নিয়ে আলোচনা করলে অনেকের কাছেই তা অবোধ্য ঠেকবে। দ্বিতীয়ত, এই কর্তা-ভজার দেশে গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে এমন একটি বিচার-বিমুখ ভক্তি গদগদ ভাব গড়ে উঠেছে যেটি অন্তত তাঁর আঁকা ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কেননা, ছবি আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে যতই চমক লাগান না কেন এক অন্ধ ছাড়া কারো মনেই তাঁর আঁকা ছবি ভক্তি ভাবের উদ্রেক করে না। ছবি আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর যাই হোন ঋষি নন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে ঋষি দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মুখে বারবার একথা শুনে এ বিষয়ে আমাদের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে তাঁর ছবি সম্বন্ধে কোনো যথার্থ আলোচনা করতে হলে প্রথমেই এই অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আঘাত হানতে হয়। আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধিতা করা যে কি সাংঘাতিক কাজ সোক্রাতেস হতে রাম-মোহন রায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রেখে গেছেন।

তবু সেই কারণেই আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির বিষয়ে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ আলোচনা হতে চিত্রকর বা চিত্রানু-রাগীরা কতটা লাভবান হবেন বলা শক্ত, কিন্তু এর ফলে রবীন্দ্র প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের বোধ যে আরো গভীর এবং যথার্থ হয়ে উঠবে তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কেননা এ ছবিগুলি হতে শুধু একথাই জানা যায়না যে লিওনার্দো কি মিকেলাঞ্জেলোর মত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও বহুমুখী ছিল; এরা এ সংবাদও বহন করে যে রবীন্দ্র-মানস আমাদের মুগ্ধ কল্পনায় যতখানি নিটোল দ্বন্দ্ব-বিহীন, সম্পূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়ে এসেছে ঠিক ততখানি তা ছিল না। লিওনার্দোর মত না হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও যে বহুমুখী ছিল, একথা সবারই জানা। কিন্তু সে প্রতিভাও যে পুরোপুরি অন্তর্বিরোধিতার হাত এড়াতে পারেনি এ সত্য খুব কম রবীন্দ্রানু-রাগীরই নজরে পড়েছে। অথচ রবীন্দ্র-নাথকে যদি আমরা নির্ভেজাল ব্রহ্মজ্ঞানী বানিয়ে আমাদের জীবন হতে বিদায় দিতে না চাই, অন্তরঙ্গতাহীন অমরত্বকেই যদি আমরা শিল্প প্রতিভার চরম পুরস্কার মনে না করি, রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক মনের মধ্যে যোগসাধন যদি আমাদের নিষ্প্রয়োজন না মনে হয়, তবে রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যে অন্তর্বিরোধের যে আভাস এই ছবিগুলি হতে পাওয়া যায় তার প্রতি উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। স্বীকার করি এই বিরোধ রবীন্দ্র প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়; তিনি মনতেন, সেক্সপীয়র কি গ্যয়টের উত্তরসাধক নন, তিনি মূলত শান্তির, প্রেমের, প্রত্যয়ের কবি। তবু তাঁর জীবনে এবং শিল্প সাধনায় অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা যে একেবারে অবর্তমান ছিল না, জীবনের কোনো একটি অধ্যায়ে তাঁর চেতনা যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎ-চন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য

বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকদের তুলনায় আধুনিক মনের অনেক বেশী নিকটবর্তী হয়েছিল, ছবিগুলির আলোয় তার রচনাবলী ফিরে পড়লে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই অবহেলিত দিকটি সম্ভবত ধরা পড়বে। সুতরাং চিত্রজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে আলোচনা করুন বা নাই করুন (এতাবৎ তাঁরা করেননি), সৎ রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেরই এদিকে অবহিত হবার প্রয়োজন আছে।

(২)

তাঁর মৃত্যুর পরে আবিষ্কৃত স্টেলার-জন্য-জর্ণালে ডীন সুইফটের যে চেহারাটি ধরা পড়েছিল তা যেমন অপরিচিত তেমনি অপ্রত্যাশিত। তাঁর জীবিতকালে সমসাময়িক ইয়াহু-রা তাঁর শানিত বিদ্রূপকেই চিরদিন ভয় করে এসেছে। কে জানত এই মানুষই সসঙ্কোচ জর্নালের পাতায় পাতায় এত মমতা আর অনুরাগ, এত স্বপ্ন আর বেদনা সংগোপনে সঞ্চিত করে রেখেছিল। তাঁর শিল্প যেন কোন জিঘাংসু মনের উদ্যত খড়্গ। আর জার্নালের পাতায় লুকিয়ে আছে এক আর্ত আহত শিশু মুখ—একান্তভাবে সে ভালবাসতে চায়, চায় ভালবাসা পেতে।

সংসারে যারা সুইফ্‌টের মত তীক্ষ্ন অনুভূতিশীল মানুষ—আর কি সে সংসার! সন্দেহ, ভয় আর নিষেধকে দেবতা বলে পুজো করাই যার ধর্ম—অনেক সময়েই তারা তাদের জীবনকে এক অবোধ্য, অস্বচ্ছ, স্ববিরোধী উপাখ্যান করে তোলে। যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরাই শুধু নিজেদের ভিতরকার পরস্পর বিরোধী বৃত্তিকে চিনতে পারেন, জানতে পারেন, জটিল এবং জঙ্গম সমগ্রতায় মেলাবার সাধনা করতে পারেন। শ্রেয়-র নামে প্রেয়-কে বলি দেবার বিবেকী প্রলোভনে তাঁরা ধরা দেন না। গ্যয়টের জীবন সত্তার এই সমগ্রতা অর্জনের এক আশ্চর্য সাধনা: ফাউস্টের মত মেফিস্টোফেলেস্ ও তাঁরি সত্তার অপর রূপ। টলস্টয়ও একদিন চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে এক-মনের পরিপূর্ণ দাবী মেটাতে গিয়ে তাঁকে নির্মম অধ্যবসায়ে অপর-মনকে মুছে ফেলতে হয়েছিল।

আমাদের যুগের সার্থকতম জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে এমনিতর

প্রচ্ছন্ন তবু গভীর আত্মবিরোধ নিহিত ছিল, তাঁর অনুরাগীবৃন্দ সাধারণত তা স্বীকার করেন না। তিনি নিজেও সে বিষয়ে সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। অন্তত তাঁর প্রকাশ্য জীবনে—আর সাধারণ স্বীকৃতি লাভের পর হতে তাঁর জীবনের বেশীটাই ত' প্রকাশ্য—এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে এ ধরনের আভ্যন্তরীণ বিরোধবোধের চিহ্ন আপাতদৃষ্টিতে বড় একটা চোখে পড়ে না। তবু তাঁর বিচিত্রমুখী প্রয়াসের বিশেষ একটি ক্ষেত্রে এই বিরোধের উপস্থিতি প্রবলভাবেই স্পষ্ট—আমি তাঁর আঁকা চিত্র এবং স্কেচ্গুলির কথা বলছি। এদের মধ্যে যে মুখের আদল ধরা পড়েছে, আমাদের সকলের বিস্মিত বিমুগ্ধ চেনাজানার আপোল্লোনিয়ান মুখশ্রীর সঙ্গে তার সুদূরতম সাদৃশ্যও আবিষ্কার করা কঠিন। তাঁর পরিণত জীবন এবং শিল্প-সৃষ্টিকে আমরা সত্যশিবসুন্দর বা হেলেনিক "টো-আগাথন"এর নিকটতম রূপায়ন বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু এই ছবিগুলির মধ্যে যাঁকে দেখা গেল তাঁর মেজাজ নিতান্তই ডাওনিসিয়ন—আদিম এবং গ্রোটেস্ক্—সে মুখের রেখাকৃতি জ্যামিতিক সুষমার প্রতিবাদী, তা স্থূল, গুরুভার, অস্বচ্ছ, জান্তব আবেগে থরথর।

এই ছবিগুলির আড়ালে কোনো এক প্রবল এবং প্রাক্চেতন অস্বস্তি যেন ওৎ পেতে আছে। প্লেটো দেখলে বলতেন এদের প্রলম্বিত সংসর্গ অস্বাস্থ্যকর, বুদ্ধির গোড়ায় পচ ধরাতে পারে। সময়ের যে নগণ্য খণ্ডের নাম সভ্যতার ইতিহাস, এদের জগৎ তা হতেও প্রাচীন, এদের উদ্ভব মানবসত্তার প্রাক্-সাংস্কৃতিক স্তরের গভীরে। চৈতন্যের সাধনা হোল এই গভীরকে আলোকিত করা, আমাদের অন্ধ জৈব বৃত্তিগুলিকে সুষমিত করে সত্তার সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে মুক্তি দেওয়া। এ ছবিগুলিতে সে সাধনা শুধু অনুপস্থিত নয়, অস্বীকৃত। এদের আবহাওয়া ভিজে, ভয় দেখানো, বন্য বললেও বুঝি ভুল হয় না—, শ্বাসরোধী, সূর্যবিহীন। দালি কিম্বা আরন্স্ট কিম্বা মাঝ-বয়েসী পিকাসোর সচেতন (আর সেই কারণে স্ব-বিরোধী)

ছবিগুলির চাইতেও এরা একান্ত এবং মারাত্মকভাবে সুর্‌রিয়ালিস্ট।

আমি জানি আমার এ প্রস্তাব রবীন্দ্র ভক্তেরা উষ্মিত উপেক্ষায় নাকচ করতে চাইবেন। এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মহত্ব এতটুকু খর্বিত করার অভিপ্রায় আমার নেই, এজাতীয় ভাবাবেগকে তাই আমি অশ্রদ্ধেয় ভাবতে পারিনে। কিন্তু ভক্তিতে যদি বা কৃষ্ণ মেলেন, প্রত্যক্ষের অস্বীকারে জ্ঞান মেলে না। আর দার্শনিক ও শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ এবং ছবি আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে একটা মস্ত চওড়া খাদের উপস্থিতি বেখাপ্পা চমক লাগানোভাবেই প্রত্যক্ষ। শুধু চোখ ঠেরে সে খাদের ওপরে সেতু গড়বার ভরসা সামান্য। খাদটা যে অন্তত প্রত্যক্ষ, এটা না মানলে সেতু গড়ার কথাই উঠতে পারে না। সেটা আসলে বাহ্য না তাঁর পরিণত সত্তার অনপনেয় চারিত্রিক, তাঁর অন্তর্জীবনের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের সার্থক বিচার সম্ভবপর নয়। সে কাজ এখনো শুরু পর্যন্ত হয়নি। জীবনী এবং স্মৃতিকথা নামে যেসব মালমসলা বই অথবা প্রবন্ধ আকারে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে শুধু কিছু ঘটনার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে খোঁজ মেলে। আমাদের সমসাময়িক বা ভবিষ্যকালের যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তার এই অন্তরকাহিনী লিখবেন, মহৎসৃষ্টির অমরতা যে তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে যতদিন না সে তথ্যাবলীর সংগ্রহ, বিচার এবং সুষমিতবিন্যাস ঘটছে ততদিন এই প্রত্যক্ষ স্ববিরোধ সম্বন্ধে নানা রকম আন্দাজ পেশ করবার হয়ত কিছু সার্থকতা আছে। এটা মোটমাট জানা যে অংকন শিল্পরীতিতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন শিক্ষালাভ করেননি। যদি বা মাঝ বয়সে শখ করে দু দশখানা ছবি আঁকার জন্যে অধ্যবসায় করেও থাকেন, সে চেষ্টা মূলত অপরের চিত্রকে মডেল করে ব্যর্থ অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের স্বকীয় অংকন-রীতির উদ্ভব বাহ্যত এক ধরনের খেয়াল খেলার মধ্য হতে। নিজের নানা রচনার প্রথম খসড়া লেখার সময়ে পাণ্ডুলিপিতে যখনি কিছু কাটাকুটি মার্জনার দরকার পড়ত, তখন এই শৌখীন মানুষটি অনেক সময়ে অনবগত মনে সেই কাটাকুটিগুলিকে মোটা রেখায় একত্র সম্বন্ধ করে দিতেন,

আর তারি ভিতর হতে কখনো কখনো বা নানা অদ্ভুত আকার গড়ে উঠত। এর উদ্দেশ্য আর যাই হোক ছবি আঁকা ছিল না। কাটাকুটির এই ডিজাইনগুলি ছিল শব্দশিল্পীর প্রকাশ সাধনার মাঝে মাঝে ফাঁক-ভরানোর চিহ্নমাত্র। কিন্তু গোড়াতে যা ছিল অবসর বিনোদন, ক্রমেই তার সম্ভাবনা-সম্পদ প্রবল প্রলোভনের বিষয় হয়ে উঠল; অবশেষে ভালো লাগার খেলা হল ভালবাসার আসক্তি। প্রথম প্রথম প্রবীণ শব্দশিল্পী তাঁর এই নিতান্ত অপরিণত প্রণয় নিয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করতেন—এমন কি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছেও এই নতুন মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল উপস্থিত করতে তাঁর রীতিমত উদ্বেগ ও সংকোচ লাগত। পরে অবশ্য, অন্তত কয়েক বছরের মত, এই নতুন প্রণয়ের হাতে নিজেকে তিনি বেপরোয়াভাবে ছেড়ে দেন—আর এই সময়টায় তাঁর নানা উদ্ভট কাহিনী ও ছড়ার সঙ্গে অজস্র এলোমেলো স্কেচ আঁকা ছাড়াও বিশেষ অভিনিবেশের সাথে নিয়মিতভাবে বহুসংখ্যক রঙগীন ছবিও তিনি আঁকেন। শেষ পর্যন্ত বোধ-হয় এই বেয়াড়া আসক্তিতে তাঁর ক্লান্তি এসেছিল। সে কি এই অপরিচিত মাধ্যমের অন্তর্লোকে কোনোদিনই প্রবেশ করতে পারলেন না, সে কারণে? অথবা যে সব প্রাক্‌চেতনিক তাগিদ তাঁকে ভাষার সচেতন জগৎ হতে চিত্র পটের অর্ধচেতন জগতের দিকে ঠেলেছে, তারা শেষ পর্যন্ত দুর্বল, অবসিত হয়ে গিয়েছিল?

(৩)

নৃতাত্ত্বিকদের অসীম অধ্যাবসায়ী গবেষণার ফলে এটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে আজ হতে তিরিশ হাজার বছর আগেও মানুষ ছবি আঁকত। এ হতে বোঝা যায় যে প্রায় প্রথম হতেই মানুষ অন্য জীবদের মত শুধু টি'কে থাকার লড়াইকে নিজের নিয়তি বলে মেনে নিতে পারেনি, সে লড়াইকে আত্মপ্রকাশের সাধনায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছে এই সাধনারই অন্যতম ফল শিল্প প্রতি শিল্পেরই নিজস্ব মাধ্যম এবং রীতি প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন সুরের মাধ্যম ধ্বনি, চিত্রের মাধ্যম রং এবং রেখা সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। এর মধ্যে সুরের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং মাধ্যমের সম্পর্ক সব চাইতে অপরোক্ষ এবং সে কারণে সঙ্গীতে স্ববিরোধ এবং আত্ম সচেতনতা সবচাইতে কম। অপর পক্ষে যেহেতু ভাষা সমাজ নির্ভর, সে কারণে সাহিত্যে, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যে, শিল্পী এবং মাধ্যমের সম্বন্ধ স্পষ্টত পরোক্ষ এবং ফলে সাহিত

কল্পনায় সব বিরোধ এবং আত্ম সচেতনতা এক রকম অনিবার্য। চিত্র শিল্পের প্রকৃতি সম্ভবত এ দু'এর মধ্যবর্তী।

আলটামিরার গুহায় আঁকা জীব-জন্তুর যুগ হতে শুরু করে আধুনিক কালের পীট মনড্রিয়ান কি যামিনী রায় পর্যন্ত নানা দেশের চিত্রশিল্পীরা যে নানা মেজাজে নানা রীতিতে ছবি এ'কেছেন, মোটামুটি তা থেকে চিত্র-শিল্পের তিনটি মূল ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ধারাটি ছন্দ প্রধান, দ্বিতীয়টি রূপ প্রধান এবং তৃতীয়টি সাদৃশ্য প্রধান। অবশ্য সব সৎ ছবিতেই ছন্দ, রূপ এবং সাদৃশ্য তিনটি লক্ষণই মিলেমিশে কম-বেশী উপস্থিত থাকে। তবে কারোর সমগ্রতা বা ছন্দের পরে বিশেষ করে নির্ভর করে, কারো বা রূপের পরে, কারো বা সাদৃশ্যের। কথার সাহায্যে এ পার্থক্য ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে উদাহরণ দিলে হয়ত প্রভেদটা স্পষ্টতর হবে। চীনে-ছবি বিশেষ করে ছন্দ প্রধান, ভারতীয় ছবি অজন্তা বাঘ হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত রূপ প্রধান এবং রেনেসাঁস হতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা মুখ্যত সাদৃশ্য প্রধান। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য উপরোক্ত বিবরণের ব্যতিক্রম আছে। তবে ব্যতিক্রমের দ্বারা সাধারণ প্রস্তাব বাতিল হয় না, মার্জিত হয় মাত্র। প্রাচীন চীনদেশের শিল্প-শাস্ত্রে ছন্দকে শিল্পের প্রথম এবং প্রধান অংগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিয়েহ্ হো একেই বলেছেন চি-ইয়ুন্ শেঙ্-টুঙ্। পেত্রুচ্চি একে অনুবাদ করেছেন la consonance de l'esprit engendre le mouvement বলে। ওকাকুরা আরো স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় একে বলেছেন rhythmic vitality. অপর পক্ষে ভারতীয় বৌদ্ধ এবং হিন্দু শিল্পী ও শিল্পাচার্যদের আলেখ্যে এবং শিল্পালোচনায় রূপের দিকটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। হিন্দু শিল্প-শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণনা আছে কি ভাবে শিল্পী আকাশ হতে বস্তু সম্পর্ক-হীন বা অ্যাবস্ট্রাকট্ রূপকে ধ্যানযোগে আকৃষ্ট করে বাহ্য মাধ্যমে আকার দান করেন। এ কল্পনার সঙ্গে পিথাগোরাস এবং প্লেটোর দর্শনের মিল সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্তী কালে যশোধর পণ্ডিত

কামসূত্রের টিকা করতে যেয়ে চিত্রের যে ষড়ঙ্গের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্তত চারটি অঙ্গ মুখ্যত রূপ সংক্রান্ত রূপ ভেদ, প্রমাণ, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকা ভঙ্গ। এ দেশের ছবিতেও অবশ্যই ছন্দ আছে—ছন্দ ছাড়া কোন শিল্পই সম্ভব নয়—কিন্তু তার ঝোঁকটা রূপের পরে। অপর পক্ষে পশ্চিম ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী হতে শুরু করে পরবর্তী প্রায় চারশ' বছর ধরে যে শিল্পরীতি বিকশিত হয়ে উঠে ছিল, তার সবচাইতে বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল verisimilitude বা সাদৃশ্য সত্য গুণ। ফান আইক বা উচ্চেল্লোর আলেখ্যে কি পিসানেল্লোর রেখাঙ্কনে ছন্দ এবং রূপ দুইই আছে। কিন্তু যেটি বিশেষ করে এদের আঁকাকে সজীব করেছে সেটি সাদৃশ্যের যাথার্থ্য। পরবর্তী কালে এই সাদৃশ্য সাধনা বিভিন্ন ধারায় আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে ডিউরের, টিশিয়ান, রাফায়েল, রুবেন্স্ রেমব্রাণ্ট্ ইত্যাদির ছবিতে।

এখন রবীন্দ্রনাথের ছবি এই তিনটি মূলধারার কোনটির মধ্যেই পড়ে না। তাঁর বহু ছবিতেই প্রাণ আছে, কিন্তু প্রায় কোন ছবিতেই ছন্দ নেই। যাঁর ব্যক্তিত্বের আর সব রকম প্রকাশের মধ্যেই ছন্দ ছিল, তাঁর ছবিতে ছন্দ নেই এ কথা বললে ভক্তরা নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যকে সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দেবেন। তবু যদি কেউ খোলা চোখে তাঁর ছবির পাশে সুঙ্গ যুগের যে-কোনো চীনা চিত্রকরের ছবি দেখেন তা হলে আমার কথাটি হয়ত একেবারে নিরর্থ ঠেকবে না। এ তুলনা যদি অসঙ্গত ঠেকে তবে তাঁর প্রায় সমসাময়িক শিল্পী মার্ক চাগালের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। দুজনেরই চিত্রকল্পনায় পুতুল, পাখী, পশু, স্বপ্ন-লোকের কিম্ভুত কিমাকারেরা আসর জমিয়েছে; কিন্তু চাগালের হাতে তারা হয়ে উঠেছে ছন্দময়। চাগালের ছবির যেটি বিশেষ লক্ষণ রেনি শোঅব যাকে বলেছেন, "ভালবাসা", হর্বার্ট রীড যাকে বলেছেন গীতধর্ম, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তার কোনো আভাস মেলে না।

ছন্দ নেই, কিন্তু রূপ? না, রং এবং রেখার উপাদানে রূপের সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করতে পারেননি। রূপের

সাধনায় রেখাই প্রধান, রং দ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথের রেখার হাত কাঁচা। কত কাঁচা পাকা শিল্পীদের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রিমিটিভ্ শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। আমাদের শিল্পাচার্যরা যাকে বলেছেন রূপভেদ, রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনদিনই আয়ত্তে আনতে পারেননি। অপর পক্ষে তাঁর বর্ণিকা ভঙ্গ অত্যন্ত স্থূল এবং সীমাবদ্ধ। তাতে না আছে মাতিসের বিশুদ্ধ বর্ণ-প্রয়োগ সঞ্জাত উজ্জ্বলতা, না আছে অবনীন্দ্রনাথের সক্ষ্ম রংমেশানোর ব্যঞ্জনা। ফলে রং এবং রেখাকে আশ্রয় করে যে লাবণ্য দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের পটে তার কচ্চিৎ সঞ্চার ঘটেছে।

আর সাদৃশ্য সত্যের অনুসন্ধান এবং চর্চা যে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিষয় ছিল না, তাঁর কিছু ছবিও যিনি একবার দেখেছেন তিনিই জানেন। এদিক হতে তাঁর ছবির মেজাজ নিতান্ত আধুনিক। তবে আধুনিকদের সঙ্গে তফাৎটা শুধু এই যে আধুনিকেরা বস্তু-রূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ অর্জন করে স্বেচ্ছায় সাদৃশ্য চিত্রণের পথ ত্যাগ করেছেন—আর তার জায়গায় ঝোঁক দিয়েছেন ছন্দ এবং রূপের পরে। রবীন্দ্র-নাথের ছবিতে প্রমা এবং পরিপ্রেক্ষিতের একান্ত অভাব; কিছু ছন্দ অথবা রূপের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হয়নি।

সুতরাং একথা এক রকম নিশ্চিত করেই বলা যায় যে চিত্রশিল্পের স্বকীয় সাধনা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম ছিল না। তবে তাঁর এই ছবি এবং স্কেচগুলিতে এত গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন কি? মহৎ প্রতিভার সাময়িক অবসর বিনোদন বলে তাদের বরখাস্ত করলেই ত হয়।

না, তা হয় না। হাজার অস্পষ্টতা সত্ত্বেও এই ছবি আর স্কেচগুলির মধ্যে এক প্রবল দুর্বোধ্য শক্তির উপস্থিতি আমাদের সত্তাকে আলোড়িত করে। যদি না জানা থাকত যে এদের স্রষ্টা একজন মহা-কবি, তবু এরা নিজেরাই এদের বোবা বিক্ষোভের জোরে আমাদের আকৃষ্ট করত। রবীন্দ্রনাথের যৌবন এবং প্রথম প্রৌঢ় বয়সের বহু গদ্য পদ্য রচনায় যার আভাস পাইনে এই ছবিগুলিতে সেই ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এরা বোবা তবু

জীবন্ত। আর যাই সম্ভব হোক এদের নিরর্থ বলে অবহেলা করা কঠিন।

যে ঐতিহ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে, তার নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা জায়গায় মস্ত দুর্বলতা ছিল। মানুষের কতকগুলো মৌল বৃত্তি, তাগিদ এবং জৈব ক্রিয়াকে পরম যত্নে অবদমিত করাকেই সে ঐতিহ্য আত্মসংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলে বিশ্বাস করত। অথচ আমাদের মনন শক্তি কিম্বা প্রতীকী সাধনার তুলনায় এই জৈব বৃত্তিগুলি কিছু আর ব্যক্তি সত্তার কম গভীরে ওতপ্রোত নয়। ফলে কোন সংস্কৃতিই এদের উচ্ছেদ করতে পারে না, কিন্তু চেতনার স্তরে এদের প্রতি সঙ্কোচ সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্রে জৈব বৃত্তির এই অবদমন নীতি এবং কর্তব্যের নামে সমর্থিত হয়ে থাকে। আর এই অবদমনকে মেনে নেওয়ার নামকরণ হয় বিবেক। সূক্ষ্মবোধ সম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় নীতি বিবেকের বদলে সৌন্দর্য এবং পরিমিতি বোধের তাগিদে এই অবদমনকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে স্বদেশী আত্মনিগ্রহাশ্রয়ী ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভিক্টোরিয় ভদ্রতা, ব্রাহ্ম পিউরিট্যানিজম্ এবং উপনিষদী ব্রহ্ম তত্ত্ব, শিল্পের ধ্রুপদী আদর্শ আর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির রোমাণ্টিক অভীপ্সা—এই সমবেত ধারাগুলির রসে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র পুষ্টি লাভ করেছে। তাঁর জীবন শিল্পে বাস্তবের অসুন্দর দিকগুলি ক্রমশই সযত্ন-বর্জিত। যে ধ্বনি সুরের সঙ্গতিতে বিঘ্ন ঘটায়, যে আবেগ ব্যঞ্জনার সুমিতিতে রসবস্তু হয়ে ওঠে না, যে বিক্ষোভ কল্পনার কাঠামোয় ভাঙন আনে—তাঁর রূপ সাধনায় তারা অপাংক্তেয়। বাইরে হতে তাদের তিনি সংযত করতে চেয়েছেন, ভিতর হতে তাদের তিনি বুঝতে চেষ্টা করেননি।

কিন্তু সব জৈবরূপের মতই ব্যক্তি-অস্তিত্বেরও একটা সামগ্রিক সত্তা আছে। এই সমগ্রতায় যা ওতপ্রোত কোনো উপায়েই তাকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত করা যায় না। সে উৎপাটনের চেষ্টায় সমগ্রতারই বিনাশ ঘটে। আর যেহেতু মানুষের ক্ষেত্রে এই সমগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত, পুষ্ট এবং বিকাশের

দিকে পরিচালিত করার বিশেষ মাধ্যম তার চৈতন্য, সে কারণে তার জৈব সত্তার সবক'টি মূল ধারাই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তার চৈতন্যের পরে ক্রিয়াশীল থাকে। সে ক্ষেত্রে হয় ব্যক্তিমানুষ এই সব ধারাকে চেতনার স্তরে স্বীকার করে নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে নিজের সামগ্রিক বিকাশে তাদের স্ফূর্তির ব্যবস্থা করে, নয়ত চেতনার স্তরে অস্বীকৃত ধারাগুলি প্রাকচেতনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সচেতন বিকাশ সাধনাকে পদে পদে ব্যাহত করতে থাকে। বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের রুচি জৈব সত্তার এই সামগ্রিক সত্যকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারেনি। এ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা গ্যয়টের তুলনায় অসম্পূর্ণ। তাঁর জীবন শিল্পে মেফিস্টোফেলেশ ফাউস্টের মত স্বীকৃত আত্মীয় নয়। গ্যয়টে যে "অন্ধকার প্রয়াস"কে (ডুঙ্কলেন ড্রাঙে) বোঝবার জন্য সারাজীবন সাধনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা আমাদের মনুষ্যত্বের সাময়িক স্খলন মাত্র।

কিন্তু চেতনার স্তর হতে নির্বাসন দিলেই কিছু এই সব প্রাক-চেতন জৈব বৃত্তি নিষ্ক্রিয় বা প্রশমিত হয়ে যায় না। তারা নানাভাবে নিজেদের প্রকাশ দাবী করে, ব্যবহারে কল্পনায় ক্রমাগতই অন্ত-র্বিরোধ আনে, আদর্শ বোধে একটু শিথিল সমাধিত্ব ঘটলেই চৈতন্যের ডিজাইনে ওলট পালট ঘটায়। আমার সন্দেহ হয় রবীন্দ্র-নাথের চিত্র চর্চার মধ্যে তাঁর সযত্ন নিরুদ্ধ প্রাকচেতনিক সত্তা এমনিতর কোন অপ্রস্তুত প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর জীবনের ঐ বিশেষ অধ্যায়ে কেন এই বিস্ফোরণ ঘটল, যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তা বলা কঠিন। হয়ত ঐ বিশেষ বয়সে তাঁর অপ্রকাশ্য জীবনে এমন কোনো প্রবল আলোড়ন সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল যাকে তিনি গ্যয়টের মত করে ভাষাশ্রয়ী চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। হয়ত বা যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মানব সভ্যতার বিশ্বব্যাপী আত্যন্তিক সঙ্কটের শুভ নাস্তিক সান্নিধ্যে সাময়িক-ভাবে তাঁর শ্রেয় বোধে শৈথিল্য এসেছিল। ছবির ভিতর দিয়ে তিনি কি সেই দুঃসহ বিক্ষোভের হাত হতে মুক্তি খুঁজেছিলেন? তাঁর ছবির মধ্যে যে প্রবল প্রাণ শক্তি আমাদের মনে আলোড়ন আনে, এই অন্ধ

বিক্ষোভই কি তার উৎস? চৈতন্যের স্বীকারে আলোকিত নয় বলেই কি সে ছবির জগতে এত গুমোট অন্ধকার?

এ চিত্র চর্চার উৎস যে প্রাকচেতনিক শুধু বাইরের লক্ষণগুলি হতেই তা অনুমান করা যায়। তার রঙে আলোর আভাস ক্বচিৎ। অনেক ক্ষেত্রেই তা এক ধরনের আঁধার সবুজের কাছ ঘেঁষা, যেন গভীর অরণ্যের নিভৃতে সূর্যস্পর্শহীন গুল্মের মত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ফ্যভিস্ত বর্ণপ্রয়োগরীতির সঙ্গে বুঝি বা কিছু আত্মীয়তা আছে। কিন্তু এখানে রঙের মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময়ের কোন আভাস নেই। বরং গুমোট অস্বস্তির ভাবটাই প্রবল। তাঁর ছবির রঙে বৈচিত্র্য সামান্য, বিভঙ্গে পরিচ্ছন্নতার অভাব। পশু পাখীর প্রতীকী নক্সা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। যেখানে মানুষের মুখাকৃতি আঁকার চেষ্টা করেছেন সেখানেও মনে হয় সে মানুষেরা যেন আলো-হাওয়া-আকাশের খবর রাখে না। তাদের বাইরের রেখা বিন্যাসে ছন্দ সঞ্চার ক্বচিৎ, তাদের অন্তর্লোকে আনন্দের স্বাদ নেই। তার কালিতে আঁকা রেখাচিত্রগুলিতে প্রায়শই রেখার বাহুল্য আছে, বিন্যাস নেই; তাদের অধিকাংশেরই পশ্চাৎপটে রেখার অরণ্য, কখনো বা তা এগিয়ে এসে ছবিকেই গ্রাস করেছে। তার অধিকাংশ ছবিই প্রাণ শক্তিতে প্রবল; কিন্তু সে প্রাবল্য মননের দ্বারা সংস্কৃত নয়। তাই তার প্রকাশ শুধু অন্ধ বিক্ষোভে।

কল্পনা করতে কৌতূহল হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর প্রাকচেতনিক সত্তাকে অবদমিত না করে চৈতন্যের স্তরে তাকে শিল্পধ্যানের উপজীব্য করতে পারতেন, তাহলে তাঁর শিল্প সাধনা কোন ধারায় বিকশিত হোত। সে ক্ষেত্রে সম্ভবত চিত্রের মাধ্যমে নিষ্ফল অধ্যবসায়ে অবক্তব্যকে আকার দেবার প্রয়োজন ঘটত না। হয়ত শব্দ শিল্পে তাঁর দুর্লভ ক্ষমতার ফলে তিনি প্রাকচেতনকে প্রতীকী প্রকাশ দেবার উপযোগী কোন অভিনব রচনা রীতির উদ্ভব করতেন। ইংরাজী সাহিত্যে জয়েস তাঁর অসমাপ্ত এপিক উপন্যাস ফিনে গানস ওয়েকে যে অকল্পিতপূর্ব সাহিত্য রূপের অস্পষ্ট সূচনা করেছিলেন, বাংলা ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধতর কল্পনায় তা কি কোন সার্থকতর পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রকাশ পেত? হয়ত এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। মোটের উপর চেতনার স্তরে স্বীকৃত ধ্রুপদী বিবেকের নির্দেশ লঙ্ঘন করায় তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। চিত্র চর্চার ভিতর দিয়ে তিনি শুধু সাময়িকভাবে সে নির্দেশকে সসঙ্কোচে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

কাহিনী ও বিন্যাসে, সুরারোপে এবং অভিনয় সৌকর্যে
বাংলা ছায়াচিত্রের বিজয়-বৈজয়ন্তীর নবতম প্রয়াস!
ফাল্গুনী মুখার্জির
'সন্ধ্যারাগ'
অবলম্বনে
প্রোডাকস সিণ্ডিকেট লিঃর
শাপ মোচন
চিত্রনাট্য
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা • সুধীর মুখার্জী
সঙ্গীত • হেমন্ত মুখার্জী
পরিবেশনায়
মেহতা পিকচার্স
চরিত্র-চিত্রনেঃ সুচিত্রা - সুপ্রভা - বনানী - তপতী - রাজলক্ষ্মী
আশাদেবী - উত্তম - পাহাড়ী - কমল মিত্র - অমর মল্লিক - নীতীশ
বিকাশ - গঙ্গাপদ - জীবেন - তুলসী - দীপক - নৃপতি - অলোক প্রভৃতি
পরবর্তী আকর্ষণঃ রূপবাণী ° অরুণা ° ভারতী

'জীবন-স্মৃতি'তে কবির জীবন

সুনেত্রা সরকার

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের আত্ম-জীবনী নয়। ইহা তাঁর 'কবি-জীবনী'।

মহাপুরুষ বা কর্মবীরদের আত্ম-জীবনী বা জীবন-চরিতে তাঁহাদের জীবনের বিচিত্র ঘটনা-ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়। আর সে-ইতিহাসই হয়ে উঠে তাঁদের যথার্থ জীবনী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আত্মজীবনী রচনা করেছেন, তা তাঁর অতীত স্মৃতির টুকরো টুকরো গ্রন্থন। এই টুকরো টুকরো স্মৃতি-গ্রন্থনে ছোটোটি বড়ো হয়ে উঠেছে, বড়োটি ছোটো হয়ে গিয়াছেঃ আগেরটি পরে চলে গিয়েছে, পরেরটি আগে চলে এসেছে। 'এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতি মাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা উঠিয়াছে। যেখানে ফাঁক ছিল না সেখানে হয়তো ফাঁক পড়িয়াছে। যেখানে ফাঁক ছিল সেখানটাও হয়তো ভরা দেখাইতেছে।

পঞ্চাশ বছর বয়সে অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলি' রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি রচনা করেন। এই বয়সে অর্থাৎ তাঁর এই পঞ্চাশ-বছর-বয়স জীবনে তাঁর জীবনের উপর দিয়ে ইংলণ্ড-ভ্রমণ, শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠা, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব, পিতা-স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদি যে বিচিত্র ঘটনা, নানা ঘাত-প্রতিঘাত ঘটেছিল, সেগুলো দিয়ে গুরুগম্ভীর বেশ ভারিক্কি দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ একটা আত্ম- ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া জীবনী লেখা যেত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার ধারে-কাছে না ঘেঁষে এমন সব ঘটনা নিয়ে 'জীবন-স্মৃতি' রচনা করলেন, যে ঘটনাগুলি যথার্থ আত্মজীবনী রচনার পক্ষে উল্লেখযোগ্য উপকরণ নয়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, আপন বাল্য-কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বয়সটাকে অর্থাৎ 'মাত্র জীবনের আরম্ভ অংশটুকুকে' তিনি জীবন-স্মৃতির মধ্যে আবন্ধ রেখেছেন। যথার্থ আত্মজীবনীতে বা জীবন-চরিতে ঐ বয়সের ঘটনাসমূহকে আত্মজীবনী বা জীবনচরিত রচয়িতাগণ খুব একটা আমলের মধ্যে সাধারণত ধরেন না। আত্ম-জীবনীতে সন্নিবেশিত হয় বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনের ঘটনাবহুল কর্মের কথা।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতির' কথা যখন বলা শেষ করলেন; তখন 'কড়ি ও কোমল' রচনার কাল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে এই যুগ এক মহাসন্ধিক্ষণ। কড়ি ও কোমলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মন্ত্র-গুরু' বিহারীলালের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি; কিন্তু ঠিক তার পরবর্তী কাব্য 'মানসী'তে তিনি গুরু-

প্রভাব কাটিয়ে তাঁর লোকোত্তর স্বপ্রতিভায় উদ্ভাসিত হলেন,—ঠিক যেন মূককীট থেকে প্রজাপতির আবির্ভাবের মতন। ঠিক এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে-ধারায় বইতে শুরু করল, সে-ধারা বাঙলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর। এই-খানে এসে তিনি তাঁর জীবনের স্মৃতির কথা আর পাঠকদের বলতে চাইলেন না; তিনি তাঁদের কাছে সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। এই বিদায়ের একটা কৈফিয়ৎ তিনি দিয়েছেন জীবন-স্মৃতির শেষ পরিচ্ছেদে।

জীবন-বৃত্তান্ত রচনা করার মতো ঘটনা চব্বিশ বছরের রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল না সত্যি; কিন্তু চব্বিশ বছরের কবির জীবনে তাঁর কাব্য-জীবনের কথা বলার প্রয়োজন ছিল। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠকদের কাছে তাঁর কাব্য-উন্মেষের ইতিহাস জানার প্রয়োজন আছে। কোরক থেকে এক একটি পাপড়ি মেলে পুষ্পের সম্পূর্ণ বিকশিত হওয়ার যে-ইতিহাস, বিকশিত-পুষ্প-দর্শকের কাছে সে-ইতি-হাস জানবার কৌতূহল থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-জীবনে বিকাশের ধারাটিকে জীবন-স্মৃতিতে প্রকাশ করেছেন এক একটি পাপড়ি মেলে-ধরার মতো। আর তা বিকশিত হয়ে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার ঠিক মুহূর্তে তিনি সেখানে ছেদ টেনে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি শুধু তাঁর কাব্য-জীবনের উদ্যোগ-পর্বের ইতিহাস বিধৃত করলেন; উত্তর-পর্ব শুরু হওয়ার প্রাক্কালে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন। কিন্তু কেন?

এর উত্তর তিনি দিয়েছেন জীবন-স্মৃতির শেষে তাঁর অনন্যসাধারণ কবিত্ব-সুলভ ভাষায়। 'এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেশির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখ-দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙা-গড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা, বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া

আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবন-দেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহা কিছুই দেখাইতে যাইব, তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বোঝানো হইবে।......অতএব খাস-মহলের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবন-স্মৃতির পাঠক-দের কাছে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।'

রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সত্যিই সচেতন ছিলেন যে, তাঁর জীবনী ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত নয়। তাই যথাযথ ঘটনার সন্নিবেশ তিনি করেন নি। তিনি নিজে বলেছেন, 'যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্মবীর তাঁহা-দের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়,—কেননা, তাঁদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্বপ্রধান রচনা। কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য। তাহা তো সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে—আবার জীবনের কথা কেন।......

কাব্য-রচনা ও জীবন-রচনা ও-দুটা একই বৃহৎ রচনার অংগ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।......কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।'

তাই রবীন্দ্রনাথ জীবনের যথাযথ ঘটনার সন্নিবেশ না করে শুধু তাঁর কাব্য-জীবনের বিকাশের সংগে ব্যক্তি-জীবনের যে সম্পর্কটুকু সেই সম্পর্কটুকুই এই গ্রন্থে স্থাপন করেছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তাঁর আপন কবিত্ব-সত্তার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনকে বিধৃত-করা।

এই জন্যে বলা যেতে পারে, জীবন-স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-উন্মেষের ইতিবৃত্ত, কবিত্ব-বিকাশের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ; তাঁর উত্তরকালের কাব্য-জীবনের ভাষ্য-পুস্তক।

রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা-বিকাশে যেসব পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী প্রভাব বিস্তার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে তাদের একে একে তুলে ধরেছেন। তাঁর

কবি-মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে প্রকৃতির যে অংশের প্রভাব সর্বপ্রথম পড়েছিল, তা জোড়াসাঁকোর প্রকৃতি। শৈশবে তিনি ভৃত্যরাজতন্ত্রের শাসনাধীনে বাড়ীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতেন ঃ বাইরের সংস্রব থেকে বিচ্যুত ছিলেন। কিন্তু বাইরের আনন্দ থেকে বিচ্যুত ছিলেন না।

তাঁর কক্ষের জানালার নীচেই ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। সেই পুকুরের পাশের বট-নারিকেল গাছগুলি, স্নানার্থী লোকজনের আনাগোনা, কলকাতা শহরের বাড়িগুলির ছাদ, ছাদে ঝোলানো শাড়ি, শূন্যে নীল আকাশ দেখে দেখে, উঠোনে কাকের কলরব, দূরে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক, সিঙ্গির বাগানের পসারীর সুর (চাই, চুড়ি চাই) শুনে শুনে তাঁর শৈশবের দিনগুলি কাটত। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, সেই সুর শুনতে শুনতে তাঁর মন উদাস হয়ে যেত। সেই সুদূরের আহ্বান শুনে তাঁর মন কোথায় এক সুদূর রহস্যালোকে ডুবে যেত। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস-গঠনে এই জোড়াসাঁকোর এই প্রকৃতির প্রভাব অসাধারণ।

এই আবদ্ধ কক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ শৈশবে সর্বপ্রথম বাইরে যেখানে যান, সে হল গঙ্গাতীরের ছাতুবাবুদের বাগান। সেই বাগানবাড়ির সামনের বারান্দায় বসে গঙ্গার স্রোতের দিকে চেয়ে তাঁর দিন কাটত। 'গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত।...প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেবল মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালী পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।' গঙ্গার প্রভাবও তাঁর কবি-সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এরপর বালক রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে যে মহান প্রকৃতির প্রভাব পড়েছিল, সে প্রকৃতির প্রভাব ভারতবর্ষের আর এক মহাকবির উপরও প্রবলভাবে পড়েছিল, তা হল হিমালয়। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে

হিমালয়ে যাত্রা করেন। ভৃত্যরাজের গণ্ডী কাটিয়ে নিখিল জগতের বিশাল গণ্ডীর মধ্যে এই সর্বপ্রথম তিনি পদক্ষেপ করলেনঃ এক মহামুক্তির আস্বাদন তিনি পেলেনঃ প্রকৃতির নিখিল সত্তার স্বরূপটি তিনি উপলব্ধি করলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিধির মধ্যে হিমালয়ের প্রভাব বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে বর্তমান। জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অন্তর্লোকে যতোখানি প্রবেশ করিয়াছিলেন, মানুষের অন্তর্লোকে ততখানি প্রবেশ করিতে পারেন নাই।'

এ-ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে পদ্মার ভয়ংকরী অথচ কোমল এবং শান্তিনিকেতনের রুক্ষ অথচ স্নিগ্ধ প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এ হল 'সোনার তরী' ও তার পরবর্তীকালের ঘটনা। তাই এই প্রভাবের কথা জীবন-স্মৃতিতে অনুল্লেখ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মানসে যে সকল ব্যক্তির প্রভাব পড়েছিল, তাঁদের মধ্যে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা আমাদের সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে। তাঁর ঋষিতুল্য চেহারা, বেদ-উপনিষদে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, সর্বোপরি তাঁর যথার্থ মনুষ্যত্ব বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর কবিতা-রচনার উৎসাহক তাঁর দাদা নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর বিদুষী পত্নী কাদম্বিনী দেবী, মিস্ আন্না, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রভৃতি অনেকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র তাঁর কাব্যজীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল। এ-ছাড়া মহর্ষির বাড়িতে তৎকালীন বাঙলা দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল; তাঁদের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের জীবনে কম পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে তৎকালীন বাঙালী-সমাজের প্রভাবও পড়েছিল। সেদিনের বাঙালীর সমাজ ছিল পরিপূর্ণ, অখণ্ডঃ রেনেসাঁর তখন ক্লাইমাক্স—নবজাগরণের পূর্ণবিকাশ। চতুর্দিকে চলেছে নব-সৃষ্টির বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা। পাশ্চাত্যের জঙ্গম তখন সবেমাত্র সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করেছে; কিন্তু সমাজকে চৌচির করে দিতে পারেনি। আজকের মতো তখনও সমাজে ফাটল ধরেনি, সমাজ তখনও খণ্ড খণ্ড, টুকরো
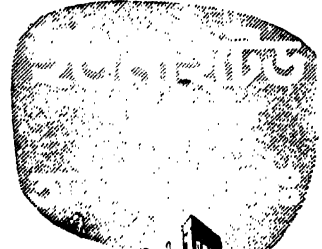
করো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। তখনও বাঙালীর জীবন আজকের মতো আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেনি—একক আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড বাঙালীর জীবনকে দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেই বৃহৎ অখণ্ড জীবনের সাহায্যে তিনি আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। সেই অখণ্ড সমাজ ও জীবন তাঁর প্রতিভার ভিত্তিকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল,—অনেকখানি দৃঢ় করে তুলেছিল;—তাঁর কবি-দৃষ্টিকে অখণ্ড, বৃহৎ করে তুলেছিল। তাই তিনি বাঙালীর কবি না হয়ে পৃথিবীর কবি হতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই বৃহৎ ও অখণ্ড সত্তা নানা দেশ থেকে নানা ভাব, নানা রস আহরণ করে এক বিশাল ভাব-রস-জাহ্নবী হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অপরিমেয়। তিনিই বাঙালীর শেষ কবি যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পান করেছিলেন, যিনি তার বিপুল ভাণ্ডার থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করে নব নব মালা তৈরী করতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের মর্মলোকে তাঁর মতো আর কোনো আধুনিক বাঙালী কবি প্রবেশলাভ করেননি। আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যে জ্ঞান ও চিন্তার ধারা সে-ধারায় তিনি নিজেকে অভিষিক্ত করতে পেরেছিলেন। কালিদাস-জয়দেবের নাটক-কাব্যকে তিনি গভীরভাবে অনুধ্যান করেছিলেন। তিনি সেই বাল্যকালেই তাঁর পিতার কাছে এই সব গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন।

তাঁর কথায়—'জল পড়ে পাতা নড়ে', আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।' এমন কি বিদ্যাসাগরের 'প্রথম ভাগে'র এই দুটি লাইনের সুরটিও বালক কবির কবি-মানসে কাব্য-সুর-তরঙ্গ কম তোলেনি।

এর পরেও বলা যায় যে, পরিবেশের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর নিজস্ব বিপুল প্রতিভা ছিল। মাটির মধ্যে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বটগাছ বিশাল মহীরূহ হয়ে ওঠে; কিন্তু সেই মহীরূহের বীজটিই যে আসলে বটবৃক্ষের বীজ। তেমনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই পরিবেশ-গুলি শুধু সেই উপাদান মাত্র—তাঁর প্রতিভার বীজটি যে তাঁর নিজেরই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিত্ব-বিকাশের প্রবাহটি দেখানর পাশাপাশি এই গ্রন্থে তাঁর জীবনের আর একটি বিশিষ্ট দিকের তথ্য পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন—তা হল তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষা-জীবন। তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা-জীবনের চিত্রটি হুবহু তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। শৈশবে তাঁর শিক্ষা শুরু হওয়ার চমকপ্রদ ইতিহাস, তার বৈচিত্র্যময় অগ্রগতি, তার কৌতূহলোদ্দীপক ধারা এবং আশ্চর্য-জনক পরিশেষ আমাদের মতো গণ্ডীবদ্ধ ছাত্রদের কাছে রূপকথার কাহিনীর মতো মনে হয়।

এইবার পুস্তকটির সাহিত্যিক মূল্য

কিসের গর্ব্ব?
রূপের, না
অলঙ্কারের...
এই কথাই তার বান্ধবীরা আলোচনা করছিল। পরে অবশ্য সবাই স্বীকার করল যে তার রূপ ত বটেই—সেইসঙ্গে এইচ কে দত্তের গহনা—এই দুয়ে মিলেই তার রূপ হয়েছে অপরূপ।
এইচ, কে, দত্ত
এণ্ড কোং
সৃজন-কুশলী মণিকার
১০৬, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সচিত্র সাহিত্য সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা	...	|৴০
শহরে বার্ষিক	...	১৯৲
ষাণ্মাসিক	...	৯৷৷০
ত্রৈমাসিক	...	৪৸০
মফঃস্বলে (সডাক) বার্ষিক	...	২০৲
যাণ্মাসিক	...	১০৲
ত্রৈমাসিক	...	৫৲
ব্রহ্মদেশ (সডাক) বার্ষিক	...	২২৲
যাণ্মাসিক	...	১১৲
অন্যান্য দেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২৪৲
যাণ্মাসিক	...	১২৲

ঠিকানা—আনন্দবাজার পত্রিকা
৮ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

সংক্ষেপে আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করবো।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে জীবন-স্মৃতির একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। আত্মজীবনীরূপে ইহা গদ্যে রচিত বটে; কিন্তু ইহা একটি উচ্চশ্রেণীর 'রচনা-সাহিত্য'। রচনা-সাহিত্যের সমস্ত লক্ষণ এই গ্রন্থে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবনী রচনার অন্তরালে একটি নূতন ধরণের 'সাহিত্য' সৃষ্টি করলেন, যা বাঙলা-সাহিত্যে ইতি-পূর্বে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অনন্য-সাধারণ মনীষা ও প্রতিভা বাঙলা-সাহিত্যের অঙ্গনে এমনি নানা পথ তো খুলে দিয়েছেন।

আত্মজীবনীরূপে রচিত এই রচনা-সাহিত্যটি বাঙলা-সাহিত্যে একক। রবীন্দ্র-নাথ বলেছেন, 'জিনিসটাকে (জীবন-স্মৃতি) সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গল্প যাতে প্রবল হয়ে না উঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি —আমার তো বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে।' আত্ম-জীবনী রচনা করতে গিয়ে গোড়াতেই তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন, আত্ম-জীবনীর ছদ্মবেশে তিনি একটি নূতন 'সাহিত্য' পুস্তক রচনা করবেন। কারণ গ্রন্থারম্ভেই তিনি বলেছেন, 'এই স্মৃতি-চিত্রগুলি সাহিত্যের সামগ্রী।'

বস্তুত এই গ্রন্থ শুধু সাহিত্যের সামগ্রী নয়, বাঙলা-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু এখন প্রশ্ন আসে এই গ্রন্থের সাহিত্য-সম্পদ কোথায়। এর উত্তর এক-কথায় বলা যেতে পারে চিত্র-রসে—এক স্বপ্ন-মধুর চিত্র-রসে। কবি তাঁর অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, অননু-করণীয় উপমায় তাঁর বাল্য-চিত্র, পারি-বারিক চিত্র, সামাজিক চিত্র, লোকচরিত্রের চিত্র বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র একে একে ছবির মতো এঁকে চলেছেন। সমগ্র গ্রন্থটির তিন-চতুর্থাংশ এই সব ছবিতে পরিপূর্ণ। কবি সব ছবিগুলিকে একটির পর একটি এমন সাজিয়ে চলেছেন, আমাদের মনের পর্দায় সিনেমার মতো সেগুলি কায়ারূপ নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠে।

চূড়ান্ত রোমাণ্টিক কল্পনার সঙ্গে গভীর মিস্টিক চিন্তার সংমিশ্রণ গ্রন্থটির সর্বত্র যেমন ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি গ্রন্থটির এক অপূর্ব শ্রীও উদ্ভাসিত করেছে। সৌন্দর্যে, প্রাঞ্জলতায়, সাজেস্টিভ-নেস-এ, উপমায়, অলঙ্কারে, ভাষা ইত্যাদিতে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-গদ্য-গ্রন্থগুলির শীর্ষস্থানীয়।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্ূচীপত্র
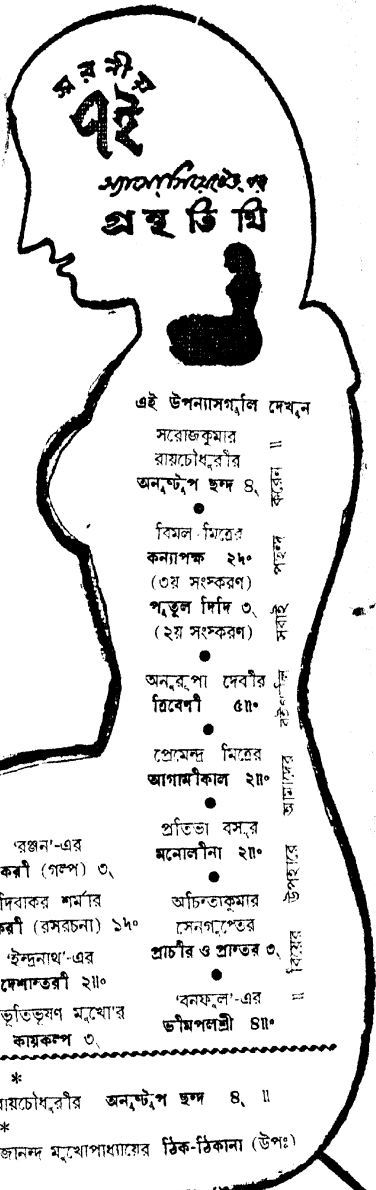
বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	-	১৮১
বৈদেশিকী—	-	১৮৩
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ—	শ্রীসরলাবালা সরকার	১৮৫
প্রকৃতি, তুমি (কবিতা)—	শ্রীশিবশম্ভু পাল	১৯২
একমুঠো রোদ (কবিতা)	শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯২
কোন অলস মুহূর্তে (কবিতা)—	শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়	১৯২
বংশ-প্রমাণ (কবিতা)—	শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার	১৯৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদফটো ॥ চম্বা রমণী ॥ শ্রীসুশান্তকুমার বসু

সচিত্র সাহিত্য সাপ্তাহিক

দেশ

প্রতি সংখ্যা	... ...	|/·
শহরে বার্ষিক	... ...	১৯৲
ষাণ্মাসিক	... ...	৯৷৷·
ত্রৈমাসিক	... ...	৪৸·
মফঃস্বলে (সডাক) বার্ষিক	...	২০৲
ষাণ্মাসিক	... ...	১০৲
ত্রৈমাসিক	... ...	৫৲
ব্রহ্মদেশ (সডাক) বার্ষিক	...	২২৲
ষাণ্মাসিক	... ...	১১৲
অন্যান্য দেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২৪৲
ষাণ্মাসিক	... ...	১২৲

ঠিকানা—আনন্দবাজার পত্রিকা
৮ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

SCISSORS
CIGARETTES
"SCISSORS"
CIGARETTES
SPECIAL
W.D.&H.O.WILLS,
BRISTOL & LONDON.
SCISSORS
W.D.&H.O.WILLS.
"SCISSORS"
W.D. & H.O.WILLS
MARK
SCISSORS
SG/249

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　　সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। এই পরিষদের সভায় সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কর্মসাধনার সম্বন্ধে অবিচল আশাশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, দেশবাসীকে যদি বিশ্বাস করা যায় এবং সংগঠনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যটিকে সহজভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাদিগকে দিয়া যে কোন কাজ করাইয়া লওয়া সম্ভব হইতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর উক্তির তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, দেশবাসীর উপর আস্থা রাখিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন এবং সেই পরিকল্পনা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধনই যে সেগুলির উদ্দেশ্য, লোকে সহজেই সে কথা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে সরকারী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে সহজেই বুঝিতে পারে; কিন্তু পরিকল্পনার বে-সরকারী অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেগুলির সহিত রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে উদ্দেশ্যটি ধরা ততটা সহজ হয় না, ব্যক্তিস্বার্থের তোষণ এবং পোষণই সেগুলির মূলে রহিয়াছে, এমন সন্দেহ অনেক ক্ষেত্রে থাকিয়া যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হইতে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বলিলে ভুল হইবে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারিত হিসাবেই বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু তদনুযায়ী দেশবাসীর ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ে নাই কিংবা বেকার সমস্যারও সমাধান হয় নাই। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান যাহাতে উন্নীত হয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তৎপ্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বহরমপুরে পরিগৃহীত প্রস্তাবে তেমন কথাই অবশ্য বলা হইয়াছে; কিন্তু পরিকল্পনা তদনুযায়ী কার্যকরী হওয়া আবশ্যক; কংগ্রেসে পরিগৃহীত সমাজতান্ত্রিক নীতির সঙ্গতি শুধু সেই পথেই দেশবাসীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে এবং গঠনমূলক কাজে জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা সর্বত্র উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

বৈপ্লবিক জীবনের আদর্শ

সম্প্রতি কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিপ্লবী কর্মী সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাংলার প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী এই সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বিপ্লবী জীবনের আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বন্ধনহীন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের সম্ভাবনাকে কার্যকর করিয়া তোলাই বিপ্লবী জীবনের মূল মন্ত্র। কথাটা আমাদের কাছে কতকটা রাজনীতিক তত্ত্বকস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ফলত বন্ধনহীন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের যে প্রেরণা, তাহা কিসে জাগে এবং সমাজজীবনে কার্যকর হয়, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। ফলত শুধু নীতি-বিচারের দ্বারা বৈপ্লবিক এই প্রাণধর্মকে সমাজজীবনে জাগ্রত করা সম্ভব হয় না। বৃহৎ আদর্শে উদ্দীপিত নৈতিক শক্তি ঐকান্তিক প্রভাবে বৈপ্লবিক চেতনা জাগায় এবং সমাজের প্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে। নৈতিক এই মনোবল স্বভাবত আর্ত, নিপীড়িতদের প্রতি বেদনাতেই বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। মানবতার বেদনায় বলিষ্ঠ এই নীতির গতি ধ্বংস বা গঠন কোন্ রীতি ধরিয়া চলিবে, তাহা অনেকটা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশের উপর নির্ভর করে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিষয়টি ঠিকভাবেই ধরিয়াছেন। তিনি বর্তমান বাংলার সমাজ-জীবনে নৈতিক আদর্শের অপহ্নব লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে বর্তমানে কোন মহৎ আদর্শের প্রেরণা নাই। অনেকটা জড়বাদী এবং স্বার্থকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে। যাহারা কর্মী, তাঁহারাও মান, যশ এবং প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিকে ঝুঁকিয়া চলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং জীবিকার সংস্থানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বিপ্লবীদের সম্মুখে বলহীন, আশাহীন, নিরাভরণ, রিক্ত বাংলা মৃত্যুশয্যায় ধুঁকিতেছে। প্রকৃতপক্ষে বিপন্ন এবং দুর্গত এইসব নরনারীর বেদনাই নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। প্রত্যুত শুধু মুখের কথায় বা উপদেশে মানব-কল্যাণ সাধনে মহাব্রতের উদ্বোধন ঘটে না এবং পথের হিসাব অনেক ক্ষেত্রে প্রাণশক্তিকে

শিথিল করে এবং গতির দিক হইতে বিড়ম্বনাই বাড়ায়।

অনুন্নতের উন্নয়ন

সরকারের পক্ষ হইতে অনগ্রসর ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রয়াসের বার্ষিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট অনুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে। গত ৪ বৎসর হইতে এই কাজে সাফল্য সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ভারতের সর্বত্রই শ্রেণীবৈষম্য শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং ধর্মের গোঁড়ামি দূর হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু দেবমন্দির বর্তমানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে উন্মুক্ত। সম্প্রতি অস্পৃশ্যতা আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থায় মানুষকে ঘৃণা করিবার দুর্বুদ্ধি এদেশের সমাজ-জীবন হইতে অদূর ভবিষ্যতে উৎখাত হইবে এমন আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে, আইনের সাহায্যে এই কাজে কিছু অগ্রসর হওয়াই সম্ভব হয়। বস্তুত অস্পৃশ্যতার পাপ হইতে সমাজ-জীবনকে মুক্ত করিতে হইলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের যাঁহারা নেতা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া শক্তি তাঁহাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। প্রত্যুত অপরের অনুগ্রহে বা আইনের পরিপোষণে মানব-সমাজের কোন অংশই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে এদিকে নির্ভর করিয়া থাকিলে মানুষের শেষটা অবনতির গতিই দ্রুততর হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত সম্প্রদায় নিজেদের উন্নয়নের জন্য যেসব বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি শুধু সেইগুলিই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টায় থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে। ঐ সব সুবিধার প্রয়োজন যাহাতে কিছুদিনের মধ্যেই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণকামীদের এইদিকে লক্ষ্য থাকা আবশ্যক।

গোয়ালপাড়া ও কংগ্রেস

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বহরমপুরের বিগত অধিবেশনে গোয়ালপাড়ার হাঙ্গামার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবের অংশস্বরূপে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুত ধেবর বাঙ্গালী-বিরোধী এই হাঙ্গামার সঙ্গে কংগ্রেসকর্মীদের জড়িত থাকাতে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া বলেন, তাঁহারা যে কাজ করিয়াছেন, তাহা জাতীয়তাবিরোধী আন্দোলন অপেক্ষা ন্যূন নহে। কংগ্রেস-সভাপতি একটু ঘুরাইয়া কথাটা বলিয়াছেন, আসামের কংগ্রেসকর্মীদের এই কাজকে আমরা সোজাসুজি রাষ্ট্র-বিরোধী বলিয়াই মনে করি। শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালী-বিরোধী এই আন্দোলন নিতান্ত অমানুষ এবং বর্বরোচিত উপদ্রবেই গিয়া দাঁড়ায়। পূর্ববঙ্গ হইতে উৎখাত হইয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে আশ্রয়াকুল নিরীহ নরনারীর উপর শুধু তাহারা বাংলা ভাষাভাষী এই অপরাধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চলে। এমনকি, নারীর মর্যাদার উপরও হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। এমন ব্যাপারের সঙ্গে যাঁহারা সংশিলষ্ট ছিলেন তাঁহারা নিজদিগকে মহামানব মহাত্মা গান্ধীর ধ্বজাবাহক বলিয়া প্রচার করেন। আমাদের মতে, গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা, যাহাদের ঘাড়ে এতৎসম্পর্কিত অত্যাচারের অপরাধ চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে তাঁহাদের অপেক্ষা এইসব কংগ্রেসকর্মীদের অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ, গুণ্ডাদের উপদ্রবের প্রতিবেশ তাঁহাদের বাংলাবিরোধী প্রচারকার্যের ফলেই সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রস্তাবের একটি অংশ আমাদিগকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই অংশে বলা হইয়াছে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কার্য সম্পর্কে কংগ্রেস কর্তৃক যেসব নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সাধারণভাবে সেগুলি প্রতি-পালিত হইলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট-ভাবেই তাহা লঙ্ঘিত হয়। এই কয়েকটি ক্ষেত্রের ঘটনার মধ্যে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহার পরিদর্শনে গেলে সেখানে বাংলাভাষাভাষীদের উপর যে অত্যাচার এবং অবিচার অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহাই মনে হয়। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের নির্দেশ লঙ্ঘনকারী কংগ্রেস-কর্মীদিগের বিরুদ্ধে সেই সময় শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে গোয়ালপাড়ার শোচনীয় ব্যাপার ঘটিত না; কিন্তু তাঁহারা সেদিকে কিছুমাত্র গুরুত্বই দেন নাই। তাঁহারা যদি অনুরূপ মতিগতি লইয়াই চলেন, তবে কল্যাণী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের নীতি-কথা প্রস্থে প্রস্থে আওড়াইয়া লাভ কি, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শুনিতেছি, গোয়ালপাড়ার উপদ্রুত অঞ্চলে বাঙালীদের মনে আশ্বস্তির ভাব সৃষ্টির জন্য আসামের এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী মিলিতভাবে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতিদের সহিত জুন মাসে সফরে বাহির হইবেন, এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে সাময়িক-ভাবে কাজ কিছুটা হইতে পারে; কিন্তু স্থায়ী প্রীতির পরিবেশ গড়িয়া উঠিবে, এমন আশা করা কঠিন। বস্তুত এই কাজে স্থানীয় যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাদিগকেই অগ্রাইয়া আসিতে হইবে। কংগ্রেসের নৈতিক বিশুদ্ধি যাহারা নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকে কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই এক্ষেত্রে প্রয়োজন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা

পরলোকগত নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতার নিকটবর্তী খড়দহে উদ্যোগ চলিতেছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২৩শে বৈশাখ বিশিষ্ট নাট্যকার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ খড়দহে একটি অনুষ্ঠানে সমবেত হন। বাংলা দেশের নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চ ক্ষীরোদপ্রসাদের নিকট ঋণী। যাঁহারা লোকপ্রিয় বঙ্গবাণীর এই সাধকের স্মৃতিরক্ষার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা জাতির ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, তাঁহাদের এই উদ্যোগ সর্বসাধারণের সমর্থন লাভে অচিরে সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

বৈদেশিকী

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে মনোমালিন্যের মূল কারণ পাকতুনিস্তান সমস্যা। সে সমস্যা সহজে মিটবার নয়। তবে দুই দেশের মধ্যে "রণং দেহি" ভাবের মাত্রা যতটা বেড়েছে তার উপর আর বেশি বাড়তেও পারে। পাকিস্তান আফগানিস্তানকে "শিক্ষা দিয়ে দেবে" বলে শাসিয়েছে। কাবুলের ঘটনা সম্পর্কে পাকিস্তান বৃটিশ ও মার্কিন মতের সমর্থন পেয়েছিল, তাতেই আফগানিস্তানের প্রতি পাকিস্তানী দাবীর সুর এতো চড়েছিল। পাকিস্তানী গভর্নমেন্টের বোধহয় আশা ছিল যে, আফগানিস্তান ঘাবড়ে গিয়ে দেড় ...নাকে খত দেবে। আফগানিস্তান তা দেয়নি। পাকিস্তানী গভর্নমেন্ট দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করার আয়োজন করে এনেছেন। পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে আফগানিস্তানী বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ করার ভয়ও দেখানো হচ্ছে। পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে যদি আফগানিস্তানীরা যেতে আসতে বা মাল আনা নেওয়া করতে না পারে তবে আফগানিস্তানের অবশ্য খুবই মুশকিল হবে। কারণ বহির্জগতের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগাযোগ বর্তমানে বেশির ভাগ পাকিস্তানের ভিতর দিয়েই চলে। এই যোগাযোগের পথ বন্ধ করলে সেটা অনেকটা আফানিস্তানের অর্থনৈতিক অবরোধের মতো হবে।

কিন্তু আফগানিস্তানী গভর্নমেন্টের হাতেও তুরুপের তাস একখানা আছে এবং সে কথা আফগানিস্তানী কর্তৃপক্ষ একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের দ্বারা জানিয়েও দিয়েছেন। পাকিস্তানের দিকের দরজা বন্ধ হলে আফগানিস্তান সোভিয়েটের দিকের দরজা আরো বেশি করে ফাঁক করবে; শুধু তাই নয়, দক্ষিণ থেকে যদি কোনো আক্রমণ সম্ভাবনা দেখা যায় তবে উত্তর থেকে সাহায্য চাইতে এবং নিতে আফগানিস্তান দ্বিধা করবে না। আফগানিস্তানের বক্তব্য ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা হুঁশিয়ার হোন পাকিস্তান যদি আমাদের উপর জুলুম

রতে প্রবৃত্ত হয় তবে আমরা আমাদের যুদ্ধ নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে রাশিয়ার দিকে হেলতে বাধ্য হব।”

এই হুঁশিয়ারী ব্যর্থ হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ঝগড়া যাতে আর বেশি দূর না গড়ায় তার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা সচেষ্ট হবেন বলে বোধ হয়। এমনকি পাকতুনিস্তানের সমস্যাটা আপাতত ধামা চাপা দিয়ে রাখবার উপায় হিসাবে ব্যাপারটাকে ইউনোর আওতার মধ্য এনে ফেলবারও একটা চেষ্টা হতে পারে। কারণ এটা দেখা গেছে যে কোনো সমস্যা একবার ইউনোর আওতার মধ্যে এনে ফেলতে পারলে সে সমস্যা আর মেটে না বটে তবে সেটা একরকম গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, আফগানিস্তানে গণতন্ত্র নেই, আফগানিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থা অত্যন্ত বিশৃংখলাপূর্ণ এইসব ব্যাপার থেকে আফগানিস্তানীদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরানোর উদ্দেশ্যেই আফগানিস্তানের গভর্নমেন্ট পাকতুনিস্তান নিয়ে হুজ্জুত হাঙ্গামা করার জন্য আফগানিস্তানীদের প্ররোচিত করছেন। আফগানিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থার বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল, তবে পাকতুনিস্তানের সমস্যা মোটেই নূতন নয় এবং সে সম্বন্ধে আফগানিস্তানীদের আগ্রহ সরকারী প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা একটা নূতন তৈরী করা ব্যাপারও নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কোন লজ্জায় এরূপ অভিযোগ করেন। পাকিস্তানে এখন গণতন্ত্রের বহরটা কিরকম চলছে তা কি কেউ জানে না? অন্যান্য দিক দিয়েও পাকিস্তানের আভ্যন্তর অবস্থাটা কি গর্ব করার বিষয়বস্তু? পাকিস্তানের প্রজাদের দৃষ্টি নিজেদের অবস্থার দিক থেকে ফেরানোর প্রয়োজন কি পাকিস্তানী কর্তারাও অনুভব করেন না? আফগানিস্তানকে “শিক্ষা দিয়ে দেবার” আস্ফালন শুনে আফগানরা যতটা না ভীত হবে তার চেয়ে পাকিস্তানী প্রজারা বাহবা দেবে—এইটিই কি পাকিস্তানী কর্তারা ভাবছেন না?

সম্প্রতি জম্মু সীমান্তে পাকিস্তানী পুলিস গুলী চালিয়ে ভারতীয় এলাকার মধ্যে ১২ জন ভারতীয় সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করেছে সেটাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করা কঠিন। ইহার পিছনে একটি অভিসন্ধি আছে বলে বোধ হয়। এই ব্যাপার নিয়ে ভারত পাকিস্তানী সরকারের মধ্যে মনকষাকষি অনিবার্য। ভারত সরকার এই ঘটনা উপলক্ষে পাকিস্তানী সরকারকে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পাকিস্তানী সরকার এই ঘটনার গুরুত্ব লাঘব করার জন্য ভারতীয় পক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টাও যে করবে অতীতের নজীর থেকে এ ভবিষদ্বাণীও করা যেতে পারে। এই ঘটনার জন্য উল্টে ভারতকে গালাগালি করা এবং পাকিস্তানী প্রজাদের কাছে পাকিস্তানী পুলিসের কেরদানীর তারিফ করা—হয়ত দুই-ই এক সঙ্গে চলবে। মোটের উপর পাকিস্তানী প্রজাদের দৃষ্টি দেশের আভ্যন্তর অবস্থার দিক থেকে অন্যদিকে ফেরানোর জন্য এই ঘটনা কাজে লাগানো হবে। সেই উদ্দেশ্যেই ইহা সংঘটিত হয়েছে কিনা কে জানে

* * *

২৬এ মে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হবে। প্রধান মন্ত্রীরূপে স্যার উইনস্টন চার্চিলের স্থলাভিষিক্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্যার এন্টনী ইডেন নূতন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত করেন। এখনই নির্বাচন হলে কনজারভেটিব পার্টির জেতার আশা অপেক্ষাকৃত বেশী বলে দলের ধারণা। জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এখন ক্রমশ কমার দিকে চলেছে। সুতরাং দেরি হলে কনজারভেটিব গভর্নমেন্টের প্রতি লোকের মন ক্রমশ বেশি অপ্রসন্ন হবে। বৈদেশিক ব্যাপারেও লোকের মন পাবার পক্ষে কনজারভেটিব পার্টি এখন একটা সুযোগ পেয়েছে। লেবার পার্টি রাশিয়ার সঙ্গে আপোষ আলোচনার জন্য বৃহৎ চতুঃশক্তির কর্তাদের একটি সম্মেলনের প্রস্তাবের উপর খুব জোর দিয়ে আসছিল। মার্কিন গভর্নমেণ্ট এই প্রস্তাবে এতদিন বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখান নি। এখন মার্কিন গভর্নমেণ্ট এরূপ একটি সম্মেলনে রাশিয়াকে আহ্বান করতে রাজী হয়েছেন। সম্মেলন হলে কবে হবে, কাদের নিয়ে হবে, তাতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হবে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এখনো বাকী। তবে আমেরিকাকে সোভিয়েটের সঙ্গে আলোচনার জন্য সম্মেলন ডাকতে রাজী করানো গেছে, এতেই নির্বাচনে কনজারভেটিব পার্টির কিছুটা সুবিধা হবে। বৃটিশ জনমত রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চায়। লেবার পার্টি বলে আসছে যে তারা যদি জেতে তবে এরূপ আলোচনার জন্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। কনজারভেটিবরা এখন বলবে যে কনজারভেটিব গভর্নমেণ্টের চেষ্টাতেই সম্মেলন আহূত হবার সম্ভাবনা হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে মার্কিন সরকারের মত সম্মেলনের প্রস্তাবের অনুকূল হওয়াও বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিব দলের কিছু সুবিধা হতে পারে; কিন্তু কার্যত সম্মেলন কি রকম হবে এখনো বলা যায় না। একদিক দিয়ে পশ্চিমা শক্তিরা জিদ বজায় রেখেছে, পশ্চিম জার্মানীকে NATOতে অন্তর্ভুক্ত না করে তারা রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলতে রাজী নয়—এটা দেখিয়েছে। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাশিয়া রাজী হয়েছে—এটাকেও রাশিয়ার পক্ষে একটা সদ্বুদ্ধির প্রমাণ বলে আমেরিকা গণ্য করতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার দিক থেকেও কোনো শর্ত নেই, এরূপ মনে করলে ভুল হবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট মনে করেন যে, বিশ্ব-শান্তির আলোচনা কেবল মার্কিন ও য়ুরোপীয় শক্তিদের মধ্যে করলে লাভ হবে না, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এরূপ আলোচনায় চীনকে শরিক করার একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু তাতে আমেরিকা বর্তমানে রাজী হবে কি? কেবল চীন নয়, ভারতবর্ষ ও অন্য এশীয় দেশের কথাও উঠতে পারে। এছাড়া আরও বিশেষ করে জার্মানীর সমস্যা সংক্রান্ত অনেক বাধা আছে।

১০-৫-৫৫

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামীজী বলিয়াছেন, "মানুষ সমাজে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন আছে।" এই কথাটির সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করা যায়, সে কথাটি এই যে, কার্য-পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন দেশের পরস্পরের কাছে শিক্ষালাভের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের কার্য-পরিচালন পদ্ধতি ঢিমাঢালা গোছের, আর পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি 'তাড়-ঘড়ি', অর্থাৎ যাহা করিবার করিয়া ফেল। সময়কে পাশ্চাত্ত্য দেশ যেভাবে মূল্য দেয়, প্রাচ্য সেভাবে মূল্যদান করে না। পাশ্চাত্ত্যে সব কাজই, তা ছোট ও বড় যেমনই হোক্ না কেন, নিয়ম ও শৃঙ্খলার বন্ধন এমনভাবে বাঁধা যে, তাহার আর এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। কিন্তু প্রাচ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার দিকে ততটা মনোযোগ দেওয়া হয় না।

স্বামীজী তাঁহার সঙ্ঘ সংগঠনে ও মিশনের কাজে এই নিয়মানুবর্তিতা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এই উভয়ই নিজের নিজের দিক দিয়া তৎপরতার পথে চলিয়াছে। মিশন হইল প্রেরণা, আর সঙ্ঘ হইল সম্মিলিতভাবে সেই প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে রূপদান। এই দুই ব্যাপারেই প্রচার-পত্রিকার যে কতখানি প্রয়োজন, স্বামীজী সেকথা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই গুডউইন যখন আমেরিকায় একখানি পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব করিলেন, স্বামীজী সে প্রস্তাবে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিলেন। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন একজন আমেরিকান ভক্তকে যে পত্র লেখেন, সে পত্রখানির ভাব এইরূপঃ—"গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা সম্বন্ধে তোমাকে ডাকে পত্র দিচ্ছে। আমারও মনে হয়, বেদান্ত প্রচারকার্যটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই রকমের একটা কিছু দরকার। আমি অবশ্য সে যেভাবে কাজ করবার উপায় নির্দেশ করবে সেইভাবেই তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব।"

মাদ্রাজেও এই সময় একখানি পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। মাদ্রাজে স্বামীজীর যেসব গৃহী শিষ্য 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন ছেলেদের জন্য একখানি পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা জানাইয়া স্বামীজীকে পত্র লিখিয়াছেন, স্বামীজী সে পত্রের উত্তরে ১৪ই মার্চ যে পত্র লেখেন, তার ভাবার্থ এইঃ—"তোমরা ছেলেদের জন্য যে কাগজ বার করবার প্রস্তাব জানিয়েছ, সে প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ব্রহ্মবাদিন পত্রিকা এবং এই পত্রিকাটি যদিও একই ধারা ধরে চলবে, কিন্তু তার মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য রাখতে হবে। এর লিখনভঙ্গী যেন সহজবোধ্য এবং সাধারণের চিত্তাকর্ষী হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

এই পত্রিকাখানি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে প্রকাশিত হইল। মাত্র বারো পাতার একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন মিঃ আলাসিঙ্গা ও ডাক্তার মঞ্জুণ্ডা এবং আর কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য।

মাদ্রাজ হইতে দুইখানি আর আমেরিকা হইতে একখানি, সর্বসমেত এই তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইল এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই পত্রিকাগুলিকে প্রচারকার্যের বিশেষ সহায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ৮ই আগস্ট যে পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেনঃ—

"যে কাজের ভার লইয়াছ, তাহা দেবকার্যের ন্যায় সমস্ত মন দিয়া করিয়া যাইবে। জানিবে যে, তাহারই সাফল্যের উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করিতেছে।"

ডাক্তার নঞ্জুণ্ডা রাওকে তিনি লিখিয়া ছিলেন—

"যে কাজের ভার যাহার উপর আছে সে তাহার পরিষ্কার হিসাব রাখিবে যে কাজের উদ্দেশ্যে যে টাকা আছে, সে টাকা সেই কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে,- সে কাজ যেমনই হোক না কেন—ব্যবহার করিবে না। ইহার জন্য যদি পরমুহূর্তে মরিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকেই বর করিবে। সদ্ভাবে কাজ করিবার ইহা নিয়ম। প্রত্যেক কাজেই অদম্য কর্ম তৎপরতা আবশ্যক। তুমি যা কিছু কর না কেন, সে সময়ের জন্য সেই কাজটি যেন তোমার ভগবৎ আরাধনা হয় উপস্থিত ঐ কাজটিই তোমার ভগবান এইরকমভাবে কাজ করিলেই তুমি কৃতকার্য হইবে।"

প্রকৃতপক্ষে ইহাই কর্মযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইহাই আদর্শ এবং এই আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই রামকৃষ্ণ মিশন অদ্যাবধি পরিচালিত হইতেছে।

প্রতিষ্ঠান যখন জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়, তখন সেই পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যাঁহাদের উপর থাকে, তাঁহাদের অর্থব্যয় ব্যাপারে কতখানি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, স্বামীজী এইভাবের নির্দেশে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

গুডউইন ও স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকা চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী কিছুদিন একাই ছিলেন, তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে বাহির হন। এই সময় তাঁহার শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রথমেই তিনি সুইজারল্যান্ড যান। জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ করেন। সংগে ছিলেন মিস মুলার, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার। সে সময় জেনেভায় এক প্রদর্শনী চলিতে-ছিল। স্বামীজী ইংলন্ড ত্যাগ করিয়া এক রাত্রি প্যারিসে থাকিয়া পরদিন জেনেভায় যান। সেখানে প্রদর্শনী দেখেন এবং প্রদর্শনীক্ষেত্রে দর্শকদের যে বেলুনে

ড়ানো হইতেছিল, সেই বেলুনেও তাঁহারা কলে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইসব পারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা ইত।

জেনেভায় স্বামীজী তিনদিন থাকেন। াহার পর সেখান হইতে চল্লিশ মাইল রে শামনিস নামে একটি গ্রামে যান। ই গ্রাম হইতে মঁ ব্লাঁ পর্বতের বরফে াকা চূড়া চোখে পড়ে। পর্বতের ানুদেশে একটি হোটেল আছে। যাহারা র্বতে উঠিতে চায়, তাহারা সেই হোটেলে াসিয়া আস্তানা নেয়, সেখানে পথ-প্রদর্শকও আছে। কিন্তু স্বামীজীকে সই পথপ্রদর্শকেরা জানাইল যে, পাহাড়ে ঠা যাহাদের অভ্যাস আছে, তাহারা ছাড়া ার কাহারও এই খাড়া এবং বরফে পিচ্ছিল পাহাড়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব। বামীজীও সেকথা বুঝিতে পারিলেন।

যাহাই হউক, তাঁহারা বরফের উপর দয়া হাঁটিবার আনন্দ উপভোগের সুযোগ াড়িলেন না। পর্বত-শিখরের নীচে যে তূপাকার বরফ জমিয়াছিল, সেই পথের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহারা রফের স্তূপ পার হইয়া পার্বত্য অধিত্যকার একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সখানে একটি ছোট হোটেল ছিল। হোটেলে এক কাপ চা পান করিতে পারিয়া তুষারের পথে ভ্রমণের পরিশ্রমের পর তাঁহারা অনেকটা সুস্থ হইলেন।

বরফ, বরফ, আর বরফ! চারিদিক যেন এক সাদা আস্তরণ দিয়া ঢাকা। সূর্যোদয় হইলে সেখানের যে অপূর্ব শোভা হয়, সে অতুলনীয় সৌন্দর্য গিরিরাজ হিমালয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বামীজীর তখন কেবলই হিমালয়ের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। সেই রুদ্র-প্রয়াগ, সেই কর্ণপ্রয়াগ ও সেই স্রোতবতী অলকানন্দা! ছয় বৎসর আগের সেই পার্বত্যপথে নিঃসম্বল ভ্রমণের দিনগুলি। সেইসব দিনের কাহিনী তিনি যখন তাঁহার সঙ্গীদের কাছে বলিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মনে একটা সংকল্প দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "আমার খুবই ইচ্ছা যে, হিমালয়ে সন্ন্যাসীদের একটি আস্তানা হয়। সেখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য ত্যাগী ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়ে নিজের নিজের দেশে বেদান্ত-দর্শন প্রচারের কার্যে প্রচারকরূপে গড়ে তুলতে হবে, আর আমার এই কর্মজীবনের শেষে অবসর নিয়ে সেখানেই ধ্যান ও ভজনের মধ্যে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারবো।"

স্বামীজীর এই কথা শুনে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, এইরকম একটা মঠ আমাদের করতেই হবে।" ইহাই মায়াবতী আশ্রম স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা।

ইহার পর তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের একটি গ্রামে প্রায় পনেরো দিন ছিলেন। সেই গ্রামে থাকিবার সময় স্বামীজী জার্মানীর 'কীল' নামক স্থান হইতে এক আমন্ত্রণ-পত্র পান। পত্রখানি লিখিয়া-ছিলেন, কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-দর্শনের অধ্যাপক পল ডয়সন। পল ডয়সন তাঁহাকে কীল বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জন্য এবং তাঁহার বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থানের জন্য সেই পত্রে বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সেই পত্রের উত্তরে স্বামীজী ইংলণ্ডে ফিরবার পথে কীলে যাইবেন, একথা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন।

অনবরত কঠোর পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ইংলণ্ডে খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সুইজারল্যাণ্ডের জল-বায়ুর গুণে ও বিশ্রামে কতকটা ভাল হওয়ায় তিনি এখন আবার কাজের মধ্যেই ফিরিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া-ছিলেন।

প্রথমে তিনি গেলেন লুকার্নে, তারপর জারমাট্রে, এটি সুইজারল্যাণ্ডের একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থানটি দেখিয়া তিনি রাইন নদীর উৎস দেখিতে গেলেন এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থান হিডেলবার্গ দেখিয়া রাইন নদী পার হইয়া কোলানে গেলেন।

কোলান হইতে বার্লিন। বার্লিন তখন পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ নগর। জার্মান সৈনাদল কিরূপ সুশিক্ষিত, কেমন তাহাদের শারীরিক গঠন, রণনৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা--জার্মান জাতি কিভাবে ঐকান্তিক সাধনায় শিল্প কলাবিদ্যা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, কি প্রবল তাহাদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা!

স্বামীজী এ সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলে[ন] এবং নিজের দেশের সহিতও মনে ম[নে] তুলনা করিয়াছিলেন।

এই অতি জ্বলন্ত দেশপ্রেম! সন্ন্যাসী পরিচ্ছদে কি তাহা ঢাকা পড়িতে পারে নিবেদিতা স্বামীজীর প্রসঙ্গে বলিয়াছে[ন] "একটি জিনিস আচার্যদেবের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল--যাহা তিনি কিরূপে ঠিকভাবে রাখিবেন, তাহা নিজে[ই] জানিতেন না। উহা তাঁহার স্বদেশপ্রে[ম] এবং স্বদেশের দুর্দশার প্রতিকারের ইচ্ছা কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে প্রা[য়] প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম। দেখিতা[ম] ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাস রূপে হইয়া রহিয়াছে। সত্য বটে, তিনি কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে চাহিলে একেবারে উহার মূলে না গিয় ছাড়িতেন না। তিনি "জাতীয়ত্ব শব্দটিও ব্যবহার করিতেন না ব[া] বর্তমান যুগকে 'জাতিগঠনের যুগ বলিয়াও ঘোষণা করিতেন না; তিনি বলিতেন, 'আমার কাজ মানুষ গড়া।' কিন্তু তিনি মহাপ্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর জন্মভূমি...

ছিল তাঁহার আরাধ্য-দেবতা। একটি ঘণ্টাকে চারিদিকের ভার সমান করিয়া নিপুণভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন উহা যে কোন শব্দ দ্বারা তাড়িত হইবামাত্র ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে, তাঁহার জন্মভূমি-সংশিলষ্ট সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ হইত। ভারতের চারি-সীমার মধ্যে যে কোন কাতর ধ্বনি উঠিত, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইত। ভারতের প্রত্যেক ভীতিসূচক চীৎকার, দুর্বলতাপ্রসূত কম্পন, অপমানজনিত সঙ্কোচবোধই তিনি জানিতেন ও অনুভব করিতেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই ভারতীয় প্রসঙ্গে তাঁহার সমান আনন্দ হইত—অথবা তাঁহার শ্রোতৃগণের সেইরূপ মনে হইত। তাঁহার এই সকল কথোপকথনে রাজপুতগণের বীরত্ব, শিখদিগের ধর্ম-বিশ্বাস, মারাঠাগণের শৌর্য, সাধুদিগের ঈশ্বরভক্তি এবং মহানুভবা নারীগণের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা—এই সমস্তই যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত। মুসলমান-গণও এই প্রসঙ্গে বাদ পড়িতেন না। তিনি ভারতকে তাহার অন্যায় আচরণের জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেন, তাহার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু সে কেবল ঐ দোষগুলিকে অপরের নয়, তাঁহার নিজেরই দোষ মনে করিতেন বলিয়া। পক্ষান্তরে, কেহই আবার তাঁহার ন্যায় ভারতের ভাবী মহিমা কল্পনায় অভিভূত হইতেন না। তাঁহার চক্ষে, হিমালয়ের অরণ্যানী-মধ্যস্থ এক পর্বতপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া, নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম "হর্ হর্ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শরীর ছাড়িয়া দেওয়াই আদর্শ মৃত্যু।"

নিবেদিতার এই বর্ণনায় স্বামীজীর যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই, আছে কেবল এক পরিপূর্ণ অনুভূতি।

স্বামীজী কীলে পৌঁছিয়া সদলে একটি হোটেলে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু অধ্যাপক ডয়সন তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই তাঁহার বাড়িতে গিয়া প্রাতঃকালীন চা খাইবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, সেজন্য পরদিন সকালেই তাঁহারা অধ্যাপকের বাড়ি গেলেন।

অধ্যাপক ডয়সন একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, ভারতীয় দর্শনের তিনি বিশেষ ভক্ত। তিনি ইতিপূর্বেই সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তিনি উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ করিয়াছেন। ইনি ভারতের প্রতি এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন যে, নিজের ডয়সন নামের পরিবর্তে নিজেকে 'দেবসেনা' নামে উল্লেখ করিতেন। স্বামীজী যে কয়েকদিন অধ্যাপকের বাড়ি ছিলেন, সেই কয়েকদিন দুজনে অধিকাংশ সময় বেদান্ত আলোচনা করিয়াছেন এবং এই অল্প কয়েকদিনেই উভয়ের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব হইয়াছিল। স্বামীজী যখন বিদায় লইবার কথা বলিলেন, অধ্যাপক তখন তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু স্বামীজীর তখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা তিনি সেখানে গিয়া ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারের একটা পাকা-

পাকি ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না। অগত্যা অধ্যাপক নিজেই ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "তা হলে আপনি প্রথমে হ্যামবুর্গে যান, সেখানে গিয়ে আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং দুজনে একসঙ্গেই ইংলণ্ডে রওনা হব।"

সেই অনুসারে স্বামীজী প্রথমে হ্যামবুর্গে গেলেন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং অধ্যাপক ডয়সনও সপরিবারে হ্যামবুর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। হ্যামবুর্গ হইতে তাঁহারা প্রথমে গেলেন হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম শহরে। সেখানকার আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিলেন, স্থানীয় অনেকের সহিত স্বামীজীর পরিচয়ও হইল। এইভাবে যেখানে যখন স্বামীজী গিয়াছেন সেইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ রোপিত হইয়াছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। লণ্ডনে তিনি সেভিয়ার দম্পতির হ্যামস্টেডের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া মিস্ মুলারের উইম্বলডনের বাড়িতে চলিয়া যান। এখানে থাকিবার সময় "মানব-সভ্যতায় বেদান্তের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে দুই সপ্তাহে দুইটি বক্তৃতা দেন। নিয়মিত ক্লাসও আরম্ভ করেন, সেই সব ক্লাসে প্রধানত 'রাজযোগ' সম্বন্ধেই শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ছাত্রদের নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে হইলে কিভাবে চলা উচিত, সে সম্বন্ধেও স্বামীজী শিক্ষা দিতেন। যাহারা বিশেষ অধিকারী বলিয়া তাঁহার মনে হইত, তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও তপস্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে মিস্টার স্টার্ডি স্বামীজীর ক্লাস করিবার জন্য ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি হল ভাড়া নিলেন এবং তারই কাছে ওয়েস্ট মিনস্টারে ১৫ নং গ্রে কোর্ট গার্ডেনে সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর জন্যে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। এই সময় স্বামীজী 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং সেই বক্তৃতাগুলিই একত্র করিয়া 'জ্ঞানযোগ' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।

স্বামীজী এই সময় স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন। বরানগরের মঠ হইতে তাঁহার গুরুভাইরা তখন আলমবাজারে গিয়াছেন। স্বামীজীর পত্র পাইয়াই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন সকলে অভেদানন্দকে লণ্ডনে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

স্বামী অভেদানন্দের গার্হস্থ্য-জীবনে নাম ছিল কালীপ্রসাদ। তাঁহার মা সন্তান-প্রাপ্তির জন্য শ্রীশ্রীকালীর অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই জন্য ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন কালীপ্রসাদ। ১৮৬৬

খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কালীপ্রসাদের জন্ম হয়। লণ্ডন যাত্রার সময় তাঁহার মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল। অল্প বয়সেই তিনি পায়ে হাঁটিয়া অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। তপস্যার দিকে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এজন্য তাঁহার গুরুভাইরা তাঁহাকে কালী-তপস্বী বলিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে একটি জন্মগত দার্শনিক ভাব ছিল; অল্প-বয়সেই তাঁহার মনে 'কেন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, জন্মগ্রহণের সার্থকতা কি, সেই সার্থকতা লাভের উপায়ই বা কি?' এই-রকম প্রশ্ন উদয় হইত। তিনি যখন 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন, তখনই তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য এবং পাতঞ্জল-দর্শন প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থও তিনি সেই সময়ে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অ্যালবার্ট হলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন, বঙ্কিম-চন্দ্র সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া কালীর মন ধর্মসাধন এবং যোগাভ্যাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গুরু না থাকিলে ধর্মসাধনার পথ দেখাইবেন কে? উপযুক্ত গুরুই বা কোথায় পাইবেন? তিনি তাঁহার সহপাঠী বন্ধু যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "ভাই, তুমি কোন গুরুর কথা জান?" উত্তরে যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "আমি একজনের কথা শুনেছি, লোকে তাঁকে পরমহংস বলে। তিনি গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী বাড়ীতে থাকেন। শুনেছি তিনি নাকি একজন মহাপুরুষ।"

এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কোন পথে যাইতে হয় তাহা তিনি জানেন না। সোজা-সুজি টালার পুল পার হইয়া একদিন খুব ভোরে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে সাতপুকুর নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এ পথ দক্ষিণেশ্বরের পথ নয়, তখন আবার তাহারই নির্দেশমত চলিতে চলিতে অবশেষে বেলা ১১টার সময় যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ফটকের কাছে আসিলেন তখন পথশ্রমে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর একেবারে অবসন্ন। তাহার পর যখন শুনিলেন যে, 'পরমহংস মহাশয় মন্দিরে নাই, তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন হয়তো রাত্রে ফিরিতে পারেন' তখন আর তাঁহার দাঁড়াইয়া থাকিবার সামর্থ্য রহিল না।

ভগবানের দয়ায় এই সময় তাঁহার দেখা হইল শশী মহারাজের সহিত। শশী মহারাজও (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঠাকুরের কাছেই আসিয়াছিলেন, তিনিও শুনিলেন ঠাকুর কলিকাতা গিয়াছেন। দুয়ারের কাছে কালীপ্রসাদ মাটীতে বসিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা জানিয়া লইলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি এত কষ্ট করে যাঁকে দেখতে এসেছ তাঁর দেখা নিশ্চয়ই পাবে। এখন এস, দু'জনে গঙ্গায় স্নান করে আসি, তারপর মা কালীর প্রসাদ পেয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি।"

সেইদিন রাত্রি নয়টার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন কালীপ্রসাদ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ইহার পর ২।৩ দিন অন্তর অন্তর কালী দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। আহিরীটোলায় নৌকায় উঠিয়া আসা যায়, কিন্তু নৌকা ভাড়া হয়ত হাতে থাকিত না, আবার বাবা ও মাকে না বলিয়া পলাইয়া আসা। এইভাবে তাঁহার দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। তাহার পর ক্রমশ অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় হইল এবং ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে তিনি তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু বাবুরামকেও দেখিয়া খুবই খুশী হইয়াছিলেন।

কাশীপুরের বাগান বাড়িতে ঠাকুরের অসুখের সময় যাঁহারা তাঁহার সেবার জন্য দিনরাত থাকিতেন কালীও সেই দলে ছিলেন। তিনি সেই সময় নরেন্দ্রনাথের উপর এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, সকল কাজে এমন কি ধ্যান ধারণার ব্যাপারেও তাঁহার অনুকরণ করিতেন।

সেই তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুভাই আজ তাঁহাকে ইউরোপ হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার কার্যে সহকারী হইবার জন্য, ইহাতে অভেদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না।

কলিকাতা প্রিন্সেপ ঘাট হইতে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে তিনি রওনা হইলেন। নয়জন গুরুভাই তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য জাহাজ ঘাটে আসিয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণ অভেদানন্দ ডেকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভেদানন্দ স্বামী ইংলণ্ডে পোঁছিয়া প্রথমে স্বামীজীর সঙ্গে মিস মুলারের বাড়িতেই ছিলেন, তাহার পর গ্রে কোর্ট গার্ডেনে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হইলে স্বামীজীর সঙ্গে তিনিও সেই বাড়িতে গেলেন। এখানে কিছুদিন স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার কার্য পরিচালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই যখন স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা দানের দিন স্থির করিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, ২৭শে অক্টোবর ভারত হইতে আগত স্বামী অভেদানন্দ ব্লুমসবেরির স্কোয়ার ক্লাবে 'পঞ্চদশী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন" তখন অভেদানন্দ ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর উৎসাহদান তাঁহার মনে শক্তি সঞ্চার করিল, তিনি মনের সকল দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। যদিও ইহার আগে কোনদিন তিনি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন নাই কিম্বা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন নাই এবং যদিও সেই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা কিন্তু সেটি এমন সাবলীল ভাষায় হৃদয়গ্রাহীভাবে বলা হইয়াছিল যে, বক্তৃতা শেষে শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন স্বামীজী নিজে। তিনি এই বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন ঃ—

"Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it".

আমি এ জগৎ থেকে অন্তর্হিত হ'লেও এই সব প্রিয় অধরে আমার বাণী ধ্বনিত হবে এবং জগৎ তা' শুনবে।"

স্বামীজীর এই দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসার পর অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মত মনীষী তখনকার দিনে ইংলণ্ডে খুব কমই ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার মত পণ্ডিত পাশ্চাত্যে আর কেহই ছিলেন না। ইনিই সর্বপ্রথমে ইংরেজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশ করেন। স্বামীজীর নিকট ঠাকুরের জীবনের অলৌকিক কাহিনী সমূহ শুনিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বামীজী ৩০শে মে তারিখের একখানি পত্রে ম্যাক্সমুলারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'য়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক। তাঁর বয়স সত্তর বৎসর হ'লেও তাঁকে যুবকের মত দেখায়। এমন কি তাঁর মুখে একটিও চিন্তার রেখা নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, তার অর্ধেকও যদি আমার থাকত!

"সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অপরিসীম এবং তিনি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে' তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি তাঁহাকে জগতের সম্মুখে প্রচার করিবার জন্য কি করিতেছেন?"

"শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন ইহা কি একটি সুসংবাদ নয়?"

যে শক্তির প্রভাবে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে আকস্মিক এক অপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল সে কোন্ অপার্থিব শক্তি? তাহারই সন্ধানে ম্যাক্সমুলার প্রথমে যাঁহার সন্ধান পান তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনিই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্র সেনের এইভাবে জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের এই আবিষ্কার তাঁহাকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই তিনি যখন স্বামীজীর মুখে শুনিলেন যে, আজ হাজার হাজা[র] লোক তাঁহার পূজারী হইয়াছে তখ[ন] অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলিয়া উঠিয়াছিলে[ন] "এমন লোক ছাড়া আর কাহাকে পূজ[া] করবে?"

অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার অক্সফোর্ডে[র] বাড়িতে স্বামীজী ও মিস্টার স্টার্ডিকে লাঞ্চ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন এব[ং] তাঁহারা তাঁহার বাসায় গেলে তিনি পরমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে[র] প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বামীজী ও স্টার্ডিকে সঙ্গে লইয়া অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও কলেজ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী দেখাইলেন, তারপর স্বামীজী যখন তাঁহাকে বিদায় জানাইয়া চলিয়া আসেন তখন তিনি তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী যখন তাঁহাকে আর কষ্ট করিয়া স্টেশন পর্যন্ত না আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন ঃ—

—"রামকৃষ্ণের শিষ্যের দর্শন প্রতিদিন পাওয়া যায় না।"

স্বামীজী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার কি অসাধারণ মানুষ! কয়েকদিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা নয়,—আমি বোলবো—তাঁর প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যই গিয়েছিলাম—কেননা যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি যে-কোনও জাতি, সম্প্রদায় বা মতেরই হউন না কেন, তাঁকে দর্শন করা আমার তীর্থ দর্শনেরই সমান। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা তে মে ভক্ত তমাঃ মতাঃ।"
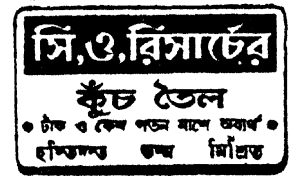
প্রকৃতি, তুমি

শিবশম্ভু পাল

পৃথিবীর সেই পুরোনো বাহার, সেই আকাশ
অম্লান নীলে ছড়িয়ে রয়েছে, অনেক ফুল
ফোটে আর ঝরে; বহুরূপী ঋতু; সবুজ ঘাস
সেই সব ছবি, তবুও কোথাও রয়েছে ভুল;
চোখের আলোয় মনে হয় ওরা ছিন্নমূল!
সুরসংগতি হারায় ওদের বর্ণাভাস।

প্রাণের অগ্নিস্পর্শে এ-মন জ্যোতির্ময়
ক'রে তোল অয়ি স্বপ্নের দূতী, ক'রো আমায়
দৃপ্ত পুরুষ—তোমারি শরণ, হে নির্ভয়।
সূর্যমুখীর বাসনা আমার তোমাকে চায়।
ঋতুপর্ণার বর্ণবিভোর রঙ্গমায়
তুমিই ফল্গু অন্তঃশীলা জীবন্ময়।

পৃথিবীর সেই পুরোনো বাহারে আনো গভীর
প্রাণনার ছোঁয়া, শূন্যেগর্ভ মৌন চোখ
কথায় সাজাও—মুকুর তোমারি ছয়াছবির
ক'রো অতুলনা। অসহ ধূসর এ-নির্মোক
দৃষ্টির পথে, প্রকৃতির মুখে। সাঙ্গ হোক
বেসুরোর পালা। বিস্ময় দাও আদিকবির॥

একমুঠো রোদ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

একমুঠো রোদ এলো একঝাঁক পাখির মতোন
উড়ে-উড়ে, ডানা নেড়ে, ঠোকরে ঠোকরে কুয়াশার
ছায়াছোঁয়া জাল ছিঁড়ে, ঘাসের সবুজে রেখে তার
ডানার নরম ছোঁয়া,—আলোর পলক একঝাড়
ঝরালো হলুদ রোদ, একঝাঁক পাখির মতোন!

পাখিরই মতোন আহা সেই রোদ গেলো উড়ে-উড়ে
এখানে-ওখানে, আর ধানক্ষেত-মাঠ-ঘাট জুড়ে
ছড়ালো আলোর ঢেউ। বাবলার ডালে, শিরীষের
পাতায়-পাতায় ঠোঁট রেখে, চুমু এঁকে-এঁকে, ফের
মেঘের মিনার ছুঁয়ে সেই রোদ ফিরে-ফিরে আসে
বাতাবী ফুলের দেহে, একরাশ বকুলের পাশে!
আলপথ ধ'রে ধ'রে আম-জাম-ঝাউ-পিপুলের
ভিড় ঠেলে-ঠেলে সেই ঝিলমিল সোনালি রোদের
ছায়ারা ছড়ালো আহা, তারপর আরো বহু দূরে!

একমুঠো রোদ এলো ঢেউনীল সমুদ্র-আকাশে
ছড়িয়ে আলোর স্বপ্ন মাঠে-মেঘে আর ফুলে-ঘাসে॥

কোন অলস মুহূর্তে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কতনা ক্লান্তি স্রোতের শিয়রে বেদনায় পাক খায়
স্বপ্নমুখর কতনা দুপুর তুমি দুই হাতে ছড়ালে
রাতে অগনিত তারার স্বপ্নে আমার আকাশ ভরালে!

চলার ছন্দে তবুও পথের ধুলো ওড়ে পায় পায়
মাঠের ওপাড়ে বিকেল গড়ায় এপারে চকিত হাওয়া
একটি দিনের শেষে গিয়ে শুধু আরেকটি দিন চাওয়া।

একটি দিনের আর্তি এখানে বেদনার সীমানায়
রাতের জোয়ারে আবেগে নিবিড়
তোমাকে দু'হাতে জড়ানো
একটি স্বপ্নে বন্ধ্যা আকাশে তারার স্বপ্ন ছড়ানো॥

বংশ-প্রমাণে

সুনীলচন্দ্র সরকার

—'বিশ সহস্র শ্রমণের সাথে
বুদ্ধ এলেন দ্বারে'—
কপিলাবস্তু শোনে সচকিতে,
বিস্ময় বাজে প্রহর-ঘড়িতে,
বন্ধ পুঁথির পাতা ওলটায়
এতদিনে এইবারে;
উতল, নিথর ভিড় গাঢ় হয়
বুদ্ধের চারিধারে।

বুদ্ধ করেন শীল-ব্যাখ্যান
পুরবাসী তাই শোনে,
শুধু বঞ্চিত রাজ-পরিবার,
ভিখারীর মাঝে পেল না কুমার,
পুরানো রোদন এতদিনকার
গুমরায় মনে মনে,
ঘরের নাটক স্তম্ভিত থাকে
মুক্ত সভাঙ্গণে।

ঘরে ফিরে এসে পুরাধ্যক্ষে
ডাকেন শুদ্ধোদন ঃ
'দেখ, কোনখানে কেমনে অচিরে
অতিথিশালায়, কিম্বা শিবিরে
আহার্য আর আশ্রয় পাবে
বিশ সহস্র জন।
প্রভাতের আগে প্রস্তুত চাই'—
বলেন শুদ্ধোদন।

—'কে আর কোথায় নেবে এই দায়
অজস্র মূল্যের?
আসে নি' কণ্ঠে লুপ্ত-প্রমাণ
পিতৃত্বের স্নেহ-আহ্বান,
তবু বোধ করি কিছু দাম আছে
রাজ-আনুকূল্যের।'
ব্যর্থ স্নেহের দাবী খাড়া হয়
অজস্র-মূল্যের।

বুদ্ধ ফেরেন ভিক্ষা-ভ্রমণে
মধ্যসূর্যালোকে,
রাজা রোখে পথ ঃ 'বলো, কি কারণ
তুচ্ছ করেছ রাজ-আয়োজন?
কিছু নয়, চাও বুড়ো রাজাটার
গায়ে ধুলো দিক্ লোকে?
অষ্ট শীলের এটা কোন্ শীল?'
ফুকারে বৃদ্ধ শোকে।

—'সেই গিয়েছিলে গভীর রাত্রে
গৃহের মর্ম ছিঁড়ে,
যথাতথা কর রাত্রি-যাপন,
সকল পৃথিবী করেছ আপন,
শুধুই জিয়াবে পুরানো এ ঝড়
নিজের জন্ম-নীড়ে?
বংশের মান নামাবে ধুলায়
ভিখারীর দলে ভিড়ে?'

'বংশের মান?'—বুদ্ধ বলেন,
'এসেছি আমি যে বংশে
সে কুল কখনো ধরেনি দণ্ড,
পায়নি মুকুট, রাজ্যখণ্ড,
দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে তারা
বেঁচেছে দানের অংশে;
জন্মেছি সেই চির-ভিক্ষুক
প্রাচীন বুদ্ধ-বংশে।

—'যে বংশ নামে পুরুষে পুরুষে
তৃষ্ণার পথ বেয়ে,
মিশ্রিত হয় মানে অভিমানে
বহু জীবনের বিপরীত দানে
সে কখনো নয় শেষ পরিচয়।
আমি দেখি তার চেয়ে
অন্তরতম সাধনাধারাটি
নামে কোন পথ বেয়ে।

'—দেখ কি অপার করুণা-সিন্ধু
লুটায় ধরণীতলে,
কেন মহারাজ আজো কূলে বাস,
শুধু পুষে রাখা ভুল ইতিহাস,
ধুয়ে মুছে নাও শোক সন্তাপ
এ সম-শান্তিজলে,
চেনো আপনার কুলপরিচয়
সত্য সাধন বলে।'

কী মন্ত্রে ঝরে দুপুর রৌদ্র
নববর্ষার মত,
স্নিগ্ধ সেচনে ধুয়ে মুছে শোক
শাদা ক'রে দেয় আরক্ত চোখ,
করে নিরাময় নৃপতি-পিতার
বৃহৎ বুকের ক্ষত,
ভোলে রাজা মান বংশ-প্রমাণ
বুদ্ধ-শরণাগত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

কিসের টাকা কোন্ দিকে গড়ায় দেখুন। যাক, মাছ দিয়েই আরম্ভ করি।

হ্যাঁ, মাছ। হিসাব করলে দেখা যায় আজ একুশ দিন বাড়িতে মাছ আসে না। আসতে পারে না। কি করে আসবে। এই প্রথম দিকে বড়জোর তিন কি চারদিন বাজার করা হয়। তখন একটু মাছটাছ শাকসব্জি এটা-ওটা দু'চার পদ কিনে থলে ভর্তি করে, যাকে বলে রীতিমত বাজার করা যদি বা সম্ভব হয়, তারপর থেকে পাড়ার মুদি দোকান ভরসা। ডাল আলু, আলু আর ডাল। তা-ও মাসের মাঝামাঝি দোকানের হিসাবের খাতায় ধারের অংক যখন মোটা হয়ে উঠতে থাকে আলুটা আস্তে আস্তে বাদ পড়তে থাকে। তার বদলে একটু পোস্ত। পোস্তর বড়া সর্ষে বাটা ও ডাল। মাসের শেষে দিকে তা-ও না। এবং তখন ডালের-ই-বা কী চেহারা হয়! দেড়-পো'র জায়গায় ছটাক দেড়ছটাক ডাল এক কড়াই জলে সিদ্ধ হয়ে তার রং স্বাদ কি দাঁড়ায় বৈদ্যনাথবাবু তো বটেই বাড়ির সবচেয়ে ছোট ভোক্তাটিও তা জানে, দেখে। ডালের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিন বছরের তিনকড়ি 'মাছ' 'মাছ' ব'লে চিৎকার ক'রে বাড়ি মাথায় তোলে। বড় মেয়ে দু'টো চুপ করে থাকে। তার তলায় ছোট ছেলে দুটো কনিষ্ঠ তিনকড়ির মত মাছের জন্য হৈ-হৈ না করলেও রাগে গজ গজ করে আর ডাল মাখা ভাতের গরাস মুখে তুলে চেহারা বিকৃত করে ফেলে। এমন দিনে, এমনি এক দুর্দিনে বড়লোক শ্যালক বাড়িতে আসেন। প্রায়ই আসেন না। না এসে অথবা সারা বছরে যেমন বিজয়ার পরে কি নতুন বছরের পয়লা দিনটিতে একবার উঁকি দিয়ে বোন ভগ্নিপতি ও বাচ্চাগুলোর সামান্য কুশল-বার্তা জিজ্ঞেস করে বেহালার বড়লোক বিরাজমোহন যেমন হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢোকেন তেমনি আবার একটা ব্যস্ততা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। অর্থাৎ কোন-রকমে আত্মীয়তা রক্ষা। অবশ্য এই জন্য বাড়িতে খুব একটা হায়-আপসোসও নেই। মামাবাবু গাড়ি হাঁকিয়ে বছর ছ'মাস পর একদিন খালি হাতে এলেন কি বেরিয়ে গেলেন—ভাগ্নেভাগ্নিরা যেমন গ্রাহ্য করে না, তেমনি, বোনের মনেও শোক-সন্তাপ নেই। সে জানে যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক টাকাপয়সা জায়গাজমি গাড়িবাড়ি করার পরও দাদার আত্মা 'পাই পয়সার' মত ছোট হয়ে আছে। পরিবর্তন নেই। আর বৈদ্যনাথবাবু তো শ্যালক বাড়িতে ঢুকছে দেখলেই পায়খানা, কলতলা কি এমনি একটা নিভৃত জায়গায় সরে গিয়ে 'হাড়কিপ্টে'র মুখদর্শন যাতে না করতে হয় সেই জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

হ্যাঁ, তিনকড়ি সেদিন 'মাছ' 'মাছ' রব তুলে একটু বেশি কাঁদছিল। শুনে বিরাজ-মোহনের মনে কষ্ট হল। তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ব্যাগ তুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে বোনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, 'একটু মাছ ডিম খেতে দিবি মাঝে মাঝে। এখন থেকে যদি প্রোটিনের অভাব হয় বাচ্চাগুলোর শরীর ডেভলাপ করবে না।' বলে আর অপেক্ষা না করে যেমন এসে-ছিলেন গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

বিরাজের দেওয়া বড়সড় সেই কারেন্সি নোটখানা নিয়ে বাড়িতে সেদিন তুমুল ঝড় উঠল।

'মামার টাকা। তিনকড়ির যেমন অধিকার আছে আমাদেরও আছে। আমরা মাছ খেতে চাই না। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে টাকাটা ভাগ করে দেয়া হোক। আমরা দু' বোন দু' টাকা দিয়ে ব্লাউজ কিনব।' বড় মেয়ে দু'টো হঠাৎ সেদিন মুখ খুলল। বড় ছেলে দু'টো বোনেদের কথা শুনে গর্জে উঠল; 'সেই ভাল, আমরা দু ভাই দু টাকা দিয়ে সিনেমা দেখব। মাছ খেতে চাই না। ভারি তো লাগে মাছ।'

কিন্তু তিনকড়ি কিছুতেই হাতের মুঠ থেকে নোট আলগা করল না।

ভাইয়ের টাকা। একটু বেশি খুশি হয়ে বৈদ্যনাথের স্ত্রী কনিষ্ঠপুত্র ও নিজের মধ্যে সেটা ভাগাভাগি করে ফেলেছে। আড়াই টাকা দিয়ে তিনকড়ির সার্ট জুতো হবে আর বাকিটা সুলতা তার লক্ষ্মীর কৌটোয় তুলে রাখবে। আপদে বিপদে খরচ করা যাবে। কতকাল কৌটোয় সে একটা পয়সা রাখতে পারছে না। কিন্তু তিনকড়ি সেসব কথায় কর্ণপাত করছে না। টাকাটা মার হাত থেকে কি করে সে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর একটু হলে কাগজের টাকা ছিঁড়ে যেত। কাজেই ভয়ে সুলতাও আর টানাটানি করলে না। আর কেউ এ-টাকায় ভাগ বসাক তিনকড়ির মোটেই ইচ্ছা নেই। টাকা হাতে নিয়ে 'মাছ' 'মাছ' করে সে অবিশ্রাম চিৎকার করছে। পায়খানা সেরে বৈদ্যনাথ ঘরে এসে সব দেখেশুনে হতভম্ব। বস্তুত পরমাত্মীয় বিরাজমোহন যে আজ পাঁচটা টাকা দিয়ে তার ঘরে এমন অশান্তির আগুন ছড়িয়ে যাবে বৈদ্যনাথ কল্পনা করতে পারেনি। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের চেহারা দেখে চট করে বুদ্ধি স্থির করে ফেললেন তিনি। 'দরকার নেই জুতো ব্লাউজ সিনেমা আর লক্ষ্মীর কৌটোর জন্য ওটা ভাগাভাগি করার। ওই দিয়ে মাছ আনব। সবাই খাবে।' বলে বৈদ্যনাথবাবু তৎক্ষণাৎ গায়ে পাঞ্জাবি চড়ান এবং থলে হাতে করে কনিষ্ঠপুত্রের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দেন। 'দাও বাবা আমি বাজার থেকে মাছ কিনে আনব তোমার জন্যে—এত বড় মাছ।' খুশিতে দুই চোখ গোল হয়ে গেল তিনকড়ির। টাকাটা বাবার হাতে তুলে দিতে সে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। স্ত্রী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বড় মেয়ে দুটো চুপ। ছেলে দুটো রাগে গজ গজ করে। বস্তুত মাছের অভাবে এতকাল ওরা খেতে বসে যেমন চেহারা করেছে আজ মাছের নাম শুনে বাড়িতে

বড় মাছ আসছে জেনে তাদের মুখভাব ঠিক এমন হবে কে বলবে! কিন্তু বৈদ্যনাথ মতের পরিবর্তন করেন না। বরং গলা বড় করে বললেন, 'মাছের টাকা। ওই দিয়ে শুধু মাছই আসবে। জামা জুতোয় খরচ করা কেন। হাতে টাকা থাকলে পাঁচ টাকার মাছ খাওয়ার মেজাজ আমাদেরও হয়। বিরাজ আর একদিন এসে শুনুক।'

বলতে কি, অনেকটা রাগের মাথায় বৈদ্যনাথবাবু সেদিন থলে হাতে করে বাজারে মাছ কিনতে ছুটলেন। বিরাজমোহন আজ বলা নেই কওয়া নেই পকেট থেকে টাকা বার ক'রে দিয়েছে। তা-ও 'মাছ' খেতে। বৈদ্যনাথ এটা কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি। জামা-কাপড়, সন্দেশ রাবড়ি, ফলমূল বা খেলনা কিনে দিও বললেও বৈদ্যনাথবাবুর এত রাগ হ'ত না। মাছ। বৈদ্যনাথবাবুর ঘরে মাছ আসে না। প্রোটিনের অভাবে তার ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সরাসরি বৈদ্যনাথের ঘরের হাঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। 'তুমি ভাল খেতে দিতে পারছ না সন্তানদের।' মাছের নাম করে পাঁচটা টাকা মুঠে থেকে আলগা করে দিয়ে কৃপণ বিরাজমোহন আজ বেশ ভালভাবেই বৈদ্যনাথবাবুর পৌরুষকে খোঁচা দিয়ে গেল। 'তা আমিও শক্ত ধাতের লোক।' বৈদ্যনাথ মনে মনে বলেন, কিছুতেই এই টাকার জের আমি ঘরে রাখবনা।' মামা টাকা দিয়েছিল ব্লাউজ গায়ে দিচ্ছি, মামার পয়সায় এই চটি, দাদার সেই পাঁচ টাকা থেকে আমি কটা পয়সা বাঁচিয়ে লক্ষ্মীর কৌটোয় তুলে রেখেছি ইত্যাদি কোনরকম কথা ঘরে লেগে থাকবে আর 'হাড়কিপটে' লোকটার চেহারা বৈদ্যনাথবাবুর চোখের সামনে অহরহ ভাসতে থাকবে বৈদ্যনাথবাবু তা একেবারেই চান না। 'সবটা পয়সা দিয়ে আজ তিন টাকা সেরের রুইয়ের পেট কি চার টাকা সেরের গঙ্গার ইলিশ ঘরে নিয়ে যাব।' তিন বছরের তিনকড়ির মত ছিপ্পান্ন বছরের বৈদ্যনাথ-বাবুর দাঁত ও জিহ্বা মাছের জন্য সিরসির করছিল। মাছ মাছ। কতকাল মাছ খাওয়া হয় না। যাকে বলে মেছো-মন নিয়ে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে মানিকতলার মাছের বাজারে ঢুকলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, ভিড় তেমন নেই কিন্তু। একশ পাওয়ারের এক একটা বাল্‌ব জেবলে মেছোরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে। রুই কাতলা ভেট্‌কি চিতেল চিংড়ি পার্শে তপ্‌সে। না এটা মিথ্যা কথা, কলকাতায় মাছের আমদানি নেই, মাছের অভাবে মানুষ শুকনো শাকপাতা চিবোয় ডালের জল খায় আর টিবি বেরিবেরিতে মরে. আজ, এখন, এমন চমৎকার মাছের বাজার দেখে বৈদ্যনাথবাবুর কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। বরং বলা যায় মাছ খাইয়ে লোকের অভাব। লোকের কি আর অভাব, পয়সা নেই, আসল কথা। বিরাজের দেওয়া পাঁচটাকার কড়কড়ে নোটখানা ঘড়ির পকেটে আর একবার অনুভব করে বৈদ্য-নাথবাবু বাজারের এ-মাথা ও-মাথা একবার লম্বা চক্কর দেন। সবাই তা করে। বাজারে ঢুকে হুট্ করে কে আর সামনে যে মাছটা চোখে দেখল কিনে সরে পড়ল। এবং এটা বৈদ্যনাথবাবুরও স্বভাব না। কালে ভদ্রে যখনই তিনি মাছ কিনতে আসেন কমসে কম পঁচিশটা দোকানে পঁচিশ রকম মাছের দর জিজ্ঞেস ক'রে ওজন যাচাই করে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে গন্ধ শুঁকে তবে মাছটা

তনি থলেতে তোলেন। হয়তো শেষ পর্যন্ত ক পো দেড় পো কুঁচো চিংড়ি কিনেছেন, কন্তু আড়াই টাকা সেরের ভেট্‌কি তিন কা সেরের রুই চার সাড়ে চার টাকা সরের কই, মাগুরের দর করতে তিনি কুণ্ঠিত নানি কোনদিন। আজ আমদানিটা বেশি। দেরের ভিড় নেই বললে চলে। এবং কেটটা বেশ ভারি থাকার দরুণ বৈদ্যনাথবাবু হৃষ্টমনে নিশ্চিন্ত গতিতে ঘুরে ফিরে াছ দেখতে লাগলেন। মানুষ যেমন পার্কে ুরে বেড়ায়। এবং সেই পার্কে ফুলের াগান থাকলে ও ফুল থাকলে এক একটি ফুলের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন সে শোভা দখে ও জোরে জোরে শ্বাস টেনে ফুলের ন্ধ অনুভব করতে চেষ্টা করে তেমনি বদ্যনাথবাবু এক একটা দোকানের সামনে কছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাছ দেখতে লাগলেন ার গন্ধ নিতে চেষ্টা করলেন। কাটা মাছের ন্ধ আস্ত মাছের গায়ের গন্ধ বরফ চাপা াছের ঠাণ্ডা আঁশটে গন্ধ। এবং কেবল ন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে দু'টো কটাকে আঙুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে দখলেন নাকের কাছে তুললেন।

বলতে কি ভিড় নেই বলে খদ্দেররাও রস্পরের চেহারা বেশ ভাল দেখতে াচ্ছিল। এটা বাজারের দস্তুর। পাশে াঁড়িয়ে যে-খদ্দেরটি একটা মাছ দর দেড় টাকাকে পাঁচসিকে করার চেষ্টায়) রছে যদি আপনার সেই মাছের ওপর লাভ যায় এবং বোঝেন দর কষার প্রতিযাগিতায় আপনি তার সঙ্গে এঁটে উঠতে ারবেন না (আপনি আঠারো আনার বেশি ঠতে পারছেন না), আপনি আলগোছে কটে পড়েন সেখান থেকে।

কিন্তু সেই ধরনের খাইয়ে লোকের চহারা বৈদ্যনাথবাবুর চোখে পড়ল না। বশেভূষায় তা না-ই—রোজ মাছের প্রোটিন ফ্যাট্ খেয়ে চেহারায় জলুস এনেছে ারা বাজার ঘুরে এমন একটা মুখ তার জরে পড়ল না। বৈদ্যনাথবাবু এতে খুশি ন।

ইচ্ছা মতন তিনি ঘুরে ঘুরে মাছ দখেন আর দরদস্তুর করেন।

করতে করতে তিনি গলদার ঝাঁকার াছে এসে দাঁড়ান।

কিন্তু তেমন টাট্‌কা মনে হয় না।

হাত দিয়ে আর না ছুঁয়ে বৈদ্যনাথবাবু হাঁটেন। এগিয়ে যান। এমনও সময় সময় হয়, যেমন ধরুন, একজন খদ্দের, আপনার যে-মাছটা পছন্দ হয়েছে তারও হ'ল খানিকটা দর করে তিনি চুপ করে গেলেন, আপনার দিকে তাকিয়ে নীরবে তিনি লক্ষ্য করছেন আপনি কতটা ওঠেন।

পার্শের মাছের সামনে দাঁড়িয়ে তাই হ'ল। বৈদ্যনাথবাবু আড়াই টাকা শেষ করে এক লাফে দু' টাকা বারো আনায় উঠে যান। দোকানি ঘাড় নাড়ে। তিন টাকার এক পাই কম না। একটু নীরবে হেসে পাশের খদ্দেরটি সরে গেল। এমনও মাঝে মাঝে হয়, যখন আপনার দর শুনে, পয়সার আড়াআড়ি না পছন্দের বেশ কম দেখে পাশের খদ্দের আপনার দিকে একটা উপেক্ষার হাসি হেসে 'বাজে জিনিস এত দর দিয়ে কিনব না' বলে সরে যায়। তখন আপনি মাছ থেকে চোখ তুলে সেই খদ্দেরকে দেখেন। বৈদ্যনাথবাবুও দেখলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এমন তাজা চকচকে পার্শে মাছকে 'বাজে জিনিস' বলে উড়িয়ে দিয়ে সেই খদ্দের এখন কোন্ মাছের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জানতে এবং সেই দোকানে একবার উঁকি মেরে দেখতে আপনার আমার মত বৈদ্যনাথবাবুরও বেশ কৌতূহল হল। পার্শে মাছ ছেড়ে তিনি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে যান।

ভেট্‌কি। তাজা। এই মাত্র কাটা হয়েছে। মাখনের মত এত বড় তেলের পিণ্ডটা পেট থেকে টেনে বার করে আলাদা করে রাখা হয়েছে। লেজ ও মাথা সমেত কাঁটাটা একদিকে সরানো। কলাপাতার মাঝখানে নাভি সমেত মাছের পেটটা দু খণ্ড করে সাজিয়ে দোকানি 'খাও খাও বাগবাজারের রসগোল্লা খাও' বলে এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে বাজারশুদ্ধ লোক হকচকিয়ে উঠল। দোকানির গলার স্বর ও কথা শুনে কিন্তু সেই খদ্দেরটি হাসছে। দেখে বৈদ্যনাথবাবুও হাসেন। তারপর হাসি থামিয়ে হঠাৎ সেই খদ্দের গম্ভীর হয়ে যেতে বৈদ্যনাথবাবুও গম্ভীর হয়ে যান। আশ্চর্য, বৈদ্যনাথবাবু মাছ থেকে চোখ সরিয়ে খদ্দেরটির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কি একটা কথা শুনতে অপেক্ষা করেন। স্বাভাবিক। এমন চমৎকার পার্শে মাছ যার পছন্দ হয়নি এখন বাজারের সেরা এই ভেট্‌কি—

বৈদ্যনাথবাবুর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল।

'চৈত্র মাসের ভেট্‌কি মাছে কিছু স্বাদ নেই। বালি বালি লাগে।' বলে ভুরু কুঁচকে ও নাকের ডগায় ছোট্ট একটা মোচড় দিয়ে মেজাজী মানুষটি সরে গেল। বৈদ্যনাথবাবুর বুকটা খালি খালি ঠেকে। বলতে কি এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সেই খদ্দের মাছটা সম্পর্কে মন্তব্য করে যায় যে বৈদ্যনাথবাবুরও মনে হয় এই জিনিস কেনার অর্থ পয়সাটা জলে ফেলা। শূন্য দৃষ্টিতে তিনি কতক্ষণ মাখনের পিণ্ডের মত চমৎকার তেল ও রক্তমাখা পেট ও নাভি খণ্ডটার দিকে তাকিয়ে থেকে পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার হাঁটেন।

এবং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাজারে এসে খদ্দেররা যেমন জিনিসের দাম নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তেমনি ভাল জিনিস সেরা বস্তুটি খুঁজে বার করারও একটা গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তাদের মধ্যে।

এখানে কেবল পয়সাটাই বড় কথা না, মেজাজ, রুচি এবং নজরটারও বিচার করা হয়।

বলতে কি বৈদ্যনাথবাবু সামনের একটা লোককে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে মরীয়া হয়ে ছুটলেন। এমন সুন্দর ভেট্‌কিকে যে ধুলোবালি করে দিয়ে গেল সে এখন আবার কোন্ মাছের ওপর চোখ দিয়েছে গিয়ে দেখতে এবং দরকার হলে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে আট আনা বেশি দিয়ে তা আগেভাগে কিনে ফেলতে বৈদ্যনাথবাবু পাগল হয়ে উঠলেন। অন্য দিন তিনি এমন করতেন কি না বলা যায় না। করেন না। পয়সা কম থাকে। হয়তো মাছ সব্জি ডাল মশলা এবং আটা চিনির লম্বা ফর্দ পকেটে নিয়ে তিনি পাঁচ টাকার বাজার করতে আসেন। এসেছেন। আজ আর তা না। একে শালার দেওয়া টাকা। মায়া কম! তার ওপর সবটাই মাছের তলে খরচ করার কথা। করবেন এই জিদ নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, সুতরাং—

ঘড়ির পকেটে টাকাটা আর একবার আঙুল দিয়ে অনুভব ক'রে বৈদ্যনাথবাবু তপ্‌সে মাছের ডালা ঘেঁষে দাঁড়ান। খুব

বেশি না, সের দেড়সের মাছ, কিন্তু একেবারে তাজা। আগুনের মত তপসের গায়ের রং, এই মাত্র জাল দিয়ে নদী থেকে তুলে আনা হয়েছে, হুঁ, ডায়মন্ডহারবারের লোনা জলের মাছ, জল শুকিয়ে গিয়ে নুনের ছিটা গায়ে লেগে আছে। দাম? চার টাকা এক সের। 'নিন বাবু নিন বছরের নতুন ফল।' আম জামের মত, মাছও একটা ফল বটে। বৈদ্যনাথবাবু ক্ষীণ হাসলেন। চার টাকা সেরের মাছ খাবার মত লোক নেই। তাই দোকানের সামনে বৈদ্যনাথবাবু ও সেই মানুষটা ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু এই মাছও কি—অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বৈদ্যনাথবাবু মেজাজী খদ্দেরের চেহারা দেখেন। না, তপসেও পছন্দ হল না। ছোট্ট লাল ব্যাগের মুখ খুলতে গিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ তা বন্ধ করে মানুষটা সেখান থেকে সরে গেল। বৈদ্যনাথবাবু হতাশ হয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু হতাশ হলেও উদ্যম হারালেন না। আবার হাঁটেন।

কি মাছ? গঙ্গার ইলিশ। দেখছেন না বরফ দেওয়া হয়নি। পায়রার বুকের মত তখনো গরম মাছের গা। আঁইশ চুঁইয়ে ভিতর থেকে তেল বেরোচ্ছে। হুঁ, পাঁচ টাকা এক সেরের দাম। ও-বেলা সাড়ে পাঁচ বিকিয়েছে। 'খাও খাও বাগবাজারের রসগোল্লা। রসগোল্লা নর্দমায় ঢেলে ইলিশ খাও—'

বৈদ্যনাথবাবুর জিহ্বায় জল এল। এবং আসতে না আসতে তা শুকিয়েও গেল।

'বাজে জায়গার মাছ। গঙ্গার না হাতি। গঙ্গার ইলিশের মাথা এমন মোটা হয়?'

তাই। আর একবারও ইলিশের দিকে না তাকিয়ে বৈদ্যনাথবাবু হাঁটেন। এগোন। কি মাছ? কৈ। জ্যান্ত। যশোরে কৈ না যে মাথাটা বড় শরীরটা শুকনো। মাতলার মাছ। হাতের তেলোর মত চওড়া পেট,—'আ-হা, কী মাছ! রাজভোগ।'

এবার বৈদ্যনাথ আগে মেজাজ দেখান। 'রাজভোগ না ঘোড়ার ডিম্ব।' চেহারা বিকৃত ক'রে তিনি লাল-ব্যাগ-হাতে পাশের মানুষটিকে দেখেন। 'নৌকোয় একমাস জিইয়ে রেখে এইবেলা তুলে আনা হয়েছে বাজারে। টেস্ট নেই। ডিম ভর্তি। তা

াড়া,—চোতবোশেখের কৈ হ'ল জাম কারিয়ার। কলেরা পক্স ছড়ায়, কি বলেন?

শুনে আর একজন মাথা নাড়ল। এবং াম জিজ্ঞেস না ক'রে দু'জন একসঙ্গে দাকান পরিত্যাগ করলেন।

বোয়াল? রাবিশ। চিতেল? বরফ খেয়ে খেয়ে ড্যাব্‌সা হয়ে গেছে। ওটা ক? আড়। ধেৎ। টাট্‌কা হলে চকচক করত—নাঃ হ'ল না।

ছোট ব্যাগ দুলিয়ে আগে আগে তিনি হাঁটেন। বৈদ্যনাথ পিছনে। ইলেক্‌ট্রিক মালোয় সারা বাজার চিকচিক করছে। লাপাতার বিছানায় মাছেরা চুপচাপ য়ে। কাটা আস্ত। বরফ দেওয়া বরফ -দেওয়া। যেন খদ্দেরের অভাব দেখে কানিরা এইবেলা ঝিমোচ্ছে। আর মাছ খতে মাছ পছন্দ করতে হে'টে হে'টে দ্যনাথবাবুরা ঘামছেন।

এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই পছন্দ য় না।

বৈদ্যনাথবাবু প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু কি ঘটছে নিজে তিনি কি করছেন যখন চোখে দেখতে পেলেন আর অবিশ্বাস করেন কি ক'রে।

তাই। এত মাছ পিছনে ফেলে শেষটায় কিনা তিনি আনাজ তরকারির বাজারে ঢোকেন।

'তা মন্দ কি।' বৈদ্যনাথবাবুর মন বলল, 'তিনকড়ি মাছ খেতে চাইছে, মেয়ে দু'টোর ইচ্ছা ব্লাউজ, ছেলেদের শখ সিনেমার, গিন্নির চিন্তা লক্ষ্মীর কৌটো, —আমার, আমারও একটা নিজস্ব চিন্তা আছে, ইচ্ছা, রুচি।'

নতুন জিনিস। বেশ কচি। সবে বেরিয়েছে। যেন এই মাত্র চাষীরা ক্ষেত থেকে তুলে এনে পাইকারকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

'হু'।' বৈদ্যনাথবাবু মনে মনে ঠিক করলেন, 'আমার যখন সাধ হয়েছে পটল খেতে পাঁচটাকার পটল কিনে নিয়ে যাব আজ। ভাজা খাব ডালনা খাব দোরমা খাব। এবেলা খাব, কাল দুপুরে, রাত্রে। যদি কিছু থেকে যায় পরশু নাগাদ ঐ চালাব। এখন দাম চড়া। পাঁচ টাকায় আর ক'সের উঠবে।' মাছের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বিরাজের টাকাটা স্রেফ পটলের তলে খরচ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বৈদ্যনাথবাবু ঝাঁকার ওপর ঝুঁকে পড়েন।

কিন্তু তখনি চোখ তুলে দেখেন যাকে অনুসরণ ক'রে তিনি এই অবধি এসেছেন তার পটল পছন্দ হয়নি।

হাতের মুঠ থেকে কচি পটলটা ছেড়ে দিয়ে বৈদ্যনাথ সোজা হয়ে দাঁড়ান। দাম জিজ্ঞেস করেন না।

'জলে ভিজিয়ে চকচক ক'রে রাখা। ভিতরটা শুকনো।'

তা হবে। তাই হবে। শব্দ না ক'রে বৈদ্যনাথবাবু হাঁটেন।

বারুইপুরের বেগুন। মাখনের মত নরম।

বারুইপুরে না ছাই। ধাপার পচা মাটির বেগুন। মানিকতলায় এসে বারুই-পুরের কুলীন সেজেছে।

বৈদ্যনাথবাবু এই এত বড় পরিপুষ্ট সবুজ কাঁচকলার ছড়ার ওপর শেষবারের মত চোখ রেখেছিলেন। তারপর আনাজের দোকান পার হয়ে তিনি পে'য়াজ রসুনের দোকানের সামনে চলে যান। এত পে'য়াজ। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন। 'সারা কালকাতার লোক ছ'মাস খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা না পারুক।' বৈদ্যনাথবাবু মনে মনে ঠিক করলেন, 'বিরাজের টাকাটা সবাই এভাবে সেভাবে খরচ করতে চাইছে। আমি একটি পাই না বাঁচিয়ে পাঁচ টাকার পে'য়াজ কিনে আজ ঘরে ফিরব। সারা মাস ওই চলবে। পে'য়াজ ভাজা পে'য়াজ সেদ্ধ। আলুর মধ্যে কিছু ছেড়ে দিয়ে উত্তম ডালনা হয়। বরফ-চাপা মাছের চেয়ে আলু-পে'য়াজের ডালনা পুষ্টিকর তো বটেই খেতেও ভাল লাগে।

রংদার বড় বড় পাটনাই পে'য়াজ দেখে বৈদ্যনাথবাবুর জিহ্বায় জল এল।

কিন্তু ভুল করলেন তিনি। অবশ্য ভুলটা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিহ্বাও শুকিয়ে তেজপাতার মত ঝরঝরে হয়ে গেল।

তা তো বটেই। পে'য়াজ দেখলে এক-জনের জিহ্বা সজল হয় আর একজন এই সুন্দর দ্রব্যটার দিকে তাকানই না। এমন চমৎকার পার্শ্বে কৈ এমন কচি পটল বেগুন

যিনি হেলায় ফেলে এসেছেন তাঁর মেজাজ পেঁয়াজ বরদাস্ত করবে এটা মনে করা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বৈদ্যনাথবাবুর। চিন্তা করলেন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পেঁয়াজের দোকানগুলি পিছনে ফেলে তিনি তাড়াতাড়ি তালপাতার পাখার দোকানের দিকে অগ্রসর হন।

এবার বৈদ্যনাথবাবু একটু নিজে.. মনে হাসলেন।

যেন বিরাজমোহনের টাকাটা দিয়ে তিনি মনে মনে শাটলকক্ ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছেন। কখনো ঢালছেন মাছে, কখনো কাঁচকলায়, পেঁয়াজে। এইবেলা কি তিনি তালপাতার পাখা কিনে সেটা সাবাড় করতে চাইছেন। পাঁচটাকায় ক'ডজন পাখা মিলবে? তা পাখা কিনে যেমন তিনি আপদ বিদায় করতে পারেন তেমনি ওধারের দোকান থেকে পাথরচুন কিনেও তা শেষ করতে পারেন। দোষের নেই।

কিন্তু নির্বিঘ্নে তিনি সে-সব দোকান পার হন। অর্থাৎ নিতান্ত অকাজের জিনিসে টাকাটা খরচ হবে ভগবান চাই-ছিলেন না দেখে বৈদ্যনাথবাবু মনে মনে বিরাজের ওপর তুষ্ট হন। কেবল বড়মানুষী দেখানো না, আসলে ভালবেসে ভাগ্নে-ভাগ্নী মাছ খাবে মন নিয়ে টাকাটা সে বোনের হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

ঈশ্বর এবং সেই সঙ্গে সেই সুন্দর রুচির মানুষটিকে, যার পিছনে হেঁটে বৈদ্যনাথবাবু এই অবধি এসেছেন, মনে মনে ধন্যবাদ জানান এবং হাঁটেন। বিরাজের টাকাটা তাঁর পকেটে থেকে মহত্তর কোনো কাজে ব্যয়িত হবার সম্ভাবনায় যেমন উশখুশ করছিল তেমনি বৈদ্যনাথবাবুর বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছিল।

হ্যাঁ, সেই ছোট্ট লাল ব্যাগের ওপর চোখ রেখে এত সব দোকান ঘুরে কিছুই না কিনে বাজার থেকে বেরিয়ে শেষটায় তিনি যুবতীর সঙ্গে রাস্তায় নামলেন।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন।

বৈদ্যনাথবাবু ভেবেছিলেন ও ট্রামবাস ধরতে যাবে, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে রাস্তা ক্রশ ক'রে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠে সাজানো বড় মনোহারী দোকানটায় গিয়ে ঢুকল। চোখমুখ বুজে তিপ্পান্ন বছরের ক্লান্ত পা দুটোকে হঠাৎ অতিমাত্রায় সজাগ করে বৈদ্যনাথবাবুও ছুটে রাস্তা পার হয়ে সরাসরি সেই দোকানে গিয়ে ঢোকেন।

যুবতী তৎক্ষণে একটিন পাউডার চেয়েছে, একটা ছোট মাখনের টিন ও একটা পাউরুটি। চাওয়ামাত্র চটপটে হাতে দোকানী সব এনে সামনে কাচের টেবিলের ওপর রাখল প্রায় বৈদ্যনাথবাবুর হাত ঠেকিয়ে। কেননা বৈদ্যনাথবাবু তরুণীর শরীর ছুঁই ছুঁই ক'রে দাঁড়িয়ে কাউণ্টারের ওপর ঝুঁকে আছেন।

বৈদ্যনাথবাবু একটু অসুবিধায় পড়লেন। পাউডার মাখনের ব্যবহার তাঁর সংসারে নেই। জিনিসগুলোর দাম জানেন না। কাজেই এগুলো ভাল 'কোয়ালিটির কিনা এবং কিনলে হার হবে কি জিত হ ইত্যাদি কোনরকম মন্তব্য হঠাৎ করতে ন পেরে তিনি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকি থাকেন। দেখলেন কোনরকম দরদস্তুর ন করে যুবতী সব তুলে একটা রুমালে বাঁধল। রক্তের মত লাল রং রুমালটার।

একটু বেশি সময় বৈদ্যনাথবাব পাকা চোখ মেলে ওর কাঁচা আঙুল ঘুরিয়ে রুমালে গিঁঠ দেওয়া দেখছিলেন বলে যে মেয়েটি আরো বেশি বিরক্ত হল। চোখ তুলে রীতিমত রেগে উঠে বলল, 'হা ক'রে তাকিয়ে দেখছ কি। না কি এখনো বলতে চাইছ সংসার তোমার না আমার। পাউডার আমার দরকার নেই, তোমার ছেলেমেয়ের কাল সকালে উঠে চা-রুটি-মাখন কিছুই খেতে হবে না। কেবল তো দোকান থেকে

দোকানে ঘুরছ আর সবটাতেই না—না করছ শুনছি।'

'না কি বাড়ির ঝগড়া বাজারে টেনে আনছ।' একটু থেমে সরে মেয়েটি আবার বলল, 'না কি এখন বাজারে এসে ঘোষণা করতে চাইছ আমি তোমার বিয়ে করা স্ত্রী না। আমার নিজের ও তোমার ছেলেমেয়ের জন্যে এক পাইও খরচ করতে তুমি ইচ্ছুক নও। সব সুখ শেষ হয়েছে।'

বৈদ্যনাথ ভূত দেখে এতটা চমকে উঠতেন না। যুবতীর কথা শুনে ও ওর চোখ দেখে তাঁর অবস্থা যেমন হয়।

'বেশ, থাক তুমি দাঁড়িয়ে এখানে ভূতের মতন,—আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আপনি এর কাছ থেকে দামটা রেখে দিন। আমি চললাম, বুঝলে আমার ঘরসংসার আছে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হবে।'

রুমালে বাঁধা জিনিসগুলি ও সেই লাল ছোট্ট ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে দোকানের চৌকাঠ পার হয়ে তরুণী রাস্তায় নেমে গেল।

'কই দিন মশাই, চার টাকা তের আনা। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বুঝি। তাই এত তেজী এমন কড়া। চটপট দাম মিটিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে পায়ে ধরুন আর কি।'

ফোকলা দাঁত বের করে দোকানের আর এক বুড়ো কর্মচারী ক্যাশমেমোটা বৈদ্যনাথবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে চোখ টিপল।

ঘাম ও বৃষ্টিভেজা শীর্ণ আঙুলে দু'টো ঘড়ির পকেট গলিয়ে বিরাজের দেওয়া পাঁচটাকার নোটখানা তাড়াতাড়ি টেনে বার ক'রে লোকটির হাতে দিয়ে বৈদ্যনাথবাবু নিঃশব্দে রাস্তায় নামলেন। মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু রাস্তায় নেমে তাঁর মনে হয় ফেরত তিন আনা দোকানীর কাছ থেকে চেয়ে আনা হয়নি। মনে হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে ভাবেন এখন আবার ওটা চাইতে যাওয়া সমীচীন হবে কি। বাজারের চোখে স্বাভাবিক! ভেবে বৈদ্যনাথবাবু ফাঁপরে পড়েন।

বাড়িতে বড়রা তো বটেই শিশু তিন-কড়ি পর্যন্ত বাবার পকেট মারা গেছে শুনে মাছের আব্দার শিকায় তুলে রাখল।

কিন্তু অফিসে সহকর্মী অন্নদাবাবুর কাছে কি ক'রে বৈদ্যনাথ গল্পটি বলে ফেললেন। শুনে অন্নদাবাবু ঠোঁট টিপে হাসলেন। তারপর বৈদ্যনাথবাবুর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। 'গেছে গেছে পাঁচ টাকার ওপর দিয়ে গেছে। মশাই আফসোস করবেন না। বোনার কোম্পানীর কামাখ্যাবাবু কাল একশ টাকা নিউমার্কেটে গিয়ে খুইয়ে এসেছে। চশমা-পরা তো? লম্বা মতন। ফর্সা, ধবধবে গায়ের রং? বুঝতে পেরেছি। খুব বুঝতে পেরেছি।'

'কামাখ্যাবাবু বুঝি নিউমার্কেটে দেখা পেয়েছিলেন?

'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, ও তো ওখানেই থাকে। ওখানেই ঘুর ঘুর করে।

মাঝে মাঝে মানিকতলায় কলেজ স্ট্রীটে আসে। বেশ ভাল ইন্‌কাম। তা আপনি বাজারে গিয়েছিলেন কেন?' অন্নদাবাবু ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন।

'ছেলের জন্যে মাছ কিনতে।' বৈদ্যনাথ কিছুই গোপন করলেন না।

'কামাখ্যা গিয়েছিলেন ও'র ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনের ফল-মিষ্টি কিনতে। তা ঐ একই কথা। আপনার মত তিনিও—' বিড়ি ধরাবার জন্য অন্নদাবাবু থামেন। বিড়ি ধরানো শেষ ক'রে বললেন, 'তা আপনার কিচ্ছু দোষ নেই মশাই! কামাখ্যা-বাবুর মুখে তো শুনলাম। বেশ সেয়ানা মেয়ে। তার ওপর রূপ নাকি একেবারে খাই খাই করছে। কতক্ষণ বাজারে ঘুরে-ছিলেন? ঘণ্টাখানেক?'

বৈদ্যনাথ নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

'মাছ কিনতে গেছলেন তো সেয়ানা রুই মাছেই আপনার টাকা নিয়েছে। আফ-সোস করা কেন?' অন্নদা টেনে টেনে হাসেন।

'তা বটে।' যেন কি মনে করতে ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে বৈদ্যনাথ পরে হাসলেন। 'সেয়ানা মাছই বলা যায়। বেশ পাকা ঝানু। অবশ্য দেখতে যতটা কম বয়সের কচিমতন মনে হয় আসলে যেন ততটা না। আমার তো মনে হ'ল। কামাখ্যাবাবু আপনাকে কি বলেছে সেকথা? একটু যেন মেক-আপ আছে।'

'ওটি না থাকলে ইস্কুলে পড়ুয়া ছেলে-ছোকরা থেকে শুরু ক'রে আপনাদের মত বুড়োধাড়িদের ও টানবে কি ক'রে মশাই। আপনি ওর বৌ-সাজ দেখে ক্ষেপেছিলেন। কামাখ্যাবাবু অই বয়সে ওর পিছু নিয়েছিলেন স্রেফ কলেজ-গার্ল মনে ক'রে। দেখুন কী ক্ষমতা রাখে কতটা কণ্ট্রোল নিজের চেহারার ওপর শরীরের ওপর!

বৈদ্যনাথ, একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন।

আইনস্টাইন প্রসঙ্গে

বিমলেন্দু মিত্র

গত ১৯শে এপ্রিল খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মৃত্যু-সংবাদ। আমেরিকার নিউজার্সির প্রিন্সটন শহরের হাসপাতালে তিনি নীত হয়েছিলেন শুক্রবার, সোমবার জীবনদীপ নিভে গেল।

প্রত্যহের মতই যথাসময়ে বিজ্ঞান-কলেজে উপস্থিত হলাম ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করে দেখলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসু মহাশয় বহুপূর্ব হতেই ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন— কান পেতে শুনি তিনি পড়াচ্ছেন আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরী অব রিলেটিভিটি। মনে হল এই-ই উপযুক্ত শোকতর্পণ পরলোকগত মনীষীর উদ্দেশে। ক্লাশ শেষ হওয়া মাত্র ফিজিক্স সোসাইটির ছেলেরা মাস্টারমশাইকে জানাল বেলা দুটো থেকে ছুটি দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ; আর সোসাইটির তরফ থেকে শোকসভা ডাকা হয়েছে দুটোয়। মাস্টারমশাই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। ফিজিক্স-এর 'সেমিনার' ঘর অত্যন্ত ছোট, কিন্তু সোসাইটির সভার পক্ষে উপযুক্ত বলেই বিবেচিত হল।

দুটো বাজবার পূর্ব হতেই বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছেন শোকমগ্ন-চিত্তে পরলোকগত মহামনীষীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে। উপস্থিত রয়েছেন পদার্থবিদ্যা, ফলিত গণিত, ফলিত পদার্থ-বিদ্যা গবেষণামূলক মনস্তত্ত্ব ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী ও কর্মচারী-বৃন্দ। সেমিনার-ঘরে সমবেত জনমণ্ডলীর সামান্য অংশেরই স্থান হল—ভরে গেল বাইরের বারান্দাটুকু। বোঝা গেল বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কর্মীর কি অসীম শ্রদ্ধা বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের প্রতি ও কি গভীর তাদের বেদনাবোধ তাঁর তিরোধানে।

অধ্যাপক বসু প্রথমে ধীরে ধীরে উঠলেন আইনস্টাইন সম্বন্ধে কিছু বলার উদ্দেশ্যে। মানসিক শোক তাঁর শরীরকেও যেন ন্যুব্জ করে দিয়েছে। কাল রাত্রেই সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কাছে সংবাদ শুনেছেন তিনি। এতদূর বিচলিত হয়েছেন যে কাল রাত্রেই টেলিফোনে এই দুঃসংবাদ তাঁর অন্যতম ছাত্রদের না জানিয়ে থাকতে পারেন নি। প্রধানত সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যেই বলতে শুরু করলেন মাস্টারমশাই। বললেন আজ পৃথিবীর বিশেষ দুর্দিন। নিউটনের মৃত্যুতে একদিন জগৎ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আজও ঠিক সেইরকম ক্ষতিগ্রস্ত হল। আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা উল্লেখ করলেন তিনি।

তারপর বললেন—"এই বিরাট মনীষীর ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ (যা আজ 'বোস্-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস' নামে সুপরিচিত—লেখক) যেন কতকটা লটারী খেলার মনোভাব নিয়েই একদিন আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি কোন সামান্য জিনিসকেও অবহেলা করতেন না। অখ্যাতনামা লোকের সেই কাজটিও যে তাঁর চোখ এড়ায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিছুদিন বাদে আমি একটি ছোট্ট পোস্টকার্ড পেলাম। তাতে তিনি লিখেছেন—যদিও কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিজের মতের সঙ্গে অমিল আছে তবুও তাঁর ধারণা এটি একটি বিশেষ মূল্যবান কাজ হয়েছে এবং তিনি নিজে এর জার্মান অনুবাদ করে প্রকাশ করছেন।"

মাস্টারমশাই বললেন—"তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই চেষ্টা করছিলাম গবেষণার কাজের জন্য ইউরোপে যাওয়ার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখনও মনস্থির করতে পারেন নি—আমার মত একজন অখ্যাতনামা অল্পবয়স্ক শিক্ষককে বিলাতে পাঠিয়ে টাকা নষ্ট করা সঙ্গত কি না, সে সম্বন্ধে। আইনস্টাইনের সেই ছোট্ট পো কার্ডখানি আমি তাঁদের দেখালাম। ব তাঁদের মনস্থির হতে বিলম্ব হল ন পোস্টকার্ডখানি দেখিয়েই অতি অ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট, ভিসা প্রভৃ জোগাড় হয়ে গেল। আমার ইউরোপ যাও স্থির হয়ে গেল।

"এইরকমেই আইনস্টাইনের সেই ছে পোস্টকার্ডখানি আমার জীবনের মে ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। ইউরো আমি তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এলাম।"

তারপর তিনি বললেন—"তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা হত। এত দ্রু তাঁর চিন্তা করবার শক্তি ছিল যে, ত সঙ্গে কথোপকথন বজায় রাখাই অনে সময় শক্ত হত। একটা কথা শোনার প মনে হত—কিছু সময় ভেবে নেই, তারপ এর জবাব দেওয়া যাবে। কোন সময় তিনি কোন কথা বললে—তার অর্থ কি, তিনি ঠিক কি বলতে চেয়েছেন—তা বুঝতে আমার দু-তিন মাস সময় কেটে যেত অথচ যদি তাঁর প্রবন্ধাদি পড়া যায় তবে দেখা যায় কত প্রাঞ্জল, সরল ভাষায় ত লেখা। অত্যন্ত অনাড়ম্বর জার্মান গদ তিনি লিখতেন। প্ল্যাঙ্ক যা লিখতেন সেও অতি সুন্দর রচনা, তবে অপেক্ষাকৃত শ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় তা লেখা। তার অর্থ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ করা যায়। কিন্তু আইনস্টাইন যা বলতে চেয়েছেন তা অতি স্পষ্ট করেই বলেছেন, কোনরকম দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক অর্থ তার হয় না।"

"ছাত্রদের তিনি ভালবাসতেন। কখনও উপস্থিত অধ্যাপকদের সামনে কোন ছাত্র বক্তৃতা দিতে উঠে যদি কোন বিষয়ে আটকে গিয়ে বিপদে পড়ত, আইনস্টাইন নিজে অনেক সময় সরল ভাষায় তারই বক্তৃতার অংশটুকু বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন।"

ন্দোঃ তারপর তিনি আইনস্টাইনের জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন—"সকলেই জানে আজ আণবিক শক্তির যে যুগ শুরু হয়েছে তারও উদ্গাতা আইনস্টাইন। গত মহাযুদ্ধের শেষে প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্টকে লেখা তাঁর ছোট্ট একটি চিঠির ফলেই আমেরিকা পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাবার গবেষণা শুরু করে।"

সবশেষে গৌরবোজ্জ্বল মুখে তিনি বললেন—"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব যে আমার পেপার স্বয়ং আইনস্টাইন অনুবাদ করেছেন।"

অধ্যাপক বসুর কথা শেষ হওয়ায় তিনি অনুরোধ করলেন অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনকে কিছু বলার জন্য। অধ্যাপক সেন উঠে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন —"আজ সকালে কাগজ পড়ে জানতে পারলাম আইনস্টাইন মারা গেছেন। আমি নিজে প্রথমে কাগজ দেখি নি, আমার ছেলে এসে জানাল খবর। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, উঠে গিয়ে নিজে কাগজে দেখলাম। মনটা অত্যন্ত দমে গেল। এর আগে কোন খবর পাইনি যে তিনি অসুস্থ, কি হাসপাতালে আছেন—খবরের কাগজ কোন ইঙ্গিত দেয়নি। একেবারে শেষ সংবাদ এল। ঠিক এই রকমই হঠাৎ আঘাত পেয়েছিলাম আর একদিন, যেদিন এডিংটন-এর মৃত্যুসংবাদ পাই।"

"আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। ১৯২১ সালে যখন আমি জার্মানী যাই তখন তিনি কাইজার উইলহেলম্ ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক। Dahlem থেকে বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে আসতেন। বছরে একবার ক'রে তাঁকে বক্তৃতামালা দিতে হ'ত তাঁর রিলেটিভিটি সম্বন্ধে।"

"আমরা তাঁকে দেখলাম। সেই মাথার রুক্ষ চুল! অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষা। একটি ছোট্ট ঘরে বসতেন তিনি, সেই ঘরেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ত। অনেক সময় আমরা দাঁড়িয়েই থাকতাম। তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। যখন তাঁর ইচ্ছা, তিনি বক্তৃতা দিতেন।"

"অধ্যাপক বসু আগেই বলেছেন, কি দ্রুত চিন্তা করতে পারতেন তিনি। তিনি বলেছেন, অনেক সময় তাঁর কথা
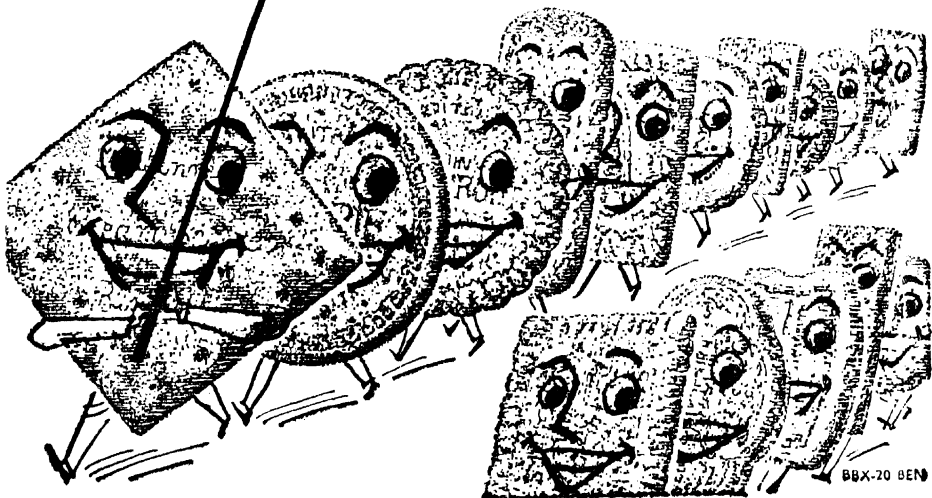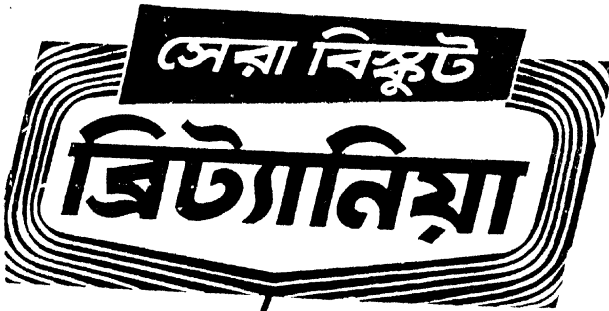
বুঝতে বেশ সময় লাগত। বোধহয় ১৯২৬(?) সালে তিনি যখন তাঁর general theory of relativity তৈরী করছেন তখন একবার এ সম্বন্ধে একটা নিয়মিত বক্তৃতার শেষে একটা বিশেষ ইকুয়েশন-এর সম্বন্ধে তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। জেনারেল থিওরীর সেই ইকুয়েশন-এ একটা lambda term ছিল। আমরা বললাম—ওটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ওটা সম্বন্ধে আমিও ঠিক খুশী নই। আমরা বললাম—কিন্তু আপনিই তো ওটা করেছেন। তিনি হেসে বললেন—হ্যাঁ আমি করেছি বটে, কিন্তু ওটা ঠিক নয় "das ist nicht vernunfstig"। কেন তিনি সেকথা বললেন আমরা বুঝতে পারিনি সেদিন। তার প্রায় আট বছর বাদে তিনি আবার সমস্ত জিনিসটাকে নতুনভাবে উপস্থিত করলেন ওসব lambda term উড়িয়ে দিয়ে সঠিক যুক্তিপূর্ণভাবে নতুন ইকুয়েশন তৈরী করলেন Lemaitre, Friedmann প্রভৃতির সাহায্যে। তারপর অধ্যাপক সেন হেসে বললেন—"অধ্যাপক বসু বলেছেন, দু' তিন মাসেই তিনি তাঁর কথা বুঝতেন, কিন্তু কেন তিনি সেদিন বলেছিলেন যে, ওটা ঠিক নয়, আট বছরেও আমি তা বুঝতে পারিনি।"

"আগেই বসু মহাশয় বলেছেন যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি কি স্বচ্ছ, সরল যুক্তিপূর্ণ। সত্যিই তাঁর প্রতিভা জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে সহজ ক'রে লোকের সামনে তুলে ধরত।"

তারপর তিনি বললেন—প্ল্যাঙ্ক যে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তাতে প্রথম প্রথম অনেক গোলমেলে ব্যাপার ছিল। প্ল্যাঙ্ক-এর ধারণা ছিল ম্যাক্সওয়েল-এর ইকুয়েশন-এর বাইরে গেলে চলবে না। যখনই তিনি নতুন ক'রে ভাবতে গেছেন তখনই ম্যাক্সওয়েল-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে—এই চিন্তায় শেষে সব গোলমাল হয়ে গেছে। প্ল্যাঙ্ক-এর হিসবে এমিশন-এর সময় একরকম কোয়াণ্টা আর absorption-এর বেলায় আর একরকম প্রভৃতি মুশকিলের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আইনস্টাইন ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক্‌ এফেক্ট বোঝাতে গিয়ে ও সমস্ত ধারণা কেটেকুটে দিয়ে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের বর্তমান গ্রাহ্য আসল রূপটুকু সকলের সামনে উপস্থিত করে দিলেন।
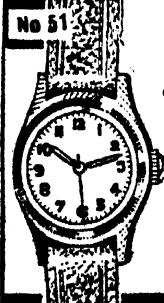
আইনস্টাইন রিলেটিভিটি আবিষ্কারের আগেই এইরকম যুগান্তকারী কাজ করেছেন। অনেকেই জানেন তাঁকে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তা দেওয়া হয় তাঁকে কোয়াণ্টাম থিওরীর কাজের জন্যই। রিলেটিভিটির তত্ত্ব তখন সুধীমহলে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করলেও অনেকে তা মেনে নেয়নি। অধ্যাপক সেন বললেন—"আমার মনে আছে, আমি তখন জার্মানীতে, আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন।—তখন এক বছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি থিওরী অব রিলেটিভিটি সম্বন্ধে বিদ্রূপ ক'রে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, রিলেটিভিটি সত্য হোক আর নাই হোক—একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভবিষ্যতে সর্বকিছু মিথ্যা প্রমাণিত হলেও মানুষের চিন্তাশক্তি যে কত উর্ধ্বে উঠতে পারে, প্রতিভা যে কত বড় হ'তে পারে, রিলেটিভিটি তারই নিদর্শন হয়ে থাকবে।"

"আইনস্টাইন সর্বদা নতুন ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন। সে সময়ে প্রায়ই ইউনিভার্সিটির 'সেমিনার' বৈঠক বসত। সেখানকার সেমিনার ঠিক আমাদের মত নয়, সেখানে বড় ছোট সকলেই নিজের বক্তব্য পালা ক'রে বল[illegible] আইনস্টাইন প্রায় প্রত্যেকটি সেমিনা[illegible] উপস্থিত থাকতেন আমি দেখেছি। তি[illegible] সেখানে যেতেন কারণ সেখানে নতুন মু[illegible] নতুন ছাত্রদের সঙ্গ তিনি পেতেন। অ[illegible] অধ্যাপক বসু যা বলেছেন—বক্তৃতা দি[illegible] উঠে কোন ছাত্র যদি প্রশ্নবাণে জর্জরি[illegible] হ'ত তিনি নিজে উঠে অনেক সময় ত[illegible] বক্তৃতাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলতেন—কেম[illegible] এই তো ব্যাপার? তাঁর যে বক্তৃতামা[illegible] হ'ত, তাতে আমরাও যোগ দিতাম, অব[illegible] পেছনের বেঞ্চিতে। তখন সে আলোচনা যোগ দেবার সাহস আমাদের হয়নি সামনের বেঞ্চিতে প্রায়ই পাঁচ সাতজ[illegible] "নোবেল লরিয়েট" বসে থাকতেন। তাঁ[illegible] বক্তৃতা দেবার ধরন ছিল—তিনি [illegible] বলতেন, সে সম্বন্ধে সকলকে প্রশ্ন করত[illegible] বলতেন। সকলে একের পর এক প্রশ্ন করত, তিনি তার জবাব দিতেন।"

জার্মানীতে অনেকে তাঁকে পছন্দ করত না, এমনকি সুধীমহলেও তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল। সেখানকার অলিখিত নিয়ম ছিল, অল্পবয়স্ক কোন লোক অধ্যাপক হ'তে পারতো না। তাকে পড়াতে দেওয়া হলেও এক পয়সাও মাইনে পাবে না সে। মানে দাড়ি না পেকে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারবে না। তাই প্ল্যাঙ্ক, লান্‌স্‌ প্রভৃতি যে জোর করে তাঁকে এনে অধ্যাপক করে দিলেন—সেই জায়গায় যেখানে হেবার, প্ল্যাঙ্ক, এ'রা অধ্যাপক ছিলেন—তখন অনেকেই খুশী হয়নি। জার্মানীতে তখন একটু

...কুট করে গোলমাল শুরু হয়েছে। ...ৎসী দলের ইহুদী বিদ্বেষ প্রচার শুরু হয়েছে। নাৎসীদের ধারণা ছিল—ইহুদীদের মধ্যে বড় বড় লোক যারা আছে তাদের খুন করতে পারলেই ইহুদীদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যাবে। আইনস্টাইনের যখন সে বছরের বক্তৃতা দেবার কথা। খবর পাওয়া গেল, নাৎসীরা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী Rathenauকে ইহুদী বলে হত্যা করেছে রাস্তার ওপর। আইনস্টাইনকে তখন Laue প্রভৃতি বাধা দিলেন বার্লিনে আসতে। নাৎসীরা তাঁকেও হত্যা করতে পারে। তিনি কিছুতেই শুনবেন না,—তবু প্রথমবারে তাঁকে আটকানো গেল। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তৃতার দিন তিনি কারও কথা শুনলেন না, এসে উপস্থিত হলেন। বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি বললেন—'ভবিষ্যতে ভয় পেয়ে কোন কাজ থেকে পিছিয়ে না যাই, এবার থেকে এটাই আমার লক্ষ্য হবে।' বক্তৃতা কিছুক্ষণ চলার পরই ওপরে দরজা খোলা ও বন্ধ করার দুম্ দাম্ শব্দ শোনা গেল। সকলেই ভীত হয়ে পড়লেন। আইনস্টাইন একটু হেসে শিস দিলেন। ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, নাৎসী ছেলেরা প্রতিবাদ জানিয়ে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। উত্তেজনা তখন অনেকটা কম, তাই আইনস্টাইনকে হত্যা করেনি তারা।

"পড়াবার সময়ে তিনি সর্বদাই নতুন চিন্তার কথা বলতেন। আমার মনে আছে একদিন বিশেষ একটা বিষয় পড়িয়ে তিনি বললেন—তোমরা এটা লিখে নাও, এ কোন বইয়ে পাবে না। এইরকমভাবে নতুন জিনিস, যা কোথাও প্রকাশিত নেই তাও ছাত্রদের কাছে বলা হয়েছে।"

তারপর অধ্যাপক সেন বললেন—"অনেকে বোধহয় জানেন, বার্লিনে একটি ভারতীয় সমিতি আছে। আরও অনেকের সঙ্গে আমিও তার একজন প্রতিষ্ঠাতা। সেটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকে বিপ্লবী ছিলেন, পরবর্তীকালে কেউ কেউ কাবুলে এসে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যাই হোক, সেই ভারতীয় ভবন প্রতিষ্ঠার সময় ঠিক হল নামকরা কোন জার্মানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। যথারীতি গভর্নমেন্টের কোন এক মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালো হল এবং তিনিও অত্যন্ত বিনয় দেখিয়ে জবাব দিলেন যে, তিনি আসবেন না। জার্মানীতে তখন ভারতীয়দের বেশ আদর যত্নই করত। শেষে আমরা কাউকে আর না ডাকাই স্থির করলাম। সেদিন সেখানে গিয়ে দূর থেকেই দেখি অনেকে ভীড় করে রয়েছে আর তাদের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটি টুপি। এই টুপিটি অধ্যাপক বসুও দেখেছেন, আমিও দেখেছি—আমাদের দশ বছর আগে যারা গেছে, বোধহয় তারাও দেখেছে। ওটার নামই ছিল—আইনস্টাইন হ্যাট। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখি, আইনস্টাইন বসে। আমরাও তাঁকে পেয়ে বসলাম। না ডাকতেই তিনি এসেছেন একথা তাঁকে বলে ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করতেই, তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন—ভারতীয় ছাত্রদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে তিনিই আনন্দিত।"

"জীবন তিনি যথেষ্ট উদ্বেগ, অশান্তির মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই এক দেশ থেকে আর এক দেশে ক্রমাগত তাঁকে বাধ্য হয়ে ঘুরতে হয়েছে। জীবনে সম্মান পেয়েছেন, বিদ্বেষও ভোগ করেছেন। কেউ তাঁকে কমিউনিস্ট বলে ঘৃণা করেছে—গ্রেপ্তার করতে চেয়েছে, দেশ থেকে তাড়িয়েছে, কেউ তাঁকে প্যাসিফিস্ট নামের প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট বলেছে। তিনি নিজে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছেন বরাবর। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্মানীতে একটি বিপ্লব হয়েছিল। লোকে বলে আইনস্টাইন স্বয়ং লাঠি হাতে সেই বিপ্লবীদের পুরোভাগে ছিলেন। জার্মানীতে এক সময় তাঁকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করা হত। সে সময়ে তিনি বাইরে ঘুরছিলেন। সকলে তাঁকে নিষেধ করেছিল জার্মানীতে ফিরতে। কিন্তু তবুও তিনি হল্যান্ড থেকে জার্মানী যাবার চেষ্টা করেছিলেন। Laue প্রমুখ জনকয়েক তাঁকে বাধা না দিলে হিটলারী নাৎসীরা নিশ্চয় তাঁকে গ্রেপ্তার করত। তিনি যখন ফিরলেন না তখন তারা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আটকে দিয়েছিল। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় অবশেষে তিনি আমেরিকায় চলে গেলেন।

তারপর অধ্যাপক সেন বললেন—"Living Scientists(?) এই পর্যায়ে কতকগুলি বই ছাপা হয়েছে। তাতে 'আইনস্টাইন' এই খণ্ডে প্রথম ৫০।৬০ পাতা আইনস্টাইনের নিজের লেখা—একদিকে জার্মান, অন্যদিকে তার ইংরাজী অনুবাদ। আমার মতে সকলেরই এই বইটি পড়া উচিত।"

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন—"ছাত্র অবস্থায় আইনস্টাইন খুব মেধাবী বলে পরিচিত ছিলেন না। সাধারণ ছাত্রদের কাছে এটি একটি আশ্বাসের মত লাগবে। তাদের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতে হয়তো আরও আইনস্টাইনের জন্ম হবে।"

অবশেষে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান হল। একটি প্রস্তাব নেওয়া হল—'বিজ্ঞান কলেজের সকল শিক্ষক ও ছাত্রদের এই সভা মহামনীষী আইনস্টাইনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে।'

১২

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। কোনও দিক হইতে আর কোনও সাড়া শব্দ নাই। নিতাই-নিমাইকে ব্যোমকেশ অবিলম্বে আসিয়া দেখা করিতে বলিয়াছিল, তাহারাও নিশ্চুপ। আবার যেন সব ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। ইস্টিশন হইতে ট্রেন ছাড়িয়া গেলে যেমন হয়, এ যেন অনেকটা সেইরকম অবস্থা।

তারপর ট্রেন আসিল। একটার পর একটা ট্রেন আসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত এত ট্রেন আসিল যে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না।

সকালবেলা ডাকে দুটি চিঠি আসিল। একটি চিঠি সত্যবতীর। সে দীর্ঘকাল আমাদের না দেখিয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে দর্শন চায়। দ্বিতীয় চিঠিখানি খেজুরহাটের রমেশ মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন—

ভাই ব্যোমকেশ, তুমি তাহলে আমাকে ভোলনি? তোমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে হ'ল বলতে পারি না। সেই পুরোনো ভুলে-যাওয়া কলেজ-জীবনের কথা আবার মনে পড়ে যাচ্ছে!

ভাই, আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যেতাম, কিন্তু কিছুদিন থেকে বাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছি, নড়বার ক্ষমতা নেই। তোমার কীর্তিকলাপ বইয়ে পড়েছি, তুমি কলকাতায় থাকো তাও জানি। কিন্তু ঠিকানা জানা ছিল না ব'লে এতদিন যেতে পারিনি। এবার সেরে উঠেই যাব।

তুমি যার কথা জানতে চেয়েছ তার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি, দেখা হ'লে সব বলব। ভারি গুণী লোক। একবার জেল খেটেছে। ওর প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে, যে-কোনও তালার চাবি একবার দেখলে অবিকল নকল চাবি তৈরি করতে পারে। গুণধর ছেলে, খুড়ো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খুড়োর সিন্দুকের চাবি তৈরি করেছিল, মাঝে মাঝে পাঁচ দশ টাকা সরাতো। খুড়ো তাড়িয়ে দেবার পর কলকাতায় গিয়ে চাকরি করত, সেখানেও ক্যাশ্‌-বাক্সর চাবি তৈরি করেছিল। ধরা পড়ে জেলে গেল। সে আজ চার পাঁচ বছরের কথা। তুমি কোন্ সূত্রে তার সম্পর্কে এসেছ জানি না, কিন্তু সাবধানে থেকো।

তোমাকে দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে। আজ এই পর্যন্ত। ভালবাসা নিও। ইতি তোমার রমেশ

ব্যোমকেশ বলিল,—'গুণী লোক তাতে সন্দেহ কি। এমন গুণী লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে। যা হোক, ন্যাপার কার্য-পদ্ধতি এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনাদি হালদার আলমারির চাবি কোমরে রাখত, দেখার সুবিধে ছিল না। কোনও সময় ন্যাপা একবার চাবিটা দেখে ফেলেছিল, সে চাবি তৈরি করল। আলমারিতে মাল আছে সে জানত, সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর—কালীপুজোর রাত্রে—' বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল।

'কালীপুজোর রাত্রে কী?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই দ্বারের কড়া নাড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি, অপূর্ব দৃশ্য, উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী দুই পাশে দুই মক্কেল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কামিনীকান্তের মুখে সুধা-বিগলিত হাসি। নিমাই ও নিতাইকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, সত্য-সত্যই দুটি ভিজা বিড়াল। খালি পা, গায়ে গরদের দোছোট, মুখে অক্ষৌরিত দাড়ি, অশৌচের বেশ।

তিনজনে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ আরাম কেদারা হইতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাহার মুখের তাচ্ছিল্য-ভাব ক্রমে ব্যঙ্গহাস্যে পরিণত হইল। সে বলিল,—'আপনারা শেষ পর্যন্ত এলেন তাহলে?—বসুন।'

তিনজন তক্তাপোশের কিনারায় বসিলেন। কামিনীকান্ত বলিলেন,—'একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি চিঠিতে যে-রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা একলা আসতে সাহস করেনি, আমার কাছে ছুটে গিয়েছিল। তা আমি হলাম গিয়ে উকিল, একটু খোঁজ-খবর না নিয়ে তো আসতে পারি না। তাই—'

'কোথায় খোঁজ-খবর নিলেন? শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে? সেখানে বুঝি সুবিধে হল না? সাক্ষী ভাঙাতে পারলেন না শ্রীকান্তবাবু সত্যের অপলাপ করতে রাজি হলেন না?'

কামিনীকান্ত আহত স্বরে বলিলেন—'ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন ব্যোমকেশবাবু! সাক্ষী ভাঙানো আমার পেশা নয়, মক্কেলের পক্ষ থেকে সত্য আবিষ্কার করাই আমার কাজ।'

'সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাবার দরকার ছিল না, মক্কেল দুটিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন।'

'ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর অশৌচ চলছে। যাহোক, আপনি কি জানতে চান বলুন, কোনও কথাই ওরা আপনার কাছে লুকোবে না। ওদের বয়ান শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, ওরা সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

ব্যোমকেশ নিতাই ও নিমাইকে পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'এ'দের মধ্যে শ্রীকান্ত হোটেলে যাতায়াত করতেন কে?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, — 'ওরা দু'জনেই যেত। তবে ওদের চেহারা অনেকটা একরকম, তাই বোধহয় হোটেলের লোকেরা বুঝতে পারেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ। শ্রীকান্ত

হোটেলের তেতলায় ঘর ভাড়া নেবার উদ্দেশ্য কি?'

কামিনীকান্ত বলিলেন,—'তাহলে গোড়া থেকেই সব খুলে বলি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ও'দের কথা ও'রা নিজের মুখে বললেই ভাল হত না?'

'হেঁ হেঁ, সে তো ঠিক কথা। তবে কি জানেন, ওরা ছেলেমানুষ, তার ওপর ব্যাপার-স্যাপার দেখে খুবই নার্ভাস্ হয়ে পড়েছে। হয়তো বলতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলবে—আপনি সন্দেহ করবেন ওরা মিছে কথা বলছে—'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ, আপনিই বলুন তাহলে। বুঝতে পারছি আপনার বলা আর ওদের বলায় কোনও তফাৎ হবে না। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কি?'

ছেলেমানুষ দুটি বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না, কামিনীকান্ত তাহাদের জবানীতে কাহিনী বিবৃত করিলেন। মোটামুটি কাহিনীটি এই—

বছর দুই আগে অনাদি হালদার মহাশয় যখন কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন তখন নিমাই নিতাই খবর পাইয়া কাকার কাছে ছুটিয়া আসে। তাহারা পিতৃহীন, কাকাই তাহাদের একমাত্র অভিভাবক; কাকাকে তাহারা সাবেক বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য নির্বন্ধ করে।

অনাদি হালদার অতিশয় সজ্জন এবং ভাল মানুষ ছিলেন, ভাইপো'দের প্রতি তাঁহার স্নেহেরও সীমা ছিল না। কিন্তু একদল দুষ্ট লোক তাঁহার ভালমানুষীর সুযোগ লইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার কানে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল, ভাইপো'দের উপর তাঁহার মন বিরূপ করিয়া তুলিল। তিনি নিতাই নিমাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

নিমাই নিতাই ন্যায়ত ধর্মত অনাদি বাবুর উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভয় হইল, এই দুষ্ট লোকগুলো কাকাকে ঠকাইয়া সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে, হয়তো তাঁহাকে খুন করিতেও পারে। নিমাই নিতাই তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া শ্রীকান্ত হোটেলে ঘর ভাড়া করিল এবং জানালা দিয়া অনাদিবাবুর বাসার উপর নজর রাখিতে লাগিল। তাহাদের বাড়িতে একটা পুরোনো আমলের দূরবীণ আছে, সেই দূরবীণ চোখে লাগাইয়া অনাদিবাবুর বাসার ভিতরকার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিত। এই দেখুন সেই দূরবীণ।

নিমাই-নিতাইয়ের একজন চাদরের ভিতর হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া দেখাইল। চামড়ার খাপের মধ্যে চোঙের মত দূরবীণ, টানিলে লম্বা হয়; ব্যোমকেশ নাড়িয়া চাড়িয়া ফেরৎ দিল। কামিনীকান্ত আবার আরম্ভ করিলেন।

নিমাই-নিতাই পালা করিয়া হোটেলে যাইত এবং চোখে দূরবীণ লাগাইয়া জানালার কাছে বসিয়া থাকিত। অবশ্য ইহা নিতান্তই ছেলেমানুষী কাণ্ড। কামিনীকান্ত কিছু জানিতেন না, জানিলে এমন হাস্যকর ব্যাপার ঘটিতে দিতেন না। যাহোক, এইভাবে কয়েক মাস কাটিবার পর কালীপুজোর রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রি দশটা আন্দাজ নিমাই হোটেলে গিয়া দূরবীণ লাগাইয়া বসিল। অনাদিবাবু বাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া বাজি পোড়ানো দেখিতেছিলেন। এগারোটার সময় এক ব্যাপার ঘটিল। অনাদিবাবু হঠাৎ পিছনের দরজার দিকে ফিরিলেন, যেন পিছনে কাহারও সাড়া পাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং বন্দুকের গুলি নিমাইয়ের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। ওদিকে ব্যাল্‌কনিতে অনাদিবাবু ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু ঘরের অন্ধকার হইতে কে গুলি চালাইয়াছে নিমাই তাহা দেখিতে পাইল না।

নিমাই ব্যাপার বুঝিতে পারিল। বন্দুকের গুলি অনাদিবাবুর শরীর ভেদ করিয়া আর একটু হইলে নিমাইকেও বধ করিত; ভাগ্যক্রমে গুলিটা তাহার রগ ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরিয়া গেল এবং দুই ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া সেই রাত্রেই কামিনীকান্তের কাছে উপস্থিত হইল। তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে ব্যোমকেশবাবু তাহা ভালভাবেই জানেন।

ইহাই সত্য পরিস্থিতি, ইহাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নাই। ব্যোমকেশবাবু বিবেচক ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে, পূজ্যপাদ খুল্লতাতকে বধ করা কোনও ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তিনি যেন পুলিসে খবর না দেন। পুলিস—বিশেষত বর্তমানকালের পুলিস—যদি এমন একটা ছুতা পায় তাহা হইলে নিতাই-নিমাইকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িবে, নিরপরাধের প্রতি জুলুম করিবে। ইহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নয়। একেই তো অবিচার অত্যাচারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে।

কামিনীকান্ত শেষ করিলে ব্যোমকেশ আড়ামোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল, অলসকণ্ঠে বলিল,—'এ'রা succession certificate-এর জন্যে দরখাস্ত করেছেন নিশ্চয়। তার কি হল?'

কামিনীকান্ত বলিলেন, 'দরখাস্ত করা হয়েছে। তবে আদালতের ব্যাপার, সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমার বিশ্বাস প্রভাত কোনও আপত্তি তুলবে না। তবে বইয়ের দোকানটা তার নিজের নামে; আপনারা যদি সেদিকে হাত বাড়ান্ তাহলে সে লড়বে।'

'না না, অনাদিবাবু যা দান করে গেছেন তার ওপর ওদের লোভ নেই।—তাহলে ব্যোমকেশবাবু, আপনি শ্রীকান্ত হোটেলের কথাটা প্রকাশ করবেন না আশা করতে পারি কি?'

'এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করে দেখব। নিমাইবাবু নিতাইবাবু যদি নির্দোষ হন তাহলে নির্ভয়ে থাকতে পারেন। আচ্ছা, আজ আসুন তাহলে।'

তিনজনে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন, চোখে চোখে কথা হইল। তারপর কামিনীকান্ত একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন,—'আজ আমরা আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ক্ষতিপূরণস্বরূপ সামান্য কিছু—' বলিয়া পকেট হইতে পাঁচটি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বাড়াইয়া ধরিলেন।

ব্যোমকেশের অধর ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হইয়া উঠিল,—'আমার সময়ের দাম অত বেশী নয়। তাছাড়া, আমি ঘুষ নিই না।'

কামিনীকান্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন,—'না না, সে কি কথা। আপনি অনাদি-

বাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করেছেন, তার তো একটা খরচ আছে। সে খরচ এদেরই দেবার কথা—। আচ্ছা, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। নমস্কার।' নোটগুলো টেবিলে রাখিয়া তিনি মক্কেল সহ ক্ষিপ্রবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ নোটগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল,—'ঘুষ কি করে দিতে হয় শিখলাম।' তারপর ভ্রূ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল,—'কেমন গল্প শুনলে?'

বলিলাম,—'আমার তো নেহাৎ অসম্ভব মনে হ'ল না।'

'এরকম গল্প তুমি লিখতে পারো? সাহস আছে?'

এমন অনেক সত্য ঘটনা আছে যা গল্পের আকারে লেখা যায় না, লিখলে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তবু যা সত্য তা সত্য। Truth is stranger than fiction.'

তর্ক বেশ জমিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে এমন সময় দ্বারে আবার অতিথি সমাগম হইল। দরজা ভেজানো ছিল, একজন দরজার ফাঁকে মুণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া বলিল,—'আসতে পারি স্যার?' বলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাসিল।

অবাক হইয়া দেখিলাম বিকাশ দত্ত! বছরখানেক আগে চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গে তাহার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাহার হাসিটি অটুট আছে। কিন্তু বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় ধন-ভাগ্যে ভাঙন ধরিয়াছে।

ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বিকাশকে বসাইল, হাসিয়া বলিল,—'তারপর, খবর কি?'

বিকাশ বলিল,—'খবর ভাল নয় স্যার। চাকরি গেছে, এখন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর হইল,—'চাকরি গেল কোন্ অপরাধে?'

বিকাশ বলিল,—'অপরাধ করলে তো ফাঁসি যেতাম স্যার। অপরাধ করিনি তাই চাকরি গেছে।'

'হুঁ। তা এখন কি করছেন?'

'কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার হাতে যদি কিছু কাজ থাকে তাই খবর নিতে এলাম।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—'কাজ—? আচ্ছা, কাজের কথা পরে হবে, আজ বেলা হয়ে গেছে, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করুন।'

বিকাশের মুখে কৃতজ্ঞতার একটি ক্লিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল,—'না, স্যার, আমাকে দুপুরবেলা বাসায় ফিরতে হবে। যদি কিছু কাজ থাকে, ওবেলা আবার আসব।'

বিকাশের মুখ দেখিয়া মনে হইল তাহার বাসায় কোনও অভুক্ত প্রিয়জন তাহার পথ চাহিয়া আছে।

ব্যোমকেশ আবার একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমার হাতে একটা কাজ আছে। সে কাজে আপনার মতন হুঁশিয়ার লোক চাই। একটি লোকের হাঁড়ির খবর জোগাড় করতে হবে।'

বিকাশ পকেট হইতে ডায়েরীর মত একটি খাতা ও পেন্সিল বাহির করিল,—'নাম?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'শিউলী মজুমদারের নাম শুনেছেন?'

'শিউলী মজুমদার? গান গায়?'

'হ্যাঁ। তার বাপের নাম দয়ালহরি মজুমদার, ঠিকানা ১৩।৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার। ওদের বাড়ির সব খবর সংগ্রহ করতে হবে।'

লিখিয়া লইয়া বিকাশ বলিল,—'কবে খবর চান?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একদিনের কাজ নয়। অনেকদিন ধরে একটু একটু ক'রে খবর জোগাড় করতে হবে। অতীতের খবর, বর্তমানের খবর, বাড়িতে কারা আসে যায়, কী কথা বলে সব খবর চাই। অনাদি হালদার আর প্রভাত—এই দুটো নাম মনে রাখবেন। যখনই কিছু খবর পাবেন আমাকে এসে জানাবেন।'

'বেশ, আজ তাহলে উঠি।' খাতা পেন্সিল পকেটে পুরিয়া বিকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ একটি একশত টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল,—'আজ একশো টাকা রাখুন। কাজ হয়ে গেলে আরও পাবেন।'

নোট হাতে লইয়া বিকাশ কিছুক্ষণ অপলক চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তারপর চোখ তুলিয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, পেটে ভাত না থাকলে মুখ দেখে ধরা যায়,—না? আপনি ঠিক ধরেছেন।' খপ্ করিয়া ব্যোমকেশের পায়ের ধুলো লইয়া বিকাশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া খামখেয়ালী গোছের হাসিল,—'কিছু টাকার সদ্গতি হ'ল।—চল, আর দেরী নয়, নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক। নৈলে এখনি হয়তো আবার নতুন অতিথি এসে হাজির হবে।' (ক্রমশ)

॥ ১০ ॥

এসোসিয়েটেড প্রেস মাত্র দু'লাইনের খবর পাঠালো। সি আর দাশ দেহ-রক্ষা করেছেন।

কিন্তু জাতির কাছে তো তিনি শুধু সি আর দাশ নন, তিনি সর্বত্যাগী জননেতা দেশবন্ধু। তাঁর মহাপ্রয়াণ দেশের বুকে চরম শোকের আঘাত নিয়ে এলো।

তৎক্ষণাৎ শ্যামসুন্দরকে দেশবন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ জানানো হলো। অনতিবিলম্বে তিনি চলে এলেন অফিসে। স্বরাজ পার্টির বিরুদ্ধবাদী বলেই লোকের কাছে তাঁর পরিচয়, পরম উৎসাহে গান্ধীবাদের পক্ষ নিয়ে তিনি লড়াই করেছেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু অফিসে যখন এলেন তিনি, দেখলাম নতুন দৃশ্য। বালকের মতো কাঁদছেন তিনি, তাঁর একমাত্র বিলাপ, "চিত্ত চলে গেল!" যাকে সামনে পান বুকে জড়িয়ে ধরেন, উন্মাদের মতো চীৎকার করতে থাকেন, 'ওরে এমন হঠাৎ চিত্ত চলে গেল!' অশ্রুসিক্ত শোকার্ত তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম, বিরুদ্ধতার আড়ালে কতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন তিনি দেশবন্ধুকে। বহু জননেতা ও স্বরাজ পার্টির কর্মী তাঁর কাছে ছুটে এলেন সান্ত্বনা পাবার আশায়, কিন্তু কে দেবে সান্ত্বনা? যাঁর কাছে আসা, তিনিই তো বেদনায় মথিত, তিনিই তো সান্ত্বনার কাঙাল।

আমাদের অফিসে সকলেই শোকে মুহ্যমান। কিন্তু সাংবাদিকের তো কাঁদবার সময় নেই, সারাদেশের কান্নাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। আমি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, রিপোর্টার ডেকে তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য বল্লাম। দেশবন্ধুর শ্যালক এস এন হালদার, দুই জামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি চিঠি ও টেলিগ্রামের কপি নিয়ে আসতে হবে, শরৎ বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যে খবর পেয়েছেন তা সংগ্রহ করতে হবে। রিপোর্টারদের বুঝিয়ে বল্লাম সব, তাঁরা দৌড়লেন।

জি ন্যাটশন প্রকাশিত দেশবন্ধুর জীবনীগ্রন্থটি কিনে আনতে পাঠালাম। তার থেকে সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয় লেখা হলো, রিপোর্টারদের আনা কপি থেকে 'দার্জিলিঙে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত' দেশবন্ধুর শেষ কয়দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি তথ্যবহুল সংবাদ রচনা করা হলো। ঘুরে ঘুরে আনা হলো জননেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

খুব দ্রুত কাজ চললো। আমরা কি করছি বাইরের লোক তা জানতেই পারলো না। রাত দু'টো পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে দেশবন্ধুর স্মৃতিতর্পণের ব্যবস্থা করলাম।

সবই হলো, কিন্তু সম্পাদকীয়? গভীর রাত্রিতে শ্যামসুন্দরের কাছে গেলাম আমি। তখন শোকার্ত মানুষের ভিড় নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। শ্যামসুন্দরকে বল্লাম সম্পাদকীয় লেখার জন্য।

কথাটা শুনেই তিনি শিশুর মতো আমাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন 'আমি পারবো না বিধুবাবু। চিত্তরঞ্জন চলে গেল, আমি কিছু ভাবতে পারছি না; আমাকে ছেড়ে দিন।'

আস্তে আস্তে তাঁকে শান্ত করতে লাগলাম। নানা কথার ভেতর দিয়ে জাতির কাছে প্রেরণার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলাম। বল্লাম, 'আপনি ডিক্টেশন দিন, আমি কলম ধরবো।'

অনেক সাধ্যসাধনায় তিনি রাজী হলেন। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তার পর বল্লেন, 'লিখুন।'

কাগজের উপর আমার কলম চলতে লাগলো। তিনি চোখ বন্ধ করে বলে যাচ্ছেন। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা। আমি লিখে চলেছি,

'Bengal, if you have tears, prepare to shed them now!'

শ্যামসুন্দর কেবল সুপণ্ডিত নন সুকবিও বটে।

পরের দিন আশাতীত ঘটনা। তিন হাজার কপি 'সারভেণ্ট' বিক্রি হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারপরও ভিড়, তারপরও চাহিদা। সারভেণ্ট চাই।

দিতে পারি না। মফঃস্বল থেকে চিঠির তাড়া আসে, দয়া করে সেদিনের একখণ্ড কাগজ পাঠান।

সেদিনের সংখ্যার দ্বিতীয় মুদ্রণ করা সমীচীন মনে করলাম না। শ্যামসুন্দরকে বল্লাম, দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধদিনে বইয়ের আকারে সারভেণ্টের একটি বিশেষ সংখ্যা বার করার জন্য। তিনি সম্মত হলেন।

দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই বিশেষ সংখ্যার উদ্যোগ চালাতে লাগলাম। পত্রিকায় দেশবন্ধু সম্পর্কিত যা কিছু বেরিয়েছে তা সংগ্রহ করা হলো। বিভিন্ন ব্লক এলো। কিন্তু প্রেসে হেডিং টাইপ নেই।

হেডিং টাইপও পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। প্রেসের এক কোণায় একটা পুরনো জরাজীর্ণ বাক্সে পড়ে ছিল কেউ খুঁজে পায় নি। টাইপপত্র এনে কম্পোজ সাজানো চলতে লাগলো।

সবুজ প্রচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বেরোল 'দেশবন্ধু বিশেষ সংখ্যা'। মনে ভয় ছিল কেমন বিক্রি হবে, কেমন জনপ্রিয় হবে। কিন্তু আশাতীত বিক্রি হলো এই বিশেষ সংখ্যা। গড়ের মাঠে বিরাট জনতা সেদিন, দলে দলে লোক আসছে সভায়, এমন সময় গিয়ে পৌঁছল আমাদের পত্রিকা। কাড়াকাড়ি করে লোক কিনতে লাগলো, হকাররা ছুটে এসে আরও চাহিদা জানালো।

কিন্তু সব বিক্রি হয়ে গেছে। অফিস কপি ছাড়া একটিও বাড়তি নেই। নিরাশ হয়ে ফিরতে লাগলো আগ্রহী ক্রেতারা। বুঝতে পারি নি এত জনপ্রিয় হবে, ছাপা হয়নি বিপুলসংখ্যায়। ভয়ের এই ত্রুটির জন্য আপসোস করতে লাগলাম মনে মনে।

'সারভেণ্টের' মূলধন ছিল সামান্য। দর্শনিষ্ঠার প্রতি মনোযোগটা প্রখর কায় পত্রিকার ব্যবসায়িক দিকটা কখনো ীতিলাভ করতে পারে নি। দ্বারভাঙ্গার হারাজার আর্থিক সহায়তা একটা মস্ত ংকট থেকে পত্রিকার পরিত্রাণ ঘটালেও ূর্বেকার সকল ঋণমুক্ত হয়ে সহজ তিতে চলার সামর্থ্য দিতে পারে নি।

পুনর্বার যখন দ্বারভাঙ্গা মহারাজার াছে অর্থ প্রার্থনা করা হলো, তিনি সম্মত লেন না। যে টাকা তখনও তহবিলে ছিল, া রয়টার ও এ পি'র ঋণমুক্তির বাবদে ্রখিয়ে টাইসন সাহেবও পরামর্শদাতার দত্যাগ করে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন।

আবার একটা সংকটের সামনে এসে াঁড়ালো সারভেণ্ট। রয়টার ও এ পি ংবাদ দেওয়া বন্ধ করলো। অথচ সংবাদ া পেলে সংবাদপত্র চলবে কিভাবে?

এই নিদারুণ দুঃসময়ে মাথা ঠিক খা শক্ত। তবু সাহসে নির্ভর করে ংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে লাগলাম।।

বাংলাদেশের সর্বত্র আমাদের সংবাদ-াতা ছিলেন। তাঁদের কাছে আমাদের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিলাম। যেখানে ংবাদদাতা ছিলেন না, সেখানের উকিল া মোক্তারবারের সভাপতি বা সম্পাদকের াছে আমাদের জন্য সংবাদদাতা নির্বাচন রে দেবার অনুরোধ জানালাম। যতো ীঘ্র সম্ভব সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ াঠাবার নির্দেশ প্রেরিত হলো। 'তারের' বল পাঠালে টাকা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

আশাতিরিক্ত সাড়া এলো। চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম পেতে লাগলাম প্রচুর। াংলাদেশের প্রায় সব সংবাদ সংগ্রহের ্যবস্থা হলো।

কিন্তু দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রাদেশিক সংবাদ না পেলে চলবে কিভাবে? ভাগ্যের আশ্চর্য যোগাযোগে সে ব্যবস্থাও হলো।

একদিন অপ্রত্যাশিত একটি চিঠি এলো বোম্বে থেকে। 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া' নামে এক অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠানের লেটার-প্যাডে জনৈক এস সদানন্দ নামের ভদ্র-লোক একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠির সঙ্গে স এফ এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের বিবরণ। লিখেছেন ফ্রি প্রেসের স্বীকৃতি নিয়ে সংবাদটি বিনামূল্যে প্রকাশ করলে বাধিত হবেন।

বর্ষার দিনে যেন এক মুঠো রোদ এলো। দৌড়ে গেলাম শ্যামসুন্দরের কাছে। চিঠি দেখালাম। সদানন্দকে চেনেন তিনি। তাঁর অনেক খবর রাখেন। শুনলাম।

এস সদানন্দ আগে এসোসিয়েটেড প্রেসে কাজ করতেন। তেজস্বী জাতীয়তা-বাদী লোক। সাহেবী প্রতিষ্ঠানের ভারত-বিদ্বেষ বরদাস্ত করতে পারেন নি, পদত্যাগ করে চলে আসেন। কিছুদিন গান্ধী আশ্রমে মহাত্মার সঙ্গে ছিলেন। কংগ্রেসের কাজ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। কিন্তু সাংবাদিকতার নেশা কাটাতে পারেন নি কিছুতেই, আবার ফিরে এসেছেন সংবাদপত্র জগতে। 'রেঙ্গুন মেলের' সম্পাদনা করেছেন কিছুকাল, কড়া প্রবন্ধের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছেন। পরে বোম্বের 'এডভোকেট ইণ্ডিয়ার' সম্পাদনা করেছেন। ভারতীয় সংবাদ সরবরাহের একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান সংগঠন করার স্বপ্ন তাঁর অনেক দিনের, কলি-কাতায় শরৎবাবু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছেন। নানা কারণে এতদিন কৃতকার্য হতে পারেন নি। কিন্তু অদম্য সাহস আর নিষ্ঠা সদানন্দের। বারবার বিফল হয়েছেন, বার-বার নৈরাশ্য এসেছে কর্মপথে, তবু ভেঙে পড়েন নি। অল্পদিনের মধ্যে বোম্বেতে কেলকার, জয়াকর প্রভৃতি নেতাদের ডিরেক্টর করে 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া' নামে জাতীয়তাবাদী সংবাদপ্রতিষ্ঠান রেজেস্ট্রি করেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী পত্রিকা-গুলি তাঁকে প্রথম কোন সহায়তা করতে স্বীকৃত হয় নি।

সদানন্দের সংবাদ শুনে সুখী হলাম। এমন লোক যে জীবনে সার্থক হবেন, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে জবাব দিলাম শ্যাম-সুন্দরের নামে। অনুরোধ জানালাম প্রত্যহ সংবাদ চাই, স্বীকৃতি অবশ্যই আমরা দেবো। প্রাদেশিক রাজধানীগুলি থেকে সংবাদ পাঠাবার জন্য তাঁর নির্বাচিত সংবাদদাতার নামে বেয়ারিং প্রেস টেলি-গ্রাম করার ক্ষমতাও দেওয়া হবে।

ত্বরান্বিত জবাব এলো সদানন্দের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সম্পর্কের গুরুত্ব। বিভিন্ন শহরের তাঁর নিজস্ব-সংবাদদাতাদের নাম ও ঠিকানা পাঠালেন। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের কাছে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে বেয়ারিং টেলিগ্রামের ব্যবস্থা হলো।

সারভেণ্ট আবার বেঁচে উঠবার সুযোগ পেলো, 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া'ও পেলো মহৎজন্মের অধিকার। কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, পাটনা, লাহোর থেকে চমকপ্রদ খবর আসতে লাগলো, কংগ্রেস ও এসেম্বলীর নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ভালো হেডিং ও সম্পাদনা করে ফ্রি প্রেসের নামে তা প্রকাশ করতে লাগলাম বড় বড় করে। সাংবাদিক মহলে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল আমাদের অসমসাহসী কাজে। দেশে পড়ে গেল একটা চাঞ্চল্যময় সাড়া।

॥ ১১ ॥

সারভেণ্টে ফ্রি প্রেসের খবর একটা চাঞ্চল্য তুললো সাংবাদিক মহলে। সবাই জানতে চায়, কারা এই ফ্রি প্রেস। আনন্দবাজার, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, বসুমতী থেকে জিজ্ঞাসা আসে। রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেস বিলেতী বণিক ও শাসনের রক্ষাবাহী, ব্রিটিশ পরিচালিত। তাঁদের পরিবেশিত সংবাদে ভারতীয় আকাঙ্ক্ষা বিকৃত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কদর্যকীর্তিত। তবু তাঁদের কাছে যেতে হতো সংবাদপত্রের, সংবাদের তারাই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান।

ফ্রি প্রেসের আবির্ভাব তাই কলকাতার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র মহলে আশার সঞ্চার করেছিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের মূল্য বুঝেছিলেন।

শুরুতেই এতটা সাফল্য আশাতীত। সদানন্দকে চিঠি লিখে দিলাম, তাড়াতাড়ি কলকাতা আসতে। তখন কানপুরে কংগ্রেস অধিবেশন বসতে দিন দুই বাকি। প্রথমে কানপুরে গেলেন সদানন্দ, সেখানে চমৎকার কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাতে লাগলেন। আমরাও সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করতে লাগলাম। এই সংবাদের কাছে এসোসিয়েটেড প্রেস ম্লান হয়ে গেল। আরো গুরুত্ব বেড়ে গেল ফ্রি প্রেসের।

কানপুরে সদানন্দের সঙ্গে দেখা হলো শ্যামসুন্দরবাবুর। দু'জনে মিলে কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন ফ্রি প্রেস সম্পর্কে। সকলেই তাঁদের শুভেচ্ছা জানালেন, উৎসাহ দিলেন। নতুন প্রেরণা নিয়ে সদানন্দ এলেন কলকাতায়।

কলকাতা পৌঁছেই সদানন্দ গেলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সর্বময় কর্তা সুরেশবাবু ও মাখনবাবুর কাছে। কলকাতায় ফ্রি প্রেসের একটি অফিস খোলার প্রস্তাব হলো। 'বসুমতী' পত্রিকার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলীর' তৎকালীন সম্পাদক আই বি সেন ও 'বিশ্বামিত্রের' মূলচাঁদ আগরওয়ালা এই প্রস্তাব সমর্থন করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

'সারভেণ্ট' পত্রিকার একটা ছোট ঘরে ফ্রি প্রেসের অফিস বসবে, এই স্থির হলো। কিন্তু অফিসের দায়িত্ব নেবেন কে? কে হবেন কলকাতা সম্পাদক।

আমার প্রতি সাগ্রহে তাকালেন সদানন্দ। মাখনবাবুও সমর্থন করলেন। কিন্তু আমি তখনও 'সারভেণ্ট' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। শ্যামবাবু কি আমাকে ছাড়তে রাজী হবেন?

শ্যামসুন্দরের সম্মতি আদায় করলেন সদানন্দ। আমার সহকর্মী শ্রীপুলিন দত্ত তখন সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাঁর হাতে ভার ছেড়ে দেওয়া যাবে নিশ্চিন্ত হয়ে, আর ফ্রি প্রেস তো সারভেণ্টের কল্যাণের জন্যই এবং সারভেণ্টের অফিসেই। সারভেণ্টের সহযোগিতা করতে পারবে অনায়াসে। কিন্তু আমি ভাবনায় পড়লাম।

অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে যাকে পুনর্গঠন করার সাধনা নিয়েছি, তাকে ছেড়ে যাবো? যদি নতুন প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়। যদি ফ্রি প্রেসের সংকল্প সার্থক হতে না পারে? আবার যাবো অনিশ্চিতের পথে।

সদানন্দের কাছে একদিনের সময় চেয়ে নিলাম।

সারারাত্রি ঘুম হলো না।

খালি ভাবনা, ভাবনা, ভাবনা। নিরুপদ্রব আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াব?

যে সাহসে বুক বেঁধে এতদিন পথ চলেছি, সেই সাহস সঞ্চয় করেই আবার নতুন পথে যাত্রা করা ঠিক করলাম। জাতীয়তাবাদী ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যদি সার্থক করতে পারি, তাহলে তো সাংবাদিকতার জীবনে পরম সার্থকতা অর্জন করতে পারবো। দ্বিধা মন থেকে মুছে রাজী হলাম সদানন্দের প্রস্তাবে।

পরদিন অফিস খুলে বসলাম সারভেণ্টের একটা কুঠরীতে। 'বেঙ্গলী', 'আনন্দবাজার' ও 'বসুমতী' থেকে ফ্রি প্রেসের মাসিক আয় মাত্র তিনশ' টাকা। বোম্বে গিয়ে সদানন্দ হাজার হোক, পাঁচশ' হোক, কিছু টাকা পাঠাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে মাখ[ন]বাবু ফ্রি প্রেসের জন্য একটা সাইকেল সাইনবোর্ড করিয়ে দিলেন। নানা কৃচ্ছ্রতা[র] মধ্যে ফ্রি প্রেস আরম্ভ হলো। অফিসে[র] কাজের জন্য মাত্র আমি, সারভেণ্টে[র] টাইপিস্ট চন্দ্রভূষণ নাগ আর পিয়ন কুলপ[তি] সিং। আয়োজন প্রয়োজনের তুলনা[য়] সামান্য। তবু কাজ আমাদের আটকে রইল না। সংবাদ পরিবেশন এতেই আমর[া] চালিয়ে যেতে লাগলাম।

আজ যখন ভাবি সেই দিনগুলোর কথা, তখন অবাক লাগে। কি অদ্ভুত

রিশ্রমই না সেদিন করেছি আমরা। সারা-
ন শুধু খবর গ্রহণ আর পরিবেশন,
ম্পাদনা, সংবাদ পরিবর্তন, পরিবর্জন
ার সংশোধন। এক হাতেই করতে হতো
ৃ প্রেস আর সারভেন্টের কাজ। তবুও
ান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, আমায় তখন
নশায় পেয়েছে।

সদানন্দ ওদিকে বোম্বেতে এক অফিস
ুলে বসলেন। নামমাত্র দক্ষিণা নিয়ে
বাম্বের প্রসিদ্ধ কাগজ 'ইণ্ডিয়ান ডেলি
মল'কে খবর দেওয়া শুরু করলেন।
বাম্বে ক্রনিকল' ইত্যাদি দু-চারটি
াগজকে বিনে পয়সাতেই খবর দেওয়া
লো। ফলে যা হবার তাই হলো। সদানন্দ
' মাসের মধ্যেও টাকা সংগ্রহ করতে
ারলেন না। এমনকি, চিঠিপত্রেরও সব
বাব তখন তাঁর থেকে পাওয়া যেতো না।
তনিও তখন নেশায় মত্ত। টাকার চেষ্টায়
দশময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাকে গ্রাহক

করা যায়, কোথায় অফিস খোলা যায়, তাঁর
তখন কেবল এই চিন্তা।

কলকাতা অফিসের চিন্তা তাঁর তখন
আর মনে নেই। তাঁর ধারণা, আমি যখন
রয়েছি, তখন যত অসুবিধেই হোক কাজ
বন্ধ হবে না।

আমি তখন আর্থিক দুরবস্থার চরমে।
কোন মাসে অর্ধেক বেতন নেই, কোন
মাসে বা বিনে বেতনেই কাজ করে যাচ্ছি
অক্লান্তভাবে। দারিদ্র্য আমায় একটুও
বিচলিত করতে পারলো না। বাধার পর
বাধা ব্যর্থ হলো আমাকে বিমুখ করতে,
আমি চলেছি ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্র মাথায় নিয়ে।

ছ' মাস পর সামান্য কিছু টাকা
এলো। সদানন্দ পাঠিয়েছেন। আর্থিক
অসুবিধা একটু লাঘব হলো। এদিকে
আমাদের ছ' মাসের অধ্যবসায় আর
নিষ্ঠাও সাফল্য অর্জন করলো প্রচুর।
'ফ্রি প্রেসের' খবর সবাই চায়। জাতীয়তা-
বাদী কাগজগুলোর ফ্রি প্রেস ছাড়া চলাই
মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাটনার 'সার্চ-
লাইট' কাগজ খবর নিতে শুরু করলো—
'হিন্দুস্থান টাইমস', তেজ, অর্জুন—
দিল্লীর প্রায় সবগুলো কাগজই একে একে
গ্রাহক হলো।

সদানন্দ দিল্লীতে খুললেন একটা
অফিস। তিনি নিজেই চালাতেন সে
অফিস। আইনসভার এমন সব খবর তিনি
সেখান থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন
যে, সারা দেশের পত্রিকাগুলো তা দেখে
অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেমন চমকপ্রদ
সব খবর আর কি সুন্দর তা পরিবেশনের
কায়দা।

লাহোর থেকে 'ট্রিবিউনের' বিখ্যাত
সম্পাদক কালীনাথ রায় মশায়, উর্দু
জাতীয়তাবাদী কাগজ দুটো 'প্রতাপ' আর
'মিলাপ' জানালেন, তাঁরও ফ্রি প্রেস থেকে
খবর নেবেন।

লাহোরে তখন একটা অফিস খোলা
দরকার হয়ে পড়লো। সদানন্দ ইতিমধ্যে
দিল্লী থেকে কোলকাতা এসে টাকার জন্য
ঘুরেছেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক
ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি তখনকার
বাংলা দেশের বড়লোকদের খুব কমই
বাকী ছিল, যাদের কাছে হাত পাতেননি।
কিন্তু টাকা দেবে কে? 'ফ্রি প্রেসের
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান; মারা
যাওয়ার ভয়ে খুব কম লোকই টাকা দিল।
সদানন্দ তবুও ঘুরছেন। কিন্তু বিফল
হতে হলো, কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন
না। এই সামান্য টাকা নিয়েই তাঁকে ঘরে
বসতে হলো।

কিন্তু লাহোরের কি করা যায়!
সব দিক থেকেই সেখানে একটা অফিস
খোলা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। শেষে অনেক
চেষ্টা করে 'সারভেণ্ট' থেকে শ্রীপুলিন
দত্তকে লাহোরে পাঠানো হলো। 'সারভেণ্ট'
তখন খুব ভাল চলছে। তাই আমারই মত
অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে পুলিন প্রথমে
একটু ভয় পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত
রাজী হলেন।

পুলিন দত্ত লাহোরে অফিস খুলে
কিছু দিনের মধ্যেই স্বীয় নিষ্ঠা আর
একাগ্রতায় সাফল্য অর্জন করেন। তিনি
শান্তশিষ্ট স্বল্পভাষী মানুষ। প্রথম প্রথম
অপরিচিত পরিবেষ্টনীতে একটু
অসুবিধায় অবশ্যই পড়তে হয়েছিল তাঁকে,
কিন্তু কালীবাবুর সাহায্যে অল্প দিনের
মধ্যেই সব কাটিয়ে উঠলেন তিনি। লাহোরে
তখন আমাদের কাজ পুরোদমে চলছে,
পুলিনের চেষ্টা আর কালীবাবুর
আন্তরিক সহায়তায়।

এদিকে দেশের একটা নতুন সমস্যা
আমাদের আরো সুযোগ এনে দিল।
কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন স্বাধীনতার লড়াই
চলছে। এ-লড়াই-এ ব্যবসায়ী সমাজও
যোগ দিলেন। ইংরেজ বণিকদের সুবিধার্থে
দিনের পর দিন নূতন নূতন আইন-
কানুন তৈরি হচ্ছে আর দেশীয় ব্যবসায়ী
সমাজের উপর দিনের পর দিন চাপানো
হচ্ছে নানান শুল্ক কর। তা এঁরা সইবেন
কেন? এঁরাও লড়াই জুড়ে দিলেন। বড়
বড় ব্যবসা কেন্দ্রে চেম্বার্স অব কমার্স
গঠিত হলো। চেম্বার্স অব কামর্সগুলো
দেশীয় বাণিজ্যবিরোধী আইনকানুনের
ঝড় তুললেন। কর্তারা এবার প্রমাদ
গুনলেন। দেশী-বিদেশী বণিকের
সম্মিলিত শোষণযন্ত্র ভারতের বুকের উপর
চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা ছিলেন নিশ্চিন্ত।
কিন্তু এমনিভাবে দেশীয় অংশটা আত্ম-
সচেতন হয়ে উঠবে, তা তাঁরা ভাবতে
পারেননি। যে করে হোক, এদের শান্ত
করতে হয়। এলো 'মণ্টেগু চেমসফোর্ড'
সংস্কার। দেশীয় বণিকেরা আইন পরিষদে
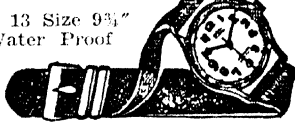
নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার পেলেন। প্রদেশে প্রদেশে ত বটেই, কেন্দ্রীয় সভাতেও তাঁদের আসন জুটল।

আইন পরিষদের ভেতরে তখন স্বরাজ্য পার্টি। প্রতিটি ব্যাপারে এঁরা আইন সভায় সরকারকে বিব্রত করে তুলেছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় পণ্ডিত মতিলাল, প্যাটেল, তুলসী গোস্বামী, বি দাস, সত্যেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি জননেতারা সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছেন। এমনি সময়ে এসে পাশে দাঁড়ালেন দেশীয় বণিকসভার প্রতিনিধিরা, স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জি ডি বিড়লা, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, আম্বালাল সারাভাই প্রভৃতি। সম্মিলিত শক্তিতে কেন্দ্রীয় সভায় তখন সরকারী অবস্থা শোচনীয়।

এসোসিয়েটেড প্রেস আইন সভার খবরাখবর দিত কম। দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের খবরাখবর ত দিতই না। ফলে আমাদের একটা সুযোগ জুটল।

সদানন্দ চলে গেলেন দিল্লী, সেখান থেকে তিনি মাসের পর মাস কেন্দ্রীয় সভার খবর ফ্রি প্রেসে পাঠাতে লাগলেন। দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের অভাব-অভিযোগ ফ্রি প্রেসে প্রাধান্য পেল। আমাদের প্রেসের মারফত বাণিজ্যপতিদের বক্তৃতা বড় বড় করে পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। শিল্পপতিরা তো আমাদের প্রতি মহা খুশী। তাঁরা ফ্রি প্রেসের ওপর এত সন্তুষ্ট হলেন যে, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর-দাস ফ্রি প্রেসের ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে রাজী হলেন। জি ডি বিড়লা প্রভৃতি অনেকেই হলেন ডিরেক্টর।

টাকার অভাব আর রইল না। দেশীয় শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় ফ্রি প্রেসের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হলো।

আমাদের কোলকাতা অফিস সারভেণ্ট অফিস থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ৮নং ডালহৌসী স্কোয়ারে। সারভেণ্ট অফিস ছিল তখন বৌবাজারে। বোম্বেতে বড় অফিস করা হলো। মাদ্রাজ, লাহোর, দিল্লীর অফিসও পরিবর্ধিত রূপ ধারণ করলো। কাজ খুব জোর চলতে লাগল দেশময়।

এই সময়ে আর একটা ব্যবস্থা হলো 'বিড়লা ব্রাদার্স'এর সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের পাটের বাজারের খবরা-খবর 'তারে' আনিয়ে তাঁদের দেওয়ার ব্যবস্থা। খুলনা, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, ভৈরববাজার প্রভৃতি জায়গা থেকে খবর আনব আমরা। আর একটা মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে বিড়লা ব্রাদার্স সে খবর কিনে নেবেন প্রতিদিন।

কিন্তু সমস্যা হলো সঠিক সংবাদ কি ক'রে সংগ্রহ করা যায়? ব্যবসার লাভ-লোকসান এই পরিবেশিত খবরের যথার্থতার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং উপযুক্ত লোক প্রয়োজন।

আমার ছোট ভাই শশীভূষণকেই শেষ পর্যন্ত পাঠানো স্থির হলো। তাঁর স্বাস্থ্যের অনুপাতে কর্মদক্ষতা ছিল অনেক বেশী। ছাত্র হিসেবে কৃতী ছিলেন, ব্যক্তি হিসেবেও ছিলেন কীর্তিমান পুরুষ। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই পূর্ব বাংলার নানা জায়গা ঘুরে ফ্রি প্রেসের কাজ করে বেড়ালেন। তাঁর চেষ্টায় আমরা এই কাজেও সাফল্য অর্জন করলাম।

কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়। গ্রামে চলে গেলেন। সেখানেও যথেষ্ট কাজ করেছেন অবশ্য ফ্রি প্রেসের জন্য নয়—গ্রামের জন্য, দেশের জন্য।

পরবর্তীকালে আমাকে ডেকে আনতে হয়েছে তাঁকে তাঁর কর্মকেন্দ্র থেকে। 'ইউনাইটেড্ প্রেস' স্থাপন করার পর তাঁকে মাদ্রাজে পাঠাতে হয়েছিল সেখানকার অফিসের সম্পাদক করে।

সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর অকালমৃত্যুতে ইউনাইটেড্ প্রেস একজন নিরলস একনিষ্ঠ কর্মী হারিয়েছেন।

মাদ্রাজের কাজে তাঁর বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ উত্তরকালে United Press-এর সাফল্যের মূলে অনেকখানি কাজ করেছে।

কর্মী ছাড়াও শশীভূষণ ছিল বন্ধু-বৎসল। তাঁর এমনি একটা আত্মীয়তাময় মনোবৃত্তি ছিল যার হাত থেকে খুব কম লোকেই রেহাই পেয়েছে। একবার তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এমনই মধুর ছিল তাঁর প্রকৃতি। বাংলা দেশের যে নেতাই যখন মাদ্রাজে গিয়েছেন অন্তত কিছু সময় হলেও তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে আসতে হয়েছে। তাঁর অকাল-মৃত্যুতে রাজাজী তাঁর স্ত্রীর কাছে টেলি-গ্রামে বলেছিলেন যে, তিনি একজন "Friend, philosoopher, guide হারিয়েছেন।" এখনও রাজাজীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি সাগ্রহে তাঁর স্ত্রী ও তাঁর মেয়েদের খবর নিয়ে থাকেন।

ফ্রি প্রেস তখন দিনের পর দিন প্রতিষ্ঠার পথে। দেশের আপামর জন-সাধারণ ফ্রি প্রেসের প্রশংসায় মুখর।

জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ে ফ্রি প্রেস নির্ভীকভাবে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে—কোনরকমের বাধা বিপত্তিই দমাতে পারেনি।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন

লবণ সত্যাগ্রহ ইত্যাদি জাতীয় আন্দোলন ছাড়াও ফ্রি প্রেস দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে যে সাহসিকতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়। 'সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন' কোম্পানীর স্বাধিকার লড়াইএ ফ্রি প্রেস এ সময়েই এর সহযোগিতা করে।

স্বদেশী যুগে এই কোম্পানী ভারতে জাহাজ চালাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তখন জলপথে বাণিজ্যের একমাত্র অধিকার ছিল বিদেশী কোম্পানীগুলোর। সিন্ধিয়ার এই প্রচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হলো সরকারী তরফ থেকে। তা নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে শুরু হলো আন্দোলন। এম এন হাঁরি একটা বিল আনলেন। প্রবল উত্তেজনার ভেতর দিয়ে এই বিলের আলোচনা চলল। যদিও শেষ পর্যন্ত বিল পাশ করানো সম্ভব হলো না তবুও এই আন্দোলনে ফল হলো যথেষ্ট। দেশীয় স্টীমার কোম্পানীগুলো বেশ কিছু অধিকার লাভ করলো।

ফ্রি প্রেস বহু ক্ষতি স্বীকার করে এতে যেভাবে সমর্থন জুগিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য।

তারপর লবণ আন্দোলন। স্বরাজ্য পার্টিকে আইন সভায় ঢুকতে গান্ধীজী অনুমতি দিলেন; উচ্ছৃঙ্খলতার আইন অমান্য আন্দোলন তখন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী তখন গঠনমূলক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন; এমনি সময়ে এলো 'সাইমন কমিশন'। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে আর একবার নতুন করে ধামাচাপা দেওয়া। বলা হলো, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য কিনা এটা তাঁরা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে চান।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দেশময় সংকল্প, সাইমন কমিশন বয়কট করতে হবে। কংগ্রেসের আহ্বান ছড়িয়ে পড়লো শহরে গ্রামে সর্বত্র. লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'সাইমন ফিরে যাও!'

সদানন্দ নিজে শর্টহ্যান্ড জানতেন না কিন্তু ছিলেন দক্ষ সাংবাদিক। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি সাইমনের সঙ্গে। বিচিত্র কৌশলে সংবাদ পাঠাতে লাগলেন তিনি, মনোরম ভঙ্গীতে, প্রাঞ্জল আঙ্গিকে। সে সব সংবাদের মধ্যে দিয়ে সাইমন কমিশনের ব্যর্থতা ও কমিশনের প্রতি সারা দেশের উত্তেজিত বিতৃষ্ণা ফুটে বেরোল।

ব্রিটিশ সরকার ক্রোধে অগ্নিশর্মা। আদেশ হলো, সদানন্দের রিপোর্ট প্রেসে যাওয়ার আগে সেন্সর করিয়ে নিতে হবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভেঙে দুমড়ে গেল। গর্জন করে উঠলেন সদানন্দ। খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে আদেশের প্রতিবাদ জানালেন। তাঁকে সমর্থন করলেন সারা দেশের জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকবৃন্দ।

ফ্রি প্রেস সাইমন কমিশনের উত্তেজনাময় দিনগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের কাঁটার মালা পরে আরো গৌরবান্বিত হয়ে ওঠলো।

দেশের উত্তেজনা চরমে পৌঁছলো দু'দিন পরেই। পণ্ডিত জওহরলাল ও লালা লাজপৎ রায় সাইমনবিরোধী শোভাযাত্রা পরিচালনা করার সময় পুলিশের আঘাতে আহত হলেন। সারা ভারতবর্ষের পিঠে ঘা পড়লো। উত্তাল জনতা উদ্বেলবেগে আছড়ে পড়লো সুকঠিন পুলিশ বেষ্টনীর ওপর।

॥ ১২ ॥

ফ্রি প্রেস এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির পথে। মনে হলো সার্থকতার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে আমাদের প্রতিষ্ঠান। ভারতের প্রধানতম জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।

সে সময় তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার ব্লাসিল ব্লাকেড কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল আনেন। এই বিল সম্পর্কে ভারতীয় সভারা আগ্রহান্বিত হলনি, প্রস্তাব আনয়নে আপত্তিও করলেন না। বিলটির বিশদ পরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠিত হলো, স্থির হলো প্রাদেশিক শহরগুলি পরিভ্রমণ করে কমিটি সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গ্রহণ করবেন।

সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনগুলির সংবাদ এই সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। রুদ্ধ ঘরে অধিবেশন বসতো গোপনে, সাংবাদিকদের তাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। সরকারী প্রেসনোটের সংক্ষিপ্ত সংবাদই ছিল সংবাদপত্রগুলির সম্বল।

সদানন্দ ঠিক করলেন, তিনি স্বয়ং রিপোর্ট লিখবেন। যে কোনভাবেই হোক সরকারী গোপনীয়তার মুখোশ টেনে খুলে ধরবেন। এই বিলের জাতীয়তাবিরোধী চরিত্র পুরোপুরি প্রকাশ করে দেবেন।

কমিটির অধিবেশন বসেছে কলিকাতায়। কয়দিন তিনি কমিটিসভ্যদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে গোপন সংবাদের তথ্য জানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কেউ মুখ খোলেন না। মনে হলো, বুঝি সব ব্যর্থ হবে।

কিন্তু অদম্য উৎসাহ সদানন্দের। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সিলেক্ট কমিটির সভা স্থগিত থাকার সময় এক মাদ্রাজী সভ্যকে সঙ্গে নিয়ে এলেন অফিসে। কফি এলো, জলযোগের বিস্তর ব্যবস্থা হলো। গল্পগুজব চলতে লাগলো। তারি ফাঁকে মুদ্রিত এজেন্ডা নিয়ে রাজনৈতিক কথাবার্তাও হলো।

আলাপের ভাষা তেলেগু। আমাদের বোধগম্য নয়। দেখলাম, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এজেন্ডার মধ্যে কী সব নোট নিচ্ছেন সদানন্দ।

একটু পরে অবাক কান্ড। মাদ্রাজী ভদ্রলোক টাইপরাইটারের সামনে গিয়ে বসলেন। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে সদানন্দের মুখ। কী যেন বোঝাচ্ছেন তিনি সদস্য মহোদয়কে, কিসের যেন প্রেরণা দিচ্ছেন।

টাইপরাইটার চলতে লাগলো। কয়েক পাতা টাইপ করে গেলেন সিলেক্ট কমিটির মাদ্রাজী সদস্য।

সন্ধ্যায় অধিবেশন শেষ হবার সময় আবার নোট নিয়ে এলেন সদানন্দ। সমস্ত লেখা, রিপোর্ট ও কাগজপত্র মিলিয়ে লিখতে বসলেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত চললো রচনা।

বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি হলো। মনে হলো যেন, অদৃশ্য সদানন্দ সর্বক্ষণ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, শর্টহ্যান্ডে সমস্ত কিছু লিখে নিয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ এই রিপোর্ট পাঠানো হলো সকল সংবাদপত্রে। যাঁরা আমাদের সংবাদ নিতেন তাঁদের তো পাঠানো হলোই, যাঁরা নিতেন না তাঁদের কাছেও পাঠানো হলো জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে। কেননা এই বিল ছিল জাতীয় স্বার্থবিরোধী, সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে এর প্রতিবাদ হওয়া কর্তব্য।

পরদিন সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিস্তৃত এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলো। দেশময় উত্তেজনা এই রিপোর্ট পড়ে। সরকারী গোপনীয়তার পর্দা যা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তা প্রকাশ হয়ে পড়লো জনসাধারণের মধ্যে।

রোজ এইভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন সদানন্দ। স্টেটস্‌ম্যান, অমৃত-বাজার ও ফরোয়ার্ড আমাদের সংবাদ নিতো না, কিন্তু সন্ধ্যায় তাদের রিপোর্টাররা এসে রিপোর্ট নিয়ে যেতেন রোজ। সাগ্রহে।

ফ্রি প্রেসের বনিয়াদ দৃঢ় হলো। আগে যাঁরা আমাদের সংবাদ নিতে স্বীকৃত হননি, তাঁরা বাধ্য হলেন আমাদের গ্রাহক হতে। এই সময়কার আর একটি 'স্কুপ নিউজ' আমাদের প্রভাব আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

গান্ধীজী রেঙ্গুন যাবেন, যাত্রাপথে একদিনের বিশ্রাম নিতে এলেন কোল-কাতায়। ব্যবসায়ী জীওনলালের গৃহে অতিথি হয়েছেন।

বিকেলে একটি জনসভার ব্যবস্থা করলেন বি পি সি সি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা হবে কিরণশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে। গান্ধীজী বক্তৃতা করবেন।

কোলকাতায় তখন ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান বেআইনী। জনসমক্ষে বিলেতী-বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ নিষিদ্ধ।

বিকেল হবার আগেই জনসভায় প্রচুর জনসমাগম হলো। গান্ধীজী বক্তৃতা দিলেন তেজোদৃপ্ত ভাষায়। তিনি বল্লেন, স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে হলে দৈনন্দিন ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বিলেতী বস্ত্র ও অন্যান্য বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা জাতীয়তা-বিরোধী।

সভার শেষে শ্রোতৃমণ্ডলী বিলেতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করলেন।

সশস্ত্র পুলিসবাহিনী বহু আগে থেকেই সভাস্থলে হাজির ছিল। তারা এতক্ষণ মৌনদর্শকের মতো স্তব্ধ ছিল, কোন বাধা দেয়নি।

কিন্তু অগ্নিসংযোগের সময় লাঠি-চালনা করে জনতা ছত্রভঙ্গ করে দিল পুলিস। গান্ধীজী অনুরোধ জানালেন, 'অহিংসা আমাদের মূলমন্ত্র, পুলিসের কাজে উত্তেজিত হওয়া অনুচিত।'

সভাপতি কিরণশঙ্কর গ্রেপ্তার হলেন। গান্ধীজীকে পুলিস নির্বিবাদে চলে যেতে দিল।

রাত্রিতে শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঘরোয়া সভা বসলো নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য। প্রায় সকল নেতাই উপস্থিত।

আমাদের নতুন রিপোর্টার দুর্গামোহন ভট্টাচার্যকে পাঠালাম উডবার্ন পার্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর নিষ্ঠা ছিল প্রথম থেকেই, এই নিষ্ঠাবলেই এখন তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন।

রাত্রি দশটায় দুর্গামোহন ফোনে জানালেন, পুলিশ কমিশনার এসেছেন শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। একটা গুরুতর কিছু ঘটছে।

নির্দেশ দিলাম সতর্ক সন্ধানে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে। মনে হলো, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করবে পুলিশ, দুর্গামোহনকে তা জানিয়ে বলে দিলাম যেন গান্ধীজীর গৃহে গিয়ে খবর নেন।

রাত্রি বারোটায় ফোনে খবর এলো, বিলেতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের অপরাধে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করবে পুলিস, জামিন দেওয়া হয়েছে, রেঙ্গুন থেকে ফিরে এলে তাঁর বিচার হবে। দুর্গা-মোহন আরো জানালেন, কোন রিপোর্টার এখনও এই খবর জানেন না।

তৎক্ষণাৎ চার লাইন 'ফ্ল্যাশ মেসেজ' পাঠিয়ে দিলাম দিল্লী, বোম্বে ও অন্যান্য অফিসগুলিতে। কোলকাতার সংবাদপত্র-গুলিতে ফোনে জানালাম এই খবর। পনের মিনিট পরে সংবাদ দিলাম, গান্ধীজীকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

প্রচুর উত্তেজনার মধ্যে কাজ করলাম রাত্রি দুটো পর্যন্ত। কেবলই উদ্বেগ, এ খবর কি একমাত্র আমরাই দিতে পেরেছি?

পরদিন সকালে দেখা গেল, ফ্রি প্রেসের সংবাদ যারা নেয় একমাত্র সে সমস্ত সংবাদপত্রেই এই সংবাদ বেরিয়েছে। একটি 'স্কুপ নিউজ' দিতে পেরেছে ফ্রি প্রেস।

সদানন্দ দিল্লীতে। তিনি গান্ধী-গ্রেপ্তারের সংবাদ বুলেটিন আকারে মুদ্রিত করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তুমুল উত্তেজনা চারদিকে। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে সারা দেশে বহু সভা অনুষ্ঠিত হলো, নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে নিন্দা জানালেন।

এ পি ও রয়টারের কর্তৃপক্ষ তাঁদের কলিকাতা অফিসের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করতে না পারার জন্য কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করলেন। যে সমস্ত সংবাদপত্র তখনও আমাদের সংবাদ নিতেন না, আমাদের কাজের গুরুত্ব তাঁরা অনুভব করলেন। (ক্রমশ)

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

[ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবীণ। দীর্ঘদিন ধরে এই কলকাতায় তিনি প্র্যাকটিস করছেন। বহুতর রোগের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন রূপ দেখেছেন। প্রথম দিকে যে রোগের প্রতিষেধক ছিল না, যে রোগকে সারান অসাধ্য বলে মনে হ'ত, দীর্ঘকাল পরে ডাঃ মুন্সী দেখেছেন সে রোগ বশ মেনেছে। তার প্রতিষেধক শুধু বড় শহরের নামী ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শনেই আর আবদ্ধ নেই। সুদূর মফস্বলের অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরও তা জানা। শুধু কি বিচিত্র রোগ, বিচিত্রতর রোগীর সংস্পর্শেও তিনি এসেছেন। সংগ্রহ করেছেন বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তারই কিছু অংশ ডাঃ মুন্সী ডায়েরীর আকারে লিখেছেন। এক সপ্তাহ পর পর দেশ পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হবে। সম্পাদক 'দেশ']

॥১॥

বিনায়ক শর্মা যদিও আমাদের সঙ্গেই ম্যাট্রিক পাশ করে তবু ওর সঙ্গে আমার কোন দিন আলাপ ছিল না। না থাকবার কারণও ছিল। ও পড়ত কলকাতায় আর আমি মফঃস্বলে। আমি যখন বি এস সি পাশ করে কলকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন বিনায়ক সায়েন্স কলেজে কেমিস্ট্রীতে এম এস সি পড়ে। তারপর দু' বছর পরে ভাল করে পাশ করে হঠাৎ একদিন ল' কলেজে ভর্তি হয়ে যায়। পিতা বিরক্ত হন, বন্ধুরা অবাক হয় কিন্তু বিনায়ক অটল। সে ঠিক করে ফেলেছে আইন শিখে হাই-কোর্টেই প্র্যাক্‌টিস্ করবে এবং অবশেষে তাই করল। প্র্যাকটিস বিশেষ জমলো না; কিন্তু তাতে দমে যাবে এমন পাত্র বিনায়ক নয়। একখানা একখানা করে আইনের কেতাব কিনে কিনে বিরাট একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলল; আর দিন রাত ঐ আইনের ব্যাখ্যায় ডুবে রইল। বয়েস বেড়ে বেড়ে যে পঞ্চাশের কোঠায় পড়ল সে খেয়াল আর হল না।

ঠিক এই সময় ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওর ঠিক বাড়ির সামনেই আমার ডিস্‌পেন্সারী। সকাল ৯টার সময় যখন দোকান খুলে আমি বসতাম দেখতাম বিনায়ক আদালতে যাবার পোষাক পরে উল্টো দিকের ট্রামে উঠে বসল। পরে শুনেছি উল্টো ট্রামে ওঠার অর্থ হল ভাল করে বসবার একটি জায়গা পাওয়া। ডিপো ঘুরে এই ট্রামই যখন হাইকোর্টের দিকে যাবে তখন তাতে ওঠা কোন ভদ্রলোকের কর্ম নয়। এ কথা বিনায়কই আমায় বলেছে। বলেছে—এই জন্যই মশাই একটু আগেই আমি বেরুই। ডিপো ঘুরে ফিরে আসতে বড় জোর দশ পনের মিনিট বেশী লাগবে; না হয় একটু আগেই বাড়ি থেকে বেরুলাম; তবু একটা বসবার জায়গা তো পাব; কি বলেন? আমি সায় দিয়ে বলেছি—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা তো ঠিকই।

রোজই ডিস্‌পেন্সারী থেকে বিনায়ককে দেখি কিন্তু আলাপ হয় না। আমার কম্পা-উন্ডার দেখলাম সব খবর রাখে। বল্‌লে—ঐ ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে; এখনও বিয়ে থা করেনি। বাড়িতে শুধু বুড়ী মা আর ঐ ছেলে। অতবড় বাড়ির মালিক তবু ট্রামে যাতায়াত করবে। একে কঞ্জুস তার ওপর বদ্‌মেজাজী; তাই ঝি-চাকর বাড়িতে টেঁকে না। বুড়ী মা রাঁধে তাই মায়ে ছেলে খায়। মক্কেল তো একটিও ঢুকতে দেখি না তবু নাকি দিন রাত বই নিয়ে পড়ে থাকে। অত পড়লে প্র্যাক্‌টিস্ হয় কখনও?

নতুন ডিস্‌পেন্‌সারী খুলেছি, রুগী-পত্তর বড় একটা কেউ আসে না। যাওবা দু' একটি আসে তা'ও হয় এক প্যাকেট অ্যাস্‌প্রো নয় দুটো বাইকোলেটের খদ্দের। বেশীর ভাগ সময় তাই বসেই কাটাতে হয়।

পড়বার সময় হাসপাতালে যখন ডিউটি করেছি এমারজেন্সীতে তখনও কতদিন থাকতে হয়েছে বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা অবধি একটানা ছোট্ট একটা টুলে বসে। কতদিন একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট কেসও সে সময় আসেনি। তখন ডিউটির সময় কেস না এলেই লাগত ভাল; মনে হত আনন্দ। ঠিক যেমন ক্লাসে একদিন মাস্টার না এলে ছেলেদের মনে হয়। কেস্ না এলেই আড্ডাটা জম্‌ত ভাল আর তাতেই ছিল মজা। এখন ডিস্‌পেন্‌সারী খুলে কখন রোগী আসবে সেই আশায় চুপটি করে বসে থাকি, কিন্তু রুগী আসে না; এখন টের পাই কাকে বলে মজা!

কম্পাউন্ডারটি বলে—এমনি করে চুপ-চাপ বসে থাকলে স্যার রুগী কখনও আসে? আর প্রেস্‌কৃপ্‌শন না হলে কি দোকান কখনও চলে? বাইরে বেশ বড় করে সাইনবোর্ড লিখে দিই স্যার এখানে রোজ সকাল বিকাল এক ঘণ্টা করে গরীব রুগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। তাইতে দেখবেন কিছু কিছু রুগী আসবেই; আর তাদের ভেতর থেকে বেছে নেব এখন কার ট্যাঁকে কী আছে। দোকানের খরচা তুলতে হলে স্যার রোজ অন্তত চার-খানা প্রেস্‌কৃপশন চাই দু' টাকা করে। আট দাগের মিক্‌শ্চার দেড় টাকা, আর পুরিয়া কি মলম একটা আট আনা অষুধের দাম ছ' আনা আর শিশি বোতল লেবেল কাগজ ধরুন গিয়ে দু' আনা। বাকী দেড় টাকা লাভ।

—লাভটা তো বেশ কষেছ দেখছি; কিন্তু বিনামূল্যে চিকিৎসার খরচাটা?

—সে স্যার আপনি ভাববেন না। লাল, সবুজ আর শাদা এই তিন রকম মিক্‌শ্চার দিয়ে সে আমি ম্যানেজ করে নেব। চারখানা দু' টাকার প্রেস্‌কৃপশন তো আগে আসুক দেখবেন ফ্রি অষুধের বোতল সব সময় ভর্তি থাকবে।

ডাঃ সেন আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র; কন্‌সালট্যাণ্ট প্র্যাকটিস্ করেন। সেদিন ক্লাবে জেনারেল প্র্যাক্‌টিস্ নিয়ে কথা হতে বল্‌ছিলেন—বিনাপয়সায় রুগী দেখে আর অষুধের দাম বেশী নিয়ে

ডাক্তাররা প্রফেশনটাকেই ডিজেনারেটেড করে ফেলেছে। রুগী দেখে তুমি যে ব্যবস্থা দিলে তার দাম রুগী কেন দেবে না? রুগীর অবস্থা বুঝে তুমি কম ফী নিতে পার, বিনা পয়সাতেও দেখতে পার; কিন্তু অষুধের দাম বেশী নেবে কেন? একটা মিক্‌শ্চারে যদি আট আনা খরচ হয় তার দাম দেড় টাকা নেওয়া জোচ্চুরী—ব্ল্যাকমার্কেটিং। রুগী দেখে তুমি বরং এক টাকা ফী নাও; কিন্তু অষুধের দাম নাও আট আনা। তাতে তোমার এথিক্স ঠিক থাকবে; রুগীরও মর্‍্যাল ইম্‌প্রুভ করবে। রুগী দেখে ব্যবস্থা দেওয়া যে একটা স্কিল্‌ড্‌ লেবার এবং তারও একটা মূল্য আছে তা লোকে বুঝবে।

কম্পাউন্ডারকে বল্‌তে সে তো হেসেই কুটি কুটি। বল্‌লে—এই এড্‌-ভাইস মত চল্‌লে স্যার দোকান লাটে উঠতে তিনটি মাসও লাগবে না। বড় বড় লোকের স্যার বড় বড় কথা! আমরা তো তবু আট আনা খরচা করে তবে দেড় টাকা কি এক টাকা লাভ করি। আর উনি নিজের ঘরে বসে রুগীর শুধু নাড়ী টিপে, বুক পিঠ আঙুল দিয়ে টকা-টক্‌ বাজিয়ে যে ষোলটি করে টাকা নেন সেটা কি? ব্ল্যাকমার্কেটিং নয়? ফীই যদি দেবে স্যার, তাহলে নতুন ডাক্তারের দোকানে আসতে তাদের ভারি বয়ে গেছে! অষুধের দাম ও রকম সস্তা করলে লোকে কী বলবে জানেন? বল্‌বে—ঐ ডাক্তার অষুধ না দিয়ে জল রং করে অষুধ বলে চালায়। এ যদি না বলে স্যার কম্পাউন্ডারী আমি আর করব না; নিজের দু'কান মলে বাড়ি গিয়ে চাষবাস ক'রব। এইত বক্‌সীবাবু এসেছেন দেখুন না ওঁকে জিজ্ঞেস করে।

বক্‌সী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একই স্কুলে লেখাপড়া শিখেছি, একই কলেজ থেকে বি এস সি পাশ করেছি। কম বয়সে একটা ফ্যাক্টরীতে ঢুকে এখন ইন্‌স্‌পেক্‌টর। দিনের বেলা আপিস করে, সন্ধে বেলা আড্ডা দেয়। আমার নতুন দোকান, রুগীর ঝামেলা নেই; আড্ডা দেওয়ার এমন উৎকৃষ্ট জায়গা পাবে কোথায়? তাই সন্ধে হতে না হতেই ও এসে হাজির হয়। এই কম্পাউন্ডারটিকেও ও-ই এখানে এনেছে।

ঘরে ঢুকেই কম্পাউন্ডারকে বক্‌সী বল্‌লে— কি হে কানাই আজও কোন রুগী ধরতে পারনি তো? এই লাইনে তুমি অমন ঘাগু লোক দেখেই না ডাক্তারের সঙ্গে তোমাকে ভজিয়ে দিলুম; এতদিনে একটা রুগীও ধরতে পারলে না?

কানাই বল্‌লে—রুগী ধরে আর কি হবে স্যার? ডাক্তারবাবু বলছেন রুগী দেখলেই ফী চাই এক টাকা করে; আর আট দাগ মিশ্চার লিখলে আট আনা। বলুন দেখি স্যার, এ করলে কখনও রুগী আসে? এলেও বাপ্‌ বাপ্‌ বলে ভয়ে পালিয়ে যাবে না?

বক্‌সী বল্‌লে—তা তো যাবেই; ভাববে পাগলা ডাক্তারের হাতে পড়েছি, আর রক্ষে নেই। দেখ ডাক্তার, অষুধের দাম-টাম নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। এ ভারটা কানাইএর ওপরই রেখ; তোমার চেয়ে এটা ও অনেক ভাল বুঝবে। সব দোকানে যা করে তোমাকেও তো তাই করতে হবে। দেড় টাকার অষুধ তুমি যে আট আনায় সত্যি দিচ্ছ তা লোকে বিশ্বাস করবে কেন? কেমন করে বুঝবে দেশ শুদ্ধ সবাই ডাকাত আর একা তুমি গোঁসাই ঠাকুর?

এমনি সময় আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমাকে দেখে দোকানে উঠে এলেন। এই যে ডাক্তারবাবু, নমস্কার! আপনি আজকাল এইখানেই বসেন বুঝি?

দশ বছর আগে যখন এ'কে প্রথম দেখি তখন ইনি চাকরী করতেন একটা পাবলিসিটি ফার্মে। এখন নিজেই সেই ফার্মের মালিক। তখন নিজে ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে নিয়ে আসতেন; এখন এঁর কর্মচারীরা সে কাজ করে। তখন ঘোরাঘুরির কাজ ছিল তাই চেহারা ছিল রোগা মেদহীন; এখন আপিসে বসে শুধু হুকুম করেন, তাই চেহারাও হয়েছে নাদুস নুদুস, মেদবহুল।

বল্‌লাম—এটা আমারই দোকান। দু'বেলাই বসি।

বটে? বটে? বেশ! বেশ! ভালই হল। বাড়ির পাশে একজন চেনা ডাক্তার থাকা অনেক সুবিধে।

আপনি তো চেহারাটা দিব্বি বাগিয়ে-ছেন দেখছি। অনেক পয়সা কামাচ্ছেন বুঝি?

তা কামিয়েছিলাম মন্দ নয়। বাড়ি করেছিলাম একটা। শেষটায় লোভে পড়ে দিলাম ডবল দামে বিক্রী করে। দেখছে এই চেহারা কিন্তু ভেতরে কিছু নেই একদম ফাঁপা। পেট ভর্তি শুধু উইন্ড আছে আপনাদের উইণ্ডের কোন অষুধ

আছে বৈ কি!

তাহলে দিন দেখি একটা। এলোপ্যাথ অষুধ অনেক খেয়েছি কিছু হয় না। ব বড় ডাক্তার সব ফেল মেরে গেছে কবরেজীও করে দেখলাম এই দু' বছর এখন ভাবছি হোমিওপ্যাথী করাব।

স্টুলটা পরীক্ষা করিয়েছেন কখনও

অনেকবার। কিছু পাওয়া যায় না শুধু শুধু টাকা নষ্ট।

আবারও যে পরীক্ষা করাতে হয়।

সে ভাই আর পারব না। ও স পরীক্ষা টরীক্ষার মধ্যে আমি আর নেই এ ক'বছরে অনেক ডাক্তার গুলে খেয়েছি। ও ফাঁদে আর পা দিচ্ছি না কোন অষুধ সত্যি থাকে তো দিন।

আচ্ছা চলুন ভেতরে পেটটা একবার দেখি।

পেটে আর নতুন কি দেখবেন? সব তো শুনলেন। দিন না একটা অষু দেখি ক'দিন ট্রাই করে।

পরীক্ষা না করে কি করে বুঝব কোন অষুধ আপনার দরকার?

তা হলে এখন থাক্‌। আজ উঠি আগে হোমিওপ্যাথী করেই দেখি কিছু দিন। ফল না পেলে তখন না হয় এসে পরীক্ষা করানো যাবে। আচ্ছা নমস্কার।

ভদ্রলোক বাইরে যেতেই কানাই বল্‌লে—দেখলেন বক্‌সীবাবু, স্যারের কাণ্ডটা! কত বড় শাঁসালো একটি মক্কেল কেমন হাতছাড়া হয়ে গেল। উইণ্ডের একটা অষুধ চাইছিল অত করে দিলেই হত একটা প্রেস্‌কৃপসন লিখে। দুদিন খেয়ে আবার আসত। তখন আবার একটা দিতেন। এমনি করেই তো রুগী আসে আর এমনি করেই তাকে হাতে রাখতে হয় পুরনো ব্যামো, চট্‌ করে তো আর সারত না! অনেক দিন ধরে অষুধ খেত। চাই কি মাসের বাড়ি ভাড়াটাও হয়ত এর ওপর দিয়ে উঠে আসত।

বক্‌সী বললে—তাইত হে ডাক্তার

গজটা কি ভাল হল? নাঃ কানাই! আমার জন্য দেখছি এবার অন্য কোথাও চেষ্টা করতে হয়!

আমি একটা জবাব দেব ভাবছি ঠাৎ দেখি বিনায়ক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আমার কাছেই এসে উপস্থিত হয়েছে। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, পায়ে চটি, পরনে ঢলে পা-জামা। আমি বসতে বলবার আগেই ও হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—এই যে ডাক্তারবাবু! দয়া করে এক্ষুণি একবার আসবেন? মার খুব জ্বর; কি রকম যেন করছেন। বলেই টেবিলের ওপর রাখা আমার ডাক্তারী ব্যাগটি তুলে নিয়ে বললে—চলুন।

আমি উঠে বললাম—ব্যাগটা আমার কাছেই দিন। বিনায়ক ব্যস্ত হয়ে ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেবে গেছে। বললে—তা কি হয়? আপনাকে আমি ডেকে নিয়ে যাচ্ছি নিজের গরজে বিপদে পড়ে। আমার জন্য এই ব্যাগটা আপনি বইবেন কেন? রাস্তাটা পার হয়ে ঐ কাপড়ের দোকানের পাশে গলির ভিতর আমার বাড়ি; জানালা থেকে আপনার ডিস্‌পেনসারী দেখা যায়।

সদর রাস্তা পার হয়ে গলি দিয়ে বিনায়ক আমাকে নিয়ে ওর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বললে—আপনি একটু বসুন। আমি ভেতরে খবর দিয়ে আসি।

তাকিয়ে দেখি যে ঘরে ঢুকেছি, সে ঘরের দেয়াল দেখা যায় না। যা চোখে পড়ে তা সব বই। এত বই একসঙ্গে আমি কোন বাড়িতে আজও দেখিনি। মনে হয় যেন একটা বই-এর দোকানে ঢুকেছি। দেয়ালের গায় তাকের পর তাক মোটা মোটা আইনের বই দিয়ে ঠাসা। আইন ছাড়া অন্য কোন বই নেই।

চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছি এমন সময় বিনায়ক এসে বললে, চলুন ভেতরে। ওর সঙ্গে ভেতরে গিয়ে দেখলাম ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা বিধবা মহিলা জ্বরে ভুগে এবং উপোস করে রক্তশূন্য হয়ে পড়েছেন। ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা লিখে নীচে এসে বসতেই বিনায়ক বললে—বাঁচালেন মশাই! মার অসুখটা তাহলে গুরুতর কিছু নয়। অসুখ হলে যে কাছে বসে একটু দেখাশোনা করবে, এমন আর কেউ এ বাড়িতে নেই। ঝির হাতের জল মা খাবেন না। তাহলে দেখুন আমাকেই আদালত কামাই করে ঘরে বসে থাকতে হয়। মক্কেলের কাজ হাতে নিয়ে তা কি করে সম্ভব বলুন তো? যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন, আমি নিজের মত চলেছি; নিজে রোজগার করে শুধু বই কিনেছি আর পড়েছি। এত যে বই দেখছেন সব নিজের পয়সায় একটি একটি করে কেনা। বাবার ইচ্ছে ছিল ওঁর ব্যবসা আমি দেখি, কিন্তু তা যখন হল না, তখন সব বেচে দিয়ে মার নামে নগদ টাকা রেখে গেছেন। যত দিন উনি ছিলেন সংসারের কোন ঝামেলা আমাকে পোহাতে হয়নি। উনি মরে গিয়ে দেখুন কী ফ্যাসাদে আমাকে ফেলে গেছেন! মাকে দেখবার দ্বিতীয় প্রাণী নেই অথচ ঝি চাকর নার্স এসব কিছুই মা সহ্য করতে পারেন না। কি করি বলুন দেখি?

এরকম ক্ষেত্রে আর পাঁচজন যা করে আপনিও তাই করুন; চটপট বিয়ে করে ফেলুন।

আপনিও একথা বলছেন? মার জন্য দেখছি শেষটায় তাই করতে হবে। অথচ আমার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করাটা কি ঠিক? মানলাম না হয় বেশী বয়সের মেয়ের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু শুধু মার জন্য বিয়ে করাটা কি অন্যায় নয়?

শুধু মার জন্য কেন? নিজের জন্যই করুন না? আপনাকে একটু দেখাশুনা করাও তো দরকার।

মাপ করবেন, ওসব দেখাশুনা এই বয়সে আর সইবে না। এই বেশ আছি। আহার নিদ্রা পোশাক পরিচ্ছদ লেখাপড়া আমোদ-প্রমোদ সবই এতদিন নিজের ইচ্ছেমত করে এসেছি; কাউকে কখনও জবাবদিহী করিনি। দেখা-শুনো মানেই এসবে আর একজনের খবরদারি মেনে নিতে হবে। না মশাই, সে আর আমি পারব না। আচ্ছা, মার জন্য তাহলে ভয়ের কিছু নেই?

বললাম—না ভয়ের কিছুই তো দেখছি না। ওষুধ পথ্য যেরকম লিখে দিয়েছি, সেই রকম চালিয়ে কাল একবার খবর দেবেন। আচ্ছা, নমস্কার! বলে উঠে এলাম।

সেই থেকে বিনায়কের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। মার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু বিনায়ক আমাকে ছাড়ল না। সন্ধ্যার পর প্রায়ই আমার কাছে আসে, ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে তবে ওঠে। মাসখানেক পর একদিন বললে—আমার পিঠটা আপনাকে একবার দেখাব ভাবছি কতদিন ধরে। কি যেন একটা হয়েছে, ভারি চুলকোয়।

বললাম—বেশ তো, জামাটা খুলুন। দেখি কি হয়েছে।

বললে—এইখানে? না থাক্। তার চেয়ে চলুন না একবার বাড়িতে; চাটা খেয়ে দেখবেন এখন।

ওর সঙ্কোচ দেখে বললাম—বেশ তো; তাই চলুন তাহলে!

লাইব্রেরী ঘরে আমাকে বসিয়ে চাকরকে চা আনতে বলে বিনায়াক জামা খুলে ওর পিঠটা দেখালে। দেখলাম সমস্ত পিঠ জুড়ে প্রকাণ্ড একটি বাঘা দাদ। বললাম—তাইত! এটা তো দেখছি একটা দাদের মত দেখাচ্ছে। এত বড় কি করে হল?

শুনেই বিনায়ক বললে—দূরে মশাই! আমার দাদ হবে কী করে? দাদ তো হয় জানি মুটে মজুরদের, যারা নোংরা থাকে। মাস চারেক আগে এক ডাক্তার দাদের মলম দিয়েছিল, সেটা লাগিয়েই তো এত বেড়ে গেল। দেখুন দেখি, আর একবার ভাল করে।

ওর মনের ভাব বুঝে জানালার কাছে ওকে নিয়ে আবার দেখে বল্লাম—এটা তাহলে বোধ হয় ফাঙাস্।

খুশী হয়ে বিনায়ক বল্লে—তাই বলুন! চার মাস থেকে ভুগছি, খুব চুল্‌কোয়। রক্তটা খারাপ হয়নি তো? দেখবেন একবার পরীক্ষা করে?

বল্লাম একটা লোশন দিচ্ছি; একটু জ্বালা করবে। তিনদিন লাগিয়ে দেখুন একবার করে।

জ্বালা করুক; কিন্তু সারবে তো?

নিশ্চয় সারবে।

তাহলে দিন লিখে।

তিন দিন লোশন লাগিয়ে বিনায়ক যেদিন এল সেদিন ওর আনন্দে উদ্ভাসিত জ্বলজ্বলে মুখখানা আজও আমার চোখে ভাসে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে—চমৎকার আপনার অষুধ, একেবারে অব্যর্থ। লাগালে বেশ কিছুক্ষণ জ্বালা করে কিন্তু কি আশ্চর্য, চুলকানিটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। চার মাস পর কাল প্রথম ঘুমিয়েছি; একবারও চুলকোয়নি। এতদিন কী কষ্টই যে পেয়েছি। একবার শুরু হলে আর রক্ষে থাকত না; ইচ্ছে হত ঝামা দিয়ে পিঠটা ঘষি। মুটেদের দেখেছি গাছের গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে দাদ ঘষ্‌তে; দেখলেই কেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করত। আমার তো ঐ নোংরা রোগটা হয়নি কিন্তু ফাঙাসেও কি এত চুলকোয়? আমি নিজে এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি, রোজ সরষের তেল মেখে স্নান করি, ওটাও তো একটা এণ্টি-সেপ্‌টিক, তবু এই রোগ হল কি করে বলুন দেখি? ট্রামে বাসে যাতায়াত করি কত রকম লোকের গা ঘেঁষে চলতে হয় তাই থেকেই হয়ত হয়েছে, কি বলেন? আচ্ছা, ধোপারা তো কত রকম রুগীর জামা কাপড় নিয়ে একসঙ্গে ফেলে রাখে; সেখান থেকেও তো এর বীজাণু আসতে পারে। আমার যিনি সিনিয়র তাঁর আঙুলে এগ্‌জিমা আছে আজ পাঁচ বছর, তিনি মাঝে মাঝে আমার পিঠ চাপড়ে দেন, হাত ধরেন; সেখান থেকে হয়নি তো?

বল্লাম— অত ভেবে আর কী হবে; কমে তো গেছে, চলুন এইবার দেখি।

পিঠটা আবার দেখলাম; সত্যি অনেক কমে গেছে। বল্লাম এখনও একেবারে সারে নি। একটা মলম দিচ্ছি; দুবার করে তিন দিন লাগিয়ে আবার আসুন।

দিন তিনেক পরে বিনায়ক আবার যখন এল দেখলাম মুখের সেই জ্বল্‌জ্বলে ভাবটি মিলিয়ে কিসের যেন একটা উদ্বেগের ছাপ পড়েছে। চোখের কোণে কালি, ভাবনায় মুখ শুক্‌নো। জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? শরীর খারাপ নাকি? মা ভাল আছেন?

বল্লে—মা দিব্বি আছেন; আপনার অষুধ বিষুধ কিচ্ছু খাচ্ছেন না। আবার আগের মত সারাদিন অনিয়ম এবং অকাজ করে বেড়াচ্ছেন।

তাহলে অমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? কোর্টে আজ হার হয়েছে বুঝি?

কোর্টে হারজিত মশাই গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওতে কিচ্ছু হয় না আজকাল। মন-মেজাজ খারাপ হয়ে আছে আপনার এই মলম মেখে। অতি বিশ্রী অষুধ।

কেন? কি হল?

আগের লোশনটা লাগিয়ে মনে হয়েছিল এবার বোধ হয় ও রোগটা থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু এই মলম মেখে দেখছি আবার ওটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ঘাড়ের কাছটা বেশ চুলকোচ্ছে কাল থেকে। মলম মেখে সারা গা চট্‌চটে হয়ে থাকে; ভারি খারাপ লাগে। দেখুন দেখি আবার কি হল?

এবারে দেখলাম পিঠে যে প্রকাণ্ড দাদটি ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ঘাড়ের কাছে নতুন একটি হয়েছে। বল্লাম —মলমটা থাক, নতুন একটা লোশন দিচ্ছি; আগেরটার চেয়ে একটু বেশী জ্বাল করবে। সাবান দিয়ে স্নান করে যেখানটা চুলকোয় সেখানে শুধু লাগাবেন একবার করে। তিন দিন পর আবার দেখব।

এটা কি সারবে না?

নিশ্চয় সারবে। কাপড় জামা তোয়ালে রোজ ব্যবহার করে যদি পরদিন সাবা জলে আধ ঘণ্টা সেদ্ধ করতে পারে তাহলে সাতদিনেই সেরে যাবে।

ওষুধে সারবে না?

সারবে, কিন্তু আবারও যাতে না হয় তার জন্যই দেখুন না ক'দিন একটু কষ্ট করে— একেবারে সেরে যাবে।

অত হাঙ্গামা কে করবে? আচ্ছা, দেখি তো এই অষুধটা লাগিয়ে।

তারপর অনেকদিন বিনায়কের আর দেখা নেই। সকালের দিকে হাস পাতালের কাজ সেরে যখন ডিস পেন্সারীতে যেতাম ততক্ষণে বিনায়ক আদালতে চলে গেছে। রাত্রেও ওকে কখনও দেখতে পেতাম না।

মাস তিনেক পর এক সন্ধ্যায় হঠাৎ এসে বললে, ডাক্তারবাবু কাল আমার বিয়ে; আপনাকে যেতেই হবে।

খুব খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, খুব ভাল খবর। কনগ্রাচুলেশনস তাই এতদিন দর্শন মেলেনি! মেয়েটি বুঝি খুব স্মার্ট?

মেয়ে তো আমি দেখিনি।

বলেন কি?

ঘটা করে মেয়ে দেখতে মশাই আমা

নিবৃত্তি হল না। মার এই বয়সে একা থাকতে কষ্ট হয় তাই বিয়ে করা। মা যখন পছন্দ করেছেন তখন আমি দেখে আর কি পরমার্থ লাভ করব বলুন দেখি!

— ওঃ বুঝেছি; মেয়েটির ছবি দেখেই আপনি কাত? বিয়ের রাতে তাহলে তো নির্ঘাৎ ফিট!

— না মশাই, ওসব ছবিটবিও আমি দেখিনি। মেয়ের মামা খুব ধরেছিলেন একবারটি মেয়ে দেখতে। কিছুতেই যখন রাজী হলাম না তখন বললেন একটা ফটো তুলে এনে দেখাবেন। এতক্ষণ বেশ বোকা-বোকা হাসি হেসে ভদ্রলোককে খাতির করেছি; কিন্তু এখন মনে হল ভদ্রলোক একটু বাড়াবাড়ি করছেন। আমার বাপ-ঠাকুর্দা কেউ মশাই বাড়াবাড়ি কখনও বরদাস্ত করেন নি; আমিও করি না। মামার কথা শুনে বাপ-ঠাকুর্দার সেই রক্ত চট করে মশাই মাথায় উঠে গেল। বলে ফেললাম, ওসব ফটোটটো যদি তুলতে যান তাহলে কিন্তু আমি বিয়েই করব না; ঐ ফটো দিয়ে অন্য পাত্র ধরবেন। ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লেন। ভাবলেন বোধ হয় জামাইএর মাথায় একটু ছিট আছে। আর তা তো বিলক্ষণ আছেই। নইলে এই পঞ্চাশ বছর ব্যাচিলর থেকে আজ হঠাৎ মার দুঃখে গলে গিয়ে কেউ কখনও বিয়ে করে? আচ্ছা আজ উঠি; কাল কিন্তু নিশ্চয় আসবেন; বলে বিনায়ক তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

কি একটা কাজে আটকে গেলাম, বিনায়কের বিয়েতে আর যাওয়া হল না। বৌভাতের দিন ওর বাড়িতে গিয়ে খুব খেয়ে এলাম। বহু লোকের নেমন্তন্ন; মেয়েদের ভিড়ই বেশী। ঐ ভিড় ঠেলে বৌ দেখা আর হয়ে উঠলো না।

আবার কিছুদিন বিনায়ক ডুব মেরে রইল। কোন পাত্তা নেই। মাসখানেক পর একদিন হঠাৎ এসে হাজির। এ ক'দিনেই চেহারায় বেশ জলুস এসেছে; সেই উস্কো-খুস্কো ভাব আর নেই। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, মাথার চুল পরিপাটি করে ব্রাশ করা, ধবধবে ফিটফাট পোশাক। মুখে সেই খুশি-খুশি জ্বলজ্বলে ভাব। দেখে খুব ভাল লাগল।

বললাম, এতদিন ডুবে থেকে আজ হঠাৎ যে ভেসে উঠলেন? ব্যাপার কি? বিনায়ক বললে, ব্যাপার খুবই সঙ্গীন! নইলে ডাক্তারের কাছে কেউ আসে? যেতে হবে এক্ষুণি!

কেন? মার আবার কি হল?

বিনায়ক বললে, মার কিছু হয়নি; এবার ব্রাহ্মণীকে নিয়েই ভারি মুশকিলে পড়েছি। কাল থেকে খুব সর্দি, সারাদিন নাক দিয়ে জল ঝরছে; তার ওপর মশাই এক বাতিক—জল-ঘাঁটা। বিয়ের পরদিন থেকেই যে শুরু হয়েছে বাসি জামাকাপড় সব রোজ সেদ্ধ করে নিজের হাতে কাচা আর ঘরদোর জল দিয়ে সাফ করা একদিনও তার কামাই নেই। কোথাও এতটুকু ময়লা জমতে দেবেন না। আজ ভোরে উঠেই দেখলাম খুব হাঁচছেন। বললাম, নাকে একটু অষুধ লাগাতে আর বারণ করলাম জল ঘাঁটতে; তা মশাই হেসেই সে কথা উড়িয়ে দিলেন। দেখুন দেখি কী রকম ছেলেমানুষী? একদিন জামাকাপড় না কাচলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? কোর্টে যাবার আগে দেখে গেলাম ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে নাক মুছচেন আর কাপড় কাচছেন! বার-লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতেই শুনি এডভোকেট মুখার্জী বলছেন, সর্দি খুব খারাপ জিনিস, নেগলেক্ট করলে এ থেকে নিউমোনিয়া, টি বি সব হতে পারে। জাস্টিস মল্লিকের মেয়ের মেন্ইন্জাইটিস্ হয়েছে, আজ পাঁচ দিন অজ্ঞান হয়ে আছে, বাঁচবে কি না সন্দেহ। শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার দেখে বলেছেন যখন সর্দি হয়ে মাথা ধরেছিল তখনই স্টেপ নিলে আর এমনটি হত না। দেখুন দেখি কি সাংঘাতিক! আচ্ছা, সর্দি থেকে র‍্যাপিড্লি কিছু সিরিয়াস হতে পারে কি? সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তখন এত খারাপ কিছু বুঝিনি; কিন্তু কোর্টে গিয়ে এই সব শুনে মনটা ভারি দমে গেছে। তাই ভাবলাম একেবারে আপনাকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি যাই। আসবেন এক্ষুণি দয়া করে? বুকে সর্দি বসেছে কি না দেখবেন একবার পরীক্ষা করে? বলবেন ব্রাহ্মণীকে একবার বুঝিয়ে?

ওর এই অকারণ উদ্বেগ দেখে ভারি কৌতুক বোধ হল। মাকে দেখবার জন্যই যাকে ঘরে আনা তার প্রতি এত দরদ কোত্থেকে এল? জামাকাপড় সেদ্ধ করার কথায় ওর পিঠের সেই দাদটির কথা হঠাৎ মনে পড়ল! জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পিঠের সেই চুলকনির কথা তো কই অনেকদিন কিছু বলেননি? ওটা আর হয়নি তো?

একগাল হেসে বিনায়ক বললে, না মশাই, ওটার হাত থেকে এতদিনে সত্যি বেঁচেছি। কি করে শেষটায় গেল জানেন? আমি গায়ে মাখা সাবানের যে ব্রান্ডটা গত চার মাস থেকে মেখে আসছি ব্রাহ্মণী তা দেখেই বললেন, এর গন্ধটা যদিও মিষ্টি, কিন্তু ভেতরটায় শুধু চুন; বেশীদিন মাখলে চামড়া খারাপ হয়, স্কিন ডিজিজ হয়। অমনি মনে পড়ল এই সাবান মাখার কিছুদিন পর থেকেই তো আমি ফাঙাসে ভুগছি! আপনার অষুধে কমে যাচ্ছে; কিন্তু আবার তো হচ্ছে। অথচ দেখুন আজ দশ বছর ব্রাহ্মণী যে সাবান মাখেন তাতে স্কিন ডিজিজ তো দূরের কথা, গায়ে একটা ফুসকুড়ি পর্যন্ত হয়নি; স্কিনটিও তাই এত সফ্ট্। তক্ষুণি মশাই আমার সাবান ছুঁড়ে ফেলে ব্রাহ্মণী যা মাখেন তাই এক ডজন কিনে এনে রোজ মাখছি। আর বলতে নেই, বেশ ভালই আছি; আপনার ঐ হুল-ফোটানো লোশনের একদিনও দরকার হয়নি। দেখলাম মশাই, আপনাদের অষুধ টষুধ সব বাজে; তার চেয়ে স্ত্রীর অষুধই ভাল।

একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ স্ত্রীই হল আসল অষুধ বিশেষ করে পঞ্চাশোর্ধে।

ময়মনসিংহের হাজং উপজাতি

সুনীল জানা ও নিখিল মৈত্র

অনেকদিনের কথা না হলেও, অন্য যুগের কাহিনীই বলতে যাচ্ছি। তখন গারো পাহাড়ের পাশ দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমারেখার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠে নি। ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে বানপুর-দর্শনার অস্তিত্ব আছে কি নেই বোঝা যেত না। মেল-ট্রেন রাণাঘাট ছেড়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াত চুয়াডাঙ্গায়। মাঝখানে হাজংদের দেশে গিয়েছিলাম সে যুগে আর আজ যখন তাদের কথা লিখছি তখন কত পরিবর্তনই না হয়ে গিয়েছে। ঢেউ খেলানো গারো পাহাড় যেখানে নেমে এসে সমতল ভূমিতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেইখান দিয়ে নতুন ভূগোলের নতুন সীমানা সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ী গারো ও সমতলভূমির হাজংকে স্বতন্ত্র দুই দেশের নাগরিক তৈরি করেছে।

আমাদের সেবার যাত্রা শুরু হল সুসং থেকে। অনেকখানি পথ পায়ে চলে যেতে হল ভোর মুরগি ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেঠো পথ দিয়ে হাজংগ্রামের উদ্দেশে চললাম। আবছা আঁধারে চারদিক ঘেরা। এর মধ্যে পথ চিনে বের করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত যদি না সহযাত্রী বন্ধু প্রতি-পদে সাহায্য করতেন। বিস্তীর্ণ খেত মাইলের পর মাইল চলে গিয়েছে। নিজের প্রয়োজনে মানুষ তাকে বহুভাবে বিভক্ত করেছে। পাশ দিয়ে সীমারেখা নির্দেশ করেছে আল বেঁধে। এরই উপর দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। তারি মাঝে পূর্ব দিগন্ত রাঙিয়ে সূর্যদেবের উদয়। দিগন্তজোড়া প্রান্তর অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ফেলে অকস্মাৎ সজীব হয়ে উঠল।

বর্ণের এই বন্যাই দু চোখ ভরে দেখছিলাম। সহযাত্রী বলছিলেন হাজংরা এ অঞ্চলে কেমন করে এলো। সে অনেক দিনের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি সুসংএর রাজা কিশোর হাতী ধরার জন্যে খেদা তৈরি করবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু বাঙালী কৃষকদের দিয়ে খেদা চালান যাবে না, তাই হাজংদের নিয়ে এসে এখানে বসবাস করানো হলো। সেই থেকে তারা এখানে আছে।

লেঙ্গুড়া গ্রামের কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, বেলা তখন অনেক। গ্রামের পাশে সোমেশ্বরী নদী, তার দুধারে হাজংদের বসতি। বাঙালী পল্লী ছেড়ে আদিম জাতির গ্রামে যে ঢুকেছি তা মেয়েদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এখানে অবরোধ-পর্দার দুঃশাসন নেই। খেতখামারে স্ত্রীপুরুষ পাশে দাঁড়িয়ে শুধু কাজই করে না, নিজেদের স্মিত সহযোগিতায় প্রতিটি কাজকে আরও মধুর করে তোলে। হাজং কৃষকদের হাসিও সংক্রামক। বহিরাগতকে আগমন বার্তা সেও জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু প্রথমেই অভিনন্দন করবে হাসিমাখা মুখ দিয়ে।

লেঙ্গুড়া গ্রাম তখনকার বাংলাদেশের শেষ পূর্ব প্রান্তে। নদী ধরে মাইল খানেক গেলেই গারো পাহাড়, আসামের সীমানা। পাশাপাশি হাজং আর গারোদের বাস এখানে। গারোরা পাহাড় থেকে ফল, তরিতরকারি, বুনো শেকড়, লতাপাতা, কাঠের গুঁড়ি, জন্তুর ছাল আর হাতে বোনা রং-চংএ কাপড়ের বিচিত্র পসরা নিয়ে হাটে আসে। হাজংরাও কাঠ কাটতে পাহাড়ে যায়। সেখানে প্রতিবেশী গারো তাকে আদর আপ্যায়ন করে। ক্লান্তি দূর করার জন্যে এক ছিলিম তামাক বা কখনও বাঁশের চোঙ্গায় ভরে ঘরে তৈরি মদ এনে দেয়।

হাজং উপজাতির মা ও শিশু

গৃহকর্মনিরতা হাজং তরুণী

াদিম জীবনের দুই স্তর এখানে পাহাড়ে । সমভূমিতে মিলে মিশে রয়েছে।

সোমেশ্বরী নদী গারোপাহাড়ের নোর-কুক শিখর থেকে নেমে এসে তুরা ও আর-বেলা পর্বতশ্রেণীর জলধারা নিয়ে সুসং-এর সমভূমিকে সিঞ্চিত করেছে। বর্ষায় পাহাড়ের গা বেয়ে জলধারা এসে নদীতে প্লাবন সৃষ্টি করে। এখন সে নদীর ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ। নদীর দুধারে উপজাতি-দের গ্রাম। সেখানে মাছ ধরা, সাঁতার, স্নান অথবা শুধুই খেলতে হাজং ও গারো পুরুষ-স্ত্রী, যুবক-যুবতী, শিশুদের ভিড় জমে। নদী চিরদিন বিভিন্ন জনপদের মানুষের মধ্যে সখ্যতা ও সদ্ভাবের সেতু রচনা করেছে। সোমেশ্বরীও পাহাড় এবং সমভূমির মানুষকে এক করেছে।

লেঙগুড়া ছোট গ্রাম। পাশাপাশি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, ধানের গোলা, গোয়াল-ঢেঁকীশাল। সারাদিন নদীর চকচকে বালুর উপর দিয়ে লোকজন চলাচল করে। মেয়েরা জল নিতে আসে, স্নান করে। খালি গায়ে খাটো ধুতি পরা হাজং চাষী হাটে যায়, না হয় চাষের কাজে মাঠে যায়।

সপ্তাহে একদিন নদীর ধারে হাট বসে। সেখানে হাজং ও গারো দুই উপজাতির লোকেরা নিজেদের পসরা নিয়ে বসে। দূরে শহর থেকে ভ্রাম্যমান দোকানী পুতি, রঙগীন ফিতে, কাঁচের চুড়ি, মশলা, সস্তা খেলনা, ছিটের কাপড়ের গাঁঠরি নিয়ে আসে। হাজং মেয়েদের বস্ত্রাবরণ সংক্ষিপ্ত; একখানা শাড়ি বুকের উপরে শক্ত করে জড়িয়ে পরে এবং সেটা তাদের নিজেদের তাঁতেই বোনা। মাঝে মাঝে এক আধজন যুবককে দেখলাম নানা বিচিত্র রংয়ের সার্ট পরে ঘোরাঘুরি করছে। বুঝলাম সুসং বাজারে গিয়ে ফরমায়েসী এই সার্ট তৈরি করে নিয়ে এসেছে।

এদেশে বন্য জীবজন্তুর ভয় আছে। হাতী, বাঘ, ভালুক, চিতা প্রভৃতির সাক্ষাৎ অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। তাই জঙ্গলের পথে চলতে গেলে সবাই হুঁশিয়ার হয়ে বেরোয়। সম্ভব হলে দলবদ্ধ অবস্থাতেই যাওয়া শ্রেয়। রাত্রে মশাল জেলে নিয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে অনেক কম।

হাজংরা চাষ আবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের বিরাট অভিযোগ ছিল যে তাদের দেয় কর সংগৃহীত হয় শস্যে। ফলে, তাদের করের হার অত্যন্ত বেশি। সভ্য মানুষ যেভাবে তার দেয় কর টাকায় দেয়, সেইভাবে দেবার জন্যে তারাও দাবি জানায়। এখানে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টিও হয়েছিল। একদিক থেকে সভ্য মানুষ তাকে বঞ্চিত করেছে, অন্যদিকে আর একদল সভ্য মানুষ তাকে উত্তেজিত করেছে এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে আন্দোলন করতে। পরে বহুবার এ সমস্যার কথা ভেবেছি। মনে হয়েছে যে সভ্যতা যেভাবে সামাজিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে, উপজাতিদের সেই পঙ্কিল আবর্তে টেনে না আনাই ভাল। এখনও যেখানে ঘৃণা, দ্বেষ, নীচতা, শঠতা প্রবেশ করে নি, জীবনে যেখানে রয়েছে অনাবিল আনন্দ ও শান্তি; সেইখানে যত সংগত কারণ থাকুক না কেন ঘৃণার আগুন জ্বালান অবাঞ্ছনীয়। তাতে অত্যাচারীর দল অগ্নি-দগ্ধ হবে কি না জানি না, কিন্তু আদিম সমাজে যে শান্তি, যে আনন্দ আছে তা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তারপর হাজংদের দেশে বহু অঘটন ঘটেছে। পাকিস্তান থেকে গৃহহারা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা সামান্য পরিমাণে হাজংরা বর্ধিত করেছে। নিজের বাসভূমি ছেড়ে যাবার স্থান কোথায়? তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে গারো পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভারত-পাকিস্তানের সীমারেখা চলে গিয়েছে। হাটের দিনে এখন মানুষে মানুষে আগের মত মিল হয় না। সভ্য মানুষের তাড়নায়, তার কলহে অতিষ্ঠ নিরুপায় হয়ে '৫০এর আত্মঘাতী গৃহ-যুদ্ধের দিনে অনেক হাজং সুসং পরগণা ছেড়ে দিয়ে গারোপাহাড়, গোয়ালপাড়া জেলাতে আশ্রয় নিয়েছে।

বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ই টি ডাল্টনের মতে রভা ও হাজং কাছাড়ী উপজাতির দুই শাখা। হাজংদের উপর প্রতিবেশী গারোদের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। উত্তর কাছাড়ের হাজই ও হাজং একই উপজাতি বলেও ডাল্টন উল্লেখ করেছেন। উত্তর কাছাড়ে হাজই ও পারবতিয়া নামে অধি-বাসীদের বিভক্ত করা হয়েছে। হাজইরা সমভূমির বাসিন্দা এবং আচারে ব্যবহারে হিন্দু সমাজের অনুগামী। পারবতিয়া কাছাড়িয়া পাহাড়ের দেশে বসবাস করে। স্বাস্থ্য ও শক্তিতে তারা হাজইদের থেকে উন্নত কিন্তু সভ্য সমাজ তার জীবন ধারার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারেনি।

হাজংরা এখন নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। উপজাতির সমাজবন্ধন ও পূর্বেকার রীতিনীতি এখনও ছাড়তে পারেনি। হিন্দু পূজো-পার্বণের সঙ্গে রফা করে নিজের দেবদেবতার পূজো-অর্চনার ব্যবস্থা করে। শুনলাম যে তাদের সমাজে সব থেকে জাগ্রত দেবতা ঋষি। ঋষির পত্নী চারিপক বলে পরিচিত। পণ্ডিতদের ধারণা যে হরপার্বতীর নামান্তর ঋষি চারিপক। দেবমুগলের বাসস্থান রাঙ্গকোরঙ্গে (স্বর্গে)। দেবপূজোয় বরাহ ও ছাগ বলি দেবার প্রথা প্রচলিত। মর্তের দেবতা ধোর-মণ্গ। গারো পর্বতশ্রেণীর চোরিহাচু পাহাড়ে জাগতিক প্রভু বাস করেন। খৃষ্টান গারো কৃষকও অনাবৃষ্টিতে ভীত হয়ে দেবতার উদ্দেশে চোরিহাচু পাহাড়ের উপর ছাগবলি দেয়। শৈলশিখর নিবাসী দেব সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করেন। বারিধারা গারো পাহাড় থেকে নেমে এসে হাজংদের দেশকেও সিঞ্চিত করে।

হাজংদের চোখমুখে মোঙ্গলীয় ভাব সুস্পষ্ট। চুল ঘন কাল। দাড়ি গোঁফের বালাই নেই। কথাবার্তা বলে কিন্তু বাংলায়। চীনে মুখে বাংলা কথা শোনায় বড় অদ্ভুত, তাই প্রথম প্রথম কথা শুনতে বড় ভাল লাগত। গ্রামে এখনও পুরুষ স্ত্রী মিলে আমোদ-আহ্লাদ, নাচগান করে। তবে হিন্দু গুরুদেব ধীরে ধীরে অনুশাসন জারি করছেন। সভ্য করার চেষ্টায় উপজাতিদের নিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারি, সমাজ সংস্কারক, হিন্দুধর্ম প্রচারক প্রভৃতি পণ্ডিতের দল নানাভাবে কাজ করেছেন। এর ফলে উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, স্কুল কলেজ গড়ে উঠেছে কিন্তু প্রগতির পথে দণ্ডও কম দিতে হয়নি। কষ্টকর জীবনে শতসহস্র অনগ্রসরতার মাঝে হাসি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস সমস্ত আদিবাসী সমাজকে সজীব করে রাখত। অতি সভ্য মানুষের সঙ্গে অনাবিল আনন্দের বোধহয় কোথাও বিরোধ আছে। তাই সভ্যতার পথযাত্রী আদিবাসীদের জীবনে কৃত্রিমতা এসেছে। উন্নয়নের নামে সভ্য সমাজের জীবনধারা তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

হাজংদের মধ্যে বাইরের জগৎ কাজ করেছে ব্যাপকভাবে। তবুও, এখনও

হাজং রমণী

তাদের জোর করে নাম পরিবর্তন কেউ করতে বলেনি। মিশনারিদের কল্যাণে গারো নামের সঙ্গে জন, জোসেফ, পল, পিটার প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েছে, হাজংদের পোশাকী নাম নেই।

হাজং ও তাদের গোত্রজ কাছাড়ী উপজাতির অন্য শাখার কাছে ব্রহ্মপুত্র নদ অতি পবিত্র। নদীর খরধারা তাদের পিপাসা মিটায়, ভূমিকে দান করে উর্বরতার আশীর্বাদ। তাই তারা ব্রহ্মপুত্রকে অভিহিত করে দইমা বলে—অর্থাৎ জননী নদী। মাতা কখনও রুষ্ট হয়ে সংহারিণী মূর্তি ধারণ করেন। তারও সঙ্গে হাজংদের পরিচয় আছে। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, কাছাড়ীরা আসামের বহু নদীর নামকরণ করেছে এবং আমরাও তাদের দেওয়া নামকে স্বীকার করেছি। তাদের ভাষায় ডি অথ বারি, অথবা নদী। সুতরাং ডি-বং, ডি হিং, ডি-গারো প্রভৃতি নদী।

নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে হাজংর আবার তাদের কাছাড়ী গোত্রজের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে। কিন্তু তাে আরও নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। হাজংর বহুদিন ধরে ভালভাবে চাষ আবাদ ক'ে গৃহস্থ জীবন যাপন করছিল। চাষে শস্য বণ্টন নিয়ে তাদের মধ্যে আন্দোলন

সোনেশ্বরী নদীর তীরে বিশ্রাম্ভালাপরত কয়েকজন চাষী

গড়ে উঠে। আন্দোলন পরবর্তী সময়ে সংঘাত, সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্থানী জবরদস্ত শাসন সমস্যাকে আরও ঘোরালো করে তোলে। হাজং এলাকায় তখন নাকি বহু অঘটন ঘটেছে। তার বিস্তৃত বিবরণ ও বিতর্কমূলক বস্তুর বিশ্লেষণের যোগ্য স্থান এ নয়। সভ্যমানুষের কাছে তারা এখনও শিশু; একথা দ্বিধাহীনচিত্তে হাজংদের সম্বন্ধেও বলব। তারা আমাদের কারসাজি, বিদ্বেষ উত্তেজনার সঙ্গে অপরিচিত। সুতরাং তাদের অগ্রগতির কথা রাষ্ট্রকে সামগ্রিক-ভাবে ভাবতে হবে। রাজনীতির প্রয়োজনে তাদের ভাগ্য যেন নির্ধারিত না হয়।

হাজংদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আদিবাসী জীবনের আরও অনেক সমস্যার কথা মনে পড়ে। সে সমস্যা তাদের সৃষ্টি নয়। আমরা অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সঙ্গে তাদের মধ্যে সংস্কার আনতে গিয়ে অনর্থ বাধিয়েছি। উপ-জাতির জীবনে, বিশেষ করে উৎসবের দিনে, প্রচুর মাংস ও ততোধিক মদ্যপান প্রচলিত আছে। আমাদের সমাজে দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষক নেশার ঝোঁকে তার জীবনকে [illegible]ত চায়। অভাব-অনটন, অপমান-অসম্মান সব কিছু থেকে মুক্তি পেতে গেলে তাড়ির ভাঁড়ের আশ্রয় সে নেয়। কিন্তু আদিবাসীদের মদ্যপান তাদের জীবনপ্রাচুর্যের অভিব্যক্তি। কোনও কিছু জোর করে ভোলার প্রয়োজন তার নেই। সুতরাং মাদক দ্রব্য বর্জন সম্বন্ধে আদিবাসী সমাজে প্রচার করার আগে অসহিষ্ণু সমাজ সংস্কারকের দলকে এসব কথা ভেবে দেখতে হবে। শুধু মাদক দ্রব্য নয়, তাদের জীবনের যে স্বাভাবিক আনন্দের উৎস আছে, বিভিন্নভাবে তাকে রুদ্ধ করতে সভ্যমানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। সীমিত পরিধানে যে অপূর্ব বর্ণসমারোহ তাদের দেহসৌষ্ঠবকে রূপায়িত করে তাকে বর্জন করে মিলের আটপৌরে ব্লাউজ সাড়ি না পরালে আমাদের সংকীর্ণ শালীনতাবোধ তুষ্ট হয় না। তেমনি তাদের যুবক-যুবতীর মিলিত নৃত্য আমাদের জরাগ্রস্ত নীতি-বোধের কাছে অসহনীয়। সভ্য মানুষের অসুস্থ সামাজিক মান আদিবাসী সমাজের উপর চাপিয়ে দিলে তাতে বিপর্যয় হয়, প্রগতি হয় না।

ফটো—সুনীল জানা

চিত্র প্রদর্শনী

॥ কলকাতা ॥

ওভার দি স্নো

গত সপ্তাহে শিল্পী কমল চৌধুরীর একটি একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ। এটি এ'র প্রথম একক প্রদর্শনী। কমল চৌধুরী গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর একজন কৃতি প্রাক্তন ছাত্র। ছাত্রাবস্থা থেকেই ভারতের বড় বড় চিত্র প্রদর্শনীতে এ'র ছবি স্থান পেয়েছে এবং যথেষ্ট প্রশংসিতও হয়েছে। সম্প্রতি ইনি হিমালয় অভিযানে বেরিয়েছিলেন সমগোত্রী তিনজন বন্ধুর সঙ্গে এবং কেদারবদ্রী হয়ে আনুমানিক ১৭ হাজার ফিট পর্যন্ত আরোহণ করেছিলেন। এখানকার বেশীরভাগ ছবি এই অভিযানেরই প্রতিফলন। জলরঙে সংক্ষিপ্ত নক্সা করে এনে পরে ইনি সেগুলিকে বড় তৈল চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন; সুতরাং এগুলিকে নিছক প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি বলা যায় না—এগুলি শিল্পীর স্বকীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি। হিমালয়ের দৃশ্যাদি ছাড়া শহর, শহরতলি, প্রতিকৃতি, জাহাজ, স্টিল লাইফ প্রভৃতি বিষয়বস্তুরও কিছু কিছু ছবি প্রদর্শন করা হয়। সবসমেত ৬০ খানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।

আধুনিকপন্থী ইনি একেবারেই নন। যা দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন সেইটুকুই প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশে এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা কিছুমাত্র না বুঝে 'আধুনিক' বিদেশী ছবি অনুকরণ করেই মস্ত বড় বড় 'আধুনিক' পন্থী হয়ে বসে আছেন। এ'রা কখনও বা মদিগ্লিয়ানি, কখনও বা চাগাল, কখনও বা মাতীজ-এর রূপ ধারণ করেন। কিন্তু মদিগ্লিয়ানি, চাগাল, মাতীজ প্রভৃতি চিত্রকরগণের চিত্রকলা একান্ত ভাবে এ'দের ব্যক্তিগত ভাবধারারই প্রতীক। এক সময় এ'রা সকলেই প্রথাগত ধারায় ছবি এ'কেছেন। কিন্তু বাস্তব জগৎধর্মী গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার মত অতি সাধারণ শ্রেণীর স্রষ্টা এ'রা নন—এ'রা এককেটি বিরাট প্রতিভা এবং কি কাব্যে, কি সংগীতে, কি চিত্রে প্রতিভা মাত্রেরই রচনা একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। সুতরাং এ'দের ব্যক্তি মানসের প্রতিফলন অন্যে অনুকরণ করলে সে ছবিকে সমর্থন করার কোনও যুক্তি আছে কি? কমল চৌধুরী এধরনের 'আধুনিকতা' করে দর্শককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেননি। ইনি উচ্চাভিলাসী বটে; কিন্তু ক্ষমতার অতিরিক্ত করতে যাননি।

'ক্লাউডস অ্যাণ্ড স্নো' বা 'আওয়ার এক্সপিডিশন' ছবিতে নীলাভ শাদা রঙে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়া ফুটে উঠেছে অনুভূতিপ্রবণ দর্শক মাত্রেই তা স্পর্শ করেছেন নিশ্চয়। ১৭।১৮ হাজার ফিট উপরে জমাট বরফের উপর চলাফেরা করা যে কি ক্লেশকর তা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে ছবির মধ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য মূর্তির ভঙ্গিমা থেকে। কাব্যময় তুলির টানটোনে বেশ মুনশিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। তবে কম্পোজিশন একটু ফটোগ্রাফ ঘেঁষা ঠেকলো। তৈলচিত্রগুলির মধ্যে 'হিমালয়ান লেক', 'টিবেটান ট্রেডার্স', 'ওয়ে টু বদ্রীনাথ'

হিমালয়ান ইয়াকস

হিমালয়ান ইয়াকস', 'গড়ুর গঙ্গা' 'টেহেরী াড়ওয়াল রোড' এবং 'ক্যালকাটা সাবার্ব' বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষণ করে বর্ণ নির্বাচন, ন্যাস এবং সংস্থাপনের জন্য। প্রতি-তিগুলিতে শিল্পীর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের কানও ছাপ লক্ষ্য করা গেল না। 'স্টিল াইফ' বা প্রতিকৃতি অংকন এ'র পথ নয়, ্যান্ডস্কেপ চিত্রণই হল এ'র প্রকৃত পথ। শিল্পী নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন যে দ্ধ আবহাওয়া অপেক্ষা মুক্তবাতাসে চিত্রাংকনেই ইনি স্ফূর্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন বেশী।

জল রঙের ছবির মধ্যে 'নকচুরনাল' এবং 'চাইনিজ কলোনী ইন ক্যালকাটা' বচেয়ে আকর্ষণীয়। এ'র দোষের মধ্যে দখলাম ত্রুটিপূর্ণ 'অ্যানাটমি'। ভবিষ্যতে । বিষয় একটু সতর্ক হলে ছবিগুলি বাঙ্গসুন্দর হতে পারে। পেন অ্যান্ড ংক স্কেচগুলি প্রদর্শিত না হলেই ভাল 'ত।

ইনি 'উগান্ডা এডুকেশন সার্ভিস'-এ ারু ও কারু কলার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে-ছেন। শীঘ্রই আফ্রিকা রওনা হচ্ছেন। নকট ভবিষ্যতে তাঁর চিত্রকলা দেখার সুযোগ হবে না, তবে সুদূর ভবিষ্যতে াতাই অভিনব কিছু দেখার আশায় ইলাম। আমরা একান্তভাবে এ'র শুভ-কামনা করি। —চিত্রগ্রীব

চীন

॥ দিল্লী ॥

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে যতগুলি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক পুতুল প্রদর্শনী অন্যতম বলিলেও চলে। এই প্রদর্শনীটি শংকরস উইক্‌লির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ও রাজধানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী ও দূত মহোদয়গণের উপস্থিতিতে স্বয়ং শ্রীজওহরলাল নেহরু ইস্টার্ন কোর্টে ইহার উদ্বোধন করেন। আফ্রিকা, বেলজিয়ম, ক্যানাডা, চীন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, নরওয়ে, মেক্সিকো প্রমুখ পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি দেশ হইতে ন্যূনপক্ষে ১৫০০ শত নানাজাতীয় পুতুল এই প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়—অবশ্য ভারতবর্ষ ত' আছেই।

সব দিক দিয়া বিচার করিলে এই প্রদর্শনীর নূতনত্ব সত্যই সকলকে অভিভূত করে। সকলেই দেখিয়াছেন ছোট ছোট মেয়েরা গৃহের এককোণে, যতদূর সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে, আপনাপন পুতুল রাজ্য গড়িয়া তোলে। মাটি হইতে আরম্ভ করিয়া কাষ্ঠ ও কাপড়ে তৈয়ারী নানা আকারের পুতুল এখানে শোভা পায় ও আমাদেরই বাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা গভীর 'অপত্যস্নেহে' এগুলিকে 'লালন পালন' করে এমন কি তাহাদের অন্যান্য সঙ্গিনীদের পুতুলের সহিত 'বিবাহ' হইতে আরম্ভ করিয়া নানা সামাজিক আচারানুষ্ঠানেরও আদান-প্রদান করিয়া থাকে। নিছক বালিকাসুলভ এহেন উৎসবগুলিকে আমরা কোনোদিনই বিশেষ মূল্য দিই নাই। কিন্তু এহেন পুতুল-রাজ্যই যে কি বিরাট ও ব্যাপক হইতে পারে তাহা এই প্রদর্শনী না দেখিলে সঠিক উপলব্ধি করা যায় না।

জাপান

প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিবামাত্রই এক বিচিত্র রসে সারা দেহমন যেন অভিষিক্ত হইয়া উঠে। হলের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমআকারের বাক্সের মধ্যে রক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানা আকারের পুতুলগুলি দেখিলে মনে হয় বুঝি বা স্বপ্নরাজ্যের কোন এক বিচিত্র দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্নিগ্ধ হাস্যের ইন্দ্রজাল ছড়াইয়া কোনো নিষ্পাপ শিশু আবেগভরে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল কোনো বালিকা তাহার দেশের বিশিষ্ট কারুকার্য-শোভিত পোশাক পরিধান করিয়া আপনার মনে নৃত্য করিতেছে, আবার কোথাও বা আপাদ-মস্তক পশুলোম-পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া কোনো এস্কিমো শিশু কেবলমাত্র সুপুষ্ট মুখখানি বাহির করিয়া জগতের অন্যান্য শিশুদের প্রতি পরম কৌতূহলভরে চাহিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে কোনো ঐন্দ্রজালিকের বিচিত্র মায়াবলে যেন সমগ্র জগতের শিশু, নরনারী ও নানা বেশভূষা এই প্রদর্শনীকক্ষে একত্র গ্রথিত হইয়া এক অপূর্ব ও অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে।

পুতুল সাহায্যে গঠিত হইলেও প্রকৃত-পক্ষে ইহাকে কেবল পুতুল প্রদর্শনী বলিলে বোধ করি ভুল হইবে। কারণ পুতুল মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের প্রতীক থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া আমরা সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন নরনারী, তাহাদের দেশাচার, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রার পরিচয় পাই। দেশের বাহিরে যাওয়া কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে —সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সুতরাং প্রদর্শনীটি কয়েকবার প্রদর্শন করিলেই সমগ্র পৃথিবীর সহিত যেন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জীবন গ্রথিত হইয়া যায়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রত্যেক দেশের পুতুলের মধ্য দিয়া সেই জাতির চরিত্রগত বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তুরস্ক-দেশের বাদকদল আপনাপন বাদ্যযন্ত্র লইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে, অতি মনোরম পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া হাঙ্গেরীর বালিকাদল চরখায় পশম কাটিতেছে, দূর দেশ হইতে চীন রমণীদল ছাগশিশু বহন করিয়া চলিয়াছে, জাপানী নারীদল অতি প্রাচীন চা-পান উৎসবের অনুষ্ঠান

আমেরিকা

করিতেছে, নরওয়েবাসী ধীবরগণ বিশিষ্ট প্রথায় জাল শুকাইতেছে। এককথায় নানা দেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতি সরল ও স্বাভাবিক চিত্র এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সর্বপ্রথমেই চীন ও জাপানের পুতুল-গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গজদন্ত, পোরসিলেন, মাটি, ময়দা, কাষ্ঠ ও প্লাস্টার মাধ্যমে তৈয়ারী নানা পুতুল এই বিভাগে দেখা যায় তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে গঠিত 'কামলু টেম্পল' (পিকিং অপেরা)-এর দৃশ্য, ইয়াকো নৃত্য ও ঢোল

বাদ্য অপূর্ব। সুরুচিসম্মত নানা মৌলি শিল্পের জন্য জাপান সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সুতরাং প্রকাশভঙ্গিমার নূতনত্ব পরিচ্ছদের বর্ণবাহুল্যের জন্য জাপানে পুতুলগুলি বার বার দেখিতে ইচ্ছা কর চীনের ন্যায় জাপানের পুতুলগুলিও না বিষয় অবলম্বনে গঠিত এবং প্রাচীন চা-প উৎসব, ঋতু উপযোগী পুষ্পসমারোহ দেশের নৃত্য ও নাট্যকলার নানা অপর নিদর্শন এই বিভাগের মধ্যে চোখে পড়ে জাতীয় নাটকের স্ত্রী-চরিত্র 'ইয়ালগা হিমে', চা-পান উৎসবে মহিলা (ফুকু
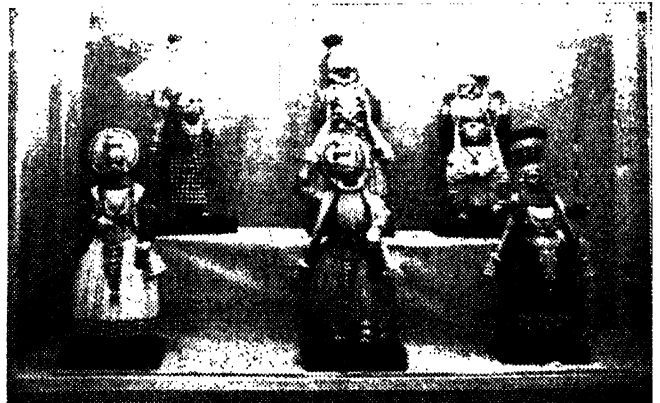
কথাকলি
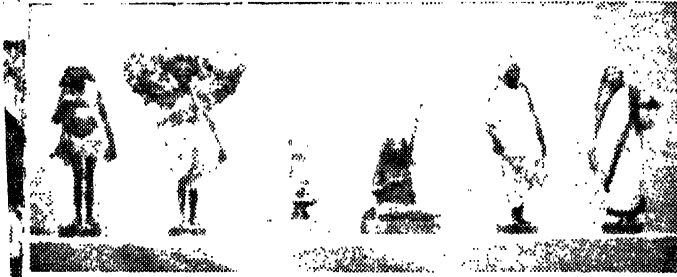
ভারতবর্ষ

বাকি) বর্ণ বহুল পোশাক পরিহিত শিশু নর্তক 'কামুরো', পুষ্প স্তবক হস্তে বালিকা (ফুজি মুসুমে) পশমে তৈয়ারী 'এসো আমরা খেলি' ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাষ্ঠনির্মিত বিভিন্ন যুগের নরনারীর মুখমণ্ডলের নমুনা আফ্রিকার পুতুলের মধ্যে দেখা যায় তবে এই বিভাগে নানা প্রতীক সমন্বিত একটি বালক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশর দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন সুতরাং এই দেশের নিদর্শনের মধ্যে 'সির্গার কুমারী' (কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ আবৃত) ও জাতীয় বর্ণবহুল ঘাগরা পরিহিত এক রমণী মূর্তির মধ্য দিয়া ফ্যারাওয়ের সমকালীন পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রান্সের পোর্ট আভেন (ব্রটানি)-এর নারী, জার্মানীর ব্যাভেরীয় মহিলা ও শিকারী, হলাণ্ডের 'ওয়ালচেরেন বালিকা', হংকঙের নীল-পোশাক পরিহিত কৃষক, হাঙ্গেরীর নারীদের সুবিখ্যাত লোকনৃত্যে, পুতুলের মধ্য দিয়া মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র বিন্যাসে ইন্দোনেশীয়ার কয়েকটি নমুনা, রঙীন পশমী-ঘাগরা শোভিত আইরিশ যুবতী, পালকের পোশাকে আচ্ছাদিত মেক্সিকোর নর্তক, কাপড়ে তৈয়ারী নেপালী পুতুল, জাকোপেন পোশাকে আবৃত পোল্যাণ্ডের কাঠুরিয়া, সিরিয়ার নববধূ, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত মহিলা, আমেরিকার কুমারী, রাশিয়ার নেনেজ অঞ্চলের বালিকা দল ও যুগোশ্লেভিয়ার ম্যাসিডোনিয় বালিকা উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত চলন্ত ও কাঁদুনে পুতুল এবং বৃহদাকারে গঠিত শিশুদের পার্ক-এরও নাম করা যায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মনোনীত বহু নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে দেখা যায়। তবে দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশ হইতে অতি অল্প পুতুলই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। দেশের বিভিন্ন বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া গঠিত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত উচ্চাঙ্গের পুতুলের জন্য কৃষ্ণনগর সমধিক খ্যাত, অথচ সেই তুলনায় এই প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের কয়েকটি সামান্য নমুনাই দেখিতে পাইলাম। এই বিভাগের মধ্যে তিরুপাঠির পুতুল, মণিপুরী নর্তকী, কোণ্ডাপল্লীর হাতী, বৈষ্ণব, কলসী-কাঁখে বঙ্গনারী, পূজারী, নাগা দম্পতি ও কথাকলি নৃত্যের বিভিন্ন পাত্রপাত্রী উল্লেখযোগ্য। আরও একটি অংশ বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেখানে সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যখানির বিভিন্ন অধ্যায় ছোট ছোট পুতুলের মধ্য দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রুচি ও কল্পনার দিক দিয়া এই অবদানটুকু সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। কারণ রামায়ণ-প্রণেতা গোস্বামী তুলসীদাসের রামায়ণ লেখন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, বিবাহ, বনবাস, সীতার উদ্ধার, রাবণ বধ ও শেষ পর্যন্ত অযোধ্যায় পুনরাগমন পর্যন্ত ছোট ছোট পুতুলের মধ্য দিয়া অতি সুন্দর ও সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি কৃষ্টি জগতে এই পুতুল প্রদর্শনী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং প্রায় প্রতিদিনই এই প্রদর্শনীতে প্রচুর বালক-বালিকা এমন কি বয়স্ক ব্যক্তিবর্গেরও সমাগম হইয়াছে। ভারতের মধ্যে ও বাহিরে বিভিন্ন দূতাবাস এই প্রদর্শনীটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রদর্শনী বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হইবে ও পরে ইহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পুতুলই দিল্লীতে শিশুদের জন্য গঠিত একটি স্থায়ী 'পুতুল যাদুঘরে' রক্ষিত হইবে।

—চিত্রপ্রিয়

॥ বোম্বাই ॥

বোম্বাইয়ের চিত্র-শিল্পীদের সাম্প্রতিক কয়েকটি একঘেয়ে প্রদর্শনীর মধ্যে বেশ খানিকটা বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রমের আস্বাদ পেলাম শ্রীঅভয় খাটাউ-এর চিত্র-প্রদর্শনীতে। প্রায় নয় বছর বাদে শ্রীখাটাউএর এই চিত্র-প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করলেন ডাঃ মুল্‌করাজ আনন্দ, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে। বিগত ১৫ বছরে আঁকা ৯২টি রচনা ছিল এই প্রদর্শনীতে।

শ্রীখাটাউ খুব অল্প বয়সেই সহজাত শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, সাধারণ কোনপ্রকার শিল্প-শিক্ষা ব্যতীত। প্রধানত এই শিল্পীকে 'বর্ণবিলাসী শিল্পী' বলা চলে এবং এই রঙের খেলায় তিনি সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র ও ব্যক্তিগত ফ্যান্টাসি। শহরের ছোটদের চিত্রকলার প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীপুলিন দত্তর তত্ত্বাবধানে দশ বছর আগেকার 'চাইল্ড প্রডিজি'কে এই প্রদর্শনীতে দেখলাম, একজন পরিণত শিল্পীরূপে, সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যক্তিত্বে প্রতিভাত হয়ে। শ্রীপুলিন দত্ত শিল্প-শিক্ষায় ছাত্র-

ছাত্রীদের যে অবাধ স্বাধীনতা দেন, তাঁদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলবার জন্য, তার সুপরিচয় পাওয়া যায় অভয় খাটাউ-এর ছবিতে। আপন খেয়ালে শিল্পী ছবি এঁকেছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্ত করেছেন নিজের স্বপ্ন-রাজ্যকে মনের আনন্দে। একান্ত নিজস্ব ধরনে আঁকা তাঁর ছবিগুলিকে কোনপ্রকার শিল্প-শৈলীর অন্তর্গত করা যায় না। আবার খুঁজলে, বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন দেশের বা শিল্পীর প্রভাবও লক্ষ্য করা যেতে পারে:—মিশরীয়, জাপানী, নন্দলাল, যামিনী রায় এই রকম আরও কত। কয়েকটি ছবির সঙ্গে আবার তুলনা চলতে পারে পণ্ডিচেরীর কবি নিশিকান্তের আঁকা পূর্বেকার ছবিগুলির সহিত। এইসব কারণেই খাটাউএর প্রত্যেকটি ছবির বৈচিত্র্য দর্শককে আকৃষ্ট করে। প্রাণের ও কল্পনার আবেগ তাঁর ছবিতে এনে দিয়েছে সজীবতা, বলিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা। রঙের খেলায় ও রেখার জোরালো টানে বিস্তার করেছেন নিজের কল্পনার ইন্দ্রজাল।

শ্রীখাটাউ বাল্যাবস্থায় চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যান। সেখানে পরিচিত হন ইউরোপীয় শিল্পকলা ও "অপেরা"র সাথে। অথচ তাঁর ছবিতে পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার প্রভাব নেই, যদিও ফরাসী, অস্ট্রিয়ান ও ইটালীয়ান অপেরা তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনে খুবই রেখাপাত করে। অপেরার বিষয়বস্তু তাঁর বহু ছবির প্রেরণা যোগায় এবং এই ছবিগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক, যেমন বিখ্যাত অপেরা 'আইডা', 'কারমেন', 'মাদাম বাটার-ফ্লাই' প্রভৃতির ছবি কয়টি। এগুলি বিভিন্ন মোটিফএ আঁকা। কোনটি মিশরীয়, কোনটা জাপানী বা ইন্দো-নেশীয় কিংবা ভারতীয়। ইউরোপকেও শিল্পী দেখেছেন একেবারে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে। সেইজন্যই বোধ হয় বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় শিল্প সমালোচক তাঁর "নাইট ক্লাব ইন প্যারিস" ছবিটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, "ইয়েস, নাইট ক্লাব ইন প্যারিস, বাট ট্যু মাচ অব ইণ্ডিয়া ইন ইট।" এই ছবিটি ও "ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেসান থ্রু এজেস" (৪৬, ৪৭

নরমা (অপেরা) —অভয় খাটাউ

নং) রীতিমত শ্লেষাত্মক রচনা বলা চলতে পারে।

১৯৪৯ সালে রোমে শ্রীখাটাউয়ের চিত্র-প্রদর্শনী দেখে প্রফেসর টুচি বলে-ছিলেন—

"Here you come across a mystical world, into an India which faces the West and not any more withdrawn within itself, open to new movements: curious not because of ancient forms, but because of the bold and fresh ones . . . ."

* * *

ওই একই দিনে আর্ট গ্যালারীর অপর পার্শ্বের হলে বিখ্যাত আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীআর ভরদ্বাজএর "হিমালয়ের দৃশ্য ও ফুল" শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন স্যার কাওয়াসজী। কিছুদিন আগে ভরদ্বাজ হিমালয় পরিভ্রমণে যান এবং ভ্রমণকালে সাদা-কালো এবং রঙীন প্রায় সহস্র ছবি তোলেন হিমালয়ের। ইদানীং বোম্বাই অধিবাসী পাঞ্জাবের শ্রীভরদ্বাজ পূর্বে ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী এবং সেইজন্যই তাঁর আলোকচিত্রে শিল্পীমন ও শিল্প-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতি, মেঘ, রোদ, পাহাড়, গাছপালা, ফুল, আলোছায়ার খেলাই হচ্ছে তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা। প্রদর্শনীতে সাদা-কালো ছবিই টাঙানো হয়েছিলো, কিন্তু উদ্বোধন-রজনীতে হিমালয়ের রঙীন ছবিগুলি পর্দায় ফেলে দর্শকদের দেখান এবং বুঝিয়ে দেন। হিমালয়ের উদাত্ত মহিমা তাঁর আলোকচিত্রে সুন্দর, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছিল এবং এই কারণেই অন্যান্য আলোকচিত্রের প্রদর্শনীর ছবির মত সাজানো-গোছানো অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। রঙীন ছবিগুলিতে হিমালয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে আলোছায়া ও রঙের খেলা, গম্ভীর 'মুড্' ভালভাবেই ধরা দিয়েছে। প্রদর্শনীর আলোকচিত্র শ্রীভরদ্বাজকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র-শিল্পী বলে প্রমাণিত করে।

—চিত্রসেন।

শার্ঙ্গদেব

আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যখন স্বরলিপির সৃষ্টি হ'ল তখন স্বরলিপি সম্বন্ধে অনেকেরই উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছিল এবং অনেক স্বরলিপির বইও বেরিয়েছিল। অবশ্য পদ্ধতি একরকমেরই নয় অনেকরকম স্বরলিপির পদ্ধতি আমাদের ছিল এবং এক সময় এইসব পদ্ধতির বৈষম্য নিয়ে ঝগড়াঝাঁটিও যে না হয়েছে তা নয়, তথাপি যাঁর যে রকম মত সে অনুযায়ী পরিশ্রম করে অনেকেই স্বরলিপি করে গিয়েছেন। আকার মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবনের পরে অপরাপর পদ্ধতিগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে এসেছে; কিন্তু এর পাশাপাশি দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি কিছুকাল চলে এসেছিল। তারপরে স্বরলিপি সম্বন্ধে আমাদের ক্রমেই যেন উৎসাহের অভাব দেখা দিয়েছে। আজকাল এত গান-বাজনার প্রসার হয়েছে; কিন্তু সেই অনুপাতে স্বরলিপির বই নেহাৎ কম বলেই মনে হয়। তারপরে যাও বা বেরোয় তাতে নিষ্ঠার সংগে কোন একটি পদ্ধতির সংগে মিল রেখে স্বরলিপি করা হচ্ছে বলে মনে হয় না—নানারকম পদ্ধতি মিশিয়ে এমন একটা জিনিস তৈরি হয় যাতে অনেক সময় স্বরলিপিকারের এবিষয়ে জ্ঞানের অভাব সূচিত হয়। এইসব নানা কারণে স্বরলিপি সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছুটা সাবধান হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

গোড়ায় যেসব স্বরলিপির প্রচলন হয়েছিল তার কোনটিরই অস্তিত্ব আজকাল নেই। কসিমাত্রিক, সাংখ্যমাত্রিক লোপ পেয়েছে, কৃষ্ণধনবাবুর রৈখিক, tonic sulphaও চলেনি। দণ্ডমাত্রিক চলেছিল কিছুকাল মন্দ নয়, তারপরে আকারমাত্রিকেরই প্রাধান্য এখনো পর্যন্ত বজায় আছে। বস্তুত সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে আকারমাত্রিক হচ্ছে সবচেয়ে স্পষ্ট, সহজ এবং বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি। যে কোন গানের সুর এবং পদ্ধতি এই স্বরলিপিতে ছবির মত স্পষ্ট করে ফোটান যায়। এই আকারমাত্রিক স্বরলিপি আগে আরও একটু ব্যাপক ছিল—আমরা আজকাল কিছুটা সংক্ষেপ করে নিয়েছি। উদাহরণস্বরূপ স্বরলিপিগীতিমালায় উল্লিখিত লয়াঙ্কের উল্লেখ করা যায়। এই লয়াঙ্ক-নির্দেশে গানের গতি অতি-বিলম্বিত থেকে অতি দ্রুত পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝানো যেত আজকালকার স্বরলিপিতে এই চিহ্নটি আর থাকে না তার বদলে "বিলম্বিত লয়ে গেয়", "দ্রুত লয়ে গেয়" —এইরকমের নির্দেশ থাকে। এতে কিন্তু উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না সুতরাং লয় সম্বন্ধে নির্দেশ আরও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।

সম্প্রতি আবার আকারমাত্রিকের সংগে ভাতখণ্ডের পদ্ধতির মিশ্রণ আনবার একটা চেষ্টা চলেছে দেখতে পাচ্ছি। এই প্রচেষ্টায় যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁরা প্রধানত হিন্দী খেয়াল-ঠুংরী শিখে বাংলা রাগপ্রধান গানে সুর-সংযোজনায় রতী হয়েছেন। বাংলা-গানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে এঁদের স্পষ্ট ধারণা নেই তা তাঁদের সুর-সংযোজনা এবং স্বর্লিপির কায়দা থেকেই পরিস্কার বোঝা যায়। আকার-মাত্রিক সম্বন্ধে তেমন অভ্যাস বা পরিচয় থাকলে তাঁরা এই খিচুড়ি পাকাতে চেষ্টা করতেন না নিশ্চয়ই। ভাতখণ্ডের পদ্ধতি আসলে খুব সাধারণ ব্যাপার, কেবলমাত্র একটা গানের কাঠামোটা ধরে রাখবার জন্য যতটুকু দরকার সেভাবেই এই স্বরলিপি করা হয়েছে। কিন্তু আকার-মাত্রিক তো শুধু সেটুকুই নয়, কাব্য-সংগীতের অনেক কিছু সূক্ষ্মজিনিসও এই পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা যায়। অতএব এমন উৎকৃষ্ট পদ্ধতিকে পুরোপুরি গ্রহণ না করে কেন যে কসিমাত্রিক ভাতখণ্ডে পদ্ধতির প্রচারে এঁরা এতটা উৎসাহী হয়ে উঠেছেন জানি না। উক্ত পদ্ধতি যদি আমাদের প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'ত তাহলে সেটা অবশ্য গ্রাহ্য হ'ত কিন্তু তা যখন নয় তখন আমাদের নিজস্ব পদ্ধতির প্রতি এই অবহেলা স্বরলিপিকারের অজ্ঞতার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে তাঁদের উচিত নিজেদের উন্নততর স্বরলিপির প্রতি আস্থাবান হয়ে প্রকৃত বাংলাগান ভালভাবে শিক্ষা করা। তথাকথিত রাগপ্রধান গানে সুর-প্রয়োগের পূর্বে বাংলা গান এবং বাংলার স্বরলিপি পদ্ধতির সংগে পরিচয় গভীরতর হওয়া আবশ্যক।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি সম্পূর্ণভাবে করতে জানা যেমন দরকার তেমনি প্রয়োজনীয় কর্তব্য হচ্ছে প্রাচীন বিভিন্ন স্বরলিপিতে লিখিত ভাল ভাল গানকে আকারমাত্রিকে পুনর্মুদ্রণ। শুধু গানই নয় সংগীতের বৈজ্ঞানিক আলোচনাও দণ্ড-মাত্রিক স্বরলিপিতে আছে। উদাহরণ-স্বরূপ দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত "রাগের গঠন শিক্ষা" নামক উত্তম পুস্তকটির উল্লেখ করা যায়। রাগের রূপ সম্বন্ধে এমন

বশ্লেষণ এবং আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ বাংলায় (শুধু বাংলায় কেন ভারতীয় সঙ্গীতে) আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। তিনি একশ' সাতটি রাগের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন; কিন্তু প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন মাত্র বত্রিশটি রাগের গঠন প্রণালী। অবসরের অভাবে অবশিষ্ট রাগগুলির গঠনপ্রণালীর পাণ্ডুলিপিও তিনি রেখে যেতে পারেননি। এই গ্রন্থে কুকুভ, ঝুম, খাম্বাজ, গারা, ঝিঁঝিট, পাহাড়ী প্রভৃতি এমন কতকগুলি রাগের পরিচয় পাওয়া আছে যেগুলি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশেষ প্রিয় ছিল, এখন আর বাংলায় তেমন শোনা যায় না। যে খাম্বাজ রাগে একদা বহু উত্তম বাংলা গান রচিত হয়েছে আজকাল সেই রাগটিই শোনা যায় কদাচিত। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ থেকে এইসব রাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য আহরণ করতে পারেন। দুঃখের বিষয় গ্রন্থটি আজকাল দুর্লভ হয়ে পড়েছে। আমাদের সঙ্গীতশিল্প সংরক্ষণ প্রসঙ্গে এটির পুনর্মুদ্রণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয়ের আর একটি উৎকৃষ্ট স্বরলিপি গ্রন্থ হচ্ছে "হারমোনিয়মে গান শিক্ষা"। এটিও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে রচিত। এতে প্রাচীন কবি, গিরীশ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেকের গানের সুর রক্ষিত হয়েছে। এইরকম আর একখানি গ্রন্থ "গীত-বাদ্য-সোপান"—এতে প্রচুর গানগুলির স্বরলিপি করেছেন দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়। তিনি কৃষ্ণধনবাবুর রীতি অবলম্বন করেছেন। এই বইটিতেও অনেক পুরোনো নাট্যসঙ্গীত রয়েছে যেগুলি থেকে সেকালকার সরল অথচ সুন্দর রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত নাট্যসঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য কেননা কাব্যসঙ্গীতের বিকাশে সেকালের নাট্যসঙ্গীতের দান স্বল্প নয়। গিরীশ ঘোষের বহু গানে অনেক নতুন রীতি অবলম্বিত হয়েছে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এসব গান হয়তো অনেকের রুচির সঙ্গে মিলবে না; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় কাব্যসঙ্গীতের বিবর্তনে এইসব নাটকের গানের মূল্য নেহাৎ কম নয়। নানাকারণে এইসব গানের স্বরলিপি রক্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নাট্যসঙ্গীতে শুধু লঘুসঙ্গীতই রচিত হয়নি বহু উচ্চাঙ্গের গানও রচিত হয়েছে। ধ্রুপদ ধামার থেকে আড়-খেমটা পর্যন্ত নানাধরনের গান আমাদের নাট্যসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এইসব অনেক গানের স্বরলিপি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে সেগুলি একসঙ্গে সংগ্রহ করলে নাট্যসঙ্গীতে আমাদের কাব্যসঙ্গীতের কতখানি উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে সেটা বোঝা যাবে।

সেকালের "সঙ্গীতপ্রকাশিকা"য় নানা ধরনের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব স্বরলিপি অনুসন্ধান করে দেখলে আমাদের অব্যবহিত পূর্বযুগের কাব্যসঙ্গীতের রূপ কি রকম ছিল সেটা বোঝা সহজ হবে।

সেকালের কাব্যসংগীতের কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় স্বরলিপি গীতিমালার তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত গানগুলিতে। "নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি" বা "কেনই বা ভুলিব তোমায় কে ভোলে হৃদয় ধনে"—এই ধরনের গানগুলিতে সেযুগের একটা বিশিষ্ট রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গানগুলি ঠিক টিপ্পা নয় অথচ টপ্পার রেশ রয়েছে—টপ্পার যুগের পরে কাব্যসংগীতে যে সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তারই প্রভাবে এইসব গান রচিত হয়েছে। সাংখ্যমাত্রিক "শতগান" নামক স্বরলিপিগ্রন্থেও এই ধরনের কিছু গান আছে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলি থেকে যেসব পুরোনো স্বরলিপির বই অনাদরে অবহেলায় দোকানে বা বহু ব্যক্তির কাছে পড়ে আছে সেগুলির মূল্য কতখানি সেটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সব পুরোনো বই-থেকে সাঙ্গীতিক মূল্যসম্পন্ন গান-গুলি বেছে নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে, তারপরে সেইসব স্বরলিপিকে সরলতর অর্থাৎ আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে পরিবর্তিত করে টীকা-টিপ্পনী এবং ভূমিকা সহযোগে সুসম্পাদিত করতে হবে। এই কাজটি নেহাৎ সামান্যও নয় এবং সহজ-সাধ্যও নয়। নির্দেশটা এক লাইনে লিখে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু বাংলা গান সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক পরিচয় না থাকলে একাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সমস্ত পুরোনো স্বরলিপির বই একত্র করাও তো কম অধ্যবসায়ের ব্যাপার নয়। বিশ্বভারতী বর্তমানে কেবলমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারে যেরকম ধারা অবলম্বন করেছেন, সমগ্র বাংলা গানের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ আরও পরিশ্রম করে করতে হবে নতুবা ফল খুব সন্তোষজনক হবার আশা কম। এই অতিশয় ব্যাপক কাজটি দুঃসাধ্য হলেও অন্তত নানা গ্রন্থ থেকে সংকলন করে এমন একটি স্বরলিপি সংগ্রহ প্রকাশ করা দরকার যাতে আমাদের বাংলা গানের বিবর্তনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরকম প্রচেষ্টার আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—সেটি হচ্ছে সাধারণের মধ্যে আমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত করা। বাংলা গান যে ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হয়েছে সেটা যেন আমাদের ধারণাতেই আসে না এবং এই কারণেই যিনি যেটুকু গান শিখেছেন তিনি মনে করছেন বাংলা গানে সেটুকুই বিশেষ সৃষ্টি তার তুলনা আর অন্য কোন রচনায় মেলে না। এই অজ্ঞ শিক্ষার প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার আর তারই জন্য এইসব লুপ্ত স্বরলিপির পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন।

এর মধ্যে আবার আরও এক কঠিন সমস্যা আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, স্বর-লিপি উদ্ধার হলেও তার গায়কীটাও জানা দরকার। অনেক টপ্পা ধরনের গান আছে যার একটা কাঠামো করে দেওয়া আছে স্বরলিপিতে। আড়ষ্ট ভঙ্গীতে স্বরলিপি দেখে দেখে এগানগুলি তুললে তার কোন বৈশিষ্ট্যই থাকবে না। এই কারণে নানা গানের বিশেষ গায়ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়াও দরকার। পরিশ্রম করে আমাদের সেগুলিও জেনে নিতে হবে।

আর একটি মহদুদ্দেশ্য এতে সাধিত হবে—সেটি হচ্ছে স্বরলিপির একটা Standardisation বা মান-নির্ধারণ। আকারমাত্রিক স্বরলিপি তো সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেই; কিন্তু বহু স্বল্প-অভিজ্ঞ স্বর-লিপিকার এই পদ্ধতিটি সমগ্রভাবে শিক্ষা করেননি। ব্যাপকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির স্বরলিপিগুলি আকার মাত্রিকে পরিবর্তিত হতে থাকলে অনেকেই এই পদ্ধতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতে পারবেন এবং ক্রমেই আকারমাত্রিক স্বরলিপি নিখুঁত হয়ে উঠবে।

যাই হোক, এই যে একটা বিরাট কাজের উল্লেখ করা গেল এইটি কতখানি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হতে পারে বলা শক্ত। মহামান্য সরকার বাহাদুর এবিষয়ে সাহায্য করলে কাজটা সহজেই অগ্রসর হতে পারে। খুব ধুমধাম করে তো পশ্চিমবঙ্গীয় সঙ্গীত একাডেমী নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভ সূচিত হয়েছে। শুনতে পাচ্ছি আসলে সেটি নাকি একটি ইস্কুল ছাড়া আর বিশেষ কিছু হবে না এবং ফুলোকে বলছে সেটাও শেষ পর্যন্ত হলে হয়। আমরা কিন্তু এসব রটনায় আস্থাবান নই—আমরা একাডেমীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি, এই ধরনের কাজে হাত দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টামণ্ডলী আসল একাডেমীত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করবেন। পাঠশালা খুলুন, সে তো ভাল কথা—রাখাল, গোপাল, কানাই, পটল সবাই আসবে। ছাত্রদের অভাব আমাদের দেশে আদৌ নেই।

আসরের খবর

গত শনিবার, ১৬ই বৈশাখ ৮, জগন্নাথ সুর লেনে "ঘরোয়া" সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক লোকসংগীতের একটি মনোরম অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আউল, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, সারি, গাজী প্রভৃতি নানা পর্যায়ের লোকগীতি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে গাওয়া হয়। মহিলা শিল্পীদের "বৌনাচ" ও "ধামাই" অনুষ্ঠানটিও বেশ উপভোগ্য হয়েছে। কলকাতার নাগরিক মুখরতায় এইসব বিভিন্ন লোকগীতি একটি স্নিগ্ধ বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

পৃথিবীর সব জায়গায় প্রাণীরা বসবাস করে [illegible] সাধারণভাবে আমরা জলে, স্থলে, বাতাসে এদের দেখতে পাই কিন্তু এমন সব প্রাণী আছে যারা অসাধারণ অবস্থায়ও জীবন ধারণ করতে পারে। মেরু প্রদেশে সমুদ্রের জল প্রায় সব সময় শক্ত বরফের আকারে জমে থাকে। এই সব বরফের নিচে দু জাতের চিংড়ি স্বচ্ছন্দে বাস করে। শীতকালে এই চিংড়িরা সাত ফুট শক্ত বরফের নিচে বেঁচে আছে দেখা যায়। সেই সময় এরা বরফের ওপর তাদের দাঁড়া জাতীয় জিনিস দিয়ে আটকে থাকে। বরফ যখন গলতে আরম্ভ করে তখন এই সব চিংড়িরা গভীর জলে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করে। অনেক সময় প্রায় ৩০০ ফুট জলের নিচে থেকে এদের সংগ্রহ করা যায়। এত নিচে গিয়ে বসবাস করার কারণ যে জলের ওপরের অংশ যত গরম হতে থাকে ততই এরা গভীর ঠান্ডা জলে আশ্রয় নিতে থাকে।

*

প্রাণীদের মধ্যে পাখী, আর মাছেদের ভেতর খুব বেশী পরিমাণে পরিযান (migration) এর অভ্যাস দেখতে পাওয়া যায়। অনেক পাখী শীতকালে এক দেশে বাস করে আবার গরমের সংগে সংগে সেই স্থান ছেড়ে নতুন জায়গায় উড়ে চলে যায়। এই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিযান হাজার মাইল দূরের স্থানও হতে পারে। সব চেয়ে মজা এই যে, এরা বছরের পর বছর ঋতু বদলানোর সংগে তাদের পুরনো জায়গায় ফিরে আসবে—এতে এদের কোন রকম ভুল হতে দেখা যায় না। এই পরিযান প্রাণীরা প্রধানত দু কারণে করে একটা হচ্ছে খাবার সংগ্রহের জন্য আর একটা হচ্ছে ডিম প্রসব করবার জন্য। পাখীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কারণ এদের আমরা খুব সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অনুসরণ করতে পারি।

কিন্তু মাছেদের বেলা এই পরিযান খুব সহজে লক্ষ্য করা যায় না—কারণ এরা জলের নিচে চলাফেরা করে বলে। তবুও প্রাণীতত্ত্ববিদরা মাছেদের পরিযান সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। মাছেরাও পাখীদের মত খাবারের জন্য এবং ডিম ছাড়ার জন্য পরিযান করে। কিন্তু এই মাছেদের মধ্যে পরিযানের রকম একটু ভিন্ন প্রকারের। পরিযান দু প্রকারের হতে পারে—একটি হচ্ছে 'এনাড্রোমাস' (anadromas) যখন লোনা জলের মাছ, সমুদ্র থেকে স্বাদু জলে খাবার সংগ্রহের জন্য এবং ডিম ছাড়বার জন্য আসে। উদাহরণস্বরূপ ইলিশ, সামন ইত্যাদির নাম করা যায়। আর এক ধরনের পরিযানকে 'ক্যাটাড্রোমাস' (catadromas) বলা হয়। এতে স্বাদু জলের মাছ লোনা জলে অর্থাৎ সমুদ্রে পরিযান করে। এর উদাহরণস্বরূপ 'ইল' (eel) যাকে আমরা বাম মাছ বলি, বলা চলে।

*

ছোট এবং হাল্কা ধরনের মোটর গাড়ির চলন দিন দিন বেড়ে চলেছে।
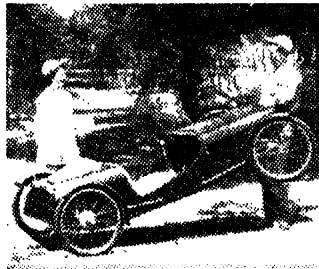
কত সহজে গাড়িটা তুলে ধরা হয়েছে

এইজন্য নিত্য নতুন এই জাতীয় মোটর গাড়ি তৈরী হচ্ছে। ছবিতে যে মোটর গাড়িটি দেখা যাচ্ছে এটি সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিকের তৈরী। গাড়িটি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে যেতে পারে—এতে ৫ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন লাগান আছে। এর ওজন সবশুদ্ধ ২০০ পাউন্ড।

*

রক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে এলে জমে যায়—কারণ এটাকে একটা রক্তের গুণ বলা চলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীর শরীরে শিরা এবং ধমনীর ভেতরও রক্ত দানা বেঁধে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 'ট্রাইপ্সিন' (trypsin) যদি রক্তের সংগে মেশান যায় তাহলে দানা বাঁধা রক্তকে আবার তরল করে দিতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা এর ফলে এখন চিন্তা করছেন যে, এই ট্রাইপ্সিন জাতীয় কোন রাসায়নিক বস্তু অদূর ভবিষ্যতে বার করা সম্ভব হবে, যেটা, যদি মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী শিরা অথবা ধমনীতে রক্তকে তরল করতে সাহায্য করবে। অনেক সময় আমাদের হৃদয়ের কাছে যে সব রক্ত চলাচলের শিরা এবং ধমনী থাকে তা'তে রক্ত জমে গিয়ে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলের বাধা সৃষ্টি করে—ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটে অথবা রক্তের চাপ নেমে যায়। এখন এই ট্রাইপ্সিন জাতীয় রাসায়নিক বস্তুটি মানুষের এই রোগে খুব উপকার করবে আশা করা যায়।

*

মানুষের সুখ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের চিন্তার অবধি নাই। এমন দিন ছিল যেদিন ছয় ঘণ্টার পথ ছয়দিনে পার করাই অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হতো। আজ আর এর মধ্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আজকের দিনে লোকে টেলিফোন সহযোগে হাজার মাইল দূরের লোকের সংগে এক পা না নড়েও স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারে। এর পরও মানুষ আরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চায়। রাতের বেলায় দরকার হলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারের মধ্যেই যদি ফোনের নম্বরটুকু দেখে নিতে পারা যায় তাহলে বিছানা থেকে ওঠার কষ্ট আর স্বীকার করতে হয় না। এরও একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আলো সহ টেলিফোন যন্ত্রের চলন হচ্ছে। ফোনের রিসিভারটি উঠিয়ে নিলেই একটি ছোট্ট বিজলী বাতি জ্বলে ওঠে। আলোটা এমন ব্যবস্থা মত রাখা থাকে যে আলো চোখে পড়ে না। অথচ ডায়ালটি বেশ আলোকিত হয়ে ওঠে। সুতরাং অনায়াসেই প্রয়োজনীয় নম্বরটি দেখে নিয়ে ফোনে কথাবার্তা বলা যায়। রিসিভারটি নামিয়ে যথাস্থানে রাখার সংগে সংগে আবার আলোটি নিভে যায়।

হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইন পাস হইয়াছে। আমরা ইহার সমর্থনকারীদের অভিনন্দন জানাইতেছি। বিরোধী দলের যাঁরা চিরচরিত নীতি অনুসারে সীতাসাবিত্রীকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও বলি—দুঃখ করিবেন না। রাম-সত্যবানের পুনর্জন্ম হউক, সীতাসাবিত্রীর মর্যাদা আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিতর্কের প্রয়োজন হইবে না।

* * *

প্রসংগত বিতর্কের কথা মনে পড়ে। শ্রীমতী জয়শ্রী রায়জী অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন — বিবাহবিচ্ছেদ আইন

ক্যাস্টর অয়েলের সামিল, ঔষধ হিসাবে ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, প্রতিদিন ইহার প্রয়োজন হয় না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু অন্তরে ময়লা যাদের স্তূপাকার হয়ে জমেছে তাদের ভয় ঘোচে কই? তারা আতঙ্কিত হয়ে আছেন। Inner cleanliness-এর জন্যে ফ্রুট্ সল্ট না নিত্য তিরিশ দিন ব্যবহার করিতে হয়"!!

* * *

বিহারে অনুষ্ঠিত সম্প্রতিক মহিলা সম্মেলনে শ্রীমতী রাজবংশী দেবী এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যিনি মা, যিনি জাতির ভবিষ্যৎ সংগঠনের একমাত্র নিয়ন্ত্রী, তিনি হইলেন "গৃহলক্ষ্মী।—"কথাটা মিথ্যে নয় এবং নয় বলেই একদিন গৃহলক্ষ্মীদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। কিন্তু কালধর্মে সে আসন দূরে থাক, ইচ্ছাসুখে এখন ট্রামে-বাসের আসন ছেড়ে দিতেও আমাদের আপত্তি; গৃহমঞ্চোতে গৃহিণীকে এখন গৃহ নোছাতের পর্যায়ে নাবিয়ে এনেছি"।

* * *

এক সংবাদে জানা গেল যে, অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) বিল বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রাজ্যসভায় গৃহীত হইয়াছে।—"তাঁদের হর্ষে আমরাও হর্ষ প্রকাশ করছি। কিন্তু ভাবছি শুধু তাঁদের কথা যাঁরা পঞ্চগব্যের ব্যবসাতে জীবিকা অর্জন করে আসছিলেন। অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) বিল পাসের পর পঞ্চগব্যের চোরা কারবার শুরু না হলেই হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মহিষবাথানের এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে গবাদি পশু নাকি উন্মাদ রোগের কবলে পড়িয়া চাষীদের তাড়া করিতেছে। "পাগল গরুতে ত্রসের কারণ নেই কারণ সতর্ক হওয়ার সময় পাওয়া যায়। ভয় শুধু গোবেচারা গরুতে, কখন যে চোখ বন্ধ করে জাবর কাটে আর কখন শিঙ উঁচিয়ে গুঁতোতে আসে তা

বোঝাই ভার"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতার চিড়িয়াখানায় সম্প্রতি দুইটি উটপাখী আমদানি করা হইয়াছে।—"আমরা আশা করছি, শুধু দেখাবার উদ্দেশ্যেই উটপাখী আমদানী করা হয়েছে, বিপদের সময় তাদের নীতি কি তা শেখাবার জন্যে নয়"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

জাপানের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আদিম ধানগাছের সন্ধানের জন্য শীঘ্রই হিন্দুকুশ ও হিমালয়ে অভিযান পরিচালনা করিবেন।—"আমাদের অনুরোধ

যে-ধান গাছে কিছুদিন আগেও ধানের বদলে কাঁকর ফলেছে সেই ধানগাছ কোন্ আদিম মানব প্রথম রোপণ করেছিলেন তার ইতিহাসও যেন জাপ বৈজ্ঞানিকরা সংগ্রহ করে আনেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সংবাদে জানা গেল, ফরমোসা সমস্যার মীমাংসায় কে মধ্যস্থতা করিবেন তা নিয়ে ভারত, পাকিস্থান আর বৃটেনের মধ্যে নাকি "রেস্" চলিতেছে। —"কিন্তু শুধু হ্যান্ডিক্যাপ দেখে উইনার ধরা যায় না, টানাটানির খবরটাও জানা চাই"—বলেন আমাদের এক ঘোড়দৌড় রসিক সহযাত্রী।
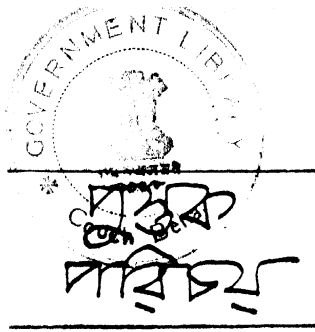
ছোট গল্প

ধূপকাঠি ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সত্যব্রত লাইব্রেরী; ১৯৭, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা।

সাম্প্রতিককালের বাংলা ছোট গল্পে উল্লেখযোগ্য নামের সংখ্যা অপ্রচুর নয়, কিন্তু এমন লেখক মাত্র তিন চারজন আছেন, যাঁদের রচনা বাংলা ছোট গল্পের কোন কোন ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করে একটি বিশিষ্ট ধারাকে প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই অল্প কয়েকজনের অন্যতম।

মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবন নিয়ে গল্প লেখার রেওয়াজ নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। তবে সে মধ্যবিত্ত আর আজকের মধ্যবিত্ত এক জিনিস নয়। এমন কি প্রেমেন্দ্র মিত্র যে-মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের সামগ্রিক রূপটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সে-জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যেও যে অপারসীম বেদনার গভীরতা ব্যক্ত করতে পেরেছেন, গত দশ বছরের মধ্যে বাঙলার মধ্যবিত্ত জীবন তা থেকে আরও খানিক সরে এসেছে। সমাজ-কাঠামোর দিক থেকে মধ্যবিত্ত একটা নির্দেশসূচক পরিচয় এখন আর নাই। অর্থনৈতিক বিচারে এই গোষ্ঠী বর্তমানে হয় নিম্নবিত্ত না হয় বিত্তহীন। এ-সমাজের জীবনধারণের মানের ক্রমশই অধোগতি হচ্ছে।

সন্ধ্যে যত ঘনিয়ে আসবে, অন্ধকার তত বেশি হবে—এ যেমন অবধারিত সত্য এবং স্বাভাবিক নিয়ম—তেমনি বাঙালীর মধ্যজীবনে নিঃস্বতা যত গভীর হবে তার চরিত্র, মন, দৃষ্টিভঙ্গী, আচার আচরণ ও ব্যবহারে ততই নৈরাশ্য, ব্যর্থতা, ক্ষোভ, কুশ্রীতা এবং মানসিক জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। নরেন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পে এ-কালের, এই সমাজটির আর্থিক এবং চারিত্রিক দুর্গতিটুকু ধরবার চেষ্টা করেছেন।

গল্পের উপজীব্য ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য লেখকের কল্পনা কখনোই জমকালো ধরনের হয় না। এমন কি ঘটনাসূত্রগুলিও অত্যন্ত সহজ ও সরল স্বাভাবিক গতির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং ছোট গল্পের যে আকস্মিক চমৎকারিত্ব সাধারণ পাঠকের চোখের ওপর রঙীন দেশলাই কাঠি জ্বালার মত ফস্ করে জ্বলে চমক লাগিয়ে দেয়—নরেন্দ্রনাথের গল্পে সেই চমক লাগানো ধাঁধা নেই। তাঁর লেখায় একটি গৃহকোণের বিচিত্র দুঃখ-বেদনার আশা-ভঙ্গের, ক্ষোভের মুহূর্তগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষের মনের সূক্ষ্ম কারুকর্মে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ—এ কথা আর বলার অপেক্ষায় নেই। তথাপি কথাটি উল্লেখ করতে হয় আবার এবং একটি কথা যোগ করতে হয় যে, সেই কারুকর্ম কোথাও অযথা বিকৃত নয়।

নরেন্দ্রনাথের রচনাশৈলী অনাড়ম্বর, সরল। বাক্যসজ্জায় সাধারণ চলিত কথার বাঁধুনি। বিষয় অনুসারে ভাষাটি তাঁর যে সাদাসিধে রূপটি রক্ষা করছে তা লক্ষ্য করার মত।

এগারোটি গল্প নিয়ে তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'ধূপকাঠি'। এ গল্পগুলির অধিকাংশই হয়ত পাঠক-পরিচিত। একটি দুটি কথায় তার পরিচয় দেওয়া বর্তমান সমালোচকের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে এই মাত্র হয়ত বলা যায় যে, 'ধূপকাঠি', 'পূর্ণ', 'অভিনেত্রী', 'নাকটুমণি', 'চিঠি', 'চাকরি' ইত্যাদি গল্পগুলি একাধিকবার পড়বার মতন। পড়লে মন ভরে যায়। অন্যান্য গল্প, 'অমনোনীত', 'শেফালী', 'এ্যাজমা', 'বেসুরো', 'সহযাত্রিনী' সব কটিই সুখপাঠ্য। গল্পের কোনও কোনও চরিত্র বহুদিন মনে থেকে যাবে।

বইয়ের কাগজ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ ভাল। ছাপাটি আরও ভাল হলে সামান্য খুঁতটুকুও থাকত না। (৯৭।৫৫)

স্ব-নির্বাচিত গল্প ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ; ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। দাম চার টাকা।

আধুনিক বাংলা ছোট গল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়, নিজস্ব বিভিন্ন ছোট গল্প-গ্রন্থে তিনি যে বহুবিধ ছোট গল্প পরিবেশন করেছেন, সে সম্পর্কে এক কথায় বলা যেতে পারে, তা অনায়াসেই জনচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে,—যা-ই তিনি লিখেছেন, পাঠককে তখনই তা আকর্ষণ করেছে,—অনবদ্য ভাষাবিন্যাস এবং ভাব-ব্যঞ্জনাই সম্ভবত তাঁর এ সাফল্যের মূলে।

তাঁর এই স্ব-নির্বাচিত গল্পগ্রন্থটিতে যে পনেরোটি গল্প তিনি নির্বাচিত করেছেন, তার সব গল্পগুলিই যে সমান শক্তি ও সৌকর্যের অধিকারী, একথা বলা চলে না; এমন কি, তাঁর আরও অনেক নামকরা ভালো গল্প এতে স্থান পায়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখকের স্ব-নির্বাচিত গল্পের মাধ্যমে লেখকের মনোভঙ্গির যে একটি বিশেষ পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে, তা' পাঠকের পক্ষে আদৌ অপ্রয়োজনীয় নয়,—লেখককে বুঝতে হলে তাঁর নিজের ভালো লাগার কথাটাও বোঝা দরকার। ভূমিকায় লেখক যথার্থই বলেছেন, "স্বয়ং-সংকলিত গল্প তো লেখকের সঙ্গে পাঠকের অনেকখানি ঘরোয়া আলাপ। সেখানে সৌজন্য-বিনিময় ন[illegible] প্রীতির পরিচিতি। আত্ম-বিলোপ নয়, আত্ম[illegible] বিকাশ।"

আলোচ্য পনেরোটি গল্পকে যদি লেখকে[illegible] মনোভঙ্গির বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে ধ[illegible] যায় ত গল্পগুলি পড়ার পর প্রথমেই যে ক[illegible] মনে হয়, সেটা হচ্ছে—লেখক প্রধানত সৌন্দর্যে[illegible] পূজারী। সার্থক শিল্পীমাত্রই অবশ্য সৌন্দর্যে[illegible] উপাসক, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সৌন্দ[illegible] আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নারায়ণবাবুর বৈশিষ্ট[illegible] আছে। শুধু বিশ্বপ্রকৃতি কেন, সমগ্র মান[illegible] প্রকৃতির মধ্যেও। সেটা হচ্ছে, প্রকৃতির বীভৎ[illegible] নিষ্ঠুর, ভয়াল দিকের উদ্ঘাটন। বিশ্বপ্রকৃ[illegible] ও মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে আদিমতা, বীভৎস[illegible] ও নিষ্ঠুরতা আছে, লেখক তারই মধ্যে যে খুঁজে পেয়েছেন সৌন্দর্যের অপরূপ লীলা,- সাধারণের চোখে যা ভয়াল, যা বীভৎস,- লেখকের চোখে তা-ই সুন্দর, তা-ই র[illegible] উৎসারণের বস্তু।

"রায়, সিং ও ঘাটে (এবং আজিজুল[illegible] গল্পে চারজন ডাকাত ও নিষ্ঠুর হত্যাকারী[illegible] নিয়ে যে বীভৎস দৃশ্য দিয়ে গল্প আরম্[illegible] করেছেন লেখক, এবং সমাপ্তিতে 'এগা[illegible] ফুট লম্বা পাইথন'কে এনে যে ভীষণত[illegible]

সৃষ্টি করেছেন লেখক,—তা নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতাতেই পর্যবসিত হয়নি, মানবমনের ও প্রকৃতিজীবনের ভয়াবহ দৃশ্যের উদ্ঘাটন-ক্ষেত্রেও তা এক বিশিষ্ট সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়েছে, এক বিচিত্র রসের সৃষ্টি করেছে "মর্গ" গল্পেও তাই—রোমান্স এখানে বীভৎসতায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েও এক বিচিত্র উপলব্ধিতে ভরে উঠেছে।

লেখকের গল্পের মূল সূত্রটি এইভাবে মনে মনে গেঁথে রেখে, আমরা তাঁর এই পনেরোটি গল্পকে মোটামুটি দু শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—এক, যেখানে মানবপ্রকৃতি বড়ো হয়ে উঠেছে, দুই—যেখানে বিশ্বপ্রকৃতি বড়ো। প্রথম শ্রেণীতে গমন দুর্ধর্ষ গুণ্ডা বুলাকীর চরিত্রায়ণ—জন্মান্তর গল্পটিকে ধরা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে,—নারায়ণবাবুর অন্যতম বিখ্যাত গল্প "কালাবদর"। স্থানান্তরে মেঘনার নাম হলো কালাবদর,—এখানে সে সুবিশাল ভয়াবহ,—এই দুর্ধর্ষ নদীতে যারা 'কেরায়া' নৌকো চালায়,—এই 'কালকেউটের মতো' হিংস্র নদী পাড়ি দিয়ে সে হিংসা বুঝি তাদেরও মনে সংক্রমিত হয়,—এই গল্পে লেখকের ভাষা ও ভাববিন্যাস এমন এক উত্তুঙ্গ স্তরে এসে পৌঁছেছে, যেখানে মানুষও বুঝি আর তার স্বাতন্ত্র্য রাখতে পারেনি, 'কালাবদরের' ক্রূরতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। গল্প শেষ ক'রে বলতে ইচ্ছা করে,—কী ভীষণ, অথচ কী সুন্দর!...'নিশাচর', 'মৃত্যুবান', 'তৃণ', 'মারীচ', 'ধন্বন্তরি' গল্প-গুলিও মানব-মনের বিচিত্র রহস্যের অপূর্ব উদ্ঘাটন!

গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদচিত্র এককথায় চমৎকার। (২৯।৯৫)

উপন্যাস

অন্যতমা—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। বেংগল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১৪। আড়াই টাকা।

পুডিংটা খেতে যদি ভালো লাগে তা হলে বুঝতে হবে রান্না ঠিকই হয়েছে, কথাটা ইংরেজী সুভাষিতাবলীর অন্যতম। ভালো উপন্যাসেরও প্রমাণ ভালো লাগাতে, যেমন "অন্যতমা"র। সাহিত্যপ্রয়াসের প্রধান উদ্দেশ্য যদি পাঠককে আনন্দ দেওয়া হয়, তাহলে আধুনিককালের লেখক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিকতম বইটিতে নিঃসন্দেহেই তা সিদ্ধ হয়েছে।

জাপানী আক্রমণের শঙ্কাছায়াচ্ছন্ন ১৯৪২-এর কলকাতার পটভূমিতে লিখিত কাহিনীটি গঠনে ও ঘটনাবৈচিত্র্যে মনোরম। নায়ক সুপ্রিয় শিক্ষিত, রুচিবান, স্বদেশপ্রেমিক; বাহুতে অসীম শক্তি, মনে নির্ভীক। এ সবের উপর সুপ্রিয় অর্থবান, কিন্তু অর্থ তার গুণরাশিকে নাশ করেনি বরং উজ্জ্বলতর করেছে।

রায় বাহাদুরের একমাত্র কন্যা অনুভার সংগে তার ভালোবাসা। প্রেমের ধর্ম অনুসারে প্রথমে তা প্রচ্ছন্ন, ক্রমশ তার প্রকাশ। অনুভা জানল তার হৃদয়ের সংবাদ, গোপনে তাকে লালন করল, তারপর তার পূর্ণতার জন্যে অনাগত দিনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

প্রেমে অনেক বাধা: গুরুজনের আপত্তি, ঘটনার চক্রান্ত, ভুল বোঝার পালা। সব অতিক্রম করে অন্তে নায়ক-নায়িকার মিলন। দেড়শো পৃষ্ঠাব্যাপী বিঘ্ন তরঙ্গের কাহিনী পার হয়ে মিলনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে পাঠক যখন সুখনিঃশ্বাস ফেলে, তখন মন-দর্পণে নায়কের ভূমিকায় সে নিজেকেই দেখতে পায়। রচনার সার্থকতা এইখানে।

অনুভা ও সুপ্রিয়র মাঝখানে দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র—বিজন ও সীমা। বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিস্টার বিজনের সংগে অনুভার বিয়ের প্রস্তাব হয়েছে, সে-প্রস্তাব দানাও বেঁধেছে—তবু অবশ্যম্ভাবীকে অতিক্রম করা যায়নি। বিজন অহংকারী, কিন্তু অনুভার প্রতি প্রেমে একনিষ্ঠ; প্রতিদান পায়নি, তবু দিতে কার্পণ্য করেনি। স্কটের আইভানহোতে রিবাদ্য বোআ গিল্বার (কিম্বা ওসমানের) ট্রাজেডির মতো বিজনের ব্যর্থতা বেদনা সঞ্চার করে।

বন্ধুর বোন সীমার যত্নে সুপ্রিয়র রোগ-মুক্তি, তারই প্রয়াসে প্রণয়িনীকে ফিরে পাওয়া। রেবেকা-আয়েষার মতো সীমা শুধু দিয়েই গেল, পরিবর্তে কিছুই পেল না। দাদার বন্ধু সুপ্রিয়কে বড়ো ভাই-এর মতো দেখবার চেষ্টা করেছে, ভক্তি জানিয়েছে—তবু তাদের পরি-পূর্ণ আনন্দে সীমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। সে অশ্রু সংক্রামিত হয়ে যদি পাঠকের চোখ ভিজিয়ে দেয় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

উপন্যাসটিতে যুদ্ধকালীন কলকাতার নিখুঁৎ চিত্র আছে, লক্ষ্ণৌ ও কাশ্মীর রূপও আংশিক মেলে। বর্মার পটভূমিকায় একাধিক কাহিনী রচনা করে হরিনারায়ণবাবু ইতিপূর্বে যশস্বী হয়েছেন। যতদূর জানি, উপন্যাসে স্বদেশকে তিনি এই প্রথম আঁকলেন। বিদেশী শক্তির অত্যাচার, স্বদেশী শিল্প, সমাজ প্রভৃতি প্রসংগ বইখানিতে আছে। এটা অবশ্য পাঠকের উপরিপাওনা।

লেখকের ভাষা সহজ সুন্দর; তাতে গল্প বলার যাদু আছে। এ ভাষা ঘাসের শীষের উপর শিশিরবিন্দুর মতোই অনায়াসলভ্য, অথচ অনির্বচনীয়।

শিক্ষা প্রসংগ

শিক্ষার কথা—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, এম-এ (কলিঃ), পি-এচ-ডি (এডিন), এফ এন আই। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। 'বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম এবং সর্ব-বৃহৎ। শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের একটি পরি-কল্পনা দেওয়া হয়েছে। তবে সেটি কতদূর কার্যকরী হবে সে-বিষয়ে লেখকের নিজেরই সন্দেহ রয়েছে। তিনি কলিকাতা ছাড়া মেদিনী-পুর, বিশ্বভারতী (বিশ্ববিদ্যালয় হবার পূর্বে এ প্রবন্ধ লেখা), বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতে চারটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। এইগুলি আপাতত অ্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হিসাবে থাকলেও

চলবে, যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ষাট বছর ছিল। এতে তাঁর মতে কলিকাতায় অস্বাভাবিক জনবাহুল্য ও ছাত্রবাহুল্য কমিয়া যাইবে। কলিকাতার অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় ছাত্রদের যে শারীরিক ও নৈতিক ক্ষতি হইতেছে তাহা হইতে রক্ষা করিবার একটি দ্রুততম উপায়।" এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রচুর সংখ্যক বিদ্যায়তন (কলেজ) এবং বিদ্যালয় স্থাপন, একত্র অত্যধিক সংখ্যক ছাত্রের বিদ্যাভ্যাস ও পরীক্ষা বন্ধ করা, আই-এ এবং আই এস্-সি পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে বি-এ এবং বি এসসি তিন বৎসরে পড়ানো। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মাইনে ও শিক্ষা-কর প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিয়ে একটি চিমৎকার স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। বিশ্বভারতীতে তাঁর কতকটা স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তবে বিশ্ব-ভারতীর ব্যবস্থা তাঁর মতের সঙ্গে ত মিলবে না। তিনি বলেছেন, "আমোদ-প্রমোদ এবং কলাচর্চার আধিক্য শিক্ষাসাধনার অনুকূল নহে। মূলত শিক্ষা একটি সাধনা, একটি তপস্যা।" ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমরা চাই বিদ্যাসাগরের প্রতিভা, বঙ্কিমের প্রতিভা, বিবেকানন্দের প্রতিভা। ঘিয়ের ব্যবসায়ে এক মাসে লক্ষপতি হইবার প্রতিভা বা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া ও ফেল করাইয়া এক বৎসরে কোটিপতি হইবার প্রতিভা ভারতের প্রতিভা নয়।" তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে সব শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতী। সংস্কৃত শিক্ষার সুপারিশ করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে "হিন্দী ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যস্ততার কোনই আবশ্যকতা নাই। ইংরাজির স্থান অধিকার করিতে হিন্দীর বহু বিলম্ব আছে। আমাদের প্রাদেশিক সকল প্রকার কার্যই বাংলা ভাষাতেই চলিবে। আন্ত-প্রাদেশিক ব্যাপারে মাত্র হিন্দীর প্রয়োজন হইতে পারে। তাহারও এখন বহু বিলম্ব।" তবে সম্প্রতি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত একটি হিন্দী অভিধান প্রকাশিত হয়েছে, যাতে প্রায় সর্ব-বিভাগের বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা আছে এবং যার মূল্য আশি টাকা, এই ধরনের একটি মহৎ প্রচেষ্টা বাংলা ভাষাতেও কেন এযাবৎ হয়নি তার জন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পুস্তকের শেষের দিকে তিনি অভিভাবকদের বারবার উপদেশ দিয়েছেন যে পড়াশুনার ক্ষতি করে ছেলেমেয়েদের খেলা ও আমোদ-প্রমোদের উপর ঝোঁক বাড়ছে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

তাঁর কথাগুলি সত্যই সকলের ভেবে দেখা উচিত। সেই সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ বেত্র-দণ্ডের ছায়াতলে এ-যাবৎ শিক্ষালাভ করে ছাত্ররা যশস্বী হয়েছে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করে এসেছে। আর আজকাল বহু চিত্তহারী বিধিব্যবস্থার আওতায় বিদ্যাভ্যাস করে প্রতিভা দূরে থাকুক বিন্দুমাত্র ক্ষমতার স্ফুরণও তো কারুর মধ্যে কোনো দিকেই দেখা যাচ্ছে না।

মত যাই হোক, এই ধরনের শিক্ষা সম্পর্কিত পুস্তকের আরও বেশী সংখ্যায় প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন যাতে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বহুবিধ তর্ক জমে ওঠে। কারণ একথা সর্বজনবিদিত যে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা এখন দিগভ্রান্ত। ৪১৭।৫৪

সাহিত্যালোচনা

ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরা-শঙ্কর সেন। প্রকাশক—প্রফুল্লকুমুদ লাইব্রেরী, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—২৳০

সুদীর্ঘ মঙ্গলকাব্যের যুগে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য। তার আগে এবং পরে, এমন কি সমসময়েও, মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির যে ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছিলো তার প্রায় সবটাই একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তি। এই এক ঘেঁয়েমির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী শুধু যে আশ্চর্য ব্যতিক্রম তা-ই নয়, লিরিক কবিতার ইতিহাসে আজও তার উজ্জ্বলতা অম্লান। আধুনিক সাহিত্যের যুগেও মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তাঁদের সাহিত্যের ওপর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। চৈতন্য পরবর্তী যুগ অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতেই এই সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে।

বিদগ্ধ লেখক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন মহাশয় এই ষোড়শ শতাব্দীই তাঁর আলোচনার জন্য গ্রহণ করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত না হলেও অপরিহার্য নিশ্চয়ই। কারণ এইটুকু গ্রন্থের মধ্যে লেখক পদাবলী সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং তাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সে আলোচনার সুযোগ অল্প।

তথাপি, ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা আরও একটু বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিলো। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের মনে তা হলে হয়তো কিছুমাত্র অতৃপ্তি থাকতো না। ১০৩।৫৫

নাটক

হরিপদ মাস্টার : সুনীল দত্ত : নব সংস্কৃতি প্রকাশনী, ৪৪।৯এ, হাজরা রোড, কলিকাতা ১৯। দাম—দেড় টাকা।

শিক্ষক-ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ছোট একটি নাটক। কাহিনীর মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু সার্থক নাটক রচনায় যে বলিষ্ঠ বিন্যাস ও বিশিষ্ট সংলাপ প্রয়োজন, তা এই নবাগত নাট্যকার এখনো আয়ত্ত করতে পারেন নি বলে মনে হলো।

বইটির ছাপা-বাঁধাই ভালো। ৬৮।৫৫

বিবিধ

বিশ্বসাহিত্যে নোবেল পুরস্কার : সুধাংশু সরকার ও রমাপ্রসাদ দাস : গ্রন্থলোক ৬বি, কালাচাঁদ সান্ন্যাল লেন, কলিকাতা ৫ দাম এক টাকা বারো আনা।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য সম্ভবত লেখা সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার-পরিচিতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থের উল্লেখ,—তা-ও সবার নয়,- সেলমা লাগেরলফ, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ, ন্যুট হামসুন, আনাতোল ফ্রাঁস, বার্নার্ড শ গ্রাসিয়া দেলেদ্দা, টমাসম্যান, গলসওয়াদি আইভান বুনিন, পার্ল বাক্ ও সিনকোয়েভিচ —এই কয়জনের কথা আছে। লেখকদ্বয়ের রচনাদি ভালো, ভাষা বেশ প্রাঞ্জল।

ছাপা-বাঁধাই ভালো। ৫৬।৫

কার ঋণ পরিশোধ

"ওরা থাকে ওধারে"র কথা মনে ড়লো। লেখক আর পরিচালক এক মন, ক অনুভূতি নিয়ে কেমন হৃদয়স্পর্শী কখানি মৌলিক সৃষ্টিই না সামনে তুলে রেছিলেন। সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত অরোরা ফিল্ম র্পোরেশনের "পরিশোধ" ছবিখানিতেও তাঁরাই দুজনে রয়েছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনায় এবং সুকুমার শগুপ্ত পরিচালনায়—কিন্তু কি আকাশ াতাল তফাৎ! দুর্বল কাহিনী বা দুর্বল রিচালনার কাজ এদের হাত থেকে আগেও বেরিয়েছে, কিন্তু "পরিশোধ"-এ যে বেখাপ্পায়ানা দেখা গেল তা যে এদের দুজনের কারুর দ্বারা সম্ভব হতে পেরেছে সেইটেই আশ্চর্যের কথা। মনে হয় যেন, অন্যে লোকে কাজ করেছে এবং এরা নিজেদের নাম ধার দিয়েছেন। এছাড়া আর কোন যুক্তিই ভেবে ঠিক করে নেওয়া যায় না। কোথাও রস জমে না; নাট্য পরি-স্থিতিও জমেনি। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলা। সংলাপেই সব ঘটনা সেরে নেওয়া। অপরন্তু যুক্তিহীনতা। এমনিতে অবশ্য গল্পটির চেহারার একটা অভিনবত্বের

—শৌভিক—

লক্ষণ প্রকাশ পায়; বৈচিত্র্যের আভাসও রয়েছে কিন্তু উপযুক্ত বিন্যাস না হওয়ায় তার কিছুই মূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

* * *

গল্পের নায়ক দ্বৈত চরিত্র বিশিষ্ট এক ব্যক্তি। অবশ্য দ্বিতীয় চরিত্রটি তাকে ঘটনাচক্রে পড়ে গ্রহণ করতে হয়, এবং সেই থেকে তার জীবনে যে বিড়ম্বনা দেখা দেয়, যা তার প্রণয় জীবনকেও প্রায় ব্যর্থ করে দিতে বসেছিল তাই হচ্ছে ছবির কাহিনী। স্বর্গত এক অতি বিখ্যাত ডাক্তারের মদ্যপ ডাক্তার ছেলে হরিশের কম্পাউন্ডার শক্তি-পদকে নিয়ে কাহিনী। হরিশের মা-মরা শিশু পুত্র হিমু থাকে হরিশের অনূঢ়া শ্যালিকা ললিতার কাছে। হরিশ ছেলের খোঁজ বড় একটা নেয় না। ছবি আরম্ভ ললিতা আসছে কলকাতায় হরিশের সঙ্গে দেখা করতে, আর শক্তিপদও হরিশের অনুরোধে ললিতার সঙ্গে দেখা করতে হাজির ওদের গ্রামে। স্টেশনে গাড়ী থেকে নামতেই শক্তিপদ আর ললিতার সাক্ষাৎ হলো তবে পরিচয় না থাকায় কোন লাভ হলো না। শক্তিপদ পরের ট্রেনে ফিরে এলো এবং ললিতাও এলো হরিশের ডিসপেন্সারীতে। হরিশ তখন যা কিছু ক্যাশে ছিল নিয়ে মদ খেতে বেরিয়ে পড়েছে। ললিতা শক্তিপদর সঙ্গে কথা বলে ফিরে গেল। ললিতা পাশ করা শিক্ষিতা মেয়ে। গ্রামের বাড়িতে ভ্রাতৃ-বধূর গঞ্জনায় সে অতিষ্ঠ; হিমুকেও তার বৌদি দুচক্ষে দেখতে পারে না। হঠাৎ বিজয়গড় স্টেট থেকে হরিশের বাবার নামে হাজার টাকাসহ এক টেলিগ্রাম হাজির—রাজকুমারের শক্ত অসুখ, তাকে দেখতে যেতে হবে। হরিশ ও শক্তিপদর কথা-বার্তায় জানা গেল হরিশের বাবা বিজয়-গড় স্টেটের ডাক্তার ছিলেন, খুব খাতির ছিল তার এবং তিনি যে মারা গেছেন স্টেটের লোক সে খবর জানে না। হরিশের বাবার মৃত্যুর খবর স্টেটকে জানিয়ে দিলেই হতো, কিন্তু টাকার খানিকটা হরিশ ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলে মুশকিল বাধিয়ে ফেললে। শক্তিপদর পরামর্শে ঠিক হলো হরিশই যাবে তার বাবার হয়ে এবং হরিশ একা যেতে সাহস না পেয়ে শক্তিপদকে সঙ্গে নিয়ে গেল। বিজয়গড় স্টেশনে রাজার লোক ওদের অভ্যর্থনা করে একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললে। সেখানে হরিশ মদের বোতল খুলে বসতেই ক্ষুব্ধ হয়ে শক্তিপদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক পরে রাজবাড়ী থেকে খবর এলো রাজকুমারের বড়ো বাড়া-বাড়ি অবস্থা। হরিশের তখন মত্তাবস্থা, তার ওপর পেটের যন্ত্রণায় কাতর। অগত্যা হরিশের কথায় শক্তিপদই নিজেকে হরিশ পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করতে বেরিয়ে পড়লো। শক্তিপদ ফিরলো সকালবেলা। হরিশেরও শেষ নিঃশ্বাস পড়লো। মারা যাবার আগে শক্তিপদর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেলো এই বলে যে, শক্তিপদ যেন নিজেকে হরিশ পরিচয়েই পরিচিত রেখে যায়। অনন্যোপায় শক্তিপদ ললিতার নামে টাকা পাঠালে হিমুর খরচের জন্য। ললিতা তখন কলকাতায় এসে শিক্ষয়িত্রীর

বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা ও সুশীল মজুমদার—এ সপ্তাহের নতুন বাঙলা ছবি "অপরাধী"র একটি দৃশ্য। পরিচালক—সুশীল মজুমদার

কাজ নিয়েছে। কাজেই শক্তিপদ তথা হরিশের পাঠানো টাকা ফেরত গেলো। খবর নেবার জন্য শক্তিপদ নিজেই এলো কলকাতায় এবং খোঁজ নিয়ে ললিতার সংগে দেখা করলে, কিন্তু হরিশের মৃত্যু সংবাদ জানালো না। বিজয়গড় হরিশ-রূপী শক্তিপদর প্রভূত খাতির। রাজ-কুমারকে আরোগ্য করে তোলার জন্য রাজমাতা শক্তিপদকে নিয়ে একটা হাস-পাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করলেন। এছাড়া ওখানকার নার্স রমা হরিশ তথা শক্তিপদর প্রেমে পড়ে গেল। শক্তিপদ মাঝে মাঝে কলকাতায় কোথায় যায় খোঁজ নেবার জন্য রমা একবার কলকাতায় এলো এবং ললিতার সংগে দেখা করে গেলো। এদিকে স্কুলের সেক্রেটারী যতীনবাবু ললিতার প্রতি আসক্ত হলেন; ললিতার ঘরে দু একবার শক্তিপদর আগমন লক্ষ্য করে যতীনবাবু ঐ আগন্তুকের পরিচয় উদ্ঘাটনে তৎপর হলেন। হিমুর জন্য নিজের জীবনটাই ব্যর্থ হয় দেখে ললিতা তাকে তার বাবার কাছে রেখে আসার জন্য বিজয়গড়ে হাজির হলো। ঠিক সেই দিনই রাজকুমারের রোগমুক্তি উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। রমা ললিতাকে নিয়ে গেল সে অনুষ্ঠানে; শক্তিপদ তখন অনুপস্থিত। অনুষ্ঠানের মাঝে শক্তিপদকে দেখে সকলেই তাকে হরিশ চৌধুরী বলে সম্বোধন করায় ললিতা ব্যাপারটা বুঝলে। সেখানে কিছু না বলে পরে শক্তিপদর কাছ থেকে ললিতা কৈফিয়ৎ চাইলে প্রতারণার জন্য। শক্তিপদ তাকে বোঝবার চেষ্টা করলে না। হঠাৎ দূর গ্রামাঞ্চলে ভীষণ বন্যার খবর এলো; কারুরই সেখানে যাবার উপায় নেই। শক্তিপদ গোঁয়ার্তুমি করে গেল সেবা ও উদ্ধার কাজের সহায়তা করতে; অন্তত সকলে তাই জানলে। যাবার সময় কেবল ললিতার নামে একখানি পত্র রেখে গেল। ললিতা তা থেকে জানতে পারলে শক্তিপদর গন্তব্যস্থান বিজয়গড়ের প্রবীণ ডাক্তার দাস ও রমাকে নিয়ে ললিতা বের হলো শক্তিপদর সন্ধানে এবং তাকে আবিষ্কার করলে পাহাড়ের ওপরে। ললিতা আগেই মনে মনে শক্তিপদকে কামনা করে রেখে-ছিল, এবার সে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

* * *

ঘটনাবলীর মধ্যে কেমন একটা গোঁজা-মিলের ভাব। অবশ্য ঘটনা বলতে প্রায় সবই সংলাপের বর্ণনায়। অনেক কষ্ট কল্পনা। ললিতা পাশ করা মেয়ে; কলকাতাতেই তাকে পড়তে হয়েছে; তাছাড়া তাদের গ্রামও কলকাতার খুবই কাছে বলেই প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও হিমুর খোঁজ খবর না নেওয়ার জন্য হরিশের সংগে দীর্ঘ কয়েক বৎসর দেখা না হবার কারণ কি? ললিতার দাদা থাকে প্রবাসে, কিন্তু তার স্ত্রীকে কটুভাষিণী কল্পনার অর্থ কি? হরিশের বাবার কথা এমন-ভাবে বলা হয়েছে যাতে মনে হয় তিনি ডাক্তার হিসেবে ভারতবিখ্যাত ছিলেন। অথচ বিজয়গড় স্টেটের লোক তার মৃত্যুর খবর রাখে না। বিশেষ করে যে স্টেটের অতিথিশালায় তার বিরাট প্রতিকৃতি আঁকিয়ে রাখা হয়েছে এবং যে স্টেট অসুখে বিসুখে তাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ডেকে পাঠায়। অতি বিসদৃশ ব্যাপার। হরিশের বাবার নামে ডাকে পাঠানো টাকা হরিশ পেতে পারে কি করে? যখন তার খানিক পরেই দেখানো হলো ললিতার নামে পাঠানো টাকা ললিতাকে না পেয়ে পিয়ন ফিরিয়ে নিয়ে গেল! রাজকুমারের দারুণ অসুখ—শক্তিপদ গেল তাকে দেখতে, কিন্তু রাতারাতি এমন আরোগ্য-লাভ করলো যে, শক্তিপদর তাতে জয়-

সুচিত্রা সেন—দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "ভালোবাসা"র নায়িকা চরিত্রে

দয়কার। আর এটাই বা কেমন ধারা—রিশ ও শক্তিপদ বিজয়গড়ে পেঁাছে াজকুমারকে দেখা স্থগিত রেখে সরাসরি ওদের জন্য নির্ধারিত বাসায় গিয়ে ঠলো—টেলিগ্রাম করে ডেকে আনানো লো এমন সাংঘাতিক অসুখ; কিন্তু পেঁাছেই রুগীকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন দখা গেল না। রাজকুমারের এমন াংঘাতিক অসুখ যে, তাকে আরোগ্য করে দওয়ার খুশীতে রাজমাতা ডাক্তারকে দশ াজার টাকা পুরস্কার দিয়ে বসলেন—এই অসুখের ঘটনা থেকেই প্রকৃত নাটকের রু অথচ সে ঘটনাটা লোকের কথার াধ্যেই নিবদ্ধ থেকে রইলো; চোখে দেখা গেল না। সময়ের ব্যাপ্তি বোঝবারও উপায় নেই। ছবি আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা যেন দিন দু'চারের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। অথচ তার মাঝে অন্য কথা বাদ দিলেও একটা হাসপাতাল তৈরীর সময় পার হয়ে যায়। বাড়ির সামনে বকুলগাছ মাত্র এই ঠিকানায় কলকাতায় বাড়ি খুঁজে বের করা এমনি-ধারা আরও এমন সব বিসদৃশ ব্যাপার রয়েছে যে, দেখে মনে হয় গল্পও প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন নি, আর পরিচালনাও সুকুমার দাশগুপ্তের নয়। বিসদৃশতা চরমে পেঁাছয় শেষ দৃশ্যে শক্তিপদ বন্যায় আর্তের সেবায় যাবার নাম করে বিবাগী হবার পর। ললিতা যখন তাকে খুঁজে বার করলে, তখন দেখা গেল পাহাড়ের ওপরে সে দিব্যি তাঁবু খাটিয়ে ওষুধের শিশিপত্তর নিয়ে বসে আছে বেশ গুছিয়ে।

* * *

ছবিখানিতে সংলাপ অংশ লেখা ভালো; সাহিত্যরস সুস্পষ্ট। তবে চোখ বুজে শুনলে উপভোগ করা যায়—কিন্তু ছবি তো চোখ বুজে উপলব্ধি করার জিনিস নয়! কিন্তু চোখ খুললেই চোখে পড়ে বিসদৃশ ব্যাপার। যুবক নায়ক শক্তিপদর চরিত্রে ছবি বিশ্বাসকে দেখতে কারই বা ভাল লাগবে? যতোই তিনি যুবক সেজে গুছিয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন না কেন? তেমনি আবার বিদগ্ধচিত্ত হরিশ ডাক্তারের চরিত্রে জহর গাঙ্গুলীকেও সহ্য করা যায় না। অভিনয়ের দিক থেকে একমাত্র রেখাপাত করেন ধীরাজ ভট্টাচার্য দুষ্টচরিত্র স্কুলের সেক্রেটারী যতীনের ভূমিকায়। ললিতাকে পাবার জন্যে তার ফন্দী-ফিকির এবং সহানুভূতিজ্ঞাপক অথচ কুমতলবী বোকা-বোকা অভিব্যক্তি দর্শকমনে ওর অভিনয়-ক্ষমতার তারিফ উৎসারিত করে তোলে। ললিতার চরিত্রটির মধ্যে একটা দীপ্ত প্রকৃতি থাকবার কথা, কিন্তু অনুভা গুপ্তার অভিনয়ে তা ফোটেনি; অবশ্য তার জন্যে অভিনয় দাঁড় করাবার উপাদানের অভাবই দায়ী। প্রধানত বিজয়-গড়ের নার্স রমা ছিল শক্তিপদর আর এক প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী। এ চরিত্রটির মধ্যেও সামঞ্জস্যের অভাব—অদ্ভুত লাগলো কলকাতায় এসে জানাশোনা না থাকতেই ললিতার ঠিকানা বের করে ওর সঙ্গে দেখা করে যেতে। পাহাড়ী সান্যাল অভিনীত বিজয়গড়ের প্রবীণ ডাক্তার দামোর চরিত্রটি যে কি জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। ললিতার বৌদি যে কি কারণে ললিতার ওপর ও হিমুর ওপর খাপ্পা তা বোঝাই যায় না। তবে বাণী গাঙ্গুলী অভিনীত বৌদির দ্বারা এই কাজটিই হয়েছে, তা হচ্ছে ললিতাকে কলকাতায় মাস্টারী নিয়ে চলে যেতে বাধ্য করা। কিন্তু ললিতা কলকাতায় থাকলেও যা, আর কুসুমপুর গ্রামে থাকলেও তাই, গল্পের তাতে কোন সুবিধেই হয়নি। অন্যান্য চরিত্রে আছেন

স্বাগতা চক্রবর্তী, পণ্ডিত নটবর, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমাণী, তুলসী চক্রবর্তী, বাবুয়া প্রভৃতি।

* * *

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ছবিখানি গৃহীত তাই কলা-কৌশলের গুণ দেখা যায়। এদিকে আছেন আলোকচিত্রগ্রহণে নির্মল গুপ্ত; শব্দগ্রহণে শ্যামসুন্দর ঘোষ, শিল্প-নির্দেশে সত্যেন রায় চৌধুরী, সঙ্গীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা দুখানি ভালো গান আছে। কিন্তু এমনি মুহূর্তে গান দুখানির উপস্থাপন যে রস-সঞ্চারের চেয়ে বিরক্তিরই উৎপাদন করে। বম্বের মতো হঠাৎ একটা গান জুড়ে দেওয়া।

ফরমুলা বাঁধা "ছোট বৌ"

সেই বড়ো ভাই আর ছোট ভাই; বড়ো বৌ আর ছোট বৌ। পিতার মৃত্যুর পর নিজে না খেয়ে পরে নাবালক ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড়ো করে তোলা, তারপর দেখেশুনে ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেওয়া। সেই পাড়ার লোকের চেষ্টা দু'ভায়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে দুজনকে পৃথক করে দেওয়া। বড়ো ভায়ের নামে ছোট ভায়ের টাকা আত্মসাতের দুর্নাম রটানো। সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে ভিন্ন হয়ে যাওয়া। ভায়ে ভায়ে, বৌয়ে বৌয়ে অভিমানের প্রাচীর গড়ে তোলা এবং শেষে সেই প্রাচীরকে ভেঙে আবার মিলন। শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি", "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি যে সমাজ, যে ধরনের পারিবারিক কাঠামো, যে প্রকৃতির চরিত্র এবং মনোমালিন্য সৃষ্টির জন্যে যে ধরনের কথাবার্তা ও ঘটনা নিয়ে তৈরী "ছোট বৌ" সেই একই ফরমুলায় বাঁধা। একই ফরমুলাতে এই সেদিন "দত্তক"ও হয়ে গেল এবং এখন এমন হয়েছে যে, এ ধরনের ছবি দেখতে দেখতে দর্শকরা পর পর কি হবে না হবে, তা প্রায় মুখস্থই বলে যেতে থাকে। মূল গল্পের রচয়িতা আগেকার দিনের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক 'নারায়ণ ভট্টাচার্য'। তবে চিত্রনাট্যে ও পরিচালনায় গল্পটি এমনভাবে বিন্যস্ত যে, "দত্তক"-এর সঙ্গে খুব বেশী মিল হয়ে পড়েছে—অথবা একথাও বলা যায় যে, "দত্তক"ই নারায়ণ ভট্টাচার্যের লেখাটাই অনুসরণ করেছে। আর এ দুখানি ছবিই অনেকাংশে অনুসরণ করেছে "নিষ্কৃতি" আর "বিন্দুর ছেলে"র কাঠামো ধরে। কাজেই "ছোট বৌ" মৌলিক নতুন কিছু এনে দিতে পারেনি। ছবিখানির পরিচালনার মধ্যেও এমন কিছুই নেই, যার বিশেষ তারিফ না করে পারা যায় না। বিভিন্ন চরিত্রে শিল্পীরাও রয়েছেন প্রায় সেই একই সেট; সেদিক থেকেও আকর্ষণ ভোঁতা।

* * *

এ ছবিতে বড়ভাই তারণ ভট্টাচ[...] পিতার মৃত্যুর পর ছোটভাই গোপীনাথ[...] পড়িয়ে ডাক্তার করে তোলে। গোপীন[...] দাদা-বৌদি অন্ত প্রাণ। তারণ[...] বিন্দুবাসিনীও গোপীনাথকে সন্তানতু[ল্য] স্নেহ করে। ডাক্তারি পাশ করার [...] তারণ চাইলে গোপীনাথ গ্রামে ডিস্পেনসা[...] খুলে বসে। তারণ নিজে পছন্দ ক[...] গোপীনাথের সঙ্গে বিয়ে দি[...] সরোজিনীকে ঘরে আনলে। তারে[...] কাছে সরোজিনী সর্বগুণসম্পন্না; বিন্দ[...]

উত্তমকুমার ও সন্ধ্যারাণী—'কংকাবতীর ঘাট'এর একটি দৃশ্য

বাসিনীও 'সরো' বলতে পঞ্চমুখ, কিন্তু গোপীনাথ অসুখী। গোপীনাথ কলেজে পড়ার সময় ভালোবেসেছিল লিলিকে; লিলির ইচ্ছে গোপীনাথ বিলেত থেকে পাশ করে আসে, অথচ গোপীনাথের পক্ষে দাদার অভিপ্রায় ক্ষুণ্ণ করে লিলিকে খুশী করার উপায় ছিল না। লিলিকে না পাওয়ার সেই ক্ষোভটা গোপীনাথ প্রকাশ করতে লাগলো সরোজিনীকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করে। গোপীনাথের মনোভাবের পরিবর্তন হলো সরোজিনী বাপের বাড়ি চলে যেতে। কিছুদিন পর গোপীনাথের

মনের অবস্থা বুঝে বিন্দুবাসিনীর পরামর্শে তারণ সরোজিনীকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলো। বিন্দুবাসিনী সরোজিনীকে কোন কাজে হাত দিতে দিত না; সেটা অবশ্য স্নেহপরবশেই। তেমনি আবার বৌদিকে একা সব করতে দেখা গোপীনাথেরও ভালো লাগছিল না। সরোজিনী হেঁসেলের কাজে হাত দিতেই বিন্দুবাসিনীর মনে ব্যাপারটা অন্যরকম লাগলো। এই হলো দুর্যোগের বীজ।

তাকে আরও লালিত করে তুললে রাঁধুনী গোবরার মা। নগণ্য কথা, মনের স্বাভাবিক অবস্থায় তা গ্রাহ্যেই আসবার মতো নয়, কিন্তু সেইসব কথাই বিন্দুবাসিনীর অন্তরে মান-অভিমান বিক্ষোভের ঝড় বইয়ে দিলে। এর ওপর পাড়ার কুচক্রী লোকের ইন্ধন জোগানো তো ছিলই। নতুন বাড়ি হচ্ছে গোপীনাথের রোজগারের টাকায়; জমি কেনা বিন্দুবাসিনীর নামে। কুচক্রীরা এই নিয়ে তারণের নামে বদনাম রটালে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গোপীনাথের হিতৈষীও জুটলো, তবে গোপীনাথ তাদের কথায় বড়ো কান দেয় না। ব্যাপার সাংঘাতিক হলো বাড়ি তৈরীর খরচ বাবদ চারশো টাকা তারণের পকেটমারা যাওয়াতে। এই নিয়ে এমন ঘোঁট পাকলো, যার ফলে ভায়ে ভায়ে ভিন্ন হয়ে গেল; তারণ সর্বস্বই দিলে গোপীনাথের নামে এবং শেষে সেই চারশো টাকা চুরির বদনাম খণ্ডনের জন্য বিন্দুবাসিনীর হাতের এয়োতি-বালা জোড়াও দিয়ে দিলে। এদের ভায়ে ভায়ে ও জায়ে জায়ে ঝগড়া আসলে কিছুই ছিল না, কিন্তু ব্যাপার যা কিছু প্যাঁকিয়ে তুললে প্রতিবেশী পাঁচজনে। ভিন্ন হবার পর তারণ পড়লো অসুখে। অবস্থা খারাপের দিকে যেতে বিন্দুবাসিনী গোপীনাথের শ্যালক ও কম্পাউণ্ডার গোবিন্দকে দিয়ে গোপীনাথকে খবর দেওয়ার কথা জানালে। কথায় কথায় গোবিন্দ গোপীনাথ ভিজিট না হলে আসবে না, এমন কথা জানিয়ে দেয়। গোপীনাথের কথা নয়, গোবিন্দই নিজের থেকে সেকথা জানায়, কিন্তু বিন্দুবাসিনীর বিক্ষুব্ধ মনে তাতেই কাজ হলো। নিজের কান থেকে দুল খুলে গোবিন্দর হাতে দিলে ভিজিটের টাকা জোগাড় করতে এবং গোপীনাথ এসে দাদাকে দেখে চলে যাবার সময় সেই টাকায় ভিজিট দিয়ে গোপীনাথের মনকে একেবারেই ভেঙে দিলে। এরপর এলো গোপীনাথের নতুন বাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ' উৎসব। প্রতিবেশীদের ওপরে কাজের ভার। তারা রঙ্গ করে তারণের নামেও একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালে। তারণ অবশ্য এটাকে অপমান বলে গ্রাহ্য না করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলো। পুজোর সময় হলো, কিন্তু গোপীনাথের ওঠবার নাম নেই। হঠাৎ দাদার গলা শুনে নেমে এসে জানালে অনুষ্ঠান-কর্তা তার দাদা; কারণ বাড়ি বৌদি বিন্দুবাসিনীর নামে। কোন কথাই গোপীনাথ শুনবে না, তার দাদাকেই অনুষ্ঠানে বসতে হবে। ভায়ে ভায়ে মান-অভিমানের রেশ চোখের জলে ভেসে গেল। কিন্তু জোড়ে না হলে কাজ হয় না। গোপীনাথ দৌড়ে গেল বৌদিকে নিয়ে আসতে। ঘরের দরজা বন্ধ।

বাইরে থেকে গোপীনাথ অনুনয়ে বিনয়ে, কান্নায়-অভিমানে ভেঙে পড়লো। তবু দরজা খোলে না। শেষে গোপীনাথ দরজা ভেঙে ফেলার উদ্যোগ করতেই দরজা খুলে সরোজিনী বেরিয়ে এলো তার দিদিকে সাজিয়ে নিয়ে।

* * *

চমক লাগবার মতো কিছুই নেই। সবই সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়। ভূমিকালিপি সম্পর্কে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বড়োভাই আর ছোটভায়ের চরিত্রে নেমেছেন যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী. আর অসিতবরণ এবং বড়ো বৌ ও ছোট বৌয়ের চরিত্রে যথাক্রমে মলিনা দেবী ও সন্ধ্যারাণী। একই ভাবেরই অভিনয়, অবশ্য খারাপ লাগে না। গোপীনাথের শ্যালকের চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একাই হাসি উপভোগ করিয়ে সর্বাংশে গুমোটে আবহাওয়া এই ছবিখানিতে মনকে হাল্কা করার সুযোগ দেন। নমিতা সিংহ আছেন অল্পক্ষণের জন্য শহুরে মেয়ে লিলির চরিত্রে, গোপীনাথ যাকে প্রথম যৌবনে ভালবেসেছিল; কিন্তু কোন ছাপ পড়ে না নমিতার অভিনয় থেকে; আর তাকে দেখিয়েছেও ভালো নয়। প্রতিবেশীদের চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন—তুলসী চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, ধীরাজ দাস, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, আশা দেবী, সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতি। কুচক্রী, দুষ্টভাষী চরিত্র সব কটিই দেখে মনে হয় যেন প্রতিবেশী হলেই পরশ্রীকাতর বদ্‌প্রকৃতির হবেই হবে। গানের দিকটা ছাড়া ছবিখানির আঙ্গিক গঠনে কলাকৌশলের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব নেই; অনেক জায়গায় কথা জড়ানো। গান পাঁচখানি; তার মধ্যে একখানি হচ্ছে "ধন-ধান্যে পুষ্পে-ভরা"র একাংশ, বাকি চারখানির রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। কীর্তন-বাউল আদি সুর সংযোজনা করে সঙ্গীত পরিচালক কালীপদ সেন বেশ তৃপ্তিদায়ক গান পরিবেশনে সক্ষম হয়েছেন, অবশ্য তাঁকে অনেকখানি সহায়তা দিয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও গায়ত্রী বসুর কণ্ঠস্বর।

অরুণপ্রকাশ ও মঞ্জু দে—"বীর হাম্বির"এর দুটি চরিত্র

ছবিখানির সংগঠনে আছেন চিত্রনাট্য রচনায় বিজন ভট্টাচার্য, পরিচালনায় সতীশ দাশগুপ্ত; আলোকচিত্র গ্রহণে বিজয় দে, শব্দগ্রহণে শিশির চট্টোপাধ্যায় ও শিল্প-নির্দেশে স্বপন সেন।

মে মাসের রেকর্ড-গীতি

মে মাসে গ্রামোফোন কোম্পানী ও কলম্বিয়ার যে নূতন রেকর্ড বাজারে বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চারখানি রেকর্ড। হিজ মাস্টারস্ ভয়েসে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র গাহিয়াছেন (এন ৮২৬৫০) "তুমি তো সেই যাবেই চলে" ও "আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে।" শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গাহিয়াছেন (এন ৮২৬৫১) "রোদন ভরা এ বসন্ত" ও "আমার মিলন লাগি"। কলম্বিয়া রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গাহিয়াছেন (জি ই ২৪৭৫৭) "যখন ভাঙলো মিলন মেলা" ও "আমার এ পথ"। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (জি ই ২৪৭৫৮) গাহিয়াছেন "একলা বসে হের তোমার ছবি" ও "ওই জানালার কাছে।"

ইহা ছাড়া "রাণী রাসমণি" ছবির দুইখানি রেকর্ডে (জি ই ৩০২৮৬ এবং জি ই ৩০২৮৭) ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের চারখানি গান প্রকাশিত হইয়াছে।

একলব্য

'ঋতু ভেদে রুচি ভেদ' বলে একটি া আছে। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্তে একই নের জিনিস ভাল লাগে না। বিভিন্ন তুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন "য় নতুন নতুন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করতে। নন্তের উদাস হাওয়ায় মন উতলা হয়ে ঠে, আষাঢ়ের বারিধারা কবির কথা স্মরণ রিয়ে দেয়;—গ্রাম পথে পথে গন্ধ ছড়ায় তের আঁটি আঁটি সোনালী ধান। মনের ধ্যে জেগে ওঠে নতুন আবেশ। প্রাণ চায় তুনের স্বাদ পেতে। তেমন বিভিন্ন ঋতুর ঙ্গে আমাদের দেশের খেলাধুলারও একটা ম্পর্ক আছে। গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়বার ঙ্গে সঙ্গে মনের উত্তাপও বেড়ে ওঠে ন্মাদনা-জাগানো ফুটবল খেলা দেখার শায়। শীতের আমেজে ক্রিকেট খেলা ভাল াগে। বসন্তে মন ভরে হকির মাধুর্য ষমায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে ঙ্গে খেলাধুলারও পরিবর্তন হয়। অবশ্য—াবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফুটবল ক্রকেট ও হকি খেলার সময়ের এই পরিবর্তন ব্রটীশ শাসক সম্প্রদায়ের ক্রীড়ারসিকদের ৃষ্টি পুরনো ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার সঙ্গে বশ্বের অন্যান্য যায়গায় খেলাধুলার সময়ের তমন যোগাযোগ নেই। আজকাল আমাদের দেশের অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছেন গ্রীষ্ম-বর্ষার পরিবর্তে শীতকালে ফুটবল খেলার প্রচলন করা যায় কি না! ভবিষ্যতে এমন কিছু পরিবর্তনও অসম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের খেলাধুলার সূত্রপাত থেকে যে ব্যবস্থা চলে আসছে তার সঙ্গেই মিশে রয়েছে ক্রীড়া-মনা নাগরিকদের অন্তরের যোগাযোগ। তাই একটা খেলার মরসুম শেষ হলেই আর একটা খেলার নেশায় মন উতলা হয়ে ওঠে। বেটন কাপের ফাইনাল খেলার সঙ্গে সঙ্গেই হকি মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। পরের দিন থেকে ময়দানে আরম্ভ হয়েছে মন মাতানো, প্রাণ-মাতানো ফুটবল মরসুম।

* * *

বর্তমান ব্যবস্থা মত পয়লা মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত ফুটবল মরসুম। পয়লা থেকে ১৫ই অক্টোবর ময়দানে খেলাধুলা নিষেধ। ১৬ই অক্টোবর থেকে জানুয়ারী মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত ক্রিকেট মরসুম এবং পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত ময়দানে হকির অধিকার। এখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাগুলি শেষ না হওয়ায় প্রতি বছরই ফুটবল ক্রিকেট ও হকিকে অপরের গন্ডির মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে হয়। কলকাতার খেলাধুলার কর্ণধারেরা 'বহুরূপে এক বলে' এক রকমে সমস্যার সমাধান করে থাকেন। তবে শেষ দিকে তাড়াহুড়ো করে যেভাবে তারা খেলাগুলি শেষ করেন তাতে খেলার মাধুর্য এবং প্রতিযোগিতার মর্যাদা কিছুই বজায় থাকে না। একটানা রোজ রোজ খেলার ফলে খেলোয়াড়রা হয়ে পড়েন যন্ত্রবৎ, মেশিন। খেলতে হবে তাই খেলা। খেলার মধ্যে পাওয়া যায় না কোন নৈপুণ্যের আভাস। খেলা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতার মাধুর্যও ক্ষুন্ন হয়। অনেক সময় আবার খেলার ফলাফল মীমাংসা করাও সম্ভব হয় না। অরক্ষণীয়া কন্যার মত বিজয়ীর পুরস্কার সমর্পণ করতে হয় অজয়ীর হাতে। এবার বেটন কাপের ফাইন্যাল খেলায় এই দুশাই দেখা গেছে। খেলার জয়পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায় ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল—উত্তর প্রদেশ এবং ওয়েস্টার্ন রেলওয়েকে যুগ্মভাবে বেটন কাপ বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দুই দলের অধিনায়ক একই সঙ্গে কাপটি গ্রহণ করেন। পরে ভাগ্যের খেলায় অর্থাৎ 'টসে' ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে জয়লাভ করায় রেল দল প্রথম ৬ মাস ঐতিহাসিক বেটন কাপটি দখলে রাখবার অধিকারী হয়।

\- \- \-

যুগ্মভাবে বিজয়ীর সম্মান লাভ বেটন কাপের ইতিহাসে কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালে ভুপাল ওয়াণ্ডারার্স এবং ত্রিকমগড়ের ভগবন্ত ক্লাব, এবং ১৯৪৮ সালে উত্তর প্রদেশ এবং কলকাতার পোর্ট কমিশনার্স টীম যুগ্মভাবে বেটন কাপ লাভ করেছে। কিন্তু নক আউট প্রতিযোগিতায় এক দলের শরিক হিসাবে বিজয়ীর সম্মান লাভ কি ভাল দেখায়? নক আউট অর্থাৎ ঠেলে ফেলে দেওয়া। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে
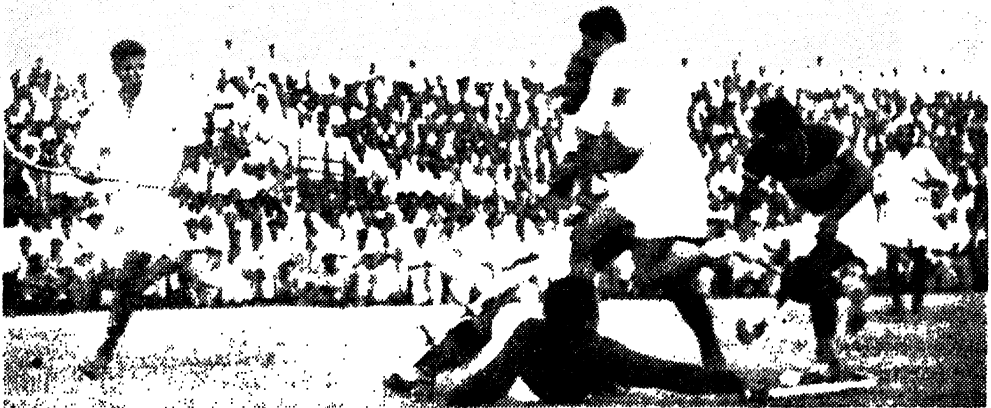
বেটন কাপের প্রথম দিনের ফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেলের গোলকিপার মোরেস মাটিতে শুয়ে পড়ে উত্তর প্রদেশের লেফট ইন ইদ্রিসের কাছ থেকে একটি গোল বাঁচাচ্ছেন

বেটন কাপে ওয়েস্টার্ন রেল ও মোহনবাগান ক্লাবের সেমি-ফাইনাল খেলার দৃশ্য। গোলকিপার বি সেনকে একটি বিপজ্জনক হিট আটকাতে দেখা যাচ্ছে

একে একে ঠেলে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তবেই হবে বিজয়ীর সম্মান লাভ। যদি কাউকে ঠেলে ফেলাই না গেল তবে কিসের বিজয়ী? দুই দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা নক আউটের আইনানুগ মীমাংসা নয়। একটি প্রতিযোগিতা শেষ করতে অক্ষম পরিচালকদের মধ্যপন্থা ব্যবস্থা। ভারতের ছোট বড় বহু হকি প্রতিযোগিতার মধ্যে বেটন কাপের খেলার আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী। 'বেটন' বিজয়ীর সম্মানও অনন্য। কিন্তু অতীতের নজির আছে বলে বার বারই যুগ্মভাবে বিজয়ী ঘোষণা করতে হবে, 'বেটন' পরিচালকদের পক্ষে এটা মোটেই কৃতিত্বের কথা নয়। অবশ্য অতীতে যারা নজির সৃষ্টি করেছেন বেটন পরিচালনায় আজ পর্যন্ত তাদেরই একচেটিয়া অধিকার বহাল আছে। তাই চক্ষুলজ্জার কোন বালাই নেই তাদের। একদল নতুন পরিচালকের হাতে কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলে নতুন উৎসাহে আরও ভালভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হতে পারে। আর যদি কর্তৃত্ব ছাড়তে তারা গররাজি হন তবে তাদের ভেবে দেখা উচিত ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা ঐতিহাসিক বেটন কাপের যথাযত মর্যাদা বজায় রেখে কি উপায়ে সুষ্ঠুভাবে খেলাগুলি শেষ করা যায়। আর সার্ভিসেস, নাগপুর ইউনাইটেড, হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌, বোম্বে লুসিটেনিয়ান্স, পাঞ্জাব পুলিস প্রভৃতি ভারতের শক্তিশালী হকি টীমগুলি বেটন কাপের খেলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে না কেন, সে বিষয়েও তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন।

* * *

এবার খেলার কথা। দুই একটি খেলা ছাড়া এবার বেটন কাপের কোন খেলাই হকি নৈপুণ্যের উন্নত কলা-চাতুর্যে প্রাণবন্ত হয়নি। কোয়ার্টার ফাইন্যালে বোম্বের টাটা স্পোর্টস ক্লাব এবং উত্তর প্রদেশের খেলাটি দর্শকদের সব চেয়ে আনন্দ দিয়েছে। টাটা স্পোর্টস গত দু'বছরের বেটন বিজয়ী। সুতরাং বিজয়ী হবার বড় আশা করে তারা কলকাতায় এসেছিল, কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় উত্তর প্রদেশের কাছে হার স্বীকার করে তাদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। টাটা এবং উত্তর প্রদেশের খেলায় দুই দলেরই কয়েকজন খেলোয়াড় উন্নত হকি নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। টাটার বিরুদ্ধে উত্তর প্রদেশের জয়লাভের মূলে প্রধানত ছিলেন তাদের সুনিপুণ অধিনায়ক দিগ্বিজয় সিং অর্থা বাবু। ভারতীয় হকি সমাজে দিগ্বিজয় সি 'বাবু' নামে পরিচিত। হকির কলা-নৈপুণ্যে যাদুকর ধ্যানচাঁদের পরই বাবুর নাম ক যেতে পারে। বয়সের গুণে বাবু অব কমজোরী হয়ে পড়েছেন তবুও উন্নত হকি মাধুর্য-সুষমায় বাবু এখনো ভাস্বর।

ওয়েস্টার্ন রেল এবং উত্তর প্রদে ফাইন্যালে উঠায় ভারতের দুই প্রাক্ত অলিম্পিক হকি অধিনায়কের পরস্প প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার চমৎকার যোগাযো ঘটে। উত্তর প্রদেশের অধিনায়ক বাব

বেটন কাপের যুগ্ম বিজয়ী ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে হকি টীম। উত্তর প্রদেশের সঙ্গে দুই দিন গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ হবার পর 'টসে' বিজয়ী হয়ে ওয়েস্টার্ন রেল প্রথম ৬ মাস বেটন কাপ দখলে রাখবার অধিকারী হয়েছে

বেটন কাপ ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দুই অধিনায়ক কিষেণলাল ও বাবু। দুইজনই ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক হকি অধিনায়ক। কিষেণলাল (বাঁ দিকে) ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে এবং বাবু ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন

৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে এবং য়েস্টার্ন রেল দলের অধিনায়ক কিষেণলাল ার আগে ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে রতের অধিনায়কত্ব করেছেন। বেটন ইন্যালের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছাড়া এদের লো দেখবার আকর্ষণও কম ছিল না। ই প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলায় ক্যালকাটা ঠ যেমন জনাকীর্ণ হয়েছিল হকি খেলায় মন জনসমাগম বহুদিন দেখা যায়নি। ন্তু খেলাটি দর্শকদের আনন্দ দিতে াটেই সক্ষম হয়নি। তা ছাড়া খেলার সময় ই দলের অযৌক্তিক ফাউল এবং অহেতুক ন্টক' চালাচালি খেলার মাধুর্য ক্ষুণ্ন করে। াউল জনিত ঘটনায় এক সময় একটু প্রীতিকর আবহাওয়ারও সৃষ্টি হয়। খেলার ঠে এই অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি খুবই ন্দনীয়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অবশ্য ান অপ্রীতিকর আবহাওয়া প্রত্যক্ষ করা য়নি। বেশ সুস্থ পরিবেশের মধ্যে খেলাটি য় হয়। ওয়েস্টার্ন রেলের অধিনায়ক ষেণলাল বর্তমানে প্রবীণ খেলোয়াড়ের র্যায়ভুক্ত। কিন্তু অনলস কর্মীর মত সারা মাঠে ঘোরাফেরা করে তিনি যেমন উন্নত হকি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা এখনকার হকি খেলোয়াড়দের দৃষ্টান্তস্বরূপ। রেল দলের যাদব, এণ্টিক, স্যাকারি, সিদ্দিক এবং উত্তর প্রদেশের মালহোত্র, ইদ্রিস ও অনিল দাসের খেলায় সময় সময় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও সামগ্রিকভাবে খেলাটিকে কোনভাবেই উন্নত পর্যায়ের হকি খেলা বলে বর্ণনা করা যায় না। হকিতে ভারত বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা। সেই ভারতের শ্রেষ্ঠ নক আউট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে দুই দলের ক্রীড়ামান ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাউকেই আশাবাদী করে তুলতে পারে নি।

বিশ্বের দরবারে হকি খেলায় যে ভারত গত ২৫ বছরেরও বেশী শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে দুটি শক্তিশালী দলের এই খেলা! একথা বার বারই মনে হয়েছে—সকল দর্শকের মনে। কবিগুরুর জন্মদিনের সঙ্গে বেটন ফাইন্যালের কোনরকমের সম্বন্ধ থাকবার কথা নয়। তবুও কি জানি কেন যেন ঘটনাচক্রে কবির জন্ম-দিনেই বহুবার ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবার অবশ্য দ্বিতীয় দিনের খেলা হয়েছিল কবির জন্মদিনে, কিন্তু গতবার ২৫শে বৈশাখই অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলা। এই শুভদিনে ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হবার আরও নজির আছে। সকাল বেলা কবিগুরুর এক স্মরণী উৎসবে গান শুনেছিলাম—'হে নূতন দেখা দিক আর বার......'। সুরের ঝঙ্কার অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানে লেগেছিল। বেটন কাপের ফাইন্যাল খেলা দেখবার সময়ও। কিন্তু খেলায় দেখছি বার বারই তাল কেটে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে খেলার ছন্দোময় গতি। 'অসীমের চির বিস্ময়' ভারতীয় হকির কাছে তাই কবির কথায় বলতে ইচ্ছে হয়েছিল আপনারে আবার উন্মোচন করো। খেলার মধ্যে প্রকাশ করো নিজের মাধুর্যসুষমা। 'তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন, সূর্যের মতন'। উদয় দিগন্তে তোমার আহ্বানের শঙ্খ বাজে। তোমার বিস্ময় আবার জাগিয়ে তোল।

* * *

হকি খেলায় ভারত এখন পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হলেও অন্যান্য দেশ হকি খেলায় যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আর কতদিন ভারত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারবে এবিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। ভারতীয় হকির কর্মকর্তাদের দৃঢ় বিশ্বাস মেলবোর্ন অলিম্পিকেও ভারত বিশ্ব-জয়ীর সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু তারপর কি হবে বলা বড় শক্ত। এই প্রসঙ্গে ভারতের অফিসিয়াল হকি কোচ শ্রীহাবুল মুখার্জী যে কথা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীমুখার্জী বলেছেন ভারতীয় হকির কায়দা কানুন, তার সূক্ষ্ম কারিকুরি, নিজস্ব বৈশিষ্ট সবই বিদেশের হকি টীমগুলো জেনে ফেলেছে, অনেকে জানবার চেষ্টা করছে। সবাই এখন চাইছে ভারতের কাছে হকি কোচ, হকির ট্রেনার। উদ্দেশ্য ভারতের কাছ থেকে হকির কায়দা কানুন শিখে ভারতকেই পরাজিত করা। এই অবস্থায় ভারতকে তার ক্রীড়াধারা পরিবর্তন করতে হবে। আজ দেশে বিদেশে ফুটবলের গবেষণা চলছে। কোন্ পদ্ধতি ভাল। কিভাবে খেললে প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাজিত করা যায়? তিন ব্যাক প্রথায় না তৃতীয় ব্যাক প্রথায় কিম্বা ডব্লিউ ফরমেশনের আক্রমণ রচনায়। সব দেশেই আজ ফুটবলের গবেষণা। হকি খেলায় ক্রীড়া পদ্ধতিরও কিছু পরিবর্তন করা যায় কিনা এ বিষয়েও ভারতীয় হকি ফেডারেশনের গবেষণা করা উচিত। হকিতে বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা হিসাবে ভারত যদি এই গবেষণা না করে কে করবে?

ভারতের বর্তমান কুশলী খেলোয়াড়দের সম্পর্কে শ্রীমুখার্জীর অভিমতঃ অলিম্পিক খেলার পক্ষে বর্তমানে কারুরই শারীরিক পটুতা নেই। প্রশ্ন করেছিলাম—'একজনেরও না'। উত্তেজিত উত্তর—'না—একজনেরও

না'। আবার প্রশ্ন—'কবে এরা পটুতা অর্জন করবে? উত্তর—নিয়মিত অনুশীলনের ফলে, সাধনার ফলে। দেশে দেশে অলিম্পিক প্রস্তুতি চলছে। ভারত নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে থাকবে না। এখনো একবছর সময় আছে তার মধ্যে সবাই শারীরিক দক্ষতা অর্জন করবে। আর ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাতে যে নৈপুণ্য এবং মাথায় যে বুদ্ধি আছে তাতে এবারও ভারত হকির বিজয় মুকুট লাভ করতে পারবে।

* * *

এফ এ কাপের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডের ক্রীড়া সমাজে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল গত ৭ই মে তার উপর যবনিকা পড়েছে। ফাইন্যালে 'ম্যানচেষ্টার সিটিকে' ৩—১ গোলে হারিয়ে 'নিউক্যাসেল' লাভ করেছে এফ এ কাপ। ফুটবলের ক্রীড়াতীর্থ ইংলণ্ডে এফ এ কাপ বিজয়ীর সম্মান অনন্য। এবার নিয়ে নিউ ক্যাসেল টীম ৬ বার এফ এ কাপ লাভ করলো। ফাইন্যাল খেলা দেখবার জন্য ওয়েম্বলী ষ্টেডিয়ামে রাণী এলিজাবেথ ও এডিনবরার ডিউক সহ প্রায় এক লাখ দর্শকের সমাগম হয়েছিল, কিন্তু খেলা দেখার টিকিটের চাহিদা ছিল দ্বিগুণ কি তিন গুণ কি তারও বেশী। আমাদের দেশে ফুটবল খেলার উপযুক্ত ষ্টেডিয়াম নেই বলে আমরা হৈ চৈ করি, কিন্তু ওদেশে ষ্টেডিয়াম থেকেও বহু লোকে খেলা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ওদেশে খেলা দেখার কত আগ্রহ এর থেকেই তা বুঝা যায়। ফাইনাল খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নামে মাত্র ১২ খানা করে টিকিট মঞ্জুর করা হয়েছিল—আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য। কিন্তু এই কলকাতায় মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে ক্লাব-কর্তৃপক্ষ এক একজন খেলোয়াড়কে এক এক গোছা টিকিট দিয়েও মন পান না। অসন্তুষ্টি লেগেই আছে। ওদেশের খেলোয়াড়দের মনোবৃত্তির সঙ্গে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের মনোবৃত্তির কত পার্থক্য তা বুঝাবার জন্য এই ছোট ঘটনার উল্লেখ।

* * * *

ইংলণ্ডের ক্রিকেট অধিনায়ক পেশাদার খেলোয়াড় লেন হাটন এম সি সি-র কাছ থেকে এক অতুলনীয় সম্মান লাভ করেছেন। এম সি সি অর্থাৎ মেরিলীবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবকে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা বলা যেতে পারে। আভিজাত্যগর্বী এম সি সি-র সুদীর্ঘ ক্লাব ইতিহাসে এই পর্যন্ত কোন পেশাদার খেলোয়াড়কে যে সম্মান দান করেন নি, লেন হাটনকে অবৈতনিক সদস্য করে নিয়ে সেই সম্মান দান করেছেন। হাটনকে অবৈতনিক সদস্য-পদ প্রদানের জন্য এম সি সি-র সভ্য গ্রহণের নিয়মতন্ত্রেরও কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। এম সি সি-র দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন ইংলণ্ড ক্রিকেটের শুভলক্ষণ। হাটন ইংলণ্ডের প্রথম পেশাদার অধিনায়ক এবং পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে এম সি সি-র প্রথম সদস্য হয়ে ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠার এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন। ইংলণ্ডের ক্রীড়া সমাজে পেশাদার এবং শৌখীন খেলোয়াড়দের সম্মানের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রাচীর খাড়া করা হয়েছিল। শৌখীন খেলোয়াড়রা আগে পেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে একসঙ্গে খানাপিনা করতেও লজ্জাবোধ করতেন। পেশাদার খেলোয়াড়দের সাজগোছের ঘরও আলাদা ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে শৌখীন খেলোয়াড়দের ঝুটো মর্যাদার আভিজাত্য ইংলণ্ড থেকে সরে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে চলতে জানে ব্রিটিশ জাতি, এ ঘটনা তারই ছোট্ট প্রমাণ।
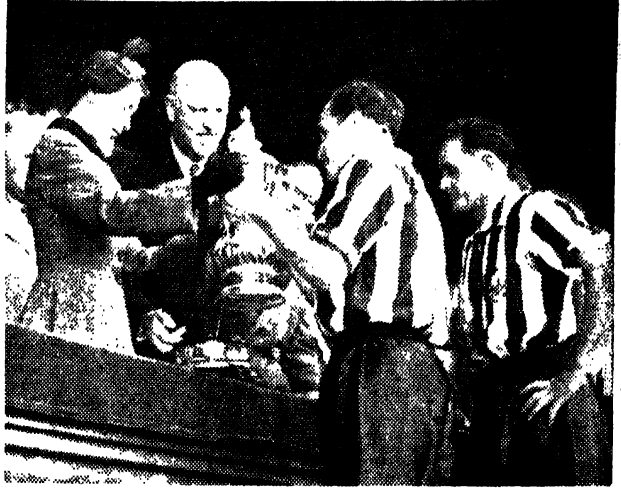
রাণী এলিজাবেথ নিউ ক্যাসেলের অধিনায়ক জিমি স্কাউলারের হাতে ইংলণ্ড-ফুটবলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—এফ এ কাপ তুলে দিচ্ছেন

খেলাধুলোর অন্যান্য খবর

গোল্ড কাপ হকি—বোম্বের গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় লুসিটেনিয়ান্স ক্লাব ২—১ গোলে নাগপুরের ভাগোয়াগর ক্লাবকে হারিয়ে কাপ লাভ করেছে। গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতা এই বছর থেকেই আরম্ভ হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। গোল্ড কাপ হকি পরিচালনার জন্য তিনি বোম্বে হকি এসোসিয়েশনকে ১০ হাজার টাকা দান করেছেন। গোল্ড কাপ হকিকে ইনভিটেশন হকি প্রতিযোগিতার পরিপূরক বলা যেতে পারে। ইনভিটেশন হকির পরিবর্তে গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডেভিস কাপ—গত সপ্তাহে বিভিন্ন দেশে ডেভিস কাপের বিভিন্ন খেলায় মিশর, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়া এবং চিলি জয়লাভ করেছে। মিশর ৪—১ খেলায় তুরস্ককে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে। অস্ট্রিয়া ৫—০ খেলায় ফিনল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেয়। অস্ট্রিয়াকে এখন খেলতে হবে বৃটেনের সঙ্গে। পর্তুগালকে ৫—০ খেলায় পরাজিত করায় চেকোশ্লোভেকিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে বেলজিয়ামের সঙ্গে খেলবার অধিকার পায়। চিলি হাঙ্গারীর সঙ্গে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে যুগোশ্লাভিয়াকে ৫—০ খেলায় হারাবার পর।

টমাস কাপ—টমাস কাপের মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য এশিয়া অঞ্চলের বিজয়ী ভারতের খেলোয়াড়বৃন্দ আগামী ২০শে মে সিঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করবেন। ২৪শে ও ২৫শে সিঙ্গাপুরে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। টি এন শেঠ (উত্তর প্রদেশ), মনোজ গুহ (বাঙলা), নন্দ নাটেকার (বোম্বাই), গজানন হেম্যাডি (বাঙলা) ও রবীন্দ্র ডোংরে (বোম্বাই) ভারতের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

শী সংবাদ

২৫শে এপ্রিল—অদ্য কলিকাতা কর্পো শনের সভায় কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের তা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার য়র ও ডাঃ অমরনাথ মুখার্জি ডেপুটি য়র নির্বাচিত হন।

২৬শে এপ্রিল—দেশে নির্বাচনপদ্ধতি হজতর ও অপেক্ষাকৃত কম জটিলতাপূর্ণ রিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন দ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন সাধনের স্তাব করিয়াছেন।

২৭শে এপ্রিল—ভারতের প্রধানমন্ত্রী ীজওহরলাল নেহরু বান্দুং সম্মেলন হইতে বমানযোগে আজ সন্ধ্যায় দমদম বিমানঘাটিতে দার্পণ করিলে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ রেন।

২৯শে এপ্রিল—পূর্ব পাকিস্থানের ধ্য দিয়া সরাসরি মালগাড়ী চলাচল গত ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে বন্ধ হওয়ার পর দ্য প্রথম মাল গাড়ীটি কলিকাতা হইতে াত্রা করে। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বলেই এই সরাসরি মাল চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৃটিশ ইস্পাত মিশন ভারতে পরবর্তী ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য পশ্চিম-বঙ্গের দুর্গাপুরকেই নির্বাচিত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৩০শে এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় জানান যে, বান্দুং-এ ফরমোজা সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আরও আলোচনা করিবার জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেননকে পিকিং যাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

অদ্য লোকসভা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বিল গ্রহণ করেন। উহাতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয়করণের বিধান করা হইয়াছে।

২রা মে—সৌদি আরবের যুবরাজ, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমীর ফৈজল অল সৌদ তিনদিনব্যাপী ভারত সফরের জন্য অদ্য নয়াদিল্লীর পালাম বিমানঘাটিতে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

৩রা মে—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন অদ্য আগরতলায় সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ করেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, সুতীবস্ত্রের আমদানী শুল্ক কিছু হ্রাস করা হইবে।

৪ঠা মে—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, গোয়ার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যদি আর একজন সত্যাগ্রহীকেও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল হইতে বিদেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বিল গৃহীত হইবার পর অদ্য রাজ্যসভার তিনমাস ব্যাপী বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য পণ্ডিত কুঞ্জরু এবং সর্দার পাণিকর আগরতলা হইতে বিমানযোগে শিলচরে উপনীত হন এবং সেখানে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

৫ই মে—আজ লোকসভায় দল নির্বিশেষে সমস্ত সদস্যের হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দনের মধ্যে হিন্দু বিবাহ বিল গৃহীত হয়।

৭ই মে—হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সংসদের উভয় সভার জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ না করিয়াই লোকসভার অধিবেশন অদ্য অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

অদ্য কলিকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকার পুরাতন অফিসে পশ্চিমবঙ্গ বিপ্লবী কর্মী সম্মেলন আরম্ভ হয়। প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলিপুরের প্রথম ট্রাইব্যুনালের জজ শ্রী আর কে দত্তগুপ্ত আজ দমদম বসিরহাট হানা মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় ভারতীয় বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের দলত্যাগী নেতা পান্নালাল দাশগুপ্ত ও অপর বাইশ জন সদস্য সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত হন। জজ পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ দশজন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অপর দশজন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনজন আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

৮ই মে—আজ বহরমপুরে (গঞ্জাম) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এই প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেন। এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের শেষে 'বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা' সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হয়, তাহাতে গভীর আস্থা প্রকাশ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে এপ্রিল—সায়গনে দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের প্রধানমন্ত্রী গো দিন দিয়েম পরিচালিত সরকারী সৈন্যদল এবং জঙ্গী সর্দারগণের বেসরকারী সৈন্যদলের মধ্যে দুই দিনব্যাপী সংগ্রামের ফলে অদ্য রাত্রিতে নিহতের সংখ্যা অন্যূন ৩০০ এবং আহতের সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক দাঁড়াইয়াছে।

১লা মে—পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ অদ্য এক ঘোষণা প্রচার করিয়া গণ-মজলিসের নির্বাচন স্থগিত রাখিয়াছেন।

ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী গো দিন দিয়েম ঘোষণা করিয়াছেন যে, জেনারেল গুয়েন ভ্যান ভি সামরিক অভ্যুত্থানের যে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। জেনারেল ভ্যান ভি রাজধানী হইতে ১৪০ মাইল দূরে এক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন।

৫ই মে—পাকিস্থানের নিকট হইতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া আফগান সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া আফগান বেতারে জানান হইয়াছে।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জাতীয় কংগ্রেস অদ্য সায়গনে রাষ্ট্রের প্রধান বাও দাইকে পদচ্যুত করার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে।

৬ই মে—পাকিস্থানের পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক সিনিয়ার অফিসার বলেন যে, ১৫ই মে তারিখের মধ্যে পাকিস্থানের দূতাবাসের উপর আক্রমণের 'সম্পূর্ণ ও যথাযোগ্য' ক্ষতিপূরণ না দিলে পাকিস্থান আফগানিস্থানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিবে এবং অর্থনৈতিক প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময়

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর পাঁচ দিবসব্যাপী আলোচনার ফল কি দাঁড়াইল, এই সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মনে বিশেষভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। কাশ্মীরের সমস্যা সম্বন্ধেই প্রধানত এই আলোচনা হয়। শোনা যায়, উভয় প্রধান মন্ত্রীই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা চালান এবং হৃদ্যতার প্রতিবেশে এই আলোচনা পরিচালিত হয়। কাশ্মীরের সমস্যাই উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রীতির অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মুহম্মদ আলীর মুখে আমরা এরূপ কথা শুনিয়াছি। সুতরাং এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য উভয় রাষ্ট্রের কল্যাণকামীদের বিশেষভাবেই আগ্রহ থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশক্তিপুঞ্জের দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের তদারকের ফলে এই প্রশ্নের জটিলতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুত কাশ্মীর সমস্যার সম্বন্ধে বিবেচনা এখন নূতন আকারে করিতে হইবে। এই সম্পর্কে অতীতের পটভূমিকা এখন অকেজো হইয়া পড়িতেছে। কাশ্মীরের অধিবাসীরা কি চায়, ইহাই প্রধানত বিবেচ্য। তাহাদের মতের বিরুদ্ধে ভারত কি পাকিস্থান, কেহই পৃথকভাবে নিজের নিজের অভিমত কিংবা সম্মিলিতভাবে উভয়ের অভিমত চাপাইয়া দিতে পারেন না। এই সহজ সত্যটি স্বীকার করিয়া লইলে প্রশ্নের সমাধানের পথ সহজ হইয়া আসে এবং এক্ষেত্রে গণভোটের কথা এখন আর উঠে না। কারণ কাশ্মীরের অধিবাসীরা নিজেদের গণপরিষদের মারফতে সুদৃঢ়ভাবেই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান কর্তৃক কাশ্মীরের জবর-দখল এলাকা কাশ্মীরবাসীরা ফিরাইয়া চায়। তাহাদের কাছে ইহা ছাড়া অপর কোন প্রশ্নই বর্তমানে অমীমাংসিত নাই। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরবাসীদের এই অভিমত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন কি? যদি না থাকেন, তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যা সমাধানের জন্য আর কার্যকর কোন পন্থা নির্দেশ করিতে পারেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই আলোচনার গতি এবং প্রকৃতিতে চুলচেরা তর্ক-যুক্তির বিচার কিংবা বিন্যাস আমরা অনর্থক বলিয়াই মনে করি। ফলত পাকিস্থান যদি ভারতের সঙ্গে মৈত্রীই কামনা করে এবং সেই দিক হইতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আন্তরিক আগ্রহ যদি তাহার থাকে, তবে, কাশ্মীরের গণপরিষদের দাবী সোজাসুজি মানিয়া লইয়া এই ইতি দেওয়াই তাহার কর্তব্য। দিল্লীর সাম্প্রতিক আলোচনার ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্পর্কে প্রথম বাধা দূর হইয়াছে, ইহাই পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর অভিমত। তথাপি সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ রকমে আগ্রহশীল নহি। মার্কিন জাতির সামরিক সাহায্যে পরিপুষ্ট পাকিস্থানের মনস্তাত্ত্বিকতা এ সম্বন্ধে আমাদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করে না।

ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য

শ্রীখাণ্ডুভাই দেশাই কেন্দ্রীয় সর
শ্রমসচিব। বোম্বাইয়ের শ্রম সম্মে
সভাপতিস্বরূপে তিনি শ্রমিক
মনিবদের মধ্যে সহযোগিতা দৃঢ় ব
জন্য আবেদন করেন। তিনি
অতীতে মনিব এবং শ্রমিকদের
আর্থিক বৈষম্যগত বড় রকমের
ছিল, এই ব্যবধান দূর না হইলে
শিল্প-বাণিজ্যের সংগঠন ক্ষেত্রে যু
ঘটানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। শ্র
বলেন, পুঁজিবাদীদের মতিগতি
পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তাঁহাদে
সত্য উপলব্ধি করা দরকার যে, অর্থ
করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ
ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইল
সেবা। তাঁহারা জাতির ধনস
আছি। জাতির সেবা করার
ভগবান্ তাঁহাদের হাতে ঐসব
করিয়াছেন। শ্রীযুত দেশাইয়ের উ
গুলি খুবই মূল্যবান সন্দেহ নাই
সব নীতিকথা আমরা নূতনও শু
না; বস্তুত কংগ্রেস বহুদিন
অর্থনীতিক সাম্যের এই লক্ষ্য লইয়
করিতেছে। ধনী-দরিদ্রের অর্থ
বৈষম্য দূর করাই গান্ধীজীর জী
আদর্শ ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষ
যে, এই আদর্শ জাতির সম্মুখে
সত্ত্বেও আমাদের সমাজ-জীবনে
বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন সাধন
সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে স্ব
প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও অর্থ
বৈষম্যের গতানুগতিক ধারাতেই
কংগ্রেসকর্মী, তাঁহাদেরও মনস্তা
সাড়া দিতে থাকে। কংগ্রেস-স

ীযুত ধেবরের ভাষায় কংগ্রেসকর্মীরাও
াতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে তাঁহাদের
বার্থসিদ্ধির খোলা মাঠস্বরূপে লাভ
রেন এবং সেই আশায় কংগ্রেস-প্রীতি
ুঁজিবাদীদের মধ্যেও উথলিয়া উঠিতে
াকে। এই প্রতিবেশের পরিবর্তন সাধন
রিতে হইলে দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিকী
রিকল্পনার কার্যক্রম অর্থনীতিক বৈষম্য
ূরীকরণের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।
মসচিব শ্রীযুত দেশাই সে সম্বন্ধে
মাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি
লিয়াছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-
ল্পনা ধনী ও দরিদ্রের ভিতরকার
্যবধান হ্রাস করিবার দিকে নিয়ন্ত্রণ
রা হইবে এবং সেই পরিকল্পনায় দরিদ্র
: মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার
ান বিশেষভাবেই উন্নীত করা হইবে!
কৃতপক্ষে এ দেশের ধনী বা পুঁজিবাদী
ম্প্রদায়ের মতিগতি শুধু নীতিকথায়
লাইবে না। তাঁহারা যাহাতে অর্থ-
ত্ত্ব সম্পর্কে গতানুগতিক মনোভাব
রিবর্তন করিতে বাধ্য হন, সমাজ-
ীবনের সর্বত্র তদুপযোগী চেতনা
াগাইয়া তোলাই একান্তভাবে আবশ্যক।
লা বাহুল্য, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী
রিকল্পনায় এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়
াই।

ুমিত্ব ও নীতি

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের
াস্তুত্যাগের গতি বৃদ্ধির কারণ এমন
িছু আন্তর্জাতিক দুরূহ তত্ত্বকস্তু নয়;
িন্তু ভারত সরকার ইহাকে অনেকটা
ুই পর্যায়ে ফেলিয়া ক্রমাগত এই সম্বন্ধে
লোচনা ও গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।
কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র বিভাগের শ্রীঅনিলকুমার
ন্দ দেখিতেছি এই তত্ত্বের গ্রন্থি সরাসরি
োচন করিয়াছেন। পাকিস্থানের সংখ্যা-
ঘু বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গিয়াসুদ্দীন
ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে পূর্ববঙ্গ
রভ্রমণ করিয়া আসিয়া তিনি ভারত
রকারের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট পেশ
রিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা
খানকার অর্থনীতিক পরিস্থিতির জন্য
াস্তুত্যাগ করিতেছেন, একথা আদৌ
ত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের বাস্তু-
াগের কারণ রাজনীতিক এবং রাজ-
নীতিক দিক হইতেই এই সমস্যার সমাধান
হইতে পারে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের
রাজনীতিক সমস্যার স্বরূপ কি, চন্দ
মহাশয় তাহাও ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন
নাই। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গে
হিন্দুরা নিজেদের নিরাপত্তা বোধ করেন
না। তাহাদের উপর অত্যাচার অবিচার
হয়, অথচ তাহার যথাযোগ্য প্রতীকার
সম্বন্ধে শাসকবর্গ উদাসীন। সরকারী
চাকুরি প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা হিন্দুদের
নাই; অধিকন্তু শাসন-বিভাগের চাপে
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতেও তাঁহারা
বিতাড়িত হইতেছেন। নিজেদের সংস্কৃতির
উপযোগী শিক্ষালাভের সুবিধা হিন্দুদের
সেখানে নাই। ইহার উপর হিন্দুদিগকে
বয়কট করিবার সামাজিক ব্যবস্থাও সেখানে
অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য,
এই অবস্থা স্বীকার করিয়া পূর্ববঙ্গে
পড়িয়া থাকিতে হইলে হিন্দুদের ক্রীত-
দাসের জীবন অবলম্বন করা ভিন্ন উপায়
নাই এবং সে পথে তাহাদের অস্তিত্ব
বিলুপ্ত হইবে, ইহাই নিশ্চিত পরিণতি।
এইরূপ অবস্থায় হিন্দুদিগকে পূর্ববঙ্গ
পরিত্যাগ করিয়া না আসিতে বলিবার
কোন অধিকার ভারত সরকারের আছে
বলিয়া আমরা মনে করি না।

যাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা

নয়াদিল্লীতে জাতীয় মিউজিয়ামের
নব-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে
ভারতের প্রধান মন্ত্রী জাতীয় জীবনে
মিউজিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে
কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিমত
প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে প্রাগৈতি-
হাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত
মানব-সমাজের অগ্রগতি কিরূপভাবে
সম্প্রসারিত হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি
করাইবার যোগ্যতার উপরই মিউজিয়ামের
সার্থকতা নির্ভর করে। আমাদের
বিশ্বাস কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের।
আমাদের মতে অতীত যুগ হইতে
বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবসমাজের
ক্রমবিকাশের ধারাটি ধরাইয়া দেওয়াই
যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির
মর্যাদাবোধকে মনে জাগাইয়া সেই
সংহতিকে সুদৃঢ় করাও মিউজিয়মের
উদ্দেশ্য। ভারতের মতো বিরাট এবং
বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত দেশের এই
প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার পক্ষে কেন্দ্রীয়
একটি প্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট নয়। প্রত্যুত
বিভিন্ন রাজ্যে এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত
হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে বৈচিত্র্যের
ভিতর দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির অখণ্ড
একটি স্বরূপ দেশবাসীর মনে জাগ্রত
হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সংগৃহীত
জিনিসের বৈচিত্র্য, দুর্লভত্ব এবং
অসাধারণত্বজনিত বিস্ময়ের বশে এদেশে
এই প্রতিষ্ঠান যাদুঘর, আজব ঘর
প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। জাতীয়
সম্পদ ও সাধনার মনন সম্পর্কে জন-
সাধারণের মধ্যে সেই বিস্ময়কে জাগ্রত
করিয়া চিন্তাশীলতায় গতিবেগ সঞ্চার
করার ওপর এই সব সংগ্রহশালা-
সমূহের সার্থকতা নির্ভর করে।
এজন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষিত এবং
স্বদেশপ্রেমিক সেবাধর্মী তত্ত্বাবধায়কদের
উপর এগুলির ভার অর্পিত হওয়া
উচিত।

পরলোকে বিজয়রত্ন মজুমদার

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রখ্যাত সাংবাদিক
এবং সাহিত্যিক শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার
পরলোকগমন করিয়াছেন। মজুমদার
মহাশয় বহুদিন যাবৎ 'বাঙলা' নামক
সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।
সাময়িক মন্তব্যপূর্ণ তাঁহার লেখা জন-
সাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইত।
তিনি বাঙলা দেশের রাজনীতির সহিত
গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কিন্তু
সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাঁহার এই সংযোগ-
সম্পর্ক প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকিত।
তাঁহার রচনা-রীতি সরস এবং সাবলীল
ছিল এবং তাঁহার নিজের একটি
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁহার লেখাগুলির
ভিতর দিয়া পাওয়া যাইত। তিনি অত্যন্ত
অমায়িক এবং মধুর প্রকৃতির লোক
ছিলেন এবং আলাপ আলোচনায় আসর
জমাইয়া তুলিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল।
তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী লেখক এবং
স্বদেশ প্রেমিকের মৃত্যুতে এদেশের
চিন্তাশীল সমাজের বিশেষ ক্ষতি ঘটিল।
আমরা মজুমদার মহাশয়ের শোক সন্তপ্ত
পরিজনবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা
জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈদেশিকী

চার বৃহৎ শক্তির অর্থাৎ মার্কিন, সোভিয়েট, বৃটিশ এবং ফরাসী গভর্নমেণ্টের প্রধানদের মিলিত হবার প্রস্তাব কোথায় এবং কী পরিবেশে কার্যে পরিণত হবে অথবা শীঘ্র অর্থাৎ দু-এক মাসের মধ্যে আদৌ হবে কিনা, তা বলা কঠিন। পশ্চিমা শক্তিদের প্রস্তাব সোভিয়েট কর্তারা "বিশেষ যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করছেন," এখন পর্যন্ত লিখিতপড়িতভাবে কোন উত্তর দেন নি। বলা বাহুল্য এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কথাও যেমন উঠে না, তেমনি বিনাশর্তে এককথায় রাজী হবার মতো বিষয়ও এটা নয়। যদি শেষ পর্যন্ত কনফারেন্স হয়, তবে তার আগেই অনেক বিষয়ে মতের আদানপ্রদান, কথা-কাটাকাটি, দরাদরি চলবে এবং উভয়-পক্ষই চাইবে (এবং চেষ্টা করবে), এমন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে কনফারেন্সের সংঘটন যাতে নিজেদের সুবিধা হয়।

কনফারেন্স হবেই এবং হলে সফল হবে—এরকম নিশ্চয় করে কোনো পক্ষই কাজ করছে না, বরঞ্চ কনফারেন্স যদি না হয় অথবা হয়ে ব্যর্থ হয়, তাহলে কী হবে, তার জন্য প্রস্তুত হওয়াই উভয়পক্ষের প্রধান চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ এবং উহাকে NATOর মধ্যে আনার চুক্তি বিভিন্ন দেশের পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত করিয়ে তবে পশ্চিমা শক্তিদের পক্ষ থেকে চার প্রধানের বৈঠকের প্রস্তাব করা হয়েছে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এই চুক্তি আটকাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বলেছিলেন যে, এই চুক্তি যদি হয়, তবে গত যুদ্ধের সময় রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে এবং রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের জন্য যে বন্ধুতার চুক্তি হয়েছিল, সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে। পশ্চিমা শক্তিরা সেকথা শোনেনি, রাশিয়াও বৃটেন ও ফরাসীর সহিত যুদ্ধের সময়ে সম্পাদিত বন্ধুত্বের চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে। NATOর প্রত্যুত্তর হিসাবে রাশিয়া। পূর্ব য়ুরোপের কম্যুনিস্ট-শাসিত দেশ-গুলির সামরিক সংহতি দৃঢ়তর করবার ব্যবস্থা করছে। সম্প্রতি ওয়ার্সাতে আটটি দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তাদের একটি সম্মেলন হয়েছে, যাতে একটি সম্মিলিত সামরিক নেতৃত্ব অর্থাৎ Joint Command প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করতে আসেন সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন এবং পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভ। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমা তিন বৃহৎ শক্তির মস্কোস্থিত রাজদূতগণ যেদিন স্ব স্ব গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে চার প্রধানের বৈঠকের প্রস্তাব-সম্বলিত চিঠি সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরে দিতে যান, সেইদিনই মার্শাল বুলগানিন এবং মঃ মলোটভ মস্কো থেকে বিমানযোগে ওয়ার্সায় পৌঁছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উভয়পক্ষই "মুখে হরি বলো, হাতে কাজ কর" এই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। একদিকে পশ্চিম জার্মানীকে যেমন NATOতে ঢুকানো হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে পূর্ব জার্মানীকে পরিকল্পিত কম্যুনিস্ট সামরিক Joint Commandএর আওতায় আনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জার্মান সমস্যার ভবিষ্যতের উপরেই চার প্রধানের বৈঠকের প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ প্রধানত নির্ভর করছে। জার্মানীকে নিরস্ত্র করে যদি রাখা না যায়, তবে জার্মানীকে অন্তত নিরপেক্ষ করে রাখার চেষ্টা রাশিয়া ছাড়বে না। পশ্চিম জার্মানীকে NATOর কবলের বাইরে আনার চেষ্টা থেকে রাশিয়া নিবৃত্ত হয়নি।

পশ্চিম জার্মানী NATOর অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকবে—এই ভিত্তির উপরে চার প্রধানের বৈঠকে যোগ দিতে রাশিয়ার কোনো আগ্রহ হতে পারে না। এরূপ ভিত্তি শিথিল বা নষ্ট করাই সোভিয়েট নীতির লক্ষ্য। তারপর সোভিয়েটের হাতে কোনো অস্ত্র নেই তা নয়। দ্বিধা-বিভক্ত জার্মানীর ঐক্যসাধন এখন জার্মান জাতির সর্বপ্রধান কাম্য। জার্মানী যদি পশ্চিমা শক্তিদের সামরিক ব্যবস্থার বাইরে এসে নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, তবে জার্মানীর

ঐক্যসাধনে রুশ-সহযোগিতা মিলবে—এই যুক্তি ও আশ্বাস জার্মানদের নিকট মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। জার্মানী যদি সত্যই নিরপেক্ষ থাকে, তবে রাশিয়া সারা জার্মানীতে স্বাধীন নির্বাচনের শর্তেও রাজী হতে পারে, যদিও তার ফলে পূর্ব জার্মানীতে বর্তমানে অধিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট কর্তৃত্বের অবসান ঘটার সম্ভাবনা খুবই বেশি। পূর্ব জার্মানীর উপর কর্তৃত্ব ছাড়াতেও হয়ত রুশিয়ার আপত্তি হবে না, যদি তার দ্বারা সমগ্র জার্মানীকে নিরপেক্ষ করা যায়।

সম্প্রতি অস্ট্রিয়া সম্পর্কে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে নীতি অনুসরণ করেছেন, সেটা অনেকটা জার্মানদের উপর চোখ রেখে এবং জার্মানদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে সন্দেহ নেই। অস্ট্রিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে রাশিয়া এতদিন টালবাহনা করছিল বলে অনেকের ধারণা ছিল—অন্তত পশ্চিমা শক্তিদের এই অভিযোগ ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী এবং মস্কোতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার ফলে যেসব শর্ত স্বীকৃত হয়, তাতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পথের বাধা দূর হয়ে যায়। এই শর্তের মধ্যে যেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো এই যে, অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকবে এবং যেমন সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সেই নিরপেক্ষতার গ্যারাণ্টি দেবেন, তেমনি পশ্চিমা শক্তিদেরও অনুরূপ গ্যারাণ্টি দিতে হবে। অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা অস্ট্রিয়ার সংবিধানের অঙ্গীভূত করতে হবে। সকল পক্ষ এই শর্তে স্বীকৃত হওয়ায় অস্ট্রিয়ার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। অস্ট্রিয়া আবার সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হ'লো। অস্ট্রিয়াবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই অস্ট্রিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারিত হবে। এই ব্যাপারের প্রভাব জার্মানদের মনের উপর নিশ্চয়ই কিছুটা পড়বে। তারা ভাববে—অন্তত রাশিয়া তাই আশা করছে—যে কোনো দলে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকলে তারাও অস্ট্রিয়ার মতো স্বাধীনতা লাভ করতে পারে এবং তাদের দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণ হতে পারে। অস্ট্রিয়া এবং জার্মানীর সমস্যার মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু মোটের উপর নিরপেক্ষতার আকর্ষণ উভয়ের পক্ষে অন্তত আপাতত অনেকটা এক রকমের।

নিরপেক্ষতার দ্বারা জার্মানদের সম্পূর্ণ প্রলুব্ধ করতে অপারগ হলেও সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট একেবারে নিরুপায় হবেন তা নয়। পশ্চিম জার্মানী যদি আপাতত NATO-র মধ্যেও থেকে যায় তাহলেও জার্মানদের কূটনৈতিক স্বাধীনতা অনিবার্য। তখন জার্মানদের সঙ্গে রাশিয়ার একটা আলাদা চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা হবে। কেবল জার্মানীর ঐক্যসাধনের ব্যাপারে নয়, জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কেও জার্মানীকে কিছু দেবার মতো জিনিস রাশিয়ার হাতে আছে। জার্মানীর বর্তমান পূর্ব সীমান্ত কখনই জার্মানদের মনঃপূত হতে পারে না। বিনা যুদ্ধে সেই সীমানার পরিবর্তন কখনো পশ্চিমা শক্তিদের সাধ্যায়ত্ত নয়, কিন্তু রাশিয়া ইচ্ছা করলে তা করতে পারে, কারণ রাশিয়া যদি চায়, তবে পোল্যাণ্ডকে বাধ্য হয়ে তার পশ্চিম সীমানা সঙ্কুচিত করতে হবে। অতীতে হিটলার-স্তালিন প্যাক্ট যদি অসম্ভব না হয়ে থাকে, তবে ভবিষ্যতে জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার আবার একটা প্যাক্ট হওয়াও অসম্ভব না হতে পারে—পশ্চিমা শক্তিদের এই ভয় আছে।

এই জটিল অবস্থার মধ্যে চার প্রধানের সাক্ষাৎ হলেই সব সমস্যা মিটে যাবে, এরকম আশা করা বাতুলতা। আসলে আগে থাকতে যদি সমস্যা সমাধানের ভিত্তি প্রস্তুত না হয়ে থাকে, তবে বড়োকর্তাদের সাক্ষাৎকারে কিছুই হবে না, বরঞ্চ সম্মেলন হয়ে যদি তা ব্যর্থ হয় তবে তার ফল আরো খারাপ হবে। তার দায়িত্ব কোনো পক্ষই নিতে চাইবে না। সম্মেলন সংঘটনের পথে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগের চেয়ে তা আরো অনেক বেশি গুরুতর হবে।

*   *   *

১৫ই মে তারিখের মধ্যে যদি আফগানিস্তান পাকিস্তানের দাবী না মেনে নেয়, তবে পাকিস্তান গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। মধ্যবর্তীরা আপস করার চেষ্টা করছেন। এই অজুহাতে পাকিস্তানী গবর্নমেণ্ট তাঁদের চরমপত্রের হুমকি কার্যে পরিণত করার দায় থেকে আপাতত নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। ইতিমধ্যে চারটি দেশের কর্তৃপক্ষ পাক-আফগানিস্তানের বিবাদভঞ্জনের জন্য মধ্যবর্তী হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন—মিশর, তুরস্ক, সৌদি আরব এবং ইরাক। এদের মধ্যে সৌদি আরবের রাজার খুড়ো কাবুল ও করাচীর মধ্যে যাতায়াত করেছেন—এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, অন্যেরা কে কী করছেন জানা যায় নি। পাকিস্তান সরকার কিন্তু সকলের মধ্যবর্তিতাকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। অবস্থাটা কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ সন্দেহ নেই। মধ্যবর্তী অনেকজন হলেও, বিবাদের মূল বিষয়টা কী তা কিন্তু ঠিক হোল না। গত ৩০এ মার্চ তারিখে কাবুলে পাকিস্তানী দূতাবাসের উপর আক্রমণ ও পাকিস্তানী পতাকার অবমাননার কথা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের আলোচনা পাকিস্তান চায় না। অন্যপক্ষে আফগানিস্তান বলছে পাকতুনিস্তানের প্রশ্নই রয়েছে সমস্যার আসল মূলে। যাই হোক, একটা কথা বুঝা গেছে—পাকিস্তান এখন রক্তারক্তি কিছু করবে না। সেটা সৌদি আরব বা তুরস্কের খাতিরে বোধহয় ততটা নয়। সম্ভবত ইঙ্গ-মার্কিন হুঁশিয়ারী একটা কিছু এসেছে।

*   *   *

এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত ভারতীয় ও পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা শেষ হয়নি ও তার ফলও কিছু জানা যায় নি। অবশ্য ফল বিশেষ কিছু হবে—বিশেষ করে কাশ্মীর সম্বন্ধে—সে আশাও কেউ করছে না। মিঃ মহম্মদ আলির এখন দিল্লীতে আসার প্রধান লক্ষ্য বোধহয় পাকিস্তানী গবর্নমেণ্টের ইজ্জত। বর্তমানে দেশের লোকের কাছে পাকিস্তানী মন্ত্রিমণ্ডলীর মান বড়ো খাটো হয়ে গেছে—তাকে একটু বাড়াবার জন্যেই বোধহয় দিল্লীতে এসে দেখানোর চেষ্টা "আমরা ঠিক আছি।"

১৭-৫-৫৫

মৃত্যু

অজিত দত্ত

প্রচণ্ড লেলিহ কোনো বহ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গের কণা
অকস্মাৎ দীপ্ত বেগে অস্তিত্বের একেবারে কাছে
ছুটে এলো। হৃদয়েরে স্পর্শ ক'রে, ঘুমন্ত চেতনা
উত্তাপে জাগ্রত ক'রে, অন্তরের আনাচে কানাচে
দীপ্তি দিয়ে, তৃপ্তি দিয়ে প্রীতির তৃষ্ণারে, সে সহসা
অন্ধকারে মিশে গেল নিরাকৃতি ছায়ার মতন।
যেন কোন্ ঘূর্ণমান্ জ্বলন্ত সূর্যের থেকে খসা
সদ্যোজাত কোনো এক বহ্নিময় গ্রহ; কিছুক্ষণ
শস্যে ফুলে ফলে আর অজস্র পার্থিব সমারোহে
দৈনন্দিন আবর্তনে ছিল অন্য পৃথিবীর মত।
তারো বক্ষ জুড়ে ছিল নরনারীশিশু জৈব মোহে
একান্তে জড়ায়ে পরস্পরে। সে-আকাশে লক্ষশত
আশা আর স্বপ্ন ছিল বর্ণময়। আজ অকস্মাৎ
তমসার প্রলয় প্লাবনে সেই ফুল ফল, সেই প্রাণ,
সেই বর্ণচ্ছটা, সেই তাপতৃষ্ণা, সেই দিনরাত
আর তার সাথে মেঘ-তারা-ফুল-আশা-ভাষা-গান
সব কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই হোত ভালো, যদি
ওই আলো, ওই প্রীতি, নিশ্ছিদ্র লুপ্তিতে চিরতরে
চেতনা-সীমান্ত পারে চলে যেত। যদি নিরবধি
সে লুপ্ত গ্রহের তাপ প্রাণের নদীর কূল ভ'রে
স্মৃতির উচ্ছ্বাস নিয়ে আজো নিত্য বয়ে নাহি যেত।
তবু কী বিস্ময়! আজ লুপ্তিতেও অবলুপ্ত নয়
সে-স্ফুলিঙ্গ চেতনার বিশ্বরূপ হ'তে। আজো সে তো
নিজে নিবে গিয়ে তারি আলো হ'তে জ্বলা জ্যোতির্ময়
শিখাগুলি যায়নি নিবিয়ে। স্মরণের দাহ রেখে
নিয়ে চলে গিয়েছে সে সান্নিধ্যের উষ্ণতার স্বাদ।
মনের আকাশ ভ'রে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া এঁকে
বিনিঃশেষে মুছে নিয়ে চলে গেছে আলোর প্রসাদ।

সকলি নশ্বর যদি, সত্য যদি অনুভূতিময়
চেতনা কেবল, তবু সত্য হোক মানবের ভাষা
স্মৃতির ছোঁয়ায়; আর জীবনের যদি লুপ্তি হয়,
তবুও সে রেখে যাক কাব্যে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা॥

আজাদ কাশ্মীর

সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

দ্বি-জাতিতত্ত্ব (Two nation theory) এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের কথা। ইংরেজ ভারত ছাড়িয়াছে। ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ৪ঠা অক্টোবর পাকিস্থানী খবরের কাগজগুলি জানাইল যে, রাওয়ালপিণ্ডির প্যারিস হোটেলে একটি সভায় আজাদ কাশ্মীর সরকার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ৩রা অক্টোবর এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় গৃহীত একটি ঘোষণাপত্রে বলা হয়—"১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে মহারাজা হরিসিং-এর (কাশ্মীর) শাসনের অধিকার লোপ পাইয়াছে ......। সুতরাং ১৯৪৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর হইতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল......

(Maharaja Hari Singh's title to rule has come to an end from August 15, 1947, and he has no constitutional or moral right to rule over the people of Kashmir against their will. He is consequently deposed with effect from October 4, 1947......).

মুজাফ্ফরাবাদে অস্থায়ী কাশ্মীর সরকার স্থাপিত হইল। এই অস্থায়ী সরকারের কর্ণধারগণের সঠিক পরিচয় জানা যায় না।

আনওয়ার আজাদ কাশ্মীর সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি। এই আনওয়ার খুব সম্ভব কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের অন্যতম নেতা গোলাম নবী গিলকার। আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠনের অব্যবহিত পরেই মহারাজা হরিসিংকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে আনওয়ার শ্রীনগর যাত্রা করিলেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কাশ্মীর সরকারের আদেশে তিনি কারারুদ্ধ হন। কিন্তু তিনিই যে আজাদ কাশ্মীর সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি, কাহারও মনে এ সন্দেহ জাগে নাই।

১৯৪৭ সালের ২৪শে অক্টোবর মুসলিম কনফারেন্সের অন্যতম নেতা সর্দার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খানের নেতৃত্বে নূতন করিয়া আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠিত হয়। রাওয়ালপিণ্ডিতে নবগঠিত সরকারের দপ্তর স্থাপিত হইল। ইব্রাহিম খান রাওয়ালপিণ্ডির সরকারী এবং বে-সরকারী মহলের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। জম্মু এবং কাশ্মীরের যে অংশ ভারতবর্ষের সহিত যোগদান করিয়াছে, সে অংশ হইতে বহু মুসলমান আসিয়া আজাদ কাশ্মীরের পক্ষে যোগদান করিল। পুঞ্চ এবং মীরপুর অঞ্চলের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণের সহায়তায় আজাদ কাশ্মীর বাহিনী গড়িয়া উঠিল।

১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। পরিষদের সমক্ষে আজাদ কাশ্মীরের বক্তব্য পেশ করিবার উদ্দেশ্যে ইব্রাহিম এবং তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা তাসের (M. D. Tasser) এই সময় আমেরিকা যাত্রা করেন। পরিষদ ইঁহাদের কথা শুনিতে রাজি হইলেন না। ইব্রাহিম এবং তাঁহার মুরুব্বিদিগের সাধে বাদ পড়িল। ইব্রাহিম দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আজাদ কাশ্মীরের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি চৌধুরী আব্বাস এবং ইব্রাহিম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে যুদ্ধের আসরে নামিলেন। আর ইঁহাদের বিরোধের সুযোগে পাকিস্থান সরকার আজাদ কাশ্মীরকে হাতের মুঠায় আনিয়া ফেলিলেন। আজাদ কাশ্মীর সরকারের 'আজাদী' লোপ পাইল। এদিকে মুসলিম কনফারেন্সের যে সমস্ত নামকরা নেতা কাশ্মীরে কারারুদ্ধ ছিলেন, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ আবদুল্লা সরকার তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। সরকার ইঁহাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া পাকিস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আব্বাসের সমর্থক। ২রা মার্চ শিয়ালকোটে কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের কার্য-নির্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে আজাদ কাশ্মীর সরকারকে মুসলিম কনফারেন্সের পরিচালনাধীন করিবার সিদ্ধান্ত হয়।

মুসলিম কনফারেন্স বা আজাদ কাশ্মীর সরকারের পশ্চাতে কোনদিনই জনমতের সমর্থন ছিল না। আজও আছে কিনা সন্দেহ। শিয়ালকোটের অধিবেশন এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর মুসলিম কনফারেন্সের স্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। এই সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চৌধুরী আব্বাসের মনোনীত। শিয়ালকোটের সভার পর চৌধুরী আব্বাস স্বৈরাচারী শাসকের মত যাহা খুশি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আব্বাসের স্বৈরাচার বেশিদিন চলিল না। ১৯৪৯ সালের ৫ই মে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, এই অজুহাতে তিনি সাময়িকভাবে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আল্লা রাখা সাগর (Alla Rakha Sagar) মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। পদত্যাগের পূর্বে আব্বাসই তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। মুসলিম কনফারেন্সের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই মনোনয়ন অসিদ্ধ। সুতরাং কর্মিগণের তরফ হইতে এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল। আব্বাস এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন না। সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আল্লা রাখা সাগর সাধারণ সম্পাদক আগা সৌকত আলি এবং কার্যনির্বাহক সমিতির কয়েকজন সদস্যকে পদচ্যুত করিলেন। রাখা সাগরের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ ইঁহাদের স্থান গ্রহণ করিলেন। জম্মু এবং কাশ্মীরের যে অংশ ভারতবর্ষে যোগদান করিয়াছে, সেখানকার বহু মুসলমান পাকিস্থান এবং আজাদ কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রাখা সাগরের অবিবেচনা এবং অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের

কনফারেন্সের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন ১৯৫০ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি মুসলিম কনফারেন্সের এক সাধারণ সভা আহ্বান করিলেন। সভায় উপস্থিত ন্যূনাধিক সত্তরজন সদস্যের মধ্যে পঞ্চাশ জনই আব্বাস কর্তৃক মনোনীত হইয়া ছিলেন। সভা তাঁহাকে মুসলিম কনফারেন্স এবং আজাদ কাশ্মীর সরকারের যে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে এই সভার অধিবেশন হয়। অধিবেশনকালে মীর ওয়েইজ য়ুসুফ সাহব, মুসলিম কনফারেন্সের কর্মিগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে আব্বাসের সমর্থকদিগের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ হয়। ফলে কয়েকজন জখম হয়।

আব্বাস ইহার পর নূতন করিয়া আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠন করিলেন সৈয়দ আলি আহম্মদ শাহ নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি মনোনীত হইলেন পাকিস্থান সরকার আব্বাসের কায অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রথমত

সূচনা হইল। জায়গায় জায়গায় ইঁহাদের মধ্যে দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া গেল। কিছু-দিনের মধ্যেই নূতন একটি মুসলিম কনফারেন্স গঠিত হইল। আজাদ কাশ্মীর সরকারের মন্ত্রী মীর ওয়েইজ য়ুসুফ শাহ ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এইবার আজাদ কাশ্মীরের কর্তৃত্ব লইয়া স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদীদিগের মধ্যে নির্লজ্জ কলহ বাধিয়া গেল। আজাদ কাশ্মীর সরকারের রাষ্ট্রপতি সর্দার ইব্রাহিম আল্লা রাখা সাগর এবং তাঁহার মনোনীত কার্যনির্বাহক সমিতির কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন।

এদিকে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতি দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিল। যুদ্ধের ফলে আজাদ কাশ্মীরের বহু অধিবাসী সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। ইহার জন্য তাহাদের শুভানুধ্যায়ী পাকিস্থানী এবং সীমান্তের হানাদার বাহিনীর কৃতিত্ব কতখানি, সে তথ্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আজাদ কাশ্মীরের অর্থনৈতিক সংগঠন ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ। দেশের সর্বত্র বেকার সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাধির প্রকোপে জনসাধারণ প্রপীড়িত। শরণার্থী-দিগের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা আজাদ কাশ্মীরের একটি প্রধান সমস্যা। আজাদ কাশ্মীরে গেলেই আকাশের চাঁদ হাতের মুঠায় আসিবে, এই আশায় ভারতভুক্ত কাশ্মীরের বহু মুসলমান অধিবাসী আজাদ কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আজও ইহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় নাই। বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে ইহাদের দিন কাটিতেছে। আশ্রয়, অন্নবস্ত্র এবং চিকিৎসার অভাবে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যের জন্য পাকি-স্থান সরকার যে অর্থসাহায্য দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আজাদ কাশ্মীর সরকারের কর্ণধার এবং তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও অনুগ্রহভাজনদিগের স্ফীতোদর স্ফীততর করিতেছে। যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ইহারাই ভোগ করে। বৃহত্তর জনসাধারণের কথা কেহই চিন্তা করে না।

নেতৃবৃন্দ কিন্তু ক্ষমতার লড়াইতেই মত্ত। ইব্রাহিম কিছুতেই রাখা সাগরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেন না। সুযোগ বুঝিয়া চৌধুরী আব্বাস পুনরায় মুসলিম

ইব্রাহিমকেই নবগঠিত সরকারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী নির্বাচনে তাঁহার মতামতের কোন মূল্য থাকিবে না, এইজন্য ইব্রাহিম সম্মত হন নাই।

আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসী এবং রণার্থী সকলেই মুসলিম কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দের আচরণে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ইব্রাহিম ইহাদিগের সাহায্যতায় ক্ষমতা হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন। আব্বাসের বিরোধী দল গঠনতন্ত্রসম্মত গণতান্ত্রিক প্রণালীতে মুসলিম কনফারেন্স এবং আজাদ কাশ্মীর সরকারের পুনর্গঠনের দাবী করিল। মীর ওয়েইজকে সভাপতি এবং মীর আবদুল আজিজকে সম্পাদক করিয়া একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটির নেতৃত্বে আজাদ কাশ্মীরে নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলন বেশিদিন নিরুপদ্রব রহিল না। সরকার প্রায় ৫০০ আন্দোলনকারীকে কারারুদ্ধ করিলেন। কঠোর হস্তে যাবতীয় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ এবং আন্দোলন দমনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। আন্দোলন কিন্তু দিনের পর দিন তীব্র হইয়া উঠিল। আজাদ কাশ্মীর পুলিস আন্দোলন দমনে অসমর্থ হইয়া পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনীর শরণাপন্ন হইল। জায়গায় জায়গায় আন্দোলনকারী এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছোট-খাট যুদ্ধ হইয়া গেল। পুঞ্চ এলাকায় রওয়ালাকোট (Rawalakot) এবং পাল্লান্দ্রিতে (Pallandri) এই রকম দুইটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। এই আন্দোলন সংক্রান্ত বহু তথ্যই আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত।

১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে মুসলিম কনফারেন্সের সদস্যগণের মধ্যে আব্বাসের বিরোধীদিগের এক সভায় কর্নেল শেখ আহম্মদ খাঁ নিখিল জম্মু এবং কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি এবং মীর আবদুল আজিজ ইহার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। কনফারেন্সের কেন্দ্রীয় দপ্তর ইহার পর রাওয়ালপিণ্ডি হইতে পুঞ্চে স্থানান্তরিত হইল। ইব্রাহিম এবং শের মাহম্মদ খাঁ আজাদ কাশ্মীর সরকারের পুনর্গঠনের দাবী জানাইলেন। আব্বাস এবং তদীয় সমর্থকবৃন্দ ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। মে মাসে আজাদ কাশ্মীরের এক প্রতিনিধি দল পাকিস্থান সরকারের কাশ্মীর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব এম এ গুরমানির সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিগণ আজাদ কাশ্মীর সরকারের যাবতীয় দুষ্কৃতি ও দুর্নীতির কথা পাকিস্থান সরকারকে জানাইয়া ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। আজাদ কাশ্মীর সরকারের নীতি এবং কার্যকলাপে জনসাধারণ যে ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে, একথাও তাঁহারা বলিলেন। এই সমস্ত অনাচার কিভাবে দূর করা যায়, নবাব গুরমানি সে সম্বন্ধে ইঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। প্রতিনিধিগণ নিজেদের মতামত জানাইলেন।

জুন মাসে ইব্রাহিমের নেতৃত্বে আস্থাবান মুসলিম কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দের এক সভায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পুঞ্চে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী আজাদ কাশ্মীর সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটিও গঠিত হইল। শান্তিভঙ্গ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের আশংকা করিয়া পাকিস্থান সরকার আজাদ কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইব্রাহিমের সমর্থকগণ কিন্তু দমিলেন না। ধীরকোটে ইব্রাহিমের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম কনফারেন্সের সাধারণ সমিতির অধিবেশন আহূত হইল। এই অধিবেশনে ১৯৫১ সালের ২৯শে আগস্ট প্রতিদ্বন্দ্বী আজাদ কাশ্মীর সরকার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কে কে এই সরকারের কর্ণধার হইবেন, তাহাও স্থির হইল। একটি ঘোষণার খসড়াও রচিত হইল।

ইহার পর পাকিস্থান সরকারের চেষ্টায় আব্বাস এবং ইব্রাহিম এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরও ইঁহাদের বিরোধ মিটিল না। পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধি ইহার পর কোহালায় ইব্রাহিমের অনুসারী আজাদ কাশ্মীর নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী আজাদ কাশ্মীর সরকার স্থাপনের তারিখ এক মাস পিছাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল।

পাকিস্থান সরকার কোন সিদ্ধান্তেই আসিতে পারিলেন না। প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁ স্বচক্ষে আজাদ কাশ্মীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া অন্তর্বিরোধ এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানের সংকল্প করিলেন। আজাদ কাশ্মীরের পথে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক জনসভায় আততায়ীর গুলীতে তাঁহার জীবনান্ত হয়। নভেম্বর মাসে নূতন প্রধান মন্ত্রী নাজিমউদ্দীন এবং অপর দুইজন মন্ত্রী রাওয়ালপিণ্ডিতে আজাদ কাশ্মীরের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের সুপারিশ করিলেন। আব্বাস রাজি হইলেন না। পীড়াপীড়ি করায় তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর নিকট তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। মুসলিম কনফারেন্স বা আজাদ কাশ্মীর সরকারের যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন স্বাধীনতাই নাই, আব্বাসের আচরণই তাহার প্রমাণ। মুসলিম কনফারেন্স বা আজাদ কাশ্মীর সরকার যদি সত্যই স্বাধীন হইতেন, তাহা হইলে আব্বাস স্বীয় অনুগত মুসলিম কনফারেন্সের কার্য-নির্বাহক সমিতির নিকটই পদত্যাগপত্র দাখিল করিতেন।

আব্বাসের পদত্যাগের পর পাকিস্থান প্রকাশ্যেই আজাদ কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। পাকিস্থান সরকার ঘোষণা করিলেন যে, তিন মাসের মধ্যে মুসলিম কনফারেন্সের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নবনির্বাচিত কনফারেন্স স্বীয় কার্য-নির্বাহক সমিতি এবং আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠন করিবেন। ২রা ডিসেম্বর (১৯৫১) মীর ওয়েইজ য়ুসুফ শাহ পাকিস্থান সরকারের আদেশে সাময়িক-ভাবে আজাদ কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মীর ওয়েইজকে শিখণ্ডী করিয়া পাকিস্থান সরকার আজাদ কাশ্মীরকে স্বীয় পদানত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

আব্বাসের পতনে ইব্রাহিম এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু আজাদ কাশ্মীরের

আজাদী এবং গণতন্ত্রের পথ যে চিরকালের মত কণ্টকাকীর্ণ হইয়া গেল, সে কথা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না।

১৯৫২ সালের প্রথম দিকে মুসলিম কনফারেন্সের সাধারণ নির্বাচন হয়। ইব্রাহিমের দল কনফারেন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। ইব্রাহিম নবগঠিত কনফারেন্সের সভাপতি এবং কুরেশী মাহাম্মদ মুসুফ ইহার সাধারণ সম্পাদক বাঁচিত হইলেন। মুজাফ্ফরাবাদের রাজা মোহাম্মদ হায়দরকে আজাদ কাশ্মীর সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হইল।

পাকিস্থান মোহাম্মদ হায়দরের সরকারকে স্বীকার না করিয়া আর একটি আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠন করিলেন ২১শে জুন, ১৯৫২)। এই সরকারের সভাপতি এবং মন্ত্রিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে করাচীর মনোনীত সরকারী কর্মচারী মাত্র। আজাদ কাশ্মীর এইবার পাকিস্থানের উপনিবেশে পরিণত হইল। ইব্রাহিমের দলের মধ্যমণি কর্নেল শের আহম্মদ খান করাচীর মনোনীত আজাদ কাশ্মীর সরকারের সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন।

করাচীর ইঙ্গিতে শের আহম্মদ খান কয়েকটি বিধান (Rules of business) প্রবর্তন করিলেন (২৮শে অক্টোবর, ১৯৫২)। ইহার ফলে আজাদ কাশ্মীর কার্যত পাকিস্থানের অধীন প্রদেশে পরিণত হইল।*—প্রগতিশীল রাষ্ট্রের বহু পৌর-প্রতিষ্ঠানও আজাদ কাশ্মীর সরকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী।

মুসলিম কনফারেন্স দাবী করে যে, ইহাই আজাদ কাশ্মীরের একমাত্র প্রতিনিধি। পাকিস্থান সরকারও মুখে তাহাই স্বীকার করেন। কিন্তু অন্তত তিনটি মুসলিম কনফারেন্স আজাদ কাশ্মীরে বর্তমান ইহারা প্রত্যেকেই ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইব্রাহিম, আব্বাস এবং মীর ওয়েইজ, ইঁহারা প্রত্যেকেই এক-একটি মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি। ইঁহাদের মধ্যে আব্বাসের সমস্ত চেষ্টাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধের সুযোগে পাকিস্থান সরকার আজাদ কাশ্মীরে সর্বেসর্বা হইয়া বসিয়াছেন।

১৯৫৩ সালের ১৪ই মার্চ মীরপুরে আব্বাসের সমর্থক মুসলিম কনফারেন্স কর্মীদিগের এক বৈঠকে আব্বাসের পুনরায় রাজনীতির আসরে নামিবার কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৫১ সালের শেষের দিকে তিনি রজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বেই একথা বলা হইয়াছে। মীরপুরের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাবে আব্বাসের অনুসৃত মুসলিম কনফারেন্সের প্রগতিবিরোধী, উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্থানের আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলন সমর্থন করা হয়। আহমদিয়া সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু অ-মুসলমান সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পাকিস্থান সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। আব্বাস ঘোষণা করিলেন যে, কাশ্মীরের মুক্তি-সাধনের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং শীঘ্রই এই পরিকল্পনা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। অল্পদিনের মধ্যেই আব্বাসের পরিকল্পনার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। মীরপুর অধিবেশনের কয়েকদিন পর গুজরানওয়ালাতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে আব্বাস বলেন যে, জাতিপুঞ্জ পরিষদের মধ্যস্থতা বা ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া তাঁহার এবং শেখ আব্দুল্লার মধ্যে একটা আপোষ-রফা করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং এই জন্য সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শাসনভার তাঁহাদের উভয়ের হাতে ন্যস্ত করা প্রয়োজন। শেখ আব্দুল্লা এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি খুব ভালভাবেই জানিতেন যে, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থানের মধ্যে বোঝাপড়া ব্যতীত এবং তাহাদের অমতে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

আজাদ কাশ্মীর নেতৃবৃন্দ আসলে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানের জন্য মোটেই ব্যস্ত নহেন। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীদের বৈঠকে আপসের পথে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে আব্বাস এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগের

*Article 5. The President of the Azad Kashmir Government shall hold office during the pleasure of the **All-Jammu and Kashmir Muslim Conference duly recognised as such by the Government of Pakistan in the Ministry of Kashmir Affairs.**

Article 8. Supreme Legislative power shall vest in the Council of Ministers provided that **no draft legislation shall be put before the Council without obtaining the advice of the Ministry for Kashmir Affairs thereon, and in case it is proposed to come to a decision at variance with such advice it shall not be given effect to without prior consultation with the Ministry for Kashmir Affairs.**

Article 21. The Ministry for Kashmir Affairs shall exercise general supervision over the service with a view to ensuring that Government employees discharge their duty properly.

Schedule I Part 4 : In addition to general supervision over all departments of the Government, the Joint Secretary, Ministry for Kashmir Affairs, shall pass final orders on appeals against orders passed by Secretaries and Heads of Departments in respect of Government servants under their control in all matters of appointments, promotions and disciplinary actions of all kinds.

টনক নড়িয়া উঠিল। ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা লাহোরে এক সভা আহ্বান করিয়া কাশ্মীরের মুক্তির জন্য জেহাদের জিগীর তুলিলেন—

("....all restrictions and responsibilities in connection with Kashmir should be ended and a struggle for liberation should be launched afresh.")

আজাদ কাশ্মীর সরকারের অর্থমন্ত্রী হামিদউল্লা খান এই সভায় একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেহাদের প্রস্তাবও তিনিই উত্থাপন করিয়াছিলেন।

আজাদ কাশ্মীর সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ। নিজস্ব কোন ক্ষমতাই ইহার নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। উপরে উল্লিখিত হামিদউল্লা খান একবার পাক প্রধান মন্ত্রীর কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে অল্পদিনের মধ্যেই, এ ধরনের কানাঘুষা শোনা যাইতে লাগিল। আজাদ কাশ্মীর সরকারের রাষ্ট্রপতি কর্নেল শের আহম্মদ খান সাংবাদিকদিগের এক বৈঠকে বলেন—হামিদউল্লার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ববস্থা অবলম্বনের কোন কথা উঠিতেই পারে না।

("Hamid Ullah was free to express his views in his personal capacity and the question of any action did not arise.")

মাত্র দুইদিন পরেই হামিদউল্লা খান পদচ্যুত হইলেন। পদচ্যুতির পর হামিদ-উল্লা সখেদে বলিয়াছিলেন—পাকিস্থান সরকারের কাশ্মীর দপ্তরের সামান্য একজন কেরানীর আজাদ কাশ্মীর সম্পর্কে মতামত আজাদ কাশ্মীর সরকারের রাষ্ট্রপতির মতামত অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

("......an ordinary clerk in the Kashmir Affairs Ministry had a greater say in problems affecting Azad Kashmir than the president of the Government of the territory.")

আজাদ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। দেশের রাষ্ট্রিক, আর্থিক এবং সামাজিক সংগঠন ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে। আজাদ কাশ্মীর সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী নাজির হুসেন খাঁন আজাদ কাশ্মীরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে একটুও অতিরঞ্জন নাই। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে পুঞ্চের অন্তর্গত আব্বাসপুরায় এক জনসভায় তিনি বলেন যে, আজাদ কাশ্মীর যেদিন স্থাপিত হয়, সেদিন জনগণ বিশ্বাস করিত যে, আজাদ কাশ্মীর স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক দাসত্বের আসন্ন অবসানের সম্ভাবনায় তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর সংগ্রামের মধ্যে ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুদিনের কোন লক্ষণ আজও চোখে পড়িতেছে না। দিনের পর দিন অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে। অন্নাভাবে লোক হাহাকার করিতেছে। শত শত লোক দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ দিয়াছে। জীবিকার উপায় দিনের পর দিন সংকুচিত হইতেছে। সর্বত্র দারিদ্র্য এবং বেকার-সমস্যা। জীবনধারণের অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও দুর্ঘট। জনসাধারণ করভারে প্রপীড়িত। করের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে। আর্থিক সংকটের জন্য অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। *

এদিকে আব্বাস, ইব্রাহিম এবং মীর ওয়েইজের দল গরম গরম বক্তৃতার সাহায্যে আসর জমাইয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। কিন্তু গলাবাজি দ্বারা শেষরক্ষা হইবে ত?

*"When we unfurled the banner of Azad Kashmir, people were confident that Azad Kashmir will prove a heaven on earth for the people of the State and they will be freed politically as well as economically. But what do we find today after six years' struggle : conditions are worsening day after day; there is famine everywhere; people eke out half-starved lives; hundreds have died of hunger. the avenues of employment are decreasing, unemployment and poverty are wide spread; necessities of life have grown scarce and taxes have increased. As a consequence of economic deterioration people are forced to commit more and more crimes."

চক্রদত্ত

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করাই এক বিরক্তিকর ব্যাপার, তার ওপর শীতের দিনে যদি বাসের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাহলে হাত পা যেন জমে যেতে আরম্ভ করে। লণ্ডনের নিউক্যাসল শহরে রাস্তার ধারে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে

গ্যাস পোস্টের মাথায় গ্যাস হিটার

গ্যাস পোস্টের মাথার ওপর একটা গ্যাস হিটার লাগানর ব্যবস্থা হয়েছে। সেই পোস্টের নীচে ও আশেপাশে যে সব লোক বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, ঐ হিটারের তাপ ছড়িয়ে পড়ে তাদের ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করে। শুধু যে বাস স্ট্যাণ্ডেই এই ব্যবস্থা হয়েছে তা নয়, বড় বড় স্টেডিয়ামে ও জাহাজ ঘাটেও এই রকম ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে।

*

বিজ্ঞান যখন জগতে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেনি; মানুষ যখন পদব্রজে দেশভ্রমণে বার হতো, তখন দূর দূরান্তের সংবাদ আদান প্রদানের জন্য পারাবত ছিল একমাত্র বার্তাবাহী দূত। আজও এদের দূতের মর্যাদা একেবারে নষ্ট হয়নি। টেলিফোন, টেলিভিসন, বেতার ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায় থাকা সত্বেও পায়রার সাহায্যে আজও সংবাদের আদান প্রদান চলে। এইসব নিরীহ জীবেরা কেমন করে দূর দূরান্তে গিয়ে আবার নিজের দেশে ফিরে আসতে পারে, সেইটাই মানুষের প্রশ্ন। শিক্ষা এদের কিছুটা দেওয়া হয় সত্যি, কিন্তু কোন্ বুদ্ধিবলে সে শিক্ষা এতখানি কার্যকরী হয়, সেইটাই চিন্তার বিষয়। এতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, এদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও প্রখর স্মৃতি-শক্তির জন্যই এরা এইভাবে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে স্বচ্ছন্দে নিজের দেশে ফিরে আসতে পারে। অবশ্য এ ধারণা যে ভ্রান্ত, পরে তারা বুঝতে পারেন। বৈজ্ঞানিকেরা এরোপ্লেনে করে বিভিন্ন ধরনের পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন এবং তারপর ঐ একই পদ্ধতি পায়রার ওপর প্রয়োগ করে দেখেছেন। এইভাবে ১০০ মাইল পথের ভ্রমণকারী পায়রা লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, তারা কোনও একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করে সেই পথ ধরে স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে। এছাড়া আরও লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, নিতান্ত অজানা অচেনা দেশে গিয়েও এরা কোনও রকম নির্দিষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য না করেই ফিরে আসতে পারে। এদের এই ধরনের গতিবিধি থেকে অবশ্য নির্দিষ্ট কোনও ধারণা করা শক্ত। মিঃ ডোনাল্ড গ্রিফিন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে, এ বিষয়ে খুব সঠিক কিছু বলা না গেলেও দেখা গেছে যে, সূর্যের আলো ও গতিই এদের ঘরে ফিরে আসতে সাহায্য করে। সূর্যের আলো সম্বন্ধে এরা বিশেষ স্পর্শকাতর। আমেরিকার ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মের পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ডিন্ এমডেনও মিঃ ডোনাল্ডকে সমর্থন করেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, পায়রা বা ঐ জাতীয় কোনও পাখীকে অজানা জায়গায় ছেড়ে দিলেই তারা কোনও দিকে না তাকিয়েই সোজা ঘরমুখো ছোটে। তাঁর মতে সূর্যের আলো ও গতির সাহায্যেই এটি সম্ভব হয়। ডাঃ এমাডন আরও বলেন যে, পাখীদের চোখের লেন্সের পিছন দিকে পাতলা ঝালরের মত একটা রিং থাকে, এটিকে "পেকটেন" বলা হয়। এই পেকটেনই সূর্যের গতি বুঝতে সাহায্য করে. এখনও পর্যন্ত পেকটেনের কার্যকারিতা কোনও বৈজ্ঞানিক ঠিক করে বলতে পারেননি। কয়েকজন জার্মান এবং বৃটিশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার জন্য সূর্যের অবস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখীর গতি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এমাডনের উক্তি নিতান্ত অমূলক নয়।

*

সাধারণত হৃদযন্ত্রের কোনও রোগ হলে ডাক্তারেরা রোগীকে নড়াচড়া করতে বারণ করেন, সেইজন্য সাধারণ লোকের ধারণা হয় যে, বেশী খাটাখাটুনির জন্য হৃদযন্ত্রের রোগ হয়। এ ধারণা কিন্তু ভুল। কারণ লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, যারা দৈহিক পরিশ্রম না করে বসে বসে কাজ করে, তাদেরই হৃদযন্ত্র রোগাক্রান্ত হয়। বৃটেনের ৩১ হাজার ট্রাম বাস কনডাকটরকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের সদাসর্বদা চলে ফিরে কাজ করতে হলেও হৃদযন্ত্রের রোগ এদের বড় একটা হয় না। এর তুলনায় এই কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়র ড্রাইভার ইত্যাদি যাদের বসে বসে কাজ করতে হয়, তাদের হার্টের রোগ বেশী হয়। আরও দেখা হয়েছে যে, যারা কুলি কামিনের কাজ করে, তাদেরও হার্টের রোগ কম হয়। ডাক্তারদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, যে সব ডাক্তার ঘোরাফেরা করেন, রোগী দেখেন, তাঁদের অনুপাতে যে সব ডাক্তার বসে বসে পরামর্শ দেন, তাঁদের বেশী হৃদযন্ত্রের রোগ হয়।

সতীন সেন ও প্রাণকুমার সেন

গণেশ মুখোপাধ্যায়

খ্যাতির লোভে নয়, প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাতেও নয়, নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাতে ত' নয়ই, শুধুমাত্র ভালবাসার জন্য যাঁরা দেশকে ভালবাসে, নিজেদের রিক্ত করে দেয় দেশের কাজে, নিঃশেষ করে আপনার সত্তাকে বিলিয়ে দেয় দেশের সেবায়, সেই আত্মভোলা, নির্ভীক দেশ কর্মীদেরই একজন অন্তিম নিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের কারান্তরালে। শত বিপদ ও ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু কংগ্রেস নেতা আজও দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে নিত্যসঙ্গী করে পূব বাঙলার মাটি কামড়ে পড়ে আছে, মৃত্যুর আবাহনে বিদায় নিল তাদেরই একজন, চলে গেল সেই দেশে যেখান থেকে কেউ কখনো ফেরে না।

ঘটনাস্রোতের আকস্মিক আবর্তে আজ থেকে তিন বছর আগে এক দুর্লভ লগ্নে অপ্রত্যাশিতভাবে এই লোকান্তরিত নেতা সতীন সেন এবং তাঁর অনুজ-প্রতিম সহকর্মী শ্রীপ্রাণকুমার সেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। দলাদলির দ্বন্দ্ব আর সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সংঘাতে পূর্ণ আজকের পৃথিবীতে কুটিলতা এবং নোংরামির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষ যখন তার মানবতাকে ভুলতে বসেছে, তখন সত্যিকার মানুষের দেখা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা বৈকি, তাই না এ সৌভাগ্যের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়ে আছে।......তাঁদের সাথে স্বল্পমাত্র পরিচয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্পদ স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করতে পেরেছি, সে সঞ্চয়ের আনন্দকে স্বার্থপরের মতো একা ভোগ করতে চাই না। তাই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গকে সীমায়িত করে সে অভিজ্ঞতার, যতটুকু প্রকাশ সম্ভব তা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

পূর্ববঙ্গের তথা বরিশালের দাঙ্গায় নিহত আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড়ের চেষ্টায় ৫২ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে আমাকে ঢাকা হয়ে বরিশাল যেতে হয়েছিল। ঢাকা গিয়ে ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিসের এ্যাটাশে শ্রীকালীপদ সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে সরাসরিভাবে তাঁদের ওখান থেকে কিছু হবার সম্ভাবনা কম আর হলেও তা সময় সাপেক্ষ। কাজেই তিনি স্থানীয় পুলিস ও জেলা শাসকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে তৎপর হ'তে উপদেশ দিলেন। এ ছাড়া যাতে ভালোয় ভালোয় কাজ মিটে যায় সেজন্য প্রাণকুমার সেনের সঙ্গে প্রথমে দেখা করে নিতে বললেন। ইনি বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী এবং কর্তা ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক সকলেরই প্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র।

পাকিস্থানে কংগ্রেস? নিজের কানকে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। পরম শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের ভাষায় বলতে গেলে "এর চেয়ে বরং চার্চিল সাহেবকে হেদোয় বসে ঠেসে ঝাল দিয়ে চিনেবাদাম খেয়ে ডাইনে বাঁয়ে নাক ঝাড়তে দেখার কল্পনা করা সহজ।" কিন্তু পরিচয়পত্রের শিরোনামাতেও ঐ একই উল্লেখ, কাজেই সন্দেহ করবার আর উপায় রইল না।

জেলা কংগ্রেসের অফিস হচ্ছে বরিশাল টাউন হলের একটি প্রকোষ্ঠে; স্টেশন থেকে যা প্রায় মিনিট সাতেকের পথ। গিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ, কাজেই সন্ধান নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে দেখা করতে হ'ল। দোহারা চেহারা, সদাহাস্য মুখ, দেখেই শ্রদ্ধা জাগে। প্রবাদ আছে, মানুষের মুখভাবই তার মনের সত্যকার প্রতিচ্ছবি। খুব সত্যি কথা, অন্তত প্রাণকুমারবাবুকে দেখে এ প্রবাদকে নির্ভুল বলে মেনে নেওয়া যায়।

আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। কিন্তু যে প্রসঙ্গে তাঁর কাছে আমার যাওয়া তা এড়িয়ে প্রথমে প্রশ্ন করলেন, কোথায় উঠেছি, খাওয়া দাওয়া করেছি কি'না ইত্যাদি। ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "সে জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না, আমার উৎকণ্ঠার প্রধান যে কারণ তা নিরসন হলেই কৃতার্থ হবো।" উত্তরে সাধ্যমত চেষ্টা করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং পথের ক্লান্তি দূর করবার জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম নিয়ে বিকালে কংগ্রেস অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

হতাশা বিক্ষুব্ধ মনের তিমির স্তব্ধ আকাশে দেখা দিল পূর্বরাগের আভাস। আমার বরিশালে আসার ফলাফলের উপর একটা দুর্ভাগ্য কবলিত পরিবারের অনেকখানি নির্ভর করছিল। ডেথ সার্টিফিকেট না' হলে তাদের শেষ সম্বল, লাইফ ইন্সিওরেন্সের ক'টা টাকা, তাও মারা যাবে। ঢাকা গিয়ে আমার কাজের প্রায় কিছুই এগোয় নি, কেবল কালীপদবাবুর কাছে পরিচয়পত্রটুকু পাওয়া ছাড়া।

যে আশার বীজ অঙ্কুরিত হ'ল, পত্র পুষ্পে সজ্জিত হয়ে ঈপ্সিত ফল প্রদান করতে তার লাগলো হপ্তাখানেক সময়। এ কয়দিন কোতোয়ালী থানা, পুলিস সুপারের অফিস, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবার, কোন যায়গায় আমাকে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে কসুর করেননি প্রাণকুমার বাবু। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গ দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের কাছে পেশ করবার জন্য বহু পরিশ্রম এবং অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে, বরিশালের দাঙ্গায় হত হিন্দুদের ধন ও প্রাণের ক্ষতির যে বিস্তৃত হিসাব তিনি তৈরি করেছিলেন, তার থেকেও সপ্রমাণ করলেন আমার পরিচিত ভদ্রলোকটির মৃত্যু সংবাদের যথার্থতাকে। এক জনকল্যাণকর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী অধ্যক্ষ হিসেবে, নিজেও একটি সার্টিফিকেট দিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কাজে তার কাছে উপকৃত হয়েছি বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উদ্দেশ্য নিয়ে এ লেখা নয়। কবির ভাষায় তাঁকে বলতে হয় "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান"! তাঁর মধ্যে সত্যকার যে মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তার সম্বন্ধেই এ লেখা। এই হপ্তাখানেক সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দানা বেঁধে উঠেছিলো। সকালে উঠেই কংগ্রেস অফিসে গিয়ে জড়ো হ'তাম। চা-পর্ব সেখানেই সেরে ন'টা নাগাদ হোটেলে

করতাম। প্রাণকুমারবাবু ছিলেন বরিশালের ক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ত্রী সংখ্যা সেখানকার নগণ্য হ'লেও, তিষ্ঠান হিসেবে তার অস্তিত্বকে ধানত তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত তিনি শিক্ষক, দিনের অবশিষ্ট সময় একনিষ্ঠ দেশসেবক। গোলে হরিবোল দিয়ে দুপুরটা কাটিয়ে, আবার জড়ো হ'তাম সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ। গল্প ও আলোচনায় রাত্রি নটা দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিতাম। সে আলোচনায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কমই থাকত। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, দেশ বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের অবস্থা, দাঙ্গার মর্মন্তুদ কাহিনী, এই সবই ছিলো আলোচনার বিষয়বস্তু। মাঝে মাঝে সম্প্রদায় নির্বিশেষের কোন সভা বা সমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্বের বা প্রধান আতিথ্যের আমন্ত্রণ এলে আমাকেও সঙ্গী করতে ভুলতেন না।

দুই

দিনের কর্ম চাঞ্চল্য জাগে প্রাণকুমার-বাবুর সকাল ছ'টায়, আর রাত্রির সুষুপ্তি, পরিশ্রম ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম না দেওয়া পর্যন্ত সে কর্মধারা চলতে থাকে অবিরাম। সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত কংগ্রেস অফিস। তারপর একটু এদিক ওদিক, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের দরবার, রিলিফ অফিস, এই সব করে স্নানাহারের জন্য বাসায় যান। সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুল। বিকেল নাগাদ ছ'টা থেকে রাত্রি সাড়ে দশ, এগারো, কখনো বা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আবার কংগ্রেস অফিস। এর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হ'তে কেউ দেখে নি। আর কাজের কি শেষ আছে। কারও ডেথ সার্টিফিকেট চাই, কারও জমিজমা বিক্রী করতে হবে কালেক্টরের অনুমতি চাই, কারও বাড়ি-ঘর বেদখল হয়ে আছে, পুলিসের সাহায্য নিয়ে বে-আইনী দখলকারের উচ্ছেদ চাই, সব করতে হবে প্রাণকুমারবাবুকে। এমনকি, বাস্তুহারা ঋণের জন্যও প্রাণকুমার বাবুকে সার্টিফিকেট দিতে হবে, তা'হলে কাজ মিটবে অনেক শীগ্‌গির। এছাড়া, গ্রামের দিকে কোথায় কোন মুসলমান হিন্দুর উপর অত্যাচার করছে, অমনি খবর এলো প্রাণকুমারবাবুর কাছে, আর তিনিও যাওয়া নাওয়া ফেলে ছুটলেন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস আর মহকুমা হাকিমদের কাছে দরবার করতে।

এসব কাজে তাঁর সহকারী দেখলাম না একজনকেও। এমনকি, চিঠিপত্র লেখা, টাইপ করা, দরকার পড়লে পিওন বুক নিয়ে ডেলিভারী দেওয়া, সবই তাঁর একার কাজ। বরিশাল কংগ্রেস কমিটির পিওন থেকে প্রেসিডেণ্ট সবই তিনি একা, তবে নামের নীচে লেখেন সেক্রেটারী কথাটা, আর এই নামেই সরকারী মহলে তিনি পরিচিত। একদিন সন্ধ্যার শো'তে সিনেমা দেখবার পর হোটেলে ফিরছি, ভাবলুম, প্রাণকুমারবাবুকে একটু দেখা দিয়ে যাই, দেখি ভদ্রলোক কি করছেন। গিয়ে দেখি, একা ঘরে বসে কি একটা টাইপ করছেন আর ঘুমে কেবলই ঢুলছেন। বুঝলাম, দিনেরবেলা পরি-শ্রমের মাত্রাটা নিশ্চয় বেশী হয়েছে, যার জন্য ক্লান্ত শরীর আজ বিশ্রাম চাইছে অন্য দিনের থেকে একটু সকাল সকাল। বললাম, "সরুন আমি করে দিচ্ছি। আপনি কেবল একটু বলে যান, যাতে তাড়াতাড়ি হয়।"

কাজটা শেষ করে উঠবো উঠবো করছি, এমন সময় কি খেয়াল চাপল, হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, এভাবে শ্মশান জাগিয়ে লাভ কী? অনুরোধ, উপরোধ, ছুটোছুটি একা কতোদিক সামলাবেন, আর এতে সত্যিকার কাজই বা হবে কতটুকু?" বাড়ি ফেরবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, আমার প্রশ্নে থেমে গিয়ে আবার বসে পড়লেন। তারপর, চোখ রগড়ে ঘুমের ভারটা খানিক কাটিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, "যে মাতৃস্তন্য পান করে আপনার শৈশবদেহ পুষ্ট হয়েছে, যে মা তাঁর অকৃপণ স্নেহ দিয়ে আপনাকে বড়ো করেছেন, আজ যদি তিনি বার্ধক্যে পঙ্গু হন বা কোন শক্ত রোগের আক্রমণে শয্যা নিতে বাধ্য হ'ন, তবে পারবেন কি তাঁর অসহায়ত্ব উপেক্ষা করে তাঁকে একা ফেলে পালিয়ে যেতে? দেশ-প্রেম শুধু বক্তৃতা দেওয়া নয়, নেতৃত্বের গর্বে অন্ধ হয়ে যাওয়াও নয়, সত্যিকার অনুভূতি দিয়ে দেশকে ভালবাসা। যে দেশের সুখের দিনে তার সুখে ভাগ বসিয়েছি, আজ তার দুঃখের বোঝা কার ঘাড়ে ফেলে যাবো?"

এতো গভীর যে ভালোবাসা, তাকে অসার প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টায় যুক্তি দেখাতে গেছি ভেবে নিজেকে অসংখ্যবার ধিক্কার দিলাম। কিন্তু প্রথম প্যাঁচেই কাৎ হলে লজ্জাটা মাত্রাধিক হবে ভেবে, কথার স্রোতে আর খানিক এগিয়ে গিয়ে বলতে হ'ল, "কিন্তু, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান, হিন্দু নিশ্চিহ্ন করবার নীতিকে কার্যকরী করতে লেগেছে, আপনি কতো দিন তাতে বাধা দেবেন। আপনার অস্ত্র হচ্ছে অনুরোধ আর উপরোধ। এ দিয়ে স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণীর মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন আপনি?"

উত্তর এলো, "হয়ত কিছুই নয়, আপাততঃ কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই একেবারে বিফলে যায় না। সত্যাগ্রহীর আসল পরীক্ষা এমনি যায়গায়। অসীম সহন-শীলতা আর কষ্টসহিষ্ণুতা না থাকলে, এমন ক্ষেত্রে সফলতা লাভ ভাগ্যে ঘটে না। দেখুন, এই নীতিতেই যদি গান্ধীজী শত শত বছরের পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে সম্পূর্ণ না হ'ক অন্তত বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে থাকতে পারেন, তবে এক্ষেত্রে কি কিছুই হবে না? ইংরেজ ছিল বিদেশী, বিজাতি। তার স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে, যে কোন রকম দমননীতি প্রয়োগ করতে সে লজ্জিত হ'ত না। কিন্তু এরা বিধর্মী হলেও বিজাতি ত নয়। ধরে নিলাম ধর্মান্ধতার উত্তেজনায় এরা বুদ্ধিবৃত্তিকে সাময়িক-ভাবে বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু এমন অবস্থা চিরস্থায়ী হবে না, হতে পারে না।"

রাত হয়ে গিয়েছিলো বলে, আলো-চনায় আর বেশীদূর অগ্রসর হইনি। তাছাড়া, এমন যাঁর আত্মপ্রত্যয়, আদর্শে নিষ্ঠা, এর পরে তাঁকে আর কি যুক্তি দিয়ে বোঝান যায়?

হোটেলে ফিরতে ফিরতে কথাগুলো ভালো করে ভেবে দেখেছিলাম। প্রাণকুমার-বাবুর অভিমতকে আদর্শবাদীর অবাস্তব কল্পনা ভেবে অনেকেই হয়ত অগ্রাহ্য করবেন, কিন্তু কংগ্রেসের কল্পনাও

একদিন এই ছিল। অবশ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে গান্ধীজী অনুসৃত নীতিকে বিদ্রূপ করবার মত বিজ্ঞ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। এমনকি, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যখন ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ হয়ে যায় তখনও অনেকের ধারণা ছিল যে, এটাও হবে মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড সংস্কার বা উনিশশো প'য়ত্রিশের আইনের মতো আর এক দফা ধাপ্পা। কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর ঐকান্তিক সাধনা কি ব্যর্থ হয়েছে? যারা একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিদ্রূপ করেছিল, এ প্রশ্নের জবাব তারাই দিক।

তিন

সহায় সম্বলহীন প্রাণকুমারবাবুর অস্ত্র শুধু অনুরোধ, উপরোধ আর তাঁর ব্যক্তিত্ব। সে ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে না, তাঁর পরিচিতজনের মধ্যে এমন একটি লোকও দেখিনি। সত্যিকারের কাজ তিনি কিছুই করতে পারেন না এমন কথাই বা কি করে বলি। যেদিন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন তাঁকেও দেখলাম সসম্ভ্রমে বলতে "What can I do for you Prankumar Babu?" খুলনায় দুর্ভিক্ষকবলিতদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার খুলতে হবে। সরকারী বে-সরকারী সব লোক একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, প্রাণকুমারবাবুই সে ভাণ্ডারের চাবিকাঠি রাখবার যোগ্যতম ব্যক্তি। পুলিস সুপার, জেলা শাসক, মহকুমা হাকিম, সবই যে যার সামর্থ্য মত চাঁদা পাঠালেন তাঁরই কাছে। কই, বিধর্মী বলে ইসলামী রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীরাও তাঁকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলেন না তো? আমি একান্ত অজ্ঞ, তাই সেদিন ওরকম বেমক্কা প্রশ্ন করেছিলাম।

প্রাণকুমারবাবু কেবল হিন্দুর নয়, মুসলমান, হিন্দু সকলের। সকলের উপকার করতেই তিনি সমান আগ্রহী, সমভাবে তৎপর। মুসলমানরাও তাঁর সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় বড়ো কম সংখ্যায় জড়ো হ'তো না। তবে হ্যাঁ, হিন্দুদের অসহায়ত্ব, তাদের প্রতি তাঁর মনোযোগ কিছু বেশীই আকর্ষণ করত। এটুকু বাদ দিলে, সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাতমূলক নীতির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় নির্বাচনক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি জীইয়ে রাখা হবে কিনা, এই নিয়ে পাকিস্তান অবজার্ভার কাগজে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি জোরের সঙ্গে এই নীতির বিরোধিতা করে জানিয়েছিলেন যে, ইংরেজ আমলে এই নীতি দ্বিজাতিতত্ত্বের সূচনা করেছে, ভুলিয়ে দিয়েছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অমৃতবাণী "সাত কোটি সন্তান হিন্দু-মুসলমান।" পাকিস্তানে সবাই পাকিস্তানী, রাষ্ট্রের স্বার্থে সকলেরই চিন্তা হবে একমুখী। সম্প্রদায়গত বিভেদ জাগিয়ে সে চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত হবে না। কাজেই, সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা যে সুবিধা সুযোগ পাবে সংখ্যালঘু হিন্দুরা সেই সুযোগ সুবিধা না পেলে বরং নিজেদের শক্তির জোরে আদায়ের চেষ্টা করবে। তাদের জন্য দরকার হবে না সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির পুনঃপ্রবর্তন করে চিরকাল শিশুর মত আগলে রাখা। এই নীতি ভারতকে তিন টুকরো করেছে, তিনশো টুকরো হবে যদি বার বার একই ভুল করা হয়।

কি বলিষ্ঠ যুক্তি। ইংরেজী রচনারও কেমন অনবদ্য সুন্দর ভঙ্গী। কিন্তু না, রচনার ব্যাখ্যা এখানে করবো না। "যাযাবর" সে পথে কাঁটা দিয়ে আগেই বিদ্রূপ করে বলেছেন, "এদেশের নেতাদে

ম্পর্কে বিদেশী পর্যটকেরা যখন বলেন ধ্য, he speaks faultless English, ন্য আমরা তখন আনন্দে গদগদ হই।" তবে াপ কথা জিগ্যেস না করে পারিনি যে, "এর সেকালে পূর্ববঙ্গ আইন সভায় যে কয়জন য়, হিন্দু সভ্য আছেন, তাঁরাও ত আর ারে ফরবেন না। সতীন সেন, বসন্তকুমার হ ঘোষ, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে, এঁদের কি আর কেউ পাত্তা দবে?" প্রাণকুমারবাবু উত্তর দিলেন, যদি না দেয় তবে ক্ষতি নেই। সংখ্যাগুরু দিচালিত সরকার যদি মুষ্টিমেয় সংখ্যা-লঘুকে বিদায় করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন তবে সতীনবাবু বা বসন্ত-বাবু মাত্র চেঁচামেচি করে কদিন আর তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। আর নির্বাচনে জয়ী হবার কথা যদি বলেন তবে আর কারও কথা বলতে পারবো না, কিন্তু সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই সতীনবাবুকে যা শ্রদ্ধা করে তাতে কোন অবিখ্যাত লীগপন্থী যে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পাবে না, একথা ঠিক।"

চার

কি একটা কারণে আমার ফিরবার দিন একদিন পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। রোজকার অভ্যাস মতো সন্ধ্যার দিকে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে হাজিরা দিয়েছি। দেখি, বার্ধক্যের উপকণ্ঠে উপনীত, অথচ বলিষ্ঠদেহী এক শান্তমূর্তি ভদ্রলোক বসে আছেন। প্রাণকুমারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনিই শ্রীসতীন সেন, যাঁর কথা কাল আপনাকে বলেছি।" নমস্কার করলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। বার্ধক্যের দ্বারে এসেও নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক দৃঢ়ভাবে তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরে রেখে-ছিলেন। বহু ঝড় ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু হিমালয়ের মতো দৃঢ় তাঁর চরিত্রে ফাটল ধরাতে পারেনি। থমথমে মুখভাব ঘিরে আছে করুণ কালিমা। হাসেন কমই, কিন্তু আলাপে আলোচনায় বিন্দুমাত্র সহৃদয়তার অভাব নেই।

কথায় কথায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গে এলাম। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার প্রসঙ্গে যখন পৌঁছেছি তখন কথার উত্তর দিতে গিয়ে সতীন-বাবুর গলা ভারি হয়ে উঠল।—"বলতে পারেন, এভাবে দলে দলে পালিয়ে গিয়ে কি লাভ হয়েছে? পশ্চিম বাঙলায় আজ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের স্থান ভিক্ষুকের থেকে বেশী উন্নত নয়। কে না জানে যে, শিয়ালদহ আর হাওড়া স্টেশন থেকে শত শত উদ্বাস্তু যুবতীকে কলঙ্কিত জীবন যাপনে প্রলুব্ধ করছে তাদেরই হিন্দু জাতভাইরা। আপনাদের কোন খবরের কাগজ তার বিস্তৃত বিবরণ ছাপে বা সরকারী প্রতীকার চায়? অথচ পাকিস্তানী মুসলমান কর্তৃক হিন্দুনারী হরণের সরস কাহিনী পেলে কাগজ-ওয়ালারা তা ছাপবার জন্য প্রথম পাতাতেই জায়গা ছেড়ে দেবে। এতে কাগজের কাট্‌তি বাড়বে কিনা!"

উত্তর দিলাম, "সব দিক ভেবে দেখুন। না গিয়ে করতো কি? যেখানে গভর্নমেণ্ট বিরূপ, সেখানে থাকতে হবে, হাতের মুঠোর মধ্যে প্রাণ নিয়ে। কিছু প্রতিবাদ করতে গেলে লাভ হ'তো আরো বেশী নিগ্রহ, আরো লাঞ্ছনা—"

আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বললেন, "দেখুন, মানুষ পিঁপড়ার থেকে বহু কোটি গুণ বড়ো জীব। কিন্তু আত্ম-রক্ষার দাবীতে, পিঁপড়াও মানুষকে কামড়াতে ছাড়ে না। আর আশ্চর্য হতেন পলায়মান উদ্বাস্তুস্রোতের দিকে তাকালে। দুর্বলতাদুষ্ট, আত্মনির্ভরতা-বিস্মৃত লক্ষ লক্ষ লোক, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র প্রহর গুনেছে আর কেবল ভগবানের নাম জপেছে। আনসার বা বেসরকারী গুণ্ডা-দলের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন যুবকই প্রাণপণ করে এগোয় নি। সাহসে এরা নিরীহ মেষশাবক থেকেও নিকৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। অত্যাচার, উৎপীড়ন বন্ধ করবার জন্য সামান্যতম প্রতিরোধশক্তি গঠন করতেও ভরসা পায়নি।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, তর্কের খাতিরে না হয় আপনার যুক্তিগুলো মেনে নেওয়া গেল। স্বীকার করলাম যে, প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করলে, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুললে, নামমাত্র হলেও কিছুটা ফল পাওয়া যেতো। তারপর দাঙ্গা ঝগড়া মিটে গেলে পর যে যার ঘরে একে একে ফিরে আসবার চেষ্টা করলে এরকম বিদেশে গিয়ে ভিক্ষুকের পর্যায়ে পড়তে হ'তো না। কিন্তু একেও আপনি স্থায়ী সমাধানের পথ বলে বিবেচনা করেন কি করে? এতো মাত্র নাটকের প্রথম অঙ্ক। এরপর আছে অর্থনৈতিক বয়কট, হিন্দু-দের "জিম্মী" বিশেষণে বিশেষিত করা আর হিন্দু মেয়ে নজরে পড়লেই তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া, অশ্লীল ইঙ্গিত করা।

উত্তর এলো, "দেখুন খবরের কাগজে যা রং ফলানো বিবরণ পড়েন, সত্যিকার ঘটনা ততটা বেশী কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, জেহাদের পাগলামী এদের মধ্যে থেকে লোপ পায়নি। কিন্তু অল্প হলেও, বুদ্ধিমান এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক আছে যারা এইসব পন্থার ঘোরতর বিরোধী। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এসব উৎপাত প্রায় নেই বললেই হয়।"

আমার সব যুক্তিই প্রায় খণ্ডিত হ'ল। অবশ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সবল যুক্তি তেমন কিছু দেখাতে পারিনি। তাছাড়া, পূর্ববঙ্গের আসল অবস্থা সম্বন্ধে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করিনি বলে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছিলাম অত্যন্ত সাবধান হয়ে।

সব শেষে বললাম, "কিন্তু চাকুরি ক্ষেত্রে একটি হিন্দুও যায়গা পাবে না। দাঙ্গা, লুঠতরাজ ব্যবসাক্ষেত্রেও তাদের অনেকখানি পিছিয়ে দিয়েছে। এমন অবস্থায়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কি উপজীবিকার উপর নির্ভর করে বাঁচবে।" এ প্রশ্নে ভদ্রলোক উত্তেজিত হলেন সব থেকে বেশী। উত্তরে বললেন, "শিক্ষা, শিক্ষা আর শিক্ষা। ও কেরানীগিরি করবার শিক্ষার গর্ব আর চলবে না। চাষ করে খেতে হবে। সারাদিন কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে মাঠে লাঙ্গল ঠেলতে হবে, তবে দুবেলা দুমুঠো ভাত মিলবে। আমার কথা ভাবুন, পঞ্চাশ পেরিয়েছি বেশ কয়েক বছর। কিন্তু প্রত্যহ অন্তত চার ঘণ্টা করে মাটি কোপাই, চাষ করি, ফসল তদারক করি। এমন সুজলা, সুফলা,

শস্যশ্যামলা দেশে জন্মেও যারা হাতে মাটি মাখতে পেলো না তারা হতভাগ্য।"

চুপ করে গেলাম। মনে মনে তাঁর কথাগুলোর বাস্তব মূল্য নিয়ে চিন্তা করছি। আমার সে চিন্তাজাল ছিন্ন করে খানিক বাদে নিজেই আবার বললেন, "কিন্তু তবু ভরসা পাই না এদের থাকতে বলবার। দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে যে ভুল করা হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অনাদিকাল ধরে। সীমান্তের ওপার থেকে কখন কি গুজব এসে ভবে, আর শুরু হবে নিঃসহায়, মৃতকল্প লোকগুলির নিধনযজ্ঞ। তাছাড়া, কি সম্বল নিয়েই বা এরা বাঁচবে। হিন্দুর সংস্কৃতি, সভ্যতা সব নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে সরিয়ত আইনে শাসিত ইস্‌লামী রাষ্ট্র পাকিস্তান। ছেলেদের শিখতে হবে, গোমাংস অতি সুখাদ্য দ্রব্য, গোহত্যায় কোন পাপ নাই। প্রকাশ্য স্থানে হিন্দুর দেবদেবী লাঞ্ছিত হবে, অথচ প্রতিবাদকে ভাষা দেবার কোন সুযোগ নেই।"

পূর্ববঙ্গের দেড় কোটি হিন্দুর এই দুর্ভাগ্য তাঁর মর্মবেদনাকে কতো গভীর করেছে, পরস্পরবিরোধী অভিমতই তার সাক্ষ্য দিল। শেষের কথা কটি প্রমাণ করে দিল যে, তিনি আগে যা বলেছেন তার অনেকখানিই তাঁর মনের কথা নয়। ভারতে এসে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য বা জনসমর্থনের অভাবে যেমন এরা যাযাবর আর ভিক্ষুকের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, তেমনি পাকিস্তানে ফিরে যাওয়াও সমস্যা সমাধানের নির্ভরযোগ্য পথ বলে মেনে নিতে, মন সায় দেয় না।

আবার খানিক থেমে, খোলা জানালার বাইরে উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ্যহীনভাবে তাকিয়ে থেকে বলে চললেন, "স্বাধীনতার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, যে কল্পনায় বিভোর হয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় আন্দোলনে কাটিয়েছি, তার কি এই বাস্তব রূপ? চেয়েছিলাম স্বাধীন ভারত, পেলাম বিভীষিকাপূর্ণ পাকিস্তান। সহকর্মীদের অনেকে সুযোগ সুবিধে আদায়ের চেষ্টায় দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে জুটলেন। মেষচর্মের আবরণ সরে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তাদের নখদন্ত। দলাদলি আর কামড়া-কামড়ির পরিধি হলো আরো বিস্তৃত। এইসব বেদনাময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে আজ রাজনৈতিক কর্মধারার উপর প্রায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছি। ক্ষতবিক্ষত মনকে সম্বল করে কলসকাঠিতে গ্রাম্য পরিবেশে বাসা বেঁধেছি। কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি চিরকাল। শাসকশ্রেণীর চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে যখনই জানাতে যাই কোন প্রতিবাদ, যেতে হয় জেলে। কিছুদিন বাদে ছাড়া পেয়ে আবার ফিরে আসি। জীবনের বাকী দিন কয়টা এভাবেই কাটিয়ে দেবো।"

ব্যর্থতা আর হতাশা, সব সময়ের জন্য মনের মাঝে যেন শ্মশানের চিতা জেবলে রেখেছে। কথাগুলো সেই চিতাবাহ্নি হতে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ। যখন থামলেন, তখন দুঃখের কুহেলীজাল সমস্ত ঘরটাকে যেন অন্ধকার করে ফেলেছে।

কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস বা আবেগ ছিল না, তবে ছিল একটা কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের ভাব। মনের ক্ষতের গভীরতা পরিমাপ করতে আর কষ্ট পেতে হয় না। বিষাদময় কালিমা সদাসর্বদার জন্য মুখ-ভাবকে কেন আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মতো থমথমে করে রাখে, তাও বুঝতে দেরি হ'ল না।

পাঁচ

আলোচনা চলতে থাকার মাঝে, প্রাণকুমারবাবু এক ফাঁকে যে কোথায় উঠে গিয়েছিলেন, তা টের পাইনি। ফিরে এসে যখন আলোর সুইচ জ্বাললেন, তখন চমক ভাঙলো। এর মধ্যে যে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছিলো, দুজনের কারও তা খেয়াল ছিল না।

"নাঃ আর বোধ হয় এলো না।" কে এলো না, কেন এলো না প্রশ্নমালার উত্তরে জানলাম যে, সতীনবাবুর চাকরের দুপুর নাগাদ বরিশাল পৌঁছানর কথা ছিল। কিন্তু দুপুর ছেড়ে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল, অথচ এখনও তার টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। তার কাছে ছিল সতীনবাবুর সামান্য কাপড় জামায় ভরা একটি অধুনা-সৃষ্ট কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, একটি ছোট বিছানা আর স্বপাক ভোজনের জন্য কুকার সহ প্রয়োজনীয় রন্ধন পাত্রাদি। আইনসভার বাজেট অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য ঢাকা যাবার পথে বরিশালে এসেছিলেন। নদীবিধৌত বরিশালের প্রায় সর্বত্রই জল ও স্থল উভয় পথেই যাওয়া আসা চলে। স্থলপথে সময়-সংক্ষেপ হয় কাজেই সতীনবাবু পদব্রজে এসেছিলেন। লটবহর নিয়ে চাকরটার আসবার কথা ছিল নৌকায়। কিন্তু সে কথা, কথাই থেকে গেল। চাকর রওনা দিয়েছে এক সাথেই, কিন্তু ভিন্ন পথে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর টিকা নিষ্প্রয়োজন।

মূল্য হিসাবে বিচার করলে জিনিস-গুলোর দাম বেশী নয়। খদ্দরের জামা-কাপড়, সবে মিলে সংখ্যায় গুটি পাঁচেক। একটা মোটা পশমী চাদরও ছিল শীত কাটাবার জন্য। সামান্য বিছানা, বাসন-কোসন, যার কোনটাই মহার্ঘ ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোককে যে অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিলো তা চরম। শীতের রাত্রি, খদ্দরের গায়ের চাদরটি ছাড়া বাকী সব গাত্রাবরণ, বিছানাও ব্যাগের মধ্যে ছিল। এমনকি, মুখহাত মোছার গামছা বা স্নান সেরে পরবার মতো বাড়তি কাপড়, কিছুই ছিল না। অদৃষ্টের কি পরিহাস। এমন লোকেরও তাহলে শত্রু আছে। কিন্তু এর আগে এমন সম্ভাবনা কখনো কল্পনায় আসেনি। এঁরা জীবনে দিয়েছেন ত অনেক। সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য যা মাত্র প্রয়োজন তার বেশী কিছুই নিজের বলে রাখেননি। অথচ এই সামান্য সম্বলের উপরও লুব্ধ দৃষ্টি! বৃথাই আমরা মানুষের উপর দোষারোপ করি। যে ভগবানের নাম নিয়ে এতো চেল্লাচেল্লি, কাটাকাটি তিনিও তাহলে অসহায়ের প্রতি সমান খড়্গহস্ত।

অযাচিতভাবে উপদেশ দিলাম থানায় যেতে, আর নিজের নির্বুদ্ধিতাকে আর এক দফা জাহির করলাম। সতীনবাবু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন "না"। তারপর সহানুভূতির সুর মিশিয়ে বললেন, "লোকটা খুবই গরীব। আর ক'টাকারই বা জিনিস নিয়েছে, তাও আবার ব্যবহার করা। বিক্রী করতে গেলে পাঁচ সাত টাকা পেতে পারে বড়ো জোর। তবে আমার কাছে কিছু চাইলে পারত। যে অভ্যাস সে করল, তা'ত সহজে ভোলবার নয়। হয়ত এর ফলে ভবিষ্যতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, সমাজের কাছে প্রতিপন্ন হবে ঘৃণ্য।"

আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না। এরপর সেখানে অপেক্ষা করলে নিশ্চয় পা জড়িয়ে ধরে বলতে হতো আমাকেও আপনার কলসকাঠি আশ্রমের সভ্য করে নিন। কিন্তু সে আচরণের নাটকীয় রূপটি মনে লজ্জা দিলো, তাই পালিয়ে রেহাই পেলাম।

বরিশাল ছেড়ে এসেছি তার পরদিন। কিন্তু বিদায় নিতে গিয়ে পাছে নিজের নির্বুদ্ধিতার তৃতীয় দফা দৃষ্টান্ত দিয়ে ফেলি, এই ভয়ে আর যাইনি।

প্রাণকুমার আর সতীন সেনেরা শেখেনি প্রতিশ্রুতিভরা বক্তৃতা দিয়ে সভা গরম করতে বা জানে না নিজেদের মধ্যে সঙ্কীর্ণ দলগত স্বার্থ নিয়ে কি করে চক্রান্ত করতে হয়, সে রীতিনীতি। এমনকি, নিজেদের আখেরের দিকে তাকিয়ে, মন্ত্রী না হোক অন্তত একটা ডেঁপো মন্ত্রিগিরির জন্য উঁচুতলায় নেতাদের মহার্ঘ চর্মাবৃত চরণে তৈল সিঞ্চন করতে এদের আত্মসম্মানে বাঁধে। এরা চিরকাল দুঃখ ও দারিদ্র্যকে সাথী করে, স্বল্পাহারে বা অর্ধাহারে বাঁচবে, নিজেদের জন্য রাখবে না কোন সম্বল। পরিবার প্রতিপালন যতদিন বেঁচে থাকবে, সাধ্যমত করবে। কিন্তু তারপর? তারপরে আর কিছু নেই, সব অন্ধকার। যে দৈন্য ও দুঃখকে সাথী করে এরা ঐহিক জীবন কাটিয়ে যাবে, মরণের পরে তারই অধিকারী করে যাবে উত্তরপুরুষকে।

টাকা আনা পাই ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক স্থাপন যাদের কল্পনার বাইরে, এ হ'চ্ছে তাদের মতে নিছক পাগলামী। দরকার কি বাপু পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিয়ে এ স্বেচ্ছা-নিগ্রহ ভোগ করবার। লেখাপড়া কিছু কম শেখোনি। আজকাল যারা রাতারাতি হোমরা চোমরা বনে গেছে, তাদের অনেকেরই সঙ্গে এককালে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল। অনেক কষ্ট করেছ, এবার কিছু একটা সুবিধা সুযোগ জোগাড় করে, বাকী জীবনটা খানিক আরামে কাটাও। দুঃখ হয়, এমন বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ লোকগুলো এই-রকম সরল আর সহজবোধ্য উপদেশ কানে তোলেন না কেন? কি মোহ আছে, আত্মীয়-স্বজন বিবর্জিত হয়ে, নিজেদের দেশে অবাঞ্ছিত বিদেশীর মতো দিন কাটানোতে?

ইতিহাসের পাতায় এদের স্বার্থশূন্য স্বদেশপ্রীতির থাকবে না কোন নিদর্শন। এদের স্মৃতিকে কালজয়ী করবার আগ্রহ নিয়ে রচনা করবে না কেউ কোন সৌধ-মালা। জীবনের হাটে বেচাকেনা সাঙ্গ করে, মহাপ্রস্থানের পথে যখন যাত্রা হবে শুরু, মাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু হয়ত ক্ষণিকের জন্য করবে অশ্রুবিসর্জন। কিন্তু সত্যিকার আত্মত্যাগ, অকুণ্ঠ দেশ-প্রেম আর নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের দৃষ্টান্ত এরা, এই পথের পথপ্রদর্শক হবে যুগে যুগে, এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে জনগণমনকে।

১৩

অপরাহ্ণে পুঁটিরাম যখন চা লইয়া আসিল তখন লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখখানা শীর্ণ ও বেদনাক্লিষ্ট। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি রে, কি হয়েছে?'

পুঁটিরাম বলিল,—'আবার অম্বলের ব্যথা ধরেছে বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমি ওষুধ দিচ্ছি, তুই শুয়ে থাকগে যা। এ বেলা আর তোকে রাঁধতে হবে না।'

কিছুদিন হইতে পুঁটিরামকে অম্ল-শূলে ধরিয়াছে; বিশুদ্ধ কাঁকর এবং তেঁতুল বিচির গুঁড়া তাহার সহ্য হইতেছে না। ব্যোমকেশ তাহাকে যোয়ানের জল দিয়া ফিরিয়া আসিলে বলিলাম,—'নীচে খবর পাঠাই, মেসেই আজ আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হোক।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—'না, চল আজ কোনও হোটেলে খেয়ে আসি। আজ পাঁচশো টাকা হাতে এসেছে, বর্বরস্য ধনক্ষয়ং হওয়া দরকার।'

আমি তাহার এই লঘুতায় সায় দিতে পারিলাম না, বলিলাম—'ব্যোমকেশ, কিছু মনে করো না। ওই পাঁচশো টাকা যে ঘুষ তা যখন বুঝতে পেরেছ তখন ও টাকা নেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল—'এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে পারি কিন্তু তা করব না। টাকা আমার চাই তাই নিয়েছি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।'

'কিন্তু ধরো—যদি শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে, নিমাই নিতাই খুন করেছে, তখন কি করবে? ঘুষ খেয়ে কথাটা চেপে যাবে?'

'না, চেপে যাব না, ওদেরই ধরিয়ে দেব। অবশ্য যদি পুলিস ধরতে চায়। মনে রেখো, অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করবার জন্যই ওরা আমাকে টাকা দিয়েছে, ঘুষ বলে দেয়নি।'

'তা যদি হয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা।'

'তোমার ভয় নেই, ঘুষ খেয়ে আমি অধর্ম করব না। অধর্ম করার মতলব যদি থাকত তাহলে পাঁচশো টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হতাম না, রীতিমত আখেরের রেস্ত করে নিতাম।' বলিয়া ব্যোমকেশ হাসিল।

চা শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইলাম। এ বেলা বোধহয় আর অতিথি অভ্যাগতের শুভাগমন হইবে না ভাবিতেছি, প্রভাত আসিয়া উপস্থিত। তাহার হাতে একটি বোঁচ্‌কা, চেহারা দেখিয়া বোঝা যায়, সম্প্রতি রোগ হইতে উঠিয়াছে, চোখের মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। ব্যোমকেশ বলিল,—'আসুন। এখন শরীর কেমন?'

লজ্জিত হাসিয়া প্রভাত বলিল,—'সেরে গেছে। সেদিন অনেক কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

'কিছু না। হাতে ওটা কি?'

'একটু মিষ্টি। ভীম নাগের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম কিছু নিয়ে যাই।'

বোঁচকা খুলিলে দেখা গেল, মিষ্টি অল্প নয়, প্রায় কুড়ি পঁচিশ টাকার কড়া পাকের সন্দেশ। সেদিন ব্যোমকেশ তাহার উপকার করিয়াছিল, ডাক্তার, গাড়ি-ভাড়া প্রভৃতির খরচ লয় নাই, তাই প্রভাত অত্যন্ত শিষ্টভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে চায়। ব্যোমকেশ উল্লসিত হইয়া বলিল,—'আরে আরে, এ যে স্বর্গীয় ব্যাপার। অজিত, আজ কার মুখ দেখে আমরা উঠেছিলাম বল তো?'

বলিলাম—'যতদূর মনে পড়ে তুমি আমার মুখ দেখেছিলে এবং আমি তোমার মুখ দেখেছিলাম।'

'তবেই বোঝো, আমাদের মুখ দুটো সামান্য নয়। যাহোক, খাবারগুলো সরিয়ে রাখা ভাল, বাইরে ফেলে রাখা কিছু নয়।' ব্যোমকেশ সন্দেশগুলি ভিতরে রাখিয়া আসিয়া বলিল—'প্রভাতবাবু, চা খাবেন নাকি?'

'আজ্ঞে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।' সে ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল,—'এখানে কেবল আপনারা দু'জনে থাকেন বুঝি?'

ব্যোমকেশ বলিল, — 'উপস্থিত দু'জনেই আছি। আমার স্ত্রী এবং ছেলে এখন পাটনায়।'

প্রভাতের চোখ দুটা যেন নৃত্য করিয়া উঠিল—'পাটনায়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, যা হাঙ্গাম চলেছে, তাদের বাইরে রেখেছি। আপনি বুঝি পাটনা এখনও ভুলতে পারেন নি?'

'পাটনা ভুলব!' প্রভাতের স্বর গা[ঢ়] হইয়া উঠিল—'জন্মে' অব্দি পাটনাতে[ই] কাটিয়েছি। কত বন্ধু আছে সেখানে। ইশাক সাহেব আছেন।'

'ইশাক সাহেব?'

'আমার ওস্তাদ। তাঁর দোকানে চাকরি করতাম, তিনি হাতে ধরে আমাকে দপ্তরীর কাজ শিখিয়েছিলেন। এমন ভাল লোক হয় না, দেবতুল্য লোক। এখ[ন] বুড়ো হয়েছেন......কে তাঁর দোকানে কাজ করছে কে জানে......হয়তো তিনি একা কাজ করছেন।' প্রভাত নিশ্বাস ফেলিল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'পাটনা কোন্ পাড়ায় থাকেন তিনি?'

'সিটিতে থাকেন। সেখানে সকলে তাঁকে চেনে। আমার আর ওদিকে যাও[য়া] হয়নি, সেই যে পাটনা থেকে এসেছি, অ[ার] যাইনি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি নিশ্চ[য়ই] মাঝে মাঝে পাটনা যান? এবার যখ[ন] যাবেন ইশাক সাহেবকে দেখে আসবেন কেমন আছেন তিনি—বড় দেখতে ই[চ্ছে] করে।'

'নিশ্চয় দেখা করব। তারপর এদিকে খবর কি? কেষ্টবাবু কেমন আছেন?'

প্রভাত বলিল,—'কেষ্টবাবু চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার বাসায় ও'র পোষাল না। মা'র সঙ্গে দিনরাত খিটিমিটি হত। তারপর একদিন নিজেই চলে গেলেন।'

'যাক, আপনার ঘাড় থেকে একটা বোঝা নামল।—আর নৃপেনবাবু? তিনি আপনার দোকানে কাজ করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি কাজ করেন?'

'বইয়ের দোকানে অনেক ছুটোছুটির কাজ আছে। অন্য দোকান থেকে বই আনতে হয়, ভি পি পাঠাবার জন্যে পোস্ট অফিসে যেতে হয়। এসব কাজ আগে আমাকেই করতে হত। এখন নৃপেনবাবু করেন।'

'ভাল।'

প্রভাত এতক্ষণ ব্যোমকেশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইতেছিল; এখন সে আমার দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিল,—'অজিতবাবু, আমি আপনার কাছে আসব বলেছিলাম মনে আছে বোধহয়। এইসব গণ্ডগোলে আসতে পারিনি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।'

'কি অনুরোধ বলুন।'

'আপনার একখানি উপন্যাস আমাকে দিতে হবে। আমি গরীব প্রকাশক, নতুন

দোকান করেছি। তবু অন্য প্রকাশকদের কাছ থেকে আপনি যা পান আমিও তাই দেব।'

নূতন প্রকাশককে বই দেওয়ায় বিপদ আছে, কখন লালবাতি জ্বালিবে বলা যায় না। একবার এক অর্বাচীনকে বই দিয়া ঠকিয়াছি। আমি ইতস্তত করিয়া বলিলাম—'তা—এখন তো আমার হাতে কিছু নেই—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কেন, যে উপন্যাসটা ধরেছ সেটা দিতে পারো। প্রভাতবাবু, আপনি ভাববেন না, অজিতের বই আপনি পাবেন।'

প্রভাত উৎসাহিত হইয়া বলিল,—'যখন আপনার বই শেষ হবে তখন দেবেন। এখন আমার দোকান ভাল চলছে না, পরের বই কমিশনে বিক্রী করে কতটুকুই বা লাভ থাকে। আপনাদের আশীর্বাদ পেলে আমি দোকান বড় করে তুলব; প্রাণপণে খাটব, কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এই তো চাই। আপনাদের বয়সে কাজে উৎসাহ থাকা চাই। তবে উন্নতি করতে পারবেন।'

প্রভাত গদগদ মুখে পকেট হইতে মনি-ব্যাগ বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি নোট লইয়া আমার সম্মুখে রাখিল। দেখিলাম দুইশত টাকা। সত্যই আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম!

প্রভাত বলিল,—'অগ্রিম প্রণামী দিলাম। বই লেখা শেষ হলেই বাকি টাকা দিয়ে যাব।' সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম,—'রসিদ নিয়ে যান।'

সে বলিল,—'না না, এখন রসিদ থাক, সব টাকা দিয়ে রসিদ নেব। আজ যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও দোকান খোলা হয়নি।'

প্রভাত প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে পরস্পর চাহিয়া রহিলাম। তারপর নোট দু'টি সস্নেহে পকেটে রাখিয়া বলিলাম—'কাণ্ডখানা কি! এ যে শ্রাবণের ধারার মত ক্রমাগত একশো টাকার নোট বৃষ্টি হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ। এত সুখ সইলে হয়!'

এই সময় দ্বারদেশে বাঁটুলের আবির্ভাব হইল। তাহার আবার চাঁদা আদায়ের সময় হইয়াছে। সে ভক্তিভরে আমাদের প্রণাম করিয়া বলিল—'চাঁদাটা নিতে এলাম কর্তা।'

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির অর্থঃ জীবন-ব্যবসায়ে শুধু আমদানি নয়, রপ্তানিও আছে।

বাঁটুলকে বসাইয়া ব্যোমকেশ টাকা আনিতে গেল। কামিনীকান্তর দেওয়া নোটগুলি হইতে একটি আনিয়া বাঁটুলকে দিল—'ভাঙানি আছে বাঁটুল?'

'আজ্ঞে আছে।'

বাঁটুল কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিল। বেশ পরিপুষ্ট গেঁজে; তাহাতে খুচরো রেজগি হইতে নানা অঙ্কের নোট পর্যন্ত রহিয়াছে। কয়েকটি একশত টাকার নোটও চোখে পড়িল। বাঁটুল হিসাব করিয়া ভাঙানি ফেরৎ দিল, তারপর গেঁজে আবার কোমরে বাঁধিল। বাঁটুলের ব্যবসা যে লাভের ব্যবসা তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিল—'বাঁটুল, অনাদি হালদার মারা গেছে শুনেছ বোধহয়?'

বাঁটুল চোখ তুলিল না, সযত্নে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—'আজ্ঞে শুনেছি।'

'কেউ তাকে গুলি করে মেরেছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই তো গুজব।'

'তুমি তো অনেক খবর-টবর রাখো কে মেরেছে আন্দাজ করতে পারো না?'

'কলকেতায় লাখ লাখ লোক আছে কর্তা, তার মধ্যে কে মেরেছে কি করে আন্দাজ করব। তবে এ কথাও বলতে হয়, উনি চুলকে ঘা করলেন। আমার চাঁদা বন্ধ না করলে বেঘোরে প্রাণটা যেত না। আমি রক্ষে করতাম।'

'বটেই তো! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা কি উচিত! অনাদি হালদারের দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। তা সে

প্রশ্নক। বাঁটুল, তোমরা রাইফেল ভাড়া
ন দাও?'
'চ 'আজ্ঞে দিই।'
'হ্য 'কি রকম শর্তে ভাড়া দাও?'
: 'আজ্ঞে ভাড়া একদিনের জন্যে কুড়ি
ত।পঁচিশ টাকা; রাইফেল আর দুটি টোটা
ন পাবেন। তবে ভাড়া নেবার সময় তিনশো
'যাকা জমা দিতে হয়, রাইফেল ফেরং
া দলে ভাড়া কেটে নিয়ে বাকি টাকা ফেরং
আদই। আপনাদের চাই নাকি কর্তা?'

'না, উপস্থিত দরকার নেই, দরটা
জনে রাখলাম। আচ্ছা বাঁটুল, যে-রাত্রে
অনাদি হালদার খুন হয় সে-রাত্রে কাউকে
রাইফেল ভাড়া দিয়েছিলে?'

বাঁটুল উঠিয়া দাঁড়াইল,—'আজ্ঞে
কর্তা, সে কথা বলতে পারব না। একজন
খদ্দেরের কথা আর একজনকে বললে
বেইমানী হয়, আমাদের ব্যবসা চলে না।
আচ্ছা, আজ আসি। পেন্নাম হই।'

বাঁটুল চলিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হয়
য়। ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় লম্বা
ইয়া বোধ করি ঝিমাইয়া পড়িল। আমার
নটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া দুইশত টাকার
াছে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।
কা যখন লইয়াছি তখন উপন্যাসটা
াড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে। অথচ
াড়াহুড়া করিয়া আমার লেখা হয় না;
নটা যখন নিশ্চিন্ত নিস্তরঙ্গ হয় তখনই
লম চলে। উপন্যাসের কথাই ভাবিতে
াগিলাম। তাহার মধ্যে নিমাই নিতাই
ভাত বাঁটুল সকলেই মাঝে মাঝে উঁকি-
ঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে পেটে ক্ষুধার উদয়
ইলে বলিলাম,—'চল এবার বেরুনো
াক। হোটেলের খরচ আজ না হয়
ামিই দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সাধু সাধু।'

আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি
হোটেল আছে। দোতলার উপর হোটেল,
রু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়; সিঁড়ির
থায় স্থূলকায় ম্যানেজার টেবিলের
পর ক্যাশ-বাক্স লইয়া বসিয়া থাকেন।
াশে পাশে ছোট ছোট কুঠুরীতে টেবিল
াতা। বিশেষ জাঁক-জমক নাই, কিন্তু
ষা ভাল।

হোটেলে উপস্থিত হইলে ম্যানেজার বলিলেন—'পাঁচ নম্বর।' অমনি একজন ভৃত্য আসিয়া আমাদের পাঁচ নম্বর কুঠুরীর দিকে লইয়া চলিল। একটি গলির দুই পাশে সারি সারি কুঠুরী; যাইতে যাইতে একটি কুঠুরীর সম্মুখে গিয়া পা অমনি থামিয়া গেল। আমি ব্যোমকেশের গা টিপিলাম। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে, কেষ্টবাবু একাকী বসিয়া আহার করিতেছেন। তাঁহার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর পাট-করা শাল, মুখে ধনগর্বের গাম্ভীর্য। তাঁহার সামনে শ্বেতপ্রস্তরাবৃত টেবিলের উপর অনেকগুলি প্লেটে রাজসিক খাদ্যদ্রব্য সাজানো; একটি প্লেটে আস্ত রোস্ট মুরগি উত্তানপাদ অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। পাশে একটি বোতল।

কেষ্টবাবু পানাহারে মগ্ন, দরজার বাহিরে আমাদের লক্ষ্য করিলেন না। আমরা পাশের প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলাম।

ভৃত্যকে অর্ডার দিলে সে খাবার লইয়া আসিল; আমরা খাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশের প্রাক্তন প্রসন্নতা আর নাই, সে যেন ভাল ভাল খাদ্যগুলি উপভোগ করিতেছে না।

আধ ঘণ্টা পরে ভোজন শেষ করিয়া কোটর হইতে নির্গত হইলাম। ম্যানেজারের টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেষ্টবাবু হোটেলের ঋণ শোধ করিতেছেন। রাজকীয় ভঙ্গীতে পকেট হইতে একশত টাকার নোট লইয়া তিনি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

এই লইয়া আজ চারবার একশত টাকার নোট দেখিলাম। দেশটা সম্ভবত রাতারাতি বড়মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ বিদায় লইবার পূর্বেই আমাদের কপাল ফিরিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের আর দেরি নাই।

ম্যানেজার ভাঙানি ফেরত দিলেন, কেষ্টবাবু তাহা অবজ্ঞাভরে পকেটে ফেলিয়া পিছন ফিরিলেন। আমরা পিছনেই ছিলাম।

চোখাচোখি হইল। কেষ্টবাবুর চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তারপর তিনি পাকশাট্ খাইয়া ঝটিতি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

আমরা যখন হোটেলের প্রপ্য চুকাইয়া পথে নামিলাম কেষ্টবাবু তখন অদৃশ্য হইয়াছেন।

বাসার দিকে চলিতে চলিতে বলিলাম,—'আজকের দিনটাই ঘটনাবহুল বলা চলে, এমন কি টাকাবহুল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ যেন চারিদিকে একশো টাকার নোটের হরির লুট হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

আরও খানিকদূর চলিবার পর বলিলাম,—'কী ভাবছ এত?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'চল অজিত, পাটনা যাই। সকালে একটা ট্রেন আছে।'

আমি ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িলাম—'পাটনা যাবে! আর এদিকে?'

'এদিকে আর কিছু করবার নেই।'

'তার মানে অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে তা বুঝতে পেরেছ!'

'বোধহয় পেরেছি। কিন্তু তাকে ধরবার উপায় নেই।'

আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম,—'কে খুন করেছে?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিল; বুঝিলাম আবোল তাবোল আবৃত্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বলিলাম,—'বলতে না চাও বোলো না। কিন্তু বিকাশ দত্তকে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে টাকা দিয়েছ তার কি হবে?'

'বিকাশ ওস্তাদ ছেলে, জানাবার মত খবর থাকলে সে ঠিক আমাকে জানাবে।'

'কিন্তু আসল খবর যখন জানতেই পেরেছ তখন আর খবরে দরকার কি?'

'দরকার হয়তো নেই, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। সুন্দরী যুবতীরা প্রসাধন করেন কেন? বল্কল পরে থাকলেই পারেন। থাকেন না তার কারণ—অধিকন্তু ন দোষায়।'

'তুমি কি সুন্দরী যুবতী?'

'না, আমি সুন্দর যুবক। আমার জন্যে আমার বৌয়ের মন কেমন করছে। সুতরাং আর দেরি নয়। কাল সকালেই—পাটনা।' (ক্রমশ)

বিদেশী কোষগ্রন্থে ভারতীয় মনীষী

কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য

ভারতের বাইরে আমাদের দেশ ও ভারতীয় মনীষিগণের সম্বন্ধে অন্য দেশের কি ধারণা বা অভিমত আমাদের জানতে স্বভাবতই কৌতূহল হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে যখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হত ও মিথ্যা রটনা চলত এবং আমাদের যথার্থ অবদান বা সম্মান কোনওটাই স্বীকৃত হত না তখন আমরা বিশ্বাস করতাম যে, যতদিন আমরা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে না পারব ততদিন এর প্রতিকার হবে না, এবং তখন আমাদের স্বরূপ বা পরিচয় আপনা থেকেই স্বীকৃত হবে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সুনাম বেড়ে চলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওদেশে আমাদের যথার্থ পরিচয় স্বীকৃত হচ্ছে অথবা পূর্বের মত উপেক্ষা চলেছে সেটাও দেখা দরকার; এবং এদেশ সম্বন্ধে ভুল বা মিথ্যা বিবরণ থাকলে তা সংশোধনার্থে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর বিকৃত জীবনী ও মতবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের কথা এবং এর প্রতিবাদে ভারত সরকারের লিপি প্রেরণের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এইরকম অনেক আসল সত্য কথার প্যাঁচে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা শ্রদ্ধেয় মনীষীকে অস্বীকৃতি বহু এনসাইক্লোপিডিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমি দু'একটি উদ্ধৃত করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমার দৃষ্ট কোষগ্রন্থগুলি সবই ইংল্যান্ড বা আমেরিকা থেকে প্রকাশিত এবং ভারত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেই প্রকাশিত। অনেকগুলি আবার প্রসিদ্ধ এবং খ্যাতি-সম্পন্ন—সুতরাং একেবারে উপেক্ষার বস্তু নয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বা চেম্বারস' এনসাইক্লোপিডিয়ায় নেই। শুধু তাই নয়, আরও বহু কোষগ্রন্থে তাঁর সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নেই, এমনকি এনসাইক্লো-পিডিয়া আমেরিকানাতেও নয়। রাজ-নীতিক্ষেত্রে ইংরেজ জাতি যে বিদ্বেষ সুভাষচন্দ্রের প্রতি পোষণ করে এসেছেন নির্দেশক (reference) গ্রন্থেও তা সম্প্রসারিত হয়েছে। তাঁকে এই ছোট করার প্রচেষ্টা আর কতকাল চলবে? সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এভ্‌রিম্যানস্‌, কোলাম্বিয়া বা ওয়েভারলী এনসাইক্লো-পিডিয়া বা বায়োগ্রাফিক্যাল নোটস্‌ তা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ বা তাঁকে হেয় করার সেই হীন প্রচেষ্টা। এভ্‌রিম্যানস্‌ এনসাইক্লোপিডিয়ায় যদিও সুভাষচন্দ্রের অন্তরিত অবস্থায় অন্তর্ধানের পর কোন ঘটনার উল্লেখ নেই, কিন্তু পূর্ববর্তী জীবন মোটামুটি ঠিকই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আর দু'টি কোষগ্রন্থে তা হয়নি। উদ্ধৃতি থেকেই পরিস্ফু[ট] হবে।

"Indian nationalist politician President of the Bengal nationa[l] Congress 1927-31; expelled fo[r] extremist views; president of th[e] Indian National Congress, 193[9] Arrested 1940 for threatening t[o] destroy memorial to the Blac[k] Hole of Calcutta; escaped to Axi[s] territory; reported to have see[n] Hitler and visited Tokyo. Be-came leader of a so-called provi-sional Govt. of Free India 194[3] Died after an air crash on For-mosa" (waverley Encyclopaedi[a] page 195).

'......In July 1940, he wa[s] jailed by the British for h[is] Axis sympathies in the secon[d] World War; escaping he fled t[o] Germany. In 1943 in Singapo[re] he headed a Japanese sponsore[d] "provisional Govt. of India" an[d] a "national army" (columbi[a] Encyclopaedia)

শেষের কোষগ্রন্থটি আমেরিকা থে[কে] প্রকাশিত, তবুও সেই একই ধরন। মন্ত[ব্য] নিষ্প্রয়োজন। কি মনোভাব প্রকা[শ] পেয়েছে স্পষ্টই প্রতীয়মান।

গান্ধীজী সম্পর্কে অপেক্ষাকৃ[ত] উদারতা থাকলেও শ্রদ্ধাশীলতার অভাব তবু অনেক ক্ষেত্রেই "নিরপেক্ষতা" বজ[ায়]

রাখা হয়েছে এবং বৃটিশ দমননীতির মধুতা দেখানর জন্য এরকম বিবরণ ত ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করলে পাওয়া যায় সর্বত্রই, ভাষার বা বলার ভংগীর যা তফাৎ......

'......his followers frequently resorted to violence and Gandhi as its unwilling cause was imprisoned 1922-24, 1930-31, 1932, 1942-44. বিশেষ করে নিম্নের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য।

'A pacific individualist, whom millions of his countrymen revered as a saint and whom all respected as the embodiment of tradition, Gandhi was not a man of commanding gifts nor an orator, nor did he make any real constructive contributions to the solution of constitutional problems. He was in fact a perpetual enigma both to admirer and critics. If he was certainly a propagandist, versed in all the arts of publicity, Hindu India either held that his guidance was infalliable, though difficult to follow, or pleaded his saintliness and the perfection of his human instrument in mitigation of manifest errors....But he was the most influential figure India has produced for generations, though it must be left to posterity to determine how much the eventual triumph of Swaraj owed to Gandhi and how much to inevitable development of British policy in the Govt. of dependent peoples from the era of Burke to the modern application of the concept of dominion status as the goal of the free and equal partnership which is called the British commonwealth of nations (Everyman's Encyclopaedia).

নেহরু অবশ্য একপক্ষে এনসাইক্লোপিডিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশী মর্যাদা পেয়েছেন। এ সম্পর্কে ভাল লেখা দেখেছি কলাম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়াতে অল্পের মধ্যে। কিন্তু ছোটখাট ভুলভ্রান্তি ত রয়েছেই। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ এবং বিরুদ্ধ মত পোষণ; Glimses of the world History থেকে তাঁর বৃটিশবিরোধী মনোভাবের এবং তাঁর ভাবাবেগ ও মতবাদের পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সন্ধান অনেক এনসাইক্লোপিডিস্ট পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অবশ্য উদারতা দেখা যায়। কেউ কেউ আবার তাঁকে বৃটিশ-বন্ধুরূপে সম্মানিত করেছেন। একজন আবার জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারে নাইট উপাধি বর্জনের প্রসঙ্গে পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে উপাধি অপছন্দ করতেন সেই মনোভাবের পরিচয় এবং তারই সূত্রপাত এইখান থেকে হয়েছে এই ইংগিতটুকু কৌশলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সম্মান যে মুখ্যত নোবেল প্রাইজের জন্য সেটাও বোঝা যায়। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ পিয়ার্স সাইক্লোপিডিয়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মাত্র এটুকুই উল্লিখিত হয়েছে "A Bengali poet who won Nobel Literature prize in 1913"। স্থানাভাবের প্রশ্ন হয়ত উঠতে পারে কিন্তু যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত ইংরেজ লেখকদের জীবনীর সারাংশ ১০।১১ লাইনের মধ্যে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনুরূপে আশা করা কি অন্যায়? বিশেষ করে যখন পরবর্তী সংস্করণে আরও যে ২।৩ লাইন রবীন্দ্রনাথের জীবনী থাকত তাই বা বর্জিত হল কেন?

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আমার দৃষ্ট কোন সাইক্লোপিডিয়ায় পাইনি। কয়েকজনের সংগে এই প্রসংগে আলোচনাও করেছি—তাঁদের অভিমত আমার কাছে অতীব দুঃখজনক। তাঁরা মনে করেন না যে, স্বামী বিবেকানন্দ এমন একজন মনীষী বা তাঁর এমন কিছু অবদান আছে যাতে তিনি এনসাইক্লোপিডিয়ায় স্থান পেতে পারেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, যেখানে অ্যানি বেসান্ত বা নাম-না-জানা মিশনারীরা সমাদরে স্থান পেয়েছেন সেখানে সত্যই কি স্বামী বিবেকানন্দ অপাংক্তেয়? যেখানে ওয়াই এম সি এ আর বাইবেল সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয় তখন কেন রামকৃষ্ণ মিশনের নাম খুঁজলেও পাওয়া যায় না? রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একমাত্র উল্লেখ দেখেছিলাম Webster Biographical Dictionaryতে। ২।১ কথা বলা হলেও তিনি যে পাশ্চাত্ত্য ধর্মবিরোধী তা পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে। শুধুমাত্র নিউ ডিক্শনারির পরিশিষ্টে বিশ্বের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জীতে বিবেকানন্দের মৃত্যুদিবস ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের তারিখও দেওয়া হয়েছে। এই কয়েকটিই উল্লেখ করলাম। এর থেকেই একটা ধারণা করতে আপনারা পারবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস।

দংশন

বিমল দত্ত

হাসনাহানার ঝোপে সাপ থাকে। হাসনাহানার গন্ধে বিষধর সাপেরা ঘাটি বাঁধার নিমন্ত্রণ পায়। এই কথাটা সন্দীপকে বাসনা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কতবার রাগ করে বলেছে, 'না, এসব চল্‌বে না। কোন্‌দিন একটা কি অপঘাত ঘটবে। ও পাপ তুমি মুড়িয়ে দাও।' সন্দীপ হাসে বলে, ছোটনাগপুরের জঙ্গলঘেরা এই শহরতলীতে সাপের ভয় মাথায় না নিলে এক পাও চলা যায় না। হাসনাহানার ঝোপটাকে দূর করলেই সাপ আসবে না এমন গ্যারাণ্টি নেই। রাগ করে ফল হয় না যখন, মিনতি করে বাসনা। আব্‌দার করে। 'লক্ষ্মীটি, ওটা তুমি কাটিয়ে দাও। আমার ভারি ভয় করে।'

সত্যিই ভয় করে বাসনার। বুকের মধ্যেটায় গুর গুর করে ওঠে গন্ধে। নিশ্বাস ভারি লাগে। ঘুমের মধ্যেও ওই গন্ধের ইশারা নাকে গেলে দুঃস্বপ্ন দেখে। যেন কতো সাপ কালো কুশ্রী তৈলাক্ত শরীরে ঢেউ তুলে এঁকে বেঁকে এগিয়ে আস্‌ছে। যেন ওকে জড়িয়ে ধরে দম বন্ধ করে দেবে। এক একদিন ঘুমের মধ্যেই হাঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

আজ বিকেলে বৃষ্টি হয়ে গেছে। দারুণ ঝড় আর বৃষ্টি। সন্ধ্যের পর ক্রমে ক্রমে মেঘ কেটে গেছে। একাদশীর চাঁদ ভিজে গাছের মাথায়। বারান্দায় হাতের সেলাইটা ফেলে রেখে ঝড় আসার আগে উঠে এসেছিল বাসনা। সেটার খোঁজে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই এক ঝলক গন্ধ এসে ওকে ঘিরে ধরলো। হাসনাহানার গন্ধ। অবশ হয়ে আসতে চাইলো হাত পা। ঠিক সেদিনের মত আব্‌ছা অন্ধকার। হাসনাহানার ঝোপের দিকে বাসনার চোখ পড়লো। ওখানে যেন কারা নড়ছে। কথা বল্‌ছে ফিস্‌ফিস্‌ করে। এখুনি কে যেন বাঘের মতো গর্জে উঠ্‌বে আর একটা আর্ত মর্মান্তিক কান্না উঠ্‌বে আকাশ ফাটিয়ে। ওর ঘরের জানলার কাঁচ কাঁপিয়ে কান্না যেন ওকেই ঘরের আনাচে কানাচে খুঁজে বেড়াবে। এক বছর ধরে ওই কান্না আর ওই মদির বিষাক্ত গন্ধ বাসনাকে খুঁজে বেড়াচ্চে। বাসনা ছুটে ঘরের মধ্যে চলে আসে। সোফার ওপর বসে পড়ে হাঁপায়।

সন্দীপ স্নান সেরে বেরিয়েই অবাক হয়ে যায়। কি হ'ল কি তোমার? শরীর খারাপ লাগচে নাকি?'

বিবর্ণ মুখ। ঠোঁট দুটো ভয়ে সা
হয়ে গেছে। চোখে স্পষ্ট যন্ত্রণা। মা
নাড়লো বাসনা। 'না, কিছু হয়নি!' '

'ওকথা বল্লে বিশ্বাস হয় না। বুকে
ব্যথাটা এতোদিন বাদে আবার চাড়া দি
উঠ্‌লো নাকি?'

তবুও বাসনা মাথা নাড়ে। অভিমা
কান্না এসে যায়। কতদিন থেকে বলেছে ও
ঝোপটাকে কাটিয়ে ফেলতে। এই সামা
একটা কথা ও রাখে না কিছুতেই।

সন্দীপ বললে, 'এই গুমোটে ঘরে
মধ্যে কেন? চলো, বারান্দায় চলো।

বাসনা আর একটু হ'লে কেঁ
উঠ্‌তো। সন্দীপের পায়ে পড়ে বল্‌তে
না না—বারান্দায় নয়। ওই গন্ধ বুকে গে
এবার ও ঠিক মরে যাবে। মুখ ফুটে কি
বল্‌তে পারে না। একথা কেমন ক
বলবে? যদি সন্দীপ জানতে পারে এ
দিনের জন্যে, অন্তত একবারের জন্যেও ব
পৈশাচিক নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল বাসনা
হলে ঘেন্নায় আর লজ্জায় কোনোদিন
মুখ দেখবে না। বাসনা বলতে পারে
তাই মুখ বুঁজে থাকে। ভুলে থাকতে চে
করে। এক বছর আগের সেই কদর্য স্মৃতি
বিষ ঝেড়ে ফেলতে চায়।

মাথা নেড়ে বাসনা শুধু বলে, না বেশ আছি এখানে, বারান্দায় নয়।

সন্দীপ হেসে ওঠে। 'আচ্ছা পাগল তো তুমি? বাইশ বছর বয়স হ'য়ে গেল এখনও ভূতের ভয় গেল না?' বাসনা চুপ করে থাকে। সন্দীপ ওর হাত ধরে বলে— নাও ওঠো; আর বিলাসীর প্রেতাত্মা যদি আসেও তোমার ভয় কি? সে যদি এখনও তোমায় চিনতে পারে আর মেমসায়েবের হুকুম তামিলে লেগে পড়ে তাহ'লে তোমার সুবিধে বই অসুবিধে নেই। ভূতেরা তো আর মাইনে নেবে না।'

রসিকতা শুনেই বাসনার সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। বারান্দায় ওকে যেতেই হবে, ওজর আপত্তি সন্দীপ শুনবে না। আপত্তি করবেই বা কী বলে? আগে প্রতি সন্ধ্যায় ওরা বারান্দাতেই বসতো। বাংলোটা ছোট হ'লেও বারান্দাটি অতি চমৎকার। হাতের পাশ থেকে কয়েকটা অর্কিড বাসনা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। খানিকটা মোরামের ঘেরা চারপাশে, ওর পরেই বাগান।

কিন্তু সে রাত্রের পর থেকে সন্ধ্যের ছায়া নামলে ওখানে বাসনা আর বসতে পারে না। তখন বাগানে সে-রাতের মতই আবছায়া অন্ধকার আর হাসনাহানার বিষশ্বাস।

যে-রাত্রে বিলাসীয়া ওইখানে খুন হ'ল তখন বাসনার অসুখটা খারাপের দিকে। সেরে ওঠার আগেই বাবার কাছে রাঁচীতে চলে গিয়েছিল বাসনা। তারপর যদিও বা এসে থেকেছে দু'চার দিন ক'রে আজ পর্যন্ত সন্ধের পর কখনো বারান্দায় বসতে পারেনি। একটা না একটা অজুহাত আবিষ্কার করেছে।

সন্দীপ বলে, 'আরে বাপু আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবো। তোমার এতো ভয়টা কি?'

'এখনি আসচি' ব'লে আলনা থেকে একটা শাড়ি টেনে নিয়ে বাসনা স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরে খিল দিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। খানিকটা সময় চাই ওর। সে এখনি কিছুতেই যেতে পারবে না। এখনও বুকটা কাঁপচে।

বাসনার যখন বিয়ে হয় সন্দীপ তখন পাটনায় পোস্টেড। বাসাটা ভালোই ছিল তবে বড়ো রাস্তার ধারে। দিনরাত ঘড় ঘড় শব্দ। লোকজন আসা-যাওয়া। বিয়ের আগে থেকে সন্দীপ ঘরে দিনরাত আড্ডা জমিয়ে রেখেছিল। বিয়ের পরও তার জের চলে। ভিড় ভালো লাগে না বাসনার। সে চায় একটু নিরিবিলি। আর চায় স্বামীকে একান্ত করে কাছে পেতে। কাজের শেষে দুজনে মিলে গল্পগুজব; খানিক বেড়িয়ে বেড়ানো।

এখানে এসে তাই ভারি খুশি হয়েছিল বাসনা। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল; সুন্দর বাংলো; বাগানের কম্পাউন্ড পেরিয়ে শাল-মহুয়া-পলাশের পাতলা জঙ্গল। খানিক দূরেই পাকা সড়ক চলে গেছে। তার ওপর যখন ইচ্ছে, যেদিন ইচ্ছে বাবার কাছে চলে যাওয়া যাবে। মাত্র মাইল ত্রিশেক দূরে।

'বুবীর' বয়স তখন সবে দু বছর। এখানে আসার আগে বাসনা এক মাস রাঁচীতে রয়ে গেল। সন্দীপ এসে ঘর-সংসার গুছিয়ে রয়েছে। বাসনার তাই এখানে এসে কোনো অসুবিধে হয়নি। হেঁসেলে প্রায় যেতেই হয় না। রাঁধুনী লোকটি চমৎকার সাজিয়ে কাজ করে। বাঙালী রান্নায় হাত পাকা। দু একদিনেই বাসনা বুঝলো যে ও-ব্যাপারে মাথা গলানো মিথ্যে। রাঁধুনী ওর চেয়ে ভালো বোঝে। সন্দীপ এখানে যে চাপরাসী পেয়েছে সে একেবারে প্রভুভক্ত হনুমান। সুখলাল। জাতে সাঁওতাল, মিশনারীর কাছে লেখাপড়া শিখে সরকারী চাপরাসী হয়েছে। অফিসের কাগজপত্র গোছানো, বাজার করা, হিসেব রাখা এমনকি ধোবা-নাপিত-মুচির সঙ্গে যাবতীয় বন্দোবস্ত সে একাই নিখুঁতভাবে করে আসচে। সেদিকে বাসনার করার মত কিছু নেই। তার ওপর বুবীকে নিয়ে থাকা আর দেখাশোনার জন্যে সন্দীপ সুখলালের বউকে বলে রেখেছিল। বাসনা যেদিন এ-বাসায় এলো বিলাসীও সেই দিন এসে বুবীকে কোলে তুলে নিল। সেও এক মিশনারী সায়েবের কাছে আগে কাজ করেছে। শিশুপালন-তত্ত্বে সে নিজের পটুতা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যা দেখালো তাতেই ঘুমন্ত বুবীকে ওর কোলে রেখে, সেই দুপুরেই বাসনা নিশ্চিন্তে নভেল নিয়ে বসলো। বাসনা ইজিচেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সন্দীপ এসে ওকে ঘুম থেকে তুললে। চায়ের সরঞ্জামও সেই সঙ্গে হাজির। বাসনা হেসে বলেছিল— 'তুমি এ কি কাণ্ড করেছ বলো তো দেখি। এমন রানীর হালে থাকলে যে দিন কতকে কোমরে বাত ধরে যাবে। কি করবো কি, সারাদিন? তোমার ঠাকুর চাপরাসী আমার সংসারে আমায় একেবারে বেকার করে ফেলেছে......।' সন্দীপও সত্যি খুশী, সবকিছু মনের মতো পেয়ে। উত্তরে বলেছিল, 'বেশ তো, এবার তুমি তোমার গানবাজনা, পরীক্ষার পড়াশোনার প্রচুর সময় পাবে।' বাসনার চোখে কপট অনুযোগ —'ওই নিয়ে কি সারাদিন থাকা যায়?'

—'যা নিয়ে সারাদিন থাকা যায়, তাও রইল তোমার কাছাকাছি। আমারও এখানে বেশী কাজের চাপ নেই। আর, আসলে এসবের জন্যে এমন কিছু বেশী খরচ হচ্ছে না। পাটনায় যখন একা থাকতাম এই এক মাসে তার চেয়ে আমার অনেক কম খরচ হয়েছে।'

বারান্দায় বসেছিল দুজনে। বাসনা এক সময়ে বলেছিল, বাগানটায় কিছু দিশী ফুলের গাছ এনে লাগাতে হবে। জুঁই বেলা হাসনাহানা রজনীগন্ধা। কি সেসব ক্যানা আর মোরগঝুঁটি বোঝাই করে রেখেছ বাগানে।

সন্দীপ উত্তর করেছিল, হাসনাহানার ঝোপে সাপ আসে বলে। এ এলাকায় কিন্তু ভীষণ সাপ!'

বাসনা হেসে ওর কথা উড়িয়ে দিয়েছিল, সাপ না হাতি। আমাদের রাঁচীর বাড়িতে কবে থেকে হাসনাহানার জঙ্গল হয়ে রয়েছে।

তিন বছর পরে অবশ্য রাঁচীর বাড়িতে পৌঁছে হাসনাহানার জঙ্গল সে নির্মূল করিয়েছে।

বাবা মাকে বোঝানো যায়। সন্দীপ কিছুতেই বুঝবে না। একদিন বাসনা ভেবেছে নিজেই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু পুরোনো মালি নেই, নতুন চাপরাসীটাও হয়েছে কুঁড়ের বাদশা, কিছুতে বাসনার কথা শোনে না।

স্নানের ঘরের দরজায় টোকা দিল সন্দীপ। 'কি ব্যাপার? কত দেরি?' বাসনা তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে ঢালতে শুরু করলো।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে আবার হাত থেমে গেল। চোখে পড়লো ছবিটা। বুবীকে কোলে নিয়ে আয়া দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের মুখভরা হাসি। ছবিটা দেখে

সন্দীপ বল্‌তো, দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনের ছবি। বিলাসীর কি আশ্চর্য শাদা সাজানো দাঁতের সারি। কোনো কথা বলার আগে একমুখ হাসি। এমন কি কাজের ফরমাস করলেও তাই। একদিন বুবীকে বিলাসী জামাকাপড় পরাচ্ছিল। বাসনার শরীরের অবস্থা ভালো নয়। বল্লে, আয়া টেবিল থেকে আমার ওষুধটা আন্‌তো!' বিলাসী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো—বল্লে, মেম্‌সাব্‌ আমায় বলেন আয়া, সায়েব বলেন বিলাসী, বুবীবাবা বলে 'বিলি'। ব'লে আবার হাসি। যেন কী হাসির কথা। বিরক্ত লেগেছিল বাসনার। ধমক দিয়েছিল বাজে বকতে হবে না। যা বলছি কর। পরে সন্দীপ একদিন বলেছিল, আচ্ছা বাসনা, তোমার ওই ঠাকুর চাপরাসী আয়া বলে ডাকতে ভালো লাগে? ওদের সবারই তো নাম আছে, সেই নাম ধরে ডাকো না কেন?

বাসনার মনে হয় ওটা অতি আদিখ্যেতা। যে যা, তাকে তো তাই বলে ডাক্‌বো। ওরাও তো তোমায় সন্দীপ না বলে সায়েবই বলে। গলায় বিরক্তি। তার কারণটা সন্দীপ বোঝে না।

সন্দীপ বারান্দায় পায়চারী করছে। পর্দাটা সরিয়ে দেখলো একবার ঘরের মধ্যে। বাসনা চিরুনীটা হাতে তুলে নিল। ভাগ্যক্রমে খুকীটা জেগে কেঁদে উঠলো। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে নিয়ে বস্‌লো বাসনা। অন্য সময় হলে চাপড়ে আবার ওকে ঘুম পাড়াতো। এখনও খুকীর ক্ষিদে পাবার সময় হয়নি। তবু ওকে কোলে নিয়ে খানিকটা সময় কাটে। খুকী এখন সবে মাস চারেকের।

এবার একেবারে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো সন্দীপ।—'খুকু ঘুমোলো?' তারপর হঠাৎ বললে, একটা খবর আছে। জানো, সুখলাল ছাড়া পেয়েছে। কাল রায় বেরিয়ে গেছে।' 'ছাড়া পেয়েছে?' বাসনার সারা শরীর হিম হয়ে যায়। বুকটা দুলে ওঠে রক্তস্রোতে। সুখলাল ছাড়া পেয়েছে? নিজের কানকেও বাসনার বিশ্বাস হয় না।

'প্রমাণের অভাব' মৃদু হেসে বল্লে সন্দীপ।'

'কি আশ্চর্য—একটা জ্বলজ্যান্ত খুনী।'

যখন আদালতে কেস চলছিল, তখন কতদিন বাসনা সন্দীপকে বুঝিয়েছে,—

তুমি কেন এমন একটা গুণ্ডা বদ্‌মাইসকে সাহায্য করছো। অমন চমৎকার বউটাকে যে কি করে খুন করলে......?'

'কি করে যে খুন করে তা কি সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু ও যে আমার জন্যে অনেক করেছে—'

'সব চাকরই মনিবের জন্যে করে থাকে—'

'কোনো কোনো মনিবও নিশ্চয়ই চাকরের জন্যে করে।'

তর্ক করে কিছুই হয়নি। বার বার এই কথা বোঝাতো বাসনা। বিলাসীর গুণপণার ব্যাখ্যা করতো। তবু সন্দীপ পুলিস কোর্ট থেকে বড়ো আদালত পর্যন্ত এই নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু সেই রাত্রের পরে বাসনার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়লো। খুকু তার কিছুদিন বাদেই জন্মালো। সে সময়ে ছ মাস প্রায় রাঁচীতেই রইল বাসনা। লোকের মুখে খবর পেতো, সায়েব পাটনা-পুরুলিয়া হাজারীবাগ করে বেড়াচ্ছেন উকিল মোক্তারদের সংগে কথা বল্‌তে।

বাসনা ওই মারাত্মক খবর শোনার আবেগ তখন কাটিয়ে ওঠেনি। সন্দীপ বল্লে, ও ছাড়া পেলে যাতে আবার এখানে চলে আসে—তাই বলে পাঠিয়েছি যতদিন না ওর চাকরি হয়, ও এখানেই থাকবে।'

বাসনার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে। গলার স্বর ভেঙে যায়। জিজ্ঞেস করে—'এখানেই?'

তার জবাব না দিয়ে সন্দীপ শুধু বলে, 'কাল আমি সকালে ট্যুরে যাচ্ছি। ও যদি এসে পড়ে ওকে বোলো, মালীর ঘরটা তো খালি আছে—ওখানেই যেন ব্যবস্থা করে।'
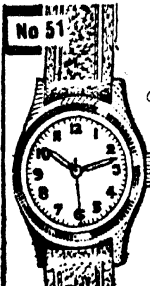
খুকু আবার নড়েচড়ে উঠ্‌লো। ওকে বুকে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো বাসনা। ভেঙে পড়লো আতঙ্কে। সুখলাল আস্‌ছে। আশ্চর্য এক ভয়ে বিছানার সংগে মিশিয়ে রইল বাসনা। ও যদি কোথাও চলে যেতে পারতো? কেউ যদি হঠাৎ ওকে রাঁচী থেকে নিতে আস্‌তো এ সময়ে? বাসনা ভাবছিল, আমার কি দোষ? আমি তো ওকে খুন করতে বলিনি—শুধু বিলাসীকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, মেয়েটা অসৎ ব'লে......

তাড়িয়ে না দিয়েই বা কি উপায় ছিল বাসনার......? সব যে জুড়ে বসেছিল বিলাসী। হাসিমুখের ডাইনী।

ওর জন্যে এমনকি বুবীকে রেখে আসতে হয়েছে রাঁচীতে।

ওখানে তবু সে বেশ থাকে। এখানে এলেই বায়না ধরে। 'বিলি' 'বিলি' করে খুঁজে বেড়ায়। পশ্চিমের বেড়ার কাছে চাপরাসীদের ঘরের কাছে হানা দেয়। সুখলাল আর বিলাসী থাকতো ও ঘরে। বুবীকে আয়া এমন করেছে যে নিজের মায়ের কাছে থাকা না থাকায় কিছুই এসে যায় না ওর। মাঝে মাঝে এমন অভিমান হতো বাসনার। ঘুম ভাঙলেই খোঁজ পড়তো 'বিলি'র। তারই আঁচল ধরে বিস্কুট চকোলেটের আব্দার।

একদিন বিকেলের দিকে ট্যুরের থেকে সন্দীপ ফিরেছে। বাসনা তখন ঘরের মধ্যে। বুবী ছুটে বাপের কাছে গেল। বাসনা
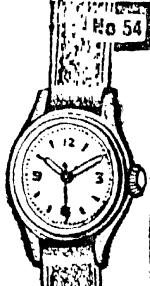
নতে পেল সে ঊর্ধ্বশ্বাসে সুখলালের রর দিকে ছুটেচে আর চিৎকার করচে—লি, বিলি, দেখো ড্যাডি কিরম লায়া া।' কি এনেছে সন্দীপ ছেলের জন্যে? টু কৌতূহল হ'ল বাসনার। জানলার া সরিয়ে ডাকলো—দেখি বুবী ড্যাডি এনেছে?' 'বুবী' 'বুবী'—সে শুনেতে ন না। ছোট্ট পায়ের উত্তেজিত শব্দ ার ঘরের দিকে মিলিয়ে গেল। অপমানে নার মুখ লাল হয়ে গেল। অসভ্য, াধ্য হয়ে উঠেছে ছেলেটা।

অফিস ঘরের দিকে এসে দেখে সন্দীপ র সুখলালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্যুরের গুলো সাজসরঞ্জামের ফিরিস্তি আলো- । চলেছে। পেট্রোলের কুপন আনাতে ব, হ্যাসাক বাতির ম্যান্টেল নেওয়া কার, জীপ্ থেকে পড়ে টর্চের কাচটা াথায় ভেঙে গেছে......বাসনা ওরই মধ্যে সময়ে বল্লে বারোটার মধ্যে ফিরবে বলে- লে, এতো বেলা হ'ল যে!' ওর দিকে বার চেয়ে সন্দীপ ঘাড় নাড়লে—ন্‌ছি'। বলেই আবার সুখলালকে বল্লে, ম এক কাজ করো। সাইকেলটা নিয়ে টারবাবুর কাছে যাও। যা দরকার নিয়ে সো। আর একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি—াস্ট করে দিও আজকের ডাকেই।' দীপ চেয়ারে বসে প্যাডটা হাতে তুলে ল। বাসনা জিজ্ঞেস করলে—দুপুরে জ কোথায় খেলে, আগরওয়ালেরা তো ল হয়ে গেছে!' 'বস্‌চি—এক মিনিট' মাথা তুল্লে না সন্দীপ। দ্রুতগতি লমটার দিকে চেয়ে চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে লো বাসনার। কান দুটো গরম হয়ে ঠলো। এমন অবশ ক্লান্ত মনে হলো হাঁটু টে যে টেবিলের কোনায় এক হাতের র দিয়ে দাঁড়ালো। মুখের ঘাম মুছলো চলে। পাশের চেয়ারটায় বসতে পারতো বসলো না। মিনিট দুয়েক এই আঘাত- কে কোনোমতে সহ্য করে ধীর পায়ে ট দুটোকে টেনে টেনে নিজের ঘরের কে ফিরলো।'

মুখ না তুলেই সন্দীপ ডাকলে, 'বাসনা ান, ডাক্তারের ঠিকানা যেন কি?' বাসনা রলো না। যেতে যেতেই বল্লে, 'নোট- ইতে লেখা আছে। পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সুখ- লকে ইঙ্গিতে ডাকলো নিজের ঘরের কে।

শব্দে যখন বুঝলো যে সন্দীপ আর বুবী নতুন আনা খরগোসের বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বাগানে খেলায় মত্ত—বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল রান্নাঘরে। উনুনের পাশে পিঁড়েটা দখল করে হাতা-খুন্তি নাড়তে শুরু করে দিল। ঠাকুর রুটি বেলে দিচ্ছিল বাসনা সেঁকে তুল্লো। ঠাকুরের সঙ্গে তার ঘরবাড়ি ছেলেমেয়ে জমিজিরাত সব নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গল্প করলে। ভয়ে ভয়ে ছিল কখন বুঝি সন্দীপ এসে হেঁসেলের দোরে দাঁড়াবে—ডাক দেবে ওকে। খানিক বাদে বুবীর আর ওর হাসির শব্দে বুঝতে পারলো ডাইনিং রুমেই রবারের বল নিয়ে হুটোপাটি করচে দুজনে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। আর কিছুক্ষণ পরেই ঝন্‌ঝন্ করে কি পড়লো ও-ঘরে। জলের জাগ্‌টা নয়তো ফুলদানীটা গেল নিশ্চয়ই। যাক্ গে, যা ইচ্ছে করুক ওরা। একবার ভুরু কুঁচকে আবার ঠাকুরের সঙ্গে গল্প জুড়লো বাসনা।

কত আর সহ্য করতে পারে মানুষ।

তরকারি মুখে দিয়েই সন্দীপ মিটি-মিটি হাসলো।

—'এতো আর ঠাকুর শ্রীবিহারীলালের রান্না নয়'—

—'না, আজ আমিই বেঁধেছি—'

'তাই তো বলি, রং রুটের হাতের গন্ধ রয়েছে। বিহারীলাল আমার পাকা সেপাই। হাতাখুন্তি ধরে রাইফেল ধরার মতো কড়া পড়ে গেছে হাতে। দেখা তো রে বিহারী—মেমসায়েবকে তোর হাতটা।'

সন্দীপ হেসে উঠ্‌লো। ঠাকুর শ্রীবিহারীলালও হাসলো। বুবীটাও কি বুঝে হেসে উঠ্‌লো ওদের সঙ্গে। অর্থ-শূন্য বিবর্ণ হাসি বাসনার মুখে একবার ছুঁয়ে গেল, প্লেটের দিকে মুখ নামিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে লাগলো সে। এমন রসিকতা সন্দীপ আগেও করেছে। তাই নিয়ে দুজনে মিলে হেসেছে অনেক। আজ যেন বড়ো তীক্ষ্ম কাঁটার মতো বিঁধলো।

তারপরেও শান্তি নেই। তার পরেও না।

তিন দিনের জন্যে সুখাডিহা অঞ্চলে ট্যুরে যাবে পরের দিন দুপুরে সন্দীপ। বিকেলে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে সেই অপমান জর্জর মুহূর্তে সংকল্প করেছিল বাসনা—যে সবকিছু এড়িয়ে যাবে, উপেক্ষা করবে। যেখানে সেধে তাকে ডাকবে না সেখানে সে যাবে না। কিছু বলবে না। কিন্তু সে সংকল্প রইল না। প্রথমে শুধু সহজভাবেই সে বল্লে সন্দীপকে—সুখা-ডিহিতে তো ডাকবাংলো নেই, কোথায় থাকবে?

'সুখলাল যেন কার কাছারিঘর ব্যবস্থা করে রাখিয়েছে—বল্লে।'

'কিন্তু ওখানে খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে? র‍্যাশান ব্যাগ তো নেয়নি দেখ্‌চি'

'সে একটা ব্যবস্থা হবেই, সুখলাল আমার মরুভূমিতে বাংলো মুরগি গজিয়ে তোলে'—

'কাল তো ইক্‌মিক্ কুকারটাই ফেলে গেল।'

'ও ইচ্ছে করেই নিয়ে যায়নি। ওখানে যে এলাহি কাণ্ড ছিল। এই তিনবেলাই পোলাও মাংস খেয়েছি।'

কি বল্‌বে যেন একমুহূর্ত ভাব্‌লো বাসনা। বল্লে, 'এবার তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে চলো না।'

'সে কি, তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে? বেজায় রুক্ষ জায়গা। শুধু কষ্ট হবে।'

'এখানেই বা আমি আর কি করচি।'

বুঝলো না সন্দীপ। ভাব্‌লে সচক্ষে ব্যবস্থাটা দেখে সন্দেহভঞ্জন করতে চায় বাসনা। তাই বোঝাতে গেল ওকে—তুমি কিছু ভেবো না, সুখলালের এমন পাকা ব্যবস্থা যে ক্যাম্পে আছি না বাড়িতে আছি, বোঝার উপায় থাকে না।

সেদিন এক ফাঁকে চুপিচুপি বাসনা বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। রেলিংয়ের ধারে একটা চেয়ার টেনে বসেছিল অনেক রাত অব্দি। কৃষ্ণপক্ষের থম্‌থমে কালো আকাশ। কি কথার পর কি কথা ভাবলে কিছু ঠিক নেই। বাবা মা'র কথা মনে পড়ে কাঁদলো অনেকক্ষণ। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার কেউ না কেউ ডাক্‌চে। খেলতে গল্প করতে ওকেই চাই। সিঁড়ি ওঠানামা করতে করতেই পায়ে ব্যথা ধরে যেতো।

তবু আপনিই কখন চোখের জল শুখিয়ে গিয়েছিল। তখন ভাবলে বাসনা, চাকরদের সর্দারী ও কক্ষণো সহ্য করবে

না। সব কাজে সে থাকবে—নিজে দেখা শোনা করবে।

সন্দীপ তখন ঘুমোচ্চে। নিজের ছোট খাটটিতে বুবীও ঘুমোচ্চে অঘোরে। মুখে চোখে জল দিতে বাথরুমে ঢুকলো বাসনা। দেখলো কাঠের খাঁচায় দুটো খরগোশের ছানা। গায়ে গায়ে ঘেঁষে বসে কান নাড়চে দুটিতে। মুখে কুট্‌কুট্ করে কি চিবোচ্চে। বুবীর পাওয়া উপহারটা এতোক্ষণে সে দেখতে পেল। একমনে কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে মনে হ'ল—এখনি যদি ইঁদুর মারার সেঁকো মেশানো এক টুকরো রুটী দিয়ে দেয় ও দুটোকে তাহলেই তো খতম। তখন বুবী কিন্তু ঠিক এসে কান্না জুড়বে —মা দেখেছো, আমার খরগোশ দুটো আর খেলা কর্চে না।

পরের দিন সকাল থেকে মরীয়া হয়ে লাগলো বাসনা। চা জলখাবার করলে নিজের হাতে। ঠাকুরের ওজর আপত্তি কিছু শুনলে না। বুবীকে আর বুবীর খরগোশকে নিয়ে খানিক খেলা করলো। বিলাসী গেছে সুখলালের জিনিসপত্র বাঁধা ছাদা করতে। বুবীর সঙ্গে খেলে মনটা ওর খুশী হয়ে উঠ্‌লো। ব্যাগ থেকে সন্দীপের জামাকাপড় খুলে দেখলো খুঁটিয়ে। নজর পড়লো, একটা সার্টের বোতাম নেই একটাও—কয়েকটার বোতাম ভাঙা। সেগুলো ছাড়িয়ে বসে বোতাম লাগালো। ছুঁচ আর সুতো হাতে নিয়ে গুন গুন করে গান গাইলো।

সন্দীপের পেছনে পেছনে সুখলাল এসে ঢুকলো ঘরে।

—একি, তুমি গৃহকর্ম নিয়ে বসেছ? তা বেশ!

—গৃহকর্ম না ছাই, একটু সময় কাটানো।

—কিন্তু একটু এক্‌স্‌পেনসিভ পাস্‌টাইম। সুখলালকে তো আবার গুছিয়ে তুলতে হবে।

—কেন, আমি কি পারি না—আমিই তুলে দেবো 'খন।

—টুনের যখন ওই বার করে দেবে—ওর নিজের হাতে রাখাই ভালো, খুঁজতে হবে না।

'—তা হোক একটু খুঁজতে' বলে বাসনা ছুঁচে সুতো পরাতে লাগলো। সুখলাল বোতাম বসানো জামাগুলো পাট করছিল। বল্লে, মেম্ সাব্, এ যে বড়ো বোতাম। বোতামের ঘর যে ছোট—এতো যাবে না!

ভুল বোতাম বসানোয় এতোটা লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই, তবু মুখ চোখ লাল হয়ে উঠ্‌লো বাসনার। লক্ষ্য করলে সুখলাল। বল্লে, ঠিক আছে, আপনি দিন—আমি ঠিক করে দিচ্চি। নির্বাক বসে বাসনা দেখলে যে, ওর লাগানো বোতামগুলো ছোট কাঁচি দিয়ে এক এক ক'রে কেটে ফেলচে সুখলাল। ছুঁচ-সুতোটা ওর হাতে দিয়ে বাসনা উঠে চলে গেল। সকাল থেকে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। বুক সেল্‌ফের পাশের সোফাটায় গা এলিয়ে দিল।

অনেক ক'রে সংযত করলে মনকে। প্রথম প্রথম এমন ভুল হবেই। অনেকদিনের অনভ্যাস।

বিহারীলাল টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। সন্দীপ তরকারি পাত্রটা নেড়ে চেড়ে হাঁক দিলো। কি করেছিস রে বিহারী। এতো জল দিয়েছিস কেন? সাঁতার প্রাক্‌টিশ করতে হবে যে! কি পান্‌সে একটা রুগীর ঝোল্......

জল্‌দিতে একটু পানি থেকে গেছে —সাব্। বাসনা উঠে পড়লো। পাত্রটা দেখ্‌লো। হাতে তুলে নিয়ে বল্লে, দাও—দাও, এক মিনিট বোসো, বুবীর সঙ্গে গপ্প করো—আমি ঠিক করে আনচি। উনুনের তাতে রক্তাভা মুখে কিছু একটা করতে পারার খুশী ঝল্‌মল করচে কোমরে তখনও আঁচল জড়ানো।

খেতে খেতে তরকারি মুখে দিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো সন্দীপ—'উঃ, কি করেছ এতো লংকা দিয়েছ কেন? মুখ যে জ্বলে গেল।'

'বল্‌ছিলে যে পান্‌সে হয়েছে—'

'পান্‌সে খাবো না বলে কি লংকা বাটাই খাবো।'

উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে বসলে বাসনা। ওতেই যথেষ্ট হয়েছিল—বুবীর জন্যে সকাল থেকে মনটা প্রসন্ন ব'লেই সহ্য করতে পেরেছিল কোনোক্রমে। চুপ ক'রেই থাক্‌তো। কিন্তু টিপ্পনী কাটলে সন্দীপ, 'যা-ও ছিল রয়ে বসে, তা-ও গেল বাঁদী এসে। কেন বাপু এমন হাতুড়োগিরি করলে।' আর সহ্য হ'লো না বাসনার।

—'কি যে তুমি চাও, কি ক'রে বুঝবো! এই বলচো পান্‌সে—আবার লংকা একটু দিলেই মুখ জ্বলে যাচ্চে—

'তোমার বোঝার দরকার কি বলো তো? বিহারী রয়েছে—ও দেখুক না!'

'বেশ, তাই দেখুক—' বলে মুখ বুজে খেতে লাগ্‌লো বাসনা।

বিহারী আছে, বিহারী দেখুক খাওয়া-দাওয়া। সুখলাল আছে, সে দেখুক জামা-কাপড় আর জিনিসপত্র। আমার থাকা না থাকা একই কথা। সন্দীপের কিছু যায় আসে না। শুধু বুবী আছে —বিলাসীকে ছাড়িয়ে দিয়ে, বুবীর সব কাজ সে নিজেই করবে।

রান্নাঘরের পেছনে একটা নিমগাছ

বুবী খেলছিল সেখানে। বাসনা এসে দাঁড়ালো। খানিক দূরেই বিলাসীদের ঘর। সামনে একটু চাঁচের বেড়া দেওয়া। বুবীর খেলা দেখছিল বাসনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সজোরে বেড়ার দরজাটা খোলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, একমুখ হাসি নিয়ে বেণীটাকে সাপের মত দুলিয়ে বিলাসী ছুটে এসে বেড়ার পাশে লুকিয়ে দাঁড়ালো। হাতে তকমা আঁটা সুখলালের পাগড়িটা। হাসচে আর উঁকি দিয়ে দেখচে সে। সুখলাল এসে হাজির হ'ল। যাই যাই করেও যেতে পারলো না বাসনা। আড়চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হুটোপাটি করচে দুজনে। এ হাতটা ধরলেই বিলাসী অন্য হাতে নেয় পাগড়িটা। নিরুপায় হয়ে সুখলাল একটা হাত ধরে মোচড় দিতেই, 'দিচ্চি—দিচ্চি' বলে বিলাসী বাড়িয়ে দিল পাগড়িটা। সুখলাল একটা কিল বসালো ওর পিঠে। 'উঃ, মরে গেলাম......' বলে হাসলো বিলাসী সরবে। তারপর গাল দিল......ডাকাত, গুণ্ডা কোথাকার। সুখলাল আবার এগিয়ে আসচে ওর দিকে। বাসনা দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে উঠে পড়লো। ঘরে ঢুকতে যেই পর্দাটা সরালো—সন্দীপের মুখোমুখী। তার সাজ-পোশাক হয়ে গেছে। পর্দাটা মাঝে ছিল তাই ওরা কতো কাছে এসে গেছে বুঝতে পারেনি। সরাসরি ওর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইল। একটা চাবি হাতে দিল সন্দীপ। অফিসঘরের চাবি—স্টোরবাবু যদি চায়—দিয়ে দিও। চাবিটা বাসনা হাত পেতে নিল কিন্তু চোখের চাওয়ায় অন্য দৃষ্টি। সন্দীপ এ দৃষ্টিটা চিনলো কিন্তু মানে বুঝলো না। কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলে—সত্যিই, তুমি মিছে ভেবো না। ট্যুরে আমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে আর কষ্ট হয় না। তার ওপর সুখলাল......

আবার সুখলাল। চোখ নামিয়ে নিল বাসনা—কিন্তু আমি কি করে থাকি বলোতো একা একা?

—আচ্ছা, এবার যখন বেশীদিনের ট্যুরে যাবো, তোমায় রাঁচীতে রেখে আসবো।

'—না-না', ভয় পেয়ে বল্লে বাসনা—এক হাতে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে মাথা রাখলে বুকের ওপর—'আমি এখানেই থাকবো। এখানেই বেশ আছি।'

যেখানে থাকতে চেয়েছিল সেখানে থাকতে পায়নি বলেই তো ওকে এতো নিচে নামতে হয়েছিল। খুকুকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে সেই কথাই ভাবছিল বাসনা। যারা ওর বাধা হয়েছিল—সে দুটোই তো বিদায় হয়েছে তবু ভয় কাটে না কেন! ওই হাসনাহানার গন্ধ যেন সব সময় ঘিরে ধরতে চাইচে। যে কথা সন্দীপের কাছে লুকিয়ে রেখেছে শুধু সেই কথাটুকুই যেন ওকে বার বার দূরে ঠেলে দিচ্চে নিরঙ্কুশ ওর আসনটার থেকে। বিলাসী মরে গিয়েও কি মুক্তি দেবে না ওকে? হাসনাহানার গন্ধে ভর করে তার ছায়া ওর পেছনে পেছনে আজীবন ঘুরে বেড়াবে? আর সুখলাল। আবার আসচে। এবার তার মৃত্যুবান নিয়ে। যদি জানতে পারে সন্দীপ?

সন্দীপ কি করে বুঝবে, কি অবস্থা করে তুলেছিল বিলাসী? সন্দীপও তো সেই জালে জড়িয়ে পড়েছিল। সুখলালের সঙ্গে বাসনার যা কথাবার্তা হয়েছিল—তা থেকে কি করে বুঝবে বাসনার মনে কি ছিল। গতবারে রাঁচীতে বুবীকে নিয়ে সার্কাসে গিয়েছিল বাসনা। সেই সার্কাসের লোভ দেখিয়ে গল্প বলে ওকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে এনেছিল। সে কিন্তু শুধু দুদিনের জন্যে। আবার বায়না ধরলে বুবী......না তোমার কাছে চান করবো না—বিলির কাছে, বিলির কাছে......না না—তোমার কাছে নয়, তুমি চোখে সাবান দিয়ে দাও। তবু ওকে জোর করে চান করালো বাসনা। দু চার চড় কশালো সজোরে। জামাকাপড় পরালো। কান্নাকাটি করে খেলো না কিচ্ছু বুবী, দুপুরে ঘুমোলো না। হাতটা জ্বালা করছিল বাসনার—বিকেল অব্দি। বুবী সেই অসময়ে সন্ধ্যের মুখে ঘুমোলো।

নিজের একটা চাঁপা রংয়ের পুরোনো শাড়ি আয়াকে পরতে দিয়েছিল বাসনা। আয়া সেদিন সেই শাড়িটা পরেছে। বুবীর জন্যে জ্বাল দেওয়া দুধ হেঁসেল থেকে তুলে আনতে গেছে—কি কাজে বাসনাও পেছনে পেছনে গেছে। শুনতে পেল—বিহারী হাসচে—বলচে—কিরে বিলাসী, সিনেমায় নাববি নাকি? একেবারে পরী সেজেছিস যে! উত্তরে খিল্‌খিল্‌ করে হাসলো বিলাসী—'যাই তো তোকেও উড়িয়ে নিয়ে যাবো। তোর যা গোঁফের বহর সিনেমাওয়ালারা লুফে নেবে।' বিহারী বল্লে, বেশ বেশ দুজনে না হয় যাওয়া যাবে। উনুন ধরতে বড়ো বেলা হয়ে গেছে। তুই রুটিগুলো বেলে দে তো—আমি সেঁকে নিই...'

বাসনা তখন দরজার কাছে। এগিয়ে এসে বল্লে,...সরো, আমি বেলে দিচ্ছি...'

'......থাক মেম সায়েব, বুবী তো ঘুমুচ্চে, আমি বেলে দিই এখন।' বলে বিলাসী হাসলো। আর পিঁড়ি টেনে বসে পড়লো।

ঠাকুর বল্লে—'আপনি গরমে কেন কষ্ট করবেন। বিলাসী মেসিনের মতো রুটি বেলে। এক্ষুণি হয়ে যাবে।

বিলাসী আর সুখলাল শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তবু তখনও এতো কঠোর হয়নি বাসনা।

সন্ধ্যেয় সন্দীপের একটা কথায় ওর বাঁধ ভেঙে গেল। ওরা দুজনে চা খাচ্ছিল। কি কাজে বিলাসী এসেছে সামনে। সন্দীপ উচ্ছ্বসিত গলায় বল্লে, 'ওরে বাবা, কে বল্‌বে বিলাসিনী কলকাতার কলেজ গার্ল নয়!'

বিলাসী উত্তরে হাসলো দাঁত বার করে। গা জ্বলে গেল বাসনার। আর কিচ্ছু নয়। ওই শাড়িটা তো পরে পরে প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছে বাসনা—নজরে পড়েনি তো কারুর।

বাসনা বল্লে, দেখো—আদর দিয়ে দিয়ে আয়া বুবীটির মাথা খাচ্চে। আয়াকে আমি ছাড়িয়ে দেবো। বুবী তো এখন বেশ বড়ো হয়ে গেছে। ওর কাজ আমি নিজেই পারবো 'খন।

'এখন পারলেও, আর কিছুদিন বাদে তো পারবে না।' হাসলে সন্দীপ। খুকী হয়েছে তার মাস ছয়েক পরে।

'সে তখন দেখা যাবে—এখন মিছি-মিছি পয়সা নষ্ট করে—' এবারে আর হাসলো না সন্দীপ। বল্লে, দেখো বাসনা—সুখলাল আমার যা কাজ করে ওকে অনেক বেশী মাইনে দেওয়া উচিত। তাই বিলাসীকে রেখেছি—ওদেরও লাভ, আমাদেরও সুবিধে।

তর্ক সেখানেই শেষ হয়ে যায়। বাসনার প্রস্তাব টিক্‌লো না।

সেদিন সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে তখন। বাসনা দেখলে বিলাসী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইচে। কালো হলেও কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলে আর দেহের গঠনে সুপুরুষ ছেলেটি। আগেও কয়েকদিন দেখছে ওকে এখানে ঘোরাঘুরি করতে। কি ভেবে বাসনা ডাকলে আয়াকে...ও ছেলেটি কে রে? কি চায় ও?

আমাদের গাঁয়ের গির্জে-ঘরের মালীর ছেলে। ও একটা কাজ চায়।'

'—ও এখানে মালীর কাজ করবে?'

'—আপনি রাখবেন?'

মালী রাখা হ'ল। বাগানটা জঙ্গল হয়ে আছে। সুখলালের পাশের কুঠরীটায় থাকতে দিলো ওকে। 'উনুন টুনুন জেবলে ওঘর যেন আর নোংরা না করে'। উপদেশ দিল বাসনা—'তোমাদের যখন দেশের ছেলে—তোমার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করুক না।' মালীর স্বভাব ভারি মিষ্টি। দিনরাত গাছ নিয়েই থাকে। বাসনা বাগান নিয়ে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লো।

লাল আর হল্‌দে ছাপ দেওয়া একটা শাড়ি একদিন হঠাৎ বাসনা বিলাসীকে দিলে। বেশীবার পরেনি ওটা—বল্লে পছন্দ হয় না। বিলাসীর খুব পছন্দ। বাগানটা অনেক পরিষ্কার হয়েছে, বুবী তখন ওখানেই খেলে। বিলাসী গাছ-তলায় বসে মালীর সঙ্গে গল্প করে। বিলাসীকে আর একদিন বাসনা কাঁচের একটা টিপ দিল। বল্লে, টিপটা মস্ত বড়ো। বাসনার মুখে নাকি মানায় না।

মাসখানেক কাটলো। ক'দিন থেকে জ্বর হয়েছে বাসনার। সামান্য সর্দিজ্বর। বুকে পিঠে কেমন ব্যথা বোধ হচ্চে। ডাক্তার দেখে গেছে। সন্দীপের ক'দিন থেকে কাজ পড়েছে—মাঝে মাঝে আসে এঘরে। যথা-সময় ওষুধ পথ্যি দিয়ে গেছে বিলাসী। সারাদিন একা শুয়ে ভাবছিল বাসনা। নিখুঁত চলেছে সংসারযাত্রা। কোনো অভাব নেই। বাসনা কিচ্ছু করুক আর নাই করুক। অথচ চারদিনের জন্যে গত ক্রিশমাসের সময় ছুটি নিয়েছিল সুখলাল আর বিলাসী। যেন হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। সেদিন দুপুর থেকে বুকের ব্যথাটা বেশী বোধ হচ্ছিল। জ্বরও বেড়েছে। বিলাসীকে একটা চিঠি দিয়ে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছে বাসনা।

বুবী হন্তদন্ত হয় ঘরে ঢুক্‌লো—'বিলি' 'বিলি' বলে ডাক্‌লো কয়েকবার। সাড়া না পেয়ে ফিরে চলে গেল। সারাদিন বাদে বুবী এসেছিল মায়ের ঘরে। বাসনার ইচ্ছে হয়েছিল কাছে নিয়ে একবার চুমু খায় ওর কপালে। বুবী চলে গেল এদিকে একবার দেখেই।

মালী ঘরে এসে ফুলদানিতে ফুল রাখলো। জিজ্ঞেস করলে, মেম সাব্ বিলাসী কোথায়—? 'কেন?' জিজ্ঞেস করলে বাসনা।

'গাছে জল দেওয়ার ছোট ঝাঁজরিটা কোথায় রেখেছে?'

'নিজের জিনিস ঠিক করে রাখো না কেন? জল দেবার ঝাঁজরি বিলাসী নেয় কেন—?'

'বুবী বাবাকে খেলাচ্ছিল। ওরা জ[illegible] দিচ্ছিল গাছে—!'

জ্বলে উঠ্‌লো বাসনা—'যাও, নিজে খুঁজে দেখো গে!'

তারপর ঠাকুর এসেছিল বিলাসী খোঁজে, রুটি বেলে দেবে সে। ধমক খেয়ে ফিরলো।

...তারপর আর সহ্য হ'ল না। সন্দীপ ...সে দায়সারা এক তত্ত্ব নিল ওর ...স্থোর, তারপর জিজ্ঞেস করলে— ...বিলাসী কোথায়?'
...'—তার কৈফিয়ৎ কি আমায় দিতে ...বে নাকি?'
...'শুধু শুধু মেজাজ খারাপ কর্চো ...ন? বুবী বারান্দায় একা বসে—তাই ...ছিলাম—
...'তোমার ছেলের যদি বিলি না থাকলে ...কা লাগে আমি কি করবো?
...যাও না—তুমি তো এসে গেছো, নাও ...ক—আয়াকে আমি ডাক্তারের কাছে ...ঠেয়েছি......'

তখনি স্থির করলো বাসনা। আর দেরি নয়।

সন্ধ্যেয় খানিক ঝড় হ'ল। ঝড় কেটে গিয়ে প্রশান্ত আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ দেখা দিল।

চাপরাসীকে ডেকে পাঠালো বাসনা। ওর মুখের দিকে না চেয়েই কঠিন কণ্ঠে বল্লে—আয়া আর মালীকে আমি রাখতে পারবো না। ওদের আমি চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবো।

'—কেন মেম্ সায়েব?'

'—ওরা ভীষণ বদ লোক। সায়েবকে এসব কেচ্ছার কথা বলতে চাই না। তুমি ভালোমানুষ, সারাদিন বাইরে থাকো, কিচ্ছু বুঝতে পারো না—'। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সুখলাল, ইঙ্গিতটা বুঝলেও মাথার মধ্যে কিছুতেই যাচ্ছে না কথাটা।

'—বার বার করে আমায় বলে যখন ছেলেটাকে চাকরিতে ঢুকিয়েছিল তখন আমার সন্দেহ হয়েছিল। ভেবেছিলাম, হয়তো গাঁয়ের ছেলে—তাই! কিন্তু সারাদিন তুমি থাকো না, আমি যা দেখি—'

সাঁওতালের রক্ত, টগ্‌বগ্ করে উঠ্‌লো। ব্যভিচার? নেমকহারামী আর শয়তানী? ছেড়ে যাওয়ায় কোনো বাধা নেই বলেই স্বেচ্ছাবন্দিনীর ছলনা ওদের কাছে তীব্র ঘৃণার। আর বেদবাক্য প্রভু আর প্রভুপত্নীর কথা। গর্জন করলে সুখলাল আক্রোশে—আমি ওকে এখুনি লাথি মেরে দূর করে দেবো ঘর থেকে। আর ওই হারামীটাকে—দাঁতে দাঁত ঘষলো সুখলাল।

বাসনা বল্লে—'এমন কি, সন্ধ্যেয় তুমি যখন ঘরে থাকো, ওরা বাগানে এসে কথা বলে—আমি দেখেছি......'

হতবাক হয়ে দাঁড়াল সুখলাল।

বাসনার মনে আর একটা ছল এলো। বল্লে—দাঁড়াও সুখলাল, এখুনি কিচ্ছু বলো না। আজ রাত্রেই লক্ষ্য ক'রো। নিজে চোখেই দেখতে পাবে।

ও চলে যাবার খানিক পরে মালী আর আয়াকে ডেকে পাঠালো বাসনা। মালীকে বল্লে, হাসনাহানার ঝোপের নীচে যে মোটা পাতার লতা আছে, সুন্দর লতা, তোমায় তুলে ফেলতে বারণ করেছিলাম—সেইটে দেখিয়ে দাও বিলাসীকে।'

বিলাসীকে আড়ালে ডেকে বললে, লতাটা বুকের ব্যথার দৈব ওষুধ, মেয়েমানুষকে তুলে আনতে হয়। আমি তো যেতে পাচ্ছি না। তুই নিয়ে আয়।'

লণ্ঠনটা হাতে নিচ্ছিল বিলাসী। বাসনা বল্লে, না, আলো নিতে হয় না। তাইতো রাত্রে তোলার কথা।

দুজনে চলে যেতেই বুকটা ভীষণ কাঁপলো কয়েক সেকেণ্ড। ঘরের আলো কমিয়ে দিয়ে জানলার পর্দা খানিক সরিয়ে দাঁড়ালো। সন্দীপ অফিস ঘরে। বুবী ঘুমোচ্চে। হাসনাহানার ঝোপের পাশে অস্পষ্ট দুটো ছায়া।

তারপর একটা বাঘের মতো গর্জন আর একটা আর্ত চিৎকার। শব্দে বুঝলো মালীর পিছনে ধাওয়া করেছে সুখলাল। কোনোমতে নিজের পালঙ্কে ফিরে এলো বাসনা। তারপর কখন পাগল হাতির মত দুপ্‌দাপ্ পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে—কিচ্ছু জানে না সে।

এতোটা তো সে চায়নি। আহত বিলাসীকে নিয়ে পুলিস আর হাসপাতাল সেরে ভোরে বাড়ি ফিরলো সন্দীপ। বিলাসী মারা গেছে। পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সুখলাল। মালী ফেরার হয়ে গেছে।

এতোটা সে চায়নি, কিন্তু সুখলালের মুক্তি ও সহ্য করবে কি করে? কোন্ সাহসে? সুখলাল নিশ্চয়ই সব কথা বল্‌বে সন্দীপকে। কিন্তু সন্দীপ কি জানতে পারবে কখনো যে কি অসহ্য যন্ত্রণায় এমন নিষ্ঠুর হয়েছিল বাসনা?

'কে, কে?' শিউরে উঠে বাসনা বিছানার ওপর বসে পড়লো। দরজার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুখলাল। মুখভরা দাড়ি। কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে—শোবার ঘরের এই আবছা আলোয়। কাঠ হয়ে বস্‌লো বাসনা। একটা ঠাণ্ডা স্রোত শিরদাঁড়া দিয়ে বার বার বয়ে গেল।'

'—আমি সুখলাল', পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল ছায়াটা। বাসনা হয়তো চিৎকার করে উঠ্‌তো, হয়তো সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যেতো বিছানায়। কিন্তু মাঝের ঘরে সন্দীপ ছিল। সে এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে।

॥ ১৩ ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায় ফ্রী প্রেস। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই তার জন্ম, স্বরাজ-সাধনার সংবাদ পরিবেশনায় তার প্রসার। স্বীকৃতি পেয়েছে, প্রশংসা পেয়েছে ফ্রী প্রেস, কিন্তু আর্থিক দুর্গতি ঘোচে নি। বিভিন্ন দৈনিকপত্র থেকে যে আয় আসতো তাতে কিছুতেই ব্যয়সঙ্কুলান হতো না। তদুপরি আরো একটা ক্ষোভ ছিল সদানন্দের, যে ভঙ্গীতে ও যে পরিমাণে জাতীয় সংবাদের প্রচার হওয়া প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতো, তেমনভাবে কিছুতেই সংবাদ প্রকাশ ঘটতো না।

ফ্রী প্রেসকে অন্যনিরপেক্ষ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার জন্য সদানন্দের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর মনে অসাধারণ সাহস। অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। অনেক দৈনিকপত্র অভিযোগ করতো, আপনাদের বিদেশী সংবাদ কই। শুধুমাত্র দেশীয় সংবাদ নিয়ে তো দৈনিক-পত্রের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারবেন না।

সদানন্দের পণ সমস্ত প্রয়োজন মেটাবেন। আর্থিক দুর্গতিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে লণ্ডনে ফ্রী প্রেসের অফিস খুলে বসলেন। সহকর্মী কাবাদিকে পাঠানো হলো আন্তর্জাতিক খবর পাঠাবার জন্য। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিদেশী সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা হলো ফ্রী প্রেস থেকে। প্রথম কয়েকমাস বিদেশী বার্তা বিনামূল্যে দেওয়া হলো। অনেক পত্রিকা গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন। সকলেই প্রশংসা করলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই।

কিছুকাল পর বিদেশী সংবাদের জন্য বর্ধিত চাঁদা দাবী করা হলো ফ্রী প্রেস থেকে। তখন দৈনিকপত্রগুলির উৎসাহ নিভে গেল। বর্ধিত মূল্য দিতে কেউ সম্মত হলেন না। তাঁদের কেবল ভয়, যদি ফ্রী প্রেস বিদেশী খবর ঠিকমতো দিতে না পারে তাহ'লে তাঁরা স্ট্যাটস্-ম্যান, ইংলিশম্যান, টাইমস অব ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল প্রভৃতি ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাগুলির সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিভাবে? যদি তখন তাঁদের নিত্য হার ঘটে!

সকলেই কাজের প্রশংসা করেন অথচ ভরসা করেন না। ঠিকমত আস্থা রাখতে পারেন না।

চঞ্চল হয়ে ওঠলেন সদানন্দ। সুষ্ঠু-ভাবে আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের সহকর্মী এবং বর্তমানকালের বিখ্যাত সাংবাদিক কৃষ্ণ শ্রীনিবাসকে লণ্ডন অফিসে পাঠানো হলো। চার্লস বার্নস নামক জনৈক ভারত-হিতৈষী ইংরেজ সাংবাদিক ও তাঁর সাংবাদিক-পত্নী মার্গারিটা বার্নসকে লণ্ডন অফিসের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করা হলো। এর কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য মহাত্মাজী লণ্ডন পৌঁছেন। বৈঠকের রিপোর্ট করবার জন্য স্বয়ং সদানন্দ গেলেন লণ্ডন। বিলেত থেকে চমৎকার রিপোর্ট আসতে লাগলো। সকলেই প্রশংসা করে বল্লেন, রয়টার এমন সংবাদ পাঠাতে পারেনি।

কিন্তু তবু আর্থিক অবস্থা মন্দ থেকে ভালো হলো না। সম্মান অর্জিত হলো, সাংবাদিক মহলে কিছুটা প্রতি-পত্তিও পাওয়া গেল, তবু দারিদ্র্যের প্রত্যহ প্রহার কিছুতেই ঘুচলো না।

অসাধারণ সাহস ও কল্পনা-শক্তি ছিল সদানন্দের। কিন্তু অর্থনৈতিক সাফল্য আসে যে বুদ্ধিতে, সদানন্দের তার অভাব ছিল। হয়তো ইতিহাসে এমন চরিত্রই সম্ভব। বৃহৎ কর্ম উদ্‌যাপনের মেজাজ নিয়ে যাঁদের জন্ম, অর্থনৈতিক সাফল্যের প্যাঁচ তাঁরা কষতে পারেন না।

লণ্ডন অফিস খোলার জন্য খরচের অংক বেড়ে গেল। অথচ আয় বাড়লো না। বিলেত থেকে গোলটেবিলের সংবাদের জন্য কিছু বাড়তি চাঁদা দাবী করা হয়েছিল সংবাদপত্রগুলি থেকে, সে দাবী পূরণ হয়নি। কেবলমাত্র পুলিন দত্ত লাহোরের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা থেকে ও কলকাতায় আমি সহযোগী সংবাদপত্র থেকে এই বর্ধিত মূল্য আদায় করতে পেরেছিলাম। অন্যান্য প্রদেশ থেকে, এমন কি সদানন্দের কর্মক্ষেত্র বোম্বে থেকেও বর্ধিত মূল্য পাওয়া যায়নি। তখন উত্যক্ত হয়ে সদানন্দ দাবী জানালেন দেশী ও বিদেশী সংবাদের জন্য ইংরেজী-ভাষী পত্রিকাগুলিকে মাসিক বারো শ' টাকা ও দেশীয়ভাষী পত্রিকাগুলিকে পাঁচ শ' টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। এই দাবীও সারা ভারতের সংবাদপত্র জগতে অগ্রাহ্য হলো।

কলকাতার সম্পাদকদের সংগে আমি নানান আলোচনা করে এই বর্ধিত মূল্যের প্রয়োজন তাঁদের বুঝিয়ে বলেছিলাম। লাহোরে পুলিন দত্ত কয়েকটি সংবাদপত্রকে সম্মত করতে পেরেছিলেন। শুধু মুষ্টিমেয় এই কয়টি দৈনিকপত্র ফ্রী প্রেসের দুর্দিনে ন্যায্যমূল্য দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে কেবল মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা সংবাদ পরিবেশন করে ফ্রী প্রেসের তখন বিশেষ গুরুত্ব। তাই সদানন্দ আশা করেছিলেন, তাঁর দাবী সকলেই মেনে নেবেন। কলকাতা ও লাহোর ছাড়া

অন্যান্য স্থানের কেউ রাজী না হওয়ায় তাঁর মনে আশাভঙ্গের আলোড়ন দেখা দিল।

তিনি স্থির করলেন, বোম্বে থেকে একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ চলতে লাগলো, ফ্রী প্রেসের ডিরেক্টরদের সভা আহ্বান করে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। নতুন পত্রিকা বার হবে ফ্রী প্রেসের, একটি অসাধারণ দৈনিকপত্র।

প্রকাশিত হলো পত্রিকা। 'ফ্রী প্রেস জার্নাল'। ফ্রী প্রেসের দেশী ও বিদেশী সংবাদের ওপর ভিত্তি করে অপরাজিত জাতীয়তাবাদী পতাকা তুললেন সদানন্দ।

স্বল্পদিনের মধ্যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করলো জার্নাল। প্রচার সংখ্যায় সকলের ঊর্ধ্বে উঠে গেল অনতিবিলম্বে। চিন্ময় দেশপ্রেম ছিল পত্রিকার অক্ষরে অক্ষরে, অপরাজেয় প্রাণশিখা দৃষ্টিকোণের ভঙ্গীতে। জনপ্রিয়তার অভিনন্দন যেমন আসতে লাগলো, ব্রিটিশ সরকারের রোষ-দৃষ্টিও তেমনি পুড়িয়ে দিতে চাইলো পত্রিকাকে। সরকার একটা 'স্পেশ্যাল প্রেস আইন' প্রণয়ন করে মোটা টাকার দাবী জানালো কিন্তু নির্ভয় সদানন্দ নিঃশঙ্ক। তাঁর কলমে আগুন, প্রাণে দেশপ্রেমের রক্তশিখা। দু'বার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিল সরকার। তৃতীয়বার জামানত চাওয়া হলো কুড়ি হাজার টাকা। সরকারী 'প্রেস এডভাইসার' নিযুক্ত হলো সংবাদপত্রগুলিকে খবরদারি করার জন্য। নিয়ম করা হলো, এইসব মান্য সিভিলিয়ান 'প্রেস এডভাইসারদের' না-মঞ্জুর কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না।

'প্রেস এডভাইসার' নিযুক্ত করায় সংবাদপত্র জগতে একটা তীব্র সোরগোল উঠলো। চারদিকে প্রতিবাদের বন্যা। যখন কিছুতেই সরকারকে নরম করা গেল না, তখন একযোগে সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ স্থগিত রাখা হলো। বোম্বেতে সভা বসলো সাংবাদিকদের। বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সাংবাদিক প্রতিনিধিমণ্ডলী। উত্তেজনা যখন চরম তখন সরকার পশ্চাদপসরণ করলেন। সাংবাদিকদের দাবী মেনে নেওয়া হলো। পত্রিকা-ধর্মঘট উঠিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু ফ্রী প্রেস থেকে কুড়ি হাজার টাকার জামানত দাবী পরিত্যক্ত হলো না। অসমসাহসী সদানন্দ জামানতের টাকা সরকারী তহবিলে পেশ করে আবার দুর্বারবেগে অগ্নিক্ষরা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন।

উৎসাহে ও উদ্দীপনায় আবার প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেন সদানন্দ। নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন ফ্রী প্রেসের। হয়তো নতুন যুগ ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে। তিনি স্থির করলেন কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও লাহোর থেকে আরো পাঁচটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করবেন। এইসব পত্রিকার উদ্বৃত্ত লাভ থেকে ফ্রী প্রেস সংগঠনের ঘাটতি ব্যয়ভার সংগ্রহ করবেন। বোম্বের কোটিপতি বণিক মথুরদাস ভাসানজীর সঙ্গে সদানন্দের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু আমি খুব উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমি মাটির কাছাকাছি মানুষ, অতিরঞ্জিত স্বপ্ন আমাকে মোহাবিষ্ট করতে পারে না। পাঁচটি পত্রিকার জন্য অন্তত কুড়ি লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তারপরেও হয়তো আর্থিক সহায়তা দরকার হতে পারে। নতুবা মাঝখানে বিপদ যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বা কালো মেঘ ভিড় করে আসে আকাশে, তখন কে রক্ষা করবে। কিন্তু আশার ঘোড়ায় ছুটছেন সদানন্দ, সকল বাধা তিনি নিজের জোরে উত্তীর্ণ হয়ে যাবেন।

আংশিক মূল্য দিয়ে পাঁচটি রোটারি প্রেস কেনা হলো। বিভিন্ন শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে পত্রিকার উদ্যোগপর্ব চলতে লাগলো। ফ্রী প্রেসের শাখায় শাখায় তখন শুধু নতুন পত্রিকার স্বপ্ন। আর ভাবনা আমার মনে। এতো বড়ো দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন সদানন্দ, তা কি সার্থক করা সম্ভব হবে? সম্ভব হবে মাত্র দেড় লক্ষ টাকার ওপর নির্ভর করে এতো বড়ো কর্ম-প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা।

বিলেত থেকে মার্গারিটা বার্নসকে বোম্বে ডেকে আনা হলো। লণ্ডন অফিসে তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদের তত্ত্বাবধান ছাড়াও রিপোর্ট ও মন্তব্য লিখতেন। মিসেস বার্নসকে নিয়ে সদানন্দ ভারতের কোটিপতি বণিকদের দরবারে ঘুরতে লাগলেন। আশা ছিল মার্গারিটার সক্রিয় সহযোগিতায় পাঁচটি পত্রিকার মূলধন সংগ্রহ করা যাবে এবং নানানতর প্রতি-কূলতার বন্ধন উত্তীর্ণ হওয়া চলবে।

মার্গারিটা বার্নস সুশিক্ষিতা, সুমার্জিতা, সদালাপী। ইংল্যাণ্ডের নানা পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। পার্লামেণ্ট সদস্য মেজর গ্রাহামপলের একান্ত সচিব হিসেবে তিনি অনেকদিন কাজ করেছিলেন; সাংবাদিক চার্লস বার্নসের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছিলেন ভারত-হিতৈষী, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বর্তমানকালের প্রতি অনুরক্ত মমতা ছিল তাঁদের।

সাংবাদিক হিসাবে মার্গারিটার যোগ্যতা আমাদের মুগ্ধ করতো। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, রাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্যধর্ম যে কোন আলো-চনায় তিনি যোগ দিতে পারতেন। মধুর ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব; কথা বলার ভঙ্গী ছিল মনোরম, ব্যবহারের মধ্যে ছিল সুমিষ্ট আন্তরিকতা। অল্পায়াসে তিনি লোকচিত্ত জয় করে নিতেন।

সদানন্দের আশা হয়তো সার্থক হতে পারতো। মার্গারিটার চেষ্টায় আরও টাকা সংগ্রহ করা গেল, বাধাও কিছুটা কাটলো। যদি অস্থির অধৈর্য হয়ে না পড়তেন সদানন্দ, তাহলে হয়তো মার্গারিটার প্রত্যহ সোৎসাহ সহযোগিতায় তিনি সাফল্য লাভ করতে পারতেন।

ফ্রী প্রেসের আর্থিক দুর্গতির ফলে লণ্ডন অফিস তুলে দিতে হলো। চার্লস বার্নস ভারতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন। মার্গারিটার চেষ্টায় অনতিবিলম্বে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বার্তা-সম্পাদক হিসেবে তিনি চাকরি গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর যোগ্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। বহুকাল কাজ করে ডিরেক্টর অব নিউজ সার্ভিসেস পদে উন্নীত হয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মার্গারিটা 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' নামে একটি মূল্যবান বই রচনা করেছিলেন। ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে বইটির বিশেষ

সমাদর হয়েছিল। সাংবাদিকতার ছাত্রদের পক্ষে এ বইটির প্রয়োজনীয়তা এখনো ম্লান হয় নি।

চার্লস ছিলেন নিরীহ শান্ত ভালো-মানুষ। দিনরাত্রি শুধু কাজ নিয়েই থাকতেন। এই সাংবাদিক-দম্পতিকে আমরা ভালোবেসেছিলাম। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সহ-মর্মিতা ছিল।

কিন্তু তাঁদের দাম্পত্যজীবনে একদা বিরোধের মেঘ দেখা দিল। যে প্রেম লণ্ডনের কুয়াশাঢাকা মাটিতে আস্তে আস্তে তাঁদের মনে গাঢ় হয়ে উঠেছিল, মিলনের মধ্যে যা হয়েছিল মধুর সার্থক, ভারতবর্ষে এসে তাতে দেখা দিল ভাঙনের স্রোত। তারপর চললো নানা ভুল বোঝা-বুঝি, অবিশ্বাস, অপ্রণয়। একদিন আইন-গত বিচ্ছেদ তাঁদের পরস্পরকে মুক্ত করে দিল বিবাহ-বন্ধন থেকে। কিছুকাল পরে জনৈকা চীন দেশীয়া সহকর্মীকে বিয়ে করেন চার্লস এবং একটি বিত্তবান সুদর্শন ভারতীয়ের সঙ্গে মার্গারিটার পরিণয় ঘটে। চার্লস ফিরে যান ইংল্যাণ্ডে আর মার্গারিটা আমেরিকায়।

ভারতের সাংবাদিক জগতে অন্তত কিছু পরিমাণেও দাগ রেখে গেছেন চার্লস দম্পতি। ভারতের ডাকেই তাঁরা লণ্ডন থেকে এসেছিলেন। কিন্তু খ্যাতি ও পরিচিতির প্রখর তাপে তাঁদের পার-স্পরিক মধুময় অনুরাগ শুকিয়ে গেল। দগ্ধ হয়ে গেল প্রেম। তাঁদের এই বিচ্ছেদ স্মরণ করে এখনো আমরা যাঁরা চার্লসদের বন্ধু ছিলাম, মাঝে মাঝে বিষন্ন হই, ব্যথিত হই।

॥ ১৪ ॥

সারাভারতে ফ্রী প্রেসের সকল শাখার মধ্যে কলকাতা ছিল সর্বোত্তম। সবচেয়ে বেশি টাকা আসতো এখানকার সংবাদপত্র থেকে, সবচেয়ে বেশি দৈনিকপত্র এখানে আমাদের খবর নিত। কলকাতার পত্রিকা-গুলির পক্ষেও ফ্রী প্রেস ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়, এই জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবর না পেলে তাদের চলতো না।

সদানন্দ তখন ফ্রী প্রেসের দৈনিক পত্রিকাগোষ্ঠী সম্পর্কে উঠে-পড়ে লেগেছেন। পত্রিকা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। দিনরাত শুধু নতুন পাঁচটি পত্রিকার ধ্যান।

এমন সময় তাঁর একটা নির্দেশ এলো বম্বে থেকে। জানিয়েছেন কলকাতার সকল কর্মীকে বরখাস্ত করে মাত্র একটি টাইপিস্ট নিয়ে ফ্রী প্রেসের কাজ চালাতে। আয়ের সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা প্রতি মাসে বোম্বের অফিসে পাঠাতে। বোম্বে অফিসে দুঃসহ দারিদ্র্য।

কয়দিন পর সদানন্দ নিজেই এলেন কলকাতা। নানা আলোচনা তুললেন, চাইলেন নানা পরামর্শ। বারবার তিনি বোঝাতে চাইলেন ফ্রী প্রেস থেকে কিছুতেই টাকা তোলা যাবে না। নিরন্তর অর্থাভাব সর্বদাই পথে কাঁটার মতো বিঁধবে। টাকা তুলতে হবে পত্রিকার মধ্য দিয়ে। এখন থেকে দৈনিক পত্রের দিকেই বেশি মনোনিবেশ দেওয়া দরকার। ফ্রী প্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে প্রত্যেকটি প্রাদেশিক 'ফ্রী প্রেস-গোষ্ঠী' পত্রিকাকে বনিয়াদ ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে।

কিন্তু পত্রিকা-প্রকাশ সম্পর্কে আমার খুব উৎসাহ ছিল না। বোম্বে শহরে ফ্রী প্রেস জার্নাল অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কল্পনাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রতি প্রাদেশিক রাজধানীতে ফ্রী প্রেসের পত্রিকা বেরোলে সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি পত্রিকা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবে। দৈনিক পত্র ও সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর-শীল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিন্দুমাত্র মেঘ যদি নামে, তাহলে বিষম ঝড় উঠবে। সেই ঝড়ে সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের অবধারিত মৃত্যু। একথা আমি বুঝে-ছিলাম। সদানন্দকে তা স্পষ্ট জানালাম। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, দেড় লক্ষ টাকা সম্বল করে পাঁচটি নতুন পত্রিকা সংগঠন করা দিবাস্বপ্ন।

কিন্তু সদানন্দ তখন আকাশকুসুম দেখছেন। কেবল পত্রিকা আর পত্রিকা, এ ছাড়া আর ভাবতে পারছেন না কিছু। পত্রিকা সম্পর্কে সামান্যমাত্র দ্বিধা আছে যার, তাকেই তার না-পছন্দ।

অথচ আমাকে সদানন্দ শ্রদ্ধা করতেন। আমার কর্মক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। লণ্ডনে চলে যাবার সময় ভারতবর্ষে ফ্রী প্রেসের কাজ চালানোর জন্য আমাকে মনোনীত করেছিলেন ম্যানেজিং এডিটর। কলকাতায় ফ্রী প্রেসের অসাধারণ প্রভাব দেখে বুঝেছিলেন আমাকে তাঁর প্রয়োজন।

অবু আমাদের সম্পর্কে একটু ভাঙন দেখা দিল। সদানন্দ স্বপ্ন দেখছেন পত্রিকা, আমি চেষ্টা করছি সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে। সদানন্দ চলেছেন কল্পনার ঘোড়ার দৌড়ে, আমি মাটিতে হেঁটে। মতানৈক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল দুজনের কাছেই।

সদানন্দ জানালেন কলকাতার ফ্রী প্রেস পত্রিকার নাম হবে 'ফ্রী ইণ্ডিয়া'। 'ফ্রী ইণ্ডিয়ার' সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি কিছুতেই রাজী হতে পারছি না। তখন একটু রাগতস্বরে জানালেন, আমি যদি অসম্মত হই, তাহলে অন্য কোন লোককে সম্পাদনার ভার দিতে হবে।

আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। মর্মাহত হয়েছিলাম। এমনি এক উদ্বেগসঙ্কুল দিনে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম, ভারত বিল্ডিং থেকে মডার্ন রিভিউ-এর খ্যাতনামা সহকারী সম্পাদক শ্রীনীরোদ চৌধুরীর সম্পাদনায় কলকাতায় 'ফ্রী ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনটি একটা আলোড়ন তুললো কলকাতা সাংবাদিক জগতে। সর্বত্র চাঞ্চল্যের হাওয়া। তুষারকান্তি ঘোষ, মাখনলাল সেন, সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (ডাঃ রায় তখন শরৎ বসুর অনুপস্থিতিতে 'ফরোয়ার্ড' পরিচালনা করছেন) আমাকে ডেকে সব খবর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা সম্মিলিত-ভাবে আমাকে জানালেন, নতুন পরি-স্থিতিতে ফ্রী প্রেসের খবর নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সদানন্দকে টেলিগ্রাম করে এ খবর জানালাম। ডাঃ রায় ও মাখনলাল সদানন্দকে চিঠি লিখলেন। তাঁদের কাছে সদানন্দর উত্তর এলো অনতিবিলম্বে কলকাতার পত্রিকা নির্দিষ্ট দিনে

বেরোবেই। আমাকে জানালেন, শীঘ্র বোম্বে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার অনেকদিনের বন্ধু। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিনিধি হয়ে তিনি 'ফরোয়ার্ড' পরিচালনা করতেন। তিনি এসে পরামর্শ করলেন আমার সঙ্গে। জানালেন ফ্রী প্রেসের নতুন পত্রিকা বেরোলে সংবাদ নেওয়া বন্ধ করতেই হবে, অথচ এরকম একটা জাতীয়তাবাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান না থাকলে কলকাতার পত্রিকাগুলি একান্ত অসুবিধেয় পড়বে। তিনি জানতে চাইলেন, আমি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবো কি না।

আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম সদানন্দের ব্যবহারে। ক্যাপ্টেন দত্তকে জানালাম, প্রাদেশিক ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না; কলকাতার সমস্ত পত্রিকার সহযোগিতা পেলে সর্বভারতীয় সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আমার পক্ষে অসাধ্য হবে না। আমার মতামতটা পত্রিকা মালিকদের কর্ণগোচর হলো।

সদানন্দকে আমি জবাব দিলাম। কলকাতার কর্মীদের পদচ্যুতি ও পত্রিকা-প্রকাশ থেকে অবিলম্বে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। স্পষ্টভাষায় তাঁকে জানালাম, অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে এ চিঠিকে আমার পদচ্যুতির নোটিস হিসেবে বিবেচিত করতে হবে। টেলিগ্রাম করে জবাব দিলেন সদানন্দ, অনতিবিলম্বে বোম্বে গিয়ে আলোচনা করতে বললেন। কিন্তু এও তিনি জানালেন, যে কোন প্রতিবন্ধক আসুক না কেন, পত্রিকা-প্রকাশ কিছুতেই বন্ধ হবে না।

সদানন্দ তখন ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। ফ্রী প্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও এডিটর, 'ফ্রী প্রেস জার্নালের' সম্পাদক। গান্ধীজীর গোল-টেবিল বৈঠকের রিপোর্ট করে সাংবাদিক হিসেবে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির তুলনায় আমি তো নগণ্য। আমার কাজ সম্পর্কে বিশ্বাস থাকলেও, আমার উপদেশে কর্ণপাত করলেন না।

ফ্রী প্রেসে আমার পদত্যাগ অবধারিত হয়ে উঠল। স্বেচ্ছায় পদত্যাগের নোটিস দিয়েছি, তা ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না।

ইতিমধ্যে ফ্রী প্রেসের সংবাদ নেবার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিল। ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের বাড়িতে কলকাতার সংবাদপত্র স্বত্বাধিকারীদের একটা জরুরী সভা বসলো। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, তুষারকান্তি ঘোষ, জে সি গুপ্ত (এডভান্স), সতীশ মুখোপাধ্যায় ও মুলচাঁদ আগরওয়ালা প্রভৃতি তাতে যোগ দিলেন। সভায় স্থির হলো, ফ্রী প্রেসের অনুরূপ একটি সর্বভারতীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হলো আমার উপর। স্থির হলো বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সভাপতি হবেন ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমি এবং প্রধান ডিরেক্টর থাকবেন সুরেশচন্দ্র, তুষারকান্তি ও জে সি গুপ্ত। কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বলে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হলো, ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া।

বারবার বেকার হয়েছি, বারবার বদল হয়েছে আমার কর্মস্থান। আবার নতুন করে জীবন-সংগ্রামে নামলাম। বৃহত্তর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। এতো বড়ো দায়িত্বের ভার আগে কখনো আসে নি। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই আমার, বিশ্বাস আছে নিজের কর্মক্ষমতার ওপর। নতুনতর কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়মূলে আশা নিয়ে আমি অগ্রসর হয়ে গেলাম।

ডালহৌসী স্কোয়ারের সুরজমল নাগরমলদের বাড়িতে দু'টি ঘর নিয়ে আরম্ভ হলো ইউনাইটেড প্রেস। অমৃত-বাজার পত্রিকা এক হাজার, আনন্দবাজার পত্রিকা এক হাজার, ডাঃ রায় পাঁচশ' ও জে সি গুপ্ত পাঁচশ' টাকা দিলেন। মাত্র তিন হাজার টাকা এলো হাতে। তা' নিয়ে আরম্ভ হলো একটি বৃহত্তর জাতীয়তা-বাদী সংবাদসরবরাহী প্রতিষ্ঠান, আজ যার বার্ষিক ব্যয় দশ লক্ষ টাকা। ১৯৩৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রবাহ শুরু হলো।

আগস্ট মাসের শেষদিন রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিন থেকে আমরা সংবাদ পাঠাতে আরম্ভ করলাম। সেদিনের উত্তেজনা, আশা, আনন্দ আর উদ্বেগ আজো বিস্মৃত হই নি, সেই স্মরণীয় দিনটি উজ্জ্বল আমার জীবনে।

২রা সেপ্টেম্বর সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ঝলমল করে উঠল ইউনাইটেড প্রেসের নাম। চারদিকে আবার একটা আলোড়ন জাগলো। ফ্রী প্রেস কোথায়? এই প্রতিষ্ঠান কাদের, কবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

বাঙলাদেশের সর্বত্র যত সাংবাদিক ছিলেন সকলকে আগেই আবেদন জানিয়ে রেখেছিলাম। পাটনা, দিল্লী, সিমলা, বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ নাগপুর প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান নগরীর কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গেও পূর্বাহ্ণেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। ডাকে ও তারে তাঁরা সংবাদ পাঠাতে আরম্ভ করলেন। আমরা তা সম্পাদনা করে পরিবেশন করতে লাগলাম।

ফ্রী প্রেসের লাহোর শাখার সম্পাদক পুলিন দত্ত আমার সঙ্গেই পদত্যাগ করেছিলেন। অল্প কিছু মূলধন সংগ্রহ করে ১লা সেপ্টেম্বর থেকেই তিনি লাহোরে ইউ পি অফিস খুলে বসে-ছিলেন। 'ট্রিবিউন' সম্পাদক কালীনাথ রায় মশায়ের স্নেহ তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় পুলিন দত্ত 'ট্রিবিউন', 'প্রতাপ' ও 'মিলাপ' পত্রিকার সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা করে নিলেন।

এতো অল্প মূলধনে এতো বড়ো একটি প্রতিষ্ঠান কিছুতেই চালানো সম্ভব নয়। তাই অর্থ-সংগ্রহের দিকে নজর রাখতে হলো। আনন্দবাজার, অমৃত-বাজার, ডাঃ রায় ও জে সি গুপ্ত মশায় ছাড়া বাকি যাঁরা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা টাকা দিতে পারলেন না। তাই বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঋণ নিতে হলো। যথারীতি মাইনেও আর দিতে পারি না আমরা। তখন বাইরের লোকের কাছে অল্প অল্প শেয়ার বিক্রী করতে আরম্ভ করলাম। কিছু বিক্রী হতে লাগলো। এইভাবে পাবলিক লিমিটেড

কোম্পানীতে পরিবর্তিত হয়ে গেল প্রতিষ্ঠানটি।

এমন সময় চারু সরকার, অমিয় বর্ধন, চন্দ্রভূষণ নাগ, নিকুঞ্জ দেব, ফণী সেন-গুপ্ত যাঁরা ফ্রী প্রেসে আমার সহকর্মী ছিলেন, তাঁরা এসে যোগ দিলেন ইউনাইটেড প্রেসে। দৈনন্দিন কাজকর্ম চললো সুষ্ঠুভাবে, আমার হাতেও কিছু সময় এলো। অর্থ-সংগ্রহ ও প্রতিষ্ঠানটির সংগঠনের দিকে নজর দিতে পারলাম।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নির্বাচিত হয়েছিলেন অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সের সভাপতি। একদল ডাক্তার-প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি গেলেন বোম্বে সভাপতিত্ব করার জন্য। আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম।

বোম্বে পৌঁছে হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের একটা খালি ফ্ল্যাটে আমরা উঠেছি। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ রায় ও আমাকে নিয়ে গেলেন 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল' ও 'বোম্বে সমাচার' পত্রিকা দুটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কামা ও সম্পাদক মিঃ ব্রেলভীর সঙ্গে দেখা করতে। ডাঃ রায়ের অনুরোধে তাঁরা ইউ পি'কে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সের একটি খালি ঘরে ইউ পি'র বোম্বে শাখার অফিস খুললাম। ফ্রী প্রেসের সহকর্মী শশাঙ্ক ঘটক নিযুক্ত হলেন সম্পাদক। সুরেশবাবু এক হাজার টাকার শেয়ার কিনে ইউ পি'র একজন ডিরেক্টর হলেন।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হলো। তিনি বহু অর্থব্যয় করেছিলেন ফ্রী প্রেসের জন্য। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ফ্রী প্রেসের শেষদিনগুলির সংবাদ। সদানন্দের কর্মপদ্ধতিতে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। আমাকে শুভ-কামনা জানিয়ে বল্লেন, ফ্রী প্রেসের মতো ভুল যেন আমরা না করি।

বোম্বে থেকে ফিরে এলাম কলকাতা। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মতো একটা প্রেস-এসোসিয়েশন গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে এই সময় মাদ্রাজের বিখ্যাত সাংবাদিক কস্তুরী শ্রীনিবাসন ও মিঃ বি শ্রীনিবাসন এসেছিলেন কলকাতায়। ডাঃ রায়ের বাড়িতে কলকাতা সংবাদপত্র মালিকদের সভা হলো। সকলেই তাঁদের শুভকামনা ও অভিনন্দন জানালেন। মতানৈক্য হলো এসোসিয়েশন গড়ে তোলার ব্যাপারে।

সেই সভাতেই ডাঃ রায় মাদ্রাজ সাংবাদিকদের অনুরোধ জানালেন ইউ পি'কে সহযোগিতা করার জন্য। তাঁরা সম্মত হলেন।

মাদ্রাজে আমাদের শাখা অফিস খুলতে হবে। গেলাম মাদ্রাজ। কস্তুরী শ্রীনিবাস তখন মাদ্রাজ সাংবাদিকদের মুকুটহীন সম্রাট। সমস্ত সংবাদপত্র মালিককে একটি সভা আহ্বান করলেন তিনি। স্থির হলো হিন্দু, মাদ্রাজ মেল, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সন্দেশ, মিত্রন ও অ... পত্রিকার কর্তারা ১২৫০, টাকা আমাকে দেবেন অফিস খোলার জন্য।

মাদ্রাজের হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর অফিসে আমি থাকতাম। সেখানকার ম্যানেজার সুধাংশু চৌধুরী

আমাদের অফিস খোলার জন্য একটা ঘর লে দিলেন। নতুন অফিস খোলা হলো মাদ্রাজে। কে ভি বেঙ্কটরমন নিযুক্ত হলেন শাখা-সম্পাদক।

কিন্তু ছ'মাস না কাটতেই নতুন সংকট দেখা দিল। আমাদের অফিসে পদত্যাগ করে বেংকটরমন রয়টারে যোগ দিলেন। রয়টারের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তাঁরা আশা করেছিলেন কস্তুরী শ্রীনিবাসন নির্বাচিত বেংকটরমন যদি ইউ পি'তে না থাকেন, তাহলে হিন্দু পত্রিকার সহযোগিতা হারাবে এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি।

অনতিবিলম্বে আমি গেলাম মাদ্রাজ। কস্তুরী শ্রীনিবাসনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর অনুমোদন নিয়ে সেতুরাম নামে একটি যুবককে সম্পাদকপদে নিযুক্ত করা হলো। সেতুরাম আগে আমাদের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৌলীন্য ছিল না তাঁর, কিন্তু অদ্ভুত করিতকর্মা লোক তিনি। সাংবাদিকের সব যোগ্যতাই তাঁর ছিল। বেংকটরমন থেকেও কৃতিত্ব দেখালেন তিনি তাঁর কর্মক্ষমতায়।

কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার গোলমাল দেখা দিল। কাজে গাফিলতি দিলেন, হিসাবপত্রেও গোলমাল পড়লো। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে লাহোরে বদলী করে মাদ্রাজে সম্পাদক নিযুক্ত করলাম আমার কনিষ্ঠ ভাই শশীভূষণ সেনগুপ্তকে।

শশীভূষণ ফ্রী প্রেসে আমার সহকর্মী ছিলেন। খুব স্বল্পদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ অফিসটি তিনি সাজিয়ে নিলেন। সাফল্য অর্জন করলেন তাঁর সৌজন্যসুন্দর ব্যবহারে। সাংবাদিক মহলে অল্পায়াসে প্রভাব করে নিলেন তিনি। রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। মাদ্রাজ অফিসের খ্যাতি ছড়িয়ে গেল সর্বত্র।

॥ ১৫ ॥

৭ই অগাস্ট, ১৯৪১ ইং।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হলো। একটা নিদারুণ আর্তনাদের মতো মনের খুব গভীরে শোকভার নেমে এলো। মনে হলো পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে একটি জীবনের অভাবে। ঠাকুরবাড়ির সামনে হাজার হাজার স্তব্ধ নরনারী, আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম শেষ প্রণাম নিবেদন করতে।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক বাঙালীর কতো আপন, তাঁর মহাপ্রয়াণের দিনে তা স্পষ্ট অনুভব করলাম। তাঁর কবিতায়, গানে আমাদের মনের আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তাঁর চিন্তা ও মনীষায় আমরা নতুন করে ভাবতে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের অজস্র দানে আমাদের প্রত্যেকের জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁর ভাষা আমাদের প্রতিদিনের অনুভব সুরঞ্জিত করে তুলেছে।

তিনি যে কতোখানি আমাদের নিকটতম আত্মার আত্মীয়, তাঁর জীবিত-কালে হয়তো তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারি নি। শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁকে অর্পণ করেছি, কিন্তু তাঁর অভাবে পৃথিবী এমন শূন্য মনে হবে, তা হয়তো আশংকা করি নি।

বাল্যকালে তাঁর কবিতা আমার জীবনে নতুন পৃথিবীর দ্বার খুলে দিয়েছিল। যামিনীমোহনের সঙ্গে কথোপকথনে ও পত্রালাপে 'রবি ঠাকুরের' নতুন নতুন কবিতা আলোচনা করে হৃদয় সম্প্রসারিত হতো। তাঁর সংগীত নিজেরা গান গেয়ে চর্চা করতাম ছাত্রাবস্থায়।

রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখি সিটি কলেজে পড়ার সময়। একদিন তিনি সে কলেজে অভিভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা আমি আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে দেখেছিলাম, এমন হিরন্ময় মূর্তি আর কবে দেখেছি। এমন দেবোপম চেহারাও কি মানুষের হয়, এমন দিব্য-জ্যোতির্ময়? দূরাগত সংগীতধ্বনির মতো তাঁর কথাগুলি শুনেছিলাম। ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর ভাষণ। অবশেষে সকলের অনুরোধে তিনি দু'কলি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সে গান এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে: 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণি, আমি অবাক হয়ে শুনি।'

স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল জন-কল্লোল যখন বঙ্গ-বিভাগ রদ করবার জন্য দুর্মর হয়ে উঠেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা ছিল আমাদের সুগভীর প্রেরণা। ভয়-দুর্বল মনে তাঁর গান এক আশ্চর্য সাহস ছড়িয়ে যেত। পরবর্তী কালের রাজনৈতিক আন্দোলনেও তাঁর কবিতা ও গান জনসাধারণের মনে দুর্বার প্রেরণা জাগিয়ে তুলতো। 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে', 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু ওগো কর্ণধার, এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক, ফিরবো নাকো আর' প্রভৃতি গানগুলি আমাদের প্রাণে ভয়হীন, শংকাহীন দুঃসাহসী যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে দিতো।

তারপর নানা স্থানে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, গান শুনেছি। তাঁর প্রতিটি নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ সাগ্রহে পাঠ করেছি। বিচিত্র অনুভূতির বর্ণসুষমায় নিজেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছি।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করার সাড়ম্বর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই উপলক্ষে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ, শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীঅমল হোম প্রভৃতি বিশেষভাবে পরিশ্রম করে-ছিলেন। দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক ও মনীষীদের শ্রদ্ধা একটি বিরাট গ্রন্থে মুদ্রিত করে কবিগুরুর কাছে পৃথিবীর অভিনন্দন নিবেদন করা হয়েছিল। এই গ্রন্থটি 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর' নামে

প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আমি নিজেও এই অভিনন্দন-সভায় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলাম, কমিটির প্রচার-শাখার সম্পাদক হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

কলকাতা টাউন হলে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩১ ইং) এই স্মরণীয় রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজকাল প্রতি বৎসর বিপুল আয়োজনে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রতি পাড়ায় পাড়ায় উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে, এই জয়ন্তী উৎসবটি ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ। এই উৎসবের গুরুত্ব এখন ঐতিহাসিক মূল্য পেয়েছে। স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের শ্রদ্ধা মিশে গিয়েছিল এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

কলকাতা নাগরিকদের পক্ষ থেকে কলকাতা পৌরসভা অভিনন্দন-পত্রে নিবেদন করেছিলঃ

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি-প্রতিভা সমগ্র সভ্য-জগতকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জন সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে এবং তোমার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারা বাঙালীজাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গ-ভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-গুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

বন্দে মাতরম্।

তোমার গুণগর্বিত
কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য-বৃন্দের পক্ষে
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, মেয়র।"

কলিকাতা,
১১ই পৌষ, ১৩৩৮।

প্রত্যুত্তরে কবি বলেছিলেন ঃ

"একদা কবির অভিনন্দন রাজ কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতে সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্ তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকা প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশে গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবি ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসম্বর্ধনা ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেব বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষি করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে

রামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ
ুক, ইহার প্রবর্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে,
তকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয়
ন্দত হউক, সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে
ঙ্গ অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন
রিয়া দিক—পুরবাসীর দেহে শক্তি
সুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌর-
ল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃ-
রোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ
াকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি
ারা এখানকার সকল জাতি, সকল
সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর
রত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত
রিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি॥"

দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য
র্পণ করা হয়, তার খসড়া লিখেছিলেন
পন্যাসিক শরৎচন্দ্র। সেই অর্ঘ্য-পত্রে
গা হয় ঃ

বিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের
স্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত-
ন প্রার্থনা করি, জীবনবিধাতা তোমাকে
তায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী
ৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয়
োক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ
রিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী,
ত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্য-
ম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের
প্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা
তামার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।
তামার পূর্ববর্তী সকল সাহিত্যাচার্য-
ণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে
ভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ
ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত
ইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার
সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে
স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে
কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা
নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া
দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে
তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি।
তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে
আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার
করি। ইতি—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদ
পক্ষে
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু,
সভাপতি।"

কলিকাতা,
রবিবার, কৃষ্ণাতৃতীয়া
১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল বঙ্গাব্দ।

দেশবাসীর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, দেশবাসীই তাতে অলঙ্কৃত হলেন। যে কবির দানে আমাদের হৃদয়-কুসুম ফুটেছে, যার কল্যাণ ও সুন্দরের স্পর্শে আমাদের মন বিকশিত হয়েছে, তাঁর প্রতি আমাদের পরম কৃতজ্ঞতা নিবেদনে আমাদের হৃদয়ই গভীরতর আনন্দে প্রসারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়েছিল এক শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল উৎসবে। তখন সবেমাত্র ইউনাইটেড প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ষামঙ্গল উৎসবে কবি কয়েকজন সাংবাদিককে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ জানালেন। প্রফুল্লকুমার সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কালিপদ বিশ্বাস ও প্রমোদ সেনের সঙ্গে আমিও গেলাম কবিতীর্থে।

তখনও শান্তিনিকেতনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হয় নি, আজকালকার মতো তার চেহারাও ছিল না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন স্পর্শ ছিল আশ্রমে, মনে হতো একটি আশ্চর্য শান্তির নীড়ে এসে হাজির হয়েছি।

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা শিশিরকুমার মিত্র ছিলেন শান্তিনিকেতন স্কুলের শিক্ষক। তিনি, সদাহাস্যময় সুধাকান্ত চৌধুরী ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দেখাশোনা করছিলেন, থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল 'অতিথিভবনের' দ্বিতলে। 'স্টেটসম্যানের' তদানীন্তন সম্পাদক ওয়ার্ডসওয়ার্থ সকন্যা এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে।

গিয়ে পৌঁছেছিলাম রাত্রিতে, কিছু দেখার সুযোগ হয় নি। সকাল ভাল করে না ফুটতেই ঘুম ভেঙে গেল, এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। লাল ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে একটি ছোট উপনিবেশ, ছোট ছোট বাড়ি, লাল সুরকীর পথ, চারদিকে গাছের সারি। ছবির মতো সুন্দর। কবির কল্পনার মতো তাঁর গড়া শিক্ষা-উপনিবেশটিও মনোরম। মন মুগ্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

আম্রকুঞ্জে বৃক্ষরোপণ উৎসবটি সম্পন্ন হলো। তখন মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশে চক্রবালরেখার কাছ থেকে সূর্যদেবের অরুণ রঙীন রথ এগিয়ে আসছে। পূর্বদিকে সোনালী কিরণের অপূর্ব ছটা। নয়নাভিরাম আলপনা চেরা মণ্ডপে ঘট ও বেদী সুসজ্জিত। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই উৎসবের পৌরোহিত্য করেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বেদমন্ত্র পাঠ করে উৎসবটিকে পবিত্র সুষমায় সুবাসিত করে দিয়েছিলেন। বেদমন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবে সঙ্গীতমুখর সুরের আশ্চর্য কলকাকলী নেমে এসেছিল।

আজকাল সরকার বনমহোৎসব পালন করেন। সরকারের সব পদস্থ ব্যক্তিগণ মহাসমারোহে বৃক্ষরোপণ পর্ব উদ্‌যাপন করে থাকেন। কিন্তু সেদিন, শান্তিনিকেতনে, কবিগুরুর উপস্থিতিতে যে মহান ভাবমণ্ডিত পরিবেশে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখেছিলাম, তার তুলনা নেই। সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও আন্তরিকতায় এই উৎসবটি মনের খুব গভীরে দোলা দিয়েছিল।

উৎসব সমাপ্ত হবার পর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সুধাকান্তবাবু সকল সময়ই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, হাস্য-পরিহাস ও গল্পগুজবে তাঁর সাহচর্য সত্যিই চিত্তাভিরাম। আর ছিলেন

শ্রীনিকেতনের কর্মকর্তা আমার বিশিষ্ট বন্ধু কালীমোহন ঘোষ মহাশয়। পল্লী-সেবা ও শিল্পোন্নয়নের কবি-কল্পনা কালীমোহনবাবুর অপূর্ব সংগঠন শক্তিতে শ্রীনিকেতনে সুষ্ঠু রূপায়িত হয়েছে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত শিষ্য ও শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট কর্মী।

সন্ধ্যায় আমরা সদলে গেলাম কবি-সান্নিধ্যে। তিনি আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর শরীর সেদিন ভালো যাচ্ছিল না, তবু তিনি একটা ইজিচেয়ারে উপবেশন করলেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিমা দেবী, নন্দিতা ও রথীবাবু ছিলেন। সুধাকান্তবাবু, অনিলবাবু, ডাঃ ধীরেন সেন, কালীমোহনবাবুও উপস্থিত ছিলেন। চা খাওয়ার পর সকলেই চলে গেলেন। একা সুধাকান্তবাবু রইলেন কবির পার্শ্বে। আমরা কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

সেদিন আলোচনার মধ্যে কবিকে বাঙলাভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তান্বিত দেখেছিলাম। ইস্কুলে যে সমস্ত পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচিত করা হচ্ছিল, তাতে দলীয় মনোভাবে নানারকম বিকৃতি এসে ঢুকেছিল। কবি সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, শিশুদের মনে ভাষার এই বিকৃত অপব্যবহার একটা বিষময় প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও আন্দোলন সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে যথার্থ শক্তি সঞ্চারিত করার দিকেই কবির সর্বাধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন, যেভাবে স্বরাজ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে, তাতে দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল নাও আসতে পারে। যদি শিক্ষিত সেবাব্রতী মানুষ দেশের বৃহত্তম জনসাধারণের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের দৃঢ় বনিয়াদ তৈরি না করতে পারে, তাহ'লে ইংরেজ চলে গেলেও দেশের দুর্দিন ঘুচবে না। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু রোমাণ্টিকতার আলো থেকে যাচ্ছে, তার ফলে লোকে তার দিকে আকৃষ্ট হলেও জনসাধারণের মধ্যে আসল প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হতে পারছে না।

মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্র-নাথের পরিকল্পিত স্বরাজ-সাধনা সারা দেশে প্রমূর্ত হবার সুযোগ পায় নি।

বিশ্বভারতী অথবা নিজের প্রচার কবি পছন্দ করতেন না। আমি বিশ্ব-ভারতীর বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রচারকার্যের কথা তুলি কবিগুরুর কাছে। তিনি সভয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন নানা যুক্তি দিয়ে প্রচারের জন্য আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি। বিশ্বভারতীর যথার্থ সার্থকতা নির্ভর করে সর্বদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সপ্রীতি মিলনে। কিন্তু প্রচারকার্য যদি পেছনে সহায় না হয়, তাহলে সর্বদেশে বিশ্বভারতীর বার্তা পেশছবে কিভাবে।

কবিকে আমি নিবেদন করি, তাঁর নিজের জন্য নয়, দেশের এবং জন-সাধারণের মঙ্গলের জন্য বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশে তিনি অর্থ-সংগ্রহের জন্য বহুবার গিয়েছেন, প্রচারকার্যের ফলে অর্থসংগ্রহও ত্বরান্বিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ধরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু অবশেষে মহামৃত্যু তাঁকে আহ্বান করলো।

রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন আনন্দের, মৃত্যুও আনন্দের। কিন্তু কবির মহাপ্রয়াণে আমাদের মনে মহাশূন্যতা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। শোকাশ্রু নিয়ে গেলাম কবি-ভবনে, সেখানে কাতারে কাতারে লোক জমেছে। কেউ কেউ কাঁদছে, বিলাপ করছে। আমরা গিয়ে শেষপ্রণাম নিবেদন করলাম।

দীর্ঘ শোকযাত্রা শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে এসে দাঁড়ালো নিমতলা শ্মশানঘাটে। সর্বক্ষণ আমি ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। পথে দেখেছি আশ্চর্য কবিপ্রীতি। শহরের কাজকর্ম একমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রতিটি বাড়িতে শোকভারনত নরনারীর ক্রন্দনরত মুখ। শহর কলকাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানবলীলা সংবরণ করলেন।

শূন্য মন নিয়ে ফিরে এলাম অফিসে। আমার শোক আমার রইলো, সারা জাতির শোক প্রকাশ করতে হবে সাংবাদিক কর্তব্যের মধ্যে। বৃহত্তম শোকসংবাদ প্রেরণ করতে হবে দেশে বিদেশে, প্রতিটি সংবাদপত্র কার্যালয়ে। এই লেখনীর মধ্যেই রইলো আমার প্রণাম কবিগুরুর পায়ে, আমার অর্ঘ্য।

(ক্রমশ)

॥ দিল্লী ॥

বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত নাগরিকবৃন্দ, ভারতস্থিত বিভিন্ন দেশের দূত, ভারত সরকারের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ জয়পুর হাউসে সম্প্রতি এদেশের সর্বপ্রথম জাতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ললিত-কলা আকাডেমীর উদ্যোগে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

একাধিক কারণে অন্যান্য প্রদর্শনী অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রথমত দেশের প্রধানতম চিত্রকলা সংস্থা কর্তৃক এই প্রদর্শনী গঠিত। দ্বিতীয়ত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ এই প্রদর্শনীতে আপনাপন রচনাসম্ভার প্রেরণ করিয়াছেন। তৃতীয়ত, প্রতিনিধিমূলক বলিয়া এই প্রদর্শনীতে কলারসিকগণ ভারতের সমসাময়িক চিত্রধারার পরিচয় পাইবার আশা রাখেন। আকাডেমীর কর্তৃপক্ষের হস্তে সর্বসমেত ২০০ রচনা আসে ও তাহাদের মধ্য হইতে বিচারকমণ্ডলী আনুমানিক ৩০০ চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন পেশ করেন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি, আশা করি আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না। আমাদের দেশে শিল্পী তথা চিত্রকলা-রসিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। একদল আছেন, যাঁহারা কেবলমাত্র প্রথাগত রীতিতেই রচনা করিয়া থাকেন বা একমাত্র এই শ্রেণীর রচনারই তারিফ করেন। ৫০ বৎসর পূর্বে যে বিষয়বস্তু বা দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া চিত্র রচিত হইত, আজিকার যুগেও তাঁহারা ইহার কোনপ্রকার ব্যতিক্রম সহ্য করিতে পারেন না। অপর দল আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা বিদেশী অনুপ্রাণিত নানাপ্রকার রচনারই গুণগান করেন। পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রথাগত রীতিতে রচিত রচনা-সম্ভারাদি তাঁহাদের নিকট প্রাণহীন ফটোগ্রাফেরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। অথচ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই দুই দলের কোন মতই ঠিক যুক্তিসংগত নহে। কারণ

আর্ট তথা সাহিত্য, নৃত্য বা সংগীত কোন যুগেই কোন বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই—তাই আর্টের জাতি বা বর্ণ নাই, আর্ট সর্বজনীন ও তাহার ভাষারও নিজস্ব দেশগত কোন বর্ণমালা নাই। যে চিত্র বা সাহিত্যধারা কেবলমাত্র একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ক্ষীণ-প্রাণ থাকিলেও তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। তাই কি চিত্রকলা, কি সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় আদানপ্রদানের—কারণ এই আদানপ্রদানের মধ্য হইতেই চিত্রকলা আপনার গতিপথের সন্ধান পায়।

Herbert Read বলেন: "Art cannot be confined within frontiers—it lives only if continually subjected to foreign invasions, to migrations and transplantations",

অর্থাৎ শিল্পকলা দেশের সীমান্ত রেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না—শিল্পকলায় যদি বিদেশীয় তথা বিভিন্ন দেশ বা স্থানের প্রভাব লক্ষিত হয়, তবেই ইহা বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং ভারতীয় চিত্রধারার উপরে অন্যান্য দেশের প্রভাব আসা অতি স্বাভাবিক এবং এ হেন প্রভাব ৫০ বৎসর পূর্বেও দেখা গিয়াছিল এবং এখনও লক্ষ্য করা যায়; তবে পার্থক্য এই যে, দুইটি প্রভাবেরই রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে বিদেশী অনুপ্রাণিত যে সকল রচনা কেবলমাত্র খ্যাতনামা বিদেশীয় শিল্পীদের অন্ধ অনুকরণ মাত্র, সেগুলিকে উৎসাহ দিয়া লাভ নাই। অর্থাৎ অংকনপদ্ধতি যাহাই হউক না কেন—যে রচনার মধ্য দিয়া দেশের মাটির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, সাধারণের চক্ষে তাহার কোন মূল্য নাই। কথাগুলি বলিতে বাধ্য হইলাম এই জন্য যে, ভারতের প্রথম জাতীয় প্রদর্শনীর সমালোচনা করিতে গিয়া দুই একটি পত্রিকা অতিশয় পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা অতি আধুনিক চিত্রকলার ভক্ত, সুতরাং যে কয়েকটি ভারতীয় রচনার নমুনা ছিল ইঁহারা সেইগুলির অযথা কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য ভারতীয় পদ্ধতিতে রচিত সব কয়টি নমুনাই যে উচ্চাঙ্গের ছিল, তাহা বলি না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অনুপ্রাণিত এমন কয়েকটি রচনাও ছিল, যাহা অতিসাধারণ প্রদর্শনীতেও স্থান পাইবার যোগ্য নহে। অথচ সেগুলির বিষয় সকলেই নীরব ছিলেন।

বৃক্ষশ্রেণী —অবিনাশ চন্দ্র

শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের তথাকথিত গোষ্ঠীবহির্ভূত কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর রচনাগুলির নাম পর্যন্ত করা তাঁহারা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। চিত্র-সমালোচকের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সমালোচক এরিক নিউটন কয়েকমাস পূর্বে বি বি সি'তে যে বেতারভাষণ দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলেনঃ

"It is not for the critic to welcome or deplore what the artist does. His proper job is to explain it and to adopt his critical machinery to whatever new developments may occur. . . . His task is to follow the artist as the man with the spotlight in the theatre follows the prima ballerina".

অর্থাৎ শিল্পী কি করেন, তাহার প্রশংসা বা পরিতাপ করা সমালোচকের কাজ নহে; তাঁহার কাজ হইল ব্যাখ্যা করা ও যে কোন নূতন ধারারই প্রবর্তন হউক না কেন, তাহার সহিত তাঁহার সমালোচনা পদ্ধতির যোগসাধন করা—থিয়েটারে স্পটলাইট লইয়া যে ব্যক্তি প্রধানা নর্তকীর সহিত ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া থাকে, সমালোচকেরও ঠিক সেইভাবে শিল্পীকে অনুসরণ করা উচিত।

প্রদর্শনী-কক্ষগুলি প্রদক্ষিণ করিলে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথমত দেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের রচনা দেখা গেলেও কর্তৃপক্ষ তথা বিচারক-মণ্ডলী যেন বিশেষভাবে আধুনিক-পন্থীদের উপর পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন—এই পক্ষপাতিত্বের কোন সংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিল্পরসিক ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক ক্ষেত্র তৈয়ারী না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও কোন বিশেষ চিত্রধারার প্রবর্তন করিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রাদির সংখ্যা যে কেবলমাত্র কম তাহা নহে, উপরন্তু আধুনিক বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও যথার্থ মনোনয়ন হয় নাই। তৃতীয়ত, উপরোক্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রদর্শনীটি অধিকাংশ স্থানে যেরূপ কঠোরভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহারও কোন যুক্তি-সংগত কারণ নাই। প্রাচীনপন্থীগণ দুঃখ করিয়াছেন যে, প্রদর্শনীতে আধুনিক ধর্মাবলম্বীদের জয়জয়কার ঘোষিত হইয়াছে—আধুনিকভাষীগণ আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ভারতীয় বা প্রথাগত

"অনীতা" (টেরাকোটা)
—চিন্তামণি কর

রচনার এ হেন নিদর্শন না থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু উভয়পক্ষই, এমন কি অধিকাংশ সমালোচকগণও প্রদর্শনীর সর্বপ্রধান দিকটুকু আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। দেশের সমসাময়িক খ্যাতনামা শিল্পীদের রচনা তো প্রদর্শনীতে ছিলই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা শিল্পীদের যে কি বিচিত্র রচনাসম্ভার এই প্রদর্শনীতে ছিল, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের রচনা দেখিবার জন্য সকলকেই এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষ পরিক্রমণ করিতে দেখিয়াছি; যেহেতু কোন চিত্র বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীর দ্বারা রচিত; সুতরাং তাহার তুলনা নাই—এইরূপ মতবাদও প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু বিভিন্ন কক্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে কয়েকটি নূতন অথবা অপেক্ষাকৃত কম-পরিচিত শিল্পী আপনাপন চিত্রার্ঘ্য লইয়া নিতান্ত ভীরু ও কম্পিতচিত্তে সকলের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সামান্য সান্ত্বনা বা উৎসাহবাণীর আশায় রহিয়াছেন, তাঁহাদের উপর মাত্র ক্ষণেকের জন্য কাহারও কৃপা-দৃষ্টি পড়ে নাই। অন্যান্য পত্রিকার কথা বলিতে পারি না, স্থানীয় অধিকাংশ পত্রিকাই কেবলমাত্র গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীরই জয়গান গাহিয়াছেন।

তৈল, টেম্পারা ও জলরঙের মাধ্যমেই বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন আকারের রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে সর্ব-প্রথমেই এন এস বেন্দ্রের "কাঁটা" চিত্রখানি চোখে পড়ে। বেন্দ্রে পরিচিত ও প্রতিভাবান শিল্পী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির সংমিশ্রণে রচিত এই চিত্রখানির মধ্য দিয়া শিল্পীর চিন্তাশক্তি ও অঙ্কন-প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কে কে হেব্বারের ৪খানি চিত্রের মধ্যে "জমির মালিক" ও "পূর্ণচন্দ্রের" মধ্য দিয়া তাঁহার অঙ্কনশক্তি ও রেখাকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষক জীবনের

"ক্রীড়ারত অশ্বদল" —আর, ডি, রাভাল

ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়কে অবলম্বন করিয়া এম এফ হুসেন যে বিরাট প্যানেল রচনা করিয়াছেন, বর্ণ-চাতুর্যের দিক দিয়া তাহা অবশ্যই লক্ষণীয়। এইচ এ গ্যাডে পরিচিত শিল্পী। হুসেনের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার "পুতুলের ঘর" উল্লেখযোগ্য। বহিঃদৃশ্যের মধ্যে বিমল দাশগুপ্তের "বৃষ্টির পরে" চিত্রখানি অপূর্ব—নূতন রীতিতে মাত্র পরিমিত তুলিকা ব্যঞ্জনার দ্বারা শিল্পী বর্ষণক্লান্ত বাঙলার নগণ্য একটি পল্লীপ্রান্তের রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শৈলজা মুখার্জী, শ্রীনিবাসলু, ক্ষিতীন মজুমদার, রথীন মৈত্র, রমেন চক্রবর্তী ও মাখন দত্তগুপ্ত প্রত্যেকেই আপনাপন রচনার মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, যদিও ইঁহাদের মধ্যে দুই একজনের রচনা সম্পূর্ণ নূতন নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অল্প-পরিচিত শিল্পীদের রচনাসম্ভারই এক হিসাবে এই প্রদর্শনীটিকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যে গণয্থম আর কৃষ্ণ রাও, অবিনাশ চন্দ্র, আর ডি রাভাল, জি এম হাজারনিস, ডি জে যোশী ও ভি এ মালির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। কেবলমাত্র সুদীর্ঘ রেখা বর্ণ-সমাবেশ ও সর্বোপরি আলোছায়ার অপূর্ব সংমিশ্রণের জন্য অবিনাশ চন্দ্রের "বৃক্ষশ্রেণী" সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোক-শিল্পকে ভিত্তি করিয়া বাঙলার সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ফুটাইয়া তুলাই অরূপ দাশের বিশেষত্ব এবং "আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজে" দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের অলক্ষ্যে যেন ফেলিয়া-আসা শিশু-জীবনের বিচিত্র সন্ধ্যার ক্ষণ-মুহূর্তগুলির কথা মনে পড়িয়া যায়। বর্ষার বিভিন্ন রূপ দেখিয়া বহু শিল্পী অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শহরেরই এক প্রান্তে অবিশ্রাম বারিবর্ষণের ফলে অবস্থা যে কী শোচনীয় হয়, ইম্প্রেশনিস্ট রেখার মাধ্যমে গণয্থম তাহা মুন্সীয়ানার সহিত "বর্ষণ" রচনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশিষ্ট আবেদনের জন্য কৃষ্ণ রাও-এর "ক্যাটল অ্যান্ড ট্রীজ" ও ডি এন ধরের "বাজার" চোখে পড়ে। কল্পনা, বর্ণবিলাস ও অতি সহজ প্রকাশ-ভঙ্গিমার জন্য রাভালের "ক্রীড়ারত অশ্বদল" অপরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করিয়া অতি কোমল নমনীয়তাটুকুর জন্য চিত্রখানি বার বার

পল্লীপ্রান্ত (কাষ্ঠখোদাই)
—গুণেন গাঙ্গুলী

দেখিতে ইচ্ছা করে। বহিঃদৃশ্যের মধ্যে হাজারনিসের "তুষারাবৃত নৈনিতাল" রচনা-পারিপাট্যে সুসম্পূর্ণ ও যোশীর "পিণ্ডোলা হ্রদ" ও "স্কেচ" বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এই সঙ্গে এম এস যোশীর "দাক্ষিণাত্য ঘাটে বৃষ্টি" ও মালীর "দেবীপূজা" উল্লেখযোগ্য।

গ্রাফিক বিভাগের নিদর্শনগুলির মধ্যে হরেন দাস সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সূক্ষ্ম কারুকার্য ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁহার প্রত্যেকটি রচনাই চোখে পড়ে—বিশেষ করিয়া

"কাঁটা"
—এন, এস, বেন্দ্রে

"কিয়ারো স্কুরোর" সত্যই তুলনা নাই। এই বিভাগে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে পরমেশ চৌধুরী ("বৈকাল"—ড্রাই পয়েন্ট) মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ("ধ্বংসাবশেষ"—এচিং) এবং সীতাংশু রায় ("বাড়ির পথে"—এচিং)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে আদি ডাভিয়ার-ওয়ালার "ওয়াটার ক্যারিয়ার" সর্বপ্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বাভাবিক ও সাবলীল রেখাছন্দ আয়তনিক সমতা ও গঠন-কৌশলের মুন্সীয়ানার জন্য কাষ্ঠ-মাধ্যমে কৃত ভাস্কর্য-শিল্পের এই ক্ষুদ্র নিদর্শনটি সত্যই বার বার দেখিতে ইচ্ছা করে। বিশেষ করিয়া রেখাছন্দের অতি সাবলীল দৈর্ঘ্যতা যেন সত্যই ইহাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। ইহার পরেই চিন্তামনি করের "অনীতা" (টেরাকোটা) উল্লেখযোগ্য। চিন্তামনি কর সমসাময়িক ভাস্করদের মধ্যে অন্যতম। এই ক্ষুদ্র রচনাটির মধ্যে তিনি বালিকাসুলভ নিষ্পাপ মুখে এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শংখ চৌধুরীর "মূর্তি" (কাষ্ঠ) ইন্দুমতী লাখেটের "নিগ্রো হেড" (ব্রোঞ্জ) ও ধনরাজ ভগতের "বসন্ত"র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরিশেষে দুইটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্বাধীন ভারতের ইহাই সর্বপ্রথম জাতীয় প্রদর্শনী। সুতরাং প্রদর্শনীটি রাজধানীর কোন কেন্দ্রীয়স্থলে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, কর্তৃপক্ষগণ এই প্রদর্শনীটি আরও কয়েকদিন চালু রাখিতে পারিতেন, কারণ শহরের কেন্দ্র-স্থলের বাহিরে মাত্র কয়েকদিনের জন্য স্থায়ী থাকায় প্রদর্শনীতে আশানুরূপ জনসমাগম হয় নাই।

॥ কলকাতা ॥

গত ১৩ই মে থেকে শ্রীসুধাংশু বসু রায়চৌধুরীর একটি একক চিত্র প্রদর্শনী চালু হয়েছে চৌরঙ্গী ওয়াই, এম, সি, এ ভবনে। শ্রীযুক্ত বসু রায়চৌধুরী জনসাধারণের কাছে খুব পরিচিত না হলেও ইনি যথেষ্ট প্রবীণ শিল্পী। ইনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাধীনে থাকার পূর্বে ইনি জয়পুর আর্ট স্কুল-এ কিছুদিন শিক্ষানবীশী করেন। এঁর

শিল্পী শ্রীসুধাংশু বসু রায়ের দুইখানি চিত্র

অপরিচিত থাকার প্রধান কারণ—ইনি শিল্পসাধনা করেছেন সভ্য সমাজ হতে অনেক তফাতে থেকে—কখনও বা আসামের গভীর অরণ্যে, কখনও বা পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসিগণ পরিবেষ্টিত হয়ে। নতুনদের কাছে অপরিচিত হলেও, প্রবীণদের অনেকের কাছেই ইনি সুপরিচিত এবং এই প্রদর্শনীটিই এ'র প্রথম প্রদর্শনী নয়।

যাইহোক, ছবিগুলিকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—গভীর জঙ্গল ও জন্তু জানোয়ার এবং আসামের নানা পার্বত্য উপজাতির সামাজিক ও কৃষ্টিগত জীবনযাত্রা। প্রথমোক্ত ছবিগুলির আবেদন আমার কাছে অপেক্ষাকৃত বেশী ঠেকেছে। বিশেষ করে গভীর 'রিজার্ভ ফরেস্ট-এর' নৈসর্গিক দৃশ্যগুলি। ঐ সব ছবিগুলির খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম কাজ সত্যই বিস্ময়কর। অত সূক্ষ্ম তুলির টানটোন একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যের দ্বারাই সম্ভব। শুনলাম, ছবিগুলি জঙ্গলের মধ্যেই বসে সরাসরি রঙ তুলি দিয়ে এ'কে ফেলা হয়েছে: পেন্সিল-এ কোনও প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত নক্সা করে নেওয়া হয় নি। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের সঙ্গে শিল্পীর আত্মীয়তা কত ঘনিষ্ট হলে এবং কতটা আত্মবিশ্বাস এলে একাজ সম্ভব শিল্পীমাত্রেই তা উপলব্ধি করবেন নিশ্চয়! আঁরি রুজোর চিত্রকলার সঙ্গে এ'র ছবির তুলনা করার হয়তো কোনই কারণ নেই; তাহলেও, কেন জানি না এ'র ছবি দেখতে দেখতে রুজোর কথাই বার বার মনে পড়েছিল। রুজোর অরণ্যচিত্র সবই প্রায় কল্পনা আশ্রিত; কিন্তু এ'র ছবি বাস্তব অরণ্যেরই প্রতিচ্ছবি। সম্ভবত উদ্ভিজ্জের সূক্ষ্ম এবং স্পষ্ট বর্ণনে এ'দের মধ্যে কোথাও মিল আছে। অবশ্য কম্পোজিশন-এ অনেক তফাৎ। ইনি চোখে যেমন দেখেছেন তাই এ'কেছেন; কিন্তু রুজো মনের মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নন্দনরূপ সৃষ্টি করেছেন। রুজোর বৃক্ষলতাদির আকারে কিছুটা 'অ্যাবস্ট্র্যাকশন' প্রযুক্ত হয়েছে; কিন্তু এ'র 'ফর্ম' সব সময় নিখুঁত প্রাকৃতিক এ'র মাধ্যম জল রঙ কিন্তু রুজো এ'কেছেন তেল রঙে, সুতরাং টেক্সচা বা বুননে তফাত তো থাকবেই। শীত কালের কুয়াশা-আবৃত সূর্যের পট ভূমিকাতে বাঁশঝাড় ছবিটি এবং মু সিল্ক-এর উপর অঙ্কিত ছবিগু কিছুটা চৈনিক চিত্রকলা অনুসরণে রচি মনে হ'ল।

শিল্পী মাওনাগা, অংগনি, পইতে ভয়, খাসি, লুসাই প্রভৃতি পাহাড় উপজাতির মধ্যে বসবাস করে তাদে সামাজিক জীবনযাত্রা এবং হাবভা চিত্রিত করেছেন। এ ধরনের ছবিগুলিতে আর্টের মারপ্যাঁচ বড় একটা লক্ষ্য করলা না। ঐ সব উপজাতির আচার ব্যবহারে প্রামাণিক লিখন হিসাবেই এগু মূল্যবান। জন্তুজানোয়ার এবং মনুষ মূর্তির নিখুঁত অ্যানাটমিবোধ এ' আরেকটি মস্তগুণ। এই কারণে প্রত্যে কলা ছাত্রছাত্রীরই এই প্রদর্শনীটি অবশ্য দেখা উচিত।

প্রদর্শনীটি সত্যই প্রীতিকর, কিন্তু শল্পীর ব্যক্তিমানসের কোনও পরিচয় পেলাম না। জনৈক বিদেশী চিত্র-রসিকের ভাষায় এঁকে বলা যায়,— 'a faithful imitator of nature'.

প্রদর্শনীটি আগামী রবিবার ২২শে মে পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা অবধি খোলা থাকবে।

—চিত্রগ্রীব

সাংবাদিকের স্মৃতিকথা

মহাশয়,

'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার ২রা বৈশাখ শনিবার সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত লিখিত 'সাংবাদিকের স্মৃতিকথা' ৭৪৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলম ২য় প্যারাগ্রাফে পড়িলাম, 'তখন গ্রামে তিনি (ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য) 'সন্তান সমিতি' ও একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।' 'সন্তান সমিতি'র জন্ম তার আরো অনেক পূর্বে হইয়াছিল। এই সমিতিতে অবিনাশ ভট্টাচার্যের নাম পাওয়া যায় না। এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র সরকার। এই সমিতি ১৯০৫ সালে গঠিত হয়। অনুকূল সরকার মহাশয় উহার সভাপতি ও মাস্টার ছিলেন এবং যাঁহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে এখানে দেওয়া হইল ঃ—
১। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার (সভাপতি ও মাস্টার), ২। শ্রীপ্রতাপ চক্রবর্তী (মাস্টার), ৩। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৪। শ্রীবলাইচন্দ্র লোধ (সব্যসাচী), ৫। শ্রীকামিনী ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ৭। শ্রীনবদ্বীপ ভট্টাচার্য, ৮। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৯। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, ১০। শ্রীমোহিনীমোহন দেব রায়, ১১। শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য, ১২। শ্রীঅখিলচন্দ্র চক্রবর্তী, ১৩। শ্রীমনোমোহন গোস্বামী (পত্তন), ১৪। শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস, ১৫। ডাঃ রামকুমার দে, ১৬। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ১৭। শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর সেন। তিনি জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 'সন্তান সমিতি' কর্তৃক পরিচালিত হইত। ডাঃ ভট্টাচার্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা নহেন। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

উপরোক্ত প্যারাগ্রাফে আরো লিখিয়াছেন যে, "এই সময় চুণ্টাতে এসে গ্রামের নানা উন্নয়ন কর্মে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর (ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য) কার্পণ্য ছিল না। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করে গ্রামটিকে উজ্জ্বল করে তোলেন তদঞ্চলে"। তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। সেই সময় ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য আদৌ চুণ্টায় ছিলেন না। তখন তিনি রিষড়া টেকনো কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসের রথযাত্রার দিন শ্রীযুত নন্দকুমার ভট্টাচার্য তাঁহার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে তদানীন্তন জেলা শাসক এফ ডাব্লিউ রবার্টসন বলেনঃ—

"Visited the Chunta H. E. School this afternoon. It has been founded by local gentleman, Babu Nanda Kumar Bhattacharjee about 16 months ago. The gentleman has not only born the cost of building, furniture, etc., but also pays whatever monthly balance remains after all fees have been collected. The building is sufficiently airy commodious and the school is undoubtedly a boon to the backward classes of the community, who cannot afford an education elsewhere.

Nanda Babu has certainly deserved thank of his co-villagers. Though so newly established there are three hundred scholars at present reading and two hundred and eighty were present at the time of my inspection. Examination are now going and I would suggest that if possible in such cases the boys be sitted at greater intervals from each other."

Sd/- F. W. ROBERTSON,
Dist. Magistrate Comilla.
11.12.28

ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীনন্দকুমার ভট্টাচার্য উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় শশিভূষণ সেনগুপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেন। তার চার বৎসর পর তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন, তিনি আরো জানেন যে, সেই সময়ে ডাঃ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'চুণ্টা প্রকাশ' মাসিক পত্রিকাতে নন্দবাবুর ফটো সহ ধন্যবাদ পত্র প্রকাশিত হয়।

বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সত্য নহে। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা গিরিবালা সেন, তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া আসিতেছেন। আজও তাঁহার নামানুসারে এই বিদ্যালয়ের নাম "গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়"। পাঠাগার সম্বন্ধেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেনগুপ্ত মহাশয় যে সময়ের কথা বলিয়াছেন সেই সময় স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয় উহা সংস্কার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, ডাঃ ভট্টাচার্য ননহন।

ভবদীয় বিশ্বস্তভাবে
বিকাশচন্দ্র লোধ, চুণ্টা

আলোচনা

নমস্কার নিবেদন,

অধুনালুপ্ত কলিকাতার অ্যাংে ইণ্ডিয়ান দৈনিক "ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ" আমার সহকর্মী (সব্-এডিটর) বন্ধ বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়, গত ১৬ই বৈশ তারিখের "দেশ" পত্রিকায়, তাঁর ক্রমশ প্রক স্মৃতিকথায়, "ডেলী নিউজ" দেশব ১৯২৪ সনে ক্রয় করিয়া "ফরোয়ার্ড" সামিল করিবার পর, সম্পাদক বিভ আমাদের সকলেরই যখন কাজ গেল, তখনব কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সহকর্মী অমল হোমও বে থাকলেন না। দেশবন্ধুর সহানুভূ আকর্ষণ ক'রে 'ক্যালকাটা মিউ সিপাল গেজেট' নামে সাপ্তাহি পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন

কথাটা ঠিক নয়। আমি "দেশবন্ধুর সহা ভূতি আকর্ষণ করে" 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ গেজেট' "প্রকাশ" করি নাই। আমার বেক ঘুচাইবার জন্য 'মিউনিসিপাল গেে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি বেকার বি দেশবন্ধুর করুণা উদ্রেকের কোন চেষ্টা কে দিনই করি নাই,—করিবার প্রয়োজনও আ ছিল না। দেশবন্ধু "ফরোয়ার্ড"-এ যোগ করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছিলেন, হি "ডেলী নিউজ"-এ আমার যে বেতন ছি "ফরোয়ার্ড"-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিট বেতন-হার তাহা অপেক্ষা কম থাকায়, ত সে-পদ লইতে সম্মত হই নাই।

'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেে প্রকাশের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল

কিবার কথাও নয়। পরলোকগত সিলর মদনমোহন বর্মণ মহাশয়ের াবে ও কর্পোরেশনের তদানীন্তন চীফ জিকিউটিভ অফিসার নেতাজী সুভাষচন্দ্র মহাশয়ের উৎসাহে, কংগ্রেস মিউনিসিপাল সোসিয়েশন 'মিউনিসিপাল গেজেট' াশের সংকল্প করেন। সুভাষচন্দ্র সম্পাদকের তাঁহার বিশেষ বন্ধু লণ্ডন-প্রবাসী বাদিক পুলিন শীল মহাশয়কে প্রতিষ্ঠিত বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দেশবন্ধুর নির্দেশে াকে সেই পদ দেওয়া হয়। "গেজেট"-এর াদক পদ গ্রহণ করিবার পর, আমি যখন লপুর জেলে সুভাষচন্দ্রের সহিত দেখা াতে যাই (৩০শে অক্টোবর, ১৯২৪), তখন নই আমাকে এই কথা জানাইয়া বলেন— াপনার উপর দেশবন্ধুর আস্থা আপনি ুট রাখিবেন, আমি এই আশাই করি।" শে বৈশাখ ১৩৬২॥

ভবদীয়
অমল হোম

'শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তিমতবাদ'

াশয়,

৯ই বৈশাখে প্রকাশিত ২৫ সংখ্যায় লোচনা' স্তম্ভে আমার লিখিত 'শঙ্করদেব তাঁহার ভক্তিমতবাদ' সম্বন্ধে শ্রীহরিহর দক মহাশয়ের সমালোচনা পড়িলাম। এ য়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

আসামের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক শঙ্করদেবের মতবাদে বাংলার চৈতন্যপ্রভুর প্রভাব যে সংশ্লিষ্ট এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নীলাচলে ন্যদেবের সহিত শঙ্করদেবের একবার াৎ হইয়াছিল ঠিক, কিন্তু সে সময়ে য়ের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা নাই। সেরূপ কিছু আদৌ ঘটিলে শঙ্কর-তকারগণ অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতেন। ভূষণ, দৈত্যারি, রাম রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রচরিতকারগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত শঙ্করদেবের ভক্তিমতবাদে বাংলার চৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাবই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করদেব যে সময়ে তাঁর ভক্তিমতবাদ প্রচার আরম্ভ করেন, তখনও চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। উভয়ের ভজনপন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিলেও উভয়ের ভক্তিমতবাদে যে মূল পার্থক্যগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আমার যুক্তির স্বপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অতএব যেহেতু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চৈতন্যদেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং উভয়েই নাম-সংকীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ সাধনপন্থা বলিয়াছেন—সে হেতু এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, শঙ্করদেবের ভক্তিমতবাদও চৈতন্য-প্রভাবমুক্ত হইতে পারে না। তবে তিনি যখন চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন ভক্ত ভক্তের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়—শঙ্করদেবও সেইরূপ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার অধিক কিছু প্রভাব ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাই না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলায় যে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা বহিল তাহার ঢেউ হয়তো কালক্রমে পার্শ্ববর্তী প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল, যাহার ফলে আসামেও 'চৈতন্যপন্থী' বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। কিন্তু শঙ্করদেবের ভক্তিমতবাদ ইহার বহু পূর্বেই আসামে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়াই যে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবমতবাদ উজ্জ্বলতর হইয়াছিল এরূপ মতও অশ্রদ্ধেয়।

শঙ্করদেব মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে তাঁহার প্রচারিত ভক্তিমতবাদ 'মহাপুরুষিয়া' নামে খ্যাতিলাভ করে। শঙ্করদেব তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য কায়স্থ মাধবদেবকে পরবর্তী গুরু নির্বাচন করিয়া যান এবং শঙ্করদেবের "একস্মরণীয় মন্ত্র" মাধবদেব পরিচালিত 'মহাপুরুষিয়া' সম্প্রদায়ের মধ্যেই মূলত অন্তর্নিহিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ দামোদরদেব প্রতিষ্ঠিত 'দামোদরিয়া' সম্প্রদায় ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে শঙ্করদেবের ভক্তিমতবাদের মূলমন্ত্র হইতে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তবে একথা ঠিক যে, শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ শিষ্যবর্গের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়—ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে অসদ্ভাবের ফলে,—চৈতন্যপ্রভাব স্বীকার করা বা না করা লইয়া নহে। এই জাতিগত বিবাদের ফলেই 'মহাপুরুষিয়া' ও 'দামোদরিয়া' ভিন্ন আরো কয়েকটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল যথা—হরিদেব প্রতিষ্ঠিত 'বামুনিয়া' সম্প্রদায় ও অনিরুদ্ধ ভুইয়া প্রতিষ্ঠিত 'মোয়ামারিয়া' সম্প্রদায়। কিছুকালের মধ্যে 'বামুনিয়া' সম্প্রদায় 'দামোদরিয়া'র সহিত মিলিত হইয়া যায়।

পরিশেষে একথা উল্লেখযোগ্য যে, অতি সংক্ষেপে লিখিবার জন্য শঙ্করদেব সম্বন্ধে সকল কথা বিস্তারিতরূপে বলা সম্ভব হয় নাই। দু'চার কথায় শঙ্করদেবের মহান চরিত্রের ও তাঁহার ভক্তিমতবাদের একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বিনীতা
কমলা সেন,
কলিকাতা—১৯।

সাহিত্য সঙ্কট

সবিনয় নিবেদন,

গত ২রা বৈশাখের ২৫শ সংখ্যা দেশে অন্নদাশংকর রায়ের 'সাহিত্যে সংকট' নিবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আণবিক বোমা সম্পর্কিত অন্নদাশঙ্করের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন দু'জন পাঠক। তাঁদের বক্তব্য, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানই হিরোশিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের জন্য দায়ী, রুজভেল্ট নন। সরাসরিভাবে বোমা নিক্ষেপের আদেশ দেওয়ার দায়িত্ব থেকে রুজভেল্টকে রেহাই দিলেও এ বিষয়ে তাঁর দায়িত্বের পরিমাণ কম ছিলো না; অন্নদাশঙ্করের ২রা বৈশাখের সংশোধিত মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য।

যেহেতু হিরোশিমার সময় রুজভেল্ট জীবিত ছিলেন না এবং ট্রুম্যান ছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট, সুতরাং দায়িত্ব ট্রুম্যানেরই এ যুক্তি অচল। রুজভেল্টের কার্যকালেই আণবিক বোমা প্রস্তুতির সমারোহ চলেছিল। এ বিষয়ে বেশী কথা না বলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের Atomic Energy Commission-এর প্রাক্তন সভাপতি গর্ডন ডীনের সম্প্রতি প্রকাশিত 'Report on the Atom' বইখানি থেকে কতকগুলি তথ্য পাঠকদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি। গর্ডন ডীন ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর মতামত আমরা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য মেনে নিতে পারি।

হিরোশিমায় বোমা-বিস্ফোরণের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী ডীন বিচার করেছেন এবং সেগুলিকে তিনি পরিষ্কাররূপে তাঁর বইএর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারীতে খবর পাওয়া গেল যে, জার্মানীতে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় এবং আরো কয়েকটি জায়গায় ঐ পরীক্ষাটি সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকেরা। পরে ঐ বছরেই আগস্টে পরমাণুকে সামরিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করবার জন্য কতিপয় বৈজ্ঞানিক কি করেছিলেন তা ডীনের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছিঃ

A group of European refugee Scientists, by now living in the United States, early recognised the military possibilities of atomic energy and, fearing German effort in this direction, organised an

attempt to interest the American Government in undertaking an atomic research programm.******* they determined to reach President Roosevelt direct. This was accomplished through a letter of August 2, 1939, signed by Albert Einstein and delivered to the President***. As a result of this approach, the President at about the same time as World War II began with the German invasion of Poland, appointed as three-man "Uranium Committee" to look into the question of developing an atomic bomb.

সুতরাং প্রমাণিত হয়, রুজভেল্ট আণবিক বোমা প্রস্তুতিতে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং সে সম্মতি দিয়েছিলেন জার্মানীর পোলান্ড আক্রমণের সময়ে। উদ্দেশ্য স্পষ্টই বোঝা যায়।

এর পরে দেখা যায় ১৯৩৯ নভেম্বরে ঐ কমিটি আণবিক বোমা প্রস্তুতকে "a Possibility" বলে রিপোর্ট দেন এবং ১৯৪০ জুনে Dr. Vannevar Bush-এর পরিচালনাধীনে 'National Defence Research Committee" বোমা প্রস্তুতি সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৪১ ডিসেম্বর পার্ল-হারবার আক্রমণের সময় সত্বর পূর্ণ উৎপাদন শুরু করতে হবে স্থির করা হয়। এবং এও ঠিক হয় যে, গঠন পর্ব শুরু হলে সমস্ত পরিকল্পনাটি সামরিক বিভাগের কাছে হস্তান্তরিত করা হবে এবং ১৯৪২ জুনে

President Roosevelt, upon the recommendation of Dr. Bush and with the approval of a policy group composed of Vice-President Wallace, Secretary Stimson, General Marshall, and Dr. Connant, made the decision to proceed with enormous wartime construction program.

অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রুজভেল্টের কার্যকালেই সামরিক উদ্দেশ্যে আণবিক বোমার প্রস্তুতি পর্ব চলেছিলো। এমন কি এই উদ্দেশ্যে ১৩ই আগস্ট ১৯৪২ নতুন manhattan Engineer District স্থাপিত হয়। এর তত্ত্বাবধান ভার সম্পূর্ণরূপে সামরিক বিভাগের হাতে ছিল।

এই সমস্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হিরোশিমা ঘটনার সময়ে রুজভেল্ট জীবিত না থাকলেও তাঁরই কার্যকালে তাঁরই অনুমতিতে আণবিক বোমা উৎপাদনের পূর্ণ প্রচেষ্টা চলেছিলো। গর্ডন ডীনের মত দায়িত্বশীল লোকের নির্ভরযোগ্য মন্তব্য সেই সত্যই উদ্ঘাটিত করেছে। হিরোশিমার ঘটনা বিচ্ছিন্ন আকস্মিক নয়, রুজভেল্ট যে উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেছিলেন, ট্রুম্যান তাই সম্পূর্ণ করেছেন মাত্র। ১৯৪৫ সালের আগস্টে যদি ট্রুম্যানের স্থানে রুজভেল্ট আসীন থাকতেন, তবে তিনিও হয়তো বোমা-বর্ষণের আদেশই দিতেন। ট্রুম্যানের একমাত্র দায়িত্ব তিনি বোমা বর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বোমা প্রস্তুতি ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব রুজভেল্টের। সুতরাং অন্নদাশংকরের সংশোধিত মন্তব্য 'প্রয়োজন হলে ফেলতে' কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। তাঁর পূর্বের 'অনুমতি দিলেন ফেলতে' মন্তব্যটিতে যদি কেউ আপত্তি করেন, করুন; তবে ২রা বৈশাখে প্রকাশিত লেখকের মন্তব্যে আপত্তি করবার কোন উপায় নেই।

ভবদীয়,
নাগপুর শ্রীঅরবিন্দশেখর ঘোষ
শ্রীদেবব্রত ঘোষ

গ্রন্থপার্বণ

॥ ১ ॥

মহাশয়,

দেশ পত্রিকার ১৩৬২ সালের সাহিত্য সংখ্যায় সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গ্রন্থ পার্বণ' বড়ই ভাল লাগল। প্রেমেনবাবু যে পার্বণের প্রস্তাব করেছেন, আমার মনে হয়, 'দেশের জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত রসিকদের কাছে বিধান ও সম্মতি পাওয়ার' আগেই সেটা কিছু লোকের মধ্যে চলন হয়ে গেছে। অবশ্য এটা ঠিক, বড়রা যদি এ সম্বন্ধে 'আন্দোলন' করেন, তবে হয়ত গ্রন্থ পার্বণের চলন সহজতর হতে পারে। মনে হয়, উপযুক্ত সময়ও এসেছে—কারণ পঁচিশে বৈশাখের উৎসবে আমাদের মধ্যে যে উন্মাদনা জাগে, তার উৎস মনের গভীরে। সেই আন্তরিকতার মাপকাঠি নেই। ইতি বিশ্বনাথ দাস, শিবপুর, হাওড়া।

॥ ২ ॥

মহাশয়,

আপনাদের সাহিত্য সংখ্যায় প্রেমেনবাবুর পরিকল্পিত গ্রন্থ পার্বণ ব্যাপারটি বড় সুন্দর লাগল। কিন্তু ভয় হয়, এ পরিকল্পনা অঙ্কুরেই শুকিয়ে ঝরে যাবে, যদি না আপনারা ও অন্যান্য পত্রিকারা ব্যাপক ও স্থায়ী প্রচারের দ্বারা একে দেশের শিক্ষিত সমাজের মনে গেঁথে দিতে পারেন। এক সংখ্যার একটা Casual আবেদন (যা আপনারা করেছেন) এ রকম একটা অভ্যাস গড়ে তোলবার পক্ষে কিছুই নয়। আশা করি আপনারা এ সম্বন্ধে আপনাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব উপলব্ধি করবেন ও আপনাদের অন্যান্য সহযোগীদেরও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন। ইতি—সতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা—২৬।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি আমেরিকার সাহায্য গ্রহণে বিরত থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সাহায্য গ্রহণ করিলে পাওনাদার একদিন চক্রবৃদ্ধি হারে তার পাওনা আদায়

করিবে।—"কিন্তু এ ছেড়ে দিলে বাকী থাকবে আফগান ব্যাংক আর তাদের সুদ চক্রের হিসেবে ধরা যায় না"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাক্ প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে ১৫ই মে রবিবার ইন্দো-পাক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করিয়াছেন।—"আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে বর্তমানে কোন কিছু বলা যেমন শক্ত, নিষ্ফলা রোববারের কথা ভোলাও তেমনি শক্ত"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

মিশরের নারী আন্দোলনের নেত্রী মাদাম দারিয়া সাফিক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলাদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন—তাঁহারা যেন একের অধিক বিবাহকারী পুরুষদের ভোট না দেন। —"কিন্তু ভোটের জন্যে পাকিস্তানের খুব ভাবনা আছে বলে সঠিক খবর আমরা এখনো পাইনি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পাক্ সামরিক কর্তারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা আফগানিস্তানকে "শিক্ষা" দিবেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী "শিক্ষা" কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মন্তব্য করিলেন—"শিক্ষার এমন কী-ই বা প্রয়োজন, তার চেয়ে মৎস্য ধরিব (অবশ্য অন্যের পুকুরে) খাইব সুখে নীতি-ই ভালো"!

* * *

এবার অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে টেলিগ্রাফের তার কাটার খবর পাওয়া গিয়াছে, অতীতের মতো পকেট কাটার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।—"সত্যিকারের কংগ্রেসকর্মীর পকেট যে গড়ের মাঠ সে কথা পকেটমারেরাও বুঝে নিয়েছে"—বলিলেন খুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহেরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতের সমস্যার সংখ্যা ছত্রিশ কোটি।—"জহরলালজী হিসেবে ভুল করেছেন। সমস্যা আমাদের মাথাপিছু একটি নয়, একাধিক এবং সেই হিসেবে সমস্যার সমাধান করতে হলে পঞ্চবার্ষিকী না করে শতবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে"—মন্তব্য করিলেন, বিশুখুড়ো।

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, স্যার উইনস্টন চার্চিল নাকি সম্প্রতি একটি অশ্বপ্রজনন প্রতিষ্ঠান ক্রয়
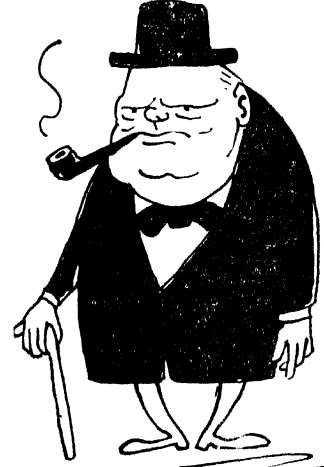
করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"A horse, a horse, a kingdom for a horse."

* * *

শ্রীযুক্ত নেহেরু বহরমপুরে তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, জনগণের প্রত্যেকের জাতীয় সংগীতে যোগদান করিয়া গগন পবন মুখরিত করিয়া তোলা উচিত।—"জাতীয়তাবোধের দিক থেকে পরামর্শটা উত্তম, কিন্তু অগণিত অ-সুর সংগমে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াতে পারে সে কথাটা নেহেরুজী ভেবে দেখেছেন কি —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেটার ফজল মামুদকে নাকি "জাহাঙ্গীর" নামক ছবির নাম ভূমিকায় নামাইবার প্রস্তাব চলিতেছে।—"কিন্তু আমরা বলি পর্দায় ফার্স্ট হওয়ার চেয়ে মাঠে ফার্স্ট হওয়া অনেক ভালো" বলে আমাদের শ্যামলাল।

কবিতা

দক্ষিণ নায়ক ঃ অরবিন্দ গুহ। প্রকাশক ঃ ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম ঃ দু টাকা।

বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্য অবারিত শতাব্দীপ্রসারী। উত্তর সাধকদের চেতনায় একটি অপরূপ গানের মত তিনি ছড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে আছেন। উত্তরকালের কবিদের চেতনায় কী অবচেতনায় তাঁর এই সশ্রদ্ধ উপস্থিতি তাঁদের কবিকর্মকে স্বভাবতই প্রেরণা দিয়েছে। উত্তরসূরীরা এই প্রেরণার সম্পদে ধনী ও ঋণী। অধিকাংশ কবিই উপনদীর মত রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্র গমনই করেছেন।

রবিরূপ গঙ্গোত্রীর মধ্য থেকে বেরিয়ে যাঁরা নতুন ধারার ভগীরথ হ'তে চেয়েছেন, তাঁদের শঙ্খধ্বনি আজ শ্রুতিগোচর হচ্ছে। এটা আশার কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম রেখে বাঙলা কবিতার এই নতুন ধারা নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট অগ্রযাত্রার পথ চিহ্নিত করতে শুরু করেছে।

সাম্প্রতিক কবিনামমালায় অরবিন্দ গুহ অনেক কারণেই একটি বিশিষ্ট নাম। অনেক কল্লোলকবি কবিকর্মে রবীন্দ্রমুক্তির প্রয়াস পেয়েছিলেন। অনেকে আবার রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করে নতুন কাব্য আন্দোলনের ধারক হ'তে চেয়েছিলেন। তাঁদের ছন্দ যেমন শ্রবণবিদারী, তাঁদের শব্দ গ্রন্থন তেমনি ভয়াল। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এত জমি আবাদ করে গিয়েছিলেন, যার ফলে এমন একটি ভূখণ্ড অকর্ষিত ছিল না, যেখানে সার্থক ফসল ফলানো চলতে পারে। এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাবান যাঁরা, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুভযাত্রা শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক দৃষ্টি-কোণের ওপর যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলোকে আশ্রয় ক'রে তাঁদের কবিকর্ম প্রাণিত হয়ে উঠেছিল। শেষতম কবিদের অংশত সার্থক উত্তরসূরী অরবিন্দ গুহ।

অরবিন্দ গুহের শব্দবয়ন মনোরম, কবিতার বিষয় প্রেম। এ প্রেম নানা রঙে, নানা আস্বাদে তাঁর কাব্যে ধরা দিয়েছে। একটি বিষণ্ণ বেদনার আভাষে। 'দক্ষিণ নায়কে'র অধিকাংশ কবিতাই সুস্বাদু। অনেক মুহূর্তে স্মরণের মধ্যে ছোট একটি ছায়ার মত, ছোট একটি অশ্রুর মত, একটি বিষাদের রঙে মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। এই মুহূর্তগুলিকে ভাষাবন্দী করেছেন কবি।

তাঁর 'ইভা দেবীর নামে', 'অল্পপক্ষণের জন্য', 'কেউ ডাকে নি', 'ময়ূরে', 'রবীন্দ্রনাথের নামে', 'দুয়ার খুলেছে' ইত্যাদি কবিতাগুলি রম্যপাঠ্য।

অরবিন্দ গুহের কবিতায় অনেক সময় জীবনানন্দ কী বুদ্ধদেব বসুর মেজাজ

আবিষ্কার করা চলতে পারে। তা সত্ত্বেও এই তরুণ কবির একটি স্বতন্ত্র মানসবৃত্ত রয়েছে। আর একটি অভিযোগ আছে। আলঙ্কারিকরা কাব্যের আত্মাকে বলেছেন ধ্বনি। এই ধ্বনি সম্পদ অরবিন্দ গুহের কবিতাতে অনেক সময় অনুপস্থিত। এদিকে একটু মনোযোগ দিলে অরবিন্দ গুহ সার্থকতর কবিতা উপহার দিতে পারবেন।

৩৮।৫৫

রম্য রচনা

ঝিলম নদীর তীর ঃ যাযাবর। নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ; ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা-১। দাম দু টাকা।

রম্যরচনাকার হিসাবে যাযাবর বাঙলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয়। 'ঝিলম নদীর তীর' তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থ। যদিচ কাশ্মীরের ইতিহাস, তথাপি লেখার মাধুর্য-গুণে ঝিলম নদীর তীর সুখপাঠ্য। হানাদারি আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত শ্রীনগর, ভারত সরকার কর্তৃক কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ, ভারতীয় সৈন্যের কাশ্মীর রক্ষা ইত্যাদি ঘটনা থেকে রাজ্যহারা হরি সিং-এর বোম্বাই প্রবাস পর্যন্ত ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে লেখা।

যাযাবরের রচনার সকল বৈশিষ্ট্যই এই গ্রন্থে বর্তমান। স্নিগ্ধ ভাষা, পরিচ্ছন্ন পরি-হাসপ্রিয়তা, নীরস ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলিকে সরস জীবন দান করেছেন। 'ঝিলম নদীর তীরে'র চার মাসেই চারটি সংস্করণ—গ্রন্থ-খানির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। সম্প্রতি আরও কটি সংস্করণ হয়েছে বোধ হয়।

গ্রন্থের ছাপা, প্রচ্ছদ, বাঁধাই চমৎকার।

(৫০১।৫৪)

ছোট গল্প

নতুন নায়িকা ঃ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যালকাটা বুক ক্লাব; ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। দাম দু টাকা।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইদানীংকালের পাঠকের কাছে অনুবাদক হিসাবে যতটা পরিচিত, মৌলিক লেখক হিসাবে ততটা নয়। অথচ আশ্চর্য, শান্তিরঞ্জন অনুবাদ-ক্ষেত্রে আসার বহু পূর্ব থেকেই মৌলিক রচনা লিখে আসছেন। বলা বাহুল্য, প্রতিভা যে পরিমাণ অপটু হলে মৌলিক লেখকরা সাধারণত অনুবাদের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন শান্তিরঞ্জনের ক্ষেত্রে তেমন কোন কারণ ঘটে নি। একদা তাঁর উল্লেখযোগ্য একাধিক ছোট গল্প পাঠের সুযোগ উৎসাহী পাঠকের হয়েছে।

নতুন নায়িকা, প্রজাপতয়ে, স্বেচ্ছাসেবক, পরকীয়া, আর কত দিন—এই কটি গল্পের সমষ্টিতে 'নতুন নায়িকা'। গল্পগুলি বিভিন্ন রসের। সব কটিতেই লেখকের তীক্ষ্ম এবং বিশ্লেষণী মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে। লেখক, বর্তমান সমালোচকের ধারণা, কিঞ্চিৎ বিদ্রূপপ্রখর। প্রজাপতয়ে গল্পটিতে সার্থক হয়েছে সেই বিদ্রূপ। সামাজিক তথাকথিত নীতি, দুর্নীতি, আচার আচরণ সম্পর্কে লেখকের ধারণা সহানুভূতিপূর্ণ বলেই বিশ্লেষণ এবং আঘাতটা রূঢ়। স্বেচ্ছাসেবক আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। অন্যান্য গল্প-গুলিতে শক্তিমান লেখকের স্বাক্ষর বর্তমান।

বইয়ের ছাপা, প্রচ্ছদ, বাঁধাই ভাল।

উপন্যাস

বিপ্লবের শিখা ঃ অসীমানন্দ সরস্বতী। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম। প্রকাশক ঃ শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য। সদ্গ্রন্থ প্রকাশনী। ৮।১ এম. হাজরা লেন, কলিকাতা-১৯।

বিশ শতকের ষষ্ঠ দশক। আজকের বাঙলা সাহিত্যের উপজীব্য রকমারি বৈচিত্র্যে, অজস্র দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐশ্বর্যময়। বুদ্ধি, হৃদয়, মনন—চিরকালের এই বিষয়গুলি নানা মৌলিক কোণ

থেকে নানা সাহিত্যিকের পরিশীলিত জীবন-বোধের দিক থেকে উপস্থিত করা হচ্ছে। তা ছাড়া, বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিসর বেড়ে চলেছে। সাহিত্যের সংসারে আজ অসংখ্য শরিক। নানা জাতি, নানা দেশ, নানা রুচির এ এক আশ্চর্য চিত্রশালা, বিচিত্র চরিত্রমালা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে বাঙলা সাহিত্য এই যে নানা বর্ণে, নানা জিজ্ঞাসায় লালিত হয়ে উঠেছে, তার একটি ইতিহাস আছে, তার বিবর্তনের একটি কক্ষপথ রয়েছে। আজকের কোন লেখক সাহিত্যের সেই ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে যদি বিন্দুমাত্র সচেতন না থাকেন, তবে যা হবার তাই হয়েছে এই উপন্যাসখানিতে। উপন্যাসটি স্বাধিকার-প্রয়াসী বাঙলা দেশের সেই অগ্নিময় যুগের কাহিনী। বিষয়বস্তুর দিক থেকে আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু সেই বিষয়বস্তুকে রসের মানসলোকে তুলতে সক্ষম হন নি লেখক। তা ছাড়া, এই সংগ্রামী অধ্যায়কে কেন্দ্র করে অনেক সার্থক রচনার উপহার আমরা পেয়েছি। এ রকম একটি ব্যর্থ সংযোজন উত্তররবীন্দ্র বাঙলাসাহিত্যে না হলেই খুশী হতাম। (১৩২।৫৫)

পূর্ণিমা : ভাস্কর। প্রকাশক—ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ; ৯, সতেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

ব্যঙ্গ-গল্পের লেখক হিসেবে ভাস্করের যে প্রখ্যাতি আছে, এ-গ্রন্থে তার ধারারক্ষা করা হয়নি। তিনি এখানে আরম্ভেই বলেছেন, 'আমাদের সমাজের একটি অতিক্ষুদ্র চিত্র অংকন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' এই চিত্রাংকনের মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা পেলাম না। মাঝারি শ্রেণীর কমেডিতে যতটুকু বৈচিত্র্য বয়ন সম্ভব এখানেও তার দৃষ্টান্ত পাই। নির্দোষ কৌতুকচিত্রায়ণে তাঁর যে-সিদ্ধি এখানে তা নেই। প্রধান চরিত্র যদি দানা বাঁধতো, তবে বইটি একটানা পড়ে যাওয়া সুসাধ্য হতো। তৎসত্ত্বেও পারিবারিক পরিবেশ-রচনায় 'ভাস্কর'এর যে নৈপুণ্য সেটিই বোধ হয় এ-গ্রন্থের আকর্ষণ। (৮৪।৫৫)

যেতে নাহি দিব : অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় : শান্তি লাইব্রেরী : ১০ বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : সাড়ে তিন টাকা।

একটি ভাবাবেগোচ্ছল, শিথিল-গ্রন্থি কাহিনী। যা নিয়ে নিতান্ত সাধারণ একটি ছোট গল্প লেখা যেত তাকে অকারণে দীর্ঘ করে উপন্যাস করা হয়েছে। না আছে কোন চরিত্রের পরিণতি, না আছে ঘটনার সুষম বিস্তার। আঙ্গিকে নতুনত্ব আনতে গিয়ে হয়েছে আরও বিপদ। একটানা গুছিয়ে বলে গেলে গল্পাংশের যে আবেদনটুকু পাঠকের কাছে পৌঁছুবার সম্ভাবনা ছিল আঙ্গিক বিভ্রাটে সেটুকুও তিরোহিত হয়েছে। ফল পাঠকের কাছে মোটেই সুখপ্রদ হয়নি। (১৩৩।৫৫)

অনুবাদ সাহিত্য

মৃগতৃষ্ণা (স্কার্লেট লেটার) : ন্যাথা নিয়েল হথর্ন। অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। টি কে ব্যানার্জি এন্ড কোং; ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দুই টাকা আট আনা।

গত শতাব্দীর ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যকে যাঁরা জীবনের নিগূঢ়কক্ষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হথর্নের নাম পুরোবর্তীদের অন্যতম। উপন্যাস বলতে যে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কোনো বিশেষ বাহ্যিক সমস্যা-সম্পাত করা-ই নয়, কোনো গূঢ় সমস্যার পরিশিলষ্ট পরিচয়চিত্রও বোঝায়, এদিকটা সম্পর্কে হথর্ন অতি সচেতন ছিলেন। তাঁর লেখায় বিষয়বৈভব ছাড়াও ছিলো কবিত্বশক্তি, যার পৌনঃপুনিক উল্লেখ অপরিহার্য; কবিত্বশক্তি—যা প্রকৃতিচিত্রণ থেকে আরম্ভ করে মানবপ্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় জগতে এসে অন্তঃস্থিত হয়েছে। সে-জগত, বলা বাহুল্য, হার্দজগতের উপর যৌথ জীবনগতির সংঘাতে আকারিত।

কিন্তু এসব তো মূল রচনার প্রসঙ্গে কথিত হলো। আসলকথা, অনুবাদের ভাষান্তরণে তার আস্বাদ ঠিক আছে কিনা। অনুবাদকদ্বয় পাঠকমহলে ইতিপূর্বেই পরিচিত এবং সমাদৃত। তাঁদের খ্যাতি এ-গ্রন্থের অনুবাদের জন্যে বাড়বে বই কমবে না। উভয়ের অনুবাদে এমন একটি দুর্লভ ঐক্য আছে, যার ফলে পাঠকের কাছে তাঁদের সুপ্রচেষ্টা এক অভিন্ন ব্যক্তিত্বেরই কাজ বলে মনে হবে। পরিশীলিত ভাষাবোধ এবং চারু কথন দুয়ের যোগাযোগে 'মৃগতৃষ্ণাকে' সুখপাঠ্য করে তোলার জন্যে অনুবাদকদের অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজিত 'লেখক পরিচিতির' জন্যও তাঁরা অভিনন্দিত হবার যোগ্য। (৮৯।৫৫)

মোপাসাঁর একাদশ : অনুবাদক শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরণজিৎ সেন; আর্ট এন্ড লেটার্স পাবলিশার্স; ৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

বাংলা ছোটো গল্পের ক্রমরেখায় মোপাসাঁর প্রভাব দূরগামী। উত্তম ইংরেজি অনুবাদের মধ্যস্থতায় তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকমহলে উত্তপ্ত আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন, এই তথ্য পরিবেশনে আজ আর কোনো অভিনব রোমাঞ্চ নেই। তাঁকে সোজাসুজি বাংলায় ভাষান্তরিত করার জন্য অনুবাদক অবশ্যই প্রশংসার্হ। অনূদিত কয়েকটি গল্প-পাঠক কাহিনীর আকর্ষণে পড়বেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু বারবার তাঁর মনে হবে যে, অনুবাদ পড়ছি। বস্তুত অনুবাদকর্মের একটি গুরু-দায়িত্বই বোধ হয় মৌল সৃষ্টির রূপ-গুণ কৃত্রিমতাবিমুক্ত অবস্থায় প্রতিফলিত করে দেখানো; আপসোসের বিষয়, এই কাজে মোপাসাঁর একাদশের অনুবাদক আমাদের সে উচ্চাশাকে পরিতৃপ্ত করেননি। মূলে যে আবহাওয়া পাই, এখানে তা আক্ষরিক যদি না থাকে তার থেকেও সেই ঘনীভবন সরে গিয়েছে।

প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীসত্যসেবক মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। (৮৭।৫৫)

কিশোর সাহিত্য

গ্যাং টক্, গ্যাং টক্। শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর। প্রকাশক : হর্সলিকা প্রকাশিকা। ৩৯বি, মহিম হালদার স্ট্রীট। কলিকাতা-২৬। দাম : বারো আনা।

বর্ণপরিচয়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে, যুক্তাক্ষরের পর্বত পেরিয়ে খোকাখুকুর দল যখন প্রথম দেখলো অক্ষরবন্দী, ছন্দোবন্দী কতকগুলি শব্দের মধ্যে টফী-চকোলেটের চেয়ে লোভনীয় আস্বাদ রয়েছে, তখন এই ক্ষুদে পাঠকদের ফরমাস আসে। ছড়া চাই। এদের দাবী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে মেটাতে হয়েছে। এদের আবদার সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথকেও রেহাই দেয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর প্রমুখ একালের সাহিত্যরথীদের দরবারেও এরা হানা দিয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে ছড়ার ভান্ডার তাই অফুরন্ত। এ দেশের বনপালা, জন্তুজানোয়ার মানুষের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ যে, তার ফলে মানুষের আচার-বিচার, সমাজ-সভ্যতা এদের ওপর চাপিয়ে কৌতুক করতে বেশ লাগে। এ দেশ আদর্শ ছড়ার দেশ। ছড়া এদেশের আকাশের নীলে, সাগরের ঢেউএ, বুদ্ধ ভূতুমের চোখে, জোনাকীর আলোতে ছড়িয়ে রয়েছে। এই ছড়ার দেশে 'গ্যাং টক্ গ্যাং টক্' একটি সার্থক সংযোজন। সুন্দর শব্দচয়নে, সুষ্ঠু ছন্দের নির্বাচনে ছড়াগুলি উপভোগ্য হয়েছে। ক্ষুদে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 'গ্যাং টক্ গ্যাং টক্' একটি লোভনীয় প্রীতিভোজ। যে খুকুর মুখে প্রথম কথা ফুটেছে, তার ছোট্ট দাদর মুখে শুনে শুনে এই ছড়াও ছুটবে—

'ঘোড়ার ডিমের ছানার ছেলে
পাশ করেছে ম্যাট্রিকে
শালের বনে বনের ভোজন
খুনতী নাড়ার চামচিকে।'
কিংবা
'বেড়ালের মুখে ভাত শেয়ালের বিয়ে
মউমাছি কামরাঙা ভাজে তাই ঘিয়ে।'

(১২১।৫৫)

[নির্ভয় নাবিক]
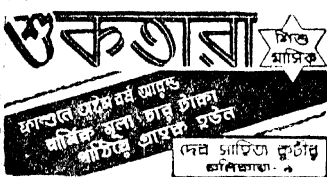
বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী কোন বিদেশী শিক্ষাব্রতী য়ুরোপ ঘুরে এসে সখেদে জানিয়েছেন সেখানে রবীন্দ্র-নাথের কবিখ্যাতি লুপ্তপ্রায়। সত্যটা অপ্রিয়, শোনার জন্যে আমাদের অনেকে তৈরি ছিলেননা। কেউ ব্যথিত, কেউ বিমূঢ় হয়েছেন। অবাক হয়ে বলছেন তবে এতদিন বাঙালী গানের রাজা বলে যে গর্ব করেছি, সেকি মিথ্যে। মিথ্যে নয়। আসল কথা, কোন রাজত্ব মৌরুসী নয়, গানের রাজত্বও না। তাই বলে এত স্বল্পায়ুই বা হবে কেন। হৃত যশের ময়না তদন্ত করে অনেকে একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন--অপটু এবং অপ্রচুর অনুবাদ। সেটা টের পেতে এতদিন লাগল এই আশ্চর্য। জাতি হিসেবে আমরা কিছু ঢিলেঢালা প্রকৃতির, শিরে সর্পাঘাত না করলে চৈতন্য হয় না।

নইলে চোখ কান খোলা রাখলে ব্যাপারটা আমাদের অনেক আগেই নজরে পড়ত। বিদেশী কোন কাব্য সংকলনেই কবিগুরুর রচনা স্থান পায় না, য়েটসের ভর্স-সংগ্রহটি বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। ইদানীং কোন ইংরেজ লেখক কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করেছেন বলে মনে পড়ে না। বীভর্লি নিকল্স যখন লিখেছিলেন টেগোর "চার্মিং মাইনর পোয়েট অভ্ বেঙ্গল, হু হ্যাজ হিজ য়্যাবোড সমহোয়্যার নিয়ার দি হিমালয়াজ", তখন আমরা মর্মে মর্মে চটেছি, কিন্তু কথাটাকে বিশেষ আমল দিইনি। ভেবেছি ওটা নেহাৎ কুৎসাকারীর ঈর্ষাপ্রসূত রটনা, গুণীজনের কাছে কবি-গুরুর আদর এখনও পূর্ববৎ। ভুলটা কিছু দেরিতে ভাঙল।

অথচ বিশ্বের দিকে তাকানোর দরকার ছিল না। বঙ্গেতর প্রদেশের দিকে চোখ ফেরালেই টের পেতুম হাওয়ার গতি কোন দিকে। ইংরেজ যতদিন ছিল, তত-দিন তবু কিছুটা ঢাকাঢাকি ছিল। হিন্দী উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। আজ চক্ষু-লজ্জাটুকু গেছে। রবীন্দ্রনাথের নাম বাংলার বাইরে কদাচিৎ উচ্চারিত হয়, হলেও সমকালীন কোন কোন হিন্দী কবির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে। বাংলা

উত্তমপুরুষ

চৌদ্দটি মুখ্য ভাষার অন্যতম মাত্র। আর তেরটি সাহিত্যের বই যখন পুরস্কার পায়, বাঙালী লেখকও তখন অবশ্য বাদ যান না। কিন্তু একথা কারো মনে হয় না, সব ভাষার একটি করে বই স্বীকৃতি পেলে বাংলার অন্তত তিনটির পাওয়া উচিত। শিক্ষিত অবাঙালী এখনও ঢোঁক গিলে অবশ্য বলেন, 'হাঁ হাঁ, জানি, বাংলা, তামিল, গুজরাতী খুব উন্নত ভাষা।' কিছুমাত্র না জেনেই বলেন। আমরাও ব্রাকেটে উল্লিখিত হয়েই পুলক বোধ করি, বলতে সাহস পাই না এই ভঙ্গবঙ্গের সাহিত্য অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অতুলনীয়-ভাবে এগিয়ে আছে।

কবিগুরুর যশও তাঁর ভীরু উত্তরা-ধিকারীদের দোষে রাহুগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথ যৌবনে আরব বেদুয়িন এবং প্রৌঢ় বয়সে ব্রজের রাখাল বালক হতে চেয়েছিলেন। হলে তার কী সুখ হত জানিনা, কিন্তু এখন ক্ষোভের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভাবি, হয়ত আমাদের সব চেয়ে লাভ হত তিনি রাজ-নীতি থেকে একেবারে সরে না গেলে। তা হলে জাতিরজনক না হোক অন্তত পিতৃব্য বলে তো তিনি মান পেতেন, তাঁর রচনা প্রচারের ভার ভারত সরকার কিম্বা সাহিত্য আকাদেমি নিজেই নিতেন, প্রতি ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে তাঁর পুস্তক পাঠ আবশ্যিক হত।

* * *

স্বয়ং কবিগুরুর রচনারই যদি এই আদর, তবে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অবস্থা অনায়াসে অনুমেয়। সেজন্য শুধু নবযুগের অবাঙালী চালকদের দোষ দেব না। আমরা নিজেদের মান নিজেরাই রাখিনি। পাঠকেরা জেনে অবাক হবেন, এ-যুগের বাঙালী লেখকেরা একে অপরের লেখা পড়েন না। দুয়েকটি গোষ্ঠী এবং তরুণতর লেখকেরা একমাত্র ব্যতিক্রম। যোগী তার আপন গাঁয়েই ভিখ পায় না।

তারপর ধরুন আপনি-মোড়ল অধ্যাপকদের কথা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপ ও রেখা সম্পর্কে এঁদের কোন ধারণা নেই, কেননা প্রায় কিছুই পড়েননি, যদি বা পড়েছেন, তবে মুরুব্বিয়ানার চশমা চোখে এঁটে। তাতে ক্ষতি ছিল না, যদি এঁরা কথায় কথায় ফতোয়া না দিতেন কতই যেন পড়েছেন এমন ভান না করতেন। একটু রূঢ়ভাবেই কথাগুলি লিখতে হল। কেননা বাংলা সাহিত্যের উপরে ইংরেজীতে বেতার বক্তৃতা এঁরাই দেন, ইংরেজী কাগজে তিন কলম জোড়া প্রবন্ধ এঁরাই ফেঁদে বসেন। বাঙালী পাঠক বা শ্রোতার তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ভুল খবর পান অবাঙালীরা। তাঁরা ভাবেন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরে আমাদের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছু রচিত হয়নি। উকিলের দোষে মামলা ফাঁসে।

চোখ বুজেই যে সব সমালোচক আমাদের সাহিত্য আগাছায় ছেয়ে গেছে কল্পনা করেন, তাঁদের কাছে একটিমাত্র প্রশ্নঃ এর চেয়ে সফল-ফসল যুগ কবে ছিল। ঊনিশ শতকে? মাইকেল-বঙ্কিম এবং পাঠ্য কেতাবের কৃপায় হেম-নবীন ছাড়া ক'জনের নাম সাধারণে মনে রেখেছে। এই শতকের প্রথম পাদে? রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র ছাড়া কার না বইয়ের ছাপা হলদে হয়ে এল। উন্নাসিকেরা জেনে রাখুন কাব্যে-কাহিনীতে, বিচিত্র বিষয়বস্তুর আহরণে, প্রকাশভঙ্গীর প্রসাধনে একালের লেখকদের দানের তুলনা পূর্ববর্তী কোন পর্বে পাওয়া যাবে না। জেনে রাখুন প্রচুরতা প্রাণেরই অপর নাম।

* * *

কোন মন্দিরের চত্বরে একবার একটি ঘণ্টা দেখেছিলাম। যে আসে সেই নেড়ে দিয়ে যায়। সাহিত্যও যেন সেই মন্দিরের ঘণ্টা, যে চায় সেই টোকা দিয়ে যায়, অধিকারী অনধিকারীর ভেদ নেই। কিম্বা যেন হাটের হাঁড়ি। যার খুশি সেই এসে বলে যেতে পারে তোমার লেখাটা কিছু হয়নি, কিন্তু পাল্টা কোন জবাব লেখকের

খ জোগাবে না। নইলে তিনিও
তহাসিককে বলতে পারতেন, 'আপনার
না তারিখসর্ব্বস্ব, নীরস; অথবা
জ্ঞানীকে 'আপনার সিদ্ধান্তে ভুল
ছে।' ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপককে
া অবশ্যই বলতে পারতেন, 'বাংলা গদ্যে
টুকু শ্রী এসেছে তার কৃতিত্বের সব-
কুই জনকয় ভূয়ো-ধিকৃত রসসাহিত্যের
টার প্রাপ্য। আপনাদের উপর নির্ভর
রলে তাকে আজও প্রাক্‌বঙ্কিম আমলে
ড়ে থাকতে হত।'

'চোখে-অক্ষম-পিঁচুটি' সমালোচকদের
থা জীবনানন্দ দাশ লিখে গেছেন। সেই
পভোগ্য বর্ণনা পাঠকেরা সুবিধা পেলে
ন পড়ে নেন। এঁদের মুখের নতুন বুলি
র সাহিত্য।' মাথা নেড়ে, গম্ভীর স্বরে
বলি বলেন, 'এ লেখা টিঁকবে না।
ছে যাবে।' জবাবে বলব, 'কীই বা
ঁকে।' এক যুগের বিজ্ঞানীর আবিষ্কার
ক পরের যুগে ভুল প্রমাণ হয় না,
তিহাসিক কি উত্তরাধিকারীর হাতে
ত্যবিকৃতির দায়ে লাঞ্ছিত হন না। তবে
ণায়ুতার অপবাদে শুধু সাহিত্যকে
ধক্কার দেওয়া কেন।

অকালমৃত্যুর ভয়ে কি সৃষ্টি বন্ধ
াকে। সাহিত্য সৃষ্টি তো থাকে না।
াকলে শিল্পের এই প্রাচীন ধারাটি কবে
ৃথিবী থেকে মুছে যেত। বিলুপ্তি ধ্রুব
নেও লেখক কোন সাহসে হাতে কলম
লে নেন? সেই সাহসে, যার বলে নাবিক
র বার সাগর পাড়ি দিতে ভয় পায় না।
াহস, বা নেশা। সেই পুরনো, পরিচিত
পটা আপনাদের বলি। এক নাবিককে
ক যেন জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার
তার কোথায় মৃত্যু হয়? সে জবাব
য়েছিল, সমুদ্রে। তোমার পিতামহের?—
মুদ্রে। প্রপিতামহের?—আবার উত্তর হল
-সমুদ্রে। বিস্মিত প্রশ্নকর্তা বললেন,
বু তুমি সমুদ্রে ভেসে পড়তে ভয় পাও
া?' নাবিক হেসে জবাব দিলে, 'না।
াপনার পিতা পিতামহ তো শয্যাতে
ষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাই
লে আপনি কি বিছানাতে শুতে ভয়
ান?' এত ভূরি ভূরি লেখা কালের সাগরে
লিয়ে গেছে, তবু সেই নাবিকের মতই,
রাডুবির ভয় লেখকের নেই। অক্লান্ত
খনী কেবলই চলে।

গোল্ডস্মিথ ও মধুসূদন

ভবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

অন্যের কষ্টে দুঃখ বা সহানুভূতি প্রদর্শন সভ্য সমাজের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু আমরা একবারও বিচার ক'রে দেখি না এতে আমাদের অধিকার আদৌ আছে কিনা, এমন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বিরল নয়, যাঁরা ঘৃণা সহ্য করতে পারেন, কিন্তু সহানুভূতি দহন করে তাঁদের।

শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে মহাজনরা বলে থাকেন—এটি নাকি জীবনতরীতে হালের কাজ করে। হালবিহীন তরীর মত বানচাল হ'য়ে যায় বিশৃঙ্খল জীবনতরী। শেলী-বায়রন মধুসূদনকে দাঁড় করান হয় উদাহরণস্বরূপ। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখা হয়েছে—এঁদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করবার অধিকার আছে তাঁদের কতটুকু?

জগতে সব কিছুর সৃষ্টির উৎসই অনন্ত আনন্দ। সে আনন্দ-রসের সন্ধান যে পেয়েছে একবার, তার কাছে এ জগতের কোন কিছুই আর কিছু নয়।

গোল্ডস্মিথ তাই পাঠশালায় পিছিয়ে-পড়া ছাত্র। বাণীর বরপুত্র যাঁরা তাঁদের আবার সীমাবদ্ধ সাধনার প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু দুষ্টুমিতে তাঁর জুটি নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিনিও নাকি পাঠশালার 'চিরপলাতক ছাত্র'। রসিক বলবেন, 'পরমেশ্বর, সবাইকে এমন পলাতক ক'রে দাও না কেন?'

মাত্র চল্লিশ পাউন্ডের পাদ্রী পিতার সন্তান। লেখাপড়া না শিখলে চলবে কেন? কিন্তু অকাট নির্বোধ', চেষ্টাচরিত্র করে কোনরকমে ট্রিনিটীতে প্রবেশ। কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়? উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য শাস্তি অঙ্গের ভূষণ হয়ে রইল। যাই হোক ঘষেমেজে কোনরকমে স্নাতক হলেন। তালিকায় নাম রইল সবার নীচে।

তারপর? গীর্জা পছন্দ হ'ল না। শিক্ষকতা করলেন কিছুদিন। মাদ্রাজে মধুসূদনও শিক্ষকতা-অধ্যাপনা করে-ছিলেন কিছুদিন। যিনি কম জানেন, তিনিই শিক্ষকতা গ্রহণ করেন—এ কথার মধ্যে সত্যতা কতটুকু, তা তর্কের বিষয়। কিন্তু যিনি বেশী জানেন, তার ধর্ম শিক্ষকতাই। তবে এতে ধৈর্যের প্রয়োজন। সেই ধৈর্য যা কোন আনন্দরস-পিয়াসী আত্মভোলা শিল্পীরই সাধারণত থাকে না, তাই গোল্ডস্মিথ ও মধুসূদনের শিক্ষকতা সাময়িক।

গোল্ডস্মিথ বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্য-দেবীর অদৃশ্য রত্ন-সিংহাসনের সন্ধানে। ফিরে এলেন শূন্য হাতে। আইন পড়তে খুড়ো দিলেন পঞ্চাশ পাউন্ড। উড়ে গেল অর্থ—হ'ল না আইন পড়া। এবার খুড়োরই অর্থসাহায্যে এডিনবার্গে চিকিৎসাবিদ্যা পড়লেন দেড় বছর। সেখান থেকে লীডেন, কিন্তু আবার সব অর্থ গেল উড়ে ভাগ্যপরীক্ষায়। পড়া আর হ'ল না।

গোল্ডস্মিথ-মধুসূদন— দুজনই সর্বদা ছুটে বেরিয়েছেন ছটফট করে। মধুসূদন হিন্দু কলেজ—বিশপস্ কলেজ শেষ ক'রে গেলেন মাদ্রাজ—সেখান থেকে আবার কলকাতা। প্রতীচী তাঁকে আকর্ষণ করল। সেখান থেকে ফিরে এলেন ব্যারিস্টার হয়ে। এর পরও তাঁকে আহ্বান করেছে ইয়োরোপ। মনীষী কবিদের জন্মলীলাভূমি। ছুটে গিয়েছেন তিনি। নিদারুণ অর্থকষ্ট আঘাত হেনেছে—ভেঙে পড়েন নি।

গোল্ডস্মিথের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইয়োরোপের দিকে পা বাড়ালেন এক বস্ত্রে, কপর্দকহীন অবস্থায়। সম্বলের মধ্যে একটি বাঁশি। পা বাড়ানো মানে সত্যি পা বাড়ানো। ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ইটালী। দিনে বাঁশি বাজিয়েছেন। রাতে গল্প আর গান শোনানোর বিনিময়ে যোগাড় করেছেন দরিদ্র কৃষকের কুটিরে এক টুকরো রুটি এবং কোনরকমে রাতটুকু কাটিয়ে দে[ওয়ার]
মত একটু আশ্রয়।

এই সময়েই সুইজারল্যান্ড [থেকে]
শুরু হয় তাঁর কাব্যসাধনা। শোনা [যায়]
এ সময় লুভেন থেকে এম-বি ডিগ্[রি]
তিনি সত্য নাকি নিয়েছিলেন। [...]
দু'বছর পর ফিরে এলেন। শূন্য হাতে[...]

মধুসূদন শিক্ষকতা-অধ্যাপনা, সংব[াদ]
পত্র সেবা, ব্যারিস্টারী এবং সাহি[ত্য]
সাধনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে[ছেন]
জীবনকে। কিন্তু গোল্ডস্মিথের পে[শা]
আরও বৈচিত্র্যময়। শিক্ষকতা করেছে[ন]
ওষুধের দোকানে কাজ করেছেন কি[ছু]
দিন, ডাক্তারীও বাদ যায়নি—লেখক [...]
ছিলেন-ই।

বড় স্বাধীনচেতা এবং অভিমানী হন শিল্পী। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সম্ভব হয় না পরাধীনতা স্বীকার করা। গোল্ডস্মিথ-মধুসূদনের চাকরি করাও তাই ছিল স্বভাববিরুদ্ধ। মধুসূদন তা নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর ঘাড়ে ছিল একটি ভূত, যে তাঁকে স্থির হয়ে চাকরি করতে দিত না।

এ সেই নিত্যজ্ঞান-সুখময়ের আকর্ষণ। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের হাতছানি। সচ্চিদানন্দ-হৃদয়ের গহন কোণে আবির্ভূত হয় উল্লাস—তাই সৃষ্টি অনন্ত বৈচিত্র্যময় এ বিশাল বিশ্বের। এ আনন্দ-উৎস-ধারের সন্ধান যে পায়, সে উন্মাদ হয়ে যায়—পার্থিব জগৎ তার কাছে অর্থহীন।

অর্থ উপার্জনে এঁরা যেমন উদাসীন অর্থব্যয়েও এঁরা তেমনি যত্নহীন। একুশ পাউণ্ডের ঋণের দায়ে যেদিন গোল্ড-স্মিথকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, সেই দিনই তাঁর 'দি ট্রাভেলার' প্রকাশকের কাছে বেচা হ'ল। একখানা প্রসিদ্ধ উপন্যাস বেচে একবার ডক্টর জনসন তাঁকে উদ্ধার করে-ছিলেন বিপদ থেকে। কিন্তু অবশিষ্ট অর্থে গোল্ডস্মিথ একদিন ভোজ দিয়ে বন্ধুদের খাইয়ে দিলেন। আবার যে তিমিরে সে-ই তিমিরেই। শুধু যে অনাহারেই অর্থব্যয় হয়েছে এমন নয়। দান ক'রে কপর্দকশূন্য হ'য়ে পড়ার দৃষ্টান্তও তাঁর জীবনে বিরল নয়।

অর্থাভাবে জর্জরিত মধুসূদনের কষ্ট-ভার লাঘবের জন্য যেসব মহানুভব বন্ধুরা বহু কষ্টে সংগ্রহ ক'রে প্রতি মাসে দুশো টাকা দিতেন তাঁদের একজনকে, একদিন মধুসূদন লিখলেন—তাঁর মত প্রতিভার একজন কবির পক্ষে মাসিক ঐ অঙ্কটা নাকি মোটেই যথেষ্ট নয়। এ মধুসূদনের আত্মম্ভরিতা নয়। আত্ম-উপলব্ধি। ক্ষুদ্র সৌরমণ্ডলের গ্রহ পৃথিবীর পরিবেশ ক্ষুদ্রতম এঁদের কাছে। পার্থিব জগতের সব কিছুই অকিঞ্চিৎকর তাঁদের কাছে, যাঁদের ব্যক্তিত্ব আকাশচুম্বী। তাই খেয়ালি কবির পক্ষে কোন অঙ্কই হয়তো যথেষ্ট নয়। 'চোর রত্নাকর কাব্য-রত্নাকর কবি' যাঁর অনুগ্রহে তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীর চিরকলহ। উৎসব অনুষ্ঠানে কবি নিজের মর্যাদা রেখেছেন; কিন্তু তাতে ঋণের অঙ্ক বেড়েছে কী পরিমাণে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না কোনদিন। ভাবপ্রবণ কবি দানও করেছেন বেপরোয়াভাবে নিজের কথা একটিবারও না ভেবে।

মধুসূদনকে রক্ষা করেছেন বিদ্যাসাগর। তিনি না থাকলে মধুসূদনের নাম পৃথিবী হয়তো শুনতোই না কোনদিন। সপরিবার অনাহারের ভয়ে সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র বিদ্যাসাগরকেই স্মরণ করতে পেরেছিলেন মধুসূদন। যে দায়িত্ব ছিল সমগ্র বাংলার, তা নিজে গ্রহণ করেছিলেন বাংলার গুরু বিদ্যাসাগর।

গোল্ডস্মিথের রক্ষাগুরু ডক্টর জনসন। তাঁর খ্যাতির মূলে জনসনের দান বড় কম নয়। একদিকে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন, অন্যদিকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে অলিভার গোল্ডস্মিথ, অন্যদিকে মধুসূদন দত্ত। বিধাতার সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যেও কী আশ্চর্য সাদৃশ্য। প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান। তবুও কী আশ্চর্য!

চন্দ্র বলেছেন, সাধারণকে আমি দিয়েছি আলো। কলঙ্ক যদি কিছু থাকে, তবে তা আমার নিজের। তাই চন্দ্রের বিচারে কলঙ্কটুকু যিনি উপেক্ষা করতে না পারবেন, তাঁর স্বাভাবিক মানুষ ব'লে পরিচয় দেবার কোন অধিকার নেই। গোল্ডস্মিথ-মধুসূদনের জীবন দর্শন বিচারের অধিকার সবার নেই।

গোল্ডস্মিথের ছন্নছাড়া জীবনে কিছুটা সংযম এনেছে সাহিত্য। তবু এ সংযম পরিপূর্ণ সার্থকতা পায়নি। পাহাড়ী নদী সমভূমিতে নেমেও কখনো প্রকাশ করে চপলতা; বন্য হরিণীর মত অসংযত প্রাণ-প্রাচুর্যভরা ভারতের আদিবাসী-তনয়া অকস্মাৎ স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলে শহরের পরিবেশের মধ্যেও। তাই কবি-জীবন বৈচিত্র্যময়। যে প্রতিভা কালজয়ী, সে হ'তে চায় না গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর ক্রীতদাস। গোল্ডস্মিথের দান কি কম? আশার ছলনায় ভুলে মধু-কবি যা লাভ করেছেন, তার কণামাত্র লাভ করলেও অনেক কবি-যশপ্রার্থীর জীবন ধন্য হয়ে যাবে। কবিমাতার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তরুণ মধু বলেছিলেন, 'তুমি দেখে নিও মা, এই মধু-ই দত্তবংশের মুখ উজ্জ্বল করবে'। সত্যদ্রষ্টা কবির ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

প্রথম জীবনে মধুসূদন বাঙালী এবং বাংলা ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। অবশ্য, এর জন্য আমাদের ত্রুটি বিন্দুমাত্র নেই বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। যাই হোক, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল বাংলা ভাষা এবং মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি যা দান করেছেন, বাঙালী তা ভুলবে না কোনদিনও। বাংলার সুধীসমাজকে তিনি বলেছিলেন—বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ও চতুর্দশপদীর প্রবর্তন সম্ভব। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর সার্থকতা প্রমাণ ক'রে তিনি সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

গোল্ডস্মিথের জীবনেও তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশ থেকে 'দি ট্রাভেলার'এর প্রকাশ পর্যন্ত পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছর তাঁর জীবনে অবিস্মরণীয়।

মিলটন যেমন শুধু 'প্যারাডাইস লস্ট'ই যদি লিখতেন, তাহলেও যেমন তিনি অমরই থেকে যেতেন—গোল্ডস্মিথ-মধুসূদনকেও তেমনি শুধু 'দি ট্রাভেলার' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' অমর ক'রে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত।

শেষজীবন দুজনারই কেটেছে নিদারুণ দুঃখকষ্টে। সাহায্য করেছেন অনেকেই। কিন্তু এমন বিরাট ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা ছিল না পৃথিবীর কারও। দারিদ্র্য এবং ঋণ বেড়েছে সমান তালে। মনোকষ্ট দ্বিগুণ পদক্ষেপে। সর্বশেষ অগ্নিপরীক্ষা। পরমেশ্বর তাঁর প্রিয় সন্তানদেরই নিক্ষেপ করেন দুঃখ সমুদ্রে। অকালমৃত্যু ঘটল গোল্ডস্মিথের। দু' বছর পর বন্ধু লিখলেন স্মৃতিফলক—
'who touched nothing he did not adorn.'

আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদনের মৃত্যু বাঙালীর কপালে কলঙ্কের তিলক পরিয়ে দিল। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যলেখক মধু-কবির দেহাবসান ঘটল শোচনীয় অবস্থায়। কিন্তু স্মৃতি-ফলক লিখবার দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে যাননি তিনি। তার ফলে সারা বিশ্ব পেয়েছে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র কবিতা—

> 'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
> বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
> (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
> বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
> দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।...'

কষ্টের গোড়া দারিদ্র্য

অভাবে পড়লে মানুষের স্বভাব আর ঠিক থাকে না এবং সেই স্বভাববিকৃতি সমাজে যে একটা কলঙ্কের পাহাড় জমিয়ে তুলেছে, তারই পটভূমি নিয়ে গল্প আনন্দ পিকচার্সের "দুর্লভ-জনম"। প্রায় বছর দুই আগে ছবিখানির মহরত হয় এবং তারপর কিছুদিন তোলা চলতে চলতে আর্থিক কারণে তোলা বন্ধ হয়ে যায়। শেষে চেষ্টা-চরিত্তির পর কোনরকমে সম্পূর্ণ করে মুক্তিদান করা হয়েছে। এইভাবে তৈরী ছবি লোকের কৌতূহলে আগেই ভাটা ধরিয়ে রেখেছে, কাজেই ছবিখানি মুক্তিলাভ করে উৎসুক দর্শকদের সমাগম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু অন্যান্য নির্গুণ ছবি "দুর্লভ জনম" নয়। খামতি যথেষ্টই, কিন্তু গল্পের মধ্যে একটা বৈচিত্রাপূর্ণ মৌলিক চিন্তার ছাপ বেশ স্পষ্ট; সমাজের একটা নিদারুণ সমস্যার প্রতি চেতনা জাগিয়ে তোলার মতো জোরও আছে; আর আছে, বিশেষভাবে অভিনয়ের দিক থেকে, একটি শিল্পোত্তীর্ণ চিত্রসৃষ্টি বলে পরিগণিত হবার যোগ্যতা। ভিক্ষা, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি অসামাজিক প্রবৃত্তির মূল উৎসের দিকে নাট্যরসপুষ্ট কাহিনীর সাহায্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটি সুচেষ্টা পাওয়া যায় ছবিখানির মধ্যে। সমাজে সব অনর্থের মূল যে দারিদ্র্য, এই তত্ত্বই নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করার চেষ্টা হয়েছে।

* * *

দুঃখ, দারিদ্র্য ও ব্যর্থজীবনেরই কাহিনী। সমাজের একেবারে জঘন্য অন্ধকারতম উপনিবেশের অধিবাসীরাই এ কাহিনীর পাত্রপাত্রী। চোর, পকেটমার, আর পেশাদার ভিখিরীদের দল। এ কাহিনী তাদের ঘৃণ্য জীবনকে উদ্ঘাটিত করে দেখাবার জন্য সৃষ্ট নয়, কেন মানুষের সন্তান হয়ে জন্মেও দারিদ্র্যের কবলায়িত হয়ে মানুষ পাশবিক হয়ে ওঠে তা নিয়ে ভাববার জন্য প্রশ্নও তোলা হয়েছে। কে দায়ী এদের এই অবস্থার জন্য? চোরের ছেলেও বংশপরম্পরায় চৌর্যবৃত্তির উত্তরাধিকারী হবেই—এইটেই সত্য, না দারিদ্র্যের আচ্ছন্ন অন্ধকারেরই শিকার হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে এরা! পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই বেশি দায়ী করা

—শৌভিক—

হয়েছে এখানে—যে অবস্থায় দশ-বারো বছরের নির্মলস্বভাব সরল প্রকৃতির দারিদ্র-সন্তানও পাকেচক্রে পড়ে দুরাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে ওঠে। মানিক নামে একটি ছেলেকে নিয়ে গল্প; ওর জন্মের আগে থেকেই এ গল্পের শুরু। শহরের আলোহীন নিরন্ধ্র ভাঙা টিন আর পোড়ো কুঁড়ের বাসিন্দা ভিখিরীর দলে কুড়িয়ে পাওয়া রুক্মিণী বড়ো হলো ওদেরই ভোলা সর্দারের হাতে। ভোলার লাভ এইসব বেওয়ারিশ মানব সন্তানগুলোকে দলে রেখে দু'বেলা দু'পাত অন্ন দিয়ে ওদের ভিক্ষের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে রাখা। বড়ো হয়ে রুক্মিণী ভালোবাসলে পকেটমার লোচনকে। ঘেন্টু ওস্তাদের দলের লোক লোচন, বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল; কিন্তু ভিক্ষে করাকে ঘৃণা করে। একদিন রুক্মিণী ভোলার কবল থেকে পালিয়ে এসে উঠল লোচনের কুঁড়েতে। লোচনেরও সেইটেই ছিল সাধ। লোচনেরও শখ হয় রুক্মিণীকে বাবুদের মেয়েদের মতো করে সাজাতে। চুরি করে এনে দেয় রঙীন সাড়ি; গয়না। রুক্মিণীর ভয় করে; লোচনকে চুরি ছেড়ে ভিক্ষে করতে বলে, লোচন উড়িয়ে দেয় সেকথা। ওরই প্রতিবেশী এক-পা-কাটা রতন লোচনকে বড়ো ঘৃণা করে. চোর পকেটমার বলে, বলে কাজ করে খেটে খা। হঠাৎ একদিন রুক্মিণীর কাছে লোচন আবিষ্কার করলে ছেঁড়া কাপড়ের ছোট্ট জামা সেলাই। অবাক হলো লোচন, কিন্তু তার মতো অমন কাবিল বাপের ছেলে ছেঁড়া কাপড়ে সেলাই জামা পরতে যাবে কেন! ছুটলো সে জামার তাড়া হাতিয়ে আনতে; কিন্তু সে যাত্রা ধরা পড়ে জেলে গেল। রুক্মিণীর কান্না পোঁছল রতনের কানে। আসন্ন-সন্তানসম্ভবা রুক্মিণীর ভার নিজে সে নিলে। কাজ করতো কামারের কারখানায়, এবার থেকে উপরি খেটে রোজগার বাড়াবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে চাকরি রতন দিয়ে দিলে আর এক হতভাগ্য বেকারকে—কাজ চায়, কিন্তু কাজ খালি নেই, অথচ চার-পাঁচটি সন্তান রয়েছে মুষ্টি অন্নের প্রত্যাশায়। রতন কিন্তু নিজের জন্য অন্য কাজের ব্যবস্থা করলে। মানিক জন্মালো। রতনের অনেক আশা মানিককে কাজের মানুষ করে গড়ে তুলবে। এদিকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লোচন ফিরে এসে দেখে তাদের পুরনো বস্তীর জায়গায় বিরাট সৌধ দাঁড়িয়ে; রুক্মিণীর খোঁজ নেই।

* * *

মানিককে মানুষ করে তোলার জন্য রতন আর রুক্মিকর চেষ্টার অন্ত নেই। ঠোঙা তৈরি করে, ঝুড়ি বুনে, ঝিয়ের কাজ করে চালিয়ে নিয়ে চললো ওরা ওদের সংসারকে। ক্রমে ক্রমে রুমকির মন পড়লো রতনের ওপর। অনেকদিন পর সে আবার লোচনের দেওয়া সাড়িখানা পরে, কপালে সিঁদুর টিপ দিয়ে বসলো এসে রতনের পাশ ঘেঁষে; সলজ্জ ব্রীড়ায় ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে। প্রথমটা রতন বুঝতে পারেনি রুমকির হঠাৎ এই অভিসারভঙ্গী, কিন্তু যখন বুঝলো তখন তীক্ষ্ম ভর্ৎসনায় রুমকির কামপ্রবণ মনের গতিকে ফিরিয়ে এনে দিলে মানিককে মানুষ করে তোলার কর্তব্যর প্রতি। দেখতে দেখতে মানিক বড়ো হলো বছর দশেকের। রতন নিজে হাতে ওকে কাজ শিখিয়ে যায় এবং একদিন এক কারখানায় ভর্তিও করে দিয়ে এলো। মানিককে মানুষ করে তোলার স্বপ্নে বিভোর রতন। ওকে নাইট স্কুলে ভর্তি করে দিলে, এতোদিন নিজের বিদ্যে মতোই ওকে পড়িয়ে আসছিল। কিন্তু রতনের স্বপ্ন ভেঙে যেতে দেরি হলো না। কারখানায় সর্দারের ভাগনেকে জায়গা দিতে মানিকের কাজ চলে যায়। আশা না হারিয়ে মানিক নিজেই বের হয় কাজের খোঁজে. কোথাও কাজ খালি নেই। ওদিকে রুমকি বেরিয়েছিল বাড়ি তৈরির মজুরণীর কাজে। কদিন ধরেই শরীর খারাপ; হঠাৎ মাথা ঘুরে ভারা থেকে পড়ে আহত হয়ে রুমকি বাড়ি ফিরলো। মার জন্য ওষুধ চাই, পথ্য চাই। মানিক বের হলো কাজের খোঁজে, কিন্তু কাজ আর জোটে না। তবে ওর সঙ্গে জুটে গেল ঘেঁটু ওস্তাদ।

লোচনদের পকেটমার দলের সেই সর্দার। এমনি শিকারেরই খোঁজে থাকে ঘেঁটু সর্দার। কেমন চমৎকার মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিলে মানিককে পরাস্বপহরণ তত্ত্ব; মানিকের দুঃখে তার দরদের শেষ নেই। কদিন রোজই পার্কে এসে মানিক দেখা করে ঘেঁটুর সঙ্গে; কাজের আগাম মজুরি বলে মানিকের হাতে ফেরবার সময় টাকা গুঁজে দিয়ে যায়। এমন সদাশয় ব্যক্তিটির প্রতি মানিকের শ্রদ্ধা জাগলো; ঘেঁটু যা বলে তাই-ই মানিকের বিশ্বাস হয়। একদিন ঘেঁটু মানিককে হাজির করলে তাদের আড্ডায়; তারপর চললো পকেটমারার তালিম। প্রথম দিনে কাজে বেরিয়েই মানিক পড়লো ধরা। রাস্তার লোকে প্রহার করে পুলিসে দিতে যায়; হঠাৎ ওর নাইট-স্কুলের মাস্টারমশাই ওকে দেখে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে; কিন্তু মানিক লজ্জায় আর বাড়ি ফিরলো না, সটান গিয়ে উঠলো ঘেঁটু সর্দারের আড্ডায়। রুমকির দিন কাটতে লাগলো কেঁদে, আর রতনের মনে প্রশ্ন জাগে চোরের ছেলে হলেই চোর হতে হয় কিনা ভেবে।

* * *

হঠাৎ একদিন ঘেঁটুর আড্ডায় লোচনের আবির্ভাব। বেশ ভারিক্কে চেহারা হয়েছে; নাম এখন বংশীবদন ভট্টাচার্য; পেশা এক জমিদার-গৃহিনীর বাজার-সরকারী। কলকাতা থেকে গা-ঢাকা দিয়ে বেনারসে এই চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে; কিন্তু স্বভাব তার যায়নি। সম্প্রতি রাণীমা কলকাতায় এসেছেন এবং সঙ্গে এনেছেন প্রচুর হীরেজহরৎ। লোচন রাণীমাকে তার মাতৃহীনা এক সন্তান আছে বলে জানিয়েছে, রাণীমা তাকে দেখতে চান, এখন ঘেঁটু সর্দার তাকে যদি একটি ছেলে জুটিয়ে দেয়। তাছাড়া ঐ ছেলেটিকে নিয়ে লোচন রাণীমার অলঙ্কারসমূহ সাফ করে আনারও সুবিধে পাবে। সামনেই ছিল মানিক, ঘেঁটু সর্দার তাকেই লোচনের ছেলে সাজতে ভিড়িয়ে দিলে। লোচনও জানলে না, মানিকও জানলে না ওদের দুজনের প্রকৃত সম্বন্ধও পিতা-পুত্র। লোচন মানিককে নিয়ে রাণীমার বাড়িতে গিয়ে উঠলো। অলঙ্কারগুলি সরাবার ফাঁদও পাতা হলো, কিন্তু একটুর জন্যে ওরা দুজনেই ধরা পড়ে গেল। হাজতে এসে সেই প্রথম লোচন জানতে পারলে মানিক তারই রুমকির ছেলে। মানিকের কাছে লোচন তার পরিচয় গোপন রাখলে এবং চুরির সব দায় নিজের ওপরে তুলে নিলে। বললে, মানিককে সে ছুরির ভয় দেখিয়ে তার কথামতো চলতে বাধ্য করে এসেছে। বিচারের সময় এসে দাঁড়ালো রতন, প্রশ্ন তুললে মানিকরা যে চৌর্যবৃত্তির প্রতি প্রলুব্ধ হয়, তার জন্য দায়ী কে? বিচারে লোচনের জেল হলো এক বৎসর এবং মানিক ছাড়া পেলো। আদালতের বাইরে রুমকি এসেছিল মানিকের খোঁজে; দেখা হয়ে গেলো লোচনের সঙ্গে। লোচনের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে তখন, হাজত-গাড়িতে ওঠবার আগে ফিরে এসে ভালো হয়ে থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল রুমকির কাছে।

* * *

কাহিনীটির বিন্যাসে ফাঁক আছে, ফাঁকিও আছে; তা সত্ত্বেও মনের ওপরে রেখাপাত করার মতো উপাদানও আছে যথেষ্টই। চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার মতো একটা মানবিক আবেদন গোড়া থেকেই সঞ্চারিত পাওয়া যায়। বাস্তব নিয়েই কাহিনী; অবশ্য একটু-আধটু কৃত্রিমতা বিবর্জিত নয়। তাহলেও মনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার মতো হৃদয়স্পর্শী নাটকীয় মুহূর্ত আছে, যা নিবিষ্ট অনুভূতি জাগিয়ে তোলে বিষয়বস্তুটির ওপরে। ডকুমেণ্টারী বা প্রামাণ্য চিত্রের চেয়ে উপন্যাসের ধারাই কাহিনীর বিস্তারে অনুসৃত হয়েছে। তাই ছবিখানি দেখতে দেখতে কাঁচা কাজের ছাপ সত্ত্বেও রস উপভোগ করতে পারা যায়। গোড়ার দিকটায় খানিকটা এলোপাতাড়ি ভাব আছে। রুমকি আর লোচনের মনে ভালোবাসার রঙ ধরার দৃশ্য থেকে ছবি আরম্ভ। রাত্রে দুজনে শুয়ে আছে দু-জায়গায়; লোচন চুপিচুপি রুমকিকে ডেকে তুললে; ভোলা হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠতেই আবার দুজনে শুয়ে পড়লো যে যার জায়গায়। পরদিন লোচন রাস্তায় রুমকিকে ধরে জিলিপির লোভ দেখিয়ে গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কাটালে যার

ফলে বাসায় ফিরে ভোলার হাতে মার খেয়ে রুমকি পালিয়ে গেল। তারপরের দৃশ্যেই দেখা গেল লোচনের কুঁড়েতে রুমকি বেশ জমিয়ে বসে আছে। দেখে মনে হয় মাঝে যেন কয়েক পদ ছুট পড়ে গিয়েছে। ছুট আরও কতক জায়গায় পড়েছে তাতে গল্পের বাঁধুনির মধ্যে ধারাবাহিকতা খর্ব হয়েছে। রুমকি আর লোচনের একত্রে বসবাসের কাল সংক্ষিপ্ত এবং প্রণয়টা ধাপে ধাপে জমবার ঘটনার অভাব। লোচনকে যে প্রকৃতির দেখানো হয়েছে তাতে জেল থেকে ফিরে রুমকিকে খুঁজতে গিয়ে তাকে না পেয়ে অপর স্যাঙাতের কথায় হাতভরে সোনাদানা নিয়ে রুমকির তল্লাস করতে যাবে ঠিক করে আর একটা চুরিতে ঝাঁপিয়ে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু জামা চুরির জন্যে ওর এতো কী দীর্ঘ সময়ের জেল হয়ে গেল যে ফিরে এসে তাদের বস্তীর চিহ্ন তো পেলেই না, অধিকন্তু দেখলে তন্মধ্যেই বিরাট সৌধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে সে জায়গায়। এটা টেকনিক্যাল ভুল, এমন ভুল শেষেও রয়েছে যখন ম্যাজিস্ট্রেট মানিককে চুরির দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন। এক্ষেত্রে নির্দোষ সাব্যস্ত হলেও অভিভাবক না থাকলে রিফরমেটোরিতেই পাঠানো হয়, আর অভিভাবক থাকলে ভালো থাকার মুচলেকা দিতে হয়। দীর্ঘকাল পর লোচন বংশীবদন নাম নিয়ে ফিরলো ঘেণ্টু সর্দারের আড্ডায়; তারপর রাণীমা'র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে মানিককে ওর সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাও একটু সাজানো বলে মনে হয়। আরও কতক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু তার চেয়ে বেশী উল্লেখ করা যায় ছবিখানির গুণের দিক।

* * *

পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী নবব্রতী। কাহিনী এবং চিত্রনাট্যও তারই রচিত। বেশ সাফল্যের সঙ্গে নাটকীয় দৃশ্য কতকগুলি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যার মধ্যে ঘটনার বৈচিত্র্যও অনুভব করা যায় এবং শিল্পীদেরও অভিনয় সৌকর্যের পরম কৃতিত্ব পাওয়া যায়। একটা দৃশ্য তো অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে যেখানে রুমকি দীর্ঘ বারো বছর পর লোচনের কথা ভুলে তারই দেওয়া শাড়ি পরে রতনের পাশে এসে বসে অভিসারভঙ্গীতে; তারপর রতনের ভর্ৎসনা আর অব্যক্ত আর্তনাদে রুমকির ফিরে চলে যাওয়া! বহুকাল এমন সুসম্পৃক্ট নাটকীয় দৃশ্য দেখা যায়নি। রুমকির চরিত্রে প্রণতি ঘোষ এবং রতনের চরিত্রে শম্ভু মিত্র এ দৃশ্যটিতে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রণতি ঘোষ অবশ্য প্রথম দৃশ্য থেকেই মনকে নিবিষ্ট করে তোলেন তার অভিনয় ক্ষমতায়—রুমকির সেই জিলিপি খাওয়ার জন্য লোভাতুর উল্লাসের অভিব্যক্তি দারিদ্র্যের বুভুক্ষাকে অতি লোলুপ করে ফুটিয়ে তুলেছে। তেমনি লুকিয়ে ছোট্ট জামা সেলাই করতে করতে লোচনের দৃষ্টি থেকে সরানো; লোচন জেলে যাবার পর ওর অসহায়তা; মানিক চুরি করেছে শুনে ওর হতাশ্বাস, প্রভৃতি এক একটি জায়গা ধরে প্রণতি ঘোষ নাটককে জিইয়ে রেখে দিয়েছেন। এই চরিত্রাভিনয়টিকে তার শিল্পী-জীবনের একটি পরম কৃতিত্ব বলে আখ্যাত করা যায়। পা-কাটা রতন এই সমাজের দার্শনিক; পৃথিবীকে চিনেছে সে; সবাইকে বলে খেটে খাবার জন্য কিন্তু তবুও ওর মনে প্রশ্ন জাগে কাজ করতে চাইলেও লোকে কাজ পায় না কেন? —ভালোভাবে চলতে চাইলেও দরিদ্রের পক্ষে তা সম্ভব হয় না কেন?—কেন মানিককে আবার চোরের দলে গিয়ে ভর্তি হতে হয় —কে দায়ী এদের এই অবস্থার জন্য? শম্ভু মিত্র এই ভূমিকাটিতে বেশ একটা দীপ্ত, সাড়া জাগিয়ে তোলার মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। পর্দায় শম্ভু মিত্রেরও এটি স্মরণীয় কৃতিত্ব। লোচনের মতো একটা উচ্ছৃংখল, বেপরোয়া দুর্বৃত্ত অথচ স্বাভাবিক অনুভূতিসম্পন্ন একটি চরিত্র সৃষ্টিতে এতোদিন পর সমর রায় তাঁর অভিনয় কৃতিত্ব প্রকাশ করার সুযোগকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন। বেশ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। ঘেণ্টু ওস্তাদের চরিত্রে গৌর সী একটি বিশিষ্ট টাইপ সৃষ্টিতে মৌলিকত্ব এনেছেনে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কিভাবে একদল দুর্বৃত্ত উপকারীর বেশে সরলমতিদের পরস্বাপহরণে ব্রতী করে তোলে তার একটা নক্সা তিনি প্রকট করে তুলতে পেরেছেন। ছবিতে সংলাপ অংশও জোরা তাঁর এবং এদিক থেকেও

তিনি বৈচিত্র্যের স্বাদ পরিবেশনে সক্ষম হয়েছেন। ঘেঁটু ওস্তাদের ডানহাত হরি; নতুন ছেলেদের তালিম দিয়ে তৈরী করা তার কাজ; আর কাজ ঘেঁটুর পালিতা কন্যার পিছনে ঘুর ঘুর করা; গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে রাস্তায় গান গেয়ে ভিড় জমানো যাতে মানিকরা কাজ হাসিল করতে পারে। চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই বললেই বোধ হয় চরিত্রটি সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়ে যায়। পাঁচটি সন্তানের দরিদ্র বেকার এক বাপের ছোট একটি চরিত্রে বেচু সিংহ মনে রেখাপাত করার মতো অভিনয় দেখিয়েছেন। মানিকের ভূমিকায় সমীর সহানুভূতি টেনে ধরে রাখে। বংশীবদনবেশী লোচনের সঙ্গে খানিকটা অংশে সরল মানিকের চারিত্রিক পরিবর্তন—পিতা বলে না জেনে লোচনের কাছ থেকেই বিড়ি চেয়ে খাওয়া, সাজানো ফন্দিমতো লোচনকে বাবা বলে ডাকা ইত্যাদি ঘটনায় বিমর্ষতার মধ্যেও আমোদ পাওয়া যায়। অভিনয়ে আর আছেন যমুনা সিংহ, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি।

* * *

জি কে মেহতা ক্যামেরার সাহায্যে বিষয়বস্তুর ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শব্দগ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় সংলাপাংশ ভালোই তুলেছেন, গানগুলির ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। আর গান চারখানি জুৎসই জায়গায় পড়লেও সুরও ভালো হয়নি, গাওয়াও নয়। জায়গায় জায়গায় পরিবেশ গড়ে তুলতে আবহসংগীত কিছু সহায়ক হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন ননী-গোপাল চক্রবর্তী। শিল্প নির্দেশক সুবোধলাল দাস; সম্পাদক শিব ভট্টাচার্য।

স্রেফ পাগলামি

স্বাভাবিকতা কোন্ পর্যন্ত এগিয়ে তারপর পাগলামির এলাকায় পা দেয় সে সীমানা জ্ঞান সুশীল মজুমদারের মতো সফলকৃতী প্রবীণ পরিচালকের না থাকার কথা নয়, কিন্তু তা তিনি খুইয়ে দিয়েছেন তাঁর নবতম ছবি "অপরাধী"র ক্ষেত্রে। তাঁর আগের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করলে মনে হয় যেন এই বোধশক্তির বিলোপসাধন তাঁর ইচ্ছাকৃত। কে জানে হয়তো তিনি একটা নতুন ধরনের কিছু উপহারদানে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমতা রেখে সামলে আর চলতে পারেন নি। ক্রাইম-ড্রামা বলে ছবিখানির নামেতেই তা ব্যক্ত। হয়তো পরিচালকের কল্পনা ছিল ভয় আর কৌতুকের অবতারণা করে কাহিনীর বিন্যাসে নতুনত্ব নিয়ে আসবেন। কিংবা হয়তো চেয়েছিলেন সংগীত, কৌতুক ও রহস্যময় পরিস্থিতির সাহায্যে একটা চমকপ্রদ কিছু সৃষ্টি করে তুলতে। প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের নামেতেই তা প্রকাশ—মিস্ট্রি মার্থ মিউজিক প্রডাকসন্স। কিন্তু তার কল্পনা ও অভিলাষ যাই থাকুক, ছবিখানি যে-চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে তার মধ্যে একটা অতি অগোছাল চিন্তাধারারই পরিচয় ফুটে উঠেছে। অনেকগুলি তারকা ভূমিকালিপিতে গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষ করে হাসি আর ভয় সৃষ্টির জন্য বাজার-চলতি নামকরা কৌতুকশিল্পীদের প্রায় কাউকেই নিতে বাদ রাখা হয়নি। লোকে তাদের জন্য হাসবার সুযোগও প্রভূত পরিমাণেই পায়, কিন্তু আবার ওদের জন্য যে প্রচণ্ড ঝামেলার সৃষ্টি হয়ে ওঠে তাকে কাটিয়ে গল্পের মূলে সুরকে নিবন্ধ করে তোলা আর হয়ে ওঠেনি। সব মিলিয়ে "অপরাধী" একটা জোট পাকানো পাগলামিতে পরিণত হয়েছে। তবে গোড়াতেই পাগলামি বলে ধরে নিয়ে ছবি দেখতে বসলে হাল্কা হাসির ছবি হিসেবে শেষ পর্যন্ত বসে থেকে ছবির পনের সহস্রাধিক ফিট দৈর্ঘ্য পার হয়ে আসা যায়।

* * *

যুদ্ধকালীন আবহাওয়ায় পূর্ব-ভারতের কোন পার্বত্য অঞ্চলের এক জায়গার একটা টিলার ওপর একটা "ভূতুড়ে" বাড়ি গল্পের ঘটনাস্থল। বাড়িটি হোটেলরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে—সামরিক বিভাগে চাকুরিয়া একদল যুবক এখানে থাকে। একদল পাগল। হোটেলের ম্যানেজার বিপুল সর্বাধিকারি। রাত হলেই ভূতের ছায়া দেখা যায় দেয়ালের গায়ে। আতঙ্কগ্রস্ত বাসিন্দারা ভয়ের চোটে এমন-সব কেলেংকারি কাণ্ড করে বসতে থাকে, যা দেখে হোটেলটিকে একটা আস্ত পাগল-খানা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এদের মধ্যেই এক রাত্রে উপস্থিত হলো অরবিন্দ রায় নামে এক রাসভারী যুবক যার কাজ ছিলো সৈন্যদের সংগীত পরিবেশন করা তিনতলার ভূতুড়ে ঘরটাই সে দখল করলে। হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দার কাছে অরবিন্দ অত্যন্ত কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠলো। পাগল দলের তাই নিয়ে কতো কি কাণ্ড! ওদেরই দলের সুনীল তখন সাহায্য করছিল যুদ্ধের প্রকোপে ব্রহ্মদেশ থেকে প্রত্যাগত অসহায় ও নিঃসম্বল এক অন্ধ নারী আর তার তরুণী কন্যা ইভাকে। সবাই অন্যত্র যখন ব্যস্ত তখন সুনীল একটা টিলার ওপর বসে গান গায়; জল-ভরণে এসে ইভা তা শোনে এবং শেষে ওদের সাহায্য করার জন্য ইভা সুনীলের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। বাড়িওয়ালা ছিল ইভাদের এক উৎপাত। বাকি ভাড়া আদায় করতে এসে সে ইভার অসহায়তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। একদিন

ইভাকে ধর্ষণোদ্যত হতেই ইভা কোমর থেকে রিভলবার বের করে গুলির ভয় দেখিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। ব্যাপার শুনে সুনীল ইভার কাছ থেকে রিভলবারটা হস্তগত করে ওদের এনে তুললে হোটেলে। হোটেলে তখন রাঁধুনী ও পরিচারিকার অভাব। ঐ কাজের বিনিময়ে ওদের থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

* * *

ইভার ওপরে টান হোটেলের সবায়েরই। নানা ছুতোয় ইভাকে কাছে ডেকে আনতে চায়। সাধ্যমত ইভাও সবায়ের মন রেখে চলতে চেষ্টা করে। এটা কিন্তু ম্যানেজার বিপুলের ভালো লাগে না। ইভাকে ডেকে সে ভৎর্সনা করতে থাকে। ব্যাপার অন্যরকম কেবল অরবিন্দের ক্ষেত্রে। সে দরজা বন্ধ করে নিজের গান-বাজনা নিয়ে থাকে; কোনদিকে খেয়াল রাখে না, এমন কি ইভা সম্পর্কেও না। কিন্তু একদিন এই ব্যতিক্রম ভাঙলো। অরবিন্দের অনুপস্থিতিতে ইভা তার পিয়ানোটা পরিষ্কার করতে করতে টুলে বসে দু'কলি গান গাওয়ার সঙ্গেই অরবিন্দ এসে দাঁড়ালো। ইভার কণ্ঠস্বর অরবিন্দকে মুগ্ধ করেছে। অরবিন্দ তার জীবনের সব সাধনাকে মূর্ত করে তোলার মাধ্যমটি এতদিনে আবিষ্কার করতে পেরেছে। ইভা অরবিন্দের কাছে গান শিখতে থাকে। হোটেলের বাসিন্দাদের মধ্যে এই নিয়ে নানা বক্রোক্তি। সুনীলেরও ভালো লাগলো না ইভার এই আচরণ। একদিন সুনীল ইভাকে নিজের করে নেবার কথা জানালে। কিন্তু ইভা জানালে ব্রহ্মদেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় পথে পাষণ্ডদের হাতে তার দেহের শুচিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুনীলকে সে দেবতাতুল্য মনে করে, বাসি ফুল হয়ে সে দেবতার পুজোয় লাগতে চায় না। পরদিন সকালে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ইভা অরবিন্দের হাত ধরে বেরিয়ে গেল, ফিরলো হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে; অরবিন্দ জানিয়ে দিলে ইভা তার বিবাহিতা স্ত্রী। একান্তে অরবিন্দ ইভাকে গান শিখিয়ে চললো মাসের পর মাস। একদিন ইভা গাইতে গাইতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ডাক্তার এসে জানালে অন্তসত্ত্বা অবস্থায় বেশী পরিশ্রম করার জন্যই ইভা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অরবিন্দের স্বপ্ন বুঝি ভেঙে যায়। ইভা একটু সুস্থ হতেই তার গান রেকর্ড করার জন্য ইভাকে নিয়ে অরবিন্দ কলকাতায় চলে এলো। একখানার পর দ্বিতীয় গানখানি রেকর্ড করা শেষ হওয়ার সঙ্গেই ইভা জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়লো। সে জ্ঞান আর ফিরলো না। অরবিন্দ আবার সেই পাহাড়ে হোটেলে ফিরে এলো। ইভার মৃত্যু-সংবাদে সকলেই অরবিন্দের ওপর ক্ষিপ্ত হলো, সবচেয়ে বেশী হলো ম্যানেজার বিপুল। ভাঙা মন নিয়ে অরবিন্দকে একদিন কার্যব্যপদেশে বাইরে যেতে হলো। যাবার আগে সে গ্রামোফোন কোম্পানীর নামে একখানা চিঠি দিতে বলে গেল বিপুলকে এই কথা জানিয়ে যে, তারা যেন ইভার গানের নেগেটিভ নষ্ট করে ফেলে। অরবিন্দ একটা সাদা কাগজে সই করে বিপুলের হাতে দিয়ে গেল বক্তব্য অংশ লিখে বিপুল যাতে চিঠিখানি পাঠাতে পারে।

* * *

অরবিন্দ ফিরে আসার পর হোটেলে ভূতের উপদ্রব বাড়লো। এবারের ভূত ইভা; রাতে তার গলার গান বাসিন্দাদের ভয়ে বিহ্বল করে তুলতে লাগলো আর অরবিন্দকে করে তুলতে লাগলো পাগল। এক দারুণ বর্ষার রাতে অমনিধারা গান ভেসে উঠলো। গান অনুসরণ করে অরবিন্দ উন্মাদের মতো বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেয়ালে এক নারীমূর্তির ছায়া। উন্মাদগতিতে অরবিন্দ পিয়ানোর ধাক্কায় মাটিতে পড়লো; সঙ্গে সঙ্গেই গুলীর শব্দ। হোটেলের সবাই এসে উপস্থিত হলো অরবিন্দের ঘরে। দেখলে মেঝেতে অরবিন্দের মৃতদেহ আর তার পাশে রিভলবার হাতে সুনীল। পুলিস এসে সুনীলকে ধরে নিয়ে গেল। বিচার হলো, বিচারে ফাঁসির হুকুম হলো। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে এলো সুনীলের দিদি রেবাকে সঙ্গে নিয়ে বিখ্যাত আইনজীবী ভগিনীপতি মণিবাবু। মণিবাবুর পুলিস অফিসার ভাই বিভাসও এলো। ফাঁসির বিরুদ্ধে আপিল করা হলো। সবাই এক-মত সুনীল নির্দোষ। খুনের রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য মণিবাবু সস্ত্রীক হোটেলে এসে উঠলো ছদ্ম পরিচয়ে; বিভাস সাজলো এদের দরোয়ান। তলে তলে বিভাস খুনের সূত্র খুঁজে বের করতে লেগে থাকে। এক রাতে আবিষ্কৃত হলো ভূতের যে ছায়া এতোদিন হোটেলের বাসিন্দাদের আতঙ্কিত করে এসেছে সেটা হচ্ছে ওদেরই একজনের ঘুমিয়ে চলার ছায়া। মণিবাবু বাসিন্দাদের ডেকে ঘুমিয়ে চলার এই রোগটির কথা বুঝিয়ে দিলেন; ভূতের ভয় গেল। বিভাস খুনের তল্লাস চালিয়ে যেতে থাকে। একদিন সে বাসিন্দাদের সকলকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে রাতে একটা বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে ডাকবার কৌশল ফাঁদলে। সবাই এসে একে একে টোকা দিয়ে যায়, আর বিভাস তাদের ইশারা করে সরে থাকতে বলে। শেষে আর একবার টোকা পড়তেই ইভার মার কণ্ঠ থেকে আতঙ্কধ্বনি নিসৃত হলো। এরপর দেখা গেল একটা ঘরে এক রেডিওগ্রামে ইভার গান বাজছে; ইভার মা সেখানে যেতেই বিপুল তাকে লাঞ্ছিত করতে আরম্ভ করে। সেই অবস্থায় সবাই গিয়ে বিপুলকে ধরে ফেললে। বিপুলই আসল খুনী। আদালতে মামলা উঠলো। মণিবাবু দাঁড়ালো সুনীলের পক্ষ থেকে। তার বিবরণ থেকে জানা গেল বিপুল গোড়া থেকেই ইভার প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে। ইভা অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বললে বিপুলের কাছ থেকে ভৎর্সনা লাভ করতে থাকে। বিপুল প্রতি রাতেই ইভার জানলায় গিয়ে টোকা দিত; ইভার মার কাছে তাই সেই টোকার শব্দ পরিচিত। বিপুলের জন্য অতিষ্ঠ হয়ে ইভা অরবিন্দকে বিয়ে করে হঠাৎ। যদিও ভালবাসতো সে সুনীলকেই, কিন্তু তার ও তার মার নিরাপত্তার জন্য অরবিন্দকে বিয়ে করাই সাব্যস্ত করে। বিপুল মনে মনে জ্বলতে থাকে। তারপর ইভা মারা গেলে বিপুল অরবিন্দর ওপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলো। সুযোগ পেয়ে গেল অরবিন্দ গ্রামোফোন কোম্পানীতে চিঠি লেখার ভার তার ওপর ন্যস্ত করে দেওয়াতে। বিপুল সই জাল করে অরবিন্দের নামে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে ইভার গানের রেকর্ড নিয়ে এলো। দেওয়াল খুঁড়ে একটা স্পীকার বসিয়ে রেনওয়াটার-পাইপের মধ্যে দিয়ে ইভার গান অরবিন্দের কানের কাছে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করলে

বিপুল। রোজই রাত্রে অরবিন্দ ইভার কণ্ঠ শুনে উন্মাদের মতো ঘরের বাইরে ছুটে আসে। সেই বৃষ্টির রাতে বিপুল অরবিন্দকে শেষ করার সংকল্প করে। কিন্তু বিপুলকে আর গুলী ছুঁড়তে হয়নি। উন্মাদের মতো চলতে গিয়ে অরবিন্দ পিয়ানোয় ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যায়। বিপুল তখন দোষটা সুনীলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য একটা গুলী ছোঁড়ে যাতে আওয়াজ শুনে সুনীল সেখানে আসে। হলও তাই, এবং বিপুল সেই ফাঁকে হোটেলের লোকজন নিয়ে উপস্থিত হয়ে সুনীলকে খুনী বলে ধরিয়ে দিতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য, সুনীল ছাড়া পেয়ে গেল।

* * *

পুরোমাত্রাতেই ক্রাইম-ড্রামা, কিন্তু খুনের ব্যাপারটা আসে ছবি প্রায় বারো আনা এগিয়ে চলার পর। গোড়ার অংশে হোটেলের বাসিন্দাদের বে-লাগাম পাগলামি, লোকে হেসে তা উপভোগ করে খুবই, কিন্তু মূল গল্পের পক্ষে সেটা বোঝা হয়ে ওঠে। অবশ্য হাল্কা কৌতুকের আবহাওয়াটাই রেখে যাওয়া হয়েছে প্রায় সর্বক্ষণই, এমন কি ফাঁসির হুকুম হবার পর জেলে সুনীলকে দেখতে গিয়েও আইনজীবী মণিবাবু সুনীলের সঙ্গে তার শ্যালক সম্পর্ক ধরে রঙ্গ করতেও বাদ দেয়নি; ধীরভাবে ধরলে এ ব্যাপারও পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। সুনীলের বিচার হলো অরবিন্দকে গুলী করে মেরেছে বলে, কিন্তু পরে মণিবাবু আদালতে ঘটনা যেভাবে বিবৃত করলে তাতে দেখা গেল অরবিন্দ পিয়ানোয় ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েই মারা গেল আর বিপুল এসে রিভলবার থেকে বাইরের দিকে তাক করে যেভাবে গুলী ছুঁড়লে তা অরবিন্দর গায়ে লাগবার মতো নয়। তাহলে কিসের জোর সুনীলের বিরুদ্ধে মামলা চললো? মনে হলো খুনের সব সূত্র যেন বিভাসের জন্যে তুলে রেখে দেওয়া হয়েছিল; সুনীলের বিচারের সময় পুলিস কিছুই খুঁজে বের করতে যায়নি বা খুঁজে দেখা দরকার মনে করেনি। একটা রহস্যের অবশ্য সৃষ্টি হয় বেশ সফলভাবেই; প্রকৃত খুনী কে তা ধারণা করতে দর্শকমনে বেশ একটা ধাঁধারও সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আর সবই হৈ চৈ করে জোড়াতাড়া দিয়ে মেলানো ঘটনা যা কোন পাগলা গারদেই শোভা পায়। হোটেল তো নয়, আস্ত একটা পাগলখানা। এক একজন এক একরকমের পাগল। অন্তত ওদের আচরণ এমনভাবে ছকে দেওয়া যাতে পাগল বলেই সাব্যস্ত করতে হয়। এই দলটির শিল্পিবৃন্দ হচ্ছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী এবং ফাউ হিসেবে অমূল্য সান্যাল। কাজেই পদে পদে হুল্লোড় সৃষ্টি যে হবে তাতে আর বিচিত্র কি! মনে হলো ওদের যেন যার যা ইচ্ছে করতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, ওরা করেছেও তাই; তাতে হাসি ভেসে উঠেছে, কিন্তু ডুবেছে গল্প।

* * *

ইভাকে বিয়ে করার পর অরবিন্দ তাকে গান শেখাতে আরম্ভ করতে 'মণ্টাজে' সময় অতিক্রমণ দেখানো হলো। দেখা গেলো, মাসের পর মাস ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ে চলেছে, কিন্তু ইভার কণ্ঠে গান উঠলো মাত্র দুখানি। আর, অরবিন্দকেও গান-বাজনার একজন মস্ত সাধক-শিল্পীরূপেও দেখা গেল না, অন্তত তার কাছ থেকে যেটুকু গান বা বাজনা শোনা গেল তাতে সেরকম কোন ছাপই পড়ে না। অরবিন্দ রেকর্ড কোম্পানীকে চিঠি পাঠাবার জন্য বিপুলের হাতে সই-করা সাদা কাগজ দিয়ে যাবে কেন?—ওটা তো কৃত্রিম উপায়ে জোড়াতালি দিয়ে বিপুলের একটা সুযোগ করে দেওয়া! আরম্ভের দিকে দেয়ালে ভূতের ছায়া দেখে হারুরূপী নৃপতিকেও বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতে দেখানো হয়েছে, অথচ শেষে আবিষ্কৃত হলো ঐ হারুই ছিল ভূত, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটতো। এ আর এক জোড়াতালি। টোকার শব্দ যাচাই করার জন্য বিভাস সকলকে রাত্রে উপরের ঘরে টোকা মারার একটা ব্যবস্থা করলে। তারিণীকে লোভ দেখালে বিলিতি মদের এই বলে যে দরজায় টোকা দিয়ে ইশারা করলে বিভাস মালটি চুরি করে তার হাতে এনে দেবে। তারিণীর না হয় মদের ওপর আকর্ষণ ছিলো, কিন্তু বাকি কজনকে বিভাস কিসের লোভে আকর্ষণ করলে? এও গোঁজামিল, অথচ ব্যাপারটা এমনি কৌতুকজনক করে সাজানো যে, হাসির তোড়ে যুক্তির কথা তলিয়ে যায়। খুনের রহস্য উদ্ঘাটন অংশের বিন্যাসে ফ্ল্যাস-ব্যাকের সাহায্যে ঘটনার আবরণ উন্মোচনে পরিচালক একটা বৈচিত্র্য এনেছেন। লোকের কৌতূহলকে বেশ জাগিয়ে রেখে দেয় এই অংশটি। কাহিনীটি রচনা করেছেন কমল মজুমদার।

* * *

পাগলদের দলই সারা কাহিনীতে পরিব্যাপ্ত। ওদেরই একজন অরবিন্দেরও চরিত্র বিচিত্র প্রকৃতির; বসন্ত চৌধুরী অভিনয় করেছেন চরিত্রটিতে, কিন্তু তেমন খাপ খায়নি তাকে। খুনী বিপুলের চরিত্রে গুরুদাসও ঐ রকম ভূমিকার জন্য নন। রবীন মজুমদারের সুনীল দলের মধ্যে একা ধীর ব্যক্তি হয়ে পাত্তা পায়নি। পরিচালক সুশীল মজুমদার নিজে অবতরণ করেছেন আইনজীবী মণিবাবুর চরিত্রে। গোড়া থেকেই হাবেভাবে তিনি সুনীলকে যে ছাড়িয়ে আনতে পারবেনই তারই প্রত্যয় জন্মিয়ে দেন। আদালতে তার ভাষণ জমে, দীর্ঘ ভাষণ কিন্তু অসার। স্ত্রী চরিত্রে ইভার ভূমিকায় গীতা সিং নিগৃহীতা শান্ত একটি মেয়ের চরিত্র ফুটিয়েছেন। অনুভা গুপ্তা সেজেছেন সুনীলের দিদির চরিত্রে; ভূমিকালিপির আকর্ষণ বাড়ানো ছাড়া তাঁর কোন কাজ নেই। ইভার মায়ের চরিত্রে শোভা সেনকে অন্ধ দেখাতে চোখের কোলে কালো কালি মাখিয়ে দেওয়ার হেতু?

* * * *

ক্যামেরার কাজ করেছেন শচীন দাশগুপ্ত। অধিকাংশই নৈশ দৃশ্য। রহস্যজনক ভৌতিক পরিবেশ তিনি ফুটিয়েছেন কিন্তু দিনের দৃশ্যের সঙ্গে রাতের দৃশ্যে আলোর পার্থক্য রাখেন নি। শব্দ গ্রহণ করেছেন পরিতোষ বসু; এমনি কাজ স্পষ্ট কিন্তু বহির্দৃশ্যাংশে শিল্পীদের দিয়ে অতি বেশী রকমভাবে চেঁচিয়ে কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনিতেও আবহ সঙ্গীত এমন উৎকট উচ্চমাত্রায় রাখা হয়েছে যে আগাগোড়া বিরক্তিরই উৎপাদন করে এসেছে। গানের সুর চলনসই। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক। সম্পাদনা করেছেন অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতা ময়দানের বুকে আবার ফুটবল এসেছে তার নিজস্ব উন্মাদনা নিয়ে। অবশ্য ময়দানের আবহাওয়া এখনো ফুটবলের উন্মাদনায় সরগরম হয়ে ওঠেনি। তবুও জনপ্রিয় দলগুলির খেলা দেখবার জন্য প্রথম থেকেই যেমন দর্শক সমাগম হতে আরম্ভ হয়েছে, তাতে ফুটবল মরসুম জমে উঠতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে না। ফুটবল বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। ছেলে-বুড়ো-যুবকের প্রাণ মাতানো মন মাতানো খেলা। বাঙলা দেশে আজ আর এমন একটিও গন্ডগ্রাম নেই, যেখানে ফুটবল খেলা যুবক-মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। কলকাতা ময়দানের ফুটবলকে নিয়ে প্রতি বছর কত আলাপ আলোচনা, গুজব গবেষণা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তার স্থিরতা নেই। প্রিয় দলের সাফল্যের প্রশ্ন নিয়ে খেলার মাঠে, মাঠের বাইরে এমন কি অন্দর মহলেও আলোচনা চলতে থাকে। মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গলের হারজিত নিয়ে সমবয়সী অফিস বন্ধুদের মধ্যে রসালাপ এবং হাসি-ঠাট্টার অন্ত থাকে না। হাসতে হাসতে মাথা ব্যথার সংবাদও বিরল নয়। বস্তুত পাঁচ মাস কালীন ফুটবল মরসুম বাঙলার খেলাপ্রিয় নাগরিক মনে যতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করে, যতখানি দোলা লাগায়, অন্য কোন খেলা-ধুলোই ক্রীড়া রসিকদের মধ্যে ততখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে না মনে ততখানি দোলা লাগাতে পারে না। বিকেলের খেলার খবর লোকের মুখে মুখে এবং রেডিও মারফত সব যায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, তাছাড়া খবর জানবার জন্য সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন এবং ট্রাঙ্ক টেলিফোনও কম হয় না, তবুও খেলার বিষদ বিবরণ জানবার জন্য সকলের উগ্র আগ্রহ। ফুটবল মরসুমে সংবাদপত্র হাতে পেয়ে অনেক পাঠকই জমকালো রাজনৈতিক খবর বাদ দিয়ে প্রথম চোখ বুলোতে থাকেন খেলার পাতার উপর। এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ফুটবল খেলা আমাদের এই বাঙলা দেশে। বাঙলা তথা ভারতীয় ফুটবলের ক্রীড়াতীর্থ কলকাতা ময়দানে সেই ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে গত ১০ই মে থেকে।

* * *

বহু রকমের লীগ এবং নক-আউট প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম ডিভিসন লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড খেলারই আকর্ষণ বেশী। অপরাপর ছোটবড় লীগ এবং নক-আউট—এ দুইয়ের আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতা। এ বছর প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ক্যালকাটা সার্ভিস টীমের দ্বিতীয় ডিভিসনে অবতরণ। এদেশে ফুটবলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সার্ভিস ফুটবলের আবির্ভাব এবং সামরিক ফুটবলের শৌর্য-বীর্যের বহু কাহিনী ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে। অবশ্য এ ইতিহাস ব্রিটীশ পল্টন বাহিনীর ফুটবল খেলার ইতিহাস। ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর ব্রিটীশ সামরিক বাহিনীর উত্তরসাধক হিসাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রথম ডিভিসন লীগে খেলবার সুযোগ পায়। লীগের সূচনা থেকেই নিয়ম ছিল কোন অবস্থাতেই মিলিটারী টীম

দুই হাজার উইকেট লাভের অধিকারী ওয়ারউইক শায়ারের প্রবীণ লেগ ব্রেক বোলার এরিক হোলিস

ডিভিসনচ্যুত হবে না। অর্থাৎ প্রথম ডিভিসন লীগে সবচেয়ে নীচে স্থান পেলেও সামরিক ফুটবল টীম নামবে না দ্বিতীয় ডিভিসনে। এতদিনও এ নিয়ম বলবৎ ছিল, কিন্তু গত বছর এ নিয়মের সংশোধন করে সামরিক টীমের বিশেষ অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। অবশ্য নিয়মতন্ত্রের সংশোধন বিধিসম্মত হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে এবং নিয়মতন্ত্র-অভিজ্ঞ মহলের অভিমত সামরিক টীমের বিশেষ অধিকার হরণের প্রস্তাব নিয়মতন্ত্রসম্মতভাবে পাশ করা হয়নি। যাই হোক গতবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামরিক ফুটবল দল দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলবার বিধানে পড়েছে; সেই সঙ্গে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমেছে ভবানীপুর ক্লাব। এ বছর দুটি টীমের দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার এবং দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে একটি টীমের প্রথম ডিভিসনে উঠবার কথা ছিল। দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন অরোরা ক্লাব তাই প্রথম ডিভিসনে খেলবার সুযোগ পেয়েছে। ক্যালকাটা সার্ভিস টীম দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি। অভিমানক্ষুব্ধ সামরিক দল লীগে খেলবে না বলে শোনা যাচ্ছে। সার্ভিস টীম যদি লীগে অংশ গ্রহণ না করে, তবে আর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

* * *

প্রথম ডিভিসন লীগের শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল এবং রাজস্থান ক্লাবকে ইতিমধ্যেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকেও হারাতে হয়েছে একটি পয়েন্ট। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব এবং লীগ রানার্স উয়াড়ী ক্লাব এখনো কোন পয়েন্ট হারায়নি। বিভিন্ন দলের শক্তি এবং খেলার ধারা সম্পর্কে এসপ্তাহে কিছু আলোচনা না করাই শ্রেয় মনে করছি। আগামী সপ্তাহে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইল। এসপ্তাহে কলকাতা ফুটবল লীগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আশা করি।

লীগের ইতিহাস

ভারতে ফুটবল খেলার আরম্ভকাল আর ক্যালকাটা ফুটবল লীগের জন্মের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান নেই। ১৮৯৩ সালে ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের জন্মের পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের সূত্রপাত। তার আগে আই এফ এ শীল্ড, ট্রেডস কাপ, ইলিয়ট শীল্ড প্রভৃতি নক-আউট প্রতিযোগিতার মধ্যে কলকাতার ফুটবল খেলা সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য ট্রেডস কাপের জন্ম আই এফ এ সৃষ্টিরও আগে।

লীগ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য

পরস্পর ক্লাবের মধ্যে বেশীবার প্রতিযোগিতামূলক খেলার সুযোগদান এবং ফুটবল খেলার উন্নতি এবং প্রসারের জন্যই লীগ খেলার প্রবর্তন। এতে করে বিভিন্ন ক্লাবের বেশী ম্যাচ খেলার ক্রমবর্ধিত চাহিদাও মিটবে আবার ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে—এদিকে দৃষ্টি রেখেই সেকালের খেলাধুলো পরিচালকেরা লীগ খেলার প্রবর্তন করেন।

পরিচালনা ও প্রসার

দেশ শাসনের মত ফুটবল শাসনেও সাহেবদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। যাদের দৌলতে এ দেশে ফুটবলের আমদানি, তারা সহজে কর্তৃত্ব ছাড়তেও নারাজ। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে ফুটবলের প্রথম যুগে ভারতীয় ক্লাবের সংখ্যাও নগণ্য ছিল।

এদেশে ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হতেও সময় লাগে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলের পরিচালনাভার ধাপে ধাপে সাহেবদের হাত থেকে ভারতীয়ের হাতে এসেছে। প্রথম অবস্থায় ক্যালকাটা ফুটবল লীগে ভারতীয় দলের প্রবেশাধিকার ছিল না। পাঁচটি ইউরোপীয়ান ক্লাব—ডালহৌসী, ক্যালকাটা, রেঞ্জার্স, হাওড়া ইউনাইটেড (তখনকার একটি ইউরোপীয়ান ক্লাব) ও ওয়াই এম সি এ এবং তিনটি সামরিক ফুটবল দল গ্লস্টারস, ৪৮ কোম্পানী এফ বি আর এ ও রয়্যাল ওয়েস্ট কেণ্ট এই ৮টি ক্লাবকে নিয়ে ১৮৯৮ সালে প্রথমবারের লীগ খেলা পরিচালনা করা হয়। বলা বাহুল্য পাঁচটি ইউরোপীয়ান ক্লাবের কর্মকর্তারাই ছিলেন লীগের প্রবর্তক। লীগ বিজয়ীর উপহার ছিল মেসার্স ওয়াল্টার লক এণ্ড কোম্পানী প্রদত্ত কারুকার্যখচিত একটি সুদৃশ্য কাপ। এই কাপটি আজও লীগ বিজয়ীর পুরস্কার। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর এইভাবে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা চলবার পর প্রয়োজনের তাগিদে ১৯০৪ সাল থেকে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের খেলা আরম্ভ হয়। গ্রামোফোন কোম্পানী দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ বিজয়ীর পুরস্কারটি দান করেন। ভারতীয় দলগুলি কিন্তু সাহেবদের ফুটবল সমাজে এখনো অপাংক্তেয়। তারা পেল না লীগে যোগদানের অধিকার। ইউরোপীয়ান এবং গোরা দলের সমন্বয়েই আরম্ভ হল দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের খেলা।

ভারতীয় দলের যোগদান

তারপর এলো ১৯১১ সাল। ঐতিহাসিক ১৯১১ সাল। লীগ বহির্ভূত ভারতীয় দল—মোহনবাগান ক্লাব দুর্ধর্ষ গোরা ফুটবল দল ইস্টইয়র্ককে হারিয়ে লাভ করলো আই এফ এ শীল্ড। অবশ্য তখনকার মোহনবাগান ক্লাবকে ভারতীয় দল না বলে বাঙ্গালী দল বলাই উচিত। যাই হোক মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ শীল্ড লাভ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করলো। তাদের জয়গাথা এখানকার সাহেবদের কান ছাপিয়ে সাগরপারের সাহেবদের কানে গিয়ে পৌঁছল। রচিত হল ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণ যুগের প্রথম সোপান। এদিকে মোহনবাগানের বিজয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ভারতীয় ক্লাবও ফুটবল খেলায় মেতে উঠলো। এরিয়ান, শোভাবাজার, কুমারটুলী, টাউন, গ্রীয়ার, জোড়াবাগান, তাজহাট প্রভৃতি ক্লাব এই সময়ে বেশ শক্তিশালী। সবাই চাইছে ফুটবলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে। ভারতীয় দলকে আর দাবিয়ে রাখা চলে না। ১৯১৪ সালে মোহনবাগান ক্লাবের জন্য দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের দ্বার উন্মুক্ত হল। এরিয়ান ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেল পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৫ সালে।

প্রথম ডিভিসনে মোহনবাগান

১৯১৪ সালে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে খেলবার প্রথম সুযোগেই মোহনবাগান ক্লাব লাভ করলো রানার্সের পুরস্কার। অবশ্য মোহনবাগান ক্লাব একা এই সম্মান লাভ করেনি। মেসারার্স ক্লাবও দ্বিতীয় স্থান লাভ করায় মোহনবাগান ও মেসারার্স যুগ্মভাবে লীগ রানার্স হয়। চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে গোরা দল ৯১ হাইল্যাণ্ডার্সের "বি" টীম। কিন্তু হাইল্যাণ্ডার্সের "এ" টীম প্রথম ডিভিসন লীগের অন্তর্ভুক্ত থাকায় আইন মতে "বি" টীম প্রথম ডিভিসনে খেলতে পারে না। সুতরাং যুগ্ম রানার্স মোহনবাগান ও

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন রকি মার্সিয়ানো

মেসারার্সের মধ্যে কোন্ টীম প্রথম ডিভিসনে উঠবে, তা নিয়ে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। দুই দলের মধ্যে পুনরায় খেলার ব্যবস্থা হল। প্রথম দিনের খেলা অমীমাংসিত থাকবার পর দ্বিতীয় দিন মেসারার্স ক্লাব ২—১ গোলে বিজয়ী হয়ে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হল। মোহনবাগান ক্লাবও দ্বিতীয় ডিভিসনে পড়ে রইল না। ৬২ কোম্পানী আর জি এ প্রথম ডিভিসন থেকে সরে যাওয়ায় লীগ কমিটি মোহনবাগান ক্লাবকেও প্রথম ডিভিসনে খেলবার সুযোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম হলো দুইটির বেশী ভারতীয় দলের প্রথম ডিভিসনে খেলবার অধিকার থাকবে না। এ নিয়মে সবচেয়ে যারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল, তারা হচ্ছে কুমারটুলী ক্লাব। একবার নয়, দুবার নয়, ১৯১৭ সাল থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত পর পর তিনবার প্রথম ডি[illegible] উঠবার অধিকার অর্জন করেও [illegible] ডিভিসনে পড়ে রইলো সে কালের [illegible] কুমারটুলী ক্লাব। ১৯১৭ সালে কু[illegible] সঙ্গে গ্রীয়ার এবং টাউন ক্লাবও [illegible] ডিভিসনে খেলবার সুযোগ পায়। শোভা[illegible] ক্লাব এদের দু বছর আগে থেকেই দ্বিতী[য়] ডিভিসনে খেলছিলো। ক্রমে তাজহাট ক্লাব[ও] দ্বিতীয় ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্[তু] ১৯২১ সালে তাজহাট ক্লাবের বিলোপসাধনে[র] সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পূর্ণ ক[রে] তাজহাটের শূন্য স্থান।

প্রথম ডিভিসনে ইস্টবেঙ্গল ও লীগের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

১৯২৪ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পুলিস ক্লাব এবছর লাভ করেছিল চ্যাম্পিয়নশিপ। কিন্তু নিজেদের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে পুলিস প্রথম ডিভিসনে উঠতে রাজি হয় না। রানার্স-আপ ক্যামেরনের "বি" টীমও আইনঘটিত কারণে প্রথম ডিভিসনে উঠবার অনধিকারী। কারণ ক্যামেরনের "এ" টীম আগে থেকেই রয়েছে সিনিয়র ডিভিসনে। সুতরাং তৃতীয় স্থানে অধিকারী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম ডিভিসনে খেলবার দাবী জানায়। কিন্তু আইনের বাধা। মাত্র দুটি টীম সিনিয়র ডিভিসনে খেলবার অধিকারী। আরম্ভ হল আন্দোলন। প্রবল আন্দোলনের ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম ডিভিসনে নিজেদের স্থান করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে লীগের নিয়মকানুনেরও রদবদল হল। মাত্র দুটি ভারতীয় টীম প্রথম ডিভিসনে খেলবার সুযোগ পাবে লীগ থেকে এ নিয়ম উঠে গেল। অবশ্য এ আইন যাতে পাশ না হয়, তার জন্য গোঁড়া ইউরোপীয় মহল থেকে কম চেষ্টা হয়নি। এই আইনের রদবদলের জন্য তখনকার লীগ কমিটির সম্পাদক মিঃ এইচ ই মেডলীকট সম্পাদকের কার্যভারও ত্যাগ করেছিলেন। যাই হোক ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম ডিভিসনে ৪ বছর খেলে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যায়। ১৯৩২ সালে তারা আবার প্রথম ডিভিসনে উঠে রানার্স হয়। ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন ডারহামস দলের মাত্র এক পয়েণ্টের ব্যবধান থাকে।

ভারতীয় দলের প্রাধান্য

ইউরোপীয়ান টীমগুলির অস্তমান প্রতিভার মধ্যে ভারতীয় টীমগুলি ধীরে ধীরে প্রথম ডিভিসনে উঠতে থাকে। ১৯২৯ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ১৯৩১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন, ১৯৩৩ সালে কালীঘাট ক্লাব, ১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৩৭ সালে ভবানীপুর ক্লাব, ১৯৪৭ সালে জর্জ টেলিগ্রাফ, ১৯৪৮ সালে রাজস্থান ক্লাব, ১৯৫০ সালে বি এন আর স্পোর্টস ক্লাব

যুব উৎসব ওয়াটারপোলো খেলার বিজয়ী স্টেট ট্রান্সপোর্ট ওয়াটারপোলো টীম

এবং ১৯৫৩ সালে খিদিরপুর ক্লাব প্রথম ডিভিসনে খেলবার সুযোগ পায়। এবার প্রথম ডিভিসনে খেলবার সুযোগ পেয়েছে অরোরা ক্লাব। কালীঘাট ক্লাবের প্রথম ডিভিসনে উঠবার ইতিহাস সত্যই বিস্ময়-জনক। ১৯৩১ সালে তারা তৃতীয় ডিভিসনে প্রথম খেলতে আরম্ভ করেই লাভ করে চ্যাম্পিয়নশিপ। পরের বছর হয় দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন। তার পরের বছর তাদের প্রথম ডিভিসনে আগমন।

তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিসন

ক্লাব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রয়োজনের তাগিদে ১৯২৮ সাল থেকে তৃতীয় ডিভিসন এবং ১৯৩৩ সাল থেকে চতুর্থ ডিভিসন ফুটবল লীগের প্রবর্তন করা হয়। তৃতীয় ডিভিসনের বিজয়ীর পুরস্কার মিত্র মেমোরিয়াল কাপ এবং চতুর্থ ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন লাভ করে রাধানাথ মেমোরিয়াল কাপ। কলকাতা ফুটবল লীগের চারটি ডিভিসন ছাড়া ময়দানে আরও বহু রকমের লীগ খেলার ব্যবস্থা আছে। যেমন বেঙ্গল সকার লীগ, এলেন লীগ, পাওয়ার মেমোরিয়াল লীগ, আন্তঃ কলেজ লীগ, আন্তঃ স্কুল লীগ, আন্তঃ অফিস লীগ ইত্যাদি। এই সমস্ত লীগের খেলা আই এফ এ কর্তৃক পরিচালিত না হলেও পরিচালনার জন্য আই এফ এর অনুমোদন প্রয়োজন।

লীগ খেলার পরিচালনা

আই এফ এ গভর্নিং বডির কয়েকজন সদস্য নিয়ে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ কমিটি গঠিত হয়। আই এফ এর কর্তৃত্বাধীনে এই সি এফ এল কমিটি লীগ প্রতিযোগিতার পরিচালনা ও তদারক করে থাকে। খুঁটিনাটি এবং বিতর্কমূলক বিষয়ের মীমাংসা লীগ কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত, কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আই এফ এর কাছে আপত্তি জানাবার অধিকার সকল ক্লাবেরই আছে।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রথম অবস্থায় লীগ খেলা পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন-রূপ। আই এফ এর সংস্রবমুক্ত না হলেও তখন লীগ কমিটির পৃথক সত্ত্বা ছিল। প্রতি ক্লাবের একজন করে সদস্য এবং সর্বোপরি একজন সাধারণ সম্পাদক নিয়ে গঠিত কমিটির উপর ছিল লীগ খেলা পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব।

খেলার নিয়ম

লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভের সময়ই ঠিক হয় প্রতি ক্লাবের সঙ্গে প্রতি ক্লাবকে দুটি করে ম্যাচ খেলতে হবে। বিজয়ী ক্লাব লাভ করবে ২ পয়েন্ট, আর খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হলে প্রতি ক্লাব একটি করে পয়েন্ট পাবে। এইভাবে খেলে শেষ পর্যন্ত যে দল বেশী পয়েন্ট লাভ করবে, তারাই হবে চ্যাম্পিয়ন অর্থাৎ লীগ বিজয়ী। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় ডিভিসন লীগেও পাল্টা খেলার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ প্রতি ক্লাবকে প্রতি ক্লাবের সঙ্গে দুটি করে ম্যাচ খেলতে হত। মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে এব্যবস্থা উঠে যায়। এখন মাত্র প্রথম ডিভিসনেই দুটি করে ম্যাচ খেলার নিয়ম আছে। যুদ্ধের মাঝে কয়েক বছর লীগে উঠানামাও বন্ধ ছিল। এবারও উঠানামা বন্ধের জন্য কতিপয় সদস্য কর্মমুখর হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাদের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। এবছর প্রথম ডিভিসন লীগে ১৪টি ক্লাব এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ডিভিসনে ১৩টি করে ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

খেলাধুলার খবরাখবর

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব প্রাধান্যের লড়াই—হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রকি মার্সিয়ানো সানফ্রান্সিসকোর কেজার স্টেডিয়ামে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে ব্রিটেনের মুষ্টিযোদ্ধা ডন ককেলকে হারিয়ে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই মুষ্টিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকায় অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল। ব্রিটেনের আশা ছিল তার কৃতী মুষ্টিক ককেল মার্সিয়ানোকে পরাজিত করতে পারবেন। কারণ ককেলের দেহের ওজন মার্সিয়ানোর চেয়ে ১৬ পাউন্ড বেশী। কিন্তু ককেলকে হার স্বীকার করতে হয় আমেরিকার বিশ্বজয়ী মুষ্টিক মার্সিয়ানোর কাছে। মার্সিয়ানোর মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত ককেল কাহিল হয়ে পড়ায় রেফারী ১৫ রাউন্ডব্যাপী লড়াই নবম রাউন্ডে বন্ধ করে দেন।

ডেভিস কাপ—গত সপ্তাহে বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে ডেভিস কাপের অনেকগুলি খেলার ফলাফল মীমাংসিত হয়েছে। কাইরোতে ভারত ৫—০ খেলায় মিশরকে পরাজিত করেছে। সুইজারল্যান্ডকে তার নিজের দেশে সুইডেনের কাছে সব কয়টি খেলায় খেলায় হার স্বীকার করতে হয়। প্রাগে বেলজিয়াম পরাজিত করেছে চেকো-শ্লোভেকিয়াকে ৫—০ খেলায়। প্যারিসে ৩—২ খেলায় ফ্রান্স হারিয়েছে আর্জেন্টিনাকে। চিলি বুদাপেস্টে হাঙ্গেরীকে ৩—২ খেলায় পরাজিত করে। ব্রিটেন অস্ট্রিয়াকে ৪—১ খেলায় পরাজিত করে। ভিয়েনায় খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। কোপেনহেগেনে ডেনমার্ক ৩—২ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করতে কোনই বেগ পায়নি। মিউনিকে ইটালী জার্মানীর বিরুদ্ধে এগিয়ে আছে ৩—০ খেলায়। সুতরাং তারা জয়ী হয়েছে।

ডেভিস কাপের ইউরোপীয় অঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইন্যালে যে দেশকে যার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তার তালিকা দেওয়া হলঃ—

ব্রিটেন	ঃ	ভারত
ইটালী	ঃ	ডেনমার্ক
ফ্রান্স	ঃ	সুইডেন
চিলি	ঃ	বেলজিয়াম

আন্তর্জাতিক ফুটবল—প্যারিসের কলম্বো স্টেডিয়ামে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আন্ত-র্জাতিক ফুটবল খেলায় ফ্রান্স ১—০ গোলে ইংলন্ডকে পরাজিত করে।

বেলগ্রেডে অলিম্পিক ফুটবল রানার্স যুগোশ্লাভিয়া ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে আর এক

আশ্বতোষ কলেজের নৌচালকরা আন্তঃ কলেজ নক আউট নৌকো বাইচের ফাইন্যালে প্রথম স্থান অধিকার করছেন

আন্তর্জাতিক ফ্বটবল খেলা ২—২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

এশিয়ান ভলিবল—টোকিওতে অন্বষ্ঠিত এশিয়ান ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। ভারতীয় দল প্রথম দিন জাপানকে ১৬—১৪, ১৫—১১, ৫—১৫ ও ১৫—৭ পয়েণ্ট পরাজিত করে। দ্বিতীয় দিন জাপানকে পরাজিত করে ১৫—৬, ১৫—৮, ৭—১৫, ১০—১৫ ও ১৫—৩ পয়েণ্ট। জাপানের সঙ্গে ভারতের তৃতীয় খেলার আগেই এই সংবাদ পরিবেশন করতে হচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় খেলার হার-জিতের উপর ভারতের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কোন প্রশ্ন নেই। পর পর দ্বটি খেলায় জয়লাভ করেই ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। ভলিবল খেলায় ভারত কতখানি উন্নতি করেছে ইতিপ্বর্বে রুশ-ভারত ভলিবল টেস্টে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে ভারতীয় ভলিবল খেলোয়াড়েরা প্বনরায় তাঁদের ক্রীড়া-প্রতিভার পরিচয় ছিল। এশিয়ান ভলিবলে ভারতের যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাঁদের নাম ঃ সত গ্বর্বদয়াল, মদনলাল, তিলকরাজ ও অভিনাশ (পাঞ্জাব), গ্বর্বদেব সিং, মোহনলাল, বাওয়া, যশোবন্ত সিং ও কুলদীপ চোপরা (দিল্লী), যোগীন্দার সিং (উত্তর প্রদেশ), হরনেক সিং (পেপস্ব) ও দিলীপ মণ্ডল (বাঙলা)। উত্তর প্রদেশের কৃতী খেলোয়াড় প্র্যাক্টিস ম্যাচে আহত হওয়ায় দলের সঙ্গে টোকিও যেতে পারেননি।

হোলিসের দ্বই হাজার উইকেট—ওয়ার উইকশায়ারের প্রবীণ 'লেগব্রেক' বোলার এরিক হোলিস গত সপ্তাহে দ্বই হাজার উইকেট প্র্ণ করেছেন। ইতিপ্বর্বে ওয়ার উইকশায়ারের কোন খেলোয়াড় এই কৃতিত্ব লাভ করতে পারেননি।

ওয়াটারপোলো—য্বব উৎসব ওয়াটার-পোলো খেলার ফাইনালে স্টেট ট্রান্সপোর্ট ওয়াটারপোলো টীম ৫—৪ গোলে বৌবাজার ব্যায়াম সমিতিকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। কয়েকজন কৃতী সাঁতার্ব এবং ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় রাজ্যের পরিবহন বিভাগে চাকরি পাবার ফলে ট্রান্সপোর্ট বিভাগ জলক্রীড়ায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে, অবশ্য অন্যান্য খেলাধ্বলায়ও এঁদের আগ্রহ কম নয়। আজাদ হিন্দ বাগের প্বকুরে ফাইনাল খেলা অন্বষ্ঠিত হয়।

নৌকো বাইচ—ঢাকুরিয়া লেকে আন্তঃ কলেজ নক আউট নৌকো বাইচের ফাইনালে আশ্বতোষ কলেজ ৩ লেংথে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। আশ্বতোষ কলেজের নৌকো বাইচ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ৩ মিনিট ৫৪½ সেকেণ্ডে দ্বরত্ব অতিক্রম করে।

ফ্বটবল লীগ—গত সপ্তাহে প্রথ ডিভিশন ফ্বটবল লীগের যে সমস্ত খেল অন্বষ্ঠিত হয়েছে, তার ফলাফল দেওয়া হল

১০ই মে '৫৫'

উয়াড়ী (১) বি এন আর (০
খিদিরপ্বর (০) রেলওয়ে স্পোর্টস (০

১১ই মে '৫৫'

কালীঘাট (২) স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০
রাজস্থান (৩) জর্জ টেলিগ্রাফ (০

১২ই মে '৫৫'

মোহনবাগান (৭) প্বলিস (১
ইস্টবেঙ্গল (১) রেলওয়ে স্পোর্টস (০
এরিয়ান (০) বি এন আর (০

১৩ই মে '৫৫'

উয়াড়ী (১) অরোরা (০

১৪ই মে '৫৫'

মোহনবাগান (১) খিদিরপ্বর (০
কালীঘাট (১) ইস্টবেঙ্গল (০
মহঃ স্পোর্টিং (০) স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০

১৬ই মে '৫৫'

উয়াড়ী (১) রাজস্থান (০
বি এন আর (২) কালীঘাট (০
এরিয়ান (০) রেলওয়ে স্পোর্টস (০

১৭ই মে '৫৫'

ইস্টবেঙ্গল (২) অরোরা (১
মোহনবাগান (১) জর্জ টেলিগ্রাফ (০
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১) প্বলিস (০

দশী সংবাদ

৯ই মে—অদ্য বহরমপুরে (উড়িষ্যা) খিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক ধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন দেবর য়ার্কিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য নুর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলে হা বিনা বাধায় গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে গায়ালপাড়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর নিন্দা রা হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দ্ব্যর্থহীন াষায় ঘোষণা করেন যে, ভারত অপর াহারও যুদ্ধে নিজকে জড়াইবে না।

শনিবার জম্মুর নিকট নেকোয়াল গ্রামে কন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থার একদল ভারতীয় কর্মীর পর পাক সীমান্ত পুলিসের গুলীবর্ষণের বরুদ্ধে ভারত সরকার পাক সরকারের নিকট ীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এই গুলী- র্ষণের ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনৈক াফিসার ও পাঁচজন সৈন্য সহ ১২ জন লোক নহত হইয়াছে।

১০ই মে—বহরমপুরে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস মিটির দুইদিনব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত য়। অদ্যকার অধিবেশনে দ্বিতীয় পঞ্চ- ার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী ী নেহরুর প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক স্তাবে নব ভারত রূপায়নে কংগ্রেসকে কলুষ ুক্ত করার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি াবেদন জানানো হয়।

কলিকাতায় কলেরা রোগ মহামারী াকারে দেখা দিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা ইয়াছে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অন্যতম সদস্য র্দার কে এম পানিক্কর অদ্য গৌহাটীতে বলেন য, ভারতের বিভিন্ন অংশে যে প্রাদেশিকতা াথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তাহা দমন করা না ইলে ভারতের ঐক্য বিপন্ন হইবে।

১১ই মে—কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের পমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ ভারত সরকারের নকট একটি বিবরণ দাখিল করিয়া পূর্ববঙ্গের হন্দুদের সাম্প্রতিক বাস্তুত্যাগের হেতু নির্ণয় রিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধের ভাবই বাস্তুত্যাগের কারণ।

অদ্য গৌহাটীতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গায়ালপাড়া জেলার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ারণ ও কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পর্কে আসাম দেশ কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিগণের সহিত ুই ঘণ্টা ১৫ মিনিটকাল আলোচনা করেন। ত্র ২০ বৎসরের মধ্যে গোয়ালপাড়ায় বাঙ্গলা াষী জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইবার এবং াঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় ইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইবার কারণ ম্পর্কে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণকে কয়েকটি ঠিন প্রশ্ন করা হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১২ই মে—পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী জি ডি খোসলা অদ্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রী এস এ বেঙ্কটরমণের মামলার রায় দেন। দুর্নীতি ও ঘুষ লওয়ার অভিযোগে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে শ্রীবেঙ্কটরমণের পক্ষ হইতে যে আপীল করা হইয়াছিল বিচারপতি তাহা নাকচ করিয়া দেন এবং স্পেশ্যাল জজ প্রদত্ত ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে জাতীয় যাদুঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে, জাতির জীবনে যাদুঘরসমূহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনা কমিশন ৬,৫০০ কোটি টাকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে কৃষি কর্মে নিযুক্ত নহে, এইরূপ ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্মের সংস্থান করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

১৩ই মে—অদ্য সিমলায় কলম্বো পরি- কল্পনা পরামর্শদাতা কমিটির দশটি এশীয় দেশের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সুপারিশ গৃহীত হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত সাহায্য সহ অতিরিক্ত সাহায্যের সমস্তই পূর্বের ন্যায় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে চলিতে থাকিবে।

১৪ই মে—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী তাঁহার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেঃ জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সহ অদ্য সকালে নয়াদিল্লীর পালাম বিমান ঘাটিতে পেীছিলে প্রধান মন্ত্রী নেহরু সহ ভারত সরকারের পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এইদিন নয়াদিল্লীতে কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা কল্পে ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটকাল স্থায়ী পাক-ভারত আলাপ- আলোচনার সূত্রপাত হয়।

ভারতের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ কলিকাতায় নূতন টেলিফোন ভবনে নগরীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কর্মব্যস্ত অঞ্চলের 'ব্যাঙ্ক' ও 'সিটি' টেলিফোন এক্সচেঞ্জের স্থলে যথাক্রমে নূতন স্বয়ংক্রিয় '২২' ও '২৩' নং এক্সচেঞ্জের উদ্বোধন করেন।

কলিকাতায় কলেরা আরম্ভ হওয়ায় কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার শহরের হোটেল ও অন্যান্য ভোজনাগারের মালিকগণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন কাহাকেও বরফ দেওয়া খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় পরিবেষণ না করেন।

১৫ই মে—জেনারেল এস এম শ্রীনাগেশ অদ্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষরূপে জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজীর নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

গৌহাটীর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য প্রাতে একদল দুর্বৃত্ত শহরের উপকণ্ঠবর্তী শান্তি- পুরে সাড়ে চারি শতাধিক আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পোড়াইয়া দেয়।

বিদেশী সংবাদ

১০ই মে—পাকিস্থান ফেডারেল কোর্ট এই রায় দিয়াছেন যে, গত ২৪শে অক্টোবর গভর্নর জেনারেল পাকিস্থান গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা বৈধ।

পশ্চিমী বৃহৎ ত্রিশক্তির দূতাবাসসমূহ হইতে অদ্য রাশিয়ার নিকট এক আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করিয়া চতুঃশক্তির রাষ্ট্র প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের এক বৈঠকে যোগদানের অনুরোধ জানানো হয়।

১১ই মে—সোভিয়েট রাশিয়া অদ্য একটি নূতন নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছে। আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করিবার জন্য সরেজমিনে তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠনের কথা এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত হইয়াছে।

সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন আজ ওয়ারস-তে কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীভুক্ত আটটি দেশের এক সম্মেলনে বলেন যে, চতুঃশক্তি সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়া পাশ্চাত্ত্য ত্রিশক্তি গতকাল যে পত্র দিয়াছেন, রাশিয়া তাহা বিশেষ যত্নের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

১৩ই মে—সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী তাস ঘোষণা করিয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অপর সাতটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ওয়ারস বৈঠকে তাহাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য সম্মিলিত হাইকম্যাণ্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

১৪ই মে—আজ ওয়ারস-তে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সাতটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মার্শাল আইভান কনিয়েফ অষ্টশক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

১৫ই মে—সতের বৎসর বৈদেশিক দখলে থাকার পর অস্ট্রিয়াকে পুনরায় স্বাধীনতা দান করিয়া ভিয়েনায় বৃহৎ চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ অদ্য এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ
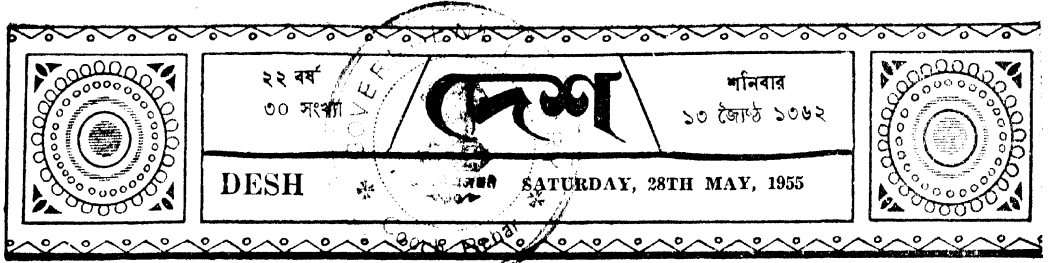
বিশ্ব-সংস্কৃতি ও ভারত

স্যার আলফ্রেড এগার্টন ইংলণ্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি অব আর্টসের সভায় তিনি বলিয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি বিজ্ঞান-সাধনার হাতে রহিয়াছে এবং সম্ভবত ভারতেরই হাতে বিশ্বমানবের ভাগ্যও নির্ভর করিতেছে। ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার ক্রমিক উন্নতি এবং সম্প্রসারণের সম্বন্ধেই স্যার আলফ্রেডের এই উক্তি। তাহার উক্তির প্রথমাংশ সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের ভাগ্য ভারতের উপর কিভাবে নির্ভর করে কথাটা বোঝা অনেকের কাছে কিছু কঠিন। এদেশের প্রভূত জনবল কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের বিচারই, কি বৈজ্ঞানিককে এই সিদ্ধান্তে প্রণোদিত করিয়াছে? স্যার আলফ্রেডের মন্তব্যের মূলে সে বিচার যে একেবারে নাই, এমন কথা বলা চলে না; কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য কিছুও আছে এবং তাহাই আমরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। স্যার আলফ্রেডের মতে পাশ্চাত্ত্য জাতির ব্যবহারিক জীবনধারা ধরিয়া জগতের ভবিষ্যৎ সভ্যতা সাম্প্রদায়িক হইবে না, কিংবা সর্বময় প্রভুত্বপর সাম্যবাদের সাহায্যেও সভ্যতার উন্নতি সম্ভব হইবে না। ফলত ভারতের প্রাচীন সভ্যতা এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিই সম্ভবত ভবিষ্যৎ-গঠনে বিশ্ব মানবের চিন্তাধারাকে নূতন পথে ঘুরাইয়া দিবে। স্যার আলফ্রেডের উক্তির তাৎপর্য এই যে, পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান-সাধনা যদি ভারতের আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই বিশ্বমানব সভ্যতার সমুন্নতি সম্ভব। তিনি এই আশা পোষণ করিয়াছেন যে, জগতের ভবিষ্যৎ গঠনে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিগত আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষভাবে কাজ করিবে। ভারতের এই যে আধ্যাত্মিক শক্তি ইহার স্বরূপ কি? উত্তরে এক কথায় ইহাই বলা চলে যে, মৈত্রীই ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির স্বরূপ। ভারতের সুপ্রাচীন আচার্যগণ সেই কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। সেই কথাই আমরা বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছি। মহাত্মা গান্ধীও সেই সত্যই তাঁহার জীবনাদর্শে প্রদীপ্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিচ্ছন্দে সেই সত্যেরই মহিমা বাজিয়া উঠিয়াছে। বাহিরের প্রয়োজনকে অনাবশ্যক এবং অনর্থক রকমে বড় করিয়া তুলিয়া আমরা যেন এই কথা বিস্মৃত না হই এবং জড়-বিজ্ঞানের উপর জোর দিতে গিয়া অন্তরের দৈন্যে অভিভূত হইয়া না পড়ি। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মনিষ্ঠার উপরই ভারতের প্রতিষ্ঠা, তাহার স্বাধীনতা এবং বিশ্ব-জগতে তাহার স্বাতন্ত্র্য-মর্যাদা নির্ভর করিতেছে।

কলিকাতায় কলেরা

গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এবৎসরেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রতি বৎসরই এই ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দিলে পৌরকর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং কিছুদিন তাঁহাদের তরফ হইতে খুব একটা হৈ-চৈ শোনা যায়। কিন্তু কতকগুলি বিধিব্যবস্থা জারী করিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন, কাজ তেমন কিছুই হয় না। বর্তমান বৎসরেও ইহাই দেখিতেছি। কলেরা প্রধানত জলবাহিত ব্যাধি। পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই এই ব্যাধির প্রকোপ সহজেই প্রশমিত করা যায় এবং ইহা কোন দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্বও নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতা শহরে পরিশ্রুত জলের একান্ত অভাব। দীর্ঘদিন হইতে শহরের এই অভাব চলিতেছে। এ সম্বন্ধে কত আলোচনা, গবেষণা, পরিকল্পনা হইল অথচ প্রতীকার এ পর্যন্ত হইল না; পক্ষান্তরে শহরে জনসমাগম বৃদ্ধির ফলে পানীয় জলের এই সমস্যা বর্তমানে একান্তই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতার মেয়র সম্প্রতি পৌরসভার আলোচনায় আমাদিগকে এ সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছেন; কিন্তু সে আশ্বাসের স্বরূপ আমাদিগকে আদৌ সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার উক্তিতে বোঝা যাইতেছে, গোটা শহরে কলেরা প্রতিরোধের ব্যবস্থাস্বরূপে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য বর্তমানে ১৫টি নলকূপ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই কয়েকটি নলকূপই বা কয়দিনের জন্য? খোঁজ করিলে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে যে, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ কয়েকদিনের মধ্যে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত পথিককে সমধিক পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণাতুর করিয়া তুলিবার যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হইয়া জনসাধারণের বিরক্তি সঞ্চার করিতেছে। কাটা ফল,

সরফ জল বিক্রয়ের উপর যে নিষেধ-বিধি জারী করা হইয়াছে, পালন অপেক্ষা লঙ্ঘনের পথেই সেগুলির মর্যাদা সমধিক রক্ষিত হইয়া থাকে। শহরের প্রত্যেকটি রাস্তায় এ পরিচয় সুস্পষ্ট। কলেরার টীকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পৌরসভার স্বাস্থ্য-বিধায়কবর্গের উপদেশপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু সুশৃঙ্খলিতভাবে প্রতি পল্লীতে টীকা দেওয়ার সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা লইয়া কাজ হয় না। প্রত্যুত পৌরপ্রতিনিধিগণ পর্যন্ত এই বিষয়ে দৃষ্টি বিধান করা প্রয়োজন বোধ করেন না। কলেরা নিতান্তই প্রতিষেধ্য ব্যাধি; কিন্তু পৌরকর্তৃপক্ষের অনবধানতা কিংবা ঔদাসীন্যের ফলে শহরে যদি এই ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দেয়, ব্যাধিকে দোষ দেওয়া চলে না, শহরবাসীদের অদৃষ্টেরই দোষ।

গোয়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলন

মহারাষ্ট্র জননায়ক শ্রী নানাসাহেব গোরে এবং সেনাপতি বাপাতের রক্তে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার মাটি সিক্ত হইয়াছে। ইঁহারা নিগ্রহ বরণ করিয়া লইয়া গোয়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূলে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, ভারত হইতে গোয়ায় প্রবেশের বাধা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার আর কতদিন উদাসীনভাবে পর্তুগীজদের বর্বর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিবেন এবং প্রস্থে প্রস্থে শান্তিপূর্ণ নীতির প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠার কথা প্রচার করিয়া গোয়ার ক্ষুদে কর্তাদের প্রশ্রয় দিবেন? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কংগ্রেস-পক্ষও গোয়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব; অথচ গোয়াকে তাঁহারা ভারতেরই অংশস্বরূপ মনে করেন। প্রত্যুত এতদিনের মধ্যে এই ব্যাপারে আগাইয়া আসিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করা তাঁহাদের উচিত ছিল। কিন্তু জন-আন্দোলন যদি বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, তবে বেশীদিন তাঁহারাও নীরব থাকিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চিত। আমরা আশা করি, এই সংগ্রামের শেষ পর্যায় এখন শুরু হইবে। ভারত হইতে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য সত্যাগ্রহী বাহিনী অবিশ্রান্ত গতিতে অগ্রসর হইবে। পর্তুগীজ প্রেসিডেণ্ট সেদিনও দম্ভভরে বলিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই পর্তুগীজদের ব্যাপারে বাহিরের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবেন না, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে আমাদেরও বক্তব্য এই যে, ভারতের কোন অংশে বহিঃশক্তির কর্তৃত্ব আমরাও আর বরদাস্ত করিব না। বস্তুত পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যদি এখনও মানে মানে ভারত ছাড়িয়া না যান, তবে তাঁহাদের পতাকা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গোয়ায় প্রবেশ করিয়া আজ যাঁহারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের পশুশক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং মানব-মুক্তির এই মহনীয় প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছি।

বিভীষিকা—সাহিত্যের সঙ্কট

সাহিত্যে বিভীষিকার স্থান না আছে, এমন কথা আমরা বলি না; কারণ বিভীষিকাও একটা রস। জীবনের মূলে রসের বিচিত্রানুভূতির পরিস্ফূর্তিই সাহিত্যকে প্রাণবান্ করিয়া তোলে এবং সমাজকে সংস্কৃতির পথে সংস্থিতি দেয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, সাহিত্য এদেশে দস্তুর মত একটা ব্যবসাতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মুনাফা-শিকারীর দল এই ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সংখ্যায় আসিয়া জুটিতেছে। যতরকম উৎকট অপরাধের নিষ্ঠুরতা এবং গ্লানির বীভৎসতা ছাপার অক্ষরে সাজাইয়া ও বেচিয়া পয়সা উপার্জনের চেষ্টা চলিতেছে। সমাজ-বিরোধী মুনাফা-শিকারের মত ইহাও পাপ-ব্যবসায় এবং শ্লীলতাবিরোধী পুস্তক উপন্যাসাদির মতই এইগুলিও জাতির রুচিকে বিকৃত করে এবং সমাজ-জীবনে অস্বাস্থ্যকর প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকে। সম্প্রতি ভারত সরকার এই শ্রেণীর বিভীষিকা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে নিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি আইন প্রবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং লোকসভার আগামী অধিবেশনে এই উদ্দেশ্যে বিল উত্থাপন করা হইবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

কবি নজরুল

মধুসূদনের পর বাংলার কাব্যসাহিত্যে কবি নজরুলের বৈপ্লবিক বীর্য বলিষ্ঠ সাধনার পথে তরুণদের চিন্তাধারার মোড় ঘুরাইয়া দেয়। একান্ত বিশিষ্ট এই অবদান এবং নিতান্তই বিশিষ্ট তাহার রূপ। কাঁচা এবং তাজা প্রাণরসে নজরুলের গীতি-সাহিত্য ভরপুর। ব্রহ্মপুত্রের উচ্ছল বারি-ধারা বর্ষার সমাগমে বাঁধ ভাঙিয়া যেমন অপ্রতিহত বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কবি নজরুলের গান সেইরূপে বাংলায় জাতীয় জীবনে নবশক্তির জোয়ার প্রবাহিত করে। রূপে রসে তাহা উজ্জ্বল এবং মধুর। কবি নজরুলের যে ছন্দ সে ছন্দে মুক্তির প্রেরণা, তাহা দুর্গমের পথে অভিসারে জাতির মনের মূলে দুর্দম গতিবেগ সঞ্চার করে এবং সে গীতি প্রাণে প্রাণে বৈদ্যুতিক স্পর্শ ছড়ায় এবং সমাজের সকল স্তরে নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোময় প্রতিভার যুগেও কবি নজরুল বাংলার জনগণের অন্তরে নিজের ব্যক্তিত্ব অবিচলিত মহিমায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বঙ্গবাণী তাঁহার দুরন্ত ছেলের গাঁথা মালা আদরের সঙ্গে কণ্ঠে তুলিয়া লইয়াছেন। সে মালা আছে কবির অশ্রুঢালা দুর্গত, নিপীড়িতের বেদনায়, তাঁহার অন্তরের জ্বালায়। কবি নজরুল আজ ব্যাধিগ্রস্ত। কবির কণ্ঠ আজ নীরব রহিয়াছে, তাঁহার রুদ্রবীণা বহুদিন আর বাজে না। বাঙালী জাতির পক্ষে ইহা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। আজ বাঙালী জাতির সঙ্কট চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে। কাজের নামে চলিতেছে ফাঁকী, সবই মেকীর কারবার। বিভক্ত বাংলার বুক জুড়িয়া উঠিতেছে গৃহহীন উদ্বাস্তু নরনারীর হাহাকার। এই দুর্দিনে কাজীর আগ্নেয় বীণা নব সৃষ্টির আবর্ত জাতির হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইত। বিদ্রোহী কবির বাঁধন ভাঙা গানে বাংলার মরা গাঙে প্রাণের বান ছুটিত। এই ব্যথা ভুলিবার নয়। এই বেদনা অন্তরে লইয়া আমরা কবির আশু নিরাময় প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহাকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতস্থ পর্তুগীজ ছিটমহলগুলির মুক্তি আন্দোলনের শেষ পর্বের আরম্ভ দেখা যাচ্ছে কি? আরম্ভ হয়ত হয়েছে কিন্তু আরো কী কী অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষ হবে তা এখনো বলা যাচ্ছে না। ভারত সরকার কী করেন তার উপর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ধারা ও গতি অনেকখানি নির্ভর করবে। কিন্তু ভারত সরকারের নীতি ও কর্মপন্থার ভিতর এখনো যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে।

অবশ্য ভারত সরকার পর্তুগালের উদ্দেশ্যে কথা যা বলছেন অর্থাৎ সরকার যে থিয়োরেটিক্যাল স্ট্যান্ড নিয়েছেন সেটা খুবই স্পষ্ট। সেটা হচ্ছে এই—গোয়া এবং ভারতস্থ অন্য ছিটমহল দুটি ভারতের অংশ এবং সেখানকার অধিবাসীরাও ভারতীয় জাতির অংশ; ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানের পরে গোয়াতে পর্তুগীজ শাসন থাকতে পারে না; গোয়ার স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত; গোয়াতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষ সহ্য করতে পারে না; গোয়াবাসীরা পর্তুগীজ শাসনের অবসান চায়, তারা অশেষ দুঃখ বরণ ক'রে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি ভারত সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন না থেকে পারে না; গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর পর্তুগীজ সরকারের নৃশংস ব্যবহারের প্রতি ভারতবর্ষ ও ভারত সরকার উদাসীন থাকতে পারেন না; তবে ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যার সমাধান চান; পর্তুগীজ শাসনের অবসানের পরে গোয়ার খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অধিকারাদি এবং পর্তুগীজ সংস্কৃতির উপর কোনোরকম জুলুম হবে না, এ প্রতিশ্রুতিও ভারত সরকার দিয়েছেন।

কিন্তু পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট এসব কোনো কথাই শুনতে রাজী নন। পর্তুগাল সরকারের এক বুলি হচ্ছে—গোয়া পর্তুগালের অংশ এবং পর্তুগীজরা কিছুতেই গোয়া ছাড়বে না। গোয়ার রাজনৈতিক হস্তান্তরের প্রশ্নের কোনোরকম আলোচনাতেই পর্তুগাল আসতে রাজী নয়। শুধু তাই নয়, NATO'র সদস্য হিসাবে পর্তুগাল গভর্নমেণ্ট গোয়া রক্ষার জন্য NATO'র দরবারে পর্যন্ত আবেদন জানিয়ে রেখেছেন।

NATO শুনেছে, কিছু বলেনি। কিন্তু NATO'র চাঁইরা পর্তুগালের প্রতি কোনোরকম সহানুভূতি দেখায় নি তাও

লা যায় না। গত আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ পক্ষ থেকে গোয়াতে সত্যাগ্রহ অভিযানের চেষ্টা শেষ মুহূর্তে কীভাবে ভারত সরকারের আদেশে ব্যাহত হয় তা এখানে স্মরণীয়। যাঁরা একটু তলিয়ে দেখেছেন তাঁরা অনুমান করেন যে, পর্তুগালের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বৃহৎ শক্তিদের চাপের ফলেই ভারত সরকার শেষ মুহূর্তে ভারত থেকে সত্যাগ্রহ অভিযান বন্ধ করে দেন। এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ ছিল। পর্তুগাল পৃথিবীময় প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছিল যে, গোয়াতে পর্তুগালের ন্যায্য অধিকার নষ্ট করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে ষড়যন্ত্র চলছে, পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ অভিযানের পিছনে ভারত সরকার ভারত-পর্তুগীজ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছেন। পর্তুগাল স্বাধিকার রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করবে এ অবস্থায় সত্যাগ্রহ অভিযানের ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হবে এবং তার জন্য ভারত সরকার দায়ী হবেন। পর্তুগালের এই প্রচার যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিনিস্টার অব স্টেট একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে পর্তুগালের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং ভারত সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিলেন যেন তাঁরা এমন কিছু না করেন যা'তে সংঘর্ষ বাঁধে। এর অল্প ক'দিন পরেই ভারত থেকে সত্যাগ্রহ অভিযানের সম্বন্ধে ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। এ অবস্থায় ভারত সরকার বিদেশী চাপে পড়ে কিছু করেন নি এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন।

গত বছর ভারত থেকে সত্যাগ্রহ অভিযান আটকে দিয়ে ভারত সরকার পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকে আলোচনার টেবিলে বসাবার অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। গোয়াতে পর্তুগীজ অধিকারের লোপ বা লাঘবের কোনো কথাই পর্তুগাল শুনতে রাজী নয়। অন্যদিকে, গোয়ার অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার জন্য পর্তুগীজ অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশই চড়তে লাগল। সেই সব অত্যাচারের বিবরণ ভারতবর্ষে গভীর উদ্বেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, গোয়াতে যে-সব কাণ্ড ঘটছে ব'লে জানা গিয়েছে তা'তে ভারত সরকারও মনে করেন যে, অবস্থা খুবই গুরুতর হয়ে আসছে। পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি "স্ট্যাটিক", বসে থাকার নীতি নয়, ভারত সরকার সজাগ আছেন, দরকার হলে বর্তমান নীতি পরিবর্তন করবেন এবং সে বিষয়ে পার্লামেণ্টকে যথাসময়ে জানানো হবে।

ইতিমধ্যে ভারত থেকে সত্যাগ্রহ অভিযান চালাবার জন্য আবার প্রস্তুতি চলল এবং গত ১৮ই মে তারিখ থেকে অভিযান চলছে।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পার্লামেণ্টের গত অধিবেশন হবার পূর্বে পার্লামেণ্টের সদস্যদের একটি সর্বদলীয় কমিটি—(এখন পর্যন্ত কংগ্রেস সদস্যরা এই কমিটিতে যোগ দেন নি) গঠিত হয় যার কাজ হবে গোয়া সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সরকার ও জনসাধারণকে তাগিদ দেয়া। সম্প্রতি এই কমিটির উদ্যোগে বম্বেতে একটি কনভেনশন হয়েছে। এই কনভেনশন গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেছেন যে, যদি পর্তুগালের সঙ্গে আপস নিষ্পত্তির আর একবার শেষ চেষ্টা করে ফল না পাওয়া যায় তবে ভারত থেকে ঔপনিবেশিকতা নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

বম্বের কনভেনশনের এই মত ও দাবী প্রকৃতপক্ষে জাতির মত ও দাবী বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গভর্নমেণ্ট কী করবেন? দু'তিন দিন পূর্বে পণ্ডিত নেহরু শ্রী খারের একটি "খোলা চিঠি"র উত্তরে যা বলেছেন তা থেকে গভর্নমেণ্টের মনোভাব ঠিক বুঝা যায় না। গভর্নমেণ্টের দিক থেকে এমন কিছু করা হবে যাতে অতি শীঘ্র নূতন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, এরূপ যেন মনে হচ্ছে না। পণ্ডিত নেহরু বিদেশে যাচ্ছেন। তিনি জুলাই মাসের মাঝামাঝির পূর্বে ফিরছেন না। পার্লামেণ্টের পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হবে ২৫এ জুলাই। সরকার এমন কিছু করবেন যাতে পণ্ডিত নেহরুর দেশে অনুপস্থিতির সময়ে একটা সংকটজনক অবস্থার উদ্ভব হতে পারে—এরূপ মনে করা যায় না। বম্বের কনভেনশনের প্রস্তাবেও "আর একটা শেষ চেষ্টার" ফাঁক আছে।

এই "শেষ চেষ্টা" করার জন্য গভর্নমেণ্টকে সময়ের সীমানা কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। কিন্তু এদিকে যদি সত্যাগ্রহ অভিযান চলতে থাকে এবং পর্তুগীজ কর্তাদের দমননীতির উগ্রতাও সমানভাবে চলে তবে পরিস্থিতি "আয়ত্তের বাইরে" চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ অবস্থায় সরকারের দিক থেকে একটা সুস্পষ্ট আশ্বাস দেশবাসীকে দেয়া কর্তব্য যাতে গভর্নমেণ্টের "শেষ চেষ্টা"র রকম ও সময় সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা সঠিক ধারণা হতে পারে। গভর্নমেণ্টের দ্বারা সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া ঠিক না হতে পারে কিন্তু যেখানে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গভর্নমেণ্টের উপরই ন্যস্ত করা হচ্ছে সেখানে সত্যাগ্রহের প্রয়োজন কেন থাকবে? বরঞ্চ এতে একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে।

পর্তুগালকে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি তার পৃষ্ঠপোষক বৃহৎ শক্তিদের জানিয়ে দেয়া উচিত যে, পর্তুগাল যদি আলোচনার দ্বারা সমস্যার নিষ্পত্তি করতে রাজী না হয় তবে ভারত সরকার গোয়ার ভারতভূমি থেকে পর্তুগীজ কর্তৃত্ব দূর করে দিতে অস্ত্রবল প্রয়োগ করতে বাধ্য হবেন। এরূপ স্পষ্ট কথা শুনলে পর্তুগালের পৃষ্ঠপোষকগণ পর্তুগালকে সুপরামর্শ দেবেন বলেই মনে হয়। গোয়াতে পর্তুগাল কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ভারতবর্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হতে রাজী হবে—এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। লজ্জা ত্যাগ করে একবার কথাটা উচ্চারণ করতে হবে যে, আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, ভারত সরকার যদি সৈন্যবাহিনী না পুষতেন তবে এমন পাপ কথা উচ্চারণ করতে কেউ তাদের বলত না।

২৫।৫।৫৫

প্রণয়-চিহ্ন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এ তার প্রণয়-চিহ্ন। ওরে মেয়ে, এখনো কি তোর
সংশয় রয়েছে তাতে? তবে শোন্, দারুণ লজ্জার
আড়ালে আশ্রয় নিয়ে যার
কেটেছে নিঃসঙ্গ দিন, রাত্রির প্রহর,
দুরন্ত শ্রাবণ কিংবা দুর্বিনীত চৈত্রের হাওয়াও
বিব্রত করেনি যাকে সেই অন্ধ লজ্জার বিবরে,
হৃদয়ের তীব্রতম ঝড়ে
সংকোচ ভাঙেনি যার, যে তবু বলেনি 'ভেঙে দাও
সমস্ত শৃঙ্খল', তুই তাকে
কেন মুক্তি দিলি? কেন সেই আত্মবিস্মৃত ক্ষুধাকে
সহস্র শিখায় দিলি জ্বালিয়ে? আমায়
জানালি না কেন? ওরে মূঢ়,
ক্ষমা আছে সেই লুব্ধ ভয়াল দস্যুরও
প্রকাশ্য পথে যে লুঠ করে
পথিকের সর্ব সুখ; ক্ষমা নেই তার
যে নিজেই ভয়ত্রস্ত. উন্মুক্ত অপার
আলোর সাম্রাজ্য থেকে যে-দস্যু সভয়ে সরে যায়
অন্ধকারে, মিথ্যার কোটরে।

এ তার প্রণয়-চিহ্ন (সেই গুপ্তঘাতকের)। হায়,
এখনো সংশয় তাতে? ওরে মেয়ে, ওরে মূর্খ মেয়ে,
যে-ক্ষুধা শৃঙ্খলে সুখী, কেন তাকে দিলি
মুক্তির মন্ত্রণা? দেখ চেয়ে
এ কার প্রণয়ে তুই মত্ত হয়েছিলি।
লোভের বৃক্ষের থেকে ফুল
তুলে নিয়ে সেই ক্ষুধা লজ্জার ছায়ায়
বারে বারে
ত্রস্ত পায়ে ফিরে যায়। (যায়, তা কি আমিও জানি না?)
ওরে মেয়ে, তোর ওই নিশ্চল পৃথুল
শরীরের স্ফীত অন্ধকারে
স্বাক্ষর রয়েছে সেই পলাতক নিষ্ঠুর ক্ষুধার।
এ তারই প্রণয়-চিহ্ন, ওরে লজ্জাহীনা,
এখনো সংশয় কেন আর?

রাজবালা

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

শেষ সংবাদটা পেয়েছিলাম ভরতপুরে গিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছিল আরো কিছুকাল পূর্বে। আমি তখন পঞ্চ-গিরিতে কাজ করি।

রেলের চাকরি,—ঘাটে ঘাটে বদলি হবার পালা। সুদীর্ঘ চাকরি-জীবনে কত দেশ ঘুরেছি, কত বিচিত্র ঘটনার সংস্পর্শে এসেছি। কখনো অশ্রু, কখনো আনন্দ ক্ষণিক আবেগের ঢেউ তুলে আবার স্মৃতির গর্ভে মিলিয়ে গেছে। তারই মধ্যে আবার এক একটা ঘটনা এমন মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে যে, তা চিরকাল মনে দাগ কেটে থাকে। সে স্মৃতি ভোলা যায় না, প্রবাস-জীবনের ফেলে আসা ঘটনা বলে নির্লিপ্ত থাকা যায় না,—এক একটা উদাস মুহূর্তে শেষ রাতের 'শুকতারার' মত সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রাখে।

এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল পঞ্চ-গিরিতে। তখন আমার ভরতপুরে বদলির আদেশ এসে গিয়েছিল, এখানকার 'পাত্-তাড়ি' গুটিয়ে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি, এমন সময় গৃহিণী এসে ধরলেন —'মেয়েটাকে সঙ্গে নিতে হবে।'

'কোন্ মেয়ে?'

'তোমাদের ওই কেবিনম্যানের বৌ। লোকটা ঘোর মাতাল, বৌটার উপর নির্যাতনের আর শেষ নেই। মেরে আর না খাইয়ে খাইয়ে মেয়েটার 'হাল' আর রাখেনি। এখানে থাকলে নির্ঘাৎ মারা পড়বে ও। মেয়েটি লুকিয়ে তার বাপের কাছে পালিয়ে যাবে। আমি কথা দিয়েছি, আমাদের যাবার পথেই তার বাপের বাড়ি, সেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেই হবে।

মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হলাম। যাত্রার আগেই এক বাধা। বিরক্তির স্বরে বললাম: 'কোথাকার কোন্ কেবিনম্যান, জানা নেই, শোনা নেই—।'

গৃহিণী বাধা দিয়ে বললেন, 'মেয়েটি নাকি তোমাকে চেনে।'

'আমাকে চেনে?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—'হ্যাঁ, তাই তো বলল। বিক্রমগড়ের কোন্ এক মহেন্দ্র সিংকে নাকি তুমি চিনতে। তারই মেয়ে।'

'মহেন্দ্র সিং?' ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল আমার। সুদীর্ঘ চাকরি-জীবনে ঘাটে ঘাটে নোঙর করে ফিরেছি, কত বিচিত্র লোকের সংস্পর্শে এসেছি, বিস্মৃতপ্রায় সেই মুখ-গুলো একে একে স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম।

গৃহিণী বললেন, 'মনে পড়ে?'

পড়ে বই কি! কতকালের ঘটনা, তবু স্পষ্ট মনে আছে। বিক্রমগড়ের মহেন্দ্র সিংকে হয়ত কোনদিন ভুলতে পারব না। তারই মেয়ে? পদ্মিনী? গৃহিণী মেয়েটির নাম জেনে রাখেনি। না জানুক, মহেন্দ্র সিংয়ের মেয়ে যখন, পদ্মিনী ছাড়া আর কে হবে? কিন্তু পদ্মিনী এখানে? পর-ক্ষণেই মনে পড়ল তাই হবে। রেলের এক

কেবিনম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল বটে। কতকালের ঘটনা, তবু স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সে কাহিনী গৃহিণীকে বলে লাভ নেই, গৃহিণী বুঝবে না সে কথা,—কিন্তু সেদিনের স্মৃতি বিয়োগান্ত নাটকের মত হয়ত চিরকাল আমার মনে দাগ কেটে থাকবে।

প্রায় একযুগ পূর্বের কাহিনী। তখন আমি বিক্রমগড়ে বদলি হয়ে গিয়েছি। ভরতপুর আর পর্ণাগিরির মাঝপথে এই ছোট স্টেশন। স্টেশনের সিমেন্ট বাঁধান ফলকে নাম লেখা রয়েছে 'ওল্ড বিক্রমগড়'। যেটা বিক্রমগড় শহর, সেটা আরো মাইল পাঁচেক দূরে, একটা অর্ধচক্রাকার বাঁক ঘুরে রেল-লাইনটা 'নিউ বিক্রমগড়' হয়ে একটা পার্বত্য উপত্যকায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ স্টেশন থেকে দাঁড়িয়ে দেখা যায় 'নিউ বিক্রমগড়ের' ডিস্টেন্ট সিগন্যাল। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস আদালত, আর শহরের ব্যস্ত কোলাহল সমস্তই ঐদিকে। এ-দিকটা ফাঁকা ও স্তিমিত। স্টেশন-সংলগ্ন দু'চারটা ছোটখাটো দোকান-পসার ছাড়া সারাটা অঞ্চল যেন অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু; অনুর্বর প্রান্তর, মাঝে মাঝে দু'একটা ভগ্ন অট্টালিকা, কোথাও ঝোপ, কোথাও কুঁড়ে—সমস্ত পরিবেশটায় যেন ম্লান হতশ্রী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এককালে শহর নাকি এদিকেই ছিল, এখন 'ওল্ড বিক্রম-গড়' শহরের উপখণ্ড মাত্র।

এমন এক জনবিরল স্টেশনে বদলি হয়ে এসে প্রথমেই এক মস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। রেলের বদলির চাকরি সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা জানেন যে, এ জাতীয় 'রোড-সাইড' স্টেশনে বদলি হওয়ার বিড়ম্বনা কত। যারা পরিবার নিয়ে থাকে, তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ব্যাচেলারদের এমন স্থানে দুর্ভোগের শেষ নেই। কোথায় হোটেল, কোথায় মেস, সে সন্ধান নিতেই বিব্রত থাকতে হয়। তার উপর আমি আবার রিলিভিংএ এসেছি। কোম্পানীর কোয়ার্টারও স্থায়ী লোকের দখলে।

স্টেশনের এক সহকর্মী বলল : 'মেস-হোটেলে যদি থাকতে চাও তো পাঁচ মাইল ঠেঙিয়ে শহরে যেতে হবে। আর পেয়িং গেস্ট-এ যদি আপত্তি না থাকে, তবে স্টেশনেই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর থাকার জন্য ভাবনা কি, লালাজীর বিরাট ধর্মশালা রয়েছে।'

ব্যবস্থাটা অপূর্ব বটে! 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে'—আমাদের মহাজনদেরই বাণী। সুতরাং ধর্মশালায় আশ্রয় নিতে আর আপত্তি কি।

আমি বললাম : 'লালাজী কে?'

বন্ধুটি হাসল, বলল, 'লালা মহেন্দ্র সিং। তামাম দুনিয়ার মালিক। অন্তত বিক্রমগড়ের মালিক তো বটেই!'

আমি হেসে বললাম, 'মানে?'

বন্ধু বলল, 'লোকটি অমনিতে ভাল। তবে মাথায় একটু 'ছিট্' আছে।'

'ছিট্?'

বন্ধু আবার মুখ টিপে হাসল। বলল, 'সে এক বিচিত্র কাহিনী। 'কুশীল' নামে এক সম্প্রদায় এখানে বাস করে। এদের আদি বাসস্থান নাকি ছিল হিমালয়ের কোন্ এক প্রান্ত প্রদেশে। তাদেরই এক শাখা কবে এই বিক্রমগড়ে এসে রাজ্য স্থাপন করে। তবে আজ সে রাজ্যও নেই, রাজাও নেই। কালের বিবর্তনে সে-সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তার রাজ্যহীন ওয়ারিসান এখনো টিকে আছে। আমাদের লালাজী নাকি তারই শেষ বংশধর।'

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আশ্চর্য তো! বিক্রমগড় রাজ্যের নাম ইতিহাসের পাতায় কোথাও আছে বলে মনে পড়ে না, অথচ তার ওয়ারিস বংশধর স্বশরীরেই বর্তমান!

বন্ধু আবার বলল, 'এ অঞ্চলে সবাই লালা মহেন্দ্র সিংকে চেনে। কেউ বলে—পাগল! কেউ বলে, নেহি, বাবুজী এ বাত সাচ্ হ্যায়। লালাজী বিক্রমগড়কা আসলি মালিক হ্যায়।'

ক্রমে আমিও জানলাম। কিন্তু সে জানার মধ্যে সেদিন এমন চপল কৌতূহল ছিল না, অক্ষম বৃদ্ধের অতীত গৌরবের দীর্ঘশ্বাস আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

স্টেশনের নিকটেই ধর্মশালা। পোড়ো বাড়ির মত মস্তবড় এক অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। এককালে হয়ত যথেষ্ট আড়ম্বর ছিল, তার বড় বড় খিলান, নাট-মন্দির আর কারুকার্যশোভিত বড় বড় ঘরগুলি এখন ধ্বংসস্তূপ মাত্র। বস্তুত

এখন এটা আর ধর্মশালা নয়। এককালে হয়ত ছিল, এখন তার স্মৃতিটুকু মাত্র বহন করছে। ভাঙ্গা অনেকগুলো ঘর খালিই পড়ে থাকে। লালাজী থাকেন আরো পিছনে, বিরাট বাড়িটার একপ্রান্তে, দুটি মাত্র মেয়েকে নিয়ে নিরিবিলি বাস করেন।

এই ধর্মশালাতেই আমার থাকবার ব্যবস্থা হল। দোতালার একটা জীর্ণ কোঠা মোটামুটি সংস্কার করে বাসোপযোগী করে নিলাম। লালাজীর সঙ্গে এখানেই আমার প্রথম পরিচয়। লম্বা চেহারা, বয়সের ভারে দেহটা খানিক সম্মুখে ঝুঁকে পড়েছে। মাথায় স্থানীয় লোকদের মত ভেলভেট কাপড়ের এক পাগড়ি, পক্ক কেশ, পুরু গোঁফ,—একজন সাধারণ মধ্য প্রদেশের বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। শুধু দারিদ্র্যের কৃচ্ছ্রতায় একটা বিষণ্ণতার ছাপ চোখেমুখে সুপরিস্ফুট। কথাবার্তায় ভদ্র এবং সদালাপী। প্রথম দিনের আলাপেই আমি প্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ভদ্রলোক বিপত্নীক, সংসারে দুটি মাত্র মেয়ে। বড়টির বয়স সতেরো আঠারো, ছোটটি আট-নয় বছরের। এই দুটি মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলেই তিনি রেহাই পান। তারপরই তীর্থে বেরিয়ে পড়বেন। বলেই তিনি একটু ম্লান হাসলেন। বললেন, 'শেষ বয়সটা তীর্থে তীর্থে ঘুরেই কাটিয়ে দেব ভাবছি।'

কথার সমর্থনে আমিও মৃদু হাসলাম। এ বয়সী একজন বৃদ্ধ লোকের স্বাভাবিক বৈরাগ্য তিতিক্ষা ছাড়া আর কোন 'ছিটের' লক্ষণ সেদিন চোখে পড়ল না।

কিন্তু লালাজীর আসল পরিচয় পেলাম সেদিন রাত্রিতে। সেটাই তাঁর পাগলামির 'ছিট' কিনা জানি না, লালাজীর সেই জ্বলন্ত চোখ দুটি দেখে মনে হয়েছিল, অতীতের মরীচিকায় এক অন্ধ মন বৃথা হাতড়িয়ে ঘুরছে।

রাত তখন অনেকটা হবে। কেন জানি ঘুম আসছিল না। একটা বিশ্রী গুমট গরমে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে একটু ঠান্ডা হাওয়ার প্রত্যাশায় ছাদে উঠে এসেছিলাম। চারদিক নিস্তব্ধ,—কেমন একটা ছমছমে ভাব। একটা ফিকা জ্যোৎস্না অনেক দূর ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। বাড়িটার আশেপাশে খানিকটা ঝোপ-জঙ্গল, তারপরই বিস্তীর্ণ অনুর্বর প্রান্তর। কোথাও ঝোপ, কোথাও টিলা,—তারই ফাঁকে ফাঁকে এক একটা ভগ্ন অট্টালিকা, আবার কোথাও ভগ্ন ইটের ধ্বংসস্তূপ। হালকা জ্যোৎস্নার প্রলেপে চারদিক ছমছম্ করছে, গভীর এক স্তব্ধতায় চারদিক যেন রহস্যাবৃত হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই, হঠাৎ ছাদের অপর প্রান্তে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। অদ্ভুত নিষ্পলক দৃষ্টিতে বিক্রমগড়ের নির্জন প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে নিস্পন্দ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন লালাজী!

কেমন এক কৌতূহল হল। পা টিপে টিপে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি চমকে ফিরে তাকালেন। ক্ষণিকের জন্য নিবিষ্ট দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আপনি বিশ্বাস করেন, বাবুজী?'

—কি?

—আমি যেন বিক্রমগড়ের চাপা কান্না শুনতে পাই!

চমকে উঠলাম আমি। তাকিয়ে দেখি, বিক্রমগড়ের সেই রহস্যময় প্রান্তর পেরিয়ে সীমান্তে বিন্দু বিন্দু আলোর রোশনাই—নিউ বিক্রমগড়ের ঐশ্বর্যের সীমানা। দূরে শহরের বুকে টাওয়ারের শীর্ষে এক উজ্জ্বল আলোর মুকুটমণি—নিউ বিক্রমগড়ের দিক্‌দর্শন! লালাজীর জ্বলন্ত দৃষ্টি তারই উপর নিবদ্ধ। হঠাৎ মনে হল, বিক্রমগড়ের চাপা কান্না নয়, রাত্রির সেই নিস্তব্ধতায় এই বন্ধ্যা প্রান্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক লুপ্ত অধীশ্বরের অশরীরী আত্মা বুঝি গুমরে কেঁদে ওঠে। লালাজীর চোখেমুখে তারই সুস্পষ্ট ছাপ!

আমি বললাম, 'ঘরে চলুন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।'

লালাজী আমাকে অনুসরণ করে স্বপ্নাবিষ্টের মত আবার বলতে লাগলেন, 'সত্যি বাবুজী, এক একদিন রাতে যেন এমনি কান্নার রোল ওঠে।'

পরদিন লালাজীর বড় মেয়ে পদ্মিনীর মুখে শুনলাম আরেক বৃত্তান্ত। এই ধর্মশালাতেই লালাজীর সঙ্গে মেয়েটিকে কয়েকবার দেখেছি। লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, চোখেমুখে বুদ্ধিদীপ্ত ভাব। আলাপ তেমন কিছু হয়নি। মেয়েটি স্বভাবত একটু লাজুক, নিজেকে প্রকাশ করার চেয়ে আড়াল করবার চেষ্টাই বেশী। কিন্তু সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে পদ্মিনী বলল, 'পিতাজীকা শির ফিন বিগড় গিয়া।'

শির বিগড় গিয়া?

হাঁ, বাবুজী, মাঝে মাঝে পিতাজীর মাথা যেন কেমন হয়ে যায়। তাঁর ধারণা, আবার বুঝি বিক্রমগড়ের অতীত দিন ফিরে আসবে।

গত রাত্রের ব্যাপারটা আমার স্মরণ হ'ল। রাত দুপুরে লালাজীর সেই ক্ষেপামী। ক্ষেপামী বই কি। দিনের আলোতে সেটাকে এক উদ্ভট পাগলামী বলেই মনে হ'ল। আমি বললাম, আপনাদের বংশের অতীত গৌরব এই বিক্রমগড়ের মাটিতে মিশে আছে, সেটা ভোলা তো সহজ নয়।'

পদ্মিনী এবার স্তব্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, তারপর শান্ত স্বরে বলল,

'একটা প্রাণহীন কঙ্কালের মূল্য কতটুকু, তা'তো আপনি জানেন, বাবুজী। বিক্রমগড়ের রাজ-ঐশ্বর্য হিন্দুস্থানের লোক কখনো স্বীকার করেনি। আমরা গরীব, আর দশজন লোকের মত বিক্রমগড়ের সাধারণ অধিবাসী মাত্র, সেটা ভুললে চলবে কেন?'

শুনে অবাক হলাম আমি। পদ্মিনীর চোখেমুখে যেন এক নিরুদ্ধ অভিমানের ছায়া কেঁপে উঠল। বিক্রমগড়ের এক ভগ্ন ধর্মশালায় আত্মগোপন করে এ মেয়েটিও কি তার লুপ্ত ঐতিহ্যের স্বপ্ন দেখে? হয়ত বা তাই। তার সুর আলাদা, লালাজীর উগ্র অভিযোগের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দিনের আলোতে লালাজী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লোক। স্টেশনের সংলগ্ন বাজারে তাঁর একটি দোকান আছে। মাথায় ভেলভেটের পাগড়ি চড়িয়ে এক গলাবন্ধ কোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ব্যবসায়ীর মতই তিনি দোকানের গদিতে গিয়ে বসেন। কেউ মুখ টিপে হেসে বলে—'রাম-রাম লালা-মহারাজ!' কেউ বলে—'রাজাজী।'

লালাজী মৃদু হাসেন। এই প্রচ্ছন্ন কৌতুক যেন সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু রাতের আবছায়ায় লালাজী আরেক মানুষ। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লালাজী একবার অতিথির খোঁজ নিতে আসেন। প্রথমে দু'চারটা টুকরো কথার পর শুরু হয় তাঁর অতীত গৌরবের মর্মোদ্ঘাটন।

—বাবুজী! এই বিক্রমগড়ের আজব ইতিহাস!

মুহূর্তে লালাজীর চোখে মুখে নেমে আসে শতাব্দী-পূর্বের রহস্যের ছায়া। কবে কোন্ অজ্ঞাত যুগে এই নির্জন প্রান্তর ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরে সমৃদ্ধ ছিল, তার খ্যাতি ছিল, প্রতিপত্তি ছিল,—বড় বড় তোরণ, মিনার আর রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য লোকচক্ষে বিস্ময় জাগাত। নিউ বিক্রমগড়ের পত্তন তো সেদিনের কথা!

দুটি চোখ রহস্যঘন করে লালাজী আবার বলেনঃ জানেন, বাবুজী, এটিও আসলে ধরমশালা নয়।

ধর্মশালা নয়? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করি।

—না, বাবুজী। এটাই ছিল বিক্রমগড়ের রাজপ্রাসাদ। কবে, কেমন করে এটা ধরমশালায় রূপান্তরিত হয়, সেটাও এক অদ্ভুত ইতিহাস!

লালাজী একবার বিচিত্র হাসলেন, তারপর আবার বললেন, 'অথচ এই ধরমশালাতেই গোপনে আশ্রয় নিয়ে বিক্রমগড়ের রাজবংশ বংশানুক্রমে টিকে আছে।'

আমি একবার মুখ তুলে তাকালাম। লালাজীর চোখেমুখে থমথমে উত্তেজনা। হঠাৎ কেন জানি মনে হল, ধর্মশালার বৃদ্ধ মহেন্দ্র সিং নয়, অতীতের কোন্ তিমির গহ্বর থেকে এক অশরীরী আত্মা যেন উঠে এসে রাত্রির এই মৌন স্তব্ধতায় আমার সামনে বসে এক অতীত কাহিনীর সওয়াল করে যাচ্ছে।

কোন কোনদিন পদ্মিনীও উপস্থিত থাকে। লালাজীর উত্তেজিত কণ্ঠে বিক্রমগড়ের সেই ঐতিহ্যোজ্জ্বল কাহিনী তার চোখেও বিস্ময় জাগায়। কখনো ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলেঃ জানেন, বাবুজী, আমরা এক সময় আপনাদের বাংলা মুল্লুকে ছিলাম।

—তাই নাকি? আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

—হাঁ। পিতাজী পূর্বে রেলেতে বাংলা মুল্লুকে চাকরি করতেন। ভারি সুন্দর দেশ আপনাদের। বলেই পদ্মিনী সলজ্জ হাসল।

আমি লালাজীকে বললামঃ আপনি রেলে কাজ করতেন?

লালাজী মৃদু হাসলেন। বললেনঃ সে অনেক কালের কথা, ই বি রেলওয়েতে কাজ করেছি কিছুকাল। ওদের মা যেবার মারা যায়, সেবারই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসি।

তারপর একটু চুপ থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে তিনি আবার বললেনঃ পরের গোলামী আর ভাল লাগল না, তাই ছেড়ে দিয়ে এলাম। ওই তো দু'টি মাত্র মেয়ে, এ দুজনকে পার করতে পারলেই আমি মুক্ত। তারপর বাকীটা জীবন তীর্থে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেব।

লালাজীর এই বৈরাগ্যের সংকল্প আরো কয়েকবার শুনেছি। লক্ষ্য করলাম, বিয়ের প্রসঙ্গে পদ্মিনীর চোখে মুখে কে

আবীর ছড়িয়ে দিল। খানিকটা
তুতভাবে এটা সেটা নাড়াচাড়া করে
নময় কি একটা অজুহাত দেখিয়ে সে
য়ে গেল। পদ্মিনী চলে যেতেই আমি
ম, 'আপনার এ মেয়ের তো বিয়ের
হয়ে গেছে।'

লালাজী এবার কেমন গম্ভীর হয়ে
ন। খানিক্ষণ চুপ থেকে কি ভেবে
বললেন, 'সে এক মুশ্‌কিল ব্যাপার,
জী। আমাদের কুশীল বংশের পাল্টা
এ অঞ্চলে কোথাও নেই। তামাম্‌
স্থান খুঁজে পাত্র বে'র করতে হয়।
র ধারা রক্ষা করতে হবে তো!

--তা তো বটেই! আমি কপট
ীর্যে কথাটা সমর্থন করলাম। বাংলা
ও দেখেছি কৌলিন্যের বিড়ম্বনা কত।
ভু কুশীল রাজবংশের গরিমা তো
বেশী। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, দু'
দিন পরের ঘটনায়। একদিন লালাজী
ন, 'পদ্মিনীর কাল সাদি, বাবুজী।'

--কাল?

--হাঁ, বাবুজী। পাত্র ঠিক করা ছিল।
াদের রেলেই কাজ করে স্টেশনে
ম্যান্‌। পহেলী রাজবংশের ছেলে।
ড়র রাজা তাদের পূর্বপুরুষ।

--তাই নাকি?

াবার লালাজী সাগ্রহে আমার একটা
চপে ধরে বললেনঃ এ বিয়েতে
ার উপস্থিত থাকা চাই কিন্তু,
ী?

মন রাজ-রাজড়ার বিবাহ উৎসবে
যত থাকার কৌতূহল আমারও যথেষ্ট
লালাজীর সনির্বন্ধ অনুরোধও

এড়াবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিয়ের
রাত্রিতে স্টেশনে 'নাইট ডিউটি' থাকায়
যাওয়া আর সম্ভব হ'ল না! বিক্রমগড়ের
ভগ্ন রাজপ্রাসাদে সেদিন বিয়ের 'রোশন
চৌকি' বসেছিল কিনা জানি না, লুপ্ত
রাজ্যের রাজকন্যার বিবাহোৎসব হয়ত
একটানা সানাইয়ের করুণ সুরের মধ্যেই
সম্পন্ন হয়েছিল, কিংবা আরো সংক্ষিপ্ত
আড়ম্বরে। পরদিন স্টেশনে টিকিটঘরে
বসে আছি, এমন সময় লালাজী এসে
উপস্থিত।

—'কই, বাবুজী, আপনি তো
গেলেন না?'

ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম।
মৃদু হেসে বললাম, 'পরের গোলামী করি,
ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় কই। বিয়ে
ভালভাবেই হয়ে গেছে তো?'

লালাজী একটু ম্লান হেসে বললেন,
হাঁ। তারা এ গাড়িতেই আজ চলে যাচ্ছে।

—তাই নাকি? আমি উৎসুক হয়ে
বললাম। কেমন একটা কৌতূহলও
হ'ল। ভূতপূর্ব বিক্রমগড় রাজ্যের
রাজজামাতাকে অন্তত চোখে দেখে
আসব। বুকিং কাউণ্টার বন্ধ ক'রে
বাইরে এসে দাঁড়ালাম। স্টেশনে গাড়ি
এসে থেমেছে। একটা থার্ড-ক্লাশের
নিরিবিলি কোণে পদ্মিনী নববধূর সাজে
ওড়নায় একমুখ ঘোমটা টেনে চুপচাপ
বসেছিল। পাশেই তার নূতন বর!

রাজজামাতাই বটে! মোটা বেঁটে
চেহারা, বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে। গোলগাল
তামাটে মুখের উপর এক জোড়া পুরু
গোঁফ—যেন তেজী এক ভোজপুরী
দারোয়ান। কলকাতার অফিস আদালতের
দোরগোড়ায় এ জাতীয় চেহারা বহু-
পরিচিত।

কেমন একটু কৌতুক অনুভব
করলাম। গাড়ি ছাড়বার মুখে পদ্মিনী
মুখ তুলে তাকাল। মুহূর্তের জন্য
একবার চোখাচোখি হ'ল। একটু মৃদু
হেসে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে
সহসা চমকে উঠলাম। পদ্মিনীর দু'চোখে
ভ্রূকুটির ধিক্কার! কৌলিন্যের যূপকাষ্ঠে
এক অসহায় মেয়ের তীক্ষ্ম ভ্রূকুটি যেন
মুহূর্তের জন্য আমাকে সচকিত করে
দিল।

গাড়ি ছেড়ে দিতে কেমন এক
অপ্রস্তুতভাবে পাশ ফিরে তাকালাম।
লালাজী তখনো অদৃশ্যপ্রায় গাড়িটার দিকে
তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সেই স্তব্ধ দৃষ্টি
আরো দূরে অতীতের এক স্মৃতি গহ্বরে
যেন ডুবে আছে।

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে
মৃদু আকর্ষণ করতেই লালাজী যেন চমকে
উঠলেন। লালাজীকে সান্ত্বনা দেবার
জন্যই বললামঃ ভগবান এদের মঙ্গল
করুন, এটাই প্রার্থনা করি।

লালাজী কেমন এক অসহায় দৃষ্টিতে
আমার দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে
আস্তে বললেন, 'সবই নিয়তির লেখা,
বাবুজী। নতুবা আমার এ মেয়ের বিয়ে
এখানে হবে কেন।'

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।
লালাজী আবার বললেনঃ 'এই অযোধ্যা
সিং আমার প্রথম মেয়ের স্বামী। সে
মেয়ে আমার মারা গেছে। আমাদের
বংশের নিয়ম এই, বিয়ের পর প্রথম মেয়ে
মারা গেলে পরের মেয়েটির বিয়েও সে
পাত্রের সঙ্গেই দিতে হবে। আমার বড়
মেয়ে মারা গেছে, তা'ও বছর দুই ঘুরে
এল।'

আমি অবাক হয়ে বললামঃ 'আশ্চর্য
তো!'

কিন্তু আমার আশ্চর্য হবার আরো
বাকি ছিল। বিশাল হিন্দুস্থানে কত
জাতি, কত ধর্ম, কত তার বিচিত্র নিয়ম
কানুন সামাজিক দণ্ড নিয়ে মানুষের
জীবনকে অনুশাসন করছে, তার কতটুকুই
বা জানি। আমাদের দেশে কুলীন প্রথা
নিয়েও তো কত আন্দোলন হ'ল, সতীদাহ
তো আরো মর্মান্তিক! হয়ত ক্ষয়িষ্ণু
কুশীল রাজবংশের ধারা অক্ষুন্ন রাখবার
জন্যই এরূপ অদ্ভুত প্রথার প্রচলন। রাজ্য
বিলুপ্ত হলেও তার বংশের গরিমা তো
কম নয়!

আমি বললামঃ ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করি এরা সুখে থাকুক।

এবার যেন লালাজী ক্ষেপে উঠলেন।
অদ্ভুত এক অন্তর্জ্বালায় তার দু'চোখ
জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ম কণ্ঠে তিনি বলে
উঠলেন, 'জানেন না, বাবুজী, লোকটা কত
বড় শয়তান! পহেলী বংশের কুলাঙ্গার।

খুনে—হাঁ, খুনেই বলবো তাকে। পাড় মাতাল, আমার প্রথম মেয়েকে ওই হত্যা করেছে। লোকের কাছে প্রচার করে বেড়িয়েছে, ও নাকি কলেরায় মারা গেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনে,—কক্ষণো না।'

চমকে উঠলাম আমি। উত্তেজনায় লালাজী তখনো কাঁপছিল। মনে হ'ল বিক্রমগড়ের বংশ গৌরবে গৌরবান্বিত লালা মহেন্দ্র সিং নন, স্টেশনের অদূরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এক অক্ষম পিতা নিয়তির অভিশপ্ত বন্ধনের বিরুদ্ধে বৃথা আস্ফালন করছে। লালাজীকে সান্ত্বনা দেব, এমন ভাষা সেদিন খুঁজে পাইনি।

*   *   *

মহেন্দ্র সিংয়ের ইতিবৃত্ত এইটুকুই। দুপুরের পর কেবিনম্যানের বৌ এসে উপস্থিত হ'ল। বিকেলের গাড়িতেই আমাদের বিদায় হবার কথা। এদেশীয় নিম্নশ্রেণীদের মত আধময়লা শাড়ি, দু' হাতে সরু কাচের চুড়ি, মাথায় পাতলা ওড়নায় ঘোমটা টানা, কিন্তু মুখখানি স্পষ্ট দেখা যায়।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পদ্মিনী তো নয়! সতেরো আঠারো বছরের এক তরুণী মেয়ে, সেদিনের পদ্মিনীর সঙ্গে এ মেয়ের বয়সের তফাৎ তো অনেক!

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি লালা মহেন্দ্র সিংয়ের মেয়ে?'

মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল—'হাঁ।'

—'অযোধ্যা সিংয়ের বৌ?'

—'হাঁ।'

বিমূঢ় বিস্ময়কণ্ঠে আবার বললাম, 'তুমিই পদ্মিনী?'

এবার মেয়েটি মাথা নাড়ল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'মেরা বড়ি বহিন্‌কা ইন্তিকাল হোগিয়া। ময় উন্‌কি ছোটি বহিন্‌—রুক্মিণী।'

একটা সজোর ঝাঁকুনী খেয়ে চমকে উঠলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। তাই হবে, এক যুগ পূর্বের কথা, এতদিনে আট বছরের রুক্মিণী এতটা বড়ই হয়েছে।

সেদিন অবশ্য রুক্মিণীকে সঙ্গে পারিনি। নেওয়া সম্ভবও ছিল সবকিছু জেনে শুনেও অনেক আর পতিব্রাত্যের উপদেশ দিয়ে পাষণ্ড লোকটার নিকটই তাকে দিয়েছিলাম। আমার অযাচিত উপ রুক্মিণীর মনে কতটুকু সান্ত্বনা দিয়ে জানিনে, কিন্তু শেষ সংবাদটা ভরতপুর আসার দিনকয়েক রুক্মিণী নাকি আত্মহত্যা করেছে।

আত্মহত্যা করেছে? শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই মনে পদ্মিনী কি আত্মহত্যা করে তা'হলে? আর—তার আগে, বড়ো বোনও?

সাধারণভাবে যখন কোন শিশুর
তৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে
। তখন বিজ্ঞানের সাহায্যে এই
ন্দহের অবসান ঘটানর চেষ্টা হয়।
পরীক্ষা অর্থাৎ "ব্লাড গ্রুপ টেস্ট"
র শিশুর পিতার সন্ধান করার উপায়
ষ্ঠানে দেখা যায়। এই উপায় সব সময়
র্যকরী হয় না; অনেক ক্ষেত্রে সঠিক
াফল পাওয়া যায় না। সুইডেনের যে
তষ্ঠানে মানুষের চারিত্রিক গুণাগুণ
য় গবেষণা করা হয় সেটিকে
ন্স্টিটিউট ফর হিউম্যান জেনেটিকস্"
া হয়। এই প্রতিষ্ঠান বলে যে, যখন
় গ্রুপ টেস্ট করেও কোনও সত্য
ারণ করা যায় না তখন চোখের রং
খ শিশুর পিতার সন্ধান পাওয়া যায়।
র মতে মা ও বাবা উভয়ের চোখের
যদি নীল হয় তাহলে তাদের সন্তানের
নও বাদামী চোখ হয় না।

*

মানুষের সৌন্দর্যের বেশীর ভাগটাই
র্ভর করে মাথার চুল ও চোখের পাতার
র। যার চুলের বাহার যত বেশী আর
খের পাতাগুলি যত বড় বড় হয় তাকেই
দেখতে সুন্দর হয়। সেইজন্য মাথার
উঠে যেতে থাকলে নানারকম তেল ও
ুধের সাহায্যে চুল ওঠা বন্ধ করার
ল প্রচেষ্টা দেখা যায়। সব সময় অবশ্য
ল ও ওষুধে চুল ওঠা বন্ধ করা যায়
কারণ সর্বক্ষেত্রে তেল জলের দোষেই
ওঠে না। ডাঃ স্মিট্ বলেন যে, সহসা
নওরকম মানসিক আঘাত পেলে চুল
ড় যেতে থাকে। তিনি প্রায় ৫০টি
গীকে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এইরকম
াত পাওয়ার জন্য তাদের চুল পড়ে গেছে
শুধু মাথার চুল নয়, চোখের পাতা
ভ্রুর ওপরের লোমও পড়ে গেছে। এই
টি রোগীর মধ্যে ২৩টি রোগীর কোনও
ম শারীরিক বা মানসিক আঘাতেই
পড়ে গেছে।

*

যে সব অক্ষম ও অথর্ব লোক পায়ে
টে চলতে পারে না তারা প্রায়ই চাকা-
লা ইজি চেয়ারে ক'রে ঘুরে ফিরে
য়। এভাবে ঘোরা ফেরা বিশেষ

চক্রদত্ত

অসুবিধাজনক নয় তবে মাঝে মাঝে উঁচু নীচু রাস্তায় এইরকম চেয়ারে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হয়। নতুন ধরনের মোটর চেয়ারে আর কোনও অসুবিধা থাকে না। এতে দুই সিলিণ্ডারের একটা ইঞ্জিন লাগান থাকে। ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ মাইল গতিতে চলে এই মোটর

মোটর চেয়ার

চেয়ারটি শুধু সমতলভূমিতে চলে না, প্রয়োজন হলে উঁচু নীচু রাস্তায় কিংবা অল্প অল্প সিঁড়ি ভেঙেও অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে।

*

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অনেক সময় মেয়েদের গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের রোগীদের জন্য ডাক্তাররা সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন এবং ওষুধ হিসাবে ভিটামিন-"ই", সেক্স হর্মোন ইত্যাদি খাওয়াতে বলেন। আজকালকার ডাক্তাররা কিন্তু এই ধরনের রোগীদের জন্য মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের মতে এইসব মেয়েদের আতঙ্ক, ভয়, লজ্জা কিংবা অবচেতন মনের মা হওয়ার অনিচ্ছাজনিত মানসিক অশান্তির দরুণই গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। ডাঃ জেভার্ট এই মত অনুমোদন করেন এবং তিনি বলেন, মেয়েদের মনের এই ধরনের অশান্তি এড্রিন্যাল গ্রন্থির দ্বারা জরায়ুর ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ডাঃ জেভার্ট ১০০টি মেয়ের গর্ভাবস্থা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এদের ৪২০ বার সন্তান-সম্ভাবনা ঘটে কিন্তু মাত্র ১৫টি শিশুর জন্ম হয়। ডাঃ জেভার্ট এদের মানসিক চিকিৎসা করার পর এই ১০০টি মেয়ে ১২৯ বার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ১১০টি সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছেন।

*

মানুষের জীবনে কখন যে কোন্ বিষয়ে উন্নতি ঘটে তা কেউ সঠিক বলতে পারে না, এর কোনও ধরা বাঁধা নিয়মও হয়তো নেই। বৈজ্ঞানিকরা কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে লক্ষ্য করে একটা মোটামুটি তথ্য বার করেছেন। সাধারণভাবে ৩০ বছর বয়সে মানুষের কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য সর্ব বিষয়ে উন্নতি ঘটে ও সৃজনীশক্তির বিকাশ দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রসায়নবিদ্‌রা ৩০ থেকে ৩৪ বছর বয়সের মধ্যে বড় বড় বিষয় আবিষ্কার করেন। প্রাণীতত্ত্ববিদের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়সের শুরুতেই তাঁদের সমস্ত শক্তির বিকাশ দেখা যায়। অঙ্ক-শাস্ত্রবিদ্‌গণ ৩৫ থেকে ৪০ আর জ্যোতির্বিদ্‌গণ ৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়সের মধ্যে চরম উন্নতি করেন। সাধারণ আবিষ্কর্তারা ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যেই তাঁদের যত আবিষ্কার করে ফেলেন। দার্শনিকরা ৩০ থেকে ৪৪ বছর বয়সের মধ্যে তাঁদের উন্নতি করেন; সাহিত্য, সঙ্গীত এবং কলাবিদ্‌গণ ২২ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যেই তাঁদের সৃজনীশক্তির বিকাশ উপলব্ধি করেন। ধর্মযাজকরা ৬০।৭০ বছর বয়সের সময় তাঁদের উন্নতির চরম বিকাশ লক্ষ্য করেন। সেনা-পতিদের এই বিকাশ ৫৭ থেকে ৬১ বছরে লক্ষ্য করা যায়।

১৪

আমাদের পাটনা যাত্রার পর হইতে স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত এই কয় মাস আমাদের জীবনের ধারাবাহিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পড়িয়া অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপারের খেই হারাইয়া গিয়াছিল। এই কাহিনীতে সে সকল অবান্তর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি অনাবশ্যক কেবল সংক্ষেপে এই আট-নয় মাস কি করিয়া কাটিল তাহার একটা আন্দাজ দিয়া নির্দিষ্ট বিষয়ে ফিরিয়া যাইব।

পাটনায় পৌঁছিয়া দশ বারোদিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল; তারপর একদিন পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পাণ্ডেজী বছর খানেক হইল বদলি হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। সেই যে দুর্গ রহস্য সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তারপর দেখা হয় নাই। পাণ্ডেজী খুশী হইলেন, আমরাও কম খুশী হইলাম না। পাণ্ডেজী মৃত্যু-রহস্যের অগ্রদূত, আমাদের সহিত দেখা হইবার দু' একদিন পরেই একটি রহস্যময় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশকেই সে রহস্য ভেদ করিতে হইল। একদিন সে কাহিনী বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শুধু যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল তাহা নয়, সারা ভারতবর্ষের জীবনে এক মহা সন্ধিক্ষণ দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। স্বাধীনতা আসিতেছে, রক্তাক্ত দেহে বিক্ষত চরণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ভেদ করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা যখন আসিবে হয়তো মুমূর্ষু রক্তহীন দেহে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে প্রত্যেক ভারত-বাসীকে হৃদয়রক্ত নিঙড়াইয়া দিতে হইবে। তবু স্বাধীনতা আসিতেছে; স্বার্থ-নিষ্ঠুর বিদেশী শাসকের খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও হয়তো বাঁচিয়া থাকিবে। আশা আশঙ্কায় কম্পমান সেই দিনগুলির কথা স্মরণ হইলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

একদিন বৈকালে ময়দানে বেড়াইতে বেড়াইতে কৈশোরের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। পরিধানে শেরওয়ানী পায়জামা সত্ত্বেও চিনিতে পারিলাম—স্কুলে যাহার সহিত প্রাণের বন্ধুত্ব ছিল সেই ফজলুল রহমান। দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম এবং সবেগে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলাম।

'ফজলু!'

'অজিত!'

কিছুক্ষণ পরে বাহু বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমি দুই পা পিছাইয়া আসিলাম, ফজলুর দিকে গলা বাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, —'নে ফজলু, ছুরি বার কর। এই গলা বাড়িয়ে রয়েছি।'

ফজলু নিজের হাতের মোটা লাঠিটা আমার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল,—'এই নে লাঠি, বসিয়ে দে আমার মাথায় তোদের অসাধ্য কাজ নেই।'

তারপর আমরা ঘাসের উপর বসিলাম ব্যোমকেশের সহিত ফজলুর পরিচয় করাইয়া দিলাম। ফজলু এখন পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে, প্রচণ্ড পাকিস্তানী। সুতরাং তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল, কেহই কাহাকেও রেয়াৎ করিলাম না। শেষে ফজলু বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, অজিতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, ওর ঘটে কিচ্ছু নেই। কিন্তু আপনি তো বুদ্ধিজীবী মানুষ, আপনি বলুন দেখি দোষ কার—হিন্দুর না মুসলমানের?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার।'

সেদিন বেড়াইয়া ফিরিতে দেরী হইয়া গেল। তারপর আরও কয়েকদিন ফজলুর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের খাওয়াইয়াছিল তারপর—

উন্মত্ত হিংসার পিশাচ-নৃত্য আবার শুরু হইয়া গেল। প্রথমে নোয়াখালি তারপর বিহার। এ লইয়া বাক-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ফজলু এই হিংসা-যজ্ঞে প্রাণ দিল। সে সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষ ছিল, যাহা বিশ্বাস করিত তাহা গলা ছাড়িয়া প্রচার করিত; তাই বোধ হয় তাহাকে প্রাণ দিতে হইল। কিছুদিন পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হইলে আমরা পাটনা

াটিতে ইশাক সাহেবের খোঁজ লইতে রাছিলাম। তিনিও গিয়াছেন; কেবল হার দোকানটা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া াছে। এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ ব কার।

কিন্তু যাক। এবার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতর সঙ্গে ফিরিয়া যাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা ইতে বিকাশ দত্তর চিঠি আসিয়াছিল; বকাশ লিখিয়াছিল—

প্রণাম শতকোটি. পাঁুটিরামের কাছে াপনার ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখছি। আশা করি আপনি শীঘ্রই ফিরবেন।

আমি এখন মাস্টারি করছি। দয়ালহরি মজুমদারের একটা আট-নয় বছরের অকালপক্ক ছেলে আছে, তাকে পড়াই। মাইনে পাঁচ টাকা, সকাল বিকেল পড়াতে যাই। ছেলেটা হাড় বজ্জাৎ; এমন ইঁচড়ে পাকা মিট্‌মিটে শয়তান আমিও আজ পর্যন্ত দেখিনি। বাড়িতে কে কি করছে, কোথায় কি ঘটছে, সব খবর সে রাখে।

দয়ালহরি মজুমদার ঢাকার লোক; সেখানে বীমার দালালী এবং আরও কি কি করত। বছর খানেক আগে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের আঁচ পেয়ে আগে ভাগেই কলকাতা পালিয়ে এসেছিল। মেয়ে এবং ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। লোকটা সন্দিগ্ধ এবং ধাড়িবাজ।

মেয়ে শিউলী শান্ত এবং ভাল মানুষ গোছের। বাইরে থেকে মনে হয় বিদেধরী, কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল গাইতে পারে, রাতদিন গান বাজনা নিয়ে আছে। গ্রামোফোনে গান দিয়েছে, তা ছাড়া টাকা নিয়ে সভাসমিতিতে গাইতে চায়। শিউলীর উপার্জন থেকে বোধ হয় সংসার চলে। বুড়োটা কিছু কাজকর্ম করে না।

আপনি অনাদি হালদার আর প্রভাত এই দুটো নাম মনে রাখতে বলেছিলেন। অনাদি হালদারের খবর পাইনি, প্রভাতের খবর পেয়েছি। কয়েক মাস আগে প্রভাতের সঙ্গে শিউলীর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তারপর সম্বন্ধ ভেঙে যায়। কেন ভেঙে যায় তা জানতে পারিনি, তবে সন্দেহ হয় কোনও গুপ্ত কথা আছে। বিয়ে ভেঙে যাবার আগে প্রভাত ঘন ঘন আসত, বিয়ে ভেঙে যাবার পরও একবার এসেছিল। দয়ালহরি মজুমদার তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

উপস্থিত বাড়িতে একজন লোকের খুব যাতায়াত আছে, তার নাম জগদানন্দ অধিকারী। শিউলীকে গান শেখাবার ছুতো করে আছে। লোকটার মৎলব ভাল নয়। গান শেখানো ছাড়া অন্যভাবে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়।

আপাতত এই পর্যন্ত। নতুন খবর পেলে জানাবেন। আপনি কবে ফিরবেন। আমার ঠিকানা নীচে দিলাম।

প্রণামান্তে বিকাশ দত্ত

বিকাশের চিঠিতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই। আমাদের জানা কথাই পরিকীর্ণ হইয়াছে।

এদিকে পাটনায় আমাদের অনেকদিন হইয়া গেল। কলিকাতায় ফিরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় দিল্লী হইতে ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিল। সর্দার বল্লভভাই পাটেল তাহার সহিত দেখা করিতে চান।

সর্দার বল্লভভাই কি করিয়া ব্যোমকেশের নাম জানিলেন, কেন তাহার সাক্ষাৎ

চান, কিছুই জানা গেল না। রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘন ঘটা, অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে বজ্রবিদ্যুৎ। ব্যোমকেশ আমাকে পাটনায় ফেলিয়া একাকী দিল্লী চলিয়া গেল।

দিল্লী গিয়া ব্যোমকেশ কি করিয়াছিল তাহা পুরোপুরি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সে ফিরিয়া আসিবার পর ইসারা ইংগিতে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করার এ স্থান নয়। দেশ তখনও নিজের হাতে আসে নাই, ইহারই মধ্যে গুপ্ত ঘরভেদীরা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, কে দেশের শত্রু কে মিত্র নিশ্চয়ভাবে জানার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্যোমকেশ চলিয়া গেলে আমি একলা পড়িয়া গেলাম। দূরে রণবাদ্য শুনিয়া আস্তাবলে বাঁধা লড়ায়ে-ঘোড়ার যে অবস্থা হয় আমার অবস্থাও কতকটা সেই রকম দাঁড়াইল। এইভাবে পাটনায় যখন আর মন টিকিল না তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু কলিকাতার বাসা শূন্য। ভাবিয়াছিলাম, নিরিবিলিতে উপন্যাসে মন বসাইতে পারিব, কিন্তু মন বসিতে চাহিল না। প্রভাতের নিকট হইতে টাকা লইয়াছি, একটা কিছু করা দরকার—এই সংকল্পটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল।

একদিন প্রভাতের দোকানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া সে গলা উঁচু করিয়া বলিল,—'পাটনা থেকে কবে ফিরলেন? আমি মাঝে আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম। ইশাক সায়েবের খবর নিয়েছিলেন?'

ইশাক সাহেবের খবর বলিলাম। প্রভাত কিছুক্ষণ অচল হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিল। আমি সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না, আবার দেখা হইবে বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রভাতের চিঠি লইয়া নৃপেন আসিল। চিঠিতে দু'ছত্র লেখা—

মাননীয়েসু, কাল কোনও কথা হইল না, সেজন্য লজ্জিত। ব্যোমকেশবাবু কি ফিরিয়াছেন?

উপন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আশা করি অগ্রসর হইতেছে। ইতি নিবেদক প্রভাত রায়

নৃপেনকে বলিলাম,—'ব্যোমকেশ এখনও ফেরেনি।—আপনি এখনও প্রভাত বাবুর দোকানেই কাজ করছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আছেন কোথায়?'

'পুরোনো বাসাতেই আছি। প্রভাতবাবু থাকতে দিয়েছেন।'

'ননীবালা দেবীর সঙ্গে বেশ বনিবনাও হচ্ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'ওদিকের খবর কি? নিমাই নিতাই?'

'ওরা আদালতের হুকুম পেয়েছে। আমাদের বাসায় অনাদিবাবুর যে সব জিনিস ছিল সব তুলে নিয়ে গেছে, আলমারিও নিয়ে গেছে।'

'পুলিসের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেয়েছেন?'

'কিছু না'

'কেষ্টবাবুর খবর কি?'

'জানি না। সেই যে বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তারপর আর দেখিনি।'

নৃপেন চলিয়া গেল।

উপন্যাস লইয়া বসিলাম। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত, তাহাকে কলমের ডগায় ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। আরও কয়েকদিন ছটফট করিয়া পাটনায় ফিরিয়া গেলাম।

ব্যোমকেশ দিল্লী হইতে ফিরে নাই। গোটা দুই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোস্ট কার্ড আসিয়াছে—ভাল আছি, ভাবনা করিও না কবে ফিরিব স্থিরতা নাই।

এদিকে স্বাধীনতা দিবস অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেশ অভাবনীয় সম্ভাবনার আশায় যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।

অগাস্ট মাসের দশ তারিখে হঠাৎ ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিল।

রোগা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শুষ্ক মুখে বিজয়ীর হাসি। বলিল—'আর না, চল কলকাতায় ফেরা যাক। পুঁটিরামকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দাও।'

(ক্রমশ)

কুমায়ুনে কয়েকদিন

পূর্ণিমা সরকার

কেবল নামের মিষ্টত্বটুকুই যেন আকর্ষণ করল। বেশ নামটি 'রাণী-ক্ষেত"। নামের কাছেই হার মানল সব। সিমলা, দেরাদুন, মুসৌরী সবই বাতিল হল। এদের সঙ্গে সঙ্গে নৈনিতালের নামটারও উল্লেখ হয়েছিল, আর তার পরেই রাণীক্ষেতের নামটা শোনা গেল। কে জানে, কেমন জায়গা! ভাল লাগবে কী না লাগবে, তাও জানি না। স্মৃতির পশরা উজাড় করেও মনে করতে পারলাম না, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ রাণীক্ষেত ঘুরে এসেছেন কি না। তবু ভালো লাগল "রাণীক্ষেত" নামটি। ঠিক করলাম, এবারের শরতের অবকাশে একবার ঐ জায়গাটাই ঘুরে আসব। নামটি কে কখন এবং কেন রেখেছিল জানি না; তবে একটা কিছু কল্পনা করে নেওয়াও কঠিন নয়। হয়তো কোনওদিন কোনও রাণী ঐখানে তাঁর গ্রীষ্মের দিন কটা আরামে কাটিয়ে দিতে তাঁবু গেড়েছিলেন। চারপাশে সিপাই-শান্ত্রী সঙ্গীণ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর চলতি পথিকজনকে সন্ত্রস্ত করে তোলে—"ইয়ে রাণীক্ষেত হ্যায়, হুঁসিয়ার হোকে যাও।" না হয়তা এইসব পাহাড়ী অধিবাসীদের মধ্যে কোনও একজনের মনে কোনও ক্ষণে কাব্যের হাওয়া লেগেছিল; আর তখনই হয়তো সে গেয়েছিল "কুমায়ুনের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" এই তার তীর্থক্ষেত্র, এই তার রাণীক্ষেত্র।

পরে অবশ্য জেনেছি, নামের পিছনে একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে। সত্যসত্যই কোনও রাণী একদা এইস্থানে বসবাস করেছিলেন এবং সেজন্যই এর নাম হয়েছিল রাণীক্ষেত।

শরতের আকাশ ঝলমলিয়ে উঠেছে। সকালে উঠলেই চোখে পড়ে সোনা-গলা রোদে বারান্দা ভরে আছে। এ তো বাঙলা দেশের পুজোর ছুটি নয় যে, মায়ের আগমনের প্রতীক্ষায় ছুটি অপেক্ষা করবে। দিল্লী য়ুনিভার্সিটিতে শারদীয়া ছুটি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়।

১৫ই সেপ্টেম্বর রাতের গাড়িতে রাণীক্ষেতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। পথপ্রদর্শক বন্ধুটি শুরুতেই জানিয়ে দিলেন যে, এপথ দুর্গম না হলেও সুগম নয়। দিল্লী থেকে রাত ৯টার গাড়িতে রওনা হয়ে রাত ২॥টার সময় বেরিলী স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। এখানের যাত্রীশালায় বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে ভোর না হতেই চায়ের সঙ্গে বেশ মোটা-রকম জলযোগ সেরে নিয়ে সকাল ৬টার গাড়িতে চড়লাম কাঠগুদামে যাওয়ার জন্য। কাঠ এখানে সুলভ। এখান থেকেই যত্র-তত্র কাঠ রপ্তানি করা হয়, কাজেই বহু কাঠই গুদামজাত করে রাখা থাকে। সেই কারণেই এই স্থানের নাম হয়েছে কাঠ-গুদাম। কাঠগুদাম থেকে বাসে করে রাণীক্ষেতের পথ ধরতে হলে। স্টেশন থেকে বার হয়েই ডানহাতি বাসের বুকিং অফিস। রাণীক্ষেত আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতি যাওয়ার জন্য ঐ বুকিং অফিস থেকে টিকিট কাটতে হয়। রাণীক্ষেত আর নৈনিতাল যাওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের নিজস্ব বাস প্রতিষ্ঠান আছে—আর আলমোড়া যাওয়ার জন্য বেসরকারী বাস প্রতিষ্ঠান আছে। এইখান থেকেই বাসে চড়ে রাণীক্ষেতের পথ ধরেছি।

পাহাড় কেটে কেটে পথ তৈরী হয়েছে। যদিও উত্তর প্রদেশ সরকারের অধীনের পিচ-ঢালা রাস্তা, কিন্তু যাতায়াত খুব সহজ নয়। বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ক্রমশ এঁকে-বেঁকে চলেছি। যে পথ ফেলে চলে আসছি, সেই পিছনে ফেলে-আসা রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে হয় কত উঁচুতে উঠেছি। কুমায়ুন পর্বতের ছয় হাজার ফুট ওপরে রানীক্ষেত, কাজেই উঠতে হবে অনেক। পাহাড়ে রাস্তা তো আর নিজের সুবিধামত হয় না, যেখানে যেমন পাহাড়, সেইভাবে পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা তৈরী হয়। সুতরাং উঠতে হবে বললেই সোজা উঠে যাওয়া চলে না। কখনও উঠেছি, কখনও নেমেছি। অবশ্য এই উত্থান-পতনের শেষে দেখা গেল যে, ছয় হাজার ফুট উঁচুতেই পৌঁছেছি। পথে কতকগুলি নাম-জানা, না-জানা জায়গায় এসেছি। কোনও কোনও জায়গায় আমাদের বাসখানা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ছুটেছে। রাস্তায় ভাওয়ালীতে আমাদের বাসটা কিছুক্ষণ থামলো। এখানে একটি যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়াম

দীর্ঘল পাইন ও দেওদারের ছায়ায় ঘেরা রাণীক্ষেত

আছে। স্যানাটোরিয়ামের কাছেই আমাদের বাসটা থেমেছিল। স্যানাটোরিয়ামের ভেতরে আমরা যাইনি, কর্তৃপক্ষরা যেতে দেন কী না জানা নেই। বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, তাই দেখলাম। বেশ ঝরঝরে তরতরে জায়গাটি। স্যানাটোরিয়ামটি ঠিক চার হাজার ফুট ওপরে। ভাওয়ালী পৌঁছানর আগে আমরা চড়াইএর পথে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠেছি—আবার উৎরাইএর পথে কিছুটা নেমে এসেছি। ভাওয়ালীতে স্যানাটোরিয়ামের পাশেই ফেরিওয়ালারা বেশ সস্তায় আপেল, ন্যাসপাতি, শশা, পেয়ারা ইত্যাদি বিক্রী করে। সস্তায় এইসব খাদ্যবস্তু পেয়ে আমরা খুবই খুশী হলাম।

বাসে আসতে আসতে অনেক সময় একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁসে আসতে হয়েছে। হাত বাড়িয়ে অনায়াসেই পাহাড়টি ছোঁয়া যাচ্ছিল। এই সেই কুমায়ুন। পাঠ্যাবস্থায় কতদিন ক্লাশে হিমালয়ের এই শাখা পর্বতটার নাম মনে করতে না পেরে পড়া না পারার লজ্জায় চোখে জল এসে যেতো, তখন এটাকে একটা কুগ্রহই মনে হয়েছে। কতদিন অপরিচিত মানচিত্রে এই পাহাড়টি ফুটিয়ে তুলতে কত রং তুলি নিয়ে রং ফলাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পাহাড়টির ওপর বিরক্তি ধরেছে। কে জানতো, এই পাঁশুটে রং-এর নিতান্ত পাথরের স্তূপের স্পর্শ মনে এত পুলকের সঞ্চার করবে। পুলক বিহ্বলভাবেই বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। আমাদের বাসটা একটানা চড়াইএর পথে বেশ কয়েক মাইল দৌড়ে প্রায় দেড়টার সময় "গরম পানি" বলে একটা জায়গায় এসে থামল। লোকমুখে শোনা যায় যে, এক সময় এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল, তাই নাম হয়েছে গরম পানি। নাম যে কারণেই হোক্, আর বাস্তবিক এখানে গরম পানি পাওয়া যায় কি না, তাও জানতে চাই না—শুধু জানলাম যে, গরম পুরী এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। একটি দোকানে ঢুকে আমরা গরম পুরী তরকারী, মাংস ইত্যাদির সাহায্যে জঠরাগ্নি নির্বাপিত করলাম। কাছাকাছি এইরকম অনেকগুলি দোকানেই গরম

বদ্রীনাথ, ক্যামেট, ত্রিশূল নন্দাদেবী, নন্দাকোট ইত্যাদি

পুরী, তরকারী পাওয়া যায়। এখানেও পয়সার অনুপাতে জিনিস অনেক বেশী পাওয়া গেল বলেই মনে হল। 'গরম পানিতে" বিশ্রাম ভবনের পাশেই বাসটা দাঁড়ায়—কাজেই ইচ্ছে হলে একটু মুখ-হাত ধুয়ে নেওয়া যায়।

রানীক্ষেতের ঠিকানা বলতে গেলে উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া জেলার নাম করতে হয়। কাঠগুদাম আর নৈনিতাল থেকে যথাক্রমে আটচল্লিশ আর চৌত্রিশ মাইল ওপরে। এই দুটি জায়গার সঙ্গেই একটি সুন্দর পাহাড়ী পথের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।

এখানে রানীক্ষেতের সঙ্গে সঙ্গে রানীর সহচরীদের নামোল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্তুত অনুসূয়া-প্রিয়ম্বদাকে বাদ দিলে যেমন শকুন্তলাকে সম্পূর্ণাঙ্গ মনে হয় না, রানীক্ষেতও তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। চৌবাতিয়া ও ধূলিক্ষেতসহ রানীক্ষেত লস্কর। সম্পূর্ণ স্থানটি ৬ মাইল লম্বা ও তিন মাইল চওড়া। লস্করটি এখনও সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ সুপরিচিত নয়। ১৮১৪ সালে বৃটিশরা যখন প্রথমে কুমায়ুনে এসে শহর গড়তে শুরু করে, তখনও রাণীক্ষেত সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

নিত্য লীলাময়ী রাণীক্ষেত
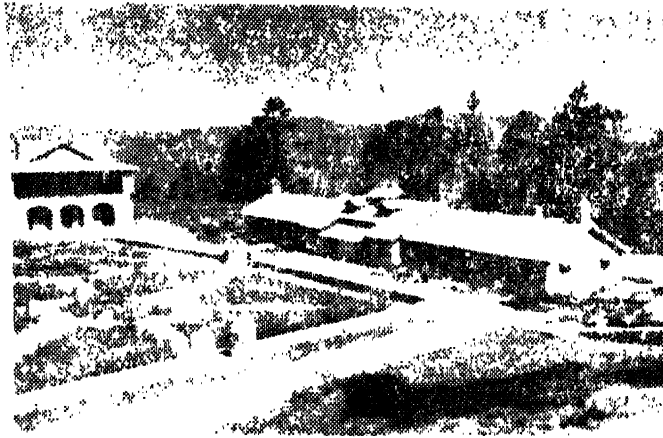
রাণীক্ষেতের পথ আমাদের হাতছানি দেয়

১৮৬৯ সালে এখানে সৈন্যাবাস বা ক্যাণ্টনমেণ্ট তৈরী হয়।

আগেই বলেছি যে, রানীক্ষেত পাহাড়ের উপর ছয় হাজার ফুট উঁচুতে। অবশ্য এখানে কোনও অংশেই যাওয়া খুব কণ্টকর নয়। স্টেশনটি সমতলভূমির ওপর আর রিজের ওপর দিয়ে শহরময় বহু পথ ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে বেশীরভাগ রাস্তাই যানবাহনের যাতায়াত উপযোগী। মিলিটারী শহর; কাজেই এইসব রাস্তাঘাট সদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দীঘল পাইন আর দেওদারের ছায়ায় ঘেরা এইসব সুন্দর সুন্দর পথের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। এ যেন মনে হয় বিধাতা তাঁর সুন্দরী রানীক্ষেতের রমণীয় রূপকে কমনীয় করে তুলতে নানা সাজ-সজ্জায় সুশোভিত করেছেন। আমরা যে কদিন ছিলাম, সময় সুযোগ পেলেই পথে পথে ঘুরেছি। পথ যেন সর্বদা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকতো।

পথ তো পড়ে আছে, হেঁটে যাবো তার বুকের ওপর দিয়ে। কিন্তু এ কি! এত চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গলাম, কৈ আমার সেই অচিন দেশের পথ। রোজ দুবেলা বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে পথ দেখি, আর ভাবি—একদিন যাব ঐ পথে, দেখে আসেবা "এ পথ গেছে কোন্-খানে!" নাঃ, সে পথ আর দেখা হলো না। আমি যত যাই, পথ ততই সরে যায়, আমি শুধু পাক্ খেয়ে খেয়ে অন্য পথে এসে পড়ি। এমনি মর্শোকিল পাহাড়ে পথে হাঁটা। এখানে পথ হারানো খুবই সোজা; কিন্তু তখন আর কোনও কপাল-কুণ্ডলা এসে মিষ্টি করে শুধায় না— "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" রানীক্ষেত জায়গাটা দেরাদুন, মুসৌরীর চেয়েও বিস্তৃত পথও অনেক এদিক-সেদিক দিয়ে বহু পথ এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। পথ চলার আর একটি বিপদ ছিল। আকাশ সব সময় বর্ষণোন্মুখ হয়ে থাকতো, কাজেই সব সময়েই ছাতা কিংবা বর্ষাতি নিয়ে বার হতে হতো। তবু পথে ঘোরার নেশা আমাদের মেটেনি। শুধু পথ কেন ঘরে বসেও একঘেয়ে লাগে না।

নিত্য লীলাময়ী রানীক্ষেত। হয়তো সকালে উঠেই দেখলাম কুলবধূর মত ঘন কুয়াসার ঘোমটা টেনে বসে আছে, আবার বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঘোমটা খসিয়ে দিব্য লাস্যময়ী। আমরা যখন গিয়েছি, তখনও বর্ষা শেষ হয়নি। সাধারণত এখানের আবহাওয়া বেশ খটখটে শুখনা। বছরে পঞ্চাশ ইঞ্চিমত বৃষ্টিপাত হয়। এখানের উত্তাপ খুব বেশী অর্থে ৮৮ ডিগ্রী, আর সর্বনিম্ন অর্থে ২৬ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাসই বেড়াতে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। বর্ষা শুরু হয় জুলাই থেকেই। স্থানীয় লোকেদের কাছে শোনা গেল, এ বছরেই নামি বর্ষা। অন্যান্য বছর এমন সময় মেঘমুক্ত আকাশের কোলে তুষার-মৌলি হিমালয়ের অপূর্ব শোভা রানীক্ষেত থেকে উপভোগ করা যায়। এখান থেকে পূর্ব-পশ্চিমে ১২০ মাইলব্যাপী তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ দৃষ্টি-গোচর হয়। বদ্রীনাথ, ক্যামেট, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পাঞ্চোলী, তিল-কোট, নীলকান্ত ইত্যাদি সর্বসমেত হিমালয়ের ২২টি শৃঙ্গ এখান থেকে দেখা যায়। আমরা অবশ্য একেবারেই বঞ্চিত হইনি। যদিও বেশীরভাগ সময়েই আকাশ অভিমানী কন্যার মত মেঘ থম থমে হয়ে থাকে, কখনও বা রীতিমত বর্ষণমুখর হয়ে ওঠে। প্রায় সব সময় ঝির ঝির করে জল তো ঝরতেই থাকে। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে মেঘের আবরণ সরে গিয়ে যদি কখনও পাহাড়ের মাথায় বরফের দেখা পেয়েছি তাহলে আর উল্লাসের অন্ত নেই। এমন দিনও গেছে যেদিন আকাশ সারাদিনই ক্রন্দসী রাধার রূপ ধরে বসে আছে। সকাল থেকে বহু সাধ্যসাধনা করে বরফ দেখা তো দূরের কথা একটু রোদের আভাসও পাইনি। নিতান্ত হতাশ হয়েই বিছানায় শুয়েছি সে রাত্রে। পরের দিনই কিন্তু আকাশের রূপ অন্যরকম। অভিমানের মেঘ তো সরে গেছেই এমন কি সরমের পাল্লাটুকুও খসে গেছে। এমন দিনেই ভালরকম বরফ দেখা যায়। এখানে বর্ষার রূপও অপূর্ব। ঝাঁপিয়ে যখন বৃষ্টি আসে তখন মনের মধ্যে এক অপরূপ পুলকের সঞ্চার হয়। বৃষ্টির পর পাহাড়ের গায়ে হাল্কা মেঘ আর রোদের খেলা আরও চমৎকার। পাহাড়ের গায়ে সবই তো সবুজে ভরা কিন্তু এমন সময় আমরা দূরে বসে প্রতি স্তরে নতুন নতুন রংএর সমাবেশ দেখি। এখনই যেখানে দেখছি গাঢ় সবুজ, পর মুহূর্তেই সেখানে দেখি হরিৎবর্ণের মাতামাতি। বুঝি সবই 'রৌদ্র ছায়ার খেলা' তবু এই রূপের মাধুরী দেখতে দেখতে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে মাথা স্বতঃই অবনমিত হয়ে আসে।

ঘরে বসে বসে এত শোভা দেখে সময় কাটালে তো চলবে না। আমাদের এই রস-পিপাসু মনের সঙ্গে স্থূল রসের রসিক উদরের সম্বন্ধটা নিতান্ত

তাচ্ছিল্যের নয়। তাই মাঝে মাঝে থলি হাতে বাজারের পথে হাঁটতে হতো আর বাজারের নতুন কপি কড়াইশুটি ইত্যাদি রসনাকেও যেমন লালাসিক্ত করে হৃদয়কেও পুলকিত করে তোলে ততোধিক। অবশ্য বাজারে যাওয়াটা নিতান্তই লোকসানের খাতায় পড়ে না। আমরা বড় পোস্ট অফিসের কাছেই একটি বাংলোতে থাকতাম আর আমাদের বাড়ি থেকে একটু ঘুর পথে বাজার গেলে অনেকগুলি দ্রষ্টব্য-স্থান চোখে পড়ে। আমাদের বাড়ির কাছেই রাণীক্ষেতের সাধারণ ক্লাব। ক্লাবটির নাম 'রাণীক্ষেত ক্লাব' যে কোন বড় শহরের উচ্চস্তরের ক্লাবের মধ্যে অন্যতম বলা যায়। এর মধ্যে টেবিল টেনিস, ইত্যাদি খেলার বন্দোবস্ত আছে বেশ ভালো একটি লাইব্রেরী আছে আর জলসা-অভিনয় ইত্যাদির জন্য একটি বড় হল আছে। বাড়ির কাছেই Conossa Convent স্কুল। বড় পোস্ট অফিস থেকে দেড় মাইলের মধ্যেই রাণীক্ষেতের গল্‌ফ কোর্স। এখানেও একটি সুন্দর ক্লাব আছে এবং ক্লাবের মধ্যে টেনিস্ বিলিয়ার্ড খেলার বন্দোবস্ত আছে। গ্লোব আর নভেলটি সিনেমা হল দুটিও বেশী দূরে নয়। এ ছাড়া রোটারী ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবও আছে। রোজা মেরি, ওয়েস্ট ভিউ ইত্যাদি কয়েকটি খুব ভাল ভাল চড়া হারের হোটেল আছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য বাজারের মধ্যেই কয়েকটি হোটেল দেখা যায়। সেগুলোতে খুব সস্তায় থাকা যায় কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয় না।

রাণীক্ষেতের সমস্ত বাজারটি কার্ট রোডের ওপর। বাজারটি খুব বড় না হলেও নিতন্ত ছোট নয়। প্রয় আধ মাইল-ব্যাপী জায়গা জুড়ে সমস্ত বাজার আর দুটি সব্জী বাজার স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। সব্জীর বাজারের পেছনেই মাংসের দোকান। মাছ এখানে দুষ্প্রাপ্য। মাঝে মাঝে সমতল-ভূমি থেকে মাছ আনা হয়। বাজারের এক প্রান্তে সরকারী ও বেসরকারী বাসের অফিস ঘর আর এক প্রান্তে একটি পোস্ট অফিস বাজারের সীমা নির্দেশ করছে। বাজারের মধ্যের রাস্তাঘাটও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

কাছাকাছির দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে নিয়ে আমরা একদিন চৌবাতিয়া গেলাম। বাজার থেকে সকাল ৯টার বাসে চড়ে ১০॥টার সময় চৌবাতিয়া পৌঁছালাম। এই জায়গাটি প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু। এখানে একহাজার সৈন্যের বাসোপযোগী একটি সুন্দর সৈন্যাবাস আছে। এখানে সৈন্যদের ক্লাব ঘরের সামনের দিকটা সবচেয়ে উঁচু জায়গা, এখান থেকে নন্দা দেবী, ত্রিশূল ইত্যাদি হিমালয়ের শৃঙ্গ দেখা যায়। চৌবাতিয়ার পথেই একটি সরকারী আপেল বাগান আছে। এখানে প্রায় একশ' রকমের আপেল ফলে। সেইসব রক্তবর্ণের আপেলে যখন গাছ ভরে থাকে তখন আপেল বাগানের অপূর্ব সৌন্দর্য খুবেই উপভোগ্য হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য বশত আমরা একটু দেরীতে গিয়েছি। শুনলাম কয়েকদিন আগেই সমস্ত আপেল পেড়ে গুদামজাত করা হয়েছে। এই সব ফল নাকি সারা বছর ধরে বিক্রী করা হবে। আমরা ঘরের মধ্যে গিয়ে আপেলগুলো দেখলাম। একসঙ্গে অত আপেল দেখতেও বড় সুন্দর লাগে। এক এক রকমের আপেল এক একটি খুপরীতে রাখা আছে। আমরা বিভিন্ন জাতের আপেলের নাম জানতে চাইলাম— ডিলিসাস্, জোনাথন, টম্‌কিন, কাণ্টারি, কুইন, ফলপিপন্ ইত্যাদি অনেক নামই বলেছিল, মনে রাখতে পারিনি। আপেল বাগান থেকে বার হয়ে স্থানীয় বাজারটি দেখে জায়গাটির আশপাশ দেখে শুনে আপেল বাগানের ধারে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ২॥টার সময় বাসে উঠে ৩॥টার সময় রাণীক্ষেতে এসে পৌঁছাই। আমাদের বাড়ি থেকে চৌবাতিয়ার পথেই অল্প একটু গেলেই ঝুলা দেবীর মন্দির পাওয়া যায়। চৌবাতিয়ার বাসে যাওয়া যায়।

বন্ধুজন পরামর্শ দিলেন যে, রাণীক্ষেত থেকে বাসে করে কৌশানি বলে একটি জায়গায় যাওয়া যায়; সেখান থেকে হিমালয়ের তুষারাবৃত চূড়াগুলি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। রাণীক্ষেতের ৫৭ মাইল দূরে গরুড় বলে একটি স্থান থেকে পাহাড়ের ওপরের তুষার খুব ভাল দেখা যায়। এখান থেকে আরও সাত মাইল দূরে বহু প্রাচীন (১০০০ বছরের) বৈজুনাথের মন্দির আছে। সেখানে রাত্রিবাসের জন্য পি ডবিউ ডি-র ইন্‌স্পেকশন বাংলো আছে। এরা আরও বলেন যে, ভ্রমণবিলাসী লোকেদের পক্ষে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার নামে ১২০৪৮ ফিট উঁচু জায়গাও দ্রষ্টব্য স্থান বলে বিবেচিত হতে পারে। সম্পূর্ণ
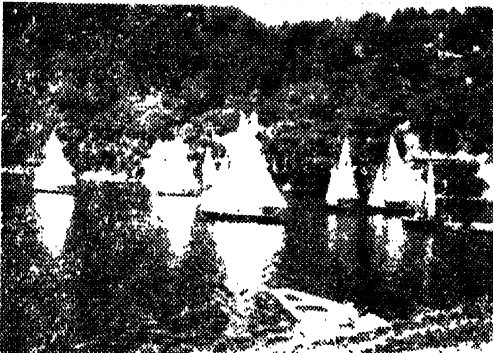
নৈনিতালে নৌকা বিহার

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার

রাণীক্ষেত থেকে তুষারমৌলী হিমালয়ের শোভা

গ্লেসিয়ারটি দু' মাইল লম্বা আর ৪০০ গজ চওড়া। রাণীক্ষেত থেকে মোটর বাসে যাওয়া যায়। তারপরই আসল এ্যাড্‌ভেঞ্চার শুরু। এখান থেকে পদব্রজে যাওয়া আরম্ভ হয়। আট থেকে বারো চৌদ্দ মাইল অন্তর অন্তর ভালো ভালো ডাকবাংলো আছে। দিনে মাইল সাতেক করে হাঁটতে পারলে রাণীক্ষেত থেকে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার-এ গিয়ে ফিরে আসতে অন্তত তের দিন লাগে। সংগে খাদ্যদ্রব্য, রান্নার সাজ-সরঞ্জাম, শয্যাদি সমস্তই নিতে হয়। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরই সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। এইরকম পরামর্শ অনেকের কাছেই পাওয়া গেল কিন্তু কোনটিই আমাদের মনে ধরলো না।

আমাদের অনুজ-প্রতিম শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ, নৈনিতাল যাওয়ার প্রস্তাব করেন। চন্দ্রনাথের প্রস্তাব সাগ্রহে অনুমোদিত হল। কারণ দেখা গেল সকলেরই মন যেন অস্পষ্টভাবে বলছিল "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।" বিদায় বেলায় রাণীক্ষেতকে বড় মধুর মনে হল। রাণীক্ষেতের কাছ থেকে বিদায় নিলাম কিন্তু বিদায় দিলাম না। রাণীক্ষেত তার অপূর্ব সৌন্দর্যসম্ভার সহ আমাদের মনে চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকবে সন্দেহ নেই আর সেই সংগে সংগে একটি সন্ধ্যার স্মৃতিও আমাদের মনে আনন্দের সঞ্চার করবে।

সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফিরছি পথে কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কলগুঞ্জন কানে এল। বাংলা কথা শুনেই বুঝলাম বঙ্গের 'বিবিধ রতন।' বিদেশে দেশের লোকের দর্শন, মনে যে কী পরিমাণ আনন্দ জাগায় তা প্রবাসীমাত্রই বোঝেন। নিতান্ত গায়েপড়া ভাবেই আলাপ করলাম। এ বিষয়ে চন্দ্রনাথই অগ্রণী। যাই হোক্ ঠকতে হয়নি। ভদ্রলোক ও মহিলারা বেশ আলাপী। আলাপ করে জানলাম যে, দলের মধ্যে ছিলেন—সস্ত্রীক ডাক্তার মিত্র, ক্যাপ্টেন বর্ধন ও জুনিয়র ও সিনিয়র মিসেস বানার্জি। গল্পে গল্পে এক-পা একপা করে এগিয়েছিলাম ওদেরই বাড়ির দিকে। ডাঃ মিত্রের বাড়িতে বসেই সেদিনের সন্ধ্যাটি গরম কফি সহযোগে আড্ডা-মুখর করে তোলা হয়েছিল। ডাঃ মিত্র ও ক্যাপ্টেন বর্ধন বহু হাস্যরসাত্মক গল্পে সেদিনের আড্ডায় প্রচুর আনন্দ পরিবেশন করেছিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ভুলে গেলাম যে, মাত্র কয়েক মিনিট আগেও এদের কারো মুখ চেনাও ছিল না। মনে হলো যেন কত পরিচিত। অতি অল্প সময়েই আলাপ হলো। তবু, জীবনে চলার পথে যাদের পেলাম তাদের কোনও দিনই হারাবো না। পরের দিন দুপুর ২॥টার বাসে আমরা নৈনিতালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আবার পার্বত্য পথ। এবার আর উঠছি না। বিসর্পিল পথে ক্রমশ পাক খেয়ে খেয়ে নেমে চলেছি।

ছোট্ট শহর নৈনিতাল। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা নৈনি হ্রদ অর্থাৎ নৈনিতাল, আর এরই চারপাশ ঘিরে শহর গড়ে উঠেছে। হ্রদের একদিকে তল্লীতাল অন্যদিকে মল্লীতাল। 'তল্লী' কথাটির অর্থ নীচু আর 'মল্লী' কথাটির অর্থ উঁচু। অবশ্য সাধারণের চোখে এই উঁচু নীচুর ভেদাভেদ ধরা পড়ে না। তবুও মেনে নিতে হয় কারণ একথা অনস্বীকার্য যে, বহতা হ্রদের জল যে পথে বয়ে যাচ্ছে সেই দিকটাই নীচু। উঁচু নীচুর এই সাধারণ ভেদাভেদ সহজে বোঝা না গেলেও একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, তল্লীতালটি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পাড়া আর মল্লীতালটি তথাকথিত আভিজাতিকদের পাড়া।

রাণীক্ষেত জায়গাটা এক চক্কর ঘুরে দেখলে যেমন মনে হয় একখানা থালার কিনারায় গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জনপদ গড়ে তোলা হয়েছে; মাঝখানে গড়খাইএ শুধু দেওদার আর সাইপ্রাসের বন। নৈনিতাল জায়গাটির ধরন ঠিক উল্টো। এখানে ঐ গড়খাই-এর মধ্যেই শহরটি গড়ে উঠেছে। যেন একটি বাটীর মধ্যে গড়া শহর। অবশ্য পাহাড়ের গায়ে গায়েও অসংখ্য ঘরবাড়ি চোখে পড়ে আর দেখা যায় পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে বেয়ে তাদের যাতায়াতের পথ শহরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করছে। রাণীক্ষেতে যেমন পাহাড়ের ওপর দিয়ে আকাশের দিক দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি মেলে ধরা যায় নৈনিতালে তেমনটি সম্ভব নয়। যে দিকেই তাকাই না কেন পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে দৃষ্টি ফিরে আসে। রাণীক্ষেতে প্রকৃতির যে চঞ্চলা বালিকা মূর্তিটি চোখে পড়েছিল নৈনিতালে এসে সেটি হারিয়ে গেল। এখানে প্রকৃতি রূপসজ্জার ভারে ভারাক্রান্ত কিছু কুণ্ঠিত। রাণীক্ষেতে যেমন শিল্পী আপন মনের মাধুরী দিয়ে খেয়ালখুশি মত রূপ তুলিকার স্পর্শে দুটি একটি মাত্র সাবলীল রেখায় রূপের প্রতিমা গড়েছেন, নৈনিতালে এসে মনে হয় এখানের শিল্পী বড় বেশী সচেতন, তাই বুঝি প্রাণের স্পর্শ জাগেনি, সবই যেন মনে হয় কৃত্রিম। ছোট্ট জায়গার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি প্রচুর বাড়ি, দু'পা এগিয়ে গেলেই বাজার; আরও কিছু এগোলেই অগুন্তি দোকান, হোটেল, ক্লাব সিনেমা সবই চোখে পড়ে। এক লহমাতেই সব দেখা হয়ে যায়, ফুরিয়ে যায় সব। রাণীক্ষেতে উদার উন্মুক্ত পাহাড়ে বেড়িয়ে নৈনিতালে এসে মনে হলো, বেড়ানোর

জায়গা কৈ! বড় সংকীর্ণ। বোধকরি, আমরা দিল্লী থেকে সোজা নৈনিতালে এলে নতুনের আনন্দে মন মেতে উঠতে পারতো। দোতলা বা তিনতলার ঘরে জানলায় বসে বসে গগনচুম্বী পর্বতের ঔদ্ধত্যে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমরা যে রাণীক্ষেত ফেরৎ। সেখানে আমরা যে, উদার ভূধরের স্নেহের উত্তাপ উপভোগ করেছি। রাণীক্ষেতে পথকে আমাদের ভালো লাগতো, পথ আমাদের ডাক দিয়ে নিয়ে যেতো। নৈনিতালে এসে তেমন করে পথের আহ্বান পাই না। তবু সব সময় ঘর ভালো লাগে না বলেই পথে বার হই। পিচ ঢালা সুন্দর বাঁধানো রাস্তা। বৃষ্টির পর পিছলে পড়ার ভয় খুবই বেশী। অবশ্য এখানে শুধুমাত্র নিজের চরণযুগলের ওপরই নির্ভর করতে হয় না। রাস্তায় যানবাহনের অভাব নেই। প্রথমত নৌকার সাহায্যে হ্রদের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দেই পারাপার হওয়া যায়। রাস্তায় সাইকেল রিক্সা সব সময়েই পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে ঘোড়াও ভাড়া করা যায়। হ্রদের বুকে নৌকা বিহার খুবই আনন্দদায়ক। শীতকালের দিনে রোদে পিঠ পেতে দিয়ে হ্রদের ঠান্ডা হাওয়া উপভোগ করতে করতে নৈনিতালের বুকে ভেসে চলার মধ্যে যেমন তৃপ্তি আছে, আবার সন্ধ্যাবেলায় আবছা আলোয় নৌকায় বসে বসে হ্রদের বুকে লক্ষ মানিকের ঝিকিমিকি লক্ষ্য করতে করতে ধীর মন্থর গতিতে নৌকা বেয়ে যাওয়াও তেমনি রোমাঞ্চকর। হ্রদের বুকে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলির বিজলী আলোর প্রতিফলন অপূর্ব মায়ালোকের সৃষ্টি করে। জল কেটে কেটে নৌকা যতই এগিয়ে যায় আলোর ঝিলিক ততই বাড়ে। ঘরে বসে বসেও এই আলোর শোভা দেখতে বড়ই সুন্দর লাগে। এখানে বিদ্যুতের আলোর প্রচলন কাজেই আলোর জ্যোতি খুব বেশী। বহু দূরের বাড়ির আলোও চোখে পড়ে। সন্ধ্যে হতে হতে যখন একটি দুটি করে সমস্ত বাড়ির আলোগুলি স্তরে স্তরে জ্বলে ওঠে তখন মনে হয়, এ কোন্ দীপাবলীর উৎসব লাগলো আজ শহরে।

লোকমুখে শোনা গেল এখান থেকে ৮৫৬৯ ফুট ওপরে 'চীনা পিক' বলে একটি স্থান আছে সেখানে উঠলে না কি
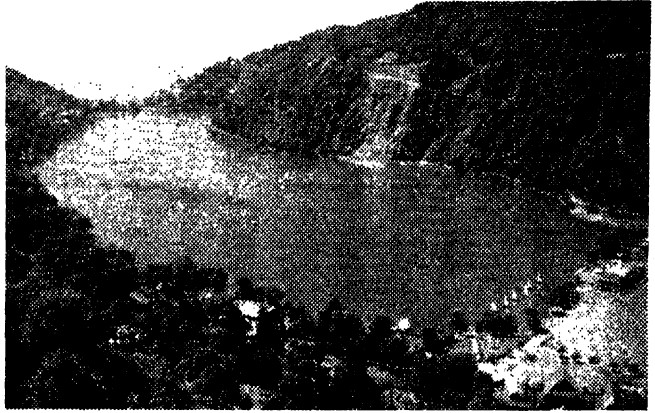
চারদিকে পাহাড়ঘেরা নৈনি হ্রদ আর তারই চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠছে শহর

নগাধিরাজ হিমালয়ের তুষার কিরীটের অনেকটাই দৃষ্টিগোচর হয়। মল্লীতালের ঠিক মাথার ওপরেই চীনা পিক। নৈনিতালের পিচ বাঁধান সমতল রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়ে তৃপ্তি পাই না, রাণীক্ষেতের বন্ধুর পার্বত্য পথে পথে মন কেঁদে বেড়ায়। তাই বলে ৮৫৬৯ ফুট ওপরে পায়ে হেঁটে উঠার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াই স্থির হলো।

পরদিন ভোর থেকেই সাজ সাজ রব উঠলো। এক প্রস্থ চা ইত্যাদি খেয়ে এবং সঙ্গে কিছু খাবার ও জল নিয়ে রীতিমত বীরদর্পে ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হলো। ওমা, একি হলো ঘোড়া ছোটে কৈ? এ ঘোড়া পক্ষীরাজ তো নয়ই টাট্টু ঘোড়াও নয়। মোটেই টগবগিয়ে চলতে পারে না। একেবারে গজেন্দ্র গমনে চলেছে। প্রাণের ভয়েই ধীরে ধীরে চলে নিশ্চয়। পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে সরু এক ফালি বোধকরি ঘোড়ায় চলা পথই তৈরী হয়েছে। তাই ঘোড়াকে ধীর পদবিক্ষেপে চলতে হয়। অন্যমনস্কতার সুযোগে ভুল করে যদি একবার পদস্খলন ঘটে তাহলে বোধহয় জীবনের সব ভুলের শেষ হবে ঐ
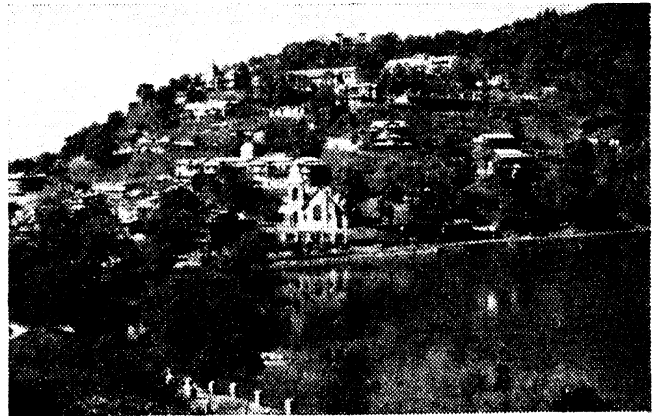
মল্লীতাল

ভুল পদ-বিক্ষেপে। মাঝে একটুখানি পথ মিঠা উৎরাই ছিল। সেই উৎরাইটুকু ঘোড়ার পিঠে চড়ে পার হতে কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠলো। উৎরাইয়ের পথে ঘোড়ায় চড়া যে কী সাংঘাতিক তা ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝা শক্ত। ঐটুকু উৎরাইএর পথ ভেঙেই আমাদের বিশেষ উপলব্ধি ঘটেছিল তাই চীনা পিকে উঠেই ঘোড়া ছেড়ে দিলাম।

চীনা পিকে যেতে হলে যত ভোরে যাত্রা করা যায় ততই ভাল কারণ সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের মাথার তুষার খুব স্পষ্ট দেখা যায়। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের কোলে মেঘ জমতে থাকে। যাই হোক্ চীনা পিকে উঠে আমরা খানিকক্ষণ বরফ দেখার পরই অনুভব করলাম এতখানি পথ এসে যত না ক্লান্ত হয়েছি ক্ষুধার্ত হয়েছি তার চেয়ে বেশী। বিশেষতঃ চা-তৃষ্ণা অদম্য। ঐ স্থানে একটি চা-এর দোকানও আছে। বেশ কষ্ট করেই এখানে চা-এর দোকান চালাতে হয় কারণ এত উঁচুতে জল পাওয়া যায় না, নীচে থেকে জল বয়ে এনে চা বানাতে হয়। চীনা পীকের চেয়ে একটু নীচে পথে আর একটি চা-এর দোকানও আছে। এটা ঠিক দোকান নয়। একটি গৃহস্থ পরিবারই পয়সা নিয়ে চা বানিয়ে দেয়।

চীনা পিক থেকে অল্প নেমে একটু ডানদিক ঘেষে দু-পা গেলেই, একটা জায়গা আছে সেখান থেকে নীচের দিকে তাকালেই রাণীক্ষেত নৈনিতাল ছবির মত দেখা যায়।

চীনা পিকের চেয়ে আর একটু নিচু 'টিফিন টপ' বলে লেকের বাঁদিকে আর একটা জায়গা আছে। এটা ৭৬৭১ ফুট উঁচু। এখান থেকেও হিমালয়ের শোভা কিছু কিছু দেখা যায়। লরিয়া কান্তা (৮১২২ ফুট), ল্যান্ডস্ এন্ড (৬৯৪০ ফুট) ইত্যাদি এইরকম আরও দু-একটি জায়গা আছে।

নৈনিতাল শহরটি সম্পূর্ণভাবে বৃটিশের হাতে গড়া, সেজন্য এখানে সাহেব সুবো এবং সাহেবী ভাবাপন্ন ভারতীয় এবং অন্য দেশীয় লোকেদের বসবাস বেশী। স্থানীয় পাহাড়ী প্রায় নেই বললেই চলে। রাণীক্ষেত, আলমোড়ায় প্রচুর স্থানীয় লোকের বসবাস চোখে পড়ে।

শারদীয়া ছুটির অবসান হতে চলেছে। আমাদেরও বিদায় নেবার সময় এবার হল। বিদায় নিলাম কুমায়ুনে পর্বতের কাছ থেকে। বড় ভালো লেগেছিল কদিন পাহাড়ে। একটুকরো পাথর একটু উঁচুতে রাখা থাকতে দেখলে ভয় পাই। মনে হয় কখন ঐ ভারী পাথরটা মাথায় পড়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। আজ এই বিরাট পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়তো করেই না বরং মনে হয় যেন মূর্তিমান অভয়। মন বলে মাভৈঃ, কী আশ্চর্য উদার, কী মহিমান্বিত।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ২ ॥

সেদিন বেলা এগারটা নাগাদ ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়ে দেখি, আমার কম্পাউণ্ডার কানাই দুটি দেহাতী লোককে রোগীর বেঞ্চে বসিয়ে হাতমুখ নেড়ে খুব লেক্‌চার দিচ্ছে। চোখে-মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। দেখেই বেশ বোঝা গেল, কানাই আজ দুটি রুগী বাগিয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমি ঢুকতেই উঠে বললে—অনেকক্ষণ থেকে স্যার এঁদের আটকে রেখেছি। মজিলপুরে থাকেন, নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদ করেন; আবার এই বারোটার ট্রেনেই ফিরে যাবেন। যদি একটু তাড়াতাড়ি করে স্যার দেখে একটা প্রেসক্রিপশন করে দেন। বলেই আমার খুব কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে ব্যাটা এক নম্বরের ঘুঘু! একটু কড়া করে স্যার টিপতে হবে। তাহলেই ঠিক পয়সা বার করবে সুড়্ সুড়্ করে।

দেখলাম, বছর চৌদ্দ বয়সের একটি ছেলের সঙ্গে একজন বয়স্ক দেহাতী লোক। আমাকে দেখে বয়স্ক লোকটি উঠে দু'হাত জোড় করে বললে—হুজুর! আপনি আমার বাপ-মা! আমার এই ছেলিটিকে বাঁচান।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

উত্তরে লোকটি ছুটে এসে আমার দু' পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে-ককিয়ে যা বললে তার অর্থ হল ঃ—গতকাল থেকে ছেলেটির ইউরিন হচ্ছে না। দু'তিন দিন আগে থেকেই এ কষ্ট চলছিল। গাঁয়ের এক ডাক্তার চার টাকা ফী নিয়ে দু' দিন রবার ক্যাথিটার ঢুকিয়ে দিয়ে ইউরিন বার করে দিয়েছে; কিন্তু আজও আবার দু'টাকা না দিলে সে ক্যাথিটার দিতে পারবে না। কিন্তু ওর কাছে আছে মাত্র একটি টাকা। তাই নিয়ে দু' ক্রোশ পথ হেঁটে ট্রেন ধরে কলকাতায় এসে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল; পথে এই কম্পাউন্ডারবাবু ধরে এনে এইখানে বসিয়েছে। এখন আমি দয়া করে ওর ছেলেটিকে যদি বাঁচাই।

ছেলেটিকে বললাম—চল দেখি ভিতরে।

পেটে হাত দিয়ে দু পা ফাঁক করে অতি কষ্টে এঁকে-বেঁকে ছেলেটি উঠে এল। হাঁটবার রকম দেখেই বেশ বোঝা গেল পেটে কী রকম যন্ত্রণা। পরীক্ষা করে বুঝলাম, এক্ষুণি ক্যাথিটার দেওয়া দরকার। ২৪ ঘণ্টার ওপর ইউরিন বন্ধ; আরও দেরি করলে প্রাণের আশংকা ঘটতে পারে। অবাক হয়ে ভাবলাম এই নিয়ে চার মাইল পথ হেঁটে ও কি করে এল?

ডিস্‌পেন্সারীতে এসব কাজের যে খরচা তার সিকি ভাগও যে দেবে এমন অবস্থা এদের নয়। তা ছাড়া ওষুধের দোকানে এ সব কাজের অসুবিধাও অনেক। তাই ভাবলাম হাসপাতাল তো কাছেই; আজ না হয় এদের নিয়ে আর একবার গেলাম। আর এস কে বলে এর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। এক্ষুণি একটা রিলিফ না দিলে ছেলেটা বিপদে পড়বে।

আর এস মানে রেসিডেণ্ট সার্জেন। হাসপাতালের ভেতরেই তাঁর বাসা; সকাল বিকাল ইন্‌ডোর বেডের রুগী দেখা ছাড়া এমারজেন্সী কাটা-ছেঁড়া করা তাঁর কাজ। কোন ছেলে ফুটবল খেলে পা ভেঙ্গে এসেছে তার প্লাস্টার কর। কে বাজী তৈরী করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে তার ড্রেস কর। কোন গোঁয়ার মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে তা সেলাই কর।

আমাদের ছোট হাসপাতাল; ফ্রী বেড খুব কম। ওষুধটাও কিনে দিতে পারে না এমন রুগী যত কম হয় তত হাসপাতালের পক্ষে ভাল। এই রুগীটির কোন ওষুধ লাগবে না ভেবে বিনা দ্বিধায় আর এস-এর কাছে হাজির করে বললাম—

রিটেনশন অফ ইউরিনের একটা কেস এনেছি; ২৪ ঘণ্টার ওপর পেচ্ছাব বন্ধ; তাই নিয়ে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে এসেছে। এক্ষুণি ক্যাথিটার না দিলে বেচারা মারা পড়বে। তাড়াতাড়ি যদি ভাই এটা একটু করে দাও!

আর এস বললে—এই সামান্য কাজটা স্যার নিজের ডিসপেন্সারীতে করলেই তো পারতেন; কিছু বাণিজ্য হত।

বললাম—তা হত; লাভ না হয়ে কিছু লোকসান হত। গাঁয়ের ডাক্তার দু টাকা ফী নিয়ে ক্যাথিটার দিচ্ছিল; আজ সে টাকা জোগাড় করতে পারে নি বলে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে আমার কাছে এসেছে।

আর এস বললে—বাঃ খাসা একখানা কেস্ বাগিয়েছেন তো? দুদিন ক্যাথিটার দেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে? তাও আবার গাঁয়ে? তাহলে আর দেখতে হবে না; ইনফেকশনটি ঠিক বাধিয়ে এনেছে! যাক ক্যাথিটার আমি পাস করে দিচ্ছি, কিন্তু পেচ্ছাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি পুঁজ বেরোয় তখন কিন্তু ফ্রী বেড দিতে পারব না; আগে থেকেই বলে রাখছি।

বললাম—পাগল নাকি? ফ্রী বেড কে দেবে ওকে? আজকের মত পেচ্ছাবটা তো ভাই করিয়ে দাও তারপর যাক ব্যাটা যেখানে খুশি সেখানে।

ভাগ্যক্রমে তক্ষুণি অন্য কোন অপারেশন ছিল না; ও টি খালি পাওয়া গেল। যে ঘরে অপারেশন করা হয়, তার নাম অপারেশন থিয়েটার। আর এস যেমন রেসিডেণ্ট সার্জন, ও টি তেমনি অপারেশন থিয়েটার। আর যে নার্সের ওপর ও টির ভার, তিনি থিয়েটার সিসটার।

আর এস ছেলেটিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে টেবিলে শুইয়ে ক্যাথিটার রেডি করতে বলে নিজে হাত ধুতে গেল।

ও টির ঠিক পাশেই আর এস-এর বসবার ঘর। যখন কোন কাজ থাকে না, তখন এই ঘরেই আমরা বসি; চা-টা খাই, আড্ডা দিই। আর এস-এর ওপর এই কেসটি চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে এক কাপ চা-এর অর্ডার দিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসলাম।

চা খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু সিনেমা এবং ঘোড়-দৌড়ের খবর তখনও সবটা দেখা হয়নি এমনি সময় থিয়েটার

সিসটার এসে বললে স্যার, আপনার কিসটায় ক্যাথিটার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইউরিন আসছে না। আর এস আপনাকে ডাকছেন।

বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি গিয়ে আর কি করব? রবার ক্যাথিটার না গেলে মেটাল ক্যাথিটার দিতে হবে। ক্যাথিটার গরম জলে ফোটাতে দিন, আমি আসছি।

মেটাল ক্যাথিটার গরম জলে ফুটিয়ে বীজানু শূন্য করতে লাগে ১০।১৫ মিনিট; ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই কাগজ পড়া শেষ করে ও টিতে ঢুকলাম।

আর এস বললে—দেখুন দেখি কোথা থেকে এক আপদ জুটিয়ে এনেছেন, কেবল ভোগাচ্ছে। রবার ক্যাথিটার সবটা ঢোকানো হয়েছে তবু পেচ্ছাব আসছে না। ব্লাডার নিশ্চয়ই ফাঁকা, ভেতরে মাল নেই।

বললাম—ক্যাথিটার ব্লাডারে গেলে তবে তো মাল বেরুবে? রবারের সরু নলতো? ব্লাডারের মুখের কাছে গিয়েই দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, ভেতরে ঢুকছে না। মেটাল ক্যাথিটার দাও দেখবে ঠিক বেরুবে।

সিসটার ইতোমধ্যে মেটাল ক্যাথিটার ফুটিয়ে নিয়ে এল। আর এস আবার হাত ধুয়ে মেটাল ক্যাথিটার মূত্রনালীতে ঢুকিয়ে দিল, তবু কোন ইউরিন এল না। বললাম, ঠিক পথে যাচ্ছে না, আর একবার ট্রাই কর। বার কয়েক ট্রাই করবার ফলে ইউরিন তো এলই না, উল্টে ক্যাথিটারের মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরুতে লাগল।

আর এস বললে—দেখলেন কী হল? এখন ঠ্যালা সামলান।

সামান্য একটা ক্যাথিটার দিতে গিয়ে এ বিপত্তি হবে বুঝলে কে ওকে এখানে নিয়ে আসতো? এখন উপায়?

বললাম—গাঁয়ে তো এ দুদিন ক্যাথিটার বেশ যাচ্ছিল, পেচ্ছাবও হচ্ছিল। তোমরাই রক্ত বার করে ছাড়লে। এখন পেট কেটে সুপ্রা পিউবিক কর।

সুপ্রা পিউবিক মানে তলপেট একটু কেটে ব্লাডার ফুটো করে ক্যাথিটার ঢুকিয়ে দেওয়া। মূত্র নালী দিয়ে ক্যাথিটার ঢোকানো যখন আর যায় না, তখন এই ভাবেই ক্যাথিটার ঢুকিয়ে ইউরিন বার করে দিতে হয়। ছোট অপারেশন; কিন্তু অজ্ঞান করতে হবে বলে রুগীর সম্মতি চাই, অভিভাবকের মত চাই। রুগী তো নিজের যন্ত্রণায় অস্থির; কাটা-ছেঁড়া অজ্ঞান করা সব কিছুতেই রাজী। শুধু চাই কষ্ট দূর করে দাও, তা সে যেমন করেই হোক। বাইরে এসে ওর বাবাকে সব বুঝিয়ে সম্মতিপত্রে টিপসই করিয়ে নিয়ে বললাম, ভয়ের কিছুই নেই, অজ্ঞান করে তলপেট ফুটো করে একটা নল বসিয়ে দেওয়া হবে। তাই দিয়েই দু তিন দিন পেচ্ছাব করবে। তারপর নলটা খুলে নিলে আবার স্বাভাবিকভাবে পেচ্ছাব হবে।

লোকটি বললে—তাহলে বাবু, বাড়ি নিয়ে যাব কি করে?

বললাম—তিন চার দিন এখন হাসপাতালে আসুক। নল খুলে দিলে বাড়ি যাবে।

এমনি সময় আমাদের হাসপাতালের যিনি বড় সার্জন, তিনি হঠাৎ এসে পড়লেন। আজ তাঁর অপারেশন নেই,

আসবার কথাও ছিল না। শালীর বাড়িতে নেমন্তন্ন; এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। একটা অপারেশন রেখেছেন চেম্বারে আজ সন্ধ্যায়; আর এস যাবে, থিয়েটার সিসটার যাবে; সেই কথাই বলতে এসেছেন।

এই সার্জনটির বয়েস কম, কিন্তু হাত-খানি ভারি পাকা। বিলেতের এক হাসপাতালে কাটা-ছেঁড়া করে হাতখানা পাকিয়ে এখানে এসেছেন। এঁকে দেখেই মনে খুব ভরসা হল। বললাম—আপনি এসেছেন না বাঁচিয়েছেন! এক ক্যাথিটার দিতে গিয়েই দেখুন কী কান্ড! একেবারে রক্তারক্তি! এখন সুপ্রা-পিউবিক না করলে আর গতি নেই। চলুন ও টিতে।

সার্জন বললেন—বলেন কি? ক্যাথিটার দেওয়া গেল না?

বললাম—গাঁয়ে তো বেশ দেওয়া যাচ্ছিল, এখানে এসেই সব গড়বড় হয়ে গেল। এখন আপনি ভরসা।

সার্জন বললেন—কিন্তু আমি যে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি; তাও আবার শালীর বাড়িতে। দেরি হলে কি হবে বুঝতেই তো পাচ্ছেন। আচ্ছা, চলুন দেখি।

ও টিতে গিয়ে রুগী পরীক্ষা করে সার্জন বললেন, ব্লাডার তো দেখছি ইউরিনে ভর্তি, যে করেই হোক বার করে দিতেই হয়। ক্যাথিটার বোধ হয় আর দেওয়া যাবে না। তবু দেখি একবার চেষ্টা করে। যদি না যায়, সুপ্রা-পিউবিকই করে দেব। পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না।

এই বলে কোট খুলে হাত ধুয়ে আর একবার ক্যাথিটার দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন—নাঃ, এ আর যাবে না। রাস্তা ছিঁড়ে এখন শুধু রক্ত আসছে। সুপ্রা-পিউবিকই করে দিই। নিন 'আন্ডার' করুন।

আন্ডার করা হল অজ্ঞান করা। ক্লোরোফরম, ইথার অথবা গ্যাস শুঁকিয়ে এমন বেহুঁশ করতে হবে যাতে দেহে ছুরি চালালেও রুগি টের না পায়, ব্যথা না লাগে, 'শক' না হয়। অজ্ঞান করে এই অবস্থায় আনাকে বলে আন্ডার করা। সার্জনের কথামত যিনি অজ্ঞান করবেন, তিনি রুগির চোখ ঢেকে মুখের ওপর তুলোর প্যাড দিয়ে তার ওপর মাস্ক বসিয়ে ইথার ঢালতে লাগলেন।

আবার হাত ধুয়ে রবারের দস্তানা প'রে সার্জন চট করে তৈরি হয়ে নিলেন। ছোট্ট অপারেশন। একটা ছুরি, কাঁচি, গোটা কয়েক ফরসেপস আর সেলাই করবার জিনিস। আর এসও এই সব এগিয়ে দেবার জন্য তৈরি হল।

রুগি আন্ডার হতেই সার্জন ছুরি বসিয়ে দিলেন; দু মিনিটের মধ্যেই ব্লাডার বার করে ফুটো করা হয়ে গেল। এইবার ফোয়ারার মত ইউরিন বেরিয়ে আসবার কথা। কিন্তু একী হল? এক ফোঁটা ইউরিনও তো এল না?

সার্জন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ২৪ ঘণ্টার ওপর ইউরিন হয়নি; গেল কোথায়? পেট অত ফুলে উঠেছে, বাজালে ঢ্যাব ঢ্যাব করে; ভেতরে তা হলে কী? পেট জুড়ে কি একটা টিউমার হয়েছে?

সার্জন ব্লাডারের ভেতর একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে চারদিক ঘেঁটে দেখে বললেন—ইউরিন মোটে জমেইনি ব্লাডারে; সামান্য একটু নীচে পড়ে আছে মাত্র। এটুকু অপারেশনে কিছু বোঝা যাবে না। কি হয়েছে দেখতে হলে বড় করে কেটে সমস্ত পেটটা দেখতে হয় কোথায় কি হয়েছে। আর তা না করে একে ছেড়েই বা দেওয়া যায় কি করে? আচ্ছা ফ্যাসাদ হল তো! সার্জন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

পেট বড় করে কেটে দেখার মানে একটি মেজর এবডমিনাল অপারেশন। এত বড় অপারেশনের জন্য আমরা মোটেই তৈরি ছিলাম না। সার্জন নয়, আর এস নয়, আমিও না। একথা শুনে আমরা পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল যেন গভীর এক গাড্ডায় পড়ে গেছি, কি করে বেরুব বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

এত বড় অপারেশনের আগে রুগীকে তৈরী করতে হয়, স্পেশাল খাট বিছানা ঠিক করতে হয়, ও, টি আলাদা করে সাজাতে হয়। এরজন্য সেসব কিছুই করা হয়নি। তার ওপর রুগীর বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে; তাকেও বোঝাতে হয়। তার মত না থাকলে অপারেশন করা যায় না।

বল্লাম—এখন আর পেট কেটে না দেখে উপায় কি? আপনারা তৈরি হয়ে নিন আমি ওর বাবাকে বুঝিয়ে আসি।

বাইরে এসে দেখি লোকটি বারান্দার এক কোণে চুপ করে বসে আছে। আমাকে দেখেই উঠে হাত জোড় করে বল্লে—হয়ে গেছে বাবু? ভাল আছে তো?

ওকে সব বুঝিয়ে বল্লাম পেট বড় করে কেটে না দেখলে আর ওকে বাঁচানো যাবে না। শুনে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বল্লে—ছেলেটা বাঁচবে তো? ওর মা এসে দেখতে পাবে তো? তারপর বল্লে—আপনি আমার বাপ্ মা, যা ভাল হয় তাই করুন।

অপারেশনের জন্য তৈরি হতেই আধ ঘণ্টার ওপর লাগল। সার্জনের নেমন্তন্ন খাওয়া হল না; টেলিফোন করে জানিয়ে দেওয়া হল যেতে দেরি হবে। অনেক যন্ত্র পাতি, ২।৩ ড্রাম ভর্তি তোয়ালে, গজ

...াদের তুলো সব স্টেরিলাইজড্ করা হল। অপারেশন টেবিলের ওপরের বড় শ্যাডো-লেস্ লাইটটা জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সার্জন আরও দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিলেন। এঁরা তিনজন হাত ধুয়ে, রবারের এপ্রন দস্তানা পরে তারপর সাদা কাপড়ের স্টেরিলাইজড লম্বা জামা পরে নিলেন, মাথায় মুখে কাপড়ের মুখোস পরলেন শুধু চোখ দুটো খোলা রইল। যিনি রুগীকে বেহুঁশ করেছিলেন তিনি অল্প অল্প ইথার শুঁকিয়ে শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। সার্জন অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিয়ে তৈরি হয়ে আসতেই তিনি রুগীকে আবার আণ্ডার করে দিলেন।

অপারেশন আরম্ভ হয়ে গেল। মুখে একটা কাপড়ের মুখোশ পরে আমিও দেখতে লাগলাম। পেটটাকে লম্বা করে কেটে সার্জন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দু ফাঁক করে ফেললেন। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দুটো যন্ত্র ঢুকিয়ে দুহাত দিয়ে টেনে পেটটা ফাঁক করে রাখল। সার্জন ভেতরে হাত দিয়ে একটা একটা করে অর্গান দেখে বল্লেন—ওপরের পেটে পিলে, পাকস্থলী, লিভার কিডনী, ইনটেস্টাইন সব ঠিক আছে। তলপেটে পেলভিসের ভিতর হাত দিয়ে বল্লেন ব্লাডারও ঠিক আছে কিন্তু তার নীচে নরম মত কী যেন একটা হাতে লাগছে পর্দা দিয়ে ঢাকা—কিন্তু টিউমার নয়। পর্দাটা একটু সরাবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ সার্জনের হাতটা পেলভিসের ভেতরে ঢুকে গেল। দেখলাম সার্জনের চোখে যেন একটা অজানা আতঙ্কের ছায়া পড়ল। মনে হল কি যেন একটা ফেটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পেটের ভিতরের গর্তটা শাদা পুঁজের মত একটা তরল পদার্থে ভরে উঠে ফোয়ারার মত উপচে পড়ে রুগীর গায়ের চাদর অপারেশন টেবিল থেকে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যেতে লাগল। একটা কটু দুর্গন্ধে অপারেশন থিয়েটার ভরে গেল। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম।

এ আবার কি হল? এত পুঁজ কোত্থেকে এল? তোয়ালে, গজ, চাদর যা ছিল তা দিয়ে মুছে শেষ করা যাচ্ছে না, এত পুঁজ কোথা থেকে আসছে? সার্জন হিমসিম খেয়ে গেলেন। বল্লেন একটা 'সাকার' থাকলে হত; পাম্প করে তাড়াতাড়ি টেনে সাফ করা যেত। দেখুন তো পালস্ কেমন?

যিনি আণ্ডার করেছেন তিনি বল্লেন খুব ভাল; চালিয়ে যান।

পেটের ভেতর এত পুঁজ এর আগে আমরা কখনও দেখিনি; আর সে কী দুর্গন্ধ! অপারেশন থিয়েটার ছাপিয়ে এ দুর্গন্ধ হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে একতলা দোতলা তিন তলায় ছড়িয়ে গেল। রুগীরা থাকতে না পেরে নাকে কপড় দিয়ে উঠে বস্ল। ভয় পেয়ে একজন নার্স তাড়াতাড়ি সুপারিটেন্ডেণ্টকে ফোন করে দিল। তিনি সবে খেতে বসেছিলেন, খাওয়া ফেলে গাড়ি ছুটিয়ে তাড়াতাড়ি এসে গেলেন। হাসপাতালে ঢুকতেই ঐ গন্ধ তাঁর নাকে ভক্ করে ঢুকলো।

ইনি যখন ও, টিতে এলেন ততক্ষণে সার্জন দুটি ড্রাম ভর্তি তুলো গজ ভিজিয়ে পেটের ভিতরটা কোনরকমে পরিষ্কার করেছেন। তখন বোঝা গেল ব্লাডারের পেছনে একটি বি, কোলাই এবসেস্ হয়েছিল; তাই ফেটে এত পুঁজ। ভেতরটা ভাল করে ধুয়ে মুছে আবার সেলাই করে দেওয়া হল। পাঁচ মিনিটের অপারেশন অবশেষে তিন ঘণ্টায় শেষ হল।

আর, এস বল্লে—আচ্ছা কেস্ একটি এনেছিলেন বটে!

বল্লাম—তোমরা তো খুব লাকি! পঞ্চাশ বছর বয়সে আমি যা দেখিনি পঁচিশ বছরেই তা দেখে নিলে। এইবারে চা-টা আনবার ব্যবস্থা কর।

ও, টি থেকে বেরুতেই রুগীর বাবা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ বাবু! ওর পেট থেকে নাকি গামলা গামলা পুঁজ বেরিয়েছে তাই এত দুর্গন্ধ? বাঁচবে তো?

বল্লাম—বাঁচবে বই কি। সেই জন্যই তো অপারেশন করা হল।

এমনি সময়ে স্ট্রেচারে করে ছেলেটিকে ও, টি থেকে ওয়ার্ডে এনে ওর নির্দিষ্ট বেডে শুইয়ে দেওয়া হল। ওর বাবাকে পাশে একটা টুলে বসতে বলে সার্জনের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। সার্জন গেলেন বেলা তিনটের সময় নেমন্তন্ন রক্ষা করতে; আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার সময় হাসপাতালে গিয়ে শুনি ছেলেটির পালস্ খারাপের দিকে; সার্জনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তক্ষুণি অক্সিজেন দেওয়া হল; সেলাইন গ্লুকোজ ফোঁটা ফোঁটা করে উপশিরার ভেতর ইনজেকশন করে চালিয়ে দেওয়া হল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সার্জন এসে গেলেন। রুগীর অবস্থা দেখে সেই যে আটকে পড়লেন রাত দুটোর আগে আর উঠতে পারলেন না। সন্ধ্যার সময় চেম্বারে যে অপারেশন করবেন ঠিক ছিল তা ফোন করে বন্ধ করে দিলেন। দেখলেন রুগীকে রক্ত দেওয়া দরকার; ডোনার নেই; রুগীর টাকাও নেই। কি করা যায়? মনে পড়ল ব্লাড-ব্যাঙ্কে আছে এক ডাক্তার বন্ধু। ছুটলেন গাড়ি নিয়ে তার কাছে; পরের দিন ডোনার জোগাড় করে দেবেন বলে নিয়ে এলেন এক বোতল ব্লাড। রুগীকে বাঁচাতে হলে অনেক দামী অষুধ দরকার এক্ষুণি। কোথায় টাকা? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ফোন করে হাসপাতালের ফাণ্ড থেকে টাকা দেবার হুকুম বার করে নিলেন।

তারপর শুরু হল লড়াই। থেকে থেকে রুগীর নাড়ী দেখ্ছেন আর একটা করে ইন্জেকশন দিতে বল্ছেন। আর এস অষুধ নিয়ে সিরিঞ্জ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে—বল্তে না বল্তে ইন্জেকশন দিচ্ছে, কখনও চামড়ার নিচে, কখনও মাংসের ভেতর কখনও বা উপশিরারর মধ্যে। ব্লাড দেওয়া শেষ হল; আবার স্যালাইন চালাও। স্যালাইন যাচ্ছে না; উপশিরা পাওয়া যাচ্ছে না; চামড়া কেটে উপশিরা বার করে তার মধ্যে ইন্জেকশনের নিড্‌ল চালিয়ে দিলেন। হাসপাতালের নার্স ডাক্তার সব সেদিন এই একটি রুগী নিয়ে মেতে গেল; যেমন করেই হোক একে বাঁচাবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি হতে দেবে না। রাত বারটার সময় অবস্থা একটু ভালোর দিকে দেখে আমি উঠে এলাম, কিন্তু সার্জন নড়লেন না।

আর. এস বল্লে—এঁর জন্যই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ; ওঁকে ছাড়বেন না।

পরদিন হাসপাতালে যেতেই আর, এস্ বল্লে—কাল রাত দুটো পর্যন্ত ভুগিয়ে আপনার রুগী এখন ভাল আছে। যান দেখে আসুন।

গিয়ে দেখি নাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল। খুব ঘুমুচ্ছে। সেই থেকে ভালোর দিকে গিয়ে দিন দশেক পরে জ্বর ছাড়ল। তারপর আরও কয়েকদিন পরে সেলাই জুড়ে গেল। মাসখানেক থাকবার পর যেদিন ছুটি দেওয়া হবে ঠিক হল সেদিন থেকেই আবার হঠাৎ ওর জ্বর হল। সঙ্গে কোমরের কাছে একটা জায়গা ফুলে ব্যথা হল। পরে বোঝা গেল পেটের মধ্যে যে পুঁজ ছড়িয়ে পড়েছিল তার কিছুটা এই পথে বেরুচ্ছে। আবার এটা কাটতে হল।

আরও মাসখানেক পর আর এস একদিন বল্লে—আর তো পারি না মশাই, কী এক রুগী দিয়েছেন, জ্বালিয়ে খেলে।

কেন কি হয়েছে?

যখনি ঠিক করি ওকে ছুটি দেব তক্ষুণি আবার একটা জায়গা ফুলে ওঠে; কাটতে হয়। আবার একটি মাস বেডটা আটকে থাকে। তার ওপর অষুধের খরচা; প্রায় শ' দুই টাকার অষুধ খরচা হয়ে গেছে। আপনার রুগী কখনও নেব না।

এমনি করে মাস তিনেক কাটিয়ে অবশেষে একদিন ওর ছুটি হল। সবাইকে প্রণাম করে হাসিমুখে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে; ওর কথা ভুলেই গেছি। একদিন সকালে ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে দেখি ছেলেটি বাবার সঙ্গে বসে আছে। আমি যেতেই আমাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। দেখলাম এ ক'মাসেই বেশ বড়সড় হয়েছে, জোয়ান দেখাচ্ছে। মুখে গোঁফ দাড়ির রেখা উঠেছে। রং তামাটে হয়েছে।

আমার কম্পাউণ্ডার কানাই দেখলাম গম্ভীর হয়ে বসে আছে, মুখে বিরক্তি। মনে হল যেন খুব রেগে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে কানাই?

কানাই যেন ফেটে পড়ল; বল্লে—ব্যাটা আপনার জন্য ভিজিট এনেছে। দেখুন সেই ভিজিট। বলে কাউণ্টারের পাশ থেকে তুলে উঁচু করে দেখালে ছোট্ট একটা মান কচু। বললে—দেখলেন ব্যাটার আক্কেল?

লোকটি বল্লে—আমার বাড়ির গাছ হুজুর। খেতে খুব মিষ্টি।

বল্লাম—ছেলে তো বেশ জোয়া হয়েছে দেখছি। কাজকর্ম করছে? শরী বেশ ভাল? পেট আবার ফোলেনি তো?

লোকটি বল্লে—সেইজন্যই হুজু আপনার কাছে আসা। আপনি ওর প্রা দিয়েছেন। আমরা চাষাভুষা লোক; খে খাই। আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

বল্লাম—আবার কী হল? একট উদ্বিগ্নও হলাম।

লোকটি আমার হাত জড়িয়ে বললে—আপনি ওর প্রাণ দিয়েছেন, এবার হুজু ওর একটা চাকরি করে দিন।
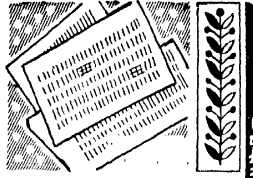
॥ ১৬ ॥

এই জীবনে সাংবাদিকতায় আমরা অঞ্জলি নিবেদন করেছি। আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে এই নিবেদন সার্থক করার চেষ্টা করেছি আজীবন। কিন্তু শুধু নিজের দায় নিয়েই খুশি থাকতে পারিনি, আরো অনেক সংখ্যক সাংবাদিক গড়ার দিকেও মন দিয়েছি। হাতে-কলমে যাঁদের কাজ শিখিয়েছি, আজ তাঁদের অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁদের গৌরবে নিজের গৌরব অনুভব করেছি সর্বদা।

'বেঙ্গলী' ও 'ডেইলি নিউজে' যখন কাজ করতাম, তখন স্বর্গীয় কে সি সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেখনকার দিনে তিনি ছিলেন প্রথিতযশা সাংবাদিক। অমায়িক মধুর ছিল তাঁর স্বভাব, সুন্দর নির্মল ছিল চরিত্র। তরুণ সাংবাদিকদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর আন্তরিকতা নিয়ে তিনি মিশতেন। অনেক ছাত্রকেই তিনি উচ্চতর পদ বা চাকুরি দিয়ে জীবনের সংস্থান করে দিয়েছেন।

ফ্রী প্রেসের প্রথম পর্বে একমাত্র টাইপিস্ট নিয়ে আমি অফিস চালাই। রাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম। সে সময় সরকার মশাই একটি ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। এম এ, বি এল পাশ করে ওকালতি আরম্ভ করেছিল ছেলেটি। কিন্তু তাতে মন লাগে নি। মন ছিল সাংবাদিকতার দিকে। নাম চারু সরকার। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আমার কাছে সাংবাদিকতা শেখার।

তৎক্ষণাৎ আমি সম্মতি জানালাম। পরের দিনই কাজে যোগ দিলেন চারু। প্রথম প্রথম ডিক্টেশন দিতাম, সংবাদ সংক্ষিপ্তকরণের কৌশল শিখিয়ে দিতাম। বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ ছেলে চারু। তাঁর হাতের লেখা সুন্দর। ইংরেজি ভাষার ওপর বিশেষ অনুরাগ। মুখে মুখে যা বলতাম, শর্টহ্যাণ্ডের মতো লিখে নিয়ে টাইপ করে দিতে পারতেন। স্বল্প দিনের মধ্যেই উপযুক্ত সাংবাদিক হয়ে উঠলেন তিনি। সদানন্দকে বলে মাত্র ত্রিশ টাকা তাঁকে মাইনে করে দিতে পেরেছিলাম। ফ্রী প্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে আসার সময় চারুর কাছেই কাজ বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। পরে তিনি এবং অন্যান্য সকল সহকর্মীরাই ইউনাইটেড প্রেসে যোগদান করেছিলেন।

স্বর্গীয় হরিদাস হালদার সে যুগে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। কালিঘাটের 'সেবাইত' হয়েও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর তিনি বন্ধু ছিলেন। 'সার্ভেণ্ট' অফিসে তিনি নিয়মিতভাবে যেতেন।

ফ্রী প্রেস যখন বড়ো হয়ে উঠেছে, আমি তখন পরেশনাথ মন্দিরের কাছে থাকি। একদিন সকালে সে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন হালদার মশাই, সঙ্গে একটি লাজুক ধরনের স্নিগ্ধ চেহারার ছেলে। হালদার মশাই বললেন, এই ছেলেটি তাঁর নাতি। নাম সরোজ চক্রবর্তী। সম্প্রতি ম্যাট্রিক পাশ করে আই এ পড়ছিল, সাধারণ লেখাপড়া শেখার মতো সংস্থান নেই বলে শর্টহ্যাণ্ড শিখছে। তিনি জানালেন, এই ছেলেটিকে রিপোর্টারের কাজ শিখিয়ে মানুষ করে দিতে পারলে তিনি উপকৃত হবেন।

সরোজকে দেখে আমার কেমন মায়া হলো। তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাজুক স্বভাব তাঁর। ঠিকমতো জবাব পেলাম না। তবু তাঁকে কাজ শেখাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম হালদার মশাইকে।

কিছুদিন পরে সরোজ কাজে যোগ দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ঠিকঠাক সব শিখে গেলেন। তাঁর হাতের লেখা খুব খারাপ, প্রায় পড়াই যায় না। কিন্তু ভালো টাইপ করতে জানতেন, দ্রুত নোট নিতে পারতেন শর্টহ্যাণ্ডে। চারুরও তাঁকে ভালো লেগেছিল।

আমার বন্ধু স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টির খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন। ইউনাইটেড প্রেসের প্রথম যুগে দিল্লী ও সিমলার সরকারী সংবাদ তিনি সংগ্রহ করে দিতেন। নানাভাবে তিনি আমাদের সহায়তা করতেন। তারপর তিনি ইউ পি'র ডিরেক্টর হয়েছিলেন। সে সময় তিনি প্রায়ই আসতেন আমাদের অফিসে। চারু ও সরোজকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন তিনি। তাঁদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল।

বেঙ্গল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। প্রথমেই তাঁর পি-এ'র পদে চাইলেন সরোজকে। সরোজ তখন দক্ষ সাংবাদিক। নানাবিধ গুণসম্পন্ন। তাঁকে ছেড়ে দিলে আমার অসুবিধে ঘটবে বিস্তর। কিন্তু সরকারী চাকুরি ও মাহিনার দিকে তাকিয়ে সত্যেন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধ মেনে নিলাম। এখন সরোজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ আস্থাভাজন পি এ।

চারুকেও সত্যেনবাবু নিয়ে গেলেন। ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা হয়, তা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করার জন্য একটি সরকারী বিভাগ আছে। এই পুস্তিকা সম্পাদনা করার একটা নতুন পদ সৃষ্টি করে সত্যেনবাবু চারুকে ডাকলেন। এই পদে চারুর ভবিষ্যৎ থাকতে পারে ভেবে আমি অনুরোধ মেনে নিলাম। নিজের হাতে যাঁদের গড়ে তুলেছি, তাঁদের প্রাত্যহিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হলাম

আমরা। তবু খুশি হয়েছি, তাঁরা উন্নতি করতে পারবেন এ সম্পর্কে নির্দ্বিধা হয়ে।

কে সি সরকার মশাই নিজের বাড়িতে একটা শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শেখার স্কুল করেছিলেন। অনেক নতুন সাংবাদিক ও বেকার যুবক তাঁর স্কুলে শিক্ষালাভ করতেন। একদা এই স্কুলের বার্ষিক অধিবেশনে স্টেটসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভারতবন্ধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবকে সভাপতি ও আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আহ্বান করা হয়। সে সভায় অনিল দাস নামক একটি যুবক আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাঁর ব্যবহারে এমন একটা দীপ্তি ছিল যে, আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বিখ্যাত দেশকর্মী পুলিন দাসের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র; বি এ পাশ করে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শিখছিলেন। সরকার মশাই অনিলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, আমার কাছে তাঁর অনুরোধ ছিল যেন অনিলের একটা ভাল ব্যবস্থা করে দিই। তখন হঠাৎ আমাদের দিল্লী ও সিমলা অফিসের জন্য এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের বক্তৃতা রিপোর্ট করার প্রয়োজনে একটি দক্ষ সাংবাদিকের দরকার পড়েছিল। অল্প কয়দিন অনিলকে কাজ দেখিয়ে দিল্লী পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। পি ডি শর্মা ছিলেন দিল্লী অফিসের সম্পাদক। তিনি পদত্যাগ করে চলে গেলে অনিল দিল্লীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে 'নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনে' তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টি ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। সুরেশবাবু তাঁকে ভালো মাহিনা, বাড়ি ও এলাওয়েন্স দিয়ে দিল্লীতে 'বিশেষ প্রতিনিধি' নিযুক্ত করেন।

অনিল যখন আনন্দবাজারে চলে যাবেন বলে স্থির করেছেন ঠিক সেই সময়ই চারু এসে আমাকে বিপন্মুক্ত করেন। সরকারী কাজে তখনও তিনি 'পার্মানেন্ট' হন নি, 'গ্রেডের'ও উন্নতি ঘটে নি। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পরলোকগমনে সে পদে তাঁর আকর্ষণও ছিল না। তিনি ফিরে এলেন ইউনাইটেড প্রেসে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে দিল্লী অফিসের সম্পাদক নিযুক্ত করলাম। দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্যে দিনের পর দিন তিনি প্রোজ্জ্বল হয়েছেন। দিল্লীর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি এখন প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন, এর জন্য আমি গর্ব ও আনন্দ অনুভব করি।

ইউনাইটেড প্রেস কর্মসাধনায় এখন এগিয়ে চলেছে। কাছের ও দূরের বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক। এই কর্মচক্রের রথ বহু প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকের সমবেত সহযোগিতায় দ্রুত সঞ্চারশীল। কিন্তু তার যাত্রারম্ভের দিনে অখ্যাতি ও দারিদ্র্যকে ব্রত করে তরুণ সাংবাদিক যাঁরা এসেছিলেন রথের রশিতে টান দিতে, আমার স্মৃতিকোঠায় তাঁরা উজ্জ্বল।

জ্যোতি দেব ইউনাইটেড প্রেসের আর একজন বিশেষ গুণসম্পন্ন সাংবাদিক। বোম্বে অফিসের সম্পাদকরূপে তিনি অপরিসীম যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ত্রিপুরা জেলায় তাঁর বাড়ি। 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার' কাজে আমার সহকর্মী ছিলেন। অবস্থার চাপে তিনি এম এ পড়তে পারছিলেন না। আমার বন্ধু অধ্যাপক জগৎচন্দ্র পালের সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন কাজের প্রার্থনা জানাতে। টাইপরাইটিং শিখে তখন তিনি শর্টহ্যান্ড শিখছিলেন। কলকাতা অফিসে কিছুদিন কাজ শিখিয়ে তাঁকে দিল্লীতে পাঠি[য়ে] দিয়েছিলাম। জ্যোতি বুদ্ধিমান [ও] উদ্যোগী ছেলে, মাত্র ৪০ বেতনে দিল্লী যেতে আপত্তি করেন নি। দু' বৎসর পর যখন মাইনে ৬০ টাকা হয়েছে, তখ[ন] বোম্বে অফিসে স্থানান্তরিত হলেন।

জ্যোতির জীবনে সুদক্ষ সাংবাদি[ক] হবার একটা সচেতন চেষ্টা ছিল। প্রতিদি[ন] দৈনিক পত্রিকা খুব খুঁটিয়ে পড়তে[ন] তিনি, কোনদিন তাতে শৈথিল্য ছিল না। ছাত্রের মতো একাগ্র সাধনা ও ধৈর্য নিয়ে প্রাত্যহিক কর্মযাপনে সাংবাদিকতার শিক্ষা নিতেন। অবসর পেলেই দিল্লীর স্টেটসম্যা[ন] অফিসে অথবা বাঙালীদের ক্লাবে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি[দের] সঙ্গে পরিচিত হওয়াও তাঁর আ[র] একটা নেশা ছিল। তাঁর সংগৃহীত Exclusive খবর বহুবার প্রশংসি[ত] হয়েছে।

কিছুকাল পরে তিনি বোম্বে অফিসে সম্পাদক পদে মনোনীত হন। বোম্বে অফিসের সাফল্য তাঁর নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। ইউনাইটেড প্রেসে বিদেশী সংবাদের সুব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে বিলেতে পাঠান হয়। লন্ডন থেকে প্রেরিত তাঁর সাপ্তাহিক সংবাদগুলি দেশে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে; আইরিশ নেত[া]

ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি চমৎকার 'Exclusive interview' পাঠিয়ে সাংবাদিক মহলে যশস্বী হয়েছিলেন।

লেখক হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান। ১৯৪২ সালে একটি সুন্দর বই রচনা করেন, 'Blood and Tears'। বিলেত ঘুরে এসে লেখেন 'I cover Europe'। লেখার ওপর দখল আছে তাঁর, আর আছে দেখার মতো চোখ। যা দেখেছেন তা লিখেছেন, কিন্তু লেখা আর দেখার গুণে তাঁর রচনা হয়েছে মনোরম। মনের মধ্যে তা গুঞ্জন তুলে যায়।

॥ ১৭ ॥

জাতীয়তাবাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘদিন এই সাধনা আমার। জীবনের একমাত্র ব্রত। দেশের প্রতি প্রত্যন্তে সংবাদদাতা গঠন করেছি, তরুণ সাংবাদিকদের শিক্ষা দিয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করেছি। আর করেছি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের কাছে আমাদের সংবাদ বিতরণ করার অধিকার অর্জন। তার জন্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে প্রত্যেকটি বৃহত্তর নগরীতে আমাদের শাখা অফিস।

দিন রাত শুধু একমাত্র ধ্যান, একমাত্র ব্রত। জীবনের মধ্যাহ্নে যে দায়িত্ব নিয়েছি স্বেচ্ছায়, তাকে পূর্ণতর মর্যাদা দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করে যাবো। তার জন্যে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ভারতের নানা স্থানে, সহায়তা ভিক্ষা করেছি নানাজনের। কোথায়ও নিরাশ হয়েছি, কোথায়ও পূর্ণ হয়েছে আশা। তবু পথচ্যুত হই নি।

জাতীয়তাবাদী সকল সংবাদপত্রের কাছেই অল্পাধিক সহায়তা পেয়েছি সব সময়। কিন্তু স্টেটসম্যান ব্রিটিশ স্বার্থের ধ্বজাবাহী। তবু তাঁদের কাছে সংবাদ বিক্রয়ের চেষ্টা করেছি। কেননা নানা কারণে এই পত্রিকার গুরুত্ব সমধিক।

তখন আর্থার মুর ছিলেন স্টেটস-ম্যানের সম্পাদক। 'ভারতবন্ধু' এই পত্রিকার কণ্ঠ চিরকালই ভারতীয় স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু মুর সাহেব ছিলেন যথার্থই ভারতের বন্ধু।

একদিন সাক্ষাৎ করতে গেলাম আর্থার মুরের সঙ্গে। অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা হলো। মাসিক পাঁচ শ' টাকা দিয়ে আমাদের সংবাদ নিতে তিনি রাজী হলেন। পরাধীনতা যখন দেশকে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধেছে, তখন আমলাতন্ত্রের রক্ষক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকের ঘরে সেদিন যে সহৃদয়তা পেয়েছিলাম, তা অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়।

কিন্তু স্টেটসম্যানের বার্তা-সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আমাদের শুভা-কাঙ্ক্ষী ছিলেন না। একটা সুযোগ তৈরি করে ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদ নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। কর্তৃপক্ষের আপত্তির ফলে সম্পাদক আর্থার মুর চেষ্টা করেও এই নির্দেশ পাল্টাতে পারলেন না। তখন তিনি ব্যবস্থা করলেন, আমাদের পরিবেশিত সংবাদ থেকে স্টেটসম্যানের পছন্দানুযায়ী খবর তাঁরা প্রকাশ করবেন। এর জন্য মূল্য নির্ধারিত হলো কলম পিছু ষোল টাকা।

কিছুকাল পরে আর্থার মুর মত-দ্বৈধতার জন্য পদত্যাগ করে চলে যান। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন আয়ান স্টিভেন।

মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন স্টিভেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ভারতীয় প্রাণায়ামে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি ছিলেন নিরামিষ ভোজী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম।

হাসি, সৌজন্য ও সহানুভূতি দিয়ে তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ আচরণ একান্তই ছদ্মবেশ। নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো।

কিছুকাল পরে দিল্লী সংস্করণের সম্পাদক কার্টনার কলকাতা এলেন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে। যুদ্ধের আমলে ভারত সরকারের 'প্রিন্সিপাল প্রেস এডভাইসার' ছিলেন তিনি, তখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

একদিন গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। স্টিভেন তখন ছুটিতে। সেই আর্থার মুরের মতো সহৃদয়তা তাঁর। সাড়ে সাত শ' টাকা দিয়ে আমাদের সংবাদ নেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। সহানুভূতি তাঁর সব ব্যবহারে। জানালেন আমাদের টেলিপ্রিন্টার চালু হলে অন্যান্য পত্রিকার সমান টাকা দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত করার আগেই তিনি পদত্যাগ করে চলে গেছেন।

এমনিভাবে দিনের পর দিন সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

বি জি হর্নিম্যান ও এস এ ব্রেলভী ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দু'জন স্মরণীয় পুরুষ। জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও তেজস্বিতায় দু'জনই প্রখর ব্যক্তিত্ব-শালী। দু'জনই ক্রমান্বয়ে বোম্বে নগরীর বিখ্যাত দৈনিকপত্র 'বোম্বে ক্রনিকলের' সম্পাদনা করেছেন।

আমাদের বোম্বে সংবাদদাতা জানিয়ে-ছিলেন, যদি আমরা ১৫ দিন পরীক্ষা-মূলকভাবে 'বোম্বে ক্রনিকলে' সংবাদ পরিবেশন করি, তাহলে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে তাঁরা আমাদের সার্ভিস নেবার ব্যবস্থা করবেন। এই মনোভাব শোনার পর একদিন ব্রেলভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি সহৃদয়তা নিয়ে আমার বক্তব্য শুনেন। তারপর কর্তৃপক্ষের কাছে আমার দাবীকৃত টাকার জন্য সুপারিশ করেন।

মিঃ কামা ছিলেন 'বোম্বে ক্রনিকলের' ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে একদিন হর্নিম্যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রীতি ও বন্ধুত্বের আন্তরিকতা নিয়ে তিনি আমাকে গ্রহণ করেন। ফ্রী প্রেস বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তাঁর মর্মবেদনা ছিল, একটি জাতীয়তা-বাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়ো-জনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতেন।

নির্দিষ্ট দিনে মিঃ কামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রকেও ব্যবসায় বলে মনে করতেন। অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। ফ্রী প্রেসের সংবাদ জানতে চাইলেন, ভারতীয় সাংবাদিকতা সম্পর্কেও কথা হলো।

পরিশেষে তিনি জানালেন, মাসে আড়াই শ' টাকা দিয়ে আমাদের সংবাদ তিনি নিতে পারেন।

হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক হাজার টাকার আশা নিয়ে আড়াই শ'!

তিনি হাসলেন। বল্লেন, 'বিস্মিত হয়েছেন, না? কিন্তু মনে করুন আমি আপনার কথাতেই রাজী হলাম। তারপর

আমার সামর্থ্যে তা কুললো না। মাসে মাসে বাকী পড়তে লাগলো, অথচ আমার টাকাটা হিসেবে ধরে রেখে আপনারা চলতে লাগলেন। অবশেষে দেখা গেল, আমাদের কপালে জুটেছে বদনাম আর আপনাদের ভাগ্যে বিপর্যয়। তার চেয়ে এই-ই ভালো নয় কি?'

অবশেষে সাড় তিন শ' টাকা ধার্য হলো।

এমনি করে কেটেছে। সারা দেশের বিভিন্ন পত্রিকাগুলির কাছে গেছি। যা আশা করেছি, তা মেলে নি। তবু তারই মধ্য দিয়ে সংগঠন চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। দৃঢ় মজবুত করতে হয়েছে।

সেবার বোম্বেতে সদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল। কী জানি কেমনভাবে গ্রহণ করবেন আমাকে। হয়তো অসন্তুষ্ট, হয়তো বিরক্ত হয়ে আছেন আমার ওপর। হয়তো রুষ্ট।

কিন্তু তাঁর ঘরে প্রবেশ করা মাত্র তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। পুরনো বন্ধুকে অনেকদিন পর কাছে পেয়েছেন, যেন হৃদয়ের কাছাকাছি।

বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। মন খারাপ করার কিছু নেই। তুমি আমার বড়ো ভাইয়ের মতো। সর্বদা তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি। মতের যদি মিল না ঘটে, মনেরও কেন বেমিল হবে?'

ফ্রী প্রেসের কথা উঠলো। আবার আমার কথা জানালাম। বললাম সংবাদ-পত্রের সঙ্গে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে চলবে না। চাই পরস্পরের মৈত্রী, বন্ধুত্ববন্ধন।

কিন্তু মনোভাবে বদল করেননি সদানন্দ। বললেন, 'তুমি তোমার মতানুবর্তী হয়ে চলো, আমি আমার। কিন্তু হয়তো একদিন দেখবে, তোমারটা ভুল। আমারটা সত্যি। আজ থাকুক সে কথা।'

হৃদয়বান সদানন্দ। জিজ্ঞেস করলেন ইউনাইটেড প্রেসের কথা, সহানুভূতি জানালেন। মাসিক চাঁদার বিনিময়ে আমাদের খবর নিতে রাজি হয়ে মধুর অন্তরঙ্গ হাসি হেসে আমাকে বিদায় জানালেন।

সদানন্দ ভারতীয় সাংবাদিকতা জগতে অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ। বৎসরাধিক কাল পূর্বে তিনি পরলোক-গমন করেছেন। নেপোলিয়নের মতো তাঁর চরিত্র। 'অসম্ভবে' তাঁর আস্থা ছিল না, নিজের প্রতি ছিল অসামান্য প্রত্যয়।

বিদায় নেবার আগে সদানন্দ জানালেন, মার্গারিটা বার্নস আছেন তাজমহল হোটেলে। যদি সময় করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি, তিনি খুশি হবেন।

পরদিন মার্গারিটার সঙ্গে দেখা করলাম। যখন তিনি বিলেতে ফ্রী প্রেসের কাজ করতেন, তখন হঠাৎ একদা তাঁর প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম।

আমার একটি বক্তৃতার কিছু অংশ বিলেতের একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সহকর্মীর প্রতি প্রীতিবশে তার কাটিং পাঠিয়ে সুন্দর একটি চিঠি লেখেন।

সেই ফ্রী প্রেস ভেঙ্গে গেছে। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি সারা দেশ। তখনও প্রাক্তন সহ-কর্মীর প্রতি তাঁর পুরনো সহমর্মিতা অখণ্ড হয়ে মনে রয়েছে।

ঘরে ঢুকতেই এগিয়ে এসে হাত ধরে বললেন, 'মনে হচ্ছে সহকর্মী হিসেবে তোমার সঙ্গে আমার কতোকালের পরিচয়।' তাঁর মুখে প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসি। কণ্ঠে অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো কিভাবে সদানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় কেন তা ভেঙ্গে গেল। কেন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছি আমি। নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। নানা খবর জানতে চাইলেন।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আবার তোমরা, তুমি আর সদানন্দ, এক হয়ে কাজ করতে পারো না?'

জানালাম, মতের যেখানে বেমিল সেখানে সব কাজ শুধু অকাজই হবে।'

সদাহাস্যময়ী মার্গারিটা অনেকক্ষণ পর বিদায় দিলেন। মনে হলো যতো প্রশংসা তাঁর শুনেছি, তার থেকে অনেক বেশি গুণবতী তিনি।

যখনই দিল্লী গেছি চার্লস দম্পতির সঙ্গে দেখা করেছি। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে চার্লস আমাদের সংবাদ নেবার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু সহকর্মী নয় বন্ধুত্বও ছিল তাঁদের সঙ্গে।

তাঁদের দাম্পত্য জীবনে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ আজো আমাকে বিষণ্ণক্ষুন্ন করে। যেখানেই তাঁরা থাকুন, ভারতী

ংবাদিকতার এই দুটি অকৃত্রিম সুহৃৎ ন সুখে থাকুন, এই কামনা।

॥ ১৮ ॥

একটা প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় ভিত্তির পর দাঁড় করাতে কোন গুণের গুরুত্ব শ? পরিশ্রম, ধৈর্য, বুদ্ধি, আন্তরিকয়তা, নাকি নিয়তি? নিয়তির রে কেউ কেউ নাকি তর্ তর্ করে রে উঠে গেছেন, আবার কেউ নাকি কবারে ধূলিসাৎ। কিন্তু নিয়তিকে তো রতে পাই নে সূর্যের আলোয়, কী মর ঘোরে, তাহলে কী হাল ছেড়ে শ্চন্ট হয়ে অপেক্ষা করবো ভাগ্যের ড় দেখতে, কোথায় নিয়তি আমাকে য় যায়, কোথায় তার যাত্রা থামে। কিন্তু লা চোখ মেলে প্রতিদিন আমাকে দেখতে চ্ছ খালি সমস্যা, সমস্যা; অর্থাভাব এবং নহযোগিতা এবং ঝামেলার জটিলতা।
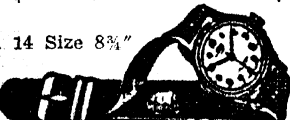
সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কাজে ঘুরে মরি, এ'র কাছে যাই ও'র দরবারে হাজির হই, সারা ভারতের প্রতিটি সংবাদপত্রের অফিসে সংযোগ রাখি—সংবাদ পাঠাই অথবা সংবাদ পাঠাবার সহমর্মিতা দাবী করি। চিঠির তাড়া পড়ি, জবাব লিখি। আর অসম্ভব অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের তরণী ঠিক মত বয়ে নেবার কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যাই। নিজের সংসারে নানা প্রয়োজনের হাঁ-মুখ বড়ো হয়ে ওঠে, নানা কর্তব্য এবং বাসনা অপূরণ থাকে অর্থসংকটে। সহকর্মীরাও আত্মত্যাগ করেন। তাঁদেরও চলতে হয় অনেক অসুবিধের মধ্যে।

জানি, ধৈর্য একটা মস্ত গুণ, বড়ো সহায়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। সেই দুঃখময় কালের অনেক পরে, এই সেদিন আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক সভায় অনেকে প্রশংসা করলেন, আমার নাকি প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার অসাধারণ নৈপুণ্য। মনে মনে আমি হেসেছি। একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এতো কষ্ট, এতো মর্মবেদনা এবং এতো ধৈর্যের প্রয়োজন যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমি অসীম জ্বালা অনুভব করেছি। কিন্তু হার মানি নি ভাগ্যের কাছে, নিরাশ হইনি বহুতর নৈরাশ্যে, তাই হয়তো এগিয়ে যাবার শক্তি পেয়েছি। প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখার মর্যাদা ও আনন্দ লাভ করেছি। এ যদি গুণ হয়ে থাকে, তাহ'লে এ-গুণই কী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সেই অসাধারণ নৈপুণ্য?

ইউনাইটেড প্রেস জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে সারা পৃথিবীতে একরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নটা আর দিবাস্বপ্ন বলে মনে হয় না, এভিয়েশন-রেডিও-টেলিভিশনের মিলনে এবং এটম-হাইড্রোজেন বোমার ভীতিতে বিশ্বময় এক রাষ্ট্রের পরিকল্পনাটা কিছু পরিমাণেও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে বাস্তব হয়েছে। কিন্তু সেই কালে, প্রায় এক পুরুষ আগে, ভারতবর্ষের বুকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে আছে ব্রিটিশ-শাসনের নাগপাশ, মহাত্মা গান্ধী মাভৈঃ মন্ত্রের মতো উত্থিত হয়েছেন শোষিত জনসাধারণের মথিত হৃদয়-সমুদ্র থেকে, জাতীয়তাবাদের মধ্যে সকল ভারতবাসীর দেশপ্রেম কেন্দ্রীভূত। দেশপ্রেমের শপথ নিয়ে জন্ম ইউনাইটেড প্রেসের, তাই আমাদের প্রেরণা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিটি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নতুন ভারতবর্ষের প্রকাশে অন্যান্য সংবাদ প্রতিষ্ঠান যেখানে বিদ্বেষপূর্ণ মন নিয়ে এবং ভাঙা তলোয়ার দিয়ে সেই নবজাগরণকে ঠেকিয়ে রাখতে সচেষ্ট, আমরা সেখানে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের দীনাতিদীন সেবকরূপে তেত্রিশ কোটি জনসাধারণের অভূতপূর্ব জাগরণকে সর্বত্র প্রচারিত করবার সাধনা করেছি।

আমরা জানতাম, আমরা জয়লাভ করবো। তাই একদিনের জন্যও আমাদের কাজে অবহেলা বা নিরানন্দ আসে নি। কিন্তু তবুও ভয় ছিল, আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো কি না। তাই কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনে আমি যখন কর্তব্যের আহ্বানে উপস্থিত থেকেছি, তখন আরও একটা চেষ্টা করেছি। অবশ্য এই চেষ্টা থেকে আমি কখনোই বিচ্যুত হই নি। এই চেষ্টাটি হচ্ছে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সচেতন করা, তাঁদের সাহায্য ও শুভকামনা অর্জন করা। কেননা, আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সেই দুর্যোগপূর্ণ কালের একমাত্র জাতীয় সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আগেই বন্ধুত্ব ছিল, এবার একসঙ্গে প্রবাসজীবন কাটাতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতার খাদে নেমে এলো। তুষারকান্তি ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কিরণশঙ্কর রায়, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ও রাজকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন আমার সেখানকার সঙ্গী। মাখনলাল সেনের সঙ্গে রাজকুমার চক্রবর্তীর অনেকখানি পার্থক্য স্বভাবে চরিত্রে জীবনে, তেমনি কিরণশঙ্করের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের; কিন্তু তবুও আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নতার বৈশিষ্ট্য নিয়েও সকলে বেশ একটি বিচিত্র ঐকতানের মতো মিশে গিয়েছিলাম।

বোম্বে অধিবেশনে একজন তরুণ

সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বেঁটে খাটো মানুষটি, বয়সে তখনও তারুণ্যের দীপ্তি ঝলমল করছে। বুদ্ধি-ব্যঞ্জক চেহারা, মুখে সব সময়েই স্মিত হাসির রেখা।

পুণার একটি দৈনিক পত্রের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। ছোট্ট একটা টাইপরাইটার মেশিন নিয়ে এসে বসতেন আমাদের ক্যাম্পে, দ্রুত হাতে খট্ খট্ শব্দে টাইপ চলতো, পাতার পর পাতা, কংগ্রেসের রিপোর্ট। মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় মন্তব্যও লিখতেন। তারপর টেলিগ্রাম নতুবা লোক মারফৎ পুণায় তাঁর অফিসে অনতিবিলম্বে লেখাগুলি পেঁছে দিতেন।

মাঝে মাঝে তাঁর লেখা আমিও দেখেছি। ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা ছিল তাঁর, সহজ ইংরেজিতে সুন্দর রিপোর্ট, বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর লেখার প্রশংসা করেছি।

কিন্তু আরও বেশি প্রশংসা করেছি সেই লোকটিকে। সহজ আন্তরিকতার একটা মধুর আকর্ষণ জড়িয়ে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। সহৃদয় হাসি আর স্বচ্ছ পরিহাসে আনন্দমুখর মানুষটি সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেছিলেন।

তাঁর নাম এ ডি মানি।

জীবনটাকে নানা কৃতিত্বের মালা পরিয়ে এখন তিনি ভারতবর্ষের খ্যাতনামা সাংবাদিক। সারভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া পরি-চালিত নাগপুরের 'হিতবাদ' পত্রিকার সম্পাদক। 'অল ইণ্ডিয়া নিউস পেপার এডিটরস্ কনফারেন্সে'র সভাপতি নির্বা-চিত হয়েছেন, 'নিউজ পেপার সোসাইটি'র সহ-সভাপতি। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের 'মানবীয় অধিকার সংস্থার' (Human Rights Committee of U. N. O) দু'বছর সদস্যরূপে কাজ করেছেন। পি টি আই-এর সঙ্গে বিশেষ-ভাবে যুক্ত। প্রেস কমিশনের সদস্য ছিলেন।

মানির একটি বিশেষ গুণ, তাঁর বাক-পটুতা। সংবাদপত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংঘ-সমিতিতে তিনি আমার সহকর্মী, তাঁর বক্তৃতা বহুবার শুনেছি। সুন্দর বলতে পারেন তিনি, যুক্তির পর যুক্তির বিচিত্র বিন্যাসে তাঁর বক্তব্যটা শ্রোতার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়।

কিন্তু সেদিন বোম্বেতে, সাংবাদিকের ক্যাম্পে দ্রুত টাইপরত অখ্যাতনামা রিপো-র্টার 'মানি'কে যে উজ্জ্বল মানবীয় গুণে উদ্ভাসিত দেখেছি, আজকাল বহু বিজলী-বাতি শোভিত খ্যাতনামা জীবনে যেন সেই আলোক আর দেখি না। রুধিরাশ্রু আচ্ছন্ন জীবনের দুর্গম পথে, সার্থকতার সন্ধান করতে করতে কী একটি প্রাণের বিচিত্র সমারোহ এমনি করেই, আস্তে আস্তে আপনার অজান্তেই পথে পথে রেখে আসতে হয়?

১৯৩৪ ও ৩৫ সাল দেশের রাজ-নৈতিক জীবনে এক সংকটপূর্ণ অধ্যায়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত জোয়ার ব্রিটিশ-পীড়নের আঘাতে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তরুণ ও বামপন্থী নেতৃবৃন্দ নতুন পদ্ধতিতে দেশমাতৃকার পতাকা তুলে ধরতে চান, গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও দর্শনের সঙ্গে তাঁদের একটা বিরোধ ক্রমশ ধূমায়িত হয়ে ওঠছে। কয়েকজন বিপ্লবী নেতা অহিংসার কার্যকারিতা সম্পর্কেও সন্দি-হান হয়ে পড়েছেন, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের একটা ঢেউ এসে আঘাত করছে গান্ধীকে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, মিনু মাসানী প্রভৃতি যুব-ভারতের নেতৃবৃন্দ প্রগতিশীল গণআন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে চান, গান্ধীজীর পথে হৃদয়-হীন পরশাসনের কঠিন শৃংখলমোচন সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা নির্দ্বিধা হতে পারছেন না।

চিন্তাজগতের এই মতান্তরটা যতই গভীর হতে লাগলো, জনসাধারণের মনেও অস্বস্তি ততই ছড়িয়ে পড়লো। যুব-নেতৃত্বের এই দ্বিধা স্বীকার করলেন গান্ধীজী। তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব পথে একাকী চলতে লাগলেন। সত্য, অহিংসা ও পল্লীসংগঠনের দুর্গম পথ তাঁর, এখানে কোন আপস নেই। অহিংসা তাঁর জীবনের পরমধর্ম; শত-সহস্র মৃত্যুর অন্ধকার পেরিয়ে যেতে পারেন তিনি, কিন্তু অহিংসাকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। অহিংসার সঙ্গে সত্যের অমোঘ মিলন, আর এই পথেই তাঁর দুর্গম অভিযাত্রা। এই যাত্রাপথে বৈচিত্র্য, দীপ্তি বা নয়নবিভ্রম সহজ সাফল্য হয়তো পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পথের দীর্ঘ দুঃসহ সাধনা এমন অপিরিমিত তেজ ও শক্তির সঞ্চার করে যেখানে পরাধীনতার শৃংখল নরম মোমের মতো গলে গলে পড়তে বাধ্য। কিন্তু নবীন নওজোয়ানদের সংগ্রাম-স্পৃহাকে তিনি তাঁদের নিজস্ব পরিক্রমায় যেতে বাধা দিলেন না, কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতৃত্বের পথ থেকে নিজেকে অপসারিত করে নিখিল ভারত খাদি মণ্ডলে নিজেকে নিয়োগ করলেন। কংগ্রেসের চার আনা সদস্যপদও রাখলেন না। পল্লীতে পল্লীতে ধ্বংসোন্মুখ কুটীরশিল্পকে রক্ষা করা ও ভারতের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতাকে নতুন শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করাই হলো তাঁর ব্রত।

এমন সময় জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু যক্ষ্মারোগে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কমলা ছিলেন নেহরুপরিবারের যোগ্যবধূ, জাতীয় সংগ্রামে তিনি নিজেও যোগ দিয়েছিলেন। এলাহাবাদে গণ-আন্দোলনের এক শোভাযাত্রা পরিচালনা

করেছিলেন, কারাদণ্ডের শাস্তিও জুটেছিল। দেশসেবার যে মহানব্রত সমগ্র নেহরুপরিবারের গৌরব, তিনিও তাঁর যথাসাধ্য সামর্থ্য তাতে অর্পণ করেছিলেন। তাই কমলার পীড়াটা শুধু নেহরু-পরিবারেরই ব্যক্তিগত বেদনার নয়, সমস্ত দেশের পক্ষেই শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কমলা গেলেন সুইজারল্যাণ্ড, জেল থেকে মুক্ত হয়ে জওহরলালও গেলেন সহযাত্রী হয়ে। সারা ভারতবর্ষ একান্ত আন্তরিক কামনা নিয়ে প্রার্থনা করলো, সুস্থদেহে ফিরে আসুন নেহরু দম্পতি। কিন্তু অনেক প্রার্থনাই যেমন সার্থক হতে পারে না, জীবনের অনেক আশা যেমন ব্যর্থ হয়ে যায়, তেমনি একদিন দুঃসংবাদ ভেসে এলো ইউরোপ থেকে, কমলা দেহত্যাগ করেছেন।

নেহরুর জন্য সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানালো সারা দেশ। নেহরুও নিয়ে এলেন দেশের জন্য এক নতুন সম্পদ। তাঁর প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতার বার্তা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে আজ জওহরলাল নেহরু অদ্বিতীয়, অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের গৌরবময় আসন দিয়েছেন। এখানে তাঁর জীবনের একটি আশ্চর্য সার্থকতা, বিশ্বশান্তির একটি উজ্জ্বল দীপালোক তিনি। তাঁর এই আন্তর্জাতিকতাবোধের শুরু হয়তো সেই সুদূর কৈশোরকালের হ্যারোবিদ্যালয়ের পরিবেশ। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না, কমলার মৃত্যুর পরে সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ তাঁর মনের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখেছে। ইতালী-জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের শাসন চলছে তখন, সোভিয়েট রাশিয়ায় অভূতপূর্ব সাম্যবাদের আশ্চর্য পরীক্ষা। রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, জওহরলালও নতুন প্রেরণা পেলেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এলেন জওহরলাল। তিনি ঘোষণা করলেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সংগঠনে সোভিয়েট স্বল্পকালের মধ্যে যে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে, ভারতবর্ষকে সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কংগ্রেস সেই পথে না এগোলে, দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের কল্যাণ আসতে পারে না।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন বসলো উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ নগরীতে। জওহরলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হলেন। জওহরলালের পক্ষে এই সম্মান নতুন নয়, কিন্তু এই নির্বাচনে তরুণ প্রগতিশীল ভারতবর্ষকেই স্বীকার করা হলো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকেও নেহরু নতুনভাবে সজ্জিত করলেন। সমাজতান্ত্রিক নেতা জয়প্রকাশ, আচার্য দেব, অচ্যুত পটবর্ধন প্রভৃতিকে গ্রহণ করে কংগ্রেসের মধ্যে নতুন প্রাণস্রোতের বন্যা আনবার চেষ্টা করলেন।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কৃষকদের মধ্যে সংগঠন, দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং নতুন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তনে যে নির্বাচন আরম্ভ হবে তাতে কংগ্রেসের যোগদান ও প্রতিযোগিতা —এইগুলি ছিল সর্বপ্রধান।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেও ইউনাইটেড প্রেসের সাংবাদিক ফৌজ নিয়ে আমি যোগদান করেছিলাম। লক্ষ্ণৌ শহরে আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন রাজনারায়ণ মিশ্র। তিনি করিতকর্মা ব্যক্তি, নানাবিধ কাজে সর্বদাই ব্যস্ত। কিন্তু তবু, তার মধ্যেই, আমাদের থাকা খাওয়া ও আনুষঙ্গিক আরাম-আয়েশের যাতে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্যে সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

একদিন রাজনারায়ণ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের নাম শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। রাজনারায়ণের কাছে তাঁর সম্পর্কে অনেক খবর শুনলাম। কংগ্রেস আন্দোলনে বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী-নেতা রফি আমেদ কিদোয়াই-র তিনি বিশিষ্ট সহকর্মী এবং প্রীতিভাজন। আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে সাংবাদিকতা করছেন।

রাজনারায়ণের ইচ্ছাটাও শোনা হলো। তিনি অনেক কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতি যথাযোগ্য কর্তব্য পালন করতে পারছেন না; তাঁর জায়গায় শ্যামাপদকে নিযুক্ত করলে উভয়ত সুবিধা হবে।

শ্যামাপদর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। তাঁর চেহারায় এমন স্পষ্ট একটা ছাপ আছে যাতে চিনতে ভুল হয় না, তিনি কাজের লোক। যে কোন কাজের ভার নেবেন, তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন।

অল্পদিন পরে শ্যামাপদকে আমাদের সংবাদদাতারূপে নিযুক্ত করা হলো। তারপর দীর্ঘদিন ধরে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারছি কাজে, সমস্যায়, সাফল্যে ও দুর্ভাবনায়। কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের কথা আমি ভুলি নি; সেদিন তাঁর সম্পর্কে আমার যে ধারণা মনে হয়েছিল তা মিথ্যা নয়। অনেকের চেহারা যেমন মরীচিকা সৃষ্টি করে, শ্যামাপদ সম্পর্কে তেমন হয়নি। একজন সামান্য সংবাদদাতা থেকে তিনি উন্নীত হয়েছেন লক্ষ্ণৌ অফিসের সম্পাদকরূপে। তাঁর কর্মনৈপুণ্যে ইউনাইটেড প্রেসের লক্ষ্ণৌ সংবাদ প্রশংসিত হয়েছে, তাঁর দক্ষতায় আমরা গর্বিত।

(ক্রমশ)
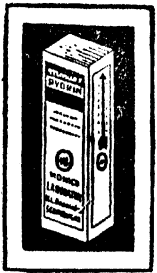
আলোচনা

মাইকেলের একখানি বিস্মৃত গ্রন্থ

শ্রীযুত দেশ-সম্পাদক মহাশয়েষু—

২৩ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় ডক্টর শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের লেখা 'মাইকেলের একখানি বিস্মৃত গ্রন্থ' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রকাশ-যোগ্য মনে করলে ছাপাবেন।

বইটি থেকে রবীন্দ্রকুমারবাবু যে উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেন তার একটি পড়ে আমার মনে ধারণা হয়েছে যে, বইটি মাইকেলের লেখা হতে পারে না। উদ্ধৃতিটি এই—

"The faithless Seeta had deserted the arms of her exile husband."

কোন অবস্থাতেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের কলম থেকে সীতার সম্বন্ধে এমন কথা বেরুতে পারে না। রবীন্দ্রকুমার-বাবুরও খট্‌কা লেগেছিল—তিনি এই জঘন্য উক্তিকে শুধু 'মারাত্মক ভুল' বলে সাফাই দিয়েছেন এই ইঙ্গিত করে যে তখনও তিনি সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন নাই। কিন্তু এর জন্যে কি সংস্কৃত রামায়ণ পড়া কোনো বাঙালীর পক্ষে কি নিতান্তই আবশ্যক? রবীন্দ্রকুমারবাবু কি এটা অস্বীকার করবেন যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ মাইকেলের বাল্যাবধি ভালো করে পড়া ছিল?

কেবলমাত্র কিশোরীলাল হালদারের উক্তির উপর নির্ভর করে বইটিকে মাইকেলের বলে সিদ্ধান্ত করলে ভুল করব। এ ধরনের বক্তৃতা ও রচনা—বিশেষ করে প্রচলিত হিন্দু ও সাহিত্যের প্রতি খোঁচা মারা রচনা—মাদ্রাজ অঞ্চলে মিশনারীদের প্রেস থেকে সে সময়ে বিস্তর বেরিয়েছিল।

এ বিষয়ে আমি রবীন্দ্রকুমারবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতি—

শ্রীসুকুমার সেন
১২-৪-৫৫

লেখকের বক্তব্য

২৪ দরিয়াগঞ্জ,
দিল্লী—৭।
৩।৫।৫৫

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, মাইকেলের The Anglo-Saxon and the Hindu নামে চব্বিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানি আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বইখানির তিন স্থানে মাইকেলের নাম—মলাটে, নামপত্রে এবং উৎসর্গ পত্রে। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন, "কেবলমাত্র কিশোরীলাল হালদারের উক্তির উপর নির্ভর করে বইটিকে মাইকেলের বলে সিদ্ধান্ত করলে ভুল করব।" এই ব্যাপারে কিশোরীলাল হালদার অথবা অন্য কাহারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যে প্রমাণে The Captive Lady ও Visions of the Past মাইকেলের রচনা সেই প্রমাণেই The Anglo-Saxon and the Hindu মাইকেলের রচনা। এখানে বলিয়া রাখি, মাইকেলের এই গ্রন্থখানি আমি আবিষ্কার করি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধকচরিতমালার ২৩ সংখ্যক গ্রন্থ মধুসূদন দত্তের জীবনীতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইটির উল্লেখ করিয়াছেন (৩য় সংস্করণ—পৃঃ ১০৮)। আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়ের এক প্রবন্ধেও এই বইখানির কথা পড়িয়াছিলাম। বইটি মাদ্রাজ অঞ্চলের কোন মিশনারীর রচনা, এই অনুমানের পক্ষে যুক্তি দেখি না। এ-গ্রন্থের কথা মিশনারীর কথা নয়। এবং যদি এ-গ্রন্থের মলাটে মাইকেলের নাম নাও থাকিত, তাহা হইলেও ইহা কোন মিশনারীর রচনা, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল হইত। কারণ ইহার কোন স্থানে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য বা দর্শন সম্বন্ধে কোন 'খোঁচামারা' মন্তব্য নাই। হিন্দু সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সীতাকে 'faithless' বলা হইয়াছে, এমন অনুমানের পক্ষেও কোন যুক্তি নাই। হিন্দুধর্ম বা সাহিত্যের প্রতি যিনি বিদ্বিষ্ট, তিনি এরূপ মিথ্যার আয়শ্র লইবেন কেন? অবশ্য অনেক মিশনারী আমাদের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এ-গ্রন্থে সেরকম কোন মিথ্যা প্রচার দেখি না। প্রকৃতপক্ষে এই বইখানিতে হিন্দু সাহিত্যের বড় প্রশংসা এবং ইহাতে ঐ সাহিত্যের অপ্রশংসা একেবারেই নাই। এই প্রসঙ্গে বেদ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তিটি আবার উদ্ধৃত করিতে পারি:

"Long before the blind beggar Homer told the tale of Troy divine enchanting the fair land of Greece —bards as sublime, breathing music as sonorous, as dulcet, had built the lofty rhyme in Hindusthan! Behold the Vedas; and adore the Shekina of intellect which fills them with a golden and rosy light".

একথা হিন্দু সাহিত্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট জনের কথা নয়। ইহা হিন্দু সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনের কথা।

বস্তুত সীতাকে যে faithless বলা হইয়াছে, তাহাও হিন্দু সাহিত্যের প্রশংসাক্রমেই বলা হইয়াছে। বেদ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসময় উক্তিটির ঠিক পরেই রামায়ণের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেনঃ

"Long before the beautiful but frail Helen kindled the flame which consumed to the dust, the proud city of Priam, the faithless Seeta had deserted the arms of her exile husband, and brought desolation and disaster and woe to the spicy and pearly shores of Lunka! But why need I dwell on such themes? Volumes could be written on the glories of old India—volumes could be written on the achievements in love and war of her heroic sons and lotus-eyed daughters. She is indeed an exhaustless mine for the Poet, the Romancist, the Historian, the Philosopher."

একথা হিন্দু সাহিত্যের প্রতি 'খোঁচা-মারা' কথা নয়। ইহাতে গ্রন্থকারের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে—কোন বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নাই। রামায়ণের ন্যায় এক-খানি মহাকাব্য ইলিয়াডের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে রচিত হইয়াছে, ইহাই এখানে গ্রন্থকারের বক্তব্য। এবং একথা তাঁহার কাছে এক বিশেষ গৌরবের কথা।

সুকুমারবাবু লিখিয়াছেন, 'কোন অবস্থাতেই মাইকেলের কলম থেকে এমন কথা বেরুতে পারে না।' মেঘনাদবধ কাব্যের কবি সীতাকে 'faithless' বলিলে আমরা বিস্মিত হইব, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা মাইকেলের প্রতিভার বিচিত্র গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা এই উক্তিকে অদ্ভুত বলিবেন; তাঁহার পক্ষে এরূপ উক্তি করা নিতান্ত অসম্ভব, এমন কথা বলিবেন না। বস্তুত মাইকেলের প্রতিভার ইতিহাস এক বিচিত্র ইতিহাস। এ-প্রতিভার বিকাশও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার মাত্র সাত বৎসর পূর্বে মাইকেল রামায়ণের আখ্যান সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যখন স্মরণ করি যে, মাইকেলের জীবনে এরূপ অবিশ্বাস্য ব্যাপারের অভাব নাই, তখন

-উক্তিকে অদ্ভুত বলিব, 'জঘন্য' বলিব না।

শৈশবে মধুসূদন যে কৃত্তিবাসের মায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমরা অবশ্য নিঃসন্দেহ হইতে পারি। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, মধুসূদনের জননী জাহ্নবী দাসী 'রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কন চণ্ডী' প্রভৃতি বাঙলা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ন ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট বৎসর বয়সের সময়ে মাতাকে ও বাড়ির অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন' (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—৪র্থ সং—পৃঃ ১৬)। এখানে মনে রাখিতে হইবে, এসব মধুসূদনের আট বৎসর বয়সের কথা। নয় বৎসর বয়সে তিনি সাগরদাঁড়ি হইতে কলিকাতা আসিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন (মধুসূদন দত্ত—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩য় সং—পৃঃ ৮)। The Anglo- Saxon and the Hindu গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে—মাইকেলের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। ১৮৩৩ সাল হইতে ১৮৫৪ সাল, এই একুশ বৎসরের মধ্যে মধুসূদন কোন সময়ে শৈশবে-পড়া রামায়ণখানি স্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করি না। হিন্দু কলেজে নয় বৎসর (১৮৩৩—১৮৪২) তিনি একমাত্র ইংরেজি সাহিত্যেরই চর্চায় মগ্ন। তখন তাঁহার ভাব ইংরেজি, ভাষা ইংরেজি। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক রাখারও সময় বা প্রবৃত্তি তখন তাঁহার একেবারেই ছিল না। বাঙলা ভাষার প্রতি তখন তাঁহার বড় অবজ্ঞা। যোগীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ 'ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙলা ভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙলা ভাষা অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহার এই সংস্কার ছিল (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—৪র্থ সং—পৃঃ ১০০)। তখন তাঁহার কথা—

And oh! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land!

(১৮৪১)

তারপর বিশপ্স কলেজের তিন বৎসর (১৮৪৪—১৮৪৭) তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে তৎপর। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষার চর্চাও কিছুটা করিয়াছিলেন; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য তখন তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই সময়ের চিঠিপত্রে বা কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের কোন চিহ্ন নাই। এবং বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে অবজ্ঞাও তখন হ্রাস পায় নাই। বিশপ্স কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেনঃ "He never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter contempt as a patois"

(মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম—২য় সং—পৃঃ ৪৩)।

মাদ্রাজ অবস্থানকালে মাইকেল বাঙলা ভাষা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এই কথার সমর্থনে তিনটি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি। (১) ১৮৪৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী এক পত্রে তিনি লিখিলেনঃ "I say, old Gour Dass Bysack! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition I am losing my Bengali faster than I can mention.

(মধুস্মৃতি—২য় সং—পৃঃ ৫৮৫)। এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে, তিনি কাশীদাসের মহাভারতকে 'Bengali translation of the Mahabharat.' বলিতেছেন। কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের গ্রন্থকে বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের বাঙালী পাঠক অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিতে অভ্যস্ত নয়। (২) ঐ বৎসরেরই ৬ই জুলাইয়ের এক পত্রে মাইকেল গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেনঃ "As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know how to do the thing in Bengali.

(মধুস্মৃতি—পৃঃ ৫৯২)। (৩) মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া মাইকেল নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য একটি পরীক্ষা দিয়াছিলেন—কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারেঃ 'নর্মাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙলা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে পৃথিবী লিখিতে প্রিথিবী লিখিত; কিন্তু সেই মধুই কিছুকাল পরেই আমার নর্মাল স্কুলে থাকার সময়েই মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাদবধ কাব্য অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমিই নর্মাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি' (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—পৃঃ ৬৫৯)।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, একুশ বৎসরের অনভ্যাসে এবং বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ফলে মাইকেল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য একরকম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এবং যিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ভুলিয়াছিলেন, তিনি যে রামায়ণের আখ্যানও ভুলিবেন, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। আট কি নয় বৎসর বয়সে সাগরদাঁড়িতে মধুসূদন রাম-সীতার যে মূর্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী-জীবনের উগ্র বিজাতীয়তার আবহাওয়ায় ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে।

এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, রামায়ণের আখ্যান না হইল ভুলিলেন কিন্তু সীতা যে 'faithless' এই আজগুবি কথা তিনি কোথায় পাইলেন? বস্তুত এই অদ্ভুত ভ্রমটির কারণ স্পষ্ট। মাইকেল রামায়ণের আখ্যানের সঙ্গে ইলিয়াডের আখ্যান গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। ঐ সময়ে তিনি রামায়ণ আয়ত্ত করেন নাই, কিন্তু ইলিয়াড যত্ন করিয়া পড়িয়াছেন। এবং সীতাহরণের বিস্মৃত কাহিনী তিনি হেলেন-প্যারিসের পরিচিত কাহিনীর সাহায্যে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুই কাহিনীর সামান্য সাদৃশ্যটি বাড়াইয়াছেন; উহাদের মৌলিক বৈসাদৃশ্যটি লক্ষ্য করিবার মত রামায়ণের জ্ঞান তখনও হয় নাই। The Anglo-Saxon and the Hindu পুস্তিকার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে The Captive Lady'র (১৮৪৯) Notes-এও মাইকেল সীতাকে Indian Helen বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যিনি রামায়ণ পড়িয়াছেন, তিনি সীতাকে Indian Helen বলিবেন না। এই Notes-এ অবশ্য মাইকেল abduction শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন — "Seeta.........deserted"
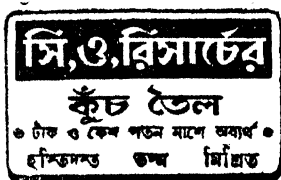
একথা লেখেন নাই। যিনি জানকীর দুঃখ সামান্যও বুঝিয়াছেন, তিনি abduction শব্দটিও ব্যবহার করিতেন না। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ সময় মাইকেলের শৈশবে-পড়া রামায়ণ ইলিয়াডের নীচে চাপা পড়িয়াছিল এবং সীতাকে স্মরণ করিতে কবি হেলেনকেই স্মরণ করিয়াছেন। ইহার আর এক প্রমাণ এই যে, Captive Lady'র এই Notes-এ মাইকেল সীতা-হরণের পরিণামের কথা বলিয়াছেন হরেসের ট্রয়-দাহ সম্বন্ধে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়াঃ

> The consequence is well-known,
> Ilion, Ilion
> Fatalis, incestusque Judex,
> Et mulier peregrina, vertit
> In pulverem

বোধ হয় এই কথা কয়টি হরেসের ওড্‌সের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার বাঙলা অনুবাদ করিবার চেষ্টা না করিয়া স্মার্টকৃত ইংরেজি অনুবাদ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলামঃ

> Troy, Troy, a fatal and lewd judge and a foreign women, have reduced to ashes.... ....

যিনি রামায়ণের কথা বুঝিয়াছেন, তিনি এই প্রসঙ্গে fatalis incestusque judex-এর কথা তুলিবেন না বা সীতাকে ইলিয়াডের mulier peregrina'র (বিদেশী রমণী) সঙ্গে তুলনা করিবেন না। বস্তুত তখন মাইকেলের 'ভিখারী-দশা', তখনও 'সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী' তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তখন তাঁহার কাছে সীতার কাহিনী হেলেনের কাহিনী হইতে অভিন্ন।

Captive Lady'র Notes পড়িয়া কাহারও মনে হইবে না, ইহার লেখক বাঙলা বা সংস্কৃতের কোন বিশেষ চর্চা করিয়াছেন। মাইকেল নিজেও ইহা বুঝিয়াছিলেন। ১৮৪৯ সালের ২৭শে মে'র এক পত্রে তিনি 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেনঃ

> **When you get my poem, I hope, you will reunite the Notes and enlarge them. I trust much to your knowledge of Hindu Antiquities. I have some intention of republishing it in London with my new poem. Can't you quote Sanskrit authority for all I say? Do write a learned essay "garnished with Sanskrit and other quotations on the Rajshooye Jujnum". I shall acknowledge it publicly.**

(মধুস্মৃতি—পৃঃ ৫৮৮)।

মাইকেল তখন ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত; ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তখনও বড় হয় নাই।

১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পত্রে মাইকেল কালিদাস ও কৃত্তিবাস চাহিয়া পাঠান। The Anglo-Saxon and the Hindu প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সময়ের মধ্যে গৌরদাস ঐ দুই গ্রন্থ মাদ্রাজে পাঠাইয়াছিলেন কি না এবং মাইকেল তাহা পড়িয়াছিলেন কি না। ঐ দুই গ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল কি না, জানিবার কোন উপায় দেখি না। তবে ১৮৪৯ সালের ১৮ই অগাস্টের এক পত্রে তিনি তাঁহার অধ্যয়নের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, অন্ততঃপক্ষে ঐ সময়ে তাঁহার বাঙলা চর্চার অবসর বড় ছিল নাঃ

> Here is my routine, 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12 to 2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7 to 10 English.

এখানে তেলেগু ও সংস্কৃতের স্থলে যদি বাঙলা ও সংস্কৃতের চর্চার কথা লিখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, তিনি বাঙলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙলা ভাষা যে তিনি একেবারে ভুলিতে বসিয়াছেন, তাহা তিনি ঐ পত্রেই বলিয়াছেন (মধুস্মৃতি—৫৯২)। ইহার পরে তিনি কাশীদাস ও কৃত্তিবাস মাদ্রাজে অবস্থানকালের মধ্যেই পড়িয়াছিলেন কি না, তাহা অবশ্য বলিতে পারি না। তবে শৈশবে-পড়া বা শোনা রামায়ণ যে প্রায় ভুলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি।

কিশোরীলাল হালদারের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বইটিকে মাইকেলের বলিয়া সিদ্ধান্ত করি নাই। বস্তুত কিশোরীলাল হালদার The Anglo-Saxon and the Hindu নামে মাইকেলের কোন গ্রন্থের উল্লেখ কোথাও করেন নাই। তিনি শুধু who is this stranger that is come amongst us? সম্বন্ধে মাইকেলের এক বক্তৃতার কথা বলিয়াছেন। The Anglo-Saxon and the Hindu পুস্তিকার নাম পত্রে who is the stranger that is come amongst us কথাটি ল্যাটিনে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া, গ্রন্থ মধ্যে এই কথাটি (Who is the stranger that has come to our dwelling) একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এবং গ্রন্থখানি Lecture I রূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি পূর্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, মাইকেলের এই বক্তৃতা ও বইখানি অভিন্ন।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, যিনি ১৮৫৪ সালে সীতাকে Faithless বলিলেন তিনি ১৮৬০-৬১ সালে অর্থাৎ মাত্র ছয় কি সাত বৎসরের মধ্যে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করিলেন কি করিয়া? প্রকৃতপক্ষে এইখানে মাইকেলের প্রতিভার অসাধারণত্ব এবং বাল্যাবধি সাধারণ বাঙালীর ন্যায় কৃত্তিবাসের পয়ারের ভক্ত পাঠক হইলে মাইকেল মেঘনাদ বধ কাব্যের ন্যায় একখানি কাব্য সৃষ্টি করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। মাইকেল রামায়ণখানি এক নতুন ভাব লইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই কারণেই মেঘনাদ বধ কাব্য রামায়ণের আখ্যানমূলক খাঁটি বাংলা কাব্য হইলেও উহা এক অভিনব সৃষ্টি। আশৈশব রামায়ণ পাঠে অভ্যস্ত লোক—'I hate Rama and his rabble এ কথা রহস্য করিয়াও মুখে আনিতেন না। অবশ্য সীতার প্রতি মাইকেলের শ্রদ্ধা অপরিসীম। বাল্মীকির সীতারও দোষ দেখি—মেঘনাদ বধ কাব্যের সীতার মহত্ত্বের সীমা নাই। বাল্মিকীর সীতা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেনঃ

অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য বাসনং মহৎ। মেঘনাদ বধ কাব্যের সীতার অনুযোগে এমন কথা নাই। কিন্তু লঙ্কার রাক্ষসকুল সম্বন্ধে মাইকেলের সীতার যে সহানুভূতি তাহা মূল রামায়ণে নাই। যিনি সীতাকে দিয়া বলাইলেন 'বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি' অথবা মরিল বাসবজিত অভাগীর দোষে' তাঁহার রামায়ণ পাঠ যে সাধারণ বাঙালীর রামায়ণ পাঠ হইতে ভিন্ন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মাইকেল লিখিয়াছেন,

> আপনি ভারতী,
> বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে
> পূর্ব জনমের তব স্মরি হে ভকতি।

মাইকেলের ন্যায় এক কুলত্যাগীর উপরকুললক্ষ্মীর আশীর্বাদও যেন পূর্বজন্মের ভক্তির পুরস্কার। অন্ততপক্ষে মাইকেলের প্রথম জীবনের কথা ভাবিলে এই কথাই মনে হয়। তাঁহার সব কিছুই যেন স্বর্গের চক্রান্ত।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

"সাংবাদিকের স্মৃতিকথা"

মহাশয়,

আমার স্মৃতিকথাতে যে ভুলত্রুটি বন্ধুবর শ্রীঅমল হোম ও শ্রীবিকাশচন্দ্র লোধ মহাশয় দেখিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমার কোন ডায়েরী নেই, ফলে ৪০।৫০ বৎসর আগের কথা লিখতে গিয়ে স্মৃতিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা যদি আমাকে কোন ভুলত্রুটির কথা লিখে জানান তবে অনুসন্ধান করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করার সময় সব ত্রুটি সংশোধন করে দেবার ইচ্ছা রইল।

'আমার স্মৃতিকথা' পড়ে খুসী হয়ে অনেকেই যাঁরা আমাকে সহৃদয় অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত

৬।২।৬২

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাথমিক ইতিহাস

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামীজীকে ইউরোপে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। লণ্ডনের খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা এই হিন্দুযোগীকে নানা ভাবে যাচাই করিতে চাহিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে দুইটি পত্রিকার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। একটি সাণ্ডে টাইমস্ ও অপরটি ইণ্ডিয়া। টাইমস্ পত্রিকার প্রতিনিধি তাঁহাকে বলেন, "আমাদের ধারণা আপনি কোন নূতন ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন না।"

উত্তরে স্বামীজী বলেন,—

"এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের নীতি নয়, কারণ সম্প্রদায় তো অনেকই রয়েছে। আর সম্প্রদায় গঠন করতে গেলে তার কর্ম-পরিচালনের জন্য লোকের দরকার। ভেবে দেখুন, যারা সন্ন্যাস নিয়েছে অর্থাৎ পদ-মর্যাদা, বিষয় সম্পত্তি, নাম যশ প্রভৃতি সবই ত্যাগ করেছে—আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তারা এ-রকম কাজের ভার নিতে পারে না! বিশেষতঃ ঐ সকল কাজ যখন অন্যদের দ্বারা (গৃহীদের দ্বারা) চলছে।"

'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করেন "কোন্ কোন্ দেশে স্বামীজী প্রচারকার্য করেছেন?" আরও জিজ্ঞাসা করেন, "সেই সব দেশেই তিনি শিষ্য করেছেন কিনা?" উত্তরে স্বামীজী বলেন, —"হ্যাঁ, শিষ্য করে এসেছি কিন্তু কোন দল গঠন করিনি। * * সম্প্রদায় ও দল যথেষ্টই আছে। তা ছাড়া সম্প্রদায় করলেই পরিচালনের জন্য উপযুক্ত লোকের দরকার। যারা এই সব দলের পরিচালক হবে তারা ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তি চাইবে। অপরের উপর প্রভুত্বের জন্য তারা প্রায়ই চেষ্টা করবে, এমন কি নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য পরস্পর লড়াই করবে।'

দল বা সম্প্রদায় গঠিত হইলে যে দোষগুলি হওয়া সম্ভব তাহা স্বামীজী জানিতেন তাই তিনি কোনো সম্প্রদায় গড়িয়া তোলা পছন্দ করেন নাই। এইরকম সম্প্রদায় গঠনের সহিত সন্ন্যাসধর্মের আপস হইতে পারে না একথাও তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সম্প্রদায় বা দল অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু তবুও এটি একটি কর্মীসঙ্ঘ ইহা নিশ্চিত। কর্ম পরিচালনের ক্ষেত্রে অর্থের একান্ত প্রয়োজন, এবং অর্থ থাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু বৈষয়িক ব্যাপারও আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যেন আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার গোড়ার দিকের ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে এ-কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়।

প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবার আগের সময়ের দেশের অবস্থা কি ছিল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনার দরকার। হুতুম প্যাঁচার নক্সা, দীনবন্ধুবাবুর সধবার একাদশী এবং জামাই বারিক প্রভৃতি পড়িলে সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়।

তখন উচ্চশ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য ইঁহাদের জীবন যাপন প্রণালী কিরূপ ছিল? দীনবন্ধুবাবুর বইয়ের জীবন্ত আলেখ্য হইতে আমরা ধনী কায়স্থগণের সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাই, তাহাতে দেখি সে সময়ের ধনী সন্তানগণের উচ্ছৃঙ্খলতা, কায়স্থগণের মধ্যে কুলীনগণের শ্রেণীবিভাগ, যেমন জন্মমুখ্য, গর্ভমুখ্য, নবরঙ্গের কুলীন, মধ্যাংস দ্বিতীয় পো, প্রভৃতি। কৌলিন্যের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না, মৌলিকগণও বংশপতির সম্মান পাইবার জন্য অনেক কিছু করিতেন, জামাই বারিক নাটকে তাহার পরিচয় বেশ ভালভাবেই পাওয়া যায়।

সে সময় ভদ্র সন্তানগণ কিভাবে স্পর্ধার সহিত মদ খাইয়া মাতাল হইতেন 'শিম্‌লার অষ্টবসুর' পাড়ার নামেই তাহা বুঝা যায়। শিমলার ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসুগণ আটজন একত্র হইয়া পাল্লা দিয়া মদ্যপান করিতেন, তাহা হইতেই 'অষ্টবসু পাড়া' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ছিল তান্ত্রিক সাধনা ও ভৈরবী চক্র। দুর্গাপূজার নবমীর দিন অনেকের বাড়ি মহিষ বলিও হইত, পাঁঠা বলি সকলের বাড়িতেই হইত। সেই সময় মহিষ বা পাঁঠার রক্তাক্ত মুণ্ডে কাদা মাখাইয়া সেই মুণ্ড মাথায় লইয়া ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে পথে বাহির হইতেন, এবং পূজক পরিবারের আবালবৃদ্ধ এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া অশ্লীল গানে পল্লী মুখরিত করিতেন।

ইহা ছাড়া সমাজপতিগণের অনুশাসন এবং ছোঁয়াছুঁইর বিচার প্রবলভাবেই ছিল, স্বামীজী ইহাকেই 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়াছেন। নিমন্ত্রণ বাড়িতে আলুনি তরকারি করা হইত কেননা নুন দিলে তরকারি উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়। নিমন্ত্রণ করিলেও সকলে সকলের বাড়িতে যাইতেন না। প্রথম কথা, কোন কর্তাব্যক্তি আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কিনা, এবং নিমন্ত্রণটি ঠিক সম্মানসূচক হইয়াছে কিনা? যদি কোনও অল্পবয়স্ক আসিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন তবে কোন ছোট ছেলে পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইত। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বাড়ির গৃহিণীকেই পালকী করিয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইত, আবার অপর দিকে ছাঁদা বাঁধিয়া খাবার লইয়া যাওয়ারও প্রথা ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে বলিতে গেলে, কতকগুলি আচার নিয়ম ও প্রথাই ছিল ধর্মের নামে প্রচলিত। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ এতদূর গড়াইয়াছিল যে, উভয় পক্ষই অপরের ধর্ম ও দেবতাকে হেয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজই ছিল ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণের আশ্রয় স্থান। ডিরোজীয়োর ছাত্রগণ হিন্দুধর্মের আচার লঙ্ঘন করাকেই সাহসের পরিচয় দান বলিয়া মনে

করিতেন এবং বৃটিশ মিশনরীগণের প্রচার-কার্য শহর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতেছিল, এই প্রচারের প্রধান বিষয়ই ছিল 'হিন্দুধর্ম'কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

এক কথায় দেশ কুসংস্কার, পরানুকরণ, উচ্ছৃংখলতা ও কদর্য মনোভাবের মধ্যে যখন একেবারে ডুবিতে বসিয়াছে তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং গীতার—
"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"
বাণীটি তাঁহার জন্মগ্রহণে সার্থক হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সূচনা হয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে। এগারো নম্বর মধুরায় লেন। এই বাড়িতেই সর্বদা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিতেন। তাঁহার আগমনের সংগে সংগে বাড়ির আবহাওয়া এমন হইয়া যাইত যে যাঁহারা সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন তাঁহাদের সকলেরই মনে হইত, তাঁহারা যেন একই পরিবারের লোক। তখন যেন এমন এক পবিত্রতা ও ভালবাসার পারিপার্শ্বিক আপনা হইতেই সৃষ্টি হইত যে হীন মনোভাব সে স্থান হইতে দূর হইয়া যাইত।

যাঁহারা সে সময় রাম দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে আসিতেন তাঁহাদের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইত না কেবল এই কথাটি বলিলেই হইত যে, "অমুকদিন পরমহংস-মশাই রাম ডাক্তারের বাড়িতে আসিবেন।"

দর্শনার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগল, চল্লিশ পঞ্চাশ হইতে ক্রমে একশো দেড়শো লোক হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মেয়েরাও আসিতে লাগিলেন। দর্শন ও কীর্তন প্রভৃতির শেষে সকলেই ছাদে গিয়া খাইতে বসিতেন। সে যেন এক পারিবারিক প্রীতিভোজন।

স্বামীজীর ভ্রাতা পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সেই সময়ের একজন প্রত্যক্ষ-দর্শী। তিনি প্রতিদিনই সেই আনন্দ-সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার বর্ণনা হইতে এখানে সামান্য কিছু তুলিয়া দিতেছি ঃ—

"আমরা যখন ছাদে খাইতে যাইলাম, তখন দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সকলেই একসংগে বসিয়া খাইতেছেন। অন্য পাড়ার দু' পাঁচজন লোকও তাহার ভিতর আছেন। অবশ্য নিরামিশ রান্না—লুচি তরকারি ইত্যাদি হইয়াছিল। তখন এরকমভাবে একত্র খাওয়ার প্রথা ছিল না। তখন বাড়িতে যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবার প্রথা ছিল; কিন্তু দেখিলাম যে, এখানে সকলে অ-নিমন্ত্রিতভাবে খাইতেছেন। * * যজ্ঞি-বাড়ির বেগারঠেলার খাওয়াতে ও এ খাওয়াতে অনেক তফাৎ বোধ হইল। এখানে যেন সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া খাইতেছেন, কেহই অবজ্ঞার ভাবে খাইতেছেন না। যে সকল লোক একসংগে খাইতেছিলেন তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর একটা টান দেখা গেল, যেন সকলেই নিজের লোক। * * পরমহংস মশাইর প্রতি যেমন একটি আন্তরিক আকর্ষণ হইয়াছিল, পরস্পরের প্রতিও সেইরূপ আকর্ষণ হইয়াছিল। এই-ভাবে পরমহংস মশাই-র একটি আত্মগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। * * দুই তিনজন এক সংগে বসিয়া 'পরমহংস মশাই'-এর সম্বন্ধে কথাবার্তা বড় আনন্দের বিষয় ছিল। রাস্তায় দেখা হইলে পরমহংস মশাইয়ের কথাই হইত। * * অন্য কোন কথা বা সামাজিকতা এসব আর ভাল লাগিত না। নিজেরা যেন অন্য এক রাজ্যের লোক। * * এইভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে লাগিল।"

ঠাকুরের অসুস্থতার সময় কাশী-পুরের বাগানে এই সঙ্ঘ বেশ জমাট হইয়াছিল এবং ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া পরস্পরের আত্মীয়তা এমন দৃঢ় হইয়াছিল যে, কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন না।

ঠাকুরের অদর্শনের পর স্বামীজী স্বতই এই সঙ্ঘের পরিচালক হইয়াছিলেন, যেন নিজের ইচ্ছায় নয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবেরই প্রেরণায়। স্বামীজী যখন "তুই কি চাস্" ঠাকুরের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি সর্বদা সমাধিস্থ হ'য়েই থাকতে চাই।" উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন "বলিস্ কিরে? এত ছোট অধিকার চাইবি তুই?" ঠাকুরের এই কথার ভিতরই সেই তাৎপর্য রহিয়াছে—'নিজের জন্য নরেনের দেহ ধারণ নয়, তার দেহ-ধারণ জগতের হিতের জন্য।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংগে নরেন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক ছিল কোন ভাষাই সে সম্পর্কের স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন, "জন্মে জন্মে দয়ানিধে, আমি দাস তব।" আবার ইহাও বলিয়াছেন —"সত্য বটে আমার নিজের জীবন এক মহাপুরুষের ভাবরাশির অনুপ্রেরণায় চলছে, কিন্তু তাতে কি? ঈশ্বরীয় ভাবসমূহে শুধু এক ব্যক্তির মধ্য দিয়েই জগতে প্রচারিত হয়নি! * * সত্য বটে আমি বিশ্বাস করি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আপ্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমিও একজন আপ্ত এবং তুমিও আপ্ত।"

প্রত্যেক মানুষই মনুষ্যত্বের মহিমায় মহীয়ান্, যদি তাহার নিজের 'মনুষ্যত্ব' সম্বন্ধে উপলব্ধি জাগ্রত হয়। স্বামীজী বার বার বলিয়াছেন, "আমার একমাত্র কাজ মানুষ করে মানুষকে গড়ে তোলা।" স্বামীজী পূজ্যপাদ অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলিয়াছিলেন, "বাংলার যুবকদের হাড় দিয়ে যে বজ্র তৈরি হবে সেই বজ্রের প্রভাবেই ভারতবর্ষের অধীনতা ঘুচে যাবে।"

তিনি বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা ভিন্ন কোনো উন্নতিই সম্ভব হয় না।" তিনি বলিয়াছেন, "উন্নতির প্রধান সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করবার এবং সেই চিন্তাকে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, সেইরকম তার খাওয়া, পোষাকপরা, বিবাহ এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতাও প্রয়োজন—যতক্ষণ না সেই স্বাধীনতায় অন্যের অনিষ্টের কারণ হয়।" তিনি তাঁর একখানা পত্রে লিখিয়াছেন, "কাজে ও চিন্তায় স্বাধীনতাই হচ্ছে জীবনের উন্নতির ও কল্যাণের একমাত্র উপায়। যে মানুষের, যে সমাজের বা জাতির তা নেই তার অধঃপতন নিশ্চিত।"

ইহার সহিত তিনি আজ্ঞাবহতার উপরও বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। আজ্ঞাবহতাই সঙ্ঘবদ্ধ হবার শক্তির উৎস। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিলে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে না। যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায় ও কার্যে যেন স্বাধীন থাকিতে পারে, যে কোন জাতির জাতীয় উন্নতির পক্ষে সেটি একান্ত প্রয়োজন, সেই

সংগে সংঘবদ্ধ হইয়াও কাজ করিতে হইলে আজ্ঞাবহতাও একান্ত প্রয়োজন। স্বামীজী তাঁহার একজন মাদ্রাজী শিষ্য ডাক্তার নঞ্জুন্ডায়াকে ১৮৯৬ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল একখানা পত্র লিখিয়াছিলেনঃ—

"ভারতবর্ষে একটি বিষয়ে আমরা খুব পেছিয়ে আছি। সেটি হচ্ছে, সকলে মিলে মিশে, সংঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ কারবার শক্তির অভাব এবং তা আনবার প্রথম উপায় হচ্ছে আজ্ঞাবহতা। * * সাহস করে এগিয়ে যাও, একদিনে বা একবৎসরে সফলতার আশা কোর না। উচ্চ আদর্শের দিকেই সব সময় লক্ষ্য রাখ। কাজে লেগে থাক। ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ কর। সত্য, মানবজাতি এবং তোমার দেশের চির বিশ্বস্ত আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যদি কাজ করে যেতে পার তা হলে তুমি জগতের ধারাই পরিবর্তন করে দিতে পারবে। মনে রেখো মানুষ—মানুষের জীবন—ইহাই সকল শক্তির গোপন ভান্ডার—অন্য কিছুই নয়।"

ভগবানের অমূল্য দান এই মানব জীবন, ভারতবর্ষে এই জীবনরূপ সম্পদের কিভাবেই না অপচয় হইতেছে! পাশ্চাত্যে বিশেষত আমেরিকায় অর্থ ও বিলাসের প্রাচুর্যের সীমা পরিসীমা নাই। সেই দেশে আসিয়া ভারতবর্ষের দারিদ্র্য যে কি ভীষণ সকল সময়ই স্বামীজী তাহা অনুভব করিয়াছেন। স্বামীজী আমেরিকায় বক্তৃতাপ্রসংগে বলিয়াছেন, "তোমরা ভারতের সর্বত্র গীর্জা তৈরী করছো (অর্থাৎ দলে দলে ধর্মপ্রচারক পাঠাচ্ছ) কিন্তু প্রাচ্যের নিদারুণ অভাব ধর্মের অভাব নয়—তাদের ধর্ম যথেষ্টই আছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারী আজ অন্নের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে, ভারতবাসী শুষ্ককণ্ঠে আর্তনাদ করছে 'অন্ন! অন্ন! তারা অন্ন চায়, তার বদলে পাচ্ছে কাঁকর। অন্নের অভাবে যে উপবাসী, তাকে ধর্মের উপদেশ দিতে যাওয়া মানেই তাকে অপমান করা। * * ভারতবর্ষ সেই দেশ,—যে দেশে যদি কোন ধর্মপ্রচারক অর্থের বিনিময়ে ধর্মপ্রচার করে তবে সে জাতিচ্যুত হয়, লোকে তার গায়ে থুতু দেয়। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীদের জন্য সাহায্য চাইতে এদেশে এসেছি এবং একথা বেশ বুঝেছি যে খৃষ্টান দেশে খৃষ্টানদের কাছ থেকে—যাদের তারা 'হিদেন' অর্থাৎ ঘৃণ্য অপদেবতার উপাসক বলে গালাগালি দেয়, সেই ভারতবাসীদের জন্য সাহায্য পাওয়া কত কঠিন।"

এটি একটি অগ্নিগর্ভ ভাষণ, যাহাতে স্বামীজীর অন্তরের দহনজ্বালার কিছুটা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে। ভারতের অভাব যে কেবল অন্নের অভাবই নয়—(যদিও প্রধানত অন্নের অভাবই সকল অভাবের মূল কারণ) সে সম্বন্ধেও স্বামীজী যেমন মনপ্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন আর কয়জন অনুভব করিয়াছেন? ভারত ভাবুকের দেশ, কিন্তু ভারতের সেই ভাবুকতা ক্লৈব্যতায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন প্রথা ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কারই ধর্মের নামে চলিয়া আসিতেছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। বর্তমানেও সে গুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পার্শ্বেই যখন জীবন ও সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে তখন তৃষ্ণার্ত লোকগুলাকে নর্দামার পচা জল খাওয়ান কেন? * * আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পূতিগন্ধময় ও গতায়ু ভাবরাশির সমর্থন করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত আমার অনেক শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়েছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। * * হায়! যদি দ্বাদশজন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতুম!"

স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পবিত্রাত্মা নরনারীগণ যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করিতে পারেন—সেই মহান্ কার্যে দলে দলে অগ্রসর হইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"A hundred thousand men and women fired with the zeal of holiness fortified with eternal faith in the Lord and nerve to lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the down trodden, will go over the length and the breadth of the land, and preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising up the gospel of equality."

ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য স্বামীজী প্রস্তুত হইতেছেন এবং স্বদেশে ফিরিয়া কিভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন তাহার একটা তালিকা করিয়া লইয়াছেন, গুরুভাইদেরও সে সম্বন্ধে জানাইয়াছেন। সেই তালিকাটি এইঃ—

১। **বেদান্ত প্রচার।** স্বামীজী বেদান্ত প্রচারকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছেন, কেননা বেদান্ত প্রচারই দেশবাসীকে বীর্যবান, দুর্বলতাজয়ী ও ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিবে।

২। **স্বাধীনতা।** ভারতবর্ষ পরাধীন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনা করিবার প্রথম সোপান নিজেকে সর্ববিষয়ের পরাধীনতা হইতে মুক্ত করা। শত বৎসরের দাসত্বে মানুষ এমনভাবে দাসমনোভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজের যে-একটা বিচারবুদ্ধি আছে তাহাই ভুলিয়া গিয়াছে। সে হইয়াছে সংস্কারের দাস, অভ্যাসের দাস, বিলাসিতা ও আরামের দাস। স্বামীজী বলিয়াছেন — "খাদ্যাখাদ্যের বিচারও অনেকটা দাসমনোভাবের কারণ; মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন কিন্তু

শত বৎসরের দাসত্ব কি সেই সব প্রাণী হত্যার চেয়ে অধিক ভয়ানক নয়। যাঁহারা ধনী, আহার্য সংগ্রহের জন্য যাঁহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না, তাঁহারা খান আর নাই খান তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু যাহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের বলপূর্বক নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। চাই মহাতেজ, মহাবীর্য এবং অদম্য উৎসাহ। উত্তম খাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য একটা জাতিকে কি ভাবে কর্মকুশল করিতে পারে জাপান তাহার দৃষ্টান্ত।"

৩। আজ্ঞাবহতা।

৪। **অস্পৃশ্যতা বর্জন।** স্বামীজী বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপে আজ দেশ ডুবতে বসেছে।"। তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর আমেরিকা হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে—"হে ভগবান আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুর মত মানুষগুলি হাড়ি ডোম প্রভৃতি তোমার বাড়ির চারদিকেই যারা রয়েছে তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ? তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য তোমরা কি করেছ বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না, দূর দূর কর। ঐ যে রয়েছেন তোমাদের হাজার হাজার সাধু আর ব্রাহ্মণ, তাঁরা এই পদদলিত গরিবদের জন্য কি করছেন? কেবল বলছেন, 'ছুঁয়োনা, আমাকে ছুঁয়োনা।"

স্বামীজী একথাও বলিয়াছেন, "বাহ্য সভ্যতাও আবশ্যক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের অন্ন সংস্থান হয়। অন্ন! অন্ন! যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইলে গরীবের অন্ন-সংস্থান করিতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে, ব্রাহ্মণই হোন—সন্ন্যাসীই হোন আর যিনিই হোন।"

৫। **শিক্ষা বিস্তার।** নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয় সে জন্য তিনি তাঁহার এক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, "তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে একটি ফান্ড করবার চেষ্টা কর। শহরের যে অংশে সর্বাপেক্ষা দরিদ্রদের বাস সেখানে একটি মাটির ঘর ও একটা চালা প্রস্তুত কর, আর গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, ম্যাপ আর গ্লোব আর কতগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় ক'রে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গরিবদের জড় কর; নিম্ন জাতি এমন কি চাঁড়ালদেরও জড় করবে, তাদের প্রথমে ধর্ম-উপদেশ দেবে। তারপর জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দেবে।"

৬। গ্রাম্য শিল্প ও কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার।

৭। নারী জাতির উন্নতি ও নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার।

ব্রহ্মচারিণী মঠ প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর বহুদিনের কল্পনা। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "যেদিন থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল—মেয়ে পুরুষ ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ, মূর্খ বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ সব তিনি এসে দূর করে দিয়ে গেলেন। তিনি বিবাদ ভঞ্জন—হিন্দু মুসলমান কি ক্রিশ্চান এসব ভেদাভেদ চলে গেল। * * ভারতে দুই মহাপাপ, এক মেয়েদের পায়ে দলা, আর এক 'জাতি জাতি' করে গরীবদের পিষে মারা।"

তিনি আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "মেয়েদের অবস্থার উন্নতি না করলে পৃথিবীর মঙ্গলের কোনও সম্ভাবনা নাই। পাখি এক ডানায় ভর দিয়ে কখনই উড়তে পারে না।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে একজন স্ত্রী-লোককে গুরুরূপে গ্রহণ, মেয়েমানুষের বেশ ধারণ করে স্ত্রীভাবে সাধনা, ইহাতে মা জগদম্বার প্রতিনিধিস্বরূপা সমস্ত নারীই যে মাতৃস্থানীয়া ইহাই প্রচারিত হয়েছে।

"সেই হেতু মেয়েদের জন্যে একটি মঠ স্থাপন করাই আমার প্রথম প্রচেষ্টা। এই মঠে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত এমন কি তাঁদের চেয়ে উচ্চাবস্থার মেয়েও সব তৈরী হবে।"

তিনি আরও যে যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি হইল ভারতবর্ষের তিনদিকে তিনটি প্রধানস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তিনটি কেন্দ্র স্থাপন। দুটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে টাকা দরকার তাহা তিনি ওদেশ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৃতীয়টির জন্য তখনও টাকার সংস্থান হয় নাই, তিনি সে টাকা ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই কেন্দ্রের একটি হইবে হিমালয় প্রদেশে। সেভিয়ার দম্পতির সহিত সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। স্বামীজী একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন (১৮৯৬ খৃঃ ২০শে নবেম্বর) "মিস্টার সেভিয়ার এবং তাঁহার স্ত্রী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে একটি স্থান ঠিক করেছেন—যেটিকে আমি আমার হিমালয়ের কেন্দ্র করতে চাই। সেটি পাশ্চাত্য দেশীয় ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণের স্থান হবে। গুডউইন একজন অবিবাহিত যুবক। সে আমার কাছে থাকবে ও আমার সঙ্গে বেড়াবে। সে একরকম সন্ন্যাসীই।"

"উইম্বলডনের মিস্ এম্ নোবল্ একজন বড় কর্মী।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসবের আগেই কলিকাতা পৌঁছিবার জন্য আমি খুবই উৎসুক। আমার বর্তমান কর্মপন্থা হবে দুটি কেন্দ্র স্থাপন করা—একটি কলিকাতায় ও অপরটি মাদ্রাজে। এই দুই কেন্দ্রেই যুবক প্রচারকগণকে শিক্ষা দেওয়া হবে। কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের কর্মক্ষেত্র, সেদিকে আমার সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে। এবং কলকাতায় একটা কেন্দ্র করবার জন্য আবশ্যকীয় অর্থ আমার কাছে আছে। মাদ্রাজের কেন্দ্রটির জন্য ভারতবর্ষ থেকেই টাকা পাব বলে আশা করছি।

"আমরা এই তিনটি কেন্দ্র (হিমালয়, কলিকাতা ও মাদ্রাজ) থেকে কার্য আরম্ভ করবো। পরে বোম্বে ও এলাহাবাদে আমরা কেন্দ্র করবো। যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা হয় এই সকল কেন্দ্র থেকে আমরা যে কেবল ভারতবর্ষেই অভিযান করবো তা নয় পরন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশে দলে দলে

প্রচারক পাঠাব। এইটি আমাদের প্রথম কর্তব্য। উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাও।"

"বর্তমানে ইংরাজী ভাষায় আমাদের একখানি পত্রিকা আছে, (ব্রহ্মবাদিন)। দেশীয় ভাষায় আমরা কতকগুলি পত্রিকা পরে বার করতে পারি।"

স্বামীজীর সংকল্পিত এই তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিলঃ হিমালয়ে "মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম," কলিকাতায় গঙ্গাতীরে "বেলুড় মঠ" এবং মাদ্রাজে "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।"

যদিও স্বামীজী কলিকাতার কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পত্রে এমন নির্দেশ নাই যে, "বেলুড় মঠ"-ই সকল কেন্দ্রের পরিচালক হইবে, বরং তাঁহার আর একখানি পত্রে "আমি বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের পক্ষপাতী।" এই কথাটি পাওয়া যায়।

এই সময় স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কেননা ভারতবর্ষে তখনও কোন কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। আলমবাজার মঠে তাঁহার গুরুভাইরা আছেন, কিন্তু সেটি অস্থায়ী আশ্রয়, তাকে কেন্দ্র বলা চলে না। মিসেস অলিবুলকে তিনি এক পত্রে ভারতে ফিরিয়া যাইবার কথা জানাইয়াছিলেন, ঐ পত্রের উত্তরে মিসেস অলিবুল তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের জন্য যদি কলিকাতার কোন স্থানে একটি আশ্রম করেন, তাহা হইলে সেই আশ্রম স্থাপনের জন্য যে টাকার দরকার তাহা মিসেস অলিবুল দিতে চাহিলে স্বামীজী তাঁহার সে আবেদন গ্রহণ করিবেন কিনা?

স্বামীজী তাঁহার সেই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"তোমার এই অতি মহৎ প্রস্তাবে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনাবশ্যক।

"প্রথমেই খুব বেশী টাকায় আমি নিজেকে জড়িত করতে চাই না। যেমন যেমন কাজ অগ্রসর হবে সেইভাবে আমি ঐ টাকা খুব আনন্দের সঙ্গে কাজে লাগাব। আমার কার্যপ্রণালী কি রকম হবে এবং কিভাবে তা সফলতা লাভ করবে এ সম্বন্ধে আমি ভারতবর্ষে গিয়ে তোমাকে বিস্তারিতভাবে জানাব।

"১৬ই ডিসেম্বর এখান থেকে রওনা হ'য়ে ইটালী পৌঁছে নেপ্‌লসে স্টীমার ধরবো।"

নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি স্বামীজী মিসেস সেভিয়ারকে চারখানা টিকিট কিনিতে বলিলেন; এই চারখানা টিকিট কেনা হইল নেপল্‌স হইতে যে জাহাজ কলম্বো শীঘ্রই রওনা হইবে তাহারই বার্থ রিজার্ভ করিবার জন্য। বরাবর জাহাজে গেলে ভারতে পৌঁছিতে দেরি হইবে এজন্য স্বামীজী নেপলস্‌ পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন। চারখানা টিকিট স্বামীজী, জেমস্‌ গুডউইন ও মিস্টার সেভিয়ার এবং মিসেস সেভিয়ার এই চার-জনের জন্য।

স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে-ছেন এ সংবাদ লণ্ডনে প্রচারিত হইল। স্বামীজীর যাঁহারা বন্ধু এবং শিষ্য তাঁহারা ঠিক করিলেন এতদিন যে মহাপুরুষ তাঁহাদের সঙ্গ দান করিয়া মানুষের প্রকৃত উন্নতি কোন্‌ পথে সে সম্বন্ধে শিক্ষা ও প্রেরণা দান করিয়াছেন তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিতে হইবে। সেই সময় তিনি যে কতখানি দিয়াছেন এবং সেই দান তাঁহাদের পক্ষে কি অমূল্য সম্পদ তাহাও তাঁহাকে জানাইতে হইবে। ভাষায় মনের ভাব যতখানি প্রকাশ করা যায় তত-খানি প্রকাশ করিতে হইবে তাহাদের অসীম কৃতজ্ঞতা ও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা।

স্বামীজীর প্রিয় বন্ধু মিস্টার স্টার্ডি এই অভিনন্দন দান ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অভিনন্দনটি রচনা করিলেন জেমস গুড্‌উইন। পিকাডিলিতে 'রয়েল সোসাইটি অব্‌ পেণ্টার্স ইন্‌ ওয়াটার কলার' সমিতির ভবনে সাধারণ সভায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর অভি-নন্দন দিবার দিন স্থির হ'ল।

সেদিন পিকাডিলি হল লোকে লোকা-রণ্য। এত ভিড়েও কোন গোলমাল ছিল না। অতি প্রিয়জন দূরদেশে চলিয়া যাইতেছেন তাহারই বিদায়ের এই আয়োজন, সভায় এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছিল।

স্বামীজী যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন অস্ফুট কলরব উঠিল, "ঐ আসছেন, ঐ আসছেন"। স্বামীজী আসন গ্রহণ করিবার পর মিস্টার এইচ বি এম বুকানন সভাপতি মিস্টার স্টার্ডিকে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্রখানি স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং মিসেস জি সি এ্যাশ্‌টন জনসন সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র অর্পণ করা হইল এবং তুমুল করতালি ধ্বনিতে জনসাধা-রণের পক্ষ হইতে তাহা সমর্থিত হইল।

অভিনন্দনপত্রের উত্তর দিবার জন্য স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সেটি অবশ্য অভিনন্দনকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলা হইল কিন্তু তাহার বিষয় ছিল 'অদ্বৈত বেদান্ত'। জগতে 'দুই' বলিয়া যাহা কিছু তা অধ্যাস মাত্র, প্রকৃত 'দুই' বলিয়া কিছু নাই। দেশ কালের ভেদ, বাহিরের যত কিছু পার্থক্য সকলই এক পরম 'একে'রই বিভিন্নরূপে প্রকাশ।

এই বক্তৃতাই লণ্ডনে স্বামীজীর শেষ বক্তৃতা। দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাইবার সময় যখন তিনি লণ্ডনে আসেন তখন তিনি কোন বক্তৃতা করেন নাই। এই দিনের বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে শ্রোতাগণ যেন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন করতালিধ্বনি পর্যন্ত শোনা যায় নাই। বক্তৃতার শেষে সমস্বরে অনুরোধ শোনা গেল, 'স্বামীজী, আবার আপনি আসবেন আমাদের মধ্যে।"

শাঙ্গর্দেব

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

পঞ্চনবতিতম রবীন্দ্রজন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই কলকাতাতেই সংখ্যাতীত অনুষ্ঠানে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষিত হয়েছে—আমরা কবিগুরুর প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত জনসাধারণের এই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি। মহাকবির স্মৃতিচারণ উপলক্ষ্যে সমগ্র জাতির এই শুভ, সার্থক উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টাকে আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই উৎসব উপলক্ষে আমরা বহু আমন্ত্রণ পেয়েছি এবং বহু উৎসবে যোগদান করেছি। এই সব নানা অনুষ্ঠানের বিবরণ ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—অতএব এর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই,—তবে 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন', 'রবীন্দ্রভারতী' এবং বি কে পাল পার্কে দুই-এর পল্লীর অনুষ্ঠানের উল্লেখ না করলে ত্রুটি থেকে যাবে কেননা বহু বৈচিত্রের মধ্যে এ'দের অনুষ্ঠান সামগ্রিকত্ব এবং সর্বজনীনত্ব লাভ করেছে। এ ছাড়া বিডন স্কোয়ারে এবং হাওড়ার যুব-সভা কর্তৃক সংগঠিত রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগেও দুটি সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গীতবিতানও একটি অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন যেমন সঙ্গীতানুষ্ঠানে তাঁদের সম্মেলন সার্থক করেছেন তেমনি একটি সাহিত্যিক ঐতিহ্যেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুটি মিলিয়ে তাঁদের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। সর্বোপরি মহাজাতি-সদনে এই উৎসবটি সম্পাদিত হওয়ায় এই সম্মেলনের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ'দের উদ্যোগে প্রচারিত কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা গেলঃ—

পূজা—কথাকলি—গ্রন্থনা—শ্রীহীরেন বসু। সঙ্গীত পরিচালনা—শ্রীঅশোক সরকার ও আর্যকুমার সেন। নৃত্য-পরি-পরিকল্পনা—শ্রীমঞ্জুশ্রী চাকী।

শিশুতীর্থ— শিল্পীচক্র— সঙ্গীত-পরিচালনা—হিমঘ্ন রায় চৌধুরী। নৃত্য-পরিকল্পনা—শ্রীগণেশ দত্ত ও শ্রীগৌরী মজুমদার। সূত্রধার—রেবতীভূষণ ঘোষ ও শ্রীঅরুণাভ দত্ত।

মায়ার খেলা— গীতবিতান— সঙ্গীত-পরিচালনা—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, নৃত্যপরিকল্পনা—শ্রীগোপাল পিল্লাই।

জয়ন্তী গীতিমাল ও বসন্ত বন্দনা— সংগীত সংস্কৃতি— পরিচালনা— শ্রীসমরেশ চৌধুরী, নৃত্য-পরিকল্পনা —শ্রীগোপাল পিল্লাই।

সামান্য ক্ষতি—নৃত্যকলালয়—পরিচালনা— শ্রীমতী ঠাকুর।

ভানুসিংহের পদাবলী— আনন্দনিকেতন— সঙ্গীত পরিচালনা—শ্রীকমলা বসু নৃত্য-পরিকল্পনা—শ্রীবনশ্রী ঘোষ।

নবীন—প্রান্তিক— সঙ্গীত পরিচালনা— শ্রীসমর গুপ্ত, নৃত্য-পরিকল্পনা— শ্রীবিজয় দাস।

চিত্রাঙ্গদা— রবিতীর্থ—সঙ্গীত পরিচালনা —শ্রীসুচিত্রা মিত্র, শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী। নৃত্য-পরিকল্পনা— শ্রীঅনাদি প্রসাদ।

সঙ্গীতাংশে বহুসংখ্যক শিল্পী অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। সম্মেলনের আমন্ত্রণে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গানে রবীন্দ্রস্মৃতি চারণ সার্থক হয়েছে।

সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সূচনা বোধ হয় এ'রাই প্রথম করেন এবং এই প্রেরণা কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে আজ দেশব্যাপী রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনেই তার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

নবনির্মিত 'রবীন্দ্রভারতী' ভবনে 'রবীন্দ্রভারতী' কর্তৃক অনুষ্ঠান এই প্রথম। এ'দের উদ্যোগে যে সব বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে সেগুলিরও উল্লেখ করা গেলঃ—'ভানুসিংহের পদাবলী'—কথাকলি, 'জীবনদেবতা'—উদীচী, 'বর্ষা-গীতি'—মুক্তধারা, 'মাধবী' নৃত্যনাট্য—উত্তরী, 'ঐ মহামানব আসে'—মধুচক্র সাহিত্যসংসদ, 'শ্যামা' — সুরমন্দির, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত' —গীতালি, 'রবীন্দ্রনাথের গান ও বাংলার লোকসঙ্গীত'—সঙ্গীত সহযোগে আলোচনা—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাসের দেশ'—মৈত্রী, 'ঋতু বন্দনা'—আর্ট ডিসপ্লে, 'কুরূচি'—সাংস্কৃতিক চক্র, 'নবীন'—প্রান্তিক।

বি কে পাল পার্কে যে সব বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'মাধবী' নৃত্যনাট্য, 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'কুরূচি' এবং 'বসন্ত'। এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হ'চ্ছে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গীতালোচনা।

আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে গীতবিতানের অনুষ্ঠানাদির উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হ'ল 'রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমপর্যায়' শীর্ষক উদাহরণ সহযোগে আলোচনা, শিশুদের সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্যাভিনয়।

শ্রীসমরেশ চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত সংস্কৃতি' শিক্ষায়তন ২৫, হিন্দুস্থান রোডস্থ ভবনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিবিধ সঙ্গীত এবং বসন্তোৎসবের গীত সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়।

এই সব নানা অনুষ্ঠান থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে যে সমস্ত রচনাকে গীতালেখ্য বা নৃত্যনাট্যে পরিবর্তিত করেন নি সেগুলিরও সাঙ্গীতিক রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে এই উদ্যমে কতকটা সাফল্য অর্জন করেছেন, অনেকে করেন নি। কবিগুরুর রচনার এই রকম improvisation আনা সহজসাধ্য নয়। অতএব এই ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন অংশ তেমন নৈপুণ্যের সঙ্গে গ্রথিত হয় না—ফলে অনুষ্ঠানে অনেক অসঙ্গতি থেকে যায়।

এবারকার বিবিধ অনুষ্ঠানে একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য ক'রে অনেকেই আনন্দিত হবেন যে শিল্পীরা সাধারণভাবে রবীন্দ্র-

সংগীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষার দিকে যত্নবান হয়েছেন। কবিগুরুর গান যাতে বিকৃত-ভাবে পরিবেশিত না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে এটি বেশ বোঝা যায়। সকলে হয়তো প্রচেষ্টায় সফল হন নি তথাপি রবীন্দ্রসংগীত যথাযথভাবে শিখে প্রচার করবার যে একটা আগ্রহ শিল্পীদের মনে জাগ্রত হয়েছে এইটিই একটি শুভ সংবাদ। এই অনুভূতিটির বিশেষ প্রয়োজন কেননা শুধু রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেই নয়—যথাযথভাবে সংগীত পরিবেশনের বোধ জাগ্রত হ'লে ক্রমে সমস্ত রচয়িতার গানই ঠিকভাবে গাইবার প্রয়াস দেখা দেবে এবং এতে করে আমাদের সংগীতের মান অনেক উন্নত হ'বে আশা করা যায়।

আর একটি কথা। এবারকার অনুষ্ঠানের বাহুল্য দেখে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হ'য়ে এমন মন্তব্য করেছেন যাতে উদ্যোক্তা এবং শিল্পীবৃন্দের অনেকেই ব্যথিত হয়েছেন। এমন কথা বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রসাহিত্য বা সংস্কৃতির অধিকারী না হ'য়েও অনেকে শুধু হৈ চৈ করবার জন্যই ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব করছেন। এই ধরনের মনোভাব পোষণ করা যুক্তিযুক্ত নয় কেননা রবীন্দ্ররচনার ওপর অধিকার সকলেরই আছে—সকলেই তাঁর রচনা পাঠ করেন, তাঁর গান গাইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন গোষ্ঠী তৈরি করেন নি,—তিনি নিজে ছিলেন সব সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। অতএব স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে দেশবাসী যখন তাঁকে অভি-নন্দন জানাচ্ছেন তখন তাঁদের প্রতি এমন অসংগত কটাক্ষ না করাই উচিত ছিল। অবশ্য উচ্ছ্বাস যখন ব্যাপক হয়ে ওঠে তখন কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা লঘুতা দেখা দেয় কিন্তু তা কালধর্মে আপনা থেকেই লোপ পায়। এই লঘুতা সম্পর্কে সচেতন করতে হ'লে এত কঠোর ভাষা প্রয়োগের কারণ ছিল না। কবে কে কোন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এই কারণেই তিনি যদি নিজেকে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির একমাত্র অধিকারী বলে মনে করেন তবে তার চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হ'তে পারে না। যিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেননি অথচ তাঁর রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছেন, তাঁর ভাবধারার সংগে গভীরভাবে পরিচিত হয়েছেন, তাঁকেও তো প্রকৃত অধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত করা সংগত নয়। তা ছাড়া কে অধিকারী আর কে অধিকারী নয় এক মুহূর্তেই সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাটাও তো হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কবিগুরুর সান্নিধ্যে এসেছেন এই গর্বে স্ফীত হ'য়ে যদি কেউ অপরকে নিরতিশয় লঘুজ্ঞান ক'রে মন্তব্য ক'রে থাকেন তো তিনিই কবিগুরুর সবচেয়ে বড় অসম্মান ঘটিয়েছেন।

আরও একটি ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়েছি। কেউ কেউ এই উৎসবে ব্যাপক সংগীতানুষ্ঠানের প্রতি অযথা কটাক্ষ করেছেন। এখানেও সেই একই যুক্তি অর্থাৎ অধিকারীর প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, যাঁরা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের বিস্তীর্ণ আয়োজন করেছেন তাঁদের মনোভাবকে ব্যবসায়ীসুলভ মনোভাব বলে নিন্দা করা হয়েছে।

এই সব সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী মনোভাবটা কোথায় দেখা গেল? তাঁরা যদি অনুষ্ঠানাদির ব্যয়ভার বহন করবার জন্য কিছু প্রবেশমূল্য নির্ধারিত ক'রে থাকেন তবে কি কাজটা অন্যায় হয়? সংগীত শিক্ষায়তন যাঁরা গঠন করেছেন তাঁরাও কি অনুরূপভাবে অর্থসংগ্রহ করছেন না? তাঁদের প্রতিষ্ঠানের "কালচারেল মেম্বারসিপ" বা "বিল্ডিং ফান্ড্"-এর জন্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান—এসবের জন্যও তো তাঁরা রীতিমত অর্থ দাবী করে থাকেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি কেউ ব্যবসায়ী মনোভাবের কথা তোলেন তবে সেটা তাঁদের কাছে অসহ্য হয়।

রবীন্দ্র-সংস্কৃতিকে জনসাধারণ যতই আগ্রহের সংগে বরণ করছেন ততই এক জাতীয় লোক বিষম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁদেরই ছিলেন, আজ জনসাধারণ তাঁকে এ'দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন। এই বিচিত্র মনোভাবের একটি বিচিত্র কারণও আছে কিন্তু সে আলোচনা থাক।

মোদ্দা কথা,—রবীন্দ্র-সাহিত্য বা রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকার সকলেরই আছে, বিশেষ ক'রে কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে। এটা তো কোন বিশেষ সাংগীতিক বা সাহিত্যিক অনুষ্ঠান নয়। এ হ'চ্ছে কবিগুরুর জন্মদিবস উপলক্ষে জনসাধারণের স্বতঃ-স্ফূর্ত অভিনন্দন। এর আনন্দকে যিনি উপভোগ করতে পারেন তিনিই ধন্য আর যিনি ভুরু কুঁচকে আর নাক সিঁটকে সব কিছু অনুষ্ঠানের ত্রুটিটাই লক্ষ্য করে গেলেন তিনি কৃপার পাত্র, কেননা এই আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণে রসের পরম আস্বাদ লাভের সুযোগ তাঁর হ'ল না।

আলাউদ্দীন সংগীত পরিষদ

গত ৮ই মে আলাউদ্দীন সংগীত পরিষদের উদ্যোগে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে শ্রীনীহারবিন্দু চৌধুরীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শ্রীযুক্ত চৌধুরী দীর্ঘ-কাল বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র এবং সংগীতে শিক্ষালাভ ক'রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং অধ্যাপনাতেও প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই সংগীতানুষ্ঠানে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীগণ যে সংগীতের একটি সর্বাংগীণ রূপের সংগে পরিচিত হচ্ছেন সেটি বোঝা গেল। অনুষ্ঠানে সেতার, বাঁশি, সরোদ, গীটার এবং এস্রাজ ছাড়াও কণ্ঠসংগীত ছিল। এছাড়া বিবিধ গীটারে কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য সংগীতানুষ্ঠানও বিশেষ উপভোগ্য হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই উভয় সংগীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে আজকাল অনেক শিক্ষকেরই এ বিষয়ে তেমন ধারণা নেই,—শ্রীযুক্ত চৌধুরীর মধ্যে এই চিন্তা-শীলতার পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

য়ুং কাঙ গুহামন্দির

পৃথিবীর প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতার অনেক নিদর্শন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মহাকালের স্বাভাবিক ধ্বংস-প্রবণতা নিশ্চয়ই এর জন্য দায়ী। তবু মানুষের অত্যাচারে যে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে একদল বাস্তুহারা হোয়াইট রাশিয়ান আশ্রয় নিয়েছিল মধ্য এশিয়ার তুং হুয়াং গুহামন্দিরে। সেখানে বাধা দেবার কেউ ছিল না, যথেচ্ছভাবে তারা বসবাস করেছে। উনুনের ধোঁয়া তুং হুয়াংএর বহু অমূল্য দেওয়াল-চিত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে। বর্তমান চীন সরকার তুং হুয়াং মন্দির রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পূরণ করা সম্ভব নয়।

সৌভাগ্যক্রমে উত্তর চীনের বৃহত্তম শিল্প নিদর্শন য়ুং কাঙ্ বৌদ্ধমন্দির মানুষের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই মন্দিরের অবস্থান অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে বলে এত বড় কীর্তির কথা লোকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। ১৯০২ সালে অধ্যাপক ইতো য়ুং কাঙ্ নতুন করে আবিষ্কার করে পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনমানবহীন দুর্গম স্থানে বেশিদিন থেকে অনুসন্ধান করা অধ্যাপক ইতোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯০৭ সালে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ই শাভান য়ুং কাঙ্-এর গুহা মন্দিরগুলি সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তার পর একে একে অনেক দুঃসাহসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ য়ুং কাঙ্ গিয়েছেন। কিন্তু সেই দুর্গম জনমানবহীন স্থানে দীর্ঘকাল থেকে কারো পক্ষে এই
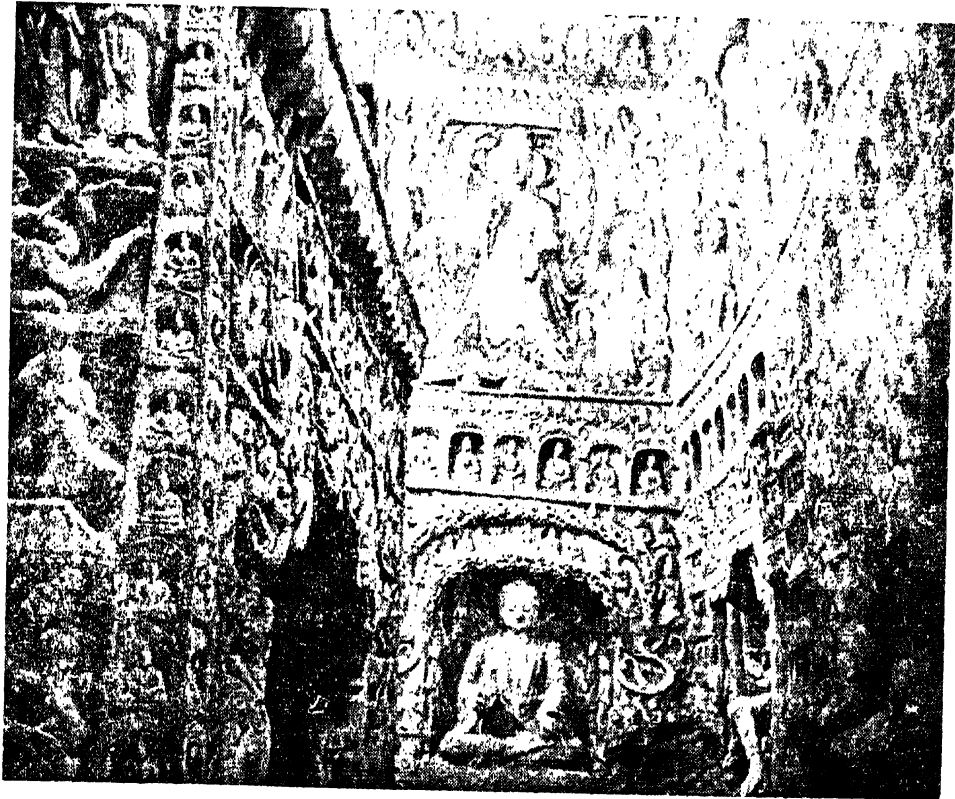
য়ুং কাঙ্ মন্দির : ৬নং গুহার অভ্যন্তর

৪নং গুহার বুদ্ধ মূর্তি

বিরাট কীর্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিৎসুনো এবং অধ্যাপক নাগাহিরো ১৯৩৮ সালে ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েণ্টাল কালচারের উদ্যোগে য়ুং কাঙ্ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর প্রায় ছ' মাস যাবৎ তাঁরা য়ুং কাঙ্ থেকে গুহা মন্দিরগুলিতে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছেন। দু-একবার একটানা ছ' মাস থাকাও সম্ভব হয়নি। নানা অসুবিধার জন্য অনেক আগেই তাঁদের চলে আসতে হয়েছে। তবু প্রধান কুড়িটা গুহার কাজ তাঁরা শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাভাব, খাদ্যাভাব এবং অসুখ-বিসুখ তো তাঁদের বিব্রত করেছেই, তার উপর এলো যুদ্ধের সংকট। সকল বাধা অগ্রাহ্য করে অধ্যাপক মিৎসুনো এবং অধ্যাপক নাগাহিরো তাঁদের সাধনা সফল করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বালি-পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন ভেঙে পড়েছে। যেগুলো অটুট আছে, তাদের প্রতিলিপি তুলে না রাখলে একটা বিরাট কীর্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই অধ্যাপকেরা ফটো তোলবার দিকে দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু ছবি তোলা সহজ কথা নয়। মূর্তি ও কারুকার্য-গুলির উপর দেড় হাজার বছর ধরে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। সে আস্তরণ কোথাও কোথাও এক ইঞ্চিরও বেশি পুরু। ধুলো পরিষ্কার করবার পর সমস্যা দেখা দিল উপযুক্ত আলোর। সেখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই, সুতরাং গুহার অন্ধকারে ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এ বাধাতেও তাঁরা দমলেন না। বড় বড় আয়না সুকৌশলে বিন্যাস করায় সূর্যালোক গুহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হলো; এবং সেই আলোর সাহায্যে ছবি তোলার অসুবিধা থাকল না। অধ্যাপক মিৎসুনো এবং অধ্যাপক নাগাহিরো অক্লান্ত সাধনা দ্বারা য়ুং কাঙ গুহা সম্বন্ধে যে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেছেন, তা এখন খণ্ড খণ্ড করে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

বুদ্ধ

পিকিং-পাওতো রেলপথের উপর তা-তুঙ্ একটি প্রধান শহর। তা-তুঙ্ থেকে প্রায় আট মাইল দূরে উ-চু নদীর তীরে য়ুং কাঙ্ গ্রাম। নদীর তীর ঘেঁষে খাড়া পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড় কেটে প্রায় চল্লিশটি ছোট-বড় গুহা মন্দির নির্মিত হয়েছিল উত্তর ওয়েই রাজাদের রাজত্বকালে। ৪৬০ থেকে ৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মন্দির নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ শ্রমণদের অধ্যক্ষ তাঙ্-ইয়াও ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন। উত্তর ওয়েই রাজবংশের সম্রাট ওয়েঙ্-চেঙ্ ছিলেন অধ্যক্ষ তাঙ্-ইয়াও-র ভক্ত। তাঙ্-ইয়াও যে কাজ আরম্ভ করেছেন, তা সম্পূর্ণ করবার জন্য ৪৬০ সালে সম্রাট ওয়েঙ্-চেঙ্ আদেশ করেন। প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল পাঁচটি গুহা মন্দির নির্মাণ করবার। প্রত্যেকটি মন্দিরে বৃহৎ আকারের বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হবে। অধ্যক্ষ তাঙ্-ইয়াও নিজেই নাকি দুটি বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন; এ দুটি এবং আরো অনেক-গুলি বুদ্ধমূর্তি উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি।

একজন গৃহী ভক্তের মস্তক : ৭নং গুহা

উত্তর ওয়েই রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ শ্রমণরা নানা প্রকার

বুদ্ধের পার্শ্বচর : ১৯নং গুহা

আর একটি বুদ্ধ মূর্তি

সুবিধা ভোগ করতেন; শ্রমণদের জীবন-ধারণের জন্য ভাবতে হতো না; অর্থের অভাব ছিল না; তাঁরা পেতেন প্রচুর অবসর। এসব সুযোগ-সুবিধার লোভে এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমণরা আসতেন। ধীরে ধীরে য়ুং কাঙ্ বৌদ্ধ ধর্মের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। খাদ্য সংগ্রহের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রমণরা মনোনিবেশ করলেন য়ুং কাঙের বৌদ্ধ মন্দিরকে প্রসারিত ও শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলতে। এর ফলে য়ুং কাঙের মন্দির এলাকা প্রায় এক মাইল বিস্তৃত হয়ে পড়ল। কিন্তু ৪৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজধানী লো-য়াঙ্ স্থানান্তরিত হওয়ায় য়ুং কাঙের মর্যাদা হ্রাস পেতে আরম্ভ করল। ক্রমশ য়ুং কাঙের কথা লোকে একেবারে ভুলে গেল।

য়ুং কাঙ্ বৌদ্ধ মন্দিরের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে এশিয়ার বিভিন্ন শিল্পরীতির মিলন ঘটেছে। য়ুং কাঙের শিল্পকলার উৎকর্ষ বিচারে এই বৈশিষ্টাকেই আবার ত্রুটির কারণ বলেও নির্দেশ করা যায়। একটি বিশেষ মুখ, একটি বিশেষ ফুল বা একটি অলঙ্করণ হয়তো সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরীতির উপযুক্ত সমন্বয় না ঘটায় রসসৃষ্টিতে বাধা জন্মে। একই মূর্তির হিন্দু শিল্পের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বক্ষ প্রশস্ত; মুখমণ্ডলে গান্ধার রীতির ছাপ শুধু ঠোঁটের কাছে চীনাসুলভ একটু চাপা হাসি। গ্রীক, গান্ধার, পারস্য, চীনা ও হিন্দু শিল্পের ধারা য়ুং কাঙে মিলিত হয়েছে। চীনের নিজস্ব শিল্প-কলা পঞ্চম শতাব্দীতে যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু ভারত থেকে বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে যে শিল্পরীতি গেল, তাকে সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করতে হয়েছিল। ধর্মের সহিত যার যোগ, তা পবিত্র, সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। বৌদ্ধ শ্রমণরা চীনদেশে যেতেন সাধারণত তক্ষশীলার পথে, মধ্য এশিয়া পার হয়ে। তাই গ্রীক, গান্ধার ও পারস্য শিল্পরীতি ভারতীয় শ্রমণদের সঙ্গে যাওয়া সহজ হয়েছিল। তাছাড়া মধ্য এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে ইতিপূর্বেই আর একটি বৌদ্ধ গুহা মন্দির স্থাপিত হয়েছে। এই মন্দিরটিও ছিল এশিয়ার সকল জাতির মিলনকেন্দ্র। তুঙ্ হুয়াং গুহায় বিশ্রাম করে যাত্রীরা য়ুং কাঙের পথ ধরতেন। তুঙ্ হুয়াং গুহার বিভিন্ন শিল্পাদর্শ য়ুং কাঙের শিল্পকলাকেও প্রভাবান্বিত করেছে। প্রবাদ এই যে, য়ুং কাঙের শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভারতীয়। তাই বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত মূর্তিগুলি ছাড়া শিব, বিষ্ণু, গড়ুর প্রভৃতির মূর্তিও সেখানে পাওয়া গেছে। বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলি ভাস্কর্যের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু এক-একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তিকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার অন্যান্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কুলুঙ্গি, দেওয়াল, ছাদ কোথাও ফাঁক নেই। হয়তো কোনো গৃহী ভক্ত করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে উপাসনার ভঙ্গীতে, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের নিকটে পরি-চারকরা আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, শ্রমণরা বুদ্ধের উপদেশ প্রচার করছে—এমনি অসংখ্য ভক্তি ও পূজার দৃশ্য মন অভিভূত করে।

ঘোড়ার মাথা : ৪নং গুহা

একটি বিচিত্র প্রাণী : ৪নং গুহা

চল্লিশটি গুহার হাজার হাজার মূর্তির সবগুলি সার্থক শিল্পসৃষ্টি হবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু শিল্পীর দুঃসাহসিক বিরাট পরিকল্পনা যে কেনো দর্শককে বিস্মিত করবে। য়ুং কাঙের বিরাট কীর্তির মধ্যে অপূর্ব সুন্দর শিল্পকার্যেরও অভাব নেই। ভারতীয় শিল্পের প্রভাব এদের মধ্যে এত বেশি যে, মনে হবে ভারতের কোন গুহার ছবি দেখছি।

ইদানীংকার বাংলা সমালোচনা

অরুণকুমার সরকার

আমার এক বন্ধু প্রায়ই দেখি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লিখে থাকেন। কাকে মাত্রাবৃত্ত বলে, কাকে স্বরবৃত্ত, আর কাকেই বা পয়ার,—বন্ধুটি তা জানেন না। আলোচনা ক'রে দেখেছি বংলা কবিতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসও তাঁর জানা নেই। সমসাময়িক বিদেশী কবিদের মধ্যে কয়েকজনের নাম, বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ, তাঁর জানা আছে বটে কিন্তু তাঁদের রচনার সঙ্গে বন্ধুটির আক্ষরিক পরিচয় নেই বল্লেই চলে।

অতীব বিনয়ের সঙ্গে একদিন তাঁকে বলেছিলাম, ব্যাকরণ ছাড়া উপভোগ হয়তো সম্ভব, কিন্তু বিশ্লেষণ কিছুতেই নয়। গানের উপর আলোচনা করতে গেলে যেমন সুর-তাল-মাত্রার জ্ঞান দরকার, চিত্রকলা সম্বন্ধে লেখবার আগে যেমন রঙরেখা-প্রেক্ষিত সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন, কাব্যালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি ছন্দবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক বোধ থাকা বাঞ্ছনীয়; এবং তৎসহ কিছুটা কাব্য ইতিহাসের।

আমার কথায় বন্ধুবর যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমিও তাতে অবাক হইনি। কেননা, আমার বন্ধুটি কিছু ব্যতিক্রম নন। বাংলা পুস্তকের সমালোচনা যাঁরা লিখে থাকেন, যদি বলি অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই তাঁরা অনধিকারী, তবে, অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সেটা খুব অনৃতভাষণ হবে না। প্রশ্ন ওঠেঃ অনধিকারীরা এমন আসন জুড়ে বসল কী ক'রে? কোথা থেকে আস্করা পেল দুঃসাহসের?

আমি বলব, সাক্ষাৎ লেখকদের কাছ থেকেই। এদেশের লেখকরা, ব্যতিক্রম সম্বন্ধে সজাগ থেকেই বলছি, সমালোচনা চান না, বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হতে পারে এমনতর প্রশংসাবাচনই খোঁজেন। আর অনধিকারীদের কাছ থেকে সহজেই যে সেটা আদায় করা যায় তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং প্রারম্ভিক প্রস্তুতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কতকগুলো বিশেষণকে কায়দা-মাফিক ব্যবহার করতে জানলে যে কেউ এদেশে সমালোচক হিসেবে খ্যাত হতে পারেন। শুধু সাহিত্যের নয়,—শিল্পের, সঙ্গীতের, নাটকের।

তাই সাম্প্রতিক সমালোচনা সাহিত্যের দীনতার জন্য আমি অন্তত লেখকদেরই দায়ী মনে করি। মনের মতো কথা বলতে না পারলে তাঁদের সঙ্গে মনান্তর অনিবার্য। প্রবীণেরা তো দূরের কথা, পনেরো বছরের কিশোর কবির মধ্যেও অহেতুক অভিমান লক্ষ্য করেছি। দু'একটি পঙ্‌ক্তির অসাবধানতার দিকে অতীব সতর্কতার সঙ্গে যেই না দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছি, অমনি বলে উঠলঃ জানেন অমুকবাবু আমার রচনা সম্বন্ধে কী লিখেছেন?

অমুকবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁর প্রশংসাপত্র কিশোর কবিটির কাব্যগ্রন্থে ভূমিকা হিসেবে ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া, আর একজন বিখ্যাত কবির আশীর্বাণীও শোভা পাচ্ছিল মলাটে। তাঁদের কথায় বিশ্বাস করতে হলে অস্বীকার করবার যো থাকে না যে কিশোর কবিটি রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ের তো বটেই, তার চাইতেও বেশি কিছু। আমি ঝগড়াটে নই। সুতরাং আমাকে চুপ ক'রে যেতে হল।

উত্তরচল্লিশে পেঁ'ছে এদেশের লেখকেরা দেবদৃষ্টি লাভ করেন। ফলে মুড়ি-মিছরি তাঁদের কাছে একই বস্তু বলে প্রতিভাত হয়। পিঠ থাক বা না থাক পিঠ থাবড়ে দেওয়াটাকে তাঁরা গুরুজনোচিত কর্তব্য ব'লে মনে করেন। কর্তব্যসাধনে মাত্রাজ্ঞান হারালেন কিনা একবারও ভেবে দেখেন না। তাই এদেশের যে-কোনো হঠৎ-লেখক যে-কোনো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের কাছে উপযুক্ত তদ্বির ক'রে মনের মতো সার্টিফিকেট আদায় করতে পারেন।

বলা বাহুল্য এই সব সার্টিফিকেটের দ্বারা সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হলেও, বিবেচক পাঠকের মনে সেগুলি কোনো দাগ রাখে না। সার্টিফিকেট-দাতারাও লেখার পর-মুহূর্তেই কী লিখেছিলেন ভুলে যান। কিন্তু যে-বইকে সার্টিফিকেট দেওয়া হল তার লেখকের মনে স্বভাবতঃ ধারণা হয়ে যায় যে তিনিও নেহাত রামা শ্যামা নন, কেষ্টবিষ্টুর একজন।

তার ফল যে কী হয় প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। চকোলেটের বাক্সের মতো নয়নাভি-রাম মলাটে, আষ্টেপৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে প্রতিদিনই বাংলাদেশে অজস্র গল্প উপন্যাস-কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে আর সমালোচকদের মতামত অনুযায়ী প্রত্যেকটি লেখকই 'শ্রেষ্ঠ'। কেউ ব 'কল্লোলোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ', কেউ ব 'তরুণতর লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', কেউ ব 'শ্রেষ্ঠত্বে অনন্যসাধারণ'। তর-তম প্রত্যয়ের পুজোর বাজার আর কি!

আগেই বলেছি ভুলচুক দেখিয়ে দিলে এদেশের লেখকেরা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠেন সমালোচক যে একেবারে মূর্খ এটা প্রমাণ করতে না পারলে তাঁদের চোখে আর ঘুম আসে না। যাঁরা মুখে কিছু বলেন না তাঁরাও মনে মনে যে কী আক্রোশ পোষণ করছেন, সমালোচকদের সঙ্গে ব্যবহারেই তা ধরা পড়ে। কথায় বলেঃ আমায় ভালোবাসলে আমার কুকুরকেও ভালো বাসো। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকলে আপনার বইকে (অথবা চিত্রকলা সঙ্গীত বা অভিনয়কে) আমার ভালো বলতেই হবে। অলিখিত হলেও এই চুক্তিটা খুব স্পষ্ট। যদি তা না বলি আমার সমালোচনা ঈর্ষাপ্রসূত, অভিসন্ধি-মূলক ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হবে। ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি একটি সমালোচনা লেখার অপরাধে একজন প্রবীণ কবি তিন বছর আমার সঙ্গে কথা বলেননি। একেই তো সমালোচনা লেখার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না। তার উপর বন্ধুত্ববিচ্ছেদ কারুরই কাম্য নয়। ফলে সমালোচকেরা মুখে যা বলেন লেখেন ঠিক তার বিপরীত। আর সমা-লোচকদের মধ্যে যাঁরা চতুরচালাক, বন্ধু-বান্ধবের সৃষ্টি সম্পদে তাঁরা চুপ চাপই থাকেন।

একজন লেখক যখন অন্য আর একজন লেখকের সমালোচনা লেখেন, তখন তে

সততা' নাম শব্দটির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। মনে হয় সমালোচনা নয়, লগ্নি কারবারের দলিল পড়ছি। পরস্পরের পিঠ থাবড়াবার অলিখিত চুক্তিটা এখানেই সব থেকে অশ্লীলতম-ভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলগুলি যেমন দলভুক্ত সাহিত্যিকদের লেখা, ভালো হোক, মন্দ হোক, ঢাকঢোল পিটিয়ে সর্বোত্তম ব'লে ঘোষণা করে, তেমনি একজন সাহিত্যিক অন্য সাহিত্যিকের লেখা সমালোচনা করার সময় সাহিত্যিক মূল্যনিরূপণের চাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, অর্থাৎ, আখের সম্বন্ধেই অধিকতর সচেতন থাকেন। যেহেতু নিজের গরজে ভালো তাকে বলতেই হবে, বিশেষণ হাতড়ে হাতড়ে গলদঘর্ম হয়ে তবেই তাঁর নিষ্কৃতি।

অন্য দিকও রয়েছে। সেটা হল একেবারে নস্যাৎ ক'রে দেবার চেষ্টা। অমুক লেখকের সঙ্গে মতে মেলে না, সুতরাং তাঁর রচনায় শিল্পবস্তু থাক বা না থাক, দাও তাঁকে শূলে চড়িয়ে। রাজনৈতিক সমালোচকরাই প্রধানত এই গর্দানদারীতে ওস্তাদ। তাছাড়া রয়েছেন নাকউঁচু সমালোচক। এঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান কিন্তু রসবোধের অভাবে এবং আত্মঘোষণার চেষ্টায় ভাঁড়বিশেষ। এঁদের উপর রাগ করেই তরুণ বয়সে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেনঃ

> তোমার মুখে কেবলই শোনা যায়ঃ এ-লেখা
> দিয়ে কী হবে—
> এ তো থাকবে না।
> না, থাকবে না; কিছুই থাকবে না—
> কিন্তু তোমার নিরেট নিখুঁত মতামতের
> পিণ্ডই কি থাকবে?
> আর তোমার অভিজাত-নীল উঁচু নাক,
> যা দিয়ে তুমি
> শুঁকে বেড়াও বইয়ের পাতা
> কুকুরের মতো? (নতুন পাতা)

এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'সমারূঢ়' নামক বিখ্যাত কবিতাটিও মনে পড়ছেঃ

> বরং নিজেই তুমি লেখনাক' একটি কবিতা
> বলিলাম ম্লান হেসে;—ছায়াপিণ্ড
> দিল না উত্তর;
> বুঝিলাম সে তো কবি নয়,—
> সে যে আরূঢ় ভণিতাঃ
> পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা,
> কালি আর কলমের পর
> ব'সে আছে সিংহাসনে,—কবি নয়—
> অজর, অক্ষর
> অধ্যাপক;—দাঁত নেই—চোখে তার
> অক্ষম পিঁচুটি;
> বেতন হাজার টাকা মাসে—
> আর হাজার দেড়েক
> পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের
> মাংস কৃমি খুঁটি;
> যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম
> আগুনের সেঁক
> চেয়েছিল;—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল
> লুটোপুটি।
> (শ্রেষ্ঠ কবিতা)

'পরিচয়ে'র গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যে এমন কয়েকজন সমালোচকদের দেখা পাই প্রসঙ্গের চাইতে অপ্রাসঙ্গিক ভূমিকায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করাটাই যাঁদের লক্ষ্য ছিল। সমালোচ্য পুস্তকের প্রতি যদিই বা তারা কখনো কখনো করুণা ক'রে তাকাতেন তা কেবল বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'হ-য-ব-র-ল-র কাকের মতো হয়নি হয়নি ফেল' বলার জন্যই। এই ধরনের সমালোচক আজকের দিনে নেই বল্লেই চলে। কিন্তু তাঁদের পরিবর্তে আমরা যে কোনো সৎ সমালোচক গোষ্ঠীকে পাইনি, আগেই তা উল্লেখ করেছি। এই অবস্থায় সমালোচনা লেখার পাট চুকিয়ে পুস্তকের, লেখকের এবং প্রকাশকের নাম উল্লেখ করে এবং সেই সঙ্গে দামটা জানিয়ে দিয়ে ইতিকর্তব্য সমাপ্ত করাই তো সব দিক থেকে মঙ্গলজনক। যেদেশে লেখক নিজেই নিজের বইয়ের সমালোচনা লিখে কিংবা মনের মতো ক'রে লিখিয়ে নিয়ে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, যেখানে টাকা দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে নেওয়া হয়, ভালো ফুটবল খেলতে জানলে সঙ্গীত সম্বন্ধেও মতামত দেবার অধিকার জন্মায়, সমালোচনার ভড়ং সেখানে না থাকাই ভালো।

কিন্তু এতটা হতাশ হওয়া হয়তো ঠিক নয়। কেননা, আমি যা বলেছি তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে। সাধু সমালোচক এবং বিবেচক সাহিত্যিক, সংখ্যায় কম হলেও, বাংলাদেশ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাননি। তাছাড়া, আমার আলোচনা কেবল পুস্তক-পরিচিতি বা রিভিয়ুকে কেন্দ্র ক'রেই; বিস্তৃত তুলনামূলক বিশ্লেষাত্মক আলোচনা, যাকে সত্যিকার সমালোচনা বলা যায়, তার প্রচেষ্টাও সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু আক্ষেপ এই যে আমাদের দেশে জীবিতাবস্থায় কোনো সাহিত্যিকেরই মূল্যায়ন করা হয় না, উল্লেখ্য সমালোচনা গ্রন্থগুলি প্রায়ই প্রাচীন সাহিত্যিকদের উপরে। সমসাময়িক সাহিত্যের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পেতে হলে রিভিয়ু বা পুস্তক পরিচিতির উপরেই আমাদের একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়। তাই সমালোচনার এই অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় বিভাগটি সৎ এবং উন্নত হোক এটা সবারই কাম্য। এর জন্য সমালোচককে যেমন উপযুক্ততা অর্জন করতে হবে, লেখকদেরও তেমনি হতে হবে সহিষ্ণু।

একেবারে হতাশ হবার সত্যিই কোনো কারণ ঘটেনি।

ইংলণ্ডের সমালোচনা সাহিত্যের হালও ইদানীং বাংলাদেশের পর্যায়ে পড়েছে। সম্প্রতি 'লণ্ডন ম্যাগাজিনের' সম্পাদক জন লেম্যান সমালোচনার নামে পারস্পরিক পিঠ থাবড়ানি দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে কতকগুলি নির্দেশ জারী করেছেন। আপাতত মজার ব'লে মনে হলেও নির্দেশগুলি বিবেচনার যোগ্য। প্রথমত, তিনি বলেছেন, লেখক আর সমালোচকদের মধ্যে বছরে একবারের বেশি দেখা হওয়া চলবে না। দ্বিতীয়ত, কখনই তাঁদের অনুমতি দেওয়া হবে না পরস্পরকে নাম ধরে সম্বোধন করতে, অর্থাৎ পদবী ধরেই তাঁরা পরস্পরকে ডাকবেন, ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করবেন না। তৃতীয়ত, কোনো প্রকাশককে সম্পাদক অথবা সমালোচকের সঙ্গে, সাক্ষাৎ করতে দেওয়া অন্যায় ব'লে বিবেচিত হবে। চতুর্থত, যদি কোনো লেখক দৈবক্রমে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদক হ'য়ে পড়েন, তাহলে তাঁকে তাঁর সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলতে বলা হবে।

এই সব নিয়মকানুনগুলো আমাদের দেশেও চালু করবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। তা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন আমার বন্ধুটি উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার প্রভেদ না জেনেও কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করতে থাকুন।

পাক্‌ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিক দিল্লী-দরবার সম্বন্ধে এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন তাঁরা প্রথম 'হার্ডল' পার হইয়াছেন।—"কিন্তু বেড়াবাজির প্রথম বেড়াটা এমন-কিছুই নয়, আরো

অনেক বেড়া আছে এবং তারপরেও আছে ফ্ল্যাটে পড়ে লম্বা দৌড়। তার আগে টেনে লম্বা দেওয়ার প্রশ্নও আছে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

জনাব মহম্মদ আলী করাচী পৌঁছাইয়া বলিয়াছেন আমরা সফল হইয়াছি বলিতে পারি না, আবার আলোচনা বিফল হইয়াছে সে কথাও বলা চলে না। শ্যামলাল বিশু খুড়োর ঘোড়-দৌড়ের কথার জের টানিয়া বলিল—"উজীর সাহেব যদি dead-heat-এর কথা মনে ক'রে কথাটা বলে থাকেন তাহলে ভালো dividend-এর আশা কম!!"

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ কোন এক মহিলা নাকি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় তাঁর অভিযোগ লিখিয়া জানাইয়াছেন পদ্যে। আদালত মহিলার এই পদ্যে-লেখা আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া গদ্যে লিখিয়া জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন।—"আমরা আদালতের সঙ্গে একমত। বিবাহ-বিচ্ছেদে মা নিষাদ জাতীয় কবিতা একেবারেই অচল"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

কালবৈশাখীর ঝড়বাদলা হইতে ধূলি ও জল সংগ্রহ করিয়া আণবিক বোমার তেজষ্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা হইবে বলিয়া একটি সংবাদ আমরা পাঠ করিলাম।—"কিন্তু যুগধর্মে প্রকৃতিও লৌহ যবনিকা ব্যবহার করছেন,—এবারে কালবোশেখী-ই হলোনা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

দিল্লীর আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে আলী সাহেব আমাদিগকে একটা নূতন-কথা শুনাইয়াছেন, সেইটি হইল—"1955 approach."—"অনেকটা আমে-

রিকার মটর গাড়ীর মডেলের মতো। আলোচনাটা রাজনৈতিক হলেও শামু চাচার পাটোয়ারী গন্ধটুকু আছে"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ডিব্রুগড়ের এক সংবাদে প্রকাশ সেখানে নাকি সম্প্রতি দুই আনা সের দরে মৎস্য বিক্রীত হইয়াছে।—"মাছের জীবনের মান এতো নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই কিনা জানিনে, আমরা সম্প্রতি
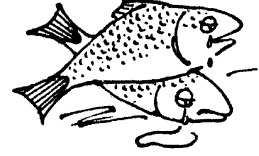
কয়েকটি মাছে মানুষ মেরে ফেলেছে এই সংবাদ পেয়েছি। কলকাতায় আমরা মাছের ওপর জুলুম করিনি, তাদের দাবী নির্বিচারে মেনে চলেছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সৌরকরকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারে লাগাইবার গবেষণা চলিতেছে। সংবাদে শুনিলাম একটি বিশেষ ধরনের চুলীতে সূর্যের কিরণ দিয় রান্না-বান্নার কাজ চলিবে—"কিন্তু চুলোর চেয়ে সাধারণ মানুষ কী রাঁধবে সেইটেই হলো বড়ো সমস্যা; সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন গবেষণার খবর পাইনি সুতরাং চুলোয় যাকগে ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়"—বলেন বিশ খুড়ো।

* * *

বিলাতে শুনিলাম সম্প্রতি পাগলের মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।—"আন্তর্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে বিলেত এবার বড় রকমের দাঁও মারতে পারবেন, কোন দেশেই পাগলের অভাব নেই। কিন্তু কথা হলো সেয়ানা পাগল এ ওষুধে সুস্থ হবে তো?"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

পরিচিতি

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

এইখানে তুমি আছ আর আছি আমি;
সারাদিন ধান খায় পায়রা চড়াই
বিকেলবেলায় কত বকুল ছড়াই—
মাঝে মাঝে কাজ করি মাঝে মাঝে থামি।

ঘড়ির কাঁটার মত শুধু নিরবধি
ছুঁয়ে যাই সব ঘর সব কোণগুলি,
চারিদিকে ছলছল আকুলিবিকুলি
স্নেহ আর প্রেম গান করুণ মিনতিঃ

রোদ সরে দিন যায় নেমে আসে রাত
বড় বড় ছায়া ফেলে চলে বুনোহাঁস—
সুদূরে ছড়িয়ে থাকে মেঘনীল হাত
ঝড় আসে, জল দেয় অমন আকাশঃ
বারোমাস তবু ভাল তুমি আর আমি
পৃথিবীতে আছি যেন একতীর্থগামী!

পারো তো

সুনীতকুমার ঘোষ

পারো তো দিও শুধু আকাশ ঘন নীল
তমাল ছায়া শুধু ছুটির আশ্লেষে
ঝাউয়ের মর্মর অথবা ভাঙগামিল
দু চোখে ভরা বিষ জীবনে কায়ক্লেশে;
পারো তো দিও শুধু গভীর ভালবেসে
কামনাঝরা পাখা একক উড়ো চিল,—
অন্ধ প্রহরের পাথুরে কালো খিল
ভাঙতে পারো যদি মুক্তি অবশেষে।

দলিত দিন। তাই অবাধ অবসর
খুঁজব বলে আমি আকাশে থাকি চেয়েঃ
শীর্ণ নদীটির উজানে চেয়ে চেয়ে
আসে যে গোধূলির অবাক ছায়াভর
ক্লান্তি; কী যে মধু তোমার সেই স্বর
পারো তো দিও ঢেলে এখানে, ওগো মেয়ে।

বিদায়ে

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

যাবার ক্ষণটি আসবে যখন
এমনি তুমি যেয়ো চলে,
ভেব না কো কোন ব্যথাটা
বাজল আমার বুকের তলে।
কৃষ্ণচূড়া ঝরবে তোমার পথের 'পরে
সোহাগ ভরে,
মৌমাছিরা ফিরে যাবে গুঞ্জরণে
স্মৃতির বনে.
শূন্যোকাশে মেঘের ছায়া উঠবে জমে
ক্রমে-ক্রমে।
ভেব না কো কোন ব্যথাটা
বাজল আমার বুকের তলে।

জানি জানি ঋতুর চাকায়
একটা যেয়ে আরেক আসে,
ফাল্গুনেরই হাসি-খেলা
কান্না হবে আষাঢ় মাসে
এবং ঋতুর উজান বেয়ে পিছিয়ে আসা
অলীক আশা,
তা বলে তো বসন্ত নয় মিথ্যে মায়া,
স্বপ্ন-ছায়া,—
যা দিলে আজ থাকবে সেটা অন্তরালে
যাবার কালে।
ফাল্গুনেরই হাসিখেলা
কান্না হবে আষাঢ় মাসে।

মিনতি এক আছে আমার,
রাখবে যদি তবে বলি,
স্মৃতির বোঝা বিষম, তাই
দিয়ো সেটায় জলাঞ্জলি;
নিজের ব্যথা পারি কিনা নিতে একা
যাক-না দেখা;—
আমায় যেন এনো না কো সংগোপনে
তোমার মনে
মধ্যরাতে হঠাৎ দেখে তন্দ্রাহারা
লক্ষ তারা।
স্মৃতির বোঝা বিষম, তাই
দিয়ো সেটায় জলাঞ্জলি॥

পুস্তক পরিচয়

রচনাবলী

বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)—প্রকাশক—সাহিত্য সংসদ। ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১০৩৬। দাম—১২॥০।

সাহিত্য সংসদের প্রথম প্রয়াস এবং প্রশংসনীয় প্রয়াস দুই খণ্ডে সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলী পাঠকসাধারণের কাছে তুলে ধরা। প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি উপন্যাস গ্রথিত হয়েছে এবং তা ইতিমধ্যেই সাহিত্য-পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় বাংলা রচনা, যতদূর সম্ভব পাওয়া গিয়েছে, সন্নিবেশিত হয়েছে। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা, ধর্মতত্ত্বালোচনা—এমন বিষয় নেই যা বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়ন করেননি এবং এই অধ্যয়নপ্রসূত চিন্তাধারা তিনি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন নি। ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজসংস্কার নিয়ে তিনি ক্ষুরধার যুক্তি-সমন্বয়ে যে পরিমাণ আলোচনা করেছেন সেই পরিমাণ আলোচনাই তিনি করেছেন ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য বিষয় নিয়ে। তাঁর এইসব প্রবন্ধাবলী পাঠ করলে বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছিল অনন্যচিন্ত্য এবং ক্লাসিকসুলভ যাবতীয় গুণ তাঁর রচনায় প্রকট। তাই তাঁর রচনার বক্তব্য বিষয় পুরাতন হয়েও নতুন, সাময়িক হয়েও সর্বকালের আবেদনে গুণান্বিত। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসিকরূপেই সমধিক পরিচিত। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক বঙ্কিম-চন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আরেক দিক দ্বিতীয় খণ্ডে অতি উজ্জ্বলরূপে ধরা পড়েছে। গ্রন্থের আঙ্গিক সৌষ্ঠব, মুদ্রণ পারিপাট্য অতুলনীয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল গ্রন্থের প্রারম্ভে 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' নামে যে সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন তা বঙ্কিম-অনুরাগী পাঠকদের কাছে বিশেষ সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা। ৯৯।৫৫

ছোট গল্প

মনে মনে—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম ২, টাকা।

আজকাল বাংলা সাহিত্যে কাহিনী-ধর্মী ব্যক্তিগত প্রবন্ধের জন্যে একটি আসন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং সেই আসনে ভিড়ের সংখ্যা খুব কমই। এর মধ্যেও আবার যোগ্য অযোগ্যেরও সাক্ষাৎ মেলে। যোগ্যদের মধ্যে সকলের রচনার বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গী এক নয় এবং যেহেতু এই রচনাগুলি মূলত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সেহেতু বিভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্পষ্ট ছাপটি ধরা থাকে। যদিচ একটি কাহিনীর আঙ্গিক মাত্র নামে উপজীব্য করে লেখকেরা এমন লেখা লিখে থাকেন।

সুধীরঞ্জন বাইরে গিয়ে ঘরটান মন দিয়ে যা দেখেছেন তা সব হয়ত চিত্তাকর্ষক নয়; কিন্তু যা লিখেছেন তার অধিকাংশকেই চিত্তাকর্ষক করতে চেয়েছেন। মনে মনে তাঁর কাহিনীধর্মী বই। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মেজাজ নিয়ে লেখা। মনে হয় ভাবাবেগময় কতক-গুলি বিশেষ মুহূর্তের কথা, নানান জবানীতে। কাজেই প্রতিটি রচনার মধ্যে একটি কাহিনীর আভাস এসেছে, কাহিনীর অঙ্গকেও স্পর্শ করা হয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কখনো চিত্র, কখনো ভাব, কখনো কেবলই একটি আবহাওয়া প্রধান হয়ে ধরা দিয়েছে সমস্তটা। মনে মনের কাহিনী-গুলিকে অন্তত বর্তমান সমালোচকের তাই মনে হয়েছে। এবং ছোট গল্পের সীমানা ছুঁয়েও এগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র হিসাবেই বোধ হয় গ্রহণীয়।

সুধীরঞ্জনের ভাষা সাবলীল। তাঁর দেখা চরিত্রগুলি এক একটি বিস্ময়ের ভাণ্ডার। তাদের আচার আচরণ আকর্ষণীয় এবং বেদনাদায়ক। এর মধ্যে 'কর্ণ কুন্তী', 'মনে মনে', 'কথায় কথায়', 'শূন্য' প্রভৃতি কাহিনীগুলি পাঠকের ভাল লাগবে আশা করি। বইয়ের ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ ভাল। (৫৫৯।৫৪)

সাহিত্য পত্র

ঋতুপত্র (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩৬২)। সম্পাদক—অমিতাভ চৌধুরী। প্রতি সংখ্যা ছ' আনা।

সারা বছরে যে-কাগজের ছ'টিই মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হবে, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা বোধ হয় চব্বিশের বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শান্তি-নিকেতন থেকে প্রকাশিত এই দ্বিমাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র চব্বিশ। এবং আক্ষেপটা শুধু সেইজন্যেই। এ নিয়ে কোনও অনুযোগ অবশ্য জানাব না। জানিয়ে লাভও নেই। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

"ঋতুপত্র"র প্রধান সম্পদ তার প্রবন্ধ। অবনীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার (অনুলিখিত) অংশ এবং শান্তিদেব ঘোষ ও সুনীতিকুমার পাঠকের দুটি প্রবন্ধ নিয়ে "ঋতুপত্র"র এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার উপজীব্য তাঁর নাট এবং এ-সম্পর্কে তাঁরই অভিমতকে অবলম্

করে শান্তিদেব ঘোষের প্রবন্ধে সুন্দর একটি আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। সুনীতি-কুমার পাঠকের তথ্যপ্রধান নিবন্ধটিও ("তিব্বতের বিয়ের গান") রচনাগুণে উপভোগ্য। তা ছাড়া আছে "সাম্প্রতিক সাহিত্য"। কবিগুরুর "চিত্রবিচিত্র" গ্রন্থ-খানির আলোচনা প্রসঙ্গে শুভময় ঘোষ একটি নতুন দৃষ্টিবিন্দু থেকে রবীন্দ্র-রচিত শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতিটি আলোচনার মধ্যেই একটি সত্যান্বেষী মনের সন্ধান পাওয়া যায়। যদিচ শ্রদ্ধারও সেখানে অভাব নেই। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহ-শীল, "ঋতুপত্র"র এই সংখ্যাটি তাঁদের তৃপ্তি-বিধানে সমর্থ হবে, তাতে সন্দেহ করি না।

পত্রিকাটির আয়তন ছোট, অত্যন্তই ছোট। কিন্তু আগেই বলেছি, তা নিয়ে অনুযোগ জানিয়ে কোনও লাভ নেই। তার কারণ, প্রবন্ধ-সাহিত্যের এই দুর্ভিক্ষের দিনে কোনও কাগজের (প্রবন্ধই যার প্রধান সম্পদ) প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, তো তার আকৃতিকে যে অত্যন্তই সংক্ষিপ্ত একটা পরিধির মধ্যে বেঁধে না দিয়ে কোনও উপায় থাকে না, সহৃদয় পাঠক মাত্রেই সে-কথা স্বীকার করবেন।

কবিতা (ঊনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। চৈত্র, ১৩৬১)। সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, সহকারী সম্পাদক নরেশ গুহ। এক টাকা।

গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস কিংবা নাটকের জন্য পৃথক কোনও পত্রিকার প্রয়োজন হয় না। কবিতার জন্য হয়। 'কবিতা' পত্রিকা এতকাল যে অবিচল নিষ্ঠায় সেই প্রয়োজনের দাবি পূরণ করে এসেছে, তার তুলনা প্রায় দুর্লভ। কথাটা নতুন করে বলতে হল। তার কারণ, কৃতজ্ঞতা নামক বৃত্তিটি এদেশে অত্যন্তই নীরব। এতই নীরব যে, মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে।

আলোচ্য সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শামসুর রহমান, সুনীল সরকার, নরেশ গুহ ও অরুণকুমার সরকারের নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এ ছাড়া নতুন কয়েকজন কবিও আছেন। সেই কয়েকজনের মধ্যে জনকয়েকের রচনায় যে শক্তির পরিচয় রয়েছে, তা কারো চোখে না পড়বার কথা নয়।

সমালোচনা-বিভাগে অরুণকুমার সরকারের লেখাটি সুন্দর হয়েছে। প্রসঙ্গত এমন কয়েকটি কথা তিনি বলেছেন, যা অপ্রিয় তবু সত্য।

নতুন লেখা—১৩৬১। বলাকা গ্রন্থমালা। সম্পাদক শ্রীসুভাষ সেন, ২৭, সাদার্ণ অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৬। দাম ১৲ টাকা।

নতুন লেখা একটি সংকলন পুস্তিকা। এই পুস্তিকা প্রকাশ উপলক্ষে সম্পাদক যা বলেছেন তাতে বোঝা যায় ইংরিজী পেঙ্গুইন সিরিজের বিশেষ এক ধরনের সংকলনের মতন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সাহিত্য ও দর্শন-মূলক আলোচনা প্রভৃতি একত্রিত করে প্রকাশ করাই এই ধরনের পুস্তিকার লক্ষ্য। বর্তমান সংখ্যাটি অন্নদাশংকর রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শান্তিদেব ঘোষ, অশোকবিজয় রাহা প্রভৃতির রচনাতে সমৃদ্ধ। কামাক্ষীপ্রসাদের একটি গল্পও আছে। এ ছাড়া রয়েছে থিয়েটার এবং সিনেমা বিষয়ক প্রবন্ধ। লেখাগুলি পাঠকদের আশা করি ভাল লাগবে।

অঙ্গনা—সম্পাদিকা : প্রতিভা রায়। বৈশাখ : ১৩৬২। দাম : বারো আনা।

বাঙলাদেশে সাহিত্য-পত্র প্রচুর। কিন্তু মহিলা পরিচালিত পত্রিকা প্রায় বিরল। অল্পগুলিমেয়ে যে ক'টি মহিলা পত্র আছে, তাও উৎকৃষ্ট রচনার অভাবে মুমূর্ষু। এদিক থেকে অঙ্গনা পত্রিকাটি বিশিষ্ট। পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষ চলছে। বর্তমান বৈশাখ সংখ্যাটি কয়েক-জন সুলেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ।

মরমী—সম্পাদক : অমরেন্দ্র দাস। বৈশাখ : ১৩৬২। দাম : চার আনা।

নতুন পত্রিকা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়—সবই আছে। যা নেই তা হলো উৎকর্ষ, বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য। পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

বিবিধ

প্রসূতি ও নবজাতক : ডাঃ শৈলেশশংকর দাশগুপ্ত এম্‌ বি : অনিয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৯৭।১এ, বহুবাজার স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত : দেড় টাকা।

বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সাধারণ জীবনের দূরত্ব এখনও যোজনপ্রমাণ। অজ্ঞতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। এর চূড়ান্ত নিদর্শন সাধারণ গৃহস্থের ঘরে প্রসূতি এবং নবজাতকের প্রতি ব্যবহারে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক চিকিৎসকের দৃষ্টিতে প্রসূতি এবং নবজাতক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা এ কাজে বিশেষ সাহায্য করেছে। এ বিষয়ে অজ্ঞ সাধারণ পাঠকের কাছে বইটি আদৃত হবে। ১২৯।৫৫

পৃথিবী প্রদক্ষিণ : শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ : অ-প-দেব-তা সাহিত্য মন্দির : ২৫, সারপেন-টাইন লেন : দুই টাকা আট আনা মাত্র।

সম্প্রতি বইএর বাজারে ভ্রমণ কাহিনীর খুব প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নতুন মর্যাদা লাভের ফলে নানা বিষয়ে নিত্য নতুন প্রতিনিধিদল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে

অপর প্রান্ত প্রদক্ষিণ করছেন। এতো ভালো কথা। কিন্তু বিপদ দেখা দিয়েছে অন্যত্র। কি করে জানি না—অনেকেরই ধারণা হয়েছে যে বাইরে ঘুরে ঘরে ফিরে একখানা ভ্রমণ কাহিনী লিখতেই হবে। তা লিখন বিষয়ে তাঁর কোন দক্ষতা থাক বা না থাক। নতুনতর দৃষ্টিতে বিভিন্ন দেশকে দেখতে পারুক আর নাই পারুক। পৃথিবী প্রদক্ষিণ তেমনি অক্ষমতার আরও একটি নিদর্শন। ইত্যাকার পুস্তক পাঠে পাঠকের আর কোন উপকার হোক বা না হোক বিংশ শতকের পঞ্চম দশকেও বাংলা ভাষার হেনস্থা দেখে চোখে যে জল আসবে তাতে আর সন্দেহ নেই। আর বিভিন্ন দেশের যে বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে তার সবটুকু যে কোন শিশু-পাঠ্য ভূগোলেই পাওয়া যাবে। তবু কেন যে এ বই লিখতেই হলো লেখকই জানেন।

১৩৫।৫৫

দৃষ্টফল চিকিৎসা : প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশক : কবিরাজ অনলকুমার চট্টোপাধ্যায়; ইনস্টিটিউট অব হিন্দু কেমিস্ট্রি এণ্ড আয়ুর্বেদিক রিসার্চ; ৬।১, মুর এভিনিউ, রিজেণ্ট পার্ক, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র থেকে আহরিত দৃষ্টফল—চিকিৎসার নিদান ও অনুপান একত্রে সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মোটামুটি সব রোগের চিকিৎসা-নির্দেশ রয়েছে,—তবে স্থানে স্থানে কঠিন শব্দ-প্রয়োগ আছে, যেগুলির অর্থ বুঝিয়ে দিলে সাধারণের পক্ষে বিষয়বস্তু অনেক সহজবোধ্য হয়ে উঠতো এবং ফলত আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়াতো।

ভূমিকাটি চমৎকার, তথ্যসমন্বিতও বটে।

(৬৭।৫৫)

ভারত শাসনতন্ত্রসার : অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশিকা লিমিটেড। ৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯ দাম : আট আনা।

উত্তরস্বাধীনতা কালের ভারতীয় সংবিধান। লেখক স্বল্প পরিসরে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক, বিচার, আইন ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রাথমিক কর্তব্য তার দেশ সম্বন্ধে, নিজের অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া। সেই প্রাথমিক জ্ঞানের দিক থেকে পুস্তিকাখানি উপকারে আসবে। (৭১।৫৫)

Nation—Sri Mohendranath Dutt Published by Sri Peary Mohan Mukherjee, Secretary, The Mohendra Publishing Committee, 3, Gour Mohan Mukherjee Street, Calcutta—6.

উনিশ শো একচল্লিশের ডিসেম্বর মাসে লেখক প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সম্পাদনা করেই এই

[ই]টি লিখিত হয়েছে। জাতি, ধর্ম ও ব্যক্তি [নির]বধ মূল্যে নিয়ে তাঁর চিন্তায় যে সব প্রশ্ন [নি]র্বিরোচিত হয়েছে, তাদের সম্মুখে [বিষ]য়াকে রেখে তিনি এ-বই লিখেছেন। [মান]বিক অধিকারের সারমর্ম এগারোটি সূত্রে [সং]ক্ষিপ্ত করে তারপরে তার সহজবোধ্য [ব্যা]খ্যাজ্ঞাপনে তিনি মনোযোগী হয়েছেন। লেখাটির মধ্যে বক্তৃতা-দানের কয়েকটি [লক্ষ]ণ দেখা যাবে। তবে জোর দিয়ে কথা বলা [হলে]ও জোর ক'রে কোনো তত্ত্ব-পদ্ধতি [পা]ঠকের চিত্তবৃত্তিতে নিক্ষেপ করা হয়নি, [এজ]ন্যে লেখক শ্রদ্ধার্হ। (২৪১।৫৪)

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ [আ]সিয়াছে।

ছোটদের সমাজবাদ—বিশ্বনাথ রায়।
মধুবংশীর গলি—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।
যখন যন্ত্রণা—রাম বসু।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ—হরপ্রসাদ মিত্র।
দেশে দেশে চলি উড়ে—শ্রীদিলীপকুমার রায়।
শাসন-ব্যবস্থা—অরুণকুমার সেন।
রাষ্ট্র বিজ্ঞান—অরুণকুমার সেন।
সেই কন্যাকে—সুকুমার রায়।
শিশু মনের সহজ কথা—দীপিকা পাল।
স্বপনচারিণী—এমিল জোলা; অনুবাদক —রমেন চৌধুরী।
মুসলিম মনীষা—আবদুল মওদুদ।
খোকাখুকুর ছড়া—মীরা রায়।
চাটনী—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।
অনুষ্টুপ ছন্দ—সরোজকুমার রায়চৌধুরী
রাণী সাহেবা—বিমল মিত্র।
কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা—ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।
কানু কহে রাই—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
নবভারতের বিজ্ঞান-সাধক—শ্রীযামিনী-মোহন কর।
অন্ধকারের দেশে—শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল।
বাংলা উচ্চারণ-কোষ—ধীরানন্দ ঠাকুর।
জগদানন্দ পদাবলী—ধীরানন্দ ঠাকুর।
সাইবেরিয়ার প্রান্তরে—জুলে ভার্নে; অনুবাদক—ইন্দুভূষণ দাস।
বসন্ত বাহার—গোপাল ভৌমিক।
অপরিচিতার চিঠি—নীলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ স্মৃতিচয়ন — স্বামী আত্মানন্দ।
নুরজাহান—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার।
ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচিত কবিতা-সংকলন—শ্রীহর্ষ-পুস্তক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।
পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা—অশোক মিত্র।
টেস অফ দি ডারবারভিলস (১ম খণ্ড)—টমাস হার্ডি; অনুবাদক—শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি ও শ্রীশোভনা মাইতি।
ত্রিবেণী—অনুরূপা দেবী।
বুদ্ধদেব বসুর স্ব-নির্বাচিত গল্প—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং।
অভিশাপ—শ্রীযোগেশচন্দ্র গণচৌধুরী।
আনন্দময়ী মা—চন্দ্রগুপ্ত।
কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো?—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।
বাঘ ও অজন্তা—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।
শহীদ অনন্তহরি—শিবরাম গুপ্ত।
সুর ও ছন্দ—শ্রীবিনোদরঞ্জন সেনগুপ্ত।
আর একদিন—আশাপূর্ণা দেবী।
বন্ধুপত্নী—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।
শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর—বুদ্ধদেব বসু।
রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়—শচীন সেন।
বুদ্ধ গয়া—ভিক্ষু শিলাচার শাস্ত্রী।
সপ্তরঞ্জনী বা সেতার সাধনা—৪র্থ ভাগ —শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
কথিকা—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।
Swami Bon Maharaj—Shri Tamalkrishna Das.
The New Year Book—1955—P. C. Sarkar.
The World Peace—Shri Kshitish Chandra Chakrabarti.

ভ্রম সংশোধন

গত ২৯ সংখ্যা 'দেশে' 'গোল্ডস্মিথ ও মধুসূদন' নামক প্রবন্ধের ৩০৮ পৃষ্ঠা ২৮ পঙক্তিতে একটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটিয়াছে। উক্ত পঙক্তি এইরূপ হইবে—'দান করে কপর্দক শূন্য হয়ে পড়ার দৃষ্টান্তও তাঁর জীবনে বিরল নয়।'

প্রতীক্ষার অবসান

তোলা হয়েছে বছর কতক আগে; এতোদিন সেল্‌ফ বন্দী হয়ে পড়েছিল। পরিবেশক ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স কি এক অজানা মোহে উদ্ধার করে মুক্তি দিয়েছেন 'প্রতীক্ষা'; প্রদীপ পিকচার্স নামক কোন একটি প্রতিষ্ঠানের ছবি। কিন্তু ছবিখানি মুক্তিলাভ না করলেই ভালো ছিল; সাধারণ্যে পরিবেশিত হবার কোন যোগ্যতাই নেই, কোন দিক থেকেই নয়। গল্প 'পাতালে এক ঋতু' খ্যাত লেখক দীপক চৌধুরী ওরফে নীহাররঞ্জন ঘোষালের লেখা। আখ্যানবস্তু অতি পুরনো ছেঁদো পরিকল্পনা। সেই যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে কৃষির বিরোধ, সেই আধুনিক প্রগতির সঙ্গে প্রাচীন রক্ষণ-

---

রূপজগৎ

—শৌভিক—

শীলতার বিরোধ। তার সঙ্গে রয়েছে বিবদমান পক্ষের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে প্রণয়। উপরন্তু সারা কাহিনীটির মধ্যে সারবস্তুর একান্ত অভাব। দু'এক জায়গায় সংলাপ ছাড়া এমন একটা অন্তঃসারশূন্য কাহিনীর পরিচয় পর্দায় খুব কমই দেখা গিয়েছে

* * *

কুসুমপুর নামক গ্রাম। এখানকার জমিদার উপেনবাবু, সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ; প্রজা বৎসল। প্রমাণ পাওয়া গেল, একজন প্রজা এসে খাজনা দিতে অক্ষমতার কথা জানিয়ে সাতদিন সময় চাইতে উপেন তাকে এক মাসের সময় দিলেন এবং সতর্ক করে দিলেন, সে যেন স্ত্রীর গহনা বেচে খাজনা দিতে প্রবৃত্ত না হয়। আর একদিকে রয়েছে ভুবনবাবু। গ্রামে মিল বসিয়ে শিল্প গড়ে তোলায় বাঙালীর নাম রাখতে চান। এদের দুজনের ঝগড়া গড়মণ্ডল নামক এক তালুক নিয়ে। উপেন গড়মণ্ডল দিতে রাজী নয়; ভুবন চিনির কল বসাবে বলে তালুকটা নিতে বদ্ধপরিকর। দুজনেরই সর্বস্ব পণ এই নিয়ে মামলা। গড়মণ্ডল উপেনের জমি, সে তা দিতে চায় না; তাই নিয়ে মামলা কিভাবে ভুবন বাঁধাতে সক্ষম হলো তার কোন কৈফিয়ৎ নেই। যাক। ওদিকে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে উপেনের মেয়ে মঞ্জু এবং ভুবনের ছেলে অমিত। অমিতের বান্ধবী ইলার মাধ্যমে মঞ্জুর সঙ্গে তার আলাপ হয়, মঞ্জুর উদ্যোগে একটা বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা-কল্পে অনুষ্ঠিত জলসায়। তারপর অমিত ও মঞ্জুর আলাপ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণে পরিণত হলো টেবল টেনিস খেলা উপলক্ষ্য করে। ওরা দুজনে বাঙলা দেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দিল্লীতে প্রতি-যোগিতায় যোগ দিতে নির্বাচিত হলো পার্টনাররূপে; ইলা থাকলো রিজার্ভে। দিল্লীতে অমিত ও মঞ্জু আরও ঘনিষ্ঠ হলো। ইলাও ভালবাসতো অমিতকে, তাকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো। অমিত বা মঞ্জু দু'জনের কেউই
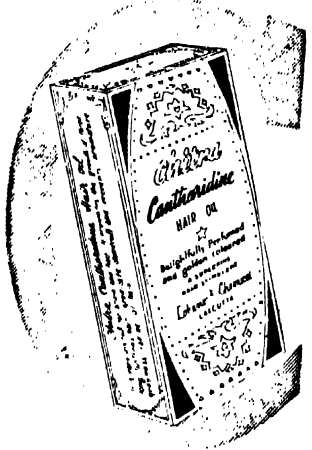
ভারতীচিত্র মের "কালবৌ"তে বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী ও তপতী

কারুর পরিচয় নেবার দরকার মনে করেনি, কাজেই ওরা যে দুই পরস্পর শত্রুপক্ষের সন্তান তা আর জানতে পারেনি। দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে মঞ্জু আড়াল থেকে শোনা তার মাসীমার কথায় অমিতের পরিচয় পেলে। তবুও ওদের প্রেম এগিয়ে চললো। কুসুমপুরের খবর—উপেন প্রথম দফা মামলায় হেরে গিয়ে বিলেতে আপীল করেছেন; টাকার জন্য বাড়ীটি বন্ধক দিয়েছেন এক মহাজনের কাছে কিন্তু টাকাটা ভুবনই বেনামীতে সরবরাহ করেন। মঞ্জু দশ বছর ধরে কলকাতায় মাসীমার কাছে থেকে পড়াশুনা করছে; কুসুমপুরে যায়নি এসময়ের মধ্যে একবারও, কে জানে কেন। অমিতও দশ বছর দিল্লীতে পড়াশুনো ক'রে ছ'মাস হলো কলকাতায় এসেছে; দিল্লীতে কেন তাইবা কে জানে! যাক্। ভুবনের কাছে মঞ্জুর সঙ্গে অমিতের মেলামেশার সংবাদ পৌঁছলো। ভুবন ঠিক করলেন অমিতকে বিলেতে পাঠিয়ে দেবেন এবং বিলেত যাবার আগে কদিন থাকার জন্য তিনি অমিতকে কুসুমপুরে নিয়ে এলেন। ওদিক থেকে মঞ্জুও এলো কুসুমপুরে। গ্রামের যুব সম্প্রদায় তখন একটি বালবিধবার বিয়ে দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। মেয়েটির বাপ মিথ্যে বলে উপেনের কাছ থেকে বিয়ে বাবদ টাকা নেয়। লোকটিকে অর্থপিশাচরূপে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কথায় কথায় টাকা চাওয়া তার স্বভাব, আর সবাই তাকে টাকা দেয়ও! অমিতও এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে উৎসাহী; উপেনের ছেলে হরেন তার সাথী। বিয়ের সময় দেখা গেল বর এক লোলচর্ম বৃদ্ধ। হরেন এই নিয়ে তেড়ে উঠতেই মেয়ের বাপ হরেনকে নিজের ঘরের কথা স্মরণ করতে বললে; সেখানে রয়েছে মঞ্জু, বাল বিধবা। আসলে দেখা গেল মঞ্জু যে বাল বিধবা এই খবরটি অমিতকে জানানোর জন্যেই যেন ঐ বিধবা বিবাহের ঘটনা। অমিত গেল মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করতে। ওদিক থেকে ভুবনও এলো উপেনের বাড়ীতে। সেইসঙ্গে খবরও এলো বিলেতে আপীলেও উপেনের হার হয়েছে। এই প্রথম উপেন ভুবনের কাছ থেকে জানলেন তাঁর বসত বাড়ীটি ভুবন বেনামীতে কিনে নিয়েছে। কিন্তু কেনার প্রশ্ন ওঠে কোত্থেকে ভুবন না হয় উপেনের মহাজনের কাছ থেকে বন্ধকী কবালাটা কিনে নিয়েছে, তাহলেই কি বাড়ী কেনা হয়ে গেল? এতোদিনে জানা গেল গড়মণ্ডল তালুকটা উপেন কিনেছিলেন মঞ্জুর নামে, ও বিধবা হবার সময়। বিধবার সম্পত্তি নিয়েই উপেন-ভুবনের লড়াই! যাক্। মামলায় হারের খবর পেয়ে উপেন ছুটে গেলেন গড়মণ্ডল রক্ষা করতে লাঠিয়াল নিয়ে; ওদিক থেকে ভুবনও গেলেন বন্দুকধারী বরকন্দাজ নিয়ে।

দু'দিকে দু'পক্ষ জমায়েৎ হলো। আবার মঞ্জুও গেল তার বাবাকে নিবৃত্ত করতেই বোধ হয়; অমিতও গেল আর এক দিক থেকে তার বাবাকেও নিবৃত্ত করতে। হঠাৎ গুলি চললো তাতে ঘায়েল হলো মঞ্জু। অমিত খানিকক্ষণ মৃতা মঞ্জুর মাথায় হাত বুলালে। তারপর দেখা গেল দুখানি পা; অমিতের পা। চলেছে, চলেছে; পায়ের জুতো জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হলো। আবার দেখা গেল ইলাকে। একটা উদাস অগোছাল ভাব; ও যাচ্ছে কুসুমপুরে। ট্রেন থামতে স্টেশনে অতি দীনবেশে দেখা করলে ভুবনের ম্যানেজার শৈলেন। তার কথায় জানা গেল দীর্ঘ পনের বছর পার হয়ে গিয়েছে। ভুবন মৃত; অমিত আসবে এই আশায় সে রোজই ট্রেনের সময়ে স্টেশনে হাজিরা দেয়। ইলা গিয়ে উঠলো ভুবনের বাড়ীতে। একটা ভাঙা পড়ো বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা। অমিতের মা তখন তুলসী তলায় বাতি দিচ্ছিলেন। ইলাকে তিনি চিনতে পারলেন না; ইলা নিজেকে অমিতের বান্ধবী বলে পরিচয় দিয়ে সেখানে থাকবার কথা জানালে। দীর্ঘ পনের বছর প্রতীক্ষা করে ইলা এসে গেল অমিতের বাড়ীতে। এই থেকেই বোধ হয় ছবির নামকরণ। হঠাৎ দরজায় আওয়াজ। দুরজা খুলেই দেখা গেল অমিতকে; রুগ্ন জীর্ণ এক পাগলের চেহারা। গৃহে প্রবেশ করে সে তার বাবার কথা মনে করলে। ইলাকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরলে আকুলভাবে কিন্তু তারপর আরম্ভ হলো দুরন্ত কাশি। কাশতে কাশতেই অমিত টেবিলের ওপরে মারা পড়লো।

• • •

কি অদ্ভুত সব ঘটনা পরিকল্পনা। এলোমেলো, গোঁজামিল, যুক্তিহীনতা, কোন বিশেষণই এ কাহিনীর বিন্যাস সম্পর্কে অপ্রযুক্ত হবার নয়। চিত্রনাট্যও লিখেছেন নীহাররঞ্জন ওরফে দীপক চৌধুরী। এমন বিন্যাস যে কোন মাথাওয়ালা ব্যক্তির দ্বারা পরিকল্পিত হতে পারে তা বিশ্বাসই হয় না। পরিচালক ভাস্কর আচার্য; বোধ হয় ছদ্মনাম। এতো বাজে এবং কাঁচা কাজ বহুকাল দেখা যায়নি। যেমন গল্প, তেমনি তার বিন্যাস! অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে নামকরা কজনও আছেন, কিন্তু যেমন তাদের কদাকার দেখিয়েছে, তেমনি অভিনয়ও করেছেন কদর্য। কলাকৌশলের যাবতীয় দিকও তথৈবচ। বিস্তৃত আলোচনা কেবল জায়গা ও সময়ই নষ্ট করবে। এক কথায় রাবিশ। এমন চৌকশ বাজে কাজ বহুকাল দেখা যায়নি। কাহিনী ও পরিচালনা ছাড়া এর সংগঠনকারীদের মধ্যে আছেন, আলোকচিত্র গ্রহণে জ্ঞান সেন, শব্দ গ্রহণে নৃপেন পাল ও লোকেন বসু; সংগীত রচনা ও পরিচালনায় গিরীন চক্রবর্তী। অভিনয়ে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, শৈলেন পাল, তারা ভট্টাচার্য,

"পকেটমার"-এর নাম ভূমিকায় দেব আনন্দ এবং সঙ্গে গীতা বালি
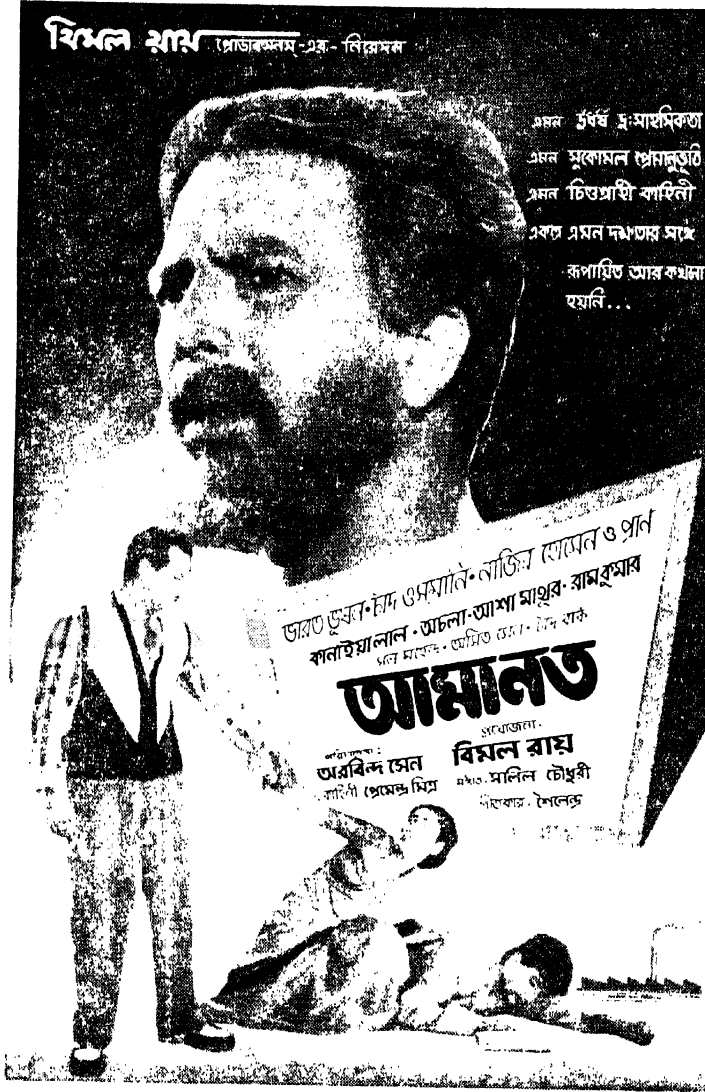
বিমল রায় প্রোডাকসনস্-এর- নিবেদন
এমন দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতা
এমন সুকোমল প্রেমানুভূতি
এমন চিত্তগ্রাহী কাহিনী
একত্রে এমন দক্ষতার সঙ্গে
রূপায়িত আর কখনো
হয়নি...
ভারত ভূষণ • চাঁদ ওসমানী • নাজির হোসেন ও প্রান
কানাইয়ালাল • অচলা • আশা মাথুর • রামকুমার
আমানত
প্রযোজনা
বিমল রায়
অরবিন্দ সেন
সংগীত . সলিল চৌধুরী
কাহিনী প্রেমেন্দ্র মিত্র
গীতিকার . শৈলেন্দ্র

শৈলজানন্দ রচিত কাহিনী অবলম্বনে তপন সিংহ পরিচালিত "উপহার"-এর একটি দৃশ্যবৈচিত্র্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার

বিজয় বোস, মণি চক্রবর্তী, স্মৃতিরেখা, সিপ্রা, অপর্ণা দেবী, রেবা বোস, রাজলক্ষ্মী, উমা গোয়েংকা, পদ্মাবতী প্রভৃতি।

আলোচনা

নাটক ও নাটকীয়তা

মহাশয়,

গত সাহিত্য সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'নাটক ও নাটকীয়তা' প্রবন্ধে বাঙলার পেশাদারী ও অপেশাদারী নাট্যসম্প্রদায়গুলি যে অভিযোগ উত্থাপন করেন ব'লে বলা হয়েছে এবং যাকে ভিত্তি ক'রে প্রবন্ধ লেখক শ্রীপংকজ দত্ত পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে অধুনাতন নাট্যসাহিত্যের হীনতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। অভিযোগটা এই যে, বর্তমানকালে নতুন নাটক নেই অথবা সৃষ্টি হচ্ছে না ব'লে বাধ্য হয়ে তাঁদের পুরনো নাটক মঞ্চস্থ করতে হচ্ছে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে আজকের দিনে নাটকের অভাব অথবা অনুৎকর্ষ এতো বড়ো আকার ধারণ করেনি যার জন্যে নাট্যসম্প্রদায়গুলির, বিশেষত পেশাদারী নাট্যসম্প্রদায়গুলির পুরাতন সংসক্তি বাধ্যতার পর্যায়ে নেমে আসবে। রসোত্তীর্ণ নাট্যসাহিত্যের অপ্রতুলতা আছে একথা স্বীকার্য। কিন্তু এতো অপ্রতুলতা নেই যার জন্যে কলকাতার পেশাদারী চারটি রংগালয়ও বছরে অন্তত দুটি ক'রে মোট আটটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ পাবেন না। শ্রী দত্ত নিজেই হিসেব দিয়েছেন যে, বর্তমানে

বছরে পঞ্চাশোধর্ব নাটক প্রকাশিত হয়। রচিত যা হয় তা এর চেয়ে অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। কেননা পত্রপত্রিকা ও প্রকাশকের অনাদর-অবহেলায় এবং নাট্য-সম্প্রদায়গুলির অসহযোগিতায় এই সৃষ্টির একটা মোটা অংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে স্রষ্টার সিন্দুকে আবদ্ধ থেকে যায়। বৎসরে এতগুলি নাটক যেখানে ছাপা হচ্ছে, সৃষ্ট হচ্ছে সেখানে 'নাটক নেই' ব'লে অভিযোগ উত্থাপন করা অশোভন। অভিযোগকারী হয়ত ব'লবেন যে, 'নেই' মানে একেবারে শূন্য নয়, যা আছে তার মূল্য নেই। সে সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ নয়।

সুতরাং তা না থাকারই সামিল। সত্যের অমর্যাদা না ক'রে এ কথাও সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া কঠিন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রলে দেখা যাবে, এ যুগে বাংলা নাটকের অভাব নেই, তার উৎকর্ষের মান নিম্নগামী নয় এবং যথার্থ রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির শক্তি ও সম্ভাব্যতা রয়েছে পূর্ণ-মাত্রায়। তবে পুরনো ঝুলি ঝেড়ে আসর সাজাতে বসার অর্থ কি? অর্থ শুধু এই যে, যখন অচলায়তনের জড়ত্ব ঢেকে রাখার আর কোন উপায় থাকে না তখন ত্রুটির বোঝাটা সচলায়তনের ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্তির ব্যর্থ চেষ্টা চালানোই একমাত্র কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। যাই হোক্, এটা তো পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, লেখক-দের মধ্যে (বিশেষ ক'রে নবীন লেখকদের মধ্যে) নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি করার প্রেরণার তেমন কিছু অভাব নেই,...তার চেষ্টাও উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লেছে। খ্যাতিমানদের মতো অর্থের মাপকাঠিতে ফলাফল মাপতে শেখেননি ব'লেই বাংলা সাহিত্যের এই প্রায়ান্ধকার কক্ষটিকে আলোকসজ্জায় সাজাতে তাঁদের চেষ্টা, পরিশ্রম ও স্বার্থ-ত্যাগের ত্রুটি নেই। অনুকূল আবহাওয়ায় প্রবীণদের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁদের চেষ্টা যে ত্রুটিপূর্ণ হ'য়ে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে তার আভাসের অভাব নেই। অপেশাদারী দলগুলির কাছ থেকে সে সহযোগিতা আশা করা যেতে পারে। কেননা কোন হীন স্বার্থপরতা অথবা সংকীর্ণতা তাঁদের মূলমন্ত্র নয় এবং তাঁদের ক্ষেত্রেই উন্নতির সম্ভাবনা পরি-ব্যাপ্ত। কিন্তু বাংলা দেশে আজ অধিকাংশ অপেশাদারী নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্ভব জলবুদ্বুদের সামিল হ'য়ে উঠেছে; অন্তঃসারশূন্য বাহিক চমক্ দেখিয়ে নিমিষেই তারা শূন্যে মিলিয়ে যায়। নাট্যকলার পরিচয় পাওয়া ত' দূরে থাক্, তার সংজ্ঞাটুকু বোঝার আগেই তাদের জীবনলীলা শেষ হয়। সে সব ক্ষেত্রে নবনাট্যের চাহিদা প্রত্যাশা করা মিথ্যা। সুতরাং তাদের বিচার-বুদ্ধির নিরিখে এই সমস্যার মীমাংসায় কোন আলোকপাত হবে না। তাদের বাদ দিয়ে য'রা নিতান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি দল ছাড়া তাদের প্রায় সকলের মধ্যেই নাট্যানুশীলন প্রবৃত্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু এই অনুশীলন-মন্যতা ছাড়া নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রসোত্তীর্ণ নতুন নাট্যসাহিত্যের জন্মও সম্ভব নয়। কেননা, যে নাটক অভিনয়ে ব্যঞ্জিত হ'ল না তার সার্থকতা ঘটা দুঃসাধ্য। একথা শ্রী দত্তও জানেন এবং আমাদের জানিয়েছেন। এইসব দলের একমাত্র লক্ষ্য 'পাব্লিক-এর নাটক' অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটক অভিনয় করা। তাঁদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে সাধারণ রঙ্গালয়েই নিবদ্ধ। নাটক, অভিনয়শৈলী, রূপসজ্জা, বাচনভঙ্গী, ভাবাভিব্যক্তি প্রভৃতি সব বিষয়েই তাঁরা সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্ধ অনুকরণপ্রয়াসী। শিল্পের স্বাধীন রূপারোপে তাঁদের স্পৃহা নেই, শক্তিও নেই। সুতরাং তাঁরা যদি বলেন যে, নতুন নাটক নেই ব'লেই আমরা পুরাতনের দিকে ঝুঁকেছি তবে তা' নিয়ে আমাদের চিন্তার অথবা দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। অবশ্য যে সব অপেশাদারী দল নাট্যকলাকে অনুশীলনের ক্ষেত্রে টেনে এনেছেন তাঁরা যদি ও কথা বলেন তবে ভাবনার কথা হয় বটে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাংলার যে ক'টি মুষ্টিমেয় সত্যিকারের নাট্যকে দল আছেন তাঁদের নাটক নিয়েই তাঁরা আসরে অবতীর্ণ হ'চ্ছেন এবং সে সব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অপূর্ব নাট্যপ্রতিভারও আমরা পরিচয় পাচ্ছি।

সাধারণ রঙ্গালয়ের তরফ্ থেকে এ প্রশ্ন ওঠা হাস্যকর। কেননা, বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়গুলি একান্ত-ভাবেই সংরক্ষণশীল। প্রগতিশীলতার সাম্প্রতিক কিছু পরিচয় তাঁদের মধ্যে পাওয়া গেলেও এখনও নতুন নাটক গ্রহণ করার প্রবৃত্তি যে তাঁদের নেই অথবা খুবই অল্প আছে আমার মতো ভুক্তভোগীমাত্রই সে কথা স্বীকার ক'রবেন। শুধু এইটুকুই ব'লতে চাই যে, নতুন হ'লে তার সবই যে খারাপ হবে এ ধারণা যাঁদের বুঝতে হবে তাঁরা উন্নতি চান না, জীবন চান না। তাঁদের অভিযোগকে আমরা অনায়াসে অসংকোচে উপেক্ষা ক'রতে পারি।

অপূর্বসুন্দর মৈত্র,
রিজেন্ট পার্ক,
কলিকাতা

খেলার মাঠে

একলব্য

গত সপ্তাহে 'ইডেন উদ্যানের' ইনডোর স্টেডিয়ামে বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটি কারণে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের উপর এবার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রথমত এবারকার প্রতিযোগিতায় ভারতের যত গুণী ও কৃতী খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সাম্প্রতিককালে বাঙলার কোন আকর্ষণীয় ব্যাডমিন্টন ক্রীড়ানুষ্ঠানে এত গুণী ও কৃতী খেলোয়াড়ের সমাবেশ দেখা যায়নি। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল আন্তর্জাতিক টমাস কাপের খেলায় আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মুখে ভারতের খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য পরখ করা। বলা বাহুল্য, টমাস কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতির সুযোগের জন্যই শীতকালের পরিবর্তে গ্রীষ্মকালে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা করা হয়। ভারত চ্যাম্পিয়ন নন্দু নাটেকার ভারতের দুই নম্বরের খেলোয়াড় ত্রিলোক শেঠ, বোম্বাইয়ের কৃতী খেলোয়াড় রবীন্দ্র ডোংরে প্রমুখ টমাস কাপের খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য নির্বাচিত সকল খেলোয়াড়কেই বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ফলে প্রতিদিনই ইনডোর স্টেডিয়ামে হয় যথেষ্ট জনসমাগম। ফাইন্যাল খেলার দিন স্টেডিয়ামের একটি দর্শক-আসনও খালি থাকে না। অনেক দর্শককে যায়গার অভাবে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়। বস্তুত কলকাতার ব্যাডমিন্টন খেলার ইতিহাসে ইতিপূর্বে এমন জনসমাগম দেখা যায়নি—যেমন জনসমাগম হয়েছিল বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ মীমাংসার দিন ইনডোর স্টেডিয়ামে।

* * *

ভারত চ্যাম্পিয়ন নন্দু নাটেকরের কলকাতায় এই প্রথম খেলা। ইতিপূর্বে বছর ছয়েক আগে পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপে নাটেকার একবার কলকাতায় খেলে গেছেন বটে কিন্তু সেদিনের নাটেকারের সঙ্গে আজকের নাটেকারের আকাশ পাতাল পার্থক্য। নাটেকার তখন ভারত জোড়া খ্যাতি অর্জন করেননি। প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসেবেও তাঁর তেমন সুনাম ছিল না, বোম্বাইয়ের একজন উদীয়মান খেলোয়াড় হিসেবেই সেদিন তাঁর পরিচয় ছিল, কিন্তু আজ নাটেকার ভারতের পয়লা নম্বরের খেলোয়াড়—ভারতের সর্বাপেক্ষা কুশলী সুনিপুণ খেলোয়াড়। তাই শুধু নাটেকারের খেলা দেখবার জন্যই ইনডোর স্টেডিয়াম দর্শকে ভেঙ্গে পড়বে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। তারপর ফাইন্যালে নাটেকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন টমাস কাপে ভারতের নির্বাচিত অধিনায়ক উত্তর প্রদেশের কীর্তিমান খেলোয়াড় ত্রিলোক শেঠ। ফাইন্যালে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য নাটেকার ও শেঠ যখন আলোকোজ্জ্বল ইনডোর স্টেডিয়ামের মাঝখানের কোর্টে এসে দাঁড়ালেন তখন দর্শকদের চোখে মুখে অব্যক্ত আনন্দের হাসি। ব্যাডমিন্টনের দুই মহারথীর ক্রীড়াশৌর্য এবং গুণপনার অনুচ্চ গুঞ্জরন। এদের খেলায় আম্পায়ার নির্বাচিত হলেন বাঙলার কৃতী খেলোয়াড় মনোজ গুহ। নাটেকার এবং শেঠের খেলা দেখবার জন্যই সবাই স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছেন। এদের খেলার জন্যই সকলের অধীর প্রতীক্ষা। সবার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন ব্যাডমিন্টনের দুই মহাযোদ্ধা। দর্শকরা এঁদের না চেনেন, এমন নয়। তবুও আম্পায়ার মনোজ গুহ
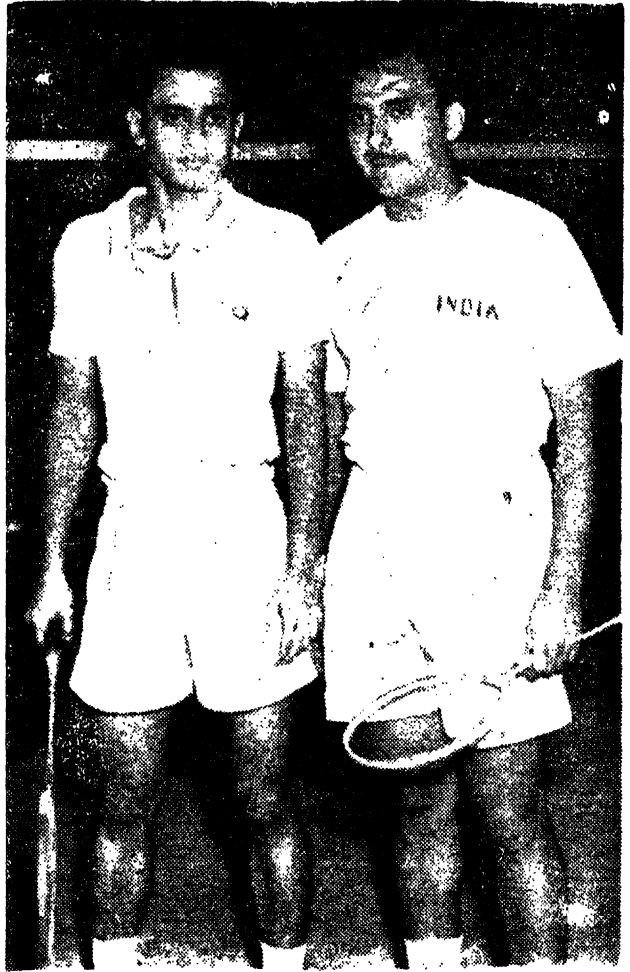
ভারত চ্যাম্পিয়ন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় নন্দু নাটেকার ও ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় ত্রিলোকনাথ শেঠ

যখন ঘোষণা করলেনঃ সিঙ্গলসের ফাইন্যাল খেলা; আমার ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন টমাস কাপে ভারতের নির্বাচিত অধিনায়ক উত্তর প্রদেশের টি এন শেঠ, তখন দর্শকদের করতালি ধ্বনিতে ইনডোর স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে উঠলো। করতালিধ্বনি মিলিয়ে গেলে মনোজ আবার বললেনঃ আমার বাঁ দিকে রয়েছেন ভারত চ্যাম্পিয়ন নন্দু নাটেকার। আবার দর্শকদের দীর্ঘস্থায়ী করতালিধ্বনি, আবার আনন্দরোল। আম্পায়ারের মুখে দুই ব্যাডমিণ্টন বীরের নাম শুনেও যেন কত আনন্দ। যাই হোক, আগ্রহাকুল দর্শকদের সামনে আরম্ভ হ'ল দুই মহারথীর খেলা। ভারতের বিভিন্ন আকর্ষণীয় ব্যাডমিণ্টন ফাইন্যালে নাটেকার ও শেঠ আরও সাত আটবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে বোম্বাইয়ের ইনভিটেশন টুর্নামেন্টের খেলা ছাড়া আর কোন খেলাতেই শেঠ হারাতে পারেননি নাটেকারকে। কিন্তু কলকাতায় শেঠ যেভাবে খেলা আরম্ভ করলেন তাতে নাটেকারের বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা গেল। চমৎকারভাবে মেরে খেলতে আরম্ভ করলেন শেঠ। নিজের কৃতিত্ব আর নাটেকারের ভুলচুকে শেঠ এগিয়ে চলেছেন। শেঠের সঙ্গে পেরে উঠছেন না নাটেকার। নেটের কোলে খুবই ভুলচুক হচ্ছে। চাপ মেরেও হচ্ছে না কোন সুরাহা। এদিকে হাতে অব্যর্থসন্ধানী মা'র আর মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে শেঠ এগিয়েই চলেছেন। সাত আটবার সার্ভিস হাত বদলের মধ্যে শেঠের হল ৯ পয়েণ্ট আর নাটেকার পড়ে রইলেন ৩ পয়েণ্টে। তবুও হাল ছাড়লেন না তিনি। অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করলেন। যে খেলায় নাটেকার সিদ্ধহস্ত; যে খেলায় তাঁর সুনাম বেশী, সেই প্লেসিং শটে নাটেকার পেলেন ক'টি পয়েণ্ট। যেখানে ৩—৯এর ব্যবধান ছিল সেখানে ৯—১০এর ব্যবধান হ'ল। তারপর চললো দুই বীরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নেটের কোলের সূক্ষ্ম মা'রে শেঠ পয়েণ্ট পান তো চাবুকের মত চাপ মা'র আর চক্রের মত প্লেসিংয়ে পয়েণ্ট লাভ করেন নাটেকার। তবুও শেঠের পয়েণ্টের নাগাল পান না ভারত চ্যাম্পিয়ন। ১১—১২, ১১—১৩, ১২—১৩, ১২—১৪, ১৩—১৪ এবং শেষ পর্যন্ত ১৫—১৩ পয়েণ্টে প্রথম সেট পান ত্রিলোক শেঠ। ২০ মিনিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম সেটের মীমাংসা হয়। দ্বিতীয় সেটের সূচনা থেকেই নাটেকার এগিয়ে যান। অবশ্য শেঠও দৃঢ়তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকেন। প্রথমদিকে বোম্বাই খেলোয়াড় ৭—১ পয়েণ্টে এগিয়ে থাকলেও এক সময়ে শেঠ ৭—৮ পয়েণ্টে নাটেকরের নাগাল পাবার উপক্রম করেন, কিন্তু শেষের দিকে তিনি মোটেই সুবিধা করতে পারেন না। ফলে ১৫—৯ পয়েণ্টে নাটেকার লাভ করেন দ্বিতীয় সেট। এ সেটের মীমাংসা হতেও ২০ মিনিট সময় লাগে। দুইজনই একটি করে সেট পান। তৃতীয় সেটে খেলার মীমাংসা। ৪০ মিনিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দু'জনই গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন। মুখ থেকে কোটের উপর ঝরে পড়ছে স্বেদবিন্দু। গায়ের জামা ঘামে সিক্ত। তৃতীয়, সেটের আগে দু'জনই একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর আরম্ভ হল প্রাধান্যের লড়াই। নাটেকার প্রথম সার্ভিসেই লাভ করলেন দুটি

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলা বিভাগের বিজয়িনী মিস ভ্যাণ্ডা উইলিয়ামস

পয়েণ্ট। পাল্টা সার্ভিসে ২ পয়েণ্ট পেলেন ত্রিলোক শেঠ। তারপর এক লাফে শেঠ এগিয়ে গেলেন অনেকখানি। ৮—২ পয়েণ্টে এগিয়ে থেকে তিনি কোট বদল করলেন। নাটেকার এলেন অপর কোটে। ভারত চ্যাম্পিয়ন নাটেকারের হার অনিবার্য বলে মনে হল। দর্শকদের বয়োকনিষ্ঠের উপরই সহানুভূতি বেশী। আরও একটি পয়েণ্ট লাভ করায় ৯—২ পয়েণ্টে এগিয়ে গেলেন শেঠ। কিন্তু এরপর নাটেকারের র‍্যাকেট মারমুখী হয়ে উঠলো। মরিয়া হয়ে খেলতে আরম্ভ করলেন তিনি। শেঠও পরাভব স্বীকার করতে নারাজ। মাথার বুদ্ধি ও হাতের কৌশলে দুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সবই চলছে এক সঙ্গে। শুধু দু'জনের হাত পা-ই খেলছে না। চোখও খেলছে দু'জনের। দৃষ্টি বাঁ দিকে থাকছে তো সাট্‌লকক যাচ্ছে ডান দিকে। ঝড়ের পাখীর মত সাট্‌লকক এ কোট ও কোট করছে। কখনো তীব্রগতি চাপ, কখনো প্লেসিং আবার কখনো নেটের কোলে সূক্ষ্ম মা'র। ব্যাট চালিত সাট্‌লকক মন্ত্রমুগ্ধের মত কখনো নেট ছুঁয়ে ও পাশে পড়তে চাইছে, কখনো চাইছে প্রতিপক্ষের ধরাছোয়ার বাইরে থেকে মাটি স্পর্শ করতে। নেটের কোলে দু'জনই অতি সচেতন। সাট্‌লকক নেটের একটু উপরে উঠছে কি অপরের অব্যর্থ পয়েণ্ট লাভ। তাই ব্যাট দিয়ে অতি সন্তর্পণে টোক্কা মেরে সাট্‌লকক চালিত করতে হবে। সাপুড়ে যেমনভাবে সন্তর্পণে টোক্কা মারে সাপের ল্যাজে। সাপ খেলায় দেখেছি সাপুড়ে সুকৌশলে সাপের ল্যাজে টোক্কা মারলে বিষধর ফণা তুলে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এখানেও দেখলাম ব্যাডমিণ্টনের দুই নিপুণ শিল্পীর র‍্যাকেটের পরশ পেয়ে সাপের ফণার মতই সাট্‌লকক উঠছে উপরের দিকে। যাই হোক, নাটেকার এগিয়ে যাচ্ছেন আর শেঠ হয়ে উঠছেন চঞ্চল। ২—৯, ৪—৯, ৪—১০, ৭—১০, ১০—১০-এ পয়েণ্টের সমতা করলেন নাটেকার। এরপর শেঠ আর একটি পয়েণ্টও লাভ করতে পারলেন না। ব্যাডমিণ্টনের নিপুণ শিল্পী ভারত চ্যাম্পিয়ন নাটেকার ১৫—১০ পয়েণ্টে শেষ সেটে শেঠকে হারিয়ে লাভ করলেন বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ।

* * *

সিঙ্গলস ফাইন্যালের পর পুরুষদের ডাবলসের খেলায় আরম্ভ হয় বোম্বাই—বাঙলা প্রতিযোগিতা। একদিকে রয়েছেন বোম্বাইয়ের দুই কৃতী খেলোয়াড় নন্দু নাটেকার ও রবীন্দ্র ডোংরে। অপরদিকে আছেন বাঙলার জুটি মনোজ গুহ ও জি হেমাডি। মনোজ ও হেমাডিকে শুধু বাঙলার জুটি বললে ভুল হয়। এঁরা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং টমাস কাপে ডাবলসের প্রতিদ্বন্দ্বী। সবারই আশা ছিল মনোজ-হেমাডি সহজেই নাটেকার-ডোংরেকে পরাজিত করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু হ'ল অন্যরূপ। মনোজ-হেমাডিকেই হার স্বীকার করতে হ'ল নাটেকার-ডোংরের কাছে। বোম্বাই জুটির বিরুদ্ধে বাঙলা জুটি মোটেই ভাল খেলতে পারেন নি। অনেক ভুলচুক হয়েছে, বিশেষ করে মনোজের খেলায়। অবশ্য নাটেকার-ডোংরেও খুব ভাল খেলেছেন একথা বলা যায় না। ডাবলসের দুই পক্ষের ৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে হেমাডির খেলাই সবচেয়ে ভাল হয়। শুধু খেলাই নয়, হেমাডির মধ্যে ভাবপ্রবণতাও ছিল বেশী। খুবই আন্তরিকতা নিয়ে খেলেছিলেন তিনি। একটু ভুলচুক হলেই শিরে করাঘাত করছিলেন। ভাবখানা—এত সোজা শট ব্যর্থ হয়ে গেলো! নাটেকার-ডোংরের বিরুদ্ধে মনোজ-হেমাডির পরাজয়ের ফলও সুদূরপ্রসারী। কারণ ডাবলসে এঁরা যদি অপর জুটির কাছে পরাজয় স্বীকার করেন তবে স্বাভাবিকভাবেই এঁদের ভারতীয় দলে নির্বাচিত হবার দাবী অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ডাবলসে উত্তর প্রদেশের ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যাণ্ট মজুমদার উঠতি খেলোয়াড়। ইনি ভারতের

দুই নম্বর খেলোয়াড় শেঠের মন্ত্রশিষ্য। চমৎকার মা'র আছে এ'র হাতে। মাথায়ও আছে বুদ্ধি। মিক্সড ডাবলসে মিস সুইনিকে নিয়ে খেলে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অতি সহজে বাঙলার পংকজ গুহ ও মীরা দাশকে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করলেন। অদূর ভবিষ্যতে আর কোন নিপুণ খেলোয়াড়ের সংগে মজুমদারের যোগাযোগ ঘটলে ভারতের ডাবলস টীম শক্তিশালী হবার সম্ভাবনা।

বাঙ্গালী মেয়ে মীরা দাশকে সিংগলস ফাইন্যালে বাঙ্গলার মেয়ে ভ্যান্ডা উইলিয়ামসের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। অবশ্য ভ্যান্ডা উইলিয়ামস বাঙ্গলার মেয়ে হলেও তাঁর দেহের সবটুকু উপাদান বাঙ্গলার জল-হাওয়ায় তৈরী হয়নি; সাগর-পারের কিছুটা উপাদান রয়েছে তাঁর শরীরে। উইলিয়ামস এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত। সব রকমের খেলাধুলোতেই এর দখল আছে। বেশ ভাল হকি খেলেন, বাস্কেট বলেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, টেবিল টেনিসও খেলতে জানেন। ব্যাডমিণ্টনেও চমৎকার হাত। কুমারী মীরা দাশ ভ্যান্ডা উইলিয়ামসের চেয়ে ভাল খেলেই প্রথম সেট লাভ করেছিলেন, কিন্তু তারপর মীরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে, কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকতেই তাঁর কষ্ট হচ্ছিল বলে মনে হয়। উইলিয়ামস সহজেই পরের দুটি সেট পেয়ে লাভ করেন চ্যাম্পিয়নশিপ।

বেংগল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের সমাপ্তি উৎসবে বিশেষ অতিথির আসনে এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন। বাঙ্গলার ব্যাডমিণ্টন অনুরাগী অনেকেই হয়তো তাঁকে চিনতে পারেননি। ঐ বৃদ্ধই বাঙ্গলা ব্যাডমিণ্টনের স্রষ্টা শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি খেলা দেখছিলেন, আর হয়তো মনে মনে এই ভেবে গর্ববোধ করছিলেন—কৈশোরে যার বীজ তিনি বপন করেছিলেন তা আজ কতবড় মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ব্যাডমিণ্টন খেলা আজ ভারতে কত জনপ্রিয়।

নীচে বেংগল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যাল খেলার ফলাফলগুলি দেওয়া হলঃ—

পুরুষদের সিংগলস

নন্দু নাটেকার ১৩—১৫, ১৫—৯ ও ১৫—১০ পয়েন্টে টি এন শেঠকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

নন্দু নাটেকার ও রবীন্দ্র ডোংরে ১৫—১১, ১১—১৫ ও ১৫—৫ পয়েন্টে মনোজ গুহ ও গজানন হেমাড়িকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস

ভ্যান্ডা উইলিয়ামস ১১—১২, ১১—৩ ও ১১—৭ পয়েন্টে মীরা দাশকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিস মীরা দাশ ও মিস নীলিমা ঘোষ ১৫-৬ ও ১৫-৯ পয়েন্টে মিস বি ক্যাচিক ও মিস ভি উইলিয়ামসকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

পি কে মজুমদার ও এম সুইনি ১৫-৬ ও ১৫-৪ পয়েন্টে পংকজ গুহ ও মীরা দাশকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস

দীপু ঘোষ ১৫-৭ ও ১৫-৬ পয়েন্টে অক্ষয় গুহকে পরাজিত করেন।

ফুটবল লীগের আলোচনা

গ্রীষ্মের রুদ্ররোষের মধ্যেই এবার ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছিল। মাঝে দুই পশলা বৃষ্টির ফলে গ্রীষ্মের রোষানল কিছু প্রশমিত হয়েছে। তবুও অপরাহ্ণ বেলা পর্যন্ত মাঠে যে উত্তাপ থাকে তার মধ্যে খেলোয়াড়রা ৫০ মিনিট খেলতে হিমসিম খেয়ে ওঠেন। এছে পায়ে রয়েছে মরসুমের প্রাথমিক জড়তা তারপর প্রথম থেকে চতুর্থ ডিভিশন পর্যন্ত সমস্ত খেলোয়াড়েরই পায়ে বুটের বন্ধন সাবলীলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সোজা কথ নয়, তারপর গ্রীষ্মের আধিক্য। প্রথম ডিভিশন লীগের খেলা আরম্ভ হবার পর একপক্ষ অতীত হয়েছে। এর মধ্যে কোন দলের খেলাতেই উন্নত ফুটবল নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ফুটবল মরসুমের সূচনায় বিভিন্ন দলের শক্তি সামর্থ নিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী হয়তো ঠিক হবে না। কারণ অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা, ফলাফল 'গড়াপেটার' কাহিনী এবং খেলার বহু অপ্রত্যাশিত ফলাফল ফুটবল মরসুমের জন্য অপেক্ষা করছে। তবুও এক পক্ষকালের খেলার পর বিভিন্ন দল সম্পর্কে যেটুকু ধারণা হয়েছে উল্লেখ করছি।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় ভলিবল টীমের খেলোয়াড়রা গত ২৪শে মে টোকিও থেকে দমদম পৌঁছিলে বিমান ঘাটিতে খেলোয়াড়দের এই ছবি তোলা হয়

মোহনবাগান ক্লাব—প্রথমেই গতবারের গ এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহন-গানের কথা বলা যাক। পাঁচটি খেলার ধ্য একটি পয়েণ্টও নষ্ট করেনি মোহন-গান ক্লাব। এরা একে একে পুলিস, দিরপুর, জর্জ টেলিগ্রাফ, বি এন আর ও রোরা ক্লাবকে হারিয়ে উপর্যুপরি পাঁচটি লাতেই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ন্যান্য বারের তুলনায় মোহনবাগানের পুরো-াগ এবার বেশ শক্তিশালী এবং বেশীরভাগ রুণ খেলোয়াড়ের মধ্যেই এ শক্তি নিহিত। মাহনবাগানের কয়েকটি খেলায় বেশ সঙ্ঘ-দ্ধতারও পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে মাহানবাগানের রক্ষণভাগের উপর এখনো তমন চাপ পড়েনি। মনে হয় রক্ষণভাগে কছুটা চোরাবালি আছে। শক্তিশালী দলের াপের মুখে তা প্রকাশ পেতে পারে। এবার মাহনবাগানের অবাঙালী খেলোয়াড়ের সংখ্যা ুবই কম। ধনরাজ ও ভেঙ্কটেশের মধ্যে ভেঙ্কটেশকে এপর্যন্ত কোন খেলায় অংশ হণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। তরুণ াঙালী খেলোয়াড়রা যেমন প্রশংসার সঙ্গে খলছেন তাতে তার খেলার সুযোগ পাবার ম্ভাবনাও কম।

ইস্টবেঙ্গল—চারটি খেলার মধ্যেই ইস্ট-বেঙ্গলকে একটি পরাজয় স্বীকার করতে য়েছে। এরা পরাজিত করেছে রেলওয়ে স্পার্টস ক্লাব, অরোরা ও পুলিস দলকে ার হার স্বীকার করেছে কালীঘাট ক্লাবের াছে। অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় অনেকটা ুর্ভাগ্যপ্রসূত। বাঙলার বাইরের এবং লকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় স্টবেঙ্গল ক্লাবে এ বছর যোগদান করলেও াদের রক্ষণ এবং আক্রমণভাগ এখনো দুর্বল য়েছে। সেণ্টার হাফ এবং সেণ্টার রোয়ার্ডের সমস্যা মেটেনি। ইস্টবেঙ্গল াব এবার যেসব কুশলী খেলোয়াড় সমন্বয়ে ঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে গোলরক্ষক ডি ঘাষ, ব্যাক এস মল্লিক ও এম ঘটক, হাফব্যাক দত্ত ও হরিদাস, ফরোয়ার্ড বিট্টু, বাল-ুব্রহ্মনিয়াম, প্যাট্রিক ও এস রায়ের নাম রা যেতে পারে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের র্তৃপক্ষ পাকিস্থানের দুই একজন খেলোয়াড়ের সাহায্য পাবার এখনো আশা াখেন।

রাজস্থান ক্লাব—যদিও তিনটি খেলার ধ্যে ইতিমধ্যেই একটি খেলায় পরাজয় বীকার করতে হয়েছে, তবুও রাজস্থান ক্লাব বশ শক্তিশালী দল বলেই মনে হয়। এদের ুরোভাগ এবং রক্ষণভাগ বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তনটি খেলার মধ্যে এরা হারিয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ ও এরিয়ান ক্লাবকে আর পরাজয় বীকার করেছে উয়াড়ী ক্লাবের কাছে এক ধতর্কমূলক পেনাল্টি গোলে। রাজস্থান াব তিন ব্যাক প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ায়দরাবাদের খ্যাতনামা খেলোয়াড় এ সালাম দলের প্রধান স্তম্ভ। তিনিই 'স্টপার' বা সেণ্টার ব্যাক হিসেবে খেলছেন। পুরোভাগে বশিথ, পুষ্পরাজ এবং ইয়ামানির কৃতিত্বের উপর অনেকখানি আশা পোষণ করা যায়। ইস্ট-বেঙ্গলের প্রাক্তন গোলকিপার এম ঘটক এবার রাজস্থানের গোলরক্ষক। হাফব্যাকে শঙ্করও বেশ কড়া খেলোয়াড়। বোম্বাই কালচার লীগের পক্ষে খেলে ইনি ইতিপূর্বেই কলকাতার মাঠে সুনাম অর্জন করেছেন। তবে দলগত শক্তি যতই থাক ফলাফলের দিক দিয়ে রাজস্থান ক্লাব কতদূর কি করবে সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

মহমেডান স্পোর্টিং—পাকিস্থান এবং বাঙলার বাইরের কয়েকজন খেলোয়াড় এবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শক্তি বৃদ্ধি করলেও বর্তমান মহমেডান দলকে অতীত দিনের ছায়া বলা যেতে পারে। পাকিস্থানের কীর্তিমান লেফট আউট মাসুদ ফাকরীর উপর মহমেডান দলের যত কিছু আশা। শুধু পাকিস্থান কেন ফাকরীর মত এমন কুশলী খেলোয়াড় ভারতেও নেই। কিন্তু একা ফাকরী দলের জয়লাভের কতটুকু সহায়ক হতে পারেন যদি না তিনি অন্যান্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সাহায্য পান। প্রথম খেলাতেই মহমেডান দল স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে একটি পয়েণ্ট হারিয়ে পরের দুটি খেলায় রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব এবং কালীঘাট ক্লাবকে পরাজিত করেছে। নতুন ও পুরনো খেলোয়াড়ের সংমিশ্রণে গঠিত মহমেডান দল দুই একটি ছোট টীমের বিরুদ্ধে বাথ তার পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু বড় বড় টীমের সঙ্গে ভাল খেলবে বলেই আশা করা যায়।

উয়াড়ী—গতবারের লীগ রানার্স উয়াড়ী ক্লাব পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে খিদিরপুরের কাছে একটি পয়েণ্ট হারিয়েছে; কিন্তু বাকী চারটি খেলায় বিজয়ী হওয়ায় পাঁচটি ম্যাচে তারা সংগ্রহ করেছে ৯ পয়েণ্ট। সমস্ত বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে উয়াড়ী টীম গঠিত। এরা হারিয়েছে বি এন আর, অরোরা, রাজস্থান এবং পুলিস দলকে। এপর্যন্ত খেলার মধ্যে যিনি হ্যাট্রিক করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি উয়াড়ীর সেণ্টার ফরোয়ার্ড এস ঘোষ, পুলিসের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি তিনটি গোল করে ইনি মরসুমের প্রথম 'হ্যাট্রিক' করেছেন। বি মজুমদার উয়াড়ী থেকে মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করায় উয়াড়ীর শক্তি কিছু খর্ব হয়েছে।

এরিয়ান—চারটি খেলার মধ্যে এরিয়ান ক্লাবের লীগের ফলাফল এবার খুবই নৈরাশ্য-জনক। এখন পর্যন্ত কোন খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি। এরিয়ান ক্লাব কোন খেলায় গোলও লাভ করেনি। লীগ কোঠায় গোল-লাভের ঘরে এখনো শূন্য বিরাজ করছে। এ পর্যন্ত দুটি রেল টীমের কাছ থেকে দুটি পয়েণ্ট পেয়েছে আর হার স্বীকার করেছে রাজস্থান ও জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে। খেলোয়াড় ভাঙাবার ফলে এবার এরিয়ান যত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি আর কোন টীম। এ দত্ত, এস রায় ও এ চ্যাটার্জীর মত তিনজন কুশলী খেলোয়াড় এরিয়ান থেকে চলে গেছেন সেই তুলনায় এরা দলভুক্ত করেননি কোন কুশলী খেলোয়াড়কে। তবে খেলোয়াড় তৈরীর ব্যাপারে এরিয়ানের সুনাম আছে, সেই সঙ্গে সুনাম আছে বড় বড় টীমকে ঘায়েল করবার। মনে হয় এরিয়ান ক্লাব আস্তে আস্তে ভালই খেলবে।

কালীঘাট—ছয়টি খেলার মধ্যে তিনটিতে জয় এবং তিনটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছে কালীঘাট ক্লাব। প্রায় সমস্ত অল্প-খ্যাত খেলোয়াড় নিয়ে কালীঘাট ক্লাব গঠিত। এদের খেলায় উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যথেষ্ট, সেই সঙ্গে গতিবেগ। শুকনো মাঠে যে কোন টীমকেই বেগ দিতে পারে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ইতিমধ্যেই ঘায়েল করেছে।

রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব—রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব ই আই রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের পরি-বর্তিত নাম। এবার নিয়ে এদের নাম অনেকবার পরিবর্তন হল। সাহেবী যুগে এদের নাম ছিল ই বি আর, তখন এরা ইউরোপীয়ান ক্লাবের মর্যাদা পেত। তারপর রেলের নামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ই বি আরের নতুন নাম হল বি এণ্ড এ আর। তারপর দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে রেল বিভাগ হলে বি এণ্ড এ আর নাম পরিগ্রহ করলো ই আই আর স্পোর্টস ক্লাব, এবার হয়েছে শুধু রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব। যাই হোক রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের ৬টি খেলায় ৪ পয়েণ্ট লাভ কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। রেল দলে দুই একজন নতুন খেলোয়াড় যোগ দিলেও পুরনো খেলোয়াড়দের উপর এদের আস্থা বেশী। সেণ্টার ফরোয়ার্ড মেওয়ালাল এখনো কলকাতা মাঠের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে প্রশংসা পেয়ে আসছেন।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব গঠিত। নাম ডাকের কোন খেলোয়াড় স্পোর্টিং ইউনিয়ন টীমে নেই। পাঁচটি খেলার মধ্যে এরা ইতিমধ্যেই তিনটি খেলায় জয়লাভ এবং একটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে ৭ পয়েণ্ট অর্জন করেছে। শেষের দিকে অবতরণের মুখে পড়তে না হয় এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে স্পোর্টিং টীম প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করছে।

খিদিরপুর ক্লাব—পাঁচটি খেলার মধ্যে খিদিরপুর ক্লাব একটি খেলাতেও জয়লাভ করতে পারেনি। তবে লীগ রানার্স উয়াড়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা যথেষ্ট ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। প্রায় সারাক্ষণ দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ দুই মিনিটে উপর্যুপরি দুইটি গোল করে খিদিরপুর / ক্লাব উয়াড়ীর সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। খিদিরপুর ক্লাবও তিন ব্যাক

প্রথার পক্ষপাতী। তিনব্যাক প্রথায় এরা খানিকটা ওয়াকিবহাল।

জর্জ টেলিগ্রাফ—একটি খেলায় জয়লাভ এবং একটি খেলা 'ড্র' করে জর্জ টেলিগ্রাফ দল চারটি খেলার মধ্যে ৩ পয়েণ্ট অর্জন করেছে। মোহনবাগানের সঙ্গে এদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের প্রশংসা করা যেতে পারে। একেবারে শেষ মুহূর্তে এদের বিরুদ্ধে একটি গোল করে মোহনবাগান ক্লাব জয়লাভ করে। জর্জ টেলিগ্রাফের গোলরক্ষকের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখা যায়। বি রাও সত্যিই একজন কুশলী গোলরক্ষক।

বি এন আর—আগের দিনে শুকনো মাঠে বি এন রেল দল বেশ ভাল খেলতো। কিন্তু পায়ে বুট চড়িয়ে দেবার ফলে এরা নগ্নপদ ক্রীড়াচাতুর্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, খেলার গতিবেগও হয়েছে মন্থর। চারটি খেলায় বি এন আর লাভ করেছে ৩ পয়েণ্ট। এখন পর্যন্ত কোন খেলায় তেমন ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেনি।

অরোরা—গতবছরের দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ন অরোরা ক্লাব এবার প্রথম ডিভিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রায় সমস্ত জুনিয়র খেলোয়াড় নিয়ে এদের দল গঠিত, কেবল মোহনবাগানের প্রাক্তন হাফ এস শেঠ আছেন অরোরা দলে। খেলোয়াড়দের গতি-বেগ আছে, উৎসাহ উদ্দীপনাও আছে; কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব। সূচনায় ভাল খেলেও শেষদিকে কাহিল হয়ে পড়ে। জর্জ টেলিগ্রাফের কাছ থেকে এপর্যন্ত অরোরা ক্লাব একটি মাত্র পয়েণ্ট পেয়েছে বাকী তিনটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তিনটি শক্তিশালী দল মোহনবাগান, উয়াড়ী ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে।

পুলিশ—পুলিশ টীমের অবস্থা এখন পর্যন্ত মোহনবাগানের উল্টো। অর্থাৎ লীগ কোঠার শীর্ষস্থান অধিকারী মোহনবাগান ক্লাব যেমন উপর্যুপরি পাঁচটি খেলায় বিজয়ী হয়েছে, লীগ কোঠার সর্বনিম্নস্থানাধিকারী পুলিশ তেমন পরাজয় স্বীকার করেছে উপর্যুপরি পাঁচটি খেলায়। সুতরাং পুলিশ টীমের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়। ময়দানে জনরব সার্জেণ্টের চাকরী দিয়ে খেলোয়াড় সংগ্রহের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুবই আগ্রহ-শীল; কিন্তু খেলোয়াড় পাওয়া যাচ্ছে না।

নীচে প্রথম ডিভিশন লীগ তালিকা এবং গত সপ্তাহের ফলাফল দেওয়া হলঃ

প্রথম ডিভিশন লীগ কোঠা

[২৪ তারিখের খেলার পর]

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	৫	৫	০	০	১৫	২	১০
উয়াড়ী	৫	৪	১	০	৮	৩	৯
স্পোর্টিং ইউঃ	৫	৩	১	১	৪	৩	৭
ইস্টবেঙ্গল	৪	৩	০	১	৬	২	৬
কালীঘাট	৬	৩	০	৩	৪	৫	৬
মহঃ স্পোর্টিং	৩	২	১	০	৫	১	৫
রাজস্থান	৩	২	০	১	৪	১	৪
রেলওয়ে স্পোর্টস	৬	১	২	৩	৩	৬	৪
বি এন আর	৪	১	১	২	৪	১	৩
জর্জ টেলিঃ	৪	১	১	২	১	৪	৩
খিদিরপুর	৫	০	২	৩	২	৫	২
এরিয়ান	৪	০	২	২	০	২	২
অরোরা	৪	০	১	৩	১	৬	১
পুলিশ	৪	০	০	৪	২	১৪	০

* খেলার সংখ্যা, জয়, ড্র, পরাজয়, নিজেদের গোল, নিজের বিরুদ্ধে গোল ও পয়েণ্ট এইভাবে পর পর লীগ কোঠা সাজান আছে।

গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিশন লীগের ফলাফলঃ

১৮ই মে '৫৫

মহঃ স্পোর্টিং (৩) রেলওয়ে স্পোর্টস (১)
কালীঘাট (১) খিদিরপুর (০)

১৯শে মে '৫৫

মোহনবাগান (৩) বি [illegible]
ইস্টবেঙ্গল (৩) [illegible]
রাজস্থান (১) [illegible]

২০শে মে '৫৫

স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২) রেলওয়ে স্[illegible]
অরোরা (০) জর্জ টেলিগ্রা[illegible]

২১শে মে '৫৫

মহঃ স্পোর্টিং (২) কালীঘাট (০)
উয়াড়ী (২) খিদিরপুর (২)

২৩শে মে '৫৫

উয়াড়ী (৩) পুলিশ (১)
জর্জ টেলিগ্রাফ (১) এরিয়ান (০)

২৪শে মে '৫৫

মোহনবাগান (৩) অরোরা (০)
রেলওয়ে স্পোর্টস (১) কালীঘাট (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১) খিদিরপুর (০)

সপ্তম উইকেটে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই কৃতি ব্যাটসম্যান ডেনিস এ্যাটকিনসন এবং ক্লারেমণ্ট দেপীজা ব্যাট করতে যাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট খেলায় এ'রা সপ্তম উইকেটে ৩৪৭ রান করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন

এয়ো এক্ষেত্রে হন, তাহা র প্রতিবেশ ভাবে অগ্রসর য় সৃষ্টি হইবে র দিক হইতে হিমা অনেক গায়ার মুক্তি বকারের গাবে

দেশী সংবাদ

১৬ই মে—ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না নিঃ ভাঃ উদ্বাস্তু সঙ্ঘের এক সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন, বর্তমান বৎসরে ভারত সরকারের বাজেটে পুনর্বাসন দপ্তরের জন্য ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই অর্থের মধ্যে ৪৫ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের কল্যাণার্থ ব্যয় করা হইবে এবং অবশিষ্ট অর্থ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই দেশাইয়ের সভাপতিত্বে ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশের যে সকল শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট কর্মিসংখ্যা ১০ হাজার, সেগুলিকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইনের আওতায় আনিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

১৭ই মে—আজ নয়াদিল্লীতে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার বৈঠকের শেষে প্রকাশিত এক যৌথ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সীমান্তের হাঙ্গামা নিবারণকল্পে ভারত এবং পাকিস্থান তাহাদের সীমান্তস্থিত সৈন্যের সংখ্যা এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছে।

১৮ই মে—মহারাষ্ট্র প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সভাপতি শ্রী এন জি গোরে এবং ৭৫ বৎসর বয়স্ক বিপ্লবী সেনাপতি বাপাতের নেতৃত্বে ৫৩ জন সত্যাগ্রহীর প্রথম দল আজ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গোয়ায় প্রবেশ করে।

নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান কাশ্মীর বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রিদ্বয় এক যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাঁচ দিন-ছে। পী নেহরু-আলী বৈঠকে যে সকল প্রশ্নের য়াড়ে চনা হইয়াছে, ঐগুলি সম্পর্কে উভয় এবার বিশদ বিবেচনার পর পুনরায় যুক্ত ত হয়েছে আলোচনা চালাইবেন।

ষ, ব্যাক এগ মঃ কলিকাতায় চৌরঙ্গী রোড ও দত্ত ও হরিদাস মোড়ের নিকট একখানি ব্রহ্মনিয়াম, প্যাড়একটি ট্রামগাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ যেতে গাড়ীর ১৯ জন লোক আহত র্তৃপক্ষ পান্টিনার গুরুতররূপে আহত দুই লোয়াড়ের সহ একজন হাসপাতালে মারা খেন।

রাজস্থ ১৯শে মে—শ্রী এন জি গোরে ও ধ্য ত্রীপতি বাপাতের নেতৃত্বে যে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদল গতকাল গোয়ায় প্রবেশ করিয়া-ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ২৭ জনকে গভীর রাত্রিতে সীমান্ত পার করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁহাদের নিকট জানা গিয়াছে যে, গতকল্য পর্তুগীজ পুলিশ সত্যাগ্রহীদের
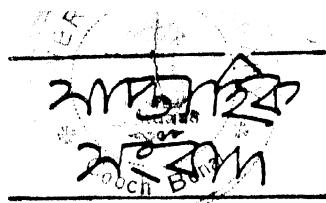
উপর গুলী চালায় এবং পরে তাঁহাদের উপর ভীষণভাবে মারপিট করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কলোনী ও জবর দখল কলোনীসমূহের উন্নয়ন সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন।

২০শে মে—আজ কোচবিহারে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট প্রায় ১২টি সংস্থা সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত আসামের গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তির দাবী জানায় এবং কোচবিহার সম্পর্কে কোনরূপে পরিবর্তন না করার অনুরোধ জানায়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আহূত মহিলা কংগ্রেস সংগঠন কর্মী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনাগুলি সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে দেশের সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। এই সমাজ নিরূপ সংগঠনে ভারতের নারীদিগকে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

২১শে মে—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরিকল্পনা কমিশনের নিকট একটি লিপি পাঠাইয়া পরিকল্পনা রচনার দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়ীভূত বিভিন্ন লক্ষ্যের ধরন সমগ্রভাবে সংশোধনের সুপারিশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি কয়েকটি বৈদেশিক জাহাজী কোম্পানী কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দরে প্রেরিত মালের মাশুলের উপর সার-চার্জ ধার্য করার প্রস্তাব করায় আজ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, ভারত সরকার ঐসব কোম্পানীর কোন জাহাজকে ভারতের কোন বন্দরে আসিতে না দিয়া উহাদের প্রস্তাবের জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন।

২২শে মে—আজ নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের দশম অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ ছাত্র সম্প্রদায়কে নিয়ম শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান।

গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ গতকল্য ৭৫ বৎসর বয়স্ক বিপ্লবী নেতা সেনাপতি বাপাতকে মুক্তি দিয়াছেন। শ্রীবাপাতকে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের হস্তে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। শ্রী এন জি গোরে বর্তমানে গোয়ার জেলে আটক আছেন।

গোয়া সম্পর্কে আজ বোম্বাইয়ে শ্রীফ্রাঙ্ক এণ্টনীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংসদ সদস্য-দের সম্মেলনে বিপুল জন সমাবেশ হয়। সহস্র সহস্র নরনারীর আনন্দধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ গোয়ায় যে অত্যাচার উপদ্রবের তাণ্ডব চালাইয়াছেন তাহার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ভারত হইতে সাম্রাজ্যবাদের এই শেষ চিহ্নটি লোপের দাবী জানানো হয়।

বিহার সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে যে, খনি শ্রমিক নেতা শ্রীসাধন গুপ্তকে জোর করিয়া নাক দিয়া খাওয়ান হইতেছে। তিনি বাঁকীপুর (পাটনা) সেণ্ট্রাল জেলে গত ৮৩ দিন যাবৎ অনসন ধর্মঘট করিতেছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই মে—চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ফরমোজা অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমনকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলাপ-আলোচনার অভিপ্রায়ের কথা পুনরায় ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯শে মে—সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মঃ ক্রুশচেভ ঘোষণা করেন যে, বর্তমান মাসের শেষভাগে একটি সোভিয়েট প্রতিনিধি-দল যুগোশ্লাভিয়ায় যাইবে। উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ভিত্তিতে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলাই হইবে এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য। তিনি স্বয়ং এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন।

১৯শে মে—করাচীস্থ আফগান রাষ্ট্রদূত সর্দার রফিক আজ বলেন যে, গত ১৪ই মে হইতে পাকিস্থান-আফগানিস্থান সীমান্ত কার্যত বন্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন, বহু সংখ্যক মাল বোঝাই লরী সীমান্তবর্তী তুরখমে পাকিস্থান কর্তৃক আটক আছে।

২০শে মে—পিকিংয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই এবং শ্রীকৃষ্ণমেনন আশাপূর্ণ মনোভাব লইয়া অদ্য রাত্রে ফরমোজা সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা শেষ করিয়াছেন। সন্ধ্যায় চীনা প্রজাতন্ত্রের সভাপতি মিঃ মাও সে তুং শ্রীমেননের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে আধ ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

২১শে মে—পাঞ্জাব গভর্নর মিঃ এম এ গুরমানি মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। গভর্নর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে মিঃ আব্দুল হামিদ খান দস্তীকে আহ্বান করেন এবং মিঃ দস্তীর নেতৃত্বে নূতন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
৩১ সংখ্যা
দেশ
শনিবার
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২
DESH
SATURDAY, 4TH JUNE, 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনিষ্টকর আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ গোয়ালপাড়ার হাঙ্গামা সম্পর্কে আসামে যাইবেন, এইরূপ কথা আছে। ইঁহারা আসামে গিয়া পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে আশ্বাসের ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশক্রমেই ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। দেখিতেছি, এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া আসামের একদল লোক বিক্ষোভের কারণ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। তাহারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিতেছে। সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হইতেছে, মিছিল বাহির করা হইতেছে, হরতাল পর্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। এই আন্দোলনের নেতারা যে ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন তাহাতে মনে হয় আসাম রাজ্য যেন কোন বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইতে বসিয়াছে, সুতরাং জাগো আসামবাসী, এই ভাব। প্রকৃতপক্ষে গোয়ালপাড়ায় অসহায় উদ্বাস্তুদের উপর যে অত্যাচার এবং উপদ্রব অনুষ্ঠিত হয়, তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই নাই এবং সেই সম্পর্কিত অপ্রীতিকর প্রতিবেশ যাহাতে কাটিয়া যায়, শুধু আসাম কেন, সমগ্র ভারতের কল্যাণকামী মাত্রেই তাহা চাহেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রীর অবলম্বিত নীতির মূলে সেই উদ্দেশ্যই নিহিত রহিয়াছে। ডাঃ রায় এবং শ্রীযুত ঘোষের আসাম পরিদর্শনে গমনের ব্যবস্থারও সেই লক্ষ্য। সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষায় সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারাই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে। ফলত আসামের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই এ সম্পর্কে উঠে না এবং তেমন কল্পনাও কাহারো মনে নাই। আসামের রাজ্যগত মর্যাদাবোধ, সংহতি এবং সর্বশ্রেণীর মধ্যে নিরাপত্তার ভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা। আসাম বহু ভাষাভাষীর রাজ্য। ভাষাগত প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তি যদি সেখানে প্রশ্রয় পায়, তবে রাজ্য হিসাবে আসামের মর্যাদা বাড়িবে, আন্দোলনকারীদের ইহাই কি বিশ্বাস? তাঁহারা কার্যত তাহাই চাহিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে এমন মনোভাব প্রশ্রয় পাইলে ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য, সেই সেই রাজ্যের অধিবাসী সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের পক্ষে এক একটি পাকিস্থানে পরিণত হইবে। আসামের সাম্প্রতিক আন্দোলনে আমাদের মনে এই আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আশার কথা এই যে, আসামের জনমতের সমর্থন এই আন্দোলনে নাই। কংগ্রেস-বিরোধী উপদলীয় চক্রান্তই এই আন্দোলনের মূল্য কাজ করিতেছে। ইহা জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। কংগ্রেসের উদার আদর্শই আসামের সমাজ-জীবনে সংহত হইয়া উঠিবে আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

গোয়ার সত্যাগ্রহে সরকারী নীতি

গোয়ার ব্যাপার সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা শহরে গোয়ার পরিস্থিতির সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বিভিন্ন রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনও হইয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদের প্রসিদ্ধ জননায়ক স্বামী রামানন্দ তীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গোয়াকে পর্তুগীজ অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভারত সরকারের সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হইবে না। জনগণের অহিংস সত্যাগ্রহ নীতির বলেই গোয়ার মুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে, সভাপতি এই অভিমত প্রকাশ করেন। আমরাও অনুরূপে মত পোষণ করিয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস এই যে ভারত সরকার ভারত হইতে সত্যাগ্রহীদের দলবদ্ধভাবে গোয়ায় প্রবেশের কোন বাধা যদি না রাখেন, তবেই যথেষ্ট; কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহারা সুস্পষ্ট নীতিস্বরূপে ইহা করেন নাই। ফলত গোয়ার সম্বন্ধে ভারতের দাবীর মূলে মানুষের মৌলিক অধিকারগত যে যৌক্তিকতা রহিয়াছে ভারত সরকারের এতৎসম্পর্কিত নীতিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে এইটুকুই প্রয়োজন। প্রত্যুত, ভারত সরকার যদি এক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে বিশ্ব-জগতে শান্তির প্রতিবেশ সৃষ্টির দিকে তাঁহারা যেভাবে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে এবং শান্তি ও মানবতার দিক হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মহিমা অনেকখানি ক্ষুন্ন হইবে। অধিকন্তু গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের পথেও ভারত সরকারের সেইরূপ নীতি আন্তর্জাতিক হিসাবে সহায়কও হইবে না। বস্তুত, ভারত সরকার যদি গোয়ার সত্যাগ্রহ করিবার পথ ভারতবাসীর পক্ষে উন্মুক্ত করেন এবং কংগ্রেস এই সংগ্রামে অগ্রণী হয়, তাহা হইলে

াায়া হইতে পর্তুগীজ প্রভুত্বের অবসানে ।লম্ব ঘটিবে না। ভারত সরকার গোয়া বেশে সকল বাধা তুলিয়া লউন আমরা হাই চাই এবং কংগ্রেস এবং অন্যান্য াজনীতিক দলগুলি মিলিতভাবে এই ংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে, বর্তমানে হাই আবশ্যক।

ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরী

লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরী থানান্তরিতকরণের সম্বন্ধে কিছুদিন ূর্বে ভারত এবং পাকিস্থানের শিক্ষা-ন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কন্তু ভারত পাকিস্থান সম্পর্কিত ন্যান্য বিষয়ের মত এই বিষয়টিও । পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। ্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত ইবার পর এই লাইব্রেরীর স্বত্ব-স্বামিত্ব য ভারত ও পাকিস্থানের উপর বর্তিয়াছে, ় বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু াইব্রেরীটি কোথায়, অর্থাৎ ভারতে না াকিস্থানে স্থানান্তরিত করা সমীচীন, ইবে, গোল দেখা দিয়াছে এই প্রশ্নে। ংলণ্ডের প্রাচ্য বিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থি-সমাজ লাইব্রেরীটি াহাতে স্থানান্তরিত করা না হয় এজন্যও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদের এজন্য আগ্রহের যৌক্তিকতা আমরাও উপলব্ধি করি। জ্ঞানের ক্ষেত্র সার্বভৌম এবং এদেশের সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও রহিয়াছে। তথাপি লাইব্রেরী মূলত ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং এদেশের দাবীই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে রহিয়াছে। আলোচনাসূত্রে এই তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্থান কোনক্রমেই লাইব্রেরীটি ভারতে স্থানান্তরিত করা হয়, ইহা চাহে না; সে বরং লাইব্রেরীর পুঁথি, কেতাবগুলি ভাগাভাগি করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। উত্তর ভারতের কোন স্থানে লাইব্রেরীটি স্থানান্তরিত করিয়া ভারত এবং পাকিস্থানের পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ সমভাবে যাহাতে লাইব্রেরীটির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতাসূত্রে এমন ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু পাকিস্থান তাহাতে রাজী হয় নাই। শেষটা ভারতের শিক্ষামন্ত্রী লাইব্রেরীর পুঁথি, কেতাব ভাগাভাগি করিয়া লইবার প্রস্তাবই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। করাচীতে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভাগাভাগির এই ব্যাপারে পুঁথি, কেতাবগুলি কোন রাষ্ট্রের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়, এদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। বলা বাহুল্য, এমন ব্যবস্থার ফলে মূল্যবান্ পুঁথি এবং পুস্তকের সংগ্রহ হিসাবে সমগ্রভাবে লাইব্রেরীটির যে মূল্য এতদিন ছিল, তাহা আর থাকিবে না এবং প্রকৃত প্রস্তাবে লাইব্রেরীটি নষ্ট হইয়াই যাইবে; কিন্তু উপায়ান্তর কোথায়? জ্ঞান অভেদ-দর্শনকে উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মান অন্যরূপ।

শিক্ষকদের দাবী

সম্প্রতি পুরীতে নিখিল ভারত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সেই সঙ্গে শিক্ষাব্রতীদের প্রাচীন আদর্শের মূল্যবত্তা সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে উদরান্নের জন্য ব্যাকুল শিক্ষা-ব্রতীদিগকে প্রাচীন আদর্শের কথা শুনানো আমরা বৃথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সামাজিক প্রতিবেশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কোন আদর্শই বাস্তবে পরিণত হইতে পারে না। বর্তমান জীবনের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সঙ্ঘাতের আবর্তের মধ্যে এদেশের শিক্ষকেরা মুনিঋষির প্রশান্তি অন্তরে লইয়া বিদ্যা-দানে ব্রতী থাকিবেন, এমন কথায় অনেক-খানি আত্মবঞ্চনা রহিয়াছে, সহজেই বোঝা যায়। সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে অধ্যাপক কবীর এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের অধ্যাপক কবীর এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের মানমর্যাদার প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে শিক্ষকদের মানমর্যাদা দেওয়া উচিত; অর্থাৎ মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে রাজভবনে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আদর-আপ্যায়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ আদর-আপ্যায়নের মূল্যই বা কি আছে? প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকেরা যদি উদরান্নের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন, তবেই সমাজ-জীবনে তাঁহাদের স্থায়ী মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। শাসন-বিভাগের পদস্থ ব্যক্তিদের পিঠ-চাপড়ানিতে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সে সমস্যা মিটিবে না এবং পেটের দায়ে পড়িয়া আদর্শকে ক্ষুণ্ণও করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীবি জে খেরের উক্তি আমরা সমধিক যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করি। তাঁহার মত এই যে, বড় বড় দালান-কোঠা, বৃহৎ পরিসর রাজপথ, সুবিপুল বাঁধ এবং সুদৃঢ় সেতুপথ নির্মাণের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন অনেক বেশী এবং সেই দিকে সরকারের সর্বপ্রথমে দৃষ্টি দেওয়া উচিত; কারণ জাতির পক্ষে প্রয়োজন মানুষের। কর্মিষ্ঠ, চরিত্রবান্ কর্মী, মানুষ আজ চাই এবং শিক্ষার প্রসারের সাহায্যেই এমন মানুষ সৃষ্টির প্রতিবেশ গঠন করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে যে দেশের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী এখনও নিরক্ষর, সেখানে সমাজ উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইতে পারে না।

বারাসত-বসিরহাট রেলপথ

বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে কোম্পানীর কার্য পরিচালনার জন্য ১৯৫১ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক যে ম্যানেজমেণ্ট বোর্ড নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাইয়াছেন যে, কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার জন্য ১লা জুলাই হইতে এই রেলপথটি তাঁহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ভারতের সীমান্ত রক্ষার এবং কলিকাতা শহরের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে এই রেলপথটির গুরুত্ব কর্তৃপক্ষকে উপলব্ধি করাইবার জন্য কয়েক বৎসর হইতে ক্রমাগত চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া লাইনটি এইভাবে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে, জনসাধারণের পক্ষে ইহা নিতান্তই দুঃসংবাদ। লাইনটির উপযোগিতার বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া মাত্র ৫০ মাইল দীর্ঘ এই রেলপথটি চালু রাখিবার সামর্থ সরকারের মনে থাকা উচিত ছিল।

ইন্দোনেশীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রায় প্রকাশিত হয়েছে—'কাশ্মীর প্রিন্সেস'এর বিনাশ গুপ্ত-ধ্বংসকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনালের বিমান ছিল। বিমানখানি পিকিং সরকার কর্তৃক চার্টারকৃত হয়ে গত এপ্রিল মাসে চীনা সাংবাদিক ও কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে বহন করে বান্ডুং যাচ্ছিল। পথে তেল নেওয়া ইত্যাদির জন্য হংকং-এ থামে। হংকং ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পরে চীন সাগরের উপর উড়ন্ত অবস্থায় 'কাশ্মীর প্রিন্সেস'এ আগুন ধরে যায় এবং বিমানখানি জলে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিমানের চালক ও কর্মচারীদের মধ্যে তিনজনের কোনো গতিকে প্রাণ রক্ষা হয়, বাকী সকলে এবং সমস্ত চীনা যাত্রী মারা যান। বিমানখানি যেখানে পড়ে, সেটা ইন্দোনেশিয়ার এলাকার মধ্যে। সেইজন্য ইন্দোনেশীয় গভর্নমেণ্ট তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেন। তদন্তের ফলে দেখা গেছে যে, বিমানটিতে টাইম-বোমা ধরনের একটা জিনিস রাখা হয়েছিল, যার বিস্ফোরণের ফলে বিমানে আগুন লাগে। বিমানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সেই মারাত্মক শয়তানী কলের অংশও পাওয়া গেছে।

যাঁদের প্রাণ রক্ষা হয়েছে, তাঁরা দুর্ঘটনার পরে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা থেকে তখনই ধারণা হয়েছিল যে, এই বীভৎস কাণ্ডের পিছনে গুপ্তধ্বংসকের হাত আছে। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই চীনা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই অভিযোগ করেন। তাঁরা বলেন যে, হংকংএ যখন বিমানখানি অপেক্ষা করছিল, তখনই তার মধ্যে টাইম-বোমা ঢুকানো হয় এবং হংকং-এর কর্তৃপক্ষের অসাবধানতা ও গাফিলতির জন্যই সেটা সম্ভব হয়; কারণ চীনা কর্তৃপক্ষ হংকং-এর কর্তৃপক্ষকে আগে থাকতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, হংকং-এ কুওমিণ্টাং-এর লোকেরা কিছু করতে পারে। এর উত্তরে হংকং-এর কর্তৃপক্ষ বলেন যে, পিকিং কর্তৃপক্ষ যে সতর্কবাণী পাঠান, তাতে গুপ্ত ধ্বংসাত্মক কার্যের সম্ভাবনার কোনো আভাস ছিল না, বান্ডুং যাত্রী চীনাদের জ্বালাতন করার জন্য কুওমিণ্টাংএর লোকেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারে—চীনা হুঁশিয়ারীর এই অর্থ তাঁরা করেছেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

যাই হোক, গুপ্তধ্বংসকের কার্যের ফলেই যে বিমানখানির বিনাশ ঘটেছে এবং অতগুলি মানুষের প্রাণ গেছে, সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং বিমানখানির হংকং-এ অবস্থান কালেই যে টাইম-বোমা তার ভিতরে রাখা হয়, তাও একরূপ নিশ্চিত। একথা হংকংএর কর্তৃপক্ষও এখন স্বীকার করছেন। সম্প্রতি পিকিং সরকারের অভিযোগের পর খোঁজখবর করতে গিয়ে নিজেরাই তাঁরা এটা বুঝতে পারেন। শুনা যাচ্ছে, হংকংএর কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য দু-একজনকে আটকও করেছেন। এ গুজবও শুনা গিয়েছিল যে, এই নারকীয় কাণ্ডের জন্য যারা দায়ী, তারা হংকং থেকে ফরমোজায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

এ অবস্থায় অপরাধীদের ধরা ও তাদের শাস্তিবিধান করা সহজ ব্যাপার হবে না, তবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করছেন না, তার প্রমাণ দেবার জন্য তাঁরা খুবই চেষ্টা করছেন এবং করবেন। কারণ এই সম্পর্কে চীনারা যা বলছে, তাতে হংকং-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইংরেজের উদ্বেগ না বেড়ে পারে না। হংকং, মার্কিন ও কুওমিণ্টাং-এর চর ও ষড়যন্ত্রকারীদের আড্ডা হয়েছে এবং হংকং-এর কর্তৃপক্ষ তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন চীনাদের এই অভিযোগের তাৎপর্য বৃটিশদের পক্ষে ভালো নয়। এই অভিযোগের অর্থ—হংকং বৃটিশের হাতে থাকা চীনের নিরাপত্তার দিক থেকে বিপজ্জনক। এই ধারার কথার সুর কতটা চড়ে, সেটা লক্ষ্য করার বিষয়।

আপাত যে দুটো বড়ো প্রশ্ন উপস্থিত, সেগুলো হচ্ছে (১) 'কাশ্মীর প্রিন্সেস'এর ধ্বংসকারীদের ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হবে কি না এবং (২) বিমান ও তার সঙ্গে যে প্রাণগুলি গেল, তার জন্য ক্ষতিপূরণ কে দেবে? গুপ্তধ্বংসকগণ ফরমোজায় গিয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকলে তাদের ধরার যদি আদৌ কোনো সম্ভাবনা থাকে, তবে তা মার্কিন সরকারের উপর নির্ভর করছে, কারণ মার্কিন সরকার জোর চাপ না দিলে ফরমোজা সরকারের আশ্রয় থেকে অপরাধীদের টেনে বার করা অসম্ভব। মার্কিন সরকারের চাপেও যে চট করে কাজ হবে, তাও নয়, কারণ চিয়াং-

গভর্নমেণ্টকে বাগ মানানো যত সহজ বলে অনেকে মনে করে, ততো সহজ নয়। তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বড়ো বেকায়দায় পড়েছেন। নিজেদের বাঁচাবার জন্য মার্কিন গভর্নমেণ্টকে দিয়ে কিছু করাবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। হংকং-এর কর্তৃপক্ষের দিক থেকে অসাবধানতা এবং গাফিলতি কিছু ছিল কি না, তার নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। হংকং কর্তৃপক্ষ প্রথমে যে সুরে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন, সে সুর এখন অনেকটা নেমেছে বলে মনে হয়। যদি তাতে করে ঝামেলা কমার আশা থাকে, তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট হয়ত নিজেদের দোষ স্বীকার না করেও শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করতে পারেন। ভারত ও চীন সরকার কাউকেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখন চটাতে ইচ্ছুক হবেন না।

অপর পক্ষ চীন সরকারও এক উদ্দেশ্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সংগে এখন একটু নরম ব্যবহার করতে পারেন। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতি (মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রতি ব্যবহারের তুলনায়) কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব দেখানো, যাতে চীন সম্পর্কে মার্কিন ও বৃটিশের মধ্যে মত ও ভাবের পার্থক্যটা আর একটু বাড়ে।

সম্প্রতি চীনা সরকার চারজন মার্কিন ফৌজী বৈমানিক বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছেন। ওরা কোরিয়া যুদ্ধের সময়কার বন্দী, কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধের বন্দী বিনিময়ের সময়ে এদের ছাড়া হয় না, কারণ চীন সরকার এদের কোরিয়া যুদ্ধের বন্দী বলে গণ্য করেন নি। ছাড়ার অব্যবহিত পূর্বে সামরিক ট্রাইব্যুনালের সামনে এদের বিচারে হয় এই অভিযোগে যে, এরা গোলমাল বাধানো এবং চীনের নিরাপত্তা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এদের বিমান চীনের আকাশে অনধিকার প্রবেশ করে। ট্রাইব্যুনাল এদের দোষী সাব্যস্ত করে চীন থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দেন—তার মানে মুক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ মেননের চীনে অবস্থিতিকালে এই বিচার হয় এবং শ্রী মেননই নূতন দিল্লীতে গত সোমবার একটি প্রেস কনফারেন্সে উপরোক্ত চারজন মার্কিন বৈমানিকের মুক্তির সংবাদ প্রথম পৃথিবীকে দেন। চীনা সরকার শ্রী মেননকে এই সংবাদ প্রথম পরিবেশন করতে দিয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতি খাতির দেখালেন এবং বোধহয় পৃথিবীতে এই অনুমান করার সুযোগ দিলেন যে, চীনের এই কাজের পিছনে ভারত গভর্নমেণ্টের অনুরোধের শক্তি সক্রিয় ছিল।

এই চারজন মার্কিন বৈমানিকের মুক্তিদানকে চীনের দিক থেকে সদিচ্ছার ইঙ্গিত হিসাবে অভিনন্দিত করার জন্য পশ্চিমা শক্তিদের, বিশেষ করে মার্কিন গভর্নমেণ্টকে সকলে বলছে। তবে যে এগারোজন মার্কিন বৈমানিকের বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি হৈচৈ হয়েছে তাদের সংগে, কিন্তু এই চারজনের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই এগারোজনকে চর বলে বিচার করা হয় এবং তাদের প্রতি বিভিন্ন সময়ের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এদের সম্পর্কে চীনা সরকার আগে কিছু বলছেন না। যাই হোক, যে চারজনকে মুক্তিদান করা হয়েছে, তাদের ফিরে পেয়েও মার্কিনের আনন্দ হওয়া উচিত। মার্কিন সরকার যদি এর জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন, তবে বাকী যারা আছে, তাদের মুক্তির পথও অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে।

তিব্বতকে 'মুক্ত' করার সময়ে চীনা কর্তৃপক্ষ লামা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন বৃটিশ বেতারযন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেন এবং এতদিন চর বলে তাঁকে ধরে রেখেছিলেন, সম্প্রতি তাঁকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সবের প্রতিক্রিয়া বিশ্বশান্তির পক্ষে ভালো হবে বলে নিরপেক্ষ দেশগুলি আশা করে।

* * *

বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি জয়ী হয়েছে। নূতন হাউস অব কমন্সে কনজারভেটিভ পার্টির সংখ্যাধিক্যের পরিমাণ প্রায় ষাট। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই বৃটেনে রেল ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ডক শ্রমিকদের একাংশের ধর্মঘট আগে থেকেই চলছিল। তার উপর দেশব্যাপী রেল ধর্মঘট। এই গুরুতর পরিস্থিতিকে আয়ত্তাধীন রাখার জন্য রাণী কর্তৃক জরুরী অবস্থা 'এমার্জেন্সী' ঘোষিত হয়েছে যাতে গভর্নমেণ্ট কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা হাতে নিতে পারেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশনের দিন ৯ই জুন করা হয়েছে, কারণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পার্লামেণ্ট কর্তৃক এমারজেন্সী ঘোষণা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

কিছুদিন আগে থেকেই পর্যবেক্ষকদের এই ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি জিতবে। লেবার পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুণ কনজারভেটিভদের কিছুটা সুবিধা হয়েছে। নির্বাচন কেন্দ্রসমূহের সীমানা পুনর্নির্ধারণের ফলও কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে। এমনিতেই সমসংখ্যক আসন লাভ করতে হলে কনজারভেটিভদের চেয়ে লেবার পার্টির বেশি ভোট পাওয়ার প্রয়োজন হত, কারণ লেবার পার্টির সমর্থকগণের সমাবেশ কলকারখানাযুক্ত শহরগুলিতেই বেশি। অপর পক্ষে কনজারভেটিভ পার্টির সমর্থকগণ পল্লী অঞ্চলে ছড়ানো। যদি খুব বেশি লোক ভোট দিতে আসে, তবে তাতে লেবার পার্টির কিছু সুবিধা হয়। এবারকার নির্বাচনে গতবারের তুলনায় অনেক কম লোক ভোট দিয়েছে—গতবারের তুলনায় এবার প্রায় দশ ভাগের একভাগ কম ভোট পড়েছে। জনসাধারণের মধ্যে ইলেকশনের উত্তেজনা বিশেষ কিছু ছিল না।

১।৬।৫৫

জিম করবেট

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

সম্প্রতি আফ্রিকায় মৃত্যু হয়েছে জিম করবেটের। তাঁর মৃত্যুতে পাঠকসমাজ হারাল রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনীর সার্থক লেখককে। শিকার-কাহিনী বহু লেখা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি হবে। অতএব জিম করবেটের উত্তরাধিকারীর সেখানে অভাব হয়তো হবে না। কিন্তু সেখানেই জিম করবেটের একমাত্র পরিচয় নয়। অন্যত্র তাঁর মৃত্যুতে সুগভীর শোক সঞ্চারিত।

হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত অঞ্চল গাড়োয়াল কুমায়ুন। হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্যভূমি। অরণ্যচারী জীবজন্তু। বনপ্রকৃতি আর সাধারণ মানুষের বন্ধু ছিলেন জিম করবেট। সেখানে তাঁর স্থান কোনদিন পূর্ণ হবে না।

জিম করবেট জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে, নৈনিতাল ও কুমায়ুনের অন্যান্য জায়গায় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছে। চাকরি করেছিলেন তিনি মোকামাঘাট স্টেশনে একুশ বছর ধ'রে। ১৯৪৭ সালের পর ভারত ত্যাগ করে পূর্ব আফ্রিকায় চলে যান তিনি।

ভারতীয় অরণ্যজগৎ সম্পর্কে জিম করবেটের ভূমিকার তাৎপর্য বুঝতে হয়তো এখনো দেরি আছে। আজও ভারতীয় মানস অরণ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়।

অরণ্য এবং তার পশু-পক্ষীকে দ্রুত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে আন্দোলন আজকে চলেছে, মুষ্টিমেয় ভারতীয় মনে অরণ্যচারী জীবজন্তু সম্পর্কে যে দায়িত্ববোধ গড়ে উঠেছে, তার পেছনে এই মানুষটির কিছু কথা ছিল।

পৃথিবীতে ভারতবর্ষ অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকার পরেই। অপর কোন দ্বিতীয় একটি দেশে এত রকম গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপ নেই। অথচ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অরণ্য সম্পর্কে যে নির্মম ঔদাসীন্য এবং অজ্ঞতা আছে, তার তুলনা অন্য দেশে মিলবে না। আমাদের দেশে শিকার এতদিন একচেটিয়া ছিল রাজা-মহারাজা, ধনী-জমিদার ও সরকারী উজির-নাজির-দের। শিকার যে প্রথম শ্রেণীর একটি ক্রীড়া, সেকথা বিস্মৃত হয়ে যেতে হয়, ভারতবর্ষের শিকারীদের অনেক ইতিবৃত্ত জানলে। বিজ্ঞানের নতুন সব আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে নির্মমভাবে প্রাণী-জগৎকে সন্ত্রস্ত, পঙ্গু, আহত এবং উচ্ছেদ করার অপর একটি নাম হচ্ছে এদেশে শিকার। আসলে আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা আশ্চর্য। মানুষের বহু আগে সৃষ্ট হয়েছিল জীবজগৎ। যে প্রকৃতির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হচ্ছে এই বিশাল পৃথিবী, তার পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি ও অরণ্য নিয়ে—সেই প্রকৃতিই নিয়ন্ত্রিত করে জীবজগৎ। মাংসাশী জীবজন্তু ক্ষুধার সময়ে অন্য জীবজন্তুকে হত্যা করে সত্য; কিন্তু বিনাপ্রয়োজনে হত্যা সেখানে অপ্রচলিত। খাদ্য ও খাদক, অন্য সময়ে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে একই অরণ্যে। জলপান করে একই নদীতে।

জীবজগতের ভারসাম্য বিধ্বস্ত করে সেখানে শিকার খেলা চলে। জঙ্গলের চারিপাশে আগুন লাগিয়ে বা শব্দ করে, জীবজন্তুকে তাড়িয়ে বের করে হাতীর পিঠের নিরাপদ দূরত্বে থেকে নির্বিচারে তাদের হত্যা করে নাম কিনে গেছেন বহুজন। যে কোন সচেতন মনেই সেই খ্যাতি অপ্রয়োজনীয় বোধ হবে।

মার্শ ডিয়ার, যার প্রত্যেকটির ওজন পাঁচ ছয় মণ করে এবং মাংসাহারের প্রয়োজন যার একটিতেই নিবৃত্ত হতে পারতো, তা-ই একদিনে তিনশো মেরেছি, হাতীর পিঠে থেকে বসে গর্ব করতে শুনেছি জনৈক ভারতবিখ্যাত শিকারীকে। পরস্পর মিলনের মৌসুম অতিক্রান্ত হলে গর্ভিণী বাঘিনী ও সদ্যোজাত শার্দুল-শাবক সহ তার মাতাকে হত্যা করে উপরওলাকে ভেট দিয়েছেন অপর একজন। এ প্রসঙ্গে এত কথাই বলা চলে, যে সব বলা অবান্তর। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে অসংখ্য সিংহ পাওয়া যেতো, বর্তমানে যা দুর্লভ। বরোদার অন্তর্গত রাজ্যের সুবিখ্যাত স্বর্ণঈগল আজ গল্পকথা। তৃষ্ণার সময়ে যখন এই নির্ভীক পাখি জল খেতে নামতো, তখন তাদের হত্যাকরা হয়েছে নির্বিচারে। আজও শিকারীরা সগর্বে বলে থাকেন, অরণ্যচারী জীবজন্তুর জলপান করবার বিশেষ

গাড়োয়ালের হিংস্র নরখাদক শিকারের পশ্চাতে দণ্ডায়মান শিকারী করবেট্

ঘাটিতে মাচা বেঁধে বসে তাঁরা কিভাবে শিকার করেছেন। হরিণ মারবার জন্য রাঁচি হাজারিবাগ অঞ্চলে স্টেনগান অবধি ব্যবহার করা হয়েছে।

আজ থেকে বিংশতি বছর আগে, জিম-করবেট, প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে, অপরাপর সমভাবে ভাবিত ব্যক্তিদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ থেকে, "Indian Wild Life" নামে একটি পত্রিকা চালু করেছিলেন। ভারতবর্ষের অরণ্য সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর ভালবাসা থেকে, অরণ্য জগৎকে বাঁচাবার জন্য তাঁর সেই আন্দোলন আজ স্মরণ করা প্রয়োজন।

জিম করবেটের জীবনের প্রিয়তম দিন-গুলি অতিবাহিত হয়েছে হিমালয়ের বুকে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে। তিনি সেদিনকার শাসকশ্রেণীর জাতের মানুষ। কিন্তু আশৈশব, তাঁর পরিচিত ভারতবর্ষকে ভালবেসে, ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরে তিনি এত সহজে আপন স্থান করে নিয়েছিলেন, সে শুধু তাঁর স্বভাবের প্রসাদগুণে। এই আশ্চর্য মানুষটির জীবনের প্রধান সুর হচ্ছে, অসাধারণ মানবিকতা। একান্ত মানবীয় আবেদন তাঁর রচনাবলীর মূল সুর।

হিমালয়ের বুকের দুর্গম সেই সব অঞ্চল একদা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল নরখাদক বাঘের অত্যাচারে। শহরে বসে বাঘের গল্প শোনা বা পড়া, একান্তভাবেই অবসর বিনোদনের জন্য। দুর্গম সেই সব গ্রামাঞ্চলে, যেখানে নিকটতম হাটবাজার, জঙ্গলের রাস্তায় দশ মাইলের কম নয়, যেখানে শহরের সুখসুবিধে অবিশ্বাস্য, সেই সব জায়গায় নির্ভীক গ্রামবাসীদের আতঙ্কিত করে, নরখাদক বাঘ তার জমানা বসাত জোর করে। বাঘ, সেই সব অঞ্চলে তার রাজত্ব কায়েম করতে, আর ক্ষেতে, হাটে, বাজারে, গ্রামে, সর্বত্র মানুষ আতঙ্কের সঙ্গে অপেক্ষা করতো, কখন সে তার কর গ্রহণ করতে আসবে। কিছু মানুষ নিহত হলে খবর পৌঁছত সরকারী দফ্তরে। সরকার থেকে শিকারীদের আহ্বান করা হত। জিম করবেট দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে মোকামাঘাটে চাকরির অবকাশে বার বার গিয়েছেন সেই সব অঞ্চলে, সরকারের আহ্বানে এবং তাঁর প্রিয় গাড়োয়াল ও কুমায়ুনকে সেই অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যে। তাঁর শিকারজীবনের সমস্ত প্রধান কাহিনীগুলি,

"Man Eaters of Kumaon", "Man Eating Leopard of Rudua Prayag, "Temple Tiger".

এই তিনখানি বইয়ের মারফতে ভারতীয় পাঠকের কাছে নিজেকে সুপরিচিত করে-ছেন তিনি। কিন্তু তাঁর শিকার কাহিনী শুধু তো শিকারের রোমহর্ষক বিবরণ নয়। ভারতীয় অরণ্যজগতের মুকুটহীন সম্রাট বাঘের চারিত্রিক বিবিধ বৈশিষ্ট্য তাতে ফুটে উঠেছে। মানুষ অবহেলার সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে গুলি করে আহত করেছে বাঘকে, আর সেই আহত বাঘ সবচেয়ে সহজবধ্য বলে মানুষকে বধ করতে শুরু করেছে। নরখাদক বাঘ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অতি সহজ ও মর্মস্পর্শী করে বলেছেন তিনি 'রুদ্রপ্রয়াগের নরখাদক চিতা' বইখানিতে। এই বইখানির তুল্য রোমাঞ্চপাঠ্য বই ইংরেজী ভাষায় রচিত বিবিধ সাহিত্যের মধ্যেও কমই লেখা হয়েছে। দীর্ঘ আট বছর ধরে একটি চিতাবাঘ রুদ্রপ্রয়াগের পথে কেদারবদরী যাত্রীদের গমনাগমন অসম্ভব করে তুলেছিল। দুর্গম গিরি অঞ্চলে পাঁচশো মাইল ধরে সে বিচরণ করতো। তার আশ্চর্য চাতুরী, মানুষের গতিবিধি সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান, তাকে এতখানি বেপরোয়া করে তুলেছিল যে, সরকার ও শিকারীদের তরফ থেকে তাকে হত্যা করবার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

জিম করবেট দীর্ঘদিন দুঃসাহসিক অভিযান করেছেন পদব্রজে এই চিতাবাঘের পেছনে। অনেক অন্ধকার রাতে, তাঁর পেছনে অনুসরণ করেছে সেই বাঘ। বৃষ্টিতে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে বন্দুক, আর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সাক্ষাৎ মৃত্যু বিচরণ করছে আশেপাশে জেনেও অন্ধকারে, অসহায়ভাবে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর যখন সত্যিই নিহত হ'ল সেই চিতাবাঘ, তখন তাঁর উল্লাসে নৃত্য করা সম্ভব ছিল বা প্রতি-শোধ স্পৃহা চরিতার্থ হ'ল জেনে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তার পরিবর্তে তিনি বললেন—"এ ত' সেই শয়তান নয়, যে রাতের পর রাত আমাকে লক্ষ্য করতে করতে নীরব জিঘাংসায় উল্লাস করেছে এই ভেবে যে, যেদিন আমাকে এতটুকু অসাবধান দেখবে, সেদিনই আমার কণ্ঠে

দাঁত বসিয়ে দেবে সে। আমার সামনে পড়ে আছে একটি বৃক্ষচিতা। ভারতবর্ষের সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং ভয়াবহ জানোয়ার, যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেনি, কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে এইমাত্র, যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে নয়, শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সে নরহত্যা করেছে। এখন সে পরম শান্তিতে শেষ নিদ্রায় অভিভূত।"

সেই অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বাঘের সম্পর্কে তিনি বারংবার বলেছেন—

"Tiger is a large hearted gentleman with boundless courage and that when he is exterminated—as exterminated he will be unless public opinion rallies to his support—India will be the poorer by having lost the finest of the fauna".

এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন, যখন অন্য সুযোগের অভাবে নিদ্রিত অবস্থায় মোহন-নরখাদক বাঘকে তিনি মেরেছিলেন।

জীবজন্তু যে বিনা প্রয়োজনে কখনোই মানুষকে আক্রমণ করে না, তা আমাদের তথাকথিত শিকারীরা জানেন না বটে, কিন্তু অরণ্যের সন্নিকটে যারা বাস করে তারা তা ভালোভাবেই জানে। আমাদের দেশে যত বিষাক্ত সাপ আর বাঘ আজও আছে, তারা যদি অকারণে মানুষকে হত্যা করত, তাহ'লে বৎসরে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হ'ত! জিম করবেট তাঁর স্ব-অভিজ্ঞতা থেকে অরণ্যব্যাপী জীবজন্তুর প্রতি মানুষের সহানুভূতি সৃজন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর একেকটি উক্তি, বিনয়-পূর্ণ হলেও সর্বাংশে সত্য। তিনি বলেছেন—একদা দুটি শিশু, দুর্গম জঙ্গলে সাতাত্তর ঘণ্টা ছিল পথ হারিয়ে। সেই জঙ্গলে বাঘ, চিতা, নেকড়ে, হায়না, অজগর এবং অসংখ্য সাপ ছিল, অন্যান্য জন্তু তো ছিলই! তবু তাদের সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে পাওয়া গিয়েছিল।" দ্বিতীয় মহাসমরের শেষের দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জনৈক নেতা যুদ্ধের নৃশংসতাকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধে শত্রুরা জঙ্গলের নীতি লাগাতে চায়। জঙ্গলের মধ্যে যে নীতি অনুসৃত তা যদি মানুষের মধ্যে থাকত, তাহ'লে কোনোদিনই যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হ'ত না। কেননা, তাহ'লে মানুষ দুর্বলকে ততখানিই ক্ষমা করে চলত, যা অরণ্যচারীরা করে। সেখানে দুর্বল ও সবলের মধ্যে একটি ভারসাম্য সর্বদাই আছে। (my India—p. 77).

ভারতীয় জঙ্গলের পশুপাখি, বিবিধ সংকেত ও অরণ্যের ভাষা জিম করবেট যতটা জানতেন, ততখানির সিকিও ভারতীয় শিকারীরা জানে কিনা সন্দেহ। তাঁর সেই অমূল্য জ্ঞানের নিশানা মিলবে 'Jungle Lore বইখানিতে।

মানুষের প্রতিও সংবেদনশীল তাঁর মন। যে ভারতবর্ষকে তিনি জেনেছিলেন, তাকে তিনি বলেছেন—"my India" তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে সেই ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা ফুটে উঠেছে। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের দরিদ্র জনসাধারণ, গ্রামের শিকারী কুন্‌য়োর সিং, গ্রাম্য বালক শের সিং, মোকামাঘাটের সত্যনিষ্ঠ চামারি পুরুষানুক্রমে ঋণগ্রস্ত বুধু, প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি ভালোবেসেছেন। আর আশ্চর্য সহজ আন্তরিকতায় তাদের কথা বলে গেছেন।

আমরা হয়তো দিবারাত্রি সেই সব মানুষের সঙ্গেই থাকি, অথচ তাদের চিনি না। প্রত্যেকের নিজস্ব একটি মাধ্যম আছে, যা দিয়ে সে পরস্পর ও বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হচ্ছে জিম করবেটের সেই মাধ্যম। তাঁর লেখনীতে তাই আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে চামারি, নীচজাতির যে মানুষটি, স্বভাব গুণে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল। বুধু, যে গরীব চাষীকে তার দারিদ্র্য ও নীচ জাতের সুযোগ নিয়ে গ্রাম্য মহাজন পুরুষানুক্রমে শোষণ করেছিল এবং যাকে ঋণমুক্ত করেছিলেন করবেট। তিনি বলেছেন—কয়লা কাটা কুলী বুধুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।......ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ ঋণ-

...ভারে প্রপীড়িত মানুষের মধ্যে সে একজন মাত্র, কিন্তু তাতে আমার আনন্দ কম হয়নি।" লালাজী, একজন ভাগ্যহত প্রাণিয়া, তার কাহিনীই বা কম কিসে। যে বাঁচতে জানে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সে আনন্দ আহরণ করতে পারে। সেই জানাই মনুষ্যের জীবনের মূল কথা। নানা ভাষায়, কবি ও সাহিত্যিকরা সেই মানুষকেই অভিনন্দিত করেছেন, জীবনের ধন যারা কিছুই ফেলে দেয় না—ধুলোর মধ্যেও যারা পূর্ণের পদস্পর্শ দেখতে পায়। করবেট সেই জাতের মানুষ। তাই তাঁর কলমে আশ্চর্য সরস এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে রুদ্রপ্রয়াগের মেষ-পালক বৃদ্ধ, গোলোক্যাইসের পণ্ডিতজী, কালা-আগর গ্রামের জোয়ান কৃষাণ, যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নরখাদক বাঘকে, ভুটিয়া শিকারী মোতি, পুনোয়া, পুতালী, এইসব সাধারণ মানুষ। নরখাদক বাঘের অত্যাচারে হতবুদ্ধি গ্রামবাসীদের নানাবিধ আচরণ তিনি ক্ষমা করেছেন, তাদের বুঝেছেন। যেখানে এতটুকু আত্মত্যাগী সাহসের নীরব ভূমিকা দেখেছেন, তাকে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। যে দস্যু সুলতানা একদা উত্তর ভারতকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল তার অত্যাচারে, তাকে তিনি বলেছেন, ভাগ্যের হাতে সে সুবিচার পায়নি। জন্ম থেকে অপরাধী আখ্যা না দিলে হয়তো সে কালে অন্য মানুষ হ'তে পারতো। সুলতানার প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা কম নয়।

শাসিত দেশের মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধার জন্য জিম করবেট ভারতীয় পাঠকের কাছে চিরস্মরণীয়। আমাদের দেশে, ভারতীয়দের সমান আত্মত্যাগ ও সাহসের সাহায্যে ইংরাজ অজস্র সাফল্য অর্জন করেছে—কিন্তু সময়ে তাকে স্বীকার করেনি। জিম করবেট তার বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম।

এই মানুষটির কথা একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করবার ইচ্ছা ঔদ্ধত্য মাত্র। কাজেই একে আমি বলব শ্রদ্ধাঞ্জলি। শ্রদ্ধাঞ্জলি সেই মানুষটির প্রতি, যার নাম কুমায়ুন ও গাড়োলায়ের ঘরে ঘরে আজও আপন-জনের মত প্রিয়। সেই মানুষটির প্রতি, যাকে অশিক্ষিত, সংস্কারগ্রস্ত পাহাড়ী ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েরা এতখানি আপনজন মনে করতেন যে, বিধর্মী করবেটের উচ্ছিষ্ট বাসন তাঁরা নিজে ধুতেন, প্রয়োজনকালে। শ্রদ্ধা জানাব সেই মানুষটির প্রতি, যিনি ভারতের অরণ্য এবং অরণ্যজগতের অকৃত্রিম সুহৃদ এবং দরদী বন্ধু ছিলেন। ভারতের যে মানুষ-দের তিনি জানতেন, তাদের ভালোবেসে-ছিলেন প্রাণ দিয়ে।

তাঁর লেখনীতে আমরা জেনেছিলাম, কুমায়ুনের আশ্চর্য অরণ্য সম্পদের কথা!

পাওয়ালগড়ের ব্যাঘ্ররাজের মহিম গতি-ভঙ্গিমার কথা। পাখি, হরিণ, বানর, গাছপালা, ঘাসের থরো থরো কাঁপা ডগা আর ধুলোতে সাপের শরীরের ছাপে অরণ্যের কী ভাষা লেখা আছে তার আশ্চর্য রহস্য জেনেছিলাম। নগাধিরাজ হিমালয়ের বুকের গরীব চাষী, পাহাড়ী মানুষের দুঃখ দুর্দশা এবং আত্মমর্যাদায় সমুন্নত শির জীবন সংগ্রামের কথা।

তাদের হয়ে কথা বলতে আর কেউ রইল না। এখন থেকে তাদের সংগ্রাম চলবে একা একা। কোন দরদী হৃদয় পাগলা মানুষ বনে বনে অনাহারে ঘুরে তাদের বিপদ নিরসন করবে না, জীবনের সঞ্চয় শূন্য করে অপরিচিত ব্যবসায়ীকে সাহায্য করবে না, একটি পুরুষানুক্রমে ঋণগ্রস্ত কুলীর জন্য মহাজনের সঙ্গে লড়বে না, নিজের গৃহের অবারিত দ্বার রোগে শোকে বিপদে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করবে না।

ভারতীয় হয়েও আমরা ভারতীয়দের সব সময় চিনি না। সুদূর পাহাড়ের গ্রামাঞ্চলের কোন মানুষ আহত বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য অসাধ্যসাধন করেছিল, কোন পিতা পুত্রের সন্ধানে নরখাদক ব্যাঘ্রের উপস্থিতি উপেক্ষা করে বনে-জঙ্গলে ফিরেছিল, কোন মেয়ে বড় বোনকে বাঁচাবার জন্য বাঘের সঙ্গে লড়েছিল, কোথায় এতটুকু সাহস, ক্ষমা, ত্যাগ আর ধৈর্য দেখা গেছে, তাদের কথা সংগ্রহ করে কেউ লিখবে না। জিম করবেটের মতন করে কোন্‌জন ভারতীয়দের চিনতে সাহায্য করবেন?

আজ থেকে অরণ্য আমাদের চোখে শুধু গাছপালার সমষ্টি আর সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র, জীবজন্তু শুধু বোধশক্তিহীন স্থূল কতকগুলি বৃত্তি সম্বলিত প্রাণী। মৌন অথচ জীবন্ত অরণ্যজগতের হয়ে কথা বলবে না কোনো বিদেশী বন্ধু। কুমায়ুনে কালাধুঙ্গীর আশে পাশে জঙ্গলে আজও রৌদ্র পড়ে এলে বিকালের আলোকে ঝল্‌সিয়ে আকাশে উঠবে বুনো ময়ূর, চিতাবাঘ আশ্চর্য গতিছন্দে লাফিয়ে পেরিয়ে যাবে পথ, বাঘ কখনো কখনো কান খাড়া করে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, তারপর গর্জন করে চলে যাবে গিরি-গুহায়। চিরতুষারময় পর্বতের কোলের জলাশয়ে বিচরণ করবে মাছ, গাছে পাখি ডাকবে, আর বসন্তে বনপ্রকৃতি নতুন করে সাজবে পুষ্পে পত্রে। তাদের সে সব কথা মণির মত সংগ্রহ করে কেউ আর লিখবে না। কুমায়ুনের বন্ধু আজ মৃত।

যদি কোন উৎসুক তীর্থযাত্রী, মহা-প্রস্থানের পথে একবার দাঁড়িয়ে রুদ্রপ্রয়াগে বা অন্য কোথাও তাঁর নাম বলেন, সেখানে মানুষ সাগ্রহে দেখাবে রুদ্রপ্রয়াগের শয়তান চিতার মৃত্যুর জায়গা, বলবে করবেটের সম্বন্ধে অনেক অনেক গল্প। সেই সব মানুষের মধ্যে ভারতবন্ধু জিম করবেট বেঁচে রইলেন, যাদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন "my India"র উৎসর্গপত্রে,

> "যদি তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস চাও, বা ব্রিটিশরাজের উত্থান পতনের ইতিহাস চাও......এখানে তা মিলবে না। যদিও আমি এখানে আজীবন কাটিয়েছি, নিরপেক্ষভাবে ঘটনা বিবৃত করবার মতো পরিপ্রেক্ষিত পাবার পক্ষে, ঘটনা-গুলির বড়োই নিকটে ছিলাম। মানুষ-গুলির সঙ্গে বড়োই জড়িয়েছিলাম।
>
> আমার ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষকে আমি জানি। সেখানে চল্লিশ কোটি মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই সরল, সৎ, সাহসী, বিশ্বস্ত এবং কঠোর পরিশ্রমী। ভগবান ও শাসক সরকারের প্রতি তাদের একমাত্র দৈনন্দিন প্রার্থনা হচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির ততটুকু নিরাপত্তার জন্য, যাতে করে তারা তাদের পরিশ্রমের ফলভোগ করতে পারে। এইসব মানুষে অনস্বীকার্য ভাবে দরিদ্র। এদের বলা হয় ভারতবর্ষের বুভুক্ষু জনসাধারণ। এদের মধ্যে আমার জীবন কেটেছে, এদের আমি ভালবাসি। তাদের কথা আমি এই বইয়ে বললাম, আর তাদেরই হাতে তুলে দিলাম এই বই। আমার সেইসব বন্ধু, সেই দরিদ্র ভারতীয়দের হাতে।"

এই ভালোবাসার জন্য জিম করবেট ভারতীয় মনে বেঁচে থাকবেন।

উত্তমপুরুষ

সেদিন এক সভায় কোন ভদ্রলোক 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ধারার' উপর একটি প্রবন্ধ পড়লেন। ইনি অবাঙালী, নিজে সুলেখক, তদুপরি উত্তরাপথের সর্বসাহিত্যপারঙ্গম। বিন্ধ্যের অধস্তন অঞ্চলের সাহিত্যেরও যথেষ্ট খবর রাখেন। রচনাটির ভাষা ইংরেজি, শ্রোতারা পঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল-বঙ্গ অবধি সব প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রবন্ধটি আকারে বড়ো, তবে বিপুল বিষয়ের পক্ষে বেমাপ নয়। লেখকের অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, সমদৃষ্টি ও সহৃদয়তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেল।

আলোচিত প্রসঙ্গের কিছু কিছু সুবিদিত, পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। আবার অনেক নতুন কথাও ছিল। আমরা বঙ্গদেশকেই উনিশ শতকের রেনেসাঁর একমাত্র লীলাভূমি বলে মনে করি; সে যুগে অন্যত্রও সাহিত্য এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল, তার খবর রাখতে চাই না। এই দৈবপ অনুদারতা আজ বুমেরাংয়ের মত ফিরে আমাদেরই আঘাত করেছে। প্রবন্ধলেখক নানা প্রদেশের সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে বিবিধ সংবাদ শোনালেন।

পরিসরের অভাবে, হয়ত অনবধানতাবশতও রচনাটিতে গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। ভারতীয় রেনেসাঁর আলোচনায় রামমোহনের নাম নেই। বঙ্কিমের নাম বারকতক শুনলুম বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথা লেখক বোধ হয় একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন। পশ্চিমের ভাব ও শৈলী যাঁরা আমদানী করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাইকেলের নাম অবশ্য-উল্লেখ্য ছিল। আবার, ইংরেজ আমলে জ্ঞানচর্চার সংস্থার মধ্যে যদিও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম একবার নাগরী প্রচারিণী সভা প্রভৃতির সঙ্গে শোনা গেল, কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির নাম তাঁর জানা আছে কিনা, লেখক সেটা আমাদের জানতে দিলেন না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ বা বঙ্গদর্শন নব্যভারত ইত্যাদির মারফৎ যে কাজ হয়েছিল, তার স্বীকৃতি শোনার আশা এর পরে দুরাশা হ'ত।

আলোচনা থেকে শিশুসাহিত্য একেবারে বাদ গেছে। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের নাম শুনিনি বলে আক্ষেপ নেই। কিন্তু দেশপ্রেমের কবির তালিকায় রঙ্গলাল বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুপস্থিতি বেদনাদায়ক। লেখকের একটি মন্তব্যেও অনেকের আপত্তি হয়েছিল। এই আপত্তি, আমার মতে অযৌক্তিক। লেখক বলেছিলেন স্বদেশী আমলের কবিতা মূলত প্রাদেশিক ভাবধারাতে পুষ্ট। নমুনা হিসাবে তিনি নানা ভাষার কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করলেন। নানা অঞ্চলের কবি দেশমাতৃকার রূপধ্যান করতে বসে আপন প্রদেশের ছবিই দেখেছেন, এঁকেছেনও তাই। ব্যতিক্রম মাত্র দুটি, সংস্কৃত এবং উর্দু সাহিত্য। কেননা এ দুটি ভাষার কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই। যাঁরা এই মতের প্রতিবাদ করেছেন, তাঁদের মনে বোধ হয় শুধু 'জনগণমন' গানটি ছিল। জাতীয় সঙ্গীতটি প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম এবং নিয়মেরই প্রমাণ। বঙ্কিম যাঁকে বন্দনা করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গমাতা; সপ্তকোটি কণ্ঠকে ত্রিংশ কোটিতে তুলে দেওয়া সহজ, কিন্তু সমগ্র ভারতভূমিকে সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা কল্পনা করা কঠিন। গোটা রাজস্থান তাহলে বাদ যায়। রবীন্দ্রনাথ সোনার বাঙলাকে ভালবাসা জানিয়েছেন; দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ধাত্রী দেশকে। সত্যেন দত্তও এই দেশের তরুলতা সব দেশের চেয়ে শ্যামল দেখেছিলেন। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রদেশপ্রীতি আর প্রাদেশিকতা এক জিনিস নয়। সুতরাং লজ্জাও অহেতুক, প্রতিবাদ অকারণ। বৃহতের ধারণা শক্ত। তাই ছোটর মধ্যে তাকে এনে প্রত্যক্ষ করতে হয়। যেমন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু; প্রতিমায় ঈশ্বর; তেমনি আপন প্রদেশের মধ্যেই সমগ্র দেশ।

এও দেখেছি, গানে যখন বাঙলার কথা লিখেছেন, তখনই বাঙলার কবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার রাজপুত, শিখ এবং মারাঠা জাতির ইতিহাস থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন। প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি থাকলে করতেন না। দ্বাপর-ত্রেতার নন্দদুলাল আর রামলক্ষ্মণের মত রাণা প্রতাপ এবং শিবাজীও বাঙলার ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলেন।

• • •

উক্ত লেখক কাব্য-পরিক্রমা প্রসঙ্গে একটি প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেছেন। চারুকলার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে লেনদেনের অভাব। যিনি লেখক, তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই, পারদর্শিতা দূরের কথা। অপরপক্ষে যিনি চিত্রশিল্পী, সাহিত্যের নবতম ধারাটির সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় নেই। অথচ ছবি, গান, লেখা 'চক' আর 'চীজের' মত আলাদা আলাদা বস্তু নয়। ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে, চিত্রকলা এবং সাহিত্য পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে. কলাকুশলীদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান

তো আছেই, কখনো কখনো একে অপরের কাছে প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কেও নূতন পথের ইঙ্গিত পান।

আমাদের দেশেও একদা এই ধারাই ছিল। শ্রেষ্ঠ কবিরা সাধারণত সংগীতজ্ঞ, অনেকে আবার সুগায়কও ছিলেন। যথা—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ইত্যাদি। তুলনীয় নাম একালে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অথচ কাব্য এবং গান আদিতে অভিন্ন ছিল, কবিতার আধুনিক ধারাটি মূলেরই শাখানদী। গান সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কান তৈরী হয় না, ছন্দ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষাও ব্যর্থ হতে পারে। আর চিত্রশিল্পীর হাতে ভাষা কি মনোহর রূপ নেয়, তার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত তো অবনীন্দ্রনাথের গদ্য।

গদ্যের কথা যখন উঠলই, তখন বলি ছন্দের কান তৈরি করার তাগিদ গদ্য লেখকেরও আছে। গানের সঙ্গে কাব্যের যে সম্পর্ক, গদ্যের সঙ্গে কাব্যের তাই। কাব্য সুর ছেড়েছে, গদ্য ছেড়েছে পদ্যের পর্ব আর মিলের গণিত। হয়ত ভাবালুতাও। (উল্লেখযোগ্য, এ যুগের কবিরা 'পোয়েটিক লাইসেন্স' বলতে রচনার যে শৈথিল্য বোঝায়, তার সুযোগ আর নিতে চান না। 'করিনু', 'মোর' ইত্যাদির প্রয়োগ ক্রমশ অচল হয়ে এল। অর্থাৎ তাঁরা গদ্যের ঋজুতার দিকে ঝুঁকেছেন। গদ্যকে এবার কবিতার কাছে লালিত্য এবং শ্রী ধার করতে হবে। এই প্রয়োজন সম্পর্কে সব গদ্যলেখক, দুঃখের বিষয় অবহিত নন)।

ওয়ার্ডস্বর্থের বিশ্বাস ছিল গদ্যের সঙ্গে পদ্যের যদি কোন তফাৎ থাকে তো সেটা শুধু মেট্রিক্যাল। এটা বোধ হয় অত্যুক্তি। 'লিপিকা' নিশ্চয়ই গদ্য নয়। আবার 'ফাল্গুনীর' চৌপদীগুলিও কাব্য নয়। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র ভাষা আবেগ-ধর্মী হয়েও গদ্য। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যালোচনার নিরাবেগ ভাষাও তাই। তবেই দেখুন, সংজ্ঞা নিরূপণ কত কঠিন। আসলে একথা কেউ বলে না যে, গদ্য-পদ্যের একেবারে বিপরীত মরুতে বসে আছে। এ তো প্রায়ই দেখা গেছে কবিরাই শ্রেষ্ঠ গদ্যশৈলীর অধিকারী। কোন ইংরেজ সমালোচক লিখেছেন, কবিতার anti-thesis যদি থাকে তো সেটা হ'ল matter of fact writing, যথা বিজ্ঞান আলোচনা। আমরা তাও বলব না, কারণ 'অব্যক্ত' এবং 'বিশ্বপরিচয়' পড়ছি, পড়েছি জীনস্ আর জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞানের আলোচনাও সাহিত্য হতে পারে। কবিতার anti-thesis আমাদের মতে হওয়া উচিত বাজারের ফর্দ বা ধোপার হিসাব। অর্থাৎ প্রভেদটা আসলে প্রাণধর্মের, প্রকাশের নয়।

ইংরেজি অভিধানে বলে প্রোজ মানে লোকের মুখের বা লেখার মামুলী ভাষা। (ওআল্টার ডি লা মেয়ার এই অত অগ্রাহ্য করেছেন)। চলতি ভাষার হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীও একদা এই জাতীয় একটা কথা বলেছিলেন। মুখের কথাকে কলমের মুখে আনতে হবে, তাঁর পণ ছিল এই। কিন্তু প্রশ্ন, কার মুখের। 'চার ইয়ারি কথা'র ভাষায় কেউ কি কথা বলে, না পারে। চৌধুরী মশাই হয়ত বলতেন, বা পারতেন। দোকানী কিম্বা ব্যাপারী বলে না বা পারে না। এখনও-অদৃশ্য ভবিষ্যতে তার শিক্ষা, রুচি ইত্যাদি উন্নত হলে বলতেও পারে বা। আসলে গদ্য—সাহিত্যের গদ্য—আদৌ মুখের কথা নয়। লেখক তাকে প্রয়োজনমত গড়ে পিটে নেন, বিদ্যুন্ময় করে তোলেন, তবে স্টাইল তৈরি হয়, যেমন অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় সাহিত্যরসে। এই রসায়নের কৌশলটি সকলের জানা নেই।

ফিরে-চাওয়ার চোখ

আলোক সরকার

নয়ন জলে ভিজলে পরে আবার তরু বাঁচতে পারে।
শোনা গানের কথা উধাও মনে বাজে
সারা সকাল সারা বিকাল ধু-ধু আকাশ তার-ও ওপারে
আনত কোন সম্ভবের আলো;
তরু আবার বাঁচতে পারে নয়ন জলে ভেজে যদি।

সারা সকাল সারা বিকাল একটি গান একটি নদী
খেয়ালী হাওয়া বিনীত কলরোলে।
প্রখর চুপ নিরুত্তাপ কোন মন্ত্রে জ্বলে?
দেখতে যাবে পুরোনো সেই বীণা
বাজে আবার বাজে কিনা
তারের ধুলো মুছবে নাকি হৃদয়ময় নয়ন জলে।

উদার পটভূমিতে আঁকে ছবি
পাখা মেলুক সবুজ পাখি ব্যাকুল ডানা মেলুক।
আড়াল যতো করে সময় ততই স্থির মুখ—
বিশ্বাসের নিবিড় হাওয়া কাঁপে!
ধু-ধু আকাশ তারও ওপারে খেয়ালী রঙে সব-ই
নয়ন জলে ফিরে-চাওয়ার চোখে উষ্ণ তাপে।

মাটির মত, হে হৃদয়

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

মাটির মত করো মনের মত ধান,
হৃদয়, হবে-হবে; সফলতার আশা
শেষ হলেও চির-নিয়মে অনুগত
দুলবে কোনো মাঠে একটি ভালোবাসা।

ধেয়ানে উদাসীন প্রখর গ্রীষ্মের
শিখায় কতকাল জ্বলেছি হাহাকারে,
তোমার কিংশুক রক্তে ঝরে গেছে—
জানি নি এই মন সইতে সবই পারে।

নরম ভিজে ভিজে বিগত শ্রাবণের
করুণ মমতার অঝোর ধারা-স্নানে
প্রাণের অংকুরে কী যন্ত্রণা যেন
অন্ধকারে কাঁদে আবার অঘ্রাণে।

একটি ফসলের তৃপ্ত গৌরবে
সময় হোক গাঢ় প্রীতিতে মধুময়,
নীরব কান্নায় মাটির মত করো
মনের মত ধান হবেই হে হৃদয়!

অন্বেষণ

কিরণশংকর সেনগুপ্ত

অন্দরে বাহিরে আজো তোমাকেই খুঁজে-খুঁজে মরি,
যতই এগিয়ে যাই দেখি তুমি দূর পরাহত;
রুদ্ধশ্বাস অন্বেষণে কাটে দিন, উত্তীর্ণ শর্বরী,
আমার অবস্থা প্রায় দিকভ্রান্ত নাবিকের মত।
অথচ সংকল্প শুধু উদয়াস্ত তোমার বন্দনা,
বাস্তব জোগাবে প্রাণ, কল্পনাও অনন্য নির্ভর,
দুর্নিবার প্রগতিতে ছিন্ন হবে যুগের ছলনা,
অন্তত নৈবেদ্য শুধু দিশেহারা বাক্‌রুদ্ধ স্বর।

কেবলি পিছিয়ে পড়ি, বন্ধুদের আছে অগ্রগতি,
কামিনী কাঞ্চনরত অনেকেই সাফল্য সোপানে
নিরঙ্কুশ যোগাসনে, ভুলে থাকে আদি প্রতিশ্রুতি;
আগেকার রুচি নেই চিরন্তন নক্ষত্র সন্ধানে।
আমি শুধু দ্বিধান্বিত, শূন্যে-শূন্যে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবান
আমাকেই করে তাড়া, আমি করি তোমার সন্ধান॥

প্রতিশ্রুতি

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এই রাত্রি দুর্যোগের,
দুঃখের করুণ মেঘে আকাশ আঁধার—
বৃহস্পতি অস্তমিতঃ
ধ্রুবতারা ডোবে বারবার;
মুহুর্মুহু ঝটিকা শাসায়ঃ
তুফান দিতেছে সায়—
সাগর গর্জায়,
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকেরা খুঁজিছে বন্দর।

আশার উজ্জ্বল বাতিঘর—
এর মাঝে তুমি নির্জন
জেগে আছো—আছো জেগে অতন্দ্র নয়ন
দিতে সত্যপথের নিশানাঃ
কোন দিকে যেতে হবে—কোথা বা সে মানা!
তুমি জানো উদয়ের পথের বিকাশ।

এ যুগ ঝড়ের যুগ,
মেঘ-বৃষ্টি-অন্ধকার-কুয়াশার কাল;
জানি, জানি আছে তবু—
আছে এক অপরূপ সোনার সকাল
উত্তরিত সর্ব দুঃখ-ভয়;
আছে এক গ্লানিহীন সুনীল সময়।

হে রাত্রির তামস-তাপস!
এ দুশ্চর তপস্যা তোমার
খুলিছে, খুলিছে সেই—
সম্ভাবিত স্বর্ণ-সিংহদ্বার;
আর—
অমৃত পিপাসা মিটাবার
আমরা পেয়েছি এক—
সুমহান উত্তরাধিকার।

তুমি তারে যত বল—
সে শুধু ভূমিকা,
যুগান্ত-জ্বালানো সেই রৌদ্রদৃপ্ত শিখা—
আমরা চিনেছি সেই ঐশ্বর্যসম্ভার;
বরাবর—বারবার
তাই ত' করিব তারে হৃদয়ে ও ললাটে বহন।
হে অগ্রজ, অগ্রগামী, পূজ্য প্রিয়জন!
শুধু নয় দায়-সারা একটি প্রণাম—
প্রতিশ্রুতিপত্রে এই দৃঢ়কর স্বাক্ষর দিলাম।
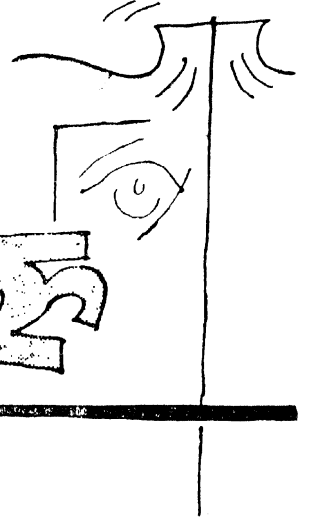
দুই বন্ধুর মধ্যে সুখ দুঃখের কথা হচ্ছিল। দুজনেই প্রবীণ, দুজনেই পদস্থ। অফিসে মোটা মাইনে না হোক মোটামুটি মাইনে পান। সংসারে স্ত্রী-পুত্র কন্যা এমনকি মেয়ের ঘরে এক-জনের নাতি-নাতনীও হয়েছে। বয়সও অনেকটা একরকম। শৈলেশ্বর দাশগুপ্ত পঞ্চাশের এধারে, দু'তিন বছর কম। আর উমাপদ লাহিড়ী পঞ্চাশের কিছু ওধারে, দু'এক বছর বেশি। শৈলেশ্বর নাতিখ্যাত এক ইন্সিওরেন্স অফিসের অ্যাকাউণ্টাণ্ট আর উমাপদের চাকরি কর্পোরেশনের কালেকশন ডিপার্টমেণ্টে। কিন্তু চাকরিই এঁদের বড় পরিচয় নয়। যৌবনে দুজনেই রাজনীতি করেছেন, অসহযোগ আন্দোলনে জেল খেটেছেন। তারপর অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কেউ আর রাখতে পারেননি, কি রাখেননি। কিন্তু তা না রাখলেও অফিস আর সংসারের মধ্যে তাঁরা একেবারে আটকে থাকেননি। একটু ফাঁক রেখেছেন। শৈলেশ্বর গেছেন সংগঠন সমাজগঠনের দিকে। টালীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর হাই স্কুল আছে, নাইট স্কুল আছে লাইব্রেরী আর শিল্পাশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। আর উমাপদ গেছেন জ্ঞানচর্চার দিকে। জীবন ভরে শুধু বই কিনেছেন আর বই পড়েছেন। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শনে এখনো তাঁর সমান আগ্রহ রয়েছে। এত পড়াশুনো থাকলেও তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। অভিমান যাতে না জন্মে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে। দু'চারজন বন্ধু এবং গুণগ্রাহী ছাড়া তাঁর পড়াশুনোর খবর কেউ রাখেন না। আত্মপ্রচারে তাঁর কুণ্ঠা আছে। কদাচিৎ সভা-সমিতিতে যান। কিন্তু সেখানেও শ্রোতার আসন ছেড়ে বক্তৃতা মঞ্চে বড় একটা উঠতে চান না। যদি বা ওঠেন সেখানে তাঁর যোগ্যতার পূর্ণ পরিচয় তেমন মেলে না, যেমন মেলে বন্ধুদের বৈঠকে।

শৈলেশ্বরের বাসা টালীগঞ্জে আর উমাপদ থাকেন ইণ্টালী অঞ্চলে। দু'জনের মধ্যে আজকাল কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়। ব্যস্ত শৈলেশ্বর তাঁর স্কুল, লাইব্রেরী আর মহিলাশ্রমের কাজে সারা শহর ঘোরাঘুরি করেন আর উমাপদ অফিস ঘর থেকে নিজের পড়বার ঘরে ইজি চেয়ারে এসে বসেন। অনেক দিন বাদে আজ শৈলেশ্বর নিজে বন্ধুর খোঁজ নিতে এসেছেন। রবিবারের বিকেল। উমাপদর স্ত্রী স্বামীর পুরোন বন্ধুকে চা জলখাবারে আপ্যায়ন করে ফের ঘরকন্নার কাজ দেখতে চলে গেছেন। ছেলে মেয়েরা কেউ খেলার মাঠে কেউ সিনেমায় গেছে। কেউ প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে গল্প করছে। বাড়িটা একেবারে নিরিবিলি। অনেকদিন কেউ কারো খোঁজ খবর না নেওয়ার জন্যে প্রথমে দু'জনের মধ্যে খানিকক্ষণ অনুযোগ অভিযোগের পালা চলল। তারপর উঠল ঘর সংসারের গল্প। সংসারের জ্বালার কথা দুজনেই স্বীকার করলেন

শৈলেশ্বর বললেন, 'তুমিই ভালো আছ হে উমাপদ ঘরের বাইরে পা বাড়াও না। আমার তো স্ত্রীর খোটা শুনতে শুনতে জীবন গেল। আমি নাকি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। আর এতই যদি দেশের কাজ করছি মন্ত্রী-উপমন্ত্রী, সহকারীমন্ত্রী নিদেন পক্ষে বিধানসভার একজন সদস্যও হ'তে পারছিনে কেন আমার স্ত্রীর মনে এই হল সব চেয়ে বড় আক্ষেপ। এদিক থেকে তুমি বেশ ভালো আছ। নিষ্কাম জ্ঞানপন্থীকে স্ত্রী বোধ হয় খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে।'

উমাপদ হাসলেন, 'শ্রদ্ধা তো বটেই। তবে প্রায়ই সেই শ্রদ্ধা শ্রাদ্ধে গিয়ে গড়ায়।'

ভেজানো দরজার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে উমাপদ বললেন, 'কতদিন যে আমার এই বইয়ের র‍্যাকে আর আলমারিতে নুড়ো জ্বেলে দিতে এসেছে তাতো তুমি আর জানো না।

শৈলেশ্বর একটু কৌতুক বোধ করে বললেন, 'তাই নাকি? তোমার ঘরেও ঝড় ওঠে! কি কর তুমি তখন?'

উমাপদ বলেন, 'কি আর করব। তৃণাদপি নিচু হয়ে থাকি, ঝড় মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। কখনো বা ঘরের দেয়াল হয়ে থাকি। চার দেয়ালের সঙ্গে পঞ্চম

দেয়াল। না হয় ছোট মেয়ের খেলার পুতুল। তার চোখ আছে দেখতে পায় না। কান আছে শুনতে পায় না।'

শৈলেশ্বর হেসে বললেন, 'তুমি ভাই বেশ আছ। কিন্তু আমি অমন দাস্যভাবের ভজনপূজন শিখিনি। আমার যখন লাগে লাঠালাঠি ফাটাফাটি হয়ে যায়।'

উমাপদ স্মিতমুখে বললেন, 'তাতে লাভ কি বল। ছেলে মেয়েদের কাছে লজ্জিত হতে হয়। তাছাড়া সংযম একবার হারিয়ে ফেললে কি কান্ড যে ঘটতে পারে তার কি কিছু ঠিক আছে। তখন শিক্ষা বল, সংস্কৃতি বল কিছুই সেই প্রলয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কাম আর ক্রোধ এই দুই রিপু প্রায়ই আসন বদলায়। বিশেষ ক'রে শেষ বয়সে দ্বিতীয়ই হয় অদ্বিতীয়।'

বন্ধুর কথা শুনে শৈলেশ্বর বেশ আন্দাজ ক'রে নিলেন যে, সব সময় উমাপদ তৃণ হয়ে থাকতে পারে না, কি থেকে রেহাই পায় না। কামের পীড়নে না হোক ক্রোধের পীড়নে তাকেও জ্বলতে হয়, পুড়তে হয়। কর্তৃপদেই জ্বলুক আর কর্মপদেই জ্বলুক।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ শৈলেশ্বর বললেন, 'আচ্ছা উমাপদ, সেক্স সম্বন্ধে তোমার আজকাল কি মনোভাব। মানে আমাদের মত বয়সে, আমাদের মত লোকের জীবনে সেক্সের প্রভাবটা কি ধরনে পড়ে, কি ধরনে পড়া উচিত—'

উমাপদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল বিস্মিত হ'য়ে রইলেন তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'শৈলেশ, একে ভূতের মুখে রাম নাম বলব না রামের মুখে ভূতের নাম বলব ঠিক ভেবে পাচ্ছিনে। সেক্স সম্বন্ধে তোমার এই আগ্রহ ঔৎসুক্য তো কোন কালে দেখিনি। হঠাৎ হল কি তোমার।'

শৈলেশ্বর একটু অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি। তুমি আমার কথার জবাব দাও।'

উমাপদ বললেন, 'তোমার প্রশ্নটা

'এত আবছা আবছা যে তার জবাবটাও ধোঁয়াটে হ'তে বাধ্য। তবু জবাব আমি দেব, কিন্তু তার আগে তোমার কাছ থেকে একটা কথা জেনে নিই। তোমার এই যৌন-জিজ্ঞাসার মূলে সেই হেড মিস্ট্রেসের কোন হাত টাত আছে নাকি হে।'

খোঁচা খেয়ে শৈলেশ্বর চটে উঠলেন, 'কোন হেডমিস্ট্রেসের কথা বলছ। সেই সব বাজে গুজব কি তোমারও কানে গেছে নাকি?'

উমাপদ কৌতুকের সুরে বললেন, 'সবটা যায়নি। আমি দু'কানে আঙুল দিয়ে রয়েছি। কিন্তু কথাটা যখন উঠল তোমার কাছ থেকেই সব শুনি। দোহাই তোমার বাদসাদ দিয়ো না, ছাট কাট করো না, যা ঘটেছে তাই বল।'

অমনিতে উমাপদ ভারি রাশভারি মানুষ। বয়সের তুলনায় মাথার চুল বেশি পেকে যাওয়ায় তাঁর প্রবীণতা আরো বেড়েছে। এমন গুরুগম্ভীর বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুকে হঠাৎ এতটা প্রগলভ হ'তে দেখে শৈলেশ্বরেরও বুকের ভার বয়সের ভার যেন অনেকখানি নেমে গেল। তিনি ফের প্রথম তারুণ্যের স্বাদ পেলেন। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে শৈলেশ্বর হেসে বললেন, 'না বাদসাদ দেব না, সবই বলব। আমার গল্প এতই ছোট, এতই কাটখোট্টা যে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। আমার বলা হয়ে গেলে তুমি বরং খানিকটা প্রাচীন কাব্যের রস আর আজকালকার ছোকরা লেখকদের দেহবাদের কথা আমার গল্পের মধ্যে যত খুশি মিশিয়ে নিয়ো আমি আপত্তি করব না।'

'তুমি তো জানো রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে আমি তোমার মত অহিংসা নিয়ে নামিনি, হিংসার পথই বেছে নিয়েছিলাম। সে পথে আমাদের একমাত্র রস ছিল রৌদ্র রস। আমাদের ক্রোধের তেজে কাম পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। 'পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী' এ জিজ্ঞাসা যে আমাদের জীবনে আসেনি তা নয়, তবে অনেক পরে এসেছে। কাব্য উপন্যাস, নাটক আর নারীকে আমরা পথের বাধা বলে এক পাশে অনায়াসে সরিয়ে রেখেছিলাম। স্কুলের সেই ফোর্থ ক্লাস, থার্ড ক্লাস থেকে এমন শিক্ষা পেয়েছিলাম যে ওসব ব্যাপারকে আমরা অব্যাপার বলেই জেনেছি। কোনদিন উৎসাহ আগ্রহ বোধ করিনি। কিন্তু এসব কথা তোমার জানা। কি করে হিংসা ছেড়ে অহিংসা ধরলাম, তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে গৃহস্থ হলাম সেকথাও তুমি অনেকবার শুনেছ। তবু যে এত সব পুরোন কথা তুললাম সে আমাদের পিছনকার ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যেই। কমলিকে তো ছাড়লাম ভাই কিন্তু কমলি যে ছাড়ে না। অফিস থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে অফিস। ঘরের এই চারদেয়ালের মধ্যে—দ্বিগুণ করলে দুই ঘরের এই আট দেয়ালের মধ্যে আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠল। কি ক'রে মানুষ যে এত ছোট জায়গার মধ্যে এমন করে হাত পা গুটিয়ে থাকতে পারে আমি তো ভেবে পাইনে উমাপদ। তোমার কথা বলছিনে, তুমি তো পুঁথির মধ্যে বিশ্বরূপ দেখতে পাও তোমার কথা আলাদা। কিন্তু যারা কেবল স্ত্রীপুত্রের মধ্যে দুনিয়াটাকে পকেট সংস্করণ ক'রে রাখে আমি তাদের কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে। এ যেন মেয়েদের রান্নাঘর আর শোয়ার ঘর। তবু তো তারা ফি বছরে কি দু' বছরে একবার করে আঁতুড় ঘরে যায়। আমাদের কি গতি? শুধু কি ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়ে জনকত্বের সাধ মেটে? তোমার কি হয়েছে জানিনে আমার তো মেটেনি। তাই ওই পাঠশালা, তাই ওই পাঠাগার, আর অনাথ আশ্রম। অবশ্য এসব ছোট ছোট ব্যাপার তুমিও পছন্দ করনি। তুমিও হিতৈষী বন্ধু হিসেবে চেয়েছ যদি কিছু করিই, যেন বড় কিছু করি। গ্রাম নয়, গঞ্জ নয়, সারা দেশ আমার কর্মভূমি হোক, বিদেশে আমার কীর্তি ছড়িয়ে পড়ুক—এমন স্বপ্ন অল্প বয়সে আমিও অনেক দেখেছি। কিন্তু বয়স বাড়বার পর নিজের মুরোদ যারা বুঝতে না পারে তাদের মত হতভাগা আর নেই। ব্যর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জ্বালায় তারা জ্বলে মরে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বলুনির চেয়ে সে জ্বলুনি বড় কম নয় উমাপদ। কিন্তু আমি অনেক আগে থেকেই টের পেয়েছিলাম মোল্লার দৌড় কোন মসজিদ পর্যন্ত। নিজের সম্বন্ধে আমার কোন মোহ ছিল না, তাই মোহ-ভঙ্গও হয়নি। কারণ আত্মপরিচয়ের মুগুরের ঘায়ে তাকে আমি বহু আগে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে গল্প শোনাতে গিয়ে বক্তৃতা শোনাচ্ছি। কি করব বল স্বভাব যায় না মলে। আর Habit is the second nature. অভ্যাসে অভ্যাসেই আমাদের স্বভাব গড়ে ওঠে। তুমি তো ঘরের কোণে লুকিয়ে থেকে রেহাই পেয়েছ। কিন্তু মাঠে ঘাটে—এমন জায়গা নেই যেখানে আমাকে গলাবাজি না করতে হয়।

'যাকগে, ভোজবাজির মত, এবার আমার গল্পের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ি। হৃদয় তো ভেঙেইছে না হয় হাঁটু দুটোও ভাঙবে, কি বল। হ্যাঁ সেই হেড মিস্ট্রেস। বছর পাঁচেক আগে জয়ন্তী বোস আমাদের স্কুলে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হয়েই এসেছিল। অর্ডিনারি গ্রাজুয়েট। এর চেয়ে বড় চাকরি কি করেই না পাবে। ইণ্টারভিউর সময় আমি ছিলাম। দেখলাম মেয়েটির চেহারা টেহারা ভালো। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আর কথাবার্তায় নম্রতা আছে। হাতের লেখাটি সুন্দর। বয়স বছর তেইশ চব্বিশের মধ্যে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাসে অঙ্ক কষাতে পারবেন তো, যদি দরকার হয়?'

জয়ন্তী আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল, পারব। আমি অঙ্ক নিয়েই পাশ করেছি।'

ওর কতখানি সাহস তাই পরীক্ষা করবার জন্যে বললাম, 'আর যদি ইংরেজী পড়াতে দিই?'

মেয়েটি ঘাবড়াল না, বলল, 'তাও পারব।'

পারুক না পারুক ওর এই নির্ভীকতা দেখে আমি খুশী হলাম। চাকরি দিলাম জয়ন্তীকে। বোর্ডে আরো দুজন মেম্বার ছিলেন। তাঁরা বললেন, 'একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখলেন না শৈলেশবাবু?'

আমি বললাম, 'ছ' মাস ধরেই তো ট্রায়াল দেব। ওকে তো অস্থায়ীভাবেই নিলাম। যদি ভালো না পড়াতে পারে, ওর কাজ দেখে আপনারা যদি খুশী না হন তাহলে ছ' মাস পরে ছাড়িয়ে দিলেই হবে।'

আমার সহকর্মীরা প্রসন্ন হলেন না। তাঁদের এক একজন ক'রে আলাদা ক্যাণ্ডিডেট ছিল। আমি দেখলাম সেই দুইটি মেয়ের চেয়ে জয়ন্তীর যোগ্যতা বেশি। তাঁরা ভাবলেন তুলনায় জয়ন্তীর বয়স কম

আর রূপ বেশি বলেই আমার এই পক্ষপাত। কিন্তু তাঁরা যাই ভাবুন, আর আমার আড়ালে যাই বলাবলি করুন, স্কুল সম্বন্ধে আমার কথার ওপর কথা বলবার, আমার ডিসিশনের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য কমিটিতে কারোই ছিল না। কারণ এই বনমালী বিদ্যাপীঠ যখন উঠে যাবার জো হয়েছিল, তখন আমি প্রথম ও পাড়ায় যাই। তারপর দিনরাত আপ্রাণ পরিশ্রম করে স্কুলটাকে আমি প্রায় ঢেলে সাজি। সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা ফের খুঁনিয়ে নিই। স্কুলের ফান্ড বলে কোন জিনিস ছিল না। আমার আমলে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়তে থাকে। প্রত্যেকটি পাই ফার্দিংএর হিসেব, প্রত্যেকটি মাস্টার ছাত্রের চরিত্রের আমি খোঁজ-খবর রাখি। নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করছি বলে কিছু মনে করো না। যা সত্যি ঘটনা তাই বলছি, যাতে ব্যাপারটা তুমি ভালো ক'রে বুঝতে পার।

যা হোক, জয়ন্তী আমার মান রাখলে। মাস দুয়েকের মধ্যেই টিচার হিসেবে ওর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার হেড-মিস্ট্রেস মিসেস সেনগুপ্ত নিজে থেকে একদিন ওর প্রশংসা করলেন। জয়ন্তী ভালো পড়ায়, খেটে পড়ায়, কোনদিন এক মিনিট লেট হয় না, একদিনও কামাই করে না। অবশ্য তখন পর্যন্ত ওকে ওপরের ক্লাসে নিয়মিত পড়াতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু নিচের ক্লাসের মেয়েদের কাছে জয়ন্তীদি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্লাস ম্যানেজ করায় ওর অসাধারণ দক্ষতা। শুনে আমি খুব খুশি হলাম। অবশ্য বয়েজ সেকশনেরই বল আর গার্ল সেকশনেরই বল প্রায় সব টিচারকেই তো আমি চাকরি দিয়েছি, আমিই দেখে শুনে বেছে টেছে নিয়েছি। তাদের সকলের গৌরবেই আমার গৌরব। তবু ওই মেয়েটির প্রশংসায় আমার মনটা যে একটু বেশি প্রসন্ন হয়ে উঠল তার কারণ আমি অন্য দুজনের অমতে ওকে চাকরি দিয়েছি। ও যদি অযোগ্য বলে গণ্য হয়, আমার মাথা নিচু হ'য়ে যায়। যা হোক ছ' মাস বাদে ওকে আমরা নিশ্চিন্ত মনেই পার্মানেণ্ট ক'রে নিলাম।

তারপর কি একটা ছুটির দিনে এমনি এক বিকেল বেলায় জয়ন্তী আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। ধোপা কাপড় নিয়ে এসেছে। আমার স্ত্রী সেই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। বাচ্চা মেয়েটি পুতুল খেলছে। ছেলে দুটি বল নিয়ে পাড়ার মাঠে বেরিয়েছে। আর আমি বারান্দায় ফুলগাছের টবের মাটি খুঁচিয়ে দিচ্ছি। আমার মত কাঠ-খোট্টা মানুষেরও কিছু পুষ্পপ্রীতি আছে তা তুমি জানো। ফুল আমি কিনতে ভালোবাসি, পেতে ভালোবাসি, দিতে ভালোবাসি আমার ভাড়াটে বাসায় এক ফোঁটা মাটি না থাকলেও টবে তার চাষ করতে ভালোবাসি। আমাদের স্কুলের মাধবীবিতান আর কম্পাউন্ডের মধ্যে হাস্নাহানার ঝাড় নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। ওসব আমারই করা। আগেকার স্কুল কম্পাউন্ড ছিল মরুভূমির মত। তাতে ফুলপাতার কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু ফুলের কথা তোমার কাছে ফলাও করে বলতে ভয় হয়। তুমি মনস্তত্ত্বপড়া পণ্ডিত। নিশ্চয়ই মনে মনে ভেবে নেবে আমার এই পুষ্পপ্রীতিও পুষ্পধনুরই কারসাজি।

যা হোক, সদরে কড়া নাড়ার শব্দে হাত ধুয়ে গায়ে একটা গেঞ্জি চড়িয়ে আমি নিজেই গিয়ে দরজার খিল খুলে দিলাম। জয়ন্তীকে দেখে বললাম, 'কি ব্যাপার, আপনি যে এখানে।'

ততক্ষণে মনোরমা—আমার স্ত্রী ধোপার হিসেব স্থগিত রেখে দরজার কাছে চলে এসেছে।

বললাম, 'কি দরকার বলুন।'

আমার স্ত্রী একটু ধমকের সুরে বলল, 'আগে ওঁকে ভিতরে আসতে দাও। দরকার অদরকার পরে শুনবে। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলবে নাকি।'

মনোরমা মৃদু হেসে তাকে প্রথমে বাইরের ঘরে এনে বসাল।

জয়ন্তীর এই প্রথম দিনের আসাটা আমি তেমন পছন্দ করিনি। স্কুলের ছাত্র হোক শিক্ষক হোক, শিক্ষয়িত্রী হোক, কোন কাজের জন্যে কেউ আমার বাসায় আসতে পারবে না এইরকম একটা নিয়ম আমি বেঁধে দিয়েছিলাম। অফিসের কেরানিগিরিতেই ঘণ্টা সাতেক কাটে। তারপর আছে আমার স্ত্রীর ভাষায় মোষ চরাবার ক্ষেত্র' এর পর যদি হাটের ভিড় ঘরের মধ্যে টেনে আনি ঘরণীর প্রাণ বাঁচে না সে বিবেচনা আমার ছিল। স্কুলের একটা রুম আমি নিজের জন্যে ঠিক করে নিয়েছি। সকালে হোক, সন্ধ্যায় হোক যখনই সময় পাই সেখানে গিয়ে বসি। নিজে কাজকর্ম করি, অন্যের কাজকর্মের হিসেব নিই, একজনের বিরুদ্ধে আর একজনের নালিশ শুনি বিচার করি, বিবাদ মিটাই। তাই কোন দরকার নিয়ে দরবার নিয়ে আমার বাড়িতে আসা সকলের পক্ষেই নিষেধ ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। শুধু

দুর্নামের ভয়ে নয়। ওদের একবার পথ ছেড়ে দিলে তুমি নিজে আর পথ পাবে না।

কিন্তু আমি হাসিমুখে অভ্যর্থনা না করলে কি হবে, মনোরমা তাকে একেবারে আত্মীয়কটুম্বের মত ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। যতক্ষণ না স্বার্থে আঘাত লাগে ততক্ষণ মেয়েদের মত মেয়ে-প্রেমিক আর কেউ নেই। দুটি মেয়ের মধ্যে এক মিনিটে যে বন্ধুত্ব জন্মে দুজন পুরুষের সেখানে পৌঁছতে এক যুগ চলে যায়।

জয়ন্তীর আসবার কারণটা আমি মনোরমার মুখেই সবিস্তারে শুনলাম। জয়ন্তী আশ্রয় চায়। ওর বাপ মা অনেক আগেই মারা গেছেন। নিকট সম্পর্কের খুড়ো জেঠা মামা মেসো কেউ নেই। দূর সম্পর্কের এক দাদার কাছে এতদিন ছিল। কিন্তু সেখানে বউদির বাপের বাড়ির লোকজন এসে পড়ায় আর জায়গায় কুলোচ্ছে না। তাই জয়ন্তীর অবিলম্বে ও বাসা ছেড়ে আসা দরকার।

আমি বললাম, 'এর জন্যে এত কষ্ট ক'রে আপনি এখানে আসতে গেলেন কেন। আপনাদের স্কুলের টিচারদের মধ্যে সবাই তো আর নিজেদের বাড়ি থেকে আসেন না। কেউ কেউ হস্টেল বোর্ডিং থেকেও আসেন, আপনি তাঁদের কাছে খোঁজখবর নিতে পারতেন।'

জয়ন্তী বলল, 'নিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও কোন সীট খালি নেই। সবাই বলল আপনাকে বললে, আপনি চেষ্টা করলে—'

হেসে বললাম, 'যেখানে সিট নেই আমার চেষ্টায় সেখানে সিট তৈরী হবে, আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারী হলেও অমন অসাধারণ ক্ষমতা আমার নেই। নিজের সাধ্যের সীমা আমি জানি।'

জয়ন্তী আমার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। আমার কাছ থেকে এতখানি রূঢ়তা ও যেন আশা করেনি। হাসিমুখে কথাগুলি বললেও আমি যে খুশী হইনি তা ও বুঝেছে, আমিও বুঝাতে চেয়েছি।

কিন্তু পরমুহূর্তে জয়ন্তী ফের মুখ তুলল, বলল, 'এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটা প্রস্তাব ছিল।'

বললাম, 'বলুন।'

জয়ন্তী বলল, 'একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে যদি মেয়েদের জন্যে একটা হস্টেল ক'রে দেন আমরা কয়েকজন টিচার ছাত্রী মিলে সেখানে থাকতে পারি।'

হেসে বললাম, 'অত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়ার মত অবস্থা আমাদের স্কুলের নয়। বেশির ভাগ গরীব ছাত্র ছাত্রীরাই এখানে পড়তে আসে। টিচাররাও সেই রকম। মাইনে যা পান, ঘরসংসারের জন্যে খরচ করেন। সব টাকা নিজের জন্যে ব্যয় করতে পারেন এমন আর ক'জন?'

জয়ন্তী বলল, 'সবই নিজের জন্যে খরচ করতে কেউ কি চায়? তা যারা করে নেহাৎই বাধ্য হয়ে করে।'

ওর স্পষ্ট কথা বলবার ধরন দেখে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু না, ঔদ্ধত্য নয় দম্ভ নয়, ওর কথার মধ্যে বরং একটু করুণ সুর ছিল। ওর যে সংসারে কেউ নেই সে কথা আমার ফের মনে পড়ে গেল। খোঁচা দেওয়াটা সংগত হয়নি সেকথা নিজের কাছে নিজে স্বীকার করলাম। একটু লজ্জাও যে না পেলাম তা নয়।

একটু বাদে জয়ন্তী উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করলাম। এবার যাই।'

কিন্তু মনোরমা তাকে অত সহজে যেতে দিল না। জোর করে বাড়ির ভিতরে ধরে নিয়ে গেল। খাবার আর চা করে খাওয়াল।

খানিক পরে ও যখন বাইরে এল দেখি একটি রক্ত গোলাপ ওর হাতে।

মনোরমা আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'জয়ন্তী তোমার টবের বড় বড় গোলাপগুলির খুব প্রশংসা করছিল। একটা দিলাম ওকে।'

জয়ন্তী মনোরমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি তো দিলেন বউদি, কিন্তু শৈলেশদা হয়ত মনে মনে খুব রাগ করছেন।'

মনোরমা বলল, 'রাগ যদি করে থাকেন সেটা বাইরের। মনে মনে নিশ্চয়ই রাগের উল্টোটাই হচ্ছে।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কি যা তা বকছ।'

আরো কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্তী বিদায় নিল। আমি ভরসা দিয়ে বললাম, 'আপনার সিটের জন্যে আমি চেষ্টা ক'রে দেখব।'

জয়ন্তী বলল, 'না না আপনি আর আমার জন্যে সময় নষ্ট করতে যাবেন না। আপনার সময়ের দাম অনেক। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম বলে ভারি লজ্জা হচ্ছে।'

জয়ন্তী চলে গেলে আমি স্ত্রীকে বললাম, 'মাঝে মাঝে তুমি বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যাও। আমি সেক্রেটারী আর ও আমার স্কুলের সাধারণ একজন টিচার। ওর সামনে ঠাট্টা তামাসা করা কি ভালো। তাছাড়া আমাদের টবের গোলাপ ওকে কেন দিতে গেলে।'

মনোরমা মুখ টিপে হাসল, 'আহা তাতে কি আর হয়েছে। তুমি তো আর দাওনি। আমিই দিয়েছি। তুমি নিজের হাতে দিতে পারলে বোধ হয় আরো ভালো লাগত।'

আমি রাগ করে বললাম, 'দেখ রমা, তোমাকে হাজার দিন বলেছি স্কুলের টিচারদের নিয়ে ও ধরনের বাজে রসিকতা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আমার সে ধাত নয়।'

মনোরমা বলল, 'আহা চটছ কেন। আমার কি পাঁচজন দেওর আছে না ননদ আছে যে তাদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করব। ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্রও তুমি আবার ঠাট্টা তামাসার পাত্রও তুমি। যাই বল, তোমার পছন্দ আছে। জয়ন্তী সত্যিই খুব ভালো মেয়ে। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ফর্সা রঙ, দোহারা গড়ন, মুখ খানা লক্ষ্মী-প্রতিমার মত। মাথায়ও বেশ একগোছ চুল আছে।'

হেসে বললাম, 'তুমি দেখি ওর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে।'

মনোরমা বলল, 'আহা, পঞ্চমুখ হ'তে বুঝি কেবল তোমরাই জানো, আমরা জানিনে। দেখ, নিজে কালো কুচ্ছিৎ হলে কি হবে, সুন্দরী কোন মেয়েকে দেখলে আমারও ভালো লাগে তোমাকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছি আমার তাতে হিংসেও হয় না, ঈর্ষাও হয় না। শুধু একটু আফসোস হয়—'

আমি বললাম, 'বাজে কথা রেখে যাও এক কাপ চা করে আন তো।'

তুমি আমার স্ত্রীকে অনেকবার দেখেছ উমাপদ। তার চেহারা খারাপ একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধু গায়ের

রঙ নয়, শুধু নাক মুখের চ্যাপটা গড়ন নয় কয়েক বছরের মধ্যে ও বেমানান রকমে মোটা হয়ে পড়েছে। ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েও কিছু করতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীর রূপের অভাব নিয়ে আমাকে কি কোনদিন হায় হায় করতে শুনেছ? আজই, না হয় বয়স গেছে কিন্তু বয়স যখন ছিল স্ত্রীর কুরূপ নিয়ে আমি তখনও কোন আফসোস করিনি। আমি নিজেও তো কন্দর্পকান্তি নই। রূপ থাকা না থাকাটা নেহাৎই আকস্মিক ব্যাপার। তার ওপর আমার যেমন হাত নেই, আমার স্ত্রীরও তেমনি। তাছাড়া স্ত্রীর কুরূপ প্রথমই দু'চারদিন যা চোখে লাগে। তারপর সব সয়ে যায়। তার দোষগুণ শ্রী আর কুশ্রীতা সব আমরা মেনে নিই। যেমন বাপ মা মাসী পিসীর চেহারা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনে, তাঁদের গায়ের রঙ কি মুখের গড়ন নিয়ে নালিশ করিনে, স্ত্রীর বেলাতেও আমাদের তেমনি একটা সহনশীলতা জন্মে। কয়েক বছর একটানা বউ নিয়ে ঘর করার পর মনে হয় তাকেও যেন জন্ম-সূত্রেই পেয়েছি। তাই মনোরমা যে সত্যিই মনোরমা নয়, তা আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম, ভুলেই যেতাম। কিন্তু সে নিজেই বার বার আমাকে মনে করিয়ে দেয়। মেয়েদের যেমন হাতের লেখা নিয়ে লজ্জা জানানোর অভ্যাস আছে, মনোরমারও তেমনি নিজের চেহারা নিয়ে বিনয় করবার অভ্যাস বড় বেশি। অন্যদিন আমি তাতে বড় একটা কান দিইনে, কিন্তু সেদিন তফাৎটা বড় চোখে পড়ল। মনোরমা আর জয়ন্তী যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল আমার অবাধ্য চোখ বারবার জয়ন্তীর মুখের ওপর গিয়েই পড়ছিল। তোমারও পড়ত, এটা রূপের সহজ আকর্ষণী শক্তি।

জানা শোনা একটা হস্টেলে জয়ন্তীর জন্যে একটি সিট শেষ পর্যন্ত আমিই ঠিক ক'রে দিলাম। সেদিন একটি নিরাশ্রয়, আত্মীয় স্বজনহীন মেয়ের ওপর আমি বিনা কারণে রূঢ় হয়ে উঠেছিলাম, এ যেন তারই প্রায়শ্চিত্ত। ভবানীপুর অঞ্চলে ছোট একটি মেয়েদের হস্টেল। জন আট দশ মেয়ে সেখানে থাকে। সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট মিসেস চ্যাটার্জীকে বোধহয় তুমিও চিনবে। কংগ্রেস মহলে নাম আছে। এক সময় খুব কাজকর্ম করেছেন। আমি জয়ন্তীর কথা বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

জয়ন্তীও থাকবার জায়গা পেয়ে খুব খুশী। স্কুলে আমার সেই অফিসরুমে এসে বলল, 'আপনি আমাকে বড় একটা দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করলেন। এত কষ্ট কেউ কারো জন্যে করে না।'

ওর কৃতজ্ঞতা জানাবার ভঙ্গিতে একটু আতিশয্য একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার আগ্রহ ছিল। আমি তা আমল না দিয়ে সেক্রেটারী সুলভ গম্ভীর গলায় বললাম, 'স্কুলের ইন্টারেস্টে আমাকে এসব করতে হয়।'

জয়ন্তী আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, বলল, 'আমি তা জানি। আপনি যা করেন, স্কুলের জন্যেই করেন।'

ও চলে যাওয়ার পর আমি ভাবলাম ওর কথার মধ্যে কেমন একটু অভিমানের সুর মিশে আছে। আর রূপবতী তরুণী মেয়ের অভিমান বড়ই সুন্দর। কথাটা যদি একটু ঘুরিয়ে বলতাম, যদি বলতাম, 'আপনারা আমার স্কুলের টিচার আপনাদের জন্যে করব না তো কাদের জন্যে করব।' তাহলে সেক্রে-টারীর মর্যাদাও থাকত, আবার মেয়েটিকেও খুশী করা হ'ত। তাতে মহাভারত এমন

কিছু অশুদ্ধ হত না। আমি তো দেখেছি একটু হাসিমুখে কথা বললে, মাঝে মাঝে ডেকে একটু উৎসাহ দিলে পুরুষ টিচারই হোক আর মেয়ে টিচারই হোক সবাইকে দিয়েই কাজ বেশি আদায় হয়।

কাজকর্মে জয়ন্তীর সুনাম আরও বাড়তে লাগল। আমার বিনা সুপারিশেই হেডমিস্ট্রেস মিসেস সেনগুপ্ত ওকে ওপরের ক্লাসগুলিতে পড়াতে দিলেন। যেমন নিচে, তেমনি ওপরে সব জায়গায় জয়ন্তীর জয় জয়কার। শুধু পড়ানো নয়, স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন আর ফাউণ্ডেশন ডে—এই দু'দিনের ফাংশনের নেতৃত্ব প্রায় জয়ন্তীই করল। ঘর সাজানো থেকে শুরু ক'রে মেয়েদের দিয়ে গান আবৃত্তি আর নাট্যাভিনয় সব ব্যাপারেই জয়ন্তীর পরিকল্পনা, জয়ন্তীর হাত রইল। প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'শৈলেশবাবু, আপনাদের স্কুলে আমি আগেও তো এসেছি। কিন্তু এবারকার মত এত সুন্দর ফাংশন তখন হয়নি। বেশ বোঝা যাচ্ছে আপনাদের এখানে নতুন কেউ এসেছে, সবাইর মধ্যে যেন নতুন প্রাণের জোয়ার লেগেছে।' আমাদের স্কুল কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট মধুবাবু তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক এমনই জোয়ার লেগেছিল শৈলেশবাবু যখন এই স্কুলটা নিজের হাতে নেন, সেই জোয়ারের জোর এবার আরো বাড়ল।

আপনি বাইরে থেকে খেটেছেন, এবার ভিতর থেকে কাজ করবার একজন এসেছেন শৈলেশবাবু। এমনি যদি চলতে থাকে দু'বছরের মধ্যে আমরা স্কুলটাকে কলেজ করে ফেলতে পারব।'

হেসে বললাম, 'আপনাদের উৎসাহ থাকলে তাতো পারাই যায়।'

কাঞ্চনের দু'তিনদিন পরে জয়ন্তী ফের আমাদের বাসায় দেখা করতে এল। আমি এবার আর গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে নয় হাসিমুখেই ওকে অভ্যর্থনা জানালাম। বললাম, 'সব জায়গাতেই আপনার সুখ্যাতি শুনতে পাচ্ছি।'

জয়ন্তী আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখছেন বউদি, অন্যের মুখে শুনেছেন তবু উনি নিজের মুখে কোন প্রশংসা করছেন না। ভয় আছে পাছে মাইনে বাড়াবার দাবি করি।'

সাধারণত কোন টিচার আমার সামনে অমন চটুল ভঙ্গিতে কথা বলতে সাহস পায় না। কিন্তু জয়ন্তীর এই প্রগলভতায় আমি অখুশী হলাম না বরং ভালোই লাগল। মনে হ'ল আজকালকার মেয়েরাতো ভারি চমৎকার ক'রে কথা বলতে জানে। সেবার জেলে বসে তোমাদেরই যেন কোন এক লেখকের গল্পে পড়েছিলাম, মাতৃ-ভাষা আরো মধুর হয়ে ওঠে প্রিয়ার মুখে। নতুন ভঙ্গি, নতুন ব্যঞ্জনা পায় প্রিয়ার ভাষায়। লেখকের সেই প্রিয়া প্রশস্তিকে তখন বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ যেন করতে ইচ্ছে হল।

সেদিনও ছুটির দিন। জয়ন্তী সারা-দিন আমাদের ওখানে রইল। আমার ছেলে জান্টু রান্টুকে ডেকে আলাপ করল, আমার মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে বসে লুডো খেলল। আমার স্ত্রীর সাথে রান্নাঘারে গিয়ে জোগান দিতে লাগল, এমন কি দু'এক পদ রে'ধেও নামাল।

অনাথ আশ্রমের ব্যাপারে আমার বেরোবার কথা ছিল। কিন্তু ভাবলাম, একটা দিন না হয় একটু বিশ্রামই নিই। তাওতো শরীরের পক্ষে দরকার। তাছাড়া শুধু ছুটোছুটি করলেই কি কাজ হয়। চিন্তা পরিকল্পনার জন্যে মাঝে মাঝে এক-জায়গায় দাঁড়ানো দরকার, বসা দরকার।

আশ্রমের জন্যে নতুন একটা এইড কি করে আনানো যায় বসে বসে তাই ভাবছি, জয়ন্তী এসে উপস্থিত। স্নান সেরে চাঁপা ফুলের রঙের একখানা শাড়ি পরেছে। পিঠে ভিজে চুলের রাশ। এসেই ঢিপ ক'রে আমাকে এক প্রণাম। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একি, একি!'

মনোরমা সঙ্গেই ছিল। জয়ন্তী মৃদু হেসে তার দিকে তাকাল।

মনোরমা বলল, 'আজকে জয়ন্তীর জন্মদিন, তাই—'

আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল, 'তাই নাকি কথাটা আগে বলতে হয়।'

মনোরমা হেসে বলল, 'আগে বললে এর চেয়ে বেশি সমারোহটা কি করতে শুনি। বাদ্য আনতে না বাজি পোড়াতে? আমি ভালো বাজার করিয়েছি, ভালো করে রে'ধেছি, জয়ন্তীকে দিয়ে রাঁধিয়েছি। তুমি কি কি করতে বল না।'

আমাকে নিরুত্তর করে দিয়ে মনোরমা ঘর থেকে চলে গেল।

জয়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'সভা-সমিতিতে যত বক্তৃতাই দিন, বউদির সঙ্গে কথায় পেরে উঠবেন না।'

বললাম, 'কার সঙ্গেই বা পারি।'

জয়ন্তী আমার দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে রইল। আমার এই পরাভব স্বীকারে ও খুশী হয়েছে।

জয়ন্তী হেসে বলল, 'আজ কিন্তু একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে আমার চেয়ে নেওয়ার আছে।'

আমি শুকনো মুখে বললাম, 'বলুন।'

তোমার কাছে গোপন করব না উমা-পদ, ও যত হাসে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার মুখ তত শুকোয়, বুক তত কাঁপে।

জয়ন্তী বলল, 'ভয় নেই। ইন-ক্রিমেণ্টও নয়, প্রমোশনও নয়। আপনি আজ থেকে আমাকে তুমি বলে ডাকবেন। আপনার মুখে আপনি কথাটা বড় বিশ্রী লাগে। আপনি বয়সে কত বড়।'

কথাটা আমার ভালো লাগল না। কত বড় মানেই কত বুড়ো কিন্তু আমি কি সত্যিই বুড়ো হয়েছি। আমার কাজ-কর্ম দেখে কেউ তো সে কথা বলে না, চেহারা দেখেও না। হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'তা ঠিক। কিন্তু এখানে বয়সটাইতো একমাত্র কথা নয়। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের।'

জয়ন্তী বলল, 'অঙ্কের হিসেবটাই বুঝি সব। আমার কিন্তু মনে হয় অনেক-দিন ধরে আপনাদের সঙ্গে আমার চেনা-শোনা। বউদি কিন্তু একদিনেই আমাকে আপন ক'রে নিয়েছেন, আপনার ক'বছর লাগবে শৈলেশদা?'

হেসে বললাম, 'একশও হ'তে পারে, হাজারও হ'তে পার।'

জয়ন্তী বলল, 'বেশ, আমি ততদিন অপেক্ষা করে থাকব। ভেবেছেন কি। তাই বলে তুমি কিন্তু আপনাকে আজ থেকেই বলতে হবে। আপনি কথাটার মধ্যে কেবল ভদ্রতা আছে। আত্মীয়তাও নেই, আপনত্বও নেই। কেবল পর পর দূরে দূরে ভাব। শব্দটাই আমাদের ভাষা থেকে তুলে দেওয়া উচিত।'

বললাম, 'না, একেবারে তুলে দিলে অসুবিধে আছে। আচ্ছা, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম।'

জয়ন্তী বলল, 'আজকের জন্মদিনে এই আমার বড় উপহার।'

মনোরমা রান্নাঘর থেকে ফের এ ঘরে এল। হেসে বলল, 'জয়ন্তী, কেবল উপ-হারেই কি আজ পেট ভরবে? বলি, আহার টাহার কি কিছু হবে না?'

বিকেল বেলায় জয়ন্তী যাওয়ার উদ্যোগ করল। সেই এলোচুলের রাশ বড় একটি খোঁপা করে বে'ধেছে। তাতে গু'জে দিয়েছে সবুজ পাতা শুদ্ধ একটি রক্ত-গোলাপ। আমার টবের গোলাপ। আজ বোধ হয় মনোরমার কাছে না চেয়েই নিয়েছে, না বলেই ছি'ড়েছে। একবার ওর সেই খোঁপার দিকে চোখ পড়তেই আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তবু সেই গোলাপ সুদ্ধ খোঁপাটি অনেকক্ষণ ধরে আমার চোখে লেগে রইল, বলতে পারো বি'ধে রইল। আমি যেন নতুন ক'রে দেখলাম মেয়েদের চুলের রঙ অন্ধকারের মত কালো, আর গোলাপের রঙ রক্তের মত লাল। কিন্তু অন্ধকারে যদি রক্ত ঝরে তবে কি কেউ দেখতে পায়?

জয়ন্তী যাওয়ার আগে আমাদের কাছে বলে গেল হস্টেলের জীবন তার কাছে মোটেই ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে কোন পরিবারের মধ্যে না আসতে পারলে তার

মনে হয় জীবনটা যেন শুকিয়ে গেছে। আর আমাদের মত এমন একটি ভালো পরিবার, সুন্দর সুখী পরিবার জয়ন্তী কোন দিন দেখেনি।

মনোরমা বলল, 'বেশ তো তুমি মাঝে মাঝে এস। এসেই যেতে পারবে না, থাকতে হবে কিন্তু।'

তারপর অনেকদিনের মধ্যে কিছু ঘটল না। তোমাকে আগেই বলেছি উমাপদ, আমার এই গল্পে বাইরের রচনা যত বেশি, ঘটনা তার তুলনায় অনেক—অনেক কম, বলতে গেলে কিছুই নয়। মাঝে মাঝে জয়ন্তীকে ডেকে স্কুল সম্বন্ধে দু'একটা পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছে যে আমার না হল তা নয়, কিন্তু আমি জোর ক'রে তা চেপে রাখলাম। কি জানি মেয়েটি যদি প্রশ্রয় পায়, কি জানি যদি কোন কথা ওঠে। জয়ন্তী আমাদের বাসায় যাতায়াত করে সেইজন্যে এরই মধ্যে স্কুলে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। আমার তা কানে গেলেও আমি তাতে কান পাতিনি। কিন্তু নিজের সুনাম যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল। নিজের ওই ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে সুনামটুকু ছাড়া আমাদের আর কি সম্বল আছে বল। আমার বিদ্যে কম, বুদ্ধি কম, শক্তি সামর্থ্য কিছু নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে সেটুকু ওই কর্তব্যবোধ। আমি কাউকে ঠকাব না, সমাজের যেটুকু সেবা করব, তার বিনিময়ে একটি পয়সাও প্রত্যাশা করব না, একটু প্রশংসাও চাইব না—এই ছিল আমার সংকল্প। দেখলাম মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। আমার কারবার যাদের সঙ্গে তারা সংখ্যায় বেশি নয়। কিন্তু তাই বলে তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতার পরিমাণ যে কম, দাম যে কম তা বলি কি ক'রে।

জয়ন্তীকে নিয়ে গুঞ্জন যতই উঠুক দুদিনেই তা মিলিয়ে গেল। পাড়ার আরো পাঁচজনের কাছে ধমক খেলেন পরশ্রীকাতর কয়েকজন মিস্ট্রেস, আর ছোকরা কয়েকটি মাস্টার। কমিটির সেই দুজন মেম্বার ইলেকশনে এবার আর দাঁড়াতেই পারলেন না। কারণ ও অঞ্চলের সবাই আমাকে চেনে। আমি তো নেতা নই যে দূরে দূরে থাকব। আমি সকলের সঙ্গে মিশি, ছোট বড় সকলের ঘরে যাই, যতটুকু সাধ্য করি। আমি কর্মী, আমি স্বেচ্ছাসেবক। সেকালেও যেমন ছিলাম, একালেও তেমনি।

আমি গেলাম না, জয়ন্তী নিজেই এল এক আবেদন নিয়ে। বি টি পড়বে। স্কুল থেকে, ছুটি চায়, সুবিধে চায়। বললাম, 'বেশ তো পড়। টিচিং লাইনে যদি থাকতে চাও, বি টিটা পাশ ক'রে নেওয়াই তো ভালো।'

জয়ন্তী বলল, 'বাংলায় এম এটাও দিয়ে নেব ভেবেছি। মোটামুটি তৈরীও আছে। কোনটা আগে দেব বলুন। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

হেসে বললাম, 'আমি কি ক'রে বলব। নিজে যা ভালো বুঝবে তাই করবে।'

জয়ন্তী বলল, 'তা নয়, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই আমাকে দিয়ে করাবেন। সংসারে আমার কেউ নেই। আপনাকে যখন পেয়েছি সহজে ছাড়ব না, আপনি যত রাগই করুন।'

বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে বি টিটাই আগে পড়ে নাও। এখন কোন টিচার ছুটিতে নেই। তোমাকে ছুটি দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। তা ছাড়া যা শক্ত যা নীরস সেই কাজই আগে সেরে রাখা ভালো।'

জয়ন্তী বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। নিজে যা ভাবি আর একজনেও যখন সেই কথাই বলেন তখন কি যে ভালো লাগে আপনাকে তা বোঝাতে পারব না। আপনি তো আমার মত এমন আত্মীয়-স্বজনহীন হয়ে একা একা থাকেননি।'

একবার ভাবলাম, বলি তুমিই বা কেন একা একা আছ জয়ন্তী। তোমারও তো বিয়ে থা করবার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কিন্তু বললাম না। জয়ন্তী এগোতে পারে, কিন্তু আমি এগোব না। উঁচু আসনের বেদীতে আমাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। একজন সামান্য টিচারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল প্রকাশ করা চলবে না।

তারপর দু'বছর কি আড়াই বছরের মধ্যে জয়ন্তী বি টি পাশ করল এম এ পাশ করল। দুটোতেই ভালো রেজাল্ট হ'ল ওর। বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস পেল। আশেপাশের স্কুল থেকে এমন কি দু' একটা কলেজ থেকে ওর ডাক এল। এল বেশি মাইনের প্রলোভন।

বললাম, 'জয়ন্তী, তোমার উন্নতির পথে আমি বাধা দিতে চাইনে। তুমি যদি ভালো চাকরি পাও, চলে যেতে পার। এখানে তো বেশি মাইনে তোমাকে আমরা দিতে পারিনে।'

জয়ন্তী বলল, 'শৈলেশদা, মাইনেটাই কি সব। এ স্কুলে আমি নিজের ইচ্ছে মত নিজের খুশি মত কাজ করতে পারছি। অন্য স্কুলে এমন সুবিধে পাব না। তা-ছাড়া দশ বিশ টাকা বেশি পেয়ে কিই বা আমার এমন লাভ। টাকা দিয়ে আমি করব কি। যা পাচ্ছি তাতে আমার হস্টেলের খরচ চলে গিয়েও কিছু বাঁচে।'

বললাম, 'সেইটাই কি সব চেয়ে বড় কথা?'

জয়ন্তী বলল, 'না, তার চেয়েও বড় কথা আছে। সেটা আপনার এই স্কুলের

আদর্শ। আপনার স্কুল আরো পাঁচটা স্কুলের মত ব্যবসার জায়গা নয়। শিক্ষা এখানে দান, শিক্ষা এখানে ব্রত। এতদিনে আমি আমার কাজের ক্ষেত্র পেয়ে গেছি। আপনি তাড়ালেও আমি যাব না।'

জয়ন্তী গেল না। কিন্তু হেড মিস্ট্রেস অণিমা সেনগুপ্ত গেলেন। তিনি আরো বড় স্কুলে বেশি টাকার চাকরি পেয়েই গেলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় আমার দুর্নাম করতে ছাড়লেন না। আমি নাকি তাঁকে বাদ দিয়ে জয়ন্তীর পরামর্শেই স্কুল চালাচ্ছি। স্কুলের লাইব্রেরিটি জয়ন্তীর হাতে তুলে দিয়েছি, বাইরের ভিজিটর কেউ এলে তাকেই আগে এগিয়ে দিচ্ছি। সব জায়গায় জয়ন্তীর সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছি, মিসেস সেনগুপ্তের কোন কৃতিত্বের কথা তুলছিনে। তাঁর কথাগুলি অসত্য নয়, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটা অসত্য, ইঙ্গিতটা অসত্য। আমি জয়ন্তীর ওপর পক্ষপাত করিনি, যোগ্যতাকেই মর্যাদা দিয়েছি। এ সব কানাঘুষোয় আমারও রোখ বেড়ে গেল, জেদ বেড়ে গেল। মিসেস সেনগুপ্ত চলে গেলে, আমি কর্মখালির বিজ্ঞাপন না দিয়ে হেড মিস্ট্রেস হিসেবে জয়ন্তীর নাম সুপারিশ করলাম। দু' একজন মৃদু আপত্তি করলেন। একজন বললেন, 'শত হলেও বাংলার এম এ।' আর একজন বললেন ' সবে মাত্র পাশ করেছে।' আমি বললাম পাশ করবার চেয়েও বড় কাজ করবার যোগ্যতা আর আন্তরিকতা। জয়ন্তীর এই দুইই আছে। কমিটিতে আমার দলের লোকই বেশি। তাই বিপক্ষেরা তেমন সুবিধে করে উঠতে পারলেন না।

চার্জ বুঝে নেওয়ার আগে জয়ন্তী বলল, 'এ কি ভালো হল?'

বললাম, 'খুবই ভালো হল। তুমি কোন দ্বিধা রেখ না। শুধু ভালো ক'রে কাজ করে যাও।'

দুর্নামকে ভয় করি। কিন্তু তাই বলে কি যা কর্তব্য বলে মনে করি তা করব না। মিথ্যে অপবাদের ভয়ে যদি পিছু হটতে শুরু করি তাহলে তো ইঁদুরের গর্তে ঢুকেও রেহাই পাব না।

এ ব্যাপারে মনোরমা কিন্তু মোটেই খুশী হল না। একদিন রাত্রে ছেলেমেয়েরা সব ঘুমোলে আমাদের মধ্যে এই নিয়ে কথান্তর শুরু হল।

মনোরমা বলল, 'ওকে তুমি আটকে রেখেছ কেন।'

আমি বললাম, 'আমি আটকে রেখেছি না জয়ন্তী নিজেই এই স্কুলে রয়ে গেছে।'

মনোরমা বলল, 'থাকবেই তো। পুরোন হেড মিস্ট্রেসকে সরিয়ে ওকে কর্ত্রী বানিয়ে দিয়েছ, এবার পুরোন স্ত্রীকে সরিয়ে ওকে ঘরে নিয়ে এলেই হয়।'

হেসেই কথাগুলি বলল মনোরমা। কিন্তু সে হাসিতে মনের জ্বালা ঢাকা পড়ল না।

বললাম, 'তোমাকে তো বলেছি এ সব তামাসা আমি পছন্দ করিনে।'

মনোরমা বলল, 'দুদিন সবুর কর, তামাসাটাই আসল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

আমি রাগ করে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলাম।

কিন্তু তারপরেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

মনোরমা এই নিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগল। পরে জেনেছিলাম তার কান ভারি করবার জন্যে স্কুলের আরো দু'একজন মিস্ট্রেস পিছনে লেগেছিলেন।

এ সব ব্যাপারে মেয়েদের ঈর্ষা যে কি ভয়ানক, কি দুঃসহ আর দুর্বিষহ সে সম্বন্ধে তোমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা হয়ত নেই উমাপদ। কিন্তু নাটক নভেলে নিশ্চয়ই অনেক বর্ণনা পড়েছ। আমিও পড়েছি কিছু কিছু। এতদিন বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ দেখলাম সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কোন যুক্তি নেই, কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। মেয়েরা যা বিশ্বাস করবে, তার থেকে তুমি ওদের একচুলও নড়াতে পারবে না। বেশি বলে কাজ কি এক-কথায় মনোরমা আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলল। এমন রাত যায় না যেদিন এই ব্যাপার নিয়ে ও আমাকে খোঁটা না দেয়, খোঁচা না দেয়। রাত্রে ফিরতে একটু দেরি হলে ও বলে, 'কি দুজনে মিলে সিনেমায় গিয়েছিলে নাকি, না থিয়েটারে? লেকে না ইডেন গার্ডেনে?' অথচ মনোরমা নিজেই জানে ওসব শখ আমার কোন কালেই নেই। শখ করবার সময়ই হয়নি জীবনে। সেকথা বললে মনোরমা জবাব দেয়, 'তোমার তো নতুন জীবন শুরু হয়েছে।'

তা এক হিসেবে কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যি নতুন জীবনের, নতুন যৌবনের স্বাদ আমি পাচ্ছিলাম। কিন্তু তা লেকে, গার্ডেনে, সিনেমায়, থিয়েটারে নয়। নিজেরই কাজের জায়গায়, নিজেরই কাজ-কর্মের মধ্যে। অফিসে খাটি, স্কুলের জন্যে খাটি, রিফিউজীদের কলোনীতে একটা নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আমার ডাক পড়ল। এসব কাজে উৎসাহ-উদ্যমের অভাব আমার মধ্যে কোনদিনই ছিল না। কিন্তু এবার যেন তা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ল, পাশের হার বাড়ল, মেয়েদের সেকশনে একটা জেনারেল স্কলারসিপ পর্যন্ত পেল, যা স্কুলের ইতিহাসে কোনদিন ঘটেনি। আমি টিচারদের মাইনের গ্রেড বাড়িয়ে দিলাম। হেড-মাস্টার, হেডমিস্ট্রেসের মাইনে হল দুশ। ধারে কাছে কোন স্কুলে অত দেয় না। কেউ কেউ কানাকানি করল এই বেতন-বৃদ্ধি জয়ন্তীর জন্যে। যারা আমার দলে ছিল তারা বলল, তা যদি হয় তাতে ক্ষতি কি। সুবিধে তো কেবল জয়ন্তী পাচ্ছে না, সবাই পাচ্ছে। নিজের কৃতিত্ব বাড়িয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়ে আমি আমার স্ত্রীর ওপর শোধ নিলাম, শত্রুদের মুখে ছাই দিলাম।

হ্যাঁ, জয়ন্তীর সঙ্গে দিনান্তে কি দিনের শুরুতে আমার একবার করে দেখা হয়, কথা হয়। কিন্তু সেকথা প্রায়ই কাজের কথা। স্কুলের আরো উন্নতি কি ক'রে হবে সেই কল্পনা, সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা খানিকক্ষণ আলাপ করি। সে সব আলাপ শেষ হয়ে গেলে জয়ন্তী হয়ত বলে, 'আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু আমার দারুণ নালিশ আছে। কেবল খাটছেন, শরীরের দিকে মোটেই তাকাচ্ছেন না।'

তোমার কাছে অস্বীকার করব না উমাপদ, ভারি মধুর লাগত কথাগুলি। মনে হ'ত জীবনে এই প্রথম একটি মেয়ের মুখে ওসব কথা শুনেছি। অথচ মনোরমা যে কত হাজারবার কত হাজার-ভাবে আমার শরীরের জন্যে উদ্বেগ জানিয়েছে তা সেই সব মুহূর্তে একবারও মনে পড়ত না।

জয়ন্তীর কথার জবাবে আমি হেসে বলতাম, 'নিজের শরীরের দিকে নিজে তাকালে অন্যের চোখদুটো যে বেকার হয়ে থাকে, আর একজনের অনুযোগ শুনবার সুযোগ হয় না যে।'

জয়ন্তীও হাসত, 'তলে তলে এত। এত সব কাজকর্ম বুঝি সেইজন্যেই।'

কখন যে আমার সেই উঁচু আসন থেকে আমি ওর সমতলে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলাম তা টেরও পাইনি কিংবা টের পেলেও উঁচু বেদীতে উঠে বসবার মত আমার যেন আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। জয়ন্তী যদি আমার সহকর্মী, সহমর্মী, সমধর্মী, সমব্যথী হয় তাহলে সমবয়সীই বা কেন হবে না? দৈবক্রমে কয়েক বছর আগে জন্মেছি বলে? সেই আকস্মিকতার বাধাটাই কি বড় বাধা?

এই সময় আমাদের দেখাসাক্ষাতের আরো একটা বাধা ঘটল। জয়ন্তী বলল, 'আমি এম এড্ পড়ব। আপনি তার ব্যবস্থা করে দিন।'

এ বাধা ঠিক আকস্মিক নয়, এ আমাদের দুজনের মিলিত সৃষ্টি। আমিই ওকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। টিচিং লাইনেই যখন আছে জয়ন্তী, থাকবেও, তখন নিজের যোগ্যতা ও আরো বাড়িয়ে তুলুক। কলকাতায় এম এড্ এর কোর্স দু'বছরের, দিল্লীতে একটা শর্ট কোর্স আছে। ন'দশ মাস লাগে।

জয়ন্তী বলল, 'আমি দিল্লীতেই পড়ব। বয়স হয়ে গেছে এখন কি আর পড়াশুনোয় মন লাগে। আপনি দিল্লীতেই একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

আমি বললাম, 'দিল্লী যে বহুদূরে।'

জয়ন্তী বলল, 'টালীগঞ্জ থেকে ভবানীপুরের দূরত্বই কি কিছু কম? আপনি তো সেই পথটুকুও পাড়ি দিতে পারলেন না। একদিনও এলেন না আমাদের হস্টেলে।' তারপর একটু হেসে বলল, 'দিল্লীই ভালো। এই উপলক্ষে বেশ একটু বেড়ানোও হবে।'

বেড়ানোটা যেন ওর একার নয়, আর একজনেরও।

আমিই সব ব্যবস্থা করে দিলাম। সরকারী মহলে ঘোরাঘুরি ক'রে একটা মোটা স্টাইপেন্ড পাইয়ে দিলাম ওকে। ছুটি দিলাম স্কুল থেকে। তারপর ওর যাওয়ার দিন হাওড়া স্টেশনে ওকে তুলে দিতে গেলাম। একবার বললাম, 'তোমার কোন বন্ধুবান্ধবকে খবর দিলে না।'

ট্যাক্সিতে ও আমার ঠিক পাশেই বসেছিল। কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়েই ও জবাব দিল, 'আমার কোন বন্ধু নেই, আর কোন বন্ধু নেই।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বন্ধু থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল।'

জয়ন্তী বলল, 'কি জানি। পুরুষদের বিশ্বাস করা যায় না, তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না। তারা বড় ছোট, বড় হীন। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম দেখলাম আপনি। আপনার মধ্যে এমন একজনকে পেলাম যাঁকে সত্যিই শ্রদ্ধা করতে পারি, সমস্ত মন দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারি।'

খুব কাছাকাছিই বসেছিলাম আমরা। ওর শরীরের ছোঁয়া আমার শরীরে লাগছিল, ওর দেহের উত্তাপ লাগছিল

আমার শরীরে। আমি হয়ত সেই মুহূর্তে ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিতে পারতাম। কিন্তু শ্রদ্ধা। ওই একটি শব্দে আমি হিম হয়ে গেলাম। হিমালয়ের মত স্থাণু হয়ে রইলাম।

ট্যাক্সি থেকে ট্রেন। দিল্লী মেলের একটা ইণ্টারক্লাস কামরায় আমার সংগে অনেকক্ষণ বসে গল্প করল। আমাকে ভরসা দিয়ে বলল স্কুলের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস নীরজা নন্দীকে ও সব বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠিক করে এসেছে। তাকে দিয়ে কাজ চালাতে কোন অসুবিধে হবে না। তারপর হেসে বলল, 'কিন্তু দেখবেন আমার জায়গা যেন ঠিক থাকে। এরই মধ্যে শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে ফেলবেন না যেন।'

আমি বললাম, 'স্থান শূন্য হলে তবে তো ফের পূরণ করার কথা ওঠে।'

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। আমি নেমে আসছি, হঠাৎ জয়ন্তী নিচু হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিল।

আমি বললাম, 'আঃ আবার ওসব কেন। তুমি তো জানো ওই প্রণাম ট্রনাম আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'

জয়ন্তী আমার দিকে হেসে তাকাল, 'খুব করেন। প্রণাম আর সুনাম ছাড়া আপনি কি কিছু চান?'

গাড়ি ছেড়ে দিল। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি সেই চলন্ত গাড়ির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। জয়ন্তী কি আমার সংগে তামাসা করল? না আমার দ্বিধা-সংকোচ, আমার প্রৌঢ় বয়সের হিসেবী মনকে সত্যিই তিরস্কার করে গেল? সুনাম। সুনাম চাইনে একথা কি বলতে পারি? সুনাম কে না চায়। চোর, জুয়াচোর অতি বড় লম্পটও এই সুনামের কাঙাল। সাধুর বেশ ধরে সে নীতি-বাদীদের এই সামাজিক সুনাম চুরি করতে চায়। জানো উমাপদ, একজন লম্পটই আর একজন লম্পটকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, বেশি ব্যঙ্গ করে। একজন মাতাল আর একজন মাতালের কাছে উপহাসের পাত্র। মদ আর মেয়ে সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে যার দুর্বলতা যত বেশি আর একজন দুর্বলের ওপর সে তত বেশি খাপ্পা। কিন্তু যদি এই গোপনতা ওরা ঘুচিয়ে দিতে পারত, যদি একজোট হয়ে বলতে পারত—যা করছি আমরা বেশ করছি, তাহলে এই গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বলে এরাই গভর্নমেণ্ট গঠন করত। হ্যাঁ, এই চোর, জোচ্চোর বদমাস মাতালের দল। দলে তো এরাই ভারি। তাহলে আর ঢাক ঢাক চুপ চুপের দরকার হত না। আইন তৈরী করত এরা, নীতি-শাস্ত্র এরা নতুন ক'রে লিখত। চৌর্য আর লাম্পট্য নৈতিক সমর্থন পেত, সামাজিক সমর্থন পেত। তাহলে সামাজিক মানুষের বুকের মধ্যে পরম অসামাজিক জীব এমন ক'রে বাস করতে পারত না, এমন ক'রে দিনরাত তাকে কুড়ে কুড়ে খেতে পারত না। কিন্তু চরিত্রহীনদের আসল হীনতা কোথায় জানো? নীতি-বাগীশদের নীতির কাছে তারাও মাথা নোয়ায়।

ফিরে এলাম বাড়িতে। বেশ একটু রাতই হল ফিরতে। মনোরমা বলল, 'আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি ওর সংগে দিল্লী পর্যন্তই গেলে। গেলেই পারতে। এই কটা মাস বিরহযন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারবে তো?'

আমি আরও ধারালো বিদ্রূপে বললাম, 'পারব। এখানকার মিলনের যন্ত্রণাও তো কম নয়। বিষে বিষে বিষক্ষয় হবে।'

মনোরমা বলল, 'ও আমি বুঝি আজকাল তোমাকে কেবল যন্ত্রণাই দিই? আমাকে বিষ এনে দাও, খেয়ে মরি। তোমার সব যন্ত্রণা মিটুক।'

আমি জবাব দিলাম, 'বিষ খেয়ে যারা মরে, তারা কারো এনে দেওয়ার অপেক্ষা করে না। খেতে হয় খেলেই পার।'

গিয়েই জয়ন্তী পেঁছি সংবাদ দিল। প্রথমে পোস্ট কার্ড আমার বাসার ঠিকানায়। বউদিকে প্রণাম জানিয়েছে, আর ছোটদের স্নেহাশিস। আমি জবাব দিলাম সরকারী এনভেলপে। জয়ন্তী পাল্টা চিঠি দিল বেসরকারী রঙীন খামে। এবার আর বাসার ঠিকানায় নয়, স্কুলের ঠিকানায় নয়, আমাদের ইনসিওরেন্স অফিসের ঠিকানায়। ওপরের খাম রঙীন, ভিতরের কাগজও রঙীন। চিঠির পর চিঠি অবশ্য শুরুতে শ্রদ্ধাষ্পদেষু পাঠ দিয়ে চিঠির শেষে জয়ন্তী যথারীতি প্রণতা কি বিনীতা হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝখানের কথাগুলি পড়লে মনে হয় এই পত্রালাপ যেন দুই বন্ধুর মধ্যে। তাতে অসম বয়স, অসম অবস্থার কোনরকম আভাস নেই সে সব চিঠির কোনটিতে থাকত সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা, কোনটিতে দিল্লীর আবহাওয়া আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা। বেশির ভাগ চিঠিরই কোন বিষয় থাকত না। যেন লেখার আনন্দে লিখে যাচ্ছে জয়ন্তী। লিখতে ভালো লাগছে, লিখতে ইচ্ছে করছে তাই ওর পক্ষে যথেষ্ট। এক এক চিঠিতে এক একটা মুড ধরা পড়ত। রোদ বৃষ্টি, জ্যোৎস্না আঁধার, শীত গ্রীষ্ম কিসে ওর মনের কিরকম রূপান্তর হয়, তা লিখে জানাতে ভালোবাসত জয়ন্তী। শহরতলীতে কি শহরের কাছাকাছি কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে খুঁটেখুঁটে তার বর্ণনা দিত। আর মাঝে মাঝে আমার প্রশস্তি করত। লিখত, আমার মত মানুষ সে আর দেখেনি। কোন কোন চিঠিতে আমাকে দিল্লী যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণও জানাত। লিখত, বড় একা একা লাগে, বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে একেক সময়।

আমার চিঠি লেখার অভ্যাস ইদানীং প্রায় ছিলই না। আমি বিবৃতি লিখি, খবরের কাগজের সম্পাদকের নামে খোলা চিঠি পাঠাই, স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরীর অর্থসাহায্য বৃদ্ধির জন্যে সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করি। ব্যক্তিগত চিঠি পড়া, ব্যক্তিগত চিঠি লেখা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জয়ন্তীর চিঠিগুলি আমার মনে নতুন আফসোস জাগিয়ে দিল। আমি তো কোনদিন

ভাষাশিল্পের চর্চা করিনি। যদি করতাম, যদি লেখক হতাম তাহলে বোধহয় ওর ওই সব চিঠির জবাব দিতে পারতাম। কথার আড়ালে মনের কথাকে কি করে আধখানা ঢাকতে হয়, আধখানা বলতে হয় সে ছলা কলা তো কোনদিন শিখিনি। যদি শিখতাম, তাহলে বোধহয় জয়ন্তীর সেই সব চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হত। যাই হোক, চিঠিতে আমি কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতাম না। কারণ যতং বদ মা লিখ, এই নীতি আমি মেনে চলতাম। মোটামুটি সাদা মাটা ভাষায় ছোটখাট চিঠিই লিখতাম। তবু সেই সব চিঠিও জয়ন্তীর ভালো লাগত। সে লিখে জানাত সারল্যের যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য আছে আমার ভাষায়, আমার চিঠিতে। আন্তরিকতার, হৃদয়বত্তার যে উত্তাপ, সেই তাপ রয়েছে আমার মধ্যে। আমি লিখতাম, 'জয়ন্তী, তোমার ওসব প্রশংসা আমার কানে নিন্দার মত লাগে, আমার মনে ব্যঙ্গের মত বেঁধে। আমি মোটেই ভালো নই, মোটেই বড় নই, অনেক হীন, অনেক ছোট।' জয়ন্তী লিখত, 'আপনি মিথ্যে বিনয় করছেন। আপনি জানেন না যে আপনি কি। আপনি ভাবছেন এসব বুঝি আমার স্তুতি। তা নয়, এ আমার স্তব। তাতো আমি নিজে ইচ্ছে ক'রে করিনে। আমার মুখ থেকে তা আপনিই বেরিয়ে পড়ে।'

তোমার মত দিল্লীতে আমারও কিছু বন্ধুবান্ধব আছে উমাপদ। বড় বড় সরকারী চাকুরে। বেসরকারী কাজেও কেউ কেউ আছে। তাদের মধ্যে দু'একজন অনেকদিন থেকেই আমাকে দিল্লীতে যেতে বলছিল। সে বলা মুখের বলা নয়, অন্তরের সায়ও তাতে ছিল। তবু আমার যাওয়া হত না। একটা না একটা কাজে আটকা পড়ে যেতাম। সেবার পুজোর ছুটিতে খানিকটা সময় হল। ভাবলাম যাব নাকি। আসব নাকি একটু বেড়িয়ে। কিন্তু মনের এই ভাবনা মুখ ফুটে কোথাও প্রকাশ করবার আগেই আমাদের কমিটির এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বিজন ডাক্তার একদিন হেসে বলল, 'ওহে শৈলেশ, খেটে খেটে তোমার শরীর যে আধখানা হয়ে গেছে। যাওনা, একটু চেঞ্জ টেঞ্জ থেকে ঘুরে এস। এ সময় দিল্লী অঞ্চলের ক্লাইমেট বেশ ভালো। দু'এক সপ্তাহেই শরীর-মন সেরে যাবে।'

বললাম, 'আমার শরীর মনের জন্যে তোমার ভাবতে হবে না ডাক্তার। তুমি অন্য রোগীদের দেখ।'

যাওয়া হল না। গেলে দু'একটা দরকারী কাজও সেরে আসতে পারতাম, শুধু বেড়াতেই যেতাম না। কিন্তু গেলাম না।

মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বলতা বিজন-ডাক্তারেরও আছে, আমি জানি। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপটা ও-ই সবচেয়ে বেশি করত। তোমাদেরই একজন বিখ্যাত লেখকের লেখায় পড়েছিলাম, 'Love is both mystery and joke.' প্রেম একই সঙ্গে সুগভীর রহস্য আর পরিহাস। আমার কি মনে হয় জানো? সেই গভীর রহস্যটা মানুষের নিজের বেলায়। সে নিজে যখন প্রেমে পড়ে তখন তার মধ্যে মহিমা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু অন্যের প্রেমে পড়াটা তার কাছে আছাড় খেয়ে পড়ার সামিল।

দিল্লীর দূরত্বকে মেনে নিলাম। কিন্তু পুরী যাওয়ার সুযোগ ঘটল। এক বন্ধু যাচ্ছিলেন পুরীতে তিনি বললেন, 'চলহে, দু'চার দিন একটু সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে আসবে।' তিনি পরিবার নিয়ে যাচ্ছেন না। তাই আমারও সপরিবারে যাওয়ার কথা ওঠে না। কিন্তু মনোরমা শুনেই বেঁকে বসল। বলল, 'তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারব না। তোমার পুরীটুরী সব ভুঁয়ো। তোমার যাওয়ার মাত্র একটি জায়গাই আছে।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তুমি কি আমাকে সেই বৃটিশ সরকারের মত নজর-বন্দী করে রাখতে চাও? আমার ওপর তোমার এতই যদি অবিশ্বাস, আলাদা হয়ে থাকলেই পার। আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখলেই পার।'

মনোরমা বলল, 'হ্যাঁ, এখন তো তুমি তাই চাও। তাইতো তোমার মনের ইচ্ছে।'

দিনভর খুব কথা কাটাকাটি ঝগড়া-ঝাটি চলল।

আমি বললাম, 'তুমি যে সব কথা বলছ, যে সব দুর্নাম দিচ্ছ, আর কেউ হলে তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলত।'

মনোরমা বলল, 'জিভ ছিঁড়ে আমাকে বোবা বানাতে পারবে নাকি? দেখনা ছিঁড়ে।'

আমি ভাবলাম কোন বাধাবন্ধন মানব না। সন্ধ্যার গাড়িতে সত্যিই পুরী চলে
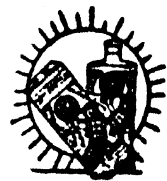
যাব। কিন্তু বিকেল বেলায় এক কাণ্ড ঘটল। দেখি মনোরমার সেই রুদ্রাণী মূর্তি আর নেই। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ও কাঁদছে। ওর সেই কালো, বিপুল স্থূল দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে দেখতে পেলাম। সেই কাঁপুনিতে আমার অন্তরের গভীরে হঠাৎ ভূমিকম্পের মত একটা ঝাঁকুনি লাগল উমাপদ। আমি আমার ঘরখানার চারদিকে তাকালাম। এলোমেলো অগোছালো ঘর। যেন সংসারের সব শ্রীছাঁদ নষ্ট হয়ে গেছে। অর্মানিতে আমার স্ত্রী বেশ সুগৃহিণী। সাজাতে গুছাতে, সব আসবাবপত্র বিছানাপাটি পরিপাটি ক'রে রাখতে ভালোবাসে। কিন্তু কিছুদিন ধরে ওর কোন কিছুতেই যেন মন নেই। যে ছেলেমেয়েগুলি ওর চোখের মণি তাদের দিকেও মনোরমা তাকাতে ভুলে গেছে। তাদের সমানে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। সব হতচ্ছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার মত আমার দৃষ্টি এড়িয়ে এঘর থেকে ওঘরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশি বয়সে বিয়ে করেছি। ছেলেপুলে হয়েছে আরো বেশি বয়সে। তাই ওরা এখনো সাবালক হয়ে ওঠেনি: তাহলে ব্যাপারটা ওরা সব বুঝতে পারত। কিন্তু সবটা না পারলেও ওরা খানিকটা খানিকটা যেন এখনই বুঝতে পারছে। এটুকু বুঝতে ওদের বাকি নেই যে, সব অশান্তির মূলে আমিই দায়ী। আমার জন্যেই ওদের মা কাঁদছে, কষ্ট পাচ্ছে। ওদের বোবা চোখে আমি সুস্পষ্ট অভিযোগ দেখতে পেলাম। 'কেন এমন হচ্ছে? ব্যাপারখানা কি?'

আমি আস্তে গিয়ে আমার স্ত্রীর পাশে বসলাম। আস্তে আলগোছে হাত রাখলাম ওর পিঠে। বললাম, 'মনোরমা, রমা, কাঁদছ কেন, কেঁদ না।'

আমার এই সামান্য আদরে ঠিক একটি অল্পবয়সী মেয়ের মতই মনোরমা ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'আমি কাঁদব না তো সংসারে কাঁদবে কে। তুমি যাও, তুমি সুখী হও, তুমি সুখে থাক। আমি আর তোমাকে বেঁধে রাখতে চাইনে। কি দিয়ে বেঁধে রাখব। আমার কি আছে।'

আমি আমার মোটা খদ্দরের ধুতির কোচার খুঁট দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'রমা, তুমি মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ।'

মনোরমা বলল, 'হয়ত তোমার কথাই সত্যি। হয়ত সবই মিথ্যে। কিন্তু তোমাকে তো কুরূপা মেয়েমানুষ হয়ে সংসারে জন্মাতে হয়নি। তোমাকে তো আমার মত নির্গুণ, অশিক্ষিতা হয়ে থাকতে হয়নি। তুমি কি করে বুঝবে আমার দুঃখ, আমার জ্বালা। আমার মত মেয়ে স্বামী সংসার সব পেয়েও যে শান্তি পায় না, তাকে যে কেবলি হারাই হারাই ভয়ে থাকতে হয় সে কথা তুমি বুঝবে কি করে।'

আমার পুরী যাওয়া আর হল না। সারা সন্ধ্যাটা স্ত্রীর কাছে বসে রইলাম। আমার ছোট ঘরের মধ্যে বিশাল সমুদ্র আর তার অগুণতি ঢেউয়ের ওঠাপড়া অনুভব করতে লাগলাম।

একটু আগে তোমাকে বলেছি উমাপদ, সংসারে চোর জোচ্চোর বদমায়েসের সংখ্যাই বেশি। সাহস থাকলে তারাই খোলাখুলিভাবে রাজত্ব করত। কিন্তু কথাটা সত্যি নয় উমাপদ। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে কি করে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেও যে আছে আধখানা করে সৎ মহৎ আর ভালোমানুষ। তাদেরও যে আধখানা হিংসা, আধখানা অহিংসা। তারা নীতির কছে মাথা নোয়ায় একথা মিথ্যে। তারাও প্রীতির কাছেই হৃদয় পাতে।

জয়ন্তীর কাছে চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করলাম। ওর দু' তিন খানা চিঠির জবাবে আমি একখানা পোস্টকার্ড কোনবার দিই কোনবার দিইনে। এ্যাকটিং হেড-মিস্ট্রেসকে বলি জবাব দিতে।

তারপর জয়ন্তী এম-এড্ ডিগ্রী নিয়ে দিল্লী থেকে ফিরে এল। ফিরে এসে দখল করল গদি। আমাকে নিরালায় পেয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম আমি আর ফিরব না।'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'কেন।'

সে বলল, 'চিঠিপত্র বন্ধ করেছিলেন যে। আপনি কি কোন সম্পর্কই রাখতে চান না?'

তরুণী রূপবতী নারীর অভিমানের সেই অপূর্ব ভঙ্গি দেখে আমার সেই মুহূর্তে মনে হল উমাপদ সংসারে মান-সম্মান সব তুচ্ছ। রূপের আগুনের কাছে সব গুণ নিষ্প্রভ। পুড়ে মরার মত সুখ আর নেই, জ্বলে মরার মত নেই আনন্দ। পুরুষের শুধু সৃষ্টি নয়, অনাসৃষ্টিও। যে সব খোয়াতে জানে না, সব হারাতে জানে না সে শুধু আধখানা পায়। যে নিজের বিত্ত বিভব সারাজীবন ধরে পাহারা

দেয় সে তো যখ। আর যে জুয়াড়ী এক-রানে সব খুইয়ে গাছতলায় ছেঁড়াকাঁথা পাতে তার এক চোখে লাখ টাকার স্বপ্ন আর এক চোখে লাখ টাকার স্মৃতি। কিন্তু বুকের মধ্যে তোলপাড় করলেও মুখের কথায় শান্ত সংযত থাকবার শিক্ষা আমি পেয়েছি। এ আমার অনেকদিনের অভ্যাস। সহিংস অহিংস দুই সংগ্রামেই এ অস্ত্রের প্রয়োগ করতে হয়েছে।

আমি তাই ওর কথার জবাবে মৃদু হেসে বললাম, 'সম্পর্ক থাকবে না কেন জয়ন্তী। তুমি এই স্কুলের বেতনভুক হেডমিস্ট্রেস, আমি অবৈতনিক সেক্রেটারী। এ সম্পর্ক আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে।'

জয়ন্তী আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে ওর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল আর পর মুহূর্তে রাঙা টুকটুকে হয়ে উঠল। স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা, সেই সম্পর্কই থাকবে।'

ওর সেই রণোন্মাদিনী মূর্তি দেখে আমি প্রমাদ গনলাম। হয়ত সুযোগ পেলে সাদা নিশান উড়িয়ে সন্ধিও করতাম, কিন্তু তেমন কোন অবকাশই পেলাম না। তারপর থেকে ছোট বড় সব ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে শুধু শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। স্কুলে হেডমিস্ট্রেস বড় না সেক্রেটারী বড়। স্কুল সম্বন্ধে ও বিশেষ বিদ্যা অর্জন করে এসেছে আর আমি সেখানে হাতুড়ে। নামের পিছনে ওর ডিগ্রীর মালা, আমার সেখানে একটি ডিগ্রীও নেই। স্কুলের খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার তো কোন ধারণা নেই উমাপদ। বিশদ বর্ণনায় তুমি কোন উৎসাহ পাবে না, বরং তোমার বিরক্তি বাড়বে। মোট কথা প্রত্যেকটি ব্যাপারে ও আমার নির্দেশ অমান্য করতে লাগল। আমাকে অপমান করতে লাগল, আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকে আনাড়ীর সিদ্ধান্ত বলে উপ-হাস করতে লাগল। এক্জিকিউটিভে জয়ন্তীও বিশেষ সদস্য। মিটিংগুলিতে ও আমার সমালোচনা করে। ওর চাপা শ্লেষ আর ব্যঙ্গ থেকে আমি রেহাই পাইনে। বিজন ডাক্তার মুখ টিপে হাসে। আমাকে আড়ালে ডেকে বলে, 'পায়ে পড় হে পায়ে পড়। দেহি পদপল্লবমুদারম্। না হলে এ যাত্রা আর রক্ষা নেই।'

জয়ন্তী নিজের গরজে নিজের শক্তিতে একটা মেয়েদের হস্টেল খুলল।

আমি বললাম, 'আবার হস্টেলের কি দরকার।'

জয়ন্তী বলল, 'আমি থাকব কোথায়। আমার আগের হস্টেলের সিট তো গেছে। আপনার বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে। কিন্তু সেখানে কি আমার জায়গা হবে? আপনি রাজী হলেও বউদি নিশ্চয়ই রাজী হবেন না।'

ওর শ্লেষে আমার দুই কান লাল হয়ে উঠল। যেন কে তা আচ্ছা করে মলে দিয়েছে। মনে পড়ল একদিন আশ্রয় ভিক্ষার জন্য জয়ন্তী আমার ওখানেই গিয়েছিল। সেদিন মনোরমার কাছে ও বলেছিল আমার বাড়ির বারান্দাতেও ও মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। আজ দিন বদলে গেছে, আজ ওর সাহস বেড়েছে। আর এই সাহস বাড়াবার মূলে আমি। আমি ওকে আশ্রয় না দিলেও প্রশ্রয় দিয়েছি।

এমনি চলতে লাগল। যুদ্ধের কৌশল জয়ন্তীও কম জানে না। কাজকর্মে ওর আরো বেশি যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কমিটিতে ওর আধিপত্য। এক-জনের প্রিয়া না হলে কি হবে, জয়ন্তী আজ জনপ্রিয়া।

তারপর একটা ব্যাপার নিয়ে এই সংগ্রাম একেবারে চরমে উঠল। ও রুল জারি করে দিয়েছিল হেডমিস্ট্রেসের বিনা অনুমতিতে মেয়েদের স্কুলে কেউ ঢুকতে পারবে না। এমন কি কমিটির সম্ভ্রান্ত সদস্যরাও নয়। রুলটা অবশ্য ভালোই। কিন্তু এটা তো আমার হাত দিয়েই জারি হওয়ার কথা। সব নোটিশের নিচে আজ-কাল জয়ন্তীর স্বাক্ষর থাকে। কেন আমি কি নিরক্ষর হয়ে গেছি?

কমিটির পুরোন সদস্য পরিমলবাবু সেদিন এসে নালিশ জানালেন। বিশেষ একটা জরুরী কাজে তাঁর মেয়েকে ডাকবার জন্যে তিনি স্লিপ না দিয়েই স্কুলের ভিতরে ঢুকেছিলেন, জয়ন্তী তাঁকে স্কুলের ঝিকে দিয়ে অপমান করিয়েছে। ঝি সুধাময়ী এসে বলেছে, 'কাম্পাউন্ডের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। এখানে ঢুকবার নিয়ম নেই। মেয়ে পরে যাচ্ছে।'

পরিমল দত্ত সেই দুজনের একজন যাঁরা শুরু থেকেই জয়ন্তীর বিরুদ্ধে ছিলেন, আমার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু এবার আমি তাঁর পক্ষ নিলাম। জয়ন্তীকে ডেকে বললাম, 'তোমাকে পরিমলবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি এই স্কুলের সঙ্গে অনেকদিন থেকে আছেন। গোড়াতে অনেক টাকা ডোনেট করেছেন।' জয়ন্তী বলল, 'সেইজন্যে তাঁর অনেক অন্যায় আমরা মেনে নিতে পারিনে। তিনি অহেতুক টিচারদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছেন। আরো কি কি করেছেন তা আপনিও জানেন।'

আমি শক্ত হয়ে বললাম, 'তাঁর বিচার নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তুমি তার আগে ক্ষমা চাইবে। এটা নিয়ম শৃঙ্খলার কাছে নতি স্বীকার, কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়।'

জয়ন্তী বলল, 'আমি তা পারব না। আপনি যেটাকে নিয়ম বলছেন, সেটাই ঘোরতর অনিয়ম।'

আমি বললাম, 'আমাদের নিয়ম যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে চাকরি কোরো না।'

জয়ন্তী বলল, 'আপনি এই কথা বলছেন? এত বড় জেদ আপনার?'

আমি জ্বলে উঠলাম, 'জেদ? হ্যাঁ, এত বড়ই আমার জেদ। সেই মুনি-মূষিকের গল্পের কথা ভুলে গেছ জয়ন্তী? যে মুনি ইঁদুরকে সিংহ বানায়, ফের তাকে ইঁদুর করবার শক্তিও সেই রাখে।'

জয়ন্তী বলল, 'কিন্তু সে শক্তি আপনি রাখেন না। কারণ এটা মুনি-মূষিকের গল্প নয়, নারী-পুরুষের গল্প। আমি আপনার কাজ ছেড়ে দিলাম।'

অনেকে অনেকরকম সাধাসাধি করল কিন্তু জয়ন্তী তার পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিল না। যেদিন গেল আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে গেল না। আমি ভাবলাম কৃতজ্ঞতা বলে সংসারে কোন সত্যিকারের বস্তু নেই। ওটা কেবল কথার কথা।

বছর দেড়েকের মধ্যে জয়ন্তীর কোন খোঁজ আমি রাখিনি। খোঁজ নেওয়াটা

আমার মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করেছি। তবু খবর এসে পেঁাছেছে কানে। আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য সে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। লণ্ডনে আছে, পড়ছে। টাকাটা সরকারের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে। বেসরকারীভাবে পাওয়াটাও ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। জয়ন্তীর মত মেয়ের টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়।

তারপর এক বছর বাদে জয়ন্তীর এই চিঠিখানা কাল আমি পেয়েছি। তুমি দেখতে পার উমাপদ। এ চিঠির মধ্যে না দেখাবার মত কিছু নেই।'

শৈলেশ্বরবাবু বুকপকেট থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

উমাপদবাবু সাগ্রহে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেনঃ—

শ্রীচরণেষু,

অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। যদিও লিখবার ইচ্ছে অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল। কিন্তু পেরে উঠছিলাম না। যে দুর্ব্যবহার আপনার সঙ্গে করে এসেছি প্রথমে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিই। যদিও জানি, ক্ষমা আমি না চাইলেও পাব, না চাইতেই পেয়েছি। এত বড় অপরাধ, এত বড় অকৃতজ্ঞতা আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারেন বলে আমি জানিনে।

আপনাকে একটি খবর জানাবার আছে। আমি বিয়ে করেছি। সে এখানকার এমব্যাসিতে কাজ করে। দেখতে শুনতে মোটামুটি মন্দ নয়। বয়স আমার চেয়ে দু' এক বছরের কমই হবে, তাই অনেক বাড়িয়ে বলে। আমাদের আলাপ এই বিদেশে এসেই হয়েছে।

এবার দেশে ফেরারও সময় হয়ে এল। দিল্লীতে একটা ভালো চাকরির কথা হচ্ছে। শৈলেনও দূতাবাস থেকে এবার নিজের আবাসে ফিরবে। আমার স্বামীর নামের সঙ্গে আপনার নামের অদ্ভুত মিল রয়ে গেল। কবিতার চকিত মিলের মত এই মিল আকস্মিক। তাই উল্লেখ না করে পারলাম না। আমরা যতই বস্তুবাদী হইনে কেন, জীবন থেকে আকস্মিকতা কি তাতে বাদ যায়।

দেশে ফিরব। ফিরে গিয়ে যেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়। আগে থেকেই নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলাম। এবার কিন্তু পায়ের ধূলি না দিয়ে পারবেন না। এবার তো আপনার সংকোচের আর কোন কারণ রইল না।

বউদির কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ নেই। কিন্তু বাচ্চাদের স্নেহ জানাবার দাবি এখনো আছে। দাবি বলব না সাধ বলব? কেমন আছে ওরা? পড়াশুনো কেমন চলছে? ওদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনার আরো পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মত ওরাও কিন্তু এক একটি প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মত খ্যাতিমানেরা প্রায়ই সে-কথা মনে রাখেন না।

বিদ্যাপীঠের কোন খবর জিজ্ঞাসা করবার অধিকার নিজেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আপনি যদি বিনা জিজ্ঞাসায় কিছু জানান তাহলেই জানতে পারব। প্রণাম জানাই। ইতি—

সেদিনের সেই দুর্বিনীতা
জয়ন্তী

একবার নয়, দু' দু'বার চিঠিখানা পড়লেন উমাপদ লাহিড়ী তারপর ভাঁজ ক'রে খামের ভিতরে চিঠিটা ভরে বন্ধুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মৃদু হাসলেন, বললেন, 'পড়লাম।'

শৈলেশ্বর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

উমাপদ হেসে বললেন, 'মেয়েটি লেখাপড়া ভালোই জানে। ভদ্রতা করতেও বেশ শিখেছে।'

শৈলেশ্বর আহত স্বরে বললেন, 'লেখাপড়া, ভদ্রতা—এসব তুমি কি বলছ লাহিড়ী?'

উমাপদ বললেন, 'তবে? তুমি কি ভেবেছ ও তোমার প্রেমে এখনো হাবুডুবু খাচ্ছে কি কোনদিন খেয়েছে?'

শৈলেশ্বর বললেন, 'না না, আমি তো বলছিনে। তবে—'

উমাপদ তেমনি স্মিতমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, তবে আর তবু একটু আছে। আমার মনে হয় কি জানো? প্রথম বয়সে কোন তরুণ বয়সী বন্ধুর কাছ থেকে ও কোন দারুণ ঘা খেয়েছিল। তাই যৌবনের ওপর ও এই বিতৃষ্ণা। স্বাভাবিক প্রেমের ওপ ওর এই বিরাগ। তাই ওর এত কর্মযোগ প্রেমের শূন্য স্থান শ্রদ্ধা দিয়ে প্রী দিয়ে ও ভরে তুলতে চেয়েছিল। তা পার কেন? পারল না যে তা তো পরে বোঝা গেল। তোমার কাছ থেকে ধা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চৈতন্য হল বছর যেতে না যেতেই যৌবনকে বর ক'রে নিল।'

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে উমাপ এবার একটু কোমল সুরে বললেন, 'ত এ নাটকে তোমারও ভূমিকা আছে শৈলেশ বেশ বড় ভূমিকাই আছে। মধ্যবর্তী

ামিকা। তুমি শুধু ওকে কাজই দাওনি, স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, হ্যাঁ বাসনাভরা ভালোবাসা দিয়ে ওর মনকে সংসারের দিকে টেনে এনেছ। সেইজন্যে তোমাকে ও চিরকাল শ্রদ্ধা করবে, তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। আমিও তোমাকে শ্রদ্ধা করি শৈলেশ। দেহের টান তো সোজা টান নয়। বয়সে যত ভাঁটা পড়ে, ওতে মন তত উজান বয়। দিবগুণ জ্বলে নিববার আগে। আমরা তখন পণ্ডিত হই। আধখানা ছেড়ে আধখানা নিই। মন মেলে না তাই শুধু দেহ ধরে টান দই। শ্রদ্ধাকে প্রেম বলে ভুল করি, প্রীতিকে, বন্ধুত্বকে, কৃতজ্ঞতাকে প্রেম বলে ভুল করি। অনেক সময় ইচ্ছে করেই ভুল করি, ভোলাতে চাই। তারপর সেই ভোলা আর ভোলানোর প্রায়শ্চিত্ত চলে।'

উমাপদবাবু ফের এবার বন্ধুর দিকে তাকালেন, একটু থেমে বললেন, 'আমার কথাগুলি কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

শৈলেশ্বর বললেন, 'বল, বলে যাও।'

উমাপদবাবু বলতে লাগলেন, 'এই বয়সে দেহের বিনিময়ে আমরা দেহ পাইনে। তাই অর্থ, যশ, আধিপত্যের বিনিময়ে আমরা তা দখল করি। ভাবি, সব পেলাম। কিন্তু যা পাই তাতে নিজেরও মন ভরে না, যা দিই তাতে আর একজনেরও দেহের সুখ অতৃপ্ত থাকে। তবু এই অসম আর বিষম দেনা-পাওনার বিরাম নেই। প্রকৃতির পরিহাস থেকে সংসারে রক্ষা পায় আর ক'জন? আত্মজীবনীতে যাঁরা কেবল আত্মার কথা লেখেন, একটু ভালো ক'রে খোঁজ করলেই ধরা পড়ে দেহের কথা তাঁরা কিভাবে চুরি করেছেন। দেহ তো শুধু দেহের মধ্যেই নেই। সে যে মনের মধ্যেও ঢুকেছে। মনও তোমার সূক্ষ্ম শরীর। আমাদের বয়সে মনই একমাত্র শরীর। সে কথা ভুলতে গেলেই বিপদ। জয়ন্তীর জীবনে তুমি মধ্যবর্তী। আর একটু খাতির করে বললে বলতে পারি মধ্যমণি। এই মধ্য-বয়সে মধ্যস্থ হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার আশা রেখ না শৈলেশ।'

শৈলেশ্বর বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখখানা কেমন যেন অপ্রসন্ন। মনে মনে ভাবলেন, 'উমাপদ আগে ছিল কবি, এখন শুধু দর্শন বিজ্ঞানের চর্চা করছে। তাই ওর এত তাড়াতাড়ি চুল পেকেছে। তাই জীবনকে কয়েকটা সাধারণ সূত্রে বাঁধবার দিকে ওর ঝোঁক। উমাপদ নিশ্চয়ই সব ব্যাপার বুঝতে পারেনি। ও হয় নির্বোধ, না হয় পরশ্রীকাতর। নাকি উমাপদও ভুক্তভোগী?

শেষ কথাটা মনে হওয়ার সংগে সংগে শৈলেশ্বরের মুখে একটু হাসি ফুটল। তিনি বন্ধুর হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বেশ একটু জোরে চাপ দিলেন। এতক্ষণে একজনের হাতের ওপর আর একজনের হৃদয়ের ভার পড়ল।

১৫
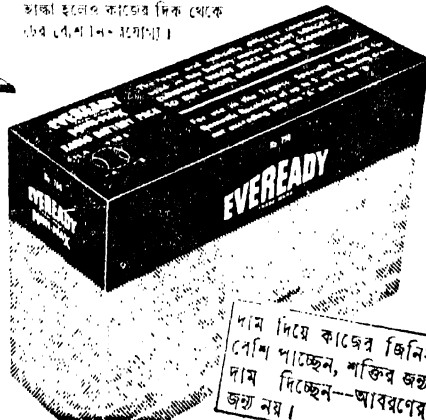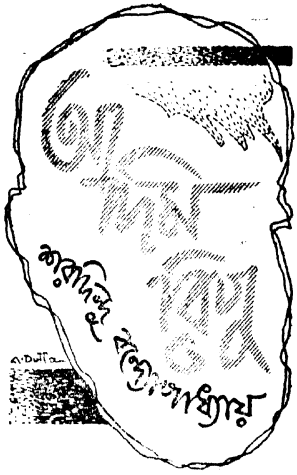
ইচ্ছা ছিল সত্যবতী ও খোকাকে লইয়া একসঙ্গে কলিকাতায় ফিরিব—সত্যবতীও এতদিন বাহিরে বাহিরে থাকিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য দড়ি-ছেঁড়া হইয়াছিল—কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। পাটনায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে বেশ একটি সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা গুটাইয়া লইবার ভার একা সুকুমারের ঘাড়ে চাপাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলাম না। কথা হইল হপ্তাখানেক পরে সুকুমার সত্যবতীদের লইয়া ফিরিবে, আমরা আগে গিয়া বাসাটা সাজাইয়া গুছাইয়া সত্যবতীর উপযোগী করিয়া রাখিব।

১৩ই আগস্ট প্রত্যূষে আমি ও ব্যোমকেশ কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। বাসার সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দেখি আমাদের সদর দরজার সামনে ভিড় জমিয়াছে। ভিড়ের মধ্যে পুঁটিরামকেও দেখা গেল। ব্যাপার কি! আমরা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি মৃতদেহ ফুটপাতে পড়িয়া আছে, পিঠের বাঁ দিকে রক্তের দাগ শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিহীন চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া খোলা।

চিনিতে কষ্ট হইল না—কেষ্টবাবু। এখনও পুলিস আসিয়া পৌঁছে নাই। আমরা ভিড়ের বাহিরে আসিলাম, পুঁটিরামকে ডাকিয়া লইয়া উপরে চলিলাম। ব্যোমকেশের মুখ লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখে চাপা আগুন।

নিজেদের বসিবার ঘরে গিয়া দু'জন উপবিষ্ট হইলাম। কেষ্টবাবুর হঠাৎ ভাগ্যোন্নতি যে এইরূপ পরিণতি লাভ করিবে তাহা কে ভাবিয়াছিল। আমি বলিলাম,—'আমার ধারণা হয়েছিল কলকাতায় সম্মুখ-সমর বন্ধ হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এটা সম্মুখ সমর নয়, কেষ্টদাসকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে।—পুঁটিরাম, তুই চিনতে পারলি?'

পুঁটিরাম বলিল,—'আজ্ঞে চিনেছি, উনি সেই ভেটকিমাছবাবু। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিলেন, আপনার কথা জিগ্যেস করলেন।'

'কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল?'

'আজ্ঞে। আমি বললাম, চিঠি পেয়েছি বাবুরা কাল সকালে আসবেন। তখন তিনি চলে গেলেন।'

'হুঁ, আচ্ছা পুঁটিরাম তুই চা তৈরি কর্ গিয়ে।'

ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় পা ছড়াইয়া কড়িকাঠের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া রহিল। আমি জানালায় গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ফুটপাথে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছে, ভিড় সরিয়া গিয়াছে। কেষ্টবাবুকে একটা মোটর ভ্যানে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। পুলিস কেষ্টবাবুর নাম ধাম জানিতে পারিল কিনা বোঝা গেল না। তাহারা লাস লইয়া চলিয়া গেল।

চা আসিল। ব্যোমকেশ চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিল, 'লাস দেখে মনে হয় শেষরাত্রির দিকে—রাত্রি তিনটে-চারটের সময়—কেষ্টদাস খুন হয়েছে। প্রথম যেদিন কেষ্টবাবু আমার কাছে আসে সেও রাত্রি তিনটে-চারটের সময়। কিন্তু তখন একটা কারণ ছিল, আজ এতরাত্রে কি জন্যে আসছিল?'

বলিলাম,—'তোমার কাছেই আসছিল তার প্রমাণ কি? মাতাল দাঁতাল মানুষ—হয়তো এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল, গুণ্ডা ছুরি মেরেছে—'

'না এতবড় সমাপতন সম্ভব নয়, কেষ্টদাস আমার কাছেই আসছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল, আমি নেই শুনে ফিরে গিয়েছিল। তারপর রাত্রে এমন কিছু ঘটল যে সে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না—' ব্যোমকেশ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল,—'ভেবেছিলাম অনাদি হালদারের ব্যাপারটা ভুলে যাব, কিন্তু এরা ভুলতে দিলে না।'

'অনাদি হালদারের সঙ্গে কেষ্টবাবুর মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ আমার প্রতি একটি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর আরাম কেদারায় লম্বা হইল।

বেলা আটটা নাগাদ বিকাশ দত্ত আসিল। তাহার আর সেই অন্তঃশূন্য চুপসানো ভাব নাই; আমাদের দেখিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল,—'এই যে আপনারা এসে গেছেন স্যার! আমি পাটনায় চিঠি লিখতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখে যাই। কিছু নতুন খবর আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বসুন, খবর শুনব। নিজের কথা আগে বলুন। আট-নয় মাস বাইরে ছিলাম, আপনার অসুবিধে হয়নি তো?'

বিকাশ বলিল,—'অসুবিধে একটু হয়েছিল স্যার। কিন্তু সে কিছু নয়। এখন সামলে নিয়েছি। তিন মাইল ঘাস কিনেছি, তাতেই চলে যাচ্ছে।'

'তিন মাইল ঘাস!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

বিকাশ তিন মাইল ঘাসের রহস্য প্রকাশ করিল। রেল লাইনের দুধারে যে ঘাস জন্মায়, রেলের কর্তৃপক্ষ নাকি তাহা প্রতি বৎসর জমা দিয়া থাকেন। বিকাশ তিন মাইল ঘাস জমা লইয়াছে এবং গোয়ালাদের সেই ঘাস বিক্রয় করিতেছে। বিকাশের কোন কষ্ট নাই, গোয়ালারা অগ্রিম পয়সা দিয়া গরু মোষ চরায়; বিকাশের কিছু লাভ থাকে।

বিকাশ বলিল,—'তাছাড়া চাকরিটা বোধ হয় এবার ফিরে পাব স্যার।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ বেশ, এবার কি নতুন খবর আছে বলুন। আপনার ছাত্রকে আজ সকালে পড়াতে যাননি?'

বিকাশ বলিল,—'পড়াব কাকে স্যার? পাখী উড়েছে।'

'সে কি?'

'সেই খবরই তো দিতে এলাম। গোড়ার দিক থেকে বলব, না শেষের দিক থেকে?'

'গোড়ার দিক থেকে বলুন।'

বিকাশ তখন তক্তপোশের উপর ভাব্যি-যুক্ত হইয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'চিঠিতে আপনাকে যে সব খবর দিয়েছিলাম তারপর আর নতুন খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। ঢিমে-তেতালায় চলছিল, তবু লেগে রইলাম। বসে না থাকি বেগার খাটি। মাস খানেক আগে জানতে পারলাম দয়ালহরি মজুমদারের নামে একজন পাঁচ হাজার টাকার মামলা ঠুকে দিয়েছে। দয়ালহরি বুড়োর ভাবগতিক দেখে মনে হল সে কেটে পড়বার মতলবে আছে। দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন প্রভাত এসে উপস্থিত। প্রভাতকে আগে দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। বুড়ো তাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না, তারপর ঘরে এনে বসালো। দোর বন্ধ করে কথাবার্তা হল, আমি জানলায় কান লাগিয়ে শুনলাম। প্রভাত বলছে, আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি—দোকান বাঁধা রেখে যেখান থেকে হোক পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করব—আপনি হ্যাণ্ডনোটের টাকা শোধ করে দিন। বুড়ো পাঁচ হাজার টাকার বদলে প্রভাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হল।

'এদিকে গদানন্দর সঙ্গে—ভাল কথা, জগদানন্দ অধিকারীর ডাক-নাম গদানন্দ—শিউলীর ভেতরে ভেতরে কিছু চলছিল। গদানন্দ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, মেয়ে-ধরা ওর পেশা, বেটা দালাল। সে যাহোক, হপ্তাখানেক পরে প্রভাত একটা ছোট্ট অ্যাটাচি কেস্ হাতে নিয়ে এল; বুঝলাম টাকা এনেছে। তারপর জানলায় কান লাগিয়ে শুনলাম, বুড়ো বলছে—তুমি ভাল ছেলে, অনাদি হালদার তোমার নামে মিছে কথা বলেছিল। আমি তোমার সঙ্গে শিউলীর বিয়ে দেব। কিন্তু শ্রাবণ মাসে আর বিয়ের দিন নেই, অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হবে। প্রভাত খুশী হয়ে চলে গেল।

'তারপর কি ব্যাপার হল জানি না, গত ৭ই আগস্ট পড়াতে গিয়ে শুনলাম গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে উধাও হয়েছে। বুড়োর সাজিশ ছিল কিনা বলতে পারি না, আমার বিশ্বাস বুড়োই নাটের গুরু। যাহোক, সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রভাত এল। খুব খানিকটা চেঁচামেচি হল। প্রভাত টাকা ফেরৎ চাইল, বুড়ো হাত উল্টে বলল—টাকা কোথায় পাব, শিউলী আর গদানন্দ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। প্রভাত রাগে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে গেল। বেচারার জাতও গেল পেটও ভরল না।

'কাল সকালবেলা পড়াতে গিয়ে দেখি বাড়ির দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই। বুড়ো ছেলেটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

গল্প শেষ করিয়া বিকাশ একটা বিড়ি ধরাইয়া ফেলিল, বলিল,—'এসব খবর আপনার কাজে লাগবে কিনা জানি না স্যার, কিন্তু এর বেশী আর কিছু জোগাড় করা গেল না।'

'সব খবর কাজের খবর'—ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর চোখ খুলিয়া বলিল,—'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে কোথায় গেছে আপনি জানেন না বোধহয়?'

'না। যদি বলেন খুঁজে বার করতে পারি।'

ব্যোমকেশ একটু মৌন থাকিয়া বলিল,—'আর একটা কাজ আপনাকে করতে হবে—'

এই সময় দরজায় টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া দেখি প্রভাত। তাহার চুল উস্কখুস্ক, মুখ শীর্ণ, চোখ-ভরা ক্লান্তি। তাহাকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'আসুন, প্রভাতবাবু, আমরা ফিরেছি খবর পেলেন কোত্থেকে?'

প্রভাত চেয়ারে বসিল। বিকাশকে সে লক্ষ্যই করিল না; বিকাশও তক্তপোশের এক কোণে এমনভাবে গুটিসুটি হইয়া বসিল যে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রভাত বলিল,—'খবর পাইনি, দেখতে এলাম যদি এসে থাকেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ। কেষ্টবাবু মারা গেছেন আপনি শোনেন নি বোধহয়।'

প্রভাত কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল, যেন কেষ্টবাবুর মরা-বাঁচা সম্বন্ধে তাহার তিলমাত্র কৌতূহল নাই।

'না, শুনিনি। কি হয়েছিল?'

'কাল রাত্রে কেউ তাকে ছুরি মেরেছিল।'

উদাসীনকণ্ঠে প্রভাত বলিল,—'ও—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যাক ও কথা। দয়ালহরিবাবুর নামে নিমাই নিতাই পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোটের ওপর নালিশ করেছে জানেন নিশ্চয়।'

প্রভাতের মুখ তিক্তায় ভরিয়া উঠিল। সে বলিল,—'জানি। কিন্তু ও কথাও যেতে দিন ব্যোমকেশবাবু। মানুষের অ-মনুষ্যত্ব দেখে দেখে আমার মন বিষিয়ে গেছে। আমি আপনাকে জানাতে এসেছিলাম যে, আর আমার এখানে মন টিকছে না, আমি শিগ্‌গিরই চলে যাব।'

'সে কি, কোথায় চলে যাবেন?'

'তা এখনও ঠিক করিনি। পাটনায় ফিরে যেতে পারি। যেখানেই যাই দু' মুঠো জুটে যাবে। কলকাতায় আর নয়।'

'কিন্তু—আপনার দোকান?'

'দোকান বিক্রি করে দেব—' প্রভাতের মুখ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, সে আমার দিকে

ফিরিয়া বলিল—'অজিতবাবু, আপনার জানাশোনা কেউ আছে, যে বইয়ের দোকান কিনতে পারে? বেশী দাম আমি চাই না। তিন হাজার—আড়াই হাজার পেলেও আমি বিক্রী করে দেব।'

ভাবিতে লাগিলাম, জানাশোনার মধ্যে এমন কে আছে যে, বইয়ের দোকান কিনিতে পারে। হঠাৎ ব্যোমকেশ এই অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিল—'আমরা কিনতে পারি। আমি আর অজিত কিছুদিন থেকে পরামর্শ করছি একটা বইয়ের দোকান খুলব। অজিত নিজে লেখক, ও চালাতে পারবে। আপনারা দোকানটা যদি পাওয়া যায় তাহলে তো ভালই হয়।'

প্রভাতের মুখে একটু সজীবতা দেখা দিল, সে বলিল—'আপনারা নেবেন? তার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? আপনারা নিলে দোকান বিক্রি করেও আমার দুঃখ হবে না। তাহলে—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'কত টাকার বই আছে আপনার দোকানে?'

প্রভাত বলিল,—'হিসেব না দেখে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু চার হাজার টাকার কম হবে না।'

'বেশ, কাল সকালে গিয়ে আমরা আপনার হিসেব পত্র দেখব। দোকানের ওপর মর্টগেজ নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে কথা রইল, কাল আমরা আপনার কাগজপত্র দেখব, স্টক মিলিয়ে নেব। যা ন্যায্য দাম তাই আপনি পাবেন। কিন্তু একটা কথা। ১৫ই আগস্ট সকালে আমাদের দখল দিতে হবে। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে ব্যবসা আরম্ভ করতে চাই।'

'তাই হবে। যখন দখল চাইবেন তখনই দেব। আজ উঠি, হিসেবের কাগজপত্র ঠিক করে রাখতে হবে।'

'আচ্ছা। ভাল কথা, নৃপেনবাবু এখনও আছেন?'

'আছেন। তাঁকে অবশ্য বলে দিয়েছি যে আমি দোকান রাখব না। তিনি অন্য চাকরি খুঁজছেন, পেলেই চলে যাবেন।—আপনারা কি তাঁকে রাখবেন?'

'রাখতেও পারি। তাঁকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

'দোকানে গিয়েই পাঠিয়ে দেব।—আচ্ছা, নমস্কার।'

প্রভাত দ্বারের বাহিরে যাইবামাত্র ব্যোমকেশ এক লাফ দিয়া বিকাশকে ধরিল, দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে তাহার কানে কানে কথা বলিয়া তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজিয়া দিল। আমি কেবল তাহার শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইলাম—'মনে থাকে যেন, কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এক মিনিট আপনার ছুটি নেই।'

বিকাশ একবার দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল, তারপর জ্যা-মুক্ত তীরের মত সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘর খালি হইয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কাণ্ডকারখানা কি?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'একটা মস্ত সুযোগ হাতে এসেছে অজিত, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।'

'কোন সুযোগের কথা বলছ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এই ধরো, বইয়ের দোকানটা। যদি পাওয়া যায়, ছাড়া উচিত কি? বইয়ের ব্যবসা খুব লাভের ব্যবসা; তুমিও মনের মতন একটা কাজ পাবে। শুধু বই লিখে আজকাল কিছু হয় না। দেখছ তো, তোমাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান সাহিত্যিক তাঁরা গুটি গুটি ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েছেন এবং বেশ দুধে-ভাতে আছেন।'

কথাটা সত্য। বইয়ের ব্যবসায় পয়সা আছে, বিশেষত যদি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের বাজার কোণ-ঠাসা করা যায়। তবু মৌখিক আপত্তি তুলিয়া বলিলাম,—'কিন্তু এই দুঃসময়ে হঠাৎ এতগুলো টাকা বার করা কি ভাল?'

সে বলিল,—'দু'জনে ভাগাভাগি করে দিলে গায়ে লাগবে না। তুমি হবে খাটিয়ে অংশীদার, আর আমি—ঘুমন্ত অংশীদার।'

আধঘণ্টা পরে নৃপেন আসিল। বলিল, —'প্রভাতবাবু পাঠালেন। আপনি আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, বসুন ঐ চেয়ারে।' ব্যোমকেশ কঠিন চক্ষে কিয়ৎকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'আপনার সব কীর্তিই আমি জানতে পেরেছি। রমেশ মল্লিক আমার বন্ধু।'

ন্যাপা চমকিয়া কাষ্ঠমূর্তিতে পরিণত হইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'অনাদি হালদারের আলমারির চাবি আপনি তৈরি

করেছিলেন। আলমারিতে অনেক টাকা ছিল, সে টাকা কোথায় গেল? আমি যদি প্‌লিসকে খবর দিই তারা জান্‌তে চাইবে। আপনি কী উত্তর দেবেন?'

ন্যাপা অধর লেহন করিল। ব্যোমকেশ বলিল,—'আমি কথাটা প্‌লিসের কানে না তুলতে পারি, যদি আপনি আমার একটা কাজ করেন।'

ন্যাপার কণ্ঠ হইতে ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বাহির হইল—'কি কাজ?'

'আর একটা চাবি তৈরি করে দিতে হবে।' (ক্রমশ)

ইউরেনিয়ামের কথা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তর, লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি যুগ অতিক্রম ক'রে বর্তমানে যে যুগে আমরা উপনীত হয়েছি সে যুগকে বৈজ্ঞানিক বিচারে কোনো নামে আখ্যাত করতে হলে করতে হয় ইউরেনিয়াম যুগ। বস্তুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর যেদিন পরমাণুর অন্তর্নিহিত অপরিসীম শক্তির
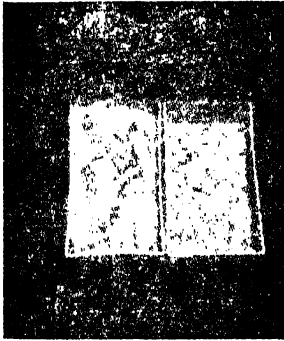
সাধারণ আলোকে দৃশ্যমান ইউরেনিয়াম খনিজ

কথা প্রকাশ পায় সেদিন থেকেই সূচনা হয়েছে ইউরেনিয়ামের যুগের। একদিন যে ধাতুটির প্রতি কেউই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি, আজ মহা মূল্যবান জ্ঞানে সকল জাতিই তার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন এবং যে সকল দেশে ইউরেনিয়ামের আকর আছে তাঁরা নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করছেন। একদা অনাদৃত ইউরেনিয়ামের এই যুগ প্রাধান্য ও সমাদর লাভের হেতু হলো পরমাণু-শক্তির উৎসমূলে আছে এই ইউরেনিয়াম। মানব জাতির ধ্বংস ও কল্যাণ উভয়ই আজ পরমাণু-শক্তির মধ্যে নিহিত কাজেই যে ধাতু এই মহাশক্তির উৎসস্বরূপ সেটি যে আজ পরম গুরুত্ব লাভ করবে তা সহজেই অনুমেয় এবং সেই অনুযায়ী এই যুগকে ইউরেনিয়াম যুগ নামে আখ্যাত করলে কোনো অত্যুক্তি হয় না।

ইউরেনিয়ামের সবিশেষ গুরুত্ব অনুভূত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে, কিন্তু এই ধাতুটি আবিষ্কৃত হয়েছিল বহুকাল আগেই। ১৭৮৯ সালে জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী ক্ল্যাপরথ এটি আবিষ্কার করেন। সে সময়ে পিচব্লেন্ড নামে একটি কৃষ্ণবর্ণের উজ্জ্বল খনিজ নিয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন। পিচব্লেন্ডকে তখন দস্তা ও লোহার আকর বলে মনে করা হত। কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিডে এই আকরটি দ্রবীভূত করে ও কস্টিক পটাশ দিয়ে তা প্রশমিত করে ক্ল্যাপরথ একটি অধঃক্ষেপ পেলেন। তাঁর অনুমান হলো, একটি নতুন ধাতু থেকে এই অধঃক্ষেপ উদ্ভূত। তেল ও কাঠ কয়লা মিশিয়ে প্রজ্বলিত করার পর তা থেকে ধাতুর মতন একরকম কালো চূর্ণ তিনি পেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই কালো চূর্ণ হচ্ছে একটি নতুন ধাতু। এই ঘটনার কয়েক বছর আগে ১৭৮১ সালে ইংলন্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হার্শেল আবিষ্কার করেন ইউরেনাস গ্রহ, তাই তার সম্মানার্থে ক্ল্যাপরথ তাঁর আবিষ্কৃত নতুন ধাতুটির নাম দিলেন ইউরেনিয়াম।

কিন্তু ক্ল্যাপরথ যা আবিষ্কার করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে ইউরেনিয়াম ধাতু ছিল না, তা ছিল যৌগিক পদার্থ ইউরেনিয়াম অক্সাইড। ১৮৪১ সালে ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী পেলিগট ক্ল্যাপরথের ভুল ধরতে পারেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ অবস্থায় ইউরেনিয়াম ধাতু প্রস্তুত করেন। বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম দেখতে শাদা, ইস্পাতের চেয়ে কিঞ্চিৎ নমনীয় এবং জলের চেয়ে ১৮ গুণ ভারী। ইউরেনিয়াম খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা সহজ নয়। অধিকাংশ ধাতুর মতো খনিজ গলিয়ে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করা যায় না। দ্রবণ, পরিস্রাবণ, অধঃক্ষেপন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রণালীর মাধ্যমে অবাঞ্ছিত দ্রব্যসমূহ থেকে ইউরেনিয়ামকে পৃথক করে প্রথমে একটি কঠিন লবণে পরিণত করা হয়। তারপর এই বিশুদ্ধ কঠিন ইউরেনিয়াম যৌগিককে ক্যালসিয়াম ধাতু-চূর্ণের সঙ্গে মিশিয়ে একটি চুল্লীতে বিগলিত করা হয় এবং এইভাবে বিজারিত হয়ে ইউরেনিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়। এই ধাতু-বিজারণ প্রক্রিয়া হচ্ছে ইউরেনিয়াম প্রস্তুত-প্রণালীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। যদিও একশত বৎসরের অধিক-কাল আগে ধাতব ইউরেনিয়াম প্রথম প্রস্তুত হয়, কিন্তু ১৯৪০ সালের আগে পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নি। এর আগে অল্প পরিমাণে ইউরেনিয়াম প্রস্তুত হত এবং যে সকল প্রণালী অনুসরণ করা হত তা বিশেষ কার্যকরী ছিল না।

পিচব্লেন্ড খনিজে ক্ল্যাপরথ একটি
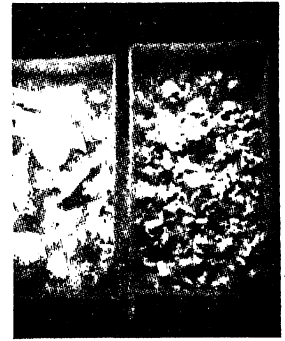
আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে উদ্ভাসিত ইউরেনিয়াম খনিজ

নতুন 'ধাতু'র অস্তিত্ব নিরূপণ করার এক শতাব্দীরও অধিক কাল পরে আকস্মিক এক আবিষ্কারে ইউরেনিয়ামের এমন একটি অনন্যসাধারণ ধর্মের কথা জানা গেল যার ফলে জড় পদার্থের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কিত ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হলো। ১৮৯৬ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকেরল ইউরেনিয়াম লবণের প্রতিপ্রভা সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। কালো কাগজে মুড়ে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট তিনি রেখেছিলেন তাঁর বীক্ষণাগারের একটি ডেস্কের ড্রয়ারে। পরের দিন বীক্ষণাগারে গিয়ে ড্রয়ার খুলে দেখেন যে, প্লেটটা কেমন করে যেন শাদা হয়ে গেছে। অন্ধকারে প্লেটটা রাখা সত্ত্বেও কি করে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো, বেকেরল ভাবতে লাগলেন। ড্রয়ারের মধ্যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের সঙ্গে একখণ্ড ইউরেনিয়াম লবণ তিনি খুঁজে পেলেন।

গাইগার-মুলার কাউণ্টারের সাহায্যে ইউরেনিয়ামের সন্ধান

ইউরেনিয়াম লবণের প্রতিপ্রভার প্রভাবে এরকম হওয়া তো সম্ভব নয়। যে সব ইউরেনিয়াম লবণ প্রতিপ্রভ নয় সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেও ফটোগ্রাফিক প্লেটে একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এ থেকে বেকেরল সিদ্ধান্ত করলেন, ইউরেনিয়ামের এমন এক রকম তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীরণ করার ক্ষমতা আছে যা কালো কাগজ ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটকে প্রভাবান্বিত করতে পারে।

বৈজ্ঞানিক জগৎ তখন রণ্টজেনের আবিষ্কৃত এক্স-রশ্মির পরিচয় লাভ করেছে। কাজেই বেকেরলের কথায় সকলেই গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হলো বেকেরলের অনুমান যথার্থই সত্য। বেকেরল রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নতুন এক শ্রেণীর পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল যারা আপনা থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা কণা বিকীরণ করতে পারে—এদের বলা হলো তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এর কিছু দিন পরে মাদাম কুরী পিচব্লেন্ড খনিজ থেকে ইউরেনিয়ামের চেয়ে আরও বেশী তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদের পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিন রকমের কণা (আলফা, বিটা, গামা) বিকীরণ করে। এটা সম্ভব হয় পরমাণুর কেন্দ্রিন ভাঙনের ফলে। অতএব জড়পদার্থের গঠন সম্পর্কে এতদিন যে ধারণা ছিল পরমাণু হচ্ছে অবিভাজ্য অন্তিম উপাদান তা অগ্রাহ্য হয়ে গেল এবং জানা গেল ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন হচ্ছে মূল উপাদান। এর পর আরও জানা গেল নিউট্রন, ডয়টেরন, আলফা কণা প্রভৃতি প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন কণার দ্বারা পরমাণুর কেন্দ্রিনকে আঘাত করতে পারলে কৃত্রিম উপায়েও তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করা যায়। প্রকৃতিজ ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত তেজস্ক্রিয় পদার্থ এক বা একাধিক কণা বিকীরণ করে বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়—এই পরমাণুগুলিকে বলা হয় আইসোটোপ। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়ামের এই রকম তিনটি আইসোটোপ পাওয়া যায়—ভর এরা ইউ ২৩৮, ইউ ২৩৫ ও ইউ নামে অভিহিত। এদের প্রত্যেকটি ক্রিয়। প্রকৃতিজ খনিজে প্রথমোক্ত টোপটিই থাকে সব চেয়ে বেশি, ও তৃতীয় আইসোটোপের পরিমা নগণ্য।

পৃথিবীতে ইউরেনিয়ামের সুবিস্তৃত, কিন্তু পরিমাণ অতি স ভূপৃষ্ঠের এক লক্ষ ভাগের ২-৪ ভ ইউরেনিয়াম খনিজ বর্তমান। এ ইউরেনিয়াম একটি দুষ্প্রাপ্য ও ধাতু বলে পরিগণিত। অনেক ইউরেনিয়াম খনিজ পাওয়া গেলেও ইউরেনিয়ামের অপ্রতুলতার জন্যে নিষ্কাশন করার প্রভূত ব্যয় ও শ্রম না। কানাডার গ্রেট বেয়ার লেকে এব জিয়ান কঙ্গোর কাটাঙ্গায় ইউরে বৃহত্তম আকর আছে। চেকোশ্লো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মূল্যবান আছে। এ ছাড়া গ্রেট বৃটেন, জ ফ্রান্স, পর্তুগাল, সোভিয়েট রাশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, স্কার, নরওয়ে, সুইডেন এবং ভারতেও ইউরেনিয়ামের কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমাদের দেশে ক্ষুদ্র আকারে রেনিয়াম খনিজ পাওয়া গেছে গয়া, সিংভূম ও ধলভূম জেলায়, স্থানের আজমীঢ় ও মারোয়াড় মাদ্রাজের কৃষ্ণা উপত্যকা ও নেলোর এবং মহীশূরের বাঙ্গালোর এ ছাড়া ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের সমুদ্র মোনাজাইট বালু প্রচুর পাওয়া তাতে প্রধান উপকরণ থোরিয়ামের স্বল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম বি সম্প্রতি বুন্দেলখণ্ড ও বিন্ধ্য ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষণের ফলে ইউরেনি মোনাজাইট অল্প পরিমাণে পাওয়া যতদূর জানা যায় আমাদের দেশে কারের ইউরেনিয়াম স্তর এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ভারত সরকার করেছেন, যাঁরা ইউরেনিয়ামের স্তরের সন্ধান দিতে পারবেন পুরস্কৃত করা হবে। বর্তমানে ইউরে খনিজ সংক্রান্ত সমস্ত কিছু ভ পরমাণু শক্তি কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধী

সকল তথ্যই গোপনীয়। এ কারণে আমাদের দেশে যে সব ইউরেনিয়াম খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যে কতখানি তা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই।

ইউরেনিয়াম খনিজ সনাক্ত করা হয় গাইগার-মুলার কাউণ্টার যন্ত্রের সাহায্যে অথবা প্রতিপ্রেভা লক্ষ্য করে। গাইগার-মুলার কাউণ্টার যখন কোনো ইউরেনিয়াম খনিজের সামনে ধরা হয়, তাতে টক্ টক্ করে একটা শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ শুনে স্থির করা যায় কোথায় ইউরেনিয়াম আকর আছে। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইউরেনিয়াম আকর সনাক্ত করা যায়। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সামনে ইউরেনিয়াম খনিজ রাখলে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ পায়। খনিজে ইউরেনিয়ামের উৎকৃষ্টতা হবে যত উন্নত ঔজ্জ্বল্য হবে তত বেশি।

পরমাণু-শক্তির উৎসরূপে ইউরেনিয়ামের পরিচয় প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত এর বিশেষ কোনো উপযোগিতা ছিল না। রেডিয়াম নিষ্কাশন, সিরামিক শিল্প ও রঞ্জক হিসেবেই ইউরেনিয়ামের এতদিন ব্যবহার ছিল। আজ কিন্তু ইউরেনিয়াম বিশ্বের একটি মহামূল্যবান সম্পদ।

ইউরেনিয়ামের যে তিনটি আইসোটোপের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ইউ ২৩৫ আইসোটোপটি হচ্ছে পরমাণু-শক্তির উৎস হিসেবে সব চেয়ে মূল্যবান। মন্থরগতি নিউট্রনের আঘাতে আইসোটোপটি যখন বিদীর্ণ হয়, তখন দুটি অসম অংশে এটি ভেঙে যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রচণ্ড শক্তি মুক্ত হয়। সর্বপ্রকার পরমাণু-শক্তি বিকাশের মূল সূত্র হলো এই।

ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে একাধিক নতুন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। যদিও এই পদার্থগুলি বীক্ষণাগারে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিতে এদের একটিকেও পাওয়া যায় না। এরা সকলেই তেজষ্ক্রিয়। নবাবিষ্কৃত এই মৌলিক পদার্থগুলি নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, আমেরিকিয়াম, কুরীয়াম ইত্যাদি নামে অভিহিত। প্লুটোনিয়াম হচ্ছে দ্বিতীয় পারমাণবিক

ধাতব ইউরেনিয়াম প্রস্তুতের প্ল্যাণ্ট

জ্বালানী এবং নাগাসাকীর ওপর নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমায় প্লুটোনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছিল।

ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন ভাঙনের সময় প্লুটোনিয়াম উপজাত হয়। পারমাণবিক চুল্লীতে ভাঙনের সময় ইউ ২৩৮ রূপান্তরিত হয় প্লুটোনিয়ামে আর ইউ ২৩৫ দুটি অংশে ভেঙে যায় ও সাথে সাথে আকাঙ্ক্ষিত শক্তিও মুক্ত করে। এইভাবে এক গ্রাম (এক ছটাকের ১০০ ভাগের প্রায় ২ ভাগ) ইউ ২৩৫ যখন ভেঙে যায়, তখন তা থেকে যে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ হলো এক গ্রাম অঙ্গার দহনের ফলে উৎপন্ন তাপশক্তির ২৫ লক্ষ গুণ। কলিকাতা মহানগরী ও শহরতলীর গৃহস্থালী ও শ্রমশিল্পের কাজে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বাৎসরিক গড়পড়তায় এক হাজার কোটি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে এবং এর দরুণ প্রায় ৫ লক্ষ টন কয়লা ব্যয়িত হয়। এই সমপরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে প্রয়োজন হবে মাত্র এক-অষ্টমাংশ টন ইউ ২৩৫। কথাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, কিন্তু যথার্থই সত্য।

শান্তিমূলক কাজে শক্তি উৎপাদনের জ্বালানীরূপে ইউরেনিয়ামের এই যে গুরুত্ব তাতে সকল প্রগতিশীল দেশ আজ পরমাণুশক্তি উন্নয়নের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেছে। ইউরেনিয়াম ছাড়া থোরিয়ামকেও পারমাণবিক জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের দেশে পরমাণুশক্তি উন্নয়নের যে সম্ভাবনা আছে তা প্রধানত মোনাজাইট বালুতে বিদ্যমান থোরিয়ামকে ঘিরেই। ভারত সরকার তাই এদেশ থেকে মোনাজাইট বালু রপ্তানি করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের আলোয়াতে থোরিয়াম উৎপাদনের কারখানা করেছেন।

শুধু ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম আকর সংগৃহীত হলেই হলো না, পরমাণু-শক্তি উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক আছে অনেক। প্রধান বাধাগুলি হচ্ছে—(১) আকর থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের প্রণালী; (২) ইউ ২৩৮ থেকে ইউ ২৩৫-কে পৃথকীকরণ; (৩) পারমাণবিক চুল্লীর ডিজাইন; (৪) উৎপন্ন তাপশক্তিকে ব্যবহারোপযোগী শক্তিতে রূপান্তরীকরণ; (৫) ইউ ২৩৮কে প্লুটোনিয়ামে এবং থোরিয়ামকে ইউ ২৩৩-এ রূপান্তরীকরণ।

আকর থেকে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের কারিগরী প্রণালী সকল দেশে অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং প্রত্যেক জাতিকে নিজস্ব চেষ্টায় তা উদ্ভাবন করতে হবে।

ইউ ২৩৮ ও ২৩৫ আইসোটোপ দুটির রাসায়নিক ও ভৌতিক ধর্ম প্রায় একই রকমের, এজন্যে তাদের পরস্পরকে পৃথক করার পথে বহু জটিলতা ও দুরূহতা আছে। এ সমস্ত দুস্তর অসুবিধা সত্ত্বেও গ্যাসীয় ক্যাপন প্রণালী অনুসরণ করে ইউ ২৩৫কে ইউ ২৩৮ থেকে পৃথক করা যায় এবং ওই প্রণালীতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকরীজ কেন্দ্রে ইউ ২৩৫কে পৃথক করা হয়। এই উদ্দেশ্যে দুটি প্ল্যাণ্ট স্থাপনে মার্কিন সরকারকে ৭০ কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়েছিল। দুটি প্ল্যাণ্টের মধ্যে একটি ফলপ্রসূ হয়নি এবং তাতে প্রায় ৩৫ কোটি ডলার অযথা নষ্ট হয়। অপরটি পুরো দু বছর চালু থাকার পর প্রায় ২০ সের ইউ ২৩৫ উৎপাদন করে যা ছিল নাগাসাকী বোমা প্রস্তুতের পক্ষে যথা-পর্যাপ্ত উপাদান।

পারমাণবিক বোমার জন্যে যেরকম চুল্লীর প্রয়োজন, শান্তিমূলক কাজে পরমাণু-শক্তি ব্যবহারের জন্যে সেরকম চুল্লীতে কাজ চলবে না, ভিন্নরকমের চুল্লী প্রস্তুত করতে হবে। পারমাণবিক চুল্লী গঠনের জন্যে নানা উপাদানের প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ কারি-গরের।

এই সকল প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা সত্ত্বেও ভারত তার প্রকৃতি-দত্ত সম্পদ নিয়ে পরমাণু-শক্তি উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প। এই উদ্দেশে বোম্বাইয়ের সন্নিকটে শীঘ্রই একটি রি-আ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন, যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ চেষ্টায় তা করা সম্ভব হবে না হয়তো।

'পরিশোধ' ছবির কাহিনী

'পরিশোধ'-এর গল্প তোমার লেখায় যা পড়লাম তাতে মনে হল অনেক জায়গায় বিশেষ করে শেষে বেশ কিছু বদলান হয়েছে। তা সত্ত্বেও গল্পের যেসব জায়গা তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে, যেসব চরিত্র অসঙ্গত ঠেকেছে ও যেসব পরিণতির যুক্তি খুঁজে পাওনি সেগুলি পড়ে সত্যিই আমার একটু অবাক লাগছে।

আমার আসল গল্পের বেশ কিছু অদল-বদল হয়েছে অবশ্য। তা ছাড়া ছবি বিশ্বাস অসাধারণ অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দিয়ে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করানতে গল্পের আকর্ষণ অনেকখানি চলে গেছে একথাও কেউ কেউ আমায় লিখেছে। আমার মনে হচ্ছে যে এইসব দোষত্রুটি ও অভাবের দরুণ ছবিটির রসাভাব না হলে এত খুঁত হয়ত তোমার চোখে পড়ত না। যা সত্যিই অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়, ঠিক মত আবহাওয়া সৃষ্টি না হওয়ার দরুণ তাও তোমার কাছে বিসদৃশ লেগেছে এই অন্তত আমার ধারণা।

মানুষের তৈরী গল্প, তা সে সেক্সপীয়র শেখভ কি রবীন্দ্রনাথ যাঁরই হোক—ইচ্ছে করলে হাজার দোষ ধরে ছিঁড়ে ফেলা যায় না কি! বিশেষ করে সে গল্প যদি সাধারণ ছকের না হয়। যে কোন গল্পেরই প্রতি পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ছায়াছবির গল্পে সেরকম প্রশ্ন যদি তোলা যায় তাহলে 'পরিশোধ' যেটুকু দাঁড়িয়েছে তাও কটা গল্প দাঁড়ায়। ইদানিং যেসব ছবি প্রচুর সাফল্য লাভ করেছে সেগুলিকেই ধরো। 'পরিশোধ'-এর সমালোচনাটি এখন আমার সামনে নেই। তবু যা যা মনে পড়ছে তাই লিখছি।

তোমার একটা বক্তব্য এই যে, জহর গাঙ্গুলী যে ডাক্তারের পুত্র ও যাঁর ছবি কোন এক State-এর অতিথিশালায় সযত্নে টাঙান আছে, তাঁকে ভারত বিখ্যাত বলেই মনে হয়, সুতরাং তাঁর মৃত্যু সংবাদ State জানবে না কেন?

প্রথমেই তোমার কথায় আপত্তি জানাই। ডাক্তার ভারত বিখ্যাত হতে যাবেন কেন? সেরকম কোন কথাও বলা হয়নি। ওইরকম একজন ডাক্তারের ঘটনা আমার নিজেরই জানা। মধ্য প্রদেশ বা উড়িষ্যায় ছোটখাট State অনেক সময়ে কলকাতা থেকে ভালো ডাক্তার বেশী fee দিয়ে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যায়। বিধান রায় বা নলিনী সেনগুপ্ত জাতীয় ডাক্তারকে সবাই নিয়ে যায় না। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশে একটি গলির ভেতর অনেক আগে একজন ডাক্তার ছিলেন। নাম কি সেন। আমি ছেলেবেলা তাঁর কাছে গেছি। তাঁকে একবার প্রায় কয়েক মাসের জন্যে ওইরকম কোনও State নিয়ে যায়। সেখানে তিনি যা পেয়ে-ছিলেন তার জোরে বড় রাস্তার ওপর একটা Dispensaryও করেছিলেন। এখন সে Dispensaryর নাম বোধহয় বদলে গেছে। আর একটি তোমারও জানা লোকের নাম বলি। প্রযোজক অভিনেতা শিশির মিত্রের বাবা পাতিয়ালার ভূতপূর্ব মহারাজার প্রিয় ঘরের ডাক্তার ছিলেন, জানো কি? তাঁকে Stateএ রাখবার জন্যে ভূতপূর্ব মহারাজা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা ভালো ডাক্তার হলেও এঁদের সংবাদ খবরের কাগজে বড় করে ছাপা হয় না। আর নলিনী সেনগুপ্তের পর্যায়ের ডাক্তারদের সংবাদই কোন এমন Headline দিয়ে করে ছাপা হয়?

বাঙালী ডাক্তারদের প্রসার প্রতিপত্তি সমস্ত উত্তর ও মধ্য ভারতে এককালে খুব বেশীরকম ছিল। সেখানকার ছোটখাট রাজ্য যদি বাংলা দেশে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক না পড়ে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

এইসব কারণে আমার মনে হয় যে, যে ডাক্তার একদিন তাদের State-এ চিকিৎসার ব্যাপারে গিয়ে সুনাম অর্জন করবার জন্যে তারা অতিথিশালায় তাঁর ছবি টাঙিয়ে রেখেছে, তাঁর মৃত্যু সংবাদ না জেনে তাঁকে আবার ডেকে পাঠান মোটেই অস্বাভাবিক নয়। M. O নেওয়ার ব্যাপারটা এত অবিশ্বাস্য কি? বাপের নাম S. D. Banerjee হলো ছেলের initialও তাই। Dr. S. D. Banerjeeর নামের মনিঅর্ডার সে ত অনায়াসেই নিতে পারে। তাছাড়া অন্যায় করে যে M. Oটা নেওয়া হয়েছে তাও গোপন করা হয়নি।

আরেক জায়গায় তুমি লিখেছ যে ডাক্তারের শ্যালিকা শিক্ষিতা ও কাছাকাছি কোনও গ্রামে থাকে। তবু বছর দুই আড়াই ধরে ডাক্তারের সঙ্গে তার দেখা না হওয়া আশ্চর্য।

এখানেও দু আড়াই বছর কথাটা তুমি ধরে নিয়েছ। গল্পে সেটা কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে বলে আমি ত জানি না। আর যে ডাক্তারকে রোগীরাই Dispen-saryতে পায় না। বাড়িতেও যে কখন থাকে ঠিক নেই, তাকে একবেলার জন্যে কলকাতার গ্রাম থেকে এসে মেয়েটি যদি সাধারণত খুঁজে না পায় তাহলে অবাক হবার খুব কিছু আছে কি? কোথায় কোন Bar-এ ডাক্তার আছে তাও' আর মেয়েটি খুঁজে বার করতে পারে না। ডাক্তার যে দায়িত্ববোধহীন ও কর্তব্য এড়িয়ে পালাতেই চায় তাত ভালোভাবেই বোঝান হয়েছে।

ডাক্তারের শ্যালিকার বৌদি অর্থাৎ তার ছেলের মামিমা কেন ডাক্তারের ছেলে ও তার মাসির প্রতি বিমুখ তারও একটা জবাবদিহি কি দরকার? আশ্রিত হিসাবে যাদের জন্যে সামান্য খরচও হয় তাদের প্রতি বিমুখ

স্বার্থপর স্ত্রীলোক কি আজগুবি কল্পনা? 'রানের সুমতি'তে রামের বৌদির মা ওরকম নীচমনা কেন (অমন দেবীর মত মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও) শরৎবাবু তার কি কোন জবাব-দিহি করেছেন?

কলকাতা থেকে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার যখন State-এ গিয়ে পেঁছোয় তখন তারা Guest House-এ গিয়ে কেন ওঠে এ প্রশ্ন উঠতে পারে আমি সত্যি ভাবিনি। উল্টো দিকটা যেমন ভাবা যায়, তেমনি একথাও ত ভাবা যেতে পারে যে ডাক্তারের ডাকটা একটা Chronic Case-এর ব্যাপারে। Resident ডাক্তারের ক্ষমতার বাইরে বলেই কলকাতা থেকে পুরানো অন্য ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হয়েছে। Chronic রোগীকে আসামাত্র দেখতে যাওয়ার কোন দরকার নেই। বিশেষ যাঁদের ট্রেনের ধকলের পর বহুদূর রাস্তা মোটরে আসতে হয়েছে; কিন্তু হঠাৎ রাত্রে Chronic রোগ acute হয়ে দাঁড়াল। তাই দরকার পড়ল ডাক্তারের। ডাক্তারের জায়গায় Compounder বাধ্য হয়ে গিয়ে সেই acute অবস্থা কাটিয়ে দিলে। যথার্থ Diagnosis হল বলেই রোগটার উপশম হল। ব্যাপারটা এইভাবে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে আমি দিয়েছি বলেই বিশ্বাস। রাণী-সাহেবা যে পুরস্কার দিলেন ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন, তা প্রথম ছেলে ভালো হওয়ার সমস্ত লক্ষণ দেখে ও পরে ভালো হওয়ার পর।

এখন Compounder-এর পক্ষে অত-বড় ডাক্তারীর বাহাদুরী দেখানর বিষয়ে বলি। এটাও আমার আজগুবি কল্পনা নয়। বরং বাস্তব জগতে যা ঘটেছে আমি তার চেয়ে অনেক কম করেই দেখিয়েছি। কিছুকাল আগে কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে এক ক্যানেডিয়ান ডাক্তারের একেবারে জয়-জয়কার পড়ে যায়। কাগজে কাগজে তার সুখ্যাতি আর ধরে না। আমেরিকার জঙ্গী বিভাগ থেকে তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেবার জন্যে যখন তোড়জোড় চলছে তখন হঠাৎ জানা যায় যে, লোকটি ডাক্তার ত নয়ই এমন কি কম্পাউণ্ডারও নয়। কোনদিন কোন কলেজেও সে পড়েনি। Farmer-এর ছেলে, ছেলেবেলা থেকে পড়া-শুনায় ঝোঁক ছিল, তারপর নানা জায়গায়, হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ছোটখাট কাজ করেছে ও নিজে নিজে যা শেখবার শিখেছে। তার জানা একজন ডাক্তারের নাম ও পদবী নিয়ে সে প্রথম ক্যানাডায় গিয়ে বসে ও পরে কোরিয়ার যুদ্ধে ডাক্তার হিসাবে যোগ দেয়। সেখানে তার আশ্চর্য জ্ঞান ও শল্য চিকিৎসা দেখে সবাই মায় বড় বড় ডাক্তারেরা তাজ্জব হয়ে গেছল। অত ভালো কাজ করেছিল বলে লোকটিকে বরখাস্ত করা ছাড়া আর কোন সাজা দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারটি নিয়ে তখন বিদেশের বড় বড় কাগজে শোরগোল হয়েছিল। এ ছাড়া দিল্লীর অনুরূপ একটি ঘটনাও হয়ত তুমি জান। T. B. specialist হিসাবে অসাধারণ নাম ডাক হবার পর ধরা পড়ে যে লোকটি একজন কম্পাউণ্ডার ছিল মাত্র।

আরো কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে তুমি লিখেছ, এখন সব মনে পড়ছে না। ছবির গোড়াতেই মন কোন কারণে বিরূপ হয়ে উঠলে আপনা থেকে ছোট ছিদ্র বড় বলে মনে হয়, মনও খুঁত ধরার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ছবিটির নিশ্চয় সে রকম কোন দোষ হয়েছে বুঝেছি। কিন্তু সহজ মনে একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখলে সব কিছুই অত বিসদৃশ বোধ হয় লাগত না। অসঙ্গতির দিকটাই বড় না হয়ে উঠে, সেখানে আপাত দৃষ্টিতে বিসদৃশ, তার তলার সম্ভাব্যতার যুক্তিটা খোঁজবার উৎসাহ হ'ত।

Life is stranger than fiction কথাটা বলে বলে পচে গেছে বলে, মিথ্যে হয়ে যায়নি। গল্পে সত্যিই সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বেশী সাবধান থাকতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, একেবারে বাঁধাধরা সুপরিচিত রাস্তায় ছাড়া গল্প এক চুল এদিক ওদিক যাবে না। ভালো ও সত্যিকার গল্পের বিশেষত্বই এই যে তা ঠিক বাঁধা রাস্তায়—ঠিক পর পর না বলে দেওয়া যায় সে রাস্তায় যায় না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তা মোড় ফেরে, হঠাৎ এমন চাল বদল করে যা নিত্য নৈমিত্তিক নয়। তা না হ'লে গল্প হবে কেন? তবে ভালো লেখক তারই মধ্যে সম্ভাব্যতার সূত্রটা বজায় রাখেন। কিন্তু সে সূত্র ত লোহার শিকল নয়। ছিঁড়তে চাইলে তা টুকরো টুকরো করে ফেলা মোটেই শক্ত নয়।

শুভার্থী,
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, বোম্বাই।

[দেশ পত্রিকায় (১৪ই মে, ২৮ সংখ্যা) 'পরিশোধ' ছবির যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কাহিনীকার শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র দেশ পত্রিকার চিত্র সমালোচকের কাছে ব্যক্তিগত পত্র দেন। চিত্র পরিচালক ও কাহিনীকারের মধ্যে অসহযোগিতা সম্বন্ধে 'চিত্র সমালোচক' যে মন্তব্য করেছিলেন কাহিনীকার শ্রীযুত মিত্র তারই জবাবে কয়েকটি মূল্যবান কথা এই পত্রে জানিয়েছেন বলেই তা পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থাপিত হল।—সম্পাদক দেশ]

গ্রন্থপার্বণ

(১)

মহাশয়,

দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৬২) প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গ্রন্থ-পার্বণ' আমি পড়েছি এবং খুশীও হয়েছি। শুধু তাই-ই নয়, তারপর হ'তে আনন্দবাজার পত্রিকায় ও দেশে এই সম্পর্কে কয়েকটি চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে দেখলুম। প্রেমেনবাবু ব'ললেন, গ্রন্থ-পার্বণ করো আর অমনি চারিদিকে সাধু সাধু রব পড়ে গেল। কয়েকদিন হয়ত কাগজে কাগজে এই নিয়ে কিছু কিছু লেখালেখিও চলবে—তারপরে হারিয়ে যাবে প্রেমেনবাবুর আবেদন। ফুরিয়ে যাবে সব কিছু।

প্রেমেনবাবু বলেছেনঃ নতুন যুগের এ নতুন পার্বণ 'গ্রন্থ-পার্বণ' হোক না কেন!... পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে সাতটি দিন পরস্পরকে গ্রন্থ উপহার দেওয়ার রীতি যদি প্রবর্তন করা যায়, কেমন হয়। ...ঋষি-কবির আবির্ভাব-সপ্তাহ বিদ্যার দীপ্তি ও রসের মাধুর্য আদান প্রদানে অভিনন্দিত করে তোলার চেয়ে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন আর কি হতে পারে!......

খাঁটি কথা ব'লেছেন প্রেমেনবাবু। কিন্তু, কেবলমাত্র একদিক বিচার ক'রে দেখলেই ত চলবে না। এই আবেদনের অন্তরায়ও কিছু কিছু আছে যার জন্যে আমরা আজো রবীন্দ্র-রচনার সবটুকু রসাস্বাদন ক'রতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি বইয়ের দাম

বিশ্বভারতী এত বেশি রেখেছেন যে আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তদের সব সময়ে তা কিনে পড়াই যখন একান্ত দুরূহ হ'য়ে পড়ে তখন উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গ আর সেখানে ওঠে কি করে বলুন! বারো টাকা দিয়ে একখণ্ড রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী কিনে পড়ার সমস্ত আবেদনটুকুই কেমন যেন ঝিমিয়ে যায়।

যে দেশে মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতেই নাজেহাল সে দেশের জীবনে এমন দুর্মূল্য দিয়ে বই কিনে গ্রন্থ-পার্বণ উৎসব করা একটা বিলাস বলেই মনে হবে। আর শুধু সেই কারণেই হয়ত প্রেমেনবাবুর এমন সুন্দর আবেদনটুকু বিফল হয়ে যাবে। একথা ভাবতেই বেদনা বোধ ক'রছি।

কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যই নয়, সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই সৃষ্ট মহাসম্পদগুলির বহুল প্রচারের জন্য সুলভ-সংস্করণ গ্রন্থমালা প্রকাশ করা উচিত এবং তা যদি কখনো কোনদিন সম্ভব হয় তবেই সেইদিন এই 'গ্রন্থ-পার্বণ' উৎসব সার্থক হবে—সত্য হবে।

পুস্তক-মূল্য হ্রাস করার জন্য রীতিমত আন্দোলন প্রয়োজন এবং সেই আন্দোলনে লেখক, পাঠক, প্রগতিমনা প্রকাশক ও সংবাদপত্রের যোগাযোগ চাই। কিন্তু এতদিন ধরে এত লেখালেখি করেও তা হোল কোথায়! সত্যি কথাটা সত্যিকারের বলার মত উপযুক্ত লোক কোথায়! না আছেন তেমন পাঠক, না আছেন লেখক, আর না আছেন তেমন আদর্শবান-বীর্যবান পত্র-পত্রিকা। তা যদি থাকতো তবে এমন করে প্রেমেনবাবুকে এতদিনে গ্রন্থ-পার্বণের আবেদন জানাতে হোত না, যে আবেদন পড়ে বাঙালী মাত্রেরই লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাওয়া উচিত। ইতি—দীপিকা দাশগুপ্ত, জামসেদপুর—৫।

(২)

প্রিয় মহাশয়,

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গ্রন্থ-পার্বণ' পরিকল্পনা 'দেশ' পত্রিকার 'সাহিত্য-সংখ্যা: ১৩৬২'-তে উৎসাহ সহকারে পাঠ করলাম। পঁচিশে বৈশাখ আজ আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম উৎসবের অঙ্গ এবং সে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনবোধের পক্ষে মঙ্গলময়—সে হিসাবে শ্রীযুক্ত মিত্রের অনুসৃত পরিকল্পনা কেবলমাত্র সময়োপযোগীই নয় আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের অন্যতম ভিত্তি এবং পঁচিশে বৈশাখকে আরও নবতররূপে স্থাপন করার নবতম গ্রন্থিস্বরূপ। সেজন্য শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ধন্যবাদার্হ। প্রস্তাবনায় "গ্রন্থ-পার্বণ" প্রসঙ্গে লেখক যথার্থই বলেছেন: "সত্যিকারের পুজো বলতে যা বুঝি, তা একলার, কিন্তু পার্বণ ব্যাপারটা সকলের।" এবং "পার্বণ ব্যাপারটা গায়ের জোরে অবশ্য গড়ে তোলা যায় না। সমবেতভাবে আমাদের মনে ও বাইরের পরিবেশে তার প্রস্তুতি অন্ততঃ থাকা দরকার। সেই প্রস্তুতি যেখানে আছে, সেখানে অনুকূল জল-হাওয়ার ব্যবস্থা করলে তা সহজেই পল্লবিত মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে।"

কবিগুরুর পুণ্য জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এ উৎসবের প্রেরণা নিশ্চয়ই অনুকূল জল-হাওয়ার ব্যবস্থা করলে সহজেই মঞ্জুরিত হয়ে উঠবে। এ সুপরিকল্পিত 'গ্রন্থ পার্বণে' লাভের দিকটাই বেশী; কেন না, কবিগুরুর জন্মোৎসবকে ঘিরে গড়ে উঠবে অন্য এক নতুন উৎসব—যা সাহিত্যে ব্যাপকতর উদ্দেশ্য সাধন করবে পরস্পরের মধ্যে সু-সাহিত্য পরিবেশনায়,—আরও এক সুদূর প্রসারী আলোক ইঙ্গিতে। বাঙলার জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রয়েছে—সে উৎসবের সুরের রেশের সাথেই না হয় এ নব-পার্বণ সংস্কৃতির সেতু হিসাবে চৌদ্দ পার্বণের আসন লাভ করুক তাতে তো আনন্দের দিকটা আমাদের; সম্মানের দিকটা বাঙলা সাহিত্যের। মনে হয়, 'গ্রন্থ-পার্বণ' পরিকল্পনা রবীন্দ্র জন্মোৎসবকে ঐতিহ্যময় পূর্ণাঙ্গ জাতীয় উৎসবে পরিণত করবার পূর্ণ সহায়তা করবে; প্রেমেন্দ্র-পরিকল্পনা সার্থক হোক।

নমস্কারান্তে, ইতি—
শ্রীনলয়শংকর দাশগুপ্ত
ক'লকাতা—৩৩।

(৩)

সবিনয় নিবেদন,

দেশ-এর গত 'সাহিত্য সংখ্যায়' শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্রবাবু রবীন্দ্র জন্মতিথিতে গ্রন্থ-পার্বণের যে-আবশ্যকতার উল্লেখ করেছেন, তার যাথার্থ্যের দিকটা আপামর জনসাধারণ স্বীকার করি, যদিও, এ প্রসঙ্গে আমার একটা বক্তব্য আছে। আমার বক্তব্যটা জিজ্ঞাসার অনুরূপ। সুতরাং তার কদর্থ না করলে বাধিত হব।

রবীন্দ্র জন্মতিথিতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর গণ্ডী অতিক্রম আমরা করি না, করা উচিতও নয়। তেমনি রবীন্দ্র জন্মতিথিতে গ্রন্থ-পার্বণের গ্রন্থপঞ্জী রবীন্দ্র-সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কি না, লক্ষ্য করবার বিষয়। আর আমার প্রশ্ন-লক্ষ্যও এস্থানে কেন্দ্রীকৃত।

যদি তাই থাকে ত, অ-রবীন্দ্র-সাহিত্যের খানিকটা ব্যবসায়িক ক্ষতির সূত্রপাত হওয়া বিচিত্র নয়। যেহেতু বাৎসরিক বাজেট সূত্রে গ্রন্থ-পার্বণ পুষ্প গ্রথিত হওয়ার পূর্বাহ্নেই মনে পড়বে আমাদের আর্থিক অসামর্থ্যের কথা—একাধিক গ্রন্থক্রয়ের ক্ষমতা যার নেই।

আর একটু বিশদ হবার চেষ্টা করছি। আমার বক্তব্য এই: গ্রন্থ-পার্বণের গ্রন্থ-নির্বাচনে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এককতা বা অগ্রাধিকার স্বীকৃত কি না? অর্থাৎ নেহাৎ প্রয়োজনে অ-রবীন্দ্র-সাহিত্যের কেবল সওগাদান করবার অধিকার থাকবে। অথচ আমাদের আর্থিক বনিয়াদ একাধিক গ্রন্থক্রয়ে অক্ষমতা জানাবে।

এমন যখন পরিস্থিতি, তখন, এ-সম্পর্কে খানিকটা চিন্তার অবকাশ আছে। ভাবনার ভারটা বিদগ্ধজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই। এটা সার্বজনীন ভাবনা। স্বয়ং অ-রবীন্দ্র-সাহিত্যিক গোষ্ঠিভুক্ত বলে এ-কথা লিখলাম, ভাবলে, ভুল বোঝা হবে।

নমস্কারান্তে ইতি—
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, হুগলী।

পার্বত্য মারিয়া • উপজাতি

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

রায়পুর থেকে নারায়ণপুরের পথে চলেছি। মধ্যপ্রদেশের বর্ণবৈচিত্র্য-হীন পরিবেশ। কেশকালঘাট পাহাড় পার হবার পর দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেল। বাস্তার জেলার আদিম জাতির বাসভূমিতে প্রবেশ করেছি। শুষ্ক, রাঙার রূপের পরিবর্তে প্রকৃতি হাস্যময়ী। উন্নত শির বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং দিগন্ত-প্রসারী শ্যামল পর্বতময় ভূমি। বনরাজ্যের অধিবাসী মারিয়া উপজাতি। সভ্য জগৎ ছেড়ে যতই দূরে যেতে লাগলাম, আদি-বাসীদের আচরণ ততই সংক্ষিপ্ত কিন্তু আভরণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য তত বেশি। নানা রং ও রকমের পুঁতির মালা, মাথা গলা এবং বাহুতে ধাতুর অলংকার। স্বাস্থ্যশ্রীতে উজ্জ্বল উপজাতির দেহ-সৌষ্ঠব নানা বর্ণের আভূষণে বড় মনোরম রূপ নিয়েছে।

নারায়ণপুরের পরও অনেকখানি পথ যেতে হবে। মধ্যপথে এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে মারিয়া উপজাতিদের গ্রামে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তার জেলার ছোট এক তহসিল শহর নারায়ণ-পুর। আশেপাশে উপজাতি অঞ্চল থেকে হাটবারে বহুলোক এখানে কেনা-বেচা করতে আসে। সেদিন এই সুপ্ত শহর অপরূপ মানুষের আনাগোনায় সজীব হয়ে উঠে।

বাস্তার জেলা বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বহু উপজাতির বাস। কোন্ডাগাঁও এবং নারায়ণপুর তহসিলের মুরিয়া উপজাতি সংখ্যায় এবং জীবন-যাত্রার বৈচিত্র্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মুরিয়া সমাজ-জীবন ঘোটুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিশোর, কিশোরী, যুবক, যুবতী জীবনের সব থেকে স্মরণীয় এবং মধুর জীবন ঘোটুলে যাপন করে। ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা তারা এখানেই পায়। হাস্য, গীত, নৃত্য, কৌতুকে ঘোটুল জীবন্ত এক রূপ নেয়। সভ্য জগতের সংস্পর্শে এসে ঘোটুল-জীবন আজ বহুপরিমাণে সংকুচিত। জগদলপুরে মুরিয়া এবং রাজগণ্ড উপ-জাতিরা বহুপরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে এবং আদিম সমাজের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে বহিরাগত মানুষের অসহিষ্ণুতা ও নীতিবোধ তাদেরও সংক্রামিত করেছে। মুরিয়া উপজাতির প্রতিবেশী হলবা আদিবাসীরা সম্ভবত অতীত দিনের দুর্গরক্ষী সৈন্য সামন্তের বংশধর। উপজাতিদের বহু সুন্দর গীত ও গাথা হলবি ভাষায় রচিত হয়েছে এবং বহু মুরিয়াও এই ভাষায় বাক্যালাপ করে। ভাত্রা উপজাতিও বোধহয় ওরঙ্গল রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে এ অঞ্চলে এসে বসবাস করে। তারাও ঘোটুল প্রথার ঘোর বিরোধী এবং উপবীত ধারণ ক'রে হিন্দু সমাজের মধ্যে স্থায়ী আসন পাবার চেষ্টা করছে। এছাড়া, ধুরেওয়া, মহরা, রাওয়াও, লোহার, কালার, ঘাসিয়া, পরধান প্রভৃতি উপজাতিদের আবাসভূমি এই বাস্তার জেলা।

পার্বত্য মারিয়া বালকবালিকা

হাটের পথে পার্বত্য মারিয়া যুবতী

বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সব থেকে কম পার্বত্য মারিয়া উপজাতির। আবুজমার পাহাড়ের দক্ষিণে 'বাইসন শৃঙ্গী মারিয়ার' বাস। বন্যমহিষের শৃঙ্গ সংযুক্ত নাচের পোশাক পরে বিবাহ বাসরে তারা নৃত্য করে ব'লে বিদেশীরা তাদের এই নামকরণ করেছে। মুরিয়াদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ নেই বললেই হয়, কেবল ঘোটপালে মরহাই উৎসবের সময়ে নাচের দিনে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। পার্বত্য মারিয়াদের এক শাখা ঝুরিয়া মুরিয়া। অতীতে কোনও এক সময়ে তাদের আদিম বাসভূমি পরিত্যাগ ক'রে তারা চলে আসে এবং মুরিয়া উপজাতির সান্নিধ্যে এবং সংস্পর্শে নিজেদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়। এমনি বহু বিবরণ বাস্তার জেলার আদিম নিবাসীদের সম্বন্ধে পেয়েছিলাম।

নারায়ণপুর থেকে মারিয়াদের পার্বত্য ভূমি যাবার দু'টি পথ। একটি দক্ষিণে, ছোট ডোঙ্গর পার হয়ে খাড়া পাহাড় এবং গুড্রা নদীর জলপ্রপাত-এর পাশ দিয়ে। পাহাড়ে নদী স্বচ্ছ, শীতল বারিধারা বহন করে পাহাড়ের বুক চিরে রাস্তা বের করে নীচে সমতলভুমির উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। চারদিকে গভীর বন এবং তারি ধারে ছোট ছোট মারিয়া গ্রাম। অভিধানিক অর্থে ৩।৪ ঘর পরিবারের বসতিকে গ্রাম ব'লে স্বীকার করতে অসুবিধে হয়। পথের শেষ সীমানায় অরচা গ্রাম। পার্বত্য মারিয়াদের সব থেকে বর্ধিষ্ণু এবং বৃহৎ পল্লী এই অরচা। গ্রামের কিছু দূরে গুড্রা নদী গিয়ে ইন্দ্রাবতীতে মিশেছে। ইন্দ্রাবতী গোদাবরীর এক সহায়ক শাখা-নদী। নারায়ণপুর থেকে অন্য পথ পশ্চিমদিকে নিব্রা নদীর ধার দিয়ে শোনপুর পার হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। এই পথে যেতে সাক্ষাৎ মিলেছে অসংখ্য ময়ূরের। আবুজমার পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সর্পিল পথ চলে গিয়েছে, দু'ধারে স্নিগ্ধ, শ্যামল বন এবং তারি মাঝে ময়ূরের ঝাঁক। আসাম বা হিমালয় তেরাইয়ের বনানীর মত বাস্তার জেলার উদ্ভিদ্ রাজ্য অত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং দুরধিগম্য নয়। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ আর চারপাশে লতাগুল্মময় বনভূমি।

মারিয়া গ্রামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় একটু অদ্ভুত রকমে। অনেকখানি পথ পায়ে হেঁটে চড়াই উৎরাই পথে ঘন জঙ্গলের মধ্যে গ্রামে এসেছি। পথপ্রদর্শক গ্রামবৃদ্ধের বাড়ির দিকে নিয়ে চলল। দূর থেকে গ্রামের মোড়ল এবং সঙ্গে কয়েকজনকে দেখলাম। আমাদের যখনই তারা দেখতে পেল, এক গইতা (গ্রাম প্রধান) ছাড়া অন্য সবাই ঊর্দ্ধশ্বাসে বনে অদৃশ্য হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গইতার কাছে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিয়ে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। গ্রামবৃদ্ধ জঙ্গলের পথে তাকে অনুসরণ করতে বলল। হাঁকডাক দিয়েও কিন্তু লোক জড়ো করা গেল না। পলায়মান দু'টি মারিয়া যুবক যুবতীর উদ্দেশ্যে গইতা উচ্চস্বরে আহ্বান এবং দ্রুত-পদক্ষেপে অনুসরণ আরম্ভ করল। বহু পথ অতিক্রম করে তাদের ভীতি বিদূরিত হল। সভ্যমানুষকে কেন তারা এত ভয় করে এর কারণ পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

আগেই বলেছি, মারিয়া গ্রাম সাধারণত অল্প কয়েকটি পরিবার নিয়ে তৈরি। দু'টি গ্রামের মধ্যে দূরত্ব ১০।১৫ মাইল পর্যন্ত। কুঁড়ে ঘর, সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। গ্রাম সাধারণত ছোট ঝরণা,

পাহা'ড়ে নদী বা জলাশয়ের ধারে। দূরে সন্নিবিষ্ট এই গ্রামের পথে যাতায়াত করতে হলে রাত্রিতে প্রতিটি গ্রামে আশ্রয়স্থল থাকা প্রয়োজন। অনেক গ্রাম থেকে হাটুরেদের ২০।৩০ মাইল পথ অতিক্রম করে আসতে হয়। নারায়ণপুরের বাজারে চল্লিশ মাইল দূরে থেকে মারিয়ারা আসে। সন্ধ্যার পর বিশেষ কোনও কারণ না থাকলে বা বড় দলে সংযুক্ত না হয়ে বড় কেউ পথ চলে না। তারি জন্যে প্রতিটি গ্রামে এক একটি পান্থনিবাস আছে। এর নাম ঘোটুল। মারিয়া ঘোটুলে অবিবাহিত তরুণ যুবকেরাও একসঙ্গে রাত্রি যাপন করে। গ্রামের প্রবেশপথে সাধারণত ঘোটুল তৈরি করা হয়। প্রবেশপথ পাহারা দেবার ভাল ব্যবস্থাও হয়। বিপদে আপদে প্রয়োজন-বোধে রাত্রে গ্রামের বলিষ্ঠ যুবক দলের সাহায্য যে কেউ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে নিতে পারে। অবিবাহিতা যুবতীরা ঘোটুলে যেতে পারে না। বিবাহিত যুবক নিজের বাড়িতে বসবাস করে।

মারিয়া পুরুষ বহু অলঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিত করে। পরিধেয় বস্ত্র যৎসামান্য। কোমরে কড়ির কোমরবন্ধ এবং তাতে নানা কারুকার্যকরা পেতলের বাটের লোহার বাঁকান ছোরা গোঁজা থাকে। গলায় বহু বর্ণের পুঁতির মালা, মাথায় কখনও টুপি থাকে, কিন্তু শিরোভূষণ হিসেবে পাখির পালক থাকবেই। বাহুতে কাঁচ বা ধাতুর বালা। কানে নানা আকারের মার্কাড়ি। মারিয়া যুবতীদের অঙ্গাভরণ একই রকমের। মোটা, মজবুত কাপড় কটিদেশে বেষ্টন করে স্ত্রীলোকেরা পরিধান করে। দেহের উপরিভাগে বডিস (চোলি) জাতীয় কোনও পরিধান ব্যবহার করে না।

নাচের পোশাকে পার্বত্য মারিয়া উপজাতি

আদিম জাতির নগ্নতা বহু সভ্য শাসক এবং সমাজ সংস্কারককে অযথা উদ্ব্যস্ত করে তোলে এবং মারিয়া দেশেও এই অবাঞ্ছনীয় উপদ্রবের পরিচয় পেয়েছিলাম। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা দেখার জন্যে কখনও এদেশে রাষ্ট্রনায়কদের শুভাগমন হয়। তার আগে সরকারী কর্মচারীর দল বেরিয়ে পড়েন আশে-পাশের গ্রামে মিলের আটপৌরে শাড়ি এবং ব্লাউজের গাঁট নিয়ে। সম্মানিত অতিথির সামনে অতি নিকৃষ্ট বস্ত্রাবরণে সুজ্জিত করে উপজাতিকে উপস্থিত করা হয়। পরিদর্শন হয়ে যাবার পর নাকি কাপড় আবার ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়, ভবিষ্যতে আবার পুতুল সাজাবার প্রয়োজন হতে পারে! একটু বিতর্ক-মূলক হলেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মানুষের দেহ-সৌষ্ঠবকে কখনও বস্ত্রাবরণের আতিশয্যে অবগুণ্ঠিত করার অপপ্রয়াস হয়নি। রৌদ্রদগ্ধ দেশে পরিধানের আধিক্য পীড়াদায়ক। আজ ইংরাজ মিশনারি প্রচারিত ভিক্টরীয় যুগের শালীনতা-বোধকে ভারতীয় আদর্শ বলে বিনা দ্বিধায় আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। বস্ত্রবৈভব সভ্যতার অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেই ধারা আবার আমরা ভারতের বিভিন্ন উপ-জাতিদের জীবনে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। মিশনারি প্রচারকের দল পৃথিবীর বহু অংশে আদিম সমাজের জীবনে অশোভন ব্যগ্রতার সঙ্গে ঐহিক ও পরমার্থিক মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। ভারত-বর্ষেও বিগত দিনে রাজনৈতিক পরাধীনতার সুযোগে মিশনারি সংগঠন এমনি বহু অকল্যাণকর কাজ করেছে। আজ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পট-ভূমিকায় নতুনভাবে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে এ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা হবে, তাই সবাই আশা করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী বিধিব্যবস্থা এখনও সেই ধারায় চলেছে।

মারিয়া উপজাতি অঞ্চলে সরকারী

পার্বত্য মারিয়াদের বাসগৃহ

কর্মচারীদের আগমন খুব ঘন ঘন হয় না। তা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশের চন্দা জেলার আদিম জাতি জেলা সংগঠক শ্রী জি পি বুচকে, "ভারতীয় আদিম জাতি" নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : তাঁহারা (সরকারী কর্মচারীরা) তাদের থেকে (পার্বত্য মারিয়া উপজাতিদের) মুর্গি, ধান এবং চাল উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে সংগ্রহ করে। বস্তুত আদিম জাতির লোকেরা বন্য হিংস্র জীব জন্তুকে অত ভয় করে না, যেমন তারা সরকারী কর্মচারী বা তাদের সমগোত্রজদের ভয় করে।" (পৃঃ ৮১, ভারতীয় আদিম জাতি, প্রথম ভাগ, প্রকাশক—ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সংঘ)। দূর থেকে মারিয়া গ্রামবাসী আমাদের দেখে কেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়েছিল তা বোঝা মুশকিল হবে না। সংগ্রহাত্মকভাবে অনুপ্রাণিত রাজকর্মচারী কি পরিমাণ উপদ্রব ও অনাচার উপজাতি জীবনে সৃষ্টি করে তার পরিচয় আরও বহু স্থানে পেয়েছি।

মারিয়া গ্রামজ্যেষ্ঠ গতিয়া সেই গ্রামের পুরোহিতও। সুতরাং তার ক্ষমতার ভাগীদার কেউ নেই। প্রধান উপাস্য দেবতা ফরসা পেন। দেবতার [illegible]

গ্রামের বাইরে ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর যথেষ্ট উৎপাত আছে। এক গ্রামে গিয়ে শুনলাম আশে পাশে কয়েকদিন ধরে একটা বাঘ উপদ্রব শুরু করেছে। তাকে ধরার জন্যে সবাই মিলে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে ইঁদুর ধরা কলের মত ফাঁদ পাতল। ফাঁদের মধ্যে মাংসের টুকরো ঝুলিয়ে রাখা হলো। পরের দিন সকালে খোঁজ নিয়ে জানলাম রাত্রে বাঘ ফাঁদে পড়েছে। এখন সবাই মিলে তাকে মারার ব্যবস্থা করছে। নিহত শার্দুলের মাংস নিয়ে গ্রামবাসীরা চলে গেল। মারিয়াদের বিশ্বাস যে গ্রামে ব্যভিচার হলে 'বড়া দেও' কুপিত হয়ে বাঘের রূপ ধারণ করে সে গ্রামের গরু, ছাগল সব কিছু খেয়ে ফেলেন। সুতরাং ব্যভিচারীদের আচরণ সম্পর্কে সমস্ত গ্রামই সচেতন।

পুত্র জন্মের ন' দিন পরে নামকরণ উৎসব হয়। গ্রাম প্রধান পৌরোহিত্য করেন। শিশুর নাম মাস, ঋতু, মহুয়া ফুল বা অন্য কোনও সুদৃশ্য ও সুগন্ধী পুষ্পের নামে হবে। শবদেহ সাধারণত কবর দেওয়া হয়। শবস্থানের উপর পাথর বা কাঠের চিত। দেওয়া হয়। মৃতের শ্রাদ্ধ-শান্তি উপলক্ষে বিরাট ভোজ দেবার ব্যবস্থা আছে। মাংস ভোজন ও সার্বিক মদ্যপান এই ভোজে সব থেকে প্রয়োজনীয় পানাহার। মারিয়া জীবনের সব থেকে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিবাহ উপলক্ষে। যুবক-যুবতী নিজের পছন্দমত সঙ্গী নির্বাচন করে এবং গ্রাম বৃদ্ধের অনুমতি নিয়ে উৎসব আয়োজন হয়। দূর দূর গ্রাম থেকে মারিয়ারা বিবাহ উৎসবে যোগদান করতে আসে। তখন যুবক-যুবতীর দল একসঙ্গে মিলিত নৃত্য করে। সেদিন তরুণ-তরুণীর দল প্রাণ খুলে নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ পায়। নতুন জীবন সঙ্গী নির্বাচনের প্রথম অধ্যায় হয়ত রচিত হয়। বিবাহিতা যুবতীর পক্ষে কিন্তু নৃত্য নিষিদ্ধ।

মারিয়া উপজাতিদের প্রধান খাদ্য ভাত। জঙ্গল পুড়িয়ে ঝুম প্রথায় চাষ আবাদ করে। নিজেদের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তা ছাড়া অন্য কিছু তারা তৈরি করে না। টেন্ডু, মহুয়া, চিরাঞ্জি প্রভৃতি বন্য ফলও তারা সংগ্রহ করে। তীর ধনুক দিয়ে বনের হরিণ, পাখি প্রভৃতিও শিকার করে।

মুরিয়া এবং মারিয়াদের জীবনযাত্রার প্রচুর পার্থক্য। প্রথম দেখে সব থেকে আশ্চর্য লাগে মুরিয়াদের পরিচ্ছন্নতা। চারদিকে তকতকে ঝকঝকে ভাব। প্রতিবেশী পার্বত্য মারিয়ারা কিন্তু একেবারে অপরিষ্কার। অপরিচ্ছন্নতায় আদিম জাতিদের মধ্যে এদের সমকক্ষ আর কেউ বোধ হয় নেই। স্নানের সঙ্গে চিরাচরিত অসহযোগিতা। ডাঃ ভেরিয়ার এলউইন এ অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিদের সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে ঝরিয়া মুরিয়ার যুবক-যুবতীর মিলিত ঘোটুল এই উন্নতির মূল কারণ। প্রেমিক প্রেমিকা একই সঙ্গে যৌবনের প্রথম যুগে বসবাস করার ফলে নিয়মিত স্নান, পরিচ্ছন্নতাও তাদের জীবনে এসেছে। মারিয়া ঘোটুল জীবন স্ত্রী-সংসর্গবিবর্জিত, সুতরাং পরিচ্ছন্নতা ও প্রসাধনের এখানে বড় অভাব।

ফটো—সুনীল জানা

॥ ১৯ ॥

মহাত্মা গান্ধী বল্লেন, 'গ্রামে ফিরে যাও।' ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক বাস করে গ্রামে, অশিক্ষা অব্যবস্থা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার পঙ্ককুণ্ডে আমাদের কোটি কোটি দেশবাসী জীবনাতিপাত করে। সেখানে যদি আলো না জ্বলে, সেখানে যদি ভয়াবহ দারিদ্র্যের অপনোদন না ঘটে, তাহলে আঙ্গুলে গোনা যায় এই সামান্য কয়টা শহরের দীপ্তি দিয়ে দেশের কী উপকার হবে? তাতে কোটি কোটি গ্রামবাসী জনসাধারণের কী কল্যাণ?'

সেই গ্রামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হলো। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো পল্লীর অভ্যন্তরে, অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের বুকের কাছে। লক্ষ্ণৌর পর মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো।

মহারাজ শিবাজীর পদরেণু মাখা মহারাষ্ট্র সমগ্র জাতির পুণ্যভূমি। স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় বীরত্বে উজ্জ্বল ইতিহাস এই ভারতখণ্ডের, নবীন ভারতবর্ষের আর এক সংগ্রামী অধ্যায় এর সঙ্গে যুক্ত হলো।

ফৈজপুরের রিপোর্ট করতে সদলবলে আমি হাজির হয়েছি। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরের শীতকাল।

স্টেশনে পেঁছেছি সকাল বেলা। প্রথমেই এগিয়ে এলেন বি জি খের মশায়। অতিথিদের অভ্যর্থনা ও বাসস্থল নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

সৌম্যসুন্দর চেহারা। মুখে শান্ত প্রাণখোলা হাসি। আন্তরিক অন্তরঙ্গতার সুর কথাবার্তায়। বল্লেন, ফ্রী প্রেসের সঙ্গে তাঁর মমত্বময় সংযোগ ছিল আর এজন্যে আমরা তাঁর আত্মার আত্মীয়ের মত।

এক মিনিটেই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম পরস্পর।

বি জি খের খাঁটি গান্ধীবাদী। রাজনৈতিক দীপালোকের মোহ তাঁকে কোনদিন আকর্ষণ করে নি, যথার্থ জনসেবা ও গ্রামোন্নয়নের মধ্যেই তাঁর সোৎসাহ অনুরাগ। দীর্ঘকাল বোম্বের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও অবশেষে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় হাই কমিশনারের কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সততা ও জনকল্যাণের প্রতি মমতা সম্পর্কে কখনো কোন সন্দেহ জাগতে পারে নি কারোর মনেই।

যখনই বোম্বে গেছি, আন্তরিক প্রীতির টানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থায় বোম্বে গবর্নমেণ্ট আমাদের সংবাদ নেওয়া আরম্ভ করে একমাত্র তাঁরই নির্দেশে।

একদা বোম্বেতে বাঙালীদের এক উৎসবে তিনি প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। আমার কন্যা প্রতিমা সেখানে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিল। তখনকার টেরিফ বোর্ডের সভাপতি ও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দূত শ্রীগগনবিহারী মেটা সে-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে প্রতিমার পরিচয় পেয়ে এগিয়ে এসে তাকে কন্যাস্নেহ জানিয়ে বলেছিলেন আমার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক বন্ধুত্বের কথা।

সম্প্রতি তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মচক্র থেকে অবসর নিয়ে পুণায় নিরিবিলিতে বাস করছেন। তাঁর জীবন শান্তিময় হোক, তাঁর প্রতি দ... থেকে আমার এই প্রার্থনা।

ফৈজপুরে অধিবেশনে আমরা উপস্থি... হয়েছিলাম বাংলাদেশের অনেক সাংবাদি...

সেই অধিবেশনে সর্বাধিক আকর্ষণ... ব্যক্তি ছিলেন এক বাঙালী বিপ্লবী নেত... নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নরেন্দ্রনাথের পি... দত্ত নামটা কবে মুছে গেছে, কিন্তু জ্ব... জ্বল করছে তাঁর স্বনির্বাচিত না... মানবেন্দ্রনাথ রায়। সংক্ষেপে এম এন রা...

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে... মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া হলো তাঁকে... তাঁর জন্য সংরক্ষিত রইলো নির্দি... আলাদা কুটীর। দেশী বিদেশী সাংবাদিক... তাঁর কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন... সকলেরই কৌতূহল তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্র... সম্পর্কে, সকলেই জানতে চায় তিনি ক... কংগ্রেসে কায়মনোবাক্যে যোগদান করবেন...

একজন সাধারণ বিপ্লবীর মতে

বিনের প্রারম্ভে তিনি অস্ত্রের সন্ধানে দেশ যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ প্রতিভা তাঁর। বিপদসঙ্কুল বিনযাত্রায় পৃথিবীর নানা দেশে পরি- ভ্রমণ করেছেন, ভারতের বিপ্লবের বার্তা দেশেবিদেশে প্রচার করেছেন, সংগঠন করেছেন। তাঁর জীবন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো বিচিত্র। বিদেশী পুলিসের শৃগালচক্ষু থেকে নিজেকে গোপন রেখেছেন, আবার তারই মধ্যে বিপ্লবী অভিযাত্রাও সঙ্কুচিত করেন নি। মেক্সিকোতে তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লব পরিচালনা করেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থায় নেতৃত্ব করেছেন, মহাচীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের পুরোধা-অংশ গ্রহণ করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের সংগে মতানৈক্যের জন্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতের বিপ্লবী গণ-আন্দোলনে আবির্ভূত হয়েছেন।

মেক্সিকো, রাশিয়া ও চীনে এম এন রায় যে ঐতিহাসিক ভূমিকা অভিনয় করেছেন, তা একজন বিদেশীর পক্ষে একান্ত অভূতপূর্ব। শুধু অভূতপূর্ব নয়, প্রায় অসম্ভব পর্যায়ের। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে সেই গৌরবময় অধিকার অর্জন করেছিলেন।

এম এন রায় শুধু বিপ্লবী বা কুশলী সংগঠক নন, তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিধি ছিল না। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে তাঁর এমন উঁচু স্তরের জ্ঞান ছিল যে, মনে হয় সমুদ্রের মতো তা অতলস্পর্শ। পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

তাঁর বইগুলিতে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মানুষটির মনীষা ও প্রজ্ঞা ভবিষ্যৎ মানুষদের জন্য সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কার্ল মার্কস্ যেখানে শেষ করেছিলেন, তারপরে হয়তো একমাত্র তিনিই নতুন কথা সংযোজন করতে পেরেছেন।

ফৈজপুরে এম এন রায় একজন কংগ্রেসের সেবকরূপে যোগদান করেছিলেন। মনে হয়েছিল, তিনি পৃথিবীর বিপ্লবী জয়যাত্রা ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, মাতৃভূমির সেবায় তা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমর্পণ করবেন। কংগ্রেস অধিবেশনে কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের খসড়া রচনার জন্য জওহরলাল তাঁকে অনুরোধ করেন। সকলের ধারণা হয়েছিল, পরবর্তী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এম এন রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

নতুন আইন অনুযায়ী সকল প্রদেশে নির্বাচন আসন্ন। স্থির করা হলো, যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন কংগ্রেস সেখানে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে। এসেম্বলী ও পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় কংগ্রেস কিভাবে জাতির সেবায় সুষ্ঠুভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে তার আলোচনার জন্য দিল্লীতে একটি কনভোকেশন ডাকা হবে বলে নির্ধারিত হলো।

কিন্তু মুশকিল বাধলো নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ নিয়ে। আইনানুযায়ী তাঁদের শপথ করতে হবে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে, তাতে ভারতীয় গণসংগ্রামের মস্ত অপমান। কংগ্রেসের চোখে ভারতের সংগে ব্রিটেনের সম্পর্কটা অধীনতার নয়, অধীনতা উচ্ছেদের। তাই স্থির হলো, আইনসভাতে যোগদানের আগে সকল কংগ্রেসী সদস্য ভারতমাতা ও ভারতবাসীর প্রতি কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করবেন।

দীর্ঘদিনের শহুরে অভ্যাসগুলো গ্রামের নানা ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ হতে পারে না। পূর্বেকার অধিবেশনগুলিতে আমাদের খাওয়ার কোন অসুবিধে ঘটে নি, দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর খাদ্যটা সহজেই জুটে যেত, তার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু ফৈজপুরে খাবার ক্যাণ্টিনে একমাত্র কংগ্রেস ডেলিগেটদেরই প্রবেশাধিকার ছিল, প্রেসের লোকেরা ব্রাত্য। তাই আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা ছিল আমাদেরই হাতে, একেবারে মুক্তপক্ষ ইচ্ছা-স্বাধীন।

কিন্তু এই 'স্বাধীনতা' আমাদের পক্ষে পরম বিড়ম্বনার মতো। বিশেষ করে আমরা যে কয়জন বাঙালী সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। খাবারের দোকান তো অনেক, সারি সারি বিজ্ঞাপন লাগিয়ে বসে আছে, কিন্তু আমরা দুর্ভাগা বাঙালী মহারাষ্ট্রীয় রান্না মুখে দিই আর অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত বেরিয়ে আসার জোগাড় হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একদিন মরীয়া হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। বলে গেলেন, 'দাদা, খাবারের একটা ব্যবস্থা করতে পারি তো ফিরবো, নতুবা এই শেষ সাক্ষাৎ।'

লোকটা কি সন্যেসী হয়ে যাবে। মনে আমাদের দুশ্চিন্তা, কিন্তু একটা আশাও জ্বলছে যদি নিরুদ্দেশ না হয়ে যান তাহলে সত্যেন্দ্রনাথ নির্ঘাৎ খাদ্যের একটা ব্যবস্থা করে ফিরবেন। আমরা সকলে উন্মুখ হয়ে প্রত্যাশা করছি, কখন তাঁর আগমন ঘটে।

ঘণ্টা কয় পরে সত্যেন্দ্রনাথের উল্লসিত চীৎকার শোনা গেল। আমরা বাঙালী

সংবাদিকরা ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরলাম। চার-পাঁচদিনের বুভুক্ষু উদর আর্তনাদ করছে তখন।

'কোথায় গিয়েছিলে দাদা?'

'আরে, ভারি মজার কাণ্ড। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম গ্রামের অভ্যন্তরে। এক মুসলমান বাড়িতে মোরগের সুমধুর কণ্ঠ শুনে সেখানেই গিয়ে হাজির হলুম। বললুম, রোস্ট বানিয়ে দাও, পরোটা করে দাও। সে ব্যাটা কি আমার ভাষা বোঝে। কিন্তু উদর-জ্বালা বড় বিষম জ্বালা—'

'আহা, এ কথাটা যদি বুঝতো কংগ্রেসী ডেলিগেটেরা।' কে একজন ফোড়ন কাটলো মধ্যপথে।

সত্যেন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, 'যা বলেছ। তাই তো প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলুম, এই ছাই সমস্যার আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করবোই। মুসলমান বাড়িতে মেয়েদের তৈরী মাংস-পরোটা নিয়ে এলুম।'

সত্যেন্দ্রনাথকে আমরা ঘিরে ধরলাম সকলে। কতদিন পরে মনের মত খাবার খেতে পাচ্ছি। কিন্তু তখনও আমি মুখে দিই নি, অন্য একজন অত্যুৎসাহী মুখ-বিকৃত করে সশব্দে মুখে পোরা মাংস-পরোটা উদ্গীরণ করে ফেল্লেন। 'ছি, ছি, ছি, কেরোসিন।'

বুভুক্ষু উদর লোভ মানে না। আমিও মুখে দিলাম সত্যেন্দ্রনাথের সংগৃহীত খাদ্য। কিন্তু নাভিমূল থেকে উৎসারিত হয়ে নেমে এলো একরাশ অশুচি বমি। 'আরে এ যে কেরোসিনের রান্না।'

সত্যেন্দ্রনাথ তখন সুগভীর নৈরাশ্যে নির্বাক স্তব্ধ। আমাদের এমন আশাভঙ্গ বোধহয় কদাচিৎ ঘটেছে।

কিন্তু তবু একটা কথা আমি ভুলি নি। মহারাষ্ট্র আমার ভালো লেগেছিল। বাল্যকালে ইতিহাসের পাতায় আর রমেশ-চন্দ্র দত্তের উপন্যাসে যে মারাঠা গৌরব-কাহিনী মনের মধ্যে প্রেরণার আলো ফেলেছিল, সেই অতীতকে আজ কিছুতেই ছুঁতে পারিনে। কিন্তু মারাঠী শ্রমিক-কৃষক স্ত্রীপুরুষের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কর্মকুশল দেহ দেখে পরিতৃপ্ত হয়েছি। এই শস্য-শ্যামল দেশের হাস্যময় কৃষকদের দেখে একটা গভীর আনন্দ অনুভব করেছি। কাছা দিয়ে শাড়ি পরা, আঁট কাঁচুলি বাঁধা মেয়েদের কাজেকর্মে পরিশ্রমে এমন একটা সানন্দ পরিমণ্ডল আছে, যা আমার বহু দেশ-দেখা চোখে কখনো নজরে পড়ে নি।

সেই দেশের খাদ্য আমি মুখে দিতে পারি নি, কিন্তু সেই দেশকে নমস্কার।

ব্রিটিশ-পরাধীনতার আইন অমান্য করেছে কংগ্রেস, কিন্তু এবার আইনসভায় প্রবেশ করে শাসনভার গ্রহণ করলো। নির্বাচনে সাতটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করায়, মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য গবর্নররা কংগ্রেস দলপতিদের আহ্বান করলেন।

দেশের সর্বত্র একটা উত্তেজনা, একটা আনন্দোচ্ছ্বাস বয়ে গেল। কিন্তু রাজ-নৈতিক কর্মীমহলে দ্বিধা ও সংকোচেরও সীমা নেই। এই সংকুচিত ক্ষমতা বা ক্ষমতার প্রহসন হাতে তুলে কংগ্রে মন্ত্রিমণ্ডল দেশের কী কল্যাণ স করতে পারবেন।

নবনির্বাচিত কংগ্রেসী মন্ত্রিদের মে এসে থামলো গবর্নর প্রাসাদের সামনে শপথ উচ্চারিত হলো। সেক্রেটারিয় ভবনগুলির মধ্যে মন্ত্রীদের নির্দিষ্ট ক জ্বল জ্বল করতে লাগলো।

খবরের কাগজে ব্যানার দিয়ে সংব মুখরোচক রটনা।

জনসাধারণ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে।

কিন্তু ৭ মাসও কাটলো না, বিহার উত্তরপ্রদেশে সংঘর্ষ চরমে উঠলো। শ্রীকৃ সিংহ ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ পদত্যাগপ পেশ করলেন গবর্নরদের সমীপে।

পদত্যাগ করে তাঁরা সোজা এ উপস্থিত হলেন হরিপুরা।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কর্মভূমি পুরা, বাদোলী তমলুকের একটি রিজ্ঞাত নাম। সেই নামটি ইতিহাসে হলো। কংগ্রেসের বার্ষিক অধি-ন বসেছে। বামপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্র পতিত্ব করবেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের সুখ-স্বপ্নটা ঙে গেল। জনসাধারণ স্পষ্ট বুঝলেন, শের প্রতিনিধিদের নিকট শাসনভার র্পণের ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিটা একটি ত্তিহীন মরীচিকা মাত্র। গবর্নরদের ছে আবেদন উপস্থিত করার মালিক ত্রীরা, শাসনভার চালাবার অধিকারী নয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন য় বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সংঘর্ষটা ুল হয়ে উঠেছিল। মন্ত্রিবর্গ দাবী লেন, বন্দীদের সসম্মানে মুক্তি দিতে ব।

গভর্নররা রুখে দাঁড়ালেন। দাসানুদাস আই ডি-দের রচিত নথিপত্র খুলে ল্লেন, বন্দীরা হিংসাত্মক অপরাধের গুরু তব্বর, তাঁদের ছেড়ে দিলে দেশ াতলে যাবে।

মন্ত্রীদের নির্দেশ অমান্য হলো। াঝা গেল, মন্ত্রীরা কেবল উপদেশ নাবার অধিকার পেয়েছেন কিন্তু সনের প্রত্যেকটি রজ্জু গভর্নরদের হাতে। সে হাত নির্মম নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। বত্রিশটি বলিষ্ঠ বলদের টানা রথে সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে শোভাযাত্রা করে আনা হলো সভামণ্ডপে। ব্রিটিশের প্রবলপরাক্রান্ত শত্রু, জনসাধারণের বীর বামপন্থী নেতা।

ইউরোপেও তখন রাজনৈতিক জগতে কুটিল মেঘ জমে উঠেছে। ইতালী ইথিওপিয়া গ্রাস করেছে, হিটলারের মুখে রণংদেহী হুংকার। মহাযুদ্ধের আসন্ন ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে, সারা বিশ্বে নতুনতর আতঙ্ক, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মারণাস্ত্র প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা।

সুভাষচন্দ্র বল্লেন, ভারতবর্ষ চার-দিকের এই যুদ্ধসজ্জা সমর্থন করে না, যুদ্ধের ডামাডোলে ভারত নিরপেক্ষ। ভারতের পক্ষে কোন কথা বলার অধিকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নেই। সে অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের।

ব্রিটিশ সরকার শশব্যস্ত হয়ে জন-সাধারণের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লেখার স্বাধীনতা খর্ব করলেন। মহাযুদ্ধের পাপচক্রে ইংরেজের বশংবদ ভৃত্যের ভূমিকায় ভারতকে দাঁড় করিয়ে রাখবার কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখলো না ব্রিটিশ।

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি বা 'জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সমিতি' স্থাপন করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল, তারই ভিত্তিতে আজ স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে।

দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র। গুরুর মতো মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষেরও বহুক্ষেত্রে মতানৈক্য ছিল। যুবভারতের আদর্শ, চাঞ্চল্য ও আপস-হীন সংগ্রামী মনোবৃত্তিতে তিনি সমুদ্রের মতো ঊর্মিমুখর, বামপন্থী কংগ্রেসের তিনি অবিসম্বাদী নেতা।

এমন সময় নিখিল বঙ্গ কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশন বসলো জলপাইগুড়িতে। সুভাষচন্দ্র সেখানে ওজস্বিনী ভাষায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জীবনপণ গণ-আন্দোলনের আবেদন জানালেন। বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ হলো যে, ৬ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার না করে তাহলে অহিংস অসহ-যোগ আন্দোলন আরম্ভ করে জনসাধারণের সেই মহৎ অধিকার অর্জন করতে হবে।

দেশের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র। আপসহীন আন্দোলনের বাণী প্রচারিত হতে লাগলো নানা দিগ্‌প্রান্তে, ভারতের নানা অভ্যন্তরে সংগ্রামের প্রবল তৃষ্ণা জাগরিত হতে লাগলো।

কিন্তু অসম্ভব পরিশ্রম সহ্য হলো না রুগ্ন দেহের, সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখটা গুরুতর। ঝরিয়াতে শরৎবাবুর ছেলের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসা চলতে লাগলো।

এই সময় ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসবে।

মহাত্মা গান্ধী চাইলেন দেশের এই দুর্যোগকালে তাঁর একজন বিশ্বস্ত শিষ্যের উপর কংগ্রেসের ভার থাকুক। সুভাষচন্দ্র বিদ্রোহী, গণবিপ্লবী।

মহম্মদ আলী জিন্নার হিন্দুবিদ্বেষটা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। হিন্দুরা সাম্রাজ্য-বাদী মনোবৃত্তি নিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করতে উদ্যত, জিন্নার এই আর্তনাদ তখন

ব্রিটিশের পক্ষপাতিত্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভারতের গণ-আন্দোলন বিপন্ন; জিন্না সারা দেশের মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন 'ইসলাম বিপন্ন, মুসলমান জাতি বিপন্ন, মোল্লা মৌলবী ভাইসব হুশিয়ার!'

মহাত্মা গান্ধী চাইলেন যে, এই সংকটে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসের কর্ণধার হউক। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম তিনি প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র মনে করলেন, দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে ভারতের দিগন্তে, এই বিপদে একজন বামপন্থীর হাতে কংগ্রেস পরিচালনার ভার না থাকলে গণজাগরণ ভ্রান্ত পথে চলবে। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর অনেক কাজ অসমাপ্ত তাই তিনি পুনর্বার সভাপতি পদে মনোনয়ন প্রত্যাশী।

কংগ্রেসের মধ্যে গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। একদিকে মহাত্মা গান্ধী, অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র। একদিকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী পুরোধা, অন্যদিকে যৌবনের প্রতীক, গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিবিম্ব, আপসবিরোধী সংগ্রামের অনির্বাণ শিখা।

মৌলানা আজাদ জানালেন যে, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক নহেন। সুভাষ তাঁর স্নেহের পাত্র, সুভাষের প্রতি তিনি প্রশংসমান। ওয়ার্ধায় যে মিটিং বসেছিল, সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন।

মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়ন পড়লো ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার উপর। গান্ধীবাদের সৈনিক, গান্ধীর বিশ্বস্ত ভক্ত।

কংগ্রেসে তুমুল উত্তেজনা। এই প্রথম সভাপতির পদ নিয়ে নির্বাচন আরম্ভ হলো। বিপুল সংখ্যাধিক্যে সুভাষচন্দ্র সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। জনসাধারণের মধ্যে সুগভীর উল্লাস, চারদিক থেকে সুভাষচন্দ্র অভিনন্দনবার্তা পেতে লাগলেন।

এমন সময় হঠাৎ মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন যে, তাঁর প্রার্থীর পরাজয় তাঁর নিজেরই পরাজয়।

কথাটা বজ্রাঘাতের মতো আঘাত করলো কংগ্রেসকে। মহাত্মা গান্ধীকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে কল্পনা করা যায় না। তাই গান্ধীর পরাজয় কথাটা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনে গান্ধীকে হারাবার একটা আশংকা দেখা দিল। পূর্বে যাঁরা সুভাষকে চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকে এবার অন্য কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

তাই ত্রিপুরীতে যখন কংগ্রেস অধিবেশন বসলো, তখন ডেলিগেটদের শিবিরে শিবিরে মহা উল্লাস, প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা। মহাত্মা গান্ধী, না সুভাষ বোস?

মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরী অধিবেশনে যোগদান করেন নি। রাজকোট দেশীয় রাজ্যে মহারাজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, মৃদুলা সারাভাই ও মণিবেন প্যাটেল। মহারাজ তাঁদের বন্দী করেন। পরে জেলের অভ্যন্তরে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে মহারাজ সাক্ষাৎ করেন এবং একটা মীমাংসার শর্ত উভয় পক্ষ গ্রহণ করেন।

কিন্তু সে চুক্তি অনতিবিলম্বে ভঙ্গ করলেন মহারাজ। প্রজাদের আন্দোলন নির্মম নিষ্পেষণে চুরমার করতে চাইলেন, অজস্র কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে প্রেরিত হলো।

মহাত্মা গান্ধীর পিতা রাজকোটের দেওয়ান ছিলেন। তাই রাজকোটের সঙ্গে গান্ধীর মর্মগত একটা গভীর সংযোগ ছিল। রাজকোট রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দিলেন। ঠিক এই অনশনের সময়েই ত্রিপুরী কংগ্রেস, গান্ধীর যোগদান তাই অসম্ভব হয়ে পড়লো।

সমগ্র দেশের মহাদুর্যোগের সামনে রাজকোটের সমস্যাকে এতো বড়ো করে দেখার জন্য মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটা অভিমানের সুর দেখা দিল বামপন্থী মহলে।

সমস্যাটা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দিলো যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য একযোগে এই সময়ে পদত্যাগ করলেন। কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি ও সদস্য থাকলেন শরৎচন্দ্র বসু। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনও একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

সুভাষচন্দ্র তখন প্রবল পীড়ায় কাতর, উত্থানশক্তি রহিত। তবু তিনি আশা ছাড়লেন না; দেশের দুর্দিনে হাল ধরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রইলেন। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটা প্রস্তাব পাশ করতে চাইলেন যে, কংগ্রেস পূর্বেকার নীতি অনুযায়ী চলবে।

সভায় গুরুতর গোলমাল দেখা দিল। দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সংঘবদ্ধ

প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিযোগিতার সামনে একাকী দাঁড়াতে পারলেন না সুভাষ, অবশেষে তিনি পদত্যাগ করলেন।

কলকাতায় এপ্রিল মাসে এ আই সি সি'র পুনরধিবেশন বসলো। রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি মনোনীত হলেন।

ত্রিপুরীর ঘটনা কংগ্রেস-ইতিহাসের একটি উত্তেজনামুখর পরিচ্ছেদ। কলকাতার অধিবেশনে নানারকম বিশৃঙ্খলা ও অসম্মানের ঘটনায় পরিপূর্ণ; তথাপি রাজেন্দ্রপ্রসাদ শান্তভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ জয়লাভ করলেন, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তখন মহাসমরের পুঞ্জীভূত মেঘ জমে উঠেছে। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করে পোল্যান্ডের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

॥ ২০ ॥

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ রাজনৈতিক জগতের একটি উত্তেজনাময় ঘটনা, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও এই ঘটনা ক্ষতিকর। সুভাষচন্দ্রকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দেখেছি আমি, সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে পদত্যাগপত্র দিয়ে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে আবির্ভূত হলেন তখন থেকেই আমাদিগকে আকর্ষণ করেছিলেন। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ইউ পি আই-এর মাধ্যমে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁর বিস্ময়কর অন্তর্ধানের মাত্র কয়দিন আগেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছিলাম।

কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চায় না যে, সেদিনের সেই রোগশয্যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

তিনি জীবিত থাকুন;. শত সহস্র বৎসর তিনি জীবিত থাকুন এই ভারতবর্ষে। বীরত্বে, বীর্যে ও দুঃসাহসের প্রেরণায় যুগে যুগে তিনি ভারতীয় মনের ক্লান্তি ও ভয়ের মেঘ ভেঙে অনন্তপ্রাণের সৃষ্টি করুন। দুর্যোগের দিনে বার বার তাঁর জন্ম হোক ভারতবাসীর মনে মনে, তরবারির আঘাত দিয়ে অসত্যের গ্লানি পরাভূত হয়ে যাক।

ইউনাইটেড প্রেসের জন্মকালে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে আমি এইরকম জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তাঁদের সকলের সহযোগিতা ও শুভকামনা যাচ্ঞা করেছি। কেউ কেউ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কেউ কেউ বোঝার অবকাশই গ্রহণ করেন নি।

অথচ দেশে তখন ইউনাইটেড প্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, দেশের সংবাদ দেশপ্রেমের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে সর্বত্র প্রচারিত করছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে এইরকম প্রতিষ্ঠান একান্ত অপরিহার্য। সাংবাদিকতার পক্ষে তো বটেই।

অথচ আমাকে বহুক্ষেত্রে নিরাশ হতে হয়েছিল। অথবা কেবলমাত্র বাক্যাড়ম্বরের চমকপ্রদ কূজন শুনেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তার ব্যতিক্রম। প্রথম থেকেই সুভাষ আমাদের সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন।

বহুদিন পর্যন্ত তাঁর সব বিবৃতি কেবল আমাদের উপরই প্রকাশের ভার ছিল। যখন অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় অবস্থান করেন, তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর অনেক বিবৃতি 'এয়ার মেল'যোগে আমাদের নিকট পাঠাতেন।
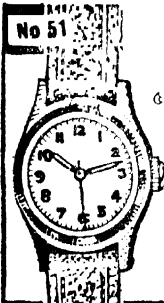
সুভাষচন্দ্রের এই সাহচর্যের ফলে ব্রিটিশ সরকারের একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমাদের উপর চিরকালই ছিল। আমরা যখন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে এ পি'র মতো সংবাদ সরবরাহ করতে চাইলাম, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার মরিস হ্যালেট তা'তে বাধা দিলেন। বড়লাটের কাছে দরবার করেও কোন ফল হয় নি।

সেই সময় একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আমাদের বিশেষ সহায়তা করেন। তাঁর নাম এস এন এ জাফরী, তিনি কেন্দ্রীয় প্রচার দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। আমাদের সংবাদ পরিবেশনা ও কর্মদক্ষতায় তিনি বিশেষ প্রীত ছিলেন এবং তাঁর একটা সহানুভূতি সর্বদাই আমাদের প্রতি করুণাধারার মতো ছিল। সংবাদপত্র সম্পাদক ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে রেলওয়ে পাস দেবার রীতি অনেকদিনের, এ পি'র ছিল দু'টো পাস। আমরা একটি পাসের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের নিকট আবেদন জানাই। সেই সময় জাফরী সাহেব আমাদের খুব সাহায্য করেন।

আমাদের আবেদনপত্র সঙ্গে সঙ্গে না-মঞ্জুর হয়েছিল। স্যার মরিস জবরদস্ত ব্যক্তি, তিনি আমাদের আবেদনপত্রের শিরে রিপোর্ট লিখেছিলেন যে, আমরা নাকি সাংঘাতিক জীব, বিপ্লবীদের ও সন্ত্রাসবাদীদের প্রচারকার্য করাই আমাদের জীবিকা।

জাফরী সাহেব আমাদের অভয় দিলেন। বল্লেন, ভয় কী স্যার জাফরুল্লা খান আছেন। স্যার জাফরুল্লা তখন কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে মন্ত্রী। অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ও সাহসী ব্যক্তি।

জাফরী সাহেবের সঙ্গে গেলাম
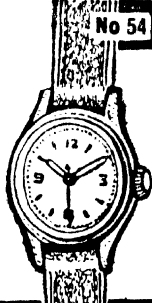
জাফরুল্লা খানের নিকট। তিনি পরামর্শ দিলেন নতুন করে আবেদনপত্র পাঠাতে এবং একটি কপি যেন তাঁর নিকট পাঠাই, তিনি তাতে রেলওয়ে বোর্ডকে পাস মঞ্জুর করবার জন্য লিখে দেবেন। অবশেষে তাই হলো, স্যর মরিস সাহেব আর অগ্রসর হতে পারলেন না।

সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, তখনও আমাদের আর্থিক অনটনটা স্বচ্ছলতার দিগন্ত কেটে যেতে পারে নি। তাঁকে আমাদের ভিতরের খবর খুলে বলতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বহু ধনী কংগ্রেসীকে আমাদের শেয়ার কিনবার পরামর্শ দেন। তাতে কিছু ফল পাওয়া গিয়েছিল।

সুভাষকে যাঁরা আপ্রাণ সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে লালা শঙ্করলাল ও বোম্বের নাথালাল পেরেক উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা যখন চরমে উঠে যায় তখন এই দুই ব্যক্তি সুভাষের পার্শ্বে সর্বদা ছিলেন। লালা শঙ্করলাল তাঁর ব্যবসা থেকে তখন অনেক অর্থ তুলে বামপন্থীদের জন্য ব্যয় করেছেন। নাথালাল পেরেকও বহুতরভাবে সাহায্য করবার জন্য ব্যগ্র থাকতেন। বোম্বেতে সুভাষ বা শরৎবাবু গেলে তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করতেন। দিল্লীর ঐতিহাসিক আই এন এ বিচারের পর নাথালাল পেরেক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহযোগিতায় সুভাষ-জীবনের নানা ঘটনাবলী দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র প্রস্তুত করেন এবং আই এন এ রিলিফ ফাণ্ডে চিত্রটি উৎসর্গীকৃত হয়। এই দুইজন ব্যক্তির কাছে সুভাষের অনুরোধ অনুযায়ী কিছু সহানুভূতি পেয়েছি।

এ ছাড়াও সুভাষ আমাদের জন্য অনেক কিছু করতে চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালে প্রত্যেক কংগ্রেসী প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমাদের সাহায্য করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী বিরোধিতার ফলে তাতে খুব কাজ হয় নি।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ (এখন পর্যন্ত) তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধানের ৪।৫ দিন আগে তাঁর বাড়িতে। সুভাষের ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ আমাকে সংবাদ দিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যান।

গিয়ে দেখি সুভাষ বসে আছেন। অসুস্থতার জন্য কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন, তখনও অসুস্থতার স্পষ্ট প্রকাশ ছিল দেহে। মুখে দাড়িগোঁফ গজিয়েছে, চেহারা খুব মলিন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর যেমন রোগজীর্ণ ক্লান্ত রূপ ছিল, তখনও যেন অনেকটা তেমনি। কিন্তু দুটি চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

বেশি কথা বলে তাঁকে বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় নি। তিনি বল্লেন, যে পথে কংগ্রেস চলেছে তাতে স্বাধীনতা সুদূর-পরাহত। এই যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ চারদিকে ব্যতিব্যস্ত, এখনই মস্ত সুযোগ। চরম আঘাত দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার এমন পরম লগ্ন খুব কম পাওয়া যাবে।

বেশিক্ষণ কথা হলো না, ফিরে এলাম। আশা ছিল সুস্থ হয়ে তিনি দেশের কর্ণধার হবেন।

কিন্তু কয়দিন পরেই পরমাশ্চর্য খবর শোনা গেল। সুভাষ নিরুদ্দেশ। তাঁর বাড়ির সামনে সতর্ক পাহারায় পুলিস সর্বদা মোতায়েন ছিল, সি আই ডি ডিপার্টমেণ্টও শোনচক্ষু মেলে তাকিয়ে-ছিল তাঁর দিকে। সর্বদা সর্বক্ষণ। কিন্তু তবু, কোথায় গেছেন, কখন গেছেন, কেমন করে গেছেন—কেউ বলতে পারে না, কেউ জানে না।

বাংলাদেশের শাসনচক্রের মাথায় তখন স্যর নাজিমুদ্দিন। তাঁর সরকার কুকুরের মতো চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো, ভারত সরকারের সমস্ত পুলিস বিভাগ সারা ভারত ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছত্রখান করে দেখতে লাগলো। কিন্তু যে মুক্ত স্বাধীনপ্রাণ বাঙালীর ঘরে দৈববলে জন্মগ্রহণ করেছিল, কে তাকে খুঁজে পাবে।

কলকাতা জেটি, প্রতিটি সীমান্ত অঞ্চল, পণ্ডিচেরী, হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য পথে সরকারের বিশ্বস্ত ভৃত্যরা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্রের ঠিকানা কেউ জানে না।

বার্লিন বেতারে তিনি যখন স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করতে লাগলেন, কেবলমাত্র তখনই জানা গেল যে, তিনি ইংরেজের বিষম বৈরী অক্ষশক্তিতে যোগ-দান করেছেন।

জওহরলালের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় কবে ও কখন হয়েছিল, সে কথা আজ সঠিক মনে পড়ে না। সাংবাদিকের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতার সম্পর্কটা দিন-রাত্রির, দেখা হলে তো বটেই, দেখা না হলেও তাঁদের আমরা নানা সংবাদের মধ্যে স্পষ্ট চিনতে পারি। কিন্তু প্রথমদিন থেকেই তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন সম্পর্কে আমার উচ্চাশা ছিল এবং প্রায় এক যুগ আগে ব্রিটিশ শাসনকালেই আমি বিলেতের খবরের কাগজে প্রকাশ করেছিলাম যে, স্বাধীন ভারতে অথবা ডমিনিয়ন স্টেটাস-যুক্ত ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেদিন আমার এই কথা নিয়ে নানারকম মতদ্বৈধতা উঠেছিল, কিন্তু ইতিহাস আমার ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করেছে যথার্থভাবে।

জওহরলাল কলকাতায় এলে আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের বাড়িতে অবস্থান করতেন। একদিন ডাঃ রায়ই বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, নানা ব্যস্ততার মধ্যে কুশল প্রশ্ন করেছেন। আমি মাঝে মাঝে

বিশেষভাবে ইউনাইটেড প্রেসের কথা তাঁকে বলতে চেয়েছি, কিন্তু তেমন অবসর খুব কমই ঘটেছে। সর্বদা তিনি ব্যস্ত, নানা সমস্যায় তিনি প্রতিক্ষণ ভাবনার রাজ্যে সমাসীন।

জওহরলালের মধ্যে দুটি পৃথক্ সত্তা এসে মিলেছে। একটি তাঁর তীব্র সংবেদনশীল আত্মাভিমান, অন্যটি সৌন্দর্যপিপাসার আত্মসমাধিস্থ মনোভাব। সর্বদা যেন তিনি চিন্তা রাজ্যে বাস করছেন, দুটি চোখে সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি। যেন মনের মধ্যে এমন আশ্চর্য মৃগনাভি রয়েছে যে, প্রতিমুহূর্তে তিনি তা উপভোগ করছেন। অথবা যেন সর্বদা ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন। সে স্বপ্ন সার্থক হতে দেরি হচ্ছে বলে মাঝে মাঝে তাঁর চাঞ্চল্যের সীমা থাকে না, মেজাজটা রুক্ষ হয়ে যায়, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে।

সামান্য দেখায় তাঁকে চেনা যায় না। তাঁকে চিনতে গেলে তাঁর সাহিত্য ও সৌন্দর্যভরা তুষারাসক্ত শৈলবিহারী মনের সন্ধান করতে হয়। সে মনের ছাপ আছে তাঁর রচনায়, তাঁর গ্রন্থে, তাঁর আত্ম-জীবনীতে, তাঁর 'ভারত-আবিষ্কারে'। সেই মনকে জানতে না পারলে তাঁর সম্পর্কে বিচার করা প্রায়ই মারাত্মক হবে। একদা এক সাংবাদিক সম্মেলনের পরে ডাঃ রায়ের বাড়িতে এবং আরেকবার বোম্বে শহরে কৃষ্ণা হাতীসিং-এর গৃহে জওহর-লালকে সুমধুর ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত দেখেছিলাম। স্নিগ্ধ হাসি, প্রাণখোলা শিশুর মতো আনন্দ চপলতা। সেই সুযোগে ইউনাইটেড প্রেসের কঠোর সংগ্রাম ও স্বদেশসেবার কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি মন দিয়ে আমার কথা শোনেন এবং তাঁকে একটি পরি-কল্পনা পাঠাতে বলেন। কিন্তু পরি-কল্পনাটি পাঠাবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি জেলে বন্দী হন, দেশের রাজনৈতিক চক্রাবর্ত দ্রুত ঘুরে চলে, ঘটনাপ্রবাহের বন্যা নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই কালের আবর্তে আমার পরি-কল্পনাটিও কখন ভেসে গেছে, জওহরলাল বা আমি কেউ-ই খেয়াল করতে পারি নি।

জওহরলালও সুভাষচন্দ্রের মতো তাঁর সব বিবৃতি ও প্রচার আমাদের মারফৎ করতেন। স্বাধীন ভারতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে বর্তমানে অবশ্য নানাকারণে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তথাপি আমি নিঃসন্দেহে জানি, আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর দরদ তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে।

১৯৩৬ সালের প্রথমদিকে পণ্ডিত নেহরু বার্মা-মালয়-মণিপুর ভ্রমণ করে আসেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় করা ও সেখানে কংগ্রেসের বাণী প্রচারই ছিল তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য। সেই সময় তাহামনকার নামক একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক লণ্ডন থেকে আমাদের বিদেশী সংবাদ পাঠাতেন। তিনি একটি সংবাদ পাঠান যে, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী একটি পত্রিকায় পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণ করবার জন্য কংগ্রেসকে পীড়াপীড়ি করছেন কিন্তু গান্ধীজী রাজী হচ্ছেন না।

আমি যখন এই সংবাদ পাই, তখন পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণান্তে নেহরু এসে উঠেছেন কলকাতায়, ডাঃ রায়ের বাড়িতে। আমি গিয়ে এই সংবাদটি দেখিয়ে তাঁর মন্তব্য প্রার্থনা করলাম।

তিনি একটু হাসলেন। তারপর নিজের ঘরে আমাকে গিয়ে অপেক্ষা করতে বল্লেন। কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে ফিরে এসে নিজের হাতে সংবাদটির প্রতিবাদ লিখে আমার হাতে দিলেন। আমি বল্লাম, আপনার ভ্রমণের impres-sionটি লিখে দিন।

তিনি বল্লেন, তাঁর হাতে এখন সময় বড় অল্প। কিছুদিন পরে লিখে পাঠিয়ে দেবেন।

এলাহাবাদ যাবার পথে তাঁর impressionটি লিখে ট্রেন থেকেই ডাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশ ছিল, আমাদের সমস্ত শাখা থেকে একটি নির্দিষ্ট দিনে ভারতের সর্বত্র যেন ইহার প্রচার করা হয়। এই নির্দেশটি তাঁর সহৃদয় মনেরই পরিচয়। কেননা, তারযোগে তৎক্ষণাৎ সেই লেখার সর্বাংশ পাঠাতে আমাদের অত্যধিক খরচ পড়ে যেত।

১৯৪২-এর মে-জুন মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। তখন আমাদের বোম্বে শাখার সম্পাদক শ্রী জে এম দেব জওহরলালকে নানা প্রশ্ন করে সংবাদ বার করার চেষ্টা করতেন। প্রথমে জওহরলাল বিরক্ত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে আবার ডেকে উত্তর দিতে শুরু করতেন। কথায় কথায় নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ হয়ে যেত। অনেকটা রহস্যের মতো করেই তখন তিনি হাসতেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নানা সংবাদ প্রত্যহ সম্পাদনা করে টেলিপ্রিণ্টারযোগে পাঠাই। তাঁর বক্তৃতা, অভিভাষণ, ঘোষণা। অক্ষরের পর অক্ষরের মালায় নামটি জ্বল জ্বল করতে থাকে। কিন্তু আমি সেই অক্ষরের পাহাড় ভেদ করে তাঁর একটি ছবি দেখি। সেই ছবি আমার শেষ সাক্ষাৎকালের।

নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের শেষে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আসরে দিল্লীতে সমবেত হয়েছি। ভারতের নানা দিগ্‌প্রান্ত থেকে নানা সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দ এসেছেন। ভারত সরকারের কয়জন মন্ত্রীও আছেন ভোজন আসরে। শ্রীজওহরলাল নেহরু মধ্যমণির মতো উপস্থিত।

আমি তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ইউনাইটেড প্রেস কেমন বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাচ্ছে, তাঁকে তা বিস্তৃতভাবে খুলে জানালাম। একটি সিগেরেট উপহার দেওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করলেন। দু' ঠোঁটের মাঝখানে সিগেরেটটি রাখা হয়েছে, আমি দেশলাই জ্বালিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি।

একটি দেশলাই কাঠি জ্বলছে। তার আলো গিয়ে পড়েছে জওহরলালের মুখে। ঠোঁটের ফাঁকে সিগেরেট। একটি ক্ষণের জন্য তাকিয়ে দেখলাম, দূরপ্রসারিত তাঁর দৃষ্টি। গভীর অভিনিবেশ সহকারে কী ভাবছেন।

কিন্তু এ চেহারা তো শিল্পীর। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মধ্যে সেই দুর্লভ চেহারা আমি রাশি রাশি অক্ষরমালায় রোজ দেখি। (ক্রমশ)

মৃত্যু-ইচ্ছা

বিমল কর

এককালে স্বর্গলোকবাসী দেবতারা মর্তবাসীদের ওপর খুব সদয় ছিলেন। তপস্যাটপস্যা করতে পারলে তো কথাই ছিল না, এমন কি কোনো কিছু না করেও নিছক তাঁদের করুণায় বা হঠকারিতায় দুর্লভ বর পাওয়া যেত। আর সে-সব বরে কী না হ'ত, কী না হতে পারত। ত্রিভুবন বিজয়ী বীর হতে চাও, তাই হবে। যদি চাও রাজত্ব, রাজ-কন্যে—তাও পাবে। লক্ষ্মীলাভ, পুত্রলাভ, আয়ুলাভ কী না! সবই লাভ করা চলত। মাঝে মাঝে অবশ্য চট্ করে কিংবা রেষা-রেষি করে বর দিয়ে ফেলে দেবতারাও কম মুশকিলে পড়তেন না। মহাদেব একবার তাঁর এক ভক্তকে ঢালাও বর দিয়ে বসলেন, ভক্তটি যার মাথাতেই হাত রাখুক না কেন —তার মাথাটি গলা সমেত ধড় থেকে পলকে খসে যাবে, উড়ে যাবে। এ-রকম একটা বর পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। ভক্তটির তো বিশ্বাসই হয় না। ভাবে, মহাদেব তার সঙ্গে রসিকতা করছেন। হঠাৎ ইচ্ছে হল, আচ্ছা একটু পরখ করেই দেখা যাক্ না বরটা সত্যি সত্যিই বর না নিছক ধাপ্পা। সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন মহাদেব, সবে বরটি দিয়েছেন তিনি। ভক্ত বললে, প্রভু তবে একবার দয়া করে বসুন, আপনার মাথায় হাত দিয়ে যাচাই করে নি ফলাফলটা। বলে ভক্ত হাত বাড়ায় আর কি। মহাদেব লাফিয়ে দু-পা পিছিয়ে গেলেন। কী সর্বনাশ, আমার মাথায় হাত দেবে কিহে, আমিই না তোমায় বর দিলুম। ও-হাত আমার মাথায় ঠেকিয়েছ কি মুণ্ডুটি আমার ধুলোয় লুটোবে। যাও, যাও—আর কারুর মাথায় হাত দিগে যাও।......ভক্ত নাছোড়বান্দ, মহাদেবের মাথাতেই সে হাত দেবে। ভয়ে মহাদেব পালালেন, ভক্তও পিছু ধাওয়া করল। মহাদেব ছুটছেন, ভক্তও ছুটছে পিছনে পিছনে। শেষ পর্যন্ত নারায়ণের শরণাপন্ন হয়ে সেবার প্রাণে বাঁচলেন মহাদেব। এমনি ফ্যাসাদ মাঝে মাঝে ঘটেছে। তা যাই ঘটুক বলতে আপত্তি কি সেকালে দেবতারা দিলদরিয়া হয়ে বর দিতে পারতেন।

এতো বরের মধ্যে সবচেয়ে বোধ হয় মহার্ঘ ছিল ইচ্ছামৃত্যুর বর। এ-বর খুব অল্প লোকই পেত। ভীষ্ম পেয়েছিলেন। যতদিন না ইচ্ছে করছো, ততদিন মৃত্যু নেই। হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে সে-কালের 'ইচ্ছামৃত্যু-বর'-পাওয়া লোক এই অ্যাটম-বোমার যুগেও বেঁচে থাকতে পারতেন এবং থাকলে এতোদিন হয়ত আমেরিকা কী রাশিয়ার মুখের ওপর তুড়ি মেরে বলতেন, বাছাধন, তোমাদের ও অ্যাটম, হাইড্রোজেনে আমার নাকের ডগাটিতে পর্যন্ত ঘাম জমবে না।

কিন্তু ও কথা যাক্, মজা হচ্ছে যে, ইচ্ছামৃত্যুর বর যাঁরাই পেয়েছিলেন কেউই মৃত্যুকে চিরকালের মতন এড়িয়ে গেলেন না, একদিন-না-একদিন ইচ্ছে করেই মৃত্যু বরণ করলেন। কাব্য পুরাণের কবিরা এঁদের অনায়াসেই বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন এবং রাখলে আমরা প্রশ্ন তুলতাম না। কিন্তু রাখেন নি। যাঁরা বর পেয়েছিলেন তাঁরাও চান নি। কেন? সেটা স্বাভাবিক হতো না বলেই কি! কিন্তু এ-যুক্তি খুব টেঁকসই নয়—। মহাকাব্য পুরাণ উপ-পুরাণে স্বাভাবিকতার স্থান বেশি ছিল এ-কথা আমার মনে হয় না। হনুমানের গন্ধমাদন বহন থেকে শুরু করে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রা কোনটাই খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অতএব মহর্ষি বেদব্যাস ভীষ্মকে বাঁচিয়ে রাখলে আমরা যে গাঁজাখুরি বলে তা হেসে উড়িয়ে দিতাম কিংবা সমালোচনা লিখতাম কাগজে কাগজে তা নয়। আসলে এমন অবস্থায়, এমন বিভিন্ন সুখ দুঃখ যাতনা ক্লেশের অভিজ্ঞতার পর এই সব চরিত্র মৃত্যু বরণ করেছে (এবং কবিরাও করিয়েছেন) যে অবস্থায় মৃত্যু কামনা করাই স্বাভাবিক। ঘুরিয়ে বললে এ-কথাই বলতে হয়—অনেক দেখে শুনে শেষ পর্যন্ত এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, 'Only errors are life and truth is death!' কথাটা হয়তো হতাশার, রেজিগনেশানের। কিন্তু সত্যি।

এককালে যা ছিল 'ইচ্ছামৃত্যু'—এখনকার কালে তাই এসেছে 'মৃত্যুই[illegible] বা 'ডেথ্ উইশ'—নাম ধরে। কিছু[illegible] আগে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহা[illegible] 'সাহিত্যে সংকট' নামক যে প্রবন্ধ [illegible] পত্রিকায় লিখছিলেন তাতে 'ডেথ্ উই[illegible] যে এ-যুগেও একটা কামনা-বাসনা হ[illegible] দেখা দিয়েছে এমন ইঙ্গিত করেছে[illegible] পাঠক ইচ্ছে করলে সেই অংশটি আব[illegible] একবার পড়ে দেখতে পারেন।

কথা হচ্ছে, মানুষ কি সত্যিই ম[illegible] মনে মৃত্যু ইচ্ছা পোষণ করে? যদি ত[illegible] হয় তবে তার জীবন-বাসনা কোথায় গে[illegible] স্থিতির জন্যে নিয়ত সংগ্রাম কর[illegible] জীবকুল এই তো জানি, এটাই তো সত[illegible] আর এ-কথা আজ নিজেদের জীব[illegible] সংগ্রামের দিকে তাকালেই বুঝতে পা[illegible] কী কঠিন, কী দুরন্ত ও তীব্র আমাদে[illegible] বেঁচে থাকার পিপাসা। মৃত্যু ইচ্ছার ঠি[illegible] বিপরীত এই বাসনা। বাঁচতে চাই অর্থে[illegible] মরতে চাই না। আর তাই তো মৃত্যুভ[illegible] আছে, মৃত্যুভয় থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক বিচারে এ-কথা
কলেরই মনে হবে, মরতে আমরা চাই
। মোটেই না। আর মরতে চাই না
ল অতি আদিম যুগ থেকে এ-যাবৎ
ত্যু আক্রমণের সকল সম্ভাবনাকে আমরা
ধা দেবার চেষ্টা করছি। নতুবা মানুষের
ভ্যতার ইতিহাস থেকে চিকিৎসা শাখা
তিল হয়ে থাকত। অপরপক্ষে নিজেদের
নশীল জেনেছি বলেই মরণোত্তর
র্তির মধ্যে শুধু স্মৃতি হয়ে বাঁচা
নর বাসনাও আমাদের কী প্রবল।

এসব থেকে এই প্রশ্নই মনে আসবে
ীবন-প্রবৃত্তি আর মৃত্যু-প্রবৃত্তি যেহেতু
স্পরবিরোধী সেহেতু এই দুই বিরোধী
বর এক সঙ্গে অবস্থান অসম্ভব।

মনস্তাত্বিকরা এ-কথা ভেবেছেন। এবং
নক ভেবে শেষ পর্যন্ত যে রায় দিয়েছেন
ত দেখা যাচ্ছে—উক্ত দুই বিরোধী
ৃত্তির এককালীন অস্তিত্ব অসম্ভব
। হলেও বাস্তবে সত্য।

একটু সবিস্তারে বলতে হলে বলতে
, মৃত্যু-বাসনা বা মৃত্যু-প্রবৃত্তি ঠিক
টা স্বাধীন প্রবৃত্তি নয়। এর স্বাধীন
তন্ত্র কোনো বিকাশ নেই (স্বাভাবিক
ত্রে)। তবে যাকে জীবন-প্রবৃত্তি বলা
(লাইফ ইনস্‌টিংকট্ বলতেও পারেন)

অর্থাৎ কিনা বিচ্ছিন্ন প্রাণকে গ্রথিত করার যে প্রবৃত্তি, বিশুদ্ধ অর্থে কাম প্রবৃত্তি বলতে যা বোঝায় সেই প্রবৃত্তি মৃত্যু প্রবৃত্তিকে কৌটো চাপা দিয়ে মুঠোয় পুরে নিয়ে তাকে সংযত রাখছে। এবং চালনাও করছে রূপকথার সেই বিষ-ভ্রমরের মতন। সময় বিশেষে কৌটোর ঢাকনি খুলে যায়—এবং বিষ-ভ্রমর মত্ত হয়ে ওঠে। তখন জাগে ধ্বংস প্রবৃত্তি। হয় তখন আত্মধ্বংস, না হয় অপরকে ধ্বংস করতে হয়। সৈনিকবৃত্তি এবং যুদ্ধ-বাসনা নাকি মানুষের এই আদি বৃত্তির একটি প্রকাশ। অস্বীকার করবার বড় একটা কারণ দেখি না। আত্মধ্বংস অনেক রকমের হতে পারে, সাধু সন্ন্যাসীদের নানাপ্রকার প্রক্রিয়ায় মৃত্যু বরণও এর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ। এবং শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসে'র মতন মদ খেয়ে খেয়ে লিভার পচিয়ে ফেলে মরাও মৃত্যুবরণের আর এক ধরনের কৌশল।

জীবন-বাসনার সঙ্গে মৃত্যু-বাসনা অত্যন্ত জটিলভাবে জড়িত রয়েছে। এর স্বপক্ষে আরও কথা আছে, নানান ধরনের কথা, বিস্তর উদাহরণ, টীকা টিপ্পনী। সেসব বিষয় আমার আলোচ্য নয়। উৎসাহী পাঠক মনোবিজ্ঞানের বই পড়লেই তা জানতে পারবেন।

মৃত্যুর ইচ্ছা বা ডেথ্ উইশ্ এ-যুগে একটা মারাত্মক, বিস্তৃত ব্যাধির মতন জগৎকে ছেয়ে ফেলেছে—একথা যদি সত্য হয় তবে ভেবে দেখতে হবে এমন আপাত অস্বাভাবিক ইচ্ছা হঠাৎ এত প্রবল হয়ে উঠল কেন!

ভেবে দেখে এই কথাই মনে হয়েছে—এর দুটি কারণ সম্ভব। এক, আত্ম-সংরক্ষণে অতি-সচেতন এ-যুগের মানুষ হয় নিরন্তর কোনো কোনো পাপ বোধের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত শান্তির আশায় মৃত্যু বরণ করতে চাইছে। আর না হয়, একালের সমাজ-রাষ্ট্র-জীবনে সর্বতোভাবে হতাশ, বীত-শ্রদ্ধ হয়ে নিরুপায় সান্ত্বনা হিসেবে অনেকটা আত্মহত্যার সামিল চোখ কাণ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে মৃত্যুগহ্বরে। এ দুটি কারণ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে তা আমি জানি না।

যে দুটি কারণের উল্লেখ করলাম—এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে গোটামুটিভাবে জড়িত। বলতে কি, এমন একটি ভৌতিক যুগে আমরা বাস করছি—যে যুগে সব কিছু টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। বিশ্বাস, নীতি, ধর্ম, কল্যাণবোধ, জীবন-সৌন্দর্যের ধ্যান—কী না! বললে অযৌক্তিক হবে না—গত দুটি যুদ্ধ এবং যুদ্ধের অন্তরালে মানুষের যে স্বার্থান্ধতা, হিংসা, ন্যায়বিচারের লোপ, ধ্বংসোন্মত্ততা, শোষণ ও শাসনের বীভৎস রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল এখন আমরা তার প্রতিক্রিয়া ভোগ করছি। Santayana যুদ্ধোত্তর বিভীষিকা এবং বিকৃতি প্রসঙ্গে যে বলে-ছিলেন, যুদ্ধশেষে যারা ভবিষ্যৎ মানব-বংশের জন্মদাতা হিসেবে থাকে তারা 'puny, deformed and unmanly'—তা অবধারিত সত্য। বলা বাহুল্য, বর্তমানে মানবসমাজের যে চেহারাটা প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে মানবোচিত সুস্থ রূপ আদপেই আছে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে।

শুনতে খারাপ লাগে যে, আমরা বর্তমান যুগের মানবসন্তানরা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ-আত্মা, অর্ধ-পশু বই আর কিছু নয়। আত্মগৌরবে যাঁদের বাঁধবে তাঁরা নিজেদের দেবশিশু বলে কল্পনা করতে পারেন এবং দিব্য-কীর্তি ও রামধনু-আদর্শে অবিচল-আস্থা থাকতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সে আত্মগৌরব নেই। হয়তো আমার মতন আরও অনেকেরই।

তেমন কোনো আদালতে দাঁড়িয়ে যদি সাক্ষ্য দিতে হত, বলতাম, প্রভু, আমার সাম্প্রতিক তহবিলে যা আছে তা ক্ষুধা, ঘৃণা, অনিদ্রা, বিরক্তি, শ্রদ্ধাহীনতা, অবিশ্বাস, বঞ্চনা-প্রবৃত্তি, দম্ভ এবং দানবশিশুর দন্তোদ্গম বেদনা। আমি আস্থা হারিয়েছি নিজের ওপর এবং তোমার বহু আয়াসসাধ্য ধারাবদ্ধ লিখিত সংবিধানের ওপর। স্বর্গ-ফলের প্রত্যাশায় অনেকবার ঘরের বউ ছেড়ে, ছেলেমেয়েকে সোনার হরিণ এনে দেবার আশা দিয়ে ক'বারই ত লড়ে এলাম। কিন্তু কি পেলাম, কি এনেছি। ভয়ানক

দুঃস্বপ্নের স্মৃতি, মাংসপোড়া গন্ধ, ক্লান্তি এবং অপ্রতিরোধ্য আশংকা।

আমাদের পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে, নির্ভর নেই, নির্ভরযোগ্য বস্তু নেই, দেশ নেই—মানুষও না।

অসহায়তা এবং বিশ্বাসহীনতা—এই দুই বোধের পরিণতি কি হতে পারে সহজেই তা অনুমেয়। তবু বলি, এর নিঃসন্দেহ পরিণতি হতাশা, আতঙ্ক, নীতিশৈথিল্য এবং নিত্য বিক্ষোভ।

আজকের মানুষের অবস্থা ঠিক এমনটি। এ যেন অনেক দেবদত্ত বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করতে নেমে একে একে সব হারিয়ে ফেলে নির্মম শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ান। যেমনটি কর্ণ দাঁড়িয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। কিন্তু কর্ণের মধ্যে যে পৌরুষ ছিল সে পৌরুষ উপস্থিত ধরা যেতে পারে মৃত। এবং এও ধরা যেতে পারে, অর্জুনের যে কোনো একটি তীরে ইহলীলা সম্বরণ করার মতন ভাগ্য আমাদের নয়। আমাদের অর্জুনের তূনীরে বহু তীর। তিলে তিলে তা মৃত্যুকে দীর্ঘস্থায়ী ও যন্ত্রণা-বীভৎস করে এগিয়ে আনে।

তাই, মনের সংগোপনে পরাজিত ক্লান্ত অনুশোচনাদগ্ধ সৈনিকের মতন আমরা শুধু মৃত্যুই কামনা করছি, করতে পারি। এই মনোবৃত্তি হয়তো পলায়নী মনোবৃত্তি। কিন্তু তাতে কি যায় আসে—! সব যখন শূন্য তখন আর এক শূন্যকে মধুর কল্পনায় 'মরণের তুহুঁ মম শ্যাম সমান' মনে করে বরণ করে নিতে বাধছে কোথায়।

বেদব্যাস অনেক আগেই বোধ হয় এটা বুঝে ফেলেছিলেন। তাই ভীষ্মচরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। ভীষ্মের মতন দুর্যোধন-শাসনের অমন দিব্যদর্শক এবং মহান্ ভৃত্য আর কে ছিল। একটি জীবন ভরে তিনি মানুষের স্বার্থপরতা, হীনতা, নিষ্ঠুরতা, ছলনা, চাতুরী, দুরাচার সব—সমস্ত লক্ষ্য করে করে শেষাবধি নিশ্চয় সেই পরিমাণ হতাশ হয়েছিলেন, যে পরিমাণ হতাশ হলে মৃত্যুকে ইচ্ছা করা যায়। অস্তিত্বকে শূন্য করা ছাড়া সেই দুর্বিষহ যাতনাকে এড়িয়ে যাবার আর কোন পথ ছিল না।

এককালে কাব্যের পাতায় যা ছিল ইচ্ছামৃত্যু এ-কালে মৃত্যু-ইচ্ছা তাই-ই। তফাৎ এ-কালে বর দিতে স্বর্গ থেকে আর দেবতারা নামেন না—ইহলোকে ভয়ংকর সব দেবতারা রয়েছেন যাঁদের সামান্য ইঙ্গিতে অ্যাটম বোমা পড়তে পারে, দুর্ভিক্ষ মাথা চাড়া দিতে পারে, যুদ্ধ, দাঙ্গা বাঁধতে পারে, শিল্প সৌন্দ তছনছ হতে পারে এবং কয়েক কো নারী ও শিশুর অস্থি চূর্ণ ফসফরাসে ধবধবে রঙ ধরে বেশ সারালো মল্লভূমি জন্ম দিতে পারে।

রবীন্দ্রকাব্যে সকল মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার মূর্তপ্রকাশ

ঢাকা হলে সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষের ভাষণ

বিগত ২৫শে বৈশাখ ঢাকায় রবীন্দ্র জয়ন্তী সংযুক্ত কমিটির উদ্যোগে ঢাকা হলে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে এক অভিভাষণে ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ বলেনঃ জীবনের এমন কোন অনুভূতির কথাই আমি মনে করিতে পারি না, রবীন্দ্রকাব্যের মাধ্যমে যার প্রকাশ আমি দেখিনি। এটা সত্যি একটা আশ্চর্য ব্যাপার। কি কোরে যে তাঁর মনের বীণায় প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা এবং আনন্দ-বেদনার মূল সুরটি সদাই এমনভাবে অনুরণিত হোচ্ছে, তা এক বিস্ময়।

ডাঃ ঘোষের অভিভাষণের পূর্ণ বিবরণ নম্নে প্রদত্ত হইলঃ

উপস্থিত ভদ্রমহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ ২৫শে বৈশাখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আজ। আমাদের মুখের ভাষা—মাতৃভাষা—বাঙ্গালা ভাষাকে জীবন্ত কোরে, ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ কোরে বিশ্বের দরবারে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত কোরে

গেছেন, তাঁরই জন্মবাসর আজ। এ দিন আমাদের কাছে তাই আনন্দের দিন—গৌরবের দিন। বাঙ্গালা ভাষায়ও বোধ হয় হিসেব নিকেশের দিন। তবে এ গুরু দায়িত্ব পালন কোরবেন তাঁরাই—যাঁদের সত্যি সামর্থ্য আছে—যাঁরা সত্যিকারের গুণী, শিল্পী, সাহিত্যিক বা সমালোচক।

আপনারা সকলেই জানেন যে, আমি সাহিত্যিক নই। কাজেই এ অনধিকারচর্চা আমি কোরব না। আমার যাতে অধিকার আছে বোলে আমি মনে করি, শুধু সে সম্বন্ধেই দু-একটি কথা আমি বোলবো। এ অধিকার অবশ্য শুধু আমার নয়—আপনাদের সকলেরই। কারণ রবীন্দ্র কাব্য, সাহিত্য বা গান ভাল আমারও লাগে—আপনাদেরও লাগে। কাজেই সে ভাল লাগার কথাটি প্রকাশ কোরে বলার অধিকার আমাদের সবারই আছে।

সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ অজস্র লেখা লিখেছেন। কবিতা, গল্প, গান, নাটক, প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেননি। পাঁচ বছরের শিশু থেকে আরম্ভ কোরে মৃত্যু-পথযাত্রী—সবাই তাঁর পাঠক। সবারই জন্য লিখেছেন তিনি। অবশ্য এদের মাঝে বোঝার তারতম্য আছে নিশ্চয়ই। কারণ রবীন্দ্রনাথের একই কবিতা ব্রজেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, শরৎচন্দ্র বা নজরুল যেমন কোরে বুঝবেন, আমি আপনি হয়ত ঠিক তেমন কোরে বুঝবো না। কিন্তু তা হোলেও অর্থাৎ ঠিক আমাদের মত কোরে আমরা বুঝলেও রসের অভাব ঘটবে না মোটেই। এ রস একটা আলাদা বস্তু।...একটা জিনিষ আমি খুব লক্ষ্য কোরেছি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বোলছি—এজীবনের এমন কোনো অনুভূতির কথাই আমি মনে কোরতে পারি না, রবীন্দ্র কাব্যের মাধ্যমে যার প্রকাশ আমি দেখিনি। এটা সত্যি একটা আশ্চর্য ব্যাপার। কি কোরে যে তাঁর মনের বীণায় প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা এবং আনন্দ-বেদনার মূল সুরটি সদাই এমনভাবে অনুরণিত হোচ্ছে, তা এক বিস্ময়। হয়তো আমার নিজেরই মনের কথা। কিন্তু তা ভাল কোরে গুছিয়ে প্রকাশ কোরে বলা-তো দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথ না পড়লে আমি হয়তো কোনদিন জানতেই পারতেম না যে, ও একান্ত আমার-ই মনের কথা। আমার-ই মনে যে ভাব জেগেছে বা জাগরিত হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে, তারই সুষ্ঠু প্রকাশ হোয়েছে তাঁর লেখনীতে—আরো উজ্জ্বল হোয়ে—আরো মধুর হোয়ে।

সবাই বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছিল ঋষি-দৃষ্টি। দুনিয়ার সব কিছুই একান্ত গভীরভাবে দেখেছেন তিনি। আর সে দেখা শুধু বুদ্ধির দেখাই নয়, হৃদয়ের দেখা-ও।

বুদ্ধির যে জগৎ তাতে পৌঁছাবার দুটি পথ আছে। একটি বিজ্ঞানের পথ। আর একটি হোলো দর্শনের।

বিজ্ঞানের পথের যাঁরা পথিক এ জড় জগৎ তথা বস্তুর সত্যিকারের রূপ তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে লক্ষ কোটি Electron বা বিদ্যুতিনের মাঝে—যে বিদ্যুতিন সময় সময় কণা আবার সময় সময় তরঙ্গ, এ উভয় রূপেই প্রতিভাত হয়।

দর্শনের পথের উপলব্ধিও এর চেয়ে খুব একটা আলাদা কিছু নয়। বস্তুর পার্থিব রূপ সেখানেও অস্বীকৃত। সত্যের মর্যাদা তার কিছু নেই। সবই সেখানে মায়া।

তবে সত্য কি? বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম হোলো বৈদ্যুতিন, দর্শনের উপলব্ধিতে তাই হোলো Spirit বা ব্রহ্ম বা আত্মা।

কিন্তু এই যে বুদ্ধির জগৎ, শুধু এ নিয়ে আমাদের মাটির মানুষের কারবার চলে কি? স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতা ভরা এ পৃথিবী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আচ্ছন্ন কোরে রেখেছে যে। এর অস্তিত্বের সত্যতাও যে বড় কম নয়। অথচ বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে হৃদয় সর্বস্ব এই পার্থিব জগৎকে-ই শুধু একমাত্র সত্য মনে কোরে চলাও যে প্রায় না চলার-ই সামিল হোয়ে দাঁড়ায়।

বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমন্বয় চাই তাই। Reality বা চরম সত্যের খোঁজ আমরা নিশ্চয়ই কোরবো। সে সত্য হয়তো Spirit; কিন্তু এ সত্যজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এ-ও আমাদের ভুললে চলবে না যে, Essence of that spirit is love. এই love বা ভালবাসাই ক্রমশঃ নিজেকে প্রকাশ কোরছে—বিস্তার কোরছে পরস্পর বিরোধী শক্তিসমূহের নিত্যলীলার মাঝে। এক কথায়ঃ

"This love is gradually unfolding itself in an eternal play of conflicting forces and their solutions"

ভালবাসার এই চোখ দিয়েই জগৎকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের সমস্ত রস নিঙড়ে ফেলা শুষ্ক শীর্ণ বৈদান্তিকের সত্য উপলব্ধিকে শ্রদ্ধা করেও জীবনকে এড়িয়ে যেতে চাননি তিনি—পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন। তমসার পরপারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ সর্বব্যাপী সেই পুরুষকে জেনেও মাটির-পৃথিবীকে অস্বীকার তিনি করেননিঃ বরঞ্চ এই পৃথিবীর বিচিত্র সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-বেদনার মাঝেই বারে বারে তিনি নিজকে খুঁজে পেয়েছেন। তার জ্ঞানের পথে, মুক্তির পথে এরা বাধা সৃষ্টি করেনি। হয়তো এ কারণেই বিজ্ঞানের রাজ্যে অনিয়ন্ত্রবাদ বা অনিশ্চয়তার আবির্ভাবে যখন নিয়ন্ত্রণবাদী বিজ্ঞানীদের সান্ত্বনা দেবার প্রয়াসে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বোল্লেন যে, এ-তো ভালই হোলো—বস্তুর মর্মে free will বা স্বাধীন ইচ্ছার পরিকল্পনার বস্তু অনেকটা মনুষ্যত্বের-ই সম্মান পেয়ে গেল, তখন খুশী হোলেন তিনি। বস্তু জগৎ তথা আমাদের এই মাটির পৃথিবী আরো অপরূপ হোয়ে ফুটে উঠলো তাঁর কাব্যে, গানে ও গাথায়। রবীন্দ্র কাব্যের সেই স্বচ্ছ সরোবরে চেয়ে দেখলাম আমরা আমাদেরই মুখচ্ছবি। কবিত্বের স্পর্শে অসামান্য হোয়ে উঠেছে তা রীতিমত অমরত্বের মর্যাদা পেয়ে গেছে।

কবিগুরু গ্যাটের প্রথম যৌবনের ভালবাসার পাত্রী ফ্রীডেরিকা যখন লোকান্তরিত হন, তখন তাঁর সমাধি গাত্রে লেখা হয়।

"এর উপর পড়েছিল কবিত্বের রশ্মি এর অমরতা তাতে হোয়েছে উজ্জ্বল।"

সত্যি তাই। কবি যে শুধু আমাদের অমরই করেন, তাই নয়। সে অমরতা আমাদের আরো উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে তাঁরই কাব্যের ছোঁয়া পেয়ে। আমরা ধন্য হোয়ে যাই।

বন্ধুগণ, আমি রাজনীতি করি না। আজকে বাঙ্গালী জীবনের সহস্র দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য ও অপমানের হিসেব রাখলেও তার সমাধান করার ক্ষমতা আমার নেই। বাঙ্গালীর অদৃষ্টের জন্য সময় সময় আমি দুঃখবোধ করি, বেদনা বোধ করি। কিন্তু করার মত কিছুই কোরতে পারি না। তবু যখনই মনে হয় যে, বাঙ্গলা রবীন্দ্রনাথকে একদিন পেয়েছিল—আমরা দীন হোলেও তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার দানে ভাষা আমাদের মোটেই দীন নয়—তখন গর্বে ভরে ওঠে আমার বুক। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আবার আশান্বিত হোয়ে উঠি। কামনা করি যে, নতুন দিনের নতুন সাধকেরা তাঁদের নব নব অভিজ্ঞতার আলোকে রবীন্দ্রনাথের এ ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যশালী কোরে গড়ে তুলবে।

রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রতিকৃতি —রামকিংকর

সিলভার স্মিথ —রণজিৎ নন্দন

চিত্র প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব উপলক্ষে একটি শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল রঞ্জি-স্টেডিয়াম-এ। ছবি এবং মূর্তি মিলিয়ে প্রায় ৩২৫ দফা দ্রষ্টব্য সাজানো হয়েছিল। এর মধ্যে ১৬৭টি ছাত্রদের এবং বাদ বাকি অতিথি শিল্পীদের রচনা। সুকুমার শিল্প হিসাবে মূর্তিগুলির প্রাধান্যই বেশী অনুভব করলাম। এবং মূর্তি শিল্পীদের মধ্যে গোড়াতেই নাম উল্লেখ করতে হয় রামকিংকরের। অবচেতন অঞ্চলে সরাসরি এমন ভাবে ঘা দিতে আমাদের দেশের আর কারুর ভাস্কর্য পারে বলে আমার অন্তত জানা নেই। যদিও এঁর ভাষা আদিম (Primitive) তা হলেও রচনাবিধি আশ্চর্যরকম ভাবে নির্ভুল। শ্রীমতী কিরণ বড়ুয়াকৃত 'রিফ্লেকশন' নামক মূর্তিটি সত্যই আগ্রহ-উদ্দীপক কিন্তু এটি থেকে আধুনিক ফরাসী ভাস্কর্যের প্রভাব (সম্ভবত জাদকিন-এর) অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। প্রভাস সেন এবং সুনীল পালের রচনা থেকেও বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদোষ দাশগুপ্তের রচনাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারলাম না। হয়ত এটির উৎকর্ষ এমন কোথাও নির্দিষ্ট যেখানে আমার বিচারবুদ্ধি পৌঁছাতে পারেনি।

এবার ছবি। অতিথি শিল্পীদের রচনা নির্বিচারে টাঙ্গানোর ফলে প্রদর্শনীটির মান অবশ্যই কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পী রীতিমত হাস্যাস্পদ হয়েছেন। চারপাশের অন্যান্য ছবির তুলনায় শ্রীশৈল চক্রবর্তীর অংকন দেখে মনে হয় শিল্পী সবে শিক্ষানবিশী শুরু করেছেন। ও সি গাঙ্গুলীর ছবি-গুলি একেবারে জাত-বিজ্ঞাপন চিত্র এবং এগুলির মৌলিকতা সম্বন্ধেও ঘোরতর সন্দেহ আছে। অবশ্য কোন কোন সমালোচকের মতে বিজ্ঞাপন চিত্র এবং সুকুমার শিল্পের মধ্যে কোনও নির্ধারিত

সীমা রেখা নেই। হয়ত বা তাই হবে। কিন্তু দেখতে পাই বিজ্ঞাপন লে-আউট এবং প্রকৃত সুকুমার শিল্পের মধ্যে পার্থক্য, ভাষায় বুঝাতে না পারলেও সামান্যতম অভিজ্ঞ দৃষ্টিও অতি সহজে অনুভব করতে পারে। সমর ঘোষের ছবির বিরুদ্ধেও আমার ঐ একই অভিযোগ। এ'র 'অটাম ইন বেঙ্গল' ছবিখানি দেয়ালপঞ্জী হিসাবে ব্যবহৃত হলেই মানানসই হয়। অরনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিগুলি দেখতে দেখতে হান্স্ অ্যান্ডারসন-এর 'এমপারারস নিউ ক্লোদস' গল্পটি মনে পড়ে গিয়েছিল—সম্রাট এমনই পোশাক পরিধান করলেন যা চোখে দেখা যায় না। অথচ ঘোষণা করা হল সভাসদগণের মধ্যে, যে এই পোশাক দেখতে পাবে না তার মত অকর্মণ্য এবং নির্বোধ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নেই। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট উপস্থিত হলেন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায়। অকর্মণ্য এবং নির্বোধ কেউই প্রতিপন্ন হতে চান না, সুতরাং সকলেই তারিফ করলেন, বাহবা দিলেন—কি চমৎকার পোশাক! শিল্পকর্ম হিসাবে অরনিবাবুর ছবিগুলিও কতকটা এই সম্রাটের পোশাকের মতই। গোপাল ঘোষের ছবিগুলি অতুলনীয়। বিশেষ করে 'নেস্ট', 'বোটস', 'বার্ড'স ভিলা' এবং 'সলিটিউড'। রঙের রহস্য বুঝতে আমাদের দেশে এ'র দোসর মেলা মুশকিল। ইদানীংকার রচনায় শিল্পীর স্টাইল কিছুটা পরিবর্তিত হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও অদল বদল হয়নি। মাখন দত্তগুপ্ত, রামকিঙ্কর, কালিকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, ইন্দ্রদুগার, প্রভাস সেন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রণেন আয়ান দত্ত এবং সূর্য রায় স্বকীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। ইন্দ্রদুগার এবং দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, এ'রা অত্যন্ত ছোট ক্যানভাস-এ তৈল চিত্রণ করেছেন—যার ফলে ছবিগুলির আবেদন নিশ্চয় কিছুটা নষ্ট হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতি পথিকৃত শিল্পীদের রচনাও কিছু কিছু প্রদর্শিত হয়েছিল।

ছাত্রছাত্রীদের অনেকের মধ্যেই যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে লক্ষ্য করলাম। এ'দের মধ্যে ইরা গঙ্গোপাধ্যায়, অনিতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, গণেশ হালুই, সুশান্ত মণ্ডল, ভোলানাথ মজুমদার, সুকুমার দাশ, নীহাররঞ্জন দত্ত, রাউথ রায়, কৃষ্ণা রায়, সমরেণ রায়, মৃণালকান্তি সরকার এবং প্রতিভা টনডন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যে সুরেন দে এবং গৌরাঙ্গ চরণের কাজগুলি লক্ষণীয়। তবে জল রঙ প্যাস্টেল, পেন অ্যান্ড ইংক, টেম্পারা প্রভৃতি মাধ্যম অপেক্ষা তৈল মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীগণ যথেষ্ট দুর্বল লক্ষ্য করা যায়—এর কারণ কি? তৈল চিত্রণে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহের অভাব, না উপযুক্ত শিক্ষার অভাব? এই প্রদর্শনীর সঙ্গে শিশু শিল্প, কারুশিল্প এবং ফটোগ্রাফও প্রদর্শন করা হয় কিন্তু নানান অসুবিধার জন্য সেগুলি সমালোচনা করা সম্ভব হ'ল না।

রবীন্দ্র প্রদর্শনী

রথেনস্টীন, মাৎসুহারা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও লেডন ওরেস্ট অংকিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এবং রবীন্দ্র গ্রন্থাদি, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রচনাবলী সাময়িক পত্রের রবীন্দ্র সংখ্যা প্রভৃতির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন 'টেগোর সোসাইটি'। প্রদর্শনীটি গত ১৪ই মে থেকে ২১শে মে পর্যন্ত কলকাতার মিউনিসিপাল মিউজিয়াম-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। —চিত্রগ্রীব

উপন্যাস

অনুষ্টুপ ছন্দ ঃ সরোজকুমার রায়-চৌধুরী ঃ প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭ ঃঃ মূল্য চার টাকা।

ঢক্কানিনাদ ও আত্মঘোষণা সভয়ে পরিহার করে কোলাহলময় পরিবেশ থেকে দূরে সরে নির্জনে যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক-বৃন্দ সাধনায় মগ্ন, সরোজকুমার তাঁদেরই একজন। যে নিষ্ঠা ও অনুভূতির দ্বারা প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, সেই নিষ্ঠা ও অনুভূতি সরোজকুমারের সহজাত। তাঁর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য দরদীমন ও সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। এই দুটি গুণের জন্যই তাঁর সাধারণ পাত্র পাত্রীও রসসমৃদ্ধে অসাধারণ হয়ে ওঠে। সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গী, স্টাইল-কণ্টকিত নয়, কথার দুর্বোধ্য মারপ্যাঁচ নয়, ঘরোয়া ভাষায় ঘরোয়া কাহিনীর বিশ্লেষণ লেখকের বিশেষত্ব।

আলোচ্য উপন্যাসটির উপজীব্য প্রেম, কিন্তু এ প্রেমে কলেজীয়ানার চটক নেই, উদগ্র আধুনিকতার গন্ধও নয়, এ প্রেম দেহাতীত। এ প্রেম মানুষকে উন্নীত করে, পূতিগন্ধময় পৃথিবীর ঊর্ধ্বে লোকাতীত রহস্যের সন্ধান দেয়। দেহজ প্রবৃত্তিতে এ প্রেমের বিকাশ নয়, অন্তরের প্রতি অন্তরের দুর্বার আকর্ষণই এ প্রেমের মূলকথা।

ব্যারিস্টার প্রণব অশিক্ষিতা নিষ্ঠাবতী স্ত্রী সৌদামিনীর সঙ্গে ঘর করার ফাঁকে ফাঁকে অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, ক্ষোভের মিশেল। শিক্ষিত মন সাহচর্য চায় শিক্ষিতা তরুণী সুচরিতার। কিন্তু তবু এ নিশ্বাস ঘর ভাঙে না, এ ক্ষোভ দাম্পত্য জীবনে ফাটল জাগাতে পারে না। তাই সৌদামিনীর আকস্মিক মৃত্যুতে প্রণব মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

এর পর প্রণবের জীবনে আসে আধুনিকা অরুণা। কর্তব্যচ্যুত হন না প্রণব কিন্তু দাম্পত্যজীবনের অবকাশে সুচরিতার অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে ওঠে তাঁর হৃদয়াকাশে। কিছু পরিমাণে লাঞ্ছনা, গঞ্জনাও ভোগ করতে হয়। প্রণব বার্ধক্যে উপনীত হবার মুখে অরুণাও সরে যায় তাঁর জীবন থেকে। অরুণার মৃত্যুতে প্রণব অবলম্বনহীন হয়ে পড়েন, কিছু পরিমাণে অসহায়।

শেষ বাধাটুকুও অন্তর্হিত। কন্যা মাধুরী সংসার সাজিয়ে বসেছে, পুত্র বিমান নিজের পছন্দমত প্রিয়াকে নিয়ে নীড় বাঁধতে উন্মুখ। কোন অন্তরায় নেই, তাই প্রণব আহ্বান জানালেন তাঁর যৌবনপ্রিয়া সুচরিতাকে। যৌবনপ্রিয়া হলে হবে কি, আজ আর যুবতী নয় সুচরিতা। রক্তে আর দোলা জাগে না, খঞ্জন নয়নে কটাক্ষের আভাস নেই, কিন্তু এ আকর্ষণ দেহজাত নয়, তাই সাড়া দেয় সুচরিতা।

মাংসের সঙ্গে মাংসের যে আদিম সম্পর্ক তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেননি সরোজকুমার, যে প্রেম স্বর্গীয়, কলুষতাহীন সংযত লেখনীতে তারই আলেখ্য রচনা করেছেন। লেখক সংযতবাক, স্থিতধী, তাই অল্প কথায়, আকার ইঙ্গিতে খুঁটিনাটি চরিত্র, দুরূহ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন তা আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক ও কথা-সাহিত্যিকদের অনুকরণযোগ্য।

যে যুগে প্রেমের চটুল সংজ্ঞাই সমধিক প্রচলিত সে যুগে এমন এক বলিষ্ঠ প্রেমের কাহিনীর খুবই প্রয়োজন ছিল।

প্রচ্ছদচিত্রণ অনবদ্য, মুদ্রণ পারিপাট্য প্রথম শ্রেণীর। ১৪।১।৫৫

অভিশাপ—শ্রীযোগেশচন্দ্র গণচৌধুরী; প্রকাশক—শ্রীমিলনচন্দ্র সরকার, শালিখা, হাওড়া মূল্য—৪৲ টাকা।

প্রচ্ছদপটে চাঁদ, সমুদ্র ও চিতার ছবি, ভিতরে লেখকের স্বরচিত গ্রন্থ হাতে গম্ভীর আলেখ্য, মেজাজ খারাপ করে দেবার পক্ষে এরাই যথেষ্ট। তার ওপর অর্থহীন মামুলী কাহিনী, ফাঁকে ফাঁকে গানের পশরা, সস্তা দেশোদ্ধারের বুকনী যদি থাকে, তাহলে সমালোচকের অবস্থা কাহিলতর হয়ে উঠে। উপন্যাস জীবনদর্শন; জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি না করতে পারলে শুধু কতকগুলো চরিত্রের ভিড়, আর সংলাপের সমাবেশ ঘটাতে পারলেই ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না।

কিশোর কিশোরীর প্রেম দিয়ে শুরু, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার হাতধরাধরি করে সমুদ্রে আত্মবিসর্জনে আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি। মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির বালাই নেই, ঘাতপ্রতিঘাতের বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাস নয়, অযথা পাতার পর পাতা জুড়ে নিরর্থক প্রলাপ। একটা উদাহরণ দেখুন। প্রেমিকার চিঠি পেতে কদিন দেরি হতে প্রেমিক ক্ষেপে অস্থির। দেরি হওয়ার কারণ সরকারের সেন্সার বিভাগ। সুতরাং বেয়াক্কেলে এমন সরকারের উচ্ছেদসাধনে নায়ক বদ্ধ-পরিকর। মুক্তিব্রত গ্রহণের এমন উপযুক্ত কারণ আর কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

গ্রন্থটির নাম 'অভিশাপ' হওয়ায় লেখক গ্রন্থটি ভয়ে কোন বন্ধুকে উৎসর্গ করেননি, অনুরূপ কারণে গ্রন্থটি সমালোচকদের হাতে তুলে না দেওয়াই সমীচীন হতো।

১৭।১।৫৫

জোয়ারের বেলা—গোপাল হালদার। ডি এম লাইব্রেরী—৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ৪৷৷০ আনা।

জোয়ারের বেলা একটি কাল-জ্ঞাপক উপন্যাস। অর্থাৎ সএ ধরনের উপন্যাসে বিশেষ একটি কালের পরিধির মধ্যে তদকালীন চিন্তা, সমাজরূপ, ঘটনা তাৎপর্য প্রভৃতির একটি পরিচয় কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে

ধরিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। লেখক বলিয়াছেন 'এই উপন্যাসের কাল মোটের উপর ইং ১৮৭০ থেকে প্রায় ইং ১৮৯০ পর্যন্ত। সমসাময়িক কোনো কোনো অনুষ্ঠান ও ঘটনার উল্লেখ তাতে আছে, কিন্তু চরিত্রসমূহ ও মূল কাহিনী কাল্পনিক, অথবা একালের মানুষেরই রূপ সেকালের ভূমিকায়।' সাধারণ উপন্যাসের মতন উপন্যাস ইহা নহে। ইহার মূল কাহিনী, চরিত্র ও নানা ঘটনার মধ্য দিয়া তদকালীন বাঙালী সমাজের বিশেষত ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজের যে চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা আগ্রহী এবং উৎসাহী পাঠকেরই আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে। রাজীব, চিন্তাহরণ, শৈল, মনোরমা প্রভৃতি চরিত্রগুলি কুশলী চিন্তাশক্তিসম্পন্ন লেখকের বিশেষ কৃতিত্বময় সৃষ্টি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে আক্ষেপ এই যে, এই এই চরিত্রগুলি যে পরিমাণ কেতাব-ধর্মী, সে পরিমাণ রক্তমাংসের জীব নহে। শৈলের আচার আচরণ অপেক্ষাকৃত জীবনোচিত। 'জোয়ারের বেলায়' যতটা চিত্র আছে, চিন্তা আছে, কথা আছে ততটা প্রাণ নাই। বলা বাহুল্য, রসসৃষ্টির এই সাধারণ সূত্র যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহারা জোয়ারের বেলায় হয়তো উল্লেখযোগ্য আরও অনেক কিছু খুঁজিয়া পাইবেন। বর্তমান সমালোচক তাহা পান নাই। তথাপি নিঃসন্দেহে ইহা পাঠযোগ্য, সৎউপন্যাসের অন্যতম।

(৫৩৫।৫৪)

ছোট গল্প

বন্ধু পত্নী : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—নাভানা। ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩। মূল্য আড়াই টাকা

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বাংলা পাঠক সমাজে খ্যাতিমান হয়েছেন সংখ্যার পরিমাপে নয়, রচনার ঔৎকর্ষে। রচনার উপজীব্য নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন, বর্ণনাভঙ্গী নিরাড়ম্বর অথচ মানবিক আবেদনে গভীর, কষ্টকল্পনা বর্জিত প্রতিটি রচনা মুক্তাবিন্দুর মত নিটোল।

বর্তমান গল্প উপন্যাসের ধারা দ্বিমুখী। একটি আবেগাশ্রয়ী, অন্যটি মননশীল। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু রচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন এই দ্বিমুখী ধারার বুদ্ধিগ্রাহ্য সমন্বয়। তাই তাঁর রচনায় যেমন হৃদয়াবেগের অযথা উচ্ছ্বাস নেই, তেমনি নেই মননশীলতার শুষ্ক ভাষণ। আবেগ ও বুদ্ধিশীলতার এই ভারসমতাই জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর রচনার প্রাণবস্তু।

চরিত্র-চিত্রণে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বর্ণবহুল পটভূমির পক্ষপাতী নন্, দু একটি আঁচড়ে তাঁর চরিত্র মুখর হয়ে ওঠে, রক্তে-মাংসে সজীবতা লাভ করে। শাখা প্রশাখার অযথা প্রসার লাভ করে না কাহিনী, পল্লবিত হওয়ার সামান্যতম প্রয়াসও নয়। সামান্য দু একটি ঘটনা, অন্তর্মুখী-সংঘাত, কিন্তু বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসাদে চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

'বন্ধুপত্নী' লেখকের আধুনিকতম গল্প-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখকের ছ'টি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলি ইতস্তত প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তবু এমন গল্প একাধিকবার পড়লেও রসাস্বাদনে অবসাদ আসে না। অবচেতন মনের গোপন রহস্য উন্মোচন করার দিকেই লেখকের বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু এই ধারা অনুসরণে অস্বাভাবিক কোন পন্থা অনুসৃত হয়নি, কষ্টকল্পিত কোন আঙ্গিকের সাহায্যও নয়। জীবনের সমস্যা-পীড়িত জটিল দিক লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীর স্পর্শে অপূর্ব রেখায় সমুজ্জ্বল।

প্রকাশভঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু মিতবাক। কথনের আতিশয্য যেমন নেই, তেমনি নেই স্বল্প কথনের শেষ। ঠিক যতটুকু বললে চরিত্র সম্পূর্ণ হয়, কাহিনীর সমাপ্তি হয় রসগ্রাহ্য, ঠিক ততটুকুই জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলেন। তার একটু বেশী নয়। সেইজন্যই অস্বাভাবিক পরিবেশ হলেও পাত্রপাত্রী কখনও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে না। দারিদ্র্যজর্জর জীবনের রূপ ক্লেদ ও হতাশারপঙ্কের পরিধি ছাড়িয়ে পংকজের রূপ নেয়।

মাঝরাতে নিদ্রিত স্বামীর শয্যাপাশ থেকে উঠে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে আলাপরত অরুণা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক মঙ্গল-গ্রহের নায়কের নবাগতা প্রতিবেশিনী লীলা-ময়ীর আলোঝলমল জীবনে উঁকিঝুঁকি দেওয়া। 'দুপুরে গল্প'র সন্তানহীনা দুটি সখীর আক্ষেপের পাশাপাশি ক্ষণেকের দেখা বেদিনীর কাহিনীও হারিয়ে যায় না। গল্প-গ্রন্থটি শেষ করার পরেও পাত্রপাত্রী ঘোরাফেরা করে মনের সামনে। তাদের ব্যথাবেদনা, চেপে রাখা বুকের ক্ষত নিয়ে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনার বিশেষত্ব এইখানেই, আর এটাই রসোপলব্ধির গোড়ার কথা।

প্রচ্ছদঅলংকরণ ও মুদ্রণ রুচিসম্মত।

৬৭৮।৫৪

আর এক দিন : আশাপূর্ণা দেবী : প্রকাশক : কে গুপ্ত, ৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা—২৬ :: মূল্য তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী সুপরিচিতা। দৈনন্দিন ছোট ছোট ঘটনা, মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নার খণ্ড প্রকাশকে নিপিচাতুর্যের মাধ্যমে রংয়ে রসে সঞ্জীবিত করে পাঠককে পরিবেশন করার শক্তি লেখিকার সহজাত। কল্পনাবিলাসী মিনারমুখী জীবন পরিহার করে বাস্তবের উপখণ্ডে ক্ষতবিক্ষত মনের সমস্যাই লেখিকার উপজীব্য। ঠিক এই কারণেই, আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট চরিত্র আত্মীয়তার রসে নিষিক্ত, কোথাও অপরিচয়ের অস্পষ্টতা নয়, দুশ্যাতার আবরণ নয়, প্রতিটি চরিত্র ঘরের মানুষই শুধু নয়, ম মানুষও।

লেখিকার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য আগ হাস্যমুখর স্রোতের অন্তরালে বেদনার ফ
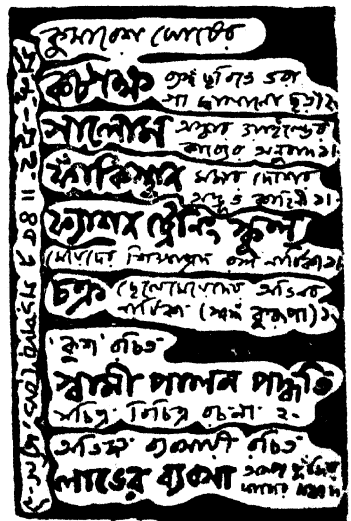
।। পরিহাসের লঘুছন্দে মধ্যবিত্ত-
মনের ব্যথাবেদনাকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত
' তোলা। সাবলীল, অপক্ষপাতদৃষ্ট
নীর প্রভাবে পাত্রপাত্রীর হাসি-অশ্রুর
রাচ পাঠকের মনেও অনুরণন জাগায়।
বর্তমান বাংলা সাহিত্যে লেখিকার সংখ্যা
ই অল্প। সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা
ণে হয়তো বহু লেখিকার প্রতিভা অংকুরেই
ষ্ট হয়। আঙিনার স্বল্প-পরিসর পার হ'য়ে
হত্যের প্রাঙ্গণে প্রসার লাভের অবকাশ
না। যে কয়েকজন লেখিকা বাধা বিঘ্ন
ক্রম করে সাহিত্যের দরবারে আসনলাভের
বদ্ধপরিকর, তাঁদের রচনাও আবর্তিত হয়
জীবনের ছোটখাটো আশা-আনন্দ, প্রেম ও
লতাকে কেন্দ্র করে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ এ
ীয় রচনার আবেদনও সীমাবদ্ধ।
কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর রচনা এ সবের
ক্রম। তাঁর রচনায় পুরুষজনোচিত ব্যঙ্গ
পরিহাসের যে বিদ্যুৎ-দীপ্তি পরিলক্ষিত
তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। সৃষ্ট
ত্রের প্রতি অপার মমত্ববোধই চরিত্রগুলিকে
বানুগ করে তোলে।
আলোচ্য গল্প-গ্রন্থটিতে লেখিকার তেরটি
সন্নিবেশিত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণে লেখিকা
কত দক্ষ তার প্রকৃষ্ট পরিচয় 'পিনাকপাণি'।
এগারোটি সন্তানের নিজ হস্তে মুখাগ্নি
করার পর হৃত গৌরব চৌধুরী বংশের
আভিজাত্যের কংকাল বুকে জড়িয়ে মুখোমুখি
দাঁড়ালেন অনাথা পুত্রবধূর সামনে। চোখের
সামনে একটি একটি করে জীবনদীপ নির্বাপিত
হ'লো এগারোটি আত্মজের, কিন্তু তবু
চৌধুরী বংশের মর্যাদার আলো যাতে না নেভে
তার জন্য কি হাস্যকর প্রয়াস। 'লড়াই' গল্পের
পরিণতি নির্মম ব্যঙ্গে মমান্তিক। পৌরাণিক
যুদ্ধের বীর্যদীপ্ত কল্পনা কি ভাবে ভেঙে
চুরমার হ'য়ে গেলো বাস্তবের ভ্রাতৃঘাতী
দ্বন্দ্বের কঠিন উপলে তারই বাস্তবানুগ
আখ্যান। এ সবের পাশাপাশি আছে কিশোরী
পুত্রবধূর অন্তর্দ্বন্দ্ব, 'প্রগলভা' নিরুপমা,
হৈমন্তিক শবরীর প্রতীক্ষা।

বিভিন্ন রসের সমাহার, বিচিত্র চরিত্রের
সমাবেশ, কিন্তু লিপিনৈপুণ্যে কোথাও
রসাভাব ঘটে না, অস্বাভাবিক ঘটনা সংস্থাপন
নয়, কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি নয়, প্রায় প্রত্যেকটি
গল্পই রূপে রসে অপূর্ব।

মুদ্রণে, প্রচ্ছদ চিত্রণে, মূল্যে এ গ্রন্থ
রসিক পাঠকের আনন্দবিনোদনে সমর্থ হবে,
এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। —১৭৭।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

আজাদী সড়ক—হাওয়ার্ড ফাস্ট।
অনুবাদক বিমলচন্দ্র পাল। পরিবেশক—
ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬। দাম ৪৷৷০ আনা।

হাওয়ার্ড ফাস্টের 'ফ্রীডম রোডে'র
বাংলা অনুবাদ 'আজাদী সড়ক'। ফ্রীডম
রোড উপন্যাসটি সম্পর্কে অল্প একটি দুটি
কথায় কোনো সৎ-পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।
শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে উপন্যাসটি
শুধু আমেরিকায় নয় প্রায় সমগ্র বিশ্বেই
অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং
সুধী ও সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় সবিশেষ
আগ্রহের সঙ্গে বইটি গ্রহণ করেছেন।
আমেরিকার নির্যাতিত নিপীড়িত নিগ্রো
জাতির অস্তিত্ব সংগ্রামের এবং মর্যাদা
প্রতিষ্ঠার এমন সুলিখিত গ্রন্থ দ্বিতীয়
আছে বলে জানি না। হাওয়ার্ড ফাস্ট
শক্তিশালী, চিন্তাশীল লেখক—কাজেই তাঁর
উপন্যাসে নিগ্রো জাতির যে বেদনা ও আশা-
আকাঙ্ক্ষা সুপরিস্ফুট হয়েছে তা স্থানীয় বা
আঞ্চলিক সীমাকেও উত্তীর্ণ করে একটি
সর্বমানবীয় রূপ পেতে চেয়েছে এবং
বহুলাংশে তা সার্থক হয়েছে। অনুবাদক
বিমলচন্দ্র পাল সম্ভবত সাহিত্য ক্ষেত্রে
নবাগত। তিনি অশেষ ধৈর্য এবং নিষ্ঠার
সঙ্গে বইটি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের
ত্রুটি ধরে এই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার বিরূপতা
করতে সকলেরই হয়ত সংকোচ জাগবে। তা
ছাড়া সামান্য ত্রুটি অনুবাদের ক্ষেত্রে, অন্তত
বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে কখনই বা না ঘটে।
পাঠক সাধারণের কাছে গ্রন্থটির প্রচার কামনা
করি। (৫০৩।৫৪)

বিবিধ

মহাযোগী—(শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও
তাঁহার সাধনা ও শিক্ষা।) আর আর
দিবাকর। পশুপতি ভট্টাচার্য কর্তৃক
অনূদিত। ভারতীয় বিদ্যাভবন। চৌপাটি,
বোম্বাই—৭। মূল্য ২ টাকা।

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের জীবনী সাধনা
ও শিক্ষা সম্পর্কীয় এই গ্রন্থখানিকে একটি
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিতে কাহারও আপত্তি
হইবার কথা নয়। শ্রী আর আর দিবাকর—
শ্রীঅরবিন্দের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন
এবং বিভিন্ন পর্বে নানা আলোচনা ও
চিন্তার দ্বারা তিনি শ্রীঅরবিন্দের অন্তঃস্থ ধর্ম
ও আদর্শটিকে অনুভব করিবার চেষ্টা
করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সে কারণে জটিল নহে,
সরল এবং সহজবোধ্য। বাংলা অনুবাদও
মোটের উপর ভালই হইয়াছে। পাঠক
সাধারণে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত
হইবেন। (৫৪৮।৫৪)

শ্রীসুদর্শন—ত্রৈমাসিক পত্র। সম্পাদক—
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। কার্যালয়—৩নং
অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা। বার্ষিক
মূল্য ৪ টাকা।

শ্রীসুদর্শনের দশহরা সংখ্যা পাঠ করিয়া
আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ডাঃ
শ্রীরমা চৌধুরী, ডাঃ মহানাম ব্রত, অনিলবরণ
রায়, উদ্বোধন সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ,
ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য, ব্রহ্মচারী মহানন্দ,
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলার
বহু মনীষীর লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতায়
আলোচ্য সংখ্যা সমৃদ্ধ। শ্রী ম-এর
অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে লিখিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত প্রসঙ্গ ক্রমিকভাবে
প্রকাশের সূচনা এই সংখ্যার প্রধান বিশেষত্ব।
ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে
'শ্রীসুদর্শন' বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে।
সম্পাদন কৃতিত্ব সর্বত্র পরিস্ফুট।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ
আসিয়াছে।

ঠাকুর মায়ের গল্প—শ্রীঅনিলকুমার
চক্রবর্তী ও শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলিকা—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ।
প্রমথ চৌধুরী—জীবেন্দ্রসিংহ রায়।
নীল-নির্জন—নীরেন্দ্র চক্রবর্তী।
মহাকবির গল্প—জোনাকি।

প্রাণীতত্ত্ববিদরা পাখীদের দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি ভাগ, যারা তাদের ডানার সাহায্যে উড়তে পারে আর একটি ভাগের পাখীদের ডানা থাকা সত্ত্বেও মাটি থেকে উড়ে ওপরে উঠতে পারে না। অবশ্য এই ধরনের পাখীদের সংখ্যা প্রথম ভাগের তুলনায় যথেষ্ট কমই। না উড়তে পারা পাখীরা তাদের ডানার সাহায্যে উড়তে না পারলেও মাটির ওপর খুব তাড়াতাড়ি চলতে ফিরতে পারে। যখন এরা দ্রুত চলে তখন তাদের পা ছাড়াও ডানা খুলে নাড়তে নাড়তে চলতে থাকে। সাধারণভাবে আমরা মুরগি হাঁসের কথা বলতে পারি। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এদের খুব জোরে তাড়া দিলে এরা ডানা ঝটপট্ করতে করতে মাটি থেকে খানিকটা উঁচু জায়গায় উড়ে গিয়ে বসতে পারে। খুব বড় আকারের না উড়তে পারা পাখীদের নাম করতে গেলে আমাদের অস্ট্রিচ এবং এমু পাখীর নাম প্রথমে মনে পড়ে। এই দুই জাতের পাখী অবশ্য আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। এরা আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে বাস করে। —এমু পৃথিবীর বৃহৎ আকারের পাখীদের মধ্যে দ্বিতীয় বলা যায়। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এদের যথেষ্ট পরিমাণে আজকাল পাওয়া যায়। কিছুকাল আগেও এই পাখীর সংখ্যা ক্রমশ এত কমে আসছিল যে তখন ঐ দেশের সরকার ভেবেছিলেন যে, এই পাখীর অস্তিত্ব একদিন পৃথিবীতে থাকবে না। কিন্তু আজকের দিনে আবার অস্ট্রেলিয়ান সরকার এই পাখীদের নিয়ে আর এক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। সমস্যা হচ্ছে যে সরকারের সংরক্ষণ করবার ফলে এদের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে গেছে যে এরা এখন শস্যের যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি করছে। প্রথমে ওখানকার চাষীরা এদের গুলি করে, ফাঁদ পেতে এবং বিষ দিয়ে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন দেখল যে এতে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তারা ৫ ফুট উঁচু তারের বেড়ার সাহায্যে এদের আটকাবার চেষ্টা করছে। এই তারের বেড়াটা লম্বায় ১৩৫ মাইল। চেষ্টা চলছে যে সমস্ত এমুদের তাড়িয়ে এনে এই বেড়ার ওধারে রাখবার। এরা যখন দল বেঁধে শস্য খেতে ঢোকে তখন এরা খেয়ে

চক্রদত্ত

শস্য নষ্ট করার চেয়ে তাদের বড় বড় পায়ের পাতার চাপে বেশী পরিমাণে শস্য নষ্ট করে। এমু লম্বায় ৫।৬ ফুট হয়, আর ওজনে প্রায় ১০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। ডিম থেকে ৫৪ থেকে ৬৪ দিনের পর বাচ্চা ফুটে বের হয়। বাচ্চা ফুটে বের হবার পরও পুরুষ এমুর কাজ শেষ হয় না—যতক্ষণ পর্যন্ত না বাচ্চা এমু নিজে চড়ে খেতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ এমু তাকে দেখা শোনা করবে। প্রয়োজন হলে এমুরা ঘণ্টায় প্রায় ৩৫ মাইল বেগে দৌড়তে পারে।

*

পিস্তল দিয়ে গুলিই ছোঁড়া হয়—এটাই আমরা এতদিন জানতাম। কিন্তু এই পিস্তল এখন গুলি ছোঁড়া ছাড়াও অন্য কাজে লাগান হচ্ছে। পিস্তল দিয়ে গুলি না ছুঁড়ে পেরেক ছোঁড়া হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে কোন লোহার পাত ইত্যাদিতে যদি
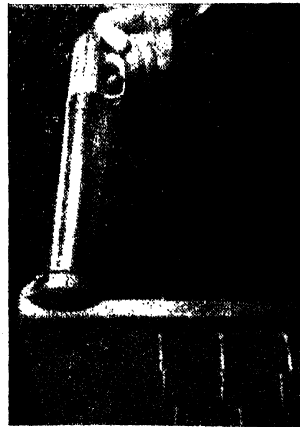
পিস্তলের সাহায্যে পেরেক পোঁতা হচ্ছে

পেরেক লাগাতে হয়, তাহলে পে ঠোকাবার জন্য কিছুটা সময় লাগে। পেরেক ছোঁড়া পিস্তলে গুলির বদ পেরেক পুরে নিয়ে প্রয়োজন মত ছু গেলেই পেরেকগুলো পাতের ওপর গে যাবে। এই উপায়ে পেরেক পুঁততে খ অল্প সময় লাগে।

*

অনেকের রক্ত চলাচলের শিরা এ ধমনী শক্ত হয়ে যায়। আর এই সঙ্গে রে সেরাম-এর অংশ বেড়ে যায় আর সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল এবং চর্বিযুক্ত প্রোট্টিন-এ অংশ বেড়ে যায়। যদি এই ধরনের রোগ দের এমন খাদ্য খাওয়ান হয় যার থেকে এ দু ধরনের জিনিস বাদ দেওয়া যায়, তাহে অনেক সময় আর শিরা আর ধমনী শ হয়ে যায় না। কিন্তু ডাঃ স্টারে বলেন যে যদি একজন মোটা লোকের ওজন কে রকমে কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ত রক্তের মধ্যের চর্বির অংশ কমে যা কিন্তু ঠিক যে দুপ্রকার চর্বি থাকার দরু শিরা এবং ধমনী শক্ত হয়ে যায় সেটা কমে না। তার মত হচ্ছে যে শরীর ধারণে জন্য মানুষের যতটা ক্যালরীর প্রয়োজ হবে তার চেয়ে বেশী যদি মানুষ খেতে থাকে তাহলে কোলেস্টেরল এবং চর্বি জাতীয় প্রোট্টিন কণা রক্তে বেড়ে যাবে। এমন কি যদি এই খাদ্যে চর্বির পরিমাণ কম থাকে।

*

কথায় বলে "অতি বাড় বেড়োনা ঝড়ে পড়ে যাবে।" শুধু ঝড় কেন অতিরিক্ত বড় হয়ে উঠলে বজ্রাঘাতে পতন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। ওক গাছের মাথায় সবচেয়ে বেশী বাজ পড়ে। এর পর "এম", "পাইন", এ্যাসেস, পপলার ইত্যাদি বড় বড় গাছেও খুব বাজ পড়ে। "বীচ" গাছই এ বিষয়ে সবচেয়ে নিরাপদ। অবশ্য এর কোনও কারণ আজ পর্যন্ত জানা যায় না। বড় বড় গাছগুলিই যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাজের কবলে পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাজ পড়ার সময় গাড়ি বা বাড়ির মধ্যে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। এটা ঠিক যে, গাছের তলায় থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

দল্লী হইতে মাত্র বারো মাইল দূরবর্তী কোন এক স্থানে নেক ব্যক্তির একটি পোষা বানর নাকি গল হইতে গাছগাছড়া জাতীয় কী টা ঔষধ আনিয়া তার প্রভুর দুরারোগ্য ড়া সারাইয়া দিয়াছে।—"রামরাজ্যে
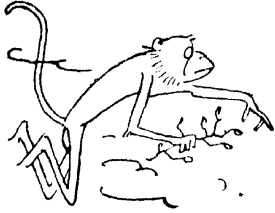
বিশ্বাসীরা সংবাদটা শুনে রাখুন; নুমানের গন্ধমাদন ক'রে বিশল্যকরণী নাটা শুধু কবির কল্পনা নয়। সরকারের দর চালান বন্ধ করার নীতির একটা র্থ খুঁজে পাওয়া গেল—জয় হিন্দ্"—চ্ছ্বসিত হইয়া মন্তব্য করিলেন অন্য এক হযাত্রী।

* * *

কলিকাতায় অনতিবিলম্বে একটি গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি নির্দেশক ন্ত্র স্থাপিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গল। এই যন্ত্রটি হইবে পৃথিবীর মধ্যে তীয় বৃহত্তম যন্ত্র।—"কোলকাতায় গ্রহ-ক্ষত্রের চেয়ে গেরো নির্দেশক যন্ত্র গরবাসীর পক্ষে আরো বেশি য়োজনীয়"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

রাঁচী হইতে একটি জল চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।—"এটাকে আমরা জার খবর বলতে রাজী নই, কেননা এর চয়ে বড় পুকুর চুরির সংবাদ আমরা এখন প্রায়ই শুনে আসছি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

জাপানের সন্নিকটে কোন এক স্থানে ত্রিশ হাজার ফুট সমুদ্রের গভীরতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আবিষ্কর্তার তারিফ আমরা নিশ্চয়ই করব কিন্তু তার চেয়ে গভীর জলে ডুবে ডুবে যারা জল খান তাঁদের আবিষ্কার করতে পারলে একটা কাজের মতো কাজ হতো"!!

* * *

কলম্বোর এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি সম্প্রতি পীতবর্ণের বৃষ্টি-পাত হইয়াছে। —"এই বৃষ্টি পীতাতঙ্ক সৃষ্টি করেছে কিনা সে সম্বন্ধে সংবাদে কিছু বলা হয়নি; আশা করি, করেনি; কেননা বান্দুং সম্মেলনে চৌ-এন-লাইকে চাক্ষুষ দেখার পর কোটেলেওয়ালা সাহেবের পীত-সবুজ-ভয় কেটে যাবারই কথা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম যে, জুন মাসে নাকি সিংহলে পূর্ণ-গ্রাস সূর্যগ্রহণ দৃষ্ট হইবে। সংবাদে বলা হইয়াছে, গ্রহণ চার মিনিট স্থায়ী হইবে এবং পৃথিবীর নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ

তাহা দেখিতে যাইবেন, শুধু সোবিয়েৎ-এর বৈজ্ঞানিকদিগকে দেখিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।—"সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, বর্তমান সহ-অবস্থানের পরিবেশে পূর্ণগ্রাসের টেক্-নিক্ কোন দেশের বৈজ্ঞানিককে দেখতে এবং শিখতে দেওয়া উচিত নয়"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহারা যেন শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি লইয়া মাথা না ঘামায়।—"শিক্ষার নীতি নিয়ে তারা মাথা

ঘামায় না, তাদের মাথাব্যথা শুধু পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত যে-কোন প্রতিষ্ঠানকে তিনি তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন।—"নেহরুজী-বর্ণিত তীর্থ সম্বন্ধে আমরাও একেবারে নাস্তিক নই কিন্তু আমাদের আতঙ্ক শুধু পাণ্ডাদের"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

জওহরলালজীর অন্য এক বক্তৃতায় শুনিলাম—ভারতে আশী লক্ষ সাধু আছেন এবং তাঁহারা বেশ স্বচ্ছন্দে ভাল খাইয়া-পরিয়াই আছেন। আমাদের শ্যামলাল স্বর্গত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের গানের একটি কলি সুর করিয়া শুনাইল —"বিনি পয়সায় জুড়িগাড়ি চড়তে যদি চাও, গেরুয়াখান প'রে দাদা চিমটে হাতে নাও"। তারপর বলিল—"সাধুদের দিব্য-দৃষ্টি আছে কিনা, সুতরাং কাজে কাজেই — — — —

—শৌভিক—

স্রেফ প্রমোদ ব্যাঞ্জন

যে সব উপাদান সহজেই গ্রহণ করার জন্য এদেশের দর্শকের রুচি ও আবেগ উ'চিয়েই রয়েছে, সেইসব উপাদানে ভরা একটা আস্ত বস্তা প্রডাকসন সিণ্ডিকেটের "শাপমোচন"। গত সপ্তাহে ছবিখানি মুক্তিলাভ করেছে। এর গল্পটিতে ঘটনা এবং পাত্রপাত্রী ও তাদের আচরণ এবং কথা-বার্তা এমনি যা অতি পুরনো চিন্তাধারার ছাপ বহন করে থাকলেও লোকের মনে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতেও সক্ষম, আবার বেশ একটা মজা দেখার আমোদও পাইয়ে দেয়। পুরোপুরিই ছক্ বাঁধা ব্যাপার। উপাদান রয়েছেও অনেক প্রকারের; একটা ফস্কে গেলে অন্য আর প্রকারে দর্শকের মন রাখার ব্যবস্থা থাকেই। সংস্কারাচ্ছন্ন মনের জন্য রয়েছে অলৌকিক ব্যাপার। রয়েছে ধনীদরিদ্রের আচরণ বৈশিষ্ট্য। দরিদ্রের নিঃস্বতার দম্ভ। বেকার সমস্যা। ধনী মেয়ের সরলচিত্ত দরিদ্র যুবকের প্রতি অনুরাগ ও প্রেম। নায়কের সান্নিধ্যে দ্বিতীয় বালিকার অবস্থানে নায়িকার ভুল ধারণা। নায়িকার প্রণয়াসক্ত দ্বিতীয় আর একজনের শঠতা। নায়কের মরণাপন্ন রোগ এবং তাই শুনেই নায়িকার আগমন এবং মিলন। অনেক গল্পেই পাওয়া গিয়েছে এমনিই সব উপাদান এবং পরিবেশনের মধ্যেও নতুনত্ব কিছু নেই। তবে অভিনয় সঙ্গীতাদির অলঙ্করণে ছবিখানি উপভোগ্য হওয়ার যোগ্যতায় জ্বলজ্বলে হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুত যদিও গল্পটিকে খুব দুর্বল বলা যায় না, জমবার মতো নাট্যবস্তু যথেষ্ট আছে, কিন্তু অতি পুরনো ধরনের বলে ছবিখানি মোটেই জমতে পারতো কিনা সন্দেহ যদি না অভিনয় ও গানের দিক থেকে জোর পাবার সুযোগ পেত। এখনকার কৃতী ও জনপ্রিয় একদল অভিনয়শিল্পী ও গাইয়ের সমাবেশে ছবিখানি বেশ একটা মর্যাদার আসন পাবারও যোগ্যতা প্রকাশ করতে পেরেছে।

* * *

তিনপুরুষ ধ'রে ফলে আসছে এমন একটা অভিশাপ ফলে আসার সূত্র ধ'রে গল্পের আরম্ভ এবং প্রেম ভালোবাসার জোরে অভিশাপকে ব্যর্থ করে দেওয়া নিয়ে গল্পের শেষ। গাইয়ের বংশ। বিষ্ণুপুর দরবারে গান হচ্ছে। গায়কের প্রশংসায় সবাই উচ্ছ্বসিত। হঠাৎ আবির্ভূত হলো এক বৃদ্ধ; গায়ককে নিজের শিষ্য বলে দাবী জানালে সে। মদগর্ব গায়ক বৃদ্ধকে গুরু মানতে অস্বীকার করলে; অপমান করলে তাকে। ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ শাপ দিলে, সে বংশে কেউ সঙ্গীতের চর্চা করলে হয় তার অপঘাতে মৃত্যু হবে, নয়তো সারাজীবন তাকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। বৃদ্ধ চলে যাবার পর সবায়ের অনুরোধে

আবার গান আরম্ভ হলো কিন্তু চড়ায় একটা তান ধরতেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গায়কের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো। দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্রের বংশে তিন পুরুষ ধরে এই অভিশাপ ফলে আসছে। দেবেন্দ্র সংগীত চর্চা করতে করতে অন্ধ হয়েছে। সংসার আর চলে না। স্ত্রী অপর্ণার সংগে পরামর্শ করে দেবেন্দ্র ছোটভাই মহেন্দ্রকে কলকাতায় পাঠালে পিতৃবন্ধু উমেশ ভট্টাচার্যের কাছে একটা কোন চাকরি পাবার ভরসায়। যাত্রার আগে দেবেন্দ্র মহেন্দ্রকে শপথ করিয়ে নিলে, সে যেন কোনদিন সংগীতচর্চা না করে। উমেশ দেবেন্দ্রদের পিতা ক্ষেত্রর কাছে বহুভাবে উপকৃত ছিল এবং উত্তরকালে প্রকান্ড ধনী হয়ে উঠলেও ক্ষেত্রর উপকারের কথা ভোলেনি এবং সে কাহিনী তার ছেলে অতীন ও মেয়ে মাধুরীর কাছে বারবার করে শুনিয়েছে। চাকরির খোঁজে মহেন্দ্র এসে পৌঁছতেই উমেশ তাকে সাদরে ঘরে ডাকলে। অতীন মহেন্দ্রের জীর্ণ সাজ-পোশাক দেখে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল। মাধুরীর প্রণয়প্রার্থী কুমার বাহাদুর এসে মহেন্দ্রকে চাকরের পদবাচ্য করে অপমান করলে। অতীন ও কুমারের আচরণ মাধুরীর কাছে অসহ্য লাগলো। নিচে এসে ওদের ধমক দিয়ে সে মহেন্দ্রকে ওপরে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলে। থাকা মানে বড়লোকের বাড়িতে সেইরকম কেতাদুরস্ত হয়ে থাকবার সব আয়োজন করে দিলে। সাজপোশাক সব নতুন তৈরী হয়ে এলো। অনভ্যস্ত মহেন্দ্রের কেমন সংকোচ লাগে; রাতে ঘুমের ঘোরে তার গ্রাম চন্ডীপুরের বাড়িতে মাটির মেঝেতে আদরের ভাইপোর শুয়ে থাকার স্বপ্ন দেখে নিজে মাটিতে শুয়ে রাত কাটালে। মাধুরী যেন মহেন্দ্রকে গড়ে তোলার একটা খেলা পেয়ে গেল। মহেন্দ্রের জন্যে সুট তৈরী হয়ে এলো; ছুরি কাঁটার সাহায্যে খাওয়ার কায়দা শিখতে হলো মহেন্দ্রকে। মাধুরীর কোন কথাতেই সে না বলতে পারে না। এ বাড়িরও কেউ পারে না। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথা শুনে উমেশের পরামর্শে মাধুরী চন্ডীপুরে পঞ্চাশ টাকা পাঠালে। মনি-অর্ডারের টাকাটা দেবেন্দ্র গ্রহণ করে মহেন্দ্রের রোজগারের টাকা মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে মাধুরীর লেখা চিঠি পেয়ে টাকা দানস্বরূপ পাঠানো হয়েছে জেনে সেটা দেবেন্দ্র ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে।

* * *

মহেন্দ্রের প্রতি মাধুরীর অনুরাগ কুমার বাহাদুরের কাছে ভালো লাগলো না। সোসাইটিতে সে বলে বেড়ালে, মাধুরী একটা বানর পুষছে। কথাটা মাধুরীর কানে গেল। এর জবাব দিতেই মাধুরী মহেন্দ্রকে নিয়ে উপস্থিত হলো এক পার্টিতে এবং কুমারকে যথাযথ অপমান করে বেরিয়ে এলো। দেবেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা ফেরৎ এলো। উমেশ ভাবলে ঠিকানা ভুল লেখাতেই বোধ হয় ফেরৎ এসেছে; কিন্তু মাধুরীর কথায় জানতে দেরী হলো না যে, নিঃস্বতার দম্ভ দেখিয়ে দেবেন্দ্র দান নিতে অস্বীকার করে
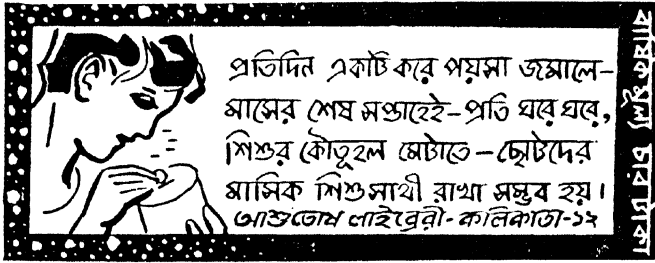
টাকা ফেরৎ পাঠিয়েছে। মহেন্দ্র চাকরির জন্য উদ্বিগ্ন হলো। চাকরির খোঁজে বের হতে লাগলো; কিন্তু কিছুতেই জোটাতে পারে না। ইতিমধ্যে একদিন মাধুরীর সঙ্গে দর্জির দোকানে গিয়েছে, মাধুরী ভিতরের ঘরে গিয়েছে কোট ট্রায়াল দিতে। বাইরের একটা গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে মহেন্দ্র বেরিয়ে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধকে দেখতে পায়। লোকজনের সাহায্যে বৃদ্ধকে ধরাধরি করে একটা বস্তির ঘরে এনে শুইয়ে দিলে। ঘরে একটি বালিকা; বৃদ্ধের নাতনি রাণু; পরনে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র; পেটে তিনদিন ভাত নেই। নিজের দামী কোটটা শীতার্ত বৃদ্ধের গায়ে চাপা দিয়ে এবং পকেটের সামান্য যা কিছু ছিল রাণুর হাতে অর্পণ করে মহেন্দ্র চলে এলো সেখান থেকে। মাধুরীকে কিছু না জানিয়ে দোকান থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে ফিরে মাধুরী উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মহেন্দ্র ফিরতেই যতো রাগ গিয়ে পড়লো তার ওপর, অধিকন্তু কোটটা দান করেছে শুনে পরের জিনিস নিয়ে দান করার গঞ্জনাও মাধুরীর রাগের মুখে বেরিয়ে এলো। পরদিন থেকে মহেন্দ্র চাকরির সন্ধানে ঘুরতে লাগলো; ডবল এম এ পাশ লোকেরই চাকরি জোটে না, তা তার মতো গেঁয়ো লোক পাত্তা পায় কি করে! ঘুরতে ঘুরতে এক সময় রাণুদের খবর নিতে গেলো। বস্তি-মালিকের দরওয়ান রাণুদের জিনিসপত্তর রাস্তায় ফেলে ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছে দশ টাকা ভাড়া বাকীর দায়ে। মহেন্দ্র দাঁড়ালো জামিন হয়ে। পরদিন সন্ধ্যায় টাকাটা দিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে দরওয়ান চলে গেল। সেই দশটি টাকা জোগাড়ের কোন পথ না পেয়ে চিন্তাগ্রস্ত মহেন্দ্র গভীর রাতে বাড়ি ফিরলো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে সামনের ঘরেই নানারকম বাজনা দেখে চিন্তার ঘোরে মহেন্দ্র বেহালাখানা হাতে নিয়ে বারান্দার এক কোণে গিয়ে বাজাতে লাগলো। অপেক্ষায় তন্দ্রাচ্ছন্ন মাধুরী শুনে মুগ্ধ হলো; মহেন্দ্রের এ গুণের কথা সে আগে জানতে না পারায় ক্ষুব্ধা হলো। মহেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়লো। মহেন্দ্রের কাছে মাধুরী সর্বস্ব সমর্পণের জন্য যখন উন্মুখ, মহেন্দ্র তখন তার কাছ থেকে ভিক্ষা করলে মাত্র দশটি টাকা। মাধুরীর দম্ভ ও সম্মান আহত হলো। মহেন্দ্রকে সে প্রত্যাখ্যান করলে; অপমান করলে। পরদিন সকাল থেকে মহেন্দ্রকে আর পাওয়া গেল না সে বাড়িতে।

* * *

দশটা টাকার উপায় আর হয় না। মহেন্দ্র পথে পথে ঘুরে ভাবতে থাকে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো পথিপার্শ্বের এক বৈরাগীর ওপরে। তার গান শুনে লোকে পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। মহেন্দ্র তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে আরম্ভ করলে একখানা গান; লোক জমলো, প্রচুর পয়সাও জমলো। তার থেকে বৈরাগীর পাওনা চুকিয়ে মহেন্দ্র বাকি পয়সা কুড়ি দিয়ে এলো রাণুর হাতে। ফিরতি পথে একটা

শুভ-মুক্তি শুক্রবার
সন্ধ্যারাণী
বিকাশ রায়
সুপ্রভা
প্রশান্ত
সবিতা
জয়শ্রী
কানু, ভানু
অপর্ণা
নীতিশ
দীপক
অভিনীত
ভিনায়কের
জ্যোতিষী
পণ্ডিত না ৪২০?
অঞ্জন ফিল্মস
পরিবেশিত
কাহিনী
গজেন্দ্র মিত্র
চিত্রনাট্য ও সংলাপ
মুরারি সেন
সংগীত
গোপেন মল্লিক
পরিচালনা
চিত্ত বসু
একযোগে
মিনার ০ বিজলী ০ ছবিঘর
নৈহাটী সিনেমা (নৈহাটী), পার্বতী (হাওড়া), পিকাডিলী (সালকিয়া), গৌরী (উত্তরপাড়া), জ্যোতি (চন্দননগর), রূপালী (চুঁচুড়া)
অঞ্জন ফিল্মস্, ১২৭বি, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মেস দেখে মহেন্দ্র ঢুকলো একটা চাকরির ও আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। একটু আগেই রাস্তায় গান শুনে মুগ্ধ সেই মেসের এক বাসিন্দা মহেন্দ্রকে চিনতে পেরে সবাই মিলে চাঁদা করে ওকে মেসে রাখবার ব্যবস্থা করে দিলে। মহেন্দ্র ওদের গান শোনায়। মাধুরী একদিন মহেন্দ্রের কাছ থেকে তার নতুন ঠিকানার খবর সমেত একখানা চিঠি পেলে এবং অবিলম্বেই গিয়ে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলে। নিজে আসবাবপত্র এনে মহেন্দ্রের ঘর সাজিয়ে দিলে। তারপর মহেন্দ্রকে নিয়ে হাজির করলে বেতার অফিসে। প্রথম দিন গান শুনিয়েই মহেন্দ্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে। গ্রামোফোন কোম্পানী ওর খোঁজ নিলে। প্রথম রোজগারের টাকাটা মহেন্দ্র দাদার কাছে পাঠিয়ে দিলে, তবে কি বাবদ রোজগার তা জানালে না। মহেন্দ্র নিজে রোজগার করে টাকা পাঠিয়েছে, দেবেন্দ্রর আনন্দের সীমা রইলো না! মহেন্দ্রর সাফল্যে সবচেয়ে খুশী মাধুরী। মহেন্দ্রকে নিয়ে রোজই বেড়াতে বের হয়। নির্জন পার্কে প্রেমগুঞ্জন চলে। কুমার বাহাদুর এই নিয়ে কুৎসা রটালে। অতীনকে কুমার ক্ষিপ্ত করে তুললে। কিন্তু মাধুরী মহেন্দ্রর সঙ্গে মেলামেশার কথা তো স্বীকার করলোই, এমন কি দাদার মুখের ওপরে মহেন্দ্রকে স্বামী বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করলে না। ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে দেখে কুমার বাহাদুরের পিতা রাজাবাহাদুর এলেন মাধুরীকে একেবারে আশীর্বাদ করে যেতে। কিন্তু মাধুরী দীপ্তভাবে এ বিয়েতে আপত্তি জানালে। রাজা বাহাদুর অপমানবোধ করে ফিরে গেলেন। উমেশের মনে পড়লো দীর্ঘদিন ধরে বিস্মৃত ক্ষেত্রনাথের কাছে তার প্রতিশ্রুতির কথা। ক্ষেত্রর ছোট ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। উমেশ পাঠালে মাধুরীকে মহেন্দ্রকে ডেকে আনার জন্য।

*   *   *

মহেন্দ্র একদিন রাণুদের খবর নিতে গিয়েছিল। মহেন্দ্রকে দাদা বলে তার পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে রাণু আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল; তা নাহ'লে তার দাদু তাকে বিক্রী করে দেবে। মহেন্দ্র রাণুকে তার মেসের ঠিকানা দিয়ে এসেছিল, সত্যি বিপদ ঘনিয়ে এলে রাণু যেন তার কাছে চলে আসে। পিতার সম্মতি পেয়ে মহেন্দ্রকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য ফুলের মালা হাতে মাধুরী যখন মেসে পৌঁছয়, ঠিক তার আগেই রাণুও এসে পড়েছিল মহেন্দ্রর কাছে আশ্রয় নিতে। বাইরে থেকে মাধুরী দেখলে ওদের দুজনকে অন্তরঙ্গতার নিবিড় সান্নিধ্যে। সব আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মাধুরীর। বাড়িতে ফিরে জানিয়ে দিলে বিয়ে সে আর করবে না।

*   *   *

চণ্ডীপুরের ছেলেরা দেবেন্দ্রকে গান শেখাবার ভার নেবার জন্য ধরে বসলো। দেবেন্দ্র রাজী হতে চায় না কিছুতেই। একদিন ওরা দেবেন্দ্রকে একটা নতুন জিনিস দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এলো মাতব্বরের বাড়িতে। জিনিসটা একটা রেডিও। গান আরম্ভ হলো; গান শুনেই দেবেন্দ্রের মনে সব যেন গুলিয়ে যেতে লাগলো। মহেন্দ্রর গলা সে চিনেছে। গান শেষ হতেই উন্মাদের মতো সে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় বার বার আছাড় খেয়ে রক্তাক্ত দেহে দেবেন্দ্র পৌঁছলো তার ঘরে। তাদের বংশের সেই অভিশপ্ত তানপুরাটা যা নিয়ে গাইতে গাইতে তিন পুরুষ আগে তার প্রপিতামহ গুরুর শাপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেটি তুলে নিয়ে আরম্ভ করলে গান। স্ত্রী অপর্ণা তাকে নিবারণের চেষ্টা করলে, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে রক্তবমি করে দেবেন্দ্র মারা গেল। কলকাতায় খবর পৌঁছতে মহেন্দ্রের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। রাণুকে নিয়ে সে গ্রামে এসে যখন পৌঁছলো তখন জ্বরে সে বেহুঁস। জ্বরের কোন প্রশমন ঘটে না। বিকারের ঘোরে মাধুরীর নাম ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, আর সে ডাক কলকাতায় ঘুমন্ত মাধুরীর স্বপ্নে গিয়ে পৌঁছে মাধুরীকে উতলা করে তোলে। ঘুমন্ত মাধুরী ঘরের বাইরে আসতে থামে আঘাত লেগে চৈতন্য হারায়। মহেন্দ্রর রোগ বাড়তেই লাগলো। মৃত্যুকে বোধ হয় আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। উপায়হীন অপর্ণা শেষ সময়ে মাধুরীর কাছে মহেন্দ্রর বড়ো প্রিয় ভাইপো খোকনকে পাঠালে। খোকন যখন কলকাতায় পৌঁছলো তখন মাধুরীর নৈনিতাল যাবার জন্য মোটরে উঠতে যাচ্ছে। কুমার বাহাদুর তাড়া দিচ্ছে গাড়িতে ওঠার জন্য। খোকন পৌঁছলো তার কাকিমার খোঁজে। মাধুরী শুনতে তার কাছে মহেন্দ্রের অসুখের কথা

প্রথমটায় মন শক্ত রাখারই চেষ্টা করলে, কিন্তু খোকনের কাছ থেকে অপর্ণার লেখা চিঠিতে সব বিবরণ জেনে আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। পিতা উমেশও চিঠিখানা পড়লে। মুহূর্তে মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে উমেশ মাধুরীকে খোকনের সঙ্গে মোটরে তুলে সোজা চণ্ডীপুরে যাবার নির্দেশ দিলে। কুমার বাহাদুর তখন টুপি আনতেই ব্যস্ত। অক্লান্তভাবে মাধুরী সেবা করে চলে। একদিন সে অভিশপ্ত তানপুরাটা ভেঙে চুরমার করে দিল। মাধুরীর সেবায় তারপর থেকেই মহেন্দ্র সুস্থ হ'তে আরম্ভ করলে। মহেন্দ্র সুস্থ হয়ে মাধুরীর সেবার মূল্য মুখে ধন্যবাদ দিয়ে সেরে নিতে মাধুরীর মন অভিমানে ভরে উঠলো। কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলো সে। কিন্তু মহেন্দ্র তাকে কলকাতায় একটি দিনের কথা মনে করিয়ে দিলে, যেদিন মাধুরী তাকে জানিয়েছিল, চণ্ডীপুরে যেদিন সে যাবে চিরদিন থাকবার জন্যেই যাবে।

* * *

ছবির আরম্ভটি বেশ। জমিদার বাড়িতে গানের বৈঠক। উচ্চাঙ্গের সংগীত এবং সত্যিই উচ্চাঙ্গের বেশ জমাটি আসর হয়ে উঠেছে গানখানি পালুসকরের গাওয়ার গুণে এবং প্রত্যক্ষভাবে গায়কের ভূমিকায় পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ঠোঁট মেলানো ও অভিব্যক্তি প্রকাশের গুণে। তান, গমক, গিটকিরি সমেত রাগসংগীতটি পরিবেশন সহজ নয়, কিন্তু পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিখুঁতভাবে অভিব্যক্তি মিলিয়ে যাওয়ায় সামনাসামনি তাঁর নিজেরই গাওয়া বলে মনে হয়। গানের মধ্যেই আবির্ভূত হলো বৃদ্ধ ওস্তাদ এবং গান শেষ হতেই শিষ্যের সাফল্যে তার আনন্দপ্রকাশ এবং শিষ্য কর্তৃক অপমানিত। চরিত্রটিতে অভিনয় করে নীতিশ মুখোপাধ্যায় নাটকীয় পর্দাটা বেশ উঁচু ঘাটে তুলে ধরে প্রস্থান করলেন। নীতিশের ভূমিকা ঐটুকুই, কিন্তু তিনি জমাট ভাবটা আরও চাড়িয়ে দিয়েই গেলেন। কিন্তু তারপরই ঘটলো প্রথম অলৌকিক কাণ্ড। অভিশাপ দিয়ে ওস্তাদ চলে যেতেই গায়ক আবার গান আরম্ভ করে চড়ায় তান দিতে যেতেই মুখ দিয়ে রক্ত সঙ্গেই হাতেহাতে তার ঐরকম ফল ফলে যাওয়া ব্যাপারটা যেন কেমন! এর পরই দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্রকে নিয়ে দৃশ্য। দেবেন্দ্র অন্ধ। বংশানুক্রমে তিন পুরুষ ধরে ঐ অভিশাপ ফলে যাওয়ার কাহিনীটা মহেন্দ্রকে শোনাচ্ছে। মহেন্দ্র কলকাতায় যাবে; দেবেন্দ্র তাকে শপথ করিয়ে নিলে সে যেন সংগীতের চর্চা থেকে বিরত থাকে। মহেন্দ্রর সংগী তার ভাইপো খোকন। দুজনেই লুকিয়ে সংগীত চর্চা করে। দাদার কাছে শপথ করে এসে মহেন্দ্র গোয়ালঘরে খড়ের গাদার ভিতর লুকনো বেহালাটা ভাঙতে উদ্যত হলো; তাকে নিবৃত্ত করে খোকন তবলার বদলে তার বাদ্য হাঁড়িটা ভেঙে ফেললে। পরদিন মহেন্দ্র দাদা-বৌদি-খোকনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় রওনা হলো। দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র, বৌদি অপর্ণা ও খোকনের চরিত্রে রয়েছেন যথাক্রমে পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, সুপ্রভা এবং অলোক। এ অধ্যায়টিকে নাটকীয় করে জমিয়ে রেখে দেয় মুখ্যত পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়। বেশ সংযত আবেগপূর্ণ অভিনয়। এর পরও দেবেন্দ্রকে পাওয়া যায় মাধুরীর পাঠানো টাকা এসে পৌঁছনর সময়, তারপর মহেন্দ্রর নিজের রোজগারের টাকা পাঠানোর সময় এবং শেষে রেডিওতে মহেন্দ্রর গান শুনে উন্মাদপ্রায় হয়ে বাড়িতে ছুটে এসে তানপুরা নিয়ে গান গাইতে গাইতে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মৃত্যু পর্যন্ত। এই অধ্যায়গুলিতে পাহাড়ী আগের মতো অভিনয়ে সমাহিত ভাব রাখতে পারেন নি; অতি-অভিনয় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মৃত্যু দৃশ্যটিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে—আবহ-সংগীতের বিকট ঝন-ঝনানিতে, দেবেন্দ্রর আঁকুপাঁকুতে, অপর্ণার হাহাকারে সব জড়িয়ে গিয়ে এমন তীব্র ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে, ঘটনাটা করুণ বলে অনুভূত হয় বটে, কিন্তু ওর আবেগটা যায় চোট খেয়ে।

* * *

মহেন্দ্র কলকাতায় উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করলে; অনিত তাকে উপেক্ষা করে চলে গেল; কুমার বাহাদুর তাচ্ছিল্য করলে। কিন্তু মাধুরী মহেন্দ্রকে যেভাবে ওপরে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পোশাক করলে, তা দেখে মনে হলো মাধুরী যেন ঐ জন্যে আগে থেকেই তৈরী হয়েই ছিল মাধুরীর পরিচয় তার কথার ওপর কারু কথা বলার উপায় নেই। তাই বলে মহেন্দ্র যে রকম নিরীহ গোবেচারার মতো নিজেকে মাধুরীর ওপর সমর্পণ করে দিলে, তার জন্যে স্প্রীংয়ের গদিতে শোয়ার অনভ্যস্ততা থেকে রেহাই পেতে মহেন্দ্রর মাটিতে শোয়া; ছুরি-কাঁটায় খাওয়া অভ্যাস করা ইত্যাদি কতকগুলো গতানুগতিক উপভোগ করার মতো মজা দেখার সুযোগ পাওয়া গেলেও মহেন্দ্রর চরিত্রের পারম্পর্য অনুযায়ী তেমন স্বাভাবিক নয়। মহেন্দ্র ও মাধুরীর চরিত্রে যথাক্রমে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন আছেন, তাঁদের ওপরে দর্শকদের দুর্বলতা আছে—অবশ্য অভিনয়ও তাঁরা ভালোই করেছেন—কাজেই চরিত্র দুটির অস্বাভাবিকত্ব ওদের ব্যক্তিগত আকর্ষণের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। অস্বাভাবিকত্ব আরও উল্লেখ করা যায়। মাঝে মাধুরীকে দেখা গেল ওস্তাদের কাছে গান শিখতে বসলো। মাধুরী দেরী করে আসার জন্য ওস্তাদ তাকে তিরস্কার করে বললেন, হাজার টাকা দিলেও তিনি কারুর বাড়িতে গিয়ে গান শেখান না। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তিনি মাধুরীর বাড়িতে শেখাতে আসেন কেন? —তার কোন হেতুর উল্লেখ নেই। গানখানি অবশ্য পরম উপভোগ্য। চিন্ময় লাহিড়ী গানখানি গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং প্রত্যক্ষভাবেও তিনি ওস্তাদের ভূমিকায় অবতরণও করেছেন, প্রতিমার গানকে অভিব্যক্ত করেছে মাধুরী। রাগ-প্রধান গানখানি প্রভূত আনন্দ দান করে। মাধুরী চরিত্রের এই যে একটা দিক, এর আর একবারও কোথাও পরিচয় দেওয়া হলো না! এ যেন চিন্ময় লাহিড়ীর গান শোনাবার জন্যই ঐ রকম কার্যকারণবিহীন একটা দৃশ্যের অবতারণা। অথবা বলা যায় পরবর্তীকালে মহেন্দ্রর মধ্যে মাধুরী যে সংগীত-প্রতিভা আবিষ্কার করতে পারলো তারই সূচনা, অর্থাৎ বাড়িতে যে বাদ্যযন্ত্র থাকতো এবং তারই মধ্যে থেকে মহেন্দ্র তার প্রিয় যন্ত্র বেহালা তুলে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাজালে, যা মাধুরীর শ্রুতিকে মুগ্ধ করতে সমর্থ হলো। এটা [illegible] নির্ধারণ করা। মাধুরী

শুনলো বেহালা বাজনা, কিন্তু মহেন্দ্র বেতারে শোনালে গান। মহেন্দ্র গায়ক, এ তথ্য মাধুরী জানলে কি করে? মহেন্দ্রকে যে রকম লাজুক প্রকৃতির দেখানো হয়েছে তাতে সে নিজে থেকে যেচে ধরা দেবার পাত্র নয়। উত্তমকুমার তাঁর অভিনয়েও এই গম্ভীর নিরীহ চাপা প্রকৃতিটাই বজায়ও রেখে গিয়েছেন আগাগোড়া। মহেন্দ্র মাধুরীদের আশ্রয় থেকে যে পরিস্থিতিতে চলে গেল, তারপর মেসের ঠিকানা দিয়ে মাধুরীর কাছে চিঠি দেওয়ার ব্যাপারও প্রকৃতিসম্মত নয়।

* * *

মাধুরীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাণুদের বস্তী থেকে উৎখাত হওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য দশটা টাকা জোগাড় করতে সব উপায়ে ব্যর্থ হয়ে শেষে মহেন্দ্র বৈরাগীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাস্তায় গান গাইলে। বেশ উদ্দীপ্ত হবার মতো চমৎকার গান; এর কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত-কুমার। এ গানখানি ছাড়া পরে মহেন্দ্রর আরও খান তিনেক গান আছে; সবগুলিই গাওয়া হেমন্তকুমারের এবং ছবির মধ্যে তা অন্যতম প্রধান উপভোগ্য উপাদান। বৈরাগীর গানখানিও সুন্দর; শ্যামল মিত্র নিজে গেয়েওছেন আবার ঐ ভূমিকায় অবতরণও করেছেন। বৈরাগীর হাতে গুপীযন্ত্র, কিন্তু আঙুলের টোকা ঠিক তালমতো হলে দেখাতো ভালো। তেমনি এর আগে মহেন্দ্রর বেহালা বাজানোর সময় ছড়ের টান বা আঙুলের টিপ সুরের সঙ্গে তাল রেখে না পড়ায় বিসদৃশ দেখায়। যেমন বিসদৃশ মনে হয় মহেন্দ্র বৈরাগীর পাশে দাঁড়িয়ে গান গাইতেই চতুর্দিক থেকে পয়সার বৃষ্টি হওয়া। ভিখিরীর আঁচলায় পয়সা পড়ার মধ্যেও একটা ছন্দপ্রকৃতি আছে; এখানে স্পষ্টই মনে হয় যে, কতকজন শিখিয়ে-দেওয়া লোক পয়সা ফেললো। এগুলোকে রেজাকি ভুল বলা যায়। আরও যেমন রয়েছে বেতার স্টেশন বোঝাবার জন্য ছোট্ট ফলকে ইংরেজি ও বাঙলায় "বেতার স্টেশন" লিখে দর্শককে স্থানটি বোঝানোর চেষ্টা করা। কোন দরকার ছিল না ও-ফলকের, আর দেওয়া একান্তই যদি দরকার ছিল তো বেশ মানানসই করে দেওয়াই উচিত ছিল।

* * *

মহেন্দ্রর প্রতি মাধুরীর প্রেমকে সংশয়ের পাঁকে ফেলে জটিল করে তুলে শেষের মিলনকে নাটকীয় করে তোলার জন্য রাণুর মতো একটি চরিত্র সৃষ্টির হয়তো দরকার ছিল; কিন্তু যেভাবে রাণুকে মহেন্দ্রর জীবনে আনা হলো সেটা জোর করে ঠেলে কাহিনীতে প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া, যাতে দারিদ্র্যের জ্বালায় মেয়ে বিক্রীর মতো একটা নৃশংস ঘটনারও অবতারণা করা যায়। তপতী ঘোষ রাণুর চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম হন। উৎকট বেকার সমস্যাকেও সামনে তুলে ধরা হয়েছে পার্কের বেঞ্চে একটা ছোট দৃশ্যে। নিরাশ, ক্লান্ত মহেন্দ্রর কাছ থেকে দেশলাই চাইতে এলো জীর্ণ-বেশ ডবল এম-এ বেকার যুবক। প্রেমাংশু বোস ঐ ছোট্ট চরিত্রটিতে ক্ষণিক আবির্ভাবে বেশ একটা দাগ টেনে দেন। কতকগুলো ব্যাপার বোঝা একটু মুশকিল হয়ে ওঠে। উমেশবাবু প্রকান্ড ধনী ব্যবসাদার, অথচ তাঁর দ্বারা মহেন্দ্রর কোন চাকরি জুটিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো না কেন?—এমন কি মহেন্দ্রর প্রতি মাধুরীর অনুরাগ জানতে পেরেও? কুমার বাহাদুরের সঙ্গে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করার পর পিতার আগ্রহে মাধুরী মহেন্দ্রকে ডেকে আনতে গিয়ে তাকে রাণুর সঙ্গে দেখে ফিরে এসে শুধু জানালে সে বিয়ে করবে না। এইমাত্র উত্তরই উমেশকে কন্যার জীবনের অতো বড়ো গুরুতর ঘটনার বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় করে রাখলে কি করে?—বিশেষ করে মহেন্দ্রর সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রশ্নও যখন ছিল! চণ্ডীপুরে রেডিওতে মহেন্দ্রর গলা শুনে দেবেন্দ্র উন্মাদের মতো বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু সে অন্ধ এবং তারই সঙ্গে আরও বহু লোক গান শুনতে হাজির থাকলেও কেউই তাকে ধরতে এগিয়ে গেল না! দাদার মৃত্যু-সংবাদ শোনামাত্রই মহেন্দ্র রাণুকে সঙ্গে নিয়েই চণ্ডীপুরে চলে আসার পর রাণুর দাদু মহেন্দ্রর মেসে গিয়ে হৈচৈ আরম্ভ করলে—মেসের ঠিকানা জানলো কি করে সে? সেই দৃশ্যে মাধুরীরও আবির্ভাব ঘটে এবং মহেন্দ্র অপর একটি মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়েছে, এই ঘটনা মনে ধরিয়ে মাধুরীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরও প্রকটিত করে তোলা হয়েছে। নাটককে ঘোরালো করে তোলায় এমন একটা ঘটনা প্রয়োজন মিটিয়েছে ভালোভাবেই। কিন্তু মহেন্দ্রর ওপরে নারীহরণের যে গুরুতর অপরাধ সেটা মাধুরীর কাছে শেষে পরিষ্কার হয়ে গেলেও রাণুর দাদু প্রভৃতির কাছে তো হলো না—তাহলে অমানুষ দাদুর কবল থেকে রাণুর পালিয়ে আসার প্রসঙ্গ তোলার কোন দরকার কি ছিল?

* * *

মঞ্চ নাটকের মতো ভাগ করে দৃশ্য পরিবেশন। পূর্বশ্রুত কথা কখনো সবাক, কখনো সদৃশ্য মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছে বড়ো বেশীবার। বিন্যাস বা পরিচালনায় উজ্জ্বল বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃতিত্ব নেই। টেকনিকাল কাজ ছবি-খানির গুণাবলী বিকশিত হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে আলোক-চিত্র, শব্দগ্রহণ ও সংগীত পরিচালনার কাজ ছবিখানির উপভোগ্যতা ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। ছবির কাহিনীটি গ্রহণ করা হয়েছে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের "সন্ধ্যারাগ" উপন্যাসখানি থেকে। চিত্র-নাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করেছেন সুধীর মুখো-পাধ্যায়। উপভোগ্য প্রমোদ পরিবেশনই যদি নির্মাতাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁদের সে সাফল্য অর্জনে সহায়ক হয়েছেন আলোকচিত্রগ্রহণে দেওজীভাই, শব্দগ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালনায় হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশে সত্যেন রায়চৌধুরী এবং অভিনয়ে উত্তম-কুমার, পাহাড়ী সান্যাল, নীতিশ মুখো-পাধ্যায়, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অমর মল্লিক, সুচিত্রা সেন, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, বনানী চৌধুরী, অলোক প্রভৃতি। মেসের দৃশ্যে বোর্ডারদের চরিত্রে শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অমর বিশ্বাস, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হাসি পরিবেশন করেন। মেস হলেই কি তার বোর্ডাররা সব মনোবিকারগ্রস্ত এক একটা ভাঁড়-গোছের লোক হয়? অন্তত চিত্রজগতে তো কেবল তা-ই দেখা যায়।

খেলার মাঠে

একলব্য

ীর ক্রীড়া ময়দানে। এদিক দিয়ে ব্রিটিশ
। শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত ফুটবলে যে
থা ছিল আজও সেই অবস্থা বর্তমান,
ন্তু উন্নতি হয়নি। অথচ খেলোয়াড়ের
া, খেলার সংখ্যা ও ক্লাবের সংখ্যা অনেক
ে গেছে; সেই সঙ্গে দর্শকের সংখ্যাও
ড়েছে বহুগুণ। কিন্তু মাঠ বাড়েনি, ঘেরা
ও না। আগে ডালহৌসী, মোহনবাগান
ক্যালকাটা—এই তিনটি ঘেরা এবং
ারীযুক্ত মাঠে প্রথম ডিভিসন লীগের
া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডালহৌসী মাঠের
ীদার ছিল রেঞ্জার্স ক্লাব আর মোহন-
নের ইস্টবেঙ্গল। ক্যালকাটা মাঠের
ত্র অধিপতি ছিল ক্যালকাটা ফুটবল
আজও আছে। ডালহৌসী ও রেঞ্জার্স
ার প্রতিষ্ঠা খর্ব এবং মহমেডান স্পোর্টিং
ার প্রতিষ্ঠা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে
হৌসীর ঘেরা মাঠের অবলুপ্তি ঘটে।
ভবনের সামনে তৈরী হয় নতুন
ডান মাঠ। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবই
াঠের একচ্ছত্র অধিপতি। কিন্তু দেশ
গের ফলে মহমেডান দলের সভ্য-সংখ্যা
পাওয়ায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের
এককভাবে মাঠটিকে অধিকারে রাখা
য় হয় না, প্রয়োজনও থাকে না। ফলে

এরিয়ান ক্লাব হয় মহমেডান মাঠের নতুন অংশীদার। এখন এই তিনটি ঘেরা মাঠেই প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

* * *

একটি কথা আছে, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। মাঠের ব্যাপারেও দেখছি সেই ব্যবস্থা। এখানে গঙ্গাজল পায় না ভাগের দুইটি ঘেরা মাঠ। ফলে 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল' ও 'এরিয়ান-মহমেডান' মাঠের শ্যামলতা লোপ পেয়েছে। মাঠের বহু স্থানেই ঘাস নেই, জায়গায় জায়গায় বড় বড় টাক্। যে সব জায়গায় ঘাস আছে তাও জলের অভাবে পাংশুবর্ণ। অবশ্য প্রকৃতি দেবীর কৃপণ দৃষ্টি এজন্য কম দায়ী নয়। কিন্তু প্রকৃতি দেবী তো আর পক্ষপাতমূলক আচরণ করেননি। সবার উপর

বজায় রাখতে পেরেছে সেখানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডান-এরিয়ান ক্লাব পারেনি কেন? কারণ অতি সোজা, ভাগের মা গঙ্গা পায় না। এক ক্লাব যদি বলে আজ মাঠে তোমার জল সিঞ্চনের পালা অপর ক্লাব বলবে আমার পালা শেষ হয়ে গেছে, আজ তোমার। এক পক্ষ যদি মাঠে নতুন মাটি ফেলার প্রয়োজন বোধ করে অপর পক্ষ হবে গররাজি। অবশ্য চারটি ক্লাবের ঘাড়ে সব দোষ চাপানো ঠিক হবে না। কারণ ক্রিকেট খেলার জন্য দুইটি ভাগের মাঠ কোন সময়েই বিশ্রাম পায় না। সারা বছরই মাঠে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি। সেদিক দিয়ে ক্যালকাটা মাঠ সারা ক্রিকেট মরশুমে বিশ্রাম পায়। ক্রিকেট মরশুমে এখানে নতুন মাটি ফেলা হয়, ঘাস লাগানো হয়, জল সিঞ্চন করে মাঠের পরিচর্যা করা হয়। কিন্তু মোহন-বাগান ইস্টবেঙ্গল বা এরিয়ান-মহমেডান মাঠে মাটি ফেলা বা ঘাস লাগাবার সুযোগ কোথায়? তবুও যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায় দুই ক্লাবের রেষারেষির ফলে তা কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

* * *

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল এবং এরিয়ান-মহমেডান মাঠের এবার যে অবস্থা তাতে শেষ পর্যন্ত মাঠ টিকবে কি না সন্দেহ। টিকবে অর্থে খেলার উপযোগী থাকবেই বুঝায়। বর্ষার সূচনায় উপর্যুপরি কয়েকদিন বৃষ্টি হলে বুটের ক্ষতে মাঠের যে হাল হবে তাতে আর ফুটবল খেলা চলবে না। কিন্তু চলবে না বললে শোনে কে? নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলা শেষ করতে হবে, খেলোয়াড়দেরও হবে মাঠে নেমে বলটিকে নিয়ে যুদ্ধ করতে। এ অবস্থায় কি ফুটবল নৈপুণ্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায়? গরুর পায়ের পাড়ায় এবং গাড়ীর চাকার দাগে পাড়াগাঁয়ের কাঁচা রাস্তার বর্ষার পরে যে হাল হয় বৃষ্টির পর এবার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান-মহমেডান মাঠের সেই অবস্থা হবার সম্ভাবনা। গতবার বর্ষার সময় মোহনবাগান মাঠ যেমন চষা জমিতে পরিণত হয়েছিল তাতে অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন—"গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনের" এটি পরম উপযুক্ত স্থান। এবার হয়তো রাজ্য সরকারের প্রচার অধি-কর্তার বলবার সুযোগ ঘটবে—'এমন খাসা জমি রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা'।

* * *

পাকিস্থানের ক্রিকেট অধিনায়ক আবদুল হাফিজ কারদার ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গত ১৫ বছর ধরে কারদার ক্রিকেটের মধ্যে ডুবে ছিলেন। ক্রিকেট

মোহনবাগান ও কালীঘাট ক্লাবের লীগের খেলায় মোহনবাগানের সেণ্টার
ফরোয়ার্ড এস ব্যানার্জি হেড করে দলের দ্বিতীয় গোল করছেন

যথেষ্ট। তবে কারদারের জীবনের সাফল্য শুধু ক্রিকেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উচ্চাভিলাষী মন জ্ঞান অর্জনের সাধনায়ও মগ্ন ছিল। অক্সফোর্ডে তিনি ছাত্র হিসাবেও যেমন সুনাম অর্জন করেছেন, ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবেও তেমন সুনাম অর্জন করেছেন। কারদারই বোধ হয় পাকিস্থানের একমাত্র ক্রিকেট খেলোয়াড়, যিনি অক্সফোর্ড থেকে 'ব্লু' লাভ করেছেন। কারদার এখন ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের সাধনায় মগ্ন। ক্রিকেট জীবনের

পাকিস্থানের ক্রিকেট অধিনায়ক আবদুল হাফিজ কারদার। ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করায় কারদারকে আর প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে না

মত তাঁর অধ্যাপক জীবনও সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই কামনা করি।

* * *

কেম্ব্রিজের ছাত্র এবং ভারতের তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় সারনজিত সিং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রিকেট 'ব্লু' লাভ করেছেন। কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ড থেকে ক্রিকেট 'ব্লু' লাভ ভারতের খুব বেশী ছাত্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাকিস্থানের ক্রিকেট অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদার সহ এই উপ-মহাদেশের ৯জন মাত্র খেলোয়াড় এই সম্মান লাভ করেন। ভারতীয় ক্রিকেটের জনক রণজিৎ সিংজী ১৮৯৩ সালে সর্বপ্রথম কেম্ব্রিজ থেকে ক্রিকেট ব্লু লাভ করেন। দীর্ঘ ৩২ বছর পরে যিনি কেম্ব্রিজ ব্লু লাভ করতে সালে ভারতের চৌকশ খেলোয়াড় ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ ১৯৩৭ সালে বি সি খান্না এবং ১৯৪৭ সালে বাঙ্গলার খেলোয়াড় পি বি দত্ত কেম্ব্রিজ 'ব্লু' লাভ করেন। অক্সফোর্ড থেকে এ দেশের যে তিনজন ছাত্র ক্রিকেট 'ব্লু' লাভ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন পাতৌদির নবাব, আর ডিভেচা ও আব্দুল হাফিজ কারদার।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

(৩১শে মে'র খেলার পর)

গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের চারিটি ঘটনা—মোহনবাগান ও উয়াড়ীর প্রথম পরাজয়, এরিয়ানের প্রথম জয় এবং পুলিসের প্রথম পয়েন্ট লাভ। গতবারের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান এবং লীগ রানার্স উয়াড়ী ক্লাবকে এ সপ্তাহে শুধু পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়নি, মোহন-বাগানকে আরও একটি এবং উয়াড়ীকে আরও দুইটি পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে। ফলে মোহনবাগান ও উয়াড়ীর গত সপ্তাহে লীগ কোঠায় যে অবস্থা ছিল এবার তেমন নেই। লীগ কোঠায় এরিয়ান ও ইস্টবেঙ্গলের অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে, সেই সঙ্গে রাজস্থান ক্লাবেরও। পুলিস ও কালীঘাটের বিরুদ্ধে এরিয়ান দুইটি খেলায়ই জয়লাভ করে। ইস্টবেঙ্গল হারায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন উয়াড়ী ও জর্জ টেলিগ্রাফকে। রাজস্থান ক্লাব পুলিস ও বি এন রেলকে হারিয়ে পুরো পয়েন্ট পেয়েছে আর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খিদিরপুর ও মোহনবাগানের কাছে একটি করে পয়েন্ট হারিয়েছে। ফলে প্রথম ডিভিসন লীগে শীর্ষস্থানীয় দল-গুলির মধ্যে মে মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থান ক্লাব হারিয়েছে ২ পয়েন্ট করে। ৩ পয়েন্ট করে হারিয়েছে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আর ৪ পয়েন্ট হারিয়েছে উয়াড়ী ক্লাব। ১৪টি ক্লাবের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিংই একমাত্র ক্লাব, যারা এখন পর্যন্ত অপরাজিত আছে।

গত সপ্তাহের খেলাগুলির মধ্যে মোহন-বাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার আকর্ষণ ছিল বেশী। একই দিনে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উয়াড়ীর সঙ্গে। এ খেলার আকর্ষণও কম ছিল না। ফলে দুই মাঠেই এত জনসমাগম হয় যে, বেলা সাড়ে তিনটার মধ্যে সাধারণ দর্শকদের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিতে হয়। খেলা দুইটিও দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। দুইটি খেলাতেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। লীগ কোঠায় নীচের দিকে অবস্থান করছে অরোরা, খিদিরপুর ও পুলিস ক্লাব। এরা এখন পর্যন্ত কোন খেলায়

২৫শে মে

এরিয়ান (১) : পুলিস (০)
বি এন আর (০) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

২৬শে মে

রেলওয়ে স্পোর্টস (১) : মোহনবাগান (০)
ইস্টবেঙ্গল (২) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
মহঃ স্পোর্টিং (০) : খিদিরপুর (০)

২৭শে মে

রাজস্থান (১) : বি এন আর (০)
এরিয়ান (১) : কালীঘাট (০)

প্রথম ডিভিসন লীগের খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ গোলরক্ষক বি রাওকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটি বিপজ্জনক আক্রমণধারা প্রতিহত করতে দেখা যাচ্ছে

২৮শে মে

মোহনবাগান (০) : মহঃ স্পোর্টিং (০)
ইস্টবেঙ্গল (১) : উয়াড়ী (০)
অরোরা (১) : পুলিস (১)

৩০শে মে

রাজস্থান (৪) : পুলিস (০)
বি এন আর (১) : রেলওয়ে স্পোর্টস (০)
অরোরা (০) : খিদিরপুর (০)

৩১শে মে

ইস্টবেঙ্গল (২) : জর্জ টেলিগ্রাফ (১)
মোহনবাগান (২) : কালীঘাট (০)
উয়াড়ী (০) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)

খেলাধুলার খবরাখবর

আগা খাঁ কাপ—এক বছর বিরতির পর পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা আগা খাঁ কাপের খেলা এবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। এবার আগা খাঁ কাপ লাভ করেছে পাঞ্জাব পুলিস হকি টীম।
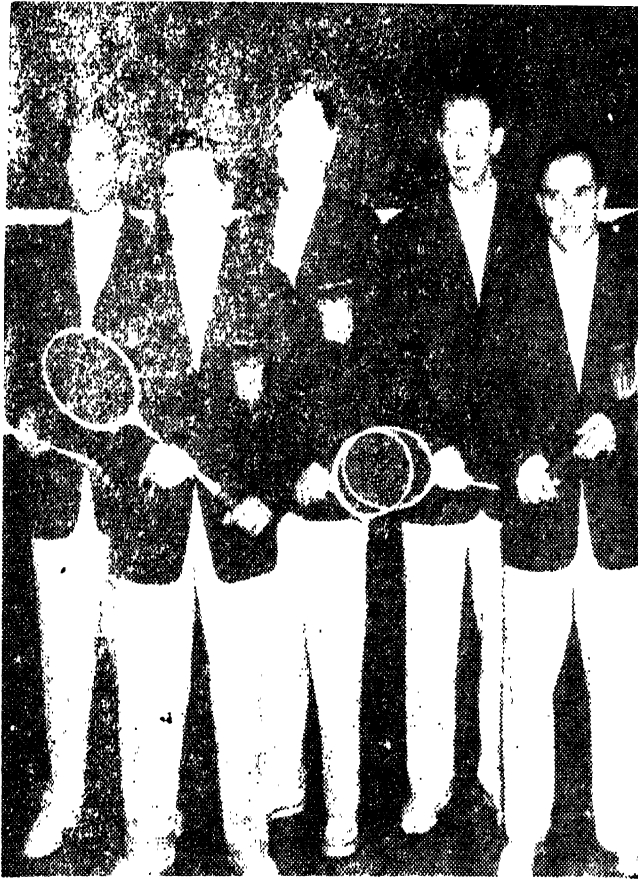
টমাস কাপে ভারত ও আমেরিকার আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি ফাইন্যাল খেলায় আমেরিকার টীম। বাঁ দিক থেকে—রবার্ট উইলিয়ামস, কার্ল লাভডে, ওয়াইন রজার্স, ডিক মিচেল ও জো এ্যালস্টন

আঞ্চলিক সেমিফাইন্যালে ভারত ৬—৩ খেলায় আমেরিকাকে এবং ডেনমার্ক ৯—০ খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করবার পর সিঙ্গাপুরে আরম্ভ হয়েছে ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলা। ভারত ও ডেনমার্কের খেলা চূড়ান্ত ফলাফল জানবার আগেই লেখা শেষ করতে হচ্ছে।

ভারত ও ডেনমার্কের খেলার বিজয়ীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে মালয়ের সঙ্গে টমাস কাপ লাভের জন্য। ব্যাডমিণ্টনের অজেয় যোদ্ধা মালয় গত দুইবারের প্রতিযোগিতাতেই টমাস কাপ লাভ করেছে। টমাস কাপ এবং ডেভিস কাপের খেলা একই নিয়মে পরিচালিত হয়। আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় পূর্ববারের বিজয়ীর সঙ্গে তার দেশে গিয়ে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের ৬—৩ খেলায় জয়লাভ খুবই কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। পাঁচটি সিঙ্গলস ও চারটি ডাবলসের মধ্যে আমেরিকা একটি সিঙ্গলস ও দুইটি ডাবলসের খেলায় বিজয়ী হয়েছে। ভারতের টমাস কাপ টীমের সিঙ্গাপুর যাত্রার পূর্বে ইডেন উদ্যানে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় জি হেমাডি ও মনোজ গুহ, নাটেকার ও ডোংরের কাছে হার স্বীকার করায় হেমাডি-গুহর সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারত ডাবলসের যে দুইটি গেম লাভ করেছে তাতে হেমাডি আর গুহই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন; পক্ষান্তরে নাটেকার-ডোংরে জুটিকে দুইটি খেলাতেই হার স্বীকার করতে হয়েছে। নীচে ভারত ও আমেরিকার ৯টি খেলার ফলাফল দেওয়া হল ঃ—

সিঙ্গলস

নন্দু নাটেকার (ভারত) ১৫—৭ ও ১৫—১৩ পয়েণ্টে ডিক মিচেলকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

টি এন শেঠ (ভারত) ১৫—৭, ৮—১৫ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে ডিক মিচেলকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পি এ চাওলা (ভারত) কার্ল, লাভেডেকে (আমেরিকা) ১৫—১৭, ১৫—১১ ও ১৫—২ পয়েণ্টে পরাজিত করেন।

নন্দু নাটেকার (ভারত) ৭—১৫, ১৫—৯ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে জো এ্যালস্টনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

জো এ্যালস্টন (আমেরিকা) ১৭—১৪ ও ১৭—১৬ পয়েণ্টে টি এন শেঠকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস

জি হেমাডি ও মনোজ গুহ (ভারত) ওয়াইন রজার্স ও রবার্ট উইলিয়ামসকে

ফাইনালে এরা ২—১ গোলে পরাজিত করে ১৯৫৩ সালের বিজয়ী বোম্বাইয়ের শক্তিশালী লুসিটেনিয়ান্স দলকে। আগা খাঁ কাপ লাভ পাঞ্জাব পুলিসের কাছে কিছু নতুন ঘটনা নয়। ১৯৪৯ সালে শেষবার কাপ লাভ করবার পর তারা ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে ফাইন্যাল খেলায় টাটা স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। লুসিটেনিয়ান্সের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব পুলিসের এবারকার সাফল্য খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। সেণ্টার হাফ চরঞ্জিত প্রথমার্ধের ২০ মিনিটের সময় আঘাত পেয়ে মাঠ পরিত্যাগ করায় অধিকাংশ সময় তাদের ১০জন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও তারা ভাল খেলেই পরাজিত করেছে লুসিটেনিয়ান্স টীমকে।

আগা খাঁ কাপের পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে বোম্বাই জিমখানার উপর; কিন্তু খেলার তারিখ এবং মাঠের বিলি-ব্যবস্থার কয়েকটি খুঁটিনাটি কারণ নিয়ে বোম্বাই প্রাদেশিক হকি এসোসিয়েশনের সঙ্গে জিমখানার মতবিরোধ হওয়ায় গতবার আগা খাঁ কাপের খেলা বন্ধ থাকে। এবার যখন খেলা পরিচালিত হয়েছে তখন আশা করা যেতে পারে, দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও মতবিরোধের অবসান হয়েছে।

(আমেরিকা) ১৫—৪ ও ১৫—৮ পয়েন্টে পরাজিত করেন।

মনোজ গুহ ও জি হেমাডি (ভারত) কার্ল লাভেডে ও ম্যানুয়েল আরমাণ্ডারিজকে (আমেরিকা) ১৫—১১, ১৪—১৭ ও ১৫—৩ পয়েন্টে পরাজিত করেন।

ওয়াইন রজার্স ও বব উইলিয়ামস (আমেরিকা) ১৫—৪ ও ১৫—৫ পয়েন্টে রবীন্দ্র ডোংরে ও নন্দু নাটেকারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

কার্ল লাভেডে ও ম্যানুয়েল আর-মাণ্ডারিজ (আমেরিকা), রবীন্দ্র ডোংরে ও নন্দু নাটেকারকে (ভারত) ১০—১৫, ১৫—১৩ ও ১৫—৯ পয়েন্টে পরাজিত করেন।

বিশ্ব রেকর্ড—গত সপ্তাহে এ্যাথ-লেটিকসের কয়েকটি বিষয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া আরও তিনজন দৌড়বীরের ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ অতিক্রমের ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের তরুণ এ্যাথলীট রজার ব্যানিস্টার সর্বপ্রথম ৪ মিনিটের কম সময়ে এক মাইল পথ দৌড়ে এ্যাথলেটিক বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন; তারপর অস্ট্রেলিয়ার আর এক তরুণ এ্যাথলীট জন ল্যাণ্ডি ব্যানিস্টারের সময়ের চেয়েও কম সময়ে মাইল পথ দৌড়ে পার হন। সম্প্রতি লণ্ডনের হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর এ্যাথলীট লাসলো ট্যাবোরী এবং গ্রেট ব্রিটেনের ক্রিশ চ্যাটওয়ে এবং ব্রায়ান হিউসন ৪ মিনিটের কম সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। ট্যাবোরী প্রথম স্থান অধিকার করেন আর চ্যাটওয়ে ও হিউসন একই সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেন। বিশ্বের যে পাঁচজন এ্যাথলীট ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল পথ অতিক্রম করে যশস্বী হয়েছেন নীচে তাঁদের বিভিন্ন সময়ের হিসাব দেওয়া হলঃ—

১৯৫৪ 'মে'—ব্যানিস্টার (ইংলণ্ড)
—৩ মি ৫৯.৪ সেকেণ্ড
১৯৫৪ 'জুন'—জন ল্যাণ্ডি (অস্ট্রেলিয়া)
—৩ মিঃ ৫৮ সেকেণ্ড (বিশ্ব রেকর্ড)
১৯৫৪ 'আগস্ট'—ব্যানিস্টার (ইংলণ্ড)
—৩ মিঃ ৫৮.৮ সেকেণ্ড
১৯৫৪ 'আগস্ট'—ল্যাণ্ডি (অস্ট্রেলিয়া)
—৩ মিঃ ৫৯.৬ সেকেণ্ড
১৯৫৫ 'মে'—এল ট্যাবোরী (হাঙ্গেরী)
—৩ মিঃ ৫৯ সেকেণ্ড
১৯৫৫ 'মে'—ক্রিশ চ্যাটওয়ে (ইংলণ্ড)
—৩ মিঃ ৫৯.৮ সেকেণ্ড
১৯৫৫ 'মে'—ব্রায়ান হিউসন (ইংলণ্ড)
—৩ মিঃ ৫৯.৮ সেকেণ্ড

আলোচ্য সপ্তাহে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্শা ছোড়ায় এবং দুই মাইল দৌড়, ৮৮০ গজ দৌড় ও ৪৪০ গজ রিলে রেসে। এর মধ্যে একমাত্র বর্শা ছোড়া অলিম্পিক ইভেণ্ট। অন্যগুলি অলিম্পিক বহির্ভূত। অলিম্পিকে মিটার হিসাবে দূরত্ব নির্ণয় করা হয়, গজ হিসাবে নয়। বর্শা ছোড়ায় আমেরিকার ফ্রাংকলিন হেল্ডের রেকর্ড ছিল ২৬৩ ফুট ১০ ইঞ্চি। সম্প্রতি তিনি ২৬৮ ফুট ২½ ইঞ্চি দূরে বর্শা নিক্ষেপ করে নতুন রেকর্ড করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বর্শা ছোড়ায় ভারতীয় রেকর্ড মাত্র ১৮৫ ফুট ৪½ ইঞ্চি। ১৯৫১ সালে পেপসুর অবতার সিং এই রেকর্ড করেন।

মুষ্টিযুদ্ধ—লাইট ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা আর্জেণ্টিনার পিরেজ জাপানের মুষ্টিযোদ্ধা যোশিও শিরাইকে পরাজিত করে নিজে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ অক্ষুন্ন রেখেছেন। গত নবেম্বর মাসেও পিরেজ-শিরাই লড়াইয়ে পিরেজ জয়লাভ করে-ছিলেন। তবে পিরেজ গতবার জিতেছিলেন পয়েণ্টে এবার তিনি পঞ্চম রাউণ্ডে শিরাইকে নক আউট করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ
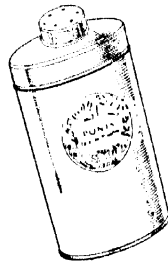
দেশী সংবাদ

২৩শে মে—আজ দার্জিলিংয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সঙ্গে আলোচনাকালে বিহারের পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চল এবং আসামের গোয়ালপাড়া জিলার অংশবিশেষ পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির দাবী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আলোচনা দেড় ঘণ্টাকাল চলে।

ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আজ বিমানযোগে দুই মাসকাল বৃটেন ও ইউরোপ পরিভ্রমণের জন্য দিল্লী হইতে যাত্রা করেন।

২৪শে মে—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় শহরাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানের ব্যাপারে কি নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্যে এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন। সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, যেসব উদ্বাস্তুকে গভর্নমেণ্ট হইতে জমি দেওয়া হইয়াছে, অথবা যাঁহারা বেসরকারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়াছেন অথবা স্থায়ী ইজারা লইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে ঋণ দেওয়া হইবে।

২৫শে মে—কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীহৃষিকেশ ত্রিপাঠি সুতাহাটা নির্বাচন কেন্দ্র হইতে তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু মহাসভা প্রার্থীকে ১৬ হাজারেরও বেশী ভোটে পরাজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রজাসমাজতন্ত্রী শ্রীকুমারচন্দ্র জানার পদত্যাগের ফলে এই উপনির্বাচন হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী জে সি মিত্র ও শ্রীরেণুপদ মুখার্জি কমলা হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। বিচারপতিদ্বয় আসামী বীরেন্দ্র দত্ত ওরফে বেচু দত্তের আপীল না-মঞ্জুর করিয়া তাহার প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই নববিধানে প্রাথমিক হইতে পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যন্ত শিক্ষাকাল মোট ১৬ বৎসর নির্দিষ্ট রাখিলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকাল দশ বৎসর স্থলে ১২ বৎসর নির্দিষ্ট রাখা হইবে।

গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের নেতা মিঃ পিটার আলভারেসকে গোয়ার কোন জায়গায় দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গুলী করার জন্য পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ সমস্ত পুলিস ও সৈন্যদের প্রতি এক নির্দেশ জারী করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৬শে মে—ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তক উইলিয়ম কেরীর স্মৃতির উদ্দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে আজ বেলভেডিয়ারস্থ গ্রন্থাগার ভবনে কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ প্রাচীন মুদ্রণ সম্পর্কে কেরী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

২৭শে মে—কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল দূরে হাবড়া কলোনী অঞ্চলের পাঁচ মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ এলাকায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রায় ৮০ হাজার উদ্বাস্তু চরম দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছে। ঐ এলাকায় দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের উপায় অভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই বেকার জীবন যাপন করিতেছে। ছয় বৎসর যাবৎ তাঁহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের কোনপ্রকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁহারা এক্ষণে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিতেছে। এই দিন উক্ত উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহের অষ্টম দিবসে ১০ জন মহিলাসহ মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদিগকে লইয়া এপর্যন্ত মোট ৮৬জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচার ঘোষণা করেন যে, আকালী আন্দোলন সম্পর্কে এপর্যন্ত ১৩৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৮শে মে—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে এক এক খণ্ডে ৫০০ হইতে ১০০০ পরিবার একত্রে বাস করিতে পারে এইরূপ উপযুক্ত জমি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিটি অবিলম্বে বিভিন্ন রাজ্য পরিদর্শন করিবেন।

শ্রী এস পি লিমায়ের নেতৃত্বে ৭০জন ভারতীয় সত্যাগ্রহীর দ্বিতীয় দল আজ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গোয়ায় প্রবেশ করে।

আজ প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি পরিচালিত এক শোভাযাত্রা কলিকাতাস্থিত পর্তুগীজ কন্সাল অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই দিন কলিকাতায় এক সর্বদলীয় সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গোয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ভারতের বুক হইতে চিরতরে ঔপনিবেশিক শাসনের চিহ্ন মুছিয়া ফেলার জন্য ভারত সরকারের নিকট উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দৃঢ় দাবী জানান। গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের নেতা শ্রীপিটার আলভারেস কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে শত নিপীড়নের মধ্যেও গোয়া মুক্তি আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন।

২৯শে মে—লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য সমস্ত সরকারী শিল্পোদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিশিষ্ট চালাই কারখানাসমূহ পরিচালনাকালে ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত মন্ত্রণালয় নামে একটি নূতন মন্ত্রিদপ্তর গঠন করিয়াছেন। আজ নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী এই নূতন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হইবেন।

আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ এবং আই এস-সি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। এ বৎসর আই এ পরীক্ষায় শতকরা ৫৩ জন এবং আই এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৪৭.৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে মে—বৃটেনের বৃহৎ বন্দরসমূহে ডক শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে ৫০খানারও বেশী জাহাজের কাজ আজ বন্ধ থাকে।

২৬শে মে—রাশিয়া আজ বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃহৎ চতুঃশক্তির বৈঠকে সম্মত হইয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটোর সহিত আলোচনার জন্য রুশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে মঃ ক্রুশেভ অদ্য বেলগ্রেডে উপনীত হন। রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন।

২৭শে মে—শিল্পপ্রধান জেলাগুলি হইতে বিপুল ভোট পাওয়ায় স্যার এণ্টনী ইডেনের রক্ষণশীল গভর্নমেণ্ট পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য বৃটেনের শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান নির্বাচনে রক্ষণশীল দল যেরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ঐ দল ঐরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর কখনও লাভ করে নাই।

পশ্চিম জার্মানী ৫ লক্ষ লোককে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করিয়াছে।

২৮শে মে—পাক গভর্নর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ আজ ৮০ জন সদস্য লইয়া নূতন পাক গণ-পরিষদ গঠনের জন্য এক হুকুমনামা জারী করিয়াছেন। উক্ত হুকুমনামা অনুসারে ২১শে জুন তারিখে নূতন গণ-পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৯শে মে—বৃটেন আজ এক অতি গুরুতর শিল্প সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে—১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘটের পর এ ধরনের জটিল পরিস্থিতি আর দেখা দেয় নাই। ২০ হাজার ধর্মঘটী ডক শ্রমিকের সহিত ৭০ হাজার রেল শ্রমিকও বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাইয়া অদ্য হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৶৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
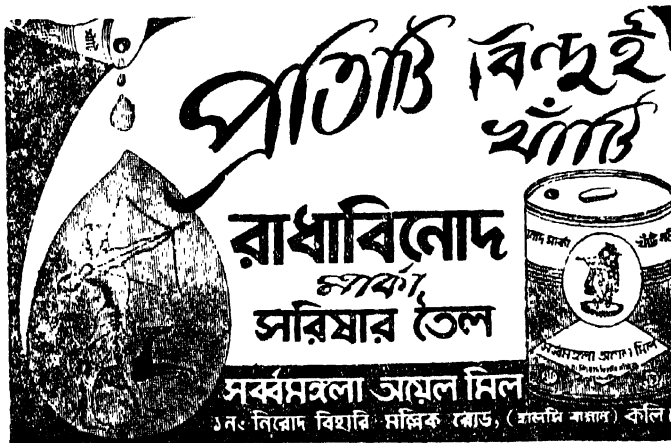
সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		

প্রচ্ছদফটো ॥ নাগা ভাইবোন (আসাম) ॥ শ্রীনির্ম্মলেন্দু ঘোষ

সত্যি সত্যিই তাজা !
কারখানা থেকে দোকানে দোকানে চটপট্ বিলি করার নিখুঁত ব্যবস্থা থাকায় ব্রুক বণ্ড চা বাগান থেকে সদ্যতোলা চায়ের মত তাজা থাকে।
ষোলআনাই খাঁটি !
মোড়কে পুরে সীল ক'রে দেওয়া হয় ব'লে ধুলো-বালি কিংবা ভেজাল মিশবার ভয় থাকে না।
Brooke Bond Tea
Brooke Bond Tea
বুঝেসুঝে কিনুন ও পয়সা বাঁচান !
ভুলে যাবেন না যে ব্রুক বণ্ড চা কিনলে দামের তুলনায় অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন !
অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে কেনেন !
BB 64 TR
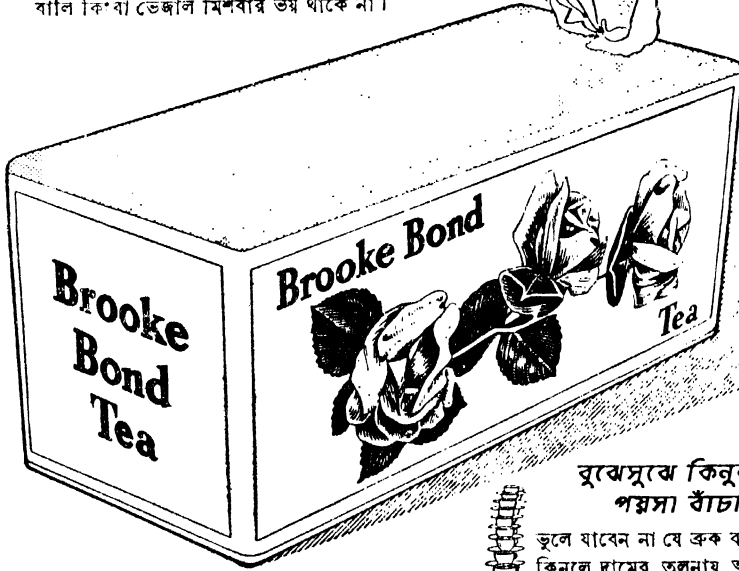
২২ বর্ষ ৩২ সংখ্যা

দেশ

শনিবার ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

DESH SATURDAY, 11TH JUNE, 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ
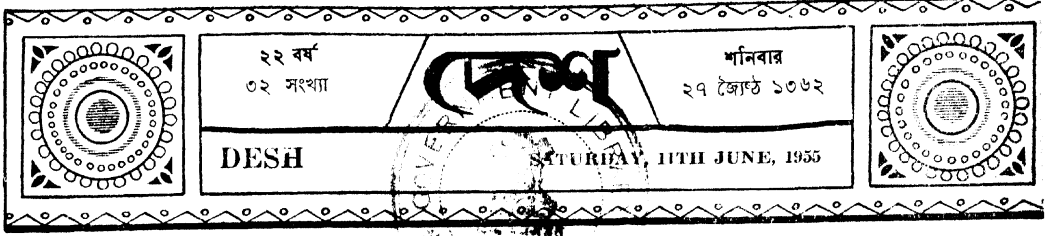
পূর্ববঙ্গে পার্লামেণ্টারী শাসন

পুরাপুরি এক বৎসরকাল পরে পূর্ববঙ্গে পুনরায় পার্লামেণ্টারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ দলীয় বা উপদলীয় মত যাহাই হোক্‌, পূর্ববঙ্গের সর্বসাধারণ ইহাতে সুখী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী গত ৩রা জুন এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাজনীতির গতি জটিল এবং কুটিল। রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূলে বৃহত্তর স্বার্থের চেতনার অভাবে পাকিস্থানে এই জটিলতা এবং কুটিলতা নানাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। এক বৎসর পূর্বে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হককে রাষ্ট্রদ্রোহীস্বরূপে অভিহিত করেন এবং নানা রকমে তাঁহাকে ধিক্কৃত, লাঞ্ছিত, এমনকি, রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করা হয়। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে হক সাহেবকেই পুনরায় পূর্ববঙ্গের নেতাস্বরূপে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। হক সাহেবের মনোনীত মিঃ আবুহোসেন সরকার তথাকার মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সুর এইভাবে ঘুরিয়া যাইবার কারণ কোথায়, এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিয়াছে। ফলত অবস্থার চাপে পড়িয়াই পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে এইভাবে মতিগতির পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। পূর্ববঙ্গের জনমতের সমর্থন লাভ করিতে না পারিলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে গণ-পরিষদের প্রতিনিধিত্ব-মর্যাদা থাকিবে না; অধিকন্তু পাকিস্থানে সংহতিবিরোধী বিভিন্ন সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিবে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছেন যে, জনপ্রিয়তার দিক হইতে পূর্ব-পাকিস্থানে হক সাহেবের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা সুকঠিন। মিঃ শহীদ সুরাবর্দী সুচতুর এবং ঝানু রাজনীতিক। তিনিই তেমন চেষ্টা করিতে গিয়া এলাইয়া পড়িয়াছেন। হক সাহেবের মনোনীত মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্থানের সমস্যার সমাধান হইবে কি না—এ প্রশ্ন কিন্তু এখনও রহিয়াই গিয়াছে। উপদলীয় চক্রান্তের এইখানেই নিবৃত্তি ঘটিবে এবং পূর্ববঙ্গের জনমত সুসংহত হইয়া রাষ্ট্রীয় আদর্শকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে, এমন আশা করা এখনও সুকঠিন বলিয়াই মনে হয়। পূর্ববঙ্গের শাসন বিভাগ সেখানকার জনচেতনাকে আড়ষ্ট করিবার মূলে অনেকখানি কাজ করিয়াছে। হক সাহেবের প্রভাবাধীন নূতন মন্ত্রিমণ্ডল শাসক-মণ্ডলীর মুরুব্বিয়ানা এবং করাচীর আভিজাত্যের সেই চাপ হইতে পূর্ববঙ্গের জনগণকে মুক্তি দিতে পারিবেন কি? উপদলীয় চক্রান্তের পাকে পাকে সেখানে বহুবিধ দুর্নীতির জাল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নূতন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে ইহা কাটাইয়া সর্বশ্রেণী এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রতিবেশ গড়িয়া তোলা খুব সহজ হইবে না। প্রকৃতপক্ষে তাহার উপরই পূর্ববঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্যাদা এবং পার্লামেণ্টারী শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে।

নৈতিক আদর্শের অধোগতি

সম্প্রতি মাদ্রাজের অন্তর্গত গুরুভায়ুরে নিখিল কেরল ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পাশ্চাত্ত্যের আদর্শসিদ্ধ যুক্তিবাদের আবরণে নিরীশ্বরবাদ ধীরে ধীরে ভারতের সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। যুক্তিবাদের মূল্য না আছে, ইহা নয়; কিন্তু শুধু যুক্তি কোন শক্তি দিতে পারে না। ত্যাগ এবং সেবার বৃহত্তর আদর্শের উপর সমাজজীবনের শক্তি গড়িয়া উঠে। শ্রীযুত শাস্ত্রীর মতে ধর্মবোধকে আশ্রয় করিয়া সমাজ-জীবনে যে নৈতিক শক্তি জাগ্রত রহিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যুক্তিবাদের মোহে পড়িয়া আমরা সেগুলি যেন ক্ষুণ্ণ না করি। এ সম্বন্ধে জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সচেতন থাকা প্রয়োজন। আমরাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকি। বাস্তবিকপক্ষে সমাজ-জীবনে প্রাণময় আদর্শের প্রেরণা সঞ্চারের সামর্থ্য ধর্মের মূলে না থাকিলে সে ধর্ম শুধু লৌকিক আচার-বিচার এবং সংস্কারমাত্রে পর্যবসিত হয়, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি এমন প্রাণধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিবর্জিত হইয়াছে, এমন মনে করা ভুল। এদেশের ভক্ত, সাধক এবং আচার্যগণ তাঁহাদের জীবন-সাধনায় জাতির মনের মূলে প্রাণ-ধারা সঞ্চার করিয়াছেন, জাতিকে তাঁহারা নৈতিক শক্তিতে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু যুক্তির বিচার করিয়া

ইঁহাদের অবদানকে অস্বীকার করিলে জাতি হিসাবে আমাদের উন্নতির পথই রুদ্ধ হইবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য জগৎ জীবনকে সত্য-রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য বর্তমানে আমাদেরই সংস্কৃতির বীজস্বরূপে বেদান্তের ভিতরই সম্বল খুঁজিতেছে। শত যুক্তির পাকে পড়িয়াও মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শের নৈতিক মহিমাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না।

গোয়া সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু

রাশিয়া পরিভ্রমণে যাত্রার প্রাক্কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল গোয়ার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি একথা স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন, সত্যাগ্রহ এই প্রশ্ন সমাধানের প্রধান উপায় এবং গোয়া সম্পর্কে সত্যাগ্রহ আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারত হইতে উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক লোক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বক্তব্য এই যে, গোয়ার অধিবাসীরা পর্তুগীজ শাসনে থাকিতে চায়; কিন্তু ভারত হইতে তাহাদের উপর চাপ দিয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ভারতভুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে; পর্তুগীজ সরকার এইরূপ প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোয়ার অধিবাসীরাই যে পর্তুগীজদের অধীন থাকিতে চায় না, জগতের নিকট এই সত্য উন্মুক্ত করাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়। পণ্ডিত নেহরুর এমন উক্তির যৌক্তিকতা আমরা সর্বাংশে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আমাদের মতে গোয়ার সম্পর্কে ভারতেরও দাবী আছে, কারণ গোয়া ভারতের অবি-চ্ছেদ্য অংশ, সুতরাং গোয়া হইতে পর্তুগীজপ্রভুত্বের উচ্ছেদে প্রত্যক্ষভাবেও ভারতের আগ্রহ থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। ফলত গোয়া ভারতেরই অংশ, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে গোয়ার অধিবাসীরাও ভারতেরই অধিবাসী একথাও মানিয়া লওয়া দরকার। এরূপ ক্ষেত্রে ভারত-বাসীরা ভারতের অংশবিশেষকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না, হইবে কি বাহির হইতে লোক আসিয়া? সুতরাং গোয়ার অধিবাসী এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে ভেদরেখা সৃষ্টি করার যৌক্তিকতা থাকে না; পক্ষান্তরে তাহাতে ভারত সরকার যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া পর্তুগীজ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, তাহাই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় গোয়া সম্পর্কে ভারত হইতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সমর্থন করাই ভারত সরকারের উচিত এবং সে কাজ তাঁহাদের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সব সমস্যা সমাধানের মৌলিক নীতিরও বিরোধী হইবে না। বস্তুত সর্বভারতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষা না পাইলে গোয়ার প্রকৃত জনমতকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করিতে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সুযোগের অভাব ঘটিবে না। তাহারা সে সুযোগ যাহাতে না পায়, ভারত সরকারের নীতিতে তদুপযোগী দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।

মাকালু শৃঙ্গ বিজয়

গত ১৫ই মে ফরাসী অভিযাত্রী দল হিমালয়ের মাকালু-শৃঙ্গে আরোহন করেন। উচ্চতায় ইহা হিমালয়ের শৃঙ্গ-গুলির মধ্যে পঞ্চম। মাকালু শৃঙ্গ বিজয়ের বিশেষত্ব এই যে, অভিযাত্রীরা সকলেই একত্র হইয়া শৃঙ্গের উপর উঠেন। হিমালয়ের অপরাপর শৃঙ্গ-বিজয়ে ইতঃ-পূর্বে ইহা সম্ভব হয় নাই। দেখা যাইতেছে, এভারেস্ট বিজয়ের পর দেবতাত্মা হিমালয়ের অপরাপর শৃঙ্গ-গুলিও ক্রমে ক্রমে বিজিত হইতেছে। দুর্গমের অভিসারে মানুষের সাফল্য অনেকটা আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে এবং পূর্বগামীদের সাধনা মানুষের অন্তরের সে সম্বন্ধে প্রত্যয়বোধ প্রবল করিয়া তোলে। এইভাবে মানুষ অজেয়কে জয়, দুর্জ্ঞেয়কেও জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিতে সমর্থ হয়। মাকালু-বিজয়ে মানব-শক্তির এই সুবিশাল সম্ভাব্যতা, অনন্তের রহস্য অধিগত হইতে তাহার সামর্থ্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার

অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের স্থলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে তিনি প্রভূত সুযশ অর্জন করিয়াছেন। ভারত সর-কারের শিক্ষাসম্পর্কিত কাজের সহিত কিছুদিন সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-নীতি সামাজিক এবং রাজনীতিক অনেক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শও পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত নিজে শিক্ষাব্রতী; সুতরাং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমুন্নতি সাধন সম্পর্কে তিনি সিনেট এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র শিক্ষক সমাজের সহযোগিতা লাভ করিবেন, ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে বহুবিধ গুরু-তর দায়িত্ব বর্তমানে সমুপস্থিত হইয়াছে। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব প্রতিপালনে সর্বতোভাবে যোগ্যতার অধিকারী। আমরা তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিপদের উপর বিপদ

গত ১লা ও ২রা জুন বর্ধমান ও বীরভূম জেলার উদ্বাস্তু কলোনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমানে প্রায় এক হাজার আশ্রয়হীন এবং দুই শত নরনারী আহত হইয়াছে। সর-কারী প্রেসনোটে প্রকাশ ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হইতেছে এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলি-কাতা হইতে বর্ধমানের উদ্বাস্তুদের জন্য ১২ শত তাঁবু প্রেরিত হইয়াছে এবং এক সপ্তাহের ডোল বিতরণ করা হইয়াছে। সান্ত্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও এই প্রশ্ন মনে জাগে যে ঝড়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হইল না, উদ্বাস্তুদের এক হাজার পরিবারেরই শুধু বাড়ীঘর উড়িয়া গেল! আমাদের মনে হয়, গৃহগুলির নির্মাণকার্যের ত্রুটি ও দুর্বলতাই উদ্বাস্তু নরনারীগণের নূতন বিড়ম্বনা ও ক্লেশের কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে সরকারের সমধিক সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর ইউরোপ ভ্রমণের মধ্যে রোমে পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎকারের কথা আছে। এতে পর্তুগীজ গবর্নমেণ্ট কিছুটা শঙ্কিত হয়েছেন বলে শুনা যাচ্ছে। গোয়া ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হলে গোয়ার খৃষ্টানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে—এই রটনা পর্তুগীজরা করে আসছে। এরূপ আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই জেনেও পর্তুগীজরা এরকম রটাচ্ছে। গোয়া ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার পরে গোয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও খৃষ্টানধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য স্বার্থ যে সুরক্ষিত থাকবে—এই প্রতিশ্রুতি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বার বার দেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বারবার অতি স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণায় অবিশ্বাস স্থাপন করার মতো কোনো কারণই থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও পর্তুগীজ গবর্নমেণ্ট এই মিথ্যা রটনা দ্বারা পাশ্চাত্য খৃষ্টান দেশগুলি বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক জাতিসমূহের মনে পর্তুগালের গোয়া নীতির প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করার চেষ্টা করে আসছেন।

পর্তুগীজ প্রচারের ফলে গোয়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশসমূহের রোমান ক্যাথলিকদের মনে অল্পবিস্তর মিথ্যা ধারণা রয়েছে, সন্দেহ নেই। এই মিথ্যা ধারণার নিরসন হলে পর্তুগীজ সরকারের মুশকিল হবে কারণ এখনও পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পর্তুগাল কিছুটা নৈতিক সমর্থন পাচ্ছে। পর্তুগালের ভয় হয়েছে পাছে পণ্ডিত নেহরুর কথাবার্তা শুনে পোপ মহোদয়ও বুঝতে পারেন যে গোয়ার ভারতভুক্তির ফলে গোয়ার খৃষ্টানদের কোনো ন্যায্য ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা নেই। পোপ মহাশয়ের মন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলে তার প্রভাব সারা পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপর কোনো না কোনোভাবে প্রতিফলিত হবে যদিও পোপ মহাশয় গোয়া সম্বন্ধে ভারত সরকারের নীতির দোষশূন্যতা উপলব্ধি করলেও প্রকাশ্যে এই রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে পর্তুগীজ সরকারের বিপক্ষে কোনো মত প্রকাশ করবেন এরূপ সম্ভাবনা নেই। পোপ মহাশয় গোপনে পর্তুগীজ সরকারকে গোয়া ছেড়ে আসতে পরামর্শ দেবেন, এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পোপ মহাশয় যদি বুঝতে পারেন যে ভারত সরকারের দিক থেকে গোয়ায় খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টানদের কোনো ভয়ের কারণ নেই তাহলেই পর্তুগীজ সরকারের বেশ একটু অসুবিধা হবে কারণ পোপের ঐরূপ মনোভাব জানার পরে পর্তুগীজ সরকারের পক্ষে ধর্মীয় মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালানো কঠিন হবে।

বিদেশ যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী গোয়া সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছেন তার মধ্যে বিশেষ করে একটি কথায় পাশ্চাত্যের লোকরা খুশী হবে। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন যে ভারতের জনমত যতই উত্তেজিত হোক না কেন ভারত সরকার গোয়ার ব্যাপারে "পুলিস এ্যাকশন" বা বলপ্রয়োগের চিন্তাকে কখনই মনে স্থান দেবেন না। পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তি ভারত সরকারের শান্তিপ্রিয় মনোভাবের পরিচায়ক হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবশ্য সম্মান পাবে এবং পরোক্ষভাবে এর দ্বারা পর্তুগীজ সরকারের উপর কিছুটা নৈতিক চাপও আসতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে একটা নৈতিক গোলাখিচুড়ির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ভারত সরকার একদিকে বলছেন গোয়া সর্বরকমে ভারতের অংশ আবার অন্যদিকে দেখাতে চান যে গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন গোয়াবাসীদেরই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এবং সেইজন্য এখান থেকে সত্যাগ্রহীদের গোয়ায় প্রবেশ

সরকারের অভিপ্রেত নয়। আবার অল্পবল্প সত্যাগ্রহী সদর রাস্তায় না গিয়ে যদি খিড়কি দিয়ে গোয়ায় ঢোকে তবে তাতে ভারত সরকারের বিশেষ আপত্তি নেই। গোয়া যদি ন্যায়ত ভারতেরই অংশ হয় তবে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয়দের বিপুলভাবে যোগদানে আপত্তি কেন হবে? এ দায়িত্ব গোয়াবাসীদের একলার কেন হবে? প্রকৃতপক্ষে গোয়াবাসীরা যথেষ্ট আন্দোলন করেছে এবং তার জন্য যথেষ্ট অত্যাচারও তারা সয়েছে, তাদের আর সইবার ক্ষমতা নেই। এখন যদি এখান থেকে লোক গিয়ে সংগ্রাম না চালানো হয় তবে গোয়ার ভিতরের আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। ভারত গভর্নমেণ্ট সেটাও চান না। আবার বেশি সংখ্যক লোক এখান থেকে গোয়ায় ঢোকে তাও চান না কারণ তাহলে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের দিক থেকে যেরকম ব্যবহারের সম্ভাবনা তাতে বড়ো রকমের সংঘর্ষ এবং তাতে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে—যা ভারত সরকার চাচ্ছেন না। সাক্ষাৎভাবে অর্থনৈতিক চাপের অতিরিক্ত জোরদার কিছু করতে ভারত সরকার চান না। কিন্তু সমস্তটা মিলে নৈতিক দিক থেকেও একটা অতি গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

* * *

বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার প্রধানের বৈঠকের স্থান ও কাল সম্বন্ধে নিজেদের প্রস্তাব রাশিয়াকে জানিয়েছে। পশ্চিমা শক্তিদের প্রস্তাব হচ্ছে—বৈঠক জেনেভায় হবে এবং আগামী ১৮ই থেকে ২১এ জুলাই পর্যন্ত এই চার দিন হবে। রাশিয়ার উত্তর এখনো জানা যায় নি।

* * *

পণ্ডিত নেহরু মস্কোতে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। মিঃ চৌ-এন-লাইকে যেভাবে সম্বর্ধনা করা হয়েছিল শ্রী নেহরুর সম্বর্ধনার বহর নাকি তার চেয়েও বেশি হয়েছে। এসব ব্যাপারে সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট তাঁদের সমসাময়িক নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন; অবশ্য সব দেশের গবর্নমেণ্টই তাই করেন তবে যে সব দেশে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মতের ভিতর পার্থক্যের বা পার্থক্য প্রকাশের অবসর কম সেখানে বিদেশী অতিথির সম্বর্ধনাও একসুরে হয়ে থাকে। সোভিয়েট নেতাদের কিন্তু পলিসির খাতিরে খাতির দেখানোর শক্তির সীমা নেই। প্রয়োজনবোধে শুধু অপরের প্রতি সৌজন্য দেখানো নয় নিজেদের গরজে নতভাব দেখাতেও ইঁহাদের সমকক্ষ নেই। যে মার্শাল টিটো এতদিন অস্পৃশ্য ছিলেন তাঁকে বাড়ি বয়ে সোভিয়েট কর্তারা আলিঙ্গন দিয়ে এলেন। সুতরাং একদা রুশ কর্তৃপক্ষ স্বাধীন ভারত ও তার নীতি সম্বন্ধে যে-সব কটূক্তি করেছেন সেগুলির সঙ্গে রাশিয়ার বর্তমান ভারত প্রীতি ও নেহরু প্রশস্তির যতই অমিল হোক এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। সব প্রশ্নেরই একই উত্তর—জমানা বদল গিয়া। তবে একথা মনে করাও ঠিক হবে না যে, রুশ গবর্নমেণ্ট এখন যা কিছু বলছেন সবই পলিসির খাতিরে। সত্য সত্য অনেক বিষয়ে তাঁদের মতের পরিবর্তনও হয়ে থাকবে। আবার এও সম্ভব যে যখন রুশ গবর্নমেণ্ট ও তাঁদের প্রচারকগণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা "ভুয়া স্বাধীনতা" ইত্যাদি উক্তি করতেন তখনও তাঁরা সে কথা নিজেদের সত্য বিশ্বাস অনুযায়ী বলতেন না। পলিসির খাতিরে বলতেন।

যাই হোক রুশ নেতারা যাই করুন, মস্কোতে শ্রী নেহরুর সম্বর্ধনার রিপোর্টে জনসাধারণের ঔৎসুক্যের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। অবশ্য ভারতবর্ষ ও শ্রী নেহরু সম্বন্ধে রুশ জনসাধারণের ধারণা তাদের গবর্নমেণ্টের দেওয়া তথ্যাদির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যাই হোক ভারতবর্ষ যে কম্যুনিস্ট-শাসিত দেশ নয় এবং শ্রী নেহরু যে কম্যুনিস্ট নন, একথা তারা জানে। তা জেনেও যে, তারা শ্রী নেহরুকে এরূপ বিপুল ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে, এটা একটা বড়ো আশার কথা। শ্রী নেহরু বিশ্বশান্তির জন্য চেষ্টা করছেন, তার জন্য তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া মস্কোর জনগণ শ্রী নেহরুর কাছে হয়ত আর একটা কারণে কৃতজ্ঞতা দেখাতে চেয়েছে। খোলা গাড়িতে নিজেদের নেতাদের যেতে দেখার সুযোগ মস্কোর লোকেরা বড়ো একটা পায় না। শ্রী নেহরুর জন্য সে সুযোগ একটা তারা পেয়েছে কারণ শ্রী নেহরুকে এরোড্রোম থেকে খোলা গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গাড়িতে তাঁর পাশে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বসেছিলেন।

* * *

গাজা অঞ্চলে ইজরেল ও মিশরীয়দের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক সংঘর্ষ হঠাৎ ব্যাপক যুদ্ধের আকার ধারণ না করে—এই আশঙ্কা অনুভূত হচ্ছে। আরব রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে মিশর, ইজরেলের অস্তিত্ব মেনে নিতে পাচ্ছে না—এই হলো আসল মুশকিল। ইজরেল যুদ্ধের দ্বারাই নিজের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপ্রাণ লড়ছে। আরব রাষ্ট্রগুলিকে বৃটেন ও আমেরিকা অস্ত্র দিচ্ছে। যদিও তার একটা শর্ত হচ্ছে এই যে, সে অস্ত্র অপর দেশকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহৃত হবে না কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির অস্ত্রবল বাড়লে তারা যে ইজরেলের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হবে এই হচ্ছে ইজরেলের ভয় এবং সে ভয় একেবারে অমূলক নয়। মিশরের প্রধান মন্ত্রীর কথায় সে ভয় আরো বাড়ছে। বৃহৎ শক্তিগুলি যদি ইজরেলের রক্ষার গ্যারাণ্টি দিত তাহলে ইজরেল অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু ইজরেলকে এরূপ গ্যারাণ্টি দিলে আরব রাষ্ট্রগুলি চটবে এবং বৃটেন ও আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে আরব রাষ্ট্রগুলিকে হাতে রাখতে চায়, সুতরাং সেদিকে তারা এগুবে না। এমন কি ইজরেলের সঙ্গে 'যুদ্ধের অবস্থা'র অবসান ঘটিয়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলির উপর চাপ দিতে পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা ইতস্তত করছেন। তাঁরা কেবল উভয়পক্ষের প্রতি 'ঠাণ্ডা হও' এই উপদেশ নিক্ষেপ করছেন। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে এশিয়ান-আফ্রিকান কনফারেন্সের নেতারাও কিছুমাত্র শক্তি বা সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারেন নি।

৮।৬।৫৫

তোডরমল

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের মহড়া ইতিমধ্যেই সারা দেশে শুরু হইয়াছে। প্রতিদিনই এই সম্বন্ধে কিছু না কিছু মন্তব্য ও বিবৃতি সংবাদ-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যমন্ত্রী, শিল্পপতি ও অর্থনীতিবিদ কেহই বাদ যাইতেছেন না। যে ব্যাপারে দেশের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ-উন্নতি জড়িত এবং যাহা ফলপ্রসূ করিবার উপর জাতির আর্থিক কাঠামো নির্ভর করিতেছে, তাহাতে সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা লইয়া এতটা সাড়া জাগে নাই। প্রথম পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে জনসাধারণ বিশেষ উদ্বুদ্ধ হয় নাই। জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে যে পরিকল্পনার মর্মর-সৌধ নির্মাণ করাই একপ্রকার অসম্ভব, এই বিষয়ে সরকার বিশেষ অবহিত। কাজেই প্রথম পরি-কল্পনার অভিজ্ঞতা লইয়া তাহারা জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা বিষয়ে পূর্ণ উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, সেই সম্বন্ধে গোড়া হইতেই সকল ব্যবস্থা সম্পাদনে যত্নবান আছেন। এমন কি পরিকল্পনা প্রণয়নে গ্রাম-পঞ্চায়েত, মহকুমা বোর্ড, জেলাবোর্ড প্রভৃতিকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দেশের সর্ব-নিম্ন কেন্দ্র হইতে যাহাতে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রেরণা উৎসারিত হইয়া সারা দেশের প্রাণকেন্দ্রে গিয়া মিলিত হয়, এই উদ্দেশ্য লইয়াই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক্ এই পরিকল্পনার আসল কাঠামোটা কি? এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই পরিকল্পনাটির পূর্ণাঙ্গরূপ আগামী বৎসরের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইবার কথা। বর্তমানে ইহার বহিরাবরণ লইয়া জল্পনাকল্পনা চলিতেছে।

অধ্যাপক মহলানবীশের রচনাটি আলোচ্য পরিকল্পনার মূল কাঠামো। যাহাতে আগামী পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং অন্যূন এক কোটি বেকার লোকের অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া উক্ত পরিকল্পনার কাঠামো তৈরী হইয়াছে। প্রথম পরি-কল্পনার কার্যকালে দেখা গিয়াছে যে, যে পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, সেই পরিমাণে উপযুক্ত কাজের সংস্থান করা সম্ভব হয় নাই। বরং দেখা গিয়াছে যে, বহুলোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির সাথে কর্মবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেখানে বিপরীত ফল দেখা দেওয়াতে আলোচ্য পরিকল্পনাতে এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যাহাতে বেকার সমস্যার আশু সমাধান হইতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ইমারত গড়িতে হইবে। এইজন্য বলা হইয়াছে যে, মূল শিল্পোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। আশা করা যায় যে, খনিজ শিল্প ইত্যাদিতে বহু লোকের নিয়োগ সম্ভবপর হইবে। এতদুদ্দেশ্যে একমাত্র রাষ্ট্রীয়

শিল্পোন্নয়নেই ৩৪০০ কোটি টাকা এবং অপরাপর শিল্পে ২২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সুপারিশ করা হইয়াছে। কাজেই কলকব্জা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি যাহাতে আমাদের দেশেই তৈরী হইতে পারে এবং এই শিল্প যাহাতে সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হয়, এইদিকটাতেই সবিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তারপর কুটির-শিল্পগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া যাহাতে দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যসম্ভার এইসব শিল্প দ্বারাই উৎপাদিত হইতে পারে, সেই বিষয়টিকেও আলোচ্য পরিকল্পনাতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেওয়া হইয়াছে। এইসব কুটিরশিল্পজাত পণ্যের চাহিদা যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং ফ্যাক্টরী উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হইতে হয়, সেই দিকটাও বিবেচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫৬০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবার কথা। কি কি খাতে এই অর্থ ব্যয়িত হইবে, তাহার মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল—

	কোটি টাকা
ফ্যাক্টরী শিল্পদ্রব্য	১০০
কুটীর শিল্পদ্রব্য	২০০
লৌহ, ইস্পাত, কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য, খনিজ শিল্প ইত্যাদি	১১০০
	১৪০০
গৃহ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি	১৩৫০
কৃষি, জলসেচন ইত্যাদি ...	৯৫০
যানবাহন পরিবহন	৯০০
বিদ্যুৎ	৫০০
মজুত কৃষিজাত পণ্য (Buffer Stocks)	৫০০
	৫৬০০

অধ্যাপক মহলানবীশের মতে ১৯৫৬—৫৭ হইতে ১৯৬০—৬১ সাল সরকারী বাজেটের আয়-ব্যয়ের মোটামুটি অবস্থা এই দাঁড়ায়—

আয়

	কোটি টাকা
রাজস্ব	৫২০০
জনসাধারণ হইতে ঋণপত্র ...	১০০০
রেলওয়ে ইত্যাদি	২০০
বৈদেশিক সাহায্য	৪০০
	৬৮০০
কর, রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্পের লাভ	৮০০—১০০০
ঘাটতি পূরণ (deficit finance) ...	১০০০—১২০০
	৮৮০০

ব্যয়

	কোটি টাকা
পরিকল্পনা অন্তর্গত ...	৪৩০০
পরিকল্পনা বহির্ভূত ...	৪৫০০
	৮৮০০

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থসচিব বাঙালোরে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়ের দিক হইতে ৯০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি পরিপূরণ করিবার মত অর্থ-সংস্থান কিভাবে হইতে পারে, এটাও একটা বিষম সমস্যা। জনসাধারণের কাছ হইতে কর বাবদ অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করার পথও নানা বিঘ্নসঙ্কুল। তদুপরি রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পগুলি হইতেও যে লাভের অঙ্ক অদূরভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে, তাহা মনে হয় না।

সম্প্রতি বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় উক্ত পরিকল্পনার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন, যাহা কার্যকরী করার মত উপযুক্ত সামর্থ্য আমাদের থাকে। উক্ত পরিকল্পনাতে এমন কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, যাহা আমরা নিজেদের যোগ্যতাতে রূপ দিতে পারিব না। পরিকল্পনার বাস্তবক্ষেত্রে আকাশকুসুম কল্পনা-বিলাসের স্থান নাই। ডাঃ রায়ের মতে আগামী পাঁচ বৎসরে আমরা কতটা উন্নত হইতে পারিব, তাহা মূলত নির্ভর করে আমাদের আর্থিক সঙ্গতির উপর। অধুনা

আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন করিবার নিমিত্তই সর্বস্ব ব্যয়িত হয়—সঞ্চয় করা তো দূরের কথা! আগামীকালের অনন্ত সুখের আশায় "অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ" এই নীতিবাদ বুভুক্ষু জনসাধারণকে ভুলাইতে পারে না। কাজেই ভাবীকালের সন্তাতিদের সুখের নীড় রচনা করিবার জন্য বর্তমানে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া সব কিছুই সঞ্চয় করিব—এরূপ নীতির আনুকূল্য জনসহযোগে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। এইদিক হইতে আলোচ্য পরিকল্পনাটির কাঠামোটি বড়ই দুর্বল। ডাঃ রায় আরও দেখাইয়াছেন যে, ৫৬০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইলেও তাহার ফলপ্রাপ্তি পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্ভব ঘটিবে না। অবশ্য কৃষি জলসেচন, নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী (কনসিউমার গুডস্) বাবদ যে ১২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তাহা হইতে কথঞ্চিৎ ফললাভের আশু সম্ভাবনা আছে। কাজেই একদিকে পরিকল্পনানুযায়ী অর্থব্যয় নিবন্ধন লোকের হাতে অর্থাগম হইবে বটে, তবে তাহাদের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন চাহিদা অনুযায়ী হইবে না। সুতরাং জিনিসপত্রের দর বাড়িবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির যাবতীয় কুফল আবার দেখা দিতে পারে।

ইহা ছাড়া অর্থনীতিবিদমণ্ডলী এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মোটামুটি পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অর্থ-সংস্থানের জন্য আরও কর বসাইতে হইবে এবং এই করভার জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ৯ ভাগের মত হইবে। শিল্পোন্নতির জন্য আনুমানিক ৬০০ কোটি টাকার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন। অনুন্নত প্রদেশ-গুলিতে বিশেষ করিয়া যেখানে আদিম অধিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে, যেখানে যানপরিবহনের সুব্যবস্থা নাই এবং জীবন-মান অত্যন্ত নীচু, সেইসব জায়গায় দ্রুত আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রয়োজন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, পল্লীঅঞ্চলে মজুরের দল দারুণ আর্থিক অনটনে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের মত শোষিত সম্প্রদায় বোধ হয় আর নাই। যাহাতে এইসব মজুরদের জন্য উপযুক্ত কর্ম-সংস্থান হয়, সেটা ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ্মণ্ডলী এইসব দল হইতে জাতীয় মজুর শক্তি (ন্যাশনাল লেবার ফোর্স) গঠনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যুদ্ধকালে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত সৈন্যদল গঠনে রাষ্ট্রশক্তি নিয়োজিত হয়, অনুরূপ যত্নসহকারে মজুরশক্তি সংগঠনেও ব্রতী হইতে হইবে। ইহা ছাড়া দেশের শিল্পসম্পদ কয়েকস্থানে কেন্দ্রীভূত না করিয়া যাহাতে চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে পারে, সেই বিষয়ে ভাবিবার অনেক কিছু আছে। তাই দেশের চারিদিকে ছোট ছোট শিল্পনগর প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

সে যাহাই হউক, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা লইয়া যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা সুলক্ষণই বলিতে হইবে। দেশের লোক জানিতে পারিবে যে, কিভাবে পরিকল্পনাটি রচিত হইলে দেশের আর্থিক মান অদূরভবিষ্যতে উন্নত হইতে পারে। পরিকল্পনা-লক্ষ্মীকে মনোমত সাজাইবার জন্য বিভিন্ন ভক্ত নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত কোন উপকরণে ও বেশে তাহাকে সর্বাধিক মানাইবে, সেটা অবশ্য এখনও অস্পষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমরা তাহাকে সুফলদায়িনী সুকল্যাণ মূর্তিরূপেই দেখিতে চাই।

সত্যি বওয়া যাচ্ছে না আর ভার। রগের পাশের দীর্ঘ চুলের গোছা ধ'রে জোরে টান দিল সমর। প্রীতি উঃ করে উঠে নেতিয়ে পড়ল আবার।

প্রীতির নিঃশ্বাসের উষ্ণতা এসে লাগছে সমরের গালে। গরম বটে, মাদকতা আনছে না তবু।

আর তা ছাড়া মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ ভেবে তাকায়নি কোনদিন। মেয়ে ভেবেছে, মানুষ ভেবেছে, মেয়েমানুষ ভাবেনি পরোপকারী সমর।

গাড়ির ঘোড়া দুটো আধমরা। ছুটছে আপ্রাণ। পাথর-পথের পাথারে সাঁতরাচ্ছে যেন। পায়ের দাপে ফুটছে স্ফুলিঙ্গ, কোচোয়ান চাবুক হাঁকড়াচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সমরের মন যত দ্রুত ছুটে যেতে চাইছে তার সঙ্গে কোন মতেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না এই অশ্বিনীতনয়রা। গাড়ির ঘোড়া—পেটে না খেলেও পিঠে সওয়াতেই হয়। কারণ তাদের আঁটঘাট বাঁধা, দু পাশ বাঁধা আঁট করে, মুখে বাঁধা লাগাম, চোখে বাঁধা ঠুলি—

সমর নিজেও আজ যেন সেই আঁটঘাট বাঁধা, চোখে ঠুলি দেওয়া ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মত। বেঁধে মারছে তাকে। নিয়তির কশা কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। সৃষ্টি করছে অদৃশ্য ক্ষত। জ্বালা করছে বুক পিঠ মুখ চোখ।

চারটে চাকা—দুটো বড়ো দুটো ছোটো। ছুটছে পলায়নপর সময়ের পিছনে। ঘোড়া দুটোও দৌড়চ্ছে আয়ুর পিছু। পথের পাথরে আওয়াজ উঠছে খট খট খট খট আর ঘড় ঘড়। আর চারটে চাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সেকেণ্ডের কাঁটা। মিনিটের কাঁটা ঘুরছে গোল হয়ে চক্রাকারে, গাড়ির চাকার মত। আর, আয়ুর বালুঘড়ি থেকে মূল্যবান আয়ু-বালু ঝরে ঝরে পড়ছে শূন্যে—

পিছনের সীটে এমনিতে দুজনের বেশী বসার জায়গা হয় না। তার মধ্যে একজন যদি এমনি নেতিয়ে পড়ে—!

আর এক সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সমরের। এতো রাত হয়নি সেদিন। পথে জনস্রোত যানস্রোত দুইই ছিল। সেদিনও এই প্রীতি এই ঘোড়ার গাড়ি। সেদিনও এমনি প্রীতি অজ্ঞান অচেতন। গাড়ি সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল, হাড়-ভাঙা পায়েও। সেই অচেতন অবস্থাতেই কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছিল প্রীতি। দুই সীটের মধ্যেকার শূন্যতা, উঁচু বাক্স পেতে সমভূম করা হয়েছিল। তবুও।

নিজের প্রাণ হরণের চেষ্টা করেছিল প্রীতি। দোতলার বারান্দা থেকে লাফ মেরে। শূন্য তাকে আশ্রয় দেয়নি আছাড় দিয়েছিল। একেবারে সিমেণ্ট কংক্রীটের উঠোনে। ডান পা-খানা সেই থেকেই থেকেও নেই। শুধু খুঁড়িয়ে নয়, শুধু অসুবিধা হয় তাই নয়, হাঁটতে চলতে প্রায় অক্ষম প্রীতি।

আর আজ? আজও তাই। আজ আর চেষ্টায় শেষরক্ষা হবে না। প্রাণ ফিরে পাওয়া যাবে না আজ!

প্রীতি আফিং খেয়েছে। ছোট বোন বীথির বিয়ের উৎসবের আলোয় এখনও সারাবাড়ি ঝলমল। এক কোণের ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল তাকে। তার চেহারা অপয়া, মূর্তি অলুক্ষণে। বিবাহের উৎসবে অনর্থ ঘটাতে পারে। বিয়ের বাসরে অনর্থক সে। চাই কি বীথির বিয়ে ভেঙেও যেতে পারে!

বিয়ের সমস্ত কাজ প্রায় শেষ। পিঁড়ি সুদ্ধু কনেকে তুলে ধরে মুখচন্দ্রিকা করানো, বরযাত্রীদের ফালতু ইয়ারকিকে সংযত রাখা—দুজায়গায়ই সমরের মাংস-পেশী কাজে লাগে। এবার পরিবেশন। পরিবেশনের এক ফাঁকে প্রীতিকে খাবার দিতে গিয়েছিল সমর। অপয়াদেরও ক্ষুধাবোধ আছে। আর, কথাও ছিল তাই।

গিয়ে দেখে সামনে আফিংএর কৌটো খোলা। ঢলে পড়ে আছে প্রীতি। বেচারী! ছোট বোনের বিয়ের উৎসবের পটভূমিকায়

নজের দূরদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা!

সেদিনও কেউ হাসপাতালে পৌঁছে দিতে আসেনি। পাড়ার আপদে বিপদে সবার আগে খোঁজ পড়ে তাকেই। প্রীতির বাবা নেই, মা থেকেও নেই! তিনি নিজেই সতীন পুত্রদের গলগ্রহ। তাঁর আরও দুটি মেয়ে। তাদের গতিও তো করতে হবে। সন্ধ্যার অল্প পরের ব্যাপার। পুত্রদের একজন বাড়ি ছিল। মুখ ফিরিয়ে ছিল। শুধু সেই দাদাই নয়, মুখ ফিরিয়েছিল গোটা পরিবার। আর, সেই সঙ্গে বুঝিবা ভাগ্যও। হাসপাতালে একটি দিনও কেউ যায়নি খোঁজ নিতে; মনে মনে মৃত্যু কামনা করেছিল সবাই। অন্তত দাদা বৌদিরা। কিন্তু মৃত্যুটাও মানুষের হুকুম মানে না। তারপর সত্যি যখন খোঁড়া হয়ে বেঁচে ফিরে আসতে হল—মৃত্যু কামনাটা তখন হতভাগিনী গর্ভধারিণীও হয়তো না করে পারেন নি।

একমাত্র সমর যেতো হাসপাতালে। আর তার চোখ দিয়ে মা দেখে আসতেন।

প্রাণ ফিরে পেলো প্রীতি, যা সে চায়নি। ফিরে পেলো না পা—যা সে ভাবেনি! একটু পয়সা খরচ করলে পায়ের বিকৃতিটা কমানো যেতো। দাদাদের সে পয়সা ছিল, মন ছিল না।

প্রীতি কিন্তু সম্পূর্ণ দায়ী করত সমরকে। তুমি বাঁচাতে গেলে কেন? কে সেধে ছিল পায়ে ধরে? বাঁচালেই যদি বিকলাঙ্গ করে বাঁচালে কেন? সমর এখনও বোঝে না, এতে তার অপরাধ কোনখানে!

ভালো হয়ে বাড়ি ফিরে এক অদ্ভুত আবদার করেছিল প্রীতি—গোপনে।

—তুমি তো এতো পরের উপকার করে বেড়াও। আমিও তো পরই, করবে আমার একটা উপকার।

সমর বলেছিল—বলো—

প্রীতি বলেছিল—একটু বিষ।

হেসেছিল সমর—এ আর এমন শক্ত কি? সেবার মা'র গাল খেয়ে বৌদিদের গঞ্জনায় লাফ মেরেছিলে দোতলা থেকে। এবার লাফ খাবার উপায় নেই, খাবে বিষ। কিন্তু এবারেও তো কাজ হবে না। বার বার তিন বার। ট্রাই এ্যাণ্ড ট্রাই এগেন—

প্রীতি বলেছিল—দাও না! মরবার সুযোগ দিয়ে বাঁচাও। একবার বাঁচাতে গিয়ে আদ্ধেক মেরে রেখেছ। এইবার মরতে দিয়ে বাঁচাও দিকি। আশীর্বাদ তো করতে পারি না, শুভ কামনা করব অন্তরীক্ষ থেকে—সুন্দরী বৌ হোক!

প্রীতি বোঁটাশুকনো পদ্মফুল। কমনীয়তার সহজ প্রসাধন আর যৌবনের লাবণ্য মুখখানাকে করেছে একটি সদ্য-ফোটা পদ্ম। কিন্তু ঐ মুখই, বা আর কিছুটা—ঐ পর্যন্তই। ছোট ছেলের হাতের পা-ভাঙা পুতুল। অদৃষ্টের অদৃশ্য আঘাত লেগেছে পায়ে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই আর।

ভর দিতে হয় দাঁড়াতে, নির্ভর করতে হয় অন্য কারুর ওপর!

আর একদিন প্রীতি বলেছিল—

—পায়ে বাড়ি মেরে খোঁড়া করে

চালে! রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে এসো, য়সা রোজগার করে আনি। তোমার কি মায়া কিছু নেই? এতো উপকার ক'রে ড়াও--সব ফাঁকি সব ফাঁকা—

আর একদিন—

—আচ্ছা, সত্যি, তোমার একটুও জ্জা করে না, মায়াও হয় না! আমার এই বস্থার জন্য কে দায়ী? তুমি নও? কেন তবে নৈতিক দায়িত্ব থাকবে না তোমার?

সমর বলেছিল—দায়িত্ব? আছে বৈ কি! কে বললে, নেই? কিন্তু তুমি কোনটা 'মীন' করছ।

উত্তরে বলেছিল প্রীতি—বোঝ না? খোকা তুমি?

পাড়ার পরোপকারী সমর। উৎসবে ব্যসনে খোঁজ পড়ে না, কাজে লাগে না। দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবেও ততোটা নয়, যতোটা রাজদ্বারে আর শ্মশানে। শ্মশানের যারা কাছে আর যারা সে পথে চলতি, তাদেরই কাজে লাগে তাদেরই বন্ধু। কোমল হৃদয়বৃত্তির ধার ধারে না সে। নৈতিক দায়িত্ব, ভার নেওয়া! ও সমস্ত বোঝে না সে—

কিন্তু ভার তাকে সত্যি নিতেই হ'ল! নারীদেহ নাকি ফুলের মতো নরম। তা'— হয়তো নরম! কিন্তু ওজন আছে।

কী আশ্চর্য! এই মেয়েটা তার ভাগ্যের সঙ্গে এমন জড়িয়ে আছে কেন? কমলি নেহি ছোড়তা।

প্রীতির ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। বিষ চেয়েছিল সে। এ বিষও তো তারই এনে দেওয়া। জেনে হোক, না জেনে হোক— এ আফিঙ তো তারই গোপন সংগ্রহ। অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশীতে গিঁটে গিঁটে বেদনা হয় প্রীতির। ডাক্তারের পরামর্শ মতে এই আফিং যে তাকেই যোগাতে হ'ত, বাধ্য হয়ে!

আর সেই সঞ্চিত আফিং প্রীতি পাঠিয়ে দিয়েছে পাকস্থলীতে—হৃদয়-যন্ত্রকে স্তব্ধ করে দিতে!

পিচের পথে চক্রনেমি তুলছে বজ্র-নির্ঘোষ—ঘড় ঘড়—

ঘড় ঘড়। মনে হতেই অজানতে কেঁপে উঠল সমরের বুক। না, বুকে ঘড় ঘড়ানি ওঠেনি এখনও। গাঁজলাও বের হচ্ছে না এখনও।

সবে চিৎপুরিয়ার মোড়। আর জি কর আর কতোদূর? যেখানে ডাক্তারেরা ভগবান, ভগবানের মত ভগবানের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবন বিলোয়, পুনর্জীবন! বারে বারে প্রীতিরা মরবার চেষ্টায় অজ্ঞান হয়, ডাক্তারের ওষুধের বিজ্ঞান তাদের বারে বারেই বাঁচায়।

দূর! এই সব আত্মহত্যা ফত্যা বোঝে না সে। আর মেয়েছেলেটেলের কাণ্ড-কারখানাও ভালো লাগে না তার। তাকে বিয়ে করবার ইঙ্গিত দিয়েছিল একদিন প্রীতি। বাউণ্ডুলে সে, ভালো ভাষায় যাকে বলে পরোপকারী। না আছে চাল না আছে চুলো। নেশাভাঙ না ক'রেও শ্মশানচারী। আর তাকে কি না! প্রীতি মেয়েটা যেন কি? এতো লোক থাকতে তাকে ধরেই বা টানাটানি কেন?
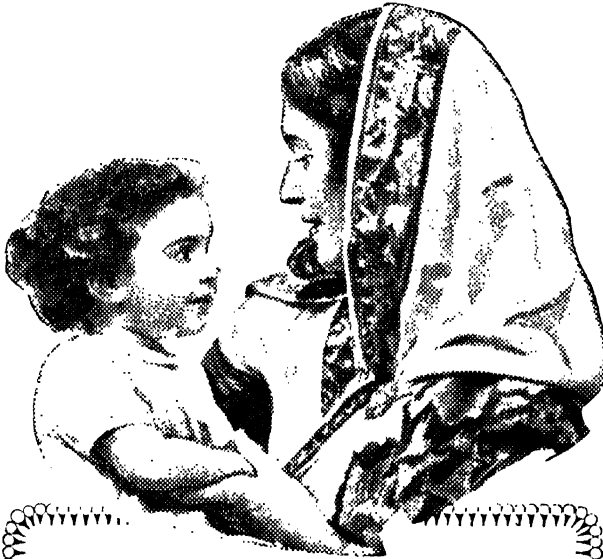
অনেক বুঝিয়েছে সমর। বুঝিয়েছে র্তমান সমাজ ব্যবস্থা। আগামী সমাজের ভয়ংকর চেহারা। কেউ আর বিশেষ রকম হেন করবে না, যার চলতি নাম বিবাহ। স্ত্রী আর পুরুষ—প্রত্যেককে অর্থোপার্জন করে খেতে হবে।

বীথির বিবাহ স্থির হয়ে গেলে জজ্ঞেস করেছিল প্রীতি।

—বীথি আমার ছোট। ওর তো গতি হ'ল! আমার কি হবে?

—বিয়েই কি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য? বয়ের চেয়ে বড়ো কি আর কিছুই নেই? —উত্তর দিয়েছিল সমর।

—যাদের পা নেই, যাদের অন্যের পায়ে চলবার জন্য পায়ে পড়তে হয়, তাদের—

কথাটা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে সূত্র-টুকু তুলে নিয়ে বলেছিল সমর—বাংলা দেশের কোন মেয়েরই পা নেই। এটা নতুন কথা নয়।

—আমি কি করব, বলতে পারো? কি করে আমার দিন চলবে? ব'লে দাওনা —একটা কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা দাও না।

ভাগ্যিস প্রতিপ্রশ্ন করেনি প্রীতি। ভাগ্যিস জানতে চায়নি কী সে শিক্ষা। উৎসাহ ছিল না তার জানবার—

এক ফোঁটা ভালবাসা দিতে পারল না সমর কোনদিন। এই ক'টা বছর ধ'রে। আর আজ তাকেই নিষ্ঠুর নিপীড়ন করছে সে। চিমটি কাটছে, চুল টেনে দিচ্ছে কানের পাশে—

এ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তে দিলে চলবে না—সে হবে কালঘুম। সে ঘুম ভাঙবে না আর কোনদিন। পাকস্থলী থেকে অধঃস্থ হবার আগে রক্তের সঙ্গে মিশবার সুযোগ না দিয়ে সমস্তটা বিষ বমন করাতে হবে—স্টম্যাক পাম্প দিয়ে—

আর ' খানিকক্ষণ—দশ পনেরোটা মিনিট। মৃত্যুকে পরাজিত করবার অনেক শাস্ত্র আছে, ডাক্তারদের ব্যাগ ভর্তি—

বাড়িতে ডাক্তার ডেকে না নিয়ে প্রকাশ্য হাসপাতালে যাওয়া যে বিপদের! এ কথাটা মনে হয়নি এতোক্ষণ! এ যে আত্মহত্যার চেষ্টার কেস— । মেয়েটা ভারি বিপদে ফেললে তো!

ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি। চাবুকের আওয়াজ হয় আর আটটা অশ্ব খুর একটু দ্রুত হয়ে ওঠে। আবার ঝিমিয়ে আসে আওয়াজ—

টালার পোল। আর জি কর দেরি নেই আর।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সমরের। হাসপাতালের পিছনে নীলমণি মিত্র লেনে ছোট্ট একজন ডাক্তারবাবু পি কে সেনের কথা। তাদের ব্যায়ামাগার আর অন্য অন্য কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার। তাঁরই কাছে যাওয়া যাক।

আর জি করের গেট দিয়ে ঢুকতে যেতেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল সমর—বাঁয়া-গলি—

দু'এক পা গিয়েই ডাঃ সেনের বাড়ি।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই বেরিয়ে এলেন ডাঃ সেন। চেম্বার থেকে সবে উঠছিলেন তখন।

—কে?

—আমি। আমি সমর দত্ত। দরজা খুলে বেরোতে যাচ্ছিল, প্রীতি তার গায়ে সম্পূর্ণ ভর দিয়ে আছে মনে ছিল না বলেই। গায়ের ভর লাগতে মুখ বাড়িয়ে বলল—

—শুনুন, একটু এগিয়ে আসুন—

এগিয়ে এলেন ডাক্তার। কি খবর? রুগী নাকি সঙ্গে? এতো রাত্রে? কি হয়েছে?

সমরকে সচকিত অবাক করে দিয়ে সোজা উঠে বসল প্রীতি।

হেসে বলল—কিচ্ছু হয়নি ডাক্তারবাবু। সামান্য মাথাধরা। উনি এতো অল্পেই ঘাবড়ে যান। একটা এ্যানাসিন খেলেই মিটে যেতো। তা নয়, এতো রাত্রে ডাক্তারবাবুকে বিরক্ত করা। মনে কিছু করবেন না ডাক্তারবাবু, নমস্কার—

গাড়ির দরজা ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু যেতে যেতে বললেন,

—বিয়েতে নেমন্তন্নও করলেন না সমরবাবু!

প্রীতি মুখ বাড়িয়ে কোচম্যানকে হুকুম করলে—গাড়ি ফেরাও—

গাড়ি চলেছে।

সমর বললে গম্ভীরভাবে—ঠিকানা বলে দাও। নাগেরবাজারই যাক—

—বেরিয়েছি তোমার কাঁধে চেপে। ফেরবার জন্যে?

—পরিবেশনই করলাম শুধু। খাওয়া জোটে নি!

—একদল মূর্খ আছে, সারাজীবনই পরিবেশন করে মরে। পাত পেতে বসবার সময় পায় না।

—আজ রাত্তিরটা থেকে এলেই হোতো। বলো তো এতো রাত্রে—

—সে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ফিরে গেলেও খুলবে না। নতুন দরজা খোলো আজ রাত্রে—

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করল—কাঁহা জায়েগা! ঘুমার লে চলে'?

সমর জিজ্ঞেস করল প্রীতিকে—বলো ঠিকানা।

প্রীতি বলল—জানি নে তো। আমার জানবার কথা তো নয়। তোমার ওপর সারা রাস্তা ভর দিয়ে এসেছি, নির্ভর করে এসেছি তোমার ওপর। ঘর ছেড়েছি, তোমার কাঁধে চেপে। ঠিকানা বলব আমি?

—আচ্ছা, আচ্ছা আমিই বলছি।— সমর উত্তর দিল।

কোচম্যানকে নির্দেশ দিল—ভবানীপুর, জলদি হাঁকাও।

প্রীতি আপন মনেই বলে যাচ্ছিল, শ্রোতা শুনল কিনা জানার দরকার নেই। উত্তরের অপেক্ষাও নেই, প্রয়োজনও নেই তার!

—জোর করে বেরিয়ে এলাম, দরজা খুলল তাই, নইলে কি এই বন্ধ দরজা খুলত! তোমার কাঁধে চেপেছি, তোমার নিতান্ত অনিচ্ছায়। নইলে কি তুমি জোয়াল পরতে কোনদিন? আফিঙের কৌটো সামনে না খুললে বেরোন চলত না তোমার সাথে। পা ভাঙা—শরীরের ভার দিয়েছিলাম, ভরও। তোমার ওপর নির্ভর করতে পেরেছি বলেই তো হাসপাতাল থেকে ফিরেছিলাম। নির্ভর করা যায় না, মন না দিলে। নিজের পা রেখে এলাম হাসপাতালে। তাই তো তোমার ঐ পা দু'খানা আমার বেডের পাশে যেতো। নিজের পা নেই। ঐ দুটো পায়েই বাড়ি ফিরলাম; ঐ দুখানা পায়েই পড়লাম কতবার। চোখের জলে ভিজল না পা! হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলে—পা'র তলে ঠাঁই পেলাম।

নির্দেশ দিয়ে দিয়ে ভবানীপুরের একটা গলিতে গাড়ি ঢোকাল সমর। গলির মোড়ে পানের দোকানে তখন এগারোটা বাজছিল।

একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড 'নারীকল্যাণ আশ্রম' একতলার ছাত থেকে ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দেখছে।

কড়া নাড়তেই দ্বারোয়ান দরজা খুলে দিল। সমরকে দেখেই সেলাম ঠুকে স'রে দাঁড়াল দ্বারোয়ান। বোঝা গেল, সমরকে বিলক্ষণ চেনে সে, সমীহও করে।

সমর বলল—গৌরী মায়িকো বোলানা—

ততোক্ষণে ধরাধরি করে প্রীতিকে নামিয়ে ফেলেছে সমর।

নামতে নামতে সাইনবোর্ডের দিকে নজর পড়ায় জিজ্ঞেস করল প্রীতি—এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

সমর বলল—কেন, তোমার ঠিকানায়।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ৩ ॥

শীতের রাত; কনকনে হাড় কাঁপানো হাওয়া। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের নীচে ঢুকব ভাবছি এমন সময় দরজার কড়া খট্ খট্ ক'রে নড়ে উঠ্‌লো। বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেখি আমার এক পুরনো রুগী আর অচেনা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

বল্‌লাম—ব্যাপার কি?

পুরনো রুগীটি ঐ ভদ্রলোককে দেখিয়ে বল্‌লেন—এঁর ছেলের আজ তিন-দিন থেকে সর্দিজ্বর; হঠাৎ খুব বেড়েছে, তাই আপনাকে নিতে এসেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—কত জ্বর?

ভদ্রলোক বল্‌লেন—১০০° থেকে আজ হঠাৎ ১০৪° উঠেছে, কেমন যেন ছট্‌ফট্ করছে।

বল্‌লাম—দিনে এলেই ভাল হ'ত, দেখবার সুবিধে হ'ত। ছেলের কত বয়স?

ভদ্রলোক বল্‌লেন—তিন বছর। বাচ্চাদের সর্দিজ্বর তো লেগেই থাকে, হোমিওপ্যাথী অষুধ খায়, সেরে যায়। এবার বড্ড বাড়াবাড়ি দেখছি, এত জ্বর আগে কখনও হয়নি, খুব ছট্‌ফট্ করছে। যদি একটু তাড়াতাড়ি করে আসেন, গিন্নী বড্ড উতলা; রিক্‌শা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

লেপের তলায় ঢুকব ভেবেছিলাম, আবার বাইরে বেরুতে হ'ল। পোশাক পরে রিক্‌শায় গিয়ে উঠ্‌লাম। কাছেই বাড়ি। ভিতরে গিয়ে দেখি, ছেলেটির গায় লেপ চাপা, জ্বরের ঘোরে বার বার হাত দুখানি বইরে বার করছে, ছট্‌ফট্ করছে। মা পাশে বসে বার বার ঐ হাত লেপের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। পাশেই একটা হারিকেন লণ্ঠন, তার ওপর ছোট্ট এলুমিনিয়মের বাটিতে সরষের তেল আর কালজিরা গরম হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঐ বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে একটু তেল নিয়ে মা ঐ ছেলের বুকে পিঠে মালিশ করছেন। দরজা জানালা বন্ধ।

বল্‌লাম—এই বন্ধ ঘরে আমারই দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাচ্চার তো আরও কষ্ট হবার কথা। একটা জানালা অন্তত খুলে দিন।

শুনে ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন। ইতস্তত ক'রে বল্‌লেন—কিন্তু এই শীতে জানালা খুললে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে না?

একটু হেসে বল্‌লম—নিউমোনিয়ায় এই বন্ধ ঘরে থাকলে আরও খারাপ হবে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে।

লেপ উঠিয়ে দেখি ছেলেটির পায়ে মোজা, গায়ে উলের হাতওয়ালা কোট, তার নীচে উলের সোয়েটার, তার নীচে সুতির একটা জামা। জামা তুলে বুক পরীক্ষা করেই বুঝলাম নিউমোনিয়া; এত গরম জামা পরিয়ে দরজা জানালায় খিল দিয়ে ঠাণ্ডা লাগা বন্ধ করেও যাকে ঠেকানো যায়নি।

বল্‌লাম—বুকে একটু সর্দি বসেছে, নিউমোনিয়া ব'লেই মনে হচ্ছে।

ছেলের মা বল্‌লেন—প্রথম দিনই আমি বলেছি, এবার জ্বরটা আমার ভাল লাগছে না, তা সে কথা উনি কানেই তুল্‌লেন না। এখন কি হবে?

বল্‌লাম—ভয় পাবার কি আছে? পেনিসিলিন দিচ্ছি, সেরে যাবে। ব'লে ব্যাগ থেকে একটা চার লাখ ইউনিটের পেনিসিলিন বার করলাম। সিরিঞ্জ এলকোহল দিয়ে স্টেরিলাইজ ক'রে শুকোতে শুকোতে মনে পড়ল, প্রথম যখন পেনিসিলিন দিই তখন কত হাঙ্গামাই না ছিল! শোনা গেল, পেনিসিলিন দিতে হ'লে ইথার দিয়ে সিরিঞ্জ স্টেরিলাইজ ক'রে নিতে হয়, এলকোহল দিলে চলে না। এই চল্‌লো কতদিন। মেয়েরা অনেকে এ গন্ধ সইতে পারেন না, গা গুলিয়ে ওঠে; কিন্তু উপায় কি? একটা বাচ্চাকে একবার পাঁচ দিন পাঁচ রাতি পেনিসিলিন দিতে হ'ল। ডাক্তার দেখ্‌লেই ভীষণ কাঁদে, হাত পা ছোঁড়ে। তাই ঠিক হ'ল নীচে থেকে সিরিঞ্জ রেডী ক'রে ওপরে উঠেই চট্ ক'রে ফুঁড়ে দেব। একবার দেবার পর নীচে এসে আবার যখন সিরিঞ্জে ইথার ঢেলেছি, শুনি ওপরে বাচ্চার চিৎকার। সেই থেকে ইথারের গন্ধ পেলেই ও চ্যাঁচাতো; ভাবতো আবার বুঝি ওকে ফোঁড়া হবে।

ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটারের এম্‌পুল থেকে এক সি সি জল নিয়ে পেনিসিলিন গুলে ইন্‌জেক্‌শন করে দিলাম। বল্‌লাম, বারো ঘণ্টার মধ্যে আর ইন্‌জেকশন দেবার দরকার হবে না। কাল সকালে একবার খবর দেবেন।

ছেলের মা বল্‌লেন—জ্বর যদি বাড়ে তাহ'লেও সকালে ইন্‌জেকশন দেবেন না?

একটু হেসে বল্‌লাম—জ্বর বাড়বে না, কোন ভয় নেই। মালিশটা বন্ধ করে দিন, মিশ্রির জল বেশী ক'রে থাক, দেখবেন কাল জ্বর অনেক কমে যাবে।

মনে পড়ল পেনিসিলিন দিতে হ'লে আগে কত কষ্টই না সইতে হ'ত। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিন ঘণ্টা পর পর ইন্‌জেক-শন দিতে হবে, নইলে কাজ হবে না। দেহে ওষুধের ধারা ছিঁড়ে যাবে, বীজাণু ঠিক মত ধ্বংস হবে না। দিনে-রাতে দেড় ঘণ্টা কি দু' ঘণ্টার বিশ্রামও এক সংগে পাওয়া যেত না। ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বাড়ি এসেই আবার এলার্ম বেজে উঠ্‌তো, শুতে না শুতেই আবার উঠে ছুট্‌তে হ'ত। তখন এক লাখ ইউনিট পেনি-সিলিন দশ সি সি জলে গুলে রেফ্রি-জারেটার অথবা ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে রাখতে হ'ত, নইলে ওষুধ নষ্ট হয়ে যেত। তিন ঘণ্টা অন্তর এক কি দেড় সি সি ক'রে ইন্‌জেকশন দেওয়া হ'ত। এখন ঝামেলা কত কম, দিনে একটা ক'রে ইন্‌জেকশন, বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত। আর দামও কত সস্তা! আগে এক লাখ ইউনিটেরই দাম দেখেছি ২০।২৫ টাকা, এখন চার লাখ ইউনিট দশ আনা।

পেনিসিলিন দিয়ে রিক্‌শায় চড়ে শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করতে করতে বাড়ি ফিরে এলাম। আগে নিউমোনিয়া দেখলে মনে একটা উদ্বেগ থাক্‌তো, বাঁচবে কিনা সন্দেহ হ'ত। আজকাল আর সে ভয় নেই; নিউমোনিয়াতে বড় একটা কেউ মরে না। বরং এসব কেস হাতে এলেই ভাল, চট্‌ করে ওষুধের ফল দেখানো যায়। রুগীরা খুশি হয়, ডাক্তারের মান বাড়ে।

পরদিন সকালে খবর পেলাম জ্বর অনেক কমেছে। দুপুরে গিয়ে দেখি, সেই ছট্‌ফট্‌ ভাব আর নেই, বেশ খাচ্ছে। হরলিক্‌স, দুধ আর মিশ্রির জল বেশী করে খাওয়াতে বলে আর একটা ইনজেক্‌শন দিয়ে চলে এলাম। বল্‌লাম—আজই জ্বর ছেড়ে যাবে এখন। কিছু ভাববেন না।

ভাবলাম এই বছর বারো তের আগেও পেনিসিলিনের নাম আমরা শুনিনি। যুদ্ধের সময় যখন চার্চিল সাহেবের নিউমোনিয়া হ'ল, শুনলাম এম বি ট্যাবলেট আর পেনিসিলিনে সাত দিনেই সেরে উঠে আবার তিনি যুদ্ধের কাজে লেগে গেছেন। এম বি ট্যাবলেটের তখন এখানে খুব চল, গাঁয়ে পর্যন্ত পৌঁচেছে। নিউমোনিয়া তাতে সারত বটে কিন্তু শরীর খুব দুর্বল হয়ে যেত—১৫।২০ দিন লাগত তা ঠিক হ'তে।

পরদিন ছেলের বাবা এসে খুশির উচ্ছ্বাসে যেন ফেটে পড়লেন। বল্‌লেন—ডাক্তারবাবু, কাল রাত্রেই জ্বর ছেড়ে গেছে। এখন ভাত খাবার জন্য বায়না ধরেছে, কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না।

বল্‌লাম—দিন খেতে ভাত, মাছ, দৈ, সন্দেশ; তাহলে পারবেন তো সামলাতে? শুনে ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুখে কথা বেরুলো না, আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

সত্যি অবাক হবারই কথা। নিউমোনিয়াতে যে দু' দিনেই জ্বর ছাড়ে আর জ্বর ছাড়লেই যে এসব খাওয়ানো যায়, তা আমরাই কি আগে জানতাম? ১০।১৫ বছরের মধ্যে চিকিৎসার ধারাটাই কি বদলালো কম? পেনিসিলিনের আগে ছিল সালফাডায়াজিন, সিবাজল, এম বি ট্যাবলেট; এইসব শক্তিশালী সাল্‌ফা ড্রাগ। তারও আগে ছিল প্রন্‌টোসিল; সেই প্রথম সাল্‌ফা ড্রাগ, রক্তের সঙ্গে মিশে বীজাণু ধ্বংসকারী প্রথম ওষুধ, জার্মানীর আবিষ্কার। আবিষ্কারক নোবেল প্রাইজ পেলেন; কিন্তু ইহুদীর দান ব'লে হিট্‌লার সে পুরস্কার নিতে দিলেন না।

প্রন্‌টোসিল তখন সবে এখানে এসেছে; হাসপাতালে নিউমোনিয়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুদ্ধের বছর দুই আগের এক নভেম্বর মাস; খুব শীত। আট মাস বয়সে আমার ছোট ছেলের একদিন জ্বর হ'ল। যে শিশু-চিকিৎসকের ওপর আমার স্ত্রীর তখন খুব আস্থা, তিনি এসে দেখে বলে গেলেন: বি, কোলাই। তিন দিনের মধ্যেই জ্বর বেড়ে ১০৫° উঠে গেল, বুকে ঘড় ঘড় আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ভদ্রলোকের তখন উঠ্‌তি প্র্যাকটিস্‌, খুব ব্যস্ত; খবর পেয়েই ছুটে আসতে পারলেন না; বল্‌লেন হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দাও। শুনে আমার স্ত্রী ক্ষেপে গেলেন, আমার বাড়ির বিনা পয়সার চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করলেন। সেই থেকে নিত্য দেখছি, ডাক্তারের চাকরি ক্ষণভঙ্গুর! এই আছে, এই নাই!

ভাগ্যক্রমে এই সংকটকালে আমার এক বন্ধু সদ্য পাশ করা ডাক্তার সেদিন হঠাৎ আড্ডা দিতে এসে পড়লেন। আমার এই বিপদের কথা শুনে ওপরে উঠে ছেলেকে দেখে বল্লেন—

বি, কোলাই-এ কখনও এরকম হয়? এটা নিউমোনিয়া।

ব'লে চিকিৎসার ভার নিজে নিয়ে সকাল বিকাল দেখে যেতে লাগলেন। কি কুক্ষণে যে আমার বাড়ির চিকিৎসার বোঝা সেদিন তিনি যেচে নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন, আজও তা ঝেড়ে ফেল্‌তে পারেন নি। বিনা পয়সার চাকরিটি তাঁর আজও তেমনি অটুট আছে।

এই বন্ধুটির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, একজন বড় কাউকে দেখিয়ে রাখা ভাল। আমাদের কলেজে যিনি মেডিসিন পড়াতেন তাঁকে এনে দেখালাম। তিনি দেখে বল্‌লেন—নিউমোনিয়া, প্রন্‌টোসিল দাও।

প্রন্‌টোসিলে কী খারাপ হয় তা তখন আমাদের জানা। বন্ধুটি কিছুতেই রাজী হ'লেন না। একে ছেলে জল কম খাচ্ছে, ইউরিন ভাল হচ্ছে না; তার ওপর প্রন্‌টোসিল দিতে আমাদের সাহস হ'ল না।

জ্বর সমানে ১০৫° চলছে, জ্ঞান নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিন আট আউন্সের বেশী কিছুতেই সারাদিনে খাওয়ানো গেল না। ফলে ইউরিন বন্ধ হয় গেল। বন্ধুটি দেখে বলে গেলেন, আজ রাতের মধ্যে কুড়ি পঁচিশ আউন্স গ্লুকোজের জল খাওয়াতে না পারলে কি হয় বলা কঠিন। আট মাসের শিশু, জ্ঞান নেই, ফিডিং বট্‌ল্‌ মুখে দিলে টানে না। এত জল কি করে খাওয়াব?

মনে পড়ে সেদিনের সেই শীতের রাত্রি। চামচে করে গ্লুকোজের জল একটু একটু ক'রে ছেলের মুখে দিচ্ছি। একবার ঢোঁক গিললে আবার এক চামচ দিচ্ছি। সারাদিন খেটে খুটে আমার স্ত্রী ছেলের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে, আমার বন্ধু অমন

যত্ন ক'রে দু'বেলা এসে দেখে যাচ্ছেন, আমি সারাদিন পাশে আছি; দেখে তিনি ভরসা পেয়েছেন, নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ক্লান্ত ঘুমন্ত মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আমার চোখে ঘুম নেই। বেহুঁশ ছেলের মুখে একটু একটু ক'রে গ্লুকোজের জল দিচ্ছি আর নাড়ী ও নিঃশ্বাসের গতি গুনছি। নখের রঙ নীল হচ্ছে কিনা বার বার টর্চ দিয়ে দেখছি। এই গভীর রাত্রে অতর্কিতে কখন মৃত্যু এসে দেখা দেয় সেই আতংক বুকে নিয়ে খাটের পাশে আলো জেবলে বসে আছি।

ভোর চারটে নাগাদ ইউরিন হ'ল। যে কুড়ি আউন্স জলে গ্লুকোজ গুলে রেখে-ছিলাম ভোর হবার আগেই দেখলাম শেষ হয়ে গেল। আবার ফিডিং বট্‌লে খেতে শুরু করল। ক্রাইসিস্ কেটে গেল। কয়েকদিন পরে ছেলে চোখ মেলে চাইল; জ্বর ছেড়ে গেল।

আর আজ দুটো পেনিসিলিন দিয়েই আমার এই রুগীর জ্বর ছেড়ে গেছে, ভাত খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে। ভাত খেতে দিন, বলায় ছেলের বাবা হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। ভদ্রলোককে ভরসা দিয়ে বুঝিয়ে বল্‌লাম—জ্বর যখন ছেড়ে গেছে আর পেট যখন ভাল আছে তখন একটু গলা ভাত আর মাছ সেদ্ধ দিতে পারেন, কোন ভয় নেই। বিকেলে একটু মিষ্টি দই আর একটা সন্দেশ দেবেন। আমি গিয়ে আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আসব।

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন। হাসপাতালের কাজ সেরে দুপুরবেলা ইন্‌জেক্‌শন দিতে এ'দের বাড়ি গিয়ে দেখি ছেলেটি উঠে বসে বিছানায় খেলা করছে। মা পাশে শুয়ে বই পড়ছেন। আমি যেতেই মা তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লেন, ছেলেটি মার কোলে আশ্রয় নিল। বললুম—এই ত' ছেলে দিব্বি উঠে বসেছে। ভাত খেয়েছে?

মা বল্‌লেন—আজ সবে জ্বর ছেড়েছে আজই ভাত খাবে কি? আজ দুধ বার্লি দিয়েছি। উনি বল্‌ছিলেন বটে, আপনি নাকি গলা ভাত, মাছ সেদ্ধ, দই আর সন্দেশ খাওয়াতে বলেছেন। শুনে পিত্তি জবলে গেল। কি শুনতে কি শুনে এসেছেন। ও'র কাণ্ডই এ-রকম। কোন
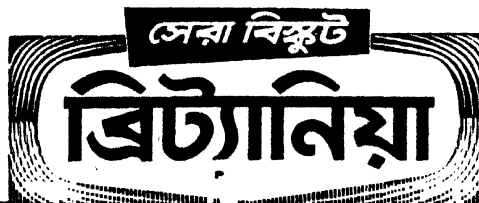
কিছুতে যদি খেয়াল থাকে। নইলে প্রথম যেদিন খোকার জ্বর হ'ল সেদিনই বলেছিলাম ডাক্তার ডাকতে, তা উনি ভুলেই গেলেন; পরের দিনও বলে বলে ওঁকে পাঠাতে পারলাম না। শেষকালে সেই গেলেন ছুটে যখন জ্বরে ছেলে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ল। আগে যদি যেতেন তাহ'লে কখনও এত বাড়াবাড়ি হয়?

মনে পড়ল আমার মার কথা। মাও ঠিক এমনি কথা একদিন বাবাকে বলেছিলেন। সেদিনও ঠিক এমনি কোলে শুয়ে ছিল আমার ছোট্ট ছ' মাসের ভাই মাখন। তুল্‌তুলে দেহ, ধব্‌ধবে রঙ নিউমোনিয়া হয়ে কেমন নিমেষে নীল হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তখন আমার কতই বা

বয়েস, বছর দশেক হয়ত বা। কিন্তু মৃত্যুর সেই হিমশীতল পরশ, সেই সাংঘাতিক ভয়াল রূপ, জীবনের সেই প্রথম অভিজ্ঞতা মনে হলে বুক এখনও তেমনি কেঁপে ওঠে।

তখন আমরা পূর্ব পাকিস্থানের এক গাঁয়ে নিজের জন্মভূমিতে থাকি। বাবা গাঁয়ের হাসপাতালের সরকারী ডাক্তার। হাসপাতাল আর প্র্যাক্‌টিস্‌ নিয়ে তিনি সারাদিন ব্যস্ত, ঘরের রুগী দেখার সময় কোথা? এইটেই মার অভিযোগ।

একদিন সকালে মার কান্না শুনে ঘুম ভেঙে শুনলাম মার এই নালিশ! বললেন আর দু'দিন আগেও বুকটা পরীক্ষা করে যদি একটা ওষুধ দিতে তাহ'লে আর এ সর্বনাশ হ'ত না। নিউমোনিয়াতে এসে দাঁড়াত না। এত বাড়াবাড়ি হ'ত না।

বাবা কিছু না ব'লে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অবসরপ্রাপ্ত এক প্রবীণ চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে নাড়ী দেখে বুক পরীক্ষা করে বাবাকে নিয়ে বাইরে গেলেন। তারপর শুরু হ'ল চিকিৎসা।

বাবা হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন আনিয়ে যন্ত্রটা ঠিক করে বসিয়ে দিলেন। বড়রা পালা ক'রে নাকের কাছে ফানেল ধ'রে বসে রইল। ঘড়ি ধ'রে ওষুধ পথ্য চলতে লাগল।

মনে পড়ল বাবার সেই বিষণ্ণ অপরাধী মুখ; মনে পড়ল মার কান্না। হাসপাতালের অক্সিজেনের স্টক্‌ ফুরিয়ে এসেছে; আজ রাতটা কাটে কিনা সন্দেহ। বিকেলের গাড়িতেই সদরে লোক পাঠানো হ'ল, রাত্রে কিনে ভোরের আগেই পেঁছে যাবে। আগের দিন কলকাতায় টেলিগ্রাম করা হয়েছে, কালই হয়ত পার্সেল এসে পড়বে।

জেঠামশাই কবিরাজ। তিসি বেটে গরম ক'রে বুকে পিঠে পুলটিসের ব্যবস্থা করলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে দেওয়া হ'ল। মকরধ্বজ, তুলসীপাতা, আদার রস আর মধুতে আধ ঘণ্টা ধ'রে খলে মেড়ে খাওয়ান হ'ল। বিকেলের দিকে তিসির বদলে পেঁয়াজ বেটে পুলটিস্‌ দেওয়া হ'ল। আমাদের এক আত্মীয় হোমিওপ্যাথ পালসেটিলা খাওয়ালেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সকালবেলা অক্সিজেন ফুরিয়ে গেল, সদর থেকে তখনও লোক ফিরল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

মনে পড়ল ক্লাসে যখন নিউমোনিয়ার চিকিৎসা পড়ানো হয় প্রফেসর বলতেন—নিউমোনিয়ার কোন অষুধ নেই; কিন্তু চিকিৎসা আছে। চিকিৎসা হ'ল রুগীর কষ্ট দূর করা। নিঃশ্বাসের কষ্টে রক্ত নীল হতে দেখলে অক্সিজেন দাও। প্রচুর গ্লুকোজের জল খাওয়াও একটু একটু ব্রাণ্ডি দিয়ে। যত বেশী জল খাবে রুগী তত ভাল থাকবে। ওষুধ কিছু নেই। মকরধ্বজ, পালসেটিলা, পুলটিস্‌, এণ্টিফ্লোজেস্টিন এ সবে কিছু হয় না। যারা বাঁচবার তারা অমনি বাঁচে, যারা মরবার তারা মরে।

আজ আমার তিন বছরের রুগীটির দুটো পেনিসিলিন নিয়েই নিউমোনিয়া জ্বর ছেড়ে গেছে, উঠে ব'সে খেলছে। এখন আমরা জানি, নিউমোনিয়ার ওষুধ আছে কিন্তু যে প্রফেসর বলেছিলেন ওষুধ নেই তিনি দেখে যেতে পারেন নি; স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কারের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমার এই বাচ্চা রুগীটিকে আবার একটা পেনিসিলিন দিয়ে রুগীর মাকে বললাম—আর জ্বর হবে বলে মনে হয় না; নির্ভয়ে ভাত দিতে পারেন।

রুগীর মা ভরসা পেলেন না; ভাত খেলেই আবার হয়ত জ্বর আসবে এই ভয়ে রাজী হলেন না। স্বামীর গাফিলতিতে একবার ছেলের বাড়াবাড়ি হয়েছে, ভাত খাইয়ে আবার যদি হয়?

মনে যে ধারণা একবার বদ্ধমূল হয়ে থাকে, একদিনে এক কথায় কখনও তা যায় কি? দীর্ঘদিনেও দেখি যায় না। কবে আমার ছোট্ট ভাইটির মৃত্যু হয়েছে, চিকিৎসার কত অদল বদল হয়েছে তবু মার কিন্তু এখনও ধারণাঃ বাবা যদি দু'দিন আগেও একটা ওষুধ দিতেন তাহ'লে আর নিউমোনিয়া হ'ত না; খোকন বেঁচে যেত।

পাণ্ডা প্রকরণ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

মনে করুন কাশী হইতে এলাহাবাদের একটা গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন, আপনাদের সঙ্গে মালপত্র লটপট্‌ও বেশ কিছু আছে, আর সঙ্গী বিভিন্ন বয়সের অন্যান্য কেহ থাকুক না কেন, আপনার বৃদ্ধা মা রহিয়াছেন। এই অবস্থায় মাঝের একটা স্টেশনে যখন গাড়িটা থামিল আপনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন, একটি মধ্য বয়সের হৃষ্টপুষ্ট লোক, পরনের ধুতি-পাঞ্জাবি খুব ফিটফাট না হইলেও খুব একটা ময়লা চিলে নয়, গাড়ির জানালা দিয়া মুখ গলাইয়া আপনাকে, আপনার সঙ্গীদের, আপনার মালপত্রগুলি এক ঝলকে একবার দেখিয়া লইল এবং তারপরে গাড়িটি ছাড়িবার সময়ে পা-দানিতে পা রাখিয়া গাড়ির সঙ্গে খানিকক্ষণ ঝুলিয়া চলিল—আস্তে আস্তে গাড়ির কামরার দুয়ারটি খুলিয়া লোকটি দেখিলেন দিব্য ভিতরে ঢুকিয়া একপাশের একটি বেঞ্চের কোনও মতে একধারে একটু স্থান করিয়া লইল। আপনার কামরায় যদি আরও অন্য যথেষ্ট লোক না থাকে, তবে এই আগন্তুক লোকটি সম্বন্ধে আপনি কি ভাবিতেছেন? ডাকাতের দলের ছদ্মবেশী কেহ মনে করিয়া ভয় পাইতেছেন কি? সি. আই. ডি বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন কি?

মনে করুন এখন আপনি এলাহাবাদের স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, আপনি মালপত্র লইয়া গাড়ি হইতে নামিবার পূর্বেই দেখিতে পাইলেন, সেই লোকটি অতি তৎপরতার সহিত নামিয়া গিয়া কুলি-মজুর ডাকিয়া আপনার মালপত্র নামাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, আপনার বুড়ী মাকে সে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এমন যত্নের সঙ্গে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিতেছে যে, দেখিয়া আপনার মনে হইতেছে জন্মে-জন্মান্তরে সে-ই সেই 'বুড়ীমা'র আসল সন্তান—আপনি একটি নকল কুশ-পুত্তলিকা মাত্র। তারপরে আপনি যখন লোকজন মালপত্র লইয়া কোনও আস্তানার দিকে রওনা হইলেন তখনও লক্ষ্য করিলেন, লোকটি আপনার সঙ্গ ছাড়ে নাই, আপনার ট্যাক্সির মাডগার্ডের উপরে দাঁড়াইয়া অথবা আপনার ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানের পাশে বসিয়া সে ছায়ার ন্যায় আপনার অনুসরণ করিতেছে। এখনও যদি এই রহস্য-উদ্ঘাটনে সমর্থ না হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনাকে অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই যে, এই লোকটি কোনও তীর্থের একটি পাণ্ডা।

পূর্বে ইহাদের ঠিক এই জাতীয় একটি 'অধরা' ভাব ছিল না, নামাবলী গায় দিয়া, হলুদ-পাগড়ি মাথায় দিয়া, পাঁচ রকমের ধর্মকথা বলিয়া, শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া, একগাদা ভুল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্তব্য তীর্থস্থানের বহুপূর্ব হইতেই রীতিমতন একটা সোরগোল বাধাইয়া দিত। গায় পড়িয়া আসিয়া 'বাবু'র নামটি জানিবার চেষ্টা করিত, কোথায় নিবাস, কোথায় যাওয়া হইবে, তীর্থে কি কি কাজ হইবে, পাণ্ডার নাম জানা আছে কি-না, জানা না থাকিলে সর্বাগ্রে কোন্ পাণ্ডার নামটি স্মরণীয়, কেন এবং কিভাবে সে বরণীয়—সব কথারই বিস্তারিত আলোচনা হইত এবং মুখ্যত সেটা একতরফা। কিন্তু এখন তাহারা বুঝিয়া গিয়াছে যে, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে এ-বিষয়ে যে-সকল কলা-কৌশল মোক্ষমভাবে ফলপ্রসূ ছিল বিংশ শতাব্দীতে তাহারা অচল হইয়া গিয়াছে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কৌশল দ্বিতীয়ার্ধে সর্বাংশে ভোঁতা হইয়া উঠিয়াছে। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে কলা-কৌশলেরও বিবর্তনে আজ এই প্রচ্ছন্ন অধরা-ভাব! কলিকালে অধমর্ণ যেরূপ কায়মনোবাক্যে উত্তমর্ণকে এড়াইয়া চলিতে চায়, প্রদোষ-লগ্নে পড়ুয়া যেরূপ গৃহশিক্ষককে এড়াইয়া চলিতে চায়, পাল-পার্বণে শিষ্য যেরূপ গুরুদেবের চরণ-ধূলি এড়াইয়া চলিতে চায়, তীর্থক্ষেত্রে যাত্রীরাও আজকাল সর্বাগ্রে এবং সর্বপ্রযত্নে এই নাছোড়বান্দা বন্ধুবরগণকে এড়াইয়া চলিতে চায়। অতএব অস্ত্র এবং প্রয়োগ-বিধি উভয় ক্ষেত্রেই যুগোচিত পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। পূর্বেকার কৌশল ছিল প্রথমে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবস্থান ও স্বল্পায়াসে বহু পুণ্য লাভের প্রলোভন, এবং তারপরে প্রবঞ্চন; আর প্রবঞ্চনে যেখানে অফলদর্শন, সেখানে প্রকাশ্যে প্রহারণ এবং প্রহরণ। এখনকার যেটা কৌশল সেটা খানিকটা রাজনৈতিক 'অবস্থান-সত্যাগ্রহের'ই ধর্মনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগমাত্র। আপনিও কথা বলিতেছেন না, সেও কথা বলিতেছে না,—আপনিও ছাড়াইতেছেন না, সেও ছাড়িতেছে না; কিন্তু আপনিও জানেন ইহার একটা ভবিষ্যৎ আছে, সেও জানে ইহার যা-হোক একটি ভবিষ্যৎ আছে; আপনি মোটেই খুশি নন, কিন্তু সে বিষয়ে সে যেন নিরুদ্বিগ্ন! কথাটিকে একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বেলা ঠিক দুপুরে বিন্ধ্যাচলে গিয়া নামিয়াছি। আমরাই ছিলাম সেদিনকার একমাত্র তীর্থযাত্রী। স্টেশনের প্ল্যাট-ফরম হইতে নামিলাম, দেখিলাম সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোনও একটি কুলি নয়, রিক্‌শা-ওয়ালা-টাঙ্গাওয়ালা নয়, বার-চৌদ্দটি পাণ্ডা—তাহাদের প্রত্যেকের চেহারাই রীতিমন 'তাগড়াই'—মাথায় সকলেরই হলুদ রঙের পাগড়ি, হাতে লম্বা পাঁচ ফুট বংশদণ্ড—সেগুলি যথেষ্ট তৈলাক্ত এবং ঘন গ্রন্থিযুক্ত, একমাত্র শিকার আমি এবং আমার সঙ্গের প্রাণী কয়েকটির উপরে তাহারা প্রায় এক সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই জাতীয় চরম বিপৎপাতে যে কৌশলটি পরম ফলপ্রদ বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছি তাহা হইল অবিচলিত তূষ্ণীম্ভাব। আক্রান্ত হইবামাত্র আমি আত্মরক্ষার সেই কৌশল গ্রহণ করিলাম। কিন্তু প্রাণপনে 'কমলী'কে ছাড়িলে কি হইবে, 'কমলী' যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহে। কুলি ও রিক্‌শা যোগাড় করিতে আমার আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে আমি বসিলে তাহারা বসিত, দাঁড়াইলে দাঁড়াইত, ঘুরিলে ঘুরিত—আবার ফিরিলে ফিরিত। আমার একটি বেয়াড়া ধরনের মৌনতা তাহাদের একটি বিজাতীয় ক্রোধ-বহ্নিকে ক্রম-সন্ধুক্ষিত করিয়া দিতে লাগিল। আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া

তাহাদের ভিতরে কেহ বলিতেছে, বাবুর সহসা কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে, অপরে ফোড়ন দিয়া বলিল, তবে ত আচ্ছা দাওয়াই চাই, অপরে বলিল, হাকিম ডাকিব না ওঝা ডাকিব, অপরে বলিল, দাওয়াই আমি নিজেই জানি, সময়ে প্রয়োগ করিব বলিয়াই সকলে যেন সমস্বরে একটা পৈশাচিক উল্লাসে হাসিয়া উঠিল। বিধির করুণায় ইতিমধ্যে দুইটি সাইকেলরিক্স যোগাড় হইয়া গেল, বাগ্‌জাল বিস্তারে অবরোধসৃষ্টিকারী ইন্‌সিওরেন্সের দালালের হাত হইতে হঠাৎ যেমন কেহ গৃহান্তঃপুরে পালাইয়া বাঁচে, শহরে মুখাত মাইক-উপচারে সরস্বতী পূজার প্রারম্ভে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত পাড়ার বৃদ্ধ যেমন শহরতলীতে মেয়ে বাড়িতে দুই দিনের জন্য পালাইয়া বাঁচে, গুম্ফ-গৌরবিত বিড়ালের সতর্ক বিস্তারিত থাবা হইতে অসহায় ইঁদুর যেমন অতর্কিতে পালাইয়া বাঁচে আমিও সেইরূপ আমার সাঙ্গপাঙ্গ সহ দুইটি রিক্‌শয় পোঁ-পোঁ করিয়া পালাইয়া বাঁচিলাম। জোরে এতক্ষণ বুক ভরিয়া শ্বাস টানিয়া বলিলাম, জয় মা বিন্ধ্যেশ্বরী এবারের মতন ত বাঁচাইয়াছ।

কিন্তু ধর্মশালায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, আমার আগমনের পূর্বেই একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান আমার জন্য নির্দিষ্ট কোঠাখানির দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন, রামচন্দ্রের জন্য শবরীর প্রতীক্ষার অনুরূপ একটু প্রতীক্ষার ভাব তাহার চোখে-মুখে। আমি প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারিলাম, স্টেশনে দেখিয়া আসিয়াছি যাহার খানিকটা আদিম অমার্জিত সংস্করণ—আমার দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া তাহারই যুগোচিত রূপান্তরিত সংস্করণ। কিন্তু তবু একটু ভাল লাগিল, কারণ লোকটির একটু ভদ্রবেশ, দণ্ড-বিরহিত মুখের ভাবটি মিষ্টি—কথাগুলি মিষ্টির উপরে আবার মোলায়েম; সুতরাং আমি নিজের মধ্যে একটু গলিয়া যাইবার প্রবণতাই অনুভব করিতে লাগিলাম। খানিকটা গদগদভাবেই বলিলাম, 'পাণ্ডাজী আপনাদের দেশে আসিয়াছি, বুড়ী মা সঙ্গে এখন পূজা-অর্চা, পাপ-পুণ্য সকলই আপনাদের হাতে।' পাণ্ডাজী জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'ওসব কথা বলিতে নাই—মানুষের হাতে দুনিয়ার কিছু নাই যাহা কিছু সবই হইল মা বিন্ধ্যেশ্বরীর হাতে, মা অষ্টভুজার হাতে।' এইভাবেই ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার ফাঁকে ফাঁকেও একটি সংশয়জনিত ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ভিতরে ভিতরে আমাকে অস্বস্তি দান করিতে-ছিল। আমি প্রথমেই তাই পাণ্ডাজীর সঙ্গে দাবী-দাওয়ার একটা ফয়সালা করিয়া লইবার পক্ষপাতী ছিলাম, একটু জোর করিয়াই সঙ্কোচের আবরণ হইতে কণ্ঠকে মুক্ত করিয়া বলিলাম, 'পাণ্ডাজী, আপনার সাত্ত্বিক দেহ এবং অনুরূপ মনোভাব দেখিয়া আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; আমি এখানে মাকে দিয়া যাহা কিছু করাইব তাহা আপনার মারফতেই করাইব; আমি বড়লোক নই, আমার আপনাকেও সামান্য কিছু দেবার ইচ্ছা, আপনি মোট কত পাইলে খুশী হইবেন অনুগ্রহ করিয়া বলুন।' তিনি খানিকটা গম্ভীরভাবে নীরব থাকিয়া খানিকটা ভর্ৎসনার সুরেই বলিলেন, 'বাবুজী, তীর্থের ধর্মকাজ দোকানদারি নয়, সে সব দোকানদারির মধ্যে আমি নাই; তুমি যেমন বুড়ীমার পুত্র, তাঁহাকে তীর্থ করাইতে আনিয়াছ—আমারও তেমনই কর্তব্য বুড়ীমার কার্যকর্ম সব যাহাতে সুফলমত হয় তাই দেখা, আমি 'সেওয়ার' জন্য আসিয়াছি—টাকার লোভে নয়, শেষে 'প্রেমসে' যদি তোমাদের কিছু দিতে ইচ্ছা হয় ত দিতে পার, না ইচ্ছা হয় না দিও—আমার কোনও দাবী-দাওয়া নাই।' ইহার পরে কোনও পাষণ্ডও আর কথা বলিতে পারে না। সুতরাং আগের ভাগেই ফয়সলা করিবার বিজ্ঞজনোচিত প্রবৃত্তি আমাকে চাপিয়াই রাখিতে হইল। পাণ্ডাজী বলিয়া গেলেন, পরের দিন সকাল বেলা তিনি ঠিক আসিয়া দেখা দিবেন। তিনি

চলিয়া গেলে আমার মা খানিকটা বিস্মিত-ভাবেই বলিলেন, 'এমন ত আর কখনও দেখি নাই!'

পরের দিন সকাল বেলা পান্ডাজী ঠিক সময়েই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আমরাও প্রস্তুত। টাকা-পয়সা সঙ্গে কি লইব পান্ডাজীর সহিতই পরামর্শ করিতে গেলাম, তিনি একটা নির্লিপ্ত নির্বিকার-ভাবে নিজেকে স্থিত করিয়া বলিলেন, 'দুইটি পূজা মাকে করিতে হইবে—মা বিন্ধ্যেশ্বরীর পূজা আর মা অষ্টভুজার পূজা। পূজা ষোড়শোপচারেও করা চলে, চৌষট্টি উপচারেও চলে—ভক্তি এবং সামর্থ্যের পরিমাণ অনুসারে চৌষট্টির ঊর্ধ্বেও ষোলর গুণনীয়ক যে কোনও সংখ্যার উপচারের দ্বারাও করা চলে; তবে কোনও তীর্থফল পাইতে হইলে ন্যূনপক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা অবশ্যকর্তব্য এবং তাহার ব্যয় ন্যূনপক্ষে ষোল টাকা, সুতরাং দুইটি পূজার বাবদ দুই ষোল বত্রিশ টাকা লাগিবেই, তারপরে আর যত লাগান যায়।' আমি সহসা চোখ দুইটি গোল্লা পাকাইয়া একবার মায়ের মুখের দিকে, আর একবার পান্ডাজীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। পান্ডাজী আমার মানসিক বিক্রিয়া খানিকটা যেন আঁচ করিতে পারিয়া বলিলেন, 'ইহার মধ্যে পান্ডার পাওনা কিছুই নাই বাবু, টাকা আমার হাতে দিয়া আমার সঙ্গে চলুন—দেখিবেন, পূজার উপচারেই সব টাকা লাগিয়া গিয়াছে। পান্ডাকে ইহার পরে ইচ্ছা হয় কিছু দিবে, না হয় না দিবে।' আমি সহসা গম্ভীর-ভাবে বলিলাম, 'আপনি চলিয়া যান, আমি আজ পূজায় যাইব না।' তিনি বলিলেন, 'কেন—কি হইল?' আমি অত্যন্ত তিরিক্ষি মেজাজে বলিলাম, 'যাইব না আমার ইচ্ছা—আপনি চলিয়া যান।' বলিয়াই আমি মায়ের হাত ধরিয়া পুনরায় কোঠাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে দুয়ারটা খুলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিলাম, না, সত্যই খানিকটা ভদ্র বটে, সত্যই সে চলিয়া গিয়াছে। আমি কিন্তু ইহা মোটেই আশা করিতে পারি নাই—আমি ঘরের মধ্যে বসিয়া পরবর্তী আক্রমণের জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলাম। সে সত্যই চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া মাকে লইয়া জয় বিন্ধ্যেশ্বরী বলিয়া নিজে নিজেই বাহির হইয়া পড়িলাম। আস্তে গঙ্গায় নামিলাম, আস্তে আস্তে ডুব দিলাম, কিন্তু ডুব দিয়া উঠিয়া চোখ মেলিয়া ফিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইতেছিল, উঠিয়া মা বিন্ধ্যেশ্বরীর শরণ লওয়া অপেক্ষা মা গঙ্গার চিরশান্তিময় কোলে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। কিন্তু যাহা মঙ্গল তাহাই ত সব সময় ললাট-লিখন নয়, অতএব স্নান করিয়া কূলে উঠিতে হইল এবং কূলে উঠিয়াই দেখিলাম, আমার চারিদিক ঘিরিয়া গত-কল্যকার সেই সব লাঠিধারী। তাহাদের কেহ আমাদিগকে তারস্বরে সূর্যের স্তব শুনাইতে লাগিল, অপরে ততোধিক উচ্চ-কণ্ঠে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল—কেহ স্নানমন্ত্র, কেহ শুদ্ধিমন্ত্র, কেহ দেব-মন্ত্র, কেহ দেবীমন্ত্র! আমি সহজাত আত্মরক্ষার বৃত্তিতেই চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলাম, 'আরে আমার যে পান্ডা আছে, তিন পুরুষের কুলপান্ডা—গদাধর পান্ডা।' বলা মাত্র আর মুহূর্ত বিলম্ব নাই, কিছু পূর্বেই যাহার সহিত প্রায় প্রাণান্ত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া গঙ্গায় চলিয়া আসিয়াছিলাম, দেখিলাম তিনি তাঁহার তাম্বূলরাগরঞ্জিত 'দন্তরুচিকৌমুদী'র বিপুল শোভা বিস্তার করিয়া সেই গঙ্গাতীরে সেই ভিড়ের মধ্যেই বিরাজমান। তিনি আগাইয়া আসিয়া প্রায় আমার দেহলগ্নই হইয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম, 'কিহে পান্ডাজী কোথায় ছিলেন? আমাদের কাজকর্মটুকু বেশ ভালভাবে করাইয়া দিন।' আশুতোষদেবের প্রেমসম্ভাষণে প্রীত হইয়া শিবানী যেমন করিয়া স্মিতহাস্যে মুখখানি অর্থবান করিয়া তুলিয়াছিলেন অনুরূপ একটি হাস্য মুখমন্ডলে বিস্তার করিয়া পান্ডাজী বলিলেন,—'চলুন, চলুন'!

বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে বংশপরম্পরা-ক্রমে বর্তাইতে থাকে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কুমারের ছেলে যেমন প্রায় জন্ম হইতেই চাকের উপরে নরম মাটি ধরিতে শেখে, কামারের ছেলে যেমন সময় ও স্থান বুঝিয়া তপ্ত লোহার দমাদম হাতুড়ির বাড়ি দিতে শেখে, যাজনিক ব্রাহ্মণের ছেলে যেমন বাক্‌শক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রশক্তির সাক্ষাৎ লাভ করে, পান্ডার পুত্রও তেমনিই ভবিষ্য বিরাট পান্ডামহীরুহেরই একটি সূক্ষ্ম অথচ অব্যর্থ বীজ। এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে একবার অযোধ্যায় বসিয়া। সঙ্গে মা ও অপর দুইটি প্রৌঢ়া মহিলা। সকাল বেলা টাঙাযোগে সোজা রাজা দশরথের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভিতরে ঢুকিয়া গিয়া দেখি, সাঙ্গোপাঙ্গ সহ রাজা দশরথ যেখানে সিংহাসনে আসীন তাহার সামনে একটি মোটা কাপড়ের যবনিকা টানিয়া দিয়া বছর দশেকের একটি

বালখিল্য পাণ্ডা 'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' সটান ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার ধ্যানের এই অকম্প্র-গভীরতা অতি দীর্ঘকালের মনে হইল না, আমাদের পায়ের শব্দ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানহীন তন্ময়তা বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও সেই বালখিল্যের শীঘ্র চোখ খুলিবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না আশপাশেও আর কোনও লোক দেখিলাম না। তখন সেই বালখিল্যকে শুনাইয়া শুনাইয়াই সঙ্গের সকলকে বলিতে লাগিলাম, 'না, চল অন্য জায়গায় যাওয়া যাক, এখানে আজ আর কোনও দর্শন হইবে না।' বলিয়াই আমি একটু সশব্দেই পায়চারি করিতে লাগিলাম; দেখিলাম সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলিয়াছে, বালখিল্য মুনির চোখ দুইটি পিটপিট করিতে করিতেই সহসা পট্ করিয়া খুলিয়া গেল। অর্ধনিমীলিত যোগভাঙা নেত্রে তিনি আমাদিগকে হাত ইশারায় তাঁহার 'উপাসনা'র অর্থাৎ কাছে বসিবার ইঙ্গিত দিলেন। আমরা কাছে বসিতেই দেখিলাম, তিনি সেই একটা অর্ধজাগ্রত ভঙ্গিতেই ভাঙা-হিন্দী ভাঙা-বাঙলায় আমাদের প্রতি অযাচিত উপদেশামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই উপদেশের বিষয়বস্তু হইল এই যে, এই যে দুর্লভ মানব-জন্ম তাহার অন্তিম লক্ষ্য কি, 'মোক্ষ' হইল সেই অন্তিম লক্ষ্য এবং এই 'মোক্ষ' লভ্য হইল একমাত্র তীর্থযাত্রা এবং তীর্থাদিতে যথাবিহিত স্নান-ধ্যান, পূজো-অর্চা দ্বারা। মিনিট দু'চারেক ধৈর্য ধরিয়া শুনিলাম, কিন্তু দেখিলাম বালখিল্য তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আরও বাক্-পল্লবিত করিবার চেষ্টায় আছেন। অগত্যা তখন কাটাছাটাভাবেই বলিতে হইল যে, অত কথা শুনিবার আমাদের সময়াভাব, সেই এক সকালেই আমাদের অনেক ঘুরিয়া অনেক দর্শন-স্পর্শন লাভ করিতে হইবে। সে ঈষৎ রোষকষায়িত নেত্রে বলিল যে, আমার মতন লোকের পয়সা খরচ করিয়া তীর্থে না যাওয়াই ভাল ছিল, কারণ আমার মতন অশ্রদ্ধাবানের পয়সাই খরচ হইবে, পুণ্য কিছুই সঞ্চিত হইবে না। গভীর সেই দশ বৎসরের পাণ্ডা-পুত্রেরই লোকজ্ঞান, নিমিষেই সে বুঝিয়া লইয়াছে, আমাকে আর বেশী ঘাটান বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না; সুতরাং আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া সে চট্ করিয়া তাহার একটা মোটা লাল-কাপড়ে বাঁধাই খাতা বাহির করিল এবং কাটাছাটা কাজের মানুষের মতনই বলিল, 'রাজভোগ কি মিলিবে বল, রাজভোগ না মিলিলে রাজদর্শন মিলে না। তিন মাঈজীর পৃথক পৃথক ভোগ দিতে হইবে।' আমিও চটপট বলিলাম, 'রাজভোগ এক রুপিয়া মিলিবে।' সে বলিল, 'এ ত বাজার নয় বাবু, এ তীর্থ; রুপিয়া-পয়সার কোনও কথা নেই, ভোগ কতটা দেবে তাই বল, এক সের দেবে কি এক পউয়া দেবে, কি আধ পউয়া দেবে, কি ছটাক দেবে, তাই বল।' আমি নিম্নতম পরিমাণ ছটাক স্বীকার করিলাম। সে নির্লিপ্তভাবে তাহাই স্বীকার করিয়া মা এবং অপর মহিলা দুইটিকে অর্ধ-হিন্দী ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে সেই এক ছটাক করিয়া ভোগের সংকল্প পড়াইয়া লইল। সংকল্প গ্রহণের দ্বারা সব ব্যবস্থা পাকা-পাকি করাইয়া লইবার পর সে একটু হিসাব করিল, হিসাব করিয়া বলিল, প্রত্যেক ছটাক রাজভোগের জন্য ১২৷৷৹

টাকা হিসাবে মোট তিন ছটাক ভোগে ৩৭৷৷০ টাকা লাগিবে। সহসা আমার ধমনীর সকল শোণিতধারা ধমনীপথ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া জমা হইল এবং আমি একটি মারমুখো চিৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু সে কোনওরূপে বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিল না, বরঞ্চ ধীর স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল যে, রাজভোগ অমনি অমনি হয় না, বিশুদ্ধ 'ঘিউ' লাগে—আজকালকার দিনে বিশুদ্ধ জিনিস মোটে মেলেই না, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া তোলা কয়েক বাহির করিবে, তাহা স্বর্ণমূল্যে ক্রেতব্য; তদুপরি কুঙ্কুম-জাফরান প্রভৃতি আরও অনেক বহুমূল্য উপকরণ ত আছেই। আমি একটি বাল-খিল্যের এত বিক্রম দেখিয়া প্রায় পাশব শক্তির প্রয়োগেই তাহাকে নিবৃত্ত করিবার উপক্রম করিতেই রঙ্গমঞ্চের দু' দিকের নেপথ্য হইতে যেমনভাবে সম্পূর্ণ পূর্ব-নির্দিষ্ট অথচ একান্ত আকস্মিকভাবে পাত্রপাত্রীর সময়োপযোগী প্রবেশ ঘটে, তেমনই দীর্ঘগুম্ফশোভিত দুই পরিণত পাণ্ডার আবির্ভাব এবং আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আস্ফালন। আমি ভড়কাইয়া গেলাম, নেপথ্যে আরও কি কি ব্যবস্থা রহিয়াছে কিছুই জানি না। আমি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিলাম এবং নিজের অসামর্থ্যের কথা সবিনয়ে নিবেদন করিলাম। প্রাণান্তক কঠিন ব্যাধি যেমন আবার অতি সামান্য মুষ্টিযোগে অপ্রত্যাশিতভাবে সারিয়া যায় তেমনই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিলাম, পরিণত পাণ্ডা দুইটিকে দুইটি টাকা এবং বাঁজাকার পাণ্ডাটিকে আট গণ্ডার পয়সা দিতেই দুর্লভ রাজদর্শন কপালে মিলিয়া গেল—নয়ন ভরিয়া দেখিলাম, কাঠের আসনে সাজান কাপড়-জামা পরান কয়েকটি মাটির পুতুল!

মনে করা যাইতে পারে, মা-মাসি-পিসি জাতীয় অনেক কেহকে সঙ্গে লইয়া তীর্থাদিতে গেলেই ত এই সব ঝামেলা, তাহার চেয়ে একা একা গেলে ত আর এত সব ঝামেলা থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগার কপালে তাহাও সত্য নয়। অনেক আগে মথুরা-বৃন্দাবনে একবার গিয়াছিলাম একা একা বেড়াইতে। মথুরা হইতে এক সকালে বাহির হইয়া পড়িলাম গোকুল-মহাবনের দিকে। মহাবনের একটি ভগ্নমন্দিরে ঢুকিতে গেলে হঠাৎ দুই পাশ হইতে দুইটি পাণ্ডা আসিয়া আমাকে বাধা দিল। আমি অপ্রস্তুত হইয়া বাধা দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, 'এই মন্দিরের এই অঙ্গনে গোপালজী হামাগুড়ি দিয়া খেলিতেন, এখানে কাহারও পায়ে হাঁটিবার নিয়ম নাই, গোপালজীর মতন হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আমার বিরক্তি ধরিল, ২৬।২৭ বৎসরের যুবক আমি, আমি কেন এক বছরের শিশুর মতন এখন ভাঙা মন্দিরের বাঁধান আঙিনায় চারি হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিতে যাইব! আমি স্পষ্ট অস্বীকার করিলাম, তাহারা পায়ে হাঁটিয়া কিছুতেই ঢুকিতে দিবে না, আমি দর্শন না করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহিলাম, তাহারা তাহাও দিবে না—

তাহাতে গোপালজীর অপমান হইবে। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল! খানিকক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পরে আমি যখন জোর করিয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম, পাণ্ডা দুইটি তখন জোর করিয়া আমাকে ঠাসিয়া ধরিয়া হামাগুড়ি দেওয়াইবার চেষ্টা করিল; উভয়ত ধস্তাধস্তির মধ্যে আমি দুইজনের মধ্য দিয়া গলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম—বাহির হইয়া আমি দিক পরিবর্তন না করিয়া চোঁচা দৌড়! দৌড়াইতে দৌড়াইতেই শুনিতে পাইলাম, পিছন হইতে পাণ্ডা দুইটি বলিতেছে—'আরে বাউরা হ্যায়—বাউরা হ্যায়।' বাউরা আছি ত আছি, সম্প্রতি হামাগুড়ির বিপদ হইতে ত বাঁচিলাম।

দুই এক সময় আবার পাণ্ডাদের উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। দেখিতে-শুনিতে পোশাকে-পরিচ্ছদে যাহাকে ঢেঁকি-অবতার বলিয়া মনে হইয়াছে কথা-বার্তায় তাহার কাছেও দিব্যি হারিয়া গিয়াছি। পুরীর সমুদ্র-তটে বসিয়া এক পাণ্ডাকে একদিন দেখিলাম, নিতান্ত নোংরা অবস্থায় একদল যাত্রীকে মন্ত্র পড়াইতেছেন। আমি একটু গায়ে পড়িয়াই বলিলাম, 'পাণ্ডা মশাই, একটু স্নান-টান করিয়া আর একটু পবিত্র-ভাবে মন্ত্র পড়াইতে পারেন না?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'তবে আর বাবা 'পুণ্ডরীকাক্ষ' আছেন কিসের জন্য? জানত বাবা, অপবিত্রো পবিত্রো বা—ঐ 'পুণ্ডরীকাক্ষ'ই একমাত্র ভরসা' বলিয়াই তিনি পুণ্ডরীকাক্ষকে হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। আর কিছু না হোক পাণ্ডা আমার মুখ এক কথাতেই বন্ধ করিয়া দিলেন।

পাণ্ডাঠাকুর মন্ত্র পড়াইতেছিলেন মেদিনীপুরের একদল যাত্রীকে। তিনি সংকল্পবাক্যের মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, 'নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ।' মন্ত্রটি অশুদ্ধ হইলেও বহু-প্রচলিত। আসলে মন্ত্রটি 'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ'—অর্থাৎ প্রথমে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সংকল্প গ্রহণ। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির ত প্রণবে অধিকার নাই, তাই বিধান হইল ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে 'ওঁ' স্থলে 'নমঃ' উচ্চার্য। তারপরে যখন মন্ত্রপাঠ চলিতে লাগিল, 'অদ্য কার্তিকে মাসি গুরুবারে পূর্ণিমায়াং তিথৌ' ইত্যাদি তখন একজন বৃদ্ধা মহিলা বাধা দিয়া বলিলেন, 'কি মন্তর পড়াচ্ছেন ঠাকুর, ও আমাদের মন্তর নয়, আমরা যে বৈষ্ণব।' পাণ্ডা ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'তাই নাকি, তোমরা বৈষ্ণব? তা আগে বলনি কেন? বৈষ্ণবমন্ত্র কি আমাদের জানা নাই? আচ্ছা গোটা কাজ কর, যে যে-ভাবে বসি' আছ সেইখানে তিনটি উল্টা পাক ঘুরি' ফের বসি' পড়—ভুল মন্ত্রের দোষ তাতেই কাটি' জিব।' সকলেই দেখিলাম তিনটি করিয়া উল্টা পাক খাইয়া বসিয়া পড়িল। পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, 'এইবারে বৈষ্ণবমন্ত্র পাঠ কর, হরিবল হরি, হরিবল হরি, হরিবল হরি—অদ্য কার্তিকে মাসি'—পূর্বোক্ত মহিলা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবারে ঠিক আছে।' সোৎসাহে পাণ্ডাঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'জানি জানি, মন্ত্র-তন্ত্র সবই জানি, তবে কার কোন্ ধর্ম সেটা ত একবার বলি' দিবে' বলিয়াই মন্ত্রজ্ঞত্বের গর্বে পাণ্ডা-ঠাকুর হিঁ-হিঁ করিয়া হাসিয়া পড়িলেন। পাশে দাঁড়াইয়া আমি দেখিতেছিলাম আমাদের ধর্ম আর ভাবিতেছিলাম আর কতদিন—আরও কতদিন?

আমার নাম
চা
আপনাদের জীবনে
আমার স্থান কতখানি সেই
কথাটাই বলছি

১৬

কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—পোহায় আগস্ট নিশি একত্রিশা বাসরে। তারপর কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, প্রথম পৌর স্বয়ংপ্রভুতার সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়া রাখে এমন কেহ বাঁচিয়া নাই। আবার আর একটি আগস্ট নিশি পোহাইল। এবারও পর্ব ঘরে ঘরে, এবারও বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া বেশ্যা করে সোর। কেবল পটভূমিকা আরও বিস্তৃত হইয়াছে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া চিন্তা করিতে বসিলাম। এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল ইহাতে আমার কৃতিত্ব কতটুকু? একটা পতাকা নাড়িয়াও তো সাহায্য করি নাই। (ব্যোমকেশ দিল্লীতে গিয়া সাত মাস ধরিয়া কিছু কাজ করিয়াছে)। আমার মত শত সহস্র মানুষ আছে যাহারা কিছুই করে নাই, অথচ তাহারা স্বাধীনতার ফল উপভোগ করিবে। একজন নৌকার দাঁড় টানে, দশজন নদী পার হয়। ইহাই যদি সংসারের রীতি, তবে কর্ম ও কর্মফলের যোগাযোগ কোথায়?

ব্যোমকেশকে আমার আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা বলিলাম। সে বলিল,—'স্বাধীনতা পরের চেষ্টায় পেয়েছি, কিন্তু নিজের চেষ্টায় তাকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

বেলা সাড়ে ন'টার সময় ব্যোমকেশ বলিল,—'চল, এবার বেরুনো যাক্। প্রভাতের বাসা হয়ে তার দোকানে যাব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'প্রভাতের বাসায় কী দরকার?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'ননীবালা দেবীকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বৌবাজারের বাসার নিম্নতলে অনিবার্য ষষ্ঠীবাবু হুঁকা-হাতে বিরাজমান। আমাদের দেখিয়া চকিতভাবে হুঁকা হইতে মুখ সরাইলেন। ব্যোমকেশ মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'ওপরতলার সঙ্গে এখন আর কোনও গণ্ডগোল নেই তো?'

ষষ্ঠীবাবু উদ্বেগপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—'না—হ্যাঁ—না, গণ্ডগোল আমার কোনও কালেই ছিল না—আমি বুড়ো মানুষ—'

ব্যোমকেশ হাসিল—আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

সিঁড়ির দরজা খুলিয়া দিল একটি দাসী। অপরিচিত দু'জন লোক দেখিয়া সে সরিয়া গেল, আমরা প্রবেশ করিলাম। যে ঘরটিতে পূর্বে একটি কেঠো বেঞ্চি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই ঘরটিকে কয়েকটি আরামপ্রদ চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে, দেয়ালে রবিবর্মার ছবি। ননীবালা দেবী একটি বৃহৎ চেয়ারে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একটি প্রখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখিতেছেন; তাঁহার হাতে পেন্সিল।

ননীবালা দেবীর বেশভূষা দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়। চক্চকে পাটের শাড়ির উপর লতা-পাতা কাটা ব্লাউজ, দুই বাহুতে মোটা মোটা তাগা ও চুড়ি; সোনার হইতে পারে, গিল্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। মুখে গৃহিণী-সুলভ গাম্ভীর্য। ননীবালা যে অনাদি হালদারের বাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ননীবালা আমাদের দেখিয়া একটু থতমত হইলেন, তারপর হারমোনিয়ামের ঢাকনি খুলিয়া সম্ভাষণ করিলেন—'আসুন আসুন—। কেমন আছেন?—ওরে চিনিবাস, দু' পেয়ালা চা নিয়ে আয়। ব্যোমকেশবাবু, একটু মিষ্টিমুখ—?'

'না না, ও সব কিছু দরকার নেই। আমরা প্রভাতবাবুর খোঁজে এসেছিলাম।'

'প্রভাত! সে তো আটটার সময় দোকানে চলে গেছে।—একটু বসলেন না?'

চেয়ারে নিতম্ব ঠেকাইয়া বসিলাম। শুধু ঝি নয়, চিনিবাস নামধারী ভৃত্যও

াছে, সম্ভবত রাঁধুনীও নিযুক্ত হইয়াছে। ক্রের মহাদশা না পড়িলে হঠাৎ এতটা ড়্-বাড়ন্ত দেখা যায় না।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওটা কি রছেন?'

ননীবালা বলিলেন,—'ক্রস্‌ওয়ার্ড াজ্‌ল্‌ ভাঙছি! জানেন, আমি ফার্স্ট াইজ পেয়েছি, একুশ হাজার টাকা!' তাঁহার কণ্ঠে হারমোনিয়মের সপ্তসুর গটকিরি খেলিয়া গেল।

গয়নাগুলো তবে গিল্‌টির নয়। আমরাও কিছুদিন ক্রস্‌ওয়ার্ডের ধাঁধা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের ভাঙা কপাল, ধাঁধা ভাঙিতে পারি নাই।

অভিনন্দন জানাইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'আজ তাহ'লে উঠি। নৃপেনবাবুও কি দোকানে গেছেন?'

ননীবালা অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন,—'না। কাল থেকে ওর কি হয়েছে, ঘরে দোর বন্ধ করে আছে। কী যে করছে ওই জানে, খাওয়া দাওয়ার সময় নেই, দোকানে যাওয়া নেই—ওকে দিয়ে আর দেখছি আমাদের চলবে না।'

আমরা বিদায় লইলাম। পথে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল,—'প্রভাত যে দোকান বিক্রী করে দিচ্ছে এ খবর বোধহয় ননীবালা জানেন না।'

দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর বলিল,—'তুমি দোকানে যাও, আমি আসছি। জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে।'

দোকানের সামনা-সামনি রাস্তার অপর পারে গোলদিঘির দেয়াল ঘেঁষিয়া এক ছোকরা জুতা মেরামত করার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছিল, ব্যোমকেশ তাহার কাছে গিয়া জুতা মেরামত করাইতে লাগিল। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম।

প্রভাত হিসাবের খাতাপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, বলিল,—'এই যে! ব্যোমকেশবাবু এলেন না?'

'আসছে। আপনার হিসেব তৈরী?'

'হ্যাঁ। এই দেখুন না।'

আমি হিসাব দেখিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্যোমকেশ আসিয়া যোগ দিল। হিসাব পরীক্ষা শেষ করিতে বেলা দুপুর হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা তিন হাজার টাকাই দেব। কাল সকাল আটটার সময় চেক্‌ পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দখল দিতে হবে।'

'যে আজ্ঞে।'—

সেদিন অপরাহ্নে ব্যোমকেশ বলিল,—'ইন্দুবাবুকে টেলিফোন কর না, গদানন্দন সাম্প্রতিক খবর যদি কিছু পাওয়া যায়।'

বলিলাম,—'গদানন্দ তো পালিয়েছে, তাকে ইন্দুবাবু কোথায় পাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু ফেরারী হয়নি। শিউলী সাবালিকা, সে যদি কারুর সঙ্গে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাতে ফৌজদারী হয় না। গদানন্দ খুব সম্ভব তাকে নিজের বাসায় তুলেছে।'

'আচ্ছা দেখি—।'

ইন্দুবাবুকে ফোন করিলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—'গদানন্দর খবর জানি বৈকি। তাকে নিয়ে সিনেমা মহল এখন সরগরম। সেদিন আপনাদের বলেছিলাম কিনা! গদানন্দ শিউলীকে নিয়ে ভেগেছে, তারপর তাকে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করেছে। এই নিয়ে গদানন্দর তিনবার হ'ল।'

'তিনবার! তিনবার কী?'

'তিনবার বিয়ে।'

'বলেন কি, আরও দুটো বৌ আছে?'

'এখন আর নেই। প্রথম বৌটা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, কিন্তু সিনেমায় সুবিধে হ'ল না; ক্যামেরায় তার চেহারা ভাল এল না। সে হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল ক'রে মারা গেল। তারপর গদানন্দ আর একটা

মেয়েকে ফুসলে এনে বিয়ে করল। এ মেয়েটা অভিনয় ভালই করত কিন্তু personality ছিল না, দেখা গেল তাকে দিয়ে হিরোইনের পার্ট চলবে না। সেটাও বেশীদিন টিক্‌ল না।'

'কি সর্বনাশ! আপনার কি মনে হয় গদানন্দ বৌ দুটোকে—অ্যাঁ!'

'ভগবান জানেন। শিউলীর অবশ্য মাইকের গলা ভাল এই যা ভরসা।'—

ব্যোমকেশকে বার্তা শুনাইলাম। সে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর বলিল,—'গদানন্দর বংশ পরিচয় জান্‌তে ইচ্ছে করে। এক পুরুষে এতটা হয় না।'

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নগর দীপাবলীতে সজ্জিত হইয়া আর একটি দীপান্বিতা রাত্রিকে স্মরণ করাইয়া দিল। ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে রেডিওর জলদমন্দ্র স্বর অন্য সব শব্দকে ডুবাইয়া দিল। সকলেরই কান পড়িয়া আছে দিল্লীর পানে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইবে।

সাতটার সময় চকিতের ন্যায় নৃপেন আসিল, দ্বারের নিকট হইতে ব্যোমকেশের হাতে একটি চক্‌চকে চাবি দিয়া আলাদীনের জিনের মত অদৃশ্য হইল।

দশটার সময় আমরা আহার শেষ করিলাম।

সাড়ে এগারোটার সময় ব্যোমকেশ পুঁটিরামকে বলিল,—'আমরা এখনি বেরুব, কখন ফিরব ঠিক নেই। তুই জেগে থাকিস। আর একটা আংটায় কাঠ-কয়লা দিয়ে আগুন করবার জোগাড় করে রাখিস। আমরা ফিরে এলে আগুন জ্বালাবি।'

পুঁটিরাম 'যে-আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কাঠ-কয়লার আগুন কি হবে।'

সে বলিল,—'অতীতকে ভস্মীভূত করে ফেলতে হবে।'

মধ্যরাত্রির কিছু আগে আমরা বাহির হইলাম। ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিতেছে—

গোলদীঘির চারি পাশের দোকানগুলি কিন্তু বন্ধ। দোকানদারেরা বোধ করি নিজ নিজ ঘরে গিয়া রেডিও যন্ত্র আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন। এত রাত্রি এদিকের রাস্তাগুলিও জনবিরল হইয়া আসিয়াছে।

একটি ল্যাম্পপোস্টের ছায়াতলে এক-জন লোক দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, আমরা নিকটবর্তী হইলে বাহির হইয়া আসিল। দেখিলাম বিকাশ।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিছু খবর আছে নাকি?'

বিকাশ বলিল, 'না। প্রভাতবাবু সাড়ে ন'টার সময় দোকান বন্ধ করে চলে গেছেন।'

'হাতে কিছু ছিল?'

'না।'

'তারপর আর কেউ আসেনি?'

'না।'

'আচ্ছা, আসুন তাহলে।'

তিনজনে রাস্তা পার হইয়া প্রভাতের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ব্যোমকেশ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিল। বেশ অনায়াসে তালা খুলিয়া গেল। তারপর চাবি বিকাশের হাতে দিয়া বোমকেশ বলিল,—'আমরা দুজনে ভেতরে যাচ্ছি, আপনি তালা বন্ধ করে দিন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলা যায় না। আপনি যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন। যদি কেউ দোর খুলে ভেতরে ঢোকে, আপনার কিছু করবার দরকার নেই।'

'আচ্ছা স্যার।'
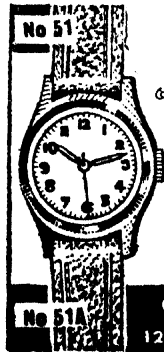
আমরা অন্ধকার দোকানে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশের পকেটে বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, সে তাহা জ্বালিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। সারি সারি বই-গুলো যেন দাঁত বাহির করিয়া নীরবে হাসিল। আমরা পিছনের কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোশের কিনারায় বসিলাম, মাঝের দরজা একপাট খোলা রহিল। ব্যোমকেশ বলিল,—'এ ঘরে বই নেই, এ ঘরে বোধ হয় আসবে না।'

আমি বলিলাম—'ব্যোমকেশ, রাত-দুপুরে আমরা প্রভাতের দোকানে কি করছি জানতে পারি কি?'

ব্যোমকেশ আমার কানে কানে বলিল, 'গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়িয়ে হামা খাপ পেতেছেন গোষ্ঠমামা।'

* * *

বইয়ের দোকানের একটা গন্ধ আছে—নূতন বইয়ের গন্ধ। এই গন্ধ সাধারণত টের পাওয়া যায় না, কিন্তু গভীর রাত্রে দোকানের মধ্যে বন্ধ থাকিলে ধীরে ধীরে অনুভব হয়। একটু ঝাঁঝালো নাক সুড় সুড় করে, হাঁচি আসে।

তার উপর নিজেদের নিশ্বাসের কার্বন-ডায়ক্সাইড আছে। ঘণ্টাখানেক প্রতীক্ষা করিবার পর অনুভব করিলাম, ঘরের বাতাস ভারি হইয়া আসিতেছে। গরমে প্রাণ আনচান করিয়া উঠিল। বলিলাম—'ব্যোমকেশ—'

ব্যোমকেশ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিল, তাহার গলা হইতে চাপা শীৎকার বাহির হইল—'স্‌স্‌স্‌—।'

আর একটি শব্দ কানে আসিল—কেহ চাবি দিয়া দ্বারের তালা খুলিতেছে।...... দরজা একটু ফাঁক হইল, বাহিরের আলো অচ্ছাভ পর্দার মত ধীরে ধীরে প্রসারিত হইল। একটি ছায়ামূর্তি প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। আমরা রুদ্ধ-শ্বাসে কুঠুরীর ভিতর হইতে দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দোকানঘরের মাঝখানে দপ্ করিয়া টর্চের আলো জ্বলিয়া উঠিল। আলোর দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে, সার্চ-লাইটের মত দেয়ালের উপর দিকে পড়িয়াছে। টর্চের পিছনে মানুষটিকে দেখা গেল না।

টর্চ হাতে লইয়া মানুষটি কাউণ্টারের উপর লাফাইয়া উঠিল। আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া কুঠুরীর দ্বারের নিকট হইতে উঁকি মারিলাম। টর্চের আলো বইয়ের সর্বোচ্চ তাকের উপর পড়িয়াছে। মানুষটি হাত বাড়াইয়া একটি বই বাহির করিয়া লইল; আকারে আয়তনে অনেকটা 'চলন্তিকা'র মত। তারপর আর একটি বই বাহির করিল, তারপর আর একটি। এমনিভাবে পাঁচখানি বই লইয়া মানুষটি লাফাইয়া নীচে নামিল; কাউণ্টারের উপর জ্বলন্ত টর্চ রাখিয়া একটি বাজার-করা থলিতে বইগুলি ভরিতে লাগিল।

থলিতে বইগুলি ভরা হইয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ গিয়া মানুষটির কাঁধে হাত রাখিল, বলিল—'থলিটা আমায় দিন।'

মানুষটির গলায় করাতের মত দ্রুত নিশ্বাস টানার শব্দ হইল। তারপর ব্যোমকেশ তাহার মুখের উপর নিজের টর্চের আলো ফেলিল।

মুখখানা ভয়ে ও বিস্ময়ে বিকৃত হইলেও চেনা শক্ত নয়—প্রভাতের মুখ।

তাহার চোখের শাদা অংশই অধিক দেখা যাইতেছে। সে মিনিটখানেক চাহিয়া থাকিয়া অভিভূত স্বরে বলিল,—'ব্যোম-কেশবাবু।'

'হ্যাঁ, আমি আর অজিত। থলিটা দিন।'

প্রভাত একটু ইতস্তত করিল, তারপর থলি ব্যোমকেশের হাতে দিল।

ব্যোমকেশ থলিটা আমার হাতে দিয়া বলিল,—'অজিত, এটা রাখ। বইগুলো ভারি দামী।—প্রভাতবাবু, এবার চলুন।'

প্রভাত আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'কোথায় যেতে হবে? থানায়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না, আপাতত আমার বাসায়। আগে বইগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তিনজনে দোকানের বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশের ইঙ্গিতে প্রভাত দ্বারে তালা লাগাইল। ফিরিয়া দেখি বিকাশ অলক্ষিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল,—বিকাশবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আপনার ছুটি। কাল সকালে একবার বাসায় আসবেন।'

'যে আজ্ঞে স্যার'—বিকাশ অন্তর্হিত হইল। আমি ও ব্যোমকেশ প্রভাতকে মাঝখানে লইয়া বাসার দিকে চলিলাম।

(ক্রমশ)

॥ ২১ ॥

পাটনাতে অফিস খোলা হলো ইউনাইটেড প্রেসের। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ফণীন্দ্রনাথ মিত্র মশায় এই অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ফণীন্দ্রনাথের জীবন বিচিত্র ঘটনায় ঊর্মিমুখর। উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে বিহারে. সে সময়ই চরমপন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। একজন অসমসাহসী বিপ্লবীনেতা রূপকথার বীরের মতো সে সময়ে তাঁর জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশ মান্য করে ফণিবাবু দুর্গম পথের অভিযাত্রিরূপে মাতৃভূমির তমসাবৃত রাত্রি লঙ্ঘন করার দুঃসহ সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

বিপ্লবী কর্মচক্রের সঙ্গে সাংবাদিকতার সাধনাও তাঁর সে সময়েই। বয়স যখন যৌবনের দীপ্তরাগে রঙীন, সেকালে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপ্লববাদের তূর্যনাদে পত্রিকাটির প্রতি অক্ষর ছিল বহ্নিময়; তাঁর সমগ্র জীবনযাপনটাই ছিল এই আগুনে রক্তক্ষরা। পুলিসের সদাসতর্ক দৃষ্টি তাঁর পিছনে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো। কিন্তু বিপ্লবী দলটি পুলিস থেকেও চতুর। একবার পুরো দলটিকে গ্রেপ্তার করার ফন্দি আঁটে পুলিস, ষড়যন্ত্রের নানা জাল ছড়িয়ে রাখে। কিন্তু আগেই খবর পৌঁছে যায় বিপ্লবীদের কাছে। যখন পুলিস এলো সাফল্যের গর্ব নিয়ে, এসে দেখে নীড় ভাঙা. সব পাখি উড়ে গেছে। ফণিবাবুরা সকলেই আত্মগোপন করেছেন। নৈরাশ্যপীড়িত পুলিসবাহিনী প্রস্থান করলো আত্মদংশন করতে করতে।

কিছুকাল পরে ফণিবাবু এলেন কলকাতায়। বারীন ঘোষ, উপেন ব্যানার্জি, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উল্লাসকর দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন এখানে।

তখনকার দিনে বিপ্লববাদের পুরোধা পত্রিকা ছিল 'যুগান্তর'। বারীন ঘোষ মশায় পরিচালনা করতেন। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিরন্তর শঙ্খনাদ ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকায়। অতুলনীয় অগ্নিময়ী ভাষায় পরাধীনতার জ্বালা ছড়িয়ে দেওয়া হতো। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'যুগান্তর' স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। মৃত্যুপণ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার যুবশক্তিকে আহ্বান করেছিল 'যুগান্তর' সেই আহ্বানের মধ্যে এমন এক নির্ভয় নিঃশঙ্ক উন্মাদনা ও বৃহত্তর জীবনের অনুপ্রেরণা ছিল যে, এই পত্রিকার প্রতিটি পাঠকের দেহে রোমহর্ষক শিহরণ বয়ে যেত। ফণীন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রিন্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তখন 'যুগান্তরের' প্রিন্টারর্স কলমে সম্পাদকের নাম ছাপা হতো না। রাজদ্রোহের অপরাধে ফণিবাবু যখন গ্রেপ্তার হলেন তখন সম্পাদকের নাম প্রকাশ করার জন্য তাঁর ওপর অমানুষিক পীড়ন চালানো হয়েছিল। কিন্তু অবিচলিত রইলেন ফণীন্দ্রনাথ, সম্পাদকের নাম কিছুতেই প্রকাশ করেননি। প্রথমে তাঁকে রাখা হলো প্রেসিডেন্সী জেলে, তারপর স্থানান্তরিত হলেন হাজারীবাগ জেলে। অত্যন্ত স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন তিনি, যা অন্যায় বলে মনে করতেন প্রাণ গেলেও তা মানতে পারতেন না। রাজার অভিষেককালে অনেক রাজনৈতিক বন্দী মুচলেকা দিয়ে মুক্তি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তিনি মাথা নত করবেন না কিছুতেই। মুক্তির আবেদন জানানো তো বাতুলকল্পনা।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর কলকাতায় ফিরে জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন তিনি। রাষ্ট্রগুরুর সস্নেহ দৃষ্টি ছিল তাঁর প্রতি, তিনি তাঁকে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার মুদ্রণবিষয়ে কর্তা নিযুক্ত করেন। পুলিসের সতর্ক প্রহরা সর্বদা ছায়ার মতো তাঁর অনুসরণ করতো, কোথায়ও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার জো নেই। পরে স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই অস্বস্তি থেকে তিনি মুক্তি পান।

'বেঙ্গলী'তে থাকবার সময়ই ইংরেজী ভাষায় সাংবাদিকতা করার জন্য তাঁর আগ্রহ জন্মে। একটা মস্ত অন্তরায় ছিল, ইংরেজী ভাষার উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করার মতো অবকাশ পান নি জীবনে। কিন্তু ইচ্ছা প্রবল, বাধাকে জয় করলেন। 'বেঙ্গলীর' প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগল, সাংবাদিকদের সঙ্গে ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে মিশতে লাগলেন। পড়তে আরম্ভ করলেন নানা সাহিত্য—সেক্সপীয়র মিল্টন শেলী বায়রন ডিকেন্স বার্নার্ড শ'। অর্জন করলেন ভাষার উপর অধিকার, সাংবাদিকতার প্রতি সবিশেষ আগ্রহ জয়ী হলো।

'ইংলিশম্যান' জবরদস্ত পত্রিকা। 'স্টেটসম্যানের' প্রতিদ্বন্দ্বী। 'ইংলিশম্যানে' লাইন ভিত্তিতে রিপোর্টারের সুযোগ পেলেন তিনি। তখনই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। 'সারভেণ্ট' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক আমি। প্রায়ই আসতেন আমাদের অফিসে, তাঁর লেখা দেখাতেন, আলোচনা করতেন, ভালো সাংবাদিক হওয়ার পথ জানতে চাইতেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর নিষ্ঠা দেখেছি। বিপ্লবের বহ্নি-উৎসবে জীবনের শ্রেষ্ঠ কালটা দিয়ে এসেছেন তিনি, কারাভ্যন্তরে কেটেছে দীর্ঘকাল। তবু উৎসাহের অন্ত নেই, জীবনকে জয় করার অত্যুগ্র সাধনা প্রদীপের মতো তাঁর হৃদয়ে জ্বলছে।

'ইংলিশম্যানের' ভারতবিরোধী ভূমিকা বেশি দিন বরদাস্ত করলেন না তিনি। চাকুরি ছেড়ে দিয়ে পাটনা চলে গেলেন। বেহারে তাঁর যৌবন কেটেছে। অন্তরঙ্গ সুহৃদদের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি। পাটনার 'সার্চ লাইট' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন স্থানীয় রিপোর্টার হিসেবে। 'ফ্রি প্রেসের' সংবাদদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন।

তারপর আমি 'সারভেণ্ট' ছেড়ে 'ফ্রি প্রেসে' গেছি। ফণিবাবুর সঙ্গে তখন আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। তাঁর নিষ্ঠা ও আগ্রহের আস্বাদন পেয়েছি প্রতি দিনের কাজে। ফ্রি প্রেস ছেড়ে ইউ পি আই যখন গড়ে তুলেছি, তখন তিনিও যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে।

তখন পাটনাতে পত্রিকার অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ক্ষুদ্র রাজধানী লোক-সংখ্যা ও বাণিজ্যগুরুত্বে হীনবল। তাই দৈনিক পত্রিকাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তদুপরি কলিকাতা থেকে বিখ্যাত পত্রিকাগুলি পাটনাতে হাজির হয় অনতিবিলম্বে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকাও বিরাট সমস্যা। 'সার্চ লাইট' কংগ্রেস-পন্থী পত্রিকা, তবুও অর্থাভাবে ইউ পি আই'র সংবাদ নিতে পারে নি। দ্বারভাঙ্গা মহারাজের অর্থানুকূল্যে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' প্রকাশিত হয়, তাঁরাও একই অসুবিধেয় আমাদের খবর নিতে রাজী হয় নি।

কিন্তু কলিকাতার পত্রিকাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকতা করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। দেশ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, জাতীয় সংগ্রামের সংবাদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইউ পি আই জাতীয়তাবাদী সংবাদ-প্রতিষ্ঠান। তাই পাটনার পত্রিকাগুলি আমাদের খবর না নিয়ে পারলেন না।

কিন্তু পাটনার পত্রিকাগুলি এতো অল্প চাঁদা দিতে রাজী হয়েছিলেন যে, তাতে একটি ছোট অফিসের ব্যয়ও কুলানো যায় না। বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন ফণিবাবু। তাঁর অসীম সাহস, আশ্চর্য নিষ্ঠা। তিনি এগিয়ে এসে পাটনা অফিসের ভার নিলেন।

অর্থাভাবের সমস্যায় ফণিবাবু ভারাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু অপরাজেয় তাঁর নিষ্ঠা। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি এমন চমৎকার কাজ চালিয়েছিলেন যে, সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তিরাও তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আন্তরিকতার দীপ্তিতে ঝলমল, হৃদয় ছিল প্রীতিতে পূর্ণ। সাংবাদিক ও সাংবাদিকতাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতারূপেও কাজ করেছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধারদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অজাতশত্রু। পাটনার সকল সাংবাদিক ও দেশকর্মী ছিলেন তাঁর সুহৃদ, তাঁর স্নেহভাজন। মৃত্যুর অনতিপূর্বে তাঁর জন্মদিন বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়েছিল পাটনা নগরীতে; মন্ত্রী, পদস্থ কর্মচারী ও সকল সাংবাদিকের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে তাঁর প্রীতিময় হৃদয় অভিষিক্ত হয়েছিল। শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ মূল্যবান উপহার দিয়ে কনিষ্ঠরা প্রণাম জানিয়েছিলেন, সমবয়সীরা প্রীতি।

হাঁপানীর রোগ ছিল তাঁর, তাতেই তিনি শেষ বয়সে বড়ো কষ্ট পেয়েছেন। শেষ সময়ে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু সমস্ত পাটনা নগরীতে শোকের ছায়া মেলে দিয়েছিল। এমন শোক অনেক রাজার ভাগ্যেও ঘটে না।

তিনি আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। ইউ পি আই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে থাকবে চিরকাল। এই রকম সৎ, চরিত্রবান এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী সব দেশেই বিরল।

তাঁর জীবন থেকে অনেক শিক্ষা নেবার আছে, অনেক প্রেরণা। তাঁর স্বার্থত্যাগী, দেশপ্রেমিক ও স্নেহময় হৃদয়ের কাছে একবার যিনি গেছেন, তাঁকেই মুগ্ধ হতে হয়েছে।

তাঁর দুই পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ পিতার স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন। পাটনা অফিসের তিনি সম্পাদক। কনিষ্ঠ সেখানকার অফিসেই নিযুক্ত। তাঁর কন্যা বুদ্ধিমতী ও হৃদয়বতী মেয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পরে পিতার সস্নেহ সাহায্যে তাঁর দিন কাটতো। এখন হয়তো অনেক বাধা-বিপত্তি তাঁর পথে এসে দুঃখ দিয়ে যায়। তবু বাবার কাছে চারিত্রশক্তি পেয়েছেন, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হননি। দুঃখের ভিতর দিয়েও পুত্রকন্যাকে যথার্থ মানুষ করার চেষ্টা করছেন তিনি। মহৎ পিতার সন্তানদের সুখী করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

॥ ২২ ॥

'সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দিল্লী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী সংবাদের উৎস এখানে, শাসনকর্ণধারদের রাজধানী। ইংরেজ আমলে সরকারী গ্রীষ্মাবাস সিমলাও বৎসরের কয়েকটা মাস দিল্লীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইউনাইটেড প্রেস প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই দিল্লী ও সিমলা থেকে সংবাদ সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আমার অন্তরংগ বন্ধু সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র তখন কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য, আমাদের সরকারী ও আইনসভার সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনে তিনি প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। কিছুকাল পরে ফ্রী প্রেসের সহকর্মী শশাংক ঘটক দিল্লী-সিমলার ভার নেন। বোম্বে অফিস খোলা হলে তিনি স্থানান্তরিত হন বোম্বেতে। সে সময় সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু আমাদের দিল্লী-সিমলা অফিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী সত্যেন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। 'ফরোয়ার্ড', 'ইংলশম্যান', 'বসুমতী' (ইং), 'লিবার্টি' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি যোগ্যতার সংগে কাজ করেছেন, লেখক হিসেবেও তিনি তৎকালীন পরিবেশে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্নেহ ও আনুকূল্য লাভ করে তিনি এসে যোগদান করেন ইউনাইটেড প্রেসে। মাত্র একশ' পঁচিশ টাকা বেতনে। তাঁকে নিযুক্ত করা হয় দিল্লী ও সিমলা অফিসের সম্পাদক পদে।

অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যেই আমাদের অফিস তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা ও তাঁর সংবাদ পরিবেশনের আশ্চর্য কায়দা আমাকে মুগ্ধ করেছে। অমায়িক ও মিষ্ট ব্যবহার তাঁর। স্বভাব-সুন্দর স্নিগ্ধ তাঁর ব্যক্তিত্ব। যাঁর কাছেই তিনি গেছেন, তাঁর প্রীতি অর্জন করেছেন সহজেই। সকলেই তাঁকে সাহায্য করেছেন, প্রশংসা করেছেন। আইনসভার সদস্যবৃন্দ, পদস্থ রাজ-কর্মচারী ও 'একজিকিউটিভ কাউন্সিলের' সভ্যবৃন্দ তাঁর প্রতি প্রীতিযুক্ত সহৃদয়তা দেখিয়েছেন।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তখন ভারত সরকারের আইনসচিব, প্রবল প্রতাপে তিনি কর্মে অধিষ্ঠিত। সত্যেন তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন দু' দিনেই। স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহারের গুণে তিনি তাঁর স্নেহ অর্জন করে নিলেন।

আইন সভার অধিবেশন কালে আমি গেছি সেখানে। উঠেছি তাঁর বাসস্থানে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো ব্যবহার তাঁর, তাঁর স্ত্রী আত্মীয়ার মতো আপন। মুগ্ধ হয়েছি সুখী দম্পতির সৌজন্যময় আতিথেয়তায়।

খুব কাছের থেকে দেখেছি তাঁকে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র, তাঁর কাজ। আমি মুগ্ধ হয়েছি। ইউনাইটেড প্রেস এমন কর্মীর জন্য গর্ব করবে চিরকাল, তাঁর মতো সাংবাদিক খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন না। বিষম ভূমিকম্পে যখন কোয়েটা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি দুর্মর সাহসে ভর করে ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। তাঁর প্রেরিত বার্তায় সারা ভারত চমকে উঠে জেনেছিল, কতো বড়ো প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটে গেছে সেখানে।

অর্থকষ্টের মধ্যে তাঁর দিনাতিপাত হয়েছে। পরিশ্রম করতে হয়েছে অমানুষিক। এর মধ্য দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এতোটা যে জীর্ণ তা কেউ বুঝতে পারেনি।

তখন আমাদের সিমলা অফিস ছিল নীচু জমিতে। রোজ কয়েকবার দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পথ পেরিয়ে আসতে হতো। একদিন তিনি অফিসে এসে একটা সংবাদ লেখার জন্য টাইপ রাইটারের কাছে গিয়ে বসলেন। কয়েকটা লাইন খট্‌খট্ করে টাইপ করে গেলেন, তারপর

হঠাৎ মেশিনের উপর তাঁর দেহটা ঢলে পড়লো।

সহকর্মী অনিল দাস ছুটে এলেন, খবর পেয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী। মনে হয়েছিল বুঝি ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু ঘুম নয়, পরমমৃত্যু তাঁকে আলিঙ্গন দিয়েছে। যশস্বী সাংবাদিক সংবাদ রচনা করতে করতে মহামৃত্যুর কোলে চলে গেলেন।

খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক ছুটে এলেন, এলেন স্যার ঊষানাথ সেন এবং অনেক সাংবাদিক ও পদস্থ রাজকর্মচারী। দীর্ঘ শোকযাত্রা স্তব্ধ-মৌন হয়ে নিয়ে গেল তাঁর দেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু টাকা দিয়ে ও চাঁদা তুলে তাঁর শেষ পারলৌকিক কার্য সমাধা করে দিলেন। আরো কিছু টাকা দিলেন তাঁর স্ত্রীর হাতে, তারপর পুত্রকন্যা সহ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পিতা সাহিত্যিক সরোজনাথ ঘোষের গৃহে।

অকস্মাৎ সত্যেনের পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল। শিশুর মতো কাঁদতে আরম্ভ করলাম আমি অফিসের মধ্যেই।

দুঃখের দুর্দিনে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু ইউনাইটেড প্রেসের পতাকা তুলে রেখেছিলেন সুউচ্চে। তাঁর পতাকা আজ আমরা সকলে বহন করে চলেছি।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতনামা, কিন্তু লেখক হিসেবেও তিনি বিশেষ প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছিলেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ওপর সেকালে 'আর্য পাবলিশিং'-এর দোকানে সাহিত্যিকদের একটা মস্ত আড্ডা জমতো। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সে আড্ডার একজন মধ্যমণি। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাহিত্যের প্রতি তাঁর আশ্চর্য মমতা আর আকর্ষণে তাঁর বন্ধুরা মুগ্ধ হতেন।

তাঁর পরলোকগমনের পর সারা ভারত থেকে শোকবাণী এসেছে। মন্ত্রিবর্গ, পদস্থ রাজকর্মচারী, খ্যাতনামা নেতা ও দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রে তার অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছে। একজন তরুণ সাংবাদিকের জন্য সারা দেশ জুড়ে এতো বেদনা, এমন আর কখনো দেখা যায়নি।

বহু দৈনিক ও সাময়িক পত্রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি সাময়িক পত্রে সম্পাদকীয় রচনা করেন বর্তমান কালের একজন যশস্বী সাহিত্যিক, 'এস পি বি'—এই শিরোনামা দিয়ে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল; 'বাংলা দেশের অনেক সংবাদপত্রে পুস্তক সমালোচনা এবং সাহিত্য প্রবন্ধের নীচে এই তিনটি ইংরেজি অক্ষর আপনাদের অনেকের চোখে প্রায়ই পড়ে থাকবে। এই তিনটি ছোট ছোট হরফের আড়ালে লুকিয়েছিল মস্ত বড় একটি মানুষ, মস্ত বড় একটা প্রাণ। আমরা তাঁকে জানতাম সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু বলে। বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলিতে যাঁদের সহকারী হিসেবে প্রবেশ করতে হয়, ভবিষ্যৎ তাঁদের কাছে চিরকাল অন্ধকার হয়েই থাকে, কিন্তু সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সে অন্ধকারকে নিজের অমিত অধ্যবসায়ের বলে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। 'বসুমতী' এবং 'ফরোয়ার্ডের' সম্পাদনাগারে যাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল, সিমলা পাহাড়ে এই সেদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সময়ে তিনি ছিলেন ভারতের প্রসিদ্ধ নিউজ এজেন্সী ইউনাইটেড প্রেসের দিল্লী-সিমলার প্রধান সম্পাদক। সত্যেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুতে আজ সাংবাদিক মহলে শোকোচ্ছ্বাসের অন্ত নেই, কিন্তু আমরা জানি, অনন্যসাধারণ, আত্মপ্রত্যয় এবং কর্মনিষ্ঠা না থাকলে তাঁকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কোন স্বরাজী বা অর্ধস্বরাজী দৈনিকের সংবাদ স্তম্ভের শিরোনামা সাজিয়ে দিন কাটাতে হতো।...

...দুঃখের কথা এই যে, সত্যিকার সদালাপী একটি মানুষকে আমরা হারালাম। যে মানুষের বন্ধুত্বের গণ্ডি ছিল বিস্তীর্ণ, চিত্তের প্রসারতা ছিল আকাশস্পর্শী, আতিথেয়তা ছিল আত্মীয়তারও বড়, সে নেই। সাংবাদিকের পৃথিবীতে সত্যকার শোক নেই, তারা mock mourner, কিন্তু যে মানুষের মনে মৃত্যু পুরানো দিনের খবরের কাগজের মতো সহজে পুরাতন এবং অর্থহীন হয় না, তারা প্রবাসে এই বাঙালী ছেলেটির একান্ত আকস্মিক মৃত্যুতে পরমাত্মীয় বিয়োগের বেদনা বোধ করবে।'

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, শ্রীদেবদাস গান্ধী, স্যার আবদার রহিম, শ্রীপ্রকাশ, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, কেন্দ্রীয় আইনসভার তৎকালীন ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট অখিলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চিঠি লিখে সত্যেনের জন্য শোক জ্ঞাপন করেন। সিমলা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ এ এইচ জোয়েস সত্যেনের স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন :

'I am writing in the absence of Mr. Jafri, the Director of Public Information, to say how shocked and grieved we are to hear of the sudden loss of your husband. Only

yesterday afternoon, I had a long and very pleasant talk with him. Not only will his death be a great loss to the Agency which he represented, put will be keenly felt both by his fellow journalists in Simla and by the officers of this Bureau. He was a man for whom I, personally, had a great regard, for he was a journalist who did honour to his profession.'

কলকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী শোকসভা অনুষ্ঠিত হলো। আমাদের সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হলো, সকলের কৃতজ্ঞতা। যতোদিন ইউনাইটেড প্রেসের কর্মচক্র চলতে থাকবে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের স্মৃতি আমরা বহন করে যাবো শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে, অনুরাগে।

॥ ২৩ ॥

পাঞ্জাব অফিস সম্পর্কে আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। দীর্ঘকালের সহকর্মী শ্রীপুলিন দত্ত কলকাতার সঙ্গে সঙ্গেই লাহোরেও ইউনাইটেড প্রেসের অফিস খুলেছিলেন।

'সারভেণ্ট' পত্রিকায় আমার সহকারী ছিলেন পুলিনবাবু। স্মিতহাস্য, সৌম্য চেহারা, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুলিনবাবু অনায়াসে লোকচিত্ত জয় করে নিতেন। অল্পায়াসেই সাংবাদিকতার কাজেও দক্ষতা অর্জন করেন। ফ্রী প্রেসে যোগদান করবার সময়ে তাঁর উপরই আমার 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকার দায়িত্ব দিয়ে আসি।

'সার্ভেণ্ট' থেকে তিনি আসেন ফ্রী প্রেসে। লাহোর শাখার দায়িত্ব নিয়ে তিনি যান পাঞ্জাবে। প্রবাসের অপরিচিত স্থানে অনাত্মীয়বোধ স্বল্পদিনেই কেটে গেল তাঁর। লাহোরের বিখ্যাত পত্রিকা 'ট্রিবিউনের' যশস্বী সম্পাদক কালীনাথ রায় মশায়ের স্নেহ ও প্রীতি অর্জন করে লাহোরের সাংবাদিক মহলে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

লাহোরে যখন তিনি ইউনাইটেড প্রেস আরম্ভ করেন, তখন তিনি পাঞ্জাবের খ্যাতিমান সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সম্মান বজায় রাখার জন্য তাঁর খ্যাতি তখন সারা ভারতে বিস্তৃত। দৃঢ়চিত্ত ও অসম সাহসী শ্রীপুলিন দত্ত। পাঞ্জাব সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি জটিল মামলা দায়ের করেন এবং গ্রেপ্তার করে এক মাস পর্যন্ত বিনা জামিনে লাহোর জেলে পুরে রাখেন।

তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম রাজদ্রোহের মামলা হয় সীমান্ত প্রদেশের দমননীতির সংবাদ নিয়ে। ১৯৩০ সাল থেকেই সীমান্ত প্রদেশে জাতীয় আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে। মহাত্মা-শিষ্য খান আবদুল গফ্ফুর খাঁ এই আন্দোলনের পুরোধা নেতা। হিংস্র পাঠান জাতির মধ্যে অহিংসা ও স্বাধীনতার মন্ত্র তিনি প্রচার করতে থাকেন অপরিমেয় উৎসাহে। ইংরেজ সরকার বিচলিত হয়। এই আন্দোলন যখন গভীর মূলে প্রবেশ করে পাঠান জাতিকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, তখন ভীত ইংরেজ সরকার নির্বিচার ও নির্মম দমননীতির আশ্রয় নিয়ে তা নির্মূল করার চেষ্টা করেন। 'ফ্রণ্টিয়ার ক্রাইমস রেগুলেশনের' আশ্রয় নিয়ে সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনকে পীড়ন ও ধ্বংস করার প্রয়াস চালিয়ে যান। এই সময় উৎমনজাই গ্রামে খান আব্দুল গফ্ফুর খানের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বাড়িতে কংগ্রেসের অফিস ছিল।

এই খবর শ্রীপুলিন দত্ত অনতিবিলম্বে প্রচার করে দেন। ফ্রী প্রেস মারফত সংবাদটি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখন সীমান্ত প্রদেশের সংবাদ প্রকাশ করা সম্পর্কে সরকারের কড়া বাঁধন ছিল, সুতরাং সংবাদ প্রচারের জন্য পাঞ্জাব সরকার ভারত সরকারের নির্দেশে পুলিনবাবুকে গ্রেপ্তার করেন এবং এক বিরাট মামলা (Under Section 505B, 124AIPC etc.) দায়ের করেন।

দীর্ঘ এক বছর এই মামলা চলতে থাকে। বিচারে পুলিনবাবুর একশ' টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করেন সেসন কোর্টে। সেখানকার বিচারে মাত্র এক টাকা জরিমানা রেখে বিচারপতি ঘোষণা করেন, সরকার সীমান্ত প্রদেশে যেরূপ কড়া দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে সংবাদের সত্যতা পরীক্ষা করার কোন উপায় নেই। এমন কি, মৌলানা সৌকত আলী, ফাদার এলুইন, মৌলভী সফ দাউদের মতো নেতাদেরও সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। একটি আঙ্গিকগত ত্রুটি (Technical offense) ছাড়া তিনি 'আসামী'র কোন অন্যায় দেখেননি।

পুলিনবাবুর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা হয় জলন্ধর আদালত অবমাননার অভিযোগে। জলন্ধরের আদালতে সমাজতন্ত্রী নেতা মুন্সী আহমদ্দীনের বিরুদ্ধে একটা রাজদ্রোহের মামলা চলছিল। মুন্সীজীর পক্ষে পুলিন ছিলেন অন্যতম সাক্ষী। সরকারের চীফ সেক্রেটারী এক নির্দেশ জারি করে সমাজতন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করার গোপন আদেশ দিয়েছিলেন। সংবাদটি ইউনাইটেড প্রেস মারফত প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

পুলিনবাবুর সাক্ষ্যদান কালে লিক প্রসিকিউটর সংবাদটির উৎস বা দদাতার (Source of the ws) নাম জানতে চান। কিন্তু চলিত দৃঢ়তার সঙ্গে সংবাদদাতার জানাতে অস্বীকার করেন পুলিন-। সরকার আদালত অবমাননার লা দায়ের করেন তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তের চাপে সরকারকে পুনরায় ন্ত হতে হয়।

এই সমস্ত মামলা পুলিন দত্তকে বের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রিয় করে তুলেছিল। সাংবাদিকতার সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভয় াম একটা বহুবিস্তৃত খ্যাতিতে ত করেছিল তাঁর নাম। ইউনাইটেড সর লাহোর শাখার কর্ণধার হয়ে হন পুলিনবাবু, তাই সেদিকে আমার চন্তি ছিল।

সব দেখাশোনা করতে একবার হার গিয়েছিলাম। নিস্বেত রোডে াদের অফিস ও পুলিনবাবুর বাস-। গিয়ে উঠলাম পুলিনবাবুর য়, কয়দিন আরামে কাটলো।

সর্বপ্রথমেই গেলাম কালীনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আন্তরিক ও প্রীতির সঙ্গে তিনি অভ্যর্থনা লেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন ার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা প্রশ্ন, তারপর জানতে চাইলেন ফ্রী প্রেসের সংবাদ।

বললেন, 'সদানন্দ যদি অধৈর্য হয়ে না উঠতেন তাহলে আপনাদের এমনভাবে নতুন করে সংগ্রাম করতে হতো না। অর্থ-কড়ি সম্পর্কে কতটা সাহায্য করতে পারব জানি না, সাংবাদিক ও বন্ধু হিসেবে যথাসাধ্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

এই প্রতিশ্রুতি তিনি সর্বদা পালন করে গেছেন।

'ট্রিবিউনের' ম্যানেজার মিঃ সন্ধির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরও সহৃদয় সহ-যোগিতা আমাদের প্রতি। বললেন, 'পুলিনবাবুর মতো লোক লাহোর অফিসের কর্তা, আপনার ভাবনা কী।'

দেখাসাক্ষাৎ করে, ট্রিবিউনের অফিস ও মেশিনপত্র পরিদর্শন করে ফিরে এলাম। ফেরার সময় কালীনাথবাবু তাঁর গৃহে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, 'একটু আগে যদি আসেন তাহলে একহাত ব্রীজ খেলা যাবে আপনার সঙ্গে।'

কালীনাথ রায় কেবলমাত্র পাঞ্জাবের একজন খ্যাতনামা সম্পাদক নয়; সারা ভারতের যশস্বী ও প্রতিভাবান সম্পাদক-দের তিনি অন্যতম। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকারী ছিলেন 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়। মনীষা ও পাণ্ডিত্য মিশ্রিত হয়ে তাঁর চরিত্রে একটা দীপ্তি ছড়িয়ে গিয়েছিল। 'ট্রিবিউনের' সম্পাদক হিসেবে তাঁর যুক্তি-পূর্ণ রচনা শত্রুমিত্র সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে পাঠ করতেন।

লাহোর শহরটা যেখানে জনাকীর্ণ সেখানে আবর্জনা আর নোংরা। 'দি মল' ছাড়া শহরের কোথায়ও সৌন্দর্য নেই। কালীনাথবাবু যেখানে থাকতেন তার নাম মডেল টাউন। প্ল্যান করে তৈরি করা এই অংশটুকু শ্যামল শোভায় স্নিগ্ধ। দূরে দূরে বাড়ি, প্রতি বাড়ির সংলগ্ন এক টুকরো লন। কালীনাথবাবুর বাড়িটি সুন্দর, স্বাস্থ্যকরও। হাঁপানী রোগে তিনি ভুগতেন বলে মডেল টাউনে বাস করা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়ও ছিল।

সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। চা খেয়ে বসে গেলাম ব্রীজ খেলতে। পুলিন খেলতে জানেন না, বসে বসে দেখতে লাগলেন। অবশেষে হাসি-তামাশা, গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে নিমন্ত্রণ সেরে আমরা ফিরে এলাম।

আরও বহুবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। আন্তরিক মমতা নিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন। বয়সানুযায়ী তাঁর স্বাস্থ্য যথাযথ ছিল না, একটু বেশি বৃদ্ধ মনে হতো তাঁকে। হাঁপানী রোগটা তাঁকে জীর্ণ করে ফেলেছিল। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন।

'প্রতাপ' আর 'মিলাপ' লাহোরের আর দুটি খ্যাতনামা উর্দু দৈনিক পত্রিকা। মহাশয় কৃষ্ণ ও মহাশয় কুশলচাঁদ যথাক্রমে পত্রিকা দুটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পুলিনবাবুর সঙ্গে বিশেষ প্রীতি ছিল তাঁদের এবং আমাদের সংবাদ তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে প্রকাশ করতেন।

'মিলাপে'র স্বত্বাধিকারী কুশলচাঁদ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আর্য-সমাজপন্থী সাধু প্রকৃতির লোক তিনি। পত্রিকার কাজ খুব বেশি দেখেন না, মাঝে মাঝে দু-একটা সম্পাদকীয় লেখেন। বাংলা দেশ ও হায়দরাবাদে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল, তিনি অনেকক্ষণ এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আর্য সমাজের কাজই জীবনব্রত করেছেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রণধীরের সঙ্গে আলাপ হলো। পত্রিকা তিনিই দেখতেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে জানেন তিনি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা। রবীন্দ্র-নাথের সব বই তিনি পড়েছেন, বহু কবিতা তাঁর কন্ঠস্থ। উর্দুপ্রধান দেশে একটি 'রবিপন্থী' পাঞ্জাবী যুবকের দেখা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল। বাঙালী খাদ্য তিনি ভালোবাসতেন। বাড়িতে মাছ-মাংস খেতেন না, কিন্তু কোন বাঙালী বাড়িতে নিমন্ত্রণ হলে আনন্দের সঙ্গে বাঙালী রান্নার মাছ-মাংস খেতেন। বাংলা দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রাণের টান ছিল।

'প্রতাপ' পত্রিকার মহাশয় কৃষ্ণণের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছি একদিন। নরম চাপাটি আর গাজরের হালুয়ার ভারি চমৎকার স্বাদ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র সুভাষ-পন্থী। সুভাষের বীরত্বপূর্ণ আপসহীন সংগ্রামবাদ তাঁকে বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনিই পত্রিকার কাজ দেখাশোনা করতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র তখনও কলেজের ছাত্র। বর্তমানে বীরেন্দ্র রাজনীতিতে যোগদান করেছেন, পূর্বে পাঞ্জাব বিধানসভার তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিছুকাল সরকারের প্রচার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। নরেন্দ্র এখন পত্রিকার সম্পাদক ও কর্ণধার।

নরেন্দ্র ও রণধীর এখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুজন খ্যাতনামা সম্পাদক। রণধীরের একটা নেশা ছিল বড় বড় কাচের পাত্রে রঙীন মাছ পোষা। একবার তাঁর সব মাছ মরে গিয়েছিল, কলকাতা থেকে আমি রঙীন মাছ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি লিখেছিলেন, একটা সাম্রাজ্য পেলেও তাঁর এতো আনন্দ হতো না।

আমাদের লাহোর শাখায় আনন্দস্বরূপ নামে একজন উত্তর প্রদেশের সুশিক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক কাজ করতেন। আমাদের 'বিশেষ প্রতিনিধি' হয়ে তিনি পেশোয়ারে বদলী হন। সেখানে গিয়ে তিনি কর্মদক্ষতায় খ্যাতি অর্জন করেন এবং নেতৃবৃন্দের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছুকাল পরে পেশোয়ারে পুরোদস্তুর একটি অফিস খুলে বসেন। ডাঃ খান সাহেব যখন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী, তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকার আমাদের সংবাদ নেওয়া শুরু করেন।

আনন্দস্বরূপের আমন্ত্রণে আমি পেশোয়ারে যাই। সেখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। খান আবদুল কোয়াম বর্তমানে লীগ গভর্নমেণ্টের একজন স্তম্ভবিশেষ, কিন্তু তখন তিনি একজন সামান্য উকিল এবং খান আবদুল গফুর খানের শিষ্য ও পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁর গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই। ইউনাইটেড প্রেসের জাতীয়তাবাদী কাজের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন তিনি। তখন মনে-প্রাণে তিনি কংগ্রেসী। গভর্নর ক্যানিংহামের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি ঝানু সিভিলিয়ান হলেও কংগ্রেসী দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

ডাঃ খান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক বিকেলে তাঁর বাংলোয়। ঢিলে সালোয়ার আর কোট গায়ে ছিল তাঁর, শান্ত সৌম্য সদাহাস্যময় মুখ। প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এমন একটা শান্তির সুষমা আছে তাঁর, এক মুহূর্তেই খুব ভালো লেগে যায় তাঁকে। যথেষ্ট টাকা দিয়ে আমাদের সার্ভিস নিতে পারলেন না বলে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমাদের জাতীয়তাবাদী কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল। আন্তরিকভাবে তিনি আমাকে বলেছিলেন, পরে ইউনাইটেড প্রেসকে ভালো টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রথিতযশা পুরুষ খান আবদুল গফুর খান। মহাত্মা গান্ধীর যোগ্য শিষ্য। একটা হিংস্র জাতিকে তিনি অহিংসা ও শান্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন নিজের দেবোপম চরিত্র ও সুদৃঢ় সংগঠন শক্তিতে। সেবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটেনি। তখন তিনি নিজের গ্রামে পল্লী উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারপর বহুবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি খুব কাছের থেকে দেখেছি তাঁকে। দেখো যেমন বিরাট পুরুষ, মহত্ত্বেও তেমনি সুবিশাল। শক্তিমান এই বিশাল পুরুষে হৃদয়ে সুউচ্চ ঔদার্য ও মানবতাবোধ তাঁর সাহচর্যে এসে বারবার যীশুখৃষ্টে কথা মনে হয়েছে আমার। আধুনিক কালের তিনি উজ্জ্বল একটি মানবরত্ন।

পেশোয়ারে দুজন মহদাশয় বাঙ্গালী সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। একজ কংগ্রেস নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, তিনি থাকতেন চকবাজারে। উত্তর-পশ্চি সীমান্ত প্রদেশে তিনি জনসেবাক্ষে খ্যাতিমান। অন্যজন শ্রী পি সি চৌধুরী সীমান্ত প্রদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনারে ছিলেন।

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সঙ্গেও তখ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি খুব প্রতিপত্তিশালী হিন্দুনেতা ও যশস্বী আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর বাড়িতে ভোজনের আসরে বসে সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুদের সমস্যা তিনি খুব বিস্তৃতভা বর্ণনা করেছিলেন। বর্তমানে তি ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী।

১৯৪৭ সালে ব্যাপক হত্যাকা অনুষ্ঠিত হলো পাঞ্জাবে। স্বাধীনত

ালি' চলতে লাগলো অমানুষিক র্বরতায়। এই দাঙ্গার সময়ে কিছু- ংখ্যাক গুণ্ডা আমাদের অফিস আক্রমণ রার চেষ্টা করে। তখন একজন সহৃদয় াঙালী সামরিক অফিসারের সহায়তায় ামাদের কর্মীরা রক্ষা পান। পুলিন- বু লাহোর থেকে চলে আসেন সিমলা, খানে আমাদের অফিস খোলেন। ট্রিবিউন' পত্রিকাও স্যার মনোহারলালের চেষ্টায় চল্লিশ দিন পরে সিমলা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। তারপরে পুলিন-বাবু এসেছেন কলকাতায়, এখন তাঁর দক্ষ ও কুশলী সহযোগিতা লাভ করেছি আমরা কলকাতা অফিসে।

এই দাঙ্গার কালে আমাদের সহকর্মী শ্রীপরেশ মুখার্জি অপরিসীম সাহস ও মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। লাহোর অফিসে পুলিনবাবুর সহকারী ছিলেন তিনি। বহু দুর্গত মানুষের প্রাণরক্ষা করেছিলেন, নানা বিপদগ্রস্ত মানুষকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেছিলেন, সহায্য করেছিলেন সেই দুঃখতমসা রাত্রিতে আরো নানানতরভাবে। এখন তিনি আমাদের কর্ম-প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পদে নিযুক্ত, তাঁর কুশলী সাংবাদিকতাগুণে তিনি আমাদের একটি সম্পদ। (ক্রমশ)

স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন

শ্রীসরলাবালা সরকার

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিন স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য লণ্ডন ত্যাগ করেন।

নেপল্‌স পর্যন্ত ট্রেনে গিয়া সেখান হইতে জাহাজে উঠিবেন ইহাই ঠিক করা হইল। লণ্ডন ত্যাগ করিবার আগে স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দের হাতে সমস্ত কার্যভার অর্পণ করিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশে কি-ভাবে কার্য পরিচালনা করিতে হইবে নিয়ত স্বামীজীর সঙ্গে থাকিয়া তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সে দিক দিয়া চিন্তার কোন কারণ নাই। ভারতের চিন্তা ছাড়া স্বামীজীর মনে তখন আর অন্য কোন চিন্তাই ছিল না।

মিস্টার সেভিয়ারকে স্বামীজী বলিলেন :—

"আমার এখন একমাত্র ধ্যান—ভারতবর্ষ! আমার মন দৌড়ুচ্ছে ভারতের দিকে, ভারতের দিকে!"

ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনার্থে সমবেত ইংরেজ বন্ধুদের একজন যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, এই দীর্ঘকাল—প্রায় চারি বৎসর আপনি পাশ্চাত্ত্যে এমন বীর্যবান, গৌরবান্বিত ও বিলাসী পাশ্চাত্ত্য জাতির সঙ্গে বাস করেছেন—এরপর আপনার মাতৃভূমি আপনার কাছে কেমন লাগবে?"

উত্তরে স্বামীজী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার আগে আমি সমগ্র ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণাও আমার কাছে পবিত্র।"

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ডোভার পার হইয়া তাঁহারা ক্যালে পৌঁছিলেন, সেখান হইতে মিলান। মিলানে পৌঁছিয়া মিলানের বিখ্যাত গির্জা দেখিলেন, তাহার পর ইটালীর কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখিয়া ফ্লোরেন্সে আসিলেন।

ফ্লোরেন্স অতি নয়নমনোহর স্থান। লণ্ডন ও অন্যান্য দেশ হইতে বহু পর্যটক ফ্লোরেন্সে আসেন। স্বামীজীর এখানে একটি পার্কে আমেরিকা নিবাসী হেল দম্পতির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। মিসেস হেল, ইনিই স্বামীজীর চিকাগোর জনারণ্যে প্রথম আশ্রয়দাত্রী। স্বামীজী যখন চিকাগো শহরে ধর্ম-মহাসভার ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথ খুঁজিতে খুঁজিতে পথভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবসন্নদেহে পথের ধারে এক গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সময় অপরিচিতা যে মহিলা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়াছিলেন ও নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আতিথ্য দান করিয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন, ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে করিয়া-ছিলেন এবং ধর্ম-মহাসভায় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই মিসেস হেল। এই মিসেস হেল, তাঁহার স্বামী ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল, তাই এই অভাবনীয় সাক্ষাতে উভয় পক্ষই যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইঁহারা ফ্লোরেন্সে বেড়াইতে আসিয়াছেন, স্বামীজীর সঙ্গে অনেকদিন পরে এই-ভাবে দেখা হওয়ায় তাঁহাদের যত কিছু বলিবার ও জানিবার ছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই সব কথাবার্তা চলিল।

ফ্লোরেন্স হইতে স্বামীজী রোমে গেলেন এবং রোম হইতে নেপল্‌সে গিয়া জাহাজ ছাড়ার দেরী আছে দেখিয়া সেখানেও কয়েকদিন থাকিলেন। মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। কিন্তু গুডউইন সাউ-দাম্পটান হইতে জাহাজে আসিয়া নেপল্‌সে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া ঠিক করা হইয়াছিল। সাউদাম্পটানের জাহাজ যখন নেপল্‌সে পৌঁছিল, গুড-ইনও সেই জাহাজে নেপল্‌সে পৌঁছিলেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা সকলে একত্রে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

জাহাজে একঘেয়ে দিন কাটানোর জন্য নানারকম খেলার ব্যবস্থা থাকে। দাবা খেলাটাই স্বামীজীর পছন্দ ছিল, দাবা খেলায় খুব কম খেলোয়াড়ই তাঁহাকে হারাইতে পারিতেন। তা ছাড়া ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াও অনেক সময় কাটিয়া যাইত।

কয়েক দিন পরে জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছিল। এখানে কয়েক ঘণ্টা জাহাজ নোঙর বাঁধিবে। যাত্রীরা শহর দেখিবার জন্য এডেনে নামিলেন। স্বামীজীও জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে প্রায় মাইল তিনেক পথ গিয়া এক পুষ্করিণীর কাছে একটা পানের দোকান দেখিতে পাইলেন। পানওয়ালাকে দেখিয়া তাহার ভারতবাসী বলিয়া মনে হইল। কাছে গিয়া দেখিলেন ভারতীয়ই বটে, ভারতের পশ্চিম প্রদেশের লোক। সে তাহার দোকানে বসিয়া পান বিক্রি করিতেছে এবং সেই সঙ্গে একটা ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছে।

স্বামীজী তাহার দিকে এত তাড়া-তাড়ি আগাইয়া আসিলেন যে, তাঁহার সঙ্গী তিনজন অনেক পিছনে পড়িয়া রহিলেন। দোকানে গিয়াই স্বামীজী তাহার পাশের একটা তক্তার উপর বসিয়া পড়িয়া তাহাকে বলিলেন, "ভাই, তুমি আমাকে এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পার?"

কতদিন হইল স্বামীজী এমনভাবে হুঁকায় তামাক খান নাই। বরানগরের ভাঙা বাড়িতে অন্ন জুটুক বা নাই জুটুক

দা-কাটা তামাক খানিকটা সংগ্রহ করা থাকিত। একটা পুরানো গড়গড়াও ছিল। সেই হুঁকোয় সকলেই একজনের পর আর একজন তামাক খাইতেন, এই তামাক খাওয়াটাই ছিল সেই সর্বত্যাগী তরুণ সন্ন্যাসিগণের একমাত্র বিলাস।

পানওয়ালা তখনই তাঁহার কাছে হুঁকাটা আগাইয়া দিল, আর স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে হিন্দীতে তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন,—কোথায় তাহার ঘর,—বাড়িতে কে কে আছে,—এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে কেমন করিয়া ইত্যাদি। পানওয়ালাও মহাখুশী, এতদিন পরে দেশের একজন লোকের কাছে ঘর-গৃহস্থালির আলোচনা কি কম আনন্দের? ইতিমধ্যে মিস্টার সেভিয়ার, মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন আসিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। অবশ্য স্বামীজীর কোন কাজেই তাঁহারা কখনও অবাক হইতেন না।

জাহাজ এডেন ছাড়িল। ক্রমে আসিয়া পড়িল আরব সাগরে। আরও কিছু দূরে এই আরব সাগরের তীরেই দ্বারকাধাম এবং প্রভাসতীর্থ। এই সব তীর্থ স্বামীজী পায়ে হাঁটিয়া দর্শন করিয়াছেন, পথে গৃহস্থের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছেন। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গম-স্থলে ভাতবর্ষের দক্ষিণের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারী তীর্থ। সেই তীর্থের সঙ্গমের জলে অর্ধমগ্ন এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া যেদিন স্বামীজী ধ্যানের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, সেই ধ্যানের চিন্তাই কি এখন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে?

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পনেরোই জানুয়ারী ঊষার অরুণোদয়ের পূর্বমুহূর্ত। স্বামীজী ডেকের উপর অনবরত পাদচারণ করিতে-ছেন। এমন সময় দূরে দিগন্তে—যেন অস্পষ্টভাবে কি একটা তাঁহার নজরে পড়িল। যেখানে সাগরের সঙ্গে আকাশ মিশিয়াছে—সেখানে সেই জলরাশির বুকের উপর ঐ কি যেন দেখা যাইতেছে, ঐ কি ভারতবর্ষের তটরেখা? অন্য অনেক যাত্রীও এই সময় ডেকে সমাসীন, তাঁহারাও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সেই স্থানটি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "হ্যাঁ, কলম্বো বন্দরই দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা

নাগাদ জাহাজ পৌঁছিয়া যাবে কলম্বো।"

স্বামীজীর ভারতীয় সকল প্রদেশের বন্ধুগণ এবং তাঁহার গুরুভাইরা পূর্বেই তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়াছেন এবং কোন্ জাহাজে ও কোন্ সময়ে যে তিনি আসিয়া পৌঁছিবেন, সে সংবাদও তাঁহারা স্বামীজীর পত্রে জানিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভাইদের মধ্যে দু'জন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন। স্বামী শিবানন্দ মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কলম্বোতেই আসিয়াছেন। স্বামীজীর অনেক ভক্ত ও শিষ্যও কলম্বোতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য।

সমস্ত সিংহলের হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছে। জাহাজঘাট হইতে তাঁহার আগমনপথ সুসজ্জিত করা হইয়াছে, মাঝে মাঝে এক-একটি তোরণ, আর পথের দুই ধারে ও পথের পাশের বাড়িগুলি ফুল-পাতা ও আলোর মালায় সজ্জিত হইয়াছে। পথে ও জাহাজের ঘাটে জনতার অবধি নাই।

সন্ধ্যার সময় জাহাজ বন্দরে আসিয়া নোঙর করিল। স্বামীজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূরে হইতেই সেই দীর্ঘায়ত বীরমূর্তি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উত্থিত হইল, "জয়! সনাতন হিন্দুধর্মের জয়! জয় ভারতমাতার জয়!"

স্বামীজী কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে সেই লোকারণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এখনও তবে ভারতবাসী বাঁচিয়া আছে—এখনও এই সব মুমূর্ষু প্রাণেও জাগিতে পারে উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দ! এখনও সমগ্র জাতির প্রাণে একই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়! স্বামীজী আপন মনে বললেন :—

"ভারত নিশ্চয়ই আবার উঠবে। এই জনগণকে এবং দরিদ্রদের সুখী করতেই হবে। * * * আধ্যাত্মিকতার বন্যা এসেছে! আমি দেখছি ঐ বন্যা সারা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রবাহিত হচ্ছে অবিশ্রাম, বাধাবন্ধনহীন এবং সর্বপ্লাবিনী। প্রত্যেক ব্যক্তিই অগ্রসর হবে, প্রত্যেক শুভ ইচ্ছাই ইহার শক্তিবর্ধন করবে এবং প্রত্যেক হস্তই ইহার পথের বাধা সরিয়ে দেবে। জয়, প্রভুর জয়!"

স্বামীজী করজোড়ে প্রণাম করিলেন তাঁহাকেই, যিনি সকল শুভ ইচ্ছার প্রেরণা-দাতা। তখনই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে। দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন এবং তাঁহারই হাত ধরিয়া জাহাজ হইতে নামিবার পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পিছনে যে তিনজন ইউরোপীয় শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে গুরু-ভ্রাতার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

তীরে মাননীয় কুমার স্বামী একগাছি জুঁই ফুলের গড়ে মালা হাতে করিয়া তাঁহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বামীজী তীরে পদার্পণ করিলে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। রাস্তায় গাড়ি অপেক্ষা করিতে-ছিল, তাঁহারা অনেক কষ্টে জনতা অতিক্রম করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলেন, গাড়ি হইতেই স্বামীজী যুক্তকরে সমস্ত জনতাকে অভিবাদন জানাইলেন।

বার্নে স্ট্রীটে একটি মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। প্রথমে স্বামীজীকে সেইখানে লইয়া যাওয়া হইল। 'সিনামন গার্ডেনে' তাঁহার জন্য একটি বাসা ঠিক করা হইয়া-ছিল, তাহার কাছেই আরও একটা মণ্ডপ করা হইয়াছিল অভিনন্দন-সভার জন্য। স্বামীজী পদব্রজেই সিনামন গার্ডেনের মণ্ডপে গেলেন, সেখানে কুমারস্বামী সিংহলের হিন্দুগণের পক্ষ হইতে অভি-নন্দনপত্র দান করিলেন এবং স্বামীজীও তাহার উত্তরে কিছু বলিলেন। পরের দিন ফ্লোরাল হলে আর একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল, স্বামীজী সেখানেও বক্তৃতা করেন।

১৭ই তারিখে তিনি সিংহলের একটি শিব-মন্দির দর্শন করেন।

১৮ই তারিখে মিঃ চিল্লায়া নামক স্বামীজীর একজন ভক্ত তাঁহাকে জল-যোগের নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহার বাড়িতে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া পাবলিক হলে "বেদান্ত দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯শে তারিখে প্রত্যূষে তিনি ক্যাণ্ডি শহরে যাত্রা করেন, সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে একটি বাংলোবাড়িতে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পর ক্যাণ্ডি অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দান করা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি মাটাল নামক স্থানে যান, সেখানে রাত্রি কাটাইয়া ২০শে জানুয়ারী সকালে জাফ্নায় যাত্রা করেন। জাফ্না মাতারা হইতে দুইশত মাইল দূরে। পথে গাড়ির চাকা ভাঙ্গিয়া গেল, সুতরাং মিসেস সেভিয়ারের লগেজ প্রভৃতি একটি গরুরগাড়িতে তুলিয়া দিয়া তাঁহারা হাঁটিয়াই চলিলেন। কিছুদূর গিয়া আর একখানি গরুরগাড়ি পাওয়া গেল, সেই গরুরগাড়িতে চড়িয়া তাঁহারা অনুরাধা-পুরে পৌঁছিলেন।

অনুরাধাপুর সিংহলের প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের এক সমৃদ্ধিশালী শহর, এখন সেখানে বহু পুরাতন মন্দির ও মঠের ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। স্বামীজী যে বাসায় ছিলেন, তাহার কাছেই দুই হাজার বৎসর আগের এক রাজপ্রাসাদের ষোল শত বড় বড় পাথরের থাম তখনও খাড়া ছিল। স্বামীজী এখানে "পূজা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতায় তিনি পূজার বাহিরের আড়ম্বর প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া ইষ্টের নিকট যাহা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন, তাহাই প্রকৃত পূজা—এই কথা বলেন।

চব্বিশে সকালে স্বামীজী জাফ্না পৌঁছিলেন। জাফ্না একটি রমণীয় স্থান। এখানে তিনি পৌঁছিবামাত্র অনেক লোক আসিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া মিছিল করিয়া মিস্টার পি পোন্নাম-পালমের বাড়িতে লইয়া গেল। বৈকালে স্বামীজী হিন্দু কলেজে গেলেন, কলেজের সম্মুখে একটি বিরাট মণ্ডপে প্রায় পনেরো হাজার বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান সমবেত হয়েছিল। ত্রিবাঙ্কুরের অবসর-প্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ এস চাল্লাম্পা পিলাই তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার পর জাফ্নার সকল অধিবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইলে অভিনন্দনের উত্তর দিতে গিয়া স্বামীজী প্রায় এক ঘণ্টা

বক্তৃতা করেন। পরের দিন সন্ধ্যায় হিন্দু কলেজে তিনি আর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বক্তৃতাটির বিষয় ছিল "বেদান্তবাদ।" শ্রোতাগণের অনুরোধে সেদিন সিস্টার সেভিয়ারকেও কিছু বলিতে হইয়াছিল। মিস্টার সেভিয়ার কেন এদেশে আসিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বলিবার বিষয় ছিল। সে বক্তৃতাটিও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সিংহলের অধিবাসিগণ স্বামীজীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহার নিকট তাহারা বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইল যে, তিনি যেন তাহার আর একজন সন্ন্যাসী সহযোগীকে এখানে পাঠান, যিনি এখানে কিছুদিন থাকিয়া তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করিবেন এবং তাঁহার জীবনের কাহিনীসমূহ তাহাদের শুনাইবেন। স্বামীজী তাহাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেই স্বামী শিবানন্দকে সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনিও সেখানে কয়েক মাস থাকিয়া প্রচারকার্য করিয়াছিলেন। বর্তমানে সিংহলে নানা স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেকগুলি কেন্দ্র আছে।

২৫শে জানুয়ারী স্বামীজী সিংহল হইতে সমুদ্রপথে ভারতে যাত্রা করিলেন। মধ্যরাত্রে রওনা হইয়া বেলা তিনটার সময় পাম্বান রোডে পৌঁছিলেন, এখানে রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এই রামনাদের রাজাই স্বামীজীকে আমেরিকা যাইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং তখন হইতেই তিনি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী।

রামনাদে পৌঁছিবার পর সেখানকার অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র দিবার পর রাজা আবেগের সহিত স্বামীজীর গুণকীর্তন করেন এবং সভাভঙ্গ হইবার সময় রাজা প্রস্তাব করেন যে, স্বামীজীর এই আগমন চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ ফাণ্ডে টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার উদ্দেশ্যে আজ হইতে এখানেও একটি চাঁদা সংগ্রহের ফাণ্ড খোলা হউক।

সভাভঙ্গের পর রাজার যে গাড়ি স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিল, স্বামীজী গাড়িতে উঠিবার পর সেই গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া স্বয়ং রাজা এবং অন্যান্য সকলে গাড়ি টানিয়া রাজার বাংলো-বাড়িতে স্বামীজীকে লইয়া গেলেন। তখনকার দিনে বিশেষভাবে ভক্তি দেখাইবার ইহাই একটা পদ্ধতি ছিল।

পরের দিন শ্রীরামেশ্বর মন্দিরে গিয়া স্বামীজী শিবপূজা করিবার পর তাঁহার দর্শনার্থী জনতার অনুরোধে মন্দিরে 'তীর্থ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

রামনাদের রাজা পরদিন স্বামীজীর আগমন উপলক্ষে বহু দরিদ্রকে অন্নদান ও বস্ত্রদান করেন এবং ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের যেখানে স্বামীজী প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ 'বিজয়স্তম্ভ' নামে একটি চল্লিশ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সেই স্তম্ভে যে বাক্য ক্ষোদিত ছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—"পাশ্চাত্যে বেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপিত করে দিগ্-বিজয়ের পর তাঁর ইংরেজ শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই পুণ্যস্থানকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্য রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক এই স্মৃতিস্তম্ভ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী নির্মিত হল।"

রামনাদের রাজা ফনোগ্রাফে ধরিয়া রাখিবার জন্য স্বামীজীকে কিছু বলিবার অনুরোধ করিলে স্বামীজী "ভারতে শক্তিপূজার আবশ্যকতা" নামে একটি ছোট বক্তৃতা দেন। স্বামীজী রামনাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার সম্মানার্থে রাজা একটি বিশেষ দরবারও আহ্বান করেন।

রামনাদে স্বামীজী পাঁচদিন ছিলেন। দেশের অনুরোধে তিনি মধ্যরাত্রে রামনাদ হইতে প্রথমে পরমকুড়ি তারপর মনমদুরায় যান। প্রত্যেক স্থানে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ও অভিনন্দন দান করা হয়। তারপর তিনি মাদুরায় গিয়া মীনাক্ষি দেবীর মন্দির দর্শন করেন, সেখানে তিনি রামনাদের রাজার বাড়িতে দিনের বেলায় বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময় কুম্ভকোনম্ নামক স্থানে ট্রেনে রওনা হন।

মাদুরা হইতে কুম্ভকোনম্ যাইবার পথে প্রত্যেক স্টেশনে পৌঁছা হইতেই জনসমারোহ হইতে থাকে। দর্শনার্থী জনগণ নিশান ও ফুলের মালা হাতে লইয়া প্রত্যেক স্টেশনেই স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানায়। ইহার পর যখন ত্রিচিনপলি স্টেশনে আসিয়া গাড়ি পৌঁছিল, তখন দেখা গেল অতবড় স্টেশন একেবারে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী সেখানে নামিবেন না জানিয়া প্ল্যাটফর্মেই তাঁহাকে দুখানা অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল, একখানা জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এবং অপরখানি নগরের সমস্ত অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে। কুম্ভকোনমেও তাঁহাকে দুখানা অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, একখানি হিন্দু জনসাধারণের পক্ষ হইতে ও অন্যখানি ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে। স্বামীজী কুম্ভকোনমে তিনদিন ছিলেন, সেখানে 'বেদান্তের আদর্শ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

স্বামীজীর আগমনে সমস্ত মদ্রদেশে যেন এক নূতন জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, বিশেষত ছাত্রসমাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। কুম্ভকোনম্ হইতে স্বামীজী যখন মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন প্রতি স্টেশনেই সমানভাবে লোকের ভিড় হইতেছিল। মায়াভরম্ স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মেই তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং তিনি অভিনন্দনের উত্তর দান করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে স্বামীজী মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিবার বহু পূর্বেই সেখানে বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, ট্রেন পৌঁছিবামাত্র ঘন ঘন জয়ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী নামিবার আগেই তাঁহার গাড়ির দিকে এত ভিড় জমিয়া গেল যে, গাড়ি হইতে নামাই অসম্ভব হইয়া পড়িল। নামামাত্রই তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া সম্বর্ধনা করা হইল।

পথের দুই ধারের বাড়ি সাজানো হইয়াছিল এবং যে পথ দিয়া তাঁহার গাড়ি যাইবে সেই পথের স্থানে স্থানে গেট এবং হইয়াছিল। গাড়ি কিছু-দূর যাইতেই গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া জনতাই গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং মিস্টার বিলিজিবি আয়েঙ্গারের 'কার্নান ক্যাসেল' নামক বাড়ির কাছে আসিয়া গাড়ি থামিল, এইখানেই স্বামীজীর থাকিবার স্থান ঠিক করা হইয়াছিল।

স্বামীজী বাড়িতে পৌঁছিবামাত্র মাদ্রাজ 'বিদ্বান মনোরঞ্জিনী সভার' পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইল, পত্রখানি মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল মিস্টার কৃষ্ণমাচারিয়ার স্বামীজীর হাতে দিলেন। আর একখানি কানাড়ী ভাষায় লিখিত অভিনন্দনও দেওয়া হইল। এই সময় জাস্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার সকলকে সম্বোধন করিয়া জানাইলেন যে, স্বামীজী এখন বড়ই ক্লান্ত, তাঁহার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। এ কথায় সকলে তখনকার মত চলিয়া গেলেন।

পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। এইদিন টাউন হলে বিরাট এক সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় মাদ্রাজ অভ্যর্থনা সমিতি, বিদ্বৎ বৈদিক সভা ও সোস্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন স্বামীজীকে পৃথক পৃথক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। এছাড়া খেতরির মহারাজার পক্ষ থেকে একখানি এবং আরও অন্যান্য পক্ষ থেকে ২০খানি অভিনন্দন দেওয়া হইল। হলে এত বেশী লোক হইয়াছিল যে, স্থানাভাবে অনেককে বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী হল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটা ফিটন-গাড়ির কোচবক্সের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেখান হইতেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন।

মাদ্রাজে স্বামীজী নয়দিন ছিলেন এবং এই নয়দিনে তিনি মোট ছয়টি বক্তৃতা দেন; ১। অভিনন্দনের উত্তর। ২। আমার সমরনীতি। ৩। ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা। ৪। ভারতীয় মহাপুরুষগণ। ৫। আমাদের উপস্থিত কর্তব্য। ৬। ভারতের ভবিষ্যৎ।

এখানে স্বামীজীর "আমার সমর-নীতি" নামক বক্তৃতার শেষাংশের কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"এই আমাদের জাতীয় তরণী; হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোতই কোটি কোটি মানবাত্মাকে জীবননদীতে পার করছে। এরই সাহায্যে অনেক গৌরবান্বিত শতাব্দীর পর শতাব্দী কোটি কোটি মানবজীবন জীবন-নদীর অপর পারে অমৃতধামে নীত হয়েছে। আজ হয়তো তোমাদের নিজের দোষেই ওতে দু' একটা ছিদ্র হয়েছে, পোতখানি একটু জখমও হয়েছে, তাই কি তোমরা এখন ওর নিন্দা করবে? জগতের সব জিনিসের চেয়ে যে জিনিস আমাদের বেশী প্রয়োজনে লেগেছে, এখন কি তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হয়ে থাকে, আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান, আমাদেরই এগিয়ে গিয়ে সেই ছিদ্র বন্ধ করতে হবে। যদি আমরা তা করতে না পারি, তবে আনন্দের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের রুধির দিয়েও তার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি তা না পারি, তবে এস আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। আমরা আমাদের মাথা দিয়ে ঐ জাতীয় অর্ণবপোতের ছিদ্রগুলি বন্ধ করবো, কিন্তু কখনও তার নিন্দা করবো না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথাও বলো না, এর অতীত মহত্ত্বের জন্য আমি একে ভালবাসি। আমি তোমাদের ভালবাসি, কেননা তোমরা দেবগণের সন্তান, মহামহিমান্বিত পূর্ব-পুরুষগণের বংশধর। তোমাদের সকল প্রকারে কল্যাণ হোক। তোমাদের নিন্দা কেমন করে করতে পারি? কখনও পারি না। হে আমার সন্তানগণ, আমি তোমাদের কাছে আমার সব উদ্দেশ্যের কথা বলতে এসেছি, যদি তোমরা শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত আছি। যদি না শোন,—এমন কি আমাকে পদাঘাত ক'রে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দাও, তবুও আমি তোমাদের কাছেই ফিরে এসে বলব—আমরা সকলেই ডুবছি। আমি এবার এসেছি তোমাদের মাঝে বসতে। যদি ডুবতে হয় তবে এস সকলে একসঙ্গে ডুবি, কিন্তু তবু আমাদের মুখে যেন কারুর প্রতি কটূক্তি উচ্চারিত না হয়।"

দেশের উপর যে জ্বলন্ত ভালবাসা আগুনের মত নিরন্তর তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, এই সব ভাষণে তাহারই পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে দেশবাসীর অনাচার ও ক্লৈব্য তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছিল বটে কিন্তু তবুও দীপ্ত সূর্যের মত তাঁহার মনে সর্বদাই তেজ ও শক্তি বিকীর্ণ করিতেছিল ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক মহান্ আশা।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই, যেখানে যেখানে স্বামীজী গিয়াছেন সেখানেই লোকের মনে আশার আলো ও কর্মের উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার আগে সেখানকার অনেকেই মাদ্রাজে যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব প্রচার হয় সে জন্য তাঁহার একজন গুরুভাইকে সেখানে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

স্বামীজী জানিতেন মাদ্রাজীরা নিষ্ঠা-চারের বিশেষ ভক্ত, তাই তিনি বলিলেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সেখান হইতে তিনি এমন একজন সন্ন্যাসীকে মাদ্রাজে পাঠাইবেন যিনি দাক্ষিণাত্যের গোঁড়া ব্রাহ্মণগণের চেয়েও বেশী নিষ্ঠাবান।

স্বামীজীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে ও মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সূচনা এইভাবে আপনা হইতেই দেখা দিল। এই সূচনাই যেন মহান্ মহী-রুহের অংকুর স্বরূপ। সেই মহীরুহই এখন তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছায়া ও কল্যাণদান করিতেছে।

শার্ঙ্গদেব
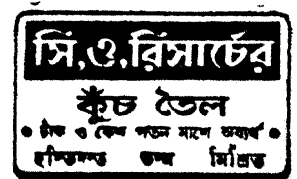
বাংলা গানে নজরুল

যে কবির মুখরতার একদিন সীমা ছিল না সে কবি আজ মূক। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশবাসীর অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ থেকে আনন্দিত বাণী শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হ'ল না। এ আমাদের পরম ক্ষতি। দত্তাপহারক বিধাতার এই অমোঘ বিধান। একদিন যে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে বিতরণ করে আর একদিন সেই আবার নিষ্ঠুর হাতে সবই অপহরণ করে। এমনিই তার রীতি। ভবিতব্যের এই কঠোর নির্দেশ যাঁকে মেনে নিতে হ'ল তিনি নীরবে তা মাথা পেতে নিয়েছেন। এই শ্রান্ত, ক্লান্ত বীরের উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন রইল, আর আমাদের প্রার্থনা যেন দুঃখ বহন করবার শক্তি বিধাতা তাঁকে দেন—পরম মঙ্গলময় যেন শান্তির প্রবাহে তাঁর ক্লেশ-জর্জর চিত্তকে অভিষিক্ত ক'রে করুণার স্নিগ্ধ স্পর্শ সঞ্চারিত করেন।

নজরুলের জীবনটাই কেটেছে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে—বন্ধনকে তিনি যেন কোনদিনই স্বীকার ক'রে নিতে পারেননি। আর এই বাঁধভাঙা চলাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। সেই উচ্ছল প্রাণ শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের মধ্যে। যেখানে গেছেন সেখানে একটা আচমকা আনন্দের হিল্লোল তুলে দিয়েছেন—সে গানেই হোক, আলাপেই হোক আর কৃতাতেই হোক। এ ছিল তাঁর চিরকালের স্বভাব—সেই ছেলেবেলা থেকে।

১৮৯৯ সালে ২৪শে মে তারিখে তাঁর জন্ম হয় আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। গরীবের ঘরে জন্ম তাঁর। বাল্য কাটিয়ে কৈশোরে পা দেবার আগেই বাবা মারা গেলেন। এই সময় থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই শুরু হ'ল। কিন্তু তা হ'লে কি হয় দারিদ্র্যের আঘাতে তাঁর ললিত-কলার প্রতি আসক্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেই ছেলেবেলা থেকেই পল্লীর নানারকম নাচ-গানের আসরে তিনি গান লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তবে পড়াশোনা নিয়মিত হয়নি। মাঝে একজন হিতৈষী তাঁকে ময়মনসিংহের এক গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন পড়াশোনা করাবার জন্য কিন্তু সেখানেও তাঁর বেশী দিন মন বসে নি। কিছুকাল বাদে ফিরে এসে রাণীগঞ্জের ইস্কুলে ভর্তি হ'লেন। সেখানে যখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন একদিন সৈন্যদলে ভর্তি হ'য়ে করাচী চ'লে গেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেটা শেষ পর্যায়। করাচীতে তিনি পারসী কবিদের গ্রন্থাদি পড়বার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। এখান থেকে নানারকমের লেখা তিনি বাঙলা পত্রিকাদিতে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

যুদ্ধ শেষ হ'ল পল্টন ছেড়ে নজরুল চুরুলিয়ায় ফিরে এলেন। সেখান থেকে চলে এলেন কলকাতায়। এইবারে তিনি গান-বাজনা এবং প্রকৃত সাহিত্য চর্চায় মন দিলেন। বাঙলা ১৩২৮ সালে "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় তাঁর যুগান্তকারী কবিতা "বিদ্রোহী" আত্মপ্রকাশ করল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নজরুল সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। সাহিত্যের সঙ্গে সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। ফজলুল হক সাহেবের প্রতিষ্ঠিত "নবযুগ" কাগজে তিনি কাজ করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব পত্রিকা "ধূমকেতু" তো ছিলই। নানারকম উদ্দীপক সাহিত্য সৃষ্টির ফলে সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে তিনি কারারুদ্ধ হ'ন। কারাগারে কর্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহারে মর্মাহত হ'য়ে তিনি প্রায়োপবেশন শুরু করেন। স্বয়ং কবিগুরু তাঁকে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ করেন এবং ক্রমে এই উপলক্ষ্যে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অবশেষে চল্লিশ দিন পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন। তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বসন্ত" গীতিনাট্যটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। নজরুল তাঁর "সঞ্চিতা" কাব্যগ্রন্থ কবিগুরুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯২৪ সালে নজরুল একটি হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন।

ক্রমে নজরুলের সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠল—গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে গান রচনায় নিযুক্ত করলেন। ব্যবসায়ের চাহিদা অনুসারে কবিকে অসংখ্য গান লিখতে হয়েছে—সে সব গানের সঙ্গে পরিচয় আজও আমাদের রয়েছে। বেতার কেন্দ্রের সঙ্গেও একদা তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

কবি প্রথম গভীর শোক পেলেন তাঁর মায়ের মৃত্যুতে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অতি আদরের ছেলে বুলবুল মারা গেল। শোকটা কবির প্রাণে গভীরভাবে বাজল। এই সময়টা তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন শান্তি পাবার উদ্দেশ্যে।

এর কয়েক বছর পরে তাঁর স্ত্রী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। বহু চিকিৎসা এবং অর্থব্যয় কবি করেছিলেন, কিন্তু ব্যাধি থেকে স্ত্রীকে মুক্ত করতে পারলেন না। অবিরাম আঘাত এবং আশাভঙ্গের ফলে ১৯৪২ নাগাদ তাঁর মস্তিষ্কে এক দুরারোগ্য জটিল ব্যাধির উৎপত্তি হ'ল। প্রথম দিকে প্রায় কোন চিকিৎসাই হয়নি এবং এক রকম অবহেলার ভিতর দিয়েই কেটে গেল প্রায় আট বছর। তারপর কিছুকাল আগে যখন চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হ'ল তখন নানাবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল

রোগ নিরাময়ের আর বিশেষ কোন আশা নেই। আজ কবি জীবন্মৃত অবস্থায় দিন যাপন করছেন এইটিই আমাদের অশেষ পরিতাপের বিষয়।

নজরুলের সবচেয়ে বড় দাবী তিনি জনপ্রিয় সুরকার। জীবিতকালে এত জনপ্রিয়তা খুব কম সুরশিল্পীর ভাগ্যেই ঘটেছে। বস্তুত বাঙলার সংগীতে নজরুলের যখন অভ্যুদয় হ'ল তখন দেশের জনসাধারণ এই রকম একটি প্রতিভার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। আমাদের দু'জন শ্রেষ্ঠ সুরকার তখনও বর্তমান, একজন রবীন্দ্রনাথ অপরজন অতুলপ্রসাদ। কবিগুরু তখন কতকটা নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। শান্তিনিকেতনে নিভৃতে তিনি যে সংগীত রচনা করেছিলেন তা কতকটা ছিল জনসাধারণের নাগালের বাইরে। কবিগুরু তখন তাঁর শিল্পী জীবনের পরিণতিতে এসে পৌঁছেছেন—সে সময় তাঁর সৃষ্টির স্বকীয়তা এবং গভীরতাকে উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা সাধারণের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিরই ছিল। ওদিকে অতুলপ্রসাদ রয়েছেন সুদূরে লখনউ-এ। তিনিও উপস্থিত হয়েছেন শিল্পী জীবনের পরিণত অবস্থায়। গজল, লাউনী, কাজরী, দাদরা বিবিধ ঠুংরি এবং টপ্পাভঙ্গিম গানে তিনি তখন বিশেষভাবে খ্যাত। কিন্তু তাঁর রচনায় দখল পাওয়াও সহজ ব্যাপার নয় কেননা তার গভীরতাও অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাঁর রচনা সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প আর তিনি ছিলেন বাঙলা থেকে বহু দূরে। সুতরাং বাঙলায় সংগীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ তাঁর ছিল না। উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে এই সময়ে বাঙলায় সাধারণ্যে প্রচলিত সংগীত এক গতানুগতিক নিয়মে চলেছিল এবং তাঁর অধোগতিও সূচিত হয়েছিল খানিকটা—এমন সময় বিচিত্র সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন নজরুল ইসলাম। সেই বৈচিত্র্য, নূতনত্ব এবং রচনায় সারল্য সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হল নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে।

নজরুলের রচনা যেমন বিপুল তেমনি তাঁর প্রতিভাও বহুমুখী। শুধু উদ্দীপনাময় স্বদেশী সংগীত রচনা করেই যে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা নয় সংগীতের বিবিধ কলাকৌশল নিয়েও

তিনি পরীক্ষা করেছেন প্রচুর, আর সেই সমস্ত পরীক্ষাই জনসাধারণের রুচির সঙ্গে মিলিয়ে করেছেন। আমাদের কাব্য-সংগীতে এইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

অনেক গান তিনি রচনা করেছেন গজলের ঢঙে—তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে যেমন ঠুংরির আমেজ, কার্ফার ছন্দ-চটুলত্ব, গজলের কতকগুলি বিশিষ্ট তান-ভঙ্গী। এই ধরনের গানের মধ্যে "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে", "এ আঁখিজল মোছ পিয়া", "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কার্ফার সঙ্গে আবার কোন কোন সময় দাদরাও মিশিয়েছেন—"ফাগুনে রাতের ফুলের নেশায়" গানটি এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া বাংলা গজল, দাদ্‌রায় "শেয়র্" এর ভঙ্গীটিও বোধ হয় নজরুলই প্রথম আনেন।

বিভিন্ন ধরনের দাদরায় নজরুল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। দাদরায় তাঁর বহু গান আছে,—এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গান হ'ল "রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়", "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর", "মেঘের হিন্দোলা", "দাঁড়ালে দুয়ারে মোর", "পানসে জোছনাতে", ঠুংরি দাদরায়—"কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী", "সখি বোলো বধুঁয়ারে।" "রুমুঝুমু রুমুঝুমু" গানটিতে একটি চমৎকার নৃত্য-ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বাংলা গানে কমই দেখা যায়। "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর" গানটিও একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সৃষ্টি। কাব্য-মাধুর্যের সঙ্গে সুরের একটি মনোহর গীত গানটিকে একটি অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য প্রদান করেছে। ঠুংরি দাদরার দিক থেকে "কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী" একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। অতুলপ্রসাদের পর এই ধরনের গানে একমাত্র নজরুল সার্থকতা লাভ করেছে।

এ সব ছাড়া বিদেশী ঢংও কয়েকটি গানে তিনি আনতে চেষ্টা করেছিলেন। "শুকনো পাতার নূপুর পায়ে" গানটি এই ধরনের একটি সার্থক রচনা। গানটির সুর এক প্রকার আরবী সুর থেকে নেওয়া এবং তাল কাহারবা। ছন্দ এবং সুর বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমাদের কাব্য সংগীতে এটিও অবশ্যই একটি উল্লেখ-যোগ্য সৃষ্টি। গানটির সুরে যেন মরু-ভূমির ঘূর্ণী হাওয়ার চঞ্চলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং ছন্দে যেন তার নাচন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রতি কলির শেষে কাহারবা ছন্দে "জল তরঙ্গে ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ ঢেউ তুলে সে যায়" এই ধুয়াটিতেও যেন একটা নৃত্যের হিল্লোল প্রবাহিত হয়।

লোক সংগীতের ঢঙে কয়েকটি রচনাতেও নজরুল বেশ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এর মধ্যে "আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল" গানটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এমন মধুর বাউল ঢঙের গান খুব কমই পাওয়া যায়। এর সঞ্চারী অংশটিও ভারি স্নিগ্ধ।

"ভুলায়নি আমারি কুল
ভুলেছে নিজেও সে কুল
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল
মোর সাথে মিলন বিরহ"

উদারার ধৈবত ছোঁয়া আরম্ভটি থেকে নিয়ে সুরের কোমল সঞ্চরণে যেন এই অংশটি মন ভোলানো আবেশের সৃষ্টি করেছে।

নজরুলের উদ্দীপক সংগীতের অনেক সুর সম্ভবত হারিয়ে গেছে। "কারার ঐ লৌহ কপাট", "আজি রক্ত নিশি ভোরে", "এই শিকল পরা ছল মোদের" প্রভৃতি গানগুলি খুব অল্প লোকেই জানেন। বিশেষ করে "এই শিকল পরা ছল মোদের" গানটির সুর নানা কারণেই রক্ষিত হওয়া উচিত। কারাবাসে এটি কবির অতি প্রিয় গান ছিল। ইংরেজ সরকার কবির হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি দিয়ে কবিকে যখন নির্জন কক্ষে বন্দী করে রেখেছিলেন তখন তিনি এই গানটি রচনা করে গেয়েছিলেন।

এই শিকল পরা ছল মোদের
এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করব রে বিকল!
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের
বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের
সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা' নয় এ শিকল ভাঙা কল।

এই রকম আরো অনেক স্বদেশী সংগীতের সুর লিপিবদ্ধ করা নেই। অচিরে এই সব গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়া দরকার। এখনও অনেকে রয়েছেন যাঁরা নজরুলের অনেক গানের সুর জানেন এ সব সুর যদি এখন ধরে রাখা না যায় তবে ভবিষ্যতে আর পাবার উপায় থাকবে না।

শেষ জীবনে কবি লুপ্ত রাগসংগীতের পুনরুদ্ধার কল্পে কিছু কিছু গান রচনা করেছিলেন সেগুলিরও অনেক স্বরলিপি বেরোয় নি। রাগসংগীতকে আশ্রয় করে নজরুল যে সব গান রচনা করেছেন অনেক দিক দিয়ে তার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে—এই কারণেই তাঁর এই সব গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে সত্যভাষণের খাতিরে একটি কথা বলতে হবে। নজরুল সাহিত্য ও সংগীতের অনুরাগী কোন লেখক একটি সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে সমালোচক হিসাবে নজরুলকে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুল-প্রসাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। এমন কি তাঁর মতে স্বদেশী গান রচনায় কৃতিত্ব কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথেরও ওপরে। নজরুলের অত্যন্ত অনুরাগী হয়েও এই ধরনের মন্তব্যকে গ্রহণ করতে আমার প্রবল আপত্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ আমাদের বর্তমান কাব্যসংগীতকে গড়ে তুলেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। সুরের বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা, গভীরত্ব কোন দিক দিয়েই নজরুলের প্রতিভা এঁদের সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। বস্তুত, এঁদের গড়া সংগীতেই নজরুল বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছিলেন। এই দিক থেকেই তাঁকে আমরা একজন বিচিত্র স্রষ্টা বলে অভিনন্দিত করি এবং তাঁর রচনার ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু স্তুতির আতিশয্যে একজনকে প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত ক'রে অপরকে সমধিক গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টা সমর্থন যোগ্য নয়। সমালোচনার প্রকৃত মূল্যই অকুণ্ঠ সত্যভাষণে নতুবা তাকে সমালোচনা বলব না, তা স্তুতিবাদেরই নামান্তর।

ব্যাসঋষি পাহাড়ের চূড়ায়

মনোরঞ্জন শর্মারায়

ভ্রমণ তালিকা অনুসারে আমাদের শেষ ক্যাম্প ছিলো মানালীতে। পাঞ্জাবের পার্বত্য কাংড়া জেলার কুলু উপত্যকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মানালী শহর অবস্থিত। স্থানীয় লোক একে বলে শহর, সমতলবাসীরা স্বীকার করুক আর নাই করুক। আমাদের এই ভ্রমণের অন্যান্য প্রায় সব ক্যাম্পের মতোই মানালী ও পাহাড়ী বিপাশা নদীর (Beas) তীরে। এর উচ্চতা ৬৫০০´ ফিট। কুলু উপত্যকা বলতে সুরমা উপত্যকা অথবা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো বিরাট কিছু ধরে নিলে ভুল করা হবে। বিপাশার দুই তীরের অতি সংকীর্ণ পার্বত্য ঢালু অঞ্চল নিয়েই কুলু উপত্যকা। এ কোথাও এক ফার্লং প্রশস্ত আবার কোথাও বা এক ক্রোশ। হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি শহর থেকে মানালী পর্যন্ত মোটরে গেলে একদিনেই সমস্ত উপত্যকা দেখে নেওয়া যায়। আর ভাগ্যদোষে মোটরচালক একটু আনাড়ী হলে, খাড়া পাথুরে পাহাড়ের গা-কেটে-কেটে চলা আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাস্তা থেকে যে কোন মুহূর্তে একটু সরে গিয়ে সহস্রাধিক ফিট নীচের বিপাশা হয়ে পর-জগতে পৌঁছার সুযোগও ঘটে যেতে পারে। যাক্‌, যা' বলতে চাইছিলাম,—সেই মানালী শহর। মানালী থেকে ১৩ই জুন (১৯৫৩ ইংরাজী) আমাদের রহ্‌টাং গিরিপথে (উচ্চতা ১৩,০৫০´ ফিট) যাবার কথা ছিল। শিক্ষা ভ্রমণে নয়—প্রমোদ ভ্রমণে। প্রমোদের উৎস ছিলো বরফ, অর্থাৎ বরফ দেখাই ছিল এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ভুল বললাম বরফ দেখা নয়, বরফ আমরা অনেক দেখেছি—যতোবারই হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছি। এমন কি শীতকালে নববনে (নিউ ফরেস্ট, দেরাদুন) ছাত্রাবাসের কক্ষে বিছানায় শুয়ে শুয়েও বরফ আমরা দেখতে পাই মুসৌরী পাহাড়ে। বস্তুত বরফের স্পর্শ লাভ করাই ছিল ভ্রমণের উদ্দেশ্য। প্রমোদ-ভ্রমণে শিক্ষকের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের অপছন্দ হবে বলেই আমাদের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জি এস ধীলন এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনস্ট্রাক্টর মিঃ ডবলিউ এন রামচন্দানি অভিযাত্রী দলভুক্ত হতে চান নি প্রথমে। শেষ পর্যন্ত আমাদের আব্দার এড়াতে পারেন নি তাঁরা।

১৩ই জুন। বেলা দুটোয় মিঃ ধিলন ও মিঃ রামচন্দানি এবং একজন ক্যাম্প ক্লার্কসহ আমরা পঁচিশজন ছাত্র (ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা—৭১) মানালী থেকে রওনা হলাম। ন'-মাইল দূরবর্তী রেহ্‌লা (উচ্চতা ৯০০০ ফিট) বিশ্রামাগারে রাত কাটিয়ে পরদিন রহ্‌টাংএ যাওয়াই স্থির হ'ল। বিপাশার গা ঘেঁষে চলা সংকীর্ণ বনোপথ ধরে আমরা পায়ে হেঁটে চললাম, আর আমাদের বিছানাপত্র (দু'জন ছাত্রের জন্য একটি বিছানা) এবং মেসের মালপত্র চললো খচ্চর বোঝাই হয়ে। চলতে চলতে দূরে পাহাড়ের গায়ে শুভ্র বরফ দেখে আনমনা হয়ে পড়লাম। মনে এক অসীম আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ভাবলাম—তবে কি সত্যি বরফের দেশে যাচ্ছি! ছেলেবেলার ঠাকুরমার 'সোনার কাঠি—রূপোর কাঠি' গল্পের মতো শেষ পর্যন্ত সবই মিথ্যে হয়ে যাবে না তো? এমনি সময়ে ঝরণার ঝির ঝির গানে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে অদূরে কালো পাহাড়ের গায়ে গলিত রজতধারা দেখে কৈশোরে পড়া সত্যেন্দ্র দত্তের **'ঝরণা'** কবিতা মনে পড়ে গেল। এর প্রতিটি কথার যাথার্থ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে আবার পথ চললাম। আবার রহস্যময় বরফ পাহাড়ে মন চলে গেল। রহস্যের ভিতর দিয়ে আট দশ মাইল দূরের বরফ পাহাড়কে আধ মাইল দূরে

ব্যাসঋষি শৃঙ্গে আরোহণের পথে

তুষারাবৃত ব্যাসঋষি শৃঙ্গে আরোহী দল

লে ভুল হল। ভুল হল ঐ পাহাড়ের লত্বের পরিমাণ হিসেব করতে—৭০ ডিগ্রী লত্বকে ৩০ ডিগ্রী বলেই মনে হল। রেতম পাহাড়ের বরফকে মনে হল আকাশের গায়ের তুলো মেঘ। অপূর্ব আনন্দের ভেতর দিয়ে আমরা পথ চললাম- বিপাশার কূল-ঘেঁষে-চলা আঁকা-বাঁকা সংকীর্ণ পাথুরে বনোপথ। এই পথই রহ্‌টাং হয়ে স্পিতি এবং লাহুল উপত্যকার উপর দিয়ে তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছে। কুলু উপত্যকার সঙ্গে তথা পাঞ্জাবের অপর অংশের সঙ্গে লাহুল এবং স্পিতি উপত্যকার ব্যবসা-বাণিজ্যের এইটিই একমাত্র পথ। সুদীর্ঘদিন ধরে এই সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়েই প্রতি শীতে এবং গ্রীষ্মে লাহুলী মেষপালকেরা সহস্র সহস্র মেষ নিয়ে আসা-যাওয়া করছে। এদের কয়েকটি দলকে আমরাও পেলাম; আর পেলাম পশম ব্যবসায়ী তিব্বতীদের এবং কুলুর খচ্চরওয়ালাদের। যতই উপরে উঠতে লাগলাম, গাছপালার সংখ্যা ততই কমতে লাগল। বিপাশার কূল-ঘেঁষে জন্মেছে যতো সিলভার ফার, স্প্রুস্‌, ওক্‌ প্রভৃতি গাছ। প্রত্যেক গাছই বরফাহত। দূরের সুউচ্চ পাহাড়ে গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। মানালী থেকে রেহ্‌লা পর্যন্ত পথে বিপাশায়-পড়া কতগুলি নালা যে পার হয়ে গেলাম, তা গোনবার ধৈর্যও হল না। তবে এইটুকু মনে পড়ে যে, কোঠিলিভার পুলের উপর দিয়ে চারবার বিপাশা পার হয়েছি। পথে অনেক ঝরণাই দেখলাম। প্রত্যেকটি ঝরণার রূপই চোখে নতুন হয়ে ঠেকল। প্রত্যেকটি ঝরণাই মনে এক একটা নতুন তরঙ্গ এনে দিল। কবি যদি হতাম, তবে সেই তরঙ্গগুলো ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত করতাম কবিতায়। কিন্তু কবি না হলেও মনের কল্পনাকে ভাষায় রূপ দেবার দুর্নিবার সাধ যে জাগে নি, এমন নয়। সাধ ছিল; কিন্তু সাধ্য ছিল না। অসীম দুঃখে মানুষ যেমন কাঁদিতে পারে না, তেমনি চারদিকের অফুরন্ত অপূর্ব সৌন্দর্য দেখেও মানুষ যে ভাষা হারিয়ে ফেলে, এর আগে তা কখনো অনুভব করি নি। যতই এগিয়ে চললাম, বলা বাহুল্য, নদীর প্রাশস্ত্য ততই কমতে লাগল। কোথাও নদী একশ' দুশ' ফিট গভীর খাদ বা গর্ত কেটে বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকার খাদের নীচে অনেক জায়গায়ই জল দেখা গেল না। কোথাও কোথাও সাপের মতোই কি যেন একটা চিক্‌ চিক্‌ করছে বলে মনে হল। হরেক মনোহর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে অক্লান্তভাবে আমরা এগিয়ে চললাম—এগিয়ে চললাম সেই পথে, যে পথ শীতের কয়েক মাস বরফের নীচে হারিয়ে যায়। ক্রমে কোঠি (উচ্চতা ৮০০০ ফিট) বন বিভাগীয় বিশ্রামাগারে পৌঁছলাম। রহ্‌টাং যাত্রীরা ইচ্ছে করলে এখানেও থাকতে পারে। বিশেষ করে ফেরবার পথে অনেকেই এখানে রাত কাটায়। বলা বাহুল্য, আমরা এগিয়ে চললাম রেহ্‌লার উদ্দেশ্যে। ওখান থেকে রেহ্‌লা দু'মাইল দূরে এবং ১০০০০ ফিট উচ্চে। পাঁচটায় আমরা রেহ্‌লা পৌঁছলাম। চড়াই উঠে উঠে চলা সংকীর্ণ পাথুরে রাস্তায় এত তাড়াতাড়ি ন'মাইল অতিক্রম করতে পেরে আমরা সত্যিই খুব আশ্চর্য হলাম। মালপত্রবহনকারী খচ্চরগুলো আমাদের অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছিল।

উৎসবসজ্জায় মানালী অধিবাসী

দেওদার বন, ওপাশে এঁকেবেঁকে চলেছে বিপাশা নদী

রেহ্‌লা পৌঁছার পর যে রকম ক্ষিধে অনুভব করলাম, জীবনে বোধ হয় কোনদিনই এভাবে অনুভব করি নি। ভাগ্যিস ওখানে একটা স্টল ছিল। সে এক অদ্ভুত স্টল। পর্বতের পাথর কেটে তৈরী গুহার ভিতরে বন্যজন্তুর বাসস্থানের মতোই ভয়াবহ অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই স্টল। এর মালিক একজন লাহুলী। গ্রীষ্মের কয়েকমাসই এই স্টলের প্রাণ। এক কাপ চায়ের দাম চার আনা; তবে প্রস্তুতি ভালো। খাবার মতো অন্য কিছু ছিল না, তাই একটা ফুল্‌কা (আটার রুটি) তৈরী করে দেবার জন্যে দোকানীকে অনুরোধ করলাম। প্রথমে সে রাজী হয় নি; শেষে আমার বিশেষ অনুরোধে একটা লাহুলী ফুল্‌কা তৈরী করে দিল। খুব উচ্চ দাম দিতে হল সেই ফুল্‌কার। কিন্তু খেতে এত তেতো লাগল এবং এত বিশ্রী গন্ধ পেলাম যে, আমার মনে হয় মন্বন্তর ছাড়া বাঙলার কোন লোকই এই ফুল্‌কা হাতেও নেবে না। আটার ফুল্‌কা নয় সেটা; অন্য আরো কিসের তৈরী বলেছিল মনে নেই। এই ফুল্‌কাই নাকি লাহুলীদের নিত্য খাদ্য। যাক্‌ সেই ফুলকার বদনাম করা আমার পক্ষে নেমকহারামী হবে, কারণ সেটাই আমাকে ক্ষিধেতে শান্তি দিয়েছিল—অন্তত সাময়িকভাবে।

এর ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের মেসে ইচ্ছেমত চা-পাকুড়ী খাওয়া হল। শরীর আবার সম্পূর্ণ সজীব হয়ে উঠল। তারপর বিশ্রামাগারের অনতিদূরে বিপাশার কূলে একটি পাথরের আড়ালে খানিকক্ষণ বসেছিলাম একা—বসেছিলাম ডায়েরী লিখতে। কিন্তু হল না। আনন্দের অসীম সঞ্চয়কে ডায়েরীর পাতায় সীমাবদ্ধ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হল। লিখতে শুরু করে লেখার সামগ্রীর প্রাচুর্যে আমি যখন চমকে উঠেছি, এমন সময় দেখলাম আমার কয়েকটি বন্ধু নদীর উজান ধরে ছুটে চলেছে—জলোচ্ছ্বাসের সাথে আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস মিশিয়ে দিয়ে। ডায়েরী বন্ধ করে আমিও তাদের সঙ্গ নিলাম। আধ মাইল চলার পর একটা

মনোরম জলপ্রপাতে এসে পৌঁছলাম। জল সেখানে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ছে। বৈকালী সূর্যের সোনালীচ্ছটায় এর রূপ যে কোন অসমৃদ্ধ হৃদয়কেও রঞ্জিত করতে সক্ষম। সেই অশান্ত জল-প্রপাতের সঙ্গে সেদিনকার আমার সেই অশান্ত মনের কোথায় যেন একটা মিল আছে। এর গগনভেদী গর্জনের মতো আমার মনেও সেদিন ছিল এলোমেলো অগণিত ভাবের উচ্ছ্বাস, কলমের শান্ত সুরে যাকে প্রকাশ করতে বারে বারেই ব্যর্থ হলাম। গর্জনশালী সেই জলপ্রপাতেরই বাঁদিকে অনতিদূরে ছোট্ট একটি ঝরণা। ঝরণাও জলপ্রপাতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে। সেই কণ্ঠে গর্জনের ভয়াবহতা নেই, আছে শান্ত নারীকণ্ঠের লালিত্য। লোকালয় থেকে অনেক দূরেও বরফ গলা জলের দুটি বিভিন্ন প্রকাশের ভিতর দিয়ে একই সঙ্গে নর ও নারীর আনন্দের কলোচ্ছ্বাস শুনে আপন একলা-চলা জীবনকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল। সত্যি এমন দিনে প্রেয়সীর বড় প্রয়োজন।

জলপ্রপাতের একটু দূরেই একটি পর্বত-প্রাচীর বা রিজ্। এর উপরকার নালার নীচু জায়গাগুলোতে বরফ জমে আছে। দূর থেকে মনে হয় যেন প্রাচীরের ওধার থেকে সাদা হাতের আঙ্গুল বাড়িয়ে কোন এক স্বর্গীয় মহামানব আমাদের ডাকছে। সবাই আমরা ওখানে যাবার জন্যে পাগল হয়ে পড়লাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে ফিরে আসতে পারব বলে আমাদের মনে হল। কিন্তু স্থানীয় ফরেস্ট গার্ডের মুখে শুনলাম, সেই জায়গাটা আড়াই মাইল থেকে তিন মাইল দূরে। ওখানে গিয়ে ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তাই মনমরা হয়ে সেখানে যাওয়া সেদিনকার মতো স্থগিত রাখতে হল। গায়ে গরম জামা-কাপড় ছিল; তবু মধ্য জুনের সন্ধ্যায় ডিসেম্বরের শেষ রাতের শীত অনুভব করলাম। সবাই ফিরে এলাম বিশ্রামাগারে।

বিশ্রামাগার আকারে অত্যন্ত ছোট। একসঙ্গে অন্তত তিন-চারজন লোক থাকতে পারে। এতে আছে অসমান দুটো কোঠা আর দু'দিকে দুটো বারান্দা। এর চাল কাঠের, আর দেয়াল মাটির। চারদিকে সুউচ্চ পাহাড়ে-ঘেরা নির্জনতার মাঝে এই বিশ্রামাগারের নিঃসঙ্গ অবস্থান সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। ছোট্ট কোঠাটিতে ধিলন ও রামচন্দানি সাহেবের থাকার ব্যবস্থা হল। বারান্দায় ব্যবস্থা হলো ক্যাম্প-ক্লার্ক ও খচ্চরওয়ালাদের। আর পঁচিশজন বন্ধুবান্ধব আমরা কোনরকমে বড় কোঠাটিতে আস্তানা গাড়লাম।

মেসে রান্না হবার তখনো অনেক বাকী। বন্ধুবান্ধব সবাই বসলো তাসের আড্ডায়, আর আমি শীতের কাঁপুনিকে বেমালুম ভুলে চলে গেলাম নদীর ধারে।

মিঃ ধিলন বরফ ভেঙ্গে পর্বতের চূড়ার দিকে চলেছেন

গেলাম গান শুনতে—নদীর কল্ কল্ সুমিষ্ট অনন্ত গান, যে গান কবে শুরু হয়েছে, কখন শেষ হবে, কেউ জানে না। সেই গানের কলতানের ভিতর অপ্রত্যাশিত-ভাবে মনে পড়ল দেশের কথা—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কথা। ভাবলাম, আমার এই আনন্দের অসীম আহরণকে কিভাবে, কোন্ ভাষায় পরিবেশন করব তাঁদের কাছে? কি কি বলব? কত-টুকুই বা তাঁরা অনুভব করতে পারবেন আমার অপূর্ণ বক্তব্য থেকে! যা' আমরা চোখে দেখি, তা ভাষায় রূপ দেওয়া অনেকটা সহজ; কিন্তু যা নিতান্তই অনুভূতির—ভাষার সাহায্যে তাকে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারণ করা ততো সহজ নয়।

মেসের ঘণ্টার শব্দে চমক ভাঙ্গল। বিশ্রামাগারে ফিরে এলাম। নৈশভোজনে বসে শুনলাম, মানচিত্র দেখে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পরদিনের জন্যে নতুন গন্তব্য স্থান নির্ধারণ করেছেন। রহ্টাং গিরিপথেরই উত্তরদিকে ১৫১৬৪ ফিট উচ্চ ব্যাস-ঋষি-শৃঙ্গে আরোহণ করা স্থির হয়েছে। রেঙ্গার কলেজের ছাত্রাবস্থায় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব একবার এই তুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গে চড়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর আরো দু'জন বন্ধুসহ। কিন্তু সে যাত্রা তাঁরা সফল হন নি—দুর্লঙ্ঘ্য রাস্তা অবলম্বন করেছিলেন বলে। এবারে তাই সমস্ত রৈখিক মানচিত্র অর্থাৎ কণ্টুর ম্যাপ দেখে আরোহণের রাস্তা ঠিক করা হল।

শৃঙ্গারোহণের কথা শুনে আমাদের মাঝে আনন্দের একটা রোল পড়ে গেল। কিন্তু শৃঙ্গারোহণে যেমন প্রবল উৎসাহ এবং অসীম অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তেমনি চূড়ান্ত প্রস্তুতিও অত্যাবশ্যক। প্রথম দুটো বস্তু আমাদের মধ্যে থাকলেও তৃতীয়টির নিতান্তই অভাব ছিল। আরোহণের সময় পরস্পরের কোমর বাঁধার সিল্কের দড়ি, বায়ুনিরোধক সিল্কের জামাকাপড়, লোহার বিশেষ কাঁটা (ক্র্যাম্পন)যুক্ত তুষার-পাদুকা (আইস-বুট), পর্বতারোহণের জন্যে তুষার-কুঠার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলো আমাদের ছিল না। আলট্রা-ভায়োলেট আলো থেকে বাঁচবার জন্যে রঙিন চশমা ব্যবহার করা প্রয়োজন; নতুবা হিমান্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ছিল না আমাদের কাছে সেরকম কোন চশমা। বরফের উপর প্রতিফলিত সূর্যতাপ কোন কোন সময় এতো গরম হয় যে, তখন তাতে গায়ের চামড়াও পুড়ে যেতে পারে; কিন্তু আমাদের কাছে সূর্যতাপনিরোধক কোন মলমও ছিল না। এমনি অবস্থায় শৃঙ্গারোহণ দুঃসাধ্য হোক অথবা অসাধ্যই হোক, সবারই মন এক রোমাঞ্চকর অভিযানের আশায় আনন্দে ভরে উঠল।

খাওয়ার পর সবাই বিছানার আশ্রয় নিলাম। কিন্তু অনেকেরই চোখের পাতায় ঘুম এল না অনেকক্ষণ। হরেক জল্পনা-কল্পনার পর যখন আমার চোখ বুজে এল, তখনো অখণ্ড বিশ্রাম খণ্ডিত করল স্বপ্ন—শুধু পাহাড় চড়ার স্বপ্ন।

১৪ই জুন। ভোরবেলাই প্রস্তুতি শুরু হল। জলখাবারের পর প্যাক লাঞ্চ সঙ্গে নিলাম। থারমস্ সঙ্গে ছি

পর্বতগাত্রে গ্লাসিয়ারের মধ্যে লেখক
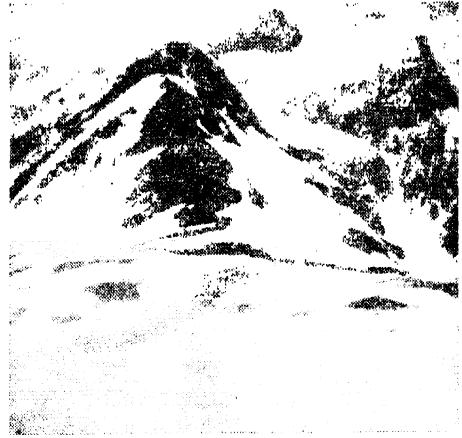
তুষারাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গ ব্যাসঋষি

না, তাই পানীয়জল নেওয়া হল না। পোশাকের মধ্যে গরম প্যাণ্ট, সার্ট, সোয়েটার এবং কলেজ ব্লেজার ছিল প্রায় প্রত্যেকেরই। আইস্ বুটের বদলে ছিল সাধারণ ফরেস্ট বুট এবং তুষার কুঠারের বদলে সাধারণ কাঠের লাঠিই অবলম্বন করতে হল। সাড়ে সাতটায় আমরা রহ্‌টাংগামী পাথুরে পাহাড়ীপথ (রকী ব্রিড্‌ল পাথ) ধরে যাত্রা করলাম। সঙ্গে একজন স্থানীয় ফরেস্ট গার্ডকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে নিলাম। পথের দু'পাশে কোন গাছপালা নেই। (সিলভার ফার্ এবং স্প্রুস্ কোথাও কোথাও ১১০০০ ফিট পর্যন্ত জন্মাতে পারে। এর উপর সাধারণত কোন গাছপালা জন্মায় না।) শুধু পাথর আর পাথর। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ঘাস-গালিচাও দেখতে পাওয়া যায়। রেহ্‌লা থেকে আড়াই মাইল গিয়েই আমরা বরফস্পর্শ লাভ করলাম,—এখানে ওখানে গলিতাবশিষ্ট বরফ। ঐখানকার উচ্চতা ১১০০০ ফিটেরও উপর। তারপর আমরা রহ্‌টাং গিরিপথগামী বুনোপথ ছেড়ে বাঁয়ের পাহাড় ধরে চললাম। গ্রীষ্মের উত্তাপে এসব জায়গার বরফ গলে গিয়েছে বা যাচ্ছে। যেখানে বরফ গলে গিয়েছে, সেখানে নানারকম ঘাস এবং গুল্মবৃক্ষ জন্মেছে নানা রংএর বিচিত্র ফুল নিয়ে। এইসব ঘাস এবং গুল্মের শতকরা প্রায় নব্বইটিই মূল্যবান অনেক আয়ুর্বেদিক ঔষধের উৎস। কোথাও কোথাও এই বিচিত্র ঘাস-গালিচা আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে। নিস্তব্ধ সবুজ প্রকৃতির মাঝে, হরেক রংএর ফুলের মাতামাতি এবং সুমিষ্ট মন-মাতানো গন্ধ এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জন্মিয়ে দিল। এইসব সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। সঙ্গী ফরেস্ট গার্ড আমাদের সঙ্গে প্রায় ১১০০০ ফিট পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর কণ্টুর ম্যাপ দেখেই আমাদের পথ চলতে হল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দলপতি হিসেবে আগে আগে চললেন, আর আমরা তাঁকে অনুসরণ করে চললাম। ১২০০০ ফিটের উপরে বরফের মাত্রা যথেষ্ট বেড়ে গেল। পাহাড়ের প্রত্যেকটি নীচু জায়গাই ছিল বরফে ভর্তি। চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে ক্রমে আমরা যতই উপরে উঠতে লাগলাম, ধীরে ধীরে আরোহীর সংখ্যা ততই কমতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে যারা পিছনে পড়ল, মন তাদের ভরে উঠল পরাজয়ের গ্লানিতে। ক্রমে পাহাড়ের চড়াই বেড়ে চলল। ১৩০০০ ফিটের উপরে গিয়ে প্রায় একলাগা বরফের সমুদ্রই ভাঙতে হল। তুষার-কুঠার না থাকায়, শক্ত কোনাচে বরফের (সেরাক) উপর দিয়ে চলতে বেশ অসুবিধে হল। বরফের মাঝে বুটের সাহায্যে জোরে আঘাত করে অনেকটা সিঁড়ির মত তৈরী করতে করতে পথ এগিয়ে চলতে হল। কোথাও একটু উৎরাই পেলে তাকে অতিক্রম করতে হল অতি-সাবধানে বরফের উপর পিছলে চলে, চলতি স্লাইড করে। বলা বাহুল্য, সর্বত্রই লাঠির সাহায্য ছিল অপরিহার্য। রহ্‌টাংগামী পথ ছেড়ে প্রায় চার মাইল চলার পর অর্থাৎ প্রায় ১৩,৫০০ ফিটে পথ চলা খুব দুঃসাধ্য হল। প্রায় সর্বত্রই খাড়া (অন্তত ৪৫ ডিগ্রী) পাহাড়ের উপর পিছলে বরফ। কোথাও কোথাও বরফহীন জায়গায় ভগ্ন স্লেট পাথরের (স্লেট অ্যাণ্ড শেল) সন্ধান পাওয়া যায় বটে, তবে সে সব জায়গায় পাহাড় এতো খাড়া যে, ছোঁওয়া মাত্রই ঘড় ঘড় করে সব নীচে চলে যায়। ঐসব জায়গায় বরফ টিকতে পারে না বলেই তারা বরফহীন। দু'জায়গাই সমান বিপজ্জনক। কোন অসাবধান মুহূর্তে পা ফস্‌কালে একেবারে স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। বরফের নীচে আবার অদৃশ্য বড় বড় ফাটলও আছে। বরফের ভিতর দিয়ে কোথাও ফস্‌কে গেলে একেবারে জীবন্ত সমাধি। ক্লান্ত, ভীত, তবু উৎসাহী আমরা উৎসাহদাতা প্রিন্সিপ্যালকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। আপন আপন লাঠির উপর ভর করে এবং সুবিধেমতো হিম বরফের উপর অথবা ভগ্ন পাথর আঁকড়ে

ধ'রে উপরে উঠতে লাগলাম—কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো বা ঝুলে ঝুলে। ১৩,৫০০ ফিট থেকে ১৪,৫০০ ফিটের ভিতর এমন কতকগুলো সাংঘাতিক বিপজ্জনক জায়গা আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল যে, সেকথা মনে হলে আজো শিউরে উঠি ভয়ে। এমনি এক জায়গায় পিছন থেকে একটি বন্ধু (পি এন দত্তগুপ্ত—পশ্চিমবঙ্গ) পা পিছলে প্রায় দুশতাধিক ফিট নীচে গড়িয়ে পড়ল। গড়িয়ে পড়ার সময় বরফের উপর উঁকিমারা কয়েকটা পাথরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে সে ভীষণভাবে আহত হয় এবং গায়ের গরম জামা-কাপড় ছিঁড়ে যায়। ওখান থেকে সে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে রেহ্লা ফিরে আসে। প্রতি পদক্ষেপে নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে ক্রমে আমরা পৌঁছলাম তুষারাচ্ছন্ন একটা পর্বতপ্রাচীরে। এর উচ্চতা ১৪,৭০০ ফিট। এই পর্বত-প্রাচীরের ডানদিকটা ভয়ংকর ঢালু অবস্থায় (৭০।৭৫ ডিগ্রী) গিয়ে মিলেছে রহ্টাং গিরিপথে এবং বাঁদিকটা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর ঢালুতে গিয়ে মিশেছে বরফাবৃত একটা ছোট্ট হ্রদে, যাকে বলা হয় 'স্নো-পণ্ড'। এই হ্রদের নাম সারাফা। সামনে প্রায় দেড় মাইল দূরে যে পর্বতশৃঙ্গে আমরা আরোহণ করতে চলেছি, আমাদের সেই শৃঙ্গটি মাথা উঁচু করে যেন আমাদের চ্যালেঞ্জ করল। এর পর থেকে শুধু আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে চলা ভয়ংকর বিপজ্জনক পথ। স্থানীয় বনপ্রহরীর মুখে শুনেছি, এই পর্বত-প্রাচীর পর্যন্ত ইতিপূর্বে অনেকেই এসেছে; কিন্তু এর আগে কেউ এগিয়ে যাওয়ার সাহস পায় নি।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত আমরা ঐ পর্বত-প্রাচীরে বসেই খাবারের পোঁটলা বার করে খেয়ে নিলাম। বলা বাহুল্য, সঙ্গে জল ছিল না, অথচ তৃষিত আমাদের ঠোঁট-মুখ গেল শুকিয়ে। বরফ গলাবার অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করার পর সবাই শেষে বরফ তুলেই খেলাম। 'শীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ করে; কিন্তু অতি-শীতল জমে-যাওয়া জল (অর্থাৎ বরফ) তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়।

১৪,০০০ ফিট থেকেই পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত এবং ভয়ংকর। উপরে অম্লজান বাষ্প কম এবং বায়ুর চাপও কম। তাই আমাদের হৃদ্স্পন্দন আর রক্তের চাপ গেল বেড়ে এবং শরীরের রং হয়ে গেল হলদে। শ্বাসরোধ অনুভব করতে লাগলাম এবং মাথা-বেদনা শুরু হল ভীষণভাবে। ইতিপূর্বে আমরা হিমালয়ের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেও পরিমিতভাবে অধিক উচ্চতায় অভ্যস্ত ছিলাম না, তাই পুরোপুরিভাবেই উচ্চতা অসুস্থতায় (অ্যাল্‌টিচুড সিকনেস) ভুগতে হল।

খাওয়ার পরই অভূতপূর্ব ক্লান্তিবোধ করলাম। বসে রইলাম খানিকক্ষণ আরো চারজন বন্ধুসহ; অন্য সবাই চললো এগিয়ে। ক্লান্তি বেশীক্ষণ আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। বরফের প্রেম বড় ভীষণ—একে উপেক্ষা করে থাকা যায় না। বসে-থাকা দু'জন বন্ধুসহ আমি আবার অগ্রবর্তীদের অনুসরণ করতে লাগলাম। অপর দু'জন (ডি কে মিত্র—ভূপাল; এম কে বর্মা—উত্তরপ্রদেশ) বসে রইল বাইনোকুলার হাতে নিয়ে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। যে অবস্থায় ঐ অনন্ত বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কোনো প্রেয়সীর জন্যেও সে অবস্থায় ততোটুকু করতাম কিনা সন্দেহ। প্রত্যেকেই পদে পদে শুধু ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে অতি সাবধানে প চালাতে লাগলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলার পর আমরা অসাধ্যবে সাধন করলাম—বরফের প্রেম করলাম জ —উন্নতশির ব্যাসঋষি পরাজিত হলে আমাদের কাছে। সকলের আগে প্রিন্সি প্যালই শৃঙ্গে চড়লেন। তারপর আনন্দে চীৎকার করে আমাদের ডাকতে লাগলে —দিতে লাগলেন উৎসাহ, নানভাবে নানা কথায়। শুধু তারই দেওয়া উৎসাহে জোরে রামচন্দানি সাহেব এবং আমর তেরোজন ছাত্র একে একে চড়লা অনারোহিতপূর্ব ব্যাসঋষি শৃঙ্গে (১৫,১৬৪ ফিট) ধিলন সাহে পৌঁছবার আধঘণ্টার ভিতরই আমর

সবাই পৌঁছে গেলাম। তখন বেলা পৌনে দুটো। যাঁরা শৃঙ্গে ওঠার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, এঁরা হলেন—**পি সি রায় চৌধুরী ও এম আর শর্মা** রায়—নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী; **পি কে রায় চৌধুরী ও এইচ এল সাহা**—পশ্চিমবঙ্গ; **আই জে খাতি** সিকিম; **কে এম তামাং**—নেপাল; **জি চন্দ্র ও এস পি সিং**—উত্তর প্রদেশ; **পি পি এস গুলেরিয়া ও বলদেব সিং**—হিমাচল প্রদেশ; **পি এন ভাটিয়া** সৌরাষ্ট্র; **বি এল পুণিয়া**—রাজস্থান; **বেদপ্রকাশ**—ভূপাল। মিঃ ধিলন ও রামচন্দানির নাম তো পূর্বেই করা হয়েছে।

শৃঙ্গের উপরে স্থান খুবই অপরিসর। বড় বড় ফাটলধরা কতকগুলো পাথর একেবারে খাড়া হয়ে আছে। এর আনাচে কানাচে বরফে ভর্তি,—সব জায়গায় বরফ টিকে থাকতেই পারে না। আমরা খুবই ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসবার জায়গা করলাম। সঙ্গে তিনটে ক্যামেরা ছিল। সাড়ে তেরো হাজার ফিট থেকেই আমরা ফটো তুলে তুলে উপরে উঠছিলাম। কারণ উপরে আবহাওয়ার কোনো স্থিরতা নেই। প্রতি মিনিটে কুয়াশা এবং তুষারঝঞ্ঝার সম্ভাবনা—বিশেষতঃ বিকেলের দিকে। শৃঙ্গে চড়েই আমরা নানাভাবে নানারকমে ফটো তুললাম। সঙ্গে কাগজ ছিল না, তাই ধিলন সাহেব একটি ক্যামেরা ফিল্মের মলাটে "Conquered by Indian Forest Ranger College, 1952-54 Batch, on 14th June, 1953" লিখে বরফের নীচে চাপা দিয়ে রাখলেন—আমাদের বিজয় অভিযানের সাক্ষীরূপে।

শৃঙ্গে চড়ার পর যে গৌরববোধ আর আনন্দ উপভোগ করলাম, একটা রাজ্য জয় করেও তা সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। গুরু-শিষ্যে সেদিন কোন ভেদাভেদ ছিল না; আনন্দে সবাই চীৎকার করেছিলাম অবোধ শিশুর মত। বলা বাহুল্য এর মূলে ছিলো শান্ত প্রকৃতির মনমাতানো সৌন্দর্য। এখান থেকে ও ডানদিকে (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) রহটাং গিরিপথ এবং বাঁয়ে (উত্তর-পশ্চিমে) সারাফা হ্রদ দেখা যায় বরং একটু স্পষ্টতরভাবেই, আর দেখা যায় রহটাং-এর কাছে ব্যাস ঋষির নীচে থেকে বেরিয়ে যাওয়া বিপাশাকে (Beas)। ব্যাস ঋষি থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে কাসিকুণ্ড থেকে যে নদী জন্ম নিয়েছে এবং কোঠি বিশ্রামাগারের একটু নীচে এসে বিপাশার সঙ্গে মিশেছে, অনেকে তাকে ভুল করে বিয়াস্ বলে। আসলে ওর নাম ব্যাস-কুণ্ডী। বাঁদিকে একটা সাডেল্ এর উপর সেই সারাফা হ্রদকে যেন সযত্নে রাখা ছবি বলেই মনে হল। [illegible] সেই হ্রদের উপরে বরফ ভেসে আছে। এর দুদিক থেকে দুটো নদী জন্ম নিয়েছে। এদের একটি বিপাশার উপনদী আর অপরটি চন্দ্রার। এই চন্দ্রা এসেছে লাহুল এবং স্পিতি উপত্যকার উপর দিয়ে। [illegible] দূরে গিয়ে (মানালী থেকে ৩২ মাইল দূরে) ভাগা নদীর সঙ্গে মিলে নাম হয়েছে চন্দ্র-ভাগা, এর স্থানীয় নাম চেনাব। [illegible] যে পাঁচটি উপনদীর জন্যে এ প্রদেশের নাম পাঞ্জাব হয়েছে, এদের যে ইংরেজী নাম আমরা জানি, বস্তুতঃ এদের একটিও ইংরাজী শব্দ নয়; সব কটি নামই স্থানীয়। সামনেই, উত্তর-পূর্ব দিকে, বরফাচ্ছন্ন লাহুল এবং স্পিতি উপত্যকা। চন্দ্রা আর এর উপনদী (কুলটি এদের মধ্যে প্রধান)। এই মনোরম উপত্যকাগুলোর সৌন্দর্য সহস্রগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। দূরে চারিদিকেই বরফাচ্ছন্ন শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তারপর শৃঙ্গ, আবার শৃঙ্গ, যেন চঞ্চলা পাহাড়ী নদীর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা। সেই ধবল তরঙ্গমালার মধ্যে আমাদের সাংসারিক কয়েকটা জীবনকে যেন কালো বালিকণা বলেই মনে হল। অনন্ত তরঙ্গময় বারিধিতে যেমন কয়েকটা বালিকণা সহজেই আপন অস্তিত্ব হারাতে পারে, তেমনি আমরাও যেন সে মুহূর্তে আপনাকে হারিয়ে ফেললাম—সেই আপন হারার দেশে। অলীক আপনাকে ভুলে সত্য লাভ করতে এই জন্যেই বোধ হয় মুনি ঋষিরা যুগে যুগে ঐ দেশেই ছুটে চলেন। বরফের সৌন্দর্য শুধু উপভোগ্যই নয়, ইহা সুসাহিত্যের সবল প্রাণবস্তুও বটে।

বেশীক্ষণ সৌন্দর্য উপভোগ করা চলল না। অতি অল্প সময়ের মাঝেই চারিদিক থেকে কুয়াশা এসে আমাদের ঢেকে

দিল। খারাপ আবহাওয়ার সম্ভাবনায় আমরা নীচে নামতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেকের মাঝেই জোরে হাওয়া বইতে শুরু হল। সেই হাওয়ার সংগে হিমের দেশের হিমেল স্পর্শে জড়সড় হয়ে পথ চলতে লাগলাম। আমি ও মিঃ সাহা প্রায় একশ' গজ পিছনে পড়ে গিয়েছি: কুয়াশার জন্যে আমাদের দেখা যাচ্ছিল না। আমরা পাছে ভুল পথে গিয়ে কোথাও চিরতরে হারিয়ে যাই, এই ভয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আমাদের ডাকতে লাগলেন উদ্বিগ্ন স্বরে। তারপর সবাই একসংগে চললাম। আরোহণের পদচিহ্নগুলো আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। সুতরাং অবতরণও আরোহণের মতই সমান বিপজ্জনক হল। প্রায় ১৪,০০০ ফিটের কাছাকাছি এসে একটি ভয়ঙ্কর খাড়া ঢালুতে (in precipitous slope) আমাদের এক বন্ধু (বেদপ্রকাশ) বরফের উপর স্লাইড ক'রে চলতে গিয়ে হঠাৎ অবলম্বন হারা হয়ে যায়। চেষ্টা করেও নিজের গতিরোধ করতে পারেনি। তীরবেগে সে নীচের দিকে ছুটে চলল। বরফের উপর দু'শতাধিক ফিট গড়িয়ে তারপর ভগ্ন শেলেট পাথরের উপর দু'শতাধিক ফিট গড়িয়ে, আবার বরফের উপর শতাধিক ফিট গড়িয়ে একটি থালার মত জায়গায় পেঁজা তুলোর মত নরম বরফের মধ্যে আট্কা পড়ল। মিনিট কয়েক সে মোটেই নড়াচড়া করেনি। যে অবস্থায় সে পড়েছিল চোখে দেখলে কেউই তার প্রাণের আশা করত না। আমরা নিরুপায়, সবাই হই হল্লা করলাম; কিন্তু বরফের উপর দিয়ে কি আর চট্ করে নেমে যাওয়া যায়? প্রায় মিনিট দশেক পরে যখন আমরা তার কাছে গেলাম, তখন দেখলাম, সে ভীষণভাবে আহত হয়েছে; তবে চেতনা হারায়নি। তার কাপড় এবং বুট সবই ছিঁড়ে গেছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চশমা ভাংগেনি মোটেই। অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর তাকে ধরে ধরে নিয়ে রওনা হলাম। অর্ধপথে আমাদের তুষারঝঞ্ঝা নাগাল পেল। ঝঞ্ঝার তাড়নে আমাদের দল ছত্রভংগ হয়ে পড়ল। অশেষ দুর্গতি ভোগ করার পর আমাদের একদল প্রায় সাড়ে ছ'টায় রেহ্‌লায় বেস্ ক্যাম্পে নেমে এলাম; কিন্তু অপর দল (আহত বন্ধুটি সহ পাঁচজন) এতো পিছনে পড়ে গেল যে, রাত সাড়ে আটটায় তাঁদের খোঁজে দু'জন চাকরকে পাঠাতে হল একটা লণ্ঠন দিয়ে এবং আহত বন্ধুটির জন্যে এক জোড়া বুট দিয়ে। সুখের বিষয় রাত ন'টায় সবাই ফিরে এল।

এরপর নৈশভোজনে বসে আপন আপন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হল। সে রাতে ঘুমে আমি কেবল বরফাবৃত শৃংগে চড়ারই স্বপন দেখলাম। এক একবার স্বপ্নের পাহাড় থেকে পড়ে যাই যাই অবস্থা হল আর ভয়ে ঘুম ভেংগে গেল।

১৫ই জুন প্রাতরাশের পরই আমরা মানালী রওনা হলাম। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে গায়ে বড্ড বেদনা হয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপেই খুব কষ্ট বোধ করছিলাম; তবু কর্তব্যের খাতিরে রওনা না হয়ে উপায় ছিল না। ফিরে আসার পথে বশিষ্ঠ কুণ্ডে (hot spring with sulphur water) আমরা চার পাঁচজন বন্ধু মিলে স্নান করে এলাম। কথিত আছে, বিশ্বামিত্র কর্তৃক বশিষ্ঠের শতপুত্র নিধনের পর, বশিষ্ঠ এখানেই বসে ধ্যান করেছিলেন।

মানালী ফেরার পর আমাদের বন্ধু জি চন্দ্রের (বিজয়ী অভিযাত্রীদের একজন) জ্বর হয়। বিকেলের দিকে তার অর্ধশরীর নিউমনিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং সে চেতনা হারিয়ে ফেলে। রাতে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চেতনাহীন অবস্থায় সে প্রলাপ বক্‌ছিল "ম্যায় পীক্ পর অবশ্য যাউংগা। মুজে কই রুক্ নেহী সেক্‌তা। ঈশ্বর মুজে শক্তি দো।" হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর সে বলে উঠেছিল, "ম্যায় পীক্ পর পোঁছ গেয়া হুঁ।" ইউরোপীয় ডাক্তারের সুচিকিৎসায় কয়েকদিনের মধ্যেই সে সেরে ওঠে। প্রাণপণ চেষ্টার ফলে সে সফলতা অর্জন করেছিল, তা'র প্রলাপ থেকেই বেশ বোঝা যায়। বস্তুত প্রিন্সিপ্যাল ছাড়া আমরা সবাই এই একইভাবে সফলতা লাভ করেছিলাম; কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল রেহ্‌লায় এসে বলেছিলেনঃ

"I had stamina to climb 2000 feet move."

তাঁর এই কথাটি খুবই সত্যি। তিনি চিরকালই একজন নামজাদা স্পোর্টসম্যান হিসেবে পরিচিত। ভবিষ্যতে তিনি আরো অনেক শৃংগেই চড়বেন, এই আশা আমরা করি।

আলোচনা

বাংলা সাইক্লোপিডিয়া

মহাশয়,

শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসু সাহিত্য সংখ্যায় বাংলা সাইক্লোপিডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে জাতির নিকট যে আহ্বান জানাইয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক জাতির বৃহৎ এনসাইক্লোপিডিয়া আছে, যেমন ইংরাজের 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা', আমেরিকানদের 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা'। জর্মান ও ইতালীয় ভাষায় বহু খণ্ডে ও পুষ্ট কলেবরের অনুরূপ গ্রন্থ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি। ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধির জন্য ব্যাকরণের সহিত অভিধান গ্রন্থেরও প্রয়োজন। পাণিনিহীন সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্যের কাঠামোর কথা কল্পনা করা কঠিন।

রাজশেখরবাবুর মতে প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' ও শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রারব্ধ 'মহাকোষ' এনসাইক্লোপিডিয়া ধাঁচের। কিন্তু মাঝারি গোছের সংকলিত 'বিষয়কোষ' বা সাইক্লোপিডিয়া রচনার আহ্বান জাতির নিকট জানাইয়াছেন। 'বিষয়কোষের' কলেবর ও মূল্য নির্দেশ এমনভাবে করিতে বলিয়াছেন, যাহাতে ছাত্র ও সুধীজনের সহজলভ্য ও সহজ ব্যবহারযোগ্য হয়। কি কি বিষয় এই 'বিষয়কোষে' স্থান পাইবে তাহারও একটি মার্জিত খসড়াও দিয়াছেন। ভাবী সংকলয়িতাকে বলি না যে সেইটিই হুবহু গ্রহণ করুন—পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করিয়া লইতে কোন বাধা নাই। পুস্তকের নামকরণ কি হইবে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। শব্দের অর্থ যাহাতে সংকলিত থাকে, তাহা 'শব্দকোষ' তেমনি বিষয়ের অর্থ যাহাতে নিহিত, তাহাকে 'বিষয়কোষ' বলাই সমীচীন। 'জ্ঞানকোষ' অথবা 'তথ্যকোষ' হইলে বোধ হয় 'বুক অব নলেজ' ধরনের পুস্তকের ইঙ্গিত দেয়।

এরূপ তত্ত্ববহুল ও তথ্যপূর্ণ রচনা-সংকলন করিয়া প্রকাশের দুটি প্রধান সমস্যাঃ

১। অর্থ ২। রচনা

অর্থের অভাব মোচনের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বর্ধমানের মহারাজা ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ ব্যক্তি অগ্রণী হইয়াছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশে বিত্তশালী ব্যক্তির কোন অভাব নাই। আমরা কি ধনকুবের শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন মুখোপাধ্যায় (স্যার), পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগ্যকুলের রায়েদের নিকট অর্থসাহায্য চাহিতে পারি না? এমন কি বাংলাদেশের বিড়লা, খৈতান, সুরজমল নাগরমল প্রভৃতিকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে অনুরোধ জানাইতেও পারি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের জন্য জাতীয় সরকার ঈদৃশ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রকোষ হইতে এর ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন। সকল চেষ্টা বিফল হইলে নিদানকালে শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রীবরকে ব্যক্তিগতভাবে এ কার্যের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতে পারি। এমন কি বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশকেরা 'বিষয়কোষ' গ্রন্থটির প্রকাশ ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন।

রচনার দিক দিয়া বিষয়গুলি যাহাতে সুলিখিত ও সুসম্পাদিত হয়, তজ্জন্য শক্তিশালী অভিজ্ঞ একজন সাধারণ সম্পাদকের প্রয়োজন। রচনা-সমস্যার দায়িত্ব তিনটি বিশেষ পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

১। উপদেষ্টামণ্ডলী। যাঁহাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রচুর জ্ঞানভাণ্ডারের সুযোগ সম্পাদকমণ্ডলী সহজে গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ বয়ো ও জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপণ্ডিতগণকে এই মণ্ডলীতে গ্রহণ করিতে হইবে। এই মণ্ডলী অলঙ্কৃত করিবেন শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি সুধিবৃন্দ।

২। সম্পাদকমণ্ডলী। বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক লইয়া এই মণ্ডলী গঠিত হইবে। তাঁহারা বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়বস্তুর সম্পাদনা করিবেন, যথা—ঐতিহাসিক সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক সম্পাদক, ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পাদক, পুরাতাত্ত্বিক সম্পাদক, আইন সম্পাদক প্রভৃতি। সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সাধারণ সম্পাদক থাকিবেন। এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের সাধারণ সম্পাদক-পদ অলঙ্কৃত করার যোগ্যতা শ্রদ্ধেয় রাজশেখরবাবু ছাড়া আর কাহারও কথা মনেই আসে না। তাঁহার 'চলন্তিকা' রচনা, মহাভারত অনুবাদের অভিজ্ঞতা, যুগান্তকারী অতুলনীয় রসরচনা, রসায়ন শাস্ত্রের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসীম জ্ঞান বাঙালীসমাজ দীর্ঘকাল লাভ করিয়া আসিতেছেন। তিনি ছাড়া ও-পদের যোগ্য ব্যক্তি বা কই? কারণ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য অবান্তরহীন, সুপ্রযুক্ত শব্দযোজনা, অতি অল্প কথায় অতি গভীর ভাব বা বিশদ বর্ণনা নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা। তাঁর রসরচনার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যেন প্রত্যেক শব্দটি যথাস্থানে ওজন করিয়া বসানো হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি শব্দ উঠাইয়া লইলে সম্যকভাব প্রকাশ হয় না এবং অধিক শব্দ যোগ করিলে বাহুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই অপূর্ব দক্ষতা কোষ রচনার উপযোগী। এ হেন অভূতপূর্ব জ্ঞান ও দক্ষতা জাতি যদি গ্রহণ করিতে বিলম্ব করে, বুঝিতে হইবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে দুর্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাঁহাকেই আমরা 'বিষয়কোষ' রচনার সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইব। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তবে তিনি মাথার উপর থাকিলে বিষয়টি সুচারুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। সম্পাদকমণ্ডলীতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি মনীষিগণকে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

৩। লেখকগোষ্ঠী। সম্পাদকমণ্ডলীই লেখকগোষ্ঠী নির্বাচন করিবেন। তাঁহাদের একাধারে সুলেখক ও সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি হওয়ার প্রয়োজন।

এই বিপুল আয়াসসাধ্য কার্যের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়তো সকল ক্ষেত্রে সম্ভব না হইতেও পারে, কিন্তু প্রতি কার্যের জন্য পরিমিত পারিশ্রমিক দিতেই হইবে। বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ চলে, কিন্তু জ্ঞানচর্চা বর্তমান যুগে চলে না। তবে পারিশ্রমিক নির্ধারণে একটি সাম্য থাকারও প্রয়োজন।

যদিও অনুরূপ গ্রন্থ পূর্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষোভের কোন কারণ নাই যদিও বাংলার বাহিরে হিন্দী মহলে অনুরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ চলিতেছে। যে কাল বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের হাত নাই, কিন্তু আর কালক্ষেপণ করা অনুচিত। কবে ঘৃত ভক্ষণ করিয়াছি বলিয়া শুধু হস্ত আঘ্রাণ করিলে চলিবে না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের জন্য বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে দেখাইলে চলিবে না। ভাষা ও সাহিত্য সজীব পদার্থ—স্থিতিতেই এর জড়ত্ব। তাই জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলা হয়—সরস্বতী, যিনি স্থিতিবতী নন। শুধু সরিয়া সরিয়া যান—পরিধি বৃদ্ধি করিয়া। বর্তমানকালেও ইঁহাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। রচনার মধ্যে দিয়া তাঁকে ধরিয়া রাখা। আর সাইক্লোপিডিয়া এই কার্যের এক সহায়ক। শ্রদ্ধেয় রাজশেখরবাবুকে ওই গুরুকার্যের ভার গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া তাঁরই নির্দেশমত ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গঠনমূলক দায়িত্ব-

পূর্ণ কার্য দেশবাসী গ্রহণ করুন। এর জন্য বিশেষ এক স্থান ও সময় নির্ণয় করিয়া এক সভা আহূত হউক, যাহাতে এই কার্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে লেখকের অভাব নাই। উপযুক্ত লেখক নির্বাচনে বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
রেওয়া—বিন্ধ্য প্রদেশ।

(২)

মহাশয়,

'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, বাংলা ভাষায় একখানি সুসংকলিত [illegible] প্রকাশের প্রস্তাব করেছেন। এইরূপ একটি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম আমরা অনেকেই। বসু মহাশয় আমাদের অনুক্ত ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর, আমরা আশা করি, আমাদের মধ্যে [illegible] অগ্রণী হবেন এবং এক্ষেত্রে [illegible] দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠু[illegible] করবেন।

[illegible] অনুরোধ, এই কাজটি সম্ভব [illegible] ও যথাসাধ্য সহায়তা [illegible]

বিনীতা

শ্যামলী দেবী,
কলিকাতা।

ইদানীংকার বাংলা সমালোচনা

মহাশয়,

৩০তম সংখ্যা 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'ইদানীংকার বাংলা সমালোচনা' প্রবন্ধের জন্য শ্রীঅরুণকুমার সরকার ধন্যবাদার্হ। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। আপনার অনুমতি লাভ করলে সবিনয় নিবেদন করতে পারি।

কবি——বিশেষ করে কিশোর কবি—— অভিমানী হবেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে না। তাই কিশোর কবির কাব্য-সমালোচনা করতে হবে সবিশেষ সাবধানতার সঙ্গে। সমালোচনা গঠনমূলক না হলে এরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। 'অভিজাত-নীল উঁচু নাক' বিশিষ্ট ইন্টেলেকচুয়ালের হাত থেকে এদের বাঁচাতেই হবে।

'প্রতিদিনই বাংলা দেশে অজস্র গল্প উপন্যাস কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে।' কিন্তু এর একটাও নিষ্ফল নয়। একথা সবার আগে মনে রাখতে হবে।

অরুণবাবু তবুও ভাল বলেছেন, 'একেবারে হতাশ হবার সত্যিই কোন কারণ ঘটেনি।' এখানে আমার গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর পেশা শিক্ষকতা, নেশা সাহিত্য রচনা করা। বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে নাম আছে। তিনি বলেন, বাংলার ভবিষ্যৎ গভীর তমিস্রাবৃত। জাতীয় জীবনে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মৃত। বর্তমান সাহিত্য-প্রচেষ্টা নাকি জাতীয় শক্তির অপব্যয়।

সশ্রদ্ধ প্রশ্ন একটি করি। বাংলার অবস্থা যদি সত্যি তাই হয়, তবে তাঁদের ব্যর্থতার কথা তাঁরা ভুলবেন কি করে? এর জন্য দায়ী তো তাঁদের মত প্রবীণ শিক্ষক-সাহিত্যিকরা। তাঁরা হতাশ হলে কে বাঁচিয়ে তুলবে এ 'মরা' জাতটাকে?

প্রবন্ধের শেষ স্তম্ভে 'লণ্ডন ম্যাগাজিনের' নির্দেশ শুধু 'মজার' নয়, হাস্যকর। লণ্ডনে অনেক মজার বস্তু আছে। এগুলো তার সঙ্গে বেমানান হবে না। তবে তৃতীয় নির্দেশটি আমাদের দেশে বিবেচনাযোগ্য। আর একটি প্রস্তাব এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়।

প্রকৃত স্রষ্টা এবং সার্থক সমালোচক সম্পূর্ণ পৃথক ধাতুতে গড়া। এক সৃষ্টির আনন্দে আত্মভোলা, অন্য তা ব্যবচ্ছেদের নেশায় মশগুল। লেখক দেন শাশ্বত সম্পদ, আর সমালোচক নিরেট নিখুঁত মতামতের পিণ্ড। (যাঁর মধ্যে এ দুয়ের সমন্বয়, তিনি ক্ষণজন্মা।) এ ছাড়া অরুণবাবুর উল্লিখিত লেখকদের পরস্পরের মধ্যে 'সততা'র অভাবের আশঙ্কায়ও এ নিয়ম চালু করলে মন্দ হয় না যে, কোন লেখক অন্যের লেখার সমালোচনা করবার অধিকার পাবেন না। সমালোচক থাকবেন নিরপেক্ষ। ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীভবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, খড়্গপুর।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীঅরুণকুমার সরকারের ৩০ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত "ইদানীংকার বাংলা সমালোচনা" প্রবন্ধে বাংলা সমালোচনা সম্বন্ধে হতাশার সুর শোনা যায়। লেখক সমালোচনার দৈন্যের কতকগুলি কারণ দেখিয়েছেন—(১) সমালোচকেরা সমালোচনা কার্যের অনুপযোগী, (২) সমালোচনা পরস্পর পিঠচুলকানি ও রেষারেষি মাত্র, (৩) কবি-সাহিত্যিকেরাও এজন্য অনেকাংশে দায়ী। লেখকের "সমালোচনা" সম্বন্ধে সমালোচনা কিরূপ হ'ল বোঝা গেল না। প্রথমত উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগের অভাব, দ্বিতীয়ত লেখকের নিজেরই উক্তি—"তাছাড়া আমার আলোচনা কেবল পুস্তক পরিচিতি বা রিভিয়ুকে কেন্দ্র ক'রেই।" আমাদের দেশে কেন সব দেশেই শোনা যায়, প্রত্যেক সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে এক একটি লেখক-গোষ্ঠী থাকে। পত্রিকায় পুস্তক পরিচিতির সময় এই গোষ্ঠী মনোভাবই কাজ ক'রে থাকে। এ মনোভাব খারাপ হতে পারে, কিন্তু স্বার্থ বা ব্যবসায়বুদ্ধি প্রণোদিত এ মনোভাবের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। লেখক এ সম্বন্ধে নীরব। যে সকল কবি-সাহিত্যিক সস্তায় নাম নেবার জন্য সুপারিশের ধান্দায় থাকেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত সাহিত্য জগতে থাকেন কি? সাহিত্যে অমরত্ব কি অন্যের পর ভর করে লাভ করা যায়? সুতরাং তাঁদের গ্রন্থ অথবা সুপারিশ (সমালোচনা?) উভয়ই সৎ সমালোচনার বিষয়-বহির্ভূত। লেখক প্রবন্ধের শেষাংশে বিলাতী কাগজের নির্দেশ উদ্ধার করে বলেছেন, "এই সব নিয়ম কানুনগুলো আমাদের দেশেও চালু করবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না।" অন্তত একটি বিষয়ে এ নিয়ম আমাদের দেশে চালু হয়েছে। লেখকের কথায়, "আমাদের দেশে জীবিতাবস্থায় কোনো সাহিত্যিকেরই মূল্যায়ন হয় না।" জীবিত লেখকদের সমালোচনায় পিঠচুলকানি কিংবা রেষারেষির ভাব জাগা স্বাভাবিক, তাই কি সুধী সমালোচকেরা এ পথ ছাড়েননি?

নমস্কারান্তে

শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

চক্রদত্ত

বড় বড় কাঠের গুঁড়ি কিংবা লম্বা
ম্বা লোহার রড্ এক জায়গা থেকে আর
ক জায়গায় নিয়ে যেতে হলে লরী করে
য়ে যাওয়াই প্রশস্ত উপায়। এতে
নেক অসুবিধাও আছে। লরীর ওপর
ঠের গুঁড়ি কিংবা লোহার রড্গুলো
র সময় ভালমত ধরে না। লরীর
াকারের চেয়ে জিনিসগুলো অনেক সময়
্বায় বড় হয়, তখন এগুলোর অনেক-
নি অংশ লরী থেকে বাইরে বার হয়ে
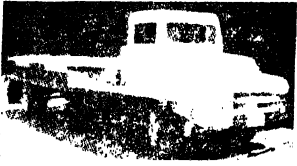
মাল বহনের নতুনরকম লরী

কে। এতে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা
ই বেশী, কারণ বড় বড় প্রত্যেক
রের রাস্তাগুলিই সব সময়েই খুব
ণী জনবহুল এবং গাড়ি-মোটর
চলের প্রাচুর্যও খুব বেশী থাকে।
ন ধরনের মালবহনোপযোগী যে লরী
কোম্পানী তৈরী করেছে, সেগুলোতে
র বিশেষ অসুবিধা হয় না। লরীর
নের চালকের বসার জায়গাটা শুধুমাত্র
কের বসার মত অল্প একটু স্থান
ড় রেখে বাকী সমস্তটাই পিছনের
লা জায়গার সঙ্গে একত্রীভূত করে
া জায়গা করে নেওয়া হয়। এর ফলে
া লম্বা লোহা, কাঠ ইত্যাদি সহজেই
 করা যায়।

*

উদ্ভিদরা দিনেরবেলায় সালোক-
শ্লেষ (photosynthesis)-এর সাহায্যে
ষের ভেতর চিনি এবং অন্যান্য
য়নিক বস্তু তৈরী করে। তেজস্ক্রিয়
বনএর সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা
হ যে, এইসব বস্তু গাছের কোষের
ট বিশেষ নির্ধারিত স্থানে গিয়ে জমা
থাকে। পরীক্ষার জন্য নিটেলা
ক একটি বড় জল-উদ্ভিদকে সালোক-
শ্লেষের সাহায্যে জল এবং কারবন ডাইঅক্সাইড থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সব বস্তু তৈরী করতে দেওয়া হল। তারপর হঠাৎ গাছটির কোষগুলি জমিয়ে ফেলা হল এবং পরে একটি বিশেষ উপায়ে শুকিয়ে নেওয়া হল। তারপর সেই কোষগুলির ওপর তেজস্ক্রিয় কারবন প্রয়োগ করা হল। কোষগুলির যে স্থানটুকুতে রাসায়নিক বস্তুগুলি গিয়ে জমা হয়েছিল, সেই স্থানটিতে শুধু তেজস্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

*

অশ্বত্থগাছের মত আমগাছকেও মহীরুহের পর্যায়ে ফেলা যায়। এক একটি বড় বড় আমগাছে কত যে ফল ধরে তার ইয়ত্তা নাই। বরনালায় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আমগাছের খোঁজ পাওয়া যায়। বরনালা পাঞ্জাবের চণ্ডিগড়ের মধ্যে। বরনালায় যে বৃহৎ গাছটির সন্ধান পাওয়া গেছে সেটির গুঁড়ির পরিধি ৩৪ ফিট। প্রধান কাণ্ডে প্রায় ১৪টি বিরাট ডালপালা আছে। প্রত্যেকটা ডালকে একটা প্রধান আম গাছের মত দেখায়। বছরে প্রায় ৪০০ মণ করে আম এই গাছ থেকে পাওয়া যায়। ভাইকারাবাদ বরনালার ঠিক উল্টো, এটা হায়দরাবাদের মধ্যে। 'মামুদা' বলে এখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট আম গাছ পাওয়া যায়। গাছটা চওড়ায় ৮ ফুট ও ৮ ফুট উঁচু। ছোট ছোট গৃহসংলগ্ন উঠান বা বাগানের পক্ষে এই গাছগুলি বেশ সুবিধাজনক। এক একটি মামুদা গাছে প্রচুর ফল পাওয়া যায়।

*

বন্দুক প্রয়োজন ছাড়াও মানুষ অনেক সময় শখ করে কেনে। ফলে শখ মিটে গেলে বন্দুক বেশীরভাগ সময় বাক্সজাত হয়ে থাকে। বন্দুক বেশীদিন ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে দেখা যায় যে, বন্দুকের নলের ভেতরে মরচে পড়েছে। আবার দরকারে ব্যবহার করবার সময় বন্দুক ওপর থেকে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করলেও নলের ভেতরের মরচে সহজে পরিষ্কার করা যায় না। সবচেয়ে ভাল যদি মরচে ধরবার আগে থেকেই সাবধান হওয়া যায়। এটা সম্ভব হয় যদি বন্দুকের নলের ভেতরে একটা রাসায়নিক বস্তু পোরা গুলি পুরে রেখে দেওয়া হয়।

মরচে প্রতিরোধক বন্দুকের গুলী

এটা দেখতে ঠিক বন্দুকের গুলীর মতই শুধু তফাৎ এই যে, গুলীর ভেতরে বারুদের জায়গায় শুধু রাসায়নিক বস্তু ভরা আছে। আর এই বস্তুটি নলের ভেতরের থেকে বায়ুর আর্দ্রতা টেনে নেয় ফলে আর লোহার নলে মরচে ধরতে পারে না।

*

ষোলশত শতাব্দীতে আকবরের আমল থেকে জগতে আমের কদর। সেই সময় আকবর দ্বারভাঙ্গার কাছে একটা বিরাট বাগান করেছিলেন। বাগানটির নাম লক্ষবাগ। এছাড়া নালগোণ্ডার কাছে একমাইল লম্বাচওড়া একটা বাগান আছে। শ্যামসুন্দর রেঞ্জির প্রায় ৬০০ একর একটা আমের বাগান আছে। এটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আমবাগান।

*

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আমের কলম নিয়ে গেছে এর মধ্যে শুধু 'মালগোরা' ওদেশে আজও বেঁচে আছে। প্রায় নয় বছর বাদে প্রথম ফল ফলে।

পশ্চিম বাংলার উত্তরখণ্ড

পুলকেশ দে সরকার

ঠিক এই সময়টিতে মহেন্দ্র চক্রবর্তীকে পাওয়া যাবে না। ঠিক রওনা দেবার মুখটিতে। শেয়ালদা থেকে এই সময়-মতো হারিয়ে যাবার পালা শুরু হ'ল তাঁর। বেঁটে গুটগুটে মানুষটি বয়সেও আমাদের সব্বার চাইতে ছোট। হারিয়ে যাবার মতো।

কিন্তু না, সব্বার চক্ষু চড়ক গাছ ক'রে হাজির হয়ে যেতেন শেষ পর্যন্ত। অবনীবাও ওর স্বাভাবিক গার্জেন হয়ে এসেছেন। তিনিও দু'চারবার এদিক ওদিক উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র চক্রবর্তীর পান-খাওয়া হাসি মুখটি দেখেই ধুপটি মেরে ব'সে পড়তেন। তক্ষুণি নির্দ্বন্দ্বচিত্তে 'কাশী গঙ্গা কেবা চায়' ব'লে অনুচ্চস্বরে গান ধরে দিতেন।

মোট ছ'জনের একটি ছোট্ট সাংবাদিক দল। সরকার পক্ষের তোড়জোড়ে পশ্চিম বাঙলার উত্তর খণ্ড সফরে বেরোনো গেল। ৫৪ সালে প্লাবন-পীড়িত হয়েছে উত্তর খণ্ড। সেই প্লাবন তরঙ্গ রোধ করবার জন্য সরকার কি কি করছেন বা ইতিমধ্যে ক'রে ফেলেছেন—উদ্দেশ্য তাই দেখানো। আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে আমি, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের পক্ষ থেকে শ্রীরবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ওরফে প্রিন্স মুডীম্যান অব বেলিয়াঘাটা, চালচলনে ঐ নামই আমি তাঁকে দিয়েছিলাম), অমৃত-বাজার পত্রিকার পক্ষে শ্রীঅবনীমোহন মজুমদার, যুগান্তরের পক্ষে শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্তী, স্টেটসম্যানের পক্ষে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, আর ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার শ্রীপ্রশান্ত সরকার (দার্জিলিংয়ের উদ্ভিদ উদ্যানে গাছপালার ল্যাটিন নাম শুনতে শুনতে যাঁর নাম দিয়েছিলাম (প্যাসিফিকো গভর্নমেণ্টাস)। হ্যাঁ, লীডার অব দি ডেলিগেশান হিসেবে ছিলেন শ্রী এ কে মুখার্জি, এসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর অব পাব্লিসিটি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সরকারী ফোটোগ্রাফার শ্রীধীরেন সরকার।

সত্যি, দাঁত নিয়ে এমন গর্ব করতে আর কাউকে দেখিনি। ওঁর সমুখের দু'টো দাঁত সর্বদাই প্রকাশমান। ধীরেন সরকার গর্ব ক'রে বলেন, এই দাঁত, এই দাঁতের জন্য কে না চেনে আমাকে? কলকাতা থেকে দুর্জয়লিংগ পর্যন্ত সব্বাই। মাথায় নানান ধান্ধা ধীরেন সরকারের। তবু এখন সারা মাথায় ছেয়ে আছে একটি ভাবনা—ওঁর আকাদেমি অব ফোটোগ্রাফি। প্রকাশমান দাঁতের জন্যই নাকি বলা যায়, মুখ বুজতে পারেন না, না-ঘুমুনো পর্যন্ত, কথা বলতে পারেন অনর্গল। তাইতে ওঁর ল্যাটিন নাম দিয়েছিলাম টিথেকাস ভাসিফারাস। হৈ হৈ ক'রে হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, সুন্দর নাম।

সকাল দশটা-পঁচিশে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসটি শেয়ালদহ স্টেশন ছেড়ে গেল। আমাদের আপাত লক্ষ্যস্থল শিলিগুড়ি এই শিলিগুড়ি যাবার কি সুব্যবস্থাই ছিল আগে। রাতে দার্জিলিং মেলে উঠেছেন ভোরবেলায় শিলিগুড়ি পৌঁছে গেছেন মাত্র একটা রাতের অপেক্ষা। জলপাইগুড়ি অল্প রাত থাকতেই পৌঁছে যেতে পারতেন। আর আমরা যারা কোচবিহার যেতাম তাদেরও পথটা ছিল সোজা পার্বতীপুরে দেড়টা নাগাদ মিটার গেজে বদলি, ব্যস সকালের দিকে সটান কোচবিহার। কলকাতা থেকে পার্বতীপুর হ'য়ে শিলিগুড়ি অবধি ছিল ব্রড গেজ, হুস হুস ক'রে দার্জিলিং মেল যেত। ট্রেনটা অনেক স্টেশনে থামত না দেখে আনন্দে গর্বে বুকটা ভ'রে উঠত। আঃ কোচবিহার থেকে কলকাতা আসতে পার্বতীপুরে কি ঠেলাঠেলিটাই হ'ত দার্জিলিং মেল ধরতে। ও থামবে না তো বেশীক্ষণ। ওতে যে কেবলই ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেণ্ড ক্লাস। একটি ইণ্টার, গোটা দুই থার্ড। বড় বড় কর্তারা এই ট্রেনে আনাগোনা করতেন। তাদের সঙ্গে একই ট্রেনে যাওয়া—বুক ভ'রে উঠবে না। তারপর ঐ রকম তার

উত্তরখণ্ডের অরণ্যসম্পদ

জলপাইগুড়িতে নদীর বাঁধ বেঁধে নতুন শড়ক নির্মাণ

চলন। বেঞ্চে জায়গা তো নেই, পোঁটলা-পুঁটলীর ওপরে বসেই কি স্বস্তি। ভোর বেলাই শেয়ালদা।

তারপর একদিন কি হ'তে কি হ'য়ে গেল। পার্বতীপুর রংপুর পররাষ্ট্র পাকিস্থানে গেল, জলপাইগুড়ির সোজা পথ রুদ্ধ, সুতরাং শিলিগুড়িও ঐ বিচ্ছিন্নাবস্থা। নাও, কর নূতন লাইন। নইলে আর সব যেমন তেমন, আসাম আর আসাম সীমান্ত একেবারে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হয়। সুতরাং নূতন লাইনের পরিকল্পনা হ'ল, নামকরণ হ'ল আসাম-লিঙ্ক। যেদিন প্রথম ছাড়ে শেয়ালদা সেদিন ওকে মাল্যভূষিত করা হয়েছিল, ড্রাইভারের নামটা আর ইঞ্জিনের নম্বরটাও টুকে নিয়েছিলাম নোট খাতায়। আজ আর তাদের কথা মনে নেই। কিন্তু একটা কথা মনে আছে। তখনও তিস্তার ওপর সেবক সেতু হচ্ছে আসাম লিঙ্কের। চালু হয়নি। পার্বতীপুরের পথেই আনাগোনা করি। শীতকাল। মুসলমান কুলীরা আগুন পোহাচ্ছে। সেখানে আমিও হাত বাড়ালাম। ভয় ভয় করতে লাগল। হিন্দু কেটে ওরা পাকিস্থান পেয়েছে। লড়কে লেঙ্গে ধ্বনিটা আজও কানে বাজে। কিন্তু না, ওরা ওদের কথা ভাবছে। পার্বতী-পুরের পথে ওদের (মানে, আমাদের) যদি আনাগোনা চলে, তবে আমাদের (মানে, কুলীদের) রুজি-রোজগারের কি হবে? রাজত্ব নিয়ে ভাগাভাগির সময় কেউ বা এদের কথা মনে রেখেছিল! কিন্তু সর্বনাশ তো হ'ল যোগাযোগ ব্যবস্থার—সব যে বিপর্যস্ত হ'য়ে গেল! অখণ্ড বাঙলা খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে গেল। কে কোথা দিয়ে যাবে? নূতন ক'রে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আর তাকে রক্ষা করা কি সামান্য কথা? সামান্য যে নয়, সারা উত্তর খণ্ডে তার স্বাক্ষর সর্বত্র। প্রতি বছর আসাম লিঙ্ক বিপর্যস্ত হয়—গতবার চূড়ান্ত হয়েছে, এ বছরও তার সংশোধন হবে না।

এখন কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যেতে কতক্ষণ লাগে? আমরা মঙ্গলবার সকাল দশটা পঁচিশে উঠে বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা শিলিগুড়ি পৌঁছেছি। অখণ্ড বাঙলার ভেতর দিয়ে আসিনি। বিহারের ভেতর দিয়ে এসেছি অনেকখানি, আর লটবহর নিয়ে নদী পারাপারের জন্য স্টীমারে ওঠানামা করেছি একবার। তারপর মনিহারী ঘাট থেকে কাঁচা নরম মাটিতে সন্তর্পণে চলেছি মিটার গেজে শিলিগুড়ি অবধি। আগেকার স্টেশন নেই শিলিগুড়ির। নূতন স্টেশন কাটজু সাহেব উদ্বোধন করেছেন। শিলিগুড়ি হ'য়ে দার্জিলিং যাবার ছোট্ট রেল লাইনটি আছে, শাখা লাইন উঠেছে, আর আসামে যেতে হলে শিলিগুড়ি হ'য়েই এখন যেতে হয়, পার্বতীপুর নয়। দুই তিনদিনের পথ। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে-দেশের দূরত্ব কমে, এখানে বেড়েছে।

সকলের মুখোমুখি বসে চোখে চোখে চেয়েও মনটা কিন্তু দেখলুম সকল দূরত্ব উপেক্ষা ক'রে এরই মধ্যে শিলিগুড়ি, পার্বতীপুর এমন কি আমিনগাঁও-পাণ্ডু পর্যন্ত ঘুরে এল। ফেরে যখন এলই তখন কানে গেল রাণী রাসমণির কথা। কি ক'রে রাসমণি এলেন এখন আর মনে নেই, হয়তো অনদিদার চাইনীজ গুণ-গুনানির সুর ধরেই।

বললাম, সুন্দর হয়েছে ছবিটি, তবে শেষের অংশটুকু। প্রথমটুকু ভাল লাগেনি। মুকুন্দদা কেমন যেন পরের-হয়েছে বেশী পাকামো ক'রে ফেলেছে, নইলে বেশ। তবে রাসমণির ভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন মলিনা। ছবিখানি ছেলেমেয়ে নিয়ে নির্বিরোধে দেখবার মতো।

সিনেমা ছবি আলোচনার মজাই এই যে, ও শুধু ভাল মন্দ যা দেখা আছে তার তুলনামূলক আলোচনা হলেই অনেকক্ষণ ধ'রে। দলের মধ্যে মহেন্দ্র চক্রবর্তীই শুধু ছোট নয়, সবচেয়ে আর আমি ছাড়া আর সবাই ইয়ংম্যান ও ব্যাচেলার। যৌবনে সব জিনিস প্রবল আবেগের সঙ্গে আলোচনা করা যায়। বয়সে হয় সংশয় বাড়ে (যেমন আমার), নইলে বিশ্বাস বাড়ে (যেমন অনদিদার)।

ম্যাকডোনাল্ড বাঙলা কইতে জানেন না, কিছু বোঝেন। সুতরাং আলোচনা মাঝে মাঝে ব্যাহত হ'য়ে ইংরেজী খাতে চলে। ওঁরা সব ইয়ংম্যান, সুট পরেন। ধুতি-কোচা পরে ইংরেজী বুকনি যদিও বা চলে, সুট পরে বাঙলা বুকনি কেমন যেন অচল। সুতরাং ম্যাকডোনাল্ডকে আলোচনায় নিতে হ'লে মাতৃভাষায় ছেদ দিতে হয়, রসও হারিয়ে যায়। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড ডাল-ভাতের সাহেব, চমৎকার মানিয়ে নিতে পারেন সব অবস্থায়, সাহেবিয়ানার অভাব ঘটল বলে একদিনও বিন্দুমাত্র অভিযোগ শুনিনি ওঁর মুখে।

বাঙলা ছেড়ে চলেছি, বীরভূম সীমান্ত গেল। পশ্চিম বাঙলার উত্তর খণ্ডের তুলনায় এর রূপ যেন নিরাভরণ শুকনো বুড়ীর মতো। উত্তর খণ্ড যেন নানা বিচিত্র ভূষায় সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে। সেই রূপ প্রাণ ভ'রে দেখব বলে চলেছি,
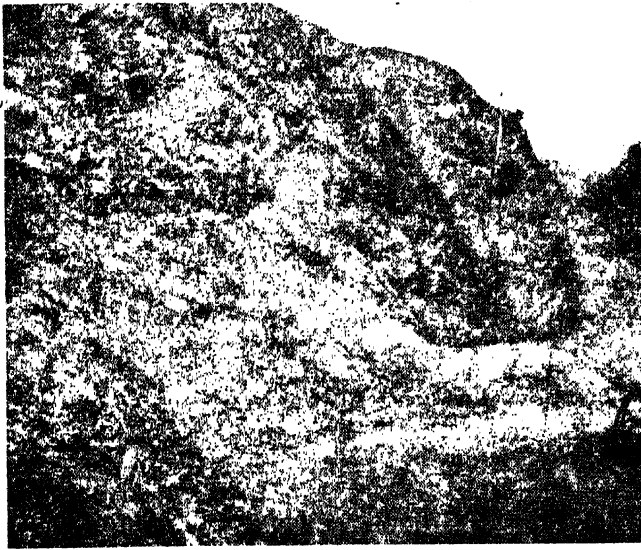
কালিম্পং পর্যন্ত রাস্তা নির্মিত হচ্ছে

প্রকৃতিরই নখরাঘাতে তার সে রূপের যে হানি হয়েছে তাও দেখতে চলেছি। কিন্তু বাঙলা দিয়ে বাঙলায় যাওয়া যায় না। চলেছি বিহার প্রান্ত দিয়ে। বিহার কিন্তু বাঙলা ভাষী বিহার। রাজ্য পুনর্গঠনের একটুও, সূচের ডগায় যেটুকু ওঠে সেটুকুও বিহার দেবে না পশ্চিম বাঙলাকে। রাজ্য শাসন, বাণিজ্য বা বাঙলা ভাষীদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া ব্যাহত হ'চ্ছে বলে বৃথাই কাঁদবে পশ্চিম বাঙলা?

একটু আগে বোলপুর ছেড়ে এসেছি। ওখানে ট্রেন থামে। শান্তিনিকেতন একটু দূরেই। রবীন্দ্রনাথের কথা কার না মনে হবে এ পথে? তিনি বিশ্বকে বন্ধুভাবে গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু নিজের সত্তাকে হারিয়ে নয়। বাঙলা ভাষাকে—মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ ক'রেই তিনি বিশ্বখ্যাতি বিশ্ব-প্রীতি পেয়েছেন। সেই ভাষা ভৌগোলিক কৃত্রিমতায় থাকবে স্তব্ধ হ'য়ে এই সীমান্তে? এখানকার বাঙালীরা শিখতে পাবে না মাতৃভাষা? এই বাঙলা অঞ্চলে ট্রেনটা শিলিগুড়ি অবধি ছুটে যেতে পারবে না বাংলা বাংলা ক'রে?

ট্রেন এসে থামল, সকরিগলিঘাটে। গঙ্গা পার হয়ে মণিহারী ঘাটে নূতন গাড়ি ধরতে হবে। কুলীর মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে এগোব এমন সময় মহেন্দ্র চক্রবর্তী কই? নেই তো নেই। শেষ পর্যন্ত থাকগে মরুকগে ক'রে আমরা ঘাটে-বাঁধা লোহার বজরায় গিয়ে উঠলাম। মাল নামানো হ'ল। দূরে ধোঁয়া দেখা যায়। আমাদের পারাপারের স্টীমার আসছে। কিন্তু আসছেন না মহেন্দ্র। যখন আমরা ও'র চিন্তায় শ্রান্ত ঠিক তখনই দেখা গেল ভীড় ঠেলে কে আসছেন—মহেন্দ্রই তো? কি ব্যাপার? নির্বিকার চিত্তে বললেন, কিছু না তো। কোথায় ছিলেন? দিব্যি বললেন, কোথাও না, এখেনেই। ব্যস, এ লোককে আর কি বলা যায় বলুন তো? গঙ্গার দিকে তাকালাম। স্টীমার এইবার ভিড়বে। পিছনে ফিরে দেখি সবাই প্রস্তুত। এ ও লটবহর নিয়ে স্টীমারে ওঠবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। স্টীমার ভিড়ল। এবার কুলীদের তাণ্ডব শুরু হবে। এদিকটায় একজন কর্মচারী হেঁকে বলছেন, ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এবার অবনীদাই বললেন, মহেন্দ্র? মহেন্দ্র নেই। আবার সরে পড়েছেন। একটু অপেক্ষা ক'রে আবার সেই মরুক থাক ক'রে এগোচ্ছি, দেখি আমাদের ঠেলেঠুলে বেঁটে গুটগুটে মানুষটি এগিয়ে পড়েছেন। ঐটুকু ছে[illegible] দেখে স্টীমারের কর্মচারীটি চেঁচি[illegible] উঠলেন, ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। ব[illegible] আটকালেন ও'কে। মুখার্জি মশা[illegible] বললেন, টিকিট আমার কাছে। কর্মচা[illegible] একটু হকচকিয়ে গেলেন, বললে[illegible] এ—এও?

স্টীমারে উঠে এসে হাসতে হাস[illegible] মরি। কিন্তু মহেন্দ্র চক্রবর্তী ভিড়ে মি[illegible] গেলেন।

মণিহারী ঘাট বেয়ে উঠে ছোট্ট গাড়ি[illegible] বার্থে বিছানা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম[illegible] রাতে আর কেউ ঘাঁটবে না। নানা কার[illegible] মনেও ঘুমের কাতরতা জমেছিল। ঘরে[illegible] বিছানা ছেড়ে আগামী ষোলো দিনের প্রথ[illegible] রাত্রি ওপরের একটি বার্থে কাটল। ভো[illegible] বেলা ধড়মড়িয়ে উঠলাম। এ যেন চেন[illegible] চেনা মাটির গন্ধ! সত্যিই তাই[illegible] চারদিকে সবুজে ছেয়ে আছে। বাঙল[illegible] চির-সবুজ রূপ, উত্তুঙ্গ পাহাড়ের কো[illegible] কোলেও বসতির দুরাভাষ। আলো-ছা[illegible] খেলছে পাহাড় আর সমতলের গা[illegible] কেমন ভেজা-ভেজা সৌন্দর্য চারদিকে[illegible] ট্রেন শিলিগুড়িতে ঢুকছে।

২

মহানন্দা নদীতীরে দাঁড়ি[illegible] শ্রীসিদ্ধান্তের কথাগুলো শুনছিলা[illegible] অনেকটা নিরক্ষর বৃদ্ধার সংস্কৃত গী[illegible] শোনার মতো। শ্রীসিদ্ধান্ত জলপাইগুড়ি[illegible] নির্মাণ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার[illegible] মহানন্দা নদীতে ৫৪ সালে যে ভাঙ[illegible] দেখা দিয়েছিল ১৯৫৫ সালে তা রো[illegible] করার ভার পড়েছে তাঁর ওপর। নদীতী[illegible] দাঁড়িয়ে তিনি যখন 'টো-পাইলিং', 'শা[illegible] বল্লা', 'স্কাউয়ার ডেপ্থ', 'বোল্ডার-পিচিং[illegible] 'এপ্রন,' 'স্পার,' 'সসেজ' ইত্যাদি ব'[illegible] যাচ্ছিলেন তখন যেন গোলক ধাঁধায় প[illegible] গেলাম। নদীর পাড় ভেঙেছে বাঁ দিকে[illegible] শিলিগুড়ি স্টেশনের অদূরে। সো[illegible] আঘাত ক'রে খেয়ে নিচ্ছিল পাড়ের মাটি[illegible] একেবারে খাড়াভাবে। এখানে দাঁড়িয়ে[illegible] স্পষ্ট দেখা যায় জলপাইগুড়িগামী ন্যাশনা[illegible] হাইওয়ের সেতু আর শিলিগুড়ি-হলদিবাড়ি[illegible] রেলপথের সেতু। ও দুটো যদি যায় সে[illegible] সড়ক আর রেল-সংযোগ সম্পূর্ণ বিপর্য[illegible] হ'য়ে যাবে। শিলিগুড়ি শহরের এ[illegible]
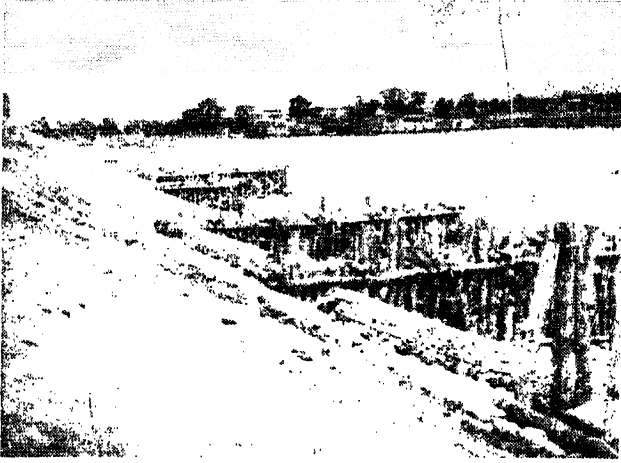
মহানন্দার বাঁধ

বিপদ গেছে ৫৪ সালে। ৫৫ সালে সে বিপদ যেন না ঘটে এজন্য ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধান্ত নদীর খাড়া পাড়কে চেঁছে ঢালু করেছেন আর সেই ঢালু জায়গায় পাথর সাজিয়েছেন নানাভাবে। পাথরগুলোকে ধরে রাখবার জন্য শাল-বল্লাগুলো নদী-তলেরও ১৫ থেকে ১৮ ফুট নীচে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। নীচে কতটা পর্যন্ত মাটি সরে যেতে পারে তা হিসেব ক'রে জেনেছেন ১৩ ফুট, সুতরাং তারও নীচে শাল-বল্লা গেছে। শাল-বল্লা মানে, শাল-গাছের খুঁটি। মাঝে মাঝে শাল-বল্লা দিয়ে চতুর্ভুজ খাঁচা করা হয়েছে, বড় রকমের খাঁচা, পাড় থেকে নদীতলদেশ পর্যন্ত সেগুলো গেছে, আর ঐ খাঁচা ভরতি পাথর। এগুলোর নামই স্পার। জায়গাটা খুব বেশী নয়, ৩০০০ ফুট; এর মধ্যে ১৭টি স্পার দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া জাল দিয়ে বেঁধে দৈত্যাকারের [illegible] পাথরের বড় বড় কোল বালিশ করা হয়েছে। এরই নাম সসেজ। ওগুলোকে ভাসিয়ে নেয়া সহজসাধ্য হবে না, এই আশা। এ করতে ২৫০০ শাল-বল্লা ৩ লক্ষ হন্দর পাথর লেগেছে। মোট বরাদ্দ হয়েছে ৯ লক্ষ, এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৫ লক্ষ। এখন যা কাজ হবার হয়েছে, বর্ষার বেগ বুঝে বাকীটা হবে। আমরা যখন দেখলাম অর্থাৎ ১০ই জুন সকালে, এখন মহানন্দা দূরে থেকে দেখা উপনদীর মতো সরু। বর্ষাকালে এর যে রূপ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসিদ্ধান্ত আঁকলেন তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। এ একেবারে শান্ত নদীটি।

শ্রীসিদ্ধান্তের হাতে আরও দুটি নদী-বাঁধ আছে। একটি জলপাইগুড়ি শহর-প্রান্তে তিস্তা নদীর বাঁধ, আর তিস্তার তিন মাইল বিস্তারের ওপারে বার্নেস-দোমহনীতে বাঁধ। তাও দেখেছি, কিন্তু একদিনে নয়। জলপাইগুড়ির বাঁধ দেখেছি ১১ই জুন, মহানন্দা বাঁধ দেখার ৪ দিন পর, আর বার্নেস বাঁধ দেখেছি ১৫ই জুন। কিন্তু নদী এপার ওপার হয়ে নয়। জলপাইগুড়ি থেকে শিলি-গুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে ডাক বাংলোয়—সেখান থেকে পরদিন সকালে বার্নেস। অর্থাৎ তিন মাইল নদী পার না হতে পারায় ১০০ মাইল পর্যটন। কিন্তু সে পরের কথা।
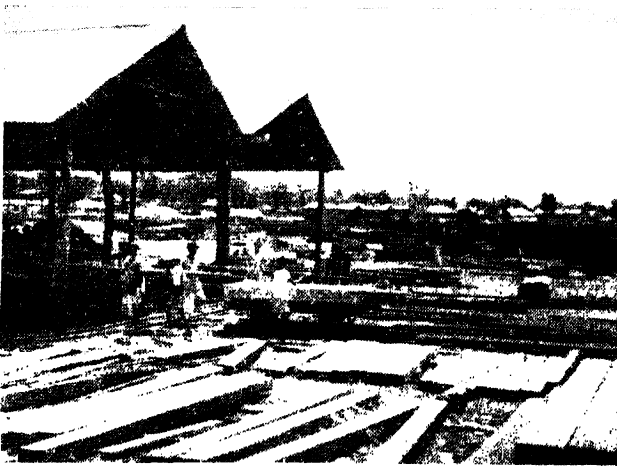
আজকের কথা করাত-কল। বনেতে গেলে এই করাত-কল থেকেই আমাদের এই বন-পরিক্রমা শুরু। কিন্তু আমাদের এই পরিক্রমা যে কারণে নির্বিঘ্ন, সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়েছিল সেই কথাটি আগে বলতে লোভ হচ্ছে। কেননা, আমাদের এই সরকারী সফরে সেইটিই সব চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা। সরকারী কর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে কথাটা খোলাখুলিই বলছি, খুব উঁচু ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। ওঁদেরকে অত্যন্ত আমলাতান্ত্রিক, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্য ও অহেতুক অহংকারী ব'লেই সাধারণের ধারণা। কখনো কল্পনা করিনি যে, আমরা এমন সব কর্মচারীর সংস্পর্শে যাব যাঁরা নিজের কাজে কেবল পটুই নয়, সর্বতোভাবে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। রস ও সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ মানুষ। বিশেষ ক'রে বন-বিভাগে

করাত-কল

আমরা যতজন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের (সংক্ষেপে ডি-এফ-ও) সংস্রবে এসেছি তাদের ভোলা সহজ কথা নয়। বয়স কারোই খুব বেশী নয়, ইয়ংম্যান বলতে আদৌ দ্বিধা হয় না, কিন্তু সাংবাদিকদের স্বাভাবিক সন্দিগ্ধচিত্তেও কখনো তাঁদের বিদ্যাবত্তা, আন্তরিকতা ও মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের রেখাপাত হয়নি, হবার অবকাশ ঘটেনি। অবশ্য তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এখনও ভাবি, পর্যায়ক্রমে এত বেশী সংখ্যায় ভাল অফিসারের সাক্ষাৎ কি ক'রে সম্ভব হ'ল?

ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধান্তও তাঁর শান্ত আচরণে আমাদের ওপর তাঁর প্রভাব রেখে গেছেন। কিন্তু এই শিলিগুড়িতে আর একটি যে মানুষের সন্ধান পেলাম তাঁর কথা আমাদের সকলকার মুখে মুখে এখনও রয়ে গেছে। তিনি জলপাইগুড়ির রিজিওনাল পাব্লিসিটি অফিসার বাগচী মশাই। তিনি যেন ছিলেন আপদকালে প্রয়োজনীয় জিনিসের এক ভ্রাম্যমান জীবন্ত ভাঁড়ার। আপনার অত্যধিক মোটর দৌড়ে ব্যথা-বেদনা হ'য়েছে, চোখ খুলে দেখলেন বাগচী মশাই সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন 'ওরিয়েন্টাল বাম' হাতে, 'দিই একটু ঘ'ষে এক্ষুণি রিলিফ পাবেন।' দার্জিলিংয়ে যথেষ্ট গরম আবরণ আনেননি, ব'সে কেশে যে রাত কাটানো ছাড়া উপায় নেই, ওমা, বাগচী মশাই কোত্থেকে এর ওর আলোয়ান নিয়ে এসে দিলেন আপনাকে ঢেকে। নিতান্ত আনুষ্ঠানিকতার গজ-কাঠিতে এ সব মানুষের পরিমাপ করা পাপ। করবও না। বাগচী মশাইয়ের জাতই আলাদা এবং সে জাতের সংখ্যাও কম। তাই বিস্মিত তো বটেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ষোলো দিনে রেলে-সড়কে হাজার দুই মাইল পরিভ্রমণের মধ্যে দু'বার আমাদের মন খারাপ হ'য়েছিল। সরকারী কর্মচারী দের বা পদস্থ ব্যক্তিদের আমলাতান্ত্রিক গর্বিত রূপেটির সাক্ষাৎ আমরা একবার কোচবিহারে, আর একবার দার্জিলিংয়ে দেখেছিলাম। এই দুই জায়গায় যেন অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেছল।

কিন্তু না, ভাল মানুষদের কথাই বলি, কেননা, বেশী সংখ্যায় তাঁদেরই দেখা পেয়েছি এই সফরে। জীবনের এই সঞ্চয়কেই যেন মনে রাখতে পারি।

ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধান্ত এর পরও আমাদের সংগে দিন দুই ছিলেন। তখন আরও ঘনিষ্ঠতর আলোচনা হয়েছিল। ততদিনে সসেজ রোল্ডার খানিকটা হজম করেছি। তিনি যে কোচবিহারের জেঙ্কিন্স স্কুলের ছাত্র, কথায় কথায় তাও প্রকাশ পেয়ে গেল। আমার বছর চারেকের জুনিয়ার হবেন। একই স্কুলে একই হেড মাস্টারের আমলে পড়েছি; আলাপ ছিল না। সিদ্ধান্ত ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলেন, অস্পষ্ট এইটুকু যেন মনে পড়ছিল। আজ তিনি আর স্কুলের জুনিয়ার ছাত্র নন। মহানন্দা আর তিস্তা নদী বাঁধবার, শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ি রক্ষার ভার পড়েছে ও'র ওপর। যতটা বাইরে থেকে অনভিজ্ঞ বুদ্ধিতে বুঝেছি কোন কাজে একক কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতেই হয় তবে তিনি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। তিন মাসে তিনি তিস্তার ১২ মাইল বাঁধ শেষ করেছেন। অবশ্য কোন কাজেরই কৃতিত্ব কাউকে একা দেওয়া ঠিক নয়, কেননা যে শত শত কুলী পালি টেনে শাল-বল্লা বসিয়েছে বা পাথর সাজিয়েছে, মাটি কেটে বাঁধ বেঁধেছে তারাও অসামান্য। কিন্তু তবু সিদ্ধান্তের সৈনাপত্যের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

করাত-কলে সম্ভবত তিনিও আমাদের সংগে ছিলেন। সরকারী প্রতিষ্ঠান। ভারত ইউনিয়ানের পূর্বাঞ্চলে এটিই বৃহত্তম করাত কল। ডি-এফ-ও দাস সাহেবের অধীনে এ চলছে। বেঁটে, সুস্থ, কালো রঙের মানুষটি। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সিদ্ধান্তের মতো এরও দেখলাম কাজের প্রতি একটি বিশেষ প্যাশান, টান বা আবেগ আছে। প্রতিষ্ঠানটি নূতন নয়। ইংরেজ আমলের। তবে একে পৃথক ডিভিশনে পরিণত করা হয়েছে এই আমলে। মস্ত বড় প্রাঙ্গণ। মাটির ওপর কাঠের গুঁড়ো, আমাদের পায়ের নীচে ভেলভেটের মতো লাগছিল। ক্রেনগুলো এক একটা লগ্ কামড়ে নিয়ে করাতের মুখটায় আনছে। করাত কলে ফেলে দিতেই অত বড় কাঠের কাণ্ড কান-

ফাটানো আর্তনাদ করে ছুটে যাচ্ছে, আর ছিন্ন-অঙ্গ নিস্তেজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে। নানা রকমের গাছ কেটে তক্তা করা হয়, বেশীর ভাগ হয়, রেলের শিলপার। গত বছর দশ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে, ব্যয় হয়েছে সাত লক্ষ। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে এই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে কাঠের আসবাবপত্র ও খেলনা বা ব্যায়ামের সরঞ্জাম এখানে একটু আয়াসেই হতে পারে। অন্তত প্রতিবন্ধক যে কিছু নেই দাস সাহেবের কাছে, তাও জানা গেল। শুধু একটু উদ্যোগের অপেক্ষা।

উত্তরখণ্ডে সফরকালে বারে বারে যে অভিযোগ আমাদের কানে গেছে, এখানেও সেই অভিযোগ। অভিযোগ সংযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অথবা সংযোগ ব্যবস্থা বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে। কাঠ অধিকাংশ রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে আসে, কিন্তু এখানে ওখানে এর তৈরী জিনিস চালান দিতে পারলে আরও অর্থাগম হতে পারত।

যতক্ষণ একথা ভাবছি ততক্ষণে শিলিগুড়ি হাসপাতালে পৌঁছে গেলাম। অসুস্থ হয়ে নয়। হাসপাতাল দেখতে। যে ডাক্তার বা ভদ্রলোকের প্রথম দেখা পেলাম, তিনি বললেন ডাঃ ভট্টাচার্যকে খবর দিয়েছি, তিনি আসছেন, তিনি বলবেন সব কথা। একটু পরেই বললেন, ঐ যে আসছেন ডাঃ ভট্টাচার্য।

আচ্ছা, বলুন তো, বহুদিন আপনার পাড়ার খেলার সাথীর সঙ্গে যদি কোন এক অপ্রত্যাশিত জায়গায় দেখা হয়ে যায়, আপনার মনের অবস্থা কি দাঁড়ায়? বলা যায় না। আমি এগিয়ে গিয়ে ডাঃ ভট্টাচার্যকে বললাম, কি রে! সেও বলল, কি রে!

অর্থাৎ আগে দেখলাম ডাঃ ভট্টাচার্যকে, তারপর দেখলাম ওর হাসপাতাল। এ হাসপাতালে আগে ছিল ২৮টি রোগী-শয্যা। ১৯৫৩ সালের জুলাই থেকে রোগী-শয্যা হয়েছে ৬৬। হাসপাতালের নিজস্ব জল-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। শিগ্‌গিরই রঞ্জন-রশ্মি ব্যবস্থা হবে ডাঃ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে এই আশ্বাস শোনা গেল। হাসপাতালে আগে একটি মাত্র বাড়ি ছিল, ১৯৫২ সালে একটি নূতন হয়েছে। আরও বাড়িয়ে এখানে ২০০ রোগী-শয্যার ব্যবস্থা হবে। সব রকমের রোগী আসে, মায় ক্ষয়-রোগী, কিন্তু এখানে বিদ্যুতের আলোর আয়োজন নেই। রোগ না হলে, হাসপাতালে রোগী না এলে ভালো, কিন্তু শিলিগুড়ির স্বাস্থ্য ভাল নয় সুতরাং, সাব-ডিভিশনের পক্ষে ৬৬টি রোগী-শয্যার হাসপাতাল নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়।

কিন্তু এখানকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে যথেষ্ট আয়োজন হয়েছে বলা যায়। শিলিগুড়ি শহরের ৪০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে অনুমান ২১ হাজার উদ্বাস্তু। এদের জন্য নতুন একটি মস্ত বড় মিউনিসিপ্যাল মার্কেট করা হয়েছে। এখনই ১৮৭টি স্টল আছে। ২৮৩টি স্টল করার কথা। সদর মহকুমা হাকিম বললেন, স্থানীয় অধিবাসীরাও খুব সহানুভূতিশীল। আমরাও দেখলাম মার্কেটটা।। সুন্দর। কিন্তু উদ্বাস্তুরা এ মার্কেটে আসবে। রাস্তার ধারে ধারে যে কোন রকম চালা তুলে দোকানের ভিড়ে শহরকে ওরা যে বিশ্রী করে ফেলেছে তা ছেড়ে ওরা আসবে না, এ অভিযোগ শোনা গেল। উদ্বাস্তুদের কি আপত্তি থাকতে পারে? যেখানে ওরা বাজার জমিয়েছে তা ছেড়ে নতুন জায়গায় বাজার জমাতে ওরা চায় না। এও একরকম সংস্কার। মারের ভয়ে বাপ পিতামহ-চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসতে সংস্কারে বাধল না, রাস্তার ধারে ধারে কুৎসিত ঝুপড়িগুলো ভাঙতে ওদের বাধে। ২০০টি স্টল নিয়ে বাজার জমবে সুন্দর পরিবেশে তা ওদের একেবারে আকর্ষণ করছে না।

আমরা কিন্তু সুন্দর এক পরিবেশে চলে এলাম। শুকনার ফরেস্ট ডাক বাংলো বিখ্যাত। এখানে নাকি আমাদের প্রধান মন্ত্রীও এসেছিলেন। আরও হয়তো অনেক বড় লোকের পায়ের চিহ্ন পড়েছে এই ডাকবাংলোয়। এর পরে গা-ঘেঁষে বন শুরু হয়ে গেল, সংরক্ষিত রিজার্ভ ফরেস্ট। পশ্চিমে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের টুকটুক টুকটুক করে ছোট ছোট গাড়ি যায়। গাড়ির ছাদে ফাঁকে মানুষ। যাত্রী নয়। গাড়ির চালকদল সামনেও দুজন, বালি ছিটোয়। একটা গাড়িই ভেঙে ভেঙে দুটো তিনটে করা হয়। একটির পর একটি চাড়ে। ছাদে বা দুই বগীর ফাঁকের মানুষগুলো নাকি ব্রেক কষে দরকার হলে। খুব জোরালো ইঞ্জিন, কিন্তু ছোট্ট। ডাকবাংলোর প্রাঙ্গণে লিচু গাছ দুটিতে ভর্তি লিচু। সুতরাং, মৌমাছি, কিন্তু অহিংস।

বিকেলবেলা বনের দিকে রওনা হলাম। সেগুন-শালের বন, বাঘ-হাতী-হরিণের বন। এই বনের রহস্য, শতাব্দীর কাহিনী ভেঙে বললেন, কার্শিয়াং ডিভিশনের ডি-এফ-ও শ্রীসুবলসখা মণ্ডল। আশ্চর্য মানুষ।

সাহিত্যালোচনা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ—ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র। প্রকাশক—ইস্ট এন্ড কোম্পানী, ৫২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—৬৲।

যে-কোনো কারণেই হোক, এককালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা অতিমাত্রায় জনপ্রিয় হতে পেরেছিলো। জনমনের বোধকে আড়ষ্ট করে দেবার মতো কতিপয় কৌশল এ-কবির আয়ত্তে ছিলো, তা বোঝা যায়। তাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার যথাযথ বিচার অনেকদিন পর্যন্ত সম্ভব না-হওয়াটা আশ্চর্য নয়। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যচর্চায় একটি প্রসংগত উল্লেখে তাঁকে যে একেবারে নাকচ করা হয়েছে সে আবার আর-একরকম অন্ধতা। এ-অবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা-বিষয়ে একটি সংগত গবেষণাগ্রন্থ সত্যি সত্যি উৎসাহ বাড়াবে।

এ-বইতে শুধু যে এই একটি কবি-বিষয়ে আলোচনা নিবদ্ধ আছে তা নয়। তাঁর সমকালীন এবং উত্তরবর্তী কতিপয় কবির সাহিত্য সাধনাকেও একই সংগে গবেষণার বস্তু করা হয়েছে। রবীন্দ্র সমকালীন হ্রস্বশক্তি কবিকুলের বাণীসাধনার সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটলো বলা যায়। ডাঃ মিত্র অবশ্য এঁদের অনেকের মধ্যেই সত্যেন দত্তর প্রভাব আবিষ্কারের একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে-প্রয়াস কিছু পরিমাণে অসংগত বলেই বোধ হবে। কেন না, সত্যেন্দ্রের কবিপ্রকৃতির এবং কাব্যপদ্ধতির বিশিষ্ট গঠন যে-কারণে সম্ভব হয়েছে, সেই একই কারণে রবীন্দ্ররীতিতে আচ্ছন্ন থেকেও তার থেকে আত্মরক্ষার অপটু চেষ্টার জন্যেই—এঁদের কবিপ্রকৃতির সাধর্ম্য জন্মেছে বলে মনে হয়।

সম্পূর্ণ আলোচনাটি দেখে বিস্ময় লাগে এই ভেবে, উক্ত যুগের কাব্যচর্চা সম্পর্কে এতও জ্ঞাতব্য ছিলো! এই প্রসংগে গ্রন্থের সূচী উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কথারম্ভের প্রস্তাব-অংশ ছেড়ে দিলে আলোচনার ধারা এই পথ নিয়েছেঃ কবি-জীবনী, দেশকাল, রবিরশ্মি, সত্যেন দত্তর কাব্যপ্রবাহ, কলাবিধি, অনুচিন্তা, শব্দসূচী ও প্রসংগসংকেত। অনুচিন্তায় করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং মোহিতলালের কাব্যসাধনাকে সত্যেন্দ্রের আলোয় দেখবার চেষ্টা হয়েছে। এ-ছাড়া দুটি পরিশিষ্টে কবির 'অন্তরংগ প্রিয়জন ও বিদগ্ধমণ্ডলী' এবং তাঁর জীবনকালে প্রচলিত সাহিত্য পত্রিকার তালিকা যোজিত হয়েছে।

এই দীর্ঘ বিবরণ দিতে হলো মাত্র এইজন্য যে, শুধু এই সূচীদর্শনেই আলোচনার বিজ্ঞানসম্মত বিস্তার বোঝা যাবে।

বিজ্ঞানপদ্ধতি হয়তো সর্বত্র যথাযথ রক্ষিত হয়নি, সমন্বয় হয়তো সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি—কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাঃ মিত্রের তথ্য সংগ্রহের সর্বচারিতায় ইতিহাসনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই উন্মুখ হবেন।

তার মানে এ নয় যে বইটি কেবল কুটিল গবেষণাধর্মী রসবিশ্লেষণের বোধবর্জিত। বরং মাঝে মাঝেই গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম রসাস্বাদী এবং পর্যবেক্ষণ পাঠকমনে কথঞ্চিৎ নূতন আবিষ্কারের তৃপ্তি সঞ্চার করে। অন্যভাবে বলা যায়, 'কলাবিধি' অধ্যায়টিতে কাব্যাস্বাদনের গভীরতায় কবি হরপ্রসাদ মিত্র উপস্থিত; কিন্তু অন্যত্র—বিচিত্র কিন্তু সত্যি—তাঁর সেই কবি-সত্তা সম্পূর্ণ গোপন হয়ে গবেষক ডাঃ মিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছেন। সেই কারণে, আমাদের মনে হয়েছে, বইটি উভয়ত তৃপ্তিদায়ক। শুধু ইতিহাসলিপ্সুর জন্যই এ-বই নয়, কাব্য-পিপাসুর জন্যেও।

তা সত্ত্বেও দুটি ত্রুটির উল্লেখ কর্তব্য মনে করি। প্রথমত ডাঃ মিত্রের গদ্যভংগি ক্রমশই এমনি এক দুরূহ জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছে যা খুব সুখদায়ক নয়। দ্বিতীয়ত তাঁর গৃহীত অনেক তথ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বলে সন্দেহ হয়—অনেক সময়েই আলোচনার ধারার সংগে তার সংগত ঐক্য গ্রন্থন ঘটে ওঠেনি। অসংখ্য তথ্যে ঘুরে বেড়ানোর অমেয় আনন্দই হয় তো এই ঐক্যের পথ থেকে অনিবার্যভাবে দূরে ঠেলে দেয়।

রচনা এবং রচনাকার সম্পর্কে এই পর্যন্ত। কিন্তু অতঃপর প্রকাশককে একটি জিজ্ঞাসা, এই নিদারুণ মলাট-প্রতিযোগিতার দিনে তিনি এই প্রচ্ছদ ব্যবহারে সাহসী হলেন কি করে। না কি, সত্যেন দত্তর কবিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাতে রঙের এই উঁচু আওয়াজ। ১৩৯।৫৫

ছোট গল্প

পুতুল দিদি—বিমল মিত্র। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ তিন টাকা।

কন্যাপক্ষ—ঐ

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ দু' টাকা বারো আনা।

রাণী সাহেবা—বিমল মিত্র। ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আড়াই টাকা।

অল্পকালের মধ্যে একই লেখকের তিনখানি গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা

হওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর জনপ্রিয়তা সূচনা করে। বিমল মিত্র জনপ্রিয় লেখক। গল্প পরিবেষণের মুন্সীয়ানা আছে তাঁর কলমে। তাঁর খ্যাতি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক হলেও তাঁর অনুশীলন দীর্ঘকালের। গল্পের প্রসঙ্গ নির্বাচনে তিনি চমকের পক্ষপাতী, প্রযুক্তির বিশেষত্বে তিনি কথকধর্মী, বৈঠকী, নাট্যপ্রবণ। 'পুতুল দিদি' এবং 'রাণী সাহেবা' স্পষ্টই ছোটো গল্পের সংগ্রহ। কিন্তু 'কন্যাপক্ষ' সম্পর্কে লেখক দাবী করেছেন যে, এতে উপন্যাসের মতন সামগ্রিক এক অখণ্ড আবেদন আছে। সেকথা সরাসরি মেনে নিতে বাধা ওঠা অসংগত নয়। কারণ উপন্যাসের অখণ্ড আবেদন আখ্যানের অখণ্ডতা, কেন্দ্রীয় কাহিনীর পরিণতি, চরিত্রের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি ব্যাপারের সংগে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। 'কন্যাপক্ষে' সে ধরনের আবেদন সৃষ্টি লেখকের নিজেরই অভিপ্রেত ছিল না। কতকগুলি চমকপ্রদ নারী চরিত্রের প্রদর্শনী দেখা গেল বইখানিতে। 'রাণী সাহেবা' এবং 'পুতুল দিদি'—দু'খানি বইয়ের দুটি নাম গল্পই সমশ্রেণীর রচনা। 'নায়িকার জন্ম', 'লিলি পালিত' ইত্যাদিতেও লেখকের একই রুচির সমর্থন আছে। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত অবাস্তবতার মাত্রাধিক্য সত্ত্বেও কৌতূহলোদ্দীপক গল্প হিসেবে এই লেখা-গুলি সুখপাঠ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু শক্তিমান লেখকের পক্ষে পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলবার শপথ নেওয়া দরকার মনে মনে। যাঁর গল্প বলবার ভাষা আছে, ভঙ্গি আছে, খ্যাতি আছে তাঁর দায়িত্বও কম নয়। অবশ্য, এ মন্তব্য প্রাসঙ্গিক।

এই তিনখানি গল্প সংগ্রহ থেকে বিমল-বাবুর প্রধান যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সে হলো তাঁর ঘটনা সমাবেশগত কৌশল। গল্পের গঠনেও (structure) তিনি বিশেষ মনোযোগী। 'রাণী সাহেবার' 'ঘরন্তী', 'আশুকাকা', 'আমীর ও উর্বশী'—'পুতুল দিদির' 'আর একজন মহাপুরুষ', 'মনের গহনে', 'মিলনান্ত'—'কন্যাপক্ষে'র মিছরি-বৌদির গল্প পড়ে ছোটো গল্পের বহু ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের পাঠক বিমলবাবুকে সাদরে গ্রহণ করবেন। তাঁর পরিণতির প্রতীক্ষা জাগবে শান্ত, সুরসিক পাঠক সমাজে।

প্রথম দুখানি বইয়ের ছাপা-বাঁধাই-প্রচ্ছদ ত্রুটিহীন। 'রাণী সাহেবা'-র প্রচ্ছদ চমৎকার, বাঁধাইও প্রশংসনীয়, কেবল ছাপা সম্পর্কেই কিছু অতৃপ্তি ঘটলো।

১৩০।৫৫, ১৩১।৫৫

ভ্রমণ কাহিনী

দেশেদেশে চলি উড়ে—দিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব-লিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—৬৲।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনীর সংখ্যা অপ্রচুর। যা আছে তারও বেশীর ভাগই বিশেষ কোনো একটি দেশের পরিচয় জ্ঞাপক—বিশ্বভ্রমণ কাহিনী নয়। বিশ্বভ্রমণ করে তার অভিজ্ঞতাও দু' একজন লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে তাও মোটামুটি ভূপর্যটকের ডায়েরীর পর্যায়ভুক্ত। সেদিক থেকে ভাবলে দিলীপ-কুমারের 'দেশে দেশে চলি উড়ে' গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য আছে বাংলা সাহিত্যে। কেবলমাত্র ভ্রমণ কাহিনী বা সাহিত্য বলেই নয়, অন্য কোনো গভীরতর কারণেও।

দিলীপকুমার আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন সাংস্কৃতিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে, স্বাধীন ভারতের প্রতিভূ হিসেবে। সুতরাং কয়েকটি দেশ দেখে আসার মধ্যেই তাঁর কর্মতালিকা সম্পূর্ণ ছিলো না, সে দেশের আত্মাকে জানা, নিজের দেশের বার্তাকে প্রচার করা এবং উভয় দেশের ভাবসম্মেলনে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে দৃঢ়তর করার গুরু দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিল। এ গুরুভার গ্রহণের যোগ্যতা দিলীপ-কুমারের আছে কি না, সে প্রশ্নই অবান্তর, কারণ তাঁর পরিচয় জানেন না, এমন কোনো শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষত বাঙালী, বোধ হয় একজনও নেই।

আধ্যাত্মিক চিন্তা দিয়ে ভারতবাসীর আমেরিকা-বিজয়ের কাহিনী এই নতুন নয়। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রী নেহরু ইতিপূর্বে তা করেছেন। হাইড্রোজেন বোমারই দেশ নয় আমেরিকা, সেখানে শান্তিকামী মানবতারও সন্ধান মেলে। এবং ধ্বংসস্তূপের ওপরেই চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে শান্তির আশ্বাস। সেই আশ্বাসবাণী আর একবার প্রচার করে এলেন দিলীপকুমার আর তাঁর সুযোগ্য ছাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

সুতরাং ভ্রমণকাহিনী নয়, সাহিত্যও নয়, অন্যমূল্যে এ গ্রন্থ মূল্যবান। ভ্রমণ কাহিনী পাঠের আস্বাদনকে অম্লান রেখেও সাহিত্যের ভিয়ানে বিভিন্ন দর্শন ও তত্ত্বকথাকে লেখক এমনভাবে জারিত করে পরিবেশন করেছেন যে, সকল ধরনের পাঠকের কাছেই তা সমান-ভাবে ভালো লাগবে। তা বলে ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা কি নেই? বার্ধক্যের প্রান্তে পৌঁছে নির্লিপ্ত উদাসীনতায় লেখক অভিজ্ঞতার সমস্ত রসকেই উপভোগ করেছেন। তাতে তিক্ততা আছে, ব্যথা আছে, কিন্তু আঘাত দেওয়ার চেষ্টা নেই। তার চেয়েও বড় কথা, প্রতিভা ও সৎচিন্তার প্রতি লেখকের অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রতিটি পাঠকমনকে মানুষের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করছে। সে সঙ্গে আছে সদারসিক দিলীপ-কুমারের রহস্যপ্রিয়তার পরিচয়। হাস্য-কৌতুকের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বইটিতে যা দু' দশ জনকে বলে অনাবিল আনন্দের স্রোত বইয়ে দেবার মতো।
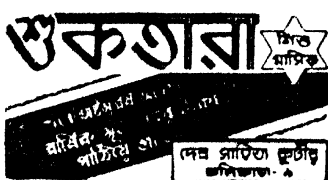
আমেরিকাকে উপলক্ষ করে লেখক সমস্ত পৃথিবীটাই ঘুরে এসেছেন। স্বল্প-পরিসরে সে-ভ্রমণ কাহিনীটুকুও তিনি এ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন। তাতে জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতূহল হয়তো মিটবে না, তবে সেখানেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

গ্রন্থের সবচেয়ে কাঁচা অংশ হচ্ছে পরিশিষ্টের ভ্রমণচুম্বক। দিলীপকুমার সুকবি, কিন্তু তিনি পরিণত বয়সে কবিপ্রতিভার এ-কি পরিচয় দিলেন? এত বড় একটি অপাঠ্য কবিতাকে গ্রন্থভুক্ত না করলে কি মর্যাদার কিছু হানি হতো? ১৪০।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীনাথ চিন্তামণি — শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম—শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী।

বাংলা ভাষার ভূমিকা—শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

শিক্ষা-প্রসংগ—বার্ট্রান্ড রাসেল; অনুবাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ।

Hindu Rashtra (A study in Indian Nationalism) Balraj Madhok.

কাজী নজরুল—শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সেই আশ্চর্য রাত—স্টিফান জাইগ; অনুবাদক—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাত্রা সহচরী—শ্রীমধুসূদন।

বংগদেশ ও মালয় এশিয়া—চুণিলাল গংগোপাধ্যায়।

মানুষ নিয়ে খেলা (১ম খণ্ড)—সুকুমার সেন।

নীলমণির স্বর্গ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

ভারত প্রেম-কথা—সুবোধ ঘোষ।

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা — শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

শরৎচন্দ্র—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

রামধনু—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প—

টিকটিকানা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

প্রিয়া ও পৃথিবী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

জ্যোতিষী—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

মিহি ও মোটা—ইন্দ্রনাথ।

প্রাচীন রাজ্য শাসন পদ্ধতি—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

সুবর্ণা—সুশীল রায়।

শ্যাম-সোহাগিনী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

অগ্নিরক্ষণ—প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়।

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে এই মর্মে মন্তব্য রয়াছেন যে, বর্তমান যুগে প্রাথমিক ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ তাঁহাদের প্য সম্মান আর পাইতেছেন না। "সম্মানের চেয়ে তাঁদের প্রাপ্য ন্যায্য ইনেটা পেলেই বোধহয় তাঁরা খুশী কবেন। একলব্যের গুরুদক্ষিণায় সত্যি ত্য আর পেট ভরছে না"—বলিলেন শুখুড়ো।

* * *

কলিকাতায় সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শিশুদিবস পালন উপলক্ষে নুষ্ঠিত সভায় শিশুজীবনের নানা মস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। —"বড়দের দেয়ালা-দিবস পালিত হলে ারো ভালো হয় কেননা তাঁদের দেয়ালা মস্যাটা এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা"—লে শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের প্রস্তাবিত আসাম সফরের বরুদ্ধে কংগ্রেসবিরোধী উপদলীয়েরা নাকি বক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন। —"তাঁরা বাধ হয় মনে করেন, দুরারোগ্য মানসিক ্যাধিতে ডাক্তারের চেয়ে হাতুড়ের চকিৎসাই প্রশস্ত"—মন্তব্য করিলেন মামাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কাশ্মীর প্রসঙ্গের আলোচনার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু

সংবাদিকদের জানাইয়াছেন যে, তাঁরা কাশ্মীরের ব্যাপারে Deadwall approach ত্যাগ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দেয়ালের কথা জানিনে, কিন্তু পর্দা-বোরখা পাকিস্তান এক কথায় ত্যাগ করবে, তা তো ভাবতে পারছিনে!!

* * *

মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে জওহরলালজী মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি সেখানে যাইতেছেন "অনুপ্রেরণা" লাভের জন্য। —"তাঁর সফর সফল হোক,
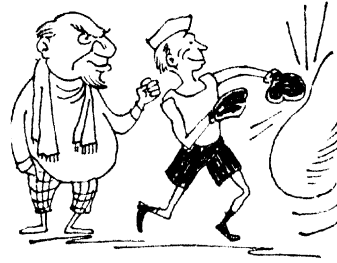
এই কামনাই করছি এবং আশা করছি তিনি ফিরে এসে বলবেন না—রাশ্যা দেশটা মাটির, সেটা সোনা-রূপার নয়, তার আকাশেতে সূর্য ওঠে, আর মেঘে বৃষ্টি হয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ যে, শিলং হইতে প্রেরিত একটি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম গোয়ালপাড়া পৌঁছিয়াছে নাকি চোদ্দদিন পর। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বহুদিন আগে শুনেছিলাম, জনৈক ব্যক্তির টেলিগ্রামে প্রেরিত একটি সন্দেশের হাঁড়ি নাকি অপর এক ব্যক্তির তারে প্রেরিত একটি লোহার সিন্দুকের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে মাঝপথে ভেঙে গিয়েছিল। কলকব্জার কথা তো বলা যায় না"!!

* * *

সুরাটের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জ্যোতিষীদের মতে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে বিবাহের ভালো দিন নাই বলিয়া সেখানে বিবাহের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রতিরাতে প্রায় তিনশত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে। —"বিবাহের চেয়ে বড়োর জন্যে অবশ্য লগ্নের প্রয়োজন নেই, সুতরাং মাভৈঃ।"

* * *

প্রসংগত ব্যাংককের একটি সংবাদে শুনিলাম, সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া কোন এক বীমা কোম্পানী নাকি বিবাহ-বিচ্ছেদ-বীমা পলিসি ইসু করিতেছেন। —"ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন নিয়ে যাঁরা আর্তনাদ করেছেন, তাঁদের অবগতির জন্যে বলছি যে, উক্ত বীমা কোম্পানীর এই পলিসি ব্যাংকক সরকার অগ্রাহ্য করেছেন; সুতরাং সেদিক থেকেও কিছু সুবিধে হবে না। তবে সর্বনাশে সমুৎপন্নে খানিকটা সুরাহার জন্যে অনুরূপ পলিসির ব্যবস্থা তাঁরা করবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীর স্বত্বস্বামিত্ব ভারত এবং পাকিস্তান দুইয়েরেই ওপর বর্তিয়াছে। কিন্তু লাইব্রেরীটি কোথায় থাকিবে, এই সমস্যার কোন সমাধান না

হওয়ায় পাকিস্তান বই ভাগ করার পক্ষে সায় দিয়াছেন। —"অতঃপর লাইব্রেরীর বই ভাগ হলে ভাগফল হবে শূন্য এবং অবশিষ্ট থাকবে শূন্য, আর হাতে থাকবে খাতা আর পেন্সিল"—মন্তব্য করিতে করিতে বিশুখুড়ো ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন।

আষাঢ় ও মন

সাধনা চট্টোপাধ্যায়

আজকে আষাঢ় এলো,
চোখে তার অশ্রু ছলোছলো,
একটু সজল হাওয়া,
মেঘ-মেঘ দিন।
আজকে মনের মাঝে,
কি এক বেদনা টলোমলো,
বিরহের ছোঁওয়া লেগে,
হয়েছে রঙীন।

আজকে যে কথাটুকু বলা হল না'ক,
যে গানটি গুনে গুনে মনে,
সেই কথা, সেই গান, আঁখি মেলে দেখি,
ফুটে আছে টগরের বনে।

আজকের ঘন মেঘে এ-হৃদয় জুড়ে,
যে ব্যথাটি থরোথরো কাঁপে,
বৃষ্টি-বীণায় যেন তারি সুরে বাজে,
টুং টাং আলাপে বিলাপে।

আজকে আষাঢ় আর আমার এ মন,
মিলে মিশে হল এক প্রাণ,
আকাশে জমাট মেঘ, আর চোখে জল,
নামছে না ভেঙে অভিমান।

বৃষ্টি

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

আকাশ-চেতনা কাঁপে
দিগন্তের মৌনতাকে ভেঙে ঃ
দু' জোড়া অচেনা চোখ
প্রত্যহের বাঁধা পথ ছেড়ে,
কি যেন অবাক করা সীমাহীন মুহূর্তের সুর
হঠাৎ ছড়িয়ে দিলো
শতাব্দীর বোবা বিস্ময়ে।

সামুদ্রিক সন্ধ্যার মত
সব ব্যথা মুছে নিয়ে,
কে এলো কে এলো কন্যা
দুই চোখে ঘুমের শিশির—
ক্লান্ত পৃথিবী আর অন্ধকার মোহনার তীর,
নিমেষে ভরিয়ে দিলো
আনন্দের অজানা আশ্বাসে।

আমার দু' চোখে সুপ্তি;
অগাধ প্রশান্তি পৃথিবীতে—
বৃষ্টি এলো বৃষ্টি এলো
দু' চোখের কান্না মুছে নিতে॥

অনং জন

আনন্দ বাগচী

যখন মাটির ঘরে মানুষের চোখ দেখি আতঙ্কে পাণ্ডুর
এ পাড়ার ও পাড়ার শিশুরা তখনও বুঝি এই পৃথিবীর
আজন্ম স্বপ্নের পর ধুলোর নগর গড়ে, সমুদ্রের দূর
ঢেউয়ের সংক্রান্তি ফের কাছে আসে ঃ
ভোলে তারা ঃ সময় গভীর।

কে তুমি আমার দুটি অপরূপ চোখে দিলে দূরের নিশান
এই দেহে দিলে ছায়া ঃ অন্য সুর, সিঁড়িভাঙা ক্লান্তির পরেও
হাওয়া-ফিসফিস্ দিন-রাত্রি দুই জানালায় খুলে দিলে প্রাণ,
নক্ষত্র পুরুষ, তুমি, শোকের উত্তাপ দিলে আমার ঘরেও॥

বিধির বিধান

নির্ভুলভাবে অপরের ভাগ্য বিচার করে দিলেও নিজের ভাগ্য বিচারের বেলায় ভুল করে বিপর্যয়ে পড়া এবং শেষে বিপর্যয় থেকে মুক্ত হওয়ার কাহিনী গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচিত "জ্যোতিষী"। খুবই ভাগ্যবান জ্যোতিষী, কারণ নিজের কপালের লিখনকে অতিক্রম করে গেলো তার স্ত্রীর কপালগুণে। আর সেই ভাগ্যগুণেটা ভি-নায়ক প্রডাকসন্সের এই নামের ছবিখানিরও সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। এ-ও নিশ্চয় বিধিরই বিধান! চিন্তার প্রখরতা বা প্রগতিশীল মনের সংস্রব কাহিনীটির খুব কাছ ঘেঁষে না

—শৌভিক—

থাকলেও ওপর ওপর আখ্যানবস্তুটির মধ্যে বেশ একটা অভিনবত্ব আছে। কাহিনীটির এইটেই মস্ত গুণ। আবেগময় ঘটনা গড়ে ওঠার মতোও উপাদান আছে, যদিও সংস্কারাচ্ছন্ন কাবু মনকে অভিভূত করার দিকেই সেইসব উপাদানের লক্ষ্য। যেভাবেই কাহিনীটির ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, এর মধ্যে এমন একটা নাটকীয় আবেদন সঞ্চারিত রয়েছে, যা যে কোন মনের লোককে একেবারে অভিভূত করে না তুলুক, নিবিষ্ট রেখে দিতে ব্যর্থ হয় না।

*　*　*

গল্পের আরম্ভ ঝড়-বাদলের রাতে। মোটরে এক তরুণী এসে যে বাড়িটির সামনে থামলো, তার দেয়ালে জ্যোতিষী বরদাচরণের নাম। উৎকণ্ঠিতা তরুণী তার প্রণয়ীর সঙ্গে বিয়ের শুভাশুভ ফলাফল জানতে এসেছে বরদার কাছে। ভাবাবেগহীন রুক্ষ প্রকৃতির লোক বরদা মর্মান্তিক ভাগ্যলিখনকে অবিচলিতভাবে বলে যেতে তার চোখের পাতা পড়ে না। তরুণী শুনলো তাদের বিয়ের ফল অশুভ হবে, তবে এটাও জেনে গেল যে, তার প্রণয়ীর ভাগ্যরেখা যদি তেমন হয়, তাহলে অশুভ লক্ষণ কেটেও যেতে পারে। বরদা বসে নিজের হস্তরেখা বিচার করতে। কোন ফাঁক পেলেই এইটেই হয় তার কাজ—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের ভাগ্যরেখা দেখা আর কোষ্ঠি বিচার করা। যতো দেখে, ততোই যেন একটা বিমর্ষতা ওর অবয়বে প্রচ্ছায়িত হয়ে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাগ্য জানার জন্য লোকের আর আসার বিরাম নেই। বরদা সকলকেই নির্ভুলভাবে গুণে দেয়। সংশয়ের রেখা ফুটে ওঠে কেবল নিজের হস্তরেখা দেখলেই। বাড়িতে থাকবার মধ্যে বৃদ্ধা মা, আর তারই গৃহে পালিত ভ্রাতৃসমতুল সন্তোষ। পাশের বাড়ির কলেজে-পড়া মেয়ে লতিকার প্রতি সন্তোষ অনুরক্ত, সন্তোষের এই দুর্বলতাকে নিয়ে লতিকার রঙ্গ-তামাসার অন্ত নেই। লতিকার দাদা বিমল বরদাকে পছন্দ করে না, তার মতে বরদা ভণ্ড; একটা চারশো বিশ'।

*　*　*

বরদার মার দুঃখ বরদা বিয়ে করতে চায় না বলে। কারণ কিছু বলে না, অথচ রাজীও হয় না। প্রতিবেশী লতিকার মার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বরদার মা লতিকার পিসতুতো বোন মায়াকে হাত দেখাবার নাম করে বরদাকে দেখিয়ে দিলে। বরদা জানালে, মেয়েটি সুলক্ষণা এবং ভালো বরই ভাগ্যে আছে তার। বরদার মা ভুল বুঝলেন, তার মনে হলো বরদাই যেন মায়াকে পছন্দ করেছে। সেই ভেবে তিনি মায়ার পিতাকে ডেকে জানালেন বিয়ের দিন স্থির করতে। বরদা শুনে আশ্চর্য হলো। মায়ার বিয়ে হবে ভালো ঘর-বরে, এই কথাই সে জানিয়েছে—নিজের জন্য সে পাত্রী নির্বাচন করতে ওকথা বলেনি। মায়ার পিতাকে বরদা সান্ত্বনা দিলো এই বলে যে, এক মাসের মধ্যেই তাঁর কন্যা সুপাত্রস্থ হবেই। কিন্তু বরদার মা নিজেকে বড়ো অপমানিতা মনে করলেন। বরদা বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় তিনি অন্ন-জল ত্যাগ করে এক অনর্থ বাধিয়ে তুললেন। বরদার মনে পড়লো তার বিধিলিপির কথা; মাতৃঘাতী হওয়া রয়েছে তার কপালে লেখা, আর লেখা রয়েছে স্ত্রীর কুলত্যাগিনী হওয়ার কথা। এইজনাই সে বিয়ের কথা এড়িয়ে যায়, এই তার বিমর্ষতার কারণ। কিন্তু মাতৃঘাতী হতে পারবে না সে। বরদা বিয়েতে মত দিলে। কিন্তু খবর পাওয়া গেল বরদার গণনা-মতো মায়ার বিয়ে অন্যত্র ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে।

*　*　*

জ্যোতিষীদের এক সম্মেলন উপলক্ষে বরদা মাকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে এলো কদিনের জন্য। এখানে জুটলো বাঙালী ব্রাহ্মণ উপেন চক্রবর্তীর বাড়িতে থাকবার জায়গা। উপেনের মেয়ে সরমাকে দেখে বরদার মার বড়ো ইচ্ছে হলো তাকে

পুত্রবধূ করে নেবার। হঠাৎ একদিন ঘাটে বরদা তার গুরু স্বরূপানন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলো। বরদা তাঁকে তার বিধিলিপির কথা জানাতে গুরু পরদিন সকালে তার মাকে সঙ্গে নিয়ে আসবার জন্য বলে চলে গেলেন। পরদিন সকালে গুরু-দর্শন পথে মা গঙ্গায় স্নান করতে নামলেন এবং ডুবে মারা গেলেন। বরদা নিজেকে মাতৃঘাতী বলে ভাগ্যের ওপরে দোষারোপ করলে। কাশীতেই উপেন চক্রবর্তী ও সরমার সহযোগিতায় শ্রাদ্ধাদি চুকে যাবার দু'মাস পর বরদা কলকাতায় ফিরে আসার সংকল্প ব্যক্ত করলে। ইতিমধ্যে বরদা সরমাকে আরও নিকট থেকে চেনবার সুযোগ পেয়েছে, নিজের অনেকখানি ভার সরমার ওপরে ছেড়েও দিয়েছে। আসবার সময় উপেন নিজে থেকেই কথাটা পাড়লে—বরদা যদি তার কন্যাকে গ্রহণ করে! বরদা তার বিধিলিপির কথা চিন্তা করে সরমাকে গ্রহণ করতে রাজী হলো না; কলকাতায় ফিরে এলো।

এতদিন সংসার চালিয়ে এসেছিলেন বরদার মা; তাঁর অবর্তমানে সংসার অচল। সোদরপম সন্তোষ আর বরদা নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে; বাকী কাজ করে ঝি রাজুর মা। কিন্তু ওভাবে চালানোই দুষ্কর। পোড়া-ভাত আর নুনগোলা ডাল খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বরদা সটান কাশী গিয়ে উপস্থিত হলো এবং সরমাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে ফিরলো। প্রথম কনেরূপে সরমাকে দেখেই বিমলের মাথা ঘুরে গেল; তার মতে বরদার পাশে সরমা যেন বানরের গলায় মুক্তার হার। সরমারও ভালো লাগলো না এই লোকটির চাউনি। বিমল কিন্তু ভয় আর টাকার লোভ দেখিয়ে রাজুর মাকে হাত করে সরমাকে পাবার ফন্দী করলে। সারাদিন সে এ বাড়িতে সরমার কাছে বসে গল্পগুজব করে। সরমা পছন্দ না করলেও ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু বলতেও পারে না। বরদার নজরে পড়লো; প্রথমে সরমাকে সে নিষেধ করে দিলে বিমলের সঙ্গে মেলা-মেশা না করতে। কিন্তু বিমলের গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে আসা সরমা বন্ধ করতে পারলে না। বিমলের সঙ্গে রাস্তায় রাজুর মার কথা হতে দেখলে বরদা। সেই ক্ষণেই রাজুর মাকে সে বরখাস্ত করে দিলে। তবুও রাজুর মা মাঝে মাঝে সরমার কাছে সাহায্যের জন্য আসা-যাওয়া করতে লাগলো। বরদার নজরে তাও পড়লো; সরমা সম্পর্কে তার মনে একটা সন্দেহের উদয় হলো। একদিন বিমল এসে সরমার কাছে 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা তুললে এবং আরও একটু সাহস করে সরমার হাত ধরলে। ঠিক সেই মুহূর্তে উদয় হলো বরদা। বিমলকে তো অপমান করে তাড়িয়ে দিলই, এমন কি সরমাকেও ছাড়লে না। এরপর একদিন সরমাকে একা ঘরে দেখে ও-বাড়ির জানলা থেকে বিমল আলাপ আরম্ভ করলে। হঠাৎ এসে পড়লো বরদা। জানলা বন্ধ করে সরমার চরিত্র নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে যা-তা বলে চলে গেল। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সরমা সেই রাতেই কাশী চলে যাওয়া স্থির করলে। রাজুর মার সহায়তা পাওয়া গেল। রাজুর মাও এমনি সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। ট্রেনে সরমাকে সে কি একটা খাইয়ে অজ্ঞান করে

ডি পি প্রডাক্‌শনের 'তিন ভাই' চিত্রে শ্যামা, পাহাড়ী ও নিরূপা রায়

দিলে। মাঝপথ থেকে বিমল এসে জুটলো।

* * *

চোখ খুলতেই সরমা নিজেকে পেলে অপরিচিত স্থানে; সামনে বিমল। ব্যাপারটা সরমা বুঝলে; বিমলের কাছে অনুনয় করে কোন ফল হলো না। সেই রাত্রে বিমল মত্তাবস্থায় সরমার ঘরে উপস্থিত হলো। বাঁচবার জন্য সরমা হাতের কাছে একটা ফুলদানী পেয়ে তাই ছুঁড়েই পশুটাকে আহত করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। ওদিকে রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বরদা সরমাকে না পেয়ে কাশীর পথে রওনা হলো। কাশীতে সরমাকে পাওয়া গেল না সে সময়। উপেন চক্রবর্তী জানালো সরমা কুল-ত্যাগিনী। উপেনের কাছ থেকে বরদা বিদায় নিয়ে চলে আসার অব্যবহিত পরই সরমাও উপস্থিত হলো। উপেন কিন্তু তার কোন কথাই শুনতে চাইলে না, বরং মুখ বাঁচাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরবারই উপদেশ দিলে। সরমা ছুটলো কলকাতায়; স্বামীর কাছে তার সতীত্বের প্রতি মিথ্যারোপকে খণ্ডন করার জন্য। সরমা কলকাতায় এসে পৌঁছলো; বরদা তখন ঘুরছে তার গুরুর সন্ধানে—এ-তীর্থ ও-তীর্থ করে। পয়সার অভাবে সরমার আর চলে না। পাড়ায় তার 'কুলটা' বদনাম রটেছে। চতুর্দিক থেকে বিদ্রূপ ও দুর্নাম তার কানে ভেসে আসতে থাকে। বরদা শেষে তার গুরুর সন্ধান পেলে। গুরু জানালেন, তার স্ত্রী কুলটা হতেই পারে না; সরমা সতী ও সাধ্বী। বরদার হস্তরেখায় স্ত্রীর কুলত্যাগিনী হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সরমার বিধি-লিপিতে তা খণ্ডিত হয়েছে। গুরু বরদাকে জানালেন, সরমা তারই আশাপথ চেয়ে তারই গৃহে অবস্থান করছে। গুরুর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে বরদা ধরলো কলকাতার পথ। পাড়ায় লোকের বিদ্রূপ, অপমান ও দুর্নাম অসহনীয় হয়ে ওঠায় সরমা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার সংকল্প করলে। গলায় ফাঁস লাগাতে যাওয়ার মুহূর্তেই বরদা উপস্থিত হয়ে সরমার প্রাণ ও মান বাঁচিয়ে দিলে।

* * *

মূল গল্পটিকে ধরলে এর মধ্যে অভিনবত্বও আছে এবং প্রভূত নাটকীয় সার বস্তুও আছে। বেশ জোরালো গল্প বলেই অভিহিত করা যায়। অবশ্য এক-জনের ভাগ্য তার স্ত্রীর ভাগ্যরেখায় খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার যে প্রতিপাদ্য এখানে টানা হয়েছে জ্যোতিষীদের কাছে তা কিরূপ স্বীকৃতি লাভ করবে, সেটা দেখবার বিষয়। তবে একথা যদি বলা হয় যে বরদা হাতের লেখায় তার স্ত্রীর কুলত্যাগিনী হওয়াটা সত্যে পরিণত হয়েছে এইভাবে যে সরমা ক্ষোভ ও অভিমান বশে একা কাশী যেতে গিয়ে দুর্বৃত্ত বিমলের খপ্পরে তো পড়ে-ছিল একবার, তাহলে বিতর্ক ঘুরে যায়

অন্য পথে। বরদার মাতৃঘাতী হওয়াটাও কি রকম! গুরু সন্দর্শনে যাবার আগে তার মা গঙ্গায় স্নান করতে নামলেন এবং ডুবে মারা গেলেন। বরদা এতে মাতৃঘাতী হলো কি করে? তবে যদি বলা হয় যে, বরদার অপরাধ সে তার মাকে জল থেকে জীবন্ত উদ্ধার করতে পারেনি তাহলে স্বতন্ত্র কথা। তার চেয়ে বরদার মার জলে ডুবে মৃত্যুই ছিল নিয়তির লিখন বললেই তর্ক চুকে যায়। যাই হোক মূল গল্পটি জমে ভালো এবং গোড়া থেকেই মনকে নিবিষ্ট রেখে দেয় কৌতূহলকে বেশ উদগ্রীব করেই। তাই বলে বিসদৃশ ব্যাপারেরও অভাব ঘটেনি। আরম্ভের দৃশ্যেতেই তো দারুণ বর্ষায় অনূঢ়া তরুণীর জ্যোতিষীর দরজায় এসে ধাক্কা দেওয়া। এটা ঠিক যে মেয়েটি যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে বিয়ের, তথা, হয়তো জীবনমরণের প্রশ্ন নিয়েই তাকে আসতে হয়েছে, কিন্তু ওটা হলো চলচ্চিত্রসুলভ যুক্তি। তেমনি ধরা যায় আর একটি মেয়ের কথাও। সহায়-হীন দরিদ্র মেয়ে; সংসারে ছোট ভাইবোন-দের মানুষ করার ভার পড়েছে তার ওপর; পরীক্ষা দিয়েছে; পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে চাকরি নিয়ে সংসারের অভাব ঘোচাবে। বরদার কাছে এসেছে তার সাফল্য সম্ভব হবে কিনা জানতে। মেয়েটি একটা করুণ চিত্র সামনে তুলে ধরে বটে, কিন্তু ওর অমন আসাটাই বিসদৃশ। মেয়েটির কাছ থেকে দক্ষিণা না নেওয়ায় বাইরে কঠিন ও গম্ভীর বরদার দয়ালু মনটাকে প্রকাশ করার যে চেষ্টা হয়েছে তা অন্যভাবেও দেখানো যেতো, এবং তা পরে একটি দরিদ্র মুমূর্ষু বিধবার ছেলেকে সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে দেখানোও হয়েছে। আরও একটি মেয়ে আসে ভাগ্য বিচার করাতে; স্মার্ট মেয়ে ডলি বসু। তার প্রশ্ন এক-জনকে বিয়ে করে তারপর তাকে ডিভোর্স করলে আবার এক স্বামী সে পাবে কি না। স্বামীর অভাব তার কোনদিন হবে না রূঢ়-ভাবে বরদা এই উত্তর দিলেও দৃশ্যটি দর্শকদের কাছে প্রচণ্ড আমোদের সৃষ্টি করে দেয়।

* * *

সাদাসিধে বিন্যাস। কিন্তু গল্পটি নাটকীয় পদ ধরে বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। তবে বিন্যাসে নতুনত্বও নেই, বৈশিষ্ট্যও নেই। বরং কথার সঙ্গে কথা ঠেস দিয়ে, অথবা সংলাপের জের ধরে অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে দৃশ্য পরিবর্তন; সবাক চিন্তা; ফটোর সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদিই রয়েছে ছবিখানি জুড়ে। কাশীতে উপেন চক্রবর্তী বললে তার কন্যা না থাকলে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেবারও কেউ থাকবে না, অমনি দেখা গেল সরমা আসছে সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে। বরদার গুরু বললেন সরমা তার আশাপথ চেয়ে আছে, তৎক্ষণাৎ পরি-বর্তিত দৃশ্যে বরদার বাড়ির বারান্দায় সরমাকে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। মাতৃশ্রাদ্ধের পর বরদা কলকাতায় চলে এলো। তারপর একদিন দেববিগ্রহের সামনে সরমা গাইলে, 'মন বলে এলে বুঝি দ্বারে ছুটে যাই', অবশ্য গাইলে দেবতারই উদ্দেশে, কিন্তু গান শেষ হতে চোখ ফেরাতেই সামনে দেখলে বরদা এসে হাজির। এসব হলো পুরনো ধারার বিন্যাস। কয়েক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো কাজ সারার চেষ্টা রয়েছে। যেমন, কাশীতে অকস্মাৎ পরমারাধ্য গুরুদেবের সঙ্গে
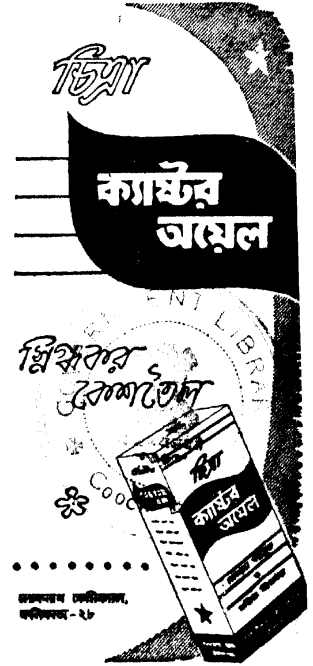
'পিয়ারা দুষমন' চিত্রে জয়রাজ এবং নাদিরা

দেখা হতেই তার কাছে বরদার নিজের বিধিলিপির উল্লেখ করা; অথবা সরমা বধূবেশে বরদার কলকাতার বাড়িতে পেঁছবার প্রায় পরের দৃশ্যেই সরমাকে লাভ করার জন্য রাজুর মার সঙ্গে বিমলের ষড়যন্ত্র। আসলে দৃশ্যগুলি ঠিকমতো উপস্থাপনেই ত্রুটি ঘটেছে। আরও রয়েছে, যেমন মাতৃশ্রাদ্ধের পর কাশীতে দুমাস থেকে বরদা কলকাতায় চলে যায় এবং সেখানে রান্না করতে হাত পুড়িয়ে আর পোড়া ভাত খেয়ে সরমাকে ঘরে আনার কথা মনে ভাবে এবং তারপরই তাকে কাশীতে চলে আসতে দেখা যায়। অথচ কাশীতে এসে প্রকাশ করলে যে মার বাৎসরিক শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত। বোঝা গেল যে সরমার সঙ্গে বিয়েটা দেখিয়ে দেবার জন্যই ওই ব্যবস্থা করতে হয়েছে, কারণ একবছর কালাশৌচ থাকতে বিয়ে হবার নয় বলে। কিন্তু মাঝে যে একটা বছর পার হয়েছে সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। ট্রেন থেকে অজ্ঞান সরমাকে বিমল ও রাজুর মা কিভাবে ম্যানেজ করে গুপ্তস্থানে নিয়ে হাজির করলে সেটা জানবার জন্য দর্শকদের ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক; কিন্তু তা নেই। কাশী যেতে সরমাকে একটা লোকাল ট্রেনে চড়তে দেখা গেল কেন? আর স্থানান্তর দেখাতেই হলেই চলন্ত ট্রেনের দৃশ্য দেখানো ছাড়া আর কিছু কি ভাবা যায় না? প্রায় সব বাঙলা ছবিতেই অমনিধারা চলন্ত দৃশ্য দেখে আজকাল এমন হয়েছে যে কোন ছবিতে দেখলেই একটা একঘেয়েমীর মৃদু বিরক্তি জেগে ওঠে।

* * *

কাহিনীটির জোর থাকায় অভিনয়ের দিকটাও জোর ফোটাবার সুযোগ শিল্পীরা পেয়েছেন। নাম ভূমিকায় অর্থাৎ বরদার চরিত্রে বিকাশ রায় চারিত্রিক অভিনয়ে চমৎকৃত হবার মতো কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। বাইরেটা কঠিন ও রূঢ়, কিন্তু অন্তরে দয়া মমতা সবই আছে অথচ নিজের বিধিলিপির কথা ভেবে শঙ্কিত ও বিমর্ষ এই চরিত্রটিতে বিকাশ রায় তাঁর শিল্পকৃতিত্বের উজ্জ্বলতম পরিচয় দিয়েছেন বলা যেতে পারে। সরমার চরিত্রে সন্ধ্যারাণীর আবির্ভাব ছবির প্রায় অর্ধেক থেকে, কিন্তু তিনি আসার পর অভিনয়ের দিকটা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এবং ব্যক্তিগতভাবেও সন্ধ্যারাণী চরিত্রটিতে তাঁর কৃতিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ফুটিয়ে যেতে পেরেছেন। বিশেষ করে বিমলের সঙ্গে তাঁর আলাপে বরদা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠা থেকে শেষে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার অংশে সন্ধ্যারাণীর অভিনয় নতুন মর্যাদা এনে দেয়। আত্মহত্যার দৃশ্যে দর্শকমনে একটা হাহাকার জেগে ওঠে। অবশ্য এ অংশে দৃশ্যগুলির পরিচালনায়ও বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। সরমার পিতা উপেন চক্রবর্তীর ভূমিকায় নিষ্ঠাবান প্রবাসী বাঙালীর একটি সুন্দর টাইপ চরিত্র কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে ফুটে উঠেছে। দুর্বৃত্ত বিমলের চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায় এতোদিন পর পর্দায় সম্ভবত এই প্রথম গণ্য করার মতো অভিনয়-কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। গোড়ার দিকে বরদার সঙ্গে তাঁর পরিহাস বা বোন লতিকার সঙ্গে খুনসুটির অংশে একটু কৃত্রিম, কিন্তু সরমার প্রতি আকৃষ্ট হবার পর থেকে যথাযথ নাট্যপুষ্ট অভিনয় ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

■ ■ ■

'বাসর প্রদীপ' চিত্রের একটি রঙ্গদৃশ্যে নৃপতি ও তুলসী চক্রবর্তী

মূল কাহিনীর সঙ্গে দুটো ফ্যাকড়া যোগ করে হাল্কা হাসি পরিবেশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে বরদার আশ্রিত সোদরপম সন্তোষ আর লতিকাকে নিয়ে; আর অপরটি হচ্ছে বরদারই গৃহসংলগ্ন মুদিখানার মুদী আর তার বাড়ির ঝি রাজুর মাকে নিয়ে। দুটি ক্ষেত্রেই প্রেমের কানামাছি খেলা। এমনি ধরতে গেলে দুটি অধ্যায়ই অবান্তর এবং তাতে গল্পের চলার পথ অনেকখানি দীর্ঘায়িতও হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রয়োজন মিটিয়েছে প্রচুর হাসি পরিবেশন করে। চুলবুলে কলেজী কিশোরী লতিকার ন্যাকাবোকা ছেলে সন্তোষকে নাকে দড়ি দিয়ে নাচানোর দৃশ্যগুলি যথাক্রমে সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং প্রশান্তকুমারের অভিনয়ে প্রভূত আমোদ উপভোগের সুযোগ এনে দেয়। ছবিখানি জনপ্রিয় করে তোলায় এদের দুজনের অভিনয়কৃতিত্ব যথেষ্ট সহায়ক বলা যায়। অবশ্য চরিত্র দুটিই অমনি। ঐ রকমই আর এক জুড়ি, খুদী আর রাজুর মা। মুদীর চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে বাঙাল এবং হাসির এক একটা ডিনামাইট বিস্ফোরিত করে দেন বার-কয়েক। রাজুর মার চরিত্রে অভিনয় করেছেন লীলাবতী। বরদার মার ভূমিকায় সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় পুত্র-স্নেহাতুর এবং পুত্রের প্রতি অভিমানক্ষুব্ধ চরিত্রটিকে বেশ আবেগময় করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন নবাগতা তিনজন মিত্রা বিশ্বাস, নীরা দত্ত ও মীরা রায়, জয়শ্রী সেন, অপর্ণা দেবী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিপিন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, জীবন গোস্বামী, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি।

কলাকৌশলের দিক সাধারণ। কোন দিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো কোন কৃতিত্ব নেই। আবহ-সঙ্গীত বড়ো ঝাঁঝালো। গান মাত্র দুখানি। তার মধ্যে একখানি, সরমার মুখে মীরার ভজন শ্রেণীর গানখানি বেশ ভালো, সুরে এবং গাওয়ায়ও। ছবিখানির সংগঠনকারিবৃন্দ হচ্ছেন—চিত্রনাট্য রচনায় মুরারি সেন, পরিচালনায় চিত্ত বসু, আলোকচিত্র গ্রহণে বিমল মুখোপাধ্যায়, শব্দযোজনায় বাণী দত্ত, সুরযোজনায় গোপেন মল্লিক, শিল্প-নির্দেশে গৌর পোদ্দার এবং সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী।

খেলার মাঠে

একলব্য

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলায় বিজয়ীর প্রতীক "টমাস কাপ" দখলে রেখে ছোট্ট দেশ মালয় নিজেকে ব্যাডমিণ্টন খেলায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলে আবার প্রতিপন্ন করেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা টমাস কাপের খেলা আরম্ভ হয়। সমস্ত শক্তিশালী দেশকে একে একে পরাভূত করবার পর ফাইন্যালে ডেনমার্ককে হারিয়ে মালয় প্রথম বছরই বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করে। তারপর ১৯৫১-৫২ সালে দ্বিতীয় বারের প্রতিযোগিতায় বিশ্বজয়ীর অনন্য সম্মান নিয়ে মালয়কে বসে থাকতে হয় নিজের দেশে। সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার বিজয়ী আমেরিকাকে যেতে হয় মালয়ে টমাস কাপ ছিনিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু পারেনি আমেরিকা মালয়ের কাছ থেকে টমাস কাপ কেড়ে আনতে। শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করে শুধু হাতে তাদের সাগর পাড়ি দিতে হয়েছে। এবার ছিল "টমাস কাপের" তৃতীয় অনুষ্ঠান। আন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার বিজয়ী ডেনমার্ককেও এবার মালয় থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। টমাস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মালয় ৮—১ খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে ডেনমার্ককে। সুতরাং ব্যাডমিণ্টনের অজেয় যোদ্ধা মালয়েরই দখলে রয়েছে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনের বিজয়ীর প্রতীক ঐতিহাসিক টমাস কাপ।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের নয়টি খেলার মধ্যে শেষ খেলায় মালয়ের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের জয়লাভকে "কনসোলেশন" প্রাইজ বলা যেতে পারে। খেলার উপর কতখানি দখল, মনের উপর কতখানি আস্থা এবং কব্জির উপর কতখানি জোর থাকলে একটি পরম শক্তিশালী দল, যারা বিশ্বের সমস্ত শক্তিমান দেশকে একে একে হারিয়ে মালয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের এমন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করা যায়! মালয় ও ডেনমার্কের খেলা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। পি টি আই-এর সংবাদের উপর নির্ভর করেই এই মন্তব্য লিখতে হচ্ছে। পি টি আই-এর সংবাদদাতা লিখেছেন—ডেনিস চ্যাম্পিয়ন ওয়ান স্কারুপ এবং ডেনমার্কের কীর্তিমান খেলোয়াড় ফিন কোবেরো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওং পেং সুন ও এ ডি চুয়ের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সহজ সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। দুই দেশের ব্যাডমিণ্টন কোর্টের নিপুণ শিল্পীদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক বেশী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন মালয়ের খেলোয়াড়েরা। খেলার মাধুর্য আর মারের প্রাচুর্যে সময়ে সময়ে কোর্টের জালের পাশে সৃষ্টি করেছেন তারা ইন্দ্রজাল। সিঙ্গাপুর ব্যাডমিণ্টন স্টেডিয়ামের ৭ হাজার দর্শক ব্যাডমিণ্টনের ক্রীড়াচাতুর্যে তন্ময় হয়ে গেছে। অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং সাধনার ফলে একটি ছোট দেশ খেলায় কতখানি উন্নতি করতে পারে মালয়ের ব্যাডমিণ্টন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

* * *

টমাস কাপে ভারতকে এবার শেষ পর্যায়ের খেলায় ডেনমার্কের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি-ফাইন্যালে আমেরিকাকে হারাবার পর ভারত ফাইন্যালে ডেনমার্কের সঙ্গে খেলার সুযোগ পায়। ডেনমার্ককে হারাতে পারলে ভারত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ পেত। আমেরিকা গতবারের রানার্স। সুতরাং আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের সাফল্যে অনেকেই আশা করেছিলেন, ভারত হয়তো ডেনমার্ককেও হারাতে পারবে, কিন্তু পারেনি। ৩—৬ খেলায় হার স্বীকার করে ভারতকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৫১-৫২ সালের টমাস কাপের খেলাতেও ভারত ডেনমার্কের কাছে হার স্বীকার করেছিল। এবারকার ফলাফল অনুযায়ী ধরে নেওয়া যেতে পারে, ব্যাডমিণ্টনে ভারত কিছুই উন্নতি করতে পারেনি, যেখানেই ছিল ঠিক সেখানেই আছে। অথচ ব্যাডমিণ্টন এই ভারতেরই আদি খেলা। ভারতের মাটিই ব্যাডমিণ্টনের জন্মস্থান। ভারতেরই প্রতিবেশী মালয়ের পক্ষে যদি বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ সম্ভব হয়, তবে বিরাট দেশ ভারতের পক্ষেই বা তা সম্ভব হবে না কেন, এপ্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। অবশ্য ব্যাডমিণ্টন ক্রীড়াভিজ্ঞ মহলের অভিমত—কিছুটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জন্মগত অধিকার না থাকলে শুধু অনুশীলনের দ্বারা ব্যাডমিণ্টনে নিপুণতা লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের মত বিরাট দেশে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন

টমাস কাপে এবার যাঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাঁদিক থেকে—আর ভোংরে, টি এন শেঠ, মনোজ গুহ ও নন্দু নাটেকার; পিছনের সারি—পি [illegible] (ম্যানেজার) ও গজানন হেমাড়ি

খেলোয়াড়ের কি অভাব? তবে অভাব এই ধরনের খেলোয়াড়দের খ‍ুঁজে বের করবার লোকের। ভারতকে ব্যাড-মিণ্টনে মালয়ের সমকক্ষ হতে হলে এই ধরনের খেলোয়াড় খ‍ুঁজে বের করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; ছোট বড় শহরে গড়ে তুলতে হবে কভার্ড কোর্ট। যাতে সারা বছরই অনুশীলনের সুযোগ পাওয়া যায়।

* * *

টমাস কাপের আলোচনা প্রসঙ্গে টমাস কাপ সৃষ্টির ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ওং পেং সুন

হবে না। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডা-রেশনের সভাপতি স্যার জর্জ এ টমাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দলগত প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালে একটি সুদৃশ্য কাপ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের হাতে অর্পণ করেন। স্যার জর্জ টমাসের নামানুসারে কাপটির নাম হয় "টমাস কাপ"। স্যার জর্জ টমাসকে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভাপতি বললেই তার সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। টমাস সর্বকালের একজন কীর্তিমান ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, আয়ার-ল্যাণ্ড, ওয়েলস প্রভৃতি দেশের এমন কোন ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা নেই, যে প্রতি-যোগিতায় টমাস বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেননি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতায় স্যার টমাস ২৯ বার ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে অবিস্মরণীয় গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। ব্যাডমিণ্টন ছাড়া টেনিস এবং দাবা খেলাতেও টমাস যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই টমাস কাপের বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠার মধ্যে একজন দিকপাল খেলোয়াড়ের নামও জড়িত হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের পরিচালনায় ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে টমাস কাপের খেলা আরম্ভ হয়। টমাস কাপের খেলার নিয়ম ডেভিস কাপের অনুরূপ। অর্থাৎ পূর্ব বারের বিজয়ীকে নিজের দেশেই বসে থাকতে হয়। বিভিন্ন জোনএ পরিচালিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে পূর্ববারের বিজয়ীর দেশে গিয়ে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ৫টি সিঙ্গলস ও ৪টি ডাবলসের খেলায় যে দেশ বেশী সংখ্যক খেলায় জয়লাভ করে তারাই অর্জন করে বিজয়ীর সম্মান। বিশ্বের যে কোন দেশের পক্ষেই টমাস কাপ লাভ পরম গৌরবের বিষয়। কিন্তু মালয় ছাড়া এপর্যন্ত অন্য কোন দেশই টমাস কাপ লাভ করতে পারেনি।

টমাস কাপের শেষ পর্যায় ভারত ও আমেরিকার খেলার ফলাফল পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে ভারত ও ডেনমার্ক এবং মালয় ও ডেনমার্কের খেলার ফলাফল প্রকাশ করা হল।

ভারত ঃ ডেনমার্ক—সিঙ্গলস

নন্দু নাটেকার (ভারত) ১৫—৮ ও ১৫—৩ পয়েন্টে স্কারুপকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

ফিন কোবেরো (ডেনমার্ক) ১৮—১৪ ও ১৫—১১ পয়েন্টে টি এন শেঠকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ফিন কোবেরো (ডেনমার্ক) ৮—১৫, ১৫—৬ ও ১৫—১০ পয়েন্টে নন্দু নাটেকারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ওল এনসেন (ডেনমার্ক) ১৫—৯ ও ১৮—১৬ পয়েন্টে পি এস চাওলাকে (ভারত) পরাজিত করেন।

স্কারুপ (ডেনমার্ক) ১৫—১০ ও ১৫—৩ পয়েন্টে টি এন শেঠকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস

নন্দু নাটেকার ও রবীন্দ্র ভোংরে (ভারত) ১৫—৩ ও ১৮—১৫ পয়েন্টে ওল আইলাটসেন ও ওল মার্টজকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

গজানন হেমাডি ও মনোজ গুহ (ভারত) ১৫—১০, ৩—১৫ ও ১৫—৩ পয়েন্টে ওল আইলাটসেন ও ওল মার্টজকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

ফিন কোবেরো ও হ্যামারগার্ড হ্যানসেন (ডেনমার্ক) ১৫—১২ ও ১৫—৩ পয়েন্টে গজানন হেমাডি ও মনোজ গুহকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ফিন কোবেরো ও হ্যামারগার্ড হ্যানসেন (ডেনমার্ক) ১৫—৮ ও ১৫—৩ পয়েন্টে নন্দু নাটেকার ও রবীন্দ্র ভোংরেকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মালয় ঃ ডেনমার্ক—সিঙ্গলস

এ ডি চুং (মালয়) ১৫—৬ ও ১৫—… পয়েন্টে ফিন কোবেরোকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

ওং পেং সুন (মালয়) ওয়ান স্কারুপকে (ডেনমার্ক) ১৫—৫, ১৬—১৮ ও ১৫—… পয়েন্টে পরাজিত করেন।

ওং প লিম (মালয়) ১৫—১০ ও ১৫—৮ পয়েন্টে এনসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

ওং পেং সুন (মালয়) ১২—১…

মালয়ের কীর্তিমান ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় এ ডি চুংয়ের খেলার ভঙ্গি

১৫—১৫—০ ও ১৫—৭ পয়েন্টে ফিন কাবেরোকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

এ ডি চুং (মালয়) ওয়ান স্কারুপকে (ডেনমার্ক) ১৫—১০ ও ১৫—৯ পয়েন্টে পরাজিত করেন।

ডাবলস

তান ইন হং ও ইয়ং কী জং (মালয়) ১৫—৯ ও ১৫—৩ পয়েন্টে ওল মার্টজ ও মাইলাটসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

ওই টেক হক ও ওং প লিম (মালয়) ১৫—৪ ও ১৫—৮ পয়েন্টে ফিন কোবেরো ও হ্যামারগার্ড হ্যানসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

ওই টেক হক ও ওং প লিম (মালয়) ১৫—৮ ও ১৫—২ পয়েন্টে ওল মার্টজ ও মাইলাটসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

ফিন কোবেরো ও হ্যামারগার্ড হ্যানসেন (ডেনমার্ক) ১৮—১৫, ৫—১৫ ও ১৫—৬ পয়েন্টে লিম কি ফং ও তান ইন হংকে (মালয়) পরাজিত করেন।

* * *

অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়েরা উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য লণ্ডন যাবার পথে দমদম বিমানঘাঁটিতে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এই সুযোগে একদল সাংবাদিক এবং এশিয়ান লন টেনিসের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রী [illegible] দে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পান। শ্রী [illegible] দে'র উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় এশিয়ান লন টেনিসের যে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে, তাতে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহণের সম্মতি আদায় করা। আর সাংবাদিকেরা গিয়েছিলেন নিজেদের [illegible] সংবাদ সংগ্রহের জন্য। অবশ্য বর্তমান টেনিস সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ান টেনিসের শিক্ষাগুরু হ্যারি হপম্যানের মতামত সংগ্রহও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। হপম্যান শুধু অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষাগুরু নন। ভারত চ্যাম্পিয়ন রামনাথ কৃষ্ণণকেও তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণণের শিক্ষা আরম্ভ হতে না হতেই তাঁকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। যাই হোক যুদ্ধোত্তর টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার বিরাট সাফল্যের মূলে হপম্যানের কৃতিত্ব রয়েছে অনেকখানি। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান খেলোয়াড় বলতে যে কয়জন, কেন রোজওয়াল, লুইস হোড, রেক্স হার্টউইগ, মার্ভিন রোজ, নীল ফ্রেজার প্রভৃতি সবাই—হপম্যানের হাতের তৈরি। প্রায় সবাই হপম্যানের মন্ত্রশিষ্য। যুদ্ধোত্তর টেনিসে অস্ট্রেলিয়া যে পর্যুপরি ৪বার ডেভিস কাপ লাভ করেছে তার জন্য হপম্যান অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। টেনিস নিয়ে জীবনভোর সাধনা করে চলেছেন হপম্যান। টেনিসের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানও পরিসীম। সেই হপম্যানের কাছ থেকে কৃষ্ণণ সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ ভারতীয় সাংবাদিকদের খুবই স্বাভাবিক।

কৃষ্ণণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হপম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—"কৃষ্ণণের অনেক কিছুই আছে, আবার অনেক কিছুই নেই। বিশ্বের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের সমকক্ষ হতে হলে কৃষ্ণণকে এখনও ৪।৫ বছর অনুশীলন করতে হবে।" এই বলে কৃষ্ণণের খেলায় যে সব দোষত্রুটি আছে, হপম্যান তারও উল্লেখ করেন। কিন্তু কৃষ্ণণ সম্বন্ধে হপম্যানের উক্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ম্যানচেস্টার থেকে খবর এলো—ভারত চ্যাম্পিয়ন রামনাথ
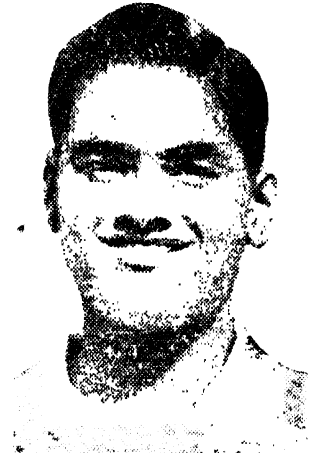
ভারত চ্যাম্পিয়ন টেনিস খেলোয়াড় আর কৃষ্ণণ

কৃষ্ণণ নর্দার্ন লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জারোস্লাভ ড্রবনীকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেছেন। যদিও নর্দার্ন লন টেনিস উইম্বলডন টেনিস নয়, এবং ড্রবনীরও বেওয়াজ নেই, এবং তার খেলার মধ্যেও উইম্বলডনের আন্তরিকতা থাকবার কথা নয়, তবুও বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত টেনিস খেলোয়াড়কে পরাজিত করা কৃষ্ণণের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশ বছর বয়সের মধ্যেই কৃষ্ণণ টেনিসে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন, এর মধ্যে ড্রবনীকে পরাজিত করা তার জীবনের বড় সাফল্য। অবশ্য কৃষ্ণণের এই কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের উল্লেখ করে হপম্যানের মন্তব্যকে খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয়। খেলার মধ্যে যে কোন সময় যে কোন অভাবনীয় ফলাফল সম্ভব হতে পারে। তবে আমাদের মনে হয় কৃষ্ণণের মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে, তাতে নিয়মিত অনুশীলন করলে হপম্যান যে মেয়াদ দিয়েছেন, তার চেয়েও কম সময়ে কৃষ্ণণ বিশ্বের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের সমকক্ষ হতে পারবেন।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা
[৭ই জুনের খেলার পর]

ফুটবলের আকারও যেমন গোল খেলারও তেমন গণ্ডগোল। অবশ্য গোলাকৃতি সকল বলের খেলাই একটু গোলমেলে। তবে ফুটবলের আকার যেমন বড়, এতে গোলমালও তেমন বেশী। কলকাতা ময়দানের ফুটবল পরিচালনা এক সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত। প্রায় প্রতি বছরই ফুটবল খেলায় এখানে কিছু না কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কোন সময় বড়, কোন সময় ছোট। কখনও কখনও এই সমস্যা আবার রাজ দরবারে গিয়ে পৌঁছয়। আবার কখনো মাঠের তাণ্ডব নৃত্য মাঠেই শেষ হয়ে যায়। খেলোয়াড়দের লাঞ্ছনা, রেফারীর নিগ্রহ, ক্লাব তাঁবুর উপর হামলা, মাঠের মধ্যে পাটকেল ও ইষ্টক বর্ষণ, দর্শকদের মধ্যে হাতাহাতি, পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ এসব ব্যাপার ফুটবল মরসুমের আনুষঙ্গিক ঘটনা। নির্মল আনন্দ পরিবেশক এবং শান্তিপ্রদ খেলার মাঠকে কলঙ্কিত করবার এমন বহু ঘটনা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করা গেছে; কিন্তু গত মঙ্গলবার ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান ও রাজস্থান ক্লাবের লীগের খেলায় দীর্ঘ কুড়ি মিনিট ধরে মাঠের মধ্যে যেভাবে ইষ্টক বৃষ্টি হয়েছে, সে দৃশ্য ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। শুধু কি ইট? তার সঙ্গে পাটকেলও ছিল সমপরিমাণ। শিলাবৃষ্টির মত [illegible] দীর্ঘস্থায়ী পাটকেল ও ইষ্টক বৃষ্টি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত ইট এবং এত পাটকেল দর্শকেরা মাঠের কাছে আসে কোথা থেকে? জনপ্রিয় দলগুলির উচ্ছৃঙ্খল সমর্থকদের জুতো ও ইট সরবরাহের জন্য কোন ঠিকাদার আছে, না হামলা করবার পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থানুযায়ী দর্শকেরা এগুলি সঙ্গে করে নিয়ে আসে, এপ্রশ্নের আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি।

মোহনবাগান ও রাজস্থানের খেলায় দ্বিতীয়ার্ধের ৩ মিনিটের সময় রাজস্থান ক্লাব মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটি গোল করে। অনেকের মতে গোলটি অফসাইডদুষ্ট। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দেরও এই অভিমত। অবশ্য রেফারী ও লাইন্সম্যানের গোল সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। গোল দেবার পর থেকেই দর্শকদের বিক্ষোভ আরম্ভ হয়েছিল। মোহনবাগান অধিনায়ক মান্না গোল সম্পর্কে আপত্তি জানাবার পর দর্শকদের বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। মাঠের মধ্যে আরম্ভ হয় ইষ্টক বৃষ্টি। মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষের আবেদন নিবেদনে কোনই ফল হয় না। উচ্ছৃঙ্খল জনতার তাণ্ডব সমান তালে চলতে থাকে। ফলে রেফারীর পক্ষে মাঠ পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

রেফারীর ভুলচুকের অছিলায় ক্লাব

ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থান ক্লাবের লীগের চ্যারিটি খেলায় রাজস্থান ব্যাক এ রহমানকে একটি বিপজ্জনক বল হেড করতে দেখা যাচ্ছে

সমর্থকদের এই উচ্ছৃঙ্খল ও বর্বর আচরণ বড়ই ভাষায় নিন্দনীয়। মোহনবাগান সমর্থকদের মনে রাখা উচিত ছিল ক্লাবকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তারা ক্লাবের সুনামের উপরই হস্তক্ষেপ করছেন। খেলায় রেফারীর ভুলচুক হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তারাও মানুষ। আর যদি সমর্থকরা মনে করে থাকেন রেফারী ইচ্ছে করেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অফসাইড গোল দিয়েছেন, তবে বলবো তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইচ্ছে করে একটি অফসাইড গোল দেবে এমন রেফারী আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি।

রাজস্থান এবং মোহনবাগানের অসমাপ্ত খেলাটি সম্ভবতঃ পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে। আমরা আশা করি, সে খেলার যে ফলাফলই হোক দর্শক এবং সমর্থকবৃন্দ তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন।

গত সপ্তাহের খেলাগুলির মধ্যে রাজস্থান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চ্যারিটি খেলার আকর্ষণই ছিল বেশী। কিন্তু এই খেলায় রাজস্থান ক্লাব জয়লাভ করার পরে মোহনবাগান ও রাজস্থানের খেলার আকর্ষণ আরও বেশী হয়ে পড়ে। কারণ বর্তমানে রাজস্থান ক্লাবই সবচেয়ে কম পয়েন্ট নষ্ট করে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ পর্যন্ত ৭টি খেলার মধ্যে রাজস্থান হারিয়েছে মাত্র ২ পয়েন্ট। আর মোহনবাগান ক্লাব ৯টি খেলায় ৩ পয়েন্ট হারিয়ে রাজস্থানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছে। অপরাপর শক্তিশালী দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১০টি খেলায় ৭ পয়েন্ট, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৮টি খেলায় ৫ পয়েন্ট এবং লীগ রানার্স উয়াড়ী ক্লাব ৮টি খেলায় ৬ পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে যেমন ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে এমন ক্ষতি আর কাউকেই স্বীকার করতে হয়নি। এ সপ্তাহে এরিয়ান ক্লাবের সঙ্গে তারা অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করবার পর রাজস্থান ও খিদিরপুর ক্লাবের কাছে পর পর পরাজয় স্বীকার করে। রাজস্থানের কাছে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের এটা প্রথম ঘটনা। ইতিপূর্বে কোন খেলায় রাজস্থান ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করতে পারেনি। খিদিরপুর ক্লাবও ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে এই মরসুমে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। প্রথম ডিভিশন লীগের ১৪টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এখন পর্যন্ত অপরাজিত থাকবার কৃতিত্ব আঁকড়ে থাকলেও পাঁচটি খেলায় পাঁচটি পয়েন্ট নষ্ট করে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের সম্ভাবনাকে প্রতিকূল করে তুলেছে। এ সপ্তাহে পুলিসের খেলায় বেশ উন্নতি দেখা যায়। ৭টি খেলার মধ্যে ৬টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করে যারা মাত্র ১ পয়েন্ট পেয়েছিল, সেই পুলিস দল এ সপ্তাহে একটি খেলায় জয় সহ ৩টি খেলায় ৪ পয়েন্ট লাভ করেছে। এ সপ্তাহে এরিয়ানের খেলাও আশাপ্রদ। ইস্টবেঙ্গলের কাছ থেকে একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নেবার পর এরা লীগ রানার্স উয়াড়ীকে পরাভূত করে।

নীচে গত সপ্তাহের খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল :—

মহঃ স্পোর্টিং (১) — বি এন আর (০)
পুলিস (০) — খিদিরপুর (০)
ইস্টবেঙ্গল (০) — এরিয়ান (০)
মোহনবাগান (৪) — স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
রাজস্থান (৩) — রেলওয়ে স্পোর্টস (২)
মহঃ স্পোর্টিং (০) — জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
খিদিরপুর (০) — বি এন আর (০)
পুলিস (২) — কালীঘাট (১)
রাজস্থান (১) — ইস্টবেঙ্গল (০)
এরিয়ান (২) — উয়াড়ী (১)
মহঃ স্পোর্টিং (১) — পুলিস (১)
জর্জ টেলিগ্রাফ (০) — কালীঘাট (০)
রাজস্থান (১) — মোহনবাগান (০)
(খেলা অসমাপ্ত)
খিদিরপুর (১) — ইস্টবেঙ্গল (০)
অরোরা (০) — স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩০শে মে—ভারতের অনুরোধে চীন সরকার এগারজন আটক মার্কিন বৈমানিকের মধ্যে চারজনকে মুক্তিদানের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, এই সিদ্ধান্ত বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমনে চীনের প্রথম প্রচেষ্টা।

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক শ্রী এন এম যোশী আজ বোম্বাইয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

আজ পুরীতে নিঃ ভাঃ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের শেষ দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি শ্রী এস ভি দণ্ডী দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারকে একটি কমিশন নিয়োগের অনুরোধ জানান।

৩১শে মে—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, গোয়া সমস্যার সমাধান অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। তিনি বলেন যে, গোয়া ভারতের অংশ এবং ইহার ভারতভুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

১লা জুন—মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক শ্রেণীর বাসগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গৃহ নির্মাণ বিভাগ নামে একটি নূতন বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজ্যের ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসগৃহ নির্মাণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বাসগৃহের সংস্থান করাই এই নূতন বিভাগের কাজ হইবে বলিয়া জানা যায়।

২রা জুন—দার্জিলিংয়ে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ডাঃ চার্লস ইভান্সের নেতৃত্বে একটি বৃটিশ অভিযাত্রী দল বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম ২৮,১৪৬ ফুট উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করিয়াছেন।

দিল্লীতে সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে ১৪০ মাইল দূরবর্তী দুর্গাপুরে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোক চুল্লী স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহা মোটামুটিভাবে অনুমোদন করিয়াছেন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী ভি আর সোনালকর আজ বলেন যে, কর্পোরেশন বিগত ছয় বৎসরে চালু শ্রম শিল্পগুলিতে নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্তনকল্পে এবং নূতন নূতন শিল্প পত্তনের উদ্দেশ্যে মোট ২৫ কোটিরও বেশী টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আজ কলিকাতায় মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে মার্কাস স্কেয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফুটপাতের উপর একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৪জন শিশু নিহত এবং ১০ ব্যক্তি আহত হয়।

৩রা জুন—অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে।

গতকল্য বর্ধমান শহর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহের উপর দিয়া ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে যে প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে প্রায় একশত জন আহত হইয়াছে।

বারানসীতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য ছাপরার নিকটে সর্দিগর্মি হওয়ার ফলে একটি নববিবাহিতা তরুণী ও চারজন পালকী বাহকের মৃত্যু হইয়াছে।

৪ঠা জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ পালাম বিমানঘাটি হইতে বিমানযোগে মস্কোর পথে বোম্বাই যাত্রা করেন। তিনি ১৬ দিন ধরিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন করিবেন। রাশিয়া ছাড়াও তিনি যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও মিশরে শুভেচ্ছামূলক ভ্রমণ করিবেন।

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শ্রম-মন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই দেশাই পরিকল্পনা কমিশনের নিকট লিখিত এক লিপিতে বলিয়াছেন যে, বিপুলায়তন শ্রমশিল্পের ব্যাপারে আশু রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থা অপরিহার্য।

গোয়া জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দুই দিন পূর্বে গোয়া মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের সময় পর্তুগীজ পুলিস গোয়াবাসীদের এক জনসভায় গুলী চালনা করে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। মজদুর কিষাণ দলের নেতা শ্রীআত্মারাম পাতিলের নেতৃত্বে তৃতীয় সত্যাগ্রহী দলের ৭৩ জন স্বেচ্ছাসেবক আজ গোয়ার সীমান্ত অতিক্রম করেন।

৫ই জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ সদলবলে বোম্বাই হইতে বিমানযোগে রাশিয়ার পথে প্রাগ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "ভারতবাসীর শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার বাণী লইয়া যাওয়াই আমার সোভিয়েট রাশিয়া তথা অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য।"

কটক হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে এক মর্মান্তিক ঘটনায় এই সপ্তাহের প্রথমে একটি পরিবারের পাঁচজনের মধ্যে চারজন প্রাণ হারাইয়াছে। সংবাদে জানা যায় যে, মহানদীতে স্নান করিবার সময় দুইটি পুত্র ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাদের পিতা জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং ছেলে দুইটিকে টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পুত্রদের সঙ্গে তিনি নিজেও জলমগ্ন হন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে মে—পিকিং বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনা কর্তৃপক্ষ চারিজন আটক মার্কিন বৈমানিককে দুই বৎসর আটক রাখিবার পর মুক্তি দিয়াছেন।

৩১শে মে—ইংলণ্ডে রেল ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অদ্য বৃটেনে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

১লা জুন—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী অদ্য বেতার ভাষণে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের মধ্যে কাশ্মীর সম্পর্কে আর এক দফা আলোচনা হইবার কথা আছে। সে আলোচনার ফলে যদি সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান না হয়, তবে ভবিষ্যতে আর কোন আলাপ আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে।

২রা জুন—অদ্য রাশিয়া এবং যুগোস্লাভিয়া অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সংকল্প প্রকাশ করিয়া এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাত বৎসরের মনোমালিন্যের অবসান ঘটাইয়া এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

৩রা জুন—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী ঢাকায় ঘোষণা করেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে ৯২ক ধারা (গভর্ণরের শাসন) প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গে অবিলম্বে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। জনাব ফজলুল হকের মনোনীত জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে অবিলম্বে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

৫ই জুন—অদ্য হইতে পূর্ববঙ্গে গভর্ণরের শাসন প্রত্যাহার করিয়া গবর্ণর জেনারেল এক ঘোষণা জারি করিয়াছেন।

৬ই জুন—জনাব আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পাঁচজন মন্ত্রী লইয়া পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এই মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী সরকার ব্যতীত জনাব আশরাফুদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী, জনাব আবদুল সালাম খান, জনাব হাসিমুদ্দিন আহম্মদ এবং সৈয়দ আজিজুল হক আছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা

দেশ

শনিবার ৩ আষাঢ় ১৩৬২

DESH

SATURDAY, 18TH JUNE, 1955

সম্পাদক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের নব গৃহ-উদ্বোধন

১৮ই জুন আমাদের নব গৃহ-উদ্বোধন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর এতদিন পর্যন্ত নিজস্ব বাড়ি ছিল না। প্রথমত এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক-বর্গের সে সংগতি ছিল না। দ্বিতীয়ত দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় তাঁহারা এমনভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সুযোগই তাঁহাদের ঘটে নাই। স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শের প্রেরণায় এবং সেই সংগ্রামের সংঘাত ও সংঘর্ষের আবর্তে তাঁহাদের সমগ্র প্রাণশক্তি একই লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট ছিল। রাষ্ট্রীয় মুক্তির সাধনা ব্যতীত অন্য সব বিষয় তাঁহাদের কাছে গৌণ হইয়া দাঁড়ায়। দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নিজস্ব ভবনের অভাব তাঁহারা একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে থাকেন। সেই সঙ্গে 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' এবং 'দেশ' পত্রের প্রচার এতই বৃদ্ধি পায় যে, নিজস্ব বাড়ি না থাকাতে নানা দিক হইতে অসুবিধা দেখা দেয় এবং সুশৃংখলিতভাবে এইরূপ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের কাজ চালানো একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর এই অভাব আজ দূর হইল। এই উপলক্ষে আমরা দেশবাসীদের সকলের শুভেচ্ছা কামনা করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিতেছেন। আমাদিগকে তিনি বিশেষভাবে অনুগৃহীত করিয়াছেন। ডাঃ রায় সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। বহু বিপর্যয়ে বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গে প্রগাঢ় তাঁহার মনস্বিতা, সংগঠনশক্তি, সর্বোপরি সর্বতোদীপ্ত তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া দিকচক্রবালে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে এই ব্যোরোম্বক পুরুষ জাতির পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইতেছেন। প্রবীণ বয়সেও অক্লান্ত তাঁহার পরিশ্রম, অপ্রতিহত তাঁহার মনোবল এবং অত্যুজ্জ্বল তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য। এমন প্রাণবান্ পুরুষের আশীর্বাদ দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনে আমাদিগকে শক্তি দিবে। আজিকার এই আনন্দের দিনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের গুরু, উপদেষ্টা এবং সুহৃৎস্বরূপে যাঁহারা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত এবং আমাদের কর্মসাধনাকে সেবা ও ত্যাগের মহান্ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের অভাব আমরা একান্তভাবেই অনুভব করিতেছি। শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং প্রফুল্লকুমার সরকার আজ আমাদের মধ্যে নাই। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকেও আমরা হারাইয়াছি। কিন্তু সাধনা তাঁহাদের জয়যুক্ত হইয়াছে। নিত্যজীবনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের পুরোগামী এই মহাপ্রাণ পুরুষগণ নিশ্চয়ই অদ্যকার এই শুভ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে ছেন। তাঁহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া নাই শ্রদ্ধাবিনম্র মস্তকে অভিনব কর্মজীবনে পথে আমরা তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

পূর্ববঙ্গে নূতন শাসন ও জনমত

জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে যু ফ্রন্ট দল ২১ দফা কর্মতালিকা লই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কি উপক্রমেই প্রমাদ ঘটে। হক মন্ত্রিমণ্ড তাঁহাদের কর্মতালিকা অনুযায়ী কা অগ্রসর হইবার প্রথম পর্বেই সেই মন্ত্রি মণ্ডল বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। পাকি স্থানের যে প্রধান মন্ত্রী একদিন হ সাহেবের উপর এমন বিরূপ ছিলে আজ তিনি তাঁহার অনুকূলে। হ সাহেবের মনোনীত পূর্ব পাকিস্থানে নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবুহোসে সরকারের মন্ত্রিমণ্ডল এখন তাঁহাদে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্মতালি প্রতিপালন করিতে সুযোগ ল করিবেন কি? কর্মতালিকায় পূর্ব বঙ্গের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী অন্ তম মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল তাঁহারা পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা-নীতি ব্যতী অন্যান্য সব ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কর্তৃত্ব দা করিয়াছিলেন, সেই দাবী কতটা রক্ষি হইবে, এ সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দে রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের নূতন মন্ত্রি মণ্ডলের পরিপোষক হইয়াও পাকিস্থানে মুখ্যমন্ত্রী তেমন ভরসা দিতে পারেন না তিনি শুধু এই আশ্বাস দিয়াছেন বর্তমানে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃত্ব প

লনায় পূর্ববঙ্গের যতটা অধিকার আছে, তিনি সেই অধিকার সুপ্রসারিত করিবার পক্ষপাতী। বলা হইল্য, উক্তিটি নিতান্তই অস্পষ্ট। পূর্ববঙ্গের দাবী সম্বন্ধে করাচীর কর্তৃপক্ষের মনোভাবের পরিষ্কার পরিচয় হাতে পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের এই দাবী মানা না মানার উপর শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পাকিস্থানের গণপরিষদের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। আপাতত দেখা যাইতেছে, মিঃ আবুহোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রীর পদে সমাসীন হইয়া কারাগারে কিছুসংখ্যক রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে বিধানসভার ১ জন সদস্য আছেন। আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার জবরদস্তি আমলে শুধু জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অদ্যাপি কারাগারে বন্দিজীবন যাপন করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু এইভাবে কিছুসংখ্যক বন্দীকে মুক্তি দিলেই জনসাধারণের মধ্যে আস্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। মিঃ আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিমণ্ডল যদি সত্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চাহেন, তাহা হইলে রাজনীতিক বন্দীদের সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দান করাই তাঁহাদের কর্তব্য।

পর্তুগীজ কর্তাদের স্পর্ধা

ভারত সরকার গোয়ার সমস্যা যতই শান্তিপূর্ণ পথে মিটমাট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, গোয়ার ক্ষুদে কর্তাদের স্পর্ধার মাত্রা ততই পঞ্চম হইতে সপ্তম পর্দায় উঠিতেছে। পর্তুগীজ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে সম্প্রতি এই অভিযোগ স্থাপন করা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের যোগসাজশে ভারতীয় সেনা বিভাগের লোকেরা গোয়ায় প্রবেশ করিতেছে। এই সঙ্গে কর্তারা একথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, পর্তুগীজ অধিকারের বিরুদ্ধে যদি কোন আক্রমণ পরিচালিত হয়, তাহা হইলে বলপ্রয়োগের সাহায্যে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইবে এবং তাহার পরিণতির জন্য ভারত সরকারই সর্বতোভাবে দায়ী থাকিবেন। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, পর্তুগীজ সরকারের বলপ্রয়োগ সম্বন্ধীয় এই ভীতিপ্রদর্শন কেবলমাত্র সত্যাগ্রহীদের সম্পর্কেই নয়, পরন্তু ভারত সরকারকেও তাঁহারা সেই সঙ্গে জড়াইয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের স্পর্ধা দেখিয়া আমরা সত্যই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু ভারত সরকারের নীতিই তাঁহাদিগকে এতটা স্পর্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য সত্যই যদি ভারত সরকারের থাকিত, এমন কি, তাঁহারা যদি পর্তুগীজ বর্বরতা হইতে গোয়াকে মুক্তি দিতে অর্থনীতিক ব্যবস্থা অবলম্বনেও অগ্রসর হইতেন, তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত পর্তুগীজদের স্বৈর শাসন ভারতভূমি হইতে বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। পর্তুগীজদের মতিগতি ক্রমেই যেরূপ বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ভারত সরকারের নীতি অবিলম্বে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। পর্তুগীজ কর্তাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না, পুলিসী ব্যবস্থাও নয়; এমন কি, অর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রয়োগেও তাঁহাদের আপত্তি, ভারত হইতে ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহীদের গোয়ায় অভিযান করিতে দিতেও তাঁহাদের অভিপ্রায় নাই—এভাবে সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হইবে না। কংগ্রেসকে যদি ভারত সরকারের এমন মতিগতির সঙ্গেই তাল রাখিয়া চলিতে হয় কংগ্রেসের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইবে। এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বৈর শাসনের উচ্ছেদ সাধনই অবিলম্বে আবশ্যক।

পার্বত্য অঞ্চলে বাংলা ভাষা

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের যেসব অধিবাসী বাংলা শিখিয়াছেন, সম্প্রতি দার্জিলিং-এ তাঁহাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং রাজ্যপাল স্বয়ং সভাপতিত্ব করেন। উত্তরবঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে বাংলা ভাষা প্রচারের এই উদ্যম বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন বাংলা দেশকে ভাষা কিংবা সংস্কৃতির দিক হইতে সুসংহত করিবার উদ্দেশ্যে কোন চেষ্টাই করা সম্ভব হয় নাই। পক্ষান্তরে বিভেদবাদের উপরই তৎকালীন শাসকেরা গুরুত্ব প্রদান করিতেন। দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলের সহিত সমতলের অধিবাসীদের ব্যবধান সৃষ্টি করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। বর্তমানে এই অবস্থার প্রতীকার সাধন করা একান্তই প্রয়োজন এবং দার্জিলিং-কালিম্পং-শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রসারের জন্য চেষ্টা করা পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকামী সকলের পক্ষেই কর্তব্য। তেনজিং এভারেস্ট বিজয় করিয়াছেন, এজন্য আমরা সকলেই গর্ববোধ করিয়া থাকি। তিনি দার্জিলিং-এর অধিবাসী, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গেরই লোক, ইহাই আমাদের গর্বের কারণ। কিন্তু তেনজিংয়ের যাহারা স্বজন, সেই সব পাহাড়িয়াদের মধ্যে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য আমরা সত্যই আন্তরিকতা সহকারে কতখানি চেষ্টা করিতেছি, ইহা বিশেষভাবেই বিবেচ্য। দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের এই সর্বোত্তর সীমান্ত দেশে হিন্দী প্রচারের জন্য সকল রকমে চেষ্টা চলিতেছে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী প্রচারে আপত্তি আমাদের নাই। হিন্দীর প্রচার এবং প্রসার সর্বভারতীয় সংহতিবোধে সমাজ-জীবনকে সচেতন করিয়া তোলে, আমরা ইহাই কামনা করি। বস্তুত বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া এই সংহতি বোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে, নতুবা সর্বভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এই বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার উক্তির প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। রাজ্যের দিক দিয়া এবং সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এই সকল অঞ্চলে বাংলা ভাষার শিক্ষা ও প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের যাঁহারা কল্যাণকামী, যাঁহারা ভাষা এবং এবং সংস্কৃতির সেবক তাঁহাদের কর্মশক্তি সমধিক উদ্বুদ্ধ হয়, আমরা ইহাই কামনা করি।

বৈদেশিকী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এবং সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটেনের তিন প্রধানমন্ত্রী—এই চার প্রধানের সম্মেলন জেনেভায় ১৮ই জুলাই থেকে শুরু হবে। পশ্চিমা শক্তিদের নির্বাচিত স্থান ও কাল সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট মেনে নিয়েছেন, তবে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এই মত প্রকাশ করেছেন যে, সম্মেলনের পক্ষে চারদিন অত্যন্ত অল্প সময় হবে। এ বিষয়ে মার্কিন গভর্নমেণ্ট বোধহয় একটু হাতে রেখেই কথা বলেছেন। পাকাপাকিভাবে আমন্ত্রণ জানাবার পূর্বে মার্কিন গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে এই খবর প্রচার করা হ'ল যে, মার্কিন গভর্নমেণ্টের মতে প্রধানদের সম্মেলনকাল এক সপ্তাহের অনধিক হওয়া চাই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে আরো কথাবার্তার ফলে চারদিনের জায়গায় পাঁচদিন অথবা ছয়দিন হওয়া অসম্ভব নয়। আগামী সপ্তাহে ইউনো'র দশম বার্ষিকী-পালন উৎসব উপলক্ষে সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে সংশ্লিষ্ট চার গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্রসচিবই উপস্থিত থাকবেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তর অবশ্য বর্তমানে নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠানের স্বগৃহে অবস্থিত কিন্তু ১৯৪৫ সালে ইউনো'র জন্ম হয় সানফ্রান্সিস্‌কোতে এবং সেখানেই ইউনো'র জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লীর প্রথম বৈঠকগুলি হয়। সেইজন্য ইউনো'র দশম বার্ষিকী পালনের উৎসব অনুষ্ঠান সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে করার ব্যবস্থা হয়েছে।) এই অবসরে চার পররাষ্ট্র-সচিবের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ হবে এবং জেনেভায় প্রধান-সম্মেলনের কর্ম-সূচী কী রকম হবে আলাপ-আলোচনা করে তাঁরা তা স্থির করতে পারবেন।

অবশ্য মার্কিন গভর্নমেণ্টের এই মত যে, প্রধানদের সম্মেলনে বড় সমস্যাগুলির সমাধান কী ভাবে হতে পারে সেই সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা এবং পথনির্দেশের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু কাজ হতে পারে না। খুঁটিনাটি আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানের কার্যকরী রূপদান পররাষ্ট্রসচিব ও বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের বৈঠকেই সম্ভব সেজন্য প্রধানদের কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে এবং পিছু পিছু পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠক করার উপর মার্কিন গভর্নমেণ্ট বিশেষ ভাবে জোর দিচ্ছেন। মোটের উপর মার্কিন গভর্নমেণ্ট লোকচক্ষে প্রধানদের সম্মেলনকে একটা অনন্যসাধারণ গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন না এবং উহার ফলাফল সম্বন্ধে লোকের মনে অত্যুচ্চ আশার উদ্রেক করতেও চাচ্ছেন না। বরঞ্চ মিঃ ডালেস প্রভৃতি মার্কিন সরকারী মুখপাত্রগণের চেষ্টা হচ্ছে যাতে জনসাধারণের মনে এরূপ ধারণা না জন্মে যে, চার প্রধানের মিলন হ'লেই যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে। রাশিয়ার দিক থেকে আমেরিকার এই ভাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, মার্কিন গভর্নমেণ্টের কথাবার্তা থেকে এরূপ সন্দেহ হয় যে, মার্কিন গভর্নমেণ্ট প্রধানদের সম্মেলনের সফলতার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব নন।

মার্কিন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগের সারবত্তা যাই থাক

া না থাক, একথা ঠিকই যে, প্রধানদের সম্মেলন সম্বন্ধে একটা অত্যুচ্চ আশা পোষণ না করাই ভালো। আসলে এই সম্মেলনের তাৎপর্য সম্বন্ধেই অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা হয়ে রয়েছে। এরূপ সম্মেলনের কথা যখন প্রথম উঠে তখন যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল ইতিমধ্যে তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। দু'পক্ষের বিরোধ ও মনকষাকষি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, অবিলম্বে একটা কিছু না করলে বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে, উভয় পক্ষের প্রধানদের মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনা হলে বিরোধের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান সহজ হবে এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা নিবারিত হবে—এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানদের সাক্ষাৎ মিলনের প্রস্তাব প্রথম চার্চিল সাহেব করেন। পৃথিবী একটা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং সংকটত্রাণের জন্য কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী পক্ষের প্রধানদের মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনা আবশ্যক—এই ধারণাই জনসাধারণের মনে জন্মান হয়েছিল। এই ভয় জনসাধারণের মন অধিকার করেছিল যে, দু'পক্ষের মধ্যে একটা আপসের ব্যবস্থা না হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে-কোন দিন লেগে যেতে পারে এবং মামুলি কূটনৈতিক পন্থায় আপস যখন হচ্ছে না তখন সংকটত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে উভয় পক্ষের প্রধানদের মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনা। এরকম হতে পারে যে, মামুলি আলোচনা পদ্ধতিতে যখন কোন কাজ হচ্ছে না অথচ একটা সংকট আসন্ন তখন দু'দলের বড়কর্তাদের মধ্যে সহসা সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা সংকট নিবারিত করা যায়। কিন্তু এই নাটকীয় পদ্ধতির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ভাবের অর্থাৎ একটা আকস্মিকতার স্পর্শ থাকা চাই। বহুকাল ধ'রে প্রকাশ্য প্রস্তুতির সঙ্গে তার সংগতি হয় না। সাক্ষাৎ মিলনের জন্য যেখানে প্রকাশ্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি আবশ্যক সেখানে বুঝতে হবে যে, মিলনের পূর্বেই অনেক বিষয়ে মতের মিল সাধিত হয়েছে অথবা মিলনপরবর্তী আপস-আলোচনার পথ সহজ করে দেওয়ার জন্য।

যে-মিলনের জন্য প্রকাশ্যে এরূপ দীর্ঘ প্রস্তুতি হয়েছে তা' থেকে আনকোরা নূতন কোন ফল বা হঠাৎ-দেখা কোন আলো আশা করা যায় না। দুই পক্ষের মধ্যে যে-কূটনৈতিক আলোচনা এবং লেন-দেন চলছিল জেনেভার মিলনকে তারই একটা অংশ বা পরিচ্ছেদ হিসাবে দেখাই ঠিক হবে।

এ বিষয়ে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, চতুঃশক্তির প্রধানদের মিলনের প্রস্তাব যখন প্রথম উঠে তখন যে আসন্ন সংকটের আবহাওয়া ছিল এখন সেটা নেই। যুদ্ধের আশংকা ও হাইড্রোজেন বোমার ভয় মিলে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল সেটা এখন অনেকটা কমেছে। যুদ্ধের আশংকা এক সময়ে যতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল এখন অন্তত সাময়িকভাবেও, তার অনেকটা উপশম হয়েছে। যুদ্ধের আশংকা কমলে তার সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন বোমার ভয়ও কমে কারণ যুদ্ধ না হ'লে তো হাইড্রোজেন বোমা পড়বে না। যুদ্ধের ভয় কমার প্রকৃত কারণ কী হয়েছে না হয়েছে তা সাধারণের পক্ষে বুঝা কঠিন। কর্তারা যখন যেরকম সুরে কথা বলেন সাধারণ লোকের ভয় ভাবনা সেইরকমভাবে উঠা-নামা করে এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দেড়-দু'বছর আগের তুলনায় এখন যুদ্ধের আশংকা কম—উভয় দিকের সরকারী প্রচারণাই এই ধারণার পরিপোষক। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংকটের অনুভূতি মোটেই প্রখর নয়। বরঞ্চ একথা বলা যায় যে, দুইদিকের প্রধানরা যে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য মিলিত হচ্ছেন এটাই একটা প্রমাণ যে, কোনো পক্ষই সংকট উপস্থিত বা আসন্ন বলে মনে করছে না। অর্থাৎ যে অবস্থায় চার্চিল সাহেব প্রধানদের মিলনের প্রস্তাব করেছিলেন সে অবস্থা এখন নেই।

ইতিমধ্যে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে যাতে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার উগ্রতা অনেকটা কমেছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধ-বিরতি যেভাবে হয়েছে সেটা যদিও তখন আমেরিকার পছন্দ হয়নি কিন্তু ইন্দোচীনের যুদ্ধ-বিরতির ফলে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ফরমোজা সম্পর্কিত পরিস্থিতিতেও একটা আশাজনক পরিবর্তন অনুভব করা যায়। ফরমোজা অঞ্চলের অবস্থার দরুণ সারা পৃথিবীতে একটা উদ্বেগবোধ ছিল এই কারণে, পাছে আমেরিকার সঙ্গে পিকিং সরকারের সাক্ষাৎ যুদ্ধ বেধে যায়। সেইজন্য ফরমোজা অঞ্চলে পিকিং সরকার ও মার্শাল চিয়াং কাইশেকের মধ্যে যুদ্ধ যাতে থামে সকলেই সেই কামনা করছিল। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদনের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কারণ আমেরিকা পিকিং সরকার এবং চিয়াং কাইশেকের বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু চুক্তি না হলেও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, কার্যত ফরমোজা অঞ্চলে একরকম যুদ্ধ-বিরতি হয়েছে। চীন ভূভাগ থেকে কেময় প্রভৃতি উপকূল-নিকটবর্তী দ্বীপসমূহের উপর গোলা ছোড়া প্রায় বন্ধ হয়েছে এবং চিয়াং কাই-শেকের দিক থেকে চীন ভূভাগের উপর বোমাবাজির চেষ্টাও স্তিমিত হয়েছে। অর্থাৎ আমেরিকা চিয়াং কাইশেককে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমেরিকা ফরমোজাকে পিকিং সরকারের হাতে যেতে দেবে না কিন্তু চিয়াং কাইশেকের চীন পুনর্জয়ের নিষ্ফল চেষ্টাতেও আমেরিকার সমর্থন নেই। অন্যপক্ষে পিকিং সরকার যদিও ফরমোজাকে মুক্ত করার অধিকার সম্বন্ধে লিখিত-পড়িতভাবে কোনোরকম আপস করতে রাজী নন কিন্তু কার্যত ফরমোজাকে অস্ত্রবলে মুক্ত করার প্রচেষ্টাও পিকিং সরকারের আপাতত নেই: কারণ সে চেষ্টা করলে আমেরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ যুদ্ধ অনিবার্য, যা চীন অথবা তার মিত্র রাশিয়া কেউই এখন চায় না। ফরমোজা থেকে চীন ভূভাগের উপর আক্রমণের চেষ্টা হবে না—এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলে চীন আপাতত ফরমোজার জন্য লড়াইয়ে নামবে না—এ ধারণা "বৈদেশিকীর" স্তম্ভে বহু পূর্বেই আমরা ব্যক্ত করেছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে সে ধারণা ভুল ছিল না। যাই হোক, ফরমোজা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের কোনো আশু সম্ভাবনা না থাকলে ফরমোজা অঞ্চল সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ছিল তার কিছুটা উপশম হয়েছে। ১৫।৬।৫৫

'দেশ'—শৈশব হইতে যৌবনে

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

১৩৪০ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ 'দেশ' প্রকাশিত হয়। ২১ বৎসর আগেকার কথা। সুতরাং 'দেশ' বর্তমানে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে বলা চলে। কালের গতির বিবর্তনে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বল বৃদ্ধি, মোটামুটিভাবে শক্তিরও বিকাশ ঘটিয়াছে। বর্তমানে 'দেশ' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত এবং এই পত্রিকা সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিভাবে এবং কিরূপে ঐতিহাসিক প্রতিবেশের সাহায্যে এবং কাহাদের সাধনা ও অবদানে ইহা সম্ভব হইল, এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। ইহার উত্তর খুঁজিতে হইলে দেশের শৈশবজীবনের দিকে দৃষ্টি-সম্পাত করিতে হয়। বস্তুত এ জগতে কোন শক্তিই নিরপেক্ষভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং বিচিত্রভাবে যে সব বিভিন্ন শক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলিকে আপন করিয়া এবং তাহাদের পরিপোষকতাতেই শক্তি বিশিষ্ট আকারে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, সুতরাং শক্তির প্রতিষ্ঠার মূলে কাজ করে ঘনিষ্ঠতা। শক্তির এই তত্ত্ব ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনে সমানভাবেই সত্য।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগী বন্ধুগণের উৎসাহ ও সহায়তায় 'দেশ' প্রকাশিত হয় এবং 'দেশ' "আনন্দবাজার" পত্রিকা গোষ্ঠীরই অন্যতম। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রকাশ এবং তাহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে। বিদেশী শাসকবর্গের আঘাত অবিরত এই পত্রিকার উপরে আপতিত হইয়াছে। তাহারা নিজেদের সমগ্র পশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া 'আনন্দবাজারকে' উৎখাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। 'দেশ'ও বিদেশী শাসকবর্গের এই কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অনেক প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া সে শৈশব হইতে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। 'দেশে'র এই প্রাণবত্তার সূত্রটির পরিচয় পাইতে হইলে এই পত্রিকা প্রকাশের মূলে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ইহা জানা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

'দেশে'র প্রথম সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'কোন বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ নহে, কোন পাশ্চাত্য "ইজম"এর তরজমা নহে,—জগতের সমগ্র ভাবধারার সহিত দেশের লোকের পরিচয় করাইয়া দেওয়া, 'দেশে'রই লক্ষ্য। রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থনীতিক্ষেত্রে যে সকল তত্ত্ব, আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা স্বদেশে ও বিদেশে চলিতেছে, তাহা আপামর সাধারণ জানুক, ভাবুক। কোন্ পথে তাহাদের কল্যাণ, তাহারাই ঠিক করিয়া লইবে। এই ভাবের ভাবুক যাঁহারা, এই সাধনার সাধক যাঁহারা সেই সকল দেশসেবকের সহিত প্রাণপাত যোগ স্থাপন করাই দেশের উদ্দেশ্য হইবে। সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কবি, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ্, রাজনৈতিক সকলের সাহচর্যে আমরা মানব জাতির সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের বর্তমান জগতের চিন্তামন্থ প্রবাহের সহিত দেশের আপামর সাধারণের পরিচয় সাধন করাইতে চাই।

উপরে "দেশে"র আদর্শ সাধারণ সূত্রাকারে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু এতদ্দ্বারা আদর্শের প্রকৃত স্বরূপটির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। "দেশ" সাপ্তাহিক পত্র, কিন্তু তাই বলিয়া "দেশ" "অর্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা"র ডবল সংস্করণ নয়। যদি তাহাই হইত তবে সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক ঔপন্যাসিক দেশের পক্ষে ইঁহাদের সাহচর্য গ্রহণের প্রয়োজন ঘটিত না। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকায় সাময়িক সাহিত্য, অর্থাৎ সমসাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আলোচনা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুচিন্তন ইহাও যেমন থাকিবে, সেইরূপে স্থায়ী যে সাহিত্য তাহারও স্থান রহিবে। এতদুভয়কে অবলম্বন করিয়া জাতির চিন্তার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা এবং জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধন এই আদর্শ লইয়া "দেশ" প্রকাশিত হয়। সাময়িক এবং স্থায়ী সাহিত্য এতদুভয়ের সংমিশ্রিত ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথেই এই পত্রিকার বর্তমান উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই উভয় সাহিত্যের সংমিশ্রণে এই পত্রিকার

প্রাণশক্তির বিকাশ এবং উজ্জীবন-রীতির ভিতরেই ইহার ঐতিহ্য নিহিত রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে "দেশ" যখন প্রকাশিত হয়, তখন সাময়িক রাজনীতিকে উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন অসহযোগ আন্দোলনের যুগ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয় ইহার কিছুদিন পরে আমাদের সমাজজীবনের সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। "আনন্দবাজার" প্রতিষ্ঠার মূলে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক উদ্দেশ্যই কার্য করিয়াছে এবং আমরা সাহিত্য-সেবার জন্য 'আনন্দবাজার গোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত হই নাই। সাময়িক প্রতিবেশকে রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। "দেশে"র শৈশব-জীবনের খোঁজ লইলে সেই মনোভাব বিশেষভাবে সেখানে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা যাইবে। বস্তুত এই মনোভাবটিকে ভিত্তি না করিলে "দেশে"র পক্ষে তৎকালে জন-জীবনের সঙ্গে নিজের আদর্শের সংযোগ সাধন করাও সম্ভব হইত না। "দেশ" প্রধানত সংবাদধর্মী কি সাহিত্যধর্মী হইবে এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা কিছুদিন পর্যন্ত চলে।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই। সাময়িক ঘটনাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া রাজনীতিক চিন্তাকে সমাজ-জীবনে জাগ্রত করিয়া তোলার দিকে এই পত্রিকার প্রথমদিকে প্রধান লক্ষ্য থাকে। "দেশে"র খুব বড় একটি সৌভাগ্য এই যে, বাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক এবং চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তির আনুকূল্য সে শৈশবজীবন হইতেই লাভ করে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং সেবকদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয়-মুক্তি সাধনার আদর্শ সূত্রে ইঁহাদের নিবিড় আত্মীয়তার সংযোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহারা আমাদিগকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন। ইঁহাদের অবদানে স্থায়ী সাহিত্যে সমৃদ্ধির দিক হইতেও "দেশ" অল্পদিনের মধ্যেই বাঙালী সমাজের দৃষ্টি উত্তরোত্তর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার "দেশে"র প্রথম সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের উপর কাজের চাপ অনেক দিক হইতে পড়িতে থাকে। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র প্রচারসংখ্যা তখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, এজন্য নানাদিক হইতে এতৎ সম্পর্কিত কর্তব্যও সম্প্রসারিত হয়। এই সব কারণে সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র কর্মোদ্যম 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদন ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত রাখা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় এবং তখন "দেশে"র সম্পাদনার ভার আমার উপর আসিয়া পড়ে। 'দেশ' প্রকাশিত হইবার ৫ মাস কি ৬ মাস পরে আমাকে ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হয়।

এই সময় শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়, তাহাতে তিনি বাঙলার জাতীয়তাবাদের উপরই গুরুত্ব দিতে বলেন এবং জাতীয়তাবাদকে সাহিত্যের সাহায্যে সমাজজীবনে সংহত করিতে হইবে অর্থাৎ সেই আদর্শকে সাংস্কৃতিক রূপ দিতে হইবে, ইহাই ছিল প্রফুল্লকুমারের লক্ষ্য।

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় News Sense বা সংবাদ-চেতনা সম্বন্ধে সমধিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। সুশৃঙ্খলিতভাবে সাপ্তাহিক সংবাদের সন্নিবেশ এবং অর্থনীতিক আলোচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাস্তবজীবনের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার এই বিচারের মূলে কাজ করিত। তিনি ছিলেন বড় কর্মী; সুতরাং এই বিচার একান্তভাবে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কিত গবেষণা তিনি বড় একটা পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, আপনাদের ঐ সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। আমি সহজ বুদ্ধির লোক। তিনি বলিতেন, সংবাদ-চেতনা যদি আপনারা না জাগাইতে পারেন, তবে বিশ্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান, এ সবের সম্বন্ধে দেশের ভাবনা জন্মাইবেন কেমন করিয়া? পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনের কূপ-মণ্ডূকতা লইয়া কোন জাতি বড় হইতে পারে? প্রাতঃস্মরণীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা" গোষ্ঠীর প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুগ্রহ দৃষ্টি সর্বদা জাগ্রত ছিল। "দেশ" প্রকাশিত হইবার পর আচার্যদেব মাঝে মাঝেই আমাদের অফিসে আসিতেন এবং তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া আমরা নানা উপদেশ লাভ করিতাম। "দেশে"র সম্পাদনার ভার আমার উপর অর্পিত হইবার পর একবার তিনি অফিসে আসিয়া উপদেশস্বরূপ যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, আজও আমার তাহা বিশেষভাবে স্মরণ আছে। প্রফুল্লকুমারও সেখানে ছিলেন। আমি আচার্যদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমার পিঠে হস্ত স্পর্শ করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন—বলিলেন—আমরা গভীরভাবে ভাবিতে জানি না। অনেকটা হুজুগে পড়িয়া চলি। সাময়িক একটা উত্তেজনা এবং উন্মাদনা, তারপরে দুদিন যাইতে না যাইতেই সব শেষ। আমাদের এই মনোভাব বদলাইয়া ফেলা দরকার। তোমাদের সেই কাজ করিতে হইবে। কেন রাজনীতি আমরা করি, কেন আমরা স্বাধীনতা চাই—ইহা যেন আমরা ভাবিতে শিখি। শুধু নিজেরাই শিখিলে চলিবে না দেশের লোককে—যেমন পুরুষদের, তেমন এদেশের মেয়েদেরও তাহা শিখাইতে হইবে। ইহা না হইলে আমাদের এই যে সব আন্দোলন, ইহার শক্তি জলের বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া যাইবে। দেশ যে অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই অবস্থাতেই থাকিবে। তোমারা দেশের লোককে ভাবিতে শিখাও—এই কাজটি কর দেখি।

প্রবীণ সাহিত্যিক পূজনীয় জলধর সেন মহাশয়ের কথা স্মরণ হইতেছে। একবার শহরের উপকণ্ঠভাগে সাহিত্য সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি ছিলেন। আমিও এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। জলধরদা বলিলেন, বঙ্কিম কই? তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, দেহ জরাতুর এবং দুর্বল। আমি কাছে গিয়া প্রণাম করিলে তিনি আমাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, তিনি "দেশ" প্রতি সপ্তাহে আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। উত্তরে আমি বলিলাম, "দেশ" নামেই "দেশ"। কাজ কিছুই করা যাইতেছে না। জলধরদা মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন—ও কি কথা বলছো, নামেই সব হয়। দেশ, দেশ এই নাম জপ কর, শক্তি পাইবে।

নাম সাধনা জানি না, বুঝি না, সুতরাং জলধরদার উক্তির ভাবটি উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ভাগবতে রস সাধনার একটি সূক্ষ্ম ধারা পাওয়া যায়। নারায়ণ হইতে নর এবং নর হইতে নারদ। যিনি নারায়ণ, নররূপে নরের সখা হইয়া তাঁহার আদর—স্বর। স্বর হইতে পর: পুরুষোত্তম স্বরূপে রসময় স্বভাবে আমাদের মনের মূলে তাঁহার প্রভাব। স্বরের মাধুর্যে জড়াইয়া চরাচরে তিনি আমাদের কাছে সুন্দর। এইভাবে আত্মতার বিশেষ রসে মনকে মিলাইয়া মিশাইয়া আমাদের প্রতিবেশে তাঁহার মধুর লীলার উন্মেষ। বস্তুত নরলীলার ছন্দেই আনন্দময় গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। ফলত দেশ বলিতে মাটি, পাথর বা পাহাড় বুঝায় না, নরলীলার আত্ম-রসের পরিপাটিতে মাত্র স্বরে বর্ণে আমরা সুন্দরকেই স্মাবিষ্ট এবং ঘনিষ্ঠভাবে পাই। বাংলার সাধক এ তত্ত্ব একদিন বুঝিয়াছিলেন। এই নরলীলার রসে মজিয়াছিলেন। এখানে জাগিয়াছিল প্রাণ, ফুটিয়াছিল গান—সে তত্ত্ব বুঝি নাই, তবে খাটিয়াছি। ভূতের মত কে যেন খাটাইয়া লইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, কাজ যেটুকু করিয়াছি, প্রাণের আবেগ ও অনেকটা উন্মাদনা লইয়াই করিয়াছি। সংবাদপত্র সেবাকে 'চাকুরী হিসাবে কোন দিনই গ্রহণ করিতে পারি নাই, "দেশ" সেবাতেও চাকুরীর ভাব কোন দিনই মনে জাগে নাই। তৎকালীন সংবাদ-পত্রসেবীরা ত্যাগেই সন্তোষ উপলব্ধি করিতেন, সেবাতেই ছিল তাঁহাদের আনন্দ।

কাজে অনেক অসুবিধা তখন ছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সবগুলি বিভাগ তখন সুবিন্যস্তভাবে গড়িয়া উঠে নাই। সম্পাদকীয় বিভাগ বর্তমানের মত সম্প্রসারিত ছিল না। "দেশে"র কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র অন্যতম সহযোগী সম্পাদক স্বরূপেও আমাকে কাজ করিতে হইত। প্রতি সপ্তাহে অন্তত সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমাকে তিন চারটি প্রবন্ধ লিখিতে হইত। ইহার উপর "দেশে"র কাজ।

"দেশে"র আকার তখন বর্তমানের চেয়ে বড় ছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা তখন এখনকার মতই ছিল আশী পৃষ্ঠা। সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রাণশক্তির বিকাশ এবং উজ্জীবন-রীতির ভিতরই ইহার ঐতিহ্য নিহিত রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে "দেশ" যখন প্রকাশিত হয়, তখন সাময়িক রাজনীতিকে উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন অসহযোগ আন্দোলনের যুগ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয় ইহার কিছুদিন পরে আমাদের সমাজজীবনের সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। "আনন্দবাজার" প্রতিষ্ঠার মূলে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই কার্য করিয়াছে এবং আমরা সাহিত্য-সেবার জন্য 'আনন্দবাজার গোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত হই নাই। সাময়িক প্রতিবেশকে রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। "দেশে"র শৈশব-জীবনের খোঁজ লইলে সেই মনোভাব বিশেষভাবে সেখানে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা যাইবে। বস্তুত এই মনোভাবটিকে ভিত্তি না করিলে "দেশে"র পক্ষে তৎকালে জন-জীবনের সঙ্গে নিজের আদর্শের সংযোগ সাধন করাও সম্ভব হইত না। "দেশ" প্রধানত সংবাদধর্মী কি সাহিত্যধর্মী হইবে এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা কিছুদিন পর্যন্ত চলে।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই। সাময়িক ঘটনাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া রাজনীতিক চিন্তাকে সমাজ-জীবনে জাগ্রত করিয়া তোলার দিকে এই পত্রিকার প্রথমদিকে প্রধান লক্ষ্য থাকে। "দেশে"র খুব বড় একটি সৌভাগ্য এই যে, বাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক এবং চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তির আনুকূল্য সে শৈশবজীবন হইতেই লাভ করে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং সেবকদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয়-মুক্তি সাধনার আদর্শ সূত্রে ইঁহাদের নিবিড় আত্মীয়তার সংযোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহারা আমাদিগকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন। ইঁহাদের অবদানে স্থায়ী সাহিত্যে সমৃদ্ধির দিক হইতেও "দেশ" অল্পদিনের মধ্যেই বাঙালী সমাজের দৃষ্টি উত্তরোত্তর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার "দেশে"র প্রথম সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের উপর কাজের চাপ অনেক দিক হইতে পড়িতে থাকে। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র প্রচারসংখ্যা তখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, এজন্য নানাদিক হইতে এতৎ সম্পর্কিত কর্তব্যও সম্প্রসারিত হয়। এই সব কারণে সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র কর্মোদ্যম 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদন ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত রাখা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় এবং তখন "দেশে"র সম্পাদনার ভার আমার উপর আসিয়া পড়ে। 'দেশ' প্রকাশিত হইবার ৫ মাস কি ৬ মাস পরে আমাকে ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হয়।

এই সময় শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়, তাহাতে তিনি বাঙলার জাতীয়তাবাদের উপরই গুরুত্ব দিতে বলেন এবং জাতীয়তাবাদকে সাহিত্যের সাহায্যে সমাজজীবনে সংহত করিতে হইবে অর্থাৎ সেই আদর্শকে সাংস্কৃতিক রূপ দিতে হইবে, ইহাই ছিল প্রফুল্লকুমারের লক্ষ্য।

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় News Sense বা সংবাদ-চেতনা সম্বন্ধে সর্বাধিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। সুশৃঙ্খলিতভাবে সাপ্তাহিক সংবাদের সন্নিবেশ এবং অর্থনীতিক আলোচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাস্তবজীবনের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার এই বিচারের মূলে কাজ করিত। তিনি ছিলেন বড় কর্মী; সুতরাং এই বিচার একান্তভাবে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কিত গবেষণা তিনি বড় একটা পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, আপনাদের ঐ সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। আমি সহজ বুদ্ধির লোক। তিনি বলিতেন, সংবাদ-চেতনা যদি আপনারা না জাগাইতে পারেন, তবে বিশ্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান, এ সবের সম্বন্ধে দেশের ভাবনা জন্মাইবেন কেমন করিয়া? পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনের কূপমণ্ডূকতা লইয়া কোন জাতি বড় হইতে পারে? প্রাতঃস্মরণীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা" গোষ্ঠীর প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুগ্রহ দৃষ্টি সর্বদা জাগ্রত ছিল। "দেশ" প্রকাশিত হইবার পর আচার্যদেব মাঝে মাঝেই আমাদের অফিসে আসিতেন এবং তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া আমরা নানা উপদেশ লাভ করিতাম। "দেশে"র সম্পাদনার ভার আমার উপর অর্পিত হইবার পর একবার তিনি অফিসে আসিয়া উপদেশস্বরূপ যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, আজও আমার তাহা বিশেষভাবে স্মরণ আছে। প্রফুল্লকুমারও সেখানে ছিলেন। আমি আচার্যদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমার পিঠে হস্ত স্পর্শ করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন, বলিলেন —আমরা গভীরভাবে ভাবিতে জানি না। অনেকটা হুজুগে পড়িয়া চলি। সাময়িক একটা উত্তেজনা এবং উন্মাদনা, তারপরে দুদিন যাইতে না যাইতেই সব শেষ। আমাদের এই মনোভাব বদলাইয়া ফেলা দরকার। তোমাদের সেই কাজ করিতে হইবে। কেন রাজনীতি আমরা করি, কেন আমরা স্বাধীনতা চাই—ইহা যেন আমরা ভাবিতে শিখি। শুধু নিজেরাই শিখিলে চলিবে না দেশের লোককে—যেমন পুরুষদের, তেমন এদেশের মেয়েদেরও তাহা শিখাইতে হইবে। ইহা না হইলে আমাদের এই যে সব আন্দোলন, ইহার শক্তি জলের বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া যাইবে। দেশ যে অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই অবস্থাতেই থাকিবে। তোমারা দেশের লোককে ভাবিতে শিখাও—এই কাজটি কর দেখি।

প্রবীণ সাহিত্যিক পূজনীয় জলধর সেন মহাশয়ের কথা স্মরণ হইতেছে। একবার শহরের উপকণ্ঠভাগে সাহিত্য সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি ছিলেন। আমিও এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। জলধরদা বলিলেন, বঙ্কিম কই? তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, দেহ জরাতুর এবং দুর্বল। আমি কাছে গিয়া প্রণাম করিলে তিনি আমাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, তিনি "দেশ" প্রতি সপ্তাহে আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। উত্তরে আমি বলিলাম, "দেশ" নামেই "দেশ"। কাজ কিছুই করা যাইতেছে না। জলধরদা মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন—ও কি কথা বলছো, নামেই সব হয়। দেশ, দেশ এই নাম জপ কর, শক্তি পাইবে।

নাম সাধনা জানি না, বুঝি না, সুতরাং জলধরদার উক্তির ভাবটি উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ভাগবতে রস সাধনার একটি সূক্ষ্ম ধারা পাওয়া যায়। নারায়ণ হইতে নর এবং নর হইতে নারদ। যিনি নারায়ণ, নররূপে নরের সখা হইয়া তাঁহার আদর—স্বর। স্বর হইতে পর: পুরুষোত্তম স্বরূপে রসময় স্বভাবে আমাদের মনের মূলে তাঁহার প্রভাব। স্বরের মাধুর্যে জড়াইয়া চরাচরে তিনি আমাদের কাছে সুন্দর। এইভাবে আত্মতার বিশেষ রসে মনকে মিলাইয়া মিশাইয়া আমাদের প্রতিবেশে তাঁহার মধুর লীলার উন্মেষ। বস্তুত নরলীলার ছন্দেই আনন্দময় গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। ফলত দেশ বলিতে মাটি, পাথর বা পাহাড় বুঝায় না, নরলীলার আত্ম-রসের পরিপাটিতে মাত্রা স্বরে বর্ণে আমরা সুন্দরকেই স্থবিষ্ট এবং ঘনিষ্ঠভাবে পাই। বাংলার সাধক এ তত্ত্ব একদিন বুঝিয়া-ছিলেন। এই নরলীলার রসে মজিয়া-ছিলেন। এখানে জাগিয়াছিল প্রাণ, ফুটিয়াছিল গান—সে তত্ত্ব বুঝি নাই, তবে খাটিয়াছি। ভূতের মত কে যেন খাটাইয়া লইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, কাজ যেটুকু করিয়াছি, প্রাণের আবেগ ও অনেকটা উন্মাদনা লইয়াই করিয়াছি। সংবাদপত্র সেবাকে চাকুরী হিসাবে কোন দিনই গ্রহণ করিতে পারি নাই, "দেশ" সেবাতেও চাকুরীর ভাব কোন দিনই মনে জাগে নাই। তৎকালীন সংবাদ-পত্রসেবীরা ত্যাগেই সন্তোষ উপলব্ধি করিতেন, সেবাতেই ছিল তাঁহাদের আনন্দ।

কাজে অনেক অসুবিধা তখন ছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সবগুলি বিভাগ তখন সুবিন্যস্তভাবে গড়িয়া উঠে নাই। সম্পাদকীয় বিভাগ বর্তমানের মত সম্প্র-সারিত ছিল না। "দেশে"র কাজ কবিবার সঙ্গে সঙ্গে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র অন্য-তম সহযোগী সম্পাদক স্বরূপেও আমাকে কাজ করিতে হইত। প্রতি সপ্তাহে অন্তত সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমাকে তিন চারটি প্রবন্ধ লিখিতে হইত। ইহার উপর "দেশে"র কাজ।

"দেশে"র আকার তখন বর্তমানের চেয়ে বড় ছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা তখন এখনকার মতই ছিল আশী পৃষ্ঠা। সাময়িক প্রসঙ্গ

বা সম্পাদকীয় মন্তব্য ৭ পৃষ্ঠা আমাকেই একা লিখিতে হইত। ইহা ছাড়া আরও তিন চার পৃষ্ঠা অন্য লেখা দিতে হইত। আমি সাহিত্যিক নহি। সুতরাং স্থায়ী সাহিত্য রচনায় হাত আমার ছিল না, এখনও নাই। দেশী এবং বিদেশী সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের উপযোগী-ভাবে সন্দর্ভ লিখিতে চেষ্টা করিতাম। বিলাত এবং আমেরিকা হইতে আগত কাগজগুলি এজন্য তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইয়াছে, প্রয়োজনীয় মন্তব্য টুকিয়া লইতে হইয়াছে, ছবি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জী রাখিবার জন্য 'আনন্দবাজারের' তখন কোন বিভাগ ছিল না। কোন ঘটনার কথা জানিতে হইলে বৎসরের পর বৎসরের পুরাতন ফাইল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে হইয়াছে। বেলা ১২টার সময় অফিসে আসিতাম, ফিরিতে কোন কোন দিন রাত্রি ১২টা ১টা বাজিয়া যাইত। বাসা ছিল তখন হাওড়ার খুরুট রোডে, কালীবাবুর বাজার ছাড়াইয়া। ফিরিবার সময় কোন কোন দিন পুল খুলিয়া দিত। মতি শীলের ঘাট হইতে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া বাড়ী ফিরিতাম।

শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংবাদ-পত্র-সেবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—এ কাজে দস্তুরমত গাধার খাটুনী। শুধু আমি কেন, পাকা সাংবাদিক মাত্রেই তাঁহার এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। প্রকৃতপক্ষে সাময়িকতায় আগ্রহ এবং উত্তেজনা সংবাদপত্র-সাধনায় স্নায়ুমণ্ডলী উত্তপ্ত করিয়া তোলে এবং স্বাস্থ্যহানির কারণ সৃষ্টি করে—স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির প্রশান্তির ক্ষেত্রে এই আশংকা ততটা নাই। কিন্তু একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সাংবাদিক সাধনাকে স্বচ্ছন্দ করিয়া তোলে, অন্তত সেযুগে এই জিনিসটি ছিল।

রাজনীতির উত্তেজনাকর প্রতিবেশের মধ্যে "দেশে"র শৈশব-জীবন শুরু হয়। সাময়িক রাজনীতি তৎকালে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু এই সাধনার গতি প্রশস্ততর একটা ব্যাপ্তির দিকে উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইয়াছে। এইভাবে 'দেশে'র সাধনা বাঙলার সংস্কৃতির প্রাণময় চেতনায় সংস্থিতি খুঁজিয়াছে। সমসাময়িক আঙ্গিকের খুঁটিনাটি ছাড়িয়া—সংকীর্ণ সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সে সাধনা সমগ্রভাবে বাঙালী জাতির অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। দলীয় রাজনীতির বিচার ভুলিয়া "দেশে"র সাধনায় বাঙালী মাত্রেই স্বদেশপ্রেম এবং স্বাদেশিক সংস্কৃতির আত্মমর্যাদাপ্রাপ্ত প্রাণরসের প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং "দেশ"কে আপনার করিয়া পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে "দেশে"র সাধনার ইহাই সাংস্কৃতিক স্বরূপ।

কথাটা খুলিয়া বলিতে গেলে ইহাই দাঁড়ায় যে, রাজনীতিক উপদলীয় কোন বিশিষ্ট ধারা ধরিয়া চলিবার উপর "দেশ" ততটা জোর দেয় নাই, রাজনীতিক আদর্শের মূলে যে প্রাণশক্তি তৎপ্রতি দৃষ্টিকে সে উন্মুক্ত রাখিয়াছে। দৃষ্টির এই উন্মুক্ততার পথে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-নাথ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র জাতির রাজনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রাণ বলকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে সে সমানভাবে মর্যাদা দিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের মধ্যেই "দেশ" জাতির উজ্জীবনোপযোগী শক্তির সন্ধান পাইয়াছে বলা চলে।

দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সাময়িক রাজনীতির আঙ্গিকের উত্তেজনার দিকটা আমাদের সমাজ-জীবনে অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বাঙালী জাতি তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের প্রসারতা উপলব্ধি করিতে উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী আজ উদার সংস্কারমুক্ত প্রতিবেশের মধ্যে বিচিত্রভাবে প্রাণ বিলাসকে উপলব্ধি করিতে চায়। "দেশে"র সেবায় তাহারা এই জিনিস পাইতেছে, মনের উপজীবিকা তাহাদের মিলিতেছে, এজন্যই বাঙালী সমাজের সর্বত্র নরনারী সকলের কাছে "দেশে"র এত আদর, "দেশে"র প্রতি সকলের এমন মমতা। আমরা যেন এই মমতার মর্যাদা রাখিতে পারি, আজ ভক্তি বিনম্র অন্তরে শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

আনন্দবাজার পত্রিকার ইতিহাস

আজি হইতে তেত্রিশ বৎসর পূর্বে ফাল্গুনের এক পূর্ণিমার দিনে বিশ্বজীবনের জন্য প্রেম, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিয়া দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমা যাহার আবির্ভাব তিথিরূপে ঐতিহাসিক মহত্ত্বে ও পুণ্যে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, প্রথম সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয় বক্তব্যে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রেমাবতার সেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মহাভাবময় জীবনের বাণীকে স্মরণ করিয়াছিল।

ইংরাজী ১৯২২ সনের ১৩ই মার্চ এবং বাংলা ১৩২৮ সনের ২৯শে ফাল্গুন আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার আত্মপ্রকাশের সেই প্রথম দিবসে লোকলোচনের সম্মুখে বিপুল কোন চমৎকারিতা উপস্থিত করে নাই; করিবার মত আর্থিক সঙ্গতিও তাহার ছিল না। পত্রিকাকে ব্যবসায়িক কীর্তির নিদর্শনরূপে গড়িয়া তুলিবার কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। সুরেশচন্দ্র ও প্রফুল্লকুমার, নিতান্তই দুই অব্যবসায়িক, একমাত্র যে কারণে এই পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, ে হইল জাতির এবং সমাজের আকাঙ্ক্ষ সুপ্রচারিত করিবার অভিপ্রায়।

জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষ আনন্দবাজার পত্রিকার আবির্ভাব। মহ গান্ধীর নেতৃত্বে তখন ভারতের জা মুক্তির সংগ্রাম এক নূতন পরিণামের প অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অস যোগ আন্দোলন ভারতভূমির জনজী নূতন উদ্দীপনার বিদ্যুৎ সঞ্চা করিয়াছে। জাতির মনে নূতন অ জাগিয়াছে; জাতি আপন ভাগ্য নিজ হা জয় করিবার প্রতিজ্ঞায় অনুপ্রা হইয়াছে। দেশবাসীর জীবনে সেই ঐ হাসিক আহ্বানকে মন্দ্রিত করিবার এবং জনচিত্তে বিপুলতর চে উদ্বোধিত করিবার জন্য বাংলার দুই দে প্রেমিক যুবকের চিন্তায় যে আগ্রহ পরিকল্পনা দেখা দিয়াছিল, তাহারই প্রত সৃষ্টি হইল আনন্দবাজার পত্রিকা।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার ই হাস বস্তুত বিগত তেত্রিশ বৎস জাতীয় জীবনের সকল আগ্রহের ই হাস। কিন্তু আনন্দবাজার পত্রি নামের ইতিহাস স্মরণ করিলে আ অতীতে ফিরিয়া যাইতে হয়। ইংরা ১৮৭৮ সনে সাপ্তাহিক "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্র ও আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রথম প্রকা হইয়াছিল।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার আ র্ভাব কালের যুগোচিত আর ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করি প্রয়োজন আছে। ১৯২২ সনের ১০ই ম তারিখে মহাত্মা গান্ধীকে সেদিনের ব্রি শাসক দূর সবরমতীর এক আশ্রমের দ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। ে ঘটনা ভারতের রাজনীতিক জীবনে নূ এক অভ্যুত্থানের সঙ্কেত এবং সঙ্কেতের তাৎপর্য বুঝিয়া লইতে এ আসন্ন কর্তব্য স্থির করিয়া লইতে দে করে নাই এই বাংলারই সেদিনের দ যুবক—সুরেশচন্দ্র ও প্রফুল্লকুমার। অস যোগ সংগ্রামের বাণীকে বাংলার ঘরে ঘ ধ্বনিত করিবার আগ্রহ লইয়া মহা গান্ধীর গ্রেপ্তারের মাত্র তিন দিন প দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা আবির্ভূ হয়। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য ঢেনকানলে

সুরেশচন্দ্র মজুমদার

দেওয়ান পদে নিযুক্ত প্রফুল্লকুমার উক্ত কর্মপদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিগত তেত্রিশ বৎসর বিংশ শতাব্দীরই বহু সংকটে ও পরীক্ষায় উদ্বেলিত এক দীর্ঘ ইতিহাসের অধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকাকেও শতাব্দীর সকল দুর্যোগ, সংকট ও পরীক্ষা সহ্য করিয়া তাহার অভীষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। পত্রিকার আর্থিক সামর্থ্য বারংবার বিপন্ন হইয়াছে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া রুষ্ট বৈদেশিক শাসকের ভ্রূকুটি পত্রিকার উপর শাস্তি, বাধা ও ভীতি বর্ষণ করিয়াছে কিন্তু এই সব বাধা বিপন্নতা ও আঘাত পত্রিকার আদর্শগত নিষ্ঠাকে কোন মুহূর্তেও বিচলিত করিতে পারে নাই। পত্রিকার সংকল্প কোন দিন পরাভব স্বীকার করে নাই। বরং সেই সব আঘাতকে সমূহভাবে তুচ্ছ করিবার মত শক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কোথা হইতে কেমন করিয়া এবং কোন্ ঐশ্বর্যের সম্বল লাভ করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা এতখানি প্রাণবত্তা লাভ করিল?

সেই ঐশ্বর্য হইল জনসাধারণের শুভেচ্ছা। আনন্দবাজার পত্রিকা জনজীবনের সকল আগ্রহ ও প্রয়াসের সহিত একাত্ম হইয়া কাজ করিয়াছে। এক্ষেত্রে পত্রিকা ও দেশবাসীর কাম্য, লক্ষ্য এবং স্বার্থের মধ্যে কোন ভিন্নতা ছিল না। তাই দেশবাসীও আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ব্রতের উপর তৎকালীন রাজশক্তির যে কোন আঘাতকে জাতীয় জীবনেরই উপর আঘাত বলিয়া অনুভব করিয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত জনসাধারণের এই একাত্মতার বোধ পত্রিকার সুপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ হেতু। ইহা তথাকথিত জনপ্রিয়তার তুলনায় অনেক বড় ও অনেক বেশি মহৎ সম্পদ। ইহাই পত্রিকার শক্তি।

বিশ্বজীবনের জন্য প্রেম, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিয়া এক ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে লাল অক্ষরে মুদ্রিত সম্পাদকীয় বক্তব্য লইয়া পত্রিকার যে প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই প্রথম অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' ডেঞ্জার সিগন্যাল তথা বিপদের সংকেত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লকুমার এবং মুদ্রাকর অধর দাস। সম্পাদকীয় বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগ লইয়া মাত্র বারজনের কর্মীদের দ্বারা পত্রিকার প্রাত্যহিক প্রকাশ পরিচালিত হইত। কার্যালয় ৭১।১, মীর্জাপুর স্ট্রীট। প্রত্যহ বৈকালে পত্রিকা বাহির

প্রফুল্লকুমার সরকার

হইত। মূল্য দুই পয়সা মাত্র। ১৯২৩ সালের ১লা জুনে আসিয়া বৈকালীন প্রকাশের রীতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে আনন্দবাজার পত্রিকা কলিকাতায় প্রভাতী পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার প্রকাশের উপযোগী আয়োজন ও উপকরণেরও বৃদ্ধি সাধন করিতে হইয়াছে। আয়োজনের বৃদ্ধি সাধনের উদ্যমে পত্রিকার কার্যালয়কেও স্থান হইতে স্থানান্তরে উপনীত করিতে হইয়াছে। ৫১।১, মীর্জাপুর স্ট্রীটের পর ১৮।১, মীর্জাপুর স্ট্রীট। তাহার পর ১, বর্মণ স্ট্রীট এবং অবশেষে ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, যেখানে আজ পত্রিকার কার্যালয় নিজস্ব ভবনের পরিবেশ-গৌরব লাভ করিয়া সুস্থিত হইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার ইতিহাস বাংলার সাংবাদিকতার সাধনায় এক নূতন ঐতিহ্যের সূচনা এবং ক্রমোন্নতির ইতিহাস। কৃতিত্বপূর্ণ সম্পাদনার ইতিহাসও বলিতে পারা যায়। ১৯২২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী যতীন মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের অভিযোগে সম্পাদক প্রফুল্লকুমার এবং মুদ্রাকর অধর দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১৯৪১ সালের ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ পত্রিকার সম্পাদকরূপে থাকিয়া দায়িত্ব পালন করেন। তাহার পর প্রফুল্লকুমার পুনরায় সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন সুরেশচন্দ্র এবং তাঁহারই সহযোগিরূপে পত্রিকার পরিচালনার কর্তব্য ক্ষেত্রে আরও যে সকল কৃতী, গুণী এবং প্রতিভাশালী কর্মিষ্ঠের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের সহায়তা আনন্দবাজার পত্রিকার উন্নতির যাত্রাপথে আর এক পাথেয় হইয়াছিল। শ্রীমাখনলাল সেন দীর্ঘকাল ধরিয়া আনন্দবাজার পত্রিকার আত্মোন্নতির উদ্যমে সুরেশচন্দ্রের প্রধান সহকর্মীরূপে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার জনপ্রিয়তারই এক ঐতিহাসিক ঘটনার কাল হইল ১৯৩০ সাল। সরকারের প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্র অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদস্বরূপে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করে। পূর্ণ ছয়মাসকাল প্রকাশ বন্ধ রাখিয়া এবং সরকার কর্তৃক অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহৃত হইবার পর পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হইতে থাকে। জনসাধারণের বিপুল অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা লাভ করে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং প্রচারসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রচারসংখ্যা এবং জনপ্রিয়তার দাবী মিটাইবার জন্য দ্রুত মুদ্রণের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ১৯৩২ সালে রোটারী যন্ত্র স্থাপন করা হয়।

কিন্তু পত্রিকার জনপ্রিয়তার অগ্রগতি ক্ষান্তিহীনভাবেই চলিতে থাকে। আরও দ্রুত মুদ্রণের উপযোগী যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হইয়া উঠে। প্রয়োজনের এই দুরূহ অধ্যায়ে পৌঁছিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা আর এক কীর্তিকর উদ্যমের প্রথম উদাহরণ স্থাপন করে। ১৯৩৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রণকার্যে বাংলা লাইনো-টাইপ যন্ত্রের ব্যবহার। বাংলা লাইনো-টাইপ অক্ষর উদ্ভাবনের গৌরব বস্তুত সুরেশচন্দ্রেরই আবিষ্কারকুশল প্রতিভার গৌরব বলিয়া কীর্তিত হইয়া রহিয়াছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসুর সহযোগিতায় সুরেশচন্দ্র বাংলা লাইনো-টাইপ যন্ত্রের উপযোগী করিয়া ১২৪টি অক্ষরে কী-

বোর্ড রচনা করেন। এই কৃতিত্ব বাংলা মুদ্রণ-শিল্পেরই উন্নতি ত্বরান্বিত করিয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর তৎকালীন বৈদেশিক রাজশক্তির রোষে কতবার এবং কিভাবে নির্যাতিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় না। শুধু এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সারা ভারতের সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকাই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ গৌরবের ঐতিহ্য লাভ করিয়াছে। জামানত তলব এবং অর্থদণ্ড ছাড়াও বহুবার পত্রিকার দৈনিক সংস্করণ এবং ১৯২৮ সালের 'কংগ্রেস সংখ্যা' 'সত্যাগ্রহ সংখ্যা' ইত্যাদি বিভিন্ন সংখ্যা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

পত্রিকার প্রথম পঁচিশ বৎসরের জীবনে দেশমুক্তির আদর্শ ও আগ্রহ প্রচারে পত্রিকা শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য, বার্তা এবং বিবরণেরই বাহক হইয়া থাকে নাই। জাতীয় জীবনের সকল সমস্যাকে এবং আগ্রহকে বাণীরূপ দান করিয়াছে আনন্দবাজার পত্রিকা। সাহিত্য-আন্দোলনে, সমাজসংস্কারে, জাতীয় সাংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে এবং 'স্বদেশীর' উন্নয়নে আনন্দবাজার পত্রিকার আবেদন জাতি-গঠনমূলক সাধনার সাহচর্য করিয়াছে। যেমন দেশের ক্ষুদ্রতম পল্লীর সুখ, দুঃখ ও সমস্যার, তেমনি বহির্বিশ্বের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের বার্তা পরিবেশন করিয়াছে পত্রিকা। পত্রিকা এক্ষেত্রে বস্তুত জনশিক্ষা দানেরই এক বৃহৎ কর্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে। বার্তা পরিবেশনের উন্নততর ও বিচিত্রতর পদ্ধতিও পত্রিকা তাহার নিজ প্রতিভার সাহায্যে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র যে উৎকর্ষে যে কোন উন্নত ইংরেজী দৈনিকের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে, ভারতের মধ্যে তাহার প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত আনন্দবাজার পত্রিকা। শত শত নূতন বাংলা পারিভাষিক শব্দ রচনা করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলা গদ্যের উন্নয়নে যে নূতন সম্পদ দান করিয়াছে, তাহাও বিস্মৃত হইবার নহে।

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মিমণ্ডলের কৃতিত্ব, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা পত্রিকার প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়াছে। লক্ষ্য করিতে হয়, জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আনন্দবাজার পত্রিকা শুধু প্রেরণা, বার্তা ও বাণী প্রচারের দায়িত্বই পালন করে নাই; পত্রিকার কর্মিমণ্ডলের অধিকাংশই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের কোন না কোন বৈপ্লবিক, গঠনমূলক ও প্রচারমূলক উদ্যোগের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পত্রিকা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কর্মীদের এই ব্যক্তিগত আদর্শের সহায়ক হইয়াছে এবং কর্মিগণের এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানেরও সহায়ক হইয়াছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালের ইতিহাস দেশবাসীর স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। জাতীয় জীবনের পরিণামের এই সন্ধিক্ষণে আনন্দবাজার পত্রিকাকে বস্তুত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। লীগশাসিত বঙ্গের সেই কঠোর দিনগুলির ইতিহাস স্মরণ করিতে হয়। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের নিকট হইতে আনন্দবাজার পত্রিকা অবশ্যই এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি দাবী করিতে পারে যে, আনন্দবাজার পত্রিকা দেশের সেই জটিল রাজনৈতিক দুর্যোগের ক্ষণে অবাধ ও অকুণ্ঠ সৎসাহসের প্রেরণা লইয়া জনমত গঠিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং জাতীয় আদর্শের ও দাবীর সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। ক্ষমতা হস্তান্তর, দেশখণ্ডন, উদ্বাস্তুর আগমন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রত্যক্ষ আঘাত, দুর্ভিক্ষাবস্থা এবং নিরাপত্তাহীন সেই অরাজক অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া পত্রিকা তাহার বলিষ্ঠ ও নির্ভীক কণ্ঠস্বরের বাণী আবেদন ও প্রতিবাদের দ্বারা জাতীয় দাবীর মর্যাদা রক্ষার যে প্রয়াস করিয়াছে, তাহা পত্রিকার জীবনের আর এক সাফল্যের অধ্যায় এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিরও আর এক অধ্যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার নিজস্ব এই নূতন ভবনের উদ্বোধনের দিনে নূতন করিয়া তাহার অভীষ্টেরই গুরুত্ব এবং তাৎপর্য স্মরণ করিতেছে। জাতীয় ঐক্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জনসাধারণের নূতন গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বিশ্বের

ভারতীয় জাতির সংকল্প এবং প্রয়াস যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শে উদ্বোধিত হইয়াছে, তাহার মহত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার ভবন উদ্বোধনের ক্ষণে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতে ভুলিবে না। জাতীয় কল্যাণ
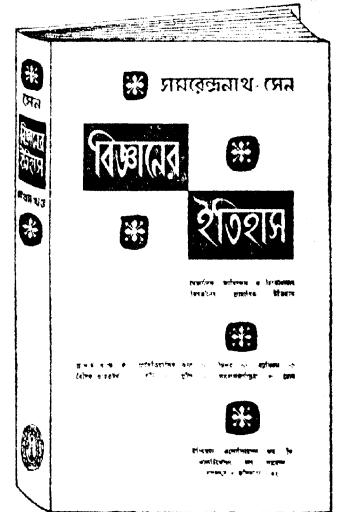
রচনার সকল আগ্রহের সহিত একাত্ম হইয়া চলিবার যে নীতি বিগত তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া পত্রিকার নীতিরূপে অক্ষুন্ন রহিয়াছে, তাহাই সনিষ্ঠ প্রয়াসে অনুসরণ করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা জনসেবার এক নূতনতর ঐতিহ্য রচনার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। পত্রিকা আজ উপলব্ধি করিতেছে, স্বাধীন দেশের জনজীবনে নূতন আগ্রহের উন্মেষ পুনরায় পত্রিকার জনপ্রিয়তার এবং প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধির নূতন এবং বিপুলতর সম্ভাবনা আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই নূতন ভবনে আধুনিকতম এবং বৃহত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন নূতন মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত আনন্দবাজার পত্রিকারই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে প্রকাশিত আরও তিনটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির কথা উল্লেখ করিতে হয়। সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ', ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' এবং 'অর্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা'।

১৯৩৭ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী লইয়া প্রথম প্রকাশিত' হয়।

"I hope the Hindusthan Standard will hold high what its name implies and be in English what Ananda Bazar Patrika claims to be in Bengali—a spirited challenge of the nation's manhood."

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস হিসাবে ২রা অক্টোবর স্মরণীয় পুণ্যাহে পরিণত হইয়াছে। এই পুণ্যাহে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের আবির্ভাব। রাষ্ট্রীয় মুক্তি-আন্দোলনের বাণী প্রচারের কর্তব্য পালন করিতে গিয়া এই পত্রিকাও ছয়বার বৈদেশিক শাসকের আক্রোশের আঘাত সহ্য করিয়াছে। ১৯৪২ সালের আগস্ট সংগ্রামের কালে যেমন আনন্দবাজার পত্রিকা ও ভারতের বিশিষ্ট কয়েকটি সংবাদপত্র সরকারী যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদে প্রকাশ স্থগিত রাখিয়াছিল, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'ও তেমনি প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া জনতার মুক্তি-সংগ্রামের সহিত সহানুভূতি ও সহযোগিতা ঘোষণা করিয়াছিল। সতর দিন প্রকাশ স্থগিত রাখিবার পর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পুনরায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন। তাহার পর হেমচন্দ্র নাগ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সাল হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার উন্নয়ন ও প্রসারের আর এক ঘটনার কাল। কলিকাতা এবং দিল্লী উভয় স্থান হইতেই উক্ত পত্রিকার একযোগে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। দিল্লীতে ১৯৫১ সালের ১৪ই অক্টোবরে নিজস্ব ভবনে স্থাপিত কার্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র লইয়া হিন্দুস্থান স্ট্যাডার্ড আজ ভারতীয় জনমত গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার আর একটি কৃতিত্বের গৌরব দেশবাসী উপলব্ধি করিয়াছে। বাঙলার সংস্কৃতির সহিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও শিক্ষিত-সাধারণের পরিচয় নিবিড়তর করিবার কল্যাণকর সাংস্কৃতিক কর্তব্যে এই পত্রিকা তাহার সূচনাকাল হইতে নিযুক্ত রহিয়াছে।

"অর্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে। দূরতম এবং দুর্গম পল্লীর জনজীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করাই অর্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্দেশ্য।

সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা ১৯৩৩ সনের নবেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। "দেশ" বাঙলার শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিকসংখ্যক প্রচারে গৌরবান্বিত সাহিত্য পত্রিকা। সাপ্তাহিক "দেশ" ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও বাঙালীর সাহিত্যগত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছে।

নূতন ভবনের উদ্বোধনের এই লগ্নে ব্যথিতচিত্তে স্মরণ করিতে হয়, সুরেশচন্দ্র এবং প্রফুল্লকুমার আজ আর ইহজগতে নাই। তাঁহাদের কীর্তির রথ দেশবাসীর সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা লোকান্তরিত হইয়াছেন। স্মরণ করিতে হয় আরও বহু কর্মীকে, যাঁহাদের অনলস সেবায় পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির কারণ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা বিগত হইয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাফল্য ও কৃতিত্বের কথা প্রেস কমিশনের যে স্বীকৃতি লাভ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"Ananda Bazar Patrika is known for its extensive coverage of news and enjoy to-day the largest circulation for any daily newspaper in any language published from one location"—

—আনন্দবাজার পত্রিকা সর্বপ্রকার সংবাদের সর্বাঙ্গীন পরিবেষণের জন্য সুপরিচিত। ভারতের যে-কোন স্থান হইতে যে-কোন ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচারসংখ্যাই সর্বাধিক।

বিধাতার আশীর্বাদ এবং দেশবাসীর শুভেচ্ছা আনন্দবাজার পত্রিকার সহায় হউক, ইহাই আজিকার শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আ ন ন্দ বা জা র পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক প্রার্থনা।

দেশ পত্রিকার বাইশ বছর

লখনউ, ৯-৬-৫৫

সবিনয় নিবেদন,

......যাই বলুন, আপনার চিঠি পেয়ে কিন্তু প্রথমে আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। খামখানা ফের একবার উল্টে দেখলাম—হুঁ, ঠিকানাটা আমারই বটে। আরো-একবার পড়লাম চিঠিখানা—উদ্দিষ্ট ব্যক্তিও, সন্দেহ-কি, আমি-ই—অপরেশ লাহিড়ী। একেবারে গ্রাহক নম্বর পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে।

অবশ্য, গ্রাহক-নম্বরী চিঠি যে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাইনে তা নয়, বৎসরান্তে কি ছমাস-অন্তে নিয়মিত এক-একখানা আসে—প্রেরক সেগুলির বিভিন্ন হলেও বক্তব্য প্রায় সকলেরই এক : অবিলম্বে মনিঅর্ডারযোগে চাঁদা পাঠাবার নাছোড়বান্দা অনুরোধ। উপসংহারে সকাতর মিনতি : 'অন্যথায় ভি-পি করা হইবে। ভি-পি ফেরৎ দিয়া এই দুর্দিনে অনর্থক আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।'

আপনি চাঁদার তাগাদা দেননি, বরং এমন একটা খবর দিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে যার মূল্য আমার কাছে অপরিসীম।... আমিই তাহলে 'দেশ'-এর জীবিত গ্রাহকদের, অর্থাৎ গ্রাহক হিসেবে জীবিতদের, মধ্যে সর্বপ্রাচীন? আমার গ্রাহক নম্বর অবশ্য এক নয়, সাত—তবে আপনারা যখন বলছেন, অবিশ্বাস করব না—করতে মনও চাইছে না। যাক, জীবনে একটা ব্যাপারে অন্তত ফার্স্ট হয়েছি!

কিন্তু সম্পাদক মশাই, আপনার চিঠির দ্বিতীয় প্যারা পড়ে যে রীতিমত নার্ভাস বোধ করছি। 'দেশ'-এর বাইশ বছরের পাঠক হিসেবে আমার লিখিত অভিমত চান? দেখুন, আমি লেখক নই—পাঠক। কিছুকাল আগেও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম, সম্প্রতি আমাদের দল হু হু করে ভাঙতে শুরু করেছে—সবাই গিয়ে নাম লেখাচ্ছে বিপক্ষে—লেখক-গোষ্ঠীতে। এবং, একবার লেখক হতে পারলে—কে না জানে—স্বীয় পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কিছু পাঠ না করাই এতদ্দেশীয় রেওয়াজ। এমতাবস্থায় আরো একজন পাঠককে, বিশেষ করে আমার মত একনিষ্ঠ একজনকে, উস্‌কে দেওয়া কি সমীচীন হচ্ছে?

লেখাটা ছাপবার আগে ভেবে দেখবেন।

॥ ২ ॥

আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকে 'দেশ'-এর পুরনো সংখ্যাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছি। ব্যক্তিগত জীবনের, প্রথম যৌবনের অনেক কথা মনে পড়ছে। বাইশ বছর আগেকার সেই দিনগুলি, আমারো তখন বাইশের যৌবন। আজ বাইশের যৌবনে উপনীত 'দেশ', বার্ধক্যের দ্বারদেশে আমি। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসেব কষবার সাধ জাগে, সাহস হয় না। হয়ত দেখব, লাভের চেয়ে লোকসানের দিকেই পাল্লা ভারী। এই হিসেব অবশ্য নিছক ব্যক্তিগত। কিন্তু সমগ্রভাবে, জাতিগত ক্ষেত্রে, ওটা সত্যি নয়। রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা ও বিবিধ দুর্দৈবের বহু চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হয়েছে সত্যি—অগ্রগতি তবু থামেনি—অনেক, অনেক এগিয়ে এসেছি আমরা। দেশের পুরনো সংখ্যাগুলি দেখছি, আর বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ ক্রমাগতির একটি চিত্র আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আর, বারবার মনে হচ্ছে, যাঁরা বলেন বাংলা সাহিত্য দিনকে দিন অধঃপাতে যাচ্ছে কী ভয়ানক অপলাপী তাঁরা, কত বড় অজ্ঞান পাপী।

'দেশ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালের ২৪শে নভেম্বর। পৃষ্ঠা-সংখ্যা আশি। আকার বর্তমানের চেয়ে লম্বায় ইঞ্চি দেড়েক ও পাশে ইঞ্চিখানেকের মত বড়। সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম—ছয় পয়সা। (মাঝের কয়েকটা সংখ্যা পাচ্ছি না, তবে যতদূর মনে পড়ে—আপনি সম্পাদক হন মাস ছয়েক পরে, তাই না?)

বাংলা সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তনের চাঞ্চল্যকর কোনো ঘোষণা তাতে ছিল না। সবিনয়ে শুধু বলা হয়েছিল : " 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগী বন্ধুগণের উৎসাহ ও সহায়তায় সাপ্তাহিক 'দেশ' প্রকাশিত হইল।...'দেশ' বিশেষভাবে জনসাধারণের কাগজ। নিপীড়িত, দীনদরিদ্রের দৃষ্টি দিয়া আমরা দেশের সমস্যাগুলি দেখিব। দেশের যাহারা অধিকাংশ, যাহারা জাতির মেরুদণ্ড, তাহারা যাহাতে বাংলা ভাষার

আনন্দ প্রেসের রক্ষকের নামে ২০০০ টাকা জামানত সরকারের জমা ছিল। 'আন্দামানে নির্বাসন' ও 'শ্রীশ্রীকালী' শীর্ষক দুইটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সম্পর্কে উক্ত জামানত হইতে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ১০০০ টাকা ও প্রেস-রক্ষকের ১০০০ টাকা-একুনে দুই হাজার টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।......"

(গত সপ্তাহের সংবাদ)

"......চট্টগ্রামের স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রাণদণ্ড এবং শ্রীমতী কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। হাইকোর্ট এই দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন। দণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" (ঐ)

"১লা ডিসেম্বর হইতে ঢাকা ও কলিকাতার মধ্যে যাত্রীবাহী বিমানপোত চলাচল আরম্ভ হইবে।" (ঐ)

"......প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসকেই একমাত্র কার্যক্ষম প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস বলবৎ থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কথা চিন্তাও করিবেন না।" (ঐ)

"জার্মানীর প্রত্যেক এক শত ভোটের মধ্যে তিরানব্বইটি ভোট পাইয়াছেন হিটলার। চার কোটির অধিক জার্মান নরনারীর ভোটলাভে সমর্থ হইয়া হিটলার আজ জার্মানীর একচ্ছত্র অধিপতি। দশ বৎসর পূর্বে হিটলারের নাম কয়জন শুনিয়াছিল?..." (**হিটলার ও জার্মানী**)

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

সোণা ও রূপা

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৩২৷৵০
বড়াল বার		৩২৷৵০
রূপা প্রতি ১০০ ভরি		৫৭,
চাউল প্রতি মণ		
দাদখানি		৭৷৷০—৮,
ঢেঁকিছাটা, বালাম		৪৷৷০—৫৷৷০
পাটনাই (আতপ)		৩৸০
ঘৃত		
গাওয়া	প্রতি সের	২,
ভইসা		১৷০—১৷৷০

সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা, আশা করা যায়, এর থেকেই তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারবেন। তবে অসাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে আরও দুই দফা দরকার। যথা—

"......গত ১১ই নভেম্বর নিউ থিয়েটার্সের নবতম সবাক চিত্র 'মীরাবাঈ' ও 'রাজরাণী মীরা' (বাংলা ও হিন্দী) যথাক্রমে চিত্রা ও নিউ সিনেমা চিত্রগৃহে উদ্বোধিত হইয়া গিয়াছে।......"

"......'চাঁদসদাগর' চিত্রখানি দর্শক আকর্ষণ করতে পারলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।...শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য লখিন্দর চরিত্রের মর্যাদা রক্ষা করতে পারলে সুখী হব।......"

"......শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর নিউ থিয়েটার্স ত্যাগ আমাদের বিস্মিত করেছে। কি কারণে শ্রীযুক্ত বসু নিউ থিয়েটার্সের সংশ্রব ত্যাগ করলেন জানি না; কিন্তু এতে ক্ষতি যা হবার তা দেবকীবাবুকে স্পর্শ করবে না নিশ্চয়।..." (রংগজগৎ)

দ্বিতীয় দফার জন্যে দ্বিতীয় সংখ্যার স্মরণ নিতে হবে ঃ

"......কিন্তু ক্রিকেট খেলা বাংলার জনসাধারণের ক্রীড়া হয় নাই এবং বর্তমান অবস্থায় সম্ভবপরও নহে। ক্রিকেট ব্যয়সাধ্য ক্রীড়া—ধীরমন্থরগতিতে অগ্রসর হয়। ইহাকে কতকটা অভিজাতদের ক্রীড়া বলা যায়, যাহাদের সময় ও অর্থ উভয়েরই প্রাচুর্য আছে। তারপর সাধারণত এই খেলা বেলা এগারোটার সময় আরম্ভ হয়। কিন্তু বাংলার ক্রীড়ামোদীরা বা ক্রীড়কেরা প্রতিদিন বেলা এগারোটা হইতে খেলার মাঠে যাইবে, উহা আশা করা যায় কিরূপে? সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ইহা সর্বদেশের সাধারণ ক্রীড়ায় পরিগণিত হইবে, এরূপ সম্ভাবনা কম।"

"......**এম সি সি দল**—বিলাতের বাছাই খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত এই দল ভারতের সহিত টেস্টম্যাচ খেলিতে আসিয়াছে। এক হিসাবে ইহাকে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক্রীড়াজগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা যায়।

"......আগামী ইংলণ্ড-ভারত টেস্ট ম্যাচে কাহারা খেলিবেন তাহা স্থির করিবার জন্য বোম্বাইয়ে একটি খেলা হইতেছে।... বাংলা হইতে গণেশ বসু, কার্তিক বসু ও এস ব্যানার্জি এই খেলায় যোগদান করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন।"

দ্বিতীয় সংখ্যায় 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে দুটি উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হয়—মহাপ্রস্থানের পথে ঃ শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, মিছিল ঃ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। উল্লেখ প্রয়োজন, সমালোচনা দুটি সাম্প্রতিক অর্থে সমালোচনা নয়—অর্থাৎ একাধারে লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, বাঁধাইকার, প্রচ্ছদশিল্পী, প্রচ্ছদমুদ্রক ও পেপার মিলের নিছক প্রশস্তিবাচন নয়।

তৃতীয় সংখ্যা থেকে আরও একটি ভাগ শুরু হয়ঃ সাহিত্য-সংবাদ। সাহিত্য সম্পর্কিত সভা-সম্মেলন ও রচনা প্রতিযোগিতার খবরাখবর এতে দেওয়া হত। কিন্তু প্রথম কয়েক সংখ্যায় এই বিভাগটি ছিল অপাংক্তেয় হয়ে—সূচীপত্রে তার উল্লেখ পর্যন্ত থাকত না, এবং প্রকাশিত হত সূচীপত্রের কয়েক পৃষ্ঠা আগে, প্রথম দিকে। কয়েক সংখ্যা পরে অবশ্য জাতে ওঠে। এবং 'সাহিত্যের' আগে নতুন একটি বিশেষণও যুক্ত হয়—'শিল্প'।

॥ ৩ ॥

তবু সেদিনের 'দেশ'কে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মুখপাত্র হিসেবে অভিহিত করা চলে না। প্রথম নববর্ষ সংখ্যার বিজ্ঞাপনে অবশ্য বলা হয়েছিল—"দেশ দৈনিকের অভাব পূরণ করে, কারণ দৈনিক পত্রের সকল প্রয়োজনীয় সংবাদই ইহাতে থাকে। দেশ সাপ্তাহিকের অভাব পূরণ করে, কারণ সপ্তাহের প্রয়োজনীয় সংবাদ, সমালোচনা, দেশী ও বিদেশী সংবাদের তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ইহাতে পাইবেন। দেশ মাসিকের অভাব পূরণ করে, কারণ বাংলার বিশিষ্ট লেখকদের লিখিত সারগর্ভ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সরস আলোচনায় ইহাকে সর্বাংশে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না।"

চেষ্টার ত্রুটি হত না সত্যি, তবু প্রকৃতপক্ষে সেদিনের 'দেশ' ছিল ইংরেজ নিউজ উইকলি'র একটি বিশদ সংস্করণ মাত্র। গল্প কবিতা অবশ্য দেশের প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে, উপন্যাস শুরু হয় পঞ্চম সংখ্যায়: প্রবোধকুমার সান্যালের 'জয়ন্ত'। কিন্তু সে সময় সমধিক ঝোঁক দেওয়া হত প্রবন্ধের দিকে। বিশেষ করে সেই সব রচনা পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামে যেগুলি সবিশেষ মূল্যবান। আর, এর প্রয়োজনও সেদিন ছিল সবচেয়ে বেশি। "দেশ স্বাধীনতাকামী...উগ্র জাতীয়তাবাদী...প্রগতিশীল...স্বাজাত্যাভিমানী...অত্যাচারিতের সমর্থক...সেবাব্রতী"—এই বিঘোষিত আত্মপরিচয় পুরনো দেশের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায়। উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্যে 'দেশ'কে দুবার সরকারী রোষেও পড়তে হয়। প্রথমবার ১৯৩৯ সালে। ২৬শে আগস্ট তারিখের সমস্ত সংখ্যা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। দ্বিতীয়বার ১৯৪৭ সালে মাসটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং গৌরাঙ্গ প্রেসের রক্ষকের কাছ থেকে হাজার কয়েক টাকা জামানত দাবি করা হয়। এতদসত্ত্বেও দেশ সেদিন স্বধর্মচ্যুত হয়নি।

তবে কালক্রমে 'দেশে'র আদর্শবাদ নতুন পথে মোড় নেয়। সাময়িক পত্রিকা হিসেবে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে তার ভূমিকা তখন সমাপ্ত- স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক-উষাকাল—'দেশ' ধীরে ধীরে একটি সাংস্কৃতিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এটা পরিচালকগোষ্ঠীর দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। কারণ ভাঙনের পালা এবার সমাপ্ত—সংগঠনের, আত্মবিকাশের কাল সমাগত। জীবনদান নয়, জীবনায়ন।

সময় থাকতে যে এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালি পাঠকসাধারণের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। 'দেশে'র পক্ষেও।

এই দূরদর্শিতার অভাবেই না একদা-বিখ্যাত বহু পত্রিকার অপমৃত্যু ও অধোগতি আমরা সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করেছি, করছি! পত্রিকা মাত্রেই যুগানির্ভর, কিন্তু যুগান্তরকে যদি না সে সানন্দে অভিনন্দন জানাতে পারে, আত্মলোপ করা বা জীবন্মৃত হয়ে থাকা ছাড়া সেক্ষেত্রে তার গতি নেই। পত্রিকাকে লেখক-নির্ভর হতে হয়, কিন্তু বিগতপ্রতিভা লেখকরা যখন অতীতের দাবিতে পত্রিকার স্কন্ধে স্থায়ী হয়ে বসেন, তখন তার অবস্থা হয় সেই সিন্দবাদের বোঝার মত। অতি বাস্তব এই সত্যটা বোঝেন না বলেই অধুনা কোন কোন প্রবীণ পত্রিকাকে আকার বদলে, নটনটীদের ছবি ছেপে, দু-চারজন উটকো আধুনিকের লেখা নিয়ে টিকে থাকবার জন্যে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে।

কিন্তু হায়! উনপঞ্চাশীকে কি ষোড়শীর রূপসজ্জায় মানায়?

॥ ৪ ॥

সত্যিকারের একটি সাংস্কৃতিক পত্রিকা বলিতে যা বোঝায়, দ্বিতীয় পর্যায়ের 'দেশ' তাই। আগে থাকত শুধু কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ—দ্বিতীয় পর্যায়ে তাতো রইলই, উপরন্তু সংযুক্ত হল নতুন নতুন আরও নানা বিভাগ।

কবিতা গল্প উপন্যাসের ধারা বদলাল। তথাকথিত বিখ্যাত বা জনপ্রিয়দের বদলে এবার এলেন সত্যিকারের শক্তিমান আধুনিক লেখকের দল। এ'দের মধ্যে কেউ সুপরিচিত, কারো নামের আগে বড় জোর 'নাতি' বিশেষণটি যোগ করা যায়, কেউ একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু সুপরিচিত হন বা অপরিচিতই হন, বাংলার নতুন ধ্যানধারণার মুখপাত্র তাঁরা, নতুন সাহিত্য আন্দোলনের সৈনিক। প্রবন্ধও তার ধরাবাঁধা বিষয়-বস্তুর গণ্ডি ভেঙে বহুমুখী হয়ে উঠল। সংস্কৃতি বলতে যে শুধু গল্প উপন্যাস কবিতা বোঝায় না—বিজ্ঞান, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, সিনেমা—এক কথায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিধর্মী মানুষের প্রত্যেকটি সৃষ্টিই যে সংস্কৃতির অঙ্গ, জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশেরই আরেক নাম যে সংস্কৃতি—তার পরিচয় পাওয়া যাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'দেশে'।

'দেশে'র এক অন্ধ ভক্ত সেদিন বলছিলেন, আধুনিক রম্যরচনার প্রবর্তক 'দেশ'। ঐতিহাসিক বিচারে এ মত আমি মানি নে। তবে একথা অস্বীকার করব কি করে যে, 'দেশ'ই রম্যরচনাকে আজ জনপ্রিয় করে তুলেছে? দেশে ইন্দ্রজিত, প্র-না-বি, রৈবত, সৈয়দ মুজতবা আলী, রঞ্জন, রূপদর্শী ও উত্তমপুরুষকে বাদ দিলে আধুনিক রম্যরচনাকার আর কজন থাকেন ভেবে বলতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, দেশের সবচেয়ে বড় কৃতি রম্যরচনা নয়—চিত্র প্রদর্শনী, গানের আস
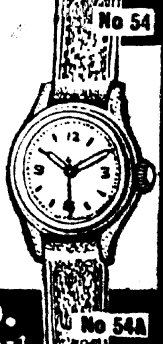
দি বিভাগের প্রবর্তনে। চিত্র প্রসঙ্গে তা থেকে অবন ঠাকুর পর্যন্ত এক বাসে আমরা উচ্চারণ করি, কিন্তু শল্পের সঙ্গে আন্তরিক কোন া বোধ করিনে—ও যেন আলাদা রাজ্যের ব্যাপার। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা কর্তব্য বলেই শ্রদ্ধাটা করে থাকি, বর সমঝদার হবার জন্যে, নিজেকে চত করে তোলার প্রয়াস কদাচ েন। এর জন্যে শুধু আমরা—রণ পাঠকরা—দায়ী নই। বনেদী কার কর্ণধাররাও ইতিপূর্বে এ ারে তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে ন করেননি। এক-আধখানা ছবি ই তাঁরা মনে করেছেন চিত্রশিল্পী-যথেষ্ট 'স্কোপ' দেওয়া হল। আর ফলে নন্দলাল বসুর চেয়ে 'শিল্পী টমাস' আদরণীয় হয়েছেন বেশি। না আজো আমাদের দেশের চিত্র-পীরা শ্রদ্ধেয় হয়েও অপাংক্তেয়, াক্ষিত। উচ্চাঙ্গ সংগীত-শিল্পীদের ক্ষেত্রেও এই একই উক্তি প্রযোজ্য। 'দেশ'কে ধন্যবাদ, সংস্কৃতির মধ্যে এই জাতিভেদ ঘোচাতে নিয়মিত চেষ্টা করছেন বলে।

বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা জীবনে কত না বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন, লিখতে জানেন, লেখার সুযোগ পেলে তাও স্মরণীয় সাহিত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পেশাগতভাবে এঁরা লেখক নন বলেই হয়ত অন্যান্য পত্রিকায় স্থান পান না। ব্যতিক্রম 'দেশ'—'যখন পুলিস ছিলাম', 'লৌহকপাট', 'চা-বাগানের কাহিনী', 'টেম্পল চেম্বার্স ও হাইকোর্টের বিচিত্র কাহিনী', 'ডাক্তারের ডায়েরী', 'সাংবাদিকের স্মৃতিকথা' ইত্যাদি কোন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সুবিখ্যাত উপন্যাসের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়।

কিন্তু এভাবে বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন কি। কেননা, এ লেখা যিনি পড়বেন অবশ্যই তিনি 'দেশে'র নিয়মিত পাঠক। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দেশের অনন্যসাধারণ ভূমিকার পরিচয় একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে সমাপ্ত করা যেতে পারে : 'দেশে-বিদেশে', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'ত্রিযামা', 'জলজঙ্গল', 'পঞ্চতন্ত্র', 'অশ্বত্থের অভিশাপ', 'ঢোরাই চরিত মানস', 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী', 'হাসুবানু', 'স্থাবর', 'রূপদর্শীর নকশা', 'কিনু গোয়ালার গলি', 'দূয়ার হতে অদূরে', 'চেনামহল', 'দুর্গরহস্য', 'হারানো অতীত', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'রাজোয়ারা', 'ভারত প্রেম কথা', 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কত অজানারে' ইত্যাদি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনাগুলি প্রথমে 'দেশে'ই প্রকাশিত হয়েছিল।

অথচ আশ্চর্য এই, এই সব গ্রন্থের সব লেখকই কিছু বিখ্যাত নন। লেখকের গুণে বইকে জনপ্রিয় করে তোলা প্রকাশকের কৃতিত্ব, সে-প্রকাশক যদু-মধু হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু শুধু লেখার গুণেই লেখকের যথাযথ মর্যাদা লাভ একমাত্র 'দেশে'ই সম্ভব।

তাই বাজারে একটা অপপ্রচার থাকলেও 'দেশে'র বাঁধাধরা কোন লেখক-গোষ্ঠী আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। এবং আমার মনে হয়, কোন পত্রিকার নির্দিষ্ট একটি লেখকগোষ্ঠী থাকা পাঠকদের পক্ষেও বাঞ্ছনীয় নয়। পাঠকরা মূল্য দিয়ে লেখা কিনে পড়েন। স্বভাবত তাঁরা রচনার গুণাগুণকেই একমাত্র বিবেচ্য বলে মনে করেন। সব জিনিসেরই যে একটা সীমা আছে, সাহিত্যিকের সৃষ্টিক্ষমতাও যে একদিন শেষ হয়ে যায়—'দেশ' এটা বোঝে। আর বোঝে বলেই পুরাতনের জায়গায় নিত্য নূতন লেখকের আত্মপ্রকাশ এই পত্রিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এই জন্যেই পাঠক সমাজে তার এত সমাদর। ঊর্ধ্বতন সাহিত্যিক মহলে কতখানি জানিনে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলার প্রত্যেক বিখ্যাত লেখকই 'দেশে' লিখেছেন, 'দেশে' লিখে বিখ্যাতও হয়েছেন অনেকে, কিন্তু কোন বিখ্যাত লেখকের অক্ষম রচনা 'দেশে' খুব বেশী পড়েছি বলে মনে হয় না। বোধ হয় সেই কারণেই গোড়ার দিকে তৎকালীন বিখ্যাত যে সব লেখক 'দেশে' নিয়মিত লিখতেন, আজ নরদেহে জীবিত থাকলেও 'দেশের' গ্রন্থ-সমালোচনা ব্যতীত অন্যত্র তাঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। পাঠক হিসেবে এজন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ।

এবং যতদিন 'দেশ' এই নীতি মেনে চলবে ততদিন আমার এই কৃতজ্ঞতাও বজায় থাকবে, গ্রাহক হিসেবেও আমি থাকব।......ইতি।

ডিহাং উপত্যকার আবর উপজাতি

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

ডিহাং নদীর উপত্যকায় দুর্ধর্ষ ও উপদ্রবী উপজাতিদের অসমীয়া ভাষায় আবর অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হত। সেই নামেই আজ এই আদিম জাতি পরিচিত। নিজেদের ভাষায় আবররা তাদের নামকরণ করে আবুইট বলে। দুরধিগম্য পাহাড় ও বনপরিবেষ্টিত পরিবেশে মানুষ বাইরের জগৎ সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাই বিদেশীদের শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজনও হয় না, সবাইকে মাডগু বলেই সে সম্বোধন করে। প্রতিবেশী তিব্বতীরাও বিদেশী মাডগু।

আবর দেশের সীমারেখা রচিত করেছে পশ্চিমে সুবনশিরি নদী, শিশেরি এবং ডিবং নদী, পূর্বদিকে এবং উত্তরে ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মালভূমির মধ্যে অজ্ঞাত শৈলশ্রেণী। মানচিত্রে এই অঞ্চলের পূর্ণ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় না। সাধারণত ডিহাং নদীর দুই তটের অধিবাসীদের আবর গোষ্ঠী বলা হয়, ডিহাং ও সুবনশিরির মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোকদের বলে গালং এবং সুবনশিরি ও বরহেলি দোয়াববাসীদের বলে দফলা।

সুদূর অতীতে ভারতের উত্তরপূর্ব গিরিবর্ত্ম দিয়ে আবররা কিভাবে এদেশে এসেছিল তার কোনও ইতিহাস নেই, কিন্তু উপজাতিদের মধ্যে কিছু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। জাম্বো দেশের সৃষ্টি প্রস্তর থেকে আবর, গালং এবং মিশমি উপজাতিদের উৎপত্তি। সে পাথর শিরিং নদীর ধারে অবস্থিত। তারপর তারা সবাই মিলে শস্যশ্যামল ভূমির সন্ধানে ডিহাং নদীর সহায়ক শাখা নদী সিগন ও সিয়নের দোয়াবে বসবাস করে। বহুদিন এইভাবে থাকার পর একদিন হঠাৎ মিনিয়ং উপজাতির লোকেরা এসে উপস্থিত হল। তারা বড়ই দুর্দান্ত। লম্বা দা হাতে করে এই সুখী উপনিবেশের লোকজনকে বিভিন্ন যায়গায় তাড়িয়ে দিল। আর সেই থেকে আবর, গালং ও মিশমিরা বিভিন্ন যায়গায় বসবাস করছে। তেমনি আবার দেবতা ও মানুষের মধ্যে ডিহাং উপত্যকায় বসবাস করার অধিকার সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে। বহুদিন ধরে সুন্দর ধরিত্রীর উপর কারা প্রতিষ্ঠিত হবে তাই নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ চলল। জয় হ'ল শেষে মানুষের আর দেবতার দল গিয়ে আশ্রয় নিল ডিহাং নদীর ডানদিকে বিস্তৃত তুষার ধবল উত্তুঙ্গ পর্বতমালায়। তাদের ভাষায় এই দেবভূমি পর্বতমালার নাম কিলিং। কিলিং পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন শৃঙ্গ ১৭।১৮ হাজার ফিট উঁচু এবং সর্বোচ্চ শিখর ২৬ হাজার ফিটের কাছাকাছি।

অনেক রকম বিচিত্র কাহিনী তাদের দেশের পাহাড়, নদী, উপত্যকা সম্বন্ধে শুনেছিলাম। প্রথম যখন সাদিয়া থেকে মিশমি উপজাতির আবাসভূমি নিজাম-ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম, সেদিনই এই রহস্যময় দেশের অতুলনীয় রূপ, ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছিলাম। গভীর

সুসজ্জিত আবর পুরুষ

হাস্যময়ী আবর রমণী

জংগলের মধ্যে দিয়ে অপ্রশস্ত রাস্তা এ'কে বে'কে চলে গিয়েছে। বনদেবতা মানুষকে চলাচলের এতটুকু পথও দিয়ে দিতে রাজী নন। বড় বড় ঘাস পথের উপরে পর্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেছে, দু'পাশে দুর্ভেদ্য বনানী। দীর্ঘ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং কতরকমের পরগাছা। জীপ করে যেতে গিয়ে মনে হয়েছিল, যেন সবুজ সুড়ংগের মধ্যে দিয়ে বনদেবতার খাস মহলের পথে চলেছি। চারদিকে বন আর বন, সামনে কেবল অল্প কিছুদূর পথ দেখা যাচ্ছে। আকাশকেও গাছের ডাল ও লতাপাতার সামিয়ানায় ঢেকে রেখেছে। বড় বড় ঘাসের উপর দিয়ে জীপ চলেছে, যাবার সময় মাথা নিচু করে আমাদের পথ করে দিচ্ছে, কিন্তু তারপরই আবার নিজের সমুন্নত শির স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। সমস্ত দেহ ঘাসের ফুলরেণুতে ভরে গেল।

দফলাদের মত আবর উপজাতিও তিব্বতী-বর্মীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মুখচোখে মোংগলীয় ভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আকারে ছোট, শরীর গঠন অত্যন্ত মজবুত। বসবাস এবং জীবনযাত্রা প্রণালী খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, তবুও স্নান প্রায়ই করে। যুবতীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। প্রতিবেশী মিশমিরা আবরদের থেকে অনেক বেশি সুন্দর। আবর উপজাতিরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। পদম শাখার সংগে সভ্য মানুষের পরিচয় বহুদিনের। তাদের কখনও বর অর্থাৎ বিরাট বলেও উল্লেখ করা হয়। ইয়ামনে ও ডিহাং নদীর মাঝে উর্বর ভূমিতে কোমকর উপজাতি বসবাস করে। বিভিন্ন উপজাতির কলহবিবাদে এরা অংশ গ্রহণ করে না বলে, উপদ্রুত অঞ্চল থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দল এইখানে বিপদের দিনে চলে আসে। এই অঞ্চলের পাশেই কারকশ শাখার আদিম জাতির বাস। এছাড়া পানাংগ, মিনিয়ং, সিমং এবং পাশি প্রভৃতি শাখার আবরও আছে। গালং উপজাতি বহুদিন আগে ডিহাং নদীর ধারে বসবাস করত কিন্তু পদম আবরেরা সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করে। গালংদের বর্তমান বাসভূমি ডিজমুর নদীর ধারে।

আবর দেশের চারদিকে অসংখ্য পাহাড়ের মেলা। তার মাঝ দিয়ে ছোট বড় পাহাড়ে নদী ও স্রোতস্বিনী বয়ে গিয়েছে। প্রবল ভূকম্পন এবং প্লাবনের পর সেখানে গিয়েছিলাম। অমিতবেগে অসংখ্য নামগোত্রহীন জলধারা তখন পাহাড়ের গা বেয়ে এসে সি-আং (ডিহাং নদীর আবর নাম) নদীতে মিশছে। বিরাট বিরাট প্রাচীন বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে পার্বত্য নদী ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। মনে হয়, বুঝি কাঠ চালান দেবার ব্যাপক আয়োজন চলছে। অশান্ত নদীর গর্জন গান প্রকৃতির গম্ভীর পরিবেশে অপরূপ কলতান সৃষ্টি করেছে। ধরিত্রীর কম্পনে এবং বন্যার প্লাবনে পাহাড়ও ক্ষতবিক্ষত। বহু পাহাড় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে আর চারদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে বিরাট ধস নামার চিহ্ন সুস্পষ্ট। পাহাড়ের পাথর আর মাটি গিয়ে সুদূর ব্রহ্মপুত্রের তলদেশে আশ্রয় নেবে, নতুন করে আবার বন্যা তারই ফলে সৃষ্টি হবে। সেদিন ডিহাং নদীর ধারে জ্ঞানবৃদ্ধ পক্ককেশ কয়েকজন আবরের সংগে কথা বলছিলাম। ডিহাং, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা এমনি কত বড় বিরাট নদীর প্রলয়ংকর মূর্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আবররা কিন্তু আমার বিবরণে মোটেই বিস্মিত হল না, আমাদের দেশের নদীর তান্ডব রূপকে প্রাধান্য দিতেও তারা রাজি নয়। সুদূরে

তিব্বতে তারো সিয়াং বলে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিনী এক বিরাট নদী আছে। তার উৎপত্তি বা সংগম মানুষের অজ্ঞাত। সেই আবরবৃদ্ধদের কাছ থেকে দুর্বার-গতি সাং-পো নদীর কাহিনী শুনেলাম। আরও শুনেলাম সেই নদীর ধারে লোম-মনিহ্রনশার উপজাতিদের বিচিত্র কাহিনী! বৃদ্ধ পিতামাতাকে রোগ-ভোগের হাত থেকে অব্যাহতি কর্তব্য-পরায়ণ সন্তানসন্ততি সেখানে অতি সযত্নে দান করে—পিতামাতাকে কেটে খেয়ে ফেলে। ১৯১২ সালে আবর উপজাতিদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত বাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন কেনেডি খম্বা অঞ্চলের অধিবাসী দুইজন উপ-জাতির কাছ থেকেও এইরকম বিবরণ সংগ্রহ করেন।

আবর গ্রামের বাড়ি ঘর সাধারণত একই জায়গায়। শ্রেণীবদ্ধ ঘর পাশাপাশি উ'চু জায়গাতে তৈরি। ১০।১২ ফুট উ'চু কাঠের গুঁড়ির উপর ঘর। তিন চার ফুট উ'চু কাঠের দেওয়াল। উপরে তাল জাতীয় গাছের পাতা দিয়ে ঘর ছাওয়া। বাড়ির সামনে দিয়ে লম্বা বারান্দা সেই সারির বিভিন্ন ঘরকে সংযুক্ত করেছে। বাঁশ সরু সরু করে চিরে ঘরের মেঝে তৈরি হয়। তাতে অল্প আয়াসে ঘর পরিষ্কার করা সম্ভব। বাড়ির পেছনে শুয়োর, মুরগি বা অন্য কোনও জন্তু জানোয়ার থাকলে তা রাখার ব্যবস্থা। শুয়োর বা কুকুর পরিষ্কার করলেও ঘরের নিচে নানারকম ময়লা এবং জল সব সময়েই জমে থাকে। ঘরের মধ্যে মেঝের উপর পাথরের উপর বালু দিয়ে উনোন তৈরি করে। সাধারণত রান্না সেইখানে করা হয়।

প্রত্যেক গ্রামেই অবিবাহিত যুবক ও অতিথিদের থাকার জন্যে একটা মণ্ডপ আছে। বর্ধিষ্ণু গ্রামে একাধিক মণ্ডপও থাকতে পারে। পূর্ব অঞ্চলের আবরদের মধ্যে অনূঢ়া যুবতীদের জন্য স্বতন্ত্র রাসেং নামক শোবার ঘরের ব্যবস্থা আছে। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত যুবক-যুবতীরা এইভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র যৌথ গৃহে বসবাস করবে। উৎসবের দিনে নাচে গানে যুবক-যুবতীর হাস্য-পরিহাসে মণ্ডপ

চিতাবাঘের চামড়া রোদে শুকোনোর পদ্ধতি

মশগুল হয়ে ওঠে। পূর্বরাগ আবরদের মধ্যে বহুদিন ধরে চলে এবং আনুষ্ঠানিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার পক্ষে কোনও বাধা নেই। বাগ্‌দত্তাকে পুঁতি ভেঙে এক অংশ পাঠিয়ে দেবার বিধি আছে। বিবাহের যৌতুক বরপক্ষকে দিতে হয় এবং তা সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষে কষ্ট-কর হয়ে পড়ে বলে বিবাহের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়। কন্যা-পরিবারের পদমর্যাদা অনুযায়ী যৌতুকের পরিমাণ স্থির হয়। পাত্রপক্ষকে কন্যা নেবার প্রতিদানে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, ভবিষ্যতে সেই পরিবারে তাঁরাও এক যুবতীর বিবাহ দিবেন। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর কিন্তু ব্যভিচারকে সমাজ কঠোর হস্তে দমন করে। পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহে কোনও বাধা নেই।

আবর পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গাভরণে নিজেকে সুসজ্জিত করে। গলায় বহু বর্ণের পুঁতির মালা, রুপোর কান-মাকড়ি, বাহুতে পিতলের বাজুবন্ধ। পিতলের উপর দক্ষ আবর কারিগর নানা রকমের সূক্ষ্ম কাজ করেছে। মেয়েদের মেখলাও নিজেদের তাঁতে বোনা। সব বস্ত্রাবরণে না হলেও, কিছু মেয়েদের পোশাকে বর্ণবৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ডংগাকি নামে কাঁসার পাত্র আবর পরিবারের সম্মানের প্রতীক। বিবাহে যৌতুক হিসেবে এই পাত্র দেবার প্রথাও প্রচলিত আছে। ডংগাকি তিব্বতে তৈরি হয় এবং তিব্বতী ভাষায় লিখিত পরি-চয়ও তার উপর আছে। মেরাং নামে ছোট ধাতুর চাকতিও আবরদের কাছে মূল্যবান সম্পদ। সভ্য সমাজ থেকে দূরে গেলে মেরাং বিনিময়ে কেনা-বেচা করতে হয়। পাশিঘাটের আশেপাশেও নোট সহজে কেউ নিতে চায় না, তবে ভারতীয় রৌপ্য-মুদ্রা নিতে আপত্তি নেই। কাগজের টাকা সম্বন্ধে আপত্তির কারণ যে অতি সহজে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আবররা উপদ্রবী বলে কুখ্যাতি বহু দিন ধরে অর্জন করেছে। তিব্বত থেকে সামান্য পরিমাণে গাদা বন্দুক এর আগে

আবর রমণীর মেখলা বয়ন

থেকেই তারা নিয়ে আসত। তবে, প্রধান অস্ত্র হিসেবে বাঁশের তীর-ধনুকের ব্যবহারই করতে তারা অভ্যস্ত। প্রয়োজন বোধে লোহার ফলা বিষ মাখিয়ে তীরের অগ্রভাগে শক্ত করে জুড়ে দেয়। সাধারণত বাঁশের চোখা তীরকেই ব্যবহার করে। আবর বীরের অন্য প্রধান অস্ত্র তিন ফিট লম্বা তিব্বতী তরোয়াল। বাঁশের খাপে কাঁধের উপর এই অস্ত্র ঝোলানো থাকে। তা ছাড়া ৮ ফিট লম্বা বর্শা এবং শক্ত মজবুত বেতের শিরস্ত্রাণ। এমন করে শিরস্ত্রাণ তৈরি হয় যে, তরোয়ালের আঘাতে তার কোনও ক্ষতিই হবে না। উপজাতির প্রত্যেকেই অবশ্য বড় দা নিয়ে চলাফেরা করে, কিন্তু বনদেশের মানুষের কাছে দা অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস, তাকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বলে অভিহিত করা অন্যায় হবে। অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনায় বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বাঁশ সূঁচলো করে কেটে মাটির মধ্যে শক্ত করে পুঁতে রাখা হয়। উপরের অংশ মাটির বাইরে থাকে।

আবর দেশে জীব-জন্তুর মধ্যে হাতী একেবারেই পাওয়া যায় না, অথচ নিকটবর্তী দফলা বাসভূমিতে বহু হাতী। মনে হয় যে, আবর দেশের খাড়া পাহাড়ের পথে বিচরণ করতে গজরাজ পছন্দ করেন না। নানা রকমের কাঠবিড়াল, বাঁদর, হনুমান, বাঘ, ভালুক, হরিণ, চিতা, শুয়োর প্রভৃতি বন্যজন্তুর প্রচুর পরিমাণে এ অঞ্চলে আছে। পণ্ডিতদের মতে আবররা বাঘ ছাড়া অন্য সব কিছু খায়। পর্নাঙ্গরা কুকুর ভোজন করে। সেবার কিন্তু বুলুং গ্রামে সোৎসাহে সবাইকে শার্দুল মাংস ভোজন করতে দেখেছিলাম। আগের দিন বিষাক্ত তীর দিয়ে বিরাট এক বাঘকে মারা হয়েছিল। সকালবেলা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সবাই মিলে তার চামড়া ছাড়িয়ে মাংস ঝলসাতে আরম্ভ করে দিল। মহাভোজে অংশ গ্রহণ করতে হবে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে রওনা হলাম। মানুষ ও বাঘে এতদিন খাদ্য-খাদক সবন্ধ এই শুনেছিলাম, সেদিন কিন্তু এ সম্বন্ধ যে পরিবর্তনশীল, তা স্বচক্ষেই দেখলাম। এ প্রসঙ্গে আর একটি কাহিনী মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে নিদাঘতপ্ত দিবসে গোরক্ষপুরের জনবিরল এক পথে সাইকেল রিক্সা বেচাল হওয়ায় বিরাট বট গাছের ছায়ায় সাধু মহারাজের পাশে এসে বসলাম। সাধুজী কথায় কথায় তাঁর গুরুদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি তিব্বতে কোন এক গুহাবাসী। তপস্যার ফলে আশেপাশের জঙ্গল থেকে কয়েকটি বাঘিনী নাকি গুরুদেবের কাছে এসে প্রত্যহ উপস্থিত হয়। সন্ত মহারাজ তাদের দুধ দিয়ে তৈরি রাবড়ী খেয়ে কালাতিপাত করেন। অদূরে অর্ধসেবিত গঞ্জিকার ধূম্র বিবরণীর উৎস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। আবর দেশে কিন্তু সে রকম মতিভ্রম হবার কোনও কারণই ছিল না। বাঘও অতি সাধারণ নয়, হলুদের উপর কালো ডোরা কাটা অর্থাৎ রাজবংশাবতংশ! পাহাড়ে নদীতে মাছ ধরার উৎসাহও আবরদের অপরিসীম। মহাশোল মাছ আমাদের পরিচিত এবং এখানে অত্যন্ত সুস্বাদু। বাঁশের ফাঁদে মাছ ধরে বা বদ্ধ জলাশয়ে বিষাক্ত ফলমূল ফেলে মাছকে অন্ধ করে তাকে ধরে। শুনলাম যে বিষাক্ত তীর বা গাছগাছড়া দিয়ে মারা জানোয়ার বা মাছ খেলে ভয়ের কিছু নেই। কেবল তীর যেখানে লাগবে, তার আসপাশের অংশকে কেটে ফেলে দেওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক সংগঠনের পুরোভাগে গাম—গ্রামবৃদ্ধ। এই পদ বংশানুক্রমিক নয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের মধ্যে উৎসাহী ব্যক্তিকে নেতৃত্বের পদে গ্রামবাসীরা নির্বাচিত করে। গ্রামে বহিরাগতের আসার অনুমতি, গ্রামের পথ দিয়ে অন্য গ্রামে যাবার ব্যবস্থা, কোন অঞ্চলে ঝুম প্রথায় চাষ আবাদ করা হবে, এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসার দায়িত্ব গ্রাম সভার উপর। গাম নিজে কোনও বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত করার অধিকারী নয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারের ভারও গ্রামবৃদ্ধদের হাতে। নরহত্যার শাস্তি—দোষীর সমস্ত সম্পত্তি নিহত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অন্য অভিযোগের বিচার হয় বড় অদ্ভুত রকমে। লম্বা বাঁশের চোঙ্গায় ফুটন্ত জলের মধ্যে ডিম ছেড়ে দেওয়া হয়। বাদী বিবাদী দুই পক্ষকেই বলা হয় সে ডিম বের করতে। অক্ষত হাতে ডিম যে তুলতে পারবে সেই সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত হবে এবং বিচারকের রায়

তারই অনুকূলে দেওয়া হবে। চুরি কদাচিৎ হয় এবং তাও সভ্য জগতের সংগে যাদের সংস্পর্শ বেশি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতীতে আবরদের মধ্যে দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল। কোনও অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বা উপজাতি যুদ্ধে বন্দীদের দাস হিসেবে জীবনযাপন করতে হ'ত। দাস সন্তানও দাস বলে পরিগণিত হ'ত। শোনা যায় যে, দূরে আবর বসতিতে এখনও দাস প্রথা বর্তমান।

আবর পুরোহিত মিরুশ। নানা রকম অপদেবতা বিতাড়ন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা মিরুশ-এর প্রধান কাজ। পুজোর প্রধান ক্রিয়া শুয়োর, মুরগি প্রভৃতি বলি-দান। জন্তু বা পাখির মাংসের টুকরো বাঁশে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই বাঁশ এবং মন্ত্রপূত বৃক্ষশাখা অসুস্থ ব্যক্তির সামনে আন্দোলিত করলে, অপদেবতা সে স্থান ছেড়ে পলায়ন করে এবং সমস্ত রোগ দূর হয়। গ্রামের সামনে সবুজ পাতা দিয়ে তোরণদ্বার তৈরি করা হয়, তাতে তীর বিদ্ধ করে রাখা হয়। কোনও অকল্যাণকর উপদ্রবী শক্তি এর ফলে গ্রামপথে প্রবেশ করতে পারে না। অনেক সময় কুকুরও বলি দেওয়া হয় গ্রামের মংগলের জন্যে। ডামরোর উত্তরে তুষারমণ্ডিত পর্বত-শ্রেণীকে আবর ভাষায় বলে মিরি পর্মাড অর্থাৎ ওঝার হিমগিরি। আবর পুরুষ-স্ত্রী সবাই উল্কি পরে। চিবুক বা কপালে তীর চিহ্নই সাধারণ উল্কি। গাছের ধারালো কাঁটা দিয়ে গায়ে দাগ কাটা হয়।

বিনিময় প্রথায় আবরদের সংগে ব্যবসা বাণিজ্য চলে। বাইরের থেকে মোটা কাপড়, আয়না, সূঁচ, সুতা, পেতল, রুপোর মাকড়ি, বাসনপত্র, লবণ প্রভৃতি আবরদেশে যায়। তাদের অঞ্চল থেকে ধান, তুলো, কাঠ প্রভৃতি বাইরে চালান যায়। ধান, বাজরা, যব প্রভৃতি প্রধান শস্য। জংগলের ফল-মূল এবং নিজেদের বাগানের কলা, কাঁঠালও খাদ্যের প্রধান উপকরণ। গৃহ-পালিত জন্তুর সংখ্যা বেশি নয় তবে শিকারের জন্যে অনেক বড় বড় কুকুর প্রতি গৃহস্থ বাড়িতেই থাকে।

বাইরের মানুষের সংগে আবরদের বহুবার সংঘাত হয়েছে, এমন কি সাম্প্রতিক সময়েও। বহিরাগতদের সম্পর্কে এই উপজাতির যথেষ্ট সন্দেহ ও বৈরিভাব আছে। প্রতিবেশী অন্যান্য আদিম জাতিদের উপর আবররা অন্যায় আচরণও করেছিল। সব কিছু মিলিয়ে প্রশ্ন বেশ একটু জটিল। রাজনৈতিক কারণে এ অঞ্চলের গুরুত্বও বেড়ে গিয়েছে। ভারত-তিব্বত সীমান্তের বহু স্থান সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি এবং সেইখানে কতরকম বিচিত্র উপজাতির বাস। সুখের কথা যে, অবস্থার গুরুত্ব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভংগী নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারত সরকার এখন সচেতন এবং আদিম জাতি সমস্যা সম্পর্কে উপদেষ্টা-রূপে প্রখ্যাত একজন নৃতত্ত্ববিদকে তাঁরা নিযুক্ত করেছেন।

আবর দেশ সম্পর্কে কিন্তু সব থেকে বেশি করে মনে পড়ে দুরন্ত ডিহাং নদীর উপর বেতের তৈরী চক্র-আকারের ঝোলা সেতু। দু'পাশের প্রবেশপথ দিয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য প্রায় আটশ' ফুটের কাছা-কাছি। লম্বা শক্ত বেত কেটে তাকে দড়ির মত তৈরি করা হল। খরস্রোতা নদীর দুই পারে শক্ত গাছ বা পাথরের সংগে বেতের দড়িকে বাঁধা হয়। তারপর দক্ষ হাতে দড়ির উপর দিয়ে গোলাকার বেতের বাঁধুনি বেঁধে দেওয়া হয়। সমস্ত সেতু তৈরি হলে ভেতর দিয়ে যাতায়াতের পথ তৈরি করা হয় বাঁশ ও পাতলা কাঠ ফেলে। প্রবেশপথের উচ্চতা নদীবক্ষ থেকে প্রায় ১৩০ ফিট এবং মধ্যভাগের উচ্চতা প্রায় ৫০ ফিট। সেতুকে প্রায়ই মেরামত করতে হয় এবং নিকটবর্তী গ্রামকে রক্ষণাবেক্ষণের পরিপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেতুপথে যাবার সময় দুলুনি লাগে, ঠিক মাঝখানে দুলুনি বড্ড বেশি। ঝড়-তুফান উঠলে এই পথ দিয়ে যাওয়া মাঝে মাঝে অসম্ভব হয়ে উঠে।

আবর গ্রামবাসীরা কিন্তু ভারি বোঝা নিয়ে এই সেতুর উপর দিয়ে গানের তালে তালে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে পার হয়ে যায়।

ফটো—সুনীল জানা

আলোচনা

য় নিবেদন,

সম্প্রতি দুটি বিষ্ণু মূর্তি মুর্শিদাবাদ র অন্তর্গত কান্দী মহকুমার ময়ূরাক্ষী তীরস্থ সুন্দরপুর গ্রামে ভূগর্ভ হইতে া গিয়াছে। একটি বসুমতী-সরস্বতীসহ মূর্তি যাহার উচ্চতা ৯" ইঞ্চি। অপরটি বিষ্ণুমূর্তি, ডান হাতটি মাঝামাঝি ভগ্ন, উচ্চতায় ১ ফুট। এই দ্বিতীয় র সিংহাসনে প্রাচীন বাংলা হরফ

বসুমতী-সরস্বতীসহ বিষ্ণুমূর্তি

ট অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে। অনুমান য, হরফগুলি সপ্তম শতাব্দীর পাল- বাংলা-প্রচলিত হরফ। বিশেষভাবে থাকে যে মূর্তি দুইটি পিতল নির্মিত। ক্ত স্থানটি ঐতিহাসিক "কালাপাহাড়ের" াসিক অভিযান পথের অন্তর্গত বলিয়া । বর্তমানে মূর্তি দুইটি কান্দী া শাসক মহোদয়ের হেফাজতে রক্ষিত । —শ্রীব্রহ্মনারায়ণ দাশশর্মা,, বহরমপুর।

"গ্রন্থ পার্বণ"

মহাশয়,

দুই তিন সংখ্যা দেশে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ন্দ্রবাবুর গ্রন্থপার্বণ লইয়া খুব আলোচনা ছে। ২০শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দীপিকা গুপ্তের আলোচনা পড়িলাম। তাঁর মতে ার্বণের কোন মূল্যই নাই। কারণ নাথের পুস্তকাবলীর মূল্য অত্যন্ত । এবং এজন্য আন্দোলন করা উচিত।

সবই সত্য। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি "ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত দামী বইগুলির যদি একটি বই সারাবৎসর সামান্য অর্থ জমাইয়া প্রিয়জনকে দেওয়া যায়, তাহাতে কি মনে এক অভূতপূর্ব সুখের সঞ্চার হয় না? আমরা যদি পূজার সময় বহুমূল্য শাড়ি ধুতি পরিধান করিতে পারি, তবে আমরা ৫।৬, টাকা খরচও করিতে পারি। এক্ষেত্রে যাহারা অর্থবান তাহার যদি গরীব প্রিয়জনকে একটি বই উপহার দেন, তবে উহা আরও সার্থক হয়। পরিশেষে বলিতে চাই পুস্তকের মূল্যের জন্য গ্রন্থপার্বণের বিরুদ্ধে আলোচনা করা ভুল। ইতি—বিশু মিত্র, দিনহাটা, কোচবিহার।

(২)

প্রিয় মহাশয়,

খ্যাতনামা লেখক ও কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গ্রন্থপার্বণ' পড়ে খুশী হলেও আজ একটা কথা জানাতে চাই। কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থপার্বণ নিশ্চয় হবে তবে সেটা যদি সকলেই না উপভোগ করেন, না বোঝেন তবে তার সার্থকতা কোথায়? গ্রামে, যেখানে আজও অধিকাংশ লোক নিরক্ষর সেখানে আমরা গ্রন্থপার্বণ করলে উপভোগটা তো করবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনে কাজেই সেটা সকলের হবে কি করে? এদিক দিয়ে চিন্তা করলেই প্রয়োজনবোধ করি নিরক্ষরতা দূরী-করণের, কেননা তা নইলে গ্রন্থপার্বণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবেই। কাজেই দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বঙ্গীয় কবি, লেখক, বিদ্যোৎসাহী ছাত্রদল সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টি যে এই প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িত একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। ইতি—মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, গড়জয়পুর, (মানভূম)।

(৩)

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের "গ্রন্থ-পার্বণ" পরিকল্পনা উৎসাহ সহকারে পাঠ করলাম। এর পর দেশ পত্রিকার ২২ বর্ষ ৩১ সংখ্যাতে তিনজনের আলোচনা পড়লাম। আমার ব্যক্তিগত মত উপরোক্ত তিনজনের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে মিলেছে। তবুও এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

আমি নিজে নিতান্তই দরিদ্র সন্তান। নিজের অবস্থা বিচার করে আমার মনে হয় এদেশে অনেকেই আমার মতন। কবিগুরুর পুণ্য জন্মদিনে আমার একান্ত ইচ্ছা হয় কয়েকখানা বই কিনি এবং আমার প্রিয়জনকে উপহার দিই। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির দরুণ তা হয়ে ওঠে না। শুধু তাই নয় কবিগুরুকে ভালভাবে জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও উপায় নেই। তার একমাত্র কারণ দেখতে পাচ্ছি বিশ্বভারতীর পুস্তকের মূল্য নির্ধারণ। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি বইয়ের দাম এত বেশী রেখেছেন যে ইচ্ছে থাকলেও আমাদের মত গরীবের দেশে সকলের পক্ষে তা সঙ্কুলান করা মুশকিল। কাজেই শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রবাবুর

বিষ্ণু মূর্তি

আশা কতদূর সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকবে। তাই বলে মনে করবেন না আমি নিরুৎসাহ করছি। এ আমার মত সাধারণের দুঃখ জানালাম মাত্র।

আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে যা বুঝি তা হলো এই যে, বই যত বেশী প্রচার হবে ততই লেখকের নাম দেশের লোকের কাছে সুপরিচিত হবে। যেদিন দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে বই কেনার, রাখার ও পড়ার উৎসাহ থাকবে সেদিনই সত্যিকারের 'গ্রন্থপার্বণ' উৎসব সার্থক হবে।

তাই আমি দেশের সাধারণ লোক হিসাবে আজকে আমাদের প্রত্যেক প্রকাশকদের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁর যেন পুস্তকের দাম সম্পর্কে আর একবার চিন্তা করে দেখেন।

'গ্রন্থপার্বণ' পরিকল্পনা কবিগুরুর পুণ্য জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যদি শুরু হয় তবে সত্যি খুব আনন্দের বিষয়। নমস্কারান্তে ইতি—বাসন্তী ভট্টাচার্য, কলিকাতা—১০।

রূপতন্দ্রা

হরপ্রসাদ মিত্র

কাল কতো রাত জানি না তখন আকাশগঙ্গাধারার নিচে
দল বেঁধে গেল হংসবলাকা ;—'হংসবলাকা-কথাটা মিছে',—
কে যেন বলেছে,—'ছলনার সুখে বানানো সে-নাম, তুচ্ছ পাখি,—
হয়তো জেনেছে অন্য জলায় এখনো পাঁকের আহার বাকি !'
ক্ষুধার জোনাকি আহরণশেষ মাঠ ফেলে যায় অন্য মাঠে ?
নির্জোর মনের গভীরে শুনেছি কে যেন কোথায় পাথর কাটে !

আলো বাংলায়। জাপান-ব্রহ্ম-মালয় ঝেঁটিয়ে সূর্য আসে।
আহ্নিকগতি এই পৃথিবীর ঘূর্ণিতে রোদ, সূর্য আসে !
ঘড়ি ঢং-ঢং। বাজনা জাগার। যাক্, ঘুম যাক্। শরীর ওঠো,
মৎস্য-আকাশ হবে ছাই হবে, শরীর ওঠো।
চলো পথ কেটে সামনে হাঁটার হাতুড়ি-শাবলে,—পাথরে, পাঁকে
নূপুরে কেটেছে তন্দ্রা, হে মন, ঘুরো দুপুরের ঘূর্ণিপাকে।

খোলা ছাদে শুয়ে এখন ঊষার উন্মেষে দেখা আকাশে ঐ—
রুপোলী মেঘের মাছ-পিঠে ঘন রুপোলী আঁশ।
নিচে ক্ষীণ ঢেউ,—হাল্কা হাওয়ায় যেন দীঘিময় অন্য জল,
মনে ছবি জাগে কুন্দ-ছিটোনো সবুজ ঘাস ।
পদ্মকলি এ-চেতনায় মিঠে হাওয়া অকথন নিরন্তর।
ক্রমে চড়া রোদ, দূরে বৈশাখ রোদে গুল্মোর-কেতনধর !

কতো যে শরীর, কতো আহরণ, এখানে-ওখানে পৃথুল মেদ—
সারা দুনিয়ার পিণ্ডচেতনা, সারা দুনিয়ার অঝোর স্বেদ,
ঘড়ি ঢং-ঢং,—তারই পাশে ফের বকুলে-চাঁপায় যে-উদ্গম—
ওপরে আকাশ। নিচে স্নানাহার। জন্মে-মরণে যে-বন্ধন—
কাল কতো রাত জানিনা তখন হংসবলাকা পাখার নিচে
মনে হলো আমি সেই পারাবার ! কি-জানি সত্যি, কি-জানি মিছে !

আজকে মনের মৃদু গুঞ্জন সেই ভূমিকায় এ-দেহ জাগে
জনম-অবধি রূপতন্দ্রায়—কে যেন বলেছে,—বাতাস লাগে !

ট্রামে-বাসে

করাচীর একটি জোর খবর বিশু-খুড়োকে পাঠ করিয়া শুনাইলাম। রে বলা হইয়াছে একটি বাঘ নাকি একটি গল দেখিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়া-

ল। বিশুখুড়ো বলিলেন—"শেরে বঙ্গাল ন ভয় না পান, এটা খবর নয়, প্রচার র। আর তাছাড়া অজা যুদ্ধের লঘু য়ার কথা তিনি নিশ্চয়ই জানেন"।

* * *

শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, রতের Voice হইল শান্তির, যুদ্ধের । —"কিন্তু এখনো অনেকের নীতি র্ভর করে His Master's Voice-এর পর"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রাশ্যার প্রতিনিধিদের প্রীতি-ভোজে আপ্যায়ন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ওহরলাল নাকি তাঁহার সঙ্গে কিছু আম ইয়া গিয়াছেন।—"এ সব আম নিশ্চয়ই ল্যাংড়া জাতীয় এবং নিমন্ত্রিতেরা খেয়েও য়ত খুশীই হয়েছেন। তাঁরা শুধু এই থাটাই জানলেন না যে ল্যাংড়া বুর্জোয়া ম, জনগণের নয়। এসবের বাজার দর র্তমানে টাকায় পাঁচটা মাত্র, সুতরাং তাকে ফলেষু বলা ছাড়া জনগণের অন্য উপায় াই"—বলিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

মাত্র মহিলাদের লইয়া গঠিত হিমালয় অভিযাত্রী দলের তিন ন মহিলা সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। ংবাদে প্রকাশ তাঁরা বাইশ হাজার ফুট উচ্চ হিমালয়ের একটি অজ্ঞাতনামা পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন।—"মনে পড়ছে স্বর্গত রসরাজ অমৃতলাল লিখেছিলেন—লেখা পড়ার গরব কি, ইংরেজীতে আই এ, বি এ পাশ করেছেন ঠাকুর ঝি—। হিমালয় আরোহণের গৌরব আর সত্যিই নাই। তাছাড়া নিত্য তিরিশ দিন যারা দুরারোহ ট্রামে-বাসে আরোহণ-অবতরণ করেন তাদের কাছে হিমালয় কোন্ ছার"!

* * *

গোয়ার এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে কর্তৃপক্ষ নাকি কম্যু-নিস্টদের সঠিক পরিচয় লাভের একটি অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁদের মতে যাঁরা লম্বা চুল এবং দাড়ি রাখেন

তাঁরাই কম্যুনিস্ট।—"অনেক দিন আগে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণ বলেছিলেন যে Poverty is the breading place of communism—কিন্তু সেটা যে চুল দাড়িতেও গজায় তা কিন্তু এত বড় দার্শনিকের দর্শনেও ধরা পড়েনি"!!

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল গাভী নাকি কখনও ঘুমায় না। শ্যামলাল বলিল—"ঘুমতো সে ঠিক-ই কিন্তু যবে
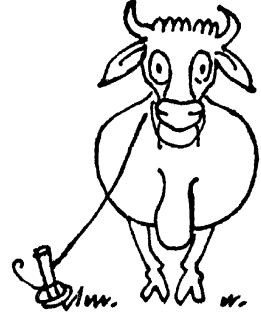
থেকে মানুষের কারসাজিতে পয়স্বিনী জলস্বিনীতে পরিণত হয়েছে তবে থেকে তার ঘুম চটে গেছে"।

* * *

যুদ্ধের সময় জনৈক সৈনিক তার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলে। অন্ধ অবস্থাতেই সে বিবাহ করে। সম্প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে কী লইয়া কলহ করিবার সময় সহসা নাকি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে। —"প্রেমের পর স্ত্রীর সঙ্গে কলহের অধ্যায় শুরু হলে আপনা থেকেই মানুষের দিব্য-দৃষ্টি ফিরে আসে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম সেক্সপীয়রের লেখা নাকি তাঁর নিজের লেখা নয় এবং অবিলম্বে এই সংবাদ সত্য বলিয়া প্রমাণ করার ব্যবস্থাও হইতেছে। "আশা করি রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর নিজের লেখা নয় এই আবিষ্কারের সময় আসতে আসতে আমরা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো"!

* * *

এবার মনসুন আসিলেও বৃষ্টি আগে আসে নাই।—"কোলকাতায় বৃষ্টি-পাত না হলেও গড়ের মাঠে মনসুন যথা-সময়ে এসেছে এবং যথারীতি ইষ্টক বৃষ্টিও হয়ে গেছে মোহনবাগান-রাজস্থানের খেলার দিনে! অতঃপর বর্ষা দানা বাধলে জুতো-ছাতা- সোডার বোতল বৃষ্টিও মাঠের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হবে"!!

১৭

তিনজনে আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে উপবিষ্ট হইয়াছি। প্রভাত ও আমি দুইটি চেয়ারে বসিয়াছি, ব্যোমকেশ তক্তাপোশের উপর বইয়ের থলিটি লইয়া বসিয়াছে। রাত্রি প্রায় দুইটা; বাহিরে নগর-গুঞ্জন শান্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ। সে চোখ তুলিয়া একবার প্রভাতের পানে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; প্রভাতের মুখে কিন্তু অপরাধের গ্লানি নাই, ধরা পড়িবার সময় যে চকিত ভয় ও বিস্ময় তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সে এখন সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ, সকল-প্রকার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত।

ব্যোমকেশ একে একে বইগুলি থলি হইতে বাহির করিল। বোর্ডের বাঁধাই বাদামী রঙের বইগুলি, বাহির হইতে দৃষ্টি-আকর্ষক নয়। কিন্তু ব্যোমকেশ যখন তাহাদের পাতা মেলিয়া ধরিল, তখন উত্তেজনায় হঠাৎ দম আটকাইবার উপক্রম হইল। প্রত্যেক বইয়ের প্রত্যেকটি পাতা এক একটি একশত টাকার নোট।

ব্যোমকেশ বইগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশে রাখিল, প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল,—'সবসুদ্ধ কত আছে বইগুলোতে?'

প্রভাত বলিল,—'প্রায় দু'লাখ। কিছু আমি খরচ করেছি।'

'দয়ালহরি মজুমদারকে যে টাকা দিয়েছেন তা ছাড়া আর কিছু খরচ হয়েছে?'

প্রভাতের চোখের দৃষ্টি চকিত হইল; ব্যোমকেশ এত কথা কোথা হইতে জানিল এই প্রশ্নটাই যেন তাহার চক্ষু হইতে উঁকি মারিল। কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন না করিয়া বলিল,—'আরও কিছু খরচ হয়েছে, সব মিলিয়ে চৌদ্দ পনরো হাজার।'

ব্যোমকেশ তখন বইগুলির উপর হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল,—'প্রভাত-বাবু, এইগুলোর জন্যেই কি আপনি অনাদি হালদারকে খুন করেছিলেন?'

প্রভাত দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল,—'না, ব্যোমকেশবাবু।'

'তবে কি জন্যে একাজ করলেন বলবেন কি?'

প্রভাত একবার যেন বলিবার জন্য মুখ খুলিল, তারপর কিছু না বলিয়া মুখ বন্ধ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি যদি না বলেন, আমিই বলছি। —শিউলীর সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে অনাদি হালদার নিজে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এইজন্যে—কেমন?'

প্রভাত কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার রগের শিরাগুলো উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দাঁতের গড়নে যে হিংস্রতা আগে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কথা বলিবার সময় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, সে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল,—'হ্যাঁ। অনাদি হালদার শিউলীর বাপকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে রাজি করিয়েছিল—' এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া গেল, নীরবে বসিয়া যেন অন্তরের আগুনে ফুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম তাহলে। —কিন্তু আপনি কেষ্টবাবুকে মারতে গেলেন কেন?'

ক্রোধ ভুলিয়া প্রভাত সবিস্ময়ে ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। বলিল,—'সে কি! কেষ্টবাবুর কথা আমি তো কিছু জানি না!'

ব্যোমকেশ সন্দেহ-কণ্টকিত দৃষ্টিতে প্রভাতকে বিদ্ধ করিল,—'আপনি কেষ্ট দাসকে খুন করেন নি?'

প্রভাত বলিল,—'না, ব্যোমকেশবাবু। কেষ্টবাবু গত আট মাসে আমার কাছ থেকে আট হাজার টাকা নিয়েছে। তার মরার খবর পেয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম; কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। বিশ্বাস করুন, আমি যদি খুন করতাম, আজ আপনার কাছে অস্বীকার করতাম না।'

ব্যোমকেশের মুখখানা ধীরে ধীরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, যে বিষণ্ণতা কুয়াশার মত তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন কাটিয়া গেল। সে বলিল,—'কিন্তু—কেষ্ট দাসকে তাহলে খুন করলে কে?'

'তা জানি না। তবে—' প্রভাত ইতস্তত করিল।

'তবে—?'

প্রভাত একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—'দশ-বারোদিন আগে বাঁটুল সর্দার আমার কাছে এসেছিল। বাঁটুলকে আপনারা বোধ হয় চেনেন না—'

'খুব চিনি। এমন কি আপনার সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ তাও জানি। —তার-পর বলুন।'

'বাঁটুল আমাকে কেষ্টবাবুর কথা জিগ্যেস করতে লাগল: কেষ্টবাবু কে, অনাদিবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কী জানে, এই সব। আমি বাঁটুলকে সব কথাই বললাম। তারপর—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল,—'যাক, এবার বুঝেছি। আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে কেষ্ট দাসের টাকার খিদে মেটেনি, সে গিয়েছিল বাঁটুলকে ব্ল্যাক-মেল করতে। অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।' —ব্যোমকেশ হাঁক দিল—'পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম ভিতর দিকের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'পুঁটিরাম, তিন পেয়ালা চা হবে?'

পুঁটিরাম বলিল,—'আজ্ঞে দুধ নেই বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কুছ পরোয়া নেই,

আদা দিয়ে চা তৈরি কর। আর কয়লার আংটা ঠিক করে রেখেছ?'

'আজ্ঞে।'

'বেশ, এবার তাতে আগুন দিতে পার।'

পুঁটিরাম প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ বলিল,—প্রভাতবাবু, আপনার মা—ননীবালা দেবী—বোধ হয় কিছু জানেন না?'

'আজ্ঞে না।' প্রভাত কিছুক্ষণ বিস্ময়-সম্ভ্রমভরা চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'আপনি কি সবই জানতে পেরেছেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'প্রভাতবাবু, আপনার মা—ননী-যায় না, কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। যেমন কেষ্ট দাসের মৃত্যুটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল, ছুরি আপনার অস্ত্র নয়।'

আমি বলিলাম,—'ব্যোমকেশ, কি করে সব বুঝলে বল না, আমি তো এখনও কিছু বুঝিনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ বলছি। অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে, তা আমি পাটনা যাবার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম অনাদি হালদারের মৃত্যু সম্বন্ধে কারুরই যখন কোনও গরজ নেই, তখন আমারই বা কিসের মাথা ব্যথা। কিন্তু ফিরে এসে যখন দেখলাম কেষ্ট দাসও খুন হয়েছে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। যে লোক মানুষ খুন করে নিজের জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়, তাকে শাসন করা দরকার। যা হোক, এখন দেখছি আমি ভুল করেছিলাম. প্রভাতবাবু কেষ্ট দাসকে খুন করেন নি। আমি একটা কঠোর কর্তব্যের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। —এবার গল্পটা শোনো। প্রভাতবাবু, যদি কোথাও ভুলচুক হয় আপনি বলে দেবেন।'

ব্যোমকেশ অনাদি হালদারের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিলাম, আজিকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন। ব্যোমকেশ হত্যাকারীকে বন্ধুর মতন ঘরে বসাইয়া হত্যার কাহিনী শুনাইতেছে, এরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই।

—'অনাদি হালদার গত যুদ্ধের সময় কালাবাজারে অনেক টাকা রোজগার করেছিল। বোধ হয় আড়াই লাখ কি তিন লাখ। প্রভাতবাবু, আপনি ক'খানা বই বেঁধেছিলেন?'

প্রভাত বলিল,—'ছ'খানা। প্রত্যেকটাতে চারশো নোট ছিল।'

'অর্থাৎ দু'লাখ চল্লিশ হাজার।—বেশ ধরা যাক অনাদি হালদার পৌনে তিন লাখ কালো টাকা রোজগার করেছিল। প্রশ্ন উঠল, এ টাকা সে রাখবে কোথায়? ব্যাঙ্কে রাখা চলবে না, তাহলে ইনকম ট্যাক্সের ডালকুত্তারা এসে টুঁটি টিপে ধরবে। অনাদি হালদার এক মতলব বার করল।

'অনাদি হালদার যেমন পাজি ছিল, তেমনি ছিল তার কুচুটে বুদ্ধি। আজ পর্যন্ত ইনকম ট্যাক্সের পেয়াদাকে ফাঁকি দেবার অনেক ফন্দি-ফিকির বেরিয়েছে, সব আমার জানা নেই। কিন্তু অনাদি হালদার যে ফন্দি বার করল, সেটাও মন্দ নয়। প্রথমে সে টাকাগুলো একশো টাকার নোটে পরিণত করল। সব এক জায়গায় করল না; কিছু কলকাতায়, কিছু দিল্লীতে, কিছু পাটনায়; যাতে কারুর মনে সন্দেহ না হয়।

'পাটনায় যাবার হয়তো অন্য কোনও উদ্দেশ্যও ছিল। যা হোক, সেখানে সে দপ্তরীর খোঁজ নিল; প্রভাতবাবু তার বাসায় এলেন বই বাঁধতে। বিদেশে বাঙালীর ছেলে, প্রভাতবাবুকে দেখে অনাদি হালদারের পছন্দ হল। এই ধরনের দপ্তরী সে খুঁজছিল, সে প্রভাতবাবুকে আসল কথা বলল; এও বলল যে, সে তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে চায়। পুষ্যিপুত্তুর নেবার কারণ, এত বড় গুপ্ত-কথা জানবার পর প্রভাতবাবু চোখের আড়াল না হয়ে যান।

'প্রভাতবাবু বই বেঁধে দিলেন। পুষ্যিপুত্তুর নেবার প্রস্তাব পাকাপাকি হল। অনাদি হালদার প্রভাতকে আর ননীবালা দেবীকে নিয়ে কলকাতায় এল। নোটের বইগুলো অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে আলমারিতে উঠল। স্টীলের আলমারি, তার একমাত্র চাবি থাকে অনাদি হালদারের কোমরে। সুতরাং কেউ যে আলমারি খুলবে, সে সম্ভাবনা নেই। যদি-বা কোনও উপায়ে কেউ আলমারি খোলে, সে কী দেখবে? কতকগুলো বই রয়েছে, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি। টাকাকড়ি সামান্যই আছে। বই খুলে বইয়ের পাতা পরীক্ষা করার কথা কারুর মনে আসবে না। এছাড়া বাইরের লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ব্যাঙ্কেও কয়েক হাজার টাকা রইল।

'অনাদি হালদারের কলকাতার বাসায় আরও দু'জন লোক ছিল—কেষ্ট দাস আর নৃপেন। নৃপেন ছিল তার সেক্রেটারী। অনাদি হালদার ভাল লেখাপড়া জানত না, তাই ব্যবসার কাজ চালাবার জন্যে নৃপেনকে রেখেছিল। আর কেষ্ট দাস জোর করে তার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। কেষ্ট দাস ছিল অনাদি হালদারের ছেলেবেলার বন্ধু, অনাদির অনেক কুকীর্তির খবর জানত, নিজেও তার অনেক কুকীর্তির সঙ্গী ছিল।

'অনাদি হালদার সতেরো-আঠারো বছর বয়সে নিজের বাপকে এমন প্রহার করেছিল যে, পরদিনই বাপটা মরে গেল। পিতৃহত্যার বীজ ছিল অনাদির রক্তে। জীবজগতে বাপ আর ছেলের সম্পর্ক হচ্ছে আদিম শত্রুতার সম্পর্ক; সেই আদিম পাশবিকতার বীজ ছিল অনাদি হালদারের রক্তে। বাপকে খুন করে সে নিরুদ্দেশ হল। আত্মীয়স্বজনেরা অবশ্য কেলেঙ্কারীর ভয়ে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিলে।

'অনেকদিন পরে অনাদির সঙ্গে কেষ্ট দাসের আবার দেখা; দুজনে মিলে এক মাড়োয়ারীর ঘরে ডাকাতি করতে গেল। অনাদি মাড়োয়ারীকে খুন করে টাকাকড়ি নিয়ে ফেরারী হল, কেষ্ট দাস লুটের বখরা কিছুই পেল না।

'এবার কুড়ি বছর পরে অনাদির সঙ্গে আবার কেষ্ট দাসের দেখা। অনাদি তখন বৌবাজারে বাসা নিয়ে বসেছে; কেষ্ট দাস তাকে বলল—তুমি খুন করেছ, যদি আমাকে ভরণপোষণ না কর, তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেব। নিরুপায় হয়ে অনাদি কেষ্ট দাসকে ভরণপোষণ করতে লাগল।

'এদিকে অনাদি হালদারের দুই ভাইপো নিমাই আর নিতাই খবর পেয়েছিল যে, খুড়ো অনেক টাকার মালিক

হয়ে কলকাতায় এসে বসেছে। তারা অনাদির কাছে যাতায়াত শুরু করল। অনাদি ভারি ধূর্ত, সে তাদের মতলব বুঝে কিছুদিন তাদের ল্যাজে খেলালো, তারপর একদিন তাড়িয়ে দিলে। নিমাই, নিতাই দেখল, খুড়োর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়, তারা খুড়োর ভাবী পুষ্যি-পুত্তুরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। গুর্খা দরোয়ান দেখে তারা প্রভাত-বাবুর দোকানে যাওয়া বন্ধ করল।

'কিন্তু এত টাকার লোভ তারা ছাড়তে পারছিল না। কোনও দিকে কিছু না পেয়ে তারা অনাদি হালদারের বাসার সামনে হোটেলে ঘর ভাড়া করল, অষ্টপ্রহর বাড়ির ওপর নজর রাখতে লাগল। এতে অবশ্য কোনও লাভ ছিল না, কিন্তু মানুষ যখন কোনও দিকেই রাস্তা খুঁজে না পায়, তখন যা হোক একটা করেই মনকে ঠাণ্ডা রাখে। নিমাই-নিতাই পালা করে হোটেলে আসত, আর চোখে দূরবীন লাগিয়ে জানলায় বসে থাকত। অজিত, তোমার মনে আছে বোধ হয়, ননীবালা যেদিন প্রথম এসেছিলেন, তিনি বলে-ছিলেন, সর্বদাই যেন অদৃশ্য চক্ষু তাঁদের লক্ষ্য করছে। সে অদৃশ্য চক্ষু নিমাই নিতাইয়ের।

'যা হোক, দিন কাটছে। অনাদি হালদার জমি কিনে বাড়ি ফেঁদেছে। প্রভাতবাবুকে সে পুষ্যিপুত্তুর নেবার আশ্বাস দিয়ে এনেছিল, প্রথমটা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করল। তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে; অ্যাটর্নীর কাছে গিয়ে পুষ্যিপুত্তুর নেবার বিধি-বিধান জেনে এল। কিন্তু বাঁধা-বাঁধির মধ্যে পড়বার খুব বেশী আগ্রহ তার ছিল না, সে পাকাপাকি লেখাপড়া করতে দেরি করতে লাগল। প্রভাতবাবু দোকান নিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, ননীবালা দেবী জানেন না যে, পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে লেখাপড়ার দরকার। তাই এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না।

'তারপর এক ব্যাপার ঘটল। প্রভাত-বাবু শিউলী মজুমদারকে দেখে এবং তার গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি শিউলীদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলেন। দয়ালহরি মজুমদার ঘুঘু লোক, সে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল যে, প্রভাতবাবু বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর; প্রভাতবাবুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তার আপত্তি হল না। দয়ালহরি মজুমদারের চালচুলো নেই, সে ভাবল ফাঁকতালে যদি মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়, মন্দ কি!

'প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে শিউলীর কথা বললেন, ননীবালা অনাদি হালদারকে বললেন। প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে অনাদি হালদারের আপত্তি ছিল না, সে বলল,—মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয় তো বিয়ে দেব।

'তখন পর্যন্ত অনাদি হালদারের মনে কোনও বদ্-মতলব ছিল না, নেহাৎ বরকর্তা সেজেই সে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু শিউলীকে দেখে সে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। মানুষের চরিত্রে যতরকম দোষ থাকতে পারে, কোনটাই অনাদি হালদারের বাদ ছিল না। সে ঠিক করল, শিউলীকে নিজে বিয়ে করবে।

'বাসায় ফিরে এসে সে বলল—মেয়ে পছন্দ হয়নি। তারপর তলে তলে নিজের ঘটকালি আরম্ভ করল। দয়ালহরি মজুমদার দেখল, দাঁও মারবার এই সুযোগ; সে ঝোপ বুঝে কোপ মারল। অনাদি হালদারকে বলল—তুমি বুড়ো, তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কেন? তবে যদি তুমি দশ হাজার টাকা দাও—

'এইভাবে কিছুদিন দর-কষাকষি চলল, তারপর রফা হল—অনাদি হালদার পাঁচ হাজার টাকা হ্যাণ্ডনোটের ওপর ধার দেবে। বিয়ের পর হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলা হবে।

'বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়ে অনাদি হালদার ভাবতে বসল, কি করে প্রভাতবাবুকে তাড়ানো যায়। পুষ্যি-পুত্তুর নেবার আগ্রহ কোনওকালেই তার বেশী ছিল না, এখন তো তার পক্ষে প্রভাতবাবুকে বাড়িতে রাখাই অসম্ভব। প্রভাতবাবুর প্রতি তার ব্যবহার রূঢ় হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ সে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেও পারল না। প্রভাতবাবু বই-বাঁধানো নোটের কথা যদি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, অনাদি হালদারকে ইন্‌কম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে জেলে যেতে হবে।

'প্রভাতবাবু ভিতরের কথা কিছুই জানতেন না। সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়াতে তিনি খুবই মুষড়ে পড়লেন, তারপর ঠিক করলেন অনাদিবাবুর অমতেই শিউলীকে বিয়ে করবেন, যা হবার হবে। তিনি দয়ালহরির বাসায় গেলেন। দয়াল-হরি তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে এবং জানিয়ে দিলে যে, অনাদি হালদারের সঙ্গে শিউলীর বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিল। টিন হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে বলিল,—'এই হচ্ছে অনাদি হালদারের মৃত্যুর পটভূমিকা। এর মধ্যে খানিকটা অনুমান আছে—কিন্তু ভুল বোধ হয় নেই। প্রভাতবাবু, কি বলেন?

প্রভাত বলিল—'ভুল নেই। অন্তত যতটুকু আমার জ্ঞানের মধ্যে, তাতে ভুল নেই।'

পুঁটিরাম চা লইয়া প্রবেশ করিল।

(ক্রমশ)

রাত্রির

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

কাশ্মীরী শালটা শুধু ধার করা, তা ছাড়া আর সব কিছুই নিলয়েন্দ্রের নিজস্ব। অবশ্য মোরেনোর চুড়িদার পাঞ্জাবির দরুণ তিরিশ টাকা ব্যানার্জি কোম্পানীর কাছে বাকী রয়েছে—মাসে মাসে মাইনে থেকে দশ টাকা ক'রে শোধ দিলে তিন মাসেই সেটা মিটে যাবে। ট্রাম থেকে নেমে পানের দোকানের আয়নাতে নিজেকে দেখে নিলয়েন্দ্র খুশীতে ফুলে উঠল যেন, একা-একা এই আনন্দের আতিশয্যে অধীর হয়ে সে আর কিছু করবার মতো খুঁজে না পেয়ে শেষে আস্ত এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক সিগারেটই কিনে ফেলল। অনভ্যস্ত হাতে জ্বলন্ত দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে, কষে একটি টান দিল। তারপর কাসতে কাসতে দম বন্ধ হবার দাখিল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খানিকটা দম নিয়ে চওড়া গলিটায় যখন সে ঢুকল তখন বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। অদূরে অনুষ্ঠান-মণ্ডপের আলো দেখা যাচ্ছে—পথের দু-পাশে সারি-সারি গাড়ির মালা। নিলয়েন্দ্র একবার কাশ্মীরী শাল আর শাদা পশমী পাঞ্জাবি মোড়া নিজেকে দেখে নিল। এই চেহারার সঙ্গে নিত্য-দিনের আটপৌরে নিলুর কোনোই মিল নেই। কে বলবে যে ধার-করা এই আলোয়ান, কে সন্দেহ করবে যে পাঞ্জাবিটার দরুণ দর্জির দোকানে দেনা রয়ে গিয়েছে। নিজের কাছে সে সগৌরবে জাহির করে, চেহারাটা তার খান্‌দানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পয়সা দিয়ে অনেক কিছুই কেনা যায়—কিন্তু রূপের ক্ষেত্রে রূপেয়ার কৃতিত্ব কোথায়! আসলে এই পোশাক-আশাক দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক শ্রীকে বড় জোর সুশ্রী করে তোলা যায়—তার বেশি আর কি! অতএব নিলয়েন্দ্র যদি আত্মপ্রসাদ কিছু অনুভব করেই তাতে অসঙ্গত কিছুই হয় না।

তবু মণ্ডপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশপাশে তাকাতে কেমন কুণ্ঠা হচ্ছে নিলয়ের। অন্যদিন এমন সময়ে, ও-পাশের গলিতে স্বচ্ছন্দে খবরের কাগজ পেতে নিলয়েন্দ্র গান শুনে থাকে। গান-বাজনার প্রতি অনুরাগ তার অনেকদিনের পোষা শখ। শখ নয় নেশা। বিশেষ করে শীত-কালের সব ক'টি সঙ্গীতের জলসার আশ-পাশে ঘোরাঘুরি তাকে করতে কে না দেখেছে। তবে হ্যাঁ, পয়সা খরচ করে গান শোনা তার দ্বারা অসম্ভব—পাবে কোথায়! ধার? না, ধার করা এ জীবনে নৈব নৈব চ। বাবার জীবনটা দেনা শুধতেই ফুরিয়ে গেছে। সে নিজেই তা দেখেছে।...এই যে পাঞ্জাবির দেনা, এটাই নিলয়ের মহাভাবনা। তাই কি করত নাকি সে, নেহাত চাকরির খাতিরে করেছে বাধ্য হয়ে।

প্যান্ডালে ঢোকার মুখে, পাশ পকেট থেকে কার্ডখানা বার করে ধরল গেট-কীপারের সামনে।

—ওই ওপাশের গেটে কাইন্ডলি যান।

প্যান্ট-পরা ছোকরাটি নিলয়কে বেশ ভালো করে দেখে নিল। সন্দেহ করল নাকি! না, তারিফ বোধ হয়। পঞ্চাশ টাকা মূল্যের আসনের স্মারকপত্র—তার উপযুক্ত সাজগোজ হয় নি? ভাবতে ভাবতে নিলয়েন্দ্র নির্দিষ্ট গেটের দিকে এগিয়ে গেল। যেন কতকালের ঈপ্সিত আরামের দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপ তার। সত্যি, কত কষ্ট করে শেষ রাত পর্যন্ত এই কন্‌কনে হিম পোহালে তবে গিয়ে শোনা যায়—

গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, কি হীরাবাঈ বরোদেকারের গান। গোলাম আলী খাঁর ঠুংরি তোমার মনকে মাতিয়ে দেবে ঠিকই—কিন্তু তার আগে নিদ্রা আর জাগরণে কি সংগ্রাম চলে! চা খেয়ে গা গরম করো—শীত লাগলে। ঘুম পাচ্ছে—আচ্ছা কড়া দোক্তা-পান খাও, মাথা-কান ঝাঁ-ঝাঁ করবে, ঘুম কোথায় পালাবে। এমনি করে গান শোনার পর গা-হাত-পা ব্যথায় জড়তায় একটা ভৌতিক আচ্ছন্নতায় পৌঁছয়। তারপর কোনো কাজ করা ত দূরের কথা, নড়তেই ইচ্ছে করে না। কিন্তু তবু সর্বদিক চিন্তা করলে আর ভূতগ্রস্ত থাকা যায় না—ডালহৌসী থেকে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার থেকে টালীগঞ্জ, সর্বত্র কোম্পানীর অর্ডার আনতে ছুটতে হয়। কোম্পানীর খদ্দেরদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়। —আর, আজ দস্তুরমত একটা আসনের পুরোপুরি দখল পাবে নিলয়েন্দ্র। ভাবতেও ভালো লাগে। চেয়ারের পিঠে ঘাড়টাকে জমা রেখে পরম নিশ্চিন্ত মনে সুরের দেশে চোখ বুজে উড়ে বেড়ানোর আনন্দ কি সামান্য কথা! যত উপদ্রব করে ঘাড়ের সঙ্গে সংলগ্ন মাথাটা। ফুটপাতের রাজাসনে জমি অনেক পড়ে আছে—কিন্তু মাথাটাকে রাখার ঠাঁই মেলে কই!

একজন সিল্কের ব্যাজ আঁটা ভদ্রলোক খুব খাতির করে নিলয়েন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে একখানা কৌচ দেখিয়ে দিল। ওদিকে গান গাইছেন কোনো প্রৌঢ়া। মিষ্টি আর ভরাট কণ্ঠস্বর—কী দরদ! হ্যাঁ ঠুংরিই গাইছেন বটে। উৎকর্ণ হয়ে নিলয়েন্দ্র শুনতে লাগলো। নরম আসনের আরামটা নিমেষের জন্যও তাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। গায়িকার মুখের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিলয়েন্দ্র—কি আশ্চর্য আকুতির দরদসমুদ্র ওই কণ্ঠের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে!

আর সারেঙ্গীর টানও কি মধুর সূক্ষ্ম মিড়-গমক সবই এত স্পষ্ট ব্যক্ত কে কি যাদুবলে কে জানে। বৃদ্ধ সারেঙ্গী দু-চোখে সুরের আমেজ লেগে রয়েছে অবাক নিলয়েন্দ্র উদ্‌গ্রীব হয়ে সমস্ পরিবেশটাকে যেন সম্পূর্ণই আত্মসা করতে চায়। 'বেদরদী সৈঁয়া কান্‌হাইয়া'কে গায়িকার সঙ্গে সে নিজেও যেন সমা আকুলতা নিয়ে ডাকতে চাইছে। গাইছে? জানে না নিলয়েন্দ্র গায়িকার নাম না, এঁর গান আর কখনও শুনেছে বলে মনে হচ্ছে না। চেহারা সে খুব ক ওস্তাদেরই চেনে, তবে কণ্ঠ অনেকেরই বহুবার শুনেছে। কিন্তু এ কণ্ঠ তা পরিচিত নয়।

গান শেষ হল। কিন্তু তার আবে নিলয়েন্দ্রকে মশগুল করে রেখেছে। নি নাম বলল—আনোয়ারী বাঈ। আনোয়ার বাঈ নামটাও শোনে নি নিলয়, তাতে বি

এসে যায়, এমন যার গায়কী ভঙ্গী তার নামের দরকার নেই। নিতান্ত স্বার্থপরের মতো সে ভাবছিল, আর কোথায় কবে এ'র গান হবে,—সেখানে গিয়ে একা-একা শুনতেই হবে।

আশ্চর্য লাগল, আনোয়ারী বাঈ স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে নিলয়ের আসন থেকে খুব কাছেই বসলেন। মুখ ফিরিয়ে নিলয় দেখল, তার পাশেই একটি মেয়ে বসে রয়েছে, নিলয়ের দিকেই যেন তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটি। আনোয়ারী বাঈকে দেখতে গেলে মেয়েটিকে ডিঙিয়ে তাকাতে হবে। বার কয়েক এইভাবে ফিরে ফিরে তাকালো নিলয়, ভাবল একবার উঠে গিয়ে গায়িকাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবে না কি—আর সেই সঙ্গে জেনে আসবে ও'র গানের প্রোগ্রামের খবর! ঠিক ভরসা হচ্ছে না। ঘুরে তাকিয়েই মনে হচ্ছে যেন, যে মানুষটি এতক্ষণ গানের ভাবের সঙ্গে মিশে সুর সৃষ্টি করছিল, সে বুঝি অন্য কেউ—কাঁচা-পাকা পাতা-কাটা চুলের নীচে যে অভিজ্ঞতার বহু-রেখাঙ্কিত মুখখানা দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে সুররাজ্যের সেই বিরহিণী রাধার কোনোই মিল নেই। গানের খেয়াতে যে মনটির খুব কাছাকাছি গিয়েছিল নিলয়, গান সারা হতেই সেই সুর-রেশ-মায়াটুকু রেখে দিয়ে গায়িকা যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'ল! কোথায় গেল? নিলয় আবার ফিরে তাকালো—পাশের মেয়েটি এখনও আগের মতো একইভাবে চেয়ে রয়েছে। নিলয়ের দৃষ্টি ওই মুখের ওপর থমকে দাঁড়ালো। গানের আবেশের কিছু রেশ যেন এইখানে রয়ে গেছে। বিরহিণী রাধার আকুলতা কেমন ছিল কে জানে, কেউ কি দেখেছে? নিলয়ের মনে হলো, এই সেই মুখ যেখানে রাধার আকুলতার ছায়া খুঁজে পায়। একে অতিক্রম ক'রে ওই দূরের মানুষটির মধ্যে বুঝি কিছু মিলবে না।

পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু হলো। কথক নাচ। নিলয়ের তেমন পছন্দ হয় না,—কথকনৃত্য। তাল আর লয়, কেবল বোল—নাচ বলতে যে একটা কাব্যছন্দমণ্ডিত সুকুমার পরিবেশ অনুভবে জাগে, কথক-নৃত্যে ঠিক তেমনটি যেন ফুটে ওঠে না। তবু বসে রইল নিলয়। এবার যেন নতুন আসনের দখলটাকে সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এপাশ-ওপাশ, সামনে-পিছনে চেয়ে দেখল—অনেক লোক এসেছে। ডান দিকে ওই কোণে তার পরিচিত একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার বসে রয়েছে। তাকে দেখে ছেলেটি হাত নেড়ে ইশারায় ডাকলো।

ওদিকে জয়পুরের নৃত্যশিল্পী মেয়েটি 'তা-থৈ তৎ' ব'কে চলেছে—মেয়েটি যেন হাঁপাচ্ছে। এই শীতেও ওর কপালে স্বেদ-বিন্দু জমে উঠেছে। এককালে হয়তো ও-ই ছিল তন্বী, কিন্তু এখন আর নেই, অঙ্গ-বাসের অন্তরালে কটিদেশের ব্যাস বড় সামান্য নয় তা বেশ টের পাওয়া যায়।

আবার নিলয়ের নজর গিয়ে পড়ল পাশের মেয়েটির ওপর। নাচ দেখছে মেয়েটি। এবার নিলয় দেখতে লাগল মেয়েটিকে। সত্যি, বেশ দেখাচ্ছে। পাশ থেকে আয়ত ভ্রূর বঙ্কিম সীমান্ত রেখাটি এসে মিশেছে—গালের মসৃণ শুভ্র পট-ভূমিতে। সুন্দর একটা ছবির 'কনট্রাস্ট'—এ দ্বন্দ্ব বিরোধের নয়, সুসমঞ্জস মায়া-সৃষ্টির! আলো এসে পড়েছে তির্যকভাবে—মনে হয় যেন একটা চকচকে আভা ওই মুখের চারপাশকে মণ্ডিত করে তুলছে। আসন থেকে একটু এগিয়ে রয়েছে ওর ঊর্ধ্ব-অঙ্গ, পাশ থেকে দেহের সুষম গঠনটুকু নিলয়ের নজরে তারিফের বিদ্যুৎ ঝলকে দিয়ে গেল। আচ্ছা, এই মেয়ে যদি ওই কথক-নাচটি নাচতো, তাহলে কতো সুন্দর হ'ত! ওদিকে হাততালি পড়ছে, বাহবার লহরে নর্তকী উৎফুল্ল হচ্ছে—কিন্তু সে-সব যেন অন্য কোনো রাজ্যের ব্যাপার। নিলয় নিবদ্ধ এই প্রতিবেশীর উত্তমাঙ্গদেশে। পারিপার্শ্বিক সব কিছুই সে ভুলে গিয়ে অর্জুনের পাখীর চোখ দেখার মতো নিবিড় ঐকান্তিকতা নিয়ে এই মেয়ের গ্রীবা থেকে কটিদেশের তাবৎ নিখুঁত ফলিতকলা নিরীক্ষণ করছে। আসরের নাচের ছন্দহিল্লোল ওই জয়পুরী নর্তকীর নাচে নেই—আছে এই একটি মেয়ের সর্বঅবয়বে। নিলয়ের মনে হলো স্থিরমূর্তিতে নাচের দোলা লেগেছে।

কে এই মেয়ে?

আনোয়ারী বাঈয়ের ঠুংরি গানের বিরহিণী রাধা, কথক-নাচের সৃষ্টিস্থিতি মুক্তির মূর্তিমতী প্রতীক—কে এই মেয়ে? নিলয় ভাবে। যতটুকু সে ভাবছে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখছে ওকে।

নাচ থামল।

রিপোর্টার সুখেন্দু আবার হাত নেড়ে ডাকতে লাগলো নিলয়েন্দ্রকে। পাশের দিকে একবার অকারণে তাকিয়ে নিলয় উঠে গেল।

কাছে যেতেই নিলয়কে প্রায় জড়িয়ে ধরে সুখেন্দু বলল—বেশ আছো ভাই। এত করে ডাকছি, ফিরেই চাও না, ব্যাপার কী?

নিলয় জবাব দিল—প্রোগ্রামের মাঝখানে উঠে আসি কি করে বলো!

—তা আজকাল আর আসোই না আমাদের ওদিকে। কিছু বড়সড় বাগিয়েছ নাকি হে!

বলে সুখেন্দু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিলয়ের আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে দেখল। নিলয় অন্যমনস্কভাবে জবাব দিয়ে যায়—নাঃ।

—সঙ্গে উনি বুঝি—

সুখেন্দু উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্নটা মাঝপথেই থামিয়ে রাখল।

নিলয় বলল—সঙ্গে ত আমার কেউ নেই! একাই এসেছি।

—বলো কি ম্যান। আমরা কি এতই বুদ্ধু।

ওদিকে ঘোষণা হল—এবার শঙ্কর সরনায়েক কৌশিকী-কানাড়ায় খেয়াল গাইছেন। তার সঙ্গে সংগত করছেন, ইত্যাদি।

সুখেন্দু বলল—বস দুটো সুখ-দুঃখের কথা কওয়া যাক। কতদিন পরে দেখা।

নিলয় বলল—শিগ্‌গির আবার দেখা হবে ভাই, আজ চলি। আশপাশের লোকেরা বিরক্ত হবে গল্প করলে।

সুখেন্দু বিজ্ঞ হাসি হেসে বলল—দ্যাখো নীলু, খবরের কাগজে ঢুকলেই দুনিয়ার হিসেব-নিকেশ দু-চোখের পাতায় পাতায় লেখা হয়ে যায়। আরে ভাই আমার সঙ্গে মস্করা ক'রে পার পাবে ভেবেছ? বলি, পেট্রনের গদীতে জাঁকিয়ে বসেছ, পাশে ত আবার একখানি শুদ্ধ কল্যাণী রাগিণী—এরপরও বলতে চাও কিছু বাগাতে পারো নি। মাইরি তোমাদের উন্নতি দেখে মনটা খুশী হচ্ছে, তবু কেন লুকুচ্ছো চাঁদ!

নিলয় নিরুপায়। সুখেন্দুর হাবভাবে এমন একটা প্রত্যয়-প্রামাণিক ভঙ্গী ফুটে উঠেছে যে, দু-চার কথায় তা বদল করা যাবে না। তা ছাড়া এইভাবে বাজে কথা কয়ে মৌজ-মেজাজ নষ্ট করতে নিলয়ের আদৌ ইচ্ছে নেই। সে বললে—তোমার কথা যেন সত্যি হয় ভাই।

—যাও যাও, ওদিকে তোমার উনি চাতকীর মতো চেয়ে রয়েছেন এইদিক পানে।

নিলয় কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না, সে বলল—তোমার এখনও ছেলেমানুষী গেল না! এই এতদূর থেকে নজর শানিয়ে বসে আছো, কোথায় কোন মেয়ে কি করছে না করছে দেখতে পাচ্ছো!

সুখেন্দু বলল—যা বলছি ঠিক-ঠিক মিলিয়ে নিয়ো, এখন আর ডিস্টার্ব করব না, কেটে পড়ো।

কালক্ষেপ না করে নিলয় নিজের আসনের দিকে এগোতে লাগলো। চলতে চলতে সারনায়কের গান তার মগজে যেন সুরের মায়া বিস্তার করে। অতি উৎসাহী শ্রোতাদের তারিফের কোলাহলে নিলয়ের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে—এদের 'আহা-হা, বাহবা' যেন গানের সুরকে ছিঁড়ে কুটে ফেলছে। ভ্রূকুঞ্চিতভাবে নিলয় বসল।

পরক্ষণে পার্শ্ববর্তিনীর অস্তিত্বটা নিলয়ের কাছে বড় বেশি অস্বস্তিকর বোধ হয়। ওদিকে সারনায়কের মধুবর্ষী গান, এদিকে এই মেয়েটি—নিলয় যেন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সুখেন্দুর কথাটা বড় বেশি মনে পড়ছে নিলয়ের।

বারেকের জন্য সুখেন্দুর দিকে নজর দিল নিলয়। না, সুখেন্দু তার পাশের লোকের সঙ্গে গল্প করছে—। নিলয় খুব সতর্কভাবে পাশের দিকে চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করতে গিয়ে বিব্রত হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল—মেয়েটি এই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যেন!

পার্শ্ববর্তিনী সহসা রিন্‌রিনে সুরে বললেন—এতো ভালো গান, আপনি মুখ বুজে কি করে শুনছেন?

চমকে নিলয় ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি তাকালো—আমাকে কিছু বলছেন?

—ঠিক তাই! ভারি মিষ্টি গলা, তাই না?

—হ্যাঁ। ও'কে অনেকে কোকিলকণ্ঠ বলে।

কোনোরকমে জবাবটা দিয়েই গানে মন দিতে চায় নিলয়। কিন্তু তার অবাধ্য চোখ দুটো এই দিকেই যেন আটক পড়ে গেছে। কোথা থেকে লজ্জার জাল এসে নিলয়কে ঘিরে ফেলেছে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে সে যদি চোখ ফিরিয়ে গান শুনতে চেষ্টা করে তবে ওই মেয়ে তাকে ভীরু ভেবে মনে মনে হাসবে। হয়তো মেয়েটি ভুল বুঝবে নিলয়কে—ধরে নেবে যে, নিলয় ওকে উপেক্ষা করল। তার এই অতিসচেতন লজ্জা সংকোচ যেন নতুন সংকল্পের দিকে জোর করে ঠেলে নিয়ে গেল তাকে—পরাভূত হতে সে নারাজ। এদিকে গায়ের গরম জামা-

াদেরগ্নলো অস্বাভাবিক রকম দুর্বহ বোধ চ্ছে।

শঙ্কর সারনায়কের সুরের যাদু বলয়কে গ্রাস করতে চাচ্ছে, কিন্তু নিলয় ই মেয়েকেই বা অগ্রাহ্য করবে কেমন 'রে? একটু আগেই যার মধ্যে সে সুরের, ন্দের, রূপের, বিশ্বের অনেক মাধুর্যের াশ্রয় আবিষ্কার করেছে তার সাড়াকে ান নিলয় সমস্ত সত্তা দিয়ে অভিবাদন নাতে চায়। সোজাসুজি ওর মুখের দিকে াকিয়ে নিলয় বলল—আপনি রোজ াসেন?

—সঙ্গী পেলে আসতে পারি। নইলে কা-একা রাত জাগতে খুব কষ্ট হয়। াজ এসেছি ওস্তাদ হাফেজ আলীর জনা শুনতে।

—আমিও বিশেষ করে ওঁকে দেখবো লেই এসেছি। এমন হাত আর হয় না।

কথা বলতে বলতে নিলয় সারনায়কের নটুকু ভুলে যেতে বসেছিল—এমন সময়ে বলাতে তেহাই পড়তে মেয়েটি স্টেজের কে তাকালো। চিবুকের উদ্ধত ভঙ্গীতে কে যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে। বিস্মিত ুগ্ধ নিলয় সেদিকে তাকিয়ে থাকতে াকতে হঠাৎ সচেতন হয়ে গানে মন তে চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি আবার বলল—াঁ সাহেবের বাজনা কখন শুরু হবে। বড্ড ম পাচ্ছে।

নিলয় জবাব দেবার জন্য এদিকে রল—শেষ রাতে ছাড়া ত ওঁদের বাজনা য় না।

—এই এক ফ্যাশন, কেন বলুন তো মানুষকে এইভাবে যন্ত্রণা দেওয়া! অন্যদিন এতক্ষণে একঘুমে হয়ে যায়।

নিলয় দেখল মেয়েটির আয়ত ভ্রূযুগের নীচে অতল ঘুমের ঢেউ বুঝি উথল-পাথাল হয়ে উঠেছে। ঘুম-জড়ানো চোখের যে এমন আশ্চর্য মায়া থাকে, তা কি এর আগে নিলয় জানত! এত কাছাকাছি ত কোনো মেয়ের ঘুম-ঘুম চাহনি সে দেখে নি—এই চাহনির রূপে কোন্ রাগিণীর সুর মাখানো রয়েছে নিলয় তা বোঝে না। শুধু একটা অবোধ নেশার মায়া নিলয়কে সব-কিছু ভুলিয়ে দিল।

তাকে এইভাবে নিষ্পলকভাবে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটির পাত্‌লা ঠোঁটে একটু হাসি খেলে গেল, ও বলল—একটু চা খেতে পারলে হতো।

শঙ্কর সারনায়কের গানের সুর কানের পর্দায় পেঁচে ফিরে-ফিরে যাচ্ছে—নিলয়ের মনে শুধু দূরে থেকে ভেসে আসা আবছা-অস্পষ্ট সুরের ক্ষীণ আবেদন।

নিলয় উৎসাহিতভাবে বলল—বেশ ত, আমি আনছি, আপনি বসুন।

সে উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটি ব্যস্তভাবে তার হাত টেনে বসিয়ে দিল—আপনি বড্ড ছেলেমানুষ, গানটা শেষ হতে দিন। তার-পর দু'জনেই না-হয় যাওয়া যাবে।

নিলয় অপ্রতিভের মতো একটু হাসল। একবার নিজের দিকে মনে মনে খতিয়ে দেখল—এ কী, সত্যিই তো এভাবে সামনের সারিতে বসে চপলতা করা অশোভন। নিজের ওপর সে খুব চটে গেল। একটি দিনের জন্য সম্মানের আসনের অধিকার পেয়ে সে এইভাবে আসনের অমর্যাদা করছে। ছি-ছি-ছি। মনে মনে সে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানালো। আগের চেয়ে অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে যেন ওরা। নইলে এইভাবে অসঙ্কোচে ওই মেয়ে নিলয়ের হাত ধরতে পারতো না। স্পর্শের অনুভূতি নিলয়কে কী যে অভিভূত করেছে তা যদি মেয়েটি জানত! নিলয় কিছুক্ষণ আর মুখ তুলতে পারে না—কিছু বা লজ্জা, কিছু বা তীব্র অনুভূতির আবেশ তাকে জড় করে রেখেছে। তবু সে বেশ বুঝতে পারে যে, মেয়েটি তারই দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছে। এখনও গান থামে নি, সুর ভেসে আসছে—এ সুরের মধ্যে কোকিলকণ্ঠের নিছক অবিমিশ্র আবেদন নেই, আছে তার চেয়ে বেশি—অনেক বেশি গভীরতা।

লাউড স্পীকারের ঘোষণা শেষ হতে মেয়েটি রিনরিনে গলায় বলল—কী ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি!

নিজের অজ্ঞাতে নিলয় একবার সুখেন্দুর দিকে তাকাবার চেষ্টা করল—দেখল সুখেন্দু তাকেই লক্ষ্য করছে। সুখেন্দুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চায় নিলয়। একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল—না, চলুন! ক'টা বাজলো?

—একটা বাহান্ন।

মণিবন্ধের ঘড়িটা দেখে মেয়েটি জবাব দেয়। নিলয় ওর গ্রীবাভঙ্গিমার উপর দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলল।

চায়ের দোকানের কাছাকাছি আসতেই মনে হ'ল ওরা অন্য রাজ্যে ঢুকে পড়েছে।

অসম্ভব ঠেলাঠেলি। হৈ-চৈ। লাউড স্পীকারের আওয়াজটা এই মুহূর্তে অত্যন্ত কর্কশ মনে হচ্ছে নিলয়ের কাছে। অথচ এতকাল ত সে এই বাইরের শ্রোতা হয়েই খুশী ছিল।

নিলয় একটু ফাঁকা জায়গা বেছে মেয়েটিকে বলল—এখানে দাঁড়ান, আমি দেখি।

বার কয়েক ভিড় ঠেলে চায়ের স্টলের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল নিলয়। অনেক খদ্দের নানা ধরনের গলার অসহিষ্ণু উক্তি—কই মশাই কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবো!...এ্যাঁ কতবার বলব, চার কাপ চা, দশটা সিঙাড়া।...কী মশাই বগলের তলা দিয়ে দিব্যি পাচার করছেন...কি হ'ল দাদা!...আরে মশাই ঠেলবেন না,
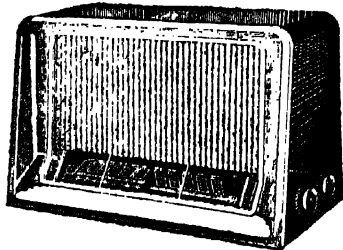
ভাঁড়ে গরম চা।...এ-হে-হে দিলেন ত নতুন কোট্‌টার বোরোটা বাজিয়ে!...ঝকমারি!

কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে ধাক্কা খেলে নিলয়। কোথা দিয়ে কি ভাবে এগিয়ে যাবে, বিভ্রান্তভাবে তাই ভাবেছিল সে। এমন সময়ে তাকে মৃদুভাবে সরিয়ে দিয়ে একটি মেয়ে চট্‌পট্‌ এগিয়ে গেল—সরুন ত, একটু পাশ দিন না, দেখুন না আমার দু-কাপ চা আর চারটে সিঙাড়া, হ্যাঁ, দিন না দয়া করে, এখুনি হাফেজ আলীর বাজনা শুরু হবে!

হাফেজ আলী খাঁ! এখনই তাঁর বাজনা শুরু হবে! নিলয়ের মনে এই ক'টি কথা যেন প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেল। নিলয়ের চোখের সামনে ভিড়ের সমুদ্র ঠেলে সাঁতরে বেরিয়ে যাওয়া সাবলীল মেয়েটি অনায়াসে কথাগুলো বলে গেল। কিন্তু নিলয়ের মনে তার প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক। আজ সে বৃদ্ধ ওস্তাদ হাফেজ আলীর স্বরোদ শুনবে, তাঁকে দু-চোখ ভ'রে দেখবে এই উদগ্র বাসনা নিয়েই ত এখানে এসেছিল। এই একটি মাত্র সংকল্পই তাকে দাম্ভিক ধনী বন্ধুর কাছে নতি স্বীকার করিয়েছে। মৃগেন চৌধুরীর কাছে যেচে সে কোনো দিন কিছু চায় নি। শুধু মৃগেন কেন, দুনিয়ার কারুর কাছে নিলয় কিছু চায় না ব'লেই তাকে সবাই খাতির করে। আজ বাদে কাল এই মৃগেন গাড়ির তেল পুড়িয়ে সবাইকে বলে বেড়াবে—'নিলু অনেক ক'রে ধরল তাই কার্ডখানা দিয়ে দিলাম'। তা বলুক, হাফেজ আলীকে দেখার জন্য এটুকু মূল্য নিলয় অনায়াসেই দিতে পারে। কিন্তু সেই বহু-যুগের পোষা সাধের মুহূর্তটি নিলয় এভাবে এই চায়ের দোকানের সামনে খুইয়ে দিচ্ছে কেমন ক'রে! থাক, চায়ে আর কাজ নেই। পিছন ফিরল সে, সঙ্গিনীকে বল্‌তে হবে—ফিরে যাই চলুন।

কিন্তু সেখানে কেউ নেই। নিলয় ভিড় থেকে বেরিয়ে আসছিল—সঙ্গিনীকে খুঁজতে। তিনি নিশ্চয় হাফেজ আলীর স্বরোদের টানে আসরে ফিরে গেছেন। ওই ত স্বরোদে টোকা পড়ছে। কী আশ্চর্য জাদু আছে বুড়ো ওস্তাদের আঙুলের টানে। নিলয়ের মাথাটা দুলে উঠল।

নিলয়ের মনে একটা বেদনা দানা বেঁধে উঠল—আত্মধিক্কারের বেদন মেয়েটিও হাফেজ আলীর বাজনা শুনতে এসেছে। নিলয়ও এসেছে ওই একই টা অথচ নিলয় এখানে কেমন ক'রে চা-পিয়াসীদের দলে ভিড়ে গেছে।

পিছন থেকে আবার রিন্‌-রিনে ভেসে এল মিড়ের সূক্ষ্ম আবেদন ছ —এই যে এদিকে! আপনি কোথায় ছেন।

নিলয় ফিরে দেখতেই মেয়েটি ব্যস্ত-ভাবে বল্‌ল—ধরুন, ধরুন আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে।

একটি ভাঁড় হাতে নিল নিলয়। মেয়েটি বল্‌ল—এখনও সিঙাড়া পাই নি, আমারটাও ধরুন। সিঙাড়া নিয়ে আসি।

নিলয় হতচকিত। সে দুটো ভাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে ললিত রাগে আলাপ শুরু করেছেন ওস্তাদজী। তার চোখের সামনে মেয়েটি আবার নিমেষের মধ্যে সাঁত্‌রে চলে গেল ভিড়ের সমুদ্রে। নিলয় মূঢ়ের মত ভাবতে লাগল—আশ্চর্য ক্ষমতা বটে। কিন্তু সে চিন্তার লঘু মেঘ উধাও হ'ল সুরের পুঞ্জ-পুঞ্জ ঘন জমাট মায়া বিস্তারে। একটি গমকের বিকাশে কতো যুগের দুশ্চর সাধনার ইতিহাস ব্যক্ত হল—নিলয়ের দু-চোখে অশ্রু জমে ওঠে—সে অশ্রুর কোনো দৃশ্য রূপ নেই।

—নিন্‌ ধরুন।

চমকে তাকালো নিলয়। তন্ময়তার ঘোর কেটে গেল মেয়েটিকে সামনে দেখে। সে বল্‌ল—'আপনার খুব হয়রানি হ'ল।'

অত্যন্ত স্পষ্ট, বুঝি বা উজ্জ্বলতার আতিশয্যে কিছু উচ্চকণ্ঠে মেয়েটি বল্‌ল —যাই বলুন, আপনার মতো মানুষ একা এলেই হয়েছিল। বা লাজুক। নিন্‌ আর জুড়িয়ে কি হবে, চা খেয়ে নিন, বাজনা শুরু হয়ে গেছে।

একান্ত অনুগতভাবে নিলয় সিঙাড়ায় কামড় দিল। খুব গরম, জিভ্‌টা পুড়ে গেল। তা যাক। এখন কোনোরকমে এগুলো শেষ ক'রে গিয়ে বসতে পারলে বাঁচে নিলয়

মেয়েটি বেশ—সপ্রতিভভাবে বল্‌ল আপনার নামটাও জানা হয় নি এখনও।

জবাব দিল নিলয়।

আবার মেয়েটি বল্‌ল—কোন্‌ রাজ্যের মানুষ আপনি?

সবই কি পাল্টে গেল নাকি। ...টিয়ে সরাসরি মেয়েটির দিকে ...' ওকে জাগিয়ে দিতে হবে। ...রকার ত গানের আসরে ...কতে পারতে তুমি

...ংকল্প নিয়ে ...র বিস্ময়- ...। এ ...না ...ন দিল।

—ও কী, আপনার শেষ হয়ে গেল ... মধ্যে? তাহলে, খুব ক্ষিদে পেয়েছিল বলুন। দেখলেন ত আমি সঙ্গে না এলে এই ক্ষিদেটা হজম করতেন, ইস!

গম্ভীর সুরের ধ্বনি বিস্তারে নিলয় অন্যমনস্ক। কথার জবাবে কথা দিয়ে এই মনের পরিবেশটুকু হারাতে চায় না সে, তাই ঘাড় কাৎ ক'রে একটু হাসলো।

মেয়েটি আবার নতুন প্রস্তাব পেশ করল—পান খাবেন?

—না।

দরগুলো অস্বাভাবিক রকম দুর্বৃত্ত ভাবতে
চ্ছে। .খতে পারি।
শংকর সারনায়কের বেশ ত চলুন।
লয়কে গ্রাস করতে চাখে নিয়ে মেয়েটি
ই মেয়েকেই বা অগ্রাহ্যলেনই বা।
রে? একটু আগেইটুকু হারাতে চায় না
ন্দর, রূপের, িদের বাধাতে। আর, একটা
শ্রয় আবিষ্এমন কি কঠিন কাজ—এমন
ন নিলয়ন্ুষের এই সামান্য অনুরোধ
নাতে খুশি হয়েই রাখতে রাজী আছে।
কিং

পান চিবোতে চিবোতে ওরা দুজনে আসরে যখন ফিরল তখন ললিত রাগে ওস্তাদজীর আলাপে গোটা আসরখানা যেন একটিমাত্র মুগ্ধ শ্রোতার মতো নিশ্চুপ —শুধু সুরের গুঞ্জন ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

নিলয় আসনে বসে মনোনিবেশ করতে চাইল। কিন্তু মেয়েটির কথাই কেবল ভাবনায় এসে দাঁড়াচ্ছে। পাশে বসে ও যেন চুলের গন্ধ ছড়িয়ে তাকে উন্মনা করে দিচ্ছে। সুরের অতলে সে কিছুতেই মগ্ন হয়ে ডুবে যেতে পারছে না। আড়চোখে সে একবার পাশের দিকে চেয়ে দেখল, মেয়েটির দু-চোখ বুজে গেছে। খুব গভীরভাবে ও সঙ্গীতের রস গ্রহণ করছে নিশ্চয়। নিলয় একটা ধাক্কা খেল। সে নিজে ত পারছে না ওর মতো চোখ বুজে উপভোগ করতে।

এবার সে নিজেকে শাসন করতে চাইল—। জোর করে দুটো চোখ বন্ধ

করল। চোখ বুজে মেয়েটিকেই দেখতে লাগল নিলয়। সেই প্রথম প্রহরের প্রথম দেখা থেকে শুরু করে প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন রূপে দেখা মেয়েটি নিলয়ের মনের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। সব শেষে দু-চোখ বুজে মেয়েটি যেমনভাবে বাজনা শুনছে সেই ছবিটি এসে দাঁড়াল। তারপর বুঝি নিলয় সুরের রাজ্যে প্রবেশ করল। স্বরোদের একটি সুরঝঙ্কারে তার সমস্ত অন্তর বেদনায় রসসিক্ত হয়ে ওঠে। একটু একটু করে সে ডুবেছে। এমনি করে কখন যে নিলয় সুরসত্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেল সে জানে না।

ফুলের দল যেন এই সুরের হাওয়ার ছোঁয়া লেগে একটু একটু করে ফুটে উঠ্ছে। স্বপ্ন জড়ানো ওড়না সরিয়ে জাগরণের আশা নিয়ে এগিয়ে আসছে। —আসছে—আসছে—আসছে! আশার ডানায় রঙ ধরলো—একটু একটু করে দুধবরণ রঙ লাগছে।...নিলয়ের চোখ দুটো আপনি বুজে যায় অনুভবের তীব্র বাসনায়। মনের মণিকোঠার দুয়ার খুলে গেল।...কত ফুল ফুটলো। দিকে দিকে কি মৌমাছিরা মধুগুঞ্জন তুলেছে ডানাকাঁপানোর হিল্লোল দিয়ে! না, ফুলেরা দল মেল্‌ছে তারই মন্-মন্ ধ্বনি!

কখন আলাপ শেষ হয়ে গৎ শুরু হ'লো, কখন বুড়ো আহমেদ জান থেরকুয়া তবলা সংগত শুরু করলেন—নিলয় তাকিয়ে দেখলো না। চোখ বুজে এক নিবিড় আচ্ছন্ন গভীরের অতল থেকে, অনুভূতির বেদনামধুর স্পর্শ দিয়ে সে স্বপ্নসত্তায় আস্বাদ গ্রহণ করছে।

এক সময়ে বাজনা থামলো। মাইকের স্পর্ধিত কণ্ঠ কি সব আর্তনাদ করল নিলয় শোনে না। তার বন্ধ চোখের সামনে এখনও অজস্র শাদা শাদা ফুলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে দল মেলে চলেছে—। আকাশের তারাদল কি সুরের সাড়া পেয়ে চলে এল, না, ফুলেরা দল বেঁধে আকাশের তারা হয়ে গেল? কি হ'ল!

এর পর ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ আপনাদের ভৈঁরো রাগে খেয়াল গেয়ে শোনাচ্ছেন।

চম্‌কে উঠ্‌ল নিলয়। স্বপনরাজ্য থেকে কারা যেন তাকে ধরা ধরি করে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিলয় সেই আশ্রয়-শূন্য অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করল আসরের চেয়ারে। মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা। প্রথম প্রহরের ঠুংরি গানের মূর্ত বেদনা নায়িকার কথা, নৃত্যচ্ছন্দময়ী সেই ক্ষীণকটি মেয়ের কথা, তারপর কৌশিকী কানাড়া শোনার পর দেখা সেই মেয়ে, তারপরে এলেন চা পরিবেশনকারিনী মেয়েটি! মনে পড়ল সুখেন্দুর কথা। সে জেগে উঠ্‌ল।

পরক্ষণে টের পেল নিলয়, তার ঘাড়ের ডানদিকটা কেমন ভারাক্রান্ত লাগছে। পাশ ফিরে সে দেখল মেয়েটি দিব্যি নিলয়ের ঘাড়ের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে।

আলো ঝলমল প্রেক্ষাগৃহের কত লোক এদিকে তাকিয়ে রয়েছে! নিলয় ভাবতে পারে না। চিন্তার তীব্র জাগৃতি যে বিদায় নিয়ে কোথায় উধাও হলো, নিলয় বুঝতে পারছে না। অথচ ভাবনা ঠিক নয় এমনই একটা নৈর্ব্যক্তিক বিকল্প শান্ত প্রক্রিয়া নিলয়ের মনে চলেছে। তাতে সে দেখছে—রাত্রি বড় ক্লান্ত, প্রহরের পর প্রহর জেগে জেগে রাত্রির অনবয়ব অস্তিত্ব অবসিতপ্রায়। বুঝি এই মেয়ে সেই রাত্রিরই কন্যা। একটি রাত্রির জীবন তিলে তিলে এই মেয়ের আশ্রয়ের আয়নায় দেখছে বুঝি নিলয়। না,—অন্য কথা বলছে ভোরের আবাহনী সুর—উদ্দীপনার আবাহনে জড়তাকে বিসর্জন দিতে হবে!...নিলয় চোখ রগড়ে সোজা হ'য়ে বসতে গিয়ে আবার সেই কাঁধের ভারটা টের পেল। এবার জড়িমাবর্জিত চোখে একবার গায়কের দিকে তাকালো। ওস্তাদজী শাদা চোখের নিরীখে দস্তুরমতো বৃদ্ধ এবং রূপশ্রীর ধার-কাছ দিয়ে হাঁটেন না। কিন্তু গানের সুরে এই মুহূর্তে তাঁর ওই দেহাধার উদ্দীপিত, ভরাট দরাজ গলায় যে নাদ ধ্বনিত হচ্ছে তা যেন 'ধা—ধা—ধা' করে আঘাত করছে।

নিলয়েন্দ্রের মনে হ'ল এমন জড়ের মতো সে কি করে বসে রয়েছে। একখানা ধার করা কাশ্মীরী শাল মুড়ি দিয়ে তার চাল-ভোল সবই কি পাল্টে গেল নাকি। অস্বস্তি কাটিয়ে সরাসরি মেয়েটির দিকে তাকালো, এবার ওকে জাগিয়ে দিতে হবে। এতই যদি ঘুমের দরকার ত গানের আসরে কেন, নিজের ঘরে থাকতে পারতে তুমি অনায়াসে।

জাগিয়ে দেবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নিলয় বিস্ময়-বিমূঢ় অপলক হয়ে রইল কিছুক্ষণ। এ কে? প্রৌঢ়া বর্ষীয়সী রূপহীনা রমণী কে? ফোটা দিনের আলোতে স্বপ্ন নেই, মায়ার ইন্দ্রজাল নিহত—পাউডার-কস্‌মেটিক্‌সের খস্‌খসে রং ঘষাঘষা হয়ে মুখময় অসমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এক পোঁচ কাঁচা চুনকালির ওপর বৃষ্টি হয়ে গেছে যেন সারারাত ধরে—। নিলয় স্পষ্ট দেখতে পেল, এত কাছাকাছি থেকে এই প্রকট আলোতে নিলয় অস্পষ্ট দেখবে কি করে—আয়ত বঙ্কিম ভ্রূযুগের বিস্তার প্রান্তরে পেন্সিলের টান আঁকা। এ মুখ, একেবারে অচেনা—একেই কি দীর্ঘরাত্রির প্রতি পলে সে দেখেছে—আর দেখে মুগ্ধ হয়েছে। এরই জন্য সে গানবাজনা ভুলে যেতে বসেছিল!

আস্তে আস্তে ভদ্রমহিলাকে জাগিয়ে দিল নিলয়।

তিনি আলস্য কাটিয়ে যখন তাকালেন তখনও নিলয় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে-ছিল। চোখের কোলে কালিমার ছোপ!

নিলয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। আর এদিকে বারেকের জন্যেও ফিরলেন না। ব্যস্তভাবে বেরিয়ে চলে গেলেন। বিদায় সম্ভাষণটুকুও জানালেন না নিলয়কে।

কোথায় যেন বিরাট একটা বিপর্যয় ঘটেছে—সে কি সুরলোকে, না মনোজগতে

নিলয় জানে না। সেই অজ্ঞাতনামা বিপর্যয়ের বেদনা নিলয়কে অহরহ আঘাত করছে—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নিলয়কে অস্থির করে তুলেছে। এখনও সে ভাবছে, কি আশ্চর্য—তখনও ত ভেবেছিল, কি আশ্চর্য—যখন সেই নায়িকাকে প্রথম দেখে মুগ্ধ বিস্ময়াবিষ্ট মনে দেখেছিল। আশ্চর্য সেই দেখা, আরও আশ্চর্য এই বেদনাবোধ।

॥২৪॥

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ। গ্রীনউইচ স্ট্যান্ডার্ড টাইম সাড়ে এগারোটায় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মধ্য ইউরোপে পোল্যান্ডের মাটিতে হিটলারের দৈত্যবাহিনী ধ্বংসলীলা শুরু করেছিল সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকে। একটা অতৃপ্ত রাক্ষসের প্রচণ্ড রক্তপিপাসা। সম্পদ ও সমৃদ্ধির লালসা। মনুষ্যত্বহীন নিষ্ঠুর ভয়াল ভয়ংকর আক্রমণে জনপদের পর জনপদ মৃত্যুর গহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।

ইংল্যান্ড সেই নিষ্ঠুর দৈত্যটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

মনুষ্যত্ব, শান্তি ও গণতন্ত্রের পতাকা ধারণ করে ইংল্যান্ড সভ্যতার আদি ভিত্তিকেই রক্ষা করবার প্রয়াস করল।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কাছে ইংল্যান্ডের এই কল্যাণব্রতী স্বরূপটা ধরা পড়তে পারলো না।

নিজের দেশে ইংরেজ ভদ্র বিনয়ী। ভারতবর্ষে তার রূপ আলাদা। নিজের দেশে ইংরেজ স্বাধীনতার ধারক, ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার শত্রু।

ইংরেজের চরিত্রে এখানে একটি বিচিত্র বিস্ময়। ইংল্যান্ডের মাটিতে যে ইংরেজকে মহৎ ও মনীষার শিখা রূপে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রশংসা করা নিতান্ত স্বাভাবিক, ইংল্যান্ডের পৃথিবীময় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকৃত স্থানে তার সে চেহারাটা আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

তার সেখানে প্রবল প্রতাপান্বিত রূপ, দুর্ধর্ষ দুর্বিনীত শোষকের চেহারা। হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বহীন, করুণাহীন।

সেই চেহারার সঙ্গে হিটলারের চেহারার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া ভার।

দুশো বছর ইংরেজের এই চেহারা ভারতবর্ষে।

তাই ইংল্যান্ডের যুদ্ধ ঘোষণায় যে কল্যাণব্রতী রূপ ছিল,— তার যতই রাজনৈতিক প্যাঁচ ও কূটনৈতিক কুটিলতা থাকুক, তবুও ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাইরে পৃথিবীর মানুষ তাতে আশান্বিত হয়েছে।

অথচ এই যুদ্ধ ঘোষণায় ভারতবর্ষ রোষে ফুঁসে উঠেছে।

ইংল্যান্ডের বেতারে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় জার্মানীর বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

কিন্তু এই ঘোষণার পূর্বাহ্নে কেন্দ্রীয় এসেম্বলী বা ভারতীয় জনসাধারণের নামমাত্র অনুমোদনেরও বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করলেন না।

তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা হিটলারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হলেও ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ইহা আদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। দাসজাতির প্রতি প্রভুর বজ্রকঠিন আদেশ।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনে হিটলারের প্রতি তিলমাত্র সহানুভূতি ছিল না। কেননা কংগ্রেসের সংগ্রাম ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধেও বিঘোষিত।

ইউরোপেও যখন ফ্যাসিজম ও নাৎসিজমের প্রতি প্রীতির মনোভাব ছিল, তখন থেকেই ইউরোপের মাটিতে রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র* ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, ফ্যাসিজম সভ্যতার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ববিরোধী জেহাদ।

কিন্তু তবুও, ভারতের অনুমোদন গ্রহণ না করে ভারতীয় জনসাধারণকে যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করার বিরুদ্ধে কংগ্রেসে গর্জন করে উঠলো।

এই গর্জন ইংরেজের বিরুদ্ধে এবং আসলে সকলপ্রকার ফ্যাসিজমেরই বিরুদ্ধে।

কংগ্রেসের মনোভাবটা অনেকদিন থেকেই স্পষ্ট। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে সুভাষ প্রখর ভাষায় এ কথা ব্যক্ত করেছিলেন। নেতৃবৃন্দ নানা বিবৃতি ও বক্তৃতায় দেশের নানাস্থানে ভারতীয় জনসাধারণের এই চিন্তাধারাটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন।

যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে

* অমিয় চক্রবর্তীর নিকট লিখিত সুভাষের চিঠি।

ভাইসরয় মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ জানালেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে গান্ধী ইংরেজকে সহায়তা করেছিলেন সর্বান্তঃকরণে, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামটাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ইংরেজের পক্ষে। ভারতবর্ষ তখন বিশ্বাস করেছিল, যুদ্ধের অবসান ঘটলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তার ভাগ্যে জুটবে। ইংরেজের প্রতিশ্রুতিও ছিল সেইরকম।

কিন্তু যুদ্ধের সমাপ্তিতে তার ভাগ্যে জুটেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ। স্বাধীনতা-কামী কোটি কোটি জনসাধারণের অপ্রতিরোধ্য ঝামেলাকে, বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে মৃত্যুর শ্মশানে ধ্বংস করতে চেয়েছিল ইংরেজ।

তাই আর একটা মহাসংগ্রামে ভারতকে বিনা অনুমোদনে টেনে নামানোর জন্যে কংগ্রেস ক্ষোভে ও প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল।

ভূগোলের সীমানা বা রাজনৈতিক কার্য-কারণের কোন সংস্পর্শ ছিল না ভারতের যুদ্ধ ঘোষণায়। হিটলারের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ থাকলেও শত শত মাইলের ব্যবধানের ফলে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কোন সুযোগ বা সার্থকতা ছিল না।

চারদিকের রুষ্ট প্রতিবাদে শঙ্কিত হলো সরকার। কূটনীতি মহলে পরামর্শ হলো, গান্ধীর যদি নৈতিক সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সরকারী প্রচারের মস্ত সহায় হবে।

যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীকে নিমন্ত্রণ জানালেন লিনলিথগো। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎকার ঘটলো যথানিয়মে। কিন্তু লিনলিথগো নিরাশ হলেন।

মহাত্মা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে হিটলারী তাণ্ডবলীলার বিরোধী, মিত্রশক্তির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিগত মতামত বা সমর্থনের কোন মূল্য নেই। ভারতবর্ষের সমর্থন লাভ করতে হলে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা ও আপস হওয়া দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না ঘটবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের নৈতিক সমর্থন ইংরেজ সরকার আশা করতে পারেন না।

যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে ইংরেজ অনিচ্ছুক। প্রভুর আদেশ নির্বিচারে পালন করবে দাসানুদাস ভারতবর্ষ, লিনলিথগোর এই মনোগত বাসনা।

এই মনের চেহারা যার, গণতন্ত্রের মুখোশটা সেখানে বীভৎস। হিটলারের সঙ্গে তার পার্থক্যটা চরিত্রগত নয়, সেখানে মূলগত ব্যবধান নেই। কংগ্রেস এই কথাটা বার বার ঘোষণা করতে লাগল।

আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিল। সকল প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে এল। মন্ত্রিত্বের প্রতি মোহ ছিল না কংগ্রেসের, তার সামনে দুটো সমস্যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক, সরকারের আপসবিরোধী অনমনীয় মনোভাব, দ্বিতীয়ত, মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল নীতি। মহম্মদ আলী জিন্না একদা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, সরোজিনী নাইডু তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সেতু। কিন্তু ক্রমশ দিনের পর দিন মহম্মদ আলী জিন্না রূপ পাল্টাতে আরম্ভ করেন। মিলনের সেতু তিনি ভেঙে শুধু চৌচিরই করেন না, হিন্দু ও মুসলমানকে ভয়ঙ্কর বিরোধিতা ও ঘৃণার শ্মশানভূমি দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক করাই হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী জীবনের একমাত্র সাধনা।

আশ্চর্য রূপান্তর।

হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত জন-সাধারণের সমষ্টিকে কংগ্রেস অনুভব করেছে ভারতীয় জাতি। ধর্মের বিভেদটা একজাতিত্বের বিচ্ছেদ ঘটায় না, অত্যন্ত সহজ বুদ্ধিতেই তা ধরা যায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিও তার প্রমাণ করে।

কিন্তু মিঃ জিন্না বুদ্ধিমান রাজ-নীতিজ্ঞ। তাঁর জীবন প্রমাণ করেছে ভাগ্যও তাঁর সুপ্রসন্ন। ইংরেজের প্রসন্নহস্ত তাঁর সর্বকালের বন্ধু। তাই রাজনীতির উচ্চাশায় তিনি ঘোষণা করেছেন, হিন্দু ও মুসলমানের কোন মিল নেই; মৈত্রী নেই; আত্মীয়তা নেই। পৃথক জাতিত্বের বিচ্ছিন্ন সীমানায় উভয়ের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। উপরন্তু, হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদী লোভের ফলে ইসলাম বিপন্ন!

মুসলিম লীগের প্রচারকৌশল ও সংগঠনের মধ্যে নিশ্চয়ই শক্তি ছিল, নতুবা স্বল্পকালের মধ্যে তার সভ্য ও সমর্থক-সংখ্যার বিপুলোন্নতি সম্ভব ছিল না।

তবুও বাংলা দেশে এ কে ফজলুল হক, পাঞ্জাবে সর্দার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ, সিন্ধুতে মৌলানা আল্লাবক্স ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস নেতা ডাঃ খান সাহেবের জাতীয়তাবাদী নীতির ফলে মুসলিম লীগ কোণঠাসা ছিল। কিন্তু ভাগ্য যার সহায়, তাকে কে রোধ করতে পারে? সিন্ধুতে আল্লাবক্স আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াৎ খাঁর মৃত্যু হলো এবং ১৯৪৩ সালে গভর্নরের চক্রান্তে বাংলায় ফজলুল হক পদচ্যুত ও বেআইনীভাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব লাভ করল। সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া প্রায় সব কটি মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশেই মুসলিম লীগ ক্ষমতা লাভ করলো বটে, কিন্তু তা রাজনীতির ঋজুপথে নয়, জন-সাধারণের হৃদয় আশ্রয় করেও নয়—

চক্রান্ত ও ইংরেজের সহায়তায় এবং কিছুটা স্বপক্ষ ঘটনাবিন্যাসে।

কংগ্রেসের সুনিবিড় প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে। কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতার স্বাক্ষর দেখেছে কংগ্রেসের কর্মপন্থায়, আদর্শে। সেখানে পথের মতানৈক্য ঘটলেও কংগ্রেস সম্পর্কে কারও মতানৈক্য ছিল না। ইংরেজ কংগ্রেসের এই চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে। তাই দেশের মধ্যে কংগ্রেসকে প্রবল শত্রুর মধ্যে দাঁড় করাতে না পারলে তার শান্তি ছিল না। মুসলিম লীগ ইংরেজকে সেই শান্তি দিলে। তাতেও খুশী-খুশী হয়ে ইংরেজ প্রচার [illegible] ভাগ করে বললে, কংগ্রেস তো সারা দেশের প্রতিনিধি নয়, আমরা কার সংগে আলাপ-আলোচনা করব? আগে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের একটা মীমাংসা হোক।

সেই মীমাংসা হলো ১৯৪৭ সালে, দেশ বিভক্ত হয়ে।

তার আগে কংগ্রেস বার বার গেছে জিন্নার গৃহে। সুভাষ, জওহর, আজাদ, গান্ধী বার বার চেষ্টা করেছেন। জিন্না সকল মীমাংসার ঊর্ধ্বে। দেশকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাগ না করে দিলে কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। কোন যুক্তি, কোন সৌজন্য, কোন রাজনৈতিক রীতির তিনি ধার ধারেন না, তাঁর একটিমাত্র দাবী, তিনি অচল, অটল।

বার বার নেতৃবৃন্দ নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছেন।

আর জিন্না সাহেব মুসলমান জনসাধারণের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে আদেশ দিয়েছেন, এক হও।

দূরে দূরে প্রান্তে এই আদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে, মসজিদে মসজিদে নামাজের শেষে মোল্লা-মৌলবীরা অগ্নিবর্ষী ভাষায় হিন্দু-বিদ্বেষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে গোপনে গোপনে মুসলমান জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। মুসলিম লীগের পতাকার নিচে সমবেত হয়েছে অগণ্য অশিক্ষিত মানুষের দল, তাদের মাথার উপরে শিক্ষিত রাজনীতিবাদীরা কড়া কড়া ভাষায় হিন্দু ও কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়েছে।

মহম্মদ আলী জিন্না হয়েছেন কায়েদ-ই-আজম। মুসলিম লীগের অবিসম্বাদী নেতা, ডিক্টেটর।

তিনি দাবী করলেন, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান চাই।

পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পথে হাজার হাজার শহীদের রক্তে স্নান করে কংগ্রেস যে নীতি, স্বপ্ন ও আদর্শের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, পাকিস্তানের দাবী তার প্রতি চ্যালেঞ্জ। ইংরেজের চ্যালেঞ্জের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়।

তাই কংগ্রেস বার বার আপস করতে এসে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৪৭ সালেও অনন্যোপায় হয়ে তাঁদের রাজী হতে হয়েছিল দেশ বিভাগের চুক্তিতে।

পাকিস্তান আজ বাস্তব সত্য। কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানে জাতির জনক। তিনি এখন মৃত, তাঁর সাধনা সার্থক।

তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক!

॥ ২৫ ॥

ক্রমশ যুদ্ধটা ইংরেজের পক্ষে সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। হিটলার অবলীলাক্রমে জয় করে নিতে লাগলেন ইউরোপের রাজ্যের পর রাজ্য, মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান শক্তি ফ্রান্সের পতন ঘটলো প্রথম আঘাতেই। খাস ইংল্যান্ডেও জার্মান বিমানের আকস্মিক আক্রমণের প্রচণ্ড ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, লণ্ডন শহর ধ্বংসলীলায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান সহজেই জয় করে নিলো ইংরেজ ও প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ঘাঁটিগুলি। ব্রহ্মের মাটিতে উড়লো জাপানী পতাকা, সিংগাপুরে লুপ্ত হলো ইংরেজ আধিপত্য।

ভারতের সীমান্তে এসে লাগল শত্রুপক্ষের সীমানা। কলকাতা ও ফেণী-চট্টগ্রামে জাপানী বিমানের বোমা পড়ল। সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতের বুক থেকে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত করে দেবার জন্য সশস্ত্রে ও সসৈন্যে প্রস্তুত হলেন। স্থাপন করলেন, অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের গভর্নমেণ্ট, 'আজাদ হিন্দ সরকার'।

চারদিকের এই বিপদের ঘনঘটায় ইংরেজ চঞ্চল হয়ে উঠল। শঙ্কিত হলো ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব সম্পর্কে। কংগ্রেসের সংগে একটা আপস করে তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জন করবার সদিচ্ছা জাগ্রত হলো। নতুবা আশংকা হলো, ভারতীয় জনসাধারণের আনুকূল্যে জাপান সহজেই জয় করে নেবে ভারতবর্ষ।

কিন্তু কে এই আপস-আলোচনা চালাবার মতো যোগ্যতা রাখে? ইংরেজের প্রতি ভরতীয়দের ঘৃণা সম্পর্কে ইংরেজ রাজনীতিবিদদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল।

তাঁরা জানতেন, দীর্ঘকাল ধরে ভারতের প্রতি নানা প্রতিশ্রুতি তাঁরা যেভাবে নির্বিবাদে ভেঙেছেন এবং নির্বিকারে দুঃশাসনের রথ চালিয়েছেন, তাতে তাঁদের প্রতি কংগ্রেস বা ভারতীয় জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আস্থাও থাকতে পারে না। এই দুঃসময়ে নজর পড়ল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রতি।

সদ্য তিনি রাশিয়া থেকে ফিরেছেন। রাশিয়াতে কম্যুনিস্ট সরকারের সঙ্গে তিনি যেরকম সাফল্যের সঙ্গে ইংরেজের চুক্তি সম্পাদিত করেছেন, তাতে মিত্রপক্ষের মস্ত কূটনৈতিক জয় হয়েছে। তাঁর এই সাফল্যে উৎফুল্ল হয়েছে ইংরেজ নরনারী, অজস্র অভিনন্দন ও জয়মাল্যে তিনি বরণীয় হয়েছেন স্বদেশে।

মনে হয়েছে, এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁকে সহজেই তুলে দেবে প্রধান মন্ত্রিত্বের আসনে। চার্চিলের পরে তিনিই হবেন ইংরেজ জাতির ভাগ্যবিধাতা।

ভারতের প্রতি তাঁর সহানুভূতি গোপন ছিল না, জওহরলাল নেহরুর তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আগে দুবার ভারত ঘুরে এসেছেন, মহাত্মা গান্ধীর সংগেও তাঁর পরিচয় আছে। এবং অনেকটা সোস্যালিস্ট মতবাদের জন্য ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট তাঁর কিছুটা জনপ্রিয়তাও বর্তমান।

তিনি তখন মন্ত্রিসভার সদস্য, কমন্স সভার নেতা।

ভারতীয় জনসাধারণের সংগে একটা আপস-প্রস্তাব আলোচনার জন্য তাঁকে নির্বাচিত করলেন বৃটিশ সরকার। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সংগে তাঁর পূর্ব-সৌহার্দ্য স্মরণ করে তিনিও তাঁর সাফল্য সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়েই ভারতে যাত্রা করলেন।

ইতিহাসের পাতায় একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের নিম্নাবতরণের সিঁড়ি তৈরি হলো।

ক্রীপস ইংল্যাণ্ডের উঁচুস্তরের ব্যারিস্টার। আইন জ্ঞান ও ঘটনা পর্যালোচনার নৈপুণ্য তাঁকে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর আইনজীবীরূপে খ্যাতি দিয়েছিল। তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাসও অত্যন্ত প্রবল। বুদ্ধি, জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের সংগে তাঁর চরিত্রে মিশেছিল সপ্রতিভ আন্তরিকতার বর্ণমালা। তাঁর প্রকৃতি সদাহাস্যময়, শোভন এবং প্রীতি-উজ্জ্বল। তাই তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সকলকেই আকর্ষণ করত, এই আকর্ষণের মাধুর্য দিয়ে তিনি খুব সহজেই প্রিয়বন্ধু হয়ে উঠতে পারতেন।

আপস-আলোচনার পক্ষে তাই ক্রীপস বোধ হয় সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন ইংল্যাণ্ডে। অন্তত সেই সময়।

কিন্তু তবু ক্রীপস ব্যর্থ হলেন, কেননা, ভারতবর্ষের স্বরাজ-সাধনা এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে, সুস্পষ্ট স্বাধীনতার শর্ত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা আর সম্ভব ছিল না।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতে পৌঁছবার পূর্বে কমন্স সভায় ১১ই মার্চ (১৯৪০) ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এক দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন।

চার্চিল সাহেব সুলেখক, সুবক্তা—ভাষার বর্ণালিপিতে তিনি বক্তব্যকে তাঁর ইচ্ছামত রূপ দিতে জানেন। বিবৃতিতে তিনি ব্যক্ত করলেন যে, জাপানের অগ্রগতিতে যে সর্বনাশা বিপদ উপস্থিত, তার থেকে ভারতের জনসাধারণকে রক্ষার জন্য ইংল্যান্ড উদ্‌গ্রীব। তদনুসারে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এক আপস-প্রস্তাব আলোচনার জন্য লর্ড প্রিভি শীল ও কমন্স সভার নেতা (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস) অবিলম্বে ভারত অভিমুখে যাত্রা করবেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের যে প্রতিশ্রুতি দীর্ঘকাল যাবৎ বৃটিশ গভর্নমেণ্ট রক্ষা করে এসেছেন, এই আপস-আলোচনায় তাই মূর্ত হয়ে উঠবে।

চার্চিল একদা মহাত্মা গান্ধীকে 'অর্ধনগ্ন ফকির' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দলের নেতা, ভারতবর্ষের স্বরাজ-আন্দোলনের মুখ্যতম শত্রু। তাই তাঁর প্রতি ভারতীয় জনসাধারণের একটা স্বাভাবিক বিরূপতা সর্বদাই ছিল, এখনও তার হ্রাস ঘটেনি। কিন্তু তবু সকলেই এবার আশা করতে লাগলেন যে, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে ইংরেজ রাজনীতিবিদেরা হয়তো একটা গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব করবেন। ক্রীপসের মনোনয়নে এই মনোভাবটা আরো সক্রিয় হয়ে উঠলো।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আশার সঞ্চার হয়েছিল। দু' পুরুষ ধরে ভারত যে আত্মত্যাগের সুকঠিন পথে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, মনে হয়েছিল, হয়তো এতদিনে অধিকাংশ স্বপ্ন সফল হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কারাবরণ ও শত শত শহীদের মৃত্যু-বরণের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বরাজ-সাধনা দুর্গম পথের দুঃসহ যাত্রা। মনে হয়েছিল, এই যাত্রার বুঝি শেষ হলো, বুঝি আমরা গন্তব্যের চূড়া দেখতে পেলাম।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের আচার, আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একটা বন্ধুত্বের আমেজ ও রঙ ছিল, যাতে জনসাধারণের এই আশাটা আরো বলবতী হয়ে উঠলো। তিনি বড়লাট প্রাসাদে না উঠে বাস করতে লাগলেন বে-সরকারীভাবে। কংগ্রেস-সভাপতি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ও নেতৃবৃন্দের সহাস্য চেহারা দিনের পর দিন প্রকাশিত হতে লাগল। ছবিতে যে মধুর হাসির মনোরম ভঙ্গী ছিল, প্রতিদিন জনসাধারণের মনে তা প্রবল প্রভাব ছড়িয়ে দিতে লাগল। সকলেই আশা করতে লাগলেন, ভারতের বন্ধু হয়ে এসেছেন ক্রীপস, ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবশ্য ঘটবে অচিরবিলম্বে।

অবিলম্বে ক্রীপস জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি প্রতিদিন সাঁতার কাটতে যেতেন পুকুরে, অসংখ্য মানুষ তাঁর পাশে ভিড় করে তাঁকে দেখতো। তাঁর হাসি, তাঁর বন্ধুর মতো ব্যবহার, তাঁর আন্তরিকতা একটা সবল রেখার মতো ঋজু আনন্দের প্রবাহ ছড়িয়ে দিলো মানুষের মনে। ভারত উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী খুব আশান্বিত হতে পারলেন না। স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হয়েছিল বছর দুই আগে, ওয়ার্ধায়, তাঁর আশ্রমে। অল্প-কিছুক্ষণের জন্য। সামান্য সে পরিচয় তিনি প্রায় বিস্মৃত হয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু জওহরলাল তাঁর কাছে নানা কথাবার্তায় ক্রীপসের খুব প্রশংসা করেন, ক্রীপস নাকি কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। তথাপি ক্রীপসের আপস-প্রস্তাব শুনে তিনি নিরাশ হলেন।

এই নৈরাশ্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট রূপ ধারণ করলো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায়। ক্রীপস প্রথমে কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রস্তাব শুনে মৌলানার মনে যখন নৈরাশ্য ভরে উঠেছে, তখন ক্রীপস তাঁকে জানালেন যে, প্রস্তাবানুযায়ী বড়লাটের যে মন্ত্রণাপরিষদ গঠিত হবে, তা হুবহু ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভার মতো।

ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভা কমন্স সভার নিকট থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছে দায়ী। মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতির প্রতিভূ ও শাসনাধিকারী। তাই মৌলানা আজাদ কিছুটা আশান্বিত হয়ে ১০ই এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ক্রীপস-প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা হলো। সকল শর্ত ও প্রতিশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হলো।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ক্রীপসের খুব আগ্রহ জন্মে। তিনি নানা-ভাবে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই গান্ধী শুধু সৌজন্য রক্ষার জন্য দিল্লীতে এসে ক্রীপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রস্তাবটি শুনে গান্ধী ক্রীপসকে বলেছিলেন, 'এই যদি আপনার প্রস্তাব হয়ে থাকে, তাহলে কেন আপনি কষ্ট

করে এসেছেন? এই যদি ভারতবর্ষকে দেবার মতো আপনার প্রস্তাবের পুরো চেহারা হয়, তাহলে পরবর্তী এরোপ্লেনে দেশে চলে যাবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাব।'

গম্ভীর ক্রীপস বলেছিলেন, 'আমি ভেবে দেখব।'

প্রস্তাবটিতে ভারতের গ্রহণযোগ্য বিধি-ব্যবস্থার একান্ত অভাব ছিল। কংগ্রেস প্রথম দৃষ্টিতেই প্রস্তাবটি প্রায় প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তবুও ক্রীপসের আগ্রহাতিশয্যে আলোচনা অর্থহীনভাবে স্তিমিত মেজাজে অগ্রসর হয়। জিন্না, লিয়াকৎ আলী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু ক্রীপস জানতেন, দেশের আসল প্রতিনিধি কংগ্রেস, তাই কংগ্রেসের প্রতিই তাঁর সর্বাধিক আকর্ষণ ছিল।

ক্রীপস-প্রস্তাবের দিকে শুধু সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টিই নিবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সকল দেশই এদিকে সাগ্রহে তাকিয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল জনসন এই উপলক্ষে ভারতে প্রত্যক্ষভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আসেন। দিল্লী বিমান বন্দরে অবতরণ করেই তিনি সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেন, 'ক্রীপস-আলোচনার খবর কি?'

ক্রীপস আলোচনার খবর বাইরে থেকে দেখতে মনোরম। প্রতিদিনই খবরের কাগজে সহাস্য ক্রীপস ও কোন বিশিষ্ট নেতার ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এ-ছবি আলোচনা অন্তের। অর্থাৎ এমন একটা ভাব তীব্রতর ভঙ্গীতে প্রচার করা, খবর শুভ, ক্রীপস এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, তাতে নেতৃবৃন্দ খুব খুশী।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে আলোচনা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো, ক্রীপস তা নিদ্বির্ধায় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মনের ভারসাম্যটা ব্যাহত হয়ে গিয়েছিল, চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেসকে বলছিলেন, স্বাধীনতার কথা। বোঝাচ্ছিলেন, এই প্রস্তাব যে অসম্পূর্ণ, তা তিনি জানেন, কিন্তু এই দৌত্য যদি সফল হয়, তাহলে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদাসীন হতে পারবেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবেন না। আবার ক্রুদ্ধ হয়ে ভয় দেখাতেও কসুর করেন নি, আভাসে জানিয়ে দিচ্ছিলেন, এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে নির্মম নিষ্পেষণে কংগ্রেসকে চুরমার করতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দ্বিধা করবে না।

কংগ্রেসের কাছে যে সুর, মুসলিম লীগের কাছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইঙ্গিতে পাকিস্থানের দাবীর সমর্থন জানিয়ে তাঁদের প্রবোধ দিচ্ছিলেন যে, প্রস্তাবে পাকিস্থান স্থাপন করবার সুযোগ রাখা হয়েছে।

তবু সব বিফল হলো। কংগ্রেস মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল প্রস্তাবটি সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য করল।

কৌশলে জয় করবার একটি কূটনৈতিক চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ক্রীপস ফিরে গেলেন মহাত্মা গান্ধী বললেন, 'অচল ব্যাঙ্কে একটি দূরবর্তী দিনের চেক নিয়ে এসেছিলেন ক্রীপস।'

ক্রীপসের আগমন ঘটেছিল আশার জ্যোতি জ্বালিয়ে। তাঁর প্রচার কৌশল, ব্যবহারের স্নিগ্ধতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁর প্রতি বিপুল জনসাধারণের আস্থা স্থাপিত হয়েছিল। জয়মাল্য ও জনপ্রিয়তার রাজপথ দিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার তৃষ্ণা যেখানে মৃত্যুঞ্জয় প্রাণপিপাসা জাগিয়ে তুলেছে, সেখানে শুধু কথার বাষ্প দিয়ে তো হৃদয় ভোলানো সম্ভব নয়। আসতে হবে আন্তরিকতায়, আসতে হবে অমৃত বারিধি নিয়ে। ক্রীপস এলেন ভুয়া বন্ধুর বেশ পরে, মেকি কথার হাওয়া উড়িয়ে, কূটনৈতিক কৌশলের পাল তুলে দিয়ে।

ইতিহাস প্রত্যক্ষ করল একটি সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের করুণ ব্যর্থতা। ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে নেমে এল নৈরাশ্যের অন্ধকার। ক্রীপস ফিরে গেলেন সেই অন্ধকার যবনিকার মধ্য দিয়ে। ফিরে গেলেন ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিতক্তে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কয়েক মাস পরেই ঘোষণা করলেন, 'ইংরেজ, ভারত ছাড়!' ভারত-বর্ষের আকাশে বজ্রে বজ্রে বিদ্যুৎ খেলে গেল, হৃদয়ে হৃদয়ে রোমাঞ্চ। স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতবর্ষ আবার বহ্নিমান হয়ে গেল।

॥ ২৬ ॥

বিফলমনোরথ স্যর স্টাফোর্ড ভারত ত্যাগ করলেন। তাঁর সুগভীর আত্মপ্রত্যয় ছিল বলেই নৈরাশ্যের আলোড়নটা তাঁর ব্যক্তিত্বকে নাড়া দিয়ে গেল। কংগ্রেসের সহযোগিতা তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল বন্ধুত্বের দাবীতে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু স্যর স্টাফোর্ড তো ব্যক্তিগতভাবে অতিথি হন নি তাঁর বন্ধু জওহরলাল নেহরুর দেশে, তিনি এসেছিলেন প্রভুজাতির প্রতিভূ হয়ে পরাধীন জাতির কোটি কোটি মানুষের জীবন-বাঁচনের প্রশ্ন নিয়ে। যেখানে জাতীয় প্রশ্ন সেখানে ব্যক্তিগত প্রীতিই যদি সর্বাধিক মূল্যবান হয়, তাহলে 'কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে বিবেচিত হতেন দেশদ্রোহীরূপে।

আপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো কংগ্রেস, ক্রীপসের দৃঢ়মূল আশা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আশাভঙ্গ থেকে জন্ম ক্রোধের। ক্রীপসের এই ক্রুদ্ধ মনের চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠলো তাঁর নানা অযৌক্তিক কটূক্তিতে। তিনি বল্লেন, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলেই তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কংগ্রেসের অনমনীয় নির্বুদ্ধিতার জন্যই ব্রিটেনের এমন সদাশয় রাজনৈতিক উপহার অগ্রাহ্য হলো।

জওহরলালের উত্তর এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বল্লেন, 'অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ক্রীপসের মতো লোকও শয়তানের দূতরূপে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারেন।' দেশের স্বাধীনতা চেয়েছে কংগ্রেস, ক্রীপস পরম বন্ধুর বেশে কংগ্রেসকে লোভ দেখিয়েছে বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের কতকগুলো ক্ষমতাহীন সভাপদের চকমকি অলঙ্কার। যুদ্ধের বিপদে সন্ত্রস্ত হয়ে কংগ্রেসের সহ-যোগিতা লাভের একটি বিচিত্র কূটনৈতিক ফন্দি ফেঁদেছিল ব্রিটিশ সরকার। কংগ্রেস সে মায়ামৃগ দেখে ভোলে নি। দিল্লী ও লণ্ডনের বেতারে এবং ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভায় পর্যায়ক্রমে তাই ক্রীপস, আমেরি ও চার্চিল রোষদৃপ্ত ভঙ্গীতে শাসিয়েছেন কংগ্রেস বেয়াদব, ভারতীয়দের আমরা দেখে নেব।

ক্রীপস যখন এলেন, দেশের চারদিকে তখন আশার নতুন সূর্যালোক। কিন্তু তখনই মহাত্মা গান্ধী বুঝেছিলেন, ব্রিটেনের প্রস্তাব ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়। ক্রীপস যখন চলে গেলেন, দেশের চারদিকে তখন নৈরাশ্যের অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী জ্যোতির্ময়কে আহ্বান করলেন, তিনি ঘোষণা করলেন, 'ইংরেজ ভারত ছাড়!'

ভারতবর্ষের অর্ধ শতাব্দীর সাধনা একটি অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ করলো। 'ইংরেজ ভারত ছাড়! কুইট ইণ্ডিয়া।' স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করলেই ইংরেজের পুলিস গুলী করে হত্যা করেছে ভারতীয়দের। শত শত শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু পরিত্যাগ করেন নি দেশ-মাতৃকার জয়ধ্বনি। এই জয়ধ্বনি ক্রমশ নির্ভয় নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার দৃপ্ত তেজে জ্বলে উঠলো। মহাত্মা ঘোষণা করলেন, ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতীয়দেরই ব্যাপার, ইংরেজ ক্ষমতা ত্যাগ করে চলে গেলেই এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সুহৃদ মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই ভারত ছাড় পরিকল্পনাটি কখন আপনার মনে জেগে উঠেছিল?'

মহাত্মা জবাব দিয়েছিলেন, 'ক্রীপস চলে যাবার অল্প কিছুদিন পরে হোরেস আলেক্সাণ্ডারকে তাঁর একটি চিঠির উত্তর লিখেছিলাম। তখনই এই চিন্তাটা আমার মাথায় ঢোকে, তারপর এই সম্পর্কে প্রচার চলতে থাকে। পরে আমি একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রচনা করি। আমার প্রথম অনুভূতি ছিল—ক্রীপস-ব্যর্থতার একটা প্রতিক্রিয়া একান্ত আবশ্যক। ধরুন, আমি তাঁদের ভারত ত্যাগ করতে বল্লাম। বহুদিন ধরে আমাদের মনে যে অত্যুচ্চ কামনা ব্যাহত হয়ে গভীর দাগ কেটে বসেছিল, এই

সংকল্পটা তার থেকেই জন্ম নেওয়া। ইংরেজদের উপস্থিতি আমাদের অগ্রগতির অন্তরায়। সোমবারের মৌন-দিবসে এই পরিকল্পনাটা আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে।'

মৌনদিবস সাধনা ও আত্মোপলব্ধির দিন। ভারতের সাধনা ও আত্মোপলব্ধি জাতির জনক গান্ধীর কণ্ঠে প্রখর সূর্যালোকের মতো জ্বলে উঠলো, 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। ইংরেজ ভারত ছাড়।'

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 'ভারত ছাড়' মন্ত্রটি ভারতের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। মহাত্মা ঘোষণা করলেন, 'ভারতে যে কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটুক, ভারতবর্ষের এবং ইংল্যাণ্ডেরও যথার্থ কল্যাণ নির্ভর করছে ইংরেজের সময়োচিত ও শৃংখলাবদ্ধ ভারত ত্যাগের উপর।' ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে ভারত সচিব আমেরি কমন্স সভায় একটি দীর্ঘ কটূক্তিতে পূর্ণ বক্তৃতা করেন। মহাত্মা তার জবাব দিলেন অনতিবিলম্বে, 'ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা কেন স্বীকার করেন না, এই অন্তর্দ্বন্দ্বটা ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার? ইংরেজ ভারত পরিত্যাগ করে যাক। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলগুলি নিজেদের স্বার্থের জন্যই মিলিত হবে।' মহাত্মা আরও বল্লেন, শ্বেত জাতির অহমিকা যদি লুপ্ত না হয়, তাহলে গণতন্ত্র ও সভ্যতা রক্ষার বাকাড়ম্বর উচ্চারণ করার কোন অধিকারই তাঁদের থাকতে পারে না।'

এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চারদিনব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভায় মহাত্মা গান্ধী রচিত প্রস্তাবটি আলোচিত হলো। মহাত্মা স্বয়ং সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তিনি তাঁর প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আলোচনায় প্রস্তাবটি পুংখানুপুংখ বিবেচিত হলো, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার ব্যাখ্যা হলো। অবশেষে কিছু পরিমার্জিত রূপে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

এলাহাবাদ অধিবেশনের দু' মাস পরে ওয়ার্ধায় ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনরধিবেশন বসল। সেই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল 'দিনের পর দিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে এবং জনসাধারণ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, তা' থেকে কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান না ঘটলে এই সংকটপূর্ণ অবস্থার অবসান হবে না। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এবং ভারতকে শত্রুহস্ত থেকে রক্ষা করবার জন্য অনতিবিলম্বে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর একান্ত আবশ্যক। ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যাবার অর্থ এই নয় যে, সব ইংরেজই ভারত ছেড়ে চলে যাক। বস্তুত সদিচ্ছার সংগে শাসনভার হস্তান্তরিত হলে ইংরেজদের ভারতে থাকার কোন বাধাই নেই। এই আবেদন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সংগে কংগ্রেস অহিংস সংগ্রামে অর্জিত সকল শক্তি নিয়ে এই রাজনৈতিক দাবী পূরণ ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হবে।'

দুর্গম যাত্রাপথের জন্য দেশপ্রাণ নরনারী প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলেন। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আসন্ন, দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এই দুর্নিবার প্রতিজ্ঞায় প্রতিটি দেশসেবকের হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!'

ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশ জাপানের করতলগত হয়েছে। সেখানে ব্রিটিশ শাসন সম্পূর্ণ লুপ্ত, জাপানের তীব্র আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় ইংরেজ বাহিনী পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেছে। ব্রিটিশের পলায়ন ঘটেছে হতলজ্জার কলংক-কালিমায়।

কিন্তু কেবল পরাজয়ের মধ্যেই ইংরেজের জয়স্তম্ভ ভেঙে পড়ে নি, ইংরেজের শাসন ও রক্ষার ক্ষমতা কতো ভিত্তিহীন, কতো অক্ষম ও অপদার্থ—বর্মাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। জাপানী আক্রমণের আগেই সেখানে প্রবল ভীতির সঞ্চার হয়, ব্রহ্মদেশীয় নাগরিকরা উন্মত্তের মতো আচরণ আরম্ভ করে, প্রবাসী ভারতীয়েরা প্রাণভয়ে মাতৃভূমির দিকে পলায়ন করতে থাকে। ইউরোপীয়দের পলায়নের ব্যবস্থা যথাযথ সুব্যবস্থায় পালিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয়দের লাঞ্ছনার সীমা থাকে নি। সারা জীবনের সঞ্চয় ফেলে তারা প্রাণের দায়ে ছুটে এসেছে, অত্যধিক ঐশ্বর্যবানরা ছাড়া অধিকাংশ মানুষের না জুটেছে উড়োজাহাজে স্থান, না জুটেছে জল-জাহাজের টিকিট। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবার সহ তারা দুর্গম পথে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে এসেছে, পথে কিছু মারা পড়ে রোগযন্ত্রণায়, কিছু নিহত হয়েছে চোরডাকাতের আক্রমণে। অবশেষে হাজার হাজার মৃতপ্রায় নরনারীর মিছিল এসে ভারতে পৌঁছায়, তাদের অধিকাংশ দুর্দশার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের চেহারা দেখে দেশের সর্বত্র গভীর সমবেদনা তো জাগেই, ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট রোষও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজের চেহারা দেখেছে ভারতবর্ষ লোভী নির্মম রাজপুরুষের। সেখানে দয়ামায়া নেই, বাণিজ্যের মানদণ্ডের বিচার করে তাঁরা শাসন চালিয়ে গেছেন। শাসন শুধু

শোষণেরই যন্ত্র। শোষণে অর্জিত স্ফীতকায় ঐশ্বর্যভাণ্ডার নিয়ে তাঁরা ইংলণ্ডে পৃথিবীর বৃহত্তম জমিদার হয়েছেন, প্রজা ভারতবর্ষের দিকে মানবীয় দৃষ্টিপাত করার প্রবৃত্তি হয় নি। যেখানে স্বাধীনতার তৃষ্ণা জেগেছে, সেখানে নির্মম নিষ্পেষণে তার আমূল উচ্ছেদ করার ব্যাপকতম চেষ্টা হয়েছে। পুলিসের লাঠি চালনা, পাইকারী জরিমানা, দীর্ঘ দিনের কারাদণ্ড এবং সৈন্যবাহিনীর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ যত্রতত্র ঘটেছে। মানুষের জীবনের কোন মূল্যায়ন থাকে নি, পশুর পালের যতটুকু দাম তার থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনচেতা স্বেচ্ছাসেবকদের বেশি মূল্য ছিল না শাসকদের বিচারে।

১৯০৫ থেকে প্রায় দু' পুরুষ এই চিত্র ভারতবর্ষের। দু' পুরুষ ধরে শত শত শহীদকে যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে, কিন্তু পরশাসনের নিষ্ঠুর যন্ত্রকে নির্বাসিত করতে পারে নি। পারে নি তার একটা কারণ অস্বীকার করে লাভ নেই যে, জনসাধারণের একটা বিপুল অংশে 'মহারাণীর' রাজত্বের প্রতি সম্ভ্রম প্রীতি ও সভয় ভক্তি ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ও সচ্ছল জীবনের মোহে তারা ইংরেজের শুধু বশ্যতা স্বীকারই করে নি, আজানুনমিত হয়ে তাঁদের পদসেবা করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা যতই ভারতের কাছে এসে পড়তে লাগল, এই সভয় আনুগত্যটাও ভেঙে চুরমার হতে লাগল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ব্রহ্মদেশে ইংরেজের অভূতপূর্ব পরাজয় জনসাধারণের মনে ইংরেজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। মিশরে ও অন্যান্য রণক্ষেত্রে হিটলারের অবিশ্বাস্য জয়লাভের দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটতে লাগল ভারতের পল্লী ও শহরবাসী মানুষের মনে।

এই পটভূমিকায় মহাত্মা গান্ধী আহ্বান করলেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' দেহের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়েও দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করতে হবে। ভারতবর্ষে আশ্চর্য আলোড়ন জাগল।

৮ই আগস্ট ১৯৪২ কংগ্রেস অধিবেশনের তারিখ। এই অধিবেশন ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে, সংবাদসেবী হিসাবে আমরা তা অনুমান করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যে গোপন ষড়যন্ত্র করে ৯ই আগস্টকে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে যাবার ব্যবস্থা করবেন, আমরা তা সামান্যমাত্রও আন্দাজ করতে পারি নি।

যথানিয়মে আমাদের বোম্বে যাত্রার আয়োজন করা হল। আগামী আন্দোলন দেশের সর্বশেষ মুক্তি-সংগ্রাম হবে, তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল না। এই সংগ্রামে আমাদের যথাযোগ্য কর্তব্য সম্পাদন করার নানা পরিকল্পনা আরম্ভ করে দিলাম। আশা ছিল, হাতে কয়েক মাস সময় আছে, ভারতের সর্বত্র সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের আরো সুষ্ঠু ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। যেহেতু 'রয়টার' ইংরেজ প্রতিষ্ঠান, তাই তাঁরা প্রচারের মাধ্যমে আন্দোলনের অনিষ্ট সাধন করার চেষ্টা করবে, এমন আশঙ্কা অযৌক্তিক নয়। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতায় এই রকম ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে। ইউনাইটেড প্রেস ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, তাই মুক্তিযুদ্ধের আপৎকালে আমাদের কর্তব্য অনন্যসাধারণ দায়িত্বশীল। ইংরেজের চণ্ডনীতির বেড়া অতিক্রম করে ভারতের সকল সংবাদপত্রে মুক্তিকামী দেশের খবর পৌঁছে দিতেই হবে। পৌঁছে দিতে হবে নেতৃবৃন্দের নির্দেশ, জনসাধারণের নির্ভয় আত্মত্যাগের কাহিনী। স্বাধীনতার প্রেরণা সংবাদ লেখার ফাঁকে ফাঁকে তুলে ধরতে হবে।

মনের মধ্যে যৌবনের স্বাদ পেতে লাগলাম। ছেলেবেলার আশ্চর্য গণ-সংগ্রামের সব স্মৃতি ভেসে বেড়াতে লাগল। বোম্বেতে যখন পৌঁছলাম, তখন ঐতিহাসিক অধিবেশনের আর বিলম্ব নেই। সব প্রদেশ থেকে এসে পৌঁছেছে কর্মীর দল, সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ এসে উপস্থিত হচ্ছেন। সকলেই অধীর আগ্রহে উৎসুক, সকলের রক্তেই মহাত্মার রণভেরী দুঃসহ শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে। সকলেই জানতে চায়, আন্দোলন কবে শুরু।

ভারতের সর্বত্র আন্দোলনের নিশানা পৌঁছে গেছে। কিন্তু প্রস্তুতি শেষ হয় নি। বোম্বে অধিবেশনে মহাত্মার প্রস্তাব পাশ হবে, তারপর বড়লাটের দরবারে মহাত্মা স্বাধীনতার দাবী পেশ করবেন। ইংরেজ সে দাবী পদদলিত করবে নিঃসন্দেহে। তখন, একমাত্র সে সময়, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করবে।

সকলেই সময়ের হিসাব কষছিলেন। এক মাস, না দু' মাস? কিন্তু কেউ জানতো না, নিঃশব্দে বড়লাটের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করার প্রত্যক্ষ প্ররোচনা চাপিয়ে দেবার দিন নির্দিষ্ট হয়েছে ৯ই আগস্ট।

৮ই আগস্ট, ১৯৪২।

ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের স্বর্ণখচিত উজ্জ্বল দিন। ধুবীতলায় কংগ্রেস অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ সমবেত, তাঁদের মুখ আগামী সংগ্রামের প্রভূত সাহসে ভাস্বর। সারা দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত, মুক্তিযুদ্ধের তেজ তাঁদের চেহারায়।

মহাত্মা গান্ধী অধিবেশনে বক্তৃতা দিলেন। বুদ্ধের মতো সদাহাস্যময় প্রশান্ত মূর্তি। অহিংসা ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক। ভারতের এক ঐতিহাসিক যুগের সর্বজনঅধিনায়ক বাপুজী। কী আশ্চর্য তাঁর

কণ্ঠ, তাঁর বাগ্‌বিস্তার। প্রতিটি শব্দ মর্মমূলে খোদিত হয়ে যায়, প্রতিটি বাক্য দেহে শিহরণ আনে।

তিনি বল্লেন ঃ 'যদি চিন্তায় সম্ভব নাও হয় তবুও কার্যে অহিংস থাকুন। আপনাদের কাছে আমার এই ন্যূনতম দাবী।'

বল্লেন, 'যদি আপনাদের মনে সামান্যতম সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে থাকে, তাহলে এই সংগ্রাম বাতিল করে দিন।'

'আমি যেমন কখনো ভাবি না, তেমনি আপনারাও ঘৃণাক্ষরে ভাববেন না যে, ইংরেজ হেরে যাবে। ইংরেজ কাপুরুষের জাতি—একথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। আমি জানি, পরাজয় বরণ করার আগে ব্রিটেনের প্রতিটি মানুষ আত্মাহুতি দেবে।'

'আমি চাই আপনারা অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করুন। আমার কাছে অহিংসা ধর্মবিশেষ, কিন্তু আপনারা অন্তত নীতি হিসাবেও অহিংসাকে গ্রহণ করবেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মতো সম্পূর্ণরূপে একে মেনে নিতে হবে এবং যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন, তখন মৃত্যুপণ করেও অহিংস থাকতে হবে।'

হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার সংগ্রাম। কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের। অন্যায় ও মনুষ্যত্বহীনতার বিরুদ্ধে সত্য ও মানবতার।

এই সংগ্রাম কি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার? আমি সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে বসে তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম। নাকি এই সংগ্রাম আরও ব্যাপক ক্ষেত্রের ও বিপুলকালের সীমানা পেরিয়ে সকল মানবজাতির স্বর্গ-আবিষ্কারের জয়যাত্রা?

অধিবেশন থেকে ফিরে এলাম বেশ রাত্রিতে। সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করে যে দেশসেবার স্বেচ্ছাসেবকতা বরণ করেছি, মনে মনে অনুভব করছিলাম তার সুকঠোর দিনগুলি আসন্ন। সকল ভয় ও বেদনাকে উত্তীর্ণ করে দেশের কাজে যেন যথার্থই আসতে পারি, মোটরযোগে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের পথে কেবল এই প্রার্থনাই মনে মনে গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

কিন্তু রাত্রেই ফোন বেজে উঠলো বাড়িতে। সাংঘাতিক খবর। সহকর্মীর উত্তেজিত কম্পিত কণ্ঠ ভেসে এলো ফোনের মধ্য দিয়ে, 'বাপুজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যদের হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাত্রিতেই গোপন বন্দি-শিবিরে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আন্দোলন আরম্ভ হবার আগেই মহাত্মা ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার! আশ্চর্য। কিন্তু ভারতবর্ষ শতাব্দীর গ্লানি মুছে ফেলার জন্য রুদ্ধ উত্তেজনায় অধীর। ইংরেজের এই আকস্মিক প্ররোচনায় দেশে কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে? ইংরেজের কূট-নীতি কী এবার কাপুরুষতার আশ্রয় নিলো?

৮ই আগস্টের শেষরাত্রে মহাত্মা ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। ৯ই আগস্ট ভোরে আগুন জ্বলে উঠলো বোম্বে শহরে। এ আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো দিগদিগন্তে ভারতের নানা প্রান্তে, শহরে, গ্রামে, বালিয়া চিমুর মেদিনীপুরে।

বেয়নেট আর বোমা কী ধ্বংস করতে পারে স্বাধীনতা-তৃষ্ণার রক্তবীজ? শহীদের রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল আর আগুনের তাপে আকাশ অরুণাভ। বহ্নিমান ৪২' জন্ম নিলো ৯ই আগস্ট।

সকালে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহরের নতুন চেহারা। কাজকর্ম বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ, হরতাল। লোকে লোকারণ্য পথ মানুষের ঢেউ আর ঢেউ। ইঁট ছুঁড়ে আর গাছপালা ভেঙে রাস্তা বন্ধ। ট্রাম থেকে লোক নামিয়ে দিচ্ছে। উন্মত্ত আবেগে জনতা অস্থির চঞ্চল উদ্বেল।

ভ্যানে করে পাহারারত পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে, জনতা তাদের প্রতি ইঁট ও জুতো ছুঁড়ে মারছে। লাঠি চলছে পুলিসের তরফ থেকে, জনতার পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর হচ্ছে ইঁটবর্ষণ। সরকার ও জন-সাধারণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে সকাল থেকেই।

অনেক কষ্টে দাদার স্টেশনে পৌঁছতে পারলাম। যে কোনভাবেই হোক অফিসে আমাকে পৌঁছতেই হবে। অবিশ্বাস্য ঘটনার মিছিল ঘটছে সর্বত্র, তার প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা করতেই হবে।

তখনো পুলিস পাহারায় যে ইলেক-ট্রিক ট্রেন চলছিল, তাতে চেপে অফিসে পৌঁছলাম। বিভিন্ন অফিসের খবর আসতে লাগলো, রিপোর্টাররা ছুটে বেড়াতে লাগলেন, ফোনে ফোনে নানা সংবাদ এলো। প্রথম দিনেই বিচিত্র ঘটনা আরম্ভ হয়ে গেল।

নানাস্থানে পুলিসে জনতায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটেছে। থানা ও আদালত ঘেরাও করেছে জনসাধারণ। লাঠিবৃষ্টি ও গুলি-বর্ষণ করেছে পুলিস। ট্রেন আটক। কংগ্রেস ভবন ভস্মীভূত। থানা অধিকার করে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন। টেলি-গ্রামের তার ছিন্ন।

বিদ্রোহী ভারতবর্ষের প্রথম দিনের চেহারাই ভয়ংকর।

মহাত্মা যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতেন, তা হতো নৈতিক বলে দুর্নিবার। যেখানে হিংসা ও উন্মত্ততার স্থান থাকতো না। শত শত নরনারী তাতে প্রাণ দিতেন, কিন্তু প্রতিশোধের অন্ধ উচ্ছৃংখলতা তাতে কখনোই এমন ঝড়ের মতো আসতে পারতো না।

লর্ড লিনলিথগো ধৈর্য রাখতে পারলেন না। মহাত্মা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, বড়লাটের নিকট তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করার আগে পত্রালাপ করবেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু বড়লাট অবিবেচক অসহিষ্ণুতায় অধীর হয়ে তার আগেই মহাত্মা ও নেতৃবৃন্দকে অজ্ঞাত বন্দিশালায় প্রেরণ করলেন।

মহাত্মার সংগ্রাম আরম্ভ হতে পারলো না।

জনসাধারণ নেতৃবিহীন আবেগের স্রোতে হিংস্র ও উন্মত্ত হয়ে গেল। এক বিচিত্র স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন আরম্ভ হলো। পূর্বে কখনো এমন আন্দোলন ঘটে নি ভারতের ইতিহাসে।

অফিসে খবরের ফাইলের মধ্যে সারা-দিন চলে গেল। খাওয়া-দাওয়া হতে পারলো না। বিকেলে বেরোলাম কোথায়ও চা খাওয়া যায় কি না।

গুজরাটি রেস্তোরাঁ 'পুরোহিত রেস্টুরেন্ট' বোম্বে শহরের একটি খ্যাত-নামা খাবারের দোকান। সেখানে গিয়ে একটা নিরিবিলি টেবিলে বসতে যাব,

হঠাৎ চোখো-চোখি হয়ে গেল দেশবন্ধু গুপ্তের সঙ্গে।

লালা দেশবন্ধু গুপ্ত দিল্লীর প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক, 'তেজ' পত্রিকার সম্পাদক। দিল্লী কংগ্রেসের তিনি পুরোধা নেতা। তাঁর সঙ্গে বসে আছেন অরুণা আসফ আলি।

চোখে চোখে ইঙ্গিত হলো। আমি উঠে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে এক কেবিনে ঢুকলাম।

ব্যারিস্টার আসফ আলি কবি ও কংগ্রেস নেতা। তাঁর স্ত্রী বাঙালী মহিলা শ্রীমতী অরুণার জীবন বিচিত্র ঘটনামালায় হীরার মতো দ্যুতিময়।

'বহ্নিমান ৪২' অরুণাকে অসমসাহসী নেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগুনের স্রোতের মতো তিনি আন্দোলনের ধারায় ধারায় দেশের সর্বত্র প্রেরণার উৎস হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তার আগে তিনি ছিলেন দিল্লী কংগ্রেসের প্রভাবশালী কর্মী। তাঁর সঙ্গে আমার আগেই বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁর হৃদয়ের গভীরে এমন আশ্চর্য উত্তাপ আমি লক্ষ্য করতাম, মনে হতো তিনি অসাধারণ কিছু সম্ভব করবেন।

দেশবন্ধু খাবারের অর্ডার দিলেন। অরুণা বল্লেন, বোম্বে পুলিস এখনও তাঁদের চিনে উঠতে পারে নি, নতুবা এতক্ষণে তাঁদের জেলে পোরা হত।

দেশবন্ধু দীর্ঘকায় সুন্দর সুপুরুষ। অরুণা তাঁর ভাবময় চোখ, কুঞ্চিত কালো চুল ও আশ্চর্য নয়নাভিরাম চেহারা নিয়ে অনন্যসাধারণ। তাঁদের দুজনের চেহারাই এমন যে, বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখা মুশকিল। তাঁদের দিকে চোখ পড়লে চোখ ফেরে না, মন চিনে নেয় তাঁদের পরিচয়।

দেশবন্ধুর ইচ্ছা দিল্লীতে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছবামাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। তাই এখনও মনস্থির করে উঠতে পারছিলেন না।

দেশবন্ধু ও অরুণা দুজনেই জানালেন, মহাত্মার নির্দেশানুযায়ী তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সে-সম্পর্কে কাজকর্ম আরম্ভও করে দিয়েছেন।

অরুণা প্রায় সর্বক্ষণ কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'আপনার কোলকাতা যাওয়ার সময় কিছু কাগজপত্র আপনার সঙ্গে পাঠাব।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যত ট্রেনের গোলযোগে বোম্বেতে আমাকে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। তার আগেই অরুণা কাগজপত্র কীভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৯ই আগস্ট থেকে অরুণা আত্মগোপন করেছিলেন। সারা দেশে ঘুরেছেন তিনি। তাঁর অমন বৈশিষ্ট্যময় সুন্দর চেহারা নিয়ে সর্বত্র সমাজের সর্বস্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

দীর্ঘকাল পরে যখন দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে এবং তাঁর প্রতি পরোয়ানা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তখন কলকাতার জনসভায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মাঝে মাঝে অরুণাকে আমি দেখতে পেতাম। বিচিত্র সব সাজে সজ্জিতা। কখনো মুসলমান, কখনো পার্শী, কখনো গুজরাটি।

সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের একটি জরুরী স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠক বসেছিল বোম্বের তাজ হোটেলে ৯ই আগস্টের বেশ কিছুকাল পরে।

হঠাৎ দেখি অরুণা। সালোয়ার পরা, পার্শীর মতো হ্যাট মাথায়, স্কার্ফ বাঁধা। কিন্তু আমার চিনতে কষ্ট হয় নি। অরুণার দিকে তাকিয়ে হাসতে যাবো, অরুণা চোখের ইঙ্গিতে জানালেন আমার এই চিনতে পারাটা গোপন রাখতে।

চারদিকে হয়তো ছড়িয়ে আছে সি আই ডি-এর অনুচরেরা। কিন্তু ছায়ানুসরণকারীরা বৃথাই খুঁজে বেড়ালো তাঁকে, তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন।

কলকাতায়ও কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মীদের দিয়ে তিনি আমাদের কাছে খবর ও অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাতেন।

'৪২-বিপ্লবের' বহ্নিময় দিনগুলিতে আমার বাড়িতে আর একজন সাংবাদিক-বিপ্লবী আসতেন। তিনি শ্রীমাখনলাল সেন।

মাখনলাল আমার কাছে অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয়। বাংলা দেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কর্মকুশলতা, সাহস ও নিষ্ঠা অতুলনীয়। সেই আন্দোলনের দিনে তিনি একাগ্র হৃদয়ে বিপ্লব সংগঠনে আত্মোৎসর্গীত। একমাত্র ধ্যান এবং একমাত্র চিন্তা—'ইংরেজ, ভারত ছাড়'।

তিনি প্রায়ই গুজরাটি ভদ্রলোকের পোশাক পরে আসতেন। মাথায় একট টুপি চড়ান থাকত। তাঁর আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের বালাই ছিল না, শুধু কাজ আর কাজ। কলকাতার নানা স্থানের খবর দিতেন এবং অন্যান্য খবর নিতেন। মাঝে মাঝে গোপনীয় প্রচারপত্রের খসড়া তৈরি করতেন।

আমি তখন সতীশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে থাকতাম। দোতলা থেকে রাস্তা দেখা যেত। প্রায়ই দেখতাম, বিশেষ লোকেরা পাহারা দিচ্ছে আমার বাড়ি। ছায়ার মতো তাদের অস্তিত্ব, সর্বদা সর্বক্ষণ।

বুঝলাম, টিকটিকি লেগেছে বাড়ির পেছনে।

তাই সম্মানিত অতিথিদের নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করে দেওয়াটাই ছিল আমার পক্ষে সব থেকে উদ্বেগজনক। তাঁদের গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার অর্থ দেশের সমূহ ক্ষতি। (ক্রমশ)

পশ্চিম বাংলার উত্তরখণ্ড

পুলকেশ দে সরকার

॥ ৩ ॥

সুবলসখা আমাদের নিয়ে বামন-পোকরি বনে ঢুকলেন। শান্ত, ধীর নুষটি। সেগুন, শাল, বনজ নিয়ে ও'র রবার। হয়তো বন্য জন্তুও। কিন্তু কদল সাংবাদিককে মুখোমুখি দেখা র ঘনিষ্ঠভাবে মেশা এই বোধ হয় প্রথম। হেব আছে, বাঙালী আছে, ধুতি-ঞ্জাবীর বাঙালী আছে, স্যুট-পরা ঙালী আছে। কে কি রকম, কে জানে? দের প্রশ্নে প্রশ্নে (হয়তো অনভিজ্ঞতারও) র চোখে ঔৎসুক্য বাড়ে, ও'র টানা-টানা খে। হেসেই উত্তর দেন এবং হয়তো রর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা করেন।

'সেগুন-শালে তফাৎ কি মিঃ মণ্ডল?'

শ্রী সুবলসখা মণ্ডল হেসে জবাব দেন, গাছের বাকল খেয়াল করুন। বামন-পোকরিতে সব সেগুন। শালের গা কুমীরের মতো কর্কশ, লম্বা চিরটানা। সেগুনের গা মসৃণ।

পাতা?

পাতারও পার্থক্য আছে। মণ্ডল বলতে লাগলেন, সেগুন বাংলা নাম, আসলে ও বর্মার টিক। টিক বা সেগুন জাতীয় নয়, বিজাতীয়। বর্মা থেকে এনে এখানে লাগানো হয়েছে প্রথম ১৮৬৮ সালে। ফল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু উদ্যোক্তাদের উৎসাহ যেন নিভে গেল। ১৮ বছরের ভেতর ওঁরা আর ওমুখো হ'লেন না। একশ বছরে একটি সেগুন গাছের পরিপুষ্টি হয়।

একশ—বছর? চক্ষু চড়কগাছ ক'রে আমরা জিগগেস করলাম। এ যে—

মণ্ডল বললেন, বনবিভাগে নিঃস্বার্থ কাজ। ব'লে হাসলেন খানিকটা। শতায়ুরা হয়তো দেখতে পান, চাকুরেদের চার পুরুষ লাগে সেগুন-চারার পরিণতি দেখে যেতে।

এসব বনে বাঘ থাকে?

থাকে। হাতীও।

সেগুন বনের কাঁচা পথ দিয়ে আমরা চলেছি। একটা স্টেশন ওয়াগন, একটা ট্রাক। মাঝে মাঝে সাইনপোস্টে সাল-চিহ্ন, কোন্ সালের বন।

'১৮৮৬ সালে আবার শুরু হয় সেগুনের চাষ। বাংলার বাইরে আরও কোথাও কোথাও হয় সেগুনের চাষ, কিন্তু বাংলার সেগুন কারও চাইতে হীন তো নয়ই, অনেকের চাইতে ভাল। শেষ চাষ হয়েছে এখানে ১৯৪১ সালে।'

'পাকা-পোক্ত হবে ২০৪১ সালে?'

তাই। কিন্তু চাষ চলছে।

আরও গভীরে নিয়ে চললেন আমাদের মণ্ডল মশাই। হঠাৎ বন যেন এখানে ছোট হ'য়ে গেল। সাংবাদিকদের চোখে ঔৎসুক্য লক্ষ্য ক'রে বললেন, এরা চার বছরের শিশু, এরা তিন বছরের, এরা দু' বছরের।

অকস্মাৎ একেবারে একটি ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। দেখি ধোঁয়া উঠছে। সবাই নামলাম। সুবলসখা মণ্ডল বললেন, আজকাল আর আগের প্রথায় আমরা সেগুন লাগাই না। আধুনিক প্রণালীতে 'স্ট্যাম্প' লাগাই। চারাটা লাগাই না, লাগাই ওটার মাথা ডালপালা ছেঁটে কাঠিটা। ব্যস তাই থেকেই গাছ গজায়। এই দেখুন।

'মাঝে মাঝে যেন ভুট্টা গাছ দেখছি?'

গ্রামবাসীরা ভুট্টার চাষ করেছে। ওরা জমিটা নিষ্কর পায়, ফসল ফলায়। তার বিনিময়ে এই 'স্টাম্প' লাগায়। ওদের চাষের স্থায়ী জমি নেই। আমরা বন কেটে কেটে যেমন এগোই, ওরাও তেমনি এগোয়। জমিতে সেগুন লাগানোর বছরটা ওরা এই জমির ফসল ভোগ করে, নূতন যে-বন পরিষ্কার হল সেটাও ফসলের জন্য পেল। এই ক'রে গড়ে ওদের হাতে ৪ একর জমি থেকেই যায়। মজুরীও পায়। এর নাম

এক বছরের সেগুন

ঝুমি চাষ। ওদের বাড়িঘর-দোরও বন বিভাগ ক'রে দেয়।

ঐ ধোঁয়া কিসের?

কাঠ-কয়লা তৈরীর ধোঁয়া। দার্জিলিংয়ে কাঠ-কয়লার খুব প্রচলন। সে কাঠ-কয়লা এইভাবে তৈরী হয়। বাজে কাঠ থেকে।

আরও এগিয়ে দেখি মস্ত বড় বড় ইট পোড়ানোর ভাটির মতো মাটির স্তূপ। চিতার মতো সাজিয়ে কাঠে আগুন ধরানো হয়েছে, আর তার ওপর পড়েছে মাটির আবরণ। মাঝে মাঝে যে ফুটো আছে, ধোঁয়া তাই দিয়েই বেরোচ্ছে। পোড়া-কাঠ থেকে কাঠ-কয়লা বস্তায় ভ'রে তুলছে পাহাড়ি মেয়েরা। এরই মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে ভূখণ্ডের তিমি মাছ —বট গাছ। এর আয়তন-আকৃতি বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন কাজে লাগবে না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে ও রোদ-বৃষ্টিতে পুড়বে পচবে, যতদিন না মাটিতে বিলীন হয়। লতায় লতায় শরীরে পদার্থ আর কিছু নেই। ভেতরটাও ফাঁপা, গোড়া থেকে বহুদূরে দেখা যায় ওর অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভ। আপাতত মানুষের আবিষ্কারে ভূপাতিত বটগাছের কোন মূল্য নেই।

সেগুন বন পিছনে ফেলে এসে শাল বনে ঢুকলাম—শুকনা শালবন। এতক্ষণে সেগুন-শালের চেহারার পার্থক্য ঠিক হ'য়ে গেছে। কাঁচা পথে আমরা খানিকটা দূর গেলাম। এবারে নামতে হবে। খানিকটা দূর হেঁটে যেতে হবে। এগিয়ে চলেছি, কয়েকজন কুলীর সঙ্গে দেখা। কাঁটা-তার ঘেরা একটা শাল-নার্সারিতে ঢুকতে যাব, কে একজন বলল, বাঘ বেরিয়েছে।

থমকে গেলাম। কবে কোথায়? এ প্রশ্নটাও যেন আর গলায় এল না। কিন্তু বনের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে। পেছোতে পারলাম না। তখনও দিনের আলো যথেষ্ট। স্বাভাবিক বন পরিষ্কার ক'রে যেখানে শাল লাগানো হ'চ্ছে সেখানে ঘুরতে লাগলাম। মণ্ডল মশাই একটি ছোট চারাগাছ দেখিয়ে বললেন, এর নাম চিলৌনি। চায়ের বাক্স তৈরীতে এর কাঠ লাগে। শালের ছায়াই এ হ'তে পারে, কেননা শালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সূর্যের নাগাল ধরবার উদ্যম এর নেই।

আমাদের মনে কিন্তু এখনও বাঘ।

কারখানায় সিনকোনার বাকল

সুতরাং, সকলকার অনুসন্ধানে যা জানা গেল, তা হ'চ্ছে এই যে, বাঘ পরশু বেরিয়েছিল ঐ বনে, মোষ মেরেছে। সরকারী ফটোগ্রাফার ধীরেন সরকার ওরফে টিথেকাস ভসিফারাস বললেন, আমি ঐ পথেই যাব, তুলব বাঘের ছবি। সবাই হা হা হা ক'রে উঠলেন। কিন্তু তিনি এগোলেন। পিছনে তাকান আর হাসেন। আমরা দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সুবলসখা বললেন, চলুন, আমরাও যাই, ঐ পথেই বেরোনো যাবে ট্রাকের পথে।

সাহস বা দুঃসাহসও সংক্রামক। এর পর কে বলবে—'না?'

পায়ে-চলা পথ। আগাছাগুলো তাতেও গড়িয়ে এলিয়ে পড়েছে। দুপাশে ঘন-শালের বন। আগাছায় আরও ঘন। দুদিকে নজর রেখে এগোই। অসম্ভব দু'দিকে নজর রাখা। মানুষ বাস্তবিক এক-চোখো হরিণ। এদিকে দেখলে ওদিকে দেখতে পায় না। গাছগুলোও সব স্তব্ধ। সত্যিই কি স্তব্ধ? ওখানে কি নড়ছে না কিছু? এদিকে তাকালে ওদিক থেকে যদি এসে পড়ে? কার ঘাড়ে পড়বে? যে সবার আগে, না সবার পিছনে? মাঝখানেই বা নয় কেন? লটারী। সাপের লেখা, বাঘের দেখা। ক্বচিৎ কখনো হয়। তাই হ'ল। সেই দুর্গম মোষ-মারা বাঘের পথে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এলাম—বাঘ দেখলাম না। আশ্চর্য মানুষের মন। পায়ে-হাঁটা পথ শেষ ক'রে যখন কাঁচা বড় রাস্তায় আমাদের স্টেশন ওয়াগনটা দেখতে পেলাম, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল, কিন্তু বাঘ দেখতে পেলাম না ব'লে কেমন নৈরাশ্যও হল।

পায়ে হাঁটা পথ পার হ'য়ে এলে মণ্ডল মশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'এরকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। তবে বাঘও মানুষকে ভয় পায়।' বাস্তবিক, মানুষ নিজেই এইসা জানোয়ার যে জানোয়ার রাজ্যেও মানুষের ভীতি আছে। হিংস্র মৃত্যুঘাতী মানুষ।

তারপর রাতে সুবলসখার ক্লাস ব'সল আমাদের নিয়ে। বনবিজ্ঞান বা বন-রহস্য। কেমন ক'রে বন কাটতে হয়, বন করতে হয়। কেমন ক'রে তিন বিঘে জমিতে ৬০০ সেগুনের সূচনা ক'রে দশ পনের বছর অন্তর ছাঁটাই বাছাই ক'রে ৪০ বছর নাগাদ মাত্র ৬০টি সেগুনকে বাড়তে দেয়া হয়। পরিপুষ্টির ব্যাপারে সেগুন-শালের পার্থক্য নেই, বাঁধা আয়ুও শতাব্দী। কতটা সংরক্ষিত বন, কতটা বেসরকারী, কোন কোন অঞ্চল অবধ্য জন্তুর বনভূমি তাও বললেন। শিকার যেখানে অনুমোদিত সেখানেও যে কোনও না-কোন গেম এসোসিয়েশনের সভ্য হ'য়ে অনুমতি চাইতে হয় তাও জানালেন। তিনি জানালেন, পশ্চিমবাংলায় আপাতত

স'তে, কাঠের হাতল শীতল। এ-ঘরেও ফায়ার-সাইড আছে। মে মাসের গরমে কম্বল-ওভার গায় দিলেই সম্ভবত দিনটা কাটে। রাতটা?

ঠিক ঐ ফায়ার সাইডের ধারে একটা ছোট বেঞ্চিতে হরিণের চামড়া পাতা। শ্রীসুধাময় মুখার্জি তাতেই বসলেন।

এমন সময় এক মহিলা প্রবেশ করলেন। বললেন, ও'দের বিশ্রাম হ'লে—

শ্রীসুধাময় মুখার্জি বললেন, ইনি আমার স্ত্রী।

সৌজন্যে হাত তুলে আমরা সবাই প্রতি-নমস্কার করলাম। কেননা, শ্রীমতী মুখার্জি পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করেছিলেন। আমাদের প্রতিনমস্কারের হাত নামাতেই বললেন, আপনারা বিশ্রাম করুণ আমি ততক্ষণে ওদিকটা দেখি।

ওদিক দেখাই ছিল। বেলা তো কম হয়নি? ও'রা আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। শ্রী মুখার্জি বললেন, আপনাদের কালিম্পং যাবার কথা জানি। কিন্তু বেলা অনেক হয়েছে, এখানেই চাট্টি ডাল-ভাত—

এর চাইতে মুখরোচক প্রস্তাব হ'তে পারে? আমার একা হ'লে, অত্যন্ত সাগ্রহে, অত্যন্ত সরবে আমি এই নিমন্ত্রণে সাড়া দিতাম। কিন্তু আমরা একটি দল, ব্যক্তি সত্তা সেখানে নেই, তার ওপর সরকারী অতিথি। তবু দেখলাম, সকল আনুষ্ঠিকতার ওপরে মানুষই সত্য। সবার পেটে তখন প্রবল চাহিদা। এমন সময় আবার এলেন অন্নপূর্ণা। তাহ'লে এবার আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমার ডাল-ভাত প্রস্তুত।

এবার যেন সব মানুষ 'আমি' হ'য়ে গেছে, একাকার। ঠিক ছিল, কালিম্পংয়ে পেঁছে একটু বেশী বেলায় হোটেলে লাঞ্চ করব। কিন্তু সে কি গেরস্থ ঘরের আমন্ত্রণ ঠেলে? কিভাবে যেন সবাই সায় দিয়ে উঠলেম। মুখ-হাত ধুতে গিয়ে দেখি পাহাড়ের এই নির্বাসনে পরিবারটির স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি কোথাও নেই। সব আধুনিক ব্যবস্থা, মায় গরমজলের টেপ-কল।

মুখার্জি পরিবার আমাদের নিয়ে গিয়ে যখন ডাইনিং হলে বসলেন তখন অবাক হ'য়ে গেলাম কান্ডকারখানা দেখে। এর নাম ডাল ভাত? বৈষ্ণবেরা আর কতটুকু বিনয়ী ছিল?

পটল ভাজা আর চপ থেকে শুরু হ'ল, চালের গন্ধে দিনাজপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। ছেলেমেয়েরা বসল না কেউ। একটি ছেলে দুটি মেয়ে। বড় মেয়েটির বিয়ে হ'য়ে গেছে। আমাদের খাবার টেবিলে ওরা অনুপস্থিত। কর্তা আর কর্ত্রী টেবিলের দুই প্রান্তে। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে কথাটি বড় সত্য মনে হ'ল। গৃহিণী অতিথিদের সঙ্গে সমানে কথা ব'লে যাচ্ছেন, কর্তার আলাপও শোনা যায়, কিন্তু গৃহিণীর তুলনায় মৃদুতর। কর্তা সুস্থকায় কিন্তু স্থূলাঙ্গ নন; গৃহিণী বাহ্যত সুস্থ তো বটেই, প্রশংসাচ্ছলে স্থূলাঙ্গীও বটেন। ও'রা দুজনেই বেশ আলাপী। কিন্তু অবাক হ'লাম ছেলে-মেয়েদের দেখে। ওরা যেন ট্যাবলো। গিয়ে অবধি দেখলাম ওরা মূক; আসবার সময়ও দেখলাম মূক. মনে হ'ল, গিন্নীর সভ্যতার শাসন খুব কড়া।

খাবার টেবিলে কর্তা বলে ফেলেছিলেন, দুধ টাকায় পাঁচ সের।

কথাটা কর্ত্রীর কানে গেছল। তিনি বলেছিলেন, দুধটা পাওয়া যায়। কত পাওয়া যায়, কর্তা যখন বলেই ফেললেন, তখন তিনি বললেন, দুধ ছাড়া আর কীই বা পাওয়া যায়, সবই আনার্তে হয়। আর দুধ? আসলে ও বাজারে চার সের, আমাদেরই কেবল দেয় পাঁচ সের।

পায়স পর্যন্ত সব ক'টা জিনিস অপূর্ব খেলাম। ১৬টি দিনের সফরে, হোটেল নয়, রেস্তোরাঁ নয়, একটি আধুনিক গেরস্থ ঘরে অভাবনীয় সমাদর পেলাম। একজন দু' জন নয়, আট ন' জন। প্রচুর বন্দোবস্ত এবং রীতিমত নেমন্তন্ন। অপ্রত্যাশিত বলে আরও সুস্বাদু।

পান নিয়ে ছোট্ট মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। মিষ্টি পান। সব রকম আয়োজন কি করে সম্ভব হ'ল? কালিম্পংয়ে রওনা হ'য়ে ভেবেছি। শ্রীমতী মুখার্জি নিঃসন্দেহে আধুনিকা। সাংবাদিকদের খুব সপ্রতিভ-ভাবেই অভ্যর্থনা করলেন, দর্শনতত্ত্ব বা বড় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন না সাংবাদিকেরা পরে পন্ডিত বলবে ব'লে। সাধারণ—নিতান্ত সাধারণ গেরস্থালীর কথা বললেন। মেয়ের কোথায় বিয়ে হয়েছে, ছেলে কোথায় পড়ে ইত্যাদি। তিনি টেবিলে কাঁটা-চামচে খেতে অভ্যস্ত, কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের পুরোনো ধারাটি পুরো বজায় আছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, শ্রীমতী মুখার্জি আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাচীন ঘরে মানিয়ে নিয়েছেন, এজন্য ও'কে কপালের সিঁদুর বা মাথার ঘোমটা বর্জন করতে হয়নি। টাকা সাহায্য করেছে নিষ্কলঙ্ক আয়োজনকে, কিন্তু হৃদয়ের পরিচয় টাকার তহবিলে হিসেব করতে হবে?

কুইনিন তৈরীর কারখানা দেখেই আমাদের ছুটি নেবার উপায় ছিল না। বিকেলে চায়ের নেমন্তন্নও রইল। অবেলায় খেয়ে কারোই আর কিছু দাঁতে কাটবার আগ্রহ ছিল না। অসৌজন্য প্রকাশের ভয়ে কেউ না-ও বলতে পারলেন না। তবু শেষ পর্যন্ত একটু অসৌজন্য প্রকাশ পেয়েই গেছে। কারখানা ইত্যাদি দেখে এসে শুনলাম. বাড়ির সবাই আমাদেরই সঙ্গে সুরেলা দেখতে যেতে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন। কিন্তু আমাদের তখন কালিম্পং যাবার তাড়া। বড় জোর এক কাপ চা, আর কিছু না, কোথাও না। সময়-বেঁধে সফর করতে বেরোলে ঐ তো দায়।

আরও একটি ছোট্ট ত্রুটি ঘটে গেছল। পরে শুনলাম। ছোট মেয়েটিকে কেউ আমাদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেয় নি এই অভিমানে সে কেঁদেছিল। ঘটনাটা আমাদের সকলেরই অজানতে। তবু যখন শুনলাম, তখন সকলেরই কেমন অপরাধী মনে হ'তে লাগল ছোট মেয়েটির কাছে।

শ্রী মুখার্জি সারা কারখানাটায় সব-কিছু আমাদের দেখালেন।

সিনকোনা গাছের বাকল থেকে কুইনিন হ'চ্ছে, কিন্তু বাকলের রঙ আর কুইনিনের রঙ এক নয়। সেন্ধবাকলের রঙ গোলা গেরুয়া, আর কুইনিনের রঙ দুধের মতো।

এর আসল জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকা। ১৬৬৯ সালে কাউণ্টেস অব্ সিনকোনার জ্বর সারে এই বাকলের কাৎ খেয়ে। ১০০ বছর পর লিনিয়াস এর নাম রাখেন সিনকোনা। আরও একশ বছর পর দক্ষিণ ভারতের নীলগিরিতে এর প্রথম চাষ হয়। তার এক বছর পর দার্জিলিং জেলার সেগুলে ১৮৬১ সালে এর চাষ শুরু হয়। মংপুতে হয় ১৮৬৪ সালে। এখন চার জায়গায় ৯,১৭৮ একর জমিতে সিনকোনার চাষ হচ্ছে। বছরে বাকল পাওয়া যায় বা যেতে পারে ২০ লক্ষ পাউণ্ড, তা থেকে কুইনিন সালফেট হ'তে পারে ৬০ হাজার পাউণ্ড, সিনকোনা ফেব্রিফিউজ ২৫ হাজার পাউণ্ড, টেবলেট ১৫ হাজার পর্যন্ত।

চাষ, তৈরী বা বিক্রী—সবটাই সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে। কিন্তু সমস্যা তো তা নয়, সমস্যা—কুইনিন আদৌ লাগবে কিনা। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাংলাদেশের পক্ষে এ অদ্ভুত প্রশ্ন বটে। তবু এ প্রশ্ন উঠেছে। এমন কি, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তরও ঘোষণা করছেন যে, ম্যালেরিয়া আয়ত্তে এল ব'লে। আসবেই। অর্থাৎ, ম্যালেরিয়া নিশ্চিহ্ন হবে। অবশ্য এ সমস্যাটা দীর্ঘমেয়াদী। কেবল তো বাংলা নয়, বিরাট ভারতবর্ষ পড়ে রয়েছে। তবু দীর্ঘমেয়াদী হ'লেও ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার, তখন এর বিকল্প একটা ভাবনা ভাবতেই হবে। ভাবা হ'চ্ছেও। এর ছায়া-শিল্প হিসেবে ইপিকাক চাষে হাত দেয়া হয়েছে। তারও চাহিদা বড় কম নয়।

এদিকে স্বল্পমেয়াদী সমস্যা হিসেবে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাও কেটে যাচ্ছে। এর বিকল্প অনেক ওষুধ বাজারে এসেছিল, কিন্তু তাদের কোন-না-কোন দোষে চিকিৎসকেরা আবার মত পাল্টে এই কুইনিনেই চ'লে আসছেন।

শুক্‌না ডাক-বাংলোয় যে মশা কামড়েছিল তাকে সায়েস্তা করার জন্য কারখানায় যন্ত্র থেকে সদ্যনির্গত গোটা পাঁচেক কুইনিন টেবলেট নিলাম। টাটকা মুড়ির মতো ও চিবিয়ে আনন্দ পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু সদ্য-কামড়ানো মশাকে জব্দ করতে সদ্য তৈরী টেবলেট নিশ্চয়ই অনেকখানি—এ আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবে কে?

কিন্তু আনন্দ সত্যিই পেলাম যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেখানে, যে কুটীরে থাকতেন, সেখানে হাজির হ'য়ে যেতে পারলাম। এখানে যিনি কুটীর তৈরী করেছেন তাঁকেও কবি বলতে হয়। আর বলতে হয় অত বড় কবির জন্যই যেন প্রকৃতির এই মহিমময় স্থানটি উদ্ভূত হয়েছিল। এখান থেকে দূরে কাছে আরও পাহাড় দেখা যায়, দেখা যায় ভয়ংকর গভীর খাদ, আব তরুণগিরি হিমালয়ের সর্বাঙ্গে সবুজ তারুণ্যের ঐশ্বর্য। ওদেরই গায়ে নরম মসলিন মেঘের আলতো ছোঁয়া।

তিনি নেই। হয়তো তিনি যে সৌন্দর্যের মাঝে অবগাহন করতেন, নিমজ্জিত থাকতেন অথবা দৃষ্টি দিয়ে আত্মসাৎ করতেন তারও পরিবর্তন ঘটেছে। তবু মনে হয়, তিনি ছিলেন—নেই, এইটেই আজ সত্য, কিন্তু তাঁর প্রেরণাস্থল তো আজও অকৃপণ, তাকে সেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করবে কে? বোঝা যায়, কেন রবীন্দ্রনাথ কখনও 'সীমায়' থাকতে পারতেন না, অসীম তাঁকে কেন এত বেশী ক'রে আকৃষ্ট করত—আর, সকল জিনিসের মধ্যে এক বলিষ্ঠ আশাবাদ ও সর্বজনীন ঐক্যের বাণী ধ্বনিত হ'ত।

কবিগুরু ১৯৩৮ সালে "এই গৃহে পদার্পণ করেন।" দেয়ালে-সাঁটা একটি ধাতব পাতে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা আছে। তিনি কবে কবে এখানে আসেন, কি কি বই লেখেন। আজ সেই "গৃহ" শ্রমবিভাগের অধীন, শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র-স্থল। মংপু আসবার পথে, ওপরে উঠতে গিয়েই বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ে—রবীন্দ্রনাথ ওয়েলফেয়ার সেণ্টার—ইংরিজীতে লেখা; আন্তর্জাতিক ভক্তজনের তীর্থস্থান।

দেয়ালে-সাঁটা ধাতুর পাতে লেখাটি আবেগময় এবং তথ্যবহুল। আজি হ'তে শতবর্ষ পরে যাঁরা কবিগুরুর সঙ্গে পরিচিত হ'তে এখানে আসবেন তাঁদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত লিপি স্বর্ণমূল্যের।

ঘরে ঢুকতে যেতেই এই অমর-বার্তাটি এই গৃহকে আরও বাঙ্ময় ক'রে তুলেছে। তিনি ১৯৩৮ সালের ২১শে মে কালিম্পং থেকে মংপু এসেছিলেন। এ গৃহে নয়, সুরেল-ভবনে। সেখান থেকে ৫ই জুন এই "গৃহে আতিথ্য গ্রহণ" করেন। দ্বিতীয়বার আসেন ১৯৩৯ সালের ১৪ই মে এবং আসেন পুরী থেকে। ১৭ই জুন ক'লকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ঐ বছরই শরৎকালে আবার মংপু এসে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহতক থাকেন। চতুর্থবার তিনি আসেন ১৯৪০ সালের ১৯শে এপ্রিল।

এবার এখানেই ২৫শে বৈশাখ ডাক দিয়েছিল, কবিগুরুর জন্মোৎসব এখানেই পালিত হয়েছিল। তিনি তখন স্বয়ং জীবিত—জন্মবার্ষিকী না মৃত্যুবার্ষিকী এই নিয়ে তখনও তিনি তর্কের অবকাশ দেননি। জন্মদিন নামে তিনটি কবিতা তিনি এখানেই রচনা করলেন।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরেও তাঁর মংপু থাকার কথা ছিল। কিন্তু কালিম্পংয়ে থাকতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই ক'লকাতা ফিরে যান।

মোট চারবার তিনি এ বাড়িতে ছিলেন। অনেক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ তিনি এখানে লিখেছেন। 'শেষ কথা' নামে ছোট গল্পটি এখানকার রচনা। পরিচয়, ছেলেবেলার আত্মজীবনী, নবজাত, সানাই, আকাশপ্রদীপ এখানকার রচনা।

ঝোপ্‌রা একটি পর্ণকুটীরে ব'সে লিখতেন। সম্মুখে দিগন্তের কোলে পাহাড়শ্রেণী। যে-ঘরটায় থাকতেন, সেটি আজও তেমনি সাজানো। শ্রম বিভাগ এর কোন অদল-বদল না ক'রে সংরক্ষণ করছেন; পাশের ঘরগুলোতে পাহাড়িয়া ছেলে-তরুণেরা সামাজিক শিক্ষা নিচ্ছে।

আমরা মংপু পৌঁছোবার অল্প ক'দিন আগে ২৫শে বৈশাখ হ'য়ে গেছে। প্রবেশপথের তোরণে তখনও শুষ্ক পত্রপুষ্পাঞ্জলি। বাঙালীর হৃদয়-তোরণে যদি কোনদিন শুষ্ক পত্রপুষ্পাঞ্জলির জঞ্জাল জমে তবে সে বড় ভয়ানক দিন। ভয় হয়, পাঁজি-পুঁথির তারিখ মিলিয়ে শুষ্ক আনুষ্ঠানিকতায় তাঁকে আবাহন করতে গিয়ে আমরা তাঁকে না হারিয়ে ফেলি। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কবিতা

মধুবংশীর গলি—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। প্রকাশক- গ্রন্থজগৎ, ৭ জে, পাণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। দাম—১৸০।

কয়েক বৎসর আগে 'মধুবংশীর গলি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক মহলের কোনো অংশে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিলো। তার কারণও ছিলো। সাহিত্যের আশ্রয়ে বামপন্থী আদর্শ তখন নতুন দিক নির্দেশের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা কবিতায় এ চেতনার উন্মেষ ঘটে প্রথম। এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি' সেদিন সে-চেতনাকেই বহন করে এনেছিলো।

প্রাথমিক উত্তেজনার ফলেই হয়তো তখন কাব্যের অন্তর-বিচারের দিকে ঝোঁক দেবার অবকাশ বেশী ছিলো না। এতদিন পর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকসাধারণ আশা করি সেদিকে নজর দেবার সুযোগ পাবেন। কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে যে ধারণা আজ পাঠকমনে প্রচারিত, এ-গ্রন্থের কবিতা কয়টি সে-ধারণার অনুগত নয়। কিন্তু অন্যপক্ষে বিদ্রোহের বাণীও তারা প্রচার করে না। কয়েকটি ছবির মিছিল কিংবা অসম্পূর্ণ ভাবনার প্রকাশে সার্থক কবিতার জন্ম হতে পারে না। 'মধুবংশীর গলি' তাই বিক্ষিপ্ত-ভাবে অনেক সুন্দর সুন্দর পংক্তির সমাবেশ ঘটালেও সমগ্রভাবে সার্থক কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি।

কোনো-কোনো কবিতা আছে যা প্রধানত শ্রুতিসুখকর। এ কবিতাগুলি বস্তুত তাই। মন দিয়ে বিচার করে পড়লে মন সাড়া দেয় না, কিন্তু যোগ্য আবৃত্তিকারের মুখে শুনতে ভালো লাগে। বিশেষ করে 'মধুবংশীর গলি' সে পরীক্ষায় নিখুঁতভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তা প্রমাণিত সত্য।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্বীকৃত সৎ কবি, সুতরাং এ কাব্যগ্রন্থ তাঁর স্বাভাবিক কবিপ্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করেছে বলতে পারি না, তবে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার অনিবার্য দোষগুলোকে এড়াতে পারলে কবিতার পাঠকরা সত্যিই আনন্দিত হতেন। তবুও বাংলা সাহিত্যে কবিতার বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ নিঃসন্দেহে কবির জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

১৩৬।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

স্বপনচারিণী—এমিল জোলা। অনুবাদক—রমেন চৌধুরী ও বিমান গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—আর্ট য়্যাণ্ড লেটারস্ পাবলিশার্স। ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ। জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২। দাম—দু টাকা বারো আনা।

সংবাদপত্র সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে কোন দেশান্তরের দেহের খবর বয়ে আনে। আর সাহিত্য সংবাদ দেয় সেই দেশটিরই হৃদয়-মানসের। তাই সাহিত্যের ভূমিকা চিরকালীন। বাঙলা সাহিত্যের আঙিনা আজ প্রসারিত হচ্ছে। তাই মিসিসিপি আর উজবেকীস্তান, ফ্রান্স কী সুইজারল্যাণ্ড আমাদের কাছে আর বিজাতীয় নয়। যার মাধ্যমে পৃথিবীর দূরতম ক্রান্তির সংগে আমাদের এই সেতুবন্ধ, তা হলো সাহিত্য। আমাদের সাহিত্যে ইদানীং অনুবাদের প্লাবন এসেছে। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু এর সংগে সংগে খানিকটা অস্বাস্থ্যের আশংকা রয়েছে। প্রথমত, অনুবাদের জন্য কোন দৃষ্টিকর গ্রন্থ নির্বাচন করা হয় কী না? দ্বিতীয়ত অনুবাদকের শুভ শিল্পবুদ্ধি আছে কি না?

'স্বপনচারিণী' সাম্প্রতিক কালের একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জোলা, ফিয়ারেণ্টিনো, ব্যালজাক, মোপাসাঁ ও বোকাশিয়োর সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি শৃংগার রসাশ্রয়ী। লেখকেরা প্রত্যেকেই সন্ধানী পাঠকের কাছে প্রখ্যাত-নামা। গ্রন্থটি কেবলমাত্র জোলার নামে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। আদিরস কী শৃংগাররসের জন্য জোলার খ্যাতি দূর-প্রসারী। শুধু এই কারণেই বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্যই যদি শুধু জোলাকে প্রচ্ছদপটে তুলে ধরা হয়, সেটা সাহিত্যিক কল্যাণবুদ্ধির পরিচয় নয়। সেখানে বাণিজ্যিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'স্বপনচারিণী' ও 'নাইটিংগেল' ছাড়া আর কোন গল্পের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ নয়। অনুবাদে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা মোটেই শ্রবণশোভন নয়। তা ছাড়া একটি পরিশীলিত শিল্পীমনকে এই অনুবাদগুলির মধ্য থেকে 'মাইক্রোস্কোপ' দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়।

(১৪৫।৫৫)

সাইবেরিয়ার প্রান্তরে—জ্বলে ভার্নে। অনুবাদক—ইন্দুভূষণ দাস, ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—আড়াই টাকা।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাতার বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত জ্বলে ভার্নের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা আড়ম্বরহীন, স্বচ্ছ এবং সাবলীল। রাশিয়ার জারের পত্রবাহক দূত হিসাবে মস্কো হইতে পূর্ব সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্ক পর্যন্ত যাত্রাপথে মাইকেল স্ট্রগফের অতুলনীয় কর্তব্যনিষ্ঠা, অত্যাশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অভাবনীয় কষ্টসহিষ্ণুতার রোমহর্ষক ঘটনাবলী পাঠকমনে যুগপৎ বিস্ময় এবং শিহরণ জাগাইয়া তোলে। ইহা ব্যতীত স্ট্রগফের সহযাত্রী সংবাদ সংগ্রাহক ব্লাউণ্ট ও জ্বলিভেত, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জনৈক ডাক্তারের কন্যা নাডিয়ার কাহিনী, তাতার সৈনিকদের অমানুষিক বর্বরতা ও নৃশংসতার চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীও লেখকের তুলিকা সম্পাতে অত্যুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনুবাদ সাহিত্যের এই মহোৎসবের যুগে অনুবাদকের এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু গ্রন্থখানাতে মুদ্রাকর-প্রমাদ ছাড়াও এমন সব অত্যদ্ভূত বানানের অবতারণা করা হইয়াছে যাহার সঙ্গে একমাত্র মধ্যযুগীয় গ্রাম্য কবিদের বানানেরই তুলনা করা চলে। ত্রুটি বিচ্যুতি সমন্বিত ১৬০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানির দাম যথেষ্ট বেশি হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। ১৫৮।৫৫

কিশোর সাহিত্য

ছবিতে রামায়ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক—শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। দাম—এক টাকা চার আনা।

কিশোর মন পলিমাটির মত উর্বর। সে মাটিতে যে বীজ ছড়ানো যাক না কেন, তা সফল ফসল হয়ে ওঠে। আর এই ফসলের ওপরই দেশের আগামী কালের নিরাপত্তা। প্রত্যেক শুভবুদ্ধি শিল্পীর প্রাথমিক কর্তব্য তার দেশের কিশোর-মনকে সংগঠন করা। এ মনকে গঠন করার মনোরম উপকরণ তার জাতীয় মহাকাব্য। এই জাতীয় চেতনার রঙটি মনের মধ্যে গভীর করে ধরিয়ে দিতে পারলে বিভ্রান্তির আশংকা কম।

'ছবিতে রামায়ণ' বর্তমানের কিশোর সাহিত্যে একটি সুন্দর উপহার। লেখায়-লেখায়, বিশাল রামায়ণকে কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে। গ্রন্থটি পরিকল্পনার মধ্যে নিষ্ঠার পরিচয় আছে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে শিল্পের স্তন্যরসের সঙ্গে মিশিয়ে কিশোরদের মধ্যে পরিবেশন করা অবশ্য প্রয়োজন। 'ছবিতে রামায়ণ' তারই একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। (১০০।৫৫)

সাধক জীবনী

প্রাচীন কবির কাহিনী : রবীন্দ্রকুমার বসু; প্রাপ্তিস্থান—৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

বাল্মীকি থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত আঠারো জন প্রাচীন কবির সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় আলোচ্য পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। লেখকের রচনা চিত্তাকর্ষক এবং ভাষাও সহজ ও সরল। বাংলা সাহিত্যের স্বল্পজ্ঞাত কয়েকজন কবির জীবনীও আলোচিত হয়েছে। ছোটরা বইখানি পড়ে আনন্দলাভ করতে পারবে ও সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে। ৮০।৫৫

উপন্যাস

মৃত্তিকার রং : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : সাড়ে তিন টাকা।

প্রথম আবির্ভাবেই হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কিছুটা চমক লাগিয়েছিলেন বাংলা-সাহিত্যে। 'ইরাবতী' উপকূলে আরাকান ছিল তাঁর প্রথম পর্বের সাহিত্যসৃষ্টি, বিদেশী পটভূমিকায় তাঁর পদসঞ্চার ঘটেছিল সে সময়। 'মৃত্তিকার রং'-এ বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের একটি উদার রঙের প্রেম এঁকেছেন তিনি।

'মৃত্তিকার রঙের' কাহিনী প্রেম, কিন্তু সাধারণত যে প্রাক-বিবাহ প্রেমের কূজন সাহিত্যে ভরপুর, হরিনারায়ণবাবু আরম্ভ করেছেন সে-কাহিনীর শেষ পর্বে। 'মৃত্তিকার রঙের' শুরু রমা ও কমলের নতুন নীড় বাঁধার প্রারম্ভ থেকে। ভালোবাসার পুরুষ কমলের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে রমা, বিকেলের পড়ন্ত আলোতে নতুন বাসায় তারা হাজির হয়েছে। পুরনো দিন মনে পড়ে রমার। বাবা, দাদা, বৌদি, বিশেষকরে ছোড়দাকে সে বাড়িতেও সকালেই জানান পড়ে গেল, রমা নেই, পালিয়েছে কমলের সঙ্গে, বিয়ে করে। সমাজের চলতি নিয়মে এ মিলনটা গর্হিত বলেই পালানো আর পালিয়ে বিয়ে করা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। নতুন ঘরসংসার, ভালোবাসা, কিন্তু উৎপাতও যে নেই তা নয়। বাড়িওয়ালার ঘরজামাই নীরেনবাবু থিয়েটারের নট। তার কথাবার্তা, ব্যবহার, দৃষ্টি সব জ্বালার মত। সে বলে, 'আমাদের থিয়েটারেও দু-একটি মেয়ে ছিটকে ছিটকে আসে। প্রেম করে ঘর ছেড়েছে তারপর শখ ফুরোতেই প্রেমিকবর ফেলে পালিয়েছে।' এক ঝড়বাদলের দুর্যোগে সে মদ খেয়ে সে হাজির রমার ঘরে, কমল তখন তার খবরের কাগজের অফিসে রাত্রির ডিউটিতে। কেলেঙ্কারি একটা হতো, বাড়িওয়ালার ভদ্র ব্যবহারের জন্য তার থেকে বাঁচা গেল। নতুন জীবনযাত্রা এগিয়ে চললো, রমার ছোড়দা সমীর এসে তার সহজখোলা প্রীতি শুভকামনা জানিয়ে গেল। রমার বাবা মারা গেলেন। বৌদি প্রমীলার অসুখে দাদা বিব্রত, অসুস্থ দেহে তারা গেলেন পুরী। হাসপাতালে এলো সন্তান-সম্ভবা রমা, প্রমীলাও। চিনতে না পেরে রমার মেয়েকে প্রমীলা বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, চিনতে পেরে টস টস চোখের জল পড়ছে প্রমীলার, বাচ্চা মেয়েটা মাটির তালের মত চুপ করে আদর খাচ্ছে।

হরিনারায়ণ বাবুর ভাষা মনোরম। মিষ্টি ঝরঝরে একটা আমেজ এ ভাষার সর্বত্র। চরিত্র সৃষ্টি অভিনব নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত।

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ শোভন। ১১৬/৫৫

ভাংগা বন্দর : শ্রীভবেশ দত্ত—দেবদত্ত এণ্ড কোং, ৪।৬৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকাতা—৩২, দাম দুই টাকা।

কোন এক সিনেমা সাপ্তাহিকে এই উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, এখন গ্রন্থরূপে এর আবির্ভাব ঘটলো। পলাশপুরে ছোট রেলওয়ে স্টেশন, তার বড় স্টেশনমাস্টার আর ছোট স্টেশনমাস্টার এবং তাদের একজনের ছেলে শোভনলাল আর একজনের মেয়ে কুন্তলা। স্বাভাবিক গতিতে প্রেম এবং তারপর বড়র সঙ্গে ছোটর বৈবাহিক মিলন আসতে পারে না বলে বিরহ। ভাঙাবন্দর ছেড়ে শোভনলালদের সপরিবারে বিদায় গ্রহণ।

গতানুগতিক কাহিনী, সাধারণ ভাষা। চরিত্রচিত্রণেও কোন শিল্পচাতুর্য নেই। প্রচ্ছদ কুৎসিত, মুদ্রণ একরকম। ১১৫।৫৫

ধর্মগ্রন্থ

গীতা রত্নামৃত—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সরস্বতী কর্তৃক অনূদিত এবং শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী কাব্যতীর্থ ও শ্রীমৎ যোগেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক সংশোধিত। শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার ধর কর্তৃক ১০৪-এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸০ টাকা।

গীতার পদ্যানুবাদ। অনুবাদ খুবই সুন্দর ও সরস; সহজেই মুখস্থ হইবার উপযোগী। অনুবাদকের কৃতিত্ব প্রত্যেকটি শ্লোকে পরিস্ফুট। পকেট সংস্করণ আকারে মুদ্রিত গীতার এই পদ্যানুবাদ সর্বত্র সমাদৃত হইবে। ছাপা, বাঁধাই সুদৃশ্য। ১২০।৫৫

বিবিধ
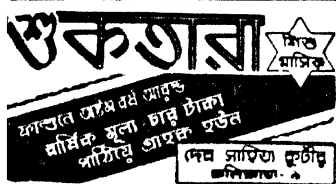
যারা হারিয়ে গেল—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালী জেলে তিন নম্বর রেগুলেশনে রাজবন্দী হিসাবে থাকাকালীন বিপ্লববাদী বন্ধুদের স্মরণ করিয়া লেখক আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। Truth is stranger than ficton—একথার সম্যক উপলব্ধি সত্যাশ্রয়ী প্রতিটি কাহিনী। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, গভীর সহানুভূতি এবং ভাবের উন্মাদনায় প্রতিটি রচনা অনবদ্য। ইতিহাসকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত এবং সহজগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার ক্ষমতা লেখকের আছে। একদালে পরশাসন মোচনের নিমিত্ত বাংলার যে-সব বিপ্লবী তরুণ অকাতরে আত্মবলি দিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই গল্পের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্তমানে পৌঁছিয়াছেন। ইহাদের কালজয়ী কীর্তিকলাপ, দুঃখ-বেদনা, আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধ পাঠক মনে অনাবিল শ্রদ্ধা এবং বেদনার সৃষ্টি করে। "হারিয়ে যাওয়ার" আক্ষেপ হয়তো সত্য নয়। ৫৩।৫৫

ছুটির সানাই—মাসিক পত্র। বৈশাখ '৬২। সম্পাদক—কাউন কুটুম। ২৫।এ, কাঁসারীপাড়া রোড, কলিকাতা—২৫। দাম—চার আনা।

কিশোরদের একটি সুন্দর মাসিক পত্রিকা। ছবিতে, ছড়ায়, গল্পে রীতিমত লোভনীয়। বল আর লুকোচুরির মত ছুটির দিনে গল্প পড়াও যে এক ধরনের খেলা; 'ছুটির সানাই' তারই আস্বাদ দেবে। 'ইকড়ি মিকড়ি'—এই বিভাগের পরিকল্পনাটি মনোরম। বারো বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কাঁচা মনের সবুজ রচনায় ভরা। এক কথায় ছবিতে ছড়াতে পত্রিকাটি কিশোরদের ভালো লাগবে।

Journalism As A Career: By B. Sen Gupta, M.A., Modern Book Agency, 10, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12, Price Rs 5/-

ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং এডিটর ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-শিক্ষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ভারতীয় সাংবাদিক জগতের একজন কীর্তিমান পুরুষ। সামান্য 'এপ্রেণ্টিস' হিসেবে সাংবাদিকতা বৃত্তিতে অনুপ্রবেশ করে তিনি সর্বভারতীয় জাতীয় সংবাদসরবরাহী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধাররূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি সাংবাদিকতার ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে তিনি রচনা করেছেন। সাংবাদিকতার প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করে প্রবেশেচ্ছু সাংবাদিকদের প্রাথমিক ধারণা জাগিয়ে দেওয়াই এই বইটির উদ্দেশ্য। তাই জটিল বিতর্কে বা আইনগত কূটবিষয়ে লেখক জড়িত হন নি। লেখকের এই উদ্দেশ্য বইটিতে সার্থক হয়েছে। বইটি পাঠ করার পর সাংবাদিকতার সমস্ত দিক সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ও কার্যকরী ধারণা জন্মে। যাঁরা সাংবাদিকতার ছাত্র নন, তাঁরাও এই বইটি পাঠ করে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ছাপা, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সুন্দর। সাংবাদিকতা সম্পর্কে বিদেশে অনেক বই আছে। এদেশে তেমন বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। কীর্তিমান সাংবাদিকের রচনায় এদেশী সাংবাদিকতার সাহিত্য সমৃদ্ধ হলো। ২১৫।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

Justice And Peace For All—Abul Hasarat.
কল্পনা—শ্রীতুলসীদাস সিংহ।
তারা-পীঠ ভৈরবী—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
অনেক আশা—চার্লস ডিকেন্স অনুবাদক মহেন্দ্র দত্ত।
শ্রীঅরবিন্দ—যামিনীকান্ত সোম।
নওজোয়ান—আলেকসান্দর ফাদেইয়েভ অনুবাদক বরুণ চক্রবর্তী।
এক আকাশ তারা—স্বপন দাস।
রাজগুরু যোগিবংশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার।
নব যুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল।
পদ্মাবিলী—অমরেশ বসু।
চেনা মানুষের নক্‌শা—অমল দাশগুপ্ত।
বুদ্ধ কথা—অমূল্যচন্দ্র সেন।
সারদা গীতিকা—১ম খণ্ড—স্বামী অসিতানন্দ।
মানষের ভাগ্যফল বা সহজ হস্তরেখা বিচার—শ্রীযুগলকিশোর ঠাকুর।

চক্রদত্ত

সাধারণত শাকসব্জি দু' একদিনের বেশী ঘরে রাখা যায় না। খুব ঠাণ্ডায় রাখলে যাও বা দু' একদিন রাখা যায় সাধারণভাবে রাখলে এক বেলাও রাখা যায় না। শাকসব্জি এক দুদিন ঘরে রাখতে হলে আমরা সব সময় একটু জল ছিটিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা কোনও জায়গায় আলগাভাবে রেখে দিই। এছাড়া কোল্ড স্টোরেজে রাখলে তো বেশ কয়েকদিন রাখা যায়। কিন্তু কোল্ড স্টোরেজ থেকে বার করার পর আর বেশীক্ষণ তাজা রাখা যায় না। খুব তাড়াতাড়ি পচতে আরম্ভ করে। ডাঃ স্মিথ বলেন যে, এইসব পদার্থের ওপর কিছুটা এন্টি বায়োটিক প্রয়োগ করলে এদের শীঘ্র পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কিছুটা স্ট্রেপ্টো-মায়াশিন জলের সংগে গুলে সব্জির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে দিলে কোল্ড স্টোরেজে রাখার চেয়েও সব্জিগুলো ভালো অবস্থায় রাখা যায়। --অবশ্য 'ফুড্ ড্রাগ এডমিনিস্ট্রে-শনের' কর্তৃপক্ষরা এই ব্যবস্থাটা সমর্থন করেন না।

*

সাঁতার কাটবার শখ হলেও সেটা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ সব সময়ে সাঁতার কাটবার জন্য সুবিধা মত পুকুর অথবা বড় চৌবাচ্চা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শখের জন্য সব কিছু করা সম্ভব। প্রয়োজন হলে সাঁতারের চৌবাচ্চা যেখানে সেখানে তৈরী করে নেওয়া যায়, আবার প্রয়োজন মিটে গেলে চৌবাচ্চা গুটিয়ে প্যাক করে তুলে রাখা যায়। এই শখের চৌবাচ্চার জন্য ৩০০ ফুট বর্গ ঘন স্থানের দরকার যেখানে এটাকে তৈরী করা যায়। এই চৌবাচ্চার চারধারটা শক্ত তারের বেড়ার তৈরী—যেটা প্রয়োজন হলেই গুটিয়ে ফেলা চলে। চৌবাচ্চার তলার আর পাশের দেয়ালগুলো শক্ত স্থায়ী প্ল্যাস্টিকের তৈরী। একটা ২০ ফিট ব্যাসওয়ালা চৌবাচ্চায় প্রায় ৭,০০০ গ্যালন জল ধরে।

*

বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করে জেনেছেন যে, ভিটামিন 'ই' মাংস জাতীয় খাদ্যবস্তুর পচন নিয়ন্ত্রিত করে। খাদ্যবস্তুর মধ্যের 'ফ্যাটি এসিড্'গুলো জারিত হ'য়ে টুকরো টুকরো হলেই মাংসের পচন শুরু হয়। দেহের মধ্যের হেমোগ্লোবিন ও হেমাটিন কম্পাউণ্ডস্ নামে যে পদার্থ আছে সেগুলোই অনুঘটক হেমাটিন অনুঘটক ফ্যাটি এ্যাসিড্‌কে জারিত হতে সাহায্য করে ফলে পচন দ্রুত হয়ে আসে। ভিটামিন 'ই' এই সব ফ্যাটি এ্যাসিডের জারণ বন্ধ করে।

*

কবি চিত্রকরের চোখে বর্ষার এক রূপ আর বৈজ্ঞানিকের চোখে বর্ষার আর এক রূপ। কবি চিত্রকররা দেখছেন বর্ষার সমস্ত রূপকে সমগ্রভাবে জড়িয়ে আর বৈজ্ঞানিক তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করে। বৃষ্টির ফোঁটার যে বিভিন্ন আকৃতি আছে সেটা বৈজ্ঞানিকেরাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় ২০০,০০০টি বৃষ্টির ফোঁটা পরীক্ষা করে দেখবার পর বৃষ্টির ফোঁটার বিভিন্ন আকৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। সাধারণত ফোঁটাগুলি খুব বড়বড় হয় আর দেখতে অনেকটা ব্যাংএর ছাতার মত হয়। এইসব ফোঁটার ওপর দিকটা গোল আর তলার দিকটা চ্যাপ্টা। সবচেয়ে ছোট ফোঁটাগুলো প্রায় বলের মত গোল। ফোঁটাগুলোর ব্যাস ১/১০০ থেকে ৪/১০০ ইঞ্চি হতে পারে আর উঁচুতে ১/১০০ থেকে ২/১০ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। এই দুই ধরনের ফোঁটার আকৃতি ছাড়াও, আকৃতি আরো অন্য রকমের হতে পারে। যেমন ন্যাসপাতির আকৃতি যদিও এই ধরনের ফোঁটা চিত্রকরদের খুবই প্রিয়, কিন্তু এই ধরনের আকৃতির ফোঁটা সাধারণত খুব বেশী দেখা যায় না। যখন ফোঁটাগুলো ভিন্ন ভিন্নরূপ নিতে থাকে—তখন সেটা বড় বড় ব্যাংএর ছাতার মত ফোঁটাগুলো থেকেই সম্ভব হয়। এই ফোঁটা পড়বার মুখে প্রথমটা খুব কাঁপতে থাকে—তারপর দুটো দিক খুব সরু হয়ে গিয়ে দু মাথায় দুটো ছোট ফোঁটার সৃষ্টি হয়—পরে এই ফোঁটা দুটো আলাদা হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকরা বৃষ্টির ফোঁটার সম্বন্ধে গবেষণা করার ফলে আবহাওয়ার সম্বন্ধে আরো সঠিক খবরাখবর পাবার আশা করা যায়।
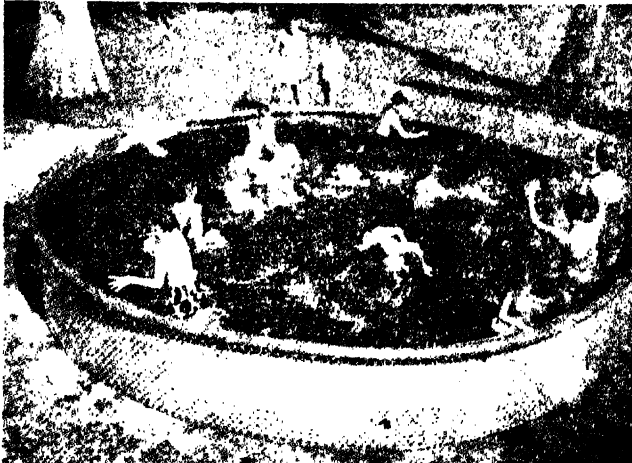
সবাই মনের সুখে কৃত্রিম চৌবাচ্চায় সাঁতার কাটছে

['হরর কমিক্‌স']

এতদিনে এদেশে 'হরর কমিক্‌স' আমদানি নিষিদ্ধ হল। বস্তুটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় অল্প, তাঁরা হয়ত অবাক হয়ে ভাবছেন আমদানি-রপ্তানির সমালোচনা 'নখদর্পণে' কেন, এ কি বাণিজ্য বিভাগ? সমস্যাটা ব্যবসায়-বাণিজ্যগত হলে সত্যিই এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হত না। কিন্তু এর সঙ্গে সুনীতি-দুর্নীতি, জাতিবৈর, চিন্তা, প্রকাশ এবং প্রচারের জটিল প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং ভরসা করি, প্রসঙ্গটা এই আসরের পক্ষে নেহাৎ বেমানানো হবে না। সরকারী আদেশের কোন প্রতিকূল সমালোচনা আজ অবধি দেখিনি। ধরে নিতে পারি, এতে সমাজের প্রত্যেক হিতকামীর সায় আছে। শুধু এদেশে নয়, কিছুদিন থেকে হরর কমিক্‌সের' উৎপাতের বিরুদ্ধে সুস্থ জনমত গঠনের প্রয়াস চলছে। কমন্স সভায় 'চিলড্রেন এ্যাণ্ড ইয়ং পার্সন্‌স (হার্মফুল পাবলিকেশন্‌স) বিল' পেশ হয়েছে বলে খবর পেয়েছিলুম। বিলাতের নানা কাগজেও এ সম্পর্কে আলোচনা দেখেছি।

'হরর কমিক্‌সে' হরর, অর্থাৎ বিভীষিকা প্রচুর, কিন্তু কমিক যদি কিছু থাকে তো এর নামে। মার্কিন সংস্কৃতির নবতম অবদানটির যাঁরা নামকরণ করেছেন তাঁদের রসজ্ঞান উৎকট। এর বিষয়বস্তুতে হাস্যরস কিছুমাত্র নেই, খুনখারাপি, রাহাজানি, বাটপাড়ি আর যাই হোক হাসির খোরাক নয়। কথাটির কোন বাংলা প্রতিশব্দ আছে কিনা জানিনে। কাজচলা গোছের একটা শব্দ তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে: চিত্রকাহিনী। ছবিতে গল্প। নাটক যেমন দৃশ্যকাব্য।

নখদর্পণ

উত্তমপুরুষ

ইতর বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করা ছাড়া এর অন্য কোন লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। এই বিষলতিকার সহকার আশ্রয় প্রধানত ইংরেজি পত্রিকা, তবে বাংলা কাগজেও একেবারে যে ভর করেনি এমন নয়।

আতঙ্ক চিত্রলেখার সমঝদার শুধু প্রাপ্তবয়স্করা হলে ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু এর থেকে প্রেরণা প্রায় প্রধানত কিশোর বয়সীরা, সমাজপতি এবং হিত-ব্রতীরা বিরত বোধ করছেন সেই জন্যেই। বাইবেলে ভ্রাতৃহন্তা মাত্র একজন—কেইন, কিন্তু যে মার্কিন মুলুক 'হরর' কচুরি-পানার জন্মভূমি, সেখানে শত শত কেইন এবেলদের হত্যা করে। সেনেট এ-সম্পর্কে একটি রোমহর্ষক রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। ১৯৪৮ সালে মার্কিন আদালতে তিন লক্ষ শিশু বা কিশোর অপরাধীর বিচার হয়, ১৯৫৩ সালে প্রায় সাড়ে চার লক্ষের। সেনেটের আশংকা, সংখ্যাটা অচিরে সাত লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। আমেরিকায় দশ থেকে ত্রিশ কোটি ডলার অশ্লীল পত্রিকা এবং রোমাঞ্চক চিত্র-কাহিনী প্রকাশের অসাধু ব্যবসায়ে খাটছে। ক্রেতা এবং পাঠক, আগেই বলেছি, বেশির ভাগই কম বয়সী, এদের টিফিন বাঁচানো পয়সার সবটাই এই পথে যায়।

'হরর কমিক্‌স' যখন পৃথিবীর বাজার ছেয়ে যায়নি তখন থেকেই একজন এর ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। প্রায় আট বছর আগে ডাঃ ভেরথাম এ নিয়ে যখন আন্দোলন শুরু করেন তখন তাঁর সমর্থকের সংখ্যা খুবই কম। একদিকে পিতামাতাদের ঔদাসীন্য, অন্যদিকে একটি শক্তিশালী বণিকদলের বিরোধিতা। দ্বিতীয় দলে কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীও ছিলেন, পরে জানা গিয়েছিল এঁরা গোপনে ব্যবসায়ীদের বেতনভুক। নিউ ইয়র্কের কোন প্রাক্তন মেয়র হেসে বলেছিলেন 'নো গুড গার্ল ওয়জ এভর রুইনড বাই এ বুক।' অনেকে গ্রিমস্‌ ফেয়ারি টেলসের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন, এ সব বইয়ে রোমহর্ষক ঘটনা কিছু কম নেই; কয়েক পুরুষ ধরে বালক বালিকারা পড়েছে, কিন্তু বিপথে যায়নি। যাত্রের পালা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে কচুগাছের উপর হাত পাকিয়েছে এমন নকল বীরের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু উত্তরকালে তাদের মধ্যে কজন আর সত্যি সত্যি ডাকাত হয়।

কিন্তু ফেয়ারি টেলসের ক্লাসিক বইটির সঙ্গে 'হরর কমিক্‌সের' কোন তুলনাই হয় না। শিশুরা সহজাত বুদ্ধি বশে জানে গ্রিম ভ্রাতাদের গল্প গল্পই; মনোহর কিন্তু সত্যি নয়। হরর কমিক্‌সের জাতই আলাদা, কেননা রচয়িতা এবং প্রকাশকেরা তাতে বাস্তবতার রঙ চড়াতে কসুর করে না। তাছাড়া ছবির প্রভাব ছাপার হরফের
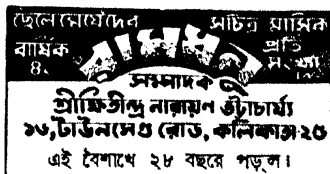
অন্তত দশগুণ। শিশু, কিশোর, নিরক্ষর প্রভৃতি যাদের I. Q. (ইনটেলিজেন্স কোশেণ্ট) নীচু মানের, যাদের কাছে লিখিত রচনা অনধিগম্য, তারাও অনায়াসে ছবি থেকে মজা পেতে পারে। কোন ইংরেজ লেখক বলেছেন, 'কমিক্‌স আর দি লিটরেচার অব দি ইলিটারেট; দে প্রোডিউস বুকওঅর্মস উইদাউট বুক্‌স।' সাহিত্যের সঙ্গে কমিক্‌সের প্রকৃত শত্রুতা এখানে। কমিক্‌সের প্রচার যত বাড়ছে, সদ্‌গ্রন্থের পাঠক তত কমছে। সমস্যার এই দিকটা নীতিগত মূল্যহানির চেয়েও গুরুতর।

'হরর কমিক্‌সের' সব পাঠকই দুর্বৃত্তে পরিণত হয় বলি না। মানুষের মনে চরিত্রগত প্রতিরোধ আছেই। কিন্তু এই প্রতিরোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, আশংকা তাদের নিয়ে। তারা ব্যাংক লুঠ, গাড়ি ওলটানো, কারণে অকারণে নরহত্যার প্রথম পাঠ আতংকচিত্রগুলির কাছেই নেয়। জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে বিকৃত ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠে। হরর কমিক্‌সের আর একটা বৈশিষ্ট্য, এতে নিগ্রো, এশিয়াবাসী, বস্তুত শ্বেতাঙ্গেতরমাত্রকেই হীনস্তরের জীব হিসাবে আঁকা হয়ে থাকে, জাতি-বৈরের বিষবীজ সেখানে। এছাড়া নিম্ন-শ্রেণীর যৌনচিত্র তো আছেই। নারীহরণ যেন একটা মামুলি ব্যাপার, পৈশাচ বিবাহ বীরোচিত, আর মেয়েরাও নাকি শুধু 'টাফ গাইদেরই' পছন্দ করে।

'হরর কমিক্‌স' আমদানী বন্ধ করে সরকার একটা সৎকাজ করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেজন্যে উদ্বাহু হয়ে জয়-ধ্বনি দেওয়াতেও বিপদ আছে। প্রশ্নটা মূলে চিন্তা এবং রচনার স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ভয়টা রেজিমেন্টে-শনের। সীমারেখা টানব কোনখানে, টানবে কে। আর্ট আর অসুস্থ সৃষ্টির সীমান্ত চিরদিন অচিহ্নিত, সৌন্দর্য-বোধের মাপকাঠি দিয়ে খানিকটা হদিশ হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু সে কাঠি আবার শিল্পী আর গুণীদের হাতে, রাজদ্বারে যাঁরা উপেক্ষিত সেখানে দাপট একমাত্র কোতোয়ালদের। এদের উপর শিল্প-বিচারের ভার পড়লে অবিচারের ভয়ই বেশি। এ তো প্রায়ই দেখা গেছে, যে সংগীন দিয়ে এঁরা দেশের সীমান্ত রক্ষা করেন, আর্টের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়েও সেই সংগীনই উঁচিয়ে ধরেন, অনধিকারীর হাতে কলালক্ষ্মীর নিগ্রহের অন্ত থাকে না। অপরাধপ্রবণতাকে উস্কানি দেয় বলে 'হরর কমিক্‌সের' প্রচার বন্ধ হল, ভালই। কিন্তু এর ফলে অতি উৎসাহী অফিসার হয়ত মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারেন। বলা যায় না, কবে হয়ত তিনি শরৎচন্দ্রের রচনায় অসতীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনের গন্ধ পেয়ে বললেন, কম-বয়সী ছেলেমেয়েদের নীতিবোধের পক্ষে এ রচনা হানিকর, প্রচার বন্ধ করে দাও। বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য সম্পদকে সেদিন লাঞ্ছিত হতে দেখলে অবাক হব না। মাইকেলের ভাষায় চণ্ডালের হাতে পুস্তক পড়লে। রাজদ্বার সাহিত্যের শ্মশান হবে।

বড়ম্বিত ঐতিহাসিক কাহিনী

ইতিহাসকে অবজ্ঞা করার কেমন যেন কটা সহজাত অভিপ্রায় চিত্রনির্মাতাদের ধ্যে মজ্জাগত দেখা যায়। ইতিহাসের মকালো চরিত্রকে পর্দায় উপস্থাপিত রতে তারা প্রলুব্ধ হন কিন্তু শেষ র্যন্ত নামটুকু ছাড়া ইতিহাসের বিশেষ ার কোন নিদর্শনকেই তারা পাত্তা দিতে ন না। এই নিয়েই বাঁধে মুশকিল। র্দায় যাদের দেখা যায় তারা বাস্তব াকের মতই কথা বলে, চলাফেরা করে ব্দ ও সজ্জায় দৃশ্যগুলির তেমনি ীবন্ত পরিবেশ। বাস্তবের বলেই াকের মনের ওপরে প্রভাব বিস্তার রার ক্ষমতা আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। াই কল্পিত জিনিসও পর্দাতে যেভাবেই তিফলিত হোক তা দর্শকের মনের মনে একটা প্রতীতির ছাপ এনে দেয়। ই কারণেই ছবিতে অবাস্তব হীননীতি ল্পনাদুষ্ট এবং দেশকাল বিরোধী কিছু মদানি করা হলে তার বিরুদ্ধে জন-াধারণকে সতর্ক করে দেওয়ার দরকার য় পড়ে। এই কারণেই যা মিথ্যা ও
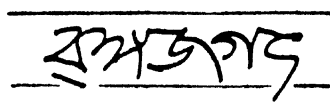
—শৌভিক—

ভ্রান্ত ছবিতে তা পরিহার করার জন্য আন্দোলন ওঠে। তেমনি ইতিহাস বলে একটা জিনিস কল্পনা থেকে গড়ে নিয়ে চালিয়ে দেওয়াও সমর্থন লাভ করে না। কারণ অপটুমেন দর্শকের সংখ্যাই বেশী যাদের পক্ষে কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট বস্তু আর ইতিহাস-সম্মত বস্তুর মধ্যে কোনটা ঠিক, আর কোনটা বে-ঠিক তা বিচার করার মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকে। কাজেই পর্দায় ইতিহাসের নাম করে একটা কল্পিত জিনিস পরিবেশন করলে সাধারণ দর্শকের কাছে তা সত্যিই ইতি-হাস-সম্মত বলে প্রতীয়মান হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এই কারণেই যদি ইতিহাস থেকে পরিবেশন করতে হয় তাহলে ইতিহাসে যেমন আছে—রস ও নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক না হয়ে ওঠে, মাত্র সেই-টুকু লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব প্রকৃত বস্তুই সামনে এনে দেওয়া উচিৎ। নতুবা ভুল ও অসত্য জিনিস পরিবেশন করার দায়ে চিত্রনির্মাতাকে অভিযুক্ত হতে হয়।

• • •

রস ও নাটকীয়তাই প্রমোদ-চিত্রের অঙ্গ; তা বাদ দিলে ছবি পাঠ্যপুস্তকের পর্যায়ে চলে যায়। তাই রস ও নাটকীয়তাকে উচ্ছ্বসিত করে তোলার জন্য ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর বিন্যাসে কিছুটা স্বাধীনতা না নিলে চলে না। কিন্তু তাই বলে যা মূল প্রকৃত ঘটনা তাকে পরিহার করে নিজের ধারণা মতো কিছু সৃষ্টি করে দেওয়ার মতো অতো স্বাধীনতা নেই। দরকার হলে ইতিহাসের যথাযথ প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে নাট্য-বিন্যাসক্ষেত্রে কোথাও কোন পাদপূরণের জন্য হয়তো ছোটখাট দু'একটা চরিত্র বা দু'চারটে ঘটনা কল্পনা থেকে সৃষ্টি করে যোগ করে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সবই কল্পনা থেকে ঘটনা বানিয়ে নিলে বা ইতিহাসে যে চরিত্রকে যেমনভাবে পাওয়া যায় তাকে সেভাবে উপস্থিত না করে অন্য কোনরকমভাবে রূপায়িত করা দস্তুরমতো অপরাধ। চিত্রনির্মাতারা এ অপরাধকে অগ্রাহ্য করেই ছবি তুলে আসছেন। বাঙলা ছবিই শুধু নয়, বম্বে বা মাদ্রাজের ঐতিহাসিক ছবিতে এ অপরাধ আরো বেশী। এমন কি বিলেত আমেরিকার ঐতিহাসিক ছবিগুলিতে ইতিহাসকে উপেক্ষা বা বিকৃত করার নিদর্শনও বড়ো কম পাওয়া যায় না। ইতিহাসকে নিজেদের সুবিধে মতো করে সাজিয়ে নেওয়াটা যেন চলচ্চিত্র নির্মাতা-দের বিশেষ অধিকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে; যেন ইতিহাসকে যথাযথ রাখলে তা নিয়ে ছবি করা যায় না। ঐতিহাসিক চিত্র সম্পর্কে এতো কথা উঠলো আই এন এ পিকচার্সের 'বীর হাম্বীর' ছবিখানির সূত্রে। কানাইলাল শীলের 'মুক্তির মন্ত্র' থেকে ছবিখানির এই আখ্যানবস্তু গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু বলতে গেলে পুরো-পুরিই বানানো গল্প।

• • •

ইতিহাস বলে মল্লরাজ বীরমল্ল প্রায় অর্ধশতাব্দী রাজত্ব করার পর তার পুত্র

বীর হাম্বীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। ছবির আখ্যানবস্তুতে পাওয়া যাচ্ছে মল্ল-রাজ রায়মল্লকে তার মন্ত্রী সুধীরথ বিশ্বাসঘাতকতা করে সপরিবারে হত্যা করলে বিশ্বস্ত সেনাপতি চিমনলাল শিশুপুত্র হাম্বীরকে নিয়ে গোপনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। চিমন এক দুর্ধর্ষ ডাকাত দল সৃষ্টি করে সুধীরথকে আতঙ্কিত করে রেখেছিল। সুধীরথ তার জ্যেষ্ঠ সুরথকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে। চিমনের দলে থেকে হাম্বীর বড়ো হয়ে উঠলো। হাম্বীরের ছেলে-বয়েস থেকেই সখ্যতা চিমনের মেয়ে মহুয়ার সঙ্গে, বয়েস হতে সখ্যতা দাঁড়ালো প্রণয়ে। চিমন বরাবরই হাম্বীরের আসল পরিচয় গোপন রেখে দেয়। দলের সকলে হাম্বীরের বীরত্বে মুগ্ধ এবং তার প্রতি অনুরক্ত। তাই যেদিন চিমন তার পরবর্তী সর্দার বলে পুত্র রণলালকে নির্বাচন করলে সেদিন একটা ক্ষোভ দেখা দিল। সর্দারী পদের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দ্বারা প্রকৃত সর্দার নির্বাচনের রীতি। রণলাল ও হাম্বীরের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হলো; রণলাল পরাস্ত হলো। কিন্তু হাম্বীর সর্দার পদ গ্রহণ করলে না। এতদিনে চিমনের কাছ থেকে প্রকাশ পেলো হাম্বীর রাজপুত্র এবং রাজ-সিংহাসনের অধিকারী বলেই চিমন হাম্বীরকে সামান্য ডাকাতদলের সর্দার পদ দিয়ে তার অমর্যাদা করতে চায়নি।

* * *

ইতিহাস বলে হাম্বীরের যুদ্ধ হয়েছিল পাঠান সর্দার দাউদ খাঁর সঙ্গে, কিন্তু ছবিতে রয়েছে চিমনের দলকে দমন করার জন্য পাঠান সেনাপতি গোলাম মহম্মদের সঙ্গে মন্ত্রী সুধীরথের ষড়যন্ত্র। এতে দেখানো হয়েছে রাজা সুরথ এই ষড়যন্ত্রের বিরোধী হওয়ায় সুধীরথ তাকে বন্দী করলে। সুরথের কন্যা অপর্ণাকে সুধীরথ গোলাম মহম্মদের হাতে অর্পণ করবে ঠিক করেছিল, কিন্তু অপর্ণা পালিয়ে চিমনের দলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হাম্বীরকে রাজকুমার বলে জানার পর থেকে মহুয়া নিজেকে রাজার অনুপযুক্তা মনে করে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে এবং চিমনের দল কর্তৃক লুণ্ঠিত সামগ্রীর স্তূপ থেকে একটি মদনমোহন বিগ্রহ খুঁজে পেয়ে মহুয়া তারই পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করে রাখলে। হাম্বীরের দল রাজপ্রাসাদ অধিকার করে বন্দী রাজা সুরথকে মুক্ত করে নিয়ে এলো। জঙ্গলে সুরথের হাতে হাম্বীরের রাজ্যাভিষেক হলো। ঠিক সেই সময়েই, চামুণ্ডার পূজায় নরবলি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হাম্বীরের প্রতি রুষ্ট পুরোহিত সুধী-রথের প্ররোচনায় জঙ্গলে আত্মগোপন করে হাম্বীরকে নিহত করার জন্য তীর নিক্ষেপ করলে। মহুয়া ছুটে এসে হাম্বীরকে রক্ষা করতে নিজে তীরবিদ্ধা হলো। হাম্বীর এ দৃশ্যে সম্বিত হারালো এবং তীরবিদ্ধা মহুয়াকে নিয়ে তার বিলাপের অন্ত রইল না। ওদিকে সুধীরথের পরামর্শে গোলাম মহম্মদের সৈন্যবাহিনী হাম্বীরের ওপর আক্রমণ চালালে। মহুয়ার জন্য বিলাপকাতর হাম্বীর যুদ্ধে উৎসাহি[ত] হলো না। হঠাৎ গর্জে উঠতে লাগ[লো] দলমাদল কামান। পাঠান সৈনারা পরা[স্ত] হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। মহুয়ার প্রাণবা[...]

ির্গত হবার পর হাম্বীর বেরিয়ে এসে খলে দলমাদলে অগ্নিসংযোগ করে দ্রকে পরাভূত করেছে রাজকুমারী পর্ণা।

* * *

ইতিহাসের নামমাত্র আভাস ছবির কাহিনীটিতে পাওয়া যায়, যেমন মদন-মোহন বিগ্রহ, দলমাদল কামান, হাম্বীরের অনুচরবৃন্দ কর্তৃক পথিমধ্য থেকে বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী লুণ্ঠন ইত্যাদি। ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে ছবির এই উপাখ্যানকে যদি মাত্র কল্পনাপ্রসূত বস্তু বলেই ধরা যায় তাহলে একটা রোমাঞ্চকর প্রণয়কাহিনীর উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে চোখে পড়বে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ডাকাত দলে মানুষ হাম্বীর কখনো দুর্বৃত্ত রাজমন্ত্রী সুধী-রথের অনুচরদের হাত থেকে বন্দী বুড়ো কামার আর তার ছেলেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে; কখনো সুধীরথের অনু-চরদের জব্দ করে গাড়োয়ান সেজে রাজ-কোষ থেকে স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠন করে আনছে যাতে সুধীরথ সেসব পাঠান সর্দারের হাতে পৌঁছে দিতে না পারে; তারপরই আনছে দুরারোহ কারাকূপ থেকে বন্দী বিসন বা বন্দী রাজা সুরথকে মুক্ত করে; সুধীরথের সৈন্যদের পরাস্ত করে রাজ-প্রাসাদ দখল; ইত্যাদি হাম্বীরের বীরত্বের পরিচয়। হাম্বীরের মনুষ্যত্বের পরিচয় রয়েছে চামুণ্ডার সামনে শিশুবলি বন্ধ করে দেওয়াতে; আবার আর একদিক থেকে সে পরিচয় পাওয়া যায় রণলালকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করেও তাকেই আলিঙ্গন করে সর্দার পদে অধিষ্ঠিত করে দেওয়াতে। মহুয়ার সঙ্গে হাম্বীরের প্রণয় রয়েছে যে প্রণয়ের বশে মহুয়া হাম্বীর রাজকুমার জানতে পেরে পাছে তার অমর্যাদা হয় এই আশঙ্কায় হাম্বীরকে বিবাহ করতে অরাজী হলো সে এবং শেষে গুপ্ত ঘাতকের অব্যর্থ লক্ষ্য থেকে হাম্বীরকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলে। আবার অপরদিকে রয়েছে বীর হাম্বীরের প্রতি অপর্ণার প্রচ্ছন্ন অনুরাগ যাকে প্রেমেরই লক্ষণ বলে ধরা যায়। অপর্ণাকে দিয়ে দলমাদলে অগ্নি-সংযোগ দ্বারা নারীর বীরত্বের রূপ রয়েছে একাংশে। তাছাড়া, অতিরিক্ত রয়েছে মদনমোহনকে ঘিরে ভক্তিরসের সন্নিবেশ। অর্থাৎ ঘটনার দিক থেকে উপাদান যা পরিকল্পিত রয়েছে তার সাহায্যে একটা বেশ রোমাঞ্চকর রূপকথাও অন্তত হাজির করে দেওয়া যেতো। কিন্তু বিন্যাসের অদ্ভুত আচরণ সে উপায় আর রাখেনি।

* * *

অত্যন্ত হাস্যকরভাবে ঘটনাগুলিকে দেখানো হয়েছে। বিশেষ পদ্ধতিতে ধাতু গলিয়ে কামান তৈরীতে ওস্তাদ কামার

আর তার ছেলেকে সুধীরথের সেপাইরা বেঁধে নিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় এক জায়গায় দাঁড়ালো যেন হাম্বীর ও তার অনুচরদের সুযোগ পাইয়ে দেবার জন্যেই। হ'লও তাই। হাম্বীরের দল এসে বন্দী দুজনকে, চিত্রপরিচালকদের নির্দেশ অনুযায়ী, ছিনিয়ে নিয়ে গেল। গোলাম মহম্মদের কাছে স্বর্ণমুদ্রা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য দেখা গেল একটা ছ্যাকড়া গরুর গাড়ি আর মাথায় পক্কড় বাঁধা দুজন গাড়োয়ান। তারপর গাড়োয়ান দুজনকে রাস্তায় বেঁধে ফেলে রেখে চিমনের অনুচররা যেভাবে রাজকোষ থেকে স্বর্ণ-মুদ্রা অপসারণ করে নিয়ে গেল, সে এক কমিক ব্যাপার। চিমনের আস্তানা বা রাজার দুর্গের যেন কোন আটঘাটই নেই: যে কেউ যখন তখন আসা যাওয়া করছে অবাধে অথচ একটা গোপনীয়তার ভাব রাখা হয়েছে। গল্পের বেশী জোর হাম্বীর ও মহুয়ার প্রেমের ওপরে; এবং তাও যে উপভোগ্য হবে সে উপায় থাকতে দেননি চরিত্র দুটির অভিনয়শিল্পী দুজনে। নবাগত অরুণপ্রকাশ অভিনীত হাম্বীরকে এক নিষ্প্রভ শান্ত গোবেচারীর চেহারায় পাওয়া যায়; তার নামের আগে বীর শব্দটির প্রয়োগ অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তেমনি হয়েছে মঞ্জুদের মহুয়া চরিত্র সৃষ্টি; ও ধরনের চরিত্রে তিনি কোন ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারেননি। হাম্বীরকে বাঁচাতে তীরবিদ্ধ অবস্থায় মহুয়ার দীর্ঘ কাতরানি ছবির সবচেয়ে বিরক্তিকর অংশ অথচ এই ঘটনাটির সাহায্যেই কাহিনীর চরম নাট্য পরিণতিটা ব্যক্ত করতে যাওয়া হয়েছে। প্রেমিকের জন্য জীবন বিসর্জন ব্যাপারটা কোন রেখাপাতই করতে পারলো না। অপর্ণার ভূমিকায় মিত্রা বিশ্বাসও নবাগতা। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ব্যক্তিত্বটা তিনি অর্জন করতে পারেননি। অভিনয় ভালো বলতে উল্লেখ করা যায় কেবল চিমন সর্দারের চরিত্রে কমল মিত্রের নাম। ডাকাত দলের সর্দাররূপে তাকে মানিয়েছেও ভালো। সুধীরথের চরিত্রে কানু বন্দ্যো-পাধ্যায় অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রটিকে দাঁড় করিয়েছেন বটে, কিন্তু অমন ধূর্ত এক পাষণ্ড মন্ত্রিরূপে তাকে যেন খাপ খায় না। সুধীরথের ক্রীড়নক রাজা সুরথের চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী নামেতেই শুধু আছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এতে সুধীরথের এক সেপাই সর্দার; ও উপযোগী চরিত্রও এটি নয়, এবং ওকে দেখে যেটুকু হাসি পায় তার চেয়ে বেশ
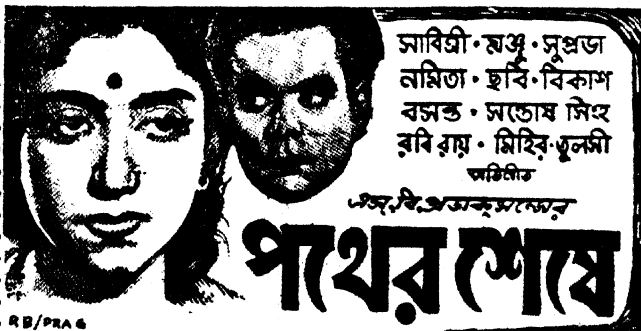
কিছু তিনি পরিবেশনও করতে পারেননি। নরবলি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চামুণ্ডা সর্দারের পুরোহিত চরিত্রে আদিত্য ঘোষ হাম্বীরের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণতার চেহারাটা ফুটিয়েছেন। পাহাড়ী সান্যাল এখানে বৈষ্ণব শ্রীনিবাস যার বৈষ্ণবগ্রন্থ হাম্বীরের অনুচররা লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে। গ্রন্থ উদ্ধার করতে এসে হাম্বীরের সংগে পরিচয় হয় তাঁর। ইতিহাসের হাম্বীরের জীবনে এ চরিত্রটির একটা মূল্য ছিল, কিন্তু ছবির কাহিনীতে মহুয়ার মৃত্যুতে হাম্বীরকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে আসেনি, তাই অতি নিস্তেজ অভিব্যক্তি। শ্রীনিবাসের সহচরের চরিত্রে বিনয় গোস্বামীকে দেখা গেল অনেকদিন পর; কীর্তনও তিনি শুনিয়েছেন। উৎপল দত্তকে দেখা যায় কামান তৈরীতে বিশেষজ্ঞ বুড়ো কামারের চরিত্রে। নীলিমা দাস রয়েছেন চিমনের গুপ্তচররূপে রাজপ্রাসাদে রাজকুমারীর সহচরী হয়ে। এছাড়া আর ভূমিকাতে আছেন সন্তোষ সিংহ, প্রীতি মজুমদার, প্রেমাশীষ সেন, বিভু, হারাধন রায়, তরুণ মিত্র, শ্রীপতি চৌধুরী প্রভৃতি।

* * *

উৎসব উপলক্ষে চিমনের অনুচরদের নাচ দু'টি ছবির উজ্জ্বল দ্রষ্টব্য অংশ। কাড়া নাকাড়া সহযোগে মুখোস নৃত্য দু'টি উপভোগ্য হওয়া ছাড়াও বেশ একটা কাহিনীর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। এই লোকনৃত্য পরিবেশন করেছেন গোকুল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মানভূমের মহামায়া নাট্যমন্দিরের শিল্পিবৃন্দ। চারু রায়ের শিল্পনির্দেশনায় ইতিহাসকালের বেশ একটা ছাপ ফুটেছে পরিবেশের গায়ে; তবে নিখুঁত নয়। পোশাকের দিকে ত্রুটি রয়েছে। আলোকচিত্রের কাজ ভালো। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন জি কে মেহতা। প্রণব রায়ের লেখা ক'খানি বিশিষ্ট গান আছে; সুরে ও গাওয়ায়ও শুনতে বেশ। সংগীত পরিচালনা করেছেন চিত্ত রায়। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন শ্যাম দাস এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য।

রবিতীর্থ-প্রযোজিত "চিত্রাঙ্গদা"

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যাবলীর মধ্যে "চিত্রাঙ্গদা"-র আদর ও জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। বহু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নৃত্যনাট্যখানি মঞ্চস্থ হয়েছে। রবি তীর্থের'ও "চিত্রাঙ্গদা" পরিবেশন গত রবিবার নিউ এম্পায়ারেই প্রথম হলো না; এর আগে একবার আশুতোষ কলেজ হলে অভিনয় করে-

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় অনাদিপ্রসাদ ও ঝর্ণা মজুমদার

ছিলেন এবং এই সেদিন রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে মহাজাতি সদনেও এ'রা একবার অভিনয় করেন। কিন্তু নিউ এম্পায়ারে সেদিন যে পরিবেশন দেখা গেল তা এ পর্যন্ত তাঁরা যতবার মঞ্চস্থ করেছেন তার মধ্যে বেশ একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেয়। রূপে বর্ণে ছন্দে সুরে উপস্থাপনের মধ্যে মনকে হৃদ্য করে তোলার মতো একটা চমৎকার শোভা ফুটেছিল সেদিনের অভিনয়ে। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেন সুচিত্রা মিত্র এবং দ্বিজেন চৌধুরী। চিত্রাঙ্গদার গানগুলি সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে অপরিসীম তৃপ্তি এনে দেয়। অর্জুনের গানগুলি গাওয়ায় দ্বিজেন চৌধুরী সম্পর্কে এতোটা উচ্ছ্বসিত হওয়া যায় না। সম্মিলিত গানগুলি পরিবেশনে রবি তীর্থের শিল্পিবৃন্দ চমৎকার একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেন। অর্জুনের সংলাপ আবৃত্তি করেন সুনীল দাশগুপ্ত। একটু মেলোড্রামাটিক। সুজিত নাথের নেতৃত্বে সংযোজিত আবহসঙ্গীত পরিবেশ মতো সুর সৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করে। পরিবেশ ও ভাবকে নিবন্ধ করে তুলতে তাপস সেনের আলোকসম্পাতও বিশেষ সহায়ক হয়।

চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় ঝর্ণা মজুমদার আগেও এই ভূমিকাতেই অবতরণ করেছেন কয়েকবার এবং নামও করেছেন। নৃত্যছন্দে ও ললিত ভঙ্গীতে ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রটি তিনি সার্থকভাবে রূপায়িত করে তোলেন। প্রথম আবির্ভাবে তাঁর যোদ্ধবেশ ঠিকই আছে, তবে পুরোপুরি পুরুষ বেশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর, সুরূপা থেকে কুরূপাতে রূপান্তরটা বড় অস্পষ্ট। নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অনাদিপ্রসাদ চমৎকার একটা বৈচিত্র্য এনে দিয়েছেন। রচনার মধ্যে রকমারিতা আছে। একটা নাগা নৃত্য দিয়ে কাহিনীর সুন্দর আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়েছে। তবে ওটা রণনৃত্য না হয়ে উৎসব নৃত্য হওয়াই উচিত ছিল, যেহেতু অর্জুনের এখানে তাপসের ভূমিকা। অর্জুনের চরিত্রে অবতরণ করেছেন অনাদিপ্রসাদ নিজে এবং সেদিক থেকেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সর্বতোভাবেই রবি তীর্থের এই "চিত্রাঙ্গদা" বেশ একটা জমকালো শিল্প-পরিপুষ্ট নৃত্যাভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

খেলার মাঠে

একলব্য

গত ৭ই জুন মোহনবাগান ও রাজস্থান ক্লাবের লীগের খেলা দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবার পর . ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগের খেলাতেও দর্শকদের অশোভন আচরণ প্রত্যক্ষ করা গেছে, আরও পরে এরিয়ান ও খিদিরপুর ক্লাবের খেলায় শেষে একজন লাইন্সম্যান হয়েছেন নিগৃহীত। অবশ্য মোহনবাগান ও রাজস্থান ক্লাবের খেলার অপ্রীতিকর ঘটনার তুলনায় পরবর্তী ঘটনাগুলি অনেক লঘু সন্দেহ নেই, তবুও সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে যে একই মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল, আশা করি একথা সবাই স্বীকার করবেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। ময়দান যাত্রীদের মনের ব্যাধি দুষ্ট ক্ষতের মত দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবুও ফুটবলের যারা কর্ণধার, হর্তা কর্তা বিধাতা, ফুটবলের দৌলতে যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রুজি-রোজগার তারা নিশ্চুপ। আর যাদের কেন্দ্র করে এই অপ্রীতিকর ঘটনা, তারাও মৌন। কারো মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোয়নি। অতীতে ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ানের খেলার অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য যারা শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় এক সপ্তাহ খেলা স্থগিত রেখেছিলেন, দর্শকদের উস্কানি দেবার অভিযোগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব এনে সতর্ক করেছিলেন কতিপয় ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়কে, আজ তারা রঙ্গমঞ্চের মূক অভিনেতা সেজে বসে আছেন কেন? শান্তিপ্রিয় দর্শকদের পক্ষ থেকে আই এফ এর বিরুদ্ধে আজ যদি কেউ পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ আনে, তবে আই এফ এ তার কি উত্তর দেবেন? আর যে মোহনবাগান ক্লাব আদি যুগে ধূমপানের অপরাধে খেলোয়াড়কে দলছাড়া করেছেন, অশোভন আচরণ এবং রেফারীকে নিগ্রহ করবার অভিযোগে বহিষ্কার করেছেন প্রতিভাবান ক্লাব সভ্যকে, ক্রীড়াক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষাই যাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল, সেই মোহনবাগান ক্লাবও সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল ও নিন্দনীয় আচরণের প্রতিবাদ করবার প্রয়োজনবোধ করেননি। এক্ষেত্রে মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস এম বসু যিনি এবছর আই এফ এর সভাপতির পদেও সমাসীন, তাঁর একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ঘটনার পর শ্রীযুক্ত বসুর একটি সময়োপযোগী বিবৃতি অবস্থার জটিলতাকে অনেক লঘু করতে পারতো বলেই আমাদের বিশ্বাস। এ ব্যাপারে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দায়িত্বও কম নয়। অতীতে মোহনবাগান ক্লাবের খেলা অপেক্ষা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলাতেই অপ্রীতিকর ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে বেশী। ক্লাব কর্তৃপক্ষ অতীতেও সমর্থকদের নিন্দনীয় আচরণের প্রতিবাদ করেননি, এবারও করেননি। উগ্র সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রতিবাদে ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিবৃতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের হয়তো সহায়ক নয়, কিন্তু এ ধরনের সময়োপযোগী বিবৃতি আর কিছু না করুক, অন্তত উগ্র সমর্থকদের মনে মাঠে ঢিল ছোঁড়বার অনুপ্রেরণা যোগায় না; ঘটনার ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষও কিছুটা সান্ত্বনা পায়। কিন্তু জনপ্রিয় ক্লাব কর্তৃপক্ষের চুপ করে থাকার অর্থ সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরোক্ষ সমর্থন। বাস্তবিক পক্ষে ক্লাব কর্তৃপক্ষের চুপ করে থাকাকে কেউ যদি 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বলে ধরে নেয়, তবে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কি বলবার আছে? কলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দান অতুলনীয়। এদের যত্ন চেষ্টা এবং পরিশ্রমেই কলকাতা ময়দান ভারতের ফুটবল তীর্থে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজ যদি সেই ক্রীড়াতীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হয়, তবে এদেরকেই সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে হবে, সমর্থকদের ভ্রান্ত নীতির ফলে মাঠে যে হলাহল উঠবে, তা এদেরকেই পান করে হতে হবে নীলকণ্ঠ। সমর্থকদের জানিয়ে দিতে হবে মাঠের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলে প্রতিপক্ষকে দুটি পয়েন্ট দেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না এবং কার্যক্ষেত্রে এই পয়েন্ট ছেড়ে নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে। তা না হলে কলকাতার ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আজ ছোট ছোট ক্লাব যাদের পেছনে খুব বেশী সমর্থক নেই, আর কিছু সমর্থক থাকলেও যাদের সমর্থকদের মাঠের মধ্যে জুতো ও ঢিল ছোঁড়বার সাহস নেই, তারা সমর্থকপুষ্ট দলের বিরুদ্ধে খেলতে অস্বীকার করছে। বলছে ও-দুটি ক্লাবের পয়েন্ট ছেড়ে দিয়ে তারা বাকি ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এতদিন একথা এরা বলেনি। কিন্তু আজ হয়তো সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছে। সমর্থকপুষ্ট জনপ্রিয় ক্লাবগুলি যদি এখনো সতর্ক না হয়, তবে একদিন এই অবস্থাই আসতে পারে।

মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লীগের খেলায় মহমেডান গোলরক্ষক এফ রহমানকে ইস্টবেঙ্গল সেণ্টার ফরোয়ার্ড প্যাট্রিকের একটি শট প্রতিরোধ করতে দেখা যাচ্ছে

জনপ্রিয় ক্লাবগুলির সমর্থকদের বিরুদ্ধেই শুধু ছোট ক্লাবের অভিযোগ নয়। এদের অভিযোগ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই এফ এর উপরও। কলকাতার রেফারীদের খেলা পরিচালনা সমর্থকপুষ্ট জনপ্রিয় দলগুলির কোলটানা বলেও ছোট ক্লাবদের অভিযোগ আছে। দর্শকদের চীৎকারে অভিভূত হবার ফলেই হোক, কি সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত হবার আশঙ্কাই হোক, অথবা অন্য কোন কারণে হোক রেফারীর পরিচালনায় জনপ্রিয় ক্লাবেরাই নাকি লাভবান হয়ে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে এ অভিযোগের মূলে কোন সত্যতা আছে কিনা ক্যালকাটা রেফারী এসোসিয়েশন ও আই এফ এ-কে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখতে হবে। ময়দানের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্য রেফারীর যোগ্যতা সর্বাধিক প্রয়োজন। আবার শুধু রেফারীর যোগ্যতাই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, যদি দর্শক ও সমর্থকদের ফুটবল আইনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলতে না পারা যায়। আই এফ এ এবং সি আর এ-র যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। জনসাধারণকে ফুটবল আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করবার ক্ষেত্রে ক্লাবেরও দায়িত্ব আছে।

* * *

কলকাতা মাঠের দর্শক তো দূরের কথা অনেক খেলোয়াড়ও আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। বহু খেলোয়াড়েরই রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করবার অভ্যাস আছে। অথচ রেফারীর সিদ্ধান্তে আপত্তি জানাবার অধিকার কোন খেলোয়াড়েরই নেই। এ সম্পর্কে ফুটবল আইনে 'খেলোয়াড়ের প্রতি উপদেশ' শীর্ষক স্তম্ভে বলা হয়েছে :

"Never question the Referee's decisions, for on points of facts connected with the play they are final. If any arguement does arise, always support the Referee."

অর্থাৎ 'রেফারীর প্রশ্নের উপর কখনও প্রশ্ন করিবেন না, কারণ খেলা সম্পর্কে ঘটনার যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোন বিতর্ক উপস্থিত হইলে রেফারীকেই সমর্থন করিবেন।' কিন্তু কলকাতা মাঠের অনেক খেলোয়াড় রেফারীকে সমর্থন করা দূরের কথা, তার বিরুদ্ধে দর্শকদের উত্তেজিত করতেও কসুর করেন না এবং প্রকারান্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির ইন্ধন যোগান, এবিষয়ে খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়া এবং সতর্ক করবার দায়িত্ব ক্লাব কর্তৃপক্ষেরও। এটা কোন নীতির কথা নয়—আইনের কথা। কারণ আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—

Football Association hold every club responsible for the behaviour of its players."

মোহনবাগান ও এরিয়ানের লীগের খেলায় জব রায় ও ভেঙ্কটেশের একটি বল হেড করবার প্রচেষ্টা

আবার লাইন্সম্যান ও রেফারীর ভাল মন্দের জন্যও ফুটবল আইনে ক্লাবের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ৫ নম্বর আইনের ব্যাখ্যায় সম্পাদকের প্রতি উপদেশ শীর্ষক স্তম্ভে বলা হয়েছে :

"The home club is responsible for the welfare of the Referee and Linesmen, before, during and after the match, and on leaving the ground.

Notoriously bad characters should be refused admission to the ground. Post bills respecting misconduct towards the referee, threatening immediate expulsion of any spectator so guilty."

এর অর্থ—যাহাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাব, খেলার পূর্বে, খেলার সময়, খেলার পর এবং মাঠ ছাড়িয়া যাইবার সময় রেফারী ও লাইন্সম্যানদের ভাল মন্দের জন্য দায়ী। উপদেশে আরও বলা হয়েছেঃ কুখ্যাত চরিত্রের লোকদিগকে মাঠে প্রবেশ করিতে দিবেন না। এই মর্মে প্রচারপত্র প্রকাশ করিবেন যে, "কোন দর্শক রেফারীর প্রতি কোনরূপ অসৎ ব্যবহার করিলে তাহ তৎক্ষণাৎ মাঠ হইতে বহিষ্কার করা হইবে

ফুটবল খেলা নিয়ে বিশ্বের সব গোলমাল লেগে আছে, তাই বিশ্বের ফু নিয়ামক সংস্থা এমনভাবে আটঘাট বে খেলার আইন তৈরি করেছেন, যাতে কোন গোলমাল না হতে পারে। তবুও আইন বোঝার জন্য এবং আইন না মানার গোলমাল বাধে, কিন্তু খেলোয়াড় এবং দ সবারই যদি আইন সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকে, তবে গোলমালের হাত অনেক সময় অব্যাহতি পাওয়া যায়।

মাঠের অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে শা রক্ষক পুলিস বাহিনীরও দায়িত্ব কম তারা যদি নির্বাক দর্শকের ভূমিকা অ না করে প্রকৃতই সক্রিয়ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা করবার চেষ্টা করেন, তবে সহজেই মা গোলমাল বন্ধ হতে পারে। চরম উচ্ছৃঙ্খল মধ্যে উৎপাত সৃষ্টিকারী কিছু দর্শ গ্রেপ্তার করলে গোলমাল অবশ্যই বন্ধ যায়। আদালতে উৎপাত সৃষ্টিকারীদের প্রমাণ করা হয়তো শক্ত। প্রমাণাভাবে এ

ডেভিস কাপে ভারতের ব্যাডমিণ্টন অধিনায়ক নরেশকুমারের খেলার ভংগী

খালাস পাবার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু বন্দী হবার পর যদি একদিন শ্রীঘরে বাস করতে হয়, কিম্বা জামিনের জন্য গাট থেকে চারটি টাকা খরচ হয়ে যায় এবং পরে আরও কিছু খরচ হয় উকিল মোক্তারের পাছে, তবে মাঠে ঢিল ছোঁড়ার উৎসাহই বন্ধ হয়ে যায়, অপর দর্শকও শিক্ষালাভ করে। কিন্তু পুলিস যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেই থাকে, তবে উগ্রপন্থী দর্শকদের মাঠে ঢিল ও জুতো ছোঁড়বার উৎকট আগ্রহ বাড়বে বৈ কমবে না। আমরা পুলিসের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি সেদিন রাজস্থান ও মোহনবাগানের খেলায় ২০।২২ মিনিট ধরে মাঠে জুতো ও ইট-পাটকেল পড়বার সময় পুলিস বাহিনী যেভাবে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, ডালহৌসী কি চৌরংগীর উপর এভাবে ইষ্টক বৃষ্টি হলে তারা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারতেন কি? রাজস্থান ও মোহনবাগানের খেলায় গোলমাল আরম্ভ হবার পর ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে লালবাজার থেকে মাঠে অতিরিক্ত পুলিস আমদানী করা হয়, তারা এসে মাঠের মধ্যে বীর দর্পে ঘোরাফেরাও করেন, কিন্তু জুতো ইট-পাটকেল নিক্ষেপকারীদের গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা না করে, মাঠের মধ্যে থেকে জুতো ও ঢিল কুড়িয়ে এক যায়গায় জড়ো করতে থাকেন, যে কাজ ক্যালকাটা ক্লাবের মালিরাও করতে পারত। ঝাড়ুদারের কর্তব্য পালনের জন্য নিশ্চয়ই অতিরিক্ত পুলিস আমদানী করা হয়েছিল না, অতিরিক্ত পুলিস ডাকা হয়েছিল গোলমাল বন্ধের জন্য, কিন্তু সে গোলমাল বন্ধ হল না কেন? পুলিস কর্তৃপক্ষ এর কি জবাব দেবেন?

সমর্থকদের সংগে ক্লাব কর্তৃপক্ষের যোগ যোগাযোগ নেই সত্য, কিন্তু তাদের সংগে ক্লাবের অন্তরের যোগাযোগ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাই আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে ক্লাব কর্তৃপক্ষও মাঠের অপ্রীতিকর আবহাওয়া বন্ধ করতে পারেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আই এফ এ, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, ক্যালকাটা রেফারী এসোসিয়েশন এবং পুলিস আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে মাঠের গোলমালের সকল উৎসই বন্ধ হয়ে যায়। ক্রীড়াক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এরা উদ্যোগী হবেন কি?

* * *

ডেভিস কাপের খেলা থেকে ভারতকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে ভারত যেভাবে ব্রিটেনের সংগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় স্বীকার করেছে, তাতে ভারতের টেনিস গৌরব কিছু ক্ষুন্ন হয়নি। ডেভিস কাপের ইউরোপীয় অঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইন্যালে ভারত ও ব্রিটেনের খেলাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের টেনিস ক্রীড়ামোদীর মনে যথেষ্ট সাড়া জেগেছিল। বস্তুত ব্রিটেন এবং ভারতের খেলা নিয়ে দুই দেশের সমর্থকদের দীর্ঘ পাঁচ দিন ধরে যেমন আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে তা সত্যই অভূতপূর্ব। চারটি সিংগলস ও একটি ডাবলস, মোট পাঁচটি খেলার মধ্যে প্রথম দিন দুই দেশই একটি করে খেলায় জয়লাভ করে। পরের দিন ডাবলসের খেলায় বিজয়ী হয়ে ভারত ২—১ খেলায় এগিয়ে থাকে। তার পরের দিন ব্রিটেন জয়লাভ করে একটি সিংগলস খেলায়। বৃষ্টির জন্য বাকি খেলাটির মীমাংসা হয় না। পরের দিন খেলা থাকে বন্ধ। পঞ্চম দিনে ব্রিটেন শেষ খেলায় জয়লাভ

ইংলণ্ডের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় টনি মট্রামের ব্যাক-হ্যাণ্ড মারের দৃশ্য

করায় ৩—২ খেলায় বিজয়ী হয়। ইংলণ্ড ও ভারতের সমস্ত খেলাতেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। ভারত চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণণ ও ইংলণ্ডের উদীয়মান খেলোয়াড় বেকারের মধ্যে প্রথম সেটটি ১৩—১১ গেমে মীমাংসিত হয়। এতেই বোঝা যায়, দুই খেলোয়াড় তথা দর্শকদের স্নায়ুর উপর কতখানি চাপ পড়েছে। ভারতের অধিনায়ক নরেশ কুমার এবং ইংলণ্ডের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় টনি মট্রামের শেষ দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ সেট পর্যন্ত খেলার ফলাফল ঝুলে ছিল। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সুতীব্র উত্তেজনার মধ্যে মট্রাম জয়লাভ করবার পর নরেশ কুমার নেট টপকে মট্রামকে জড়িয়ে ধরেন। দুই দেশের দুই কৃতী খেলোয়াড় আলিংগনাবদ্ধভাবে পারস্পরিক প্রতিভার তারিফ করেন। খেলার মধ্যে জয়েও যেমন আনন্দ, যোগ্যের কাছে পরাজয়েও তেমন আনন্দ—এইটাই খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তি বা 'স্পোর্টসম্যানস স্পিরিট।' নীচে ব্রিটেন ও ভারতের ডেভিস কাপের খেলার ফলাফল দেওয়া হল—

সিংগলস

আর কৃষ্ণণ টনি মট্রামকে ৬—৪, ৬—০ ও ৬—২ গেমে পরাজিত করেন।

আর বেকার ৬—২, ৭—৯, ৬—২ ও ৬—৩ গেমে নরেশ কুমারকে পরাজিত করেন।

আর বেকার ১৩—১১, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে আর কৃষ্ণণকে পরাজিত করেন।

টনি মট্রাম ২—৬, ৯—৭, ৪—৬, ৭—৫ ও ৬—৩ গেমে নরেশ কুমারকে পরাজিত করেন।

ডাবলস

নরেশ কুমার ও আর কৃষ্ণণ ২—৬, ১—৬, ৬—৩, ৭—৫ ও ৬—৪ গেমে টনি মট্রাম ও জিওফ পাইসকে পরাজিত করেন।

* * *

ইন্দোনেশিয়ার উদীয়মান ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ফেরি সোনেভিলের কাছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওং পেং সুনের পরাজয় গত সপ্তাহের খেলাধুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কুয়ালালামপুরে মালয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় সোনেভিল সেমিফাইনালে ওং পেং সুনকে পরাজিত করবার পর ফাইনালে ডেনমার্ক চ্যাম্পিয়ন স্কারুপকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। সেমিফাইনালে তিনি বিশ্বের পয়লা নম্বরের খেলোয়াড় সুনকে ৮—১৫, ১৫—৩ ও ১৫—২ পয়েণ্টে পরাজিত করেন, আর স্কারুপকে ১৫—৫ ও ১৫—৪ পয়েণ্টে স্ট্রেট গেমেই পরাজিত করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ওং পেং সুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার দুই দিন পূর্বে সোনেভিল অসুস্থ হয়ে পড়েন—দুই দিন তিনি শুধু তরল আহার্য গ্রহণ করেছিলেন। তাই সুনকে হারাবার পর শ্রমকাতরতায় সোনেভিল সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সুস্থ অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ পেলে সোনেভিল হয়তো আরও ভাল খেলতে পারতেন। বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে ফেরি সোনেভিলের নাম এতদিন অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে পরাজিত করবার পর স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিশ্বজয়ীর আখ্যা লাভ করেছেন।

ফুটবল লীগ খেলার সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

[১৪ই জুনের খেলা পর্যন্ত]

এ সপ্তাহের লীগ খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইস্টবেঙ্গল এবং রাজস্থান দুইটি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়লাভ। যে মহমেডান দল পাঁচটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে পড়ছিল, রাজস্থান ও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করায় তাদের অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে। এখন তারা চ্যাম্পিয়নশিপের পথে শক্তিশালী দলগুলির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, মহমেডান দল এখন পর্যন্তও অপরাজিত থাকবার গৌরব আঁকড়ে আছে। লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের এ সপ্তাহের ফলাফল একেবারেই সন্তোষজনক নয় আর ইস্টবেঙ্গলের খেলার ফলাফল গভীর নৈরাশ্যজনক। রাজস্থান ও মোহনবাগানের গোলমেলে খেলার পর মোহনবাগানকে এরিয়ানের কাছে একটি পয়েণ্ট হারাতে হয়, তারপর উয়াড়ী ক্লাবের কাছে স্বীকার করতে হয়েছে মরসুমের দ্বিতীয় পরাজয়। ফলে ১১টি খেলার মধ্যে মোহনবাগানকে ৬ পয়েণ্ট নষ্ট করতে হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে রাজস্থানের পরাজয়ে মোহনবাগানের যেটুকু সুবিধা হয়েছিল উয়াড়ীর কাছে হার স্বীকার করায় সেটুকু সুবিধা নষ্ট হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক কালের ফুটবল খেলার ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে উপর্যুপরি ৪টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে বলে আমাদের মনে পড়ে না। হাতের কাছে রেকর্ডপত্র না থাকায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কোন বছর একাদিক্রমে ৪টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছে কি না বলতে পারছি না, তবে আমাদের মনে হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ইতিপূর্বে কোনদিন এমনভাবে হার স্বীকার করতে হয়নি। যে বছর তাদেরকে দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যেতে হয় সে বছরও বোধ করি একাদিক্রমে পাঁচটি খেলায় গোল করবার অক্ষমতা প্রকাশ পায়নি। লীগ কোঠায় শীর্ষস্থানীয় দলগুলি অপেক্ষা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এখন বহু দূরে। তাদের বর্তমান ক্রীড়াধারায় খেলার মোড় ঘোরানোও কণ্টকর। এই অবস্থায়ই তাদের শনিবার চ্যারিটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে। মোহনবাগানের সাম্প্রতিক খেলাও আশাব্যঞ্জক নয়। তাই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রাণ মাতানো মন মাতানো খেলারও এবার আকর্ষণ কম।

এবার লীগ বিজয়ের পথের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজস্থান ক্লাব বেশ ভালই খেলেছে। খ্যাতিমান খেলোয়াড় সালামের অভাবে মহমেডান দলের বিরুদ্ধে এদের তিন ব্যাক প্রথার ক্রীড়াধারা ব্যাহত হয়। তবুও ভাল খেলেছিল রাজস্থান ক্লাব, কিন্তু গোল করতে পারেনি। যাই হোক, বর্তমানে রাজস্থানই সবচেয়ে কম পয়েণ্ট হারিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। এরিয়ানের খেলা উন্নতির দিকে। নীচের দিকের দলগুলি একটি দুটি করে পয়েণ্ট লাভ করেছে। এই সপ্তাহেই প্রথমার্ধ লীগের প্রায় সব খেলা শেষ হবার কথা, কেবল শিকেয় তোলা থাকবে মোহনবাগান ও রাজস্থান ক্লাবের গোলযোগপূর্ণ খেলা সম্পর্কে আই এফ এর সিদ্ধান্ত। নীচে গত সপ্তাহের খেলার ফলাফল ও লীগ কোঠায় প্রথম ছয়টি দলের অবস্থা দেওয়া হল :—

৮ই জুন '৫৫

উয়াড়ী (০) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
পুলিস (১) : রেলওয়ে স্পোর্টস (০)

৯ই জুন '৫৫

মোহনবাগান (০) : এরিয়ান (০)
অরোরা (০) : বি এন আর (০)

১০ই জুন '৫৫

মহঃ স্পোর্টিং (২) : ইস্টবেঙ্গল (০)
রাজস্থান (৩) : কালীঘাট (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০) : জর্জ টেলিগ্রাফ (০

১১ই জুন '৫৫

রেলওয়ে স্পোর্টস (১) : উয়াড়ী (০
এরিয়ান (১) : অরোরা (০

১৩ই জুন '৫৫

মহঃ স্পোর্টিং (১) : রাজস্থান (০
এরিয়ান (২) : খিদিরপুর (১
জর্জ টেলিগ্রাফ (২) : রেলওয়ে স্পোর্টস (১

১৪ই জুন '৫৫

উয়াড়ী (১) : মোহনবাগান (০
বি এন আর (১) : ইস্টবেঙ্গল (০
অরোরা (১) : কালীঘাট (১

প্রথম ডিভিশন লীগে উপরের ৬টি দল

(১৪ই জুনের খেলার পর)

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১১	৭	২	২	২১	৪	১৬
মহঃ স্পোর্টিং	১০	৫	৫	০	১০	২	১৫
রাজস্থান	৯	৭	০	২	১৬	৪	১৪
এরিয়ান	১১	৫	৪	২	৭	৪	১৪
উয়াড়ী	১১	৫	৩	৩	১০	৭	১৩
ইস্টবেঙ্গল	১২	৬	১	৫	১১	৮	১৩

দেশী সংবাদ

৬ই জুন—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে একটি শুভেচ্ছাসূচক বাণীতে বলেন, সৌভাগ্যক্রমে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ভারতের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ। তিনি মনে করেন, শ্রী নেহরুর ভ্রমণের ফলে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ়তর হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে কুটীর শিল্পের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার কর্তৃক পাঁচ কোটি টাকার এক খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ আজ ঘোষণা করেন যে, এ বৎসর ভারতে ১৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইবে। ইতোপূর্বে আর কোনও বৎসর এত অধিক পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হয় নাই।

শ্রীঅনিলকুমার চন্দের নেতৃত্বে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল রবিবার রাত্রে বিমানযোগে চীন যাত্রা করেন।

৭ই জুন—ভারত সরকার অদ্য ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাইকে স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার কেন্দ্রীয় বোর্ডের সভাপতি পদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বোম্বাই সরকারের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী বৈকুণ্ঠলাল মেটা বোর্ডের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারত সরকার প্রস্তাবিত হিন্দী কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। বি জি খের এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮ই জুন—শ্রীনগরে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থান সরকার পাকিস্থান অধিকৃত তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীরের' প্রেসিডেণ্ট জেনেল শের আহম্মদ খানকে তাঁহার স্বগৃহে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

গতকল্য হাবড়া উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহের ৯ জন বন্দীকে বিচারের জন্য বারাসত মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করা হয়। বন্দিগণ জামিনে মুক্তি পাইতে অস্বীকার করেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

৯ই জুন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরিসংখ্যান উপদেষ্টা এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া কাঠামো রচয়িতা অধ্যাপক পি সি মহলানবীশ আজ কলিকাতায় এক সংবাদিক বৈঠকে ঐ কাঠামো-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, কাঠামো-পরিকল্পনা রচনার মূল উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—(১) যতশীঘ্র সম্ভব বেকার

সাপ্তাহিক সংবাদ

সমস্যার সমাধান এবং (২) ভবিষ্যতে শিল্পোন্নয়নের দৃঢ়ভিত্তি রচনা।

এলাহাবাদে প্রাপ্ত এক সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, এলাহাবাদ হইতে দশ মাইল উজানে গঙ্গাবক্ষে এক নৌকাডুবির ফলে অন্তত ৩২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে ৩১ জন নারী এবং একজন বালক।

কলিকাতার শুল্ক বিভাগের প্রিভেণ্টিভ অফিসারগণ সম্প্রতি বড়বাজার এলাকার দুইটি স্থানে হানা দিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের হীরক খচিত অলংকারপত্র আটক করিয়াছেন।

এলাহাবাদ ব্যাংকের কলিকাতা শাখার কর্মচারিগণ ছয়দিন অবস্থান ধর্মঘটের পর আজ কাজে যোগদান করেন।

১০ই জুন—পর্তুগীজ উপনিবেশে মুক্তি আন্দোলনের উপর পর্তুগীজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া আজ সকালে নিরস্ত্র চতুর্থ স্বেচ্ছাসেবক দল গোয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। এই দলে ১২০ জন স্বেচ্ছাসেবক আছেন। এপর্যন্ত যতগুলি দল গোয়া মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দল। সাতারার কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীরাজারাম পাতিল এই দলের নেতৃত্ব করিতেছেন।

১১ই জুন—আজ রাত্রি আট ঘটিকায় যাদবপুর অঞ্চলে রামগড় উদ্বাস্তু পল্লীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীমুকুল বসু অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এই মৃত্যু সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উত্তর আসামের জোড়হাট ও গোলাঘাট মহকুমা দুইটিতে ২৪টি চা বাগানের ১১ হাজার ৬ শত শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে। প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট চা-বাগানসমূহের পরিচালকগণ চায়ের পাতা তুলিবার মজুরির যে নূতন হার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার ফলে শ্রমিকদের পূর্বাপেক্ষা কম আয় হইতে থাকে এবং ইহাই ধর্মঘটের কারণ বলিয়া প্রকাশ।

১২ই জুন—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এ বৎসরের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল ঘোষিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় শতকরা পাশের হার গত বৎসরের তুলনায় অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। গত বৎসর শতকরা পাশের হার ছিল .২৪। এ বৎসর ঐ হার হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৫১.২৫।

বিদেশী সংবাদ

৭ই জুন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ বিমানযোগে সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। বিমান ঘাটিতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন, মঃ ক্রুশেভ, মঃ মলোটভ এবং মঃ ম্যালেনকোভ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ শ্রী নেহরুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রী নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, তাঁহার এই ভ্রমণ দ্বারা ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী দৃঢ়তর হইবে।

৮ই জুন—পর্তুগীজ পররাষ্ট্র দপ্তরের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় যে, পর্তুগীজ সরকার ভারত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে একথা জানাইয়া দিয়াছে যে, ভারতস্থ পর্তুগীজ এলাকায় 'আক্রমণ' বলপ্রয়োগে দমন করা হইবে।

১০ই জুন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ ক্রেমলিনে মার্শাল বুলগানিন কর্তৃক প্রদত্ত ভোজসভায় বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট সরকারের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের প্রথমেই মার্শাল বুলগানিন শ্রী নেহরু ও ভারতের জনগণের কল্যাণ কামনা করিয়া শ্রী নেহরুকে মহান জননায়ক বলিয়া বর্ণনা করেন।

১১ই জুন—আজ সকালে শ্রী নেহরু ষ্ট্যালিনগ্রাদে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য পৃথিবীর সকল "স্বাধীন জাতিকে" মানব কল্যাণে আণবিক শক্তি উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য ও কারিগরী সুযোগ-সুবিধা দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

১২ই জুন—হংকং-এর পুলিস কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক ধরনের টাইম বোমা বিস্ফোরণের ফলেই ভারতীয় যাত্রিবাহী বিমান "কাশ্মীর প্রিন্সেস" ধ্বংস হইয়াছে। এই অন্তর্ঘাতী কার্যের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আদালতে দণ্ডিত করা যায়, এমন কোন সংবাদ দিতে পারিলে ১ লক্ষ হংকং ডলার (৬,২৫০ ষ্টার্লিং) পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া পুলিস কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৹ আনা, বার্ষিক—২০, যান্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতিকারের প্রকৃত উপায়

ভারতের পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না পূর্ব পাকিস্থানের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আবুহোসেন সরকারের সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং উভয়ের সেই মিলিত বৈঠকের পর তাঁহারা সম্মিলিতভাবে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সফর করিবেন, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে হক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সেখান হইতে উদ্বাস্তু সমাগম হ্রাস পায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছুটা আশ্বস্তির ভাব ফিরিয়া আসে। কিন্তু হক মন্ত্রিমণ্ডল অপসারিত হইয়া গভর্নরের জবরদস্তি শাসন সেখানে চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বস্তির ভাব বিনষ্ট হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দলে দলে অবস্থা অতিষ্ঠ বুঝিয়া পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটিতে থাকে। সম্প্রতি হক সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত নূতন মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় আশ্বস্তির ভাব ফিরিবার সম্ভাবনা অনেকটা দেখা দিয়াছে; কিন্তু এই মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাদের প্রতিশ্রুত কর্মতালিকা কতটা কার্যে পরিণত করিতে পারিবেন, তাহার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। মিঃ আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিমণ্ডল পূর্ববঙ্গের সব রাজবন্দীকে অদ্যাপি মুক্তি দিতে সমর্থ হন নাই। বাংলাভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী এবং বাংলাভাষা সম্পর্কিত আন্দোলনের জন্য ১৯৫২ সালে যে সব তরুণ আত্মদান করিয়াছিল, তাহাদের স্মৃতির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী ছুটির দিন স্বরূপে ঘোষণা করিবার পূর্ব সিদ্ধান্তে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল দৃঢ় থাকিবেন কিনা, তাহাও জানা যায় নাই। বাস্তবিকপক্ষে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্বস্তির ভাব ফিরাইতে হইলে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে অবিলম্বে কার্যকর করিতে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা শুধু ভারত এবং পাকিস্থানের মন্ত্রীদের মিলিত সফরেই এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, এমন সফরের ফলে যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্বস্তির ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্য যথেষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি

কলিকাতা শহরে কলেরার প্রকোপ উত্তরোত্তর ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। খিদিরপুর অঞ্চলে সম্প্রতি এই ব্যাধির প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। কলেরার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার পৌরসভা একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন। সভার আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, দূষিত কলের জল খিদিরপুর অঞ্চলে ব্যাধির প্রাবল্যের কারণ। কারণটি অবশ্যই দুর্জ্ঞেয় নয় এবং ইহা পৌরসভার আগেও জানা ছিল; কিন্তু সময় থাকিতে তাঁহারা ইহার প্রতিকার সাধন প্রয়োজন মনে করেন নাই, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কিছুদিন পূর্বে পৌরসভার এক অধিবেশনে কয়েকজন সদস্য দূষিত কলের জল নমুনাস্বরূপে উপস্থিত করেন, তবু কর্তাদের জ্ঞান হয় নাই। বর্তমানে ব্যাধি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। হাসপাতালগুলিতে রোগীর জায়গা হইতেছে না। রোগীর সংখ্যা প্রতি সপ্তাহেই বাড়িতেছে। পৌরসভার কর্তা-দের এতদিনে টনক নড়িয়াছে, তাঁহারা পরিস্রুত জল সরবরাহের জন্য লরীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাপকভাবে টীকা দেওয়ার জন্য এখন তাঁহাদের তাগিদ জাগিয়াছে। অথচ সময় থাকিতে তাঁহাদের এই সুবুদ্ধির সঞ্চার হইলে জলবাহিত এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে যে শহরবাসীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। মহামারী ভীষণ-ভাবে ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইলে তবে এই সহজ সত্যটির সম্বন্ধে পৌরসভাকে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতে হয়, ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

মহত্বের অবমাননা

পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারী মিঃ এন এম খাঁর মধ্যযুগীয় জবরদস্তি মনোবৃত্তির জন্য কীর্তি-খ্যাতি আছে। সম্প্রতি তাঁহার অভিনব কীর্তি-কথা লোকে জ্ঞাত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয় হইতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি অপসারণের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। ভারত-পাকিস্থান উপ-মহাদেশের নেতৃ-বৃন্দের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী যে অন্যতম, এ পর্যন্ত মানিয়া লইতে তিনি রাজী

আছেন। কিন্তু কায়েদে আজম জিন্নার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীকে স্থান দিতেই তাঁহার যত আপত্তি। মিঃ এন এম খানের ন্যায় এই মনোভাবের জন্য গান্ধীজীর মহিমা কিছুই ক্ষুন্ন হইবে না; পরন্তু খাঁ সাহেব এই কাজে তাঁহার নিজের পরিচয় নিজেই দিয়াছেন। গান্ধীজী শুধু রাজনীতিজ্ঞ নহেন, তিনি বর্তমান যুগের মহামানব। সার্বভৌম মানবতার উদার আদর্শ তাঁহাকে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিশ্বমানব কল্যাণের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপে গান্ধী সর্বত্র পূজিত। তাঁহার মর্যাদা প্রদর্শনে মানবতার প্রতিই মর্যদা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পাকিস্থান ইস্লামিক রাষ্ট্র, এই সত্য স্বীকার করিয়া ও মিঃ খানের কাজ দেখিয়া আমাদের এই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় যে, পাকিস্থানে তবে কি মানবতার কোন মূল্য নাই? মিঃ খানের ন্যায় শাসকবর্গ তাঁহাদের এইরূপ ধরনের মনোবৃত্তির দ্বারা মানব-সংস্কৃতি এবং মানবতার উদার আদর্শকেই ক্ষুন্ন করিতেছেন। অধিকন্তু তাঁহাদের কার্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্থানের মর্যাদারও অপহ্নব ঘটিতেছে। নৈতিক আদর্শ যদি রাষ্ট্রের মূলে না থাকে, তবে কোন রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে না এবং এইদিক হইতে দুর্বল বলিয়াই পাকিস্থান নানারকমে অন্তর্বিরোধে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। দেখা যাইতেছে, পাকিস্থানের শাসকবর্গ বহুভাবে ঠেকিয়া আজও এই শিক্ষা অর্জন করিতে পারিলেন না।

মৃত্যুবরণে অমরত্ব

গুপ্তঘাতী কূটচক্রান্তের ফলে কাশ্মীর প্রিন্সেস নামক বিমান সমুদ্রে পতিত হয়, ইহা সুনিশ্চিতরূপে বিভিন্নরূপ তদন্তের ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই বিমানখানি একদল চীনা প্রতিনিধিকে লইয়া হংকং হইতে বান্দুং সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য জাকার্তা অভিমুখে যাইতেছিল। সম্প্রতি ভারত সরকার এই বিমানের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি কে জাঠার, তত্ত্বাবধায়িকা কুমারী গ্লোরিয়া বেরী, ইঞ্জিনীয়ারিং মিঃ ডি দুলহা এবং জে জে পিমেণ্টা এবং সি ভি ডি সুজা ইঁহাদিগকে অশোকচক্রের দ্বারা সম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন। বিমানের আটজন যাত্রীসহ ইঁহারা দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বৈমানিকদের মধ্যে সহ-বিমান পরিচালক ক্যাপ্টেন দীক্ষিত, নেভিগেটর মিঃ কার্নিক এবং মিঃ পাঠক দুর্ঘটনায় এই তিনজন মাত্র রক্ষা পান, ইঁহাদিগকেও বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপে বিভিন্ন অশোকচক্রের দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। আর্তরক্ষার সুমহান্ ব্রত পরিপালন করিতে গিয়া এই বিমান দুর্ঘটনায় যাঁহারা মহনীয় মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য, মৃত্যুর ভিতর দিয়া তাঁহারা অমরত্ব অর্জন করিয়াছেন। নিজেদের গৌরব, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বৈমানিকদের গৌরবও তাঁহারা বাড়াইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের মৃত্যুতে মৃত্যু মহনীয় হইয়াছে। ইঁহারা মানব-সমাজের নমস্য। যে তিনজন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া অশোকচক্রের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়াছেন, তাঁহারাও সমভাবেই মানব-সমাজের মর্যাদার অধিকারী। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে

বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে আগামী ১লা জুলাই হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই রেলপথ বন্ধ হইয়া গেলে যাত্রীদিগকে যে কিরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইবে, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ক্রমাগত আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই রেলপথের যাত্রীদের একদল প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট গিয়া নিজেদের অসুবিধার কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁহাদের সিদ্ধান্তেই দৃঢ় আছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। আমাদের মতে যে পর্যন্ত এই পথে উপযুক্ত সংখ্যক বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইতেছে, সে পর্যন্ত এই লাইনটি চালু রাখা উচিত। নূতন রেললাইনের কথা শুনা যাইতেছে। কতদিনে সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবে বলা কঠিন। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া নূতন রেলপথ প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এই রেললাইনটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিলে জন-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ প্রতিপালিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে

গত ৮ই আষাঢ় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় তিরোভাব বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ পুরুষসিংহ ছিলেন। দেশসেবার সংকট-যাত্রায় তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া অমরত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কাশ্মীরের কারাগারে তাঁহার জীবনদানে যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা নিভিবে না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্য, বিশেষভাবে বাঙলার জীবন্ত জাতীয়তাবাদ এবং উদার সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া সে অগ্নি উত্তরোত্তর দুরন্তবলে দিগন্তে আলোকধারা বিকীর্ণ করিবে। যুগ যুগ ধরিয়া শ্যামাপ্রসাদের অবদানের অপরিম্লান প্রাণ-মহিমা জাতির ভবিষ্যৎকে প্রদ্দীপ্ত করিবে এবং দেশ-সেবার বলিষ্ঠ বীর্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে। এমন মৃত্যু বীরেন্দ্রবর্গ-বাঞ্ছিত। বীরের মৃত্যুতে শোক করিতে নাই। আমরাও শোক করিব না। বীরের স্মৃতি-পূজায় দুর্বলের অশ্রু আমরাও ফেলিব না। ভারতের সংহতি-সাধনার কল্যাণব্রতে আত্মদাতা শ্যামাপ্রসাদের প্রাণবত্তা এবং তাঁহার অমৃতময় সত্তাকেই আমরা আজ অন্তরে অনুভব করিব। আমরা মৃত্যু ভুলিয়া শ্যামাপ্রসাদের নিত্য জীবনেরই জয়গান করিব।

কলিকাতার রাজপথ

বর্ষা সমাগমে কলিকাতা সহরবাসীকে যে সব দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে, তন্মধ্যে পথের সংকট অন্যতম। লঘুবৃষ্টি হইলেই রাজপথে বান বহে। অধিক বৃষ্টি হইলে দুস্তর সমুদ্রের মত অগাধ জলে ঢেউ ছুটে। ট্রাম বাস সব বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে লোকের অসুবিধা, কাজকর্মের ক্ষতি কতটা ঘটে কাহারো অবিদিত নয়; কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার এ পর্যন্ত হয় নাই এই বিশেষ দুর্ভোগের বিড়ম্বনা হইতে পৌর জনগণকে রক্ষা করা কি বর্তমানের এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সত্যই অসম্ভব?

পণ্ডিত নেহরুর সোভিয়েট ভ্রমণের পরে জুগোস্লাভিয়াতে সপ্তাহখানেক বেড়াবেন। য়ুরোপ ত্যাগের পূর্বে তাঁর রোমে দু-একদিন কাটাবার কথা। সেখানে পোপ মহোদয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা আছে। ফেরার পথে পণ্ডিত নেহরু দুদিন মিশরের প্রধান মন্ত্রী কর্নেল নাসেরের আতিথ্য গ্রহণ করবেন স্থির আছে। বর্তমান সফরের যে নির্ঘণ্ট স্থির ছিল, তাতে পণ্ডিত নেহরুর এবার লণ্ডনে যাবার কথা ছিল না। কিন্তু সম্ভবত তিনি লণ্ডনে যাচ্ছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সার এ্যাণ্টনী ইডেন পণ্ডিত নেহরুকে লণ্ডন যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সার এ্যাণ্টনী পণ্ডিত নেহরুকে জুগোস্লাভিয়া ভ্রমণ শেষ করেই লণ্ডনে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। পণ্ডিত নেহরু বেলগ্রেড থেকেই লণ্ডনে যাবেন অথবা রোমের পরে যাবেন, তা এখনো জানা যায় নি, তবে যখনি হোক অল্প সময়ের জন্য হলেও সার এ্যাণ্টনী ইডেনের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে, এটা একরকম নিশ্চিত বলা যায়।

মস্কোতে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর যে ধারণা জন্মেছে, সার এ্যাণ্টনী ইডেন তা জানতে চান। আগামী মাসে জেনেভাতে বৃহৎ চতুঃশক্তি প্রধানদের যে সম্মেলন হবে, তাতে বিভিন্ন বিষয়ে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কতদূর এগুতে বা পেছুতে প্রস্তুত, পূর্ব থেকে তার একটা আঁচ পেলে পশ্চিমা শক্তিদের সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরুর কাছ থেকে কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে সার এ্যাণ্টনী ইডেন নিশ্চয়ই আশা করেন, বিশেষ করে সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে।

জেনেভা কনফারেন্সে সুদূর প্রাচ্যের কথা অবশ্য উঠবে। চীনকে বাদ দিয়ে সুদূর প্রাচ্যের বিষয় আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ হতে পারে না। রাশিয়া চতুঃশক্তির জায়গায় পঞ্চশক্তির অর্থাৎ চীনকে নিয়ে আলোচনা চেয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার বর্তমান নীতিতে সম্ভব ছিল না। সুতরাং জেনেভা কনফারেন্সে চতুঃশক্তির প্রধানগণই মিলিত হবেন। সম্মেলনে রাশিয়া একদিকে চীনের দৃষ্টিভংগীর প্রতিনিধিত্ব করবে এবং অন্যদিকে চীন যাতে সাক্ষাৎভাবে আলোচনার শরিক হতে পারে, তার চেষ্টা করবে। আগামী মাসে জেনেভায় যে কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে চীন না থাকলেও এই কনফারেন্সের জের হিসাবে যে সব আলোচনা চলবে বলে আশা করা যায়, তার সঙ্গে চীনকে সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা হতে পারে। বান্দুংএ চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই বলেন যে, আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনার করার জন্য চীন সরকার প্রস্তুত আছেন। এই কথাটা অস্পষ্টই রয়ে গেছে, তবে আমেরিকা ও চীনকে আলোচনার জন্য এক টেবিলে উপস্থিত করার জন্য কূটনৈতিক চেষ্টা ভিতরে ভিতরে বোধ হয় চলছে। জেনেভা কনফারেন্সের পরে তার চেয়ে একটু নিম্নস্তরে—যেমন বৈদেশিক মন্ত্রীদের একটা বৃহত্তর কনফারেন্স হতে পারে, যাতে চীন যোগ দিতে পারে।

জেনেভা কনফারেন্সে অবশ্য ইউরোপীয় প্রশ্নসমূহ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংকুচনের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হবে। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা-গুলিকে আলাদা রেখে এসব প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়। পশ্চিমা শক্তিদের

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীবিমল করের ছোট উপন্যাস 'অবগুণ্ঠন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক
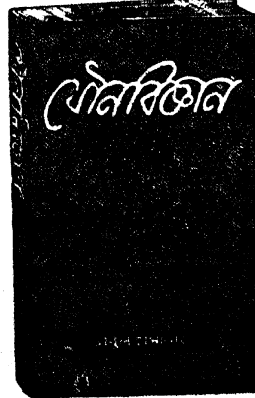
মধ্যে এ ভয়ের কথাও শুনা যাচ্ছে যে, ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়া যদি নিশ্চিন্ত হতে পারে অথচ সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতির বিষয়ে কিছু করা না হয়, তবে তাতে রাশিয়া এবং মোটের উপর কম্যুনিস্ট পক্ষের সুবিধা হবে, কারণ তখন রাশিয়া সুদূর প্রাচ্যে কম্যুনিস্ট শক্তি বাড়াবার জন্য বেশি সুযোগ ও অবসর পাবে।

অস্ত্র-সংকুচনের প্রশ্নেরও সুদূর প্রাচ্যকে বাদ দিয়ে মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কারণ রাশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের সৈন্যবলের সীমা যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হয়, তবে কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট ব্লকের রণশক্তির মধ্যে সমতা রক্ষা করার ব্যবস্থা হয় না। সুতরাং মীমাংসা করতে হলে সব একসঙ্গে করতে হয়। বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রধানদের কনফারেন্সে কোনো সমস্যারই পূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হবে, এরূপ আশা করা যায় না, মীমাংসার দিকে এগুবার জন্য ব্যাপকতর আলোচনার পথ যদি কিছুটা খোলে, তাহলেই যথেষ্ট হবে।

এদিকে অবশ্য জার্মানীই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। রাশিয়া পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ডক্টর এ্যাডেনয়েরকে মস্কোতে নিমন্ত্রণ করার পরে পশ্চিমা শক্তিরা স্বভাবতই অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। পশ্চিম জার্মানীকে NATO থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাশিয়া তো সর্বপ্রকার চেষ্টা করবেই। জার্মানদের সর্বপ্রধান কাম্য এখন জার্মানীর ঐক্যসাধন। রাশিয়া দেখাতে চাইবে যে, পশ্চিম জার্মানী যদি NATOর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, তবে রাশিয়ার সহযোগিতায় জার্মানীর ঐক্যসাধন অবিলম্বে সম্ভব। বস্তুত রাশিয়ার হাতে অনেক কিছু আছে, যা দিয়ে রাশিয়া জার্মানীকে প্রলুব্ধ করতে পারে। অন্ততপক্ষে জার্মানদের চোখে পশ্চিমা শক্তিদের বেকায়দায় ফেলার মতো অনেক বাণ সোভিয়েটের তূণে আছে। ডক্টর এ্যাডেনয়ের সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করেছেন। সেখান থেকে লণ্ডনে এসে সার এ্যাণ্টনী ইডেনের সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন। উভয় সাক্ষাৎকারের পরেই যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে পশ্চিম জার্মানী পশ্চিমা শক্তিদের দিকে আছে, এই কথার সঙ্গে এ কথাটাও বলার আবশ্যক হয়েছে যে, পশ্চিমা শক্তিরা জার্মানীর ঐক্যসাধনের জন্য বরাবর চেষ্টা করে আসছে।

রাশিয়া যে রকম চাল চালছে, তাতে কেবল এই কথা দ্বারা জার্মান জনমতকে সন্তুষ্ট রাখা যাবে না। মার্কিন ও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে ডক্টর এ্যাডেনয়ের নিশ্চয়ই আরও কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। রাশিয়া কী দিতে চাইলে তার পাল্টা পশ্চিমা শক্তিরা কী দিতে রাজী আছে, ইত্যাদি ধরনের কথা অবশ্যই হয়েছে, যেগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য। মনে হয়, ইউরোপের ভবিষ্যৎ বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রধানদের সম্মেলনের চেয়ে জার্মান লোক-মতের উপর যেন বেশি নির্ভর করছে অথবা একথা বলা যায় যে, ইউরোপের ভবিষ্যৎ বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রধানদের সম্মেলনের উপর নির্ভর করছে বটে, কিন্তু ঐ সম্মেলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জার্মান লোকমতের উপর। অদূর-ভবিষ্যতে ইউরোপে কোনো "বৃহৎ" শক্তির সম্মেলন জার্মানীকে বাদ দিয়ে হতে পারবে বলে মনে হয় না।

* * *

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আর্জেন্টিন রাষ্ট্রে একটা আধা-বিপ্লব হয়ে গেল, যার ফলে প্রেসিডেণ্ট পেরনের ডিক্টেটরী বোধ হয় অবসান হতে চল্ল। পেরন এখনও প্রেসিডেণ্টের পদেই আছেন, যারা গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তারা দমিত হয়েছে, মোট ফল হয়েছে পেরনের ক্ষমতা হ্রাস। পেরন ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে রাজশক্তি প্রয়োগে বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। ফলে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাতে সৈন্য বিভাগের এক অংশও যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত সরকারী পক্ষ জয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমনের কৃতিত্ব পেরনের চেয়ে সৈন্য বিভাগের মন্ত্রী জেনারেল লুসেরোরেই অধিক বলে সংবাদে প্রকাশ। বস্তুত পেরন পেছনে পড়ে গেছেন এবং সম্ভবত তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা অনেক-খানি খসে পড়ে গেছে, আর তাঁর হাতে সে ক্ষমতা ফিরে যাবে কিনা সন্দেহ। ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের একটা আপস না হলে আর্জেন্টিনের মুশকিল, যা ঘটেছে তার পরে সে আপস হতে হলে পেরনকে সরতে হবে।

২২।৬।৫৫

সমন্ত ভদ্র

এখন সব স্বপ্নের মত হয়ে গেছে। কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট। যোগসূত্র খুঁজে মেলে না। টুকরো জোড়া দিয়ে ছেঁড়া চিঠি পাঠোদ্ধারের খেলা যেন। রাত্রিশেষে শীতের কুয়াশার মত প্রথমে ঝাপসা, তারপর ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসে ছবিগুলি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সারা হলে, আবার বাইরের ঘরে এলাম।

রায়চৌধুরী বললেন, 'এবার একটু বিশ্রাম করুন।'—বলে আমাকে একা রেখে, দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে খড়মের শব্দ তুলে চলে গেলেন।

ভেবেছিলাম একটু ঘুমিয়ে নেবো। শরীর মন ক্লান্তও হয়েছিল।

নড়বড়ে খাট, ছেঁড়া শতরঞ্জিতে একটা বোটকা গন্ধ, তাকিয়াটাও তথৈবচ। এসব অসুবিধা অবশ্য আমার গা-সহা। চাকরিটাই এমনি যে বেশির ভাগ সময় মফস্বলে ঘুরে ঘুরেই কাটে, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ জোটে কদাচিৎ।

জরাজীর্ণ ঘরটা। দেওয়াল ও ছাত থেকে চুনবালির পলেস্তারা খসে খসে পড়েছে, কোথাও ফাটল। কড়িতে মাকড়সার জাল। ঘরের এক পাশে একখানা কাঠের বেঞ্চিতে কতকগুলি সেকেলে তোরঙ্গ একটার পর একটা সাজানো। সামনের খোলা জানালাটা দিয়ে মাঝে মাঝে একটু হাওয়া আসছে, নজরে আসছে রায়চৌধুরীর ছোট উঠোনের পুঁই-মাচা ফুঁড়ে ওঠা আধমরা একটা পেঁপে গাছের হলদে চেহারা।

অবসাদে দেহ ভারি, তবু ঘুম এল না। ভোঁতা নেশার মতই শুধু একটু তন্দ্রা। আচ্ছন্নভাব।

আর সেই তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে চেনা-অচেনা অতীত জগৎটা উঁকি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।...

বিছানার সামনে জানলাটা এমনি খোলাই ছিল। ঠিক অমনি আলকাতরা মাখানো কবাট। পুঁই-মাচা বা পেঁপে গাছ নয়, কয়েক হাত তফাতে একটা ইট-ওঠা এবড়ো খেবড়ো দেওয়ালের কুৎসিত ভঙ্গি আকাশটাকে আড়াল করে রাখে। তবু সকালের দিকে, ঐ দেওয়াল আর ও-বাড়ির তেতলার বারান্দার ফাঁকটুকু দিয়ে জ্যামিতিক আয়তের মত এক ফালি রোদ জানলা দিয়ে ঢোকে, দোতলা মেস-বাড়ির ছোট ঘরটির মেঝেয় ও দেওয়ালে এসে পড়ে।

নিচে আঁধার স্যাঁতসেতে গলি। একবার বৃষ্টি হয়ে গেলে তিনদিনে কাদা শুকোয় না। ডাস্টবিনের পাশে একটা কুকুর শুয়ে থাকে।

ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙেছে, তখনো এপাশ-ওপাশ করে জড়তামাখানো আরাম-টুকুর স্বাদ নিচ্ছি। দরজায় টোকা পড়ল।

'কে?'—বিরক্ত হলাম একটু।

দরজা খুলে দেবার জন্যে উঠতেই হল। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল চাকর গোবিন্দ।

নিমেষে বিরক্তি জল হয়ে গেল।

দ্বিতীয় খাটের দিকে ইশারা করে গোবিন্দ বললে, 'ওঠেন নি যে?'

এতক্ষণে খেয়াল হ'ল রুমমেটের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি এখনও। অথচ খুব সকালে ওঠাই প্রতুলবাবুর অভ্যাস।

টেবিলের ওপর চায়ের বাটি ডিশ দিয়ে ঢেকে রেখে গোবিন্দ চলে গেল।
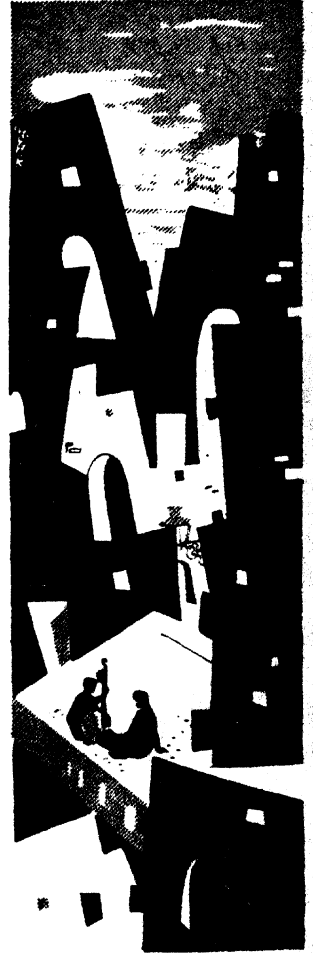
এ্যাকাউণ্টেন্সির মোটা বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে আটটা বাজল। তারপর সাড়ে আটটা। মেসবাড়ি মুখর হয়ে উঠেছে। কলতলায় জল ঢালবার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, অনেকে স্নান করতে নেমেছে। চেঁচিয়ে কে ঠাকুরের কাছে ভাতও চাইল যেন।

এখনও ওঠেন নি, আপিসে নিশ্চয়ই লেট হবেন প্রতুলবাবু। আজ আবার সেই পাগলামি মাথায় চাপল না তো তাঁর?

তা নয়, জ্বর হয়েছে প্রতুলবাবুর। ডাকতে উঠে, গায়ে হাত দিয়ে টের পেলাম। উত্তপ্ত নিশ্বাসের সঙ্গে বুকটা ওঠানামা

করছে। আমার স্পর্শে অসুস্থ দৃষ্টি মেলে তাকালেন। দু'চোখের কোল বেয়ে কোটরের মধ্যে যেন কালি গড়িয়ে পড়েছে, চোখের রক্তাভ হলুদ বর্ণে কেমন অস্থির কাতরতা।

অসুখের দোষ নেই। কাল রাতে ঝুপঝুপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যখন বাসায় ফিরেছেন, চেহারা দেখে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। জামা কাপড়, সারা শরীর ভিজে জবজবে। বৃষ্টির সময় কোথাও দাঁড়িয়ে মাথাটা বাঁচাবেন সে খেয়াল তাঁর হয়নি। চালচলন অমনি অদ্ভুত প্রতুলবাবুর। সংসারে চলতে হলে যতটুকু চেতনা থাকা দরকার তা একেবারেই নেই। বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও, এই ক'বছর এক সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়ে কি করে প্রতুলবাবুর ভালমন্দের দায়িত্বটা আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে, নিজেও ঠিক টের পাইনি।

আপিসে কাজ করেন, কিন্তু আপিসকে মোটেই খাতির করে চলেন না প্রতুলবাবু।

কতদিন দেখেছি, আপিসের বেলা হয়ে গেছে, অথচ চুপচাপ গা এলিয়ে পড়ে রয়েছেন তিনি।

'আ[illegible] প্রতুলবাবু?'

'নাঃ।' [illegible]ভাবে উত্তর দিয়েছেন।

'বন্ধ নাকি?'

'না বন্ধ নয়, যেতে ইচ্ছে করছে না তাই'—

জানি এ-ইচ্ছের নড়চড় কেউ করতে পারবে না। বললাম, 'তাহলে খবর তো একটা দিতে হয়। ছুটির জন্যে এপ্লাই'—

কথা শুনে, লেজে পা-পড়া সাপের মতই ফোঁস করে উঠেছেন প্রতুলবাবু, 'আপনি দেখছি আমাদের চীফ সুপারের এক কাঠি ওপরে! কাউকে এক টিপ নস্যি নিতে দেখলে মেমো পাঠায়! সবাই মিলে পাগল করে দেবে।'

পঁচিশের কোঠা বোধ করি সবে পেরিয়েছেন প্রতুলবাবু,—'ক'দিনেরই বা চাকরি! এর মধ্যেই তিক্ত হয়ে উঠেছেন। দেশের অবস্থা তেমন ভাল নয় যে, কাজ না করলে চলবে; অথচ এই রুটিন-বাঁধা জীবনে তাঁর গভীর অশ্রদ্ধা।

বললাম, 'তা অত চটছেন কেন? না হয় নাই গেলেন আজ আপিসে। বরং এখন একটু বাজনা শোনান তো মন্দ হয় না।'

'বাজাব?'—খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রতুলবাবুর। সামান্য একটু অনুরোধ, তাঁর মনের ইচ্ছার প্রতিধ্বনি মিলেছে। বিরক্তির লেশটুকু এক নিমেষে উবে গেল। হাত বাড়িয়ে দেওয়াল থেকে টেনে নিলেন তাঁর সেতার।

খাটের পাশে দেওয়ালে ঝোলানো থাকে ওটা। ফুলকাটা সস্তা কাপড়ের ঢাকনির মধ্যে পালিশ করা কাঠের তৈরি বড় আকারের সেতারটা।

অসীম দরদ তাঁর যন্ত্রটার ওপর। সেতার নিয়েই তাঁর সময় কাটে; অন্য কোন বড় আকাঙ্ক্ষা জীবনে নেই প্রতুলবাবুর।

ঐ যন্ত্রটার তারগুলির মধ্যে তাঁর লম্বা লম্বা আঙুল আশ্চর্য দ্রুততায় ঘুরতে থাকে। প্রতুলবাবু যেন তখন অন্য মানুষ। তাঁর মুখের ওপর একটা প্রসন্ন আলো এসে পড়েছে মনে হয়। নিবিড় তন্ময়তায় ডুবে যান তিনি, যেন আশেপাশের সব কিছুই তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

স্বসৃষ্ট সুরের সঙ্গে শিল্পীর পার্থিব চেতনা নাকি একাত্ম হয়ে যায় শুনেছি, সব উঁচুদরের শিল্পীরই। আমি কমার্সের ছাত্র; এ-কথার সঠিক অর্থ আমার উপলব্ধিতে আসে না। প্রতুলবাবুর বাজনা শুনে তার সূক্ষ্ম-কলা কিছুই বুঝতে পারি না সত্যি। তবু তার দরদী আবেদনটুকু অন্তরে পৌঁছায়।

ভাল বাজান প্রতুলবাবু। সুরের সমঝদার অনেকেই স্বীকার করেছে তাঁর ভবিষ্যৎ আছে।

সাধনাও আছে তাঁর। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়, নেবুতলার মেসবাড়ির এই দোতলার ঘরটিতে যেন প্রাণ সঞ্চার হয়। সপ্তাহে দুটো নির্দিষ্ট দিন বাদে, এই সময়টিই তাঁর সুর-সাধনার সময়। কখনো একা, কখনো দু'চারজন সঙ্গীও জোটে। মেসেরই আর একজন মেম্বার গৌরদাসবাবুর তবলা বাজাবার হাত আছে; গলি ছাড়িয়ে পার্কটার দক্ষিণ-পুব কোণে একটা বাড়িতে থাকেন ধ্রুপদ গাইয়ে শ্রীশবাবু, তিনিও আসেন। প্রতুলবাবুর পরিচিত আরো দু'একজন গাইয়ে-সমজদারকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সেই জমাট আসর ভাঙতে কোন কোন দিন রাত এগারোটা বারোটা বেজে যায়।

গণিতের বই হাতে আমি অবশ্য ততক্ষণ অন্য কোন ঘরে নির্জনতা খুঁজতে যাই। কারণ আগামী বছর পরীক্ষায় পাশ আমাকে করতেই হবে।

তবু কাছে কাছে থেকে প্রতুলবাবুর জীবনের ধর্মটা কেউ যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকে, সে আমি।

কিন্তু কোন মানুষ সম্বন্ধেই একথা হলপ করে বলা চলে না যে, কতটুকু সত্যিই চিনেছি তার, আর কতটা বাকি রয়ে গেছে!

গোবিন্দকে ডেকে প্রতুলবাবুর অসুখের কথা বললাম। অবস্থার কথা জানিয়ে পাড়ার বিপিন ডাক্তারের কাছে পাঠালাম তাকে। পুরনো চাকর—তার সব জানা। ওষুধ আনতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

মাঝে মাঝে 'উঃ-আঃ' করছেন প্রতুলবাবু। জ্বর হয়তো বাড়ছে। ভুল বকাও আছে সঙ্গে। হঠাৎ এক সময় চমকে উঠে বললেন, 'কে এল বলুন তো? কে?' মাথা তুলে দরজার দিকে তাকালেন। এদিক-ওদিক।

তাড়াতাড়ি গিয়ে বালিশ টেনে ভাল করে শুইয়ে দিলাম তাঁকে। বললাম, 'আপনি ঘুমোন—কেউ আসেনি'—

...হঠাৎ স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলাম। রায়চৌধুরীর বাইরের ঘরে নড়বড়ে খাটের শয্যা পিঠের নিচে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। ঘামে ঘাড়ের নিচে ভিজে গিয়েছে মসী-পড়া বালিশটা। ভেজানো দরজা একটা হাওয়ার ঝটকায় অর্ধেক খুলে গেছে।

ভিতরের ঘর থেকে রায়চৌধুরীর গলা আসছে, স্ত্রীকে শাসাচ্ছেন তিনি। বড্ড বেশি বিলাসিতা প্রশ্রয় দিচ্ছ মেয়েদের।

স্রেফ মাথা খাওয়া হচ্ছে। নীলাটার ভাবভঙ্গি অনেকদিন লক্ষ্য করেছেন তিনি। আজ নয় একখানা সাবান কিনেছে, আর কুলুঙ্গিতে অত স্নোর শিশি, পাউডারের কৌটো—কার ওসব? তাঁর চোখ নেই, দেখতে পান না তিনি?

নীলা ও'র মেজ মেয়ে। লক্ষ্য করেছি, ছেলেমেয়েদের ওপর চৌধুরীর শাসন অতি কড়া। ধমক আর শাস্তির ভয় সর্বদা ওদের মাথার উপর উঁচু হয়ে আছে। তাই ওদের মুখের হাসি অমন ভীরু, অতটা আড়ষ্ট।

শুধু কি ছেলেমেয়েদের মধ্যে, এ আড়ষ্টতা গোটা পরিবারের। এতক্ষণ এসেছি, তবু কিসে আমাকে কেবলি ঠেলে রেখেছে, অন্দরের একজন হয়ে আত্মীয়-অন্তরঙ্গতা জমাতে পারি নি।

তবু রায়চৌধুরী যখন হেসে আমায় অভ্যর্থনা করেছিলেন, সে হাসিকে পোশাকী মনে হয়নি।

স্টেশনে এসে আমায় নামিয়ে নিয়ে এসেছিল বিনয়—রায়চৌধুরীর বড় ছেলে। বাইশ-তেইশ বয়স, মুখে বেশ একটু সপ্রতিভ ভাব।

আপ্যায়নের কোন ত্রুটি ঘটেনি।

বাইরের ঘরে বসে নানান আলাপ জমে উঠল। রায়চৌধুরীর জিজ্ঞাসা আর শেষ হতে চায় না। খুঁটিনাটি সমস্ত খবরই জেনে নিলেন একে একে। পাকিস্তানের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন কে কে টি'কে আছে এখনও, ব্যবসা আরো বাড়লে কি রকম কমিশন পাবো, ভাইয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা চরিত্র করছি কিনা—কিছুই বাদ রাখলেন না।

নিজের কথাও বললেন। বড় সংসার—স্ত্রী ও পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বাতে পঙ্গু বুড়ি পিসি, তেরো বছরের একটি ছেলে নিয়ে বিধবা বড় বোন। স্থানীয় জমিদারি-সেরেস্তায় সামান্য চাকরি করেন—তার আয়ে এতগুলি পেট চলা শক্ত। জমিজমা সামান্য যা ছিল, মন্বন্তরের বছর বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

সংসারের ঝামেলার অন্ত নেই; মাথার চুল অর্ধেক পেকে গিয়েছে। অভাব আর দুশ্চিন্তা।

'বলুন তো কত বয়স হ'ল?'—মিটমিটে চোখে রায়চৌধুরী তাকালেন আমার দিকে।

'কত আর হবে—পঞ্চাশ?'—অনুমান করবার চেষ্টা করলাম আমি।

'না, দু'বছর বেশি, বাহান্ন। তা এর মধ্যে এত বুড়ো হয়ে পড়তাম না মশাই। ছেলেটাই বড্ড ডিসাপয়েণ্ট করল কিনা—'

...মেসের বন্ধুরা আড়ালে বলাবলি করে—জিনিসটা খারাপ ছিল না তো. টুংটাং করেই কত লোক করে খাচ্ছে। তেমন বুদ্ধি থাকলে, লোকটা চল্লিশ টাকার জন্যে দশটা-পাঁচটা আপিস ছুটোছুটি করে?

সংসারের বৈষয়িক দিকটা মোটেই উপেক্ষা করি না আমি, তাদের কথায়ও সায় না দিয়ে পারি না। দু' একজন আবার অন্য কথা বলে। বলে—টাকা আনার হিসাবের ছকে এসব লোককে টেনে আনা ঠিক নয়। খটকা থেকে যায়—এটাও একেবারে উড়িয়ে দেবার মত কথা নয়। নিজের তৈরি মিথ্যা জগতে ডুবে থেকে, আসল জগৎটাকে ভুলে থাকার মত পাগল দুনিয়ায় কত আছে! তাদের লাভের পাল্লা ক্রমে খালি হয়ে আসে ঠিক, কিন্তু নেশাটা বড় জবর, তা এড়ানোও বোধ হয় কঠিন।

শুনেছি কোন কোন মানুষ বড়ও হয়। অধিকাংশই যায় তলিয়ে।

দৈনিক কাগজটা খুঁজতে খুঁজতে একতলায় ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। দেখি, প্রতুলবাবুর নামে এক নোটিশ তৈরি হয়েছে: গত দু' মাসের দেনা মিটিয়ে না দিলে, ওমুক তারিখ থেকে তাঁর 'মিল' বন্ধ করে দেওয়া হবে। প্রতুলবাবু এখন নেই, ফিরলেই নোটিশ তাঁর হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি?'

ম্যানেজার একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, ব্যাপার কিছুই জানেন না আপনি? উনি তো আপনার রুমমেট।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। মেসের টাকা অনেকেরই কিছু কিছু বাকি থাকে জানি, কিন্তু প্রতুলবাবুর ব্যাপার অন্য। পুরো দু' মাসের মধ্যে এক পয়সা তিনি ছোঁয়ান নি। কিন্তু কারণটা তো আমার জানবার কথা নয়!

একটু বিরক্ত হয়ে ম্যানেজার বললেন,

দেবে কোত্থেকে! মুদীখানার ছোঁড়াটা, মার তার মা'কেও পুষছে যে আজকাল। ঐ তো মাইনে পায়!'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হ'ল। ঘটনাটা সত্যিই আমার অজানা নয়।

মুদীখানা দোকানের ছোকরাকে আমাদের ঘরেই প্রথম দেখি।

প্রতুলবাবু সেতার নিয়ে বসেছেন সন্ধ্যাবেলা, পাশেই মেরুদণ্ড সোজা করে ছেলেটি তাঁরই ডুগি তবলায় বোল তুলে সংগত করে চলেছে। দেখে অবাকই হয়েছিলাম—বয়স বারো তেরোর বেশি নয়, রোগা লিকলিকে চেহারা। কালো রঙের একটা হাফপ্যান্টের ওপর ময়লা জালি-গেঞ্জি পরনে।

পরে ওর কথা জিজ্ঞেস করলাম প্রতুলবাবুকে।

প্রতুলবাবু বললেন, 'চিনলেন না? বড় রাস্তায় পড়ে ডানদিকে যে মুদীখানার দোকানটা আছে, ওখানে কাজ করে'—তারপর একটু গর্বের সুর ফুটে ওঠে প্রতুলবাবুর গলায়ঃ 'বুঝলেন, আমিই ওকে আবিষ্কার করেছি। ছেলেটার তাল-লয়ের জ্ঞানটা কেমন টনটনে'—

পেটভাতা ও সামান্য মাইনের ঠিকে কাজ করে বকু। বাপ নেই, আছে কেবল মা। সেও আবার কোথায় ঝি-গিরি করে। প্রতুলবাবুর ধারণা ট্রেনিং দিতে পারলে বকু একদিন ভাল তবলচিদের সারিতে গিয়ে বসতে পারবে।

তারপর প্রায়ই দেখতাম, বকু প্রতুল-বাবুর শতরঞ্জি-পাতা তক্তাপোশে এসে জুত করে বসেছে, বাঁয়া তবলা টেনে নিয়ে মুখে মুরুব্বির ভাব ফুটিয়ে, ছোট হাতুড়িটা দিয়ে খুট খুট শব্দ করে আওয়াজ বেঁধে নিচ্ছে। প্রতুলবাবুও যত্ন নিয়ে অনেক কিছু শেখাতে লাগলেন তাকে।

তারপর সেদিন সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে, বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, বকুর কব্জি ধরে টানতে টানতে এইদিকেই আসছেন প্রতুল-বাবু। ফোঁস ফোঁস করে বকু কেবল কাঁদছে, আর চোখ মুছছে বার বার। আজ আর গায়ে সেই গেঞ্জিটা নেই, পরনে শুধু হাফপ্যান্ট।

হাঁফাতে হাঁফাতে প্রতুলবাবু বললেন, 'কাণ্ড দেখুন একবার'—

জিজ্ঞেস করলাম, 'হয়েছে কি?'

বকুর খালি গায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রতুলবাবু বললেন, 'অমানুষিক মার মেরেছে মশাই। সাজা কি আর লোকে দেয় না, না সাজা দিতে দেখিনি। অতটুকু ছেলে'—তারপর বকুর হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ধমক দিলেন তিনি, 'আঃ আবার কাঁদছিস? হয়েছে থাম্ এবার।'

প্রতুলবাবুর ধমকে ধাতস্থ হয়ে বকু যা বলল তার মর্ম, দোকান থেকে মাল চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। মন্মথ বলে যে, আর একজন লোক আছে, মনে হয় তার কারসাজি। আরো একবার, মন্মথই দোকানের জিনিস সরিয়ে বকুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিল। পুরনো লোক বলে মালিক তার কথাই বিশ্বাস করে। চুরির অপরাধে বকুকে আজ বেদম মার দিয়ে দোকান থেকে বার করে দিয়েছে; বলেছে—ফের ওমুখো হলে পুলিসে দেবে।

'পুলিসে এদেরই দেওয়া উচিত'—প্রতুলবাবু রুদ্ধস্বরে বললেন, 'খুনে বদমাশ কাঁহাকা'—

আমি অবশ্য মারের কথা মোটেই ভাবছিলাম না। হাড়গোড় ভাঙেনি বকুর। দু' একদিন পরে গায়ের ব্যথাও কমে যাবে। কিন্তু মার খেয়েও চাকরিটা যদি বজায় রাখতে পারতো!

এর পরের ব্যাপার কিছু শোনবার সুযোগ হয়নি। আজ শুনলাম। ম্যানেজার বলছিলেন, 'কি করব বলুন, লোকের সুবিধে-অসুবিধের কথা আমরা ভাবি। কিন্তু টাকা নইলে তো মেস চলে না...'

...জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কথা বল-ছিলেন, বিনয়?'

রায়চৌধুরী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলেন, 'ওটাকেও মানুষ করতে পারলাম না। সেই যে বলে—তুমি যাও বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে!'

বললাম, 'কেন, এখানে ইস্কুলে টিচারি করছে শুনলাম—'

মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে রায়চৌধুরী বললেন, 'শুধু ঐটুকু শুনেছেন, আর কিছু শোনেন নি! যা ইস্কুলের অবস্থা! এ বছর এডের জন্যে চেষ্টা করেছিল, পায়নি। পাঁচ মাস মাইনে বাকি।'

সখেদে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রায়চৌধুরী। অল্প একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'বি এ-টা পাশ করলে। ভেবেছিলাম নিজের চেষ্টায় কাজকর্ম দেখে নেবে। বড়বাবুর রেকমেণ্ডেশন নিয়ে কলকাতায় দু' এক জায়গায় দেখা করলেই ভাল চাকরি হ'ত।'

বুঝলাম, বড়বাবু বলতে এখানকার জমিদার।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হ'ল না কেন?'

বিরক্ত সুরে রায়চৌধুরী বললেন, 'ছেলে এক পাও নড়ল না এ-জায়গা ছেড়ে। কেন জিজ্ঞেস করছেন? নড়লে মফস্বলের উন্নতি করবে কে! দেশের অপোগণ্ডদের মানুষ করবার দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে কে!'

'ঐসব কথা বলে বুঝি?'—আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

রায়চৌধুরী আরো একটু এগিয়ে বসে, গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনার কাছে গোপন করব কি! আসল কথা মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে ওর।'

'সে কি!'

নিচু গলায় ব্যাপারটা খুলে বললেন রায়চৌধুরী। বটকৃষ্ণ মজুমদার এখানকার সরকারী উকিল। তাঁরই মেয়ে। বয়স বছর কুড়ি, নাম বুঝি অণিমা। সব কিছুর মূলে সে-ই। কুচ্ছিত চেহারা, চোখও নাকি একটা ট্যারা মতন। বছরখানেক এক কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়েছিল, সেই থেকে সূত্রপাত। ছেলে অবশ্য কাউকে কিছু জানায় নি। কিন্তু টের পাওয়া গিয়েছে সবই। বয়স হয়েছে, এক ফোঁটা বুদ্ধি হ'ল না অথচ। জানাজানি তো হবেই, মুখে কালি পড়বে তখন। তার বাকিই বা কি। কত রকম কানাকানি ও ফিসফাস যে চলেছে!

একটা নিঃশ্বাস ফেলে রায়চৌধুরী সখেদে বলেন, 'বলুন তো গরীবের ঘরে এই ঘোড়া-রোগের কী ওষুধ আছে!'

কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় বাইরে কে যেন ডাকল।

কাঠের খড়ম পায়ে ব্যস্তভাবে রায়-চৌধুরী উঠে গেলেন।

ঘরের লাগাও বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আগন্তুক লোকটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-

বার্তা হ'ল। কি নিয়ে যেন কাকুতি-মিনতি করছে লোকটা।

তারপর এক সময় বিরক্তভাবে রায়চৌধুরী ঘরে ঢুকে পড়লেন হঠাৎ। তারপর দুম করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গজ গজ করতে করতে আবার এসে বসলেন।

'পাপ! পাপ জুটেছে কতকগুলো। দিনরাত জ্বালাতন করে মারলে—'

'কে লোকটা?'—কৌতূহল প্রকাশ করলাম আমি।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এস্টেটের রায়ত। বাকি খাজনার দায়ে মামলা ঝুলছে কোর্টে'—

'তারই তদ্বির করতে এসেছিল বুঝি?'

ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করে রায়চৌধুরী বললেন, 'এদের সঙ্গে কারবার করছি কি আজ থেকে? সব হারামজাদাকে চিনি। সময়টা কি পড়েছে ব্যাটারা বোঝে না। আমাদের কথা মনে রাখবি তো! কাজ আদায় করে নেব, অথচ একটি পয়সা ঠেকাব না এ কি রকম মতলব...'

...বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, দেওয়ালে ঝোলানো সেতারটা আর নামান নি প্রতুলবাবু। ফুলকাটা ঢাকনীর আশ্রয়ে মাকড়সা জাল বিস্তার করেছে। সন্ধ্যাবেলা মেসবাড়ির দোতলার ঐ ঘরটা অন্ধকারে চুপ করে থাকে। বন্ধুর দল হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে, গৌরদাসবাবু সন্ধ্যা হতে, পাড়ার ক্লাবে তাসের আড্ডায় গিয়ে জড়ো হয়েছেন। কি যেন হয়েছে প্রতুলবাবুর, প্রশ্ন করেও কোন জবাব পাইনি। জীবনের ছন্দে হঠাৎ একটা ছেদ পড়েছে।

অসুখের সময় তাঁর মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল; শুধু সেই কারণেই যে তাকে অতটা শুকনো আর বিমর্ষ দেখায় তা নয়। কিছু একটা ওলট-পালট ঘটে গিয়েছে—মনের স্বাচ্ছন্দ্য ভেঙেচুরে-দেওয়া পরিবর্তন।

ক'দিন বাদে টের পেলাম।

রাত তখন অনেক, ক'টা বেজেছে ঠাহর নেই। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি তখনো। ভ্যাপসা গুমোট গরমের অস্বস্তিতে, চোখের পাতা বুজতে পারিনি। ছটফটানি বেড়ে চলেছে।

খেয়াল হ'ল, বাইরে ঝুলবারান্দায় একটা ছায়া; প্রতুলবাবু অত রাতেও রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনড় একটা মূর্তির মতই।

বিছানা ছেড়ে, আমিও বাইরে এসে দাঁড়ালুম। প্রতুলবাবুর বাহুতে আলতো স্পর্শ করতেই চমকে পিছু ফিরলেন তিনি।

বললাম, 'চলুন, ছাতে গিয়ে একটু বসি। বড় গরম।'

'চলুন।'—প্রতুলবাবু ক্লান্ত স্বরে বললেন। এতক্ষণ কি একটা গভীর ভাবনায় ডুবে ছিলেন তিনি।

ঘর থেকে আমিই তাঁর সেতারটা নামিয়ে নিলাম। সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাতে উঠে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

পরিষ্কার আকাশের মাঝখানে অপূর্ণ চাঁদ। হাল্‌কা জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে চারিদিকে। আবছা আলোয় শহর ঘুমিয়ে; হাওড়ার ওদিকে অনেক দূরে দুটি লাল তারার সংকেত বিন্দুর মত ফুটে রয়েছে।

প্রতুলবাবুর কোলের ওপর নামিয়ে দিলাম সেতারটা। আমার পানে এক নজর তাকিয়ে সেটা টেনে নিলেন তিনি।

'কি বাজাব?'

'যা আপনার ইচ্ছে—'

প্রতুলবাবুর আঙুলগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশাপাশি সাজানো তারগুলির মধ্যে। হাতের এই স্পর্শে সুরের ঘুম ভেঙে যায়, নির্জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে আজও। কিন্তু আজকের এ সুর যেন অন্যরকম। সে আকর্ষণও নেই। এর মধ্যে প্রতুলবাবুকে ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সুর যেন খোঁচা দিয়ে জাগানোর মত, আঘাতের যন্ত্রণার মত। সেই স্নিগ্ধ আবেগের মধ্যে আজ যেন বিষাদের বিষ মিশে আছে।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত তাঁর বাজনা শুনলাম। তারপর এক সময় হঠাৎ তাঁর হাত থেমে গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর স্তব্ধতা ভাঙলাম আমিই: 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব প্রতুলবাবু?'

'কি?'—প্রতুলবাবু তাকালেন আমার দিকে।

'আপনার কি হয়েছে জানি না। কিন্তু হঠাৎ একটা পরিবর্তনে আপনি যেন ভেঙে পড়েছেন মনে হচ্ছে। খুব স্পষ্ট সেটা—'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রতুলবাবু। আকাশের দিকে নিষ্পলক অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। অনেকক্ষণ। তারপরে—

'নান্তু! নান্তু!'—চীৎকার করে গলা ফাটাচ্ছেন রায়চৌধুরী। সেজছেলের বয়স বারো-তেরো। দিনরাত দুষ্টুমি করে বেড়ায়। চড়-চাপড়, তার চেয়ে গুরুতর শাস্তিও হার মেনেছে তার কাছে।

'নাঃ, এরা পাগল করে ছাড়বে দেখছি।'

রায়চৌধুরী গিন্নীও এবার আর চাপতে পারেন না।

'পাগল হতে কি বাকি আছে? সময় নেই অসময় নেই দিনরাত পিটছ ছেলে-

মেয়েগুলোকে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পাগল হবে।'

কোন কোন সময়ে অসহ্য হয়ে ওঠে। সব সময়ে এই শাসনের হুমকি ভাল লাগে না তাঁর।

'থামতো তুমি, রায়চৌধুরীর গলায় উষ্মা ঠেলে উঠল এবারঃ 'বড় ছেলেটা অমনি করে বিগড়ে গেছে। পাগল না হলে এরাও কি সিধে থাকবে?'

বড় রকমের প্রত্যাশা গুড়িয়ে গিয়েছে রায়চৌধুরীর। তার প্রতিক্রিয়াটাও হয়েছে এমনি। সদাসর্বদা শাসনের খড়্গ উঁচিয়ে রেখেও কি শেষ অবধি 'সিধে' রাখতে পারবেন ওদের?

নান্তুকে বোধ হয় ধরেছেন রায়-চৌধুরী। উপরি উপরি চড়-চাপড়ের শব্দ......নান্তুর ফোঁপানি......

রায়চৌধুরীর ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছেঃ 'হতভাগা তোমাকে আস্ত রাখব না আমি। হোম টাস্কের খাতা ভরে ছড়া লেখা হয়েছে! রক্ত-জল-করা পয়সার খাতা কিনে এই সব!'

একটু পরে আবার নীরব। রায়-চৌধুরী গিন্নীর অনুযোগ-অভিযোগগুলি আর কানে আসে না।

তন্দ্রাটা এবার আরো একটু গাঢ় হয়ে এলো চোখের পাতা দুটো ভারি ভারি; সব কিছু কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে—

......অনেকক্ষণ তেমনি তাকিয়ে থাক-বার পর প্রতুলবাবু বললেনঃ 'শুনুন তাহলে। শুধু আপনাকেই বলতে পারি এসব কথা।'

একে একে সব কথাই বলে গেলেন প্রতুলবাবু। চমকপ্রদ কিছু নয়। প্রায় সবটাই মামুলি। আর পাঁচটা কাহিনীর সঙ্গে খুব বেশি অমিল নেই।

চিন্ময়ীকে সেতার শেখাবার কাজটা তাঁর এক বন্ধুই জুটিয়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে ধরায় তিনি রাজি হয়ে-ছিলেন। আগে থেকে চেনা-পরিচয় ছিল না।

বিজনেস করে টাকা করেছেন চিন্ময়ীর বাবা সত্যজিৎবাবু। পাড়ায় নাম আছে, সম্মানও আছে।

সপ্তাহে দু'দিন যেতে হত সেতারের পাঠ দিতে।

ট্যুইশনি এর আগেও করেছেন প্রতুল-বাবু। পদ্ধতিটা নিতান্তই ধরাবাঁধা গোছের। একটু একটু করে সাধারণ নিয়মকানুনগুলি সামনে ধরে দেওয়া, পথটা চিনিয়ে দেওয়া। যেটুকু করা যায়, মাস্টার শুধু সেইটুকু করতে পারে।

অন্য দিকে প্রতুলবাবু তাকাননি। সে প্রয়োজনও হয়নি।

যতদূর সম্ভব নিরাসক্ত কর্তব্য পালনই করে চলেছিলেন তিনি। চিনুদের বাগান-ঘেরা বাড়ির মার্বেলের মেঝেয় তাঁর পা হড়কে যাবে এ আশংকা একবারও মনের কোণে উঁকি দেয়নি।

আগের দিন পাড়ায় একটা জলসার মত হয়েছিল। আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে সেতার বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন প্রতুলবাবু। চিনুও উপস্থিত ছিল।

পরদিন যেতেই চিনু বলল, 'সত্যি অপূর্ব হয়েছিল আপনার জয়জয়ন্তী।'

কথা শুনে প্রতুলবাবু মৃদু হেসেছেন। বাজনাটা সত্যিই জমেছিল সেদিন। দু' একজন বড়, ও ক'জন মাঝারি আর্টিস্ট উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও তারিফ করে-ছিলেন। অতবড় শিল্পী তয়েবুদ্দিন, দু' চারটি ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে উর্দু ভাষায় বলেছিলেন, 'আপনার হাত আছে। রেওয়াজে বেচাল না হলে সংগীতের সরস্বতীর দাক্ষিণ্য লাভ করবেন আপনি।'

আজ চিনুর প্রশংসায় যেন অন্য কিছু ছিল, তার বলার ভঙ্গিটুকুও ভাল লাগল প্রতুলবাবুর।

প্রতুলবাবু বললেন, 'আমি যা বাজাই তাই বুঝি তোমার ভাল লাগে!'

চিনু প্রতিবাদ করে বলল, 'বেশ তা কেন, অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন।'

প্রতুল বললেন, 'অন্য কাউকে? নাঃ, তার চেয়ে তোমার কথাই বিশ্বাস করলুম। আমার বাজনা কি সবাই তেমন বোঝে?'

মুখ দিয়ে অতর্কিতে বেরিয়ে গিয়েছে কথাটা। ঈষৎ লজ্জিত হয়েছেন প্রতুলবাবু। কিন্তু চিনুর মুখ-ই বা অতটা ঝুকে পড়েছিল কেন।

বাদ্যযন্ত্রটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রতুলবাবু বললেন, 'নাও এবার ধরো দিকি চৌতালটা'—

সেই হল সূত্রপাত।

সেদিন যার সূচনা, সেই পরিবর্তনটা ধীরে ধীরে প্রতুলবাবুর সমস্ত সত্তাকে অধিকার করেছে। নিজের জগৎটা প্রতুল-বাবুর বড় সংকীর্ণ ছিল। মনে হত এখানে আর কারো ঠাঁই নেই, সেখানে যেন একটা বড় ফাঁক সেদিন চোখে পড়েছে।

এর পর দুজনে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ক্রমে ক্রমে। কখনো একত্রে পার্কে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কখনো গঙ্গার ধারে। চিনুকে পাশে নিয়ে গানের কন-ফারেন্স শুনেছেন প্রতুলবাবু। মনিরুদ্দি খাঁর খেয়াল আর লক্ষ্মী বাঈয়ের ঠুংরির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়েছেন তাকে।

বটানিকে গিয়ে একবার ক্যামেরায় ছবিও তুলেছিলেন তাঁরা। চিনুর স্ন্যাপ নিয়েছিলেন তিনি নিজে, চিনু তুলল তাঁরটা।

ক্যামেরা চিনুর। ক'দিন বাদে, দোকান থেকে ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করাবার পর, ছবিগুলি দেখাল তাঁকে।

প্রতুলবাবু হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, 'কই আমারটা দাও আমায়'—

নিজের তোলা প্রতুলবাবুর ছবিখানা চিনু এগিয়ে দিয়েছিল।

প্রতুলবাবু বলেছেন, 'বাঃ, আমি যেটা তুলেছি সেটাই আমার পাওনা।'

মৃদু হেসে চিনু বলেছে, 'বেশ সেটাই নিন।'

প্রতুলবাবু বলেছেন, 'নিলাম। কিন্তু শুধু ছবি নিয়েই কি তুষ্ট থাকতে পারব? মানুষ যত পায় তার দাবিও তত বেড়ে যায়।'

কিন্তু একদিন এ অধ্যায়ে ছেদ পড়ে।

সেদিন ভৈরব রাগের ধ্যানরূপ বোঝাচ্ছিলেন চিনুকে। চোখের সামনে শুভ্রাম্বর গঙ্গাধরের সেই মূর্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর—নরমুণ্ডধারী সর্পালংকার বিভূষিত শ্যামদেহ। প্রতুলবাবু স্বভাবত বাকপটু নন; কিন্তু আজ মুখ খুলে গিয়েছিল তাঁর।

আলোচনায় ব্যাঘাত হ'ল।

দোরের বাইরে মুখ বাড়িয়ে কে যেন ডাকল, 'চিনু'—

শোনামাত্র চিনু আসন ছেড়ে উঠে গেল। সেই যে গেল, ফিরল প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। প্রতুলবাবু তখন অধৈর্য হয়ে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

কিছুদিন থেকেই অল্পবয়সী যুবকটিকে দেখছেন প্রতুলবাবু। কিছু কিছু শুনেছেনও সত্যজিৎবাবুর বিজনেসের চারআনা অংশীদার ব্যারিস্টার সেন রায়ের ভাইপো স্নেহময়; ব্যাংকে টাকা আছে, কলকাতায় বাড়িও আছে খান দুই। বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়র হয়ে সদ্য ফিরেছে; দু-এক জায়গা থেকে ভাল চাকরির অফার পেয়েছে, এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারেনি।

আগে কখনও দেখেননি তাকে। সম্প্রতি ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে স্নেহময়কে। সন্ধ্যার দিকে প্রায় প্রতিদিনই সত্যজিৎবাবুর বাড়িটা তার হাসিতে ও কথাবার্তায় মুখরিত হয়ে ওঠে। আর স্নেহময়ের সাড়া পাবামাত্র চিনুও চঞ্চল হয়ে ওঠে, সুরের আকর্ষণ তাকে ধরে রাখতে পারে না।

প্রতুলবাবু নিজেকে বুঝিয়ে রেখেছেন এতদিন। কিন্তু ক্রমে একটু বিরক্তিও জমে উঠেছে তাঁর ভেতর। তাঁকে নয়, সাধনাতে এই অবহেলা কোন যুক্তিতেই ভাল বলে মনে করতে পারেন না প্রতুলবাবু। আজ কথায় তাই একটু অনুযোগই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

'তোমার কি ভাল লাগছে না চিনু? একটুও ব'স না যে আজকাল?'

প্রথমটা নীরব। মুখ নিচু করে দাঁত দিয়ে চিনু নখ খুঁটতে লাগল।

প্রতুলবাবু বললেন, 'ভেবেছিলাম তোমায় আমি তৈরি করে তুলব, কিন্তু......'

কথা শেষ করতে পারেন নি, চিনু মুখ তুলে সহজ সুরে বললে, 'বাবা বলেন এক সেতার নিয়ে কতকাল পড়ে থাকবি? সব কিছুই অল্পসল্প শেখা দরকার। স্নেহদা-ও তো ঐ কথাই—'

প্রতুলবাবুর কোথায় যেন বিঁধল। বললেন, 'তিনি কি বলেন?'

'বলেন, আগে চাই গান। আজকাল যে-কোন মহলেই রবীন্দ্র সংগীতের আদর সবচেয়ে বেশি।'

'ওঃ।'—নিজেকে যেন অনাবশ্যকভাবে, অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রতুলবাবু। এবার গুটিয়ে আনবার পালা। মুখে আর একটিও কথা আসেনি। কোথা থেকে একটা বিস্ময়ের ধাক্কা এসে লেগেছিল। মুখ বুজে চলে এসেছিলেন প্রতুলবাবু।

আরো একদিন। প্রতুলবাবু চিনুর অপেক্ষায় বসেছিলেন।

আজকাল স্নেহময়কে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ পরিবারে বৈকালিক চায়ের আসর ভাঙতে বেশ দেরি হয়। প্রতুলবাবুকে তাই মাঝে মাঝে বসে থাকতে হয় চিনুর জন্যে।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে কথাগুলো কানে এল।

চিনুর উদ্দেশে স্নেহময় বলছিল, 'আমাদের ক্লাবের ফাংশনটার কথা বলে দিও তোমার মাস্টারকে। বাজনা শুনিয়ে আসবে গিয়ে।'

সত্যজিৎবাবুর মোটা গলায় সোৎসাহ সমর্থন পাওয়া গেলঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ দিস্ দিস্। কবে তোমাদের ফাংশন স্নেহ?'

'আসছে বুধবার', স্নেহময় বললে, 'এমনি তো নয়, ক্লাবের তরফ থেকে দু' পয়সা পাইয়েও দোব। আগে বলে রাখলে প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকবে।'

সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল প্রতুলবাবুর। শক্ত হয়ে উঠেছিল চোয়াল দুটো। তবু অতিকষ্টে সংযত রেখেছিলেন নিজেকে।

কিন্তু স্বপ্নে যা ভাবতে পারেন নি তাও ঘটল। কথাটা পাড়তে চিনুর মুখেও আটকাল না।

সেতারের পাঠ শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রতুলবাবুও উঠতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সে বলল।

কয়েক মুহূর্ত কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রতুলবাবু। তারপর কাঁপা-কাঁপা সুরে বললেন, 'আমি শুনেছি। শিল্প জিনিসটা বাজারের পণ্য নয় চিনু, যে টাকা ফেললেই পায়ের কাছে

হাজির হবে। কথাটা বুঝিয়ে দিও তোমার স্নেহদাকে।'

চিনুর মুখ কালো হয়ে গেল অপমানে।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রতুলবাবু। সেখান থেকে রাস্তায়। দেহটা কেমন টলছিল। যে আস্থা সম্বল করে নিজেকে এতদিন বুঝিয়ে রেখেছিলেন, হঠাৎ তা চূর্ণ হয়ে গেছে।

এরপর পরিণতিটা হ'ল স্বাভাবিক।

তিন দিন পর সন্ধ্যাবেলা চিনুদের বারান্দায় উঠতেই, কার্পেটের চটি পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চিনুর বাবা সত্যজিৎবাবু।

'চিনু আজ বসবে না মাস্টারমশাই।'

প্রতুলবাবু উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করেছেন, 'কেন? শরীর খারাপ নয় তো?'

'না'। চিনুর বাবা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছেন, 'শুনুন। শুধু আজ নয়, আপনার আর আমার দরকার হবে না। ওকে আর বাজনা শেখাব না ঠিক করেছি।'

'ও!' প্রতুলবাবু বিমূঢ় গলায় উচ্চারণ করলেন।

সত্যজিৎবাবু বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়ান। আপনার টাকাটা এনে দিচ্ছি।'

শেষবারের মত ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন প্রতুলবাবু। চিনুর সঙ্গে দেখা হয়নি। তার শেষ জবাব নেওয়া বাকি ছিল তখনও।

সেদিন চলে আসবার পর, আরো একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত সত্যজিৎবাবুর প্রকান্ড বাড়িটার সামনে উপস্থিত হয়েছেন প্রতুলবাবু, কিন্তু স্প্রিংএর গেট ঠেলে কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ভিতরে ঢুকতে পারেন নি।

চিনুকে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে চিঠি লেখা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। শেষবারের মত, সে কি বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না? নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যায় পার্কে গিয়ে হাজির হলেন প্রতুলবাবু।

ছ'টায় সময় দেওয়া ছিল। ছ'টা বেজে সাতটা হ'ল। তারপর আটটা। অস্থিরভাবে একটা গাছতলায় পদচারণা করে বেড়াতে লাগলেন প্রতুলবাবু। অন্য দিকে খেয়াল ছিল না। কখন আকাশে পুরু মেঘ জমেছে। হঠাৎ অল্প অল্প হাওয়া—তারপর নেমে এল মুষলধারে বৃষ্টি!......

'চিনু এল না, কোন জবাবও দিল না তারপর'—দুই নখ দিয়ে সেতারের একটি তারে আঁচড় দিতে দিতে প্রতুলবাবু বললেন, 'কিন্তু জবাব যে সব সময় কথাতেই দিতে হবে তাতো নয়। শেষ জবাবের আর কিছু কি বাকি আছে তার?'

চাপা নিঃশ্বাসের মধ্যে কাহিনী শেষ করে, তেমনি নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন প্রতুলবাবু। হাওড়ার দিকে বিন্দুর মত সেই লাল আলোটার দিকে চেয়ে। আলোটা যেন এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন।

সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। মনকে তাঁর শান্তই বা করব কেমন করে। আমি ভাবছিলাম। কমার্সের ছাত্র আমি। বাণিজ্য-সম্পর্কের আইন-কানুন আমি কিছু কিছু জানি, বৈষয়িক আদান প্রদানের নিয়ম। কিন্তু অন্তঃসার দিয়ে গড়া একের সঙ্গে আর একের জটিল সম্পর্কের রীতিনীতি ভাঙাগড়ার সূক্ষ্ম নিয়ম আমার অভিজ্ঞতায় অনাবিষ্কৃত।

সে দিনের পর দুটো সপ্তাহ কেটে গেল, একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি, ঘরে একটা বড় তালা ঝুলছে, কেউ নেই।

চাকর গোবিন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে বলল, 'কেন আপনাকে বলেন নি কিছু? প্রতুলবাবু দেশে চলে গেছেন। ঘণ্টা দুই আগে তাঁর বাক্স বিছানা রিক্শায় তুলে দিয়েছি।'

'হঠাৎ দেশে গেলেন কেন?'

'আজ্ঞে তিনি তো শুনলাম চাকরিতেও ইস্তফা দিয়েছেন। আর ফিরবেন না।'.....

মনে পড়া নয়, চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে দৃশ্যগুলি। হয়তো এলোমেলোভাবে ছড়ানো, কোন পূর্বাপর সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতদিন পরে তা কে-ই বা খুঁজে পাবার আশা করে? ভিড় করে যখন আসে, বর্তমানের সম্বিৎ একটুও থাকে না তখন, আবছা অস্পষ্টই হয়ে আসে রায়চৌধুরীর বাড়ির প্রাচীন অথচ অচেনা পরিবেশ।

খট খট খড়মের শব্দে ঘরে ঢোকেন চৌধুরী মশাই।

'এই যে জেগে আছেন দেখছি। দুপুরে মশাই আমারও ঘুম হয় না। দুপুরেও না, রাতেও না। এই মাথার ব্যারামটাতো আর সারলো না। ডাক্তারের কথা শুনে এক মুঠো টাকা খরচ করে বৃথা গুচ্ছের নার্ভ টনিক খেলাম। টনিকে মশাই কি করবে—রাতদিন দুশ্চিন্তা। তার উপর ছেলেমেয়েগুলো যা হয়েছে'—

আমার কান ছিল না। পঁচিশ বছর আগেকার এক টুকরো আলোর ছটা তখনো খুঁজছি আমি......দেওয়ালের লম্বা ছায়াটার দিকে চোখ তখনো বিঁধে রয়েছে।

'ওকি আপনি কি দেখছেন?'

'ওটা—'

রায়চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলাম। ভাঙাচোরা টাঙানো সেতারটা। জীর্ণ একটা কংকাল। অক্ষত তার একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ড্যাম্প-লাগা দেওয়াল থেকে উ'ইয়ের দল এসে নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে।

রূপকথার দেশের রাজকন্যা হ'ল সুর। সাধকের হাতে সোনার কাঠির পরশ পেলে তবে সে জাগে। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে চিরতরে যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে আর জাগাবে কে?

রায়চৌধুরীও তাকিয়ে রয়েছেন সেদিকে।

বললাম, 'আপনার মত ওটার সঙ্গেও আমার পরিচয় অনেক দিনের।'

হেসে উঠলেন রায়চৌধুরী। বললেন, 'আপনার মনে আছে সব? কি সব পাগলামি যে তখন করেছি!'

হাসবার সময় তাকিয়ে দেখলাম সামনের দিকে গোটা দুই দাঁত পড়ে গেছে রায়চৌধুরীর।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

সম্প্রতি বহু ধুমধাম করিয়া রবীন্দ্র জয়ন্তী হইয়া গেল।

পুস্তকে, সাময়িক পত্রে, সভা-সমিতিতে বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বহু আলোচনা ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। এসব হইতে বোঝা যায়, কবিগুরুর সর্ব বিষয়—সংগীত, কাব্য, সাহিত্য, চিন্তাধারা বুঝিতে আমাদের দেশ কিছু সক্ষম হইয়াছে কিন্তু একটা বিষয় এখনও অবোধ্য বা দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে, সেটি তাঁহার চিত্রশিল্প। আমাদের দেশে এবিষয়ে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। এক শ্রেণীর মনোভাব রবীন্দ্রনাথের কাজ, সুতরাং প্রশংসা করিতেই হইবে, বোঝার দরকার নাই। তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইবে ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। আর এক দলের কাছে তাঁহার চিত্রকলা হইতেছে প্রহেলিকামাত্র। তাঁহারা বলেন, রবীন্দ্রনাথ যদি চিত্রকর হইতে পারেন, তবে সকলেই চিত্রকর হইতে পারে; শিশুর মত কাজ, ড্রয়িং বা টেকনিক জানা নাই। একদল ভক্ত, অন্যদল নিন্দুক। রবীন্দ্রনাথের কাজকে ভক্তের উচ্ছ্বাস দিয়া দেখার প্রয়োজন নাই, তাকে যুক্তি তর্ক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

মাইকেল এঞ্জেলো ফ্লেমিশ ও ইটালিয়ান চিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, একজন ভক্ত ফ্লেমিশ চিত্র দেখিলে অশ্রুপ্লুত হইবে, ইটালিয়ান চিত্র দেখিলে সেরূপ হইবে না। ইহা চিত্রের সমাদর বোঝায় না, ইহা শুধু ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। যাঁহারা আর্টের আর্গুমেণ্ট বা যুক্তি তর্ক মানেন না, তাঁহারাই ফ্লেমিশ চিত্র পছন্দ করিয়া থাকেন। ইটালিয়ান প্রথিতযশা শিল্পী ও মনস্বীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া আমি বলিতে পারি, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে ভক্তের উচ্ছ্বাস দিয়া দেখার প্রয়োজন নাই, তিনি সত্যকারের একজন স্রষ্টার মত শিল্পপ্রচেষ্টায় হাত দিয়াছেন, তাই তাঁহাকে শিল্পের যুক্তি তর্ক দিয়া বিচার করা যায়। তাঁহার কাজে শিল্পের রস পাওয়া যায়, তাঁহাকে একজন প্রতিভাবান মৌলিক শিল্পী হিসাবে সমাদর করা যাইতে পারে।

আর্টের এই বিচার কি? কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি, শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি না। তাঁর কাব্যের বিচার দ্বারা চিত্ররাজিকে দেখিলে চলিবে না, ভুল বোঝা হইবে। কেহ মনে করেন, তাঁহার কবিতা হইতে চিত্রের উৎপত্তি। ছবির মধ্যে কবিতা আছে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কবি রবীন্দ্রনাথ এবং শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। দুই সৃষ্টি-প্রতিভা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। ডেনমার্কে যখন তাঁহার ছবির প্রদর্শনী হইয়াছিল তখন সেখানকার একজন সমালোচক তাঁহার লেখায় কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"My Pictures are verses in lines" (কবি অন্যত্র আবার ভিন্নমতও দিয়াছেন)। সমালোচক কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করিয়াছেন:

"It is however, difficult to discover a similiarity between the poet's poems and his paintings."

ছবি বোঝা সম্বন্ধে ঘনবাদ তত্ত্বের (কিউবিজম) প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী পাবলো পিকাসো লিখিয়াছেন:

"Every one wants to understand art. Why not try to understand the song of a bird? Why does one love the night, flowers, everything around one, without trying to understand them? But in the case of a painting people have to understand." (Artists on Art).

অর্থাৎ প্রত্যেকেই শিল্প বুঝিতে চেষ্টা করে। পাখীর গানকে বুঝিতে চেষ্টা কর না কেন? কেন একজন নিশীথিনীর সৌন্দর্য, ফুল, আমাদের চতুর্দিকে যাহা আছে, উহাদের না বুঝিয়াও ভালবাসে? কিন্তু ছবির বেলায়, তাহা বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথও নিজের চিত্র সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:

"It neither questions our mind for meaning nor burdens it with unmeaningness, for it is above all meaning."

রবীন্দ্রনাথের চিত্র বুঝিতে গেলে, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্প ও শিল্প-তত্ত্বের সহিত পরিচয় থাকার দরকার, এ বিষয়ে যাঁহারা অজ্ঞ তাঁহাদের রবীন্দ্র শিল্পনীতি বোঝানো কিছু মুশকিল এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন না। আমি এই উক্তি হইতে এই ইংগিত করিতেছি না যে, তিনি কোনো ইউরোপীয় রীতির অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাজ সম্পূর্ণভাবে মৌলিক ও ব্যক্তিগত। তাঁহার চিত্রের সংগে কোনো কোনো আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে, ইহা ইচ্ছাকৃত নহে, আকস্মিক। জার্মান সমালোচকের মন্তব্য ঃ

"You find in them mystisism of the Orient, as well as the pure formation of any occidental school but there is nowhere imitation or copying to be found."

প্যারিসে কবির যে চিত্র প্রদর্শনী হয়, সে উপলক্ষে প্যারিসের কাগজে কবি স্বয়ং মত দিয়াছেন,—

"There is no connection between his work as a poet and his work as a painter."

তিনি আরো বলিয়াছেন, "কবি হিসাবে তিনি দর্শনীয় বস্তু দেখেন, উহার তিনি বর্ণনা করেন, তিনি ইহাকে বলেন, মানসিক প্রতিরূপ। তিনি একটি দৃশ্য দেখেন, সে দৃশ্যরূপ তিনি অনুকরণ করেন। দৃষ্ট বস্তুর আদর্শ তাঁর মনে ছাপ দেয়, তাঁর কবিতাগুলি দেখা অথবা সৃষ্ট করা মূর্তি জ্ঞাপন করে। অন্যপক্ষে তিনি যখন চিত্রকর হন (এবং কাহিনীর ইহা অদ্ভুত অংশ), ঠিক সেই মুহূর্তে অন্যে অনুকরণ করে, তিনি তাহা ত্যাগ করেন। তাঁহার ছবি কোনো পূর্বকল্পিত নকসা রূপায়িত করে না। পূর্বে কিছু না দেখিয়াই তিনি আঁকেন, তিনি যখন ছবি আঁকেন জানেন না যে, ইহা কিরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। কাজেই কবিতা লেখার কালে তিনি চিত্রকর হিসাবে কাজ করিয়াছেন; এখন তিনি চিত্রকর, তিনি এখন কবির মত কাজ করেন। তাঁহার এই নূতন কাজ দুই বিজ্ঞান অথবা শিল্পের মধ্যবর্তী।"

বাঙলার সাময়িক পত্রে মাঝে মাঝে শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা চোখে পড়ে। মনে হয়, অনেক সময় তাহাতে ত্রুটি থাকে। সাহিত্য কাব্য সমালোচনা দ্বারা চিত্র দেখিলে চলিবে না, চিত্র সমালোচনা ও তাহার রসোপলব্ধি আর এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। দেশ-বিদেশের চিত্ররাজি, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ও তার চিন্তাধারার সংগে ওয়াকিবহাল থাকার দরকার; শুধু পাণ্ডিত্য ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদ্বারা (আজিকার দিনে সাহিত্য ও চিত্র সমালোচনায় সাইকোলজির বড় বাড়াবাড়ি)

ইহার ব্যাখ্যা চলিবে না। কোনো কোনো বাঙলা লেখায় এরূপ পাণ্ডিত্য ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আতিশয্য দেখিতে পাই, অবশ্য এটা আধুনিক কালের রেওয়াজ। ইংরাজী সাহিত্যেও এরূপ প্রচুর নিদর্শন আছে। বিশেষ করিয়া ইংরেজ চিত্র-সমালোচক হার্বার্ট রীডের নামোল্লেখ করা যায়। তাঁর লেখা নিতান্ত দুর্বোধ্য। আর্টকে তিনি সহজবোধ্য না করিয়া আরো ঘোরালো এবং আরো দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি প্রথম দিকে ছিলেন সাইকোলজির ছাত্র পরে হইলেন আর্ট ক্রিটিক। উর্বর-মস্তিষ্ক পণ্ডিতগণ শিল্পীগণ সম্বন্ধে যে সব চিন্তা আরোপ করিয়া থাকেন, শিল্পীরা হয়ত কোনো-কালে তাহা ভাবেন নাই। শিল্প সম্বন্ধে বুঝাইতে গেলে উহার ব্যাকরণ ও টেক-নিকের সংগে পরিচয় থাকার বিশেষ দরকার মনে করি। আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের এ বিষয়ে অধিকাংশ সময়ে জ্ঞানের অভাব আছে। একবার কলিকাতার চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে এক দৈনিক কাগজে, লিনোকাট সম্বন্ধে মন্তব্য পড়িয়াছিলাম,

"It contains excellent touches of brash."

জানেন না যে, লিনোকাট তুলিতে আঁকা ছবি নহে, ইহা ছুরি দিয়া কাটিয়া রবার রক হইতে ছাপা ছবি। বড় শিল্পীকে বোঝাইতে গেলে একজন ছোট শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন। ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের অনেক নামজাদা চিত্র সমালোচক চিত্রকরও বটেন, যেমন রোজার ফ্রাই। ইউরোপের বহু শিল্পীর লেখক ও চিত্র-সমালোচক হিসাবে খ্যাতি আছে। আমাদের বাংলাদেশে পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকদের উপর এ কাজের ভার, কাজেই তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলেও শিল্প সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ। বাঙলা সাহিত্যে শিল্প সমালোচনা এখনো গড়িয়া ওঠে নাই। আমাদের বাঙ্গালী শিল্পীরা ছবি আঁকা লইয়া ব্যস্ত, শিল্প-সমালোচনায় তাঁহারা দৃষ্টি দেন নাই। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথই ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি সব্যসাচী। তিনি খ্যাতনামা লেখকও বটেন, ভারতীয় শিল্পের তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমার মনে হয়, শিল্পীদের এবিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত। বাঙলা সাহিত্যে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনা গড়িয়া উঠিয়াছে, সে তুলনায় শিল্প সমালোচনা কিছুই নাই।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প সম্বন্ধে দু'-একটি লেখা চোখে পড়িয়াছে। বহু পাণ্ডিত্য দর্শাইবার চেষ্টা থাকিলেও সে-সব রচনা ভ্রমাত্মক। আমি তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করিতে পারি না। রবীন্দ্র-নাথ স্বয়ং তাঁহার চিত্রাদর্শের ব্যাখ্যা সুষ্ঠু এবং সুস্পষ্টভাবে দিয়াছেন। পাশ্চাত্য কলারসিকদের লেখাতেও তাঁহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে 'পেন্টিঙস্ অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর'* নামে ২০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা বাহির হইয়াছিল। ১৯৩০ সনে ইউরোপে ও

আমেরিকায় কবির যে চিত্র প্রদর্শনী হইয়াছিল, সে উপলক্ষে বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচকদের সমালোচনা সংগ্রহ। আমরা আমাদের দেশের শিল্পীর কাজকে বুঝি না, কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পরসিকগণ তাহার সম্যক সমাদর করিয়াছেন এবং তাঁহার চিত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি খুবই সহায়। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত "রবীন্দ্র চিত্র-কলা" পড়িয়াছি, সুলিখিত তথ্যপূর্ণ সঙ্কলন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের দুইটি অ্যালবাম প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথমটি গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল হইতে শ্রীমুকুলচন্দ্র দে কর্তৃক প্রকাশিত। সেখানে ১৯৩২ সনে কবির যে চিত্র প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহারি সচিত্র ক্যাটালগ, মোট ১৭খানি হাফটোন ছবি, সুন্দর ছাপা কাগজ। এই পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'চিত্রলিপি'। মোট ১৫খানি রঙীন চিত্র আছে, পুস্তকের ভূমিকায় ইংরেজীতে 'মাই পিকচার্স' নামে কবি স্বয়ং নিজের চিত্র সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য দান করিয়াছেন।

বহু বৎসর পূর্বে কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ভ্রমণে গিয়াছিলাম। কবিগুরু তখন শ্রীনিকেতনে বাস করিতে-ছিলেন। দেখা মাত্রই বলিলেন, "শিল্পীকে আমার ছবি দেখাব।" টেবিলের উপর এক তাড়া ছবি পড়িয়াছিল, একে একে প্রত্যেকটি দেখিলাম। আমার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "একে আল্ট্রা-মডার্ন আর্ট বলে, আধুনিক ইউরোপ একাজই আজকাল করছে।" আমার প্রশংসাবাক্য শুনিয়া আনন্দিত ও বিস্মিতও হইলেন। বলিলেন, "বলিস কিরে? যারা শেখে না, তারা মডার্ন আর্ট করে, আর যারা শেখে তারা করে অজন্তার আর্ট।" মুকুলচন্দ্র দে তাঁহার ক্যাটালগের ভূমিকায় এরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন, "অনেক শিল্পসমালোচকের কাছে নব্য বঙ্গীয় স্কুলের কাজের দুর্বলতা সৌন্দর্যের পক্ষে যে হানিকর, ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। রবীন্দ্রনাথের মতানু-সারে আজিকার দিনে অজন্তার স্কুলের মত মহান্ ঐশ্বর্যশালী চিত্রের পুনরুদ্ধার করা অকেজো। কবি চিত্রকর একেবারে সম্পূর্ণ নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি শক্তিশালী নিপুণ রেখাপাতে সৃষ্টি করিয়াছেন, কোথাও কম্পিত হন নাই। সত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার আঙ্গুলগুলি দৃঢ়, উহা কোনো কম্পন দর্শায় না। তাঁহার কালি-কলমের কাজ সত্য সত্যই অত্যুৎকৃষ্ট রচনা। একটি আঁচড়ে যে ফিগারগুলি আঁকিয়াছেন, তাহা শক্তিমান। তাঁহার চিত্র অত্যন্ত গতিশীল। তাঁর আল্ট্রা-মডার্ন চিত্রের বর্ণনা দিতে আমাদের ব্যর্থকাম হইতে হয়। তিনি একজন বড় নক্সাকারক এবং তাঁর বিষয়বস্তুতে অত্যন্ত কল্পনা দর্শায়।"

কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার পুন-রুদ্ভব করিয়াছেন। সকলেই জানেন, তিনি শিল্পীভ্রাতৃদ্বয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা ছিলেন কিন্তু নিজে চিত্রকর হিসাবে তাঁহাদের দ্বারা সংক্রামিত হন নাই, একেবারে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি শিল্পীদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সারা পৃথিবী ঘুরিয়াছেন, আর্ট গ্যালারিগুলি দর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহাকে প্রভাবিত করে নাই, সাধারণ দর্শকের মতই দেখিয়াছেন। কারণ তখন কল্পনা করেন নাই, একদিন তিনি চিত্রকর হইবেন। তাঁহার কোনো শিল্প শিক্ষা নাই একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার চিত্রের উৎপত্তি হইয়াছে খেয়াল হইতে। প্রথমে তিনি আর্টিস্ট হইবেন এইরূপ মনোভাব লইয়া কলম ধারণ করেন নাই।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কবির চিত্র সবন্ধে একটি সুন্দর বিশেষণ শুনিয়াছিলাম। তিনি ইহাকে Eruptive quality বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন, চমৎকার ব্যাখ্যা। ইংরাজী eruption শব্দের অর্থ হইল আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত। অগ্নি প্রস্রবণ যেমন বাধা না মানিয়া নিজের শক্তিতেই পথ করিয়া লয় তেমনি রবীন্দ্রনাথের শিল্পের পন্থা (টেক্‌নিক, অ্যানাটমি, ড্রয়িং, পার্স-পেক্টিভ ইত্যাদি) না জানা সত্ত্বেও নিজের প্রেরণা ও কল্পনার বলে শিল্পের এক নূতন রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের এই বিশেষণটি আমার একজন ইউরোপীয় শিল্পী সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করে, তিনি বিখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী ভ্যানগঘ। তিনিও কোনো শিল্পগুরুর কাছে শিক্ষা পান নাই, শুধু নিজের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফলে নিজের প্রকাশ ভঙ্গিমা আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই দুই শিল্পীর মধ্যে কোথাও একটা ঐক্য খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগে। ইউরোপীয় মডার্ন আর্টে এখন বিখ্যাত মাতিস ও পারলো পিকাসোর নাম। তাঁহারা সুশিক্ষিত শিল্পী, অর্থাৎ প্রচলিত অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং-এর ভাল শিক্ষা আছে অর্থাৎ তাঁহারা বাস্তবধর্মী চিত্র আঁকিতে খুবই নিপুণ কিন্তু তাঁহারা সাদৃশ্যধর্মী চিত্র ত্যাগ করিয়া নয়া পন্থা ধরিয়াছেন যাহাকে বলা হয়, আল্ট্রা-মডার্ন আর্ট।
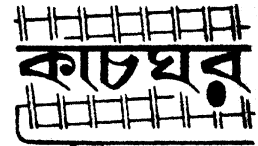
* Paintings of Rabindranath Tagore, with foreign comments: published by N. Mukherjee, Art Press.

অর্থাৎ তাঁহাদের কাজে বিশুদ্ধ ড্রয়িং, শেড্ লাইট, পার্সপেক্টিভ প্রভৃতি পাওয়া যাইবে না। তাঁহারা আঁকেন অজ্ঞ শিশুর মত (child's art) অথবা শিক্ষাবিহীন প্রিমিটিভ লোকদের মত (Primitive art)। রবীন্দ্রনাথ আর্টের কিছু শিক্ষা না করিয়াই এই আল্ট্রা-মডার্ন স্তরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন,—'যারা শেখে না তারা মডার্ন আর্ট করে, আর যারা শেখে তারা অজন্তার আর্ট করে।' ইহার অর্থ বোধ হয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ট্র্যাডিশনাল আর্টের উদ্ভব হয়। এখন আমার প্রশ্ন মাতিস ও পিকাসোর ন্যায় টেকনিক শিক্ষা করিয়া মডার্ন আর্ট করা ভাল না, কিছু না শিক্ষা করিয়াই রবীন্দ্রনাথের মত মডার্ন আর্টে পৌঁছান ভাল? ইহার সদুত্তর দিতে পারিলাম না, বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন।

বাংলা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে কেউ ঘনবাদী (কিউবিস্ট) কেউ অতি বাস্তববাদী (স্যুররিয়ালিস্ট—ইহা ফরাসী শব্দ। 'স্যুর' শব্দের অর্থ অতি) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহার কোনটাই নহেন।

তাঁহাকে আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীভুক্ত যদি করা যায় তবে বলা যায় তিনি স্বরবৈচিত্র্যবাদী (এক্সপ্রেশনিস্ট)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকে শ্রেণীবিহীন (Unclassified) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তিনি নিজেও জানেন না যে, তাঁহাকে আধুনিক ইউরোপীয় গোত্রভুক্ত করা যাইতে পারে। তিনি ইচ্ছাপূর্বক ইউরোপীয় নীতির অনুসরণ করেন নাই, তাঁর ছন্দ ও সঙ্গীতের সম্বন্ধ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য আকস্মিকভাবে একস্‌প্রেশনিজমের নীতি আসিয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সে এই নীতি মাতিসের শিল্পে জন্মগ্রহণ করিলেও জার্মানীতে এই নীতি বিশেষ আদৃত ও পুষ্ট হইয়াছে; তাই শিল্প সমালোচকেরা ইহাকে জার্মান একস্‌প্রেশনিজম বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। জার্মানীর মিউনিক শহর ছিল নয়াশিল্পীদের মস্ত এক ঘাটি। আমাদের বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়, অথবা সূর্যের উত্তাপ হইতে বালুর উত্তাপ বেশী। এই উপমা ফরাসী ও জার্মানীর চিত্র সম্বন্ধে খাটে। প্যারিসে আল্ট্রা-মডার্ন আর্টের জন্ম হইলেও মিউনিকের শিল্পীরা উহাকে অত্যন্ত উৎকর্ষের সীমানায় পৌঁছাইয়াছিলেন। তাঁহারা জার্মানীর এই নয়াশিল্পের নাম দিয়াছিলেন জুং কুন্‌স্ত্ (Junge Kunst) অর্থাৎ তরুণ শিল্প বা যুবশিল্প। জার্মান একস্‌প্রেশনিস্ট আর্টের পিতা কান্তিনস্কি; তিনি জাতিতে জার্মান নহেন, রুশো-পোলিশ। মিউনিকে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন ও সেখানেই তাঁহার কর্মস্থান। চিত্রে যেমন একস্‌প্রেসনিজম প্রচার করেন এই শিল্পী, তেমন ভাস্কর্যে এই নীতি প্রচার করেন আর্কিপেঙ্কো।

হিটলার জার্মানীর তক্তে আরোহণ করিয়া শুধু রাজনীতির সংস্কার করেন নাই, জার্মানীর শিল্প ও সংস্কৃতিতেও কঠোর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জার্মানীর তৎকালীন শিল্পও তাঁর নিদারুণ শাসন হইতে রেহাই পায় নাই। তিনি নয়াগোষ্ঠীর শিল্পীদের প্রতি কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন—সকলে বুঝিতে পারে এমন শিল্প সৃষ্টি কর, যদি না পার জার্মানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। কতক শিল্পী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গিয়া বসবাস করেন এবং নয়া মতবাদ ও নয়াশিল্পের প্রচার করেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন আর্কিপেঙ্কো, তিনি নিউ ইয়র্কে গিয়া বসবাস করেন এবং সেখানে এক দল আমেরিকান শিল্পীকে নয়া মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী ইউরোপের নানাস্থানে হইয়াছিল। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হইয়াছিলেন জার্মানীতে, কারণ জার্মান শিল্পীরা যাহা করিতেছিলেন, তাহাই শিল্পরসিকগণ তাঁহার কাজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

বার্লিনে 'গ্যালারী মোলার'-এ চিত্র প্রদর্শনী হইয়াছিল, সে উপলক্ষ্যে সেখানকার বিখ্যাত পত্রিকা Vossiche Zeitung (16-7-30) লিখিতেছে, "নিশ্চয়ই এ কাজ একজন শৌখীন শিল্পীর (এ্যমেচার), কিন্তু এই শব্দটিকে অত্যন্ত সদর্থে নিতে হইবে; ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, খুব স্থির সংকল্প এবং দায়িত্বের সঙ্গে কাজ লওয়া হইয়াছে, প্রায়শ ইহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীসৃষ্টির সীমা ছুঁইয়া যায়।"

Hamburger Fremdenblatt (26.7.30): "টাগোরের সর্বশেষ প্রকাশ শিল্পী হিসাবে, অর্থাৎ চিত্রকর হিসাবে। এই প্রদর্শনী তাঁহার পরিচয় দিবে। আমরা তাঁহার নূতনত্ব, বিষয়ের মৌলিকতা ও প্রকাশভঙ্গিমা দেখিয়া চমৎকৃত হই। তাঁহার ছবিগুলি এক দূরজগতের ইন্দ্রজাল সমগ্র ধীশক্তির সম্মুখে উপস্থাপিত করে এবং তিনি জার্মানী ও ভারতের মধ্যে একজন মধ্যস্থ ও দ্বিভাষী হইতে পারেন।"

বহু লেখক রবীন্দ্রনাথের কাজের সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পীদের নামোল্লেখ করিয়া তুলনা করিয়াছেন; বিশেষ পাওয়া যায় এমিল নোল্ড ও পল ক্লীর নাম। একাধিক কাগজে স্কাণ্ডিনেভিয়ান শিল্পী এমিল নোলড-এর নামোল্লেখ আছে।

Hannovershe Kurier (19.7.30): লিখিয়াছে—"বিশেষভাবে ইহাতে পাওয়া যায় একস্‌প্রেশনিজম-এর ছায়া, ইহাতে নোল্‌ড-এর বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইবে, ইহাকে কোনো প্রভাব বলা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে একই প্রবণতা আছে, তারই নিদর্শনপত্র।"

অঁ্যারি মাতিস যে নিজের চিত্রকলা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ একেবারে হুবহু মিলিয়া যাইবে; মাতিস বলিয়াছেন,—"আমি দাসবৎ প্রকৃতিকে অনুকরণ করিতে পারি না, আমি প্রকৃতির ব্যাখ্যান করিব এবং ছবির প্রকৃতির কাছে উহাকে বশ্যতা

স্বীকার করাইব—যখন সকল বর্ণ-সামঞ্জস্যের সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাইব, ফল হইবে স্বরের একটি জীবন্ত একতান সঙ্গীত, চিত্রের সমন্বয় সঙ্গীত রচনা হইতে পৃথক নহে।

অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ফ্রান্সের (আর্টিস্টস্ অন আর্ট) প্রতিচ্ছায়াবাদীদের (ইম্প্রেশনিস্ট) সঙ্গে কোনো মিল নাই; তিনি জগৎটাকে সম্মিলিত রেখার সমষ্টি-রূপে দেখিতে চান। I can imagine the universe to be a universe of lines)। ফ্রান্সের প্রতিচ্ছায়াবাদের (ইম্প্রেশনিজম) প্রতিষ্ঠাতা ম্যানে জগৎ রচনায় রেখার সমাবেশ দেখিতে পান না, তিনি দেখেন রংয়ের উপর রং।

একস্প্রেশনিজম তত্ত্বের একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন, একস্প্রেশন শব্দের অর্থ বাংলায় সাধারণত প্রকাশ বা ভাব বুঝায়। এখানে এই অর্থ হইবে না, ইহার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্বন্ধ আছে। চেম্বার্স ডিকশনারীতে ইহার অর্থ দিয়াছে,

"Marked indication of feeling in production of musical sounds."

বেণীমাধব গাঙ্গুলীর ডিকশনারীতে বাংলা প্রতিশব্দ আছে "স্বরবৈচিত্র্য।" আধুনিক চিত্র সমালোচনায় দুইটি শব্দ পাওয়া যায় Polychromy এবং Polyphony। পোলীক্রোমী শব্দের অর্থ হইল ইউরোপের মধ্যযুগীয় বহু রংএ রঞ্জিত মূর্তি; মধ্য-যুগে ভাস্কর্য বহু রং-এ রঞ্জিত করার বিধি ছিল, পোলীক্রোমী বলিতে সে সবই বুঝাইয়া থাকে। শিল্প সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন, চিত্র হইবে বহু রং বিশিষ্ট মূর্তির মত। পোলীফোনী শব্দের অর্থ ডিকশনারীতে—

"Notting musical composition of two or three more parts each with indendent melody of its own."

এর বাংলা প্রতিশব্দ করা যায় "বহু ধ্বনি বিশিষ্ট সঙ্গীত রচনা।" শিল্প সমালোচক-গণ বিশেষ করিয়া এই দুইটি শব্দ একস্-প্রেশনিস্ট নেতা মাতিস-এর কাজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁর চিত্রে নাকি পাওয়া যায় ছন্দ, সঙ্গীত মাহাত্ম্য এবং উজ্জ্বল বর্ণসংযোজনা। আমার মনে হয় এই দুইটি শব্দ পোলীক্রোমী ও পোলী-ফোনী রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধেও কোথাও কোথাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাঁর চিত্রে ভারতীয় পুতুলের আমেজ পাওয়া যাইতে পারে।

মাতিস চিত্রের গুণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—"ব্যবসায়ী হোন অথবা সাহিত্যিক হোন, সকলের পক্ষে আর্টের কাজ হইল মস্তিষ্ক শান্ত করা, যেমন একটি ভাল আরাম কেদারা ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেয়।" রবীন্দ্রনাথ তেমনি সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে বিদায় লইয়া চিত্রকর্ম দ্বারা মনকে বিশ্রাম ও শান্তি দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে সজ্ঞান শিল্পী (কনশাস আরটিস্ট) হইতে কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। তিনি যখন প্রথম কালি কলম লইয়া ছবির মত কিছু আঁকাবুকি শুরু করেন, তখন তাঁর আর্টিস্ট বলিয়া পরিচিত হইবার এবং সত্যিকারের ছবি আঁকার স্পৃহা জাগে নাই; কালি কলম লইয়া ইস্কুলের শিশুর মত খেলা করিতে করিতে তাঁর ছবি আঁকার স্পৃহা জাগিল, শিশুর ক্রীড়া শেষে আর্টে পরিণত হইল। প্রথম দেখি তিনি নিজের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতেছেন কাটাকুটি করিয়া। শুধু একটি লাইন টানিলেই অশুদ্ধ অংশ কাটা হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বিচিত্র সম্মিলিত রেখার সহযোগে, উহার একটি আলঙ্কারিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন, ফলে দাঁড়ায় কল্প জগতের অথবা শিশুর স্বপ্ন জগতের অদ্ভুত পশুপক্ষী; ইহা শুধু অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি নিজের কবিতার চিত্ররঞ্জন (illumination) করিতেছেন, তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে কবিতা লিখিয়া, উহাকে অলংকরণে সুশোভিত করিতেছেন, বলিতে পারি, উহাতে আছে গথিক সৌন্দর্য। এসবের মধ্যে আছে ক্যালিগ্রাফিক গুণ। তারপর আসিল অদ্ভুত কাল্পনিক জীব-জন্তু ও পাখী, তাহাদের পৃথিবীতে কোনো অস্তিত্ব নাই এবং অদ্ভুত ভঙ্গিযুক্ত মুখ ও মুখোশ। শেষে আসিল নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে ফিগারপেন্টিং। কাজের মধ্যে পাওয়া যায় অদ্ভুত ছন্দ, ভার সাম্যতা, অবকাশ রচনার (spacing) জ্ঞান। রেখার সম্মিলনে ছন্দ সৃষ্টি এবং উজ্জ্বল বর্ণ-প্রয়োগ লক্ষণীয়। এসব কাজে বাস্তবধর্ম পাওয়া যাইবে না কিন্তু স্থান-চিত্রের বেলায় বাস্তবধর্মী চিত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এসব চিত্র ইউরোপে আদৃত হয় নাই। জার্মানীর বিখ্যাত আর্ট জার্নাল বলিতেছে "তিনি যখন জাপানীজ এবং ইংলিশ সেন্টিমেন্টাল আর্ট দ্বারা প্রভাবিত হন এবং স্থানচিত্র প্রাকৃতিক বস্তু আঁকিতে চেষ্টা করেন, তখন উহা হয় অস্পষ্ট ও রূপহীন।

অন্যপক্ষে বিখ্যাত চিত্রসমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় 'মডার্ন রিভিয়্যু'তে চিত্রলিপির সমালোচনাকালে ভিন্ন মত দিয়াছেনঃ

"Three experiments in landscapes would have done credit to Vangogh or even to Turner."

অর্থাৎ তিনটি স্থানচিত্রের পরীক্ষণ ভ্যান গঘ অথবা টার্নারকেও কৃতিত্বের পরিচয় দিবে। ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়। কিন্তু গাঙ্গুলী মহাশয় পরে যে বাক্য লিখিয়াছেন তাহার সঙ্গে জার্মান সমা-লোচকের মন্তব্যের ঐক্য আছেঃ

"They descend to a lower level than the heights attained by his so called fantastic creations,"

অর্থাৎ কবি তাঁহার তথাকথিত "আজগুবি শিল্পে" যে স্তরে পৌঁছিয়াছেন, তাহার তুলনায় ইহা (স্থানচিত্র) নিম্নস্তরের কাজ।

পাশ্চাত্য কলারসিকদের সকল সমালোচনা আমি পড়িয়াছি। উহার মধ্যে একটি শব্দের অভাব আমার মনে হয়, উহা construction বা সংগঠন রীতি। কবির নিজের লেখা এবং তাঁহার চিত্ররাজি অনুশীলন করিয়া তাঁহার চিত্ররীতি সম্বন্ধে এই শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। তাঁহার চিত্রের টেকনিক একটি অট্টালিকা গঠনের ন্যায়। রেখার সম্মিলনে ও বর্ণ প্রয়োগের সহযোগে সংগঠন রীতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতানুযায়ী তাঁহার চিত্রনীতিকে এক্সপ্রেশনিজম্ না বলিয়া কনস্ট্রাকশনিজম্ বা সংগঠনবাদ বলিলে কেমন হয়? বস্তুত আধুনিক শিল্পে এই সংগঠনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একজন ইংরেজ চিত্রকর এডওয়ার্ড ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন—

"The spirit of our epoch is one of synthesis, and construction and any work of art which does not express this spirit does not belong spiritually to our age."

অর্থাৎ আমাদের যুগের আদর্শ হইল, একটি সংশ্লেষণ ও সংগঠন, এবং যে কোন শিল্পের উদাহরণ এই আদর্শ ব্যক্ত করে না, তাহা আত্মিকভাবে আমাদের যুগে বর্তায় না।

পূরবীর পাণ্ডুলিপিতে (১৯২২) প্রথম দেখি ক্যালিগ্রাফিক কাটাকুটি, যদিও অল্পবিস্তর কাটাকুটি ইহার পূর্বেও কিছু করিয়াছেন। কাটাকুটি ত্যাগ করিয়া সম্ভবত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সত্যিকারের ছবি আঁকিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় প্যারিসে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। সেই বৎসরই ইংলণ্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক, রাশিয়া ও আমেরিকায় চিত্রপ্রদর্শনী হয়। কলিকাতায় প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয় তাঁর সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে ১৯৩১ সালে, পর বৎসর ১৯৩২ সালে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সংগ্রহালয়ে ১৮০০ শতের কাছাকাছি চিত্র আছে। দেশে এবং বাহিরে ব্যক্তিগত সংগ্রহে ও সংগ্রহালয়ে কিছু আছে। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের ভিতর মোট দুই হাজারেরও উপর রেখা চিত্র ও চিত্র আঁকিয়াছেন।

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ইহা সাধারণত জানা নাই, বিশ্বকবি কেমন শিল্পপ্রেমিক ও একনিষ্ঠ ছাত্র। তাঁহার বিস্তৃত ভ্রমণে যে কোনো দেশের শিল্পের সংগ্রহালয়, কোনো দর্শনীয় আর্ট স্টুডিওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে বাদ দেন নাই" তারপর তিনি একজন তৎকালীন ইউরোপীয় চিত্রকর ও ভাস্কর্যের ফর্দ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁহাদের অনুশীলন ও সমাদর করিয়াছেন। আমার একথা অত্যন্ত অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। তিনি শিল্পপ্রেমিক বটে, কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সংবাদ তাঁহার কোনো আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতায় বা লেখায় পাওয়া যায় না। তাহা যদি হইত, তবে কোথাও না কোথাও তাহার ইঙ্গিত থাকিত। তাঁহাকে আর্টের একনিষ্ঠ ছাত্র বলা যায় না, ছাত্রের ন্যায় আর্টের অনুশীলন কোনো দিনই করেন নাই। বিশ্বভারতীতে ছবির কথা নামক সংকলনে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি, জীবনস্মৃতি ও নানা চিঠিপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে জানা যায়, তিনি প্রথম জীবনে কখনো কখনো স্কেচবুক ও পেন্সিল লইয়া এক-আধটু নাড়াচাড়া করিয়াছেন। মুকুল দেও এরূপ উক্তি করিয়াছেন, ইহা শুধু একটু শখের কাজ, ইহাকে খুব seriously নেওয়া চলে না, এ-কাজের সঙ্গে বৃদ্ধ বয়সের কাজের তুলনা করা চলে না। 'Keen Student'-এর ন্যায় তাঁকে আর্ট অভ্যাস করিতে হয় নাই; বৃদ্ধ বয়সে শুধু কল্পনা, অধ্যবসায়, ব্যক্তিত্ব, ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রতিভার বলে শিল্পে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শৈশব হইতেই কাব্য ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র, আর্ট সম্বন্ধে উহার বৈষম্য দৃষ্ট হইবে।

তাঁর ইউরোপীয় শিল্প সমাদরের তিনটি উদাহরণ দিতে পারি। ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে জন এডিংটন সীমনস লিখিত 'দি লাইফ অব মাইকেল এঞ্জেলো' উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটি আমি পড়িয়াছি। রবিকাকার হাতের লেখা উপহার পৃষ্ঠা আছে। বহু বৎসর পূর্বে বিলাতের ভিক্টোরিয়ান শিল্পী জর্জ ফ্রেডারিক ওয়াটস-এর আঁকা 'আশা' নামক রঙীন চিত্র প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। শুনিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বিলাত থাকিতে এ-চিত্র দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং একটি প্রিণ্ট কিনিয়া রামানন্দবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, অনুরোধ ছিল, প্রবাসীতে যেন ছাপা হয়। ওয়াটস-এর কাজ অত্যন্ত সেণ্টিমেণ্টাল, আজিকার দিনে ইউরোপীয় শিল্পীদের ভিতর তাঁহার কোনো স্থান নাই। ভিক্টোরীয় যুগে সে যুগের বাহক ওয়াটস-এর কিছু নাম-ধাম ছিল, তার পরে সে সম্পূর্ণ মৃত। দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথ এক সময় ইংলিশ সেণ্টিমেণ্টালিজম-এর অনুরক্ত ছিলেন। তিনি যখন আর্টিস্ট হইলেন, সেণ্টিমেণ্টালিজম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁর চিত্রে কোনো প্রকার সেণ্টিমেণ্টালিজম নাই। তাঁহার কাব্যে সেণ্টিমেণ্টালিজম নাই, একথা বলা চলে না, প্রচুর নিদর্শন আছে। এ বিষয়ে কাব্য হইতে চিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি রাশিয়ান শিল্পী রোয়েরিকের সমাদর করিতেন, তিনি আমার কাছে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন; শান্তিনিকেতনে ছাত্র থাকাকালীন আমি একদিন কথা প্রসঙ্গে রোয়েরিকের কথা পাড়িয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওরিজিন্যাল ছবি যদি দেখতি, কি যে রং!" রোয়েরিক রবীন্দ্রনাথকে নিজের আঁকা একটি ক্ষুদ্র ছবি উপহার দিয়াছিলেন। এক দীর্ঘ দেহ প্রাচীন রাশিয়ান সাধু দাঁড়াইয়া আছেন, দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু নাভি অবধি বিস্তৃত, পশ্চাতে একটি রাশিয়ান নগর দেখা যাইতেছে, আকাশ ঘোর রক্তবর্ণ। এই ছবিটি এখন কলাভবন সংগ্রহালয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে আমার নিজের বক্তব্য বলার আর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি না। রবীন্দ্রনাথ নিজের চিত্র সম্বন্ধে যে ইংরেজী ভূমিকা লিখিয়াছেন, যাহা চিত্রলিপি এ্যালবামের প্রারম্ভে রহিয়াছে, তাহা যত্ন সহকারে পাঠকদের পড়িবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। এই ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের শিল্প-পরিচয়ে যথেষ্ট আলোক প্রদান করিবে।

তোডরমল

ঘাটতি পূরণের সমস্যা

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ ঋণ করিয়া ঘি খাও—এই বিধানটি বিশেলষণ করিলে এই দাঁড়ায়ঃ যাহা বলপ্রদ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী এইরূপ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হইলে ঋণ করিতেও দ্বিধা বোধ করা উচিত নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঋণ তো করা গেল, কিন্তু শোধ দিবার কি উপায় হইবে? উত্তর সংক্ষিপ্ত—স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার সাথে উপার্জনও বাড়িবে। কাজেই ঋণ পরিশোধ করিবার পথও সরল হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্যের দিক হইতে উপরোক্ত বিধান যতটা সত্য, জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও উহা সমপরিমাণে প্রযোজ্য। বর্তমানে যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইতেছে এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়নের মহড়া শুরু হইয়াছে, তাহার মূল উদ্দেশ্যই হইল জাতির আর্থিক মান উন্নত করা এবং দারিদ্র্যপিষ্ট হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার। এইসব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অথচ আমাদের তদনুরূপ অর্থ সংগতি নাই। তবে কি সুদিনের আশায় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? কদাচ না। অর্থাভাব বলিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। আমাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেভাবেই হউক উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। দরকার হইলে ঋণ গ্রহণ করিতেও আমরা পরাঙ্মুখ হইব না। ধরা যাক্, আমাদের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বরাদ্দ যে ২০৬৯ কোটি টাকার সংস্থান—উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ঐ অর্থ ব্যয়িত হইলে আমাদের মোট জাতীয় আয় ৮৭০০ কোটি (১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাবে) টাকা হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ১০,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত হইবার কথা। হিসাব দৃষ্টে আমাদের দেশে কর, রাজস্ব, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি বাবদ মোট ১৪১৪ কোটি টাকা উঠাইতে পারা যায়। অনুমিত ৬৫৫ কোটি টাকার টান পড়ে। এই টাকাটা সংগ্রহ করিতে না পারিলে কি সমস্ত পরিকল্পনাটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে? এই ঘাটতি অর্থ যে করিয়াই হউক পূরণ করিতে হইবে। যখন সরকারী ব্যয় অনুমিত রাজস্ব হইতেও অধিক হইয়া পড়ে, তখন ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে হয় জমা তহবিলে হাত দিতে হয়, অথবা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ হইতে ধার করিতে হয় নতুবা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে নোট চালু করিতে হয়। এই ঘাটতি পূরণের পদ্ধতিকেই ইংরেজীতে "deficit financing" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ঘাটতি বাজেট-ই (unbalanced budget) উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ। জাতির আর্থিক মান উন্নয়নকল্পে 'deficit financing'-এর আশ্রয় গ্রহণ করা অনেকটা ঋণ করিয়া ঘি খাওয়ার অবস্থা। সাধারণ ক্ষেত্রে দেনা করিয়া ঘৃত সেবনেচ্ছু বহু ব্যক্তিই হয়ত জুটিবে, কিন্তু চাহিবামাত্রই যে তাহাদিগকে ঋণ দান করিতে নিঃসংকোচে অগ্রসর হইবে এমন দাতাকর্ণ হয়তো নাও মিলিতে পারে। কারণ ঋণদাতা প্রথমেই বিচার করিবেন যে, ঋণ গ্রহণেচ্ছুর উদ্দেশ্য যত সাধুই হউক তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার মত যোগ্যতা বা সামর্থ্য আছে কিনা। সরকার সম্পর্কে কিন্তু ঋণদানে উপরোক্ত বিচারের বন্ধন নাই। কারণ জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রিজার্ভ ব্যাংক সকল সময়ই সরকারকে ঋণদান করিতে মুক্তহস্ত থাকিবে। ইহা ছাড়া, প্রয়োজন বোধে সরকারের নির্দেশ অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত নোটও বাজারে ছাড়িতে পারে—যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় "created money". এইখানে স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্রিটিশ শাসনাধীনে দ্বাদশ শিল্পপতি যে পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন তাহাতে "created money"র সাহায্যে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল। প্রশ্ন উঠিতে পারে—এইসব ক্ষেত্রে "আয় বুঝে ব্যয় করার" নীতিই শ্রেয় না সাধু সংকল্প সাধনের জন্য ঋণ করিবার নীতি গ্রহীতব্য।

অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় নীতি অবলম্বন করিলে শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ঘাটতি বাজেটের জন্য মুদ্রাস্ফীতিজনিত সকল প্রকার কুফলের উদয় হইতে পারে। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘাটতি বাজেটজনিত মুদ্রাস্ফীতির যে ভয়াবহ স্মৃতি লোকের মানসপটে অঙ্কিত আছে তাহাই অনেককে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শংকাকুল করিয়া তোলে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ঘাটতি বাজেট ঘটিলেই যে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দেখা দেয়, তাহা সব সময় সত্য নয়। মন্দার সময় ঘাটতি বাজেট প্রণীত হইলে আয় হইতে সরকারী ব্যয়াধিক্য বশত বাজার দরের নীচু মান আবার উচ্চমুখী হয়। ইতালীতে এইভাবে ঘাটতি বাজেটের সাহায্যে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করা হয়। সুইডেনেও অনুরূপ পদ্ধতিতে দেশের পুনর্গঠন সমস্যা সমাধান করা হয়। ঐ দেশে ভবিষ্যৎ উন্নতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া এমনভাবে ঘাটতি বাজেট তৈরী হয়, যাহাতে নিরূপিত ঘাটতি
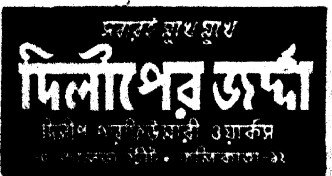
কয়েক বৎসর বাদে দেশের আর্থিক উন্নয়নের সাথে সংকুলান হইয়া উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। দেশের গঠনমূলক কার্যে অধিক অর্থ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইলে জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রসারণের জন্য যে অধিক মুনাফা সরকার তহবিলে আসে তাহাতে সরকারী বাজেটে ঘাট্‌তি পূরিয়া ভবিষ্যতে উদ্বৃত্ত দেখা যায়। তাহা ছাড়া, ইতিমধ্যে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্য সামগ্রীও উৎপন্ন হয় এবং ইহার ফলে ব্যয়াধিক্য বশত যে বাজার দর উচ্চাভিমুখী হয় তাহা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কাজেই মুদ্রাস্ফীতির কুফলও অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য প্রয়োজন হইলে সরকারকে আর্থিক লেন-দেন কারবার নিয়ন্ত্রণ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রব্যসামগ্রীর দর নিয়ন্ত্রণও করিতে হইবে। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন উপরোক্ত অব্যর্থ শরগুলি সরকার-তূণে সঞ্চিত আছে তখন অদূরভবিষ্যতে আর্থিক মান উন্নয়নের জন্য যদি ঘাট্‌তি বাজেটের আশ্রয় লইতে হয় তাহাতে অযথা শংকাকুল হওয়ার কোনও কারণ নাই। লোকসভায় যখন আমাদের অর্থসচিবকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তিনি সেই সময় নিঃসংকোচে বলেন যে, মোটরচালক যেমন কোন পথের বাঁকে হঠাৎ বিপদের সম্মুখীন হইলে উহা উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ ঘাট্‌তি পূরণজনিত মুদ্রাস্ফীতির কুলক্ষণগুলি প্রশমিত করিবার জন্য দেশের অর্থ-সচিবকেও সময়োপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়ে দেশবাসী তাঁহার বিচারবুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য যে ৬৫৫ কোটি টাকার ঘাট্‌তি পড়ে, তাহা আংশিক পূরণ করিতে ২৯০ কোটি টাকার মত "deficit financing"এর সংকল্প সরকারের ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, "deficit financing"এর অর্থ হইল সরকারের মজুত তহবিল ("স্টার্লিং ব্যালেন্স সহ") ভাঙ্গা অথবা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ হইতে ধার নেওয়া। প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ও সরকারী ঋণপত্রের পর ভিত্তি করিয়া অধিকতর নোট চালু করিবে। এইভাবেই উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করা হয়। বাকি টাকা তুলিবার জন্য সরকারকে আরও করভার চাপাইতে হইবে নতুবা জন-সাধারণের কাছ হইতে আরও ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বশেষ উপায় বিদেশের কাছে হাত পাতা। সে যাহাই হউক, প্রথম পরিকল্পনার গোড়ার দিকে "deficit financing"এর কোনও প্রয়োজন হয় নাই। শেষদিকে এই বাবদ ৩৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই সম্পর্কে আশ্বাস দিয়াছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন-ভাবেই বিপন্ন হইবে না। এইখানে অর্থনীতিশাস্ত্রের খ্যাতনাম্নী অধ্যাপিকা জোন রবিন্‌সনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে—যেখানে আর্থিক মান দ্রুত উন্নয়ন প্রয়োজন—"deficit financing" সেখানে বিশেষ কার্যকরী। যেমন দ্রুত রোগ নিরাময়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ ঔষধ সেবন প্রয়োজন, সেইরূপ অনুন্নত দেশের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য ঘাট্‌তি বাজেটের বিশল্যকরণী প্রয়োগও অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন যে, ঘাট্‌তি পূরণ রীতি অনুসারে যে অতিরিক্ত অর্থ বাজারে চালু থাকিবে তাহার ফলে যদি মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তাহা হইলে যাহাতে অধিক পরিমাণে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতে পারে সেইদিকে মনোনিবেশ করিলেই অবস্থা আয়ত্তে আসিবে। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই মুদ্রাস্ফীতির আতংক হ্রাস পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, ইতি-মধ্যেই কৃষিজাত দ্রব্যের দর অনেক পড়িয়া গিয়াছে, যদিও সরকারী ব্যয়ের অংক অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতেই অনুমিত হয় যে, ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রের কোনও বিশেষ স্থানে সরকারের অধিক ব্যয়ের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তাহা সম্যক্ প্রতি-ফলিত হয় নাই। কাজেই সরকারী ব্যয়াধিক্যের অন্তরালে মন্দার যে লক্ষণ-গুলি ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা প্রশমিত না হইলে দেশের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না। এইদিক লক্ষ্য করিয়াই সরকার প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ব্যয়ের অংক ২০৬৯ কোটি টাকা হইতে ২২৪৪ কোটি টাকায় বর্ধিত করিয়াছেন। জোন রবিন্‌সন আরও বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত অর্থসংস্থানের জন্য এবং যাহাতে অর্থব্যয়ের ফল অচিরেই পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে বিলাস দ্রব্য-সামগ্রীর বাহির হইতে আমদানি। এমন কি, স্বদেশে ঐসব জিনিসের উৎপাদন কিছুকাল স্থগিত রাখা উচিত। যাহাতে রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্পগুলি অদূর ভবিষ্যতে লাভ দেখাইতে পারে এবং লাভের অংক ঐসব শিল্পের অধিকতর সম্প্রসারণের জন্য নিয়োজিত হইতে পারে সেই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

সে যাহাই হউক, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয় চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনার খস্‌ড়াতে ও ১৮০০ কোটি টাকার 'deficit financing' সম্বন্ধে সুপারিশ করা হইয়াছে। ভারতের প্রধান সমস্যা আর্থিক মান দ্রুত উন্নতি করা। আমাদের দেশে জীবন-মান বর্ধিত করার সব উপকরণই হাতের কাছে আছে। কিন্তু ঐসব উপকরণ কাজে লাগাইয়া ফল সৃষ্টি করা স্বভাবতই সময়সাপেক্ষ। এদিকে নিরন্ন বুভুক্ষু জনগণ ধৈর্য মানিতে অক্ষম। কাজেই তাহাদের অভাব অনটন প্রভৃতি যত অল্প সময়ে দূর করা যায় সেই পুণ্য কাজেই পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ কলিন ক্লার্কের মতে ভারতের বর্ধিত জনশক্তি প্রতিপালনের জন্য জাতীয় আয়ের আনু-মানিক শতকরা ১২·৫ ভাগ সঞ্চিত অর্থ প্রয়োজন। এই অর্থ সঞ্চয় করিতে বহু যুগ লাগিবে। কিন্তু আমাদের সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা নাই —'সবুরে মেওয়া ফলে' এই নীতি অবলম্বন করিলে আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকখানি পিছাইয়া পড়িব। কাজেই উপযুক্ত অর্থসংস্থানের জন্য 'deficit financing'-এর আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমাদের শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। অর্থনীতিশাস্ত্রের ধন্বন্তরি-গণ অন্তত এই আশ্বাস আমাদের দিয়াছেন এবং আমরা ঐ আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি।

১৮
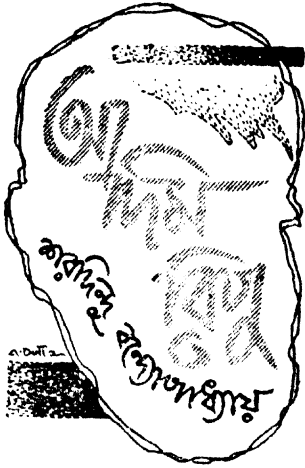
নির্জনে নীরবে বসিয়া আদা-গন্ধী চা সেবন করিলাম। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—'ননীবালা দেবী যখন প্রথম আমার কাছে এলেন তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমি উল্টো দিক থেকে দেখলাম। প্রভাতবাবুর জীবনের কোনও আশঙ্কা আছে কিনা এইটেই হল প্রশ্ন। ননীবালা যা বললেন তা থেকে ভয়ের কারণ আমি কিছু দেখতে পেলাম না। তবু বলা যায় না। দিনকাল খারাপ, নরহত্যা সম্বন্ধে মানুষের মন থেকে অনেক দ্বিধাসঙ্কোচ সরে গেছে; একটা আদিম বর্বরতার মনোভাব আমাদের চেপে ধরেছে। আমি তদারক করতে বেরুলাম।

'প্রভাতবাবুকে দেখলাম; নিমাই নিতাই, অনাদি হালদার, নৃপেন, কেষ্টদাস, সকলকেই দেখলাম। ননীবালা আবার এলেন, তাঁকে বললাম—প্রভাতবাবুকে মেরে কারুর কোনও লাভ নেই, বরং অনাদি হালদারকে মেরে লাভ আছে। তারপর কালীপুজোর রাত্রে সত্যিই অনাদি হালদার খুন হল।

'শেষ রাত্রে কেষ্টদাস এসে আমাকে নিয়ে গেল। সকলের বিশ্বাস কেষ্টদাসই খুন করেছে। আমি গিয়ে সব দেখেশুনে বুঝলাম, এ রাগের মাথায় খুন নয়, প্ল্যান করে খুন। কেষ্টদাস যদি খুন করত তাহলে খুন করবার আগেই অনাদি হালদারের সঙ্গে ঝগড়া করত না। তাছাড়া, যত ঝগড়াই হোক, যে-হংস স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসব করে তাকে খুন করবে এমন আহাম্মক কেষ্টদাস নয়।

'তবে একটা কথা আছে। কেষ্টদাস যদি অনাদি হালদারকে খুন করে একসঙ্গে মোটা টাকা হাতাতে পারে তাহলে সে খুন করবে। কিন্তু এ যুক্তি বাড়ির অন্য লোক-গুলির সম্বন্ধেও খাটে। এ যুক্তি মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে, অনাদি হালদারের বাড়িতে অনেক নগদ টাকা ছিল।

'অনাদি হালদার বাড়িতে মোটা টাকা রাখলে স্টীলের আলমারিতেই রাখত। আলমারির চাবি সর্বদা তার কোমরে থাকত। আমি যখন আলমারি খুললাম তখন তাতে মাত্র শ' দেড়েক টাকা পাওয়া গেল। তবে কি এই সামান্য টাকা রাখবার জন্যে অনাদি হালদার স্টীলের আলমারি কিনেছিল?

'আলমারিতে টাকা পাওয়া গেল না বটে কিন্তু দেখা গেল বইয়ের থাক্ থেকে কয়েকটা বই অদৃশ্য হয়েছে। বাকি বই-গুলো রামায়ণ মহাভারত জাতীয়। প্রশ্নঃ স্টীলের আলমারিতে এই জাতীয় নিতান্ত সাধারণ বই রাখার মানে কি?

'আলমারিতে ব্যাঙ্কের চেক-বই ছিল, তা থেকে জানা গেল যে ব্যাঙ্ক থেকে যে-পরিমাণ টাকা বার করা হয়েছে তার চেয়ে বেশী টাকা অনাদি হালদার তার নতুন বাড়ির কণ্ট্রাক্টর গুরুদত্ত সিংকে দিয়েছে। বাকি টাকা এল কোথা থেকে? অনাদি হালদার নিশ্চয় কালো টাকা রোজগার করেছিল এবং তা আলমারিতে রেখেছিল। বর্তমানে টাকা যখন আল-মারিতে নেই তখন হত্যাকারীই তা সরিয়েছে।

'হত্যার মোটিভ্ পাওয়া গেল। কিন্তু হত্যাকারী লোকটা কে? এবং কেমন করে সে বাড়িতে ঢুকল? মৃত্যুর সময় অনাদি হালদার বাড়িতে একলা ছিল এবং বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

'অনাদি হালদার গুলি খেয়েছিল সদরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা থেকে তাকে সহজেই গুলি করে মারা যায় কিন্তু তার আল-মারির থেকে টাকা সরানো যায় না। সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেল থেকে মেরে কোনও লাভ নেই।

'নিমাই নিতাই যখন উকিল নিয়ে হাজির হল এবং দাবী করল যে তারাই অনাদি হালদারের ওয়ারিশ, প্রভাতবাবু আইনত পুষ্যিপুত্তুর নয়, তখন আর একটা মোটিভ পাওয়া গেল। অনাদি হালদার পাকাপাকি পুষ্যি নেবার আগে যদি তাকে সরানো যায় তাহলে সব সম্পত্তি ভাইপোদের অর্শাবে। অনাদি হালদার নিশ্চয় উইল করেনি। এ দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত লোকেরা উইল করে না।

'নিমাই নিতাইয়ের পক্ষে খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। এখন দেখা যাক তাদের কার্য-কলাপ। হত্যার দুমাস আগে তারা শ্রীকান্ত হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছিল এবং নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করত। হোটেলের চাকরদের সঙ্গে তাদের মুখ চেনাচেনি হয়েছিল। যারা খুড়োকে খুন করতে উদ্যত হয়েছে তাদের পক্ষে এতটা খোলাখুলিভাব কি স্বাভাবিক? আগেই বলেছি, এ প্ল্যান করে খুন; খুনী ঠিক করেছিল কালীপুজোর রাত্রে খুন করবে বাজি পোড়ানোর শব্দে যাতে বন্দুকের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। তাই যদি হয় তবে ছ'মাস আগে থেকে ঘর ভাড়া নেবার অর্থ কি? তাছাড়া কালীপুজোর রাত্রে খুড়ো যে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াবে তার নিশ্চয়তা কি? এ রকম অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে কেউ প্ল্যান করে না।
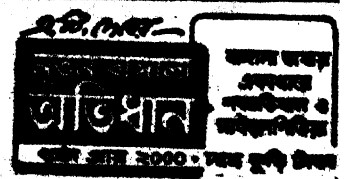
আবার গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে গিয়েছিল, অথচ সেটা ব্যাল্‌কনিতে পাওয়া গেল না। এও ভাববার কথা।

'সুতরাং শ্রীকান্ত হোটেলের জানলা থেকে নিমাই নিতাই খুড়োকে মেরেছিল এ প্রস্তাব টেঁকসই নয়। যেই মারুক বাড়ির ভেতর থেকে মেরেছে। দেখা যাক বাড়ির ভেতর থেকে মারা সম্ভব কিনা।

'সদর দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু বাড়ির পিছন দিকে ছাদে যাবার দরজাটা খোলা থাকত, অনাদি হালদার রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে সেটা বন্ধ করত। তাছাড়া দরজার ছিট্‌কিনি খুব শক্ত ছিল না, দু'চারবার দরজায় নাড়া দিলে ছিট্‌কিনি খুলে পড়ত। মনে করা যাক সেদিন রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় একজন চুপিচুপি এসে অনাদি হালদারের নতুন বাড়িতে ঢুকল। নতুন বাড়ির এক-তলার ছাদ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, চারি-দিকে ভারা বাঁধা। হত্যাকারী ছাতে উঠল; দুই বাড়ির মাঝখানে সরু গলি আছে, হত্যাকারী ভারা থেকে একটা লম্বা তক্তা নিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানে পুল বাঁধল, তারপর সেই পুল দিয়ে পুরোনো বাড়িতে পেরিয়ে এল। ছাদের দরজা খোলা থাকবার কথা, কারণ অনাদি হালদার তখনও শুতে যায় নি।

'দেখা যাচ্ছে, একজন চট্‌পটে লোকের পক্ষে বাড়িতে ঢোকা খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কে সেই চট্‌পটে লোকটি? নিমাই নিতাই নয়, কারণ আলমারিতে অনেক কালো টাকা আছে একথা তাদের জানবার কথা নয়; একথা কেবল বাড়ির লোকই জানতে পারে কিম্বা আন্দাজ করতে পারে।

'বাড়িতে চার জন লোক আছে—ননীবালা, কেষ্টদাস, নৃপেন আর প্রভাতবাবু। এদের মধ্যেই কেউ অনাদি হালদারকে খুন করেছে। যদি বল, নিমাই নিতাই বাড়িতে ঢুকে খুন করেছে এবং আলমারির থেকে মাল নিয়ে সট্‌কেছে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—তারা সাত-সকালে এসে বাড়ি দখল করতে চেয়েছিল কেন? চুপ করে বসে থাকাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যথাসময়ে আদালতের মারফত দখল তারা পেতই। তারা খুন করেনি বলেই তাড়াতাড়ি এসে বাসার দখল নিতে চেয়েছিল, যাতে আল-মারির জিনিসপত্র এরা সরিয়ে ফেলতে না পারে।

'যাহোক, রইল বাড়ির চার জন। এরা সকলেই অবশ্য বাইরে ছিল, কিন্তু কারুর পাকা অ্যালিবাই নেই। ননীবালা দেবীকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ তিনি মোটা মানুষ, তাঁকে চট্‌পটেও বলা চলে না। তক্তার ওপর দিয়ে গলি পার হওয়া তাঁর সাধ্য নয়।

'বাকি রইল কেষ্টদাস প্রভাতবাবু আর নৃপেন। গোড়ার দিকে নৃপেনের ওপরেই সবচেয়ে বেশী সন্দেহ হয়, তার চালচলন খুবই সন্দেহজনক। আলমারিতে যে অনেক টাকা আছে এটা তার পক্ষে জানা সবচেয়ে বেশী সম্ভব, কারণ সে অনাদি হালদারের সেক্রেটারী, টাকাকড়ির হিসেব রাখে। কিন্তু যখন জানতে পারলাম সে আলমারির চাবি তৈরি করে-ছিল তখন তাকেও বাদ দিতে হল। অনাদি হালদারকে খুন করবার মতলব যদি তার থাকত তবে সে চাবি তৈরি করতে যাবে কেন? অনাদি হালদারের কোমরেই তো চাবি রয়েছে।

'ভেবে দেখ। নৃপেনের স্বভাবটা ছিঁচ্‌কে চোরের মত। সে চাবি তৈরি করেছিল, মতলব ছিল অনাদি হালদার যখন বাড়ি থাকবে না তখন আলমারি খুলে দু' চার টাকা সরাবে। কিন্তু সরাবার সুযোগ বোধহয় তার হয়নি। চাবিটা তার টেবিলের দেরাজে রেখেছিল। সে-রাত্রে সিনেমা থেকে ফিরে এসে যখন দেখল অনাদি হালদার খুন হয়েছে তখন সে চাবির কথা সাফ্‌ ভুলে গেল। তারপর আমি অনাদি হালদারের কোমর থেকে চাবি নিয়ে সবাইকে দেখালাম, তখন নৃপেনের মনে পড়ে গেল। সর্বনাশ! পুলিস এসে যদি তার দেরাজে চাবি পায় তাহলে তাকেই খুনী বলে ধরবে। সে কোনও মতে চাবিটাকে বিদেয় করবার চেষ্টা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এক ফাঁকে চাবিটা জানলা দিয়ে গলিতে ফেলে দিলে।

'চাবিটা আমি সকালবেলা গলিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম নৃপেন খুন করেনি। তারপর আমার বন্ধু রমেশ মল্লিকের চিঠি পেয়ে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নৃপেন ছিঁচ্‌কে চোর, মানুষ খুন করবার সাহস তার নেই।

'বাকি রইল কেষ্টদাস আর প্রভাতবাবু।

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা কেষ্টদাস এখানে এল। রাত্রে তাকে মদ খাইয়ে অনাদি হালদারের পুরোনো ইতিহাস জেনে নিলাম। কেষ্টদাসও সেদিন আমার কাছে একটা কথা জানতে পেরেছিল। আমি তাকে কথায় কথায় বলেছিলাম যে, প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন। কথাটা সে আগে জানত না।

'যা হোক, তারপর কয়েকদিন কেটে গেল। দেখলাম নৃপেন আর কেষ্টদাস

পুরোনো বাসাতেই রয়েছে। তারা যদি টাকা মেরে থাকে তাহলে পুরোনো বাসা কামড়ে পড়ে আছে কেন? তাদের চলে যাবার যথেষ্ট ওজুহাত রয়েছে, অনাদি হালদার মরে যাবার পর ওদের ওবাড়িতে থাকার আর কোনও ছুতো নেই। টাকাগুলোই বা রাখল কোথায়? ব্যাংকে নিশ্চয় রাখবে না, অন্য কোনও লোকের হাতেও দেবে না। তবে?

'কলকাতায় ওদের অন্য কোনও আস্তানা নেই যেখানে টাকা লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু প্রভাতবাবুর একটা আস্তানা আছে—দোকান। তিনি যদি খুন করে টাকা সরিয়ে থাকেন তাহলে টাকা লুকিয়ে রাখার কোনও অসুবিধা নেই।

দোকান—বইয়ের দোকান। বিদ্যুৎ চমকের মত সমস্ত ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠল—প্রভাতবাবু পাটনায় হিসেবের খাতা বাঁধেন নি, বেঁধেছিলেন একশো টাকার নোট—অনাদি হালদার তাঁর বাঁধানো বইগুলোকে রামায়ণ মহাভারতের সংগে মিশিয়ে আলমারিতে রেখেছিল—প্রভাতবাবু অনাদি হালদারকে মারবার পর তার কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি থেকে নোটের বইগুলো বার করে নিজের দোকানে এনেছিলেন—দোকানের হাজারখানা বইয়ের মধ্যে নোটের বইগুলো প্রকাশ্যে সাজানো আছে—বাইরে থেকে বই দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না—

'আগাগোড়া প্ল্যানটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'কিন্তু—

'প্রভাতবাবু টাকার লোভে এমন কাজ করবেন? প্রভাতবাবুর চরিত্র যতখানি বুঝেছিলাম তাতে তাঁকে অর্থলোভী বলে মনে হয়নি। উপরন্তু অনাদি হালদারের মৃত্যুতে প্রভাতবাবুর ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী; সে বেঁচে থাকলে তাঁকে পুষ্যিপুত্তুর নেবে, সমস্ত সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা। নগদ টাকার লোভে সেই সম্ভাবনা তিনি নষ্ট করবেন?

'তবে কি, টাকাটা গৌণ, তার চেয়ে বড় কারণ কিছু ছিল? অনাদি হালদার শিউলীর সংগে প্রভাতবাবুর বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল; কিন্তু সেটা কি এতবড় অপরাধ যে তাকে খুন করতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেরিতে পেয়েছিলাম। দয়ালহরি মজুমদারের বাসা থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ আসল কথাটা মাথায় খেলে গিয়েছিল।

'অনাদি হালদার এমন কাজ করেছিল যাতে নিতান্ত নিরীহ লোকেরও মাথায় খুন চেপে যায়। সে দয়ালহরিকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে নিজে শিউলীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। প্রভাতবাবুর রক্তে আগুন ধরে গেল। আগুন ধরা বিচিত্র নয়, আগুনের ফুলকি তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল।

'আবার একটা বরফের মত ঠাণ্ডা কূটবুদ্ধি তাঁর ছিল, সেটাও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তিনি অনাদি হালদারকে ধনেপ্রাণে মারবার প্ল্যান ঠিক করলেন। বাঁটুল সর্দারকে তিনি আগে থাকতেই চিনতেন, রাইফেল ভাড়া করা কঠিন হল না। কালীপুজোর রাত্রে বুড়ো পাঁঠাকে বলি দেবার ব্যবস্থা হল।

'সে-রাত্রে প্রভাতবাবু ননীবালা দেবীকে সিনেমায় পৌঁছে দিয়ে দোকানে গেলেন। দোকান আলো দিয়ে সাজিয়ে সাড়ে দশটার সময় আবার বেরুলেন, এবার একটা কাপড়ের থলি পকেটে নিলেন। দোকান খোলাই রইল, গুর্খা দারোয়ান দরজায় পাহারায় রইল।

বাসার কাছে এসে প্রভাতবাবু দেখলেন বাসার সামনে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। কেউ তাঁকে লক্ষ্য করল না, তিনি নতুন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নতুন বাড়ির মধ্যে বাঁটুল সর্দার রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাঁটুল অনাদি হাল-

দারের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সুতরাং তার এ ব্যাপারে উৎসাহ বেশী থাকাই স্বাভাবিক।

'ছাতের ওপর তক্তা ফেলে প্রভাতবাবু বাসায় ঢুকলেন। ছাতের দরজা সম্ভবত খোলাই ছিল; না থাকলেও ক্ষতি নেই, তিনি দু'চারবার দরজায় নাড়া দিয়ে ছিট্‌কিনি খুলে ফেললেন। ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়িয়ে অনাদি হালদার বাজি পোড়ানো দেখছিল, পিছন দিকে শব্দ শুনে সে ফিরে দাঁড়ালো। প্রভাতবাবু সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন। গুলিটা অনাদি হালদারের শরীর ভেদ করে রাস্তার ওপারে শ্রীকান্ত

হোটেলের জানলা দিয়ে ঢুকে দেয়ালে আট্‌কালো। হাই ভেলসিটি মিলিটারি রাইফেল, তার গুলি যদি নিমাই কিম্বা নিতাইকে সামনে পেতো তাকেও ফুটো করে যেত।

'তারপর প্রভাতবাবু মৃতের কোমর থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন। নোটের বইগুলো থলিতে পুরে, চাবি আবার যথাস্থানে রেখে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে গেলেন। বাঁটুল অপেক্ষা করছিল, রাইফেল নিয়ে অদৃশ্য হল। প্রভাতবাবু দোকানে ফিরে গিয়ে বইগুলো উঁচু একটা থাকে সাজিয়ে রেখে দিলেন। তারপর যথাসময়ে সিনেমায় গিয়ে মা'কে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরলেন।

'গুর্খা দরোয়ানটা জানত যে প্রভাতবাবু সে-রাত্রে সারাক্ষণ দোকানে ছিলো না। আমি যখন গুর্খার খোঁজ নিলাম তখন সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে।

'সেদিন আমি আর অজিত প্রভাতবাবুর দোকানে যাচ্ছিলাম, দেখলাম বাঁটুল আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। সে প্রভাতবাবুর দোকানে ঢুকতে গিয়ে পিছনে আমাদের দেখে দোকানে ঢুকল না, সোজা চলে গেল। আমরা দোকানে গিয়ে দেখলাম প্রভাতবাবুর জ্বর হয়েছে, তাড়সের জ্বর। তাঁকে নিয়ে আমার জানা এক ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার প্রভাতবাবুকে পরীক্ষা করলেন এবং পরীক্ষার ফল আমাকে আড়ালে জানালেন। তখন আর সন্দেহ রইল না।

'প্রভাতবাবু যে অনাদি হালদারকে খুন করেছেন একথা আমার আগে আর একজন বুঝতে পেরেছিল—সে কেষ্টদাস। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, কেষ্টদাস জানত যে অনাদি হালদারের আলমারিতে কালো টাকা আছে; তাই সে যখন আমার মুখে শুনল যে প্রভাতবাবু দপ্তরীর কাজ জানেন তখন চট্‌ করে সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। সে প্রভাতবাবুকে শোষণ করতে আরম্ভ করল। অজিত, তোমার মনে আছে কি, একদিন ক্রমাগত একশো টাকার নোট দেখে দেখে আমাদের চোখ ঠিকরে গিয়েছিল? এমন কি রাত্রে হোটেলে খেতে গিয়েও নিস্তার ছিল না,

সেখানে কেষ্টদাস একশো টাকার নোট বার করল। সেই নোটগুলির বেশীর ভাগই এসেছিল অনাদি হালদারের বাঁধানো নোটের বই থেকে।

'যাহোক, পাটনা যাবার আগে অনাদি হালদার ঘটিত ব্যাপার মন থেকে একরকম মুছে ফেলেই চলে গেলাম। কেবল বিকাশ দত্তকে বলে গেলাম দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে

'তারপর পাটনা থেকে ফিরে এসে দেখি—এক নতুন পরিস্থিতি। কেষ্টদাস খুন হয়েছে। কেষ্টদাস প্রভাতবাবুকে দোহন করছিল, তাই বিশ্বাস হল তিনিই তাকে খুন করেছেন। তখন আবার আসামীকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু শুধু অপরাধীকে ধরলেই চলবে না, টাকাগুলোও উদ্ধার করা চাই।

'টাকাগুলো সহজে উদ্ধার করবার জন্যে একটু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল, নৈলে সারা দোকান হাতড়ে নোটের বই-গুলো বার করা কষ্টকর হত। হয়তো প্রভাতবাবু তল্লাসী করতে দিতেন না, পুলিস ডাকতে হত; আমার হাত থেকে সব বেরিয়ে যেত। তাই প্রভাতবাবু যখন দোকান বিক্রি করার কথা বললেন তখন ভারি সুবিধে হয়ে গেল। আমি বললাম, আমরা দোকান কিনব। সঙ্গে সঙ্গে বিকাশকে পাঠালাম নজর রাখবার জন্যে প্রভাতবাবু দোকান থেকে কোনও জিনিস সরান কিনা।

'দোকান কেনার ব্যবস্থা পাকা হল, স্বাধীনতা দিবসের সকালে দখল দিতে হবে। জানতাম দখল দেবার আগে কোনও সময় বইগুলো প্রভাতবাবু সরাবেন। বিকাশ খবর দিলে, দিনের বেলা তিনি কিছু সরান নি। রাত্রে আমরা দোকানে ঢুকে প্রতীক্ষা করে রইলাম। ন্যাপা চাবি তৈরি করে দিয়েছিল—'

হঠাৎ বাহির হইতে বিপুল শব্দ-তরঙ্গ আমাদের কর্ণপটাহে আঘাত করিল—রেডিও যন্ত্রের ঘুম ভাঙার আওয়াজ। আমরা চমকিয়া জানালার দিকে তাকাইলাম। বাহিরে দিনের আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]
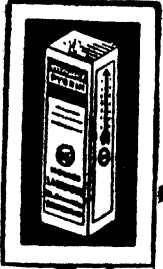
ডাক্তারের ডায়েরী
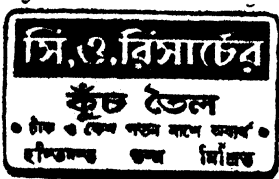
—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

(৪)

তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি, যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। পাকিস্থানের জন্ম হয়নি শুধু জল্পনা কল্পনা আর তাই নিয়ে কাগজে কাগজে কথার লড়াই চলছে। দেশ থেকে আমার একটি আত্মীয় একটি রুগী পাঠালেন।

মফস্বলের রুগী কলকাতায় আসে বড় ডাক্তার দেখাতে। চিকিৎসাটা কি হল সেটা গৌণ, নামকরা কোন বড় ডাক্তার দেখানো হল, কে কি বল্লেন সেইটেই মুখ্য। বড় বড় ডাক্তার দেখাও ঘটা করে চিকিৎসা কর। ফিরে গিয়ে যেন বলতে পারি—অমুক অমুক ডাক্তার দেখিয়েছি, এত এত পরীক্ষা হয়েছে, এত টাকা খরচ হয়েছে। এ রকম দুটি একটি রুগী হাতে থাকলে মনটা বেশ হাল্কা থাকে। কাজ করে সুখ পাওয়া পাওয়া যায়। টাকার কথা ভাবতে হয় না। পকেটে বেশ দু' পয়সা আসে।

এই রুগীটি দেখে কিন্তু চক্ষু চড়কগাছে উঠে গেল। ছ' মাসের একটা বাচ্চা, প্রায় মাসখানেক হল জ্বর হচ্ছে, একটা চোখ ফুলেছে। ফোলা নয় যেন চোখের গর্ত থেকে চক্ষু পিণ্ডটা ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। শুধুই কি চোখ? পিঠে কাঁধের নীচে দুদিক এবং দু' হাঁটুর নীচে পায়ের পেছনে দুদিক ফুলে ঢিবি হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা করে মনে হল সব কটার ভিতরেই পুঁজ হয়েছে। জ্বর ১০৫ ডিগ্রী।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে এতটা বাড়লো।

ছেলের বাবা বললেন—মাস দেড়েক আগে মাথায় ঘা হয়ে শুকিয়ে যাবার মুখে ছেলেটা একদিন বিছানা থেকে পড়ে চোখে ব্যথা পায়। তার পরই মাথার ঘা শুকিয়ে গেল কিন্তু চোখটি ফুলে উঠলো।

বল্লাম—তখন ওষুধপত্র কিছু দেননি?

ভদ্রলোক বল্লেন—গাঁয়ে থাকি ধারে কাছে ভাল ডাক্তার নেই তাই নিজেই—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখেছি, বাড়িতে বসে বই পড়ে, আর বিনা পয়সায় অষুধ বিলিয়ে। প্রথম দিন থেকেই বই দেখে লক্ষণ মিলিয়ে অষুধ দিয়েছি। পরে জ্বরটা ক্রমশ বাড়ছে দেখে দু' মাইল দূর থেকে এলোপ্যাথী ডাক্তার নিয়ে এলাম। তিনি সিবাজল দিলেন। চোখে বরিক্ কম্প্রেস্ করতে বল্লেন।

বললাম—কটা সিবাজল পড়েছে?

ভদ্রলোক বল্লেন—আধখানা করে ছ' দিনে তিনটে। তাতে জ্বরটা কিছু কমেছিল কিন্তু ফোলাটা কমেনি। তার-পর ডাক্তারবাবু কি একটা টনিক দিলেন আর কম্প্রেস বন্ধ করে এণ্টি-ফ্লোজেস্টিন লাগাতে বল্লেন। তাই চল্লো কিছুদিন। জ্বরটা আবার বেড়ে গেল। তখন বল্লেন পেনিসিলিন দিতে হবে।

বল্লাম—কত লাখ পেনিসিলিন পড়েছে?

ভদ্রলোক বল্লেন—অতটুকু বাচ্চাকে তিন ঘণ্টা পর পর ফোড়া হবে ভেবে প্রথমটায় আমরা রাজী হলাম না। কয়েক-দিন বায়োকেমিক করে দেখলাম। কিন্তু জ্বরটা কমে আবার ১০৩° ডিগ্রী উঠে গেল দেখে পেনিসিলিন দেওয়াই ঠিক হল। দুদিনে এক লাখ পেনিসিলিন দেওয়া হল; কিন্তু জ্বরটা ১০০ ডিগ্রীর নীচে নাবলো না। চোখের ফোলা যেমন ছিল তেমনি রইল। হঠাৎ একদিন গালটাও ফুলে উঠলো। ডাক্তারবাবু বললেন, চোখের ভিতর থেকে পুঁজটা বোধ হয় গাল দিয়ে বেরুচ্ছে, কেটে দিলেই বেরিয়ে যাবে। জানেন তো কাটা কুটিতে আমাদের কত ভয়, তবু রাজী হলাম। ডাক্তারবাবু গালে অপারেশন করলেন কিন্তু পুঁজ বেরুলো না। দেখে আমরা ঘাবড়ে গেলাম। পরদিন জ্বর ১০৫ ডিগ্রী উঠে গেল, পিঠে আর পায়ে চার জায়গা ফুলে উঠ্‌লো। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এলাম। এখন আপনিই একমাত্র ভরসা।

শেষ অবস্থায় রুগী দেখাতে নিয়ে এলে কোনো ডাক্তারেরই মেজাজ ঠিক থাকে না। ডাঃ তলাপাত্র হলে স্পষ্টই বলে দিতেন—এত দেরি করে আমার কাছে এসেছ কেন? এখন শকুন ডেকে নিয়ে যাও।

কিন্তু সত্যি কি শেষ অবস্থা? অমন ফুট্‌ফুটে বাচ্চাটা বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে? একটা চোখের দৃষ্টি যদিও বা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে প্রাণটা যাবে কেন? এখুনি সব কটা জায়গায় অপারেশন করে পুঁজ বার করে বেশী করে পেনিসিলিন দিলে কেন বাঁচবে না?

ছেলের বাবাকে বুঝিয়ে বল্লাম—রোগটা হল 'অরবিটাল সেলুলাইটিস', অর্থাৎ চোখের গর্তের ভেতরে পুঁজ হয়েছে। সেই পুঁজ বাইরে বেরুবার চেষ্টা করে চোখটাকে ঠেলে বার করে দিচ্ছে। পুঁজটা বেরুতে না পেরে অবশেষে রক্তের সঙ্গে মিশে পাইমিক অ্যাবসেস্ হয়ে এক এক জায়গায় ফুটে বেরুচ্ছে। এক্ষুণি সব জায়গা থেকে পুঁজ বার করে দেওয়া দরকার। একটা চোখের দৃষ্টি হয়ত গেছে কিন্তু প্রাণটাতো রক্ষা পাবে।

শুনে ভদ্রলোক আমার দু' হাত জড়িয়ে ধরে বললেন—আপনার ভরসাতেই

এত দূরে থেকে এসেছি। সব চেয়ে বড় সার্জন দেখিয়ে যা ভাল হয় তাই করুন!

সব চেয়ে বড় সার্জন কে? যাঁর সব চেয়ে বেশী নাম? একবার যাঁর নাম হয়েছে প্রয়োজনের সময় তাঁকে পাওয়া সব চেয়ে বেশী কঠিন। এত বেশী লোক তাঁর কাছে যায় যে, রুগীর প্রতি নূন্যতম কর্তব্যটুকুও সব সময়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। লোকে ভুলে যায় চিকিৎসক একজন মানুষ মাত্র, তাঁরও ক্ষমতার একটা সীমা আছে। দেশ বিদেশ থেকে যত লোক একই সংগে তাঁর কাছে আসে, দেখে মনে হয় এ'রা যেন সব তীর্থযাত্রী; দেবদর্শনে এসেছে। বড় ডাক্তার একবার দেখলেই বুঝি এদের রোগ সেরে যাবে।

তখন বেলা বারোটা, কোন সার্জনকেই টেলিফোনে পাওয়া যাবে না; এটা হাসপাতালে থাকবার সময়। হাসপাতালের পর যদি সংগে করে নিয়ে যেতে পারি এই ভেবে হাসপাতালে এলাম। এসে দেখি প্রথম সার্জন অপারেশান করছেন। ঘণ্টাখানেক বাইরে ঘোরাঘুরির পর তিনি বেরুলেন। আমাকে চিনতেন, দেখেই বললেন—কি হে, কি খবর?

নিবেদন করলাম—দেশ থেকে একটি রুগী এসেছে, অরবিটাল সেলুলাইটিস থেকে পাইমিক্ অ্যাব্সেস্, জ্বর ১০৫°।

A. 41

বাড়ি ফেরবার পথে যদি দয়া করে একবার দেখে যান।

সার্জন বল্‌লেন—আজকে তো ভাই হয় না, তিন দিন পর্যন্ত আমি বুক্‌ড্‌। বিকেলে চেম্বারে নিয়ে এস দেখে দেব এখন।

মফস্বলের রুগী একবার বুঝিয়েছি সার্জনকে বাড়ি নিয়ে আসব; এখন না পারলে আমার প্রেস্‌টিজ থাকবে না। ভাববে আমি কিছুই পারি না। তাই দ্বিতীয় সার্জনের খোঁজে বেরুলাম। সারা হাসপাতাল খুঁজে তাঁকে পাওয়া গেল না। শুনলাম এই এক্ষুণি তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

বিকেলে চারটের সময় তাঁকে ফোন করে ঠিক হল সাড়ে ছ'টার সময় তিনি রুগী দেখতে আসবেন। ছ'টার সময় রুগীর বাড়িতে গিয়ে এ খবর দিয়ে বললাম কালই অপারেশন করিয়ে দেব।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় ইনি এলেন। বেশ খুশ্‌ মেজাজে গাড়ি থেকে নেমে হাসি গল্প করতে করতে ভেতরে ঢুকে রুগী দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বল্‌লেন—তাইত, চোখটা এরকম হল কি করে?

সব শুনে বল্‌লেন—পিঠের এবং পায়ের যে ক'জায়গায় এ্যাব্‌সেস্‌ হয়েছে কালকেই তা কেটে দি. বেশী করে পেনিসিলিন দেওয়া হোক, চোখটা পরে দেখা যাবে।

বল্‌লাম—চোখটা থেকেই যখন শুরু ওটা ফেলে রাখা কি ভালো হবে? একবার যখন পাইমিক্‌ এ্যাব্‌সেস্‌ আরম্ভ হয়েছে আরও তো হবে। তার চেয়ে এক-সঙ্গেই সব করে দিন না? হাঙ্গামা চুকে যাক্‌।

শুনে সার্জন আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখখানা কালো করে বললেন—চোখটায় হাত দেওয়া এখন ঠিক হবে না। এগুলো আগে হোক্‌ জ্বরটা কমুক, তখন দেখা যাবে।

বুঝলাম চোখে ইনি হাত দিতে চান না। কিন্তু কেন? যত কঠিন কঠিন অপারেশন ইনি করেছেন তাতে এতো একটা অপারেশনই নয়। শুধুই ফোড়া কাটা। তবু কেন এত আপত্তি? বিনা পয়সার কেস্‌ও নয়। তবে? চোখ বলেই কি এই দ্বিধা? এটা কি তাহলে চোখের সার্জনের কাজ?

বল্‌লাম—যদি দরকার মনে করেন তাহলে চোখের সার্জেনও কাউকে দেখাই। আপনারা দু'জনে একসঙ্গে সব কটা অপারেশন একদিনেই করে দিন।

তবু ইনি রাজী হলেন না। মুখখানা আরও কালি করে বল্‌লেন—আমার মতে চোখটা এখন ডিস্‌টারব্‌ করা ঠিক হবে না।

ইনি বাম-পন্থী সার্জন, আমাদেরই সমবয়সী। এ'র কাছ থেকে এরকম কথা কখনও আশা করিনি। ডাঃ তলাপাত্রের কথা মনে পড়ল। তলাপাত্র বলতেন—ফ্র্যাক্‌চার ভাই আমি কখনও সেট করি না। ঠিক মত যদি জোড়া না লাগে হাত বেঁকে যাবে কি পা খোঁড়া হয়ে থাকবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে দীর্ঘকাল বেঁচে বলে বেড়াবে আমি ওর পা খোঁড়া করে দিয়েছি। সুনাম বজায় রাখতে হলে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়, বুঝলে?

ইনিও কি ভাবলেন ছেলেটা কানা হয়ে বেঁচে থেকে এ'র বদনাম করে বেড়াবে? যাই হোক, বোঝা গেল এ'কে দিয়ে হবে না। ইনি বিদায় হলে ছেলের বাবাকে বল্‌লাম—চোখটাই আসল, তাই ইনি ছোঁবেন না। বাকি ফোঁড়াগুলো তো আমিই কেটে দিতে পারি। তার চেয়ে চলুন প্রথম যাঁর কাছে গিয়েছিলাম। দেখাতে হলে সব চেয়ে যিনি বড় তাঁকে দেখানোই ভাল।

মিছিমিছি একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। ভেবেছিলাম কালই অপারেশন করিয়ে দেব, তা আর হল না। প্রথম সার্জন বাড়ি এসে দেখে যেতে পারবেন না। অগত্যা পরদিন রুগী নিয়ে ও'র চেম্বারে গেলাম।

তখনও চারটে বাজেনি কিন্তু ঘর ভর্তি লোক। সবাই অবশ্য রুগী নয়। একজন যদি রুগী সঙ্গী তার তিন জন। শহরের লোক, গ্রামের লোক, দূর দেশের লোক। যে আগে এসে স্লিপে নাম লিখেছে তাকে আগে ডাকা হবে। স্লিপে নাম লিখে চাকরের হাতে দিয়ে টেবিলে রাখা বহু পুরনো বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলাম। দেখতে দেখতে ভিড় আরও বাড়তে লাগল। একজন যদি বেরোয় তিনজন নূতন আসে। কারুর হাতে প্লাস্টার, কারুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কেউ পা ভাঙ্গা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকবার পর আমাদের ডাক এল। ভেতরে ঢুকতেই নার্স এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে পরীক্ষা ঘরে চলে গেল। ছেলের বাবাকে নিয়ে আমি সার্জনের ঘরে ঢুকলাম।

সার্জন একটা এক্স্-রে প্লেট দেখছিলেন। দেখা শেষ করে যে ডাক্তার দাঁড়িয়েছিল তাকে কি করতে হবে বলে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—বসো। এই বার বল তোমার কি কেস্‌

কেস্‌টা বুঝিয়ে বল্‌লাম। এর মধ্যেই দুবার ফোন এল, সার্জন ফোনে ব্যবস্থা দিতে দিতে আমার কথা শুনতে লাগলেন। শেষ হলে বল্‌লেন—চল তোমারটাই আগে দেখে আসি।

ভেতরে গিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে এ'র মুখখানাও কালো হয়ে গেল। বল্‌লেন —তাইত হে, তোমার কেস্‌ তো বিশেষ ভাল দেখছি না। চোখটা এরকম হল কি করে? একেবারে শেষ করে নিয়ে এসেছ?

মনে মনে বললাম—কেস ভাল হলে আর আপনার কাছে আসব কেন? নিজেই তো ম্যানেজ করে নিতাম। কেসটা আবার সব বুঝিয়ে বল্‌লাম।

সার্জন রবারের দস্তানা পরে রুগী পরীক্ষা করে বল্‌লেন—কালকেই পিঠের আর পায়ের অ্যাব্‌সেস্‌গুলো কেটে দি।

বল্‌লাম—চোখটা?

সার্জন বল্‌লেন—ওটা এখন থাক। এইগুলিই আগে দরকার।

বল্‌লাম—চোখ থেকেই তো অন্য জায়গা অ্যাব্‌সেস্‌ হচ্ছে। এটা ফেলে রাখা কি ঠিক হবে?

সার্জন আরও গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন —অ্যাবসেস্‌গুলো এক্ষুণি কেটে দেওয়া দরকার। দেরি হলে খারাপ হবে।

বলে চোখের কথা এড়িয়ে গিয়ে পাশের টেবিলের রুগী দেখতে চলে গেলেন।

বুঝলাম ইনিও চোখটায় হাত দিয়ে নাম খারাপ করতে রাজী নন। এ'দের এত নাম তবুও বদনামের এত ভয়? কিন্তু কিসের বদনাম? একটা চোখের দৃষ্টি হয়ত নষ্ট হয়েই গেছে, অপারেশন করে সেটা আর কি খারাপ হবে? ভেতরে যে পুঁজ আছে তা বার করে না দিলে আরও অন্য জায়গায় ফুটে বেরুবে, শেষে হয়ত মৃত্যু হবে। তবুও ইনি চোখে হাত দিতে চাইছেন না। নিজের চোখে না দেখলে একথা বিশ্বাসই করতাম না। পর পর দুজন নামকরা সার্জন কেমন অনায়াসে এড়িয়ে গেলেন। নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। সস্তা সুনামের মোহ বিজ্ঞানীকে কোথায় নিয়ে যায় দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। পরীক্ষার সময় কোন ছাত্র এ'দের কাছে রুগীর এই ব্যবস্থা দিলে এ'রাই তাকে ফেল করিয়ে দিতেন।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সীতে উঠে ছেলের বাবা বল্‌লেন—এত নামকরা বড় বড় দুজন সার্জন যখন অপারেশন করতে সাহস পাচ্ছেন না তখন ভাবছি হোমিওপ্যাথিই করে দেখি। ছেলেটা তো বাঁচবেই না মিছিমিছি কাটা ছেঁড়া করে কি হবে?

একথার কি জবাব দেব? এমন একটা পরিস্থিতি যে হতে পারে আমিই কি আগে ভেবেছি? এখন কি করে বলি— বড় ডাক্তার দেখানোর শখ মিট্‌লো তো?

ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বল্‌লেন—

খুবই আশা করে কলকাতা এসেছিলাম। ভেবেছিলাম অপারেশন করিয়ে ছেলেটাকে ভাল করে তুলে বাড়ি নিয়ে যাব। আমার কপালে তা হল না। ছেলেটা দেখছি আর বাঁচবে না। আর এখানে থেকে কি হবে? কাল সকালে একজন বড় হোমিওপ্যাথ দেখিয়ে ব্যবস্থা নিয়ে বিকেলের গাড়িতেই ফিরে যাব।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটা বাবার কোলে ঘুমুচ্ছে। ফুট্‌ফুটে, ফর্সা, গোলগাল, হাঁদলা-হোঁদলা। এক্ষুণি অপারেশন করিয়ে দিলে এখনও বেঁচে যায়। সে কথা কি করে এঁকে বোঝাই? কাকে দিয়েই বা অপারেশন করাই? সার্জন বন্ধুদের কাছে গেলে এক্ষুণি করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বড় বড় সার্জনদের এই কথার পর ছেলের বাবা রাজী হবেন কেন? কেনই বা ভাববেন না, ও'র ছেলেকে দিয়ে আমরা একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে চাইছি?

তা হলে সত্যি কি ছেলেটা শেষে মরে যাবে? এত অর্থব্যয় করেও বাঁচবার এই শেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে? নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় বলে মনে হল। বাঁচবার উপায় হাতের কাছে, তবু কাজে লাগাতে পারলাম না।

ছেলের বাবা বল্‌লেন—আপনিও আমাদের বাড়ি চলুন। ওর মাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

সব শুনে ছেলের মা কেঁদে ফেল্‌-লেন—আপনার ভরসাতেই এখানে আসা, আপনিও কিছু করতে পারলেন না?

বল্‌লাম—অত অধীর হবেন না। একটা ব্যবস্থা হবেই। কলকাতা শহর, অপারেশন করানো যাবে না, তা কি কখনও হয়? দেখি কি করতে পারি।

ছেলের বাপ বল্‌লেন—ও চেষ্টা আর করবেন না। এত দেরি হয়ে গেছে অপারেশন ছেলে সইতে পারবে না, টেবিলেই মারা যাবে। অত বড় দু'দুজন সার্জন যেখানে সাহস পেলেন না সেখানে কার কাছে আর যাবেন?

সত্যি, এখন কার কাছেই বা যাব? সুনাম দুর্নামের পরোয়া করেন না এমন বিখ্যাত সার্জন কোথায় পাব? হঠাৎ মনে পড়লো এমন একটি লোক এখনও তো বেঁচে আছেন এবং প্র্যাক্‌টিস্‌ও করেন। একদিন তাঁর নামটাই আগে মনে আসত; এখন কি আশ্চর্য এতক্ষণ মনেই পড়েনি! কিন্তু তিনি ভারতীয় নন, ইউরোপীয় সাহেব এবং বিখ্যাত ব্যক্তি।

বল্‌লাম দুজন নামকরা সার্জন সাহস পাননি বলেই প্রমাণ হয়নি চোখটি অপারেশনের বাইরে চলে গেছে। আমি এখনও মনে করি অপারেশন করা যায় এবং করা উচিত। না করলেই খারাপ হবে, ছেলেটা হয়ত বাঁচবে না। আপনারা যদি মত করেন তাহলে আমি একজন ইউরোপীয় সার্জনকে দেখাই। এ'র নাম আপনারাও জানেন। ইনিও যদি ঐ একই কথা বলেন তাহলে বুঝব আমিই ভুল বুঝেচি।

ছেলের মা বল্‌লেন—বেশ, আপনি তাহলে আজকেই সায়েবকে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। কাছেই একজনের বাড়ি থেকে ফোন করে ঠিক করলাম। সায়েব বল্‌লেন আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন।

ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে সায়েবের গাড়ি এসে রুগীর বাড়িতে থামল। সায়েব নেমে বাইরের ঘরে বসে কেসটা আগে সব শুনলেন তার পর বল্‌লেন চল এইবার রুগী দেখি। ছেলের বাবা কোলে করে বাচ্চাটাকে নিয়ে এলেন। চোখটা দেখেই সায়েব বল্‌লেন—চোখটা অনেক আগেই অপারেশন করা উচিত ছিল। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, এখন দৃষ্টিটা ফিরবে কিনা বলা শক্ত। পাইমিক্‌ অ্যাব্‌সেস যখন শুরু হয়েছে আর ত দেরি করা চলে না। কাল সকালেই ব্যবস্থা কর, অপারেশন করে দি।

বল্‌লাম—সবগুলি একসঙ্গে হবে তো?

সায়েব বল্‌লেন—নিশ্চয়। একবার

আন্ডার করে চোখটা আগে কেটে বাকী চারটে অ্যাবসেস্ ওপ্ন্ করে দেব। পনের মিনিটের বেশী লাগবে না।

ছেলের বাবা তবু ভরসা পেলেন না। সায়েব যেমন বিখ্যাত ব্যক্তি তেমনি কুখ্যাতও বটেন। ওঁর বদনাম, অপারেশন করে অনেক নাম করা লোককে নাকি উনি মেরে ফেলেছেন। অপারেশন করা যেখানে দরকার সায়েব সেখানে কোন বাধা মানেন না। অস্ত্রোপচার করে রুগীকে বাঁচবার শেষ সুযোগ দেন। অপরে যেখানে দ্বিধা করে সাহেব সেখানে নির্ভয়। তাই এই বদনাম।

ছেলের বাবা বল্লেন—অপারেশনের ফলে প্রাণহানি হবে না তো?

সাহেব হেসে বল্লেন—অপারেশন করলে হবে না, না করলে হবে।

ছেলের বাবার তবু ভয় গেল না। আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলে ফেল্লেন ছেলের মার কাটা ছেঁড়াতে বড্ড ভয়। তাই আমরা সাহস পাচ্ছি না।

সাহেব উঠে বল্লেন—চল ছেলের মাকে বুঝিয়ে আসি। অগত্যা সায়েবকে ভেতরে নিয়ে যেতে হল। ছেলের মার কাছে গিয়ে সায়েব বল্লেন—আপনার ছেলেকে কাল আমি অপারেশন করব। একসঙ্গে পাঁচ জায়গায় অপারেশন করলে ছেলে বেঁচে যাবে। তার জীবনের জন্য আমি দায়ী থাকব। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখনও অপারেশন করলে আপনার ছেলে বাঁচবে কিন্তু না করলে বাঁচবে না। অপারেশনে কোন রিস্ক্ নেই; লাইফের জন্য আমি নিজে গ্যারাণ্টি থাকব। বলে নিজের বাঁ হাত মুঠো করে বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের বুক ঠুকে বার বার নিজেকে দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

সায়েবকে অত জোরে কথা বলতে দেখে ছেলের মা তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলেন। ছেলের বাবার মনেও কিছু ভরসা হল। কিন্তু সায়েবকে দিয়ে অপারেশন করাতে না জানি কত টাকা লাগবে এই ভেবে একটু ইতস্তত করে আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বল্লেন—সায়েব কত নেবে?

সায়েব তক্ষুণি জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলের বাবা ফিস্ ফিস্ করে কি বললেন?

সায়েবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লাম কত দর্শনী দিতে হবে না জানলে এরা সাহস পাচ্ছে না।

সায়েব তক্ষুণি বল্লেন—আই য়্যাম নট এ গ্রীডি ম্যান, তোমার পার্টি তুমিই ভাল জানবে এদের অবস্থা। তুমি যা দেবে তাই আমি নেব। কিন্তু কালকেই অপারেশন করা চাই।

ঠিক হল, পরদিন সকালে সায়েবের নার্সিং হোমে অপারেশন হবে।

৯টার সময় অপারেশন। ভোর সাতটায় রুগীকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল। সিস্টার বাচ্চাটাকে রেডী করতে নিয়ে গেল। ন'টার একটু আগে সাহেব এলেন। সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন সব ঠিক আছে কি না। তার পর হাত ধুয়ে তৈরী হতে গেলেন। রুগীর মা বাবা রুগীর নির্দিষ্ট ঘরে বসে রইলেন, আমি অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলাম।

অতটুকু বাচ্চা চট্ করে আন্ডার হয়ে গেল। সায়েব ভুরুর নীচে এক ইঞ্চি আন্দাজ কেটে একটা লম্বা ফরসেপ্স্ ঢুকিয়ে চাড় দিলেন। অমনি চোখের গর্তের ভেতর থেকে পুঁজ আর কালো রক্ত ভক্ করে বেরিয়ে এল। চট্ করে একটা সরু গজ ঢুকিয়ে রুগীকে উল্টে দিতে বল্লেন। যিনি অজ্ঞান করছিলেন তিনি আর আমি বাচ্চাটাকে উল্টে দিলাম। এই বার পিঠের অ্যাব্সেস্ ছুরির এক টানে ওপ্ন্ করে ফরসেপস দিয়ে মুখটা ফাঁক করে দিলেন, পুঁজ রক্ত আপনি বেরিয়ে এল; অমনি গজ ঢুকিয়ে দিলেন। এমনি করে চট্পট চারটে অ্যাব্সেস্ কাটা হল। পনের মিনিট লাগবে বলেছিলেন, দশ মিনিটেই হয়ে গেল।

দুদিন নিজে ড্রেস করে সায়েব বল্লেন——এইবার বাড়ি নিয়ে যাও একদিন অন্তর ড্রেস কোরো।

আট দশ দিনের মধ্যেই সব কাটা জুড়ে গেল। জ্বরটা কিন্তু একেবারে ছাড়লো না। রোজ বিকেলের দিকে গা একটু গরম হয়ে ৯৯ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতো, আবার রাত্রে ছেড়ে যেত। সায়েব সব অষুধ বন্ধ করে দিয়ে বললেন আপনি আস্তে আস্তে এটা সেরে যাবে।

ছেলের মা বল্লেন—সব ভাল হয়ে এই একটা খুঁত নিয়ে আমি ছেলে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না। পরে যদি বেড়ে যায়? এই জ্বরটুকু সারিয়ে দিন।

বল্লাম—বেশ তো কয়েকদিন থেকেই যান না? ওষুধ বন্ধ করে দিন সাতেক দেখা যাক।

দিন তিন চার পরে গিয়ে দেখি জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে। ছেলের মা বল্লেন—কাল থেকে জ্বর ছেড়ে গেছে তাই ফিরে যাবার উদ্যোগ করছি।

বল্লাম—দেখলেন তো ওষুধ বন্ধ করেই কেমন জ্বর ছেড়ে গেল! তখনি বলেছি আর ওষুধের দরকার নেই। ছেলের বাবা হেসে বললেন—বিনা ওষুধে মোটেই সারেনি। আপনাদের ওষুধ দুদিন বন্ধ করেও যখন দেখলাম জ্বর ছাড়লো না তখন আমি নিজেই লক্ষণ মিলিয়ে দিলাম এক ফোঁটা ওষুধ। তাইতেই পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল। আমাদের ওষুধ ঠিকমত লাগাতে পারলে এক ফোঁটাতেই কাজ দেয়। দেখলেন তো ফলটা?

॥ ২৭ ॥

পাঁচ বছর। ঊনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকে ঊনিশ শ' সাতচল্লিশ। পাঁচ বছর যেন পাঁচ যুগ। ইতিহাসের গতি বন্যার স্রোতের মতো গতিশীল। ক্রীপস মিশন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহাত্মার অনশন, মন্বন্তর, লর্ড প্যাথিক লরেন্সের কেবিনেট মিশন, দাঙ্গা, লোকবিনিময়, মাউন্ট-ব্যাটেন, জিন্নার পাকিস্থান, স্বাধীনতা। পাঁচ বছর ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ঘটনা-মালায় উপলমুখর।

লর্ড লিনলিথগো'র স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন লর্ড ওয়াভেল। তিনি ছিলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি, সৈনিক ধুরন্ধর। প্রথম জীবনে সাহিত্যিক হিসাবে শিল্পচর্চা করেছিলেন, একটি বিখ্যাত জীবনী লিখে খ্যাতিলাভও করেছিলেন। এই সাহিত্যিক-সৈনিক পুরুষকে ভারত শাসনের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটেনের সরকার কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ক্রমশ যে জটিল পরিস্থিতির মেঘ স্তূপীকৃত হয়েছিল, তার ফলে লিনলিথগো ব্যর্থশাসক হিসাবে পরিগণিত হয়ে এলেন।

লর্ড ওয়াভেলের প্রতি ভারতের জনসাধারণ কিছুটা আশার মনোভাব নিয়ে তাকিয়েছিল। লিনলিথগো শাসনব্যবস্থা শুধু দিনের পর দিন চালিয়ে গেছেন। কোন সমস্যার সমাধান হয় নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী বিজয়ের নিশান, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের তেজ, মুসলীম লীগের ক্রমবর্ধমান চীৎকার। আশা করা গিয়েছিল, সৈনিক ওয়াভেল বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে ঘটনাবলীকে নতুন পথে পরিচালনা করতে পারবেন।

কিন্তু আশা ব্যর্থ হলো। পূর্ববর্তীর অনুবর্তন চালিয়ে যেতে লাগলেন ওয়াভেল। যৌবনকালে একদা সাহিত্যিক মন নিয়ে মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর লেখার মধ্যে, পরিণত বয়সে আর একটি মহান দেশের ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে সেই পরিবেশের সম্মুখীন হয়েও কোন হৃদয়বৃত্তি বা মানবীয় রাজনীতিবোধের পরিচয় দিতে পারলেন না। এই পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কি হৃদয়-কুসুম শুকিয়ে দেয়?

১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটলো। রক্ষণশীল দল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিরোধীদলের আসনে গিয়ে বসলো, শ্রমিকদল সরকার গঠন করলো। উইনস্টন চার্চিল মহাসমর জয় করেও নির্বাচনে পরাজিত হলেন। এটলী হলেন প্রধানমন্ত্রী, ভারত সচিবের পদ অধিকার করলেন লর্ড প্যাথিক লরেন্স।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ইংলণ্ডের শ্রমিকদল চিরকালই সহানুভূতি সম্পন্ন। নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রমিকদলের সম্মেলনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়েছিল, তাঁরা সরকার গঠন করতে পারলে ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রবর্তিত করা হবে।

সরকার গঠন করে মিঃ এটলী ও লর্ড প্যাথিক লরেন্স তাঁদের পূর্বপ্রতিশ্রুতি রূপায়িত করবেন বলে ঘোষণা করলেন। ভারতবর্ষে নতুন আশা জেগে উঠলো।

লর্ড ওয়াভেল অনতিবিলম্বে লণ্ডন পাড়ি দিলেন। চার্চিলের শাসন থেকে এটলীর সরকার সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। এই পার্থক্যটা ওয়াভেলের লণ্ডন গমনের আগে ও পরে স্পষ্ট ফুটে উঠলো। লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তন করে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন, নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভারতের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

ইংলণ্ড সরকারের প্রতিনিধি এক মিশন এলো ভারতবর্ষে। এই মিশন ইতিহাসে ক্যাবিনেট মিশন নামে খ্যাত। লর্ড প্যাথিক লরেন্স, স্যর স্টাফোর্ড ক্রীপস ও মিঃ আলেকজাণ্ডার মিশনের সভ্য ছিলেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ছিলেন সহযোগী সদস্য।

দিল্লী বিমানঘাটিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিশন-নেতা লর্ড প্যাথিক লরেন্স সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে-ছিলেন, ভারতের ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে পুনর্গঠন করে কোন মীমাংসা আরোপ করা হবে না। তাঁর কথায় স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, জিন্নার পাকিস্থান দাবীকে তিনি কোনপ্রকার গুরুত্ব দিতে স্বীকার করেন না।

কিন্তু দীর্ঘদিনের ইংরেজ প্রশ্রয়ে রক্ষিত ও বর্ধিত মহম্মদ আলী জিন্নার দল ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত না করে কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করতে সম্মত হলো না। মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল; লর্ড প্যাথিক লরেন্স যাবার আগে ঘোষণা করে গেলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করাই তাঁর জীবনের ব্রত, তিনি এই চেষ্টা থেকে বিরত হবেন না।

লর্ড ওয়াভেল গভর্নর জেনারেল হিসাবে পরিপূর্ণ ব্যর্থ হলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক পরিমাণে ব্যর্থতার জন্য দায়ী। তিনি সুদৃঢ় কোন প্রত্যয় নিয়ে এগোতে পারতেন না, কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাকে সবল মন নিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করার শক্তি তাঁর ছিল না। কংগ্রেসের বহ্নিমান দেশপ্রেম তাঁকে রুষ্ট করতো, মুসলিম লীগের তোষণ করতে কার্পণ্য করতেন না। গম্ভীর মুখ নিয়ে তিনি রাজকার্য করতেন, পুঞ্জীভূত কৃষ্ণকায় মেঘস্তূপের মতো বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখের ভাব করে থাকতেন। অনেক সময় মনে হতো, তিনি কি হাসতে জানেন না?

এমন সময় ইংলণ্ডের শ্রমিক মন্ত্রিসভা লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলরূপে মনোনীত করলেন। মাউণ্টব্যাটেন যুদ্ধের সময় কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থান করতেন তাঁর দক্ষিণ-পূর্ব আঞ্চলিক দপ্তরের হেডকোয়ার্টার্সে। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তিনি মালয়-সিংগাপুরে সাদর অভ্যর্থনা করে বন্ধুত্ব রচনা করেছিলেন।

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন ইংরেজ রাজ-পরিবারের প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। নৌ-বিভাগীয় সামরিক বৃত্তিতে জীবন আরম্ভ করে ইংলণ্ডের অগ্রণী নৌসেনাপতিরূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন। জীবনে যত কঠিন, যত দুঃসাধ্য কর্তব্যই তাঁর সামনে আসুক, তিনি নির্ভয় নিঃশঙ্কচিত্তে তা পালন করেছেন। ব্যর্থতা বা পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, বিজয়মাল্যে তাঁর জীবন সর্বদা দ্যুতিময় হয়ে আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অসাধারণ জয়মাল্য নিয়ে তখন তিনি স্বদেশে ফিরে এসেছেন। দেশে তাঁর বিপুল খ্যাতি, বিশাল জনপ্রিয়তা। তাঁকে নির্বাচিত করা হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা জটিল গুরুদায়িত্বে। ভারত-বর্ষের সমস্যা সমাধানে। তিনি ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল পদ গ্রহণ করে দিল্লীতে এলেন।

দীর্ঘ সুন্দর দেহের অধিকারী তিনি, সদাহাস্যময় মনোরম তাঁর চেহারা। মনের মধ্যে অজস্র সাহস ও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন-মতি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলাম আমরা ভারতবর্ষের সাংবাদিকবৃন্দ। রাজনীতির নায়করাও আশ্বস্ত হলেন।

কলকাতার দাংগা ঘটেছিল ১৬ই অগাস্ট, ১৯৪৬ সালে। সপ্তাহব্যাপী নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে মহা-নগরীতে, বিবেকহীন মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য-হত্যা সংঘটিত হয়েছে চল্লিশ লক্ষ নরনারীর বাস বৃহত্তর কলকাতায়। এক অন্ধকার বর্বর যুগ।

নোয়াখালী ও বিহারে এই অমানুষিক বর্বরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে হত্যালীলা অব্যাহত হয়ে ছুটেছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দুর্বহ ঘৃণা, মানুষে মানুষে বিষাক্ত জীঘাংসা। মহাত্মার মিলন, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী লুটিয়ে পড়েছে ধূলিতে, নাগিনীরা বিষম স্ফূর্তিতে ফুঁসছে।

মহাত্মা একাকী গেলেন নোয়াখালী। পাদুকাহীন শীর্ণ দেহ পল্লীপথে রক্তাক্ত হয়ে যেতে লাগলো, তিনি শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার সাধনা করতে লাগলেন। যে পথে সাম্প্রদায়িক হত্যার নিষ্ঠুর ঝড় বয়ে গেছে, সে পথ দিয়ে তিনি মিলন ও প্রেমের বাণী ছড়িয়ে ছড়িয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। অবশেষে সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় পাঞ্জাব থেকে লোকবিনিময় করার আদেশ দিলেন।

লোকবিনিময়ের মধ্যে মানুষের জীবন রক্ষা হলো পাঞ্জাবে। তিনি আলো দেখতে পেলেন। দীর্ঘদিনের বিষাক্ত প্রচারণায় মুসলিম লীগ যে বর্বর সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সৃষ্টি করেছে, তার ফলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এবং শান্তি প্রায় সুদূরবর্তী
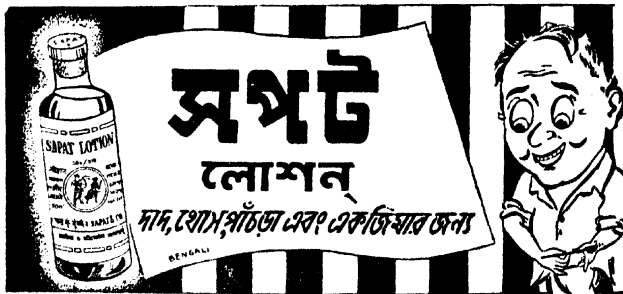
স্বপ্ন হয়েই আছে। দ্বিধাবিভক্ত ভারতবর্ষ কংগ্রেসের নিকট মহাপাপস্বরূপ অগ্রহণীয়, অখিল ভারত মিলিত কংগ্রেস-লীগ সরকার মুসলিম লীগের নিকট বাতুলতামাত্র।

কিন্তু এই অবস্থাই কি চলতে থাকবে?

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাবাবলী রচনা করলেন। বড়লাটের জাতীয় কার্যকরী পরিষদে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল এবং লিয়াকৎ আলীর পুরোধায় মুসলিম লীগ দল শাসনভার গ্রহণ করেছিল। মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব সর্বপ্রথম এই শাসন পরিষদে আলোচিত হয়।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মাউণ্টব্যাটেনের। প্রখর কূটনৈতিক বুদ্ধিতে তাঁর প্রতিটি বক্তব্য উজ্জ্বল। পণ্ডিত নেহরু উপলব্ধি করলেন ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে মাউণ্টব্যাটেন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে স্বাধীনতা সুদূরবর্তী হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদের সর্বাপেক্ষা বিরোধী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি সান্ধ্য প্রার্থনাসভার বক্তৃতাবলীতে প্রায় প্রত্যহ দেশের বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন।

জাতির জনক গান্ধীজীর বিরোধিতা মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিবেচিত হলো। তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মহাত্মা মত পরিবর্তন করলেন অবশেষে।

সম্পূর্ণ বাংলা ও পাঞ্জাব গ্রাস করতে চেয়েছিলেন মহম্মদ আলী জিন্না। মাউণ্টব্যাটেন ভ্রূকুঞ্চিত করে জানালেন, সমস্ত দেশ বিভক্ত হলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, প্রদেশগুলি এই ফরমুলা থেকে বাদ যাবে কেন? তিনি আরও জানালেন, এই মুহূর্তে যদি তিনি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহলে পাকিস্থানের দাবী কোনদিনই পূরণ হবে না।

জিন্না অনতিবিলম্বে রাজী হলেন।

মাতৃভূমি দ্বিধাখণ্ডিত হলো। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। ইতিহাসের নতুন পরিচ্ছেদ নতুনভাবে লেখার স্থির সিদ্ধান্ত হলো দিল্লীতে।

কিন্তু নেতাদের সম্মতি লাভ করলেও মাউণ্টব্যাটেনের আর একটি দুরূহ কর্তব্য বাকি ছিল। জনসাধারণের সম্মতি অর্জন করতে হবে। জনসাধারণের প্রতিনিধি ও চারণ সাংবাদিকদের হৃদয় জয় করতে হবে তাঁর।

নেতাদের সম্মতি দানের একদিন পর ৪ঠা জুন দিল্লীতে এসেম্বলী হলে সাংবাদিকদের সভা ডাকা হলো। শাসন পরিষদের বেতার ও প্রচার সচিব হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাতে সভাপতিত্ব করলেন।

দেশ বিদেশের প্রায় তিনশতাধিক সাংবাদিক তাতে যোগদান করেছিলেন। শুধু রিপোর্টারদের তথাকথিত 'প্রেস কনফারেন্স' নয়, বিশিষ্ট সম্পাদক ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এই সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছিল। আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

জীবনে বহু প্রেস কনফারেন্সে আমাকে যোগ দিতে হয়েছে। বহু খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা ও মনীষীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখেছি তাঁদের, অনুভব করেছি তাঁদের ব্যক্তিত্ব, শুনেছি তাঁদের কথা।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের এই ঐতিহাসিক সাংবাদিক বৈঠক আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

দীর্ঘ সুপুরুষ ব্যক্তি মঞ্চের মধ্যভাগে এসে দাঁড়ালেন। শান্ত আবেগবর্জিত যুক্তিমালায় ভূষিত বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, হাতে একখণ্ড কাগজ। কিন্তু কাগজে কী লেখা আছে একবারও সেদিকে তাঁর নজর নেই, সহজ সপ্রতিভ দৃষ্টি তুলে তিনি সাংবাদিকদের নিকট তাঁর প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে চলেছেন। বক্তৃতা দীর্ঘ হচ্ছে, কিন্তু তিনি কোথায়ও থামছেন না বক্তব্যের সন্ধানে অথবা শব্দনির্বাচনে। অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষীর দরদ তার কণ্ঠ ও বাক্যে।

স্যর স্টাফোর্ড ক্রীপস বিখ্যাত বক্তা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের মূলগত পার্থক্য। ক্রীপস আবেগপ্রবণ, হৃদয়বৃত্তির তপ্ত লাভাস্রোতের মতো উষ্ণ তাঁর কথা। মাউণ্টব্যাটেন যুক্তিধর্মী, বাস্তবপন্থী। তাঁর কথায় স্রোত নেই, আছে বুদ্ধির বৃষ্টি। ক্রীপস সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়েন, সামান্য বিদ্রূপ বা বিরোধিতায় ক্রুদ্ধ হন। মাউণ্টব্যাটেন সর্বদা হাস্যময় প্রশান্ত, কোন আঘাতেই তিনি আহত বা অপ্রসন্ন হয়ে উঠেন না। কঠিন প্রশ্ন করা হয়েছে, জটিল যুক্তির তর্ক তোলা হয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন সহজ ভাষায় সানন্দে তার জবাব দিয়েছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য শেষ হলো, সাংবাদিকদের নানানমুখী প্রশ্নেরও তিনি জবাব দিলেন। আমরা বুঝতে পারলাম

তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আর এই পরিস্থিতিতে কোন গত্যন্তর নেই। মাউণ্টব্যাটেনের কুশলী বুদ্ধি বিজয়লাভ করলো।

তারপর ক্রমশ এগিয়ে এল ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন।

১৫ই অগাস্ট, ১৯৪৭।

দু'শ' বছরের পরাধীনতা আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম দিল্লীর ঐতিহাসিক দুর্গ লালকেল্লার সামনে। সহস্র সহস্র উত্তাল জনতা, নতুন সূর্যের রক্তিম আলো এসে পড়েছে তাঁদের প্রত্যেকের মুখে, প্রতিটি মুখ স্বপ্নে ও সুখে উজ্জ্বল।

স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করলেন। বিশ্বসভায় স্বাধীন পতাকার সারিতে আর একটি নতুন পতাকা উড়লো, ত্রিরঙা পতাকা, মুক্ত ভারতবর্ষ।

আমাদের রিপোর্টার সভার অভ্যন্তরে গিয়ে বসেছিলেন। আমি নিঃশব্দে একাকী এসে দাঁড়িয়েছিলাম এই ঐতিহাসিক সকালবেলার জনতারণ্য উত্তালমুখর মানুষের সমুদ্রে।

মানুষ আর মাটি। মাতৃভূমি।

আমি রোমাঞ্চলাগা উত্তেজনায় আনন্দে কাঁপছিলাম। আমার মাতৃভূমি আজ স্বাধীন হলো।

॥ ২৮ ॥

সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী করাচী ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রত্যন্তের মহানগরী। করাচীতে আমাদের সংবাদাতা ছিলেন শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম। তিনি এখন আসামের রাজ্যপাল। তখন তিনি সিন্ধু প্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা, করাচীর অধিবাসী। তিনি ছিলেন ব্যস্ত মানুষ, ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। পরিপূর্ণ সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে পাওয়াও দুর্ঘট ছিল, কংগ্রেসের খবর ভিন্ন অন্যান্য সংবাদ প্রায় পাঠাতেই পারতেন না।

এমন সময় ডি এম তাহিলরমানি নামক এক যুবক আমাদের সংবাদদাতারূপে কাজ করবার অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন। কয়েক মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে তাঁকে নিয়োগ করলাম। তাহিলরমানি তখন বি এ ক্লাশের ছাত্র।

ডাকে খবর পাঠাতেন তাহিলরমানি। তাঁর চিঠিগুলি বিচিত্র সংবাদে ভরা থাকতো, অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মতো রচনাশৈলী। তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলাম। অনতিবিলম্বে তিনি পুরো সাংবাদিকের নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন।

সামান্য মাসিক মাহিনা তাঁকে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর উৎসাহ ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। সংবাদদাতারূপে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বি এ পাশ করলেন, আয়ত্ত করলেন সর্টহ্যাণ্ড বিদ্যা। সাগ্রহে শিক্ষা করলেন সাংবাদিকতার নানা বিভাগের কাজ, অর্জন করলেন সাংবাদিকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিক্ষা।

১৯৩৬ সালে আমি প্রথম করাচীতে যাই। মরুভূমির উপর দিয়ে সোজা রেললাইন চলে গেছে, পথের দুদিকে ধু ধু বালি, দিগন্তখোলা মরুমাঠ। দস্যুদের অবাধ লুণ্ঠনে সে পথ দুর্গম, ধূলির ভয়ের সঙ্গে দস্যুর ভয়ও সে পথে সর্বদা ত্রাসের আতঙ্ক বিস্তার করে আছে।

সেই ত্রাসের রাজ্য পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম করাচী স্টেশনে। তাহিলরমানি উপস্থিত ছিলেন প্ল্যাটফর্মে, তিনি স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। আগে কখনও দেখা হয়নি আমাদের; ভাবনা ছিল ভিড়ের মধ্যে পরস্পরকে চিনতে পারবো কিনা। কিন্তু গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হলেন তাহিলরমানি, নমস্কার করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

করাচী ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর ছিল। শহর তখন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আধুনিক প্ল্যান অনুযায়ী অগ্রসরমান শহর সৌন্দর্যে মনোরম। সমুদ্রের তীর নয়নাভিরাম দৃশ্য।

'বড়বন্দরের' রাস্তায় একটি দোতলা বাড়িতে আমাদের অফিস ছিল। নিচে অফিস, উপরে তাহিলরমানির সপরিবার বাসস্থান। অতিথি হলাম তাঁদের পরিবারে, পরিচয় হলো তাঁর বাবার সঙ্গে। শিক্ষায়, রুচিতে ও আন্তরিকতায় পরিবারটি সুন্দর। তাহিলরমানির ছোটভাই তখন বি এ পড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা, এডিট করা ও সর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি সাংবাদিকতার কাজে শিক্ষানবিশী করছে।

তাহিলরমানি করিৎকর্মা ব্যক্তি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল করাচীতে আমাদের পুরোদস্তুর অফিস খোলা। হেড অফিস থেকে কোনপ্রকার আর্থিক সহায়তা ছাড়াই অফিসের সমস্ত ব্যয়নির্বাহের তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বুদ্ধি কৌশল, সাংগঠনিক নিষ্ঠা অপরাজেয়।

করাচীতে নতুন অফিস উদ্বোধন করা হলো। তাহিলরমানিকে নিয়োগ করা হলো সম্পাদকরূপে, তাঁর ছোটভাই নিযুক্ত হলেন সহ-সম্পাদক। পুরো অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাহিলরমানি, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

'সিন্ধ অবজার্ভার' তৎকালীন করাচীর প্রসিদ্ধ পত্রিকা। পরলোকগত কে পুনিয়া তখন তার সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এক দুপুরে, শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা তাঁর, সর্বদা একটা প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে আছে মুখে। সহৃদয় আন্তরিকতায় তাঁর ব্যক্তিত্ব মনের মধ্যে ছাপ রাখে। তাঁর ছোটভাই কে রামা রাও আমার সহকর্মী ছিলেন 'ফ্রি প্রেসে,' বন্ধুত্ব রচিত হয়েছিল অনেকদিন আগে। কে পুনিয়া মশায় আমাকে ছোটভাই-এর মতো গ্রহণ করলেন।

কে রামারাও 'ফ্রি প্রেসের' পত্রিকা 'ফ্রি

ইণ্ডিয়ার' সম্পাদক হয়েছিলেন, দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমসের' বার্তা-সম্পাদক হিসাবে বহুদিন কাজ করেন। পরে জওহরলাল নেহরুর সংবাদপত্র 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে'র সম্পাদক হয়েছিলেন। এখন তিনি রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছেন, পার্লামেণ্টের একজন খ্যাতনামা সদস্য। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচিত্ত সাংবাদিক, নানারূপে তাঁকে দেখেছি, নিজের স্বাধীনতা কখনো ক্ষুণ্ন হতে দেননি।

করাচীর বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে সাক্ষাৎ করলাম, যাঁরা আগে আমাদের সংবাদ নিতে কার্পণ্য করতেন, তাঁদের সহায়তা অর্জন করলাম। করাচী অফিসের আয় কিছুটা বেড়ে গেল। তাহিলরমানি সুখী হয়েছিলেন আমার তিনদিন করাচী-ভ্রমণে. আসবার সময় স্টেশনে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন। তখন আমরা পরস্পরের নিকট আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

দু'-তিন বছর পর আর একবার করাচী গিয়েছিলাম তাহিলরমানির ডাকে। সিন্ধু সরকারের কাছে আমাদের সংবাদ নেবার অনুরোধ করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যে আমার করাচী যাওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছিলেন।

এবার লালওয়ানী নামক এক ঐশ্বর্য-বান হিন্দুমহাসভাপন্থী ব্যবসায়ীর গৃহে আমার আতিথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তাহিলরমানি নিজে এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

রায়বাহাদুর কিমত্রাই আসুমল করাচীর প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী। সরকারের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, শহরের প্রভাব-শালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তিনি তাঁর গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে।

আমাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য তিনি 'করাচী ক্লাবে' এক মধ্যাহ্ন 'ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে সিন্ধু সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, খ্যাত-নামা সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভার কিছুদিন পরেই সিন্ধু সরকার আমাদের পরি-বেশিত সংবাদ নিতে স্বীকৃত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে পড়ে। সিন্ধুতে হিন্দুর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশানুপাতে অল্প ছিল, হিন্দুদের হত্যা ও সম্পত্তি লুণ্ঠন সেখানে অব-লীলায় অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। সেই দুর্দিনে আমাদের অফিস আক্রান্ত হয়। তখনও তাহিলরমানি অবিচলিত সংকল্প নিয়ে করাচীতে সাংবাদিকতা করে চলেছেন। কিন্তু তারপর একদিন সাম্প্র-দায়িক বর্বরতার আক্রমণে অফিসের দ্বিতলে তাঁর গৃহ পর্যন্ত লুণ্ঠিত হয়। সেসময় প্রাণের দায়ে একজন মুসলমান সহকর্মীর হাতে অফিস চালাবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি সপরিবারে বিমানযোগে বোম্বে চলে আসেন।

তার কিছুদিন পরে হায়দরাবাদে ভারত সরকারের "পুলিসী আক্রমণে" সেখানকার রাজাকর-স্বাধীনতা যখন ধসে পড়ে তখন আমাদের হায়দরাবাদ অফিসের সম্পাদক আবদুল হাফিজকে করাচী অফিস পুনর্গঠিত করে পুনর্বার সুষ্ঠু-ভাবে চালাবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হয়। আবদুল হাফিজ দীর্ঘদিন আমাদের সহ-কর্মী, তাঁর কর্মতৎপরতায় আমার আস্থা ছিল। বিশ্বাস করেছিলাম পাকিস্থান সংবাদের জন্য একজন সুযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আবদুল হাফিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। আমার দীর্ঘ কর্মপ্রচেষ্টার একটি নিদারুণ নৈরাশ্য তাঁর সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট স্বার্থপরতায় অক্ষয় হয়ে রইলো।

আবদুল হাফিজ কিছুকাল আমাদের প্রতি আনুগত্য নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে আমাদের জানালেন যে, হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরি-চালিত এবং ভারতে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত বলে করাচীতে তাঁর কাজ করা দুর্ঘট হয়ে পড়েছে। 'ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্থান' নাম দিয়ে নতুন কোম্পানী রেজিস্টার্ড করা হলে কাজের বাধাগুলি অপসারিত হবে। আমাদের সম্পত্তি, সুনাম ও সহযোগিতার জন্য নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে আমাদের শতকরা ১৫ ভাগ শেয়ার থাকবে এবং আমাদের নির্বাচিত একজন ডিরেক্টর গ্রহণ করা হবে।

আমরা বাস্তব বাধাগুলি অনুধাবন করছিলাম। তাঁর শুভবুদ্ধির প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। আমি সম্মতি জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিলাম।

করাচীতে নতুন প্রতিষ্ঠান রেজিস্টার্ড করা হলো—'ইউনাইটেড প্রেস অব পাকি-স্থান'। আবদুল হাফিজ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চীফ এডিটার হলেন।

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকলেও হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে আবদুল হাফিজকে আমরা উৎসাহিত করেছি। সাংবাদিকতার বন্ধুর পথে একদা আমিই তাঁকে উন্নতির সোপানে বসিয়েছিলাম, শিক্ষা ও সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হিসাবে গড়ে উঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছি।

কিন্তু করাচীতে সুগভীর ভারতীয় বিদ্বেষের বিষাক্ত আবহাওয়ায় আবদুল হাফিজ তাঁর অতীত বিস্মৃত হয়েছেন। বিস্মৃত হয়েছেন সাংবাদিকতার ভিত্তি-মূলক সৌভ্রাত্র ও নিরপেক্ষতা। আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। করাচী থেকে কোন সংবাদই পাঠান না, চিঠি লিখলেও ভদ্রতাসূচক একটা জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তাও আর বোধ করেন না।

করাচী অফিসের স্থাপয়িতা ও সংগঠক তাহিলরমানি এখন হায়দরাবাদ শাখার সম্পাদক। সেখানকার প্রখ্যাত পত্রিকা 'হায়দরাবাদ বুলেটিনের' স্বত্বাধি-কারী শেঠ মতিলালের সঙ্গে নিবিড় সৌহার্দ্য স্থাপন করে অত্যল্প সময়ে তিনি শাখা অফিসটি বৃহৎ পরিকল্পনায় পুনর্গঠিত করেছেন। তাঁর সাফল্য আমাদের অগ্রগতির মালায় একটি চিত্তাভিরাম ফুল। (ক্রমশ)

পশ্চিম বাংলার উত্তরখণ্ড

পুলকেশ দে সরকার

৫
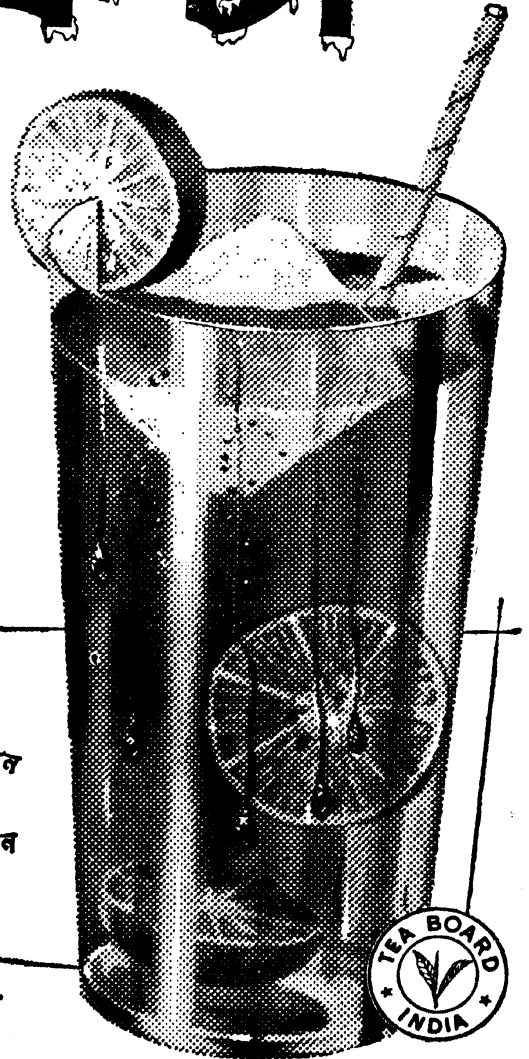
কালিম্পংয়ে সন্ধ্যা নাগাদ পেঁাছোলাম। পেঁাছেই আবার একটি আশ্চর্য মানুষের দেখা পেলাম। তাঁর নাম গিরি। ঘড়ির কাঁটার মতো তাঁর চলন। অবশ্য ভাল ঘড়ির। সময়ানুবর্তিতা অদ্ভুত। পাহাড়ের সার্থক সন্তান। অমন উঁচু-নীচু কালিম্পংয়ে অনায়াসে ওঠা-নামা ছোটাছুটি করে।

কিন্তু কালিম্পং সমস্যা-সঙ্কুল। এক এক সময় মনে হয়েছে একা গিরি কি করবে? কালিম্পংয়ের পথে পথে ধস, ধস পড়ার বিপদ, কালিম্পংয়ের অলি-গলিতে বিদ্রোহের নিশ্বাস। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফিসফিসানি।

দার্জিলিংয়ে নয়, কালিম্পংয়ে গোর্খা লীগ দার্জিলিং জেলার স্বাতন্ত্র্যের দাবী করেছে। এ দাবীর নেতৃত্ব করেছেন সেই সব বিধানসভার সদস্য যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে একাসনে বসেন। বোঝা যায়, এঁদের মনকে তৃপ্ত করা যায়নি। বাঙলার কম্যুনিস্টরা ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে। তাদেরও দাবী দার্জিলিংয়ের স্বায়ত্তশাসন। তিব্বত কালিম্পংয়ের সীমান্ত থেকে ৪০ মাইল। এখানের গ্রীসের সিংহাসনচ্যুত রাজা আছে, আমানুল্যার পরিবারের লোক আছে, ডাঃ রোয়েরিক নামে এক রুশ দার্শনিক আছেন, তিনি তিব্বতের ইতি-হাস থেকে ভারতের ১৪শ শতাব্দীর ইতিহাস লিখছেন।

এই কালিম্পং শহরে আছে লেপচা, ভুটিয়া, তিব্বতী, চীনা, আমেরিকান, ইঙ্গ-ভারতীয়, মারোয়াড়ী, বিহারী। তবে নেপালী ও বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। তিন বর্গ মাইলে ১৬ হাজার লোকের বাস। এখানে ভুটিয়া এসোসিয়েশন, লেপচা এসোসিয়েশন আছে, শেরপা এসোসিয়েশন আছে, তিব্বতী-ভারতীয় এসোসিয়েশন আছে, তিব্বতীদের পাঞ্জা খিদু আছে। তিব্বতের রাজনীতি এখানে বড় গরম। এ ছাড়া বিশ্বকর্মা সমাজ, দর্জি সমাজ আছে। গোর্খা লীগ তপশীলভুক্ত এদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ক'রে থাকে। বাঙ্গালীদের একটি সঙ্ঘ আছে, মিলনী সঙ্ঘ। টাউন ক্লাব—পাঁচমিশালী। পাহাড়িয়াদের একটি কালিম্পং দুঃখ-নিবারক সম্মিলন। এখানকার ব্যবসায়ীরা প্রধানত মারোয়াড়ী ও বিহারী। তিব্বতের উলই প্রধান ব্যবসা।

একদিন এঁদেরই একজনের মুখে
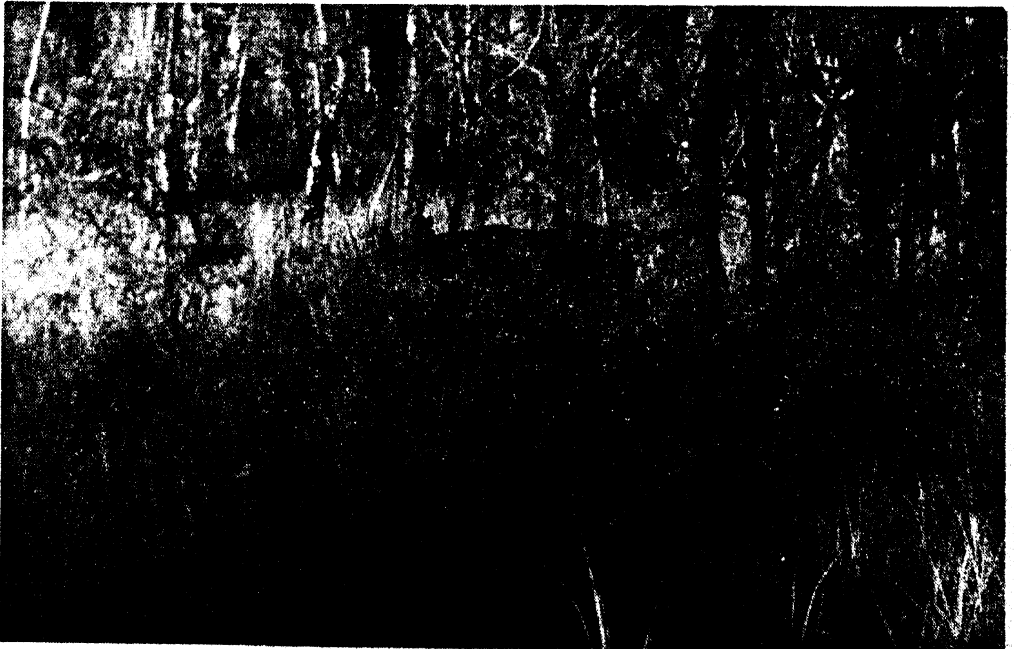
জঙ্গলের আড়ালে গা-ঢাকা দেওয়া গণ্ডার

জলদাপাড়ার বনভূমিতে গণ্ডারের সন্ধানে

বিস্তর নিন্দা শুনলাম কালিম্পংয়ে সরকারী ব্যবস্থার। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে কম-সে-কম তিনটি জীপ ধুলো উড়িয়ে গেল বেগে। আই জি এলেন। আড়ম্বর লক্ষ্য করবার মতো। রাস্তায় রাস্তায় পুলিস। এ'রা কি বিদেশী শাসক?

বিহারী ব্যবসায়ীটি বলছিলেন, জলের দুঃখ আর ঘুচল না এখানকার। ঘোচাবার চেষ্টাও নেই। জলের এই কষ্টে এবং আরও নানা রকম কষ্টে লোকে এখানকার বাড়ি বিক্রয় করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। সরকার শহর উন্নয়নের যেসব প্লট রেখেছেন তা কিনছে না কেউ। অফিসাররা সব আসেন, দুদিন কালিম্পংয়ের ধুলো উড়িয়ে চলে যান।

কালিম্পং থেকে ৩০ মাইল দূরে রিসিলা বলে একটি জায়গা আছে। এখানে সিকিম, ভুটান, দার্জিলিং (বা বাঙলা) এসে মিশেছে। কিন্তু সারা কালিম্পংয়ে বিভিন্ন ধারার সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র এমন কিছু দেখলাম না। থিয়েটার হল ব'লে কিছু নেই। সিনেমাভবন যেটি আছে তাতে মার্কিন আর হিন্দী ছবি দেখানো হয়। মাঝে মাঝে মিলনী সংঘ বাঙলা নাটক মঞ্চস্থ করেন, তা দেখতে পাহাড়িয়ারাও আসে, কিন্তু পাহাড়িয়ারা যখন নাটক মঞ্চস্থ করে তখন তা দেখতে বাঙালীরা যায় না, যোগও দেয় না। এ কিন্তু অভিযোগের সুরেই শুনলাম।

এখানকার শিক্ষা (দীক্ষা) প্রধানত মিশনারীদের হাতে। স্কটস মিশনের তত্ত্বাবধানে একটি ছেলেদের স্কুল, একটি ইণ্টার-কলেজ আছে। আর একটি ছেলেদের স্কুলের নাম সেণ্ট অগস্টাইন স্কুল। স্কটস মিশনের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের এইচ ই স্কুল আছে। রোমান ক্যাথলিকদের তত্ত্বাবধানে সেণ্ট-ফিলোমেনা নামেও মেয়েদের স্কুল আছে।

এ ছাড়া, স্থানীয় লোকেরা ধর্মোদয় বিহারে বি, এ পর্ব অবধি পড়াশোনার জন্য একটি নৈশ কলেজ খুলেছে। তবে এখনও অনুমোদিত হয়নি বলে শোনা গেল। ছেলেদের সরকারী একটি স্কুল আছে, ক্লাস সেভেন থেকে টেন। স্থানীয় লোকেদের পরিচালনায় কুমুদিনী টাউন স্কুলে ক্লাস ফাইভ থেকে টেন অবধি পড়ানো হয়। একটি অবৈতনিক মিউনিসিপাল প্রাইমারী স্কুল আছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নেপালীই শিক্ষার মাধ্যম।

এই পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হলাম কালিম্পংয়ে। একমাত্র গিরিই আমাদের অবলম্বন। আমরা যা দেখতে লাগলাম, অর্থাৎ সরকারী কর্মতৎপরতা, তা যেন এই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন।

অথচ কৃষি-ফার্মের উদ্দেশ্য পাহাড়িয়াদের খাদ্যোৎপাদনের কাজ সহজ ক'রে দেওয়া। ও'রা ভুট্টা নিয়ে নানারকম গবেষণা করছেন, সংকর ভুট্টা সৃষ্টি করছেন। একই ভুট্টা ক্রমান্বয়ে ৫ ইঞ্চি থেকে ছোট হ'তে হ'তে ১॥ ইঞ্চি হ'য়ে যায়। এই অবস্থায় দুটি জাতির সংমিশ্রণে যে সংকর ভুট্টার সৃষ্টি করছেন তা বিস্ময়কর। পাহাড়িয়াদের জন্যই। পাহাড়িয়ারা ভুট্টার ভাত খায়। জাপানী প্রথায় ধানেরও চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এসব কোন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারছে না কেন পাহাড়িয়াদের মধ্যে। কোথায় এর ত্রুটি? ঝরনার জলে যাতে মাছের চাষ হয় তারও চেষ্টা চলছে। তার নাম কাৎলি-কালচার বা কাৎলি মাছের চাষ। পরীক্ষা ব্যাপকভাবে সফল হ'লে মস্ত একটি অভাব দূর হবে।

কিন্তু না, কালিম্পংয়ে নানারকমের ধারা ব'য়ে চলেছে। এখানে এমন একটি 'হোম' আছে যেখানে ৫৫০টি ইঙ্গ-ভারতীয় শিশুকে পড়ানো হয়। তার মধ্যে ২৭০ জনকে কোন খরচ দিতে হয় না। বিরাট এই প্রতিষ্ঠান, মস্ত এর আয়তন এবং এর বাৎসরিক খরচ প্রায় ছয় লক্ষ। ছোট খাট একটি রাজ্য। সব-কিছু এতে আছে।

এতে কি ভারতীয়েরা স্থান পায়?

ভারপ্রাপ্ত সাহেব বললেন, আগে অবশ্য পেত না। পরে নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু কোন-না-কারণে ভারতীয়েরাই ভর্তি হ'তে আসে না। কোন-না-কোন কারণটি কি?

মোদ্দা কথা, ভারতীয়েরা এতে স্থান পায় না।

কিন্তু কাটজু সাহেব এদেরই একটি শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছিল, প্রতিষ্ঠান

পরিচালকেরা তাই ক্যামেরায় ধ'রে রেখেছেন, ছবি ছাপিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উদারচিত্তে যা সাহায্য করছেন ছ-সাত লক্ষের কাছে কিছু নয়।

বড় অঙ্কের টাকাটা কোত্থেকে আসে? ভারপ্রাপ্ত বললেন, বেশীর ভাগ ইউ-রোপীয়ানদের দান থেকে। ছেলেরা কোত্থেকে আসে এবং কারা এরা।

আমাদের দেশের চা-কর বা পদস্থ চা-বাবুদের অনেকেই সাহেব। কিন্তু কেউই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসে না। 'ওটি চাই।' হাতের কাছে পাহাড়ের বুনো টকটকে ফুল বোতামের ফুটোয় (বাটন-হোলে) সাজায়। পরিণতি যা হবার হয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। ফল পরিপুষ্টির আয়োজনে কার্পণ্য করে না। ঘরে রাখাও দায়। সুতরাং টাকা ওঠে দানের নামেই। গেরস্থ ঘরের বাপ-পিতামহর 'হোম' না পেলেও, হোম একটা পায়। সেখানে নিয়মানুবর্তিতা শেখে, লেখাপড়া শেখে; কিন্তু কোন্ দেশের প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগে? ভারতীয় তো নেই, ভারতের কথা কিছু আছে? কি কথা আছে?

কথা নেই দেখলাম 'কালিম্পং আর্টস এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স'-এ। কালিম্পং মিশন ইণ্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে এ চলে। বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলকাতা, দার্জিলিং, ডুমডুমা, মাদ্রাজ, নৈনীতাল, নয়াদিল্লী, উতকামন্দ, শিলংয়ে এর এজেন্সী। জিনিসের দাম সব জায়গায়।

এর কারিগর কারা? পাহাড়িয়ারা। পাহাড়ীয়া শান্ত মেয়েরা যে বিচিত্র বয়নের কাজ করে তা বিস্ময়কর। সহজ শিল্পী এরা। নিঃশব্দ এদের কাজ। মিসেস উই-লিয়ামসের অদৃশ্য না দৃশ্য শাসনের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। ওরা কাজ করে, কথা কয় না। ফুরণে কাজ করে। পিস ওয়ার্ক। কোন্ কাজের কত মজুরী হবে তা তত্ত্বাবধায়কই খেয়াল-খুশিমতো ঠিক ক'রে দেন। বাজারে তার ফ্যান্সি-দাম। দর কষা-কষি নীচেই। একটি অদ্ভুত যুক্তি শুনলাম। বেশী উপার্জন করলে ওরা গোল্লায় যায়, নয়তো কাজে আগ্রহ কমে যায়। অতএব ওদের বাঁচা-মরার মার্জিনটা সব সময় রাখতে হবে। ছোটলোকেরা মদ খেয়ে গোল্লায় যাবে যাঁরা অহোরহ উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে চীৎকার করেন তাঁরা নিজেরা কিন্তু অত্যন্ত দামী পিপেয় চান করেন। এখানেও মানবতার সেই ভাবনা! রাজ্য সরকারের উচিত অন্তত এইসব সুন্দরী শিল্পীদের ন্যায্য মজুরী ও নির্দিষ্ট খাটুনি স্থির করার জন্য এমন প্রতিষ্ঠান গ্রাস করা, নতুবা পাল্টা কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে' তোলা।

উলের গুদাম : কালিম্পং

কালিম্পং-দার্জিলিংয়ে ঘুরে এ সত্য উপলব্ধি করেছি যে এই পাহাড়িয়া অঞ্চলকে যদি আত্মীয়ভাবে পশ্চিম বাঙলাকে রাখতে হয় তবে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া ব্রিটিশ আমলের শাসন ও শোষণভঙ্গিটি পাল্টাতে হবে। নতুবা পাহাড়িয়া অঞ্চলে কত স্কুল করেছি, কত কি করেছি তার পরিসংখ্যান্ নিয়ে ছুটো-ছুটি করলেও কিছু হবে না। আমরা সাংস্কৃতিক দল নিয়ে বিদেশ-বিভূঁয়ে আত্মীয়তার সূত্র খুঁজছি, কিন্তু পশ্চিম-বাঙলার সমতলক্ষেত্রের সংস্কৃতির সঙ্গে পাহাড়িয়া অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিনিময় কতটুকু হয়েছে? দার্জিলিং-কালিম্পংয়ে আন্তর্জাতিক ও বিজাতীয় উর্ণনাভেরা যে জাল বুনছে তা সারা পাহাড়িয়া অঞ্চলকে আচ্ছন্ন করার আগেই যদি ফাঁসিয়ে দিতে হয়, তবে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগই একমাত্র পথ। 'দেবে আর নেবে, মেলাবে মিলিবে।' বসতে হবে একেবারে ওদের মাঝখানে।

ব্রিটিশ আমলে কি ছিল? রাজার জাত বা শাসকের জাত ছিল আলাদা। পাহাড়িয়া ছেলে-মেয়ে ছিল ওদের ইচ্ছার দাস। যেভাবে খুশী ওদের ব্যবহার করেছে। কিন্তু রাজার জাতের হাতে পয়সা ছিল, দরিদ্রকে ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে তারা মোটা টাকায়। আমাদের তেণ্টা আছে রাজার জাতের মতো, কিন্তু বকশিশ দিতে সিকির বেশী বেরোয় না। সুতরাং সে শ্রদ্ধাও আমরা আকর্ষণ করতে পারিনে। শোষণের ঘাঁটিও আমাদের হাতে নেই, সুতরাং সেখানে পয়সা দিয়ে শোষণের ক্ষতিপূরণও আমরা করতে পারব

না। আছে শাসনের চাবুকটি হাতে। তাতে আস্ফালন হবে, পথে-বিপথে জীপের ধুলোই উড়বে।

না, একেবারেই এ দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আমরা অভিনয় করব, ওরা দেখবে; ওরা অভিনয় করবে, আমরা দেখব না, একেবারেই তা নয়। আমরা বলব, ওরা শুনবে, ওদের ভাষা আমরা শুনব না, এ হ'তে পারে না। সরকারী কর্মচারীদের তো বটেই, ওদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার মতো প্রত্যেককে ওদের ভাষা শিখতে হবে, তবেই ওদের কথা কানে উঠবে। আরও মনে করি, নৃতত্ত্বের দিক থেকে আমরা ওদের খুব দূরে নই, এদেরকে সাময়িক প্রয়োজনে ব্যবহার না ক'রে এদের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠতর স্থায়ী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে তা শুভেরই সূচনা করবে।

কালিম্পং-দার্জিলিংয়ে এই একই কথা মনে হ'য়েছে বার বার।

আবার নেমে এলাম সমতলক্ষেত্রে—জলপাইগুড়িতে। সেই শিলিগুড়ি হয়ে, শিলিগুড়ি আসার পথে মংপুকে ডানদিকে ফেলে, তিস্তা চলেছে সঙ্গে। শিলিগুড়ি থেকে ২৭ মাইল জলপাইগুড়ি। ডাক-বাংলোয় সব গলা-কাটা দাম, তেমনি খারাপ খাবার, রাত্রে তো আস্ত এক গান্ধী-পোকাই চিবিয়ে ফেললাম, তার চাইতেও বেশী খারাপ পরিবেষণ ব্যবস্থা। কিন্তু বড় ভাল লাগল ডি-সি শ্রী এস বি রয়কে। চন্দননগরে ও'কে দেখেছিলাম, ভাল লেগেছিল, এবারও ভাল লাগল। ঠিক যেন আফিসিক চাল ও'র নেই। একটা ঘটনা আমার মনে আছে, হয়তো ও'র নেই। সরকারী দপ্তর ভবনে আমার প্রেস-কার্ডটি দেখিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, শ্রী রয়। কি ব্যাপার?—না, পাহারাদার ওকে অনুমতিপত্র ছাড়া যেতে দেবে না। আমি পাহারাদারকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, উনি চন্দননগরের এডমিনিস্ট্রেটর। পাহারাদার বলল, আমি জানি না। তখন আমি ভেতরে গিয়ে কাছে-ধারে যে মন্ত্রী ছিলেন তাঁর ঘরে গিয়ে জানালাম ব্যাপার। তারপর অবিশ্যি সুরাহা হ'ল।

অর্থাৎ ও'র চেহারা বা আচরণ সাধারণ থেকে পৃথক্ নয়, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী থেকে পৃথক্। খুব কৌতূহল প্রকাশ করলেন আমাদের সফরে এবং নদীর বাঁধ দেখব কাল সকালে, তিনি যেচে বললেন, 'আমি ৮টায় ডাক-বাংলোয় পৌঁছে যাব। পৌঁছে গেছলেনও। বেশ খোলামেলা কথা! বললেন, বাঁধ হয়েছে চমৎকার। কিন্তু ভাবনায় পড়েছি, শহরের বর্ষা-জল কি ক'রে সরাবো। নিজেই গরজ ক'রে বললেন, কোথায় কোথায় আগাম জানিয়ে দিতে হবে বলুন, জানিয়েদি। দিয়েছিলেনও।

জলপাইগুড়ি বাঁধও সিন্ধান্তেরই কীর্তি। অদ্ভুত।

এরপর আমরা মানুষের সকল কীর্তি পেছনে ফেলে ভীষণ বনে এলাম। একেবারে বনের মাঝখানে। এখান থেকে সাধারণের যাতায়াতের রাস্তা—সবচাইতে কাছে তিন মাইল। সংরক্ষিত বনের মধ্যে গরুমারা—অবধ্য জন্তুর বনভূমি। জেনে-শুনেও স্বাধীনোত্তর কালের একজন আই জি ৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তারিখটা আর বললাম না, ফরেস্ট বাংলোয় খাতায় মন্তব্য লিখেছেন—'শিকার করবার চমৎকার জায়গা' (এ গুড প্লেস ফর শুটিং)। কে একজন তীর কেটে পাল্টা মন্তব্য লিখেছেন, 'এটা অবধ্য জন্তুর বনভূমি।' আর, সেই তারিখেই আই জির দেখাদেখি জনৈক ডিসি-ডিডি লিখেছেন, 'আমারও তাই মত' (অর্থাৎ শিকার করবার চমৎকার জায়গাই বটে)। ইংরিজীটা হ'ল, 'আই এগ্রি।' আমাদের সেই অনামা টীকাকার এখানেও তীর কেটে পাশে লিখেছেন, এ ছাড়া আপনি কীই বা করতে পারতেন? (হোয়াট এল্‌স কুড ইউ ডু?)

১০০ মাইল ট্রাকে চ'ড়ে শরীর যখন আমার অবসন্ন, তখন হঠাৎ ঘনবনে আলো ফেলে ফেলে আমরা চলেছি। এ বনে হাতী আছে, বাঘ আছে, গণ্ডার একটু পরেই—ঐ স্যাংচুয়ারীতে। গরুমারা ডাক-বাংলোর চারদিকে হাতী-নিবারণী খাদ, লোক-পারাপারের জন্য ড্র-ব্রিজ। বাঘ নয়, হাতী নয়, গরুমারায় গণ্ডার দেখব ব'লে এলাম। যখন পৌঁছলাম তখন ঘনবনে অনেকটা রাত।

(৬)

যখন শুনলাম গরুমারায় গণ্ডারের দেখা মিলতেও পারে, নাও পারে, তখন আমার উৎসাহ নিভে গেল। কেবল হাতী-চড়ার আনন্দে কপাল ঠুকতে যাব? হাতী-চড়ার অভিজ্ঞতা আমার ভালই ছিল। ও আমাকে নূতন ক'রে আকর্ষণ করতে পারল না। আমি ফায়ারিং লাইনে কপাল গুনতে বসলাম। চোখে নানারকমের মায়া। পাতানড়ে, গণ্ডারের মুখখানা খুঁজি। নীচেই একটি স্রোতস্বতী। সন্ধ্যার আবছায়ায় নিশ্চয়ই বাঘ আসবে জল খেতে এখানে। দূরে ওটা কি? না, নড়নচড়ন নেই। গাছের মস্ত গুঁড়ি হ'তে পারে। বহুদিন ভূতের মতো পড়ে আছে ওখানে। কিন্তু একটু যেন কান চুলকোল। হঠাৎ ওটা নড়ে চড়ে বসে না—হঠাৎ একটা জংলি হাতী? না, হাতীরা দল বেঁধে ঘোরে। হ্যাঁ, সমাজে অন্যায় কাজের জন্য দল-তাড়ানো হাতীও থাকে বনে। তাদের নাম মাকনা। নানা অনাসৃষ্টি করে। কুলবধূর দিকে বড্ড অন্যায় নজর। পোষা মেয়ে হাতীর কথা বলছি। এদের আশে-

পাশে ঘোরাফেরা করে, জামার কলার টেনে স্মার্ট হয়, নয়তো শিষ দেয়। সেট-মাহুত-বনপ্রহরীদের কেউ না কেউ হৈ-হৈ ক'রে ওঠে, পালিয়ে যায়।

ওমা, এরই মধ্যে একদিন গরুমারা বাংলোর কুলবধূকে ইডেনে পাঠানোর মতো হ'ল। কে জানে, মাকুনার না যূথ-বন্ধ দে'তোর কাজ? জানা অবশ্য গেল। সন্তানের ওপর দে'তো-পিতার বড় টান। বাচ্চা যখন সাতদিনের তখন একদিন দল ক'রে ওরা হাজির, দলনেতা দে'তো। ব্যস, বাচ্চাকে নিয়ে রওনা। সর্বনাশ, সরকারী সম্পদ অপহরণ না হোক, রক্ষায় অক্ষমতার দায়ে বনপ্রহরীর চাকরি তো যাবেই মাথা না যায়! মাথায় বুদ্ধি খেলিয়ে বাচ্চার মাকেও সে ছেড়ে দিল। বাবুরা আসতে না আসতে বাচ্চাও গেল, মাও গেল। পোষা মেয়ে-হাতী বুনো দলে ভিড়ে গেল।

এখন উপায়? কারও মাথা নিলে মাথাটাই যাবে, হাতী ফিরবে না।

কিন্তু বাবুও তেমনি, দুর্ধর্ষ বাবু। বনে থাকতে থাকতে মানুষের একেবারে ভয় কমে যায় এমন কাহিনী আমি আরও শুনেছি। দিনাজপুরের বংশীহারিতে এক ভদ্রলোক হাতার ঘায়ে আক্রমণোদ্যত দুই গোক্ষুরকে ঘায়েল করেছিলেন। এবার যা শুনলাম, তাতে মনে হল, আসলে মানুষের ভয় ব'লে কোন-কিছু নেই।

আর এক হাতীর পিঠে চড়ে বাবু চললেন অপহৃতা সীতাকে উদ্ধারের জন্য। কোথায় সেই অপহারকের দল, এই গভীর পথে কোনদিকে গেল? এক ভরসা সাত-দিনের হাতীর বাচ্চাটি। সে গজেন্দ্রগমনে যেতে পারবে না নিশ্চয়ই।

বনে হাতীর দল চলে জানান দিয়ে। মট্‌মট্‌ ক'রে গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে যায়। দূরে দূরে ওদের চলার নোটিশ পাওয়া যায়। উদ্ধারকারীরা 'কান পেতে রয়' আর এগিয়ে চলে। এও কি সম্ভব?

হ'ল তো সম্ভব। কানে মট্‌মটে আওয়াজ এল। হুঁ, ঠিক ঐ দলই বটে। বাচ্চা আর মা'টি দলের পেছনে। দে'তো আর দলবলেরা নজর রেখে চলেছে। গিয়ে হুস ক'রে টানলেই তো হবে না বাচ্চাটিকে। একেবারে প্রলয়কাণ্ড হবে। বুনোদের আইন-কানুন আলাদা। এমন নয় যে, আমার মেয়ে-ছেলেকে ধরে এনেছ ব'লে তোমায় অপহরণের দায়ে গ্রেপ্তার করলাম।

সুতরাং, কৌশল। কাহিনীটা সেই দুর্ধর্ষ বাবুর কাছে শোনা নয়। বলেছিলেন ডি-এফ-ও বারীন দে। বলেই বলেছিলেন, শুনতে হয় তো ও'র মুখে, গুপ্ত সাহেবের কাছে, আমি আর কি বললাম? বলেছিলাম—যা বললেন গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। তারপর?

উদ্ধারকারী দল মতলব আঁটলেন—যে ক'রে হোক বাচ্চাটিকে (সুতরাং মাটিকেও) দল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। অথচ জীবহত্যা এ বনে নিষেধ। হাতীকে ভয় দেখানো চলবে, আহতও করা চলবে না। কিন্তু দে'তোরা নজর রেখে চলেছে। পোষা হাতীর ওপর গুটি তিনেক মানুষ দেখে সর্দার-হাতী শঙ্খধ্বনি করল। এর পরই সারাটি বন যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। না, সম্মুখ-সমর অসম্ভব।

উদ্ধারকারীরা ওদের আড়ালে গেল কিন্তু হঠাৎ একটি আগুনের হল্কা 'যূথ-বন্ধের' গায়ে আঁচ লাগিয়ে গেল। ওরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ল। পালাই পালাই ভাব। মা-বাচ্চা কোথায়? আবার একটি আগুনের হল্কা। ব্যস, চাচা আপন বাঁচা।

বাচ্চার জন্য মাও পিছিয়ে পড়েছে। এবার দল-ছাড়া। কিন্তু এক্ষুণি হয়তো এসে পড়বে ওরা। পোষা হাতী পালানো-হাতীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চল বাড়ি ফিরে। উঁহু, যাব না। বন ভাল। চল বলছি। উহুঁ। ও, ভাল কথার মানুষ নও তুমি?

গুপ্তবাবু মাহুতকে বললেন, লাফিয়ে পড় ওর ঘাড়ে, ও না যায় তো ওর ঘাড়ে যাবে। কিন্তু মাহুতও গররাজী। ও, তুমিও ভাল কথার মানুষ নও। দুর্ধর্ষ বাবু দিলেন মাহুতকে ঠেলে ফেলে, পড়বি তো পড় একেবারে পালানো হাতীর ঘাড়ে। ব্যস, ধুলো-পড়া। মাহুতের হাতে অঙ্কুশ। চল, এবার বাড়ি।

হু যাবে, যাও দেখি! পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দুই দে'তো। পটাপট কান নাড়ছে। এবার একেবারে মারমুখী। কিন্তু এ স্যাংচুয়ারী। অবধ্য জন্তুর বনভূমি। মরবে তবু মারবে না। বড় জোর ভয় দেখাও আপন প্রাণ বাঁচাতে। সুতরাং, আবার দুই বিদ্যুৎগতি গুলির হল্কা আর গা-ছোঁয়ানো অসহ্য আঁচ। এক দে'তো তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি, আর একটি চোচা দৌড়। এবার ওরা সত্যিই অদৃশ্য হ'ল। তবে ঘনবন, আবার-না কুলো কান পটাপট্ নেড়ে শুন্ডমানেরা দেখা দেয়। সাবধানে চলতে হ'ল।

সাবধানতা কি শুধু ঐ জন্যই? সাতদিনের শিশু। হোক্ না হাতীর বাচ্চা। অপরের অপহরণে বাধা দেবার চেষ্টায় শ্রান্তি আছে, অবিশ্রান্ত চলায় ক্লান্তি আছে, তারপর এই যুদ্ধের পরিণতিতে ফিরে চলার সবটা পথ আছে। সাতদিনের বাচ্চার সয়? ডাক-বাংলোয় আসতে এই খানটায় খাড়া পাহাড়ের মতো। দুঃসাধ্য এ আরোহণ। দুই বড় হাতীতে ওকে একরকম হোল্ডলে-বাঁধা বেডিংয়ের মতো ঠেলে ঠেলে তুলতে হ'ল। বেচারীর প্রাণান্ত।

সত্যিই প্রাণান্ত হ'ল নাকি? ডাক-বাংলোর উঠোনে এসে পড়ে সেই যে বাচ্চাটা চিৎপটাং হয়ে পড়ল দুইদিন দুই রাত ওর আর ঘুম ভাঙে না। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি সব্বার চিন্তা কাটিয়ে ও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। পাছে আবার ওর বাবা ওকে নিতে আসে এজন্য বাচ্চাকে গরুমারা থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। আমাদের আর বাচ্চাটিকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

বুনো কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখার সৌভাগ্য হয়নি সেখানে। সেদিক থেকে গরুমারায় আমাদের অবস্থান নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু এখানকার রান্না আর ফালাকাটার মিষ্টি আজও যেন মুখে লেগে আছে।

নীলপাড়ার ব্যাপারটা উল্টো। এখানে রান্নার গৌণ নালিশ জলদাপাড়ার জঙ্গলে আপন পরিবেশে মহীয়ান্ গণ্ডার দেখে মিটে তো গেছেই, আমরণের সঞ্চয় আছে সেই অভাবনীয় দৃশ্য।

বেলা দেড়টায় গরুমারা ছেড়ে এলাম। জঙ্গলের পথে সাত মাইল চলে লাটাগুড়ি পেঁাছলাম। তারপর ময়নাগুড়ি, গয়েরকাটা, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, রাজাভাতখাওয়া, হাসিমারা হ'য়ে নীলপাড়া ডাক-বাংলোয় পেঁাছলাম রাত ৮টায়। রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গলেই রাত হ'য়ে গেছে। দয়া ক'রে হাতীর দল বেরোলেই হ'ল আর কি। হাসিমারায় আরও রাত। তারপর নীলপাড়ার পথে পথ গেল হারিয়ে। একা নবকুমার নই যে, কপালকুণ্ডলা এসে বলবে, পথ হারিয়েছ? সঙ্গে সত্যি সত্যিই অনেক কুমার ছিলেন, কিন্তু এ এক দঙ্গল। দুটি ট্রাক-ভর্তি লোক। ঘন অন্ধকার—সুমুখে আড়াআড়ি বাঁশ দিয়ে পথ বন্ধ, নোটিশে প্রবেশ নিষেধ।

আমরা এসে পড়েছি এক বিমানক্ষেত্রের প্রবেশমুখে। যুদ্ধে তৈরী বিমানক্ষেত্র, এখন চায়ের মালিকেরা ব্যবহার করেন। কপালকুণ্ডলা না হলে সেই অন্ধকারে একটি ভূত যেন কথা ক'য়ে উঠল। সেই অদৃশ্য বাণীকণ্ঠ নেপালী ভাষায় যা বলল, তার মর্ম এই যে, পথটা ভুলই হয়েছে তবে, বিমানক্ষেত্র দিয়ে নিষিদ্ধ যাত্রা করলেও নীলপাড়া বাংলো পাওয়া যায়।

এই লোকটি এই ঘন অন্ধকারে কি করছিল একা?

পেলাম বাংলোর সন্ধান। দোতলা, বহুল স্বাচ্ছন্দ্যের বাংলো। রাতে শুয়েছি তো প্রবল হ'য়ে এল আকাশের পাগল বাতাস। জানালাগুলোয় সশব্দে এসে তো লাগলই, মশারি অমল ধবল পাল হ'য়ে উড়তে লাগল। সহ্য করা যেত। কিন্তু এতো শুকনো নয়, এ জলদাপাড়ার এলাকা। সুতরাং, জলও এল প্রবল বেগে। বাতাসের মতো পাগল, উদ্দাম। কি অবিশ্রান্তই হ'ল জলাগম, না-থামা পর্যন্ত উপমাও মনে হ'ল না। লোকে বলে বেড়াল-কুকুরের মতো বৃষ্টি; হাতী-গণ্ডারের দেশেও একই তুলনা চলবে কেন?

মানুষের হাঁক-ডাকই কি কম? ঝড়-বৃষ্টি ক'মে যাবার পরই হাসিমারার ওদিক থেকে স্লোগানের সমস্বর ধ্বনি আমাদের তন্দ্রা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিল। চা-বাগিচার শ্রমিক অঞ্চলে প্রবল অসন্তোষ চলছে।

পরদিন বেলা তিনটেয় চললাম আমাদের লক্ষ্যস্থলে। তাকে দেখব। মনটা শুধু বলছে জলদাপাড়া, জলদাপাড়া। নীলপাড়ায় জলদাপাড়াই হ'চ্ছে অবধ্য জন্তুর বনভূমি। পৌনে এক মাইল ট্রাকেই গেলাম। তারপর উঠলাম হাতীতে। আমাদের হাতীর নাম লক্ষ্মীপিয়ারী, মাহুতের নাম মখিশরণ।

দলে ছিল চার হাতী। মাহুত ছাড়া প্রত্যেক হাতীতে তিনজন ক'রে। বনের প্রথম স্তর পার হ'য়ে গেলাম। তারপর তোরসা নদী! পার হ'তেই, চুপ! আর কথা নয়। পুণ্ডীবনে হাতী ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। চার হাতী দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। আমাদের দলে লক্ষ্মীপিয়ারী আর রাজলক্ষ্মী ওরফে মাতঙ্গী। লক্ষ্মীপিয়ারীতে আমি (মাহুতের পেছনেই), প্রশান্ত সরকার ওরফে প্যাসিফিকো গবর্ণমেণ্টাস, আর রবি গাঙ্গুলী ওরফে প্রিন্স মুডিম্যান অব বেলেঘাটা। দ্বিতীয় হাতীতে আমাদের সেই বারে-বারে হারিয়ে যাওয়া মহেন্দ্র চক্রবর্তী আর কোচবিহার ডিভিসনের ডি এফ ও শ্রী এস মিশ্র (শান্ত শুভ্র সংযত হাসির অধিকারী)। ওদের মাহুত দর্শন থারু।

চুপ তো চুপ। খাঁটি বাঙালী পোশাকে দুঃখ অনেক। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি বাঙালী যে প্রকৃতপক্ষে নগ্নই, হাতীর গর্দানায় ঘষা লেগে লেগে তো চর্মে চর্মে উপলব্ধি হ'ল। কর্ণের মতো, দুঃসহ হ'লেও, নিস্তব্ধতা না ভেঙে সইতে হবে। অথচ, আমি যে জায়গায় বসেছি ও হ'চ্ছে রাজাসন। লং প্যাণ্ট হ'লেই সম্রাট। কিন্তু উপায় নেই, কৃশ তনু যার, খাঁটি বঙ্গসন্তান না হয়ে উপায়ই বা কি তাঁর?

চুপ তো চুপ, দেড় ঘণ্টা চুপ। গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এই যে, এই যে (হৈ হৈ ক'রে নয়, আঙুলের ইঙ্গিতে)। হ্যাঁ—এই, এই। ঐ গেছে। মাহুত হাতীকে সেই পথে নিয়ে চলে। যাঃ চলে! কোথায় গেল তার পায়ের চিহ্ন? নেই।

আবার চল গাছের ডাল মটকে, ঘন ঘাস-বন ভেদ ক'রে। হঠাৎ নজরে পড়ল বিরাট মলস্তূপ, পুরোনো এবং সদ্য। মাহুত অনুচ্চস্বরে আমায় শুনিয়ে বলল, কাছে-ধারেই আছে, ব'লে সদ্যত্যক্ত একটি মলস্তূপ দেখিয়ে দিল। আরও বলল যে,

ওদের অভ্যেস একই জায়গায় অপরিহার্য এই জৈবিককৃত্যটি সম্পাদন করা। আবার একটি গণ্ডারের পদচিহ্ন পাওয়া গেল। চাপা উল্লাসে ঐ পদ অনুসরণ করলাম। ঘুরলাম। তারপর আবার কোথায় কিভাবে বিলীন হ'য়ে গেল পদচিহ্ন ঘুরপাক খেয়েও হদিশ করা গেল না।

শ্রী মিশ্র বললেন, আজ ব্যর্থশ্রম। কাল সকালে দেখাবই। মনটা একেবারে দমে গেল। আবার কাল? আজ কিছুতেই নয়?

হাতী ঘুরল। চলল ফেরার পথে। একটু পরে দেখি শ্রী মিশ্রই তাঁর ছোট্ট হাতী নিয়ে অন্য পথ ধরলেন। ফিস্‌-ফিসানিতে জানা গেল, আর একটি সদ্য পদচিহ্ন পাওয়া গেছে। চলছি ধীরে ধীরে। সামান্য একটু হাতীর চলার খসখসে শব্দ। ছপ ছপ ছপ ছপ। আস্তে। চেপে। ঠিক পাওয়া গেছে তার নাগাল।

মাহুত বলল, আমার হাতী বার বার শুঁড় তুলছে। কাছে পিঠেই আছে। ব'লেই হাতীর মাথায় মারল অঙ্কুশ। লক্ষ্মীপিয়ারীর মাথা ফুটো হ'য়ে গেল। লক্ষ্মীপিয়ারী ভয় পেল নাকি? যদি ক্ষেপে যায়? ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্। চলেছি। ছোট্ট একটি স্রোতস্বতী। এখন সামান্য জল। লতা এসে পড়েছে জলের ওপর অজস্র। অনেক ঝোপ এলিয়ে পড়েছে স্রোতস্বতীর কোলে। গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে ওর বুকে। ওরই ডান তীরে দিয়ে চলেছি। ফাঁকা, ঝোপ, ফাঁকা, ঝোপ। স্রোতস্বতী বে'কে গেছে এইখানে। আমরাও বে'কেছি—

হুড়ুস ক'রে ওপারের ঘন ঘাসবন ভেদ ক'রে কে পালিয়ে গেল? উ'চু ঘাস-বনগুলো তখনও আলোড়নে দুলছে। আমার মনও নৈরাশ্যের আলোড়নে দুলছে, এত কাছে এসেও সে পালালো? কেমন একটি ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ যেন রয়েছে। আমরা এ তীরের একেবারে ঝোপ-ঝাড় ঘে'ষে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের হাতীর আর একটি পা—ব্যস, আমরা স্রোতস্বতীর মধ্যে পড়ব। কিন্তু আমাদের হাতী যেন এগোতে চায় না। শ্রী মিশ্র বিরক্ত হ'য়ে মাহুতকে এগোবার ইঙ্গিত করলেন, মাহুত লক্ষ্মীপিয়ারীর গলায় মারল পায়ের গুঁতো, সেই মুহূর্তে—
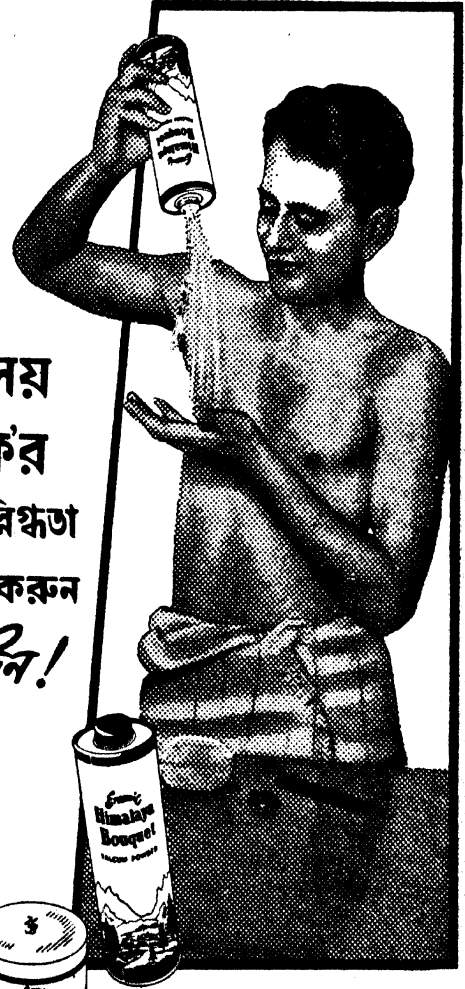
ঝ্ুপ ক'রে ছোট্ট স্রোতস্বতীর ওপারে খোলা জায়গায় মূর্তিমান উঠে দাঁড়াল। একেবারে পূর্ণচন্দ্র। রোখা-রোখা ভয়-ভয় ভাব। কালো, মোষের মতো নরম চাম নয়, কিন্তু দেখতে মোষের মতো। উঁহ্ু হ'ল না, অনেকটা বেঁটে কালো সুপুষ্ট গাইয়ের মতো। তাও ঠিক নয়, ওর নাকের ডগায় খড়্গ। সব মিলিয়ে অপরূপ। গা বেয়ে রূপোর মতো জলের বিন্দু পড়ছে। ওয়াটার প্রুফের মতো। এরই নাম গণ্ডার? মুক্ত স্বাধীন বুনো গণ্ডার? এই?

মূর্তিমান সেই যে দাঁড়িয়ে থাকল, আর তো নড়ে না। দেখবে, দেখ। সাংবাদিক তোমরা ছবি তুলবে, তোলো। এই আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সত্যি, বিশ্বাস হয় না, দেখলাম। যাকে এত খুঁজেছি, যার দেখার আশায় উদগ্র আগ্রহে এসেছি তাকে দেখে যেন বিস্মিত হ'লাম না, মুগ্ধ হ'লাম। যেন দেখা হবার কথা ছিল। দেখা হ'ল। দেখা হ'ল ওর নিজস্ব পরিবেশে, আমাদের অবাঞ্ছিত আগমনে খানিকটা বিস্মিত পরিবেশে।

শ্রী মিশ্র বললেন, আর নয়, আর ওকে বিরক্ত করা নয়, চলুন।

চলুন। কিন্তু আফসোসে মন ভ'রে গেল। আধুনিক যন্ত্রে স্মৃতি ধ'রে রাখার উপায় ছিল না আমাদের। কোন ফটো-গ্রাফার ছিলেন না আমাদের সঙ্গে। দু'জন ফটোগ্রাফারই গেছেন আর দুটি হাতীতে—আলাদা দলে। যাত্রাকালে একজন উঠেও ছিলেন, আমি যে-হাতীতে ছিলাম সেই হাতীতে। বসার অসুবিধে বোধ ক'রে তিনি সে-হাতী ছেড়ে গেছলেন। ম্যাক-ডোনাল্ড নিজে ছবি তোলেন, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ এই অভিযানে আদৌ আসেননি।

সুতরাং, স্মৃতিপটে দাগ বুলোবার কোন অবলম্বন থাকল না আমাদের। আমাদের রেটিনায় যেটুকু ধরা পড়ে তার ছাপ পড়ে স্মৃতিপটে, কিন্তু বড় সহজে বিলীয়মান এই ছাপের রেখাগুলো।

শ্রী মিশ্রের কাছ থেকে একটা অঙ্ক বা জ্যামিতির কাঠামোয় এই স্মৃতিকে রাখতে চেয়েছি। দেড় ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর ৪ ফুট উঁচু, ৯ ফুট লম্বা এক গণ্ডারের দেখা পেলাম। ওর খাঁড়াটা হবে ৯-১০ ইঞ্চি। উনি শ্রীমান্ গণ্ডার। শ্রীমতী নয়। রঙ কালো। কিন্তু 'কালো তা সে যতই কালো হোক্ দেখেছি তার' রুষ্ট ভয়ের চোখ। কোদালবস্তি জলদা-পাড়া ফায়ার লাইনে শিষমারা নদীতে সে চান করছিল।

সত্যি দেখে মনেও হয়েছিল একথা। শ্রীমতী পারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, হয়তো ও'র চুলঝাড়াও হ'য়ে গেছল ভরা কলসীটির পাশে; শ্রীমান জলে গা ডুবিয়ে সাবান মেখে চান করছিলেন। বিকেলের গা ধোয়াধুয়ির পাট। হয়তো দুজনে নিভৃতে আলাপও হচ্ছিল একটু, ছেলে-মেয়ে বখে যাওয়ার কথা, নয়তো বয়সোচিত ফষ্টি-নষ্টি।

এমন সময় দুটি হাতী সাতটি মানুষের আবির্ভাব। শ্রীমতী লজ্জায় জিভ কেটে ঘোমটা টেনে ছুট একেবারে অন্দর মহলে। অসূর্যম্পশ্যা। কর্তা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, কে? দাঁড়াও তবে, ব'লে চান টান ফেলে একেবারে রুখে দাঁড়ালেন। ও, তোমরা নিরীহ সাংবাদিকের দল?

ব'লে দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তিমান।

আমরাই ফিরে এলাম। এরপর কল-কল ক'রে কথা কইছি আমরা। নূতন অভিজ্ঞতায় মন-মাথা ডগমগ। জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এলাম নদীতে। নদী দিয়ে এগোচ্ছি, এমন সময় আমি আবার চীৎকার ক'রে উঠলাম। ঐ যে, ঐ যে আর একটি।

দেখলাম, নদী পার হ'য়ে আমরা যে বন থেকে বেরোলাম সেই বনে উঠছে পার বেয়ে। ইঁটের মতোর রঙ যেন ওর। আমি প্রায় সবটাই দেখেছিলাম। ও'রাও, কেউ কেউ, খানিকটা খানিকটা দেখলেন। শ্রী মিশ্র বললেন, আমার মনে হ'য়েছিল মোষ বুঝিবা। কিন্তু এখানে তো মোষ আসবার কথা নয়।

চললাম ওর পেছনে। নদীর পারে ওর পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেল। নিঃসন্দেহে গণ্ডার। ওপারে চেয়ে দেখি, আমাদের বন্ধুদের দলটি বন থেকে বেরোচ্ছে নদীর দিকে। ও'রা কি দেখেছেন কোন গণ্ডার —অথবা এই পলায়মান গণ্ডারটি? ঐ দলে হাতী ছিল রূপকালী ওরফে আনার-কলি আর সুরেশ বাহাদুর। ওদের পিঠে ছিলেন অবনীদা, ফটোগ্রাফার অসিত মুখার্জি, বাগচী মশাই, ফটোগ্রাফার সরকার, রেঞ্জ অফিসার শ্রী জে সি চক্রবর্তী এবং আলিপুরদুয়ারের সাব-ডিভিসনাল পাব্লিসিটি অফিসার।

হ্যাঁ, ও'রা দেখেছিলেন গণ্ডার। ইটে-রঙের গণ্ডারটির উদ্দেশে ব্যর্থ ছুটোছুটি ক'রে আমরা যখন নদী পার হ'লাম তখন ও'দের সঙ্গে দেখা। ও'রা দেখেছিলেন একটি গণ্ডার, আমাদের মতো অমন স্পষ্ট নয়, পলায়মান অস্পষ্ট ভারি দেহের খানিকটা। তাতেই খুশী। কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রিন্স মুডিম্যানের কাহিনী-কাকলীতে ওদের গল্প মৃদু হ'য়ে এল। ধন্যবাদ জে সি চক্রবর্তী, তিনি কথা দিয়ে-ছিলেন গণ্ডারের দেখা পাওয়া যাবেই, জোর গলায় একথা কে বলতে পারেন? পারেন রেঞ্জার চক্রবর্তী আর ডি-এফ-ও মিশ্র। হ্যাঁ, তাঁরা কথা রেখেছিলেন বটে। পরদিন তাঁরা ভোরের অভিযানে অল্প সময়ের ভেতর পাঁচটি গণ্ডার দেখিয়েছেন সাংবাদিকদের। এদলে আমি যাইনি। পঞ্চাশটি গণ্ডার আছে এই অবধ্য জন্তুর বনভূমিতে। দেখা পাওয়া যাবেই আমার কেন যেন মনে হয়েছিল যা বিরল তাকে দেখার আধিক্যে সহজ ক'রে ফেলব না, আমার স্মৃতিপটে শিষমারা নদীপারে পূর্ণাঙ্গ রোখা-রোখা ভীত-সন্ত্রস্তের মূর্তিমান কালো গণ্ডারটিই আঁকা থাক্। আর নয়।

শেষ

কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীসরলাবালা সরকার

যখন মাদ্রাজেই স্বামীজীর আগমনে এত উৎসাহ ও আন্দোলন, তখন তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতায় কি আনন্দের সাড়া পড়িয়াছিল কল্পনাতেই তাহার খানিকটা বুঝা যায়।

স্বামীজীর গুরুভাইরা—তাঁহারা তো বিবেকানন্দগতপ্রাণ। তাঁহারা আলমবাজারের মঠেই স্বামীজীর আগমনের জন্য আয়োজন করিতেছেন, আবার কলিকাতায় অভিনন্দনের উদ্যোগ আয়োজনের সহিতও যোগ রাখিতেছেন। বরানগরের বাড়ি ছিল খুব বড় আর ভাঙ্গাচোরা। এ-বাড়িও অবশ্য ভাঙ্গা বাড়ি, কিন্তু ততটা অপরিষ্কার ছিল না। যাহা হউক সেই বাড়িই যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে।

কলিকাতায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছিল এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সেই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে স্বামীজী জাহাজ হইতে নামিয়া যে পথ দিয়া আসিবেন, সেইসব রাস্তার দুইধার পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল এবং পথের মাঝে মাঝে গেটও করা হইয়াছিল। সার্কুলার রোডে যে গেটটি করা হইয়াছিল. তাহার মাথায় লেখা ছিল—'এস স্বামীজী'। হ্যারিসন রোডের গেটটির উপরে লেখা ছিল 'জয় রামকৃষ্ণ' এবং রিপন কলেজের সম্মুখে যে গেটটি করা হইয়াছিল তাহার উপরে লেখা ছিল 'স্বাগত!'

এই রিপন কলেজেই স্বামীজীকে প্রাথমিক অভিনন্দন দেওয়া হইবে এই রকম ঠিক করা হইয়াছিল এবং খিদিরপুর ডক হইতে শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সেদিন যে দেশবাসীর কি আনন্দের দিন, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বহুদিনের পরাধীন এক জাতি যেন এক ক্ষণিকের স্বাধীনতার স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে। জয়ী হইয়া আসিয়াছেন, পরাজিত জাতিরই এক প্রতিনিধি জেতৃ জাতির দেশে গিয়া। এ জয় কাহারও ব্যক্তিগত জয় নয়, এ জয় সমগ্র দেশের জয়, প্রত্যেক দেশবাসীই এই জয়ের অংশীদার। প্রত্যেক দেশবাসীই সেদিন তা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র সে দিন স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন—

(সাহানা-ধামার)

ভুবন ভ্রমণ কর যোগীবর, যাঁর ধ্যানে—
তাঁহারি সন্তানগণে চেয়ে আছে পথপানে।
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানবচিত প্রভুর গৌরব গানে,—
নানা দেশে, নানাভাষে—জয়ধ্বনি একতালে।
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব পুলক আলোক দানে।
জনমন পুলকিত ঘোর নিশা অবসানে।

বহুকণ্ঠে এই গীতটি সুর লয়ে গান করা হইয়াছিল। সেদিন মনে হইয়াছিল পরাধীনা ভারতমাতা আজ আর দুঃখিনী নন, তিনি আজ বীরপুত্রের গৌরবে গৌরবিনী। তাঁহার সেই বীরপুত্র, যে—

কোথা দূরে মিলালো সংশয়,—
মা, তোর দুলাল সেই— সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
দশদিক গাহে তার জয়!
ভাই বলি সমাদরে পতিতে হৃদয়ে ধরে,
আতুরে দেবতা করি মানে,—
দরিদ্র অভাগা জন তার পূজ্য নারায়ণ
ধনী দীনে ভেদ নাহি জানে—।
যাঁর মা এমন ছেলে, তাঁরে কে দুঃখিনী বলে?
মৃত্যু জয়ী সে চির অমর,
বীর পুত্র তব বীরেশ্বর!

সে দিনের সেই আনন্দক্ষণের স্মৃতির যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁহারা যেভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, আজ বর্ণনায় তাহার চিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়।

খুব ভোরেই জাহাজ খিদিরপুরে পৌঁছিয়াছিল। ডকে জাহাজ পৌঁছিবামাত্র ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে গঙ্গার তরঙ্গরাশি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বামীজীর জন্য স্পেশ্যাল ট্রেন প্রস্তুত ছিল, সেই ট্রেনে সকাল সাড়ে সাতটায় স্বামীজী শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিলেন। মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, পুষ্পমাল্যভূষিত করিয়া তাঁহারা স্বামীজীকে ও তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণকে একখানি ফিটন গাড়িতে তুলিলেন। তখনকার দিনে 'মোটর কার' বলিয়া কিছু ছিল না।

স্বামীজী গাড়িতে উঠিবার পর স্টেশনে আগত যুবকগণ আগাইয়া আসিয়া গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিলেন। বাগবাজারের অনেকেই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল, শরচ্চন্দ্র

সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত (দত্ত-বাবু), অপরেশ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্গাপদ ঘোষ, রামকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি অনেকেই সেদিন গাড়ি টানিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় তখনও ডাক্তার হইয়া বাহির হন নাই। তিনি কিছুদিন আগে লোকান্তরিত হইয়াছেন; মৃত্যুর অল্পদিন আগেও তিনি সেদিনের কথা আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই দলে ছিলেন। তিনি আজিও সেই দিনের কথা স্মরণ করেন।

গাড়ি রিপন কলেজের গেটের সম্মুখে পৌঁছিলে ভিড় এতই বাড়িয়া গেল যে, সেই ভিড়ের চাপে অনেকেই চাপা পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশত সেদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। অপরেশবাবু লোকের পায়ের তলায় পড়িয়া গিয়াছিলেন, মণি গুপ্ত মহাশয় অতি কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

এই দিন আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তখনকার দিনে ঘটা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ এমন পর্দানশীন ছিলেন যে, গঙ্গাস্নানে যাইতে হইলে পাল্কিতে করিয়া তাঁহাদের গঙ্গাগর্ভে নামিয়া স্নান করিতে হইত। কিন্তু সেদিন সেই প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া বিডন স্ট্রীটের চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর পুরমহিলাগণ প্রকাশ্য রাজপথে স্বামীজীকে ধূপ দীপ দিয়া আরতি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, স্বামীজীর আগমন সেদিন লোকের মনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সেদিন বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে স্বামীজীর মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল এবং *গোপাল শীল মহাশয়ের কাশীপুরের বাগান বাড়িতে তাঁহার এবং তাঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামীজী আহারান্তে পশুপতি বাবুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে কাশীপুরে গেলেন বটে, কিন্তু রাত্রে তাঁহার গুরুভাইদের নিকট আলমবাজার মঠে গিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

টাউন হলে অভিনন্দন দিতে কয়েক দিন দেরি হইবে জানিয়া ইতিমধ্যেই বাগবাজারে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর নাট মন্দিরে তাঁহাকে একটি অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন অল্পবয়স্ক যুবক, কিন্তু তিনিই এই অভিনন্দনদান ব্যাপারে অগ্রণী হইলেন এবং বাগবাজারের অন্যান্য যুবকবৃন্দ, বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবুও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

ইহার পর যেটি বিশেষ অভিনন্দন, সেটি টাউন হলে না হইয়া শোভাবাজারে স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাড়ির প্রকাণ্ড উঠানে করিবার আয়োজন করা হইল। এই দিনের সভায় কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন।

এই সভায় অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী যে ভাষণ দিয়াছিলেন, সেটি প্রধানত বাঙ্গলার যুবকগণকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। সেই ভাষণ হইতে এখানে সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ইহাই ঋষিবাক্য। ভারতের প্রতি ধূলিকণাও পবিত্র এবং এই ভারতবর্ষ এক মহাতীর্থ।

ভারতের অধিবাসিগণের আচার ব্যবহারকে যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, সকল দেশের আচার ব্যবহারের ভিতরেই কোন না কোন গভীর তাৎপর্য আছে, সেই জন্য কোন আচরণকেই উপহাস করা উচিত নয়।

ভারতবর্ষের যে যত দরিদ্র সে তত সাধু।

হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করাই মহা বীরত্ব।

আমার দ্বারা যা কিছু জীবনপ্রদ, বলপ্রদ ও পবিত্র কার্য সাধিত হয়েছে অথবা যা কিছু আমি বলেছি সে সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তির খেলা, তাঁরই বাণী এবং তিনিই স্বয়ং।

ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ মহাশক্তির বিকাশ।

ভারতবাসী রাজনীতি, সমাজ সংস্কার এবং অন্যান্য যাহা কিছুই হউক ধর্মের মাধ্যমে না হ'লে গ্রহণ করতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সার্বভৌম ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর ভ্রাতৃভাব স্বরূপ।

মহান্ এক আদর্শ পুরুষের উপর একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগই যে কোন জাতির উত্থানের উপায়। একই পতাকা তলে সকলকে সমবেত হ'তে হবে।

ভারতবাসীর ইহাই প্রকৃতি যে তারা কোন ধর্ম বীরকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ না করলে তার উঠতে পারবে না ও মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণই সেই আদর্শ পুরুষ, অতএব আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তাঁকেই আদর্শ করা প্রয়োজন।

আমাদের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক সে জন্য তাঁর কাজ থেমে থাকবে না। তিনি সামান্য ধূলিকণা থেকেও শত শত কর্মী সৃষ্টি করতে পারেন।

বিস্তৃতিই জীবনের লক্ষণ। আমাদের হয় সমস্ত জগৎ জয় করতে হবে না হয় লুপ্ত হয়ে যেতে হবে। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। সুতরাং বিদেশে যেতেই হবে। ভারতের বাইরে অন্যান্য জাতি কিভাবে উন্নতি করছে তা লক্ষ্য করতে হবে এবং এই তুলনার দ্বারাই বোঝা যাবে যে আমরা কোথায় পড়ে আছি। দিতেও হবে আবার নিতেও হবে। আদান প্রদানই উন্নতির মূল। ভারতের অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। চৈতন্য রাজ্যের অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে পাশ্চাত্য জাতির নিকট থেকে জড়রাজ্যের অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। আধ্যাত্ম বিষয়ে আমরা হব ওদের শিক্ষাদাতা এবং জড় সম্পর্কিত বিষয়ে ওরাই হবে আমাদের শিক্ষা-

দাতা। সম অবস্থাপন্ন না হ'লে কখনও বন্ধুত্ব হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তি খুবই ভাল জিনিস বটে, কিন্তু তাদের বেশী দূর এগোবার ক্ষমতা নাই। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্য সকল উদ্ঘাটিত হয়। বাঙালী ভাবুক এবং ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হবে।

শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এখন উঠতে হবে, জাগতে হবে এবং সাহস সহকারে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি মহাবলি চান, সেই বলির জন্য চাই আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ ও মেধাবী যুবকের দল।

ভারত দরিদ্র, কিন্তু দারিদ্র্য আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হ'তে পারবে না। চাই মানুষ—চাই উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"যে আপনাকে দুর্বল ভাববে সেই দুর্বল হবে।' প্রত্যেক আত্মায় অনন্ত শক্তি রয়েছে, কেবল তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ধীর হ'তে হবে।

ভয় একেবারে ত্যাগ করতে হবে। অতীতের ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছে—সাধারণ লোকের মধ্য থেকেই জগতের যত কিছু শক্তির প্রকাশ হয়েছে।, সাধারণ লোকের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করেছেন। যা একবার ঘটেছে তা আবার ঘটবেই। পুনরাবৃত্তিই জগতের নিয়ম।

বাংলার যুবকগণের মধ্য দিয়াই সেই শক্তির বিকাশ হবে। বাংলার যুবকগণের উপরেই সমর্পিত হয়েছে এই অতি গুরু দায়িত্বের ভার।"

স্বামীজীর এই যে বাণী, ইহাতে যেন তাঁহার মনের ভিতরের তাপ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় উৎসারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই রহিয়াছে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়া নবজীবন লাভের মন্ত্র। স্বামীজীর কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবেরই বাণী। আরও একটু বেশী দূর গেলে এই কথাটি আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন" এই মহাবাণীরই প্রচারক এবং এই বাণী প্রচারই তাহার প্রধান কার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ যেন দুইরূপে এক অভেদ সত্তা। স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা Nivedita of Ram-Krishna Vivekananda? এই নামে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন একদল ছেলে চাহিয়া-ছিলেন, যাহারা উচ্চ কার্যের প্রেরণায় সব-কিছু ত্যাগ করিতে পারে; যাহারা অনাসক্ত অথচ প্রেমময় হইবে, যাহারা হইবে সর্ব-ত্যাগী অথচ মহাকর্মী—সেইসব ছেলের দলের নেতারূপেই তিনি স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, "আর সব নর আর তুমি হলে নরেন্দ্র। (অর্থাৎ সকল নরের মধ্যে তুমি নরশ্রেষ্ঠ।) ভালবাসার দিক দিয়াও স্বামীজীর মনের ভাব তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতেন। স্বামীজী যে কোন কিছুর প্রার্থী নন, সেকথাও তিনি জানিতেন; তিনি স্বামীজীকে সে বিষয়ে পরীক্ষাও করিয়াছেন অনেক সময়ে।

তখনকার দিনে কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁহার বক্তৃতার সময় সরস্বতী দেবী যেন তাঁহার রসনায় আসিয়া আবির্ভূতা হইতেন। তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাষা সাবলীল উদ্দীপক এবং মনোমুগ্ধকর, তাই শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতায় যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হইত।

কিন্তু একবার তিনি গ্রীষ্মের সময় দদলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সেখানে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার সময় লক্ষ্য করিলেন, পরমহংসদেব একটু বক্তৃতা শুনিবার পর উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরমহংসদেবের মতামতের কেশববাবুর কাছে বিশেষভাবেই মূল্য ছিল, তাই তিনি বক্তৃতার শেষে তাঁহার নিকট আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন বক্তৃতার ভিতর কোন ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তুমি যে বললে, ভগবান তুমি সমীরণ দিয়েছ, তরুগুল্ম দিয়েছ, এসব তো বিভূতির কথা। এসব নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? যদি এসব বিভূতি কিছুই তিনি না-ই দিতেন, তাহলে কি তিনি ভগবান হ'তেন না? বড়মানুষ হলেই কি বাপকে বাপ বলবে, গরীব বাপকে কি বাপ বলবে না?" কেশবচন্দ্র একথার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিষম তার্কিক, প্রত্যেক কথাতেই তিনি তর্ক তুলিতেন, যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়া না দিলে তিনি কোন কথাই মানিয়া লইতেন না। এমন কি অনেক সময় তিনি ঠাকুরকে বলিতেন, "তুমি আর কি জান, তোমার কাছে শেখবারই বা কি আছে?" একথা শুনিয়া ঠাকুর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুই এখানে আসিস কেন? ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, তবুও এমন-ভাবে রোজ রোজ আসিস কেন বল দেখি?" উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলিয়া-ছিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, সেই জন্য তোমার কাছে আসি।" এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, সেই মুহূর্তে তিনি সমাধিস্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে তিনি উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "শুনলে নরেনের কথা, ও কিছুই চায় না, কেবল ভালবাসে বলেই এখানে আসে।"

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার কথা না মানিয়া লইয়া আবার তাঁহার সঙ্গে তর্ক করে, ইহাতেও ঠাকুর খুশি হইতেন, তিনি জানিতেন এইভাবে তর্ক করিবার সাহস একমাত্র নরেন্দ্রনাথেরই ছিল। আর অন্য দিক দিয়া নরেন্দ্র একেবারে নির্লোভ, অর্থ ও সম্পদ তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। স্বামীজীর ভ্রাতা পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমার বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়। পূর্বের দিন আমাদের বাড়িতে চাকর সরকার প্রভৃতি অনেক লোক ছিল, কিন্তু পরের দিন আমরা একেবারেই গরীব হইয়া পড়ি, কিছুই সংস্থান ছিল না। সংসারের সকল ভার তখন নরেন্দ্রনাথের উপরেই পড়িল। সে তখন আইন পড়িতেছিল এবং এক অ্যাটর্নির আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়াছিল কিন্তু সেখান হইতে কিছু পাইবার আশা ছিল না। সংসার কি করিয়া চলিবে এই চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে আমাদের সংসারে অতিশয় কষ্ট আসিল, নরেন্দ্রনাথ তাহাতে একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িল। এই সময় সে কাহারও সহিত মিশিত না, তাহার পূর্বকার প্রফুল্ল ভাব একেবারে চলিয়া গেল, সে ম্লান হইয়া পড়িল। একদিন সে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাইকে বলিল, "আপনি মাকে বলুন, যাতে আমার মা ভাইদের খাওয়া পরার কষ্ট দূর হয়। এত কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। পরমহংস মশাই বলিলেন, "তুই মা কালীকে প্রণাম করে যা চাইবি তাই পাবি। নরেন্দ্রনাথ কালীর মন্দিরে যাইয়া সংসারের অভাবমোচনের জন্য মা কালীর কাছে প্রার্থনা করিবে এইরূপ মনস্থ করিয়া পরমহংস মশাই-এর ঘর হইতে বাহির হইল। মন্দিরে যাইয়াই মা কালীকে প্রণাম করিয়া সংকল্পিত ইচ্ছা সকল ভুলিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "মা আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও।" তাহার পর পরমহংস মশাই-এর ঘরে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, মার কাছে প্রার্থনা করেছিস?" নরেন্দ্রনাথ বলিল, "মশাই, ভুলে গেছি।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যানঃ ১২৪ পৃঃ)

বিষয় সম্বন্ধে এইরকমই যাঁহার মনোভাব এবার তাঁহারই উপর বিষয়ের ভার আসিয়া পড়িল।

টাকা। টাকা না হইলে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। পরিচালিত করিতে হইলেও টাকারই প্রয়োজন। স্বামীজী বিলাতে বক্তৃতা করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়াই তিনি আলমবাজারে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কাছে সমস্তই দিয়া দিলেন। তাঁহাকে গঙ্গার ধারে মঠের জন্য এক খণ্ড জমির খোঁজ করিতেও বলিলেন।

এই সময় অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী স্বামীজী মিসেস অলিবুলকে লিখিয়াছিলেন—"সন্ন্যাসীদের জন্য একটি ও মেয়েদের জন্য একটি—এই দুটি কেন্দ্র স্থাপন না করে যদি আমি মরে যাই, তাহলে আমার কর্তব্যের শেষ হবে না।"

"যদি আমি মরে যাই" অর্থাৎ দিন সংক্ষেপ, কাজ শেষ করিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। আর মেয়েদের জন্য একটি মঠের কথা তিনি অনেকবারই বলিয়াছেন।

মিসেস অলিবুলকে এই পত্রে তিনি টাকাকড়ির কথাও লিখিয়াছেন।—"ইংলণ্ড থেকে ইতিপূর্বেই আমি পাঁচশো পাউণ্ড (প্রায় ৭৫০০) পেয়েছি। 'মিঃ এস'-এর কাছ থেকে প্রায় পাঁচশো আর তোমার টাকাটা দিয়ে ঐ দুটি কেন্দ্র স্থাপন করতে আমি নিশ্চয়ই পারবো। সেই জন্য আমার মনে হয় তোমার ঐ টাকাটা যত শীঘ্র পার পাঠানো উচিত।"

মিসেস অলিবুলকে তিনি ঐ পত্রে আরও লিখিয়াছেন, "সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে ঐ

টাকাটা তোমার ও আমার এই দুজনের নামে জমা করে দেওয়া। তা হলে আমাদের দুজনের মধ্যে যে কেউ ঐ টাকাটা বার করতে পারবে। ঐ টাকাটা কাজে লাগাবার আগেই যদি আমি মরে যাই, তুমি ঐ টাকা দিয়ে আমি যা করতে চেয়েছিলুম, তাই করতে পারবে। একথা আমি এই জন্য বলছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার লোকেরা ঐ টাকাটা নিয়ে গোলমালের সৃষ্টি করতে পারবে না। ইংলণ্ডে পাওয়া টাকাটাও ঐভাবে আমার ও 'এস্'-এর দুজনের নামেই রাখা হয়েছে।"

টাকা যে কি সাংঘাতিক জিনিস, সর্বত্যাগী স্বামীজীর সে সম্বন্ধেও বিশেষভাবে ধারণা ছিল, তাঁহার এই পত্রে সেকথা বেশ বুঝা যায়। আরও একটি বিষয় বুঝা যায় যে, কোন কাজ এলোমেলোভাবে হয় এটা তিনি একেবারেই চাহিতেন না, পাশ্চাত্যের সুশৃঙ্খল কার্যপদ্ধতিকে তিনি অনুকরণের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময়ও সন্নিকট। এই সময়টিতে যাহাতে উপস্থিত থাকতে পারেন, সেজন্য স্বামীজী ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এতদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই ঠাকুরের জন্মোৎসব করা হইত। তাহার কারণ বরানগর অথবা আলমবাজারের মঠে স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতেই ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করা হইয়াছে এবং তাহাতে কোন আপত্তিও ওঠে নাই। কিন্তু এবার আপত্তি দেখা দিল। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া যখন মন্দিরের উঠানে ঢুকিতে গেলেন, তখনই দুয়ারের দারোয়ান বাধা দিল। হিন্দুর দেবালয় এখানে সাহেব মেমের অথবা কোনো মুসলমানের প্রবেশের অধিকার নাই। রাণী রাসমণি তাঁহার উইলে যদি সে অধিকার দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কি হইত অবশ্য বলা যায় না।

কিন্তু এই যে মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার এবং জেমস গুডউইন ইঁহারা কি এখনও সাহেব মেম আছেন? ইঁহাদের হিন্দুধর্মের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধা, কোন হিন্দুর তাহা আছে? তাঁহারা একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের দেশ ত্যাগ করিয়া বহু দূরে এই ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নিজেদের আচার ও আচরণ ত্যাগ করিয়া এই দেশের আচার গ্রহণ করিবার জন্য কত নিষ্ঠা সহকারে অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মত নিষ্ঠাবানই বা এদেশে কয়জন আছেন?

যাহা হউক মন্দির প্রবেশের এই বাধায় জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে হওয়া সম্ভব হইল না। এই সময় স্বামীজী তাঁহার এক মহিলা ভক্তকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এখন আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়, কিন্তু তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না।" × × ×

এই পত্রে তিনি একথাও লিখিয়াছেন যে, 'তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া

পর্যন্ত অসম্ভব, কারণ রাসমণির দেবালয়ের মালিক 'বিলাত ফেরত' বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দিবেন না। অতএব আমার প্রথম কর্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই চারিটি বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটি স্থান করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

ঠাকুরের জন্মোৎসবের অবশ্য তখনও কিছু দেরি আছে। কিন্তু স্বামীজীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষত ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার এক মুহূর্তও বিশ্রাম লইবার সময় হয় নাই। তাই তিনি অল্প কয়েক দিন বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং গেলেন এবং সেখানকার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত এম এন্ ব্যানার্জি মহাশয়ের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, গিরিশবাবু, মিস্টার গুড-উইল এবং মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা ও সিঙ্গারা ভেলু (যাঁহাকে স্বামীজী কিডি বলিতেন) এবং ব্যাঙ্গালোরের জি জি নরসিংহ চারিয়া—এঁরাও সকলে গিয়াছিলেন। এই সময় বর্ধমানের মহারাজা তাঁহার "রোজ ব্যাঙ্ক" নামক বাড়ির এক অংশ সকলের থাকিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার বাহিরে এইটিই প্রথম সঙ্ঘ। মাদ্রাজের অধিবাসিগণ সেখানে তাঁহার একজন গুরুভাইকে পাঠানোর জন্য পূর্বেই অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজী বলিয়াছিলেন, একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান সাধুকে সেখানে পাঠাইবেন, সেই সময় শশী মহারাজের কথাই তাঁহার মনে হইয়াছিল। শশী মহারাজের পূজা ও অর্চনায় যে কতখানি নিষ্ঠা, সেকথা স্বামীজী খুব ভাল করিয়াই জানেন। তাই তাঁহাকে মাদ্রাজে পাঠাইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ রিপোর্টের পঞ্চম পৃষ্ঠায় আছে যে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে পৌঁছিয়া প্রথমে ত্রিশ টাকায় একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া সেখানে কাজ আরম্ভ করেন এবং প্রায় এক বৎসর সেই ভাড়া বাড়িতেই কাজ করিয়া যান। ইঁহার পর স্বামীজীর 'ট্রিপলিকেনে' নামক একজন শিষ্য তাঁহার ক্যাসল কার্নেল নামক প্রকাণ্ড বাড়ির এক অংশে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর পর্যন্ত শশী মহারাজ সেখানেই থাকিয়া মিশনের কাজ করিয়া যান।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবরের ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি বিবরণী বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছে—"বহুদিন থেকে মাদ্রাজকে কাজের একটি কেন্দ্র করবার জন্য তাঁর একজন গুরুভাইকে মাদ্রাজে পাঠাতে তিনি অতি সহজেই রাজি হলেন। এই কাজের জন্য স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকেই মাদ্রাজে পাঠাতে মনস্থ করলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মার্চ মাসের শেষাশেষি প্রথমে ক্যাসল কার্নেলে প্রতি সন্ধ্যায় গীতার ক্লাস আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে আইস হাউস রোডের উপরস্থ মঠে ক্লাস করেন।"

শশী মহারাজকে সাহায্য করিবার জন্য স্বামীজী তাঁহার প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দকেও সঙ্ঘে পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হইল।

শশী মহারাজ মাদ্রাজ রওনা হইয়া গেলেন। সুতরাং ঠাকুরের সেবা ও পূজার ভার পড়িল বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) উপর। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সন্তানগণের সেবার ভারও পড়িল তাহারই উপর, কেননা এতদিন শশী মহারাজ ঐ দুই ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভার বলিতে বুঝায় মঠের রান্নার ব্যবস্থা, আবশ্যকীয় জিনিস কি আছে বা নাই, তাহার খোঁজ নেওয়া এমনকি সাধুদের ধ্যান হইতে তুলিয়া আনিয়া খাওয়ানো। এই কাজ বাবুরাম মহারাজ ঠিক শশী মহারাজের মতই আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে বরাবরই করিয়া আসিয়াছেন যতদিন না তিনি দারুণ কালাজ্বরে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাই তাঁহার সম্বন্ধে সকলেই এক বাক্যে বলতেন, "বাবুরাম মহারাজ যেন মঠের ছেলেদের মা ছিলেন।"

শার্ঙ্গদেব

সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্ত

"বরষার মেঘ নামে ঝর বরিষণে"—নববরষার বর্ষণসিক্ত অপরাহ্নে মনে গুনগুনিয়ে উঠছে মিয়ামল্লারের করুণ মীড়। যিনি সুর দিয়েছিলেন তিনি আজ আর নেই—এ গান যাঁর লেখা তিনিও আজ পরলোকে। সুরসাগর হিমাংশুকুমার এবং গীতকার অজয়কুমার দুজনেই অকালে ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন।

এই করুণ সুরের কোমল কোরক প্রথম প্রস্ফুটিত হয়েছিল বাংলার পূর্ব প্রান্তে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহরে। এই শহরেই মানুষ হয়েছেন ত্রিপুরার রাজবংশের সন্তান শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণ যিনি উত্তরকালে হিমাংশুকুমারের সুরকে কণ্ঠে রূপায়িত করেছেন। কবি অজয়কুমারের নিবাসও ছিল এই কুমিল্লাতেই। এই ত্রয়ীর সম্মেলনে আমাদের বাংলা গান বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

হিমাংশুকুমারের কৈশোরের সঙ্গে যিনি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন তিনি হ'চ্ছেন বিশিষ্ট গীতকার শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ। একজন গান রচনা করতেন আর একজন সুর দিতেন। এইভাবে দিনের পর দিন কেটেছে এ'দের গানের নেশায়। হিমাংশুকুমারের অতি প্রিয় গান—"ডাক দিয়ে যায় কেগো আমায় বাজিয়ে বাঁশি"—সুবোধবাবুর লেখা। আরও কত গান তাঁর পরে বিখ্যাত হয়েছে—"খুঁজে দেখা পাইনে যাহার", "তব স্মরণ খানি", "আবেশ আমার যায় উড়ে কোন ফাল্গুনে"—ইত্যাদি। মাঝে মাঝে কুমিল্লায় আসতেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। হিমাংশুকুমার তাঁর কাছ থেকে "ভজন" গাইবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কুমিল্লার এক ধর্মমন্দিরে তিনি এইসব ভজনাদি গাইতেন। এইসব গানের একটি প্রভাবও তাঁর মনে স্থায়ী হয়েছিল যার ফলে তাঁর স্বভাবে সাত্ত্বিকতাই প্রাধান্যলাভ করেছিল।

তাঁর পিতার উৎসাহও ছিল এ বিষয়ে প্রচুর। হিমাংশুকুমারের সুর দেওয়া গান শোনবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে বহু পরিচিত ব্যক্তিকে আহ্বান করতেন এবং শুধু গান নয়, প্রচুর জলযোগেও তাঁদের পরিতৃপ্ত করতেন। কুমিল্লার অধিবাসীদের মধ্যে আজও অনেকে সে সব কথা স্মরণ ক'রে আনন্দিত হন। এই প্রসঙ্গে এটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর মা ছিলেন সুগায়িকা এবং তাঁর কাছ থেকেই সঙ্গীতের প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি খুব অল্প বয়স থেকে।

গান নিয়ে থাকলেও পড়াশোনায় হিমাংশুকুমার অবহেলা করেননি। ১৯২৪

সালে কুমিল্লা জেলা ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২৬ সালে আই এস-সি পরীক্ষায় তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। এই সময়ে কিছুকাল তাঁর পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটলেও পড়া ছাড়েন নি, বি এ পাশ করেছিলেন।

ধীরে ধীরে কলকাতায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বহু অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের আমন্ত্রণে তিনি সংগীত পরিবেশন করতেন। গম্ভীর প্রকৃতির এই যুবকটিকে কিন্তু কোন তরল জলসায় বা বৈঠকে খুঁজে পাওয়া যেত না। সুরের গভীরতা যেমন তিনি পছন্দ করতেন তেমনি ছিল তাঁর পরিচিতের পরিধি। স্বল্প এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহচর্য তিনি পছন্দ করতেন—হাল্কা অনেকের মেজাজ চটুল পরিবেশ নয়। যাঁরাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁরাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য। এই কারণেই ব্যবসায়ী সংগীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তিনি কোনদিন অগভীর সুর রচনা করেন নি জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে। হয়তো কম সুর রচনা করেছেন কিন্তু যেটুকু করেছেন সেটুকু লাভ করেছেন গভীর উপলব্ধি থেকে। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের কয়েকটি ভংগী তিনি তাঁর সুরে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে প্রচেষ্টা আজকের সিনেমার প্রচেষ্টা নয় সেখানেও মীড়ের চমৎকার গভীর কাজগুলি আমাদের সংগীতে আনবার দিকে ছিল তাঁর লক্ষ্য। স্বরজ্ঞান ছিল তাঁর খুব প্রখর। বাল্যকাল থেকে তিনি স্বরলিপির চর্চা করেছেন। স্বরলিপিতে একবার চোখ বুলিয়ে অনায়াসে গেয়ে যাওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির প্রতিটি গ্রন্থ ছিল তাঁর প্রিয়, তাছাড়া ভাতখণ্ডের স্বরলিপি থেকেও তিনি বহু সুরের উৎস খুঁজে পেয়েছেন।

প্রসংগত এটিও উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। তাঁর সুরে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রসংগীতের রীতিতে তিনি গানের চারটি কলিকে রূপায়িত করতেন, বিশেষ করে সঞ্চারীটি, স্বরলিপির এই অভ্যাসটিও রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন থেকেই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল।

কলকাতায় এসে তাঁর পরিধি ব্যাপক হ'লেও ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে সংগীত রচনার বিরাম ছিল না। কলেজের অবকাশে কুমিল্লায় ফিরে গিয়ে তিনি নানা গানের সুর দিয়েছেন। এই সময় অজয়কুমার গান লিখতে আরম্ভ করেন এবং তাতে হিমাংশুকুমার সুর সংযোগ করতেন। এইসব গানের স্মৃতি এখনও আমাদের মনে বিশেষ উজ্জ্বল সুতরাং উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। "মম মন্দিরে", "আলোছায়া দোলা", "তুমি তো বঁধু জান" প্রভৃতি গান সুর সৃষ্টির অপূর্ব উদাহরণ। আরও অনেকের গানে সুর দিয়েছেন হিমাংশুকুমার। এর মধ্যে শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় রচিত গানগুলি সংগীতের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান। "নতুন ফাগুন যবে"—এই বিখ্যাত গানটি এ'রই রচনা।

এই সুগভীর সুর সৃষ্টির জন্য তাঁর পাড়া থেকে তাঁকে "সুরসাগর" আখ্যা

ভূষিত করা হয়। সম্ভবত ১৯৩১ সালে তিনি এই সম্মান প্রাপ্ত হন। এই পরিচয়েই তিনি বিশেষ খ্যাত। বস্তুত "সুরসাগর" বল্লে একমাত্র হিমাংশুকুমারের নামই আমাদের মনে পড়ে।

হিমাংশুকুমারের চরিত্রের আর একটি দিক ছিল পুরোপুরি "রোমান্টিক"। আর এই স্বপ্নরঙীন মন ছিল অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর এবং অভিমানী। যা তিনি চেয়েছেন তা পান নি। তাঁর স্বপ্নের প্রত্যাশা সফল হয়নি। এই না পাওয়ার বেদনা তাঁর শেষ জীবনের কত গানের গভীর মীড়ে সুগভীর করুণ চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। সে মীড় শান্ত, উদাস অথচ স্নিগ্ধ। যৌবনের যে দিনগুলি তাঁর রসোচ্ছলতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারত তা নিরাশার তপ্তশ্বাসে দগ্ধ হয়ে বিলীন হয়ে গেল। এই মানসিক দ্বন্দ্ব এবং জ্বালাকে তিনি কতভাবে এড়াতে চেয়েছেন। উদাসীর গৈরিক চিহ্ন ছিল তাঁর প্রিয়। গৈরিক সজ্জায় তিনি তৃপ্তি পেতেন। শুনেছি একদা গৈরিক পরিহিত দুই ব্যক্তি স্বামী অভেদানন্দের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক উপদেশে অন্তরকে শীতল করবার উদ্দেশ্যে। একজন নজরুল অপরজন হিমাংশুকুমার। স্বামীজী মধুর সম্ভাষণে তাঁদের পরিতৃপ্ত করে সন্ন্যাস-জীবন থেকে নিবৃত্ত করেন।

অবশেষে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ এই বেদনার সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে মুছে দিল। সুরসাগরের জীবনাবসান হয় ১৯৪৪ সালের পনেরোই নভেম্বর। তখন তিনি সবেমাত্র যৌবনের পূর্ণতায় পৌঁছেছেন।

হিমাংশুকুমারের সুরের মূল রসটি হচ্ছে করুণ রস। এই করুণ রস বাংলা গানে কত ভাবে কত ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়ে এসেছে। কীর্তনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য করুণ রস, টপ্পা তো করুণ রসকেই আশ্রয় করে আছে। কিন্তু হিমাংশুকুমার বেছে নিয়েছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য মীড়ে এবং ছোট ছোট অলঙ্কারে। এই অপূর্ব মীড়গুলির বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে করুণ রস। নই করুণ রস বাংলা গানে সূক্ষ্ম কাজ এবং সৌন্দর্য এই গানটিতে আছে তা লিখে বোঝাবার নয়। অন্তরায় এবং আভোগে মধ্যম থেকে ধৈবত এবং পুনরুক্তির সময় মধ্যম থেকে তারসপ্তকে কোমল মীড়ের সঞ্চরণ মনে যেন একটা বিষাদের রেখা টেনে দেয়। সঞ্চারীতে দুটি গান্ধারের প্রয়োগে একটি ব্যথাতুর আন্দোলন মনকে দোলা দেয়; আর ছোট ছোট কাজ যেমন "গমপমগমা", "নর্সর্র্সনর্সা", "ধণর্সণধণা"—যেন ব্যথার তারে এক একটি ঝঙ্কার তোলে। এই কাজগুলিই হিমাংশুকুমারের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি।

যে সময়ে তিনি ব্যাপকভাবে সুর দিয়েছেন সেই সময়টা বাংলা গানের একটা চলন্ত যুগ। গ্রামোফোনের নানা শ্রেণীর রেকর্ডই হ'চ্ছে তখন লোকের আদর্শ। খেলো গজল, চটুল ঠুংরী, ভাটিয়ালি, হাল্কা দাদ্রা—এই সবই ছিল তখন বিশেষ জনপ্রিয়। হিমাংশুকুমার এই বৃথা বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হন নি। তাঁর রুচির বিকৃতি কখনো ঘটেনি বিবিধ রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও। এইসব কারণেই অব্যবহিত পূর্ব যুগের বহু গান আজ বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে কিন্তু হিমাংশুকুমার তাঁর গৌরব রক্ষা করেছেন এবং তাঁর সুরের সৌন্দর্য বর্তমান পরেপ্রেক্ষিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হিমাংশুকুমারের সুর রচনা বলতে গেলে রাগসঙ্গীতের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বৈচিত্র্য অনেক ক্ষেত্রে রাগ সঙ্গীতের কারুকলার বিচিত্র প্রয়োগে নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। স্পর্শ সুর তিনি খুব বেশি ব্যবহার করতেন এবং প্রথাগত স্বরের জোড়গুলি পরিহার করে অনেক সময় সুরের মিশ্রণ আনতেন অস্বাভাবিকভাবে। এই প্রচেষ্টাই তাঁকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দিকে মনোযোগী ক'রে তুলেছিল। অনেক সময়ে রাগসঙ্গীতের স্বাভাবিক ভঙ্গী থেকে তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে ফিরে যেতেন। যেমন "নতুন ফাগুনে যবে" গানটির অন্তরা এবং আভোগ—স্বাভাবিক-ভাবেই মধ্যম থেকে তারসপ্তকে এই অংশের সুর উঠেছে কিন্তু শেষ হ'ল তাঁর নিজস্ব বিচিত্র ভঙ্গীতে। "আলো ছায়া দোলা" আর একটি বিচিত্র সুরসৃষ্টি। বাহারের সব লক্ষণই এতে আছে, রাগ-সঙ্গীতের বিশিষ্ট ভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে হিমাংশুকুমারের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এইখানেই তাঁর প্রকৃত গুণপনার পরিচয়। অনেক সময় অতুলপ্রসাদের রচনাতেও স্বকীয়তার এইরকম পরিচয় পাওয়া যায়।

এই রাগমিশ্রণ এবং স্বরের বিচিত্র প্রয়োগের মূলে রয়েছে হিমাংশুকুমারের গভীর উপলব্ধি। জীবনের তীব্র অনুভূতিকে তিনি সুরে ব্যক্ত করেছেন—এইখানেই তিনি মামুলি সুরকারের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। এই যে প্রকাশ, এর জন্য তিনি যে রীতি বেছে নিয়েছেন তাও মামুলি পন্থা থেকে স্বতন্ত্র। স্বল্প-ক্ষমতাসম্পন্ন সুরকার হ'লে হয়তো বিবিধ জ্ঞান অথবা ঠুংরির কৌশল প্রয়োগ করতেন; কিন্তু হিমাংশুকুমার ব্যবহার করেছেন কেবল কয়েকটি মীড় এবং ছোট ছোট সুনির্বাচিত অলঙ্কার। তাঁর অভিধানে বিবাদী স্বর ছিল না তাই বৈষম্যের মধ্যেও এনেছেন মাধুর্য—কেবল সুনিপুণ প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে। এই নৈপুণ্যের প্রকাশ বিশেষ চিন্তাশীল শিল্পী ভিন্ন আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

পরিশেষে একটি বক্তব্য। বারবারই বলেছি, এবারও বলতে হয়। হিমাংশুকুমারের বহু স্বরলিপি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে যা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। এছাড়া অনেকের কাছে তাঁর নিজের লেখা স্বরলিপি রয়েছে এবং অনেকে তাঁর সুরের স্বরলিপি করেও রেখেছেন। এইসব স্বরলিপি প্রকাশিত এবং একত্রিত হবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। স্বরলিপি প্রকাশের দায়িত্ব অল্প নয় এবং এটি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। শুধু হিমাংশুকুমার নয় আরও বহু সুরকারের অনেক অপ্রকাশিত স্বরলিপি সংকলিত হবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে কিন্তু এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না কাউকেই। এই নিশ্চেষ্টতার দরুণ আমরা অনেক হারিয়েছি এবং আরও অনেক হারাব। জাতির দুর্ভাগ্য হ'লে এমনটাই ঘটে থাকে।

কবি শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র পাল সুরসাগর সম্বন্ধে বহু তথ্য আমার গোচর করেন। এঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। এঁদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য (লণ্ডন)

নির্বাচনের গুরুত্ব অনির্বচনীয়। গুরুঠাকুরের গাম্ভীর্য ও পান্ডিতের পান্ডিত্যকে যেমন আমরা শ্রদ্ধা করি, নির্বাচনের নীতি ও নিয়তিকে মর্যাদা দেই তার চেয়ে বেশী—জাতির ভবিষ্যৎ যে নির্ভর করছে তার ফলাফলের ওপর।

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাস্যরস পরিবেষণ করার মত সাহস ও
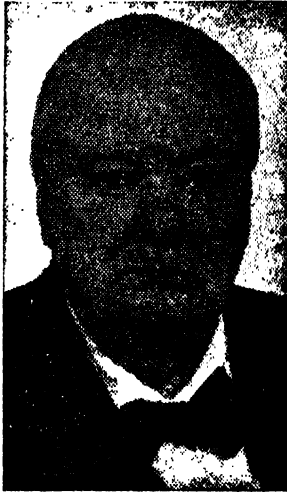
উইনস্টন চার্চিল

সাধ্য আমার নেই—এমন কি ইজি-চেয়ারে হেলান দেওয়া ভাব নিয়ে এর বর্ণনা দিতেও বাধে। তার ওপর কাল বাদ দিলেও স্থান ও পাত্রটাও দেখতে হবে। লিখছি লণ্ডনে বসে আর পাত্র স্বয়ং গ্রেট বৃটেন—কিছুদিন আগেও যে ছিল 'দি গ্রেট'—যার রাজত্বে নাকি সূর্য ডুবত না। আজ প্রভুত্ব না থাকলেও আভিজাত্য ত আছে। বিশ্ব-সমস্যা নিয়ে 'talk at the summit'-এর কথা ভাবতে হলেও টপ করে মনে পড়ে ইংরেজের রাশ সেখানেও টানা আছে।

এই লেখাটা বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনের ধারা বিবরণী নয়। সাংবাদিকের ভাষায় যাকে বলে high light তাও নয় —কয়েকটা এলো মেলো ঘটনা, যাকে বলতে পারেন tit bit।

হাসাবার বাসনা আমার নেই। বৃথা চেষ্টা করে লোক হাসাতেও চাই না। তবু যদি পড়তে পড়তে কারও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখা দেয়, জানবেন আমার দোষ নেই।

চার্চিলের কথা দিয়েই শুরু করি। অমন রাশভারী লোক দুনিয়ায় কজন আছে, ছবি দেখলেও ভয় হয়। শুরু করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, আপনারা আঁচ করেছেন, আমি উল্লেখ করব তিনি এটলিকে প্রায় দুমুখো সাপের পর্যায়ে ফেলেছেন, বলেছেন, piebald; আর এটলি উত্তরে চার্চিলকে বহুরূপী বা chamelion আখ্যা দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। কিম্বা ভাবছেন, উদাহরণ দেব, চার্চিল বিভানকে বলেছেন voluble careerist উত্তরে বিভান চার্চিলের বিগত রাজনৈতিক জীবনের পাতা উল্টে প্রমাণ করেছেন তিনি নিজেই একজন নামজাদা careerist।
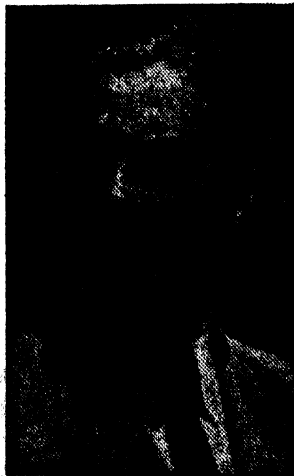
এন্টনি ইডেন

না তা আমি মোটেই বলতে চাই না। চার্চিল বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন ছবি কল্পনা করে নিন। লোকে লোকারণ্য—হলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না—ছ-শ-লো-ক জমা হয়েছিল (সংখ্যা শুনে হাসবেন না, এদেশে একে রেকর্ড ভিড়ের পর্যায়ে ফেলা যায়)। বর্তমান নির্বাচন উপলক্ষ্যে লণ্ডনের বুকে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। সাংবাদিক, প্রেস ফটোগ্রাফার
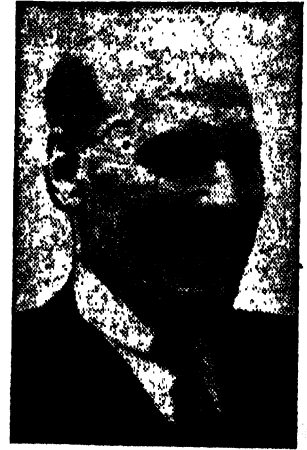
ক্লেমেণ্ট এটলি

সাইন ক্যামেরাম্যান যেখানে যত ছিল সব, হাজির হয়েছিল। হাততালি, হৈ-চৈ, যৌথ সংগীতের আর্তনাদ কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তবে আলোক-চিত্র বিশারদদের আলোকে তিনি উদব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই যখন ছবি তোলার পর্ব শেষ হল, তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, বললেন, এতক্ষণে সভ্যতার হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম।

সমাজতন্ত্রের যুগে যদি চার্চিলকে নিয়ে মাতামাতি করায় আপত্তি থাকে, চলে আসুন পেনরিথ শহরে, মিঃ ব্রাউন-রিগ এখানে নির্বাচন দ্বন্দ্বে নেমেছেন। তিনি বলেছেন, আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে পারি কিন্তু দেশের ও দশের মঙ্গলই আমার কামনা। আমার দাবী কাম্বারল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন, ছচুন্দর

শকারীদের বর্ধিত বেতন, বড়দিনের উৎসবে বিধিবদ্ধ কুক্কুট সংগ্রাম...।

এমন বিশদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করেও তাঁর মনের মহত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পেরেছি কিনা সন্দেহ।

এবারকার নির্বাচনকে সবাই বলেছেন নিরামিষ—না আছে প্রাণ না আছে উত্তেজনা। নির্বাচনে লঙ্কাকান্ড বিলেতের বুকে ঠিক আশা করা যায় না কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড না হলে জমবে কেন? নেতারা রক্ত গরম করার মত কথা বলুক তবে ত লোকে ভোট দিতে ছুটবে! কিন্তু সে আশায় বাদ সেধেছেন মাতব্বরেরা। মোটা মোটা মগজ খাটিয়েও জুতসই ফাঁদ পাততে পারলেন না, কাদা ছোড়াছুড়িও করলেন বটে তবে লোক মাতাবার মত মালমসলা জোগাতে পারলেন না।

নির্বাচন নিরিবিলি হোক বা তার লোক নাচাবার মত উপকরণ না থাকুক, তাতে রোমান্সের অভাব হয়নি। সাধারণ যুবক যুবতীরা সেই উপলক্ষ্যে রোম্যান্স করে বেড়িয়েছেন সে উদাহরণ দিয়ে আপনাদের উদ্বুদ্ধ করতে চাই না, কেবল আভিজাত্যপূর্ণ ঘটনা নিবেদন করে নিরস্ত হতে চাই।
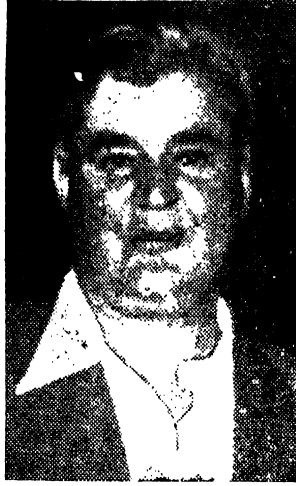
আনুরিন বিভান

ক্যাপ্টেন আর্থার টিকলীর কন্‌সার-ভেটিভের ছাড়পত্র নিয়ে সাউথ হল থেকে দাঁড়িয়েছেন। পার্লামেণ্টে দাঁড়াবার মতই তাঁর অভিজ্ঞতা ও বয়েস—এই ৭০ বছরে পা দিলেন আর কি। ভোট সংগ্রহে সাহায্য করার জন্যে একজন বয়স্কা সহ-কর্মিনীও পেয়েছেন, মিসেস গ্ল্যাডিস ব্রাউন—বয়েস ৬৫। এবং তিনি বিধবা। তাই নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার আগেই ক্যাপ্টেন মশাই ঠিক করেছেন, পার্লামেণ্টে বসে দেশের ওপর প্রভুত্ব করার সুযোগ না হলেও গ্ল্যাডস ব্রাউনের সাংসারিক অভি-যোগ শুনতে বাধা রাখবেন না অর্থাৎ তাঁরা ১লা জুন উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন।

এবার এক বীরপুরুষের পরিচয় দেই, তিনি কন্‌সারভেটিভের পক্ষ হয়ে ওয়েস্ট হ্যাম সাউথ থেকে দাঁড়িয়েছেন, নাম মিঃ জো এমডেন—যোদ্ধা জো নামেই পাড়ায় ছেলেমেয়েরা তাঁকে চেনে। তাঁর প্রচার পত্রিকার প্রথম ও প্রধান কথা হল ছাতি ৪২ ইঞ্চি। তিনি ঘুষোঘুষি করেছেন, কুস্তির কসরত দেখিয়েছেন আবার এক-কালে ওয়েটলিফটিংও করেছেন। মিঃ জো রাজনীতির কচকচি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না তবে বলেন পার্লামেণ্টে তাঁর প্রবেশ অনিবার্য—কেউ রোধ করতে পারবে না।

ভোটাররা তাঁর ঘুষির ভয়ে ভোট দেবে কিনা জানা যায়নি। অবশ্য কুস্তির প্যাঁচ কষিয়ে পারিষদদের কাবু করতে পারবেন এই ভরসায়ও ভোটারদের তাঁর ওপর আস্থা থাকতে পারে।

নর্থ প্যাডিংটন-এর মিস্টার বি টি পার্কিন লেবারের পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এলাকার অধিকাংশ লোক ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। বাড়িগুলোর আকার দেখে গর্ব করার মত কিছু পাওয়া যায় না—কিছু অথর্ব হয়ে পড়ে আছে অথচ বাড়ি-ওয়ালা চুনবালির জন্যে পয়সা খরচ করতে নারাজ, বরং তাদের নজর ভাড়া বাড়ানর দিকে। তিনি বুঝেছেন বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাই মোক্ষ অস্ত্র। তাই বলে বেড়িয়েছেন—আমাকে পার্লামেণ্টে যাবার পথ করে দাও, দেখে নেব হাড়িমুখো বাড়িওয়ালাদের। আইনের চাপে তখন সুড় সুড় করে রাজমিস্ত্রী ডেকে আনবে, ভাড়া কমাতে পথ পাবে না।

নির্বাচনের আগে বহু স্লোগান বেরোয়। সে প্রায় তর্জার লড়াই গোছের হয়। দু'পক্ষ বিপক্ষকে জুতসই কথার থাপ্পড় বসাতে চেষ্টা করে। কয়েকটা দলীয় কাগজ উপযুক্ত স্লোগানের জন্যে মোটা টাকা পুরস্কারও দেয়।

নির্বাচনের ঠিক আগের দিন হঠাৎ হৈচৈ শুরু হল, লেবার পার্টির মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে মারামারি বেধেছে। এটলিকে সরিয়ে বিভান গদি দখল করবে। তখন টোরিরা স্লোগান বার করল—

Highlight for Bevan means twi-light for Britain.

আর একটা স্লোগান—

The conservative creed is every body's need.

কবিতাও ছাপা হয়ঃ—

Under Tories life is good
So never let us rest
Until our good is better
And our better, best!

লেবার পার্টি নির্বাচন দ্বন্দ্বে নেমে-ছিল বাজার দর সামনে রেখে। বলেছিল—দিন দিন সব জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে এমন হলে লোকে খেয়ে বাঁচবে কি ক'রে? তাই রব তুলল—আচ্ছা বাড়ির খোদ কর্তা কি টোরিভক্ত? তাহলে তাকে বাজার

করতে পাঠিয়ে দাও। ঠেলার চোটে লেবারকে ভোট দেবে।

Housewives! If your husband is a Tory make him do the shopping —that will cure him—vote labour!

এই নির্বাচনকে অনেকে বলেছিলেন, petticoat election। ভাববেন না যেন তার মানে পেটিকোট দেখিয়ে নির্বাচনের বৈতরণী পার হবার মতলব। তার অর্থ যে পার্টি মেয়েদের দলে টানতে পারবে তাদেরই জয়জয়কার। অর্থাৎ ব্যালেন্স অফ পাওয়ার মহিয়সী নারীর হাতে।

কিন্তু সত্যি নাকি ভুল ধারণাই ফলবতী হয়েছিল। টোরি গ্ল্যামার গার্ল মিস জন ভিকার্স পেটিকোট দেখিয়ে এবারকার ভোটযুদ্ধে নামকরা প্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল ফুটকে হারিয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে এই এলাকায় ভদ্রলোকের কাছে তিনি গো-হারান হেরেছিলেন। লোকে আরও এককাটি বাড়িয়ে বলছে। এবং ছড়াও বার করেছে, তার মর্ম, মহিলারা সাবধান, স্বামীকে আগলে রাখ, জন ভিকার্স আসরে নেমেছেন।

ভদ্রমহিলা সলজ্জভাবে প্রতিবাদ করেন, বলেন—না না তা কেন? তাঁর মোটামুটি বক্তব্য; ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে তিনি প্রচারে বেরিয়েছিলেন। হাই হিলে খোঁচা লেগে স্কার্ট গেল ছিঁড়ে। সামনের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। এক বৃদ্ধার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন ছুঁচসুতো। কিন্তু এমনি বেয়াড়া জায়গায় ছিঁড়েছে সেলাই করা দায়, ভালো করে ধরতে পারছেন না। বৃদ্ধা ধমক দিলেন—রাজনীতিতে এত বুদ্ধি আর ঘরের কাজে একেবারে ছেলেমানুষ। ওরকমভাবে কি সেলাই করা যায়? স্কার্টটা খুলে সেলাই করে নাও।

জন ভিকার্স কিন্তু কিন্তু করেন। মহিলার স্বামীও যে এই ঘরে রয়েছে।

মহিলা হেসে বলেন—ওঃ এই কথা। ও নিয়ে ভাবতে হবে না। মহাশয় ব্যক্তিটি জাহাজে কাজ করে চুল পাকিয়েছে, ওসবে পরোয়া করে না। ভিকার্স আশ্বস্ত হলেন। মহিলার কথা মেনে নিয়ে চটপট সেলাই সেরে ফেললেন। তখন কি তিনি এর গুরুত্ব বুঝেছিলেন!

আর একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করব। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী দল সিন ফিন —ডি ভ্যালেরা একে প্রাণ দিয়ে গড়েছিলেন। আলস্টারেও এই বিপ্লবী দলের বহু লোক আদর্শের জন্যে জীবনের সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। আজও অনেকে কারারুদ্ধ হয়ে আছে। তাদের মধ্যে ৭ জন নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। সংগে সংগে প্রচার করা হল—বন্দীদের নির্বাচনে দাঁড়াবার কোন অধিকার নেই। সুতরাং ভোটাররা সাবধান—তাদের ভো দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা অবাধ্য দেশবাসী সে সদুপদেশে কা দেয়নি। তাদের দুজনকে পার্লামেন্ নির্বাচিত করেছে। একজন মিস্টার টম মিচেল বয়েস ২৩ বছর অন্যজন মিস্টা ফিলিপ ক্লারক। এ'রা দুজনেই সশস্ বিপ্লবের অপরাধে বন্দী—শাস্তির মেয়া দশ বছর। তবু জনসাধারণের শ্রদ্ধা সমর্থন আছে তাদের পক্ষে—কিন্ আইনের সম্মতি পাবে কি? দেশবাস তাদের মনে রেখেছে এইত বড় সান্ত্বনা।

চক্রদত্ত

...সাইকেলে চড়ে চলেছি—হঠাৎ কথা-
...র্তা নেই এক বিরাট কুকুর ঘেউ ঘেউ
...রে সাইকেলের পিছন দিক থেকে তেড়ে
...ল। প্রাণের দায়ে যত জোরে সাইকেল
...লাই, কুকুর তত জোরে তেড়ে আসে।
...খন যে মনের অবস্থা কী দাঁড়াল তা
...ক্তভোগীরা বেশ ভালভাবেই জানেন।
...দের এই তাড়ার হাত থেকে সহজে রেহাই
...বার একটা উপায় বার করা হয়েছে।
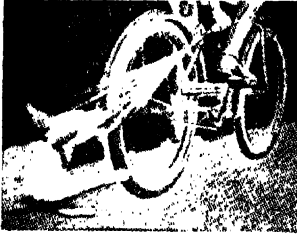
সাইকেল থেকে কুকুরটার দিকে জল ছিটান হচ্ছে

...ইকেলের সঙ্গে একটা জল ভর্তি ...চকারী লাগান থাকবে। কুকুর তাড়া ...লেই সাইকেল চালাতে চালাতে ...চকারী থেকে কুকুরের দিকে জল ছিটিয়ে ...ওয়া যাবে। জল ছিটানোতে কুকুরটা ...কটু হকচাকিয়ে যাবে—ফলে জোরে ...ইকেল চালিয়ে সেখান থেকে সরে পড়া ...বে।

*

সাপকে ভয় কে না করে। তবে এদের ...নি সব সময় মেলে না। যা দু'চারটে ...খতে পাওয়া যায়—সেগুলো বেশীর ভাগ ...ত্রেই ঘরের বাইরে। কিন্তু যদি সরকারী ...তরে বসে কাজ করতে করতে পায়ের ...লায় সাপ দেখা যায় তাহ'লে তো আর ...াই নেই। এই ধরনের একটা খবর ...জপ্ট থেকে পাওয়া গেছে। সেখানকার ...কটা সরকারী দপ্তরের ভেতরে একটা ...পের আড্ডার খবর পাওয়া গেছে। ...খানকার সরকার এই সাপগুলো ...ড়াবার জন্য সম্ভব অসম্ভব সব রকম ...ষ্টাই করছেন। প্রথমে তাঁরা একজন ...পুড়েকে ডাকলেন সাপ তাড়াবার জন্য। ...পুড়ে সব দেখে শুনে বলে গেল যে, ...গুলো সাপ নয়—প্রেতাত্মা। এর পর

একজন যাদুকর তার যাদুর সাহায্যে সাপ-গুলো তাড়াবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে চলে গেল। এরপর সরকার চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিলেন। প্রথমে সেখানকার কর্তৃপক্ষ কতকগুলি ছোট ছোট সরীসৃপ দপ্তরের মধ্যে এনে রাখলেন। কয়েকটা ছোট ছোট সাপ এদের খেতে এসে ধরা পড়লো বটে, কিন্তু বড় সাপগুলোর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। এরপর চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ কতকগুলো বেজী এই দপ্তরে ছেড়ে দিতে চাইলেন। এই বেজীগুলো দপ্তরে ঘোরাফেরা করে সর্পকুল ধ্বংস করবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে দপ্তরের কর্তৃপক্ষরা রাজী হলেন না—কারণ প্রয়োজনে এই বেজীগুলোকে দপ্তরের পয়সায় খাওয়াতে হবে। ফলে সেই দপ্তরের সাপ তাড়ানো তো সম্ভব হোল না—বরং সাপরা নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করে তাদের বংশ বৃদ্ধি করতে লেগেছে।

*

চশমা পরলে শুধু যে চোখের সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যায়—তা নয়, চশমা-ধারীদের আরো অনেক অসুবিধাও ভোগ করতে হয়। বিশেষ করে, যে সমস্ত সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করতে হয়। ডাক্তাররা এই অসুবিধা খানিকটা দূর করেছেন। চশমার বদলে এখন চোখের তারার সঙ্গে সোজাসুজি কাচ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে এই সুবিধাগুলো হচ্ছেঃ—(১) বৃষ্টি, তুষার এবং কাদায় কাচের কোনই অসুবিধা হয় না। (২) এটা পরে জলে অনায়াসে সাঁতার কাটা যায়। (৩) সাধারণ চশমার চেয়ে দৃষ্টির শক্তি আরো তীক্ষ্ম হয়। অবশ্য এই চোখে লাগান কাচের বিরুদ্ধেও কিছু বলবার আছে। যেমন সাধারণ চশমার চেয়ে এর খরচ বেশী। চোখে লাগান কাচ খুব বেশীক্ষণ পরে থাকলে চোখ খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

*

ক্যানসার রোগটা দুরারোগ্য। আর এটার আক্রমণ মানুষের ওপর খুব বেশী হতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা ক্যানসার রোগে মানুষ মরতে খুব বেশী দেখি না—তার কারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রতি-রোধের ক্ষমতার জন্য। দেখা গেছে যে, প্রত্যেক ৮টি ক্যানসার রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে মাত্র ১ জন শেষ পর্যন্ত ক্যানসারে মারা যায়। বাকী ৭ জন প্রতিরোধের ক্ষমতার জন্য বেঁচে যায়। ৪০ বৎসরের পরেই মানুষের শরীরে ক্যানসারের আক্রমণ শুরু হয়। শরীরের যে সব স্থানে ক্যানসার হলে খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক-ভাবে সেরে যায় সেটা হচ্ছে মুখের ভেতর আর মলনালী।

*

যাদের মাথায় টাক আছে তারা অনেক সময় তাদের টাক-এর সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। এদের অনেকের মনে এই রকম একটা ধারনা জন্মায় যে, টাক থাকার দরুণ বোধ হয় তাদের খারাপ দেখাচ্ছে। আর সেই কারণে এরা টোটকা থেকে আরম্ভ করে বড় বড় ডাক্তার ইত্যাদি কিছুই বাদ দেন না। কিন্তু সত্যিই টাকওয়ালা লোকদের বহু-ক্ষেত্রে দেখতে সুন্দরই হয়—এবং টাক থাকার দরুণ তাদের সৌন্দর্যের কোন হানি হয় না। পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোকের মাথাজোড়া টাক দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদের সুন্দরের পর্যায়ও ফেলা যায়। টাক কি কারণে হয় তার সঠিক কারণ আজও বলা যায় না। নানা মুনির নানা মত। অনেকে বলেন মাথা চাপা টুপি পরলে টাক হয়—আবার কেউ কেউ বলেন, টুপী একবারে না পরা অথবা ভাল করে চুল জল দিয়ে না ধোওয়ার জন্যে টাক পড়ে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, যারা খুব মাথার কাজ করেন তাদের বেশী টাক পড়তে দেখা যায়। মাথার চামড়ার নিচে যদি বেশী পরিমাণে চর্বি থাকে, তাহলেও নাকি টাক পড়ে যেতে পারে। অনেক সময় আবার বলতে শোনা যায় বাপ, ঠাকুরদার টাক থাকলে নাকি ছেলে, নাতির টাক পড়তে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এরও ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়।

উপন্যাস

নীলমণির স্বর্গ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা।

প্রথমেই বলা যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই উপন্যাসে এক অভিনব প্রচেষ্টা করেছেন। এই বইয়ের নায়ক কোনো মানুষ নয়, একটি জন্তু—একটি ভালুক, তা নাম নীলমণি এবং তার নাম অনুসারে বইয়ের নামকরণও করা হয়েছে। শ্রীযুত বিশী সেই জন্তুটির জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা বিশেষ নিপুণতার সংগে বিবৃত করেছেন এবং সেই সংগে বলেছেন আরো দুটি জীবের কথা, একটি বেড়াল ও একটি কুকুরের কথা—তাদের নাম সুরকি ও মুন্সী।

এ ছাড়া অনেক মানুষ-চরিত্রেরও সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু তারা নীলমণির ব্যক্তিত্বের কাছে সকলেই যেন নিষ্প্রভ; তারা কেউই এই জন্য হীরোশিপের গৌরব লাভ করতে পারেনি, এদের বলা যায় উপনায়ক। যেমন, ভালুক-অলা মুরলী, আর মাস্টার মশাই সঞ্জীব।

গত যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাস। জাপানী বোমার ভয়ে একটি পরিবার নিরাপদ স্থান নির্বাচনকরে সুবর্ণ রেখার উপকূলে (ঘাটশিলায়?) নরসিংহপুরে আস্তানা নেয়। এইখানে ভালুক নীলমণি ও ভালুক-অলা মুরলীর সংগে তাদের সাক্ষাৎ এবং সেই সংগে তথাকার অধিবাসী একটি পরিবারের দুটি মেয়ে ছায়া ও কায়ার সংগে পরিচয়। এই সাক্ষাৎ ও এই পরিচয় কেন্দ্র ক'রেই উপন্যাসের যাত্রা আরম্ভ। সঞ্জীবের সংগে মুরলীর ঘনিষ্ঠতা এবং সঞ্জীবের সংগে ছায়ার প্রণয়। ওদিকে মুরলী ঘরে বউ এনে জীবনের এক দুরূহ জটিলতার সৃষ্টি করল, এদিকে সঞ্জীব ও ছায়ার জীবনে প্রবল প্রণয় ঘনীভূত হয়ে এল। শ্রীযুত বিশী এক সংগে দুইটি কাহিনী অতি দক্ষতার সংগে বর্ণনা করেছেন। এবং এই জন্যেই বইটি রসঘন হয়ে উঠেছে।

আর দুইটি নারী চরিত্রের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। এর মধ্যে একজন ইন্দু—ভালুক-অলার স্ত্রী; মুরলীর জীবনের ট্র্যাজেডির মূলে এই ইন্দু। এ চরিত্রটিও সুন্দর ফুটেছে। দ্বিতীয় চরিত্রটি পাপড়ি। এ যেন কাব্যের এক উপেক্ষিতা। রবীন্দ্রনাথ ঊর্মিলা সম্বন্ধে লিখেছেন—"কবি তাঁহার কল্পনা উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন।...কবি-কমণ্ডলু হইতে এক বিন্দু অভিষেক-বারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্র ললাটে সিঞ্চিত হইল না! হায় অব্যক্ত বেদনা দেবী ঊর্মিলা"। শ্রীযুত বিশীও তাঁর সমস্ত মমতা ঢেলেছেন তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্র ছায়ার উপর, কিন্তু অব্যক্ত বেদনা আর একটি জীব তাঁর অগোচরে রয়ে গেছে, সে, হচ্ছে এই পাপড়ি।

উপন্যাসের উপকরণ ছাড়াও এ বই পাঠে উপরি লাভ কিছু হয়েছে। শ্রীযুত বিশী একজন প্রকৃত কবি। কবির দৃষ্টিতে তিনি যেসব নিসর্গশোভা দেখেছেন, তার সুনিপুণ বর্ণনায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমরা ধারাগিরির সৌন্দর্য তো দেখতে পেয়েছিই, সেই সংগে তার জলোচ্ছ্বাসের ধ্বনিও যেন শুনতে পেয়েছি।

এ ছাড়া আছে কয়েকটি উপমা। তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করার লোভ দমন করা গেল না—

(১) বড় বোন ছায়ার সংগে মিলিয়া কায়া এখন কায়েম হইয়া বসিয়াছে, বিবাহের বেনারসীর মত এখন কালে-ভদ্রে মাত্র বাহির হয়।

(২) নারীর দয়ামায়া কূপের মত গভীর কিন্তু সংকীর্ণ, ঘরের চাহিদার বেশী মিটাইতে পারে না।

(৩) গার্ডগাড়ির পিছনের লাল বাতিটি বিদায়-লক্ষ্মীর অনামিকার অংগুরীয়ের চুনিটির মত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশেষ বিলীন হইয়া গেল।

আর একটি ক্ষুদ্র চরিত্রের কথা সর্বশেষে মনে পড়ছে। যে চরিত্রটি বিষাণ। হঠাৎ তার প্রসংগ আরম্ভ এবং হঠাৎই শেষ। কিন্তু তবু মনে দাগ রেখে গেছে।

বইটি সুখপাঠ্য। ছাপা বাঁধাইও সুন্দর।

ভ্রমণ কাহিনী

অমৃত কুম্ভের সন্ধানে—কালকূট। বেংগল পাবলিশার্স; ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। সাড়ে চার টাকা।

সমালোচকমাত্রেই ভাল বইয়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। প্রশংসা করতে পারলেই তাঁরা খুশী হন। কিন্তু এমন বই খুব কমই হাতে আসে, মনে কোনও কুণ্ঠা না রেখে যার প্রশংসা করা যায়। সম্প্রতি সেই রকমের একখানি বই আমরা পেয়েছি। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। লেখক কালকূট।

চলতি অর্থে যাকে আমরা ভ্রমণ-কাহিনী বলি, এ বইয়ের সংগে তার বিস্তর পার্থক্য। ভ্রমণ কাহিনীতে দেশ এবং কালের বর্ণনাই

বড় হয়ে দেখা দেয়, পাত্র সেখানে প্রাধান্য পায় না। দেশকালের বর্ণনা এখানে নেই এমন নয়; আছে, কিন্তু পাত্রের প্রাধান্যই এখানে বেশী। তার ফলে বুঝতে পারা গেল, লেখকের মনের ঝোঁকটা মূলত কোন্ দিকে। কুম্ভমেলার যাত্রী হয়ে তিনি এলাহাবাদে গিয়েছিলেন। সেই তীর্থভূমির স্থানিক বিবরণই এখানে বড় হয়ে দেখা দিতে পারত। পারেনি। তার কারণ, লেখকের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল। তীর্থের দিকে নয়, তীর্থযাত্রীদের দিকে। সেই বিপুল বিচিত্র মানব-মিছিলের একটি অনিন্দ্যসুন্দর ছবি তিনি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুন্দর এবং বিস্ময়জনক।

'বিস্ময়জনক', এই বিশেষণটি এখানে অকারণে প্রয়োগ করা হয়নি। বস্তুত, যে অপরিসীম দক্ষতায় অসংখ্য মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি তিনি রচনা করেছেন, পাঠক-মাত্রেই তাতে বিস্ময় বোধ করবেন। এই দুঃসাধ্যসাধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে বোধ হয় এই কারণে যে, মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রায় অন্তহীন। দোষ ত্রুটি সমস্ত নিয়েই মানুষকে তিনি ভালবাসতে জানেন। তার সুখ, তার দুঃখ, তার আকাঙ্ক্ষা, তার আশাভঙ্গ, সমস্ত কিছুই এখানে লেখকের মমতায় অভিষিক্ত হয়েছে। হৃদয়ে মমতা এবং চোখে বিস্ময় নিয়ে মানুষকে তিনি দেখেছেন। সে দেখা ব্যর্থ হয়নি।

পরিশেষে একটি অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ করব। শিল্পী হিসেবে কালকূট যে-পরিমাণে হৃদয়বান, লেখক হিসেবে তার অর্ধেক পরিমাণেও যত্নবান নন। ভাষার শৈথিল্য দু-এক জায়গায় অত্যন্তই পীড়াদায়ক, শব্দ-নির্বাচনেও কয়েক স্থানে অন্যমনস্কতার পরিচয় রয়েছে। এ তাঁর ত্রুটি। এ-ত্রুটি পরিহার করা প্রয়োজন।

৭৮।৫৫

ছোট গল্প

কানু কহে রাই—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স; ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দু টাকা আট আনা।

শ্রীযুত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরল গোষ্ঠীর লেখক, এখনও যাঁরা কলাকৈবল্যে বিশ্বাসী এবং যুগোপযোগী রচনার অন্ধ মোহ এখনও যাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। ফলত প্রেম—'যে প্রেম সম্মুখ-পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে'—নিয়ে গল্প রচনায় আজও তাঁর কুণ্ঠা নেই তার করুণ ও কোমল রূপটি আজও তাঁর শিল্পী চিত্তকে দোলা দিয়ে থাকে। এ সব গল্পে সমাজের কতখানি হিত হবে, অথবা আদৌ হবে কি না, আমরা জানিনে, তবে পাঠকের অনেক নিরানন্দ মুহূর্ত যে একটি বেদনাময় আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ করি না।

শরদিন্দুবাবুর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ 'কানু কহে রাই'। মোট বারটি গল্প এ বইয়ে আছে। সব গল্পই অবশ্য প্রেমের নয়। তবে অধিকাংশ গল্পেই তাঁর রোমাণ্টিক মনের ছোঁয়া লেগেছে। মানব-মনের বিভিন্ন রহস্যকে এতই নিপুণভাবে ইতস্তত তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে তাতে মুগ্ধ হতেই হয়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর গল্প-বয়নের সুন্দর মাধুর্য। শরদিন্দুবাবুর ভাষার লাবণ্য যে কতখানি, পাঠকদের তা অজানা নয়। এ-বইয়েও তার আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আগেই বলেছি, এ-বইয়ের অধিকাংশ গল্পই রোমাণ্টিক। রোমাণ্টিকতা ভাল, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এ-বইয়ের প্রথম গল্পে সেই বাড়াবাড়ি এতই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, শরদিন্দুবাবুর অতি-বড় ভক্তের পক্ষেও সেটাকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন হবে।

১৫২।৫৫

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প : ভাস্কর বিহার সাহিত্য ভবন, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা—৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

আজকাল 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'সেরাগল্প', 'স্বনির্বাচিত গল্প' প্রভৃতির যুগ। কথা-শিল্পীর রচনা নৈপুণ্যের একটা পুরো চেহারা এতে ধরা পড়ে, তাই এ রকম গ্রন্থ প্রকাশ সাহিত্য পাঠকের পক্ষে আনন্দের। 'ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প' এ রকম আরেকটি গ্রন্থ।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনায় খ্যাতি-মান লেখক খুব বেশী নেই। যে কয়জন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক ব্যঙ্গাত্মক রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন, 'ভাস্কর' তাঁদের অন্যতম। স্বনাম শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় ঘোষ অথবা ছদ্মনাম 'ভাস্কর', দু' নামেই তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত।

আলোচ্য গ্রন্থটি ৪৮টি ব্যঙ্গ গল্পের সংকলন। লেখক চিন্তাশীল ব্যক্তি, আমাদের চারদিকে যে বিশাল জনস্রোত, যে জীবন প্রবাহ, সংসার যাত্রা তার সম্পর্কে লেখকের কৌতূহল ও অনুকম্পা এই সব গল্পের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। হাসি, কান্না, প্রেম বিরহ, জীবনের নানাদিক তিনি সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন এবং আত্মীয়ের মতো তার কৌতুক দিকটা তুলে ধরেছেন। 'ভজহরির' গল্পগুলি, 'ব্যয় সঙ্কোচ' 'ঔষধ', 'মজলিস', 'ফুল ও কাঁটা' 'আগে ও পরে' 'শিক্ষার মাধ্যম' প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু একটা কথা সবিনয়ে বলি, অনেকগুলি লেখাতে পুরো 'গল্পের' চেহারা বোধ হয় আসতে পারেনি, 'নক্সা' জাতীয় রচনার আদল এসেছে।

প্রচ্ছদ, কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই চমৎকার।

২৫।৫৫

সব মেয়েই সমান: শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। প্রকাশক: ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম: তিন টাকা।

'শোভা', 'কমলা', 'মীরা', 'বিজলী',

'নীরদা', 'প্রভা', 'নলিনী', 'মনোরমা'—নারী-নামাঙ্কিত মোট আটটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলিতে টেকনিকের কোন চমক নেই, বিষয়বৈচিত্র্যও নজরে পড়ে না। তবুও গল্পের আন্তরিক বিন্যাসের মধ্যে একটি ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পাওয়া যায়। তবু একটি বক্তব্য আছে। উত্তররবীন্দ্র বাঙলা ছোট গল্প আমাদের সাহিত্যে সর্বোত্তম ফলবান শাখা। ছোট গল্পের পরিমিতি, হ্রস্ববাচন আর নাট্যবোধ রীতিমত নিপুণতার অপেক্ষা রাখে। ছোটগল্প তাই মুহূর্তের মিনার। সেদিক থেকে এই সংকলনের অধিকাংশ গল্প-গুলিকে অভিযুক্ত করা যায়। ১২৮।৫৫

চাটনী—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক, শ্রীবিক্রম রায়চৌধুরী; ৮৩, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ২৫। দেড় টাকা।

ভূমিকায় লেখক বলছেন, "বলতেই জানি, লিখতে জানি না।" বইখানি আদ্যন্ত পড়ে বোঝা গেল, এ তাঁর বিনয় নয়, স্বীকারোক্তি। ১৪৮।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

দুই নগরের গল্প—চার্লস ডিকেন্স। অনুবাদকঃ শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। ক্লাসিক প্রেস, ৩।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২।

ঊনিশ শতকের ইংল্যান্ডের স্থিথধী সন্তান ডিকেন্স। তাঁর রচনাও আজ ক্লাসিক বলে গণ্য। চিরন্তন রসের স্বাদ পরিবেশনে এই অনন্য সাধারণ রসিক মন একাধারে কুশলী শিল্পী ও সুস্থ সমাজ-নীতিজ্ঞ। ডিকেন্স শিল্পের নিছক প্রচার উদ্দেশ্যকে স্বীকার করতেন না, কিন্তু স্বীকার করতেন তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য (Good purpose) আছে। ডিকেন্সের সকল রচনাতেই তাই একটি মানবীয় মহত্বের উজ্জ্বল শিল্প-গুণান্বিত সৌন্দর্য আছে যার মূল্য চিরন্তন। সম্ভবত ডিকেন্সের রচনা এই কারণেই কুলীন শিল্পের অন্তর্গত এবং জনপ্রিয়ও।

'এ টেল অফ টু সিটিজের' বাংলা অনুবাদ দুই নগরের গল্প। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে টেল অফ টু সিটিজের সমপর্যায়ের বই খুব বেশি আছে বলা চলে না। সাধারণ পাঠক বইটির সংগে অল্প বিস্তর পরিচিত একথাও বলা যায়। কিন্তু ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের কাছে বইটির পূর্ণাংগ পরিচয় হতে পারে 'দুই নগরের গল্প'। সাম্প্রতিক সময়ের দুজন খ্যাতনামা অনুবাদক শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। এঁদের অনুবাদে নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনুবাদের ভাষা সুন্দর এবং সাবলীল। বইয়ের প্রচ্ছদ চমৎকার না হলেও চলনসই। ছাপা ভাল। ২১৬।৫৪

দি ডেথ অব আইভান ইলিচ—লিও টলস্টয় : অনুবাদক—মনোজ ভট্টাচার্য। গ্রন্থ-জগৎ, ৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। ২, টাকা।

ভগবানকে পেতে হলে জ্ঞানের পথেই পেতে হবে। এই জ্ঞান সব মানুষেরই মনের অন্তরতম গভীরে রয়েছে। সভ্যতার বিকৃতির ফলে তা অস্পষ্ট, দুষ্প্রাপ্য। আমরা জানি এই জ্ঞান ও যুক্তির পথই টলস্টয়ের পথ। কিন্তু এই যুক্তিপথ সত্ত্বেও টলস্টয় শেষ পর্যন্ত মিস্টিসিজমের পথ নিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মও মিস্টিসিজমের গভীর সত্য বহন করেছে। তাঁর শেষ পর্বের কয়েকটি উপন্যাসে মানব-মনের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির সমাধান হয়েছে মিনিটকাল ঘটনা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা। মানুষের অন্তরের আলোর আভাপাতে। সে আলো নিছক বুদ্ধিবৃত্তির আলো নয়।

আইভান ইলিচের মৃত্যুকাহিনীতেও দেখা গেছে, জীবনের মহৎ সার্থকতার সন্ধান আইভান ইলিচ পেল, ঠিক মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুভয়ের দ্বারাই তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। মনের অন্তরতম গভীর থেকে আলোক-রশ্মি এসে পড়ল তার জীর্ণ জীবনে। তার ফলেই তার জীবন করুণাধারায় সিঞ্চিত হল।

এই গ্রন্থের নায়ক অত্যন্ত সাধারণ চরিত্রের লোক, যেমন সমাজের আর পাঁচটা সাধারণ শিক্ষিত লোক হয়। জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামায়নি। মহত্বের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না। হাকিমী তার পেশা, তাতেই তার জীবনের সব সার্থকতা। কিন্তু মানুষ কখন, কিভাবে যে তার তুচ্ছতার আবরণ খসিয়ে ফেলে মহত্ব পূর্ণতার স্পর্শ লাভ করে বলা যায় না। এই অতি সাধারণ তুচ্ছ হাকিমসাহেব ভীষণ অসুখে পড়ল। জানল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তার ফলে জীবনে আর তার কোনও স্বপ্ন রইল না, ঔৎসুক্য রইল না। তখন সব আশা আকাঙ্ক্ষার দীপ নিভিয়ে সে বুঝে নিল জীবনের কোনও অর্থ নেই, জীবন শূন্যোগর্ভ। তবেই পৌঁছল এক নির্বিকার বৈরাগ্যের মহাসুখে। কিন্তু এই বিরাগ নৈরাশ্যবাদীর বিরাগ। টলস্টয়ের নয়। তাই দেখা গেল গেরাসিম (বা জেরাসিম) নামে এক ভৃত্যের রূপে স্বর্গের আনন্দধারা নেমে এল। ভৃত্যের সহজ সুন্দর নিঃস্বার্থ সেবায় প্রেম, জীবন এবং ত্যাগের বিশ্বাস তার মনে প্রতিষ্ঠিত হল। মৃত্যুর আগে অন্তরের আলোকে মহৎ আনন্দের সন্ধান পেল।

আইভান ইলিচের মৃত্যু এই মহৎ প্রাপ্তির কাহিনী। মানুষের জীবনে এই আশা-সন্ধানের প্রয়োজন প্রতিযুগেই আছে। এযুগে আরও বেশি করে আছে।

অনুবাদের ভাষা চলনসই। প্রকৃত অনুবাদক শুধু ভাবাই অনুবাদ করেন না। বইয়ের ভাব ও তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে এক আলোকময় জগতের দ্বার খুলে দেন—যেমন করেছেন গার্ণেট। সেই প্রেরণার অভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও অনুবাদক এবং প্রকাশককে অভিনন্দন জানাতে হবে। গ্রন্থ নির্বাচনেই তাঁদের সাহিত্যরসোপভোগের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। ৫১৬।৫৪

বিবিধ

যৌন বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ১০, টাকা।

বংলা ভাষায় লিখিত পড়িত ভাবে যৌন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনা একদা অবাঞ্ছনীয়

ছিল। পরবর্তীকালে এই অযথা সঙ্কোচ কাটাইয়া সামান্য কয়েকটি যৌনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সামান্য কয়েকখানিরও অধিকাংশ নানা কারণে বাঙালী পাঠকের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে নাই। আবুল হাসানাৎ মহাশয়ের পুস্তকটি নিঃসন্দেহে একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। লেখক এমন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়াছেন যাহার সুস্থ, সহজ ও স্বাভাবিক আলোচনা কেবল-মাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ হইলেই চলে না উপরন্তু বক্তব্য বিষয় ও তাহার প্রকাশকে অতিমাত্রায় সংযমী ও সম্পূর্ণ বিকার-রোহিত করা কর্তব্য। হাসানাৎ মহাশয় এ বিষয়ে সফলকাম হইয়াছেন। গ্রন্থটির মর্যাদা এই যে, ইহার সমস্ত আলোচনাগুলি বিস্তৃত, যথাসম্ভব তথ্যসম্বলিত, সুবোধ্য এবং সংযত। গ্রন্থটি যোগ্য পাঠকের সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আশা করি। ৯০।৫৫

কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো?—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। প্রকাশক—দেব-কুমার বসু। ৭ জে পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। দাম—এক টাকা।

সমস্ত পৃথিবীর অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সাগরপারের দেশগুলির মত আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক আন্দোলন এত ব্যাপক বা প্রচারিত নয়। তা সত্ত্বেও নাগরিক মানুষ মাত্রেই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কম-বেশী সচেতন; ক্রমশ এই সচেতনতা প্রসারিত হচ্ছে। তাই ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলো-চনার প্রয়োজন আছে। এবং সে আলোচনা নীরস অর্থনীতির তত্ত্বব্যাখ্যা হলে পাঠক বিমুখ হবে। 'কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো?' এদিক থেকে এটি রম্য আলোচনা। ব্যাঙ্কের প্রতিটি খুঁটিনাটি, গলদ-বিচ্যুতির দিকে লেখক আঙুল প্রসারিত করেছেন। ত্রুটিহীন ব্যাঙ্কিং কিভাবে সম্ভবপর, তারও একটি ইঙ্গিত রয়েছে। গ্রন্থটি সন্ধানী পাঠকের দরবারে নিঃসন্দেহে সমাদর পাবে। কারণ, এর পেছনে প্রবন্ধের কঠিন গুরুমশাই নেই, গল্পের একটি সহজ-হৃদয় আমেজ আছে। (১৭৩।৫৫)

মজুরী দাম মুনাফা—কার্ল মার্কস। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ কলিকাতা। দাম আট আনা।

মজুরী ও পুঁজি—কার্ল মার্কস। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

প্রায় একশ বছর আগে কার্ল মার্কস তাঁর অভিনব চিন্তাধারা দিয়ে চিন্তা জগতে বিপ্লব এনেছেন। মানব সভ্যতার ধারা বিশ্লেষণ করে তিনি অর্থনীতি ও দর্শনে যুগ প্রবর্তন করে গেছেন। এই পুস্তিকাগুলি তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কীয় দু'টি ঐতিহাসিক রচনার বঙ্গানুবাদ। মজুরের শ্রমশক্তি একটি পণ্য বিশেষ, মালিক শ্রেণী এই পণ্য ক্রয় করে শিল্পে উৎপাদন ঘটায়। মার্কসীয় অর্থনীতির ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই পুস্তিকা দুটিতে মজুরী, পুঁজি, দাম ও মুনাফা সম্পর্কে মার্কসের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত হয়েছে। মার্কসীয় দর্শন বুঝতে গেলে এই পুস্তিকা দু'টি বিশেষভাবে পড়া উচিত। বাংলা অনুবাদে কোন কোন স্থানে কণ্টকৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধন করা উচিত। ২০, ২১।৫৫

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ—জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশকঃ এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

শান্তিনিকেতনের কবি কি রকম সত্য অর্থে বিশ্বনাগরিক ছিলেন সেই অনুসন্ধানে এই গ্রন্থ মূল্যবান সহায়। বহু পরিশ্রমে লেখক অনেক তথ্য জোগাড় করেছেন। ফলে অনেকের পরিশ্রম বাঁচবে। ২০৪।৫৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

সমুদ্রের গান—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কমিউনিজম ও কৃষক—রামস্বরূপ
শেষ সীমান্ত—হাওয়ার্ড ফাস্ট অনুবাদক অবন্তী সানাল
কাচঘর—বিমল কর
কত অজানারে—শংকর।
লণ্ডন গোধূলি—রবীন্দ্র বিশ্বাস
লালফুল—ব্যারনেস ওজি অনুবাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রাশিয়ার রূপকথা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
দিল্লীকা লাড্ডু—শ্রীসুনির্মল বসু
এক যে ছিল পুতুল—অশোক গুহ
চালিয়াৎ চন্দর—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বেহাগ—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।
বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা—নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।
মাধবীর জন্য—প্রতিভা বসু
উজালা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মুক্তিদাতা আইজেনহাওয়ার—আঁদ্রে মরওয়া অনুবাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ সাহা
পঁচিশে বৈশাখ—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত
তপস্বিনী—শ্রীপরেশপ্রসন্ন সেন
পশারিণী—শ্রীসমরেশ বসু

আরেক রূপে

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

সেদিনও এসেছ তুমি
দেখেছ গৈরিক বেশে সবুজের সন্ন্যাসী-জীবন,
দেখেছ অকাল ঝড়ে ঝ'রে যেতে প্রত্যাশার ফুল;
ধূলার নীরব শঙ্খে জাগেনি তোমার সম্ভাষণ,
বিলাপী হাওয়ার ডাকে দিগঙ্গনা হয়েছে আকুল!

আজকে আরেক রূপে
আবার এলে কি তুমি, জাগালে কি এ সন্ন্যাসী বন,
এনেছ কি শাপদগ্ধ মৌন মূক বিহঙ্গের গান—
সে গানের মুক্ত ঢেউ, আবেগের ব্যাপ্ত শিহরণ
স্বপ্নের সবুজ ঢলে ভাসাল কি অগ্নিজ্বলা প্রাণ!

সৃষ্টি কি মুখর হ'ল
উত্তরের ঝর্ণাঝরা নৃত্যলোল নূপুরে নূপুরে,
বিহ্বল দৃষ্টির তটে ললাটের তৃতীয় গঙ্গার
ছড়াল প্রেমিক সূর্য পূর্বরাগ মেদুর দুপুরে?
এলো কি জীবন-বৃন্তে লগ্ন ফিরে ফুলের জল্‌সার!

তাহলে প্রসন্ন হও
স্নেহশ্যাম বুকে তুলে এবার আমাকে দাও ঠাঁই,
আনন্দের অশ্রু হ'য়ে ঝরে যাক মেঘ প্রতীক্ষার—
অশ্রুকণা সুরে গেঁথে মণিহার তোমাকে পরাই,
ধূলার নীরব শঙ্খ তুলে দাও দু'হাতে আমার!

স্মৃতিমিলিতা

বটকৃষ্ণ দে

সে আছে অনেক দূরে। নদী-ট্রেন-স্টীমারের সেতু
পার হয়ে তারপাশার কোনো গ্রামে। এতোটা সুদূরে
যে, তার ছবিও মনে ভেবে নিতে আব্‌ছা লাগে। হেতু,
নিতান্ত সহজ। আমি শহরের পথে-পথে ঘুরে
তার নাম জপ ক'রে তবু মনে আনতে পারি না,
এখন আঙুলে তার কোন তান, কোন সুর বীণা!

যৌবনের রাণী-মার সিংহাসন পেয়ে আজ সে কি
ভুলে গেল ছোট-শিশুবয়সের স্বপ্নসঙ্গী সখী
আপন মনের। না কি বিকেলের ছায়ার পুকুরে
সমস্ত দিনের শেষে ছোট বোন (কী দুষ্টু!) খুকুরে
গা' ধুইয়ে দিতে এসে ঝিলিমিলি আপনারই সাথে
কথা বলে, প্রতিচ্ছবি আর সে, দুজনে গল্পে মাতে!

জানি না। সে এখনো কি মনে রাখে রান্না-রান্না খেলা
বউ-বউ বাসরের স্মৃতি, আর, খেলার সংসার
অভিমানে চুপ করা, রেগে ওঠা, কান্না-কান্না পালা
পাকা-গৃহিণীর মত সব-কিছু-করা, বলা, আর
সেই চালে-চলা। এতো হিসেবী কি কালের কিংখাব
তুলে, একবারো ভুলে দেখে না কোথায় কী অভাব!

কে জানে! শহর, আমি নীড়ভ্রষ্ট। সেদিনের পুঁজি
কৃপণের মতো নাড়ি, সচকিত দৃষ্টি মেলে খুঁজি—
অন্ধ-গলিতেও যদি আসে তার সৌরভের হাওয়া
শহর, নিয়োনা কেড়ে স্মরণ-প্রহরে তাকে পাওয়া॥

সেতু

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তাকেও ভাসালো প্রেম পুণ্যবহা নদীর উজানে,
দ্বাদশ দেউল তীরে মায়াজনা চন্দনের ঘ্রাণে
জলের এস্রাজে কেঁপে আশীর্বাদ-লগ্ন এঁকে দিল,
শুভ্রতার বরমাল্য কণ্ঠহারে সেও বেঁধে নিল—
শান্তির অমৃতকান্তি ভ'রে দিল প্রেমচিহ্ন-ঘট;
ছিন্ন হোক, ছোটো হোক জীবনের বর্ণচোরা পট
প্রেমের অনন্তবর্ণ তাকে ঘিরে স্বপ্নসুরা আনে,
আমার বন্দরে থেকে সেও খোঁজে প্রণয়ের মানে॥

১৬ই জুন থেকে ১ নম্বর সদর স্ট্রীট-এ (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম স-এর পিছনে) রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার টি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন কাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর পক্ষ। প্রদর্শনীটি ৩০শে জুন পর্যন্ত সাধারণের জন্য খোলা থাকবে। সবশুদ্ধ ইখানি ছবি টাঙানো হয়েছে। ছবি-র বেশীর ভাগই অপরিচিত।

শোনা যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সময় জনৈক ভদ্রলোক তোষামোদ করে ত গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বাবুর লেখাই তিনি পছন্দ করেন ী। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁর ঃ দুর্বোধ্য। শরৎবাবু জবাব দেন— মি লিখি আপনাদের জন্য আর রবীন্দ্র-লেখেন আমাদের জন্য"। রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন ভাষাও অতি সাধারণ দর্শকদের কাছে ধ্য ঠেকতে পারে। অবশ্য একথা , জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁকে য় রাখতে চাইনে। যতই দুর্বোধ্য ঃ না কেন, ছবি বা স্কেচগুলির প্রতি ঃ দিলেই এক প্রবল প্রাণশক্তির স্থিতি আমাদের সত্তাকে আন্দোলিত তোলে। যদি নাও জানা থাকতো, চিত্রকলা এক বিরাট প্রতিভার ব্যক্তি-সর প্রতিফলন, তা হলেও এগুলির দুর্নিবার বল অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করতো। রবীন্দ্রচিত্রকলার মেজাজ নিতান্ত আধুনিক। খাঁটি এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পী আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই বলা চলে। এক্সপ্রেশন বলতে আমরা বুঝি স্বকীয় ভাবাবেগকে প্রকাশ করা। 'হোয়াট ইজ বিউটি' গ্রন্থে ই, এফ, ক্যারিট বলেছেন—

An expression is a sensuous or imagined object in which we perceive (not infer) feeling. Secondly, expression is not communication. Expression may be confined to ourselves."

এই ভাবাবেগকে প্রকাশ করতে শিল্পীরা আশ্রয় নেন অতিরঞ্জন বা বিকৃতিকরণের। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পনায় বেশীর ভাগ আসর জমিয়েছে পশু, পাখি, মানুষ এবং স্বপ্নলোকের কিম্ভূতকিমাকারেরা। দৃশ্যচিত্রও কিছু কিছু আছে। রঙ ব্যবহার করেছেন ফাউণ্টেনপেন-এর ব্লু ব্ল্যাক কালী, লাল কালী, পোস্টার রঙ, স্বচ্ছ জলরঙ, কাঁণ্ট ক্রেয়ন এবং আরও কত কি! কাগজ ব্যবহারেও তাঁর কোনও 'শৌখীনতা' ছিল না, সস্তা ব্রাউন পেপার, রাইস পেপার, প্রেস্‌ড্‌ বোর্ড, সাধারণ চিঠির কাগজ সব কিছুই ব্যবহার করেছেন। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ সাদৃশ্য সত্যের অনুসন্ধানী ছিলেন না। কিছু ছবির ফর্ম-এ সম্পূর্ণ জ্যামিতিক অ্যাবস্‌ট্র্যাকশন লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এগুলি চরম ভাবপ্রবণ মানসিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া। মহান্‌ ব্যক্তিদের চিন্তাধারা একই রকম—এই প্রবাদের সত্যতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। এখানেও দেখা গেল, জন পাইপার-এর 'ব্ল্যাক হেড অ্যাণ্ড ফ্লাওয়ার্স', 'ওয়েস্ট উড ম্যানর ফার্ম' প্রভৃতি ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছবির আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য অনুভব করা যায়, অথচ প্রায় একই সময় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে এবং জন পাইপার ইংলণ্ডে বসে ছবিগুলি রচনা করেছেন। জ্যামিতিক অ্যাবস্ট্রাক্‌ট ছবিগুলি ছাড়া, বেশীর ভাগ ছবিরই ফর্ম এবং রঙ থেকে একটি অবসাদের সুর ভেসে আসে, যে সুর রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিরল—কবি রবীন্দ্রনাথ এবং চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য।

এ প্রদর্শনীর অনেক ছবির ক্যাপশন-এর সঙ্গে ছবির ভাবাবেগের কোনও

সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া গেল না; সম্ভবত এই ক্যাপশনগুলি রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত নয়। যেমন, ২৮ নম্বর ছবির নামকরণ হয়েছে' উওম্যান ফেস'। ছবিটিতে দেখা যায় এক শোকাতুরা বৃদ্ধা, দৃষ্টি উপর পানে। এ স্থানে কেবলমাত্র 'নারীর মুখাবয়ব' নাম খুব সঙ্গত ঠেকছে না। 'টু ফিগার্স' (২৮), 'ট্রী' (৩০), 'উওম্যান ফেস' (৩৭), 'লুকিঙ আপ' (৯০) প্রভৃতি ছবির অসঙ্গত ক্যাপশন হওয়ায় এগুলির গভীরত্ব নিশ্চয় কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ৮৪ নম্বরের 'বার্ড' ছবিটি ঠিকভাবে টাঙ্গানো হয়েছে কিনা সন্দেহ। শিল্পীর নাম সই অনুযায়ী বিচার করলে মনে হয়, ছবিটি কাত করে টাঙ্গানো হয়েছে। এ ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'পক্ষী' বটে, কিন্তু ঠিকভাবে টাঙ্গানো হলে দেখা যাবে এটি একটি দণ্ডায়মান মনুষ্যাকৃতি—অবশ্য অবাস্তব।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে তাঁর সাময়িক অবসর বিনোদন বলে খ্যা[illegible] করলেও, পল ক্লী বা শাগাল-এর মত [illegible] ছবিও উদ্দেশ্যপূর্ণ, কল্পনাসম্ভূত [illegible] স্বতঃপ্রবৃত্ত। বিরাট ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি অনস্বীকার্য।

এমন ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শ[illegible] কলকাতায় এর আগে আর কখনও হয়নি। এই ব্যবস্থা করে অ্যাকাডেমী অব ফা[illegible] আর্টসের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের ক[illegible] অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। —চিত্র[illegible]

আলোচনা

দেশ পত্রিকার বাইশ বছর

সম্মাননীয়েষু,

'আনন্দ সদনের' দ্বারোদ্ঘাটনের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেশ পত্রিকার মলাট-এর প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু নিবেদন বোধ হয় অসাময়িক হবে না।

২১ বছর আগে রাত ৯টার সময় ১৪নং পার্শিবাগানে স্বর্গত সুরেশ মজুমদার ও শ্রীমাখনলাল সেন এসে অতি ব্যস্ত হয়ে জানালেন, 'সাপ্তাহিক বার করছি। নাম 'দেশ'। মলাট চাই। সময় মাত্র দু'দিন। সব প্রস্তুত, শুধু মলাট নেই। মলাট হবে দু রঙ-এ লাইন ব্লকে।' জানালাম ৩।৪ দিনের আগে হবে না। হাতে অনেক কাজ। ও'দের সঙ্গে ব্লকমেকার অমূল্য সেনও ছিলেন। তিনি বললেন, দু দিনের বেশী সময় নিলে Two colour Block হবে না। বন্ধু সুরেশ মজুমদার ও মাখন সেন বললেন,—'আর কোনও কথা নেই। ঠিক দু দিন পরে এই সময় এসে মলাট নিয়ে যাব। যেমন করে হোক করে দিতেই হবে।'

দু'দিনেই মলাট এঁকে দিলাম। আড়ম্বরের সময় ছিল না। সাদাসিদে Symbolic Design হল। বন্ধু সুরেশ মজুমদার ও মাখন সেন জিজ্ঞাসা করলেন, মলাট দেখে মানে বলুন। জানালাম,—'অগ্নিবেষ্টনীর মধ্যে সুর্বকিরিটিনী দেশ পর্বতের মত অচল।' দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠলেন—বাঃ! সমসাময়িক। মজুমদার বললেন, 'মানেটা ছেপে দিলে কি হয়?' বললাম, 'না। যারা বুঝবার ঠিক বুঝবে।'

ঠিক ৪ দিনের মধ্যে ক্রীম কাগজে লাল ও নীল রংয়ে ছাপা মলাট নিয়ে 'দেশ' আত্মপ্রকাশ করলে। অগ্নিবেষ্টনীর পরিকল্পনা নটরাজের মূর্তির বেষ্টনীর পরিকল্পনা থেকে নেওয়া।

মলাটের নীচে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন আমারই যোগাযোগে ছাপা হয়। ছবিটা আমার (ঢাকী) আঁকা। ঐ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন আজও অব্যাহত আছে।

আমার আঁকা প্রথম মলাট নিয়ে 'দেশ' পত্রিকা যে শৈশব থেকে যৌবনে এগিয়ে চলেছে এর আনন্দ আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করছি। আমার পরে যে সব কৃতী শিল্পী 'দেশ'-এর মলাটের শোভা বর্ধন করে আসছেন, তাঁরাও আমারি দলে। তাঁরা 'দেশ'-এর অঙ্গে যে বিভিন্ন শোভার ছাপ দিচ্ছেন, তা মনোরম।

আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও একটা বেদনা ভুলতে পাচ্ছি না, সেটা আমার পরম বন্ধু স্বর্গত সুরেশ মজুমদারের অভাব।

আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। ভবদীয়

যতীন্দ্রকুমার সেন

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার এই সংখ্যায় (২২ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা) "দেশ পত্রিকার বাইশ বছর" প্রকাশিত হওয়ায় আমরা বেশ আনন্দিত হয়েছি। এর আদি সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানবার জন্য আমরা বেশ উৎসুক ছিলাম। আমরা যারা নবীন হয়ত তারা অনেকেই দেশ পত্রিকার "স্বাধীনতাকামী-উগ্র জাতীয়তাবাদী-প্রগতিবাদী-স্বাজাত্যাভিমানী-সেবাব্রতী ইত্যাদি অতীত আত্মপরিচয় জানতাম না। আর জানতাম না কতদূর সরকারী কোপদৃষ্টি, লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করে এতদূর এগিয়ে আসতে হয়েছে। এইজন্যই এই পরিচয়টুকুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বললাম।

আর একটি কথা বলব, অপরেশবাবুর চিঠিটি বড় সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত করে লেখা হয়েছে। তিনি প্রবীণ এবং গ্রাহক হিসেবে 'ফার্স্ট', তবু এটুকু কষ্ট স্বীকার করায় [illegible] আমরাও তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি

শ্রীরণেন্দ্র চক্রবর্তী, ঘুঘুডাঙ্গা, দমদম।

॥ ৩ ॥

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, বর্তমান সংখ্যা 'দেশ'-এ প্রকা[illegible] 'দেশ পত্রিকার বাইশ বছর' সম্পর্কে গ্রা[illegible] হিসেবে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। সংক্ষে[illegible] নিবেদন করছি:

'দেশ'-এ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইগু[illegible] মধ্যে কয়েকটির নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, য[illegible] 'স্মৃতির অতলে', 'পলাশীর যুদ্ধ'। অনু[illegible] সাহিত্যের উল্লেখ একেবারে নেই, থাকা উ[illegible] ছিল। আর্ভিং স্টোনের স্মরণীয় গ্রন্থ [illegible] ফর লাইফ'-এর অনুবাদ 'জীবন-তৃষা', জি[illegible] চেস্টরটন এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত [illegible] লাগের্কভিস্টের প্রথম বাংলা অনুবাদ যথা[illegible] 'আজব জীবিকা' ও 'জীবন-মৃত্যু' 'দেশে' প্রকাশিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সার্তরের 'নো[illegible] হাত' ও আর জে মিনির 'চার্লস চ্যাপলিন'

অবশ্য, অনুবাদ সাহিত্য সম্প[illegible] অনুৎসাহী শুধু অপরেশবাবু নন—মনে [illegible] আপনারাও কিছু পরিমাণে। সংস্কৃতির [illegible] জাতিভেদের অবসান ঘটানোর সঙ্গে স[illegible] দেশ-বিদেশের ব্যবধানও দূরীকরণ বাঞ্ছনী[illegible] এই দিক দিয়ে 'দেশ' পিছিয়ে রয়েছে ব[illegible] আমি মনে করি। আধুনিক বিদেশী সাহি[illegible] ও সাহিত্যিক সম্পর্কে নিয়মিত আলো[illegible] হওয়া দরকার। ভারতের অন্যান্য ভা[illegible] সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কেও। এব[illegible] ক্রমশ-প্রকাশ্য অনূদিত উপন্যাসের [illegible] জানানো কি অসঙ্গত হবে?

অপরেশবাবু পুরনো সংখ্যা ঘেঁটে অ[illegible] কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশন করেছে[illegible] সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু একটা জিনিস [illegible] চোখ এড়িয়ে গেছে: আজ 'দেশ'-এ [illegible] উপন্যাস লিখে থাকেন—এমন [illegible] প্রখ্যাত কথাশিল্পী সেদিন লিখতেন [illegible] যথা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ [illegible] হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। আবার প্র[illegible]

শিল্পী হিসেবে সাহিত্যজীবন শুরু করে হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এমন হরণও আছে—অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরী শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নিছক হিসেবে হয়ত অনেকের কাছে তেমন চাঞ্চল্যকর নয়, তাই এই সঙ্গে র কবিতা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি পারলে মন্দ হত না। কিন্তু ওঁরা কি সেটা ভালো মনে নেবেন! ইতি—নাথ সেন, শ্রীরামপুর।

রবীন্দ্র চর্চা

নয় নিবেদন,

এ বছরের 'সাহিত্য সংখ্যা' 'দেশ'-এ প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র-চর্চা'র' বিষয়ে লোচনার অবতারণা করে ভাল করেছেন। য়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অনেক- দিক আছে। তাই এ-বিষয়ে বিশেষ লোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে করি।

বিশ্বভারতীর মতো কলিকাতা বিশ্ব-ালয় এবং 'রবীন্দ্র-ভারতী'তে বিশেষ ন্দ্র-অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার াজনীয়তা সম্বন্ধে আশা করি কেহই মত হবেন না। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের রাধানের অব্যবহিত পরেই একজন তী মনীষী (খুব সম্ভবত বার্নার্ড শ) বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-াপক পদের সৃষ্টির প্রস্তাব করে থাকতে ন, তখন বিভিন্ন ভারতীয় বিদ্যালয়েও চেষ্টা করার প্রস্তাব আশা করি, অসঙ্গত মনে হবে না। এ-বিষয়ে বাংলার চার এবং বাংলাদেশের ধনাঢ্যকুলের কূল্য আশা করা যেতে পারে।

বিশেষ বৃত্তিভোগী রবীন্দ্র বিষয়ক ছাত্র ক একাধিক সংখ্যায় বিভিন্ন স্থানে করার প্রয়োজনীয়তা প্রমথবাবুর মতো আরও অনেকে অনুভব করে থাকেন। রবীন্দ্র স্মারকনিধির কর্তৃপক্ষ, রবীন্দ্রভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর এ-বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে বলে মনে করি।

গবেষণার বিষয় কি এ-প্রশ্ন অবান্তর না হলেও অর্বাচীন, কারণ গবেষণা তো সবে শুরু হয়েছে। প্রায় সব কাজই এখন বাকী। প্রাথমিক কয়েকটি কাজের আশু প্রয়োজন আছে, তার ওপর ভবিষ্যতের সমস্ত কাজ নির্ভর করবে।

প্রথমত, রবীন্দ্র-রচনার সূচী। প্রশান্ত মহলানবীশ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুলিনবিহারী সেন এ-বিষয়ে সুন্দর রাস্তা দেখিয়েছেন। পুলিনবাবু এই কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে নানা মূল্যবান কাজ করেছেন। এখন প্রয়োজন কোনো কেন্দ্রীয় সমিতির তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ ও ছাত্র-গবেষকদের সাহায্যে এই কাজটি অখণ্ড-ভাবে সম্পূর্ণ করা। ব্রজেন্দ্রনাথ 'গ্রন্থসূচী' করে গেছেন। এখন 'রচনা-সূচী'; অর্থাৎ কোন্ কবিতা, কোন্ প্রবন্ধ, কোন্ গল্প, কোন্ উপন্যাস কবে লিখিত এবং কোথায় কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, তার কালানুক্রমিক তালিকার প্রয়োজন। এই তালিকা হবে বিষয়-নিরপেক্ষ। কিন্তু এ-ছাড়াও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের স্বতন্ত্র তালিকা (কালানু-ক্রমিকভাবে সাজানো) প্রয়োজন, যেমন সামাজিক রচনা, রাজনীতিক রচনা, রসশাস্ত্র-মূলক রচনা, শিক্ষা বিষয়ক রচনা ইত্যাদি। এ-সম্বন্ধে কিছু কাজ পুলিনবাবু এগিয়ে রেখেছেন, যথা—'শিক্ষাবিষয়ক তালিকা', 'ছোটোগল্পের তালিকা' ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যাবতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বিষয়ানু-ক্রমিক তালিকা। এ-বৎসর 'দেশে'র 'সাহিত্য সংখ্যায়' পুলিনবাবুর 'রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থ-পঞ্জী' এ-বিষয়ে মূল্যবান পথ-প্রদর্শক। তিনি বাংলা ভাষায় এ-বিষয়ে যাবতীয় গ্রন্থের তালিকা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ-গুলিরও তালিকা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং শুধু বাংলার নয়, অন্যান্য সব ভাষারও।

তৃতীয়ত, 'ব্রাউনিং সাইক্লোপিড়িয়া' জাতীয় একটি সম্পূর্ণ বর্ণানুক্রমিক 'রবীন্দ্র-কোষ'। এতে প্রত্যেকটি কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গ্রন্থ ইত্যাদির স্বতন্ত্র পরিচয় থাকবে, যেমন—রচনাটির শীর্ষক, কবিতা হলে তার প্রথম পংক্তিটিও, রচনার তারিখ, প্রথম প্রকাশ, তৎপরবর্তী যাবতীয় প্রকাশ, পাঠান্তরের ইঙ্গিত, বিষয়বস্তুটির সংক্ষিপ্তসার এবং তৎসম্বন্ধীয় মূল্যবান সমালোচনার তালিকা ইত্যাদি। এই সূচীটি হবে বর্ণানুক্রমিক, যেমন 'কোষ' জাতীয় গ্রন্থ হয়ে থাকে। এরই অপর অংশে বা অপর খণ্ডে থাকবে একটি বিষয়ানুক্রমিক নির্ঘণ্ট যা উপযুক্ত সূচী-পৃষ্ঠার নির্দেশ দেবে, যেমন—'সন্ধ্যা', 'বর্ষা', 'ব্রাহ্মণ', 'বিধবা', 'পূর্ণিমা', 'সমবায়-প্রথা' ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোন্ কোন্ রচনার পরিচয় কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় আছে। বলা বাহুল্য, এই কাজটি বৃহৎ ও বিপুল। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ হলে রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্র-গবেষণার পথ কিরূপ সুগম হয় সে-বিষয়ে অলমতি বিস্তরেণ।

উপযুক্ত লোক কোথায়, টাকা কোথায় ইত্যাদি চিরন্তন প্রশ্নের কোনো আলোচনা করলাম না। এ-প্রশ্ন চিরকাল উঠে থাকে, কিন্তু লোকও পাওয়া যায়, টাকাও আসে। অনুকূল বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন। প্রথমে তাকেই সৃষ্টি করা যাক। ভবদীয়—হিমাংশু-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।

ইদানিংকার বাংলা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার ৩০ সংখ্যায় শ্রীযুত অরুণ-কুমার সরকারের 'ইদানিংকার বাংলা সমা-লোচনা' পড়ে খুব খুশি হয়েছি। অপ্রিয় হলেও অরুণবাবু যে এমন সত্যি কথাটা সত্যিকারের বলতে পেরেছেন, অন্তত ইদানিংকার প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক হয়েও যে তাঁর অপরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে কিছু পিঠ চাপড়ানি পাবার মনোবৃত্তি হয়নি দেখে খুব আনন্দ হল। যে সুচারু মনোভাব বর্তমান সাহিত্যিক মহলে একান্তই বিরল।

এটা বিজ্ঞাপনের যুগ (হুজুগেরও যুগ)। তাই বেশির ভাগ সমালোচনার আড়ালে যা পাই তা-ও বিজ্ঞাপনই। তাছাড়া ইদানীং যেন পিঠ চাপড়ে দেবার রীতিটা বড় বেশি হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন তেমনভাবে কোন চাঁই-গোছের কারো সার্টিফিকেট আদায় করতে পারলেই হল—আর দেখতে হবে না, তাতেই যেন সব হবে। তাছাড়া এই সমস্ত চাঁইরা লজ্জার মাথা খেয়ে কি করে যে এমন সমস্ত হাস্যকর সার্টিফিকেট দেন তাও বুঝতে পারিনে।

এ ছাড়া আছে সাহিত্যে দলাদলি। যার ফলে যোগ্য স্থানে নিন্দা আর অযোগ্যতায় প্রশংসা তো অহরহই দেখা যাচ্ছে।

প্রকৃত সমালোচকের মনকে নিরঙ্কুশ খাঁটি করতে হবে এবং অপ্রিয় হলেও সত্যি কথাটা সত্যিকারের বলবার মত সৎসাহস অর্জন করতে হবে, তবে যদি সমালোচনা সাহিত্যের কিছু উন্নতি হয়। নতুবা, নতুবা অরুণবাবুরা হাজার লিখলেও কিছু হবে না।

পরিশেষে ইংলণ্ডের সমালোচনা সাহিত্যের ধারার যে বর্ণনা অরুণবাবু করেছেন সে প্রথা মেনে চললে হয়ত কিছু সার্থক সমালোচনা আমরাও পেতে পারবো বলেই আমার মনে হয়। বর্তমান সমালোচক-সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে কিছু ভাববার অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রীতি নমস্কারান্তে—দীপিকা দাশগুপ্ত, জামসেদপুর—৫।

মাস্টারির পরিণাম

চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ঝোঁক জিনিসটা মহা কাল। এক ভাবের একখানা ছবি একবার যদি উৎরোয় অমনি পরবর্তী চিত্র-নির্মাতারা লেগে গেলেন সেই পথ ধরে নিতে। তেমনিই "প্রফুল্ল" যখন হতে পারলো তখন "পরপারে", "পথের শেষে" প্রভৃতি এক একটা কান্নাসাগর যে পর্দায় উপস্থিত হবেই তা জানা কথাই। কাজেই "পথের শেষে"-র আবির্ভাব মোটেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। কিন্তু এস বি প্রডাকসন্সের তোলা ছবিখানিতে দেখা গেল, নাটকাকারে যা ছিল কান্নাসাগর পর্দারূপে তা পরিণত হয়েছে অশ্রু-তড়াগে। এই আবেগোচ্ছ্বাস প্রশমিত পরিবর্তন মূল নাট্যরূপের নির্মম মরবিড চেহারায় একটা সংযম নিয়ে আসারই চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতেই গিয়েছে গল্পের জোর কমে। নাটক এমন পর্দায় সুর বাঁধা যে, পদে পদে যাতে অশ্রু প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সেটা প্রার্থনীয় কি না, সে প্রশ্ন অন্য কথা, কিন্তু ঐটাই ছিল এই রচনার বৈশিষ্ট্য। ছবিখানিতে আবেগকে সংযত করতে গিয়েই হয়েছে ফ্যাসাদ। কারণ মূল রচনার ভিত্তিই যা নিয়ে, তার ওপর থেকে জোর সরিয়ে নিলে আর রইলো কি! নাট্যকার নিশিকান্ত বসু রায় তাঁর মূল রচনাতে যে উদ্দাম আবেগ সৃষ্টি করে গিয়েছেন, চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করে উদ্দামতা কম করার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে এ গল্পের জোর গেছে নিভে। যে গল্প যা নিয়ে, তা থেকে সেইটি বাদ দিয়ে দিলে যে ফল হয়। যার ছিল নির্মম, করুণ পরিণতি, তাকে প্রফুল্ল মিলনান্ততে পরিণত করে তোলার অধিকার সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন তুলতে হয়। এখনকার মনের মতো করে যদি পরিবর্তন করে নেওয়াই অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে, তাহলে দরকার কি ছিল এমনি এক বিগত-রুচির আখ্যানবস্তুকে রূপান্তরিত করতে যাওয়ার! এই মাস্টারিগিরির ফলেই ছবিখানি গিয়েছে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে। "পথের শেষে" নিয়েই ছবি হবে, অথচ তার জমে ওঠার জোর যা নিয়ে তা সংযত অথবা পরিহার করে নিতে হবে, এমন মনে হলে "পথের শেষে" নির্বাচন করা কেন?

* * *

"পথের শেষে"র যা আখ্যানবস্তু, এ যুগে তার কোন আবেদন নেই। ছবিখানিতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে যে রূপে দাঁড় করানো হয়েছে, তাতেও কোন আবেদন সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। জমিদার দুর্গাশঙ্কর তাঁর বাল্যবন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন নিজের পুত্রের সঙ্গে বন্ধু-কন্যার বিবাহ দেবার; কিন্তু পুত্র নলিনী মরণাপন্ন বন্ধুকে শান্তি দেবার জন্য তার ভগিনী পারুলকে বিবাহ করে। নলিনীর পিসতুতো ভাই লম্পট যোগেশ এ ব্যাপারে নলিনীকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়, কারণ নলিনী পিতার অবাধ্য হলে সম্পত্তি তারই পাবার সম্ভাবনা। বিয়ের খবর দুর্গা-শঙ্করের কাছে পৌঁছলো যেদিন নলিনীকে আশীর্বাদ করার দিন। যোগেশ আর তার কুটিলা, কুচক্রী মা সুখদা এই খবর বহন করে এনে দিয়ে কপট শোক প্রকাশ করলে। রাগে ও লজ্জায় দুর্গাশঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে নলিনীকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলেন। নলিনীকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করে-ছিল দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত নায়েব অনাদি। সে দুর্গাশঙ্করকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। দুর্গাশঙ্কর হুকুম দিলেন, নলিনী যেন তার স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর কলকাতার বাড়ি ত্যাগ করে। যোগেশই এ বার্তা নলিনীকে শুনিয়ে এলো। এদিকে অনাদি থাকলে পাছে দুর্গাশঙ্করকে হাত করতে তথা সম্পত্তি হস্তগত করতে বাধার সৃষ্টি হয়, এই

—শৌভিক—

আশংকায় সুখদা নিজে দলিল চুরি করে যোগেশের সহায়তায় তা বিপক্ষ দলের হাতে পেঁছে দিয়ে দলিল চুরির দায়ে অন্যদিকে গৃহছাড়া করলে। সুখদা রোজই দুর্গাশংকরের খাবারের সঙ্গে অল্প অল্প আর্সেনিক মিশিয়ে দেয়। ওদিকে নলিনীর অবস্থা চরমে উঠলো। পয়সা নেই, চাকরি নেই। শেষে বস্তীতে তাদের আশ্রয় হয়েছে। একটি সন্তানও জন্মেছে, কিন্তু তার ঔষধ বা পথ্যের কোন সংস্থান হয় না। দুর্গা-শংকরের রাগ প্রশমিত হতে থাকে। একদিন তিনি নলিনীর মায়ের গহনা-গুলো নলিনীকে দিয়ে আসতে বললেন যোগেশকে। যোগেশ এই গহনাগুলি নিয়ে নায়েব নিবারণের টাকা ও অনূঢ়া শ্যালিকা ললিতাকে নিয়ে কলকাতায় গা ঢাকা দিলে। দুর্গাশংকর একটা উইল করেছিলেন, কিন্তু একদিন দেখলেন উইলের লেখা অন্য, তাতে যোগেশকে সব সম্পত্তির মালিক করে দেওয়া হয়েছে। সুখদা প্রথমে ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে এবং তা না পেরে দুর্গা-শংকরকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাতেও ধরা পড়ে নিজেই সেই বিষ খেলে। নিবারণ কলকাতায় যোগেশকে খুঁজে বের করলে এবং প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে যোগেশকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হারালে। পুরাতন ভৃত্য গোবিন্দ ছিল নলিনীর সঙ্গে বরাবর। নলিনীদের অবস্থা সইতে না পেরে দুর্গাশংকরের কাছে এসে ওদের কথা জানায়। দুর্গাশংকর যখন কলকাতায় এসে পেঁছিলেন, সেইদিনই নলিনী মিথ্যা চুরির দায়ে জেল থেকে খালাস পেয়েছে। দুর্গাশংকরেরই গাড়িতে নলিনী আহত হলো। নলিনীর অনুপস্থিতিতে বাড়িওয়ালি পারুলকে ঘরছাড়া করে। দারুণ দুর্যোগে শিশুকে বুকে আঁকড়ে পারুল আশ্রয় নিলে তার সইয়ের আশ্রমে। দুর্গাশংকর নলিনীকে নিয়ে যখন সেখানে পেঁছিলেন, তখন শিশুটি আর ইহজগতে নেই। দুর্গা-শংকর পারুলকে বুকে তুলে নিলেন।

* * *

গল্পে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে, তার আবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা এখন

নেই। আর যে ধরনের ঘটনা, তা নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে খানিকটা আবেগ এনে দিলেও কোন গভীর রেখাপাত করতে পারে না। নিজের গোঁতে অন্ধ দুর্গাশংকর তাঁর পরহিতব্রতী সৎ পুত্রকেও চরম দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করবে, সেটা মানগর্বী দাম্ভিক জমিদারদের পক্ষে অশোভনীয় ছিল না। কিন্তু এখনকার মনোভাবে তা সায় পায় না। কাহিনীর বিন্যাস ইতস্তত। কয়েকক্ষেত্রে কার্যকারণের ভিৎ গড়ে না তুলেই ঘটনাকে সামনে হাজির করে দেওয়া হয়েছে। অসংলগ্নতাও কিছু কিছু আছে। ছবির আরম্ভ বজরায় মাল্লাদের গান দিয়ে, "জল মুলুকের বজরা বেগম চলে"! গানখানি রচনা, সুর, গাওয়া এবং চিত্রায়নে মনকে আঁকড়ে নেবার মতো চমৎকার একটি পরিবেশ আরম্ভতেই গড়ে তোলে এবং একখানা উৎকৃষ্ট ছবি দেখার আশায় মন ভরিয়ে তোলে। কিন্তু তারপরই অতি সাধারণ বিন্যাস; একটা এলোমেলো ভাব। সুখদা কেন ভ্রাতৃ-হত্যায় প্রবৃত্ত হবে, তার কোন ভিত্তি নেই। লম্পট যোগেশ বৈষ্ণবী রাধার ওপরে কলঙ্ক চাপিয়ে গ্রামের মোড়লদের টাকা দিয়ে যেভাবে নিজেকে রেহাই করে নিলে, সে এক হাস্যাস্পদ ব্যাপার। দুর্গা-শঙ্করের বাড়িতে অভ্যাগতদের সামনে সুখদা চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে সর্বসমক্ষে নলিনীর বিয়ের খবরটা যেভাবে ব্যক্ত করে, তাও একটা কৌতুক-দৃশ্যেরই অবতারণা করে। অমনভাবে দৃশ্য রচনা মঞ্চের স্বল্প পরিসরে চলে, পর্দায় বিসদৃশ।

* * *

ছবিখানির জ্ঞান বলতে অভিনয়ের দিকটা। ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায় ও বসন্ত চৌধুরী যথাক্রমে দুর্গাশঙ্কর, যোগেশ ও নলিনীর চরিত্র তিনটিতে বেশ ভরাট অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়কে ভ্রাতৃহত্যায় নিবন্ধ স্বার্থসর্বস্ব কুট চরিত্রে দেখবার আশা করেনি কেউ; যদিও শিল্প-দক্ষতায় তিনি চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দরিদ্র বন্ধুর ভগিনী পারুলের চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা মাখানো হতভাগিনীর রূপটা ফুটিয়েছেন। মঞ্জু দে অবতরণ করেছেন বৈষ্ণবী রাধার চরিত্রে, শেষকালে যে পারুলের একমাত্র সহায়ক-রূপে দেখা দেয়। নমিতা সেনগুপ্তাকে দেখা যায় ললিতার চরিত্রে; নির্জীব অভিনয়। বৈষ্ণবী রাধার উদ্ধারকারী স্বামীজীর চরিত্রে মিহির ভট্টাচার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেওয়ান অনাদি ও ভৃত্য গোবিন্দের চরিত্র দুটি পাকা অভিনেতা, যথাক্রমে রবি রায় ও সন্তোষ সিংহের দক্ষতায় জীবন লাভ করেছে। অন্যান্য চরিত্রে আছেন হরিমোহন, তুলসী চক্রবর্তী ধীরাজ দাস, বেচু সিংহ, ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ক্যামেরার কাজ ভালো; কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণে যতীন দাসের প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দ ফ্যাসফেসে। শিল্প-নির্দেশের কাজও ভালো। আরম্ভেই বজরায় মাল্লাদের গান "জল মুলুকের বজরা বেগম চলে" মনকে মাতিয়ে দেবার মতো গান। গায়ক মাঝির চরিত্রে ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তি মানিয়েছেও ভালো। আর একখানি গান ললিতার মুখে যোগেশের সঙ্গে কলকাতায় পালিয়ে আসার পর। এ গানখানিও শুনতে ভালো, তবে গোড়ায় শিক্ষিতা বলে পরিচয় দিইয়ে ললিতাকে প্রায় বাঈজীর মতো

দেখিয়ে একটা ভিন্ন ভাব জাগিয়ে তোলে। সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষের জাজের প্রতি ঝোঁক দেখা গেল আবহ-সংগীত রচনায়। সংগঠনকারীদের মধ্যে আছেন পরিচালনা ও সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শব্দযোজনা ও শিল্প-নির্দেশে আছেন যথাক্রমে শচীন চক্রবর্তী ও বটু সেন।

পৌরাণিক "শ্রীকৃষ্ণ সুদামা"

পৌরাণিক আখ্যানবস্তুকে একটু ভিন্নভাবে পরিবেশন করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তাল হারিয়ে আর পাঁচটার মতোই রূপ নিয়ে ফেলেছে দে প্রোডাকসন্সের "শ্রীকৃষ্ণ সুদামা"। বেশ আরম্ভ গোড়াটা; একটা বৈচিত্র্যও সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু শেষার্ধে সে বৈচিত্র্য আর পাওয়া যায় না। কৃষ্ণসখা সুদামার অবিচল ভক্তির দিকটাই এ ছবির আখ্যান-বস্তু। আরম্ভে কিশোর সুদামার বালক সখা কৃষ্ণ। আশ্রমে ইন্দ্রের স্তবগান দিয়ে ঘটনার আরম্ভ। সুদামা অন্য-মনস্ক, তার কানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণের মুরলী। আচার্যের প্রশ্নে সুদামা উত্তর দেয় ইন্দ্রের প্রশস্তি তার ভালো লাগে না। ক্রুদ্ধ আচার্য বেত্রাঘাত করলেন, কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে বালক কৃষ্ণ নিজের হাতে আঘাত পেতে নিলে। এই অলৌকিক কাণ্ড আচার্যকে বিস্মিত করলে। সুদামা ব্রাহ্মণ সন্তান; কৃষ্ণ গোপের ছেলে। সুদামা কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে তিরস্কৃত হলো। মা নিষেধ করে দিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু নির্যাতন সত্ত্বেও সুদামা কৃষ্ণের সখ্যতা ত্যাগ করতে পারলে না। কৃষ্ণ কিন্তু একদিন সুদামাকে কাঁদিয়ে চলে গেল দ্বারকায়। তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। যুবক সুদামা কৃষ্ণনাম গেয়ে ব্যাকুল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কৃষ্ণ তার সখা শুনলে লোকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু সুদামার ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা তার শিষ্য সুবীরের। সুদামা বিবাহ করেছে; পত্নী সুমতি। দারিদ্র্যের সংসার। দিন আর চলতে চায় না। এমনি অবস্থায় একদিন কৃষ্ণ ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে সুদামাকে দ্বারকায় যাবার আহ্বান দিয়ে গেল। সুদামা ধাবিত হলো দ্বারকার পথে। বালকের বেশে

কৃষ্ণই তাকে নদী পার করে দিলে। দ্বারকার প্রবেশ-দ্বারে রক্ষী সুদামার পথ রুখে দিলে। সুদামা ফিরে চললো; কৃষ্ণ ভাবে সুদামার আগমন জানতে পেরে ছুটে এসে বাল্য-সখাকে আলিঙ্গন করে প্রাসাদে নিয়ে গেল। সত্যভামা ও রুক্মিণীর সেবা-যত্ন কয়েকদিন ভোগ করে সুদামা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হলো। কৃষ্ণ তার গলার মালা সুদামার কণ্ঠে পরিয়ে দিলে। রুক্মিণী বর দিলে মালার কাছ থেকে একবার যা প্রার্থনা করা যাবে, তাই পাওয়া যাবে। স্বর্গের দেবতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সুদামা যদি স্বর্গের সিংহাসন চেয়েই বসে! ইন্দ্র রম্ভাকে মর্তে পাঠালেন ছল করে সুদামার কাছ থেকে মালা জোগাড় করে আনতে। রম্ভা ব্যর্থ হলো। ইন্দ্র নিজেই গেলেন এবার এবং ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ ধরে সুদামার মনে করুণার উদ্রেক করিয়ে মালাটি হস্তগত করলেন। সুদামা ফিরে চললো তার গৃহের পানে। ওদিকে রুক্মিণী ছদ্মবেশে সুদামা-পত্নী সুমতির কাছে আবির্ভূতা হয়ে তাকে একটা লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপহার দিয়ে গেল। এরই গুণে পলকেই সুদামার কুটির পরিণত হলো সুরম্য প্রাসাদে। গৃহে ফিরে সুদামা স্ত্রীর কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনে বুঝলে স্বয়ং লক্ষ্মীই এসেছিলেন। সুদামা সব ঐশ্বর্য প্রত্যর্পণ করতে চাইলে, কিন্তু বিগ্রহের মধ্য থেকে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে তাকে নিবৃত্ত করলে।

* * *

সচরাচর যেমন পৌরাণিক ছবি দেখা যায়, তার চেয়ে কিছু বেশী যত্ন, একটু বেশী দরদ দিয়ে তোলা "শ্রীকৃষ্ণ সুদামা"। সখার প্রতি টান, ভগবানে ভক্তি এবং আর্তের দুঃখে বেদনাবোধ হচ্ছে এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। কল্পনা থেকে ঘটনা সাজিয়ে নেবার যে সুযোগ পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, তা কাজে লাগানো হয়েছে এবং একটা মানবিক আবেদনও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করে তাজ্জব বানাবার চেষ্টা বড়ো কম নেই; অবশ্য শেষের দিকেই বেশী যা দর্শকের কাছে ম্যাজিকের খেলা বলে মনে হয়। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ একাধারে কাহিনীকার, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচয়িতা। গোড়ার অংশ বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী পর পর সাজিয়ে পরিবেশন করলেও একটা নাটকীয় আবেগ সৃষ্টি করে দেয় এবং সুদামার কৈশোর পর্যন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারকায় যাত্রার ঘটনা পর্যন্ত অংশই ছবির শ্রেষ্ঠ অংশ। এই অংশে সুদামার গান "নীল যমুনায় তমাল বনে" প্রাণের দরদকে উদ্বেলিত করে তোলে, আর সুদামার চরিত্রে সুখেনও সখার বিরহে কাতর একটা আবেগাকুল রূপ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বড়ো সুদামার চরিত্রে রবীন মজুমদারও এক একাগ্রচিত্ত মানুষের প্রতি দরদী, ভক্তিতে অটল চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সাম্প্রতিককালের মধ্যে রবীন মজুমদারের এটি শ্রেষ্ঠ অভিনয়-কৃতিত্ব। কখানি গান গেয়েও তিনি বিমোহিত করে তোলেন। ছবির গতি বদলে যায় দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে। চরিত্রটিতে দীপক মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাবেই যেন তাল কেটে যায়। ও যেন ওঁর উপযোগী ভূমিকা নয়। এ থেকেই ছবির বৈচিত্র্যও চলে যায়; আ পাঁচটা পৌরাণিক ছবিরই পর্যায়ে এ দাঁড়ায়। অলৌকিক ঘটনার আর অ নেই। সুদামা ও সুমতি এবং ওদের ভক্ত সুবীর ও ললিতাকে ঘিরে সুরে ছন্দে কাব্যিক বিন্যাসটা মনে লাগবে সুদামার গান ছাড়া সুবীরেরও কথা গান খুবই ভালো লাগবে। সেই সঙ্গে সুবীরের চরিত্রে ধীরেন বসুরও অভিনয় আন্তরিকতার ছাপ মনে লাগবে সুমতির চরিত্রে যমুনা সিংহ পতিপ্রাণ রমণীর চরিত্রটি ফুটিয়েছেন ভালো ললিতার চরিত্রে অবতরণ করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়; ছোট ভূমিকা। স্বর্গে দৃশ্যে ইন্দ্ররাজের চরিত্রে নীতি
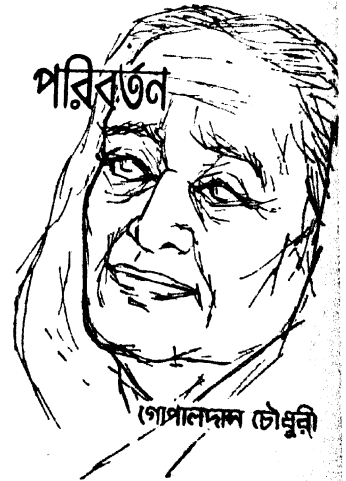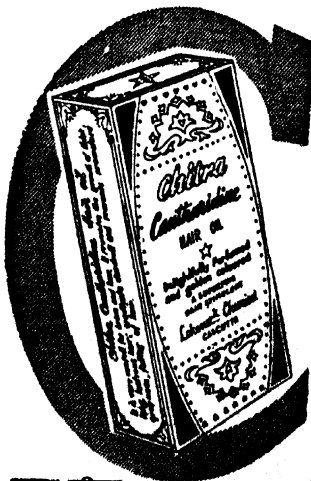
খোপাধ্যায়কে হঠাৎ দেখেই কেমন যেন ন হয়। অবশ্য অভিনয় তিনি ভালোই রেছেন। নারদের চরিত্রে মিহির ট্টাচার্যকে মন্দ লাগবে না। মিহির শই একটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করছেন। ভিনয়ে আর শিল্পীদের মধ্যে আছেন চু সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী, তুলসী বর্তী, অজিতপ্রকাশ, জীবেন বোস, ভু, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, নমিতা ংহ, সুদীপ্তা রায় প্রভৃতি। সমগ্রভাবে ভিনয়ের মধ্যে শান্ত সংযত ভাবটা ক্ষ্য করার বিষয়।

গানের দিকেই ছবিখানিতে বেশী ার দেওয়া হয়েছে। টাইটেলেই ষ্টোত্তর শতনাম দিয়ে গানের আরম্ভ ং মোট দশখানি গান ও ছটি ন্ত্র পরিবেশিত হয়। দু'খানি ছাড়া ধিকাংশই সুগীত ও যথাযথভাবে প্রযুক্ত। গীত পরিচালক রাজেন সরকার 'ঢুলি'-র ঃ উপভোগ করার মতো আরো কতক- লি গান পরিবেশনে সক্ষম হয়েছেন। বশ্য এক্ষেত্রে সবই ভক্তিরসাত্মক গান। গানগুলি গেয়েছেন রবীন মজুমদার, অপরেশ লাহিড়ী, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, কল্যাণী মজুমদার ও ভারতী বসু। তা ছাড়া আবহ সংগীত পরিবেশনেও একটা অনুকরণীয় সংযত ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। দু'একটি দৃশ্যে এক শট থেকে আর এক শটে সুর ও বাজনার পরিবর্তন একটু বিসদৃশ লাগে। শেষে সুদামাকে প্রলুব্ধ করার জন্য রম্ভার নাচের সঙ্গে সংগতটা যথাযথ হয়নি। নাচটাও জমেনি। এই নাচটিই গেভা কলারে রঙীন। বাংলা ছবিতে এই প্রথম, কিন্তু তেমন কোন মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা যায়নি। শেষে সুদামার বিশ্বরূপ দর্শনের দৃশ্যটিও রঙীন, কিন্তু তার জন্য অতিরিক্ত আকর্ষণ কিছু ঘটেনি।

পরিচালনায় শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী কিছুটা বৈশিষ্ট্য আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাল রাখতে পারেন নি। চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন আলোকচিত্র গ্রহণে জি কে মেহতা ও বিশু চক্রবর্তী; বাঙলা ছবিতে সচরাচর দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে শিল্প-নির্দেশক গুপী সেন এবং পশ্চাৎপট রচনায় রামচন্দ্র শেণ্ডের প্রশংসনীয় কাজের কথা উল্লেখ-যোগ্য। গৌর দাস ও হৃষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব্দ-গ্রহণ কাজও ভালো। ছবিখানি সম্পাদনা করেছেন গোবর্ধন অধিকারী। সর্বাঙ্গীণভাবে কলাকৌশলের কৃতিত্ব ছবিখানির আঙ্গিককে পরিপাটি করে উপস্থিত করে দিয়েছে।

সচিত্র সাহিত্য সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা	... ...	।৵০
শহরে বার্ষিক	... ...	১৯৲
ষাণ্মাসিক	... ...	৯॥০
ত্রৈমাসিক	... ...	৪৸০
মফঃস্বলে (সডাক) বার্ষিক	...	২০৲
ষাণ্মাসিক	... ...	১০৲
ত্রৈমাসিক	... ...	৫৲
ব্রহ্মদেশ (সডাক) বার্ষিক	...	২২৲
ষাণ্মাসিক	... ...	১১৲
অন্যান্য দেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২৪৲
ষাণ্মাসিক	... ...	১২৲

ঠিকানা—আনন্দবাজার পত্রিকা

৮ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

খেলার মাঠে

একলব্য

ইংলণ্ডের কাছে পর পর দু'বছর রাবার' হারালেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়রা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে টেস্ট খেলার প্রবর্তন হবার পর এ পর্যন্ত কোন দলই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে 'রাবার' নিয়ে ফিরতে পারেনি, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কাছ থেকে রাবার লাভ করে নূতন ঘটনার সৃষ্টি করেছে। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এ পর্যায়ের কোন টেস্ট খেলার খবরই দেশের পাতায় ছাপা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরীর অধিকারী নীল হার্ভে

তাই একসংগে পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করছি।

অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া তিনটি খেলায় জয়লাভ করে, বাকী দু'টি খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটি খেলাতেও জয়লাভ করতে পারেনি। লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন ও মার্টিনডেলের পরে বোলিংয়ের দিক দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তেমন শক্তিশালী ছিল না, ব্যাটিংই ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যাচ জেতার প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইংলণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলাররা যথেষ্টই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে ভ্যালেণ্টিন এবং রামাধীন সবচেয়ে মারাত্মক বোলার। বিশেষ করে ইংলিশ টার্ফে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্পিন বোলার সোনি রামাধীন ছিলেন ইংলণ্ডের ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের ভীতি সঞ্চারক। কিন্তু ইংলণ্ডের পর ভারত সফরে এলে দেখা গেল রামাধীনের বোলিংয়ে আর সে জলুস নেই। ভ্যালেণ্টিন অবশ্য বিশ্বের কৃতী বোলারদের অন্যতম। যাই হোক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতে ব্যাটিংয়ের চমৎকারিতা দেখিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, বোলিংয়ে তেমন সুনাম অর্জন করতে পারেন নি। উইকস, ওয়ালকট, স্টলমায়ারের ব্যাটিংয়ের কলাকৌশল এখনো যেন চোখের উপর ভাসছে। এই সফরেই এভার্টন উইকস পর পর পাঁচটি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করে বিশ্ব রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই কলকাতার মাঠেই উইকসের রেকর্ড পূর্ণ হয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কীর্তিমান খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক ওরেল অবশ্য নিজ দেশের জাতীয় টীমের সংগে ভারত সফর করেন নি, কিন্তু ভারতের ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীরা ওরেলের খেলা দেখবারও সুযোগ পেয়েছেন, ওরেল দু'বার ভারত সফর করেছেন কমনওয়েলথ দলের সংগে। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং প্রতিভার সংগে আমরা ভালভাবেই পরিচিত। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিং আমাদের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। এই বোলিং-দুর্বলতাই অস্ট্রেলিয়ার নিকট ওয়েস্ট ইংণ্ডিজের শোচনীয় পরাজয়ের প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। দুর্বল বোলিংয়ের বি অস্ট্রেলিয়ার কৃতী ব্যাটসম্যানরা সাবলীল ব্যাটিং করতে বিশেষ বেগ পাননি। দিকে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের বে নৈপুণ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম আশানুরূপ রান সংগ্রহ করতে হয়ে অসমর্থ। তাই দুই দলের ক্রীড়ামানের বিরাট পার্থক্য।

তবুও ক্লাইড ওয়ালকট, এভার্টন উই ডেনিস এ্যাটকিনসন, ক্লারেমণ্ট দে প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যাটসম্যানেরা ব নৈপুণ্যের কম পরিচয় দেননি। সুদি খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক ওরেল ও স্পিন বো রামাধীনের ব্যর্থতা বিশেষভাবেই উ যোগ্য। ওয়ালকট দ্বিতীয় এবং টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরী করে ন বিশ্ব রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পর্যায়ের টেস্টে দুই দলেরই একজন ব্যাটসম্যান ডাবল সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব অ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যাটকিনসন—এর সবচেয়ে বেশী রান করার অ্যাটকিনসনের। চতুর্থ টেস্টে তিনি রান করে আউট হন। কিন্তু ২১৯ রান মধ্যেই তার সবটুকুই কৃতিত্ব অ্যাটকিনসন ও দেপিজার সহযোগিতায় স উইকেটে নূতন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা হ তার কৃতিত্ব অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে ভা দুই দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প খেলায় সবচেয়ে বেশী রান লাভের কৃ অর্জন করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ধু ব্যাটসম্যান ক্লাইড ওয়ালকট, পাঁচটি তিনি ৮২৭ রান লাভ করেন। অস্ট্রেলি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বেশী রান করার কৃ নীল হার্ভের। পাঁচটি টেস্টে হার্ভে স করেছেন ৬৫০ রান; তবে তিনি

নিংসের বেশী ব্যাটিং করবার সুযোগ নানি আর ওয়ালকটকে ১০টি ইনিংসেই টিং করতে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লায় দুইটি নূতন বিশ্ব রেকর্ড ছাড়া রও কয়েকটি রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক ইনিংসে ৭৫৮ রান লাভও অস্ট্রেলিয়ার তন রেকর্ড। ইতিপূর্বে কোন টেস্ট লায় অস্ট্রেলিয়া এত বেশী রান সংগ্রহ রতে পারেনি, তা ছাড়া এক ইনিংসে াচজন খেলোয়াড়ের সেঞ্চুরী লাভও নূতন কর্ডের পর্যায়ভুক্ত। নীচে পাঁচটি টেস্ট

অস্ট্রেলিয়ার কৃতী ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড

লার সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ স্কোর বোর্ড ওয়া হল—

প্রথম টেস্ট

জামাইকার কিংসটন মাঠে প্রথম টেস্ট লায় অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ওয়েস্ট ডজকে পরাজিত করে। অস্ট্রেলিয়ার গ সমানতালে খেলতে না পারায় দিনব্যাপী টেস্ট খেলা সাড়ে চার দিনে হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের হীত বেশী রানের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ডজ 'ফলো অন' হতে অব্যাহতি পাবার াজনীয় রান সংগ্রহ করতে পারে না, ফলে র ফলো অন' করে দ্বিতীয় ইনিংসে টং করতে হয়। দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে স্ট ইণ্ডিজ ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে াহতি পেলেও শোচনীয় পরাজয় এড়াতে র না। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মিলার ও হার্ভে , ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ওয়ালকট ও প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী করলেও স্মিথের সেঞ্চুরী লাভ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। একুশ বছরের খেলোয়াড় কোলী স্মিথ টেস্ট খেলায় প্রথম নেমেই এই সেঞ্চুরী করেন।

ফলাফল ঃ—

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—(৯ উইঃ ডিঃ) ৫১৫ (মিলার ১৪৭, নীল হার্ভে ১৩৩, আর্থার মোরিস ৬৫, সি ম্যাকডোনাল্ড ৫০; সি ওয়ালকট—৫০ রানে ৩ উইঃ, ভ্যালেণ্টাইন ১১৩ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—২৫৯ (সি ওয়ালকট ১০৮, সি স্মিথ ৪৪; লিণ্ডওয়াল ৬১ রানে ৪ উইঃ, মিলার ৩৬ রানে ২ উইঃ, আর্থার ৩৯ রানে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—২৭৫ (সি স্মিথ ১০৪, জে কে হোল্ট—৬০, সি ওয়ালকট ৩৯; মিলার ৬২ রানে ৩ উইঃ, আর্চার ৪৪ রানে ২ উইঃ, বিনাউড ৪৪ রানে ২ উইঃ, লিণ্ডওয়াল ৬৩ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(১ উইঃ) ২০ (এল ম্যাডকস নঃ আঃ ১২;

[অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে বিজয়ী]

দ্বিতীয় টেস্ট

ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেন মাঠে ৬ দিনব্যাপী মন্থর ক্রিকেটের পর অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। উইকস এবং ওয়ালকট দুই কৃতী ব্যাটসম্যানের প্রশংসনীয় ব্যাটিং এবং সেঞ্চুরী লাভের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৩৮২ রান সংগ্রহ করে, প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া করে ৬০০ রান। হার্ভে, মোরিস এবং ম্যাকডোনাল্ড তিনজনই শতাধিক রান লাভ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে। খুবই বিপদ দেখা দেয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সম্মুখে। পিচ খারাপ হয়ে গেলে ঘন ঘন উইকেট পড়তে আরম্ভ করবে। সুতরাং এ খেলাতেও পরাজয় অনিবার্য, বৃষ্টির ফলে শেষ দিন দুই ঘণ্টা খেলাও স্থগিত থাকে। কিন্তু তারপর খেলা আরম্ভ হলে ওয়ালকটের ব্যাটিংয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। প্রধানত ওয়ালকটের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ের ফলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাজয়ের হাত থেকে পায় অব্যাহতি। উইকসও ওয়ালকটকে কম সাহায্য করেন না, ৮৭ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়ালের বোলিং খুবই মারাত্মক হয়েছিল। ফলাফল ঃ—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৮২ (এভার্টন উইকস ১৩৯, সি ওয়ালকট ১২৬, জি সোবার্স ৪৭; লিণ্ডওয়াল ৯৫ রানে ৬ উইঃ, বিনাউড ৪৪ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস (৯ উইঃ ডিঃ) ৬০০ (নীল হার্ভে ১৩৩, আর্থার মোরিস ১১১, সি ম্যাকডোনাল্ড ১১০, রন আর্চার ৮৪, আয়ান জনসন ৬৬; রামাধীন ৯০ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—(৪ উইঃ) ২৭৩ (সি ওয়ালকট ১১০, এভার্টন উইটকস নঃ আঃ ৮৭, জে স্টলমায়ার ৪২; রন আর্চার ৩৭ রানে ৩ উইকেট)

[খেলা অমীমাংসিত]

তৃতীয় টেস্ট

ব্রিটিশ গায়নার জর্জটাউন মাঠে ওয়েস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রেকর্ড সৃষ্টিকারী ব্যাটসম্যান ডেনিস এ্যাটকিনসন

ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট খেলা নির্ধারিত সময়ের দুই দিন আগেই শেষ হয়ে যায়। এই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে ৮ উইকেটে। এই কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আয়ান জনসন অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন; বিনাউড এবং মিলারের কার্যকরী বোলিংও কম প্রশংসার দাবী রাখে না। তৃতীয় টেস্টে কোন পক্ষেরই কোন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। খেলাটিকে লো-স্কোরিং ম্যাচ বলা যেতে পারে। প্রথম ইনিংসে বিনাউড ও মিলারের বল খুবই কার্যকরী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক জনসন মারাত্মকভাবে বোলিং করে ৪৪ রানে ৭টি উইকেট দখল করেন। ফলাফল ঃ—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—১৮২ (এভার্টন উইকস ৮১; বিনাউড ১৫ রানে ৪ উইঃ মিলার ৩৩ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—২৫৭ (আর

অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার রে লিণ্ডওয়ালের বল করবার ভঙ্গি

বিনাউড ৬৮, সি ম্যাকডোনাল্ড ৬১, এ মোরিস ৪৪, নীল হার্ভে ৩৮; সোবার্স ২০ রানে ৩ উইঃ, এ্যাটকিনসন ৮৫ রানে ৩ উইঃ, রামাধীন ৫৪ রানে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—২০৭ (সি ওয়ালকট ৭৩, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৫৬; জনসন ৪৪ রানে ৭ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(২ উইঃ) ১৩৩ (নীল হার্ভে নঃ আঃ ৪১, এ মোরিস ৩৮, সি ম্যাকডোনাল্ড ৩১; মার্শাল ২২ রানে ১ উইকেট)

(অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী)

চতুর্থ টেস্ট

পূর্বের তিনটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দুটি খেলায় জয়লাভ করায় বারবাডোজের ব্রিজটাউন মাঠে চতুর্থ টেস্ট খেলার উপর অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' লাভের প্রশ্ন নির্ভর করছিল। এ খেলা 'ড্র' হলেও অস্ট্রেলিয়া রাবার পাবে, আর জিতলে তো কথাই নেই। কেবল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করলে পরের টেস্ট পর্যন্ত 'রাবারের' প্রশ্ন ঝুলে থাকবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক জিফ্ স্টলমায়ার আবার এ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না। ডেনিস এ্যাটকিনসনের উপর অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পিত হ'ল। যথেষ্ট দৃঢ়তা নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েরা। এই টেস্টেই সপ্তম উইকেটে নতুন বিশ্ব রেকর্ডেরও প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁরা; কিন্তু বিধি বাম। খেলায় জয়লাভ করতে পারলো না। অমীমাংতিসভাবে খেলা শেষ হ'ল ব্রিজটাউন মাঠের চতুর্থ টেস্ট। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে এসে প্রথম 'রাবার' লাভ করলো, যা লাভ করা অন্য কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের বিপুল সংখ্যক ৬৬৮ রানের বিরুদ্ধে নিজেদের উপর আস্থা রেখে ব্যাটিং করা সহজ কথা নয়। তবুও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিংয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা। ওয়ালকট এবং ওরেল অবশ্য প্রথম ইনিংসে সুবিধা করতে পারলেন না, কিন্তু অধিনায়ক অ্যাটকিনসন এবং দেপিজার অটুট মনোবল! শেষ পর্যন্ত সপ্তম উইকেটে এঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন বিশ্ব রেকর্ড। ১৯০২ সালে ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতের খেলোয়াড় কে এস দলিপ সিংজী এবং ডব্লিউ নিউহ্যাম সপ্তম উইকেটে যে রেকর্ড করে রেখেছিলেন, দীর্ঘ ৫৩ বছর পরে অ্যাটকিনসন ও দেপিজা তা ভেঙ্গে দিলেন। দলিপ সিংজী এবং নিউহ্যাম ছিলেন সাসেক্সের খেলোয়াড়। এসেক্সের বিরুদ্ধে সপ্তম উইকেটে তাঁরা করেছিলেন ৩৪৪ রান। দলিপ ২৩০ আর নিউহ্যাম ১৫৩। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে অ্যাটকিনকন ও দেপীজা সপ্তম উইকেটে যোগ করেছেন ৩৪৭ রান। অ্যাটকিনসন ২১৯ আর দেপিজা ১২২। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৩৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অ্যাটকিনসন ও দেপিজা সপ্তম উইকেটে ২১৮ রান যোগ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রেকর্ড করেছিলেন। এঁরাই আবার বিশ্ব রেকর্ড করলেন। কিন্তু তবুও 'ফলো-অনের' হাত থেকে অব্যাহতি পেল না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জনসন চাইলেন না ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে 'ফলো-অন' করাতে। যাই হোক, পুরো ৬ দিন খেলা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক স্টলমেয়ার

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জনসন

দুইটি টেস্ট খেলায় দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্বে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ক্লাইড ওয়ালকট

হবার পর চতুর্থ টেস্ট অমীমাংসিত থেকে যায়। অধিনায়ক অ্যাটকিনসন দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৬ রানে ৫টি অস্ট্রেলিয়ান উইকেট দখল করেন, বোলিংয়েও নৈপুণ্য দেখান।

ফলাফল :—

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৬৬৮ (কিথ মিলার ১৩৭, লিণ্ডওয়াল ১১৮, রন আর্চার ৯৮, নীল হার্ভে ৭৪, এল ফেভেল ৭২, জি ল্যাংলে ৫৩, সি ম্যাকডোনাল্ড ৪৬; ডিউডনে ১২৪ রানে ৪ উইঃ, অ্যাটকিনসন ১০২ রানে ২ উইঃ ও ওরেল ১২০ রানে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৫১০—(ডি অ্যাটকিনসন ২১৯, সি দেপিজা ১২২, উইকস ৪৪, সোবার্স ৪৩; বিনাউড ৭৩ রানে ৩ উইঃ, জনসন ৭৭ রানে ৩ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়ার চৌখস খেলোয়াড় কিথ মিলার

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস— ২৪৯ (আয়ান জনসন ৫৭, এল ফেভেল ৫৩; অ্যাটকিনসন ৫৬ রানে ৫ উইঃ, স্মিথ ৭১ রানে ৩ উইঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—(৬ উইঃ) ২৩৪ (সি ওয়ালকট ৮৩, জে কে হোল্ট ৪৯; আর্চার ১১ রানে ১ উইঃ)

(খেলা অমীমাংসিত)

পঞ্চম টেস্ট

আগেই 'রাবারের' প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে যাবার ফলে জামাইকার কিংস টাউন মাঠে পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলার আর বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। তবুও যদি শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করতে পারে, এই যা আকর্ষণ। টসে জয়লাভ করে ব্যাটিংও আরম্ভ করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়ালকটের সঙ্গে ওরেল এই খেলায় খানিকটা ব্যাটিং করলেন। কিন্তু মিলারের মারাত্মক বোলিং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বেশী রান সংগ্রহ করতে দিল না। ৩৫৭ রানে শেষ হল ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। মিলার পেলেন ১০৭ রানে ৬টি উইকেট। তারপর আরম্ভ হ'ল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস। বেপরোয়া ব্যাটিং। সবারই হাত খুলে গেছে। হার্ভে, আর্চার, ম্যাকডোনাল্ড, বিনাউড, মিলার সবাই নিপুণ হাতে উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে খেলে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিলেন। পাঁচজনই করলেন সেঞ্চুরী। এর মধ্যে হার্ভে ডাবল সেঞ্চুরী লাভের গৌরব অর্জন করলেন। একই ইনিংসে পাঁচজন খেলোয়াড়ের পক্ষে সেঞ্চুরী করা ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ান ইনিংসের এটা নতুন রেকর্ড। আরও নতুন রেকর্ড তাদের এই ইনিংসের সমষ্টিগত রান। ৮ উইকেটে ৭৫৮ রান করে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জনসন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একবার অস্ট্রেলিয়া দল ৬ উইকেটে ৭২১ রান করেছিল। সেইটাই ছিল তাদের বৃহত্তম টেস্ট ইনিংস, কিন্তু পঞ্চম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে ৭৫৮ রান ক'রে তারা নিজেদের পূর্ব রেকর্ড অতিক্রম করল। তা ছাড়া তৃতীয় উইকেটে ম্যাকডোনাল্ড ও হার্ভের ২৯৫ রান, পঞ্চম উইকেটে মিলার ও আর্চারের ২২০ রান এবং অষ্টম উইকেটে বিনাউড ও জনসনের ১৩৭ রান লাভও অস্ট্রেলিয়ার নতুন টেস্ট রেকর্ড বটে। বিনাউড এবং আর্চারের এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। এর মধ্যে বিনাউডের সেঞ্চুরী খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি মাত্র ৭৮ মিনিটে শতরান পূর্ণ করেন, যা এই পর্যায়ের খেলায় আর কেউই করতে পারেন নি। যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ার বিপুল রান সংগ্রহের ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের আশা লুপ্ত হয়ে গেল। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও প্রায় অসাধ্য। সত্যই পরাজয় রোধ করতে পারলো না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্লাইড ওয়ালকট অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাটিং করে দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরী করলেন। ফলে একই পর্যায়ের দুটি টেস্ট খেলায় দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করায় তাঁর নতুন রেকর্ড হল। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ
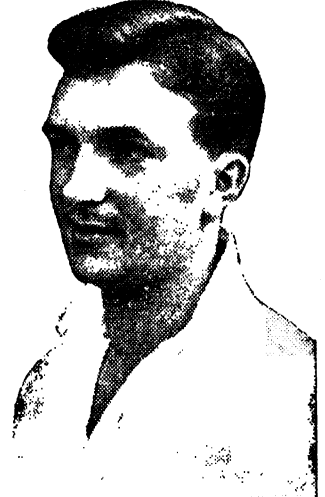
মাত্র ৭৮ মিনিটে টেস্ট সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্বের অধিকারী রিকি বিনাউড

পরাজয় স্বীকার করলো এক ইনিংস ও ৮২ রানে।

অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার গিল ল্যাংলে এই সফরে অল্পের জন্য রেকর্ড সৃষ্টিকারী উইকেট কিপারদের দলে নিজের নাম ভুক্ত করতে পারেন নি। পাঁচটি টেস্ট খেলায় তিনি ২০ জন খেলোয়াড়কে ক্যাচ লুফে আউট করেছেন,—কিন্তু এক পর্যায় ক্যাচ ধরার রেকর্ডের সংখ্যা হচ্ছে ২১। পঞ্চম টেস্টের ফলাফল ঃ—

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৫৭ (সি ওয়ালকট ১৫৫, ওরেল ৬১, উইকস ৫৬; মিলার ১০৭ রানে ৬ উইঃ, লিন্ডওয়াল ৬৪ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—(৮ উইঃ ডিঃ) ৭৫৮ (নীল হার্ভে ২০৪, রন আর্চার ১২৮, ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, আর বিনাউড ১২১, কিথ মিলার ১০৯; কিং ১২৬ রানে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—৩১৯ (সি ওয়ালকট ১১০, জি সোবার্স ৬৪, ই উইকস নঃ আঃ ৩৬; বিনাউড ৭৬ রানে ৩ উইঃ, জনসন ৪৬ রানে ২ উইঃ, লিন্ডওয়াল ৫৬ রানে ২ উইঃ ও মিলার ৫৮ রানে ২ উইঃ)

(অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৮২ রানে বিজয়ী)

অস্ট্রেলিয়ার সাফল্যমণ্ডিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্য স্যার ডন ব্র্যাডম্যান বলেছেন—অস্ট্রেলিয়ার এ সাফল্য খুবই কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, এতে উল্লসিত হবারও কারণ আছে, কিন্তু ভুললে চলবে না—আগামী বছর অস্ট্রেলিয়াকে ইংলণ্ডের মাটিতে শক্তিশালী ইংলণ্ড দলের সম্মুখীন হতে হবে। এই জন্য অস্ট্রে-

কলকাতা মাঠের দুই প্রধান ফুটবল ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেংগলের চ্যারিটি খেলার পূর্বে দুই দলের খেলোয়াড়দের রাজ্যপালের সংগে করমর্দনের দৃশ্য

লিয়ার শক্তি বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজন।' ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে পর পর দু' বছর ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রাবার পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যে খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সারা ক্রিকেট বিশ্বই ক্রিকেট মাঠের বাঘ-সিংহের এই লড়াইয়ের ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

(২১শে জুনের খেলার পর)

প্রথম ডিভিশন লীগের শীর্ষস্থানীয় দল-গুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র তীব্র হতে তীব্রতর হতে আরম্ভ করেছে। লীগ কোঠার উপরের দিকে প্রায়ই হচ্ছে স্থানের অদল বদল। কখনো মোহনবাগান শীর্ষে, কখনো মহমেডান স্পোর্টিং শীর্ষস্থানে আবার কখনো রাজস্থান সবার উপরে। এদের মধ্যে এরিয়ানও মাথায় উঠবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু নীচের দিকের অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত জয়লাভে অসমর্থ অরোরা ক্লাব সবার নীচে বসে আছে। কোন-ভাবেই উপরে উঠতে পারছে না। অরোরার উপরেই কালীঘাটের স্থান, তাদের অবস্থাও ভাল নয়।

গত সপ্তাহের খেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এরিয়ান ক্লাবের কাছে অপরাজিত মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রথম পরাজয়। মহমেডান দলের পরাজয়ের পর প্রথম ডিভিশন লীগ থেকে অপরাজিত দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অপর দলের কীর্তি নাশ করবার কৃতিত্ব এরিয়ান ক্লাবের সবচেয়ে বেশী। ১৯৩৫ সালেও এরিয়ান ক্লাব অপরাজিত মহমেডান দলকে পরাজিত করেছিল। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করবার অনেক আগে ইস্টবেংগল ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারত, কিন্তু এই এরিয়ান ক্লাব তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এমন আরও বহু ঘটনা আছে। তাই এরিয়ান ক্লাবকে মাঠের 'কীর্তিনাশা' ক্লাব বলা যেতে পারে। গত সপ্তাহে ইস্টবেংগল ও মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলা দর্শকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তবে ইস্টবেংগলের নৈরাশ্যজনক ফলাফলের জন্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবারকার উৎসাহ কম ছিল। নীচে গত সপ্তাহের খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল :—

রাজস্থান (১)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
পুলিস (০)	জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
মহঃ স্পোর্টিং (১)	উয়াড়ী (০)
রেলওয়ে স্পোর্টস (৪)	অরোরা (০)
এরিয়ান (৩)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১)
পুলিস (১)	বি এন আর (০)
ইস্টবেংগল (১)	মোহনবাগান (১)
খিদিরপুর (২)	জর্জ টেলিগ্রাফ (১)
এরিয়ান (১)	মহঃ স্পোর্টিং (০)
রাজস্থান (২)	অরোরা (০)
উয়াড়ী (২)	কালীঘাট (০)
ইস্টবেংগল (২)	রেলওয়ে স্পোর্টস (০)
মোহনবাগান (১)	পুলিস (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১)	বি এন আর (০)

দেশী সংবাদ

১৩ই জুন—আসামে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আজ কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত আসামের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জির আলোচনা হয়।

আগামী ১লা জুলাই হইতে বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার ফলে ৫৮০ জন কর্মচারী অনির্দিষ্টকালের জন্য বেকার হইয়া পড়িবে। ইহা ছাড়া ৫০ হাজার লোক এই রেলওয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে রুজি-রোজগার করিতেছিল, তাহাও অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে।

১৪ই জুন—হাবড়া অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের দাবী সম্পর্কে রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রেণুকা রায় এক বিবৃতিতে জানান যে, হাবড়া উদ্বাস্তু উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত শহর এবং পল্লীগুলির উন্নয়নের নিমিত্ত রাজ্য সরকার কর্তৃক বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং এতদুদ্দেশ্যে কতকগুলি নূতন উন্নয়নমূলক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৮৬ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ব্যয়ের এক খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। আজ সরকারী দপ্তর ভবনে রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ঐ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন করেন।

১৫ই জুন—আজ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে বাংলা ভাষায় এক ভাষণে বলেন, 'আমি যা অল্প স্বল্প দেশের সেবা করেছি, সে সেবার শিক্ষা আমি এখানেই পেয়েছি।'

আজ ভারত সরকারের লৌহ ও ইস্পাত মন্ত্রিদপ্তর গঠিত হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য স্থাপিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এই মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হইবে। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী এই নূতন দপ্তরেরও মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৬ই জুন—ভারত সরকারের রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা আগস্ট হইতে ইস্টার্ন রেলওয়েকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। ইহার ফলে যে দুইটি রেল অঞ্চল সৃষ্টি হইবে, তাহাদের নাম হইবে ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে। কলিকাতায় এই দুইটি রেলপথেরই হেড-কোয়ার্টার স্থাপিত হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য কলিকাতা হইতে আট মাইল দূরবর্তী কামারহাটিতে উদ্বাস্তু নারীদের সমবায় শিল্পাশ্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত আশ্রমের প্রায় ২০০ উদ্বাস্তু বালিকা এক্ষণে এক বৎসরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে।

১৮ই জুন—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার কলিকাতাস্থ ৬নং সুটারকিন স্ট্রীটের নবনির্মিত অফিস ভবনের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি বিশেষ আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে ঐ নূতন ভবনে বিশিষ্ট এক জনমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় দেশ, জাতি ও জনগণের জীবনে সংবাদপত্রের উচ্চস্থান এবং সাংবাদিক বৃত্তির কর্তব্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁহারা উভয়েই আনন্দবাজার সংস্থাত্রয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

গোয়া মুক্তি আন্দোলনের অষ্টম বার্ষিক দিবসে অদ্য ১২৭জন স্বেচ্ছাসেবকের এতাবৎ বৃহত্তম সত্যাগ্রহী দল প্রবল বারিপাতের মধ্যে শ্বাপদসঙ্কুল বিপজ্জনক বনানীর মধ্য দিয়া কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া গোয়া অভিযান করেন।

১৯শে জুন—অখিল ভারত হিন্দু সভার সম্পাদক ও সংসদ সদস্য শ্রী ভি জি দেশপাণ্ডে আজ ৪৬জন ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সহ গোয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে গ্রেপ্তার হন। শ্রী দেশপাণ্ডেকে আটক করিয়া অন্যান্য সত্যাগ্রহীদিগকে ভারত সীমান্তে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

চন্দননগরের প্রথম নির্বাচন অদ্য বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সমাপ্ত হয়। প্রকাশ, গড়ে শতকরা ৭০জনেরও অধিক ভোটদাতা এই দিন ভোট দিয়াছেন। এই নির্বাচন কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় একজন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ফরাসী শাসন হইতে মুক্ত হইয়া ভারতে, তথা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পর চন্দননগরের ইহাই প্রথম নির্বাচন।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই জুন—পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ১৮ই জুলাই জেনেভায় চতুঃশক্তি সম্মেলনের যে প্রস্তাব করে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহা গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ ক্রিমিয়া হইতে জর্জিয়ান রিপাবলিকের রাজধানী তিবলিসে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

১৪ই জুন—বৃটেনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর রেল ধর্মঘটের পরিচালকগণ ১৭ দিনব্যাপী রেল ধর্মঘটের অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৬ই জুন—পাক প্রধান মন্ত্রী ও পাকিস্থান মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট জনাব মহম্মদ আলী অদ্য এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, নূতন গণপরিষদের জন্য সরকারীভাবে মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনে যদি কোন লীগ সদস্য বাধা দেন, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

আর্জেণ্টিনার রাজধানী বুয়েনস আয়ার্সে নৌ ও বিমানবহরের সৈন্যদল পেরঁ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। এক সরকারী ইস্তাহারে জানা যায় যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ভ্যাটিকান কর্তৃক পেরঁ সরকার সমাজচ্যুত হন।

১৭ই জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য উরাল অঞ্চলে ম্যাগনিটোগরস্কে উপনীত হন। ইতিপূর্বে কোন বিদেশীকে উরালের শিল্পাঞ্চলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

আজ নিউ ইয়র্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রিত্রয় 'চার রাষ্ট্রনায়ক বৈঠকের প্রাক্কালীন' গোপন আলোচনা আরম্ভ করেন।

১৮ই জুন—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ স্বের্ডলোভস্কে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা পরিদর্শন করেন। এখানে ভারতের জন্য ইস্পাত কারখানার যন্ত্রাদি নির্মিত হইবে। স্বের্ডলোভস্ক পরিদর্শনের ফলে শ্রী নেহরুর উরাল অঞ্চল সফর সমাপ্ত হইল।

১৯শে জুন—করাচীর একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত ৭ই মে নেকোয়াল গ্রামে পাক পুলিসের গুলীতে ৬জন ভারতীয় সৈন্য এবং ৬জন ভারতীয় অসামরিক কর্মচারী নিহত হওয়ায় ভারত সরকার পাকিস্থান সরকারের নিকট ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী জানাইয়াছেন। পাকিস্থান সরকার ভারত সরকারের এই দাবী সম্পর্কে এখনও বিবেচনা করিতেছেন।

আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট পেরঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর অদ্য রাজধানী বুয়েনাস-এরিসের রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহের চতুর্দিকে কড়া পুলিস প্রহরী মোতায়েন রাখা হয়।

প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩,

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাক গণপরিষদের ভবিষ্যৎ

পাকিস্থানের ভূতপূর্ব গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলের গরিষ্ঠতা ছিল। বর্তমান পরিষদে মুসলিম লীগের সে প্রাধান্য বিচূর্ণ হইয়াছে। পরিষদে দল হিসাবে এককভাবে লীগের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা আছে সত্য, কিন্তু অপর কোন দলের সঙ্গে যুক্ত না হইলে গণপরিষদে সমগ্রের ভোটে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে না। লীগ যদি পরিষদে ভোটের জোর চালাইতে চায়, তবে তাহাকে হয় হক সাহেবের যুক্ত ফ্রন্ট কিংবা মিঃ সুরাবর্দীর আওয়ামী লীগের দলকে নিজের দলে আনিয়া ভিড়াইতে হইবে। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী নিশ্চয়ই হক সাহেবের দলের সমর্থন লাভ করিবেন, এই আশা পোষণ করিতেছেন। তিনি সেকথা প্রকাশও করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থান সম্বন্ধে তাঁহার অবলম্বিত নীতির রীতি ও গতি হইতে মিঃ মহম্মদ আলীর এই মনোভাবের স্পষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়। নতুবা হক সাহেবের মনোনীত মন্ত্রিমণ্ডলকে পূর্ব পাকিস্থানের গদিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি আগ্রহান্বিত হইতেন না। বৃহৎ কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিংবা স্বদেশপ্রেমের প্রবৃত্তিতে তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া কাজ করিয়াছেন, ইহা মনে করা কঠিন। কিন্তু হক সাহেবের পক্ষে মিঃ মহম্মদ আলীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা—তাঁহাদের ইচ্ছা থাকিলেও সহজ হইবে না। কারণ মিঃ সুরাবর্দী সজাগ রহিয়াছেন। রাজনীতির ঘুঁটি খেলায় তিনি পাকা ওস্তাদ। তিনি পূর্ব পাকিস্থানে হক সাহেবের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজে জনপ্রিয় হইতে চেষ্টা করিবেন, এবং হক সাহেবের দলে ভাঙ্গন ধরাইবেন। এই ভয় হক সাহেবের দলের বিশেষভাবেই আছে। এই জন্যই দেখা যাইতেছে, যুক্ত ফ্রন্ট নেতাদিগকে ইতিমধ্যেই মিঃ মহম্মদ আলীর উক্তির প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। হক সাহেব এবং তাঁহার দলবল এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দলের ২১ দফা দাবী মানিয়া না লওয়া পর্যন্ত তাঁহারা কোন দলের সঙ্গেই সহযোগিতা করিবেন না। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার লীগ দলকে এই মতে আনিতে পারিবেন কি? লীগ পক্ষের সবই পশ্চিম পাকিস্থানী। তাঁহারা পূর্ব পাকিস্থানের ২১ দফা শর্তে মানিয়া লইয়া নিজেদের দলীয় স্বার্থ দরিয়ায় ডুবাইয়া দিতে রাজী হইবেন, ইহা মনে হয় না। এমন বিরোধী সুর পশ্চিম পাঞ্জাবে ইতিমধ্যেই বাজিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পাকিস্থানের রাজনীতিতে উপদলীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠার কূট রীতির খেলা চলিতেই থাকিবে এবং সেক্ষেত্রে সুবিধাবাদই মুখ্যস্থান অধিকার করিবে। প্রথম অবস্থায় মিঃ মহম্মদ আলী নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য রাজনীতিক এই ক্রীড়ায় নীতিচাতুর্য প্রয়োগে পটুতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁহার সমর্থক দলে ভাঙ্গন ঘটাইবার সুযোগ তাঁহার প্রতিপক্ষের যে কোন দলের থাকিবে। বাস্তবিক পক্ষে গণপরিষদ নূতনভাবে গঠিত হওয়াতে পাকিস্থানের রাষ্ট্র সংগঠন সমস্যার সমাধান হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

গোয়া ও কংগ্রেস

গোয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রীআমীরচাঁদ আত্মদান করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথম শহীদ। পর্তুগীজ পুলিশের নির্মম প্রহারের ফলে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার পর আরও একজন সত্যাগ্রহী গুলীতে প্রাণ দিয়াছেন। আত্মদাতা বীরের এই রক্তদান বৃথা যাইবে না। ইঁহাদের উত্তপ্ত শোণিত গোয়ার মুক্তি সুনিশ্চিত করিবে এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দুর্জয় শক্তি জাগাইবে। গোয়ার সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই অংশস্বরূপ। এই সত্য স্বীকার করিয়া লইলেও তদনুযায়ী বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বনে কংগ্রেসের সুস্পষ্টরূপ সঙ্কোচ দেশবাসীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমান নারায়ণ কয়েকদিন পূর্বে গোয়া সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেস সভা-সমিতি করিয়া গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পরিচয় দিবে। পর্তুগীজ সরকারের নির্মম অত্যাচারের নিন্দাবাদ করা কংগ্রেসের কর্তব্য হইবে; কিন্তু এই পর্যন্তই—কারণ কংগ্রেস সম্পাদক পরে এই শর্ত জুড়িয়া দিয়াছেন যে, কংগ্রেস কর্মীরা গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে অপরাপর রাজনীতিক দলের

কর্মতালিকার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারেন; কিন্তু কংগ্রেস ও ভারত সরকারের মৌলিক নীতির ব্যতিক্রম ঘটে, তাঁহারা এমন কিছু যেন না করেন। কংগ্রেস কর্মীরা অন্যান্য দলের সঙ্গে গোয়ার সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারিবেন না, ইহাই এই উক্তির তাৎপর্য। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস-সম্পাদকের একই উক্তির পূর্বার্ধ এবং শেষার্ধ পরস্পরবিরোধী। গোয়া সম্পর্কে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—কংগ্রেস নীতি দাঁড়াইতেছে অনেকটা এইরূপ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সার্থকতা বিধানে এবং মানবতার আদর্শ প্রতিপালনে কংগ্রেসের এই দ্বৈধভাব প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার ঐতিহ্যের মর্যদা ক্ষুণ্ণ করিবে। বস্তুত গোয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতিই যদি থাকে, অর্থাৎ সেই সংগ্রাম তাহার আদর্শানুমোদিত হয়, তাহা হইলে সেই সংগ্রাম সার্থক করিবার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই কংগ্রেসের পক্ষে কর্তব্য। অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই কংগ্রেসের নীতির মৌলিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফলত অপরকে সত্যাগ্রহ করিতে বলিয়া নিজেরা দূরে সরিয়া থাকিবার যুক্তি বিবেক এবং মানবধর্ম-সম্মত বলিয়া আমরা মনে করি না। বাস্তবিকপক্ষে গোয়া সম্পর্কে কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতি সমর্থনের পক্ষে কোনই যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সতীন সেন স্মৃতি

২৫শে জুন সতীন সেন স্মৃতিপক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, ৯ই জুলাই পর্যন্ত ইহা প্রতিপালিত হইবে। গত ২৫শে মার্চ প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বীর 'বরিশালের সতীন সেন' ঢাকা জেলে মৃত্যুকে বরণ করেন। সতীন সেন স্মৃতি কমিটি সত্যাগ্রহী এই বীরের স্মৃতিস্বরূপে একটি ভবন প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে দেশবাসীর নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই স্মৃতি ভবনে দেশের জন্য আত্মদাতাদের মূর্তি, চিত্র এবং স্মৃতিফলক থাকিবে। ইহা ছাড়া কমিটি সতীন সেনের বিস্তৃত জীবনী এবং দেশের আত্মদাতা সন্তানদের জীবনী প্রকাশ করিবেন এমন ইচ্ছাও কমিটির রহিয়াছে। সতীন সেনের সমগ্র জীবন স্বদেশ সেবার মহিমায় উজ্জ্বল। ত্যাগ এবং বৈরাগ্যময় তাঁহার স্নেহ সাধনায় কার্পণ্য কোনদিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং তৎসম্পর্কিত বিচার-বিবেচনার সর্বপ্রকার দৈন্যের ঊর্ধ্বে সতীন সেনের আত্মমহিমা জাতির ঐতিহ্যে অনাময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অসত্য এবং অন্যায়ের কাছে তিনি কোনদিন মাথা নত করেন নাই এবং উন্নত মস্তকেই সতীন সেন তাঁহার মর্ত্য-জীবনের কর্তব্য শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। বাঙলার জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাঁহার জীবনে অপরিম্লান মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। মানবতাকে তিনি তাঁহার অনুপম চরিত্রবল এবং নৈতিক শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়াছেন। এমন পবিত্র চরিত্র পুরুষের স্মৃতিপূজায় জাতি উন্নত হয় এবং তাহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য লাভ করে। তাঁহার স্মৃতিপক্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমরা বঙ্গ জননীর এই বীর সন্তানের উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং সতীন সেন স্মৃতি কমিটির আবেদনের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উদ্বাস্তুদের দুর্দশা

ভারতের পুনর্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করিয়া আসিয়া সেই সব আশ্রয়প্রার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। একান্ত নিঃস্ব এই নরনারীদের সামান্য কিছু বিছানাপত্র ছাড়া কিছুমাত্র সম্বল নাই। দলে দলে ইহারা আসিতেছে। মাথা গুঁজিবার স্থান মিলিবে এই ভরসাও ইহাদের নাই। ভারতের পুনর্বাসন সচিব এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের জন্য বহু অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন, এই সংবাদ জানিয়াই পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ বাস্তুত্যাগ করিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। তাঁহার এই উক্তি যে কতটা ভিত্তিহীন উদ্বাস্তুদের দুর্দশা দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। পাকিস্থানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী সি সি দেশাইও পূর্ববঙ্গ সফর শেষ করিয়া আসিয়া মিঃ মহম্মদ আলীর উক্তি যে আদৌ সত্য নহে, তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—হিন্দুরা গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাইবার জন্য বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে, ইহা হইতেই পারে না। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার উপর পাকিস্থানের রাজনীতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ফলত পাকিস্থানের প্রতিবেশ এই ধর্মান্ধ সংস্কারের প্রতিকূল প্রভাবেই হিন্দুদিগকে উদ্বাস্তু হইতে হইতেছে। এক্ষেত্রে পরিবর্তন কোথায়? পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সেদিনও গণপরিষদের সদস্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও এই মনোবৃত্তি পর্যাপ্তভাবেই প্রতিফলিত হইয়াছে—তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম ছাড়া, রাজনীতি থাকিতে পারে না। ধর্ম বলিতে এক্ষেত্রে অবশ্য ইসলাম ধর্ম বুঝিতে হইবে। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্থানের সংবিধান রচনা করিতে হইবে মিঃ মহম্মদ আলীর ইহাই নির্দেশ। রাষ্ট্রের নীতি যদি বিশেষ কোন ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে শাসকদের মতিগতিও বৈষম্যমূলক হইতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তিত হইলেও সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুকূল প্রতিবেশের সৃষ্টি হইবে, এমন আশা করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থান ইসলামিক রাষ্ট্র নয়; পাকিস্থান হিন্দু-মুসলমান সকলের রাষ্ট্র এবং সকলের সেখানে সমান অধিকার। পূর্ববঙ্গের নব প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিমণ্ডল পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় আদর্শে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইবেন কি? ধর্মের নামে মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া রাখিবার দুর্বুদ্ধি হইতে পূর্ববঙ্গের উদার অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য পাকিস্থানকে মুক্ত করুক, আমরা ইহাই কামনা করি।

বৈদেশিকী

পণ্ডিত নেহরুর সোভিয়েট-ভ্রমণান্তে সোভিয়েট ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত যে দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রত্যাশিতভাবেই তথাকথিত "পঞ্চশীলের" স্বীকৃতি প্রথম স্থান পেয়েছে। তবে নেহরু-বুলগানিন বিবৃতিতে 'পঞ্চশীলের' উল্লেখের ভাষায় এক জায়গায় একটু নূতনত্ব আছে। 'পঞ্চশীলের' একটি 'শীল' হচ্ছে পরস্পরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। নেহরু-বুলগানিন বিবৃতিতে এই কথাটাকে একটু বিশদ করে বলা হয়েছে এইভাবে যে, কোনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা মতবাদ সংশ্লিষ্ট (ideological) কারণে একে অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। মতবাদের কথার উল্লেখ হওয়াতে অনেকে এর মধ্যে একটা বিশেষ তাৎপর্য অনুসন্ধান করছেন। কেউ কেউ মনে করছেন যে, এর মধ্যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত আছে।

বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির উপর রাশিয়ার প্রভাব সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক কম্যুনিস্ট পার্টিই রাশিয়ার স্বার্থ সর্বাগ্রে দেখে। সুতরাং ফলত বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির মারফৎ সেই সব দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের উপর রাশিয়ার একটা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ আছে। একদা 'কোমিনটার্নে'র দ্বারা বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির উপর সোভিয়েট রাশিয়ার শাসন পরিচালিত হোত। গত যুদ্ধের সময় ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রদের চাপে স্ট্যালিন 'কোমিনটার্ন' ভেঙ্গে দেন। হিটলারের রুশ আক্রমণের পরে সর্বত্র কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি 'জনযুদ্ধে'র নামে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। তখন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের অ-কম্যুনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে সরকার ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না সুতরাং সাময়িকভাবে 'কোমিনটার্ন' তুলে দিতে কোনো অসুবিধা ছিল না। যুদ্ধের শেষ হতে না হতেই যখন রাশিয়া ও তার ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রদের মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব নূতনভাবে প্রকট হয়ে উঠল তখন থেকে আবার বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি ও সেই সব দেশের গভর্নমেন্টের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি সর্বাগ্রে সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থ-রক্ষাকেই নিজেদের প্রধানতম কর্তব্য বলে মনে করতে লাগল। এই অবস্থায় আবার আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পরিচালনার জন্য হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রয়োজন হোল এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য 'কোমিনফর্মের' জন্ম হোল। 'কোমিনটার্ন' ও 'কোমিনফর্মের' রূপ বাহ্যত এক না হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য এবং কাজের ধারা একই বলা যায়।

'কোমিনটার্নের' দ্বারা অন্য দেশের আভ্যন্তর ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে—এই অভিযোগ দূর করার জন্যই যুদ্ধের সময়ে স্টালিন 'কোমিনটার্ন' ভেঙ্গে দিতে রাজী হয়েছিলেন। সেই যুক্তি অনুসারে এবং অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করার নীতি পুরোপুরি মানতে হলে 'কোমিনফরমকেও' ভেঙ্গে দিতে হয়। রাশিয়া 'কোমিনফরম' তুলে দিতে রাজী হতে পারে—এই ইঙ্গিত নেহরু-বুলগানিন বিবৃতির উপরোক্ত কথার মধ্যে আছে কিনা তাই নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা চলেছে। 'কোমিনফরম' তুলে দিতে রাশিয়া রাজী হলে তাতে বিশেষ আশ্চর্য হবার হেতু দেখি না। একাধিক কারণে রাশিয়ার দিক থেকে 'কোমিনফরমের' উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণটি রুশ-যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট। যুগোশ্লাভিয়াকে 'কোমিনফরম' থেকে বার করে দিয়ে টিটোর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর জন্য 'কোমিনফরমের' সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও যুগোশ্লাভিয়াকে শায়েস্তা করতে পারা যায় নি। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়াকে টিটোর কাছে একরকম ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছে। এই ক'বছর যুগোশ্লাভিয়াকে জব্দ করার এবং টিটোকে ধ্বংস করার চেষ্টা কেন করা হয়েছে তার এই হাস্যকর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, বেরিয়াই ছিল যত নষ্টের মূল। বেরিয়াই নানারকম মিথ্যা নজির সৃষ্টি করে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে বিভ্রান্ত করে। যাই হোক এ ব্যাপারের পরে 'কোমিনফরমের' আর কোনো 'প্রেস্টিজ' নেই, সুতরাং ওটা একরকম অকেজো হয়ে গেছে। পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট-প্রভাবাধীন দেশগুলিকে একগাট্টা করে রাখার জন্য 'কোমিনফরমের' পরিবর্তে বর্তমানে অন্য রকম ব্যবস্থা হয়েছে।

যে পরিস্থিতিতে এক সময়ে 'কোমিনটার্নে'র অথবা 'কোমিনফরমে'র মারফৎ আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের সুযোগ ছিল তারও পরিবর্তন হয়েছে। এশিয়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির উপর এখন উত্তরোত্তর চীনের প্রভাব বাড়ছে। ইউরোপে অবস্থিত 'কোমিনটার্ন' বা 'কোমিনফরমের' মতো সংস্থার দ্বারা এশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা এখন সম্ভব নয়। সেদিক দিয়ে এখন 'কোমিনফরম' তুলে দিলে বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। এখন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের গতি নিয়ন্ত্রনের অন্য কৌশল আবশ্যক হয়েছে।

'কোমিনফরম' না থাকলে অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য থাকবে না, এরূপ আশংকা রাশিয়া বোধহয় করে না। মিঃ চৌ এন লাই এবং ইন্দোনেশিয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে বান্দুং কনফারেন্সের সময়ে এই স্থির হয়েছে যে ইন্দোনেশিয়ার চীনাবংশোদ্ভূত অধিবাসীদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্থির করতে হবে তারা চীন অথবা ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক থাকবে—ডবল নাগরিকত্ব রাখা চলবে না। অনেকে মনে করেছেন যে এই রকম প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে মিঃ চৌ এন লাই চীনের দিক থেকে একটা উদারতা দেখিয়েছেন (যেহেতু চীনের পূর্বের আইন অনুসারে কোনো চীনাই যেখানেই থাক চীনের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে পারে না) এবং একটা আশংকা দূর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়ের চীনারা নিজেদের চীনের নাগরিক না বলে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়ের নাগরিক বল্লেই যে চীনের প্রতি তাদের দরদ ও পক্ষপাতিত্ব কিছু কমবে তা বলা যায় না। আমেরিকার ইহুদিরা আমেরিকার নাগরিক হয়েও ইজরেলের জন্য তারা কী না করছে। তেমনি 'কোমিনফরম' বা ঐরকম কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দৃশ্যত পরিচালক না হয়েও অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির রুশ দরদ অন্তত আপাতত অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে রাশিয়া আশা করতে পারে। সুতরাং 'কোমিনফরম' তুলে দিতে রাশিয়া ভিতরে ভিতরে রাজী হয়েছে, এরূপ মনে করলে হয়ত ভুল হবে না।

'কোমিনফরম' তুলে দিলে রাশিয়ার স্বার্থের কোনো ক্ষতি হবে না অথচ প্রোপাগাণ্ডার দিক থেকে খুব একটা বড় লাভ হবার সম্ভাবনা। কারণ, 'কোমিনফরম' তুলে দিলে সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মানোর চেষ্টা হবে যে বিশ্বশান্তির জন্য, 'সহাবস্থিতির' জন্য রাশিয়া খুব একটা বড়ো ত্যাগ করল।

আর একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। যাঁরা নেহরু-বুলগানিন বিবৃতির এই কথাতে কেবল রাশিয়ার দিক থেকেই একটা 'কনসেশনে'র ইঙ্গিত দেখছেন তাঁরা ভুল করছেন অথবা বলা যায় তাঁরা একদিক মাত্র দেখেছেন। যে-কথা বলা হয়েছে সেটাকে রাশিয়ার দিক থেকে একটা দাবী হিসাবেও দেখা যেতে পারে। মিঃ ডালেস সর্বদাই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির 'মুক্তি'র কথা বলছেন। অস্ট্রিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের পরে মিঃ ডালেস বলেছেন যে, অস্ট্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশও এই আশায় উৎসাহিত হবে যে একদিন তারাও অস্ট্রিয়ার মতো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবার সুযোগ পাবে অর্থাৎ তারা সোভিয়েট প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে। মিঃ ডালেসের এই ধরনের কথায় এবং পূর্ব ইউরোপের উদ্দেশ্যে প্রচারিত মার্কিন প্রোপাগাণ্ডায় সোভিয়েট রাশিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত এবং সম্ভবত একটু শংকিতও হয়েছে। রাশিয়া বলছে আমেরিকা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির আভ্যন্তর শাসনব্যবস্থা উল্টে দিতে চায়—আইডিওলজিক্যাল কারণে। রাশিয়ার এই অভিযোগের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত নেহরু-বুলগানিন বিবৃতির কথাটার যোগ আছে বলেই মনে হয়। তার অর্থ রাশিয়া জানাতে চায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে অ-কম্যুনিস্ট হস্তক্ষেপ রাশিয়া বরদাস্ত করবে না। বিবৃতি রচনার পূর্বে যদি এ বিষয় পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্টভাবে আলোচনা হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে পণ্ডিত নেহরু পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধে রাশিয়ার কথাই সমর্থন করেছেন। বিবৃতিতে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে যে-সব মত প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলিও মোটের উপর কম্যুনিস্ট পক্ষের অনুকূল।

২৮।৬।৫৫

এই নিয়ে তিনবার। আজও ঠিক তাই হলো। নীচে কলঘর। গা ধুয়ে বাসনা উঠছিল। গা-মুখ ভিজে-ভিজে, ঠাণ্ডা। বাঁ হাতে কাচা শাড়ি, সেমিজ, গামছা, সাবান-কেস। মাঝ সিঁড়িতে আসতেই শুনলো কমলার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে আটটা বাজছে।

থমকে দাঁড়াল বাসনা। মুখ তুললে এবং কান পাতল। থেমে থেমে, রেশ ছড়িয়ে, মিলিয়ে যাই-যাই করেও একটা ধাতব সুরেলা শব্দ বেজে যাচ্ছিল। আর বাসনা সেই ঈষৎ ভারি ভাঙা প্রতিটি ঢং—ঢং শুনতে শুনতে এবং গুনতে গিয়ে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। যেন ধক্ করে এক দমকা ঝাঁঝাল কটুগন্ধ হাওয়া এসে সজাগ চেতনাকে আবিল করে তুলল। দৃষ্টিকেও। সিঁড়ির আলো নিভু-নিভু হয়ে আসছিল। দোতলার মুখে খানিকটা অন্ধকার বাতাসে-দোলা-পর্দার মতন দুলতে লাগল, একবার আলো দেখল বাসনা, নড়ে উঠে সেই আলো মুছল এবং অন্ধকার নামল। আবার আবছা আলো।

বাসনার বুকে নিশ্বাস আসছে না, প্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মাথাটা ঘুরে আসছে; ভীষণ হাল্কা লাগছে হঠাৎ। একটা অদ্ভুত ভার দেহটাকে ঠেলে দিচ্ছে একপাশে।

বাসনা একটিবার ভেবেছিল সিঁড়িটুকু সে কোনোরকমে উঠে যাবে। কিন্তু ওঠবার চেষ্টাই করে নি, করতে পারল না। ধুপ্ করে বসে পড়ল সিঁড়িতে।

তারপর খুব আবছাভাবে বাসনা শুনতে পেয়েছে, কেউ চিৎকার করে ডেকে উঠল, হুড়মুড় করে ছুটে এল কমলা, বীথি। মাথায় জল ঢালল। পাখা দিয়ে হাওয়াও করল বুঝি। হুটোপাটি, ছুটোছুটি। শেষ পর্যন্ত ওকে কে যেন পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চললো। কে? কী শক্ত হাত, যেন আঁকড়ে ধরে বুকের কাছে উঠিয়ে নিয়েছে।

অল্প ক'দিন হলো এই বিশ্রী রোগটা দেখা দিয়েছে বাসনার। ফিট্ হচ্ছে আচমকা। দিন পনেরো আগে প্রথম। সেদিনও ঠিক এমনি, গা ধুয়ে আসছে কলতলা থেকে, সিঁড়ির কাছে আসতেই টলে পড়ল। ভাগ্যিস অমলেন্দু ছিল ধারেকাছেই। ছুটে এসে ধরে ফেলেছিল, নয়তো মাথা ফাটত কী হাত-টাত ভেঙে এক কাণ্ডই করে বসত বাসনা। বাড়িতে তখন সুধাময় ছিল না। মেয়েরা ভয় পেয়ে হুটোপাটিই করলে শুধু। জল ঢালল ঘটি ঘটি মাথায় মুখে আর হাওয়া করলে। জলে ভিজে একসা হয়ে পড়ে থাকল বাসনা সিঁড়ির গোড়ায়, পথের মাঝখানে। কতক্ষণ আর যাওয়া-আসার পথে ধুলোয় নোঙরায় ফেলে রাখা যায়। মূর্ছা যে কখন ছাড়বে তারই বা ঠিক কি? গা-হাত শক্ত করে তখনও পড়ে আছে বাসনা। চোখ বুজে।

মেয়েরা কী পারে, না সে-শক্তি আছে। কাজেই ওই সব তুচ্ছ লজ্জা বাদ-বিচারের কথাই ওঠে না। অমলেন্দুকেই বাসনার ভিজে ভারি শরীরটা পাঁজাকোলে করে বয়ে আনতে হয়েছে সিঁড়ি বয়ে দোতলায়। বাসনার ঘরে এনে শুইয়েও দিয়েছে।

স্মেলিং সল্ট ছিল না। ব্লটিং পুড়িয়ে কটু ধোঁয়া নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে অমলেন্দু। বাসনা মাথা সরাবার চেষ্টা করেছে প্রথমে, মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। তারপর চোখ খুলেছে। আলগা, স্তিমিত, ঘোলাটে দৃষ্টি। যেন জ্বর এই ছাড়ল।

ক'দিন পরে আবার। ঠিক এই আটটা বাজ-বাজ সময়ে, কমলার ঘরে ঘড়িতে সবে ঘণ্টার প্রথম শব্দ উঠেছে। বাসনা গা ধুয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। মাথা টলে ছিটকে পড়ল। আর মুখ গুঁজে, মাথা এক সিঁড়িতে, পা নীচে অন্য সিঁড়িতে, সে-এক বিশ্রী বেকায়দা ভাবে। হ্যাঁ, সেদিন বেশ লেগেছিল বাসনার। কপালের একটা পাশ কেটে গিয়েছিল, পায়ের গোড়ালি মচকে ফুলে উঠেছিল। সে-বারও অমলেন্দু তুলে আনল। ব্লটিং পেপারের ধোঁয়া শুঁকিয়ে ফিট্ ছাড়াল।

হঠাৎ একবার কোনো কারণে ফিট্ হয়, হতে পারে হয়তো, হওয়া এমন কিছু

আশ্চর্যের নয়। বাসনার হয়েছিল। তা বলে আবার, ক'দিন যেতে না যেতে, ফিট্ হবে এ-কথা কেউ ভাবে নি, ভাবতে পারে নি। দ্বিতীয়বারের পর, হ্যাঁ, তা একটু ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। কমলা সুধাময়কে বললে। সুধাময় জবাব দিল, বড় খাটা-খাটুনি করেন ছোড়দি। শরীর দুর্বল হলে অমন হয়। আগেও নিশ্চয় ফিটের ব্যায়রাম ছিল ও'র।

না, ছিল না। কোনোকালেই দিদিকে ফিট্ হতে দেখে নি কমলা। এমন কি জামাইবাবু যখন মারা গেলেন, তখনও দিদি জ্ঞান হারায় নি, শুধু পাথরের মতন বসেছিল। অদ্ভুত, দুর্বোধ্য চোখ নিয়ে, ঠোঁট কামড়ে।

উপসর্গটা নতুনই। একেবারেই কাল-পরশুর। তবে হ্যাঁ, দিদির শরীর আজকাল যেন একটু খারাপই যাচ্ছে। এ-মাসে ক'টা যেন উপোসও করল পর পর। কমলা কতো বারণ করেছে। বাসনা শোনে নি।

তবু একটা স্মেলিং সল্ট্ কমলা আনিয়ে রেখে দিল দ্বিতীয়বারের পর। থাক একটা। দরকার লাগতে পারে।

লাগলও কাজে। আবার ফিট্ হলো বাসনার আজ। সেই আটটার সময়ই। কী আশ্চর্য! আর কপাল ভালো যে এই সময়টাতেই হয়, যখন সুধাময় বাড়িতে না থাকলেও অন্তত অমলেন্দু থাকে, বীথিকে পড়ায়। আর খানিক পরে হলে সেও থাকত না, চলে যেত।

ক'বারই অমলেন্দু এই দুঃসময়ে থেকে, বলতে নেই কমলাদের উদ্বেগ আশঙ্কাকে যথেষ্ট হাল্কা করেছে।

আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিটের ঘোর কেটে গেল। আস্তে করে চোখ মেলে প্রথমে কী যেন দেখল বাসনা। চোখ বুজল আবার। সজ্ঞানে ক'বার নিশ্বাস নিল। যদিও আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না, তবু কেমন এক গাঢ় অবসাদ রয়েছে। ভার-ভার ব্যথা। কপালে সামান্য একটু যন্ত্রণা। গলা ঠোঁট শুকিয়ে তেষ্টা।

ঘরের বাতিটা নিভনোই ছিল। জানলার বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না। মাথার ওপর পাখাটা বাতাস কেটে যাচ্ছে, এক-টানা মৃদু একটা শব্দ।

খাট ছেড়ে উঠল বাসনা। ভাবল একবার বাতিটা জ্বালে। কিন্তু জ্বালল না। নিজের ঘর, ঘরের খুঁটিনাটি এখন আর অচেনা ঠেকছে না।

জল গড়িয়ে খেল বাসনা। বিছানায় এসে ধীরে ধীরে বসল আবার। রাত কি অনেক হয়ে গেছে নাকি? কমলাদের কারুর সাড়া-শব্দ শোনা যাচ্ছে না! বারান্দার বাতিটা অথচ জ্বলছে। ঘরে বসেই সে-আলো দেখতে পাচ্ছে বাসনা।

আঁচলে মুখ মুছে, পা গুটিয়ে বসতে গিয়ে হঠাৎ বাসনা ঘাড়ের কাছে বেশ একটু ব্যথা অনুভব করলে। হাত দিয়ে আলতোভাবে জায়গাটা স্পর্শ করতে আচমকা যেন অন্য কিসের ছোঁয়া লেগে গেল। গা শিউরে একটু একটু কাঁটা দিল কোথাও। আর হঠাতই অদ্ভুত এক লজ্জায় কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকল। বাসনার মনে হচ্ছিল, অত্যন্ত সবল সুস্থ এক পুরুষের কঠিন হাতের স্পর্শ যেন ঘাড়ের কাছে এখনও লেগে রয়েছে।

অস্বস্তির চেয়ে রাগ হচ্ছিল বেশী। কমলাদের ওপরই। কোনো একটা কাণ্ড-কাণ্ডি জ্ঞান নেই। যে সে বাইরের একটা লোক গায়ে হাত দেবে তার, তা বলে! না হয় ফিটই হয়েছিল বাসনার, যেখানে সেখানে লুটিয়ে পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে। তাতে কি, তোমরা কি ধরাধরি করে একটু সরিয়ে দিতে পারতে না! থাকতই বা পড়ে বারান্দায়, দালানে, সিঁড়ির একপাশে বাসনা। কতোক্ষণই বা আর। কী-ই বা ক্ষতি হত তাতে? তা বলে ওই অমলেন্দু, যার সঙ্গে বাসনার কোনো সম্পর্ক নেই, কমলাদের একটা দূর সম্পর্ক থাকলেও থাকুক, সে কোন্ অধিকারে ওর গা ছোঁবে। আর এমন নয় যে, একবার, হঠাৎ একবার এমনটা হলো—এই নিয়ে তিন, তিনবার। ...প্রথমবার—; প্রথমবারের কথাটা মনে পড়লে এখনও সারা গা কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে আসে। সবই শুনেছে বাসনা বীথি কমলার মুখে। ছি, ছি, ছি। জল ঢেলে ঢেলে একেবারে নাইয়ে দিয়েছিল কমলারা। মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছিল; গা, কাপড় জামা সব ভিজে ছপ্ছপে। সেই অবস্থায় অমলেন্দু তাকে তুলে নিয়ে এসেছে। কী বিশ্রী কাণ্ড।

লোকটাকে, মানে এই অমলেন্দুকে বাসনার মোটেই পছন্দ হয় না। না হবার কারণ আছে। চেহারাটা অবশ্য শক্ত-সমর্থ পুরুষের মতনই, কিন্তু মুখের কোথাও যদি একটু বুদ্ধির কী রুচির ছাপ আছে। গোল, নিস্তেজ, হাবা-গোবা গোছের মুখ। বসা নাক, পুরু ঠোঁট, ফুলো ফুলো গাল, ছোট কপাল। কোথাও ছিটে-ফোঁটা ধার নেই, উজ্জ্বলতা না। নির্বোধ, অতি-সাধারণ সেই মুখের দিকে তাকালে মনেই হয় না, লোকটার কোথাও বিন্দু ব্যক্তিত্বও

আছে। নেই। কিন্তু অন্য এক জিনিস আছে যা কদর্য। বাসনা তা জানে, জানতে পেরেছিল। লোকটা লোভী। তার চোখে সেই লোভ নোংরা খানা-ডোবার উপচানো জলের মতন বড়বড়ি কাটে। তাকান যায় না, গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

বাসনা তা জানে। জানতে পেরেছিল। হ্যাঁ, তখন কিছুদিন, মাস দুয়েক হবে অমলেন্দু এ-বাড়িতে ছিল। সবেই এসেছে কলকাতায়, এ-বাড়িতে। বীথির ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাকে। তাতে যদিও শোওয়া-বসার অসুবিধে হয় নি বীথির, কিন্তু পড়াশোনার আর অন্য অন্য অনেক অসুবিধে হচ্ছিল। বীথি বাসনার ঘরেই ছিল সেই দু মাস। এক বিছানায় শুতে হতো দু-জনকে।

শুয়ে গল্প হতো রাত্রে। অমলেন্দুর কথা উঠতো, কেননা অমলেন্দুর ঘর আগলে রাখার জন্যে বীথির অসুবিধেই ছিল সবচেয়ে বেশি। আর রোজই একটা না একটা অসুবিধে দেখা দিত বীথির। কথাও উঠতো সেই ছুতোয়।

তার ঘর দখলের জন্যে যদিও অমলেন্দুর ওপর খানিক বিরূপই ছিল বীথি প্রথম প্রথম—অন্তত মুখে তাই দেখাত, কিন্তু মাঝে-মধ্যে অন্য সুরেও কথা বলে ফেলত। একদিন বললে, 'বুঝলে ছোড়দি, যত বোকা দেখায় আসলে লোকটা অতো বোকা নয়।'

'কি করে বুঝলি?' বাসনা শুধলো।

'কি করে আবার, ভালো করে দেখলেই বোঝা যায়।' বীথি বেয়াড়া রকম প্রশ্নের এলোমেলো উত্তর দিয়ে পার পেতে চায়।

আর একদিন বীথি বললে, 'শুনেছো ছোড়দি, আমাদের ওই বোকারাম মশাই শেষ পর্যন্ত চাকরি পেয়েছে।'

'কোথায়?'

'কলেজে। আমি তো ভেবেই পাই না কী পড়াবে ও? কে বা ওকে মানবে?'

'কেন?'

'যা বাঁটকুলে দেখতে। তার ওপর কথাই বলতে পারে না ভাল করে। তোতলায়। যাই বলো ওকে বাপু প্রফেসার-টফেসার মানায় না।'

'হ্যাঁ, এক তোর পাশেই যা তবু একটু-আধটু মানাবে জোড় পরে দাঁড়ালে—!' বাসনা অন্ধকারেই কেমন করে যেন হাসে।
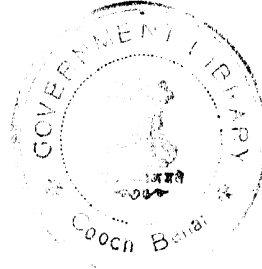
আর যদিও মুখ দেখতে পায় না বীথির, তবু মনে মনে অনুমান করবার চেষ্টা করে।

'এই ছোড়দি—।' বীথি অন্ধকারেই খপ্ করে বাসনার মুখ চেপে ধরে। তার গায়ে মাথা রগড়ে, হাত খামচে ছটফটে ভঙ্গি করে বলে, 'বয়ে গেছে আমার। কখ্খনো না। তুমি কী অসভ্য। কিছু আটকায় না মুখে!'

বাসনা আস্তে আস্তে মুখ ছাড়িয়ে নেয়। বীথির সোহাগের আলিঙ্গনও। কিছুই বলে না আর। অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

কথাটা খুব স্পষ্ট ভাবে না হলেও, কমলার মুখে এ-রকম একটা আভাস পেয়েছে বাসনা। সুধাময়ের ইচ্ছে, বন্ধুর সঙ্গেই বোনের বিয়েটা দেয়। কমলারও আপত্তি নেই। বীথিও অরাজী নয়। অবশ্য রাজী না হওয়ার কোনো কারণ নেই। শিক্ষিত, নীরোগ, সুস্থ ছেলে, অবস্থাও খারাপ নয়। এক বয়সে একটু বেমানান হচ্ছে। অমলেন্দুর বয়েস বছর তেত্রিশ, বীথির কুড়ি। বয়সের তফাৎ নিয়ে আজকাল লোকে খুঁত খুঁত করে। আগে করতো না। কমলার সঙ্গে সুধাময়ের বয়সের তফাতও তো প্রায় বছর আষ্টেকের। তা নিয়ে কেই বা কথা উঠিয়েছিল। কী ক্ষতিই বা হয়েছে তাতে। সুখের সংসার কমলার। দুটি ছেলেমেয়ে।

নিজের তুলনাও বাসনা দিতে পারে। তার আর তার স্বামীর মধ্যে খুব একটা তফাৎ ছিল না। বছর চারেকের। কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে! সিঁদুর যখন মোছবার, মোছেই, বয়স গুনে মোছে না। নয়তো দু-বছরের ছোট বড় দুই বোনের একজনের কেন মুছল? এ সব ভাগ্য! কপাল!

কাজেই বয়সের কথাটা কিছু নয়, সে-বাধাও সত্যি কোনো বাধা নয়। রাজী অরাজীর প্রশ্নে কমলারা রাজী আছেই, বরাবরই থাকবে। এখন অমলেন্দুর ইচ্ছেটা কী, সেটাই জানা দরকার। ওইটেই আসল।

বাসনার ধারণা, অমলেন্দুর ইচ্ছেটা অন্য রকম। বীথি সম্পর্কে তার তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ হয় নেই। থাকার কথাও নয়। বীথি সুন্দরী নয়, মোটা-মুটি দেখতে, চলনসই। রঙটাও ময়লা। এমনিতেও রোগা।

বরং অমলেন্দুর আকর্ষণ কার ওপর, তার চোখ কার ছায়াটুকু পর্যন্ত লোভীর মতন চুরি করে কৃতার্থ হয় বাসনা তা জানে। আর হ্যাঁ, বাসনা একাই; আর কারুর জানার কথা নয়। কেউ জানে না।

এ বাড়িতে থাকার সময় অমলেন্দু বাসনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছিল। উন্মুখ হয়ে থাকত। সুযোগ খুঁজত, সুবিধের সদ্ব্যবহার করত। এবং যদিও মুখে স্পষ্ট করে সেটা প্রকাশ করত না, কিন্তু তার হাবভাব, আচার-আচরণে বাসনা ধরতে পেরেছিল।

প্রথমটায় অবশ্য একটু ভুল হয়েছিল। অতোটা বুঝতে পারেনি বাসনা। কেই বা পারে! নতুন এল বাড়িতে। সুধাময় খাতির যত্ন করলে। কমলাও আদর আপ্যায়নে খুঁত রাখলে না। যাদের বাড়ি তারাই যদি মাথায় করে নেয়, তবে বাসনা--এ-বাড়িতে শুধুই যে আশ্রিত তার মুখ ফিরিয়ে থাকা শোভা পায় না। হয়তো তাতে সুধাময় ক্ষুণ্ণ হতো, কমলাও অসন্তুষ্ট হতো। হওয়া আশ্চর্য ছিল না।

বীথি যতোই বলুক, অমলেন্দু কথা বলতে পারে না, তোত্‌লা—বাসনা নিজে জানে এর কোনোটাই নয় অমলেন্দু। বীথির যত বাড়াবাড়ি। এক রকম ঢঙই। ন্যাকামো। পেটে খিদে, মনে খাই খাই ভাব, মুখে জোর করে ঢেকুর তোলা। বাসনা কি আর তা জানে না, না বুঝতে পারে না!

অন্যের বেলায় যাই হোক্, বাসনার বেলায় অন্তত অমলেন্দু নিজেই এগিয়ে এসেছিল। আলাপ সালাপ করতে চেয়েছে। গল্পগুজোব জমাবার চেষ্টা করেছে।

বাসনা এই মাননীয় অতিথিটিকে সরাসরি উপেক্ষা করতে পারে নি। অকারণে রূঢ় হবার উপায় ছিল না এ-ক্ষেত্রে। তা ছাড়া তখন কি বাসনা স্বপ্নেও ধারণা করতে পেরেছিল লোকটার আসল রূপ কী কদর্য! না, পারেনি। যদি সে-সন্দেহ জাগতো, কোনোরকম প্রশ্রয়ই অমলেন্দু পেত না। যেমন পায়নি আরও কয়েকজন, যারা বাসনার আঠাশ বসন্তের অসহায় সৌন্দর্যকে সহানুভূতি জানাবার জন্যে নানাভাবে এগিয়ে এসেছিল। তাদের সমস্ত ছলাকলা অত্যন্ত অনায়াসে এবং অতি নির্মমভাবেই ব্যর্থ করে দিয়েছে বাসনা।

আশ্চর্য, এরা ভেবে নিয়েছিল, বাসনা তার বৈধব্যের ক্লান্তি, শূন্যতার অসহ ভার আর বইতে পারছে না। এক কণ্ঠ-রোধ দুর্বিষহ যন্ত্রণায়, জ্বালায় ছটফট করছে; মাথা খুঁড়ছে। এই বাধ্য বন্ধন থেকে মুক্তির লোভ দেখালেই নির্বোধ হরিণী ছুটে আসবে।

ওরা জানতো না, কী নিরপেক্ষ মন নিয়ে বাসনা তার ধৈর্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। এবং কত সংযত, সুস্থিত চিত্তে। পরম সহ্যগুণে। না, বাসনার মনে কোনো চঞ্চলতা ছিল না, কোথাও কোনো আবিলতা অথবা ব্যর্থতার হাহাকার।

যদিও তিনি নেই, তবু তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আছে, বাসনা ভাবত। আর ভেবে খুশী হতো যে, এই নিষ্কলঙ্ক আত্মনিবেদন এবং পবিত্রতার মধ্যে যে স্নিগ্ধতা আছে, আর শান্তি--বাসনা তা একান্তভাবেই উপভোগ করছে। সমস্ত শূন্যতা এতে ভরে গেছে। অনবয়ব উপস্থিতি দিয়ে স্বামী তাকে ঘিরে রেখেছেন, রাখবেন।

শুচিতার এক আশ্চর্য বিভায় বাসনা একটি প্রদীপের মত জ্বলছিল, এবং লোভী পতঙ্গদের সাধ্য ছিল না সে-বিভা অতিক্রম করে।

অমলেন্দু সেই সীমানা অতিক্রম করতে চেষ্টা করছে তখন।

একদিন কিছু ফুল কিনে এনে-ছিল অমলেন্দু। বারান্দায় দেখা। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে বাসনা তাকে দেখল।

'বাঃ, সুন্দর ফুল তো!' নরম করে হেসে বাসনা বলেছিল। আর বলে দাঁড়ায় নি, তার নিজের ঘরে আসছিল। পিছনে পায়ের শব্দও থামেনি, এগিয়ে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে বাসনা আবার ফিরে তাকাল। অমলেন্দু এসে দাঁড়িয়েছে। বাসনা কথা না বললেও একটা প্রশ্ন তুলেছিল চোখে।

ফুলগুলো এগিয়ে দিয়ে অমলেন্দু বললে, 'কাল যে বলছিলেন; নিয়ে এলাম।'

বাসনা অবাক। কাল সে কী বলেছে? ও, হ্যাঁ—মনে পড়েছে। অমলেন্দুর হাত থেকে ফুল নিয়ে বাসনা বললে, 'আমি তো আপনাকে ফুল আনতে বলিনি, বলেছিলাম, এ সময়ে চাঁপা ফুল পাওয়া যায় না।'

'দেখছেন তো পাওয়া গেল।' অমলেন্দু হেসে বললে, 'চেষ্টা করলে কি না পাওয়া যায়।' 'কি-না' শব্দটার ওপর কেমন এক রহস্যের আভাস দিলে।

......আর একদিন।

স্নানে যাবার আগে অমলেন্দু ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছে। টেবিলের ওপর মুখের সামনে ছোট্ট আয়না, সাবান, ব্রাশ, জল, ক্ষুরের খোলা বাক্স। সর্ সর্ করে পরম অক্লেশে অমলেন্দু গালের ওপর দিয়ে ক্ষুর চালিয়ে, থুতনি তুলে গলার কাছে হাত এনেছিল। বাসনা চায়ের পেয়ালা হাতে এসে দাঁড়িয়েছে। অমলেন্দু অতি মসৃণ গতিতে গলার আশে পাশে ক্ষুর চালিয়ে যাচ্ছে। দেখে, কে জানে কেন, বাসনার হঠাৎ কেমন গা শিউরে উঠলো। অস্ফুট একটা শব্দ করতেই অমলেন্দু মুখ ফেরাতে গেল। গলার একটু ওপরেই ক্ষুরের ধার বসে ফিনকি দিয়ে রক্ত। বাসনা সেই রক্ত দেখে চমকে উঠেছে। অমলেন্দু তোয়ালেটা বুঝি খুঁজছিল। বাসনা কি করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ তার আঁচল দিয়ে চেপে ধরল কাটা জায়গাটা। রক্ততে থানের খানিকটা টকটকে লাল হয়ে ভিজে উঠল।

'ইস্, কী করলেন, কাপড়টা নষ্ট করলেন যে।' বললে অমলেন্দু। আর বলে কেমন এক চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

হুঁশ আসতে সটান ঘরে ফিরে গেল বাসনা। সাদা ধবধবে থানের একটা পাশের একটি জায়গা লাল হয়ে গেছে। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বাসনার বুক কাঁপছিল। শাড়িটা লুকিয়ে রেখে দিতে হয়েছে বাসনাকে, সকলের চোখের সামনে ওটা বের করতে পারে নি। পরে কখন যেন সবার আড়ালে লুকিয়ে কলঘরে নিয়ে গিয়ে কেচে এনেছে। রক্তটা তখন শুকিয়ে কেমন যেন দাগ ধরেছিল। আর বাসনার বিশ্রী লাগছিল চোখে সেই দাগ।

অমলেন্দু ঘটনাটা ভুলতে পারে নি। সন্ধ্যে বেলা দেখা হতে বললে, 'আপনি তো বড় ভীতু!'

'কেন?'

'তাই দেখলাম।'

'আপনিও বড় অসাবধানী।' পাল্টা জবাব দিলে বাসনা।

কিন্তু অমলেন্দুর চেয়েও বাসনা যে অনেক—অনেক বেশি অসাবধানী, একথা কি বাসনা জানতো?

টুক্ করে আলো জ্বলে উঠলো বাসনার ঘরে। চমকে উঠে বাসনা চাইল। অমলেন্দু নয়, কমলা।

বাসনার ফিট ছেড়েছে, জেগে শুয়ে আছে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কমলা পাশে এসে দাঁড়াল।

'কেমন আছো এখন, ছোড়দি?'

'ভালো।' নড়ে চড়ে পাশ ফিরলো বাসনা।

বিছানায় বসলে কমলা। বাসনার কপাল থেকে ক'টা চুল সরিয়ে, আর ভিজে চুলগুলো আঙুল দিয়ে ফাঁক করে দিতে দিতে বললে, 'খুব দুর্বল লাগছে, না!'

'একটু—!' অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল বাসনা।

'বীথি দুধ গরম করে আনছে, আর কিছু খাবে?'

'না।'

'সারা রাত খালি পেটে থাকবে দুর্বল শরীরে? কিছু সামান্য মুখে দাও।'

হাত নাড়ল বাসনা। না। বললে, 'খেলেই বমি হবে।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। কমলা বললে, 'তোমার শরীরটা কিছুদিন ধরে বড় ভেঙে পড়েছে, দিদি। কি হয়েছে তোমার কিছু বলো না। একটা রোগ-টোগ বাঁধালে নাকি।' একটু থেমে বললে আবার, 'তোমার কি হজম-টজম হচ্ছে না, অম্বল হয়?'

'কেন—?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। নিশ্চয় অম্বল-টম্বল হচ্ছে তোমার। চোরা অম্বল কী ওই রকম কিছু। পেট-টেট্ জ্বালা করে, বুক?'

বাসনা হঠাৎ যেন বড় বেশি চমকে উঠল। ফ্যাকাশে মুখে বললে, 'কে বললে তোকে। আমার কিছু হয়নি।'

'হয়নি হয়নি বলো, ওদিকে ফিট হলে এমনভাবে পেট গুটিয়ে হাত দিয়ে মুচড়ে থাকো, দেখলেই মনে হয় যন্ত্রণা পাচ্ছ খুব।' কমলা বোনের মুখের দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে আরও অন্তরঙ্গ সুরে বললে, 'এতো অত্যাচার তুমি করো। কথায় কথায় উপোস। অতো বেলায় খাওয়া। শরীরে সইবে কেন! ওরা বলছিল, পেটের জন্যেই এসব হচ্ছে। ঘা-টা হচ্ছে হয়তো কিছু, খুব যন্ত্রণা যখন হয় সহ্য করতে পার না, ফিট হয়ে পড়।'

'ওরা বলছিল বলেই তাই হবে!' বাসনা একটু রুক্ষস্বরে বললে।

'না হলেই ভালো। কাল একবার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই।'

'না।' কঠিন স্বরে বাধা দিলে বাসনা।

'কেন?' কমলা অবাক।

'অযথা আমি ডাক্তারই বা দেখাব

'কেন? মিছিমিছি আমাকে কতকগুলো ওষুধ-বিষুধ গেলাতে চাস্?'

'কি মুশকিল, তোমার কি হয়েছে সেটা তো জানতে হবে?'

'কিছু হয়নি আমার!'

'না হলে হঠাৎ ফিটের ব্যায়রাম ধরবে কেন?'

বাসনা চুপ। জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না।

॥ ২ ॥

পরের দিনই সুধাময় ডাক্তার এনে হাজির করলে। বাসনার মুখ গম্ভীর হলো। অদ্ভুত একটা ভয়ে তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু উপায় ছিল না কিছু। বাড়ির মধ্যে একটা বিশ্রী কান্ড করাও যায় না। বিছানায় এসে চাদর ঢাকা দিয়ে শুতেই হলো বাসনাকে সমস্ত উদ্বেগ, বিরক্তি, ভয় কোনোরকমে চাপা রেখে।

ডাক্তার মানুষটি ভালোই বলতে হবে। একবার বুক দেখলেন, পেট টিপলেন আলগা হাতে, চোখের তলা আর জিভ।

কি হয় ফিট! আর, কিছু না। যন্ত্রণা হয় বুকে? হয় না, ভালো। পেটে যন্ত্রণা? কি রকম যন্ত্রণা, জ্বালা করে, না কন কন করে—? করে না। একটু-আধটু চিনচিন। দ্যাটস্ নাথিং। আমাদের বাঙালী পরিবারের বিধবা মেয়েদের যা খাওয়া-দাওয়া, তাতে পেট চিনচিন বা একটু-আধটু ব্যথা, জ্বালা—ওসব করবেই। অন্য কোন রকম গোলমাল, কন্সটিপেশন, ব্যথা-মাথা? ভাববেন না। কিচ্ছু হয়নি। নো গালসার। নাথিং এলস্। শরীরটা দুর্বল। খাওয়া-দাওয়া, রেস্ট, অ্যাম্পল রেস্ট, মনের স্ফূর্তি। মাস খানেকের মধ্যে সব সেরে যাবে।

বাসনা বললে কমলাকে, 'কি, স্বস্তি হলো তো তোর। বলেছিলাম আগেই, কিছু হয়নি আমার।'

'তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যাকগে, এখন কিছুদিন তোমার অযথা গাধার খাটুনি আর পাঁজি খুঁজে খুঁজে রাজ্যের টপোস-টপোস একটু কমাও তো।'

'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো সারাদিন!' কি যে বলিস তুই, কমলা!'

'থাকলেই বা হাত-পা গুটিয়ে বসে। আমরা দুটো মেয়েমানুষ আছি বাড়িতে। ঝি-চাকর আছে।'

'তা আছে। তবু—!'

'দেখো ছোড়দি, আগে শরীর, তারপর সংসার ধর্ম!' কমলা বললে গম্ভীর মুখে।

বাসনা হাসল। বললে, 'চুপচাপ শুয়ে থাকলে আমি মরে যাবো।'

'তা যাও।' কমলা অক্লেশে বললে।

সেদিনই সন্ধ্যের পর ছাদে পায়চারি করছিল বাসনা। বেশ হাওয়া। ফুরফুর করে বয়ে যাচ্ছে। একটু চাঁদ উঠে এসেছে এরই মধ্যে। একরাশ তারা জ্বলজ্বল করছে। এ-বাড়ি থেকে ট্রাম দেখা যায় না, তার শব্দটা শোনা যায়। আরও কতো বিচিত্র শব্দ। কেউ গলা সাধছে, কারুর বাড়িতে রেডিও বাজছে। একটা ট্যাক্সি হর্ন বাজিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, রিক্শা যাচ্ছে ঠুং-ঠুং। তাড়া খেয়ে একটা কুকুর কেঁউ কেঁউ করে পালাল।

বাসনা আলসের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ সব শুনছিল। তার চোখে এই সব বিচিত্র ছেঁড়া খোঁড়া নক্সা ভেসে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ চোখের সামনে সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় যেন কাকে দেখে চমকে উঠল বাসনা। অমলেন্দু।

এগিয়ে এসে অমলেন্দু বললে, 'আপনি ছাদে? কি আশ্চর্য!'

বাসনা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'পড়ানো হয়ে গেল?' চোখ নামিয়ে বললে বাসনা মৃদু গলায়।

'কই আর। বীথি ফেরেনি এখনো বন্ধুর বাড়ি থেকে।'

একটু চুপ। অমলেন্দুই বললে তারপর, 'আজ বেশ ভালোই আছেন তাহলে। শুনলাম ডাক্তারও এসেছিলেন।'

'কিছু হয়নি আমার।' হঠাৎ কেমন যেন অযথা জোর দিয়ে বললে বাসনা কথাটা, অহেতু।

'হয়তো হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ!'

'কেন?'

'যা সব লক্ষণ দেখছি!' অমলেন্দু একটু হাসল।

সমস্ত শরীরটা বিশ্রী এক ভয়ে শিউরে উঠে কাঁটা দিলে। বাসনা চুপ।

'লক্ষণ' শব্দটা কানের কাছে বাজছে তখনও।

'আমি নীচে যাচ্ছি।' বাসনা বললে হঠাৎ, অস্বাভাবিক রুক্ষস্বরে।

'নীচে কেন, এই তো বেশ ফাঁকায় ছিলেন।' সরলভাবে বললে অমলেন্দু খানিক অবাক হয়েই।

'ভালো লাগছে না।' বাসনা কীভাবে যে বললে জড়িয়ে মিশিয়ে, অমলেন্দু হয়তো বুঝতেই পারল না পরিষ্কার করে।

অমলেন্দুর একটু ভয়ই হলো। হঠাৎ শরীর খারাপ হলো নাকি আবার। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে যদি আবার মাথা ঘুরে টলে পড়ে বাসনা। পিছন পিছন এলো অমলেন্দু।

না, বাসনা মাথা ঘুরে পড়ল না, দোতলায় নেমে সটান ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অমলেন্দু অবাক হচ্ছিল। অদ্ভুত মেয়ে এই বাসনা। যেন কিসের এক ঘোরে রয়েছে। কোন স্ফূর্তি নেই আচার-ব্যবহারে। কেমন যেন!

রাত্রে আর ঘুম আসছিল না বাসনার। জানলা খোলা, চাঁদের আলো এসে খাটের পায়ের কাছে পড়েছে। হাওয়াও দিচ্ছে, ফ্যানটাও চলছে আস্তে, তবু কেমন এক গুমোট, অস্বস্তি বাসনার। পেটের সেই ব্যথাটা আবার কনকন করে উঠেছে। কেমন যেন গা বমি-বমি করছে। খানিকটা বাতাস গলার মধ্যে এসে পুঁটলি পাকিয়ে রয়েছে। আর কোমর থেকে পা দুটো যেন টাটিয়ে উঠেছে।

বিছানার মধ্যে ছটফট করছিল বাসনা। এ-পাশ ও-পাশ। দু-দুটো বালিশ পেটের মধ্যে চেপে ধরেছিল।

আবার জল খেয়ে বমি-বমি ভাবটা অনেক কষ্টে চাপল বাসনা।

আর, এইবার, এই অন্ধকারে, একা—বাসনা তার মনের লুকনো ঝাঁপি থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে কী যেন তুলে নিল। হ্যাঁ, তুলে নিল আর তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখল।

সন্দেহটা চাপা পড়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে। অন্তত মন থেকে সারা বেলাটা সেই বিশ্রী সন্দেহ ও সরাতে পেরেছিল ডাক্তার দেখে যাবার পর। যদিও বাসনা জানতো এবং বিশ্বাস করেনি, এখন, এই সময় ডাক্তার কিছু বুঝতে পারবে। এসব ক্ষেত্রে প্রথমটায় কিছু বোঝা মুশকিল অন্যের। তবু ভয় ছিল বৈকি বাসনার। কারণ তার এই অভিজ্ঞতা প্রথম। যাক, সে

ভয় তখন কোনো রকমে পার হয়ে গেছে ও।

কিন্তু নিজের কাছে ফাঁকি দেওয়া কঠিন, বড় কঠিন। আরও কঠিন মনে হচ্ছে এখন, অমলেন্দুর সেই কুৎসিত হাসি-জড়ানো কথাটা শোনার পরঃ 'যা সব লক্ষণ দেখছি!'

অমলেন্দু কি কিছু বুঝতে পেরেছে নাকি?

বাসনা একটু একটু করে এবং তন্ন তন্ন করে সমস্ত মন হাতড়ানোর পর এক জায়গায়, একটি বিশেষ দিনে এসে হঠাৎ হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু এই একটি দিনের হিসেবে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। বাসনা তার বৈধব্য জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে খুঁজে পায়, প্রত্যেকটি রাত্রিকে এবং সেই সব মুহূর্ত ও রাত্রির শুচিতা সম্পর্কে ও নিঃসন্দেহ। কোনও কলঙ্ক এই দীর্ঘ দিনের কোথাও স্পর্শ করেনি। শুধু একটি দিন.........

বাসনা সেই দিনটিকে মনে করতে পারছে। তখন অমলেন্দু এ-বাড়িতে। বীথি ছিল না সেদিন। তার কাকার বাড়ি গিয়েছিল বালিগঞ্জে। তখন কত রাত হবে? বোধ হয় বারোটা বেজে গিয়েছিল। ঘুম আসছিল না বাসনার। সাধারণ একটা ব্যথা সেবারে যেন একটু বেশিই কষ্ট দিচ্ছিল। যদিও তখন তা হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তবু। মাথাটাও ধরেছিল এবং বাঁ বুকের তলায় খানিকটা জায়গা জুড়ে টনটনে ব্যথা আর ফোলা। বাসনা ঘুমোতে পারছিল না, যন্ত্রণায়, কষ্টে। হ্যাঁ, আর এই অস্বস্তি কাটাবার জন্যে বাইরে এসেছিল বাসনা। ফাঁকা উঠোনের বেঞ্চিতে এসে বসেছিল খানিকক্ষণ ঠান্ডা হাওয়ায়। হঠাৎ একটা ছায়া দেখে চমকে উঠল বাসনা। মুখ তুলে দেখে, অমলেন্দু।

'কি ব্যাপার, এতো রাত পর্যন্ত বাইরে বসে আছেন?' অমলেন্দু প্রশ্ন করলে।

'বড় মাথা ধরেছে।' অস্ফুট স্বরে বললে বাসনা, যন্ত্রণায় তার স্বর বুঝি-বা অন্য রকম শোনাচ্ছিল। মুখটাও বিকৃত হয়েছিল বা।

'কষ্ট হচ্ছে খুব।'

'হ্যাঁ।'

কী ভাবলে অমলেন্দু। বললে, 'আচ্ছা. দাঁড়ান আনছি।'

'কি?'

'চমৎকার একটা ওষুধ। এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বেন, ব্যথা-ট্যথা আর বুঝতেই পারবেন না।'

'ওষুধ?'

'হ্যাঁ, আমারও ওই রোগ আছে কি না। মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে রাত্রে আর ঘুম আসে না কিছুতেই। তখন খেয়ে নি।'

অমলেন্দু আর দাঁড়াল না। চলে গেল। বাসনা ভাবলে, ভালোই হলো। একটু ঘুমিয়ে বাঁচবে তবু।

অমলেন্দু এল ঘর থেকে। হাতে কাঁচের গ্লাস। বললে, 'নিন, খেয়ে ফেলুন।'

বাসনা খেয়ে ফেলল ঢক্ করে। কেমন এক কটু স্বাদ। নাক-মুখ কুঁচকে বললে, 'ইস্!'

'কষ্টটা লাগছে?'

'লাগছে বৈকি!'

'আর একটু জল খেয়ে নিন তবে।'

বাসনা ঘরে এল জল খেতে।

জল খেয়ে বিছানায় বসলে বাসনা। কী ওষুধই যে খাওয়ালে। গলার কাছটায় এখনো বিশ্রী লাগছে।

বিছানার ওপর একটু এ-পাশ ও-পাশ করলে বাসনা। অপেক্ষা করলে যেন ঘুমের। আর হ্যাঁ খানিক পরে তন্দ্রা আসছিল, ঝিমুনি ধরছিল।

তারপর কখন যে অসাড়ে ঘুম এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল বাসনা বুঝতেই পারল না। কোন সাড় ছিল না, সামান্য মাত্র সম্বিৎ। অচেতন একটা বস্তুর মতন পড়ে ছিল বাসনা সারা রাত।

গভীর ঘুমের অতল অজ্ঞানতা থেকে জেগে উঠে বাসনা যখন চোখ মেলল, দেখে দরজা খোলা, রোদ এসে ঘর ভরে গেছে।

ইস্, দরজাটা বন্ধ করতে পর্যন্ত খেয়াল ছিল না। কী অকাতরেই ঘুমিয়েছে সারা রাত।

আজ, সেই রাত্রের কথা ভাবতে গিয়ে বাসনা এখন নিথর হয়ে গেল। সত্যি, তার কোন জ্ঞান ছিল না শুধু সেই ক'টি ঘণ্টা। আর দরজাও খোলা ছিল। কেউ যদি এসে বাসনাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যেত, তবু জানতে পারত না সে।

জীবনে সেই একবার অসতর্ক হয়ে পড়েছিল বাসনা, স্বেচ্ছায় নয় তবু। অনিচ্ছায়, সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতে। আর সেই অসতর্কতার, ক্ষণিক মৃত্যুর সুযোগ নিয়েছে, যদি কেউ নিয়ে থাকে, তবে ওই সমলেন্দু।

শয়তান, শয়তান কোথাকার! পশু! ঘিন ঘিন করে ওঠে বাসনার। এতো নোংরা, কদর্য হবে ওই বোকা বোকা মানুষটা কে ভেবেছিল। মনে মনে তার এমন হীন পাশবিক অভিসন্ধি থাকবে, কে জানতো!

আর ঈশ্বর, ঈশ্বর কী নিষ্ঠুর, বাসনার ক'টি মুহূর্তের অসতর্কতাও ক্ষমা করতে পারলেন না। করলেন না। কলঙ্কের একটি কীট দংশন করে চলে গেল। বিষ মিশে গেল রক্তে। বাসনার শিরা-উপশিরায় সেই বিষ আজ ছড়িয়ে পড়েছে। চেতনাতেও।

কাঁদছিল বাসনা। গুমরে গুমরে। ফুঁপিয়ে, ছেলেমানুষের মতন।

সকালে চোখ খুলতেই বাসনা দেখল সমস্ত আকাশ ধুয়ে স্বচ্ছ রোদ নেমে এসেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠল বাসনা। ভালোই লাগছিল মনটা। বাইরে ক'টা কাক ডাকছে। চড়ুই এসে বসেছে জানলায়। শরতের হাওয়া দিয়েছে।

নিয়মিত অভ্যাস। ঘুম-চোখের কোল মুছে ধীরে ধীরে বাসনা এসে দাঁড়াল টেবিলটার কাছে। থানের আঁচলটা গলায় জড়িয়ে চোখ তুলল। স্বামী। মুখে তাঁর স্মিত হাসি। প্রাণ নেই, ছবি হয়ে আছেন। এই ছবিতে তবু প্রাণ আছে কোথাও। বাসনা সেই প্রাণকে অনুভব করে। সমস্ত শূন্যতা তাতে ভরে যায়; এতোকাল গেছে।

আজ আর গলায় কাপড় জড়িয়ে দুহাত জোড় করে প্রণাম করেও. সাধ মিটছিল না। বাসনা ডান হাতটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ছবিটা তুলে নিচ্ছিল দেওয়ালের পেরেক থেকে। মাথায় ঠেকাবে, বুকে ধরবে, মুখের কাছে, ঠোঁটে ছুঁইয়ে নেবে। গভীর করে স্পর্শ করবে। আবার। আজ।

খুলে নিয়েছে সবে, হঠাৎ মুখের ওপর ফট্ করে কী যেন ছিটকে পড়ল। পড়েই হাতে শির-শির করে, কিলবিল করে আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

বাসনা চমকে উঠে হাত ঝেড়ে বুঝি টিক্‌টিকিটাকে ফেলতে গিয়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঝন্‌-ন্‌ করে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ। শব্দটা যেন সমস্ত স্নায়ুতে বেজে বেজে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাসনা দেখল, শরতের সেই আশ্চর্য নীল মেঘ-গলানো সোনার মত স্বচ্ছ রোদ্দুরে তার স্বামী, স্বামীর ছবি পাপোষের ওপর অসাড়ের মত পড়ে রয়েছে। কাঁচ ভাঙা ছড়িয়ে গেছে ঘরের চারপাশে।

॥ ৩ ॥

একটা সন্দেহ যদিও কাঁটার মত খচখচ করছিল সর্বক্ষণ, তবু নিঃসন্দেহ হতে পারেনি বাসনা। অন্তত চায়নি। মাঝে মাঝে ও ভাবত, ভাবতে চাইত, এ-সন্দেহ মিথ্যে হয়ে যাবে। মনে মনে রোজই ভগবানকে ও জানাত; বলতোঃ বাঁচাও ভগবান, এই কলঙ্ক থেকে, এতো বড় গ্লানি থেকে।

আর আশ্চর্য, যখন জোর করে ভাবত, ওর মনের ভার খানিকটা হাল্কা হতো। অবিশ্বাস করার মতন কারণও কিছু কম ছিল না। হয়তো বেশিই ছিল। সেই সব একে একে সাজিয়ে, বিচার বিবেচনা করে দেখলে বাসনা উদ্বিগ্ন হওয়ার মতন সত্যিই কোনো কারণ খুঁজে পেত না। সমস্ত বিষয়টাই ওর কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো। আবার যখন সম্ভাবনার সূত্র দিয়ে বিচার করতো তখন এমন কতকগুলো স্থূল স্পষ্ট কারণ দেখতে পেত, যাতে সন্দেহ আরও গভীর হওয়াই স্বাভাবিক। তবু সমস্ত ব্যাপারটাই যখন সন্দেহ এবং সম্ভাবনা, হয়তো আর হয়তো-নার মধ্যে দুলছে তখন আশা-নিরাশা, হ্যাঁ-না এই দুইয়ের টানা পোড়েনের মধ্যে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকা ছাড়া পথ ছিল না। আর বাসনা, যা স্বাভাবিক, এই মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্যে শুধু সময়ের মুখ চেয়ে বসেছিল। আরও কিছু সময়, ক্যালেণ্ডারের লাল কালো তারিখ পুরনো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিছুই যেন নিশ্চিত হয়ে উঠছে না।

সংসারের কাজে অকাজে এই সময় নিজেকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখতে চাইত বাসনা। একা থাকতে, একা বসতে, চুপচাপ শুয়ে সময় কাটাতে ওর ভয় হতো। নিঃসংগ এবং নিষ্কর্ম হলেই মন শুধু ওই এক অপ্রতিরোধ্য আবর্তে এসে পড়তো। কাজের মধ্যে তবু যতটুকু ভুলে থাকা যায়। যদিও বাসনা দেখত, ও চিন্তা সরাবার নয়, ধিকি ধিকি জ্বলছে সর্বক্ষণই।

তা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। কমলার চোখকে ফাঁকি দেওয়া। সারাদিন বিছানায় গড়াগড়ি করলে বা আর আর যে-সব উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, সেগুলো প্রকাশ করলে যদি কমলা কিছু সন্দেহ করে বসে, তবে?

অথচ সামনাসামনি, মুখোমুখি বসে থাকলেও বোনের কাছে সব সময় যেন নিজেকে আড়াল দিয়ে রাখতো বাসনা। এমন কি বীথির কাছেও। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ চুরি করে ওদের কথা শুনত, ওদের চোখ মুখ দেখত, বোঝবার চেষ্টা করত কমলা বা বীথি ওকে নিয়ে কোনো সন্দিগ্ধ আলোচনা করছে কি না!

বাসনার অকারণ শরীর পাত সংসারের জন্যে কমলার ভাল লাগত না। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছিল, খাওয়া দাওয়ার যত্ন নিতে। বাসনা তা গ্রাহ্যও করলে না, এতে কমলা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বোনে বোনে এই নিয়ে কয়েকবার রাগারাগি, মান অভিমানের পালা সাঙ্গ হয়েছে, তবু বাসনাকে সংসারের ঘানি-টানা থেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি কমলা। হতাশ হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে, আর কিছু বলে না। বলবে না, ঠিক করেছে।

আরও যতো সময়ের অপেক্ষায় বাসনা ব্যাকুল হয়ে দিন গুনছিল, তেমন সময় এলো গেলো। আরও দিন, আরও সময় কী সহজেই এসে শরতের রোদে জলে আকাশে মিলে গেল, হারিয়ে গেল। যদি বা আশা ছিল, কিছু না-র হিসেবে—একে একে শুকনো পাতার মত সব ঝরে গেল। বাসনা এইবার, হয়তো এই প্রথম, নিরন্ধ্র এক ভয়ানক অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

বাসনা এবার বেশ বুঝতে পারছিল, অনুভব করতে পারছিল একটা ভার আর যন্ত্রণা পেটের তলায় নেমে এসেছে। উবু হয়ে বসতে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণায় যেন মনে হয় কতকগুলো শিরা ছিঁড়ে যাবে।

যদি বিষ জুটতো, তাই বুঝি খায় এখন—ভাবত বাসনা। এও ভেবে দেখত, মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। কিন্তু বাসনা দেখেছে, সব কলঙ্ক মৃত্যু দিয়ে ঢাকা যায় না। বাসনা যদি মরেও যায়, তবু কেউ কিছু জানতে পারবে না, জানবে না—তা নাও হতে পারে। যেমন যায়নি মাধবী বৌদির। মাধবী বৌদি তবু তো কতো আগেই বিষ খেয়েছিল। মারা গেল বটে, কিন্তু কলঙ্কটা রটে গেল সর্বত্র। পরেই।

মৃত্যু চিন্তাকে খুব একটা লোভনীয় বলে মনে হলো না বাসনার। বরং অন্য কোনো পথ......

একদিন মনে মনে যখন এই পথের কথাই ভাবছে বাসনা, এক ম্লান বিকেলে, বীথি এসে বসল কাছে।

'চুলটা বেঁধে দাও তো, ছোড়দি।'

চুল বাঁধতে বসে বললে বীথি, দাঁতে ফিতে চেপে, 'একটা নতুন রকম বিনুনী বাঁধোতো দেখি, কী রোজ একঘেয়ে চুল বাঁধা তোমার!'

'আমি কি ফ্যাসান ট্যাসান জানি, কি করে বাঁধবো বল!'

'বা ,তা বুঝি আমি বলবো!'

'তা কি আমি জানবো!'

যত্ন করে নতুন রকমের এক বিনুনী জড়াতে জড়াতে বাসনা বললে, 'হঠাৎ নতুন বিনুনী বাঁধার এতো ঘটা কেন!'

'বা, যাবো যে এক জায়গায়।'

'কোথায়!'

'জানো না তুমি।' বীথি ঘাড় ঘোরাবার চেষ্টা করলে, 'থিয়েটার দেখতে।'

'নাকি, কমলাও যাবে?'

'না। আমি আর—' আর যে কে সে-কথাটা বীথি স্পষ্ট না বলে থেমে গেল।

বিনুনী জড়াতে গিয়ে আঙ্গুলগুলো হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো। বীথির গা নাড়াতে চমকে উঠে আবার আঙ্গুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো বাসনার। 'আমায় নিয়ে যাবি!' একটু হেসে বললে বাসনা।

'তুমি!' বীথির অবাক গলার সুর শোনা গেল।

'কেন, আমি যেতে পারি না!'

'বাব্বা, তুমি যাবে বাড়ির বাইরে তাও বেড়াতে, থিয়েটার-সিনেমা দেখতে!' এর চেয়ে যদি বলতে ভর সন্ধেয় গঙ্গায় চান করতে যাবে—' বীথি হাসল।

'অতো কথা কেন, বলছি যাবো। নিয়ে যেতে চাস তো বল্।'

'আজকে তো হয় না ছোড়দি। টিকিট মাত্র দুটো।'

'তোর আর অমলেন্দুর।' ঠোঁটে বেঁকান হাসি বাসনার।

বীথি জবাব দিল না।

'ভয় নেই, তোর মুখের খাবার আমি কেড়ে খাচ্ছি না।'

কথাটা এমন বিশ্রী আর নোংরা নোংরা শোনাল যে, বীথি মাথা টেনে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে চাইল বাসনার দিকে। আর তাকিয়ে অবাক হলো। বাসনার অমন সুন্দর ধবধবে মুখে চামড়া কুঁচকে কেমন এক কালিমা লেগেছে। বীথির কাছে এই দুইই অপ্রত্যাশিত। অমন ইতর রসিকতা ছোড়দি করতে পারে, এও যেমন ভাবা যায় না, তেমনি হঠাৎ অকারণে এতো রাগ, এমন বিশ্রী মুখ চোখ হতে পারে বীথি ভাবতে পারে না।

চুপ করে থাকাই হয়তো উচিত ছিল বীথির। কিন্তু অবস্থাটা হঠাৎ এমন গুমোট আর বিশ্রী হয়ে উঠেছিল যে, কথা না বলেও থাকতে পারছিল না বীথি।

'হঠাৎ তোমার রাগের কি হলো, ছোড়দি!' বীথি শুধলো।

'রাগটাগ আমার হয়নি। ঘুরে বসো। চুলটা শেষ করে দি।'

বীথি ঘুরে বসল না। বললে, 'থাক। ওটুকু আমি ঠিক করে নিতে পারবো। কিন্তু কি হয়েছে তোমার, শরীর খারাপ!'

'না।'

'তবে?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে বাসনা উঠলো।

'আমার টিকিটটা নিয়ে তুমিই যাও তবে।' বীথি বললে, 'আমি বলে দেবো অমলদাকে।'

'তোমার টিকিট না নিয়েও আমি যেতে পারি, বীথি। আর তোমার অমলদার সঙ্গেই।' বাসনা আর দাঁড়াতে পারছিল না বীথির মুখোমুখি। জানলার কাছে সরে গিয়ে কঠিন হাতে গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়াল।

বীথি চলে গেল আরও খানিক দাঁড়িয়ে থেকে।

আর সেই ম্লান বিকেল ঘন হয়ে যখন জলকালি অন্ধকার নামছিল, বাসনা তখন ভাবছিল, বীথির অতো কৃপণতা এবং গর্ব সে এক নিমেষেই ছিনিয়ে নিতে পারে। হ্যাঁ, পারে। অমলেন্দুকে একটু ইশারা করলে কুকুরের মতন তার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। বাসনা জানে। আর এও জানে বাসনা—তার চোখ, মুখ, চুল, হাত, শরীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আজও যতো সুন্দর, এতো সৌন্দর্যের ছিটে ফোঁটাও বীথির সমস্ত শরীরের কোথাও লুকিয়ে নেই। অমলেন্দুর চোখে বীথি একটা বিস্বাদ অভ্যাস। আর বাসনা এক দুরন্ত লোভ।

হঠাৎ বাসনার মনে হলো, অমলেন্দুকে এ-সময় তার চাই। হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে। এই লোকটাকে তার আজ সত্যি সত্যিই প্রয়োজন। একা বাসনা এই নির্যাতন সইবে কেন, অমলেন্দুকেও পাশে থাকতে হবে, আসতে হবে, তার দায়িত্ব তাকেও বইতে হবে।

বাসনা ঠিক করে ফেলল, আজ, আজই অমলেন্দু এলে ও তাকে ডেকে পাঠাবে, এই ঘরে। (ক্রমশ)

আইন-ব্যবসায়ী গান্ধীজী

অমূল্যরতন গুপ্ত

গান্ধীজী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় ত পাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, আইনের তিনি কিছুই শেখেন নাই। তিনি প্রথমে বোম্বাইয়ে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেখানে কোন সুবিধা না হওয়ায় রাজকোটে আসিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে রাজকোটে তাঁহার কিছু পশার হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাও আশানুরূপ নহে। এইভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে আবদুল্লা শেঠ নামে দক্ষিণ আফ্রিকার এক মুসলমান ব্যবসায়ীর একটি জটিল মামলা পরিচালনার জন্য গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। শেঠের সঙ্গে চুক্তি হয় যে, গান্ধীজী এক বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিবেন। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহাকে বিশ বৎসরকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে হয়। এই বিশ বৎসর কালই গান্ধীজীর আইন-ব্যবসায়ীর জীবন।

আইন ব্যবসায় পরিচালনায় গান্ধীজীর কয়েকটি মূল সূত্র ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান সূত্রটি ছিল এই যে, তিনি কেবলমাত্র ন্যায়ের পক্ষই সমর্থন করিবেন; অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি কোনও মামলা পরিচালনা করিবেন না। দ্বিতীয় সূত্রটি এই যে, বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে যাহাতে আদালতের বাহিরে আপসে বিবাদ মীমাংসা হইয়া যায়, তিনি সর্বদা সেই চেষ্টা করিবেন। ইহাতে আইন-ব্যবসায়ীর আর্থিক ক্ষতি হইলেও বিবদমান পক্ষদ্বয়ের অনেক অনাবশ্যক খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং তাহাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য বজায় থাকিবে।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিয়া অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আবদুল্লা শেঠের মামলার বিষয় বুঝিয়া লইলেন। মামলায় অপর পক্ষ তৈয়ব শেঠ ছিলেন আবদুল্লা শেঠের নিকট আত্মীয়; প্রায় চল্লিশ হাজার পাউন্ড (ছয় লক্ষ টাকা) দাবীর মামলা। মামলার বিষয় বুঝিয়া লইয়া গান্ধীজী আবদুল্লা শেঠের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি অপর পক্ষের সহিত আলাপ করিয়া এই মামলা আপসে মিটাইবার চেষ্টা করিবেন। আবদুল্লা শেঠ গান্ধীজীকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তৈয়ব শেঠ সহজে কোনও মীমাংসা মানিয়া লইবার লোক নহেন; তবে আপসে যদি মামলা মিটিয়া যায়, আবদুল্লা শেঠের নিজের কোনও আপত্তি নাই। গান্ধীজী মামলার কাগজপত্র দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহার মক্কেলের কেস খুব জোরালো এবং আইন তাঁহাকেই সমর্থন করিবে; কিন্তু মামলা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিবে এবং খরচ জোগাইতে উভয় পক্ষই সর্বস্বান্ত হইবেন। তাই তিনি অপরপক্ষ তৈয়ব শেঠের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে আপসে মামলা মিটাইবার পরামর্শ দিলেন। গান্ধীজী প্রস্তাব করিলেন যে, উভয় পক্ষের বিশ্বাস-ভাজন একজন সালিশের হাতে মামলা নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হউক; তাঁহার বিচার উভয় পক্ষই মানিয়া লইবেন। আবদুল্লা শেঠ পূর্ব হইতেই রাজি ছিলেন; তৈয়ব শেঠও রাজি হইলেন। একজন সালিশ নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার বিচারে আবদুল্লা শেঠ জয়ী হইলেন। স্থির হইল যে, তৈয়ব শেঠ আবদুল্লা শেঠকে সাঁইত্রিশ হাজার পাউন্ড দিবেন; কিন্তু মুশকিল হইল এই যে, তৈয়ব শেঠের পক্ষে এক-সঙ্গে অত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। এবারেও গান্ধীজী আপসে মীমাংসার চেষ্টা করিলেন এবং স্থির হইল যে, তৈয়ব শেঠ কিস্তিবন্দিমতে টাকা পরিশোধ করিবেন। দুই আত্মীয়ের ছিন্ন সৌহার্দ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। গান্ধীজী অন্তরে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে হইল যে তিনি সত্যকার ওকালতি শিখিলেন; তিনি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিতে এবং মানবচরিত্রের উৎকৃষ্ট দিক দেখিতে শিখিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিবদমান দুই পক্ষের ভিতরের বিচ্ছেদ দূর করাই আইন ব্যবসায়ীর প্রকৃত কাজ। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় বিশ বৎসর আইন-ব্যবসায় করেন; এবং তাঁহার অধিকাংশ মামলাতেই তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে আপসেই মিটমাট করিতে সফল হইয়াছেন। গান্ধীজীর নিজের ধারণা ইহার ফলে আইন-ব্যবসায় করিয়াও তাঁহাকে তাঁহার আত্মা বিক্রয় করিতে হয় নাই, এমন কি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয় নাই।

ছাত্রাবস্থায় আইন পড়িবার সময় গান্ধীজী শুনিয়াছিলেন যে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে আইন-ব্যবসায় চালান যায় না। কিন্তু মিথ্যা দ্বারা অর্থ বা প্রতিপত্তি অর্জনের স্পৃহা কোনকালেই তাঁহার ছিল না; সুতরাং ছাত্রাবস্থায় শোনা

...ই কথা তাঁহার মনে কোনরূপ প্রভাব ...স্তার করিতে পারে নাই। আইন-...্যবসায়ে গান্ধীজী কথনও মিথ্যার প্রয়োগ ...রেন নাই; অনেক সময়ে চক্ষুর সম্মুখে ...বরুদ্ধ পক্ষ ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলিয়া ...গয়াছে, তিনি তাঁহার মক্কেল বা সাক্ষী-...দগকে সামান্য একটু মিথ্যা বলিতে ...ৎসাহিত করিলেই মামলায় জয় হয়; ...কন্তু গান্ধীজী তাহা কখনই করেন নাই। ...াঁহার মনের ভাব সর্বদা এই ছিল যে, ...মলা যদি সত্য হয় তাহা হইলেই যেন ...াঁহার মক্কেল জেতে, মিথ্যা মামলায় যেন হার হয়। তাঁহার মক্কেলরাও গান্ধীজীর মনোভাব জানিতেন; তাই তাঁহারা কখনও কোন মিথ্যা মামলা তাঁহার কাছে আনিতেন না। মক্কেলদিগকে তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিতেন যে, মিথ্যা মামলা লইয়া তাঁহারা যেন তাঁহার নিকট আসে না; সাক্ষীদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া লইতে তিনি পারিবেন না ইহার ফলে এমন নিয়ম দাঁড়াইল যে, মক্কেলরা মামলা সত্য হইলে তাঁহার নিকট আসিতেন এবং মিথ্যা হইলে অপরের নিকট যাইতেন।

একবার একটি মামলায় জিতিবার পরে গান্ধীজীর মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার মক্কেল মিথ্যা মামলা দিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে; তিনি মনে মনে অতিশয় আহত হইয়াছিলেন। আর একবার কোর্টে মামলা চলিবার কালেই গান্ধীজী বুঝিতে পারেন যে, মক্কেল তাঁহাকে মিথ্যা মামলা দিয়া ঠকাইয়াছে; তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারককে তাঁহার মক্কেলের বিরুদ্ধে রায় দিতে অনুরোধ করিলেন। গান্ধীজীর আচরণে প্রতিপক্ষের উকীল বিস্মিত হইলেন এবং বিচারক সন্তুষ্ট হইলেন; এমন কি তাঁহার মক্কেলও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গান্ধীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল; মামলায় হারিয়া তাহার মনে কোনরূপ ক্ষোভ রহিল না।

গান্ধীজী তাঁহার "আত্মজীবনী"তে মামলা পরিচালনায় সত্যনিষ্ঠার দুইটি স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম মামলাটি ছিল গান্ধীজীর একজন ধনী মক্কেলের; ইনি গান্ধীজীকে দিয়া অনেক মামলা করাইতেন। এই মামলাটিতে অত্যন্ত জটিল হিসাবের ব্যাপার ছিল এবং অনেক দিন হইতেই বিভিন্ন আদালতে ইহার শুনানী চলিতেছিল। ইহার হিসাব সম্বন্ধীয় অংশ সালিশীর জন্য একজন খ্যাতনামা হিসাব পরীক্ষকের উপর ভার দেওয়া হয়। সালিশের রায় গান্ধীজীর মক্কেলের অনুকূলেই ছিল; কিন্তু সালিশের হিসাবে একটি ক্ষুদ্র অথচ মারাত্মক ভুল দেখা গেল। অসতর্কতা-বশত হিসাব পরীক্ষক খরচের দিকের একটি অঙ্ক জমার দিকে ধরিয়াছেন।

বিরুদ্ধ পক্ষ এই ভুল ধরিতে পারে নাই; কিন্তু অন্য কারণ দেখাইয়া সালিশের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। গান্ধীজী প্রথমাবধি নিম্ন আদালত-সমূহে এই মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন; সুপ্রীম কোর্টের মামলায় তিনি একজন খ্যাতনামা ইংরেজ ব্যারিস্টারের জুনিয়ার রূপে নিযুক্ত হইলেন। গান্ধীজীর অভিমত এই যে, সুপ্রীম কোর্টে শুনানির সময় তাঁহাদের পক্ষ হইতে সালিশের এই ভুল স্বীকার করা কর্তব্য; কিন্তু সিনিয়ার ব্যারিস্টার গান্ধীজীর সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মত এই যে, বিরুদ্ধ পক্ষের সুবিধা হয় এমন কোন ভুল কোর্টে স্বীকার করিতে তাঁহাদের মক্কেল বাধ্য নন—তাহাতে মক্কেলের ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ গান্ধীজী সিনিয়ারের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না; তিনি সিনিয়ারকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তাঁহারা স্বীকার না করিলেও বিচারক নিজেই এই ভুল ধরিয়া ফেলিতে পারেন এবং সালিশের রায় নাকচ করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং ভুল স্বীকার করাই কর্তব্য; মক্কেলও গান্ধীজীর সহিত একমত হইলেন। সিনিয়র ব্যারিস্টার ভুল স্বীকার করিবার শর্তে মামলা পরিচালনা করিতে অসম্মত হইলেন। তখন গান্ধীজীকে একাই মামলা চালাইবার ভার লইতে হইল; মক্কেল সাহসের সহিত বলিলেন—"ভগবান ন্যায়ের পক্ষে আছেন।"

যথাসময়ে সুপ্রীম কোর্টে মামলা উঠিল। গান্ধীজী প্রথমেই সালিশের ভুলের উল্লেখ করিলেন। বিচারকদিগের মধ্যে একজন মনে করিলেন যে, গান্ধীজী মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়া অসাধুতা করিতেছেন; মক্কেলের অসুবিধা হইতে পারে ইহা বুঝিয়াও যে কোন আইন-ব্যবসায়ী এইভাবে সালিশের ভুল আদালতে প্রদর্শন করিতে পারেন ইহা বিচারকের ধারণার অতীত। বিচারকের সহিত গান্ধীজীর কিছুটা কথা কাটাকাটি হইল; কিন্তু ক্রমশ বিচারকগণ গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠা বুঝিতে পারিয়া মনোযোগ সহকারে তাঁহার বক্তব্য শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, সালিশের হিসাবের ভুলটি অনবধানতাবশতই হইয়াছে; সুতরাং এই ভুলটি সংশোধন

করিয়া সালিশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষেই সুপ্রীম কোর্ট রায় দিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিয়া যাহা কিছু বলিলেন বিচারকগণ তাহা কিছুই মানিলেন না। সত্যনিষ্ঠ গান্ধীজীরই জয় হইল, সত্যকে ত্যাগ না করিয়াও আইন-ব্যবসায় করা যায়—গান্ধীজীর এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

দ্বিতীয়টি ঠিক মামলা নহে; কিন্তু মামলা এবং কারাদণ্ডের সম্ভাবনা হইতে কিরূপে গান্ধীজী তাঁহার এক মক্কেলকে সত্যনিষ্ঠার সাহায্যে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহারই কাহিনী। দক্ষিণ আফ্রিকার জনসেবার কাজে রুস্তমজী নামক একজন পার্শী ভদ্রলোক গান্ধীজীর সহকর্মী ছিলেন; তিনি পরে গান্ধীজীর মক্কেলও হন। রুস্তমজী ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী; ভারতবর্ষ হইতে তিনি নানা মাল আমদানী করিতেন এবং প্রায়ই শুল্ক ফাঁকি দিবার জন্য নানারূপ অসাধুতা অবলম্বন করিতেন। রুস্তমজী নিজের অনেক কথাই গান্ধীজীর নিকট বলিতেন, কিন্তু শুল্ক ফাঁকি দিবার কথা কখনও বলেন নাই।

একবার রুস্তমজী বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার শুল্কচুরি ধরা পড়িয়া গেল এবং ইহাতে তাঁহার জেল পর্যন্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গান্ধীজীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সকল অপরাধ গান্ধীজীর নিকট অকপটে স্বীকার করিলেন। তিনি অনুরোধ করিলেন যে, গান্ধীজী যেন তাঁহাকে রক্ষা করেন। গান্ধীজী বলিলেন যে রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা তিনি বলিতে পারেন না; তবে রুস্তমজী সকল অপরাধ গভর্নমেণ্টের নিকট স্বীকার পাইতে রাজী হইলে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। রুস্তমজী বড় দমিয়া গেলেন; গান্ধীজী তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, অপরাধ করাই লজ্জাজনক, অপরাধ স্বীকার করায় কোন লজ্জা নাই। এমন কি, তাঁহাকে যদি জেল খাটিতেও হয়, তাহাতে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্তই হইবে। গান্ধীজীর উপদেশ রুস্তমজী মানিয়া লইলেন, গান্ধীজী প্রধান শুল্ক-কর্মচারী ও এটর্নী-জেনারেলের সহিত দেখা করিয়া অকপটে সকল কথা বলিলেন। তাহাদিগকে রুস্তমজীর খাতাপত্র দেখাইলেন এবং রুস্তমজী যে কতখানি অনুতপ্ত হইয়াছেন তাহাও বলিলেন। তাঁহারা যাহা কিছু জরিমানা ধার্য করেন রুস্তমজী প্রফুল্ল-চিত্তে তাহা দিবেন; কিন্তু মামলা হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতে হইবে। গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠা ও সততায় শুল্ক-কর্মচারী ও এটর্নী-জেনারেল মুগ্ধ হইলেন। রুস্তমজীর বিরুদ্ধে মামলা হইল না। তাঁহার নিজের স্বীকৃতিমত তিনি এ পর্যন্ত গভর্নমেণ্টকে যত টাকা ঠকাইয়াছেন তাহার দ্বিগুণ টাকা জরিমানা দিলেন।

উপরে আইনজীবী গান্ধীজীর যে পরিচয় আমরা পাইলাম তাহা সত্যের পূজারী মহাত্মা গান্ধীরই উপযুক্ত। আইন-ব্যবসায়ে সত্যের আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভবপর কিনা আইনজীবীগণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত জহরলাল রাশ্যানদের কাছে এতই জনপ্রিয় হইয়াছেন যে, কেহ কেহ নাকি তাঁদের সদ্যোজাত শিশু-পুত্রের নাম "নেহরু" রাখিবার জন্য নেহরুজীর কাছে অনুমতি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। মেয়ের নাম "ইন্দিরা" রাখিবার অনুমতির জন্যও শুনিলাম "তার" আসিয়াছে।— "অনুমতি হয়ত জহরলালজী সানন্দেই দেবেন। কিন্তু আমরা বলি না দেওয়াই ভালো। কেননা

বহু বহু বছর পর কোন ঐতিহাসিক হয়ত হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলবেন যে, নেহরু নামে যে-ব্যক্তি বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বশান্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে-ছিলেন তিনি ভারতীয় ন'ন, উজবেকিস্তানের একজন বাসিন্দা। তারপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নামের সূত্র ধরে স্বয়ং গান্ধীজীকে উরাল পর্বতবাসী কোন তপস্বীরূপে আবিষ্কার করে ফেলাও হয়ত অসম্ভব হবে না। সম্প্রতি মহাকবি সেক্সপীয়রের নবতম ঐতিহাসিক পরিচিতির রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের কথা শুনে আমরা তাজ্জব বনে গেছি কিনা, তাই আমাদের এই আশঙ্কা"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

মঃ মলটভ বিশ্বশান্তির জন্য সাত দফা পরিকল্পনা পেশ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, নেতাদের এখন কথা ছাড়িয়া কাজে নামিয়া আসা উচিত এবং ইহাই হওয়া চাই, তাঁদের First Goal.—"কিন্তু বায়ু অনুকূল থাকতে থাকতে আরো কয়েকটা Goal দিয়ে রাখাই ভালো, কেননা অনেকবার দেখা গেছে মাত্র এক Goal-এর lead সব সময় রাখা যায় না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মঃ মলটভের সাত দফা পরিকল্পনা এমন একটা কিছুই নয় এবং তার প্রয়োজনও কিছু নাই। সমাসন্ন জেনেভা সম্মেলনে এই মনোভাব লইয়াই আমরা যাইব—এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন মিঃ ডালেস।—"অর্থাৎ জেনেভা সম্মেলন Dull, Duller, Dullest"—বলিলেন এক সহযাত্রী।

* * *

মান্দ্রাজের জনৈক মন্ত্রী প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, সরকার নাকি ব্যক্তিগত আয়ের উপর "Ceiling" ধার্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"শুধু Ceiling-এর ব্যবস্থায় কাজ হবে না, বেড়া দরমার হলে তার ফাঁক দিয়েও অনেক কিছু আসে এবং যায়!!"

* * *

মার্সাইর এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে জনৈক ব্যক্তি নাকি উপবাসে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন।—"কথাটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছিনে, কেননা হরিমটর সম্বন্ধে ভারতকে এখনো বলা যায়—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

জনৈক কার্টুনিস্ট নাকি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে টেলিফোন অপারেটররূপে অঙ্কিত করিয়া নাম দিয়াছেন —"Busy operator"—"কিন্তু ব্যস্ততাই বড় কথা নয়, আমরা আশা করিব শ্রীযুক্ত মেনন wrong number যাতে না দেওয়া হয়, সেদিকেও নজর রাখবেন"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে জানা গেল, চীনে অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি যে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের

আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই নাকি তবলা বাজাইয়াছেন।—"আশা করি মন্ত্রীমশাই না-তিন-তিন-না পর্যন্তই থামবেন, তেরে কেটে তাক্ পর্যন্ত আর তাক লাগাবেন না"—বলে শ্যামলাল।

* * *

একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কারের কথা শুনিলাম,—বিয়ার নাকি হার্টের অসুখের পক্ষে পরম উপকারী। ভিড়ের

মধ্যে কে বলিয়া উঠিলেন—"হার্টের অসুখ কী করে করা যায় জানলে বড় উপকার হতো!!"

চক্রদত্ত

"ক্যাস্পিয়ান সি" পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ। এই হ্রদটির আয়তন ১৬৯০০০ বর্গ মাইল। রাশিয়ার একজন ভূতত্ত্ববিদের মতে এই হ্রদটি ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, ক্যাস্পিয়ান সি'র জল নিয়ে সেচ কাজ করা হয় এবং নানা স্থানে বিভিন্ন রকম বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা করা হয়। সাধারণত বড় বড় হ্রদ ও জলাশয় থেকে জলের কিছুটা অংশ বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। বৃষ্টি হওয়ার দরুণ পার্বত্য স্থান বা সমতল ভূমি থেকে উঁচু ঢালু জমির জল গড়িয়ে হ্রদ ইত্যাদিতে জমে। এই কারণে যে অংশ বাষ্প হয়ে যায়, সে অংশ আবার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখন যে পরিমাণ জল নানারকম পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং স্বাভাবিক-ভাবে যে পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, তাতে মাত্র বৃষ্টির জলে ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিকটি বলেন, এই কারণে গত ৫০ বছরের মধ্যে হ্রদটির প্রায় ১৪০০০ বর্গ মাইল মত স্থান শুখিয়ে গেছে। ক্যাস্পিয়ান হ্রদ এভাবে শুখিয়ে যাওয়ার ফলে এই হ্রদে এখন মাছ অনেক কম পরিমাণে ধরা পড়ছে অথচ এই হ্রদ থেকেই রাশিয়ায় সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মাছ সরবরাহ হতো। এছাড়াও এই হ্রদ শুখিয়ে যাওয়ার দরুণ জল-যানের চলা-চলের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছে—ফলে অন্যদিক দিয়ে রাশিয়ার তেলের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে, কারণ ক্যাস্পিয়ান হ্রদের ধারে ধারেই বিভিন্ন ধরনের তেলের খনি আছে।

*

প্রায় প্রত্যেক মানুষকেই অল্প বিস্তর রোগ ভোগ করতে হয়, তবে আজকালকার দিনে রোগ হলেই মৃত্যুভয় হয় না, কারণ প্রত্যেকটি রোগেরই কিছু না কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি বার হয়েছে। কিন্তু এমন কতকগুলি রোগ আছে, যার চিকিৎসা পদ্ধতি তো বার হয়নি, উপরন্তু শৈশবাবস্থাতেই মানুষ এইসব দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সারা জীবনের মত অক্ষম ও পঙ্গু হয়ে থাকে। পোলিও রোগটি এদের মধ্যে অন্যতম। পোলিওর মত বাত-জ্বরও (রিউম্যাটিক ফিভার) একটি রোগ, যেটি খুবই বেশী মারাত্মক। এই রোগের আক্রমণে মানুষ পোলিও রোগের চেয়ে ৩০ গুণ বেশী মারা পড়ে। রিউম্যাটিক ফিভার হলে মানুষের সব সন্ধিগুলো আক্রান্ত হয় এবং হৃদযন্ত্রেরও খুব ক্ষতি হয়। এই রোগের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্ট্রেপটো-কোকাল বীজাণুর আক্রমণ প্রথম দেখা যায়। এই বীজাণু প্রথমে গলায় আক্রমণ করে—আর ১০ দিন থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে রোগীর রিউম্যাটিক ফিভার হতে দেখা যায়। তারপর সন্ধিস্থলগুলিতে ব্যথা হয় এবং ফুলে ওঠে। এই রোগটা ৫ থেকে ১৫ বছরের বয়েসের ছেলেদের হতে দেখা যায়। এই রোগ হবার পর দেখা যায় যে, প্রায় শতকরা ৭৫ জনের হৃদযন্ত্রের অসুখ হয় এবং তাদের সারা জীবনের জন্য অক্ষম করে ফেলে। আগে এই রোগের চিকিৎসার জন্য টীকা দেওয়া হত। এখন এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধে এর চিকিৎসা ভালো হয়। কারণ ডাক্তারদের মতে এ রোগটি বীজাণুঘটিত। এ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধের মধ্যে পেনিসিলিনই রিউম্যাটিক ফিভারের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ওষুধ বলেই জানা ছিল। বর্তমানে ডাক্তাররা প্যানবায়োটিক ব্যবহার করছেন। প্যানবায়োটিকের মধ্যে তিন রকম পেনি-সিলিন পাওয়া যায়। প্যানবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়ার সংগে সংগেই রক্ত প্রবাহের মধ্যে প্যানবায়োটিকের পেনি-সিলিন এসে জমা হয়। এইভাবে ক্রমশ সাতদিন ধরে মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে সাত দিনের মাথায় ওষুধটা রক্তের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সংপৃক্ত হয়।

*

যেসব ছাত্র চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করে, তাদের মানুষের দেহের অভ্যান্তরের যন্ত্রপাতি হাড় পাঁজরা সম্বন্ধেও কিছু জানতে শিখতে হয়। দেহের ওপর থেকে যতটা যা বোঝা যায়, তা-ই এরা শেখে এছাড়া এক্স-রে ছবির সাহায্যেও কিছুটা শিখতে পারে। আজকাল আবার 'এক্স-রে মুভি' ছবি দিয়ে শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এক্স-রে করে যেসব ছবি তোলা হয়, সেগুলো একটা প্রোজেক্টরের সাহায্যে সিনেমার ছবির মত ধীরে ধীরে সরিয়ে নড়িয়ে দেখানো হয়।

এক্স-রে মূর্তি

সৌরভ

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

নিভৃত-সঞ্চারী ছায়া
প্রদোষ আলোয়—
লঘুপক্ষ দিয়েছে বিস্তারি।

মগ্ন-চেতনায় নামে
মধুক্ষরা—
সুধা-রস-ধারা।
দূরাগত—একান্ত আপন।

প্রত্যক্ষের বৃন্ত হতে খসা
জ্যোতির্ময় বাসন্তী গোলাপ
সংগোপনে সুরভি ছড়ায়।

ভালবাসা নীরবে ঝংকৃত!
সন্ধ্যালোকে—ধূপগন্ধে;
রয়েছে একান্ত কাছে—তবুও অজানা।

অনুকূল মৃদু সমীরণে
সুরভিত তারি পদধ্বনি!

তবে বলতেম

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

দিতে যদি আরো প্রাণ, আরো যদি দিতে ভালবাসা,
আরও গভীর ক'রে দিতে যদি অমেয় পিপাসা,
তবে একবার
তোমার দুবাহুপানে বাড়াতেম হৃদয় আমার।

আমার পালের বুকে দিতে যদি আরো কিছু হাওয়া,
আরও আকুল যদি হ'ত দূর আকাশের চাওয়া,
তবে একবার
ছোট তরীখানি মোর ভাসাতেম অকূলে তোমার।

এ বীণার তারগুলি হ'ত যদি আরো সুর-বাঁধা,
সুধাহীন কণ্ঠ মোর হ'ত যদি আরো কিছু সাধা,
তবে একবার
শেষ সভা সাজাতেম তোমার গানটি জাগাবার।

আরো স্পর্শময়ী ভাষা যদি এই জীবনে পেতাম,
যাবার বেলায় তবে বলতেম, "হে প্রিয়, প্রণাম"।

লেখ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

দূরবিহংগমা তুমি এইবার কাছে কাছে থাকো
পশ্চিমা হাওয়ায় ঘুরে ক্লান্তপক্ষ তুমি বহুকাল,
হও যদি একা একা হও কিংবা লুপ্তচক্রবাক-ও
তাতে কার কি বা আসে, হয় ভোর, হবেও সকাল;
সেই সব কৃষ্ণচূড়া কবেকার বকুল অশোক
বহু ঝড় জল সয়ে দগ্ধপ্রাণে ঝরার সময়ে
অস্থির হয়নি, তবু গেঁথে গেছে পরপর শ্লোক
একটি কবিতা-মালা চিত্রলেখ অকালপ্রলয়ে;

ব্যর্থ প্রেমে ভয় পেয়ে দিনরাত্রি বনে বনে ফিরে
কী হবে কান্নার বীজ ছড়িয়ে এ সময়-প্রান্তরে—
সমস্ত আকাশলগ্ন অরুণিমা রাখে যদি ঘিরে
তবু সে শুকাবে রৌদ্রে, কেন্দ্রচ্যুত প্রত্যেক বছরে;
তার চেয়ে ভুলে যাও কী পেলে না কি বা ছিল কাল
এখনো ত পড়ে আছে অন্যতর দিকচক্রবাল!
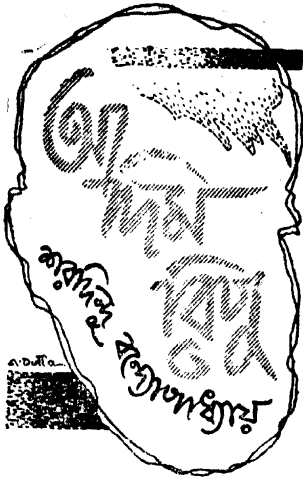
১৯

ব্যোমকেশ নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

'পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম দরজা দিয়া মুণ্ড বাড়াইল।

'আগুনের আংটা নিয়ে এস।'

আমি বলিলাম,—'অনেকক্ষণ ধরে আংটার কথা শুনছি, কিন্তু আংটা কি হবে এখনও জানতে পারিনি। —হোম-টোম করবে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, হোম করব। এই নোটগুলো আগুনে আহুতি দেব।'

'মানে!'

'মানে নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলব।'

আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম,—'অ্যাঁ! দু' লাখ টাকা পুড়িয়ে ফেলবে!'

'হ্যাঁ। এই নোটগুলো কালো টাকা, অভিশপ্ত টাকা; এর ন্যায্য মালিক কেউ নেই। আজকের পুণ্য দিনে দেশমাতৃকার চরণে এই হবে আমাদের অঞ্জলি।'

কিন্তু—কিন্তু—পুড়িয়ে ফেললে দেশ-মাতৃকা পাবেন কি? তার চেয়ে যদি ওই টাকা আমাদের নতুন গভর্নমেণ্টকে দেওয়া যায়—'

'একই কথা অজিত। পুড়িয়ে ফেললেও রাষ্ট্রকেই দেওয়া হবে। ভেবে দেখ, নোটগুলো তো সত্যিকারের টাকা নয়, গভর্নমেণ্টের হ্যাণ্ডনোট মাত্র। হ্যাণ্ড-নোট পুড়িয়ে ফেললে গভর্নমেণ্টকে আর টাকা শোধ দিতে হবে না, দু' লাখ টাকা তার লাভ হবে। কিন্তু এখন যদি নোট-গুলো ফেরৎ দিতে যাও, অনেক হাঙ্গামা বাধবে। গভর্নমেণ্ট জানতে চাইবে কোথা থেকে টাকা এল, তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তার দরকার কি! এই ভাল, আগুনে যা আহুতি দেব তা দেবতার কাছে পৌঁছবে। —প্রভাতবাবু, আপনি কি বলেন?'

প্রভাত বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল,—'আমার কিছু বলবার নেই, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

পুঁটিরাম গনগনে আগুনের আংটা আনিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে রাখিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল,—'তুই এবার ঘুমোগে যা।'

পুঁটিরাম চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ আমাদের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। তারপর বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া আগুনে ফেলিতে লাগিল। মন্দ্রস্বরে বলিল,—'স্বাহা—স্বাহা—স্বাহা—'

আমি আর বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, উঠিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, তাহাকে আমি ভালবাসি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু আজ তাহার চরিত্রের একটা নূতন দিক দেখিতে পাইলাম। সে যাহা করিল আমি তাহা পারিতাম না, নিজের হাতে দুই লক্ষ টাকা পোড়াইয়া ফেলিতে পারিতাম না।

'স্বাহা—স্বাহা—'

ঘণ্টাখানেক পরে ব্যোমকেশ ও প্রভাত আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য উঠিয়াছে, চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম আংটার চারিপাশে কাগজ-পোড়া ছাই স্তূপীভূত হইয়াছে। কালো টাকার কালো ছাই।

তিনজনে জানালার ধারে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রভাত প্রথমে কথা কহিল, কম্পিত স্বরে বলিল,—'ব্যোমকেশ-বাবু, আমি—আমার সম্বন্ধে—আপনি যদি আমাকে খুনের অপরাধে ধরিয়ে দেন আমি অস্বীকার করব না।'

ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিল, অনুকম্পা দ্রবিত স্বরে বলিল,—'আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব না। সব সভ্য দেশেই প্রথা আছে পর্ব-দিনে বন্দীরা মুক্তি পায়, আপনিও মুক্তি পেলেন। আপনার দোকান আমরা কিনব বলে-ছিলাম, যদি আপনি বিক্রি করে চলে যেতে চান আমরা দোকান নেব। কিম্বা যদি আমাদের কাছে দোকানের অর্ধাংশ বিক্রি করে অংশীদার করে নিতে চান তাতেও আপত্তি নেই।'

প্রভাত ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শেষে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, এ আমার কল্পনার অতীত।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা যে কালে বাস করছি সেটাই যে কল্পনার অতীত। আমরা বেঁচে থেকে ভারতের স্বাধীনতা দেখে যাব এ কি কেউ কল্পনা করেছিল? কিন্তু ও কথা যাক। আপনি প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু একেবারে মুক্তি পাবেন না। কিছু দণ্ড আপনাকে ভোগ করতে হবে। এ সংসারে কর্মফল একেবারে এড়ানো যায় না।'

'প্রভাত বলিল,—'কি দণ্ড বলুন, আপনি যে দণ্ড দেবেন আমি মাথা পেতে নেব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে নিজের পরিচয় জানতে হবে।'

প্রভাত চক্ষু বিস্ফারিত করিল,—'নিজের পরিচয়!'

'হ্যাঁ। নিজের পরিচয় আপনি জানেন কি? —পিতৃনাম?'

প্রভাত মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না। মা'র কাছে শ্নেছি হাসপাতালে আমার জন্ম হয়েছিল। আর কিছ্ জানি না।'

'আমি জানি। আপনার পিতৃনাম—অনাদি হালদার।'

প্রভাতের উপর এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব না, কারণ আমি নিজেই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। অবশেষে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম,—'ব্যোমকেশ! এ কী বলছ তুমি। এর কোনও প্রমাণ আছে?'

ব্যোমকেশ বলি,—'আছে বৈকি। প্রভাতবাব্র গায়েই প্রমাণ আছে।'

'গায়ে!'

'হ্যাঁ। প্রভাতবাব্র কোমরে একটা আধ্লির মত লাল জড়্ল আছে। প্রভাতবাব্, জড়্লটা দেখতে পারি কি?'

যন্ত্রের মত প্রভাত কামিজ তুলিল। ডান দিকে কাপড়ের কশির কাছে জড়্ল দেখা গেল। ব্যোমকেশ আমাকে বলিল,—'ঠিক এইরকম জড়্ল আর কোথায় দেখেছ মনে আছে বোধহয়।'

মনে ছিল। মৃত অনাদি হালদারের কোমরে চাবি পড়াইবার সময় ব্যোমকেশ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময় ঘ্চিল না, অভিভূতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে প্রভাতবাব্র কোমরে জড়্ল আছে?'

'প্রভাতবাব্কে যেদিন ডাক্তার তাল্কদারের কাছে নিয়ে যাই সেদিন ডাক্তারকে ও'র কোমরটা দেখতে বলেছিলাম।'

প্রভাত টলিতে টলিতে গিয়া আরাম কেদারায় শ্ইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ দ্ই হাতে ম্খ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম—সমস্তই ঠিক-ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। অনাদি হালদার জানিত প্রভাত তাহার ছেলে, ননীবালা তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। কালা বাজারে অনেক টাকা রোজগার করিয়া সে গোপনে ছেলেকে দেখিতে গিয়াছিল। যখন দেখিল ছেলে দপ্তরীর কাজ করে তখনই হয়তো নোটগ্লোকে বই বাঁধাইয়া রাখিবার আইডিয়া তাহার মাথায় আসে। ছেলেকে ছেলে বলিয়া স্বীকার করার চেয়ে পোষ্যপ্ত্র নেওয়াই অনাদি হালদারের কুটিল ব্দ্ধিতে বেশী সমীচীন মনে হইয়াছিল।...তাহার দ্রন্ত প্রকৃতি মাঝখানে পড়িয়া সমস্ত ছারখার না করিয়া দিলে প্রভাতের জন্মরহস্য হয়তো চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।—যাইত।—

প্রভাত মরার মত ম্খ তুলিয়া উঠিয়া বসিল, ভগ্নস্বরে বলিল,—'ব্যোমকেশবাব্, এর চেয়ে আমার ফাঁসি দিলেন না কেন? রক্তের এ কলঙ্কের চেয়ে সে যে ঢের ভাল ছিল।'

ব্যোমকেশ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া দ্ঢ়স্বরে বলিল,—'সাহস আন্ন প্রভাতবাব্। রক্তের কলঙ্ক কার নেই? ভুলে যাবেন না যে মান্ষ জাতটার দেহে পশ্র রক্ত রয়েছে। মান্ষ দীর্ঘ তপস্যার ফলে তার রক্তের বাঁদরামি কতকটা কাটিয়ে উঠেছে; সভ্য হয়েছে, ভদ্র হয়েছে—মান্ষ হয়েছে। চেষ্টা করলে রক্তের প্রভাব জয় করা অসাধ্য কাজ নয়। অতীত ভুলে যান. অতীতের বন্ধন ছিঁড়ে গেছে। আজ নতুন ভারতবর্ষের নতুন মান্ষ আপনি—অন্তরে বাহিরে আপনি স্বাধীন।'

প্রভাত অন্ধভাবে হাত বাড়াইয়া ব্যোমকেশের পদস্পর্শ করিল—'আশীর্বাদ করুন।'

—শেষ—

॥ ২৯ ॥

আধুনিক সংবাদপত্রের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কথাই হচ্ছে, 'দ্রুত করো'। পৃথিবীর আর প্রান্তে যে ঘটনা এইমাত্র ঘটলো, সামান্যমাত্র সময়ের ব্যবধানে তার বিবরণ এসে পৌঁছানো চাই সংবাদপত্র অফিসে। পূর্ণ বিবরণ, সচিত্র যদি হয় তাহলে উত্তম।

তাই আধুনিক সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টেলিপ্রিণ্টার একান্ত আবশ্যক। নতুবা যুগধর্ম বজায় থাকে না, সাংবাদিকতায়ও পেছনের বেঞ্চিতে লজ্জিত মুখ নিয়ে বসে থাকতে হয়।

টেলিপ্রিণ্টারের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি দীর্ঘকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটার পর যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্মিত টেলিপ্রিণ্টার লাইনগুলি লীজ দেওয়া হবে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। দরবার করেছি সরকারী ভবনে ভবনে শরণ নিয়েছি মন্ত্রীদের অফিসে অফিসে, চিঠির পর চিঠি লিখে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছি তাঁদের। কিন্তু তবু দীর্ঘকাল আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে।

লর্ড ওয়াভেলের অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সর্দার প্যাটেল ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও প্রচার দপ্তরের অধিনায়ক।

সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আমাদের বহুকালের পরিচয়। আমাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভকামনা ছিল, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলিতে তিনি আমাদের সহায়তাও দাবী করেছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভাপতি। তিনি, ভুলাবাই দেশাই ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ নির্বাচনে কংগ্রেসের সুষ্ঠু প্রচারকার্য চালাবার জন্য তারের 'বেয়ারিং অথরিটি' দিয়েছিলেন। তা'ছাড়া সংবাদ সরবরাহের অন্যান্য খরচের জন্য আর্থিক সাহায্যও দান করেছিলেন।

কিন্তু মন্দভাগ্য আমাদের। চিঠির পর চিঠি লিখেও সরকারের আমলাতন্ত্রী চক্রকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারলাম না। অবশেষে নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল আমার মন। কিন্তু তবু চেষ্টার তো বিরাম দেওয়া যাবে না, টেলিপ্রিণ্টার লাইন আমাদের পেতেই হবে।

সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে এই সম্পর্কে কয়েকবার দেখা করেছি। একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম দিল্লীতে বিড়লার বাড়িতে।

তখন বিড়লার বাড়িতে সর্দার প্যাটেল থাকেন। একদিন বিকেলে সেখানে হাজির হয়েছি। ঘনশ্যাম বিড়লা ও দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে তিনি বাড়ির পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমাকে দেখে সঙ্গীরা একটু পেছিয়ে গিয়ে সর্দারের সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন।

সর্দারকে বল্লাম আমার আবেদনের কথা। আমাদের অতীত কাজগুলিও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, বল্লাম জাতীয় সরকারের দায়িত্ব আমাদের সাহায্য করা।

আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন বাংলার কথা। জানতে চাইলেন, সেখানকার কংগ্রেসে এত ঝগড়া কেন। বল্লেন যুদ্ধের চাপে বাংলা বিধ্বস্ত, সবাইকে এক হয়ে সেখানে দাঁড়াতে হবে।

তারপর আমার আবেদন সম্পর্কে বল্লেন, আমার মনে আছে সব। আমি তোমাদের দাবী সম্বন্ধে অবহিত আছি। কিন্তু এখন নানা গোলযোগ চলছে, যথাসময়ে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ হবে।

আরও কিছুকাল অপেক্ষা করলাম। চিঠিতে প্রচার ও তার বিভাগকে সচেষ্ট করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায়ও আশা দেখতে পেলাম না।

তারপর পূর্ণ স্বাধীনতার পরবর্তী ঘটনা।

তখন মাউণ্টব্যাটেন ভারত ত্যাগ করে গেছেন, রাজাগোপালাচারী গভর্নর জেনারেল।

একদিন আবার দেখা করতে গেলাম নর্দার্ন সেক্রেটারিয়েটে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে। একটা বিরাট ঘরে তাঁর অফিস, মাঝখানে তিনি বসে আছেন অজস্র ফাইলপত্রের মধ্যে।

সেক্রেটারীরা যাতায়াত করছে, দর্শনপ্রার্থী কেউ নেই।

আমি আবার টেলিপ্রিণ্টারের আবেদন জানালাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের নানা খবর, কত লোক আছে, কেমন সার্ভিস দেওয়া হয়, ভারতের কোন কোন পত্রিকা সংবাদ নেয়। পরিশেষে জানালেন, নতুন করে আবেদনপত্র পাঠাতে; আশ্বাস দিলেন আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন দেওয়া হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা প্রায় চার লক্ষ টাকার মেশিনপত্রের অর্ডার দিয়েছি বিলেতে, জাহাজযোগে বোম্বে বন্দরে মেশিনগুলো এসে আটক পড়ে আছে।

সে কথা সবিস্তারে জানালাম তাঁকে। খুলে ধরলাম সব সমস্যা, সব পরিকল্পনার কথা।

তিনি পুনর্বার আশ্বাস দিলেন। মনে আশা হলো হয়তো শীঘ্রই টেলিপ্রিণ্টার পাবার সরকারী আদেশ পেয়ে যাবো।

কিন্তু আবার সেই গতানুগতিক লাল ফিতের ঢিলেতাল গতি। আমাদের নতুন আবেদনপত্রও সরকারী দপ্তরে পুরোনো হয়ে উঠতে লাগলো।

এদিকে মেসিনপত্র সব বোম্বেতে আটক পড়ে আছে। ছাড়াতে পারা যাচ্ছে না। টেলিপ্রিণ্টারের আশায় প্রত্যেকটি বড় বড় শাখায় নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, বৃহৎ ব্যবস্থার অনুরূপ সব প্রয়োজন মিটাতে হয়েছে। তার ফলে প্রতি মাসে বহুলব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে প্রতিষ্ঠানের।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দিল্লীতে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নানা প্রসঙ্গান্তরে আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন পাওয়া সম্পর্কে কথা তোলেন। শ্রীফিরোজ গান্ধী সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছিলেন আমাদের ডিরেক্টর। তিনিও জওহরলালকে তাড়াতাড়ি টেলিপ্রিণ্টার লাইন দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

ঠিক সে সময়েই সর্দার প্যাটেল সেখানে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে নেহরু বল্লেন, এইতো লাইন দেবার মালিক এসে গেছেন। সর্দার প্যাটেলকে তখন ডাঃ রায় ও শ্রীগান্ধী সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে বলেন।

সর্দার প্যাটেল জবাব দিলেন, শীঘ্রই মন্ত্রিসভার অধিবেশনে এবিষয়ে আলোচনা হবে। আমি আশা করি অবিলম্বে আপনাদের প্রতিষ্ঠান টেলিপ্রিণ্টার লাইন পেয়ে যাবে।

আমরা আশায় আশায় দিন গুনছি। এমন সময় আমাদের দিল্লী অফিসের সম্পাদক চারু সরকার এক টেলিগ্রাম করে জানালেন, সরকার আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন লীজ দেবার আদেশ দিয়েছেন। এই দিনটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্মরণীয়, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮।

আমাদের প্রথম টেলিপ্রিণ্টার চালু হয় দিল্লী থেকে বোম্বে ও দিল্লী থেকে কলকাতা। তারপর আস্তে আস্তে সব প্রধান শহরের সঙ্গে আমাদের টেলিপ্রিণ্টার সংযোগ হবে এমন পরিকল্পনা আছে।

সর্দার প্যাটেলকে টেলিপ্রিণ্টার উদ্বোধন করতে বলা হয়। তিনি তখন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে দিল্লী থেকে বাইরে থাকায় তিনি উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানালেন। জওহরলাল নেহরুর নিকটও উদ্বোধনের আবেদন নিয়ে হাজির হই।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে তাঁর বৈদেশিক দপ্তরে গিয়ে অপেক্ষা করি। সেদিন তিনি বড় ব্যস্ত, নানা দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও সেক্রেটারী পরিবৃত ছিলেন। তৎকালীন চীন মহাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী কে, এম, পাণিকর নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। বসবার ঘরে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো, চীন থেকে সংবাদ আনার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হলো। অবশেষে তিনি নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভেতরে চলে যান।

আমি অপেক্ষা করছি। অনেকক্ষণ। এমন সময় পাণিকর এসে বল্লেন, নেহরু বাড়ি যাবার জন্য গাড়িতে গিয়ে উঠছেন। দৌড়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

নেহরু তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠতে যাবেন, আমি দ্রুতপদে গিয়ে তাঁকে ধরলাম।

স্মিতহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? সাংবাদিকরা সব নাছোড়বান্দা।

আমি হাসলাম। জানালাম আমার আবেদন। কিন্তু তিনি অসম্মত হলেন। বল্লেন, সরকার ও প্রেস এখন আলাদা। প্রেসকে সরকারী আওতায় আনতে চাইবেন না। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কোন প্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমার পক্ষে এবং প্রেসের পক্ষেও দৃষ্টিকটু।

তাঁকে জানালাম, ব্রিটিশ সরকার কিভাবে রয়টার ও সংবাদপত্রগুলিকে সহায়তা করে। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না। বল্লেন, আমার শুভেচ্ছা আছেই। কংগ্রেস-সভাপতিকে উদ্বোধন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য অনুরোধ করুন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি তখন পাটনায়। আমাদের পাটনা অফিসের সম্পাদক ফণীবাবুর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল, ফণীবাবু গিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্মতিদান করলেন।

৫ই মে দিল্লীতে টেলিপ্রিণ্টার লাইন উদ্বোধন করা হলো। আমাদের অফিসের সংলগ্ন জয়পুর রাজার প্রসিদ্ধ 'যন্ত্রমন্ত্র' বাগান। সেখানে সামিয়ানা টাঙিয়ে আলোর মালা বসিয়ে বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা হলো।

৫ই মে, ১৯৪৮।

উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত সুসজ্জিত অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট অতিথিরা ক্রমশ উপস্থিত হতে লাগলেন। কেউ এসেছেন একা, কেউ সস্ত্রীক। সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক, মনীষী ও চিন্তানায়কদের চেহারা দেখতে লাগলাম প্যাণ্ডেলের নিচে।

একটি প্রতিষ্ঠান যখন সফল হয়ে উঠে, তখন তা ব্যক্তির পরিধি উত্তীর্ণ হয়ে বৃহৎ জনমণ্ডলীতে গিয়ে পেঁাছায়। আমাদের স্বপ্ন ও পরিশ্রম দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নিয়ে আমাদের সামান্য ব্যক্তিত্বের বহুদূরে প্রসারিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো। নতুন নতুন মানুষ তাতে যোগদান করেছেন, নতুন নতুন সাধনার পাত্র ভরে তাতে বিরাট গরিমা গৌরবান্বিত করছে। আরো নতুন নতুন সাংবাদিক ও কর্মীরা এর কর্মচক্র বহন করে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিনগুলিতে।

॥ ৩০ ॥

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার কয়েকবার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সে স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক। সেই স্মৃতিকথা নিবেদন করে আমার কাহিনীর যবনিকা টানব।

যখন 'ডেলি নিউজ' পত্রিকায় কাজ করি, তখন আমার যৌবনকালের এক দীপ্ত দিনে, ১৯২০ সালের কংগ্রেসের কলকাতা বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে প্রথম দেখি। অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

তাঁর গম্ভীর তেজোপূর্ণ চেহারা, দেশাত্মপ্রাণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা আমাকে সেদিন বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। সে সভায় আমাদের রিপোর্টার উপস্থিত ছিলেন, তবু আমি কিছু নোট নিয়েছিলাম। সে নোট ও আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি মুখবন্ধ লিখেছিলাম মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে। পরদিনের কাগজে সে মুখবন্ধটি ছাপা হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। ভারতের মুক্তিসাধনাকে মহাত্মা নতুন প্রবাহে পরিচালিত করেছেন, তিনি উদ্ভাসিত হয়েছেন জনগণ অধিনায়ক হৃদয়পতিরূপে। তাঁর কাহিনী প্রতিদিনের সাংবাদিতা কার্যে অক্ষরের প্রার্থনা দিয়ে লিখেছি।

ইউনাইটেড প্রেস গঠিত হবার প্রায় সাত বছর পর তাঁর সঙ্গে আমি প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করি সেবাগ্রামে। তখন ১৯৪০ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসোন্মুখ জগতের সর্বত্র কালো অধ্যায় পরিয়ে দিয়েছে। তিনি তখন বিশেষভাবে ব্যস্ত।

৭ই মে, বিকেল ৪-৩৫ মিঃ সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেবাগ্রামে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বাহ্নে। গান্ধীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই মাথায় ভিজে গামছা জড়িয়ে সুতো কাটছিলেন। আমাকে বললেন, 'বসুন, জিরিয়ে নিন।'

ঠিক ৪-৩৫ মিঃএর সময় মহাদেব দেশাই আমাকে নিয়ে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর কাছে।

মহাত্মা গান্ধী চরকায় সুতো কাটছিলেন, স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করলেন।

বললেন, 'একটু চেঁচিয়ে কথা বলো, আমি কানে কম শুনি।'

একটু চেঁচিয়ে আমার বক্তব্য জানালাম তাঁকে। জানালাম ইউনাইটেড প্রেসের সংগ্রামের কাহিনী, তার আদর্শ, তার সমস্যা।

তিনি বললেন, সদানন্দও তাঁর কাছে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কি করতে পারেন? সদানন্দের মত আমাকেও একই কথা বলা ছাড়া তাঁর উপায় নেই।

আর্থিক সহায়তা না পাওয়া যায় তো না যাক। কিন্তু আমি যে তাঁর আশীর্বাদ চাই। বললাম তাঁকে, 'আমি যাবার আগে জেনে নিতে চাই, আমাদের পেছনে আপনার শুভকামনা আছে।'

মহাত্মা হাসলেন, বললেন, 'আমার শুভকামনা কি এতোই মূল্যবান?' বললাম জবাবে, 'নিশ্চয়ই। তা ছাড়াও প্রতিটি সংগঠনে শুভকামনা তো বড় সম্পদ।'

তিনি বললেন, 'তুমি যদি তা মনে করো, তাহলে তোমার পেছনে আমার শুভেচ্ছা রইলো।'

আমি ফিরে এলাম। কিছুটা নিরাশ হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু তবু তাঁর আশীর্বাদ ও শুভকামনা সঞ্চয় করে এনেছি তাই যে মস্ত সম্পদ।

মহাত্মা গান্ধী সারা দেশের প্রাণ, তাঁর প্রত্যেকটি সংবাদ জাতির কাছে বিশেষ মূল্যবান। তাই তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকার জন্য নিযুক্ত করেছিলাম একটি নিষ্ঠাবান সাংবাদিককে। তাঁর নাম শ্রীশৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

শৈলেন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। আমাদের এলাহাবাদ অফিসে মাঝে মাঝে সংবাদ সরবরাহ করতেন।

তারপর একটা চিঠি লেখেন আমাকে। সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য। এসে সাক্ষাৎ করেন কলকাতায়।

সে সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মৃত্যুশয্যায়। সায়েন্স কলেজে। শৈলেনকে নিযুক্ত করি প্রফুল্লচন্দ্রের আবাসে সর্বক্ষণ থাকার জন্য। আচার্যদেবের রোগ থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সমস্ত কালটায় তিনি চমৎকার রিপোর্ট করেন। তাঁর বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আমাকে মুগ্ধ করে। আমি আনন্দিত হই তাঁর কাজে।

তাঁকে পাঠাই বোম্বেতে। সেখান থেকে তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ সংবাদদাতারূপে নিযুক্ত করি। গান্ধীজীর সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁর সব সংবাদ সরবরাহ করেছেন। ভালো হিন্দী জানতেন তিনি, সংবাদের পটভূমিকাও তাঁর জানা। তাই তাঁর প্রতিটি রিপোর্ট প্রাণের প্রাচুর্যে ও সহৃদয়তায় ভরা থাকত।

প্রশান্ত, একনিষ্ঠ ও দরদী এই সাংবাদিকটিকে গান্ধীজীর পছন্দ হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়পাত্র হবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন শৈলেন।

একদা বৈকালিক ভ্রমণের সময় গান্ধীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শৈলেন, সময় কতো হলো বলো তো।'

শৈলেন বলেছিল, 'আমার তো ঘড়ি নেই, বাপুজী!'

হাসতে হাসতে বলেছিলেন গান্ধীজী, 'সেকি, এতো বড়ো সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের কর্মী তুমি, তোমার ঘড়ি নেই! ঘড়ি ছাড়া সাংবাদিকের কাজ চলে কি? তোমার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলো, যেন একটা ঘড়ি তোমাকে উপহার দেন।'

কথাটা জানতে পেরে শৈলেনকে আমি একটা ঘড়ি উপহার দিয়েছিলাম। গান্ধীজী খুশি হয়েছিলেন।

শৈলেনের সত্যনিষ্ঠা অসাধারণ। গান্ধীজীর সঙ্গে থেকেও সমস্ত খবর তিনি সরবরাহ করতেন না। গান্ধীজীর অনুমোদিত সংবাদই কেবলমাত্র পাঠাতেন।

অনেক সময় এ পি অনেক বেশি খবর পাঠাতে পারতো। আমি একবার এজন্য শৈলেনকে আরো কুশলী হওয়ার জন্য বলেছিলাম।

শৈলেন কথাটা তুলেছিলেন গান্ধীজীর কাছে। উত্তরে গান্ধীজী যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজো আমার কানে বাজে।

তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের সংবাদের মূলগত ধর্ম হোক সত্য।

একটা খবর বেশি কি কম দিতে পারলে তাতে কিছু যায় আসে না। যাঁরা সত্যের উপর নির্ভর করে পরিশেষে তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী।'

১৯৪৬ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর সংগে পুনর্বার আমি ইউনাইটেড প্রেসের দায় নিয়ে সাক্ষাৎ করি। তখন মুসলিম লীগের সংগে একযোগে কংগ্রেস জাতীয় সরকার গঠন করেছে। গান্ধীজী তখন দিল্লীতে ভাঙ্গী কলোনীতে বাস করেন।

সকাল ৬টায় আমাদের সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু মানসিক উত্তেজনায় সারা রাত আমার ভালো ঘুম হলো না, সাড়ে তিনটায় জেগে গেলাম। পাঁচটায় প্রস্তুত হয়ে মহাত্মা গান্ধীর সংবাদের জন্য নির্দিষ্ট আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শৈলেন চ্যাটার্জির সংগে গান্ধী সমীপে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা করলাম।

ভাঙ্গী কলোনীতে উপস্থিত হয়ে দেখি শ্রীমতী মুরিয়েল লেস্টার ও তাঁর সদ্য ইংলন্ড প্রত্যাগত এক বন্ধু গান্ধীর সংগে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী অমৃত কাউর ও আভা গান্ধীর সংগে মহাত্মা বাগানে পরিভ্রমণ করতে এলেন। তখন মুরিয়েল গান্ধীর সংগে কথোপকথন আরম্ভ করেছেন।

একটু পরেই গান্ধীর সেক্রেটারী প্যারীলাল এগিয়ে এসে আমাদের গান্ধীর নিকট নিয়ে গেলেন। শ্রীমতী লেস্টার তখন তাঁর বক্তব্য বলছিলেন। প্যারীলাল আমাদিগকে তাঁর সংগে পরিচয় করে দিলেন।

গান্ধীজী ধীরপদে অগ্রসর হয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীমতী মুরিয়েল থামলেন। তখন গান্ধীজী তাঁর প্রথম দৃষ্টিতে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'তুমিই কী সর্বভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক?'

আমি সম্মতি জানিয়ে উত্তর করলাম। তারপর সেবাগ্রামে প্রথম সাক্ষাতের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আমার স্মরণ হয়েছে।'

আমার প্রতিষ্ঠানের কাহিনী খুব সংক্ষেপে আবার তাঁকে জানালাম। তিনি হেসে বললেন, স্নেহ জড়িয়ে ছিল তাঁর কণ্ঠে, 'আমি অনুভব করি তোমার সংগ্রামের কথা।'

আমি তখন টেলিপ্রিন্টার প্রার্থনা করে সরকারী দরবার চালিয়ে যাচ্ছি গভর্নমেণ্ট দপ্তরে। গান্ধীর সহায়তা চাইতে তিনি বললেন, 'নেহরু, সর্দার ও শরতের কাছে গিয়ে জোর দরবার কর। বিশেষ করে শরতের কাছে।' শরৎ, অর্থাৎ শরৎ বসু। তখন তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তার কিছুদিন আগেই কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গান্ধী তার কাহিনী জানতে চাইলেন। তিনি বিশেষ করে জানতে চাইলেন হিন্দুদের দ্বারা মুসলমান পরিবার ও মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু পরিবার রক্ষার কাহিনী। তিনি অভিভূত হয়ে শুনছিলেন। প্রায় পঁচিশ মিনিট কথা বলার পর তিনি এক সময় একটুক্ষণ চুপ করে আরেক জনকে প্রশ্ন করলেন।

বুঝলাম আমার বিদায়ের ইঙ্গিত। আমি পদধূলি গ্রহণ করে ভাঙ্গী কলোনী থেকে ফিরে এলাম।

আজ নতুন ভারত গঠনের জন্য দেশের মঙ্গলকামী মানুষেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। মহাত্মার আদর্শ সকলের অন্তরে অন্তরে জ্বলছে। একটি হৃদয়, একটি জীবন সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গলব্রতের সংগে একাত্ম হয়ে মিশে আছে।

মহাত্মার স্বপ্ন সম্ভব হোক আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। এই দুঃখ, দৈন্য, মিথ্যাচার, হিংসা ও লোভ দূর হয়ে যাক। মহাত্মার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা আমাদের এই প্রাচীন দেশকে নতুন সার্থকতায় উদ্দীপ্ত করুক। সেই গৌরবান্বিত দিন, সকলের সুখী, সমৃদ্ধ ও মৈত্রীবন্ধ জীবন, কবে আসবে আমাদের দেশে, কবে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ পূর্ণ রূপায়িত হবে, কবে আসবে সে দিন?

(সমাপ্ত)

দাবাগ্নি

বীরেশ্বর বসু

দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে বিজনবিহারী ফিরে এলেন আবার তাঁর কর্ম-স্থলে। সঙ্গে একমাত্র মেয়ে শান্তা।

প্লাটফরমের বাইরে বাগানের গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ট্রাক্ দেখেই বিজন-বিহারীর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। ভাঙা গলায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন —"সব ঠিক আছে তো?" তারপর সর্বদিক দেখে শুনে গাড়িতে চড়ে বসলেন।

ফাল্গুন মাস। দুপুর বেলা। বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঝির ঝির বাতাস বইছে। জানালার পর্দা বাতাসে অল্প অল্প দোল খাচ্ছে। বাড়ির গা-লাগানো চা-বাগানে শিরিষ গাছে শুকনো শুঁটির বাজনা বাজছে।

কাঠের বাড়ি। উপরে টিন। কড়ি বরগার ফাঁকে ফাঁকে চড়ুইয়ের বাসা।

ভিতর বাড়ির চারদিকে দেশী বিদেশী ফুল আর পাতাবাহারের গাছ। মাঝখানটা ফাঁকা—কোন গাছ-গাছালি নেই। শুধু সবুজ ঘাসের গালিচা। এখানে বসে বিজনবিহারী সকলকে নিয়ে সকাল বিকেল চা খেতে বসতেন। চারদিক থেকে এলো-মেলো হাওয়া আর ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসতো।

বাড়িতে অন্য কোন লোক ছিল না। বিজনবিহারীর খাবার তৈরী হয়েছিল তাঁরই এক সহকর্মী বন্ধুর বাসায়। কিন্তু খাওয়া তাঁর হলো কই? ঘরে ঢুকতেই বাতাসে জানালার পর্দাটা নড়ে একটা ছায়া পড়লো ঘরের মেঝেয়—একেবারে তাঁর সামনে। চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেলেন।

তারপর ধীরে ধীরে অভিভূত মনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ভিতরের ফুল বাগানে। একবার মনে করলেন সবুজ ঘাসের গালিচার উপর একটু বসেন। কিন্তু বসতে পারলেন না। ভাঙা হাড় এখনো যে ঠিকমত জোড়া লাগেনি। ফুল আর পাতাবাহারের গাছে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে লাগলেন। স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে রইলেন শূন্য আকাশের দিকে। তারপর তাঁর নজর পড়লো জাম গাছটার উপরে। কচি কচি পাতায় ভরতি গাছ। যৌবনের রূপশ্রী যেন টলমল করছে। বেগুন গাছে বেগুন, শিম গাছে শিম ধরে আছে। ছোট্ট আম গাছটি মুকুলে ভরতি।

সবই খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলেন তিনি। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এলো পাহাড় পার হয়ে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। দেখার অন্ত নেই—ঘন ঘোর আঁধারেও তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে না আজ। চোখে যেন শতমণির জ্বালা।

শান্তা এসে ডাক দিতে তাঁর চমক ভাঙল। "অন্ধকারে কেন মিছেমিছি বাগানে ঘুরছ বাবা? ভেতরে এসো।"

শান্তা বাবার হাত ধরলে। বিজন-বিহারী যন্ত্রচালিতের মতো চললেন শান্তার সঙ্গে সঙ্গে। শান্তা বললে—"কোন্ সকাল আটটায় দুটি খেয়েছ—আর এ পর্যন্ত জল স্পর্শ করলে না? ও বাড়ির কাকীমা ফল, দুধ আর পাউরুটি দিয়ে গেছেন। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।"

বিজনবিহারীর মোটেই খিদে পায়নি। কিন্তু মেয়ের মুখ-তাকিয়ে কিছু না খেয়ে পারলেন না।

কুচবিহার থেকে আসবার পথে ঘন শালের বন। সেই শাল বনের বুক চিরে চলেছে রেলের রাস্তা—মোটরের রাস্তা। রেল লাইন ও মোটর রাস্তার ক্রসিং-এ গাড়ি আসবার আগে থেকেই শুরু হলো ঝড়। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো দাবানল। আরম্ভ হলো বনদেবীর আহুতি। সেই হোমের ধুঁয়ায় চোখে দেখলেন হিমের কুয়াশা। বিষাক্ত বাতাসে ভরে গেল পেট। সেই যে চার মাস আগে পেট ভরেছে—এখনো তা খালি হলো না।

সন্ধ্যা থেকে শুরু হলো লোক সমাগম। অগুনতি বন্ধুবান্ধব এলেন দেখা

করতে। সকলেই অবাক! কি শরীর কি হয়ে গেছে।

ক্ষীণকণ্ঠে সকলের কথারই খুব সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছিলেন তিনি। কথা বলতে সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছিল বিজন-বিহারীর। তাই একে একে সকলেই বিদায় নিলেন। রাত বাড়ল। বিজন-বিহারী ক্লান্ত, একাই বসে আছেন। কাছে পটের মতন শান্তা দাঁড়িয়ে আছে। বিজনবিহারীর বুঝতে দেরী হলো না, তিনি না শুতে গেলে শান্তা কিছুতেই শোবে না। কাজেই মেয়েকে শুতে বলে তিনিও শুয়ে পড়লেন।

ঘুম। ঘুম কোথায়? কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করলেন তিনি। তারপর এক সময় বিছানায় উঠে বসলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে সমান তাল দিয়ে চলেছে তাঁর এলোমেলো চিন্তা।

জানালা খোলা ছিল। নজর পড়লো বাইরের দিকে। চমকে উঠলেন। ও কে দাঁড়িয়ে কলা বাগানে? কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কলা গাছ-গুলোর দিকে। বসেও থাকতে পারলেন না। বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন জানালার ধারে। একটু পরেই দমকা হাওয়ায় শুকনো কলার পাতাগুলো বেজে উঠলো। বিজনবিহারী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এবারেও ঘুম এলো কই? ঘুম আসবার আগেই বনের আগুন এসে আচ্ছন্ন করে ফেললো তাঁর শরীর মন। গুমোটে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সন্তর্পণে নেমে এলেন বিছানা থেকে। মশারি ফেলা ছিল। সেটাকে গুটিয়ে রাখলেন। আবার একটা সিগারেট ধরালেন। দু'একটা টান দিয়েই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। সিগারেটটা আপনা থেকে পুড়তে পুড়তে তাঁর আঙুলের ডগা ছুঁয়েছে। তবুও তাঁর খেয়াল নেই।

এলোমেলো কতো চিন্তা। আস্তে আস্তে মনের গভীরে জেগে উঠলো ছ মাস আগের কথা।...

অসুখে পড়েছিল মায়া। অসুখটা যে কী তা ভালভাবে বুঝতে না পারলেও এটা যে পেটেরই একটা কিছু এ বুঝতে বিজনবিহারীর কষ্ট হয়নি। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা—ছট্‌ফট্‌ করত মায়া। সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য।

একদিন রোগটা বেঁকা পথ নিল।

নিজের উপরে আস্থা হারিয়ে ফেললেন তিনি; ভাল ডাক্তার হয়েও। ডেকে পাঠালেন আর একজন ডাক্তার বন্ধুকে পরামর্শ করবার জন্যে। অবশ্য এর ভেতর তিনি যে কোন ওষুধপত্র দেননি তা নয়। একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন। একটা ইনজেকসনও তৈরী করে রেখেছেন টেবিলের ওপর।

অজ্ঞানের ঘোরে পড়েছিল মায়া। পাশে বসে তাঁর চার মেয়ে। বিজনবিহারী কেবল ঘরে-বারান্দায় পায়চারি করছেন।

একটুক্ষণ পরেই ডাক্তার বন্ধুটি এলেন। দুজনেই একমত। শুরু হলো পেনিসেলিন ইনজেকসন।

একদিন পরে রোগীর অবস্থা ভাল দেখা গেল। কিন্তু তবুও বিজনবিহারী নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তখনও চিন চিন ব্যথা চলছেই।

স্ত্রীকে বললেন—'চলো কলকাতা যাই। সেখানে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে আসি'।

মায়া বাধা দিয়ে বললেন—'কলকাতা যেতে হবে কেন? আজকাল তো কুচবিহারেই ভাল ভাল ডাক্তার আছেন। চলো কুচবিহারে যাই। তাছাড়া সেখানে গেলে অনেক সুবিধেও হবে। দরকার মতো মা, দাদা, বৌদি সকলেই দেখাশুনা করতে পারবে। এই দেখো না—দুহপ্তা মতন অসুখে ভুগছি এর ভেতরই মেয়ে চারটে খেটে খেটে কেমন রোগা হয়ে গেছে।'

মায়ার কথা যুক্তিসঙ্গত। বিজন-বিহারী মেনে নিলেন তাই। বললেন,—'তবে চলো কুচবিহারেই যাই।'

দিন দুয়েক পর ও'রা কুচবিহার রওয়ানা হলেন।

কুচবিহারে দিনগুলি বেশ হইহল্লার ভেতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে সবার। মায়া দেবী আর ব্যথা টের পান না। তাঁর মন এখন সরস—শরীর সবল।

মা একদিন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে মায়া, তুই তো এখানে এসে বেশ ভালই আছিস মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, মা, ভালই আছি।

মা ও মেয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মায়ার দাদা সমরবাবু। ও'দের কথা শুনে বোনের দিকে ফিরে বললেন—ওখানে তোদের অসুখ না হওয়াই অন্যায়।
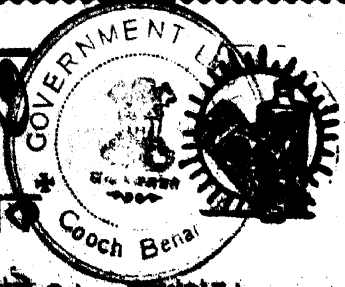
মায়া একটু মুচকি হাসল।
স্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন ছেলের
ন।

সমরবাবু বলে চললেন—একটু নড়া-
নেই। কেবল এ ঘর ও ঘর করা।
তোদের চা-বাগানের মেয়েদের
টা স্বতন্ত্র রীতি। কতো সুন্দর
া জায়গা—ফাঁকা রাস্তাঘাট ওখানে,
ও কি তোরা ভুলে বার হোস সূর্যের
দেখতে?

কুচবিহারে এসে মায়ার শরীর সারল।
ধপত্রের সঙ্গে বাপের বাড়ির স্নিগ্ধ
বেশ। আনন্দ আর তৃপ্তি।

আস্তে আস্তে ফুরিয়ে গেল ছুটির
গুলি।

বিজনবিহারী একটা ভাল দিন দেখে
না হলেন কর্মস্থল, চা-বাগানে।
আবার গাড়ি বদল আলিপুরে।
ফর্মে নামতেই এক বন্ধুর দেখা।
কথায় জানতে পারলেন—যে-
তে বাগানে যাবেন সে গাড়ি ক'দিন
উঠে গেছে।

বন্ধুটি বললেন তাঁর ওখান থেকে
। রাজী হলেন না বিজনবিহারী।
আলিপুর থেকে বাস চলাচল করে
র পাহাড়ের গা অবধি। এর মাঝে
জায়গায় নামতে হবে তাঁদের।
বিধার কিছুই নেই। এখন বেলা
তিনটে—সন্ধ্যা নাগাদ বাগানে
ছে যাবেন।

মটরের রাস্তা ভাল না। বড়ই
ান। এ রাস্তায় মটরে নতুন স্প্রীং না
লে যেমন ভেঙ্গে পড়বার ভয় তেমনি
সঞ্জারের শারীরিক স্প্রীংও সুস্থ-
না থাকলে অবস্থা খারাপ হয়ে
। মায়ার মোটেই ইচ্ছে নয় বাসে যান।
মায়াকে অনেক বুঝিয়ে সকলকে নিয়ে
উঠলেন। বাস চলতে লাগলো
ধুলোর মেঘ উড়িয়ে। অসমতল রাস্তার
পাথরগুলি ছুটতে লাগলো তীরবেগে।
শুরু হলো স্প্রীং-এর অবিশ্রান্ত কান্না।
লোকালয় পেরিয়ে বাস এলো বনের
ভেতরে। বনের পশুপাখি ছুটলো ভয়ে।
বন পেরিয়ে আবার লোকালয়।

এবারে ড্রাইভার একটা ছোট্ট
অপরিসর বাড়ির সামনে গাড়ি থামালে।
বললে এটা তার শ্বশুরবাড়ি। একটা খবর
দিয়েই আসছে। কিন্তু গেল তো গেল
আর ফেরে না। অনেকটা সময় কাটিয়ে
ফিরল।

আবার বাস চলতে শুরু করলে।
সেই ধুলো-পাথরের খেলা আর স্প্রীং-এর
কান্না। দেখতে দেখতে লোকালয় পেরিয়ে
বাস এসে পড়লো গহন শালের বনে।

দূরে আবছা আবছা দেখা গেল রেল
লাইন—মটরের রাস্তা কেটে বেরিয়ে গেছে
সগর্বে।

নিঝুম বন। কোনও সাড়াশব্দ নেই।
শুধু আরোহীদের গুঞ্জন ও বাসের
ঘ্যান-ঘ্যান আওয়াজই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ
করছে। তখনও অন্ধকার হয়নি। অস্তগামী
সূর্যের নিষ্প্রভ কিরণ শালের পাতায়
পাতায় ঝিক্‌মিক্ করছে। শুধু রেল
লাইনে আর মটরের রাস্তায় অন্ধ কুয়াশার
মতো আঁধার নেমেছে। সেখানে সূর্যের
রশ্মি নেই। সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে
বনস্পতি শাল।

বিজনবিহারী বসে ছিলেন সামনের
সিটে, পাশেই তাঁর স্ত্রী ও চার মেয়ে।
মেয়েরা গল্প করছে। মায়া মাঝে মাঝে
বিরক্ত হয়ে বলছেন—তোরা একটু থাম
তো। বিজনবিহারীর কিন্তু সেদিকে
লক্ষ্য নেই। তিনি তন্ময় হয়ে ভাবছেন
সংসারের কতো খুঁটিনাটি।......
ঝি না থাকলে মায়াকে নিজের
হাতেই ঘর-সংসারের সব কিছু করতে
হয়, বাটনা বাটা থেকে শুরু করে রান্না-
বান্না পর্যন্ত। ছোট মেয়ে তিনটি স্কুলে
পড়ে। তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয় তা
মায়া কোন দিনই চান না। তবু তারা যে
মাকে একেবারেই সাহায্য না করে তা নয়।
তাঁর নিজের ফরমাসও নিতান্ত কম নয়।
সে ফরমাস খাটে মেয়েরাই। ঘরবাড়ি,
বিছানাপত্র দিনে দু'তিনবার ঝাড়ঝাট
দিতে হয়। ফুলদানির জল পাল্টে দিতে
হয় রোজ। ফুল সাজিয়ে রাখতে হয়
বেডসাইড টেবিলের ওপর। সিগারেটের
টিন, দেশলাই, মসলার কৌটো এ সবও
খালি থাকার যো নেই। শুধুই কি এই
সব? এ ছাড়া অনেক ছোটখাটো জিনিসও
গুছিয়ে রাখা চাই—যেমন কান খোঁচানো
পিতলের কাঠি, দাঁত খোঁচানো খড়কে,
ছাইদানি।

বড় মেয়েটি বাড়িতেই থাকে সব
সময়। সে খাটে মার ফাইফরমাস। ম্যাট্রিক
পাশ করে বসে আছে। অনেক দিন ধরে
বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে। মনোমত ভাল পাত্র
ও ঘর না পেলে বিয়ে দেন কেমন করে?
চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন তাঁর মেয়ের
এক বন্ধুর দুর্দশা। কি লাঞ্ছনাই না ভোগ
করছে মেয়েটি। যাক, এবারে ভগবান
মুখ তুলে চেয়েছেন—ভাল একটি ছেলে
পাওয়া গেছে। প্রফেসারি করে কলেজে।
ভালোয় ভালোয় এক মাস কেটে গিয়ে
বিয়েটা হয়ে গেলে বিজনবিহারী বাঁচেন।
মায়াও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

বিজনবিহারী তৃপ্তির নিশ্বাস
ফেললেন। তারপর একটা সিগারেট
ধরিয়ে দু'একটা টান দিতেই শুনতে
পেলেন ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দ। উৎকর্ণ
রইলেন ক্ষণকাল। আর আর আরোহীরাও
কান খাড়া করে আছে। সকলেই নির্বাক
তাকিয়ে আছে। কোন্ দিক থেকে শব্দ
আসছে? কেউ কিছু দেখতে পেলে না।
মুহূর্তে ভেসে এলো অজস্র ধোঁয়া ঘন
কৃষ্ণমেঘের মত। ছেয়ে ফেলল বন, গাছ-
পালা, রাস্তাঘাট। সাথে সাথে দুরন্ত
বাতাস। উড়তে লাগলো শুকনো শালের
পাতা। তার সঙ্গে এলোমেলো বইতে
লাগল পাথরের কুচি-ভরা পথের বালি।
শব্দটা যেন হঠাৎ জোর হয়ে কানের কাছে
এসে বিঁধল। আঁধারে আবছা দেখতে
পেলেন বিজনবিহারী কী একটা বিরাট
দৈত্যের মত এগিয়ে আসছে। তার
ভৌতিক কপালে কাঁচের চোখ জ্বল-জ্বল
করছে।

চিৎকার করে উঠল সকলে। বাস
থামাও, বাস থামাও, রেল আসছে। ব্রেক
চাপতে না চাপতেই বাসের মুখটা এসে
পড়েছে রেল লাইনের ওপর। চকিতে কী
যেন ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদে
কান্নায় ভরে গেল সারা বন।

ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে বাসটা ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা খাদে।

তারপর? তারপর কি হলো কিছুই তো তাঁর স্মরণ নেই। কে জানে চোখ বুজে ছিলেন কতক্ষণ। চোখ মেলে দেখলেন—দু'একজন যাত্রী ছাড়া সকলেই ছিটকে পড়ে নানা ভঙ্গিতে ছটফট করছে। সামনেই দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। বনস্পতির আহুতি যেন। চেয়ে দেখলেন—সেই পৈশাচিক হোমাগ্নিতে তাঁরই রক্তে তৈরি তিনটি দেহ দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিজনবিহারী প্রথমে। তারপর কানে এল শোক-যন্ত্রণাবিদ্ধ অদ্ভুত, অদ্ভুত সব কথা, ডাক, ভিক্ষা, কাকুতি। মায়াকে কোলে করে বসে আছে শান্তা। গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে এলেন বিজনবিহারী তাঁদের কাছে। চেয়ে রইলেন মায়ার দিকে। আঁৎকে উঠলেন রক্ত দেখে। এ যে মাথা ফেটে অবিরল ধারায় রক্ত বেরুচ্ছে! মাঝে একটিবার শুধু তাকিয়েছিল মায়া আগুনের দিকে। তারপর অদ্ভুত, দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে মায়া তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে। কি যেন বলতে চাচ্ছে—ঠোঁট নড়ছে, তবু শব্দ নেই। কখন যেন অলক্ষ্যে নিভে এল চোখের মণি, তা যেন টের পেলেন না তিনিও।

কখন এল রিলিফ ট্রেন। সেই ট্রেন চলল আবার কুচবিহার। বিজনবিহারীর চোখের ওপর দিয়ে ছবির মত সব কটি দৃশ্য এল, ভেসে গেল। কোনো শারীরিক অনুভূতি নেই। আছে শুধু মন—সেখানে আজ মায়া আর তিন মেয়ে আর তাদের আগুন-জ্বলা দেহ। সেই অগ্নিশিখা স্পর্শ করছে তাঁর বুকও। বড় বড় শালের গাছ উপড়ে পড়ছে সে আগুনে। সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

রিলিফ ট্রেন পেঁৗছল কুচবিহার। তখন রাত। তারপর রিলিফ ভ্যান, হাসপাতাল। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স। কত রকম ওষুধ, যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজ, তুলো। শুরু হল ইনজেকশন—একটা, দুটো, তিনটে। নাকে এল ঝাঁঝাল ওষুধের গন্ধ। কখন যে চোখ বুজেছেন তা টের পাননি বিজনবিহারী।

কেটে গেল রাত। পরের দিন দুপুর বেলা চোখ মেলে দেখলেন—সামনে দাঁড়িয়ে সার্জন, আর আর ডাক্তার, নার্স। সকলেরই মুখ ভারী। বিজনবিহারী ম্লান, স্তিমিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন,—'কাকে খুঁজছেন?'

কাকে?—কেঁদে ফেললেন বিজনবিহারী। তারপর বললেন এক সময়—'ওঁর কি সৎকার হয়ে গেছে?'

—'না। কেন, বলুন তো?'

'একটু দেখিয়ে নিয়ে যাবেন আমাকে!' আবার কেঁদে উঠলেন বিজনবিহারী। ছেলেমানুষের মতন।

কিছুক্ষণ পরে একটা স্ট্রেচারে সাদা কাপড়ে ঢাকা মায়ার দেহ আনা হলো।

'একবার মুখটা খুলে দেবেন? ওকে দেখি।' টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অপলক চোখে দেখলেন খানিকক্ষণ। বললেন,—'পরনের কাপড়খানা যদি পালটে দেন। বাসন্তী রঙের একখানা ভাল শাড়ি ছিল ওঁর বাক্সে। সেখানা যদি পরিয়ে দেন।'

কাপড়খানা শেষ পর্যন্ত পরানো হয়েছিল কি না কে জানে। ......

হঠাৎ চমকে উঠলেন বিজনবিহারী। কিসের শব্দ হলো। ট্রেনের? না, তিনি চা-বাগানে নিজের বাড়ির বিছানায় শুয়ে আছেন।

ঘুম কিছুতেই আসছে না। বিছানায় ছটফট করছেন। রাত বুঝি দুটো পার হয়ে গেল। জানালা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। কালো মেঘে ছেয়েছে সারা আকাশ। মেঘের ডাক শোনা গেল। এলো বৃষ্টি। পায়ের কাছের কম্বলটি টেনে নিয়ে কখন যে গায়ে দিয়ে চোখ বুজেছেন!

বিজনবিহারী চোখ বুজে আছেন। কে যেন তাঁকে বলছে—দেখেছ, কি আগুনটাই না লেগেছিল। সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আম-লিচুর থোলগুলি পুড়ে খাক্ হয়েছিল—জল আর বাতাস পেয়েই ঝুর ঝুর করে পড়ে গেছে। কাঞ্চন গাছে আর একটিও ফুল নেই—কলা গাছ ভেঙে পড়ে গেছে ঝড়ে। চা-বাগানে শিরিষের শুকনো পাতাটি আর বাজাবে না। সব ঝরে পড়ে গেছে। বেগুন শিম সব নষ্ট হয়ে গেছে শিলে। বৃষ্টি পেয়ে জাম গাছে পিঁপড়ে ... ছেয়ে গেছে। কতো যত্নের ফুল বাগান আমার, সব শেষ—।

ফুলবাগানে বসে আরাম করে ... খাওয়াও বন্ধ। ঘাসের গালিচা ... মাটি মাখা—স্যাঁৎসেঁতে। শুকনো পাতা ভিজে বালি, পচা আম-লিচুর খোলে ভরতি। মাছি পোকা ভন্ ভন্ করছে সবখানে। কে আর ওদিকে যায়? আমার বড্ড ঘেন্না করছে। কে আবার ঘর বাড়ি বাগান সাজাবে গো?

'কেন, তুমি তো আছ'—বলে ... বিজনবিহারী তাঁর হাত বাড়িয়েছেন ... বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচল ধরতে অমনি চড়ুইয়ের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখেন—ঘর থেকে বাইরে উড়ে গেল কটা চড়ুই। আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শান্তা। সকাল হয়েছে।

সেবাগ্রাম-স্মৃতি

তরুণকুমার ভাদুড়ী

রাতের মৌন নিস্তব্ধতায় অনেক দূর থেকেই কানে ভেসে আসে সমবেত কণ্ঠের সংগীত আর মৃদু করতালির ধ্বনি। স্পষ্ট শুনতে পাই;

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সব্‌কো সম্মতি দে ভগবান।"

আরো এগিয়ে যাই। প্রার্থনা প্রাঙ্গণে একটা ছম্‌ছমে ভাব। সমস্ত পরিবেশটায় যেন ম্লান হতশ্রী ফুটে উঠেছে। চাঁদের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আলো রাতের অন্ধকার ভেদ করে এসে পড়েছে আশ্রমবাসীদের মুখের ওপর। নিশ্চল পাথরের মূর্তি যেন সব। থমকে দাঁড়াই। মধুর কণ্ঠের সংগীত-ধ্বনি আবার কানে ভেসে আসে;

"বৈষ্ণব জনতো তেনে কহিয়ে
পীর পরায়ী জানে রে......"

রাতের স্তব্ধতায় কেমন একটা আশঙ্কার আভাস। কিছু যেন একটা হবে। মিনিট পাঁচেক আরো কাটে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু শুনতে পাওয়া যায় কয়েকজনের পদশব্দ। একজন লোক উঠে চলে যায় ও কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসে। হাতে তার একগোছা চাবি। চাবিটা সে তুলে দেয় আরেক জনের হাতে। ধীরে ধীরে প্রার্থনা প্রাঙ্গণ খালি হয়ে যায়। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় আশ্রমবাসীদের চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করছে। আবার নিস্তব্ধতা ফিরে আসে। শোনা যায় শুধু ঝিঁঝি-পোকার একটানা সংগীত।

* * *

অনেকেই দেখতে পেলো না, অনেকেই জানতে পারল না। রাতের অন্ধকারে সেদিন ১৮ই এপ্রিল মহাত্মা গান্ধীর অতি প্রিয় সেবাগ্রাম আশ্রম আর বাপুর নিজের পর্ণকুটির বন্ধ হয়ে গেল। পরের দিন সকালে কেউ কেউ খবরের কাগজের এক কোণে ছাপান একটা ছোট্ট খবর পড়লো—"Sevagram Ashram and Bapu Kutir closed: Inmates join Bhoodan."

সুদীর্ঘ বিশ বছর পরে, জাতির পুণ্যতীর্থ সেবাগ্রাম আর "বাপুকুটির" বন্ধ হয়ে গেল। ছোট একটা ঘটনা কিন্তু ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

খবরের কাগজে কাজ করি—অনেক দিন থেকেই করছি, আর তাই বোধ হয় সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সিনিসিজম্‌ও মনে স্থান পেয়েছে। কিন্তু ১৮ই এপ্রিলের ঘটনার পর সেবাগ্রাম থেকে যখন ফিরে এলাম মনটা বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। বহুবার সেবাগ্রাম গিয়েছি—বাপু থাকতে এবং তাঁর অবর্তমানে, কিন্তু কই এরকম বিষাদ নিয়ে তো কোনো দিন ফিরিনি?

এই তো সেদিনের কথা, সেবাগ্রামে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন এক মহিলা, সুইডিশ সাংবাদিক। ঘুরে ফিরে দেখলাম। ঠিক সেই রকমই আছে কোনো তফাৎ নেই। বাপুর কুটিরের দরজায় দাঁড়িয়ে মনে হলো তিনি বোধ হয় বাইরে গেছেন। এক্ষুণি ফিরে আসবেন। ঘরের প্রতিটি জিনিস যেন তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছে। ঠিক তেমনি আছে, যেমন তিনি ছেড়ে গিয়েছিলেন ২৫শে আগস্ট ১৯৪৬ সালে। বলে গিয়েছিলেন 'আবার আসব'। কিন্তু আর আসা হয়নি।

আমার সঙ্গের সুইডিশ সাংবাদিক রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শুধু বলে উঠলেন :—

"Generations to come, will be amazed to know that a man named Gandhi walked the earth with feet firmly on the ground and his head crowned with the stars."

সেদিন ১৮ই এপ্রিল সেবাগ্রাম আবার দেখলাম। বাপুর কুটিরের সামনে আবার দাঁড়ালাম কিছুক্ষণের জন্য। কি জানি, হয়তো জাতির এই পুণ্যতীর্থ চিরকালের জন্য স্মৃতির অন্তরালে লুকিয়ে পড়বে। রাতেই আশ্রম ও বাপুকুটির বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

পুরীর সর্বোদয় সম্মেলনে আচার্য বিনোবা ভাবে সবাইকে আহ্বান করলেন ভূদান যজ্ঞে যোগ দিতে। সেবাগ্রামের অবশিষ্ট ১০।১২ জন আশ্রমবাসীর কাছে পৌঁছাল বিনোবার সেই আহ্বান।

বাপু-কুটিরের ভিতরের দৃশ্য। গান্ধীজীর ব্যবহৃত গদি আর আড়ম্বরহীন আসবাব

স্থির হলো আশ্রম বন্ধ রেখে তাঁরা যাবেন ভূদান যজ্ঞে যোগ দিতে আর যতদিন পর্যন্ত ভূদান যজ্ঞ না শেষ হয় আর আশ্রমে ফিরবে না কেউ। বিনোবার মত নিতে পাঠান হ'ল কস্তুরবা হাসপাতালের ডাঃ প্রভাকরজীকে উড়িষ্যাতে। বিনোবা বললেন, ১৮ই এপ্রিল আশ্রম বন্ধ করে দাও।

এক টুকরো চিঠি পাঠালেন আশ্রমের ম্যানেজার চিমনভাই শাহকে। লিখলেন, আশ্রম আর বাপুকুটির তালা লাগিয়ে চাবি তুলে দেওয়া হোক গান্ধীজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছগনলাল গান্ধীর হাতে। আশ্রমের জমিজমা, বললেন, কাছাকাছি গ্রামবাসীদের বিলিয়ে দিতে।

লিখলেন ঃ

"বাপুকুটী বন্দকরকে কুঞ্জী ছগনলাল ভাইকে পাস্ দি জায়।......দেখনেওয়ালে বাহ্‌রসে দেখেঙ্গে আউর ভূদান্‌মে কাম্‌মে লাগ্‌নেকা আদেশ উস্‌সে উন্‌কো মিল জায়েগা"......বিনোবাকা প্রণাম॥

(বাপুকুটির বন্ধ করে চাবি ছগনলাল ভাইকে দেওয়া হোক। যারা দেখতে আসবে তারা বাইরে থেকেই দেখবে। আর তাতে তার ভূদানের কাজে যোগদানের আদেশও পেয়ে যাবে। বিনোবার প্রণাম)

১৯৫১ সালে ১৮ই এপ্রিল রামনবমীর দিন শিবরামপল্লী সর্বোদয় সম্মেলন শেষ হবার পর শীর্ণকায়, বৃদ্ধ বিনোবা শুরু করেছিলেন তাঁর ভূদান যজ্ঞ তেলেঙ্গানাতে। হেঁটে শুরু হল তাঁর সেই যাত্রা। প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভারতবর্ষের ১ কোটি ভূমিহীন প্রজার জন্য তিনি ৫ কোটি একর জমি লোকের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন ১৯৫৭ পর্যন্ত। না হলে আর ফিরবেন না।

ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে। মার্কিন সাংবাদিকরা বললেন, 'দি গড্ দ্যাট গীভস্ অ্যাওয়ে ল্যান্ড'। আজ চার বছর হয়ে গিয়েছে, পেয়েছেন মোটে ৩৭ লক্ষ একর জমি। বাকী আছে মোটে দু বছর। বিনোবার প্রতিজ্ঞা কি ব্যর্থ হবে?

১৯৫৫ সালে পুরী সম্মেলনের পরে বিনোবা আবার সবাইকে আহ্বান জানালেন ভূদান যজ্ঞে যোগ দিতে। আশ্রমবাসীরা এগিয়ে এলো। বন্ধ হলো বাপুকুটির আর সেবাগ্রাম। তাঁরাও

বাপুকুটিরে রাখা গান্ধীজীর লাঠি ও খড়ম

প্রতিজ্ঞা করলেন কাজ সমাপ্ত না করে আর ফিরবেন না। তাঁরা না ফিরলে সেবাগ্রামও বন্ধ থাকবে। তবে সেবাগ্রাম আর বাপুকুটির কি চিরকালের মত অতীতে মিলিয়ে গেল? কে জানে?

শেষ প্রার্থনা হোল ১৮ই এপ্রিল রাতে। পরদিন সকালে আশ্রমবাসীরা রওনা হলেন পদব্রজে ভূদান যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিতে।

সেবাগ্রাম আশ্রম আর বাপুকুটির বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ভারতবাসীদের প্রতি বিনোবার চ্যালেঞ্জ।

* * *

আজও মনে পড়ে ১৯৪২ সালের কথা। তখন ছিলাম ছাত্র। মহা উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলাম সেবাগ্রামে বাপুকে দেখতে। গান্ধীজী যাবেন বম্বে। সেদিন বোধ হয় ছিল ২রা আগস্ট। বাপুর কুটিরের কাছে গিয়ে দেখি দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের বেশ ভিড়। গান্ধীজী নিজের বক্তব্য বিষয়ের একটা খসড়া করে মহাদেব দেশাই-এর হাতে দিলেন। মহাদেবভাই ডিক্‌টেট্ করতে লাগলেন আর রিপোর্টাররা লিখতে লাগল। মাঝে মাঝে গান্ধীজী ভুল ধরে শুধরে দিচ্ছিলেন আর এক একবার উচ্চস্বরে হেসে উঠছিলেন—তাঁর সেই বিখ্যাত শিশুসুলভ হাসি যা দেখে একজন সাংবাদিক লিখেছিলেন,

"that toothless smile which has disarmed many an enemy."

তারপরই এল বোম্বাই কংগ্রেস—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। "কুইট ইণ্ডিয়া", দীর্ঘ কারাবাস।

সেদিন খবরের কাগজের লোকদের ওপর হিংসা ও রাগ দুই হয়েছিল—কত সময় তারা গান্ধীজীর নিল, এটা হল রাগ আর গান্ধীজীর কত কাছে ওরা সব বসেছিল, এটা হল হিংসা।

অনেক চেষ্টা করে দেখা হল গান্ধীজীর সঙ্গে। কিছুই বলতে পারলাম না আমরা কয়েকজন। চট্ করে একটা প্রণাম করলাম। তিনি একটু হাসলেন আর চলে গেলেন।

* * * *

ফিরে এলেন বাপু আবার সেবাগ্রামে —৩রা আগস্ট ১৯৪৪ সাল। সঙ্গে নেই জীবনসঙ্গিনী কস্তুরবা আর 'ফ্রেন্ড, ফিলসফার এণ্ড গাইড' মহাদেবভাই দেশাই।

তারপর শুরু হল দাঙ্গা—কলকাতা, দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার নোয়াখালী। অহিংসার পূজারী, হিংসার এই নগ্নমূর্তির তাণ্ডব নৃত্য দেখে শিউরে উঠলেন। বললেন, "আমি যাবো"। অনিশ্চিত যাত্রা।

২৫শে আগস্ট ১৯৪৬। তখন নিজেই খবরের কাগজে কাজ করি। অনেক চেষ্টা করার পর মিনিট কয়েকের জন্য দেখা হল গান্ধীজীর সঙ্গে। আরো অনেক সাংবাদিকও ছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আমাদের কথা বলতে দেখে কিছু লোক যারা এসেছিলো দর্শন করতে, তারা দেখলাম আমাদের দিকে ঈর্ষায় তাকিয়ে আছে। ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে গেল।

বাপুকে জিজ্ঞাসা করলাম কবে ফিরবেন?

গান্ধীজীর কুটিরের মধ্যে পণ্ডিত নেহর্ ব্যথিত নয়নে গান্ধীজীর শূন্য আসনের দিকে চেয়ে আছেন
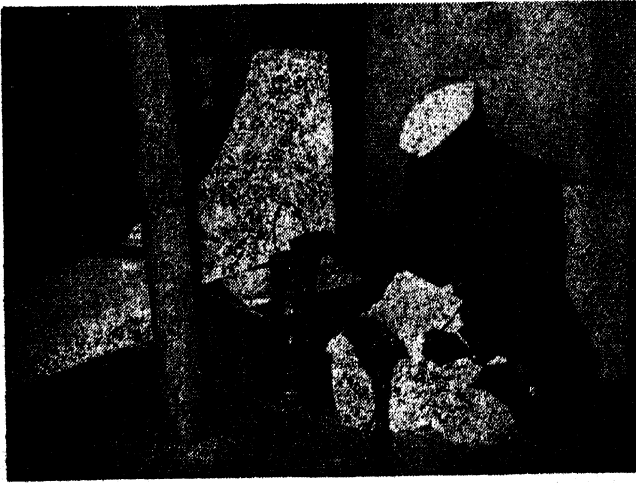
১৯৪৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বাপ্কুটির থেকে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বেতারে 'শান্তির আবেদন' প্রচার করছেন

ওপরে হাত দেখিয়ে জবাব দিলেন, 'ঈশ্বরই জানেন।'

"কিন্তু সেবাগ্রাম আশ্রমের কি হবে?" আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেন।

মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'সারা ভারতবর্ষই আজ সেবাগ্রাম হয়ে ওঠা উচিত।'

চলতে চলতে বলে উঠলেন "কাম খতম্ হোনে পর জরুর আউংগা।"

কিন্তু আর আসেননি।

তবুও যেন মনে হতো, যতবার সেবাগ্রামে গিয়েছি, ততবারই মনে হয়েছে যেন আশ্রমের প্রতিটি কাজ তাঁর অদৃশ্য হাত দিয়ে চালিত হচ্ছে।

* * * *

গান্ধীজীর সত্য আর অহিংসার গবেষণাগার ছিল সেবাগ্রাম আর ছিল "Headquarters of the Gandhian Empire."

একজন বিদেশী সাংবাদিক সেবাগ্রাম ঘুরে দেখে এসে লেখেন—

—"The Ashram was a conglomeration of dissimilar and differently cranky elements. The only common bond binding them was affection of Gandhi."

মহাদেব দেশাইয়ের ভাষায় এক সময় সেবাগ্রামের এই 'ক্যুয়ার ক্রাউড্'-এর মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ভাঁসালী, যিনি এক বছর নিজের মুখ নিজে সেলাই করে মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন আর এক বছর শুধু নিমপাতা খেয়েছিলেন; ছিলেন আরেকজন জাপানী ভিক্ষু "Who worked like a horse and lived like a hermit."

ছিলেন একজন কুষ্ঠরোগী ও আরেকজন টি বি রোগী।

* * *

সবরমতী আশ্রম ছেড়েছিলেন গান্ধীজী এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, যতদিন ভারত স্বাধীন না হবে ততদিন তিনি আর সবরমতী যাবেন না। শেঠ যমনালাল বাজাজ গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন ওয়ার্ধায় আসতে। ৭ই নভেম্বর, ১৯৩৩—ভোর বেলা গান্ধীজী এসে পৌঁছলেন বিনোবার "সত্যাগ্রহ আশ্রমে" শুরু হল এক হরিজন আশ্রম। এবার এলেন ওয়ার্ধায় মগনওয়াড়ীতে।

মীরাবেন (কুমারী ম্যাডেলিন স্লেড্) তখন থাকতেন ওয়ার্ধার কাছে সেগাঁও

নামে যমনালাল বাজাজের এক গ্রামে একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী উঠলেন সেই কুঁড়ে-ঘরে, এপ্রিল ৩০শে ১৯৩৬।

সেই কুঁড়েঘরই হলো বাপুকুটির।

গাঁয়ের নাম পাল্টে দিলেন গান্ধীজী, নাম হলো "সেবাগ্রাম"। ওয়ার্ধা শহর থেকে ৬ মাইল আঁকাবাঁকা পথ ধরে যেতে হয় সেবাগ্রামে।

"সেবাগ্রামের শান্তিই এখন আমার কাম্য" গান্ধীজী বলতেন। তিনি ঠিক করেছিলেন সেবাগ্রামে তিনি একাই যাবেন। সঙ্গে কেউ যাবে না—কস্তুরবাও

বাইরে থেকে বাপুকুটির
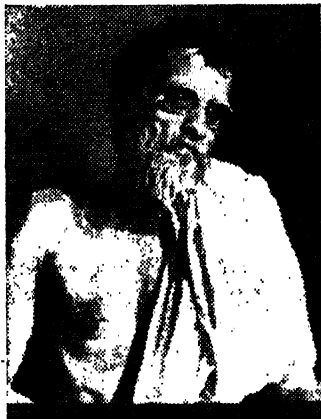
আচার্য বিনোবা ভাবে : যাঁর ভূ-দান যজ্ঞে যোগদানের জন্য আশ্রমবাসীরা সেবাগ্রাম ও বাপুকুটির বন্ধ করে চলে গিয়েছেন

না। মহাদেব দেশাই এক জায়গায় লিখেছেন যে, যখন ১৯৩৭ সালে ডাঃ জন মট্ গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তাঁদের সাক্ষাৎ হয় সেবাগ্রামের একটিমাত্র কুটিরে। ছোট ঘরটায় থাকত আরো ৪।৫জন লোক, তারা সবাই এসেছিল গ্রাম সেবার জন্য।

আস্তে আস্তে সেবাগ্রামে ভিড় হতে শুরু হল। গান্ধীজী কাউকেই "না" বলতে পারলেন না। শুরু হল ডাঃ সুশীলা নায়ারের নেতৃত্বে একটা ডিস্পেনসারী। আর্যনায়কম দম্পতি নিয়ে এলেন বেসিক স্কুল ওয়ার্ধা থেকে। সেবাগ্রামের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। এবার শুরু হল ডেয়ারী, সব্জীর বাগান, তারপর এলো গরু, বাছুর, ছাগল—সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলল।

গান্ধীজীর ছাগল ততদিনে বেশ খ্যাতিলাভ করেছে। প্রসিদ্ধ জাপানী কবি ইয়নি নোগুচী দেখা করেন গান্ধীজীর সঙ্গে ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। সেই সাক্ষাৎকে চির-স্মরণীয় করে গেছেন জাপানী কবি তাঁর এক কবিতার ছন্দে।

"I left Gandhi's tent
.. ..
under the shade of tree, three
goats are playing,
I pass them by, symbols of
toleration and love"......

'এ যে দেখছি সেই সন্ন্যাসীর গল্পেরই পুনরাবৃত্তি'—বললেন মহাদেব দেশাই, ছোট একটা কুঁড়েঘর থেকে আশ্রমের এই ক্রমবর্ধমান আয়তন দেখে। গান্ধীজীর
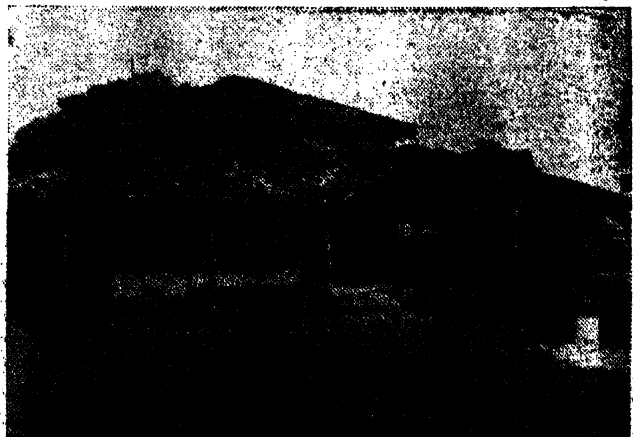
সেবাগ্রামে কস্তুরবা কুটির

সেবাগ্রামে গান্ধীজী রোপিত অশ্বত্থ বৃক্ষ

পঁচাত্তর বছরের জন্মদিনে তাঁকে একটা স্মারক গ্রন্থ দেওয়া হয়। তাতে মহাদেব-ভাই সেই সন্ন্যাসীর গল্প বলেছেন।

"The Sanyasi had a cat. A cow was needed to give it milk. Then someone to take care of the cow and so on"!

সেবাগ্রাম বেড়েই চলল গান্ধীজীর অজান্তেই। তিনি একদিন বললেন,

"I had originally thought of living and working there in solitude. But inspite of myself the place has developed into an Ashram without any rules and regulations. It is growing and new huts are springing up. Today it has become a hospital."

কৌতুক করে সর্দার প্যাটেল একদিন আশ্রমকে অভিহিত করলেন "menagerie"। গান্ধীজী হেসে বললেন, 'হোম ফর ইনভ্যালিডস্'। আরো একটু এগিয়ে গেলেন তিনি বললেন, 'লুনাটিক অ্যাসাইলাম'। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন মন্তব্য করলেন,

"Surely Swaraj through the spinning wheel can be a proposition only of a lunatic. But lucky lunatics are unaware of their lunacy. And so I regard myself as sane."

আশ্রমবাসীরা সব কাজ নিজেই করে। তবুও আশ্রম চালাবার জন্য অর্থ তো চাই। মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার এক সপ্তাহ ছিলেন সেবাগ্রামে। বাপুকে তিনি প্রায়ই এই কথা জিজ্ঞাসা করতেন। বাপু উত্তর দেন,

"In this Ashram we could live much more poorly than we do and spendless money. But we don't and the money come from our rich friends."

সকাল বিকেলে ভ্রমণের সময় গান্ধীজী যখন শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন ওয়ার্ধার রাস্তায় এই সাদা পাথরটার উপর বিশ্রাম করতেন

সরোজিনী নাইডু কিন্তু রসিকতা করে উঠলেন,

"It costs a great deal of money to keep Gandhiji living in poverty."

ছোট্ট বাঁশ দিয়ে ঘেরা মাটির এই বাপুকুটিরে কত ঐতিহাসিক ঘটনাই না হয়ে গেছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কত ঘরোয়া আলোচনা হয়েছে এই ঘরে।

এই ঘরেই আশ্রমবাসীদের হাতে বোনা তালপাতার মাদুরের ওপর বসে কথাবার্তা বলেছেন গান্ধীজীর সঙ্গে লর্ড লোদিয়ান ও স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্। জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের ভাগ্যনির্ণয় হয়েছে বহুবার এই কুঁড়েঘরে।

আজ মনে পড়ছে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। সেবাগ্রামে হচ্ছিল বিশ্ব শান্তিবাদী সম্মেলন। পৃথিবীর প্রায় তিরিশটা দেশ থেকে এসেছিলেন ১০০জন শান্তিবাদী (প্যাসিফিস্ট)। কিছুদিন আগেই শান্তিনিকেতনে সম্মেলনের উদ্যোগসভা হয়েছিল।

স্পষ্ট মনে পড়ে এখনও। সাক্ষাৎ করতে গেছি রেভারেণ্ড মাইকেল স্কটের সঙ্গে। আফ্রিকার বর্ণশংকরদের তিনি চ্যাম্পিয়ন। দাঁড়িয়ে ছিলেন বাপুর কুটিরের দরজায়। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক। আমার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ-এর আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেলেন।

ইণ্টারভিউ-এর একটা কথা আজও মনে আছে। স্কট্ বলেছিলেন,

"From Shantiniketan to Sevagram, from "Shyamali" to "Bapu Kutir," is a long pilgrimage—a pilgrimage of peace."

বিখ্যাত শান্তিবাদী হোরেস আলেকজাণ্ডার বললেন—

"Hope of humanity lies in this small, bamboo-roofed, mud-walled, single-roomed hut."

কুটিরের এক কোণে বসে অনশন করছিলেন জাপানের গান্ধীয়ান সোসাইটির সেক্রেটারী রেভারেণ্ড রিরি নাকায়ামা। আর এক কোণে বসে অনশন করছিলেন গান্ধীজীর পুত্র—মণিলাল, সবে আফ্রিকা থেকে ফিরেছিলেন তখন।

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ রাত্রে বাপুকুটির থেকে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বেতারে ঘোষণা করলেন—"ওয়ার্ল্ড পীস্

অ্যাপীল।" অল ইণ্ডিয়া রেডিও সেই ব্রডকাস্ট সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিল অন্যান্য বিদেশী রেডিও স্টেশনের সঙ্গে ব্যবস্থা করে।

হারিকেনের স্তিমিত আলোতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পড়লেন শান্তির আবেদন প্রথমে ইংরাজীতে তারপর হিন্দিতে। পাশে উপবিষ্ট বিখ্যাত শান্তিবাদীরা। সেদিন ছিল যুগাবতার যীশু খৃষ্টের জন্মদিন। তাঁর কথা মনে করিয়ে দিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আবেদনে আর স্মরণ করলেন মহাত্মা গান্ধীকে। বল্লেন,

"This is the message of the modern apostle of peace, who till the otherday walked on this earth and infected millions by his life and faith; and given from the hut which he occupied for years at Sevagram in India, on this solemn and sacred day of the birth of the Prince of Peace."

* * *

১৮ই এপ্রিল সেদিন সেবাগ্রাম আবার দেখলাম। বোধ হয় শেষবারের মতই দেখলাম। বাপুকুটির থেকে ভারাক্রান্ত মনে বেরিয়ে এলাম। কেবলই মনে হতে লাগল সেবাগ্রাম আর বাপুকুটির যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ঐ তো বাপুকুটির—দেওয়ালে মাটি দিয়ে লেখা "ওম্" আর "রাম"। মাটি দিয়ে তালপাতার নক্সা আঁকা দেওয়ালে, —অনেক পরিশ্রম করে এ'কেছিলেন মীরা বেন। দশ হাত এগিয়ে ঐ তো প্রার্থনা-

সেবাগ্রামে কর্মী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্মেলনের কয়েকজন বিদেশী সদস্য। ডানদিক থেকে ২য় ব্যক্তিই লেখক

প্রাঙ্গণ, এক্ষুনি প্রার্থনা শেষ হল। কাছেই কস্তুরবার কুঠি। পাশেই আশ্রমের রান্না-ঘর। আরেকটু এগিয়ে গেলেই মহাদেব-ভাইয়ের কুটির। ঐ তো গান্ধীজীর আর কস্তুরবার নিজে হাতে রোপণ করা দুটি গাছ। ওয়ার্ধার পথে ঐ তো সেই সাদা পাথর, গান্ধীজী কতদিন বেড়াতে এসে যেখানে বিশ্রাম করেছেন।

* * *

সেবাগ্রাম আর বাপুকুটির ছিল পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী। পরে হল জাতির পুণ্যতীর্থ। বাপুর সেই পর্ণকুটিরের সঙ্গে কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে। কত অতীত গৌরব এখানকার ধুলোয় মিশে আছে। বহুকাল কেটে গেছে, তবু সে স্মৃতি ভোলা যায় না।

আজ সেবাগ্রাম আর বাপুকুটির বন্ধ। আশ্রম আজ শূন্য। বৃষ্টি, রোদ, ঝড়ের দাপটে কতদিন থাকবে সেই কুটির? কালের বিবর্তনে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে কি?

বহুকাল পরে যারা হাঁটবে এই পথ দিয়ে—অতীতের তিমির গহ্বর থেকে সেবাগ্রাম আর বাপুকুটিরের ঐতিহ্যোজ্জ্বল কাহিনী শুনে তারা হয়ত স্তম্ভিত হবে, বিস্মিত হবে।

লল্ল যোগেশ্বরী

সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ এক সময় কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের শাসনে প্রাচীন কাশ্মীর শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৬৯৫-৭৩২ খৃঃ), অবন্তী বর্মা (৮৫৫-৮৪ খৃঃ) প্রভৃতির নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১০১৫ সালে গর্জানির সুলতান মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করেন। পরাজিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। যতটা জানা যায়, কাশ্মীর অভিযান ব্যতীত সুলতান মাহমুদের অন্য কোন অভিযানই ব্যর্থ হয় নাই।

চতুর্দশ শতকে মুসলমানগণ কাশ্মীর অধিকার করেন। সদর উদ্দীন (১৩১৯-২২ খৃঃ) কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান সুলতান। ইনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহার পূর্ব নাম রিনচেন (Rinchen)। তাঁহার মৃত্যুর পর কাশ্মীর পুনরায় হিন্দু রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩৯ সালে শাহমীর নামে মুসলমান ভাগ্যান্বেষী কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর মুসলমানগণই কাশ্মীরের ভাগ্যবিধাতা হইলেন।

এই সময় কাশ্মীর ইতিহাসের এক দুর্দিন। ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, এককথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই, কাশ্মীরের মনীষা নিঃস্ব, রিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইসলামের সংস্পর্শে কাশ্মীরের নবজন্মের সূচনা হইল। ধর্মের ক্ষেত্রে এই যুগে সমন্বয়ের সাধনা আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, মধ্যযুগের ভক্ত সাধকদিগের সমন্বয়ের সাধনার উপর ইসলামের প্রভাব উপেক্ষা করিবার মত নহে। ধর্ম যেদিন কেবল বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল, মধ্যযুগের সাধকগণই সেদিন তাহাকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠে সাম্য ও সমন্বয়ের সুর। যে ঈশ্বরের কথা . তাঁহারা বলিলেন, তিনি সম্প্রদায় বিশেষের ঈশ্বর নহেন, "তিনি সর্বজীবের প্রাণেশ্বর"। ঠাকুরঘরের ক্ষুদ্র কারাগার হইতে তাঁহারা মানুষের নারায়ণকে মুক্তি দিয়াছিলেন। যে ধর্মের কথা তাঁহারা শুনাইলেন, তাহা বিশ্ব-মানবের ধর্ম।

কাশ্মীর দুহিতা লল্লেশ্বরীও এই পথেরই পথিক। তাঁহার কণ্ঠেও শুনি মরমিয়া ভক্ত সাধকদের সুরের প্রতিধ্বনি। প্রাক্-মুসলমান যুগ হইতেই মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণ কাশ্মীরে ইস্‌লামের বাণী প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর ইঁহাদের কর্ম-তৎপরতা আরও বাড়িয়া গেল। ফলে কাশ্মীরের ধর্ম এবং চিন্তা জগতে সংঘর্ষের সূচনা দেখা দিল। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই কাশ্মীরের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিয়াছিল। লল্লেশ্বরী এই আধ্যাত্মিক নবযুগের অগ্রদূত। পাম্প্রে-থানের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৩৩৫ সালে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান এবং যাবতীয় গোঁড়ামির প্রতি তাঁহার তীব্র বিদ্বেষ দেখা যায়। এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী এবং শাশুড়ী তাঁহার উপর বহু অত্যাচার করেন। এই অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়াইয়া গেল, তখন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার অর্ধবাহ্য দশা। কাপড় চোপড় ছেঁড়া, পাগলের মত কখনও নাচিতেছেন, কখনও বা গান করিতেছেন। এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি শৈব সাধক সিধ-বায়ুর নিকট উপস্থিত হ'ন্। সিধবায়ু তাঁহাকে শৈব দর্শন এবং প্রাচীন কাশ্মীর সংস্কৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার পর বিখ্যাত মুসলমান সাধু শাহ্ হামাদান যখন কাশ্মীরে আসেন, লল্লেশ্বরী ধর্ম, দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বহু আলাপ-আলোচনা করেন। এই আলোচনা লল্লে-শ্বরীর ধর্ম-জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিল। তিনি ধর্ম সমন্বয়ের ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ব্রত সফল হইয়াছিল। বহু হিন্দু এবং মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ভক্তদিগের নিকট তিনি লাল দেদ (Lal Ded—লল্লমাতা) এবং মুসলমান ভক্তদিগের নিকট লল্ল মাজি নামে পরিচিতা। অন্যেরা তাঁহাকে লল্লেশ্বরী বা লল্ল যোগেশ্বরী আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। লল্লেশ্বরী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু-দের বিশ্বাস যে, তিনি বাতাসে মিশিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ কিন্তু কাশ্মীরের ব্রিজবিহারের জামা মসজিদের নিকট একটি সমাধি মন্দিরকে লল্ল মাজির সমাধি জ্ঞানে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন।

লল্লেশ্বরী প্রচলিত ভাষায় ধর্ম প্রচার করিতেন। লল্লবাক (লল্লবাক্য?) নামে পরিচিত তাঁহার বাণীগুলি প্রাচীন কাশ্মীর সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইংরেজী, সংস্কৃত এবং আরও কোন কোন ভাষায় লল্লবাক অনূদিত হইয়াছে। ইহার বাংলা বা হিন্দী অনুবাদ আছে কিনা জানি না। জীবনের শুচিতা, স্বার্থ-বিমুখতা, ত্যাগ এবং অনাসক্তি লল্লবাণীর মর্মকথা। বাসনামুক্ত, জিতেন্দ্রিয় মানুষই মাত্র ভূমানন্দের অধিকারী। সংযম ধর্ম সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। "শুষ্ক কাষ্ঠের মত আপন দেহ" করিতে না পারিলে মুক্তিলাভের আশা সুদূরপরাহত। একটি লল্লবাণীতে দেখি*—কেহ ঘর ছাড়ে, কেহ বা ছাড়ে বন। নিজের মনকেই যদি বাঁধতে না পারিলে, তপোবনে বাস করিয়া কি লাভ হইবে? গতানুগতিকতার পথে বা ধর্মের বহিরঙ্গ প্রতিপালন করিলেই শান্তি লাভ হয় না।

সমস্ত ধর্ম এবং দর্শন যে মূলত অভিন্ন এই পরম সত্যটি লল্লেশ্বরী উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, ভগবানকে যে নামেই ডাক না কেন, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তিনিই মুক্তি-

---

* "Some have abandoned home,
"Some the forest abode,
"What use a hermitage if thou
controllest not thy mind?"

দাতা। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" গীতার এই মহাবাক্যেরই প্রতিধ্বনি তাঁহার কণ্ঠে শুনিতে পাই।* গুরুবাক্যে যাঁহার বিশ্বাস, অন্তরে যাঁহার ভগবৎ প্রেম আছে এবং যিনি জ্ঞানের বল্গা দ্বারা মনরূপ অশ্বকে আয়ত্তে আনিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করেন।

বুদ্ধদেবের ন্যায় লল্লেশ্বরীও ভোগে এবং ত্যাগে বাড়াবাড়ির বিরোধী ছিলেন। একটি বাণীতে তিনি বলিয়াছেন—বেশী খাইয়া তোমার কোন লাভই হইবে না। ভোজন ত্যাগ করিলে তোমার অভিমান হইবে যে, তুমি তপস্বী। পরিমিত আহারে মানসিক সাম্য রক্ষিত হয়। পরিমিত আহারের ফলে সমস্ত সফলতার দ্বার খুলিয়া যাইবে।*

* "Whether it be Shiva (of Shaivites) or Keshave(!) (of Brahmins) or Kamala Janatha (Brahma) or Jina (the deity of the Buddhists or the Jains, by whatever name a worshipper may call the Supreme. He is still the Supreme and he alone can release."

* "By over-eating you will not achieve anything and by not eating at all you will become conceited by considering yourself an ascetic. Eat therefore moderately, O! Darling, and you will remain balanced. By eating moderately all the doors of success will be unlocked to you."

সাধনার পথে বাধা আসিবেই। সাধকের কিন্তু নিরাশ হইলে চলিবে না। অন্তরের মণিকোঠায় জ্ঞান ও প্রেমের দীপ জ্বালিবার চেষ্টা হয়ত বারে বারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিতে হইবে—"জীবন কণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুখে ধৈর্য ধরি......

তবেই পথের শেষে দুঃখহীন নিকেতনে একদিন যাত্রার অবসান হইবে। লল্লেশ্বরীর বাণীতেও এই সুরেরই রেশ। একটি লল্লবাণীতে দেখি—

প্রভুর সন্ধানে বাহির হইয়া সাধ্যের বেশী পরিশ্রম আমি করিয়াছিলাম। আমি শ্রান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম তাঁহার দ্বার বন্ধ। তাঁহাকে পাইবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর, আমার সংকল্প দৃঢ়তর হইল। আমি হাল ছাড়িলাম না।* এক মহামাহেন্দ্রক্ষণে অবশেষে সত্য এবং জ্ঞানময় প্রভু আমাকে কৃপা করিলেন। আমার নিজের ঘরেই তিনি আমাকে দেখা দিলেন। আমার নয়ন সার্থক হইল।**

প্রথম প্রথম অনেকেই লল্লেশ্বরীকে পাগল মনে করিতেন। "মূঢ় বিজ্ঞজন" তাঁহাকে বহু উপহাস করিয়াছে। ইঁহাদের হাতে লাঞ্ছনাও তাঁহাকে কম সহিতে হয় নাই। এই বিরূপ মনোভাব পরে একেবারে দূর হইয়া গিয়াছিল। লল্ল যোগেশ্বরী ৬০০ বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার স্মৃতি অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার বাণীগুলির জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

* "Searching and seeking Him,
I, Lalla, wearied myself
"And beyond my strength I strove
"Then, looking for Him, I found his doors closed and latched
"This deepened my longing and stiffened my resolve;
"And I would not move but stood where I was,
"Full of longing and love, I gazed on Him."

** "Passionate, with longing in my eyes, searching, wide and seeking night and day,
"Lo! I beheld the Truthful One, the Wise,
"Here in mine own House to fill my gaze
"That was the day of my lucky star
'Breathless, I hold Him my Guide to be."

মুসলমান বিজয়ের পর কাশ্মীরে ধর্মের ক্ষেত্রে যে সাধনা আরম্ভ হয়, তাহার ফলে কাশ্মীরের শৈব ধর্ম এবং বিদেশী ইসলামের সমন্বয়ে এক নূতন মতবাদ জন্মলাভ করে। এই মতে মানুষ নিজেই তাহার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ গঠন করে। অতীন্দ্রিয় কোন শক্তির সহায়তার প্রয়োজন নাই। মুক্তির জন্য প্রয়োজন অখণ্ড আত্ম-বিশ্বাস। কাশ্মীরে লল্লেশ্বরীই এই মতের পথিকৃৎ।

লল্লেশ্বরীব জীবদ্দশাতেই কাশ্মীরে আর একজন মরমিয়া সাধক আবির্ভূত হ'ন্। তিনিও ধর্ম সমন্বয়ের সাধনা করিয়াছিলেন। ধর্মে তিনি মুসলমান। তাঁহার নাম নূর উদ্দীন। বারান্তরে তাঁহার কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।*

* প্রবন্ধে উদ্ধৃত লল্লবাণী প্রেমনাথ বাজাজকৃত "The History of Struggle for Freedom in Kashmir" হইতে গৃহীত। লেখক

গ্রহান্তরের প্রাণে

জে বি এস হ্যালডেন

আগের কালের অনেক লোকের ধারণা ছিল যে, জ্যোতিষ্কগুলি হচ্ছে দেবতা আর মানুষের ভাগ্যকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের যুক্তি অনেকটা এ-রকম ঃ ভোরের আকাশে লুব্ধককে প্রথম দেখা যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীল নদে দেখা দেয় শস্যদায়িনী বন্যা; কাজেই, নীল নদের বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে লুব্ধক! এমনিভাবে আরেকটা তারা নিয়ন্ত্রণ করে মেষ-পালনের ঋতুকে, অন্য একটা গমের ফসল।

কিন্তু কতকগুলি ঘটনা, যেমন যুদ্ধ আর মহামারী, নিয়মিতভাবে ঘটে না। এদের তাই নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণ করে অন্যদের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে নিজেদের অবস্থান বদলায় এমন সব ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহগুলি। (যেমন যুদ্ধবিগ্রহের জন্য দায়ী করা হয় মঙ্গল গ্রহকে আর অন্যান্য নানারকম অমঙ্গলের জন্য দায়ী করা হয় শনি গ্রহকে ঃ অনুবাদক।) আজকের দিনেও যুদ্ধ বা মন্দা বাজারের কারণ হিসেবে আমাদের যা সব শোনানো হয়, তাদের অনেকগুলির চাইতেই এ-যুক্তি খারাপ নয়। এমন কি, দু' হাজার বছর আগেও গ্রীক আর রোমানরা, তাদের মধ্যে যদিও তারা-পুজোর প্রচলন ছিল না, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পার্থিব সমস্ত জিনিসের মতো একই উপাদানে তৈরী এ-কথা বলাকে ঈশ্বর-বিরোধিতারই সামিল মনে করতো।

অনেক কাল আগেই এ-কথা নিঃসংশয়ভাবে জানা গিয়েছে যে, সূর্যের আলো-কে প্রতিফলিত করেই চাঁদের দীপ্তি। দূরবীণ যন্ত্রে শুক্র গ্রহকে লক্ষ্য করে গ্যালিলিও চাঁদের কলার মতো বাঁকানো একটা ফালি দেখতে পেলেন। গ্রহটার গতির সঙ্গে সেটার আকার বদলায়। এ-থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল যে গ্রহগুলি পৃথিবীর মতোই ঠাণ্ডা জিনিস। (কারণ তারা যদি খুব উত্তপ্ত হ'ত তবে তাদের নিজেদেরই আলো থাকতো; আর তারা স্বতঃ-জ্যোতিষ্মান হলে তাদের সম্পূর্ণ চেহারা সব সময়েই দেখা যেতো, চাঁদের কলার মতো তাদের অংশমাত্র সময়বিশেষে দৃশ্যমান হতো নাঃ অনুবাদক।) গ্রহগুলি আর পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কোপারনিকাস-এর এই মতবাদ থেকে তাদের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হ'ল। তারপরে দূরবীণে তাদের ছায়ার পরিমাণ মেপে তাদের আয়তন নির্ধারণ করা হ'ল। দেখা গেল যে, শুক্র আর মঙ্গল আয়তনে প্রায় পৃথিবীর সমান, বুধ কিছু ছোট আর বৃহস্পতি ও শনি অনেক বড়।

এ-সমস্ত গ্রহে জীবের বসবাস আছে এরকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন বলতে আমরা যা জানি, গ্রহগুলিতে সে-ধরনের কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব কি না, তা বলতে পারার আগে এদের সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানা দরকার। দূরের নক্ষত্র ও নীহারিকাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। কিন্তু গ্রহদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান গত অর্ধ শতাব্দীতে খুব বেশি দূরে এগোয় নি।

এর কারণটা ভারি মজার। অনেক দূরের একগুচ্ছ তারার সম্বন্ধে আরো খবর জানবার ইচ্ছে হলে আমরা একটা দূরবীণ এমনভাবে সাজাই যেন ঐ তারা-গুচ্ছটাকে তার ভেতরে দেখা যায়। আমাদের নিজেদের অতি সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার সাহায্যে তারপরে সেই দূরবীণের অত্যন্ত জটিল নানারকম যন্ত্রপাতিকে এমনভাবে চালানো হয় যে, দূরবীণটা আকাশের এপার থেকে ওপারে ঐ নক্ষত্র-গুচ্ছের আপাতগতিকে অনুসরণ করে। তারপর একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে ঐ নক্ষত্রগুচ্ছের আলো দূরবীণের সঙ্গে লাগানো ফটো-ফিল্মের উপরে ফেলা হয়।

কিন্তু এভাবে মঙ্গল গ্রহের ফটো নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ গ্রহটা তার নিজের অক্ষের উপরে পৃথিবীর প্রায় সমানবেগেই ঘোরে। কাজেই এ ব্যাপারে জ্যোতির্বিদদের তাঁদের চোখের উপরেই নির্ভর করতে হয়। আর প্রকৃতপক্ষে এই গ্রহগুলির পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত কাজে সব চাইতে ভালো ফল পাওয়া যায় অপেশাদার জ্যোতির্বিদদের কাছ থেকেই। এ'দের দূরবীণগুলিও তুলনায় ছোট। এ'দের মধ্যে আছেন হাস্যরসাভিনেতা মিঃ উইল হে ও ইংলণ্ডের মফস্বল অঞ্চলের কয়েক-জন পাদ্রী।

মঙ্গল গ্রহের বেলায় আমরা তার উপরকার শক্ত আবরণটাকে দেখতে পাই। কিন্তু বৃহস্পতির বেলায়, এবং সম্ভবত শুক্র ও শনির বেলাতেও, আমরা শুধু তাদের আকাশে মেঘের উপরের অংশটাই দেখতে পাই। এই মেঘগুলিতে বোধ হয় কোনো তরল পদার্থ বা কঠিন পদার্থের কণা আছে। মঙ্গল গ্রহের ঋতু-পরিবর্তন বুঝতে পারা যায়। শীতের সময়ে মেরু-দুটিতে দেখা দেয় সাদা ঢাকনা। এগুলি নিঃসন্দেহে তুষারের আবরণ। এই তুষার বরফও হতে পারে। আবার তা জমাটবাঁধা কার্বন-ডাই-অক্সাইড্‌ও হতে পারে। বরফ-শিল্পে এই জমে যাওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড 'শুকনো বরফ' নামে ব্যবহার হয়। কার্বন-ডাই অক্সাইড বরফ-জমানো ঠাণ্ডার অনেক নীচের তাপে জমে

শক্ত হয়ে ওঠে। মঙ্গল গ্রহের স্থান-বিশেষে রং-এরও পরিবর্তন দেখা যায়। নানারকম উদ্ভিদ এই বর্ণ পরিবর্তনের কারণ হতে পারে।

এ-সব গ্রহের উপরকার নানারকম দাগ সম্পর্কে গত অর্ধ শতাব্দীতে আমরা বিশেষ কিছু নতুন খবর পাইনি বটে, কিন্তু অন্য দুটো যন্ত্রের সাহায্যে তাদের সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। দূরবীণের অলোক-কেন্দ্রে একটা খুব সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ (তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তনের হিসেবও পাওয়া যায় এর কাছ থেকে) থার্মোপাইল বসালে তাতে কোনো নক্ষত্র থেকে যে-পরিমাণ তাপ আসে, সেই তাপের সমানুপাতিক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ঐ থার্মোপাইলে। খুব পাৎলা এক পর্দা জল প্রতিফলিত সূর্যা-লোককে ঠেকাতে পারে না, কিন্তু যে-জিনিস উত্তপ্ত অথচ তাপে সাদা, এমন কি লালও হয়ে যায়নি তার তাপকে আটকাতে পারে। কাজেই থার্মোপাইলের সামনে ছোট্ট একটা জলাধার রেখে আমরা গ্রহ-গুলির তাপ মাপতে পারি।

বুধ আর শুক্র পৃথিবীর চাইতে গরম। কিন্তু শুক্রের তাপ বোধ হয় জলের স্ফুটনাঙ্কের চাইতে অনেক নীচে। আবার, মঙ্গল পৃথিবীর চাইতে ঠাণ্ডা, যদিও সেখানকার গ্রীষ্মকালে, অন্তত দিনের বেলায়, বরফ গলে জল হয়ে যায়। বৃহস্পতি বা শনির যে-অংশ আমরা দেখতে পাই, তা কিন্তু দারুণ ঠাণ্ডা। মেঘের নীচে ওদের দেহের শক্ত আবরণ কিছুটা বেশি গরমও হতে পারে, বিশেষ করে সেখানে যদি আগ্নেয়গিরি থাকে।

বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রও ব্যবহার করা যায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর ভেতর দিয়ে আলো যাবার সময়ে আলোর কয়েকটা উপাদান তা শুষে নেয়। অন্য সমস্ত গ্যাসের বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটে। ফলে শুক্র থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোককে চাঁদ থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোকের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে, প্রথমটা সাধারণ চাপযুক্ত কয়েক-শো গজ কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর ভেতর দিয়ে এসেছে।

শুক্র কিংবা মঙ্গলের আবহাওয়ায় অক্সিজেন অথবা জলীয় বাষ্প নেই। যদি থাকেও তবে পৃথিবীর তুলনায় তা নগণ্য। ফলে এ-সব গ্রহে মানুষ খনি থেকে উদ্ধার করবার যন্ত্রের অনুরূপ কোনো জিনিসের ভেতরে বেঁচে থাকতে পারে। আমার মনে হয়, শুক্র গ্রহে আদৌ কোনো রকম জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। (সম্প্রতি কয়েকজন সোভিয়েট বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছেন যে, প্রাণের সঞ্চার হবার অনুকূল অবস্থা শুক্র গ্রহে সবেমাত্র দেখা যাচ্ছে : অনুবাদক।) মঙ্গল গ্রহে যদি কোনো জীব থাকেও, তবে তা সম্ভবত আমাদের সুপরিচিত প্রাণী বা উদ্ভিদের মতো না হয়ে কালো কাদার গভীরে যে-সব জীবাণু বিনা অক্সিজেন-এ বাঁচে, তাদেরই অনুরূপ হবে। কাজেই গ্রহান্তরে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথা এখন না ভেবে আমাদের নিজেদের গ্রহটিকেই বুদ্ধিপ্রবণ জীবের পক্ষে বসবাসযোগ্য করে তোলবার দিকে মন দেওয়াটাই বোধ হয় বেশি কাজের হবে।

অনুবাদক : পরিতোষ খাঁ

ভরতপুর

নরেশচন্দ্র বসু

আগ্রা ফোর্ট থেকে মাত্র ৩৩ মাইল পশ্চিমে গেলেই পড়ে ভরতপুর। কিন্তু এই সামান্য দূরত্বেই ভরতপুর এড়িয়ে গেছে ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি। ভ্রমণকারীদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেলেও, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভরতপুর একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আজ থেকে বহুদিন আগে সপ্তদশ শতাব্দীতে রুস্তম নামে একজন জাঠ দস্যু ভরতপুরের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৭৩৩ খৃঃ মহারাজা সুরজমল রুস্তমের বংশধরগণের কাছ থেকে ভরতপুর নিয়ে শহরটিকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করেন। মোটা পরিখা ও মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা নিরাপদ ভরতপুর শতাব্দীর পর শতাব্দী শত্রু-আক্রমণকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আর এইখানেই ভরতপুরের বৈশিষ্ট্য। বানগঙ্গা, গম্ভীর এবং রূপারেল নদীতে যখন বান ডাকতো তখন তার জলটাকে প্রাচীরের পরিখার মধ্যে ধরে রেখে দিয়ে পরে তাকে লাগানো হতো কাজে। শত্রুসৈন্য যখন শহরের সীমানার মধ্যে এগিয়ে আসতো, তখন ঐ জল ছেড়ে দিয়ে তাদের করা হতো বিপর্যস্ত।

ভরতপুর দুর্গের মাটির এই প্রাচীর জোড়া আছে জওহর বুর্জ—যেখানে রাজাদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো এবং আজও হয়। আর আছে বলওয়ান্ত প্রাসাদ ও নতুন যাদুঘর যা সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও যাদুঘরটি এখনও তার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করতে পারে নি। এটি কিন্তু উদয়পুর, জয়পুর, আজমীড় প্রভৃতি রাজস্থানের বিখ্যাত শহরের যাদুঘরগুলির মত বাহ্যিক আড়ম্বরে বিড়ম্বিত নয়। এখানকার অধ্যক্ষ চতুর্ভুজদাস চতুর্বেদীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল। এমনিতেই ভদ্রলোকটি অমায়িক তার ওপর বাংলাদেশ থেকে আসছি শুনে আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখলেন না। তাঁরই একান্ত অনুরোধে ভরতপুরের প্রাচীন রাজধানী "দিগ"-এ ঐতিহাসিক তথ্যাদির খোঁজে যাই।

ভরতপুর থেকে মাত্র ২৩ মাইল দূরে "দিগ"। সুন্দর পীচের রাস্তা তার ওপর ছায়ার আঁচলখানি বিছিয়ে রেখেছে দু'পাশে গাছের সারি। এই পথ দিয়ে ২।৩ ঘণ্টা অন্তরই মোটর-বাস যাওয়া আসা করে—কাজেই যাতায়াতের কোন রকম অসুবিধে নেই। "দিগ"কে ছোট্ট একটা গ্রাম বললেও অত্যুক্তি হয় না—জনসংখ্যা খুবই অল্প, তার চেয়েও অল্প তাদের বিত্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'দিগ'-এর দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণে অবস্থিত থুন এবং সিনাসিনি গ্রামের জাঠেরা চূড়াননকে তাদের দলপতি নির্বাচিত করে 'দিগ' অধিকার করে। চূড়াননের পুত্র মুকুন্দ সিং যখন রাজা, তখন জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ থুন আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় আক্রমণের সময় চূড়ামনের ভাইপো বদন সিং আক্রমণকারীদের সাহায্য করায় জয়সিংহ 'দিগ' অধিকার করে নিয়ে পুরস্কারস্বরূপ ১৭২২ খৃঃ তাঁকে রাজা উপাধি দিয়ে 'দিগ'-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বদন সিংহের পুত্র সুরজমল ১৭৩৩ খৃঃ ভরতপুর অধিকার করে 'দিগ'কে তার রাজধানী করেন। সুরজমলের পুত্র জওহর সিংহের মৃত্যুর পর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে জাঠ দলপতিদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং এই ঝগড়ার সুযোগে নজফ্ খান কিছু অংশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮০৪ খৃঃ মহারাজা রণজিৎ সিংহ হোলকারের মহারাজাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন ও আশ্রয় দেন। ব্রিটিশ সেনাপতি হোলকারের মহারাজাকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করার জন্য বহু অনুরোধ করেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহ সে অনুরোধকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করেন। ফলে ১৮০৪ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর 'দিগ'-এ উভয় পক্ষের এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 'দিগ'-এর পতন হয় এবং মহারাজা ও তাঁর সৈন্যদল ভরতপুর দুর্গে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহ এই ভরতপুরের দুর্গকেই কেন্দ্র করে ঘটেছিল।

'দিগ'-এর প্রধান আকর্ষণ বদন সিংহের প্রাসাদ—১৭২২ খৃঃ নির্মিত হয়। রূপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটা আয়তক্ষেত্রের মধ্যে প্রস্থের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য, চারধারে প্রাসাদ দিয়ে ঘেরা

প্রাসাদের প্রবেশদ্বার

ও মাঝখানে এক অপূর্ব উদ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বদন সিংহের প্রাসাদ। সেই উদ্যানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছে একটা পথ। এই আয়তক্ষেত্রের একটা অংশ মাত্র সম্পূর্ণ, কিন্তু সেই অংশও প্রায় ৭০০ বর্গফুট। এই অংশের মাঝখানে রয়েছে পাশ্চাত্ত্যের স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী অপূর্ব ফোয়ারাগুলি। কিন্তু প্রত্যেকটি ফোয়ারার কারুকার্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু 'দিগ'-এর অন্যতম আকর্ষণ দুই স্তরবিশিষ্ট কার্নিস এবং এই কার্নিসের কারুকার্যের সঙ্গে প্রাচীন অথবা আধুনিক ভারতের কারুকার্যের তুলনা হয় না। দ্বিতীয় সারির কার্নিসগুলি ঢালু এবং এই ঢালের সামনে পর্দা টাঙ্গাবার ব্যবস্থা ছিল। যখন পর্দাগুলি টাঙ্গানো থাকতো তখন এই পর্দাগুলিকে কার্নিসের একাংশ বলেই মনে হতো। প্রথম সারির কার্নিসগুলি সমতল এবং সমতল ছাদের একাংশ বলেই মনে হয়। পাশ্চাত্ত্যের প্রাসাদগুলিতে এইরকম কার্নিস একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য বহন করে। ব্র্যাকেটের খিলানগুলির কারুকার্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের।

"It wants, it is true the massive character of the fortified palaces of other Rajput States, but for grandeur of conception and beauty of detail it surpasses them all." কিন্তু "The greatest defect of the palace is that the style, when it was erected, was losing its true form of lithic propriety. The form of its pillars and their ornaments are better suited for wood or metal than for stone architecture,......since the time when Surajmall completed this fairy creation, the tendency, not only with Rajput princes, but the sovereigns of such states as Oudh, and even as Delhi has been to copy the bastard style of Italian architecture we introduced into India" (Fergusson) এককালে শিল্পে ও স্থাপত্যের শীর্ষে আরোহণ করেছিল যে ইটালী—তার প্রতি সৌজন্যবশতই তার অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়েছিল, না ইতালীয় কোন স্থপতি-বিশারদের অদৃশ্য হস্ত এর নির্মাণকার্যে সহায়তা করেছে, কে জানে?

'দিগ'-এর দুর্গটি ভগ্নপ্রায়। সমস্ত পুরীটি জনমানবশূন্য হয়ে বন্যজন্তুর আবাসস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অচিরে এই দিকে আকৃষ্ট না হলে দুর্গের কক্ষগুলি কালের করাল গহ্বরে মিলিয়ে যাবে। একদিন যে পুরী হাস্যে, লাস্যে, উৎসবে আনন্দে নি[illegible] করে রেখেছিল, আজ সে নিঃস্ব হয়ে পথিকের করুণার 'পরে আত্মসমর্পণ করে দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যাদের ঘরের এই সম্পদগুলি শুধুমাত্র যত্নের অভাবে আজ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হতে চলেছে তাঁরা দেশান্তরী হয়ে মনের সুখে কলকারখানা, অফিস গুদাম বাড়িয়ে চলেছেন। এ'দের আয়ের সামান্যতম অংশ পেলেও এই ঐতিহাসিক পরিচয়গুলি হয়ত কোনমতে বেঁচে যেতে পারতো। কিন্তু কি বলতে কি বলছি——

রূপসাগরের তীরে বদন সিংহের প্রাসাদ

ফটো: নির্মল মল্লিক

আর্জেণ্টিনায় বিদ্রোহ

মৃত্যুঞ্জয় রায়

সম্প্রতি এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহৎ ও সম্পদশালী রাষ্ট্র আর্জেণ্টিনায় কিছু রক্তপাত হল। ঘটনাটি সাক্ষাৎভাবে আর্জেণ্টিনার ঘরোয়া ব্যাপার হলেও এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই অনেকের দৃষ্টি, বিশেষ করে বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আর্জেণ্টিনার ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাঁরা যে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য পে'র সরকার বলছেন যে, সামরিক বিদ্রোহ দমিত হয়েছে। বিদ্রোহীরা দেশ থেকে পলায়ন করেছে। দেশ এখন বিপন্মুক্ত।

আর্জেণ্টিনা সরকারের এই দাবী কতদূর সত্য বা সঠিক বলা সম্ভব নয়। কারণ বিদ্রোহীরাও পাল্টা দাবী জানাচ্ছে এবং বলছে যে, বিদ্রোহীদের কেউ কেউ দেশ ত্যাগ করলেও অন্যরা কাজ করে যাচ্ছে। এখানে-ওখানে ধ্বংসাত্মক কাজ চলছে। পে'র সরকারের কথা, প্রেসিডেণ্ট পের'-র হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে না নেয়া পর্যন্ত তারা থামবে না, ইত্যাদি। এ-পাল্টা দাবীর সত্যতা যাচাই করাও সম্ভব নয়। বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ আসছে। প্রায় সব সংবাদই পরস্পর-বিরোধী। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রচারণা ও সেন্সরের কড়া পাহারায় পরিবেষিত সংবাদ—এই দুয়ের মাঝ থেকেই সত্য সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, তাতে বলা যায়, সমস্ত পরিস্থিতিই এখন তরল অবস্থায় রয়েছে। তবে বিদ্রোহ যে দমিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে দেশে পূর্ণ শান্তি ফিরে এসেছে বা শাসন-ব্যবস্থায় ও শাসক মহলে ভাঙাগড়ার পালা শেষ হয়েছে, তা মনে করা ঠিক হবে না। নৌবাহিনীর উদ্যোগে পরিচালিত এই বিদ্রোহ হয়ত ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু এই বিদ্রোহ পে'র-র বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষেরই প্রকাশ মাত্র। উহা সাময়িক-ভাবে আবার চাপা দেওয়া হল, সুযোগ উপস্থিত হলেই আবার তা প্রকাশ পাবে এবং হয়ত বর্তমানের চেয়ে আরও মারাত্মকরূপে। কারণ ক্ষত গভীর, তা সহজে সারবার নয়।

আর্জেণ্টিনার বর্তমান বিদ্রোহ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৬ই জুন তারিখে। ঐদিন কতকগুলি জেট বিমান দুই ঝাঁকে এসে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রাজধানী বুয়েনস আয়ার্সের উপর বোমা বর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারীভাবে ঘোষিত হয় যে, নৌবিমানবহর জেনারেল জুয়ান পে'র-র সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেই ঘোষণাতেই বলা হয় যে, বিদ্রোহ শুরু হবার কয়েক ঘণ্টা আগে পোপ পের' সরকারকে 'ধর্মচ্যুত' করেছেন। এইভাবে ধর্মচ্যুতির সঙ্গে বিদ্রোহের কোন যোগাযোগ আছে কিনা, তা বলা যায় না। তবে উরুগুয়ে থেকে বিদ্রোহীরা যে বার্তা প্রচার করেছে, তাতে বলেছে যে, কোন রাজনৈতিক দল তাদের বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেনি, 'ভগবানের উপর বিশ্বাস ও দেশের মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই' তারা বিদ্রোহী হয়েছে।

যাক, বোমা বর্ষণের ফলে সরকারী ভবন (গভর্নমেণ্ট হাউস) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোষাগার, মন্ত্রীদের দপ্তরখানা ইত্যাদিও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রেসিডেণ্ট পে'র তখন গভর্নমেণ্ট হাউসে ছিলেন। বোমা বর্ষণের পরেই তিনি অন্যত্র চলে যান। বোমা বর্ষণের ফলে হতাহতের যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, ১৮০ জন নিহত, ১০০ জন গুরুতর আহত ও ৮০০ জন সামান্য আহত হয়েছে।

বোমা বর্ষণের পরেই সরকারী বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধে। কতকগুলো বিমানঘাটি, যা বিদ্রোহীরা দখল করে নিয়েছিল, তা সরকারী সেনাদল আবার দখল করে নেয়। বিদ্রোহ শুরু হবার দুদিন পরেই তা দমন করা হয়। বিদ্রোহীদের নেতারা কিছু রণসম্ভার আর বিমান নিয়ে উরুগুয়ে পালিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁরা নিজেদের বেতারে জন-সাধারণ, শ্রমিক ও স্থলবাহিনীকে বিদ্রোহে যোগদানের জন্য আবেদন জানান। জনসাধারণ ও শ্রমিকদের বৃহদাংশ পে'র সরকারের সমর্থক। তারা সরকারের ডাকে বরঞ্চ বিদ্রোহীদেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর স্থলবাহিনী একান্তভাবে সমর্থন করেছে প্রেসিডেণ্ট পে'রকে। এর জন্য সবটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য আর্জেণ্টিনার স্থল-বাহিনীর সচিব জেনারেল ফ্রাঙ্কলিন লুসার্নোর। তিনি বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করেন। ৫৮ বৎসর বয়স্ক এই জেনারেলটি ছিলেন বলেই স্থল-বাহিনী বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, বরঞ্চ রাষ্ট্রপতির প্রতি অনুগত থেকে বিদ্রোহ দমন করেছে। একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, জেনারেল হিনবার্টো মোলিনা হচ্ছেন আর্জেণ্টিনার দেশরক্ষা সচিব। ইনি লুসার্নোর ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসার। মোলিনা সামরিক অভ্যুত্থান দমনে অপারগ হওয়াতে লুসার্নো নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করে বিদ্রোহ দমন করেন।

এই ক্ষণস্থায়ী সামরিক অভ্যুত্থানের সত্যিকারের নায়ক কে বা কারা ছিলেন, তা পরিষ্কার জানা যায়নি। তবে যতদূর প্রকাশ পেয়েছে, তাতে দেখা যায়, প্রথম পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল বেনগোয়া হচ্ছেন এই বিদ্রোহের নেতা। আবার অন্য এক সংবাদে জানা যায়, রিয়ার এ্যাডমিরাল এনিবল অলিভিয়ারীই এই বিদ্রোহের নেতা। মণ্টিভিডো থেকে প্রচারিত বিদ্রোহীদের গুপ্ত বেতারকেন্দ্র থেকেও এই কথাই প্রচার করা হয়েছে। জেনারেল অলিভিয়ারী ছিলেন আর্জেণ্টিনার অন্যতম নৌবিভাগীয় মন্ত্রী। বিদ্রোহ শুরু হবার পরের দিনই নাকি তিনি 'গা-ঢাকা' দেন। ফলে তাঁকে অপসারিত করে অন্য লোককে নৌসচিব নিযুক্ত করা হয়। অন্য এক সংবাদে প্রকাশ যে, তাঁকে একদিন আগে নাৎসী-পন্থী বলে সরকারী দপ্তর থেকে অপসারিত করা হয়েছে।

ঐ দুজন ছাড়া বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছেন বলে যাঁদের নাম শোনা যায়, তাঁদের মধ্যে আছেন রিয়ার এ্যাডমিরাল স্যামুয়েল ডোরাঞ্জো ক্যালডে'র, ভাইস-এ্যাডমিরাল গারগিরো (ইনি বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর আত্মহত্যা করেন) ইত্যাদি। আর্জেণ্টিনার সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ নৌবাহিনীর তিনজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে বিদ্রোহীদের নেতা বলে ঘোষণা করেছেন। ঐ তিনজন অফিসার হচ্ছেন রিয়ার এ্যাডমিরাল এনিবল অলিভিয়ারী, রিয়ার এ্যাডমিরাল স্যামুয়েল ডোরাঞ্জো কলডে'র ও ভাইস-এ্যাডমিরাল বেঞ্জামিন গারগুইরো।

বিদ্রোহীদের আয়োজন যে নেহাৎ সামান্য ছিল না, তা বলা যায়। কারণ প্রথম আঘাত তাঁদের প্রচণ্ডই হয়েছিল। একসঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ ছড়িয়েও পড়েছিল। নিজস্ব বেতারকেন্দ্র ছিল বিদ্রোহীদের এবং সেখান থেকে প্রচারণা করার পক্ষে সুবিধা ছিল। মনে হয়, অন্যান্যদের কাছ থেকে যতখানি সাহায্য তাঁরা পাবে আশা করেছিল, তা পায়নি, তাই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে অনেক বিদ্রোহীকে পালিয়ে উরুগুয়ে চলে যেতে হয়। উরুগুয়ে সরকার অবশ্য তাদের অন্তরীণ করে রাখেন। তাছাড়া আর্জেণ্টিনাতেই যেসব বিদ্রোহী ধরা পড়েছেন, সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার হবে।

এবার আর্জেণ্টিনার সামান্য পরিচয় ও পুরানো ইতিহাস কিছু আলোচনা করব।

আর্জেণ্টিনা একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এর আয়তন হচ্ছে ১,০৭৯,৯৬৫ বর্গ-মাইল। উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তৃতি হচ্ছে প্রায় ২০৭০ মাইল। এর পূর্ব দিকে আতলান্তিক মহাসাগর, পশ্চিমে চিলি, উত্তরে বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, ব্রেজিল, উরুগুয়ে প্রভৃতি রাষ্ট্র আর দক্ষিণে চিলি এবং আতলান্তিক মহাসাগর।

প্রজাতন্ত্রী আর্জেণ্টিনায় সবশুদ্ধ ১৭টি প্রদেশ, ৭টি বিভিন্ন জনপদ ও একটি ফেডারেল জেলা রয়েছে। এর মোট লোকসংখ্যা হচ্ছে ১,৮৩,৭৯০০০ (১৯৫৩ সালের হিসেব মতে)। জনসংখ্যার বেশির ভাগই য়ুরোপীয়। দো-আঁশলা লোকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। এককালে যে ইণ্ডিয়ানরাই এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী ছিল, তারা প্রায় লুপ্ত। ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজারের মধ্যে হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

জনসংখ্যার বেশির ভাগই রোমান ক্যাথলিক। রাষ্ট্রের কোন নিজস্ব ধর্ম নেই, কিন্তু আর্জেণ্টিনার গঠনতন্ত্র অনুসারে সরকারকে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে সমর্থন করতে হয়। অবশ্য শাসন-তন্ত্রে অন্য ধর্ম সম্বন্ধেও উদার মত অবলম্বনের নির্দেশ আছে। শাসনতন্ত্রে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে, তা হচ্ছে

আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট পেরঁ

রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টকে অবশ্যই রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হতে হবে। যাহোক, জনসংখ্যার শতকরা ৯৩ ভাগ রোমান ক্যাথলিক হলেও এবং রাষ্ট্রের প্রধানও রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হলেও রোমান ক্যাথলিক চার্চ কখনও রাষ্ট্র শাসন বা ঐ প্রকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি। সে সাধারণত ধর্মপ্রচারে এবং মানুষের আত্মিক উন্নতিতেই নিজের কাজের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট পে'র এর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতেই এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। অবশ্য এ ছাড়া বিদ্রোহের অন্য কারণ থাকাও সম্ভব। সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার পূর্বে আর্জেণ্টিনার অতীত ইতিহাস, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস জানা দরকার। কারণ তাতে বর্তমান বিদ্রোহের পটভূমিকা ভাল করে অনুধাবন করা যাবে। তাছাড়া আর একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যায়, সে হচ্ছে যে, আর্জেণ্টিনায় সম্প্রতি যে সামরিক বিদ্রোহ ঘটল, তা সে-দেশের পক্ষে নতুন কিছু নয়। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে অর্থাৎ আর্জেণ্টিনার বর্তমান প্রেসিডেণ্ট জেনারেল জুয়ান ডোমিনগো পে'র নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত বার তিন-চার সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এই বিদ্রোহের ফলে রক্তপাত যে প্রচুর হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। যাক, প্রথম থেকে শুরু করি।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ডন জুয়ান দিয়াজ দা সোলিস নামক জনৈক স্পেনীয় দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলস্থ রিয়ো দা লা প্লাটা আবিষ্কার করেন। স্পেন সরকার ১৫৩৪ সালে ডন পেড্রো দা মেণ্ডোজাকে পাঠান ঐ এলাকা দখল নেবার জন্য। ১৫৩৬ সালে মেণ্ডোজা বুয়েনস আয়াস জনপদটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বৃহত্তম জনপদ এবং বর্তমানে আর্জেণ্টিনার রাজধানী। স্পেনীয়দের ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গিয়ে বহু জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। কারণ ঐ অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানরা বিদেশী শ্বেতকায়দের বিদূরণের জন্য মরণপণ লড়াই করেছে। তারা জানত, এদের এক্ষুণি তাড়াতে না পারলে ওরাই তাদের নিশ্চিহ্ন করবে এবং কার্যত করেছেও তাই। যাহোক, ঐ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত চলেছে একটানা গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। তারপর সর্বপ্রথম ১৮৫৩ সালে সে অঞ্চলে একটি স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি শাসনতন্ত্রও গৃহীত হয়। এই শাসনতন্ত্র অনুসারেই আর্জেণ্টিনা শাসিত হত। অবশ্য ১৯৪৯ সালে প্রেসিডেণ্ট পেরঁ ঐ শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আর্জেণ্টিনার শাসনতন্ত্র অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে রচিত। পার্থক্যটা হচ্ছে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা রয়েছে অধিক। কেন্দ্র ইচ্ছে করলেই প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। গঠন-তন্ত্র অনুসারে আইন করার ক্ষমতা রয়েছে দুইটি পরিষদে বিভক্ত কংগ্রেসের হাতে।

পরিষদের একটির নাম হচ্ছে সিনেট। এর সদস্য-সংখ্যা ত্রিশজন। অপর পরিষদ চেম্বার অব ডেপুটির সদস্য-সংখ্যা হচ্ছে ১৫৮ জন।

১৮৫৩ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রেসিডেণ্ট ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন-প্রার্থীকে অবশ্য আর্জেণ্টেনীয় এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী হতে হবে। তিনিই হবেন নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ এবং তিনিই সমস্ত সামরিক অফিসারদের নিয়োগ করবেন। একজন নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেণ্টও থাকবেন এবং তিনিই সিনেটের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁকে সাহায্য করার জন্য আটজন মন্ত্রী নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন।

১৮৫৩ সালে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং যার প্রধান ধারাগুলি উপরে বলা হল, তা ১৮৬০, ১৮৬৬, ১৮৯৮ এবং সর্বশেষ ১৯৪৯ সালে সংশোধিত হয়। প্রেসিডেণ্ট পে'র প্রথম থেকেই ছিলেন অনেকটা ডিক্টেটর মনোভাবাপন্ন। নিজের সুবিধার জন্য তিনি তাই শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করেন এবং মনে হয়, সেদিন থেকেই চার্চের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত করেন। কারণ সেই দিনের পর থেকে তিনি যেভাবে কাজ চালাতে থাকেন, তা চার্চের তথা পোপের মনঃপূত হয়নি। তবে প্রথম দিকে তাঁরা এ ব্যাপারে কোন-রূপ হস্তক্ষেপ করেননি, কিন্তু পরে প্রেসিডেণ্ট পে'র এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন, যার ফলে ভ্যাটিকানও তৎপর হয়ে উঠল। বিরোধ জোর বাধল। সে কথা যথাস্থানে বলছি, এখন পুরানো ইতিহাসে ফিরে যাই।

১৮৫৩ সালে নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন জাস্টো জোসে দা উরকুইজা। তারপর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন দারকুই। তাঁর সময়ে রাষ্ট্রে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গৃহযুদ্ধের ফলে তিনি পরাজিত হন, ফলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। তাঁর স্থলে ১৮৬২ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন মিট্র্। তারপর অনেকে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হয়ে দেশের উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু গৃহবিরোধ ও সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সঙ্গে বৈরিতার জন্য তাঁদের বহু শক্তি ক্ষয় করতে হয়। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট জেনারেল পে'র নির্বাচিত হবার পূর্বে আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট হন জেনারেল অডেলমিরো জে ফ্যারেল। এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তিনি প্রেসিডেণ্ট হন। কিন্তু দু' বছর পরেই (১৯৪৬ সালে) তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

ফ্যারেলের পূর্বে যে দু'জন প্রেসিডেণ্ট হন তাঁরাও ছিলেন সামরিক অফিসার—এক একজন জেনারেল। তাঁরা যেমন সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেণ্ট হন, তেমনি প্রেসিডেণ্ট পদ থেকেও ঐভাবে অপসারিত হন। অর্থাৎ দেখা যায় ১৯৪৩ সাল থেকেই আর্জেণ্টিনায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন প্রায় সামরিক অভ্যুত্থানের ফলেই হচ্ছে। অবশ্য এর আগেও যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন ও অবসর গ্রহণ সব সময় আইনানুগ পদ্ধতিতে হয়েছে তা নয়। সামরিক কর্তারা কোন না কোন ভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করেছেন।

যাক, পূর্বেই বলেছি বর্তমান প্রেসিডেণ্ট কর্নেল জুয়ান ডোমিনগো পেরঁ নির্বাচিত হন ১৯৪৬ সালে। এর আগে তিনি ছিলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট। তাছাড়া সমর সচিব, শ্রম সচিব হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন। সেনাবাহিনীর চাপে তাঁকে ঐ সব ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয় কিন্তু এজন্য জনসাধারণ ভীষণভাবে আন্দোলন আরম্ভ করে। এর ফলে তিনি সব ক্ষমতা ফিরিয়ে পান। তাঁরই চেষ্টায় ১৯৪৬ সালে আবার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় এবং তিনি ভোটাধিক্যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ছয় বৎসর পর পুনর্বার তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। তাঁর এই সাফল্যের মূলে তাঁর স্ত্রী ইভা পেরঁ-র অনেকখানি হাত ছিল। ইভার চেষ্টাতেই শ্রমিক ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন তিনি পেয়েছেন ও পাচ্ছেন।

এবার সাম্প্রতিক বিদ্রোহের সম্ভাব্য কারণ (সম্ভাব্য বলছি এজন্য যে, বিদ্রোহের সঠিক কারণ এখনও কোন বিশ্বাস-যোগ্য উৎস থেকে জানা যায় নি। সরকার পক্ষ এবং বিদ্রোহী পক্ষ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

এই বিদ্রোহের তিনটি কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম হচ্ছে, ক্ষমতা হস্তগতের জন্য সামরিক ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে চার্চের বিরুদ্ধাচরণ করায় পেরঁকে অপসারণের জন্য চার্চের গোপন উস্কানি।

প্রথম কারণটি এই বিদ্রোহের জন্মদাতা হতে পারে বলে মনে হয় না, কারণ বিদ্রোহের নেতা হিসাবে যাদের নাম প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা কেহই প্রথম শ্রেণীর সামরিক নেতা নন। দ্বিতীয়ত, স্থলবাহিনীর কোন বিশিষ্ট অফিসারের যোগাযোগ ভিন্ন এই প্রকার অভ্যুত্থান সফল হবার সম্ভাবনা কম। এই বিদ্রোহে তেমন কোন যোগাযোগ দেখা যায় না, বরঞ্চ স্থলবাহিনী প্রেসিডেণ্টের প্রতি অনুগতই ছিল। অবস্থা দেখে মনে হয় এই সামরিক বিদ্রোহের কারণ ক্ষমতা লাভের আগ্রহ নয়, এর প্ররোচনা এসেছে অন্য কোন খান থেকে, যাদের উৎসাহের ফলে সামরিক বাহিনীর একাংশ প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে তথা সমগ্র সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহী হয়েছে। ধর্ম তথা ভ্যাটিকানের নীরব উৎসাহ এই বিদ্রোহের কারণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কম্যুনিস্টদেরও বিদ্রোহে হাত থাকতে পারে বলে অনেকে সন্দেহ করেন। প্রেসিডেণ্ট পেরঁ'ও তাঁর বেতার বক্তৃতায় বলেছেন যে,

'the fight was started as usual by a cancus of foreign and national enemies'.

অর্থাৎ কতিপয় বৈদেশিক ও দেশীয় শত্রু দ্বারাই এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। তিনি আর একবার বলেছিলেন যে, কম্যুনিস্টরা বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ধ্বংসাত্মক কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চার্চ ইত্যাদি ধ্বংস করে অবস্থা আরও ঘোরালো করে তুলেছে। তাই বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিস্টদের গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়।

কম্যুনিস্টদের উপর বিদ্রোহের প্ররোচনা দানের অভিযোগ আরোপ করলেও তা খুব টেঁকসই বলে মনে হয় না। কারণ, প্রথমত, কম্যুনিস্ট পার্টি আর্জেণ্টিনায় বেআইনী সংস্থা। তারপর তাঁদের যে শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী তারা পেরঁ সরকার সমর্থক। প্রেসিডেণ্ট পেরঁ-র স্ত্রী

এভিটা পের'র প্রচেষ্টায় শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণও পের'-কে কায়মনবাক্যে সমর্থন করে। এই বিদ্রোহে তাদের আচরণও সেকথা প্রমাণ করেছে। সুতরাং মনে হয় কম্যুনিস্টরা বিদ্রোহের সুযোগে ফ্যাসিস্ট মনোভাবাপন্ন পের' সরকারকে নাজেহাল করার জন্য কিছু ধ্বংসাত্মক কার্য করলেও এই বিদ্রোহে তাদের কার্যত কোন হাত ছিল না। সুতরাং মাত্র তৃতীয় কারণটি অবশিষ্ট থাকে এবং তা হচ্ছে চার্চের সঙ্গে বিরোধ। চার্চ অর্থাৎ ধর্মের অবমাননাই এক শ্রেণীর সামরিক কর্মচারীকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছে। সঙ্গে তাঁদের কিছু ব্যক্তিগত কারণ থাকা স্বাভাবিক।

চার্চের সঙ্গে বিরোধের ফলেই যে এ বিদ্রোহ প্রেসিডেন্ট পের' কিন্তু তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বিদ্রোহের পেছনে ধর্মসংক্রান্ত কোন সমস্যা ছিল আমি তা মনে করি না। কিন্তু একথা সকলেই জানে যে, তাঁর সঙ্গে ভ্যাটিকানের বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল। চার্চের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তিনি যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা পোপের বিরক্তির কারণ হয় এবং পোপ চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসাবে তাঁকে, তাঁর সরকারকে 'ধর্মচ্যুত' করেন, এবং এই আদেশ জারীর কয়েক ঘণ্টা পরেই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। উহা কি কাকতালীয় ব্যাপার? আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না।

চার্চের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পের'-র বিরোধ খুব বেশী দিনের সৃষ্ট ব্যাপার নয়। প্রথমে চার্চ তাঁকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতেন। তিনি যখন প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তখন বুয়েনস্ আয়ার্সের আর্কবিশপ প্রকাশ্যে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং ভগবানের শুভেচ্ছা প্রেসিডেন্টের উপর বর্ষিত হোক—তাই প্রার্থনা করেন। কিন্তু গত বছর থেকে চার্চের সঙ্গে পের'-র বিরোধ বেঁধে ওঠে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চার্চের প্রভাব। চাকুরিজীবী, শ্রমিক, ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর চার্চের প্রভাব বৃদ্ধি পের'কে শঙ্কিত করে তোলে। তিনি ওগুলোর ভিতরে ক্যাথলিক রাজনৈতিক দল গঠনের আভাস পান। কোন দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধতা সহ্য করা পের'র স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি শঙ্কিত মনে ঐ উন্নতিশীল দলের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। গত অক্টোবর মাস থেকে তিনি চার্চের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা হ্রাস করার ইচ্ছায় চার্চ পরিচালিত স্কুলসমূহে যে অর্থসাহায্য করা হত তা বহুলাংশে হ্রাস করেন, বহু পুরোহিত যাঁরা বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার কার্য করতেন, তাঁদের স্কুল থেকে বিতাড়িত করেন, যাজক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমিতির সদস্য যে সব সরকারী কর্মচারী তাঁদেরও সরকারী চাকুরি থেকে বিতাড়িত করেন. পুলিস ক্যাথলিকদের বহু সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, সরকারের প্রতি 'অসৌজন্যের' অভিযোগে অন্তত ১৩ জন ধর্মযাজককে গ্রেপ্তার করেন। ধর্মসম্পর্কিত শোভাযাত্রাদিও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিরোধের কারণ এখানেই শেষ হয়নি। পে'র সরকার কার্যত রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধচারণ করার জন্য পর পর তিনটি আদেশ জারি করেন। তা হচ্ছে, (১) স্কুলসমূহে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার অধিকার থেকে চার্চকে বঞ্চিতকরণ, (২) ডিভোর্সকে আইনসম্মতকরণ এবং (৩) ১৮ বৎসর পূর্বে যে বেশ্যাবৃত্তি আইনবিরুদ্ধ কাজ ছিল তাহাতে সম্মতি দান। এই সব আইন রচনা প্রত্যক্ষভাবে চার্চেরই বিরুদ্ধাচরণ। এই সম্পর্কে এক বেতারবাণীতে প্রেসিডেন্ট পের' বলেন যে, কিছু রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত এবং ক্যাথলিক অ্যাকশন সমিতির সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য জাতীয় সংস্থায় অনুপ্রবেশ করছে এবং কার্ডোবা, লা রিয়োজা ও সান্টা ফে'র বিশপগণ রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, তাই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চার্চ এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। পেরোনিস্টা পার্টি ও জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার ধর্মযাজকদের ঐ প্রকার 'অনুপ্রবেশের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শোভাযাত্রা করে। ক্যাথলিকরাও প্রতিশোভাযাত্রা বের করে। চার্চ-পের' বিরোধ অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত পোপ পের' সরকারকে 'ধর্মচ্যুত' করেন। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পরিহারের চেষ্টা, রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূসম্পত্তির উপর কর ধার্যকরণ, কোন কোন ধর্মযাজককে গ্রেপ্তার ও পদচ্যুতকরণ যে এক শ্রেণীর ধর্মভীরু সামরিক অফিসারকে বিদ্রোহে উদ্বোধিত করেছে, তাতে কোন ভুল নেই। ক্যাথলিক ধর্মযাজকরাও পূর্ব থেকেই বিদ্রোহ প্রচার করে আসছিল। সুতরাং বিদ্রোহের পথ অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছিল এবং তার প্রধান কারণ চার্চের সঙ্গে বিরোধ। বিংশ শতাব্দীতে ধর্মের কারণে এ ধরনের আজও বিদ্রোহ দেখা দেয়!

বিদ্রোহের ফলে আর্জেণ্টিনার কি অবস্থা হয়েছে সংক্ষেপে বলে প্রবন্ধ শেষ করব। প্রথমত, যে সব সংবাদ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট পের' রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হতে কার্যত বিদায় নিয়েছেন। এখন জেনারেল লুসারের নেতৃত্বে এক জঙ্গী গোষ্ঠীই দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন। পের' সরকারের মন্ত্রিসভাও পদত্যাগ করেছে বলে সংবাদ এসেছে। তাছাড়া পোপ কর্তৃক ধর্মচ্যুত হওয়ায় পের' প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্যতা হারিয়েছেন শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে।

চার্চের ক্ষমতা খর্ব করার ব্যাপারে এবং ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে পের' হঠাৎ অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের যুগে তাঁর ফ্যাসীবাদী মেজাজ ও ক্ষমতা বজায় রাখতে গিয়ে এই বিপদ ডেকে এনেছেন। তাই এখন অবস্থাটা বুঝতে পেরে নরম সুরে বলছেন, 'আমি নিজে একজন ক্যাথলিক এবং আমার দলে বহু ক্যাথলিক আছেন। ক্যাথলিক ধর্মের উপর আক্রমণ আমার অভিপ্রেত নয়। আমরা কেবল বিবেকের স্বাধীনতা চাই।'

যাক, যে সমস্যা নিয়ে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার সমাধান হওয়া দরকার, নচেৎ গায়ের জোরে বিদ্রোহ দমন করা গেলেও দেশে স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়।

সেকালের শিক্ষাব্রতী

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা। মেট্রোপলিটান কলেজে পড়ি। এখন এই কলেজের নাম হয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজ। সারদারঞ্জন রায় (সংক্ষেপে এস রায়) তখন আমাদের অধ্যক্ষ। আর জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি সংক্ষেপে জে আর ব্যানার্জি নামে পরিচিত) ছিলেন আমাদের উপাধ্যক্ষ। পরে তিনি অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজীতে অনার্স নিয়েছি। আমার তিনটি পাঠ্য বিষয় ছিল বাংলা, অঙ্ক আর সংস্কৃত। কুঞ্জলাল নাগের কাছে ইংরাজী পড়া আমাদের বহু ভাগ্যের কথা বলে মনে হত। তিনি তখন টাইফয়েড থেকে উঠেছেন। কলেজে আসতেন একখানি পাল্কি করে। তিনি সপ্তাহে মাত্র দু-তিনদিন ইংরাজী অনার্স পড়াতেন। দোতলায় উঠতে পারতেন না। নিচেয় রসায়ন ক্লাসের গ্যালারিতে পড়াতেন। তিনি যখন সেক্সপীয়র পড়াতেন, তখন প্রত্যেক কথাটার ধাতু কোথা থেকে এসেছে, ল্যাটিন থেকে কি এ্যাংলো-স্যাক্সন থেকে কি ওল্ড ইংলিশ থেকে, সেগুলি বলে বুঝিয়ে দিতেন। ইংরাজী 'গো' শব্দটির অতীত কালের রূপ 'ওয়েণ্ট' হল কি করে এবং 'এক্সপোজ', কনজাংশন প্রভৃতি প্রত্যেক কথার ধাতুগত অর্থ বলে দিতেন। আবার যখন সেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করতেন, তখন এক-একটি লাইন বলতেন আর তার প্যারালাল প্যাসেজ বলতেন সেক্সপীয়রের বত্রিশখানি নাটক থেকে। সমস্ত ইংরাজী সাহিত্য যেন তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমরা প্রতিদিন তাঁর পড়ান শুনতাম, আর প্রত্যেক কথাটি বইয়ের মার্জিনে শরু পেন্সিল দিয়ে লিখে নিতাম। একটি কথাও যেন বাদ না পড়ে যায়। কারণ এ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় ত কোন অর্থপুস্তকে পাওয়া যাবে না।

অন্য কলেজের ছাত্রেরাও কুঞ্জবাবুর পড়ান শুনতে আসত। তখন আমরাও এক-একদিন রিপন কলেজের জানকী ভট্টাচার্য, কোনদিন বা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনা শুনতে যেতাম। তিনজনেই তখন কলকাতায় ইংরাজী সাহিত্যের অতুলনীয় অধ্যাপক। কুঞ্জবাবুর অধ্যাপনার ধরন পূর্বেই বলেছি। প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক জানকী ভট্টাচার্যের বিশেষত্ব ছিল, তিনি ভাষাতত্ত্বের দিকে বড় যেতেন না। সেক্সপীয়রের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করতেন, যা একবার শুনলে চিরদিন মনে থাকে। জানকীবাবু কথা বলতেন খুব আস্তে আস্তে। তখন এক সেকশনে ছাত্র ছিল প্রায় দেড়শ'। ক্লাসের শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা পৌঁছুত না। আজ যদি তিনি থাকতেন, তাহলে হয়ত বর্তমান যুগের ছাত্রদের যেরকম রীতিনীতি দেখি, তাতে মনে হয় যে, ছেলেরা রীতিমত 'কলেজে এ প্রফেসর রাখা চলবে না।' স্লোগান দিয়ে তাঁকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ত। কিন্তু তখনকার দিনের ছাত্ররা বই আর একটা খুব শরু করে কাটা পেন্সিল নিয়ে তাঁর চেয়ারের চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত। আর একটি কথা তাঁর মুখ থেকে বেরুলেই সেটি টুকে নিত। আমরাও তাই করতে লাগলাম। রিপন কলেজের ছেলেরা বলত, জানকীবাবুর পড়ান শোনার পর তাদের আর বাড়ি গিয়ে কিছু পড়তে হত না। কেবল পরীক্ষার পূর্বে শুধু বইতে টোকা সেই নোটগুলি একবার দেখে নিলেই হত। কথাটা ছিল সম্পূর্ণ সত্য।

জানকীবাবু ক্লাসে পড়াবার সময় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। শুধু পড়ানর ভেতর তন্ময় হয়ে ডুবে যেতেন। একদিন তিনি এই রকম তন্ময় হয়েই ক্লাসে পড়াচ্ছেন। কখন যে ঘণ্টা বেজে গিয়েছে, তিনি শুনতে পাননি—কোনদিন পেতেনও না। অন্য ক্লাসের ছেলেরা সেই ক্লাসের দরজায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। চিৎকারও আরম্ভ করেছে। কারণ সেই পিরিয়ডে তাদের এই ঘরে ক্লাস বসবে। অবশেষে বাইরের চিৎকার তাঁর কানে গেল। তিনি ক্লাসের একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'Is the bell gone?'

ছেলেটি বললেন—'Yes Sir.'

জানকীবাবু তখন ঝড়ের বেগে রোল কল করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। জানকীবাবুর অপূর্ব অধ্যাপনায় মুগ্ধ ছাত্ররা তখন যে ছেলেটি বলেছিল—'Yes Sir.' তার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে তাকে এই মারে ত এই মারে। কারণ সে যদি না বলত, তাদের আরও কিছুক্ষণ জানকীবাবুর পড়া শোনবার সৌভাগ্য হত।

আমরা বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অতুলনীয় অধ্যাপক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনাও শুনতে যেতাম। তাঁর রং ছিল অত্যন্ত কাল। আর চেহারাটা ছিল বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তিনিও সেক্সপীয়র পড়াতেন। তাঁর পড়ানর বিশেষত্ব ছিল দুটি। একটি হল তিনি যে অংশটি পড়াতেন, সেটি আগে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর সেই ভাবের কবিতার পংক্তি ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য থেকে অনর্গল বলে যেতেন। তাতে জিনিসটা বেশ পরিষ্কার হত। তাঁর ইংরাজী, সংস্কৃত আর বাংলা সাহিত্যের জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

দ্বিতীয়ত, তাঁর বলবার ধরন ছিল এমন যে, তাঁর পড়াবার সময় ক্লাসে হাসির ফোয়ারা ছুটত। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক। ক্লাসশুদ্ধ ছেলে হাসচে। তিনি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতেন না। গম্ভীর হয়ে পড়িয়ে যেতেন। হাসির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য পরিবেশন করে যেতেন। সুতরাং তাঁর ক্লাসে আনন্দ ছিল বেশি। নিছক জ্ঞান ছাড়াও এই যে আনন্দময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হত, এও ছাত্রদের পক্ষে একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টার পরিচয় তাঁর 'ব্যাকরণ বিভীষিকা', 'ফোয়ারা' প্রভৃতি বহু পুস্তকে এবং 'ফোড়ার ফাড়া', 'ক কারের অহঙ্কার' প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধে।

একদিন শুনলাম, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আসবে কলেজ দেখতে আর কলেজের পড়ান শুনতে। কমিশন এল। তার সভ্য ছিলেন অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, গ্ল্যাসগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ উপাচার্যগণ, আর এদেশের মধ্যে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ। কলেজ কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, কমিশনের সভ্যদের তাঁরা কুঞ্জলাল নাগের অধ্যাপনা শোনাবেন।

একতলার ক্লাসে আট-দশখানা চেয়ার পড়ল। কমিশনের সভ্যরা সব কাগজ-পেন্সিল নিয়ে কুঞ্জবাবুর টেবিলের চারিদিকে ঘিরে বসলেন। অধ্যাপক যা পড়াবেন, তাঁরা সব লিখে নেবেন। স্যার আশুতোষ ক্লাসে অধ্যাপনা শুনতে এলেন না। স্যার মাইকেল স্যাডলার তাঁকে ডাকলেন। আশুতোষ বললেন—'আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই, তখন কুঞ্জবাবু ছিলেন বর্তমান কলেজের অধ্যক্ষ। আমি ও'র পাণ্ডিত্যের কথা খুব জানি। আমার খাতা তখন ও'র কাছে পড়েছিল। আমার শোনবার প্রয়োজন নেই। আপনারা শুনুন।'

আশুতোষের তখন যৌবন। ইয়া বিরাট গোঁফ ঠোঁট দুটিকে ডিঙিয়ে নিচেয় এসে পড়েছে। মাথার চুলগুলি খুব ছোট ছোট করে ছাটা। গায়ে একটি গলা-আঁটা শাদা কোট, হাঁটু পর্যন্ত এসে পে'ৗচেছে। পরনে একখানি মোটা থান কাপড়। তাঁর পা দুটি ছিল খুব বড়। দুপায়ে দুটি বিশাল লাল রংয়ের ফিতে বাঁধা জুতো। আর কোটের ওপর কাঁধে ঝুলছে একখানি ভাজ-করা চাদর। হাতে একগাছি লাঠি। এই পোশাকে তিনি স্যাডলার কমিশনের সভ্যরূপে ভারতবর্ষময় কলেজ দেখে বেড়িয়েছেন। সেটা বোধ হয় ১৯১৭ সালের কথা।

যাই হোক, স্যার আশুতোষ ক্লাসের বাইরে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের সংগে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করতে লাগলেন।

ক্লাসের ভেতর কুঞ্জবাবু হাতের লাঠিগাছটি টেবেলির ওপর রেখে পড়াতে আরম্ভ করলেন। অন্য দিন যেমন হাত নেড়ে পড়ান, ঠিক সেই রকমই পড়াতে লাগলেন। এতগুলি যে বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী তাঁকে ঘিরে বসেছেন, সেদিকে দ্রূক্ষেপও করলেন না। গম্ভীর হয়েই পড়াতে লাগলেন। গায়ে তাঁর একটি পাঞ্জাবী। আর চাদরের বদলে তার গলায় চাদরের মতন করেই এক পাক জড়ান থাকত একটি গরম কম্ফটার। পরনে একখানি ধপধপে কাপড়। আর পায়ে এক-জোড়া গ্রিসিয়ান স্লিপার। সে-যুগে গ্রিসিয়ান স্লিপার আর কারও পায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তিনি ম্যাকবেথ পড়াতে আরম্ভ করলেন। যে দৃশ্যে দর্জি লোকের কাপড় চুরি করে নরকে গিয়ে দরজায় ঠক্ ঠক্ করচে সেই দৃশ্য। এক লাইন করে পড়ান, আর তার ভেতর যে ক'টি শক্ত কথা আছে, সেগুলি কোন্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে—ল্যাটিন, না এ্যাংলো-স্যাক্সন আর সেই ধাতু থেকে আর কি কি কথা নিষ্পন্ন হয়েছে, সেগুলি আমরা কি কি অর্থে ব্যবহার করি, এই সব কথা অনর্গল এবং অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন। ইংরাজী ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্য না থাকলে এসব কথা বলা অসম্ভব। আবার ইংরাজী কথা গঠনে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র পর্যন্ত বলতেন। কোন্টি বর্তমানে স্থ, কোন্টি-বা অপর কিছু।

ব্যাকরণগত কথা শেষ করে এইবার ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। তারপর চলল প্যারালাল প্যাসেজ সারা ইংরেজি সাহিত্য থেকেই। মানুষ এক জীবনে যে এত বিদ্যা সঞ্চয় করতে পারে, শুধু শিখে সঞ্চয় করা নয়, সেগুলি মনে রেখে প্রয়োজনমত ঠিক জায়গায় ব্যবহার করা, আমাদের মত সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বলে মনে হয়। যাই হোক, আমরা ত অন্য দিনের মত তাঁর অধ্যাপনা মুগ্ধ হয়েই শুনতে লাগলাম, আর ভাবচি কমিশনের সভ্যরা এই অধ্যাপনা কিভাবে নেবে, তাঁদের মত অদ্বিতীয় পণ্ডিতদের কাছে আমাদের ভারতবাসীর মুখে বিদেশী ভাষার ভেতর দিয়ে, তাঁদেরি শ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপীয়রের নাটকের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ কেমন লাগচে।

এক ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। দুঃখের দিনই দীর্ঘ মনে হয়—যেন আর কাটতে চায় না। কিন্তু এমন অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় শুনতে শুনতে সময়টা কোথা দিয়ে কেটে গেল বোঝা গেল না। ঘণ্টাও বাজল। কুঞ্জবাবু—'I stop here to-day' বলে বই বন্ধ করলেন। স্যার মাইকেল স্যাডলার প্রভৃতি সকলে একে একে কুঞ্জবাবুর সংগে করমর্দন করে বললেন—'আপনি কতদিন সেক্সপীয়র পড়াচ্ছেন?'

কুঞ্জবাবু বললেন—'জীবন ভোর।' তারপর বললেন—লুকোচুরি না করে সত্য কথা আপনাদের খুলে বলাই ভাল। আমি এম-এ—সংস্কৃতয়—ইংরাজীতে নয়। তাও আবার তৃতীয় বিভাগে।

স্যাডলার প্রভৃতি তাঁকে জানালেন—ইংলণ্ডের বাইরে এসে এমন পাণ্ডিত্যের সংগে সেক্সপীয়র পড়ান শুনবার তাঁরা আশা করেননি।

তারপর স্যার মাইকেল স্যাডলার স্যার আশুতোষকে বললেন—আপনি এরকম সেক্সপীয়র পড়াবার লোক পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে নিয়ে যান না কেন?

আশুতোষ বললেন—আমি ত ওঁকে অনেকবার নিয়ে যেতে চেয়েছি। উনি বয়স হয়েছে বলে নিজেই যেতে চান না।

কুঞ্জবাবু বললেন—আমার বয়স বাহাত্তর বছর। এ বয়সে আর নতুন করে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব নয়।

বাহাত্তর বৎসরের বৃদ্ধের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করবার জন্যে স্যার আশুতোষকে অনুরোধ করলেন, এমনকি এমন পণ্ডিত ব্যক্তিকে স্যার আশুতোষ এতদিন নেন নি বলে তাঁকে অনুযোগও করলেন। কিন্তু আজকালকার নিয়ম অনুসারে শিক্ষা বিভাগের লোক ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হলেই তাঁকে অবসর নিতে হয়। ষাট বৎসর পর্যন্ত যে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন, তিনি যদি সুস্থ ও সবল থাকেন, তবে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর অর্জিত বিদ্যা যদি দেশবাসী গ্রহণে বিমুখ হয়, তবে সেটা দেশেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

এবার সংস্কৃত সাহিত্য পড়ানর কথা বলি। যিনি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়াতেন, তিনি ব্যাকরণের কচকচির ভেতর আটকে পড়তেন। তিনি শকুন্তলা, দুষ্মন্ত, বিদূষক প্রভৃতির চরিত্রের অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিশ্লেষণ, ঘটনার অপরূপ সমাবেশ তেমন অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ভেতর যে রূপের খনি আছে, তার ভেতর যে কি অপরূপ সৌন্দর্য আছে, তার পরিচয় আমরা পেতাম পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভেতরে। তিনি আমাদের পড়াতেন 'উত্তররামচরিত'। তেতলার বিরাট হলে দেড়শ' ছেলের ক্লাসে তিনি আমাদের পড়াতে আরম্ভ করতেন। তিনি এমন সুন্দর পড়াতেন, তাঁর ক্লাসে দুর্দান্ত ছেলের দল এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত যে, তাদের লক্ষ্য ছিল যেন তাঁর ঘণ্টার একটি মিনিট নষ্ট না হয়ে যায়। পণ্ডিত মশাইয়ের সৌম্য মূর্তি, ফর্সা রং, মাথায় দীর্ঘ কোঁকড়ান কাল চুল, আর মুখে সম্পূর্ণ শাদা দাড়ি, আর পড়াতে পড়াতে যখন তিনি সেই দীর্ঘ দাড়িতে মাঝে মাঝে হাত বুলোতেন, তখন তাঁকে ঋষিকল্প বলেই মনে হত। তাঁকে কোনদিন ছেলেদের তিরস্কার করতে শুনিনি।

একদিন সেই বিরাট ক্লাসের কোন্ কোণে একটি ছেলে কথা কয়েছে। সেটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি তৎক্ষণাৎ পড়ান বন্ধ করে বললেন--'তোমরা একটু গল্প করে নাও। আমি একটু অপেক্ষা করচি। লোকের যেমন হাসি পায়, কান্না পায়, কাশি পায়, হাঁচি পায়, তেমনি গল্পও পায়। তোমাদের গল্প পেয়েছে, একটু গল্প করে নাও। আমি একটু পরে পড়াব।'

ছেলেদের মিষ্টি কথায় এত বড় শাস্তি দেওয়া কি আর কোন রকমে সম্ভব? যে ছেলেটি কথা কয়েছিল, সে ত লজ্জায় অধোমুখ। আর ক্লাসসুদ্ধ ছেলে দেখছে, কে কথা কয়ে ক্লাসের ওপর এই বিপদ্ ডেকে এনেছে। আমরা এই রকমই শ্রদ্ধা করতাম পণ্ডিত মশাইকে, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তাঁর দেবচরিত্র, আর বিষয়বস্তুটি তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবে ও অপরূপ ভাষায় আমাদের মনের সামনে উপস্থাপিত করবার অদ্ভুত শক্তির জন্য।

পণ্ডিত মশাই আবার পড়াতে আরম্ভ করলেন। উত্তররামচরিতের যে অংশ রামচন্দ্র সীতা নির্বাসনের পর বনে বেড়াতে এসে তার পূর্বে বনবাসের সময় সীতার সাহচর্যে কোথায় কিভাবে ছিলেন, কোথায় পর্ণকুটীর রচনা করে তিনি সীতার সঙ্গে পরম আনন্দে বাস করেছিলেন, কোথায় কোন্ লতা কোন্ বৃক্ষকে আশ্রয় করে রয়েছে, তাই দেখে সীতা তখন তাঁকে কি বলেছিলেন, কোথায় সীতা তাঁর বাম বাহুকে উপাধান করে শুয়ে থাকতেন, সেই সব দৃশ্য ও কথাবার্তা তাঁর মনে পড়ে তাঁর স্মৃতিকে আলোড়িত করে তুলচে, আর রামচন্দ্রের দুনয়নের সুতীব্র বিরহের অশ্রুর বন্যা অবিরল ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। কখনও বা বিরহের দীর্ঘশ্বাসে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে, রামচন্দ্র হাহুতাশ করছেন কঠিন কর্তব্যের বোঝা তিনি আর বইতে পারছেন না। রাজার পুত্র হয়ে, স্বয়ং সিংহাসনে বসেও মানুষের জীবন যে এমন করে একজনের অভাবে হাহাকারময় আর নিস্ফল হতে পারে এইজন্য তিনি দুঃখ করেছেন। নির্বাসিতা সীতাও সেই বাল্মীকির তপোবনেই বাস করছেন। বাল্মীকির বরে নিজে অদৃশ্য থেকেও তিনি রামচন্দ্রের সব কথাই শুনতে পাচ্ছেন এবং সবই দেখতে পাচ্ছেন।

সীতা আপনমনে বলছেন—আর্যপুত্র আমার জন্য এত দুঃখ ভোগ করছেন! তিনি আমাকে এখনও এত ভালবাসেন? রামচন্দ্র বনবাস কালের একটা কথা এখন তাঁর মুখে শুনে সেই সব দৃশ্য সীতারও স্মৃতিপটে উদিত হচ্ছে। তিনিও আর্যপুত্রের কথার উত্তরে সেই সময় তিনি কি কথা বলেছিলেন তাও তাঁর মনে পড়ছে আর তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না।

পণ্ডিত মশাই রামসীতার বিরহের সেই আত্মগত আলোচনা আমাদের কাছে সুনিপুণ ভাষায় বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আমরা যেন তাঁর বর্ণনা নৈপুণ্যে আমাদের মনে ভেসে ওঠা দৃশ্যগুলি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, আর মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেছি। এদিকে পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু বেরিয়ে তাঁর দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি বেয়ে ছিন্নসূত্র মুক্তামালার মত একে একে তাঁর কোলের ওপর ঝরে পড়ছে। চিরবিরহী সীতার দুঃখ বর্ণনা করতে করতে পণ্ডিত-মশাইয়ের গলা ধরে আসছে, তাঁর গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না। তিনি মাঝে মাঝে থেমে গলা ঝেড়ে নিয়ে আবার বলছেন। অশ্রুর বন্যার বিরাম নেই। তিনি অবিচলভাবে বর্ণনা করে চলেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর যে রুদ্ধ হয়ে আসছে আমরা যেন বুঝতে পারছি না।

এমন সময় ঘণ্টা বেজে গেল। যে ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের পূর্ণ আনন্দের মাঝখানে রসভঙ্গ করল তাকে অভিসম্পাত দিয়ে আমরা বল্লাম—"মা নিষাদ......"।

সে যুগের অন্য অধ্যাপকের অধ্যাপনা বর্ণনা করে প্রবন্ধ দীর্ঘ করতে চাই না।

তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে। কুঞ্জবাবু, জানকীবাবু, ললিতবাবু, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনর্গল জলপ্রবাহের মত ইংরাজীর অবিরল বাক্যধারায় স্নান করে আমরা সে যুগে ধন্য হয়েছি। পণ্ডিত মশাইয়ের উত্তর রামচরিত পড়ান এখনও মনে পড়লে দুঃখ হয় যে হায় রে সেকাল! একালে কি এমন গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়? এমন অপরূপ অধ্যাপনা কি এখনও ছেলেদের মুগ্ধ করে?

সেই অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, তাঁদের জীবন-ব্যাপী সাধনা, তাঁদের বোঝাবার সেই অপরূপ ভঙ্গী, তাদের সহৃদয় ও কোমল ব্যবহারে আমাদের মন ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপনিই সেই অধ্যাপকদের চরণে নত হয়ে আসত। আর মনে হত, আমিও যদি সেই রকম পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়ে এমনি করে পড়িয়ে ছাত্রদের হৃদয়কোরক প্রস্ফুটিত করে তুলতে পারি তবে আমার জীবন ধন্য হয়ে উঠবে। চোখের সামনে ভবিষ্যতের সেই আদর্শ ফুটে উঠত। ভগবান বোধহয় আমার প্রার্থনাটা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন—"তথাস্তু।" শিক্ষক অবশ্য হয়েছি, কিন্তু পণ্ডিত হওয়াটা এ জন্মে আর হ'ল না। সেটা পরজন্মের জন্য রেখেছি।

"গ্রন্থ পার্বণ"

॥১॥

শ্রদ্ধেয় মহাশয়—দেশ পত্রিকার ২২ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যায় 'গ্রন্থপার্বণ' সম্পর্কে ২।৩টি আলোচনা পড়িলাম। বাংলার জনসাধারণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দামী বইগুলির একখানাও প্রিয়জনকে উপহার দিয়া আনন্দ লাভের উপায় প্রায় নাই। বর্তমানে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা কিছু শুরু হইয়াছে বলা যাইতে পারে। শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও উন্নতি-বিধানের প্রস্তুতি যখন দেখা যাইতেছে, তখন স্বভাবতই পার্বণ-উৎসব আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। নমস্কারান্তে ইতি—অমর গাঙ্গুলী, বাঁকুড়া।

॥২॥

সবিনয় নিবেদন,—'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় সুকবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের "গ্রন্থপার্বণ" পরিকল্পনা পড়েছি। এপর্যন্ত দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত আলোচনাই পড়েছি। আমার ব্যক্তিগত মত প্রায় সকলের মতের সাথেই কিছুটা মিল আছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রায় সকলের সুরই এক। আমাদের মত দরিদ্র দেশে যেখানে দুবেলা পেটের অন্ন যোগাড় করাই বেশী সংখ্যক লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য, সেখানে দামী বই কেনা কেমন করে সম্ভব। বিশেষ করে বিশ্বভারতীর প্রত্যেক বইয়ের দামই এত বেশী যে, সাধারণ লোকের পক্ষে কেনাই দুঃসাধ্য। বিশ্বভারতীর মত প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করলেই কম দামে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিবেশন করতে পারে। তবে দাম বেশী বলে যে একখানাও কেনা যাবে না, এ হতেই পারে না। এবিষয়ে ৩৩ সংখ্যায় বিশু মিত্র মহাশয়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছুই করা যেতে পারে। দাম বেশী বলে সমস্ত বৎসরে বেশী দাম দিয়ে একখানা বইও কেনা যাবে না এ কোনও কথাই নয়। দুর্গা পূজায় কেউ বেনারসী কেনেন, কেউ বা সস্তা তাঁতের শাড়ীতেও আনন্দ পান। বিশ্ব-ভারতী তাঁদের অধিকাংশ দামী বইয়ের সুলভ ও শোভন দুটো সংস্করণই করে থাকেন। দুই টাকায় যে গীতাঞ্জলি পাওয়া যায়, তিন টাকা চার আনায়ও সেই গীতাঞ্জলিই পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না কেবল বাঁধনের চাকচিক্য। কলকাতায় হয়তো পাশের বাড়ীর লোকের সাথেও পরিচয় থাকে না, কিন্তু মফঃস্বল শহরে কিংবা গ্রামে প্রায় সকলের সাথেই সকলের জানাশোনা থাকে। একটা গ্রামে একখানা বই থাকলে গ্রামের সকলেই সে বই পড়বার সুযোগ পান। প্রেমেনবাবুর 'গ্রন্থ পার্বণ' পরিকল্পনা সুপরিকল্পনা সন্দেহ নেই। প্রতি বৎসর কিছু সংখ্যক লোকও যদি বই কেনার দিকে ঝোঁকেন ও প্রিয়জনকে ধুতি শাড়ির পরিবর্তে উপহার দেন তবে একখানা বই গড়ে ১০০ একশত লোক পড়বার সুযোগ পাবেন। তবে 'গ্রন্থ পার্বণে' রবীন্দ্রনাথের বই-ই কেবল লোকে কিনবে এও ঠিক মনঃপূত হলো না। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বিশ্বভারতী যেমন টাকায় দুই আনা বাদে ১২½% কমিশনে বই বিক্রি করেন, ঐ সময় অন্য সমস্ত প্রকাশকরাও যেন তাঁদের প্রকাশিত বই কিছু কম দামে পরিবেশন করবার ব্যবস্থা করেন। —শ্রীনির্মলকুমার গুপ্ত, পোঃ আলিপুর-দুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি।

আলোচনা

॥৩॥

সবিনয় নিবেদন,—'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় সুকবি ও লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গ্রন্থ-পার্বণ' পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখনও 'গ্রন্থ-পার্বণ' লইয়া আলোচনা শেষ হয় নাই। সবার আলোচনাই শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়াছি। গত ২২ বর্ষ ৩৩ সংখ্যায় বিশু মিত্রের আলোচনা পড়িলাম। তিনি আলোচনার পরিশেষে বলিয়াছেন, "পুস্তকের মূল্যের জন্য গ্রন্থ-পার্বণের বিরুদ্ধে আলোচনা করা ভুল।" কিন্তু এখানে তিনি নিজেই একটি 'ভুল' করিয়াছেন। কারণ মূল্যের সাথে 'গ্রন্থ-পার্বণ'ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গরীবদেশে বই কিনিবার মত সামর্থ্য ক'জনেরই বা আছে। কিন্তু অর্থের অভাবহেতু তাঁর বই কিনিতে দেশের অধিকাংশ লোকই অক্ষম। বইয়ের দাম কমাইলেই দেশের বহুলোক কবিগুরুর বই কিনিতে সক্ষম হইবে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা করে কবিগুরুর পুণ্য জন্মদিনে তাঁহার বই কিনিতে এবং প্রিয়জনকে উপহার দিতে। কিন্তু বিশ্বভারতীর বইয়ের দাম এতই বেশী যে, তা সাধারণ লোকের পক্ষে কেনা অসম্ভব। ফলে 'গ্রন্থ-পার্বণ' সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, যদি না বইয়ের দাম কমে। তাই আমি এটুকু বলি যে, 'গ্রন্থ-পার্বণ'কে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে বইয়ের দাম কমানো একান্ত প্রয়োজন। বইয়ের দাম কমানোর জন্য যে কথা উঠিয়াছে তাহা মোটেই 'গ্রন্থ-পার্বণে'র 'বিরুদ্ধে আলো-চনা' নয়, তাহা 'গ্রন্থ-পার্বণে'র স্বপক্ষে আলোচনা। ইতি—শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মিত্র, সিউড়ী, বীরভূম।

॥৪॥

সবিনয় নিবেদন,—গ্রন্থ-পার্বণ আলোচনা প্রসঙ্গে দুজন পাঠিকা জানিয়েছেন, "বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি বইয়ের দাম এত বেশি রেখেছেন যে ইচ্ছে থাকলেও আমাদের মত গরীবের দেশে সকলের পক্ষে তা সংকুলান করা মুশকিল।" আমিও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে এবং পাণ্ডিত্য যদিচ এক ফোঁটাও নেই, কিন্তু বই পড়ার ও সংগ্রহ করার অভ্যেস আমার আছে এবং আমি জোর দিয়েই বলব বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে পাঠিকাদের অভিযোগ তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। অন্যান্য প্রকাশকদের সঙ্গে তুলনায় 'বিশ্বভারতী' ও 'উদ্বোধন' এ দুই প্রকাশকের বইয়ের দাম অপেক্ষাকৃত কম।

আমার উক্তির স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে একটা সাধারণ হিসেব দাখিল করছি। প্রতিটি এক টাকার কম দামে রবীন্দ্রনাথের ১২টি বই পাওয়া যায়, প্রতিটি একটাকা হিসেবেও ঐ সংখ্যক, এক টাকা থেকে দুটাকার নীচে ৫০টিরও বেশী বই আছে, দুটাকা দামের আছে ১৬টি বই, দুটাকার ওপরে ও তিন টাকার নীচে ১২টি, তিন টাকায় ৯টি, তিন থেকে চারের মধ্যে ৬টি, চার টাকায় ৯টি, পাঁচ টাকায় একটি, সাড়ে পাঁচ টাকায় একটি। সঞ্চয়িতা সংস্করণ ভেদে আট ও দশ টাকা। স্বরলিপি, চিত্রলিপি ও পাঠ্যপুস্তক এ হিসেবে ধরা হয়নি। ইচ্ছে থাকলে এর থেকে কিছু বই সংগ্রহ করা বোধহয় সকলের পক্ষেই সম্ভব। (বইয়ের নেশা যাঁদের আছে তাঁদের কথা তুলছি না কারণ নেশার কড়ি চিন্তামণি যোগান। আর পালা-পার্বণের অপেক্ষাও তাঁরা রাখেন না।) আশা করি রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সংখ্যাধিক্যের জন্যে কেউ অভিযোগ আনবেন না, অন্তত তার জন্যে বিশ্বভারতীকে দায়ী করা চলে না।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র কথাও ওপরের হিসেবে ধরা হয়নি কারণ 'রচনাবলী' যাঁরা কিনবেন তাঁরা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সেট সংগ্রহ করবেন আশা করা যায়। তার জন্যে কিছুটা হিসেবনিকেশ করেই এগোতে হবে। তবে সেক্ষেত্রেও সংস্করণ অনুসারে দামের তারতম্য আছে। আর সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর মতো 'রচনাবলী'র সম্পূর্ণ সেট একত্রে নিতে হয় না। তবে সাহিত্য সংসদের বঙ্কিম রচনাবলীর মতো কাগজ ও ছাপা দিয়ে 'রবীন্দ্র রচনাবলীর' একটি সংস্করণ বিশ্বভারতী প্রকাশ করতে পারেন।

বিশ্বভারতী সংস্করণ অনুসারে দাম ধরেন। তথাকথিত বোর্ড বাঁধাইয়ের দ্বারা বইয়ের দাম খামকা বাড়ান না। তাঁদের সাধারণ সংস্করণগুলিও সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত ও রক্ষণের উপযোগী। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ছাড়াও সস্তায় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ প্রভৃতির প্রকাশের দ্বারা বিশ্বভারতী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সেই কৃতজ্ঞতার জন্যেই তাঁদের বিরুদ্ধে অহেতুক অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হলাম। —অমিয়কুমার, অণ্ডাল।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রিয় মহাশয়,—শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে যে তথ্য পরিবেশন করিতেছেন, তাহার জন্য আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন। বিভিন্ন যায়গায় তাঁহার লেখার মধ্যে পড়িলাম যে, বিবেকানন্দের নিজস্ব ভাষার বক্তৃতা জনৈক মহারাজা রেকর্ড করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহা অদ্যাপি প্রাসাদে রক্ষিত আছে। যদি তাহাই হয়, তবে কোনো গ্রামোফোন কোং যদি উদ্যোগী হইয়া সেই রেকর্ডের 'বাণী' বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তবে শুধু বাংলা কেন, ভারতের ঘরে ঘরে এই যুগেও আমরা তাঁহার 'বাণী' শুনিবার সুযোগ পাইব। বিবেকানন্দের 'বাণী' যাদুঘরে না রাখিয়া দেশবাসীর সম্পত্তিরূপে রেকর্ড মাধ্যমে প্রচারের প্রস্তাবে আশা করি অনেকেই একমত হইবেন। —প্রবোধচন্দ্র বসু।

ইদানীংকার বাংলা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,—শ্রীঅরুণকুমার সরকারের 'ইদানীংকার বাংলা সমালোচনা' লেখাটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী হয়েছে। তার প্রতিবাদ দুটিও পড়লাম। অরুণকুমার সরকার সমালোচনার নামে পিঠ-থাবড়ানি অথবা নির্দয় বিদ্রূপ দুটিতেই আপত্তি জানিয়েছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়টি থেকে কবি-যশপ্রার্থীকে রক্ষা করবার কোনো উপায় নেই। কীট্‌স্‌ এবং রবীন্দ্রনাথকে (সাহিত্য-সংখ্যা 'দেশে'ই তার উদাহরণ রয়েছে) যা সহ্য করতে হয়েছিলো, তা দেখার পরে হীনতরো প্রতিভার পক্ষে প্রকৃত রসগ্রাহিতা আশা করাও অসম্ভব।

কিন্তু এতে প্রতিভার পক্ষে ততো বড়ো দুর্দিন নয়, যতো বড়ো দুর্দিন চতুর্দিকে অক্ষমতাকেই ঢেঁড়া পিটিয়ে বাজারে তুলে ধরবার চেষ্টা। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে,—বিশেষত কাব্য সাহিত্যে,—এমন নির্লজ্জ গোষ্ঠীপ্রীতি এবং নিদারুণ প্রচারপ্রবণতা দেখা দিয়েছে যে, কে ভালো কে খারাপ তা নিজে যাচাই না করে কোনো সমালোচক অর্থাৎ পুস্তক পরিচায়কের কাছে জানবার চেষ্টা একেবারেই বৃথা। আর পুস্তক পরিচিতি ছাড়া প্রকৃত অর্থে আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনাই বা কোথায়? এই সব মেকি সমালোচকেরা সব কবিতাকেই যে নির্জলা প্রশংসা করেন, তা নয়। বরং উপমা-উৎপ্রেক্ষার সূক্ষ্ম বিচার নিয়ে অথবা স্বরবৃত্তের নির্ভুল গুনতি খুঁজে অনেক হোম্‌রা চোম্‌রাকেও নাকাল করতে পেছ-পা হন না। কিন্তু যে-কাজটি এ'রা করেন না, সেটা হলো অসৎসাহিত্যকে দমিত করবার জন্যে প্রকৃত নিন্দার চাবুক হাতে তুলে নেওয়া। দু'চারটে খুঁত বের করা যায় না, এমন কবিতা বোধহয় নেই। কিন্তু যে-কবিতা কবিতা হয়নি, তাকে সমালোচনার সম্মান দেওয়াই অন্যায়। তাতে মুড়ি-মিছরির একদর দাঁড়াবার সম্ভাবনাই বর্ধিত হয়। —শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, পুণা।

সাহিত্যে অসাধুতা

গত ২৩শে এপ্রিলের ২৫ সংখ্যায় দেখলাম আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর 'সূর্যপ্রতিম' নামে একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর ওই কবিতাটি গত পূজা সংখ্যা, ১৩৬১ 'এশিয়া'তে প্রকাশিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ১১৮)। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি 'এশিয়া'তে ওই কবিতাটা পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশেষ কারণ ছাড়া একই লেখার দুবার মুদ্রণ নিতান্ত অন্যায়। সাহিত্যে এই ধরনের নোংরামি লজ্জাকর ও অনুতাপের বিষয় এবং সাহিত্যের দিক থেকে এই ধরনের মনোবৃত্তি আদৌ সুস্থ নয়, সুন্দর ত' নয়ই। লেখকের স্মরণ থাকা উচিত কবিতাটি ভালো হলেও পরপর দুটো পত্রিকায় দুবার মুদ্রণে খ্যাতির মান বাড়িয়ে দেয় না, বরং নিচে নামিয়ে আনে। ইতি—ভবদীয় শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার, পোঃ মণিহারীঘাট, জেলা পূর্ণিয়া, বিহার।

[সম্পাদককে ফাঁকি দিতে পারলেও পাঠককে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাহার আর একটি প্রমাণ এই পত্রখানি। পত্রলেখককে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সম্পাদক]

হাল সালের চতুর্থ সংখ্যা 'সোভিয়েট লিটারেচার' হাতে এল। এটি মস্কোর বহুভাষী সাহিত্যপত্র, ইংরেজী ছাড়া ফরাসী, জর্মন, পোলিস এবং স্প্যানিসে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইংরেজী পত্রিকাটাই দেখছিলুম। পাতা উল্টে যাচ্ছি, হঠাৎ শিরোনামা চোখে পড়ল, 'নোট্স অন ইণ্ডিয়ান লিটারেচারস্', লেখক খাজা আহমদ আব্বাস।

পড়তে শুরু করলুম, বিষয়গুণে তো বটেই, লেখকের নামের আকর্ষণেও। আব্বাস সাহেবের লেখার বহু অনুরাগীর মধ্যে আমিও একজন। এঁর ইংরেজী বই এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নানা নিবন্ধ একদা সাগ্রহে পড়েছি। এক দুর্লভ উদারতা খাজা সাহেবের রচনায় পরিব্যাপ্ত, রাজনৈতিক লেখাতেও পরমতসহিষ্ণুতা দেখিনি। তবে আমাদের দেশের লেখকদের মক্কা হল ফিল্ম স্টুডিও (বোধ হয় কারবালাও), আব্বাস সাহেবের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইনি সিনেমা জগতেও নাম করেছেন। সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

বহুদিন পরে প্রিয় লেখকের রচনা পড়তে গিয়ে দেখি তার সুখপাঠ্যতা তেমনই আছে। নিবন্ধটির নাম যখন 'নোটস', তখন ধরেই নিয়েছিলুম এতে শুধু উপর-উপর আলোচনা থাকবে, অর্থাৎ কিছু লেখকের নাম ও রচনার ফর্দ, সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত, তার বেশি কিছু না। তা ছাড়া বিষয়টিও ছোট নয়। এদেশে মহাবিদ্যার যদি দশ রূপ, বিদ্যার তবে চৌদ্দটি (সংবিধান সংহিতামতে)। এই বহুরূপী বাগ্দেবীর বর্ণনা একমুখে সম্ভব না।

আব্বাস সাহেব ভূমিকায় বলেছেন, ভূমা ভারতের বহিরঙ্গমাত্র। সব ক'টি

নখদর্পণ

উত্তমপুরুষ

সাহিত্যের মন একসূত্রে গাঁথা। প্রথমত প্রায় সব মুখ্য ভাষার মূল এক, একীকরণকে এগিয়ে দিয়েছে আরবী এবং ফারসীর প্রভাব (মধ্যপ্রাচ্যের কথা, গাথা ও শব্দ সম্পদ আজ ভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গীকৃত); পরবর্তীকালে ইংরেজীর। আব্বাস অবশ্য ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবের কথা বলেননি, ইংরাজ শাসনের উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক বন্ধন নানা অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সাহিত্য আন্দোলনকেও এক সঙ্গে বেঁধে দিতে চেয়েছে। ডোর কখনও কখনও মালা হয়ে উঠেছে।

প্রবন্ধের প্রস্তাবনা অংশ বিবৃতিমাত্র, এর বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। খটকা লাগে বিশ্লেষণ পর্যায়ে পেঁৗছে। পরশাসনের বিরোধিতা জাতিকে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দিয়েছে, জাগ্রত করেছে প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা, যার শ্রেষ্ঠ ফল রবীন্দ্রনাথ। তিনি আমাদের অতীতের সম্পদ পুনরাহরণ করেছেন—এটা আংশিক সত্য মাত্র, এবং কবিগুরু সম্পর্কে মাত্র এতটুকু স্বীকৃতিতে বাঙালী পাঠকের মন ভরে না। প্রবন্ধটির উদ্দিষ্ট বিদেশী পাঠক, সতর্কতার প্রয়োজন সেজন্যে আরও বেশী। রবীন্দ্রনাথকে শুধু গীতাঞ্জলির ঋষি বলে বিদেশে প্রচার করার ভুল দ্বিতীয়বার করা ঠিক হবে না। সাহিত্যকে কেবল ইতিহাসের পটভূমিতে রেখে বিচার করলে এ জাতীয় বিভ্রম ঘটবেই। শিল্পের পরিবেশনিরপেক্ষ প্রেরণাও সম্ভব। আর এ তো আমরা সবাই জানি, রবীন্দ্রনাথ শুধু অতীতের খনিতে নামেননি, বর্তমানের ডাঙাতেও দাঁড়িয়েছেন, এগিয়ে গেছেন আগামীর দিগন্তের দিকে। তাঁর বিশ্বভারতী যেমন সর্বদেশকে আহ্বান, তাঁর সাহিত্য তেমনই সর্বকালের আবাহন।

একটা হীনমন্যতার সুর যেন আব্বাস সাহেবের এই রচনায় অন্তর্লীন, সেজন্যেও বিস্ময় বোধ করেছি। সমাজতান্ত্রিক সভ্য দেশের কাছে আপন সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর যেন বড় অস্বস্তি। এ-সাহিত্যে যদি এখনও রহস্যবাদের ছোঁয়া লেগে থাকে, যদি জীবনদর্শনে ক্ষয়িষ্ণুতার ছাপ দেখতে

পাও তবে ক্ষমা কোরো, কেননা এখানে এখনও যে সামন্ততন্ত্রের খোয়ারি ভাঙার পালা চলছে, সমাজবাদী সাহিত্য সৃষ্টি হবে কী করে! কোন্ সাহিত্যের কথা স্মরণ করে আব্বাস সাহেবের এত কুণ্ঠা জানিনে। সাহিত্যে যদি স্বদেশ আর সমসময়ের ছোপ থাকে তাতে লজ্জাই বা কী। সমাজ তো আনকোরা কাপড়ের ছাপের মতো, কালের জলে সহজেই ধুয়ে যায়, কালান্তরেও যেটা টেঁকে সেটা শিল্পগত উৎকর্ষ। এলিজাবেথীয় সমাজ কবে গেছে, কিন্তু সে-যুগে লেখা নাটক নিয়ে আজও বিশ্বের কাছে ইংরেজের বড়াই। টলস্টয়-চেকভের রচনা নিয়ে শুনি এখনও রুশদের গর্বের শেষ নেই। রসের বিচারে অসার না হলে সামন্ততন্ত্রগন্ধী সাহিত্যও উপহাস্য নয়।

একালের ভারতীয় সাহিত্যে সাম্যবাদী এবং নির্দলীয় মার্কস্‌বাদীদের প্রাধান্য, আব্বাস সাহেবের এই দাবীরও প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে। 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক' নীতি সমকালীন সেরা লেখকরা পরিত্যাগ করেছেন একথাও স্বীকার করি না। এই বহু-উদ্ধৃত ইংরাজী বাক্যটির টীকা ব্যাখ্যা নিয়ে একদা নানা তর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু আর্ট বলতে যদি চির সুন্দর আর শাশ্বতকে বুঝি, তবে তার জন্যে, এবং শুধু তারই জন্যে, প্রকৃত শিল্পী লাখ লাখ যুগ সাধনা করতে প্রস্তুত আছেন। কেননা চূড়ান্ত বিচারে সুন্দর শুধু সত্য নয়, শিব।

সাহিত্যের শুদ্ধ স্বরূপ নিয়ে তর্ক থাকুক। জনকয় লেখকের রচনায় 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিটি' পুরোমাত্রায় আছে, আব্বাস সাহেব সগর্বে বলেছেন। বস্তুটা কী তার অবশ্য কোন সংজ্ঞা দেননি, নমুনা হিসেবে যে-সব লেখা ও লেখকের তালিকা দাখিল করেছেন তার থেকে কিছুটা অনুমান করতে পেরেছি। 'নোট্‌স' কিনা, লেখকের তালিকা তাই সংক্ষিপ্ত। কথাকারদের মধ্যে এই ক'টি নাম চোখে পড়ল ঃ মুল্‌করাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষণ চন্দর, বরেন বসু। এর মধ্যে কৃষণ চন্দরের প্রতি খাজা সাহেবের পক্ষপাতিত্ব কিঞ্চিৎ বেশী, তাঁর নাম বারবার করেছেন। 'স্যোস্যালিস্ট রিয়ালিটি'র নমুনা হিসাবে যে ক'টি রচনার উল্লেখ আছে তার একটি স্পেনে ফ্রাংকো-বিরোধী গেরিলাদের বীরত্বের কাহিনী (দি ফিগ), একটি কোরীয়ায় মার্কিন বর্বরতার আলেখ্য (হোয়েন স্যোল ওয়জ বার্নিং), একটির নাম 'লেটার টু দি ফার্স্ট আমেরিকান সোলজার কীল্ড ইন কোরীয়া' আরেকটি ভারতপ্রবাসী কোন চীনা তরুণী স্বদেশে ফিরে গিয়ে কোরীয়ায় কী ভাবে মার্কিনদের হাতে প্রাণ দিল তার সাশ্রু বিবরণী। এবার কয়েকটি সোস্যালিস্ট কবিতার শিরোনামা শুনুন ঃ 'সয়লাব-এ-চীন', 'হম ডলার দেশকো দেখা হৈ', 'মস্কো অবভি দূর হৈ।'

নামের তালিকা ছোট বলে অভিযোগ নেই, যদিও আমার বিশ্বাস আরো বহু যোগ্যতর রচনা এবং রচয়িতার খোঁজ আব্বাস সাহেব বাংলা দেশের বামপন্থী শিবিরেই পেতেন। উল্লিখিত লেখকেরা আর কিছু লেখেননি এও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে সৎ সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ তিনি বেছে বেছে এগুলোই বিদেশী পাঠকের কাছে তুলে ধরলেন কেন। আমরা তোমাদের শামিল হয়েছি এইটুকু জানিয়ে তিনি যদি রুশ বা চীনা পাঠকের মনোরঞ্জন করতে চান, তবে অবশ্য বলার কিছু নেই। মস্কো, পিকিং বা কোরীয়া নিয়ে কাহিনী বা কাব্য রচনা প্রগতি সাহিত্যের চূড়ান্ত রূপ, আব্বাস সাহেব সত্যিই একথা বিশ্বাস করেন বলে মনে করি না। প্রকৃত প্রগতি সাহিত্যের প্রাণমূল দেশের মাটির গভীরে। সে ফসল আজও প্রচুর ফলে, তার বাম বা বামেতর পরিচয় নেই। তাকে উপেক্ষা করে খাজা আহমদ সস্তায় বাহবা নেবার দিকে ঝুঁকেছেন। ভেবে দেখেননি, ভারতীয় সাহিত্যে ভারতের রূপ কতটা ফুটেছে বিদেশী পাঠক তাই জানতে চায়, এদেশের লেখার ভিতর দিয়ে স্পর্শ পেতে চায় এদেশের মাটির, মানুষের। রাশিয়ায় রবীন্দ্র রচনাবলী পুনর্মুদ্রণের এবং বিবিধ ভারতীয় ক্লাসিক্‌সে তর্জমার আয়োজনে নবজাগ্রত আগ্রহের প্রমাণ পেয়েছি। আব্বাস সাহেব যদি সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালের সাহিত্য-প্রয়াসের যথাযথ চিত্রটি তুলে ধরতে পারতেন তবে এই আগ্রহ বলবত্তর হত।

পুস্তক পরিচয়

কবিতা

নীলনির্জন—নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সিগনেট প্রেস, ১০।২, এল্‌গিন রোড, কলিকাতা ২০। দাম দু' টাকা।

আজ থেকে বারো বছর আগে, ১৩৫০ সালের "নিরুক্ত" পত্রিকায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'জ্বর' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। সে সময়ে অধুনা-খ্যাত গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, দুই কবিই 'নিরুক্ত'-পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন। মনে আছে, 'জ্বর' কবিতাটি সেকালের জীবনানন্দ-প্রভাবিত, সাম্যবাদ-রঞ্জিত, অনুকরণ-সর্বস্ব বহু জোলো কবিতার মধ্যে মনের পৃথক এক মর্জি-র প্রতিফলন হিসেবে চেতনায় দাগ রেখেছিল। তারপর, এই বারো বছর পরে সুশোভন, সুমুদ্রিত, 'নীল নির্জন' বইখানির ৪২টি কবিতার মধ্যে ন্যূনপক্ষে দশ-পনেরোটি কবিতায় পুনরায় সেই মনোনিরীক্ষণস্বভাব, স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বময়, শান্তচেতা কবির সঙ্গলাভ করা গেল। 'নীলনির্জন'-নামটিই যেন কবিতার শিশির-কণা। 'জনতার সমুদ্রে' 'লজ্জাহীন আকাঙ্ক্ষার নৌকা' ভাসাবার রুচি এসে তাঁর শান্তিভঙ্গ করে না। তাঁর মনে হয়ঃ—

"এখানে আনন্দে কিংবা শোকে
মগ্ন হওয়া অর্থহীন, দর্শকের নিষ্ঠুর ক্ষোভের
লক্ষ্য হয়ে লাভ নেই প্রহসন পঞ্চাঙ্ক নাটকে।
বরং দু' দণ্ড এই শ্যামশষ্প মাঠের গভীরে
বসে থাকি, স্থিতবুদ্ধি
আম-জাম-ঝাউয়ের ছায়ায়
কথা বলি কিছুক্ষণ,
বিকেলের নির্জন হাওয়ায়..."

'মনের নীল নির্জন প্রান্তে' যখন রাত্রি নামে, যখন 'ঘুমের শিয়রে' স্বপ্নেরা জেগে ওঠে, 'জ্যোৎস্না-ধোয়ানো চিন্তার ফুল' ফোটে যখন,—তখন পথে পথে ঝরে পড়ে 'চাঁদের স্তব্ধ নীল প্রশান্তি'! এই নীলে এবং নির্জনতায় নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মার অভিরুচি। নিজের মনকে ডেকে বলেছেন, তিনি——

মন, এই জল ঝড়ে
পথের প্রখর নেশা হারিয়ে গেলেই
নিবু নিবু আলো লেগে ঢেউয়ের শিখরে
যে-সোনা ঠিকরে ওঠে তা-ই খাঁটি সোনা,
তা ছাড়া কোথাও কিছু নেই, কিছু নেই;
মন তুমি কোনোদিকে যেয়ো না যেয়ো না।

'শান্তিহীন বুদ্ধির আগুনে দুই পাখা পুড়িয়ে' যে রিক্ত-বিক্ষত-প্রশ্নব্যাহত মন আমাদের এই প্রতিদিনের পরিচিত জীবন-সংগ্রামের মধ্যে অবরোধ যাপন করছে, তাকে তিনি আর-এক দিগন্তের আশা দিয়েছেন,—"অপরূপ রৌদ্রময় উন্মোচিত উদার আকাশের" আশা।

'রোম্যাণ্টিক' কিংবা 'পলায়নী বৃত্তি',—'স্বপ্নময়' কিংবা 'প্রকৃতিপ্রীতি'—কতো যে বিশেষ্য-বিশেষণের 'লেবেল' চালু করেছেন সমালোচকরা! নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা পড়তে বসেও এইসব স্বল্পার্থসূচক নামের আক্রমণ মেনে নিতে হয় বটে,—কিন্তু তিনি যে সত্যিই শক্তিমান কবি, তার অন্তত একটি প্রমাণ এই যে, পাঠকের সমালোচকসত্তা তাঁর উপলব্ধির বিশিষ্টতার কাছে মাথা নীচু করে। একথা মানতেই হয় যে, সনাতন সত্যকে তিনি সনাতন কবিমানসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তাঁর নিজের পারিপার্শ্বিক সময় ও সমাজ আদৌ পরিত্যক্ত হয়নি, এই প্রক্রিয়ায় সময়ের সাম্প্রতিক স্বাদ এবং সমাজের নিকটতম প্রকৃতি, দুই-ই বজায় আছে, উভয়েরই চিহ্ন আছে এবং একথাও স্বীকার্য যে, নিকট, খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ জীবনে বা জগতে তাঁর মন মগ্ন হবার উৎসাহ বোধ করেনি। চিরকালের কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন অকপট সারল্যের পথে——

"মন, তুমি তবে নির্ভয়, তবে এই বিষণ্ণ
সময়কে ভুলে সেই গান গাও
যে-গানে শীর্ণ গৈরিক নদী
পাথরের মোহমরণে মরেও
বিস্মরণের স্বপ্নে উধাও।"

তবু নির্ভয়-শপথের ঘোষণা সত্ত্বেও 'নীল-নির্জনের' কবির অন্তর্বেদনার বিশ্লেষণে 'ভয়' কথাটির প্রতি তাঁর পক্ষপাত অবশ্যই লক্ষ্য করতে হয়। একটি পুরো কবিতাই চিহ্নিত হয়েছে 'ভয়' শিরোনামে। বহুদিন আগে পড়া সেই মর্জিময় 'জ্বর' কবিতাটির সঙ্গে এ-কবিতার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শুধু মর্জির কথা নয়। 'ভয়' দেখা গেল আরো কয়েকটি লেখার মধ্যে উন্মোচন, তৈমুর ('প্রস্তুত'), শিয়রে মৃত্যুর হাত, সময়চারী,—এগুলিতে তো বটেই, তা ছাড়া এ-বইয়ের অন্যতম দীর্ঘ আত্মপ্রকাশী রচনা 'পার্বত্য'-এও——

"ভাবি, আর মনে ভয় নামে,
নামে ছায়াছায়া ভয়
সারা মন জুড়ে; মায়াবী কপাট
প্রাণপণে ঠেলি, পালাবো।
কোথায় পালাবো? ধবল ছায়াছায়া ভয়
নেমে আসে,
আর ম্লান চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে মন,
মনের দীর্ঘ ছায়া বড়ো হয়।"

জীবন সম্বন্ধে যে রহস্যের বোধ তাঁর মজ্জাগত,—এই ভয়ও সেই একই বোধের সন্তান। অন্ধকার, রহস্য, ভয়—পৃথক নামে

নিগূঢ় অদ্বিতীয়ের বন্দনা জাগে কবিদের মনে। সেই দুর্জ্ঞেয় জীবনসত্যের ছায়া পড়েছে এই ছায়াছায়া ভয়ের ভাষায়।

মোটামুটি এই হলো নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর আন্তর বৈশিষ্ট্য। এই মনোভঙ্গির ভাষা আবিষ্কারে তাঁর সন্ধান সক্রিয়;—মিলের মসৃণ আবেশ, শব্দের বেগ ও ঝংকার, ভাবের ঈপ্সিত যতিস্থাপনা,—সততাময় কবির সমস্ত কর্তব্যেই তাঁর সজাগ প্রয়াসের লক্ষণ আছে 'নীলনির্জন'-এ।

"......তীব্রতম ফাঁকি
তবুও প্রচ্ছন্ন থাকে না কি
থাকে।" —(কটাক্ষ)

এই উধৃতির শেষতম শব্দের মধ্যে যে চূড়ান্ত জবাবের ছেদ পড়েছে, কিংবা—

দূরে 'কাংলামারুর মাঠে
একলা অশথ গাছের চাঁদের ছায়া হাঁটে;
রাত্রি ছিঁড়ে স্বপন ওঠে, স্বপন ছিঁড়ে মন।
—(পরম ক্ষণ)

এখানকার শেষ শব্দ 'মন'-এর বিষয়ে অত্যল্পকথিত যে পরম সংবাদটি ফুটেছে,—এসব দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখা গেল যথার্থ কবির সামর্থ্য, শিল্পীর মিতভাষিতা।

নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভবিষ্যৎ অভিমুখিতার বিষয়ে কোনো পূর্বাভাস সন্ধানের কৌতূহল হয়তো কাব্য আস্বাদনের পক্ষে অবান্তর। তবু সে কৌতূহল যে পাঠকের মনে কতকটা অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়, সেকথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই। সেই সন্ধানের স্পৃহা নিয়ে এই বিয়াল্লিশটি কবিতা পুনর্বার পড়ে মনে হলো, জীবনানন্দ দাশের ধারায় পৃথক ব্যক্তিত্বময় আর এক নির্জনতার কবি দেখা দিয়েছেন এ-কালের বাংলা কবিতার আসরে। তিনি নিজেই নিজের লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়েছেন——

"পোশাকে মুখ লুকিয়ে,
দ্যাখে কতো না সাবধানে
আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই,
চেনে না কেউ সোনা;
এখানে মন বড় কৃপণ,
এখানে সেই আলো
ঝরে না, ভেঙে পড়ে না ঢেউ—
এখানে থাকবো না।"
—(ঢেউ)

—হরপ্রসাদ মিত্র
১৮৭।৫৫

ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচিত কবিতা সংকলন। আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের ১৩৬০-১৩৬১ সালের রচনা। প্রকাশকঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ঃ শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগের পক্ষে। ২৩৪-এ রাসবিহারী এভিন্যু। কলিকাতা—১৯। দামঃ শোভন—তিন টাকা। সাধারণ—দুই টাকা।

ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতা সংকলন। অধিকাংশ কবিতায় অনিপুণ হাতের ছাপ রয়েছে। তবু ছাত্রছাত্রীদের মিলিত কাব্য প্রচেষ্টায় খানিকটা নতুনত্ব আছে। 'গোধূলির শান্তিনিকেতন', 'দৃষ্টি বধূ', 'ঘুমভাঙানীয়া'—এই কবিতা তিনটির মধ্যে পরিণত শিল্পবোধের সংকেত আছে। প্রথমেই ছাত্রকবিদের প্রতিকৃতিযুক্ত করা ঠিক শোভন নয়, রুচির দিক থেকে তো বটেই। ১৬৩।৫৫

সাধক জীবনী

তারাপীঠ ভৈরব—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক ৮, প্রামাণিক রোড, কাশীপুর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৫, টাকা।

মহাকৌল শাক্তসাধক বামাক্ষেপার জীবনী। তান্ত্রিক কুলাচারসম্মতভাবে ক্ষেপার সাধনা। তন্ত্রাচারের আঙ্গিক এবং তাহার উপযোগিতা ও সাধন সম্পর্কিত তাৎপর্য আমরা অনেকেই বুঝি না। প্রত্যুত মাতৃভাবে ভগদারাধনার তান্ত্রিক রীতি এবং নীতি সাধারণের নিকট অনেক ক্ষেত্রেই রহস্যময় এবং দুর্জ্ঞেয়। কারণ লৌকিক ধারা ধরিয়া এই সাধনা চলে না। সাধক এই সাধনার বলে মনের মূলে নিগূঢ় শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সেই শক্তির উদ্দীপনা এবং অনুভাবনায় লৌকিক রীতিনীতির সম্বন্ধে অনপেক্ষতা লাভ করেন। তিনি সাধন-শক্তির অন্তর্নিহিত কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে আগাইবার মত মনে দুর্দমনীয় গতি উপলব্ধি করেন। ঊর্ধ্বলোক হইতে মহাশক্তির সংকেত বা ইঙ্গিতময় আলোকের খেলা তাঁহার মনকে দোলা দেয়। সেই খেলা এবং দোলা সাধককে নাচাইয়া মাতাইয়া তাঁহার পথের বাধা চুরমার করিয়া উপরে লইতে চায়। রঙ্গময়ী এই লীলার সঙ্গে নিজকে মিলাইয়া সেই শক্তির ধারা ছাড়াইয়া তিনি জড়শক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করেন এবং সেগুলির উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া যোগসংসিদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হন।

বামাক্ষেপা এই সিদ্ধির জীবন্ত বিগ্রহ-স্বরূপে তারাপীঠের মহাশ্মশানে প্রকটিত হইয়াছিলেন। অপ্রাকৃত তাঁহার ভাব, অচিন্ত্যনীয় তাঁহার ভক্তি, অভাবনীয় সর্বভূতে তাঁহার সমাত্মদর্শন। জীবের দুঃখকষ্ট নিবৃত্তির জন্য নিত্যজাগ্রত সদার্দ্র তাঁহার অনুভূতি। মায়া তাঁহার মহামায়ারই বিভূতি, দয়া তাঁহার মায়েরই সেবা। এমন জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ষোল আনা খাপ খাইতে পারে না। সেই মাপে ইঁহাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনে যাহা সম্ভব, ইহাদের জীবনে তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু এইসব যোগৈশ্বর্য এমন মহৎ জীবনের খুব বড় কথা নয়। কারণ সেগুলিও অনেকটা জড়শক্তি সম্পর্কিত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সত্যকে

সাধারণের দৃষ্টিতে উন্মত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব অঘটনঘটনের উপযোগী যোগৈশ্বর্য কৃপাস্বরূপে ইঁহাদের মানোমূলে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। বস্তুত ভাগবতী শক্তিরই ইহা লীলা এবং সাধারণ মানুষকে উন্নততর জীবনের দিকে আকৃষ্ট করাই সে লীলার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এইসব মহাপুরুষের জীবনবৃত্তে পরিস্ফূর্ত এই ভাগবতী-লীলার লোকপাবনী রীতির রহস্য যোগৈশ্বর্যের দিকটা বড় করিতে গিয়া যদি চাপা পড়িয়া যায়, এবং সেই ভাবে আমাদের বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের সম্পর্ক হইতে আমরা যদি ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি, তবে মহৎ-জীবনের মহিমা অনেকটা ক্ষুণ্ণ এবং তাহার লাবণ্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ক্ষেপার যোগৈশ্বর্যের কথা খুবই আছে। স্থানে স্থানে ইহা আতিশয্যেও দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মাতৃপ্রেমে বিভোর এবং মায়ের নামে উন্মাদ সিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপা মানুষ হিসাবেও যে কত বড় ছিলেন, সে পরিচয় আমরা পুস্তকখানিতে পাই। বিরাট, বিশাল তাঁহার ব্যক্তিত্বের কাছে পরম বিস্ময়ে আমাদের মাথা নুইয়া পড়ে। ফলতঃ বামাক্ষেপার জীবন-লীলায় এই মাধুর্য বীর্যের বিস্তারই পুস্তকখানির বিশেষত্ব। মহামাতৃসাধক বামার বিভিন্ন অবস্থার উক্তি এবং উপদেশ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সূত্রে অধ্যাত্মরাজ্যের অনেক গূঢ় রহস্য তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। দার্শনিক জটিলতার মধ্যে এই সিদ্ধপুরুষ পড়িতে চাহেন নাই। সত্যলাভের সোজাসুজি পথ তিনি দেখাইয়াছেন। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংস্কারকে তিনি সার্বভৌম উদার দৃষ্টিতে নিরাকৃত করিয়াছেন। সকল সংশয়চ্ছেদী দ্বিধাহীন তাঁহার নির্দেশ। মায়ের নাম কর, মাকে ডাকো, ইহাই তাঁহার উপদেশ। তাঁহার সমগ্র জীবন-লীলায় মাতৃমন্ত্রেরই এক এবং অখণ্ড উন্মেষ। সংস্কারান্ধ আমাদের বর্তমান সমাজে এমন জীবনী প্রাণরস সঞ্চার করিবে এবং আত্মপ্রত্যয়বোধ বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। ইহার বহুল প্রচারের প্রয়োজন আছে। মনোরম প্রচ্ছদপট — বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুদৃশ্য ছাপা, বাঁধাই, কাগজ। কয়েকখানি সুন্দর চিত্রে গ্রন্থখানি সুসজ্জিত। ২১৭।৫৫

সবার মা সারদা—শ্রীঅতুলানন্দ রায়। প্রকাশক—অমূল্যরতন সাহা, নব গ্রন্থ নিকেতন, ৩১।১ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীমা সারদার জীবনী। লেখক এইরূপ একটি জীবনী রচনার সময় ঘটনা অথবা বিষয়ের প্রতি যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন তাহা স্বাভাবিক। অতএব কোনো ঘটনা বা সাল তারিখের কোথায় কি ত্রুটি ঘটিয়াছে, বর্তমান পুস্তকে তাহা বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হইতেছে লেখকের গভীর নিষ্ঠা ও সারদামণির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা। বলিতে পারি, সারদা-জীবনীর ক্রমবিকাশ আলোচনায় ও এই মহামহীয়সী নারীর আন্তর রূপটি উদ্ঘাটন করিবার দুরূহ কার্যে লেখক সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছেন। লেখকের লেখায় ঘরোয়া গল্পের সুন্দর এক ঢঙ আছে। ভাষা সাবলীল ও সুন্দর। গ্রন্থটির আমরা প্রচার কামনা করি। ছাপা বাঁধাই ভাল। ৪৩৫।৫৪

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

শেফালিকা—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।
বিজ্ঞানের ইতিহাস : ১ম খণ্ড—সমরেন্দ্রনাথ সেন।
রক্তগোলাপ—কিরণকুমার রায়।
যখন প্রথম ধরেছে কলি—কৃষ্ণ ধর।
জীবন-কাব্য—শ্রীপতিচরণ পড়ুয়া।
সত্যের সন্ধানে—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
বনহরিণী—ভবানী মুখোপাধ্যায়।
কলকাতার ফুটবল—আরবি রচিত

ভ্রম সংশোধন

গত ৩৪ সংখ্যা 'দেশে' তোডরমল লিখিত আর্থিক জগতের 'ঘাটতি পূরণের সমস্যা' নামক রচনার ৬৫৬ পৃষ্ঠার ৩য় কলমের ১৮ লাইনে একটি মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটিয়াছে। ১৮০০ কোটি সংখ্যার পরিবর্তে ১০০০ কোটি হইবে।

গানের আসরে হিমাংশুকুমার দত্তের আলোচনায় ৬৮৮ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ৩য় অনুচ্ছেদের ৯ লাইনের পর একটি লাইন বাদ পড়িয়াছে—উক্ত পাঠ এইরূপ হইবে 'এই অপূর্ব...হচ্ছে 'ঝরা চামেলি বনে' গানটি। কত যে সূক্ষ্ম......।

—শৌভিক—

চর্বিত চর্বণ

মাত্র গত সপ্তাহেই একই প্রকারের ভাবাবেগ নিয়ে বিভিন্ন চিত্র প্রযোজকদের ভিন্ন ভিন্ন ছবি তোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু এ সপ্তাহে এস এল কারনানীর 'ঝড়ের পরে' দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, ওরকম দৃষ্টান্ত এখনও আরও রয়েছে। বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে এটা বড়ো আশ্চর্য লাগে এই কারণে যে, বাঙলা দেশের চিত্রনির্মাতারা বহু পূর্ব থেকেই উপলব্ধি করে আসছেন যে, ছবির আসল দিক হচ্ছে গল্পের দিক। সেই মতো তারা গল্পের ওপরে জোরও দিয়ে আসছেন। ভালো গল্প যাতে পাওয়া যায় সেজন্য তারা ভালো সাহিত্যিকদের লেখা গল্প-উপন্যাস থেকে আখ্যানবস্তুর উপাদান আহরণ করছেন, অথবা ভালো সাহিত্যিকদের দিয়ে নতুন কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখিয়েও নিচ্ছেন। গল্পের ওপরে প্রধান ঝোঁক রাখাটাই হচ্ছে বাঙলা ছবির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই বাঙলা ছবি শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে যেমনই দাঁড়াক, কাহিনীর দিক থেকে প্রায় প্রতিটি ছবিই কিছু না কিছু মৌলিকত্ব বরাবরই এনে দেয়। গল্পের দিক থেকে অবিরল বৈচিত্র্য নিয়ে আসার মতো পর্যাপ্ত সাহিত্যসম্ভার আছেও বাঙলাতে। তাছাড়া একবার এক ধরনের গল্প পরিবেশিত হলে তা যতোই জনপ্রিয়তা লাভ করুক, পরবর্তী ছবিতে তারই পুনরাবৃত্তি দর্শকসাধারণের কাছে বরদাস্ত হতে পারে না। হয়তো শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'-রই বিষয়বস্তু প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'ভাঙাগড়া'তে পরিবেশিত হয়েছে, পার্থক্য কেবল পটভূমির। এর পরে 'দত্তক' এবং নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'ছোট বৌ'ও ঐ একই ধরনের আখ্যানবস্তুরই অনুসৃতি। এখানে অবশ্য নারায়ণ ভট্টাচার্য 'ছোট বৌ'তে শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'কে অনুসরণ করেছেন, না শরৎচন্দ্র 'ছোট বৌ' পড়ে 'নিষ্কৃতি' রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সে নিয়ে কোন বিচার তোলা হচ্ছে না। এখানে ছবিগুলি যেভাবে পর পর এসেছে, সেই কথাই ধরা হচ্ছে। একথা বলা হয়তো নেহাৎই অযৌক্তিক হবে না যে, প্রথমে 'নিষ্কৃতি' এবং তারপর 'ভাঙাগড়া'র সাফল্যই বাকি ছবিগুলি তোলায় প্রযোজকদের প্রণোদিত করেছে। সব ক'খানি ছবিরই আখ্যানবস্তু একই—সেই, বাপমার মৃত্যুর পর দাদা-বৌদির হাতে পুত্রবৎ ছোট ভায়ের মানুষ হওয়া; যথাকালে ছোট ভায়ের বিয়ে দেওয়া; সংসার সুখে চলতে চলতে হঠাৎ সামান্য কথার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে মান-অভিমানের প্রাচীর গড়ে ওঠা; ভায়ে ভায়ে আলাদা হতে যাওয়া ও হওয়া এবং শেষে তেমনি হঠাৎই কোন ঘটনার সূত্রে অমিলের প্রাচীর ধ্বসে মিলন দৃঢ়তর হয়ে যাওয়া। সব কটিতেই প্রায় একই রকমের চরিত্র, একই প্রকৃতি, সব কটি আখ্যান বস্তুরই মূল এক, তফাৎ ঘটে কেবল ঘটনার বিস্তারে। এযেন যুক্ত পরিবারে ভায়ে ভায়ে জায়ে জায়ে কতো রকমের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এবং কতো রকমভাবে মনোমালিন্য ঘটতে পারে ছবি ক'খানি তারই টানা একটা সিরিজ।

* * *

'ঝড়ের পরে'-র কাহিনীকার প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ছবিখানি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে একে বলা যায় 'ভাঙাগড়া'র কাঠামোর ওপরে 'নিষ্কৃতি'র প্রলেপ। এ কাহিনীর যখন উদ্ঘাটন হয়, তখন বড়ো ভাই ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধিশালী সংসার গড়ে তুলেছে। এখানে তার নাম সত্যেন্দু। এরা তিন ভাই; দ্বিতীয় ভ্রাতা পূর্ণেন্দু ও ছোট ভাই নীলেন্দু। এই নীলেন্দুকে নিয়েই ঝামেলার সৃষ্টি। কথাচ্ছলে জানা গেল, নীলেন্দুর যখন আড়াই বছর বয়স তখনই সে মাতৃহারা হয়; পিতার স্বর্গবাস হয় তার আগেই। সত্যেন্দুর প্রথম সন্তান বিলু মারা যায় শৈশবেই এবং সেই থেকে স্ত্রী সুনয়নার সমস্ত মাতৃস্নেহটুকু নীলেন্দুর ওপরেই গিয়ে পড়ে। বহুকাল পরে সুনয়নার আর একটি পুত্র জন্মায়, কিন্তু নীলেন্দুই তার

"দেবদাস"-এর দ্বিতীয় হিন্দী সংস্করণের চুনীলাল ও দেবদাস—বিমল রায় পরিচালিত ছবিখানির ভূমিকায় মতিলাল ও দিলীপকুমার

কাছে সব। সুনয়না আদর্শ গৃহকর্ত্রীর মতো সংসার মাথায় রেখেছে। মেজভাই পূর্ণেন্দু সাদাসিদে মানুষ, কিন্তু স্ত্রী রেণুর কুচুটেপনাই হয়ে দাঁড়ালো যতো নষ্টের মূল। বড়ো লোকের বাড়ীর মেয়ে বলে দম্ভ কম নয়। ওদের ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে। নীলু ডাক্তারী পড়ে। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েকটি কাকা বলতে অজ্ঞান; নীলুরও ওদের নাহলে চলে না; বড়ো আদরের ওরা। বেশ সুখের সংসার, কিন্তু হঠাৎ চিড় খেলো নীলেন্দুর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হতেই। মেজ বৌ রেণু তার বোনের সঙ্গে নীলুর বিয়ের কথা পেড়েছিল, কিন্তু সত্যেন্দু জানিয়েছিল নীলু ডাক্তারি পাশ করলে তখন বিয়ের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাইরে একজায়গায় কার্যব্যপদেশে গিয়ে এক অতি দরিদ্র ঘরে পদ্ম ফুলের মতো একটি মেয়েকে দেখে সত্যেন্দু তাকে নীলুর জন্য পাত্রী নির্বাচিত করে বিয়ের পাকা কথা দিয়ে চলে আসে। নীলুর ফাইন্যাল পরীক্ষা আসন্ন বলে সুনয়না ও পূর্ণেন্দু বিয়ের তারিখ পিছাবার জন্য বলে, কিন্তু সম্ব্যবসায়ী সত্যেন্দু দেওয়া কথায় নড়চড় করতে রাজী হলো না।

বিয়ের দিন ধার্য হয়ে গেল। রেণুর মন উঠল বিষিয়ে; তার বোনের সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় মা'র কাছে সে ভাসুর ও বড়জাকে মিথ্যুক বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করলে না। ছোট বৌ সুমিত্রা এলো শাঁখা পরে; সুনয়না তার গা'ভরে গয়না পরিয়ে দিলে। রেণুর তাতে ঈর্ষা বাড়লো। এই ছোটঘরের মেয়ে সুমিত্রা রেণুর কাছে হয়ে দাঁড়ালো সংসারের আপদ। নীলুর চিরকালের অভ্যাস সুনয়নার হাতে জল খাবার খাওয়ার, কিন্তু সুমিত্রা আসার পর সে-ই জল খাবার নিয়ে হাজির হয়। নীলুর তা পছন্দ নয়; রেণু বলে বেড়ালে নীলুর সুমিত্রাকেই পছন্দ নয়। সুমিত্রা ছেলেমানুষ বলে সুনয়না তাকে কোন কাজেই হাত দিতে দেয় না; তাতেও রেণুর ঈর্ষা। রেণু নীলুর ঘরে ছেলেমেয়েদের যাওয়া বন্ধ করে দিলে। নীলু প্রশ্ন তুলতে ওকে জানানো হলো পরীক্ষা নিকট বলে ওরা যাতে পড়ায় ব্যাঘাত না ঘটায়, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হবার পরও নীলু যখন ছেলেমেয়েদের ওর ঘরে আসা বারণ শুনলে তখন বিরক্ত না হয়ে পারলে না। এই নিয়েই

একদিন বিবাদ করে নীলু বাড়ী থেকে অভুক্ত বেরিয়ে দুদিন নিখোঁজ। সুনয়নার তখন অসুখ। রেণুর কাছে সুমিত্রাই এর জন্যে দায়ী। নীলুর ডিসপেন্সারি করার জন্য সত্যেন্দু কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বিরাট একখানা বাড়ী কেনে। রেণু জ্বলে ওঠে তাতে। পূর্ণেন্দুকে ফাঁকিতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখিয়ে উস্কানি দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পূর্ণেন্দু তাতে কর্ণপাত করেনি। এমনি বিমনা আবহাওয়ায় একদিন সুমিত্রার হাত থেকে পড়ে গিয়ে রেণুর ছেলের ঠোঁট কেটে গেল। বলা বাহুল্য, রেণুর কাছে এটা সুমিত্রার ইচ্ছাকৃত শত্রুতাপনা বলেই ধার্য হলো এবং তাই ধরে নিয়ে সে সুমিত্রার ছোট বংশ তুলে মনের ঝাল মিটিয়ে গালাগালি দিলে। নীলু দূরে দাঁড়িয়ে

সবই শুনলে এবং তৎক্ষণাৎ সে পৃথক হওয়া সাব্যস্ত করে বৌদি ও দাদার কাছে তার সিদ্ধান্তের কথা জানালে। সুমিত্রার কাকাকে চিঠি লিখে আনিয়ে নীলু জানিয়ে দিলে সে চাকরি জোগাড় করে বাইরে চলে যাবে এবং সুমিত্রা থাকবে তার কাকার কাছে। দাদা বৌদিকে না জানিয়েই নীলু নিজের ব্যবস্থা করতে বসলো। শুনে সুনয়নার অভিমানের অন্ত রইলো না। নীলুদের সংসার আলাদা করার হুকুম হয়ে গেল। কিন্তু নীলু সে বাড়ীর কিছুই নিতে রাজী নয়। এক বস্ত্রে সে সুমিত্রাকে নিয়ে চলে যাবে। সুমিত্রাকে দিয়ে সব গয়না খুলে সুনয়নার কাছে ফেরৎ দেওয়ালে। সুমিত্রা কিন্তু যেতে নারাজ; সুনয়নার কাছে থাকাটাই আজ দরকার তার। কিন্তু কি করে সে স্বামীর কাছে জানায় সে সন্তান-সম্ভবা! ঝোঁকের মাথায় ট্যাক্সী নিয়ে এল নীলু। চলে যাওয়ার কথা শুনে সত্যেন্দু সামনে এসে দাঁড়ালো। সত্যেন্দু জানালে নীলু তার অংশ গ্রহণ করুক। নীলু জানালে সে কিছুই চায় না, উপরন্তু তাকে মানুষ করার জন্য দাদা ও বৌদির কাছে যে ঋণ তার জমা হয়েছে তা সে শোধ করে দেবে। সত্যেন্দু শুনে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে তৈরি হয়ে এলো। সুনয়নাও এসে পড়েছে সেখানে। সত্যেন্দু সুনয়নাকে নিয়ে নীলুর সঙ্গে যেতে উদ্যত। বললে নীলু বলেছে তাদের ঋণ শোধ করে দেবে, তাই ওরা নীলুর কাছে গিয়ে থাকবে; নীলু ওদের খাইয়ে পরিয়ে প্রতিপালন করবে। দাদার কথায় হতচকিত নীলু। এমনভাবে ঋণ শোধ করতে হবে জানলে কে পৃথক হতে চাইতো! নীলু জানালে সে বাড়ী ছেড়ে যাবে না; সুমিত্রা তো আগে থেকেই নারাজ। তার ওপর সুনয়না যখন চুপিচুপি শুনলে সুমিত্রার মাতৃত্বের কথা, তখন তো যাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

* * *

এই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত অপর ক'খানি ছবির পারম্পর্যায় 'ঝড়ের পরে'-র শেষটা একটু অন্যরকম। কারণ এক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের চরিত্রটি অন্যান্য ছবি ক'খানির বড় ভাইদের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। অতীব ভাবালু পরিস্থিতিতেও

হৃদয়বেদনায় থর থর হয়ে নেতিয়ে না পড়ে ধীরভাবে প্রশস্ত সমাধানের পথ দেখিয়ে অবিকার চরিত্রচাতুর্য প্রকাশ করেছে সত্যেন্দ্র। এইটুকুই 'ঝড়ের পরে'র বৈশিষ্ট্য।—ঋণ শোধের কথাই যদি ওঠে তাহলে তারা যেমন নীলুকে মানুষ করে তুলেছে তেমনি নীলুও তাহলে ওদের প্রতিপালনের ভার নিক; কিন্তু সন্তানকে মানুষ করে তোলার ঋণ কি কখনো পরিশোধ করা যায়! এ ছাড়া 'ঝড়ের পরে'র ঘটনাবলী নিস্তেজ; পোষা একঘেয়ে জিনিস সব। তবে ঘরোয়া পারিবারিক ব্যাপার যার দর্শকসাধারণের মনে বসবার একটা স্বতস্ফূর্ত আবেদন থাকে। এই কাহিনীর যারা চরিত্র বাস্তবেও তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

* * *

সুমিত্রার কাকার বাড়ীর একফালি, নীলুর হাসপাতালের বিশ্রামাগারের একটি কোণ, মিলের অফিস ও মেসিনের একাংশ এবং পূর্ণর শ্বশুরবাড়ীর বারান্দার একটি কোণ ছাড়া সত্যেন্দ্রদের বাড়ীই সম্পূর্ণ ঘটনাস্থল। এবং তা হওয়াও স্বাভাবিক। সাদাসিদে ঘটনা; চমকপ্রদ নাটকীয়তা সৃষ্টি করে তোলার মতো জমাট জিনিসের অভাব। অর্ডার মাফিক হঠাৎ ঝড়-জল নামিয়ে আনার মতো কৃত্রিমতার নির্দশন কয়েকক্ষেত্রেও আছে। পূর্ণর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করেই চলে আসার মতো বিসদৃশতাও আছে। বাড়ীর আসবাব সাজসৌষ্ঠবের আড়ম্বরতা যেন এ ধরনের কাহিনীর চরিত্র ও প্রকৃতিতে সামঞ্জস্যহীন। হোক না ওরা বড়লোক। কলাকৌশলের দিক মোটামুটি। সঙ্গীতাংশে, কণ্ঠ এবং আবহ কোন ক্ষেত্রেই উল্লেখ করার মতো বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। কলাকুশলীবৃন্দ হচ্ছেন—আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়: শব্দগ্রহণ শিশির চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত পরিচালনা নচিকেতা ঘোষ; শিল্প নির্দেশ নরেশ ঘোষ ও সম্পাদনা অজিত দাস। গান তিনখানি গেয়েছেন রবীন মজুমদার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

* * *

এই চর্বিত-চর্বন আখ্যানবস্তুটির একমাত্র সান্ত্বনা ও তৃপ্ত অভিনয়ের দিকটা। ছবিখানি দেখতে দেখতে ভাঙা-গড়া-নিষ্কৃতি-দত্তক-ছোটবৌ আদির কথা বার বার মনে ভেসে উঠবেই, কিন্তু মনকে বিরক্ত হওয়ার পাল্লা থেকে রেহাই দেয় অভিনয় সৌকর্য। পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত এই দিকটা ফুটে ওঠার পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়েছেন। তিন ভাই এবং তাদের তিন বৌ, মোটামুটি এই ছটি চরিত্র; আর বাকি যা আছে অববাহক মাত্র। প্রধান চরিত্র ছটিই হৃদয়স্পর্শী অভিনয়ে ছবিখানির জান রেখে দিয়েছেন। বিভিন্ন ছয় প্রকৃতির ছটি চরিত্র। বড়োভাই সত্যেন্দ্র, পিতৃতুল্য কর্তব্য করে আর ভাই কটিকে মানুষ করেছে; ব্যবসা করে সম্পত্তি বাড়িয়েছে। স্নেহপ্রবণ, সত্যনিষ্ঠ সরল মানুষ, কিন্তু সংকটে বিভ্রান্ত হওয়ার মতো আবেগ-বিধ্বস্ত প্রকৃতি নয় তার। তাই সহজেই তার দ্বারা সংসারের ভাঙন রোধ করা সম্ভব হলো। এই চরিত্রটিতে ছবি বিশ্বাস বেশ দীপ্ত মানবিক আবেদনপূর্ণ অভিনয় ফুটিয়ে তুলেছেন। স্ত্রী সুনয়নার চরিত্রটি

শুক্রবার ১লা জুলাই হইতে প্রদর্শিত হইতেছে!

অন্যান্য ভূমিকায়—সাবিত্রী - ছবি - জহর - কমল - বিকাশ - সুপ্রভা - রেণুকা - জয়শ্রী - নৃপতি - অনুপ - প্রশান্ত
রাজলক্ষ্মী - আশা দেবী - অনিল - পরিতোষ

কাহিনী—বিজয় গুপ্ত ● প্রযোজনা—ভবেন্দু দত্ত ● পরিচালনা—আনু সেন ● সংগীত—কালিপদ সেন

রাধা - প্রাচী - ইন্দিরা

অশোক (শালকিয়া) - শ্রীকৃষ্ণ টকীজ (বালী) - নিউ তরুণ (বরানগর) - নেত্র (দমদম) - সুচিত্রা (বেহালা)

● অগ্রিম আসন সংগ্রহ করে রাখুন ●

——নর্মদা চিত্র রিলিজ——

নিষ্কৃতি-দত্তক-ছোট বৌ'য়ের একটি যুক্ত সংস্করণ এবং মলিনা দেবীও ঐ তিনটি চরিত্রের অভিনয়ের জোর এই একটির মধ্যে সঞ্চারিত করে অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এমন চরিত্রে তাকে আগে কয়েকবারই দেখা গেলেও এখানে নতুনভাবে দৃষ্টিপাত করতে হয়। মেজ-ভাই পূর্ণেন্দু দাদা-বৌদি অনুগত, শান্ত প্রকৃতির। কাহিনীর 'ভিলেন' মেজবৌ রেণুর স্বামী থাকা দরকার বলেই কাহিনীর সঙ্গে পূর্ণের সংযোগ; না হলে রেণু এ পরিবারে উটকো হয়ে পড়ে। যাই হোক পূর্ণেন্দুর চরিত্রে মিহির ভট্টাচার্য অল্পের মধ্যেও যথাযথ অভিনয় প্রকাশ করেছেন। রেণুর কুচুটেপনাই হচ্ছে সংঘাত সৃষ্টির মূল। স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরায়ণ এবং মিথ্যাশ্রয়ী চরিত্রটিতে রেণুকা রায় একটা মূর্তিমতী দুর্যোগের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ধরনের চরিত্রে তিনি আগেও অবতরণ করেছেন এবং এবারও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নীলুর চরিত্র নিষ্কৃতি-ভাঙাগড়া- দত্তক- ছোটবৌ'য়ের ছোট-ভাইয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। একই চরিত্র, এখানেও সে ডাক্তার। রবীন মজুমদার গোড়ার দিকে তেমন ছাপ না দিতে পারলেও পৃথক হওয়ার সঙ্কল্প করা থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত জমাটি অভিনয় করেছেন। ছোটবৌ সুমিত্রাকে মধুরস্বভাব বিনম্র চরিত্রে রূপায়িত করে তুলতে প্রণতি ঘোষের অভিনয় সহায়ক হয়েছে। ছবির আরম্ভেই পাওয়া যায় বাড়ীর ভৃত্যরূপে জহর রায়, সন্তোষ সিংহ ও নবদ্বীপ হালদারকে। পরেও এক আধবার চোখে পড়ে, তবে তেমন কিছু নেই ওদের। বিভু, শ্যামল, বাবুয়া, গৌর প্রভৃতি কটি ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। এক-মাত্র সুমিত্রার ছোট ভাইয়ের চরিত্রে বিভু ছাড়া আর কটিকে দিয়ে তেমন অভিনয় করানো যায়নি—কেমন আড়ষ্ট সচকিত ভাব। অভিনয়ে আর আছেন তুলসী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা, আশা প্রভৃতি।

'এইচ-এম্-ভি'

N 82652—সুরসাগর জগন্ময় মিত্র গেয়েছেন দুখানি আধুনিক গান "অশ্রু মুকুতা কেন" ও "মন বিহঙ্গরে"। N 82653—কুমারী বাণী ঘোষাল—"জাগো বসুমাতা" ও "সন্ধ্যামণি কনক চাপা"। N 82654—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—"মনের বনে বনে" ও "আকাশ মাটি যেথায়"। N 82655—শ্যামল মিত্র "যদি ডাক এপার হতে" ও "ও শিমুল বন"। P 11929 -পঙ্কজ মল্লিক রাইকমল বাণী চিত্রের "যদি তোর হৃদ্ যমুনা"। N 76014—পঙ্কজ মল্লিক ও শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোঃ 'রাইকমল' বাণী চিত্রের "বৃন্দাবন বিলাসিনী" ও "বিদগ্ধ যৌবন"। N 76013—পঙ্কজ মল্লিক ও শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোঃ 'রাইকমল' বাণী চিত্রের "পোড়া বিধি আমার" এবং "মন্দির ত্যজি যব"। N 76012—পঙ্কজ মল্লিক ও শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোঃ 'রাইকমল' বাণী চিত্রের "বঁধু অনেক কাঁদায়ে" ও "অল্প বয়স মোর"। N 76011—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 'অপরাধী' বাণী চিত্রের গান "ছিল সুর ছিল গান" ও "আমি নিশীথের মায়া।"

কলম্বিয়া

G E 24759—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য আধুনিক "আমায় তুমি ভুলতে পার" ও "রুমা ঝুমা ঝুম"। G E 30921—ওস্তাদ ডিভি পালুশঙ্কর 'শাপ মোচন' বাণী চিত্রের গান "কলিয়ান সঙ্গ করত"। G E 30288 এবং G E 30289—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'শাপ মোচন' বাণী চিত্রের গান "সুরের আকাশে তুমি" ও "ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস" এবং "শোন বন্ধু শোন" ও "ব'সে আছি পথ চেয়ে"।
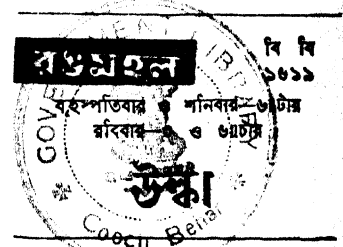
খেলার মাঠে

একলব্য
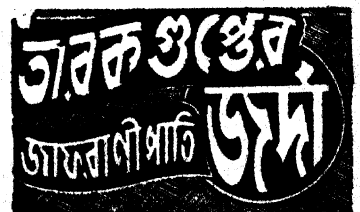
পর্বতারোহণ, পদযোগে বা সাইকেলে দেশ ভ্রমণ, মোটরযোগে কলকাতা-লণ্ডন যাতায়াত, সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার, ডিঙিগর ভেলায় বিশ্ব পরিক্রমার প্রচেষ্টা ইত্যাদি দুঃসাহসিক কার্যকলাপ খেলাধুলোর আওতায় পড়ে কি না জানি না। কিন্তু খেলাধুলোর জন্য শারীরিক পটুতা, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার যতটুকু প্রয়োজন দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় শারীরিক পটুতা, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী, সবার উপরে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারের' জন্য চাই অটুট মনোবল এবং ঐকান্তিক আগ্রহ। দুইয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যেও আছে কিছু পার্থক্য। খেলাধুলোর উদ্দেশ্য শারীরিক কসরত আর দেহমনের আনন্দ। আর দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় আছে আনন্দের সঙ্গে বৈচিত্র্য এবং অজানাকে জানবার ঐকান্তিক আগ্রহ। জীবনে এই বৈচিত্র্য লাভের জন্য দেশ বিদেশের কত শত ডানপিটে ছেলে অজানার পথে পা বাড়িয়ে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ইয়ত্তা নেই। দৈনিকে এ ধরনের খবর হামেশাই চোখে পড়ে। গত এক মাসের মধ্যেই কতগুলি ঘটনা চোখে পড়েছে। প্রদীপ দাশ নামে একটি ছেলে পদযোগে বিশ্ব পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মিশ্রীলাল জয়সোয়াল তুরস্কের ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে পৌঁছেছেন, সস্ত্রীক ভারতীয় দূত শ্রীহাকসারের সঙ্গে জয়সোয়ালের একখানি ছবিও বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়েছে। বাঙলার অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের দুই সদস্য জেরি জাওয়েট এবং কলিন ওয়ার্ডলে অবিরাম মোটর যাত্রায় লণ্ডন পৌঁছে গেছেন, কটকের এক বাঙালী ভদ্রলোক লণ্ডনে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করছেন, সুইডিশ অভিযাত্রী দল কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে ফিরে এসেছেন। জার্মানীর তিন দামাল ছেলে কাঠের ভেলায় দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এঁদের ডিঙিগ কলকাতার ঘাটে নোঙর ফেলেছিল, আবার অজানার পথে যাত্রা করেছে।

'হুগলী' বক্ষে বিশ্বপরিক্রমায় বহির্গত জার্মাণীর তিন দামাল ছেলে এবং তাদের ডিঙিগ নৌকো। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—হ্যানস সীফিল্ড (৩৪), হেনজ লোকল (২৬) ও এগন কুন (১৯)

দক্ষিণ জার্মানীর এই তিন যুবক প্রায় ১১ মাস আগে 'আলম' শহর থেকে তিনখানি ডিঙিগ আশ্রয় করে যাত্রা আরম্ভ করেন। বিভিন্ন দেশ পরিক্রমার পর ১৯৫৬ সালে 'মেলবোর্ন' অলিম্পিকে যোগদান এদের অন্যতম উদ্দেশ্য। দক্ষিণ জার্মানীর কয়েকখানি সংবাদপত্রের অর্থ সাহায্যে এরা এই বিপদসংকুল নৌকো যাত্রা আরম্ভ করেছেন। এদের ডিঙিগর দৈর্ঘ মাত্র ১৫ ফুট, প্রস্থ ২ ফুটের বেশী নয়, কাঠের তৈরী, তবে রবার ক্লথে মোড়া, ইচ্ছেমত ভাজ করা যায়। ডিঙিগর ওজন আধ মণের বেশী নয়; ডিঙিগ চালাবার দাঁড়ও খুব হাল্কা ধরনের। এরা জার্মানী যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, ভূমধ্যসাগরের অঞ্চল ঘেঁষে তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, সৌদি আরব, পাকিস্থান ও ভারতের মধ্য দিয়ে ডিঙিগ পথে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করেছেন। কলকাতা থেকে জাহাজযোগে যাত্রা করেছেন এরা সিঙ্গাপুরের দিকে। সেখান থেকে ডিঙিগ পথে ইন্দোনেশিয়া হয়ে এদের অস্ট্রেলিয়া যাবার ইচ্ছা; এরা জাপান হয়ে আমেরিকার বিপদ সংকুল ও দুর্গম 'অ্যামাজোন' দরিয়ায় পাড়ি জমাবারও আশা রাখেন। শুনলে আশ্চর্য লাগে এঁদের সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই. আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্রও না। থাকবেই বা কেন? এঁরা যে জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে অজানার পথে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং "দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' কিছুই এদের পক্ষে লঙ্ঘন করা কষ্টসাধ্য নয়। এরা সব দেশমাতৃকার দামাল ছেলে।

* * *

বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রের তিন মহারথীর পরিণয় সংবাদ সম্প্রতি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। এক মাইল দৌড়ের ইতিহাস সৃষ্টিকারী বৃটিশ এ্যাথলীট ডাঃ রজার ব্যানিস্টার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন সুইডেনের মিস্ ময়রা এলভার জ্যাকোবসনের

সঙ্গে। আমেরিকার স্বনামধন্যা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় মিস মোরিন কনোলী বিয়ে করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার মিঃ নর্মান ইউগিন ব্রিংকারকে। আর অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ খেলোয়াড় লুইস হোডের সহধর্মিণী হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ারই মহিলা টেনিস খেলোয়াড় মিস জেনিকা জেনস স্ট্যানলী। প্রতিথযশা এ্যাথলীট ও খেলোয়াড়দের বিয়ের বাজারে যথেষ্টই দাম আছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের অনেক কুমারীই এ'দের পাণিগ্রহণের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ভয় হয়, খেলার মধ্যে মেতে থাকায় এদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগে ডিভোর্স স্যুট দায়ের না হয়। কিছুদিন আগের এক ঘটনা ঃ ইংলণ্ডের জর্জ কপাস নামে এক ক্রিকেট খেলোয়াড় অধিকাংশ সময় ক্রিকেটের মধ্যে ডুবে থাকায় তার সহধর্মিণী মিসেস জয়েস কপাস নিষ্ঠুরতার অভিযোগে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন। বিচারপতি কার্মিনাস্কি অবশ্য আবেদনের সত্যতা স্বীকার করেও বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেননি। তিনি মন্তব্য করেন—জর্জের ক্রিকেট খেলা একটা নেশা এবং তিনি ফুটবলেও সমভাবে আগ্রহী, এ কথা জেনেই জয়েস তাকে স্বামীত্বে বরণ করেছেন সুতরাং এখন নিষ্ঠুরতার অভিযোগ কেন? বিচারপতি কারমিনাস্কির রায়ে অনেক খেলোয়াড়েরই সুরাহা হবে। তা না হলে খৃষ্টান আইনে যে সব ছুতোনাতা ব্যাপারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শোবার পর এলার্মের শব্দে স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেলে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আসে; স্বামী নাক ডেকে ঘুমোলে ডাক্তারের সার্টিফিকেটে স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়, স্ত্রীকে রেখে স্বামী দুইদিন সিনেমায় গেলে স্বামীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আসে, আর পরস্ত্রীর সঙ্গে সিনেমায় গেলে তো কথাই নেই। এমন ধারা আইনে খেলার উপাসকদের খুবেই ভয়ের কথা। তবে ভরসা এই উপর্যুপরি তিনবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান মোরিন কনোলী খেলা ছেড়ে দিয়েছেন, দৌড়বীর ডাঃ রজার ব্যানিস্টারও রানিং-শু ত্যাগ করে 'স্টেথিসকোপ' গলায় পরেছেন; আর লুইস হোড যাকে বিয়ে করেছেন তিনিও টেনিসে আসক্ত, শুধু আসক্তই নন, একজন খ্যাতনাম্নী খেলোয়াড়, সুতরাং মাভৈঃ।

* * *

ভারতের খ্যাতনামা টেস্ট বোলার এস জি সিন্ধের অকাল মৃত্যুতে ক্রিকেট ক্রীড়ামোদী মাত্রেই ব্যথিত হয়েছেন। মাত্র ৩১ বছর বয়সেই সিন্ধের জীবন লীলা শেষ হয়ে গেল। ভারতীয় ক্রিকেটে সিন্ধের স্থান হয়তো অপর খেলোয়াড় দ্বারা পূরণ হবে, তার জন্য তেমন ভাবনার কথা নয়, কিন্তু ক্রিকেট খেলোয়াড় তথা ক্রীড়ামোদীর গভীর ব্যথা

পরলোকগত টেস্ট বোলার এস জি সিন্ধে

সিন্ধের পরিবারের কথা চিন্তা করে। সিন্ধে বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী এবং ৪টি কন্যা রেখে ইহধাম ত্যাগ করেছেন; তাঁর ছোট মেয়েটির বয়স মাত্র দুই মাস। এদের ভরণপোষণ চলবে কিভাবে? বোম্বাইয়ের শিবাজী পার্কে সিন্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বহু ক্রীড়ামোদী, খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট বোর্ডের কতিপয় সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এ'দের সম্মুখে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক এবং বোম্বাইয়ের অন্যতম শিল্পপতি বিজয় মার্চেণ্ট সিন্ধের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য এক সাহায্য ভাণ্ডার খোলার প্রস্তাব করেছেন। আমরা সর্বান্তঃকরণে মার্চেণ্টের প্রস্তাব সমর্থন করি, সেই সঙ্গে আশা করি মার্চেণ্ট তাঁর নিজের কর্তব্যও পালন করবেন, আর ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

টেস্ট খেলায় পাঁচ হাজার রান লাভের কৃতিত্বের অধিকারী ইংলণ্ডের কীর্তিমান ব্যাটসম্যান ডেনিস কম্পটন

মহারাষ্ট্রের আদি খেলোয়াড় সদাশিব সিন্ধে ছিলেন লেগব্রেক ও গুগলী বোলার। ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সালে ভারতের ক্রিকেট টিমের সঙ্গে তিনি ইংলণ্ড সফর করেন। সিন্ধে সবশুদ্ধ ৭টি অফিসিয়াল টেস্ট খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন—৬টি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ১টি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। ১৯৫২ সালে দিল্লীতে ভারত ও ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় সিন্ধে মারাত্মকভাবে বোলিং করে ৯১ রাণে ৬টি উইকেট দখল করেছিলেন। রণজি ট্রফির খেলার ইতিহাসেও সিন্ধের বোলিং নৈপুণ্যের অনেক ঘটনা বিদ্যমান।

* * *

বোম্বাইয়ে সিন্ধের পরলোকগমন আর কলকাতা ময়দানে বিজয়কৃষ্ণ দের মৃত্যু সমসাময়িক ঘটনা। বিজয়কৃষ্ণ দে নামটি পরিচিত নয়, এ নাম কোনদিন খবরের কাগজেও ছাপা হয়নি। কিন্তু ময়দানের নিত্যকার যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই বিজয়কে চিনতেন। ইনি খেলোয়াড় ছিলেন না, খেলার পরিচালক গোষ্ঠীরও কেউ না। বিজয় ছিলেন কলকাতার তিনটি ঘেরা মাঠের গ্যালারীর মালিক হেডওয়ার্ড কোম্পানীর কর্মী। তাই বিজয়ের নামের আগে ক্রীড়াসেবক উপাধিই উপযুক্ত বলে মনে হয়। সত্যিই বিজয় ছিলেন প্রকৃত ক্রীড়াসেবক। হেডওয়ার্ড কোম্পানীর নীরব এবং একনিষ্ঠ কর্মী। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি হেডওয়ার্ড প্রতিষ্ঠানের সেবা করে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কলকাতার ময়দানই ছিল বিজয়ের ঘরবাড়ি। মহমেডান-এরিয়ান মাঠের উত্তর-পূব কোণে টিনের যে ছাউনি আছে, সেই ছাউনিকেই বিজয় নিজের স্থায়ী বাসস্থান করে নিয়েছিলেন। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, তিনি হেডওয়ার্ড কোম্পানীর গ্যালারীর অতন্দ্র প্রহরী। সদাহাস্যময় বিজয় খেলোয়াড়, ক্রীড়া পরিচালক তথা দর্শকদের সেবার জন্য সদাই উন্মুখ। নিজ প্রতিষ্ঠানের তো কথাই নেই। প্রিয় দলের খেলা দেখার জন্য দূরাগত দর্শকেরা খেলার দুইদিন আগে মাঠে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে, বিজয় তাদের আহার্য সংগ্রহ করেছেন, তৃষ্ণায় বিলিয়েছেন পানীয়। ময়দানের তিনটি মাঠের গ্যালারীর সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল বিজয়ের

উপর। কোথায় কোন্ কাঠখানা ভেঙেগ গেছে তার মেরামতের জন্য মিস্ত্রী ডাকা, প্রয়োজন মত বেঞ্চ সাজান, গ্যালারীতে রং লাগানো, খেলার আগে মাঠের দরজা খোলা এবং খেলার পর দরজা বন্ধ করা সব কিছুরই তদারক করতে হয়েছে বিজয়কে। একদিন দুইদিন নয়। দীর্ঘ ৩৫ বছর বিজয়কে এই কর্তব্য পালন করতে হয়েছে ময়দানে। এক বিবাহিতা কন্যা ছাড়া বিপত্নীক বিজয়ের সংসারে আর কোন টান ছিল না, তাই হয়তো এমন নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলেয়ে দিতে পেরেছেন খেলার প্রয়োজনে।

বিজয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে মাঝে মাঝে তিনি রক্তের চাপে কষ্ট পেতেন। এরিয়ান-মহমেডান মাঠের কোণে তার নিজের ঘরে একদিন রাত্রিতে সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন, খবর পেয়ে ময়দান পাড়ার লোকজন ছুটে আসে। ময়দানেও একটা ছোট্ট সমাজ আছে। বিভিন্ন তাবুর মালী ও দারোয়ানের সংখ্যা ময়দানে কম নয়। সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাবের কর্তৃপক্ষ তাদের ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ময়দানস্থ ক্লাব তাঁবুর মালীদের একখানা করে নতুন বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। এজন্য সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাবকে শ'তিনেক কাপড় কিনতে হয়েছিল। এই শ'তিনেক লোককে নিয়েই ময়দানের সমাজ। সুখে দুঃখে এরা পরস্পরের সমব্যথী। ক্রীড়া সেবক বিজয়েরও ছিল এরা ব্যথার ব্যথী। বিজয়ের অসুস্থ সংবাদে এদের অনেকেই ছুটে এসেছিল, আর ছুটে এসেছিলেন মালিক প্রতিষ্ঠান হেডওয়ার্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি বিজয়কে। ময়দানের মস্ত পুরুষ বিজয় ময়দানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে খেলোয়াড়, খেলা পরিচালক তথা দর্শকদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক, এই কামনা।

* * *

টেস্ট খেলায় কম্পটনের পাঁচ হাজার রান—দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ৬৯ রান লাভের পর ইংলণ্ডের কীর্তিমান ব্যাটসম্যান কম্পটন টেস্ট খেলায় পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ৬৯টি টেস্ট ম্যাচে কম্পটনের এই রান পূর্ণ হয়। শুধু টেস্ট খেলায় পাঁচ হাজার রান করা বিশ্বের বেশী খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে স্যার জ্যাক, ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, ডন ব্রাডম্যান ও লেন হাটন এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। টেস্টে পাঁচ হাজার রান লাভের কৃতিত্বে কম্পটন বিশ্বের পঞ্চম ব্যাটসম্যান।

মুষ্টিযুদ্ধ—লাইট হেভি ওয়েট মুষ্টি-যুদ্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইয়ে আর্চিমুর মিডল ওয়েট চ্যাম্পিয়ান কার্ল বোবো ওলসনকে নক আউটে পরাজিত করে নিজের পূর্ব অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ওলসন তৃতীয় রাউণ্ডেই আর্চি-মুরের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী হয়ে লুটিয়ে পড়েন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মুষ্টিযুদ্ধের নিয়মানুযায়ী আর্চিমুর ও ওলসনের দেহের ওজনের মধ্যে একটি ধাপের পার্থক্য। ওলসন বিশ্বের মিডল ওয়েট চ্যাম্পিয়ন আর আর্চিমুর লাইট হেভি-ওয়েটে বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা। সুতরাং ওলসনের আর্চিমুরকে চ্যালেঞ্জ করা অনেকটা চাঁদে হাত দেবার মতই। অবশ্য আর্চিমুরেরও গিরি লঙ্ঘন করবার বাসনা আছে। তিনি বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান রকি মার্শিয়ানোর সঙ্গে লড়বার জন্য তোড়জোড় করছেন।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

(২৮শে জুনের খেলার পর)

গত সপ্তাহের ফুটবল লীগ খেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বি এন রেল দলের কাছে রাজস্থান ক্লাবের মরসুমের তৃতীয় পরাজয় এবং রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের কাছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দ্বিতীয় পরাজয় স্বীকার। মোহনবাগান ক্লাবের মত রাজস্থান এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও লীগ বিজয়ের সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং এই পরাজয়ের ফলে রাজস্থান ক্লাবের যে সুযোগ ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। মহমেডান স্পোর্টিংও সুবিধা হারিয়েছে। রাজস্থান ক্লাবকে শুধু বি এন রেল দলের কাছেই হার স্বীকার করতে হয়নি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছেও হারাতে হয়েছে একটি পয়েন্ট। অবশ্য এখন পর্যন্ত রাজস্থানই সবচেয়ে কম পয়েন্ট নষ্ট করেছে। মোহনবাগানের নষ্ট পয়েন্টের সংখ্যা আট আর রাজস্থানের সাত। এটা এমন কিছুই নয়। মহমেডান স্পোর্টিং নষ্ট করেছে নয় পয়েন্ট। সুতরাং চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে এই তিনটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা। ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকর্ষণও বেশী। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে কি বাঘের শত্রু ষাঁড়ে মারে এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। এরিয়ান ক্লাবও খুব পিছিয়ে নেই। তারা হারিয়েছে দশ পয়েন্ট। গত সপ্তাহে ইস্ট-বেঙ্গল ও রাজস্থানের খেলাটির আকর্ষণ ছিল বেশী। এই খেলা দেখবার জন্য

ক্যালকাটা মাঠে দর্শক সমাগমও হয় যথেষ্ট। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ভাল খেলে এবং প্রথম গোল করেও ইস্টবেঙ্গল জয়লাভ করতে পারেনি। প্রথম ডিভিশন লীগ কোঠার নীচের দিকের অবস্থা পূর্ববৎ। এখন পর্যন্ত জয়লাভে অসমর্থ অরোরা ক্লাবেরই ভয় বেশী। ১৪টি খেলায় এরা সংগ্রহ করেছে মাত্র ৬ পয়েন্ট। সুতরাং এদের হয়তো আবার দ্বিতীয় ডিভিশনে ফিরে যেতে হবে। কালীঘাটও খুব আশাবাদী নয়। ভয় আছে কালীঘাটেরও। নীচের দিকের দলগুলির মধ্যে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির কারবার আরম্ভ হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ কোঠায় হাওড়ার ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাবের স্থান সবার উপরে। পোর্ট কমিশনার্স টীম এদের সংগে সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। ইণ্টারন্যাশনালের লীগ বিজয়ী হবার সম্ভাবনা বেশী, কারণ প্রায় সব শক্তিশালী দলের সংগেই এদের খেলা হয়ে গেছে, তারপর পোর্ট টীমের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে তো আছেই। প্রথম ডিভিশনচ্যুত ভবানীপুর ক্লাবের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিনটি খেলায় পরাজয় এবং দুইটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করায় তাদের প্রথম ডিভিশনে উঠবার আশা বিলীন হয়ে গেছে। নীচের দিকে গ্রীয়ার ক্লাব বিপদের মুখে। ফোর্টের সামরিক দল ক্যালকাটা সার্ভিসেস দেরিতে খেলা আরম্ভ করে দুইটি ম্যাচেই পরাজিত হয়েছে।

তৃতীয় ডিভিশনে ক্যালকাটা জিমখানা সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। লীগ কোঠায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী টাউন ক্লাবের সংগে সম-সংখ্যক ম্যাচ খেলে এরা আছে দুই পয়েন্ট উপরে। নীচের দিকে মিলন সমিতি, ক্যালকাটা পুলিস, তালতলা কারো অবস্থাই ভাল নয়। শ্যামবাজার ক্লাব দেরিতে খেলা আরম্ভ করে ৩টি খেলায় অর্জন করেছে মাত্র এক পয়েন্ট।

চতুর্থ ডিভিশনে এক্সসেলসিয়ার্স ক্লাবের অবস্থা খুবই ভাল এবং এদের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বাণী নিকেতনের সংগে সমসংখ্যক ৯টি ম্যাচ খেলে এরা ৪ পয়েন্ট এগিয়ে আছে। নীচের দিকে আলীপুর, নিবেদিতা, শ্যামবাজার ইউনাইটেড, বেংগল স্পোর্টিং, রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং সবাই ভয়ের মুখে।

নীচে গত সপ্তাহের প্রথম ডিভিশন লীগের খেলার ফলাফলগুলি দেওয়া হইলঃ—

২২শে জুন '৫৫'

রাজস্থান (১)	খিদিরপুর (০)
মহঃ স্পোর্টিং (৩)	অরোরা (০)

২৩শে জুন

মোহনবাগান (১)	বি এন আর (০)
ইস্টবেংগল (১)	কালীঘাট (০)
উয়াড়ী (০)	জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

ইস্টবেংগল ও রাজস্থান ক্লাবের লীগের খেলায় রাজস্থান গোলরক্ষক এম ঘটককে একটি বিপজ্জনক বল 'ফিস্ট' করতে দেখা যাচ্ছে

২৪শে জুন

রেলওয়ে স্পোর্টস (২)	মহঃ স্পোর্টিং (১)
পুলিস (১)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১)

২৫শে জুন

ইস্টবেংগল (১)	রাজস্থান (১)
মোহনবাগান (০)	জর্জ টেলিগ্রাফ (০)
খিদিরপুর (১)	এরিয়ান (০)

২৭শে জুন

বি এন আর (১)	রাজস্থান (০)
মহঃ স্পোর্টিং (১)	অরোরা (০)
পুলিস (১)	উয়াড়ী (১)

২৮শে জুন

মোহনবাগান (১)	রেলওয়ে স্পোর্টস (০)
ইস্টবেংগল (১)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
এরিয়ান (৩)	জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২০শে জুন—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চন্দননগর নির্বাচনকেন্দ্রের ফল ঘোষিত হইয়াছে। কম্যুনিস্ট সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীহরবরণ ঘোষকে ৩,৪৮৮ ভোটে পরাজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

আজ কলিকাতায় খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। এই গ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সর্বাধিক স্থিতিকাল প্রায় ৭ মিনিট ৮ সেকেণ্ড। প্রায় সাড়ে বারো শত বৎসর পরে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এত বেশী সময় স্থায়ী হইল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণে বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে।

২১শে জুন—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে ব্যাপকভাবে পাট চাষের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তর আপাতত যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে এই সময়ে পাটের উৎপাদন নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্ভবত ৫০ লক্ষ বেলে পৌঁছিবে।

আজ ভারত সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তিনটি অতিরিক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতে যৌথ পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ভারত ৫২২৭০০ ডলার পাইবে।

২২শে জুন—পাকিস্থানে ভারতের হাই কমিশনার শ্রী সি সি দেশাই আজ কলিকাতায় সাংবাদিকদের বলেন যে, পূর্ব পাকিস্থানে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সেখানকার সংখ্যালঘুদের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছে।

২৩শে জুন—আজ নয়াদিল্লী ও মস্কোতে যুগপৎ নেহরু-বুলগানিন যৌথ বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে। গতকল্য মস্কোতে উক্ত যৌথ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উহাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চনীতি (পঞ্চশীল) ও বান্দুং ঘটনাবলীতে পুনরায় আস্থা প্রকাশ করিয়া বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক উন্নত ও দৃঢ়তর করার উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে।

২৪শে জুন—শতকরা সাড়ে ৩ টাকা সুদে ১০ বৎসরে পরিশোধ্য ১০০ কোটি টাকার নূতন ঋণ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার আজ ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঋণ 'জাতীয় পরিকল্পনা ঋণপত্র—দ্বিতীয় পর্যায়' নামে অভিহিত হইবে।

আজ নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১লা এপ্রিল হইতে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্থান এই উভয় দেশ কর্তৃক সিন্ধু নদ এবং তাহার শাখা ও উপনদীসমূহের জল সেচকার্যে ব্যবহার সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থান সরকার একটি সাময়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

২৫শে জুন—আজ জনৈক ভারতীয় অহিংস সত্যাগ্রহী গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম শহীদ হইয়াছেন। পর্তুগীজ পুলিসের প্রহারে জর্জরিত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই শহীদ স্বেচ্ছাসেবকের নাম শ্রীআমীরচাঁদ। ইনি মথুরার অধিবাসী।

আজ দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির মধ্যবর্তী টুং নামক অঞ্চলে মার্গারেট হোপ টি এস্টেটে চা শ্রমিক ধর্মঘটীদের উপর পুলিসের গুলী চালনার ফলে তিন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে মারা গিয়াছে এবং নয়জন আহত হইয়াছে।

আগ্রার নিকট ভারতীয় বিমান বহরের দুইটি ডাকোটা বিমানের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় বিমান বহরের ১৫ জন ও সেনাবিভাগের ৪ জন নিহত হইয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

২৬শে জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু এবং পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জোসেফ সিরাঙ্কিয়েনিয়ার শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ারস'তে একটি যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই ঘোষণায় "পঞ্চশীল" বা পঞ্চনীতি গ্রহণ এবং অনুমোদন করা হইয়াছে। যৌথ ঘোষণাটি নয়াদিল্লী এবং ওয়ারস' হইতে একযোগে প্রচারিত হইয়াছে।

চা শ্রমিক ধর্মঘটের ব্যাপার লইয়া গতকল্য মার্গারেট হোপ চা বাগানে হাঙ্গামার পর দার্জিলিং শহর ও ধর্মঘটবিক্ষুব্ধ নয়টি চা বাগানে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। গতকল্য উক্ত চা বাগানে পুলিসের গুলী চালনায় আহতদের মধ্যে দুই ব্যক্তি হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ফলে নিহতের সংখ্যা ৫ জন হইল। আজ পাঁচ দিন যাবৎ উক্ত ধর্মঘট চলিতেছে এবং উহা ৩৫টি চা বাগানে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে জুন—কলম্বোতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সিংহলের পূর্ব উপকূলবর্তী ত্রিঙ্কোমালী ও বটিকালোয়া নামক স্থানে মার্কিন দল পরিষ্কার আকাশে ভালভাবে সূর্যগ্রহণ দর্শন করিতে পারিয়াছেন। সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য ভারত, জাপান, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা সিংহলে মিলিত হইয়াছিলেন।

২১শে জুন—মস্কোতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল নিকোলাই বুলগানিন ভারত ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

আজ পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে পাক গণপরিষদের নির্বাচন আরম্ভ হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, করাচী ও বেলুচিস্থানের নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হইয়াছে।

২২শে জুন—আজ রাষ্ট্রপুঞ্জে বক্তৃতার সময় সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটভ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য সাত দফা পরিকল্পনা পেশ করেন।

২৩শে জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু রাশিয়া পরিভ্রমণ শেষ করিয়া আজ মস্কো হইতে বিমানযোগে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস' যাত্রা করেন। ওয়ারস'তে পৌঁছিলে পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জোসেফ সিরাঙ্কিয়েনিয়ার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক শ্রী নেহরু বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

২৪শে জুন—পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী আজ ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থানের কেন্দ্রে মুসলিম লীগ ও পূর্ববঙ্গের যুক্ত ফ্রণ্ট দলের সদস্য লইয়া (জনাব সুরাবর্দী চালিত আওয়ামী লীগ বাদে) কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে। পাকিস্থানের নবগঠিত গণপরিষদে এই দুইটি দল একযোগে কাজ করিবে।

২৫শে জুন—আজ ওয়ারস'তে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ও পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জোসেফ সিরাঙ্কিয়েনিয়ার তিন দিবসব্যাপী বহুবিধ সমস্যার আলোচনার পর একটি যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

২৬শে জুন—আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু সদলবলে ওয়ারস' হইতে ভিয়েনায় আসিয়া পৌঁছিলে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার জুলিয়াস রাব ও অস্ট্রিয়ার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২৲, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩,
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
৩৬ সংখ্যা
দেশ
শনিবার
২৪ আষাঢ় ১৩৬২
DESH
SATURDAY, 9TH JULY, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সেবাগ্রাম আশ্রমের সংস্থিতি

সর্বসেবা সংঘ ওয়ার্ধায় একটি অধিবেশনে সেবাগ্রামস্থ মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম অবিলম্বে পুনরায় খোলা হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেশবাসী-মাত্রেই এই সিদ্ধান্তে সুখী হইবেন। সংঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, আশ্রমটি পুনর্গঠনের অপেক্ষায় সাময়িকভাবেই বন্ধ রাখা হয়। কর্মীরা সকলেই ভূদান আন্দোলনে যোগদান করিতে গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনে যোগদানের জন্য আশ্রমটি পরিত্যাগ করিবার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়—তাহা দেশবাসীর মনে বিশেষ দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে। ভূদান আন্দোলনে যোগদানের জন্য আশ্রমটি পরিত্যাগ করিবার পক্ষে কি যৌক্তিকতা আছে অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং আকস্মিক এই সিদ্ধান্ত যে অবিবেচনা প্রসূত হইয়াছে, সকলেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে সর্বত্যাগের প্রেরণা সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী সেবাগ্রামের আশ্রম পরিত্যাগ করেন, সম্ভবত এই আশ্রমটি পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করিবার মূলে তাঁহার সেই কার্যই আদর্শস্বরূপে গৃহীত হয়, ইহাই মনে হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর সেই আশ্রম পরিত্যাগের সঙ্গে বর্তমান আশ্রম ত্যাগের সিদ্ধান্তের সৌসাদৃশ্যের অভাব রহিয়াছে। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব জাতির জনচেতনাকে বৃহত্তর সাধনায় সমগ্রভাবে অনুপ্রাণিত করে; তাঁহার পক্ষে তৎকালে আশ্রম ত্যাগ প্রয়োজন হয়। ফলত গান্ধীজী মর্ত্যদেহে বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া জাতির মনোমূলে যে উদার-বীর্য সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহার অন্তর্ধানের পর তাঁহার স্মৃতির উজ্জীবনের ভিতর দিয়া আমাদিগকে সেই অভাব পূরণ করিতে হইবে। সুতরাং ভূদান যজ্ঞের মূলে গান্ধীজীর জীবনা-দর্শকে উদ্দীপ্ত রাখিয়া তাহার সার্থকতা সাধন করিবার পক্ষে সেবাগ্রাম পরিত্যাগের সিদ্ধান্তের সমীচীনতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে গান্ধীজীর স্মৃতি এবং সাধনাকে জীবন্ত রাখিবার পক্ষে সেবাগ্রাম আশ্রমের সংস্থিতি বিধানের প্রয়োজনীয়তাই বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। সেবাগ্রাম জাতির পক্ষে পবিত্র তীর্থস্বরূপ। এখানকার জল, বাতাস, গাছপালা গান্ধীজীর পবিত্র স্মৃতিতে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। জাতির ভবিষ্য বংশধরগণ এই তীর্থের সম্পর্কে গিয়া সাক্ষাৎ সম্পর্কে সেই প্রাণময় স্পর্শ লাভ করিবেন। সেবাগ্রামের ঐতিহাসিক প্রতিবেশের এই মহিমা ক্ষুণ্ন করা দেশ, জাতি এবং বৃহত্তর মানবসমাজের সংস্কৃতির দিক হইতে কিছুতেই কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

কলিকাতার পৌর ব্যবস্থার উন্নয়ন

সম্প্রতি কলিকাতা নাগরিক সভার বার্ষিক সম্মেলনে পৌর স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব-অভিযোগ এবং তৎপ্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনায় এই সত্যটি অকুণ্ঠভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, কলিকাতাবাসী নাগরিকের পক্ষে যে পরিমাণ এবং যে প্রকারের পৌর-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিবার অধিকার আছে, তাহা আজও কলিকাতার নাগরিক জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। ইহার কারণ কি? এবং এজন্য পৌরসভা, রাজ্য সরকার কাহার দায়িত্ব কতখানি আছে, ইহা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু দায়িত্ব শুধু তাঁহাদেরই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সম্পর্কে দায়িত্ব রহিয়াছে। কারণ কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের অংশ বিশেষ হইলেও ইহার সর্বভারতীয় একটা দিক রহিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে সমগ্র ভারতের স্বার্থের সঙ্গে কলিকাতার স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। সুতরাং কলিকাতার পৌর-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নয়নকে ঠিক স্থানীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করিবার যুক্তি নাই। যে জনপদ অর্থনৈতিক গুরুত্বে সর্বভারতীয় প্রয়োজনের দাবী মিটাইতেছে, সেই জনপদের পৌর-স্বাচ্ছন্দ্য একান্তভাবে স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ একটি রাজ্য সরকারের দায়িত্বের বিষয় থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সঙ্গে পৌর কর্তৃপক্ষেরও নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কলিকাতা বস্তি অঞ্চলের দুর্দশা, বিশুদ্ধ জলসরবরাহ এবং চিকিৎসা বিধানোপযোগী ব্যবস্থার অভাব এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সব

সমস্যার সমাধানে পৌর কর্তৃপক্ষের আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে অভিযোগের কারণ অবশ্যই রহিয়াছে। শহরে বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং তাহার স্থায়িত্ব এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রমাণ। পৌর-কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত এই দিকে শহরের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। দেখা যাইবে ধনী অপেক্ষা গরীবদের মধ্যেই এই সব ব্যাধির প্রাদুর্ভাব অধিক ঘটিয়া থাকে; বস্তি অঞ্চলগুলি এই সব ব্যাধির কেন্দ্র। ধনীর তুলনায় গরীব নাগরিকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সাধনের দিকে তাঁহাদের সমধিক দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

প্রাণের শাশ্বত উৎস

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৭৪তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সমগ্র জাতির শুভেচ্ছার অমৃত ধারায় তিনি অভিষিক্ত হইয়াছেন। ডাঃ রায় কর্মী পুরুষ। অনলস তাঁহার কর্মোদ্যম, অতন্দ্রিত তাঁহার সাধনা। কর্মসাধনার এই যে বল ইহার একটি ধর্ম আছে। এদেশের প্রাচীন আচার্যগণ তাঁহাদের জীবনাদর্শে এবং আচরণে সেই ধর্মের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ অনেকটা দার্শনিক যুক্তিতে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই যুক্তি এবং ভিত্তি হইতে কর্মের শক্তি উৎসারিত হইয়া প্রাণবলের প্রাচুর্য বিধান করে। অভিনন্দনের উত্তরে ডাঃ রায় সংক্ষেপে এই সত্যটি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্যের কথা যদি বুঝিয়া থাকি, তবে তাহা এই যে, তুমি যাহা পাইবে, তাহা দান করিবে, কার্পণ্য করিবে না। কাহারও নিকট হইতে দান আসে তখনই, যখন আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যত প্রাণ, যত প্রাণশক্তি দেওয়া যাইবে, ততই আত্মশক্তি বাড়িবে। বাংলার ব্যুঢ়োরস্ক বর্ষীয়ান্ নেতার এই উক্তির দার্শনিকতা নৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত রহিয়াছে। এদেশের সংস্কৃতির মর্মকথা ইহাই। কিন্তু এইসব কথা আমাদের সমাজ-জীবনে কতটা বাস্তব আকার ধারণ করিতেছে, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। ফলত প্রাণ দিতে চাহিলেই দেওয়া যায় না। প্রাণশক্তির জাগরণের মূলে বেদনাবোধ থাকা প্রয়োজন এবং মমত্বকে ভিত্তি করিয়াই তাহা জাগ্রত হইয়া থাকে। এই মমত্ববোধের মূলে কোথায় ডাঃ রায় সেই কথাটা খুলিয়াই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাকে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনি কাজ করিবার এত শক্তি কোথায় পান? আমি বলি, আপনাদের নিকট হইতে পাই। আপনারাই সেই শক্তি দেন। আপনারা না দিলে কোথায় পাইব? অবদান সম্বন্ধে ব্যষ্টি-জীবনের মূলে সমষ্টির সকৃতজ্ঞ এই যে স্বীকৃতি, ইহাই শক্তির উৎস এবং এই উৎস হইতেই প্রকৃত কর্মী দুর্জয় মনোবলে সাধনার পথে আগাইয়া চলেন। জাতির উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন প্রত্যেকে নিজ নিজ অবদানের বিন্দু বিন্দু প্রাণধারা দিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে। এই সম্বন্ধে সচেতন এমন মমত্ববোধে ইহাদের প্রতি কর্তব্য প্রতিপালনে যদি আমরা প্রত্যেকে উদ্বুদ্ধ হই, তবেই শাশ্বত প্রাণধারার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সংযোগ ঘটিবে, তখন পথের কোন বাধাই আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। ডাঃ রায়ের প্রাণময় কর্মসাধনা সুদীর্ঘকাল জাতিকে এই সত্যে জীবন্ত করিয়া রাখুক, আমরা ইহাই কামনা করি।

মানবতার দাবী

সর্বভারতীয় গোয়া পার্লামেণ্টারী কমিটি সম্প্রতি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে পর্তুগীজদের বর্বর অত্যাচার সম্বন্ধে সভ্য জাতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবকগণ এই ক্ষেত্রে সম্ভবত সভ্য জগৎ বলিতে জগতের কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্রকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গোয়ার পর্তুগীজ কর্তাদের আচরণ এতাবৎকাল পর্যন্ত ইঁহাদের নজরে পড়ে নাই, ইহা সম্ভব নহে। অথচ কোন শক্তিই এই পর্যন্ত পর্তুগীজদের আচরণের প্রতিবাদে একটি শব্দও উচ্চারণ করা প্রয়োজন বোধ করে নাই; পক্ষান্তরে অত্যাচারী শাসকদের প্রতি গোপনে গোপনে ইঁহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতিই যে রহিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। কারণ যদি তাহা না হইত তাহা হইলে ক্ষুদ্র পর্তুগালের স্পর্ধা এতটা চূড়ান্ত মাত্রায় উঠিত না। ভারত সরকার এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের নীতি তাহাদের এই স্পর্ধা পরিবর্ধিত করিয়া প্রভুত্বপর শোষক শক্তিবর্গকেই মদগর্বে প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত জগতের স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার যে নীতিকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করিতেছে, ভারত সরকারের গোয়া সম্পর্কিত নীতি এই হিসাবে তাহার স্পষ্টই বিরোধী। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ার আঘাতই ভারতের তটভূমি হইতে তাহাদের শেষ অধিকারকে উৎখাত করিবে ইহা নিশ্চিত। কিন্তু বৃহত্তর মানবতার সেই চেতনার এই সংযোগ সূত্র হইতে নিজেদের নীতিকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া ভারত সরকার এবং কংগ্রেস উভয়েই তাঁহাদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বর্বর নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের মর্মমূলে যে প্রেরণা উত্তরোত্তর সংহতভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে গণতন্ত্রী ভারত সরকার এবং জনস্বার্থের সংরক্ষক হিসাবে কংগ্রেসের শক্তি তাহাতে সংযুক্ত হওয়া উচিত। সেই পথেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের যৌক্তিকতা জোর বাঁধিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার এবং কংগ্রেসের নীতির ফলে প্রকারান্তরে গোয়া ভারতের অঙ্গীভূত নহে, বহির্জগতে এমন ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হইতেছে। সুতরাং এই নীতির দ্বারা পর্তুগীজ শাসকদের মতিগতির পরিবর্তন ঘটিবে, এমন আশা করা যায় না। তাঁহারা বড় জোর শাসনতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের একটা ফন্দী অবলম্বন করিতে পারেন, তাহারই সূত্রপাত হইল। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাহায্যেই গোয়ার মুক্তি সাধন সম্ভব হইতে পারে। ভারত সরকার এবং কংগ্রেসের নীতি সর্বতোভাবে এমন সত্যাগ্রহের সহায়ক হয়, দেশবাসী ইহাই দেখিতে চায়। ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এ সম্বন্ধে দ্বৈধভাব অবলম্বনের কোন প্রশ্নই এখন আর উঠে না।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টায় সৌদী আরব ও মিশরের মধ্যবর্তিতা নিষ্ফল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যে-পাকিস্তানী শর্ত আফগানিস্তানের সরকার মেনে নিতে পারলেন না বলে গোল মিটল না সেটা হচ্ছে এই যে, পাকতুনিস্তান সম্পর্কে আফগানিস্তান কোনোরকম প্রচার বা আন্দোলনে সহায়তা করতে পারবে না। এ শর্ত আফগান সরকার মানতে রাজী হননি। অতঃপর পাকিস্তান সরকার কী করেন সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। কাবুলে পাকিস্তানী দূতাবাসের উপর জনতার হামলা ও পাকিস্তানী পতাকার অবমাননার একটা প্রতিকার না হলে পাকিস্তান সরকারের মুখরক্ষা হয় না। কাবুলের ঘটনার পরে পেশোয়ারে একটা পাল্টা ঘটনা ঘটে যাতে সেখানকার আফগান কনসালের অফিসের উপর হামলা হয় এবং আফগান পতাকার অবমাননা হয়। আফগান সরকার এর প্রতিকার চান। পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট পেশোয়ারের ঘটনাকে আফগানিস্তানের ভাড়াটে লোক দিয়ে করানো একটা সাজানো ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কাবুলের ঘটনার পরে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট আফগানিস্তানে পাকিস্তানী কনসালের অফিসগুলিও বন্ধ করে দেন।

কাবুলের ঘটনার প্রতিকার আগে চাই এবং তার সঙ্গে পেশোয়ারের ঘটনার তদন্ত অথবা আফগানিস্তানে পাকিস্তানী কনসালের অফিসগুলির আবার খোলার প্রশ্ন জড়ানো চলবে না—এই ছিল পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের দাবী। অন্যপক্ষে পেশোয়ারের ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত ও আফগানিস্তানে পাকিস্তানী কনসাল অফিসগুলি আবার খোলার উপর আফগান সরকার জোর দিচ্ছিলেন। পাকিস্তানী কনসাল অফিসগুলি খোলার উপর আফগান গভর্নমেণ্টের জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আফগান গভর্নমেণ্টের মনে এই আশঙ্কা রয়েছে যে, পাকিস্তানী গভর্নমেণ্ট কাবুল-ঘটনা সম্পর্কে নিজের দাবী আদায় করে নিয়ে চুপ করে বসে থেকে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অসুবিধা ঘটিয়ে যেতে পারে। কনসালের অফিসগুলি খোলার মানে হবে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে এবং পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আফগানিস্তানের বাণিজ্য চলাচলের পথ খোলা থাকবে। পাকিস্তান কিন্তু এই অস্ত্রটি হাতে রেখে কাবুলের ঘটনার প্রতিকার আগে চেয়েছিল। আর তা'তে যদি আফগানিস্তানের আপত্তি থাকে, যদি আফগানিস্তান চায় যে, কনসালের অফিসগুলিও খোলার ব্যবস্থা হোক, তবে তার বদলে আফগানিস্তানকে এই শর্তে রাজী হতে হবে যে, পাকতুনিস্তান সম্পর্কে কোনোরকম প্রচার বা আন্দোলন আফগান গভর্নমেণ্ট করতে দেবেন না।

আফগান গভর্নমেণ্ট এ শর্ত স্বীকার করে নিতে রাজী হন নি, আফগান গভর্নমেণ্টের পক্ষে রাজী হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ এতকাল পাকতুনদের অনুকূলে মত প্রকাশ করে এখন উল্টা সুর ধরলে কেবল পাকতুনদের কাছে নয়, আফগানদের সামনেও আফগান গভর্নমেণ্ট মুখ দেখাতে পারবেন না। তাছাড়া, আফগানিস্তান নিজের স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্যও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত পাকতুনিস্তানের মতো একটা অঞ্চল থাকার আবশ্যকতা বোধ করে। পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের মনে অবশ্য এই আশঙ্কা আছে যে, সীমান্তের পাঠান-অধ্যুষিত অঞ্চল ভবিষ্যতে নিজের আওতায় আনার উদ্দেশ্যেই আফগানিস্তান পাকতুন আন্দোলন সমর্থন করছে।

যাই হোক, অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তা'তে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছেদনের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে। তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের দিক থেকে আফগানিস্তানের বাণিজ্য পথ আরো ভালো করে বন্ধ করার চেষ্টাও অবশ্য হবে। তা'তে উভয় দেশেরই ক্ষতি হবে সন্দেহ নাই। আফগানিস্তান সেজন্য কিছুটা প্রস্তুতও হয়েছে। ইতিমধ্যেই সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আফগানিস্তানের একটা চুক্তি হয়েছে যাতে সোভিয়েটের পথে আফগানিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাল যাতায়াত করতে পারবে। পূর্বের ব্যবস্থার তুলনায় সেটা আফগানিস্তানের পক্ষে খুব যে সুবিধার হবে তা নয়, তবে আফগানিস্তান অচল হবে না।

এই ঝগড়ার ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে যদি সোভিয়েটের সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড়তর হয় তবে সেটা পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক বৃহৎ শক্তিদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে মুশকিল হয়েছে এই যে, কাবুলের ঘটনাতে পাকিস্তানের অবমাননা হয়েছে সন্দেহ নেই এবং সেইজন্য পাকিস্তানকে

বেশি নরম হতে বলাও কঠিন; কিন্তু আবার ধমকে আফগানিস্তানকে দিয়ে কিছু করানোও সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র হলেও বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে "buffer" রাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্থান তার দুর্বলতা কী তাও জানে, আবার তার জোর কোথায় তাও জানে। "buffer" রাষ্ট্র বলে ইরাণ একদিকে মার্কিন ঋণও যেমন পাচ্ছে তেমন অন্যদিকে সোভিয়েটের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতেও ছাড়ছে না। ইরাণে কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত তুদে পার্টির উচ্ছেদ সাধনে ইরাণ গভর্নমেন্টের তৎপরতা সুবিদিত, তা সত্ত্বেও কিন্তু ইরাণ সরকার সোভিয়েট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ইরাণের এগারো টন সোনা ফেরৎ আদায় করেছে, যেটা যুদ্ধের সময়ে ইরাণ থেকে রাশিয়ানরা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, রাশিয়ার কাছ থেকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইরাণ ধারে মাল পাচ্ছে, যেমন বৃটেন ও জার্মানীর কাছ থেকেও পাচ্ছে। এইসব সুবিধার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা অর্থাৎ ইরাণের জনসাধারণের কল্যাণে তা লাগছে কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র এবং তার উত্তর হয়ত মোটেই প্রীতিকর হবে না। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে buffer রাষ্ট্রগুলি চতুর হলে কীরকম দু'দিক থেকেই সুবিধা আদায় করতে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসাবেই এখানে ইরাণের উল্লেখ করা হল। আফগানিস্তানও "buffer" রাষ্ট্র হিসাবে তার অবস্থানের সুযোগ নেবে।

এক্ষেত্রে পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক শক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে পাকিস্তানকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া যা'তে মুখরক্ষার জন্য পাকিস্তানকে একটা চরম কিছু করার দিকে অগ্রসর হতে না হয়। "চরম" অর্থে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে না, যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে আদৌ মনে করি না। কূটনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদ ও বাণিজ্য পথ বন্ধ করাও ঠিক কাজ হবে না। এই ধাক্কায় পাকতুনিস্তান সম্পর্কিত সমস্যা শেষ করে দেবার চেষ্টা করে পাকিস্তান ভালো কাজ করেনি। এ সমস্যা অত সহজে মিটবার নয়, অবস্থা যেমন আছে মোটামুটি তেমনি থাকতে দিয়েই আপাতত কাবুলের এবং তৎপরবর্তী ঘটনা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির একটা মীমাংসা করে নেওয়া উচিত ছিল।

কাবুলের ঘটনার প্রতিকার হিসাবে যা কর্তব্য তা করতে আফগান সরকার রাজীও হয়েছিলেন। অতঃপর ঐরকম ঘটনা আর ঘটবে না, এরূপ আশা করাও যেত, কিন্তু পাকতুনিস্তানের অনুকূলে আর কোনোরকম প্রচার চলবে না—এই দাবী করা এবং এই দাবী না মানলে কনসালের অফিসগুলি খোলা হবে না—এই শর্তের উপর জোর দিয়ে মীমাংসার পথ বন্ধ করা উচিত হয়নি। হয়ত এখনো পুনর্বিবেচনার অবসর আছে। পাকিস্তান গভর্নমেণ্টকে বুঝতে হবে যে, বর্তমানকালে কেবল চোখ রাঙিয়ে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রকে দিয়ে যা-ইচ্ছা করানো যায় না। পাকিস্তান তো দূরের কথা—আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন প্রভৃতির মতো চাঁইদেরও অনেক রয়ে সয়ে কাজ করতে হয়।

* * *

বান্দুং কনফারেন্সে ইজরেলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি যদিও সর্বতোভাবেই ইজরেলের আমন্ত্রণ পাওয়া উচিত ছিল। ইজরেলকে ডাকলে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো কোনো দেশ অসন্তুষ্ট হবে, এমন কি তারা কনফারেন্সে নাও আসতে পারে, এই ভয়ে ইজরেলকে ডাকা হয়নি। বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষকেও এই অন্যায় আচরণের সমর্থক হতে হয়েছে। এর দ্বারা বান্দুং কনফারেন্সের নৈতিক বল হ্রাস হয়েছে বলে মনে করি। হয়ত এজন্য মনে মনে অনেকেই লজ্জিত হয়েছেন কিন্তু একমাত্র বর্মা গভর্নমেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নু ই ইজরেলকে না ডাকা যে অনুচিত হয়েছে একথা প্রকাশ্যে বলতে দ্বিধা করেন নি। সম্প্রতি শ্রী নু ইজরেল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, শ্রী নু মিশরেও যাবেন। শুনা যায়, মিশরের প্রধানমন্ত্রী কর্নেল নাশের শ্রী নুকে ইজরেলে যাওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। শ্রী নু তা'তে রাজী হননি। কর্নেল নাশেরের কথায় বোধহয় এই ইংগিত ছিল যে, ইজরেলে গেলে মিশরে তাঁর সম্বর্ধনার অসুবিধা হবে। শ্রী নু মিশর ভ্রমণ বাদ দিয়ে ইজরেলেই গেলেন। বলা বাহুল্য, শ্রী নু মিশরেরও বন্ধু, কিন্তু মিশরের গভর্নমেণ্ট তাঁকে ইজরেল যেতে বারণ করবে, এটা তিনি বরদাস্ত করেন নি।

* * *

তুর্কী-ইরাক সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তান যোগ দেবে—একথা করাচী থেকে সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে। সংবাদটি আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। ইতিপূর্বে বৃটেন এই চুক্তির শরিক হয়েছে।

৫।৭।৫৫

॥ ৪ ॥

অমলেন্দু এল। সুধাময় তখন অফিস থেকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছে। কমলা কলঘরে। বাসনা চা জলখাবার তৈরি করছে সুধাময়ের। রান্নাঘরে। সাজগোজ শেষ করে বীথি যাবার পথে উঁকি দিল। 'বৌদি বেরোয় নি এখনো! আমি যাচ্ছি ছোড়দি!' রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পায়ের কাপড়টা একটু টেনে, বিনুনী জড়ানো খোঁপাটা বাঁ হাতে ঘাড়ের কাছে ঠিক করতে করতে, এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে বীথি চলে গেল।

বাসনা এক পলক তাকিয়ে বীথির সাজের ঘটাটা দেখে নিয়েছিল। যাবার সময় বীথি হেজলিন আর সেণ্টের উগ্র খানিক গন্ধ ছড়িয়ে গেল। রান্নাঘরের বাতাসে সেই গন্ধ থাকল একটুক্ষণ। বীথির কথায় জবাব দেয় নি বাসনা, মাথাও নাড়েনি। যেন শুনতেই পায়নি কথাটা।

বীথি চলে যেতে বাসনা মুখ তুলল। যদিও বীথি নেই তবু তার শাড়ির খস্‌খস্‌, গরবিনীর খুশীর ভঙ্গিগুলো গা থেকে এখনো ঝরে পড়ছে চৌকাঠটার সামনে। আর গন্ধ। বাসনা যেন দেখতে পাচ্ছে, শূন্য চোখে তেমনিভাবে তাকিয়ে থাকল।

বাসনার মনে হচ্ছিল, বীথি যেন ইচ্ছে করেই কথাটা তাকে শুনিয়ে গেল। নিজেকেও সেই সঙ্গে দেখিয়ে গেল। অবশ্য বীথির সাজগোজের দিকে তাকিয়ে বাসনা মনে মনে হেসেছে। দাঁড়কাকের গায়ে ময়ূরের পালক গোঁজার মত দেখাচ্ছিল বীথিকে। ওই তো কালো রঙ, অথচ গায়ে টান টান করে জাপ্টেছে মুর্শিদাবাদী জবজবে-রঙ লতাপাতার কাজ করা শাড়ি। মুখে গুচ্ছের স্নো পাউডার। কপালে এক বাহারী টিপ। সব জড়িয়ে-মিশিয়ে রূপ যা খুলেছে বীথির, রাস্তায় নেমে অমলেন্দুই না লজ্জায় দু-হাত সরে সরে থাকে।

রূপ যার নেই তার কেন যে অতো ঘষামাজা, পেত্থম তোলা সাজ বাসনা বুঝতে পারে না। যতোই সাজ, বাসনা সুধাময়ের চা ঢালতে ঢালতে ঠোঁট উল্টে হাসছিল, ওই রূপ দিয়ে কোনো ছেলেকে ভোলানো যায় না। শুধু কতকগুলো খটখটে হাড়, গালভাঙা চিবুক, ছোট্ট বুক, আর ডবল সায়া পরে শরীর ফুলনো—এ-সব এমন কিছু নয় যা দিয়ে বেশি দিন ঠকানো চলে। বুঝলে বীথি, বাসনা বীথিকে মনে মনে উদ্দেশ করে যেন বলছিল, হাড় নয় মাংসও চাই, ছাঁদ চাই, গড়ন, গঠন। চোখ, নাক, মুখ, ঠোঁট, চুল, বুক, হাত—প্রতিটি অঙ্গ ভরাট হওয়া চাই, সুন্দর আর নরম, নধর। তবে!

চা আর জলখাবার নিয়ে বাসনা উঠবো উঠবো করছে, কমলা এসে পড়ল। গা ধুয়ে কোনো রকমে শাড়ি-জামাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। এখনো মুখ চুল পরিষ্কার করেনি, জামা কাপড় পরতে পারেনি গুছিয়ে।

'বীথিরা চলে গেছে?' কমলা শুধলো।

'কখন!' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল বাসনা।

কমলা স্বামীর জলখাবারের প্লেট, চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে বললে, 'তোমার চা ঢেলে নাও, ছোড়দি। আমি আসছি।'

কমলা চ'লে গেল। বাসনা নিজের জন্যে চা ঢেলে নিয়ে বসল একটু তফাতে। আঁচ থেকে সরে।

উনুনটা জ্বলছে। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি চাপানো। ভাতের জল বসেছে। পাশ থেকে গনগনে আঁচের একটা আধটু দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে কেমন এক হলুদ আলো। বিবর্ণ। জানলা নেটে ঝুল জড়িয়ে জড়িয়ে অদ্ভুত এক রঙ ধরে গেছে। ফাঁকগুলো পর্যন্ত কালো, চিটচিটে। একটা টিকটিকি জানলার মাথার কাছাকাছি নেমে এসে যেন বাসনার দিকে চেয়ে লেজ বেঁকিয়ে বসে। ক'টা আরশোলা ফর ফর করে উড়ছে। গুমোট গরম উঠছে। হাওয়া নেই।

অন্যমনস্ক মনে বাসনা দেখছিল। আজকাল মাঝে মাঝে বাসনার চোখে রান্নাঘরের এই হলুদ দেওয়াল, মিট-মিটে আলো, ঝুল, টিকটিকিটার কচিৎ টিক্‌টিক কেমন যেন অন্যরকম মনে হয়। কোথাও কী একটা মিল খুঁজে পেয়েছে বাসনা এই রান্নাঘর আর তার মধ্যে! হয়তো। কেননা আজ বাসনার মনে হচ্ছিল, ওর শরীর মন সমস্তই ওই রকম বিবর্ণ, কালি ধোঁয়ায় মাখামাখি,

রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছে। কোথাও একটু শিল্প নেই, হাওয়া নেই, উজ্জ্বলতা বা বাইরের বাতাস-আলোর সহজ ছোঁয়া। চারপাশ থেকে ও চাপা পড়ে গেছে, অন্ধকারে ডুবে গেছে।

এর জন্যে অবশ্য কাউকে দায়ী করা যায় না। কেউ ওকে বলেনি, তুমি রান্না-ঘর, ভাঁড়ার আর কমলার ছেলেমেয়ের বায়না আদর আব্দার নিয়ে অন্তঃপুরের আড়াল থেকে আরও আড়ালে সরে যাও। বরং বাসনাকে বাইরের আলো হাওয়ায় টেনে আনার কম চেষ্টা করে নি কমলা। সুধাময়ও কতো বলেছে, কতোবার। বাসনা সে-সব কথায় কান দেয় নি।

আজকেও, সত্যি সত্যি বাসনা যদি চাইত, অমলেন্দুদের সঙ্গে অনায়াসেই থিয়েটারে যেতে পারত। কিন্তু বাসনা গেল না। অমলেন্দুকেও ডেকে পাঠাল না।

বিকেলের ঘটনার পর ওর বিশ্রী লাগছিল। বীথির ওপর মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। মেয়েটা অসম্ভব লোভী, হ্যাংলা স্বভাবের, বাসনা ভাবছিল বীথির নানা আচরণে খুঁত ধরতে ধরতে। বিয়ে হবে কী না হবে তার ঠিক নেই, অথচ অমলেন্দুর সম্পর্কে এমন সুরে কথা বলে, এমন সব হাবভাব তার, যেন বিয়ে হয়েই গেছে। অমলেন্দুর ওপর ওর কতোখানি আধিপত্য আর অধিকার বীথি যেন সব সময় সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছে। আর সেই গর্বে গট্‌গট্‌ করছে। এই সব মেয়েদের, এই হয়। বিয়ের আগে থাকতেই তাদের বেহায়া রকম গিন্নীপণা। যা দেখলে ঘেন্না ধরে, গা জ্বালা করে।

যদিও অমলেন্দু পড়াবার জন্যে রোজ আসে, আর বীথি বই খাতাপত্র খুলে বসে তবু পড়াশোনা যে কী হয়, কতটুকু, বাসনা তা জানে। পড়াশোনার এই ভানটা ওপর-ওপর, আসলে বেহায়া মেয়েটা নির্বোধ এক পুরুষের চোখের সামনে প্রজাপতির মত ফর ফর করে উড়ছে, পাখা খুলছে, মেলছে, ছুঁই ছুঁই খেলা খেলছে। কমলারা যে তা না জানে তা নয়। জানে, বুঝতে পারে সবই। কিছু বলে না। মেলামেশার সুযোগটাই তো তারা দিতে চায় দু-জনকে কাজেই আপত্তি করবে কেন!

আর কারুর না হোক্, বাসনার চোখে এ-সব বিশ্রীই লাগে। কমলাদের এই হালফ্যাসানের কায়দা কানুন তার পছন্দ হয় না। হোক্ না কেন মেয়ে বড়, অমলেন্দুর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তাও চলছে—তবু ব্যাপারটা সেই টোপ্ ফেলে মাছ ধরা ছাড়া আর কী, অন্য কী হতে পারে।

এই যে দু-জনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সন্ধে বেলা, ফিরতে হয়তো রাত দশটা এগারোটা হবে। এতোখানি সময় সায়না বয়সী দুটি ছেলে মেয়ে কোথায় গেল, কি করল, কে তার হিসেব রাখছে। একটা কেলেঙ্কারী হতেই বা কী! যা স্বভাব দুটির, অন্তত একজনের!

বীথি এতো মেতে উঠেছে অমলেন্দুকে নিয়ে যে তার নিজের ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞানও আর নেই, বাসনা ভাবছিল এবার, বীথির কথায়। বীথি জানে না, জানা সম্ভবও নয় তার পক্ষে, অমলেন্দু বাস্তবিক কী ধরনের পুরুষ। বীথি কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছে, যে-লোকের ওপর ও বিশ্বাস রাখছে—অসহায়তার সুযোগ নিতে তার বাধবে না, বাধে না। আর এই লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, বদমাস—একটা পশুই বলতে হবে। তার চেয়েও যদি কিছু হীন থাকে তবে তাই। বিবেক, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য কোনো কিছুরই মূল্য যার কাছে নেই। বীথি ঠকবে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে একদিন, যেমন হয়েছে বাসনার।

বীথির ওপর এতোক্ষণ পরে বাসনার ধীরে ধীরে একটু যেন সহানুভূতি হচ্ছিল। বাসনা ভাবছিল, এই বোকা, বেহায়া মেয়েটাকে তার সাবধান করে দেওয়া কি উচিত! কমলাদের কথা ভেবে, সুধাময়ের সংসারের মান সম্মানের কথা ভেবে, হ্যাঁ, এটা তার কর্তব্য।

বিকেলের প্রসাধন সেরে কমলা এল। বাসনা চমক ভেঙে চাইল।

চা ঢালতে ঢালতে কমলা বললে, 'ওমা, তুমি যে চা খেলে না, ছোড়দি।'

নিজের চায়ের কাপটার দিকে চোখ পড়তে একটু যেন বিব্রত হল বাসনা। ভর্তি কাপটা তেমনিই পড়ে আছে, জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে কখন।

'ভাল লাগল না!' আস্তে গলায় কৈফিয়ৎ দিলে বাসনা।

উঠল বাসনা। ভাঁড়ার ঘর থেকে তরি-তরকারির ঝুড়িটা নিয়ে এসে কুটনো কুটতে বসল।

কথা হচ্ছিল টুক্‌টাক। কখনো রান্নার, কখনো সংসারের।

কমলা হঠাৎ বললে, 'সেই ওষুধটা তুমি ঠিক মতন খাচ্ছ তো, ছোড়দি, তোমার ভগ্নিপতি জিগ্যেস করছিল।'

'খাচ্ছি।' বাসনা মাথা নাড়ল। তার-পর আচমকা বললে, 'পরশু দিন একটু দক্ষিণেশ্বর যাবো ভাবছি, যদি সময় হয় তবে ওই সঙ্গে একবার বেলুড়। অমলেন্দুকে বলবো নাকি সঙ্গে যেতে? সময় হবে ওর!'

'তা বলো না। সময় ঠিক করে নেবে।' কমলা সহজভাবেই জবাব দিল।

বাসনা খুব খেয়াল করে জবাবটা শুনল। না, কমলা কিছু মনে করে নি। অবাক হয়েছে বলেও মনে হলো না। বাসনা অবশ্য এই প্রথম মুখ ফুটে অনাত্মীয় কারুর সঙ্গে বাইরে যাবার কথা বললে। ওর মনে হয়েছিল, কমলা এরকম প্রস্তাবে খুবই অবাক হবে। দেখা গেল, কমলা অমলেন্দুকে অনাত্মীয় পুরুষ বলে মনে করতেই যেন পারল না।

'বীথিদের বিয়ের কি হলো?' বাসনা মুখ আড়াল রেখে শুধলো।

'কই, কিছুই না।' কমলা একটু বুঝি হতাশ গলায় বললে।

'কি বলে অমলেন্দু?' বাসনা মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ন চোখে দেখছিল কমলাকে।

'পরিষ্কার করে কেউ তো জিগ্যেস করে নি, ওই বা নিজের থেকে কি বলবে।'

একটু চুপ। বাসনা কী ভেবে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'তোর কী মনে হয়, কমলা?'

'কিসের?'

'বীথিকে অমলেন্দুর পছন্দ?'

'মনে তো হয়।'

হয়! বাসনার বুকের কোথা থেকে যেন একটা সতেজ শিরা কট্ করে

সাঁড়াশি দিয়ে ছিঁড়ে দিলে কেউ। উনুনের আঁচের আভা না পড়লে মনে হতো ওর মুখের সমস্ত রক্ত হঠাৎ যেন শুষে নিয়েছে কেউ, এমনি ফ্যাকাশে, বরফ-সাদা আর ঠান্ডা।

কথাটা ভুলতে পারেনি বাসনা। কাঁটার মত বি'ধে খচ্ খচ্ করছিল। সংসারের কাজকর্ম সারা হলে, গা ধুয়ে একটু ছাদেই গেল বাসনা। আর নিরিবিলি, ফাঁকায়, আকাশের দিকে চোখ তুলে কথাটা ভাবলো।

কমলা হয়তো অনুমানেই কথাটা বলেছে। কিংবা হয়তো কিছু তার চোখে পড়ে থাকবে যাতে মনে হয়েছে বীথিকে অমলেন্দুর পছন্দ। বলতে কি, বাসনার চেয়ে কমলাই ওদের খোঁজ বেশি রাখে, রাখতে হয় তাকে। হয়তো বীথিই বলেছে নিজের মুখে কিছু, বলা যায় না, যা বেহায়া মেয়ে।

অসম্ভব নয়। সবই সম্ভব। এতো মেলামেশা, পাশাপাশি মুখোমুখি বসা, গল্প, হাসি, তামাশা—এসবের পর বীথিকে হয়তো ভালই লেগেছে অমলেন্দুর। বিশেষ করে যখন বিয়ের কথাটাও জড়িয়ে রয়েছে দুজনের মধ্যে। অমলেন্দুর মতন হাল্কা স্বভাবের ছেলের, মেয়ে দেখলেই যার জিভ্ দিয়ে জল পড়ে, তার পক্ষে বীথিও যা বীথির চেয়েও কদাকার কোনো প্রীতি, রেণু, বেণু সবই সমান।

বাসনা ভাবছিল, যদি এমনই হয়, বীথির সংগে ঘনিষ্ঠতার ফলে অমলেন্দু শেষ পর্যন্ত বীথিকেই ভালবেসে ফেলেছে, তবে?

কথাটা ভাবতেই অদ্ভুত এক ভীত অনুভূতি বাসনার সমস্ত বুকটাকে যেন ভীষণভাবে আঁকড়ে দিয়ে একরাশ ধুলো-বালি চোখে গলায় ছিটিয়ে করকরে জ্বালায় আর টনটনে চাপা ব্যথায় ভরে বিহ্বল করে গেল। নিশ্বাস নিতেও ভুলে যাচ্ছিল বাসনা। কেউ যেন মুঠোর মধ্যে মুচড়ে ধরেছিল ফুসফুস। মোচড় দিচ্ছিল নির্দয়ের মত।

বীথিকেই ভালবাসল অমলেন্দু! সেই বীথি। যার রূপ নেই, রুচি নেই, শ্রী নেই। কিছুই যার নেই। অত্যন্ত সাধারণ, ফাজিল গোছের একটা মেয়ে। হাজারটা খুঁত যার চেহারায়, স্বভাবে, চলনে বলনে।

ছি, ছি, ছি। অমলেন্দুর কী চোখও নেই। সামান্য একটা রুচিজ্ঞানও তো থাকে মানুষের। কি দেখে ভালবাসলে ঐ কালো, রোগা, নির্লজ্জ মেয়েটাকে। ভালবাসার মতন মেয়ে কি চোখে পড়ল না আর তোমার। বিয়ে করতে হবে বলে কোনো বাদবিচার নেই, যা হাতের কাছে জুটবে, তাই। বাসনা ঘিনঘিন করছিল। নাক, চোখ, ঠোঁট কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল।

কী ভাগ্য করেই এসেছিল বীথি। কতো সহজে, কী অনায়াসেই ওর মতন মেয়েও একটি পুরুষের ভালবাসা পেয়ে গেল। বীথি আজ সেই গরবে গরবিনী। অমলেন্দুকে কৃপণের মতন আগলে রেখেছে। তার কাছ থেকে কেউ এক ফোঁটা নেয় বীথির তা সহ্য হয় না।

বীথিকে ঈর্ষা করছে বাসনা—ভীষণভাবে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে বেশ বুঝতে পারল ও, এখন, এই অন্ধকারে, ছাদে বসে, একা-একা। বাস্তবিকই আশ্চর্য এক ঈর্ষা কেমন করে যেন আস্তে আস্তে বাসনার মধ্যে এসে গেছে। কেন?

অমলেন্দু বাসনার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, বাসনার মনে হলো। আর মনে হতেই সেই দূরত্বটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়ে বাসনা ভয় পেয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করলে।

অমলেন্দু যে নাগালের বাইরে চলে গেল! বাসনা দুরুদুরু বুক নিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল চারপাশে। হাত বাড়াচ্ছিল। কাউকে ছোঁয়া যাচ্ছে না, ধরা যাচ্ছে না।

কি হবে, আমার কি হবে? গলায় কান্নার আবেগ জমা হয়ে কাঁপছিল, বাসনা হাতের মুঠো মুখে চেপে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো। সামনেটা ঝাপসা হয়ে গেছে। আলো নেই, জ্যোৎস্না নেই, তারা নেই, মেঘও না—একটা কালো পুরু ছায়া, জলের ট্যাংক্‌টা শুধু নিরেট যবনিকার মতন পড়ে আছে।

আমার কি হবে, আমার? আমার সন্তানের, আমার সম্মানের? বাসনা প্রাণপণে আঙ্গুল কামড়েও দমকা, উথলে ওঠা কান্নার আবেগ থামাতে পারছিল না। কাঁদছিল অসহায়ের মতন। করুণ একটা গোঙানি তুলে, ফুঁপিয়ে।

বড় দেরি হয়ে গেছে, বাসনার বুক একটু হাল্কা হলে ও ভাবল। অমলেন্দুকে আরও আগে থাকতেই কাছে টেনে নেওয়া উচিত ছিল। এখন ঘৃণা করার সময় নয়। ওকে পাশে রাখার সময়। বিপদে একমাত্র অমলেন্দুই তো সম্বল। অন্তত লোকটাকে কাছে না রাখলে দরকারের সময় কার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেবে বাসনা, কাকে দায়ী করবে—করতে পারবে। আমি অন্যায় করিনি, দোষ আমার নয়, অন্য একজন দায়ী এ-কথা বলার মধ্যেও অনেকটা দোষ-স্খালনের শান্তি আছে। ধরে রাখতে হবে অমলেন্দুকে শুধু তাই। শুধু এই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে। লজ্জা ঢাকতে।

আমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তোমায় আমি দেবো না। কিছুতেই না। বাসনা বললে যেন অমলেন্দুকে মনে মনে, বীথিই সব নয় তোমার। আমি আছি, আমরা।

॥ ৫ ॥

পথে বেরিয়ে আড়ষ্ট পায়ে পথ হাঁটছিল বাসনা। অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে রাস্তায় বেরুনো এই প্রথম। অমলেন্দুকে এগিয়ে রেখে ছাড়া ছাড়া একা-একা ভাবে এগুচ্ছিল বাসনা। মুখ নীচু করে। অমলেন্দু বড় রাস্তায় পড়ে দাঁড়াল। কী যেন জিজ্ঞেস করলে, বাসনা শুনতে পেল না ভাল করে, জবাবও দিল না।

স্টপেজে দাঁড়াল এসে স্থাণুর মতন। মুখে রোদ লাগছিল। তেতে উঠছিল মুখটা। বিকেলের রোদে এতো ঝাঁঝ কেন বাসনা বুঝতে পারছিল না। মাথাটা টিপ্‌ টিপ্‌ করছে।

ট্রাম আসতে উঠল। বাসনার জন্যে জায়গা ছিল মেয়েদের সীটে, অমলেন্দুর জায়গা ছিল না। বাসনা বসল। বসেই জানলার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সারাটা পথ অমলেন্দুর দিকে একটিবারও তাকাল না।

শ্যামবাজারে নেমে অমলেন্দু বললে, 'বাসে বড় ভিড় হবে, একটা ট্যাক্সি করি, কি বলেন?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল বাসনা।

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি দুজন। মাঝখানে জায়গা রেখে পাশ ঘেঁষে বসে। দুজনেই চুপ। অন্যদিকে তাকিয়ে। অমলেন্দু সিগারেট ধরাল। কয়েকটা টান দেবার পরই কানে গেল সামান্য একটু কাশল বাসনা। তাকাল অমলেন্দু। মুখের কাছে হাতের মুঠো তুলে বাইরে তাকিয়ে বসে রয়েছে বাসনা।

'কাশছেন যে! ধোঁয়া লাগছে নাকি?'

'না।' মাথা নাড়ল বাসনা।

'তবু রক্ষে। নয়তো আস্ত সিগারেটটাই ফেলে দিতে হতো।' অমলেন্দু হাসল।

'দিতেনই বা!' বাসনার ঠোঁট থেকে আচমকা কথাটা খসে পড়ল। নিজেই অবাক হলো বাসনা। অমলেন্দুর দিকে চাইল, চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। না, অমলেন্দু কথাটা ঠিক ধরতে পারে নি। আশ্চর্য, বাসনাই বা হঠাৎ এমন তরল, ঘনিষ্ঠ সুরে কথা বললে কি করে!

পিচের রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিটা উড়ে চলেছে। কানের কাছে ক'টা ভোমরা যেন গুঞ্জন করছে একটানা; দোলা লাগছে থেকে থেকে, গা নড়ছে, মাঝে মাঝে পাশে হেলে পড়ি-পড়ি ভাব। মসৃণ একটা গতি যেন দেহেও অনুভব করছিল বাসনা। অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে। একটা বাগান ঘেরা বাড়ি হুট্‌ করে মুখ বাড়িয়েই পিছু হটে গেল; গাছের সারি, ইলেক্‌ট্রিক্‌ পোস্ট পলকে সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাস, লরী, মটর, ট্যাক্সি তীরের বেগে গায়ের পাশ কাটিয়ে এক দমকা ধুলোমেশা হাওয়া ছুঁড়ে উধাও।

'আজ কী—?' অমলেন্দু প্রশ্ন করলে।

বাসনা মুখ ফেরাল। অমলেন্দুর চোখে হাল্কা মতন হাসি। কথাটা ঠিক ধরতে পারছিল না বাসনা। চেয়ে থাকল।

'আজ কী দক্ষিণেশ্বরে কিসের পুজোটুজো হচ্ছে?' অমলেন্দু বললে আবার।

'কিসের পুজো! কই জানি না তো!' বাসনার ঘন ভুরুর রেখা সহজ হয়ে এল।

'জানেন না। তবে যে হঠাৎ—?' অমলেন্দুর বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'এমনি। বেড়াতে যাচ্ছি।' বাসনার মাথার কাপড় খসে খসে পড়ছিল হাওয়ায়। ক'বারই তুলেছে। আর তুলল না।

'বেড়াতে!' অমলেন্দু কৃত্রিম বিস্ময়ের মুখভঙ্গি করলে। হাস্যকর দেখাচ্ছিল সেই বিস্ময়বিস্ফারিত মুখভঙ্গি। নজর করে দেখছিল বাসনাকে। বললে, 'বলেন কি, এমন দুর্মতি হঠাৎ!'

'হওয়া আশ্চর্য কী! সঙ্গদোষ!' বাসনা নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে সরু শিখার মত একটু হাসি ওষ্ঠকোণে ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিল। লোকটা যে দুর্জন, কেমন ঘুরিয়ে তা বলা গেল!

অমলেন্দু রীতিমত অবাক হচ্ছিল। বাসনার মুখ থেকে এমন স্পষ্ট, সপ্রতিভ জবাব শোনা যাবে, ও আশা করেনি।

আর বাসনা নিজের জবাবে নিজেই খুশী হচ্ছিল। হ্যাঁ, ও পারে, এখনও ইচ্ছে করলে বাসনা মনের মতন করে, সুন্দর, সরস কথা বলতে পারে। বেশ সহজভাবেই। কষ্ট হয় না, কথা আটকায় না।

আমাকে, বাসনা ভাবছিল, কথা বুনতে হবে, সুন্দর করে, চমৎকার করে, যা অমলেন্দুর ভাল লাগবে, তাকে খুশী করতে পারবে। আর সে-কথা মুহূর্তেই ফুরিয়ে যাবে না। অমলেন্দুর কানে বাজবে, মনের পর্দায় কাঁপবে। ও মুগ্ধ হবে।

বাসনার মনের ভাবটা অনেকটা এইরকম, ও যেন একটা ছুঁচের কাজে হাত দিয়েছে কাউকে দেবে বলে, আর সেই কাজের নক্‌শা, কী বুনন, কী রঙ-মেলানোর কাজটা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে, একমনে শেষ করতে চায়। দক্ষতার সঙ্গে।

খানিকটা পথ আরও ছাড়িয়ে এসে কী ভেবে অমলেন্দু বললে, 'আমি কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছি না। ফাঁকা দেখে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকবো। ধর্মটর্ম যা করবার আপনি সারবেন।'

'না পারলেন ঘুরতে। আমি কি বলেছি আমায় আগলে নিয়ে ঘুরুন।' বাসনা সামনে তাকিয়ে প্রথম কথাটা বললে, একটু থামল, আড়চোখে তাকাল অমলেন্দুর দিকে, একটু যেন আহত হওয়ার মতন সুর তুলল গলায়, আবার চোখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল।

মোড় ঘোরার মাথায় গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। সামনে পর পর কতকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

গলা বাড়িয়ে অমলেন্দু বললে, 'কী হলো, অ্যাকসিডেন্ট নাকি?'

বাসনা এ-পাশে জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা রঙীন পোস্টার দেখছে সিনেমার। অশ্বত্থগাছের গায়ে আঁটা। একটি নবারূঢ় মেয়ের মুখ দু হাতের মধ্যে তুলে একদৃষ্টে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রয়েছে একটি ছেলে। মেয়েটির মুখেও লজ্জা আর খুশীর উজ্জ্বলতা। ভীরু ভীরু চোখ। ভালোই লাগছিল বাসনার।

অমলেন্দু আবার কী বললে। বাসনা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

ট্যাক্সিটা সামান্য পিছু হঠে সোঁ করে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। পিচের রাস্তায় উঠে মসৃণগতিতে এগিয়ে চলল আবার।

'দেখলেন তো কাণ্ড। রাস্তার মধ্যে দুটো ষাঁড়ে লড়াই বাঁধিয়েছে।'

'তাই নাকি!' বাসনা হাসল।

'আহা, দেখলেন না! কী রণরঙ্গ মূর্তি দুটোর!' অমলেন্দু হাসছিল।

'আপনি দেখুন।' বাসনা সোজাসুজি চোখে চেয়ে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসল এবং মনে মনে বললে, আরও কতো রণ-রঙ্গিনী মূর্তি তোমায় দেখতে হবে, তুমি জানো না। আজকের পর, এই বেড়িয়ে ফেরার পর বীথি কী রকম ফোঁস ফোঁস করবে, তুমি তা আন্দাজ করতে পারছ না।

তা বলে আর বীথির আঁচলের তলায় তোমায় লুকোতে দিচ্ছি না। দেবো না। একবার যখন পথে বেরিয়েছি—বাসনা দৃঢ় সিদ্ধান্তে মন শক্ত করছিল, এই পথ থেকে অন্য পথে, নতুন রাস্তায় তোমার পাশে পাশে আমি আছি। পায়ে পায়ে। আমায় থাকতে হবে। তোমায় চোখের আড়াল করবো, সে-সময় আর আমার নেই, সে বিশ্বাসও আর না।

একটু কুঁজো হয়ে পেটে চাপ পড়ে এমনভাবে সামনে ঝুঁকে বসল বাসনা। কনকনে ব্যথাটা পাক্ দিয়ে গেছে পেটে। আবার।

মন্দিরের সামনে নেমে গাড়ি ছেড়ে দিল অমলেন্দু। বাসনা দাঁড়িয়ে থাকল। মাথায় ঘোমটা নেই। কপালে, গালে কতক চুলের গুচ্ছ জড়িয়ে গেছে। মাথাটাও একটু উস্কোখুস্কো। খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে। গলার সরু হারটা চিক্‌চিক্ করছিল। সুন্দর সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল বাসনা। আর কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই।

'তা হলে আপনি যান। আমি ওই দিকটায় এগিয়ে নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজি গে ঘাটের কাছে।' অমলেন্দু হেসে হেসে বলল। কথাটা সে ভোলেনি।

বাসনা একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, 'তারপর আমি কোথায় খুঁজে বেড়াব আপনাকে। তার চেয়ে একটু দাঁড়ান। আমি একবার প্রণাম সেরে আসি।'

'একবার প্রণামে কাজ সারা যায় না এখানে!' অমলেন্দু মাথা নাড়ছিল।

'যায়। দেখুনই না একটু দাঁড়িয়ে।' বাসনা চলে গেল।

সত্যিই সামান্য একটু পরে ফিরে এল বাসনা। অমলেন্দু ভাবেনি বাসনা এতো তাড়াতাড়ি আসতে পারে। বট-অশ্বত্থের ছায়ায় পায়চারি করছিল অমলেন্দু সিগারেট টানতে টানতে। বাসনাকে ও দেখে নি।

বাসনাই অমলেন্দুকে খুঁজে নিয়ে কাছে এসে বললে, 'চলুন।'

অমলেন্দু মুখ ঘুরিয়ে দেখে বাসনা। রীতিমত অবাক হয়ে বললে, 'হয়ে গেল! আরে ছি ছি, সত্যিই কী আর আমি চলে যেতাম। আপনিও তাই বিশ্বাস করলেন। লাভের মধ্যে প্রণামটাও ভাল করে করতে পারলেন না।'

'করেছি। চলুন, কোথায় যাবেন।'

হাঁটতে হাঁটতে বললে অমলেন্দু, 'কোন্ মন্দিরে গিয়েছিলেন?'

'কালীমন্দিরে।'

'খুব ভিড়?'

'খুব নয়, তবে ভিড়ই।'

'দেখতে পেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি বললেন প্রণাম করতে করতে এত তাড়াতাড়ি?' অমলেন্দু হাসছিল

'কি বলতে পারে মানুষে?' বাসনা চোখ তুলল।

'আমি হলে তো যশ, অর্থ, স্বাস্থ্য সবই একদমে চেয়ে বসতুম।' অমলেন্দু শব্দ করে হেসে উঠল। সরল প্রাণখোলা হাসি।

'আপনি বড় লোভী।' বাসনা অদ্ভুত সুরে বললে। কথাটা তার নিজের কানেই কেমন শোনাল।

'লোভের কি আছে! চাইলেই তো পাচ্ছি না। আর পেলেই বা কী, আমাকে আর কতটুকু দিতে পারেন ঈশ্বর, প্রার্থী
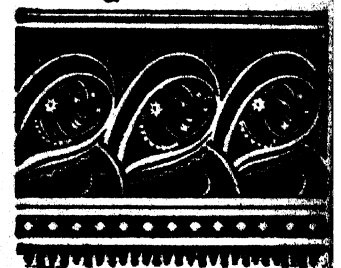
যে অসংখ্য!' অমলেন্দু ঘন গাছের ছায়া থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

'না চেয়েই তো কতো পাচ্ছেন!' বাসনার কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট স্থূল ইংগিত ছিল। যেন ইচ্ছে করেই বাসনা কথাটা অমনভাবে বললে, অমলেন্দুকে বোঝাতে।

'পাচ্ছি!' অমলেন্দু দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে তাকাল বাসনার দিকে সোজাসুজি।

'বরং আমরা—' বাসনা চোখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করলে, 'এই আমার মতন যারা, তাদের চাইতে হয়। মাথা খুঁড়তে হয়, মানৎ করতে হয়।'

এতো কথা—সব যেন হাল্কা শুকনো পাতা, খড়-কুটোর মতন উড়িয়ে দিয়ে অমলেন্দু হো হো করে হেসে উঠল, 'তাই বলুন। টপ্ করে একটা মানৎ করে এলেন বুঝি!'

'এলাম!' বাসনা আকাশের দিকে চেয়ে ভারী, ভরা, থমথমে গলায় বলল স্পষ্ট উচ্চারণে।

ওরা বসেছিল, পাশাপাশি। গঙ্গার পাড়ে। ঘাসে। সূর্য পশ্চিমে ডুবে আসছে। আকাশের নীলে কোথাও আবছা কালো মিশছিল। গাঢ় আলতা রঙের আলো ঢেউ ভাঙা ফেনার মতন দিগন্তে ছড়ানো। সোনালী জরির পাড় বসানো টুকরো টুকরো ক'টি মেঘ। থৈ থৈ জলে সোনার গুঁড়ো ঝরিয়ে প্রথম আশ্বিনের সূর্য ডুবছে। অজস্র সাপ যেন সোনালী ডোরাকাটা গা জলে ভাসিয়ে ভেসে চলেছে। মিষ্টি একটা হাওয়া দিচ্ছিল।

নৌকোগুলো কালো হয়ে আসছে। কোথাও একটা ঘণ্টা বাজছিল। আর এখানে অত্যন্ত উদাস সুন্দর একরাশ মুহূর্ত যেন বৃষ্টির ঝিরঝির ফোঁটার মতন ঝরে পড়ছিল দুজনের মনে, দুজনের মাঝখানে।

গোড়ালি মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁটু তুলে, হাতে হাতে আলগা করে ছুঁয়ে বসেছিল বাসনা। হাওয়ায় চুলগুলো কপাল থেকে চোখে এসে পড়ছে কখনো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে বাসনা। থানের আঁচলটা টান করে কোলে ফেলে রেখেছে। দুটি হাতের অনেকখানি অনাবৃত। ধবধবে, নিটোল হাত। কোথাও-বা নীল শিরা, ক'টি তিল। দুগাছি চুড়ি সেই সাদার ওপর ম্লান শিখার মত জ্বলছে। আকাশে চোখ রেখে বাসনা দেখছিল, ক'টা পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। হাওয়ার স্রোতে। এত চিলতে মেঘের মতই। ওর গলা একটি সারস পাখির মতনই সুন্দর এক ছন্দে বেঁকে ছিল। গালে এক মুঠো ফিকে সোনারঙ রোদের আবীর লেগেছে। চোখের পাতায় অবসাদ। কেমন যেন নেশা মাখানো।

অমলেন্দু মাঝে মাঝে দেখছিল বাসনাকে। এই স্থির, শান্ত, বেদনা-স্তব্ধ মূর্তিটা আজ যেন অন্যরকম লাগছে অমলেন্দুর। বাসনা নিজেকে আজ এতো স্পষ্ট, সহজ করে তুলছে যে, অমলেন্দু এখনো বিস্ময়ের ঘোরে বোবার মতন চুপ করে আছে। কথা বলতে পারছে না, বলা সম্ভব হচ্ছে না।

বাসনা বলছিল, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, খুব মৃদু মোলায়েম গলায়, 'আমার হয়তো কিছুদিন এমনিভাবে বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে কাটানো উচিত।'

'সে তো ভালোই।' অমলেন্দু হাতের পাশ থেকে ক'টা ঘাস ছিঁড়ল।

'ভাবছি তাই করবো। শরীর মন দুই-ই যেন ভেঙে যাচ্ছে।' বিষণ্ণ স্বর বাসনার।

'অসম্ভব কী!' অমলেন্দুও বললে শান্ত গলায়, 'আপনার বয়সে অতো কৃচ্ছ্রতা ভাল নয়। তা'তে ক্ষতি হয়। হচ্ছেও তো, দেখতে পাচ্ছি।'

'দেখতে পাচ্ছেন না, এমনও অনেক কিছু আছে।' বাসনা ভাসা ভাসা চোখ অমলেন্দুর চোখে রেখে বললে, 'আমাকে সব সইতে হয়, মুখ বুজে।'

অমলেন্দু অনেকক্ষণ আর জবাব দিতে পারল না। বাসনা যখন গালের পাশ থেকে চুলগুলো সরাচ্ছে, অমলেন্দু বললে, 'খানিকটা রিলাক্সেসান্ দরকার। হৈ চৈ, বেড়ান, হাসি, আনন্দ।'

'দরকার। বাস্তবিকই দরকার। আমিও বুঝছি।' বাসনা বুকের মধ্যে নিশ্বাস চাপল। তারপর হঠাৎ বললে, 'ভাবছি, আপনাকে মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে বেরুবো।' বলে বাসনা মিষ্টি করে হাসল।

'অনায়াসেই।'

কথাটা বলবে-কি-বলবে না বাসনা ভাবল। এবং অনেকটা যেন মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, 'বীথির হয়তো অসুবিধে হবে।' বলে তাকাল অমলেন্দুর চোখে।

'বীথির, কেন?' অমলেন্দু অবাক হচ্ছিল।

'হবে না! কী জানি। মনে হয় হবে। পড়াশোনার ক্ষতিই হবে হয়তো।' বাসনা অত্যন্ত সাবধানে কথা সাজাচ্ছিল। যেন দাবার ঘুঁটি চালছে হিসেব করে করে।

'না। তেমন কিছু না। কীই বা পড়ে ও!' অমলেন্দু সিগারেট ধরাল।

'পড়ে না?'

'পড়ে। তবে সে পড়ায় দু দশদিন কামাইয়ে কিছু আসে যায় না।'

'নাকি, কি করে বুঝবো। আপনি একদিন পড়াতে না এলে মেয়েটা এমন করে যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে ওর।' বাসনা ঠোঁট টিপে হাসল।

'তাই নাকি! বলতে হবে তো ওকে।' অমলেন্দুও হাসল। বাসনা ভাবলে কী সাংঘাতিক চাপা, জেগে ঘুমোচ্ছে। ধরা দেবে না।

'না। এ-কথা ওকে বলতে পারবেন না।' বাসনা বললে।

'কেন?'

'কেন আবার কি, আমি বারণ করছি।'

'বেশ।'

একটু চুপ। বাসনা আঁচলে মুখটা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'কমলারা কিন্তু অনেক আশা করে রয়েছে।'

'কিসের!' অমলেন্দুও উঠে দাঁড়াল।

'আপনি তো জানেন।' বাসনা পা বাড়ালে।

'জানি না ঠিক। অনুমান করতে পারি।'

'কেমন মেয়ে বীথি?' বাসনা মুখ ফেরায়।

'এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন।' অমলেন্দু হাসে।

'তবু—!'

'কি!'

'কেমন লাগে ওকে দেখতে!'

'আপনি তো আমার চেয়ে বেশিই দেখছেন।' অমলেন্দু যে ইচ্ছে করে কথাটা এড়িয়ে গিয়ে জটিল করে তুলছে স্পষ্টই তা বোঝা যায়।

'আমার তো ভালোই লাগে, আমাদের চেয়েও বোধহয় দেখতে শুনতে ভাল।' বাসনা থমকে দাঁড়ায়। সামনে খানিকটা জলকাদা। ডোবা। ডিঙোতে হবে। বাসনা যেন দেখছে খুব সতর্ক চোখে।

'তুলনা যদি করেন—' অমলেন্দু সামনের ছোট্ট ডোবা মতন জায়গার দিকে নজর দিয়ে চোখ তুলল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। হাতটা বাড়িয়ে দিল অমলেন্দু। বাসনার গা ছুঁয়ে গেল। বললে, 'তুলনা করলে বীথি দাঁড়ায় না, আপনাদের দু-বোন, বিশেষ করে আপনার কাছে। ধরুন, হাত ধরুন—ছোট্ট করে লাফ দিন একটা।'

মুহূর্তে বাসনার বুকে মুখে খানিকটা উষ্ণ, অসহ্য উষ্ণ রক্ত যেন উথলে এসে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। বুকটা কেঁপে গেল দুরু দুরু, ধক্ ধক্ করে উঠল হৃদপিণ্ড, অদ্ভুত এক খুশীর আবেগে টনটনে ব্যথা ছড়িয়ে গেল। বুকের হাড়-গুলো যেন কুচি কুচি হয়ে যাচ্ছে। সারা মুখ গরম, নিশ্বাস ঘন, দ্রুত, তপ্ত। চোখের পাতা যেন আর তুলতে পারছে না বাসনা।

তারপর হয়তো এই অন্ধকারে ওর সমস্ত জড়তা কোথায় ধুয়ে গেল। হাতটা ধরে ফেলল অমলেন্দুর। কী শক্ত হাত, কী কঠিন। বাসনার মনে হচ্ছিল, যদি এখানে এই অন্ধকারে, ঘাসে, নির্জনে হঠাৎ, হঠাৎ ও ফিট হয়ে পড়ে। তবে?

কিন্তু না, ফিট আর হ'লো না বাসনা। সামনে যে-বাধা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল কী সহজেই তা পেরিয়ে গেল অমলেন্দুর হাত ধরে।

বাড়ি ঢোকবার আগে বাসনা বললে নিজের থেকে, 'তাহলে বেলুড় নিয়ে যাচ্ছেন কবে?'

'যেদিন খুশি, চলুন না—!'

'পরশু, না পরশু রবিবার বড় ভিড় হয়। সোমবার।'

'বেশ।'

'একটু বিকেল বিকেল যাবো। আপনি কমলাকে বলে রাখবেন।'

'উনি কি যাবেন?'

'না, না, কেউ না। গুচ্ছের লোক আমার ভাল লাগে না।' বাসনা হঠাৎ বড় বেশি জোর আর বাধা দিয়ে বলে উঠল।

বাড়িতে পা দিয়ে বাসনা শুনল, কমলার ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে আটটা বাজছে। সেই আটটা। শব্দগুলো আজ আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল দূরে থেকে যেন গির্জার ঘণ্টা বাজছে। আর বাসনা হঠাৎ সাতটা বছর পিছিয়ে এসেছে। মফস্বলের এক শহর, হ্যারিকেনের আলোয়, একা, পড়ার টেবিলে বসে জানলা দিয়ে আলোঝরা এক সুন্দর মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

রাত্রে আর ঘুম আসছিল না বাসনার। এক বিন্দু অবসাদ ছিল না মনে। কিংবা শরীরে। চোখের পাতা পর্যন্ত বন্ধ করতে পারছিল না। হাত কী গা শিথিল করে আলস্যভরে ছড়িয়ে দিতেও পারছে না। জানলার দিকে পাশ ফিরে, লম্বা-লম্বি টান টান হয়ে শুয়ে। বাইরে কাঁচের মত ঝক্‌ঝকে জ্যোৎস্না। তারে-মেলা বীথির কমলা রঙের শাড়িটা যেন স্তব্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরছে মৃদু মোলায়েম শব্দ তুলে। বাইরে থেকে ঈষৎ ভিজে ভিজে ঠাণ্ডাও ঘরে আসছে। আর সব চুপ। কমলার ঘর ঘুমিয়ে, বীথির ঘরও বুঝি।

গোটা বিকেলটার কথা এরই মধ্যে কতোবার যে ভাবল বাসনা। ভেবেও আশা মিটছিল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবল; ঘটনা, কথা, ওর প্রশ্ন, অমলেন্দুর জবাব; দুজনের মিলিত পরিহাস এবং দক্ষিণেশ্বরের সেই সূর্যাস্ত, নিরিবিলি সান্নিধ্য, অন্ধকার, জলকাদার ছোট্ট ডোবার সামনে থমকে দাঁড়ান, অমলেন্দুর হাত ধরে সেই সামান্য বাধা ডিঙিয়ে আসা।

ইস্, কী ভয়ই হয়েছিল বাসনার। বীথির ভাবভঙ্গি দেখে, কমলার কথা শুনে ও প্রায় বিশ্বাস করে নিতে বসেছিল, বীথি অমলেন্দুর মন পেয়ে গেছে, অধিকার বিছিয়ে ফেলেছে, পুরোপুরি,

গভীরভাবে। সেখানে আর জায়গা হবে না বাসনার। কোনো আশা নেই।

তা নয়, বীথি পারে নি। অমলেন্দুর মন বীথির মুঠোয় নেই; ধরা দেয় নি অমলেন্দু। এখনো বাসনা সেই মন জুড়ে বসে আছে। শুধু এইটুকু, এইটুকুমাত্র কথা, (যদিও কথা এইটুকু কিন্তু বিষয়টা বাসনার কাছে কী যে অসম্ভব প্রয়োজনীয় আর মূল্যবান আর বিস্তৃত ছিল) জেনে নিতে বাসনা আজ যেন সর্বস্ব পণ করে বসেছিল। নিজের সংকল্পকে দৃঢ়, স্থির, অটুট রেখে বাসনা আজ, আজ এগিয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত হিসেব করে করে, একটু একটু করে সে পা ফেলেছে। কোথাও তার ভুল হয়নি, ভুল ঘটতে দেয়নি। লজ্জা, সঙ্কোচ, জড়তা, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা—সমস্ত কাটিয়ে উঠে, মুখোমুখি সরাসরি দাঁড়িয়ে বাসনা জিনিসটা স্পষ্টাস্পষ্টি জেনে নিয়েছে। হ্যাঁ, বীথি নয়; বাসনা, বাসনাই অমলেন্দুর মন জুড়ে রয়েছে এখনো। এবং বীথি নয়, অমলেন্দুর দুর্বলতা বাসনার ওপরই। যা ভেবেছিল বাসনা, তার যে-ধারণা ছিল তা যে ঠিকই, এখন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাসনা মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিল।

এখন নিজেকে বাসনার কতো হাল্কা লাগছে। মনের মধ্যে কান পাতলে গুন-গুন, শিরশির। আলতো, ছুঁই-না-ছুঁই ঠোঁটের থরথর শিহরণ-সুখে গা-মন ভর ভর। এমন সুখ আর নিশ্চিন্ততায় এই বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এখন। নরম বালিশ দিয়ে সব যেন ঢেকে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এই চোখ, চুল, নাক, গলা, ঠোঁট। থানটা যেন বড় বেশি জাপ্টে ছিল। গা-কোমর সব পাকে পাকে বেঁধে, অতি সতর্ক প্রহরীর মতন। আস্তে আস্তে আলগা করে দিলে বাসনা, করকরে, গায়ের ছাল-ওঠা বিশ্রী পুরু কাপড়ের সেমিজটা খুলেই ফেলল অর্ধেক, কোমরের কঠিন পাকটা ঢিলে করল। তারপর নরম বিছানায় বালিশে নিজেকে গাঢ় করে মিশিয়ে রাখলে।

নিজেকে এই ঘরে বেশ ভাল করেই দেখতে পাচ্ছিল বাসনা। বাইরের কাঁচের মতন স্বচ্ছ জ্যোৎস্না জানলা ডিঙিয়ে বিছানায় এসে বাসনাকে খুব পাতলা মিহি একটা সাদা চাদরের মতন ঢেকে দিয়েছে। সেই চাদরের তলায় বাসনা নিজের ধবধবে নধর হাত দেখছিল, হাতের আঙুল, স্পর্শ করে করে, মুখ আর গাল আর গলা। এবং আরও সুন্দর সুন্দর, ননীমসৃণ কোমল, কতো সুধাস্বাদ অঙ্গ। দেখছিল আর ভাবছিল বাসনা, তার আঠাশ বছরের এই দেহ ফুলের মতই ফুটে রয়েছে এখনো। ঝরে পড়েনি, ঝরে যায়নি। আর এই আড়াল করা পুষ্পস্তবক যদি হাতছানি দেয়, মুগ্ধ মধুমক্ষিকা ফিরে ফিরে আসবে, গুনগুন করবে তাকে ঘিরে।

নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস আজ ফিরে পেয়েছে বাসনা। সে পেরেছে। সহজভাবেই সব পারল। অমলেন্দু, বোকা অমলেন্দু অনায়াসেই নাগালের মধ্যে এসে গেল।

মনে মনে একটা গর্ব সাবানের ফেনার মতন ফেনিয়ে উঠছে বাসনার। একটি পলাতক পুরুষকে কত অক্লেশে আবার চুম্বকের মত কাছে টেনে নিতে পারল বাসনা তার এই সুষমিত সৌন্দর্য দিয়ে। না, কোথাও প্রখর বা উগ্র কী বিহ্বল মাদকতাকে অনাবৃত করে মেলে ধরতে হয়নি। পূর্ণিমার স্নিগ্ধ, একটু-বা বিষণ্ণ, মধুর জ্যোৎস্নার মতন ছড়িয়ে থেকেই অমলেন্দুকে আকর্ষণ করে নিতে পেরেছে ও। প্রয়োজন হলে বাসনা অবশ্য তার সাধ্যায়ত্ত সবটুকু আগুন জ্বালিয়ে দিত, এ বিষয়ে তার মনে আর দ্বিধা ছিল না, ভবিষ্যতেও যদি প্রয়োজন হয় না-দেবে এমন নয়, কিন্তু উপস্থিত এই স্নিগ্ধ শিখাতেই পতঙ্গ কাছে এসে গেছে।

বাসনার একবার মনে হলো, অমলেন্দুর সঙ্গে এই অতি সতর্ক, সন্তর্পণ চাতুরী কি ভাল হচ্ছে! যদি ও বুঝতে পারে, সন্দেহ করে এবং সাবধান হয়, বাসনার এই কৃত্রিম আকর্ষণের গিঁট খুলে সরে যায়। তবে?

যদি যায়—! বাসনা অতো ভাবতে পারছিল না। তবে নিজেকে বলছিল, অমলেন্দুকে ভালবাসতে হবে, কিংবা তাকে আমি ভালবাসব—এ, এ-চিন্তা অসম্ভব, আমার পক্ষে। পারি না, ওই অমলেন্দুকে কিছুতেই, কোনোদিনই ভালবাসতে আমি পারি না, পারবো না।

ভালবাসার কথাই এখানে উঠতে পারে না, বাসনা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছিল, যে-লোক আমার পবিত্রতা, নিষ্ঠা, নিষ্কলুষ একাগ্রতা এবং সুন্দর শুচিতাকে অসতর্ক, অজ্ঞাত মুহূর্তে কলুষিত করেছে তাকে ভালবাসব আমি? অসম্ভব। কে পারে, তোমার সযত্ন লালিত একটি কায়া, হ্যাঁ শিশুর মতই এক অসহায় অবলম্বনকে, ভাল-বাসার কুসুমকে যদি হঠাৎ কেউ গলা টিপে মেরে রেখে যায়, তুমি পার তাকে ভালবাসতে?

বাসনাও পারে না। তার স্বামী, যিনি এতোকাল ধরে প্রণাম আর প্রেম, বুকের সমস্ত করুণা উজাড় করে নিয়ে এসেছেন, যাঁর স্মৃতি বাসনার মনের পর্দায় পর্দায় কতো সূক্ষ্ম, কতো একান্ত করে মেশান—তাঁকে ফেলে দিয়ে উপেক্ষা করে, ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে ভালবাসা, তাও কি সম্ভব!

আমি বলছি, আমার মনের কথা—ঃ বাসনা বাইরের শূন্যের দিকে চেয়ে যেন তার স্বামীকে বলছিল বিড়বিড় করে, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, ভালবাসার কেউ না। বিশ্বাস করো, এ আমার ভালবাসা নয়, নিছক প্রয়োজন, কলঙ্ক মোচনের একটা উপায়। আমার আর অমলেন্দুর মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক। সে আমার সব লুঠ করে নিয়েছে। আমিও এই পশুকে ঘর আর আরাম থেকে কেড়ে নিয়ে যাবো, সুখ থেকে সরিয়ে, সম্মান থেকে অসম্মানে, রুক্ষতায়, ধুলোয়।

এ-পাপ তাকে লালন করতে হবে আর এক ব্যাধির মতন। আমি দেখব।

নাকি?

বাসনা চমকে উঠেছিল ভীষণভাবে। না, বীথি নয়, কাঁচের ঝকঝকে আলোয় বাইরে তারে-মেলা বীথির কমলা রঙ শাড়িটা বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে গুটিয়ে পাকিয়ে অদ্ভুতভাবে দোল খাচ্ছে। মনে হচ্ছিল বীথি যেন সামনে দাঁড়িয়ে সারা গা দুলিয়ে অট্টহাস্য হাসছে বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে, বাসনার কথা শুনে শুনে।

জানলাটা বন্ধ করে দিলে বাসনা ভীষণ শব্দ করে। আচমকা।

(ক্রমশ)

তোডরমল

জাতীয় পরিকল্পনায় করনীতি

কর বসান ব্যাপারে সরকারের যতখানি ঔৎসুক্য, করদাতার ততখানি ঔদাসীন্য। কারণ সুস্পষ্ট। জাতীয় গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করিবার জন্য সরকার-কোষে প্রচুর অর্থাগম প্রয়োজন। অথচ এই অর্থের সংস্থান না হইলে ঐ সব পরিকল্পনা শুধু শূন্যগর্ভ কথার মালা হইয়াই থাকিবে—তাহা হইতে প্রাণপ্র; সুরভি বিকীর্ণ হইবে না। আবার এইসব পুণ্য কাজে স্বেচ্ছায় অর্থদান করিবেন, এমন দাতাকর্ণের সংখ্যাও সংসারে বিরল। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে কর বসাইতে হয়, যাহাতে স্বেচ্ছায় না হোক্‌ অনিচ্ছায়ও সকলে অর্থদানে ত্রুটি না করে। এ যেন অনেকটা বনের পাখিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাঁচায় আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতায় খাঁচার পাখির সাথে বনের পাখির মিলন একদা দৈবক্রমেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু করনীতির ক্ষেত্রে বনের পাখিকে খাঁচায় পুরিবার চেষ্টা প্রয়োজনপ্রসূত। অপরপক্ষে নূতন কোন ট্যাক্সের কথা উঠিলেই করদাতার শিরে বজ্রাঘাত। কারণ ট্যাক্স দিতে হইলে নিজেকে ঐ পরিমাণে বঞ্চিত করিতে হয়। ফলে এই দাঁড়ায় করদাতার আয় নূতন কর অনুযায়ী কমিয়া যায় এবং সেই পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। কাজেই নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অপরপক্ষের ধনবৃদ্ধি করনীতির এই স্বাভাবিক রীতি করদাতার পক্ষে খুব লোভনীয় ব্যাপার নয়। তাহা হইলেও করনীতির ক্ষেত্র যে কেবলই কণ্টকাকীর্ণ এরূপ ভাবা ঠিক হইবে না। এখানেও ফুল ফুটিতে পারে। করনীতির বিকাশ ও জাতীয় উন্নতির সোনার রেখা ফুটিয়া উঠিতে পারে। যে অর্থ করদাতার কাছ হইতে সংগৃহীত হইয়া রাষ্ট্রীয় কোষে সঞ্চিত হইল তাহাই যদি জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নকল্পে শিক্ষাদীক্ষা শিল্প প্রসারণ প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে দেশও উন্নত হয় এবং জাতীয় সম্পদও বৃদ্ধি পায়। কাজেই করদাতা যাহা দিলেন তাহার বিনিময়ে তিনি অনেক কিছু পাইলেন এবং এক হাতে যাহা শূন্য করিলেন, অপর হাতে তাহা বহুল পরিমাণে ফিরিয়া পাইলেন। কাজেই জাতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে করনীতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
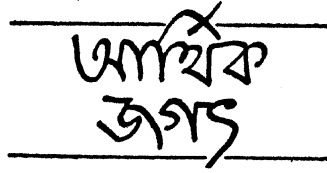
এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৩ সালে একটি কর-কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ শাসনকালে অনুরূপ কমিশন গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষোক্ত কমিশনের সুপারিশ বর্তমানে প্রায় অচল। কারণ দেশের আকৃতি ও প্রকৃতি ইতিমধ্যে অনেকখানি বদলাইয়াছে! কাজেই বর্তমান অবস্থানুযায়ী করনীতি সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য প্রথমোক্ত কমিশন বসান হইয়াছিল। জনসাধারণের উপর বিভিন্ন করের বিবিধ প্রতিক্রিয়া, জাতীয় উন্নয়নকল্পে বর্তমান করনীতির উপযোগিতা, শ্রেণীগত আর্থিক বৈষম্য দূর করা, শিল্প প্রসারণানুকূল উপযুক্ত মূলধন সৃষ্টি কার্যে করনীতির সহায়তা এবং মুদ্রাস্ফীতির অথবা মন্দার লক্ষণ করনীতির সাহায্যে প্রশমিত করা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত দেওয়ার গুরু দায়িত্ব উপরোক্ত কমিশনের উপর ন্যস্ত ছিল। সম্প্রতি এই বিষয়ে কর-কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার উপর কথঞ্চিৎ ভিত্তি করিয়া এই বৎসরের বাজেটও প্রণীত হইয়াছে। কাজেই এই কমিশনের তথ্যবহুল সুপারিশগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই কমিশনের বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়াছেন কিভাবে করনীতির সাহায্যে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। জনকল্যাণকারী কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করা সম্ভব, ব্যক্তিগত শিল্পোন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার উপায় কার্যকরী হইতে পারে।

অর্থ বণ্টনের বৈষম্য দূর করা কি ভাবে সম্ভব? যাহাদের অনেক আছে তাহাদের কাছ হইতে কিন্তু অংশ সংগ্রহ করিয়া যাহাদের কিছুই নাই তাহাদের প্রয়োজন ও উন্নতিকল্পে ঐ অর্থ ব্যয় করিলে ধনবণ্টনের বৈষম্য কথঞ্চিৎ হ্রাস পায়। এই অর্থ আহরণ ও বণ্টন একমাত্র সরকার কর্তৃকই সম্ভব এবং করনীতিই এই কার্যের প্রধান অবলম্বন। যে পর্যন্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট সম্প্রদায়ের আর্থিক মান বৃদ্ধি না পায় সেই পর্যন্ত অর্থবৈষম্য থাকিবেই। কাজেই অর্থবৈষম্যের মূলে আঘাত করিতে হইলে দরিদ্র নরনারায়ণের অবস্থার উন্নতি বিধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেইজন্য কৃষি, জলসেচন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি হিতকর কার্যে অধিক অর্থ বিনিয়োগ বিধেয়। উপরোক্ত জনকল্যাণকর কার্যের অবশ্যম্ভাবী ফল জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি। ইহা ছাড়া আর এক উপায় আয়কর বৃদ্ধি। আয়কর বৃদ্ধি পাইলেই বিত্তবানের কোষ হইতে অধিক অর্থ সরকার-কোষে সঞ্চিত হয়। সেই সাথে ইহাও দেখিতে হইবে যাহাতে আয়কর কেহ ফাঁকি দিতে না পারে। তাহা হইলেই একদিকে যেমন দরিদ্রশ্রেণীর আর্থিক উন্নতি ঘটিবে অপরদিকে ধনিকসম্প্রদায়েরও আয় করদানের জন্য কমিয়া আসিবে। পরিশেষে এইভাবেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যের আদর্শে মিলন সম্ভব হইবে। কমিশন মনে করেন যে, করদানের পরেও ব্যক্তিগত আয়ের উপর এক জায়গায় সীমারেখা টানিয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের মতে কোন ব্যক্তিবিশেষের আয় দেশের প্রতি পরিবারের গড়পড়তা আয়ের ত্রিশগুণের বেশী হওয়া উচিত নয়। সম্প্রতি যে উত্তরাধিকার কর (inheritance tax বা estate duty) ধার্য হইয়াছে তাহাতেও অর্থবৈষম্য অনেকটা বিদূরিত হইবে।

আয়কর, উত্তরাধিকার কর, কৃষি আয়কর জাতীয় প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও পরোক্ষ করের

indirect tax)এর ব্যাপকতা প্রয়োজন। পরোক্ষ কর বলিতে ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য যথা কেরোসিন, তামাক, চা প্রভৃতির উপর কর বোঝায়। এই করের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইল উক্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। তাহার ফলে জনসাধারণকে অধিক মূল্য দিয়া ঐসব জিনিস খরিদ করিতে হয়। অথবা ঐসব জিনিস নিজেদের প্রয়োজনের চাইতে কম করিয়া কিনিতে হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রে বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যসামগ্রীর উপর অধিকতর কর নিরূপণের যৌক্তিকতা আছে। এইসব করের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মদিরা মঙ্গল" নামক একটি ব্যঙ্গ কবিতাতেও বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাটির শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য আছে—

"লালপানির উপর অকস্মাৎ করবৃদ্ধি উপলক্ষে ভুক্তভোগীর খেদোক্তি।"

"মদ্য আমার! পানীয় আমার!
সরাব আমার! আমার Peg।
কেন কোম্পানী নজর দিল গো!
কেন হল এই Duty Plague?
কেন গো তোমার বাজার চড়িল?
কেন গো ললাটে উদিল মেঘ?
চৌদ্দ ভুবনে ভক্ত যাহার
ডাকে উচ্চে "আমার Peg!
কিসের দুঃখ কিসের চিন্তা
কিসের Duty কিসের মেঘ?
Buy যদি নাই করো গো সবাই
Steal Borrow কিবা করিবে Beg!"

অধিক সংখ্যক মৎস্যাশিকারের জন্য যেমন জাল ছড়াইয়া ফেলিতে হয়, সেইরূপ অধিক পরিমাণ অর্থসংগ্রহের জন্য করের জালও বিস্তৃতভাবে অনেক স্থান জুড়িয়া ছড়িতে হয়। ইহার ফলে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীও করের জালে আটকাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে এবং তাহা এড়ানও সম্ভবপর নয়। হিসাবে দেখা যায় যে, নগরবাসীরা গ্রামবাসীদের অপেক্ষা অধিক করভারাক্রান্ত। কাজেই গ্রামের যাহারা অর্থবান সম্প্রদায় তাহাদিগকে করের আওতায় আনিবার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রহিয়াছে। বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টার ফলে অনেক স্থান উন্নত হইয়াছে এবং সেখানকার জমি ইত্যাদির দাম অনেক বাড়িয়াছে। যাহারা ঐসব স্থানে কম দরে জমি কিনিয়াছিলেন তাঁহারা বর্তমানে অনেক দামে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হইয়াছেন। এইসব অপ্রত্যাশিত লাভের উপর (unearned increment) কর বসাইবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। লবণ কর পুনঃ প্রবর্তনের সুযোগ আছে বটে—কিন্তু এই লবণ করের সাথে জাতীয় সংগ্রামের স্মৃতি জড়িত। মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত ডাণ্ডী অভিযান এই লবণ করের বিরুদ্ধে। কাজেই এই কর আবার বসাইবার বিপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের পুণ্যস্মৃতির বাধা অত্যন্ত প্রবল। আমাদের দেশে বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭—৮ ভাগ কর বাবদ সংগৃহীত হয়। ইহার তুলনায় অন্যান্য দেশে করের অংশ স্ব স্ব জাতীয় আয়ের আনুমানিক শতকরা ২৫—৪০ ভাগ। কাজেই আমাদের দেশে আরও কিছুটা করবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু এখানে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন কর ধার্য হইয়াছে। এমন কি, এক জাতীয় করের হারও নিরূপণ বিভিন্ন উপায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহাতে এইসব কর সম্পর্কে একই প্রকার নীতি বিভিন্ন প্রদেশে অনুসৃত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বিক্রয় করের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতে পারে। এইসব ব্যাপারে শাসনবিধির ২৬৩ ধারা অনুসারে সর্বভারতীয় একটি কর কমিটি বসান উচিত যাহাতে করনীতির বিভেদ ক্রমশ অপসারিত হয়।

এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদৃচ্ছা কর বসাইলেই সমস্যার সমাধান হয় না। করের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি দেখেন যে, অত্যধিক পরিশ্রমোপার্জিত অর্থের বেশীর ভাগ করদানেই ক্ষয়িত হয়, তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবে অধিক পরিশ্রম না করা। মানসিক বিচারে—পরিশ্রমের সার্থকতাই বা কি যদি উপার্জিত অর্থ ভোগ না করা যায়? এই অবস্থায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইবে খরচ করা। আয়ের বেশীর ভাগ ব্যয় করিলে সঞ্চয়ের অঙ্ক কমিয়া যায় এবং সঞ্চয় না করিলে মূলধন সমস্যা প্রকট হয়। মূলধন না থাকিলে শিল্পোন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগের আশাও তিরোহিত হয়। শিল্পোন্নতি না ঘটিলে আবার জাতীয় সম্পদও বৃদ্ধি পায় না এবং জীবন মান উন্নত হয় না। কাজেই এইদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, করের প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ নহে, ইহা সুদূরপ্রসারী, এমন কি, দেশের উন্নতির মূলে গিয়া আঘাত হানিতে পারে। কাজেই কর নির্ধারণ কার্যে অত্যধিক সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ প্রয়োজন। আমাদের মত অনুন্নত দেশে, যেখানে ব্যক্তিগত মূলধন নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনেককাল অনুভূত হইবে, গুরু করভার উন্নতির পথে অনেক বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই আমাদের দেশে এমন করনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন যদ্দ্বারা মূলধন সৃষ্টি ব্যাপারে কোন বিঘ্ন না ঘটিতে পারে, জাতীয় উন্নয়ন কার্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে, সঞ্চয় স্পৃহা বৃদ্ধি পায়, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দাজনিত উপসর্গগুলি অপসারিত হয় এবং দেশের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এই ব্যাপারে শ্যাম ও কুল উভয় দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে।
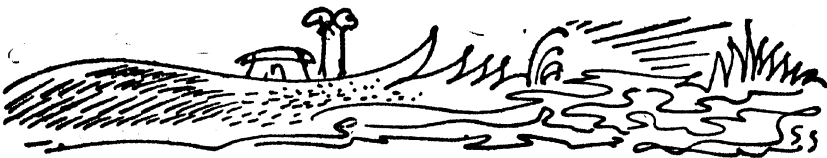
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর কংগ্রেস কর্মীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে শাদা শার্ট তিনটি, পাজামা তিনটি, ধুতি তিন জোড়া ও এক জোড়া মাত্র চপ্পল তাঁরা ব্যবহার করবেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কংগ্রেস কর্মীদের ভাগ্যবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে শুধু কৌপীন পরার নির্দেশ দিলে সেটা শাস্ত্র এবং সংস্কৃতি-সম্মত হতো।"

* * *

পশ্চিম জার্মানীর এক সংবাদে শুনিলাম সেখানকার গাভী-গুলি নাকি "Jazz" পছন্দ করে না।
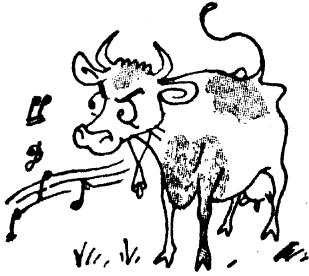
—"আমাদের দেশে গরুগুলো নেহাৎ গরু ব'লে যে-কোন সুর শুনে আনন্দে জাবর কাটে আর চোখ বুজে সমঝদারি করে" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শুনিলাম সর্দার শরণ সিং নাকি বলিয়াছেন যে গৃহসমস্যার সমাধান করিতে হইলে পর-পর অনেক-গুলি প ঞ্চ বা র্ষি কী পরিকল্পনার প্রয়োজন। —"দেখে শুনে মনে হচ্ছে গৃহসমস্যা সমাধানের আগে পরিকল্পনা-সমস্যার সমাধানই আমাদের এখন বড় হয়ে উঠেছে" বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর হারাইয়া যাওয়ার বিস্ময়কর সংবাদ আমরা পাঠ করিলাম। —"কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হলো সে প্রশ্নের উত্তরও হয়ত গড্ডলিকা প্রবাহে হারিয়েই যাবে"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

মার্শাল বুলগানিন্ এবং পণ্ডিত নেহরুর যুক্ত বিবৃতি প্রকাশের পর ভারতীয় কমিউনিস্টরা ভারতের নীতি সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"এতদিনে ধরা হ্যায়।"

* * *

করাচীর সংবাদে প্রকাশ জনাব মহম্মদ আলি নাকি চীন সফরে যাইবেন। —"সফরটা cultural কি agricultural হবে তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

দক্ষিণ ইতালীর এক সংবাদে শুনিলাম যে কোন এক মহিলার নাকি বাক্‌শক্তি হারাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহার হারাইয়া যাওয়া স্বামী যখন অকস্মাৎ বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁহাকে দেখিয়াই ভদ্র-মহিলার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসে।

—"স্বামীর সংগে লাট্টু-লাটুম আগরে জিব্ আপনা থেকেই চড়চড় করে ওঠে —বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

জার্সিতে কোন এক উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ একটি গাছে পাঁচরকম ফল ফলাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন —"চেষ্টা করলে আমরাও যে না-পারতাম

তা নয়, কিন্তু আমাদের নীতি হলো ম ফলেষু কদাচন, সুতরাং - - -" বলে শ্যামলাল।

* * *

কোন এক বিশেষজ্ঞের মতে নাগরিক জীবনই নাকি মানুষকে সহজে পাগল করিয়া দেয়। তিনি এ সম্বন্ধে একটি পরিসংখ্যানও প্রকাশ করিয়াছেন, —তাহাতে বলা হইয়াছে যে আমেরিকার প্রতি দুইশতের মধ্যে একজন, ফ্রান্সে তিন-শতের মধ্যে একজন এবং ইজিপ্টে প্রতি হাজারে একজন পাগল হয়। —"বুঝতেই পারছি আমেরিকা শুধু অর্থে নয়, অনর্থেও সবার ওপরে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

গ্রীসে সম্প্রতি 'সৌন্দর্য-প্রতি-যোগিতার বিরুদ্ধে কেহ কেহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। —"সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা একেবারে উঠে গেলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভও যে কম হবে না একথাটা গ্রীস কেন বুঝতে পারছেন না তা আমাদের কাছে Greek হয়েই রইল !!

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

কথায় বলে মাছের তেলেই মাছ ভাজা যায়। রান্নাঘরের আবর্জনা দিয়েই রান্না-বাগানের উন্নতি করা যায়। শুকনো পচা ঘাস পাতা রান্নাঘরের আবর্জনা ইত্যাদি থেকে ৩০ দিনের মধ্যে খুব ভালো বাগানের সার তৈরী করা যায়। এর জন্য কোনও রকম খাটাখাটুনির দরকার নেই। শুধু মাত্র জঞ্জালগুলো
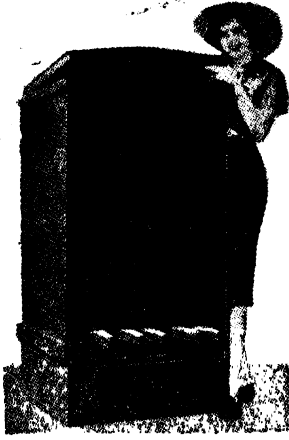
সার তৈরীর বাক্স

বাক্সটির মধ্যে ফেলে কিছুটা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে রেখে দিতে হয়। তারপর ত্রিশ দিনের মধ্যে ওগুলো গাছের সার হয়ে নীচের টানাগুলোতে এসে জমা হবে। এই সারগুলোতে কোনও রকম গন্ধ নেই। যে বাক্সটায় সার তৈরী হয় সেটাতে মশামাছি পোকামাকড় ঢুকতে না দেওয়ার জন্য ঢাকা থাকে।

*

টিয়াংবোক গুম্ফার তুষার মানব সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত পোষণ করেন। সম্প্রতি কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযাত্রী দলের দলপতি ডাঃ চার্লস ইভান বলেন যে, টিয়াংবোকে 'ইয়াতী' বলে যে মাথার খুলিটি তুষার মানবের মাথার খুলি বলে বছরের পর বছর সকলকে দেখানো হয় সেটি আসলে কোনও তুষার মানবের মাথার খুলি নয়। ডাঃ ইভান সেবার যখন এভারেস্ট অভিযানে যান তখন টিয়াংবোকের প্রধান পুরোহিত তাঁকে ঐ খুলিটি দেখান। তিনি এর থেকে গোটা কয়েক চুল ছিঁড়ে নিয়ে সেটা পরীক্ষার জন্য বৃটিশ মিউজিয়মে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করে ডাঃ ইভানকে জানান যে, এগুলো শুকরের চুল। ডাঃ ইভান আরও বলেন যে, ঐ জীবটি ঠিক অতখানি ওপরে দেখা যায় না, খুব সম্ভব এটাকে পাহাড়ের নীচে থেকে নিয়ে গিয়ে গুম্ফায় রাখা হয়েছে। অবশ্য ডাঃ ইভান তুষার মানবের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন না। তিনিও ১৬ হাজার ফিট উঁচুতে কতকগুলো পায়ের ছাপ দেখেছেন। সেগুলো তুষার মানবের পায়ের ছাপ হতে পারে। সেগুলো ঠিক কী ধরনের জন্তু তা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। এরা দ্বিপদও হতে পারে চতুষ্পদও হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দ্বিপদ জন্তুও যেমন বাঁদর হাত ও পা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার মত চলতে থাকে তখন চলা-পথে এদের চতুষ্পদ জন্তুর মতই ছাপ পড়ে। আবার অনেক সময় চতুষ্পদ ভল্লুকও চার পায়ে না হেঁটে কখনও দু পায়ে চলে। এদের পদচিহ্ন দ্বিপদ জন্তুর মতই হবে। সুতরাং তুষার মানব জীবটি বাদর জাতীয় কী ভল্লুক জাতীয় জীব একথা আজও ডাঃ ইভান বলতে পারেন না।

*

প্যারী শহরের আবহাওয়া অফিস থেকে জানান হয়েছে যে, এ্যাটম বোমা ফাটানোর দরুণ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সূর্যরশ্মির পরিমাণ কমে যেতে পারে। জগতে যে সব 'এ বোমা' ও 'এইচ বোমা' ফাটান হয় তার থেকে যে তেজষ্ক্রিয় ধূলিকণা ওড়ে তাতে প্রায় দু' বছরের জন্য শতকরা কুড়ি ভাগ সূর্যরশ্মি কমে যায়। এ্যাটম বোমা ফাটানোর পর যে সব তেজষ্ক্রিয় মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায় তাতে বৃষ্টিপাতের কোনও রকম তারতম্য ঘটে না তবে সাধারণ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। মেরু প্রদেশে বোমা ফাটানোর পর দেখা গেছে যে, ঠান্ডা হাওয়াটা গরম হাওয়ায় পরিণত হয়। এমনও হতে পারে যে, যদি পর পর কতকগুলো এ্যাটম বোমা ফাটান যায় তাহলে স্থানীয় আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে বদলে যাবে। আবহাওয়া তত্ত্ববিদরা পরিমাপ করে দেখেছেন যে, 'এ বোমা' ফাটবার পর যে মেঘের উৎপত্তি হয় তার তেজষ্ক্রিয় শক্তি সমস্ত জগতের আবহাওয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ঘণ্টায় ১২ থেকে ৩৭ মাইল গতিতে ছড়ায়।

*

ধাতু খনিজ পদার্থ, ধাতু গাছে ফলে না একথা চিরদিনই জানি। কিন্তু বিজ্ঞান আজ নতুন কথা শোনাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া সরকারের বনজ শিল্প বিভাগ নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার কোনও গাছ থেকে এলুমিনিয়ম ধাতু পেয়েছে। এই বিভাগ প্রায় ৮০টি গাছ পরীক্ষা করে প্রত্যেকটি গাছের কাঠের মধ্যেই এলুমিনিয়ম ধাতু পেয়েছেন। গাছের মধ্যে বিভিন্ন জৈব এসিডের সঙ্গে যৌগিকভাবে এই পদার্থটি পাওয়া যায়। তারা পরীক্ষা করে শুধু যে, মূল কান্ডের মধ্যেই এলুমিনিয়ম পেয়েছেন তা নয় অন্যান্য ডালপালা ও পাতার মধ্যেও পাওয়া গেছে। গাছের বিভিন্ন অংশে এই ধাতু পাওয়ায় মনে হয় যে, এইসব গাছ মাটি থেকেই ধাতুটি সংগ্রহ করে। কুইন্সল্যান্ডের একটি গাছ থেকে প্রথম জৈব এলুমিনিয়মের খবর পাওয়া যায়। তখন বৈজ্ঞানিকরা এটিকে প্রকৃতির রাজ্যে বৈচিত্র্য বলেই মনে করেন পরে যখন দেখা গেল যে, অন্যান্য গাছ থেকেও এই রকম এলুমিনিয়ম পাওয়া যাচ্ছে তখন আর এটাকে প্রকৃতির খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। বর্তমানে এ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা চলছে। কেমন করে গাছগুলি মাটি থেকে এলুমিনিয়ম সংগ্রহ করে তা এখনও জানা যায়নি। তবে লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, অস্ট্রেলিয়ার আর্দ্র জমির গাছের মধ্যেই এই ধাতু পাওয়া যায় শুকনো জমির গাছে পাওয়া যায় না।

বাঘ ও অজন্তা : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। পরিবেশক : গ্রন্থজগৎ, ৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। দাম : দেড় টাকা।

বাঘ ও অজন্তা ভারতীয় শিল্পলিপির প্রাচীন পুণ্যপীঠ। বিভিন্ন মূর্তি, অপরূপ চিত্রলেখায় বাঘ ও অজন্তার গুহাগুলি কারুশ্রীময়। লেখক স্বয়ং খ্যাতিমান রেখা-শিল্পী। পূর্বসূরীদের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধায় তিনি এই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার মর্মরূপ উপলব্ধি করেছেন। আমাদের দেশে চিত্রকলাকে এখনও জনপ্রিয়তার আসন দেওয়া হয়নি। তাই প্রাক্ পুরুষের শিল্পসাধনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন উত্তরধারক ছাড়া আর কারও আগ্রহের সৃষ্টি করছে না। এটা স্থবিরত্বের লক্ষণ। বন্ধ্যাত্বের সংকেত। যে দেশে শিল্পানুরাগ অনুপস্থিত, সে দেশ যান্ত্রিক। তার মানস নেই। 'বাঘ ও অজন্তা' তারই ওপর একটি অন্তরঙ্গ আলোকপাত। এই শিল্পপীঠের প্রতি সরকারের বিশেষ মনোযোগ নেই। লেখক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতকে সন্ধান করতে হলে তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার সংগে সংগে মনন ও শিল্পকেও খুঁজতে হবে। তা না হলে এই সন্ধান নিরর্থক। অজন্তা ও বাঘের শিল্পমানসটিকে পরিচ্ছন্ন ভাষায় লেখক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর রচনার ভঙ্গিটি ঘরোয়া, ঘনিষ্ঠ। শেষের দিকে বাঘ-অজন্তার গুহাগাত্রের অনেক চিত্রের অনুলিপি সংযোজিত হয়েছে। এগুলি লেখক অপূর্ব নিষ্ঠার তুলিতে ধরে এনেছেন। সন্ধানী পাঠক ও অজন্তা-বাঘ যাত্রীর কাছে গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। ১৭৪।৫৫

বাংলা ভাষার উচ্চারণ

বাংলা উচ্চারণ-কোষ—ধীরানন্দ ঠাকুর। বুকল্যান্ড লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম তিন টাকা।

বাংলা ভাষার উচ্চারণগত বহু বৈচিত্র্য-ব্যতিক্রম-বিভ্রাটের কথা বাঙালীরা যতো না জানেন, তার চেয়ে বেশি জানেন অ-বাঙালী বাংলা-শিক্ষার্থী। অতএব, বাংলা শব্দের ঠিক ঠিক উচ্চারণের রূপ জানার জন্য উচ্চারণ-কোষের শরণার্থী হওয়া বাঙালীর পক্ষে তো বটেই,—কিন্তু ততোধিক বেশি দরকার অ-বাঙালী বাংলা শিক্ষার্থীর। এমতাবস্থায় ধীরানন্দ ঠাকুর মহাশয় আন্তর্জাতিক উচ্চারণ-সংকেতসূচক লিপিমালা ব্যবহার না করে সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। তাছাড়া, উচ্চারণের রূপ সম্বন্ধেও কিছু সংশয়ের কারণ দেখা গেল এই বইখানিতে। 'অব্যূঢ়' শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ কি শুধু 'অবূঢ়' বা 'অবুঢ়ো'? 'অব্যবহিত'—কথাটি কোথায়, কোন্ অঞ্চলে উচ্চারিত হয় 'অব্-বোহিতো'-রূপে? 'অবেলা' কথাটি সাধারণত

শোনা যায় 'অ-ব্যালা'-রূপে, 'অব্যালা' নয়;—শেষোক্ত বানানে ধ্বনিটা হয়ে দাঁড়ায় 'অব্‌ব্যালা'। 'একবচন'-এর উচ্চারণ জানাতে 'এ্যাকবচন' লেখবার দরকার কি অনিবার্য? 'অ্যাকবচন' লিখলে য়্যা-ধ্বনির জন্য একটি মাত্র চিহ্ন 'অ্যা'-প্রয়োগের সংগতি বজায় থাকতো। 'মেরাপ' কথাটা পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্বত্র উচ্চারিত হয় 'ম্যারাপ'রূপে। বর্তমান গ্রন্থে আছে শুধু 'মেরাপ'; তেমনি 'মেনকা'। 'যজ্ঞ' যে কোন্ অঞ্চলে 'জোগ্‌গোঁ'-রূপে উচ্চারিত হয় তা আমাদের জানা নেই। সুনীতিবাবুর Origin and Development of the Bengali Language বই দুখানির মধ্যে এক একটি শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ রীতির উল্লেখ আছে অন্য কারণে। তিনি ভাষা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি—তাঁর বইয়ে শব্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ ইত্যাদি নানা ব্যাপারের আলোচনা আছে এবং প্রধানত সেইসব সূত্রের ব্যাখ্যানের দৃষ্টান্ত হিসেবেই উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের তালিকা আছে। অপরপক্ষে ধীরানন্দবাবু লিখেছেন, "ভাষার নিদর্শ উচ্চারণ-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে কথিত ভাষার উচ্চারণের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে পরভাষীর পক্ষে সে ভাষা শেখা সহজ হয়। সুতরাং নিদর্শাঙ্কিত উচ্চারণ প্রণালী ভাষার প্রসারে সাহায্য করে...।" এই মন্তব্যের পরে বইয়ের মধ্যে,—বিশেষ অঞ্চলের উল্লেখহীন, বৈজ্ঞানিক সংকেতলিপিহীন, বহুবিভ্রম কণ্টকিত কতকগুলি বাস্তব-অবাস্তব উচ্চারণ রূপ প্রকাশ করা দায়িত্বহীনতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে হয়। এক একটি শব্দের সংগে যে বিভিন্ন উচ্চারণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সাজাবার কোনো ক্রমবিধিও অনুসৃত হয়নি। 'বৈবর্ণ্য' কথাটার তিনটি রূপ দেখা গেল—যথাক্রমে 'বৈবোরনো' 'বৈবর্‌নো' এবং 'বৈবর্‌ন'। প্রচলিততম রূপের প্রাধান্য মনে রাখলে এই ক্রম পুরোপুরি বিপরীত প্রান্ত থেকে শুরু করা উচিত ছিল। বইখানি যোগ্যতর সম্পাদকের দ্বারা অবিলম্বে পুনর্লিখিত হওয়া দরকার। ১৫৬।৫৪

ভাষাতত্ত্ব

বাংলা ভাষার ভূমিকা—সুখময় বসু। একক প্রকাশনী, ৪৪৩।১, কালীঘাট রোড, কলিকাতা। আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত সুখময় বসুর বৃত্তি হলো অধ্যাপনা। বাংলা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থেকে এ শাস্ত্রে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়েছে এবং তারই প্রমাণ পাওয়া গেল এই বইখানিতে। সাধারণ পাঠক এবং ছাত্র-সমাজ, উভয় সম্প্রদায়ই বইখানি পড়ে খুশি হবেন। ভাষাতত্ত্বের মতো নীরস(?) শাস্ত্রের ব্যাখ্যানেও তাঁর সরস বর্ণনার কৌশল চোখে পড়লো। প্রথম পর্যায়ে আলফাঁস দোদের 'দি লাস্ট লেসন্' গল্পটি স্মরণ করার মধ্যে বাংলাভাষার প্রতি লেখকের যে মমতাবোধের পরিচয় আছে, সেই মমতাবোধের নিরলস শাসনেই তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় আগাগোড়া সুপরিস্ফুট করেছেন। অবশ্য কোন কোন জায়গায় তাড়াতাড়ি পাণ্ডুলিপি শেষ করার ব্যস্ততার চিহ্ন রয়ে গেছে। O.D.B.L না লিখে সুনীতিবাবুর বইখানির পুরো নামটিই দেওয়া উচিত ছিল। Aspiration-এর বাংলায় শুধু 'পীনায়ন' না বলে 'মহাপ্রাণের

পীনাঙ্গন' কিংবা 'মহাপ্রাণন' বললে বোধ হয় আরো সংগত হয়। 'শীৎকার' এবং 'কাকুধ্বনি' এক জিনিস নয় (পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য);—"বিশেষভাবে কোন ধ্বনিকে প্রকাশ করার নাম বল, স্বরাঘাত বা ঝোঁক' —এই সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। এরকম আরো কিছু কিছু অসতর্কতার নজির থাকলেও বইখানি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

বাঁধাই ভালো, কিন্তু ছাপার বহু ত্রুটি চোখে পড়লো। ১৯১।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

শিক্ষা-প্রসঙ্গ—বার্ট্রাণ্ড রাসেল। অনুবাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ। কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা ও সাড়ে তিন টাকা।

শিশুর কল্পনা, ভয়, কৌতূহল, স্নেহ-মমতার ক্ষুধা, স্বাস্থ্যবোধ ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গের শিক্ষাপ্রদ, চিন্তাজনক আলোচনা আছে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের On Education বইখানিতে। শিক্ষাব্রতী শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র চন্দ সেই প্রবন্ধগুলির মূলানুগ অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের শ্রী ও সমৃদ্ধি বাড়ালেন তো বটেই, তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষী পিতামাতার উপকার করলেন। অপত্য স্নেহের সঙ্গে জ্ঞানেরও প্রয়োজন। আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা আদর্শ সমাজগঠনের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখবে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য,—সেই সঙ্গে বর্তমান গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে শিশুর যে রকম শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যেক পিতামাতার পক্ষে সাধ্য, সেই রকম পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। চরিত্রগঠন এবং নানা তথ্য-তত্ত্ব পরিবেষণ—এই দুটি কর্তব্যেই শিশুর শুভার্থী শিক্ষককে অবহিত থাকতে হয়। রাসেল এই দুই ধারার কথাই আলোচনা করেছেন। শিক্ষা কার্যকরী হবে, না-কি বিশুদ্ধ জ্ঞানও রসচর্চামূলক হবে, এইসব পরিচিত মতামতের পক্ষ-পক্ষান্তর মেনে নিয়েও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে চরিত্র গঠন বা ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন, এ বিষয়ে কোনো মতান্তরের অবকাশ নেই। 'শিক্ষা-প্রসঙ্গের' মূল প্রসঙ্গ এইটিই।

নারায়ণবাবুর অনবাদ সুখপাঠ্য। বই-খানির ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি সবই নিখুঁৎ। ১৯২।৫৫

সংবাদধর্মী সাহিত্য

চেনা মানুষের নক্শাঃ অমল দাশগুপ্ত। প্রকাশকঃ নতুন সাহিত্য ভবন। ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা ২০। দামঃ দু টাকা আট আনা।

নাগরিক জীবনের চারপাশে অজস্র চরিত্রের চিত্রমালা। নানা জটিলতার জটলা। এই জটিল জীবনের মধ্য থেকে কয়েকটি চরিত্র তুলে নিয়েছেন লেখক। ছবি লাইন-ম্যান, মৃত্যুজীবিকার পুরুতঠাকুর, হেড কম্পোজিটার প্রকাশবাবু, লাইন ম্যান, বাবু খালাসী ইত্যাদি। লেখকের পরিমিতি বোধ সুন্দর। রচনার প্রকাশ স্বচ্ছন্দ। ভাষা বর্ণাঢ্য না হলেও বিষয়-বাহনের উপযোগী। রচনা-গুলি স্বাভাবিকভাবেই সংবাদধর্মী। এ পর্যন্ত আমাদের আপত্তি নেই। অভিযোগও নেই। কিন্তু অধিকাংশ চরিত্রের নেপথ্যে লেখক একটি আশ্চর্য সচেতন সংগ্রামী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এই সংগ্রাম নানা আকারে সরকারের বিরুদ্ধে, কখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মালিকানার বিপক্ষে রূপ নিয়েছে। রচনা যাই হোক, যখনই তাকে শিল্পের মার্কা মেরে পাঠকের হাতে উপহার দেওয়া হয়, তখন তার মধ্য থেকে বিশেষ এক জেহাদ কামনা করা হয় না। সাহিত্য বলি, শিল্প বলি—কেউ stimulant নয়, কেউ malice নয়। উত্তেজক রচনার আয়ু অচিরকাল। সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনের নির্দেশ কাম্য, তা যদি বিশেষ কোন sloganএর উত্তেজনায় চিহ্নিত হয় তা হ'লে সাহিত্যের সংকটকাল উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে। গ্রন্থখানির অঙ্গসজ্জা রুচিসম্মত। (২২৫।৫৫)

সংগীত

সপ্তরঞ্জনী বা সেতার সাধনা—শ্রীজিতেন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত। প্রকাশক—গীতবিতান, ১৫৫, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫। দাম—চার টাকা।

ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের তিনটি ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি চতুর্থ ভাগ। সপ্তরঞ্জনীর প্রকাশিত চার ভাগে আই-মিউস্ ও বি-মিউস্ উপাধি পরীক্ষার নির্ধারিত অধিকাংশ রাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, স্বরবিস্তার, মসীদখানি ও রেজাখানি চালের গৎতোড়া প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত রাগের স্বরবিস্তার, তান-তোড়া ঝালা ইত্যাদি ও কেদারা, মারোয়া, গৌড়সারং রাগের গৎ গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত। অন্যান্য বেশির ভাগ গৎই ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ ও ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। যে-সব রাগ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—দুর্গা, জয়জয়ন্তী, তিলং, জৌনপুরী, তিলক কামোদ কেদার, সোহিনী মারোয়া, মুলতান, গৌড়সারং, দরবারী কানাড়া, পুরিয়া, ধানেশ্রী এবং কালাংড়া। গ্রন্থকার যন্ত্রসংগীতজগতে সুপরিচিত এবং শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ। গ্রন্থখানি শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারে লাগবে।

সুরছন্দা—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩৯বি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা—২৬। দাম—প্রতি সংখ্যা আট আনা।

এটি সম্পূর্ণ সংগীতবিষয়ক মাসিক
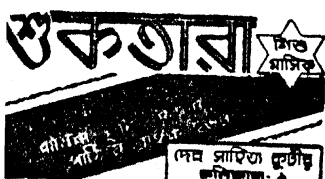
পত্রিকা। বর্তমানে সংগীতপত্রিকা প্রকাশ করা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার; কেন না প্রতি মাসে উপযুক্ত রচনা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। সাধারণত পত্রিকাদিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাংগীতিক প্রবন্ধাদি পড়লে সংগীত-সাহিত্য যে এখনও কতখানি অপরিণত, সেটি চোখে পড়ে এবং মন ভারাক্রান্ত হয়। অধিকাংশ রচনাই কাঁচাহাতের সাক্ষ্য দেয় এবং সম্যক্ জ্ঞানের অভাব সূচিত করে। আলোচ্য পত্রিকাটিও এবম্বিধ ত্রুটি থেকে রক্ষা পায়নি। এর পাঁচটি সংখ্যায় কিছু কিছু অক্ষম রচনা স্থান পেয়েছে। কোন কোন নামকরা শিল্পীর নিকৃষ্ট রচনা প্রকাশ করবার দায়িত্ব সম্পাদক মহাশয় না নিলেও পারতেন। স্বরলিপি-গুলি বহু ক্ষেত্রে রীতিসম্মত হয়নি এবং ছাপা আরও ভাল হওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ গানের রচনা অতিশয় অপটু—সুর এবং সাহিত্য দু দিক থেকেই। অনেকের ধারণা সংগীতে কথাটা গৌণ এবং সুরটাই মুখ্য; কিন্তু সেটি একেবারেই ভ্রান্ত, বিশেষ ক'রে বাংলা গানের ক্ষেত্রে। বাংলা কাব্যসংগীতে কাব্যাংশ অক্ষম হ'লে সুরের মাধুর্যও সম্পূর্ণ বিকশিত হবে না এবং রচনাটি সর্বাংশে অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।

এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যম প্রশংসনীয়। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের "সংগীত পারিজাত"-এর অনুবাদ একটি উত্তম প্রচেষ্টা। বাংলার সংগীতে উক্ত গ্রন্থের একটি বিশেষ স্থান আছে—এই কারণেই এই গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। পত্রিকাটির বিপুল সম্ভাবনা আছে, যদি প্রকাশকমণ্ডলী এর মাধ্যমে প্রকৃত সংগীত এবং সংগীতসাহিত্য পরিবেশনে যত্নবান হন। আমরা পত্রিকাটির সর্বাংশে উন্নতি কামনা করি।

জীবনী

কাজী নজরুল—শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (হুগলী)। প্রকাশক—দেবদত্ত এণ্ড কোং, ৪।৬৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকাতা—৩২। দাম—তিন টাকা।

লেখক দীর্ঘকাল কবির সাহচর্য লাভ ক'রে তাঁর মর্মরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই প্রেরণা থেকেই তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে কবির জীবনকথা বিবৃত হয়েছে এবং এর সঙ্গে "নজরুলের চোখে ভারতীয় মুসলমান", "ব্যক্তিগত জীবনে নজরুল", "দরদী নজরুল" এবং "কাজী নজরুলের ধর্মপ্রবণতা" এই চারিটি প্রবন্ধে কবির ভাবধারার সঙ্গেও পাঠককে পরিচিত করা হয়েছে। রচনার ভিতর দিয়ে লেখকের শ্রদ্ধা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল সম্বন্ধে এই তথ্যপূর্ণ সুলিখিত গ্রন্থটি বাংলাসাহিত্যের একটি অভাব বহুলাংশে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ: যামিনীকান্ত সোম। প্রকাশক: শ্রীমানবেন্দ্রনাথ পাল। ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। দাম: এক টাকা চার আনা।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন কাহিনী। ভারতীয় সাধনমানসে শ্রীঅরবিন্দ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাঁর জীবনচর্যা মানুষকে এক নতুন মানসিক উন্মেষের পথ দেখিয়েছে। তাই এ কালের আচার্যদের তিনি পুরোধা। মহা-পুরুষদের জীবনী আগামী পৃথিবীকে দ্রুত সঞ্চরণশীল করে। আজকের কিশোর মনে এই জীবনী যদি ঠিকমত এঁকে দেওয়া যায় তবে ভবিষ্যতে পথচলার নিরাপত্তা তারা লাভ করবে। শ্রীঅরবিন্দের জীবন, আবির্ভাব থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত বৈচিত্র্যময়। কর্ম ও যোগে, জ্ঞানে ও ধ্যানে নিজেকে স্বর্ণপদ্মের মত তিনি বিভাসিত করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে পণ্ডীচেরীর আশ্রম পর্যন্ত এই বিশাল রাজপথটি নানা বিবর্তন দিয়ে চিহ্নিত। সংক্ষিপ্ত পরিসরে শ্রীঅরবিন্দের জীবন কিশোর-কিশোরীদের হাতে তুলে দিয়ে লেখক কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। (২১৯।৫৫)

কাহিনী

মেঘ ও চাঁদ: অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রাপ্তিস্থান—১০।বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম বারো আনা।

বড় গল্পের নামে অবিন্যস্ত ও অসংলগ্ন রচনা। কাহিনী, চরিত্র বা বর্ণনাভঙ্গী কিছুই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ৩১।৫৫

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

আমি—শান্তি রায়
রুল অফ থ্রি—ভাস্কর
পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরা গল্প—
রুহুল আমিন নিজামী
আধুনিক রাষ্ট্রীয় মতবাদের ভূমিকা—
সি ই এম জোয়াড—অনুবাদক—শ্রীগুরুপ্রসাদ দত্ত
চীন দেখে এলাম ২য় পর্ব—মনোজ বসু
সৃষ্টি—সঞ্জয় ভট্টাচার্য
মেঘলা প্রহর—আশা দেবী
পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ—
বিশ্বেশ্বর মিত্র
প্রিয়ংবদা—শ্রীশান্তিময় ঘোষাল
রাজ্যের রূপকথা—১ম খণ্ড—
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
নববার সংযম—১ম খণ্ড—অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস
শান্তির বারতা—২য় খণ্ড—
স্নেহময় ব্রহ্মচারী
সত্যার্থ চাণক্য নীতি কথা—শ্রীলীলাময় দে

উপজাতির [illegible]—ডক্টর শ্রীমনীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক

মাধুরী—শ্রীপূর্ণেন্দুবিকাশ মণ্ডল

ভ্রম সংশোধন

"সবার মা সারদা" গ্রন্থখানির প্রাপ্তিস্থান নবগ্রন্থ নিকেতন, ৩৭।১, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য ৩ টাকা [illegible]।

প্রতিদিন হায়

দীপংকর দাশগুপ্ত

প্রতিদিন হাঁটি তোমার দরজা দিয়ে—
সম্মুখে পথ কোন পথে গিয়ে মেশে;
খোলা জানালায় দাঁড়িয়েছো আনমনা—
নীরব দৃষ্টি সুদূর আকাশ শেষে।

দীপ্ত প্রবাল তোমার কর্ণমূলে,
শিথিল খোঁপায় অশোকের মঞ্জরী,
পরেছো কাঁকন লীলায়িত দুটি হাতে,
বরতনু ফিরে জড়ানো নীলাম্বরী।

আঁচলে হাওয়ার অবিরাম হুটোপুটি—
যেন সহকারে ললিত পল্লবিনী
চঞ্চল হ'লো বসন্ত সমাগমে।
তুমিই কি সেই মায়াবনবিহারিণী।

কে দিলো তোমাকে এত রূপ, অনুপমা,
না কি সে তোমার হৃদয়বর্ণ-ছটা :
মরুপ্রান্তরে হঠাৎ জাগালে সাড়া—
আকাশ ভরেছে শ্রাবণের ঘনঘটা।

বাসনা আমার ভীরু প্রদীপের মতো
কম্প্র আনত সন্ধ্যায় তরুমূলে।
সব ব্যর্থতা মেনে নিয়ে চ'লে যাবো,
একটি অশোকমঞ্জরী দিয়ো খুলে॥

ক্লান্তি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

(বদলেয়ার-এর অনুসরণে)

রিক্তশেষ আকাশের দুর্বার দুর্বহ স্পর্ধা নিয়ে
আমার নিঃশেষ বুকে বেদনারা ডানা মেলে চলে,
গভীর, সুকৃষ্ণ যত রাত্রিকে নীরব করে দিয়ে
অন্ধকার দিনগুলি অঝোর কান্নার কথা বলে।

যখন ধূসর মাটি তুহিন কারার মত জ্বলে
যেখানে মায়াবী কন্যা আশা শুধু রিক্ত প্রতীক্ষায়
ডানার ঝাপট মারে, বেদনার তীব্র কুতুহলে
মাথা খোঁড়ে নিরন্তর মৃত্যুর নির্বেদ ইশারায়।

সেখানে অঝোর ধারে বৃষ্টির চুম্বন এসে পড়ে
কয়েদখানার ওই ম্লান কালো রেলিঙে রেলিঙে,
সেখানে ক্লেদাক্ত জাল ঊর্ণনাভ বোনা শেষ করে
আমাদের হৃদয়ের সুনিবিড় ক্লান্তির আফিঙে।

সচকিতে হৃদয়ের কারাঘণ্টা নিদারুণ সুরে
আকাশে চিৎকার করে দানবিক ঘৃণার উল্লাসে,
(মনে ভাবি) শতকোটি অতৃপ্ত প্রেতেরা এসে জুড়ে
জানায় দুর্বহ স্পর্ধা অহরহ প্রমত্ত প্রলাপে।

ধূসর পাণ্ডুর সুর, ঐকতান সমারোহ ছেড়ে
আমার হৃদয়ে আজো ধীরে ধীরে এসে ভিড় করে
আশার নিঃশেষ ছায়া অবরুদ্ধ বিদীর্ণ চিৎকারে
আমার কঙ্কাল চিরে মৃত্যুর পতাকা তুলে ধরে॥

আকাঙ্ক্ষা

শোভন সোম

পারবনা আমি উজ্জ্বল এই গোধূলির আলো দিয়ে
একখানি গান সন্ধ্যার অবকাশে
এ'কে রেখে যেতে, কড়ি ও কোমলে উতল মূর্ছনায়
মৃদু শিহরিত রাত্রির ঘাসে ঘাসে?
তুমি হেঁটে যাবে এই পথ দিয়ে, তাকাবেনা জানি ফিরে
বৃথা বাসনারা তবুও হৃদয় ঘিরে
কলরোল তোলে; কেউতো জানেনা, বুক ভরা এই ক্ষত
ঢেকে রাখি অবিরত।
উড়িয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে কখন কৃষ্ণচূড়ার চিহ্ন
ফাল্গুন কবে ফের হবে অবতীর্ণ

রিক্ত শাখায় অঞ্জলি তুলে, তুমি নিচু ডাল ধরে
দাঁড়াবে কখন একফোঁটা অবসরে?
তোমার ও চোখে কাঁপছে আকাশ স্বপ্নিল ইঙ্গিতে
আমার ইচ্ছা মেলে দেয় পাখা, পায়না কোথাও নীড়
করুণ কণ্ঠে ডেকে ডেকে সারা, নিমগ্ন ক্লান্তিতে
—তুমি যে তখনো উদাসীনতায় নির্মম-গম্ভীর।
পারবনা আমি উজ্জ্বল এই গোধূলির আলো দিয়ে
ব্যথিত পূরবী সন্ধ্যার অবকাশে
এ'কে রেখে যেতে মীড়ে ও নিখাদে নিবিড় মূর্ছনায়
তোমার হৃদয়ে সকরুণ উচ্ছ্বাসে?

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

॥ ৫ ॥

আমাকে কিছুদিন নিজ হাতে রান্না করে খেতে হয়েছে। একবার সেই জাপানী বোমা পড়বার সময়; আর একবার দশ বারো বৎসরের ছেলে দুটি নিয়ে যখন এ বাড়িটায় এলাম সেই সময়। আমার একটা বাচ্চা চাকর ছিল; আমার ছেলে দুটির চেয়ে ৩।৪ বছরের বড়। সে-ই আমাদের তিনজনের রান্না-বান্না' সব কাজ করে দিত।

একদিন রুগী দেখা শেষ করে দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে দেখি সেই চাকরটি শুকনোমুখে সিঁড়ির নীচে বসে আছে। চেহারা দেখেই মনে হল স্নান খাওয়া কিছুই হয় নি। জিজ্ঞাসা করলাম কি রে এখনও চান করিস নি? এত বেলায় নীচে বসে আছিস্?

চাকরটি বল্‌লে—বড়দাদাবাবু ওপরে উঠতে বারণ করেছে।

বল্‌লাম—কেন? কি হয়েছে?

চাকরটি বল্‌লে—বড়দাদাবাবু আমাকে বরখাস্ত করেছে। বলেছে আপনি ফিরলে মাইনে নিয়ে চলে যেতে।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। এ ছোকরাটি প্রায় বছর দুই আমার কাছে আছে। ছেলেদের প্রায় সমবয়সী। তাই মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি এমনকি হাহাতাহাতি কখনো সখনো হয়েছে। আমি এসে নালিশ শুনে মামলা মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ আমি বাড়ি ফিরবার আগেই চাকরি থেকে একবারে ডিস্‌মিস্ হয়ে গেল শুনে ভাবনা হল—নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—রান্না বান্না সব করেছিস?

মাথা হেঁট করে চাকরটি বল্‌লে—আজ্ঞে না বাবু। দাদাবাবু রান্নাঘর থেকে বার করে দিয়েছে। ওপরে উঠতেই দিচ্ছে না।

মে মাসের দুপুর রোদে বেলা দেড়টা নাগাদ অভুক্ত থেকে বাড়ি ফিরে একথা শুনলে মেজাজখানা কি রকম হয় একবার ভেবে দেখুন। গরম গরম এর ঝালটি গিন্নীর ওপর ঝাড়তে পারলে সেই পরিমান সুখটি হয় কিনা তাও একবার ভাবুন। কিন্তু আমার ভাগ্য অন্যরূপ। এই সুখটুকু থেকেও আমি বঞ্চিত। কারণ আমি বিপত্নীক। বছর দুই আগে আমার ঝঞ্ঝাট আমারই ঘাড়ে ফেলে আমার স্ত্রী গত হয়েছেন। তাই মুখখানা প্যাঁচার মত কালো করে গম্ভীর হয়ে বল্‌লাম—আচ্ছা চল্ ওপরে। দেখি কি হয়েছে।

ওপরে উঠতেই দেখি আমার বড় ছেলে গেরুয়া রঙের পাজামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে রান্নাঘরে জল ঢেলে ঝাঁটা দিয়ে সাফ্ করছে। উনুনে মাছের ঝোল ফুটছে; কুকার নাবানো। থালা বাটি সব মাজা হয়ে গেছে, এই বারে বাবু ঘর সাফ্ করছেন।

আমাকে দেখেই বল্‌লে—রান্না-বান্না সব হয়ে গেছে; এইবারে তুমি খেতে বসতে পার।

রান্না হয়নি শুনে মনের মধ্যে যে আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল খাবার তৈরী শুনে তাই যেন ফুটুস্ করে নিভে গেল। তবুও মুখ গোমরা করেই বল্‌লাম—কিন্তু এসব কি? পড়াশুনা না করে রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর ধোয়া? চাকর ছাড়িয়ে দিয়ে এ সবই করবি নাকি?

বুক ফুলিয়ে ছেলে বল্‌লে—হ্যাঁ, আমরাই করব যতদিন না অন্য লোক পাওয়া যায়।

আমরা অর্থাৎ উনি নিজে এবং ও'র ছোট ভাই। একজনের বয়স বারো, আর একজনের দশ।

বেশ একটু রাগ করেই বললাম—তাহলে এখন থেকে ঘরের কাজই কর। ইস্কুলে গিয়ে আর কি হবে?

ছেলে বল্‌লে—ইস্কুলে যাব না কেন? আমরা দুভায়ে ভাগ করে সব কাজ করব। এক বেলা আমি, একবেলা ছোটবাবু।

ছোটবাবুটি এতক্ষণ বাথরুমে ছিলেন। স্নান সেরে গা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—হ্যাঁ বাবা, আমরা দুজনে ভাগ করে সব কাজ করে ফেলব। তুমি কিছু ভেবো না। তাছাড়া পাড়ার ছেলেদের বলে রেখেছি আজই বিকেলে দেখো লোক এসে যাবে।

আমার এই দুই ছেলের মধ্যে বয়সের ব্যবধান মাত্র ষোল মাস। কিন্তু দুজনের মধ্যে এতটুকুও মিল নেই; না চেহারায়, না স্বভাবে। বনিবনাও ছিল না। একজন যদি হাঁ বলে আর একজন ঠিক না বলবে। খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে খটাখটি ঝগড়া-ঝাঁটি শেষ পর্যন্ত মারামারি রোজই লেগে যেত। কোন কিছুতেই দুজনে

কখনো একমত হত না। কিন্তু এই চাকর তাড়ানোর ব্যাপারে দেখলাম দুজনেই এক এবং অভিন্ন।

বললাম—কিন্তু ওর অপরাধটা কি শুনি?

অপরাধ যা শুনলাম, সে হলঃ—চাকরটি ইদানীং নাকি ভয়ানক ইম্‌পারটিনেন্ট হয়েছে। কথা বললে গ্রাহ্যই করে না। ডাকলেও নাকি সাড়া দিতে চায় না। কৈফিয়ৎ চাইলে বলে শুনতে পায়নি। কিছু একটা হুকুম করলে সে কাজ তো করেই না, উল্টে নিজের মনে বিড় বিড় করে কি সব বলে। তার ওপর ভীষণ নোংরা। রোজ স্নান করে না; নিজের জামা কাপড় কাচে না। গায়ে দুর্গন্ধ। ওর হাতে ছেলেরা খাবে না।

নোংরা থাকা নিয়ে ছোকরাটাকে আমিও অনেক বকাঝকা করেছি। আজকাল তাই স্নানও করত, জামা কাপড়ও পরিষ্কার রাখত। আজ নাকি উনুন ধরাতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, কলের জল চলে গেছে। তাই ও বলেছিল বিকেলে স্নান করবে। সেই কথাতে দাদাবাবুরা ক্ষেপে গেছে, বলেছে ওর হাতে আর খাবে না। এর পর এ বাড়িতে আর ও কাজ করবে না।

বুঝলাম দু পক্ষই এখন বেশ গরম। এক্ষুণি কোন মীমাংসা করা যাবে না। তাই চাকরটাকে বললাম—এখন তো খাওয়া দাওয়া কর। যেতে হয় ও বেলা যাবি।

চাকরটি মাথা নিচু করে বললে—না বাবু, আমি এখানে খাব না।

সেই যে ঘাড় নিচু করে না বললে, তাকে আর হ্যাঁ বলাতে পারলাম না। বুঝলাম ছেলেরা ওর হাতে খাবে না বলাতেই ওর মনে খুব লেগেছে। তাই বাবুদের হাতেও ও আর খাবে না। ছেলেদেরও বোঝাতে পারলাম না একথা বলা ওদের অন্যায় হয়েছে। নোংরা লোকের হাতে খেতে নেই একথা নাকি হাইজিনে আছে। মাস্টারমশাই বলেছেন।

কাজেই চাকরটিকে বিদায় করতে হল। ছেলেরা মহা উৎসাহে ঘরের কাজে লেগে গেল। এমনি করে তিন চারদিন কেটে গেল। পাড়ার ছেলেরা কেউ নতুন চাকর জোগাড় করে দিতে পারল না। কিন্তু রোজই শুনতাম—ও বেলাই লোক আসবে।

একদিন রাত দশটা নাগাদ কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখি আমার বড় ছেলে বাড়ির দোর গোড়ায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে।
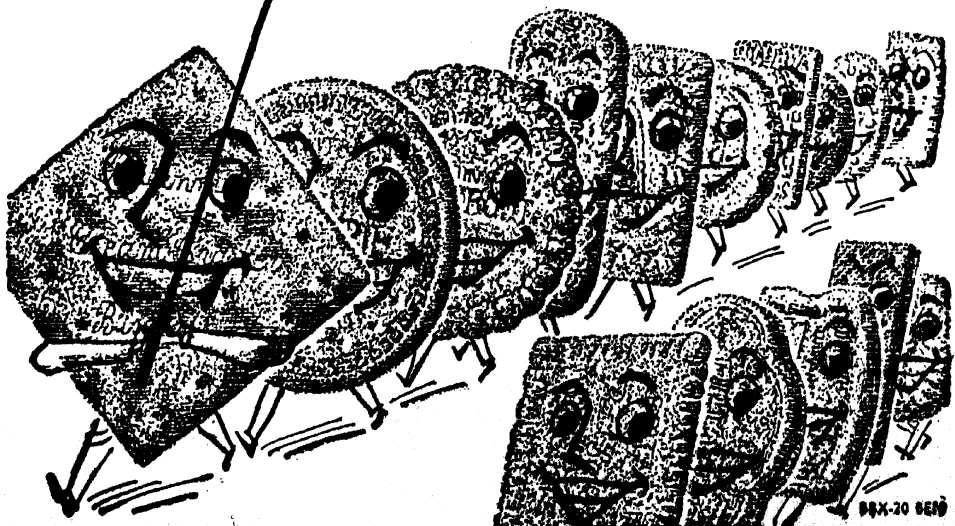
জিজ্ঞাসা করলাম—কি রে এই অসময়ে এইখানে যে দাঁড়িয়ে? খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

ছেলে বল্‌লে—রান্নাই হয়নি তা খাব কি?

অবাক্ হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? কি হয়েছে?

ছেলে বল্‌লে আজ বিকেলে ছোটবাবুর ডিউটি ছিল এবং সন্ধ্যার পর কুকারও যথারীতি উনুনে বসানো হয়েছিল। এক ঘণ্টা পরে যখন নাবানোর কথা তখন গিয়ে দেখা গেল উনুন নিবে গেছে। কুকারের ভেতর ডাল-চাল যেমন ছিল তেমনি আছে কিছু সেদ্ধ হয়নি। তারপর ছোটবাবু নতুন করে কয়লা ভেঙে ঘুঁটে দিয়ে উনুন সাজিয়ে কাগজ দিয়ে ৫।৭ বার ধরাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু উনুন ধরেনি। বার বারই ঘুঁটে কাগজ সব পুড়ে গেছে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে ছোটবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বাবুর একা থাকতে ভয় করে তাই রাস্তায় নেমে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। শুনে ইচ্ছে হল ঠাস্ করে ওর গালে এক চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু ওর ঐ শুক্‌নো মুখ আর অসহায় ভাব দেখে শুধু বল্‌লাম—তা ছোটবাবু যখন পারল না তুই নিজে ধরালেই তো পারতিস্।

বড়বাবু বল্‌লে, উনুন ধরানোর ব্যাপারে ছোটবাবুই নাকি খুব এক্সপার্ট। আজ সে-ই যখন ফেল মেরে গেল তখন ওতে হাত দিয়ে আর কি হবে? তাছাড়া ও তখন অঙ্ক কষছিল যে?

এর পরে আর কথা চলে না। তাই পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি পরে রান্নাঘরে ঢুকলাম। উনুন ধরিয়ে রান্না শেষ করে গা ধুয়ে যখন বেরুলাম তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।

ছোটবাবু ঘুমুচ্ছিল। তাকে তুলে তিনজনে খাবার টেবিলে যেই বসেছি অমনি সিঁড়িতে ধপাধপ পায়ের শব্দ শোনা গেল। দোতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ির পাশেই আমাদের খাবার ঘর। মনে হল একাধিক লোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসছে।

এত রাত্রে এরা আবার কারা? দরজার কড়া নাড়বার আগেই খাবার টেবিল থেকে উঠে সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়ে দেখি তিনজন অপরিচিত লোক ওপরে উঠে এসেছে। এদের মধ্যে দুজনকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হল না। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের দুই যুবকের সঙ্গে তের চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে। ছেলেটিকে ভাল করে দেখতে যেন চেনা চেনা মনে হল কিন্তু কার ছেলে কি নাম কিছুই মনে পড়ল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে চাই?

প্রথম যুবকটি বল্‌লে—ডাক্তারবাবুকে। একটু তাড়াতাড়ি ডেকে দিন, বিশেষ দরকার।

গম্ভীর হয়ে বল্‌লাম—আমিই ডাক্তারবাবু। বলুন কি দরকার।

শুনে যুবকটি একটু থতমত খেয়ে গেল। একবার আমার পোশোকের দিকে, আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বুঝলাম কলকাতার মত শহরে এত রাত্রে কড়া না নাড়তেই খালি গায়ে লুঙ্গিপরা ডাক্তারবাবুর দর্শন মিলবে এতটা বোধ হয় শ্রীমান কখনও প্রত্যাশা করেননি।

গলার স্বর আরও বেশী ভারি করে বল্‌লাম—কি দরকার?

যুবকটি বার দুই ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বলে ফেল্‌লে—এই ছেলেটির মা আপনার কাছে পাঠালেন। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

দেখুন দেখি কি মুশ্‌কিল! এত রাতে আমার নিজেরই বলে খাওয়া হয়নি, তা একে এখন জল খাওয়াও। ভেবেছিলাম চট্ করে জেনে নেব কি দরকার, তা দেখলাম আর হল না। এদের বসতে দিতে হবে, জল খাওয়াতে হবে। কিন্তু কোথায় বসাব?

আমার দুখানি মাত্র ঘর। একখানা শোবার। যেটি বসার ঘর সে ঘরেই ছেলেরা খেতে বসেছে। শোবার ঘরের মেঝেতে আমাদের তিনজনের বিছানা পাতা। চেয়ারগুলো সব এক পাশে সরানো। সেই শোবার ঘরে এনেই এদের বসালাম। বাড়িতে গিন্নী না থাকার এই দেখুন কেমন সুবিধে। শোবার ঘরে যাকে তাকে যখন ইচ্ছে তখন কেমন নিঃসঙ্কোচে নিয়ে আসা যায়।

এক গেলাস জল খেয়ে যুবকটি ঐ ছেলেটিকে দেখিয়ে বল্‌লে—এর মা আপনার কাছে পাঠালেন, এক্ষুণি একবার যেতে হবে।

এতক্ষণে ছেলেটিকে ভাল করে দেখলাম। আরে এ যে আমাদের মুকুন্দর ছেলে। ওর বাবার সঙ্গে এককালে খুব বন্ধুত্ব ছিল। একই মেসে থাকতাম। বি এস-সি পাশ করে একটা ওষুধের কারখানায় কেমিস্টের কাজ করত। পরে বিয়ে করে বাসা করেছে। তিন চার বছর আগেও ওদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। আমাদের চিকিৎসায় ওর বিশ্বাস ছিল না, কাটা ছেঁড়া, ফোঁড়াফুঁড়ি ও পছন্দ করত না। তাই ওদের বাড়ির চিকিৎসায় আমাদের কখনও ডাক পড়েনি। কিন্তু আজ এ কি হল? জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ছেলেটি বল্‌লে—আমার বোনটির খুব জ্বর, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কত জ্বর? কখন অজ্ঞান হল?

ছেলেটি বললে—১০৫ ডিগ্রী। সকাল থেকেই জ্ঞান নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি? সকালবেলা অজ্ঞান হল আর এখন এসেছ নিয়ে যেতে?

ছেলেটি শুধু বললে—মা বলেছেন।

সঙ্গের যুবকটি ওকালতি করে বল্লে—মায়ের প্রাণ বুঝতেই তো পাচ্ছেন; চলুন একবার দয়া করে।

ওকালতি শুনে পিত্তি জ্বলে গেল। বলে ফেললাম—সকাল বেলা জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে যে মা রাত বারোটায় ডাক্তার ডাকতে পাঠায় তার প্রাণ সামান্য নয়। পাথরের চেয়েও কঠিন।

যুবকটি বল্লে—আপনি ভুল বুঝেচেন, ডাক্তার তো দেখানো হয়েছে।

একটু শ্লেষের সঙ্গেই বল্লাম—কোন ডাক্তার? হাতুড়ে?

যুবকটি বললে—সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মেয়ের হঠাৎ পেটে ব্যথা হয়, মা জোয়ানের জল খাইয়ে দেন। তারপর খুব কেঁপে জ্বর আসে। কর্তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়। কর্তা ডাক্তার না এনে অষুধ নিয়ে আসেন। সেই অষুধ এক দাগ খাবার পরই মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন ছুটে সেই অষুধের দোকানে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল না। কম্পাউণ্ডার বললে ফিরতে দেরি হবে। তাই তাড়াতাড়ি মোড়ের মাথায় ডিস্পেন্সারিতে যে ডাক্তার বসেন তাঁকে নিয়ে আসা হল। তিনি বল্লেন, তড়কা। মাথায় বরফ আর নাকে স্মেলিং সল্ট দেওয়া হল। তবু জ্ঞান ফিরল না দেখে ডাক্তারবাবু বললেন রোগটা ভাল মনে হচ্ছে না, আপনারা বড় ডাক্তার ডাকুন।

তখন পাড়ার যিনি প্রবীণ এলোপ্যাথ তাঁকে ডাকা হল। তিনি দেখে বললেন এক্ষুণি রক্ত পরীক্ষা করা দরকার, ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া দরকার। জানেন তো ইন্‌জেক্‌শন দিতে এ'দের কত ভয়, কত আপত্তি! রক্ত-পরীক্ষার ফল বিকেলে জানা গেল। তাই দেখে ডাক্তারবাবু বল্লেন মেন্‌ইন্‌জাইটিস্‌ হয়েছে, এক্ষুণি পেনিসিলিন দিতে হবে। অনেক সলাপরামর্শের পর রাত আটটায় ডাক্তারবাবু পেনিসিলিন চার লাখ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন কাল সকালে খবর দিতে।

বললাম—তাহলে তো চিকিৎসা ঠিকই হয়েছে। এত রাত্রে গিয়ে আমি আর নতুন কি করব?

যুবকটি বললে—তবু আপনি একবার চলুন। মেয়ের মা বড্ড বেশী ঘাবড়ে গেছেন। রাত দশটার পর গলা দিয়ে কি রকম একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হচ্ছে দেখে আবার ডাক্তারবাবুকে আনতে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তিনি এলেন না। বাড়ির লোকে বললে রাত দশটার পর তিনি এক ঘণ্টা প্রাণায়াম করেন, পুজোতে বসেন, বাড়ি থেকে বেরোন না। আপনারা হয় অন্য ডাক্তার ডাকুন, নয় হাসপাতালে নিয়ে যান। এত রাত্রে অচেনা কোন ডাক্তারই আসতে চায় না। তাই আপনার কাছে পাঠালেন।

এইবারে বুঝলাম কেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য এত ঝুলোঝুলি! পয়সা খরচা করেও যখন ডাক্তার পাওয়া গেল না তখনই আপনার কথা মনে পড়ল! নইলে বিনা পয়সায় এমন বেগাড় আর কে খাটবে? ভাবলাম এ বেশ হয়েছে। যেমন আমাদের দেশের রুগী তেমনি তাদের চিকিৎসক! বিজ্ঞানী কোন গৃহ চিকিৎসক এদের থাকলে এ রকমটি কি কখনও হয়? সকালে রুগী অজ্ঞান হয়ে গেছে বিকেলে মেন্‌ইন্‌জাইটিস্‌ বলে ধরা হয়েছে, আর রাত আটটায় একটা প্রকেন পেনিসিলিন পড়েছে। এ শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব!

বললাম—তা আপনারা রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? এ রকম কঠিন রোগ, বাড়িতে সব ব্যবস্থা করা কি সোজা কথা?

যুবকটি বললে—আপনি একটু কণ্ট করে গিয়ে যদি ওদের তাই বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। এর মা আপনার পথ চেয়ে আছেন।

ছেলেটি আবার বললে—মা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম—যান, তাহলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসুন। বলবেন যাব আর আসব।

যুবকটি উঠে গাড়ি আনতে গেল। আমি লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট শার্ট পরে নিলাম। ছেলেদের ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। একজন বললে—তুমি খাবে না?

বললাম—ট্যাক্সি করে যাব আর আসব। এসে খাব। সিঁড়ির দরজায় খিল না দিয়ে তোরা শুয়ে পড়।

ট্যাক্সি নিয়ে এল, না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। মনে পড়ল ডাক্তারী পাশ করেই একজন জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম হাত দেখাতে, ভাগ্য গণনা করতে। তিনি হাত না দেখেই আমার ভাগ্য বলে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—বাবাজীর কি করা হয়?

সবিনয়ে নিবেদন করলাম—এই সবে ডাক্তারী পাশ করেছি।

শুনে জ্যোতিষী বললেন—কি সর্বনাশ! তুমি যে বাবা খেতে পাবে না!

আঁৎকে উঠে বললাম—বলেন কি? কেন?

জ্যোতিষী বললেন—ডাক্তারী পাশ করেছ কিন্তু যদি প্র্যাক্‌টিস্ না হয় তাহলে পয়সা পাবে না তাই খেতে পাবে না। আর যদি প্র্যাক্‌টিস্ হয় তাহলে দিন রাত রুগীরা তোমায় জ্বালিয়ে খাবে, তুমি নাইতে খেতে সময় পাবে না।

সেদিন একথা শুনে খুব হেসেছিলাম। আজও ট্যাক্সিতে বসে এ কথা মনে পড়ে হাসি এল। আজকে এই রুগীর জন্য খেতে পেলাম না সত্যি, কিন্তু পয়সাও তো পাব না? আমার ভাগ্যে তাহলে রুগীও হল তবু পয়সা হল না। নিজের হাতে রাঁধা ভাতও অভুক্ত পড়ে রইল।

পনের মিনিটের মধ্যেই মুকুন্দর বাড়ি পোঁছে গেলাম। যুবকটি ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার মতলবে ছিল, আমি বারণ করলাম। বললাম ট্যাক্সি থাকুক, এক্ষুণি তো ফিরে যাচ্ছি এত রাত্রে আবার কোথায় ট্যাক্সি খুঁজতে যাবেন?

দোতলার দুখানা ঘর নিয়ে মুকুন্দর ফ্ল্যাট্। সিঁড়ির দরজা খোলাই ছিল। ঢুকতেই কে যেন রুগীর ঘরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি একখানা তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতা, তার ওপর ৮।১০ বছরের একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। নিশ্বাসের কণ্টে গলা দিয়ে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হচ্ছে। শিয়রের কাছে রুগীর মাথায় আইসব্যাগ ধরে মুকুন্দর স্ত্রী মালতী বসে। আর একজন মহিলা মাথায় পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছেন। আর একজন রুগীর হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মনে হল প্রতিবেশিনী।

আমি যেতেই মালতী বললে—এই দেখুন মেয়ের কি অবস্থা করেছে। আমাকে বলে কিনা তড়্কা! মেয়ের যে এদিকে হুঁশ নেই—এক ফোঁটাও জল খাচ্ছে না তাও কেউ বুঝবে না। আমি সেই দুপুর থেকে বলছি আপনাকে একবার খবর দিতে তা বলে কি ডাক্তার তো দেখছে, অত ব্যস্ত হবার কি আছে? আচ্ছা বলুন দেখি ব্যস্ত হবার কিছু নেই? এই নাকি এর চিকিৎসা?

রুগীর চেহারা দেখেই আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। মালতীর কথার কোন জবাব না দিয়ে রুগীর চোখের পাতা টেনে দেখলাম চোখ জবা ফুলের মত লাল। টর্চের আলো ফেলে চোখের তারা দেখলাম। মাথা তুলে দেখলাম ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে, মাথা এপাশ ওপাশ ফেরানো যায় না। বুক পরীক্ষা করে ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। পেট ফাঁপা—কিসের যেন প্রলেপ লাগানো রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কি?

মালতী বললে—গঙ্গা মৃত্তিকার প্রলেপ।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে লাগালো?

মালতী বললে—আটটার সময় ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে এসে ডাক্তারবাবু বলে গেছেন গঙ্গামৃত্তিকার প্রলেপ লাগালে পেটফাঁপা কমে যাবে।

রুগী দেখা শেষ করে উঠে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে মালতীকে জিজ্ঞাসা করলাম কখন অজ্ঞান হল?

মালতী বললে—সেই সকাল থেকেই।

তারপর আমি যা শুনেছি সব আবার বলে জিজ্ঞাসা করল—কেমন দেখলেন? বাঁচবে তো?

বল্‌লাম—মেনিন্‌জাইটিস্‌ রোগটা তো খুব কঠিন। আগে বেশীর ভাগই বাঁচতো না। আজকাল এই সালফা ড্রাগ আর পেনিসিলিন বেরুবার পরে অনেকেই তো ভালো হচ্ছে। এখনও আশা ছাড়বার মত কিছু দেখছি না। তবে অনেক কাজ বাকী। অক্সিজেন দেওয়া চাই এক্ষুনি। আর অনেক ইন্‌জেক্‌শন। এত ফোঁড়া-ফুঁড়ি কি বাড়িতে করা যাবে? তার চেয়ে হাসপাতালে দিন না? আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মালতী বললে—না না হাসপাতালে আমি দিতে পারব না। যদি যায় আমার কাল থেকেই যাক্‌। ফোঁড়াফুঁড়ির জন্য আপনি ভাববেন না যা দরকার সব করুন।

বললাম—কিন্তু মুকুন্দ? সে এই চিকিৎসা সইতে পারবে কি?

মালতী বললে—ওর কথা আর বলবেন না। কোন জিনিসটা ও বোঝে? মেয়ের যে এখন-তখন অবস্থা তাই ও বোঝে কি? আমাকে বলে কিনা জ্বর হলে এমন তড়্‌কা অনেকেরই হয়। না না ওর কথা আপনি মোটেই গায় মাখবেন না। আমি বলছি সব ব্যবস্থা আপনি বাড়িতেই করুন।

এই বাড়িতে চিকিৎসার দায়িত্ব কে নেবে? ভেবে এসেছিলাম, যা চল্‌ছে তাই চলুক বলে কেটে পড়ব; অথবা বলে দেব হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু মালতী দেখছি আমার ঘাড়েই এ দায়িত্ব চাপাতে চায়। খুশী হয়েই ভার নিতাম যদি এদের আমার ওপর আস্থা থাক্‌ত। অথবা যদি কাজের বিনিময়ে পয়সা পেতাম।

বললাম—রাত ন'টার মধ্যেও যদি আমাকে খবর দিতেন তাহলেও বড় ডাক্তার কাউকে দেখিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম। কিন্তু এত রাত্রে কাউকেই তো পাব না। তার চেয়ে হাসপাতালেই নিয়ে যান।

হঠাৎ মালতীর কি হল ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে মুকুন্দকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে চীৎকার করে বলতে লাগল—দেখ তোমার কীর্তি! শোন তোমার বন্ধুর কথা। সেই দুপুর থেকে বলছি এঁকে একবার খবর দাও। রাত নটার মধ্যেও যদি সে কথা শুনতে তাহলেও মেয়েটা বাঁচত। তুমিই ওকে মারলে!

আমাকে দেখিয়ে বল্‌লে—আপনি সাক্ষী রইলেন।

দেখুন, কিসের থেকে কি হয়ে গেল। মুকুন্দ আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বল্‌লে—ভাই, কিছুই কি করার নাই? আমার ঐ একটি মাত্র মেয়ে!

বল্‌লাম—থাকবে না কেন? অনেক কিছুই তো করার আছে এবং করা দরকারও। কিন্তু বাড়িতে অত সব করা যাবে কি?

মুকুন্দ ব্যাকুল হয়ে বল্‌লে—কেন যাবে না?

বল্‌লাম ইন্‌জেক্‌শন, অক্সিজেন এসব না হয় হবে কিন্তু ধর যদি লাম্‌বার পাংচার করা দরকার হয়? তোমার আপত্তি হবে না?

মুকুন্দ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—ওটা কি? আমার আপত্তি হবে? কেন?

বললাম—রুগীর কোমরের কাছের শিরদাঁড়া ছেঁদা করে জল বার করে দেওয়া তুমি সইতে পারবে? এবং দরকার হলে তার মধ্যে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন করা?

মুকুন্দ অনায়াসে বল্‌লে—মেয়ে তো এমনিতেই মরে যাচ্ছে, বাঁচাবার জন্য যা দরকার সব তুমি করবে; আমি তাতে আপত্তি কেন করব? তোমাদের চিকিৎসায় যতক্ষণ আপত্তি ছিল কখনও তোমাকে ডাকিনি। আজ যখন ডেকেছি তুমি যা ভাল বুঝবে তাই আমরা মেনে নেব। সবই সইতে হবে।

মুকুন্দর মুখ থেকে এমন কথা শুনব কখনও ভাবিনি। অবাক হয়ে গেলাম। এরপর দায়িত্ব এড়াবার আর কোন পথ রইল না। দেখুন কেমন ফেসে গেলাম। চিকিৎসার ভার কি করে নিজের ঘাড়ে এসে পড়ল। বললাম—এক্ষুণি তাহলে আর একজন বড় ডাক্তার কাউকে এনে দেখাতে হয়, অক্সিজেন গ্লুকোজ পেনি-সিলিন এই সব আনতে হয়। টাকা আছে ঘরে?

মুকুন্দ ব্যাগ খুলে দেখে বললে—এখন মাত্র পঞ্চাশটি টাকা আছে; তোমার কাছে দিচ্ছি। কাল সকালে আরও যা লাগবে জোগাড় করে দেব। কত লাগবে? বললাম—যা আছে তাইতো এখন দাও। বাকী পরে দেখা যাবে।

পঞ্চাশটি টাকা পকেটে নিয়ে মালতীকে বললাম—আপনি কিছু ভাববেন না। রুগীর এই অবস্থায় যা কিছু করা সম্ভব সব আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, আমি ট্যাক্‌সি নিয়ে গিয়ে দেখি কোন্‌ বড় ডাক্তারকে আনতে পারি। রাস্তায় দোকান থেকে অক্সিজেনও পাঠিয়ে দেব।

মালতীর চোখে মুখে আশার আলো দেখা দিল। বললে—আর আমার কোন ভাবনা নেই। যা দরকার সব আপনি করুন।

মনে হল জলে ডোববার সময় এমনি করেই বুঝি লোকে আঁকড়ে ধরে, হাতের কাছে যা পায় তাই।

সেই যুবকটিকে সঙ্গে করে ট্যাক্‌সি

নিয়ে বেরুলাম। এত রাত্রে অক্সিজেন জোগাড় করাও মহা হাঙ্গাম। দু'তিন দোকান ঘুরে অবশেষে এক চেনা দোকান থেকে সংগ্রহ করে যুবকটিকে দিয়ে রিক্শা করে পাঠিয়ে দিয়ে বড় ডাক্তারের খোঁজে বেরুলাম। রাত্রি প্রায় একটা। এখন কাউকে পাব কি?

কাছেই এক মেডিসিনের অধ্যাপকের বাসা। সোজা সেখানে গিয়ে কড়া নাড়লাম। প্রবীণ চিকিৎসক। একসঙ্গে কাজও করেছি। তাঁর চাকর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে বললে; এত রাত্রে ডাক্তার সায়েবের ঘুম ভাঙ্গানো চলবে না, শরীর অসুস্থ। সকালবেলা আটটার সময় এলে দেখা হতে পারে। বলেই দরজা বন্ধ করে দিলে।

মহা মুশকিলে পড়লাম। এখন কার কাছে যাই? মুকুন্দ অথবা মালতী যত ভরসাই আমার ওপর দেখাক, পেনিসিলিন কি গ্লুকোজ যাই কেন না ইনজেকশন দেই, মেয়ের যদি মৃত্যু হয় বলবে আমিই ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলেছি। অথচ একজন নাম করা ডাক্তার যদি কোনও রকমে একবার দেখিয়ে রাখতে পারি, যত ভুলই আমার হোক, কেউ সে কথা বলবে না। একবার শুধু ঐ বুড়ী ছুঁয়ে রাখা চাই। এই হল কলকাতার চিকিৎসা।

মনে হল বিপদ এখন মালতীর নয়, মুকুন্দর নয় এমন কি মেনিনজাইটিসে অজ্ঞান ঐ মেয়েটিরও নয়। বিপদ শুধু আমার। যেমন করেই হোক্ বুড়ী ছুঁয়ে রাখতে হবে। কিন্তু ঐ বুড়ী পাই কোথা?

ভেবে দেখলাম প্রফেসর ক্লাসের কাউকে এখন পাওয়া যাবে না। তার নীচে নামতে হবে। তাহলে আমার যে বন্ধুটি এই দশ বৎসর ধরে আমার বাড়িতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছেন তাঁকেই এনে দেখাই না কেন? এ'র কথা মনে পড়তেই প্রাণে যেন জোর এল। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম তাঁর বাড়িতে।

বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে গলির ভিতর ঢুকে তাঁর একতলার সিঁড়ির দরজার কলিং বেল টিপলাম। ঘুম থেকে চমকে উঠে দোতালার আলো জেবলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বন্ধু বললেন—কে? কি চাই?

নীচে থেকে বললাম—আমি। আপনাকেই চাই।

আমার গলা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে বন্ধু বললেন—কেন? ব্যাপার কি? ভাবলেন বুঝি আমার বাড়িতেই কিছু হয়েছে।

ব্যাপার সব খুলে বলে মিনতি করে বললাম—চলুন একবার।

আমার বাড়ির কিছু নয় জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বন্ধু বললেন—ওঃ এইজন্য? এজন্য আর আমাকে যেতে হবে না। আপনি একটা ১০% ড্যাগেনান মোডিয়াম কি সালফাডায়াজিন যা পান পাঁচ সি সি ইনজেকশন করে দিয়ে আসুন। আর পেনিসিলিন, গ্লুকোজ, অক্সিজেন যেমন দিতে চাইছেন দিন। তরাপর কাল সকালে দেখা যাবে।

বললাম—সে হয় না। আজ রাতের মধ্যেই যেমন করেই হোক একটি বুড়ী অন্তত ছুঁয়ে রাখতে হবে নইলে মান থাকবে না। আপনি পোশাকটি পরে চট্ করে নেবে আসুন। ট্যাক্সি রয়েছে, যাবেন আর আসবেন। আধঘণ্টার বেশী লাগবে না। আপনাকে একবার দেখিয়ে না আনতে পারলে আমার বিপদ কাটবে না। বিনা পয়সার এ দায়িত্ব পয়সা দিয়ে আপনার ঘাড়ে চালান করতে চাই।

বন্ধু দেখলেন আমি নাছোড়বান্দা! কিছুতেই ছাড়বো না। তবু বললেন—কেন মিছিমিছি আর আমাকে ভোগাবেন! এইটুকুন তো কাজ, নিজেই করে আসুন।

বললাম—সে হয় না। আমার প্রাণ বাঁচাতে হলে আপনাকে যেতেই হবে।

অগত্যা রাজী হয়ে বললেন—আচ্ছা যাচ্ছি। আপনার যত অসময়ে উৎপাত। কেবল ঘুমটা এসেছিল!

বললাম—আপনাকে আমি তো শুধু

ঘুম থেকে উঠিয়েছি আর এরা যে আমার খাওয়া বন্ধ করে টেনে এনেছে!

বন্ধুটিকে তুলে নিয়ে একটা দোকান থেকে অষুধ কিনে মুকুন্দর ফ্ল্যাটে উঠলাম। রুগীর ঘরে গিয়ে দেখি অক্সিজেন যেমন পাঠিয়েছিলাম তেমনি পড়ে আছে কেউ তা রুগীর নাকে লাগাতে পারে নি। বি এস্-সি পাশ মুকুন্দও না।

আমার বন্ধুটি রুগী দেখতে লাগলেন, আমি অক্সিজেন চালু করে দিলাম। রুগী পরীক্ষা করে বন্ধুটি বললেন—রাত আটটায় একটা চার লাখ প্রকেন পেনি-সিলিন মাত্র পড়েছে, আপনি পাঁচলাখ আর একটা দিন। তা ছাড়া ছ' ঘণ্টা অন্তর একটা করে পাঁচ সি সি সালফাডায়াজিন ইনজেক্শন চলুক। সকাল থেকে ইউরিন হয়নি; একশ' সি সি গ্লুকোজ ইণ্ট্রা-ভেনাস দিয়ে রাখুন তারপর লাম্বার পাংচারের কথা কাল সকালে ভাবা যাবে।

বললাম—ট্যাক্সি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসুক। আমি এসব ইন্-জেক্শন শেষ করে তারপর যাব।

বন্ধুটি উঠতেই মালতী উঠে বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি রকম দেখলেন বলে যান।

বন্ধুটি একটু ইতস্তত করে বললেন—এখন তো কিছু বলা যাচ্ছে না; সবই নির্ভর করে অষুধে কি রকম কাজ হয় তার ওপর। বারো ঘণ্টার আগে কিছু বলা যাবে না। মনে হচ্ছে সকালের আগে আর কোন বিপদ হবে না।

বন্ধুটি চলে গেলে মালতী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—এই ডাক্তারটি কে?

বললাম—ইনি আমার বিশেষ বন্ধু। ডাক্তারী বিদ্যা বলতে গেলে এ'র কাছেই আমার শেখা। আমার বাড়িতে অসুখ হলে এ'কেই আমি ডাকি। আমার নিজের অসুখে এ'র চেয়ে বড় ডাক্তার কখনও দেখাই না।

মালতী তবু ভরসা পেল না। বললে—এ'র নাম তো কই আগে কখনও শুনিনি?

বললাম—আপনারা যাঁদের নাম শোনেন তাঁদের এত রাত্রে পাওয়া যায় না। যদি পারেন আনতে, দেখুন না একবার চেষ্টা করে? আমি তো একজনের বাড়িতে গিয়ে এক্ষুণি ফিরে এলাম। চাকর দেখাই করতে দিলে না।

শুনে মালতী বললে—সবই আমার অদৃষ্ট! আপনিও যখন পারলেন না তখন আমরা আর কি করে পারব? কালকে সকালে কাউকে পাওয়া যাবে?

বললাম—তা হয়ত যাবে। আগে সকাল হোক্ তখন দেখা যাবে। আপাতত এই ইন্জেক্শনগুলো এক্ষুণি দিতে হবে।

মালতীর কথায় আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে উঠে সিরিঞ্জ রেডী করতে লেগে গেলাম। তিনটি সিরিঞ্জ স্টেরিলাইজ্ করা হল। পেনি-সিলিনের জন্য দু সি সি; সালফা-ডায়াজিনের জন্য পাঁচ সি সি আর গ্লুকোজের জন্য পঞ্চাশ সি সি।

ভেবেছিলাম এইসব আয়োজন দেখে মালতী বুঝি খুব ভড়কে যাবে। কিন্তু দেখলাম মালতী বেশ শক্ত। ফোঁড়াফুঁড়ি দেখে একটুও ঘাবড়ালো না। এমন কি গ্লুকোজ দেওয়ার সময় সাহায্যও বেশ করল। পঞ্চাশ সি সি গ্লুকোজ দেবার পর উপশিরার ভেতর নিড্ল্-এর মুখ যখন আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে বললাম মালতী অনায়াসে তা চেপে ধরল। আমি সিরিঞ্জ বার করে নিয়ে আবার পঞ্চাশ সি সি গ্লুকোজ ভরে নিতে নিতে বললাম, দেখবেন আঙুলের চাপ আলগা করবেন না তাহলে কিন্তু নিডলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুবে। মালতী ঠিক ধরে রইল। সিরিঞ্জ ভরে আবার নিডলের মুখে পুরে দিলাম, এক ফোঁটা রক্তও বাইরে পড়ল না। মালতী আঙুল উঠিয়ে নিল।

কাজ শেষ করে বললাম—ইন্জেক্শন যা দেবার সব দিয়ে গেলাম; ছ' ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু আমাদের করবার নেই। অক্সিজেনটা ঠিকমত চল্ছে কিনা নলটা জলে ডুবিয়ে পরীক্ষা করে নেবেন আধঘণ্টা পর পর। কাল সকালেই একটা খবর দেবেন।

মালতী বললে—সে কী? আপনি কোথায় চললেন? আপনাকে ছাড়া চলবে না। এইখানেই থাকতে হবে।

বললাম—মিছেমিছি থেকে কি হবে? ছ'ঘণ্টার মধ্যে আমার তো আর কিছুই করবার নেই। যতক্ষণ দরকার ছিল, আমি অমনিতেই থেকেছি। এত রাত্রে না খেয়েই চলে এসেছি। এখন তো আর কাজ নেই, এইবারে আমি আসি।

উদ্বিগ্ন হয়ে মালতী বললে—এখনও আপনার খাওয়া হয় নি? তাহলে তো আরও যাওয়া চলবে না। দাঁড়ান আমি এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললাম—আমার জন্য মিথ্যে অত উতলা হবেন না, রুগীর পাশেই বসুন। এইখানেই আপনার এখন কাজ। তা ছাড়া বাড়ি আমাকে যেতেই হবে, ছেলে দুটি একলা রয়েছে। বড়টি যদি না ঘুমিয়ে থাকে তাহলে হয়ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। একা থাকতে ওর খুব ভয়।

তবু মালতী ছাড়বে না। বললে—তাহলে ট্যাক্সি করে ওকে এখানে আনিয়ে

নিচ্ছি কিম্বা আমার ছেলেকে পাঠাচ্ছি ওখানে গিয়ে শোবে।

দেখলাম আমার সুবিধে অসুবিধে কিছুই মালতী বুঝবে না। ওর নিজের প্রয়োজনের কথাই ও শুধু ভাবছে। তখন বললাম—কালকে আপনার মেয়ের জন্য অনেক কাজ বাকী রইল। আজ যদি আমাকে আটকে রাখেন তাহলে কাল সকালে সে সব কিছুই আমি পারব না। বড় ডাক্তার দেখানো যাবে না।

এইবার মালতী বুঝলো। বললে—তাহলে থাক্। কিন্তু রাত্রে যদি দরকার হয় তাহলে কিন্তু ট্যাক্সি পাঠাব আবার আসতে হবে।

বললাম—তা নিশ্চয় আসব। কিন্তু আমি বলছি তার আর প্রয়োজন হবে না। ভোর বেলা কাউকে পাঠিয়ে একটা খবর দেবেন।

এই বলে নেবে এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম। রাত তখন আড়াইটা। বাড়িতে ঢোকবার গলির মুখে এসে দেখি আমার বড় ছেলে আমার অপেক্ষায় ঠিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে নেবে এসে জিজ্ঞাসা করলাম কি রে? তুই এখানে?

ছেলে বললে—ঘরে ঘুম আসছিল না। ভয় করছিল।

বললাম—রাস্তাতেও তো লোকজন নেই এখানে ভয় করছিল না?

ছেলে বললে—মোড়ের বড় দোকানটার রকে এক নেপালী দ্বারওয়ান থাকে, সারা রাত দোকান পাহারা দেয়। তার কাছেই বসেছিলাম। তোমার এত দেরি? খাবে কখন?

বাড়ি এসে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া সেরে শুতে শুতে তিনটে বেজে গেল। পরদিন ভোর হতে না হতেই দরজায় আবার খটা-খট্। উঠে দরজা খুলে দেখি মুকুন্দ। জিজ্ঞাসা করলাম—কি খবর? মেয়ে কেমন? কত জ্বর?

মুকুন্দ বললে—আমি তো কিছুই ভাল দেখছি না। ঐ একই রকম। জ্বর ১০৪°।

বল্লাম—তা এত ভোরে এসেছ, এখনও তো বড় ডাক্তার কাউকে পাওয়া যাবে না। ৭টার সময় বেরুব। তুমি ততক্ষণ বসবে না আবার ঘুরে আসবে?

মুকুন্দ বললে—এখানেই বসি। বাড়িতে থাকতে আর ভাল লাগছে না। কেমন করে এ রোগ আমার বাড়িতে এল বল দেখি? মেয়েটা কি বাঁচবে? এখন দেখছি তোমার কাছেই প্রথমে আসা উচিত ছিল।

বললাম—বাঁচাবার চেষ্টা তো করা হচ্ছে, তারপর দেখ কি হয়।

চা খেয়ে দুজনে যখন অন্য এক প্রবীণ বড় ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে পেঁছিলাম তখন সাতটা বাজতে কিছু বাকী আছে। ইনিও একজন প্রফেসর। গিয়ে শুনলাম প্রফেসর হাওয়া খেতে বেড়িয়েছেন ময়দানে। এক্ষুণি এসে পড়বেন। রোজ তো এর আগেই ফিরে আসেন আজ কেন যে এত দেরি হচ্ছে? ভৃত্যটি আমাদের বসিয়ে এই কথা বলে বার বার রাস্তার দিকে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

আধ ঘণ্টা বসে থাকবার পর তিনি মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরে এলেন। আমাকে দেখে বললেন—কি হে? কি খবর?

সব শুনে বললেন—আমার গাড়িটা পেতে একটু দেরি হবে, তোমার গাড়ি এনেছ?

বললাম—আজ্ঞে না; গাড়ি এখনও হয়নি। চলুন, ট্যাক্সি ডেকে আনছি।

মুকুন্দ ট্যাক্সি নিয়ে এল। আমরা তিনজনে আবার মুকুন্দর বাড়ি এলাম। প্রফেসর রুগী দেখে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—এ কি হে? তোমার রুগী তো বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। বাঁচবে কি না সন্দেহ। এদের অবস্থা কেমন?

বললাম—মধ্যবিত্ত, যত্র আয় তত্র ব্যয়, বাড়তি কিছু জমা নেই।

প্রফেসর বললেন—তাহলে হাস-পাতালে দাও না কেন?

বললাম—সে চেষ্টা অনেক করেছি, এরা রাজী হয় না।

প্রফেসর বললেন—তাহলে যা চলছে তাই এখন চলুক। ইউরিন যদি হয় ইউরিনটা আর ব্লাডটা আর একবার পরীক্ষা করিয়ে নাও। লাম্বার পাংচার করা যাবে?

বললাম—যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয় করতেই হবে। বাড়িতে ওসব করা একটু অসুবিধা তো বটেই।

প্রফেসর বললেন—তাহলে ওটা থাক। শুধু সালফাডায়াজিনটা ৬ ঘণ্টা অন্তর না দিয়ে বারো ঘণ্টা অন্তর দাও আর পেনিসিলিন চার ঘণ্টা অন্তর দু লাখ। গ্লুকোজ যেমন দিচ্ছ তেমনি চলুক দু বেলা। বিকেলে একটা খবর দিও।

মুকুন্দ উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম দেখলেন?

প্রফেসর বললেন—খুব খারাপ। আজকের দিন না কাটলে কিছু বলা যাবে না। অষুধের সব ব্যবস্থা করে দিলাম। ডাক্তারবাবু রইলেন সব করে দেবেন।

শুনে মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে বললে—তাহলে বিকেলে আপনি একবার দেখে যাবেন। প্রফেসর বললেন—বেশ, আগে একটা ফোন করে খবর দেবেন।

প্রফেসর চলে গেলে মালতী বললে—বড় ডাক্তারবাবু তো নতুন ওষুধ কিছু
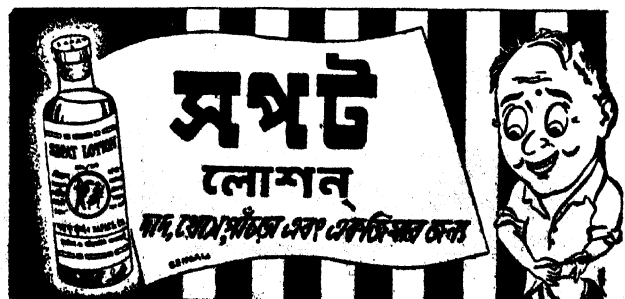
দিলেন না? আপনারা যা করেছেন তাই তো দেখি চালিয়ে যেতে বললেন।

বললাম—এ অসুখে এ ছাড়া আর তো কিছুই করবার নেই। উনি আর নতুন কিছু বলবেন কি করে? উনি দেখে যে বলে গেলেন চিকিৎসাটা ঠিকমতই হচ্ছে আর রোগটা ঠিক ধরা গেছে সেইটেই হল আসল কথা। সেইজন্যই ও'কে ডাকা।

আবার সব ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বললাম—রুগীর মাথা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে গা হাত পা সব গরমজলে মুছিয়ে দিতে হবে। পেটে গঙ্গামৃত্তিকার ঐ প্রলেপ ধুয়ে মুছে তুলে দিতে হবে। তবু যদি ইউরিন না হয় তাহলে তলপেটে গরম শেঁক দিতে হবে। ইউরিন হলে ওটা ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে দিবেন। রক্তটা আবার পরীক্ষা করতে বলে গেছেন, সেটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আবার চার ঘণ্টা পরে এসে পেনিসিলিন দেব। বলতে বলতেই ইউরিন হল, বিছানার চাদর খানিকটা ভিজে গেল, পাত্রে ওটা ধরা গেল না। দেখলাম চাদরে গাঢ় হলদে দাগ। তবু এইটুকুও যে হল তা দেখে সালফাডায়াজিন আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে এলাম। প্রফেসরের কথা না শুনে বন্ধুর কথা রাখলাম।

বাড়ি ফিরবার পথে সেই ডাক্তার-বন্ধুটির বাড়ি হয়ে এলাম। বললাম—আজ সত্যি সত্যি বুড়ী ছুঁয়ে এসেছি। সকালবেলা প্রফেসরকে ধরে এনে দেখিয়েছি। বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন—কি বললেন প্রফেসর?

বললাম—সালফাডায়াজিন বারো ঘণ্টা পর পর, আর দু লাখ পেনিসিলিন চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিতে বলেছেন। রাতে ঐ সালফাডায়াজিন আর পেনিসিলিন গ্লুকোজ দেওয়াটা খুব ভাল হয়েছে বললেন।

বন্ধুটি বললেন—আমাকে যদি সালফা আর পেনিসিলিনের মধ্যে যে কোন একটা ওষুধ দিয়ে মেন্‌ইন্‌জাইটিসের চিকিৎসা করতে হত তাহলে আমি সালফাটাই বেছে নিতাম। রুগীকে যদি বাঁচাতে চান, যান, এক্ষুণি গিয়ে সালফা-ডায়াজিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আসুন।

বললাম—ইউরিন হল দেখে সালফা ইন্‌জেক্‌শন অলরেডি করে এসেছি।

শুনে বন্ধু খুশী হয়ে বললেন—রুগী যদি বাঁচে জানবেন এই সালফার জন্যই বেঁচেছে। লাম্বার পাংচার করে পেনি-সিলিন দিতে পারলে আলাদা কথা। কিন্তু বাড়িতে ওসব হয় না। রুগী দেখে কি রকম মনে হল? কালকের চেয়ে খারাপ?

বললাম—না. ঐ একই রকম। তবে বুকটা অনেক ক্লিয়ার মনে হল। আর ইউরিনও হল একটু।

বন্ধুটি বললেন—ঠিক আছে। আপনি সালফা. পেনিসিলিন, গ্লুকোজ চালিয়ে যান।

চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর যাই, রুগী পরীক্ষা করি, ইন্‌জেক্‌শন দেই। জ্বর সেই ১০৪° থেকে ১০৫°। চক্ষু লাল, ঘাড় শক্ত, কিছু খাওয়ানো যায় না। এক চামচ জলও না। মুখে দিলে গড়িয়ে আসে। সন্ধ্যেবেলা প্রফেসর এসে দেখে বললেন—রাতটা কাটবে কি না সন্দেহ।

শুনে মুকুন্দ যেন ভেঙে পড়ল। আমার দু' হাত ধরে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—তাহলে কি হবে? কলকাতার সবচেয়ে যিনি বড় ডাক্তার তাঁকে এনে একবার দেখানো যায় না? যত টাকা লাগুক তুমি একবার আনো। বল কত টাকা চাই।

বললাম—আর বড় ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। রুগী যদি বাঁচে এই চিকিৎসাতেই বাঁচবে।

তবু ওর ভরসা হল না দেখে মালতীকে বললাম—আপনিও কি চান আরও বড় ডাক্তার কাউকে দেখাতে?

মালতী বললে—বড় ডাক্তার দেখিয়ে আর বেশী কি হবে? আপনিই তো বলছেন আর ভয় নেই।

বললাম—ভয় নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কালকের চেয়ে অনেক কম।

মালতী বলল—তাহলেই হল। এক-দিনেই সেরে যাবে নাকি? ওর যেমন কথা!

রাত বারোটায় শেষ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বললাম—আজকের দিনটা তো কাটল। কাল দেখবেন জ্বর নিশ্চয় আরো কমে যাবে।

আশা পেয়ে খুশী হয়ে মালতী বললে—তাই বলুন, সত্যি যেন কমে যায়।

সারাদিন আমার খাটুনী দেখে রাত্তিরে থাকবার জন্য আজ আর মালতী কোন পীড়াপীড়ি করল না। শুধু বলল—রাত্তিরে কোন বিপদ হবে না তো?

বললাম—মনে তো হয় না। যদি বলেন, রাতে থাকবার জন্য একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করি। মালতী ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—না না আর অন্য ডাক্তারের দরকার নেই। খারাপ মনে হলে আপনার কাছেই ট্যাক্‌সি পাঠাব।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার মুকুন্দ এল। বিরস মলিন মুখ। জিজ্ঞাসা করলাম—কত জ্বর? কেমন আছে?

মুকুন্দ বললে—জ্বর ১০৩°, জ্ঞান হয়নি। একটুও ভাল দেখছি না। পেচ্ছাব হয়েছে খানিকটা।

বললাম—তাহলে তো ভালই আছে। এত ভাবছ কেন?

মুকুন্দ বললে—মনে হচ্ছে এত করেও মেয়েটা বুঝি বাঁচবে না। তোমরা বলছিলে লাম্বার পাংচার করবে। কৈ করলে না তো? বলবে একবার প্রফেসরকে?

দেখুন কার মুখে কি কথা! বললাম—বেশ তো তুমিই বোলো। এখন চল, দেখে আসি কেমন আছে তোমার মেয়ে।

গিয়ে দেখলাম, সত্যি অনেকটা ভাল। পেট ফাঁপা কমে গেছে, বুকের সেই ঘড় ঘড় আওয়াজ নেই। চোখের লাল ঘোলাটে ভাবটাও অনেক কম। ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে
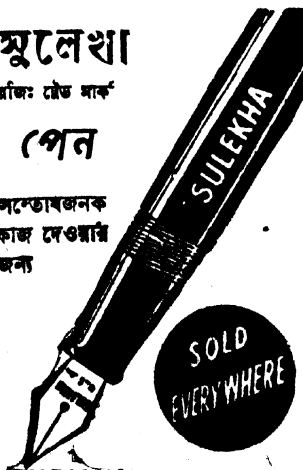
বললাম—আজ তো অনেক ভাল দেখছি। ওষুধ ধরেছে মনে হচ্ছে।

প্রফেসর এসে দেখে বললেন—রাতটা যে কেটেছে এইটেই খুব ভাল লক্ষণ। এই ভাবে যদি লড়তে পারে তাহলে আশা আছে। এসব কেস্ একটুও বিশ্বাস নেই। যে কোন মুহূর্তে খারাপ হয়ে যেতে পারে।

মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করলে—লাম্বার পাংচার করলে বাঁচবে?

প্রফেসর বললেন—তা কি কখনও বলা যায়? খারাপও হতে পারে। ওটা এখন থাক।

প্রফেসর চলে গেলে মালতী বললে—এই বুড়ো ডাক্তারকে মিছিমিছি কেন বার বার ডাকা? নতুন অষুধ তো দেখি একটাও দেয় না। শুধু শুধু ভয় দেখায়। কেবল টাকা নষ্ট!

সেইদিন সন্ধ্যায় জ্বর কমে ১০১° হল। বরফ দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। চামচে করে একটু একটু করে জল মুখে দেওয়া হত জিভটা ভিজিয়ে রাখবার জন্য; রাত্রে দেখা গেল ঢোঁক গিলে রুগী সে জল খায়। তাই দেখে গ্লুকোজের জল একটু একটু করে দিতে বলে এলাম। ইন্‌-জেক্‌শন সেই আগের মতই চলতে লাগল।

পরের দিন গিয়ে দেখি চোখের লাল কেটে গেছে, ঘাড়টাও বেশ নরম হয়েছে, জ্বর কমে ১০০° হয়েছে। গ্লুকোজ, হরলিক্‌স্ ফিডিং কাপে করে বেশ খাওয়ানো গেল। গ্লিসারিন দিয়ে পাই-খানা করানো গেল, সারাদিনে অনেকটা ইউরিন হল। রুগী কিন্তু সেই অজ্ঞান। অক্সিজেন বন্ধ করে দিয়ে মালতীকে বললাম—দেখবেন কাল জ্বর ঠিক ছেড়ে যাবে। মেয়ে কথা কইবে।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মালতী বললে—সত্যি?

পরদিন জ্বর ৯৯° পর্যন্ত উঠে সন্ধ্যার দিকে ছেড়ে গেল। পাঁচদিন অজ্ঞান থেকে মেয়েটি এই প্রথম চোখ মেলে চাইল।

মালতী খুশীতে বিভোর হয়ে মেয়ের চোখে মুখে চুমু খেয়ে আদর করে ব্যতি-ব্যস্ত করে তুলল।

জিজ্ঞাসা করলাম—এইবারে বল দেখি খুকু কি খেতে ইচ্ছে করে?

মেয়েটি একবার মালতীর আর এক-বার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে দ্বিধাভরে বললে—সন্দেশ।

তক্ষুণি বাজার থেকে দুটো ভাল সন্দেশ নিয়ে আসতে বললাম। মালতী ভাবলে বুঝি ঠাট্টা! সন্দেশ নিয়ে এলে একটু ভেঙে রুগীর মুখে দিতে বললাম। চক্ষু ছানাবড়া করে ম্যাজিক দেখার মত বিস্ময়ে অবাক হয়ে সবাই এই রুগীর সন্দেশ খাওয়া দেখতে লাগল।

ফেরবার পথে সেই ডাক্তার বন্ধুটির চেম্বারে গেলাম। তিনি তখন কাজ সেরে বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হয়ে রাস্তায় রাখা পুরনো অস্টিনটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে-ছেন। আমাকে দেখেই খুশী হয়ে বললেন—এই যে! আপনার কথাই ভাবছিলাম। নিন্ উঠে পড়ুন। আপনাকে তাহলে পেৌঁছে দিয়েই বাড়ি যাই।

গাড়িতে উঠে বসতেই বন্ধু বললেন—এইবার বলুন সেই রুগীর কি খবর।

বললাম—জ্বর ছেড়েছে, জ্ঞান হয়েছে। এই মাত্র সন্দেশ খাইয়ে আসছি।

খুব খুশী হয়ে বন্ধু বললেন—বাঃ সন্দেশ তো আমার পাওনা। সেদিন রাত্রে না গেলে কি হত?

বললাম—রুগী তো বাঁচল, কিন্তু আমি নিজেই যে এখন মারা যাচ্ছি।

ঠাট্টা মনে করেও যেন একটু বিচলিত হয়ে বন্ধু বললেন—কেন? আপন আবার কি হল?

বললাম—হাতে একটিও পয়সা নেই দিন দেখি দশটি টাকা।

বিস্মিত হয়ে বন্ধু বললেন—এত ব কঠিন কেস্ করলেন, রুগীও বেঁচে উঠ তবু আপনার পয়সা নেই? খা চাইছেন?

বললাম—সেই প্রথম রাত্রে যে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল তা অক্সিজেন, ইন্‌জেক্‌শ আপনার ফী আর ট্যাক্‌সি ভাড়াতে সব গলে গেছে। তারপর থেকে গাড়ি ভাড়াটাই শুধু দিয়েছে। এখন ধার ক করলে খাব কি?

শুনে বন্ধু ক্ষেপে গেলেন। পকে থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিয়ে ঘটাং করে গিয়ার টেনে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। বললেন—দেখুন দেখি কি অন্যায়? এরা স ভাবে কি? ডাক্তারদের কি কোন খরচ নেই? খেতে পড়তে হয় না? শুধু এক বার ডাকলেই কাজ পাওয়া যায়? পয়স লাগে না? কিছু না খাইয়ে ফোকটেই যদি কাজ পাওয়া যায় তাহলে গাড়িতে মোবিল আর পেট্রোল ঢালবার দরকার কি? বেশ এবার থেকে তার বদলে দুটো ডাক্তার ডেকে এনে এঞ্জিনে বসিয়ে দেব, আপনি গাড়ি চলবে, একটি পয়সাও খরচা লাগবে না।

কার্ল ফ্রেডারিক গাউস

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে আহ্বান জানান হয়েছে গাউসকে, ইউ-লারের শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্য। গত ২৩ বৎসর ধরে বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ইউলারের সম্মানজনক পদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না পাওয়ার জন্য মহা-পরাক্রমশালী জারের দরবারের সম্মান আজ ক্ষুণ্ণ, তাই গাউসকে রাশিয়ার চাই। আমন্ত্রণ পাঠান হয়েছে অজস্র প্রলোভনে মণ্ডিত করে যাতে গাউসের মনে কোন সংশয় না জাগে।

নেপোলিয়নের আক্রমণের ফলে সমগ্র জার্মানী তখন প্রচণ্ড দুর্ভোগের সম্মুখীন। গাউসের অভাবও কম নয়, তাই রাশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায়ই তাঁর ছিল না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিত-বিজ্ঞানী জার্মানীর সন্তান গাউস আজ অন্নের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করবেন—এ যে সমগ্র জাতির লজ্জা!

অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই গাউসের সেণ্ট পিটারসবার্গে যাওয়া বন্ধ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। যেমন করেই হোক, জার্মানীতেই একটা ভালো চাকরি দিয়ে গাউসকে ধরে রাখতে হবে। গোটিনজেন অবজারভেটরীর পরিচালকের পদটা তো খালিই পড়ে আছে—সেটা সব-দিক দিয়েই গাউসের উপযুক্ত।

এই বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন গাউসের অন্তরঙ্গ বন্ধু আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট। প্রতিপত্তি তাঁর কম ছিল না, কিন্তু মাত্র তিরিশ বছর বয়সের এক-জন বিজ্ঞানীকে এতো বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করবার চেষ্টা করার আগে তৎকালীন দিকপাল ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাপলাসের মতামতটা নেওয়া দরকার মনে করলেন। আলেকজান্ডার হামবোল্টের দৃঢ় ধারণা, গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসাবে গাউসের যোগ্যতা সম্বন্ধে উচ্চ মত প্রকাশ করতে ল্যাপলাস দ্বিধামাত্র করবেন না।

একদিন তাই হামবোল্ট সাহেব বিজ্ঞানী ল্যাপলাসকে প্রশ্ন করলেন,—"আচ্ছা বলতে পারেন? জার্মানীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ কে?"

"কেন? পাফ্—।" ল্যাপলাস অম্লান বদনে উত্তর দিলেন। জোহান ফ্রেডারিক পাফ্ ছিলেন হেমস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক এবং লাইব্রেরীয়ান।

ঠিক এইরকম একটা উত্তর, ল্যাপ-লাসের কাছে পাবার আশা হামবোল্ট কোন সময়েই করেন নি। অবাক বিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করলেন,—"তাহলে গাউস কি?"

গাউসের নামেই ল্যাপলাসের মুখে পরম তৃপ্তির হাসি দেখা দিল, "গাউস? —সে কেবলমাত্র জার্মানীর নয়, পৃথিবীর সেরা গণিত-বিজ্ঞানী।" বলা বাহুল্য গাউসকে রাশিয়ায় আর যেতে হয় নি,—সকলের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি গোটিনজেন অবজারভেটরীর পরিচালকের পদটা পেলেন। কাজ গবেষণা করা আর সময়-মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গণিতের শিক্ষা দেওয়া।

পুরো নাম ছিল তাঁর জোহান কার্ল ফ্রেডারিক গাউস—পরবর্তীকালে কর্মজীবনে এই জোহান অংশটি তিনি নিজেই তাঁর নাম থেকে বাদ দিয়ে দেন। গণিত বিজ্ঞানের সর্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠতম গবেষকদের মধ্যে তিনি নিজস্ব প্রতিভার মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন, তাই গাউসকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'প্রিন্স অফ্ ম্যাথামেটিকস্'। গণিত বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেবলমাত্র আর্কিমিডিস এবং নিউটনই গাউসের সমকক্ষ আসন পাবার অধিকারী।

ব্রানসউইকের একটি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে,—১৭৭৭ সালের ৩০শে এপ্রিল কার্ল ফ্রেডারিক গাউসের জন্ম হয়। তাঁর বাবা কখনও মালীর কাজ আবার কখনো ইঁট তৈরীর কারখানায় কাজ করে পরি-বারের ভরণপোষণ নির্বাহ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং কঠিন প্রকৃতির লোক। সংসারের অবস্থা কোন সময়েই ভালো ছিল না, তাই তিনি সর্বদাই কোন কাজে গাউসকে ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। গাউস যে লেখাপড়া শেখে, এটা তাঁর বাবার কোন কালেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কেবলমাত্র মায়ের সাহায্যেই তিনি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর মায়ের সমগ্র জীবনব্যাপী অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং আশীর্বাদেই শিক্ষাজগতে গাউসের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

একদিন শনিবার বিকেলবেলা গাউসের বাবা তাঁর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মাইনের হিসেব-নিকেশ কর-ছিলেন,—তাঁর সামনে বসেছিল ছোট্ট গাউস। গাউস একমনে বাবার হিসেব করা দেখে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে বলে উঠলো,—"বাবা ভুল হচ্ছে,—ঠিক হবে এইটা।" চমকে উঠে বাবা দেখলেন তাঁর ছোট্ট ছেলে হিসেবে ভুল ধরে শুধরে দিয়েছে। গাউসের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। এতো অল্প বয়সে আর কোন বিজ্ঞানীর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল কি না জানা নেই, তবে গাউস খুবই অল্প বয়সে নিজের থেকেই অক্ষর পরিচয় সমাপ্ত করেছিলেন, যেটুকু মাত্র সাহায্য বাইরে থেকে তাঁকে নিতে হয়েছিল তা খুবই সামান্য। পরবর্তী জীবনে গাউস একবার পরিহাস করে বলেছিলেন,—"আমি কথা বলবার আগেই হিসেব করা শিখে ফেলেছিলাম।" বিবেচনা করে দেখলে কথাটা ঠিক উড়িয়ে দেবার মতো মনে হয় না। সত্যিই এই বিষয়ে একটি ঐশ্বরিক পারদর্শিতা তাঁর সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ৭ বছর বয়সে গাউসকে স্কুলে ভর্তি করা হয় এবং ১০ বছর বয়সে তিনি অঙ্কের ক্লাসে প্রবেশাধিকার পান।

অঙ্কের শ্রেণীতে প্রথম দিনই একটি ভারী মজার ঘটনা ঘটলো। মাস্টার মশাই এরিথমেটিক্যাল প্রোগ্রেসনের একটা বিরাট অংক কষতে দিয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে লাগলেন এবং কচি কচি ছেলে মেয়েগুলো ভয়ে ঘামতে লাগলো নতুন এক অজানা অঙ্কের পাল্লায় পড়ে। মাস্টার মশাইয়ের ফরমুলা জানা আছে, অতএব অংকটা কয়েক মিনিটেই হয়ে যাবে, তত-

ক্ষণ ছেলেগুলো ভাবতে ভাবতে গলদঘর্ম হোক। হঠাৎ দেখা গেল, ছোট্ট গাউস তার শ্লেট টেবিলের ওপর রেখেছে,—অংকটা তার নাকি হয়ে গেছে!

মাস্টার মশাই অবাক হয়ে দেখলেন,—শ্লেটের ওপর অংকের সঠিক উত্তরটা লেখা রয়েছে। অন্য কোন আঁকজোক না করে, মনে মনেই অংকটা করেছে গাউস। মাত্র ১০ বছরের ছেলের মন থেকে নতুন অংকের পদ্ধতি উদ্ভাবন সত্যিই অবিশ্বাস্য ঘটনা!

মুগ্ধ মাস্টার মশাই, এই অতুলনীয় ছাত্রকে শিক্ষাদান করতে উৎসুক হয়ে উঠলেন। নিজের পয়সায় গাউসকে কিনে দিলেন অংকের বই আর খাতা। ছাত্র প্রচণ্ডগতিতে সেই বই শেষ করে ফেললে; মাস্টার বললেন, আমি যে প্রাথমিক গণিতের শিক্ষা দিয়ে থাকি তা শেষ হয়ে গেছে। সেই স্কুলের সহকারী শিক্ষক বারটেলস্-এর গণিতের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ, এবার তিনি এগিয়ে এলেন গাউসের সংগে যুগ্মভাবে গণিত শিক্ষা করবার জন্য এবং উভয়ের পারস্পরিক চর্চার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করলো গাউসের অচিন্তনীয় গণিত প্রতিভা।

ব্রানসউইকের ডিউক কার্ল উইলহেম ফার্ডিনাণ্ড ছিলেন একজন অত্যন্ত গুণী লোক। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে গাউসের অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন। অর্থের বাধা হলো দূর, ডিউকের কৃপায় সমস্ত বিপত্তি অতিক্রম করে গাউস অগ্রগামী হলেন জয়যাত্রার পথে, শুরু হলো তাঁর এক নতুন জীবন। ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ব্রানসউইক কলেজে প্রবেশ করলেন। এই কলেজে থাকাকালীনই উচ্চ পাটীগণিত বিষয়ে গাউসের গবেষণা আরম্ভ হয় এবং এই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই তিনি যা আবিষ্কার করেছিলেন, কেবলমাত্র তাই গাউসকে চিরকাল অমর করে রাখতে পারতো। ১৭৯৯ সালে হেমস্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিত বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন।

উচ্চ পাটীগণিতের ওপর তাঁর অপূর্ব গবেষণার ফলাফল "Disquisitiones Arithmeticae" (Arithmetical Researches) নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে, গাউসের বয়স তখন মাত্র ২৪ বৎসর। অনেক বিজ্ঞান সমালোচকের মতে এই পুস্তকখানিই বিজ্ঞানী গাউসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বিশুদ্ধ পাটীগণিতের ক্ষেত্রে গাউসের গবেষণা এই পুস্তক প্রকাশের সংগেই শেষ হয়ে গেল। এর পর তিনি অ্যাস্ট্রোনমি, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করলেন। গবেষণার পথ নিরাপদ করবার জন্য গুণমুগ্ধ ডিউক একটি ভাতার ব্যবস্থা করে গ্রহণ করলেন গাউসের আর্থিক অনটনের সমস্ত দায়ভার।

বিশুদ্ধ পাটীগণিতের ওপর প্রকাশিত ঐ একখানি বই-ই গাউসকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুললো। এতো ভালো বইটি বিক্রি হলো যে স্বয়ং গাউসের অনেক ছাত্রও পরে এর এক কপি সংগ্রহ করতে না পেরে হতাশ হয়েছিলেন। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী লাগ্রানজ্ স্বয়ং চিঠি লিখে গাউসকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি লিখেছিলেন, —"এই একটিমাত্র পুস্তকই আপনাকে প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞের সম্মান দিয়েছে। ...মহাশয়, বিশ্বাস করুন, আমার চেয়ে বেশী নিষ্ঠার সংগে আর কেউই আপনার সাফল্যে প্রশংসা করছে না।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দৈবচক্রে গিউসেপ্পি পিয়াজী, সিরাস নামক একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করলেন। বর্তমানকালে সুপরিচিত গ্রহানুপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র অংশ হলো এই সিরাস।

গিউসেপ্পির আবিষ্কারের কথা ঘোষণার সংগে সংগেই সমস্ত দার্শনিকেরা, এ অসম্ভব বলে চিৎকার করে উঠলেন। গ্রহের সংখ্যা মাত্র সাত, অতএব ১৭৮১ সালে হার্শেল সাহেব কর্তৃক ইউরেনাস আবিষ্কার হবার সংগে সংগেই অন্য কোন নতুন গ্রহ পাবার সম্ভাবনা একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে। দার্শনিকেরা ফতোয়া জারি করলেন, এই বিশ্বজগতে সাতটির কমবেশী গ্রহ থাকতেই পারে না, তাই এর জন্য বিজ্ঞানীরা যেন আর কোন অবিশ্বাস্য এবং অকল্যাণকর কথা ঘোষণা না করেন। এমন কি স্বয়ং দার্শনিক হেগেল পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের এই অবাস্তব কাজ বোকার মতো করে সময় নষ্ট না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এদিকে সিরাসও গেল হারিয়ে, আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এমন স্থানে সে দর্শন দিয়েছিল, যা পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, অতএব উপায়? —একমাত্র উপায় সিরাসের কক্ষপথ নিরূপণ করা, কেবল তাহলেই এর পুনরাবিষ্কার সম্ভব। নিউটনের নিয়ম যদি সত্যি হয়, সিরাস নিশ্চয়ই তাহলে কোন একটা কক্ষে সূর্যকে পরিভ্রমণ করছে এবং গণনার দ্বারা সেই কক্ষপথের সন্ধান পেলেই দার্শনিকদের ভিত্তিহীন বদ্ধমূল বিশ্বাসকে চুরমার করে দিয়ে সিরাস আবার পর্যবেক্ষকের কাছে ধরা দেবে। কিন্তু কে গণনা করবে সিরাসের কক্ষপথ, স্বয়ং নিউটন পর্যন্ত বলে গেছেন এই ধরনের কক্ষপথ নির্ণয় করা গণিতজগতের কঠিনতম কাজ।

ছেলে তো পণ্ডিত হলো, কিন্তু ও করবে কি? দুশ্চিন্তায় গাউসের বাবার ঘুম হচ্ছিল না। ছেলের বিদ্যে বোধ হয় কোন কাজেই লাগবার নয়, অতএব মহাপ্রাণ ডিউক যেদিন ভাতা বন্ধ করবেন, আবার সেদিন থেকেই শুরু হবে দুঃখকষ্ট। বাবা, মা আর বন্ধুরা দেখতে চায়

গাউস কোন নির্দিষ্ট একটা কাজ করছে। সকলকে ভরসা দেবার জন্য গাউস স্বয়ং শতাব্দীর এই বিরাট সমস্যার ভার গ্রহণ করলেন। সিরাস-এর কক্ষপথ তিনি বার করবেন, সূত্র খুবই কম তাই প্রয়োজন অজস্র হিসাব-নিকাশের, যা আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যেও করা সহজ নয়। চললো গবেষণা, সিরাসকে পাওয়া গেল গাউস নির্দিষ্ট যথাস্থানেই। কল্পনাতীত পরিশ্রম করে গাউস লাভ করলেন অভাবনীয় সাফল্য। ১৯০৯ সালে তাঁর গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়, "Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium" (theory of the Motion of the Heavenly Bodies Revolving round the sun in Conic Sections), নামে প্রকাশিত হয়ে তাঁর খ্যাতি শতগুণে বর্ধিত করলো। স্বয়ং ল্যাপলাস পর্যন্ত গাউসের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করে নিলেন।

এইবার এই তরুণ বিজ্ঞানীর ভাতা কিছু বাড়িয়ে দিয়ে ডিউক তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৮০৫ সালের শুভ ৫ই অক্টোবর ব্রানসউইকের এক সহ-পাঠিনীর সঙ্গে গাউসের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। বিবাহের মাত্র কয়েক বছর পরেই বিজ্ঞানীর এই প্রথমা পত্নী তিনটি শিশু রেখে পরলোকগমন করেন। শিশু-পুত্রকন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েক মাসের মধ্যেই গাউসকে আবার পাণিগ্রহণ করতে হয়।

প্রথম বিবাহের কিছুদিন পরেই গাউসের জীবনে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। সম্রাট নেপোলিয়নের আক্রমণে জার্মানী তখন বিব্রত, তাই তাঁকে বাধা দেবার জন্য ব্রানসউইকের ডিউক ফার্ডিনান্ড সসৈন্যে রণক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এই ভগ্নহৃদয় বীর গেলেন মারা। পিতৃতুল্য ডিউকের মৃত্যুতে গাউস শোকে অভিভূত হয়ে গেলেন,—তাঁর শিক্ষাদাতা, সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস আজ পরলোকে—কে তাঁকে পরিচালিত করবে উপযুক্ত পথে? ডিউকের মৃত্যুতে ভাতাও গেল বন্ধ হয়ে, আর্থিক অনটন তাঁকে বিচলিত করে তুললো। একান্ত বাধ্য হয়েই কর্মসংস্থানের জন্য তিনি বিদেশ যাত্রার মনস্থ করলেন। কিন্তু বিদেশ আর যেতে হলো না, আলেকজান্ডার হামবোল্ট-এর চেষ্টায় গোটিনজেন অবজারভেটরীর পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করে চরম দারিদ্র্যের আক্রমণ থেকে গাউস লাভ করলেন মুক্তি।

ডিউকের মৃত্যুর পর থেকেই গাউস সম্রাট নেপোলিয়নকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন—জার্মানীর ওপর তখন সম্রাটের অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। গাউস এবার রাজরোষে পড়লেন, গোটিনজেন অবজারভেটরীর পরিচালক-রূপে নেপোলিয়নের যুদ্ধ তহবিলে দেবার জন্য তাঁকে ২০০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হলো। এই পরিমাণ অর্থ জরিমানা দেওয়া গাউসের পক্ষে অসম্ভব, তাই তিনি প্রস্তুত হলেন শাস্তি পাবার জন্য।

একমাত্র উপায়, এই দাম্ভিক সম্রাটের কাছে অর্থের দায় থেকে মার্জনা ভিক্ষা করা। নেপোলিয়ন গণিত কিছুই বুঝতেন না, কিন্তু সবজান্তা মাতব্বরের মতো গুণী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা সব সময়েই করতেন। এটা ছিল তাঁর রাজকীয় চালের একটা অঙ্গ। কবি, বিজ্ঞানী বা শিল্পীর যে একটা প্রতিভা আছে, তা মোটামুটি স্বীকার করলেও—তাঁদের অকুণ্ঠ সম্মান তিনি দিতে জানতেন না। এমন কি একবার এই উদ্ধত সম্রাট ল্যাপলাসকে বলেছিলেন,—সময় পেলে তিনি একবার তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকখানি পড়ে দেখবেন অর্থাৎ অনুগ্রহ করে কিছু সময় নষ্ট করবেন। সামরিক প্রতিভা উল্লেখযোগ্য হলেও জ্ঞানীদের প্রতি কৃপামিশ্রিত তাঁর এই সমাদর সুপরিচিত। অতএব গাউসের মতো স্বনামধন্য গণিত বিজ্ঞানী যদি দয়ার জন্য আবেদন করতেন, তাহলে সম্রাটের কৃপা তিনি নিশ্চয়ই পেতেন, কিন্তু নিজের অতুলনীয় সুনামকে রাজ-দরবারে করুণার নীলামে তোলবার জন্য তাঁকে বরণ করতে হতো চরম মানসিক দৈন্য।

বন্ধু-বান্ধব সকলেই গাউসকে আবেদন করতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু তিনি অটল। শাস্তি গ্রহণ করতে গাউস প্রস্তুত, কিন্তু বিজ্ঞানীর মানমর্যাদা লুণ্ঠিত হতে দেবেন না। জার্মানীর এই দুঃসময়ে তিনি মনেপ্রাণে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছেন, তাই এক বন্ধুকে লিখে পাঠালেন,—"এমন একটি জীবনের চেয়ে মৃত্যুও আমার কাছে অনেক প্রিয়।"

গাউসের এই বিপদকালে সমগ্র ইউরোপের বিজ্ঞানী মহল চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—অনেকেই এই টাকা নিজে দিতে চাইলেন, প্রিন্স অফ্ ম্যাথামেটিকস্-এর সম্মান রক্ষার জন্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ওলবার গাউসের কাছে টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু নির্দোষী গাউস অন্যায় জরিমানার জন্য কোন বন্ধুরই দয়া গ্রহণ করবেন না, অতএব ধন্যবাদের সঙ্গে টাকাটা ওলবারের কাছে ফেরত গেল। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাপলাস গাউস-চরিত্রের এই দিকটির সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলেন, তাই আর দেরী না করে ফ্রান্সে বসেই ফরাসী মুদ্রায় তিনি জরিমানার টাকা দিয়ে দিলেন। এ দান গাউস চান নি, কিন্তু তখন তাঁকে নিবৃত্ত করার কোন উপায়ই গাউসের ছিল না। রাজরোষের অর্থ-দণ্ডের পরিসমাপ্তি এইভাবেই ঘটলো।

নিউটনের প্রতি গাউসের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি অনুভব করতেন, এই অসামান্য বিজ্ঞানীকে সমগ্র জীবনে বিজ্ঞানের সর্বশাখায় অনবদ্য অবদানের জন্য কি প্রচণ্ড পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। গাছ থেকে টুপ করে আপেল পড়লো আর আবিষ্কার হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—এই ধরনের গল্প রূপকথার পর্যায়েই ফেলা যায়। নতুন কিছু জগতকে দিতে হলে কি পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন, তা নিজের জীবনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আপেলের গল্প কি করে এতো সুপ্রচলিত হয়েছে, গাউস কথিত আর একটি গল্প তার ওপর আলোকপাত করে। গাউস বলেছিলেন,—"একদিন একজন খুব গণ্যমান্য বোকা লোক নিউটনের কাছে এলেন। এসে তিনি জানতে চাইলেন, কি করে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন। প্রশ্ন-কর্তার হাবভাব দেখে নিউটন বুঝতে পারলেন, তিনি একজন অত্যন্ত কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সম্মুখীন হয়েছেন।

অতএব, সোজা বুঝিয়ে দিলেন তাকে —আপেল পড়লো টুপ করে আর সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কৃত হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি আনন্দের সঙ্গে গেলেন ফিরে।"

বিজ্ঞানী গাউসের সাহিত্যের প্রতি ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। অনেকগুলি ভাষা তিনি জানতেন এবং সবই প্রায় শিখে-

ছিলেন নিজের অধ্যবসায়ে। এমন কি, কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তিনি নিজেই রাশিয়ান ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত শিখবারও চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারেন নি।

ইংরাজি সাহিত্যে সেকস্‌পীয়র স্কট আর বায়রনের রচনাই তাঁকে সবচেয়ে মুগ্ধ করতো। কেনিলওয়ার্থের বিষাদময় ঘটনাবলী তাঁকে এতো বেশী বিচলিত করেছিল যে, তিনি ঐ পুস্তক পড়তে শেষে অস্বীকার করেন। রচনার মধ্যে স্যার স্কট এক স্থানে উত্তর-পশ্চিমে চাঁদ ওঠার কথা ভুল করে লেখায়, লেখকের এই ভুলের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রাণভরে হেসেছিলেন। কেবলমাত্র হেসেই ক্ষান্ত না হয়ে এই খামখেয়ালী বিজ্ঞানী যেখানে যতো কপি এই বই পেলেন সব সংগ্রহ করে নিজের হাতে শুধরে দিলেন ভুল। ইংরাজী ইতিহাস সাহিত্যের মধ্যে তিনি সবচেয়ে পছন্দ করতেন গীবন আর মেকলের রচনা। জার্মানীর কবিদের মধ্যে জিন পাউল ছিলেন এই বিজ্ঞানীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি।

গাউসের শেষ জীবন কেটেছে অজস্র সম্মানের মধ্যে দিয়ে। যদিও শরীর তাঁর দুর্বল হয়ে আসছিল, তবু গবেষণা তাঁর কোন দিনই বাদ যায় নি। জ্ঞানসমুদ্রের মধ্যে অনুসন্ধান চালাবার সময়ে তিনি কোন দিনই পেছন ফিরে দেখেন নি তাঁর গবেষণা জাগতিক বিষয়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে কি না? তিনি তো ব্যবসায়ী নন যে, প্রতিটি পদক্ষেপে লাভালাভের হিসেব করে তাঁকে চলতে হবে। এই বিষয়ে নিউটনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট প্রভেদ ছিল, —গাউস আর্কিমিডিসের মতোই পৃথিবীর যে কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে গণিতচর্চা করতে পছন্দ করতেন অনেক বেশী। নাম চাই না, মান চাই না,—শুধু করতে চাই সাধনা। নিউটন সাধারণ জীবনে অনেক বড় বড় পদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গাউস ছিলেন এ সবের অনেক উর্ধ্বে। অফুরন্ত কাজ পড়ে রয়েছে তাঁর সামনে, কিন্তু সময় বড় কম।

গাউসের গবেষণার একটা নির্দিষ্ট ধারা ছিল, শত প্রলোভনেও তিনি অন্য কোন কাজে মনোনিবেশ করতে রাজি হতেন না। অমর বিজ্ঞানীর একনিষ্ঠ বিজ্ঞানপ্রিয়তার এই নিদর্শন খুবই চমকপ্রদ। ১৮১৬ সালের কথা, প্যারিস একাডামি 'ফারমাট'-এর শেষ উপপাদ্যটি প্রমাণ অথবা ভুল প্রমাণ করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। বিজ্ঞানী ওলবার তৎক্ষণাৎ এই প্রতিযোগিতার কথা গাউসকে জানিয়ে যোগদান করতে অনুরোধ জানালেন,—ওলবার বিশ্বাস করতেন এই কাজের জন্য তিনিই উপযুক্ততম লোক। কিন্তু পুরস্কারের লোভ গাউসের কোন সময়ই ছিল না; দু সপ্তাহ পরে ওলবারকে খবরটা জানাবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলেন,—ফারমাটের শেষ উপপাদ্যের মতো একটা আলাদা সমস্যার জন্য সময় নষ্ট করতে তিনি নারাজ। তিনি নিজেই এরকম অনেক উপপাদ্য পরিকল্পনা করতে পারেন, যা কেউই প্রমাণ অথবা ভুল প্রমাণ করতে পারবে না।

এ জগতের মানুষের ভালো আর মন্দ দুটো দিক থাকে, গাউসেরও একটা মন্দ দিকের উল্লেখ করে অনেকেই তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। অনেকের মতে গাউস তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার সাফল্যকে সম্বর্ধনা জানাতে দ্বিধা বোধ করতেন। উদাহরণস্বরূপ সমালোচকেরা দেখান, কাউচে, হ্যামিল্টন প্রভৃতি তরুণ বিজ্ঞানীরা যখন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন, তখন প্রবীণ গাউস একবারও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে তাঁদের উৎসাহ প্রদান করেন নি। তাঁদের গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে একেবারে নীরব থেকে গেছেন! কথার সত্যতা কিছুটা স্বীকৃত হলেও এতো বড় অপবাদ গাউসকে সম্পূর্ণভাবে কিছুতেই দেওয়া যায় না। গাউসের জীবনের স্বপ্ন আর সাধনা গণিত বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তিনি কখনই তরুণ প্রতিভার অমর্যাদা ঘটিয়ে গণিতের অসম্মান করতে পারেন না। হয়তো গাউস উচ্ছ্বাস প্রকাশে বিলম্ব করতেন, নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনন্দন জানিয়ে পত্রালাপ করতেন না, কিন্তু আলাপ-আলোচনার দ্বারা তরুণ বিজ্ঞানীদের সুপরিচালিত করবার জন্য তাঁর মনের দরজা সব সময়েই ছিল খোলা। যে কোন গবেষকই তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে কোন দিনই বিফলমনোরথ হয় নি। যে সব মহিলা গণিত বিজ্ঞানী গাউসের কাছ থেকে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে মাদামাজোয়েল সোফিয়া জারমেইনের নাম উল্লেখযোগ্য। সোফিয়ার সঙ্গে গাউসের জীবনে কখনও দেখা হয় নি, গুরু-শিষ্যার চিন্তাধারার আদান-প্রদান চিঠির মাধ্যমে চলতো। অসাধারণ প্রতিভাশালিনী সোফিয়া জারমেইন মৃত্যুর পরে গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

গাউস-চরিত্রের বিচিত্রতা দীর্ঘ এক শতাব্দী পরে উপলব্ধি করার চেষ্টা খুবই কঠিন কাজ। প্রথম রেল লাইন পাতা হচ্ছে গোটিনজেন এবং কাসেলের মাঝে, ছেলেমানুষের মতো বিজ্ঞানী গাউস দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে শহর ত্যাগ করে ছুটলেন রেলগাড়ির পথ নির্মাণ আর অন্যান্য কার্যকলাপ দেখবার জন্য। পথের মধ্যে হঠাৎ গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পেলেন তীব্র মানসিক আঘাত। যাই হোক, কোন রকমে সেরে উঠে রেলগাড়ির গোটিনজেনে প্রথম পৌঁছনোর আনন্দ তিনি উপভোগ করতে পেরেছিলেন।

সময় ঘনিয়ে এসেছে, দেহ-মন আর চলতে চায় না। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক সুপ্রভাতে বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কার্ল ফ্রেডারিক গাউস পরলোকগমন করলেন। এগিয়ে চলার পথে গাউসের অসামান্য অবদান চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। মৃত্যুর শতবর্ষ পরে দেশ, কাল ও জাতি নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবী আজ তাই চিন্তাজগতের এই মহানায়ককে স্মরণ করছে—আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে।

পুলকেশ দে সরকার

দার্জিলিংয়ের আকর্ষণ আমাদের চিত্তে দুর্নিবার ক'রে তুলেছিলেন সাহেবেরা। দার্জিলিং বলতেই আমরা সাহেবদের বিশ্রামসুখ লাভের স্বর্গ বলে জানতাম। বাঙালী বা ভারতীয় যাঁরা সাহেবদের অনুচর হয়ে যেতেন তাঁদের অবশিষ্ট বঞ্চিত মন্দভাগ্য ভারতীয়দের কাছে বুকটা গৌরবে স্ফীত হয়ে উঠত। ওদের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষা হ'ত বঞ্চিতদের।

স্বাধীনতার পর দার্জিলিংয়ে আজও সাহেবদের আধিপত্য আছে, দাপট নেই। আজ দার্জিলিংয়ের দরজা রাজনৈতিক কারণে কারও মুখের ওপর বন্ধ করা হয় না। কিন্তু ওর সাহেবী ভোলটা খুব বেশী বদলায় নি। রাজভবনে একজন বাঙালী রাজ্যপাল থাকেন এই মাত্র। আগে থাকতেন লাল-মুখো বিলিতী গবর্নর। রাস্তায় বেরোলে শীতের পোশাকে যাঁদের দেখা যায়, তাঁদের মুখগুলো কালো, পোশাকটায় চিরাচরিত বিলিতী ঐতিহ্যের গন্ধ। সুতরাং, চাল বা চলনেও সাহেবিয়ানার ধাঁচ রয়ে গেছে প্রায় সবটাই; সিগারেট ধরাবার কায়দা থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁয় চা নিয়ে বসে থাকা পর্যন্ত। যারা এতদিন লালমুখো সাহেবদের 'বোই' (মানে বয়) ছিল, তারাও একেবারে বেকার না হয়ে পড়ায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে; কিন্তু ন্যাপকিন-কাঁটা-চামচ-প্লেট ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখার দিকে ঝোঁক আর নেই, জানে—যে-বাবুরা শীতের আমেজে আলোয়ান গায়ে দেয়, তা সুটের মতো ইস্ত্রিতে পাটপাট করে রাখতে হয় না সর্বদা, আলনা থেকে টেনে কাঁধে ফেললেই হ'ল।

লোভ ছিল, ইংরেজদের পূর্ণ সত্তায় দার্জিলিং দেখব। কিন্তু সে সম্ভাবনা ঘুচে গেছে। কার্শিয়াংয়ে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ই আমি ওদের লক্ষ্য করেছিলাম। আমার হাতে স্টেটসম্যানে সংবাদটি দেখে এক জোড়া সাহেব-মেম সমস্ত সাহেবী সংস্কার ভুলে একটু জোরেই বলে উঠেছিল, ও হোয়াট দে আর ডুইং। এরই বছর দুই পর দার্জিলিংয়ের লেবংয়ে লাট এণ্ডার্সনের প্রাণ নিতে গিয়ে দুটি ছেলে মারা পড়েছিল, আর, দার্জিলিংয়ের দরজা বাঙালীদের মুখের ওপর বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। তখন আমি হিজলী বন্দিশিবিরে।

তারপর দার্জিলিংয়ের আকর্ষণ আমার কাছে একেবারে তুচ্ছ ও সামান্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে ১৯৫৫ সালের মে মাসে সাংবাদিকজীবনে এ সুযোগ যখন এসেই গেল, তখন দার্জিলিংয়ে আমার প্রথম আকর্ষণ হ'ল তেনজিং। কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের বাড়িতে হাণ্টের সঙ্গে হিলারী আর তেনজিংকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তখন সে অনুষ্ঠানে আমি তাকে খুব কাছে দেখেছি। কিন্তু এদেশের 'সন্ত্রাসবাদী' স্বদেশীদের দমনে বিদেশী বর্বরতার নিদর্শনস্বরূপ ছিল হাণ্ট। আমি তখন নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরে নজরবন্দী। হাণ্টের উষ্ণ সামরিক গোয়েন্দাগিরির কিছু খবর তখন অনেক তরুণই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিল; সে খবর আজকের গোয়েন্দারা জানে না, অথবা হাণ্টের সম্বর্ধনাকালে জাতভাইদের কুকীর্তি বিস্মৃত রাখার জন্যই সম্ভবত সেদিন তারা ওর পরিচয় সাংবাদিক ঔৎসুক্যের কাছে প্রকাশ করেনি। তাই হাণ্টের পাশাপাশি পাহাড়িয়া শেরপা তেনজিংকে দেখে আমার সাধ মেটেনি। তেনজিংকে পাহাড়ের পরিবেশেই দেখা উচিত। সুতরাং, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে তেনজিংকে দেখব, দার্জিলিং যাওয়ার এই ছিল আমার প্রথম আকর্ষণ। এভারেস্টে তো তাঁকে কোনকালেও দেখতে পাব না।

তেনজিংয়ের সাফল্যকে উপলক্ষ করে দার্জিলিংয়ে পর্বতারোহণ শিক্ষায়তন খোলা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের এটিও আজ নূতন আকর্ষণ এবং আমাকে তাও টেনেছে দার্জিলিংয়ের দিকে। ভবিষ্যতে আর কি কোন তেনজিং নোরকে 'নোরগে' হবে? না, হবে না?

সি আর দাশের বাসগৃহ স্টেপ এসাইড। এই গৃহে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

তৃতীয় আকর্ষণ ছিল 'স্টেপ এসাইড'। যশ যখন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো সর্বব্যাপী এবং প্রভাব যখন গৃহে গৃহে দীপ্ত তখনই বাংলার ঐশ্বর্য-বৈরাগী চিত্তরঞ্জন দাশ অবধারিত মৃত্যুর কবলে অস্তমিত হলেন। নারায়ণ সাহিত্যপত্রে যে চিত্তের প্রকাশ পেয়েছিল, আলিপুর বোমার মামলায় যে চিত্তের আবেগ উৎসারিত হয়েছিল এবং প্রতিভানৈপুণ্যে স্বোপার্জিত অতুল বৈভবের মায়ামুক্ত হতে যে চিত্ত ছিল দ্বিধাহীন, কর্মযোগী সেই চিত্তরঞ্জন জীবনের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এইখানে—এই স্টেপ এসাইডে। বাঙালী ভাবপ্রবণতার শেষ সঞ্চয়টুকু অবলম্বন ক'রে পশ্চিম বাংলার বাঙালী রাজ্যপাল ও-বাড়িটি কিনেছেন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুকে মর-জগতে অমৃতময় ক'রে তুলতে। সে বাড়ি আমাদের আকর্ষণ না ক'রে পারে?

আর একটি জিনিস আমাকে ব্যক্তি-গতভাবে আকর্ষণ করেছিল। সে হচ্ছে লেবংয়ের ঘোড়দৌড় মাঠ। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের শেষ অধ্যায়টি লেখা হয়েছে এইখানে। সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস-ব্যাখ্যায় অনভিজ্ঞ এ-দেশীয় সাম্যবাদীদের মুখে ইংরাজের অপবাদগ্রস্ত স্বদেশী-সন্ত্রাসবাদীদের বড় নিন্দা। মাঠে মাইকের চিৎকারেই ওদের প্রতিবাদী গৃহাগ্নণতত্ত্ব নিঃশেষিত। 'সন্ত্রাসবাদীরা' অগ্নিনালিকার গর্জনে যেদিন এণ্ডার্সনী দুঃশাসনের প্রতিবাদ জানিয়েছিল, সেদিনকার দুঃসহ অবস্থা আজকের মেঠো-সাম্যবাদী কল্পনারও সামর্থ্য রাখে না—যে সামর্থ্য নিয়ে, যে বলিষ্ঠ নির্ভয় প্রাণ নিয়ে দুটি তরুণ ঘনবিন্যস্ত শ্যেনদৃষ্টির বেড়াজাল ব্যর্থ করে এণ্ডার্সনের নিষিদ্ধ চৌহদ্দিতে হাজির হয়ে গিয়েছিল তা মতান্ধদের চিত্ত-দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হ'তে পারে না। হিংস্র উদ্ধত সিংহকে তার গুহায়, আলি-পুরের খাঁচায় নয়, যারা পর্যুদস্ত করতে যেতে পারে তারা অসামান্য, একথা স্বীকার করতেও অসামান্য শ্রদ্ধাবোধ থাকা চাই। এরা—এরাই লেবংকে আমাদের কালের পুরুষদের কাছে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে—নইলে লেবংপ্রসিদ্ধ হবে ঘোড়ায় না জুয়ায়?

আর কি আছে দার্জিলিংয়ে দেখবার—আমাদের আকর্ষণ করবার?

দেশবন্ধু চেস্ট ক্লিনিক

দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ—রৌদ্র-দীপ্ত শ্বেতোজ্জ্বল রূপ। শুনেছি মেঘের আড়ালে অবলুপ্ত এই রূপ না দেখতে পেয়ে বহু দূরাগত স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক রূপান্বেষী অনেকে হতাশায় দার্জিলিং ছেড়ে গেছেন।

অনেকটা সকাল গড়িয়ে গিয়ে দুপুর হয়-হয় এমন সময় দার্জিলিং পৌঁছালাম।

হিমালয়ান পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের ভবন
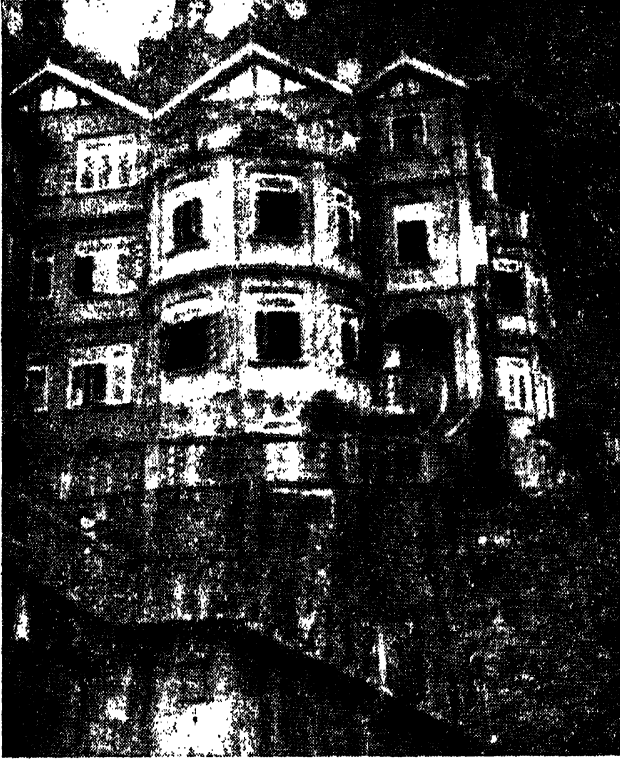
পর্বতারোহণ শিক্ষায়তন

দার্জিলিংকে নিয়ে কাব্য করার কবিরা আগেই জন্মে গেছেন, দার্জিলিংয়ের বর্ণনাও দিয়েছেন; সুতরাং, বর্ণনাবাহুল্য ঘটিয়ে লাভ নেই। ইট-পাথর দেখে দেখে যাদের শহুরে চোখ নিরেট হয়ে গেছে, তাদের এত সবুজের বিলাস দেখে, পথের পাশে গাঢ় রঙের বুনো গোলাপ আর নানা রকমের ফুল দেখে পাগল হবারই কথা। কিন্তু ইডেন স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছে অবধি আমাদের যিনি দার্জিলিংয়ে সরকারী তৎপরতা দেখাবেন, তাঁকে পাগল ক'রে তুললাম আমি তেনজিংকে দেখবার জন্য। কর্মসূচী অনুসারে, তার বদলে, স্টেপ এসাইড দেখে একটি ক্ষুধা মিটল। এখনও ওর আয়োজন অসম্পূর্ণ, লাইব্রেরীর বই এখনও বান্ডিল-বাঁধা, দরিদ্র দারোয়ান সব দেখিয়ে পাণ্ডার মতো হাত পাতে। অভিজাতদের সমাবেশস্থল মল বা চৌরাস্তা দেখলাম। লাটভবনের বিরাট পরিবেষ্টনীর বাইরেকার প্রান্তভাগ দেখলাম—ব্রিটিশ আমলে বহু জাঁদরেল কূটনীতিক যে হিম-প্রাসাদকে গুঞ্জরিত ক'রে গেছেন। এই রাজভবনে ১৯৫৫ সালের মে মাসে বসল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অধিবেশন। দার্জিলিংয়ের ভাগ্য, পশ্চিম বাংলার ভাগ্য হয়তো নির্ধারিত হয়ে গেল অনেকখানি এখানেই এবং এখান থেকে কালিম্পংয়ে। লোকসেবক সঙ্ঘের সেবকেরা এসেছিলেন মানভূম থেকে, বাংলাকে ফিরিয়ে দিতে হবে মানভূম। কালিম্পংয়ে গোর্খা লীগ বলল, থাকব না পশ্চিম বাংলার সঙ্গে। উপলক্ষ করে কংগ্রেস আর রাজ্য সরকার মেলা বসিয়েছিলেন ওঁদের অসংখ্য উপস্থিতির। সরকারী জীপ আর গাড়িতে ভর্তি দার্জিলিং। মন্ত্রী উপমন্ত্রীতে পরিপূর্ণ দার্জিলিং। পথে প্রতি তিনজন অভিজাত পথচারীর মধ্যে একজন সরকারী পদস্থ ব্যক্তি, নয়তো স্টেনো। তাঁদের স্ত্রীরা অনেকে। তারপর কংগ্রেসী কর্তারা, কংগ্রেসীরা। তাঁদেরও স্ত্রী বা বান্ধবীরা নাকি? মস্ত ঘটা করে বিকেল পাঁচটায় পার্টি বসল রাজভবনে—গাড়ির পর গাড়ি, গাড়ির পর গাড়ি, সারা কলকাতা এল নাকি ছোট্ট দার্জিলিং শহরে?

এখানটায় একটু খাড়া, এটিই প্রবেশপথ, পার্টিতে যাবার পথ, গাড়িগুলো ছড়ছড় করে যাচ্ছে, এমন সময় এলেন হেঁটে হেঁটে খাকী উর্দিপরা—কে? পুলিস সাহেব? ডেপুটি কমিশনার? কমিশনার—না—আই জি? হাতে জওহরলালী ছোট্ট একটুকু লাঠি, ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন ঠিক প্রবেশপথে প্রহরারত এক পাহাড়িয়া সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে—দৃষ্টিসাৎ যাকে বলে। সস্ত্রীক যাচ্ছেন বড়া সাহেব (খাঁটি বাঙালী সাহেব) এস পি-টেস পি হয়ে এসেছেন, দাপট কত বুঝে নিক জীবনের ক্যামারাডারি স্ত্রী। ওপরে সাহেবী ভঙ্গিতে উঠতে উঠতে সাব-ইনসপেক্টরটিকে অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টিসাৎ করলেন। পথে একটি গাড়ি ধীরে নামছিল—এই অপরাধ।

পরদিন উদ্ভিদ উদ্যানের ল্যাটিন-অরণ্যে হারিয়ে গেলাম কিছুকাল। ওর হটহাউস আর ফুলের সমারোহ আমাদের কিছুকাল ভুলিয়ে রাখল। লোকের ঘুম ছুটে যায়, আমরা ঘুমে ছুটলাম, ঘুম এসে গেল, বৌদ্ধ মন্দিরে ধম্মচক্র, ওঁ মণিপদ্মে——। এখানেও পাণ্ডা। চারদিকে তাকালে মনে হয়, কে বলে তিব্বত (তিব্বতে যাইনি তো) পৃথিবীর ছাদ, ঘুমই সেই ছাদ; চারদিকের পাহাড়ের চূড়া ছোট হয়ে এসেছে যেন। ফেরার পথে খাড়া পাহাড়ে উঠেই দেখলাম রুদ্ধদ্বার দেশবন্ধু চেস্ট ক্লিনিক। তেনজিংয়ের দেখা কি পাব না? তাঁর পর্বতারোহণ শিক্ষায়তন?

দুঃখ শুরু হল। দেশবন্ধু চেস্ট ক্লিনিক—নির্জন ও রুদ্ধদ্বার। পর্বতারোহণ শিক্ষায়তন জনশূন্য—রুদ্ধদ্বার, তেনজিংয়ের গৃহ জনবহুল—রুদ্ধদ্বার।

এর আগের দিন রাজভবনে বিকেলের চা-পার্টিতে তেনজিংকে যেতে দেখেছি।

কলকাতায় যা দেখেছি তার তুলনায় রোগা দেখালেও পরদিন অসুস্থ হয়ে পড়বেন—হিসেব করা যায় নি। আমরা যখন তাঁর সবুজ বাড়িটির দরজার পাশে পেঁছিলাম তখন সেখানে দর্শনার্থীর মস্ত ভিড়। আমরা আগের দিন দেখা-সাক্ষাতের জন্য ফোন করিয়েছিলাম মিঃ সাণ্ডাসকে দিয়ে। জবাব পাওয়া গিয়েছিল, আজ নয় কাল। মিঃ সাণ্ডাস (স্থানীয় প্রচার বিভাগীয় কর্তা) কিন্তু আমাদের বলেছিলেন, চেষ্টা করতে পারেন, সুফল হবে মনে করিনে।

অহঙ্কার হয়েছে তেনজিংয়ের?

তাও হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকদের ও'র বড় ভয়। বস্তু আবোল-তাবোল প্রশ্ন করে সাংবাদিকেরা—অনেক সময় অপমান-করও। এ-কথাও ঠিক, তেজিংয়ের দৃষ্টি আজ ছোট নেই, তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ঘট।

গাড়ি থেকে নামতেই দেখি, ওপরে ওঠবার মুখে হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন—তেনজিং অসুস্থতাবিধায় দর্শনার্থীদের দর্শন দিতে পারবেন না।

তেনজিংয়ের গোটা দুই তিন কুকুর আছে; বাঁধা না থাকলে ওরা দর্শনার্থীদের কামড়ায়। আমরা থাকতেই একটি লোককে কামড়ে দিল। কিন্তু এদের চাইতেও অনেক সজাগ প্রহরী শ্রীমতী তেনজিং, তেন-জিংয়ের স্ত্রী। তাঁর হাতে পাসপোর্ট। এ-ছাড়াও, তেনজিংয়ের সেক্রেটারী আছেন। সুতরাং, নিষেধ যখন একবার হয়েছে তখন আর যে সুরাহা হবে এত বাধা পেরিয়ে, মনে হ'ল না।

বার বার তেনজিংকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করায় ম্যাকডোনাল্ড বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তেনজিংকে দেখবার কি আছে। জবাব দিই নি, রিটর্ট দিয়েছিলাম ঃ—হাণ্টকে দেখার জন্য পাগল কেন বিলেতের লোকে, কেন রাণী তাঁকে নাইট করেন? তেনজিং আমাদের দেশের শেরপা বলেই কি দর্শনযোগ্য হবে না?

শেষ চেষ্টায় একখানি কার্ড পাঠালাম, আমাদেরই কয়েকজনার স্বাক্ষর দিয়ে, ম্যাকডোনাল্ডেরও। শ্রীমতী তেনজিং ফটো তুলছেন দর্শনার্থীদের সঙ্গে বসে, দর্শনার্থীদের অনুরোধে। মধু অভাবে গুড়। সান্ত্বনা। তেনজিংয়ের কার্ড-ফটো বিক্রি হচ্ছে। হিন্দুস্থানীরা উপরোধ করছেন, বহুৎ দূরসে আয়া। শ্রীমতী পাহাড়িয়া। পাহাড়কে নড়ানো দুঃসাধ্য।

তেনজিংকেও তাঁর সঙ্কল্প থেকে টলানো দুঃসাধ্য। সাণ্ডাস সেক্রেটারীর হাত দিয়ে আমাদের স্বাক্ষর করা কার্ড পাঠিয়েছিলেন। কার্ড ফিরে এল। না, দেখা হবে না।

ম্যাকডোনাল্ডের কাছে হার হ'ল। মুখ ছোট হয়ে গেল। আরও ছোট হয়ে গেল মুখ তখন, যখন নেমে আসবার সময় শুনলাম, আসলে তেনজিং পাছ-দুয়ার দিয়ে রাজভবন অথবা কোথাও কোন 'রইস' আদমির সঙ্গে দেখা করতে নেমে গেলেন। এইমাত্র।

বুঝলাম, তেনজিং সত্যিই অসুস্থ।

দুর্বল শরীরে খাড়া পাহাড় চেস্ট ক্লিনিক, পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনে উঠে দুর্বলতর হয়েছিলাম; কিন্তু ক্লান্তির আর অবধি থাকল না যখন দেখলাম লেবং ঘোড়দৌড় মাঠই আছে, বাঙালী রাজ-পুরুষেরা 'রাজশক্তি' হয়ে এসে এখানকার অধ্যায়টি যথাযথ লিখতে পারেন নি এই মাঠে। ঘোড়া আর জুয়াকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি এণ্ডার্সনী দাপটের মাঠ।

দার্জিলিংয়ের একমাত্র সৌন্দর্য মনে আছে বহু দূরে দেখা ঝলমলে রুপোর কাঞ্চনজঙ্ঘা—আর তো কিছু মনে নেই।
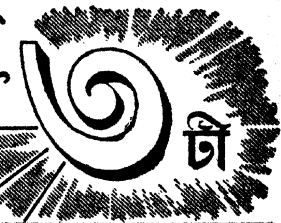
চন্দন কাঠ

অনিল চন্দ্র দলুই

মাইনের আড়াই শো টাকা রমাপতি মলিনার হাতে তুলে দেন। নির্বিরোধ মানুষ তিনি। কোনক্রমে রাস্তাটুকু পার হয়ে আসেন—বারে বারে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে পিছনে তাকান। একটা ভীতি শির্‌শির্‌ করে বয়ে যেতে থাকে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বাড়ি এসে স্বস্তির শ্বাস ফেলেন। শরীর এবং মনটা কেমন হাল্‌কা-হাল্‌কা লাগে তাঁর।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রমাপতি বলেন, 'এ মাসে তোমার কোন ওজর-আপত্তি চলবে না। সংসার চলুক আর না-চলুক, তোমাকে এবার যেতেই হবে। এবার আর 'না' করতে পারবে না।'

মলিনা বেলনটা চালাতে চালাতে মুখ না তুলেই বলেন, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে মানে?'—তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রমাপতির।

এবার একটু হেসে বলেন মলিনা, 'দেখা যাবে মানে, যাব।'

'হ্যাঁ, যাওয়া চাই।'

একটু পরে মলিনা বলেন, 'তোমার হঠাৎ-রেগে-ওঠা ব্যামোটা এখনও গেল না!'

'হঠাৎ রেগে-ওঠা মানে? তুমি কি বলতে চাও, তোমার কিছু হয়নি? বেশ বহাল তবিয়তে আছো?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'তোমার 'মনে হওয়াটা' সকলের মনে হওয়া নয়। আমায় বলবে সত্যি করে, আর কতকাল ফাঁকি দেবে?'

'ফাঁকি!—' বিস্মিত হয় মলিনা।

'ফাঁকি ছাড়া আর কি! রোজ সন্ধ্যে-বেলা ঘুস্‌ঘুস্‌ জ্বর হচ্ছে, মাঝে মাঝে খক্‌ খক্‌ কাশছ, চোখের কোণে কালি পড়ছে—এতেও যদি বলো তোমার শরীর বেশ ভালো আছে তাহলে ফাঁকি ছাড়া আর কি বলতে পারি?'

মলিনা আবার হাসেন। একটু—ম্লান। বলেন, 'ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'বেশ লাগুক। তবে কাল যেতে-ই হবে।'

রমাপতি উঠে যান। লম্ফটার লম্বা শিখা কাঁপতে থাকে। উনুনের লাল আভা লাগে মলিনার মুখে। ও-পাশের ঘর থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ ভেসে আসে। তবু এপাশটা, এ রান্নাঘরের দিক্‌টা, কেমন যেন একটু ঝিমিয়ে পড়ে—স্তব্ধতা যেন আল্‌তো পায়ে নেমে আসে ধীরে ধীরে।

সত্যিই শরীর খারাপ হচ্ছে মলিনার, তা তিনি বোঝেন। আগেকার শক্তিতে ভাটা পড়েছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আজকাল কিসের একটা ক্লান্তি জড়িয়ে থাকে দেহের প্রতিটি কোষে কোষে।

বেশ বুঝতে পারেন, শরীরে তাঁর ভাঙন ধরেছে। গভীর অবসাদে শরীর-মন আর কাজ করতে চায় না। কিন্তু সংসারের কাছে ছুটি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই; সংসার তাঁকে চালাতে হবে-ই।

বিরাম চাই মলিনার। কিন্তু অবসর কোথা? সংসারে কাজ করার লোক তিনি একক। আগে অবশ্য বরুণা-অরুণা ছিল। তাঁর কাজের অনেক তারা করে দিত। এখনকার মত সব কাজ নিজের হাতে তাঁকে করতে হতো না। আজো সেজ মেয়ে করুণা কাজ করবার জন্যে এগিয়ে আসে। মলিনাই তাকে কাজ করতে দেন না। বাঙালীর ঘরে যখন মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে তখন সারাজীবন তো সংসারের জোয়াল বইতেই হবে, জিরোনের সময় পাবে না। যে ক-টা দিন বাপের বাড়ি থাকে সে ক-টা দিনই ওদের ছুটি। তাই তাঁকে সারাদিন চরকির মত ঘুরতে হয়; নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পান না।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর দিনের পর সন্ধ্যের দিকে শরীরটা ঝিমিয়ে আসে। কপালটা ধীরে ধীরে গরম হয়ে ওঠে। দেহের পেশীগুলো কাহিল হয়ে আসে। তা বলে একে অসুখ বলতে তাঁর বিশেষ আপত্তি। দীর্ঘদিনের একটানা খাটুনির পর কার না শরীরে ক্লান্তি নেমে আসে? এক নাগাড়ে ছোটার পর তেজী ঘোড়াও হাঁপাতে থাকে। তবু রমাপতির কথায় তাঁকে রাজি হতে হয়, না হলে তাঁর রাগ পড়ে না। ডাক্তার দেখাতে মলিনার এক একবার ইচ্ছে জাগে। গভীর ক্লান্তিকর মুহূর্তে তাঁর এ ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। দেহ-মনের অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার আকুল আশায় সমগ্র সত্তা উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু সংসারের কথা মনে পড়লে এ-ভাব বেশীক্ষণ থাকে না। রমাপতির আড়াই-শো টাকা এক ফুঁয়ে উড়ে যায়। তারপর নিয়মিত চিন্তা করতে হয়, কবে আবার মাসের পয়লা আসবে এবং কেমন করে বাকি দিনগুলো কাটবে।

মেয়ে দুটোকে পার করতে তাঁদের হাড়ে কালি পড়েছে। সে-কালি যদি দেহের ওপর কিছুমাত্র কালো ছাপ ফেলে থাকে তাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হবার কারণ দেখেন না মলিনা। বিগত দিনের ইতিহাস যদি তার চরণ-চিহ্ন আঁকে, আঁকুক না। ক্ষতি কি! জীবনের চলার পথে ওরা শিলালিপি হয়ে থাকে।

রাতে রমাপতি বলেন, 'তোমার শরীরের কি যে হাল হয়েছে তা কি দেখতে পাওনা? আয়নার সামনে কতোকাল দাঁড়াওনি বলোত?

'বুড়ো বয়সে আবার ফিরিয়ে চুল বাঁধবো না কি যে আয়নার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকব? বয়স বাড়ছে না কমছে?'

'আমি ও-কথা বলছি না। তোমার শরীরের দিকে তাকিয়েছো কোনদিন?'

'বয়েস হলে কি আর বাঁধুনি থাকে?'

'তুমি ফের এড়িয়ে যাচ্ছ। আমার কথা আশা করি তুমি বুঝতে পারছ, কিন্তু এমন ভান করছ যে, তুমি বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারছ না। লোক জেগে ঘুমুলে তাকে ঘুম থেকে তোলা যায় না—বুঝলে?'

মলিনা শুধু মুখ টিপে একটু হাসেন। কিছু বলেন না।

'হাসছ আবার?'

আরো হেসে বলেন মলিনা, 'কাঁদব না কি?'

রমাপতি আর কিছু বলেন না। মলিনাকে ঠিক এরকম দেখে আসছেন বিয়ের সময় থেকে। কিছুতেই নিজের দিকে তাকাবেন না। এ নিয়ে কত শতবার তাঁদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। এমন কি মাঝে মাঝে দিন কয়েকের জন্যে কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

রমাপতি শুয়ে পড়েন।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে মলিনা ভাবেন, কোনদিক দিয়ে কথাটা রমাপতির কাছে পাড়বেন। মেজ মেয়ে অরুণা জানিয়েছে, শীতের তত্ত্ব করেনি বলে তার বড়-জা তাকে গঞ্জনা দিচ্ছে দিনরাত। মেয়েদের সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারেন না মলিনা। তিনি তো জানেন, গরীবের ঘরের মেয়েরা কতো অত্যাচারের পর তবে বাপ-মায়ের কাছে মুখ ফুটে কিছু চায়। তাঁরও তো একদিন অমন গেছে।

অথচ একথা বলতে গেলে রমাপতি রেগে যাবেন। সংসার-ই চলে না আলোভাবে অথচ মাসের-পর-মাস একটা-না-একটা বাড়তি খরচ লেগেই আছে। ঘর-সংসার করতে গেলে সে সব উড়ো ঝঞ্ঝাটকে ছেঁটে ফেলা যায় না। ভালমানুষ রমাপতি এতো সব বুঝতে চান না। মলিনার সম্ভাব্য অসুখের চিকিৎসার জন্যে বহুদিন থেকে রমাপতি চেষ্টা করে আসছেন কিন্তু কিছুতেই আর ঘটে উঠছে না।

রমাপতির দিকে তাকিয়ে মলিনার মন ব্যথায় ভরে ওঠে। কতো সরল। কিছু

বোঝেন না সংসারের। মলিনার প্রতি তাঁর ভালবাসা অসীম তা তিনি বুঝতে পারেন। স্বামীর এ-প্রেম যে কোন স্ত্রীর-ই অমূল্য সম্পদ। সব বোঝেন মলিনা তবু তাঁকে রমাপতিকে ঠকিয়ে রাখতে হয়। কোন উপায় নেই। তিনি আজ জড়িয়ে পড়েছেন সংসারের বেড়া-জালে।

পরের দিন রবিবার।

সকালে উঠেই রমাপতি তাগাদা দেন, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, বেলা ন-টার মধ্যে যেতে হবে?'

মলিনা আকাশ থেকে পড়েন, 'এ সাত-সকালে কোথায় যেতে হবে?'

'ডাক্তারখানা।'

'পাগল হয়েছো!—' মলিনা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এড়িয়ে যেতে চান রমাপতিকে। চলে আসেন রান্নাঘরে।

রমাপতি আজ একেবারে নাছোড়-বান্দা। রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ান। দিনের পর দিন এমনি করে তিলে তিলে ক্ষয়ে যেতে দেবেন না মলিনাকে। আঘাতে আঘাতে তীরের যদি ভাঙন জেগে থাকে তবে তাতে শক্ত বাঁধ দিতে হবে। আজ কোন বাধা-বন্ধন মানতে তিনি নারাজ।

'তোমার মতলব কি—' কঠিন স্বর রমাপতির।

মলিনা চোখ তোলেন—চৌকাঠের বাইরে পাথরের মত কঠিন রমাপতি দাঁড়িয়ে, কপালের চামড়ায় পড়েছে সেই চিরচেনা তিন ভাঁজ—বার্ধক্যের নয়, ক্রোধের। দীর্ঘ তিরিশ বছরের চেনা চিহ্ন।

'ডাক্তার দেখাবে কি জন্যে? কি হয়েছে আমার?'

'ডাক্তারী তো পড়িনি, তাহলে বলতে পারতাম। নিজে পারব না, তাইতো ডাক্তারের দরকার।'

মলিনা বোঝেন, রমাপতি আজ কোনো বারণ শুনবেন না। অথচ অরুণার চিঠির ভাষা যেন মুখর হয়ে ওঠে, তাঁর কানের কাছে; দারুণ আর্তির মত বাজে তাঁর বুকে। ডাক্তারের কাছে গেলেই ছত্রিশ ফয়জৎ হবে তা তাঁর জানা আছে। তাই বাধা দিতে চান রমাপতিকে, 'ডাক্তারের খরচ জোগাবে কে?'

'যে জোগায়।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমাকে ডাক্তার দেখিয়ে টাকা খরচ করার চেয়ে তোমার টাকাগুলোর অন্যভাবে সদ্‌গতি করা যেতে পারে।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়। সংসারের দিকে তো কোনদিন চোখ মেলে তাকাও না তাহ'লে বুঝতে কতো দিকে কতো রকম খরচ থাকে।'

রমাপতি বোঝেন, মলিনা কথা ঘোরাচ্ছেন। তবু প্রশ্ন করেন, 'কি রকম?'

'কাল অরুণার চিঠি এসেছে।'

'কি লিখেছে?'

'লিখেছে, মা, বাবা কবে শীতের তত্ত্ব করবে? শীত যে যেতে বসলো।'

রক্ত চড়ে যায় রমাপতির মাথায়। মলিনার ডাক্তারখানায় যাবার আপত্তি এখন জলের মত পরিষ্কার হয় তাঁর কাছে। সংসারের সকলে যেন দলবেঁধে ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর বিরুদ্ধে। মলিনাকে বাঁচাবার সব চেষ্টা এরা বার বার ব্যর্থ করে দিচ্ছে। সকলের বিরুদ্ধে তাঁর মনটা বিষিয়ে ওঠে। বলেন তীব্র কণ্ঠে, 'চার বছর বিয়ে হয়েছে এখনো কেরানী বাপকে বছরের মধ্যে পয়ষট্টি বার তত্ত্ব করতে হবে? কি ভেবেছে? একটু কি বাপ-মায়ের দিকে চাইতে নেই? বিয়ে হলে মেয়েগুলো বাপ-মাকে দুয়ে নিতে পারলে আর কিছু চায় না। উকুনের জাত, গায়ে বসে রক্ত চুষতে একটুও বাধে না।'

রমাপতি তাজা আগ্নেয়গিরি। প্রবল চাপে মাথা গেছে উড়ে; বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ধোঁয়া আর কুচি পাথর; ঝরণার আকারে নেমেছে তপ্ত লাভার ধারা। চারিদিকে লেগেছে বহ্ন্যুৎসব!

মলিনা বলেন, 'মেয়েটাকে যা-তা বলো না। সে তো নিজে চায়নি, দেখোনা তার বড়-জা খোঁটা দিচ্ছে মেয়েটাকে। তাই না লিখেছে এ কথা। না হলে সে কি বোঝে না আমাদের অবস্থা?

'ওকালতি কোরো না। আমাদের অবস্থা বোঝবার জন্যে তার দিনরাত আর ঘুম হচ্ছে না। তুমি যাই বলো, তত্ত্ব-টত্ত্ব আমি করতে পারব না।'

'করবে না?'

'না।'

'মেয়েটা কি ভাববে বলোতো?'

'যা-ইচ্ছে-তাই ভাবুক। পারবো না, তা তোমাকে পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

রমাপতি আর দাঁড়ান না। যে বাঁধ বাঁধতে এসেছিলেন তা আরো ধসে গেছে কঠিন তরঙ্গাঘাতে। যাক্, সব যাক্। ভারবাহী পশুর মত ঢিমে-তেতালা তালে চলার চেয়ে রাস্তায় পা ভেঙে পড়ে যাওয়া ঢের ভালো।

মলিনা কি করেন! বড়ো গাছে যে ঝড় বেশী লাগবেই। নিজের দিকে তাকাতে গেলে চলে না, যারা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় বেঁধেছে তাদের রক্ষা করা কর্তব্য, তাদের সব রকম আপদ-বিপদ থেকে যে তাঁকেই বাঁচাতে হবে।

অরুণার তত্ত্ব পাঠাতে হবে দু-এক-দিনের মধ্যে। এ সংসারে মলিনা বহুদিন এসেছেন। চিরটা কাল-ই দেখে আসছেন, সংসারের মধ্যে টানাটানি লেগে রয়েছে। স্বচ্ছলতার মুখ কোনোদিন দেখেননি। তার জন্যে তাঁর মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই। এই অভাবের মাঝেও জীবন কাটিয়ে তিনি একটি গভীর পরিতৃপ্তি অন্তরের মধ্যে অনুভব করেন। মনে তাঁর এক-দিনের জন্যেও কোনো গ্লানি জাগেনি দারিদ্র্যের কষার নির্মম আঘাতে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্য মন্থন করে যে-অমৃত উঠেছে তা তিনি পান করেছেন আকণ্ঠ।

সংসার ঠিক চলে যাবে, তা বলে মেয়েটা মুখ ফুটে চেয়ে পাবে না? না দিলে অরুণা কি ভাববে? বড়ো অভি-মানিনী মেয়ে সে। হয়ত আর আসতেই চাইবে না।

বড়ো ছেলে অমিতাভকে বাজারে পাঠান তত্ত্বের জিনিস কিনতে। বি এ পাশ ছেলে কিন্তু বেকার। দু' বছরে একটাও কাজ জুটলো না। চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি সে। হাসিখুশি ছেলেটা কেমন যেন মিইয়ে গেছে। ওর মুখের দিকে তাকালে মলিনা একটা ব্যথা অনুভব করেন। ভাবেন মনে মনে দিন কাল কী হলো? বেশী হিসেব-নিকেশ করবার শক্তি নেই তাঁর। চিরকাল, পৃথিবীটাকে সাদা চোখে দেখে এসেছেন, তাই আজ রঙীন পৃথিবীকে চিনতে ভুল হয়। হিসেবের খাতা যায় গরমিলে ভরে।

মেজ ছেলে এবার ইস্কুল ফাইনাল

পরীক্ষা দেবে। আসছে মাসে তার ফি দিতে হবে। ছোট দুটো ছেলে আর করুণার আছে ইস্কুল। এর ওপর আছে সংসারের ছোট-বড়ো নানা চাহিদা। অথচ জল তো এক কলসী, গড়াতে গড়াতে আর কতোক্ষণ থাকে!

রাত্রে মলিনা বলেন 'একটা কাজ করেছি, কিছু বলতে পাবে না কিন্তু!'

সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে রমাপতি বলেন হেসে 'আজ আবার গৌরচন্দ্রিকা কেন? গাওনা কি শুরু করো, অভয় দিচ্ছি।'

'তোমার সংসারের কিছু টাকা নিয়েছি।'

'বুঝেছি। আচ্ছা, না করলে কি চলতো না?'

'মেয়েটা চেয়েছে...'

কেমন যেন ভাঙা স্বর মলিনার। হ্যারিকেনের আলো ছায়া ফেলে এধারে-ওধারে—কালো কালো, আলোছায়ার এক বিচিত্র সাদাকালো নক্‌সা কেটে দেয়। মলিনার মুখ মলিন। পুরনো দিনের মলিনার কথা মনে পড়ে রমাপতির। কোন কথা বলতে পারেন না তিনি।

শুধু একটু পরে বলেন রমাপতি, 'এমনি করে নিজেকে কেন ক্ষয় করছ?'

ক্ষয়!—হাসেন মলিনা। পুরোনো হাসি।

'করুণা, তুই রান্নাঘরে কেনরে?'

রমাপতি আপিস থেকে ফিরেই করুণাকে প্রশ্ন করেন।

'মা-র যে অসুখ!'

'কোথা?'

'শুয়ে।'

রমাপতি ঘরে আসেন। পিলসুজের ওপর সন্ধ্যাদীপ জ্বলে। ম্লান ছায়া ছড়িয়ে থাকে ঘরের প্রতিটি কোণে কোণে। মলিনা শুয়ে, গায়ে কাঁথা চাপান। তিনি ধীরে ধীরে বসেন মলিনার শিয়রে। মাথায় রাখেন হাত।

হাতের স্পর্শে চম্‌কে ওঠেন মলিনা। মাথার কাছে রমাপতিকে বসে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানতে চেষ্টা করেন।

থাক।—বলেন রমাপতি।

'কখন এলে?'

উঠতে চান মলিনা, বাধা দেন রমাপতি। বলেন, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন? চুপ করে শোও তো।' তিনি মলিনার গায়ের কাঁথাটা ভালো করে টেনে দেন। দিনে দিনে ক্ষয়ে যাচ্ছেন মলিনা। শেষ হয়ে গেছে তাঁর শরীর। ফেলে-আসা জীবনের মলিনাকে খুঁজে পেতে চান রমাপতি। কঙ্কালের ওপর চামড়ার প্রলেপ—মলিনার কাঠামো। ইমারৎ কোথা? অতীত থেকে বর্তমানের প্রতিটি দিনের কথা স্মরণ করেন—কবে, কোথা, কোন্ পথের ধারে মলিনাকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। অন্ধের মত খুঁজে চলেন, হাতড়ে হাতড়ে, বারে বারে ধাক্কা খেয়ে পথের এপাশে-ওপাশে।

'চা খেয়েছ?'

'চুপ করে শোও।'

'ছাড়ো চা করে আনি।'

উঠে পড়েন মলিনা। সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে রমাপতির এক কাপ চা না হলে চলে না। দেহের ক্লান্তি ছাড়তে চায় না পীতাভ পানীয় পেটের মধ্যে না গেলে। তিরিশ বছরের একটানা অভ্যাস। মলিনা নিজের হাতে চা করে না দিলে রমাপতির তৃপ্তি হয় না।

মলিনা যখন আঁতুড় ঘরে থাকতেন রমাপতি বলতেন, 'তোমার চা-এ কি দাও বল ত?'

ঘরের মাঝ থেকে মলিনা বলতেন, 'কেন বলো ত?'

'জুৎ হয় না কেন পরের হাতের চা খেয়ে?'

'জানি না, যাও।'

হেসে বলতেন রমাপতি, আমি জানি কিন্তু!

'কেন?'

'তোমার হাত দুটোই মিষ্টি।'

কৃত্রিম কোপ কটাক্ষ হেনে বলতেন মলিনা, 'যাও!'

আজ রমাপতি বাধা দেন, 'না, যেতে হবে না। তোমার জ্বর এখনো ছাড়েনি।'

'ওঃ একটু জ্বর, তুমি সরো...'

হাসেন মলিনা—ফ্যাকাসে। হেসে ভোলাতে চান রমাপতিকে। এমনি হাসিতেই কতোদিন রমাপতিকে ভুলিয়েছেন, অভিনেত্রীর মত নিখুঁত সে-হাসি; কোনোদিন ধরা পড়েন নি রমাপতির কাছে। কিন্তু আজকের হাসি প্রদীপের চিল্‌তে আলোয় ব্যথায় করুণ হয়ে ওঠে। অন্তরের নিঃসীম ক্লান্তি যেন হাসির মাঝে ভেঙে ভেঙে পড়ে।

রমাপতি বলেন, 'দেখো আজ যদি উঠতে চেষ্টা করো তবে আমার মাথার দিব্যি। হেসে আর কতোদিন ভোলাবে? আমি কি কচি খোকা?'

দিব্যি শুনে শিথিল হয়ে আসেন মলিনা। প্রতি অঙ্গে অঙ্গে অবসাদের স্রোত বয়ে যায়। আজ আবার রমাপতি রেগেছেন। চুপ করে শুয়ে পড়েন। অভিনয় করে আজ আর রমাপতিকে ভোলাতে পারা যাবে না। তা ছাড়া শরীরটা যেন আজ আর উঠ্‌তে চাইছে না। এমনি শুয়ে থাকতেই ভালো লাগে।

তাকান রমাপতির মুখের দিকে। চোখ দুটো তাঁর ভরে ওঠে জলে। বলেন মলিনা, 'ছিঃ! কাঁদো কেন? আমার কি হয়েছে?'

'কেন আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ? কি অপরাধ করেছি আমি? কেন তুমি এমনি করে পালাচ্ছ?'

টপ্ টপ্ করে জল পড়ে মলিনার কপালে। তাঁরও চোখের কানায় কানায় আসে জলের জোয়ার। তাকাতে পারেন না রমাপতির মুখের দিকে। প্রদীপের একটু আলো পড়ে রমাপতির মুখে। কিছু বলেন না মলিনা, চুপ করে থাকেন।

'তোমাকে এ মাসে ডাক্তারখানায় যেতে হবে।'

গত মাসেও রমাপতি বলেছেন, কিন্তু মলিনা যাননি। মেজছেলের পরীক্ষার ফি দিতে হয়েছে গেল মাসে। মলিনা কোনো দিক থেকে কোনো রকমে সুযোগ করে উঠতে পারেন না। অবিশ্যি চেষ্টা যে খুব বেশী করেছেন, এমন না। আজ আর মলিনা আপত্তি করতে পারেন না। রমাপতির চোখের জল আজ তাঁকে বড় বিচলিত করে তোলে। না, বাঁচবার তিনি চেষ্টা করবেন। আর রমাপতিকে ফাঁকি দেবেন না।

'যাবে তো?'

মাথা নাড়েন মলিনা—হ্যাঁ।

দুপুর গড়িয়ে চলে। নীল আকাশে চলে রোদের খেলা। বসন্তের বাতাস বয়ে যায় ধীরে। কোথায় একটা ঘুঘু একটানা ডেকে যায়। চারিদিকের স্তব্ধতার মাঝে ঐ ডাকটাই একমাত্র প্রাণের স্পন্দন তোলে। দূরে নীল আকাশ আঙিনায় একটা চিল পাক খেয়ে ফেরে—ওটাকে একটা চলন্ত কলঙ্কের মত দেখায়। মলিনা শুয়ে শুয়ে ভাবেন, সে-সন্ধ্যার কথা। রমাপতির দু-ফোঁটা চোখের জল তাঁর অন্তরে শেলের আঘাত করে। তিনি সৌভাগ্যবতী। এমন স্বামী ক-টা মেয়ের ভাগ্যে জোটে! কিন্তু তাঁকেই তিনি প্রতারণা করে আসছেন।

কদিন থেকে তাঁর কাশিটা বেড়েছে। কাশতে কাশতে বুকের মাঝে হাঁফ ধরে। দম ফুরিয়ে আসে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় শরীর কুঁকড়ে যায়। আজ শুয়ে থাকতে থাকতে কাশির বেগ আসে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাশতে থাকেন। সারা শরীরটা থর্ থর্ করে কাঁপে। তিনি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েন আবার। কিন্তু কাপড়ের দিকে নজর পড়তে তিনি চমকে ওঠেন—এ কি রক্ত! কাপড়ের ওপর লাল রক্তের দাগ। আর কোন সন্দেহ নেই। এবার ডাক এসেছে। দেহের কোষে কোষে বাসা বেঁধেছে মৃত্যুর দূত!

সারা সংসারের খুঁটিনাটি জিনিস তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাঁচার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এ সাজানো সংসার ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। এ মাসে তিনি ডাক্তারখানায় যাবেন। মন তিনি স্থির করে ফেলেন, না আর কোন ওজর আপত্তি করবেন না। মরতে কার-ই বা ভালো লাগে? আর মাত্র তিন দিন, তারপর মাসের পয়লা। এ ক-টা দিন ভালো থাকতে হবে।

বিকেলবেলা পিওন চিঠি দিয়ে যায়। বরুণার চিঠি। লিখেছেঃ মা, আমার শ্বশুর কাল মারা গেছেন। তোমাকে আগে থেকে জানালাম।

আগে থেকে জানাবার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না মলিনার—ঘাটে তুলতে হবে। হিসেব করে দেখেন, মাত্র দিন আটেক বাকি আছে। এর মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে।

অথচ কি-ই বা ব্যবস্থা করতে পারেন তিনি? এ কথা রমাপতিকে বললে তিনি তা কানে তুলবেন না। শুধু শুধু মেয়েদের ওপর কটূক্তি বর্ষণ করবেন। কিন্তু নিজের শরীরের কথাও চিন্তা করেন মলিনা। বুঝতে পারেন সহজেই, আরো এক মাস অপেক্ষা করতে গেলে শরীরের দশা কি হবে। কিন্তু বরুণা ঘাটে উঠবে কি করে? অন্যান্য বৌয়েদের বাপের বাড়ি থেকে কাপড় আসবে আর বরুণার যাবে না এমন কথা ভাবতে পারেন না মলিনা। নাঃ! ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। কুটুমের কাছে মাথা নোয়াতে পারবেন না।

রাতে রমাপতি বলেন, 'আজ নতুন জিনিস দেখছি যে!'

'কি?'

'পানের রাঙা রসে ঠোঁট রাঙিয়েছ। যেদিন মানাত সেদিন বলে বলে হেরে গেছি। আজ হঠাৎ এ শখ কেন?'

মলিনা একটু কেঁপে ওঠেন। হেসে বলেন, 'ঠিক শখ নয়, এখন ভেবে দেখেছি ভাত খাবার পর একটা পান খাওয়া ভালো।'

'বড্ড দেরীতে বুঝেছ।'

'আফশোষ হচ্ছে?'—রসিকতা করেন মলিনা।

'যদি বলি, হ্যাঁ।'

হঠাৎ কাশির বেগ আসে মলিনার। বুক ধরে বসে পড়েন। মুখে কাপড় চাপা দেন। সমস্ত দেহে কাঁপন তুলে কাশির দমক আসে। থর্ থর্ কাঁপে তাঁর ক্ষীণ দেহ।

রমাপতি তাড়াতাড়ি ধরেন মলিনাকে। মাথায় পাখার বাতাস দেন। কাশি কমে আসে। ধরে ধরে শুইয়ে দেন রমাপতি মলিনাকে বিছানায়।

একটু জল......

তখনো হাঁফাতে থাকেন মলিনা।

জল দেন রমাপতি। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে, মলিনার কাপড়ে লাল দাগ। শিউরে ওঠেন তিনি। বলেন, 'রক্ত!'

চমকে ওঠেন মলিনা, 'কই?'

'তোমার কাপড়ে......'

হাসেন মলিনা। 'তোমার চোখে এর মধ্যে ছানি পড়ল নাকি? রক্ত কোথা, পানের রস। আলোটা নিবিয়ে দাও। সহ্য করতে পারছি না।'

'থাক না জ্বালা।'

'চোখে লাগছে, ঘুম হবে না।' মলিনা হঠাৎ জোর দিয়ে বলেন।

আলো নিভিয়ে দেন রমাপতি।

মলিনার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন আস্তে আস্তে।

আঁধার ভরা ঘর। আজ আর রমাপতির চোখের জল মলিনার চোখে পড়বে না। বড় দুর্বল কোরে দেয় দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু।

শীতল হাত চলাফেরা করে মলিনার কপালের ওপর। যেন ছোট্ট ছেলে রমাপতি। কত সহজে ঠকেন। দিনের পর দিন। তাঁর চোখ জ্বালা করে আসে। ধীরে ধীরে রমাপতির হাতটা চেপে ধরেন তাঁর ক্ষীয়মান শীর্ণ হাত দিয়ে! আর রমাপতি অন্ধকারেই ভাবেন, পানের রস অতো লাল হয় কি করে! মলিনাই বা হঠাৎ পানের নেশা শুরু করলে কেন?

রামকৃষ্ণ মিশনের নামকরণ ও নিয়মাবলী

শ্রীসরলাবালা সরকার

শ্রী শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে হইল না, হইল দাঁয়েদের বাগানবাড়িতে। ইহাতে কালীবাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল কি না, অনেকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আইনত মালিক যিনি তিনি যেদিক দিয়া বিষয়টির মীমাংসা করিয়াছিলেন, আরও একটি দিক আছে সে বিষয়ে চিন্তা করেন নাই।

আইন সর্বত্রই আছে, এমন কি সর্বত্যাগী সাধুগণ যখন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, সেখানেও নিয়মাবলীর প্রয়োজন আছে। স্বামীজী এপ্রিল মাসের শেষদিকে দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আলমবাজারেই আসিয়া উঠিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন কতকগুলি ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়াছিলেন এবং তিনি ফিরিবার পরেও আরও দু-একজন যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলে আলমবাজারেই আছেন। এতজন সাধু একত্র হইয়াছেন দেখিয়া স্বামীজীর মনে হইয়াছিল, এখন একটা নিয়মাবলী প্রয়োজন।

স্বামীজী চিরদিনই নিয়মের পক্ষপাতী, তা ছাড়া লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এবং সর্বোপরি তিনি যে আর বেশী দিন ইহলোকে থাকিবেন না তাহাও তিনি জানিতেন।

স্বামীজী নিয়মাবলী রচনা করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচারী সুধীর তাহা লিখিয়া লইলেন। ব্রহ্মচারী সুধীরই পরে স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

১৩২০ সালের আষাঢ়ের 'উদ্বোধনে' স্বামী শুদ্ধানন্দ 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ হইতে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচদিন হইল বাড়ি ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, ও সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলসিঙ্গা পেরুমল, কিডি ও জিজি প্রভৃতি।

"স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েক দিন হইল স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামীজীকে বলিলেন, "এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।"

স্বামীজী তাঁর অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ,—একটা নিয়ম করা ভাল বৈকি। ডাক্ সকলকে।" সকলে আসিয়া ঘরটিতে জমা হইলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন,—"একজন কেউ লিখ্তে থাক্, আমি বলি।" তখন এ উহাকে সাম্‌নে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেহ অগ্রসর হয়না। শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণত একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধন ভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার,—আর লেখাপড়াটা—উহাতে মান যশের ইচ্ছা আসিবে। যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচার কার্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন তো নাই-ই, বরং উহা হানিকর, এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরোয়া, আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম।

স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি থাক্‌বে?' (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারীরূপে তথায় থাকিব অথবা দুই এক দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব। সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন "হাঁ"। তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম।

নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কুনিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের দ্বারা সেই কুনিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

এরপর যে নিয়মগুলি লেখা হ'ল সেগুলি হচ্ছেঃ—

১। আলমবাজারের এই মঠই প্রধান মঠ-

রূপে নির্ধারিত হইল। ইহার আনুষঙ্গিক সমুদয় মঠকেই ইহার নিয়মাবলী অনুসারে চলিতে হইবে।

২। এই মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মাত্র এই মঠ সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ বলিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও প্রশিষ্য-গণকে বুঝিতে হইবে।

৩। সমুদয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মিলিয়া একটি প্রধান অধ্যক্ষ নির্ধারিত করিবেন।

৪। উক্ত প্রধানাধ্যক্ষের সহিত এক দুই বা ততোধিক সহকারী নির্ধারিত হইবেন।

৫। কোন বিষয় নির্ধারিত করিতে হইলে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের $\frac{2}{3}$ অংশের মত হইলেই চলিবে। আপাতত চার বৎসরের জন্য প্রধান অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারীরা সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অমত সত্ত্বেও কার্য করিতে পারিবেন।

৬। প্রত্যেক সন্ন্যাসী দুইটি ও প্রত্যেক ব্রহ্মচারী একটি ভোট দিতে পারিবেন।

৭। মঠে তামাক ব্যতীত অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা নিষেধ। সকলেই পরস্পর সদ্ভাবে কথাবার্তা কহিবেন। যখন কাহারও কিছু আবশ্যক হইবে তিনি কর্মাধ্যক্ষকে জানাইবেন।

৮। ব্রহ্মচারিগণ সন্ন্যাসিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

৯। সকল ধর্ম, ধর্মপ্রচারক ও সকল ধর্মের উপাস্য দেবতার প্রতিই যথাযোগ্য ভক্তি-সম্মান রাখিতে হইবে।

১০। যথাসম্ভব সকলেই প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ করিবেন। গাত্রবস্ত্রাদি সমুদয় পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

১১। কর্মাধ্যক্ষ দেখিবেন যেন সকলে সমুদয় পরিষ্কার রাখেন এবং যথাকালে আহারাদি পান।

১২। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলকে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করিতে হইবে।

১৩। মঠাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারী দেখিবেন যেন সকলে প্রাতঃকালে স্নানাদির পর নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী জপ ধ্যান ও পূজাদি করিতেছেন।

১৪। যথাসম্ভব সকলে একত্র আহার করিবেন। তৎপরে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিবেন।

১৫। তৎপরে প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী পৃথক পৃথক বা দুই তিন জনে একত্রে মিলিত হইয়া শাস্ত্র পাঠ করিবেন।

১৬। অপরাহ্ণে পুনরায় পাঠ হইবে। তাহাতে একজন পাঠক থাকিবেন ও সকলেই শুনিবেন।

১৭। সন্ধ্যার পর পুনরায় জপ, ধ্যান ও স্তব পাঠাদি হইবে।

১৮। সমুদয় কার্য ও কথাবার্তা শান্ত-ভাবে করিতে হইবে।

১৯। যাঁহারা বাহিরে ধর্মপ্রচার করিতে যাইবেন তাঁহারা এখানকার মত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা প্রচার বা ভ্রমণ করিতে বাহিরে যাইবেন, তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদের প্রচার বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বলিত অন্যূন একখানি পত্র মঠে লিখিবেন। যাঁহারা চিঠি পত্রাদি রাখিবেন তাঁহারা ঐগুলি বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন ও মঠাধ্যক্ষের আদেশ ও উপদেশ মত তাঁহা-দিগকে পত্র লিখিবেন ও তাহার প্রতিলিপি রাখিবেন।

২০। বাহিরের লোক বাহিরের ঘরে বসিয়া যাঁহার সহিত আবশ্যক কথাবার্তাদি কহিবেন।

২১। মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেহ মঠে রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন না।

২২। মঠের যে সকল কার্য সকলকে সমবেত হইয়া করিতে হইবে সেই সকল কার্যের পূর্বে ঘণ্টা বাজাইতে হইবে।

২৩। আবশ্যক মত এই সকল নিয়মের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে পারিবে।

মঠের নিয়ম অনুসারে সুধীন মহা-রাজের স্বহস্তে লিখিত এই নিয়মগুলি আজিও যত্নের সহিত রক্ষিত আছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সব গুরুতর বিষয়ে একটি-মাত্র শব্দের পরিবর্তনও সমস্ত বিষয়েরই পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। অনেকে অভিযোগ করেন যে, এই নিয়মাবলী দুই হইতে একটি শব্দ পরে পরিবর্তিত করিয়া তাহার স্থলে অন্য শব্দ বসানো হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, সেরূপ হওয়া কোন কারণেই সম্ভব নয়, কেননা সত্যের উপরেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভিত্তি স্থাপিত। এবং স্বামীজী যাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "তাঁহার বাণী এবং তিনি স্বয়ং" সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—তিনি যে কথাটি উচ্চারণ করিতেন—যেভাবেই তাহা উচ্চারণ করুন না কেন, তাহাই কার্যত ফলবতী হইত, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইত না।

স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহার ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

> তারপর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান জ্ঞান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্র-গ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করিয়া "ডেলসার্ট" ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন "দ্যাখ্, একটু দেখেশুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ্—দেখিস যদি কোন নিয়ম negative (নেতি-বাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive করে দিবি

এই সময় স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করিবার

উদ্যোগ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বলরামবাবুর বাড়িতে একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ শিষ্যগণকে আহ্বান করা হয়। এই সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক গঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী পুস্তকে যেভাবে বিবরণ লেখা হইয়াছিল, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

উদ্‌যোগ সভা, শনিবার ১লা মে ১৮৯৭ খৃঃ (Original Proceedings Book হইতে বাংলায় অনুবাদ) "১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মে তারিখে সন্ধ্যার সময় কলিকাতা ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীট 'বলরামবাবুর বসত বাটীতে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থশিষ্য ও ভক্তগণের এক সভা হয়।

আলমবাজার মঠের কতকগুলি সন্ন্যাসীও ঐ সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের আদর্শ, উপদেশ ও নীতির প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়ায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসার হওয়ায় ঐ কার্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন বাঞ্ছনীয় বোধ হয় এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্র —যেখানে সকলে নিয়মিতভাবে মিলিত হইতে পারেন,—স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়ঃ—

১। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান।

২। পরমহংসদেবের উপদেশাবলী ও আদর্শ যাহাতে জনসাধারণ অবগত হয় তাহার উপায় নির্ধারণ।

৩। এই কার্যের অধিকতর প্রসারকল্পে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান (Sister bodies) সমূহের সঙ্গে কর্মপন্থার আলোচনা। অন্যান্য বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও পরমহংসদেবের প্রতি এবং তাঁর উপদেশের উপর শ্রদ্ধাই যাঁদের একমাত্র মিলন ক্ষেত্র এমন সকল লোককে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করে একটি সাধারণ সঙ্ঘ স্থাপনের ব্যবস্থা হল।

যাঁরা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নিয়ে একটি কার্য-পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা হয় এবং বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য খরচের জন্য একটা চাঁদার তালিকাও করা হল।

স্থির হল যে [illegible]

মহাশয়ের বাড়িতে সমিতির সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন হবে।

সমিতির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও পরিচালনার নিয়মাদির আলোচনা ও নির্ধারণের জন্য আগামী বুধবার সন্ধ্যায় কার্যপরিচালক-মণ্ডলীর একটি প্রাথমিক সভা হবে ইহাও স্থির হল।

প্রায় চব্বিশ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বুধবারের সভার কার্যবিবরণী।

বুধবার, ৫ই মে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন

স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে সমিতির নাম, উদ্দেশ্য, কার্য-প্রণালী এবং পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী নির্ধারিত হইল।

সেগুলি এইঃ—

নামঃ—রামকৃষ্ণ মিশন।

উদ্দেশ্যঃ—মানবের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক প্রয়োজনে সেই সকল তত্ত্ব যাহাতে কার্যত প্রযুক্ত হয় সে বিষয়ে সাহায্য করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

মিশন বা ব্রতঃ—পৃথিবীর নানা ধর্মমতকে সেই এক চিরন্তন সার্বভৌমিক ধর্মেরই রূপান্তর মাত্র জেনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করে গিয়েছেন তার অনুশীলনই হল এই সমিতির মিশন বা ব্রত।

কার্যপ্রণালীঃ—লৌকিক ও পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষাদান করবার উপযুক্ত লোক তৈয়ার করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেই সকল কেন্দ্রে শিল্প ও কলাবিদ্যাকে উৎসাহদান এবং বেদান্ত ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা জনসমাজে প্রবর্তন করাই হল এই সমিতির কার্যপ্রণালী।

ভারতবর্ষে কাজঃ—জনসাধারণকে শিক্ষাদান করবার উপযুক্ত এমন সব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিক্ষক তৈয়ার করবার জন্য সমগ্র দেশের বড় বড় শহরে কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেই সকল শিক্ষকগণকে দেশের বিভিন্ন অংশে (যাতে তাঁরা জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারেন) পাঠাবার ব্যবস্থা করাই হল ভারতবর্ষের মিশনের কাজ।

বিদেশে কাজঃ—ভারতের বাহিরের দেশ-সমূহে প্রচারক প্রেরণ, ভারতে স্থাপিত কেন্দ্র-গুলির সঙ্গে ভারত বহির্ভূত দেশসমূহের ইতিপূর্বেই স্থাপিত কেন্দ্রগুলির সহানুভূতি ও সহযোগিতা আনয়ন করা এবং নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপন করা।

সমিতির নিয়মাবলীঃ—

মিশনের কলিকাতা কেন্দ্র পরিচালনের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

১। যিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে (মিশনে) বিশ্বাসী এবং সেই আদর্শের প্রসারকল্পে সহযোগিতা করছেন এবং করবার জন্য যিনি প্রস্তুত এবং যিনি সৎজীবন যাপনের চেষ্টা করছেন তিনিই—অন্য সভ্যরা আপত্তি না করলে এই সমিতির সভ্য হবার অধিকারী।

২। যদি কেহ বাস্তবিকই অপারক হন, তিনি ছাড়া আর সকল সভ্যকেই মাসিক আট আনা করে চাঁদা দিতে হবে।

৩। প্রত্যেক শাখার সভাপতির, সেই সেই শাখার যে কর্মপদ্ধতি তা অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা থাকবে। (অর্থাৎ শাখা কেন্দ্রের সভাপতির সে বিষয়ে স্বাধীনতা থাকবে।)

৪। কার্যপরিচালকমণ্ডলীর, সম্পাদকগণের সহায়ে সমিতির সভা আহ্বান করবার ও কোষাধ্যক্ষগণের সহায়ে অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা থাকবে।

৫। প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬৷৷টার সময় বাগবাজার ১৩নং বোসপাড়া লেনে সমিতির সভা হবে।

"স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন।

"স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র অ্যাটর্নি মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এবং বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার আণ্ডার সেক্রেটারী এবং শিষ্য-শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। (স্বামী শিষ্য সংবাদ ৭৬ পৃঃ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে ব্রহ্মচারী কপিল কর্তৃক বাংলা ১৩১৯ সালে প্রকাশিত)।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। উদ্যোগ সভার তারিখ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ১লা মে এবং মিশনের নামকরণ এবং সাধারণ সভাপতি ও কার্যপরিচালকমণ্ডলী প্রভৃতি নির্বাচন ১৮৯৭ খৃঃ ৫ই মে তারিখে হয়। এখানে দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল ইংরেজী বিবরণীটিও দেওয়া হইল।

"Wednesday, 5th May, 1897"

2nd meeting of the Association.

Under the Presidency of Swami Vivekananda the name, object, method of work of the Association and the Rules for its guidance were fixed upon. These were the following:—

Name :—The Ramakrishna Mission.

Object :—The object of the Society is to propagate the principles propounded by Sri Ramakrishna and illustrated by his own life for the benefit of humanity and to help mankind in the practical application of those principles in their spiritual, intellectual and physical needs.

The mission :—The mission of this society is to carry on the work, inaugurated by Sri Ramakrishna, of fraternising the various creeds of the world knowing them to be only phases of one eternal universal religion.

Method Of Work :—The method of work is by starting centres in different places to train spiritual and secular educations and by encouraging arts, industries and by popularizing the study of the Vedanta and other systems of spiritual thought as interpreted by the life of Sri Ramakrishna.

The Work In India :—The work in India is by starting centres in the capitals of the Empire to train Sannyasins (ascetics) and grihasthas (House-holders) as educators of the people and to enable these teachers to reach the people by making them visit different parts of the country.

Foreign Work :—To send missionaries to various foreign countries to bring the centres already existing in countries outside of India in sympathy and co-operation with those existing in India and to start other centres.

The Rules of the Association.

The following Rules were unanimously adopted for the guidance of the Calcutta Centre of the Mission:—

(1) Any one who believes in the Mission of Sri Ramakrishna, who is ready to co-operate for the spread of that mission and who endeavours to lead a moral life, would be eligible to the membership of this society, the other members not objecting.

(2) The members should pay a subscription not less than eight annas per month unless any one is specially incapable.

(3) The President of every branch shall have the power of calling meetings through the Secretaries and collecting funds through the treasurer.

(4) A meeting should be held every Sunday at 6-30 P.M. at the premises of No. 13, Bosepara Lane, Baghbazar.

Swami Vivekananda has been elected the general President of the Ramakrishna Mission.
Swami Brahmananda has been elected the President of the Calcutta centre of the Mission.—" (Vide original Proceedings Book of the first Ramakrishna Mission, Page 4 to 7.

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এইভাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' এই নাম লইয়া যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জেনারেল প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি হইয়াছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামী সারদানন্দ তখন বিদেশে ছিলেন।

এখন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং এখন হইতে ৫৮ বৎসর আগেকার সেই দিনটি আমাদের বিশেষভাবেই স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।

স্বামীজী মিশন স্থাপন ব্যাপারে গৃহী ভক্তগণকেই সর্বাগ্রে আহ্বান করিয়াছিলেন। সভ্য হওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তিনি নিয়মাবলীর এক নম্বরে বলিয়াছেন, 'যিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই আদর্শের সহযোগিতা করিতে যিনি প্রস্তুত এবং যিনি সৎজীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই এই সমিতির সভ্য হইবার অধিকারী।' ইহার মধ্যে গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর কোন পার্থক্য করা হয় নাই।

তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে কলিকাতা কেন্দ্রের 'সিসটার বডিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অধীনস্থ কেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যেক কেন্দ্রই মূল কেন্দ্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কেন্দ্র পরিচালনা করিবে এই-রকম অভিপ্রায় তাঁহার উক্তিতে অন্যত্রও দেখা যায়। বাধ্যতা যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই বিশেষভাবে প্রয়োজন তা' তিনি যেমন ঘোষণা করিয়াছেন, সেই রকম স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথাও বিশেষ-ভাবেই বলিয়াছেন। দাসসুলভ মনোভাব সর্বথা বর্জনীয় এইটি তাঁহার বাণীর মধ্যে সকল জায়গায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

আর একটি কথা তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়াছেন, সেটি হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। 'যত মত তত পথ' এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি মটো"। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব যেমন ভিন্ন, তেমনি চিন্তাপ্রণালীও এক নহে। এই বিভিন্নতা একই মিলনমন্ত্রে এক হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ দেশে দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার কর্মতৎপরতা দিনে দিনে প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভাবই হইতেছে সকল কর্মের প্রেরণাস্বরূপ, ভাবহীন কর্মকেই গীতা বলিয়াছেন কর্ম-বন্ধন। গীতার এই মহান সত্য কর্মী মাত্রকেই প্রতিক্ষণে স্মরণ রাখিতে হইবে।

'স্বামী শিষ্য সংবাদ' নামক গ্রন্থে স্বামীজীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া তাঁহার মনের ভাব যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এখানে সামান্য কিছু তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে 'এসব বিদেশীভাবে কাজ করা হচ্ছে' এই কথা বলিয়া যখন অনুযোগ করেন, তখন উত্তরে স্বামীজী বলেন, 'সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয়নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।'

শিক্ষার দিকে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়ম প্রণয়ন হইতেই জানা যায়। ভারতবর্ষের কাজ হইল শিক্ষক তৈয়ার করা, সন্ন্যাসী বা গৃহী যে কোনো শ্রেণী হইতেই হউক। আর সেই সকল শিক্ষককে তাঁহাদের দেশের বিভিন্ন অংশে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিবার ভারও লইতে হইবে মিশনকেই।

তিনি তাঁহার নিয়মাবলীতে (যেটি বেলুড় মঠের জন্য পরে করিয়াছিলেন) ২১নং নিয়মে লিখিয়াছেন—

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্ম চর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' করিতে হইবে।"

তিনি তাঁহার ১৭নং নিয়মে একথাও বলিয়াছেন যে, "খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য যাহারা পুনর্বার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে।" (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হইয়া আবার সুপথে ফিরিতে চায়, তবে তাহাকে সে সুযোগ দেওয়া হইবে।)

এই সকল নিয়মগুলির প্রত্যেকটিই মহামূল্য। ইহার মধ্যে আরও দুটি একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

—বৌদ্ধ ধর্মে যেমন সংঘম শরণং গচ্ছামি' উক্তি আছে, স্বামীজীর প্রবর্তিত নিয়মে সেইভাবেই 'সংঘ'কে সম্মান দেওয়া হইয়াছে। ১ম নম্বরের নিয়মে বলা হইয়াছে, 'সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তি সংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সংঘের অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহ-পরলোক উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইবেন।

১১নং নিয়মে বলা হইয়াছে, 'যদি কাহারও পদস্খলিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সংঘের নিকট আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সংঘ যাহা বিধান করিবেন, তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে।'

সাধন প্রণালীর ষষ্ঠ নিয়ম এইরূপঃ 'ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তি-সাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি মহত্তরকার্য করেন।'

শার্ঙ্গদেব

কীর্তনের প্রবর্তক কি ওরাও' উপজাতি?

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় "বাংলার লোক সাহিত্য" নামক একটি বৃহৎ গ্রন্থরচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে বাংলার লোকসাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে লোকসংগীত তথা সংগীত সম্বন্ধেও তিনি কতিপয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে কীর্তনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেছেন সেটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। অতএব উক্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্তব্য।

"বাংলার লোকসাহিত্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "গীতি" সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষ্যে গ্রন্থকার যা লিখেছেন সেটুকু উদ্ধৃত করছিঃ—

"কীর্তনের মত জনপ্রিয় সংগীত বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নাই। বর্তমানে ইহা লোকসংগীতের স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সংগীতের স্তরে উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কোন আদিবাসীর লোকসংগীতের উপর ভিত্তি করিয়াই যে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল এবিষয়ে কোন সংশয়ের কারণ নাই। তথাপি বিষয়টি এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

বাংলা ভাষায় যে অর্থে কীর্তন কথাটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে শব্দটি যে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলায় আসিয়াছে এমন মনে করা যাইতে পারে না। Monier-Williams তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ A Sanskrit Dictionaryতে সংস্কৃত মহাভারত ও পঞ্চতন্ত্রে ইহার যে সকল প্রয়োগ পাইয়াছেন, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, যথা mentioning, repeating, saying, telling'—অর্থাৎ উল্লেখ করা, পুনরাবৃত্তি করা, বলা বা কহা; কিন্তু কীর্তন কথাটি দ্বারা বাংলায় প্রধানত যাহা বুঝায়, অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকৃতির সংগীত, তাহার কথা সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায় না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধানে' কীর্তন শব্দের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সংগীত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য কৃষ্ণপ্রসংগ বাংলাদেশে প্রবেশলাভ করিবার পূর্বে ইহা দ্বারা যে কেবলমাত্র বিশেষ এক রীতির সংগীতই বুঝাইত, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বাংলা ভাষায় শব্দটি কোনও স্বতন্ত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। সেই সূত্রটিই আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, ছোট নাগপুরের আদিবাসী ওরাঁও জাতির নৃত্যসম্বলিত লোকসংগীতের একাংশের নাম কীর্তন। অন্যান্য আদিবাসী সংগীতের মত ওরাঁও জাতির নৃত্যসম্বলিত লোকসংগীতও নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র চারিটি পদ পাওয়া যায়। বৃত্তাকারে সমবেত নৃত্যকালীন ইহার প্রথম দুইটি পদ গাহিয়া সম্মুখের দিকে পা ফেলিতে হয়, তাহাকে 'ওর' ও শেষ যে দুইটি পদ গাহিয়া পিছাইয়া আসিতে হয়, তাহাকে কীর্তন বলে।"

(পৃষ্ঠা ১৭৪—১৭৫)

এর পর গ্রন্থকার শ্রী W. G. Archerএর The Blue Grove নামক গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রেছেন। শ্রীযুক্ত Archer এবিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন অতএব তাঁর অভিমতটিও বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

অতঃপর গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন—

"ওরাঁও জাতির এই সংগীতাংশ হইতে ক্রমে এদেশে বিশেষ কোন অঞ্চলের সমগ্র সংগীতের উপরই কীর্তন কথাটি প্রযোজ্য হইতে থাকে বলিয়া মনে হয়।...

একথা বুঝিতে পারা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কোন অঞ্চলে উক্ত ওরাঁও কিংবা অন্য কোন অনুরূপ সংস্কৃতির অধিকারী উপজাতির প্রভাববশতঃ কীর্তন গান সর্বপ্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল। তখন ইহা স্বভাবতই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী কিম্বা ধর্মসম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু কালক্রমে সেই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে তাহাতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী প্রবেশলাভ করিয়াছে। অতঃপর বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে তাহা বাংলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহে বিস্তৃত হয়। বৈষ্ণব ধর্মের সহায়তায়ই কীর্তনগান আঞ্চলিক পরিচয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সমগ্র বাংলা দেশেরই জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদরূপে গণ্য হইয়াছে।"

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এইভাবে অতি সহজেই প্রমাণ করেছেন যে, কীর্তন কথাটা ওরাও'দের কাছ থেকে এসেছে এবং এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমার সন্দেহ ঘোচেনি কেননা আমার মনে হয় এমন একতরফা বিচার ক'রে নিঃসন্দেহ হ'তে গেলে সংগীতের ইতিহাসের প্রতি খুব সুবিচার করা হয় না। বিষয়টি সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

"কীর্তন" শব্দটি সংস্কৃতভাষা থেকে আসেনি—এমন সিদ্ধান্ত গ্রন্থকার কেন করলেন বোঝা গেল না। আসলে গোড়াতে এই ধরণের গানকে বলা হ'ত "কীর্তি" কীর্তন নয়। কীর্তন শব্দটি এই কীর্তি থেকেই এসেছে। কৃৎ+অন—হ'ল কীর্তন আর কৃৎ+তি—হ'ল কীর্তি। ব্যাপারটা মূলত একই। এই কৃৎ ধাতু বা কীর্তি শব্দ যে সংস্কৃত নয় ওরাও' নামক আদিবাসীর ভাষাসম্ভূত এমন কথা বিশ্বাস করবার কোন হেতুই খুঁজে পাইনে।

কীর্তি কথাটার মানে সুখ্যাতি, যশ বা সুনাম কথন। অবশ্য গান করেই যে কীর্তিপ্রচার করতে হবে তার কোন মানে নেই, কিন্তু গান করেও যে কীর্তি গাথা প্রচারিত হবে না এমন কথাও তো কোন শাস্ত্রে লেখে না। পরন্তু এইটাই বরাবর হয়ে আসছে। একটা গল্প গদ্যেও বলা যায় পদ্যেও বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণত আখ্যায়িকাগুলি রচিত হয়েছে পদ্যে। সে রকম, কীর্তিকথা আবৃত্তি করেও বলা যায়, কিন্তু সাধারণত সেগুলি সুর করেই গাওয়া হ'ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ—
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥

অর্থাৎ,—নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়ো, কানে কর্ণিকাকুসুম, পরিধানে সোনার মত উজ্জ্বল পীতবাস, গলায় বৈজয়ন্তীমালা, অধরে বেণু, গোপগণ তাঁর যশোগান করছেন—এইভাবে তিনি বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করলেন। এইখানে "গীতকীর্তিঃ" বলা হয়েছে অর্থাৎ গোপগণ তাঁর কীর্তি গান করছেন। এখন, এমন অনুমান করা যেতে পারে যে, গোপগণ গান না করে তাঁর প্রশস্তি পাঠ

বা আবৃত্তি করছেন; কিন্তু সেটা নেহাৎ কষ্ট-কল্পনা।

এই "গান" কথাটা নিয়েই কি কম মারামারি? গান বলতে এক সময় ঈষৎ সুর ক'রে পাঠ বোঝাতো। বেদগান মানে বেদপাঠ অথবা মহাভারত বা রামায়ণগান মানে উক্ত গ্রন্থাদির সুরসংযোগে পঠন। এস্থলে গান বল্লে খুব উচ্চাঙ্গের গান বোঝায় না। যদিচ পরবর্তীকালে এই পঠনের মধ্যেই উচ্চাঙ্গের গান সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীধর কথক মহাশয় কথকতার মধ্যেই এমন গান রচনা করে গেছেন যা উৎকৃষ্ট টপ্পার অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে।

"কীর্তি" নামক একশ্রেণীর গানের উল্লেখও সংগীতশাস্ত্রে আছে এবং আমার ধারণা কীর্তনের আদিরূপ হ'চ্ছে এই "কীর্তিলহরী" বা কীর্তি প্রবন্ধ। কিন্তু এর আগে আর একটি কথা বলা দরকার। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের অনেককেই সাঙ্গীতিক তথ্য সম্বন্ধে সংগীতশাস্ত্রের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে মতামত দিতে দেখেছি। চর্যাপদ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতাংশ সম্বন্ধে এ রকম অতিশয় ভ্রমাত্মক (অনেক সময় হাস্যকর) মতবাদ বহু প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাস বা প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। যে সমস্ত সাঙ্গীতিক শব্দের ব্যাখ্যা সাধারণত লেখকরা খুঁজে পান না সেগুলি অভিধানে খোঁজবার চেষ্টা করেন এবং সেখানে না পেলেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিজস্ব অভিমতকে প্রাধান্য দেবার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঐতিহাসিক বিকৃতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

সাঙ্গীতিক বহু শব্দই অভিধানে নেই। সংগীতরত্নাকরে যে ছিয়াত্তরটি গীতরূপের নাম এবং পরিচয় রয়েছে তার ক'টির উল্লেখ অভিধানে মেলে? অতএব সংগীতসাগরে উত্তীর্ণ হ'তে গেলে অধিকতর নির্ভরযোগ্য সংগীতশাস্ত্রকে অবলম্বন করেই উত্তরণ করতে হবে।

অভিধানে থাকলেও সব শব্দের তাৎপর্যবোধ সম্ভব হয় না। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি—এগুলির কোনটিরই মূলত সাঙ্গীতিক অর্থ নেই; অথচ প্রত্যেকটিই গানের রীতিকে বোঝায়। চর্যাও তাই;—অভিধানে চর্যা বলতে গান বোঝায় এমন কথা পাওয়া যাবে না। আসলে অভিধান হ'চ্ছে নামবাচক গ্রন্থ। কোন গভীর অর্থ অভিধান থেকে খুঁজে বের করাটাই নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। এই যে কীর্তি বা কীর্তন,—এই ধরনের গান বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্য এই গানকে একটি বিশেষ রূপ দিলেন এবং তাঁর সময় থেকেই কীর্তন কথাটির গুরুত্ব লাভ হয়েছে। এরকম নামকরণ আমাদের দেশে আরও হয়েছে। "নৃত্যনাট্য" কথাটিই ধরা যাক। নৃত্য এবং নাট্য দুটি শব্দের অর্থই আমরা জানি, কিন্তু কবিগুরু "নৃত্যনাট্য" নাম দিয়ে যে সংগীতশিল্প সৃষ্টি করেছেন তার একটি বিশেষ অর্থ আছে এবং আজকাল নৃত্যনাট্য শব্দটি এই বিশেষ অর্থেই পরিচিত হয়েছে।

যা বলছিলাম। এই "কীর্তি" শ্রেণীর গান "করণ" প্রবন্ধের অন্তর্গত। "করণ" ছিল সেকালকার বিখ্যাত সূড় প্রবন্ধ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। "করণ" প্রবন্ধের যে বর্ণনা শাস্ত্রে আছে এবং টীকাকারগণ এর যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে এই গীত-রূপটি যে কীর্তনের মতই ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। করণপ্রবন্ধ আট রকম —স্বরকরণ, পাটকরণ, বন্ধকরণ, পদকরণ, তেনকরণ, বিরুদকরণ, চিত্রকরণ এবং মিশ্র-করণ। এই সংগীতের সঙ্গে প্রধান বাদ্য ছিল মুরজ। গানের শেষে ভণিতাসংযোগ করা হ'ত। গানের সময় আখরের কাটান আনা যেত এমন অনুমানও করা যেতে পারে, কেননা টীকাকার বলছেন—"আভোগস্তু পদৈর্বিরচ্যতে" অর্থাৎ আভোগ অংশে পদকর্তার নিজস্ব পদ-সংযোগের অবকাশ আছে। এ গানের সঙ্গে হাতে তাল দেওয়া হ'ত, মুরজের সঙ্গতও করা হ'ত। মুরজের সঙ্গে গানকেই বলা হয়েছে বন্ধকরণ। এইভাবে স্বর, হাতের তাল এবং মুরজের সংযোগকে বলা হয়েছে চিত্রকরণ এবং স্বর, তালের সঙ্গে মঙ্গলবাচক (যাকে সংগীতশাস্ত্রে "তেন" বলা হয়) অর্থাৎ "ওঁ তৎ সৎ" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগকে বলা হয়েছে মিশ্রকরণ।

এই করণগুলির প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার;—"মঙ্গলারম্ভ", "আনন্দ-বর্ধন" এবং "কীর্তিলহরী"। এসব গানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় টেকনিকাল হয়ে পড়বার আশংকা আছে। অতএব অলমতিবিস্তরেণ। তবে এথেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই শ্রেণীর সংগীত অনেকাংশে কীর্তনের মত এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই প্রযুক্ত হ'ত। "কীর্তি" নামক একটি সংগীতকলার পরিচয়ও এই প্রবন্ধগোষ্ঠী থেকে মিলচে। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যে "বাংলা ভাষায় শব্দটি কোন স্বতন্ত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে" লিখেছেন, সেই স্বতন্ত্র সূত্রটি হ'চ্ছে এই। কিন্তু এখানে যদি বলা যায় ওরাঁওদের "করম" নাচ থেকেই "করণ" প্রবন্ধের উৎপত্তি তাহ'লে ভারি মুস্কিলে প'ড়ে যেতে হবে, কেননা, কল্পনায় সবই সম্ভব।

কীর্তনের নৃত্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য শ্রী W. G. Archer প্রণীত The Blue Grove-এর রচনাটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি নিজস্ব অভিমত গঠন করেছেন। শ্রীযুক্ত Archer কোথাও বাংলা কীর্তনের সঙ্গে উক্ত ওরাঁওদের কীর্তনের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন নি। তিনি ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ছোটনাগপুরে এস ডি ও ছিলেন এবং এই সময়েই ওরাঁওদের সংগীত সংগ্রহ করেন। তাঁর বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। উক্ত গ্রন্থে কীর্তন নৃত্য ছাড়া যাত্রা-নৃত্যের উল্লেখ আছে। এছাড়া আরও অনেক শব্দ আছে যা থেকে মনে হয়, ওরাঁওরা বাংলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু শব্দ সংগ্রহ করেছে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত হ'তে গেলে বলতে হয়, আমাদের যাত্রাগানও ওরাঁওদের কাছ থেকে এসেছে যেহেতু তাদের মধ্যেও এই নামে একটি নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বিষয়টা তা নয়, আসলে বাংলা এদের কাছ থেকে এসব জিনিস নেয়নি, এরাই বৃহত্তর সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এইসব শব্দ সংগ্রহ করেছে। এইটিই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

কীর্তন মূলত নৃত্যানুষ্ঠান নয়, গীতানুষ্ঠান, যদিচ নৃত্যের ব্যবহার কীর্তনে আছে। সে নৃত্য শ্রী ভট্টাচার্য যে ধরনের নৃত্যের উল্লেখ করেছেন সে-রকমের নয়। ওরাঁওদের "কীর্তন" হ'চ্ছে পুরোপুরি নাচ এবং তাদের নৃত্যের reverse actionকে "কীর্তন" বলা হয়। "In the dances which have a definite advance and reverse action the first two lines are called the Or or opening movement and the third and fourth lines are known as the Kirtana or reverse" (The Blue Grove p. 26).

এইরকম একটি নৃত্য-আঙ্গিকের সঙ্গে বাংলা কীর্তনের কোন সম্বন্ধ নির্ণয় যে কি ক'রে সম্ভব সেটাও বুঝতে পারা গেল না।

পূর্বোক্ত "করণ" প্রবন্ধে নৃত্যের ব্যবহার যে না হ'ত তা নয়। সে নৃত্যের বর্ণনা হ'চ্ছে—

মুহুঃ প্রসারিতাবিদ্ধবাহু তদনুসারিনৌ।
চরণাবাদিতালেন প্রসরন্ মধ্যমানতঃ॥

অর্থাৎ—উন্মুক্ত বাহুযুগল প্রসারিত এবং তারি সঙ্গে ধীরে ধীরে আদি তালে চরণ প্রসারিত হচ্ছে। এই যে বর্ণনা এ তো আমাদের কীর্তনের সঙ্গে ব্যবহৃত অঙ্গ-ভঙ্গীরই বর্ণনা। এর সঙ্গে ওরাঁওদের "কীর্তন" নাচের মিল নেই।

আরও একটু কথা আছে। ওরাঁওরা যে "কীর্তন" শব্দটি উচ্চারণ করে তা কি অবিকল আমাদের বাংলা উচ্চারণের মত? তাদের ভাষাগতরূপ থেকে কি এ শব্দের অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়? এসব ব্যাপার বোধ হয় সম্যক্ আলোচিত হয় নি। সুর দিক থেকে বিচার না ক'রে এমন সিদ্ধান্তে আসা কোনক্রমেই উচিত নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কোন অঞ্চলে ওরাঁওদের প্রভাবের ফলে কীর্তনগান সর্বপ্রথম বিকাশলাভ করেছিল।

বস্তুত কীর্তনের অনুরূপ প্রবন্ধ-গীতি বহুকাল থেকেই সারা উত্তরভারতে ছড়িয়েছিল এবং এইরূপ থেকেই পরবর্তী কীর্তনের অভ্যুদয় হয়েছে। যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় তা'তে মনে হয়, করণ-প্রবন্ধই কীর্তনের আদিরূপ। ওরাঁওদের কীর্তন অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাংলার কীর্তনের তফাৎ অনেকখানি এবং এ দু'টির সঙ্গে একটি সংযোগ স্থাপন করা যায় এমন নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রই পাওয়া যায় না। অতএব এইটিই অনুমান করতে হয় যে, ওরাঁওরা "কীর্তন" কথাটি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করেছে। অথবা এই কথাটির অন্য ব্যাখ্যাও হ'তে পারে তাদের ভাষা বিচার করে।

বাংলার কীর্তন সম্বন্ধে ঈদৃশ মতবাদ অপর কোন গ্রন্থে বা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লে হয়তো বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতাম না; কিন্তু "বাংলার লোকসাহিত্য" রচয়িতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় স্বনামধন্য গবেষক এবং তাঁর পুস্তকাদি বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। অতএব তাঁর মতবাদটি উপেক্ষিত না হ'য়ে সম্যক্ আলোচিত হওয়া উচিত বলে মনে করি।

সহগান সভা

আমরা সম্প্রতি শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে "সহগান সভা" সম্পর্কে একটি চিঠি পেয়েছি। পত্রটি বাংলায় অনুবাদ ক'রে দেওয়া হ'ল।

প্রধানমন্ত্রীর ভবন
নয়াদিল্লী
৩রা জুন ১৯৫০

প্রিয় বন্ধু,

"সহগান সভা" কর্তৃক প্রচারিত একটি আবেদন পাঠাচ্ছি। আমার মনে হয় এই প্রচেষ্টা আমাদের জাতির দিক থেকে গুরুত্ব-পূর্ণ এবং আপনাদের সহযোগিতা ভিন্ন এর সাফল্য অসম্ভব।

এটা নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করবেন যে, আমাদের গানগুলি বিভিন্ন বয়স্ক ব্যক্তি যাতে সব অনুষ্ঠানে গাইতে পারেন সেরকম সরল এবং সবাইকার উপযোগী হওয়া উচিত।

উদাহরণস্বরূপ মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হ'ল:—

জাতীয় সঙ্গীত এবং মার্চএর উপযোগী গান

ঐতিহ্যমূলক এবং বীরত্বব্যঞ্জক গান

উৎসবে এবং বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহৃত গান।

আপনারা যদি আপনাদের রচনাসমূহ আমার কাছে পাঠিয়ে দেন তাহলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হই।

আপনাদের ভাষাভাষী অঞ্চলে যে সমস্ত লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে সেগুলি সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে তো খুবই ভাল হয়। যদি তা সম্ভব না হয় তবে যাঁরা এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন তাঁদের নাম পাঠিয়ে দিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হ'ব। ইতি—

ভবদীয়া—ইন্দিরা গান্ধী

উক্ত "সহগান সভা" নাম প্রতিষ্ঠানের অধিনেত্রী হচ্ছেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী। প্রচারিত আবেদনের সারমর্ম হ'চ্ছে এই যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভার যেমন সঙ্গীত-নাটক একাডেমি গ্রহণ করেছেন তেমনি সাধারণ্যে প্রচলিত সঙ্গীতের সংরক্ষণ এবং উন্নতির ভার গ্রহণ করলেন "সহগান সভা" নামক প্রতিষ্ঠান। লোক-সঙ্গীতের বহু বৈচিত্র্য সারা দেশে ছড়িয়ে আছে; যেমন—বীজ বপনের গান, ফসল কাটার গান, বিভিন্ন উৎসবের গান; ঋতুর গান—যথা, হোলী, চৈতী, বারমাস্যা ইত্যাদি। এইসব গান দেশের লোকদের একটি বন্ধুত্ব সূত্রে বেঁধে রেখেছে। এছাড়া রয়েছে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নগর-কীর্তন, সুরদাস, মীরা, কবীর প্রভৃতির ভজন, আমীর খস্রু প্রবর্তিত কাওয়ালী। এগুলিও আমাদের সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে। স্বদেশী সঙ্গীতও একটি বিশেষ প্রেরণা প্রদান করেছে লক্ষ লক্ষ লোককে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, দক্ষিণ ভারতের ভারতী, রামপ্রসাদ বিসমিল, ইকবাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটি এইসব গান যাতে দেশের লোকের মধ্যে আরও ছড়িয়ে পড়ে সেই চেষ্টা করবেন। এতে করে সম্মেলক সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি হবে এবং লোকসঙ্গীত বা বিভিন্ন সমবেত কণ্ঠের উপযোগী সঙ্গীত সংরক্ষিত হবে।

কাজটি সুকঠিন এবং এর জন্য সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীদের সাহায্য প্রয়োজন। যাঁরা এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন তাঁরা এইসব গান সংগ্রহ ক'রে বা নিজেদের লেখা বা সুর দেওয়া গান শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠালে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

আমরা আশা করি, "দেশ"-এর সঙ্গীতামোদী পাঠক পাঠিকা এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবেন।

চিত্র প্রদর্শনী

চিত্রগ্রীব

গত ১লা জুলাই থেকে শ্রীমান রঞ্জন সেনের একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ। রঞ্জন সেন শিল্পী শ্রীঅবনী সেনের পুত্র। বর্তমানে এর বয়স ১৩ বছর মাত্র।

ছবিগুলি দেখে বোঝা গেল শিল্পীর

একটি মেয়ে : শ্রীরঞ্জন সেন..

ঝোঁক প্রতিকৃতি চিত্রণেই বেশী। কয়েকটি প্রতিকৃতি আশ্চর্যরকমভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে, যেমন স্যার উষানাথ সেন (১১) মিসেস ডরোথী শেরউড (৭১) স্টাডি (৫৮,৬০,৬৪), সেল্‌ফ্ (৭৫) প্রভৃতি। বর্ণবিন্যাস এবং টানটোন অত্যন্তই পাকা। ১৩ বছরের ছেলের হাতের এই আঁকা দেখে অনেকেই বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে শ্রীমান রঞ্জনের বর্তমান বয়স ১৩ বছর হলেও, সে ছবি আঁকা আরম্ভ করেছে ২ বছর বয়স থেকে এবং এই পরিপক্ক অঙ্কন সুদীর্ঘকালের সাধনার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, সুতরাং একে প্রতিভা বলে প্রচার করে এই সাধনার অমর্যাদা করতে পারলাম না। যাই হোক, স্টিল লাইফগুলির মধ্যেও কয়েকটি খুব চমৎকার ছবি চোখে পড়ল (১৬, ১৭, ২১ এবং ৫২)। সী (৩) সিউইঙ (৮) ল্যান্ডস্কেপ এবং স্কেচ—এ ক'টি ছবিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কণ্টি ক্রেয়ন, জলরঙ, পেন অ্যান্ড ইংক প্রভৃতি মাধ্যমের মধ্যে কণ্টি ক্রেয়নেই শিল্পী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশী। ভ্যান গগ, সেজান, রেমব্রান্‌ড্‌ট্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিল্পীদের ছবি থেকে শ্রীমান রঞ্জন যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে, লক্ষ্য করলাম। ফলে স্বতঃপ্রবৃত্ত বালক মনের অনুপস্থিতি ছবিগুলিকে অত্যন্ত কৃত্রিম করে তুলেছে। অবশ্য সব ছবিগুলি যে এই কৃত্রিমতাদুষ্ট, তা বলছি না।

শ্রীমান রঞ্জন এই ১৩ বছর বয়সেই বহু পুরস্কারাদির অধিকারী হয়েছে। ১৯৪৯ সালে শঙ্করস উইকলী পরিচালিত শিশু চিত্র প্রতিযোগিতায় সমবয়সীদের মধ্যে রঞ্জন প্রথম পুরস্কার লাভ করে; ১৯৫০ সালে ঐ প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত দুইটি পুরস্কার লাভ করে; ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রথম পুরস্কার লাভ করে; ১৯৫২ সালে পাটনা-শিল্পকলা পরিষদে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী হিসাবে পুরস্কার পায়; ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালে শঙ্করস উইকলী পরিচালিত আন্তর্জাতিক শিশু চিত্র প্রতিযোগিতায় কয়েকটি পুরস্কার লাভ করে। যাই হোক, প্রশংসা তার অবশ্যই প্রাপ্য, কিন্তু সে যেন এই প্রশংসা এবং প্রচারে ভুলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়—এই আমাদের একমাত্র কামনা। প্রদর্শনীটি ১০ই জুলাই অবধি জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

স্টাডি : শ্রীরঞ্জন সেন

সেলাই : শ্রীরঞ্জন সেন

॥ ২ ॥

গত ৪ঠা জুলাই থেকে ১ নম্বর সদর স্ট্রীট-এ অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস এর ব্যবস্থাপনায় শিল্পী শান্তি শা-র একটি একক চিত্রপ্রদর্শনী চালু হয়েছে।

শান্তি শা গুজরাট প্রদেশের বাসিন্দা এবং অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ হন। অর্থকষ্ট এঁকে বিজ্ঞাপন শিল্পী

ঝোড়ো হাওয়া : শ্রীশান্তি শা

হিসাবে জীবনযাত্রা শুরু করতে বাধ্য করে। ১৯৪২ সালে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করায় ইনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাবাসের সময় এ'র সুকুমার শিল্পী প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। কারামুক্ত হবার পর ইনি মাদ্রাজ চারু ও কারু বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর শিক্ষাধীনে থেকে অংকন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। উপস্থিত ইনি কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে শিক্ষালাভ করছেন।

ল্যাণ্ড্‌স্‌কেপ চিত্রণেই এ'র ঝোঁক বেশী বোঝা গেল। তবে নানা বিষয়বস্তু এবং নানা টেকনিক-এ ইনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য এখনও কোন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পান নি। প্রতিকৃতি চিত্রণেও ইনি বেশ পারদর্শী।

মোপলা : শ্রীশান্তি শা

সবশুদ্ধ ৭০টি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই তৈল এবং টেম্পারা মাধ্যমে রচিত। ইনি সাদৃশ্য সত্যের সন্ধানী; সুতরাং যাঁরা কল্পনা-সম্ভূত বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শিল্পের অনুরাগী তাঁরা এই প্রদর্শনী দেখে খুব পুলকিত হতে পারবেন না। এ'র আন্তরিকতা অনস্বীকার্য এবং এ'র দৃষ্টি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। এই অনুভূতিপ্রবণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এ'র স্লীপিঙ ভ্যালি (৫১), ডন অ্যাট কোডাইকানাল (৫৩), মাইটি যোগ (১২) প্রভৃতি ছবি থেকে। নিয়ার গোয়া (১১), হিলস্‌ অ্যাণ্ড প্লেন (২৬), এ ক্যানাল ইন সিলোন (৩৫), এ রোড টু উটি (৩৮), রু সী (৫৫) প্রভৃতি ছবি থেকে ইমপ্রেশনিজম্‌-এর অল্প অল্প আঁচ অনুভব করা যায়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ছবি তুলির বদলে প্যালেট নাইফ-এর সাহায্যে অঙ্কিত হওয়ায় টেক্সচারে রীতিমত স্তর অনুভব করা যায়। এই টেকনিকটিকে অবশ্য নতুন বলা চলে না, এ'র আগে অনেকেই এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। টেম্পারা মাধ্যমে এ'র তুলির গতি অপেক্ষাকৃত সাবলীল মনে হ'ল। ভারতীয় ধারায় অঙ্কিত ছবিও কয়েকটি চোখে পড়ল, তবে সেগুলি নিতান্তই মামুলী ধরনের। ইনি ভাস্কর্যও অভ্যাস ক'রে থাকেন, যদিও ভাস্কর্যের কোনও নিদর্শন এখানে রাখা হয়নি। শিল্পী শিক্ষার্থী অবস্থা অবশ্যই কাটিয়ে উঠেছেন; এখন আর নানান ধারার দিকে ঝোঁক না দিয়ে এ'র পক্ষে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন।

প্রদর্শনীটি ১০ই জুলাই পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা আছে, প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা অবধি।

আলোচনা

'গ্রন্থপার্বণ'

(১)

মহাশয়,

সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গ্রন্থ-পার্বণে'র প্রস্তাব বাংলার পাঠক মহলে বেশ একটা আলোড়ন এনে দিয়েছে। এবং এ নিয়ে 'দেশে' অনেক আলোচনাও চলেছে। এই সুন্দর প্রস্তাবটির জন্যে প্রেমেন্দ্রবাবুকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তবে এবিষয়ে আমাদের কয়েকটি বক্তব্য আছেঃ

(১) রবীন্দ্রনাথের বইয়ের দুর্মূল্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু দাম যদি কমাতে হয় ত আমাদের মতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রত্যেকটি বইয়েরই দাম কমানো উচিত। কারণ, আসলে সব বইয়ের দামই আমাদের মত লোকদের পক্ষে অনেক বেশী, রবীন্দ্র-বইয়ের দাম সেই তুলনায় বরঞ্চ কিছু কমই।

(২) 'গ্রন্থ-পার্বণ' যে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সে রকম কোন ইঙ্গিত প্রেমেন্দ্রবাবু দেননি যাতে আশঙ্কা করা যেতে পারে যে, এই ক'টি দিন অ-রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাজার মন্দা যাবে। আমাদের মনে হয়, তাঁর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য আমাদের জীবনে সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার।

(৩) এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে তিনি জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত রসিকদের কাছে সম্মতি পাবার আবেদন করেছেন। আমাদেরও মনে হয়, রসিক মহল থেকে তিনি আন্তরিক সম্মতি লাভ করেছেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত বলতে যাদের বুঝিয়েছেন সেইসব মহল থেকে কি সাড়া পাওয়া গেছে, না পাওয়ার আশা আছে?

(৪) 'গ্রন্থ-পার্বণ' বিষয়ে যত আলোচনা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে প্রেমেন্দ্রবাবু সেগুলো বিবেচনা করে এবং প্রয়োজন হলে আরো আলাপ আলোচনা করে আবার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সংশোধিত প্রস্তাব এই 'দেশে'র পাতাতেই প্রকাশ করুন, তাঁকে এই অনুরোধই আমরা করি। ইতি—বিভাস চক্রবর্তী, করুণাময় মজুমদার, রাধাকান্ত সাহা, বাগজলা, দমদম।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

'গ্রন্থপার্বণ' সম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনা দেখলাম। তাতে কেউ দিয়েছেন পুস্তকের দামের দোহাই কেউবা নিরক্ষরতার। কিন্তু আমাদের দেশে, অন্তত অধিকাংশ স্থলেই সব জিনিসেরই মূল্য নির্ধারিত হয় তার দামের (cost price) উপর। অল্প খরচ করে বইয়ের দাম সস্তা করলে কি অবস্থা হয় তার প্রমাণ পেলাম নিজেই। একবার কোনো বিশেষ উপলক্ষে আমার দুই বন্ধুকে দুখানি বই উপহার দেই। তারমধ্যে একখানি ছিল রবীন্দ্রনাথের। পরে বই দুখানির যা পরিণতি দেখলাম তাতে খুবই ব্যথা পেয়েছিলাম। দোষ আমারই, বই দুখানির দাম তত বেশী ছিল না।

এই দেখুন দামের দোহাইয়ের পরিণতি। তারপর নিরক্ষরতা। এ সম্বন্ধে বলবার মত দুঃসাহস রাখি না।

শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের পরিকল্পনাটা কার্যকরী হোক। বিস্বৎ সমাজে এই আমার প্রার্থনা। ইতি—শ্রীশশাঙ্কশেখর নাথ, এ ও সি বয়েজ হাইস্কুল, ডিগবয়।

(৩)

মহাশয়! 'দেশ' পত্রিকায় সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গ্রন্থপার্বণ' সম্বন্ধে কতকগুলো আলোচনা পড়েছি। বিভিন্ন দিক থেকে যেসব যুক্তি এসেছে, সেগুলোকে অস্বীকার করবার কারণ নেই, কিন্তু আরও একটা বড় বাধা আছে বলে আমার মনে হয়, যেটা 'গ্রন্থপার্বণ' পরিকল্পনার সার্থকতার পরিপন্থী। সে সম্বন্ধে আমি দু'চারটে কথা বলতে চাই।

প্রথমেই বলে রাখি এটা প্রধানত চাকুরে ও সংসারী সমাজের কথা, কিন্তু একথা যদি সত্যের খাতিরে মেনে নিতে হয় যে এ'দের কাছে রবীন্দ্র-গৌরব লুপ্তপ্রায়, তাহলে গ্রন্থ-পার্বণের সর্বতোমুখিতা বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। শুধু ছাত্র ও সুধীসমাজের মনের প্রস্তুতির দিক থেকে, নিশ্চয়ই গ্রন্থপার্বণ পরিকল্পনা উদ্ভূত হয়নি। এ'দেরকে বাদ দিলে সাধারণের যে একটা বিরাট অংশ থাকে, তাঁদের মধ্যে যেন একটা রুচিবিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। পাঠে অরুচি বা আলস্য ঠিক নয়, সুসাহিত্য ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠে রুচির দীনতা। রুচির এই মানদণ্ড নেমে আসার মূলে যে কারণই থাক না কেন, ভালো কিছু পাঠের দিকে মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার একটা প্রবণতা যেন আমরা ক্রমশ হারাতে চলেছি। রবীন্দ্র গ্রন্থের মূল্য বেশী, এ অভিযোগ সত্য, কিন্তু যে কারণে একটা বিশেষ দেশ ও কালের অবস্থায়, রবীন্দ্র রচনাবলী ক্রয়ে আমাদের অসামর্থ্য আমরা জ্ঞাপন করতে চাইছি, আমার মনে হয়, ঠিক সেই কারণে, ঠিক সেই আর্থিক পরিস্থিতির কৃচ্ছ্রতার মধ্যে বহুবিধ অন্যান্য গ্রন্থ কেনবার অসুবিধা অসামর্থ্য আমাদের হচ্ছে না। রবীন্দ্র রচনায় সাহিত্য সম্পদ আহরণের চেষ্টা যাঁর একান্তভাবে থাকবে, তাঁর পক্ষে কিছু না কিছু অগ্রসর হবার সুযোগ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ভেতর থেকে প্রস্তুতির আহ্বান এলে, পার্বণ প্রচলনের অন্তরায়গুলো আমাদের কাছে অনেকটা ছোট হয়ে যাবে নাকি?

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদাশঙ্করের কথায় আজকের দিনে পাঠক আছেন কিন্তু 'অন্তিমপাঠক' বা আলটিমেট রীডার বিরল যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী। হৃদয় ও বুদ্ধিকে আগুলে রেখে, চোখ ও মনের আলগা রুচি দিয়ে হাল্কাভাবে পড়বার ও বোঝবার তাগিদ যেখানে বেড়ে চলেছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাবো কি করে? জীবনের বহুবিধ দৈন্য ও সংঘাত সত্ত্বেও নিছক লঘু মানসিক বিলাস ও আরাম লাভের উন্মাদনায় যে প্রচুর অর্থের অপব্যয় আমাদের জীর্ণ মধ্যবিত্ত পকেট থেকে দিনের পর দিন হয়ে আসছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র রচনাবলীর দুর্মূল্যতার যুক্তি সুসংগত মনে হয় না।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজনের বাহুল্য এ বছরে চোখে পড়বার মতো। খুবই আনন্দের কথা। এ আয়োজন নিষ্ফল একথা বলছি না, তবে আড়ম্বরের বিড়ম্বনায় বহু আরাধ্য প্রস্তুতির আলো যেন নিভে না যায়, 'সাংস্কৃতিক সম্পদের সার্থকতা' যেন নষ্ট না হয়, ভয়টা এইখানে।

সাধারণের একজন হিসাবে আমার মনে হয়, আমরা বোধহয় শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্রবাবুর সাধু প্রস্তাবের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারিনি। এ দুঃখ সত্ত্বেও আশা কোরবো, আমরা যাতে ভবিষ্যতে আরও প্রস্তুত হ'তে পারি। ইতি—ভবদীয়, শ্রীঅমিয়কুমার বসু, কলিকাতা—১০।

'স্বামী বিবেকানন্দ'

সবিনয় নিবেদন,—

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয় 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে, মহীশূরের মহারাজার প্রাসাদে তাঁহার বক্তৃতার রেকর্ডটি কিছুদিন পূর্বেও রক্ষিত ছিল। কিন্তু শোনা গেল রেকর্ডখানি এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রেকর্ডখানি সেকালের প্রণালীতে গৃহীত হইয়াছিল এবং পুরানো হইয়া যাওয়ার জন্য জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

—সরলাবালা সরকার

সেকেলে হলেও আবেগময়

মনের মধ্যে ঠিকভাবে আবেগ সৃষ্টি করে তোলার মতো বাহাদুরী দেখাতে পারলে নেহাৎ সেকেলে গল্পের সাহায্যেও দর্শকমনকে অভিভূত করা যায়। রমা পিকচার্সের 'বিধিলিপি'র ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। সন্তান হয়না বলে প্রাতঃকালে পুত্রবধূর মুখদর্শন না করতে চাওয়া; অন্ধ মাতার গর্ভে অন্ধ সন্তান জন্মে বলে কুসংস্কার; এক বধূ জীবিতা থাকতেই পুত্রের আর একটি বিবাহ দেবার চেষ্টা ইত্যাদি অন্ধ সংস্কারবশীভূত যে চরিত্র নিয়ে 'বিধি-লিপি'র কাহিনী তার কোন আবেদন এ যুগে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'বিধিলিপি' নাটকীয় রসে বেশ একখানি উপভোগ্য চিত্রসৃষ্টি হয়েইউপস্থিত হয়েছে। সাধাসিধে কাহিনী যার মধ্যে মৌলিক চিন্তাশক্তির

—শৌভিক—

তেমন কোন নিদর্শন যদিও নেই, কিন্তু চিত্রনাট্যে কাহিনীর বিন্যাস এবং নাট্য পরিস্থিতি রচনা করায় পরিচালকের কৃতিত্ব ছবিখানি ভালো লাগার অনুকূল করে তুলেছে। পরিচালনায়ও মৌলিক কল্পনাশক্তির তেমন কিছু পরিচয় নেই কিন্তু একটা সংবেদনশীল মনের ছাপ পাওয়া যায়। গল্পটি সম্পর্কে আরও একটি কথা হচ্ছে, সেকেলে কুসংস্কার-প্রভাবিত দিনের গল্প হলেও সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাকে দূর করার একটা চেষ্টা সুফলপ্রসূ হতে দেখা যায় যা দর্শকমনে স্বতঃই আনন্দের সঞ্চার করে। 'বিধিলিপি'র কাহিনীটি লিখেছেন বিজয় গুপ্ত; চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রণব রায় এবং পরিচালনা করেছেন মানু সেন।

* * *

গল্প প্রাচীন সংস্কারধর্মী মা এবং তার বোধশক্তিসম্পন্ন ছেলের মধ্যে নীতির সংঘাত নিয়ে; উপলক্ষ্য পুত্রবধূ। সাত বছর বিয়ে হলেও ফটিকজলের জমিদার শচীকান্ত নিঃসন্তান। স্ত্রী শকুন্তলা রোজ উষায় রাধামাধবের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আসে, কিন্তু কোন ফলই দেখা যায় না। শচীর মা প্রাতঃকালে এমন বৌয়ের মুখ দেখাও পাপ মনে করেন। শ্বশুর বংশে পূর্বপুরুষদের মুখে জল দেবারও কেউ থাকবে না এই চিন্তায় শচীর মার মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। শকুন্তলাকে তিনি স্পষ্টতঃই তার মনোভাব জানাতেন। কিন্তু শকুন্তলার জীবন দুর্বিসহ

হতে পারেনি কেবল তার স্বামীর অকুণ্ঠ ভালোবাসার জন্যই। একদিন শাশুড়ীর গঞ্জনা খেয়ে মাথাঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে শকুন্তলা অসুখে পড়লো। রোগটা দাঁড়ালো ম্যানেঞ্জাইটিসে এবং আরোগ্য লাভ করলেও চিরকালের জন্য শকুন্তলা চোখ দুটি হারালে। শচীর মার মনে নাতির মুখ দেখবার ক্ষীণ আশা যা একটু ছিল তাও নিভে গেল; তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যদিও বা শকুন্তলা কোনদিন মা হয় তো সে সন্তান নিশ্চয়ই অন্ধ হয়েই জন্মাবে, তার শ্বশুরকুলের বংশে এ কালিমা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাই শচীকে তিনি আবার বিয়ে করার জন্য বললেন। শচী তীব্রভাবেই তার প্রতিবাদ করলে। স্পষ্ট-ভাবেই জানালে শকুন্তলাকে সে ত্যাগ করতে পারবে না। শচীর মা ধূর্ত নায়েব মুকুন্দকে ডাকলেন এই বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য। ওরা দুজনে এমন এক চক্রান্ত করলেন যাতে শচীকে জমিদারী সংক্রান্ত একটা মামলা তদারক করার জন্য সদরে যেতে হলো কিছুদিনের জন্য। সেই সুযোগে শচীর মা স্বামীর অনুরাগ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এই মিথ্যে বলে শকুন্তলাকে তার দাদা রমানাথের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শচী ফিরে আসতে মা তাকে জানালেন শকুন্তলা স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছে এবং সাধ্যসাধনা করে না আনলে সে আসবে না। প্রথমে শচীর মনে অভিমান দেখা দিল, কিন্তু পরে সে নিজেই গেলো শকুন্তলাকে নিয়ে আসতে। শকুন্তলার দাদা ক্ষেপাটে প্রকৃতির। রমানাথ শকুন্তলাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য শচীকে যাতা বলে অপমান করলে। শচী চলে এলো শকুন্তলার সঙ্গে দেখা না করেই। ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেলো শকুন্তলা মাতৃ-সম্ভবা। রমানাথ শচীর মার কাছে চিঠি লিখলেন সে কথা জানিয়ে; মুকুন্দ বললে শচীর যাতে বিয়ে না হয় তাই রোধ করার জন্যই রমানাথের ওটা একটা চাল। এ চিঠির কথা শচীকেও জানানো হলো না। শচীর মার মনে পড়লো তার গঙ্গা-জলের মেয়ে সন্ধ্যার কথা। মুকুন্দকে তিনি পাঠালেন বিয়ের কথা পাড়বার জন্য। মুকুন্দ সন্ধ্যার মার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির [illegible] উপ-লক্ষে শচীকে নিয়ে শচীর মা কলকাতায় আসবেন এবং সেই সুযোগে শচী ও সন্ধ্যার আলাপ পরিচয়ের সুযোগ করে দেওয়া হবে। সেই মতোই কাজ হলো। এদিকে সন্ধ্যা ভালবাসতো তাদেরই পরি-বারের পরিচিত এবং তার গানের শিক্ষক প্রশান্তকে। ওদের দুজনের ভালোবাসা সন্ধ্যার মা ও দাদুর কাছে প্রশ্রয়ও পেয়ে আসছিল। কিন্তু সন্ধ্যার অন্যত্র বিয়ের কথা হতে বজ্রপাত হলো। শচী তার মার সঙ্গে এসে পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যার মা প্রশান্তকে ও-বাড়ীতে বসতেও জায়গা দিতে পারলেন না আর। অভিমান বুকে নিয়ে প্রশান্ত ফিরে গেল। সন্ধ্যারও কম রাগ হলো না শচীর ওপরে। শচীর দিক থেকে সর্বক্ষণই মুখ ফিরিয়ে থাকে সন্ধ্যা। দুজনে তফাতে তফাতে থাকে। একদিন দুই গঙ্গাজলে স্নানে গিয়েছেন, সন্ধ্যার একটা বিমনা গানে আকৃষ্ট হয়ে শচী তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। শচী তার জীবনের দুঃখের কাহিনী শোনালে সন্ধ্যাকে এবং তাকে
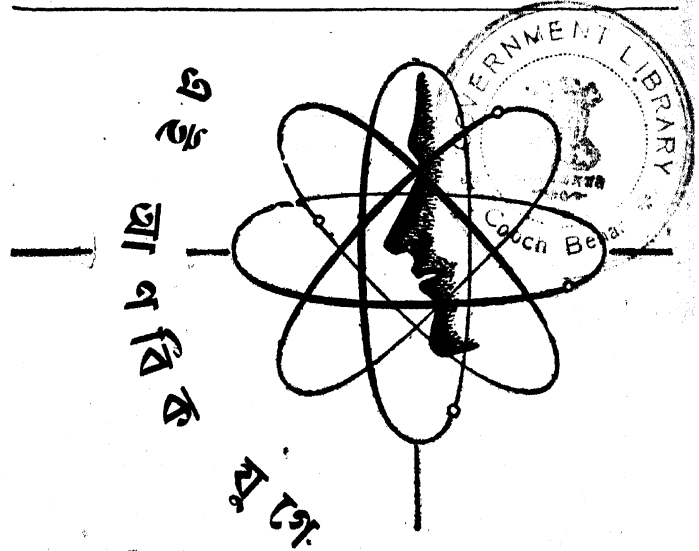
পার্বতী—বিমল রায় কর্তৃক বম্বেতে প্রযোজিত-পরিচালিত হিন্দী সংস্করণ "দেবদাস"-এর পার্বতী চরিত্রে সুচিত্রা সেন

নিজের বোন বলে সম্বোধন করলে। সন্ধ্যা এতদিনে আবার সহজ হয়ে উঠলো, প্রশান্তকে সে ডেকে পাঠালে। প্রশান্ত এসে সন্ধ্যাকে শচীর সঙ্গে হাসাহাসি করতে দেখে ভুল ধারণা মনে নিয়ে দরজার পাশ থেকেই চলে গেলো। ওদিকে দুই সইয়ে শচী ও সন্ধ্যার প্রফুল্ল মনোভাবের পরিচয় পেয়ে ওদের বিয়ের সম্ভাব্যতা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে বলে মনে ধরে নিলেন। শচীকে নিয়ে তার মা ফিরে এলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শচীকে তিনি বিয়েতে রাজী করাতে পারেন নি। ইতিমধ্যে শকুন্তলার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছে; শচীরা সে খবর পায়নি। এইভাবে প্রায় এক বছর অতিবাহিত হলো। একদিন শচীর মা শচীকে বিয়ের কথা বললেন, শচী জানালে সে শকুন্তলার কাছে প্রতিশ্রুত, বিয়ে সে আর করবে না। মা জানালেন তিনিও যে তার গঙ্গাজলের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, তার চেয়ে কি শচীর প্রতিশ্রুতি বড়ো হলো! মা অন্নজল ত্যাগ করে ঠাকুর ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ে রইলেন তিন-দিন। মুকুন্দ এসে শচীর কাছে মায়ের জীবন সংশয়ের কথা জানিয়ে দিলে। নিরুপায় শচী মাকে অনশন ত্যাগ করতে বলে এই প্রতিশ্রুতি দিলে যে সন্ধ্যার বিয়ে হবেই। আনন্দিত হয়ে মা গঙ্গাজলের কাছে তার পাঠালেন মাত্র দুদিন পরই বিয়ের দিন ধার্য করে। তার পেঁছিতে সন্ধ্যা বজ্রাহতা হলো। প্রশান্তর কাছে গিয়ে হাজির হলো সন্ধ্যা। একবছর আগে প্রশান্ত সন্ধ্যাকে শচীর সঙ্গে দেখে সেই যে ফিরে যায়, সেই থেকে তার অভিমান। সন্ধ্যা তাকে সব কিছু খুলে জানালে এবং বললে কোনরকমে কাঞ্চনপুরে শচীর স্ত্রী শকুন্তলার কাছে খবর পেঁছে দিলে বিয়ে রোধ করা যাবে। প্রশান্ত ইতঃস্তত করতে ওর সহপাঠিরা সে-কার্জের ভার নিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে পড়লো। শচীকে নিয়ে তার মা পেঁছলেন কলকাতায় তাদের বাড়িতে। বিয়ের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। শচীকে বর বেশে সাজানো হয়েছে। বর যাত্রা করার আগে শচী খানিকক্ষণের জন্য বাইরে চলে গেল এবং গিয়ে উঠলো প্রশান্তর বাসায়। তারপর দেখা গেল শচী প্রশান্তকে বর বেশে সাজিয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে বিয়ের আসরে বসিয়ে দিলে। ওদিকে প্রশান্তর সহপাঠিরা শকুন্তলাকে সপুত্র এনে হাজির করে দিলে শচীর মার সামনে। শচীর মা নাতি পেয়ে এবারে শকুন্তলাকে বুকে তুলে নিলেন। সেইসঙ্গে মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি মতো শচীও সন্ধ্যার বিয়ে দিয়ে ফিরে এলো।

* * *

'বিধিলিপি' নামটা এ গল্পে ঠিক খাপ খায় না। কারণ এতে ভাগ্যকে মেনে নেওয়া, বা ভাগ্যের খেলার ওপরে ঘটনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, বরং শচীর মধ্যে দিয়ে কুসংস্কার ও পুরাতন অন্যায় রীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবারই প্রচেষ্টা

হিন্দী ছবি "রফতার"-এর নায়িকা চরিত্রে নাদিরা

পাওয়া যায়। এবং এইটেই কারণ যেজন্যে গল্পের উপাদান সেকেলেয়ানায় ভরে থাকতেও এখনকার মনের ওপরেও ছাপ দিতে সক্ষম হয়। এখনকার মনে সায় পাবার মতো ঘটনা এবং চরিত্রও এমনি সব উপস্থিত করা হয়েছে যারা সংস্কার ও পুরাতন রীতির প্রতিবেশে সাময়িকভাবে বিরোধের মূল হয়ে উঠলেও শুভবুদ্ধির কাছে নির্দ্বিধায় পরাজয় মেনে নিতে পিছপাও হয়নি। তাই যে শচীর মা শকুন্তলাকে নির্দয়ভাবে চক্রান্ত করে একদিন তাড়িয়ে দেন, তিনিই শেষে শকুন্তলাকে বুকে জড়িয়ে আরও সায় পাবার মতো চরিত্র সন্ধ্যার দাদু—সন্ধ্যা ও প্রশান্তর প্রণয়কে যিনি সুস্থ ও উদারভাবে গ্রহণ করেন। প্রশান্তর কলেজের সহপাঠিবৃন্দও সন্ধ্যাকে ভগিনীতুল্য জ্ঞান করে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ায় প্রশংসনীয় হতে পেরেছে। বিয়ের আগে শকুন্তলাকে নিয়ে আসার জন্যে ওদের মার্চ করে বেরিয়ে যাওয়ার আচরণ কৌতুকজনক এবং প্রেক্ষাগৃহে হাসির হুল্লোড় সৃষ্টি করে।

* * *

ছবির আরম্ভটি ভালো। জোর হবার ঠাকুরঘরে গিয়ে সন্তানের জন্য শকুন্তলার প্রার্থনা। এখনকার চিন্তায় এতোদিন সন্তান না হওয়ার জন্যে ডাক্তারের কাছে স্বামী ও স্ত্রীর সুস্থতা পরীক্ষার কথা মনে হতো। যাই হোক, গল্পের পরিবেশটি কিন্তু জমে ওঠে সেই থেকেই। এমনিতে অবশ্য ছক বাঁধা গল্প এবং বিন্যাসও হয়েছে মামুলী পথ ধরেই। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে নাটকীয়তা সৃষ্টির কৃতিত্ব বেশ উপলব্ধি করতে পারা যায় এবং তা প্রশংসা পাবারও যোগ্য। সকালে শকুন্তলা শাশুড়ীর সামনে এসে পড়ায় তার মুখ দেখে ফেলার জন্য শাশুড়ীর কটুক্তি
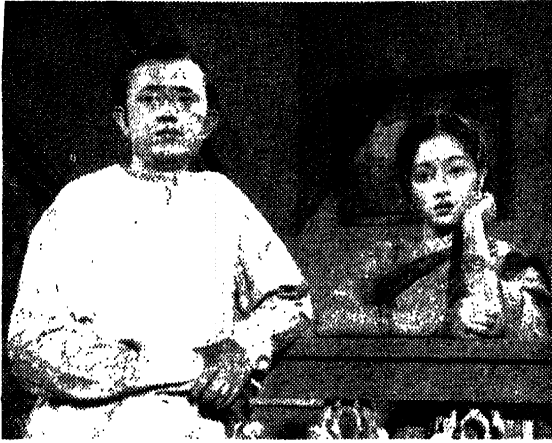
এ সপ্তাহের বাঙলা চিত্রমুক্তি "জয়মা কালী বোর্ডিং"-য়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ

শুনে শকুন্তলার মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া থেকে শকুন্তলার অসুখ এবং তার দৃষ্টিশক্তি হারানো পর্যন্ত অংশটি নাটকীয়তায় দর্শকচিত্তকে নিবিষ্ট রেখে দেয়। গল্পের শেষে বিয়ে ইত্যাদি ব্যাপার হুটোপাটির মধ্যে শেষ করে দেওয়ার ঘটনায় একেবারে 'সিনেমা-সুলভ' কৃত্রিমতাকে সহায় করা হয়েছে। কালক্ষেপেও গোঁজামিল। বিয়ের দিন ঠিক করে শচীর মার কাছ থেকে যখন টেলিগ্রাম এসে পৌঁছলো তৎক্ষণাৎই সন্ধ্যা সেই টেলিগ্রাম হাতে দৌড়ে হাজির হলো প্রশান্তর হোস্টেলে। বিয়ের তারিখ দুদিন পর। সন্ধ্যা পৌঁছবার স্বল্পক্ষণ পরই প্রশান্তর সহপাঠিরা ট্যাক্সী নিয়ে ছুটলো শকুন্তলাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু সেই ট্যাক্সীতেই তারা শকুন্তলাকে নিয়ে ফিরলো ঠিক যখন বরযাত্রী বের হবার সময়। মধ্যে দুদিন অতিবাহিত হওয়া অস্পষ্ট। সময়ের এমনি গোঁজামিল শকুন্তলার সন্তান জন্মের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়; অন্ততঃ সময়ের অতিবাহনটা স্পষ্ট নয়। শকুন্তলার অতোবড় অসুখ যাতে যে দৃষ্টিশক্তি হারালো সে খবর তার দাদাকে না জানানো; বা শকুন্তলার সন্তান জন্মাবার পর সে খবরও শচীদের বাড়িতে না পাঠানোর ব্যাপারে এইটেই মনে হয় যে তম্বারা গল্পতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব সম্ভাবনা ছিল সে জটিলতা যেন এদের পক্ষে সামলে ওঠা দায় ছিলো। তা নয়তো যুক্তির দিক থেকে কোন হেতু পাওয়া যায় না। জমিদারী সেরেস্তা, নায়েব, চর নিয়ে মামলা, রাধামাধবের মন্দির ইত্যাদির কাঠামোর উপর তৈরী পরিবেশ যা বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে বহুভাবে পেয়ে পেয়ে এখন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এক বৌ থাকতে আর এক দারপরিগ্রহ ব্যাপার নিয়ে একটা গ্রাম্য দৃশ্য অবতারণা করে শচীর মন বাঁধবার সুযোগ দেখানো হয়েছে। কিন্তু সে দৃশ্যের গঠন এলোমেলো; চরিত্রগুলি বিচিত্র। তবে এক্ষেত্রে সেসবও সহ্য হতে পেরেছে মূল কাহিনীর পরিচর্যার গুণে। এবং তার জন্যে পরিচালনা ও অভিনয়কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। সংলাপের দিকটা মাঝে মাঝে বড়ো দুর্বল।

* * *

মৌলিক কোন নতুন প্রকৃতির চরিত্র এতে নেই একটিও। শচীর মার মতো সংস্কারাচ্ছন্ন শ্বাশুড়ী, শকুন্তলার মতো সাধ্বী স্ত্রী, শচীর মতো সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রামী মন, সন্ধ্যার মতো মেয়ে বা প্রশান্তর মতো কলেজি ছেলে, শকুন্তলার দাদার মতো ক্ষ্যাপাটে ব্যক্তি বা তার বৌদির মতো অন্তরে ভালো কিন্তু মুখরা নারী, সন্ধ্যার দাদুর মতো বৃন্দেদুতী দাদু, বা মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো ধূর্ত নায়েব বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে নতুন নয়। কিন্তু শিল্পীবৃন্দ অভিনয়গুণে চরিত্রগুলিকে পুষ্টভাবে সামনে তুলে ধরেছেন। অভিনয়ে শকুন্তলার চরিত্রে সন্ধ্যারাণীর কথাই মনে হবে আগে। বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রাভিনয়ে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছেন অন্ধ শকুন্তলার চরিত্রে তার চমৎকার মনোজ্ঞ পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। দর্শকমাত্রেরই সহানুভূতি শকুন্তলার ওপরে স্বতই উপচে পড়ে। শচীর চরিত্রে উত্তমকুমারকে সংস্কারকে কাটিয়ে ন্যায় ও যুক্তির পক্ষে দাঁড়াবার একটি অন্তর্দ্বন্দ্ববিশিষ্ট চরিত্র

চিত্রণে সফলকৃতিরূপে পাওয়া যায়। একদিকে মায়ের জিদ অপরদিকে স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য, এই দোটানা অবস্থার রূপটিকে তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সন্ধ্যার চরিত্রে সাবিত্রী তার বিভিন্নমুখী অভিনয় প্রতিভার আর একটি নিদর্শন সামনে তুলে ধরেছেন। প্রশান্তর চরিত্রে প্রশান্তকুমার এখানে ব্যক্তিত্বহীন। তবে এদের প্রসঙ্গটি জমিয়ে তোলেন দাদুর চরিত্রে ছবি বিশ্বাস। নাতনীর প্রণয় অভীপ্সাকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর রসিকতার ভঙ্গী বেশ রস সঞ্চার করে। শচীর মার মতো চরিত্রে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়কে আগেও দেখা গিয়েছে এবং এবারও তিনি অভিনয় ভালোই করেছেন। কাহিনীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির মূলে এই চরিত্রটি। নায়েব মুকুন্দ চক্রবর্তীর চরিত্রে কমল মিত্র "মুকুন্দ চক্রবর্তী সব পারে, পারে না কেবল মরা মানুষ বাঁচাতে" কথাটা কয়েকবার ব'লে দর্শকদেরও মুখের কথায় ধরিয়ে দেন। চরিত্রটি তিনি ফুটিয়েছেনও ভালো। শকুন্তলার ক্ষ্যাপাটে ভোলামন দাদার ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী তাঁর চিরাচরিত ধারাই বজায় রেখেছেন। স্টেথিস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে তারই খোঁজে সারা বাড়ি তোলপাড় করা বড়ো মামুলী কৌতুক। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় রেণুকা রায় মুখরা নারীর টাইপ চরিত্রটি উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন। প্রশান্তর হোস্টেলে অনুপ-কুমার তাঁর একদল সহপাঠী নিয়ে কৌতুকরঙ্গ উপভোগের বেশ সুযোগ ক'রে দেন। ওদের অংশ হাসির হুল্লোড় সৃষ্টি ক'রে দেয়। এক ডাক্তারের ছোট্ট চরিত্রে আছেন বিকাশ রায় ক্ষণিকের জন্য একবার। তেমনি আর এক ডাক্তারের চরিত্রে আছেন ধীরাজ দাস। অন্যান্য চরিত্রে আছেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জয়-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, জয়শ্রী সেন, চিত্রা মণ্ডল, বিভা প্রভৃতি।

* * *

কলাকৌশলের দিক সাধারণ। কল্পনাপ্রসূত তেমন মনোজ্ঞ দৃশ্যরচনা বলতে নেই; কাজ চলে গিয়েছে এই পর্যন্তই। তবে সংগীত পরিচালনায় কালীপদ সেন, বিশেষ করে আবহ-সংগীতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দৃশ্য অনুসারে বেশ ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টিতে আবহসংগীতকে যথাযথ কাজে লাগাতে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়ে-ছেন; সুর ও অর্কেস্ট্রা বেঁধেছেন ভালো। ক'খানি গানের মধ্যে রেডিওতে 'মৃণাল চক্রবর্তীর একখানি গানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলাকুশলীদের মধ্যে কাজ করেছেন আলোকচিত্র গ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী, শব্দগ্রহণে জে ডি ইরাণী, শিল্পনির্দেশে সুনীল সরকার ও রূপসজ্জায় [illegible] ।

খেলার মাঠে

একলব্য

উইম্বলডন টেনিসের আর একটি অনুষ্ঠান সম্প্রতি শেষ হয়ে গেল। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ টেনিস প্রতিযোগিতার এই মহা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড় ও টেনিস ক্রীড়ামোদীর মনে উৎসাহ উদ্দীপনার যে সাড়া জেগেছিল, সমস্ত বিষয়ের ফাইন্যাল খেলার পর স্বাভাবিকভাবেই তা মন্থর হয়ে গেছে। তবে উইম্বলডনের স্মৃতি সহজে মন থেকে মুছবার নয়। টেনিস-রস-পিপাসু ক্রীড়ামোদীর মনে সারা বছরই উইম্বলডনের স্মৃতি জেগে থাকে। কারণ উইম্বলডন হচ্ছে বিশ্ব টেনিসের পীঠস্থান। উইম্বলডন বিজয়ীর সম্মানও অনন্য। টেনিসে বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতার কোন আয়োজন নেই, তাই উইম্বলডন টেনিসের বিরাট এবং ব্যাপক আয়োজন, নিখুঁৎ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি প্রতিযোগিতার আভিজাত্য উইম্বলডন টেনিসকে বিশ্ব প্রতিযোগিতার পরিপূরকের মর্যাদা দান করেছে। সেইজন্য উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নও বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত টেনিস বীর। বিশ্ব টেনিসের অজেয় যোদ্ধা হিসাবেই উইম্বলডন বিজয়ীর খ্যাতি ও মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত।

উইম্বলডনের এবার ছিল ৬৯তম অনুষ্ঠান। এবারকার প্রতিযোগিতায় আমেরিকারই জয়জয়কার। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে যাঁরা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন, তাঁরা দুই জনই আমেরিকার অধিবাসী। পুরুষদের বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ২৪ বছর বয়স্ক দীর্ঘাকৃতি শক্তিধর খেলোয়াড় টনি ট্রাবার্ট আর মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন লুই ব্রাউ। পুরুষ ও নারীর মিশ্র প্রতিযোগিতা অর্থাৎ মিক্সড ডাবলসের ফাইন্যালেও আমেরিকা জয়ী হয়েছে। আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন ভিক সেক্সাস ও মিস ডোরিস হার্ট লাভ করেছেন বিজয়ীর সম্মান। পুরুষদের ডাবলসে অস্ট্রেলিয়া এবং মেয়েদের ডাবলসে ইংলণ্ড বিজয়ীর পুরস্কার পেয়েছে। পুরুষদের ডাবলসে ৪ জন অস্ট্রেলিয়ানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত রেক্স হার্টউইগ ও লুইস হোড নীল ফ্রেজার ও কেন্ রোজওয়ালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। পুরুষদের ডাবলসের মত

১৯৫৫ সালের উইম্বলডন রাণার্স কার্ট নীলসেন

মহিলাদের সিংগলসেও দুই আমেরিকানবাসিনী ফাইন্যালে পরস্পরের সম্মুখীন হন, শুধু ফাইন্যালই বা কেন, সেমি-ফাইন্যালেও উঠেছিলেন আমেরিকার ৪ জন টেনিস পটিয়সী। টেনিসের মহিলা বিভাগে আমেরিকার এই প্রাধান্য গত ১৮ বছর ধরে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। তবুও এবার উপর্যুপরি তিনবারের চ্যাম্পিয়ান মোরিন কনোলী অংশ গ্রহণ করেননি। উইম্বলডনে আমেরিকার এই টেনিস সম্রাজ্ঞীকে এবার দেখা গেছে সাংবাদিকরূপে। খেলোয়াড়রূপে নয়। গতবার টেনিস নৈপুণ্যের উন্নত ক্রীড়াচ্ছটায় যিনি উইম্বলডনকে মুখরিত করে তুলেছিলেন, অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন সমবেত সাংবাদিককুলের কাছে, এবার তাঁকেই সাংবাদিকের আসনে বসে অপরের খেলার সমালোচনা করতে হয়েছে। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! গতবার উইম্বলডন বিজয়ের তৃতীয় সাফল্যের পর অশ্বারূঢ়া কনোলী নিজের দেশে এক দুর্ঘটনায় পতিত হন, তার ফলেই টেনিসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ। র‍্যাকেট ছেড়ে এখন তিনি লেখনী ধরেছেন। যাই হোক, এবারও আমেরিকার যে মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন, কনোলীর মত তাঁরও টেনিস খ্যাতি সর্বজনবিদিত। মিস লুই ব্রাউও উপর্যুপরি তিনবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন; ১৯৪৮, ৪৯ ও ৫০ সালে তিনি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। এবার নিয়ে মিস ব্রাউ ৪ বার বিজয়ী হলেন। তাছাড়া উইম্বলডন বিজয়ীদের তালিকায় লুই ব্রাউয়ের নাম আরও ৯ বার খোদিত আছে। অপর খেলোয়াড়ের সঙ্গে
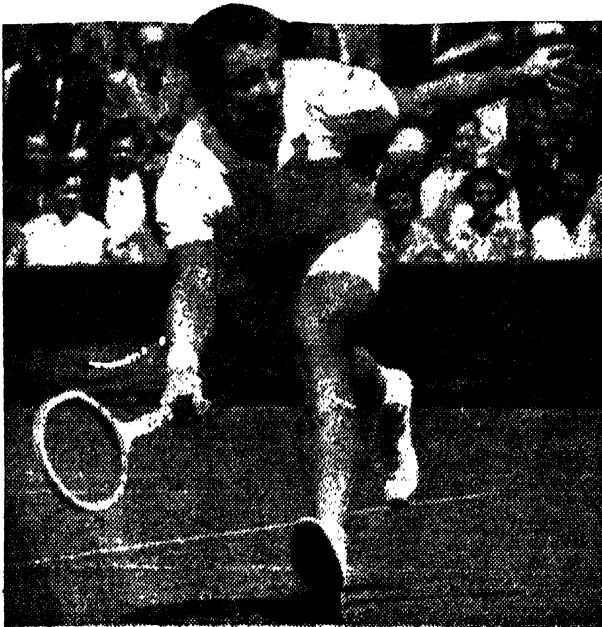
১৯৫৫ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন টনি ট্রাবার্টের খেলার ভঙ্গী

তিনি মিক্সড ডাবলসে ৪ বার এবং ডাবলসে ৫ বার বিজয়িনী হয়েছেন। মিস ব্রাউ ফাইন্যালে এবার যাকে পরাজিত করেন, তিনি ব্রাউয়ের চেয়ে ৭ বছরের ছোট। ব্রাউয়ের এ সাফল্য যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ, তাঁর অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাস সত্যই প্রশংসনীয়। ব্রাউ কোন প্রতিযোগিনীকে একটি সেটও দেননি।

* * *

মহিলা প্রতিযোগীর শ্রেষ্ঠত্বের বাছাই তালিকায় লুই ব্রাউকে দ্বিতীয় স্থান দান করা হয়েছিল। সম্ভাবিত বিজয়িনী হিসাবে মিস ডোরিস হার্ট ছিলেন প্রথম স্থানের অধিকারিণী। কিন্তু মিস হার্ট সেমি-ফাইন্যালে আমেরিকারই অন্যতমা টেনিস পটিয়সী মিসেস বেভারলি বেকার ফ্লিটজের কাছে পরাজিত হন। বেভারলি বেকার টেনিসের অপরিচিত নাম না হলেও বাছাই তালিকায় স্থান পাননি, তাই এই ফলাফলকে অপ্রত্যাশিত বলা যেতে পারে। কুমারী অবস্থাতেই তিনি 'অ্যাম্বিডেক্সট্রাস' খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে মিঃ ফ্লিটজের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় মিসেস বেভারলি বেকার ফ্লিটজনামে পরিচিতা হয়েছেন। 'অ্যাম্বিডেক্সট্রাস' অর্থাৎ সব্যসাচী খেলোয়াড়। দুই হাতেই এর সমান নিপুণতা। ব্যাকহ্যান্ডের বালাই নেই। ডান হাতে খেলছেন, হঠাৎ বাঁদিকে একটা বল এলো, বেভারলি ডান হাতের র‍্যাকেটখানা বাঁ হাতে এনে ফোরহ্যান্ডে বল ফিরিয়ে দিলেন। 'অ্যাম্বিডেক্সট্রাস' খেলোয়াড়ের খেলার সঙ্গে কলকাতার দর্শকরা একেবারেই পরিচিত নন, এমন নয়। স্টিফনী নামে এক খেলোয়াড় কলকাতার সাউথ ক্লাবে দুই হাতে খেলে

গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জারোস্লাভ ড্রবনি

অস্ট্রেলিয়ার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় কেন্ রোজওয়ালের ভলি মারার দৃশ্য

খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় তারা টনি ট্রাবার্টকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন, ট্রাবার্টই বিজয়ী হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ডেনিস চ্যাম্পিয়ন কার্ট নীলসেনের ফাইন্যালে ট্রাবার্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তালিকা রচয়িতাদের হিসাব বহির্ভূত ঘটনা। বাছাই তালিকায় টনি ট্রাবার্টের পরই স্থান ছিল অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ন কেন্ রোজওয়ালের। তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভিক সেক্সাস, তারপর অস্ট্রেলিয়ার লুইস হোড ও রেক্স হার্টউইগ। অসামঞ্জস্যপূর্ণ খেলার জন্য গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জারোস্লাভ ড্রবনিকে দেওয়া হয়েছিল ষষ্ঠ স্থান। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন বাজপেটি সপ্তম স্থানে ছিলেন, সুইডেনের খ্যাতনামা খেলোয়াড় ডেভিডসনের স্থান ছিল অষ্টম। বাছাই তালিকার এই ৮জনের মধ্যে অবশ্য ৬ জন কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হন। আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন ভিক সেক্সাস এবং অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম কীর্তিমান খেলোয়াড় রেক্স হার্টউইগ কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠতে পারেননি। ১৯৫৩ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এবং আমেরিকার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ভিক সেক্সাসকে দ্বিতীয় রাউন্ডেই তার দেশের উদীয়মান খেলোয়াড় গিলবার্ট শীর কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হার স্বীকার করতে হয়। আমেরিকান টেনিসে শী দশম স্থানের অধিকারী। বাছাই খেলোয়াড় হার্টউইগ তৃতীয় রাউন্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার এক অখ্যাত খেলোয়াড়ের কাছে স্ট্রেট সেটে পরাজয় স্বীকার করেন। যাই হোক দৃঢ়চেতা খেলোয়াড় কার্ট নীলসেন বাছাই তালিকার বাইরে থেকেও তিন বছরের মধ্যে দুইবার উইম্বলডন ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

গেছেন। ইনি ছিলেন ইটালীর সব্যসাচী টেনিস খেলোয়াড়। যাই হোক 'অ্যাম্বিডেক্সট্রাস' মিসেস বেভারলি বেকার অবশ্য ফাইন্যালে জয়লাভ করতে পারেননি। তাঁর দেশেরই বর্ষীয়সী নিপুণা খেলোয়াড় লুই ব্রাউয়ের কাছে হার স্বীকার করেছেন। তবে এই দুই প্রতিযোগিনীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। পুরুষদের সিঙ্গলসের চেয়ে মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল দর্শকদের বেশী আনন্দ দান করে।

* * *

গুণাগুণের মাপকাঠিতে পুরুষ খেলোয়াড়ের শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচনে প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের হিসাবে ভুল হয়নি। পুরুষ

১৯৫৫ সালে উইম্বলডনের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিস লুই ব্রাউ

লুইস হোড—ডাবলস চ্যাম্পিয়ন জুটির একজন

অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ভিক সেক্সাসের কাছে পরাজিত হন, এবার পরাজিত হয়েছেন টনি ট্রাবার্টের কাছে। ট্রাবার্টের সংগে নীলসেন অবশ্য ভাল খেলতে পারেননি। স্ট্রেট সেটেই তাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। অবশ্য প্রথম দিকে নীলসেনের খেলায় যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু ৬ ফিট দীর্ঘ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ট্রাবার্ট ছিলেন শক্তিশালী, সুকৌশলীও বটে। তার গোলার মত সার্ভিস আর তীব্র গতি ভলির কাছে নীলসেনকে সহজেই পরাভব স্বীকার করতে হয়। ট্রাবার্টের প্রচণ্ডগতি সার্ভিসে বলের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১০ মাইল বলে হিসাব করা হয়েছে। তবুও বিশ্ব টেনিস রণাংগনে আমেরিকা ও ডেনমার্কের দুই বীরের মরণপন সংগ্রামের অবসান ঘটতে ৭৩ মিনিট সময় লাগে।

ডেনিস চ্যাম্পিয়ন নীলসেন ফাইন্যালে সুবিধা করতে না পারলেও সেমি-ফাইন্যালে দুই ঘণ্টা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ন কেন্ রোজওয়ালকে পরাজিত করেন। রোজওয়ালের পরাজয় অপ্রত্যাশিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দুই বীরের ক্রীড়াধারার সংগতিসূচক ফলাফল। সত্যই নীলসেনের খেলায় অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনারকমের মারের ওস্তাদ সুকৌশলী রোজ-ওয়াল নীলসেনের সার্ভিস ও ভলির কাছে পরাজিত হন।

গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন মিশরের খেলোয়াড় জারোশলাভ ড্রবনির ক্রীড়ামান এ বছর উন্নত ছিল না। কয়েক সপ্তাহ আগে নর্দার্ন লন টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের কোয়ার্টার ফাইন্যালে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নকে ভারতের তরুণ খেলোয়াড় কৃষ্ণণের কাছে স্ট্রেট সেটে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া ড্রবনি আরও কয়েকটি খেলায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রীড়াধারার পরিচয় দেন। সম্ভবত এই কারণেই ড্রবনিকে বাছাই তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রাখা হয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ড্রবনিকে ট্রাবার্টের সংগেই খেলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তবে পরাজিত হলেও ড্রবনি টেনিসের উন্নত কলানৈপুণ্যে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ড্রবনির সংগে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় মার্ভিন রোজের খেলাও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়।

বিশ্বের দুই ধুরন্ধর ন্যাটা খেলোয়াড় ড্রবনি ও রোজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দিন সব খেলার উপরে স্থান পেয়েছিল। এছাড়া সিংগলসের অপরাপর খেলাগুলির মধ্যে বাজপেটি ও লুইস হোডের খেলাও উন্নত টেনিস নৈপুণ্যে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু যতজন যত নৈপুণ্যই প্রকাশ করুক, টনি ট্রাবার্টের প্রতিভাদীপ্ত খেলার সংগে আর কারুর খেলার তুলনা হয় না। যেমন তার তীব্র সার্ভিস, তেমন তার মারের ওস্তাদি, তেমনই সাবলীল ভংগি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ পর্যন্ত ট্রাবার্টকে ৭জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে হয়। এর মধ্যে কেউ তাঁর কাছ থেকে একটি সেটও লাভ করতে পারেননি। এমন সহজ ও সাবলীল ভংগিতে খেলে উইম্বলডন জয় বিশ্বের বেশী খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯২২ সালে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের বিলোপসাধনের পর ১৯৩৮ সালে আমেরিকারই অন্যতম খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ এইভাবে প্রতিপক্ষের

আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন ডিক্ সেক্সাস—মিক্সড ডাবলস বিজয়ী জুটির অন্যতম

মিস ডোরিস হার্ট—মিক্সড ডাবলসে সেক্সাসের সংগী

কাছে কোন সেট না হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিলেন। ডোনাল্ড ছিলেন ব্যাক হ্যাণ্ড স্ট্রোকের সুনিপুণ ওস্তাদ।

সিংগলসের খেলা সম্পর্কে আর একজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ না করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। ইনি হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম খেলোয়াড় জ্যাক আর্কিনস্টল, যিনি এই বছরই নিখিল ভারত চ্যাম্পিয়নশিপে কৃষ্ণণকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে গেছেন। আর্কিনস্টল অবশ্য উইম্বলডনের উপরের দিকে উঠতে পারেননি, কিন্তু তিনি সিংগলস ও ডাবলসের খেলা নিয়ে একদিন পুরো ৭ ঘণ্টা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে এই দিন সবশুদ্ধ ১৩২টি গেম খেলতে হয়েছিল।

* * *

উইম্বলডনে ভারতের তিনজন খেলোয়াড় এবার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রামনাথ কৃষ্ণণ, নরেশকুমার, আর মিস, রিতা ডেভার। এর মধ্যে ভারতের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিস রিতাকে প্রথম খেলাতেই দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন মিসেস হেজেল রেডিক স্মিথের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। এটা ছিল দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা। 'বাই' পাবার ফলে রিতাকে প্রথম রাউণ্ডে খেলতে হয়নি। ভারতের তরুণ চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণণ প্রথম রাউণ্ডে গ্রেট ব্রিটেনের ই আর বামার ও দ্বিতীয় রাউণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার রাসেল সেমুরকে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে চিলির খেলোয়াড় লুইস আয়লার কাছে পরাজিত হন। উইম্বলডনে কৃষ্ণণের এটা ছিল তৃতীয় অভিযান। ভারতের টেনিস অধিনায়ক নরেশকুমার আরও ৬বার উইম্বলডনে খেলে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সপ্তম অভিযানে তিনি বিশ্বের

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন টনি ট্রাবার্ট ডাচেস অব কেণ্টের হাত থেকে বিজয়ীর পুরস্কার গ্রহণ করছেন; ডানদিকে হাস্যরত উইম্বলডন রানার্স নীলসেনকে দেখা যাচ্ছে

১৬জন কৃতী খেলোয়াড়ের মধ্যে নিজের নাম খোদিত করেছিলেন। কিন্তু আর বেশী দূর এগুতে পারেননি। চতুর্থ রাউণ্ডে তাঁকে অমিতবিক্রম 'টনির' কাছে হার স্বীকার করতে হয়। নরেশকুমার প্রথম রাউণ্ডে হারিয়ে-দিলেন ভেনেজুয়েলার আই পিমেণ্টলকে, দ্বিতীয় রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার গিলমারকে। কুমার ও গিলমারের মধ্যে আড়াই ঘণ্টা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। তৃতীয় রাউণ্ডে পুরো দুই ঘণ্টার সংগ্রামে কুমার দক্ষিণ আফ্রিকার তিন নম্বর খেলোয়াড় আয়ান ভার্মাককে পরাজিত করেন। তার পরেই ট্রাবার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ। উইম্বলডনের শেষ ১৬ জন কৃতী খেলোয়াড়ের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বেশী ভারতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে এ সম্মান লাভ করা সম্ভব হয়নি। ভারতের একজন মাত্র খেলোয়াড় এ পর্যন্ত উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হতে সমর্থ হয়েছেন। ইনি হচ্ছেন এদেশের টেনিস দিকপাল গউস মহম্মদ। ১৯৪৮ সালে গউস সেবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ববি রিগসের কাছে কোয়ার্টার ফাইন্যালে পরাজিত হন। পাঁচটি সেটের মধ্যে রিগসের কাছ থেকে দুটি সেট লাভও করেছিলেন গউস। যাই হোক এবার ভারতের ডাবলসের খেলাও উইম্বলডনের টেনিস পণ্ডিতম্মন্যদের প্রশংসা অর্জন করে। সিঙ্গলসে কুমার যেমন চ্যাম্পিয়ন 'টনির' কাছে হার স্বীকার করেছেন ডাবলসেও কুমার কৃষ্ণ হার স্বীকার করেছেন ডাবলসেও কুমার-কৃষ্ণ ও হার্টউইগের কাছে। ভারতীয় জুটি দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইংলণ্ডের ওয়ালিস ও অ্যালেককে পরাজিত করেন, তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত করেন ব্রিটেনের ডাবলস জুটি মট্রাম পাইসকে ও তারপর পরাজিত হন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী হোড হার্টউইগ জুটির কাছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ডেভিস কাপের খেলাতেও মট্রাম পাইসকে কুমার কৃষ্ণের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সম্প্রতি ব্রিটেনের সংবাদে প্রকাশ, ডেভিস কাপের ইউরোপীয় অঞ্চলের সেমি-ফাইন্যালে ইটালীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ব্রিটেনের যে টীম গঠন করা হয়েছিল তার থেকে মট্রাম ও পাইসকে ছেড়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। ডেভিস কাপ ও উইম্বলডনে কুমার-কৃষ্ণণের হাতে মট্রাম ও পাইসের পরাজয়েই হয়তো এই প্রতিক্রিয়া।

মিক্সড ডাবলসের খেলাতেও ভারত পদ্ম-পাঠ বিদায় গ্রহণ করেনি। কৃষ্ণ ও কুমারী রিতা, যাদের বয়স কুড়ির কোঠা পার হয়নি, তারা মিক্সড ডাবলসের দ্বিতীয় রাউণ্ডে জে ষ্ট্যাপার (স্পেন) ও মিস এম গ্রেসকে (ব্রিটেন) হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে মিক্সড ডাবলসের রানার্স মিস লুই ব্রাউ (আমেরিকা) ও এনরিক মোরিয়ার (আর্জেণ্টিনা) কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। মিক্সড ডাবলসে নব-পরিণীত লুই হোড ও মিসেস হোডের সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। খ্যাতনাম্নী টেনিস পটিয়সী জেনিফা ষ্ট্যানলীর সঙ্গে কীর্তিমান খেলোয়াড় হোডের

পরিণয়ের পর যে টেনিস দম্পতি উইম্বলডনের উৎসব ক্ষেত্রকে 'মধুযামিনীর' ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাদের সম্বন্ধে সবার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া অস্ট্রেলিয়ান টেনিসে এদের স্থানও অনেক উঁচুতে। কিন্তু এরা পারেননি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে। সেমিফাইন্যালে পরাজয় স্বীকার করেছেন মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ন ভিক সেক্সাস ও মিস ডোরিস হার্টের কাছে।

* * *

উইম্বলডনে ব্রিটেনের সাফল্য এবার মহিলাদের ডাবলসে। মিস মর্টিমার ও মিস শীলকক ব্রিটেনেরই অপর জুটি মিস ব্রুমার ও মিস ওয়ার্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। মিস মর্টিমারের উপর ব্রিটেনের

উইম্বলডনে ভারতের একমাত্র প্রতিযোগিনী মিস রিতা ডেভার। উইম্বলডনে মিস রিতাকে নিজের কোটের দ্বারা বৃষ্টি আটকাতে দেখা যাচ্ছে

এবার অনেক আশা ছিল। ২৩ বছর বয়স্ক মর্টিমার এই বছরই ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। সুতরাং মোরিল কনোলীর অভাবে তিনি এবার বিজয়িনী হবেন এই ছিল ব্রিটেনবাসীর আশা। কিন্তু মর্টিমারকে দ্বিতীয় রাউণ্ডেই হাঙ্গেরীর টেনিস কলা-কুশলী মিস জুসি কর্মোকজির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। জুসি টেনিসে যথেষ্ট

ভারতের টেনিস অধিনায়ক নরেশকুমার

অভিজ্ঞতাসম্পন্না। তিনি ১১ বছর থেকে টেনিস খেলে আসছেন আর ৭ বার হাঙ্গেরীর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। যাই হোক, সিংগলসে সাফল্য লাভ করতে না পারলেও মিস মর্টিমার ডাবলসে শীলককের সহ-যোগিতায় বিজয়িনী হয়ে ইংলণ্ডের টেনিস মর্যাদার কিছু পুনরুদ্ধার করেছেন। মহিলাদের ডাবলসে বাছাই তালিকার শীর্ষ-স্থানে ছিলেন আমেরিকার মিস ডোরিথ হার্ট ও বারবারা ডেভিডসন জুটি, কিন্তু এ'রা ইংলণ্ডের দুই তরুণী মিস জেনিফার

ভারত চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণন

মিডলটন ও মিস ডোরিন স্পিয়ার্সের কাছে প্রথম রাউণ্ডেই কুপোকাত হন। মিস স্পিয়ার্স মিডলসেক্সের মেয়ে। আর কুমারী জেনিফা উইম্বলডনের অধিবাসিনী, উইম্বলডনের কোলে লালিতা পালিতা।

* * *

উইম্বলডনে বিশ্ব টেনিসের মহামেলার বারোদিনব্যাপী ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর্যালোচনা করতে এ সপ্তাহের লেখার কলেবর অনেক-খানি বেড়ে গেল। উইম্বলডনের আয়োজন ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছুই লেখা গেল না। তবুও সংক্ষেপে বলি উইম্বলডনে এবার ৩৫টি দেশের আড়াইশো প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুশোভিত মনোরম অনুষ্ঠানক্ষেত্রের ১৬টি শ্যামল ঘাসের কোর্টে বারোদিন ধরে চলেছে এদের অবিরাম সংগ্রাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে আগত দুই লক্ষ সত্তর হাজার টেনিস-রসপিপাসু দর্শক এবার খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। ৩০ হাজার অত্যুৎসাহী হতাশ দর্শককে বসবার স্থান দিতে না পারায় প্রতিযোগিতা কামিটিকে ১৭৬,০০০ পাউণ্ড ফেরত দিতে হয়েছে। বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় বল লেগেছে ৭ হাজার। এর থেকেই উইম্বলডনের ব্যাপকতা বোঝা সহজ হবে। ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল:

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল

টনি ট্রাবার্ট (আমেরিকা) ৬-৩, ৭-৫ ও ৬-১ গেমে কার্ট নীলসেনকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল

মিস লুই ব্রাউ (আমেরিকা) ৭-৫ ও ৮-৬ গেমে মিসেস বেভারলি বেকার ফ্লিটজকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

রেক্স হার্টউইগ ও লুইস হোড (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে নীল ফ্রেজার ও কেন্ রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল

মিস এ মর্টিমার ও মিস জে শীলকক (ব্রিটেন) ৭-৫ ও ৬-১ গেমে মিস এস ব্রুমার ও মিস পি ওয়ার্ডকে (ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

ভি সেক্সাস ও মিস ডোরিস হার্ট (আমেরিকা) ৮-৬, ২-৬ ও ৬-৩ গেমে ই মোরিয়া (আর্জেণ্টিনা) ও মিস লুই ব্রাউকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

লীগ খেলার সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

[৫ই জুলাইয়ের পর]

প্রথম ডিভিশন লীগের খেলা শেষ হতে এখনো প্রায় এক মাস বাকী। সব ক্লাবকেই আরও সাত আটটি করে ম্যাচ খেলতে হবে।

মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগের খেলায় মহমেডান গোলরক্ষক এফ রহমান লাফিয়ে উঠে একটি বল ফিস্ট করবার পর গোলের মুখের দৃশ্য

বর্তমানে লীগ কোঠার উপন্তের দিকে যে অবস্থা তাতে পাঁচটি দলের সম্মুখেই লীগ বিজয়ী হবার রঙীন হাতছানি। এমনকি ইস্টবেংগল ক্লাব, যারা উপর্যুপরি চারটি খেলায় পরাজয়ের মুখে মোট ১২ পয়েন্ট নষ্ট করে লীগের আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল তাদের খেলোয়াড় ও সমর্থকমনে এখন আশার আলো। সাত আটটি খেলা বাকী থাকতে পাঁচটি দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের প্রশ্নে এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। ৫ই জুলাই পর্যন্ত ইস্টবেংগল ক্লাব হারিয়েছে ১৩ পয়েন্ট, রাজস্থান ক্লাব নষ্ট করেছে ১১ পয়েন্ট, আর ১০ পয়েন্ট করে নষ্ট করেছে মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং ও এরিয়ান ক্লাব। ইস্টবেংগল ক্লাব এখনও যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন, তবুও তাদের সাম্প্রতিক খেলার ধারা কিছুটা আশাব্যঞ্জক, যদিও ইস্টবেংগলের রক্ষণভাগ চোরাবালিতে ভর্তি। মোহনবাগানের খেলায় উন্নতির কোনই লক্ষণ নেই। কয়েকটি খেলায় দর্শকদের তারা যথেষ্টই মনোকষ্ট দিয়েছেন।

[illegible] খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলই এবারকার লীগের বিশেষত্ব। নীচের দিকের দলের কাছে উপরের দলের পরাজয় এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আশা করা যায়, প্রতি দলের যে সাত আটটি করে খেলা বাকী আছে তার মধ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যাবে। জুনিয়র খেলোয়াড়েরা এক বছরে খুব পটু হয়ে উঠেছেন বলে এরূপ অপ্রত্যাশিত ফলাফল সম্ভব হচ্ছে, এটি মনে করলে ভুল হবে। ফুটবলের মান উন্নত তো নয়ই বরং নিম্নমুখী। তা ছাড়া পায়ে বাধ্যতামূলক বুটের বন্ধন সিনিয়র ও জুনিয়র খেলোয়াড়দের প্রায় এক স্তরে এনে ফেলেছে। তাই মনে হয় ফুটবল মরসুমের জন্য আরও অপ্রত্যাশিত ফলাফল অপেক্ষা করছে।

গত সপ্তাহের খেলাগুলির মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান ক্লাবের চ্যারিটি খেলার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। অনেকটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে খেলে মোহনবাগানকে এই খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে হয়। খেলাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের ১০ জন খেলোয়াড়ের [illegible] সত্ত্বেও খেলাটি [illegible] হয়ে [illegible]। [illegible] সপ্তাহে কালীঘাট ক্লাবের কাছে রাজস্থানের পরাজয়ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কালীঘাট ক্লাব, যাদের স্থান সর্বনিম্নস্থানাধিকারী অরোরা ক্লাবের কেবল উপরে, তারা ২—১ গোলে শক্তিশালী রাজস্থান ক্লাবকে পরাজিত করে। বি এন আর এরিয়ান ও কালীঘাট ক্লাবের কাছে উপর্যুপরি তিনটি খেলার পরাজয় রাজস্থান ক্লাবকে চ্যাম্পিয়নশিপের পথ থেকে কিছুটা সরিয়ে দিয়েছে। তবুও তাদের লীগ বিজয়ের সম্ভাবনা পুরোভাবেই বিদ্যমান। নীচে গত সপ্তাহের খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:

২৯শে জুন '৫৫' ......

মহঃ স্পোর্টিং (৪) : কালীঘাট (২)
উয়াড়ী (১) : অরোরা (০)

৩০শে জুন '৫৫'

ইস্টবেংগল (২) : বি এন আর (১)
রেলওয়ে স্পোর্টস (২) : পুলিশ (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০) : খিদিরপুর (০)

১লা জুলাই '৫৫'

এরিয়ান (১) : রাজস্থান (০)
জর্জ টেলিগ্রাফ (৩) : কালীঘাট (০)

২রা জুলাই চ্যারিটি ম্যাচ

মহঃ স্পোর্টিং (২) : মোহনবাগান (১)

৪ঠা জুলাই '৫৫'

কালীঘাট (২) : রাজস্থান (১)
মহঃ স্পোর্টিং (০) : পুলিস (০)
বি এন আর (৩) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)

৫ই জুলাই '৫৫'

ইস্টবেংগল (২) : জর্জ টেলিগ্রাফ (১)
মোহনবাগান (৩) : অরোরা (২)
উয়াড়ী (০) : খিদিরপুর (০)

দেশী সংবাদ

২৭শে জুন—গোয়ায় পর্তুগীজ পুলিসের গুলীতে আরও একজন ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু হইয়াছে। এই স্বেচ্ছাসেবকের নাম শ্রীজগন্নাথ যোশী।

আজ কলিকাতায় পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের পুনর্বাসন দপ্তরের সচিবদের সম্মেলন আরম্ভ হয়। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

২৮শে জুন—আজ দার্জিলিং-এর চা-শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান ঘটে। সরকার শ্রমিকদের বর্তমান দৈনিক মজুরী ১ টাকা ৪ আনা হইতে বাড়াইয়া অন্তত ১ টাকা ৫ আনা ৬ পাই করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন এবং ধর্মঘটীদের অন্যান্য দাবী বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিগত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ১৫০০ খানি উত্তরপত্র খোয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৮শে মার্চ দমদম বিমানঘাটিতে প্রেরণের পথে ঐগুলি খোয়া যায়।

কলিকাতায় পূর্বাঞ্চলের ছয়টি রাজ্যের পুনর্বাসন দপ্তরের সচিবদের সম্মেলনে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্বাঞ্চলের ছয়টি রাজ্যে যে সকল শহরবাসী উদ্বাস্তু আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে ব্যাপকতরভাবে গৃহাদি নির্মাণ করা হইবে।

২৯শে জুন—গোয়ার পর্তুগীজ সরকার কর্তৃক সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকার পর্তুগীজ সরকারের নিকট পুনরায় তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী শ্রীঅজয় ঘোষ আজ দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত সরকার আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং শান্তি-রক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কম্যুনিস্ট পার্টি তাহা সমর্থন করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই রাজ্যের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ১৩৫টি ছোটবড় পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৩০শে জুন—সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে য, লৌহ ও ইস্পাত কন্ট্রোলার কর্তৃক অদ্য ঘোষিত পরিবর্তিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী ১লা জুলাই হইতে ভারতে ইস্পাতের দর টন প্রতি ২০ টাকার কিছু অধিক বৃদ্ধি পাইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

সিমলায় গৃহনির্মাণ দপ্তরের মন্ত্রীদের সম্মেলন শেষ হইয়াছে। শহর ও গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা, বস্তি উচ্ছেদ এবং সাধারণ বাসোপযোগী গৃহনির্মাণের জন্য যেসব জমি দখল করা হইবে রাজ্য সরকার-সমূহের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি খসড়া বিল প্রণয়ন করা উচিত বলিয়া এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত করেন।

বোম্বাইয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে আগামী ১৫ই আগস্ট তারিখে পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া, দমন ও দিউ-এ গণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

১লা জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বজনবরেণ্য নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ ৭৪ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষে কংগ্রেস ভবনের প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ রায়ের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া তাঁহার হস্তে ৮৫ হাজার টাকার একখানি চেক অর্পণ করেন।

অদ্য হইতে নবগঠিত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাজ আরম্ভ হইল এবং ভারতের অভ্যন্তরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কার্যের অবসান ঘটিল।

২রা জুলাই—আজ কলিকাতায় রাজভবনে এতৎরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে "দেশমান্য বিধানচন্দ্র রায় কো-অপারেটিভ শীল্ড" এবং অন্যান্য পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণের এক অনুষ্ঠান হয়। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি এই অনুষ্ঠানে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

৩রা জুলাই—গোয়া মুক্তি অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য বাঙলার অন্যতম সংসদ সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী সদলে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া যাইবার প্রাক্কালে আজ সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। শ্রীচৌধুরী এইদিন রাত্রেই শ্রীনিতাই গুপ্ত ও শ্রীঅজিত ভৌমিক নামক দুইজন কর্মীসহ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যে গোয়া অভিমুখে রওনা হইয়া যান।

বসিরহাটে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার বার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে হাবড়া সত্যাগ্রহের প্রতি সমর্থন জানাইয়া আগামী ১৭ই জুলাই হইতে এক সপ্তাহ-ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে জুন—গতকল্য হেলসিংকি শান্তি সম্মেলনে লর্ড রাসেল কর্তৃক প্রস্তাবিত আণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটি নূতন পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। রাসেল স্বয়ং শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারায় একখানি পত্রযোগে এই পরিকল্পনা পেশ করেন।

২৮শে জুন—ভিয়েনার সংবাদে প্রকাশ, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা এমিলি শেঙ্কলের নিকট তাঁহার কন্যা শ্রীঅনিতা বসুর শিক্ষা ও ভরণপোষণের নিমিত্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আর্থিক সাহায্যদানের প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্তা শেঙ্কল তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। গতকল্য শ্রীনেহরুর সহিত শ্রীযুক্তা শেঙ্কলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কন্যা অনিতাসহ তখন তিনি শ্রীনেহরুর সহিত প্রাতরাশ করেন।

৩০শে জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সাত দিনব্যাপী যুগোশ্লাভিয়া পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আজ বিমানযোগে বেলগ্রেডে উপনীত হইলে প্রেসিডেণ্ট টিটো তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানান।

১লা জুলাই—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে বেলগ্রেডের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ইতোপূর্বে একজন মাত্র বিদেশী এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী অদ্য এক বেতার বক্তৃতায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত তাঁহার পরবর্তী আলোচনা নিষ্ফল হইলে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য "অন্যান্য উপায়" প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ করেন।

আজ আফগান পার্লামেণ্টের নবম অধিবেশনের উদ্বোধন করার সময় রাজা জাহীর শাহ তাঁহার ভাষণে স্বাধীন "পাখতুনিস্থান" রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন সমর্থন করিয়া বলেন, "পাখতুনীস্থান গঠন আফগানিস্থানের একটি মূল দাবী। পাখতুন ও আফগানরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।"

২রা জুলাই—আজ যুগোশ্লাভ পার্লামেণ্টের পূর্ণ অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এক ভাষণ দান প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করেন। বিদেশীদের মধ্যে শ্রীনেহরুই সর্বপ্রথম যুগোশ্লাভ পার্লামেণ্টে ভাষণ দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩,
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা
দেশ
শনিবার ৩১ আষাঢ়, ১৩৬২
DESH SATURDAY, 16TH JULY, 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ
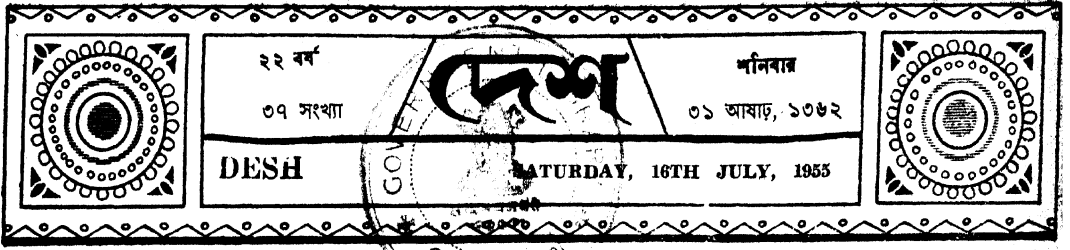
ফরাসী সংস্কৃতি ও বাঙালী

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একদা তাঁহার এক প্রবন্ধে ফরাসী জাতির মন ও মানসিকতার পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে, মানুষের সহিত মানুষের আত্মীয়তা পাতাইবার যে সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক সভ্য গুণটি থাকিলে সহানুভূতি বশত আমরা একে অপরের সহিত মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি, ফরাসী জাতির মধ্যে সেই গুণটি পুরাপুরিভাবে বর্তমান। সমাজ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফরাসী জাতি তাহার মনের এই স্বাভাবিক সুন্দর গুণটিকে ক্রমোত্তর বিকশিত করিয়া চলিয়াছে। সম্ভবত এই কারণেই পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ বা জাতি নাই, মন-মৈত্রীর সেতু বন্ধনে ফরাসী সংস্কৃতিকে সানুরাগে গ্রহণ করিবার আকর্ষণ অনুভব না করিয়াছে। বাঙালীও এ মহান লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। ইংরাজ শাসনের এবং ইংরাজী সংস্কৃতির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও বাঙালী মনীষীরা ফরাসী সংস্কৃতির সেই অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ফরাসী দর্শনের চর্চা করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী সাহিত্যের মণি-মুক্তা সংগ্রহ করিয়া বাঙালীর হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ হইতে বর্তমানকালেরও বহু সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিল্প-সমালোচক ফরাসী সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির সহিত বাঙালী সংস্কৃতির সেতু বন্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙালী জাতির ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি এই অনুরাগ ও আকর্ষণ উভয়ের পক্ষে যে কল্যাণকর, তাহা আমরা স্বীকার করি এবং সেই অনুরাগের বন্ধন নিবিড়তর করিবার প্রচেষ্টায় ১৪ই জুলাই স্মরণে ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি ইহা আমাদের পত্র-শ্রদ্ধার্ঘ্য।

শিল্পী রমেন্দ্রনাথ

শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আকস্মিক অকালমৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও আচার্য নন্দলাল বসুর অনুপ্রেরণার ধারা বহন করিয়া যে-সব শিল্পী ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধনে ব্রতী ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। রমেন্দ্রনাথ এই প্রথিতযশা শিল্পী কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন। চিত্রশিল্পের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বিভিন্ন রীতিতে রমেন্দ্রনাথ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের রমেন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হন নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। তাঁহার স্বল্প-পরিসর জীবন সাধনার প্রভাবে সমুজ্জ্বল। স্বদেশে তিনি সম্পূজিত হইয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনীগুলি গুণিজনের কাছে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে। দেশের গৌরব, জাতির সংস্কৃতিকে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রমেন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনায় একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। সে বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাণধর্মের স্পর্শে সঞ্জীবিত। তাঁহার রেখার টানে টানে বাংলার প্রাণের গানই বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার তুলিকার স্পর্শ-প্রতিবেশে বাংলার জল বায়ুর স্নিগ্ধ-শ্যামল ছন্দটি সাক্ষাৎ সম্পর্কে অন্তরে সাড়া দেয়। কিন্তু রমেন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে বাংলার প্রকৃতিই শুধু প্রতিফলিত হয় নাই, রমেন্দ্রনাথের বাঙালী হৃদয়টিও তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশ এবং জাতিকে কতটা আপনার করিয়া লইতে পারিলে জাতীয় অন্তঃপ্রকৃতির এই উৎসের সঙ্গে প্রগাঢ় এমন পরিচিতি লাভ সম্ভব হইতে পারে ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয় এবং রমেন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শির শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে শিল্পী রমেন্দ্রনাথ কাহারো অনুকরণ করেন নাই। সাক্ষাৎ সম্পর্কে তিনি সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং বৃহতের চেতনার মধ্যে নিজের ভাবনাকে তিনি বিলাইয়া দিয়াছেন। এইভাবে সাধনার ভিতর দিয়া প্রাণরসের পরিব্যাপ্তি-সূত্রে রমেন্দ্রনাথ তাঁহার চারিদিকে আত্মীয়তার অপরূপ প্রতিবেশ রচনা করিয়াছিলেন। ছাত্রবৎসল, বন্ধু-বৎসল রমেন্দ্রনাথের সম্পর্কে গিয়া কত শিল্পী ও শিল্পরসিক যে কত শিক্ষা ও আনন্দ আহরণ করিয়াছেন, তাহার হিসাব আজও সম্ভব নয়। এই পরিবেশটি তাঁহার পরিচালনাধীন বিদ্যায়তনের মধ্যে কখনও নিবদ্ধ থাকে নাই; পরন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের এমন উদার প্রভাব দেশ ও জাতিকে আত্মধর্মে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অভাব ঘটিল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। একান্ত বেদনার্ত হৃদয়ে আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

গোয়া সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ভারতবাসীরা প্রায়শই পর্তুগালকে ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়—অর্থাৎ ফরাসী গবর্নমেণ্ট যেমন পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি ছেড়ে দিয়েছে, তেমনি পর্তুগীজ গবর্নমেণ্টেরও গোয়া প্রভৃতি ছেড়ে দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, এটা খুবই সৎপরামর্শ। তবে ফরাসী দৃষ্টান্ত যে একেবারে নিখুঁত নয় এটাও আমাদের মনে রাখা দরকার। ফরাসীরা পর্তুগীজদের মতো এতো বাড়াবাড়ি করে নি সত্য, কিন্তু পণ্ডিচেরী প্রভৃতি ছাড়াতে ফরাসীদের সঙ্গেও কম টানাটানি করতে হয় নি। আর পণ্ডিচেরী ছাড়ার রকম থেকেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের রূপের সঠিক ধারণা করা যায় না। ইন্দোচীনকে আঁকড়ে রাখতে ফরাসীরা কী রকম চেষ্টা করেছে এবং এখনও ইন্দোচীনে ফরাসী ঔপনিবেশিক স্বার্থ যতখানি সম্ভব বাঁচানো যায়, তার জন্য কী রকম চেষ্টা চলছে তা অপ্রকাশ নেই। উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো, আলজেরিয়া ও টিউনিসিয়াকে অস্ত্রবলে করতলগত করে রাখার জন্য ফরাসী তৎপরতার বিবরণও নিত্য সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এগুলো তো ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের একটা অংশ মাত্র। ফরাসী সাম্রাজ্যের গোটা রূপটি চোখের উপর থাকলে বুঝা যায়, ফরাসীদের পণ্ডিচেরী ত্যাগের মাহাত্ম্য কতটুকু।

ভারতে ফরাসী ঔপনিবেশিক ছিট-মহলগুলির মোট আয়তন ছিল মাত্র ১৯৬ বর্গ-মাইল। এই একশ' ছিয়ানব্বই বর্গ-মাইলের জন্যও ফরাসী গবর্নমেণ্ট কম দরদ দেখান নি, তবে যুদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেন নি—এই যা। কিন্তু যেখানেই স্বার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ উন্মাদের কাজ বলে পরিগণিত হবে না, সেখানেই ফ্রান্স যুদ্ধ করেছে এবং করছে। দিয়েন বিয়েন ফুয়ের হারের পরে যখন ফরাসী গবর্নমেণ্ট বুঝলেন যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধ জয়ের আর আশা নেই, তখনই সেখানে যুদ্ধবিরতি হলো। কিন্তু ফ্রান্স মনে করছে ইন্দোচীনে যা হয়েছে হোক, মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়াকে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে ফরাসী গবর্নমেণ্ট সেখান থেকে অনেক সৈন্যসামন্ত সরিয়ে এনে উত্তর আফ্রিকায় কাজে লাগাবার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী নীতির জবরদস্তি না কমে বরং বেড়ে চলেছে। গত বছর মঃ মেঁদে-ফ্রাঁস প্রধান মন্ত্রী হয়ে ইন্দোচীনের যুদ্ধের অবসান ঘটান। উত্তর আফ্রিকায় তিনি সংস্কারমূলক নীতি প্রবর্তন করে শান্তি আনার চেষ্টাও একটু শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাতেই প্রতিক্রিয়াশীল দলসমূহ থেকে রব উঠল, "মেঁদে-ফ্রাঁস উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী স্বার্থ বিসর্জন দিলেন।" এর ফলে মেঁদে-ফ্রাঁসের মন্ত্রিত্ব গেল। বর্তমানে মরক্কো এবং আলজেরিয়ায় পুরো দমে দমননীতি চলছে এবং সেটা কেবল সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা নয়। বেসরকারী ফরাসী সন্ত্রাসবাদীরাও তাতে যোগ দিয়েছে এবং খুনখারাপি চালাচ্ছে। ফরাসী কর্তৃপক্ষের তাতে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা নেই।

ফরাসী ঔপনিবেশিকদের চেষ্টা হচ্ছে যাতে কিছুতেই ঐ দেশগুলি স্বাধীন হতে না পারে। প্যারিসে যদি বা কখনো কোনো দল কোনো বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদার ভাবের পরিচয় দেবার লক্ষণ দেখান তো স্থানীয় ফরাসী ঔপনিবেশিকগণ, যারা এখন "রাজার জাত" হয়ে আছে এবং লুটে-পুটে খাচ্ছে, তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এখনো ঔপনিবেশিক স্বার্থের প্রভাবই ফরাসী রাজনীতির উপর সর্বাধিক কাজ করছে।

এ অবস্থার কতদিনে পরিবর্তন হবে তা বলা কঠিন। বর্তমান পার্লামেণ্ট থাকাকালে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। আগামী বছর সাধারণ নির্বাচন হবে। সাধারণ নির্বাচনের ফল কী দাঁড়াবে তা বলা কঠিন, তবে বর্তমান দল-বিন্যাসের কোনো আমূল বা চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন হবে, এরকম লক্ষণও কিছু দেখা যাচ্ছে না। র‍্যাডিক্যাল পার্টি যদি মঃ মেঁদে-ফ্রাঁসের নেতৃত্বে বেশ একটু জোরালো হয়ে আসতে পারে এবং যদি সোস্যালিস্টরাও অন্তত তাদের বর্তমান শক্তি বজায় রাখতে পারে, তবে হয়ত উভয়ের সংযুক্ত প্রভাবে গবর্নমেণ্টের ঔপনিবেশিক নীতি পূর্বের চেয়ে কিছুটা উদারতর হবে। তবে আগামী নির্বাচনের পরেও ফ্রান্সে কোয়ালিশন গবর্নমেণ্ট ছাড়া একক কোনো পার্টির গবর্নমেণ্ট হবার সম্ভাবনা নেই এবং যে কোয়ালিশনই হোক না কেন, সেটা মোটামুটি রক্ষণশীল ধরনের হওয়াই সম্ভব। যাই হোক, আপাতত মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া সম্পর্কে ফ্রান্সের নীতি যে রকম চলছে সেই রকম চলারই সম্ভাবনা।

টিউনিসিয়া সম্পর্কে এক সময়ে আশা হয়েছিল যে, বোধ হয় একটা আপস-নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু সংস্কার প্রস্তাবগুলিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হচ্ছে তাতে টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন শান্ত হতে পারে না। টিউনিসিয়ানরা এখনই ষোল আনা স্বাধীনতা না পেলেও আপসে রাজি হতো যদি তারা বুঝতো যে, তারা স্বাধীনতার দিকে এগুচ্ছে। আপাতত বৈদেশিক ব্যাপারে এবং সৈন্য বিভাগে ফরাসী কর্তৃত্বের স্থান স্বীকার করে নিতে হয়ত তারা আপত্তি করত না, কিন্তু ফরাসীদের প্রস্তাবিত সংস্কারে কেবল বাইরের ব্যাপারে নয় ভিতরের ব্যাপারেও ফরাসী কর্তৃত্ব থাকবে। অর্থনীতি, আভ্যন্তরিক নিরাপত্তা, শিক্ষা—কোনো বিষয়েই টিউনিসিয়ানদের পুরো কর্তৃত্ব হবে না, একদিকে ফরাসী গবর্নমেণ্ট এবং অন্যদিকে স্থানীয় ফরাসী ঔপনিবেশিকদের তাঁবে তাদের থাকতে হবে। ফরাসী গবর্নমেণ্ট যদি এই নীতি চালাবার চেষ্টা করে যান, তবে টিউনিসিয়ায় শান্তি আসবে না।

মরক্কোকেও গায়ের জোরে ফরাসী উপনিবেশ করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে ফরাসী গবর্নমেণ্ট মরক্কোর সুলতান সিদি মহম্মদ বেন ইউসুফকে রাজ্যচ্যুত করে তাঁর জায়গায় তাঁর খুড়ো ফরাসীদের তাঁবেদার

মৌলে আরাফাকে বসান। সুলতান ইউসুফের অপরাধ ছিল যে, তিনি জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু ইউসুফকে সরানোর ফলে জাতীয় আন্দোলন দমিত না হয়ে আরো তীব্র হয়েছে। মরক্কোতে অশান্তি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারী দমন-নীতির সংগে ফরাসী ঔপনিবেশিকগণের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও চলছে।

এ তো গেল টিউনিসিয়া ও মরক্কোর কথা, যেগুলি আইনের ভাষায় খাস ফরাসী রাজ্য নয়—"প্রটেক্টরেট্" মাত্র। আলজেরিয়াকে তো ফরাসীরা ফ্রান্সের খাস অংশ বলেই দখলে রাখতে চায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স আলজেরিয়াকে দখল করে ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করে। আলজেরিয়া দখলে থাকাতেই তার একদিকে টিউনিসিয়া এবং অপরদিকে মরক্কোকে কবলিত করার সুযোগ ও অজুহাত ফ্রান্সের জুটে। ১৮৮১ সালে টিউনিসিয়ার উপর এবং ১৯১২ সালে মরক্কোর উপর ফরাসী কর্তৃত্ব প্রসারিত হয়। ফ্রান্স সহজে এই কর্তৃত্ব ছাড়বে না, হয়ত উত্তর আফ্রিকায়ও একটা "দিয়েন বিয়েন ফু" না হওয়া পর্যন্ত। উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হলে ফ্রান্সকে যে উত্তরোত্তর সামরিক বলের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, একথা ফরাসী গবর্নমেণ্টও বুঝেছেন। সেই জন্যই ফরাসী গবর্নমেণ্ট উত্তর আফ্রিকায় NATO শক্তিসমূহের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সহায়তা বাঞ্ছা করেছিল এবং সংগে সংগে আমেরিকা প্রভৃতিকে আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শোষণে অংশ নিতে আমন্ত্রণ করেছিল।

আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া ও মরক্কোতে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তার খবর কিছু আমরা পাই, কিন্তু এগুলি ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের একটি অংশমাত্র। টিউনিসিয়ার আয়তন হচ্ছে ৪৮৩১৩ **বর্গমাইল,** মরক্কোর ১৭২১০৪ বর্গমাইল এবং আলজেরিয়ার ৮৪৭৫৫২ বর্গমাইল। এদের মোট আয়তনের পরিমাণ তাহলে হয় প্রায় ১০ লক্ষ ৬৮ হাজার বর্গমাইল। বড় সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু কেবল আফ্রিকাতেই যে ফরাসী কর্তৃত্বাধীন ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৩ লক্ষ বর্গমাইল। (এর মধ্যে মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার বর্গমাইল সমন্বিত দুটি তথাকথিত "ট্রাস্টীশিপ" দেশও আছে।) ফ্রান্সের আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের আয়তন কত বড়ো তার ধারণা আমাদের হবে যদি ভারতবর্ষের আয়তনের সংগে তার তুলনা আমরা করি। ভারত ইউনিয়নের আয়তন ১২ লক্ষ ২২ হাজার বর্গমাইলের মতো। আফ্রিকা অঞ্চল ছাড়াও পৃথিবীর অন্যত্র ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক রাজ্য আছে, তবে তুলনায় সেগুলির আয়তন ক্ষুদ্র —যদিও তার মধ্যেও কয়েকটি বেশ মূল্যবান সম্পত্তি আছে।

রেণীর প্রেম

এমিল জোলা

"...লেখকের কল্পনা প্রসূত দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়ে যে অনুপম সৌন্দর্যময় সোনালী কবিতা জন্মলাভ করেছে...এত সুষ্ঠু এবং সামঞ্জস্য সহকারে নির্মিত অংশ আমি আর দেখিনি। ...**La Cure'e**র (রেণীর প্রেম) শেষ পাতাটি প'ড়বার পর মনের ওপর যে একটি গভীর শৈল্পিক সৌন্দর্যের ছাপ রেখে যায়--একথা যে মানুষ কানা, খোঁড়া বা বোবা সেও স্বীকার করবে।" জর্জ মুর। এমিল জোলার সুবৃহৎ উপন্যাস **La Cure'e**র অনুবাদ 'রেণীর প্রেম'—দামঃ চার টাকা মাত্র।

মোপাসাঁর

এক দশ

পুনঃপ্রবেশ নয়, অনুপ্রবেশ;

শিহরণ নয়, অনুরণণ;

মাধ্যম থেকে নয়, মূল থেকে।

ছয় রঙ্গা প্রচ্ছদপট।

দাম ঃ তিন টাকা আট আনা।
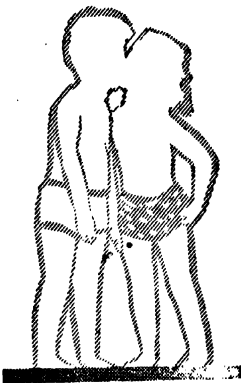
নারীর প্রতি তার অরুচি ছিল না। সে দেখল প্যারিস নাগরিকা লোভার্ত, দুঃসাহসী, লালসায়িত।

ক্লারিসীঃ একজনের রক্ষিতা তবু সে **বহুবল্লভ।**

মেরীপিস' ঃ কোমলদৃষ্টি আর কমনীয়তার মুখোশধারী স্বৈরিণী।

বার্থাঃ অভিসারিকা। অক্টেভের ঘরে তার নৈশাভিসার সমাজের মুখে ছিটিয়ে দিল কলঙ্কের কালি, জাগিয়ে দিল মানুষের অন্তরের হিংস্র দানবকে।

১৭নং রু দ্য চসোলের ভাড়াটে বাড়ির সম্ভ্রান্ততার ভারী যবনিকার অন্তরালে চলে অভিজ্ঞতা আর প্রণয়ের মিশ্র অনুশীলনী।

তিনরঙা প্রচ্ছদপট।

এমিল জোলার

বস্তি

(Pot Bouille এর অনুবাদ)

দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা।

ছাপা হইতেছেঃ—

এমিল জোলার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি 'LA [illegible] বাংলা অনুবাদ

"নানা জননী"—

দাম ঃ সাড়ে চার টাকা।

স্বপনচারিণী

এমিলজোলা

সূচীপত্র

স্বপনচারিণী—এমিল জোলা

হাতে খড়ি—গিয়োভানী ফিয়োরেণ্টিনো

প্রেমের পাঠ—বালজাক্

রাজার প্রিয়া—বালজাক্

গাড়ল—মোপাসাঁ

একটি প্রেমের অপমৃত্যু—মোপাসাঁ

নাইটিংগেল—গিয়োভানী বোকাশিয়ো

দাম ঃ দু'টাকা বারো আনা।

মুক্তি প্রতিক্ষায়ঃ—

এমিল জোলার

LA HONTE বা SHAMEএর

বাংলা অনুবাদ

প্রসপার মেরিমের

কারমেন

পল ও ভির্জিনি

দুটি শিশু, একটি স্ত্রী একটি পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে গালে গাল দিয়ে শুয়ে থাকে। ক্রমশঃ বড় হ'য়ে ওঠে তারা। ভির্জিনির আসে লজ্জা। পল ভাবে—কেন ভির্জিনি এমন ব্যবহার করে। ভির্জিনি কিছুতেই শান্তি পায় না—পল এলে কেমন তার জড়তা আসে। পলকে আর সে আলিঙ্গন করতে পারে না, চুম্বন করতে পারে না। মার কাছে ছুটে যায়, কি যেন বলতে চায়—কিন্তু কিছুই বলতে পারে না তারপর... ব্যারনারদ্'্যা দে স্যাঁ পীয়্যার'-এর এই বইখানি ইউরোপের সব ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বইখানির এই প্রথম বাংলা অনুবাদ। চার রঙ্গা প্রচ্ছদপট। দাম ঃ তিন টাকা মাত্র।

আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স

৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২

(সি ৩৪১৩)

অন্য স্বদেশ

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"উতম আ দো পাত্রি—লা সিয়েন, এ পুই লা ফ্রাঁস।" অর্থাৎ মানুষমাত্রেরই দুটি মাতৃভূমি; একটি তার নিজস্ব, আর অন্যটি ফ্রান্স। উক্তিটি জনৈক ইউরোপীয় সাহিত্যিকের। ফরাসী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্সের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয়লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা সকলেই যে এ-কথা সমর্থন করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বর্তমান ইউরোপের সভ্যতা ও মানবতাবাদের যা-কিছু প্রেরণা, তার উৎস ছিল প্রাচীন গ্রীস। গ্রীসের মর্মবাণী ইউরোপকেই শুধু নয়, ইউরোপের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকেই প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। সৃষ্টিশীল মানুষ আজও সেই মর্মবাণীর মধ্যেই তার সকল কর্মের প্রেরণা খুঁজে পায়। যে-দেশের মধ্য দিয়ে প্রাচীন গ্রীসের সেই গৌরবময় আদর্শ আজ আবার মূর্ত হয়ে উঠেছে, সে-দেশ ফ্রান্স। দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য, এই উভয় জগতের সর্ব ব্যাপার সম্পর্কেই প্রাচীন গ্রীসের মনোভাবে যে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যেত, ফ্রান্সের মনোভাবেও তার প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ঋষিরাও একদিন এই একই মনোভাবের ধারক ছিলেন। আমাদের চিন্তা যাতে সুপথে পরিচালিত হয়, পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রে তার জন্য দৈব নির্দেশ প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীস ছিল সৌন্দর্য ও শিল্পের উপাসক। সৃষ্টিশীল জাতিমাত্রেই সৌন্দর্য ও শিল্পের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে থাকেন। ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সৌন্দর্য-নিষ্ঠা এবং শিল্পানুরাগ ফরাসী-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের যে-আদর্শ একদিন প্রাচীন গ্রীসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, আধুনিক ফ্রান্সও প্রবল অনুরাগে সেই একই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছে। ফরা-

স্টিল লাইফ। জর্জ ব্রাখ্

চিন্তানায়কদের কাছ থেকে যে-কটি মূল্যবান সম্পদ আমরা পেয়েছি, এটি তার অন্যতম।

শিল্প আর কারুকলার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রাধান্য, কিংবা তার জীবন-বিন্যাস নিয়ে নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন করে না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সুরুচি আর শুভবুদ্ধি ফরাসী জীবনযাত্রায় একটি মস্ত বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। জীবনের যা-কিছু ভাল, যা-কিছু মহৎ, ফ্রান্স তাকে গ্রহণ করতে জানে। এ-ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীর সামনে সে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

গত দুশো বছরে ফ্রান্স ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব

তান্ত্রিক জাতিমাত্রেই নাগরিক শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন; ফরাসী-জীবনের সঙ্গেও এই শুভবুদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। প্রাচীন গ্রীস আর প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারায় "চরম সত্য" সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, ফ্রান্সের চিন্তাধারাতেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

সর্বোপরি, ফরাসী চিন্তায়—শুধু চিন্তায় নয়, চিন্তার প্রকাশভঙ্গীতেও—একটি লঘু সরসতার স্পর্শ রয়েছে। অত্যন্ত জটিল বিষয়বস্তুও সেই সরসতায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। দুরূহ সহজ হয়। আর সেই সরসতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্য। তার ফলে গোঁড়ামি সেখানে ঠাঁই পায়নি। যে-ঔদার্যের এখানে উল্লেখ করলাম, অন্ধ বিশ্বাসের সে জন্মশত্রু। খোলাখুলিভাবেই সে স্বীকার করতে চায় যে, সত্য দুর্জ্ঞেয়। এবং বলা প্রয়োজন যে, অন্ধ বিশ্বাসের পথে নয়, এই স্বাধীন চিন্তা-বুদ্ধির পথেই বরং সত্যের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব। দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য, এই উভয় জগৎকে কীভাবে গ্রহণ করতে হয়, মানুষকে সে তা শিখিয়েছে। শিখিয়েছে বিনীত একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে,—ক্য সে-জ্? (মঁতেঞ-এর এই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের মুখেও আমরা শুনেছি। রবীন্দ্রনাথেরও সেই একই জিজ্ঞাসা,—"আমি কি জানি?") ফ্রান্সের

পারী নগরীর প্রধান তোরণ 'আর্ক দ্য ট্রীয়ম্ফ'

নিবিড় হয়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, ভারতবর্ষ আর তার সংস্কৃতি তাতে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। সেইসঙ্গে ফরাসী মানসের উপরেও যে ভারতীয় চিন্তাধারার খানিকটা প্রভাব পড়েছে, সে-কথাও স্বীকার করতে হয়। ভারতবর্ষের প্রাগ্রসর কয়েকটি সাহিত্য, বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের উপরে ফরাসী সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রভাব যে কতখানি, সকলেই তা জানেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন এবং আধুনিক কালের বিখ্যাত কয়েকখানি সাহিত্যগ্রন্থও তেমনি ফরাসী সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ফরাসী চিন্তাধারার স্বচ্ছতার কথা সর্ববিদিত। ভারতীয় চিন্তাব্রতীদের কাছে তা একটি উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষের কয়েকটি জায়গায় একদা ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। সম্প্রতি সেই প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে। ফ্রান্স ছিল শাসক, আমরা শাসিত। সে-সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। সে-সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বলে ভারতভূমির উপরে ফরাসী সংস্কৃতির আলোটি কখনও নিভে যাবে না। ভারতীয় সভ্যতার সেইখানেই বৈশিষ্ট্য। জগতের যা-কিছু ভাল, যা-কিছু মূল্যবান, তাকে সে গ্রহণ করতে জানে।

পণ্ডিচেরিতে সম্প্রতি ফরাসী সংস্কৃতি ও শিক্ষা নিকেতনের (ইনস্টিটিউট অব ফ্রেঞ্চ কালচার অ্যান্ড হায়ার স্টাডিজ) প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর ফলে ফ্রান্স ও ভারতবর্ষের সম্পর্কে একটি নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হবে। সে-অধ্যায় সহযোগিতার। এবং তা যদি হয়, মানবতার সেবায় এ-দুটি দেশ পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই শুধু নন, প্রখ্যাত ফরাসী পণ্ডিতরাও ফ্রান্স ও ভারতের এই নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত, উপলব্ধিও গভীর। ফ্রান্সকে যাঁরা জানেন, এবং ভালবাসেন, এ-ব্যাপারে সেই ভারতীয়দের সহযোগিতারও এখানে উল্লেখ করতে হয়।

"ভিজ লুমিয়ের"-এ বিশিষ্ট ফরাসী মনীষিবৃন্দের কাছে ভাষাতত্ত্ব ও মানব-সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। শিল্প ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভাবধারায় অবগাহনের সৌভাগ্যও একদা আমার হয়েছিল। যে-প্রেরণা সেদিন আমি পেয়েছিলাম, পরে আরও কয়েকবার প্যারিসে যাওয়ার ফলে তা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে (ইউরোপীয় ভাবধারা আমাকে ভারতীয় ভাবধারা সম্পর্কেই অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছে, ভারতীয় ভাবধারা সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধাকে সে আরও প্রগাঢ় করেছে)। পণ্ডিচেরিতে যে শিক্ষা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা হল, তাকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যভূমির দুই মহান দেশ ফ্রান্স ও ভারতবর্ষ। প্রাচীনকালে গ্রীস একদা যে গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, বর্তমান কালে ফ্রান্সও সেই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর ফ্রান্সেরই এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও মানবতাবাদী রনে গ্রুসে ভারতবর্ষকে Cette Grece excessive বলে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পণ্ডিচেরির শিক্ষা-নিকেতন এই দুই মহান দেশের মধ্যে এক সুদৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের সহায় হোক। ভিভ্ লা ফ্রাঁস! জয় ভারত!

ফরাসী-বাঙলা

সৈয়দ মুজতবা আলী

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোনো একস্থলে খেদ করেছেন, আমরা ইয়োরোপের যে-টুকু চিনলুম সেটা ইংরেজের মারফতে।

তিনি ঠিক কি বলেছিলেন মনে নেই বলে অপরাধ মেনে নিয়ে নিবেদন করি, ইংরেজ বরঞ্চ চেষ্টা করেছে আমরা যেন ইয়োরোপকে না চিনতে পারি।

ইংরেজ যখন এদেশে রাজত্ব করতো তখন দু'টি প্রচারকর্মে মেতে থাকতে সে বড় আনন্দ পেত। তার প্রথম বিশ্ব-জনকে জানানো যে, ভারতীয়েরা ড্যাম নিগার, কালা আদমী; তাদের কোনো প্রকারের কলচর্ নেই। দ্বিতীয়, ভারতীয়দের জানানো, ইংরেজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং তাই (আ ফর্তেরিয়রি) ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নেশন তো বটেই। প্রমাণস্বরূপ সেক্স্‌পিয়রের নাম করলে।

আমরা তখন আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই-পরখ করে দেখলুম, কথাটা ঠিক; সেক্স্‌পিয়রের মত কবি পৃথিবীতে কম,—নেই বললেও চলে। ইংরিজীতেই পড়লুম, ফরাসী-জর্মন-ওলন্দাজ-দিনেমার সবাই এ-কথা স্বীকার করেছে। তাই আমরা ইংরেজের বাদ-বাকি দাবীগুলোও সুড় সুড় করে মেনে নিলুম। ঘড়েল মিথ্যে সাক্ষী—কন-ফিডেন্স্ ট্রিক্স্‌টার—এইভাবেই সরল জনকে আপন সব পচা মাল পাচার করে দেয়।

ইংরেজ কিন্তু একথা বলতে ভুলে গেল, উপন্যাসে তার টলস্টয় নেই, গল্পে তার মপাসাঁ নেই, চিত্রকলায় তার রাফায়েল নেই, ভাস্কর্যে তার মাইকেল এঞ্জেলো নেই, দর্শনে কান্ট নেই, নৃত্যে তার পাভ-লোভা নেই, ধর্মে লুথার নেই, সঙ্গীতে বেটোফেন নেই।

বিশেষ করে বেটোফেনের কথাই তুললুম।

ইংরেজ জাত সুর-কানা। তাই সে বেটোফেনের নাম করে না। তাই ইংরেজের বাড়িতে বাড়িতে সঙ্গীত চর্চা নেই। যদি থাকতো তবে এ-দেশের বড় সায়েবদের বাড়িতেও সে-চর্চা আসন পেত। আমরাও ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতুম। ইংরেজ চর্চা করলে, এবং আমাদের শেখালে জ্যাজ্—যেটা তার খুড়তুতো ভাই মার্কিন শিখলে তাদের গোলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে।

অতি অবশ্য আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে ফ্রন্স্-জর্মনী-ইতালি-রুশে যায়নি বটে, কিন্তু শতে শতে তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক'জন ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাদের সংখ্যা এক হাতের এক আঙুলে গোণা যায় (এবং আশ্চর্য, যে মহাজন আমাদের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তিনি [illegible]নস্ ব্রাঁদ—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [illegible])।

[illegible] পত্রিকার এ সংখ্যা ফরাসিস্ সাহিত্য নিয়ে। অতএব সেই বিষয়-বস্তুর ভিতরই নিজেকে সীমাবদ্ধ করি।

ইংরিজী ভাষা গম্ভীর এবং জটিল কিন্তু তার প্রসাদগুণও আছে। ফরাসী চটুল ও রঙীন। অতিশয় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করার সময়ও ফরাসী কেমন যেন একটুখানি তরল থেকে যায়। পক্ষান্তরে রসিকতা করার সময়ও ইংরিজী তার দার্ঢ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। চার্লস্ ল্যাম্, এমন কি জেরম্ কে জেরম্ পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ধ্রুপদ। উড্ হাউসে এসে আমরা সর্বপ্রথম চটুলতা পাই।

কিন্তু এহ বাহ্য। ফরাসী ভাষার সর্বপ্রধান গুণ তার স্বচ্ছতা, তার সরলতা। ফরাসীরা নিজেই বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার, ক্লিয়ার) নয় সে জিনিস ফরাসী নয়।' আমাদের দেশে আজকাল যে দুর্বোধ্য অবোধ্য পদ্য বেরয় সে 'মাল' প্রথম যখন ফ্রান্সে বেরতে আরম্ভ করল তখন গুণী আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, 'যে বয়সে মানুষ অবোধ্য জিনিস ভালো-বাসে আমার সে-বয়স পেরিয়ে গিয়েছে;
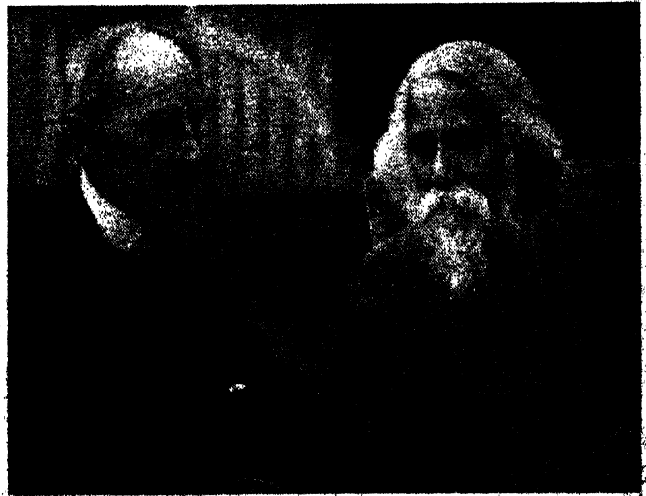
ফরাসী ও ভারতীয় সংস্কৃতির দুই প্রতীক রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

আমি আলো ভালোবাসি।' তাই আরেক গুণী শেষ কথা বলেছেন, 'স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা, পুনরপি স্বচ্ছতা।'

ফরাসী চটুলতা হয়তো অনেকেই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফরাসী স্বচ্ছতা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে যদি আসতো তবে আর কিছু না হোক, আমাদের মনন সাহিত্য যে অনেকখানি লোকপ্রিয় হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি আরো

একটুখানি ফরাসী আওতায় আসতেন তবেই ঠিক বোঝা যেত তাঁর দেবার মত সত্যিই কিছু ছিল কিনা। এ বিষয়ে বরঞ্চ বলবো, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্করের লেখা অনেকখানি ফরাসিস্।

শব্দতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিকরা ঠিক ঠিক বলতে পারবেন কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার নিবেদন, বাঙলা ভাষার উপর ফরাসী ভাষার (language) প্রায় কোনো প্রভাবই পড়েনি। বাঙলাতে ক'টি ফরাসী শব্দ ঢুকেছে সে কথা প্রায় পাঁচ আঙুলে গুনেই বলা যায়। অবশ্য এইটেই শেষ যুক্তি নয়; আমরা বাঙলাতে প্রচুর আরবী এবং ফার্সী শব্দ নিয়েছি বটে কিন্তু ঐ দুই ভাষার প্রভাব আমাদের উপরে প্রায় নেই। কিন্তু অন্য কোনো বাবদেও ফরাসী ভাষার প্রভাব বাঙলার উপর আমি বড় একটা পাইনি।

সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ইনি ফরাসী সাহিত্যের যতখানি চর্চা করেছেন ততখানি চর্চা বাঙলা দেশে তো কেউ করেনই নি, অল্প ইংরেজ জর্মন ইতালিয়ই —অর্থাৎ অফরাসিস—করেছে। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, কত বিচিত্র বস্তুই তিনি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে বাঙলায় প্রচার করেছেন। এই যে ইংরিজী এবং ফরাসী পাশাপাশি জাতের ভাষা — সেই ইংরিজীতেই পিয়ের লোতির লেখা 'ভারত ভ্রমণ' অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজ অনুবাদক হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে মূল ফরাসী যে ঠিক ঠিক ধরা পড়েছে তাই নয়, প্রাচ্য দেশীয় আবহাওয়াও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে।

এই জ্যোতিরিন্দ্রের বাঙলা ভাষাতেই ফরাসী ভাষার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

* * *

বরঞ্চ ফরাসী শৈলীর (style) প্রভাব বেশ কিছুটা আছে।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা পাকাপাকিভাবে বলতে পারবেন, বাঙলার কোন্ লেখক সর্বপ্রথম ফরাসীর সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপনা করেছিলেন; আমি শুধু সার্থক সাহিত্যিকদের কয়েকজনের কথাই তুলবো।

মাইকেলের সার্থক সৃষ্টিমাত্রই গম্ভীর —সংস্কৃত এবং লাতিনের ক্লাসিকাল গুণের সঙ্গে তিনি তাঁর বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন। ওদিকে তিনি আবার অতি উত্তম ফরাসী জানতেন—নূতন ভাষা তিনি যে কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারতেন, সে কথা আজকের দিনের ভাষার 'ব্যবসায়ী'রা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সে 'রঙীলা ঘরানা' তাঁর ভাষার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১] তাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে তিনি লা ফঁতেনের ধরনে 'ফাব্ল্' (ফেব্ল্) রচনা করলেন কেন? লা ফঁতেন তাঁর অনেক গল্প নিয়েছেন ঈশপের গম্ভীর গ্রীক থেকে, কিন্তু লিখেছেন অতি চটুল ফরাসী কায়দায়। অথচ তাঁরই অনুকরণে যখন মাইকেল বাঙলাতে 'ফাব্ল্' রচনা করছেন তখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলছেন,

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে—

দুই সুর একেবারে ভিন্ন। অথচ মাইকেলের সব ক'টি 'ফাবলের' উৎস লা ফঁতেন।

প্রহসনেও তাই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মূলে মলিয়ের। অথচ শৈলীতে গম্ভীর।

* * *

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। যদিও তাঁর আপন ভাষাতে ফরাসী প্রভাব নেই তবু তিনি অনুবাদের মারফতে যে শৈলী এবং বিষয়বস্তুর অবতারণা করে গেলেন তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের দূর দূরান্ত কোণে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরো বহুদিন ধরে পৌঁছবে।

তেয়োফিল গতিয়ে, এমন কি বাল্জাক্ ও মপাসাঁরা পূর্বে কয়েকটি সার্থক ছোট গল্প লিখেছেন কিন্তু আজ শুধু ফরাসিস না, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করে, মপাসাঁই ছোট-গল্পের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, দীর্ঘ উপন্যাস না লিখেও পাঠককে কি প্রকারে কাহিনী-রসে আপ্লুত করা যায় ('কণ্ঠহার'

---

১ বরঞ্চ গৌর বসাককে লেখা চিঠিগুলোতে প্রচুর ফরাসী ফ্রিভলিটি পাবেন।

গল্প নিয়ে সাত ভল্যুমী 'জাঁ ক্রিস্তফ' লেখা যায়)। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য ডস্‌তেয়ফ্‌স্‌কির মত ভল্যুম ভল্যুম না লিখেও 'সূত্ররূপে' সেই রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ছোট-গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ যবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মারফতে মপাসাঁকে চিনতে শিখলেন তবে থেকেই তাঁর গল্প ঋজু কাঠামো নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ পেল (অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে থাকতো প্রচুর গীতিরস এবং পরবর্তী যুগে তিনি অন্য এক মিস্‌টিক নবরসে ছোট গল্পকে অপূর্ব এক নবরূপ দান করেন)।

* * *

দান্তে, সেকস্‌পীয়র, গ্যোটে, কালিদাস কেউই পৃথিবীর সুন্দরতম সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবান্বিত করেনি মপাসাঁ যতখানি করেছেন। এটম্‌ বম্‌ হয়ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু বাইসিক্‌ল ও সেলাইয়ের কল যে রকম গ্রামে গ্রামে পেঁচেছে এটম্‌ বম্‌, সেক্‌স্‌পীয়র সে রকম সাহিত্যে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতে পারেননি।'২

অথচ আজো যখন কোনো মানুষের জীবনে কোনো এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে সে তখন তার প্রকাশ দেবার চেষ্টা করে ছোট-গল্পের মাধ্যমে, অর্থাৎ মপাসাঁর কাঠামো নিয়ে। ইংরেজ, জর্মন, রুশ, বাঙলা এ-সব অর্বাচীন সাহিত্যের কথা বাদ দিন, অতিশয় প্রাচীন চীন আরবীর মত ক্লাসিকাল্‌ সাহিত্যেও মপাসাঁ ছোট-গল্পে আদি গল্পগুরু বাল্মীকি। সবাই তাঁরই 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।'

* * *

বাঙলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি ফরাসী জানতেন কিনা শৈলী-আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং এ'দের মাধ্যমে মপাসাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের কোনো গল্প লেখকই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মত মপাসাঁর এত কাছে আসতে পারেন নি। মপাসাঁরই মত প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মত তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দু'জনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিকরূপে মপাসাঁ ফ্রান্সে বিশেষ কোনো সম্মান পান নি; বাঙলা দেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নিবেদন, প্রভাত-পরবর্তী যুগের প্রায় সব বাঙালী গল্পলেখকই মপাসাঁর অনুকরণ করেছেন প্রভাতের মাধ্যমে।

* * *

এই সময়ে 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক নূতন কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এ গোষ্ঠী অহরহ অনুপ্রেরণা পেত জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এ'দের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী ও সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এ'রা প্রধানত ফরাসী সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে বাঙলা দেশে এক নূতন ফরাসিস 'গুলস্তান' বানাতে আরম্ভ করলেন। এ'দের একটা মস্ত সুবিধে ছিল এই যে, এ'রা রবীন্দ্রনাথের গড়া আধুনিকতম বাঙলার সম্পূর্ণ ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সুযোগ পাননি বলে তাঁর ভাষা ছিল বিদ্যাসাগরী। এ'রা রবীন্দ্রনাথের সলীল ভাষা ব্যবহার করাতে তখনকার দিনের বাঙালী পাঠকের মর্মদ্বারে দরদী আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

সবচেয়ে 'তাজ্জব ভেল্কি বাজি' দেখালেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত! তাও আবার কাব্যে! এক ভাষার কবিতা যে অন্য ভাষাতে তার আপন রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে এরকমভাবে প্রকাশ পেতে পারে এর কল্পনাও বাঙালী পাঠক এর পূর্বে কখনো করতে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন কি

---

২ হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ শেক্সপীয়র অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলাতে আজ পর্যন্ত কেউ শেক্সপীয়রের অনুকরণ করেননি।

রবীন্দ্রনাথও বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এক 'সম্ভাবশতক' ছাড়া অন্য কোনো বই জনপ্রিয় হতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন, অনুবাদমাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মত; মূল নক্সার সন্ধান তাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর-সব সৌন্দর্য উল্টো পিঠে ওৎরায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন, ওৎরায়, এবং, মাঝে মাঝে উল্টো দিকটাও মূলের চেয়ে বেশী মূল্য ধরতে জানে।

যাঁরা সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন। অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক কান্তি ঘোষ বহুবার একথা বলেছেন। তিনি নেই। তাই আজকের দিনের সবে-ধন নীলমণি নরেন্দ্র দেবকে আমি সাক্ষী মানছি।

তোয়েফিল গতিয়ে, রঁসার, ল্যাকঁৎ দ্য লিল্, ভেরলেন্, বদলের, য়ুগো (Hugo), শেনিয়ে, মিস্ত্রাল, ভেরেরেন্, ভালমোর, বেরাজেঁ—কত বলবো?—কত না জানা-অজানা কবির কত না কবিতা দিয়ে তিনি তার কুম্ভ 'তীর্থ-সলিল' দিয়ে পূর্ণ করলেন, কত দেশের কত 'তীর্থ রেণু' বাঙালীর কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

ঋগ্বেদে আছে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের পুরোহিত, কারণ তুমি আমাদের সর্ব আহুতি দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। সত্যেন্দ্রনাথ বহু দেশের বহু কবির পুরোহিত।

* * *

কথাসাহিত্যেও ঐ সময়ে প্রচুর ফসল ফললো। গতিয়ে, য়ুগো, মেরিমে, দোদে, মপাসাঁ, দুমা, বাল্জাক্ ইত্যাদি বহু লেখকের বহু ছোট গল্প এবং উপন্যাসও বাঙলায় অনূদিত হল।* এ গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বাঙলা সাহিত্যে কতখানি স্থায়ী মূল্য ধরে তার বিচার একদিন হবে; উপস্থিত বলতে পারি এঁরা বাঙলা সাহিত্যে যে ফরাসী উদারতার আমন্ত্রণ জানালেন তার ফলে পরবর্তী যুগের অনেক বাঙালী লেখক গোড়ার থেকেই সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে সাহিত্যের আরাধনা করতে পেরেছিলেন। হঠাৎ একদিন বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে এঁদের লোকপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে

ফরাসী ছোট গল্পের রাজা মপাসাঁ

গিয়ে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু শরতের মোহ কেটে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেন যে কেউ এঁদের সন্ধান করে না সে এক আশ্চর্যের বস্তু!

* * *

বাঙলায় ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে শুধু প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। ইনিই একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক যাঁকে সর্বার্থে ফরাসিস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র এঁরই ভাষাটিতে 'ঈভনিং ইন্ প্যারিসের' খুশবাই পাওয়া যায়। এঁর শৈলী ফরাসী শেম্পেনের মত বুদ্বুদিত, ফেনায়িত। এমন কি এঁর বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে ফরেসডাঙার ধুতী পরে মজলিসে এসে বসে। বাঙলা সাহিত্যে বহু পণ্ডিত, বহু দার্শনিক, বহু কলাবৎ এসেছেন, কিন্তু একমাত্র এঁকেই সত্য বিদগ্ধ জন বলা যেতে পারে। এবং সে বৈদগ্ধ্য ফরাসী বৈদগ্ধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসিসের সঙ্গে বাঙালীর চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়ে-ছিলেন; প্রমথনাথে দুই সাহিত্যে গভীরতম প্রণয়ালিঙ্গন।

এঁর সাহিত্য সৃষ্টি হয়ত বাঙলাদেশ একদিন ভুলে যাবে কিন্তু এই বাঙালী ফরাসিস্ চরিত্রকে বাঙালী কখনো ভুলবে না।

প্রমথনাথের শেষ বয়সে, ভারতী গোষ্ঠীর মুমূর্ষু অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি এ-দেশে আসেন। তাঁর চতুর্দিকে তখন এক ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এঁদের প্রধান ফণী বোস৩, প্রবোধ বাগচী, মণি গুপ্ত ,শশধর সিংহ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন। এঁদের কেউই প্রচলিতার্থে সাহিত্যে নামেন নি কিন্তু এঁদের মাধ্যমে আমরা এদেশে সর্বপ্রথম ফরাসী পাণ্ডিত্যের সন্ধান পাই। এতদিন আমরা জানতুম, ইয়োরোপীয় 'প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব' বলতে বোঝায় ইংরেজ। এঁরাই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, ফরাসিস্ ভারতবর্ষে রাজত্ব না করেও ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা করেছে প্রচুর।৪ বিশেষ করে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতাদি। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি সাহিত্য ছাড়া অন্য রসে ইংরেজ বঞ্চিত। ফরাসীরা সেখানে যথার্থ গুণী। মণী গুপ্তের অনুবাদে বাঙালী তার সন্ধান পাবে। শান্তা দেবী এই সময়েই বিশ্বভারতীতে ফরাসী শেখেন।

এই গোষ্ঠীর বাইরে আরো দুজন পণ্ডিতের নাম করতে হয়। মহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়। দিলীপ রায়ও এই যুগের লোক।

* * *

কিন্তু আমাদের জোড়া কুতুব-মিনার? বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ? তা হলে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখতে হয়। এ যুগের ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, imitation-এর বাঙলা অনুকরণ; aping-এর বাঙলা কি? 'হনুকরণ।' যাঁরা ফরাসীর 'হনুকরণ' করেন তাঁদের উল্লেখ আমি এ প্রবন্ধে করিনি। পদস্খলন সকলেরই হয়। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের কেউ কেউ হয়তো অজানাতে মাত্রাধিক্য করেছেন কিন্তু এ-দুটি লোক সম্বন্ধে অধম নিঃসংশয়।

বঙ্কিম কিঞ্চিৎ ফরাসিস্ জানতেন। কিন্তু তিনি ইংরিজীর মাধ্যমে কঁৎ-কে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পূর্বসূরগণের

---

৩ ইনি যৌবনেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এঁর রচনা তখনই বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৪ পরবর্তী যুগে ভিন্টারনিৎস্, জর্মন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং তুচ্চী ইতালীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। এঁদের সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, বিশ্বভারতীতে।

প্রসাদাৎ ক'ৎ ফরাসী তর্কালোচনায় যে শুদ্ধবুদ্ধির (rationality-র) চরমে পৌঁছেন, বঙ্কিম সেই শাণিত অস্ত্র নিয়ে হিন্দুধর্ম রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব। তাই এই আক্ষেপ দিয়েই বঙ্কিমালোচনা শেষ করি, হায়, তাঁর এই শুভবুদ্ধির অনুসরণ আর কেউ করলে না কেন? যে লোক ইস্তেক দয়াসাগরের খেলাফে তলোয়ার খাড়া করেছিল তার অনুকরণ অনুসরণ, এমন কি 'হনুকরণ'ও কেউ করলো না কেন?

রবীন্দ্রনাথের উপর মপাসাঁর ছায়া পড়েছিল সে-কথা পূর্বেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ফরাসী কবিতানাট্য এমন কি 'শারাদ'ও পড়েছিলেন। তারই ফলে

Celui qui me lira, dans les siecle, un soir,
Troublant mes vers

ইত্যাদি (ইংরেজীতে শব্দে শব্দে অনুবাদঃ

One who will read me, after centuries, one evening, turning over my verses

'আজি হতে শতবর্ষ পরে' হয়ে বেরল। কিন্তু প্রথম কয়েকছত্রের পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন।

ঠিক সেইরকম মেটারলিঙ্কের 'নীল-পাখি' যে কাঠামোতে৫ লেখা রবীন্দ্র-নাথের 'ডাকঘর', 'অরূপ রতন' সেই কাঠামো নিয়ে, কিন্তু উভয় নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রসনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ককে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন। এবং সর্বশেষ নাটকদ্বয় 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'-র কাঠামোও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব—ভাষা, শৈলী, রসনির্মাণ পদ্ধতি রাবীন্দ্রিক তো বটেই।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, অরবিন্দ ঘোষ (ইনি উত্তম ফরাসী জানতেন)—এ'দের মত প্রতিভাবান লেখকের রচনাতে এ'র প্রভাব, ও'র ছায়া-পাতের অনুসন্ধান করে কোনো লাভ নেই। হীনপ্রাণ লেখক সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ঐ বুঝি লোকে ধরে ফেললে, সে অমুকের কাছ থেকে ধার নিয়েছে; তাই সে মহাজনদের বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই এত বড় মহাজন যে, তাঁরা যত্রতত্র অনায়াসে বিচরণ করেন। ক্ষুদ্রতম লেখকের বাড়িতেও পাত ফেলতে তাঁদের কণামাত্র ভয় নেই। তাঁদের ঘানিতে যাই ফেল না কেন, স্নেহাসিক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে।

২

এইবারে শেষ প্রশ্নঃ ফরাসীর উপর বাঙলা কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

রলাঁ যেরকম বহু বাঙালী লেখককে প্রভাবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি তিনিও বাঙালী গুণী-জ্ঞানীদের সন্ধান রাখতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং এ'দের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। বহু ফরাসী এ'রই মারফতে বাঙলাদেশের অনেক কিছু চিনতে শিখেছে।

পূর্বেই বলেছি, লেভির সঙ্গ পেয়ে বাঙালী গুণী ফরাসী পাণ্ডিত্যের চর্চা করেছিল। লেভি নিজে করলেন উল্টোটা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে তাঁরই সাহায্যে করলেন 'বলাকার' ফরাসী অনুবাদ! আজ যদি শুনি, পাণিনি কোনো এক চীনা কবির রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন তা হলে যে-রকম আশ্চর্য হব।

শ্রীমতী আঁদ্রে কারপেলেজ ফরাসীতে একখানা সঞ্চয়িতা বের করেন। তার নাম 'ফ্যাই দ্য ল্যাঁদ'—'লীভ্‌জ্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া'। এই চয়নিকায় বাঙালী ও বাঙালী সাহিত্য নিয়েই আলোচনা ছিল প্রধানত। দুর্ভাগ্য-ক্রমে বইখানা আমার হাতের কাছে নেই।

এবং নেই, শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ফের্না বেনওয়ার রচনাবলী। অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তিনি 'মুক্তধারার' ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন 'লা মাশিন' (দি মেশীন) নাম দিয়ে এবং পরবর্তী যুগে বাঙলা সম্বন্ধে আরো বিস্তর লেখা ফরাসীতে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন।

এবং মারাত্মক নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসী প্রেসের অভিমত, অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ যতবার ফ্রান্সে গিয়েছেন, যখনই তার চিত্র-কলার প্রদর্শনী হয়েছে, ফ্রান্স তখনই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে স্বীকার করেছে। প্যারিসে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ কর্ম নয়। এ-সব প্রেস্ কাটিংস্ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শান্তি-নিকেতন লাইব্রেরীতে পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

অর্থাৎ হাতের কাছে কিছুই নেই—'ঢাল নেই তলওয়ার নেই'—

তাই আর কেউ বলার পূর্বেই স্বীকার করে নেই, এ লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

---

৫ 'লোয়াজো ব্লু' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙলায় অনুবাদ করেন।

ইতিহাস সমুদ্র সফেন

কিরণকুমার রায়

ভার্সাই শহর।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। রোগশয্যায় পীড়িত লোকের ঘুমের মতো। উদ্বেগব্যাকুল দিনের আঁচলে অসুস্থ নিঃশব্দতার পাড়।

প্যারিসে সারাদিন তুমুল আলোড়ন। সেখান থেকে এসেছে দুঃসংবাদ।

ঘুম ভেঙে জাগাতে হলো রাজাকে। রাজা ষষ্ঠদশ লুই। মোটা দেহ, বড়ো বড়ো চোখ, দীঘল নাক। শান্ত নির্বিরোধ রাজা, একটু নির্বোধ।

দুঃসংবাদ বহন করে এনেছেন ডিউক। শুনে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন রাজা, বললেন, 'এ্যাঁ, এতো বিদ্রোহ! এখন?—'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ডিউক। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত ব্যাকুল দেখাচ্ছে তাঁকে। বললেন, 'না হুজুর, এ বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব!'

১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ সাল। মঙ্গলবার।

এ দিনটি শুধু ফ্রান্সে নয়, মানুষের ইতিহাসে উজ্জ্বল। জনতার সমুদ্র সফেন উত্তাল উচ্ছ্বসিত জাগরণ। বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব!

এ বিপ্লবের গুঞ্জন শোনা গেছে কয়েক বছর আগেই। ভাঙনের ধ্বনি শোনা গেছে।

ন' বছর আগে রাজা গিয়েছিলেন বৃদ্ধ মার্শালের বাড়িতে। মার্শাল অব রিশলয়্যে দীর্ঘকাল বেঁচেছেন, এবার আর বুঝি বাঁচেন না। মরণাপন্ন হয়েছেন ব্যাধিতে। কিন্তু সেরে উঠলেন তিনি, আস্তে আস্তে দেহে শক্তি ফিরে পেলেন।

রাজা এসেছেন তাঁকে দেখতে। একটু কৌতুক করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো তিন যুগ বাঁচলে, বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?'

'তিন যুগ নয়, তিন রাজার রাজত্বকাল।'

'ও একই কথা। তিন রাজার তিনটে কাল সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মার্শাল। তারপর বললেন, 'চতুর্দশ লুই-এর কালে লোকে কিছু বলতে সাহস করতো না, পঞ্চদশ লুই-এর আমলে লোকের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল, কিন্তু তা অত্যন্ত মৃদু। মহারাজার যুগে লোকে যা খুশি সব কথাই জোরে জোরে বলছে।'

ষষ্ঠদশ লুই এমন একটা কালে সিংহাসন লাভ করেছেন, যখন দুর্ভাগ্যকে আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাঁর আগে রাজত্ব করেছেন তাঁর ঠাকুর্দা পঞ্চদশ লুই, তাঁর আগে চতুর্দশ লুই। চতুর্দশ আর পঞ্চদশ দুজনই দুর্দান্ত ব্যক্তি, দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছেন। স্বেচ্ছাচারিতার চরম, অত্যাচারের চরম দুটো রাজত্বকাল। সারা দেশ থেকে লুণ্ঠন করেছেন অর্থ, অপরিমিত অর্থ, তা ব্যয় করেছেন বিলাসে আর যুদ্ধে। সৈন্যসামন্ত পুষেছেন, পাগলা কুকুরের মতো তাদের লেলিয়ে দিয়েছেন জনসাধারণের ওপর। তাদের গর্দান নিয়েছে অথবা মর্দানে মর্মঘাতী পীড়ন করেছে আর ধনসম্পত্তি লুঠে নিয়েছে সৈন্যরা। যত গরীব লোক, পীড়ন বেড়েছে তত বেশি। বড়ো লোকরা মলম্বা-জীবন কাটিয়েছে, ঐশ্বর্যে বিলাসে পাপাচারে।

বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রেরণা। যুগে যুগে ফরাসী জনসাধারণকে যা উদ্বুদ্ধ করেছে। ইউজিন দ্যলাক্রোয়া অঙ্কিত এই চিত্রটিতে শিল্প-সমালোচকগণ কিছুটা নাটকীয়তা লক্ষ্য করলেও স্বাধীনতা, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অনুপ্রেরণা ব্যক্ত করেছে জনসাধারণ

বড়োলোকের-বড়োলোক রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতার চরমশীর্ষে জীবনযাপন করেছেন। কিন্তু একটা সীমা আছে, যার বাইরে গেলে ভূমিপতন সুনিশ্চিত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুই সে-সীমা লঙ্ঘন করে রাজত্ব করে গেছেন। সেই পাপাচারের ফলভোগ করতে জন্ম ষষ্ঠদশ লুই-এর, তিনি শান্ত হোন, ধার্মিক হোন, মহাকালের হলাহল তাঁকে পান করতেই হবে। ষষ্ঠদশ লুই-এর কালে ফ্রান্সের দুঃখী দরিদ্র মানুষ আর নিঃশব্দ নির্বিরোধ নেই, তাঁরা কথা কয়ে উঠেছেন, তাঁদের গুঞ্জন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সহস্র প্রহরীবেষ্টিত সুরম্য রাজ-প্রাসাদেও।

এ কেবল গুঞ্জন নয়, মহাপ্রলয়ের নিনাদ। বড়োলোকদের মধ্যেও ত্রাস। আগেকার মান্যতা নেই, রুক্ষ বদমেজাজী হয়ে গেছে মানুষগুলো।

ধনী মহিলারা এ বিপদের দিনেও অভিজাত পুরুষদের সঙ্গে 'জনসাধারণ' নিয়ে কৌতুক করেন। বিদ্রোহ একটা আসবে, এমন ধারণা সকলের। কিন্তু রাজসৈন্য এ বিদ্রোহ নির্মূল করতে পারবে এমন একটা অনুভবও সকলের মনে।

একদিন এক প্রমোদরজনীতে ডাচেস অব গ্রেমন্ট হাসতে হাসতে বল্লেন, 'ভাগ্যিস আমরা মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম, তাই এবার বেঁচে যাবো। মেয়েদের নিয়ে নিশ্চয়ই বিদ্রোহীরা টানা-হেঁচড়া করবে না।'

জবাব দিয়েছিলেন কাজোট, 'আজ্ঞে না, এবার বিদ্রোহীরা পুরুষ আর রমণীতে ভিন্ন ব্যবহার করবে না। নারী-পুরুষে ভেদ থাকবে না।'

কথাটা বর্ণে বর্ণে মিলেছিল। নারী পুরুষ সমানে এসে মিলেছিল বিপ্লবে, এদিকে আর ওদিকে। জনতার বিশাল জনতরঙ্গ আর মুষ্টিমেয় ধনীদের দুদিকে।

দেশে দারিদ্র্য যতো ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে, বিদ্রোহের চেতনা তত বেড়েছে। রুসো ভল্‌তেয়ার প্রভৃতি নামী লেখকরা প্রভাব বিস্তার করেছেন। মঞ্চে যে সমস্ত নাটক অভিনয় হচ্ছে, সেখানেও সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতি মিশে আছে। সবাই রাজনীতি সচেতন ঃ নামী আসরেও রাজনীতির আলোচনা, ছোট কাফের অলস আড্ডাধারীরাও রাজনীতির তর্ক ছাড়া আর কিছুই করে না।

রাণীকে নিয়েও কথা ওঠে। রাণী মারি আঁতোয়ানেত্। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী মারিয়া তেরেসার কন্যা। পনের বছর বয়েসে ফ্রান্সে এসেছেন, যুবরাজ লুই-এর পত্নী হয়ে। প্রাণচঞ্চল একটি মেয়ে, আস্তে আস্তে সুন্দরী রূপসী রমণীতে পরিণত হয়েছেন। অনেককাল পর্যন্ত কোন সন্তান হয় নি। বিলাসে, কৌতুকে আর প্রমোদ-বাসরে জীবন কাটিয়েছেন। নিজস্ব দরবার আছে তাঁর, বার্ষিক তিন লক্ষ ফ্রাঁ তাঁকে দেওয়া হয় রাজকোষ থেকে। অস্ট্রিয়ার রাজদূত তাঁর কাছে ঘন ঘন আসতেন, বার বার তাঁকে বলতেন অস্ট্রিয়ার কথা। তাঁকে শেখাতেন অস্ট্রিয়াকে ভালোবাসতে, তাঁর আবাস ফ্রান্স, কিন্তু মাতৃভূমি

অস্ট্রিয়া। ফ্রান্সের থেকেও মাতৃভূমিকে বেশি ভালোবাসতে।

তরুণী তন্বী মারি আঁতোয়ানেত্ হাসতেন। সুন্দর দীঘল তাঁর চোখ, বাঁশির মতো তীক্ষ্ন নাক, আশ্চর্য মনোরম দেহ। তিনি ফ্রান্সকেও ভালোবাসেন নি, অস্ট্রিয়াকেও না। তিনি ভালোবেসেছিলেন নিজেকে আর বয়সটা যখন যৌবনের প্রান্তসীমায়, তখন তাঁর ছেলেমেয়েদের। বিয়ের অনেকদিন পরে তাঁর সন্তানের জন্ম হয়েছে, একটি মেয়ে দুটো ছেলে। মেয়েটি বড়, ছেলে দু'টি ছোট। বড় ছেলের বয়স সাত বছর, ফ্রান্সের যুবরাজ সে।

প্রথমদিকে মারি আঁতোয়ানেত্ জনপ্রিয় ছিলেন। যখনই রাজপ্রাসাদের বাইরে গেছেন, দর্শকরা উ'চুকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়েছে, হাততালি দিয়েছে। কিন্তু তারপর ক্রমশ তাঁর দুঃখের দিন এগিয়ে এসেছে। 'রাণী দীর্ঘজীবী হোন!' ধ্বনি আর শোনা যায় না, হাততালিও পড়ে না। শুধু তাই নয়, কেউ তাঁর সঙ্গে নাচতে পর্যন্ত চায় না। আশ্চর্য দুর্ভাগ্য। শুধু রাণী হিসেবে নয়, নারী হিসেবেও মর্যাদা হারিয়েছেন তিনি। লোকে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, তাঁর নিন্দা করে কলকণ্ঠে। কিছুদিন আগে 'নেকলেস' নিয়ে অনর্থক একটা কলঙ্কও জুটেছে তাঁর নামের সঙ্গে। বিনা দোষে।

দেশের বুকে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ জমে উঠেছে। ভয়াল দুর্ভিক্ষ। গত দশ বছর ধরেই একটানা চলেছে এই দুর্ভিক্ষ। ক্ষেতখামার তৃষিত, শস্য ভালো ওঠে না। রুটির দাম চড়া। দাম যখন বেড়ে ওঠে গরীবদের পক্ষে বে'চে থাকাটা তখন কণ্টকর, কিন্তু রুটি যখন দুষ্প্রাপ্য, মৃত্যুর তখন সমারোহ। ১৭৮৮ সালটা গেছে একটা দুঃসহ গ্রীষ্মকাল, মাটি মাঠ শুকিয়ে গেছে। শস্য ফলে নি। দুর্বিষহ দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে সারা দেশে। লোকে খেতে পায় না। চারদিকে 'দাও অন্ন, দাও অন্ন, [illegible]ব। কিছু বড়োলোক আর ধনী পাদ্রী [illegible] বিনামূল্যে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে[illegible] কতকগুলি সঙ্ঘ ও সমিতি থেকে [illegible]নামূল্যে রুটি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে[illegible]কন্তু ব্যক্তিগত দান-[illegible] তো সারা [illegible]র অভাব মোচন
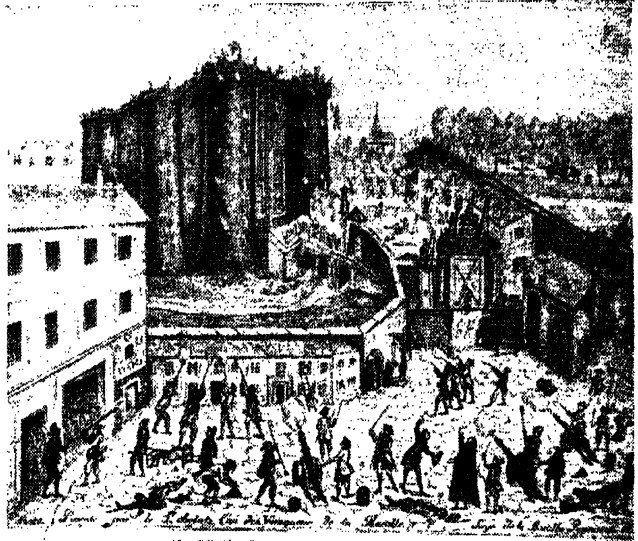
বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের একটি কাল্পনিক চিত্র

করতে পারে না। সারা দেশে দুর্ভিক্ষের তলোয়ারের নিচে দুঃখী দরিদ্র দুঃস্থ মানুষ ছটফট করছে।

আরো দুর্ভাগ্যের তখনও বাকি ছিল। তুমুল শিলাবৃষ্টি হলো প্যারিসের উপকণ্ঠে। নর্মাণ্ডি থেকে শেম্পেন পর্যন্ত শিলাবৃষ্টির বিষম ঝড় কয়দিন আর থামে না। ফ্রান্সের এ জায়গাটা ছিল সবথেকে উর্বরা-ক্ষেতের স্থান। সেখানে সব আশা শেষ হয়ে গেল। তাতে প্রায় একশ' কোটি টাকা নষ্ট হলো দেশের। তারপর এলো শীতকাল, প্রচণ্ড শীত, ১৭০৯ সালের সেই অসহ শীতের তাড়নের থেকেও দুঃসহ। এতো শীত যে লোকে মারা পড়তে লাগলো। শূন্য ডিগ্রীর ১৪½ ডিগ্রী নিচে নেমে গেল উত্তাপ। অলিভ গাছ সব মরে যেতে লাগলো, যেগুলো বাঁচলো তাতেও দু' বছরের জন্য আর ফল হতে পারবে না। বাদাম গাছের ক্ষেতের পর ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেল। ১৭৮৯ সাল ভয়ঙ্কর একটা বছর। যতই দিন যেতে লাগলো দুর্ভিক্ষের দাপট ক্রমশ বেড়ে উঠলো। চারদিকে কেবল 'হা অন্ন, হা অন্ন' আর্তনাদ।

দুর্ভিক্ষের প্রথম বলি হলো বেকাররা। বেকারে দেশ ভরে গেছে, দুর্দিনে কে কাজ দেয়। তার ওপর গত বাণিজ্য চুক্তির ফলে নর্মাণ্ডির লিনেন ও লেস কারিগরদের চল্লিশ হাজার মানুষ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। তারা সব বেকার হয়ে পালিয়ে এসেছে প্যারিসে। যদি কিছু কাজ পায়। সেখান ছাড়াও সব প্রদেশ থেকেই বেকার আর দুঃখী লোকরা ভিড় জমিয়েছে রাজধানীতে।

প্যারিসে ভিক্ষুকের সংখ্যা অগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষুক আর বেকার। যেখানেই বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা, সেখানেই লোকে লোকারণ্য। দীর্ঘতর লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে সব, একঠায় দাঁড়িয়ে। আজ যদি খাবার না পাওয়া যায়, কাল তো পাবো, অথবা পরশু। লাইনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া, কুৎসিত কোলাহল, মারামারি। বন্যাভা নেমে এসেছে প্যারিসের

পথে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অপচিত জীবনের পশু-বিকার।

এলো জুলাই মাস। বাজার একেবারে শূন্য। বার্লির রুটি কিছুদিন আগেও পাওয়া গেছে, কালো কালো দুর্গন্ধময় শুকনো রুটি। কিন্তু এবার তাও পাওয়া যাবে না। পুলিস অফিসাররা চোখ পাকিয়ে রুটির দোকানদারদের ধমক লাগাতে লাগলেন, সব দেখে দোকানদার পলায়নপর হয়ে উঠলো। যে দাম ঠিক করা হয়েছে, তাতে রুটি বিক্রি করা যায় না। তার ওপর রুটি বানাবে কি দিয়ে? হাওয়া দিয়ে তো রুটি হয় না, চোখ রাঙিয়ে তো রুটি হয় না। অবধারিত মৃত্যু এবার। দুর্ভিক্ষের শাণিত তীর ছুঁড়েছে মহাকাল।

দেশের এই দারুণ সংকটের দিনে রাজনীতিতেও গুরুতর সমস্যা জট পাকিয়ে গেল।

রাজকোষে অর্থাভাব। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুই বিলাস আড়ম্বর ও যুদ্ধের ব্যসনে সঞ্চিত অর্থ শেষ করে এনেছিলেন।

তার ওপর আমেরিকায় ইংরেজদের সংগে যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রায় পয়ষট্টি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাভাবের নিদারুণ সংকটে সমগ্র শাসনব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়তে পারে, এমন একটা অবস্থা এলো।

নতুন করধার্যের প্রস্তাব হলো। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের ওপর করধার্যের উপায় ছিল না—তাঁরা ছিলেন করদানের ঊর্ধ্বে। কিন্তু জনসাধারণের যে অবস্থা, কর আদায় করা যাবে কেমনভাবে। প্রদেশে প্রদেশে 'স্টেট' ছিল অনেকটা আইন সভার মতো। কেন্দ্রীয় সভা ছিল 'স্টেটস-জেনারেল'। স্বেচ্ছাচারী রাজারা 'স্টেটস-জেনারেল' আহ্বান করতেন না, আপন খেয়ালখুশি মতো শাসন করতেন।

কিন্তু রাজা লুই-এর কোন উপায় ছিল না। রাজকোষের তীব্র অভাবের ফলে 'স্টেটস-জেনারেল' আহ্বান করতে বাধ্য হলেন তিনি।

বিভিন্ন প্রদেশের 'স্টেট' থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিরা যাবেন 'স্টেটস-জেনারেলে'। তিন রকম প্রতিনিধি। ৩০০ প্রতিনিধি যাজকদের, ৩০০ শ অভিজাতদের আর ৬০০ শ' জনসাধারণের। যাজক ও অভিজাতরাই দেশের আসল মালিক, জনসাধারণ অনেকটা কৃপাপ্রার্থীর মতো।

তুমুল আলোড়নের মধ্য নির্বাচন সমাধা হলো। ৫ই মে বসবে 'স্টেটস-জেনারেলের' প্রথম অধিবেশন। জনপ্রিয় নেকারকে পুনর্বার মন্ত্রিত্বে আহ্বান করা হলো। সারা দেশে নেকারের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা প্রচণ্ড। জনসাধারণের পক্ষে মতামত জানাবার দোষে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল কিছুদিন আগে।

আশা হলো, শাসকদের সুবুদ্ধি দেখা দেবে। দেশের সঙ্কট কাটবে।

'স্টেটস-জেনারেল' বসবে ভার্সাই শহরে। রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে বিরাট এক হলে।

২রা মে প্রতিনিধিরা আসতে লাগলেন শহরে। সেদিন রাজা তাঁদের সংবর্ধনা জানাবেন বলে নির্ধারিত ছিল। যাজক ও অভিজাত প্রতিনিধিরা দলে দলে এলেন, জমকালো পোশাক পরে। রাজা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করি[illegible] রাখা হলো, যখন তাঁরা রাজপ্রাসা[illegible] প্রবেশ করলেন অভিজাত মহিলা[illegible] ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, রাজাও কোনপ্রক[illegible] অভ্যর্থনা জানালেন না। একজন ব্রতা[illegible] কৃষক-প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদে[illegible] দেশীয় পোশাক পরে, খানিকটা কৌতুকে[illegible] স্বরে রাজা কেবল তাঁর সংগে দু'টো ক[illegible] বললেন।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন জন[illegible] সাধারণের প্রতিনিধিরা। সব আশা ভে[illegible] গেল ক'দিনেই। 'স্টেটস-জেনারেলে' তাঁদের প্রবেশাধিকার নিয়ে গোলমাল দে[illegible] দিল। তাঁরা যে অবাঞ্ছিত এমন এক[illegible] ভাব সর্বত্র।

৫ই মে আভ্নী দ্য পারী'র সে[illegible] বৃহৎ প্রাসাদে সকাল থেকেই লো[illegible] লোকারণ্য। দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে এলে[illegible] যাজক ও অভিজাত প্রতিনিধিরা।

বেলা একটায় বসবে অধিবেশন[illegible] সকাল ন'টার মধ্যেই দর্শকদের স্থান ভ[illegible] গেল। দামী পোশাক পরে এসেছে[illegible] অভিজাত মহিলারা, যাজক ও অভিজা[illegible] পুরুষরাও শৌখিন পোশাকে জ্বল[illegible] জ্বলন্ত। লাল টুপি পরেছেন কার্ডিনাল[illegible] বিশপ ও অভিজাতবৃন্দ তাঁদের নির্দি[illegible] আসনে।

রাজা এলেন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই[illegible] রাণী মারি আঁতোয়ানেত্ তাঁর সংগে[illegible] রাজকীয় পোশাকে ভূষিত তাঁরা। পাখি[illegible] পালক ও রিবনে সজ্জিত রাজার মুকু[illegible] হীরার কারুকার্য করা। রাজাকে সপ্রতি[illegible] দেখাচ্ছে, রাণীকে একটু যেন ম্লান, এক[illegible] যেন দুশ্চিন্তিত।

রাজার অভিভাষণ শেষ হলে কীপার অব স[illegible]লস বক্তৃতা করলেন।

অধিবেশন সমাপ্ত হলো। কি[illegible] রাজাকে বুঝতে পারলো না অভিজাত যাজক প্রতিনিধিরা। গোলমাল বেঁধে গেল[illegible]

একদিন সন্ধ্যায় রাণী মারি আঁতো[illegible] য়ানেত্ তাঁর নিজস্ব [illegible]মরায় বসেছিলে[illegible] সংগে তাঁর সহচরীরা [illegible]চারিকা। ড্রেসি[illegible] টেবিলে চারটি মোম[illegible] জ্বলছে।

হঠাৎ দমকা [illegible] নিভিয়ে দি[illegible] একটা বাতি। [illegible] গেল বা[illegible] জ্বালাতে। প্রথম দে[illegible] গেল বাতি[illegible]

দু'বারের সময়ও। তিনবারের সময়েও বাতি নিভে গেল বাতাসে।

রাণী কেমন ম্রিয়ম্লান হয়ে গেলেন তা দেখে। বল্লেন, 'চারবারের বারও যদি বাতি নিভে যায় তাহলে বুঝবো, চরম দুঃখের দিন আর রোধ করা যাবে না।'

অনেক সাবধানে পরিচারিকা চতুর্থ-বার জ্বালাতে গেল মোমবাতি।

এবারও নিভে গেল।

রাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র তখন রোগশয্যায়। কয়েক মাস ধরেই ভুগছে অসুখে। কাহিল হয়ে গেছে, রোগ সারে না কিছুতেই। যুবরাজ সে।

তার কয়েকদিন পর ৪ঠা জুন মারা গেল যুবরাজ। সাতবছর সাতমাস বয়সে।

দুঃখের নিরন্তর পীড়নে রাণীর দেহ ভেঙে এলো। দুর্ভাবনায় তাঁর সব চুল শাদা হয়ে গেল।

কয়েকদিন আগে রাণীর একটি তৈল-চিত্র এঁকেছিলেন একজন খ্যাতনামা শিল্পী। সে চিত্রটি বান্ধবীর নিকট পাঠিয়ে রাণী তার নিচে লিখে দিলেন, 'দুঃখে এর সব চুল শাদা হয়ে গেছে!

কিন্তু তখন দুঃখের কেবল শুরু। বেচারী জানতেন না, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটি পরম বেদনার চরিত্র হয়ে থাকার জন্যই তাঁর জন্ম। আরো দুঃখ, আরো বেদনার সমারোহ নামবে তাঁর জীবনে।

'ষ্টেটস-জেনারেলের' সঙ্গে রাজার বিরোধ ক্রমশ অনিবার্য হয়ে এলো। রাজার প্রত্যেকটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিয়ে প্রতিনিধিরা শপথ করলেন, দেশের সংবিধান রচনা না করে তাঁরা স্থান ত্যাগ করবেন না। সভার নতুন নামকরণ করলেন 'ন্যাশনাল এসেম্বলী'। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা কাছাকাছি টেনিসকোর্টে গিয়ে শপথ করলেন, দেশের দুর্ভাগ্য মোচন না করে তাঁরা বিশ্রাম নেবেন না।

সৈন্যবাহিনী তলব করলেন রাজা। প্যারিস ও ভার্সাই প্রত্যেকটি রাস্তায় সশস্ত্র সৈন্য টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলো।

১১ই জুলাই নেকারকে পদচ্যুত করলেন রাজা। নিঃশব্দে নেকার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে চলে এলেন।

১২ই জুলাই রবিবার নেকারের পদচ্যুতির খবর ছড়িয়ে গেল প্যারিসে। একটা তুমুল আলোড়ন জেগে উঠলো।

বাস্তিল দুর্গের পতন

যে যেখানে ছিল চীৎকার করে উঠলে, 'অস্ত্র নাও!' এই চীৎকার সারা শহরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। পথে পথে উত্তাল জনতা উন্মাদের মতো ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগলো। প্রত্যেকের হাতেই কিছু একটা মারণ যন্ত্র। বন্দুক যে পেয়েছে কাঁধে চাপিয়েছে। যে পায়নি, একটা লাঠি নিয়েছে সে, নতুবা পাথরের টুকরো। সর্বনাশা ধ্বংসের লেলিহান আগুন জ্বলে উঠেছে প্রত্যেকটি লোকের মনে। অসহ্য, অসহ্য এই জীবন, এ জীবন দান করতে হবে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আনতে হবে প্রার্থিত সেই দিন। সুখের দিন।

দলে দলে ক্ষিপ্ত লোক নেমে এলো রাস্তায়। নেকারের একটা প্রস্তরমূর্তি কাঁধে নিয়ে বেড়াতে লাগলো এ পথ থেকে ও পথে।

উন্মাদ হয়ে গেল প্যারিস। সবগুলি গীর্জার ঘণ্টা বেজে উঠলো। রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর যে অংশ জনসাধারণের দলে যোগদান করেছিল, তারা এলো সশস্ত্র-সজ্জিত হয়ে। যুদ্ধ একটা বাঁধবে। রাজা ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধের দিন এসে গেছে।

সরকারী খাদ্যভাণ্ডার লুণ্ঠিত হলো সর্বপ্রথমে। তারপর অস্ত্রের সন্ধানে পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলো। রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে ছোটখাট কয়েকটা সংঘর্ষ বাধলো কিন্তু বেসেনভাল তাঁর সৈন্যদল অপসরণ করে নিয়ে গেলেন।

প্যারিসের মান্যব্যক্তিরা 'টাউন হলে' সভা করলেন। নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হলো। একটা সমিতি তৈরি করা হলো এই পরিস্থিতিতে জন-সাধারণকে পরিচালিত করার জন্য। 'ন্যাশনাল গার্ড' নামে জাতীয় সৈন্য-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হলো। এই সৈনিক দলে হাজার হাজার সশস্ত্র লোক এসে মিলিত হলো। লাল ও নীল রঙের ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হলো অদের। ন্যাশনাল গার্ডের সৈন্যবাহিনী সে রাত্রেই প্যারিসের রাস্তাগুলিতে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলো।

১৪ই জুলাই-এর ঐতিহাসিক দিনের সকাল হলো। সারারাত্রি ঘুম হয়নি প্যারিসের। উন্মত্ত কোলাহল আর ক্ষিপ্ত ক্রোধ নরনারীর মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সকালেই একদল জনতা অবরোধ করলো পুরনো সৈনিকদের আবাস। যতই সময় বাড়তে লাগলো জনতার সংখ্যাও বেড়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিল জনতা। তুমুল আনন্দধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো। আরো অস্ত্র চাই, আরো অস্ত্র।

মনে পড়লো বাস্তিল।

বাস্তিল দুর্গ প্যারিসের বুকে দাঁড়িয়ে। শুধু ফ্রান্স নয়, সারা জগতের অত্যাচার ও অবিচারের প্রতীক। কতো লোক এখানে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছে, আর ফিরে যায়নি। উন্মাদ হয়েছে বন্দীরা, মাথা ঠুকে মরেছে, মরেছে না খেয়ে। বিভীষিকার প্রতিমূর্তি বাস্তিল।

আটটি সুবৃহৎ ও সুউচ্চ কারাগার নিয়ে বাস্তিল দুর্গ। সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে দুর্গটি ঘেরা। খাল, খানা ও ব্রিজ দিয়ে দুর্গটি সমান সুরক্ষিত।

দলে দলে লোক ছুটে যেতে লাগলো বাস্তিলের দিকে। অত্যাচারের এই প্রাসাদ বিজয় করে আনতে হবে।

সকালে দেখা গিয়েছিল কারাধ্যক্ষ দুর্গের কামানগুলি সরিয়ে নিয়ে এসে সবগুলো পথের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন।

ক্ষিপ্ত জনসাধারণের অসংখ্য দল এসে বাস্তিলের সামনে দাঁড়ালো। লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার সশস্ত্র জনতা। একটা প্রতিনিধি দল গেল কারাধ্যক্ষের কাছে, তিনি আপসের মনোভাব দেখালেন। কিন্তু দুর্গের গহ্বর থেকে তিনি অপেক্ষমান গর্জনমুখর জনতা দেখতে এসে ভীত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ আক্রমণের আদেশ দিলেন তিনি। দুর্গের সৈন্যবাহিনী অগ্নি-উদ্গার করে জনতাকে আক্রমণ করলো।

একটি যুবক নিল জনতার নেতৃত্বের ভার। আগে তিনি সৈনিক ছিলেন, নাম এলিয়া। পাঁচটি কামান নিয়ে দলবদ্ধ জনতার স্রোত সেই আক্রমণ প্রতি[...] করলো। প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে গেল জ[...] ও সৈন্যবাহিনীর।

কারাধ্যক্ষ দুর্গের একটা ফাঁক দি[...] এক টুকরো চিঠি পাঠিয়ে দিলে[...] এলিয়া উচ্চকণ্ঠে পড়লেন সে চি[...] 'তোমরা সন্ধি কর নতুবা দুর্গটি জ্বালি[...] দেব আমি।'

জনতা গর্জন করে উঠলোঃ 'না স[...] নয়!' তুমুল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিকে[...] পাঁচটায় বাস্তিল অধিকার করলেন জ[...] সাধারণ। এলিয়াকে কাঁধে চড়ি[...] বাস্তিলের চাবি নিয়ে সুদীর্ঘ শোভায[...] বেরোল পথে। প্যারিসের বিজয়ী জ[...] সাধারণ বিপ্লবের তূর্যনাদ ব[...] ইতিহাসের সফেন সমুদ্র নিয়ে এ[...] ফ্রান্সে। যে বিপ্লবের ধ্বনিঃ 'স্বাধীন[...] সাম্য, মৈত্রী!' যে বিপ্লব আজো চলে[...] সভ্যতার শেষ সিঁড়িতে না গেলে [...] বিপ্লবের শেষ নেই!

ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়

প্রমথ চৌধুরী

ইহজীবনে আমাদের দেহমনের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট। এই সত্যের উপরই ফরাসি সাহিত্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। ফরাসি জাতি চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানকে মিথ্যা বলে উড়িয়েও দেয় নি, অকিঞ্চিৎকর বলেও উপেক্ষা করে নি; সুতরাং ফরাসি সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্টের একত্রে সাক্ষাৎলাভ করা যায়। হেনরি জেমস্ বলেছেন যে, ফরাসি জাতি বিশেষ করে সেই সকল মনোভাবের অনুশীলন করেছেন যাতে করে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা জন্মায়। এই গুণেই ফরাসি সভ্যতা পরকে আপন করতে পারে। ফরাসি সাহিত্য প্রধানত মানবমনের সাধারণ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা সর্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্বলোকপ্রিয়। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' ফরাসি সভ্যতার এই বীজমন্ত্র কোনো ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আপনারা সকলেই জানেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সকল ফরাসি দার্শনিক বিশ্বমৈত্রীর বার্তা ঘোষণা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই নাস্তিক ছিলেন। মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরেই ফরাসি মনোভাব প্রতিষ্ঠিত, এবং সে মনোভাব প্রধানত ফরাসি সাহিত্যই গঠিত করে তুলেছে। হেনরি জেমস্ বলেছেন যে, ফরাসি মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, ফরাসি মন স্বভাবতই তা দেখতে চায় না; এর ফলে যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসি সাহিত্যে বড়-একটা পাওয়া যায় না। সরস্বতীদর্শনের কাল, ফরাসি কবিদের মতে গোধূলিলগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসি সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপর পক্ষে এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই।

ফরাসি সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্ট-ভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বে বলেছি যে, ফরাসি সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুই-ই আছে। ফরাসি মনের এই প্রসাদগুণপ্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসি লেখকরাই দিতে পারেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসি পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না। প্রকৃত দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র নিজের ব্যব-হারের জন্য সত্য আবিষ্কার করতে ব্রতী হন না। মানবজাতির নিকট সত্য প্রকাশ ও প্রচার করাই তাঁর সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা পরিষ্কার করে অপরকে দেখিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া, যা জটিল তাকে সরল করা, যা কঠিন তাকে সহজ করা তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। এক কথায় সায়েন্টিস্টের পক্ষে আর্টিস্ট, জ্ঞানীর পক্ষে গুণী হওয়া আবশ্যক। জর্মান পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যায় ফরাসি পণ্ডিতেরা কত শ্রেষ্ঠ গুণী। জর্মান পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম করে যা প্রস্তুত করেন তা অধিকাংশ সময় বিদ্যার গ্যাস বই আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে ফরাসি পণ্ডিতেরা মানবজাতির চোখের সুমুখে যা ধরে দেন, সে হচ্ছে গ্যাসের আলো।

জিনিয়াস শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য হচ্ছে প্রতিভা। কিন্তু এই প্রতিভা শব্দের অর্থ নিয়ে বিষম মতভেদ আছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে প্রতিভার অর্থ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। এ অর্থে ফরাসি জাতি যে অপূর্ব প্রতিভা-শালী, তার প্রমাণের জন্য বেশি দূর যাবার দরকার নেই। গত শত বৎসরের ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে নি। এই এক শ' বৎসরের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স বারংবার পীড়িত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, অথচ এই অশান্তি এই উপদ্রবের ভিতরেও ফ্রান্স মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাস্তুর এবং দর্শনের ক্ষেত্রে বের্গস' যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ। আর সাহিত্যক্ষেত্রে হিউগো এবং মুস্সে

Musset, গোতিয়ে Gautier এবং ভেরলেন Verlaine প্রমুখ কবির, রেনাঁ Renan এবং তেইন Taine প্রমুখ সমালোচকের, স্তাঁদাল Stendhal এবং বালজাক, ফ্লোবেয়র এবং মোপাসাঁ, লোতি Loti এবং আনাতোল ফ্রাঁস প্রমুখ উপন্যাসকারের, রোস্তাঁ Rostand এবং ব্রিয় Brieux প্রমুখ নাটককারের নাম ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে কার নিকট অবিদিত? এ'রা সকলেই কাব্যজগতের নব পথের পথিক, নব বস্তুর স্রষ্টা। এবং এ'দের রচিত সাহিত্য যতই নতুন হোক, এক ফ্রান্স ব্যতীত অপর কোনো দেশে তা রচিত হতে পারত না; কেননা এ সকল কাব্যকথা আলোচনার ভিতর থেকে একমাত্র ফরাসি প্রতিভাই ফুটে উঠেছে। এ সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন হলেও বিজাতীয় নয়, পূর্ব পূর্ব যুগের ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে এর রক্তের যোগ আছে। ফরাসি প্রতিভা যে কি পরিমাণে অদম্য, দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে সাহিত্যে এই সকল নবকীর্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বর্তমান ইউরোপের দুটি সর্বপ্রধান সাহিত্য হচ্ছে ইংরেজি ও ফরাসি। ইউরোপের অপর কোনো দেশের সাহিত্য ঐশ্বর্যে ও গৌরবে এই দুই সাহিত্যের সমকক্ষ নয়।

ইংরেজি সাহিত্যের সহিত আমাদের সকলেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের সহিত ফরাসি সাহিত্যের পার্থক্যের পরিচয় লাভ করতে পারলে আমরা ফরাসি সাহিত্যের বিশেষত্বের সন্ধান পাব।

এক কথায় বলতে গেলে ইংরেজি সাহিত্য রোমাণ্টিক এবং ফরাসি সাহিত্য রিয়ালিস্টিক।

রিয়ালিজম্ এবং রোমাণ্টিসিজম্ বলতে ঠিক যে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজে বহুকালাবধি বহু তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। কিছুদিন হল বাংলা সাহিত্যেও সে আলোচনা শুরু হয়েছে।

আজকের এ প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নেই, তবে সাহিত্যের এ দুই মার্গের মোটামুটি লক্ষণগুলি নির্দেশ করা কঠিন নয়।

রোমাণ্টিক সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ এই যে, তা সাব্‌জেকটিভ। রোমাণ্টিক কবি প্রধানত নিজের হৃদয়ের কথাই বলেন; নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের আশা-নৈরাশ্য, নিজের বিশ্বাস-সংশয়, এই সকলই হচ্ছে তাঁর কাব্যের উপাদান ও সম্বল। শুধু তাই নয়, খাঁটি রোমাণ্টিকের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে জগতের সার সত্য। বাংলার সর্বপ্রথম কবি চণ্ডীদাসের কবিতা আগাগোড়া সাব্‌জেকটিভ, অপর পক্ষে সংস্কৃত কবিতা আগাগোড়া অব্‌জেকটিভ। এক ভর্তৃহরি ভিন্ন অপর কোনো সংস্কৃত কবি মানবহৃদয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে 'অহং জানামি' এ কথা বলেন নি। সংস্কৃতের ন্যায় ফরাসি সাহিত্যও প্রধানত অব্‌জেকটিভ, বাহ্যঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই ফরাসি সাহিত্যের আসল কারবার; এক কথায় ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। সে চোখ মানুষের ভিতর-বাহির দুই সমান দেখতে পায়।

রোমাণ্টিক সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সে সাহিত্য আধ্যাত্মিক।

আমাদের দর্শনে সত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—এক ব্যবহারিক, আর এক তদতিরিক্ত। ফরাসি সাহিত্যে এই ব্যবহারিক সত্যেরই আলোচনা ও চর্চা হয়ে থাকে। যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর যা বুদ্ধির অগম্য, ফরাসি সাহিত্যে তার বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। The proper study of mankind is man, এই হচ্ছে ফরাসিমনের মূল কথা। সুতরাং মানবসমাজ মানবমন ও মানব-চরিত্রের জ্ঞানলাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জ্ঞান লাভ করতে হলে সামাজিক মানবের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করতে হয়, এবং সেই সঙ্গে সেই আচার-ব্যবহারের আবরণ খুলে ফেলে তার আসল মনের পরিচয় নিতে হয়; তাও আবার সমগ্রভাবে নয়, বিশ্লেষণ ক'রে, পরীক্ষা ক'রে। বৈজ্ঞানিক যে ভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে জড়বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করেন, ফরাসি সাহিত্যিকরাও সেইভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন। তাঁরা মানবজাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্যকারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে Moliere মোলিয়েরের নাটক ফরাসি প্রতিভার সর্বোচ্চ নিদর্শন। মোলিয়ের ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে খাড়া করে দিয়েছেন। কিন্তু এ সকল মূর্তি দেখে মানুষের মনে ভয় হয় না, হাসি পায়। মানুষের ভিতর যা-কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই মোলিয়েরের চোখে পড়েছে, আর যা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন।

ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের তুলনা করলেই এ উভয়ের প্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষিত হবে। শেক্সপীয়রের রিচার্ড দি থার্ড, ইয়াগো প্রভৃতির পরিচয়ে দর্শকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শাইলক আমাদের মনে যুগপৎ করুণা ও ঘৃণার উদ্রেক করে, কিং লিয়রের পাগলামি আমাদের মনকে বেদনাতুর করে, এয়ারিয়েল Aeriel আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ফরাসি কবিরা শুধু হাস্য করুণ, বীর ও মধুর রসের চর্চা করে ইংরেজ কবিদের ন্যায় তাঁরা ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত রসের রসিক নন। ফরাসি জাতির ভিতর কোনো শেকস্পীয়র জন্মায় নি ও জন্মাতে পারে না। পাগল, প্রেমিক ও কবি যে এক জাত, এ কথা কোনো ফরাসি কবি বলেনও নি, স্বীকারও করেন নি। কেননা তাঁরা তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধির উপরেই চিরকাল নির্ভর করে এসেছেন। ফরাসি জাতির দেহে কিংবা মনে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই। এবং তাঁরা কস্মিন্‌কালেও তাঁদের মগ্ন-চৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এই কারণে ফরাসি কবিতা ইংরেজি কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত; সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না।

ফরাসি সাহিত্যের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে তার আর্ট। ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন—

The one high principle which, through so many generations, has guided like a star the writers of France is the principle of deliberation, of intention, of a conscious search for ordered beauty; an unwavering, an indomitable pursuit of the endless glories of art. †

এই আর্টের গুণেই ফরাসি রচনা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের শীর্ষ-স্থান অধিকার করে আছে।

এক কথায় এ আর্ট রোমাণ্টিক নয়, ...সিকাল। কি কি গুণের, কি কি ...ণের সদ্‌ভাবে রচনা আর্ট হয়, সে ...য়ে ফরাসি জাতির মত নিম্নে বিবৃত ...। ফরাসি রচনার রীতির পরিচয় ... পূর্বে ফরাসি ভাষার কিঞ্চিৎ প... দেওয়া আবশ্যক, কেননা ভাষার স... সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এত ঘনি... এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না

চারুশিল্পে ফরাসীর অনুরাগপ্রিয়তার একটি নিদর্শন

---

† L. Strachey, Landmarks in French Literature, Home University Library.

য, সকল দেশের জাতীয় সাহিত্যের রূপগুণ সেই দেশের ভাষার শক্তির উপর নির্ভর করে। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জাতীয় সাহিত্য রচিত হইবার বহু পূর্বে জাতীয় ভাষা গঠিত হয়। যুগযুগান্তরের আত্মপ্রকাশের চেষ্টার ফলে একটি জাতীয় ভাষা গড়ে ওঠে এবং সেই ভাষার অঙ্গে জাতীয় মনের ছাপ থেকে যায় এবং তার অন্তরে জাতীয় চরিত্র বিধিবদ্ধ হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে সম্বন্ধ, ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ ফরাসি ল্যাটিনের অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত। ফরাসি ভাষার শব্দসমূহ ল্যাটিন হতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় যাকে তদ্ভব বলে, ফরাসি অভিধানের প্রায় সকল শব্দই সেই শ্রেণীভুক্ত, এসকলই ল্যাটিনের তদ্ভব। এ ভাষায় দেশি এবং বিদেশি শব্দের সংখ্যা এত অল্প যে তা নগণ্য স্বরূপে ধরা যেতে পারে। ফরাসি ভাষা মূলত এক হওয়ার দরুণ এ ভাষার ভিতর এমন-একটি ঐক্য ও সমতা আছে যা রচনার একটি বিশেষ রীতি গড়ে তোলার পক্ষে একান্ত অনুকূল। ইংরেজি ভাষা ঠিক এর বিপরীত। অ্যাংলো-স্যাক্শন এবং নর্মান-ফ্রেঞ্চ, এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে বর্তমান ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি। এর ফলে সে ভাষার অন্তরে বৈচিত্র্য আছে, সমতা নেই। ইংরেজি রচনার যে কোনো-একটি বিশিষ্ট রীতি নেই, ইংরেজি ভাষার বর্ণসংকরতা তার অন্যতম কারণ। ইংরেজি লেখকেরা যে প্রত্যেকেই নিজে রুচি অনুসারে রচনার স্বতন্ত্র রীতি গড়ে নিতে পারেন, তার প্রচুর এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ এক উনবিংশ শতাব্দীর ইংরজি সাহিত্য হতে পাওয়া যায়। কার্লাইল এবং নিউম্যান, রাস্কিন এবং ম্যাথু আর্নল্ড, থ্যাকারে এবং মেরেডিথ্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং শেলি, টেনিসন এবং ব্রাউনিং—একই যুগে এই সব বিভিন্নপন্থী লেখকের আবির্ভাব এক ইংলন্ড ব্যতীত অপর কোনো দেশে সম্ভব হত না। উনবিংশ শতাব্দে ফ্রান্সের রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্টিক লেখকদের রচনার ভিতর এরূপ জাতিগত প্রভেদ নেই। ফরাসি ভাষায় এরূপ বৈচিত্র্যের অবসর নেই। সুতরাং ফরাসি লেখকেরা যুগে যুগে রচনায় বৈচিত্র্য নয়, ঐক্যসাধন করে একটি আদর্শ রীতি গড়ে তোলবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করেছেন, এবং সে বিষয়ে কৃতকার্যও হয়েছেন। এই যুগ-যুগান্তরের সাধনার ফলে অধিকাংশ ফরাসি শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ ভাষার ব্যবহারে অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করবার জো নেই। আমাদের দেশের বাঁধা ঠাটের বাঁধা রাগিণীর মত এ ভাষা গুণীব্যক্তির হাতেই পূর্ণশ্রী লাভ করে, এবং তার মূর্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একটি বেপর্দায় হাত পড়লে সুর যেমন আগাগোড়া বেসুরো হয়ে যায়, তেমনি একটি অসংগত কথার সংস্পর্শে ফরাসি রচনা আগাগোড়া অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিমিত শব্দে স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করবার পক্ষে এ ভাষা যতটা অনুকূল, হৃদয়ের গভীর ও অস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নয়। এর ফলে গদ্যরচনার পক্ষে ফরাসি হচ্ছে ইউরোপের আদর্শ ভাষা।

ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু কেবলমাত্র উপাদানের গুণে কোনো শিল্পই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না, যদি না তা শিল্পীর হাতে পড়ে। আর তা ছাড়া অন্যান্য শিল্পের উপাদানের সঙ্গে সাহিত্যের উপাদানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। পাষাণ কি ধাতু, বর্ণ কি স্বর, আমরা বাইরে বাইরে থেকে যা পাই তাই আমাদের গ্রাহ্য করে নিতে হয়, কেননা ও সকল বাহ্যজগতের বস্তু; আমরা তা সৃষ্টি করি নি, অতএব আমরা তার ধাতও বদলে দিতে পারি নে। কিন্তু ভাষা হচ্ছে আমাদেরই সৃষ্টি। সুতরাং পূর্ব-পুরুষদের নিকট যে ভাষা আমরা উত্তরাধিকারীস্বত্বে লাভ করি, তার অল্প-বিস্তর রূপান্তর করা আমাদের সাধ্যের অতীত নয়। আমরা যা পড়ে পাই তা চৌদ্দ আনা, তাকে ষোলো আনা করা না-করা, সে আমাদের হাত। বর্তমান ফরাসি ভাষা এবং প্রাচীন ফরাসি ভাষা এই দুই মূলত এক হলেও এ দুইয়ের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। যুগের পর যুগের ফরাসি লেখকদের যত্নে ও চেষ্টায় এ ভাষা জাতীয় মনোভাব প্রকাশের এমন উপযোগী যন্ত্র হয়ে উঠেছে। ফরাসি ভাষার এ ইভলিউশন আপনি হয় নি, এ উন্নতি এ পরিণতির ভিতর ফরাসি জাতির সুবুদ্ধি ও সুরুচি, যত্ন ও অধ্যবসায়, এ সকলেরই সমান পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি চাই যে আমাদের শিক্ষিত-সমাজে ফরাসি সাহিত্যের সম্যক্ চর্চা হয়। আমার বিশ্বাস, সে চর্চার ফলে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

আমি বলেছি যে ইংরেজি সাহিত্য মুখ্যত রোমান্টিক, ফরাসী সাহিত্য মুখ্যত রিয়ালিস্টিক। যে দুটি বিভিন্ন মনোভাব থেকে এই দুটি পৃথক্ চরিত্রের সাহিত্য জন্মলাভ করে, প্রতি জাতির মনে সে উভয়েরই স্থান আছে। কোন্ জাতি এর মধ্যে কোন্‌টির উপর ঝোঁক দেন, তার উপরেই জাতীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর করে।

প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই দুটি পৃথক্ ধারা বরাবর পাশাপাশি চলে এসেছেঃ একটি সম্পূর্ণ সাব্‌জেক্‌টিভ, অপরটি সম্পূর্ণ অব্‌জেকটিভ। যে বাঙালি জাতির মন থেকে বৈষ্ণব পদাবলী জন্মলাভ করেছে, সেই বাঙালি জাতির মন থেকেই কবি-

কঙ্কনচণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল জন্মলাভ করেছে। সুতরাং রোমাণ্টিক এবং রিয়ালিস্টিক উভয় সাহিত্যই আমাদের হৃদয়-মন সমান স্পর্শ করতে পারে। ইংরেজি সাহিত্য যেমন আমাদের মনের একটি দিক ফুটিয়ে তুলেছে, আমাদের মনের আর-একটি দিক আছে যা ফরাসি সাহিত্য তেমনি ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে যে কি সুফল জন্মেছে তা সকলেই জানেন; কিন্তু সেই সঙ্গে যে কি কুফল জন্মেছে তা সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়।

সংগীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ। কেননা যে জাতির ক্ল্যাসিক্‌স্ হচ্ছে সংস্কৃত, সে জাতির পক্ষে রচনার আর্ট সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া স্বাভাবিক নয়।

একটি ইংরেজ লেখক বলেছেন—

The amateur is very rare in French literature—as rare as he is common in our own.†

ইংরেজি সাহিত্যের এই amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই।

ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়। কেননা সংযম ব্যতীত, কি মনোজগতে, কি কর্মজগতে, কোনো বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ করা যায় না। সংস্কৃতে একটি কথা আছে যে, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলং'। রচনা সম্বন্ধে এই কৌশল লাভ করতে হলে লেখকদের পক্ষে যোগ অভ্যাস করা দরকার। অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কোথাও বা হঠযোগ, কোথাও বা রাজযোগ। বাহুল্য আর ঐশ্বর্য, স্ফীতি আর শক্তি যে এক বস্তু নয়, এ সত্য ফরাসি সাহিত্য মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

† G. L. Strachey.

[প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধের আংশিক উদ্ধৃতি। বিশ্ব-ভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত]

ফরাসী দেশের কথা

স্বামী বিবেকানন্দ

[॥ সংকলয়িতার নিবেদন॥ ভারতে নবযুগের প্রধান স্রষ্টা ও ভাবীকালের অভ্রান্ত পথ-নির্দেশক স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর ভাবধারার পরিপূর্ণ মহত্ত্ব এখনও দেশ ও জাতি সম্পূর্ণভাবে অনুভব করেননি। এই ভাবুক ও প্রেমিক বীর-সন্ন্যাসী বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে যা কিছু মহৎ, তার সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করেছিলেন এবং ভারতের যা শ্রেষ্ঠ বাণী তা প্রচার করেছিলেন। আমাদের শিখিয়েছিলেন নিজেদের শ্রদ্ধা করতে এবং অন্যের মধ্যে যা শ্রদ্ধেয়, তাকে প্রণাম করতে। জাতিগুলি পরস্পরের কাছে আসবে ও পরস্পরের ভাব গ্রহণ করে বিকাশ লাভ করবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

ফরাসী সভ্যতা সম্পর্কে স্বামীজী বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ইতিহাস পাঠে তাঁর খুব অনুরাগ ছিল। "শুধু ঘটনা-সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া একটা জাতি বা তদন্তর্গত শক্তিশালী পুরুষদিগের ক্রিয়া-সমূহ প্রকাশ পায়, ইতিহাস পাঠ দ্বারা সেই সকল অবস্থার পরিচয় লাভ ও পর্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন।" (স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথনাথ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭)। বলা বাহুল্য, ফরাসী দেশের ইতিহাস তিনি এইভাবেই পড়েছিলেন।

বরাহনগর মঠে স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের অন্যতম প্রধান পাঠ্য ও আলোচ্য ছিল ফরাসী ইতিহাস। "...জোয়ান অব আর্ক...প্রভৃতির গল্প হইত।...স্বামীজী কার্লাইলের ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব নামক গ্রন্থ হইতে সুদীর্ঘ অংশসমূহ আবৃত্তি করিতেন এবং সকলে সমস্বরে...'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক', 'সাধারণতন্ত্রের জয় হোক' এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন।" (তদেব, পৃঃ ১৬১)।

স্বামীজী যখন প্রথমবার পরিব্রাজকের বেশে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করার সময় বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন, "তখন স্বামীজীর সঙ্গে ফরাসী সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক, একটি কমণ্ডলু ও একখানি মাত্র গেরুয়া বস্ত্র ছিল।" (তদেব, পৃঃ ২৮৮)

পরবর্তী কালে তিনি ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন। এ ভাষায় গুণীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতাও করে-ছিলেন। য়ুরোপীয় ধ্রুবসাহিত্য স্বামীজী ভালোভাবেই পড়েছিলেন, ফরাসী সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আর স্বামীজীর বাংলা গদ্য যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন ফরাসী-গদ্যের আরনল্ড-কথিত সমস্ত গুণই তাতে বর্তমান।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা আগস্ট থেকে স্বামীজী কিছুকাল প্যারিস ও ফ্রান্সের অন্যান্য স্থানে ছিলেন। প্যারিসে তিনি Place des Estats Wnis-এ লেগেট দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরে স্বঃ জুল বোওয়ার অতিথি হন। এ সময় Congress of the History of Religion-এ যোগদান করেন। এছাড়া আরো কিছু বক্তৃতা তিনি দেন ও ফরাসী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় নিবিড়ভাবে করেন। এসম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীর The Paris Congress and a Tour in Europe অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা এইখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ফ্রান্সে থাকতেই স্বামীজী ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ প্রসঙ্গে গভীরভাবে ভাবিত হন। এই ভাবনার অংশ পেয়েছিলেন নিবেদিতা। পরে এই ভাবনাই ভাবিত করে অবনীন্দ্র-নাথ-নন্দলাল-কুমার স্বামীকে। এ সম্পর্কে 'উদ্বোধন' সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ কালিদাস নাগের চোখ-ফোটানো প্রবন্ধ 'জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়' সকলকে পড়তে অনুরোধ করি।

ফ্রান্স ও য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডে (কন্টিনেণ্ট) খৃষ্টধর্মের যে প্রধান রূপ, তার মূল কথাটি স্বামীজীর খুব ভালো লেগেছিল মনে হয়। "সে ধর্মে...জেগে বসেছেন 'মা'! শিশু যিশু কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষরূপে, অট্টালিকায়, বিরাট-মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণ কুটিরে 'মা', 'মা', 'মা'!...'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী', দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ১৮শ সংস্করণ, পৃঃ ৭৩-৭৪)। ক্যাথলিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কর্মকাণ্ডের মিল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

ফ্রান্সে যাঁদের সঙ্গে স্বামীজীর অন্ত-রঙ্গ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাঁরা হলেন, জুল বোওয়া (Jules Bois), পেয়র হয়সিন্থ (Pere Hyacinthe), মাদাম কালভে (Madame Calve), মাদাম সারা বার্নাড (Madame Sarah Bernhardt), Prof. Geddes প্রভৃতি। এ'দের বিস্তৃত পরিচয় 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থদ্বয়ে আছে। মাদাম কালভে সম্পর্কে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'এদেশে-ওদেশে' বইয়ে একটি মনোরম স্মৃতিচিহ্ন আছে।

স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'পরিব্রাজক' এই দুটি ছোট বইয়ে প্রসঙ্গত ফরাসী সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বলেছেন, সেগুলি থেকে কিছু অংশ সংকলন করে উদ্ধৃত করা হল।

সবশেষে স্মরণ করি, রোমাঁ রলাঁর পুণ্যনাম। এই নামটি ভারত-ফ্রান্স মৈত্রীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বামীজীকে তিনি শুধু পাশ্চাত্যেই নতুন করে ব্যাখ্যা করেননি, প্রাচ্যেও অনেকে তাঁর মাধ্যমেই স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। বিবেকানন্দ-বাণীর আলোচনা শেষে রলাঁ যে আশ্চর্য সুন্দর কথা বলেছেন সেটি উদ্ধৃত করে আমার নিবেদন শেষ করি:

"Europe and Asia are the two halves of the Soul. Man is not yet. He will be. God is resting and has left to us His most beautiful creation—that of the seventh Day: to free the sleeping forces of the enslaved spirit; to reawaken God in man; to recreate the being itself."]

* * *

এ ইউরোপ বুঝতে হলে পাশ্চাত্য-ধর্মের আকর ফ্রান্স বুঝতে হবে। ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক-আঁধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে—এই পারি নগরীতে। পারির পর ইউরোপ দেখা, চর্বচুষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাখা।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রান্স ইউরোপের কর্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া, এমন দেশ আর কোথাও নেই। নাতি-শীতোষ্ণ, অতি উর্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ—সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-দরিদ্র, তাদের ঘর দোর ক্ষেত ময়দান, ঘষেমেজে, সাজিয়ে-গুজিয়ে ছবিখানি করে রাখছে। এক জাপান ছাড়া, এভাব কোথাও নেই। সেই ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন—মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ; একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা এবং সফলও হয়েছে।

এই ফ্রান্স প্রাচীনকাল হতে গোলওয়া (Gaulois), রোমক, ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষ ভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোম সাম্রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপে একাধিপত্য লাভ করলে, এদের বাদ্‌সা শার্লামাঞন ইউরোপে কৃশ্চান ধর্ম তলোয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আসিয়াখণ্ডে ইউরোপের প্রচার—তাই আজও ইউরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিঙ্গি, প্লাঁকি, ফিলিঙ্গি ইত্যাদি।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীক ডুবে গেল। রাজচক্রবর্তী রোম বর্বর আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল. এদিকে মহাবেগে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগল। মহাবল পারস্য আরবের পদানত হল। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমান ধর্ম আর একরূপ ধারণ করলে: সে আরবি ধর্ম আর পারসিক সভ্যতা সম্মিলিত হলো।

আরবের তলওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য-সভ্যতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যে পারস্য-সভ্যতা প্রাচীন গ্রীস ও ভারতবর্ষ থেকে নেওয়া। পূর্ব পশ্চিম, দুদিক হ'তে মহাবলে মুসলমান তরঙ্গ ইউরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অন্ধ ইউরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প বর্বরাক্রান্ত ইতালীতে প্রবেশ করলে, ধরারাজধানী রোমের মৃতশরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগলো—সে স্পন্দন ফ্লরেন্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে, প্রাচীন ইতালী নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগলো,—এর নাম রেনেসাঁ, নবজন্ম। কিন্তু সে নবজন্ম ইতালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম।

ইতালী বুড়ো জাত, একবার সাড়া-শব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত, নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

ইউরোপে, ইতালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান্, অভিনব নূতন জাতিতে। চারিদিক হ'তে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালী জাতিতে সে বীর্য ধারণের শক্তি

ছিল না, ভারতের মতো সে উন্মেষ ঐখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইউরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজেদের তরণী ভাসিয়ে দিলে. সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগলো, সে একধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগলো; ইউরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল।

এই পারী নগরী ইউরোপী সভ্যতার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দনগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ না লন্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লন্ডন, নিউইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; কিন্তু নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যাবুদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান সভা এদের একাডেমির নকল: এই পারি উপনিবেশ সাম্রাজ্যের গুরু. সকল ভাষাতেই যুদ্ধ-শিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশই ফরাসী; এদের রচনার নকল, সকল ইউরোপী ভাষায়; দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

পারির পর পাশ্চাত্ত্য জগতে আর নগরী নাই: সব সেই পারির নকল অন্তত চেষ্টা। . কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য (অন্যান্যে) সে অনুকরণ স্থূল। (অন্যান্য ইউ-রোপীয় জাতি) ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ি অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি, অশ্বারোহী, রথী. সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু (তাঁদের) দোতলা বাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়,—এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা, হাতী ঘোড়া রাখবার বাড়ি দেখে মনে হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে।

এরা হচ্ছে শহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে, তা পঞ্চাশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর পরে জার্মান ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হোক বা শিল্পে হোক বা সমাজ নীতিতেই হোক। এই ফরাসী সভ্যতা স্কটল্যান্ডে লাগলো, স্কটরাজ ইংলন্ডের রাজা হলেন, ফরাসী সভ্যতা ইংরেজকে জাগিয়ে তুললে; স্কটরাজ স্টুয়ার্ট বংশের সময়ে ইংলন্ডে রয়েল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি।

যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগতকে দেবার থাকে ত পারি হচ্ছে সেই প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে ত ইউরোপ অবশ্য প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সব দেশেই সহজে প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের দেশে পারি নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়,—এ পারি মহাকদর্য নরককুন্ড। অবশ্য একথা ইংরেজরাই বলে থাকে এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে। কিন্তু লন্ডন, নিউইয়র্কও ঐ ভোগের উপকরণ পূর্ণ; তবে তফাৎ এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া। বুনোশোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ পারির বিলাসের সেই তফাৎ। তাও এই ঘোর বিলাস এসব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য। ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না।

তা ছাড়া, আর এক তামাসা এই যে, আমেরিকান, জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ঝাঁ। করে সব দেখতে শুনতে পায়। দু-চার দিনের আলাপে আমেরিকান দশদিন বাস করবার নিমন্ত্রণ করে; জার্মান তদ্রূপ; ইংরেজ একটু বিলম্বে। ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাৎ, পরিবারের অত্যন্ত পরিচিত না হ'লে, আর বাস করতে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসী পরিবার দেখবার জানবার অবকাশ পায়, তখন এক ধারণা হয়। বলি, মেছোবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি? তেমনি এ পারি।

মোদ্দা এমন শহর ভূমন্ডলে নাই। পূর্বকালে এ শহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কাশীর বাঙ্গালীটোলার মতো। আঁকাবাঁকা গলি রাস্তা, মাঝে মাঝে দুটো বাড়ি এককরা খিলান, দেলের গায়ে পাতকো ইত্যাদি। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদলেছে, এক একবার লড়াই বিদ্রোহ হয়েছে, কতক অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আবার নূতন ফরদা পারি সেই স্থানে উঠেছে।

বর্তমান পারি অধিকাংশই ৩য় ন্যাপোলেঅঁ-র তৈরী। ৩য় ন্যাপোলেঅঁ মেরে কেটে জুলুম করে বাদ্সা হলেন। ফরাসী সেই প্রথম বিপ্লব হওয়া অবধি সতত টল্মল্; কাজেই বাদ্সা, প্রজাদের খুশী করবার জন্য ক্রমাগত রাস্তাঘাট তোরণ থিয়েটর প্রভৃতি গড়তে লাগলেন। অবশ্য, পারির সমস্ত পুরাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রইল। রাস্তাঘাট সব নতুন হয়ে গেল। পুরানো শহর পগার পাঁচিল সব ভেঙ্গে বুলভারের অভ্যুদয় হতে লাগলো এবং তা হতেই এ শহরের সর্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে রাস্তা তৈরী হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া যে, মধ্যখানে এবং দুপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং একস্থানে অতি বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম প্লাস্ দ লা কনকর্দ। দিল্লীর চাঁদনীচৌক কতক অংশে এই প্লাস্ দ লা কনকর্দ-এর মতো এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ বিজয়তোরণ আর বিরাট নরনারী সিংহাদি ভাস্কর্য মূর্তি। মহাবীর ১ম ন্যাপোলেঅঁ'র স্মারক এক ধাতুনির্মিত বিজয়স্তম্ভ।

আর এক স্থানে বাস্তিল ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন। তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন; তার নাম লেটর্ দ ক্যাশে—মানে, রাজ মুদ্রাঙ্কিত লিপি। তারপর সে ব্যক্তি আর কি করেছে কি না, দোষী কি নির্দোষ, তার আর জিজ্ঞাসা পড়া নেই, একেবারে পুরলে সেই বাস্তিলে; সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িণীরা কারুর উপরে চট্‌লে রাজার কাছ থেকে ঐ সীলটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে দেশসুদ্ধ লোক এসব অত্যাচারে খেপে উঠলো, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সব সমান, এ ধ্বনি উঠালো, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে প্রথমেই মানুষের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন বাস্তিল ভূমিসাৎ করলে। রাজারাণীকে মেরে ফেললে। দেশসুদ্ধ লোক স্বাধীনতা সাম্যের নামে মেতে উঠলো। ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। শুধু তাই নয়, বললে—'দুনিয়া-সুদ্ধ লোক তোমরা ওঠো, অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হোক, সকলে সমান হোক।

তখন ইউরোপসুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো, এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, তাই তাকে নেবাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে চারদিক থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ করলে। এদিকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে দিলে 'লা পাত্রি আ দাঁজে'—জন্মভূমি বিপদে। সে ঘোষণা আগুনের মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দে উৎসাহপূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত 'মার্সাই এ' গাইতে গাইতে, দলে দলে, জীর্ণবসন সে শীতে নগ্নপদ, অত্যল্পাহার ফরাসী প্রজাফৌজ বিরাট সমগ্র ইউরোপী চমূর সম্মুখীন হ'ল, বড় ছোট সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল—'পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' বেরুল। সমগ্র ইউরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসী জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর,—তাঁর অঙ্গুলি হেলনে ধরা কাঁপতে লাগলো, তিনিই ন্যাপোলেঅঁ। তিনরঙা ককার্ডের জন্ম হল।

তারপর ন্যাপোলেঅঁ ফ্রাঁস মহা-রাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ সাব্যস্ত করবার জন্যে বাদ্‌শা হলেন। তারপর তাঁর কার্য শেষ হল, ছেলে হল না বলে সুখদুঃখের সঙ্গিনী ভাগ্যলক্ষ্মী জোসেফিনকে ত্যাগ করলেন, অস্ট্রিয়ার বাদ্‌শার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য ফিরল, রুশ জয় কর্তে গিয়ে বরফে তাঁর ফৌজ মারা গেল। ইউরোপ বাগ পেয়ে তাঁকে জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠালে। পুরনো রাজার বংশের একজনকে তক্তে বসালে। মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে ফ্রাঁসে হাজির হল, ফ্রাঁসসুদ্ধ লোক তাঁকে মাথায় করে নিলে। কিন্তু অদৃষ্ট ভেঙ্গেছে আর জুড়লো না—আবার ইউরোপসুদ্ধ পড়ে তাঁকে হারিয়ে দিলে, সেন্ট হেলেনা নামক দূর দ্বীপে বন্দী রাখলে—আমরণ।
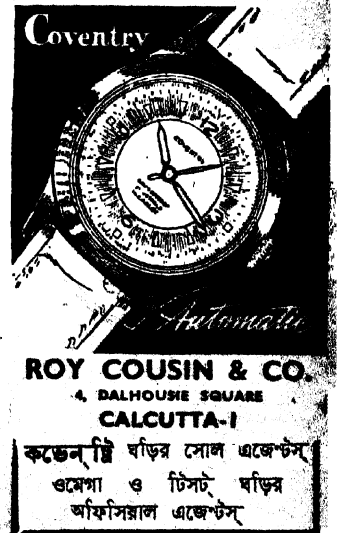
আবার পুরানো রাজা এল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠলো, আবার প্রজাতন্ত্র হলো। ন্যাপোলেঅঁর এক ভাইপো এ সময়ে ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতি-পাত্র হলেন, ক্রমে একদিন নিজেকে বাদ্‌সা ঘোষণা করলেন; তিনিই ৩য় ন্যাপোলেঅঁ। দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হ'ল। কিন্তু জার্মান যুদ্ধে হেরে তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজা-তন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলছে।

প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়-রূপ আচার ছাড়া আর সমস্ত রীতি-নীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাসবৃদ্ধিতে বড় বেশি এসে যায় না, কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছো যে, রাক্ষসীর প্রাণ একটা পাখির মধ্যে ছিল। সে পাখিটার নাশ না হলে, রাক্ষসীর কিছুতেই নাশ হয় না; এও তাই। আবার দেখবে যে, যে অধিকার-গুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, সে অধিকারগুলো সব যাক না, সে জাতি তাতে বড় আপত্তি করে না, কিন্তু যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে তৎক্ষণাৎ মহাবেগে প্রতিঘাত করে।

এই ফ্রাঁস স্বাধীনতার আবাস, প্রজারা সব সয়, করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই কেউ স্বাধীনতার উপর হাত দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। 'জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চবংশ, নীচ বংশ, রাজ্যশাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার।' এর উপর কেউ হাত দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়। কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এটিই ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী চরিত্রের মেরুদণ্ড।

সংকলয়িতা—অজিতকুমার
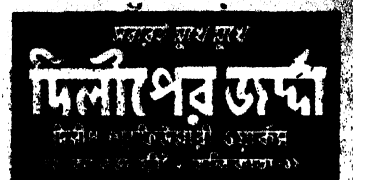
বর্ষায় সম্পূর্ণ
নির্ভরযোগ্য
ওয়াটারপ্রুফ
নিউকাট
৪৷৹
ওয়াটারপ্রুফ
ক্যাযুয়েল
৪৸৷৹
ওয়াটারপ্রুফ
অক্সফোর্ড
৪৸৷৹
Bata

মোলিয়্যার-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মোলিয়্যার-এর (১৬২২—১৬৭৩) জন্মের ত্রৈশতাব্দিক উৎসব শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বভারতী সম্মিলনীর (উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের সভা) উদ্‌যোগে; বিশ্বভারতীর সূচনাকাল থেকেই এখানে ফরাসী ভাষা শিক্ষার বিশেষ আয়োজন হয়েছিল। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভিও এই সময়ে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা কর্মে রত। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ১৩২৮ চৈত্র সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র থেকে পুনর্মুদ্রণ করা গেল। এই সভায় "বিশ্বভারতীর ফরাসী ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পেস্‌টনজি হিরজিভাই মরিশ মহোদয় অমর সাহিত্যিক মোলিয়্যারের জীবনী ও লেখার সহিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় সাধন করিয়ে দেন। অতঃপর অধ্যাপক লেভি মূল ফরাসী ভাষায় মোলিয়্যারের একটি সনেট ও একটি ব্যঙ্গনাট্যের একটি দৃশ্য পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সবশেষে গুরুদেব হাস্যরস প্রধান নাট্য ও লেখার সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।"—'শান্তিনিকেতন' পত্র, ফাল্গুন ১৩২৮]

আমি মোলিয়্যারের বিষয়ে একরকম অনভিজ্ঞ, তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান, তা জ্যোতিদাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে দিয়ে হয়েছে; আর বোধ হয় মোলিয়্যারের ইংরাজী অনুবাদও কিছু কিছু পড়েচি। সাহিত্যের কোনো ভাল রচনা ভাষান্তরিত হলে তা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, সেই অনুবাদে সৌন্দর্য রক্ষিত হয় না, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। অনুবাদের ভিতরে দিয়ে লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না এবং সে পরিচয়কে অবলম্বন করে সমালোচনা করাও কঠিন। আমাদের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক মরিস সাহেব স্বয়ং মাদাম লেভির কাছে মূল মোলিয়্যার পড়চেন সুতরাং এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর বক্তৃতায় আমরা নাট্যকার সম্বন্ধে অনেক পরিচয় লাভ করেচি। আজ আমি সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলব।

মরিস সাহেবের বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেচেন যে মোলিয়্যার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ কেউ কেউ করেন যে, তিনি যে সকল পাত্রের চরিত্র চিত্রিত করেচেন, অতিশয়োক্তির দ্বারা, স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে তাদের দেখানো হয়েচে। এই উক্তির প্রতিবাদ বা সমর্থন করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এই বাদানুবাদ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি কিছু বলতে পারি।

শিল্পী একটা বিশেষ প্ল্যানকে নির্বাচন করে তাঁর কাজ করেন। তিনি যা গড়ে তুলবেন তার সমগ্রতার রূপ তাঁর মনে আছে, তাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি বহির্জগতের থেকে সব জিনিসকে অবিকল গ্রহণ করে একত্র সংগ্রহ করেন না। তিনি কতক ত্যাগ করেন, কতক গ্রহণ করেন—তাদের নিয়ে এমন সংলগ্ন সঙ্গত একটা চিত্র সৃষ্টি করেন, যা তাঁর মনের পরিকল্পনার অনুরূপ। বাইরে যা দেখচি তার প্রতিলিপি তৈরি করলে তা যথার্থ আর্ট বলে গণন হয় না। সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি 'ম্যাকবেথ্' বা 'হ্যামলেট্'-এর বর্ণিত ঘটনা বাইরের বিশ্বে কখনো এত বেশি সুসংলগ্ন ও নিবিড়ভাবে ঘটে না। শোক-দুঃখ, চিত্তের আবেগ, চিত্তদাহ, এমন উজ্জ্বলভাবে তিনি চিত্রিত করেচেন যে বাস্তব জগতে তা এমন করে প্রকাশ পায় না। কারণ প্রকৃতিতে ছেদ আছে—শোক-দুঃখ অমন সংহতভাবে দেখা দেয় না। সংসারে চলতে ফিরতে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা, ছোট বড় নানাবিধ কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই শোক-দুঃখ বিস্তৃত হয়ে যায় বলে তার তীব্রতা চোখে পড়ে না। কিন্তু কবি তাদের এমন সুব্যক্ত সুদৃঢ় করে তাঁর ট্র্যাজেডিতে [illegible] যে, সমস্ত উপাদান আমাদের সামনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। রাজা লীয়ার ঝড়ের মধ্যে গিয়ে বিদূষকের সঙ্গে যে রকমভাবে বাক্যালাপ করলেন, পাগলেও তেমন করে না। এই যে এখানে বাস্তবজগতের হিসাবে অতিশয়তা প্রকাশ হয়েচে, এটা কাব্যজগতের পক্ষে অতিশয় হয়নি। অতএব কাব্যে কোন্ অতিশয়োক্তি সত্য ও কোনটা অসত্য তার একটা আদর্শ আমাদের মনে থাকা চাই। একটা বাহ্যিক প্রাসঙ্গিক ও আকস্মিক ব্যাপারকে যদি বেশি প্রাধান্য দান করা হয় তবে সাহিত্যে তা সয় না। যেমন একজন পাত্রের খুঁড়িয়ে হাঁটা যদি রঙ্গমঞ্চে দেখানো যায় তবে তাতে লোককে হাসানো যেতে পারে কিন্তু এতে কোনো নিত্য সত্যকে প্রকাশ করা হয় না। এরকম বাড়াবাড়িকে trick বা কৌশল বলা যেতে পারে কিন্তু তাতে কোনো পাত্রের চরিত্রের কোনো সত্য উপাদান দেখানো হয় না।

শিশু মনে এমন করে ভাবে, বিশ্বকে এমন করে দেখে যে, তার মধ্যে আমরা অসঙ্গতি দেখতে পাই, আমাদের হাসি পায়। এই অদ্ভুত অসংলগ্নতাই শিশুস্বভাবের চিরন্তন লক্ষণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণে এই শিশু আছে—আমাদের সমস্ত চিন্তা সমস্ত আচরণই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই অসঙ্গতি, এই অযৌক্তিকতা যেখানে মানবচরিত্রের কোনো একটি ব্যাপক পরিচয় দেয় সেইখানেই সে হাস্যরসের বড় রকমের উপাদান যোগায়। আর যেখানে সে নিতান্ত অগভীর, যেখানে সে মানবচরিত্রের একটা অবান্তর বিষয় মাত্র, সেখানে সেটাতে কেবল ভাঁড়ামি প্রকাশ করা যায়।

মোলিয়্যারের বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে একথাই বলতে পারি যে, তিনি যে খ্যাতি লাভ করেচেন শুধু ভাঁড়ামি করলে সেই পরিমাণ খ্যাতি পাওয়া যায় না। কোনো পাত্রের তোৎলামিতে লোকে হেসে অস্থির হতে পারে কিন্তু তাতে যথার্থ সাহিত্যরস-নৈপুণ্যের যশ লাভ করা যায় না। প্রতি পাত্রের গভীর প্রকৃতিতে এমন একটা হাসি বা কান্নার দিক আছে যাকে স্থায়ী

হয় না। যা আকস্মিক তাকে অত্যুক্তির দ্বারা উৎকটভাবে প্রকাশ করলে যে ক্ষণিকভাবে আপাত ফল ফলে না তা নয় —এতে লোককে হাসানো আর কাঁদানো যেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত, আমাদের দেশে বক্তৃতাতে 'মা' শব্দ বারংবার ব্যবহার করলে শ্রোতার চোখে জল আনা খুবই সহজ কেননা বাঙালী সন্তান হচ্চে মায়ের আদুরে সন্তান; এবং নাটকে নভেলে সতীত্বের অত্যুক্তিপূর্ণ চিত্র আঁকলেও পাঠকের মনকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়া যায়, কেননা বাঙালী স্বামীর প্রধান গৌরব হচ্চে স্ত্রীর কাছে পূজা আদায় করে'। এই মনের অভ্যাসের অনুবর্তনে লোককে উত্তেজিত করা খুব সহজ ব্যাপার কিন্তু সেটা নিত্য সাহিত্যের যোগ্য বিষয় নয়। স্থানিক সাময়িক কোনো বিশেষ হৃদয়গত অভ্যাসকে আঘাত করে' যে একটা সস্তারকমের হৃদয়াবেগ উৎপন্ন করা যায় কোনো বড় প্রতিভাশালী লেখক সেই সব খেলো জিনিস নিয়ে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি করেন না।

মোলিয়্যারের "লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম" নামক নাটকের অনুবাদ "হঠাৎ নবাব"টাই ধরা যাক্। অকস্মাৎ কেউ অনেক টাকা পেলে তার কেমন মনের বিকার হয় এটাই এর মূল কথা নয়। কিন্তু এতে দেখানো হয়েচে যে, একজন 'হঠাৎ নবাব' ধনী ব্যক্তির চালচলন লক্ষ্য করে' তার অনুকরণে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করে সেটা কি জিনিস। সেই অনুকরণের চেষ্টা মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার—সে একজন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিকৃতি নয়। তাই এই অনুকরণ প্রায়ই অসঙ্গত আকার ধারণ করে, তাই মানুষের পক্ষে এ একটা চিরকেলে হাস্যরসের বিষয়। সকল দেশেই সকল কালেই এই হাস্যরসের উপাদান মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়,—অন্তরের মধ্যে যে জিনিসটাকে পাওয়া যায়নি, বাইরের উপকরণ দিয়ে সেইটেকে কৃত্রিমভাবে খাড়া করে' লোককে ভোলাবার অপরিমিত প্রয়াস আমরা নানা জায়গায় নানা প্রকারেই দেখে থাকি—আর তাই নিয়ে হাসাহাসি চলে।

"হঠাৎ নবাব" নাকটটাকে এই হিসাবে অত্যুক্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে, যে তাতে অল্প পরিসরে অনেকখানি হাসির উপাদান ঘনীভূত করে" দেখানো হয়েচে। পূর্বেই বলেচি, বাস্তব সংসারে এই সকল হাস্যকর ব্যাপার বিরল বিকীর্ণ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। মোলিয়্যার তাকেই বেছে নিয়ে নিবিড় করে' সাজিয়ে তুলেছেন। এই সাজিয়ে গড়ে তোলাতেই শিল্পীর বাহাদুরী। করুণ রসকে ব্যক্ত করতে হলেও শিল্পীকে এমনি ঘনীভূত চিত্র আঁকতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রে বিচার করে দেখা দরকার যে, যা আকস্মিক, যা উপরে উপরে ভাসচে, তাকে অবলম্বন করা হয়েচে, না, স্বভাবের গভীরতার লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করা হয়েচে।

—'শান্তিনিকেতন পত্র', চৈত্র, ১৩২৮

ভিক্টর হ্যুগো হইতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিক্টর হ্যুগোর কবিতাবলীর এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনা। "কবি", "বিসর্জন", "তারা ও আঁখি", "সূর্য ও ফুল" প্রভাত সংগীত (১৮৮৩); "শিশুর মৃত্যু" কড়ি ও কোমলে (১৮৮৬) প্রথম গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়। "জীবন-মরণ" 'আলোচনা' (১৮৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।
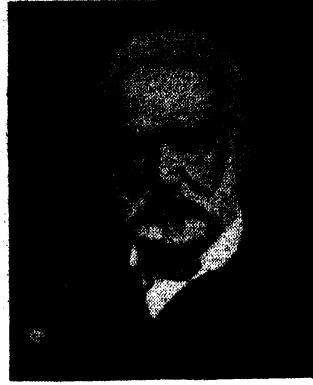
কবি

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক্, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া।
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয়-মাঝারে গিয়া!
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙা টুক্ টুক্,
কারো বা শতেক রঙ্ যেন ময়ূরের পাখা।
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাবভাব করে কত রূপসী সে মেয়েগুলি।
বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ্‌লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্, বিশাল-কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধ বট—
মাথায় নিবিড় জট;
ত্রিবলী-অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল;
কোথা বা ঋষির মত
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতিভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শমশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই! ওই কবি!"

বিসর্জন

যে তোরে বাসে রে ভাল, তারে ভাল বেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস্।
আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্ আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধরে, সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরি হ'ল, যা তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস্ আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস্ সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে!

তারা ও আঁখি

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হ'ল, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে
পাখীগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারিধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার,
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।

দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল,
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে!"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা,
ঢাল গো আমার পরে প্রণয়ের ধারা।"

জীবন-মরণ

ওরা যায়, এরা করে বাস;
অন্ধকার উত্তর বাতাস
বহিয়া কত না হা-হুতাশ
ধূলি আর মানুষের প্রাণ
উড়াইয়া করিছে প্রয়াণ।
আঁধারেতে রয়েছি বসিয়া;
একই বায়ু যেতেছে শ্বসিয়া
মানুষের মাথার উপরে।
অরণ্যের পল্লবের স্তরে।
যে থাকে সে গেলদের কয়,
"অভাগা কোথায় পেলি লয়।
আর না শুনিবি তুই কথা,
আর না হেরিবি তরু লতা,
চলেছিস্ মাটিতে মিশিতে,
ঘুমাইতে আঁধার নিশীথে।"
যে যায় সে এই ব'লে যায়,
"তোদের কিছুই নাই হায়,
অশ্রুজল সাক্ষী আছে তার।
সুখ যশ হেথা কোথা আছে
সত্য যা' তা' মৃতদেরি কাছে।
জীব, তোরা ছায়া, তোরা মৃত,
আমরাই জীবন্ত প্রকৃত।"

সূর্য ও ফুল

বিপুল মহিমা-মূর্তি আগ্নেয় কুসুম
সূর্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে আকাশের পানে
অমর রবির আলো ভাতিছে যেখানে,
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ ছটা আমারো ত আছে।"

শিশুর মৃত্যু

বেঁচেছিল, হেসে হেসে,
খেলা ক'রে বেড়াত সে,
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কি হ'ল তোমার!
শত রঙ্-করা পাখি
তোর কাছে ছিল নাকি!
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার!
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি!
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি!
শত-তারা-পুষ্পময়ি!
মহতী প্রকৃতি অয়ি,
না-হয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য তব
তাহে কি বাড়িল নব!
নূতন আনন্দ কণা মিলিল কি ওরে!
অথচ তোমারি মত বিশাল মায়ের হিয়া,
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া!

কবি ভিক্তর হ্যুগো

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে।
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল-বকুলে—

বসন্ত অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মন মোর মত্ত গো সে রসে।
হে ভিক্তর, জয়ী তুমি এই মর-কূলে।
আসে যবে যম, তুমি হাস হে সাহসে।

অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে।
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
(ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গ'লে মাটী হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে।

দেখে যাও

ভল্টেয়ার

অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তুমি কি দেখিবে, বালা, কি মধুর আলো,
জ্বালিয়াছ হৃদয়ে আমার?
কথায় ভাষায় শুধু তাই ফোটে ভাল
যে-লালসা তুচ্ছ অতি ছার!
নীরবে,—দেখ গো চেয়ে—কত ভালবাসি,
প্রণয় নীরব চিরদিন,
এ-নয়নে,—দেখে যাও—শুধু ওই হাসি
জাগায়েছে শকতি নবীন!

'তীর্থসলিল'

স্তোত্র

শার্ল বদলেয়ার

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার!

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

অক্ষয় সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে;
সংগোপনে, কোনো ভুলে-যাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভ'রে।

কেমনে, অম্লেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমারে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
শাশ্বতের অন্তরে আমার!

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে—
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার!

'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'

এ-প্রেম এ কবিতা

পল এলুয়ার

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

আমার প্রেম আমার আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রূপ দিতে
তোমার ওষ্ঠাধরকে গাঁথে তোমার কথার
আকাশে তারার মতো
তোমার চুমাগুলিকে প্রাণময় রাত্রিতে
আর আমাকে ঘিরে তোমার বাহুর পথরেখা
যেন এক বিজয়চিহ্নের মশাল
আমার স্বপ্নগুলি পৃথিবীতে
স্বচ্ছ ও মনোময়

আর যখন তুমি থাকো না
তখন আমি স্বপ্ন দেখি ঘুমোবার স্বপ্ন
দেখি স্বপ্ন দেখার।

'বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা'

উৎকণ্ঠা

স্তেফান মালার্মে

অনুবাদ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমগ্র জাতির পাপ সংক্রান্ত যে-জান্তব শরীরে,
তার নৈশ বলিদানে আজ আমি নই উপনীত;
জাগাবে না ক্ষুব্ধ ঝড় অপবিত্র কেশের গভীরে
আমার চুম্বন, যাতে দুরারোগ্য নির্বেদ নিহিত॥

নিবিড়, নিশ্চিন্ত নিদ্রা খুঁজি আমি তোমার শয়নে,
অসন্তাপ প্রাবরণে নির্বাণের শান্ত অবরোহ।
ফুরালে মিথ্যার পালা, রক্ষা পাও তুমি যে-অয়নে,
নিত্য সে-নিখিল নাস্তি; তার পাশে মৃত্যুও সম্মোহ॥

আমিও, তোমার মতো, অভিগ্রস্ত ব্যাপক কলুষে,
অনুর্বর, বীতস্বত্ব সৌজাত্যের মৌল মর্যাদায়
পাষাণহৃদয় তুমি পক্ষান্তরে যেহেতু স্বেচ্ছায়,

অক্ষত তোমার বক্ষ তাই অপরাধের অঙ্কুশে।
আর আমি পরাজিত, প্রেতভয়ে পাণ্ডু, দ্রুতপদ,
ঘুমাতে পারি না একা, ভাবি শয্যা শবের প্রচ্ছদ॥

'প্রতিধ্বনি'

রু দ্য সেইন

জাক প্রেভের

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রু দ্য সেইন
রাত সাড়ে দশটা
আর-এক রাস্তার মোড়ে
টলছে একটি মানুষ...একটি যুবক
মাথায় টুপি
গায়ে বর্ষাতি
আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে
ঝাঁকুনি দিচ্ছে
আর কী যেন বলছে সেই ছেলেকে
ছেলেটি মাথা নাড়ছে
টুপিটা এক পাশে হেলানো
আর মেয়েটির টুপিও আর-একটু হলেই খসে পড়বে
ফ্যাকাশে মুখ দুজনের
ছেলেটি নিশ্চয়ই চলে যেতে চায়
পালাতে চায়...কিংবা মরতে
অথচ মেয়েটির মধ্যে জ্বলছে বাঁচবার এক দারুণ আকাঙ্ক্ষা
আর তার কণ্ঠস্বর
তার চাপা কণ্ঠস্বর
এ তো যে-কেউ বুঝবে
যেন স্বর নয় গোঙানি
যেন আদেশ...
যেন আর্তনাদ...
ঠিক তেমনই ব্যগ্র...
আর করুণ
আর জীবন্ত...
শীতার্ত কবরখানায় কোন সমাধির উপরে
ঠান্ডা হাওয়ায় শিউরে উঠছে রুগ্ন এক নবজাতক...
দরজার পাল্লায় আঙুল চেপটে গিয়ে যেন ককিয়ে উঠেছে কেউ
যে-গানের যে-কথার
কোনও পরিবর্তন নেই
তারই পুনরুক্তি...
কেউ তাতে বাধা দেয়নি
উত্তরও দেয়নি কেউ
মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই ছেলে, দৃষ্টি বিস্ফারিত
যেন অথই জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ
আর ডুবতে-ডুবতে শুনছে সেই কথা
সেই একই কথার পুনরুক্তি
রু দ্য সেইন আর-এক রাস্তার মোড়ে
মেয়েটি কথা বলছে
প্রশ্ন করছে বারবার
সেই একই উৎকণ্ঠ প্রশ্ন
সেই একই বেদনা যার উপশম নেই
পিয়ের, সত্যি করে বল
পিয়ের, সত্যি করে বল
সবকিছুই আমি জানতে চাই
সত্যি করে বল...
টুপি খসে পড়েছে সেই মেয়ের
পিয়ের, সবকিছুই আমি জানতে চাই
সত্যি করে বল...
সেই নির্বোধ শাশ্বত প্রশ্ন
পিয়ের যার উত্তর জানে না
সে এখন সর্বস্বান্ত
অর্থাৎ সেই ছেলেটি পিয়েরের নামে যে তার পরিচয় দিয়ে থাকে
মুখে তার অল্প-একটু হাসি
যে-হাসি আর-একটু মধুর হলেই হয়তো শোভন হত
সে বলছে
ও-রকম করতে নেই লক্ষ্মীটি, শান্ত হও, পাগলামি কর না
অথচ সে নিজেই যে অভ্রান্ত এমন বিশ্বাসও তার নেই
এমন বিশ্বাসও তার নেই
হাসতে গিয়ে তার মুখখানি তাই বিকৃত হয়ে উঠছে
দম আটকে আসছে
বিশ্বপৃথিবীর পায়ের তলায় যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সেই ছেলে
সেই ছেলে
নিজেরই প্রতিশ্রুতির শিকলে সে এখন বন্দী...
এবারে তার জবাবদিহির পালা
ওই যন্ত্রের কাছে
প্রেমপত্র রুমার ওই যন্ত্র
দারুণ দুঃখের ওই যন্ত্র
যে তাকে বন্দী করেছে...
যে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করে চলেছে
পিয়ের, সত্যি করে বল।

ফরাসী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক

ফাদার ফাঁলো এস জে

(১)

প্রথম ভাগ ১৯১৪ অবধি

বিশ্বাসের পুনরাবিষ্কার : ক্লোদেল

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ তারিখে ফরাসী কবি পল ক্লোদেলের 'দূত সংবাদ' নামক সংকেত নাটকখানি প্যারিস নগরীর

পল ক্লোদেল

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়েছিল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি প্রমুখ অসংখ্য রাজনীতিক, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সেইদিন বৃদ্ধ কবি ক্লোদেলকে সমগ্র ফরাসী জাতির অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। অল্পদিন পরে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের এই শ্রেষ্ঠ কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে আধুনিক ফরাসী চিন্তা-জগতের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম যৌবনের অবিশ্বাস থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং অজ্ঞেয়বাদ ও বিজ্ঞান-সর্বস্ববাদের মায়াজাল ভেদ করে তিনি আবার ফরাসী জাতির চিরাচরিত খ্রীষ্টীয় ধর্মের আদর্শে পূর্ণভাবে আস্থাবান হয়েছিলেন; সেই পুনরাবিষ্কৃত ধর্মবিশ্বাসকে তাঁর অপূর্ব কাব্যে রূপায়িত ক'রে তিনি বিশ্বসৃষ্টির মাহাত্ম্য আজীবন কীর্তন ক'রে গিয়েছেন। প্রবল আনন্দে, গভীর বিশ্বাসে, দার্শনিক প্রেরণার অদম্য উৎসাহে ক্লোদেলের সাহিত্যসৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত।

আমার মনে পড়ছে গত বৎসরের একটি বিশেষ দিনের কথা। ক্লোদেলের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ৫০ বৎসর পূর্বেকার ফরাসী চিন্তা-জগতের আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও নৈতিমূলক মনোভাব বর্ণনা ক'রে আমাকে বলছিলেন, "আমরা তখন কত কষ্ট ক'রে ১৯শ শতাব্দীর অসার ও অলীক জীবনদর্শন থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। ফ্রান্সের চিন্তা-নায়কেরা সেই সময় বিজ্ঞানের দ্বারা বিমুগ্ধ হয়ে সত্যকার জ্ঞান ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন। সাহিত্যজগতে তখন ধর্মই অবান্তর ছিল। আমরা কি তখন ভাবতে পারতাম যে, একদিন একটি ক্ষুদ্র ধর্মমূলক নাটক সমস্ত প্যারিসের প্রাণে এমন সাড়া জাগিয়ে তুলবে।"

কোঁৎ-এর উত্তরাধিকার

১৯শ শতাব্দীতে ফরাসী দর্শন ও চিন্তাধারা কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা প্রবলরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ভিক্তর কুজ়্যাঁ (Victor Cousin), মেন দ্য বিরাঁ (Maine de Biran) প্রভৃতি কয়েকজন অধ্যাত্মবাদী (স্পিরিচুয়ালিস্ট) দার্শনিক ছাড়া অধিকাংশ ফরাসী মনীষী একপেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে ও পদার্থবিদ্যার প্রণালী অনুসরণ করেই সর্বপ্রকার দার্শনিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী ছিলেন। বৈজ্ঞানিক নিয়তিবাদ (ডিটার-মিনিজম্) সকলেরই দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকত। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রিবো (Ribot) ও শার্কো (Charcot), সমাজ-তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে লেভি-ব্রাল (L'evy-Bruhl) ও দ্যুরখাইম (Durkheim), ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রে হিপলিত ত্যান (H. Taine), বিজ্ঞানতত্ত্বে ল্য দাঁতেক (Le Dantec) প্রভৃতি বিজ্ঞানসর্বস্ববাদী কোঁৎ-এর আস্থাবান শিষ্য ছিলেন। অধিবিদ্যা (মেটাফিজিকস্) ও ধর্মবিশ্বাস পরম অবজ্ঞা ও উপেক্ষার বস্তু ছিল। সংকীর্ণ যুক্তিবাদ বা সংশয়াকীর্ণ অজ্ঞেয়-বাদ সর্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসী মনীষী প্রত্যক্ষবাদ ও যুক্তি-বাদের ব্যাপক প্রসারে সন্ত্রস্ত হয়ে ভক্তি-প্রধান অন্ধ বিশ্বাসবাদ (fideism)-এর আশ্রয় নিয়ে থাকতেন। র‍্যানাঁ (Renan) প্রভৃতি কয়েকজন লেখক শাস্ত্রসম্মত

অগস্ত্ কোঁৎ

ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে ভগবান খ্রীষ্টের কথা নতুন ছাঁচে ঢেলে দিয়ে আদর্শ-"মানুষ" যীশুর কাহিনী প্রচার করতেন।

নবদর্শনের অভ্যুদয়

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে নানাদিক থেকে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ফরাসী দর্শন-ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ, আদর্শবাদ বা ভাববাদ (আইডিয়ালিজম্) এবং নব-টমিস্ট চিন্তাধারা (neo-thomism) তখন থেকে

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...

নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল। হাঁরি বের্গ্‌সন্‌-এর আবির্ভাবও সেই সময়েই হয়েছিল এবং তাঁর প্রভাবে দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল।

কার্তেসীয় ধারা

ফরাসী অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণ কুঁজি ও বির়াঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁদের উপর দেকার্ত্‌ ও লাইব্‌নিৎস্‌ (Leibnitz)-এর প্রভাবও কম পড়ে নি। রাভেস° (Ravaisson), পল জানে (Paul Janet), ওলে-লাপ্রূন (Olle-Laprune) ও এমিল বুৎরু (Emile Boutroux)-র নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানবীয় ইচ্ছাবৃত্তির আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন করলেন তাঁরা বিজ্ঞানবাদী যান্ত্রিকতা (মেকানিস্ট সায়ান্টিজম)-এর বিরুদ্ধে; তাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা ক'রে বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্যকে পরম সত্য ব'লে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা একাধারে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিক ছিলেন ব'লে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতেন উভয়ের অধিকারক্ষেত্র নির্ণয় ক'রে। এই কার্তেসীয় (Cartesian) চিন্তাধারা জড়বাদের বিরোধী কিন্তু তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টি যুক্তিবাদ ও দ্বৈতবাদের দোষে কতকটা অবাস্তব ও কৃত্রিম হয়ে রয়েছিল।

কান্তীয় দর্শন

ফরাসী ভাববাদী দর্শনিকদের মধ্যে লাশ্যালিয়ে (Lachelier), হাম্যালিঁ (Hamelin), লেয়োঁ ব্রুঁশ্‌ভিগ্‌ (Leon Brunschvicg) প্রভৃতি কান্ত্‌ ফিখ্‌তে ও হেগেল-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁরাও বিজ্ঞানবাদের একচেটে দাবি অস্বীকার ক'রে দার্শনিক সত্য পুনরায় আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রয়োগবাদী (প্রাগম্যাটিজম্‌) দার্শনিক রানুভিয়ে (Renouvier)র গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বালোচনাও উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু তিনি এবং অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিক কান্ত্‌-এর নৈতিমূলক প্রভাব তখনও এড়াতে পারেন নি, তাই অধিবিদ্যা-সম্মত পারমার্থিক সত্যচর্চায় বেশিদূর অগ্রসর হন নি। চিৎকে পুনরাবিষ্কার ক'রে সৎকে তাঁরা স্ব-অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন নি।

ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট: প্যারিসের সেণ্ট জন্‌ ক্যাথিড্রালে রক্ষিত মূর্তি

আকুয়াইনাসের দর্শনধারা

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে কাথলিক-মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সকল খ্রীষ্টীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষাকেন্দ্রে কাথলিক ধর্মযাজকগণ সেণ্ট টমাস আকুয়াইনাস্‌এর দার্শনিক চিন্তাধারা অভিনিবেশের সঙ্গে নূতনভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করতে লাগলেন। খ্রীষ্টীয় মনোজগতে সেণ্ট টমাস্‌-এর যে উচ্চ স্থান ও অসাধারণ গুরুত্ব বহুদিন থেকে নির্ধারিত হয়ে আসছে, তার একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে হিন্দু দার্শনিক জগতে শঙ্করাচার্যের স্থান ও গুরুত্বের সঙ্গে। টমিস্ট চিন্তাধারা মধ্যযুগের সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি অব্যাহতরূপে খ্রীষ্টীয় দার্শনিকদের প্রভাবান্বিত ক'রে এসেছে, কিন্তু ১৬শ শতাব্দীর পরে পাশ্চাত্ত্যের "আধুনিক" দর্শন অলক্ষ্যে ও পরোক্ষভাবে সেই প্রভাবের অধীন হয়ে থেকেও প্রকাশ্যেই টমিস্ট চিন্তাকে মধ্যযুগীয় ব'লে কতকটা উপেক্ষা করেছিল। গত শতাব্দীর শেষে টমিস্ট দর্শনের পুনরভ্যুদয় হতে লাগল। ফরাসী দার্শনিক ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এই দর্শনধারার প্রভাব ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

হাঁরি বের্গসন্‌

হাঁরি বের্গ্‌সন্‌-এর দার্শনিক চিন্তার প্রভাব কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর শেষে ও ২০শ শতাব্দীর প্রথম দিকে উপরিউক্ত সকল চিন্তাধারার তুলনায় আরও সুদূরপ্রসারী ও সুফলদায়ী হয়েছিল। তাঁর একজন বিখ্যাত ছাত্রের ভাষায় এই প্রভাব বর্ণনা করা যেতে পারে, "তিনি আমাদের মনকে নূতন আনন্দের ধারায় আপ্লুত করেছিলেন অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স)-কে তার উপযুক্ত আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে। পরমার্থ সত্তা বোধির অধিগম্য, আমরা সৎকে (রিয়ালিটি) যথার্থরূপে জানতে পারি, এই আশ্বাস আমাদের দিতেন তিনি। বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার সাহায্যে সত্যকার দার্শনিক জ্ঞানের দাবী প্রমাণ করতেন।" বের্গসনের 'সৃজনশীল ক্রমবিবর্তন' (ক্রীয়েতিভ এভলিউশন) এবং "নীতি ও ধর্মের দ্বিবিধ উৎস" (Two Sources of Morality & Religion) নামক বই দুটি ফরাসী চিন্তাজগতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাত্মক চিন্তাপদ্ধতি ও

দার্শনিক বোধির সমঞ্জস সমন্বয়ে বের্গ্সন্ বিশ্বব্যাপী জীবনীশক্তির আত্মপ্রকাশের নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের লোকাতীত সত্তাও মরমিয়া-সাধকদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাঁর পক্ষে দার্শনিক অনুসন্ধানের বস্তু হয়ে উঠল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনসাধনার শেষে বের্গ্সন্ নিজে আন্তরিকভাবে খৃষ্টবিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাঁরই দর্শনের প্রভাবে বহু ফরাসী চিন্তাশীল ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাস ও আস্তিক দর্শনে পুনরায় আস্থাবান হয়েছেন। তা ছাড়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। অধিবিদ্যা ও ধর্মসাধনা আর কেউ অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারে না।

মরিস ব্লোঁদেল

বের্গ্সনের সমসাময়িক আর একজন দার্শনিকের কথা এখানে বলতে হবে। মরিস ব্লোঁদেল-এর নাম বিদেশে অনেকে শোনে নি, তাঁর বিশাল দার্শনিক সৃষ্টির মূল্যে ফ্রান্সেও বহুদিন সকলে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে নি। আজ কিন্তু বহু ফরাসী মনীষী বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁদের দেশে দেকার্ত্-এর পরে ব্লোঁদেল-এর সমকক্ষ আর কোনও দার্শনিক আবির্ভূত হন নি। তিনি একাধারে সাধক, বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানী ছিলেন। 'L'Action' (কর্মসাধন) নামক গ্রন্থখানি বিশ্বের দর্শনেতিহাসের একটি মহৎ অধ্যায় বলে গণ্য হতে পারে। মানবীয় কর্মসাধনপ্রয়াসের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তার যে সব নিগূঢ়তম সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, তার সূক্ষ্ম নির্ণয়ের দ্বারা ব্লোঁদেল তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করেন। ব্লোঁদেল-এর দার্শনিক প্রভাব বর্তমানে দেশে-বিদেশে বিস্তারলাভ করছে।

'ইত্যাদি'

তখনকার ফরাসী চিন্তানায়কদের মধ্যে আরও অনেক মনীষীদের নাম উল্লেখযোগ্য। শার্ল মোরাস্ তাঁর উগ্র জাতীয়তাবোধ ও অতিরক্ষণশীল চিন্তার দ্বারা একসময় ফ্রান্সের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবন-

প্রবাহকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছেন। তিনি কোঁৎ-এর শিষ্য ছিলেন এবং ফরাসী জাতির ধর্মগত ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক মূল্য উপলব্ধি করেও খৃষ্টীয় ধর্মের প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝতে পারেন নি। জাঁ জোরেস প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে মার্ক্সীয় জীবনদর্শনের প্রতিভাবান ও উৎসাহী প্রচারক ছিলেন; ফরাসী জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব সেই সময়ে অতুলনীয় হয়েছিল।

(২)

দ্বিতীয় ভাগ (১৯৫৫ অবধি)

চিন্তাবিলাস ও শিল্পসর্বস্ববাদ

বের্গ্সন্, ব্লোঁদেল প্রভৃতির দার্শনিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল একদিনেই ফলে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অনেক ফরাসী মনীষী ও সাহিত্যিক ধর্মপথের সন্ধান পুনরায় লাভ করা সত্ত্বেও বহুদিন ফ্রান্সের সাধারণ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সেই আগেকার নৈতিমূলক জীবনদর্শন থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে নি। সাহিত্যক্ষেত্রে আঁদ্রে জিদ্, মার্সেল প্রুস্ত্, পল ভালেরি-র তখন প্রবল আধিপত্য ছিল। জিদ্-এর অনিন্দ্যসুন্দর ভাষার মোহে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য পাঠক তাঁর জীবনদর্শনের অসারতা সঠিক উপলব্ধি করতে পারত না। ভালেরি-র সৌন্দর্যোপাসনার মধ্যে কোনও জীবনদায়ী বাণী পাওয়া যেত না। প্রুস্ত্ অসাধারণ শিল্পী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর পক্ষে শিল্পই ছিল জীবনের সর্বস্ব। এই চিন্তাবিলাসের মধ্যে নিহিত ছিল একটি 'পলায়নী' আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব জীবনের সত্যকে অস্বীকার ক'রে অতি মার্জিত ও সূক্ষ্ম স্বার্থান্বেষণের প্রয়াস।

খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব

২০শ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর ধ'রে ফ্রান্সের খৃষ্টীয়মণ্ডলী একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনা চিরাচরিত পথ ত্যাগ ক'রে নানাবিধ "আধুনিক" মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বিপথে চালিত হবার উপক্রম হয়েছিল। হেগেল-এর আদর্শবাদ, বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদ, ঐতিহাসিক গবেষণার নূতন পদ্ধতি ইত্যাদির প্রভাবে খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের

হাঁরি বের্গ্সন্

অভিনব ব্যাখ্যা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মণ্ডলীর আচার্যগণ তাঁদের অক্লান্ত সাধনা ও তত্ত্বচর্চার গুণে খৃষ্টীয় পরম্পরাগত শিক্ষার সত্যকে সেই সকল ভ্রান্ত মত থেকে রক্ষা ক'রে দৃঢ়রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। তাঁরা অনেকে একাধারে ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিক ছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গেও তাঁরা সুপরিচিত ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা ব্যাপারে তাঁরা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ্যার গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাবিষয়ে তাঁরা আধুনিক দর্শন ও চিন্তাকে উপেক্ষা করতেন না। পাণ্ডিত্য, দার্শনিক গভীরতা, সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত যৌক্তিকতার জন্য তাঁদের দ্বারা লিখিত বহু গ্রন্থ সমস্ত ফ্রান্সে সমাদৃত হয়ে উঠেছে। কয়েকজন প্রতিভাবান ফরাসী ধর্মতত্ত্ববিদ্ (Theologians)-এর নাম উল্লেখ করব মাত্র।

লাগ্রাঁজ (Lagrange), গ্রাঁমেজঁ (Grandmaison), লেব্রেতঁ (Lebreton প্রা (Prat), বোঁসিরভাঁ (Bonsirven) ইত্যাদি বাইবেলের অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ ক'রে মৌলিক গবেষণা করলেন। বাইবেলের ঐতিহাসিক সত্তা ও প্রকৃত অর্থ সেই সকল গবেষণার দ্বারা নূতন আলোকে প্রতিভাত হতে লাগল। আচার্য সের্তিয়াঁজ (Sertillanges) খৃষ্টীয় ও দর্শন ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অপূর্ব গভীরতা ও প্রতিভার পরিচয় দিলেন। দের্বির্নিয়ি (d'Herbigny), দ্য লা তাইয়ে (de la Taille), গার্দেই (Gardeil), মাজুর (Masure) প্রমুখ আরও বহু ফরাসী খৃষ্টীয় যে সকল ভাষ্য ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ক্রমে সমগ্র ফ্রান্সের বিশ্বাসী মনীষিগণ তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেন। ফরাসী সাহিত্য ও লৌকিক দর্শনের কথা অনেক বিদেশী জানেন বটে, কিন্তু এই খৃষ্টীয় তত্ত্ব সাহিত্যের কথা অনেকে সেইরূপ জানেন না। এই শতাব্দীর প্রথম অর্ধে ফরাসী ধর্মতত্ত্ব আলোচনার পরিমাণ ও উৎকর্ষ পূর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে।

মারিতঁ ও জিল্‌সঁ

টমিস্ট নবদর্শনের চর্চা প্রথমে ধর্মযাজক শিক্ষাকেন্দ্র ও মণ্ডলী পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রুসেলো, গারিগুলাগ্রাঁজ ও সের্তিয়াঁজ প্রভৃতি টমিস্ট দর্শনাচার্যগণ সকলে ধর্মযাজক ছিলেন। ফ্রান্সের অধিকাংশ অধিবাসী ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী এবং ক্যাথলিক মণ্ডলীর ফরাসী যাজকেরা অন্যান্য দেশের অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত, তাঁদের প্রভাব খুবই ব্যাপক। সেই জন্য টমিস্ট চিন্তাধারা কেবল অল্প কয়েকজন ধর্মভীরু যাজককে নয়, ফরাসী জনসাধারণকেই নানা রূপে প্রভাবান্বিত করেছে আর করছে। সম্প্রতি যাজক ছাড়া কয়েকজন দর্শনের অধ্যাপক ও মনীষী টমিস্ট নবদর্শনের চর্চা খুব সাফল্যের সহিত করতে আরম্ভ করেছেন। প্যারিস, লাইয়ন্স, লিল প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে টমিস্ট দর্শনের বিষয় নিয়মিত গবেষণা ও অধ্যাপনা চলছে। বর্তমান ফরাসী চিন্তাজগতে টমিস্ট, দর্শনধারাই সর্বাপেক্ষা সজীব ও সক্রিয় চিন্তাধারা বললে অত্যুক্তি হবে না।

অধ্যাপক জাক মারিতঁ (Jacques Maritain) তাঁর বলিষ্ঠ ও গভীর দার্শনিক চিন্তার জন্য দেশ-বিদেশে আজ বিখ্যাত।

আধুনিক জগতের সর্বপ্রকার সম তিনি আলোচনা করেছেন বহু দর্শনগ্র ও অসংখ্য প্রবন্ধে। মধ্যযুগীয় আচা সেণ্ট টমাস-এর শিষ্য হয়েও তিঁ আধুনিক বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, অর্থ সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির সং অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত এবং তাঁ ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও উদার দার্শনি মতবাদের সাহায্যে তিনি সেই সক সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর ও সমাধা আবিষ্কার করতে সচেষ্ট আছেন।

এতিয়েন জিল্‌স (Etienn Gilson) দর্শনেতিহাসে অদ্বিতী পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এবং মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় আচার্যগণের জীবন ও দার্শনি সৃষ্টি নিয়েই তিনি আজীবন গবেষ করেছেন।

মার্ক্সীয় চিন্তাধারা

ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদ বহুদি মার্ক্স-এর চিন্তা ও দ্বন্দ্ব মূলক জড়বাদের প্রভাব থে কতকটা মুক্ত ছিল। প্রুদঁ (Proudhor ছিলেন ফরাসী সাম্যবাদী ও সমাজবাদ দের আদিগুরু। কিন্তু ২০শ শতাব্দী জোরেস্-এর তিরোধানের পর থে মার্ক্সীয় দর্শন ক্রমে ক্রমে ত প্রভাব বিস্তার করেছে ফরা অখ্রীষ্টীয় বামপন্থীদের উপর (বহু ফরাসী খ্রীষ্টীয় সমা তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক এবং বহু যাজক খ্রীষ্টভক্ত মনীষী জড়বাদ ও মার্ক্সী হিংসাত্মক সাম্যবাদের বিরোধী হয়ে প্রকৃতই বামপন্থী ও প্রগতিশীল।)

বিজ্ঞানবাদের প্রসার ও প্রভাবের ফ অনেকে কম্যুনিজমের অনুগত হয়েছে ফরাসী মনোজগতের সাহিত্য বিজ্ঞ দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আজ মার্ক্সীয় চিন্ত ধারা খ্রীষ্টীয় ধারার সমতুল না হয়ে অত্যন্ত কার্যকরী। এই কথা বলা যে পারে যে, বর্তমান ফ্রান্সে খ্রীষ্টীয় মার্ক্সীয় এই দুই আদর্শ ও জীবনদ ছাড়া সেইরূপ আর কোনও সজীব প্রেরণাদায়ী আদর্শ নেই। পূর্বের পলায়নী মনোভাব ও বাস্তব-ছাড়া আদ বাদের যুগ শেষ হয়েছে। ফরা সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ আজ সক কোন-না-কোন একটা জীবন্ত ধর্ম

...স্তব জীবনাদর্শের নিকট সমর্পিত, চিন্তাবিলাস ত্যাগ ক'রে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন সমস্যাসমূহের সমাধানে ফ্রান্সের সকল চিন্তানায়ক ও দার্শনিক তাঁদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করছেন। বাস্তব ধর্ম ব'লেই আজ ঈশ্বরমুখীন খৃষ্টীয় ধর্ম ও ঈশ্বরবিমুখ জড়বাদী "ধর্ম" অর্থাৎ মার্ক্সীয় আদর্শ ফরাসী মনকে জয় করার জন্য অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

অস্তিবাদ : সার্ত্র্, কাম্যু, মার্সেল

অস্তিবাদী (এক্সিস্টেনশিয়ালিস্ট) জাঁ-পল সার্ত্র্ খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ঘোর বিরোধী এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাম্যবাদী জীবনাদর্শেরও তীব্র সমালোচক। গত মহাযুদ্ধের সময় "সৎ ও অসৎ" নামক দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সার্ত্র্ এই যুগের অন্যতম মহৎ চিন্তানায়ক ও দার্শনিক ব'লে স্বীকৃত হলেন। মহাযুদ্ধের পরে নানা দার্শনিক গ্রন্থ ও নাটকের দ্বারা এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত "লে তাঁ মদের্ন্" (Les Temps Modernes) পত্রিকার মারফতে তিনি তাঁর নূতন মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। কয়েক বৎসর ধ'রে সার্ত্র্-এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব অত্যাশ্চর্যভাবে বৃদ্ধিলাভ করতে লাগল। সার্ত্র্-এর মতে মানবীয় জীবনের কোনও লোকাতীত তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য নেই। বিজ্ঞানবাদী ও সাম্যবাদীদের লৌকিক স্বপ্ন ও সুখবাদ তাঁর মতে তেমনি অসার। মানুষ মৃত্যু ও শূন্যতার অভিমুখে ধাবিত হয়ে চলেছে, ধর্মবিশ্বাস কিংবা সাম্যবাদের আশ্রয় নিয়ে সে নিজেকে প্রতারণা করে মাত্র। এই চরম নিরাশার সম্মুখীন হয়ে যে মানুষ সত্যই তার উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্বের একটি মূল্য খুঁজতে চায়, তাকে প্রথম নির্ভীকভাবে স্বীকার করতে হবে সেই সর্বপ্রকার প্রচলিত মতবাদের অলীকতা। তার নিজ ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও মানবীয় পৌরুষের অভিব্যক্তিতেই জীবনের একটিমাত্র মূল্যবত্তা নিহিত রয়েছে।

সার্ত্র্-এর এই নৈতিমূলক জীবনদর্শনের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল ফরাসী জনসাধারণের ব্যাপক হতাশা ও অস্থিরতার ভাব। তা ছাড়া সার্ত্র্ সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক আদর্শ ও মতবাদ তীব্রভাবে সমালোচনা ও নিন্দা করতেন ব'লে মহাযুদ্ধের অবসানে অনেক ফরাসী নরনারী তাঁর এই ভাঙার মনোভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। অস্তিবাদী দর্শনের কথা অনেকে বুঝতে না পেরেও মনের গ্লানি ও হতাশার তাড়নায় সার্ত্র্-এর শিষ্যত্ব স্বীকার করত। বিজ্ঞানের উপর যারা একদিন পূর্ণ আস্থা রেখেছিল কিংবা সাম্যবাদকে ধর্মরূপে যারা একদিন গ্রহণ করেছিল তারা অনেকে বিজ্ঞান বা সাম্যবাদ বিষয়ে তাদের আশা

জাঁ-পল্ সার্ত্র্

হারিয়ে অস্তিবাদের মধ্যে সাময়িকভাবে আশ্রয় খুঁজেছিল। আজ সার্ত্র্-এর মতবাদের আকর্ষণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। সার্ত্র্ নিজে কম্যুনিজ্মের দিকে এখন হেলে পড়ছেন। তাঁর সাহিত্যের রূঢ়তা ও অশ্লীলতা এবং তাঁর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনেককে অতিষ্ঠ করেছে।

আমার মতে আল্বেয়ার কাম্যু সার্ত্র্-এর অপেক্ষায় মহৎ লেখক। তিনিও অস্তিবাদী লেখক এবং একসময় সার্ত্র্-এর বন্ধু ও সহকারী ছিলেন। তাঁর 'মহামারি' (দি প্লেগ্) নামক উপন্যাসখানির মধ্যে অস্তিবাদী জীবনদর্শনের একটি অপূর্বসুন্দর ও মনোগ্রাহী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বিদেশে গাব্রিয়েল মার্সেল-এর খ্যাতি এ পর্যন্ত খুব বেশি হয়নি। তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার। অস্তিবাদীদের মত তিনি নূতন দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ ক'রে জীবন-সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত। জার্মানি ইয়াস্পের্স্ (Jaspers) ও হাইদেগের (Heidegger) এবং দেনীয় কির্কেগদ্ (Kierkegaard)-এর চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর দর্শনের সামঞ্জস্যই বেশি। তিনি খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী এবং অস্তিবাদের নৈতিমূলক মত ও আদর্শকে তাঁর বিশ্বাসের আলোকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত করেছেন। মার্সেল্-এর প্রভাব বর্তমানে সার্ত্র্ ও কাম্যু-র প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশি।

(৩)

তৃতীয় ভাগ (বহির্বিশ্বে ফরাসী চিন্তার প্রভাব)

খৃষ্টীয় জগতে ফরাসী প্রভাব

বর্তমান কালে বিশ্ব-খৃষ্টমণ্ডলীর দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজনীতিক চিন্তাধারা ফরাসী খৃষ্টীয় মনীষীদের দ্বারা অসাধারণরূপে প্রভাবান্বিত। ফ্রান্সে আজ কয়েকজন অতি প্রতিভাবান ধর্মাচার্য ও উপদেষ্টা রয়েছেন। জেসুইট্ ডমিনিকান বেনেডিক্টিন প্রভৃতি সন্ন্যাসীসংঘের ফরাসী সদস্যেরা কয়েকটি উচ্চস্তরের ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকা পরিচালিত করেন। বিদেশে যেখানেই ক্যাথলিক মণ্ডলী সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে অনেক কাথলিক মনীষী, যাজক, ছাত্র প্রভৃতি ফরাসী খৃষ্টীয় চিন্তানায়কদের কাছ থেকে প্রেরণা পায়। ধর্ম সম্বন্ধীয় ফরাসী বইগুলি জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হয়। খৃষ্টীয় জগতের সব জায়গা থেকে অনেক ধর্মযাজক-পদপ্রার্থী ও শিক্ষার্থী ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী আচার্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন।

ফাদার দ্য ল্যুবাক (de Lubac), ফাদার কোঁগার (Congar), ফাদার শেন্যু (Chenu), ফাদার দানিয়েলু (Danielou), ফাদার বিগো (Bigo)

প্রভৃতির গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ কেবল ফ্রান্সে নয়, কাথলিক জগতের সর্বত্রই আজ পাঠ করা হয়ে থাকে।

বহির্বিশ্বে ফরাসী চিন্তার প্রভাব

রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে বর্তমান জগতে ফ্রান্সের স্থান খুব উচ্চ না-ও হতে পারে, কিন্তু সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির দিক থেকেই সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতের মধ্যে ফ্রান্সের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। বের্গসনের দার্শনিক চিন্তা ইউরোপে, আমেরিকায়, এমন কি এশিয়ার বহু দেশে এক অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আজও প্যারিস হচ্ছে পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক রাজধানী। লাভেল, ল্যাসেন, মুনিয়ে, সার্ত্র্, মালরো প্রভৃতি আমাদের সমসাময়িক ফরাসী চিন্তানায়কগণের বইগুলি জগতের সকল দেশেই গিয়ে পৌঁছায়। ফরাসী চিন্তা বড়ই সজীব, সর্বদাই সেই চিন্তার যাদুস্পর্শে বিশ্ব-মনোজগতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

ব্রাঞ্চ—জামসেদপুর

বঙ্গদেশে ফরাসী চিন্তার প্রভাব

বহুদিন থেকে বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলার চিন্তাধারা নানাভাবে ফরাসী চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ-এর দর্শন আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেই প্রত্যক্ষবাদ একদিন বহু বাঙালী মনীষীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। সাধারণত ফরাসী সাহিত্য ও চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ইংরেজী সাহিত্য ও চিন্তার মধ্য দিয়ে। সিম্বলিস্ট্ সাহিত্যধারা বাঙলাদেশে প্রবাহিত হয়েছিল ফরাসী সংকেতধর্মী সাহিতিকগণের ইংরেজ শিষ্যদেরই লেখার মারফতে। আরাগোঁ ও সার্ত্র্-কে প্রথমে পড়েছি ইংরেজী অনুবাদে। আধুনিক বাঙলা মনোজগতের অনেক নূতন ধারার উৎস ফ্রান্সেই।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্য ও দর্শনের যে পরিচয় এখানে পেয়েছি সেই পরিচয় আংশিক মাত্র। নানা কারণে এলুয়ার ও আরাগো-র নাম শুনেছি, ক্লোদেল এ'দের অনেক বড় হয়েও আমাদের অপরিচিত। সার্ত্র্-কে পেয়েছি, মার্সেল-কে জানি না। বের্গসনের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ব্লোঁদেল ও মারিতিঁ-কে চিনি না। ফরাসী চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরেজী অনুবাদসাপেক্ষ কিংবা নানা রাজনীতিক কারণে কতকটা 'একপেশে' হয়ে থাকছে। তাতে আমরা সমগ্র ফ্রান্সের বহু বিচিত্র ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আজ অবধি পাই নি। সেই পরিচয় যদি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সাক্ষাৎভাবে ফ্রান্স ও বাঙলার মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান যদি আরও বেড়ে যায়, তবে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করব যে, ফরাসী ও বাঙালী এই দুটি জাতির সাদৃশ্য অনেকখানি বটে।

সিংহ শিকারী তারতাঁরা দ্য তারাসকঁ

আল্‌ফঁস্‌ দোদে

[ফরাসী সংস্কৃতির যে স্বর্ণযুগ, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মহারথী আলফঁস্‌ দোদে (১৮৪০-১৮৯৭), ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি, গল্পলেখক এবং বহু রম্য রচনা, ব্যঙ্গ ও উপহাসাত্মক রচনার লেখক। এঁর এক অপূর্ব চরিত্রসৃষ্টি হল তার্‌তার্যাঁ। অনেকের মতে, সের্‌ভান্‌তের ডন্‌ কুইক্‌জোটের পর বিশ্বসাহিত্যে এমন চরিত্রসৃষ্টি অতি বিরল। তার্‌তার্যাঁ অতুলনীয় কারণ তার ব্যক্তিত্বে ডন্‌ কুইক্‌জোট্‌ ও সাংকো পাঞ্জার সংমিশ্রণ। ব্যঙ্গ রচনা হিসাবে দোদে-র এই অবদান অমর হয়ে থাকবে।

'প্যারিসের ত্রিশ বছর' নামক বই-এ তারতার্যাঁর উল্লেখ করে দোদে বলেছেন ঃ "লিপি-চাতুর্য এবং সুন্দর, সমন্বিত ও ব্যঞ্জনামূলক গদ্যের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু, ঔপন্যাসিকের পক্ষে সেটাই সব নয়। তার সত্যিকার আনন্দ চরিত্র সৃষ্টিতে, সম্ভাব্য অথচ প্রতিনিধিমূলক মানব সৃষ্টিতে।"

দোদে তারতার্যাঁকে নিয়ে তিনটি বই লিখেছেন। সিংহ-শিকারী তারতার্যাঁ (সংক্ষেপে যে গল্পটি এখানে দেওয়া হল) 'তারতার্যাঁ দ্য তারাসক'—নামক বইটির উপাখ্যান। এইটিই ঐ সিরিজের প্রথম বই। অন্য দুটি হলঃ 'তারতার্যাঁ সীর আল্‌প্‌'—তারতার্যাঁর আলপ্‌স্‌ পর্বত আরোহণ অভিযান; 'পোর্‌-তারাসক'—কী করে তারতার্যাঁ পলিমেনিয়াতে এক উপনিবেশ স্থাপন করল।

—সম্পাদক, 'দেশ'।]

সিংহ-শিকারী তারতার্যাঁ নিরুদ্দেশ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

"তারাস্‌ক'—এই নগরী আজ মুহ্যমান। সিংহ-শিকারী তার্‌তার্যাঁ আফ্রিকায় গিয়াছেন সিংহ বধ করিবার জন্য। কিন্তু আজ কয়েকমাস যাবৎ তাঁহার কোনো খবর নাই। আমাদের এই বীর সন্তানের কী হইল? অন্যান্য অনেকের মত তাঁহাকেও কি গ্রাস করিল তত্রত্য মরুভূমির ধূলি? না কি নিহত হইলেন এটলাস্‌ পর্বতের সিংহের হস্তে? তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, সিংহের একটি চামড়া উনি আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিকে পাঠাইয়া দিবেন। আজ ভীষণ অনিশ্চয়তার ভিতর শহরবাসীগণ কালাতিপাত করিতেছেন। এইদিকে, মেলায় আগত কাফ্রি বণিকগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, তাহারা মরুভূমিতে একজন ইউরোপবাসীকে দেখিয়াছেন এবং তিনি টিম্‌বাক্‌টুর দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন। উক্ত ইউরোপবাসীর বর্ণনায় আমাদের তারতার্যাঁ-র সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়।"

এই সংবাদটি ছাপা হয়েছিল আলজিয়ার্সের কোনো একটি খবরের কাগজে অনেককাল আগে—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। অবশ্য, সমস্তই কাল্পনিক। ঐ সংবাদোক্ত তারতার্যাঁ হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলফঁস্‌ দোদে-র এক অপূর্ব চরিত্র-সৃষ্টি।

লিক্‌লিকে ঘোড়ায় চড়ে টিক্‌টিকে ডন্‌ কুইক্‌জোট্‌ বিরাট বর্শা নিয়ে একদা আক্রমণ করেছিল উইণ্ডমিল্‌কে। তার সহচর সাংকো পাঞ্জার শত অনুরোধ উপরোধ সেদিন তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তারাস্‌ক'বাসী তার্‌তার্যাঁ হলেন ঐ ডন্‌ কুইক্‌জোট্‌ ও সাংকো পাঞ্জার দুই বিরোধী চরিত্রের সংমিশ্রণ। একদিকে অসম সাহসিক কাজ করে লোকের কাছে নাম করবার উদগ্র বাসনা, অন্যদিকে ভয়-ভীতি-শংকার পিছুটান।

ছোট্ট মফস্বল শহর তারাস্‌ক', দক্ষিণ ফরাসীতে। সেই শহরে তারতার্যাঁ-র খুবই নামডাক, একজন কেউ-কেটা। তার বাড়ি-ঘরের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বীররস। মস্ত বড় বাগান, কিন্তু নিজের দেশের কোনো গাছ-গাছড়া নেই তাতে। সব আফ্রিকার গাছ—বাওবাব্‌, রবার, কোকো, ডুমুর, পাম্পপাদপ, মনসা, কলাগাছ, এমনি কত কিছু। তেমনি তার বসবার ঘরটিও—নানা দেশের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিতঃ বন্দুক, তলোয়ার, কুক্‌রি, রাইফেল, মাদ্রাজ দেশের লম্বা দা, ছোরা, তীরধনুক, মেক্সিকোর ফাঁস-দড়ি, ডাণ্ডা, রিভল্‌বার, কুঠার, বর্শা, আরো অনেক কিছু। দেয়ালে লেখা রয়েছেঃ 'বিষাক্ত তীর—স্পর্শ করিবেন না!' 'গুলিভরা বন্দুক, সাবধান!'

ঘরটির মাঝখানে একটি টেবিল। তার উপর এক বোতল মদ, একটি তুরস্ক দেশীয় তামাকভরা পাউচ, আর অনেক বই—কাপ্তেন্‌ কুক্‌-এর ভ্রমণ কাহিনী,

নানা জীবজন্তুর শিকার কাহিনী, আর য়্যাড্‌ভেঞ্চার উপন্যাস। এক হাতে বই অন্য হাতে পাইপ্‌ নিয়ে সেখানে বসে অসমসাহসিক, বীর-ব্যঞ্জক মুখ ভঙ্গি করছেন তার্‌তার্‌্যাঁ। চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ ছর বয়েস, বেঁটে, মোটাসোটা, লাল-মুখো; থুত্‌নিতে শক্ত খাটো দাড়ি, চোখ দুটো আগুনে। "এই মানুষটি, ইনিই লেন তারতার্‌্যাঁ, তারাস্‌ক'বাসী তার-তার্‌্যাঁ, নির্ভীক, বীরপুংগব, অতুলনীয় তারতার্‌্যাঁ দ্য তারাস্‌ক'।"

টুপি শিকার

এককালে তারাস্‌ক'র বড়-ছোট সকলেই ছিল শিকারী। ফলে এমনটি লে যে তল্লাটে আর পশুপাখি কিছু ছিল না। কিন্তু শিকারীদের কিছু একটা চাইতো? তারা প্রতি রবিবার দল বেঁধে, বন্দুক, গুলি, কুকুর, খাবার-দাবার নিয়ে চলে যেত মাঠে। আর শিকার করত কি? না—'টুপি'। শূন্যে টুপি ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করত গুড়ুম গুড়ুম। এবং যে সব চাইতে বেশি ফুটো করতে পারত তাকেই সেদিন করা হত ওস্তাদ-শিকারী। বন্দুকের ডগায় ফুটো টুপি চড়িয়ে, কুকুরদের ঘেউ ঘেউ আর বিরাট হৈচৈ মাচিয়ে দস্তুরমত মিছিল করে শিকারীরা আসত শহরে। আর এই টুপি-শিকারী-দের ভিতর তারতার্‌্যাঁর জুড়ি ছিল না কেউ। তার চিলে-ঘর ভরা শতছিন্ন, ছিদ্র-বহুল গাদা গাদা টুপি।

সে সকলের প্রিয় মানুষ, গর্বের মানুষ। এমনকি রোয়াকি ছেলেরাও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতঃ 'হ্যাঁরে, দেখেছিস হাতের বাইসেপ্‌? ডবল্‌ মাস্কেল্‌!" পুলিসের বড় কর্তা, ম্যাজি-স্ট্রেট্‌, সিভিল সার্জন, সকলেই বন্ধুলোক। বলেনঃ অমন মানুষটি আর হয় না।

এসব সত্ত্বেও তারতার্‌্যাঁ-র মনে সুখ নেই। ছোট শহরের চৌহদ্দিতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। যার মন চায় বিরাট যুদ্ধ, দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তর আর মরুভূমির বালি, যে চায় বৃহৎ হিংস্র শিকার, ঘূর্ণি আর তুফান,—তাকে কিনা সন্তুষ্ট থাকতে হয় শুধু টুপি শিকার করে।

চাঞ্চল্যকর, সাহসী কাহিনীর বই পড়তে পড়তে তারতার্‌্যাঁ ভুলে যায় সে

ডন্‌ কুইক্‌জোট ও সাংকো পাঞ্জা। শিল্পীঃ অ'রে দোমিয়ের (১৮০৮-১৮৭৯)

বসে আছে তার বৈঠকখানায়। হাতে একটা বল্লম নিয়ে চিৎকার করে ওঠেঃ "আও, আভি আও। আনে দেও উস্‌ লোগোঁকো।" সে নিজেই জানে না কারা এই 'উস্‌ লোগ'। তার ধারণা যারা আক্রমণ করে, লড়াই করে, নির্যাতন করে, গর্জন করে, কামড়ায়, খামচায়, যারা জল-দস্যু কি স্থলদস্যু—এরাই সব হল গিয়ে ঐ 'উস্‌ লোগ'। তারতার্‌্যাঁ সর্বদাই অপেক্ষা করছে ঐসব 'উস্‌ লোগ্‌'-দের সাক্ষাতের জন্যে, বিশেষ করে সন্ধ্যের পর যখন সে আড্ডার দিকে যায়।

আড্ডায় যেত শহরের অন্ধকার গলি ঘুপ্‌চি রাস্তা ধরে। রোজ ভাবত, এক-বার ঐ-সব 'উস্‌ লোগ্‌'-দের সঙ্গে দেখাটা হয়ে যায় তো ব্যস্‌, একহাত নিয়ে নেবে। তার বাঁ হাতে থাকত লোহার পাঞ্জা, ডান হাতে একটা গুপ্তি; পকেটে রিভল-বার আর বুকের কাছে লুকানো একটা মালয়ী ছোরা। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে একটা কুকুর কি একটা মাতাল অবধি রাস্তায় তার সামনে পড়ত না।

একদিন রাত্রে খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে ঝোপের আড়ালে কান পেতে তারতার্‌্যাঁ রেডি হয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এসে গেছে 'উস্‌ লোগ্‌'। "এই কৌন হ্যায়!" বিরাট রণ-নির্ঘোষে তারতার্‌্যাঁ বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসে এক ছায়ামূর্তির মুখোমুখি। "আরে, কৌন্‌ রে! তারতার্‌্যাঁ নাকি?"—ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়, তারতার্‌্যাঁ-র বন্ধু ডাক্তার বেজিকে। ধুত্তোর, যা একটা পাওয়া গেল—তাও মাটি!!

তারতার্‌্যাঁ যেন দুটি মানুষ—ডন্‌ কুইকজোট্‌ আর সাংকো পাঞ্জা, আর এই দুই তারতার্‌্যাঁর ভিতর কতো না কথোপ-কথন। গুস্তাভ্‌ এমার-এর উপন্যাস আর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে তার-তার্‌্যাঁ-কুইক্‌জোট বলে উঠত, "এবার আমি বেরিয়ে পড়ব।"

তারতার্‌্যাঁ-সাংকো ভাবে গেঁটে-বাতের কথা, বলে, "আমি নড়ছি না।"

"তারতার্‌্যাঁ-কুইক্‌জোটঃ (উদ্দীপনার সঙ্গে) নিজেকে ঢেকে নাও গৌরবে তারতার্‌্যাঁ!

"তারতার্‌্যাঁ-সাংকোঃ (অতি শান্ত ভাবে) তারতার্‌্যাঁ! নিজেকে ঢেকে নাও ফ্লানেলের কাপড়চোপড়ে।

"তারতার্‌্যাঁ-কুইক্‌জোটঃ (অধিকতর উদ্দীপনার সঙ্গে) কী চমৎকার দো'নাল বন্দুক! চমৎকার খঞ্জর, মেক্সিকোর ফাঁস দড়ি আর রেড ইণ্ডিয়ানদের জুতো!

"তারতার্‌্যাঁ-সাংকোঃ (অতি শান্ত আঃ, কী চমৎকার হাতে-বোনানো সোয়ে

টার! চমৎকার গরম হাঁটু-ঢাকার কাপড়! কী চমৎকার কান-ঢাকা বাঁদর-টুপি।

"তারতার‍্যাঁ-কুইকজোট্ঃ (দিশেহারা) কোথায় কুঠার! দাও, দাও, আমার হাতে দাও একটা কুঠার!

"তারতার‍্যাঁ-সাংকোঃ (ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরাণীকে ডাকে) ও জানেত্! এক কাপ চকোলেট্ দাও দিকিনি।"

তারতার‍্যাঁর আর তারাস্কঁ-র বাইরে যাওয়া হয়ে উঠছে না।

দুই সিংহ

দিনকাল হয়ত অমনি যেত যদি না ঘটত তারাস্কঁ শহরে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তারতার‍্যাঁ একদিন তার এক বন্ধুর বাড়িতে বসে নতুন উৎসাহীদের দেখাচ্ছিল কী করে গাদা-বন্দুক ছুড়তে হয়। হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির দলের একজন টুপি-শিকারী। "সিংহ! সিংহ!" বলে কি! একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। ঠেলাঠেলির ধুম্; কেউ পালায়, কেউ করে দরজা বন্ধ, তারতার‍্যাঁ বন্দুকে বেয়নেট্ লাগিয়ে একেবারে রেডি।

ব্যাপার কি না, কাছের মেলায় এসেছে এক সার্কাস পার্টি। নানান্ জীবজন্তুর ভিতর তাদের আছে একটি সিংহ, খাস্ এটলাস্ পর্বতের এক বৃহৎ সিংহ। তারতার‍্যাঁ ভাবেঃ "এটলাস্ পর্বতের সিংহ এইখানে, এত কাছে, এই দু'পা দূরে! সিংহ, মানে সেই পশুরাজ! সেই বীর, হিংস্র জন্তুদানব, তার স্বপ্নের

শিকার সিংহ!" বজ্রকণ্ঠে তারতার‍্যাঁ ঘোষণা করেঃ "চলো।"

দেখতে দেখতে তারাস্‌কঁ শহর ভেঙে পড়ল সেই সিংহের খাঁচার সামনে। নির্ভীক ভঙ্গিতে তারতার‍্যাঁ গিয়ে দাঁড়াল সিংহের মুখোমুখি। হাত দুটো বন্দুকের উপর ভর করে রাখা। "এক ভীষণ, গুরু-গম্ভীর সাক্ষাৎকার! মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারাসকঁ শহরের সিংহ আর এট্‌লাস্‌ পর্বতের সিংহ। হঠাৎ সিংহটা কেশর ফুলিয়ে ঝাড়ল এক মহা গর্জন। আর দে-দৌড় দে-দৌড়, যে যেখানে ছিল। একমাত্র তারতার‍্যাঁ রইল দাঁড়িয়ে সেই খাঁচার সামনে। সাহস আছে বটে।"

অন্যান্য টুপি-শিকারীরা আশ্বস্ত মনে আবার যখন ফিরে এল খাঁচার সামনে, তারতার‍্যাঁ তাদের দিকে চেয়ে বল্লঃ "সা, উই, সে-ত্‌-ইন্‌ শাস্‌ (হ্যাঁ, এটা একটা শিকার করবার মত জিনিস বটে।)"

তারতার‍্যাঁ মুখ-নিসৃত ঐ একটি বাণী তারাস্‌কঁ শহর তোলপাড় করে তুলল। যে যার সঙ্গে দেখা হয় বলেঃ "আরে, ইয়ে, খবর শুনেছ?"

আরে ইয়ে, কোন্‌ খবর? তার-তার‍্যাঁ-র আফ্রিকা যাত্রার তো?"

বেচারা তারতার‍্যাঁ কিছু জানে না। কিন্তু সমস্ত শহরবাসীর মুখেমুখে এই বার্তা রটে গেল যে, তারতার‍্যাঁ যাচ্ছে আফ্রিকায় সিংহ শিকার করতে। এবং এই খবরে সব চাইতে যদি কেউ অবাক হয়ে থাকে তো সে তারতার‍্যাঁ নিজে। কিন্তু এম্‌নি তার অহমিকা যে সোজা-সুজি 'না' করতে পারল না যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সত্যি সে যাচ্ছে কি না। দুএকবার তানানানা করে শেষটায় বলে ফেল্লঃ "সে সেয়ারত্যাঁ (নিশ্চয়ই)"।

দুই আপাতবিরোধী মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, চিন্তা-শংকাকুল তারতার‍্যাঁ অবশেষে আরম্ভ করল প্রাক্‌-যাত্রার বিরাট আয়োজন পর্ব। যথাঃ

একদমে পড়ে নিল সে নামকরা আফ্রিকা-পরিব্রাজকদের বইঃ ম্যাংগো-পার্ক, লিভিংস্টোন্‌, কাইয়িয়ে, দ্যুভিরিয়ে ও অন্যান্যদের রোমাঞ্চকর কাহিনী। অভ্যস্ত হতে হবে অনশনে, তৃষ্ণায়, স্বল্পাহারে এবং সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে

শুধু গরম জলে ভেজানো রুটির টুক্‌রো; গোটা শহরকে পরিক্রমা করছে দিনে সাত-আটবার লম্বালম্বা পা ফেলে, জিমনাস্টিকের ভঙ্গিতে। অভ্যাস করতে হবে রাত্রের খোলা হাওয়ায়, কুজ্ঝটিকায়। বন্দুক হাতে নিয়ে তারতার‍্যাঁ রাত বারোটা অবধি কাটায় বাগানের মুক্ত আকাশের নিচে। অভ্যাস করতে হবে সিংহের গর্জনে। যতদিন মেলায় ছিল সার্কাসের দল, তারতার‍্যাঁ রোজ অন্ধকার রাত্রে গিয়ে কিছুক্ষণ করে কাটাত সিংহটার খাঁচার সামনে।

কিন্তু সপ্তাহ গেল, মাস গেল, তারতার‍্যাঁর যাত্রা আর শুরু হয় না।
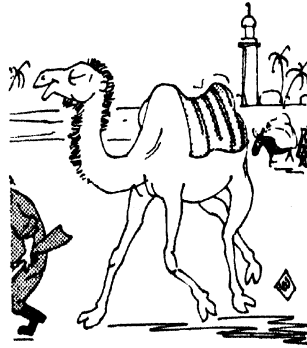
লোকজনের কথাবার্তায় কান-রাখা মুশকিল হয়ে উঠল। এমন কি বন্ধু-বান্ধবরাও হাসিঠাট্টা করতে আরম্ভ করলঃ "আর গেছে আফ্রিকায়!" "সিংহ শিকার না হাতী! ব্যাটা গুল্‌-রাজ!" এদিক-ওদিক মুখ বাড়িয়ে ছেলে-ছোকরারা শুনিয়ে শুনিয়ে তারতার‍্যাঁকে নিয়ে কাটে মজার ছড়া।

তার কানে সবই পৌঁছুতে লাগল। দুঃখের আর সীমা নেই।

এ সমস্ত নিন্দের কথা আর সইতে না পেরে অবশেষে তার বন্ধু ব্রাভিদা অনুরোধ করে বললেঃ তারতার‍্যাঁ, তোমাকে এবারটি যেতেই হবে। ইল ফো পার্‌তির্‌।

পাশুটে মুখে তারতার‍্যাঁ উঠে দাঁড়ায়। তার বিষণ্ণ দৃষ্টি ঘুরোয় অতি আরামের

ভরা কক্ষ, গা এলানোর আরাম-কেদারা বইগুলো, গালিচা, বাইরে বাগানে দুলছে গাছের ডাল। চোখ বেয়ে দরদর নামছে জল। ব্রাভিদার হাত দুটো ধরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেঃ তাই হোক তাহলে; যাবো ব্রাভিদা!

অভিযান শুরু

শুরু হল প্রকাণ্ড অভিযান পর্ব। হাজারো রকম অস্ত্রশস্ত্র, টিনের খাবার, ক্যাম্প-খাট, তাঁবু, বৃহৎ বৃহৎ ছাতা, জুতো, রোদ-ঢাকা চশমা, বর্ষাতি আর গোটা একটা ফার্মেসি—সব ভরা হল মস্ত এক কাঠের বাক্সে।

গোটা শহর ভেঙে পড়ল তার যাবার দিনটায়। চোখে জল নিয়ে সকলে বিদায় দিচ্ছে তাদের বীর তারতার‍্যাঁকে। আলজেরিয় পোশাকে সজ্জিত তারতার‍্যাঁ। ঢিলেঢালা হাঁটু অবধি শিকারী পান্তলুন, মাথায় লাল ফেজ্‌ টুপি, লাল কোমরবন্ধ, দুই কাঁধে দুখানা বন্দুক আড়াআড়ি গুলীর বেল্ট বুকের উপর কোমরবন্ধে আঁটা একটা কুকরি, কোমরের পাশে ঝুলছে রিভলবার।

শান্ত, সমাহিত তারতার‍্যাঁ, যেন বি পান করার আগের মুহূর্তের সক্রেটিস্‌ গাড়ির কামরায় গিয়ে উঠল তারতার‍্যাঁ আর শহরের জনতা সজল চোখে বিদায় দিল তাকেঃ "তারতার‍্যাঁ জিন্দাবাদ"।

পরদিন মার্সাই বন্দরে গিয়ে জাহাজে উঠল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আলজিরিয়ার উদ্দেশে। তিনদিনের পথ। জীবনে এ প্রথম তার বাইরে আসা।

জলযাত্রায় বিশেষ কিছু আ ঘটেনি। তবে তারাসকঁর বীর সন্তা জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে কেবিনে ঢুকল বেরুল তিনদিন পা হঠাৎ জাহাজটা যখন থরথর করে থেমে গেল। তারতার‍্যাঁ এই তিনদিন শুধু করেছে বমি আর বমি। যেমনি জাহাজটা থেমে গেল পীড়িত তারতার‍্যাঁ ভাবল নিশ্চয় জাহাজ কোথাও কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবতে আরম্ভ করেছে। প্রা মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়ে সে বেরিয়ে এল সঙ্গে অবিশ্যি তার অস্ত্রাগারটি আছে আসলে, জাহাজ আলজেরিয়ার বন্দরে পৌঁছে গেছে।

তারতারাঁ আশ্বস্ত মনে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চমকে উঠলঃ কালো কালো, অর্ধনগ্ন বিকট সব কাফ্রিরা দৌড়ে জাহাজে উঠছে আর বাক্স, প্যাঁটরা মাল-বস্তা যা যেখানে আছে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারতারাঁ জানে এরা কে।—"ঐতো ওরা, মানে সেই 'উস্‌লোগ'-দের দল, যাদের অন্বেষণে সে ঘুরেছে তারাসকঁর অলিতে গলিতে।" স্রেফ্ জলদস্যু এরা।

প্রথম চমকটা সামলে নিয়ে, তড়াক করে কুকরি খুলে চিৎকার করে সে যাত্রীদের ডেকে বলতে লাগলঃ "ও-জারম্, ও-জারম্! (হাতিয়ার লাও, হাতিয়ার লাও)"! জাহাজের ক্যাপ্টেন তখন বুঝিয়ে বললে যে ওরা জলদস্যু নয়, জাহাজের কুলি। মালপত্র নাবাচ্ছে।

যাহোক, ওদেরই কয়েকজনের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে তারতারাঁ নেমে এল আফ্রিকার মাটিতে।—না, না, অতো বিশ্বেস করা ঠিক হবে না। কই, কুলি তো আমাদের তারাস্কঁতেও আছেঃ তারাতো দেখতে এই কুলিদের মতো নয়। অতোটা বিশ্বেস করা ঠিক হবে না। তারতারাঁ শক্ত করে কুকরির ডাঁটটা চেপে ধরে।

প্রথম শিকার

তারতারাঁ আস্তানা নিল এক হোটেলে। প্রথম দিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলঃ আজ আমি সিংহের দেশে। এত কাছে সব সিংহ, হয়ত ঐ ওখানটাতেই আছে সিংহ—আর ওটাকে শিকার করতে হবে। কেমন যেন একটা মৃত্যু-শীতল হিম তার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারতারাঁ আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সিংহ-শিকার বাসনাটা এমন চাঙা হয়ে উঠল যে তার-তারাঁ মনে মনে একটা প্লান্ করে নিল। অস্ত্র-শস্ত্র ও ভাঁজকরা তাঁবুটা ঘাড়ে ফেলে, বড় রাস্তা বেয়ে চলে গেল সোজা শহরতলিতে। সিংহ তো কাছেভিতে রয়েছেই। গোটা দুয়েক মেরে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া চাই। সুতরাং প্লান্‌টা সে গোপনই রাখল।

শহরতলিতে পেঁৗছে দেখতে শুনতেই রাত্রি হয়ে গেল। একটা মাঠ বরাবর তার-তারাঁ এগিয়ে গেল। প্রায় মরু প্রান্তর, ধুলোবালির রাজ্য। দূরে দূরে দু'একটা বাড়ি। অসংখ্য কাঁটাগাছ আর মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। হঠাৎ এক জায়গায় সে থেমে গেল। "হুঁ, বাতাসে মনে হচ্ছে সিংহের গন্ধ পাচ্ছি," মনে মনে এই বলে ওস্তাদজী ডাইনে বায়ে বাতাস শোঁকে।

ব্যস্! একটা ঝোপের আড়ালে তার-তারাঁ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সামনে একটা বন্দুক: আরেকটা বন্দুক হাতে, একেবারে তাক্ করে। যখন ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করেও কোনো কিছুর আভাস পর্যন্ত পাওয়া গেল না, তখন তারতারাঁর মনে পড়ল, বড়ো বড়ো শিকারীরা সকলেই লিখেছেন যে একটা ছাগল-টাগল কাছে বেঁধে রাখতে হয় শিকার আকৃষ্ট করার জন্যে। ছাগল আর এখন কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? ঘুপটি মেরে তারাসকঁ-বীর-সন্তান নিজেই ডাকতে লাগলঃ ম্যাঁ-হ্যাঁ-এ্যা, ম্যাঁ......।

"প্রথমটায় বেশ আস্তে আস্তে, কারণ মনে মনে একটু ভয় রয়েছে যে যদিই সিংহ সেটা শুনে ফেলে। পরে যখন দেখল যে কিছুই আসছে না তার ছাগলের ডাকের অনুকরণে, তখন তারতারাঁ বেশ জোরসে ডাকতে লাগল; ম্যাঁহ্যাঁম্যাঁ, ম্যাঁহ্যাঁম্যাঁ—। তবু কিছুই এল না। অধৈর্য হয়ে এতো জোরে আর ঘন ঘন ডাক সে ছাড়ল যে, অজসন্তান শেষটায় এক বলীবর্দের আকার ধারণ করল।"

অমনি সময় হঠাৎ তার সামনে কালো বড়ো একটা কী যেন নড়ে উঠল। মাথা নিচু করে জীবটা মাটি শুঁকলো, তারপর লাফ দিয়ে কোথায় চলে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে এল। না কোনো সন্দেহ নেই, সিংহই বটে—ঐ তো খাটো খাটো পা, জবরদস্ত গর্দান আর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। ফায়ার! গুড়ুম গুড়ুম!! প্রত্যুত্তরে শোনা গেল ভীষণ এক আর্তনিনাদ।

তারতারাঁ রাত্রিতে আর খুঁজতে গেল না শিকার কোথায় পড়েছে। ভোরের আলোয় দেখল, হায়! হায়! এ কোন জায়গায় সে এসেছে? কোথায় মনে করেছে সে আছে এক উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরে, আর কোথায় এ কিনা কা'র এক সব্জি বাগানে সে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফুলকপি

আরেকটা বীট্ গাছের মাঝখানে! "এখানকার লোকগুলো পাগল না কী! যেখানে সিংহ আসে সেখানে লাগিয়েছে বাঁধাকপি ফুলকপির গাছ? আর যাই হোক্, স্বপ্ন তো দেখিনি। এই অবধি এসেছিল সিংহটা—এই তো চিহ্ন রয়েছে"।

শক্ত করে মুঠোয় রিভলবার ধরে, রক্তের দাগ অনুসরণ করে তারতার্যাঁ এসে পোঁছল এক কলাই ক্ষেতে যেখানে মরে পড়ে আছে তার শিকার।

একটা গাধা। আলজেরিয়ায় যে খাটো ধরনের গাধা পাওয়া যায় তেমনি একটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাধার খোঁজে এসে হাজির কিষাণী বুড়ি। ঐ না দেখে, কী কান্ডই না বাঁধাল বুড়ি! তারতার্যাঁকে ধরে সে ছাতাপেটা করতে লাগল,—তারতার্যাঁর নিজের ছাতা। যাহোক, শেষটায় বেশ কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তবে না ছাড়া পায়।

অতঃপর বেশ কিছুকাল তারতার্যাঁ স্রেফ্ ভুলে গেল সিংহ শিকারের কথা। হঠাৎ-চেনা একজন লোকের পাল্লায় সে পড়ে। লোকটি নিজের পরিচয় দিয়েছিল মন্তেনেগ্রোর রাজকুমার বলে। এই রাজকুমারের পাল্লায় পড়ে তারতার্যাঁ বিলাসব্যসনে মেতে গেল। ওদিকে দেশের লোক উদ্বিগ্ন—কী হ'ল তাদের সিংহ-শিকারীর! এমনি এক সময়ে আলজিয়ার্সের কোনো এক খবরের কাগজে যখন বেরুলো নিরুদ্দেশ তারতার্যাঁকে নিয়ে খবর (লেখার প্রথমেই সেটার উল্লেখ আছে), তখন তার চমক ভাঙল। আবার বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে সে যাত্রা শুরু করল, এবার আরো দক্ষিণ-দিকে।

অপমানিত সিংহ

রাস্তায় সহযাত্রীদের কাছে সে নিজের পরিচয় দেয়ঃ "তারতার্যাঁ দ্য তারাস্ক', তীয়ার দ্য লিয়ঁ' (সিংহ-ঘাতক)"। এমন কি সত্যিকারের খ্যাতনামা এক শিকারীর কাছেও, যাঁর বই তারতার্যাঁর প্রায় মুখস্ত, তিনিও বললেনঃ ম্যসিয়্য! দেশে ফিরে যান। আলজিয়ারে আর সিংহ নেই। হ্যাঁ কিছু প্যান্থার আছে, কিন্তু সেতো আপনার কাছে অতি নগণ্য জীব।

মিলিয়ানা শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তারতার্যাঁ। একটা মোড় ঘুরতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল—ছবি তো নয়—একটা সিংহ! সিংহটা অন্ধ, পোষা। মুখে কামড়ে-ধরা একটা কাঠের পাত্র। সঙ্গে লাঠিধারি, অতিকায় দুজন কাফ্রি। লোকেরা সেই কাঠের পাত্রে পয়সাটা আনিটা দিয়ে যাচ্ছে।

তারতার্যাঁ রেগে আগুন' কী! এই মহান পশুরাজের এই অপমান। সে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল সিংহটার সামনে আর এক ঝট্‌কা টান দিয়ে কাঠের পাত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা হৈ-চৈ বেঁধে গেল। কাফ্রি দুটো ঝাপিয়ে পড়ল তারতার্যাঁর উপর ঃ মনে করল, বোধ হয় চোর। বেচারা তারতার্যাঁ ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। এই সময় কোত্থেকে এসে হাজির মন্তেনেগ্রোর রাজকুমার। গায়ের ধুলোবালি ঝেড়ে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা।

এক ধরনের মুসলমান ফকির সম্প্রদায় আছে—বড় কঠোর, জবরদস্ত লোক এরা। এদের কাছে সিংহ অতি পবিত্র জীব। তারা সিংহ পোষ মানায় আর সেই সিংহ নিয়ে ফকিররা ঘুরে বেড়ায় সারা দেশ, ভিক্ষে সংগ্রহ করে। তাদের বিশ্বাস যে, যদি কোনো কারণে ঐ সিংহকে দেওয়া টাকা-পয়সা হারিয়ে যায়, তাহলে সিংহ তাদের খেয়ে ফেলবে। তাই কাফ্রি দুটো তারতার্যাঁকে আক্রমণ করেছিল।

—তাহলে আল্‌জেরিয়ায় সিংহ আছে বল?

—আছে বৈ কি।

চল, কালকেই বেরিয়ে পড়া যাক, রাজকুমার বলে।

পরদিন, গোটা ছয়েক কুলির মাথায় বোঁচকা-বুঁচকি চাপিয়ে দুজনে র'না হল। শেলিফ্ নদীর উপত্যকায় কোথাও হয়ত পাবে সিংহ-শিকার। তার সিংহ সদৃশ ভাব-ব্যঞ্জনার সঙ্গে তাল রেখে তারতার্যাঁ চলছে—দৃষ্টি সোজা সম্মুখে। কিন্তু কল্পনার সিংহদের টিকিও দেখা যায় না। কয়েকদিন রাস্তা চলার পর, সবগুলি কুলিই ধীরে ধীরে ভেগে গেল—কারোর অসুখ, কেউ করল চুরি, আর একটি তো ভেদবমি করে মরেই গেল। কী করা যায়? এত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আর বাক্স-প্যাঁটরা—কী উপায়? না, না, ওই গাধা কেনার দরকার নেই (তারতার্যাঁর মনে পড়ে যায় সেই গর্দভ-শিকারের কেলেঙ্কারী)। মোটেই মানাবে না তাদের এই সিংহ-শিকার অভিযানের সঙ্গে। শেষটায় কেনা হল এক আরবী বাজার থেকে একটা উট। ওটার পিঠে দুজনে চেপে, মাল-পত্র যা নেওয়া গেল নিয়ে, এগিয়ে চল্ল দক্ষিণ-দিকে তারতার্যাঁ আর রাজকুমার।

প্রায় মাসখানেক তারা চল্ল এমনি করে গ্রামগঞ্জ পেরিয়ে। যখনই সুবিধে হয় তখনই তারতার্যাঁ উঁকিঝুঁকি দেয় খেজুর গাছের ঝোপে, বন্দুক দিয়ে খোঁচায় কাঁটা-গাছের ঝোপ জঙ্গল। কিন্তু না, সিংহ আর আসে না।

অবশেষে একদিন বিকেলে একটা দরগার কাছে তারতার্যাঁ হঠাৎ যেন শুনতে পায় দূরাগত একটা গর্জন। ক্রমশ গর্জনটা স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। গ্রামের কুকুর-
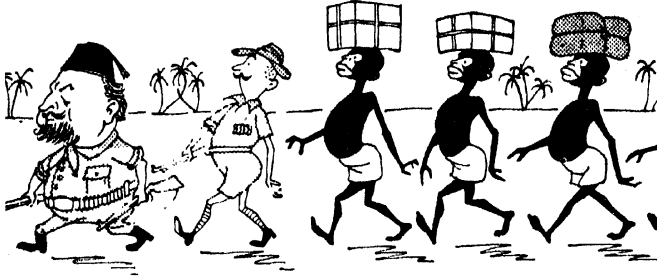
াও করছে ঘেউ ঘেউ। আর কোন
হ নেই—নিশ্চয়ই সিংহ। তারতার‍্যাঁ
 হয়ে গেল। রাজকুমারের হেপাজতে
পয়সাগুলো রেখে ("না, না, তুমি
 থাকো; ওটাকে আমি একলাই
ল করতে পারব")। সে একটা
ীগাছের ঝোপের নিচে আস্তানা
। বইপড়া ফরমুলা অনুযায়ী সে
 পেতে বসল সেইখানে। সামনে
না একটা ছোট্ট নদী এবং ওখানেই
সংহটা জল খেতে আসবে সে-বিষয়ে
তার‍্যাঁ নিঃসন্দেহ।

রাত হয়ে গেল। ভয়ে তারতার‍্যাঁর
 করছে ঠক্‌ঠক্। হঠাৎ শুনলো
না নদীটার ওখানে কিছু একটা
 আওয়াজ আর নুড়ি-পাথর গড়িয়ে
ার শব্দ। মাটি ফুঁড়ে ভয় এবার
ক থেকে তারতার‍্যাঁকে ছেয়ে ধরল।
 বুঁজে আন্দাজে সে ঝেড়ে দিল
 গুলি অন্ধকারের দিকে, আর
ই সংগে সংগে পালাল ঊর্ধ্বশ্বাসে
র দিকে।

"রাজকুমার, ও রাজাসাহেব! রক্ষা
 সিংহ!!" কোনো সাড়াশব্দ নেই।
 রাজাবাহাদুর! আছো নাকি
ন?" দরগাটার শাদা দেয়ালের
 দাঁড়ানো শুধু কিম্ভুতকিমাকার
ট। 'মন্তেনেগ্রোর রাজকুমার' টাকা-
ার থলে নিয়ে • ভাগল্-বা। 'হিজ্
নস্' একমাস যাবৎ এই সুযোগের
ক্ষায় ছিলেন।

বন্ধুহীন, সংগীহীন (একমাত্র
 ছাড়া), আলজেরিয়ার প্রান্তরে
ান্ত, কপর্দকহীন তারতার‍্যাঁ অঝোরে
ত লাগল পরদিন সকাল বেলায়।
সর্বপ্রথম তার মনে জাগল বিরাট
হ সবকিছুর প্রতি—মন্তেনেগ্রোর রাজ-
কুমার, বন্ধুত্ব, খ্যাতি, এমনকি, সিংহের
প্রতিও।

এমনি সময়ে মস্ত এক সিংহ
তারতার‍্যাঁর দশ-পা দূরে মাথা তুলে
গর্জন করে উঠল। বীর তারতার‍্যাঁ সংগে
সংগে ঝাড়ল দুটো গুলী—গুড়ুম!
গুড়ুম! সিংহের মাথা এ-ফোঁড়-ওফোঁড়!
প্রায় একই সংগে দেখা গেল দুইজন
কাফ্রির মস্ত দেহ—সেই মিলিয়ানা শহরে-
দেখা কাফ্রি ফকির। হায়! হায়! এতো
সেই অন্ধ, পোষা সিংহ!! বজ্রাঘাত!

ঘটনাচক্রে এক দারোগা সাহেব এসে
না পড়লে কাফ্রিরা সেদিন তারতার‍্যাঁকে
টুকরো টুকরো করে ফেলত। যাহোক,
অনেক দিন ধরে শহরের আদালতে হ'ল
বিচার, আর তারতার‍্যাঁর জরিমানা হল
আড়াই হাজার ফ্রাঁ। সমস্তগুলি অস্ত্র,
ওষুধপত্র ও টিনের খাবারগুলো বেঁচে
দিয়ে কোনমতে সিংহশিকারী জরিমানা
দিয়ে খালাস। উটটা কেউ কিনতে চাইল
না।

তারতার‍্যাঁর ধনসম্পত্তির ভিতর রইল
মাত্র সিংহের চামড়াটা। বহুযত্নে ভাঁজ করে,
পার্শেলে ভরে, সেটা সে পাঠিয়ে দিলে
তারাস্‌কঁতে তার বন্ধু ব্রাভিদার কাছে।

আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। যথা-
শীঘ্র পরিত্যাগ কর এই আলজেরিয়া।
একটা ফুটো পয়সাও নেই সংগে। 'তার-
তার‍্যাঁ চলল হেঁটে হেঁটে আলজিয়ার্সের
দিকে। সংগী শুধু এই উষ্ট্র মহারাজ।
খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, কিন্তু সে আর
কিছুতেই পিছু হটে না। আলজিয়ার্স
বন্দরে তারতার‍্যাঁ উটটাকে এড়ানোর জন্যে
অলি গলি ঘুরে জাহাজের জেটিতে এল।
ক্যাপ্টেনের দয়ায় জাহাজেও একটু স্থান
পেল।

জাহাজ বন্দর ছেড়ে রওনা হল
মার্সাই বন্দরের দিকে। হঠাৎ দেখা গেল,
জাহাজের পাশ দিয়ে সাঁতরে আসছে সেই
উষ্ট্র মহারাজ। তারতার‍্যাঁ অপরাধীর মন
নিয়ে চেয়ে থাকে অন্য দিকে। ক্যাপ্টেন
জিজ্ঞেস করে, কী হে! উটটা তোমার
নাকি? 'না, না, আমার হতে যাবে কেন?
কোথাকার উট কে জানে?' —মাঝিমাল্লা
নামিয়ে ক্যাপ্টেন উটটাকে শেষে তুলে
নেয় জাহাজে।

জিন্দাবাদ

পালিয়ে পালিয়ে তারতার‍্যাঁ মার্সাই
শহরে উঠে পড়ে তারাসকগামী গাড়িতে।
গাড়ির পিছু পিছু থপ্ থপ্ করে চলছে
উষ্ট্র মহারাজ। কী কেলেংকারী, তার-
তার‍্যাঁ ভাবে। একটা পয়সা নেই, সিংহ
নেই, কিছু নেই, শুধু একটা উট নিয়ে
যেতে হবে তারাসকঁতে? কী কেলেংকারী!!

তারাস্‌কঁ ইস্টিশান। চারদিকে শহর-
ভাঙা জনসমুদ্র। জানালায় মুখ বাড়াবার
সংগে সংগে উঠল গগনভেদী আওয়াজঃ
'সিংহ-শিকারী তারতার‍্যাঁ—জিন্দাবাদ'
জিন্দাবাদ!' পার্শেলে পাঠানো সিংহের
চামড়া করেছে এই কাণ্ড। গোটা দেশে
ছড়িয়ে পড়েছে তারতার‍্যাঁর অসমসাহসিক
বীরপনার কথা। খবরের কাগজে
বেরিয়েছে কত কাহিনী, কত বিবরণ।
একটা সিংহ তো কী ছাড়! তারতার‍্যাঁ
শিকার করেছে সিংহ গণ্ডায় গণ্ডায়।
'তারতার‍্যাঁ—জিন্দাবাদ!'

দস্তুরমত মিছিল চলল তারাসকঁর
রাস্তা দিয়ে। ছাতে, জানালায়, বারান্দায়
নরনারীর মুখ। এবং গর্ব ও আনন্দ
উপচে পড়ল সকলের, যখন দেখা গেল
তারতার‍্যাঁর পশ্চাতে ধুলোমাখা, ঘর্মাক্ত
এক বৃদ্ধ উট। আরো জোরে ধ্বনি ওঠেঃ
'সিংহ-শিকারী তারতার‍্যাঁ—জিন্দাবাদ!
জিন্দাবাদ!!'

'তারতার‍্যাঁ সংগীদের আশ্বাস দিয়ে
বলেঃ 'ওটা আমারই উট।' তারসকঁ
শহরের আবহাওয়া লেগেছে তার গায়।
তারতার‍্যাঁ উটের পিঠে হাত বুলিয়ে বলেঃ
বড়ো চমৎকার জীব হে! যতগুলো সিংহ
শিকার করেছি, ও-তো ওর নিজের
চোখে দেখেছে।'

ঘন ঘন ওঠে আকাশ-কাঁপানো জনতার
কণ্ঠধ্বনি 'সিংহশিকারী তারতার‍্যাঁ—
জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!!'

অনুবাদকঃ খগেন দে সরকার

বর্তমান ফরাসী কবিদের কথা

অরুণ মিত্র

এক

কয়েক বছর আগে একজন ইংরেজ লেখক সখেদে প্রশ্ন করেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডে কোনো সার্থক কবির উদ্ভব হল না কেন যেমন হল ফ্রান্সে। তিনি নাম করেছিলেন, আরাগঁ এবং এলুয়ার-এর। গত একশ' বছর ধরে ফরাসী কাব্য জগতে যা ঘটেছে, তা থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। যুদ্ধ আর পরাধীনতার ট্র্যাজিডির পটভূমিতে সমসাময়িক ফরাসী কবিদের সাফল্য প্রাক্তন প্রয়াসের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে সাফল্য ভুঁইফোঁড় নয়; তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের পূর্বগামীদের ইতিহাস রয়েছে তার পেছনে।

দুঃসাহস যাত্রার পথে এগিয়ে যাবার এক মনোভাবে বর্তমান ফরাসী কাব্য অনুপ্রাণিত। তার বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তির মূল সেইখানে। আজকের কবিরা এই মনোভাব উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন তাঁদের অগ্রজদের কাছে থেকে। বোদলের, ভের্লেন, মালার্মে, করবিয়ের, লোত্রেয়াম', র‍্যাঁবো, লাফর্গ্, জারি, আপলিনের আরও কতজন, যেন একজনের পর একজন অভিযাত্রীর মিছিল, নতুন নতুন পথে পৃথিবী আর জীবনকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছেন। কাব্য আর শুধু রসাত্মক বাক্য থাকেনি, বাঁচবার একটা পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেকাদাঁ-স্যাঁবলিস্ত্ আমলে এবং তারপর আমাদের এই শতাব্দীতে যে কবিরা প্যারিসের কাফে কাবারেতে অদ্ভুত আচরণ ক'রে লোককে তাজ্জব বানিয়েছেন এবং যথেষ্ট বিদ্রূপও শুনেছেন, তাঁরা তার দ্বারা একটা বিশেষ মনোভাবই প্রকাশ করেছেন: নিছক অভ্যাসের বশে অনুসৃত জীবনযাত্রার ছকের প্রতি অবজ্ঞা এবং বিদ্রোহ। পূর্বগামী কবি প্রধানদের উদ্যম বিভিন্ন প্রকৃতির। বোদলের-এর কাব্য চেতনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল শহুরে মানুষ তার যন্ত্রণা অসুস্থতা ও জটিল অন্তর্বিরোধী ব্যক্তিত্ব নিয়ে, আধুনিক জীবনবোধের প্রবর্তন হল কাব্যে। লোত্রেয়াম' মানুষ আর মানুষের স্রষ্টাকে আক্রমণ ক'রে লিখলেন "অবচেতনার বাইবেল", মনকে ছেড়ে দিলেন এক নতুন পথে যেখানে অদ্ভুত অনুষঙ্গ থেকে সৃষ্টি হল এক নতুন সৌন্দর্যবোধ। র‍্যাঁবো চাইলেন জীবনকে পরিবর্তন করতে, সমস্ত প্রচলিত বোধকে উল্টে দিয়ে কবিকে দ্রষ্টা করতে। মালার্মের ধ্যান হল সৃষ্টির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছবার, পৃথিবীর অসম্বন্ধতাকে কবিতার সম্বন্ধতা দিয়ে অপসারিত করবার।

কবিদের এই যে দুর্গম যাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল, তার না ছিল কোনো সীমা, না কোনো নির্দিষ্ট দিক। প্রেরণার উৎস এক হওয়া সত্ত্বেও পথ যে কত ভিন্ন হতে পারে, আমাদের শতাব্দীতে তার এক প্রধান দৃষ্টান্ত পল ক্লোদেল এবং সুররিয়ালিস্টদের আচরণ। র‍্যাঁবোর নাম ক'রেই একজন অঙ্গীকার করলেন খৃষ্ট ধর্মীয় প্রত্যয়কে আর অন্য পক্ষ অগ্রসর হলেন সমস্ত স্বীকৃত প্রত্যয়কে উচ্ছেদ করতে।
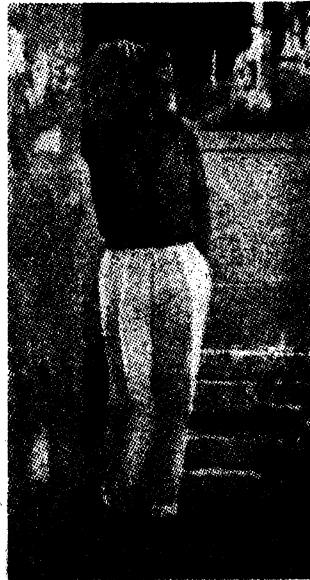
[illegible]

বর্তমান শতাব্দীতে সুররিয়ালিজম ফরাসী কাব্যের এক বিরাট আন্দোলন। তার পূর্বগামী স্বল্পায়ু দাদাইজ্‌ম্ ছিল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের আন্দোলন, নেতিবাচক। সব ঠাট ভেঙে ফেলো, সব ভড়ং, ভাষাকেও বাদ দিও না, সেও এক ভড়ং—এই রকম আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে দাদাইজ্‌ম্ আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে। তার অব্যবহিত পরেই আসে সুররিয়ালিজম্। ধ্বংসের ভূমিকা তার ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল নতুন মূল্য নিরূপণের উদ্যম। যুক্তির সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে মনকে অবাধে চলতে দিতে হবে, এক দিকে ছিল এই, অন্য দিকে শৈশব ও আদিম দৃষ্টির অন্বেষণ, আশ্চর্যকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস। সুররিয়ালিজমের বাণী কাব্যের মুক্তি আন্দোলনে এক প্রবল প্রেরণা জুগিয়েছে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের কাব্যক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মীও দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা স্বকীয় কীর্তির দৃষ্টান্ত ধরেন কনিষ্ঠদের সামনে। যেমন আপলিনের, যিনি কাব্য আর অকাব্যের সীমারেখা মুছে দিয়ে কবিতাকে সর্বগামী করেন। এই দৃশ্যপটের অপর প্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভালেরি; তাঁর গতি অন্যদিকে। যুক্তি ও বুদ্ধি ছিল তাঁর ঘোষিত নীতি, সুররিয়ালিস্টদের বল্গাহীন কল্পনার বিপরীত। কিন্তু মজার কথা এই, তাঁর বুদ্ধির "কসরৎ" শেষ পর্যন্ত নিজেকে অতিক্রম ক'রে হয়ে দাঁড়াল এক নেশা।

ফ্রান্স ছাড়া বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও কবি এবং কাব্য এমন তীব্রভাবে, এমন নিবিড়ভাবে বাঁচতে আরম্ভ করেনি, অন্য কোথাও একটার পর একটা সাহিত্য আন্দোলন এমন আত্মচেতনা নিয়ে দেখা দেয়নি। কবিদের মধ্যে ঐক্য এবং দায়িত্বের [illegible]

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে সংঘর্ষ। আধুনিক ফরাসী কাব্যের বিবর্তনের ইতিহাসে সাহিত্যিক মতভেদের জন্যে ব্যক্তিগত বিরোধ ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনা একাধিক ঘটেছে। কাব্যমতের সংঘাত দেখা দিলে ইংরেজ সুলভ শহবৎ ফরাসী কবিরা দেখাতে পারেন নি।

দুই

বর্তমান ফরাসী কাব্যে বিভিন্ন কবির উদ্যম এত ভিন্ন রকম যে তাদের পরিষ্কার শ্রেণী বিভাগ প্রায় অসম্ভব। গত যুদ্ধের সময় পরাধীনতার প্রশ্ন সব কিছু আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। তখন প্রতিরোধ ছিল এক সাধারণ চিহ্ন যা দিয়ে এক সাধারণ শ্রেণী নির্ণয় করা চলত, আর ট্র্যাজিডির একই অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন কবির কণ্ঠ একই সুরে মিলত। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চিন্তা ও প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক, নানা কবির মধ্যে যত মিল ছিল, মূলত অমিল ছিল তার চেয়ে বেশী। প্রবীণ আরাগঁ এবং নবীন এমানুয়েল যতই প্রতিরোধে এক হোন, তাঁদের মধ্যে সত্যিকার আত্মীয়তা থাকার কথা নয়; কারণ মানবমুক্তির জন্যে আরাগঁ কামনা করেন সর্বহারা বিপ্লব আর এমানুয়েলের দৃষ্টি নিবদ্ধ মানব পরিত্রাতা যীশু খৃষ্টের দিকে। এমন কি যে ক্ষেত্রে চিন্তার পরিমণ্ডল এক, সেখানেও পদ্ধতি প্রকরণ অত্যন্ত পৃথক, স্বরগ্রাম খুবই ভিন্ন। যেমন, পল ক্লোদেল (যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন) এবং পিয়ের জাঁ-জুভ। ধার্মিক ক্লোদেল তাঁর বিস্তৃত বাইবেলী গদ্য ছন্দে এক বিশাল হার্মনি গ'ড়ে তোলেন এবং পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক সমগ্রতার অনুভব; তাঁর সঙ্গে কণ্ঠস্বরের মিল কোথায় ধর্মবিশ্বাসী জুভের, যিনি তাঁর নিরন্তর অনুভূত ভালোমন্দের সমস্যায় মিশিয়ে দেন মনস্তাত্ত্বিক ও যৌনতাত্ত্বিক উপাদান এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গীকে যেন অনেকটা ইচ্ছে ক'রেই জটিল করেন? যাঁদের কাছে শব্দই ব্রহ্ম, কবির একমাত্র ভাবনা, তাঁদের মধ্যেই বা কতখানি মিল? রবের গাঁজো অতি যত্নে সংগঠিত করেন এক একটি কবিতা, মালার্মের মতো তাঁর

চেষ্টা শব্দের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আবিষ্কার করা; আর জাক আদিবের্তি শব্দ ছড়িয়ে দেন মুঠো মুঠো, যেন মুখরতা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই তাঁর।

ফ্রান্সে গত যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগ নতুন নতুন কবিকে লোকের সামনে তুলে ধরেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লেখা আরম্ভ করেন সুররিয়ালিজম্-এর অন্তিমকালে (১৯৩৪-১৯৩৮), কেউ কেউ আরও পরে। তাঁরা নিশ্চিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এবং স্বীকৃতিও লাভ করেছেন, যদিও কোনো কোনো কবি আশাভঙ্গও ঘটিয়েছেন। এই সব কবির মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল, এ'দের জন্মকাল ১৯০৭ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যেঃ গিলেভিক, আঁদ্রে ফ্রেনো, লুসিয়াঁ বেকের, জাঁ রুসলো, এমে সেজের (নিগ্রো কবি), জাঁ কেরল, পাত্রিস দ্য লা তুর দু প্যাঁ, পিয়ের এমানুয়েল, আঁরি পিশেৎ। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্নভাবে তাঁদের শ্রেণী বিভাগ এবং নামকরণ করেন, যথা আধ্যাত্মবাদী, আলঙ্কারিক, বিদ্রোহী, গীতিধর্মী, বাস্তববাদী, মানবতাবাদী, বস্তুতন্ত্রী ইত্যাদি। এ থেকে আর কিছু না হোক, আধুনিক ফরাসী কাব্যের বৈচিত্র্য অনুমান করা যায়।

সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক প্রধান কবি কোনো না কোনোভাবে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুররিয়ালিজমের 'সরকারী' নেতা আঁদ্রে ব্রতঁ ছাড়া আর সকলেই ঐ আন্দোলন থেকে স'রে এসেছেন অনেককাল আগে। এই কবিদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত হলেন লুই আরাগঁ। তাঁর কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণই সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের প্রথম বড় ভাঙন। কবি হিসেবে আরাগঁ গত যুদ্ধের সময়ই গৌরবের উচ্চতম শিখরে ওঠেন। সনাতন কাব্যরীতিকে নতুনভাবে এবং আশ্চর্যভাবে ব্যবহার ক'রে তিনি এক বলিষ্ঠ উচ্ছ্বসিত গীতিময়তা সৃষ্টি করেন, যা পরাধীন জাতির আশা ভালোবাসা, ঘৃণা ও ক্রোধকে অনবদ্য ভাষা দেয়। আরাগঁ'র যুদ্ধকালীন জনপ্রিয়তা যদিও কমেছে, তবু তাঁর প্রতিভা সন্দেহাতীত। কি গদ্যে কি পদ্যে তাঁর শিল্প নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। আরাগঁর পাশাপাশি একই সাহিত্যিক বিবর্তনের পটভূমিতে উঠে আসে আর একটি নামঃ পল এলুয়ার। তিনি আর বেঁচে নেই, কিন্তু সমসাময়িক কাব্যে তাঁর কীর্তি এখনও জীবন্ত। আধুনিক কালের মহৎ কবিদের তিনি অন্যতম। চিত্রকল্পের স্বকীয়তায় ও সমৃদ্ধতায়, অনুভবের ঘনিষ্ঠতায়, প্রেমের অকৃত্রিম মানবিক ব্যঞ্জনায় তাঁর কাব্যের তুলনা বিরল। এ'দের সমকালীন আর একজন বড় কবি হলেন ত্রিস্তাঁ ৎসারা। দাদাইজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা করেন ৎসারা, কিন্তু তাকে বর্জন ক'রে

পল এলুয়ার

চলে আসেন সুররিয়ালিজমে, সেখান থেকে এগিয়ে হিউম্যানিটেরিয়ানিজ্‌মে। ৎসারা নিজেই বলেন, তিনি এখন মানবতাবাদী। এককালে ধ্বংসে ছিল তাঁর মূলমন্ত্র, এলোমেলো বাক্যের স্রোতে এক মারমুখো তীব্রতা ছিল। এখন সেই বাক্যপ্রবাহ অনেকটা সুসম্বন্ধ। পূর্ণতর অস্তিত্বের জন্যে মানুষের প্রয়াস এবং মনোজগতের অন্তহীন আন্দোলন, এ দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনে তাঁর কাব্য ব্যাপৃত।

প্রাক্তন সুররিয়ালিস্টদের বয়োজ্যেষ্ঠ জুল সুপেরভিয়েল এবং পিয়ের রভেরদি বরাবর তাদের আন্দোলন থেকে তফাৎ ছিলেন। সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকেই এঁরা দু' জনে প্রতিভাশালী কবিরূপে স্বীকৃতি পান এবং দু' জনেই পরবর্তী জীবনে সে স্বীকৃতিকে বজায় রাখেন। সুপেরভিয়েল তো এখন মহৎদের মধ্যে একজন।

বিশ্বজগৎকে যে দৃষ্টিতে সুপেরভিয়েল দেখেন, তার কাছে পর বা দূর ব'লে কিছু নেই। পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তার সঙ্গে এক অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা তাঁর—মানুষ, পশু, গাছপালা, পাথর সব কিছুর সঙ্গে। এর মূলে জীবনের প্রতি এক নিবিড় প্রেম। অনেকখানি পথ চ'লে আসার পর এই ভাঙাচোরা ক্ষয়িষ্ণু জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে তার সৌন্দর্যকে তিনি এইভাবে উপলব্ধি করেনঃ

এই তো সুন্দর এই যে দেখেছি
পত্রগুচ্ছের নীচে ছায়া
এই যে অনুভব করেছি
বয়স নগ্নদেহের উপর সঞ্চরমান
আমাদের ধমনীর কালো রক্তের
বেদনার সঙ্গী হয়েছি
আর তার নীরবতাকে সাজিয়েছি
সহিষ্ণুতার তারায়............
এই যে অনুভব করেছি
ত্রস্তব্যস্ত হেলাফেলা করে ভালোবাসা জীবনকে
এই যে তাকে ধরে রেখেছি
এই কবিতার মধ্যে।

সমস্ত বস্তুর নিরবচ্ছিন্নতা, সব কিছুর প্রাণ তাঁর কাব্যে প্রতিধ্বনি তোলেঃ

হোমারের কাল থেকে সমুদ্রের এক ঢেউ
মনোরম উপকূল খুঁজে ফেরে যাতে তিন
সহস্র বছর মর্মরিত হয়ে ওঠে।

কিম্বা

এই গাছ এত কাছাকাছি, ওর মিল
সেই সব অপূর্ব স্মৃতির সঙ্গে যারা তাদেরই
ভস্মের মধ্যে নড়ে।

কিম্বা

সৃষ্টির সব কম্পমান পশু
আমার ধমনীর সঙ্কীর্ণ খালের মধ্যে বেঁচে।

সুপেরভিয়েল নিজে বলেছেন, "আমি অনুভব করি একই সময়ে আমি সর্বত্র উপস্থিত আছি, যেমন স্থানের মধ্যে তেমন হৃদয় ও চিন্তার বিভিন্ন এলাকায়।" এ অনুভূতি তাঁর কাব্যে স্পষ্ট। প্রত্যক্ষ যা নয় তার উপস্থিতি তাঁর কাছে প্রত্যক্ষের মতোই সত্য। তাই মৃত্যুও তাঁর

ছ মৃত নয়ঃ

কিছু পৃথিবীতে মরে গেছে
থেকে নিশ্বাসে জীবনে টেনে ফেরে
অন্ধকারে বিস্মৃতি বেড়ে ওঠে
ক জিজ্ঞাসা করে ফেরে।

সুপেরভিয়েল-এর জগতের কেন্দ্রে
তু সেই মানুষ যার সঙ্গে সংযোগেই
কিছু অর্থময়। মানুষের দৃষ্টি,
ুষের মনোযোগ যখন নিবদ্ধ হবে না
নই সব কিছুর বিলোপঃ

ত্র বলে মনে মনে, "আমি এক সুতোর
ডগায় কাঁপছি
কেউ আমার কথা না ভাবে তাহলে আমি
আর থাকি না।"

বা

ন কেউ তার দিকে তাকায় না
ন সমুদ্র আর সমুদ্র নয়
হয়ে যায় আমাদের মতো
ন কেউ আমাদের দেখে না

বিলুপ্তি, নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণাকে পিয়ে সুপেরভিয়েল-এর কাব্য সৃষ্টি রছে পৃথিবীর এক বিশাল জীবন-হিনী। যুক্তি বা মতবাদ দিয়ে সংগঠন ক'রে নয়, আত্মীয়তায় অনুভব ক'রে। তাঁর কাছে মানুষের দায়িত্ব তাই স্বতস্ফূর্তঃ

পৃথিবীর ভার বহন করা কি কঠিন!
লোকে বলবে
প্রত্যেক মানুষের পিঠেই তার ভার রয়েছে।
কিন্তু তাকে আর একটু দূরে তো বয়ে নিয়ে
যেতে হবে সব সময়ে
যাতে আজ থেকে আগামীকালে সে উত্তীর্ণ
হয়।

পিয়ের রভেরদির কবিতা অন্য জাতের। তিনি এক নতুন প্রকাশরীতি প্রবর্তন করেন ব'লে একদা তাঁকে সুররিয়ালিস্টরা 'গুরু' বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। যৌবনে তিনি পিকাসো প্রমুখ চিত্রকরদের সাহচর্যে কিউবিস্ট আন্দোলনে জড়িত ছিলেন (আপলিনের ও মাক্স জাকব ছিলেন তাঁর সঙ্গে।)। তখন তাঁর কবিতা কিউবিস্ট নামে অভিহিত হয়েছিল, এখনও হয়। কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা কিউবিস্ট চিত্রসুলভ এক নিশ্চলতা ও সমরূপতা স্মরণ করিয়ে দেয়। রভেরদি তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন, কবিতা হল "সেই ফটিক-দানা (crystal) যা বাস্তবের সঙ্গে মনের উথল সংস্পর্শে জমাট বাঁধে!" এ সংজ্ঞা তাঁর কবিতা সম্বন্ধেই সব চেয়ে বেশী প্রযোজ্য। তাঁর মনের ওঠাপড়াকে বাইরের বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করার সূক্ষ্ম চেষ্টা থেকে যে সব কবিতার জন্ম হয় তারা স্বচ্ছ ফটিক-দানার মতো, সেখানে বিলীয়মান মুহূর্তের রহস্য যেন কেন্দ্রীভূত হয় এবং প্রধানত একটা উদ্বেগের অনুভূতি বিকীর্ণ করে। যে উদ্বেগ আমাদের সময়ের উপর চেপে আছে তারই বিকীরণ? হয়তো তাই। একটি ছোট কবিতা শুনুনঃ

সব নিবে গেছে
হাওয়া মর্মর শব্দে বইছে
আর গাছগুলো শিউরে উঠছে
জন্তুরা মরে গেছে
কেউ আর নেই
দ্যাখো
তারারা আর জ্বলছে না
পৃথিবী আর ঘুরছে না
একটা মাথা ঝুঁকে পড়েছে
তার চুল রাতের উপর দিয়ে ছড়িয়ে আছে
শেষ গির্জাচূড়া দাঁড়িয়ে
রাত বারোটা বাজল।

রভেরদির কবিতায় মুখরতা এবং চমকপ্রদ চিত্রকল্প একেবারে অনুপস্থিত। তিনি যে সব শব্দ ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, তা সহজ সাধারণ, এমনকি অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাতে তাঁর বাক্য দুর্বল হয় না, বরং তাঁর কণ্ঠস্বরের অকৃত্রিমতাই জোর পায়।

সুপেরভিয়েল ও রভেরদি প্রাচীন কবিদের দলে। এ'দের প্রায় সমসাময়িক আরও কয়েকজন আছেন, যাঁরা আধুনিক ফরাসী কাব্যে কিছু কিছু নিজস্ব সুর এনেছেন, যেমন স্যাঁ-জন পের্স এবং জাঁ কক্‌তো। প্রাচীনদের উল্লেখে আর একজনের নাম স্মরণীয়। তিনি হলেন ব্লেজ সাঁদ্রার। আধুনিক যন্ত্রযুগের গান গেয়েছেন সাঁদ্রার তাঁর প্রবলকণ্ঠ কাব্যে। ভবঘুরের মত পৃথিবীর নানা দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে সহজলভ্য উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, "এই যে রয়েছি এইটাই তো এক সত্যিকার সুখ" এবং "আমরা বিষণ্ণ হতে চাই না।" কিন্তু বর্তমানের উল্লাসকে আঁকড়ে

ধরা সত্ত্বেও সাঁদ্রার শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি ও সন্দেহকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, লিখেছেন ঃ

প্রভু, আমি বাড়ি ফিরেছি ক্লান্ত, একলা আর খুব বিষণ্ন
আমার শয্যা কবরের মতো নিরাবরণ
প্রভু, আমি একেবারে একা, আমার জ্বর এসেছে
আমার শয্যা শবাধারের মতো ঠান্ডা
প্রভু, আমি চোখ বন্ধ করেছি, আমার দাঁত ঠকঠক করছে
আমি অত্যন্ত একা, আমার শীত করছে, আমি তোমাকে ডাকছি
লক্ষ লাটিম ঘুরছে আমার চোখের সামনে
না, লক্ষ মেয়ে; না, লক্ষ বেহালা
প্রভু, আমি ভাবছি আমার দুঃখের মুহূর্তগুলোর কথা......
আমি তোমার কথা আর ভাবছি না, আমি তোমার কথা আর ভাবছি না।

একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে ফ্রান্সে যে কবিরা সব চেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তাঁরা কেউ তরুণ নন। কারো বয়স ৪৭-এর নীচে নয়। গত মহাযুদ্ধের পরেই তাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন। যদিও লিখছেন অনেক দিন থেকে। তাঁদের মধ্যে দু' জন হলেন রেমঁ কনো ও ফ্রাঁসিস পঁজ। কনোর বিস্ময়কর বাকচাতুর্য সব কিছুকেই উপহাস্য ক'রে তোলে, এমনকি কবিতা লেখাকেও। মনে হয়, তাঁর ব্যঙ্গ যেন মানুষের যা কিছু প্রিয় তাকে নস্যাৎ করতে চায়, নিজের সত্তাও তা থেকে বাদ যায় না। তার ফলে কনোর কাব্য পাঠকের মনে এক গভীর অস্বস্তি জাগায়, মানুষের এক অর্থহীন অবস্থার ছাপ পাঠকের মনে রেখে যায়।

ফ্রাঁসিস পঁজ-এর জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি চিত্রকরদের মতো স্টীল্ লাইফ্-এর ছবি আঁকেন। পাথরের নুড়ি, কমলা লেবু, শামুক, ঝিনুক, রুটি, এই সব হল তাঁর রচনার বিষয়। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত-ভাবে তিনি বহির্বস্তুর বর্ণনা করেন, লেখকের ব্যক্তিগত আবেগকে তার কাছে ভিড়তে দেন না। কিন্তু তাঁর প্রক্রিয়া কবি এবং বর্ণিত বস্তুর মধ্যে একটা একাত্মতা নিয়ে আসে, যার ফলে কবিতা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে দু' পক্ষেরই যেন এক নতুন অস্তিত্ব শুরু হয়, কবিতা লেখা হওয়ার আগে ঠিক বেরকমটা ছিল না। পঁজ একে বলেন সহ-জন্ম (co-naissance)। তাঁর

জুল সুপারভিয়েল

কবিতার বাহন হল গদ্য, স্বচ্ছন্দ নমনীয় ফরাসী গদ্য। তার সাহায্যে তিনি মানুষ আর দৃশ্য বস্তুর মধ্যে এক অলক্ষ্য সহানুভূতির বন্ধন গ'ড়ে তোলেন। মানুষের কথা পঁজের কাব্যে এইভাবে আসে। প্রকৃতির সংজ্ঞা দিয়ে মানুষ নিজেকে আবার বুঝবে, এই তাঁর কামনা।

কিন্তু বর্তমান ফরাসী কাব্যে এঁদের চেয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অন্য তিনজন কবি, যাঁরা গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রধান লেখক ব'লে স্বীকৃত হয়েছেন! তাঁরা হলেন জাক প্রেভের, আঁরি মিশো এবং রনে শার। গত যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাঁরা অল্পবিস্তর উপেক্ষিতই ছিলেন।

এই তিনজনের মধ্যে প্রেভের এক বিশেষ কৌতূহল জাগ্রত করেছেন, যার জন্যে ফরাসীরা বলে le cas Prevért। তিনি কাব্যকে নিয়ে গেছেন জনসাধারণের কাছে। যে সময় আধুনিক কাব্য 'বিশেষজ্ঞ' মনের সংরক্ষিত এলাকা ব'লে বিবেচিত হচ্ছিল এবং জনসাধারণ সসম্ভ্রমে দূরে স'রে ছিল, তখন প্রেভের তার প্রবেশদ্বার খুলে দিয়েছেন সকলের কাছে। সব চেয়ে আশ্চর্য এই, তিনি এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন তুচ্ছতা এবং স্থূলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, আধুনিক কাব্যের জটিল উদ্ভাবনাকে অস্বীকার না ক'রে। এই হল প্রেভের-রহস্য le cas Prevért। প্রেভের-এর বইয়ের বিক্রি ঔপন্যাসিকদেরও ঈর্ষার বিষয়; তাঁর প্রথম বই Paroles এ যাবৎ হাজার পঞ্চাশেক বিক্রি হয়েছে। কেন তাঁর এই জনপ্রিয়তা? এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে প্রেভের আসলে প্রথম শ্রেণীর কবি ন'ন ব'লেই এত জনপ্রিয়। কিন্তু শ্রেণী-নির্ণয়ের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, প্রেভের অগ্রাহ্য করবার মতো কবি ন'ন এবং সেইজন্যেই তাঁকে নিয়ে এত মাথা-ঘামানো। প্রেভের-এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা কেন, তার উত্তর তাঁর রচনার মধ্যেই রয়েছে। তাঁর কাব্য সাধারণ মানুষের আবেগকে প্রতিফলিত করে এমন এক ভাষায় যাতে তিনি কথ্য ভাষার আস্বাদ সঞ্চার করতে পারেন। লোকে যে ভাবে কথা বলে আভিধানিক না হ'য়ে, সতর্ক না হয়ে, ছক তৈরী না ক'রে,

তেমনিভাবে প্রেভের কবিতা লেখেন, আর তাঁর কবিতায় গল্প বলার সুর নিয়ে আসেন। তাঁর সেই ভঙ্গিতে তিনি প্রকাশ করেন মানুষের অবস্থাকে, যে ভালোবাসা ও তিক্ততা, যে করুণা ও মাধুর্য তাকে আজ নাড়ায় সেই আবেগকে। সাধারণ ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তিনি যেমন আঁকেন সহজ এক বাঁচার আনন্দ, তেমন জীবনের ক্রূরতা ও প্রবঞ্চনা। কখনও বলেন ঃ

হাজার হাজার বছরেও কুলোবে না
যদি বর্ণনা করতে যাই
চিরন্তনকালের সেই ছোট্ট মুহূর্তটা
যখন তুমি আমাকে চুমু খেলে
যখন আমি তোমাকে চুমু খেলাম
শীতের এক সকালের আলোয়
মঁসুরি পার্কের ভিতরে প্যারিসে
প্যারিসে
পৃথিবীর উপর
পৃথিবী সে এক নক্ষত্র।

আবার কখনও বলেন ঃ

উপোসী দিশেহারা ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট
সম্পূর্ণ একা কানাকড়ি শূন্য
একটা ষোল বছরের মেয়ে
নিশ্চল দাঁড়িয়ে
প্লাস দ্য লা ক'কর্দে
পনেরই অগস্ট দুপুরে।

কিম্বা ঃ

কী সাংঘাতিক
শক্ত ডিমের ছোট্ট আওয়াজটা
রেস্তোরাঁর বারকোসের উপর ভাঙার সময়
সাংঘাতিক এই আওয়াজটা
যখন তা ক্ষুধার্ত মানুষটার
স্মৃতির মধ্যে নড়তে থাকে।

প্রেভের-এর কবিতা লোকের কাছে বন্ধুর মতো, ফাঁদে পড়তে তাদের বারণ করে ঃ

ওখানে যেও না
সব আগে থেকে যোগসাজসে ঠিক হয়ে আছে
প্রতিযোগিতাটা একেবারে সাজানো।

মারাত্মক শ্লেষের মধ্যে দিয়ে প্রেভের নাটেরগুরুদের দেখিয়ে দেন; যারা তাদের ক্ষমতা, উন্নাসিকতা আর অমানুষিকতা দিয়ে জীবনকে দুঃসহ ক'রে তুলেছে তাদের টেনে আনেন সামনে। তাঁর বিখ্যাত সুদীর্ঘ কবিতা Diner des Testes a Paris-France তাঁর এই শ্লেষ-ক্ষমতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দীর্ঘতর কবিতা La crosse en Air-এও সে পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও রাতের পাহারাদার ও ডানাভাঙা পাখীর কথায় সে কবিতা এক নিবিড় করুণ অথচ আশাময় সুরে শেষ হয়েছে।

প্রকাশপদ্ধতিতে প্রেভের-এর মুন্সীয়ানা যথেষ্ট। তিনি আশ্চর্য সাবলীলতার সঙ্গে এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক চিত্রকল্প থেকে আর এক চিত্রকল্পে চ'লে যান; কখনো তাদের তরতর ক'রে ব'য়ে যেতে দেন, কখনো ভেঙে ফেলেন, উল্টে-পাল্টে দেন, এক অনুষঙ্গকে আর এক অনুষঙ্গে মিশিয়ে দেন। সুররিয়ালিস্ট 'স্বয়ং-চল রচনা'র শিক্ষা তাঁর ভাষায় পরিস্ফুট।

আঁরি মিশো ফ্রান্সের অন্য সব কবি থেকে একেবারে পৃথক। তাঁর এডভেঞ্চারে তিনি একক। মিশো এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি ক'রে তাকে তাঁর কল্পনার প্রাণী ও বস্তু দিয়ে ভরেছেন; তাঁর নিজের সত্তাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। অবিচল অধ্যবসায়ে সেই জগৎকে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেন। অদ্ভুত ভ্রমণ বা অদ্ভুত দেশের বর্ণনাই হোক বা কল্পিত কোনো ব্যক্তির জীবনকাহিনীই হোক অথবা নিজের মানসজীবনের চিত্রই হোক, সবই তাঁর
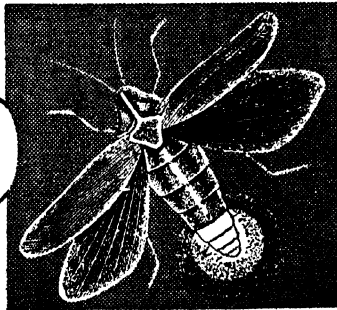
রনে শার

সেই জগতের বৃত্তান্ত। কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, মিশো যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা ইচ্ছা পূরণের জগৎ নয়, সে হল অনিশ্চিততার জগৎ, অদ্ভুত ও হৃদয়হীন ঘটনার জগৎ, যা কাউকে আশ্বস্ত করে না। সুতরাং তথাকথিত পলায়নী বৃত্তির অপবাদ তাঁকে দেওয়া যাবে না। যে রাজার মূর্তি তাঁর ঘরে রাজত্ব করে তাকে তিনি অপমানিত করেন, ভেঙেচুরে ফেলতে চান, কিন্তু সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকে আবার রাজত্ব করে; যে নারীকে তিনি সম্ভোগ করতে চান সে তার কাছে এসে পাখীর মতো ছোট হয়ে যায়; এমন কি রুটিটা পর্যন্ত জন্তু হয়ে খেতে চায়—তাঁর জগতে কাউকে বা কিছুকে আপন ক'রে পাওয়া যায় না। তাঁর স্বপ্নের জগতে স্বপ্ন নেই, তা যেন আমাদের বাস্তব অবস্থারই তীব্রতম প্রতিরূপ। কাল্পনিক রূপান্তরে তিনি বাস্তব জগতের বৈর পরিপার্শ্বকেই যেন প্রকাশ করতে চান। এ এক নিরাশাবাদ। কিন্তু মিশোর নিরাশাবাদে একমাত্র স্বস্তিকর বিষয় হল শিল্পকর্মে তাঁর আস্থা। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি লেখেন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, "শত্রু জগতের চেপে ধরার শক্তিগুলোকে" ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। বোধ হয় শিল্প সৃষ্টির উদ্যমেই তিনি খুঁজে পান একমাত্র এলাকা যেখানে মানুষ নিজের প্রভু, যেখানে সে [illegible]

প্রধানত লেখেন গদ্যে, যাতে কোনো 'কাব্যিকতা' নেই।

রনে শার তাঁর কাব্যের সুরে মিশোর সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবী ও জীবনের প্রতি ভালোবাসায় তা ধ্বনিত। কিন্তু সে ভালোবাসার মূলে আছে জীবনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে তাঁর চেতনা। তাঁর অনুভূতি সরল রেখায় আঁকা নয়; ছায়া আলো শূন্যতা উচ্ছলতার জটিল রেখায় মূর্ত। তারই মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো প্রকাশ পায় মানুষের মুখ, ভবিষ্যতের দিকে বাড়ানোঃ

এই তো মৃত বালি, এই তো শরীর পরিত্রাণ পেল
নারী নিশ্বাস নেয়, পুরুষ সোজা দাঁড়িয়ে।

তাঁর কাব্যে যে-আশা মাঝে মাঝে দীপ্ত হয়ে ওঠে, তার কেন্দ্রে কবি। কবির আশার মধ্যেই সমস্ত জগৎ বেঁচেঃ "অদৃশ্য হয়ে যাবার আকুলতা সত্ত্বেও আমার ছিল অপর্যাপ্ত প্রতীক্ষা, দুর্দম বিশ্বাস। হাল ছাড়া নয় কোনোমতে।" দৃপ্ত কণ্ঠে শার ঘোষণা করেনঃ "প্রত্যেকবার সব প্রমাণ যখন ভেঙে পড়ে, তখন কবি জবাব দেয় কামানের মতো ভবিষ্যৎ দেগে।"

মুক্তিকে উল্লেখ করে তিনি বলেনঃ
"তার কথা অন্ধ মেষ ছিল না, ছিল সেই চিত্রপট
যাতে আমার নিশ্বাস অঙ্কিত হয়েছিল।"

শার তাঁর রচনায় শব্দবাহুল্যকে সর্বদা পরিহার করেন, তা অপরিহার্য শব্দের এক ঠাসবুনোনি। এর ফলে প্রথম পাঠে তাঁর কবিতা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য। কিন্তু দরদী ও অধ্যবসায়ী পাঠক ক্রমে আবিষ্কার করেন তাঁর ব্যবহৃত শব্দের বিশেষ শক্তি, যাকে ফরাসী সমালোচকেরা আখ্যা দিয়েছেন valeur explosive। তা ছাড়া এক একটা উজ্জ্বল চিত্রকল্পে তাঁর বক্তব্য প্রায়ই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।
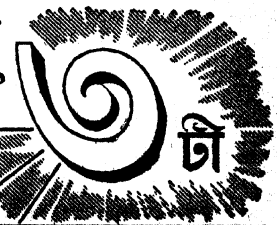
ফরাসী আর ইংরেজ

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মাঝে ইংলিস চ্যানেল। ব্যবধান পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইলের বেশি নয়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে তফাৎ একেবারে আকাশপাতাল—কি আচারে-ব্যবহারে, কি পোশাকপরিচ্ছদে, কি খাওয়াদাওয়ায়, কি ধ্যানধারণায়, এমন কি চলাফেরা বলা-কওয়ায় ওঠাবসায় পর্যন্ত!

আমি যখন প্রথম বিলাত যাই তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। টমাস কুকের বড়ো সাহেব মিস্টার ডোল্‌টন উপদেশ দিলেন, পথে কোথাও নামা উচিত হবে না; যদিও ইটালীর নেপ্‌লস ও ফ্রান্সের তুলঁ জাহাজের রুটেই পড়ে। কারণ, তখন কন্টিনেন্টের রেলগাড়ির গতিবিধির কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। ডোল্‌টন বললেন, জংশন স্টেশনে দু-তিন-চার দিনও পড়ে থাকতে হতে পারে। আমি তাই সোজা গিয়ে নামলুম টিল্‌বেরী ডক্‌সে। প্যারিস সেবার আর দেখা হল না।

এর আগেই ফরাসি ভাষার সামান্য কিছু চর্চা করা গিয়েছিল। কোনো কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এমনি-এমনি। আসলে খানিকটা ল্যাটিন শেখার প্রয়োজন ঘটেছিল। আমি যে আইন পড়তে বিদেশে যাব, এটা অনেকদিন আগের থেকেই জানা ছিল। শোনা গিয়েছিল, আইনের পরীক্ষায়—বিশেষত ইউনিভারসিটির পরীক্ষার দ্বিতীয় অংশ জুরিস্‌প্রুডেন্সে—কিঞ্চিৎ ল্যাটিন জানা থাকলে নাকি সুবিধে হয়।

আমাদের বাড়ির কাছেই হোম্‌স বলে এক ফিরিঙ্গি সাহেব বাস করতেন। সাহেব ফিরিঙ্গি হলেও ইংরিজি জানতেন ভালো, আরো পাঁচরকমের অন্য ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স-এর ছাত্ররা তাঁর কাছে ল্যাটিনে কোচিং নিত। আমি তাঁর কাছে ভর্তি হলুম। দুটো ভাষাতে একসঙ্গে কোচিং নিলে দক্ষিণার কিছু শস্তা হয় বলে, স্থির হল হপ্তায় দুদিন ল্যাটিন আর দুদিন ফ্রেঞ্চ। সাহেবের কাছে মেন্সা (টেবিল), মেন্সে, মেন্সা ইত্যাদি ল্যাটিন শব্দরূপ, আর জ্যে পোর্ত, (আমি বহন করি) তু পোর্ত, ইল্‌ পোর্ত ইত্যাদি ফ্রেঞ্চ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে লাগলুম। ফ্রেঞ্চে লা ফঁতে'র কথামালা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় বিদেশ যাত্রা।

বিলাতে প্রায় আটমাসকাল বাস করার পর লং ভেকেশন অর্থাৎ লম্বা ছুটি পড়ল। প্যারিসে তখন আমাদের জানা কার্পেলেস পরিবার ছিলেন। পরিবার বলতে এমন কিছু নয়। মা ও দুই মেয়ে, আঁদ্রে আর সুজান। এঁরা আমাকে প্যারিসে আসার নিমন্ত্রণ জানালেন। ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের তখন ভাঙন ধরেছে অধোগতির মুখে। রোজ পড়ছে তো পড়ছেই। ভাবলুম, শস্তায় কিস্তি পেয়ে প্যারিসযাত্রা কিছু মন্দ কর্ম হবে না, ভালোই হবে। টক্‌ করে টমাস কুকের ওখানে গিয়ে প্যারিসের টিকিট বুক্‌ করে ফেললুম।

জাহাজ থেকে কালে বন্দরে নেমে দেখি, এ কি ব্যাপার! কিউ সিস্টেম নেই, সকলেই ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি ধস্তাধস্তি করে, আগে যাবার জন্যে। চীৎকার ঝামেলা বহু। আমাদের দেশের রামারে, শ্যামারের মতোই ডাকছেড়ে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি! আমি একটু হক্‌চকিয়ে গেলুম। সবে ইংল্যান্ড থেকে নেমেছি। সেখানে সব-কিছু বেশ শান্তশিষ্ট। কোথা থেকে এক ষণ্ডামার্কা কুলি এসে আমার হাত থেকে দুটো সুটকেশই ছিনিয়ে নিল। কি যে বলল, তার এক-বিন্দুও আমি বুঝতে পারলুম না। ফ্রেঞ্চ শিখেছি বলে মনে-মনে একটু গর্বই ছিল। কিন্তু কুলি না বোঝে আমার ভাষা, আমি বুঝি না তার ভাষা। যাই হোক, আমি ফ্রেঞ্চ ছেড়ে ইংরিজি ধরলুম। তাতেও যখন শানালো না, তখন বাংলাই চালিয়ে গেলুম। ফল একই।

কাস্টমস্‌ পেরিয়ে প্যারিসগামী ট্রেনে ওঠা গেল। ইংল্যান্ডে একই সঙ্গে মাইলের পর মাইল চলেছি, কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মুখের উপর খবরের কাগজ ধরে শুধু আড়চোখে এক-আধবার সহযাত্রীর দিকে তাকায়। চোখাচোখি হয়ে গেলে আবার খবরের কাগজের পিছনে মুখ লুকোয়। কিন্তু

এখানে এক মিনিট যেতে না যেতে সব পরিচয় হয়ে গেল, কোথায় যাবে, কি করবে, কোথা থেকে আসছে। ঠিক দেশেরই মতো। বিদেশ থেকে প্রথম প্যারিসে যাচ্ছি শুনে, প্যারিসে কোথায় কি দেখবার আছে এক মুহূর্তেই সব জানিয়ে দিলেন। কম্পার্টমেণ্টের এক কোণে এক আধাবয়সী ইংরেজ মহিলা চোখে চশমা এ'টে এক ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন দেখছিলেন। আমার উপর তাক করে তিনি মৃদুস্বরে জানিয়ে দিলেন, পথেঘাটে অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে বেশি মাখামাখি ভালো নয়।

আমিয়াঁ স্টেশন এসে গেল। খুব বড়ো স্টেশন। মহাযুদ্ধে জার্মানরা এখানেও ঠেলে এসেছিল। ভাবলুম, এই বেলা এক পাত্র চা খেয়ে নেওয়া যাক্। কিন্তু কোথায় চা? স্টেশনের এক মুড়ো থেকে অপর মুড়ো পর্যন্ত খ'ুজেও চায়ের সন্ধান পাওয়া গেল না। কফি এক পেয়ালা পাওয়া যেতে পারে শুনলুম। কিন্তু আমার যা ধাত, বিকেলে কি রাত্তিরে কফি খেলে সেদিনকার মতো ঘুমের দফা গয়া। ভ্যাঁ রুজ্ কি ভ্যাঁ ব্লাঁশ অর্থাৎ লাল কি সাদা মদ বিস্তর আছে। কিন্তু ও দুটোর কোনোটাতেই আমার রুচি না থাকায় অগত্যা এক বোতল লিমনাদ্ সাদা ভাষায় লেমোনেড জোগাড় করে কোনোক্রমে গলা ভিজানো গেল। কিন্তু মুখটা তিতো হয়ে রইল। ফরাসী লেমোনেডে মিষ্টি বড়ো কম।

ট্রেন এসে প্যারিসের গার্ দু নর্দ-এ থামল। কার্পেলেসরা শহরতলির ওতোই অঞ্চলে বোসেজুর বলে এক প্রাইভেট্ হোটেলে আমার বাসথান স্থির করে একটা ঘর ভাড়া করে রেখেছিলেন। এক ট্যাক্সি ভাড়া করে ড্রাইভারকে ঠিকানাটা দিয়ে বললুম, একটু শহর ঘুরিয়ে নিয়ে চল। লোকটা আমার ফ্রেঞ্চ বুঝলো কিনা জানি নে, কিন্তু এমন মুখভঙ্গী করে ঘাড় নাড়া দিয়ে আমার দিকে তাকালো যে, বলতে চায় যেন, ঢের হয়েছে, সব বুঝেছি, অতো আর ফ্যাচফ্যাচ কোরো না হে ছোকরা।

বেশ ভালো করে শহর ঘুরিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার নিয়ে চলল। কিন্তু ভয় ভয় করতে লাগল। এমন বেপরোয়াভাবে ট্যাক্সি চলছে যে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল যেন এইবার বুঝি ফুটপাতের উপর উঠে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য হাতের টিপ্! যায়-যায় করেও ঠিক চলে গেল। কিন্তু এতে সোয়াস্তি থাকে না। তবু শহর যা দেখলুম, তাতে তাজ্জব বনে গেলুম। কোথায় লাগে লণ্ডন শহর। ফরাসী আর ইংরেজদের সৌন্দর্যজ্ঞানের মধ্যে আসমান জমীন ফারাক। প্ল্যাস দ' লোপেরা, প্ল্যাস দ' লা কংকর্দ স'জেলিজে পার হতে-হতে মনে হতে লাগল, এরকমটা আর কোথাও দেখিনি। বাড়িগুলো ইংরিজি বাড়ির মতো এক প্যাটার্নের নয়। সবগুলোর মধ্যে খানিকটা করে যেন ব্যক্তিত্ব ফুটে আছে। দেখতে-দেখতে চোখ মরে যায় না।

অবশেষে হোটেলে পে'ছিনো গেল। কর্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির দোরগোড়ায় ট্যাক্সি এসে থামতে তিনি বেরিয়ে এসে সাদর আহ্বান জানালেন। যেন কতো আপনার লোক। বিলিতি হোটেলে ঠিক এমন আত্মীয়তার সমাদর দুর্লভ। একটি চাকর আমার স্যুটকেশ দুটো কাঁধে চড়িয়ে আমার ঘরে নিয়ে গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তার ন্যায্য প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে কিছু উপরি বখশিশ্ দিলুম। কিন্তু কি বিপদ! লোকটা বিদায় না হয়ে হাত-পা ছ'ুড়ে নেচে কু'দে লা-লা করে চীৎকার ঝামেলা লাগিয়ে দিলে। ব্যাপার কি? না, বখ্শিশের পরিমাণ কিছু কম হয়েছে। আর কটা ফ্রাঙ্ক নোট ছ'ুড়ে দিলুম। ইংরেজ ট্যাক্সি ড্রাইভার এরকমটা কোনো-মতেই করত না। শুধু এমন এক বক্র বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ নিক্ষেপ করত যার ফল অনিবার্য। কিন্তু এরকম দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি কখনোই করত না।

হোটেলকর্ত্রী জানালেন, কার্পেলেসরা বসে থেকে থেকে আপনার দেরি দেখে বাড়ি

ফিরে গেছেন। আপনার রাত্তিরের খাওয়া সেখানে। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে সেখানে যাবেন। এখন আপনাকে কিছু দিতে পারি কি? আমি বললুম, এক পেয়ালা চা পেলে কিছু মন্দ হয় না। চা? চা তো আমাদের এখানে নেই। আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমি মুদির দোকানে লোক পাঠিয়ে দেখি, পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু তৈরি করা আপনাকে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে, আমি জানিনে। সলজ্জ কৌতুকে কর্ত্রী কথাগুলো জানালেন। আমি বললুম, আমাদের দেশে কথা আছে, ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হয় না। সুতরাং আপনি যদি চা জোগাড় করতে পারেন তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে তা তৈরি করে নিতে পারব।

দোতলায় শোবার ঘরে গেলুম। ইংলণ্ডে এইরকম ছোটখাট হোটেলে এতো ভালো আসবাবপত্তর দেখা না গেলেও সেখানে এখানকার চেয়ে সব জিনিস বেশি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ফরাসীদের সব ব্যাপারেই যেন অনেকটা আমাদের মতোই এলোমেলো ভাব। হাতমুখ ধুয়ে নিচে নেমে দেখি, কর্ত্রী ছোট এক প্যাকেট চা জোগাড় করেছেন। চা তৈরি করে কর্ত্রীকে বললুম, আপনি এক পাত্র আমার সঙ্গে পান করলে আনন্দ পাই। কর্ত্রী প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর একটু ইতস্তত করে জানালেন যে, তিনি চা কখনো খান নি। মুখ দেখে মনে হল ভাব এই যে, ঐ ইংরিজি বিষ খেয়ে তিনি অকালে মরতে রাজি নন। আমি তখন বললুম, তাহলে এক পাত্র কইনাগ্ আপারিতিফ্ চলুক। খুশিতে কর্ত্রীর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন, আমি সমজ্‌দার ব্যক্তি। ফ্রান্সে এরকমটা চলে। উঁচু নিচুর ব্যবধান ইংল্যাণ্ডের চেয়ে সেখানে কম। হোটেলের লোকরা অতিথির সঙ্গে বসে খেলে কিছু দোষের হয় না। খরচাটা অবশ্য অতিথিরই বিলে যায়।

কারপেলেসদের বাড়ি হোটেলের কাছেই। খুঁজে বের করতে দেরি হল না। হোটেলকর্ত্রী বেশ গুছিয়েই সব নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন। ২৭নং রু দু দক্‌তর গ্রাস-এ এসে খবর নিতে শুনলুম, কারপেলেসরা তিনতলায় থাকেন। কারপেলেসদের বাবা মারা যাবার

স্কেচ্। লিয়োনার দ্য ভিন্‌চি (১৪৫২-১৫১৯)

পর তাঁদের অবস্থা পড়তির দিকে। প্যারিসে অবস্থা যতো পড়তে থাকে ততোই উপরের দিকে উঠতে হয়। আমার তখন জোয়ান বয়েস। তেতলা কি চার-তলা টক্ টক্ করে উঠে যেতে কিছুমাত্র কষ্ট হত না। ঘণ্টা টিপতে আঁদ্রে স্বয়ং এসে দরজা খুলে দিয়ে আমাদের দিশি প্রথায় আমাকে নমস্কার জানালেন। ঘরে ঢুকে মনে হল, তেতলা হলে কি হয়; একতলার চেয়ে ঢের বেশি খোলামেলা। ঘর থেকেই সুরের বোয়া দ' বুলোঁ-এর বড়ো বড়ো গাছগুলো দেখা যায়।

কারপেলেসরা দুই বোন যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। ছোট সুজান হাসিখুশিতে ভরা, চঞ্চল, কথা বলতে ওস্তাদ, বড়ো বোন আঁদ্রে স্থির ধীর শান্ত, কথা বলেন খুবই কম। কারপেলেসদের মা'র সঙ্গে পরিচয় হ'ল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সেই যে কালো পোশাক ধরেছেন এখনো তা ছাড়েন নি। আঁদ্রে আর্টিস্ট ও সাহিত্যিক দুই-ই একাধারে। সম্প্রতি বোনার বলে এক পাবলিশার জোগাড় করেছেন, সেখান থেকে প্রাচ্য দেশের ক্ল্যাসিক্‌স্ অনুবাদ করে ছাপাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমায় ধরে পড়লেন; আমি যেন কতকগুলো বাংলা বই-এর অনুবাদ করতে তাঁকে সাহায্য

করি। সুজান সোবোর্ণে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন করছেন। সম্প্রতি পালি পড়ছেন, আমাকে বললেন, ধম্মপদটা আমি যেন তাঁকে পড়িয়ে দিতে সাহায্য করি।

খেতে বসা গেল। আমি ছাড়া আর একটি পুরুষ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর নাম পল্ বিয়ো। ইনিও আর্টিস্ট, উড-কাট্ ও এচিং-এ দক্ষ। খাবার আসতে দেখলুম, ফ্রেঞ্চদের খাবার ও খাবার ধরন দুই-ই ইংরেজদের থেকে অনেক তফাৎ। সুপ্ দিল একটা জামবাটির মতো পাত্রে। সেটা খেতে হবে তেলের পলার মতো দেখতে দস্তার এক প্রকাণ্ড পলা করে। রিয়ো সার্ভিয়েত অর্থাৎ ন্যাপকিনটা কোলের উপর না রেখে গলায় জড়িয়ে নিলেন। আমিও তাঁর দেখাদেখি তাই করলুম। অন্যান্য খাবার জিনিসও দেখলুম ইংরিজি ডিসের মতো কেবল রোস্ট কি সিদ্ধ কি ভাজা নয়, নানারকম জিনিস মিশিয়ে মশলা দিয়ে রান্না করা হয়েছে, বেশ সুখাদ্য। একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলুম। এরা শস্ কিংবা গ্রেভি পাতে ফেলে রেখে দেন না। এক টুকরো রুটি ভেঙে সেটাকে আঙুল দিয়ে ধরে প্লেটের উপর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চেঁচেপুঁচে নেন। ইংরিজি নিয়ম অনুসারে এটা এক দারুণ অসভ্যতা। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে সুজান বললেন, কিন্তু ইংরেজরা এমন শস্ আর গ্রেভি পাবে কোথায়? তাই তাঁরা ওসব জিনিস পাতে ফেলে রাখেন। আমি বললুম, কিন্তু ইংরেজদেরও বড়ো বড়ো খানাপিনায় ফরাসী খাবার ও মদের দরকার। ফরাসী সেফ্ ডাকতে হয়। এমন কি মেনুও ফরাসী ভাষায় লিখতে হয়। সুজান বললেন, ঐ পর্যন্ত।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, কারপেলেসদের এই ক্লাশের কি পুরুষ কি মেয়ে ইংরেজদের ঐ ক্লাশের মেয়ে-পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি রসজ্ঞ। কোনো কথার সূক্ষ্ম ভাব কি রহস্য—বিশেষত সাহিত্য কি আর্টের—এ'রা যতো চট্ করে বুঝতে পারেন ইংরেজরা তার কাছ দিয়েও যান না। আর ফরাসী ভাষাও এমন স্বচ্ছ ঝক্‌ঝকে যে, এসব সম্বন্ধে কথা শুনতে শুনতে বিভ্রম লেগে যায় না। যা-কিছু বলা হয়, সবই বেশ স্পষ্ট, ধোঁয়া-ধোঁয়া একেবারেই নয়। তাই অনেকেই দেখতুম, ইকনমিক্স ও দর্শনশাস্ত্রের কথা ভালো করে বোঝবার জন্যে ইংরিজি ছেড়ে, ফরাসীতেই ওসবের বই পড়ে থাকেন। আর ঠিক এই কারণে ইংরিজি কবিতা ফরাসী কবিতার চেয়ে অনেক ভালো। ফরাসীরা প্রাণ দিয়ে কবিতা লেখেন না, মন দিয়ে লেখেন। সেইজন্যে এ'রা কাব্যসমালোচনায় কাব্য-রচনার চেয়ে ঢের বেশি ওস্তাদ। ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাস ফরাসী তেঁ যেমন লিখেছেন, ইংরেজ সেণ্টসবরী কি এড্‌মণ্ড গস্ এমন কি স্টফর্ড ব্রুকও তাঁর কাছে এগোতে পারেন না।

সাহিত্যের ও আর্টের রসের সমাদর ফরাসী দেশের সমাজের সব স্তরের লোকের মধ্যে বেশ চলে গেছে তার প্রমাণ প্যারিসে থাকতে-থাকতে অনেক পেয়েছি। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। সেন্ নদীর ধারে জায়গায়-জায়গায় কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরনো বই-এর সংগ্রহ বিক্রির জন্যে মজুত থাকে। পুরনো বই ঘাঁটার বাতিক আমার অনেক কালের। একদিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বই ঘাঁটছি, এমন সময় দেখলুম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক ভিক্ষুক। পরনে তার কেপ্‌ওয়ালা এক শতছিদ্র ওভারকোট্। ভিতরে আর কোনো জামাকাপড় নেই। কাছে এসে সে কবিতা আওড়াতে শুরু করে দিলে—উগো, দ্যমুসে, বোদেলির, ভারলাঁ, এমন কি মেলার্মের কবিতা পর্যন্ত। কবিতা শুনিয়ে ভিক্ষে করার রীতি আমি ইংল্যাণ্ডে কখনো দেখি নি। আমি খুশি হয়ে ভিক্ষুকের হাতে একটা কুড়ি ফ্রাঙ্কের নোট তুলে দিলুম। রাস্তাঘাটের নামকরণেও ফরাসীরা সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, সংগীতকার, নাট্যকলাবিদ্ প্রভৃতি জ্ঞানীগুণীদের নাম প্রচুর ব্যবহার করে থাকেন। শুধু নিজের দেশের নয় অন্য দেশেরও। ইংল্যাণ্ডে এরকম ব্যাপার
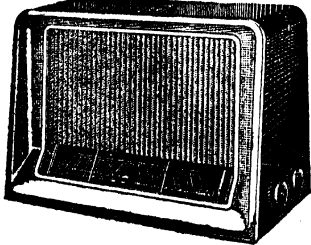
কুত্রাপি আমার চোখে পড়েনি। তাছাড়া ফরাসীদের জাত্যাভিমান ইংরেজের চেয়ে অনেক কম। প্যারিসে 'ধলাকালার' বাছ-বিচার নেই। আফ্রিকা, সিরিয়া, ভারতবর্ষ, ইন্দোচায়না থেকে আসা লোকেরা ঠিক খাঁটি প্যারিসিয়ানদের মতোই চলছে ফিরছে, কাজকর্ম করে যাচ্ছে; কেউ তাদের দিকে কটাক্ষ পর্যন্ত পাত করছে না।

প্যারিস ইউনিভারসিটিতে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা দেবার চমৎকার ব্যবস্থা আছে। ইংল্যান্ডেও আছে। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিতরা এমন এক নতুন দৃষ্টি খুলে দেন যে, তার তুলনা ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যে কমই পাওয়া যায়। আমি একবার সোবোর্নে কিছুদিনের জন্য মাঁস-উরসেল-এর উপনিষদের উপর বক্তৃতা শুনি। একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, উপনিষদের জ্ঞানই বৌদ্ধধর্মের প্রাণ। উপনিষদের জ্ঞান উচ্চস্তরের কয়েক-জন জ্ঞানীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, বুদ্ধদেব তাকেই সহজভাবে সাধারণের কাছে প্রচার করলেন। মাঁস-উরসেল-এর এই কথাটি অনেকে হয়তো মনের থেকে গ্রহণ করতে না পারেন। তা না পারেন তো নেই পারেন। কিন্তু এরকম একটা ভাবিয়ে তোলানো কথা আমি কেমব্রিজে র‍্যাপসন সাহেবের কি লণ্ডনে কীথ সাহেবের লেকচারে কখনো শুনিনি।

তবে ফরাসীরা কেউই সাধারণত ধর্মের কথা বলেনও না, শুনতেও চান না। বরং ধর্ম সম্বন্ধে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবই যেন তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। একটি আসল প্যারিসিয়ান মেয়ে একবার কোন বিখ্যাত আর্টিস্টের আঁকা যিশুখৃস্টের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলে-ছিলেন, লোকটি তো অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন বলেই দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু তিনি বিয়ে করেন নি কেন? কোন ইংরেজ মেয়ের মুখ দিয়ে এরকম কথা বেরোনো অসম্ভব ব্যাপার। ভোলতেয়ার একবার বলেছিলেন, মানুষকে ভগবান গড়েন নি, মানুষই ভগবানকে গড়েছে।

বিদেশী লোকের যাঁরা প্যারিসে যান, তাঁরা ফরাসীদের আমোদ-প্রমোদকারী বিলাসী লোক বলেই ধরে নেন। বিদেশীর চোখে অবশ্য আমোদ-প্রমোদের দিকটাই বেশি করে নজরে পড়ে। কিন্তু এটি তাঁদের স্বরূপ নয়। এ'দের অধিকাংশ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা বিদেশীদের জন্যে। অস্কার ওয়াইল্ড প্যারিসকে ভালো করেই জানতেন। তিনি বলেছিলেন, খাঁটি আমেরিকানরা মরে গিয়ে প্যারিসে যান। মৃত আমেরিকানরা প্যারিসে গিয়ে কি উপদ্রব লাগান, তা আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু জ্যান্ত আমেরিকানরা যে সেখানে গিয়ে কি উৎপাত করেন, তার খানিক-খানিক আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁরা সমস্ত সংযম জাহাজের শিকেয় তুলে রেখে তবে প্যারিসের মাটিতে পদার্পণ করেন। যুদ্ধের পর খাবারের দাম চড়া। সেই খাবার ফরাসীদের চোখের সামনে রাস্তায়

'নাতিভিতে' (যীশুর জন্ম)—জর্জ দ্য লা-তুর (১৫৯৩-১৬৫২)

'স্লেভ এয়ওয়াকৃ' (ক্রীতদাস)—মিকায়েল আঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪)

ছ‘ুড়ে ফেলছেন, কুকুরকে খাওয়াচ্ছেন। অসভ্য রকমের চীৎকার-ঝামেলা লাগাচ্ছেন। মেয়েদের ধরে টানাটানি করছেন। ইতর ভাষায় কথাবার্তা বলছেন। লজ্জাসরম নেই।

অবশ্য ফরাসীরা আমোদ-প্রমোদ ইংরেজদের চেয়ে একটু বেশি ভালোবাসেন। তাঁরা ভালো জিনিস উপভোগ করে মনের খুশি প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। লোকে মনে করে, ফরাসীদের বুঝি, হেসে নাও দুদিন বইতো নয়—সদা সর্বদা যেন এই ভাব। এইজন্যে ফরাসীরাই বলে থাকেন, ইংরেজরা আমোদও করে অত্যন্ত কুতিয়ে-কুতিয়ে। তবে ফরাসীরা আমোদ করেন বটে, কিন্তু সে-আমোদ কোথাও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে অসংযমে পরিণত হয়েছে, তা আমি দেখিনি। ফরাসীরা সত্যিকারের আর্টিস্ট প্রকৃতির লোক। যাকিছু অসংযম দেখেছি, তা বিদেশীদের আমোদ সরবরাহের জন্যে।

আমি একবার একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছি। একটি মেয়ে আমাকে বিদেশী দেখেই বোধ হয় আমার দিকে এগিয়ে এল। হাবভাবে বোঝা গেল, সে কি চায়। আমি রহস্য করে তাকে বললুম, দেখ, আমি হিন্দু। আমার খুব ছেলেবয়সেই বিয়ে হয়েছিল। তোমার বয়িসি আমার এক মেয়ে আছে। মেয়েটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, তাহলে আপনি যখন মাঝবয়িসি হবেন, তখন তো আপনার স্ত্রী বুড়ি হয়ে যাবেন। তখন কি করবেন? আমি সরোষে বললুম, পোড়ারমুখি, তুমি নিপাত যাও। মেয়েটি হেসে বলল, তবুও বলব, ভিভ্ লামুর এ লা জোলি ফাম। অর্থাৎ বেঁচে থাক প্রেম, আর তার সঙ্গে থাকুক মনোরমা তরুণী। আমি একটা দশ ফ্রাঙ্কের নোট তার হাতে দিয়ে আঙুল দেখিয়ে বললুম, ওখানে অনেক আমেরিকান বসে আছে, তাদের কাছে যাও। মেয়েটি বিষণ্ণ হয়ে বললে, তাই যাচ্ছি, কিন্তু ওরা যে অসম্ভব রকমের বর্বর, বন্য, পশু।

আমি আইফেল টাওয়ারে চড়িনি, নোতরদাম বাইরের থেকে দেখেছি, ভিতরে ঢুকিনি, ফোলিবার্জারে একবার ঘোষের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু তবুও প্যারিসে যা দেখেছি, তাতে ইংল্যাণ্ড থেকে বার বার সেখানে ফিরে-ফিরে গিয়েছি।

পড়ুয়ার নোট থেকে

সতীনাথ ভাদুড়ী

বিশ বছর আগে লোকে কথায় কথায় Marcel Proust-এর নাম আওড়াতো। তাঁর পনর খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস 'A la recherche du Temps perdu' আজ অনেকেই পড়ে ফেলেছে ব'লে সে ফ্যাশন কেটেছে। তিনি আজ সেকেলে; কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্যের উপর তাঁর প্রভাব আজও শেষ হয় নি। জীবনের আপাত-তুচ্ছ ঘটনাগুলোর উপর এত গুরুত্ব, তাঁর আগে আর কেউ দেননি। সেগুলোর সঙ্গেও যে মানুষের মন জড়ানো; আমি মেশানো। আমার মন বাদ দিয়ে কোন জিনিসের বা ঘটনার কি মূল্য? অনুভূতির মিষ্টি রঙে রঙাতে পারলে ছাইমাটিও সোনা হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ জিনিসগুলোও সাহিত্যের দরবারে আর অপাঙক্তেয় থাকে না। তখন সাহিত্যিকের কাজ হয়ে ওঠে আরও কঠিন। কোনটুকুকে বাদ দিয়ে কোনটুকুকে রাখবে সাহিত্যের মাল-মসলা হিসাবে লেখকের এই সনাতন সমস্যায়, আগের চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্দর্শনের দরকার হয়। কারণ তথা-কথিত তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে রসের উৎস বলে নিতে পাঠকের মনে একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে। Proust-এর চেয়ে কম প্রতিভার সাহিত্যিকরা পাঠকের মন ধরে রাখবার জন্য, লেখকদের জানা কতকগুলি পাঠক-ঠকানো কৌশলের সাহায্য নেন। কিন্তু রুচিবান পাঠকরা এতে ভোলেন না। Zola-র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া লেখার মধ্যে কোন জিনিসের ভেজাল, তা' সূক্ষ্মরুচি পাঠকরা সেই সময়ই ধরে ফেলেছিলেন। পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখবার জন্য Proust কিন্তু সে সব পথ মাড়াননি। আপনা থেকে সে সব জিনিস যখন নিজ মূল্যে এসে গিয়েছে, তখন অবশ্য তিনি সেগুলোকে বাদ দেননি। দিলে তাঁর মনের আড়ষ্টতাই প্রমাণিত হ'ত। কোন বিষয়ের তুচ্ছতা বা গুরুত্ব আমাদের আরোপ করা জিনিস—কতকটা মতামতের ব্যাপার। কিন্তু তুচ্ছতম জিনিসের আড়ালেও কত রহস্য আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। সেইসব রহস্যগুলোর উপর নানা দিক থেকে সন্ধানী-আলো ফেলে, তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সম্মুখে। এই রহস্যের সন্ধানই আমাদের কৌতূহলকে জাগ্রত করে রাখে! নিছক বিশ্লেষণ নয়; আবার শুধু ভাবানু-ষঙ্গগুলোকে প্রকাশ করাও নয়; তাঁর লেখার সমগ্র রূপ এ দুইয়েরই ঊর্ধ্বে। নইলে একটার পর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে আমাদের মন হাঁফিয়ে উঠত।

অভিনব এই রস। পাঠকের সব-চেয়ে আনন্দ নিজেকে আবিষ্কারের। অল্প বয়সে দাগ-দিয়ে-দিয়ে-পড়া বই, আবার বেশী বয়সে পড়লে এক রকম হয় না? মার্জিনে নিজের হাতের লেখা 'Very Important' টুকুকে পাশের শেক্‌স্‌-পিয়রের লাইনগুলোর চেয়েও ভাল লাগে। আসলে কিন্তু আমি তখন ঐ লেখাটুকুকে ভাললাগালাগির ঊর্ধ্বে উঠে যাই। কি যেন অন্য একটা জিনিসের পরশ পাই। বোধ-হয় অনেক বছর আগেকার আমির একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তার। পুরনো অথচ অভিনব এক মিষ্টি রসে আমার মন ভরে ওঠে। Proust হয়তো ভেবেছিলেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলোকে তুলে ধরছেন পাঠকদের সম্মুখে। কিন্তু পাঠকদের বুঝবার ও নেবার ক্ষমতার ভিত্তি যে সব সময়ই তাদের নিজের নিজের অভিজ্ঞতা। চেষ্টা করে, একজন জন্মান্ধকে লাল আর নীলের পার্থক্য কি কেউ কোনদিন বোঝাতে পারে?

• • •

ছবি দেখবার সময় সৌন্দর্যপিপাসু লোকে সমগ্র রূপটাই দেখে; খুঁটিয়ে দেখতে চায় না। সমস্ত ছবিটাই তার চোখের সম্মুখে পড়ে কিনা প্রথম থেকে। কিন্তু বই পড়বার সময় পাঠক প্রথম থেকে সমগ্র রূপটা দেখতে পায় না। খণ্ড থেকে তাকে সমগ্রে পেঁছিতে হয়। দর্শকের থেকে পাঠকের ধৈর্য তাই অনেক বেশী। কথাশিল্পীর এতে অসুবিধার চেয়ে সুবিধা অধিক। পাঠকের মন তয়ের করে নেবার, তিনি সুযোগ পান প্রচুর। ভাবানুষঙ্গ, সূক্ষ্ম-অনুভূতি-আশ্রয়ী স্মৃতি, বিশ্লেষণ ও বিবরণের মধ্যে দিয়ে Proust সেই সুযোগের

যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রথমের দিকে পাঠক সেকথা ঠিক বুঝতে পারে না। বিবরণের ঢিমে তেতালা গতি, থেমে থেমে চলা, জেদী মাছির মত ফের পুরনো জায়গায় ফিরে আসা, অন্তহীন বর্ণনা ও বাগবিস্তার, বহু পদসমন্বিত অতি দীর্ঘ বাক্যাবলী, প্রভৃতি দেখে পাঠক একটা বিরোধ নিয়ে, বইখানি পড়া আরম্ভ করে। পরে কয়েকখণ্ড পড়বার পর কখন থেকে যেন, পাঠকের মন নিজের গতি ভুলে, গল্পের মৃদু স্রোতে গা এলিয়ে দেওয়াটাকে উপভোগ করে। পড়তে পড়তে তখন মনে হয়, প্রতি বিষয়ের উপর তাঁর এত বলবার আছে যে, বহু-পদসমন্বিত, বিশেষণখচিত দীর্ঘ বাক্যাবলী না হ'লে, বুঝিবা তা' প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না। ভুলে যেতে হয় যে, ছোট ছোট সরল বাক্যেও এই কথাগুলিই বলা যেত, এবং বলতে পারলে আরও ভাল লাগত পাঠকের।

Faulknerও লেখার হৃদয়ে প্রবেশ করতে দেবার আগে, তাঁর একনিশ্বাসে-বলে-যাওয়া দাঁতভাঙা কথার ঘটায়, পাঠককে অভ্যস্থ করিয়ে নেন। Meredithও তাই নিতেন। নিজের বদভ্যাস পাঠককে সইয়ে নেবার সাহস ও ক্ষমতা ক'জন লেখকের আছে? শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে নিজের লেখার পাঠক নিজে তৈরী করে নেওয়া কি সহজ কাজ! কবিরা এ বিষয়ে গদ্য লেখকদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে আছেন।

* * *

তবু A la recherche du Temps perdu পড়বার পর ধারণা জন্মায় যে বইখানি যেন চমৎকারিত্বে পূর্ণ অনেকগুলি মুহূর্তের যোগফল। ওই মুহূর্তগুলির ব্যাপ্তি অনুভূতির রঙে রঙিয়ে বিস্তৃত করে দেওয়া হয়েছে। লেখকের কৃতিত্ব যেন উছল মুহূর্তগুলিকে বাছায়, সাজানোতে, তাদের বিস্তৃতি বাড়ানো কমানোতে। এই রকমের লেখায় সাধারণত লেখকের দৃষ্টি থাকে, যাতে এক পূর্ণ-মুহূর্ত থেকে আর এক পূর্ণ-মুহূর্তে যাবার সময় পাঠকের মন ঝাঁকানি না খায়। গাঁথুনি আর জোরের দাগগুলো যেন হঠাৎ দেখলে বোঝা না যায়। Proust-এর কৌশল আলাদা। তিনি ঝাঁকানি খাইয়ে খাইয়ে মনকে পুরনো মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। গাড়ির ঝাঁকানিতে কিছুক্ষণের পর যেমন ঘুম আসে, এবেলায়ও হয় তেমনি। গতির ছন্দ আয়ত্ত হয়ে গেলেই ঝাঁকানি থেকে আরাম পাওয়া যায় দোলনের।

আর এক রকমের উপন্যাস আছে, যাতে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলোর উপর গুরুত্ব কম। পাথর জুড়ে জুড়ে ইমারত খাড়া করা হয় না সেক্ষেত্রে। একটা সমগ্র পাহাড় কুঁদে, বাহুল্যটুকুকে বাদ দিয়ে, শুধু ইমারতের অংশটুকুকে রাখা হয়—অজন্তা, এলোরার গুহাগুলোর মত।

এই দুই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে দ্বিতীয়টি যে প্রথমটির চেয়ে ভালো, এমন কোন কথা নেই। একই জিনিস, একই চেষ্টা, আকর্ষণও প্রায় এক—শুধু একটু জোর দিয়ে বলার (emphasis) পার্থক্য। দুটোরই সমগ্র রূপ রয়েছে—একটা চোখের সম্মুখে, আর একটা একটু আড়ালে।

* * *

যখনই মনে-পড়াগুলোকে নিয়ে কোন লেখা চোখে পড়ে, তখনই ভাবি যে, এর জন্য নতুন একটা বিরামচিহ্ন কেন এখনও সৃষ্ট হল না। প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন, দৃষ্টান্তচিহ্ন বা উদ্ধারচিহ্নের মত, মনে-পড়া বা নীরব চিন্তা বোঝাবার জন্য একটা চিহ্নের এখন দরকার হয়ে পড়েছে ভাষায়। এই সব সঙ্কেত চিহ্ন-

গুলির ব্যবহারে কম কথায় বেশি বলা যায়—শর্টহ্যান্ড লেখার মত। পাঠকেরও বুঝতে সুবিধা, লেখকেরও বোঝাতে সুবিধা।

বাঙলা গদ্যে আগে একটি দাঁড়ি ছাড়া আর কোন ছেদচিহ্ন ছিল না। পরে প্রয়োজনবোধে আমরা বিদেশী ভাষা থেকে বহু বিরামচিহ্ন বাংলায় নিয়েছি। আর একটা বাড়াতে দোষ কি? মুশকিল হচ্ছে যে এই 'স্মরণ বা চিন্তনচিহ্ন' কোন বিদেশী ভাষাতেও নেই। অথচ এর দরকার সব ভাষাতেই। মনে পড়া বোঝাতে গিয়ে এক একজন লেখক এক-একরকম চিহ্ন ব্যবহার করেন। একই লেখক, চিন্তন বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করছেন তা'ও দেখা যায়। এই একই উদ্দেশ্যে কেউ ব্যবহার করেন 'ড্যাশ' কেউ 'বন্ধনী-চিহ্ন', কেউ 'উদ্ধার-চিহ্ন', কেউ বা শুধু কয়েকটি বিন্দু। এর অসুবিধা হচ্ছে যে লেখক এক ভেবে চিহ্ন দিলেন, পাঠক হয়তো তার অন্য অর্থ করল। একজন লোক ভাবছে, এই কথা বোঝাতে গিয়ে লেখক হয়তো চিন্তারাশির আগে ও পরে অনেকগুলি করে বিন্দু-চিহ্ন দিলেন। পাঠক হয়তো সেগুলোকে 'বর্জন-চিহ্ন' হিসাবে নিল। আর লেখার মধ্যে বর্জন চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত ড্যাশ কিম্বা বিন্দুসমষ্টিকে পাঠকরা চিরকাল একটু সন্দেহের চোখে দেখে।

কোন একটি চরিত্রের মনে মনে ভাবা চিন্তাগুলোকে যখন আর সাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তখন এর জন্য একটা নতুন চিহ্ন সৃষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর দরকার বোধহয় দিনদিনই বাড়বে। 'সে ভাবিতে লাগিল', 'তাহার মনে পড়িল', কিম্বা অনুরূপ কোন পদ বারবার চোখে পড়া, পাঠকের পক্ষেও বিরক্তিকর। ফরাসীদের মত সাহিত্যপ্রেমী ও যুক্তিবাদী জাতি কেন এরকম একটা ছেদচিহ্নের সৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামায়নি জানিনা। এই উদ্দেশ্যে কোন স্বীকৃত চিহ্নের প্রথম প্রচলন করে যে কোন ভাষা, আজ পৃথিবীর অন্য ভাষীদের পথ দেখাতে পারে। বাঙলার এ এক সুযোগ।

* * *

'চিন্তন-চিহ্ন' না থাকায় একটা ফল

ল্যাক'ত্ দ্য লীল্

দেখা যাচ্ছে ভাষার উপর। একরকম লিখন শৈলীর প্রচলন হতে আরম্ভ হয়েছে, যেখানে লেখকের দেওয়া বিবরণ, পুস্তকের কোন চরিত্রের মনে মনে ভাবা কথা, ও সেই চরিত্রের মুখে প্রকাশিত কথা, সবগুলো এক নিশ্বাসে বলে যান লেখক। স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না কোনটা কি; আভাস ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। একটা থেকে আর একটায় যাবার সময় যাতে পাঠক হোঁচট না খায়, সেদিকে লেখকের নজর থাকে। যেমন ধরুন লেখক লিখলেনঃ—

এ গল্প আমার শোনা নরেনের মুখে। বিশ বছর আগেকার তার প্রেমের কাহিনী। এক কিশোরীর সঙ্গে। এখনও সেই কিশোরীটির কথা বলতে গেলে তার চোখে জল আসে। কি মিষ্টি ছিল তার মুখের হাসিটি! আছে না এক-একটা মেয়ে? না হেসে কথা বলতে পারে না? হাসি ছাড়া তাদের যেন ভাবতেই পারা যায় না। ইত্যাদি...এই প্যারার মধ্যে প্রথম চারিটি বাক্য লেখকের দেওয়া বিবরণ। পঞ্চম বাক্যটি নরেনের মনে মনে ভাবা কথা। তার পরের বাক্যগুলি নরেনের বলা কথা।

[illegible]

যত চমৎকারিত্বেই ভরা হোক না কেন, একটানা চিন্তা সব সময়ই পাঠকের একঘেয়ে লাগে। তাই লেখকদের এই বৈচিত্র্যের চেষ্টা।

* * *

উপন্যাসের আদিযুগে উত্তমপুরুষে লেখারই প্রচলন ছিল; অর্থাৎ একটি চরিত্র নিজের জবানিতে গল্পটি বলে যেত। এ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা বুঝতে পেরে লেখকরা দায়িত্ব নিলেন সর্বজ্ঞ হবার; অধিকার নিলেন প্রেমিক-প্রেমিকার শোবার ঘরে ঢুকবার। ফলে পাঠক লেখকের কাছ থেকে অনেক বেশী কিছু আশা করতে শিখল। লেখক যখন সকলের আচরণ ও মনের অন্ধিসন্ধি জানেন, তখন কোন বিষয় অনুল্লেখের দায়িত্ব তাঁরই; এই হল পাঠকের যুক্তি। কিন্তু যেখানে একটি চরিত্রের জবানিতে কোন গল্প বলা হয়, সেখানে পাঠকরা অপেক্ষাকৃত ক্ষমাশীল ও উদার লেখকের প্রতি। যার জবানিতে গল্পটি বলা, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আড়ালে বা অজুহাতে লেখকের ত্রুটি কিছু পরিমাণে ঢাকা পড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে লেখককে একজনের চোখ দিয়ে সমস্ত ঘটনাবলী দেখতে হয়—সব রকম সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কাজ এখানে অপেক্ষাকৃত সহজ। লেখকের মন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হবার অবকাশ পায় কম। সেইজন্য একজন চোরের মুখ দিয়ে যিশুখৃষ্টের মৃত্যুবিবরণ বলানো, কিম্বা একজন সাধারণ সৈনিকের মুখ দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া, লেখকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখে Proust এই সুবিধাটি পেয়েছেন। লেখক নিজেই এখানে গল্পের কেন্দ্র। তাই লেখক হিসাবে Proustএর ত্রুটিগুলোকে, কিছু পরিমাণে মানুষ Proust এবং গল্পের নায়ক Proustএর রুচি অভিরুচির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে ভাবতে পাঠকরা ভালবাসে।
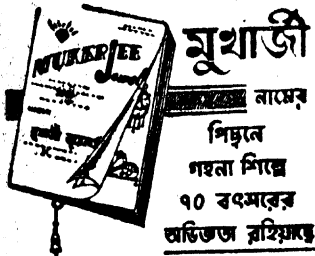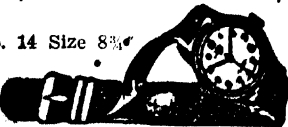
তবু মন নিয়ে লেখা বইয়ে, মনের চেয়ে মনন বেশী থাকলে সেটা যে লেখার দুর্বলতা হয়ে দাঁড়ায়, একথা পাঠকরা চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না।

* * *

অনেককে বলতে শুনি যে, লাগাম-ছাড়া চিন্তাগুলোকে নিয়ে উপন্যাস লিখবার চলন নাকি মনঃসমীক্ষণশাস্ত্রের প্রভাব, সাহিত্যের উপর, কিন্তু পড়লেই বোঝা যায় যে,' এইসব অসংলগ্ন চিন্তা-গুলো বেশ চেষ্টা করে সাজানো। অসংলগ্নতাটুকু কৃত্রিম। ঔপন্যাসিক বুঝতে পেরেছেন যে, এই ধরনে লিখলে, তিনি অনেক বাইরের কথা ঢোকাতে পারেন লেখার মধ্যে, যা তা নাহ'লে সম্ভব হচ্ছিল না। Balzac, Tolstoy-এর লেখার মধ্যেও এমন অনেক ছোট ছোট ঘটনা আছে যা মূল আখ্যায়িকার পক্ষে ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। উদ্দেশ্য সকলের এক না হলেও, এ প্রয়োজন ঔপন্যাসিক-মাত্রেরই হয়। হঠাৎ-আসা অসংলগ্ন চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে লেখকরা নানারকম প্রসঙ্গ বইয়ের মধ্যে ঢোকাবার একটা নতুন হাতিয়ার পেয়েছেন। মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে এর সম্বন্ধ যদি বা কিছু থাকে, তা' অত্যন্ত অপ্রত্যক্ষ। শুধু মনঃসমীক্ষণ কথাটি, পাঠকদের ভ্রূকুঞ্চনের হাত থেকে বাঁচবার একটা পলকা আড়াল দিয়েছে মাত্র, লেখককে।

* * *

সেকালের ফরাসী কবিদের অনেকেরই মনে ভারতবর্ষের নামের নেশা লেগেছিল। আমাদের ঠাকুরদেবতাদের নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন বিখ্যাত কবি Leconte de Lisle। বৈদিকমন্ত্রের অনুকরণে লেখা সূর্যদেবের উপর কবিতা আছে তাঁর। তার মধ্যে অপ্সরা, তালগাছ, সাদাপদ্ম, গোলাপী রঙের গরু, অনেক কিছু আছে। এগুলোতো বুঝি। কিন্তু সোনার érable কোন গাছ বুঝলাম না। এই শ্রেণীর একটা গাছ থেকে Maple-Syrup তৈরী হ'ত আগে। কিন্তু আমাদের স্বর্গের কোন গাছ?

Henry Cazalis নামের কবি ব্রহ্ম, বুদ্ধ, শিব ও হিন্দুধর্মের অনেক বিষয়ের উপর কবিতা লিখেছিলেন। 'ঋষি' নামের একটি কবিতায় জেনেছিলাম, মরণকালে বিশ্বামিত্র কেমন করে তাঁর কবরে প্রবেশ করেছিলেন। 'সমাধি' শব্দটির একাধিক মানে হওয়ার বিপদ অনেক।

বিদেশী বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে এরকম সব ছোট ছোট ভুল হ'তে বাধ্য, লেখার মধ্যে।

বুদ্ধের দেশ ব'লেই বিদেশীর কাছে ভারতবর্ষের নামডাক সবচেয়ে বেশী। এককালের খ্যাতনামা ফরাসী কবি Francois Coppée কবিতা লিখেছিলেন 'বুদ্ধের চড়ুই'এর উপর। বুদ্ধ যখন নির্বাণের পূর্বে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ঘোর তপস্যায় মগ্ন, তখন একটি চড়ুই প্রতি বছর তাঁর হাতের উপর বাসা বাঁধত। এক বছর না আসতে দেখে, পাখীটি মরে গিয়েছে জেনে বুদ্ধের চোখে জল এল। কবিতাটি কিন্তু সত্যিই সুন্দর। কবিতার ক্ষেত্রে তথ্যের ভুল কিছু পরিমাণে মার্জনীয়।

আমাদের দেশের গায়করা শুনে সান্ত্বনা পাবেন যে, Emile Bergert নামের একজন ফরাসী কবি, একটি কবিতায় ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে অন্তহীন দুঃখে ভরা হিন্দুদের গানের সাদৃশ খুঁজে পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি কিছু খারাপ ভেবে বলেননি।

এরকম আরও অনেক আছে। এসব কবিতা আমাদের কাছে যেমনই লাগুক, কবিদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, আর সে সময়ের ফরাসী পাঠকদের কাছে সমাদৃতও হয়েছিল।

ভারতবর্ষের দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি ফরাসীদের টান আজও কমেনি।

* * * *

Leconte de Lisle-এর কথা ওঠায় আর এক কথা মনে পড়ল।

কোন কবি বা লেখকের মৃত্যুর ঠিক পরই দেশ এক দফা তাঁর সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে। জেগে উঠেই দেশ ভাবতে আরম্ভ করে যে, তাঁর উপর বুঝি বা অবিচার করা হয়েছে এতদিন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরই সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন 'শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, 'শ্রীজীবনানন্দ দাশ।

সব দেশেই মৃত্যুর পর অল্প কিছু-দিন লেখকদের বই বেশ বিক্রি হয়। Leconte de Lisle-এর বেলায় ব্যাপারটা

ঘটেছিল অন্যরকম। তিনি উপকৃত হয়েছিলেন অন্য কবির মৃত্যু থেকে; নিজের মৃত্যু থেকে নয়।

দেশের সর্বোচ্চ সম্মান অ্যাকাডেমির সদস্যতার জন্য যখন তিনি প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি মাত্র দুইটি ভোট পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল ভিক্টর হুগোর ভোট। এর কয়েক বছর পর ভিক্টর হুগো মারা যান। হুগোর ব্যক্ত ইচ্ছা রক্ষার্থে, তাঁর শূন্য স্থানে Leconte de Lisleকে অ্যাকাডেমির সদস্য করা হয়। প্রচলিত প্রথানুযায়ী অ্যাকাডেমি যখন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে প্রবেশাধিকার দেয়, তখন অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে Alexandre Dumas (ছোট) নিজের ভাষণে, একরকম ঘুরিয়ে নিন্দাই করেছিলেন Leconte de Lisle-এর। তবুও অনুতাপদগ্ধ দেশ স্বর্গগত হুগোর প্রতি সম্মান দেখাতে ভোলেনি।

* * *

বিদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প কবিতা উপন্যাস লিখবার দোষ হচ্ছে যে, তার মধ্যে লেখক নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ অজ্ঞাতে রেখে যান। তবু এর উপর লেখকদের লোভ। কারণ পাঠকরা সে পরিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ। পাঠকদের বিদেশ সম্বন্ধে জানবার স্বভাবসুলভ কৌতূহলকে, লেখকরা অনেক সময় নিজেদের সৃজন প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব'লে ভুল করেন।

ফরাসীরা বলে যে, পিয়ের লোতির লেখার মধ্যে বিদেশের আবহাওয়ার রূপ রস গন্ধ অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু যে দেশ সম্বন্ধে লেখা, সেই দেশের রুচিশীল লোকদের মত ও সম্বন্ধে কি তা'ও জানা উচিত তাঁদের। বিদেশীর চোখ দিয়ে দেখা আমার দেশ, আমার নিজের চোখে দেখা দেশের সঙ্গে এক হবে না, এ তো জানা কথা, কিন্তু আমি বলছি তথ্যের ভুলের কথা। মুশ্‌কিল হচ্ছে যে, বিদেশী পাঠক সেইসব অজ্ঞানতাপ্রসূত ভুল তথ্যগুলিকে সত্য ব'লে মনে করে।

জানি ভুল; তবু স্পেন দেশের কথা ভাবতে গেলেই আমার মনের মধ্যে প্রথমে আসে, Prosper M'erim'e-র লেখা Carmen-এর পরিবেশের কথা।

* * *

আলবেয়ার কেম্যু

সুখের বিষয় যে, বাংলা সাহিত্য আজকাল অনুবাদের দিকে মন দিয়েছে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত লক্ষ্য করতাম যে, হিন্দীর চেয়ে বাংলা এদিক দিয়ে পিছিয়ে আছে।

ক্ল্যাসিক ছাড়া, অনূদিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অধিকাংশই নোবেল পুরস্কার কিম্বা স্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের লেখা। যত বই নোবেল প্রাইজ পায়, তার প্রত্যেকটির উৎকর্ষ যে অবিসম্বাদিত, তা নয়। তবুও নোবেল প্রাইজ না-পাওয়া লেখকদের ভাল ভাল বই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। Mauriac-এর লেখা উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ হ'ল তিনি নোবেল প্রাইজ পাবার পর। এ ছাপ না থাকলে বোধহয় বই বিক্রি হয় না। কিন্তু সব বড় সাহিত্যেই, প্রায় সমান প্রতিভার অনেকগুলি ক'রে উচ্চশ্রেণীর লেখক, সব সময়ই থাকেন। নোবেল প্রাইজ না পেলে তাঁদের নাম দেশের বাইরের লোকরা জানতে পারে না। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ থেকে বিদেশী পাঠকরা বঞ্চিত হয়।

Albert Camus অবশ্য সে দলে পড়েন না। তাঁর লেখার সঙ্গে বহু বিদেশী পাঠকেরই পরিচয় আছে; কিন্তু বাংলায় কেন এখনও তাঁর বই অনূদিত হয়নি জানি না। উপন্যাস লিখেছেন তিনি মাত্র দুইখানি। এর মধ্যে L'e'tranger পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। ১৭৫ পাতার ছোট্ট বই—সর্বজনীন এর আবেদন —অনুবাদের যোগ্য সব দিক দিয়ে। এ বইখানির অনুবাদ বাংলায় হওয়া উচিত।

* * *

সব বই অনুবাদ করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ লেখাই অনুবাদের ধকল সইতে পারবে না। এ হ'ল ভাষার দিক থেকে। অন্য নানাদিক থেকেও অনুবাদের অযোগ্যতার কারণগুলো আসতে পারে। 'পথের পাঁচালি'র রস গ্রহণ করা বিদেশীদের পক্ষে কঠিন। অবনীন্দ্রনাথের লেখার কথাই ধরুন। ও'র ছোটদের জন্য লেখা বই থেকে, ছোটদের চেয়ে বড়রা বেশী আনন্দ পায়। যে বয়সের জন্য লেখা, তার চেয়ে বড় না হ'লে অবনীন্দ্রনাথের লেখা ভাল লাগে না। এ ব্যবস্থায় বাঙ্গালী পাঠক আপত্তি করেনি; কিন্তু বিদেশী শিশুদের বা বয়স্কদের মনঃপূত নাও হতে পারে। সামাজিক কারণেও বহু বইয়ের অনুবাদ সম্ভব নয়। একই বই বিভিন্ন দেশের পাঠকের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। Charles Peguy, Maurice Barre's, Martin du Gard, Colette প্রভৃতি ফরাসী দেশে সমাদৃত লেখকদের লেখা, ইংরেজ পাঠকদের কাছে বিশেষ আমল পায়নি। রুচির তারতম্য আছে বিভিন্ন দেশের পাঠকদের। Sartre-র "La Nause'e" অথবা Louis Guil-

আঁতোয়ান্‌ সাঁ-দ্‌রুপেরী

ভাস্কর আরিস্তিদ্‌ মাইয়োল
(১৮৬৭-১৯৪৪)

loux-র "Le Sang Noir" ফরাসী পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছে, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক সে বই পছন্দ করবে না। তা' ছাড়া, এমন বইও আছে, যা ইংরেজীতে কলকাতার দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, অথচ বাংলায় অনুবাদ করলে পুলিসে ধরবার ভয় আছে।

সর্বদিক বিবেচনা করে একখান অনুবাদযোগ্য ফরাসী বইয়ের নাম করছি। বইখানির নাম 'Le Mas Theotime'; লেখক Henri Bosco। লেখক নিজের দেশেও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য প্রতিভা ব'লে গণ্য ন'ন। কিন্তু বইখানি অপূর্ব এবং ফরাসীদেশে সমাদৃত। অভিনব এর রস। আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধও নেই; কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত চেতনামূলক একটা রহস্যের স্বাদ বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। একটা কিসের যেন ছায়া, অথচ মজা হচ্ছে যে, সেটা কোথাও স্পষ্ট লেখা নেই। ঈর্ষাদ্বেষে ভরা, বিঘাকাঠায় ঘেরা, ভূমিবৎসল গ্রামীণ মন কত সংকীর্ণ ও কত উদার যে হতে পারে তাই দেখিয়েছেন শক্তিমান লেখক বইখানিতে। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, এ বই আমাদের দেশের পাঠকদের খুব ভাল লাগবে। এ বইখানি অনুবাদ করাও সহজ।

* * *

'মার্জিতরুচি' কথাটির কোন সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। ফরাসীদেশের লোকেদের মার্জিতরুচি ব'লে পৃথিবীময় খ্যাতি। তাই আশ্চর্য হই তাদের হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ বইয়ে অতি স্থূল রসিকতা দেখে। রসিকতায় শ্লীলতা অশ্লীলতার কথা আমি তুলছি না; আমি বলছি স্থূলতা সূক্ষ্মতার কথা। Balzac-এর 'Contes Drolatiques'-এর হাসির গল্পগুলি, ইচ্ছা করেই অশ্লীল গল্প লিখব ব'লে লেখা। সেগুলোর কথা তাই বাদ দিলাম। ধরুন Jules Romains-এর লেখা 'Les Copains'-র কথা। ফরাসী ভাষায় এ শতাব্দীর হাস্যরসের বইগুলির মধ্যে এর শ্রেষ্ঠত্ব একরকম স্বীকৃত। বইখানি সত্যি সত্যিই অতি উচ্চাঙ্গের। লেখক উচ্চাদর্শের সাহিত্যিক অ্যাকাডেমির সদস্য। বর্তমানকালের যে পাঁচজন ফরাসী লেখকের বই সে দেশের পাঠকেরা সবচেয়ে বেশী চায়, ইনি তা'দের মধ্যে একজন। বইখানি থেকে নমুনা হিসাবে কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি—অবশ্য বেছে বেছে।

......"সে স্বপ্ন দেখল যে, তার খুব প্রস্রাব করতে ইচ্ছা করছে। মূত্রাশয় ভারী হয়ে উঠেছে আর ব্যথা করছে। তার হৃদয় যেন মূত্রাশয়ের মধ্যে নেমে এসেছে। সে তার সব নাগরিক অধিকার ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে, শুধু এক মিনিট মূত্রত্যাগ করবার আনন্দের পরিবর্তে। এক মিনিট কেন, শুধু কুড়ি সেকন্ড! উষ্ণ প্রস্রবণের মত প্রবল বেগে তাকে মূত্রত্যাগ করতে হবে।......হঠাৎ সে আবিষ্কার করল একটি সুন্দর প্রস্রাবাগার—মূত্রত্যাগের এক বিরাট প্রাসাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না।......কি শাহানশাহী কান্ড! প্রাসাদের মধ্যে সারি সারি ছোট ছোট কামরা। সে প্রথমটার মধ্যে গিয়ে মূত্রত্যাগ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কি কান্ড! কিছুই যে বার হয় না! এক ফোঁটাও যে না! মূত্রাশয় আরও ভারি হয়ে ওঠে।...সে ঢুকল দ্বিতীয়টির মধ্যে।...ইত্যাদি...ইত্যাদি......"

আর এক পাতা থেকে দু লাইন তুলে দিঃ—

সরাইওয়ালী যাবার সময় বলে গেল খাটের নীচে একটা পাত্র আছে। আমাদের উপদেশ যদি শোন তাহলে বলি—দেখো ওটা যেন অর্ধেকের বেশী ভরে না যায় (প্রস্রাবে)। কেননা, উপরের দিকে একটা ফুটো আছে।...ইত্যাদি......

আর এক অধ্যায়ে মন্ত্রী সৈন্যব্যারাকের রাতের-পায়খানা নিরীক্ষণ করতে করতে বললেনঃ—

"এখানকার ব্যারাকের লোকদের পেটের অসুখ নাকি?"

"হ্যাঁ, মন্ত্রী মশাই। তবে শুধু যারা রাতের-পায়খানা ব্যবহার করে তাদের। দিনের পায়খানার মালগুলো বেশ শক্ত গোছের। এখানকার মত নয়।"......

Les compainsর শেষের দিক থেকে আর একটা প্যারা তুলে দিচ্ছি—যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির হাস্যাস্পদ বিবরণ দিয়ে হাসানর চেষ্টার নমুনা হিসাবে। যেকথা নিজের ভাষায় বলতে লজ্জা করে, সে কথা বিদেশী ভাষায় বলা চলে।

........"Son Sexe, bien 'etale' sur l'echine du cheval, frappait a la fois par sa grosseur, et par son naturel. Les dames, et plus d'une jeune fille, n'en finissaient pas de l'admirer"................

এই সব স্থূল রসিকতা আমাদের বটতলার বইয়েও আজকাল চলে না।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়, আমাদের পছন্দ অপছন্দর মধ্যে। হাস্যরসের বিষয়বস্তু হিসাবে যে জিনিসগুলোকে স্থূল ও অমার্জিত মনে হয়, সেই জিনিসগুলোকেই যখন একটু গম্ভীর রসের বিদেশী বইয়ের মধ্যে দেখি, তখন সে সাহিত্যের ঔদার্যের প্রশংসা করি ও সে ভাষার লেখকদের হিংসা করি।

সমগ্র বইখানির আমি নিন্দা করছি না; ফরাসীদের উদার সাহিত্যরুচির একটা বিশেষ দিকের উল্লেখ করছি মাত্র। Rabelaisর প্রাণখোলা হাসির ধারা আজও শুকিয়ে যায়নি ফরাসী সাহিত্যে, এগুলো তারই প্রমাণ।

কিছু কিছু অংশ আমাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকলেও বই হিসাবে Les Compains খুব ভাল। কারণহীন কাজ নিয়ে এ ধরনের হাসির বই আর কোন সাহিত্যে কেউ লিখেছেন কি না আমার জানা নেই।

* * *

ফরাসীদের মন যুক্তিবাদী। সেইজন্য অনেক সাহিত্যিকই বেশ ভেবে, একটানা একটা 'Ism' ঠিক করে তারপর সেইটাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। Sartre-র অস্তিত্ব-

যাদের কথা আজ সব দেশের লোকেই জানে। Camus আছেন Absurd-এর দর্শন নিয়ে। Mounier বেছেছেন Personalisme; এর বাণী হল 'ব্যক্তি সমাজের জন্য এবং সমাজ একক ব্যক্তির জন্য!' Jules Romains-এর সৃষ্টি l' unanimisme.

গত পঞ্চাশ বছরের ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, কত যে 'ism'-এর সৃষ্টি হয়েছে তার অন্ত নেই।

Adolph Lacuzon এর Integralisme; Boreas এর Romanisme; Jammisme; Naturisme (Naturalism নয়); Humainisme (ক্লাসিকাল নয়)); Futurisme; Intimisme; Neo-classisime; Populisme; Dadaisme, Proxysme, Surrealisme; Realisme Mystique;

এ সব নামের ফর্দ শেষ হতে জানে না। সৃষ্টিকর্তাদের সকলেই কি ভেবেছিলেন যে, তাঁর সাহিত্যিক ফরমুলা টিকবে? না তাঁর নাম স্থায়ী হয়ে থাকবে সাহিত্যে? টেকে না তো দেখি একটাও। শক্তিমান লেখকরাও তো দেখি যে, নিজের সৃষ্ট সাহিত্যিক ফরমুলার কয়েদখানায় শেষের দিকে বন্দী অবস্থায় থাকেন।

* * *

ডুমা ও হুগোর দেশে ঐতিহাসিক-উপন্যাস আজ এত কম লেখা হয় কেন। প্রকাশকরা বলেন চাহিদা নেই। ঔপন্যাসিকরা বলেন যে, আজকাল উপন্যাসের মত করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে বলে পাঠকরা আর ঐতিহাসিক উপন্যাস চায় না; উপন্যাসের বদলে ইতিহাস পড়ছি ভেবে পাঠক নিজের চোখে নিজের মর্যাদা বাড়ায়; আসলে এগুলো ইতিহাস নয়, কতকগুলো সরস খবরের সঙ্কলন।

যুক্তিগুলো ধোপে টেকে না। কেননা একই কারণ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজীতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাঠকের অভাব নেই। আমেরিকার ইতিহাস নিয়ে তো নিত্য বই বার হয়। বইগুলির আমেরিকায় বেশ কাটতিও হয়। ঐতিহাসিক পট-ভূমিতে লেখা বইয়ের Ret Butler বা Amber আজও তো দেখি ইংলণ্ডের পাঠকদের মনে তুমুল সাড়া জাগায়। ইতিহাস নিয়ে লেখা Howard Fast-এর বইগুলোরও তো দেখি খুব চাহিদা।

* * *

পৃথিবীর সাহিত্যে একটি নূতন স্বাদের আমদানী করে গিয়েছেন ফরাসী লেখক Antoine de Saint-Exupery প্রকৃতি ও জীবনের সনাতন বিষয়গুলিকে নতুন জানলা দিয়ে দেখা—এরোপ্লেনের জানলা দিয়ে। এরোপ্লেনের জগৎ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন অনেক লেখক—Faulkner পর্যন্ত। কিন্তু তাঁদের লেখায় Antoine de Saint-Exupery-র শান্ত গভীরতা নেই। আমাদের আনন্দ যে, সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়ের ক্ষেত্র দিন দিনই বাড়ছে। পরী, হুরী, দৈববাণীর যুগ চলে যাওয়ার ক্ষতি লেখকরা পুষিয়ে নিতে পারবেন। ভবিষ্যতের সাহিত্যিকরা যন্ত্রের যন্ত্রসত্তার পিছনে বহু রকম রহস্য-রসের সন্ধান পাবেন। বিমানচালক Antoine de Saint-Exupery হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন যে, যন্ত্রের সান্নিধ্য এমন কি যান্ত্রিকতাটুকুও সাহিত্যসৃষ্টির পরিপন্থী নয়।

* * *

ফরাসী বই এত আক্রা কেন? ইংরেজী বইয়ের সঙ্গে তুলনা করতে গেলেই জিনিসটা চোখে পড়ে। ফরাসী পুস্তক-বিক্রেতারা প্রথমে কথাটা স্বীকারই করতে চান না। পরে অবশ্য কারণ দেখান। ইংরাজী বই নাকি একসঙ্গে অনেক বেশী ছাপা হয়। এইটাই একমাত্র কারণ, একথা মনে ধরে না।

Colette-এর লেখা Cheri এবং La fin de Cheri, দুখানি বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ একত্রে, দুই শিলিংএ কিনতে পাওয়া যায়। এই বই দুখানি মূল ফরাসীতে কিনুন; সবচেয়ে সস্তা সংস্করণে আট নয় টাকা লাগবে। ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসিক বইগুলো কত সস্তায় পাওয়া যায়। অথচ ফরাসী ভাষায় Stendhal-এর লেখা La Chartreuse de Parme কিনতে যান আজ; দেখবেন দাম কত লাগে। তা ছাড়া এসব বইয়ের মলাট সাধারণ কাগজের; বইয়ের পাতাগুলোও পুরনো হলেই হলদে হয়ে যায়। তবু এত দাম। ভাল মলাটের বইগুলোর দাম দ্বিগুণ। নতুন ফরাসী বইয়ের পাতা কাটা থাকে না, এও পাঠকদের একটা অভিযোগ।

যে সব প্রতিষ্ঠান ফরাসী সংস্কৃতির বাইরে প্রচারের জন্য ইচ্ছুক, তাঁরা যদি ফরাসী বইয়ের দাম যাতে একটু কম হয়, সেদিকে নজর দেন, তাহলে বড় ভাল হয়। ফরাসী সংস্কৃতির স্বাদ নেবার পথে বিদেশীদের এটাও এক অন্তরায়। শুধু বিদেশে বিক্রি করবার জন্য একটা সস্তা সংস্করণ বার করা যায় না কি?

ফরাসী চিত্রে ইম্‌প্রেশনিজম্‌

অহিভূষণ মল্লিক

পত্র পত্রিকার চিত্রসমালোচনায় আজকাল 'ইমপ্রেশনিজম' কথাটি হামেশাই চোখে পড়ে। কথাটির যে অপপ্রয়োগ হয় না, এমন নয়। অনেক চিত্রশিল্পীকেও এর অদ্ভুত রকম ব্যাখ্যা করতে শুনেছি। সুতরাং ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বলা সময়োপযোগী হবে মনে করে এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছি সেগুলি নানা পত্রপত্রিকা এবং বই থেকে সংগৃহীত আর যা মতামত প্রকাশ করেছি তা একান্তই নিজস্ব, সুতরাং অন্যের সংগে আমার মতের মিল মাঝে মাঝে না-ও হতে পারে।

ইমপ্রেশনিস্ট আখ্যাটির স্রষ্টা হলেন শিল্প-সমালোচক আলফ্য ল্যারোয়া। ১৮৭৫ সালে প্যারিস-এ নাদার নামে এক ফটোগ্রাফ ব্যবসায়ীর কার্যালয়ে এই ইমপ্রেশনিস্ট গোষ্ঠীর প্রথম শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। প্যারিস-এর সরকারী চিত্র-প্রদর্শনী 'সালো' এ'দের প্রবেশ অধিকার না দেওয়ায় এ'রা একটি সমিতি গঠন করিলেন, নাম হ'ল, সোসিয়েতে অনোনীম দেজ আর্তীস্ত্, প্যাঁত্র, স্কিল্প্তয়োর গ্রাভয়ো ইত্যাদি। এই প্রদর্শনীটির উদ্দেশ্য—সরকারী সালোঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। এতে অংশগ্রহণ করলেন সবশুদ্ধ তিরিশজন পুরুষ এবং একজন মহিলা শিল্পী। এই তিরিশজন পুরুষের মধ্যে ছিলেন দ্যগা, র‍্যানোয়ার, মনে, পীজারো, সেজান, সীসলে প্রভৃতি এবং একমাত্র মহিলা ছিলেন মরীজো। শিল্পী এদুয়ার মনে যদিও গোড়া থেকেই এই আন্দোলনের স্বপক্ষে তা হলেও প্রথম প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন নি। এ'দের শিল্পকর্ম দেখবার পর দর্শকদের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—কেউবা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, গোঁড়া-পন্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন একে শিল্পবিদ্যার অবমাননা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, আবার কেউবা ব্যাপারটি অত্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করে শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে ক্ষান্ত রইলেন। ছবিগুলির মধ্যে ক্লোদ মনে অঙ্কিত একটি ছবির নাম ছিল, 'ইমপ্রেশন, সানরাইজ' (আঁপ্রেজিয় অলেই ল্যভাঁ)—এ থেকেই শিল্পসমালোচক ল্যারোয়া উপহাস করে সমগ্র গোষ্ঠীটির নামকরণ করলেন 'ইমপ্রেশনিস্টস্' এবং এই আন্দোলনের নাম হ'ল 'ইমপ্রেশনিজম্'। খবরের কাগজওয়ালারা শুধু ইমপ্রেশনিস্ট নামকরণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, নানারকম বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধাদি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি প্রকাশ করে চললেন। এমন কি একটি কাগজে মস্ত বড় এক কৌতুক উপন্যাসও ছাপা হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশী গালাগালি খেলেন সেজান। কিন্তু এ আন্দোলন থামলো না; সরকারী সালোঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত 'নিও ক্লাসিসিস্ট' চিত্রধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমশই বেড়ে চলতে লাগলো।

এ'দের ছবি নিয়ে এত হৈ চৈ হবার কারণটা কি? প্রথমে ধরা যাক ছবির বিষয়বস্তু। পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা-গান, ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, জাতীয় বীরপুরুষদের প্রতিকৃতি, কাউন্ট এবং কাউন্টেস-দের কৃত্রিম ভঙ্গীমার প্রতিচ্ছবি এসবের পরিবর্তে, মাতাল, ভবঘুরে, বারবনিতা, নর্তকী, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, মদের দোকান প্রভৃতি এ'দের ক্যানভাস-এ আসর জমিয়ে বসলো। এ'রা আশেপাশের সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং মডেল কে বুঝতে না দিয়ে ক্যামেরা যেমনভাবে অকৃত্রিম ভঙ্গিমা তুলে নেয়, তেমনিভাবে—ঢুলু ঢুলু চোখে মাতাল মদের গেলাস মুখের কাছে নিয়ে আসতে যাচ্ছে বা পরিশ্রান্ত রজকিনী ইস্তিরি করতে করতে হাই তুলছে অথবা গ্রাম্যদৃশ্যে সূর্যালোকের রকমফের প্রভৃতি স্বাভাবিক ভঙ্গিমা এবং দৃশ্য বেপরোয়া তুলির আঁচড়ে এ'কে চললেন। অতি নগণ্য জিনিসপত্রও এ'দের কাছে অঙ্কনের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা দিল—মরা মাছ, ফলের ঝুড়ি, ফুলের তোড়া, এসবকেও অত্যন্ত যত্ন নিয়ে এ'রা ক্যানভাস-এ তুলে রাখলেন। এমন কি জাপানী ছবির প্রিন্ট, প্রাচ্যদেশীয় খোদাই কর্ম, চিনামাটীর বাসনপত্র প্রভৃতিও এ'দের অনুপ্রেরণা জোগাতে লাগলো। এ হেন শিল্পকর্মকে সরকারী সালোঁ কি করে স্থান দেন!

পাইন গাছ ঃ মনে

স্নানরতাঃ র‍্যানোয়ার

দালী ঃ পীজারো
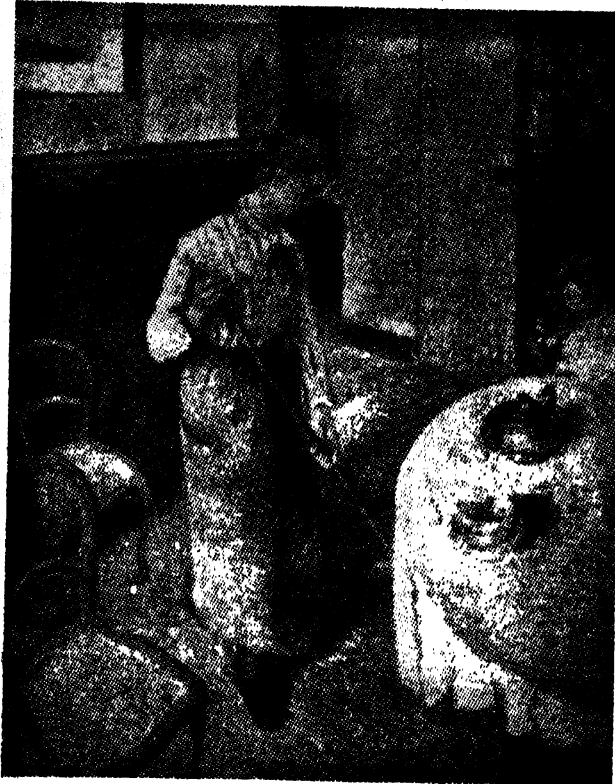
অবশ্য র‍্যানোয়ার 'ভেনাস' বা 'ডায়ানা' লেবেল মারা কয়েকটি ছবি সরকারী সালোঁ-এ অতি সহজেই প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ ছবিগুলি ছিল সাধারণ একটি স্বাস্থ্যবতী ফরাসী যুবতীর নগ্নমূর্তি স্টাডী। সমালোচকদের চরম বিরক্তি দেখা গেল, এ'দের রঙ ব্যবহার দেখে—হলদে, লাল, কমলা, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙের মোটা মোটা তুলির আঁচড়—না দেখিয়েছে আলো আঁধারের ক্রম-পরিণতি, না মিলিয়েছে টানটোনগুলি। ছবি আঁকার নামে এ কি? আঁচড় মেলানোর কায়দাকানুন কি এরা শেখেনি? লাল, হলদে, সবুজ, নীল এসব মারাত্মক রঙ যে সব সময় এড়িয়ে চলা উচিত—এদের গুরুমশাইরা কি সেকথা এদের জানায় নি? কালো রঙ, ছাই রঙ, চকোলেট রঙ,—এসব গেল কোথায়? নির্দিষ্ট সীমারেখা বলে কিছু নেই, যেন মাখনের মত গলে সব মাখামাখি হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতন সব কালের শিল্পীরাই, যা তাঁরা জানেন, সেইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। সব সময়েই এ'দের আরও কিছু জানবার দিকে ঝোঁক। সেই কারণে, নতুন বিষয়, নতুন পন্থা, নতুন মাধ্যম—এসবে এ'দের পরীক্ষানিরীক্ষার অন্ত থাকে না। সাধারণবুদ্ধির মানুষের কাছে এই পরি-বর্তন বিশেষ আমন্ত্রণীয় ঠেকে না, কেননা নতুন জিনিস বুঝতে বা উপভোগ করতে হলে আবার নতুন করে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। ইমপ্রেশনিস্টরা নতুন কিছু জানবার প্রয়াসে যে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে-ছিলেন, তার ফলে এই সত্যের সন্ধান পান যে, আলো এবং রঙের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্ক আব-হাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া যদি হালকা হয় তবেই আলোর তেজ বাড়ে এবং বিষয়বস্তুর রঙ বদলায় সেই অনুসারে। প্রায় পাঁচশ' বছর আগে জিওভানি বেলিনি এবং তার অনুসরণ-কারী ভেনিসিয়ান স্কুল-ও এই আলো এবং রঙের মধ্যের আত্মীয়তা কিছুটা অনুমান করেছিলেন। ফ্লোরেন্টাইন বতি-চেলির ভেনাস এবং ভেনিসিয়ান তিসিয়ান-

এর ভেনাস দেখলেই বোঝা যায় পার্থক্য কোথায়। ইংরেজ শিল্পী কনস্টেব্‌ল এবং টার্নারও এ সত্যের আভাষ পেয়েছিলেন। তবে ইমপ্রেশনিস্ট-দের প্রগতি আরও বিজ্ঞানসম্মত এবং এ'দের বর্ণ-বিন্যাসশৈলী সত্যই অভিনব। এ'রা সূর্যালোকের বিশিলষ্ট বর্ণাদির অর্থাৎ লাল, কমলা, হলুদ, নীল, বেগুনী এবং সবুজ রঙের স্বতন্ত্র আঁচড় ক্যানভাস-এ প্রয়োগ করে যৌগিক বর্ণের সৃষ্টি করলেন। আরও পরিষ্কার করে বলি, ছবিতে কোনও অংশে হয়ত নীলাভ লাল রঙ দেখাতে হবে; লাল এবং নীল রঙ প্যালেট-এ মিশিয়ে নিয়ে ক্যানভাস-এ প্রয়োগ করা চলে; কিন্তু এ'রা তা করলেন না—এ'রা লাল এবং নীল রঙের ছোট ছোট স্বতন্ত্র আঁচড় দিয়ে অংশটি ভরে দিলেন। দূর থেকে, আঁচড়গুলি একত্রিত হয়ে দর্শকের চোখে নীলাভলাল হয়ে দেখা দিল। এ'দের মতে—প্যালেট-এ মিশিয়ে নিয়ে ক্যানভাস-এ প্রয়োগ করলে বর্ণ তার স্বরূপে প্রকাশ পায় না। ছায়ার মধ্যেও এ'রা রঙ দেখতে পেয়েছিলেন, তাই এ'দের ছবিতে লক্ষ্য করা যায় কালো গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। যেখানে ছায়া দেখানো হয়েছে তাও ঐ সূর্যালোকের বিশিলষ্ট বর্ণাদির স্বতন্ত্র আঁচড়ের সংমিশ্রণ। এ'দের এত যে নিয়মকানুন এ সবই নিখুঁতভাবে প্রকৃতির রঙের উন্মাদনা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসে। এ'দের ছবির আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনও দৃশ্যের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে থাকার পর চোখ সরিয়ে নিলে মনের মধ্যে যে ছাপটা থেকে যায় সেইটেই এখানে প্রকাশ পায়। পুঙখানুপুঙখরূপে প্রতিটি ফর্ম-এর চিত্রণ নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে এ'দের ইমপ্রেশনিস্ট নাম খুবই সঙ্গত বলে মনে হবে। ইমপ্রেশনিস্টদের মধ্যে কমপ্লিমেণ্টারী কলর কথাটি খুব প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে এখানে দু চার কথা বললে নিশ্চয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কমপ্লিমেণ্টারী কলর জিনিসটি অবশ্য ইমপ্রেশনিস্টদের আবিষ্কার নয়। ফরাসী রোমাণ্টিসিস্টদের পাণ্ডা দেলাক্রোয়া একসময় একটি ঘোড়ার গাড়ি লক্ষ্য করেন। গাড়িটির উপরের জন্য হলদে এবং নীচের ভাগ কালো। হলদে এবং কালোর মিলন-রেখার নীচে খানিকটা অংশ তাঁর চোখে বেগুনী ঠেকেছিল। এই বেগুনী রঙটিই হ'ল হলদের কমপ্লিমেণ্টারী রঙ। আরেকটি উদাহরণ, সাময়িক পত্রে টক্‌টকে লাল রঙের মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে প্রায়ই পড়ে, ঐ অক্ষরগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমরা যদি দৃষ্টি শাদা দেওয়ালের উপর নিক্ষেপ করি, তাহলে ঐ অক্ষরগুলিকে সবুজ রঙে দেওয়ালে ভাসতে দেখা যায়। অর্থাৎ আমরা যে কোনও রঙের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে আমাদের চোখে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আরেকটি রঙের উপস্থিতি ঠেকে। এই বিপরীতধর্মী রঙটিকে আসল রঙের কমপ্লিমেণ্টারী বলা হয়। ইমপ্রেশনিস্টরা ছায়ার মধ্যেও আশেপাশের অন্য রঙের কমপ্লিমেণ্টারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করছিলেন। টেকনিক নিয়ে বাড়াবাড়ি রকম আলোচনা করলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, সুতরাং আবার ঘটনায় ফিরে আসা যাক।
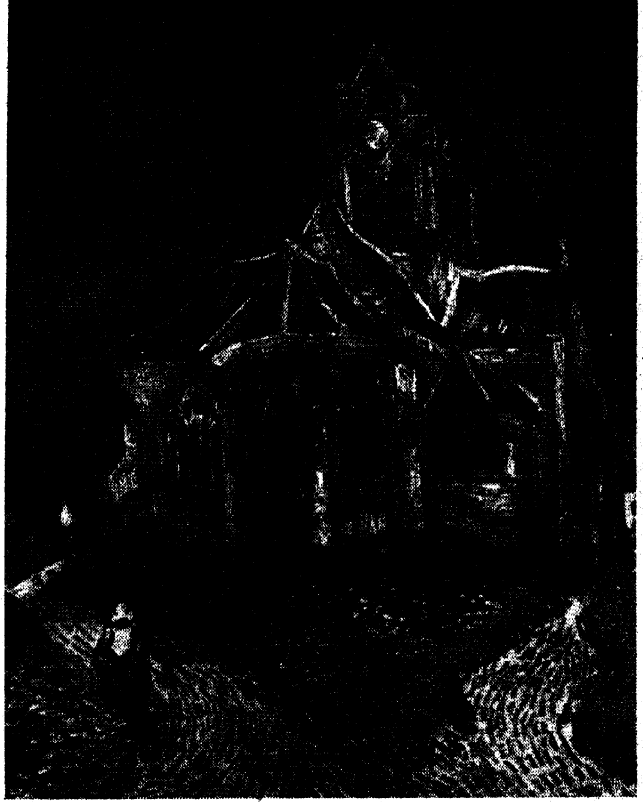
গীর্জাঃ ভ্যান গগ

এ'দের দ্বিতীয় প্রদর্শনীটিও (১৮৭৬) জনসাধারণের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পেলো না। কাগজওয়ালারা আরেক দফা গালিগালাজ করলেন, এবার আরও কড়া ভাষায়। ল্য ফীগারো কাগজে মন্তব্য বার হ'ল—"উন্মাদ হলে মানুষ যে কত বিপথগামী হয় এটি তার একটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।" প্রতিক্রিয়াশীলদের সমালোচনায় ইমপ্রেশনিস্টরা দমবার পাত্র নন। রঙ তুলি ইজেল কাঁধে নিয়ে এ'রা স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলেন খোলা মাঠে, প্রকৃতির সত্য রূপ ধরবার জন্য। 'মনে'

স্টিল লাইফ: সেজান

একই স্থানে বসে থেকে একই দৃশ্য এঁকে চললেন বার বার, উদ্দেশ্য—সূর্যালোকের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বস্তুর রঙের পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করে রাখা। ফলে ফর্ম গেল গোল্লায় শুধু টিঁকে রইল তাল তাল রঙ। এ ছবি কিনবে কে? যাই হোক, ১৮৭৬ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে আরও বার কয়েক এরা প্রদর্শনী করলেন। কোন কোন শিল্পীর এক আধখানা ছবি বিক্রীও হ'ল কিন্তু তাতে সংসার চলে না। পেটে ভাত না জুটলে কতদিন আর আদর্শ আঁকড়ে বসে থাকা যায়। শিল্পীরা দল ছেড়ে একে একে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। অবশ্য অর্থকষ্টই দল ভেঙ্গে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। ঠিক পথে যাচ্ছেন কিনা সে সম্বন্ধেও অনেকের মনে সন্দেহ জেগে-ছিল। দ্যগা, মানে, সেজান এঁরা গোড়া থেকেই ইমপ্রেশনিস্ট অঙ্কন রীতি সম্বন্ধে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না—কারণ বিষয়বস্তুর গঠনযোগ্যতা এতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। সেজান তাঁর ছবিতে গঠন যোগ্যতা বজায় রাখার জন্য এক অভিনব পন্থা বার করলেন, তিনি বিষয়-বস্তুর বহির্ভাগকে কয়েকটি সমতলখণ্ডে ভাগ করে গাঢ় থেকে হাল্কা বা হাল্কা থেকে গাঢ় রঙ পর পর ভরে দিলেন। অনেক পণ্ডিতের মতে সেজান-এর এই অঙ্কন-রীতি অনুসরণ করেই উত্তরকালের শিল্পীরা কিউবিজম-এর জন্ম দেন। এঁদের মধ্যে দলাদলিও দেখা দিয়েছিল। শোনা যায় ১৮৮০ সালের প্রদর্শনীতে গোগ্যাঁকে প্রবেশাধিকার দেওয়ায় মনে এবং র‍্যানোয়ার এঁদের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। গোগ্যাঁ তখনও পেশাদার শিল্পী হন নি; শেয়ার বাজারে দালালী করেন ও মাঝে মাঝে পীজারোর কাছে ছবি আঁকা শিক্ষা করতে যান। এ রকম একজন খেলো শিল্পীর সঙ্গে ছবি প্রদর্শন করতে মনে এবং র‍্যানোয়ার কিছুতেই রাজী হন নি। ১৮৮১ সালের প্রদর্শনীতেও মনে এবং র‍্যানোয়ার-এর অনুপস্থিতির কারণ গোগ্যাঁর অংশ গ্রহণ। পরে অবশ্য গোগ্যাঁ নিজেই এঁদের দল ছেড়ে চলে যান। ইমপ্রেশনিস্টদের শেষ প্রদর্শনী হয় ১৮৮৬ সালে। দল তখন পাতলা হয়ে ১৭ জনে ঠেকেছে। মনে এবং র‍্যানোয়ার এবারেও যোগ দিলেন না। কারণ এবার আর গোগ্যাঁ নন, এবার স্যয়েরা। স্যয়েরা হলেন পয়ণ্টিলিজম্-এর জন্ম-দাতা। আঁচড়ের বদলে ইনি বিন্দু প্রয়োগ করে ছবি আঁকতেন। মনে এবং র‍্যানোয়ার-এর এতে ঘোর আপত্তি। মনে যদিও ইমপ্রেশনিস্টদের অনেক প্রদর্শনীতেই অংশ গ্রহণ করেন নি তা হলেও ইনিই ছিলেন ইমপ্রেশনিজম-এর একনিষ্ঠ সাধক। পীজারো এবং সীসলের নিষ্ঠাও কম ছিল না। কেবল এঁরা তিনজনেই, ধরা যায় জীবনের শেষ পর্যন্ত ইমপ্রেশনিস্ট রীতিতে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গিয়ে-ছিলেন। এখনও পর্যন্ত ভ্যান গগ্ এবং তুলুজ লোত্রেক-এর নাম উল্লেখ হ'ল না বলে অনেকে হয়ত অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইমপ্রেশনিজম-এ এঁদের অবদান খুব বেশী নেই। এঁরা অল্প কিছুকাল ইমপ্রেশনিজম-এর প্রভাবে পড়ে চিত্রাঙ্কন করেছিলেন মাত্র। পরে গোগ্যাঁর মত এঁরাও স্বকীয় ধারায় এগিয়ে চলেন। সুতরাং গোগ্যাঁ, গগ, লোত্রেক, প্রভৃতিকে ইমপ্রেশনিস্ট গোষ্ঠীভুক্ত করা ঠিক যায় না। তবে ইমপ্রেশনিস্টরাই যে এঁদের পথ-প্রদর্শক সে কথা অনস্বীকার্য। সম-কালীন শিল্পেও এঁদের শিক্ষাই হ'ল মূল ভিত্তি। এ সম্বন্ধে সার উইলিয়াম অরপেন-এর মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বক্তব্য শেষ করছি।

শৃগাল ও বালিকা: গোগ্যাঁ

The effect of this art method of Impressionism on the art of our own day is enormous....It is true to say that the vast majority of artists are now painting in the way they are because of this theory of the effect of light upon forms and colour which the French artists first put-forward in the latter part of last century. Actual divisionism of pointillism is not so evident; but something akin to it in broken colour, loosely put on to the canvas with more regard for the effects of light than for the basic form permeates contemporary art.

ফরাসীর জীবনবোধ ও বাঙালী লেখক

শিবনারায়ণ রায়

ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক প্রায় দেড়শ' সোয়াশ' বছর ইংরেজের সাগরেদী করেও বাংলা সাহিত্যের যে আজো স্বঃপ্রাপ্তি ঘটল না, তার একটা কারণ বাধ হয় এই যে ইংরেজ আমাদের লখিয়ে ভাবিয়েদের অনেক তত্ত্বে তালিম দয়েও একটা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, লতে কি অন্ধ করে রেখে গেছে। সত্য য লজ্জার ঘাটে পা ধোয় না, একথা মামাদের ইংরেজ গুরুরা আমাদের শখাননি। হয়ত একথা শেখাবার তাকত তাঁদের ছিল না। কেননা ইংরেজের কাছে খন আমরা তালিম নিতে শুরু করলাম তখন আর ইংরেজ এলিজাবেথান-জকোবিয়ান যুগের ইংরেজ নেই, তার তি পরিবর্তন ঘটেছে। রেনেসাঁসের ত্যান্বেষণ ক্ষীণ হতে হতে রূপান্তরিত য়েছে রোমাণ্টিক সত্যবিমুখতায়; তার দীর্ঘাশ্বিত ভোগবুদ্ধি শীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয় বিবেকের মেদাতিশয্যের নীচে চাপা পড়েছে। ফলত ডনের কবিতা, হব্‌স্‌-এর দর্শন, সুইফ্‌টের ব্যঙ্গ কিংবা স্টর্নের উপন্যাস বাঙালী শিক্ষিতমনের উজ্জীবনে বিশেষ কোন ছাপ ফেলেনি। এমনকি যদিও শেক্সপীয়রের নাম বলতে আমরা গদ গদ বোধ করেছি তবু কি উনিশ কি বিশ শতকে এমন বাঙালী লেখকের সন্ধান পাওয়া শক্ত যাঁর লেখায় শেক্সপীয়রী মেজাজের কিছুটা আভাস চোখে পড়ে। রোমান্টিক ভাবালুতার আওতায় আমরা জীবনের চাইতে কল্পনাকে বড় বলে ভাবতে শিখেছি; ভিক্টোরিয় ঔচিত্যবোধে দীক্ষা নিয়ে আমাদের ধারণা হয়েছে সত্যের চাইতে শ্লীলতা বেশী মূল্যবান। আমাদের সাহিত্য-কল্পনা পুষ্ট হয়েছে স্কট ওয়ার্ডসোয়ার্থ টেনিসন ডিকেন্সের রীতিতে। ফলে আমাদের লেখকেরা মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের অনুধাবন না করে তার ভাবরূপটিকে নিয়ে মশগুল হয়েছিলেন। শুধু হয়েছিলেন না, বাংলার অধিকাংশ লেখক আজও সে মোহ কাটাতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশংকর, রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু, এ'রা

বালজাক্‌। শিল্পী র'দা নির্মিত মূর্তি

সকলেই কমবেশী এই রোমাণ্টিক ভিক্টোরীয় ধারার সাধক। প্রসাদগুণের খাতিরে এ'রা জীবনের অনেকগুলো দিককেই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বাংলাভাষায় আজো যে কোনো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস কি নাটক লেখা হল না, আমার বিশ্বাস বিচার করলে দেখা যাবে রোমান্টিক ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা হয়ত স্পষ্ট হবে। দেহকে বাদ দিয়ে মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং মানুষ সম্বন্ধে সত্যকথা লিখতে হলে দেহের দিকে চোখ বুজলে চলবে কেন? অথচ ইংরেজী সাহিত্যে পাঠ নিয়ে আমরা লেখক কি পাঠক সকলেই শরীরটাকে নিয়ে অদ্ভুত কুণ্ঠা বোধ করতে শিখেছি। ইংরেজি সাহিত্যে চিরকাল এ কুণ্ঠা ছিল না; ক্যান্টারবেরী টেলসের কবি হতে ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডীর ঔপন্যাসিক পর্যন্ত অনেক ইংরাজ লেখকই দেহ এবং মন সম্বন্ধে সমান কৌতূহলী ছিলেন। কিন্তু উনিশশতকের গোড়ার দিকে নানাকারণে শিক্ষিত ইংরেজের রুচিতে এক মস্ত পরিবর্তন শুরু হয় এবং ক্রমে ইংরেজি সাহিত্যে দেহ এবং বিশেষ করে দেহের আদিম প্রক্রিয়া প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কুণ্ঠা প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের শিক্ষিত জনের রুচি যে ইংরেজের প্রভাবে গড়ে ওঠে, সে এই দেহ-কুণ্ঠিত ইংরেজ। ফলে গত একশ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিদ্যাসাগর ১ এবং দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় ছাড়া অন্য প্রায় কোথাও দেহ সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন উল্লেখ চোখে পড়েনা।

এই কুণ্ঠা বোধহয় প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। একধারে খৃষ্টান মিশনারী এবং অন্যধারে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবক্রমে এই কুণ্ঠাকে আমাদের শিক্ষিতমনে দৃঢ়মূল করে এবং পরে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রধান কল্পনায় এ কুণ্ঠা মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান লক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়। নায়ক নায়িকারাও যে হাঁচেকাশে, খায়দায়, মলমূত্র ত্যাগ করে, সম্ভোগকামনার দ্বারা পীড়িত হয় এবং জ্ঞানান্বেষণ কি নীতিবোধের মত এগুলিও যে মনুষ্যত্বের সামান্য লক্ষণ—রোমাণ্টিক-ভিক্টোরীয় ইংরেজ-রুচির আওতায় পড়ে মানুষ সম্বন্ধে এই নিতান্ত সাধারণ সত্যকথা আমাদের সাহিত্যিকেরা ভুলেছেন এবং পাঠকদের ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে আমাদের সাহিত্যে মানুষের যে রূপটি প্রধান হয়ে উঠেছে, সেটিতে দরজির হাত যত স্পষ্ট, প্রকৃতির হাত ততটা নয়। ভাল দরজির কারিগরী নিশ্চয়ই তারিফ পাবার যোগ্য; তবু বস্ত্র স্টাইলের দরজিরও সাধ্য নেই যে শুধু ছুঁচ সুতো আর কাঁচির জোরে
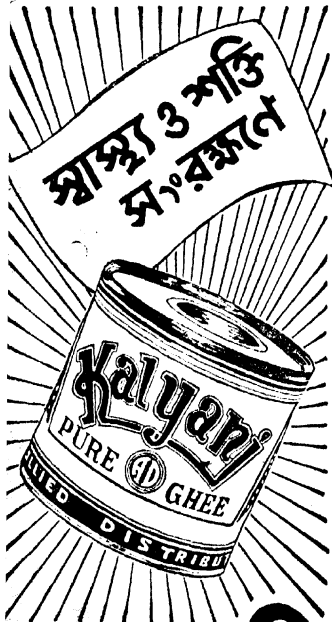
একটা আস্ত জ্যান্ত মানুষ পয়দা করে। বাঙালী লেখক যতদিন এই সহজ কথাটি না হৃদয়ঙ্গম করছেন ততদিন তাঁর কলম আর যাই পারুক স্তাঁদালের মত উপন্যাস অথবা শেক্সপীয়র কি মোলিয়েরের মত নাটক রচনা করতে পারবে, এ আশা সুদূরপরাহত।

কুণ্ঠা যে সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক, আরেকদিক হতেও একথাটা বিচার করা যেতে পারে। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা এবং একথা সকলেই জানেন যে ভাষার বিকাশ ছাড়া সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব। অথচ রোমাণ্টিক-ভিক্টোরীয় সাহিত্য ভাষা সম্বন্ধে যে আদর্শে আমাদের লেখকদের দীক্ষিত করেছে, সে আদর্শ মেনে নিলে ভাষার বিকাশ কিছুদূরে পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কেননা এই আদর্শ অনুসারে শুধু শ্লীলতার শীলমোহর দেওয়া ভাষাই সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। অথচ এই শীলমোহর দেবার যাঁরা অধিকারী তাঁরা সমাজের একটা ছোট অংশমাত্র। ফলে অধিকাংশ লোক যে ভাষায় ভাবে এবং কথা বলে তার অনেকখানিই সাহিত্যে অপাংক্তেয়। এ অবস্থায় ভাষার বিকাশ যে শুধু ওপরতলার লোকেদের লেনদেনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে এ আর আশ্চর্য কি? ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে এ আদর্শ চালু হবার আগে শেক্সপীয়র বেন জনসনের মত লেখক সে ভাষায় লিখে গেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্য সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রভাবে টেকচাঁদ, দীনবন্ধু২ এবং হুতোমের মত স্বল্প-সমর্থ লেখকেরা বাংলা গদ্যের ইতিহাস হতে একরকম প্রায় মুছে গেছেন। পরবর্তী কালে বীরবলের চেষ্টায় বাংলা গদ্যে সাধুভাষা এবং চলতিভাষার মাঝখানের ব্যবধান কিছুটা কমল বটে, কিন্তু তিনিও শ্লীলতার মোহ কাটাতে পারেননি। বাংলা ভাষা নিয়ে যিনিই কারবার করেছেন তিনিই জানেন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভাষা কত দুর্বল, কত দরিদ্র। এর অবশ্য বহু কারণ আছে; কিন্তু ভাষার শ্লীলতারক্ষা বিষয়ে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মোহ যে তার একটা প্রধান কারণ, কজন লেখক এতাবৎ সে কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে পেরেছেন। দেহাতীভাষা, বস্তির ভাষা, চায়ের দোকানে খেলার মাঠে হামেশাই যে ভাষা শোনা যায় সেই খিস্তির ভাষা বাংলাগদ্যসাহিত্যে আজও তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অথচ অন্য কারো লেখার সঙ্গে যদি পরিচয় নাও থাকে এক শেক্সপীয়রের ভাষা হতেই এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির ভাষার ব্যবধান বড়জোর একচুল, এবং খিস্তির ভাষার মধ্যে কাব্য বা দর্শনের ভাষার চাইতে কম ব্যঞ্জনা লুকিয়ে নেই।৩

টেরেন্স বলেছিলেন, আমি মানুষ, সুতরাং মানুষের কোনকিছুই আমার অনাত্মীয় হতে পারে না। এ শুধু মানব-তন্ত্রীর কথা নয়, এ খাস সাহিত্যিকের কথা। আর মানুষ সম্বন্ধে সত্যকথা যে লিখতে চায়, ভাষার শুচিবাই তাকে ছাড়তেই হবে। ইংরেজের মারফৎ রেনেসাঁসী জীবনদর্শনের আংশিক পরিচয় লাভ করে উনিশশতকের মাঝামাঝি সময় হতে বাঙালী লেখকেরা অধ্যাত্মতত্ত্বের কবিতা চর্বণ ছেড়ে মানুষের জাগতিক জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে শিখেছেন। কিন্তু এই এক'শ বছরেও এ কৌতূহল যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি তার একটা প্রধান কারণ সে জীবনদর্শন ভিক্টোরীয় শুচিবাইয়ের প্রভাবে অনেকটা বিকৃত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। ফাঁপা অভিজ্ঞতার পরে কথার চেকনাই দিয়ে মহৎ সাহিত্য কোনদিন রচিত হয়নি। বিশ্বাসের চাইতে যুক্তি বড়, অভ্যস্ত পথে চলার চাইতে নিজের বিবেকবুদ্ধি খাটানোর দাম বেশী, মানুষ-মানুষীর সুখদুঃখ নিয়ে না লিখতে শিখলে সাহিত্যের ভবিষ্যত অন্ধকার, ইংরেজের কাছ হতে এ তত্ত্ব শেখার ফলে বাংলা সাহিত্য-মানসের একদিন নতুন করে উজ্জীবন ঘটেছিল। কিন্তু তারপর আর আমরা খুব বেশী এগোতে পারিনি। আমরা এখনো এটা বুঝিনি যে মানুষের কথা যিনি লিখতে চান তাঁর কাছে কি ভাষা কি বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রেই শ্লীলতার চাইতে সত্যের দাবী অনেক বেশী বড়। কূলের টান যত বড়ই হোকনা কেন শ্যামের টানের কাছে তা তুচ্ছ। বাংলা ভাষায়

যথার্থ মহৎ সাহিত্য তখনি সম্ভব হবে যখন রাধার মত বাঙালী লেখকেরাও ঠেকে বুঝবেন লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।

॥ দুই ॥

এবং আমার বিশ্বাস এই বোঝার ব্যাপারে বাঙালী লেখক ফরাসী লেখকের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারেন। কেননা রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী সত্যসন্ধিৎসা ফরাসী সাহিত্যে যেমন পরিণত এবং প্রায় অব্যাহত প্রকাশ লাভ করেছে, তেমনটি বোধহয় আর কোন সাহিত্যে লাভ করেনি। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহ্য এই সত্যসন্ধিৎসার দ্বারা সমৃদ্ধ। সে সন্ধান মানুষের দেহমনের কোনো দিককেই লজ্জার অন্ধকারে আত্মগোপন করতে দেয়নি। ছি ছি'র ভয়ে অন্বেষণের মুখে লাগামটানা ফরাসী লেখকের ধাত নয়। রাবেলে-মলিয়রের রচনায় যে মানব-পরিক্রমা শুরু হয়েছিল ফ্রাঁস্-প্রুস্ত, কেমু-সার্ত্র্-এ পেঁছে আজও তাতে ক্লান্তি এলনা।

ফরাসী গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ রাবেলের কথাই ধরা যাক। ১৪৯৪ সালে এ'র জন্ম—অর্থাৎ শেক্সপীয়ারের সত্তর বছর আগে। মধ্যযুগের দীর্ঘরাত সবে ফিকে হতে শুরু করেছে, কিন্তু ফরাসী চিন্তা তখনো জীবনবিমুখ ধর্মতত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন। পুরুত মোহান্তরাই তখন সমাজের সবচাইতে ক্ষমতাশালী পুরুষ। রাবেলেও প্রথম যৌবনে ধর্মতত্ত্বের চর্চা করেছিলেন—কিন্তু তাঁর কুতূহলী মন মঠের সংকীর্ণ গণ্ডীকে মেনে নিতে পারল না। মঠে থাকাকালেই রেনেসাঁসের নতুন যে মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছিল তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সযত্নে এবং সঙ্গোপনে তিনি গ্রীকভাষা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন; তাঁর চোখ হতে খৃষ্টান আত্মনিগ্রহশীল নীতিতত্ত্বের আবরণ খসে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন জীবনের অর্থ সম্ভোগের মধ্যে, নিগ্রহের মধ্যে নয়; সুস্থ মানুষের পক্ষে কল্পিত পাপের জন্যে কান্না হাহুতাশ করার চাইতে কৌতুক করাটাই বেশী স্বাভাবিক; তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে "ভাগ্যের অনিশ্চয়তার মুখে তুড়ি

জাঁ-পল্ সার্ত্র্

মেরে যে জন মনের ফূর্তি বজায় রাখতে পারে সেই যথার্থ দার্শনিক।" সেদিন একথা বলতে গেলে সমূহ বিপদের আশংকা ছিল। রাবেলেকেও তাই রফা করে বাঁচতে হয়েছে, কিছুটা রেখে ঢেকে বলতে হয়েছে।৪ কিন্তু মুক্তবুদ্ধির জিজ্ঞাসাকে কে রুখতে পারে। রাবেলের জিজ্ঞাসা তাঁকে মঠছাড়া করল, ঘোরালো পথে পথে, শহরে গ্রামে, কখনো পণ্ডিতদের জগতে কখনো শুঁড়িখানায়। তিনি দর্শন পড়লেন, আইনকানুন পড়লেন, শেষ পর্যন্ত উত্তরতিরিশে পেঁছে চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা শুরু করলেন। ধর্মতত্ত্বের চাইতে শরীরতত্ত্বের মধ্যে মানুষের প্রকৃত খোঁজখবর মেলার সম্ভাবনা অনেক বেশী, সেই ধর্মান্ধতার যুগেও একথা বুঝতে তাঁর খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। আটত্রিশ বছর বয়সে রাবেলেকে তাই আমরা দেখি লিয় শহরের হাসপাতালে প্রধান চিকিৎসক-রূপে। একধারে তিনি মধ্যযুগীয় টীকাভাষ্যের জঞ্জাল দূর করে হিপোক্রেটেস এবং গেলেনের আয়ুর্বেদ বিষয়ক মূল রচনাবলীর সম্পাদনা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথার্থ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করছেন; অন্যধারে রোগনির্ণয় এবং নিরাময়ের উদ্দেশ্যে নানা দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তিনি আধুনিক আয়ুর্বেদের গোড়াপত্তন করছেন। শোনা যায় তিনি চিকিৎসক থাকা কালে লিয় শহরে মৃত্যুহার লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়।

জীবন সম্বন্ধে এই অসীম কৌতূহল, জীবন সম্ভোগের এই অক্লান্ত ক্ষমতা, জীবন বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অর্জিত এই বিচিত্র জ্ঞানসম্ভার নিয়ে রাবেলে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে নামলেন তখন দেখা গেল কি উপাদান সম্পদে, কি বাচন-নৈপুণ্যে রেনেসাঁসের সেই অসামান্য সমৃদ্ধ-যুগেও তাঁর জুড়ি মেলা দুষ্কর। গার্গাঁতুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল মহাকাহিনীর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৫৩২ সালে, চতুর্থ পর্ব ১৫৫২ সালে। সম্ভবত তার পরের বছরে রাবেলের মৃত্যু ঘটে। (তাঁর মারা যাবার দশ-বারো বছর পরে এ কাহিনীর পঞ্চম পর্ব নামে যে বই বেরোয় পণ্ডিতদের মতে তার বেশীটা অনু-কারকদের রচনা, রাবেলের নয়।) প্রায় বিশ বছর ধরে ফাঁদা এই বিরাট গালগল্পের মধ্যে আর যাই থাক লজ্জাসংকোচ কি দৈন্যকার্পণ্যের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর কল্পনায় দুর্লভ প্রাণশক্তির সঙ্গে দুর্লভ-তর বৈদগ্ধ্যের মিলন ঘটেছে, ব্যাপক জ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি ঘটেছে ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার; সুতীক্ষ্ম দার্শনিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে তীক্ষ্মতর কৌতুকবোধ। যেমন ভাব তেমনি ভাষার ব্যাপারে কোন উচিত অনুচিতের নিষেধ তিনি মানেননি, তাঁর

বিপুল অট্টহাস্যের ধাক্কায় সেসব নিষেধের গণ্ডী বুদ্বুদের মত নিমেষে ফেটে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তত্ত্বকথাকে খিস্তির ময়ান দিয়ে সুস্বাদু এবং সুপাচ্য করতে যেমন তিনি এতটুকু ইতস্তত করেননি, তেমনি শারীরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্শনপ্রস্থানের অবতারণা করা তাঁর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল। মোটকথা রেনেসাঁসের এই মানবতন্ত্রী সত্যসন্ধিৎসাকে ঔচিত্যবোধের চাইতে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন এবং তা দিয়েছিলেন বলে বোকাচিও, শেক্সপীয়র এবং সার্ভান্তেসের মত রাবেলেও দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যতা এবং বিশ্বজনীনতা অর্জন করেছেন।

ফরাসী সাহিত্যমানসে রাবেলে যে মানবতন্ত্রী জীবনবোধের বীজ বপন করেন গত চারশ বছরে তা বিচিত্র শস্য-সম্ভারে বিকাশ লাভ করেছে। তার মানে এ নয় যে রেনেসাঁস-উত্তর সব ফরাসী লেখকই রাবেলের প্রদর্শিত পথের যাত্রী অথবা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে অন্য কোন ধারা অবর্তমান। রাকিন, শাতোব্রিয়াঁ কি রোলাঁকে রাবেলের উত্তরসাধক বললে অবশ্যই ভুল করা হবে। সন্‌তেনের স্মিত-কৌতুকের সঙ্গে রাবেলের অট্টহাস্যের যদি কোন সম্পর্ক থাকে তবে সেটি বৈপরিত্যের বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা বোধহয় একথা স্বীকার করবেন যে, ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের, যেটি মূল ধারা পাঁতাগ্রুয়েলী জীবনবোধ তার প্রধান উৎস। এ জীবনবোধে ভাবরূপের চাইতে অস্তিত্ব বেশী মূল্যবান, সিদ্ধান্তের চাইতে জিজ্ঞাসা বেশী প্রবল, বিচার করার চাইতে বোঝবার আগ্রহ বেশী সক্রিয়। এ জীবনবোধ সম্ভোগে সরস, কৌতুকে উজ্জ্বল, যুক্তিশীলতায় শাণিত, মুক্তির অভীপ্সায় বেগবান। মলিয়েরের কমেডিতে, লা-ফ'তেনের নীতিগল্পে (আসলে যেগুলো খোস গল্প, নীতিতত্ত্বের ছিটেফোঁটাও এদের মধ্যে বার করতে হলে অনুবীক্ষণ কষতে হয়), ভলতেয়রের ব্যঙ্গরচনা এবং দার্শনিক কাহিনীতে এবং তার চাইতেও বেশী দিদেরো-র বড়গল্পে, বলজাক, ক্লদ তিলিয়ের (Mon Oncle Benjamim-এর অখ্যাত কিন্তু অসামান্য লেখক), আনাতোল ফ্রাঁস এবং সার্ত্র্-এর উপন্যাসে এ জীবন বোধ বিচিত্ররূপে প্রস্ফুরিত হয়েছে। এ'দের প্রত্যেকেরই মেজাজ, উপজীব্য বিষয় রচনারীতি পরস্পর হতে স্বতন্ত্র; তবু জীবনবোধের নিগূঢ় ঐক্যে এ'রা পরস্পরের এবং রাবেলের অতি নিকট আত্মীয়। কৌতুকান্বিত সংশয়, সম্ভোগ-পুষ্ট বৈদগ্ধ্য নিঃশঙ্ক জীবন জিজ্ঞাসা এবং ততোধিক নিঃসংকোচ প্রকাশসামর্থ্য এ'দের প্রত্যেকের পরিণত রচনাকে সৎ-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

এসব দুর্লভ গুণ শুধু যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাবেলের উত্তরসাধক তাঁদেরি রচনায় বর্তমান তা নয়। সাধারণভাবে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি শাখা, প্রতি ধারায় যা কিছু সার্থক রচনা তার প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই এসব গুণের একটি না একটি অথবা একত্রে সবকটির উপস্থিতি কমবেশী চোখে পড়ে। ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তবু যতদূর জানি তাদের কোনোটি সম্বন্ধেই এ জাতীয় প্রস্তাব সম্ভবত প্রমাণসহ নয়। ইংরেজী, জার্মান, নরওয়েজিয়ান কি রুশ সাহিত্যেও এসব গুণে গুণী লেখক অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সাহিত্যঐতিহ্যের প্রতিভূ কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত গুণাবলী ফরাসী সাহিত্য-মানসের সামান্য লক্ষণ। তাই সুমিতিসাধক মনতেন অত্যন্ত গুরু বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে যেয়েও হাটেবাটে চলতি নিতান্ত অসাধু, অশ্লীল অথবা গ্রাম্যভাষাকে প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে সংকোচবোধ করেননি; তাই পাস্কালের চিন্তায় গভীর ধর্মবিশ্বাস গভীরতর সংশয়কে প্রশ্রয় দিয়েছে; বিপ্লবী বিশ্বকোষ (Encyclopedic) আন্দোলনের অকুতোভয় দার্শনিক নেতা দিদেরোর সবচাইতে পরিণত রচনা "নিয়তিবাদী থাক"-এর কাহিনীতে তাই অলজ্জ ইন্দ্রিয় সম্ভোগের কৌতুকদীপ্ত বিবরণ জীবনদর্শনের আসর জুড়ে বসেছে, (৫) স্তাঁদাল তাঁর উপন্যাসে তাই পার্থিবক মুক্তি-

শীলতার সঙ্গে জৈববৃত্তির বেপরোয়া তাগিদকে মেলাতে পেরেছেন। এ'দের মধ্যে এক দিদেরো ছাড়া আর কারোকেই রাবেলেপন্থী বলা চলে না; তবু সত্য-সন্ধ জীবনবোধের কথা পূর্বে বলেছি এ'দের সকলের রচনা সে বোধে সমৃদ্ধ। আর শুধু গদ্য নয়, ফরাসী কাব্য ঐতিহ্যও তার বিশিষ্ট পরিণতির জন্য এই জীবনবোধের কাছে ঋণী। ব্যদলেয়র, ভর্লেন, রাঁবো এবং লাফোর্গ ত বটেই, এমনকি মালার্মে এবং ভলেরীও আমার বিবেচনায় এই জীবন-বোধের কবি। শেষোক্ত দুজন সম্বন্ধে কেউ যদি আপত্তি করেন (ইংরেজ সমালোচকদের বক্তব্যের পরে নির্ভর করলে সে আপত্তি স্বাভাবিক) তবে তাঁদের পুনরায় "ফনের অপরাহ্ন" (Apre's-midid'un Faune) এবং "সমুদ্রসমাধি" ((Le cimetiere Marin) কবিতা দুটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

ফরাসী সাহিত্যের মেজাজ সম্বন্ধে এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে এটুকু হয়ত স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে ফরাসী লেখকদের আর যা দোষই থাক ভাষা কি ভাব সম্বন্ধে শুচিবাইয়ের ব্যামোতে তাঁরা ভোগেননি। ইংরেজী শিক্ষিত পাঠক তাতে তাঁদের বেহায়া বলতে চান বলুন; ফরাসী সাহিত্যে ছি-ছি সম্বল নীতিবাগীশ এবং পেট-রোগা নাবালকের পথ্য মেলা সত্যই শক্ত। কিন্তু ব্যাস-কালিদাস, হোমর-শেক্স-পীয়রেই কি এদের পথ্য মেলা এত সহজ? মোটকথা ফরাসী লেখক জীবনের ওপর শ্লীলতার বোরখা চাপাতে নিতান্তই গররাজী; মূঢ়লজ্জার আবরণ ঘুচিয়ে অস্তিত্বকে মুক্তি দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ। এই আনন্দ ঘোর দুঃখবাদী ফরাসী লেখকের রচনাতেও স্ফূর্তির স্বাদ এনেছে। গোমড়ামুখো হাওয়াকেই যাঁরা দার্শনিকতার লক্ষণ মনে করেন সুকুমার রায় বর্ণিত সেই রামগরুড় সন্তানদের কাছে এ স্ফূর্তি অন্তঃসারহীনতার লক্ষণ বলে প্রতিভাত হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবনের কাছে পাঠ নিয়ে যাঁরা প্রকৃত বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছেন তাঁদের কাছে একথা স্পষ্ট যে ফরাসী লেখকের কৌতুকলঘু কল্পনা আসলে তাঁর নির্ভীক জীবন জিজ্ঞাসার একটি লক্ষণ মাত্র। গত চারশ বছরে ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের যে অতুলনীয় বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই নির্ভীক কৌতুকসরস জীবনজিজ্ঞাসাই তার প্রধান এবং অক্ষয় উৎস।

॥ তিন ॥

বাংলাভাষাতে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান ব্যক্তিরা লেখা সত্ত্বেও বাংলাসাহিত্য আজো যে প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করতে পারেনি, আমার বিবেচনায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই নিঃসঙ্কোচ জীবন জিজ্ঞাসার অভাব তার অন্যতম প্রধান কারণ। বাঙালী লেখকের ভাব এবং ভাবনা এখনো সত্যের টানে লজ্জা ঘৃণা ভয় জয় করতে শেখেনি। আমাদের মধ্যে যাঁরা নামজাদা লেখক তাঁদের
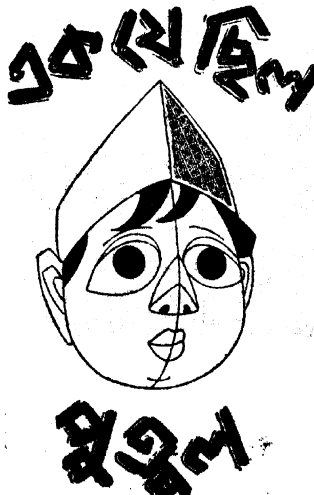
অধিকাংশই মিহিবুলিতে মোলায়েম ভাব পরিবেশন করে খুশী। ফলে বাংলা ভাষায় 'মিষ্টি লেখা'র খুব ছড়াছড়ি—এবং যেহেতু সবদেশের মত আমাদের দেশেও পাঠকপাঠিকাদের মন লেখকদের চাইতেও অপরিণত, সেকারণে আমাদের সাহিত্যে এই মিষ্টি লেখকদের রাজত্ব এখনও অপ্রতিহত।

অবশ্য এ ধারার বিরুদ্ধে কোন বাঙালী লেখকই যে বিদ্রোহের চেষ্টা করেননি তা নয়। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা এতাবৎ প্রকৃষ্টতর ঐতিহ্যে ফলপ্রসূ হয়নি। তার নানা কারণ আছে, দুএকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে পাঠক, সমালোচক, এবং লেখক প্রায় সকলেই ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত এবং সে শিক্ষা যে আমাদের অনেক কিছু দেওয়া সত্ত্বেও জীবনের কোনো কোনো প্রধান দিক সম্বন্ধে ভীতসংকুচিত করে রেখেছে—একথা পূর্বেই বলেছি। আমাদের লেখকরা বিদ্রোহ করতে যেয়েও এই অর্জিত সংকোচকে পুরোপুরি জয় করতে পারেননি; ফলে তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত বিদ্রোহ-প্রয়াস কালক্রমে সংকোচের কাছে হার মেনেছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' এই ব্যর্থতার একটি প্রধান উদাহরণ। তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে তিনি ক্রমেই অস্তিত্বকে খাটো করে ভাবরূপকে প্রধান করে তুলেছেন। 'চতুরঙ্গে' বিদ্রোহের কিছু যদি-বা আভাস আছে, 'শেষের কবিতা' এবং 'গোরা'তে বিশুদ্ধ ভাবরূপের একেবারে জয়জয়কার। তাছাড়া বিদ্রোহীরা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি এ বিদ্রোহের নির্দেশ কোন পথে; এর উৎস কোন জীবন-দর্শনে। যে পাঁতাগ্রুয়েলী জীবনবোধ ফরাসী সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে, এ'রা প্রায় কেউই সে জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হননি। 'শেষপ্রশ্নে' তাই কথার ফেনা বিস্তর, জীবনের স্বাদ আছে কি নেই। শরৎচন্দ্রের বেশ্যারা প্রত্যেকেই এক একটি সতীলক্ষ্মী, তাঁর উচ্ছৃংখলতম নায়কও শুধু যে সাধুভাষায় কথা বলে তা নয়, সাধুভাষায় ভাবে, সাধু রীতিতে উচ্ছৃংখল হয়। তবু যদিবা বিদ্রোহীদের মধ্যে দু'একজন যথার্থ সৎসাহসী দেখা গিয়েছিল, তাঁরা আবার সাহিত্যকর্মে তেমন বিশেষ দড় ছিলেন না। মনের যে পরিণতির ফলে অস্তিত্বের জটিলতম অভিজ্ঞতাকে সহজে সহৃদয় হৃদয়সম্বাদী করে তোলা যায়—জীবনের রূঢ়তম উপাদানকেও সরস করে তোলবার সেই সামর্থ্য—এ'রা অর্জন করতে পারেননি। ফলে এ'দের রচনায় সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান থাকা সত্ত্বেও সে রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। এ'দের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। নরেশচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে দুর্লভ বলিষ্ঠতা চোখে পড়ে; কিন্তু সে বলিষ্ঠতার প্রকাশ বড় কাঁচা, বড় অমার্জিত। তাঁর ভাষায় ব্যঞ্জনা সামান্য, তাঁর ভাবনা কৌতুকরসে জারিত নয়। ফলে যদিচ এককালে তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা লেখক-পাঠকমহলে প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল, পরবর্তীদের মনে তিনি বিশেষ দাগ রাখতে পারেননি।

এছাড়া সম্প্রতি বাংলাসাহিত্যে এক মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছে; সে হল মতবাদের ব্যাধি। এ ব্যাধি শুচিবাইএর চাইতে মারাত্মক; এ ব্যাধির পোকা জীবনজিজ্ঞাসার গোড়া কুরে আপনাকে পুষ্ট করে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলাভাষায় যে অল্পকয়েকজন ক্ষমতাবান লেখক মিষ্টি লেখার মোহ কাটিয়ে সত্যসন্ধিৎসার সাহস দেখিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই জীবনজিজ্ঞাসা আজ এই ব্যাধির আক্রমণে জীর্ণ অবসিত।

ফলত যে অকুণ্ঠ জীবনবোধ ফরাসী সাহিত্যের অতুল বৈভবের উৎস, বাংলা সাহিত্যে আজো তা ভালো করে শেকড় গাড়তে পারেনি। অথচ বাংলাসাহিত্যকে যদি পরিণত সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে হয়, তবে বাঙালী লেখককে এ বোধ অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আমার ধারণা ফরাসী সাহিত্যের সংগে ঘনিষ্টতর পরিচয় এই আত্মপ্রস্তুতির ব্যাপারে বাঙালী লেখককে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। বহুকাল আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে ফরাসী সাহিত্যের সংগে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা যে তেমন ফলবতী হয়নি তার একটা প্রধান কারণ বোধহয় এই যে কি তাঁর বাছাইএ, কি তাঁর অনুবাদে ফরাসীর বিশিষ্ট মেজাজটি ধরা দেয়নি। সত্যেন্দ্র-

নাথ দত্ত কৃত ফরাসী কবিতার ভাবানুবাদ বিষয়েও সেই একই অভিযোগ আরো বেশী যথার্থতার সঙ্গে করা চলে। তবে প্রমথ চৌধুরী ফরাসীর অনেকখানি অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে শুধু "চারইয়ারি কথা" কি বীরবলের প্রবন্ধাবলী নয়, পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের বিকাশ তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু চৌধুরীমশাইএর অন্তরঙ্গতাও ফরাসী সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার মধ্যে আবদ্ধ ছিল; মনতেনকে পেরিয়ে রাবেলের জগতে তিনিও প্রবেশ করতে পারেননি। ঠাকুরবাড়ির শ্লীলতাবোধ সম্ভবত সে প্রবেশের পথে বাধা হয়েছিল।

ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী লেখক এবং পাঠকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাতে হলে সে সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলায় বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার—এবং তার চাইতেও বেশী দরকার সে সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ মূল থেকে বাংলায় তার তর্জমা করা। তার দ্বারা শুধু পাঠকসম্প্রদায় নয়, লেখকসম্প্রদায়ও প্রভূত উপকৃত হবেন। তবে একটা কথা কোন রকমেই ভুললে চলবে না। জীবনবোধের আদি এবং অক্ষয় উৎস বই নয়, জীবন নিজে। সাহিত্য চোখের ঠুলি খসাতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টি দিতে পারে না। আমাদের লেখকরা যতদিন না জীবনের বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে শিখছেন ততদিন তাঁদের বিদগ্ধ লেখকে পরিণত করে এ সাধ্য কারো নেই—না সে শেকস্পীয়রের না রাবেলের।

ছাগল। শিল্পী পাব্লো পিকাসো

---

(১) বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথার্থ স্থান নিরূপণের এখনো পর্যন্ত চেষ্টা হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে অধিকাংশ আলোচনায় ভক্তির ভাব যতবেশী, বিশ্লেষণের চেষ্টা তত কম। ফলে তাকে "অশ্লীল লেখক" বলে অবিহিত করলে অনেক পাঠকই চটে উঠে প্রতিবাদ করবেন। আমাদের সৌভাগ্যবশত তাঁর বিদ্যা আধুনিক কালের শিক্ষিতদের মত শুধু ইংরেজির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; তাঁর রুচি মুখ্যত সংস্কৃত সাহিত্য হতে পুষ্টি আহরণ করেছিল। এবং সংস্কৃত লেখকদের আর যে ত্রুটিই থাক দেহ সম্বন্ধে কোন শুচিবাই ছিল না ফলে বাল্যবিবাহ এবং বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই সত্যসন্ধ মানুষটি কোন রকম ভদ্রতার আব্রু রাখেননি। তাঁর "আবার অতি অল্প হইল" (কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য) লেখাটি হতে একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দাখিল করছি ঃ
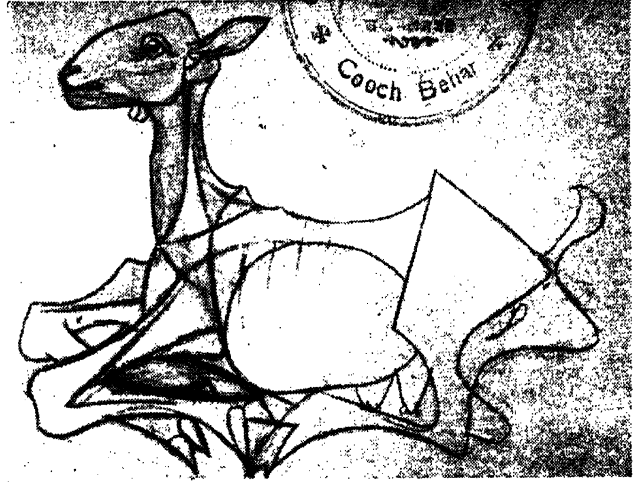
" খুড়া অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই, সুতরাং অপচার এবং উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।"

আগে বহু উদাহরণ দেওয়া যেত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রসে যাঁরা পুষ্ট তাঁরা যদি মূর্চ্ছা যান এই বিবেচনায় আপাতত লোভ সংবরণ করা গেল।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরেকটা খুব ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা নাকি একান্তভাবেই সংস্কৃতঘেষা এবং সে কারণে গতিহীন। বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষার আমদানী করে সে ভাষার গতি যাঁরা বাড়াবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে টেকচাঁদ, হুতোম, বীরবলের নাম সকলেই জানেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইও যে তাঁর লেখায় প্রচুর আরবী ফারসী এবং দেশজ কথা ব্যবহার করেছেন এটা অতি অল্প লোকই লক্ষ্য করে থাকবেন। আসলে বিদ্যাসাগরের খোশমেজাজী লেখার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় অল্প, "অতি অল্প হইল" এবং "আবার অতি অল্প হইল" হতে দুচারটে নমুনা দিলে পাঠকেরা হয়ত আন্দাজ করতে পারবেন ভাষার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর কত মুক্তবুদ্ধি ছিলেন। "বেহুদা পণ্ডিত', 'দেদার ভুল, ছরকট করিয়াছেন', 'সংস্কৃত বিদ্যায় ফাজিল'। 'গোমুখ্য বুদ্ধি'। 'বেয়াড়া খ্যাতি', 'বড়দার', 'বিদকুটে, তুয়াক্কা 'দিলদরিয়া' তুখড় ইয়ার—এসব বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত শব্দ। তিনি নিজেই লিখেছেন লোকে জানে আমার চালাকি ও ফচকিয়ামি আসে না।

(২) বাংলা গদ্যের আলোচনায় টেকচাঁদ এবং হুতোমের তবু নাম করা হয়, কিন্তু দীনবন্ধু এখনো পর্যন্ত অবজ্ঞাত রয়ে গেছেন। অথচ কি ভাষা কি উপজীব্য উভয় দিক হইতেই বাংলা গদ্য সাহিত্যে দীনবন্ধুর দুঃসাহসিকতার তুলনা মেলা কঠিন। দীনবন্ধু প্রথম শ্রেণীর লেখক নন, যেখানে তিনি সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে তিনি প্রায় অপাঠ্য। তাঁর কল্পনা খুব সীমাবদ্ধ। তবু যেখানে তাঁর বিশিষ্টতা সেখানে তিনি আজো বাঙালী লেখকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। শিক্ষিত সমাজ যাদের অবজ্ঞার দূরে সরিয়ে রেখেছে, গ্রামের সেই অশিক্ষিত মানুষদের তিনি যত সহজে সাহিত্যে স্বাগত করতে পেরেছেন তাঁর পরে এই সত্তর-আশি বছরের মধ্যে আর কোনো লেখক তা পারলেন না,—না রবীন্দ্রনাথ, না তারাশঙ্কর, না বিভূতিভূষণ না মাণিক বাঁড়ুয্যে। এবং যখনি তিনি সাধুভাষা ছেড়ে কথ্যভাষায় লিখেছেন

তখনি তাঁর গদ্যে এমন এক বলিষ্ঠ গতিশীল, স্বতঃস্ফূর্ত সত্যবোধের স্বাদ এসেছে যার পাশে টেকচাঁদ এবং হুতোমকে ম্লান এবং বীরবল ও অন্নদাশঙ্করকে কৃত্রিম ঠেকে। নীল দর্পণের' তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ভাষা এরই প্রামাণিক উদাহরণ।

ক্ষেত্র—ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসীর সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না। (হস্ত ধরিয়া টানল) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা; হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।

রোগ—তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না। বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র—মোর ছেলে মরে যাবে—দই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতী।

রোগ—তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না। (বস্ত্র ধরিয়া টানল।)

ক্ষেত্র—ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটা করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।

স্বভাবতই এ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয়নি। দীনবন্ধুর জীবনী এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে তিনি দীনবন্ধুর রুচির দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে একথাও স্বীকার করেছেন যে এ দোষ ইচ্ছাকৃত নয়, তিনি তাঁর তীব্র সহানুভূতির অধীন ছিলেন বলেই এদোষ ঘটেছে। বঙ্কিম 'সধবার একাদশীর' পাণ্ডুলিপি পড়ে দীনবন্ধুকে জানিয়েছিলেন যে, ঐ প্রহসন "বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে" এবং সে কারণে অনুরোধ করেছিলেন যে, "ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়।" বাংলা সাহিত্যের জোর বরাত দীনবন্ধু শেষ পর্যন্ত বন্ধুর সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

(৩) একথায় যদি কারো আপত্তি থাকে তবে তাঁকে হ্যামলেট, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য স্মরণ করতে বলি।

Queen: Come hither my good Hamlet, sit by me.
Hamlet: No good mother, here's metal more attractive.
Polonius: Oho, do you mark that?
Hamlet. Lady, shall I lie in your lap?
Ophelia: No my lord.
Hamlet: I mean, my head upon your lap.
Ophelia: Ay my lord.
Hamlet: Do you think I meant ccunty matters?
Ophelia: I think nothing, my lord.
Hamlet: That's a fair thought to lie between maid's legs.

দার্শনিক যুবরাজের মুখে এ জাতীয় ভাষা দিতে শেক্সপীয়রের এতটুকু সংকোচ হয়নি। ঐ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে 'To be or not to be' বিখ্যাত স্বগোতোক্তির ঠিক পরেই হ্যামলেট ওফেলিয়ার কথোপকথন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ফলস্টাফ্, ইয়াগো, উন্মাদ লীয়র—এদের ভাষা কিম্বা ভাবনায় কি কোন শ্লীলতার আব্রু আছে? শুধু কি তাই। হ্যামলেট নাটকের করুণতম মুহূর্তে নিষ্পাপ কিশোরী ওফেলিয়াকে দিয়ে শেক্সপীয়র কি গান গাইয়েছেন (চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)।

Quoth she, before you tumbled me,
You promised me to wed
So would I ha' done by yonder Sun
An thou hadst not come to .
my bed.

ওথেলো চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে ডেসডেমোনার "Sing willow, willow, willow" গানের শেষ চরণঃ "If I court no women, you'll couch with mao men."

আধুনিকতম কোনো বাঙালী কবি কি তরুণী নায়িকার মুখে "tumble" বা "couch with" জাতীয় ভাষা দিতে পারেন? তবুত এ তরুণীর ভাষা। যেখানে সে বাধ্য নেই, মহাকবি সেখানে আর কোনো রেয়াৎ করেননিঃ

Even now, now, very now, an
old black ran
Is tupping your white ewe.

(ওথেলো প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)।

এর বাংলা যদি কেউ করতে পারতেন, তবে সে এক দীনবন্ধু মিত্র।

(৪) রফা করেই কি সব সময়ে রেহাই মিলেছে। যৌবনে মঠে থাকা কালে কর্তৃপক্ষ টের পান যে তিনি গোপনে গ্রীকভাষা চর্চা করছেন, ফলে তাঁর নিজস্ব গ্রীক গ্রন্থ সংগ্রহ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীকালে গার্গাঁতুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল কাহিনীর এক এক খণ্ড যেমন যেমন বেরিয়েছে আর অমনি সর্বোনের অসীম ক্ষমতাশালী কর্তারা তার প্রকাশ এবং প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন। তবু যে তাঁকে খুব বেশী ভুগতে হয়নি তার কারণ পারীর বিশপ জাঁদু বেলে ছিলেন তাঁর একজন মস্ত সমজদার পৃষ্ঠপোষক। এঁরি খাতিরে পোপ রাবেলেকে ক্ষমা করেন এবং রাজা নিজে তাঁকে তাঁর বই ছাপানোর জন্যে বিশেষ অনুমতি দান করেন।

(৫) Jacquesle fataliste দিদেরোর জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। এবং একথা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও যতদূর জানি বিশ্বসাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদের ইংরেজী পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আজো কোনো প্রকাশক বার করেননি। অথচ এ বই গ্যয়টে এবং স্তাঁদালকে মুগ্ধ করেছিল; এর অন্তর্নিহিত বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীকে মার্কস এবং এঙ্গেলস সোচ্ছ্বাসে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং আউফক্লারুঙ্গের জীবন দর্শন যে এই আপাতদৃষ্টিতে অতি অশ্লীল উপন্যাসটিতে কত পরিণত প্রকাশ লাভ করেছে তা বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতন্ত্রী দার্শনিক কাসিরের সাহেবের নজর এড়ায়নি।

প্রণয়-নগর

কোলেৎ

ইঁট-কাঠ-পাথরের এই জীবন, এর বাইরেও একটি পৃথিবী রয়েছে। যে-পৃথিবী আরও শান্ত, আরও স্নিগ্ধ, আরও মধুর। সবাই তার খবর পায় না। কেউ কেউ পায়। মাদাম কোলেৎ পেয়েছিলেন। এ-কালীন ফ্রান্সের যাঁরা বিশিষ্ট লেখক, তিনি তাঁদের অন্যতমা। জন্ম ১৮৭৩ সালে। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত হবার পরেই সাহিত্য-জীবন শুরু। প্রথম দুটি বিবাহ সুখের হয়নি। জীবিকা-অর্জনের জন্য মিউজিক-হলের প্রমোদ-অনুষ্ঠানেও এক সময় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা, বিচিত্রতর তাঁর প্রয়োগ-পদ্ধতি। সম্প্রতি —মাত্রই এক বছর আগে—তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। প্যারিস সম্পর্কে তাঁর একটি রম্যরচনার অনুবাদ এখানে পত্রস্থ হল।

প্রবল বিরাগও অনেক সময় প্রগাঢ় অনুরাগে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে। পারীর প্রতি এক সময় আমার বিরাগের অন্ত ছিল না। এখন অনুরাগের অন্ত নেই। প্রথম যখন পারীতে আসি, আমার বয়স তখন কুড়ি। একা আসিনি। সঙ্গে ছিলেন স্বামী। তাঁর বয়স তখন ছত্রিশ, আমার চাইতে ষোল বছরের বড়। মোটাসোটা মানুষ, এবং সেই বয়সেই তাঁর মাথায় দিব্যি একটি টাক পড়েছিল। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। বাগান, মাঠ, পুকুর, এইসবের মধুর রহস্যের মধ্যে আমার দিন কাটত। সেই মুক্ত পরিবেশের মায়া কাটিয়ে হঠাৎ একদিন এখানে চলে এলাম। এসে আমার একটুও ভাল লাগেনি। নিচু ছাত, পায়রা-খোপের মত ঘর, মাংসের বদলে মিষ্টি, আর দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। দু'দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। সে-সব দিনের কথা আজও আমার মনে আছে। আজও আমি ভুলিনি যে, একটি গভীর এবং নির্বোধ আশা সেই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের মধ্যে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আশাটা এই যে, শৃঙ্খলিত এই নগর-জীবন আর বেশীদিন স্থায়ী হবে না। শিগগিরই এর অবসান ঘটবে। আমি মারা যাব। তারপর আবার নতুন করে জন্ম হবে আমার। হঠাৎ একদিন চোখ মেলে দেখব যে, আমি আমার সেই দেশের বাড়িতে, আমার বাগানের মধ্যে বসে রয়েছি।

এর কিছুকাল বাদেই আমি বুঝতে পারলাম যে, আসলে পারী বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব নেই। নানান জায়গার নানান মানুষের এটা একটা মিলন-ভূমি মাত্র। এবং খুব সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য, একটি সূত্রে তাদের বেঁধে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, ইচ্ছে করলে এরই মধ্যে নিজের জন্য আলাদা একটি জগৎও আমি গড়ে নিতে পারি। যে-জগৎ আমার নিজস্ব, যার সঙ্গে আমার চেনা-পরিচয় রয়েছে। ঠিক কবে যে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তা আর এখন আমার মনে নেই। তবে বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আমি বেঁচে গেলাম। বাড়িয়ে বলছি না, পারীতে থাকতে এ-যাবৎ চোদ্দবার আমি বাসা-বদল করেছি। বন্ধুরা হাসেন। এক-একবার বাসা পালটাই, আর তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, "কী, আর-একটা জগৎ খুঁজে পেয়েছ বুঝি?"

উত্তর দিই না। চোখ তুলে একবার তাকাই মাত্র। সে-দৃষ্টিতে ঈষৎ লজ্জা, এবং অনেক অহঙ্কার মেশানো থাকে। হ্যাঁ, এই পারীর মধ্যেই আরও একটা জগতের সন্ধান আমি পেয়েছি। সবাই তার খোঁজ পায় না। কেউ কেউ পায়। পাবার আগ্রহ যাদের আছে। আমিও তাকে আবিষ্কার করেছি। আবিষ্কার, না পুনরাবিষ্কার? ভাবতে গিয়ে বুক দুরুদুরু করে আমার, নাড়ীর গতি চঞ্চল

মাদাম কোলেৎ

হয়ে ওঠে। ষাট বছর এই পারীতে আছি, তবুও আমার পরিবর্তন হল না। আজও সেই পাড়াগাঁয়ের মেয়েই রয়ে গেলাম। সেই মাঠ, সেই বাগান, সেই নদীতীর, আজও আমি তাদের মায়া কাটাতে পারিনি। আজও তাদের খুঁজে ফিরছি।

পারীর মানুষদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পারী তাদের জন্মভূমি নয়। বিশ্বাস না হয় তো, যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখুন। জন কুড়িকে যদি জিজ্ঞেস করেন তো আঠারো জনই আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলবে যে, পারীতে তাদের জন্ম হয়নি, পাড়াগাঁ থেকে তারা পারীতে এসে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু মজাটা এই যে, বাইরে থেকে কেউ এখানে এসে পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পারী আবার তাকে নতুন করে গড়ে নেয়, তার চরিত্রে নিজস্ব খানিকটা সৌরভ মিশিয়ে দেয়। এই কৌতুকময় আভিজাত্য, যুক্তির এই নির্ভুলতা, এই সরস মাধুর্য, আর—এমন কি—সর্বনাশ আসন্ন জেনেও সবকিছুকে মেনে নেওয়ার এই দুর্লভ ক্ষমতা, পারীর মানুষ এ-গুণ পেল কোত্থেকে? কে তাকে এ-সব শেখাল? পারীর আকাশ,—প্রতি মুহূর্তে যার রঙ পালটে যায়? পারীর নরম কুয়াশা? পারীর বিচিত্র বিক্ষুব্ধ ইতিহাস? কে তাকে শিখিয়েছে, আমি জানি না। শুধু জানি যে, পারীকে যারা ছেড়ে চলে যায়, এ-সব গুণ আর তাদের থাকে না। পারী থেকে যে-শিল্পী অন্যত্র
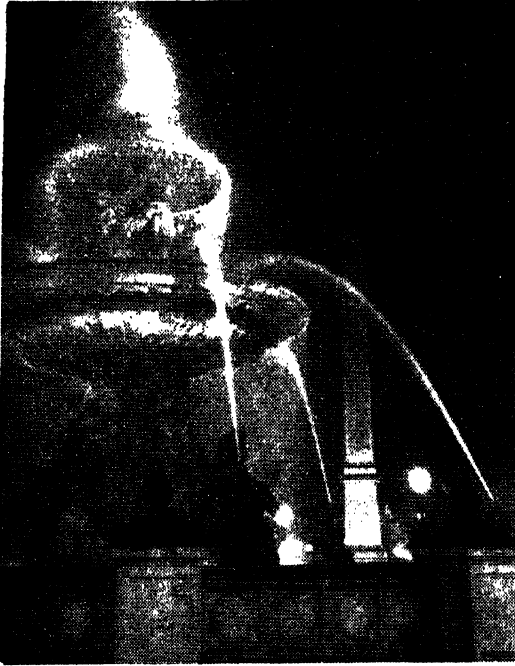
ফ্রান্স। এর একদিকে নাগরিক আনন্দের প্রগল্‌ভ সমারোহ

গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, মাঝে-মাঝে এখানে যদি তিনি ফিরে না আসেন, যদি না এই রহস্যময়ী নগরীর ধূলিকণা থেকে নতুন করে আবার প্রেরণালাভের প্রয়াস পান, তো একদিন সভয়ে তিনি আবিষ্কার করবেন যে, তাঁর শক্তি স্তিমিত হয়ে এসেছে, তাঁর জাদুদণ্ড মৃত বিবর্ণ কাষ্ঠ-খণ্ডে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় এমন কোনও রাজধানী নেই, পারীর সঙ্গে যার তুলনা চলে। পারী আলাদা, পারী স্বতন্ত্র। শহর মাত্রেই কতকগুলি অট্টালিকার সমষ্টিমাত্র। পারী তা নয়। দু-তিনটে রাস্তা দিয়ে ঘেরা আলাদা-আলাদা সব পাড়া, তারই মধ্যে এক-আধ টুকরো বাগান, এক-আধখানা কোর্ট-ইয়ার্ড। এই হল পারী। এর প্রত্যেকটি পাড়ারই পৃথক পরিচয় রয়েছে, পৃথক সত্তা। এবং প্রতিটি রাস্তাতেই এমন কতকগুলি বেরাল দেখতে পাওয়া যায়, পাড়ার প্রত্যেকেই যাদের মালিক। এমন শহর কি আর একটিও আছে? আমার তো মনে হয় না। শাঁজেলিজের কথাই ধরা যাক। এটি হল আধুনিক মহল্লা। সিনেমা, মোটরগাড়ি আর নাগরিকতার পীঠস্থান। কিন্তু এই শাঁজেলিজেতেও এমন জায়গায় আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি, পুরনো আমলের দু-চারটি কোর্টইয়ার্ডের যেখানে সন্ধান পাওয়া যাবে। এবং শুধু কোর্টইয়ার্ডই নয়, প্রাচীন গুটিকয়েক গাছ, একটি আঙুর-বাগান, তন্ময় একজন শিল্পী আর সে-কালের জনৈক বুর্জোয়ারও আপনি এখানে দেখা পেতে পারেন।

শাঁজেলিজেতে আমি আট বছর ছিলাম। এমন এক জাতের শিল্পী আছেন, অসম্ভবের সাধনাতেই যাঁদের আনন্দ। আমিও বোধহয় সেই দলেরই মানুষ। তা যদি না হব তো এই নিতান্ত শহুরে এলাকায় আমি পল্লী-জীবনের স্বাদ খুঁজতে যাব কেন? পালে রোয়াইয়াল, ইল স্যাঁ লুই, প্লাস দে ভশ্‌—এর প্রত্যেকটি জায়গাতেই এর আগে আমি আমার সেই পৃথক জগতটিকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। তাই বলে শাঁজেলিজেতেও? নিতান্ত নাগরিক এই পাড়া, স্বপ্নের স্থান কোথায় এখানে? মেহগনি কাঠের প্রাচীন সব আসবাবপত্র, লতাপাতা-আঁকা সেকেলে ঝাড়ন, আর রঙচঙে অপ্রয়োজনীয় একগাদা কাঁচের বাসন নিয়ে যে-মেয়ে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আধুনিক কালের জিনিসপত্রে যার রুচি নেই, এখানে এই আধুনিক মহল্লায় এসে যে তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটবে, এ তো জানা কথা। কিন্তু না, আমার স্বপ্নকে এত সহজে আমি ব্যর্থ হতে দেইনি। এই শাঁজেলিজেতেও আমি আমার আলাদা জগৎটিকে ঠিক খুঁজে নিয়েছিলাম। ঝকঝকে সাদা দেয়াল; এতই সাদা যে, সারাক্ষণ আমার অস্বস্তি লাগত। তার উপর দিয়ে তাই মোটা একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলাম।
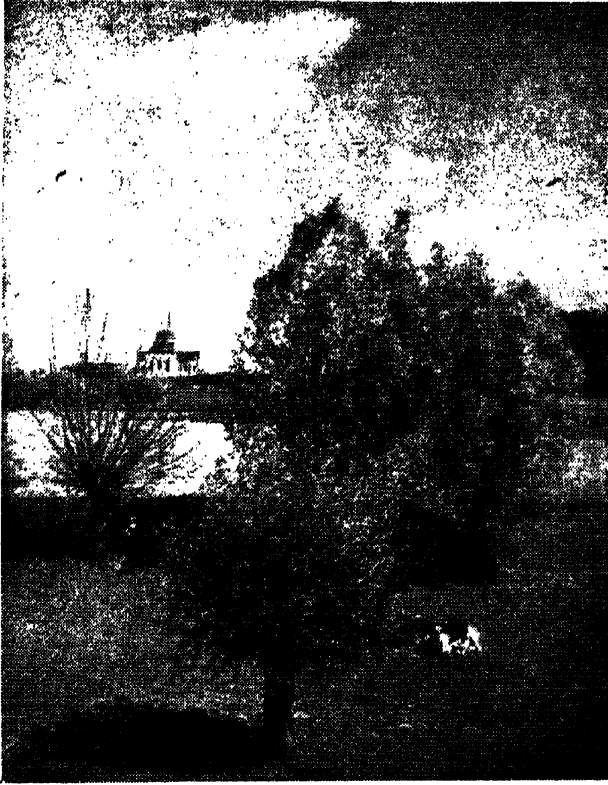
অন্যদিকে সব্জের শান্ত পরিবেশ

সেকেলে ইজিচেয়ার আর একেলে বুক-শেলফের মধ্যেও ধীরে ধীরে সামঞ্জস্য ঘটল। দিনের বেলা যাও-বা কিছু অসংগতি দেখা যেত, রাত্রে তার চিহ্ন পর্যন্ত থাকত না। ডেস্ক-ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে দিলেই সে-এক স্বতন্ত্র জগত। ল্যাম্পের সংকীর্ণ আলোকচক্রে একমাত্র সেই জিনিসগুলিরই অস্তিত্ব ধরা পড়ত, যেগুলির বয়স আমার চাইতেও বেশী, এবং আমারই মতন যারা অতীত-জীবনের আবছায়া একটি স্মৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, আমার সেই নিজস্ব জগৎটিকে আবারও আমি খুঁজে নিতে পেরেছিলাম। ব্যর্থ হয়নি আমার চেষ্টা। মে মাসের উদ্দাম হাওয়ায় ঘরের জানালা-গুলি কেঁপে কেঁপে উঠত। এক-আধটা ফুলের পাপড়ি, কি দু-একটা প্রজাপতি আর ভ্রমরকেও তখন আমার ঘরের মধ্যে উড়ে আসতে দেখেছি। তারা আমাকে জানিয়ে দিয়ে যেত যে, এখনও ফুল ফোটে, কীটপতঙ্গের পৃথিবী এখনও নিঃশেষ হয়নি। প্যারীর ফুল আর প্যারীর কীটপতঙ্গ,—সহজে এরা মৃত্যু-বরণ করতে চায় না।

এর কিছুদিন বাদেই আমি হোটেল ক্ল্যারিজে উঠে আসি। প্রাসাদোপম অট্টালিকা। এ-সব বাড়ির চেহারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় একইরকম হয়ে থাকে। এই হোটেল ক্ল্যারিজের নীরস আবহাওয়ার মধ্যেও ধীরে-ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল সেই স্বতন্ত্র পৃথিবী। হোটেলের সবচাইতে উঁচু তলায় আমি থাকতাম। ছোট্ট দুটি ঘর। তার পিছনে ঢালু টালির ছাত, আর সামনের ব্যাল-কনিতে ফুলের সমারোহ। নীচের দিকে জলের লম্বা পাইপ। সেই পাইপের উপর দিয়ে বাদামী রঙের একটা ইঁদুর আর ঘর-পালানো একটা বাঁদর যাওয়া-আসা করত। উৎসবের রাত্রে সারা আকাশ যখন আলোয়-আলো হয়ে যেত, তখন আমার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, নাম-না-জানা রাত্রিচর পাখিরা সেই আলোর সমুদ্রে যেন আনন্দে সাঁতার দিয়ে ফিরছে।

অনেক রকম ফুলগাছ লাগিয়ে-ছিলাম আমি। উইসটেরিয়া, রেড জিরা-নিয়াম, আরও কত কী। রুক্ষ নীরস নগর-জীবনে এরা আরেক জগতের খবর নিয়ে আসত। ফুল আমার চিন্তার সংগী, আমার কল্পনার সহচর।

বড় ভয়ানক আমার দাবি। আমি চাই, আমার ঘরের সামনে ঝাঁকড়া-মাথা একটা গাছ অন্তত থাকবে। আর নয়তো একফালি আকাশ। যে-আকাশের রঙ ক্ষণে-ক্ষণে পালটে যায়। আর নয়তো গোটাকয়েক পাখি। তা-ও যদি না পাই তো—হে ঈশ্বর—মানুষের গলার সেই গুঞ্জন, সেই আশ্চর্য মর্মর আমাকে শুনিও, রবিবারের শান্ত সকালবেলায় গ্রামের পথে যা শুনতে পাওয়া যায়। তখন, গির্জায় প্রার্থনা শেষ হয়ে যাবার পর অনেক মানুষ যখন একসংগে বাড়ি ফিরে আসে। সেইসংগে রুটি সেঁকবার উষ্ণ নিবিড় গন্ধটুকু যেন পাই। যেন দেখতে পাই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছোট্ট একটি মেয়ে রাস্তা ধরে দৌড়ে চলেছে। পিছনে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে,

মা তাকে ডাকছেন। উচ্চ, তীক্ষ্ণ, তীব্র তাঁর কণ্ঠস্বর। আর এদের প্রত্যেককেই আমি নাম ধরে ডাকতে চাই। কার কী নাম, আমি জানি না। কিন্তু তাতে কী। যদি প্রয়োজন হয়, নতুন করে আমি তাদের নামকরণ করব। রাত্রে যখন ঘুমোই, প্রায়ই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। ফ্রান্সের সব পল্লী-অঞ্চলগুলি আমার স্বপ্নে যেন একাকার হয়ে যায়। যে-অঞ্চলে আমি জন্মেছি, অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তার আর তখন কোনও পার্থক্য থাকে না। জেগে উঠে মনে হয়, আমাদের পাড়াগাঁর বাড়িতে মস্তবড় যে-একটা ঘড়ি রয়েছে, এক্ষুনি তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। মনে হয়, আমি আমার সেই গ্রামের বাড়িতেই শুয়ে আছি, মাথা তুললেই শিয়রের জানালাটা আমার চোখে পড়বে। আর হাত বাড়ালেই পুরনো সেই টেবিলটা হয়তো স্পর্শ করতে পারব, যা আমাদের দেশের বাড়িতে অযত্নে অব্যবহারে ধূলিমলিন হয়ে রয়েছে। কিংবা ছোটবেলায় যে-ঘরে আমি থাকতাম, দু'পা এগিয়ে গেলেই চোখের সামনে তার পিতলের হাতলটা হয়তো ঝকঝক করে উঠবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার সব জিনিস, এখনও আমি তাদের ভুলতে পারিনি। দিনের বেলায় কোথায় যেন হারিয়ে যায় তারা, রাত্রে—আধো-তন্দ্রা আধো-জাগরণের সেই মুহূর্তটিতে—আবার ফিরে আসে। আহা, সে এক আশ্চর্য মুহূর্ত। মনে হয়, হাত বাড়িয়ে দিলেই তাদের স্পর্শ করতে পারব। মনে হয়, হাতের ঠিক নীচেই একরাশ ফুল যেন স্তবকিত হয়ে রয়েছে। স্মৃতির ফুল। এবং সে-স্মৃতিও আমার অনুভূতির। সেই আশ্চর্য অনুভূতির, যা আমি কখনো ভুলতে পারব না। কী করে ভুলব। তা হলে আমার অস্তিত্বকেই যে ভুলতে হয়।

ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াল? প্যারীতে না থেকে পাড়াগাঁয়ে থাকলে কি আমি খুব সুখে থাকতাম? না বোধহয়। প্যারীর নিজস্ব একটি সৌরভ রয়েছে। পাড়াগাঁয়ে থাকলে এই সৌরভটিকে আমি পেতাম না। সেটা একটা মস্ত বড় লোকসান। তার চাইতেও বড় কথা, প্যারীর মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যেত না। অথচ, প্যারীর মানুষদের আমি ভালবাসি। তাদের সঙ্গে আমার সুন্দর একটি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অনেক বয়স হয়েছে আমার। হাঁটতে পারি না। কোথাও যেতে হলে অন্য-কারও কাঁধে ভর দিয়ে, কিংবা হুইল-চেয়ারে বসে, যেতে হয়। চেয়ারটি অ্যামেরিকায় তৈরি। ভারী সুন্দর কাজ দেয়। আর দেখতেও চমৎকার। পথে বেরিয়েই বুঝতে পারি, সস্নেহ দৃষ্টিতে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে তারা ভালবাসে। সে কি আমার এই অসহায় অবস্থার জন্য? না বোধহয়। ঘর ছেড়ে যখন পথে বেরই, তখন দুপুর। অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই। এখন লাঞ্চের ঘণ্টা। ফুটপাথে আর খোলা ময়দানে অসংখ্য মানুষ। সবাই এরা খেটে খায়। মজুর, কেরানি আর ওয়েট্রেস। অনেকে দোকান থেকে খেয়ে আসে। অনেকের সঙ্গে আবার লাঞ্চের ছোট্ট একটা প্যাকেট থাকে। বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছে। কোথাও বসে খেয়ে নেবে। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টিতে ঈষৎ একটু হাসি ফুটে ওঠে। আমিও হাসি।

একমাত্র এদের সাহচর্যই আমার ভাল লাগে, একমাত্র এদের সঙ্গেই প্রাণ খুলে আমি কথা কইতে পারি। আপনারা তো এদের চেনেন না। অথচ, এরাও এই প্যারীরই মেয়ে। প্যারীর মেয়ে বলতে শুধু সোসাইটি-উইমেনকেই আপনারা চিনেছেন। এদের চেনেননি। আপনারা যাদের চেনেন, আমি তাদের চিনি না। চিনবার জন্য যে রুচি আর সময়ের প্রয়োজন হয়, তার কোনওটাই আমার ছিল না। জীবনভোর আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্যারীর বিলাস-জীবনের সঙ্গে পরিচয়সাধনের, তার নানান রকমের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার, সুযোগ আমার হয়নি। সেখানে যে-মেয়ে যায়, পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার গল্প আপনারা পড়েছেন। কীভাবে সে হাঁটে, তার মাথা তখন কী অদ্ভুত কায়দায় একপাশে একটু হেলে থাকে, কোন্ কোন্ পোশাকে তার রুচি, এ-সবই আপনারা জানেন। শুধু একটি জায়

হয়তো জানেন না। জানেন না যে, বাল্ দ্য প্যাতি লি ব্র অথবা এই ধরনের অন্যান্য সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য কতখানি মূল্য তাকে দিতে হয়। কী অপরিসীম মূল্য। 'মূল্য' বলতে আমি শুধু পরিশ্রমই বুঝিয়েছি। অল্প দামে কোথায় ভাল এক টুকরো ছিটকাপড় পাওয়া যাবে, তারই খোঁজে দোকানে-দোকানে এরা ঘুরে বেড়ায়। খোঁজে সেই দর্জিকে, ছাঁটকাটের কায়দায় সবাইকে যে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি এদের চষে বেড়াতে হয়। শুধু বাছাই, শুধু বাছাই। এটা নয়, ওটা; ওটা নয়, সেটা। না, সেটাও নয়। তখন? আর এই বাছাই কি শুধু ইভ্নিং গাউনের ব্যাপারে? তা হলে তো কোনও কথাই ছিল না। এদেরই একজনের সংগে সেদিন আমার কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, "ইভ্নিং গাউন নিয়ে আমাদের তেমন চিন্তা নেই; ও যা হোক, শেষ পর্যন্ত একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ই। অল্প-একটু স্নো, কিছু গয়না, কিছু মুক্তো, আর একটু পাউডার। এই দিয়েই সমস্ত ত্রুটি ঢেকে দেওয়া যায়। মুশকিল হয় সাদাসিধে পোশাক নিয়ে। যার ছাঁটকাট একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। সে এক মহা সমস্যা। কিছুতেই মন উঠতে চায় না। মনে হয়, নিশ্চয়ই কোথাও কোনও খুঁত রয়ে গেল। আর এর জন্য খরচাই কি কিছু কম হয়!"

না, আমি এদের নিন্দে করছিনে। জানি, এরও দু-একটা ভাল দিক আছে। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। তার চাইতে বরং সামনের ওই বাগানে যারা বসে রয়েছে, ওদের কথাই বলি। ওই যে মেয়েরা, ওরা খেটে খায়। আমার চোখে চোখ মিলিয়ে ওদের দিকে তাকান একবার, আর-একটু ভাল করে ওদের দেখুন। সযত্নে চুল বেঁধেছে। সযত্নে, বিলাসকে প্রশ্রয় না দিয়ে। নম্র, লাজুক, মর্যাদাময়ী। আর তাই দেখানিরামা ওদের কাছে প্রশ্রয় পায় না। মুখে রঙ মাখতে ওরা লজ্জা পায়, অদ্ভুত সব গয়না পরতে ওদের রুচিতে বাধে। ছিপছিপে চেহারা, পরনে আটপৌরে ব্লাউজ, কব্জির [illegible] একটু [illegible]। [illegible] পোশাকে ওদের ঘোরতর আপত্তি। আর ওই সাদাসিধে স্কার্টে—যা ওরা পরে রয়েছে—বয়স হয়তো একটু বেশীই দেখাত। দেখায় না। তার কারণ, স্কার্টের ঝুল ঈষৎ কম রাখা হয়েছে। পায়ের গড়নও ভারী সুন্দর। মোজা পরে ওই সুন্দর পা দুখানিকে কেন যে ওরা ঢেকে রাখে, ভেবে পাই না।

সাতসকালে ওদের অফিসে যেতে হয়। ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার বাগান দিয়ে ওরা হেঁটে চলেছে। হঠাৎ সবাই দৌড়তে শুরু করল। দূরের কোন্ গির্জার ঘড়িতে হঠাৎ সময় বেজে উঠেছে। এখনও গির্জা আছে প্যারীতে। এখনও সেখানে ঘণ্টা বেজে ওঠে। এখনও সারা আকাশে তার সুরমূর্ছনা ছড়িয়ে যায়।

ভারী ভাল লাগছিল আমার। অল্প-বয়সী ওই মেয়েদের, ছুটতে-ছুটতে যারা অফিসে চলেছে। ছুটছে, কিন্তু তেমন কোনও উদ্বেগ নেই। উদ্বেগ নেই, কিন্তু কপালে তবু দু-একটি কুঞ্চন ফুটে উঠেছে। সবে আটটা। এরই মধ্যে গৃহস্থালীর কাজকর্ম গুছিয়ে রেখে আসতে হয়। তা নইলে বাইরে বেরবার উপায় নেই। পোনে সাতটায় ঘুম থেকে উঠেছে, ঘর ঝাড় দিয়েছে, দুধ জ্বাল দিয়েছে, কফি বানিয়েছে। কফি তো নয়, কফিরই একটা সস্তা অনুকল্প। তারপর আছে জামাকাপড় ইস্ত্রি। আর তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। কথায়-কথায় অনেক দূরে এসে পড়েছি।

কী যেন বলছিলাম? বলছিলাম যে, এই শান্ত সুন্দর আকাশেও এক-আধ সময় প্রতিবাদের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। শীতের সকাল, মেঘে-মেঘে সারা আকাশ থমথম করছে। তখন মনে হয়, শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তিই যথেষ্ট নয় বুঝি; মনে হয়, ভালভাবে বাঁচতে হলে একটা পশমী কোট কি একটা রেশমী জামারও প্রয়োজন রয়েছে। অপব্যয়ের রুচি নেই ওদের, সামর্থ্যও নেই। তবু যখন হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি, সেই গরিব মেয়েটি—উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যাকে সংসার চালাতে হয়—তার পায়ে চকচকে নতুন এক জোড়া জুতো, অনেকদিন বাদে

সাবান-জলে গা ধুয়ে সে রাস্তায় বেরিয়েছে, আর একটি সুকুমার লাবণ্যে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে তার দেহশ্রী, তখন বুঝতে পারি যে, অন্য-কোনও আনন্দের আহ্বান সে শুনতে পেয়েছে; শুনতে পেয়ে দৈনন্দিন জীবনের দাবিকে তুচ্ছ করতেও তার দ্বিধা হয়নি। ("সাবানের দাম আবার বেড়ে গিয়েছে ভাই। আমার তো মনে হয়, বড়-সাবান কেনাই ভাল। তাতে করে পয়সার কিছু সাশ্রয় হয়।" "তাই নাকি? কিন্তু সস্তা সাবানের গন্ধ যে আমার সহ্য হয় না।")

শেষ পর্যন্ত কী হবে এই মেয়ের? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাকে পয়সা রোজগার করতে হয়? চাকরি হয়তো ভাল লাগবে না। হয়তো এই পালে রোয়াইয়ালেরই একতলায় বড় রাস্তার উপরে ছোট একটা দোকান খুলে বসবে। তা যদি হয় আমি খুশী হব। দোকানী মেয়েদের অনেকেই আমার বন্ধু। ওর সঙ্গেও আমার চেনা-পরিচয় হবে। যখন খুশি উপরে এসে দু'দণ্ড আমার সঙ্গে গল্প করে যাবে। আমি তো প্রায় সব সময়েই ঘরে থাকি। কিংবা এমনও হতে পারে যে, ধরাবাঁধা কোনও গণ্ডীর মধ্যে ও থাকতে চায় না। মার্সেল ব্রতের মত স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। মার্সেলও এই প্যারিসেরই মেয়ে। রুচিস্মিতা, লাবণ্যময়ী। ঠোঁটের কোনায় সারাক্ষণ এক-টুকরো হাসি লেগে থাকে। মেয়েরা যে টুপি পরে, তার নতুন নতুন ডিজাইন্ উদ্ভাবন করে মার্সেলের খুব নাম হয়েছে। আর শুধু টুপিই-বা কেন, যা-কিছুই ও স্পর্শ করে তা-ই যেন সুন্দর হয়ে ওঠে। বেতের তৈরি বেল্ট আর স্যাণ্ডাল আজকাল খুব চালু হয়েছে। আইডিয়াটা প্রথম মার্সেলের মাথাতেই এসেছিল। সেদিন দেখলাম, কী-একটা কাঁটাগাছের ডাল দিয়ে চমৎকার টুপি বানিয়েছে; তার উপরে সাদা মুক্তোর কাজ করা। মোট কথা, এ-সব ব্যাপারে দক্ষতা ওর অসীম; রুচিও নিখুঁত। আর তাই ফ্যাশন-ডিজাইনারদের মধ্যে সারাক্ষণ ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। এক-একটা ডিজাইনের জন্যে যে-টাকা ও পায়, তার অঙ্কটা প্রায় অবিশ্বাস্য। চাকরি নিয়ে সাধাসাধি করছে সবাই, কিন্তু মার্সেলের সেই এক গোঁ, চাকরি করবে না। একেবারেই যে করে না, তা অবশ্য নয়। করে, তবে দু-চার মাস। তারপরেই চাকরি ছেড়ে দেয়। আমি জানি, বাঁধাধরা একই-রকমের কাজ ওর ভাল লাগে না। নিজের ইচ্ছেমতন চলব, যখন যে-ধরনের কাজ পছন্দ হয় সেই ধরনের কাজ করব, এই হল মার্সেলের মনের কথা।

মার্সেল এখন স্যাঁ ক্লু-তে থাকে। শহরতলি অঞ্চল। সেইখানে এক-টুকরো জমি নিয়ে ফল-ফুলের চাষ করছে। ফুল বিক্রি করেও রোজগার কিছু খারাপ হয় না। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। বিছানায় বসে দু-দণ্ড গল্প করে যায়। আমার এই টেবিলটার উপরে—পেপারওয়েট, কাগজ-পত্র আর বাসী ফুলের স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে—একগাদা টাটকা লাল টম্যাটো ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে। হাসতে-হাসতেই কখন যেন আবার গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বলে, "কী সুন্দর টম্যাটো, দেখেছেন? কেন যে এগুলো খাই আমরা। খেতে লজ্জা হওয়া উচিত।"

"না খেলেই তো হয়।"

"হয়। তবু তো খাই।"

শুধু টম্যাটো নয়, এক গুচ্ছ ফুলও নিয়ে এসেছে। সারা ঘর তার সৌরভে ভরে উঠেছে। কিন্তু এ-সৌরভ ফুলের, না মার্সেলের? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। চোখ দুটি নীলাভ, সাদা ঝকঝকে দাঁত, গালের উপরে রক্ত-রঙের ছোঁয়া লেগেছে। এ-মেয়ে শহরের নয়। এ-মেয়ে গ্রামের।

"মার্সেল, তোমার তো এখন কাজ নেই, না?"

"আছে বই কি। চাকরি না হয় করি না, তা বলে কাজ থাকবে না? ভারী সুন্দর একটা কাজে হাত দিয়েছি। একটু একটু করে শেষ করছি সেটাকে, আর নিজেই মোহিত হয়ে যাচ্ছি। তা হলে বলি শুনুন। আমার বাগানে চারটে কাঁটাঝোপ আছে। ভেবেছিলাম, কেটে ফেলব। কিন্তু কাটতে কেমন মায়া হল। তখন আবার আর-এক চিন্তা, এইভাবে অযত্নে ফেলে না রেখে এগুলোকে কোনও কাজে লাগিয়ে দিলেই তো হয়। তা

অনেক ভেবেচিন্তে তারও একটা উপায় বার করেছি। ঝোপের বাইরের দিককার ডালপালায় হাত দিইনি, কাঁচি চালিয়ে ভিতরের দিককার ডালপালা সব ছে'টে দিয়েছি। চারপাশে লতাপাতার আবরণ, আর ভিতরের দিকে বিস্তর ফাঁকা জায়গা। ঝোপ তো নয়, যেন লতাপাতার তৈরি ঝুড়ি এক-একটা। ইচ্ছে হয় তো খাঁচাও বলতে পারেন। এখন অন্তত সেইরকমই দেখাচ্ছে। তা সেই খাঁচার মধ্যে গোটাকয়েক বাটিও বসিয়ে দিয়েছি। তার কোনওটায় থাকবে জল, কোনওটায় খাবার। চারপাশের লতাপাতা আর ডালগুলোকে বেশ শক্ত করে বে'ধে দিয়েছি, যাতে না ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে।"

"তা যাদের জন্য এতসব করছ, সেই পাখিরা কী বলছে, মার্সেল?"

"পাখিরা?" হাসতে-হাসতে মার্সেল বলল, "ওঃ, সে যা কিচিরমিচির লাগিয়েছে, যদি একবার দেখতেন। প্রথম খাঁচাটা তৈরি হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাপারটা তারা বুঝে নিয়েছে। সারাটা দিন এখন মিটিং চলছে তাদের। আমার আবার একটা বেরাল আছে, জানেন তো? ব্যাপারটা বোধ হয় তার ভাল লাগেনি। চোখ পাকিয়ে মাঝে-মাঝে তাকায় আমার দিকে। যেন বলতে চায় যে, ফাঁদ পাতার কায়দা-কৌশল শিখতে আমার অনেক দেরি আছে।"

"তা পাখিরাও কি এটাকে ফাঁদ বলে ভাবছে নাকি?"

"না।" মুখ বাঁকিয়ে মার্সেল বলল, "পাখিরা আমাকে চেনে। খাঁচায় ঢুকবার একটা পথ করে দিয়েছি। ইতিমধ্যেই সেখান দিয়ে তারা ভিতরে-বাইরে যাওয়া-আসা করছে। দেখছি, আর অবাক লাগছে আমার। পাখিরা কোথায় খাঁচা থেকে বাইরে পালাবার চেষ্টা করবে, তা নয়, এরা বাইরে থেকে খাঁচায় গিয়ে ঢুকছে। তবু তো এখনও বসন্তকাল আসেনি। এলে দেখবেন কী হয়। খাঁচায় ঢুকবার জন্য পাখিদের মধ্যে তখন মারামারি লেগে যাবে।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল মার্সেল। [illegible] যে-ঝুড়িতে করে টম্যাটো আর [illegible] নিয়ে এসেছিল, সেটার মুখ [illegible] আটকাতে বলল, "না, মারামারি আমার ভাল লাগে না। তার চাইতে বরং আরও গোটাকয়েক খাঁচা বানিয়ে দেব।"

ঝুড়িটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল মার্সেল। চিবুকের নীচে স্কার্ফের গেরোটা আরও শক্ত করে বাঁধল। এবারে বিদায় নেবে। বললাম, "আমার সেই কালো মখমলের টুপিটা, সেটা কি এখনও শেষ হয়নি নাকি? না কি ভুলেই গেলে?"

যেতে যেতে থেমে দাঁড়াল। বলল, "না, না, ভুলব কেন। তবে কি জানেন, পাখিদের ঝামেলাটা আগে মিটিয়ে নিই। আপনি তো বড়-একটা বাইরে যান না, দুদিন দেরি হলেও তেমন-কিছু লোকসান নেই আপনার। খাঁচাগুলো আগে তৈরি করে ফেলি। ঠাণ্ডা লেগে পাখিরা বড় কষ্ট পাচ্ছে।"

এই হল মার্সেল। পারীর মেয়ে। শহরে থেকেও গ্রামকে ও ভালবাসে। আর আমি? গাঁয়ের মেয়ে হয়েও আমি পারীর প্রণয়-জালে জড়িয়ে গিয়েছি। আর আমরা দুজনেই চাইছি যে, গাঁয়ে আর শহরে একটা সুন্দর সমন্বয় হোক। এইখানে—আমার এই নতুন বাসায়—আবারও সেই সমন্বিত পৃথিবীকে আমি খুঁজে পেয়েছি। সেই পৃথিবীকে, সকলে যার সন্ধান পায় না, কেউ কেউ পায়। আমি পেয়েছি। পেয়েছি আমার বন্ধুদের এই ভালবাসার মধ্যে, এদের এই সহজ সুন্দর অন্তরঙ্গতার মধ্যে। আর তো কিছুই আমি চাই না। বন্ধুদের এই ভালবাসা, আর এই প্রাচীন আসবাবপত্র, এরই মধ্যে আমি তৃপ্ত, সুখী। লোহার রেলিং দেওয়া পুরনো এই ব্যালকনি, অর্ধচন্দ্রাকার এই তোরণ আর এই প্রাচীন ভাস্কর্য—অনেক শতাব্দীর প্রহার সহ্য করেও যা এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, কালের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে—এদেরই তো আমি খুঁজে বেড়িয়েছি এতদিন। না আর কিছুই আমার চাই না। এখন শুধু ভাবতে ভাল লাগে যে, এইখানেই আমার শেষ নিশ্বাস পড়বে। ভাবতে ভাল লাগে যে, আমার সমাধির শিয়রে একটি গির্জা থাকবে। প্রাচীন একটি গির্জা, আর কয়েকটি গাছ।

স্বাগত, বিষাদ

রঞ্জন

কাব্য, হ্যাঁ। অর্থাৎ লিরিক বা গীতিকবিতা। ছোটগল্প, হতে পারে। লঘু বা গুরু প্রবন্ধ, অসম্ভব নয়। কিন্তু পরিণত উপন্যাস, আমার ধারণা ছিল, অপরিণত বয়সে একেবারেই অসম্ভব। নিজের ব্যর্থ প্রেম-কাহিনী লেখা আলাদা ব্যাপার, সে শুধু নিজের চোখের জলকে কালি করে সাদা কাগজে গড়িয়ে যাওয়া। ফল পাঠকের মর্ম স্পর্শ করতে পারে, লেখক বা লেখিকার অন্তরের ব্যথার নিরাভরণ প্রকাশ পাঠকের চিত্তে সহানুভূতি বা অনুকম্পা জাগাতে পারে। কিন্তু শ্রদ্ধা, নৈব নৈব চ। অন্তত, আমি তাই ভাবতুম।

ঠিক এমনি সময় একটি অসাধারণ ফরাসী উপন্যাসের ইংরেজি সংস্করণ হাতে এলো। নাম, Bonjour Tristesse. অর্থাৎ, ফরাসী নামের কোনো ইংরেজী অনুবাদ পর্যন্ত করা হয়নি। আমি যে আমার ক্ষুদ্র নিবন্ধের নাম ওই উপন্যাসেরই মূল নাম থেকে নিয়েছি তা শুধু নাম রক্ষার জন্য Bonjour মানে ঠিক স্বাগত নয়, এবং Tristesse মানে ঠিক বিষাদ নয়। তবু, আমি আশা করছি, আলোচ্য উপন্যাসের বাঙালী নামকরণ পুরোপুরি অসঙ্গত হয়নি। আক্ষরিক অনুবাদ কেন করিনি তার কারণ ক্রমশ প্রকাশ্য।

*

তার আগে গল্পটা বলে নেওয়া যাক। পুরো কাহিনী উত্তমপুরুষে বর্ণিত। আমি, আমি, আমি। তবু বইতে কোথাও অহমিকার আভাসমাত্র নেই। ষোলো কি সতেরো বছরের একটি মেয়ে। মা নেই। বাবা আছেন, কিন্তু তিনি বন্ধুর মতো। কোনো কাফেতে যাবে? বাবা সঙ্গে আছেন। কোনো নাইট ক্লাবে যাবে? বাবা সানন্দে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এমনি করে চলছিল দু' জনের। সুখ, তা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না কারোই। কেউ কাউকে বাধা দিতো না, বাধা দিতে চাইতো না। এর মধ্যে এলো নিদাঘ। ওরা গেল রিভিয়েরায়—যেমন ওরা যায় প্রতি বছর। মেয়ে, বাবা, আর বাবার বান্ধবী এলসা। ঠিক বান্ধবী নয়। একান্ত সাময়িক ব্যবস্থা, তাই রক্ষিতা বললেও ঠিক হবে কিনা জানিনে। যাই হোক, ছুটি কাটছিল নিশ্চিন্ত আরামে। সারাদিন তিন জন শুয়ে থাকতো দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরধৌত বেলাভূমির বালুরাশির

মাদমোয়াজেল সাগঁ

শয্যায়। রাত্রির শোবার ব্যবস্থা একটু অন্যরকমের। কিন্তু কিশোরী মেয়ে সেসিল তা অনায়াসে অনুমান করতে পারে। অনুমান করে সে আপত্তি জানায় না, কেননা বাবা খুশী, এল্‌সা খুশী—আর খুশীর চেয়ে বড়ো জিনিস সংসারে আছে কী? সেসিলের আপন আনন্দেরও অভাব ছিল না, সিরিল বলে একটি ছেলে-বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছিল।

বেশ দিন কাটছিল চারটি আনন্দ-সন্ধানী প্রাণীর। এমন সময় খবর এলো অ্যান্ আসছে ঈগল হয়ে। নীড়ের সব চেয়ে ছোটো পাখীটির মনে স্বভাবতঃই ভয় হোলো সব চেয়ে বেশী, অর্থাৎ সেসিলের। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে, অ্যানের আগমন রোধ করবার আর উপায় নেই। কিশোরী হলে কী হবে, সে অতি বিচক্ষণা। তাই অ্যান্ আসামাত্র ওই ছোটো পরিবারটির ভাবনাহীন পরিবেশে যে পরিবর্তন আসতে শুরু করল, সেসিল তার অবসান ঘটাবার জন্য নানা রকমের ফন্দি আঁটতে লাগল। সেসিল আনন্দ ছাড়া আর কিছু চায় না। অ্যানের জীবন-দর্শন ভিন্ন শ্রেণীর, সে চায় সুখ, শান্তি —ক্ষণিক আনন্দ নয়। অ্যান তাই সেসিলের বাবার অর্থাৎ রেমঁদের রক্ষিতা থেকে তুষ্ট নয়—যেমন এল্‌সা ছিল—সে চায় স্ত্রী হতে, স্ত্রীলোক থাকতে নয়। এলসাকে তাই বিদায় নিতে হোলো। বাকী রইল সেসিল, অ্যান আর রেমঁদ।

অ্যান নিয়মনিষ্ঠ, সে চাইল আর

ভবিতব্য স্বামীর আর সেসিলের জীবন তার নিজের ধ্রুপদী সুরে বাঁধতে। আনন্দ-ক্লান্ত রেম'দ এই নতুন জীবন মেনে নিল, আকাশের মুক্তির পরে মন্দ লাগল না খাঁচার বন্ধন। সেসিল অ্যানকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। অ্যান যেন একটি person নয়, একটা entity. স্নেহ আছে, কিন্তু তাতে যেন আতিশয্য আসতে না পায়। জীবনে ভালোবাসার স্থান আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা যেন সর্বদা শোভন ও সুরুচিসম্মত হয়। জীবন হেলাফেলা খেলার বস্তু নয়, এ যেন একটি বাদ্যযন্ত্র। একে রোদে পোড়াতে হবে, এতে তার বাঁধতে হবে। লাগবে, 'সে যে বিষম ব্যথা', কিন্তু পরে যখন তাইতে সুর তোলা হবে তখন সে ব্যথা সার্থক হবে।

এত শত সেসিলের পছন্দ নয়। সে চায় সিরিলের সংগে নৌকাবিলাস, পরে পাইনকুঞ্জে কাছাকাছি থাকা। পাকা মেয়ে তাই ফাঁদ পাতল, প্রৌঢ় বাপ তাইতে পা দিল। অভিমানাহত অ্যান ওদের পরিবার থেকে বিদায় নিল একেবারে জীবন থেকেই বিদায় নিয়ে, কিন্তু এই শেষ কাজেও পরিচয় দিয়ে গেল তার রুচির। আত্মহত্যাকে সবাই মনে করল মোটর দুর্ঘটনা বলে।

সেসিল আর রেম'দ ফিরে গেল তাদের আনন্দসর্বস্ব জীবনে। প্যারিসের বাড়িতে বাপ আর মেয়ে এখন আগেকার মতো রাত্রে ফেরে দেরি করে। ক্লান্ত মেয়ে শুতে যায় শোবার ঘরে। বাবা যান তাঁর নিজের ঘরে। একা নয়, সংগে থাকে সঙ্গিণী, এবং প্রতি রাত্রে একই সঙ্গিণী নয়।

মাঝে মাঝে সেসিলের মনে পড়ে অ্যানের কথা। তখন অজানতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—Bonjour Tristesse.

*

লেখিকার বয়স উনিশ। কিন্তু বিদগ্ধ ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক মর্টিমার দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন:

"This is not just a remarkable book for a girl to have written: it is a remarkable book absolutely."

একমত না হয়ে উপায় নেই। সহজ সাবলীল ভাষায় লেখা, যেন এর পিছনে আছে দীর্ঘ জীবনের অধ্যবসায়। অনুবাদেও বোঝা যায়, এমন স্বচ্ছ রচনা, গদ্য, বিশেষ ট্যালেন্টের অধিকারিণী না হলে লেখা সম্ভব হোতো না। কোথাও একটি বাজে কথা নেই, বেশী কথা নেই। পড়তে গিয়ে কোথাও থমকে দাঁড়াতে হয় না। কোনো কোনো জায়গায় এসে শুধু বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়, ওইটুকু মেয়ের কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। শুধু আনন্দ নিয়ে সংযত উচ্ছ্বাস নেই, জীবনের অপর দিকের সংগে গভীর পরিচিতিরও পরিচয় মেলে ছত্রে ছত্রে। চরিত্রচিত্রণে লেখিকার অসামান্য ক্ষমতা। শুধু সহ-আনন্দ-সন্ধানীদের জন্য সহিষ্ণুতা নেই, আছে অন্যতর জীবনদর্শনের প্রতি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি।

লেখিকার পরিণত দৃষ্টির প্রমাণ-স্বরূপ দুটি চরিত্রের উল্লেখ করব। সেসিলের বাবা রেম'দ ইংরেজি উপন্যাস-পাঠকদের অনেককে সমরসেট ম'মের 'দি রেজার'স্ এজ্'-এর এলিয়ট টেম্পলটনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। এই দুটি চরিত্রের জীবনদর্শনে কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রেম'দের বিলাসপ্রীতি যেন টেম্পলটনের জীবনের মতো জ'লো নয়। দীর্ঘ প্যারিসবাসের পরেও টেম্পলটন যেন মার্কিনই রয়ে গেছে, আর রেম'দের চরিত্রের পিছনে আছে যেন বহু যুগের ফরাসী আভিজাত্যের নির্ভুল স্বাক্ষর। ন্যায়অন্যায়বোধ সজ্ঞানে বিসর্জন দিয়ে পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ

করবার এই দুর্লভ ক্ষমতা ফ্রান্সের বাইরে খুব বেশী দেশে বোধহয় নেই। সব দেশেই আনন্দান্বেষী অসংখ্য, কিন্তু এই জীবনে আতিশয্য এড়ানো বড়ো দুরূহ কাজ। রেম'দ তার জীবনে আনন্দকে এমন ছন্দিত সমৃদ্ধি দিয়েছে যে, সহস্র নৈতিক আপত্তি থাকলেও (আমার একটিও নেই) ওর উপর রাগ করা যেন শক্ত। এই ক্ষমনীয়তার কারণ ওর জীবনের কমনীয়তা। ওর জীবনে অব্‌সীন্ কিছু থাকতে পারে, ভাল-গারিটির বাষ্পমাত্রও নেই। রেম'দের চরিত্রের এই সবগুলি দিক এত কম কথায় পরিবেশন করতে যে পরিণত বুদ্ধির পরিচয় কুমারী সাগ' দিয়েছেন তা মাদাম কলেতের পরিণত বয়সের রচনার সঙ্গে তুলনায় আদৌ দীন বলে মনে হবে না।

দ্বিতীয় চরিত্র অ্যান্। কিশোরী সেসিল একে পছন্দ করে না। লেখিকা ছেলেমানুষী মন নিয়ে লিখতে বসলে একে আঁকা হোতো আগাগোড়া কালো রঙে। অথচ, আগেও বলেছি, অ্যানের সুগঠিত জীবনধারার প্রতি সেসিলের (লেখিকারও) শ্রদ্ধা আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ আছে। অ্যানের চরিত্রের প্রতিটি সদ্‌গুণ সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে এবং সর্ব-শেষ পরিণতিতে তাকে প্রায় মহত্বের পর্যায়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই পর-ধর্মসহিষ্ণুতা বয়স্কদের মধ্যেও বিরল, এবং প্রত্যেক গল্পলেখক জানেন মন্দ চরিত্রের ভালো দিক্‌গুলিও দেখিয়ে তাকে জীবন্ত করা কী ভয়ানক শক্ত। আমি অ্যানের কাঠামো অনুযায়ী বাঁচব না, কিন্তু তার প্রত্যেকটি গুণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব এবং পাঠকের কাছে অকপটভাবে কবুল করব যে, আমি যে অ্যানের জীবনদর্শন গ্রহণ করিনে তা আমারই অক্ষমতা।

*

উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে মনে হতে পারে যে, সেসিল অনুতপ্তা। সেটা ভুল। আত্মধিক্কারের চিহ্নমাত্র নেই সেসিলের জীবনে বা জবানীতে। আত্মগ্লানির ইঙ্গিত নেই বলেই, আমি বলি, কুমারী সাগ' তাঁর পরিণতমনস্কতার নবতর প্রমাণ দিয়েছেন। সেসিল এমন বুদ্ধি-মতী মেয়ে যে সে জীবনের সব দিক তার বুদ্ধি দিয়ে মেপে নিতে পারে, যাচাই করে দেখতে পারে এবং প্রত্যাখ্যাত মতেরও সুখ্যাতি করতে পারে—এবং তারপর নির্ভয়ে আপন জীবন বাঁচতে পারে। সেসিলের জীবনদর্শন তাই ন্যায় নয়, অন্যায় নয়—amoral.

এই ন্যায়-অন্যায়-বিরহিত জীবন-দর্শন সকলের সমর্থন লাভ করতে পারে না। তাই বইখানি মূল ফরাসী সংস্করণে প্রায় চার লক্ষ কপি বিক্রীত হয়েছে বটে, কিন্তু সমালোচনাও কম পায়নি। স্বভাবসিদ্ধ স্বল্পভাষণ পরি-হার করে ইংরেজ সমালোচক রেমণ্ড মার্টিমার তাই বলেছেনঃ

"How alarming that she should choose such a theme! The language respects decorum, but the coolness with which the writer treats a scabrous situation, as if it were nothing out of the way, makes the book even more distasteful to old fashioned readers."

কোনো উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা সেই জাতির বা সমাজের নিখুঁৎ ছবি, এমন মনে করা মূর্খতা মাত্র। তাই একান্ত অর্বাচীন পাঠক ছাড়া কেউই মনে করবে না যে, ফ্রান্সে সবায়েরই অসংখ্য রক্ষিতা আছে আর সব মেয়েই সেসিলের মতো বাঁচার আনন্দ ছাড়া জীবনে আর কিছু চায় না। কিন্তু মার্টিমার দুটি অর্থপূর্ণ উক্তি করেছেন। এক, মাদমোয়াজেল সাগ' ঠিক এই রকমের কাহিনী কেন লিখতে বসলেন? দুই, এর বর্ণনায় তিনি এমন উদ্বেগশূন্য ঔদাসীন্য দেখাতে পারলেন কী করে যাতে মনে হয়—যেন তেমন কিছু হয়নি? গোটা ফরাসী জাতের নয়, কিন্তু ফরাসী বিদগ্ধ সমাজের একটা প্রভাবশালী অংশের জীবনদর্শনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে কি? প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে কোন কোন লেখকের লেখা শ্রীমতী সাগ'র ভালো লাগে। তার মধ্যে একটি নাম—Sartre. আর বইয়ের নাম নেওয়া হয়েছে Paul Eluard-এর একটি কবিতা থেকে। এ থেকে অনেক কিছু অনুমান করা সম্ভব। সব অনুমান মিথ্যা না-ও হতে পারে।

মাকালুজয়ী এক ফরাসী

রূপদর্শী

"না, মসিয়', খুবই দুঃখিত, মসিয়' বাদবেতা বাসায় নেই।" বামা-কণ্ঠের উত্তর পেলাম।

মহা ঝঞ্ঝাটে পড়লাম তো! মাকালু বিজয়ী ফরাসী অভিযাত্রী দলের কলকাতায় পেঁাছাবার কথা। পেঁাছাবার কথা কি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই পেঁাছে গেছে। কোথায় উঠেছে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিনে।

আমার যিনি কর্ণধার, কলকাতার ফরাসী কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল মসিয়' বাদবেতা, তাঁর আর পাত্তা পাচ্ছিনে কিছুতেই! দিন কয়েক আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা। সেদিন কলকাতার ফরাসী কনসাল মাকালু বিজয়ীদের সম্মান জানাবার জন্য তাঁর আফিসে এক পার্টি দেন, সেখানেই মসিয়' বাদবেতার সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেল। ফরাসী অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই শুনে খুব খুশী।

"নিশ্চয়ই মসিয়', এ আর বেশী কথা কি। ২১ তারিখে (জুন) একটা ফোন করবেন আমাকে। মসিয়' জাঁ ফ্রাঁকো (এই ফরাসী দলটির নেতা) কাল দার্জিলিং যাচ্ছেন, ডাঃ ইভান্স (কাঞ্চনজঙ্ঘা বিজয়ী বৃটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা) আর মসিয়' তেনজিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে।" মসিয়' বাদবেতা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন। তারপর একটু থেমে, একটু হেসে, আবার বললেন, "২১শে ওরা কলকাতায় ফিরবে, ২৩ তারিখে ফ্রান্সে রওনা দেবে। কাজেই একটু সময় পাওয়া যাবে। ২১ তারিখে একটা ফোন করবেন। কেমন? আমার অফিসে, কেমন? আচ্ছা, গুড্ নাইট।"

সেইদিন এই পর্যন্ত। কিন্তু একুশ তারিখে কথামত ফোন করে একেবারে ডাহা বোকা বনে গেলাম। তিনটের সময় ফোন করলাম, "হ্যালো, ফরাসী কনস্যুলেট? দয়া করে একবার ম' বাদবেতাকে দেবেন? অ্যাঁ, কি বললেন, বন্ধ? আফিস ছুটি হয়ে গেছে? সাড়ে বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে? ও, আচ্ছা, ধন্যবাদ। ও, হ্যাঁ, শুনুন, এই মাকালু বিজয়ী দলটি কি কলকাতায় ফিরেছে? ফিরেছে। যাক্ বাঁচালেন। আচ্ছা, ও'রা কোথায় উঠেছেন, জানেন?"

"না, মসিয়', খুবই দুঃখিত" অপারেটর জবাব দেয়।

যাচ্চলে, একটু আলো যদিও ঝলমারল, তা তারও গেল খেই ছিঁড়ে।

মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলাম: "হ্যালো, মসিয়' বাদবেতাকে কি বাসায় পাব?"

অপারেটর জবাব দিল, "আমার পক্ষে বলা মুশকিল, তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন না।"

কিন্তু মসিয়' বাদবেতা বাসাতে নেই।

হতাশ হয়ে দোসরা উপায় ভাবছি এমন সময় ফোন বাজল।

"হ্যালো, আরে! মসিয়' বাদবেতা নমস্কার, নমস্কার। কোথায় আপনি আফিসে? সে কি, তবে না আফিস ছুটি হয়ে গেছে। আমার জন্যে এসেছেন ধন্যবাদ।"

মসিয়' বাদবেতাই হদিশ দিলেন ওদের। হোটেলের নাম জানালেন। ওদের ঘরের নম্বর দিলেন। বললেন, "তবে আমার যতদূর বিশ্বাস, মসিয়' ফ্রাঁকো

কলকাতায় মাকালু বিজয়ী ফরাসী অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ম' বাদবেতা (ভাইস-কন্সাল)

মাকালু গিরিশৃঙ্গের দৃশ্য ঃ মাকালু শৃঙ্গ বিজয়ী ফরাসী অভিযাত্রী বাহিনী কর্তৃক গৃহীত চিত্র

বেন না আজ। তবে ম' তেরেইকে কেন, ম' কুজিকে পাবেন, আর তাইকেই পাবেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

॥ ২ ॥

হোটেলের যে স্যুইটে মাকালু জয়ী ফরাসী অভিযাত্রীরা বাসা নিয়েছেন, সে তল্লাটে ঢুকতেই যার সঙ্গে মোমুখী, ইংরেজী তাঁর কাছে গোমাংস। জেই আমি হাসলাম। তিনিও হাসলেন। তিনি নমস্কার করলেন। আমি ফেরতাই লাম। তারপর কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি রাবিশ্য ভাব বিনিময়ের) চলবার পর আমি খবরের কাগজের লোক এটা তিনি বুঝলেন। আর আমি বুঝলাম, তাঁর ছে নয়, পর পর দুখানা কামরা ছেড়ে নম্বরতি কামরাখানায় ঢুকলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। ইংরেজি জাননে-ওয়ালা একজন সেই ঘরে আছে।

কামরার দরজায় টোকা পড়তেই টকটকে মুখ উঁকি দিল। তারপর দরজা একটু ফাঁক হল। একখানা মোলায়েম হাসির সঙ্গে আহ্বান এল, "আস্তাজ্ঞা হোক।"

ঘরের ভেতর জিনিসপত্রে ছত্রখান। প্যাকিং বাক্স, চামড়ার তোরঙ্গগুলোর কিছু হাঁ করে ভরপেট বাতাস নিচ্ছে, কিছু দ্বিধায় পড়ে ভাবছে, এই বিদেশী গাঁয়ে উঁকি মারব কি মারব না। আর কিছু বড় গম্ভীর। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই পেটের মধ্যে কি আছে।

সেই ঘরে দুজন। এবং উভয়েই সুজন। অমায়িক হেসে বসতে বললেন। দেখে মনে হ'ল, কলকাতার এই বর্ষাটে গরমে ওদের একেবারে বেহাল করে ছেড়েছে। পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার আর মুখে বরফ-ছোঁয়া পানীয়।

"আমি তেরেই। আর ও—" বলে মসিয়' তেরেই তাঁর সঙ্গীর দিকে ফিরলেন। সঙ্গীটি একমনে গালে সাবান ঘষছেন আর শিষ দিয়ে সুর ভাঁজছেন।

মসিয়' তেরেই বললেন, "ও হ'ল কুজি। মসিয়' জাঁ কুজি।"

মসিয়' কুজির সাবান মাখান দাড়ির বুরুশ একটুক্ষণ থামল। সুর ভাঁজা থামল না। চকিতে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে, একটু মাথা নুইয়ে আবার নিজ কাজে মন দিলেন।

"আমি আর কুজিই প্রথম মাকালু শীর্ষে চড়েছি।" মসিয়' তেরেইয়ের মুখে খুশীর আভা ছড়িয়ে পড়ল।

"মাকালু বিজয়ের বিবরণ জানতে চান? তা, আমার স্মৃতিশক্তি তো তেমন খর নয়। আমাদের নেতা মসিয়' ফ্রাঁকোর সঙ্গে দেখা করলেই ভাল করতেন। তিনি সুন্দর করে গুছিয়ে সব বলতে পারতেন।" মসিয়' তেরেই এক ঢোঁক ঠাণ্ডা অরেঞ্জ (মদ নেই। সেদিন শুকনো দিন।) পান করে গলা ভেজালেন।

তারপর বললেন, "কিন্তু আফসোস, তাঁকে পাওয়া যাবে না। মসিয় ফ্রাঁকো বড় ব্যস্ত।"

বললাম, "মসিয় ফ্রাঁকোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দার্জিলিং যাবার আগে, ফরাসী কনস্যুলেটের এক পার্টিতে কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। শুধু তাঁর কথা নয়, আপনার কথাও শুনতে চাই।"

"ধন্যবাদ মসিয়।" মসিয় তেরেই হাসলেন। বললেন, "পাহাড়ে চড়া এক কথা, আর তার গল্প শোনান আরেক কথা। দুটো কাজ সমানভাবে হাঁসিল করা পয়লা নম্বরের ওস্তাদি। অত ক্ষমতা আমার নেই। মোটামুটি বলে যাই। শুনুন।

"এবারে বড্ড তাড়াহুড়ো করে আমাদের আসতে হয়েছে। এমনই তাড়া যে, নতুন জিনিসপত্র জোগাড় করবার সময়ও আমরা পাইনি। ঐ গত বছর যেসব জিনিসপত্র এনেছিলাম, এবারকার বেশীর ভাগ জিনিসই তার মধ্যে থেকে বেছে আনতে হয়েছে। কি করব? গত বছর মাকালু থেকে ফিরলামই তো নভেম্বরে। ২০শে অক্টোবর (১৯৫৪) মসিয় ফ্রাঁকো মাকালুর দ্বিতীয় শৃঙ্গে উঠেছিলেন।"

বললাম, "সঙ্গে আপনিও তো ছিলেন। আপনারা দুজনেই তো উঠেছিলেন।"

মসিয় তেরেই হাসলেন। বললেন, "মনে আছে দেখছি। সেবারে খুব কড়া কম্পিটিশন ছিল। একটা কালিফোর্নিয়ার দল ছিল। হিলারী আরেকটা দল এনেছিলেন। আর আমরা এসেছিলাম।"

কালিফোর্নিয়ার যে দলটি গত বছর মাকালুতে এসেছিল, তার নেতৃত্ব করেছিলেন এক পদার্থবিদ্, ডাঃ উইলিয়াম এ সিরি। তাঁর দলে দশজন অভিযাত্রী ছিল। অক্সিজেন ছাড়াই ওঠা যায় কিনা, ও'রা দেখতে চেয়েছিলেন। ২৩ হাজার ফিট পর্যন্ত উঠেওছিলেন। তারপর আর না। নেমে আসতে বাধ্য হলেন।

অক্সিজেন ছাড়া হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলোতে ওঠা কি সম্ভব? এভারেস্টে অক্সিজেন না নিয়ে কেউ কি উঠতে পারে না?

ফরাসী কনস্যুলেটের পার্টিতে মসিয় ফ্রাঁকোকে কয়েকজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন। মসিয় ফ্রাঁকো বলেছিলেন, একেবারে অসম্ভব বলি কি করে। অক্সিজেন না নিয়ে ওঠা হয়ত যায় কিন্তু সে গোয়ার্তুমি করার কি কিছু মানে হয়? আপনাকে হিমালয় অভিযানে আসতে হলে বিশেষ ধরনের তাঁবু, বিশেষ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ, জুতো, খাদ্য সবই যখন আনতে হবে, তখন বেচারা অক্সিজেনকেই বা হরিজন করে রাখা কেন? অক্সিজেন তো খাদ্যই।

মসিয় তেরেইও বললেন, "অক্সিজেনের সর্বাধুনিক বোতলই সব প্রথম অজেয় হিমালয়ের দম্ভ চূর্ণ করে। এখন হিমালয়ের রহস্য জানা হয়ে গেছে আমাদের। অক্সিজেন সঙ্গে নাও। হিমালয়ের উচ্চস্তরের জলবায়ুর সঙ্গে মোলাকাত কর। সইয়ে নাও নিজেকে। শেরপাদের কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে যাতে, তাদের সেইভাবে কাজে লাগাও। ব্যস্, হিমালয় তোমার কাছে নতি স্বীকার করবে। সংগঠন, মজবুত সংগঠনই শুধু হিমালয়কে হারাতে পারে।

"আমরা যে দল নিয়ে গত বারে এসেছিলাম, এবারেও সেই দলই এনেছি। কাজেই হিমালয়ের হাল চাল আমাদের সকলেরই জানা ছিল। আর তা ছিল বলেই এবারে মাকালু জয় এত সহজে করতে পেরেছি। আর জয় বলে জয়, আর কোনও অভিযাত্রী দল বোধ করি আমাদের মত এমন গুষ্ঠিশুদ্ধ কোন শিখরে ওঠেনি। সব মিলিয়ে উপরের দিকে আমরা ১৫ জন ছিলাম। ৮ জন ফরাসী, ৬ জন শেরপা আর তাদের সর্দার। একে একে এই পনেরজনই উঠেছে। একটা রেকর্ড থাকল আমাদের। কি বলেন?"

গত বছর মাকালুতে ফরাসীরা যে অভিযান চালিয়েছিলেন, মসিয় জাঁ ফ্রাঁকোই তার নেতৃত্ব করেছিলেন। এবারকার অভিযানটিও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। ফ্রাঁকো ছাড়া আরও দশজন ফরাসী অভিযাত্রী এই দলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মসিয় জি ম্যাগ্নোন, মসিয় জাঁ বুভিয়ে, মসিয় এস কুপে, মসিয় এম ল্যাটিয়েল, ডাঃ পি বোর্দে, ডাঃ এ লাপ্রা, মসিয় তিরয়লেং,

মসিয়' এল তেরেই, মসিয়' জাঁ কুজি আর মসিয়' পি ল্যারু। তার মধ্যে ৫ জন মানু পাহাড়ে চড়িয়ে, পেশাদার গাইড। তেরেই আর কুজি অন্নপূর্ণা অভিযানেও এসেছিলেন। তেরেই বোধ করি, এই দলের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া। অন্নপূর্ণা অভিযানে অদ্ভুত কেরামতি দেখিয়েছেন। তিনজন নতুন এসেছেন। হিমালয়ে চড়ার এই তাঁদের সবে হাতেখড়ি। আর আছেন দুজন বৈজ্ঞানিক, ভূতাত্ত্বিক আর বাকিজন ডাক্তার। ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদ ভূতাত্ত্বিক দুজনকে পাঠিয়েছেন। ফরাসী পর্বতারোহণ ফেডারেশনের উদ্যোগে এই অভিযানটি সংগঠিত হয়েছে। আর ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের খোদ প্রেসিডেণ্ট এর পৃষ্ঠ-পোষকতা করছেন।

"কিন্তু এত থাকতে মাকালুতে এলেন কেন?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"তার কারণ, এখানে আসবার অনুমতি চটপট নেপাল সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেল। তাছাড়া বৃটিশরা কাঞ্চনজঙ্ঘায় চেষ্টা করছে। তবে? মাকালু ছাড়া আর গতি কি? মাকালু উচ্চতায় (২৭৭৯০ ফিট) পৃথিবীতে পঞ্চম। গতবার কালিফোর্নিয়ার দলটি দক্ষিণ-পূব দিক থেকে অভিযান চালিয়েছিল। ওদিক থেকে উঠা খুব মুশকিল। বড় কষ্টসাধ্য পথ। হিলারীর অভিযান চলেছিল পশ্চিম আর উত্তর থেকে। এদিকের পথ ভালই হতে পারে। অন্তত হিলারী তাই বলেছিলেন।"

কিন্তু ফরাসী অভিযাত্রীরা ও দুটো পথের একটিও অনুসরণ করলেন না। তাঁরা অনুসন্ধান চালালেন অন্য পথে। মাকালুতে উঠবার সহজতর আর কোনও পথ পাওয়া যায় কিনা?

"সৌভাগ্যের কথা, পথ আমরা পেলাম। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা মাকালু 'কল' (২৬০০০ ফিট) পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। ফ্রাঁকো আর আমি উঠেছিলাম মাকালুর দ্বিতীয় শৃঙ্গটাতে। শীত নেমে গেল। তুষার পাত, ঝড় শুরু হল। হিমালয়ের ক্রূরতম মূর্তির আবির্ভাবের সময় এসে গেল। তাই আমরা নেমে এলাম! ফিরে গেলাম দেশে।

"কিন্তু দেশে ফিরে বিশ্রাম নিতে পারিনি। কয়েক মাস পরেই আবার হাওয়াই পথে পাড়ি মারলাম ভারতে। সময় বাঁচানর জন্য কলকাতা থেকে বিরাট-নগর পর্যন্ত প্লেনেই গেলাম।

"তারপর সেখান থেকে হাঁটাপথে ধরমবাজার। ধরমবাজারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সর্দার গিলজেন। দার্জিলিং থেকে ২৫ জন 'বাঘা' (টাইগার) শেরপা সে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। শোলো খুম্বু উপত্যকা থেকেও ১০০জন শেরপা কুলি এসেছিল। ওরা পাহাড়ের সুউচ্চ অঞ্চলে মাল বইতে ওস্তাদ। তার উপর আরও ২০০ নেপালী কুলি ধরম-বাজার থেকে জোগাড় করা হ'ল। ওরা নিচু অঞ্চলে মাল বইবে। ২০শে মার্চ (১৯৫৫) আমরা ধরমবাজার থেকে যাত্রা করলাম মাকালুর উদ্দেশে।

"২০শে মার্চ রওনা দিলাম আর ৪ঠা এপ্রিল পৌঁছে গেলাম বেস ক্যাম্পে। ঠিক ১৬ দিনে। গত বছর এই পথটুকু যেতে আমাদের ২৪ দিন লেগেছিল। তা'হলেই আমাদের এবারকার তাড়াটা বুঝবেন। একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা বলে না, তাই। অবিশ্যি এবারের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আগেরবারের চেয়ে ভাল ছিল।"

বেস ক্যাম্পে পৌঁছে, ২০০ নেপালী কুলিকে বিদায় দিতে হল। আর ওরা উপরে উঠতে পারবে না। ওদের মুরোদ এই পর্যন্তই। এবার মাল বইবে শেরপা কুলিরা।

"এই শেরপারা, বুঝলেন মসিয়'",—মসিয়' তেরেই বললেন, "অদ্ভুত। একেবারে আশ্চর্য জীব। দেখে তাজ্জব বনে গেছি। ২৩ হাজার ফিট উপরে, বুঝে দেখুন, কি প্রচণ্ড শীত, ওদের ভ্রূক্ষেপও নেই তাতে। খালি পায়ে বরফের উপর দিয়ে দিব্যি মালের বোঝা পিঠে চাপিয়ে চলেছে। ওদের জন্য জুতো ছিল। দিতে গেলাম। নিল না।"

বেস ক্যাম্পে পৌঁছে ওঁরা দেখলেন, ও অঞ্চলে তখনও বেশ শীত। সারা বছর কাজকাম করে বাড়ি ফেরার আগে তাবৎ দেশের শীত যেন সেখানে মজুরী চুকিয়ে নেবার জন্য হাজির হয়েছে।

বেস ক্যাম্প থেকে ১নং ক্যাম্পে মাল চলাচল শুরু হল। সর্দার গিলজেনের উপর এই কাজের ভার পড়ল। আর সেই ফাঁকে অভিযাত্রীরা উঁচু উঁচু পাহাড়ে
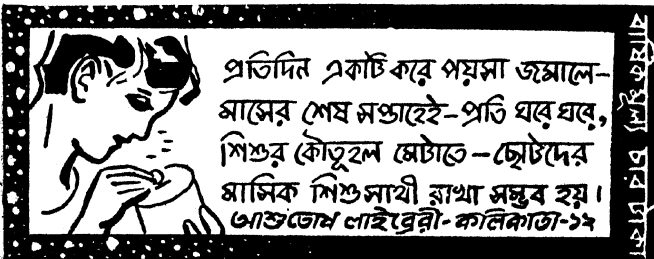
দলের নেতা ৬নং ক্যাম্প থেকে মাকালু শৃঙ্গ পর্যবেক্ষণ করছেন

চড়ে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে শেরপারা বেস ক্যাম্প থেকে ১নং ক্যাম্পে মাল উঠিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আরও উপরে উঠে ২নং ক্যাম্প স্থাপন করল। এরপর ২ জন অভিযাত্রী আরও উ'চুতে উঠে ৩নং ক্যাম্প বসালেন। সে দুজন ফিরে এলেন। তাঁদেরকে বিশ্রাম করতে নির্দেশ দিয়ে ফ্রাঁকো দুইজন নতুন লোককে পাঠালেন ৪নং ক্যাম্প স্থাপন করতে। মাকালু কলের কাছাকাছি এই ক্যাম্প বসান হ'ল। তারপর তাঁরা দুজন নেমে এলেন।

মঁসিয় তেরেই বললেন, "পথ এরপর থেকে ক্রমশ খাড়া হতে লাগল। ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বড় বড় বরফের চাঙড় ভেঙে পড়ছে কখনও। কোথাও বা তুষার প্রপাতের ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। আমরা চোখ কান, শুধু চোখ কান কেন, সমগ্র ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। হিমালয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল মানুষের। কী তীব্র বাতাসের গতি! কী তীক্ষ্ম বরফের দাঁত! ফাঁক পেলেই যেন চিবিয়ে গ'ুড়ো করে দেবে। তবু ভাল, আবহাওয়া বে'কে বসেনি।"

পাহাড়ের গা খাড়া উঠে গেছে। শক্ত, নীল বরফের দেখা পেতেই অভিযাত্রীরা খুশী হলেন। শক্ত বরফে কাজের সুবিধে। সি'ড়ি কাটো আর উপরে ওঠো। বরফ কেটে সি'ড়ি বানান শুরু হ'ল। ৯ই মে দুজন সারাদিন ধরে বরফ কাটলেন। আর দড়ি খাটালেন। এই সি'ড়ি আর এই দড়ি সম্বল করে পে'ছাতে হবে মাকালু কলে। মাল তুলতে হবে। ক্যাম্প খাটাতে হবে —৫নং ক্যাম্প। —তবু দুজন বরফ কাটছিলেন তাঁরা সেদিন আর ৪নং ক্যাম্পে পে'ছাতেই পারলেন না। পরদিন দুজন তাজা লোককে পাঠান হ'ল ওদের বদলি দিতে। সি'ড়ি কাটা হ'ল। দড়ি খাটান হ'ল। তারপর সারাদিন (১০ই মে) ২৭ জন শেরপা মাল বয়ে নিল কলে। ৫নং ক্যাম্পও সেখানে খাটান হ'ল।

১০ই থেকে ১৪ই, এই চারদিন একেবারে বেকার কেটে গেল। অভিযাত্রীরা ইঞ্চি খানেকও আর এগুতে পারলেন না। মাকালু কলের পর কিছুটা পথে বরফ নেই। একেবারে ঠকঠকে পাথর। সোজা উঠে গেছে। কাজেই এই চারদিন নতুন পথ খ'ুজতেই খরচ হয়ে গেল।

এদিকে ৩নং ক্যাম্পে উ'চু চুড়ায় ওঠবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ২ জন অভিযাত্রী আর ২১ জন শেরপা উঠে এল। তারা কদিন এখানে বিশ্রাম করল। তারপর এদের মধ্য থেকে দুজন অভিযাত্রী আর দুজন শেরপা কিছু কিছু মালপত্র

নিয়ে একেবারে ৫নং ক্যাম্পে উঠে গেল। হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে এল। তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়ল। একজন আবার একটু ভালও হয়ে গেল।

দুজন ফরাসী আর তিনজন শেরপা আরও উপরে উঠে গেলেন। তারপর সেইদিনই (১৪ই মে) ৬নং ক্যাম্প বসান হ'ল। প্রত্যেককেই অতিরিক্ত বোঝা বইতে হ'ল সেদিন। অক্সিজেনও টানতে হচ্ছিল। শুধু একজন শেরপা অক্সিজেনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না রেখেই দিব্যি উঠে গেল।

"পরদিন (১৫ই মে) আমি আর মসিয়' কুজি সকাল ৭৷৷টায় বেরিয়ে পড়লাম মাকালু শিখরের উদ্দেশে। বন্দোবস্ত তাই ছিল। আমরা দুজনেই অক্সিজেন টানছিলাম। আর ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম। আমরা এবারে পশ্চিমদিক থেকে মাকালুর উপর অভিযান চালিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত মোটামুটি সেইদিক দিয়েই উঠছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমাদের উত্তরদিকে ঘুরে যেতে হ'ল। তাছাড়া চুড়ায় পেঁছাবার আর কোন উপায় নেই।

"আবহাওয়া খুব সুন্দর ছিল। আমি আর কুজি দুজনেই তো অন্নপূর্ণা অভিযানে এসেছিলাম। গত বছরও মাকালুতে এসেছি। কিন্তু এমন মনোরম মন জুড়ান আবহাওয়ার সাক্ষাৎ আর কখনও পাইনি। তবে তাপমাত্রা সাংঘাতিকভাবে নেমে গিয়েছিল। প্রথম দিকে আমরা খাড়া উপরে উঠছিলাম, বরফের গা কেটে কেটে। বরফের অজস্র কার্নিশ ঝুলে আছে। ওগুলো যেন জমাট বাঁধা স্তব্ধতা। কি অপার্থিব স্তব্ধতা!

"বাতাস মোটে নেই। আকাশে বিন্দুমাত্র ময়লা নেই। মনে হ'ল আকাশটা কী পাতলা! কী স্বচ্ছ! যেন আর একটু উপরে উঠে আকাশের গায়ে উঁকি মারলেই এক অন্য জগৎ—যাকে দেখিনি, যার কথা কখনও শুনিনি, কল্পনাতেও যার ছবি আনতে পারিনি,—দেখব।

মসিয়' তেরেই একটুক্ষণ থামলেন। একটু হেসে বললেন, "ঐ অত উঁচুর পাতলা বাতাবরণে কখনও কখনও এইসব অদ্ভুত ভাব মনে জাগে।

"ঘণ্টা দুয়েক অবিশ্রাম উঠলাম। উঠতে উঠতে হঠাৎ দেখি, দূরে এক বিরাট পাথরের প্রাচীর। সর্বনাশ! ক্রমে তার নিচে এসে থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু না, সর্বনাশের কিছু নেই। দেখলাম পাথরের গায়ে গায়ে অনেক খাঁজ। খাঁজের ভিতর বরফের লেশ নেই। মাঝে মাঝে ধাপও আছে।

"বরফের পাহাড় ছেড়ে এবার চলল পাথরের পাহাড়ে চড়ার পালা। ঘণ্টাখানেক এইভাবে শুধু পাহাড় বেয়েই উঠতে হ'ল। তারপর একেবারে আখেরি পাল্লায় এসে পড়লাম। চুড়ার নাগালের মধ্যে এসে পড়লাম যখন, তখন মনে বল এল। আজ হেস্তনেস্ত একটা না ক'রে ছাড়ব না। এবারে আবার বরফ পাওয়া গেল। কাটো বরফ। শুধু বরফই নয়, পাথরও কাটতে হয়েছে। এবার বেশ কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু হাল ছাড়িনি আমরা। দুজনেই পালা করে বরফ আর পাথর কাটতে কাটতে যখন চুড়ায় পেঁছে গেলাম, বেলা তখন প্রায় ১১৷৷টা হবে।

"অপরিসর চুড়ায় দুজনে বসে রইলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক। এভারেস্ট দেখলাম। কিছু খেলাম। ফটো তুললাম। তারপর নেমে চললাম। সাফল্য শরীরে দুনো বল এনে দিল। আমরা নামতে নামতে একেবারে ৩নং ক্যাম্পে চলে এলাম। সেইদিনই। তারপর? তারপর আর কি? পরদিন নেতা জাঁ ফ্রাঁকো নিজে গেলেন। সবাইকেই বললেন, যাও, যে পার, ঘুরে এস মাকালুর চুড়া থেকে। যে কথা সেই কাজ। একে একে সবাই চড়ল চুড়ায়। এমনভাবে গোটা দল আর কখনও হিমালয়ের চুড়ায় ওঠেনি। সে হিসেবে আমরা রেকর্ড করলাম একটা। কি বলেন?"

॥ ৩ ॥

মসিয়' তেরেই বললেন, "রেকর্ড একটা নয়, এবারকার মাকালু অভিযানে দুটো রেকর্ড হয়েছে। আরেকটা করেছেন আমাদের ডাক্তার। ডাঃ লাপ্রা। বেস ক্যাম্পে এক শেরপার এপেন্ডিস্ পেকে ফেটে যায়। যন্ত্রণায় সে এই মরে তো সেই মরে। ডাঃ লাপ্রা তক্ষুণি সেইখানেই তার অপারেশন করেন। বেঁচে গেল লোকটা। না ভাল ওষুধপত্র, না উপযুক্ত সরঞ্জাম, ডাঃ লাপ্রা বাঁচিয়ে দিলেন ওকে। সে এক অদ্ভুত গল্প। আপনি বরঞ্চ ঘটনাটা ডাক্তারের নিজের মুখ থেকেই শুনুন। সাংঘাতিক গল্প।"

"ডাঃ লাপ্রা? ডাঃ লাপ্রা?"

কোথায় ডাঃ লাপ্রা? এঘর ওঘর খুঁজে মসিয়' তেরেই ফিরে এলেন। বললেন, "না মসিয়', খুবই দুঃখিত। ডাঃ লাপ্রা হোটেলে নেই। বেরিয়ে গেছেন।"

কি আপসোস!

AF. 35
Combine Business with Pleasure

ফরাসী রাষ্ট্র সংগীত

অনুবাদ ও স্বরলিপি : **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময় 'লা মার্সেইয়েজ' গাইবার ঢেউ উঠেছিল। উদ্দীপনাময় এই জাতীয় সংগীত জাতীয় প্রেরণায় সকল ফরাসীকে উদ্বুদ্ধ করে

আয়রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে;
অত্যাচার ঐ দ্যাখ্—গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে স্ত্রীপুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ সংগঠন;
চলো—চলো—মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু-রক্ত হোক্ সিঞ্চন।

[যে মার্সেইয়েজ গান ফরাসী জাতিকে মাতাইয়া তুলে, যাহা গাহিয়া ও বাজাইয়া ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্য পরিপূর্ণ উৎসাহে তাহাদের উভয়ের শত্রু জার্মানদের সহিত যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে, যাহা ভারতের পাঠান সৈন্যেরা বাজাইয়া, ফরাসী জাতির সহিত সমপ্রাণতা দেখাইয়া, তাহাদিগকে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া সম্প্রতি রয়টার সংবাদ দিয়াছেন, সেই মার্সেইয়েজ গানের মূল-সুরের অনুগত বঙ্গানুবাদ ও তাহার স্বরলিপি, এই য়ুরোপীয় মহাসমরের দিনে প্রবাসী-পাঠকদিগের কতকটা কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে মনে করি।*]

Allons, enfants de la patrie | Le jour de gloire est arrive | Contre nous de la tyrannie | L'etendard Sanglant est leve' | Entendez Vous dans ces campagnes | Mugir ces feroces soldats | ils viennent jusque dans vos bras | Egorger vos fils vos compagnes | Aux-armes citoyens | Formez vos bataillons | Marchons, marchons | Qu'un sang impur abreuve nos sillons.

বাঙলায় উহার উচ্চারণ এইরূপ হইবে—আলোঁজ্-আঁফাঁ দ্য লা পাত্রি। ল্য জুর দ্য গ্লোআর এৎ-আরিভে। কন্ত্র্ নু দ্য লা তিরানী। লেতাঁদার্ সাঁগ্লাঁৎ-এ লভে। আঁতাঁদে ভু দাঁ সে কাঁপাঞ্। মিয়্জির্ সে ফেরোস্ সল্দা। ইল্ ভিয়েন্ জিস্ক্ দাঁ ভো ব্রা। এগর্জে ভো ফিস ভো কঁপাঞ। ওজ-আর্ম্ সিতোয়াই আঁ, ফর্মে ভো বাতাইয়োঁ। মার্শ মার্শ। ক্যঁ সাঁক্-অ্যাঁপ্যির আব্রিভ্ নো সিঅঁ।

* ভাদ্র ১৩২২, প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত

প্রকাশিত হয়েছে, নিম্নে তার তালিকা দেওয়া গেল—

১৮৮৪। **হঠাৎ নবাব।** প্রহসন। মোলিয়ের-এর 'লে বুর্জোয়া জাতিয়ম্' অবলম্বনে।

১৯০২। **দায়ে পড়ে দারগ্রহ।** প্রহসন। মোলিয়ের-এর মারিয়াজ ফোর্সে অবলম্বনে।

১৯০৩। **ভারতবর্ষে।** ভ্রমণ। আঁদ্রে শেফ্রিয়োঁর গ্রন্থ অবলম্বনে।

১৯০৪। **ফরাসী প্রসূন।** গল্প, কবিতা ও নাট্যকাব্য।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে সাতটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ বা 'স্বাধীন অনুবাদ' আছে—পোল দেবাল, গ্যাব্রিয়েল মার্ক, চার্ল গলেট, ইউজেন মরে, ভ্যালোয়া, ইউজেন ডোরিয়াক, পল য়্যুজেল-এর রচনা। দ্বিতীয় অংশে অধিকাংশ কল্পের কবিতার অনুবাদ। এই লেখকের দুটি কাব্য-নাট্যেরও অনুবাদ আছে১, এবং ভিক্টর হুগোর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ আছে।

১৯০৯। **ইংরাজ - বর্জিত ভারতবর্ষ।** ভ্রমণ। পীয়ের লোটির রচনা হইতে।

১৯১১। **সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।** দর্শন। ভিক্টর কুজ্যাঁ প্রণীত গ্রন্থ হইতে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'অবতরণিকা'য় (।৴০—৷৷৵০) ভিক্টর কুজ্যাঁর জীবন ও দার্শনিক গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়েছেন।

ফরাসী দার্শনিকের গ্রন্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ভিক্টর কুজ্যাঁর গ্রন্থ মহর্ষি যত্ন সহকারে পাঠ করেছিলেন; তার ফলেই পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা অনুবাদ করবার প্রেরণা লাভ করেন—

"কোন সময়ে পিতৃদেব সাহেবগঞ্জে গঙ্গাবক্ষে বজরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোন বিষয়কর্ম উপলক্ষে সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বজ্‌রার মধ্যে গিয়া দেখি, টেবিলের উপর দুই চারখানা বাঁধান ফরাসী গ্রন্থ, আর একখানি ফরাসী-ইংরাজি অভিধান রহিয়াছে। এই গ্রন্থগুলি Victor Cousin-র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, Le Vrai, Le Beau, Le Bien অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল'। উহার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, ফরাসী মূল-গ্রন্থ পড়িবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয়েক কপি বিলাত হইতে আনাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক কপি প্রতি পৃষ্ঠার মধ্যে শাদা কাগজ

গ্রথিত করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি ইংরাজি অনুবাদের সঙ্গে মিলাইয়া, অভিধানের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে, যে অংশ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আমাকে তাহার অর্থব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, আমি অল্পস্বল্প ফরাসী জানি। তাঁহার বার্ধক্যে এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য হইলেও সে সময়ে আমি পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, ঐ কীটদষ্ট গ্রন্থ বোলপুরের লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া পাঠ করি ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই।"২

১৯২০। **শোণিত-সোপান।** গল্প।

১৯২২। **অবতার।** উপন্যাস। থিয়োফিল গোতিয়ে-র রচনা হইতে। "ইংরাজীতে বোধ হয় ইহার অনুবাদ হয় নাই।"—অনুবাদকের ভূমিকা

১৯২৩। **মিলিতো না।** উপন্যাস। থিয়োফিল গোতিয়ে-র রচনা হইতে। "ইহার ইংরাজী অনুবাদ নাই।" অনুবাদকের ভূমিকা

এই সকল গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হয়নি ফরাসী সাহিত্যের এমন বহু অনুবাদ সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে; এগুলি কেবল কথাসাহিত্য নিদর্শন নয়, যেমন Emile Senart-এর রচনা (প্রবাসী ১৩২৩-২৪), De La mazeliere-এর গ্রন্থ (প্রবাসী ১৩১৭-২০)। ভারততত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেক রচনারও তিনি অনুবাদ করে গিয়েছেন, Paul Lapie কৃত ফ্রান্সে শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশীলন-এর অনুবাদ (বঙ্গবাসী) করার কালেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বসুমতী সাহিত্য-মন্দির যে পাঁচ খণ্ডে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন তা'তে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কতকগুলি অনুবাদ সংগৃহীত হয়েছিল, যেমন চতুর্থ খণ্ডে পীয়ের লোটির রচনার অনুবাদ "প্রবাসীর আত্মকথা", "ঘণ্টা-তিনেকের আত্মবিনোদন", "ভারতের উপকূলস্থ মাহে নগর", "ওবক বন্দর"; দ্বিতীয় ভাগে অনেকগুলি ফরাসী গল্পের অনুবাদ আছে।

বর্তমানে ফরাসী গল্প উপন্যাসের অনুবাদে বাংলা সাহিত্য প্লাবিত। আশা করা যায়, মূল ফরাসী থেকে অনূদিত এই গল্প-উপন্যাসগুলির পুনঃ প্রচারে কোনো প্রকাশক উদ্যোগী হবেন এবং ভারততত্ত্ব সম্বন্ধীয় রচনাগুলির অনুবাদের প্রতি কোনো বিদ্বৎসভার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। ফরাসী রাষ্ট্রসংগীতের তিনি যে মূলানুসারী স্বরলিপি ও বঙ্গানুবাদ রচনা করেছিলেন, তা এই সংখ্যার অন্যত্র মুদ্রিত হ'ল।

শ্রীহলধর হালদার

---

১ ফ্রান্সে মূল নাটক দুটির অভিনয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রী Sarah Bernhardt প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি", প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮।

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সাহিত্য-সাধকচরিতমালার ৬৮ সংখ্যক গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

৪ "সেই অসুখই যে তাঁর শেষ অসুখ, তাহা তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই। অন্তিম-শয্যায় শুইয়াও আশ্চর্য সজ্ঞানভাবে আজীবনব্যাপী সাহিত্যসেবার শেষ নিদর্শন তাঁহার এই অসমাপ্ত 'ফরাসী শিক্ষা-বিজ্ঞান'-এর অনুবাদ সমাপ্ত করিবার ভার আমাকে দিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের শেষাংশ অনুবাদ ও প্রবন্ধটি সংশোধন ও প্রকাশ করিয়া তাহার শেষ অনুরোধ ভক্তি-ভরে সাধ্যমত রক্ষা করিলাম। শ্রী—ইন্দিরা দেবী।" —বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩৩২, "ফ্রান্সে শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশীলন"।

সংস্কৃতির রাজধানী প্যারিস

শেখর সেন

কয়েক বছর আগে এমনি এক জুলাই-এর সকালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম 'বাস্তিল কলমে'র সামনে। মনে পড়েছিলো চোদ্দই জুলাই ১৭৮৯ সালের সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা—যেদিন নিরন্ন বস্ত্রহীন পীড়িত নিষ্পেষিত ফরাসীরা বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তাদের জাতি ও জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক ভীতিপ্রদ বাস্তিল কারাগার ভেঙে চুরমার করে দেয়। ছিন্ন করে সকল শৃংখল; মুক্তির স্বাদে ও আনন্দে মত্ত হয়ে প্যারিসের আকাশ-বাতাস কম্পিত করে তোলে।

'বাস্তিল কলমে'র মাথায় একটি প্রতিমূর্তি—'জিনিয়াস অফ লিবার্টি' নাম। ১৮৩০ সালের বিদ্রোহের স্মরণ-চিহ্ন। এর নীচের অংশ ১৮৪৮ সালের বিদ্রোহের চিহ্ন বহন করছে। সব মিলিয়ে 'বাস্তিল কলম' বিপ্লবের প্রতীক।

প্যারিসে পা দিয়ে অবধি পায়ের বিশ্রাম নেই। শেষ নেই দেখার, ঘোরার। হাতে সময় অল্প: তারই মধ্যে অনেক কিছু দেখতে হবে। যেতে হবে অনেক জায়গায়, যেখানে আছে ফরাসীর সংস্কৃতি, তার জীবন-দর্শনের যা কিছু দর্শনীয় বিষয়।

ফরাসী সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের কিই-বা বুঝব এই অল্প সময়ে? একটি জাতির সংস্কৃতি জানতে ও বুঝতে হলে তাদের মধ্যে কিছুকাল বাস করা দরকার, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অনির্দিষ্টভাবেই ঘুরে বেড়াই, আর তন্ময় চোখ দিয়ে দেখি প্যারিসের পথঘাট, তার বাড়ি, বাগানের শোভা, দোকানপাট আর তার পথচারীদের।

অনেক দিন লণ্ডনে বাস করার পর এসেছি প্যারিস ভ্রমণে। খাঁটি ইংরেজি আদব-কায়দা ও সভ্যতা-ভব্যতা এরই মধ্যে রপ্ত হয়ে গেছে। অল্প কথা বলতে, অকারণে পরের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ না করতে, শান্তশিষ্ট ও গম্ভীর হয়ে থাকতে শিখেছি লণ্ডনে বাস করে। এখানে এসে দেখি ব্যাপার অন্য রকম। ইংলিশ চ্যানেলের এপার ওপারে এত তফাৎ কে জানতো! হৈ-চৈ আনন্দ নিয়ে মাততে জানে ফরাসীরা। জানে প্রাণ খুলে হাসতে আর গল্প করতে। আদর-আপ্যায়নে, কৌতুক ও কৌতূহলে, উচ্ছ্বাসে ও উচ্ছলতায় ফরাসীরা বেশ পটু। ইংরেজদের মাপা মাপা কথাবার্তা, ঘড়ি ধরে ওঠা বাস চলা ফেরা। তাই প্যারিসে এসে অবাক লাগল আর সত্যি বলতে কি খুশীতে মন ভরে উঠল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ ও আন্তরিক সম্পর্ক এখানে। কৃত্রিমতা নেই, আড়ম্বর নেই ভদ্রতার। ভারতবাসী আমরা, এই ধরনের জীবনেই অভ্যস্ত। প্যারিসে এসে আমার আসল ভারতীয় প্রকৃতি যা এতদিন ইংরেজি কাঠামোতে রাশ মেনে ছিল—ছাড়া পেল ফরাসীদের মধ্যে।
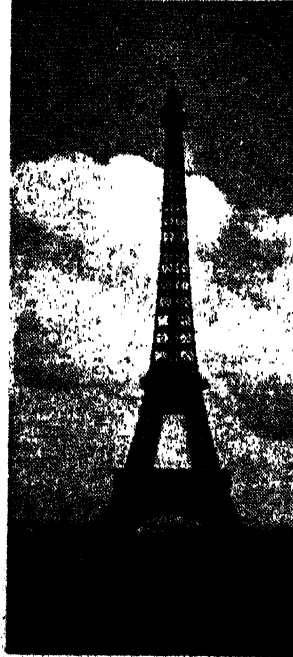
আইফেল টাওয়ার

কিন্তু ভাষা হলো প্রতিবন্ধক। এখানে রাস্তাঘাটে ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা বিরল। লণ্ডনে থাকতে ফরাসী ভাষা যেটুকু শিখেছি তাতে পথেঘাটে হারিয়ে যাব না, একই জায়গায় বারবার ঘুরে হয়রান হব না, বা রেস্তোরাঁয় খাদ্য তালিকা বাছতে গিয়ে গলদঘর্ম হব না। কিন্তু এতেই তো সব হয় না। ফরাসীদের সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে যে কৌতূহল, তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা সে সব জানা আমার সামান্য ফরাসী বিদ্যায় সম্ভব নয়।

সাঁজএলিজের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাষার অসুবিধার কথাই বলছিলাম সদ্য আলাপী এক বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে। এই পথেই দেখা তাঁর সঙ্গে। দুদিন হলো এসেছেন প্যারিসে। হাতে একটি ইংরেজি-ফরাসী ভাষার ছোট অভিধান, পাশে একটি ফরাসী তরুণী। নিজে এক বর্ণ ফরাসী জানেন না, তাতে কি! যখন যেটি বলা বা জানা দরকার, অভিধান খুলে ইংরেজি শব্দের পাশে দেওয়া ফরাসী শব্দটি কখনো উচ্চারণ করছেন, কখনো দেখিয়ে দিচ্ছেন সঙ্গিনীকে। সঙ্গিনী ইংরেজি জানেন না এক বর্ণ, তাঁর হাতের ফরাসী থেকে ইংরেজির অভিধান দেখে বা শুনে বুঝে নিচ্ছেন সঙ্গীর বক্তব্য। তাঁর দিক থেকেও একইভাবে উত্তর দেওয়া চলছে। ভদ্রলোকের এই অস্বাভাবিক অধ্যবসায় ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। ফরাসী ভাষা না জানলেও এরই মধ্যে ফরাসী সঙ্গিনী যোগাড় করে নিয়েছেন তিনি!

আমাকে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে দেখে অট্টহাস্যে বললেন, 'দেখছেন কি! আমার পন্থা অনুসরণ করুন। ফরাসী সংস্কৃতি, জীবন, দর্শন সব বুঝতে পারবেন মায় ফরাসী নারী চরিত্র অবধি।'

আমি একটু সন্দিগ্ধভাবে মেয়েটির
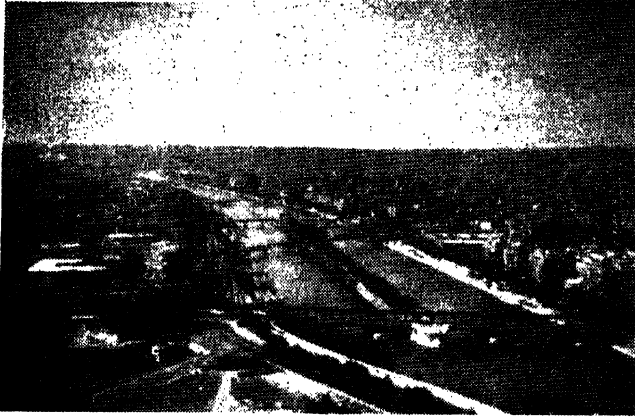
আইফেল টাওয়ারের উপর হইতে 'সেন' নদী

দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন, 'রাস্তার মেয়ে নয় মশাই, দস্তুরমত সোরবঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী-সাহিত্যের ছাত্রী। য়ুনিভার্সিটি দেখতে গিয়ে আলাপ।'

'সেন' নদীর ধারে তিনশো মিটার উঁচু আইফেল টাওয়ার। সুউচ্চ লৌহ-সৌধ। গুস্টভ আইফেল নামে একজন ইঞ্জিনীয়ার এটি ১৮৮৭ সালে নির্মাণ করেন। তাঁরই নামে এটি পরিচিত। শুধু প্যারিসেই নয়, সারা য়ুরোপে এমন সৃষ্টি আর নেই। প্যারিসবাসীরা গর্ব করে 'আইফেল টাওয়ার'কে নিয়ে।

এর সর্বোচ্চ ধাপের গোল রেলিং ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্যারিসের বাইরেও বহুদূর অবধি দেখা যায়। নীচে বয়ে যাচ্ছে 'সেন' নদী, টাওয়ারের চারপাশে অপরূপ বাগান।

কণ্টিনেণ্টে ভারতীয় দেখলে কৌতূহলী হয়ে ওঠা য়ুরোপীয়দের সাধারণ রেওয়াজ। ইংলণ্ড ভারত শাসন করেছে দুশো বছর ধরে। ভারতের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর ইংলণ্ড জানে; তবে সাধারণ ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে তেমন খবর রাখে না, যা রাখে তার অনেকটাই অসত্যে ভরা। কৌতূহল প্রকাশ করা তাদের ভদ্রতায় বাধে। পথে-ঘাটে, অজানা-অচেনা কোনো ভারতীয় দেখলে তারা জিজ্ঞেস করে না, যদি বা করে, তবে সেটা ভারতবর্ষের গরম সম্বন্ধে। ভারতীয় আবহাওয়ার বেশী কোনো খবর সংগ্রহ করতে ইংরেজ চায় না। কিন্তু কণ্টিনেণ্টে ভারত ও ভারতীয়দের সম্বন্ধে কৌতূহল

ভদ্রতার খাতিরে চাপা থাকে না। ভারতীয় দেখলে অনেকেই এগিয়ে আসে আলাপ করতে। ভারতবর্ষের কথা, গান্ধী-নেহর‍ুর কথা সর্বত্র! স্বাধীন ভারত কি করছে! কি উপায়ে সে তার দ‍ুশো বছরের পরাজয়ের গ্লানি ঝেড়ে ম‍ুছে উঠে দাঁড়াচ্ছে, তার অতীত ঐতিহ্যকে সে আবার কতখানি স্থান দিচ্ছে বর্তমান কাঠামোতে—এই সব প্রশ্ন য়ুরোপের অনেক চিন্তাশীল মান‍ুষই করে থাকেন ভারতীয়দের সংস্পর্শে এসে। য়ুরোপে ফরাসীদের মনে বর্ণস্বাতন্ত্র্য নেই। ইংলণ্ডে খ‍ুবই আছে, তবে তার অশোভন প্রকাশ নেই, জর্মানিতেও তাই। কিন্তু ফ্রান্সে বিশেষ করে প্যারিসে, যেখানে প‍ৃথিবীর সমস্ত দেশ ও সভ্যতার মিলন সম্ভব ও সার্থক হয়েছে—সেখানে বর্ণ-বিদ্বেষ নেই। তাই বলে কোনো ফরাসী ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের সঙ্গে কালো লোকের বিয়ে দিতে এক কথায় রাজী হবে, তা নয়। গায়ের রং-এর জন্যে ততটা নয়, যতটা তারা ভাববে সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে। একটি য়ুরোপীয় মেয়ের পক্ষে যে আজীবন সম্প‍ূর্ণ অন্য এক ভাবধারায়, সামাজিক ও ধার্মিক অন‍ুশাসনে বেড়ে উঠেছে, সে কেমন করে সব ভুলে সব পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে আর এক ভাবধারায়, সামাজিক ও ধার্মিক অন‍ুশাসনের মধ্যে? এটাই হলো প্রশ্ন ও সমস্যা। তাই বলে কি বিয়ে হচ্ছে না য়ুরোপীয় মেয়ের সঙ্গে ভারতীয় প‍ুর‍ুষের? তারা স‍ুখী হচ্ছে না? হচ্ছে বই কি? কিন্তু লটারীতে টাকা পাওয়া যেমন ভাগ্যের কথা, একটা চান্স, ভারতীয়ের পক্ষে য়ুরোপীয় মেয়ে বিয়ে করে ও সম্প‍ূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে রেখে সকলকে স‍ুখী করা ও নিজেদের স‍ুখী হওয়া তেমনি ভাগ্যের কথা। তেমনি এক চান্স! কারো দোষে নয়, কারো অন্যায়ে নয়; দেশ জাতি ধর্ম ও সামাজিক প্রথার চাপে ও প্রভাবে নির্দোষী অতি স‍ুখী ভিন্ন-জাতি দম্পতির মনে ভাঙন ধরে অনেক সময়েই। যেখানে ধরে না সেখানে ব‍ুঝতে হবে সেই দম্পতির মন দেশ, জাতি, ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে; তারা শ‍ুধ‍ু ভাগ্যবান নয়, তারা প‍ৃথিবীর সৎ দ‍ৃষ্টান্ত!

'আইফেল টাওয়ারের' চ‍ূড়ায় দাঁড়িয়ে এক ফরাসী শিল্পীর সঙ্গে এই আলোচনাই হচ্ছিলো। আমাকে ভারতীয় দেখে এগিয়ে এলেন আলাপ করতে, সে আলাপ কদিনের প্যারিস বাসের ফলে ঘনিষ্ঠ বন্ধ‍ুত্বে পরিণত হলো।

তাঁরই সঙ্গে গেলাম তাঁর স্ট‍ুডিও দেখতে বিশ্ববিখ্যাত মোমার্ত পল্লীতে। প্যারিসের উত্তরে ছোট একটি পাহাড়ী জায়গায় এই অপর‍ূপ সৌন্দর্যময়ী পল্লী। প্যারিসের বিখ্যাত নাইট ক্লাব। সেরা ফরাসী স‍ুন্দরীদের কোলাহল ম‍ুখরিত পরিবেশ, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক, গায়কদের লীলাভূমি, আলোর বন্যায় ও আনন্দের ঢেউএ উদ্বেলিত মোমার্তের প্রতিটি রাস্তাঘাট, দোকান, কাফে, স্ট‍ুডিও বাগান। বিদেশীদের চোখ ধাঁধাঁতে ও মন মাতাতে যত রকম ব্যবস্থা প‍ৃথিবীতে সম্ভব—সব এই মোমার্তে মজ‍ুদ। প‍ৃথিবীর সেরা আকর্ষণ প্যারিস—প্যারিসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মোমার্ত।

মোমার্তে এসে মনে হয় দ‍ুটি চোখই যথেষ্ট নয়, আরো কয়েক জোড়া চোখ থাকলে ভাল হত। নয়নাভিরাম এত কিছ‍ু আছে এখানে দেখার। প‍ৃথিবীতে সৌন্দর্য যে কত রকমের হতে পারে, কত কুৎসিত আর অশ্লীলকে যে কত বড়ো সৌন্দর্যময় করে তোলা যেতে পারে, তার পরিচয় মোমার্তের আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে। পথ দিয়ে চলতে চলতে কানে আসে পাশের কাফেতে কফি ও স‍ুরাপায়ীদের সমস্বরে গান,

রমাঁ রলাঁ ও মাদাম রলাঁ

'আলুয়েৎ'। রাস্তার ওপর অপরূপ চিত্র-সম্ভারের প্রদর্শনী, ওদিকে আর একটু এগোতেই শুনি ঐক্যতানে সুরের মায়া-জাল সৃষ্টি করেছে বাদ্যযন্ত্রীরা আর পায়ের দাপাদাপিতে চলেছে প্রসিদ্ধ ফরাসী 'ফ্যান ফ্যান' নাচ। 'বল ট্যাবারিনে'র পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি দলে দলে সুবেশ নরনারী সহাস্যে ঢুকছে নাচগানের আসরে। এইমাত্র আমার পাশ দিয়ে দুটি তরুণ-তরুণী কোমর ধরাধরি করে নেচে নেচে উড়ে উড়ে চলে গেলো! দেখছি শুনছি আর ভাবছি জীবনকে এরা জানে উপভোগ করতে, হাসিখুশি আনন্দে উচ্ছলতায় ভরে দিতে। যতটা পারো নাও, যতটা পারো দাও—কালকের কথা কাল ভেবো। দেখে দেখে ভাবি, দুঃখ দুর্দশা অভাব কি এদের নেই? কোনো সমস্যাই কি এদের জীবনকে সংকটময় করে তোলে না? দুঃখ দুর্দশা দারিদ্র্য সমস্যা সবই আছে, কিন্তু তাতে কি! তাই বলে কি পড়ে থাকবো তাই নিয়ে? স্বাদ নেবো না আনন্দের? নাচে-গানে, ছবি আঁকায়, মূর্তি গড়ায়, শখ ও শৌখিনতায়, ম্যুজিয়ম ও বাগান করায়, 'সেন' নদীর পাড়ে জ্যোৎস্নালোকিত রাতে প্রেমের তপস্যায় ফরাসীরা পেয়েছে অফুরন্ত আনন্দের আর শক্তির উৎস সন্ধান। পুঁথি-গত সংস্কৃতি বিদ্যা তাদের নয়। জীবন দর্শনের মোটা মোটা বইয়ের র‍্যাকে থাকে সে-সব, ছাত্র ও গবেষকদের জন্যে, সাধারণ মানুষের শিল্পী মনে তার স্পর্শ নেই।

এভিন্যু ফ্লেবারের ওপর প্রকাণ্ড বাড়িতে ইউনেস্কোর সদর কার্যালয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক প্রতি-ষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত স্থান প্যারিস। সারা য়ুরোপের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তার।

ইউনেস্কোর একজন মস্ত অফিসার মিঃ নির্মল চৌধুরী। বাঙালী, বহুকাল এদেশে আছেন। এভিন্যু ফ্লেবারের ওপরই আর একটু এগিয়ে ভারতীয় দূতাবাস। সেখানে যেতে গিয়ে আলাপ হলো মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে। সেই আলাপ পরে বন্ধুত্বে পরিণত হল।

নিয়ে গেলেন ইউনেস্কোর অফিসে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম কিছু কিছু। প্যারিসে যেমন অসংখ্য দর্শনীয় বস্তু, এই প্রকাণ্ড বাড়িটিতেও তেমনি কম দেখার জিনিস নেই! পৃথিবীময় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচার, আদান-প্রদান, গবেষণা ও আলোচনার কত রকমের ব্যবস্থা এদের। পৃথিবীতে যে কত কিছু জানার আছে এবং আমরা যে কত কম জানি ইউনেস্কোর এই অফিসে বসে তার বহু-মুখী কর্মধারা লক্ষ্য করতে করতে সেই কথাই ভাবছিলাম।

College Des Quatre Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কার্ডিনাল ম্যাজ-রিনের অর্থে, এখানেই নেপোলিয়নের সময় হতে রয়েছে Institute of France. 'সেন' নদীর ধারে এর প্রকাণ্ড বাড়ি। এখানে ফরাসী দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীলদের আস্তানা। পাঁচটি আকাদামি নিয়ে এই ইনস্টিটিউট।

ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে এলাম এক ফরাসী কবির সঙ্গে। তিনি আধুনিক কবি; জাঁ পল সার্ত্রের ভক্ত ও তাঁর Existentialism নামে মতবাদে বিশ্বাসী। সার্ত্র্ এখন সমগ্র য়ুরোপের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বহু অনুরাগী তাঁর।

তাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল ফরাসী সাহিত্য নিয়ে। প্রাচীন ও বর্তমান। ফরাসী ঔপন্যাসিকরা ভারতবাসীর কাছে বিশেষ পরিচিত, বিশেষ প্রিয়। ফ্লবেয়ার, ভিক্টর হুগো, ফ্রাঁস, বালজাক ত আমাদের প্রিয় লেখক। বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন কবি পল এলুয়া, কবি আরাগ'র নাম, আঁদ্রে জিদ্ও অপরিচিত নন।

বন্ধুটি স্বীকার করলেন, ভারতীয় সাহিত্য তাঁর পড়া নেই একমাত্র টেগোর ছাড়া। প্রাচীনদের মধ্যে তিনি জানেন কালিদাসকে। য়ুরোপে যেখানেই গেছি দেখেছি ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে খবর রাখে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই। সাধারণ লোকের কথা থাক, যারা সাহিত্য অনুরাগী বা সাহিত্যসেবী তারাও রাখে না তেমন খবর। অবশ্য এই খবর না রাখার পিছনে আছে অনেক কারণ। তার প্রথম ও প্রধান কারণ ভারতবর্ষ ছিল এতকাল পরাধীন। তার নিজের কথা বিদেশে বলবার তেমন সুবিধা ছিল না, অধিকার ছিল না আত্ম-

প্রচারের। উপযুক্ত অনুবাদের অভাবও কম নয়। 'টেগোর' ছাড়া য়ুরোপীয়রা আর কোনো কবি সাহিত্যিককেই বড় বেশী জানে না। মুলুক রাজ আনন্দ অবশ্য কিছুটা পরিচিত হয়েছেন কোনো কোনো মহলে।

মনীষী রোমা রলাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে দেশে থাকতেই পত্রালাপ ছিল। ইংলণ্ডে গিয়ে সে যোগাযোগটা বেড়ে ছিল। প্যারিসে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিশেষ নিমন্ত্রণ ছিল।

বুলভা জোপারনাসের ওপর একটি বাড়ির গায়ে ঝুলছে সাইনবোর্ড, 'Association des Amis de Romain Rolland.' মাদাম রলাঁ থাকেন এই বাড়িরই একটি ফ্ল্যাটে।

ঘণ্টা বাজাতেই দরজা খুললেন এক ভদ্রমহিলা। বয়স বেশী নয়, পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, 'মিঃ সেন?'

আমি ঘাড় নাড়তেই বললেন, 'আসুন ভেতরে।'

ভেতরে ঢুকলাম, তিনি বসতে বলে বললেন, 'মাদাম এখুনি আসছেন।'

তারপর বললেন, 'কি রকম লাগছে প্যারিস?'

হেসে বললাম, 'বলা মুশকিল।'

মাদাম রলাঁ এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি; ওপারেই হবে হয়ত। কিন্তু শরীর এখনো বেশ শক্ত। মুখে শান্ত স্নিগ্ধ শ্রী। শ্রদ্ধাভরে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন আন্তরিকতার সঙ্গে।

প্রথম ভদ্রমহিলার সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। জাতিতে জার্মান, বিয়ে করেছেন একজন অ্যামেরিকানকে। অ্যামেরিকার এক বিখ্যাত পত্রিকার লেখিকা তিনি। এ দেশে বেড়াতে এসে মাদামের সঙ্গে কাটিয়ে যাচ্ছেন কদিন।

তারপরই মাদাম রলাঁ হেসে বললেন, ডাঃ কালিদাস নাগের বন্ধু তুমি। আমি ভেবেছিলাম তাঁর বয়সীই হবে।'

আমি কিছু না বলে হাসলাম।

জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ নাগের কথা। তিনি কেমন আছেন, আবার এদেশে আসবেন কি না। তাঁর কাছে শুনলাম রলাঁর কাছে ডাঃ নাগ আসতেন, সাহায্য করতেন রলাঁকে তাঁর লেখার ব্যাপারে। ডাঃ নাগ আর বিনয় সরকার ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে। বিনয় সরকার মারা গেলেন। ডাঃ নাগ আসেন না কেন এদেশে আবার?

দেয়ালের গায়ে পরপর আলমারি সাজান। প্রত্যেকটিই বই-এ ঠাসা। রলাঁর হাতের স্পর্শ এর প্রত্যেকটি বইয়ে লেগে আছে। রলাঁ ছিলেন ভারতপ্রেমিক। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর জীবনী লিখেছেন তিনি। ভারতীয়

সংস্কৃতি ও দর্শনের তিনি ছিলেন ভক্ত। য়ুরোপে ভারতবর্ষকে যে কজন মনীষী বড় করে গেছেন, রোমাঁ রলাঁ তাঁদের মধ্যে একজন।

টেবিলের ওপরে একটি স্ট্যাণ্ডে তাঁর ফটো। কি জ্বলন্ত দৃষ্টি! এই দৃষ্টিতে সত্যের তেজ যেন ফুটে বেরোচ্ছে! কিন্তু তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টির আড়ালে ছিল স্নিগ্ধ কোমল মন। মানুষের দুঃখে তিনি কাঁদতেন। পৃথিবী-ব্যাপী মারামারি হানাহানি হিংসা আর অন্যায়ের যুদ্ধে তিনি শোনাতে চাইতেন শান্তির বাণী। তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ধর্ম-বিশ্বাসকে মানুষের মনের হীনতা, কদর্যতা ও হিংসা দ্বেষ যেন মুছে দেবার কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্যে তিনি মানুষের জয়গান গেয়ে গেছেন। একাধারে ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও মানবপ্রেমিক ছিলেন রলাঁ। তাই হাজার হাজার মাইল দূরে তাঁরই মতো দুটি অসাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে বাস্তবরূপে যা করে চলেছিলেন, রলাঁর ছিল তাই আবাল্য স্বপ্ন। সেই-জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাকে তাঁর অতি নিকট আত্মীয় বলে মনে হয়েছিল।

সেদিন অনেক আলোচনা হল রলাঁ-সঙ্গিনীর সঙ্গে।

মাদাম বললেন, 'রলাঁর কাজ আজো শেষ হয়নি। আজো প্রয়োজন আছে রলাঁর বাণী প্রচার করবার। আমি চেষ্টা করছি তাঁর আদর্শ অক্ষুন্ন রাখতে। তাই স্থাপিত হয়েছে Association Des Amis de Romain Rolland. 'রোমাঁ রলাঁর বন্ধুদের সমিতি।' পৃথিবীর সর্বত্রই আছেন রলাঁর বন্ধুরা—যাঁরা রলাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর আদর্শ ও মানবপ্রেমকে শ্রদ্ধা করতেন। বড় বড় সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী—সবাই আছেন এতে। সাধারণ মানুষও আছে। তাদের জন্যেই ত রলাঁর জীবন। দেশ-বিদেশে এর শাখা আছে। (ভারতবর্ষে লেখক ডাঃ কালিদাস নাগের পৃষ্ঠ-পোষকতায় একটি সমিতি স্থাপন করে-ছিলেন কয়েক বছর আগে) এ'দের কাজ সর্বত্র রলাঁর আদর্শ প্রচার করা ও মানুষের কল্যাণ করা। সেই সঙ্গে সাহিত্যের ও সংস্কৃতির অনুশীলনও আছে।'

দেরাজ থেকে টেনে রলাঁর কয়েকটি ফটো উপহার দিলেন তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। তারপর বললেন, 'চল তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। খুশী হবে দেখে।'

নিয়ে এলেন পাশের ঘরে। সে ঘরেও দেয়ালের গায়ে সিলিং অবধি শেলফ—বই ও ফাইলে ভর্তি। একটি সিঁড়ি নিয়ে এসে নিজেই উঠে গেলেন ওপরে। তারপর একটি একটি করে চারটি মোটা মোটা ফাইল আমার হাতে দিয়ে নেমে এলেন।

খুলে দেখি সেগুলির একটি রবীন্দ্র-নাথের নিজের হাতের লেখা চিঠিপত্র। ফাইলগুলিতে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির স্বহস্ত লিখিত পত্রাবলী! সবগুলিই রলাঁকে লেখা।

পরম শ্রদ্ধায় ও অধীর আগ্রহে পড়ে চলেছি একটির পর একটি। আমার দেশের মনীষীদের ছোঁয়ায় রোমাঞ্চ জাগছে শরীরে।

কতক্ষণ ধরে যে পড়ে গেছি জানি না, হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলে দেখি আমার সামনে এক চেয়ারে মাদাম বসে আছেন নীরবে আর তাকিয়ে আছেন আমার দিকে সহাস্যমুখে। অপর ভদ্র-মহিলাটিও নীরবে কাপে কফি ঢালছেন, তাঁর মুখও হাসিতে ভরা।

ফরাসী মঞ্চ ও পর্দা

সাহিত্য ও চিত্রকলার মতো ফরাসী দেশের মঞ্চ ও পর্দা বিষয়ে সম্যক্ পরিচয় লাভ করার সুযোগ এদেশের মোটেই হয়নি। বই ও ছবি এদেশে নিয়মিতভাবেই আসে এবং না এলে তা আনিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ও দেশের মঞ্চ ও পর্দার কোন সৃষ্টিকে সেইভাবে আনিয়ে দেখার উপায় নেই। চলচ্চিত্র যা-ও বা বছরে দু' একখানি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশে বসে ফরাসী নাট্যাভিনয় দেখার কথা ভাবাই যায় না। এখানকার ফরাসী অধিবাসী-দের উদ্যোগে কখনো কখনো শৌখিন নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত অবশ্য হয়, কিন্তু তা থেকে ঠিকভাবে মান নির্ণয় করা যায় না। অথচ একথা আজ পৃথিবীর সর্বত্রই অবিসম্বাদী সত্যরূপেই পরিগণিত যে, কি মঞ্চ আর কি পর্দার ক্ষেত্রে, কারুকলার দিক থেকেই হোক আর যান্ত্রিক কুশলতার দিক থেকেই হোক স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও মৌলিকত্বের পরিচয় দানে ফরাসীদের সমতুল্য কৃতি আর নেই। ইওরোপ ও আমেরিকার মঞ্চ ও পর্দার ক্ষেত্রে নতুন ভাব ও ভঙ্গীর প্রবর্তনে ফরাসীরাই অনুকরণীয় হয়ে আসছে গত কয়েকশত বৎসর ধরেই। ইওরোপ ও আমেরিকায় এই ধারণাই বদ্ধমূল যে, শিল্পক্ষেত্রে অভিনবত্ব আনয়নে ফরাসীরাই হচ্ছে অগ্রগামী। সব সময়েই একটা প্রাণচঞ্চল সৃজনস্পৃহা ওদের শিল্পক্ষেত্র ছেয়ে রয়েছে।

অত্যন্ত আমোদপ্রিয় জাতি, তাই সর্বসাধারণ্যে আমোদ পরিবেশনের যে সম্ভার বৈচিত্র্য এদেশে দেখা যায় তা আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। নাচগান সর্বত্র ছেয়ে রয়েছে সেইটেই বড়ো কথা নয়, সকল ক্ষেত্রেই সতত অভিনবত্ব রক্ষা করার চেষ্টাই উপলব্ধি করা যায়। সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রের নব নব ভাব-ধারায় ওখানকার প্রমোদ উপাদানগুলি সততই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রের মহারথিবৃন্দের অনেকেরই প্রতিভা প্রমোদ মাধ্যমগুলির রূপায়নের পিছনে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। তাই প্রমোদ উপাদানগুলি এতো মৌলিকত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে, এতো শিল্পসাহিত্য সম্পৃক্ত বলে অনবরতই একটা না একটা আলোড়ন জাগিযে তোলে। তা ওখানকার ব্যালে ক্যাবারের ক্ষেত্রেও যেমন তেমনি ওদের মঞ্চ ও পর্দার ক্ষেত্রেও।

ফরাসী নাট্যাভিনয়

ফরাসী মঞ্চের সৃষ্টি দু' রকমের। এক, নাট্যাভিনয় আর অপরটি অপেরা বা গীতাভিনয়। মধ্যযুগের তুঙ্গী অবস্থায় ফরাসী নাট্যাভিনয়ের জন্ম। প্রথম আমলে একমাত্র ধর্মীয় বিষয় নিয়েই অভিনয় হতো এবং গোড়াকার অভিনেতা ছিলেন ধর্মযাজকেরা। বাইবেল থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে লাটিন ভাষায় অভিনয় করতেন তাঁরা। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে মৌলিক ও জনপ্রিয় নাটকেরই অভিনয় চলতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারীতে প্রথম নাট্যালয় স্থাপিত হয়। এই নাট্যালয়টিকে এক কমেডি অভিনেতা দলের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়। অনতিকাল মধ্যেই এই দলটি "দরবারি দল" আখ্যা গ্রহণ করে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে এক ইতালীয় সম্প্রদায় প্যারীতে আস্তানা পত্তন করে। সে সময়ে স্যাঁ জার্মেঁ ও

ভারত চিত্রমের কালোবো চিত্রে বিকাশ রায় ও তপতী ঘোষ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শিল্পী সঙ্ঘ। সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী। ভবতারিণী পিকচার্স-এর পরিবেশনায় আপনাদের প্রিয় চিত্রগৃহে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে।

ল্যাঁ লোয়াঁ-য়ের মেলাতে নৃত্যগীত অভিনয়ের প্রচুর ব্যবস্থা রাখা হতো।

১৬৩০ সাল নাগাদ যে সময়ে কর্নেঈ আবির্ভূত হন সে সময়ে বেশ একটা ভালো দল ওতেল দ্য বুরগঞ্চ অধিকার করে।

চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে কর্নেঈ ও রাসিনের আমলেই মঞ্চে লিরিক ও এপিক কাব্য চরম প্রকাশলাভ করে। ১৬৩৬ সালে কর্নেঈ 'লা সিদ'-য়ের ক্ল্যাসিক রূপটিকে ট্রাজেডিতে রূপান্তরিত করেন। তার নাট্যাবলীতে তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি আমদানী করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী জাঁ রাসিন তাঁর ট্রাজেডীর উপাদানে কর্তব্যের চেয়ে প্রেমকে বড়ো করে তোলেন।

এই একই কালে মলিয়েরের প্রতিভাবলে কমেডিও একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহে সক্ষম হয়। অত্যন্ত স্থূলভাবে গ্রথিত নাটক নিয়ে তিনি আরম্ভ করে ক্রমে কমেডির আবরণে জীবনের মূল নীতি ও চরিত্র নিয়ে মৌলিক নাটক রচনায় সফল হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর "দার্শনিকরা" মঞ্চকে শিক্ষা প্রসারের বাহনরূপেই বেশী নিয়োজিত রাখেন; সেই সঙ্গে জীবন-নীতির যথার্থ প্রতিফলন সম্ভাব্যতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন।

এছাড়া, চরিত্র বিষয়ক কমেডি বা হাল্কাভাবে চরিত্রের বিশ্লেষণবাদে নীতি সম্পর্কেও বহু কমেডি পরিবেশিত হয়। "প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী" নাটকখানিতে লা সাজই প্রথম এক চাকরকে প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখান। আর একখানি নাটকে তিনি মহাজনদের আক্রমণ করেছেন। "এদিপ" নাটকে ভলতেয়ার ধর্মযাজকদের আক্রমণ করেন।

১৭৬১ সালে দিদের বুর্জোয়া নাটক "বংশের জনক" দ্বারা দর্শকদের কান্নায় ভাসিয়ে দেন। বোমার্শে তাঁর "সেভিলের ক্ষৌরকার" প্রভৃতি কমেডির সাহায্যে মঞ্চের পূর্ণ ক্ষমতা বিকশিত করে তোলেন। ১৭৯০ সালে জাতীয় পরিষদ নাট্যালয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৮১২ সালে নেপোলিয় তৎকালে শ্রেষ্ঠ কমেডিশিল্পী টালমাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁর মস্কো ঘোষণা দ্বারা কমেডি-ফ্রাঁসেকে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বলে প্রতিষ্ঠা দান করেন।

১৮৩০ সালে রোমাণ্টিক নাটকের প্রচলন হয়। এজাতীয় নাটকের মধ্যে একটা উদ্দীপনা, একটা আন্তরিকতা উৎসারিত হয়ে ওঠে এবং ভিক্টর হুগো ও আলফ্রেদ দ্য ভিঞ্জির নাটকের মধ্যে এমন একটা কাব্যিক মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে

যা মঞ্চের জীবনে যৌবনের সাড়া জাগিয়ে তোলে। আলফ্রেদ দ্য মীসের যে সব নাটক তৎকালে কোমল ভাষায় কুমারীর প্রণয়-বেদনা প্রকাশের জন্য জনপ্রিয় ছিল আজও তার বৃহৎ দর্শকমণ্ডলী রয়েছে।

১৮৮৭ সালে আঁতোয়ানের তেয়াত্র্ লিবর্ বা "স্বাধীন নাট্যালয়" চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আঁতোয়ান অভিনয় ও মঞ্চসজ্জায় স্বাভাবিকতা আনার চেষ্টা করেন। জর্জ কুর্তলীন প্রমুখ কমেডি লেখকদের তিনি সাধারণ্যে পরিচিত করিয়ে দেন। তাছাড়া, টলস্টয় ও ইবসেন প্রভৃতির নাটক পরিবেশন করে তিনি বিদেশী নাটকের প্রতি ফরাসীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। এই "স্বাধীন নাট্যালয়ের" প্রতিক্রিয়াতেই হোক বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হোক, একদল অতি প্রতিভাবান শিল্পীর অভ্যুদয় ঘটে; পোল ফর, লীঞে পোয়ে, জাক কপো প্রভৃতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফরাসী নাট্যালয়কে আবার প্রাণস্ফূর্ত দেখা যায়। তখন ভিয়ে কলম্বিয়েতে জাকের দৃষ্টি সাহিত্য সম্পদে নাটককে সম্পৃক্ত করার দিকে। মতপার্নাসে গাস্ত বাতী তখন মঞ্চ পরিচালককে সামনে এনে মঞ্চ-সজ্জাকেই প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী। ম'তমার্তয়ে শার্ল ডীলে্য প্রাচীন রচনা বা স্পেনীয় নাট্যালয়ের প্রেরণায় নাটক পরিবেশন করে দীর্ঘ সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। কমেদি দে শাঁ-জেলিজে ও পরে আথেনেতে পরিচালক-অভিনেতা মঞ্চাধ্যক্ষ লুই জুভে তাঁর সতীর্থ জাঁ জিরোদুকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত করায় রত হন।

গত শতাব্দীতে সাহিত্য ও নাট্যালয় ছিল সম্পূর্ণ পৃথক দুই সত্তা; কিন্তু এখন হয়েছে তার উল্টো। এখন সাহিত্য ও নাট্যালয়ের মধ্যে স্পষ্ট কোন পার্থক্য-রেখা টানা যায় না। শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমস্ত সাহিত্য-মনীষী—আঁদ্রে জিদ, পল ক্লদেল, কোলেৎ, জুল রোমাঁ, সারৎর, মতেরল'—প্রত্যেকেই তাঁরা নাট্যালয়ের জন্য লিখেছেন। জিরোদুর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলতে তাঁর নাটকাবলীকেই বোঝায়। কক্তো, ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর মধ্যে তাঁদের নাটকগুলিও স্থান পায়। সার্তেরের মতো আলবের কামী প্রতিভার সঙ্গে মঞ্চে তাঁর ভাবধারাকে সঞ্জীবিত করেছেন। জাঁল সুপারভীল, অদিবেরতি প্রভৃতি মঞ্চে সংযত রিয়ালিজম প্রবিষ্ট করিয়েছেন। এখনকার দুজন বলিষ্ঠতম নাট্যরচয়িতা হচ্ছেন জাঁ আনুই এবং আর্মা সালাক্রু।

যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে নাট্যালয়ের অবস্থাও এখন অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু দেশের মতোই ফ্রান্সের নাট্যালয়েও নানা-রকম সমস্যা ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এখন আর কোন প্রযোজক তাঁর নিজের ভালো লেগেছে বলেই কোন নাটক মঞ্চস্থ করে খেয়াল চরিতার্থ করতে পারেন না; কেউ নাটক লিখলে লেখার গুণাগুণ বিচারের ওপরে সেটি মঞ্চস্থ হবার দিনও চলে গিয়েছে।

বহু নতুন উদ্যোক্তার আবির্ভাব হচ্ছে আজকাল। প্রযোজকরা প্রথমে নতুন

মারিঞী তেয়াৎরে মঞ্চস্থ পল ক্লদেলের "দি এক্সচেঞ্জ" নাটকের একটি দৃশ্য

নাটক প্যারীতে মঞ্চস্থ করার আগে মফস্বল শহরে পরিবেশন করে যাচাই করে নিচ্ছেন। প্রতিভাবান নতুন নাট্যকার ও অভিনেতা জুটলে নতুন দলও তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া, গভর্নমেণ্টও ছোট ছোট দলগুলিকে উৎসাহ দিচ্ছে, আর্থিক সাহায্যও দান করছে এবং ছোট দলদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতারও প্রবর্তন করছে। এই সঙ্গে গভর্নমেণ্ট মফস্বল শহরে নাট্যশিল্পচর্চার আঞ্চলিক কেন্দ্রও স্থাপন করেছে যার ফলে সর্বস্ব প্যারীতে হুমড়ি খেয়ে পড়া রুদ্ধ হতে পেরেছে: ছোট দলগুলি এক একটা অঞ্চল ধরে পরিভ্রমণ করে।

প্রতি বছরই আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ প্যারীতে এসে তাদের নবতম নাটক মঞ্চস্থ করে যায়। এই যোগাযোগের একটা মূল্য আছে। আঞ্চলিক কেন্দ্র-সমূহে নাট্যসম্প্রদায় ও দর্শকবৃন্দের মধ্যে একটা নিবিড় সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে।

শৌখিন দলগুলির মধ্যেও উৎসাহ বড়ো কম দেখা যায় না। যুদ্ধের দরুণ তারা পেছিয়ে পড়েছিল তবে আবার এখন পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গিয়েছে তারা। একটা হিসেব থেকে দেখা যায় যে, শৌখিন দলগুলি কর্তৃক বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নাট্যাভিনয় হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে পেশাদার মঞ্চের অবস্থা ঘোরতর। তবে একদল লোক নাট্যালয়ের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ-ভাবে সচেষ্ট আছেন। গভর্নমেণ্টও সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য আর্থিক সাহায্য করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সাহায্যই যে যথেষ্ট তা হয়তো নয়, তবে নাট্যাভিনয়কে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টাটাই হচ্ছে প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

ওদেশে বর্তমানে আধ্যাত্মিক বিষয়-বস্তু সম্বলিত নাটকের প্রচলন বেড়েছে। তারই পাশে আবার জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে সারৎরের নাস্তিকতাবাদ সম্পর্কিত নাটক। আজকের মতো ফ্রান্সে আর কখনও খৃশ্চানরা নাস্তিকদের সম্পর্কে ভাবিত হয়নি, এবং নাস্তিক-দেরও ভগবান সম্পর্কে এতো উদ্বিগ্ন দেখা যায়নি। আজকের নাট্য আন্দো-লনের এইটেই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাধারণ দর্শক আজ দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বলিত দেশী ও বিদেশী নাটকের সমাদর দ্বারা এই প্রমাণই দিচ্ছে যে, তারা আধ্যাত্মিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন নয়।

অপেরা

প্রথম সঙ্গীত একাডেমির প্রতিষ্ঠা হয় ১৬৭১ সালে এবং প্রথম গীতাভিনয় পরিবেশিত হয় Pomone যার সঙ্গীতাংশ রচনা করেন Pierre Perrin ও Cam.

bert। গীতিনাট্যখানি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে একাদিক্রমে আট মাস ধরে মঞ্চস্থ হয়। তবে অর্থের দিকে সাফল্য আসেনি।

এই সময়েই দরবারের ওস্তাদ জাঁ ব্যাপিতিস্ত লীলি সংগীত-নৃত্য-একাডেমি নাম দিয়ে দ্বিতীয় সরকারী একাডেমির প্রতিষ্ঠা করেন। অপেরা পরিবেশন ছাড়া এই একাডেমিতে নৃত্য গীত শিক্ষা-ব্যবস্থাও রাখা হয়। মোলিয়েরের মৃত্যুর পর লীলি রোয়াল তিয়েৎরটির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। নাট্যালয়টিকে অভিনেতারা পরিত্যাগ করায় পড়ে ছিল। ১৬৭৩ থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত নব্বুই বছর অপেরাটি চালু ছিল তারপর ওটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। ১৬৮৭ সালে মৃত্যু পর্যন্ত লীলি এখানকার পরিচালক ছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে কুড়িটি গীতিনাট্য উপহারের মধ্যে দিয়ে ফরাসী অপেরার বিশেষ রূপ ও প্রকৃতিটা নির্ধারণ করে দিয়ে যান।

প্রথম দিকে কোন মহিলা শিল্পী গ্রহণ করা হতো না। প্রাচীন গ্রীকদের অনুকরণে পুরুষদের মুখোশ পরিয়ে নামানো হতো। ১৬৮২ সালের প্রথম মহিলা শিল্পী ম্যাদমোয়াজেল লা ফ'তেন অবতরণ করেন। ১৭৭০ সালের আগে পর্যন্ত অপেরাতে স্বতন্ত্র নৃত্যরচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না। তারও বহু পরে, ১৮৬১ সালে ব্যালের বিজ্ঞাপন প্রকাশ প্রথম প্রচলিত হয়। ১৭৩৩ সালে গানকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে অপেরার আকৃতি রচনায় রামোঁ কর্তৃক একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত না হওয়া পর্যন্ত লীলিরই প্রভাব চলতে থাকে। রামোঁর জীবিতকালে কিন্তু এই পরিবর্তনটি বিশেষ খাতির পায়নি। সমালোচকরা "বড়ো বেশী গান, বড়ো উৎকট গান" বলে রব তোলেন। কিন্তু দেবুসির মতে রামোঁই আধুনিক কাব্য-সংগীতের অগ্রদূত।

১৭৭৩ সালে ইতালীয় প্রভাবের বিরোধী জার্মান ভাবধারার প্রেরণায় গ্লাক সংগীতকেই অপেরার মুখ্য অংশরূপে পরিবেশন করে অপেরায় দ্বিতীয় যুগান্তর নিয়ে আসেন।

পালে রোয়াইয়াল পুড়ে যাবার পর কিছুকালের জন্য তুইলেরিজে অপেরা স্থানান্তরিত হয় এবং ১৭৭০ সালে পুনর্নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হতে আবার পালে রোয়াইয়ালে ফিরে আসে। ১৭৮৪ সালে আবার আগুন লাগার ফলে অপেরা উঠে যায়। জুন মাসে আগুন লাগে এবং ঐ বছরই অক্টোবরের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে পোর্ত-সাঁত-সার্তি নাট্যালয় তৈরী করে সেখানে অপেরাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে আসন সংখ্যা ছিল দু' হাজার দর্শকের জন্য কিন্তু উদ্বোধন দিনে আসন বসানো হয়ে না ওঠায় দশ হাজার দর্শক একত্রে দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ পায়। এই নতুন প্রমোদ-মাধ্যমটির প্রতি জনসাধারণের বিপুল আগ্রহের এইটেই প্রমাণ।

এর পর আসে বিপ্লবের যুগ। জন-নিরাপত্তা বিভাগের আদেশে রাষ্ট্রীয় রঙ্গশালায়ে

অপেরা কমিকে মঞ্চস্থ চাইকাউস্কির একটি গীতিনাট্যের দৃশ্য

সড়কে নির্মিত নতুন নাট্যালয়ে অপেরাকে তিয়েৎস দ্যে আর্ট নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরিস্তোক্রাতদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরী পালার জায়গায় দেখা দিল "বাস্তিল বিজয়", "গণতন্ত্রের জয়যাত্রা" প্রভৃতি গীতিনাট্য। কেউ এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করতো না, বিশেষত গণতন্ত্রের আমলে অপেরাকে কড়া শাসনে রাখা হয়েছিল। তখন কোন গায়িয়ের গলা ধরে যাওয়ার দরুণ সে যদি অভিনয়ে নামতে না পারে তাহলে তার জেল হতো। এ অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার ফাঁসি।

১৮২২ সালে লা পেলতিয়ে অপেরাতে পরিবেশিত "আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ"-এর ক্ষেত্রেই প্রথম গ্যাসের আলো ব্যবহারের প্রচলন হয়। এই থিয়েটারেই শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্যসমূহ যার আজও সমাদর তার অনেকগুলিই পরিবেশিত হয়। এ ন্যাট্যালয়টিও ১৮৭৩ সালে আগুনে ভস্মীভূত হয়। মাস কতক তিয়েৎর ইতালিয়'তে থাকবার পর সঙ্গীত একাডেমি বর্তমানের এই পালে গার্নিয়ে স্থানান্তরিত হয়। দুর্ঘটনার প্রতিরোধকল্পে কর্তৃপক্ষ বৈদ্যুতিক আলো বসাতে স্বীকৃত হন। মঞ্চে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রথমে বসে ১৮৮৭ সালে। তারপর থেকেই আলোর কি মনোরম খেলাই না দেখানো হয়ে আসছে!

পালে গার্নিয়ে অপেরা নতুনভাবে উন্নতি করে। নতুন নতুন পালা মঞ্চস্থ করার সঙ্গে অনেকটা সঙ্গীত বিষয়ে মিউজিয়ামের ভূমিকাও গ্রহণ করে। লীলির অনুগতরা সাফল্যের সঙ্গে অপেরাটি চালিয়ে নিয়ে যান। সব সময়ে তখন মার্জিত ও সুদৃশ্য পরিবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতাদের পালা মঞ্চস্থ করা হয়। শুধু তাই নয়, বিদেশেরও শ্রেষ্ঠ গুণীদের রচনাবলীও ফরাসীদের সামনে তুলে ধরাতেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরাতন শ্রেষ্ঠ গীতাভিনয়গুলি পুনরুজ্জীবিত দেখা যায় ১৯৫০ সালে। এর উদ্যোক্তা তিয়েৎর লিরিক নেশিয়নের তত্ত্বাবধায়ক মরিস লেমান। লেমান সপ্তদশ শতাব্দীর রচনাগুলিতে অতি-আধুনিক টেকনিক প্রয়োগ করেন। অপেরা পরিবেশনে ফ্রান্সের অনবদ্য পরিকল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় আজ। ব্যক্তিগতভাবে গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরী বাজনার দল, অতুলনীয় নৃত্যশিল্পীদের সমন্বয়ে ব্যালে দল এবং ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ গায়কদের দল, এই সবের সমন্বয়ে অপেরা এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ওদেশের শ্রেষ্ঠ মঞ্চসৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

চলচ্চিত্র

ফ্রান্সের নাট্যাভিনয় বা গীতাভিনয় ওদেশে গিয়ে দেখে না এলে তার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। পাশ্চাত্য দেশ-গুলি তবু নাটক বা স্বরলিপি দেখে দেখে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ গুণীদের সুকীর্তি-গুলিকে নিজেদের দেশে মঞ্চস্থ করলেও করতে পারে। কিন্তু প্রাচ্যের কাছে সে আকর্ষণ থাকবার কথা নয়। তবে চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। পৃথিবীর যে কোন দেশেই চলচ্চিত্র বর্তমান, ফ্রান্সের স্পর্শ সেখানেই গিয়ে পেঁাচেছে। কারণ চলচ্চিত্রের উদ্ভব থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার প্রতিটি ধাপেই রয়েছে ফরাসী কুশলীদের কৃতিত্বের হাত।

১৮২০ থেকে ১৮৩০ সাল মধ্যে নিসেফোর নিপয়ে ও ম'দে দাগুয়েরের অনুশীলনের ফলে আলোকচিত্র গ্রহণ কৌশলটির উদ্ভব হয়। ১৮৭০ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক জুলে মারের আবিষ্কারের ওপরে ভিত্তি করেই ইংরাজ কুশলী মায়রীজ ১৮৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একই দৃশ্যকে পর পর খন্ড খন্ডভাবে

'ফোয়ার স্যাঁ লোরাঁ' থিয়েটার (অষ্টাদশ শতাব্দী)

তোলার পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন।

১৮৮৭ সালে এমিল রেনড নামক এক প্রতিভাবান কুশলী যোশেফ প্লাটোর থিওরির ভিত্তিতে প্রাক্সিনোস্কোপ নামে একটি ছোট যন্ত্র নির্মাণ করেন এবং সেই যন্ত্রটিরই ক্রমোন্নতি সাধন করে তার "অপটিকাল থিয়েটার"-এর উদ্ভব করেন। তিন বছর এই যন্ত্রটির সাহায্যে তিনি প্রথম কার্টুন ছবি প্রদর্শনে সক্ষম হন।

আমেরিকায় এডিসনের গবেষণাগারে কাজ করতে করতে ম্যারে আজকালকার ছিদ্রযুক্ত ফিল্মের উদ্ভাবন করেন। এই ফিল্মই ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর লুই লমিয়ের তাঁর প্রথম চিত্রপ্রদর্শন যন্ত্রে ব্যবহার করে সাধারণ্যে দেখান। এইটেই ছিল সাধারণ্যে প্রথম এবং প্রবেশমূল্য দিয়েও প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

১৮৯৬ সালে জর্জ ম্যালিই চলচ্চিত্রে আর্টের প্রয়োগ নিয়ে আসেন। সর্বত্রই তাঁরই ছবির অনুকরণ হয়েছে এবং ১৯০০ সাল থেকে সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর ছবিগুলির প্রত্যেকটির শত শত কপি বিক্রী হতে থাকে।

১৯০০ সালে সীন নদীর তীরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-প্রদর্শনীতে জোলি ও ব্যাঁর এবং লি'ও গমোঁ ও তার ইঞ্জিনীয়ারদের চেষ্টায় প্রথম সবাক ছবি প্রদর্শিত হয়। শব্দ ও কথার জন্য ছবির তালে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো হয়। এ হলো এখনকার সবাক ছবি প্রবর্তিত হবার পঁচিশ বছর আগের কথা।

ম্যালির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শার্ল পাথে ১৯০২ সালে এক বিরাট চলচ্চিত্র শিল্পের পত্তন করেন। ১৯০৮ সালে পাথে ক্যামেরা তৈরীতে লেগে যান। তখন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এবং সর্বাধিক সংখ্যক স্টুডিও পাথের। নিজের কোম্পানীতে তোলা ছবি নিজেরই পরিবেশনে নিজস্ব চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হতে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁর ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে আমেরিকা যতো ছবি তৈরী করতো তার তিনগুণ বেশী ছবি দেখানো হতো পাথের তৈরী। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ব্যবসা ফ্রান্সের একচেটে ছিল এবং যে কোন দেশের ৮০।৯০ ভাগ

আর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি; বাতিল করেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ; শহরের রাস্তায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছুটিয়ে 'বাসের' মালিকদের শহর থেকে দূরে তাড়িয়েছেন, মাত্র ১৮ মাসে ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে তুলেছেন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গগনচুম্বী সৌধ—নতুন সেক্রেটারীয়েট ভবন; স্টেডিয়াম নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের সে আন্তরিকতা কোথায়? এবারও যে অবস্থার মধ্যে স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যেই বা আন্তরিকতা কতটুকু বুঝতে পারছি না।

লালকুঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর খাস কামরায় রাজ্যের গণ্যমান্যেরা সমাগত। আলোচনার বিষয়বস্তু—খেলার মাঠে দর্শকদের উৎপাত আর তা বন্ধের উপায় উদ্ভাবন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় স্বয়ং সভাপতির আসনে সমাসীন। পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত। এখানে সবাই উপস্থিত। কংগ্রেস প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষ, পুলিস কমিশনার, রাজ্য পুলিসের সর্বময় কর্তা, স্বরাষ্ট্র সচিব, সিটি আর্কিটেক্ট, আর খেলার মাঠের সব মাননীয়েরা। নানা বিষয়ের নানা আলোচনা। মাঠের গোলমাল নিরসনের জন্য স্টেডিয়ামের উপরই বেশি জোর। আলোচনা খাদে আরম্ভ হয়ে খাদেই শেষ হয়ে যায়, মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর টিপ্পনীতে রসাত্মক হয়ে ওঠে। যেমন রাজস্থান ক্লাব সম্পাদক যখন বললেন ঃ মাঠে গোলমাল কিছুই ছিল না, রাজস্থান ক্লাব মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করবার পরই গোলমাল আরম্ভ হল, তখন ডাঃ রায় বললেন, রাজস্থান ক্লাব যদি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল না করে তাহলেই তো গোলমালের কোন কারণই থাকে না। সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের যুগ্ম মাঠ অনেক গোলমালের কারণ বলে যখন দুটি ক্লাবের পৃথক মাঠের ব্যবস্থা করার কথা উঠলো তখন ডাঃ রায় বললেন, আলাদা মাঠ কেন, দুটি ক্লাব এক হয়ে যাক না কেন। আবার হাসি। আলোচনা শেষে আই এফ এর সভাপতি যখন ডাঃ রায়কে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের চ্যারিটি খেলায় মাঠে উপস্থিত থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন তখন মুখ্যমন্ত্রী এই উক্তি করে নিমন্ত্রণ এড়ালেন যে, "মাঠে যাব কি ইট পাটকেল খেতে"। এবার সবাই হেসে কুটোপাটি। তাই ভয় হয় হাসিঠাট্টার মধ্যে এবারের স্টেডিয়াম পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে না যায়!

* * *

স্থানাভাবের জন্য এ সপ্তাহের ফুটবল লীগ খেলার পর্যালোচনা করা সম্ভব হল না, শুধু প্রথম ডিভিশন লীগের ফলাফল ছাপা হ'ল ঃ—

৬ই জুলাই '৫৫

এরিয়ান (০) রেলওয়ে স্পোর্টস (০)

৭ই জুলাই '৫৫

মোহনবাগান (২) উয়াড়ী (০)
ইস্টবেঙ্গল (২) খিদিরপুর (০)
জর্জ টেলিগ্রাফ (০) অরোরা (০)

৮ই জুলাই

পুলিশ (১) রাজস্থান (০)
এরিয়ান (০) মহঃ স্পোর্টিং (০)
রেলওয়ে স্পোর্টস (১) স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)

৯ই জুলাই

বি এন আর (০) কালীঘাট (০)
খিদিরপুর (১) অরোরা (১)

১১ই জুলাই '৫৫

উয়াড়ী (১) ইস্টবেঙ্গল (১)
রাজস্থান (২) রেলওয়ে স্পোর্টস (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১) কালীঘাট (০)

১২ই জুলাই '৫৫

মোহনবাগান (১) খিদিরপুর (০)
মহঃ স্পোর্টিং (০) বি এন আর (০)

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩,
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
৩৮ সংখ্যা
দেশ
শনিবার
৬ শ্রাবণ, ১৩৬২
DESH
SATURDAY, 23rd JULY, 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বাস্থ্য বিধানে সমাজ চেতনা

চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের মুখপাত্র কর্নেল এম এল আহুজা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ১৯৪৯ সাল হইতে আজ পর্যন্ত চীনদেশে কলেরা কিংবা প্লেগে কেহই আক্রান্ত হয় নাই। মাত্র ৬ বৎসরের মধ্যে চীন কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইল ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু বিষয়টি আশ্চর্য হইলেও ইহা বাস্তব সত্য। জগতের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ চীন পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া সেখানকার অবস্থার সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা মিঃ এটলী চীন ঘুরিয়া আসিয়া কয়েক মাস আগে বলিয়াছিলেন যে, চীনের কোথায়ও তিনি মাছি দেখেন নাই। যাদুমন্ত্রের দ্বারা নিশ্চয়ই চীনে এই অসাধ্য সাধিত হয় নাই। ফলতঃ বৈজ্ঞানিক উপায়েই চীন ইহা করিয়াছে। ব্যাপকভাবে কলেরা টীকা দেওয়া, মাছির উপদ্রব নিবারণ করা, বহিরাগত রোগীকে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ কলের জল এবং সিদ্ধ জল সরবরাহ, এই সব ব্যবস্থার ফলে চীনের জনস্বাস্থ্যে এই অভাবনীয় সমুন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। এদেশেও এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব আরোপ না করিতেছেন, এমন নয়; কিন্তু চীনের অনুপাতে সেগুলির সাফল্য তেমন কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, চীনের গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের কাজে জনসাধারণের চেতনাকে যতখানি জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এদেশের সরকারের কাজে তেমন চেতনা জাগিতেছে না। জনগণের প্রাণশক্তি এদেশে এখনও সুপ্ত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেশক্তি কিছু কিছু জাগিলেও সে জাগরণের গতি অত্যন্তই মন্থর। এদেশের সরকারের গঠনমূলক নীতির প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে এই ত্রুটি অনেকখানি রহিয়াছে। দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী সমাজ বিশেষভাবে রাজনীতিক কর্মীদের এ সম্বন্ধে আজ গভীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস রচনার জন্য যে সম্পাদকমণ্ডলী নিযুক্ত করা হয়, আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাহাদের কাজের মেয়াদ বজায় থাকিবে, কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য এত উদ্যোগ এবং আড়ম্বরের সহিত সুযোগ্য সম্পাদকমণ্ডলীর দ্বারা যে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণই রহিয়া যাইবে। কারণ সম্পাদকমণ্ডলী আগামী ৬ মাসের মধ্যে তাঁহাদের কাজ নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। এইভাবে তাঁহাদের সংগৃহীত উপাদানসমূহও অকেজো হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের এমন সিদ্ধান্তের ফলে শুধু মূল্যবান মস্তিষ্কেরই যে অপচয় ঘটিবে এরূপ নহে, জনসাধারণের প্রভূত অর্থেরও অপচয় হইবে। সম্পাদকমণ্ডলী তাঁহাদের কাজের মেয়াদ অন্তত ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাড়াইয়া দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। ন্যস্ত কর্তব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে তাঁহাদের এই অনুরোধের যৌক্তিকতা সকলেই উপলব্ধি করিবেন।

জাতীয় কলঙ্ক

রেল বিভাগের দুর্নীতি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই কমিটি গত ১১ই জুলাই রেল সচিবের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিটি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, দুর্নীতি কেবল রেল বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সরকারী সব বিভাগে সমভাবে ইহা চলিতেছে এবং সর্বত্র এই পাপ দস্তুরমত শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। সুতরাং সাধারণভাবে এই পাপকে উৎখাত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া রেলবিভাগ হইতে দুর্নীতি উৎখাত করা সম্ভব নয়। বস্তুত কমিটির এমন মন্তব্যে আশ্চর্য হইবার মত কিছুই নাই। আমরা সকলেই এই অবস্থার কথা

অবগত আছি। এদেশের সরকারী বিভিন্ন বিভাগে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিন্দাকর বলিয়াই বিবেচিত হয় না, পরন্তু এগুলি সাধারণের কাছে কতকটা সরকারী নিয়ম এবং আইনের মতই রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নীরব সম্মতিক্রমেই দুর্নীতি-মূলক সেইসব ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া থাকে। জনসাধারণ নির্বিঘ্নে নিজেদের কাজ পাইবার জন্য সেগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়, কারণ অন্যথাচরণে ঝঞ্ঝাটই শুধু বাড়ে। সরকারী বিভাগে এইরূপে দুর্নীতির প্রচলন জনসাধারণেরও দায়িত্ব আছে। সামাজিক প্রতিবেশের প্রভাব একক্ষেত্রে রহিয়াছে, আমরা এ সব কিছুই অস্বীকার করি না। কিন্তু সমগ্র জাতির পক্ষে কলঙ্ককর এই অবস্থার কার্যকরভাবে প্রতিকার করিতে হইলে যে সব সরকারী কর্মচারী এই পাপের সহিত সংশিলষ্ট তাহাদের প্রতি দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে অবলম্বন করা প্রয়োজন। ফলতঃ সেই পথেই সমাজ-জীবনে এতৎসম্পর্কিত নৈতিক কর্তব্যবোধ প্রখর হইতে পারে। জনসাধারণের সঙ্গে এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব জড়িত করিয়া সেই বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করিলে অবস্থার জটিলতা বাড়িবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মনুষ্যত্বের শক্তি

পাকিস্থান সরকার সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খানের উপর হইতে সব বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। গফ্ফর খানের মতের কিন্তু পরিবর্তন ঘটে নাই। তিনি সমুন্নত মস্তকে নিজের মতেই দৃঢ় আছেন। পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের মতিগতি স্বভাবতই দুর্বোধ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যবস্থিত চিত্ততার পরিচায়ক। তাঁহারা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত গফ্ফর খানকে তাঁহাদের শত্রুস্থানীয় বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহাদের এই মনোভাব যে কতটা গণতন্ত্রবিরোধী এবং স্বেচ্ছাচার-মূলক পশ্চিম পাকিস্থান বিশেষভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীরা তাঁহাদিগকে সে সত্য চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। রাজনীতিক নাগপাশ হইতে বন্ধন বিমোচনের পর গফ্ফর খান সীমান্তে যেরূপ বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছেন তাহা পাকিস্থানী শাসকদিগকে নিশ্চয়ই লজ্জিত করিয়াছে এবং তাহাদের স্বেচ্ছাচারকে জনসাধারণ কি চোখে দেখে তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গে হক সাহেবের মর্যাদা পুনরায় স্বীকৃতিতে এই একই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে জনগণের সমর্থনের এই ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের নীতি সুব্যবস্থিত হইবার সুযোগ লাভ করে, রাষ্ট্রের সুসংহত স্থায়ী আদর্শ গড়িয়া উঠে। পাকিস্থানের শাসকগণ এই সত্যকে আগাগোড়া উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহার ফলে গোষ্ঠীগত স্বার্থই সেখানে বড় হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্থান গণপরিষদের বিগত অধিবেশনে এমন গোষ্ঠী স্বার্থের মনোভাবেরই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক গঠন কার্যের পথে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পরিবর্তে পরিষদের বিগত অধিবেশনে পারস্পরিক আক্রমণের সুরটাই বেশী বাজিয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থানী রাজনীতিতে উপদলীয় প্রভুত্ব-পিপাসার এই দ্বন্দ্ব-কোলাহলের অন্তরালে জনচিত্তের সংবেদনধারা সেবা এবং ত্যাগের আদর্শকেই অন্তরে কিভাবে স্থান দেয় এবং জনগণের যাহারা প্রকৃত সেবক ও কল্যাণকামী তাঁহাদের স্থান কত ঊর্ধ্বে আদর্শনিষ্ঠ সাধক খান আব্দুল গফ্ফর খানের সমাদর এবং সম্বর্ধনায় সেই সত্যই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবং প্রভুত্বস্পর্ধী স্বেচ্ছাচার ধিক্কৃত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছে।

বিশ্বরক্ষায় বৈজ্ঞানিক সমাজ

বিজ্ঞান মানুষের হাতে যে অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে, তাহার ফলে মানব সমাজ সমগ্রভাবে ধ্বংস হইতে পারে। জগতের বিভিন্ন দেশের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ৮ জন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এই সম্পর্কে বিশ্বের জনসমাজকে সচেতন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রযুক্ত হইলে তাহার ফলে জগতের ভৌতিক উপাদানে তেজস্ক্রিয়শক্তি এমনভাবে সঞ্চারিত হইবে যে, তাহার ফলে মানব-জাতির বিলোপ ঘটিবে। বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন এই সত্য বহুদিন পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং আণবিক শক্তি অপপ্রয়োগের বিশ্ব-বিধ্বংসী এমন সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেন। কিছুদিন পূর্বে মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল আইনস্টাইনের স্বাক্ষর সহ অপর ৬ জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের এতৎসম্পর্কিত সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধে আণবিক শক্তি প্রয়োগে বিশ্ববিধ্বংসী ভয়াবহ অনিষ্টকারিতা সভ্য সমাজে কাহারো আজও অজানা আছে আমাদের ইহা মনে হয় না এবং এ কথাও সত্য যে জগতে যুদ্ধ যদি বাধে সভ্যজাতিরাই সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সে কাজে অগ্রণী হইবে। বস্তুত যাহারা অসভ্য এবং অনুন্নত আধুনিক যুগের যুদ্ধের ন্যায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবার শক্তি তাহাদের নাই। পক্ষান্তরে সভ্য জাতিদের দ্বারা পিষ্ট হওয়াই তাহাদের অদৃষ্ট। এরূপ অবস্থায় সাধারণ বিচারে ইহাই বোঝা যায় যে, সভ্য জাতিদের মধ্যে যদি শুভবুদ্ধির সঞ্চার হয়, তবে আণবিক শক্তি অপপ্রয়োগের সংকট সহজেই এড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু মুশকিল হইতেছে এই যে, বড় রকমের একটা যুদ্ধ যদি সত্যই বাধে তাহা হইলে আণবিক শক্তির বিধ্বংসী প্রভাব বিদিত থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক বিজিগীষার প্রবৃত্তিই সেক্ষেত্রে বড় হইবে এবং কোন শক্তিই নিজেদের সুযোগ সুবিধামত আণবিক অস্ত্র প্রয়োগে ইতস্তত করিবে না। হিংসার প্রবৃত্তি মানুষকে এমনই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং হিংস্র করিয়া তোলে। আমাদের মতে মানব সমাজের বর্তমানের এই সংকটের কারণ মানসিক। আণবিক অস্ত্র নিরোধের যুক্তি আঁটিয়া কিংবা সেই সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক বৈঠক আহ্বান করিয়া এই ব্যাধির সম্যক্ নিরসন করা যাইবে না। সেজন্য সাংস্কৃতিক পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বস্তুত মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ সাধনই এই সংকট হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

সোমবার থেকে জেনেভায় চতুঃশক্তির প্রধানদের কনফারেন্স আরম্ভ হয়েছে। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ার, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এণ্টনি ইডেন এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ ফরে যে প্রাথমিক বক্তৃতা দেন তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং মার্শাল বুলগানিনের বক্তৃতায় দু'পক্ষের মতভেদের রূপ ও আয়তন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। স্যার এণ্টনী ইডেন ও মঃ ফরে অবশ্য প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের কথার সঙ্গে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে কিছু বলেন নি, তবে তাঁদের বক্তৃতার মধ্যে মতবিরোধের প্রশ্নগুলিকে খুব স্পষ্ট করে তোলা হয় নি। মঙ্গলবার সকালে চার পররাষ্ট্রসচিবের বৈঠকে ঠিক হয় তাঁদের কর্তারা কীকী বিষয় আলোচনা করবেন। বিষয়সূচীতে আছে (১) জার্মানীর ঐক্য-সাধন (২) ইউরোপের নিরাপত্তা (৩) নিরস্ত্রীকরণ এবং (৪) যোগাযোগ বৃদ্ধি। কনফারেন্স চলতে চলতে প্রধানগণ ইচ্ছা করলে অন্য প্রশ্নও আলোচনা করতে পারেন। অবশ্য সকলের মত না হলে কোনো প্রশ্নের আলোচনা হতে পারবে না।

মার্শাল বুলগানিনের প্রাথমিক বক্তৃতায় সুদূর প্রাচ্যের সমস্যার উল্লেখ ছিল কিন্তু নির্ধারিত বিষয়-সূচীতে সেটা স্থান পায় নি। তার কারণ এই যে, আমেরিকা বর্তমান কনফারেন্সে সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে চায় না। আমেরিকার এই মনোভাব পূর্বেই মার্কিন সরকারের মুখপাত্রগণের কথায় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর বক্তৃতায় সোভিয়েটের আওতাধীন পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কথাও তুলেছিলেন কিন্তু এগুলিও বিষয়সূচীতে স্থান পায় নি। বলা বাহুল্য আমেরিকা যেমন সুদূর প্রাচ্যের বিষয় আলোচনা করতে চায় নি বলে সে কথা বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি তেমনি রাশিয়ার আপত্তির দরুণ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির কথা এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কথা বিষয়-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কিন্তু এমনি কাটাকাটির দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা বাদ রাখলে কি বিশেষ লাভ হবে? সুদূর প্রাচ্যের কথা বাদ দিয়ে রেখে দুই ব্লকের মধ্যের মনকষাকষির নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিখ্যাত চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের ছায়াচিত্রযুগের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ স্মৃতিকথা 'যখন নায়ক ছিলাম' আগামী সপ্তাহ হইতে দেশ পত্রিকায় ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক 'দেশ'

তেমনি আমেরিকা যদি মনে করে যে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ধারা অপরিবর্তিত থাকলে সোভিয়েট ব্লক এবং পশ্চিমা ব্লকের মধ্যে মনকষাকষি ও অবিশ্বাস যাবে না, অথবা ইউরোপীয় পরিস্থিতিতে একটা ভারসাম্য আনতে হলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দেওয়া আবশ্যক তাহলে এই সব প্রশ্নের আলোচনা না করে দুই পক্ষের মতবিরোধ কিভাবে মিটতে পারে?

তবে প্রকাশ্য বিষয়-সূচীতে না থাকলেও আলোচনার সময়ে এই সব কথা বা সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা একেবারেই উঠবে না তা মনে করা অসম্ভব। অবশ্য পিকিং সরকারের অনুপস্থিতিতে সুদূর প্রাচ্যের কোনো সমস্যার আলোচনা করে কোনো মীমাংসায় উপস্থিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তবে সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনার জন্য ভবিষ্যতে কী ব্যবস্থা হতে পারে সে বিষয়ে একটা কথাবার্তা হওয়া সম্ভব।

এতো গেল বিষয়-সূচীর বহির্ভূত ব্যাপারের কথা। বিষয়-সূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলির আলোচনার ফলাফল কী হবে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমান কনফারেন্সের ফলে জার্মানীর ঐক্যসাধনের উপায় সম্বন্ধে উভয় পক্ষ একমত হবে এরূপ কোনো আশা আছে বলে মনে হয় না। জার্মানীর ঐক্য-সাধনের প্রশ্নের সঙ্গে NATO এবং ইউরোপীয় 'নিরাপত্তা'র প্রশ্ন জড়িত এবং তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন। বলতে গেলে এই তিনটা প্রশ্ন এক প্রশ্নেরই বিভিন্ন অঙ্গ এবং প্রত্যেকটির বিষয়ে উভয়পক্ষের প্রকাশিত মতের মধ্যে এখন পর্যন্ত দুরতিক্রম্য ব্যবধান বর্তমান।

কেউই আশা করেন না যে, এইসব ব্যাপারে বর্তমান কনফারেন্সের দ্বারা মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা সমস্যাগুলির সমাধান হবে। সবচেয়ে বেশি যা আশা করা যায় তা হচ্ছে এই যে বর্তমান কনফারেন্সের পরে পররাষ্ট্র-সচিবদের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার জন্য একটা পথ খুলে রাখা হবে। কোনো সমস্যাই মিটল না, আবার কোনো সমস্যাই যেরকম ছিল তার চেয়ে বেশি গুরুতর আকার ধারণ করবে না—আরো কনফারেন্স, আরো কথাবার্তার অবসর থাকবে। NATOও সহজে ভাঙছে না, SEATOও যাচ্ছে না কিন্তু কোনো পক্ষেরই মোট রণশক্তি অপর পক্ষের চেয়ে

হঠাৎ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী হলেও তার গতি অত্যন্ত মন্থর হবে সুতরাং রাশিয়ার সেজন্য ভীত হয়ে পড়ার বিশেষ কারণ নেই।

আসলে উভয় পক্ষই যুদ্ধের ভয়ে ভীত কোনো পক্ষই যুদ্ধ চায় না কারণ এবার বড়ো যুদ্ধ লাগলে তাতে হাইড্রোজেন বোমা এবং অন্যান্য আণবিক মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হবে, যার ফলে উভয় পক্ষেরই, এমন কি সমগ্র মানব জাতির ধ্বংসপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রধানদের বর্তমান কনফারেন্স এই ভয়েরই স্বীকৃতি। একটা যুদ্ধ আসন্ন হবার উপক্রম হয়েছে, একটা সংকট উপস্থিত হয়েছে যেটার নিরসন না হলে শীঘ্রই যুদ্ধ লেগে যেতে পারে এই ধরনের কোনো অনুভূতির দরুণ বর্তমান কনফারেন্স সংঘটিত হয় নি। বরঞ্চ বলা যায় যে, সংকটের অনুভূতি তেমন নেই বলেই এই কনফারেন্স সম্ভব হয়েছে। এই কনফারেন্সের সংগঠন থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আপাতত যুদ্ধের আশংকা নেই। এই কনফারেন্সের বিশেষ কোনো সফলতা বা বিফলতার উপরে যুদ্ধ বা শান্তি নির্ভর করছে না।

এই কনফারেন্সের যে ভাবে পরিসমাপ্তি হবার সম্ভাবনা তাতে এটা সফল হোল কি বিফল হোল তাই ভালো বুঝা যাবে বলে মনে হয় না। আসলে হয়ত এ কনফারেন্স সফলও হবে না, বিফলও হবে না। সফল হবে না তার কারণ এই যে যে-সব সমস্যা আলোচিত হবে তার নিষ্পত্তির কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিফল হবে না এই জন্য যে যেমন-ভাবেই সমাপ্ত হোক তার দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতির আশংকা নেই—কারণ যে-কারণে আপাতত আন্তর্জাতিক "টেন্‌শন্‌" এবং বিশ্বযুদ্ধের আশংকা কমেছে তার প্রভাবেই এই কনফারেন্স হয়েছে এবং সেটা এই কনফারেন্সের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল নয়—সেটা হচ্ছে উভয় পক্ষের পূর্বোল্লিখিত হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধের ভয়।

* * *

জেনে রাখতে বলেছেন যে ভারতবর্ষ গোয়া সম্পর্কে কোনরকম 'ননসেন্স' বরদাস্ত করবে না, গোয়া থেকে পর্তুগীজদের সরতেই হবে তবে ভারত গভর্নমেণ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় ভিন্ন অন্য কোনো পথ অবলম্বন করবেন না। ভারত থেকে বেশিসংখ্যক ভারতীয় সত্যাগ্রহী গোয়ায় প্রবেশ করে এটাও ভারত গভর্নমেণ্ট চান না। দু পাঁচজনের যাওয়া ঠেকানো যায় না। তবে ভারত গভর্নমেণ্ট চান যে গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে গোয়ার লোকেরাই (গোয়ার ভিতরের ও বাহিরের) অংশ গ্রহণ করবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোয়া সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের নীতি পূর্ববৎই আছে। সে নীতি হচ্ছে এই যে, গোয়া থেকে পর্তুগীজ কর্তৃত্বের উচ্ছেদ করার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট অস্ত্রবল প্রয়োগ করবেন না এবং ভারতীয় এলাকা থেকে কোনো বৃহৎ সত্যাগ্রহী দলকেও গোয়ায় প্রবেশ করতে দিতে সরকার ইচ্ছুক নন। তবে কীভাবে পর্তুগীজ শাসনের অবসান হবে—এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতজী বলেন, পর্তুগীজ শাসন ভেঙে পড়বে, 'collapse' করবে। তাহলে ভারত গভর্নমেণ্টের ধারণা এই যে, ভারত থেকে গোয়ার উপর যে অর্থনৈতিক চাপ দেয়া হচ্ছে ও হবে এবং গোয়াবাসীদের আন্দোলন এই দুইয়ের ভারেই গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃত্ব ভেঙে পড়বে। অথবা ভারত গভর্নমেণ্ট একটি তৃতীয় কারণের উপরও কিছুটা নির্ভর করছেন? পণ্ডিত নেহরু কি আশা করছেন যে NATO শক্তিদের প্রতি তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণের ফলে কিছু কাজ হবে অর্থাৎ NATO শক্তিদের মধ্যে যাঁদের কাছ থেকে পর্তুগাল যে-সমর্থন পাচ্ছিল তাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে পর্তুগাল তা পাবে না এবং ফলে গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃত্ব নিরুৎসাহ হয়ে 'collapse' করবে? সে যাই হোক এখন ভারত থেকে সত্যাগ্রহ অভিযানের কী হবে? এ বিষয়ে ভারতীয় জনমত ও ভারত সরকারের নীতির একটা সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক।

পণ্ডিত নেহরু NATO শক্তিদের ২০।৭।৫৫

সতীর্থ রমেন্দ্রনাথ

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

১৯২১ সন হইতে শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহিত আমার পরিচয়। এই দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত আমার সহযোগিতা রহিয়াছে। রমেনবাবু কলাভবনে যোগ দেওয়ার পূর্বে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন।
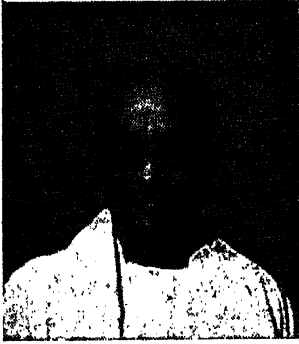
পূর্বে শ্রীযুত অসিতকুমার হালদার সেখানে অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার কাছে রমেনবাবু প্রথম ভারতীয় চিত্রকলার প্রেরণা পান।

রমেনবাবুর সঙ্গে শেষ দেখা এই মাসের ১লায়। তাঁহাকে হাস্যময় এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ দেখিলাম। তখন কি ভাবিতে পারিয়াছিলাম, এই দেখাই শেষ দেখা? দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের স্মৃতি। ছাত্ররূপে, শিক্ষকরূপে, অধ্যক্ষরূপে তাঁর কর্ম লক্ষ্য করিয়াছি।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে আমরা পাশাপাশি বসিয়া বহুদিন কাজ করিয়াছি। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, যত্নপূর্বক কাজ করিতেন, কাজের মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল না, কাজের মধ্যে ছিল একটা ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ছাত্র জীবনের কাজ যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। তাঁহার কলাভবনের প্রথম কাজটির কথা আজো মনে পড়িতেছে, চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। কয়েকজন পথিক পার্বত্যপথ দিয়া যাইতেছে, দুই দিকে অনুচ্চ টিলার মত সম্ভবত আগরতলার দৃশ্য হইবে। এই প্রথম চিত্রটিই তাঁর শিল্পরুচি সূচনা করিতেছে। তখন ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির রেওয়াজ ছিল সাধারণত পৌরাণিক চিত্র করা, শান্তিনিকেতন কলাভবন এ বিষয়ে ভিন্ন রুচি দর্শায়। শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রাম্যজীবন এবং গ্রাম্য দৃশ্য নন্দলাল বসুর প্রেরণায় ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রমেনবাবু গ্রাম্য চিত্রের উপর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, যদিও অনেক প্রশংসনীয় পৌরাণিক চিত্রও তিনি আঁকিয়াছেন। তিনি অবনীন্দ্র-রীতি জলরঙা "ওয়াশ" টেকনিক অপেক্ষা টেম্পারার কাজ অধিক পছন্দ করিতেন। তাঁর চিত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব অপেক্ষা নন্দলালের প্রভাব অধিক প্রকট। তাঁর প্রিয় রং সম্ভবত ছিল গোবর মাটির রং; এই রং-এ তিনি বিশেষ যত্ন নিতেন ও আনন্দ পাইতেন। এই রং তিনি কোথায় পাইলেন? সম্ভবত বীরভূমের মাটির ঘর তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই রঙের অতি সুন্দর একটি ছোট ছবির কথা মনে পড়িতেছে। তিনি শান্তিনিকেতনের এক দলের সঙ্গে বদরীনাথ ভ্রমণে গিয়াছিলেন; হিমালয়ের অনেক স্কেচ করিয়াছিলেন। সেই স্কেচ হইতে হিমালয়ের চটির দৃশ্য একটি আঁকিয়াছিলেন। চটির মধ্যে বসিয়া তীর্থযাত্রীরা—নরনারীরা গল্পগুজব করিতেছে। দেয়ালের গোবর মাটির রঙ অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রোফেসর গেতিসের পুত্র তখন বিশ্বভারতীর সোসিওলজির অধ্যাপক ছিলেন, তিনি ৩৫৲ টাকায় এই চিত্রটি ক্রয় করেন। হিমালয়ের স্কেচের মধ্যে চটির পাথরের ঘরগুলি প্রাধান্য লাভ করে। আর্কিটেকচারের ড্রয়িং-এ তিনি যেন বিশেষ আনন্দ পাইয়াছেন, অতিশয় যত্ন এবং ধৈর্যের সহিত এসব কাজ করিয়াছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ড্রয়িংগুলি বিশেষ পছন্দ করেন এবং এক সেট আঁকিয়া দিতে বলেন। রমেনবাবু মূল স্কেচ হইতে এক সেট নকল করিয়া উপহার দিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে এই যে গৃহ আঁকার যত্ন দেখি, পরবর্তী জীবনে ইহার পরিণত রূপ প্রতিভাত হয়। এচিং-এ কলিকাতার অট্টালিকা অঙ্কনে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করি। বিলাতে অধ্যয়নকালে সম্ভবত ম্যুরহেড বোন্-এর নিকট হইতে এ বিষয়ে প্রেরণা লাভ করেন। তিনি ছাত্র

গুরু নন্দলালের জন্মদিবসে শিষ্য রমেন্দ্রনাথের প্রণাম নিবেদন

অবস্থা হইতেই স্কেচের উপর বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, জীবনের পরিণতকাল অবধি এই অভ্যাস রাখিয়াছিলেন, বলা যায় চিরজীবনই তিনি ছাত্র ছিলেন।

মাঝে মাঝে নন্দবাবু ছাত্রদের লইয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং সময় সময় কোপাইর নদীর তীরে পিক্‌নিক হইত, জয়দেবের কেন্দুলী মেলায় যাওয়া হইত এবং সেখানে তাঁবু খাটাইয়া থাকিতাম। এ সব "আউটিঙ"-এ স্কেচ করার সুযোগ হইত, রমেনবাবু এখানে ভ্রমণের নেশা পান এবং কলাভবনের ছাত্র অবস্থাতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; পরবর্তী জীবনেও এই ভ্রমণ লক্ষ্য করি।

রমেনবাবু স্বাবলম্বী ছিলেন। সাধারণের রান্নাঘরে খাইতেন না। কিছুকাল নিজে কুকারে রান্না করিয়া খাইয়াছেন। কলাভবনের ছাত্রদের আলাদা মেস ছিল না, বিশ্বভারতীর সাধারণ রান্নাঘরে সকলের খাইতে হইত। একটা অসুবিধা ছিল, তখন সেখানে নিরামিষ খাইতে হইত। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কলাভবনের ছাত্রেরা একটা আলাদা আমিষ মেস্ করিয়াছিল, তার নাম দিয়াছিলাম "বোহিমিয়ান ক্লাব"। বিশ্বভারতীর ছাত্ররাও কেউ কেউ এর মেম্বার ছিল, যেমন সৈয়দ মুজতবা আলী, অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীআশানন্দ নাগ এবং আমেরিকার অর্থনীতি বিশারদ ডাঃ দাস। আমাদের পাচক ছিল একজন মেথর জাতীয় লোক, অবশ্য সে মেথরের কাজ করিত না, রান্না করিত ভাল। রমেনবাবু আমাদের মেসে যোগ দিয়াছিলেন।

রমেনবাবু সর্বদাই ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, কখনো ক্রোধান্বিত হইতে দেখি নাই। এমন কি পরবর্তী জীবনে যখন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছেন তখনো দেখিয়াছি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রাগ করেন নাই। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে "টেম্পার লুজ" করা, সেরূপ ঘটে নাই। কলাভবনে একদিন ভয়ানক ক্রোধ দেখিয়াছিলাম। বিশ্বভারতীর অন্য সকল ছাত্রদেরই ছাত্রাবাস ছিল, কলাভবনের ছাত্রদের এক সময় থাকিবার স্থান ছিল না। দিনের বেলায় ছাত্রেরা কলাভবনে কাজ করিত, রাত্রে আবার সেখানে মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইত, ভোর বেলায় বিছানা গুটাইয়া অন্যত্র রাখিতে হইত; এজন্য তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। এই অসন্তুষ্ট ছাত্রদলের পুরোভাগে ছিলেন রমেনবাবু। আমার অবশ্য কোনো অসুবিধা ছিল না ইস্কুলের একদল ছেলেদের হোস্টেলের ভার লইয়া তাহাদের সঙ্গে একই গৃহে শুইতাম। রমেনবাবু আমাকে বলিতেন, আপনি বেশ আছেন। কর্তৃপক্ষকে আবেদন করিলেও তাঁহারা কলাভবনের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই অসন্তুষ্টি একদিন চরমে উঠিয়াছিল। কলাভবনের এক প্রকোষ্ঠে প্রকাণ্ড এক কাঠের আলমারী ছিল, তাহাতে ইস্কুলের ছেলেদের খেলার সরঞ্জাম থাকিত। এই জিনিসটির জন্য কলাভবনের ছেলেদের অনেক অসুবিধা হইত। রমেনবাবু একদিন আমাকে বলিলেন, 'ওদের বলুন আলমারী সরিয়ে নিতে, তা নইলে সব জিনিস বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' তৎকালীন স্পোর্ট ডিরেক্টর শিক্ষক বিভূতিভূষণ গুপ্তকে এ কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, 'বল গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।' রমেনবাবু সে কথা শুনিয়া আলমারী হইতে ব্যাট, ক্রিকেট প্রভৃতি লইয়া দুম দাম করিয়া দোতলা হইতে মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

কলাভবনের পুরাতন কাহিনী বলিতে গেলে পিয়ার্সন সাহেবের নামোল্লেখ করিতে হয়। তিনি শিল্পদরদী ছিলেন এবং আর্টিস্টদের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে ভালবাসিতেন, কখনো কখনো এক আধটা ছবি কিনিয়া উৎসাহও দিতেন। আমি এরূপ উৎসাহ পাইয়াছি। আমি স্লেটে নরুন দিয়া

খোদাই করিয়া বা রিলিফের কাজ করিতাম; পিয়ার্সন সাহেব আমার একটি কাজ ২৫৲ টাকা দিয়া কিনিয়াছিলেন। এ কাজের জন্য তাঁহার মনে হইয়াছিল, আমি যদি উড্ এনগ্রেভিং করি ভাল হইবে। বিলাতের শিল্পী ম্যুরহেড বোন ছিলেন পিয়ার্সন সাহেবের বন্ধু, তাঁহার পুত্র উড এনগ্রেভিং করিতেন। পিয়ার্সন সাহেব তাঁহার কাছে কিছু টাকা পাঠাইয়া দেন এক সেট উড এনগ্রেভিং-এর যন্ত্র পাঠাইতে। বিলাত হইতে কিছু কাঠ আর যন্ত্রের পার্শেল আমার জন্য আসিল। আমি কিছু কাজ করিয়াছিলাম। কলাভবনে এ কাজ আমি আরম্ভ করিলেও ইহা আমি চালু রাখি নাই। ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেস কলাভবনের অধ্যাপক হইয়া আসিলে রমেনবাবু তাঁহার কাছে উড-কাট শিক্ষা করেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ কর বিলাত হইতে লিথোগ্রাফী শিক্ষা করিয়া আসিলে তাঁহার কাছে ইহা শিক্ষা করেন। রমেনবাবুই গ্রাফিক আর্টস প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করেন এবং ইহার উন্নতির জন্য লাগিয়া থাকেন। কিছু রঙিন উডকাঠও করিয়াছিলেন। আমি এ কাজ ছাড়িয়া দিলেও পরে আর্ট স্কুলে যোগ দিলে রমেনবাবুর কাজ দেখিয়া আমার আবার উদ্যম আসিয়াছিল; কতগুলি লিনোকাট করিয়াছিলাম। সে বিষয়ে যথাস্থানে আবার উল্লেখ করিব।

চাকুরি লইয়া ১৯২৫ সালের জানুয়ারীতে সুদূর সিংহলে চলিয়া গেলাম। প্রায় দুই বৎসর পরে রমেনবাবুও মসলিপটমে জাতীয় কলাশালার চিত্র বিভাগের পরিচালক হইয়া গমন করেন।

একবার মসলিপটমে রমেনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহা আমার দ্বিতীয়বার আগমন। ছাত্রাবস্থায় এখানে একবার ভ্রমণে আসিয়াছিলাম, তখন কৃষ্ণ পত্রিকার সম্পাদক মুটনুরি কৃষ্ণমূর্তি রাওর গৃহে সাত দিন কাটাইয়া গিয়াছিলাম। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের গভর্নর) সঙ্গেও আমার আলাপ হইয়াছিল; সেই পূর্ব পরিচয় আবার ঝালাইয়া লইলাম। রমেনবাবুর গৃহে বিখ্যাত তেলেগু সাহিত্যিক শ্রীরাম শাস্ত্রীর সহিত পরিচয় হইল। তাঁহাকে আমি বলিলাম, আপনাকে তো আমি চিনি; আমি যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অল্পবয়স্ক বালক, তখন তিনি কিছুকাল এখানে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। সিংহলের স্মারকচিহ্ন-স্বরূপ ঘাসের তৈরি কতগুলি মানিব্যাগ আনিয়াছিলাম, শাস্ত্রী মহাশয়কে একটি উপহার দিলাম। তিনি পরিহাস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, মানিব্যাগ তো পাইলাম, কিন্তু আমার টাকা নাই। রমেনবাবুর সঙ্গে মসলিপটম শহরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে এক নগণ্য ব্যবসায়ীর গৃহে লইয়া গেলেন; সেখানে বিখ্যাত অন্ধ্র শিল্পী রামা রাওর খান আস্টেক ছবি দেখিলাম। এই ছবির মালিক ছিলেন মসলিপটমের এক ধনী জমিদার, তিনি ৪৫০০৲ টাকায় এগুলি কিনিয়াছিলেন। তিনি দেউলিয়া হইয়া যান এবং সর্বস্ব বিকাইয়া যায়। ঐ ব্যবসায়ী এই ছবিগুলি জমিদার হইতে ৮০৲ টাকায় ক্রয় করেন। রামা রাওর নামকাম শুনিয়াছি, এ কাজ দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলাম, এ ছবির এত দাম কি করিয়া হইতে পারে?

রমেনবাবু আমার সঙ্গে একবার সিংহল গিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বাড়ি হইতে সিংহল যাওয়ার পথে পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে মাদ্রাজে মিলিয়াছিলাম। মাদ্রাজ স্টেশনে নামিয়া দেখি তিনি আমার জন্য হাজির আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, আমার জন্য ১৫ দিন ধরিয়া হোটেলে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং রোজই একবার স্টেশনে আসিয়া ঘুরিয়া যাইতেন।

সিংহলের প্রসিদ্ধ চিত্র সিগিরিয়ার ফ্রেস্কো দেখিতে হইবে। অবশ্য ইতিপূর্বে আমার সিংহল ভ্রমণ শেষ হইয়াছে, রমেনবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার যাত্রা করিলাম। সিগিরিয়ার পথে জাম্বুলে বিহার, ইহার ১৮শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্রও দর্শনীয়। রেলগাড়ি সবটা পথ যায় না, কতকটা পথ বাসে যাইতে হয়। দুইজনে বাসে উঠিয়াছি, দুইজনের দুই বেশ; আমার খাকি হাফ প্যান্ট শার্ট, রমেনবাবুর ধুতি পাঞ্জাবী। বাসের ড্রাইভার একজন বিদেশীকে দেখিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া ডাকিয়া সামনে নিজের পাশে বসাইল। আমাকে স্বদেশবাসী মনে করিয়া খাতির করিল না। রমেনবাবু এই উপলক্ষে আমাকে

সাঁওতালী মা ও ছেলে শিল্পী: রমেন্দ্রনাথ

বলিয়াছিলেন, "দেখলেন, সাহেবী পোশাক পরে আপনি ঠকে গেলেন, আর বাঙগালী পোশাক পরে আমি জিতে গেলাম।" ডাম্বুল বিহারে এক রাত্রি কাটাইয়া সিগিরিয়া যাত্রা করিলাম। রেস্ট হাউস, আমরা যাকে ডাক বাংলো বলি, সেখান হইতে সিগিরিয়া মাইল খানেক দূরে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়া সিগিরিয়া পর্বতে যাত্রা করিলাম। সিগিরিয়া পর্বতে দ্বাররক্ষক আমাকে দেখিয়া এক সেলাম। তাহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। পকেট হইতে এক টাকা বাহির করিয়া দিলাম। ইহা বখশিশ নহে, ঘুষ। কেননা, সিগিরিয়া পর্বতে উঠিতে গেলে আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের লিখিত অনুমতি আবশ্যক। এ সব হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য সহজ পন্থা গ্রহণ করিতে হয়। অনুমতি লওয়ার ব্যবস্থার কারণ হইল সিগিরিয়া পর্বতে ওঠা বিপজ্জনক। খানিকটা দড়ির মই বাহিয়া উঠরে উঠিতে হয়, আর নীচে ৭ শত ফিট ফাঁকা। হাত ফসকাইয়া নীচে পড়িয়া গেলে আর রক্ষা নাই। দ্বাররক্ষক আমাকে গল্প করিয়াছিল যে, এক মেমসাহেব দড়ির মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন। মাঝপথে গিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া ভয় পাইয়া আর উঠিতেও পারেন না নাবিতেও পারেন না, দড়ি আঁকড়াইয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শেষে একজন লোক উঠিয়া তাঁহার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া নামাইয়া দেয়। সেজন্য যারা দুর্বল, তারা আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট হইতে উপরে ওঠার অনুমতি পায় না। শুনিয়াছি এখন কোনো মুশকিল নাই, লোহার ঘোরান সিঁড়ি হইয়াছে এবং তাহার চারিদিকে তারের জাল দিয়া ঘেরা। আমারও কিছু বিপদ হইয়াছিল। রমেনবাবু মই বাহিয়া উঠিতেছেন, আমি নীচে আছি। হঠাৎ নজরে পড়িল রমেনবাবুর হাত কাঁপিতেছে, কতকটা নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছেন। যাহাই হউক কোনো রকমে উপরে উঠিয়া চিত্র দর্শন করিলাম। ফেরার পথে সন্ধ্যাকালে রাস্তার পার্শ্বে দেখিলাম একটি "বুটিক"। আমরা যাকে সরাইখানা বলি সে রকম কিছু। মাটির ঘর, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আহার্য এবং রাত্রে বাসস্থান মিলিবে কি না এবং খরচ কত? বলিল, আহার্য এবং রাত্রে বাসের জন্য ব্যবস্থা আছে, মূল্য ৭৫ সেণ্ট অর্থাৎ বারো আনা, দুইজনের পড়িবে দেড় টাকা। আমরা ভাবিলাম, রেস্ট হাউসে না থাকিয়া এখানেই রাত কাটাইব, তাহাতে কিছু খরচ বাঁচিবে। রেস্ট হাউসে আসিয়া ম্যানেজারকে বলিলাম, আমরা এখানে থাকিব না বুটিকে রাত্রি কাটাইব মনস্থ করিয়াছি। ম্যানেজার নাক সিটকাইয়া বলিলেন, "ওঃ দ্যাট কাণ্ট্রি হাউস, ডার্টি প্লেস!" আমাদের ভ্যানিটিতে আঘাত লাগিল, নোংরা গ্রাম্য কুঁড়ে ঘরে গিয়া থাকিব? বলিলাম, আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব তোমার এখানেই খাইব এবং রাত কাটাইব। সিংহলীরা হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে তাই বলিলাম, আমাদের খাদ্য-তালিকা হইতে মাংস বর্জন করিতে হইবে। দুইজনে টেবিলে খাইতে বসিয়াছি, ম্যানেজার সাহেব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খাবার তদারক করিতেছেন, 'বয়' খাদ্য পরিবেশন করিতেছে। মাংসের মতন একটা পদার্থ পরিবেশন করিল। ম্যানেজারকে বলিলাম, "হোয়াট ইজ ইট? উই টোলড ইউ নট টু সার্ভ মীট?" ম্যানেজার উত্তর করিলেন, "ইট ইজ নট মীট, ইট ইজ জাঙ্গল ফাউল।" বন্য কুক্কুট! পরদিন বিলখানাও তেমন হইবে। রাত্রে শোয়ার সময় দেখিলাম ঘরের মধ্যে গরম লাগিতেছে। রেস্ট হাউসের তিন দিকে সুন্দর প্রশস্ত খোলা বারান্দা; ভাবিলাম বারান্দায় শুইলে মন্দ হয় না। ম্যানেজারকে বলিলাম, আমাদের বিছানা বাহির করিয়া দাও। দুইটি গদি মেঝের উপর পাশাপাশি পাতিয়া দিল। সুন্দর মনোমুগ্ধকর রজনী, অসীম আকাশে চন্দ্র, আকাশের পটে সিগিরিয়া পর্বতের সিলউয়েট রেখা দেখা যাইতেছে, যেন ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বর শিব। ভোর বেলায় ব্রেকফাস্ট করিয়া যাত্রা করিতে হইবে; দুই টুকরা রুটী মাখন ও দুটি কলা পাইলাম। বিল আসিল, আহার রাত্রিবাস সব মিলিয়া দুইজনের খরচ পড়িল ১১৷৷৹ টাকা।

এর পরে অনুরাধাপুরে যাত্রা। অশোক যে বোধিবৃক্ষের শাখা কন্যা সঙ্ঘমিত্রার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, সিংহলীদের বিশ্বাস তাহা এখনো অনুরাধাপুরে বাঁচিয়া আছে। রাত্রে আমরা এই বোধিবৃক্ষ দর্শনে আসিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা, বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ পর্বদিন। অগণিত বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী বোধিবৃক্ষ ও সন্নিহিত মন্দির দর্শনে

আসিতেছিল। এই উৎসব উপলক্ষে সেখানে একটি ডায়নামো বসানো হইয়াছিল। কারণ অনুরাধাপুর শহরে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত ছিল না। চতুর্দিক উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোকে আলোকিত, ডায়নামোর অবিরাম ধুক্ ধুক্ শব্দ নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। আমার কাছে ইহা নিতান্ত বেখাপ্পা এবং অনুপযুক্ত বোধ হইতেছিল, মনে হইতেছিল বিজলী বাতির পরিবর্তে মাটির দীপের মৃদু আলোকে উৎসবসজ্জা যেন আরো বর্ধিত হইত। এখন মনে পড়িতেছে, রমেনবাবু ছাত্র অবস্থায় এমন একটি ছবি আঁকিয়াছিলেন। অনুরাধাপুরের বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তির অনুকরণ করিয়া একটি বুদ্ধমূর্তি আঁকিয়াছিলেন, চতুর্দিকে সাজানো ছিল মাটির প্রদীপ; ছবিটা বোধ হয় একশ টাকায় বিক্রী হইয়াছিল। একজন স্যুট-পরা সিংহলী আমাদের কাছে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, তিনি ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার, এখানকার বিজলী বাতির ব্যবস্থার ভার তাঁর উপর। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। ১১টার পর ডায়নামো বন্ধ হইয়া যাইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঁচ টাকা দান করিয়া আমরা আরো আধ ঘণ্টা ইহা চালু রাখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিব কি না। আমরা আমাদের অনিচ্ছা জানাইলাম, আলো বন্ধ হইলেই যে আমরা বাঁচি! বোধিবৃক্ষের চতুর্দিকে পাথরের বাঁধান উচ্চ চাতাল আছে, মনে হইল মুক্ত আকাশের নীচে এখানে শুইয়া রাত কাটাইলে মন্দ হয় না! কোনো কর্তাব্যক্তির কাছে এ বিষয়ে অনুমতি চাহিলাম, অনুমতি মিলিল। দুইখানা সতরঞ্চি পাতিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। শয়নের আয়োজন করিতেছি এমন সময় এক সিংহলী আসিয়া হাজির লুঙি ও শার্ট পরা। বলিল, এখানে আসিয়াছ বোধিবৃক্ষকে পূজা করিবে না? বৃক্ষমূলে কিছু অর্থ দিয়া পূজা কর। মূলের চারিদিকে রেলিং দিয়া ঘেরা; আমরা দুইজনে গরাদের ফাঁক দিয়া বেদির উপর দুইটি সিকি স্থাপন করিলাম।

শিল্পী রমেন্দ্রনাথকৃত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি

ঐ লোকটি বিনা বাধায় ঐ অর্থ গ্রহণ করিল। পরে বলিল, তোমরা এখানে শুইবে পঞ্চাশ সেণ্ট করিয়া দাও। দেখিতেছি লোকটা নেহাৎ একটা ভ্যাগাবণ্ড, আমাদের বিদেশী দেখিয়া ঠকাইয়া পয়সা আদায় করিতে চায়। বলিলাম, ভাগো এখান থেকে, তোমাকে পয়সা দিব কেন? আমরা কর্তৃপক্ষ হইতে এখানে শুইবার অনুমতি পাইয়াছি।

তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ১১টার সময় বাতি নিবিয়া গেল। নির্মল পূর্ণচন্দ্রের আলোকে পুণ্যভূমি আলোকিত হইল, বোধিবৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো ঝরিয়া পড়িতেছে, চতুর্দিকে নৈশ নীরবতা বিরাজ করিতেছে।

রমেনবাবু সিংহল ত্যাগ করিতেছেন, আমি কলম্বো স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছি। একটি সেকেণ্ড ক্লাশের কামরা ফাঁকা দেখিয়া তুলিয়া দিলাম। সেখানে মাত্র দুইজন যাত্রী ছিল। একজন বৃদ্ধ পাদরী সাহেব, বিস্তর শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত শাদা আলখাল্লা পরিহিত; অপর একজন বাদামী রংয়ের এক সাহেব, মনে করিয়াছিলাম কোনো ভারতীয় ফিরিঙ্গি হইবে, আমাদের কাছে বসিয়াছিল। আমার ধুতি পাঞ্জাবী পরনে ছিল; কাছে যাইতেই বাদামী সাহেবটি ভারতীয় প্রথায় হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া আমাকে নমস্কার করিল এবং পরিষ্কার বাংলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে মশায়, কোথায় থাকেন, আপনার বাড়ি কোথায়?" পরিষ্কার উচ্চারণ, একটুও বৈদেশিক অ্যাকসেণ্ট নাই। জানাইলাম ঢাকা বাড়ি, পাল্টা প্রশ্ন করিলাম, তাঁর জাতি কি বাড়ি কোথায়? উত্তর করিলেন, নারায়ণগঞ্জে থাকেন, ওখানকার বিখ্যাত গ্রীক কোম্পানী রেলী ব্রাদার্স-এর পাটের গুদামের কর্মচারী। তিনিও জাতিতে গ্রীক, কুড়ি বছর ধরিয়া নারায়ণগঞ্জে আছেন। রং রোদে পুড়িয়া বাদামী হইয়া গিয়াছে। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। রমেনবাবুর কাছে পরে গল্প শুনিয়াছিলাম, এই গ্রীক পুঙ্গবটি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মদ্যপান করিয়াছে, বোতলের

ছিপি খোলার সবুর সয় নাই, ডগাটি ভাঙিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া বোতল হইতেই পান করিয়াছে। পাশে বসিয়া বৃদ্ধ পাদরী সাহেব কম্পমান। অবশেষে অসহ্য বোধ হওয়াতে উপরের বাঙ্কে তুলিয়া দিতে রমেনবাবুর কাছে সাহায্য চাহিলেন; বিস্তর ঠেলাঠেলি করিয়া রমেনবাবু বৃদ্ধকে উপরের বাঙ্কে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বাহিরে চাকুরি করিয়া শান্তিনিকেতনে আবার ফিরিয়া আসিলাম। কলাভবনে আমার প্রকোষ্ঠে আসিয়া একদিন অধ্যক্ষ মুকুল দে আমার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং বলিলেন, আর্ট স্কুলে একটা কাজ খালি হবে তোমাকে এ কাজ দিতে চাই, নেবে তো? চাকুরি হওয়ার পূর্বেই কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছিলাম। রমেনবাবু তখন ৯ নম্বর গোপাল ব্যানার্জি স্ট্রীটে থাকেন। একা থাকেন, পরিবার তখন কাছে নাই। তাঁহার বাসায় উঠিয়াছিলাম এবং দুই মাস পেয়িং গেস্ট হিসাবে বাস করিয়াছিলাম। এ সময় রমেনবাবুর বাড়িতে আমার পরিচয় হইয়াছিল আর্ট স্কুলের অধ্যাপক ঈশ্বরীবাবু, শিল্পী যামিনী রায় এবং অতুল বসুর সহিত। ঈশ্বরীবাবু এবং অতুলবাবুর সঙ্গে ১৯১৬ সালে আমার পরিচয় হইয়াছিল, দেখি তাঁরা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, পূর্ব-পরিচয়ের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম।

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে আর্ট স্কুলে আমার কাজ শুরু হইল। একটা বোর্ডিং হাউসে থাকিতে হইবে। রমেনবাবু আমাকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন এবং খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিলেন। দেবেন ঘোষ রোডে একটা বোর্ডিং মিলিল, একটা কোঠা একা ভাড়া করিয়া রহিলাম। ইহা রমেনবাবুর বাসার কাছেই,* কাজেই আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম না। একদিন রাত্রে দেখি রমেনবাবু আমার ঘরে আসিয়া হাজির। রাত্রে আমার কাছেই থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি প্রমাদ গণিলাম, একখানা বই দ্বিতীয় শয্যা আমার নাই। রমেনবাবু বলিলেন, মাদুর কিনে আনুন, মাদুরে শোব। কাছেই জগুবাবুর বাজার, মাদুর সংগ্রহ করিলাম। মেঝেতে শুধু মাদুর পাতিয়া সেই রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিলাম।

পরে আবার কাছাকাছি আশুতোষ মুখার্জি রোডে একটা বোর্ডিংএ কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। এই বোর্ডিংটা খুব ভাল ছিল, পাঁচতলা দালান, দক্ষিণ কলিকাতার সর্বোচ্চ বাড়ি। আমি দখল করিয়াছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ কোঠাটি; একেবারে পাঁচতলার কোঠা। উত্তর দক্ষিণ খোলা জানালা, প্রচুর আলো, হুহু করিয়া বাতাস। রমেনবাবু আমার ঘরে একদিন আসিয়া খুব খুশি হইলেন। উত্তর দিকে কলিকাতার গৃহরাজির সুন্দর দৃশ্য, দিগন্তে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গম্বুজ দেখা যায়। বলিলেন, এই দৃশ্যের একটা এচিং করব। রমেনবাবুর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যে ড্রাই পয়েন্ট আছে, তাহা আমার ঘর হইতে করা।

প্রথম বাসা করি ২৬নং রাজা বসন্ত রায় রোডে। আমার বাসা ছিল রাস্তার শেষ সীমায়, দক্ষিণে একেবারে খোলা পাড়াগাঁ। সামনে একটা এ'দো পুকুর, জানালা দিয়া দেখিতাম বৌ-ঝিরা বাসন মাজিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, জলে হাঁসের দল সাঁতার কাটিতেছে। রাত্রে কখনো কখনো শেয়ালের ডাকও শুনিয়াছি। রমেনবাবুর সঙ্গে গ্রামে ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। একদিন ভোরে আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, চলুন শ্যামবাজারে ভাগ্নের বাসায়; উঁহার ভাগ্নে শ্যামবাজারে ডাক্তার। শ্যামবাজার হইতে ফেরার সময় প্রস্তাব হইল হাঁটিয়া যাই। শ্যামবাজার হইতে দক্ষিণ কলিকাতা আমরা দুইজন হাঁটিয়া আসিয়াছি।

রমেনবাবুর এচিং করার যেন একটা নেশা ছিল, শুধু কাজ করা নহে, দেখাটাও যেন একটা নেশা। রাস্তায় বাহির হইলে, তাঁহার উপযুক্ত বিষয় দেখিলে, যথা একটা পুরাতন দালান, কুটীর, হয়ত একটা জীর্ণ গাছ, বলিয়া উঠিতেন, "এটা বেশ একটা এচিংএর সাবজেক্ট।" তিনি আমাকে বলিতেন, আমাদের শিল্পীরা শুধু গ্রাম্য দৃশ্য আঁকিয়া থাকে, গ্রাম্য দৃশ্যই একমাত্র শিল্পীর বিষয় হইবে কেন? আমরা শহরে বাস করি, আমাদের চারপাশে যা দেখি, শহরের অট্টালিকা তা শিল্পীর বিষয় হবে না কেন?

ড্রাই পয়েন্ট বা এচিং অঙ্কন করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে; যাহারা কাগজে পেন্সিলে ভাল ড্রয়িং করিতে পারে, তারা একাজ অনায়াসে করিতে পারে। শুধু কাগজের পরিবর্তে তামা বা দস্তার চাদরের উপর এচিং নীড্‌ল্ বা ছুঁচের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র লোহার শলাকা দ্বারা আঁচড় কাটিয়া ড্রয়িং করিতে হয়। কিন্তু ছাপা কঠিন ব্যাপার। উড্‌কাট উড এনগ্রেভিং শিল্পী নিজের হাতেই ছাপে, এচিংএর জন্য একটি প্রেসের দরকার। আবার এচিং প্রেস ক্রয় করিতেও একটু মোটা টাকার দরকার হয়। ধাতুর প্লেটে পরিমিত পরিমাণে কালি মাখাইতে হয় এবং তাহা ছাপিতেও পরিমিত পরিমাণে 'প্রেস' বা চাপের প্রয়োজন। বেশী চাপ বা কম চাপ হইলেই ছাপা খারাপ হইয়া যাইবে। কাজেই ভাল এচিংএর লক্ষণ

শিল্পী: রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কাশীর ঘাট (ড্রাই পয়েণ্ট এচিং)

যেমন ভাল ড্রয়িং, তেমন ভাল ছাপার প্রয়োজন।

রমেনবাবু অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া একটি ভাল এচিং প্রেস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিউম্যান কোম্পানীর ছাপাখানায় একটি প্রেসের সন্ধান পান; উহা উহাদের গুদামে অনেককাল অকেজো অবস্থায় পড়িয়াছিল। উহা কিনিলেন পঞ্চাশ টাকায়। এই প্রেসটির দাম অনেক, সাহেব ভুলক্রমে পুরানো মালের দরে ছাড়িয়াছেন। কিছুকাল পরে সাহেবের খেয়াল হইল, তিনি ভুল করিয়া ভয়ানক ঠকিয়া গিয়াছেন। রমেনবাবুকে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাঁর নিজেরই জিনিস তিনি আবার আড়াই শো টাকায় কিনিবেন। অবশ্য রমেনবাবু ব্যবসায়ের একটা দাঁও মারার লোভে প্রেসটিকে হাতছাড়া করেন নাই।

আমার ড্রাই পয়েণ্ট করার বাসনা ছিল; কিন্তু প্রেস কোথায়? ছাপাই কোথায়? রমেনবাবুর প্রেসে আমার কাজ ছাপার সুবিধা হইল। তিনি এচিংএর [illegible] হইতে। আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই দোকানে গেলেন, এবং প্রকাণ্ড একটি দস্তার চাদর কিনাইয়া দিলেন; দাম সস্তা, মোটে ছয় টাকা, সেগুলি উপযুক্ত সাইজে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতে আরো খরচ পড়িল দুই টাকা। মোট আট টাকায় বেশ ভাল সাইজের ছয়খানা প্লেট হইল। এখন এসব ধাতুর চাদরের দাম বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে। আমি বিলাতী এচিং নীড্‌ল্ কিনি নাই। কলিকাতার এক পুরাতন লোহার দোকান হইতে চারি আনায় একটা উকো কিনি, ছুটিতে দেশে গেলে গ্রামের কর্মকারকে দুই আনা মজুরি দিয়া উহা পিটাইয়া সরু ছুঁচল করিয়া লই; উহাতে বেশ কাজ চলিয়াছে। প্লেটের উপর এনগ্রেভিং গ্রামেই গ্রাম্য বিষয়ে করিয়াছি—লাইফ ড্রয়িং ও মানচিত্র। রমেনবাবুর প্রেসে ছাপিয়াছি। এই কয়খানা কাজ করার পর এ বিষয়ে আমার আর অগ্রসর হয় নাই।

এচিং করার নানা সমস্যা; সব কাগজে ছাপা যায় না। হাতে তৈরী বিশেষ কাগজের প্রয়োজন। খিদিরপুরে জাপানীদের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল। রমেনবাবু একদিন বললেন, চলুন খিদিরপুর যাব। ৮০৲ টাকার জাপানী হ্যাণ্ড-মেড পেপারের অর্ডার দিলেন; এখানে পাওয়া যায় না, একেবারে জাপান হইতে মাল আসিবে। তিনি নানা রকম কাগজে এক্সপেরিমেণ্ট করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহাকে আমি একবার ঢাকার আড়িয়াল গ্রামে তৈরী দেশী তুলট কাগজ উপহার দিয়াছিলাম। উহাতে ছাপিয়াছিলেন, মন্দ নয় ছাপা।

বিলাতের কিম্বার কোম্পানী গ্রাফিক আর্টস অর্থাৎ উড্ এনগ্রেভিং এচিং ইত্যাদির যন্ত্রপাতির শ্রেষ্ঠ দোকান। রমেনবাবু এখানে একবার অর্ডার দিয়েছিলেন, আমিও এঁর সঙ্গে উড্‌কাট ও লিনোকাটের দ্রব্যাদির জন্য অর্ডার দিলাম। রমেনবাবুর প্রায় শতাবধি টাকার মাল আসিল, আমার খরচ পড়িয়াছিল ৪৫৲ টাকা। আমাকে এ জিনিস নূতন উদ্যম দান করিয়াছিল। আমি বার দিনে বারখানা লিনোকাট করিয়াছিলাম। কোনা বর্ষার ভ্রমণের দৃশ্যের [illegible]

একটি পোর্টফোলিও বাহির করিয়াছিলাম। আমি বিখ্যাত রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিককে (এখন পরলোকে) এই চিত্র-সংগ্রহের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করি, তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন; একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

আমার পূর্বেই রমেনবাবু কুড়িটি উড্‌কাটের একটি পোর্টফোলিও প্রকাশিত করিয়াছিলেন, উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রমেনবাবুর এ-কাজই আমার পোর্টফোলিও প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল।

রমেনবাবু দুই বৎসরের স্টাডি লিভ্ লইয়া বিলাত যান। হাওড়া স্টেশনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলাম, ২০।২৫ জন ছাত্রও আসিয়াছিল। বোম্বেতে গিয়া জাহাজে ওঠেন। বিলাত হইতে চিঠি পাইয়াছি। প্যারিস হইতে ছোট একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম, তাহাতে একটি বাক্য ছিল, "এয়ার মেলে চিঠি যাইতেছে, লম্বা চিঠি লিখতে পারলাম না, মনে কিছু করিবেন না, টিকিটের পয়সা বেশি লাগবে।" একই খামের ভিতর শিল্পী প্রদোষ দাশগুপ্তেরও চিঠি ছিল। এই চিঠিতে জানি, তাঁহারা ওলন্দাজ শিল্পী ভ্যানগগের কবর দেখিতে গিয়াছিলেন এবং তাহাতে পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন। রমেনবাবু আর্ট স্কুলে শুধু অধ্যয়ন করেন নাই, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে অনেক পেন্সিল স্কেচ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিলে ঐ স্কেচ হইতে ব্লক করিয়া একটি পুস্তক ছাপেন।

কলিকাতায় আসিয়া আগরতলার মহারাজের কাছে একটি আবেদন পেশ করেন; তিনি বিলাত হইতে নানা শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, মহারাজের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করেন। মহারাজা নানা সাইজের এবং নানা বিষয়ের দশখানা চিত্রের অর্ডার দেন মোট ৪৫০০৲ টাকার। এ সময় বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান পার্কে এক টুকরা জমি কিনিয়াছিলেন, আমাকে একদিন এই জমি দেখাইয়া আনিয়াছিলেন। শুনিয়াছি সেখানে তাঁর একখানা বাড়ি তৈয়ারী হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আর তাঁহার হইল না।

এর পর তিনি তৈলচিত্রে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এখানে আমার স্মৃতিকথা শেষ করি।

আলোচনা

'সাহিত্যে সংকট'

সবিনয় নিবেদন,

'সাহিত্যে সংকট' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গে তাঁর 'প্রতারকতুল্য ব্যবহার'-এর উল্লেখ করেছেন দেখে শ্রীমতী জয়া ঘোষ 'ব্যথা পেয়েছেন' এবং জানিয়েছেন যে, 'এরূপ ভাষা হিন্দুমাত্রেরই প্রাণে ব্যথা দেবে।' কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের 'প্রাণে ব্যথা' না দেওয়াই সাহিত্যের পরম লক্ষ্য কি না সেটা বিবেচ্য। প্রবন্ধ-লেখক যে প্রসঙ্গে ঐ ভাষা ব্যবহার করেছেন, পত্রলেখিকা রামায়ণ থেকে সেই প্রসঙ্গটির আলোচনা ক'রে তারপর যদি প্রমাণ করতে পারতেন যে এরূপ ভাষা ব্যবহার ওখানে অসংগত হয়েছে তা হলে কিছুই বলার থাকতো না। তা না ক'রে তিনি হিন্দুয়ানার দোহাই দিয়েছেন! সাহিত্য পাঠকদের মধ্যে এই মনোভাবই যদি ব্যাপক হয় তা হলে সেটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে দুশ্চিন্তার কথা।

মূল রামায়ণে 'আদর্শ হিন্দু স্ত্রী' সীতাদেবীর মুখে স্বয়ং কবি বাল্মীকি রামকে উদ্দেশ ক'রে যে কথা বসিয়েছেন তা পাঠ ক'রে পত্রলেখিকা ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই আরও বেশি মর্মাহত হয়ে থাকবেন। লঙ্কা বিজয়ের পর পত্নীর সতীত্বে সন্দিহান শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে বলছেন যে রাবণের চিন্তা কি একবারের জন্যেও তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেনি? তখন সীতাদেবী উত্তর দিচ্ছেন—তুমি অতি প্রাকৃতজনের ন্যায় কথা বলছ। (প্রাকৃতজন অর্থাৎ ইতর, ছোটলোক।) হিন্দুস্ত্রীর পক্ষে এতাদৃশ ভাষা উচ্চারণ করা পত্রলেখিকার মতে নিশ্চয়ই অতীব গর্হিত। তথাপি সীতাদেবী কিন্তু চিরকাল প্রাতঃস্মরণীয় এবং মূল রামায়ণের লেখক মহর্ষি, তদুপরি মহাকবি।

প্রসংগত উল্লেখ করি, বাংলা রামায়ণকার কৃত্তিবাস ঠাকুর কিন্তু সীতাদেবীর মুখে কদাচ হেনবাক্য উচ্চারিত হতে অনুমতি করেননি। সম্ভবত তার কারণ কৃত্তিবাস বাঙালী হিন্দু এবং নিশ্চয়ই কবিও।

ইতি, বিনীত
নরেশ গুহ কলিকাতা

'সূর্যপ্রতিম'

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ১৭ই আষাঢ়ের 'দেশ' পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক আমার উপরিলিখিত কবিতাটির দুইবার প্রকাশ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। উক্ত কবিতাটি দীর্ঘ এক বৎসরেরও পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কবিতাটি প্রকাশ হয় না। পূর্ব পাকিস্তান হইতে লেখা পাঠাই—অনেক লেখাই ঠিকমত পৌঁছে না—ভাবিয়াছিলাম কবিতাটিও মধ্যপথেই মারা গিয়েছে। অতঃপর শারদীয়া 'দেশের' জন্য প্রেরিত কবিতাও সম্পাদকের হস্তগত হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে 'স্বপ্ন' নামে প্রেরিত কবিতাটির জন্য সহকারী সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে তিনি কবিতাটি শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে জানান। কিন্তু উহা 'স্বপ্ন' নয়, 'সূর্যপ্রতিম'। শারদীয়া 'এশিয়া'তে প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই ইহাকে 'অসাধুতা' না বলিয়া 'ভ্রম-প্রমাদ' বলাই যুক্তিসংগত হইবে। 'দেশ' আমার অত্যন্ত প্রিয় পত্রিকা। দেশ ভাগ হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যসাধনাকে আজিও ভাগ করিতে পারি নাই। সম্ভবত ১২ বৎসর যাবৎ 'দেশে' নিয়মিতভাবেই লিখিতেছি। আশা করি পত্রলেখক অতঃপর নিজেই লজ্জিত হইবেন—অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের একজন লেখকের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্য। নিবেদন ইতি—আশরাফ সিদ্দিকী, রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী।

॥ ৬ ॥

'আজ ক'দিন ধরেই দেখছি ছোড়দির যেন—'

কথাটা কানে যেতেই বাসনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কমলার ঘরে ওরা কথা বলছে, ওরা স্বামী স্ত্রীতে। নীলচে রঙের কম-জোর এক বাতি জ্বলছে ঘরে, এক বিন্দু আলো নেই বারান্দায়; দরজা জুড়ে পর্দা। পর্দার গায়েগায়ে বাসনা। এই এসে দাঁড়াল, হেঁসেল বন্ধ করে, কমলার বাচ্চা মেয়েটার দুধ গরম সেরে, বাটিটা হাতে নিয়েই। আর একটু হলেই পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ত বাসনা। হাত প্রায় বাড়িয়েছিল, আচমকা কথাটা কানে যেতেই হাত গুটিয়ে নিল। মাটিতে আঁট হয়ে থাকল পা-দুটো। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ। আজ ক'দিন ধরে কী— কী দেখছে কমলা? কান পেতে থাকল বাসনা, যেন কমলাদের একটা নিশ্বাসও না হারিয়ে যায় এখন ওর কাছ থেকে।

'আজ ক'দিন ধরে দেখছি ছোড়দির যেন মতিগতি খানিক বদলেছে।' কমলা বলছিল।

যদিও এখানটায় অন্ধকার এবং বাসনাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বাসনাও কাউকে নয়, তবু মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বাসনার। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করছে। বাসনা অসাড়, কাঠ-পা হয়ে দাঁড়িয়ে। কি বলতে চাইছে কমলা, কি বোঝাতে চাইছে সুধাময়কে? মতিগতি বদলেছে! মানে, কি মানে? কিসের ইঙ্গিত দিতে চায় কমলা স্বামীকে?

'প্রথম প্রথম কিছুই তো গায়ে মাখো না তোমরা, শেষে যখন আর পথ থাকে না তখন হুঁশ হয়!' সুধাময় জবাব দিল।

সুধাময় যে-সুরে জবাব দিলে তা খুব রুক্ষ কী গম্ভীর মনে হলো না। বরং একটু হাল্কাই লাগল কানে। কিন্তু তবু ঠিক বুঝতে পারছে না বাসনা, ওরা স্বামীস্ত্রী কী বলতে চাইছে।

'তা ঠিক।' কমলা বলছিল। আর শব্দ উঠছিল তার চুড়ির। খুব সম্ভব শুতে যাবার আগে ঘরের কোনো কাজ সারছে কমলা।

'যাক্ শেষ পর্যন্ত যে উনি বুঝেছেন এই যথেষ্ট।' সুধাময় বললে।

'শুধু বোঝেনি, ক'দিন ধরে দেখছো না, কেমন একটু বদলে গেছে। আজকাল মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে অমলেন্দুর সঙ্গে। আগে এক দণ্ড ছোড়দিকে রান্নাঘর কী ভাঁড়ার ঘরের বাইরে বসতে দেখতুম না। এখন তবু খানিক বেড়ায় দুদণ্ড ঘরে শুয়ে থাকে, গল্পের বইটই পড়ে।'

বাসনা রুদ্ধ নিশ্বাসে কমলাদের এই আড়াল-আলোচনা শুনছিল। অমলেন্দুর সঙ্গে ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ানোর কথাটা যে-ভাবে বললে কমলা তাতে বোঝা মুশকিল, আর, অন্য কিছু বলতেও চাইছে কিনা কমলা? বা তার চোখে এটা দৃষ্টিকটু লেগেছে কিনা! যখন শুধু কথাই শোনা যায় কারুর, যে-মানুষটি কথা বলছে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তার গলার স্বর থেকে মানুষটির মনোভাব জানা মুশকিল। মুখ দেখলে সে-মন পড়া যায়, বোঝা যায়। বাসনা কমলার মুখটা দেখবার চেষ্টা করছিল মনে মনে।

'শরীর-টরীর এখন কেমন?' সুধাময় প্রশ্ন করলে।

'এমনিতে আর কি বুঝবো। তবে ভালই বোধ হয়। মন ভাল থাকলে শরীরটাও তো ভাল থাকে।' কমলা যেন ঘরের এক কোণ থেকে সরে প্রায় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তার গলা আরও স্পষ্ট আরও ভাল শোনাচ্ছিল, 'ছোড়দিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে কখনো এতো জাপ্টা-জাপ্টি করতে দেখিনি বাপু। ওর আদর-টাদর সব আলগা আলগা। আজ ক'দিন যেন সে-ছোড়দি আর নেই। মিণ্টুটাকে নিয়ে কী ভীষণ যে চটকাচ্ছিল আজ, আমি তো অবাক।'

একটু চুপ। বাইরে দাঁড়িয়ে বাসনা পর্দাটার দিকে শূন্য স্তব্ধ চোখে চেয়েছিল। হাতের ওপর খানিকটা আঁচল পুঁটলি করে রেখে দুধের বাটিটা বসিয়ে এনেছিল বাসনা, এখন কাপড়টুকু গরম হয়ে হাতে তাত লাগছে।

কমলা বললে আবার, 'যতোই বলো, মেয়েমানুষের নাড়িই আলাদা; ছেলে-পুলে না থাকলে ভরে না। ছোড়দির যদি ছেলেমেয়ে অন্তত একটা থাকত, ও বোধ হয় এতো মনমরা হয়ে থাকত না।'

'তা তো ঠিকই।' সুধাময় জবাব দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল।

সুধাময়ের চটির শব্দ উঠতেই চমকে উঠে বাসনা ডাকল, 'কমলা!'

পর্দা সরিয়ে কমলা পা বাড়াতেই বাসনা বললে, 'এই নে দুধ। উনুনে ছাই পড়ে গিয়েছিল। বসে থেকে থেকে তবে একটু গরম হল। চিনি দিয়ে এনেছি।'

কমলার হাতে বাটিটা দিয়েই বাসনা সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাতি জ্বালল বাসনা। বুকের মধ্যে এখন আর ঢিপ ঢিপ করছে না, কিন্তু আশ্চর্য, কেমন এক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনেই হয় না, এই বুকে কোথাও হাড়, মাংস, রক্ত কোনো কিছু আছে। কিছু নেই যেন। শুধু একরাশ হাওয়া, আর সেই হাওয়া ঠেলে ওঠা পাক দেওয়া ব্যথা।

কমলার চোখ যে আজকাল এতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাসনাকে দেখছে এই যেন প্রথম জানল ও। এখনো অবশ্য ঠিক বুঝতে পারছে না বাসনা, সুধাময়ের কাছে এ-সব কথা বলার কি দরকার পড়ল কমলার। হ্যাঁ, অমলেন্দুর সঙ্গে ক'দিন খানিক ঘোরাঘুরি করেছে বাসনা। কিন্তু এই ঘোরাঘুরি যে তার ভাল লাগছে, কিংবা বাসনার মনে সায় আছে অমলেন্দুর সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোয়, আর এতে তার ভালই হচ্ছে, শরীরের এবং মনের—এ-কথা কি করে বুঝলো কমলা, সুধাময়কেই বা বলতে গেল কেন? সুধাময় তো অন্য কিছু ভাবতে পারে। যদিও মনে হল না তা। তবু! তবু!

অথচ বাসনা চায়নি, জানতেও দেয়নি অমলেন্দুর সঙ্গে পথে বেরুবার ব্যাপারে ওর একটুও গা আছে। বরং বরাবরই ও ভাবখানা এমন রেখেছে যে, অনেকটা যেন দায়ে পড়ে, নেহাতই বাধ্য হয়ে, কমলাদের কথাতেই একটু আধটু ঘোরাঘুরি শুরু করেছিল। তাও নিছক শরীরটার জন্যে অনিচ্ছাসত্বেও, যেমন মানুষে ওষুধ গেলে বিরক্ত হয়ে, তে'তো মুখে উপায় নেই বলেই।

তবে হ্যাঁ, কথাটা তুলতে হয়েছে বাসনাকেই কখনো, কোনো কোনো দিন। রোজ রোজ অমলেন্দুকে দিয়ে কথাটা বলানো ভাল দেখাবে না ভেবে, ইদানীং ক'বারই বাসনাকে কিছু কিছু বলতে হয়েছে, যেমন কিনাঃ যাই বলিস খানিক

ঘোরাঘুরি করলে রাত্তিরে বেশ ঘুম হয় রে, কমলা। কাল তো কী যেন বলে তোদের সেই ইডেন গার্ডেন, সেখানে ঘুরলাম খানিকটা, রাত্তিরে অসাড়ে ঘুমিয়েছি। কোনোদিন-বা বাসনা বলেছে, লজ্জায় আমি মরি, কমলা। অমলেন্দু শুনে হেসেই বাঁচে না। আ, হাসবার কি আছে, আমি কি কলকাতার মেয়ে না ছেলেমানুষ যে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এ-সব দেখিনি বলে ছ্যা ছ্যা করতে হবে। কবে একবার যেন গিয়েছিলাম, তোর সঙ্গেই না, মনেও কি আছে ছাই। তাই নিয়ে কী ঠাট্টাটাই করলে অমলেন্দু।

এ-সব কথা এমন ভাবে বলতো বাসনা যেন তার কোনো বিষয়ে কিছু আগ্রহ নেই। এবং সে চায়ও না চিড়িয়াখানা কী লেক, অথবা মেমোরিয়াল দেখতে গিয়ে তার চক্ষু সার্থক হোক। সবই যেন অমলেন্দু বলছে, অমলেন্দুরই ইচ্ছে।

শুনে কমলা জবাব দিত, ওমা তা বলে তুমি ঘরকুনো হয়ে বসে থাকবে, এ-সব দেখবে না। কলকাতায় থাকো। বাইরে থেকে হাজার হাজার লোক আসে দেখতে আর কলকাতায় থেকে তুমি গেঁয়ো হয়ে থাকবে। যাও না, দেখে এসো। দেখাও হবে, বেড়ানোও হবে।

কাপড় ছেড়ে শোবার জন্যে তৈরি হয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাসনা। ছিটকিনি তুলে দিল। বাতি নিভিয়ে বিছানায় এসে বসল।

না, কথাবার্তা শুনে মনে হলো না, কমলারা খারাপ কিছু ভাবছে, বাসনা ভাবছিল, বরং ওরা যেন একটু খুশীই হয়েছে। আর বোধ হয় এও চায়, বাসনা কিছুদিন ঘুরুক ফিরুক হৈ চৈ আনন্দ গল্পগুজব করুক যাতে কিনা তার মন, কমলাদের যা ধারণা, বাসনার মন ভালো হবে, এই মুষড়ে পড়া ভাবটা কেটে যাবে —আর তাতে, তার ফলে শরীর সেরে যাবে।

কমলারা যে সমস্ত জিনিসটা এতো সহজ এবং সরল মনে দেখছে, ভাবতে এবার ভালই লাগছিল বাসনার। সত্যি, বড় ভালবাসে কমলা তাকে। এবং সুধা-ময়ও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। না করবে কেন? আজ ক'বছর, বিধবা হবার পর থেকেই একরকম, বাসনা ছোটবোনের কাছে রয়েছে। কমলা নিজেই স্বেচ্ছায় তার সংসারে টেনে নিয়েছে বোনকে। কোনোদিন কখনো এতোটুকু দুঃখ দিতে চায়নি। দেয় নি। বাসনার স্বভাব কমলার জানা আছে ভাল করেই। এ-মেয়ে হাল্কা নয়, এর কোনো বেচাল নেই, কখনো একে নিয়ে তোমায় বিপদে পড়তে হবে না। হ্যাঁ, কমলা এ-সব ভাল করেই জানত। জানত আর বিশ্বাস করত। এখনও সেই বিশ্বাস অটুট আছে। কাজেই কমলা কি সুধাময় বাসনার সঙ্গে অমলেন্দুর ঘোরাফেরার মধ্যে কোনো খারাপ কিছু খুঁজে বের করতে যাবে না। ভাবতেই পারবে না প্রথমত যে, বাসনা তার বৈধব্যের পবিত্রতা এবং একনিষ্ঠতা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়েছে, হতে পারে!

এ-সব কথা ভাবলে অবশ্য খারাপই লাগে, মনের মধ্যে গ্লানি জমে ওঠে। নিজেকে ধিক্কারও দেয় বাসনা। কেননা, আজ যাই হোক— যতো বিশ্বাসই থাক—আর কিছুদিন পরে, হয়তো আর একমাস কি বড়জোর দু মাস—তারপর একদিন কমলাদের বিশ্বাসের দৃঢ় সৌধটা হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য ভূমিকম্পে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়বে, ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যাবে। এখন ওরা তা কল্পনা করতে পারছে না।

যতদিন তা না হচ্ছে, আর যতদিন কমলা-সুধাময়ের বিশ্বাস অটুট রয়েছে, ততদিনই বাসনার মঙ্গল। ঈশ্বর করেন, আর কিছুদিন একটা কি দুটো মাস কমলারা অন্ধ হয়েই থাকুক, বিশ্বাসে, ভালবাসায়, শ্রদ্ধায় ওদের চোখের পর্দা ঢাকা থাক।

মনে মনে এই প্রার্থনাটুকু জানিয়ে বাসনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলো, জানলার দিকে মুখ করে।

বাইরেটা অন্ধকার। খুব আবছা-ভাবে দোতলার খোলা বারান্দার আলসেটা চোখে পড়ে। একটা জোনাকি শুধু উড়ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই এক ফোটা নীল আলোর জ্বলা-নেভা, এপাশ ওপাশ ছুটে বেড়ান দেখছিল বাসনা। গালের তলায় একটা হাত, আর-একটা হাত কোমরের ওপর পড়ে রয়েছে। খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছে বাসনা। গায়ে সেমিজ নেই। শুধুই কাপড়। অনেক কদিন ধরে এই অভ্যেস করে ফেলেছে ও। গায়ে কিছু রাখতে পারে না। রাখলে ঘুম হয় না। খস খস করে, হাঁপ ধরে। বিশেষ করে বুক আর পেটটা যেন আঁট লাগে, হাঁসফাঁস করতে থাকে ও।

জোনাকিটা উড়ছিল। এই ওপরে এক কোণে, হঠাৎ টিপ্ করে আরও একটু ওপরে জ্বলে উঠলো, তারপর পাশে, একটু পরে নীচে, আরও নীচে। হঠাৎ একটুর জন্যে যেন উধাও। আবার চোখের সামনে অন্ধকারে জ্বলছে, নিভছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল বাসনা। ভালোই লাগছিল দেখতে। মনে হচ্ছিল এই ঘর এবং ওই বাইরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে আরও একটা জোনাকি জ্বলছে। হ্যাঁ, তার মন; এই চঞ্চল, অস্থির মনটাই যেন আর-এক জোনাকি। অন্ধকারে ও নিস্তব্ধতায় খাপছাড়াভাবে জ্বলছে নিভছে। এক ভাবনা থেকে সরে যাচ্ছে অন্য ভাবনায়, কমলার কথা ভাবতে ভাবতে অমলেন্দুকে মনে পড়ছে, অমলেন্দুর মুখ একটুক্ষণ থাকছে কি থাকছে না, বীথির মুখ ভেসে উঠছে। এবং বীথির কথাও বেশিক্ষণ ভাবা যাচ্ছে না।

অমলেন্দু আর বীথির কথায় সে-

দিনের ঘটনাটা আবার মনে পড়ল এখন হঠাৎ।

বীথি নিজের ঘরে বসে পড়ছিল। পড়ুক না পড়ুক, অন্তত টেবিলের ওপর পিঠ কুঁজো করে বসেছিল। বই খোলা। বাতি জ্বলছে। আর টেবিলের অন্যদিকে চেয়ারে বসে অমলেন্দু।

বাসনা অমলেন্দুকে চা দিতে গিয়েছিল। টেবিলের ওপর পেয়ালাটা নামিয়ে রেখেছে সবে, অমলেন্দু বললে, 'আবার চা, আজ আর চা খাবো না ভেবেছিলাম। অনেকবার খাওয়া হয়ে গেছে। রাত্রে ঘুম হবে না।'

'অনেকবারের সঙ্গে আর একবার

হলে কিছু হবে না, খেয়ে নিন।' বাসনা বললে।

'খাবো!' অমলেন্দু মুখ কাঁচুমাচু করলে, 'তা হলে ওটা আধাআধি করে দিন। বীথি, তুমি অর্ধেকটা নাও।'

'না।' বীথি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'না কেন, নাও না।' অমলেন্দু হাসতে হাসতে বলছিল, 'আধ পেয়ালা চায়ে তোমার কী ক্ষতি হবে!'

বীথি তবু মাথা নাড়ল। বই থেকে মুখ না তুলেই।

'অর্ধেক টর্ধেক ও পছন্দ করে না।' বাসনার হঠাৎ কি যে হলো, হেসে (সত্যি কি বাসনা হেসেছিল, না সে-হাসিতে আর কিছু ছিল)—হেসে বললে পরিহাসের সুরে, 'পুরোটা হ'লে ও পারে।'

এবার বীথি মুখ তুলল। কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেছে। চোখ দুটো ধক্ ধক্ করছিল না বীথির!

'হ্যাঁ। তা পারি।' বীথি কেমন এক দাঁতচাপা অস্ফুট স্বরে জবাব দিলে। দিয়েই মুখ নীচু করলে।

অমলেন্দু একবার বীথি, আর একবার বাসনার দিকে তাকিয়ে কাপটা তুলে নিল।

কথাটা ভোলেনি বীথি। অমলেন্দু চলে যেতে বাসনাকে এসে বললে, 'একটা কথা, ছোড়দি। ও-রকম ঠাট্টা তুমি আমার সঙ্গে করো না। আমি ভালবাসি না।'

'ও, আচ্ছা!' বাসনা চুপ করে গিয়েছিল। অপমানে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল তার। বাসনা ভাবতেও পারেনি, ওইটুকু মেয়ে এমনভাবে তার সামনে এসে শাসাতে পারবে। কিন্তু বীথি পারল। বাসনা এও জানে, ভবিষ্যতে বীথি আরও অনেক কিছু পারবে। রাগটা তার বাসনার ওপরই। বাসনাই না তার মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছে। একদিন বলেছিল অবশ্য, নেবে না। কিন্তু নিল; না নিয়ে পারল না। বীথি তো তা জানে না।

আর একদিনের কথাও মনে পড়ল। আরও আগের ঘটনা। সেই বেলুড়ে বেড়াতে যাবার দিন, বীথি সে-দিন কীভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, দেখছিল তাদের—তাকে আর অমলেন্দুকে। ওরা তখন বাইরে যাচ্ছিল দুটিতে আর বীথি সবে কলেজ থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল। না, বীথি কোনো কথা বলে নি। শুধু জায়গা ছেড়ে পাশ ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল। যদিও একবারের বেশি তাকায় নি বাসনা, তবু বুঝতে পারছিল, দেখতেই যেন পারছিল একটা অসীম ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে আগুনঝরা চোখে মেয়েটা তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে

অবশ্য এ-সবে কিছু আসে যায় না বাসনার। বরং যে-বীথি এতোদিন আঁচলে হীরে বেঁধেছে ভেবে দাম্ভিকের মতন, অত্যন্ত অসার একটা অহমিকায় মাটিতে পা রেখে যেন হাঁটছিল না আর, ফেটে পড়ছিল গর্বে, সেই বীথিকে হীরে আর কাঁচের পার্থক্যটা ভাল মতন বুঝিয়ে দিয়েছে বাসনা। জব্দ শুধু নয়, হারিয়ে দিয়েছে। চুনকালি মাথার মতন লজ্জা, অপমান, ক্ষোভ সব মেখে নিয়ে বীথি গুম হয়ে বসে রয়েছে এখন। আর ওই রোগা কালো মেয়েটার হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরার দুঃসাহসকে চমৎকার ভাবে ব্যর্থ করতে পেরেছে ভেবে খুশীই হয়েছে বাসনা।

বীথির কথাও বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না বাসনা। তলপেটের কোথায় যেন জড়ানো পাকানো ক'টা শিরা কনকন করে উঠতেই কোমর থেকে হাতটা নামিয়ে তালুর চাপ দিয়ে দিয়ে ব্যথাটাকে সরিয়ে দিতে চাইল ও। একটুক্ষণের জন্যে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখলে। খানিক আরাম পাওয়া যায় এতে।

ব্যথাটা সরছিল না। আরও যেন ছড়িয়ে পড়ছিল। বাসনা আজকাল বেশ বুঝতে পারে, পেটের বাঁ-পাশে একটা নাড়ি টনটন করে এমন ব্যথা উঠলেই আর মনে হয় সেই নাড়িটা যেন কেউ খামচে খামচে ধরছে। বেশিক্ষণ বা বেশি জোরে ব্যথাটা উঠলেই সারা গা বমি বমি ক'রে ওঠে। সে-দিন তো রাত্রে খেয়ে ওঠার পর ব্যথাটা ঠেলে উঠলো। সবেই ঘরে এসেছে বাসনা। সামলাতে পারে নি। বমিই করে ফেলল। আগেও করেছে কয়েকবার। প্রতিবারই বমির ক্লান্তির চেয়ে ভয়ে ভাবনায় তার গা হাত মরার মত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এই বুঝি কমলার কাছে ধরা পড়ল। কিন্তু না, কমলা

কোনোদিনই সে-রকম সন্দেহের সামান্য আভাসও দেয় নি। ভয়ে, রাত্রে খাওয়াই প্রায় বাদ দিতে বসেছে বাসনা। কমলাকে বলছে, খাওয়া একটু বেশি হলে অম্বল হচ্ছে, হজম হচ্ছে না, গা গুলোয়। কমলাও তাই বিশ্বাস করে নিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে।

বালিশটা দু'পায়ের মধ্যে রেখে পেটের মধ্যে চেপে ধরে ধনুকের মতন বেঁকে শুলো বাসনা। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে আচ্ছন্নের মতন পড়ে থাকল। আস্তে আস্তে চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে আসছিল। এতোক্ষণ যে মনটা জোনাকির মত টিপ্ টিপ্ করে জ্বলেছে নিভেছে, সেই মনও যেন নিভে আসছে।

নিভে গেল।

এবং অন্ধকার। ঘন। জল বয়ে যাচ্ছিল। জলের তলায় ডুবে থাকলে স্রোত বয়ে যাওয়ার যে-অনুভূতি মাথার মধ্যে সর সর করে যায়, তেমনি।

বাসনা দেখছিল। কী দেখছিল বুঝতে না বুঝতে, মনে রাখতে না রাখতেই সব মিশে গেল, একটা কালো মেঘ যেন আলতো করে ওর মনের ধুলো বালি খড় কুটো সব মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে সরে গেল।

আর বাসনা পড়িমড়ি করে ছুটে আসছিল। বড্ড কাঁদছে ছেলেটা। গলা চিরে দম বন্ধ হয়ে না মরে যায়। সিঁড়ি-টুকু শেষ হয়েছে সবে, গোড়ালি পিছলে গেল, টাল সামলাতে পারল না বাসনা মাথা উল্টে পড়ল। পড়ল তো পড়লই। বাসনা যেন বুঝতে পারছিল, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে পড়ছে। হাত বাড়াতে পারছে না, কিছু ধরতে পারছে না। কী অসহায় ও! শেষপর্যন্ত সিঁড়ির কোণা লাগলো পেটে। ভীষণ জোরে। যেন কেউ একটা কোপ বসিয়ে দিলে কোদালের। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বাসনা। কিন্তু আর সে পড়ল না। শরীরটা উঁচুনীচু হয়ে তাল গোল পাকিয়ে পড়ে থাকল। কেউ এলো না তাকে তুলতে। বাসনার মনে হচ্ছিল তার পা আর পেট সব যেন ভিজে গেছে, ভিজে যাচ্ছে রক্তে।

চোখ চাইতে পারছিল না বাসনা। মনে হচ্ছিল এখনও সে পড়ে আছে সিঁড়ির তলায়। হঠাৎ চোখ চাইল। চেয়ে চমকে উঠল। অন্ধকারের মধ্যেও বালিশ আর চাদর আর নিজের গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো। না, সত্যিই সে পড়ে যায় নি। স্বপ্ন দেখছিল।

বিছানায় বসে বসে বুক ভরে কিছু-ক্ষণ নিশ্বাস নিলে বাসনা। ঘাড় গলা বুক ঘামে ভিজে গেছে। আঁচল দিয়ে মুছল। আ, কী বিশ্রী, বিশ্রী স্বপ্ন। এখনও যেন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে রয়েছে।

পা কাঁপছিল। বাতি জ্বালল বাসনা। জল খেল। আর দেখল। না, কিছু নয়। মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু না। যে বাঁচবার সে বেঁচেই আছে। বাসনার শরীর মধ্যে, সযত্নলালিত হয়ে।

স্বস্তির আর পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাতি নিভিয়ে আবার বিছানায় এসে বসলে বাসনা।

এবং বসে বসে কী ভাবতে গিয়ে তন্ময় হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ, নিজেকে নিজেই অবাক করে দিয়ে বাসনা বুঝল, একটা জমা কান্না ওর বুক ঠেলে গলায় তুলোর মতন পুঁটলি হয়ে হয়ে ছড়িয়ে গেছে। বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদল খানিক, শেষে কান্নাজড়ানো গলায় নিজেকেই বললো, হ্যাঁ বললে, যদি মরি দু-জনেই মরবো। আমার এই এক-দেহের মধ্যে দুটি দেহ থাকবে—আর একটি চিতাই জ্বলবে। আমরা পুড়বো। তুই আর আমি।

বাসনা আশ্চর্য মমতায়, যেন সেই কোমল অঙ্গকেই ও স্পর্শ করতে পারছে, ফুলের মতন নরম একটি অবয়বকে—তার আবরণের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ঘন সুখে ওর গায়ে নেশা নেশা লাগছিল।

ইচ্ছে করছিল বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, মুখে গালে টিপে ধরে সেই রক্ত-পিণ্ডকে। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল বাসনার। দুরন্ত এক পিপাসা—কিসের স্বাদ যেন পেতে চাইছে এই ঠোঁট। এই বুক। কিন্তু সে কোথায়? কবে আলো লাগবে তার চোখে!

হঠাৎ মনে পড়ল কমলার কথা। আজই সুধাময়কে বলছিল: ওর আদর টাদর সব আলগা আলগা। আজ ক'দিন যেন সে-ছোড়দি আর নেই। মিণ্টুটাকে নিয়ে কী ভীষণ যে চটকাচ্ছিল আজ, আমি তো অবাক।

অবাক! কি আছে তোর অবাক হবার? বাসনা ভ্রূকুটি করে যেন জবাব দিচ্ছিল কথাটার, একটু চটকালে কী আদর করলে তোর মেয়ে গলে যাবে না কমলা। ক' মাস পর আর যাচ্ছিও না তোর ছেলেকে চটকাতে। (ক্রমশ)
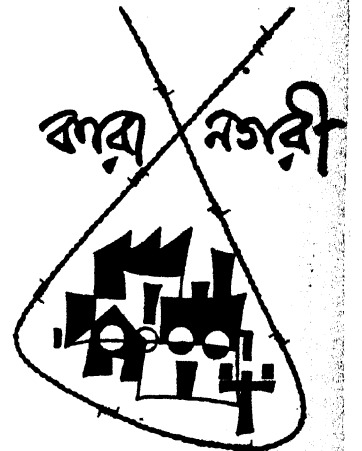
আইফেল টাওয়ার

॥ অভিজিৎ ॥

কলকাতার যেমন মনুমেণ্ট, দিল্লীর যেমন কুতুবমিনার, প্যারিসের তেমনি আইফেল টাওয়ার।

ঠিক ৬৬ বৎসর আগে প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষে গুস্তাভ আইফেল নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার স্বনামখ্যাত সুউচ্চ এই চূড়াটি তৈরি করেন; কেবলমাত্র লোহা দিয়ে। তখনও মজবুত ইস্পাতের জন্ম হয়নি।

প্যারিসের লোকেরা আইফেল টাওয়ারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ১৯২৮ সালে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশন প্যারিসবাসীদের সন্দেহ দূর করতে পারলেন না। তাঁরা রায় দিলেন, যে হারে টাওয়ারের গায়ে মর্চে পড়ছে তাতে আর বেশিদিন নয়; হয়ত সামনের ঝড়েই এই বিরাট টাওয়ার মাটিতে সটান শুয়ে পড়বে।

কমিশনের এই রায়দান সত্ত্বেও এবং বছরে কয়েক হাজার করে নাটবল্টু মর্চে প'ড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আইফেল টাওয়ার প্যারিসের বুকে আজও দাঁড়িয়ে আছে, অচল, অটল। আরও কতকাল থাকবে কে বলতে পারে? অবশ্য এই টাওয়ারকে খাড়া রাখতে বহু মিস্ত্রীকে সারা বছর ধ'রে নিযুক্ত থাকতে হয়।

আইফেল টাওয়ারের আইফেলের পুরো নাম অ্যালেকজাণ্ডার গুস্তাভ আইফেল। বার্গাণ্ডির ডিজন নামে স্থানে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, মারা যান ১৯২৩ সালে। সে সময়ে প্যারিসের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ইকোল সেণ্ট্রালে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ১৮৫৫ সালে লেখাপড়া শেষ করেই কর্ম-জীবন শুরু করেন, একাদিক্রমে তিরিশ বৎসর। প্রথমেই তিনি ঐ আইফেল টাওয়ার খাড়া করবার জন্যে এক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সবচেয়ে উঁচু চূড়ো তিনি খাড়া করবেন। আইফেল আগাগোড়া লোহার পুল তৈরি করে কালক্রমে সারা ইয়োরোপে এবং ইয়োরোপের বাইরে যেখানে ফরাসী সাম্রাজ্য আছে, সর্বত্র অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। পুলের বনেদ তৈরি করতে এবং থাম বসাবার জন্য তিনি অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। আমস্টার্ডাম এবং নাইস তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন এবং পৃথিবীর বহু দেশের ইঞ্জিনীয়ারগণ রেলপথ নির্মাণে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। কিন্তু আইফেল টাওয়ারই তাঁর অতুলনীয় কীর্তি।

আইফেল টাওয়ার

আলেকজান্ডার গুস্তাভ আইফেল

আইফেল টাওয়ারের বিভিন্ন অংশের নক্সাই আঁকা হয়েছিল বড় বড় পাঁচ হাজারখানা কাগজের ওপর। আইফেল টাওয়ারের মোট উচ্চতা হ'ল ৯৮৪ ফুট, আর এর নীচের চারটি পা দাঁড়িয়ে আছে আড়াই একর জমির ওপর, পরস্পরের সংগে তফাৎ হ'ল ৩৩০ ফুট। টাওয়ারটি তৈরি করতে মোট ১৫০০ খণ্ড লোহা এবং পঁচিশ লক্ষ রিভেট ব্যবহৃত হয়েছে। যে পরিমাণ লোহা ব্যবহৃত হয়েছে তার মোট ওজন হ'ল সাত হাজার টন।

আইফেল টাওয়ারে মোট ১৭১০টি সিঁড়ি আছে; ১৯০ ফুট উচ্চতায় একটি রেস্তোঁরা এবং ৩৮১ ফুট উচ্চতায় একটি পানশালা আছে। ৫০০ ফুট উচ্চতায় বেশ প্রশস্ত চত্বর আছে এবং এখানে এক দফা লিফট্ পাল্টাতে হয়। তাছাড়া এখানে নামকরা খবরের কাগজ ফিগারোর একটি ছাপাখানা আছে। এত উচ্চতায় ছাপাখানা রাখবার উদ্দেশ্য কি কে জানে, তবে সামান্য হলেও স্বর্গের কিছু কাছে, সর্বোচ্চ তলায় আইফেল স্বয়ং কিছুকাল তাতে হয়ত "ছাপাখানার ভূতেদের" কিছু তাড়াতাড়ি মোক্ষলাভ হতে পারে। বাস করেছিলেন, সেখানে তিনি ছোট-খাটো কারখানাও বসিয়েছিলেন।

রেডিও চালু হবার পর থেকে ওখান থেকে সময়জ্ঞাপন করা হ'তো এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মার্কিনরা এখানে একটি বেতার কেন্দ্র এবং একটি ক্যাণ্টিন বসিয়েছিলেন। এখনও এখানে একটি বেতার কেন্দ্র আছে, আর নতুন যোগ হয়েছে একটি টেলিভিসন স্টেশন। এখান থেকে এরোপ্লেনকে আলোর সংকেত জানানো হয়। একটি আবহাওয়া স্থির করার কেন্দ্রও এখানে আছে। একদা এক বিখ্যাত ফরাসি মোটরগাড়ি নির্মাতা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সমস্ত টাওয়ারটি ভাড়া নিয়েছিল। টাওয়ারের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়ালে ৫০ মাইল দূর পর্যন্ত দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়।

১৯৫৪ সালে সমস্ত টাওয়ারটি রং করা হয়। এজন্য ৬০জন রং-মিস্ত্রিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাদের তুলি লেগেছিল ১২০০টি আর রং সত্তর হাজার পাউন্ড। রং লাগাতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ জোরে হাওয়া বইলেই টাওয়ারটি দুলতে থাকে, সময় সময় এদিকে বা ওদিকে চার ফুট পর্যন্ত হেলে।

আইফেল টাওয়ারকে উপলক্ষ করে একজন বৈমানিক প্রাইজ জিতে নিয়েছিল। আমেরিকায় রাইট ভাইয়েরা যখন তাদের বাইসাইকেলের কারখানায় এরোপ্লেন তৈরি করবার চেষ্টা করছেন, তখন স্যাণ্টস-ডুমণ্ট নামে একজন ব্রেজিলবাসী প্রোপেলার লাগানো সিগারাকৃতি একটি বেলুন তৈরি করে। বেলুনের মধ্যে সেই দুঃসাহসী যুবক কোনো একস্থানে পেট্রলচালিত একটি ইঞ্জিনও লাগিয়েছিল। এই বেলুনে চড়ে সে আইফেল টাওয়ারকে প্রদক্ষিণ করে উড়ে এসে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেয় এবং বিশ হাজার ডলারের একটি প্রাইজ জিতে নেয়।

খেলায় ফ্রান্সের অপূর্ব অবদান

শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটরা খেলা ভালবাসে। খেলার সাহায্যে যেটুকু ব্যায়াম হয়, তাতে তাদের শরীর পুষ্ট হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এ বিধান প্রকৃতির। তাই খেলায় আছে অতি সহজ আনন্দের অফুরন্ত যোগান। বড়দের কাজ আছে, কাজের খাটুনি আছে, দায় আছে, ভাবনা আছে, নানান সমস্যা আছে। তারি ফাঁকে শরীর, মনকে চাঙ্গা করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা খেলায় নামেন। অন্তত খেলা দেখে সাময়িকভাবে মনটাকে রসিয়ে নেন। কথাটা পুরোপুরি সত্য না হলেও আংশিক সত্য।

এদেশে বুড়োদের মধ্যে কেউ কেউ এক হাত তাস, পাশা, দাবায় বসেন। এতে হাতের পুষ্টিলাভ হোক বা না হোক, মগজে সান পড়ে, মনের একটা খোরাক জোটে। বয়সের সঙ্গে সকলেরই কিছু না কিছু হারাতে হয়েছে। হয়ত শরীর ভেঙ্গেছে। হয়ত স্নেহাস্পদকে হারিয়ে মন ভেঙ্গেছে। হয়ত পালিত হরিণশিশু হারিয়ে রাজা ভরতের মত আর্ত মন করুণভাবে ডাকছে—আয়, আয়, ফিরে আয়।

একালের অলিম্পিক খেলার প্রবর্তক ফ্রান্সের মহামতি বারোঁ পিয়ার দ্য কুবারত্যাঁ

উপন্যাসের পাতায় আমরা জীবনের কথা পড়ি। দোর্দণ্ড-প্রতাপ, বাতে পঙ্গু, বদমেজাজী বুড়ো জমিদার মেঝেয় পাতা গালচের উপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলছেন ছোট্ট নাতিটিকে পিঠের উপরে চাপিয়ে। শরৎবাবুর বৃদ্ধ কৈলাস-চন্দ্র প্রদীপের আলোয় শিশু বিশ্বেশ্বরকে দাবার চাল শিখিয়ে সাকরেদ বানাবার চেষ্টা কচ্ছেন। বলছেন, "বিশু, ঘোড়া আড়াই পা চলে।" অবোধ শিশুকে বোঝাচ্ছেন "না দাদা, এ ঘোড়া গাড়ি টানে না। সে ঘোড়া আলাদা।" খেলাকে তুচ্ছ বল, কিন্তু তার মহিমা উড়াবার নয়।

ছোটদের আবোল তাবোল কথার মত এলেবেলে খেলার মধ্যেও আছে আনন্দ। বাঁধাধরা নিয়মের খেলায় আছে নানান দুরূহ প্যাঁচ, বুদ্ধির চাল, ফিকির-ফন্দি, শারীরিক পটুতা। প্রতিযোগিতার হার-জিতের সাহায্যে খেলার তুলনামূলক দক্ষতা বিচার হয় কে বেশি ভাল! বিধি-নিয়ম মেনে নিয়মিত খেলা—শিক্ষারই নামান্তর। খেলার সততা ও উদারবৃত্তির সাহায্যে চরিত্র ফুটে উঠে। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে দূর-দূরান্তরের মানুষের মধ্যে সহজে যোগ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সব নানাবিধ গুণ থাকায় সভ্য-সমাজে তুচ্ছ খেলা ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে লোকে বুঝেছে, খেলা নিতান্ত সাময়িক, অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নয়। এর মধ্যেও আছে দামী জিনিস—আছে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের উপকরণ—এর ভিত্তিতে আছে ধর্ম, সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ও সত্যনিষ্ঠা।

জনকল্যাণে খেলার দান

খেলার এই কিছু শেষ কথা নয়। খেলার সাহায্যে সারা দুনিয়ার ভবিষ্যতের ভরসাস্থল যুবজনদের আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এ তত্ত্ব ভেবে চিন্তে বের করেছিলেন একজন চিন্তাশীল ফরাসী মনীষী। এঁর নাম বারোঁ পিয়ার দ্য

১৮৯৪ সালের প্রথম নির্বাচিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্যগণ। বাঁদিক থেকে পাঁচজনের পর কুবারত্যাঁ দাঁড়িয়ে

সেকালের লন টেনিস সম্রাজ্ঞী সুজান লংলা

কুবারত্যঁ। ইনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী, লেখক, পর্যটক। বিশ্বের কল্যাণে ইনি করেছিলেন একালের অলিম্পিক খেলার উৎসব ও প্রতিযোগিতার পুনঃপ্রবর্তন। খেলা নিয়ে ফ্রান্সের এই মহান অবদান অভূতপূর্ব, অতুলনীয়, যুগান্তকারী।

অলিম্পিক খেলা প্রতিযোগিতা উৎসবের উদ্ভব হয় গ্রীসে। একেবারে প্রাচীন যুগের কথা। সেকালে গ্রীস ছাড়া ইউরোপের বাকি অংশটা ছিল সম্পূর্ণ অজানা। এদের অলিম্পিক খেলা ধরে বছর গণনা করা হত। খেলার এই উৎসবের কথা মিশে আছে কতক এদের রূপকথায়, কতক পৌরাণিক গল্পে, কতক ইতিকথায়।

কাজ কি সেকালের এই খেলার পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটে? 'দেশ' পত্রিকার পাতায় দুবার খেলার সে আনন্দমেলার খুঁটিনাটি অনেক কথাই বলেছি (দেশ, ১লা ও ৮ই কার্তিক, ১৯৫৯ সাল)। সেকালের সে গ্রীস আর নেই—নেই তার অলিম্পিক খেলার মহোৎসব। এ ছিল প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। খেলার সে আখড়ার কবি ছিলেন পিন্ডার। যথারীতি এর বৈঠক বসেছে বারশো বছর ধরে। এর মধ্যে গ্রীসের হয়েছে উত্থান ও পতন, হয়েছে রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও অবসান।

বা র শো বছর—ইতিহাস-নির্ণীত অতীতের এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও বেশি সময়। এক লাগাড়ে এতকাল পৃথিবীর কোন রাজবংশ আপন আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি, কোনো নিরূপিত সমাজ-ব্যবস্থা, কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত না হয়ে এতকাল একাদিক্রমে টিকে থাকতে পারেনি। এ খেলার উৎপত্তি হয়েছিল ধর্ম থেকে; দেবার্চনা এর ছিল একটা অঙ্গ। ধর্ম নিয়েই এর হল উচ্ছেদ। রোমের কৃশ্চান রাজা হুকুম দিলেন "খেলার ব্যাপারেও এসব পুতুল পুজো চলবে না। মন্দির ভাঙ্গো—বন্ধ কর এসব খেলা।"

রাজার আইন। মন্দির হোল ভূমিসাৎ। বিগ্রহ কিছু সরিয়ে ফেলা হল তুর্কীর রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল-এ। সেখানে এসব ভাঙ্গাচোরা মূর্তির যা-কিছু জড়ো করা হয়েছিল, তাও চুরমার হয়ে গেল ভয়াবহ ভূমিকম্পে। এমনি করে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেকালের অলিম্পিকের বিরাট প্রতিষ্ঠান। যেখানে জড়ো হত চল্লিশ হাজার লোক—গুণী, জ্ঞানী, কবি, কথক, বক্তা, শিল্পীর দল যেখানে ভিড় জমাতেন—সেখানে গজিয়ে উঠল ঘন বন।

ফ্রান্সের টেনিস মাস্কেটিয়ার চতুষ্টয়ের দুইজন, সকলের ছোট অঁরি কশে ও তাঁর বামে রুনিয়ে

নূতন প্রেরণা

বছরের পর বছর কাটল। ইউরোপের চেহারা বদলাল। ক্রমে ক্রমে দেখা দিল যন্ত্রযুগ। সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে উঠল নানান সমস্যা। ধন, দৌলত, চোক-ধাঁধান সভ্যতা, প্রভাব, প্রতিপত্তির প্রসার হল। বাড়লো আতঙ্ক, অশান্তি। চিন্তাশীল মনীষীরা ফিরে তাকালেন অতীতের দিকে। পুরনো অলিম্পিকের রঙ্গভূমিতে খোঁড়াখুঁড়ি চলল। তা থেকে বেরুল কিছু কিছু খেলার কঙ্কাল—এ যুগের নতুন প্রেরণা। নতুন করে শুরু হল অলিম্পিক উৎসব।

সেকালে গ্রীসের চেষ্টা ছিল অলিম্পিক খেলার সাহায্যে নিজের সংস্কৃতিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা; চেষ্টা ছিল এর সাহায্যে তার জনপদ সাম্রাজ্যের শক্তি বাড়ান। একালের অলিম্পিক খেলার ফরাসী প্রবর্তক এই ক্রীড়া মহোৎসবকে লাগিয়েছেন বিশ্ব কল্যাণের কাজে। এখানেই খেলার এই দুই ধারার সবচেয়ে বেশি পার্থক্য। সেকালের অলিম্পিকের বৈঠক গ্রীসের বাইরে বসত না। একালে পালাক্রমে পৃথিবীর নানা দেশের শহরে এর বৈঠক বসে। একাল, সেকাল কেউ কখনও ভাবতেও পারেনি তুচ্ছ খেলা আবার এত বড় কাজে লাগতে পারে, এরও মাহাত্ম্য এত বড় হতে পারে। ফ্রান্সের এ অবদান শুধু অভূতপূর্ব, তুলনাহীন নয়—এ সত্যিই কল্পনাতীত।

একালের অলিম্পিকের প্রবর্তক ফ্রান্সের ঋষিতুল্য সন্তান বারোঁ দ্য কুবারত্যঁর কর্মজীবনের কথা ভাবলে মন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ভরে উঠে। তিনি ছিলেন সত্যিকার নীরব কর্মী। জীবনে চাননি নাম, যশ, অর্থ, মান। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তিনি করেছেন অক্লান্ত সাধনা; পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তি সরিয়ে একনিষ্ঠভাবে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছেন অপূর্ব কীর্তি।

একুশ বছরের সাধনা

একুশ বছর ধরে চলেছিল এই সাধনা। এ সময়টা তাঁর কেটেছে গম্ভীর মনোনিবেশ

চিন্তায়, সুদূর অতীত ও মধ্যযুগের যা কিছু ভাল, তারই সুনিপুণ বিশ্লেষণে, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতির যা কিছু ভাল, তারই আহরণে। এসব করে যা পেয়েছেন বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও পুস্তকে তিনি তাই লিখে গেছেন। তাঁর লেখা "এ ক্যাম্পেন অব্ টোয়েনটি ওয়ান ইয়ার্স", "ট্রান্স-য়্যাটলাণ্টিক য়ুনিভারসিটিস", "মেমরিজ অব আমেরিকা য়্যাণ্ড গ্রীস"—তিনি যে কত মনীষী ছিলেন, তারই ভাল মত পরিচয় দেয়।

অতীতের গ্রীক বা হেলেনিক সভ্যতার আদি কথা হল শরীর ও মনকে এক করে গড়ে তুলতে হবে শক্তি ও সৌন্দর্যের ছন্দে। এর সঙ্গে তিনি সংযোগ করলেন মধ্যযুগের নিষ্কাম শৌর্য ও উদার বীরপনা। তাঁর রচিত অলিম্পিক খেলায় এই সবই আছে। তাই এতে স্থান পেয়েছে শিল্প ও সাহিত্য। এতে নেই পার্থিব লাভের ইতর প্রচেষ্টা।

সব দেশের যুবজনের জন্য অলিম্পিক বৈঠক তৈরি হয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে সবাই এ খেলায় মিলতে পারে। এর প্রীতি, মার্জিত রুচি, উদার নীতির প্রভাবে তারা যেন পরস্পরকে ভাই বলে বুকে টেনে নিতে পারে। এর খেলার খোলা মাঠে ফুটে উঠবে উদার বীরপনা, বলদৃপ্ত দেহসৌষ্ঠব, মার্জিত মনের প্রীতিপদ ছবি। তারই প্রভাবে ছেলেদের সবাইয়ের মনে সহজেই জাগবে প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভ্রাতৃ-বাৎসল্য। এ খেলায় নেই হারাজিতের অভিমান। এ-এক অপূর্ব জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান।

বারোঁ দ্য কুবারত্যাঁ ১৮৯৪ সালে একদিন জাহির করলেন যে, তিনি একালের উপযোগী করে প্রাচীন অলিম্পিক খেলার পুনঃ-প্রবর্তন করবেন। সেদিন তাঁর কথা কেউ কানেও তুলতে চাননি। অনেকেই ভেবেছিলেন, এ হুজুগ দুদিনেই মিলিয়ে যাবে। সেকালের খেলা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এর না ছিল বিশেষ কোন পদ্ধতি, না ছিল শ্রেণী বিভাগ। লোকে খেলত একঘেয়েমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। যারা খেটে খায়, তাদের খেলবার সময় কখন? ছেলেরা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। বাড়িতে বা একটু, যেমন-

ফ্রান্সের তৃতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের রথে লাকস্ত

তেমন খেলাধুলো চলতে পারে।

প্রথম বাধা এল শিক্ষকদের কাছ থেকে। জনসাধারণ রইল উদাসীন। বারোঁ দ্য কুবারত্যাঁ দমবার পাত্র নন। নিজের হাতে তিনি সব করেছেন। টাইপ রাইটার, সেক্রেটারী, প্রকাণ্ড অফিস, এসব তাঁর কিছুই দরকার হয়নি। নিজের হাতে দেশ-দেশান্তরে তিনি চিঠি লিখেছেন, চিঠির জবাব দিয়েছেন—কেরানীর কাজ তিনি নিজেই করেছেন। সঙ্ঘ গড়েছেন। প্রত্যেকটি বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় নেমেছেন। উদ্দেশ্য, কাপ—বা মেডেল জেতা নয়—এসব খেলায় কি অভাব, কোথায় গলদ, বিধি-নিয়মের গণ্ডগোলে কোথায় বিরোধের সম্ভাবনা, তাই খুঁজে বের করা।

এমনি করে খেলার অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি নিজের হাতে অলিম্পিক খেলার লিখে গেছেন সব কিছু আচার-অনুষ্ঠান, আদব-আচরণ, মূলনীতি ও বিধি-নিয়ম। খেলার প্রকৃতি বিচার করে সেগুলোকে বেঁধে দিয়েছেন শ্রেণী-বিভাগ করে। তাঁর পকেট কোনদিনই ভারি ছিল না। চিঠি পাঠানো ও প্রচার খাতে যা কিছু খরচ হল, তা তিনি নিজের পকেট থেকেই করলেন।

এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাতে প্রচুর টাকা লাগে। তা সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত অলিম্পিক আন্তর্জাতিক কমিটির কোন সদস্যই খরচের দাবী করেন না। অলিম্পিক কংগ্রেসের বৈঠক বসে পূর্ব-নিরূপিত বিভিন্ন দেশে। সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত হন নিজের খরচায়। প্রতি-যোগিতা চালাবার জন্য কারো কাছ থেকে বরাদ্দ চাঁদা বা অর্থসাহায্য নেবার ব্যবস্থা

নেই। যদি কোন সদাশয় সদস্য নিজের ইচ্ছায় টাকা দেন, সে অবশ্য আলাদা কথা। ১৮৯৬ সালে এথেন্সে অলিম্পিকের প্রথম বৈঠক হয়ত বাতিল হয়ে যেত, যদি ম'সিয়ে য়্যাডরেফ নামে একজন ধনী গ্রীক নিজের খরচায় স্টেডিয়াম মেরামত করে নতুন করে গড়ে না দিতেন।

বারোঁ দ্য কুবারত্যঁ জগতের মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। সব দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি যে কাজ করে গেছেন, তারই কল্যাণছায়ায় তাঁকে ভাল করে দেখা যায়নি, তাই তাঁর উপরে তাদের নজরও তেমন পড়েনি।

নতুন অলিম্পিক খেলার প্রবর্তনের পরও দুবার পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল। শান্তি প্রতিষ্ঠায় সব দেশের লোক অলিম্পিক উৎসবে নতুন করে দীক্ষা নিয়েছে। কথা উঠেছে কুবারত্যঁ রচিত বিধি-ব্যবস্থার কিছু কিছু রদবদল করা দরকার। কিন্তু আজও তা করা সম্ভব হয়নি। কারণ হয়ত উপযুক্ত মনীষীর অভাব।

লন টেনিস সম্রাজ্ঞী

একদিন টেনিস খেলার জগতে পরম বিস্ময় রচনা করেছিল ফ্রান্সের এক দুলারী মেয়ে। নাম তার সুজান লাংলাঁ। পনের বছর বয়সে উইম্বলডন প্রাধান্য প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় তিনি নেমেছিলেন প্রবীণ অভিজ্ঞ, ঝানু খেলোয়াড় মিসেস লাম্বার্ট চেম্বার্সের বিরুদ্ধে। মেয়েদের প্রতিযোগিতায় এর চেয়ে উচ্চাঙ্গের ও উত্তেজনামূলক খেলা আজও পর্যন্ত দেখা যায়নি। টেনিসের বিশেষজ্ঞরা সবাই এ বিষয়ে একমত। উইম্বলডনের এই প্রাধান্য উপাধিটা সে সময় ছিল যেন মিসেস লাম্বার্ট চেম্বার্সের একচেটে সম্পত্তি। এর আগে তিনি এটা জিতে নিয়েছেন সাতবার।

এবার এই ছোট্ট মেয়েটি তাঁকে সত্যিই নাকানি চোবানি খাওয়ালে। প্রথম সেটটি লাম্বার্ট চেম্বার্সের দখলে আসত যদি তিনি মাত্র আর দুটো পয়েণ্ট জিততে পারতেন। কিন্তু তাঁকে এই সেট হারাতে হল। ফরাসী মেয়েটি জিতলো ১০—৮ মাত্রায়। কিন্তু এইখানেই সংগ্রামের এক রকম নিষ্পত্তি হল না। লাম্বার্ট চেম্বার্স প্রতিপক্ষের নাগাল ধরে নিলেন দ্বিতীয় সেটটি ৬—৪ মাত্রায় জিতে।

এই সময় সকলের মনে হয়েছিল বুঝি বা কুমারী লাংলাঁর দম ফুরিয়ে গেছে। তাকে ব্র্যান্ডি দিয়ে জিয়ানো হল। লাম্বার্ট চেম্বার্স তৃতীয় সেটে ম্যাচ প্রায় হাতের মুঠোর ভিতর এনে ফেললেন। তিনি আগিয়ে আছেন ৬—৫, ৪০—১৫ মাত্রার ব্যবধানে। দুবার ম্যাচ পয়েণ্টে এসেছে। কিন্তু খেলা এত সহজেই নিষ্পত্তি হল না। পরিশেষে কুমারী লাংলাঁর হল জয়। ছোট্ট মেয়েটি তৃতীয় সেটটি জিতলো ৯—৭ মাত্রায়।

মিসেস ডরোথি লাম্বার্ট চেম্বার্স এই উপাধি জিতেছিলেন ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৬, ১৯১০, ১৯১১, ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালের প্রতিযোগিতায়। তারপর এল লাংলাঁর যুগ। চ্যাম্পিয়ানের তালিকায় ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ তাঁর নাম লেখা হল—বাদ শুধু ১৯২৪ সালের প্রতিযোগিতা। সে বছর তিনি খেলেন নি। এই খেলার একজন নামকরা সমঝদার লিখে গেছেন—লাংলাঁর আরও কম বয়সে উইম্বলডনেরে মেয়েদের খেলায় প্রাধান্য অর্জন করতে পারতো, যদি না প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখা হত। জগৎবিখ্যাত টিলডেন টেনিস কোর্টের সম্রাজ্ঞী বলে এই মেয়েটিকে অভিহিত করেছিলেন।

লাংলাঁ টেনিস খেলার বিজয়ীর যে মশাল জ্বালিয়েছিলেন, পরে তাই এসে পড়ল চারজন তরুণ ফরাসী ধুরন্ধরের হাতে। খেলার বিক্রম ও মাধুরীর জন্য এদের জগৎজোড়া নাম—"ম্যাসকেটিয়ার্স"। এই চারজন হলেন যথাক্রমে ১ম জ্যাক বুনিয়ে, ২য় জাঁ বরোত্রা, ৩য় রনে লাকস্ত ও ৪র্থ আঁরি কশে। এ'রা উইম্বলডনের পুরুষের প্রাধান্যের প্রতিযোগিতায় ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সকলকেই করেছিলেন নিষ্প্রভ।

১৯২৬ সাল থেকে তিন বছর আমেরিকায় গিয়ে লাকস্ত ও কুশে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এসেছিলেন। ডেভিস কাপ ফ্রান্সের দখলে থাকে ১৯২৭ সাল থেকে পর পর ছ' বছর।

টিলডেন কশেকে "টেনিস কোর্টের প্রতিভা" বলে অভিহিত করেছিলেন। কশে বয়সে ও মাথায় ম্যাসকেটিয়ার্সদের মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট। যেভাবে ১৯২৭ সালের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় এই ছোট্ট কশে টিলডেনকে হারিয়েছিলেন, তা এই খেলার ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে ভাসছে। সেবার টিলডেনের খেলা যেমন দুর্বার, তেমনি প্রচণ্ড। খেলার নানা অস্ত্র তাঁর হাতে। তাঁর হাতের মার অনেকটা বিদ্যুতের মত। তেমনি চোখ-ধাঁধান, তেমনি গতিবেগ, তেমনি অগ্নিগর্ভ।

খেলা চলছে। এর আগে এ'রা পরস্পরকে একবার হারিয়েছে। তাই এ খেলায় কি হয় দেখবার জন্য আসর খুবই জমেছে। কশের ব্যাক হ্যাণ্ড 'মার' নেই বললেই হয়। টিলডেন খেলায় আগিয়ে চলেছে। প্রথম দুটো সেট ও ম্যাচ প্রায় তাঁর হাতের মধ্যে। সে আগিয়ে আছে ৫—১ গেমে।

কশে কেমন করে খেলার মোড় ঘোরাল, সে কথা আজও কেউ যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারেনি। টিলডেনের যে দম ফুরিয়ে গেল, তা নয়। তাঁর 'মারের' তীব্রতা বা দাপট কিছুমাত্র কমেনি। কিন্তু কশের দুর্জ্ঞেয় চরিত্র খেলায় এনে দিলে এক পরম বিস্ময়। কিছুতেই তাঁকে বাগ মানান গেল না। সে যেন হেরেও হারে না, মরেও মরে না। সে খেলায় সে জয়ী হল।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের ভাল-মন্দ সব কিছু দেখে লিখেছিলেন: "লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর নেই সে ফরাসী মানুষ।" কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে [illegible]

মহাভারতের প্রেমোপখ্যান

ভারত প্রেমকথা—সুবোধ ঘোষ। প্রকাশক —আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ৫, চিন্তামণি দাস সেন, কলিকাতা ৯। মূল্য—৬, টাকা।

কেবল ঐতিহাসিক নয়, পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে গল্প বা উপন্যাস রচনার রীতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে একেবারে লোপ পেয়েছে। যদিও বা ক্বচিৎ কখনো দেখা যায় দু-একটি ছোট গল্পের নায়ক-নায়িকা আর পার্শ্ব চরিত্রের নামোল্লেখে লেখক দেবদেবী বা মুনি ঋষির নাম ববহার করেছেন, তথাপি তাঁরা শ্রদ্ধেয় নন, কারণ হাসির খোরাক জোগাবার উদ্দেশ্যটাই সেখানে প্রধান। সাধারণত জীবনের বিকৃতি ও ব্যর্থতাকে দেখে দুঃখিত হই, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এত বেশী বিকৃতি আর ব্যর্থতা যে, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনধারা আর আমাদের হাসির উদ্রেক করে না। তাই জীবনের এই ব্যর্থতা আমরা মনের আনন্দে এবং যথেচ্ছভাবে বিকৃতরূপে আরোপ করি দেবদেবী আর মুনি ঋষিদের ওপর এবং যেহেতু তাতে আমাদের চিরকালের একটা শ্রদ্ধাপ্লুত ধারণা আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে, সেহেতু মহত্ত্বের সেই বিকৃতি ও ব্যর্থতা দেখে আমরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করি। অভ্যাসে সব কিছুই সহ্য হয় এবং এমন গা-সওয়াই হয়ে যায় যে, প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দেখলেই আমরা যেন নতুন করে আঁতকে উঠি। রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী যখন আধুনিককালে প্রায় বিদ্রূপ আর শ্লেষাত্মক গল্প রচনার উপকরণ হওয়া ছাড়া আর সব গুণই হারিয়ে বসেছে, ঠিক তখনই 'ভারত প্রেম কথা'র আবির্ভাব সাধারণ মানুষের চোখে একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর চিত্রাঙ্গদা'র নাম। দুটি নাটকেরই বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারতের অন্তরঙ্গ, কিন্তু ভাবনা ধারণার আধুনিকতায়, লেখনভঙ্গীর

অভিনবত্বে এ দুটি কাহিনীর একটিও আর পৌরাণিক কাহিনী হয়ে থাকে নি এবং আধুনিক মানুষের স্বতস্ফূর্ত চিন্তাধারার এক একটি প্রকাশ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবশতই কি আমরা তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'চিত্রাঙ্গদা'কে কিংবা ইতিহাসগত 'রাজা ও রাণী' বা 'তপতী', 'রাজর্ষি' বা 'বিসর্জন' অথবা 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' বা 'পরিত্রাণকে' আধুনিক সাহিত্য বলে স্বীকার করে নেবো, নাকি নিঃসংশয়ে আধুনিক মনের অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠেছে বলে তারা আজ আধুনিক সাহিত্য। এ প্রশ্ন আজ আর কোনো বাঙালী পাঠকের কাছেই সমস্যা নয়, তাই যদি দেখি, অন্য কোনো প্রতিভাধর সাহিত্যিক ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় রামায়ণ মহাভারত কিংবা প্রাচীন ইতিহাস থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নয়, নিতান্তই সৎসাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাতে সমানভাবেই সার্থক হয়েছেন, তা হলে তাঁকেও আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। 'ভারত প্রেমকথা'ও যিনি পড়েছেন, তিনিই বুঝবেন, দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টি কৌশলে এ গল্পগুলো এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়েছে, যার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'গান্ধারীর আবেদন' কিংবা 'কচ ও দেবযানী' ছাড়া অন্য কোনো নাম মনে আসে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রচুর সম্ভাবনাময় এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে পাঠকসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্য মনীষী সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষকেই অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিলো। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গী যে কী পরিমাণ সম্ভাবনাময় তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই দিয়েছেন ইয়োরোপের আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক —আঁদ্রে জিদ, হাওয়ার্ড ফাস্ট এবং আরো অনেকে। বিদেশী সাহিত্য পাঠে আর অনুবাদে বাংলাদেশ আজ ছেয়ে গেলো, কিন্তু এদিকে কেন যে আর কারো চোখ পড়লো না সেইটেই বিস্ময়ের বিষয়।

এখানে ঐতিহ্যই প্রধান। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক টি এস এলিয়ট বলেন, সাহিত্যিকের প্রধান এবং সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঐতিহ্য-প্রীতি ও ঐতিহ্য-রক্ষা। এ যাঁর নেই, তাঁর পক্ষে সাহিত্যিক হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। অথচ আশ্চর্য, বর্তমানকালের সাহিত্য ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসটিরই যেন বিশেষ অভাব। তার মানে এই নয় যে, প্রাচীন সমস্ত সংস্কারই ঐতিহ্য এবং ভালোমন্দ মিশিয়ে তার সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করার মধ্যেই ঐতিহ্য-প্রীতি নিহিত। বলা বাহুল্য, এই ঐতিহ্যকেও চিনতে হবে হৃদয়ের উদারতা এবং শিক্ষিত মনের বৈদগ্ধ্য দিয়ে। এ উদারতা এবং এ বৈদগ্ধ্য আছে সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের। তাই শুধু মাত্র 'প্রেমকথা' লিখতে বসেছেন বলে তাঁর দৃষ্টির সংকীর্ণতা ঘটেছে, একথা বললে ভুল বলা হবে, বরং এই থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন, ঐতিহ্যকে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তবে শুধু প্রেমকথাই নয়, সমস্ত জীবন ও চেতনাকেই অখণ্ডভাবে আবিষ্কার করা চলে নতুন ক'রে।

কিন্তু এ-তো গেলো ঐতিহ্যের কথা। পুরনো কথা যা আবহমানকাল থেকে পাঠক মনে প্রচলিত কাহিনীর রূপ নিয়ে বয়ে চলেছে, সুন্দর ভাষায় তারই পুনরাবৃত্তি করলে আর বৈশিষ্ট্য রইলো কি? মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন একটি লোকও কি আছে সমস্ত ভারতবর্ষে! সুতরাং সে কাহিনীই যদি যথাযথভাবে বর্ণনা করলেন লেখক তবে আর তাঁর মূল্য রইলো কোনখানে? এইখানেই সুবোধ ঘোষের প্রকৃত জয়। প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যে যে অভিনবত্ব, যে আধুনিক মানসিকতাকে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই অভিনবত্ব, সেই আধুনিক মানসিকতাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছেন সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ভারত প্রেমকথা'য়। একদিকে যেমন লেখকের অবাধ স্বাধীনতা খর্ব হয়নি, অন্যদিকে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীও মূলত বিকৃত রূপ নিয়ে ঐতিহ্যকে বিদ্রূপ করেনি। 'মনে কি হয় না, সুশোভনার উদ্বেল যৌবনের লীলা চাতুর্যে, লোপামুদ্রার অনৈশ্বর্য প্রেমে, লপিতার স্বার্থসর্বস্ব ভালোবাসায়, সুপ্রভার মহান তিতিক্ষায় আছে চিরকালের নারী হৃদয়ের বিভিন্ন রূপের রূপরেখা? মনে কি হয় না, পরীক্ষিৎ-এর প্রেমের প্রতি ঐকান্তিকতায়, উতথ্যের মনস্তাপে, সংবরণের দ্বৈতসত্তায়, অগ্নির কামলিপ্সায়, গালবের স্বার্থান্বেষণে আজকের বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন মানুষেরই চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে! এমন কি যদি বলি কাহিনী মহাভারতের আশ্রয়ী মাত্র, বস্তুত অখণ্ডকালের কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন লেখক চিরকালের মানব-হৃদয়কে প্রকাশ করারই উদ্দেশ্যে, তা হলে হয়তো কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না।

প্রসঙ্গত, আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে-কোনো পাঠকের নিশ্চয়ই দৃষ্টি এড়াবে না যে, যদিও লেখক পৌরাণিক কাহিনীকেই অবলম্বন করেছেন, তথাপি পৌরাণিক কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কোনো অপ্রাকৃত

কিংবা দৈব ঘটনার অবতারণা করেননি। নিতান্তই যেখানে এমন দু' একটি ঘটনা মূল কাহিনীর অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, শুধু সেখানেই লেখক অত্যন্ত সাবধানে তার অবতারণা করেছেন। ভুলে যান নি, তিনি পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি করতে বসেন নি, এ তাঁর সনিষ্ঠ সাহিত্য কর্মই। সুবোধ ঘোষ সচেতনভাবেই জানেন, পুনরাবৃত্তিতে সাহিত্যের মূল্য নির্ধারিত হয় না, হয় লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। 'ভারত প্রেমকথা' প্রচলিত অপ্রচলিত কাহিনী হলেও তাদের নবতন রূপায়ণে লেখক তাই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে হারাননি। অন্যপক্ষে এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে সাড়ম্বরে প্রচার করতে গিয়ে তিনি মূল কাহিনীর বিকৃতি ঘটিয়েছেন এমন মিথ্যা প্রচার যদি কেউ করতে চান, তাহলে তিনিও ভুল করবেন, কারণ লেখক সে বিষয়েও প্রয়োজনানুরূপ সচেতন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে তিনি পাঠকের প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা দেখাতে চেষ্টা করেননি।

সুবোধ ঘোষের রচনার সঙ্গে যাঁর সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, এ লেখক আকস্মিক। সুবোধ ঘোষ ভাষায় ভঙ্গীতে বাংলা সাহিত্যে প্রথমাবধিই অনন্য। সুতরাং 'ভারত প্রেমকথা'র ভাষায় ও ভঙ্গীতে যদি আবার কোনো নতুনত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে পাঠকেরা বিস্মিত হবেন না, এমন আশা করা অন্যায় নয়। তবুও বলতে বাধা নেই, পাঠক মনের সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের চমকিত করেছেন। 'ভারত প্রেমকথা' পড়লে মনে হবে, এ যেন বাংলা সাহিত্যের সমতল ভূমিতে ভাস্কর্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন একটি সূর্য মন্দির। পাঠককুলের সহনশীল গতানুগতিক ভাষার আশ্রয় যদি করতেন লেখক, তা হলেও হয়তো আমরা বলতাম, চমৎকার! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ গ্রন্থ এ ভাষায় রচিত না হলে যেন একেবারেই মানাতো না। মহাভারতের আকাশচুম্বী ঐতিহ্য ও মহত্ত্বকে রক্ষা করতে গেলে ভাষার এই ঐশ্বর্যেরই প্রয়োজন ছিলো। আমরা আর একবার অবাক হয়ে দেখলাম, বাংলাদেশ দীন হতে পারে, কিন্তু বাংলা ভাষার সম্ভার কত। এ গুপ্তধন আবিষ্কার এখনও বুঝি সম্পূর্ণ হয়নি।

বিজ্ঞান-সাহিত্য

বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্রনাথ সেন; প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর্ দি কালটিভেশন অব্ সায়ান্স, কলিকাতা—৩২। দাম—সাড়ে দশ টাকা।

বিজ্ঞানের ইতিহাস ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রগুলো এক ও অভিন্ন। প্যাস্কেল বলেছেন,—

"The whole succession of men through the ages should be considered as one man, ever living and always learning."

সর্বকালের এই মানুষটির যে পরিচয় 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে তা সম্বর্ধনার যোগ্য। মনে হয় গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় সভ্যতা ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক অগ্রগতির এক প্রামাণ্য সংকলন হিসাবে সমাদৃত হবে। পুস্তকখানির প্রতিটি পরিচ্ছেদে ক্রমবিকাশের মূল্যবান কারণসমূহের সঞ্চয়নে লেখকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুভব করছেন এবং সেই উপলব্ধির তাগিদেই বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রকাশন বাংলা ভাষার পুষ্টি-কল্পে সাম্প্রতিক এক মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত; পর্যায়গুলিতে যথাক্রমে প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের বিকাশ, গ্রীসীয় ও আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং রোমক ও গ্রেকো বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়কে আবার কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত ক'রে লেখক বিবর্তনের পর্যালোচনাকে সুসম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আন্তর্জাতিকতার পরিচয় প্রসঙ্গে এবং তৎপরে একে একে এসেছে মানুষের আবির্ভাব, প্রাচীনত্ব, বংশ পরিচয় এবং বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মানুষের ইতিহাস। সভ্যতার বিকাশের কথাপ্রসঙ্গে ফলিত বিজ্ঞানের প্রতিটি পদক্ষেপের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায়, তা পাঠকসমাজের সাধারণ কৌতূহল নিবারণের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কথা ও লেখা এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমেই সমগ্র জগতের পারস্পরিক সংযোগ তাই লিপি ও বর্ণমালা আবিষ্কারের চিত্তাকর্ষক অধ্যায়ের সংযোজনটি এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের সারবত্তা শতগুণে বর্ধিত করেছে। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তৎসঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীন ক্রমবিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় বিজ্ঞানের কর্মতৎপরতার এক প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থটির এক প্রধান অঙ্গ। সাধারণ কোন বিদেশী বিজ্ঞানেতিহাসের পুস্তকে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানঅবদানের যথেষ্ট আলোচনা স্থানলাভ করে না। অতএব সেই পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় এই প্রচেষ্টার নতুনত্ব যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।

খৃষ্টপূর্ব গ্রীসীয় বিজ্ঞানের যুগকে প্রাচীন বিজ্ঞানেতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার, পিথাগোরাস, এম্পিডক্লিস, ডিমোক্রিটাস, হিপোক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি দিকপাল বিজ্ঞানীরা। প্রকৃতপক্ষে এই যুগেই যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাবিদ্যা এবং আরিস্টটলের জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যার অধিকাংশ স্থলেই যুক্তিসম্মত ফলিত বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়। তথ্যমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রীসীয় ও তৎপরে আলেকজান্দ্রিয় বিজ্ঞানের এক সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান পরিচয় পাঠকবৃন্দ বিজ্ঞানেতিহাসের এই গ্রন্থে পাবেন। রোমক বিজ্ঞানের গ্যালেন

প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ গ্যালেনের চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। গ্যালেনের প্রচলিত মতবাদকে অস্বীকার করতে গিয়ে প্যারাসেলসাস এবং পরবর্তীকালে ভেসেলিয়াসকেও যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছিল। গ্যালেনের চিকিৎসা-শাস্ত্রের এক চিত্তাকর্ষক প্রতিচ্ছবি এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

"হীরোর বলবিদ্যার সবটুকুই অবশ্য ম্যাজিক নয়। উপরিউক্ত নানাবিধ কারসাজির বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বহু আলোচনাও প্রচ্ছন্ন আছে। বাতাস যে এক প্রকার পদার্থ এবং ইহার অস্তিত্ব আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সযত্নে একটি পাত্রকে নীচের দিকে মুখ করিয়া সোজাসুজি জলের মধ্যে ডুবাইবার চেষ্টা করিলে দেখা গেল পাত্রটি ডুবিতেছে না, কিসের যেন বাধা পাইতেছে। তিনি বলিলেন, পাত্রস্থ বায়ু বাহির হইতে না পারিয়া বাধার সৃষ্টি করিতেছে। বায়ুর যে স্থিতিস্থাপকতা আছে, তাহাও তিনি প্রমাণ করেন।" (পৃষ্ঠা—২৪৩)

এই সামান্য উধৃতিই বিজ্ঞানের ইতিহাস পুস্তকের রচনাশৈলীর পরিচয় প্রদান করবে। আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞানের যে কেন বিষয়-বস্তুই বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করা খুবই কঠিন কাজ।

বিজ্ঞানের ইতিহাস মৌলিক অবদান সমন্বিত কোন গবেষণা গ্রন্থ নয়,—এখানে সংকলন ও সম্পাদনের প্রাধান্য অনেক বেশি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির উধৃতি ও যে-কোন ব্যবহারের প্রতি প্রকাশকের শর্ত আরোপ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এর ফলে বিজ্ঞানেতিহাসের চর্চায় পুস্তকখানির ব্যবহার অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে প্রচলনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। বিজ্ঞানেতিহাসের গবেষণা ও চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জর্জ সার্টন এবং তৎসঙ্গে চার্লস সিঙ্গার, হোম-ইয়ার্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা গবেষকগণ তাঁদের কোন পুস্তকেই এ ধরনের শর্ত আরোপ করেছেন বলে আমাদের মনে পড়ে না।

ঠিক এই রকমের বিষয়বস্তুর পরি-প্রেক্ষিতে পুস্তকের প্রয়োজন বাংলা ভাষার বহুদিন থেকেই আছে, সুতরাং সেই অভাব পূরণ করবার সর্বপ্রথম চেষ্টা করে আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন প্রতিষ্ঠান, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর্ দি কালটিভেসন অব্ সায়ান্স বাংলা দেশের সমগ্র পাঠক-সমাজের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

বইখানির ছাপা বাঁধাই খুবই ভালো, মলাট রুচিসম্মত। অজস্র সুদৃশ্য ছবি ও প্লেটের সমাবেশ পাঠকের চোখ ও মন উভয়েরই তৃপ্তিবিধান করবে।

১৫১।৫৫

সমালোচনা সাহিত্য

শরৎচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সপ্তম সংস্করণ। প্রকাশকঃ এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে এই বই বহুকাল ধরে একচ্ছত্র আধিপত্য করেছে। তাতে লেখকের যত গৌরব, ধ... সমালোচনা সাহিত্যের দৈন্য ততই প্রকা... লেখা অতিশয় স্পষ্ট, কোথাও কোথাও বিশ্লেষণও নিপুণ।

বিবিধ

সভ্যতার জয়যাত্রাঃ—শ্রীনীলরতন বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রণীত। অপূর্বকুমার ঘোষ কর্তৃক ২৬।২, নাজির লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ আনা।

বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষণায় ভারতের আধ্যাত্মতত্ত্ব এবং আদর্শের উপযোগিতা সম্বন্ধে পুস্তকখানিতে আলোচনা করা হইয়াছে। আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহ-শীল ব্যক্তিগণ পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

আমরা বাঙালী—শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস।
নবজন্ম—আশাপূর্ণা দেবী।
ছায়া-মারীচ—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
মহাত্মা লালন ফকির—শ্রীবসন্তকুমার পাল।
নিরীক্ষা—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।
অগ্নিস্বাক্ষর—শক্তিপদ রাজগুরু।
দুই মহল—আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
জীবন শিল্পী শেখভ—কাজি আফসার-উদ্দিন আহমদ।

ভ্রম সংশোধন

গতবারে স্বামী শুদ্ধানন্দকে স্বামীজীর শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উল্লেখে কিছু ভুল আছে। সুধীর মহারাজকে স্বামীজী দীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং কাশীধামে এই সন্ন্যাস গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়।

গত ৩৬ সংখ্যা দেশে ইস্ট লাইট বুক হাউসের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মুদ্রাকর প্রমাদবশত প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস 'নতুন দিনের' পরিবর্তে নতুন দিদি মুদ্রিত হইয়াছে।

অতীত গৌরবের [illegible]

সমীরকুমার মিত্র

অমৃতসর থেকে লাহোর—মাত্র ৩৫ মাইল পথ; সোজা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড্ ধরে চলে যাওয়া যেতো এককালে অতি অল্প সময়েই। কিন্তু কালের চাকা ঘুরে গেল ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর। অমৃতসর লাহোরের মাঝামাঝি ওয়াগার উপর দিয়ে সীমারেখা টানা হলো—একদিকে ভারতবর্ষ, অন্যদিকে পাকিস্তান। লাহোর থেকে মাত্র সতেরো মাইল। দুই রাষ্ট্রের আড়াআড়ি বেড়ে যাওয়ায় অবাধ যাতায়াত বন্ধ হ'য়ে পারমিট এবং পরবর্তীকালে পাস্‌পোর্ট চালু করা হ'ল যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে।

পাস্‌পোর্টের বাধা লঙ্ঘন ক'রে লাহোর যাবার কথা স্বপ্নেও মনে হয়নি কখনো; তাই যখন শুনলাম যে, উভয় পাঞ্জাবের পুলিসদলের হকিখেলা উপলক্ষে যাতায়াতের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হবে তখন লাহোরের দর্শনীয়গুলো ভালো ক'রে দেখা যাবে ভেবে আনন্দের সীমা ছিল না।

২১শে এপ্রিল সকালবেলা রওনা হওয়া গেল ওয়াগা সীমান্তের উদ্দেশে। আঠারো মাইল পথ পার হ'তে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগলো না। দলে দলে লোক চলেছে পাকিস্তানে, বেশীর ভাগই তার মধ্যে আমাদের মত, হকিতে যাদের তেমন কোন উৎসাহ নেই। কেউ চলেছে পুরানো ইয়ারদোস্তদের সাথে মিলতে—কেউ বা চলেছে এ ভাঁড়ের তেল ওভাঁড়ে ঢেলে দু' পয়সা কামিয়ে নিতে। সারি সারি লোক এগিয়ে চলেছে বাহারে সিল্ক ও সাটিনের পাগড়ী মাথায়, এমন সুন্দর পাগড়ী তো অমৃতসরে কাউকে বাঁধতে দেখি না সচরাচর। তবে কি বিদেশে নিজে-দের সম্মান উঁচু করার জন্যই এত রঙের সমারোহ? কৌতূহলের নিবৃত্তি হতে বেশী দেরী হ'ল না; দু' পক্ষের কাস্টমসের বাধা পার হয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখা গেল, বেশীর ভাগই পাগড়ী খুলে পরিপাটিরূপে ভাঁজ করে রাখছে। [illegible] বস্ত্রাভাব চরম, তার সুযোগ নিয়ে এরা বেশ কিছু কামিয়ে নেবার সুবিধা পেয়ে পুরোমাত্রায় তার সদ্ব্যবহার করে নিল, যার মনে যা।

ওয়াগা লাহোর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে লাহোর থেকে পাঁচ মাইল পিছনে শিল্পানুরাগী সম্রাট শাহ্‌জাহান্ যে মনোরম উদ্যান নির্মাণ করিয়েছিলেন যেটা 'শালেমার বাগ' নামে সুপরিচিত। ১৬৪২ সালে এই উদ্যান রচনা শেষ হয়। চল্লিশ একর জমির উপর নির্মিত এই প্রমোদকানন তিনটি বিভিন্ন অংশে সম্পূর্ণ। প্রথম অংশে প্রবেশপথের দক্ষিণে ও বামে পাষাণময় পথ সমস্ত উদ্যান বেষ্টন করে এর শেষ পর্যন্ত

শালেমার বাগঃ প্রথম অংশের বামপার্শ্বস্থিত পথপ্রান্তে দ্বিতীয় অংশে অবতরণের সোপান এবং দ্বিতীয় অংশের ফোয়ারাসমন্বিত জলাশয়ের একটি দৃশ্য

শালেমার বাগঃ দ্বিতীয় অংশের জলাশয় ও মর্মর-আসন। এই আসনে সম্রাট শাহ্‌জাহান অবসর যাপন করতেন

লাহোর কেল্লার প্রবেশদ্বার

বিস্তৃত। উদ্যানের মাঝে কচি সবুজ ঘাসের বুকে নাতিদীর্ঘ পাইনের সমারোহ, মাঝে মাঝে গোলাপ এবং অন্যান্য ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। প্রথম অংশ থেকে সোপানশ্রেণী অবরোহণ করে দ্বিতীয় অংশে আসতে হয়। উচ্চতার ব্যবধান চোদ্দ-পনর ফিট—দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের ব্যবধানও চোদ্দ-পনর ফিট। আয়তনে তৃতীয় অংশটিই বৃহত্তম—দীর্ঘ বৃক্ষশীর্ষে সবুজের সমারোহ এখানেই সর্বাধিক। উদ্যানের তিনটি অংশেই বৃক্ষলতা-তৃণের প্রাচুর্য, মধ্যে জলপ্রবাহের অগভীর প্রস্তরপ্রণালী উদ্যানের প্রথম থেকে শেষ অবধি বিস্তৃত। বিভিন্ন যায়গায় জলপ্রণালী থেকে ডাইনে-বাঁয়ে ক্ষুদ্র নালী বের করা হয়েছে—নালীগুলো উদ্যানের দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাদশাহী আমলে বাইরের প্রণালী থেকে বাগের ভিতর জল আনার বন্দোবস্ত ছিল। প্রথম অংশ থেকে দ্রুতপতিত জলকণা কারুকার্যখচিত মর্মরপ্রাচীরের ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়ে দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় অংশে অসংখ্য ফোয়ারা বসানো এক বিরাট জলাশয়ে সেই জল নিয়ে আসা হয়। সমস্ত ফোয়ারাগুলো থেকে উৎক্ষিপ্ত জল যখন নিম্নে জলাশয়ে পতিত হতে থাকে তখন নয়নমুগ্ধকর এক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

জলাশয়ের এক পাশে মর্মরনির্মিত বেদীর উপর সম্রাট শাহ্‌জাহান্ অবসর যাপন করতেন। সে আসন আজও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান।

তৃতীয় অংশে যে পাষাণপ্রাচীর দিয়ে জল নির্গত হয় তার কারুকলা দ্বিতীয় অংশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রতিটি রন্ধ্রের পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। এক সময়ে এই প্রকোষ্ঠগুলি দীপালোকে ঝলমল করতো, জলের উপর তার প্রতিফলন এক অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করতো এই ধরণীর বুকে। কালের প্রবাহে সে দীপমালা আজ নির্বাপিত। যে জলধারা সমস্ত উদ্যানকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখতো সে জলধারা আজ শীর্ণা, ক্ষীণস্রোতা; চৌবাচ্চা আর জলপ্রবাহের নালী আজ শুষ্কপ্রায়। ফোয়ারাগুলো আজ বেদনায় মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে লীলাচঞ্চল দিনগুলো চলে যাবার কালে এদেরও স্তব্ধ ক'রে দিয়ে গেছে।

এসব সত্ত্বেও শালেমার বাগে প্রবেশ করলে বিক্ষিপ্ত মনটা যেন আপনা থেকে স্থির হয়ে আসে; বাইরের প্রাণচাঞ্চল্য আর কলকোলাহল যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে যায়।

শালেমার থেকে বাসে করে লাহোর ফিরলাম। মুঘল যুগ থেকে প্রত্যাবর্তন ইংরেজ যুগে। প্রশস্ত মল্ রোড্—দু' পাশের বৃক্ষসমারোহ তাকে এক অপূর্ব সুষমায় ভরে দিয়েছে। বিরাট এই শহরের চারদিকে সবুজের এত ছড়াছড়ি যে, এর রুক্ষপ্রাষাণ প্রাচীর আর ধূলিধূসর পায়ে চলার পথ চোখে অস্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারে না। এখানকার লরেন্স গার্ডেনস্ সত্যিই অপরূপ। বিরাট এলাকা জুড়ে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের গাছ—তার মধ্য দিয়ে এ'কে বে'কে চলে গিয়েছে পিচবাঁধানো পথ দূরে লতাগুল্মের অন্তরালে। এ অন্তহীন পথের শেষ কোথায়। উদ্যানের এক যায়গায় মাটি জমা করে নকল পাহাড় তৈরী করা হয়েছে —এর নাম সিম্‌লা হিল্‌স্। বৈশাখ-সূর্যের তীব্রদাহে ক্লান্ত হয়ে এর ছায়াঘন বুকে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত শ্রান্তি যেন
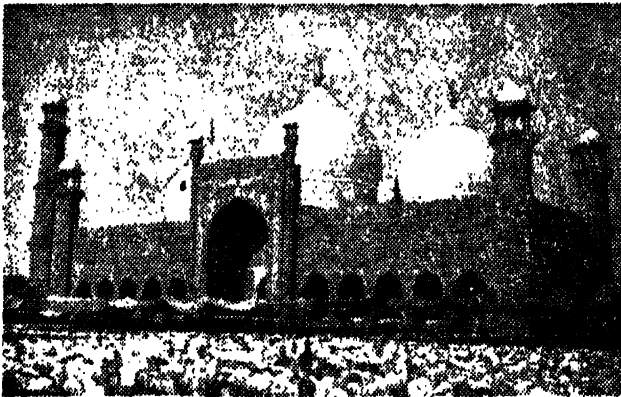
শাহী মস্‌জিদঃ বাঁদিকে মস্‌জিদ সীমার প্রধান চারটি মিনারের একটি

দূরে হয়ে গেল। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন আক্ষেপ করে বললেন—"বুঝি না দিল্লীতে কেন কর্তারা এমন একটা তৈরী করান না।"

সময় সংক্ষেপ। যাত্রা করলাম শহর-বাজারের মধ্য দিয়ে লাহোর কেল্লা আর শাহী মস্‌জিদের দিকে। লাহোর কেল্লার লাগোয়া শাহী মস্‌জিদ। কেল্লা পুরো-পুরি ফৌজের দখলে, ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। বাইরের দর্শনেই তাই তৃপ্ত হ'তে হ'ল। লোকমুখে শুনলাম বাদ-শাহী আমলে লাহোর কেল্লা এবং শালেমার বাগের মধ্যে মাটির নীচে সুড়ঙ্গপথ ছিল। রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্রাটের মহিষীরা সেই পথ দিয়ে প্রমোদ উদ্যানে যাতায়াত করতেন। সে পথ এখন রুদ্ধ।

শাহী মস্‌জিদ নির্মাণ করান সম্রাট ঔরংজীব। পাষাণ নির্মিত প্রায় পনর শ' ফিট সমচতুষ্কোণ বিরাট চত্বর, চারকোণে চারটি বিরাট মিনার; উচ্চতা দু শ' ফিটের কিছুটা বেশী। প্রবেশদ্বার থেকে চত্বর পার হয়ে মস্‌জিদের প্রবেশমুখ। মস্‌জিদের চার কোণে চারটি ছোট মিনার, কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট গম্বুজ। তার দু'পাশে অপেক্ষাকৃত ছোটো আরো দুটো গম্বুজ। বাহুল্যবর্জিত অনাড়ম্বর এই মস্‌জিদ স্রষ্টার চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। কেবল এর বিরাটত্বে মুগ্ধ হতে হয়।

মিনারের শীর্ষে উঠে লাহোরের চারদিক একবার দেখে নিলাম। কেল্লার দুয়ারের উপর উড্ডীন পাকিস্তানের পতাকা, প্রাকারের উপর টহলদারী সশস্ত্র সৈনিকদের আনাগোনা। মস্‌জিদ চত্বরে অসংখ্য লোকের ভীড়—এ'দের বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন।

লাহোর সেণ্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন থেকে রেলপথে পাঁচ মাইল দূরে সাদরা। ট্রেনে করে এবার সেইদিকে অগ্রসর হওয়া গেল। লোকালয়ের জনকোলাহল থেকে দূরে ইরাবতীর তীরে এক শান্ত নির্জন পরিবেশে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত সম্রাট জাহাঙ্গীর আর তাঁর প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহাঁ।

জাহাঙ্গীরের সমাধি নির্মাণ করান সম্রাট শাহ্‌জাহান ১৬৩৭ সালে। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমেই একটি প্রাঙ্গণ পার হ'তে হয়। এই প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে পাষাণময় জল-প্রণালীর আরম্ভ। জলপ্রণালীর দুই পাশে নাতিদীর্ঘ পাইনের সারি—দুই পাশে সরল রক্তিম পথ সমাধিমন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত। পথের দুই পাশে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো, তার মধ্যে আম জাম বিভিন্ন গাছ ছায়া বিছিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। পথ শেষ হয় সমাধিমন্দিরের প্রবেশমুখে। সমাধি-মন্দিরের চার কোণে চারটি অনতিউচ্চ কারুকার্যখচিত মিনার। সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্থলে সম্রাট জাহাঙ্গীর অন্তিম শয্যায় শয়ান। প্রবেশপথ ছাড়াও তিনদিকের মর্মরনির্মিত গবাক্ষপথে আলো প্রবেশ করে। অভ্যন্তরের মর্মর প্রাচীর সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত। বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি একাধিকবার আকর্ষণ করেছে এর মণিমাণিক্য রত্নরাজি—প্রাচীরবক্ষে অপহরণের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।
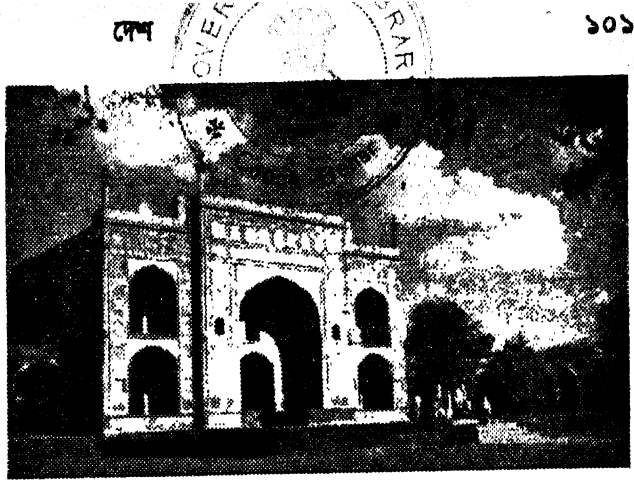
জাহাঙ্গীরের সমাধির শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সকল চাঞ্চল্য যেন স্তব্ধ হয়ে আসতে চায়; দুঃখ জ্বালা যেন কার মঙ্গলস্পর্শে শীতল হয়ে যায়। ইচ্ছা

জাহাঙ্গীর মক্‌বারার (সমাধি) প্রবেশদ্বার
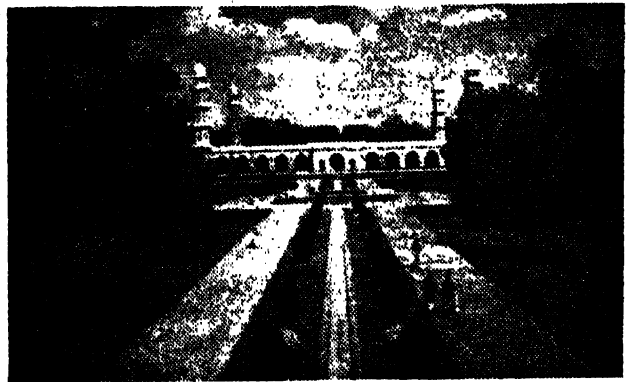
জাহাঙ্গীর সমাধিমন্দির: প্রবেশের পর প্রাঙ্গণ পার হয়ে

হয়, এখানে ঐ পুঞ্জীভূত ছায়ায় সবুজ ঘাসের বুকে আশ্রয় নিই।

'সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।'

জাহাঙ্গীর মকবারা (সমাধি) থেকে অল্প কিছু দূরে সম্রাজ্ঞী নূরজাঁহার সমাধি জাহাঙ্গীরের সমাধির রত্নশোভিত আড়ম্বর আর চাকচিক্যের পাশে বাহুল্য-বর্জিত দ্যুতিহীন নূরজাঁহার সমাধি-মন্দির দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে। এই সমাধিমন্দির সম্রাজ্ঞী নূর-জাঁহা নিজেই নির্মাণ করান ১৬৪৭ সালে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুর পর তাঁকে এই সমাধিমন্দিরে সমাহিত করা হয়। সামান্যতম আড়ম্বর মৃত্যুর পর তাঁকে যেন ভারগ্রস্ত না করে এই ছিল তাঁর কামনা। সমাধিগাত্রে খোদাই করা স্বরচিত একটি ফার্সী কবিতায় আপনার মনোভাব তিনি ব্যক্ত করে গেছেন—

"বা মাজারে মা গরীবা
না চরাগে না গুলে,
না পরে পরওয়ানা সোজে
না সদায়ে বুলবুলে।"

যার ভাবানুবাদ

দরিদ্র আমি, সমাধির পরে মম
জেলো না আলোক দিও না
রঙীন ফুল,
দুঃখের অশ্রু যেন না ঝরায় কেউ
যেন আনন্দে নাহি গায় বুলবুল।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই এ বাড়িটা ভাড়া পেয়ে গেলাম। এতদিন কলকাতায় আছি, শহরের এদিকটায় আসা বড় একটা ঘটত না। এ পাড়ায় চেনা-শোনাও বিশেষ কেউ ছিল না। নতুন জায়গায় এসে দু'চার দিনের মধ্যেই সবাইয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা আমার স্বভাবে নেই। তাই পাঁচ ছ' মাস অনায়াসে কেটে গেল; পাড়ার কারু সঙ্গে আমার ভাব জমলো না।

আমার মেয়ের স্বভাবটি আবার ঠিক উল্টো। কি একটা ছুটিতে হোস্টেল থেকে বাড়ি এসে তিন দিনের মধ্যেই এ-বাড়ি ও-বাড়ির সবাইর সঙ্গে আলাপ করে একেবারে আত্মীয়তা করে ফেললো। কেউ দিদি, কেউ মাসি, কেউ বা দাদা হয়ে গেল। সমবয়সী মেয়েরা এ বাড়ি যাতায়াত করতে লাগলো। আমি ওদের মেসোমশাই হয়ে গেলাম।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে মেয়েটি আসত, তার নাম লিলি। এই মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লাগতো। সুন্দর ফর্সা চেহারা, পাতলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, ভাসা-ভাসা চোখ। লেখাপড়ায় খুব ভাল। ফার্স্ট সেকেণ্ডের নীচে কখনও নামে নি। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

আমাদের সামনের বাড়িতেই থাকে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা উকিল, ব্যাংকশাল স্ট্রীটের ছোট আদালতে প্র্যাক্‌টিস করেন।

লিলি বলত—জানেন মেসোমশাই! ম্যাট্রিক পাস করে আমি আই এ পড়ব। তারপর বি এ। বি এ পাস করে চাকরি করব। আমার ভাই তো কেউ নেই, আমি কাজ না করলে বুড়ো বয়সে বাবা মাকে দেখবে কে?

ওর কাঁচ মুখে এমনি ভারিক্কি কথা শুনতে ভারি মিষ্টি লাগতো। এই লিলি স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলো; ফার্স্ট ডিভিশনে আই এ পাশ করে বি এ ক্লাসে ভর্তি হল। থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠে একদিন ২৫।২৬ বছরের একটি সুদর্শন যুবককে সঙ্গে নিয়ে এসে দুজনে মিলে আমাকে প্রণাম করলো। আমি অবাক হয়ে লিলির সিঁথির দিকে চেয়ে রইলাম। কৈ সিঁদুরের দাগ তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?

আমার বিহ্বল ভাব দেখে লিলি নিজে থেকেই বললে—বিয়ে এখনও হয় নি মেসোমশাই, পরীক্ষার পর হবে।

বললাম—বাঃ খাসা মক্কেলটি পাকড়াও করেছ তো? ছেলে কী করে?

মুচকি হেসে ছেলেটির দিকে কটাক্ষ হেনে মিষ্টি করে লিলি বললে—কিছু করে না। বসে বসে বাপের টাকা ধ্বংস করে। একটি আস্ত ভ্যাগাবণ্ড।

বলেই সগর্বে নতুন ভ্যানিটি ব্যাগটি দেখিয়ে বললে—দেখুন না, মিছিমিছি পঁচিশটি টাকা নষ্ট করে মার্কেট থেকে বাবু এটি কিনে এনেছেন। তাও বুঝতাম যদি নিজের রোজগার হত। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, আই এ এস তো কত ছেলেই পরীক্ষা দেয়, সবাই কি অ'র চাকরি পায়?

বুঝলাম ছেলেটি শুধু সুদর্শনই নয়, গুণীও বটে। আই এ এস পরীক্ষা দিয়ে সিলেক্‌টেড হবার আশা রাখে। খুব ভালো লাগলো লিলির পছন্দ দেখে।

বললাম—কিন্তু লিলি, বি এ পাস করে তোমার না চাকরি নেবার কথা ছিল? বুড়ো বাপ-মাকে এবার কে দেখবে?

ছেলেটির বাহুতে নিজের আঙুল দিয়ে ছোট্ট একটি খোঁচা দিয়ে সলজ্জ হেসে তক্ষুণি লিলি বললে—কেন, এই হাকিম সায়েব?

ক্ষুদে হাকিমটি অপ্রস্তুত হাসি হেসে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে একবার লিলির দিকে আর একবার আমার দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালো।

দেখলাম ছ'টা বাজতে পনের মিনিট বাকী। লিলি অমনি উঠে বললে—আজ উঠি মেসোমশাই, আর একদিন আসব।

বললাম—কোন্ বায়োস্কোপে যাচ্ছ?

লিলি হেসে বললে—রোড টু লাইফ।

ঘরময় খুশি ছড়িয়ে লিলি চলে গেল। কী একটা জারন্যাল পড়ছিলাম, আবার সেটা তুলে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হল প্রবন্ধটা আগাগোড়া পড়েছি, কিন্তু এক বর্ণও মগজে ঢোকে নি। বই-এর পাতায় চোখ রেখে লিলির কথাই এতক্ষণ ভেবেছি।

মাসখানেক পরে লিলি আবার একদিন এল। এবারে একা, মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো; হাতে সেই ব্যাগ।

বললাম—কি খবর লিলি? একা যে?

মুখখানা একটু গম্ভীর করে লিলি বললে—কিছু ভালো লাগছে না, মেসোমশাই, অষুধ-টষুধ কিছু একটা দিন তো।

বললাম—তোমার ঐ ওষুধ তো একটি লোকই জানে। সে কোথায়

শুনে লিলি হেসে ফেললো, মুখখানা যেন একটু রাঙা হল, ভাসা-ভাসা

চোখ দুটি খুশিতে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলো। বললে—আপনার সব সময়েই ঠাট্টা! ওকে ইচ্ছে করেই আনিনি। শরীরটা সত্যি ভারি খারাপ হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। কেমন যেন হয়ে গেলাম, শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তাই ওকে কিছু না বলে একলা আপনার কাছে এসেছি।

এইবার আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। লিলি বলে কী? মনের উদ্বেগ আপন মুখে ফুটে উঠলো। গম্ভীর হয়ে গেলাম। লিলি দেখে ভয় পেয়ে বললে—আমার কি হয়েছে মেসোমশাই?

বললাম—আগে তোমাকে পরীক্ষা করি, তারপর বলছি।

পরীক্ষা করে উদ্বেগ কেটে গেল। মনে হল পেটের গোলমাল থেকেই রক্ত-শূন্যতা হয়েছে, মাথা ঘুরছে। হেসে বললাম—কিচ্ছু ভয় নেই। রক্ত আর স্টুলটা পরীক্ষা করে নিই আগে তারপর তোমার ওষুধের ব্যবস্থা করছি।

রক্ত এবং স্টুল পরীক্ষা করে যা ভেবেছিলাম, সেই এনিমিয়া এবং এমিবা পাওয়া গেল। ওষুধ-পথ্যের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বললাম—শীগ্‌গিরই সেরে যাবে। কিচ্ছু ভেবো না।

লিলি খুশী মনে চলে গেল। তারপর মাস দুই লিলি আর এল না। এক-দিন দুপুরে কাজ সেরে কেবল বাড়ি ফিরেছি, লিলিদের ছোকরা চাকরটা এসে বললে—দিদিমণির খুব অসুখ। এক্ষুণি একবার আসুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ছেলেটি বললে—কালো পাইখানা হচ্ছে।

গিয়ে দেখি, লিলি শুয়ে আছে, মুখখানা হাসি-হাসি, আগেকার সেই পাংশু ভাব মিলিয়ে গিয়ে যেন কিসের একটা উজ্জ্বলতা এসেছে। দেখেই মনে হল কোন কঠিন অসুখ কিছু হয় নি; খুব আশ্বস্ত হলাম।

ওর মা বললেন—কালো পাইখানা দেখে আমরা ঘাবড়ে গেছি। ওর বাবারও এই রকম একবার হয়েছিল; ডাক্তাররা বলেছেন গ্যাস্ট্রিক আলসার। মেয়েটারও বুঝি সেই রোগ হল। স্টুলটা রেখে দিয়েছি, দেখবেন একবার? সকালে উঠেই পেটে খুব ব্যথা; কিছু খেতে পারছে না।

দেখলাম স্টুলটা আলকাতরার মতই কালো, ঠিক যেমন গ্যাস্ট্রিক আলসারের রক্ত ক্ষয় হলে হয়। বললাম—এটা ল্যাব-রেটরীতে পাঠিয়ে দিন। আমি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাচ্ছি।

শুনলাম মাসখানেক ওষুধ খাবার পর লিলি বেশ ভাল ছিল। কলেজে যাচ্ছিল, পড়াশুনাতেও মন বসেছিল। তবে ইদানীং খাওয়া-দাওয়াটা বাঁধা-ধরা নিয়মে না করে আগের মত ঝালটাল সব খাচ্ছিল। তাইতেই বোধ হয় পেটে ব্যথা হয়ে আজ এই কাণ্ড।

লিলিকে বললাম—একটু ভাল হয়ে উঠেই যেমন লাফালাফি করেছিলে এইবার তার শাস্তি নাও। সাতদিন বিছানা থেকে উঠতে পাবে না। এই সব ওষুধ ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিসেব করে খেতে হবে, ঝাল লঙ্কা আর জীবনে খেতে পাবে না।

লিলি বললে—এখন না হয় নাই খেলাম। ভাল হলে তো খেতে পাব?

ওর মা বললেন—ঝাল লঙ্কা না হলে মেয়ের রোচে না। কিছুই খেতে চায় না।

বললাম—এইরকম তো চলুক এখন, ভাল হলে তখন দেখা যাবে।

স্টুল পরীক্ষা করে রক্ত পাওয়া গেল। আগে যে অ্যামিবা পাওয়া গিয়েছিল, এবারে সে সব কিছুই পাওয়া গেল না। গ্যাস্ট্রিক আলসারের যা পথ্য সেই দুধ, গলা ভাত আর সেদ্ধ মাছ খাবার ব্যবস্থা দিয়ে বললাম—শিগ্‌গিরই সেরে যাবে।

মাসখানেকের মধ্যেই লিলি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলল—আমি এখন তো বেশ সেরে গেছি, আর কতদিন দুধ-ভাত খাব?

বললাম—আরও দু' মাস।

লিলি বললে—দু' মাস পরে ঝাল খেতে পাবো তো?

বললাম—যদি ভাল থাক নিশ্চয়ই পাবে।

সেই থেকে লিলি প্রায়ই আসত। রোজ প্রায় এক সের করে দুধ খেত, চেহারাও বেশ ফিরে গেল। একদিন বললে—মেসোমশাই, আর এত দুধ খেতে পারছি না। এইবারে ঝাল-তরকারি খাই? একটু ডালমুট?

বললাম—আগে একবার এক্স-রে করে পেটটা দেখি। যদি সেরে গিয়ে থাকে তখন সব খেতে দেব।

লিলি বললে—ওরে বাব্বাঃ, এক্স-রেতে তো শুনেছি অনেক টাকা লাগে। না—না, ওসব হাঙ্গামা করবেন না। আমি তো বেশ আছি। মিছিমিছি অত খরচা করে কি হবে?

বললাম—তা হলে ঐ দুধ-ভাতই খেতে হবে। পারবে?

লিলির হাসি-হাসি মুখখানা নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। অভিমানে ভাসা-ভাসা চোখ দুটি ছল্‌ছলে করে বললে—আপনি ভয়ানক নিষ্ঠুর। খালি সেদ্ধ ভাত আর দুধ খেয়ে কেউ বাঁচে?

তারপর অনেকদিন লিলি এল না। একদিন দেখলাম, কলেজ থেকে ফেরার পথে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খুব হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলতে বলতে চলেছে। বুঝলাম শরীর বেশ সুস্থ আছে। দেখতে দেখতে ওদের টেস্ট হয়ে গেল; ফাইনাল পরীক্ষার আর মাস-খানেক বাকী, এমনি সময় একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম লিলিদের বাড়ি থেকে ৪।৫ বার লোক এসে ডেকে গেছে, ওর শরীর নাকি খুব খারাপ।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, আবার লিলির কালো পাইখানা হয়েছে, ব্যথা হচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। মুখখানা দেখেই

মনে হল খুব কষ্ট হচ্ছে। রাত্রির মত মরফিয়া ইন্জেক্শন করে পরদিন সকালে গিয়ে দেখলাম লিলি অনেকটা সামলেছে। সারা রাত্রি ঘুমিয়েছে তবু এখনও চোখে ঘুম যেন লেগে আছে। আমাকে দেখে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—মেসোমশাই, পরীক্ষা দিতে পারব তো?

বললাম—নিশ্চয় পারবে। এখন ভাল করে ঘুমোও। বলে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে কনুই-এর সামনে উপশিরার ভেতর গ্লুকোজ ইন্জেক্শন করে চলে এলাম।

এবারও লিলি দিন সাতেকের মধ্যে সেরে উঠলো। ওর বাবাকে বললাম—বার বার কালো পাইখানা হচ্ছে, একটা এক্স-রে না করালে তো আর চলছে না।

ভদ্রলোক বললেন—মাস খানেকের মধ্যেই তো ওর পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন করালে কি খুব ক্ষতি হবে? আমার দেখুন সেই একবারই ওরকম হয়েছিল, তারপর এই বছর দুই তো বেশ ভাল আছি।

বললাম—যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। শরীর যদি ভাল থাকে পরীক্ষার পরেই না হয় করাবেন।

দেখতে দেখতে লিলির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। শেষ দিন পরীক্ষা দিয়ে এসে শরীরটা কি রকম খারাপ লাগলো, রাতে কিছু খেতে চাইল না। ওর মা জোর করে একটু দুধ খাওয়ালেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পেটে ব্যথা শুরু হল। এত ব্যথা বিছানা ছেড়ে উঠতে পর্যন্ত পারে না।

ভোরবেলা বেরুবার মুখে ওর বাবা এসে এই খবর দিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, লিলি আর সে লিলি নেই। একদিনেই কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। অমন ভাসা-ভাসা চোখ দুটি গর্তে ঢুকে গেছে, চোখে কালি পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে লিলি?

আমার দিকে একবার তাকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ক্ষীণ কণ্ঠে লিলি বললে—বড্ড ব্যথা।

বুঝলাম ব্যথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে এত ব্যথা। পাশে বসে ওর নাড়ী দেখলাম। গ্যাস্ট্রিক আলসার থেকে রক্তক্ষয় হলে যা হয়, দেখলাম নাড়ীর গতি ঠিক তাই। পেটে হাত দিলাম। কিন্তু একি? এ তো গ্যাস্ট্রিক আলসার নয়? এ যে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্! আগে তো কখনও এ রকম লিলির হয় নি? পেটটাও একটু ফেঁপেছে; মনে হচ্ছে যেন পেরিটো-নাইটিস্ হচ্ছে। কি সর্বনাশ! এক্ষুণি যে হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন করা দরকার।

পরীক্ষা শেষ করে অন্য ঘরে এসে লিলির বাবা মাকে এই কথা বললাম।

শুনে ওঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। ওর মা শুধু বললেন—বলেন কি? অপারেশন? কেন?

বুঝিয়ে বললাম, এখন যা অবস্থা তাতে অপারেশন করানোই ভালো। ওর বাবা বললেন—হাসপাতালে নেবার আগে একজন সার্জন দেখিয়ে নিলে হয় না?

বললাম—খুব ভাল হয়। কিন্তু যাঁকেই দেখানো হোক, তাড়াতাড়ি করে দেখাতে হবে। দেরি করলে চলবে না। বিকেলের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া চাই-ই।

বলে পেনিসিলিন, গ্লুকোজ, এট্রো-পিন ইত্যাদি ইনজেকশন দিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলাম। দুপুরে বাড়ি ফিরতেই ওর বাবা এসে বললেন—আমাদের চেনা যিনি বড় সার্জন তাঁকে আজকে পাওয়া যাবে না। কাল তিনি হয়ত আসতে পারেন।

বললাম—তাহলে অন্য সার্জন দেখান হোক।

ভদ্রলোক বললেন—আপনিই তাহলে কাউকে দেখান। কাকে দেখাবেন?

ভেবে দেখলাম, এক্ষুণি এনে দেখান যায় এমন চেনা শোনা একটি সার্জনই আছেন। কাছেই তাঁর চেম্বার। নাম-করা সার্জন। স্থানীয় এক মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর প্রফেসর। ছুটলাম তাঁর কাছে।

গিয়ে দেখি, তিনি হাসপাতালের কাজ সেরে সবে চেম্বারে ফিরে লাঞ্চ খাচ্ছেন। খেতে খেতেই কেসটা আগা-গোড়া সব শুনে খাওয়া শেষ করে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। লিলিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে হাত ধুয়ে পাশের ঘরে এসে বললেন—তোমার ডায়াগনোসিস নির্ভুল। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই থেকে খানিকটা পেরিটো-নাইটিসও হয়েছে। পালস্টা খুব ভাল। এক্ষুণি অপারেশন না করে কিছুক্ষণ ওয়াচ্ করা চলবে।

বললাম—সেই জন্যই তো সময় থাকতে হাসপাতালে পাঠাতে চাইছি। যাতে ওরা ওয়াচ্ করে দরকার হলে সময়-মত অপারেশন করতে পারে।

সার্জন বললেন—বেশ, সে হলে তো খুবই ভালো। যদি আমাদের হাসপাতালে দাও, আমাকে ফোন করো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

শুনে লিলির বাবা বললেন, কাছেই যে আর একটি বড় হাসপাতাল আছে, সেখানে পাঠালে কেমন হয়? বললাম—খুব ভালো হয়। ওখানকার সার্জনও খুব নাম-করা। যিনি ভর্তি করবেন, তিনিও আমার চেনা, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। ওখানে ভর্তি করলে তাঁকেও আমি চিঠি লিখে দিতে পারি।

হাসপাতালে ভর্তি করা হবে শুনে

চোখ দুটি খুশিতে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলো। বললে—আপনার সব সময়েই ঠাট্টা! ওকে ইচ্ছে করেই আনিনি। শরীরটা সত্যি ভারি খারাপ হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। কেমন যেন হয়ে গেলাম, শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তাই ওকে কিছু না বলে একলা আপনার কাছে এসেছি।

এইবার আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। লিলি বলে কী? মনের উদ্বেগ আপন মুখে ফুটে উঠলো। গম্ভীর হয়ে গেলাম। লিলি দেখে ভয় পেয়ে বললে—আমার কি হয়েছে মেসোমশাই?

বললাম—আগে তোমাকে পরীক্ষা করি, তারপর বলছি।

পরীক্ষা করে উদ্বেগ কেটে গেল। মনে হল পেটের গোলমাল থেকেই রক্ত-শূন্যতা হয়েছে, মাথা ঘুরছে। হেসে বললাম—কিচ্ছু ভয় নেই। রক্ত আর স্টুলটা পরীক্ষা করে নিই আগে তারপর তোমার ওষুধের ব্যবস্থা করছি।

রক্ত এবং স্টুল পরীক্ষা করে যা ভেবেছিলাম, সেই এনিমিয়া এবং এমিবা পাওয়া গেল। ওষুধ-পথ্যের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বললাম—শীগ্‌গিরই সেরে যাবে। কিচ্ছু ভেবো না।

লিলি খুশী মনে চলে গেল। তার-পর মাস দুই লিলি আর এল না। এক-দিন দুপুরে কাজ সেরে কেবল বাড়ি ফিরেছি, লিলিদের ছোকরা চাকরটা এসে বললে—দিদিমণির খুব অসুখ। এক্ষুণি একবার আসুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ছেলেটি বললে—কালো পাইখানা হচ্ছে।

গিয়ে দেখি, লিলি শুয়ে আছে, মুখখানা হাসি-হাসি, আগেকার সেই পাংশু ভাব মিলিয়ে গিয়ে যেন কিসের একটা উজ্জ্বলতা এসেছে। দেখেই মনে হল কোন কঠিন অসুখ কিছু হয় নি; খুব আশ্বস্ত হলাম।

ওর মা বললেন—কালো পাইখানা দেখে আমরা ঘাবড়ে গেছি। ওর বাবারও এই রকম একবার হয়েছিল; ডাক্তাররা বলেছেন গ্যাস্ট্রিক আলসার। মেয়েটারও বুঝি সেই রোগ হল। স্টুলটা রেখে দিয়েছি, দেখবেন একবার? সকালে উঠেই পেটে খুব ব্যথা; কিছু খেতে পারছে না।

দেখলাম স্টুলটা আলকাতরার মতই কালো, ঠিক যেমন গ্যাস্ট্রিক আলসারের রক্ত ক্ষয় হলে হয়। বললাম—এটা ল্যাব-রেটরীতে পাঠিয়ে দিন। আমি ইন্‌জেক্‌-শন দিয়ে যাচ্ছি।

শুনলাম মাসখানেক ওষুধ খাবার পর লিলি বেশ ভাল ছিল। কলেজে যাচ্ছিল, পড়াশুনাতেও মন বসেছিল। তবে ইদানীং খাওয়া-দাওয়াটা বাঁধা-ধরা নিয়মে না করে আগের মত ঝালটাল সব খাচ্ছিল। তাইতেই বোধ হয় পেটে ব্যথা হয়ে আজ এই কাণ্ড।

লিলিকে বললাম—একটু ভাল হয়ে উঠেই যেমন লাফালাফি করেছিলে এইবার তার শাস্তি নাও। সাতদিন বিছানা থেকে উঠতে পাবে না। এই সব ওষুধ ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিসেব করে খেতে হবে, ঝাল লঙ্কা আর জীবনে খেতে পাবে না।

লিলি বললে—এখন না হয় নাই খেলাম। ভাল হলে তো খেতে পাব?

ওর মা বললেন—ঝাল লঙ্কা না হলে মেয়ের রোচে না। কিছুই খেতে চায় না।

বললাম—এইরকম তো চলুক এখন, ভাল হলে তখন দেখা যাবে।

স্টুলে পরীক্ষা করে রক্ত পাওয়া গেল। আগে যে অ্যামিবা পাওয়া গিয়েছিল, এবারে সে সব কিছুই পাওয়া গেল না। গ্যাস্ট্রিক আলসারের যা পথ্য সেই দুধ, গলা ভাত আর সেদ্ধ মাছ খাবার ব্যবস্থা দিয়ে বললাম—শিগ্‌গিরই সেরে যাবে।

মাসখানেকের মধ্যেই লিলি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলল—আমি এখন তো বেশ সেরে গেছি, আর কতদিন দুধ-ভাত খাব?

বললাম—আরও দু' মাস।

লিলি বললে—দু' মাস পরে ঝাল খেতে পাবো তো?

বললাম—যদি ভাল থাক নিশ্চয়ই পাবে।

সেই থেকে লিলি প্রায়ই আসত। রোজ প্রায় এক সের করে দুধ খেত, চেহারাও বেশ ফিরে গেল। একদিন বললে—মেসোমশাই, আর এত দুধ খেতে পারছি না। এইবারে ঝাল-তরকারি খাই? একটু ডালমুট?

বললাম—আগে একবার এক্স-রে করে পেটটা দেখি। যদি সেরে গিয়ে থাকে তখন সব খেতে দেব।

লিলি বললে—ওরে বাব্বাঃ, এক্স-রেতে তো শুনেছি অনেক টাকা লাগে। না—না, ওসব হাঙ্গামা করবেন না। আমি তো বেশ আছি। মিছিমিছি অত খরচা করে কি হবে?

বললাম—তা হলে ঐ দুধ-ভাতই খেতে হবে। পারবে?

লিলির হাসি-হাসি মুখখানা নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। অভিমানে ভাসা-ভাসা চোখ দুটি ছল্‌ছলে করে বললে—আপনি ভয়ানক নিষ্ঠুর। খালি সেদ্ধ ভাত আর দুধ খেয়ে কেউ বাঁচে?

তারপর অনেকদিন লিলি এল না। একদিন দেখলাম, কলেজ থেকে ফেরার পথে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খুব হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলতে বলতে চলেছে। বুঝলাম শরীর বেশ সুস্থ আছে। দেখতে দেখতে ওদের টেস্ট হয়ে গেল; ফাইনাল পরীক্ষার আর মাস-খানেক বাকী, এমনি সময় একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম লিলিদের বাড়ি থেকে ৪।৫ বার লোক এসে ডেকে গেছে, ওর শরীর নাকি খুব খারাপ।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, আবার লিলির কালো পাইখানা হয়েছে, ব্যথা হচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। মুখখানা দেখেই

মনে হল খুব কষ্ট হচ্ছে। রাত্রির মত মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন করে পরদিন সকালে গিয়ে দেখলাম লিলি অনেকটা সামলেছে। সারা রাত্রি ঘুমিয়েছে তবু এখনও চোখে ঘুম যেন লেগে আছে। আমাকে দেখে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—মেসোমশাই, পরীক্ষা দিতে পারব তো?

বললাম—নিশ্চয় পারবে। এখন ভাল করে ঘুমোও। বলে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে কনুই-এর সামনে উপশিরার ভেতর গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন করে চলে এলাম।

এবারও লিলি দিন সাতেকের মধ্যে সেরে উঠলো। ওর বাবাকে বললাম—বার বার কালো পাইখানা হচ্ছে, একটা এক্স-রে না করালে তো আর চলছে না।

ভদ্রলোক বললেন—মাস খানেকের মধ্যেই তো ওর পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন করালে কি খুব ক্ষতি হবে? আমার দেখুন সেই একবারই ওরকম হয়েছিল, তারপর এই বছর দুই তো বেশ ভাল আছি।

বললাম—যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। শরীর যদি ভাল থাকে পরীক্ষার পরেই না হয় করাবেন।

দেখতে দেখতে লিলির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। শেষ দিন পরীক্ষা দিয়ে এসে শরীরটা কি রকম খারাপ লাগলো, রাতে কিছু খেতে চাইল না। ওর মা জোর করে একটু দুধ খাওয়ালেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পেটে ব্যথা শুরু হল। এত ব্যথা বিছানা ছেড়ে উঠতে পর্যন্ত পারে না।

ভোরবেলা বেরুবার মুখে ওর বাবা এসে এই খবর দিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, লিলি আর সে লিলি নেই। একদিনেই কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। অমন ভাসা-ভাসা চোখ দুটি গর্তে ঢুকে গেছে, চোখে কালি পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে লিলি?

আমার দিকে একবার তাকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ক্ষীণ কণ্ঠে লিলি বললে—বড্ড ব্যথা।

বুঝলাম ব্যথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে এত ব্যথা। পাশে বসে ওর নাড়ী দেখলাম। গ্যাস্ট্রিক আলসার থেকে রক্তক্ষর হলে যা হয়, দেখলাম নাড়ীর গতি ঠিক তাই। পেটে হাত দিলাম। কিন্তু একি? এ তো গ্যাস্ট্রিক আলসার নয়? এ যে অ্যাপেণ্ডি-সাইটিস্! আগে তো কখনও এ রকম লিলির হয় নি? পেটটাও একটু ফেঁপেছে; মনে হচ্ছে যেন পেরিটো-নাইটিস্ হচ্ছে। কি সর্বনাশ! এক্ষুণি যে হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন করা দরকার।

পরীক্ষা শেষ করে অন্য ঘরে এসে লিলির বাবা মাকে এই কথা বললাম।

শুনে ও'রা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। ওর মা শুধু বললেন—বলেন কি? অপারেশন? কেন?

বুঝিয়ে বললাম, এখন যা অবস্থা তাতে অপারেশন করানোই ভালো। ওর বাবা বললেন—হাসপাতালে নেবার আগে একজন সার্জন দেখিয়ে নিলে হয় না?

বললাম—খুব ভাল হয়। কিন্তু যাঁকেই দেখানো হোক, তাড়াতাড়ি করে দেখাতে হবে। দেরি করলে চলবে না। বিকেলের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া চাই-ই।

বলে পেনিসিলিন, গ্লুকোজ, এট্রো-পিন ইত্যাদি ইনজেকশন দিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলাম। দুপুরে বাড়ি ফিরতেই ওর বাবা এসে বললেন—আমাদের চেনা যিনি বড় সার্জন তাঁকে আজকে পাওয়া যাবে না। কাল তিনি হয়ত আসতে পারেন।

বললাম—তাহলে অন্য সার্জন দেখান হোক।

ভদ্রলোক বললেন—আপনিই তাহলে কাউকে দেখান। কাকে দেখাবেন?

ভেবে দেখলাম, এক্ষুণি এনে দেখান যায় এমন চেনা শোনা একটি সার্জনই আছেন। কাছেই তাঁর চেম্বার। নাম-করা সার্জন। স্থানীয় এক মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর প্রফেসর। ছুটলাম তাঁর কাছে।

গিয়ে দেখি, তিনি হাসপাতালের কাজ সেরে সবে চেম্বারে ফিরে লাঞ্চ খাচ্ছেন। খেতে খেতেই কেসটা আগা-গোড়া সব শুনে খাওয়া শেষ করে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। লিলিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে হাত ধুয়ে পাশের ঘরে এসে বললেন—তোমার ডায়াগনোসিস নির্ভুল। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই থেকে খানিকটা পেরিটো-নাইটিসও হয়েছে। পালস্‌টা খুব ভাল এক্ষুণি অপারেশন না করে কিছুক্ষ ওয়াচ্ করা চলবে।

বললাম—সেই জন্যই তো সময় থাকতে হাসপাতালে পাঠাতে চাইছি যাতে ওরা ওয়াচ্ করে দরকার হলে সময়-মত অপারেশন করতে পারে।

সার্জন বললেন—বেশ, সে হলে তো খুবই ভালো। যদি আমাদের হাসপাতালে দাও, আমাকে ফোন করো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

শুনে লিলির বাবা বললেন, কাছেই যে আর একটি বড় হাসপাতাল আছে, সেখানে পাঠালে কেমন হয়? বললাম—খুব ভালো হয়। ওখানকার সার্জনও খুব নাম-করা। যিনি ভর্তি করবেন, তিনিও আমার চেনা, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। ওখানে ভর্তি করলে তাঁকেও আমি চিঠি লিখে দিতে পারি।

হাসপাতালে ভর্তি করা হবে শুনে

লিলিদের আরও কয়েকজন আত্মীয় এসে পড়লেন। সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক হল, কাছের ঐ বড় হাসপাতালেই ভর্তি করা ভালো হবে। আমি কি চিকিৎসা করেছি, সব লিখে যিনি ভর্তি করবেন, তাঁর নামে একটা চিঠি লিখে দিলাম।

বিকেল বেলা অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে ওরা লিলিকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি, লিলির বাবা বসে আছেন। বললেন—হাসপাতালে ভর্তি হতে কোন অসুবিধা হয়নি। আপনার চিঠি পড়ে আর রুগী পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, এটা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ই বটে, তবে অপারেশন কখন করা হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। আপনি যে ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন, তাতে ব্যথা অনেক কমে গেছে, তাই ও'রা আরও কয়েক ঘণ্টা দেখবেন। সন্ধ্যের পর একজন বড় সার্জন এসে দেখে গেছেন, তিনিও বলেছেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্। রাত্রে হয়ত অপারেশন দরকার হতে পারে। আপনাকে খবর দিয়ে আবার হাসপাতালে যাচ্ছি।

বললাম—সময় থাকতে যে হাসপাতালে পাঠানো গেছে, এইটেই খুব ভাগ্য। নইলে বাড়িতে আপনারা এ কেস কি করে চিকিৎসা করাতেন ভাবুন তো?

ভদ্রলোক বললেন—এত সিরিয়স্ যে হয়ে গেছে, আমরা তো ভাবতেই পারিনি। ভাগ্যি আপনি ছিলেন।

বললাম—অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের অপারেশন আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এতে আর কোন ভয় নেই। এবারে দেখবেন ওর চেহারা ফিরে যাবে। বারে বারে আর কষ্ট পেতে হবে না। কি হল, কাল সকালেই খবর দেবেন।

পরদিন সকালে উঠে চা খাচ্ছি, ভদ্রলোক এলেন। বললেন—কাল আপনার কাছ থেকে উঠে বাড়িতে গিয়ে ভাত খেয়ে হাসপাতালে গিয়েই শুনি বড় সার্জন এসে লিলিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছেন। রাত একটার পরে সবাই ও টি থেকে বেরুলেন। সার্জন বললেন—কেসটা বড়ই কম্‌প্লিকেটেড। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্, কিন্তু পেট কেটে দেখা গেল তা নয়। অ্যাপেণ্ডিক্সের কাছেই প্রকাণ্ড একটি আলসার, টিউবারকুলার বলেই মনে হচ্ছে। একটি আলসার থাকলেও কেটে বাদ দেওয়া চলত, কিন্তু সমস্ত ইনটেস্‌টাইনের গায়েই আলসার। তাই অপারেশন করে কিছু করা গেল না। এখন শক্ যদি কাটিয়ে ওঠে, তাহলে আশা করা যায় ভাল হয়ে উঠবে।

ভদ্রলোক বললেন—কাল সারা রাত আমরা পালা করে হাসপাতালে ছিলাম। ডাক্তার নার্স সব্বাই বলছেন খুব সময়মত লিলিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাড়িতে রাখলে আর বাঁচত না। রাত্রেই মৃত্যু হত। আপনার দয়াতেই ওর প্রাণ বাঁচলো। আপনি না বললে হাসপাতালে যাওয়াই হত না। কাল রাত্রে এক বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছে, আজ আর এক বোতল দেওয়া হবে। ডাক্তাররা সবাই খুব যত্ন নিচ্ছেন। কখনও ভাবিনি হাসপাতালে এত যত্ন হয়।

শুনে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। লিলির তাহলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসও হয় নি, গ্যাস্ট্রিক আলসারও না। প্রথম থেকেই যা হয়েছিল সে হল টিউবারকুলার আলসার! তাই একটু পরিশ্রম আর অনিয়ম করলেই শরীর অত খারাপ হত। কিন্তু জ্বর হয় নি কেন? হয়ত একটু একটু হ'ত, কখনও খেয়াল করে নি। আমিও তো কৈ একথা কখনও ভাবিনি? মনটা ভারি দমে গেল। চা খাচ্ছিলাম, হঠাৎ যেন বিস্বাদ মনে হল। বললাম—টি বি'র তো আজকাল খুব ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। হাসপাতালে তা নিশ্চয়ই দেবে। কাজেই শিগ্‌গিরই লিলি সেরে উঠবে। টি বি-তে আর এখন ভয় কি?

ভদ্রলোক খুশী হয়ে উঠে গেলেন। কিন্তু আমি মনে একটুও শান্তি পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগলো, এতদিন থেকে বেচারা ভুগছে আর আমি রোগটা কী, তাই ধরতে পারি নি। ধরতে পারলে এতদিনে কবে লিলি সেরে উঠতো!

অপারেশনের শক্ লিলি কাটিয়ে উঠলো। পেটের আলসারের যে অংশ কেটে পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়েছিল, তা টিউবারকুলার বলেই রিপোর্ট এল। টিউবারকুলোসিস-এর চিকিৎসা শুরু হল।

তখন টিউবারকুলোসিসের একটিমাত্র ওষুধ বেরিয়েছে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন। অনেক দাম। এই ওষুধই লিলিকে দেওয়া হল। কিন্তু এমন ওর ভাগ্য, এই ওষুধের খুব কম ডোজও লিলি সইতে পারল না। ওষুধ দিলেই ওর রিঅ্যাকশন হয়, সাংঘাতিক বমি হয়, যা খায় কিছুই রাখতে পারে না। বাধ্য হয়ে ওষুধ বন্ধ করে শুধু নিউট্রিশনের দিকে নজর দেওয়া হল।

হাসপাতালের সার্জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঢালা হুকুম দিয়ে রাখলেন, লিলি যখন যা খেতে চাইবে, তাই যেন হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। নিউট্রিশন বাড়াবার জন্য নূতন নূতন দামী ওষুধ ইনডেণ্ট করিয়ে আনিয়ে রাখলেন। নিজে দু'বেলা এসে লিলিকে দেখে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন। সারাদিন লিলি কি খেয়েছে,

আর কি খেতে চায়, নিজে এসে দেখে যেতে লাগলেন। কড়া মেজাজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এই দুর্বলতা দেখে ডাক্তার নার্সরা অবাক হয়ে গেল।

প্রথম কয়েকদিন বেশ আগ্রহ করে চেয়ে খেয়ে লিলির আবার অরুচি ধরে গেল। কিছুই খেতে ভালো লাগে না। এমন কি ঝাল পর্যন্ত না। কোন ওষুধ লিলি খেতে পারে না। দামী দামী ভালো ভালো ওষুধ দু-চামচে চার চামচে খেয়েই ফেলে রাখতে হয় আবার নতুন ওষুধ আসে। ইন্‌জেক্‌শন দেবারও উপায় নেই, দিলেই রিঅ্যাকশন হয়, কাঁপুনি ধরে। গ্লুকোজ পর্যন্ত লিলি সহ্য করতে পারে না। ডাক্তার নার্সরা হার মেনে গেল। মাস তিনেক ধরে নানা রকমে চেষ্টা করে কিছুই করতে না পেরে অমন জবরদস্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন—আমরা তো সব রকম চেষ্টাই করে দেখলাম, কিছুই কাজে লাগলো না। এইবার ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখুন। বাড়ির আবহাওয়ায় হয়ত কিছু উপকার হতে পারে।

অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আবার লিলি বাড়ি ফিরে এল। গিয়ে দেখি, লিলি জানালার কাছে বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু কোথায় লিলি? কোথায় সেই ভাসা-ভাসা চোখ? অমন মিষ্টি হাসি? সেই ফুটফুটে ফর্সা রং? এ যেন লিলির কঙ্কাল, পাংশু চামড়ায় মোড়া, চর্বি-বিহীন। আমাকে দেখেই ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—মেসোমশাই, হাসপাতালে ওরা ইনজেকশন দিতে জানে না। ফুঁড়ে ফুঁড়ে দেখুন আমার হাত কি রকম কালো করে দিয়েছে। আমি আর হাসপাতালে যাব না। আপনার ওষুধ খাব; আপনার কাছ থেকেই ইন্‌জেক্‌শন নেব।

বললাম—বেশ তো, তাই হবে।

আবার আমি ইনট্রাভেনাস গ্লুকোজ দিতে শুরু করলাম। কি আশ্চর্য, কোন রিঅ্যাকশন হল না। একবার ফুঁড়েই রোজ গ্লুকোজ দেওয়া গেল। লিলি খুশী হয়ে বললে—এমন সুন্দর ইন্‌জেক্‌শন হাসপাতালে কেউ দিতে জানে না। ওখানে ইন্‌জেক্‌শন দিলেই আমার কাঁপুনি আসত।

লিলির আত্মীয়রা পরামর্শ করে একজন বড় চিকিৎসক এনে দেখালেন। তিনি আবার স্ট্রেপ্টোমাইসিন দিতে বলে গেলেন। হাসপাতালে যতবার স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেওয়া হয়েছে, ততবারই লিলির সাংঘাতিক রিঅ্যাকশন হয়েছে। এই শরীরে আবার ঐ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে রিঅ্যাকশন করাতে আমি রাজি হলাম না। বললাম—লিলি আর বেশিদিন বাঁচবে না। এখন ওর কষ্ট হয় এমন ইন্‌জেক্‌শন আমি দিতে পারব না। আর কেউ এসে বরং দিক।

শুনে লিলির বাবা বললেন—তাহলে মিছিমিছি ফোঁড়াফুঁড়ি করে কি হবে? আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। লিলির জন্য আপনি যা করলেন আর কেউ কি তা করত? এ ঋণ আমরা কোন দিন শুধতে পারব না।

বাড়ি এসে প্রথম দু'চার দিন একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠে লিলি আবার নির্জীব হয়ে পড়ল। বি এ পরীক্ষার ফল বেরুল, ডিস্টিংশনে পাশ করেছে খবর পেয়েও লিলির কোন ফুর্তি দেখা গেল না। শুধু আমাকে দেখেই একটু খুশী হয়ে উঠতো। শীর্ণ হাতখানা গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শনের জন্য বাড়িয়ে দিত; চোখের ইঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বলত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি, লিলি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নাড়ী দেখে চুপি চুপি উঠে এলাম। সেইদিন রাত্রিশেষে আবার হঠাৎ কালো পাইখানা হল, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, নাড়ী নেই। পাশে বসতেই আমার দিকে একবার চোখ মেলে চাইল; সে দৃষ্টি স্থির হয়ে চোখের পাতা আর বন্ধ হলো না। নিঃশ্বাসের ক্ষীণ স্পন্দন ক্ষীণতর হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। লিলির ঐ দৃষ্টিহীন স্থির চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্তব্ধ বুকের ওপর স্টেথিস্‌কোপ বসিয়ে কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে উঠে এলাম। আমার হাতে ওর চিকিৎসা শুরু হয়েছিল; আমার হাতেই শেষ হল।

চেনা মহলে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। লিলির জন্য আমি যা করেছি, তার নাকি তুলনা হয় না। লিলির আত্মীয়েরা এত কৃতজ্ঞ, চারদিকে এত প্রশংসা; তবু কেন মন খুশিতে ভরে ওঠে না? কেন মনে হয়, এত আগে আমি দেখেছি তবু রোগটা ধরতে পারি নি?

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ বলে হাসপাতালে ভর্তি করবার দিন যে সার্জনকে আগে দেখিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা হল। লিলির কথা সব শুনে তিনি বললেন—তুমি জেনারেল প্র্যাকটিশনার আর আমি একজন এক্সপার্ট। সেই আমারই ভুল হল। অথচ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ ধরতে কখনও ভুল হয় না বলে আমার গর্ব ছিল। তুমি প্রথম থেকে যা করেছ আমি হলেও তাই করতাম। যে কোন ভাল চিকিৎসকই তাই করতেন। লক্ষণ দেখে বিচার করাই আমাদের কাজ। তাতে তোমার কোন ত্রুটি হয় নি।

বললাম—আইনের দিক থেকে, বিজ্ঞানের দিক থেকে আপনি যা বললেন তা সবই ঠিক। কিন্তু এ কথাই বা কি করে ভুলি যে, কলকাতার মত শহরে থেকে ছ' মাস ধরে চিকিৎসা করেও রোগটা আমি ধরতে পারি নি। অত আগে ধরা পড়লে স্ট্রেপ্টোমাইসিনও হয়ত লিলি সইতে পারতো, অমন রিঅ্যাকশন হয়ে শেষে চিকিৎসার বাইরে চলে যেত না।

• •

সাড়ে আট ভাই

প্রভাত দেবসরকার
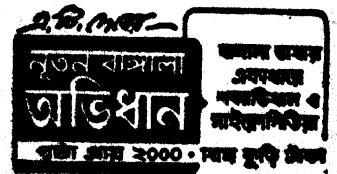
দুপুরের ডাক গাড়িটা ইন্ করার সংগে সংগে কুটো ওড়ার মত এ দলটা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

পৈতার গোছাটা কামিজের ওপর বার ক'রে ভিজে গামছাটা পাট ক'রে মাথার ওপর চাপিয়ে বেতের ছড়িগাছটা ঘুরিয়ে পীতাম্বর বললে, ঐ বাৎ সিধা—দশ রুপয়া!

দলের বাকি দু'জন খুঁৎ খুঁৎ করলে, দশ টাকায় হবে না; আরো কিছু বাড়াও।

এতক্ষণ অনেক বুঝিয়েছে, আর বোঝাবার ধৈর্য নেই। সময়ও নেই। পা বাড়িয়ে পীতাম্বর বললে, হম্ ছোড় দেতা! দশ্‌সে জাদা নেহি, ব'লো কেয়া মতলব্?

কৈলাস আর বিশ্বনাথ মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রলে। মতলব আর কি, দশ টাকায় সরে দাঁড়াবে না। অনেকগুলো যাত্রী নেমেছে আজ, মোটা রোজগার!

গোঁ ভরে পীতাম্বর এগিয়ে চ'লল। ওরা পিছু নিলে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পীতাম্বর ছড়ি নেড়ে বললে, তব্‌ভি? চলিয়ে, হামারা কে'য়া!

কৈলাস আপসের সুরে বললে, একঠো বাত্ তো শুনিয়ে পুতম্ ভাই!

কেয়া? মার মূর্তি পীতাম্বর, দোস্‌রি বাত্‌সে কেয়া ফয়দা! দশসে ধেলা জাদা নেহি! মান্ রহ তো বোল!

বিশ্বনাথ এগিয়ে এসে বললে, এগার

মাথার গামছা খুলে ফেলে পীতাম্বর টিকটিকির কাটা লেজের মত লাফিয়ে উঠলো: বৈমান!

বিশ্বনাথ তেড়ে এল হাত মুঠো ক'রে, মুখ তোড় দেগা এক ঝাপট্‌সে! বৈমান তুম্!

মাঝখানে পড়ে কৈলাস দু'জনকে সামলাতে লাগলো, এ পুতম্ ভাই, এ বিশুয়া ভাই!...কাহে ঝেগড়া করতা?...ছোড় দো...এ ভাইয়া পুতম্...বহুৎ আপসোস কি বাত্...

মিনিট দশেক স্টপেজ আছে ডাক গাড়ির এখানে। জংশন স্টেশন। মথুরা। ক' মিনিট তো কেটেই গেল দরদস্তুর আর ঝগড়াঝাটিতে। উড়ো কুটি শান্ত হওয়ার মত ঝিম্ ধরেছে স্টেশনের। যাত্রীই বা কই!

কৈলাস আঁক-পাঁক করলে অবস্থা বুঝে—শেষটা ঝগড়াই না সার হয়। ভাগ ক'রবে কি নিয়ে! যাত্রীরা ভেগে গেল ওদিকে!

চারিদিকে চোখ রেখে কৈলাস বললে, হমরা একঠো বাত্ শুনেগা ভাই? তিনো আদমী এক সাথ দেখনে সে যাত্রী ভাগ্ যায়েগা—কুছ্ কাম নেহি হোগা!...হিঁয়া আউর ভি বহুৎ পাণ্ডা হ্যায়...ও লোক লুট লেগা!...যাত্রী বিল্‌কুল বিগড় যায়েগা!

পীতাম্বর, বিশ্বনাথ দু'জনেই সমঝালে। সত্যি কথাই বলেছে কৈলাস। আজকাল যাত্রীগুলো বড় চালাক হ'য়েছে, পাণ্ডার ভিড় দেখ্‌লেই মুখ ফেরায়—কিছুতে আর বাগে আনা যায় না। তাই—

সমাগত পাণ্ডারা নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ক'রে নেয়—দলের এক-জন এগিয়ে যায় শিকার ধরতে। কাচ-পোকার মত তেলাপোকা ধরে। যেমন পারে, যত পারে দুয়ে নিক তারপরে, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু স্টেশনের বেড়া ডিঙবার আগেই রফার টাকাটা মিটিয়ে দিতে হয় দলের যারা স'রে দাঁড়ায় তাদের। পাঁচ, দশ, পনের, বিশ যেমনই হোক্! গাড়ি স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতে 'ডাক' সেরে নিতে হয়! দৃষ্টি ভাগাড়ে পোঁছতে না পোঁছতে ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়তন, অবস্থান ঠিক করে নিতে হয়! এ একরকমের ভাগ্যপরীক্ষা যাত্রী নিয়ে। ফট্‌কা!

কৈলাস বললে, হমরা বাত্ মানো পুতম ভাই, এক আধুলি আউর দেও-ও। দেখিয়ে তোমরা নাফাই হোগা, কমসে কম পাঁচ যাত্রী উতারা মথুরা মে! পহেলে বাত্ থা, ইসিসে বোলতা ম্যায়...

পাঁচই থাক, আর পঞ্চাশই থাক, এখন ওসব কথা শুনবে না পীতাম্বর। গাড়ি পোঁছবার আগেই ডাক হ'য়ে গিয়েছিল, তখন তারা চুপ ক'রে ছিল কেন! মতলব খারাপ, তাই না!

পীতাম্বর মাথা নাড়লে, কুছ বাত্ নেহি! সব সে পুছা! কেয়া ভুল্ যাতা!

ভোলবার কথা নয়, তবু মাঝে মাঝে

বুঝি ইচ্ছে ক'রেই ভুলে যেতে হয় দেখে-শুনে। কার ভাগ্যে কখন কি জোটে কিছুই বলা যায় না। আজ এক সপ্তা দেখছে, মেরে-কেটে দশ টাকা ডাক হ'লো তো যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত গ্যাটের টাকাই জল—লাভের গুড় পিঁপড়েয় চেটেই শেষ করে। যাত্রী যা নামে যে-যার পথ দেখে, পাণ্ডা দেখলে কামড়াতে আসে যেন! তা ব'লে টাকা ফেরৎ পারে না—'ডাকের' টাকা মিটিয়ে দিতেই হবে!

পর পর ক'দিন এমনি লোকসান গেছে বিশ্বনাথের, কৈলাসের। আজ 'ডাক' নিয়েছে পীতাম্বর। ওর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ক'জন যাত্রী এদিক-ওদিক বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইছে। আনকোরা নতুন মনে হ'চ্ছে!

কৈলাসও রাগ দেখালে, নেহি মানে গা? কেয়া নীলাম, ঘন্টি পড়নেসে সব খতম হো যায়েগা! চলিয়ে বিশুভাই, হম্ দেখেগা!

পীতাম্বর তম্বি ক'রলে, চলিয়ে! মথুরামে এহি বৈমানী চল্ রহে!...

কানে বুঝি কথাটা এতক্ষণে বড় বাজে বিশ্বনাথের। প্রকৃত তাদের বলবার কিছু নেই। বিবেকে বাঁধছে!—ডাক শেষ হবার পর কোন কথা বলা উচিত নয়, অন্যায় বলেনি পীতাম্বর।

বিবেক দংশনে আহত বিশ্বনাথ বললে, ছোড় দিজিয়ে বহুৎ বৈমান দেখা হ্যায়,...সাধু সন্ত ভি দেখা হ্যায় বহুৎ! দে দেও রুপেয়া—দশ্-ই নিকালো ঝট্‌পট্!

সঙ্গীদের মুখের ওপর কট্ কট্ ক'রে চেয়ে ট্যাঁক্ ঝেড়ে ভিজে নোটখানা বার ক'রে দিলে পীতাম্বর। আর কিছুক্ষণ দাঁড়াবার হ'লে যেন আশ মিটিয়ে গাল দিতো ওদের! বলতো, যাদের কথার ঠিক থাকে না তারা আবার মানুষ, তারা আবার মুখ নাড়ে! পাণ্ডাগিরি ক'রতে লজ্জা করে না!

একরকম ছুটতে ছুটতে সামনে এগিয়ে গেল পীতাম্বর। কৈলাস, বিশ্বনাথ টাকাটা ভেঙে ভাগ করবার জন্যে পা ঘসে স্টেশন গেটের বাইরে চলল।

এদিকে যাত্রী দেখে বুঝি খুব খুশী হ'লো না পীতাম্বর মনে মনে। তিনটি বুড়ি একমাথা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তীর্থ-যাত্রা না, গঙ্গাযাত্রা! ধুকছে!

তবু সামনে এসে পীতাম্বর বললে, কেয়া মাইজি দর্শন হোগা মথুরাধাম, গোকুল, গোবরধন, বৃন্দাবন? আইয়ে হমরা সাথ, সব বন্দবস্ত কর দেগা। কুছ্ ভাবনা নেহি!

বুড়িরা নড়ে-চড়ে পোট্‌লা-পুঁটলি সামলালে। পীতাম্বরের কোন কথা কানে গেল কিনা কে জানে।

পীতাম্বর আবার সাদর অভ্যর্থনা করলে, হমরা সাথ আইয়ে, হম্ সব বন্দবস্ত করেগা! যো কুছ হ্যায় হিয়া দর্শন হো যায়েগা! বাঙ্গাল দেশ কা পাণ্ডা আছি মাইজি হম্‌লোক!

নড়ে-চড়ে আবার যেন স্থির হ'য়ে গেল বুড়িরা। এত কথার কোন উত্তরই দিলে না। সঙ্গে কেউ আছে নাকি, গাঁন্ড কেটে মুখে চাবি দিয়ে গেছে?

পীতাম্বর আশ-পাশ নিরীক্ষণ করলে। স্টেশন ফাঁকা, ডাক গাড়ি উধাও তেপান্তরে। সিগন্যালগুলোর কান খাড়া দুপুর রদ্দুরে! ধুলো উড়ে দিগন্ত ঝাপ্‌সা।

বেতের ছড়িটা কাঁধের ওপর জোয়ালের মত রেখে ডানা-খেলানর ভঙ্গিতে দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে পীতাম্বর. নাকিসুরে বিশুদ্ধ বাংলায় বললে, কোঁন ভ'য় ক'রবেন না মা, আমি সব দেঁখিয়ে দেঁবে! বাংলা দেশ থেঁকে কেতো লোক আসে...ভয়ের কিঁচ্ছু নেই মা! আঁসুন!

বুড়িদের মধ্যে একজন মনে হয় শক্তসমর্থ, পথশ্রমে তত ক্লান্ত নয়, বুড়িটি বললে, সাড়ে-আট-ভাই-এর ধরমশালায় যাব আমরা! চিঠি দেওয়া আছে।

মুহূর্তের জন্যে কি ভাবলে পীতাম্বর, বললে, আমি সিঁখান থেকেই আঁসচে! আঁসুন—

ভাল ক'রে বাজিয়ে নিতে বুড়িটি বললে, বাঙালী ঘাট, সাড়ে-আট-ভাই ধরমশালা?

পীতাম্বর মাথা নাড়লে, হ্যাঁ, হ্যাঁ... ওতো আমাদেরই আছে। ঘাবড়াবেন না কিছু! আসুন!

মথুরাধামে আজকাল বৈমানী চলছে, জুয়াচুরি, মিথ্যার কারবার হ'চ্ছে! রাগ হ'লে বন্ধুদের পীতাম্বর বলে! সে মিথ্যা বলে না? বৈমানী করে না? না!

এককালে সাড়ে-আট-ভাই যাত্রি-নিবাসের অংশীদার ছিলেন তার ঠাকুরদা বিশ্বম্ভর চতুর্বেদী। এখন পীতাম্বরের নিজস্ব ধরমশালা হ'লেও সাড়ে-আট-ভাই বলতে তাদের গুষ্ঠিকেই বোঝায়!

বুড়িদের পীতাম্বর মিথ্যা বলেনি, মিছে ধোঁকা দেয়নি।

অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ! পীতাম্বর বুড়িদের অভয় দিলে, কোনও ভাবন করবেন না...ঠিক জায়গায় নিয়ে যা আপনাদের!

তবু টাঙ্গায় ওঠবার আ অবিশ্বাসের সুরে বুড়িটি জিজ্ঞে ক'রলে, আমরা সাড়ে-আট-ভাই-এ ওখানেই যাচ্ছি তো? সাড়ে-আট-ভা বাঙালী ঘাট, মথুরা!

পীতাম্বর কাঁধের গামছা মুখে সামনে চামরের মত নেড়ে মাছি তাড়ি বললে, কোন ভাবনা করবেন না মা, ঠি নিয়ে যাব দেখবেন!

পড়ে যাবার ভয়ে বুড়িরা তিনজ টাঙ্গার ওপর জড়াজড়ি করে রইল সাড়ে-আট-ভাই যখন, তখন ভয়-ভাবনা কিছু নেই। ওরা খুব বিশ্বস্ত পাণ্ড মথুরায়!

বোধ হয় পীতাম্বরের ঠাকুরদার ঠাকুরদারা ঐ নামে যাত্রিনিবাস করেছিলেন। বাংলা দেশ থেকে তখন যত যাত্রী আসতো, সবাই নাকি খুঁজে খুঁজে ঐখানেই উঠতো। মথুরার তখন সুনাম ছিল, আর সুনাম ছিল সাড়ে-আট-ভাই-এর! একটি পয়সার বেহিসাব পাবে না, একটি পয়সা একদিকে-ওদিকে হবে না যাত্রীদের। পাঁচ সিকেয় তীর্থদর্শন সমাধা হ'তো। দেশে ফিরে তীর্থযাত্রীরা নাম করতো, লোক ছুটে আসতো। এমনি কারবার ছিল না যাত্রী পটাবার। আপনি আসতো, খুশী হয়ে দান করতো।

সে-সব দিন স্বপ্নের মত, শোনা কথা পীতাম্বরের। বংশ বৃদ্ধি হয়ে সাড়ে-আট-ভাই এখন পঁয়ষট্টি ভাই-এ বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন যত ঘর তত পাণ্ডা! বাংলায় অখণ্ড নাম মথুরার খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে! বুড়িরা কি বুঝবে—সাড়ে-

আট-ভাই তো সাড়ে-আট-ভাই! কে কার খোঁজ রাখে!

পীতাম্বর তখন বেশ ছোট। যাত্রীর পিছু পিছু ঘোরবার বয়েস হয়নি। বাঙালী ঘাটের ওপর এখনো যে যাত্রী-নিবাসটা বেশীর ভাগ বানরের আস্তানা তার সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করবার সময় দেখতো লেখাটা—'কান মে লাড্ডু সাড়ে-আট-ভাই! বাঙালীর পান্ডা, মথুরাধাম!'

তারও পরে ইংরেজী অক্ষরে লেখা হয় বিজ্ঞাপন—

Ladoos in ears Eight-Half Brothers! Pandas of Bengal Province, Mathradham, Bengali Ghat!

ঠাকুরদার কাছে শোনা পীতাম্বরের—ওরা ছিল নয় ভাই, এক ভাই-এর তখনো বিয়ে হয়নি তাই, সাড়ে আট; একজনের কানে ছিল আব। ঐ নামে তীর্থযাত্রীরা কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে আসতো—বার মাস যাত্রিনিবাস ভর্তি থাকতো! নাম-ডাক খুব ছিল সাড়ে-আট-ভাই যাত্রিনিবাসের!

না হ'লে কোথাকার এই বুড়িগুলো আজো নাম করে! বাঙালী ঘাট আছে, নামে সে-যাত্রিনিবাসও আছে, কিন্তু সাড়ে-আট-ভাই-এর সুনাম কবে মুছে গেছে! স্টেশনের ধুলো ঝেড়ে তবে যাত্রী জোটাতে হয়! তাও টানা-ছেঁড়া, খেয়ো-খেয়ি! নীলাম ব্যবস্থা!

ভাগ্যিস, পথে বুড়িরা আর সাড়ে-আট-ভাই-এর কথা জিজ্ঞেস করেনি রক্ষা! নইলে পীতাম্বর নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যেত!

বুড়ি তিনজন ঘর দেখে বুঝি খুশী হ'লো। পোঁটলা-পুঁটলী নামিয়ে বললে, এই ঘরেই থাকবো তো? বেশ ঘর!

যাত্রীর সরলতায় পীতাম্বরও খুশী হ'লো। গড় গড় ক'রে বললে, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! এখানেই থাকবেন, সব কুছ দর্শন করবেন, যমনা মে স্নান করবেন, পূজা দেবেন, ব্রাহ্মণকে দান-ভোজন করাবেন, কাঙালকে ভিখ্ দেবেন, বহুৎ সে পুণ্য হোবে, তীর্থ ফল মিলবে।

বুড়ি তিনজন কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে পীতাম্বরে মুখের দিকে চেয়ে রইল। পান্ডা বলছে কি?

ভোজন-পূজন-ভিখ্! এ তিন না হ'লে নাকি তীর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কথাটা পীতাম্বর কেবল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বুড়ীদের। এতদূরে তা হ'লে কষ্ট ক'রে ছুটে এসেছে কেন?

পীতাম্বর অভয় দিয়ে বললে, কিচ্ছু ভাবনা ক'রবেন না, হামি সব ঠিক ক'রে দেব!

বুড়িরা সমস্বরে প্রশ্ন ক'রলে, কত খরচ লাগবে ওগুলো করতে?

চাপা দিয়ে পীতাম্বর তাড়াতাড়ি বললে, সে কিচ্ছু ভাবনা করবেন না! যেমন চাইবেন তেমন ক'রে দেবো! খুব সুবিস্তা হবে—

বুড়িরা কানে-কানে কি যেন আলাপ ক'রলে। পীতাম্বর লক্ষ্য ক'রে মনে মনে প্রমাদ গণলে—তার ভাগ্যে আজ আচ্ছা শাঁসাল যাত্রী জুটেছে! খরচের নামে গোড়া থেকেই মুখ চুণ! প্রথম দর্শনে যা ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত তাই না দাঁড়ায়! পয়সার বেলায় ফোক্কা!

পীতাম্বর ভাবলে, এখনি খরচের ফিরিস্তিটা দিয়ে ঠিক করেনি! বুড়িরা তাতে-বাতে আসুক, তারপর বুঝিয়ে-বাজিয়ে দেখবে, তা নয় আগে থেকেই, এ-কর, সে-কর!

নিজেকে সংশোধন ক'রে পীতাম্বর বললে, আপনারা এখানে আরাম করুন! স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি...এই অবেলায় যমনাজিতে আর স্নান করবেন না!

খানিক পরে ফিরে এসে পীতাম্বর দেখলে বুড়িরা মুখোমুখি চুপটি ক'রে বসে আছে। তীর্থস্থানের কোন তৎপরতাই তাদের মধ্যে নেই। কেমন যেন নিঝুম মেরে গেছে।

পীতাম্বর জিজ্ঞেস ক'রলে, কেয়া মাইজি গোসল নেই করেগা? নাই কর, খানার কি ব্যবস্থা হবে আপনাদের?

নড়ে-চড়ে একজন বুড়ি বললে, আমরা আজ কিচ্ছু খাবো না! কাল তখন দেখা যাবে, যা হয়—

পীতাম্বর বললে, গাড়িতে এত কষ্ট হ'লো, না ঘুম, না খাওয়া হ'লো, এখন খাবেন না কিছু?—শরীর টিক্‌বে না। যা মনে করছেন তা নয়, মথুরা মে সব শুদ্ধ! মিঠাই, পুরি যো কুছ মাঙ্গে গা সব মিল যায়েগী! বলিয়ে কোন্ চিজ্ লেয়াগা! পেঁড়া? লাড্ডু? পেঠা? পুরি? মালাই?

বুড়িরা বললে, কিচ্ছু দরকার হবে না, আমাদের কাছে খাবার আছে, আজ রাতটা চলে যাবে। খালি মুখ-হাত ধোয়ার জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দাও!

পীতাম্বর বল্‌লে, আপকা মর্জি! আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি গোসলখানা!

একজন বুড়ি পীতাম্বরের পিছন পিছন উঠে এল। খানিকটা এসে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বাবা, এখানে আফিম্ পাওয়া যায়? দেখনা, ঐ আমাদের মোক্ষদা কখন থেকে পেট ফুলে আছে! তীর্থ ক'রতে এসেছে না, ঢং ক'রতে এসেছে! নেশার জিনিসটা সঙ্গে আনতে পারেনি! অমন গু না খেলে নয়! ছিঃ!

পীতাম্বর বললে, মিলবে! তবে সংগ্রহ করতে কিছু তক্‌লিফ হবে! কেত্‌না চাইয়ে?

বুড়িটা সাগ্রহে বললে, দোহাই বাবা, কষ্ট ক'রে একটু দেখ বুড়িটা মরে যায়! আঁচলের গেরো খুলে বুড়ি কয়েক আনা পয়সা বার ক'রে পীতাম্বরের হাতে দিতে গেল।

পীতাম্বর হাত না বাড়িয়ে বললে, উসসে নেহি হোগা মাইজি! ও চিজ্ কনট্রোল হ্যায়! দো রুপয়া কম্ সে কুছ্ ভি নেহি মিলি!

বুড়ির দৃষ্টি বড় করুণ হয়ে উঠলো। ব্যথিত বিমর্ষ কণ্ঠে বললে, সে কি, আমার দেশে তো এইতে পাওয়া যেত!

পীতাম্বরের বুঝি ধৈর্যচ্যুতি হয়, বললে, এ মথুরা হ্যায়!

কি ভাবলে বুড়ি খানিক, পরে বললে, এখন বাবা তুমি এনে দাও...বুড়ির প্রাণটা তো বাঁচাও!...পয়সা তোমাকে দিয়ে দেব মিটিয়ে।

যথা লাভ হিসাবে বুড়ির হাত থেকে পয়সাগুলো নিতে নিতে পীতাম্বর বললে, কিন্তু দু' টাকা লাগবে পহেলে ব'লে রাখছি।

বুড়ি ব্যগ্রভাবে বললে, যা লাগে লাগবে! প্রাণটা বাঁচুক আগে! তারপর মোক্ষদার উদ্দেশে গাল দিয়ে বললে, এমন নেশা না করলে নয়! ওর চেয়ে গু খাওয়া ভাল! দেবতার স্থানে এসে

ঢলানিপণা! মুখে ঝাড়ু অমন মেয়েমানুষের!

চোখ দিয়ে পীতাম্বর বুড়ির দেওয়া পয়সাগুলো গুনে গুনে দেখলে আর মন দিয়ে হিসাব ক'রলে, বাকি কত হ'লে দু টাকার হিসাব পুরো হবে!

দেশ থেকে চাল-চিঁড়ে বেঁধে এনেছিল বুড়িরা। যতটা হাত-পা-হারান, জলে-পড়া ভাবা গিয়েছিল তা নয়। দিব্যি সংসার পেতে বসেছে এরি মধ্যে! পীতাম্বরের কোন কথাই তারা কানে তোলেনি; তীর্থ ক'রতে এসে অত তক্‌লিফ্ করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব; বলুন কি দরকার?

আফিং খেয়ে চাঙ্গা হয়ে মোক্ষদা বলেছিল, কিছু না বাবা, তুমি কেবল আমাদের দেবতার থানগুলো দেখিয়ে দাও!

গ্রাম সম্পর্কে পিসি সুরধুনী বললে, খাবার জন্যে তীর্থে আসিনি! তিন কাল গিয়ে এখন এক কালে ঠেকেছে, এখনো খাই-খাই করবো?

মাসি সম্পর্কে বিনোদিনী বললে, একবেলা খাওয়া তার আবার অত! যা হোক্ ফুটিয়ে নিলে চলবে...তুমি ভেবো না বাছা! আমাদের কোন কষ্ট নেই!

তিরিশ বছরের পাণ্ডাগিরিতে এমন শাঁসাল যাত্রী পীতাম্বর বুঝি আর কখনো পায়নি। যা বলে তাতেই না। শেষবেলা কিছু থাকলে হয়! ঘর থেকে কিছু না যায়!

মনে মনে বিরক্ত হয়ে পীতাম্বর বললে, আপকা মর্জি! সুবিধার জন্যে বলছি!

এলুমিনিয়মের ছোট একটা হাঁড়ি তিনবার জলে ধুয়ে ইঁট-পাতা উনুনে চাপিয়ে সুরধুনী বললে, তুমি বাবা আমাদের দেখবার জায়গাগুলো ঘুরিয়ে এনো দুপুরের দিকে! কতক্ষণ! এক্ষুণি আমাদের রান্নাবাড়া হয়ে যাবে! ওবেলা বিন্দাবনে নিয়ে যাবে তো?

মনে মনে পীতাম্বর বললে, বুড়িগুলো ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে! একদিনে সব শেষ করে ফেলতে চায়—মথুরা! বৃন্দাবন! বুড়িরা জানে না কোথায় এসেছে!

মুখে পীতাম্বর বললে, তীর্থে এসেছেন কত জন্মের সুফল! বহু পুণ্যবতী আপনারা, এখন ধীরে সুস্থে সব দেখুন, রামজীর পূজা করুন...রাধাকৃষ্ণের নাম নিন! তাড়াতাড়ির কি দরকার আছে!

সখেদে মোক্ষদা বললে, সে বরাত কি করেছি বাবা ছিকিষ্ণের চরণে দুটো দিন জিরোব! মুখপোড়া গুখেকোর বেটারা সব ছুটেপুটে খাবে!......গিয়ে হয়তো দেখবো কুঁড়ে ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে!

বিনোদিনী বললে, কি কষ্টের আসা! টাকাগুলো কি ছাই আদায় হয় মুখপোড়াদের কাছ থেকে! কত বলে বলে তবে গাড়িভাড়াটা আদায় করা! গোবিন্দ টেনেছিলেন তাই! তোরা মেরে আমায় কি করবি? তোদের ধম্মে হয় দিবি! আর চাইবো না, বিধবার ক'টা টাকা মেরে যদি তোদের ভাল হয় হোক!

বুড়িদের কথাবার্তা কিছুই বোধগম্য হয় না পীতাম্বরের। কি স্বার্থে যে এরা পরস্পর মিলিত হয়েছে কে জানে। তীর্থ দর্শন? পুণ্য সঞ্চয়? পরকালের পাথেয়? তাই বা কি ক'রে পীতাম্বর ভাবতে পারে না। এখনো ইহকালের প্রতি এদের যে টান!

সুরধুনী বললে, বেশিদিন আমরা থাকতে পারবো না। দুটো কি তিনটে দিন! ঘরসংসার সব ফেলে এসেছি। এই মাসে আবার বৌমার ছেলে হবে!

ঝগড়া ক'রে আচ্ছা 'ডাক' নিয়েছিল পীতাম্বর। বুড়িরা একেবারে ঝানু! প্রথম থেকেই উল্টো সুর ধরেছে! মনের কথাটা চেপে পীতাম্বর বললে, আপনারা খাওয়া-দাওয়া ক'রে নিন, আমি সময় মত এসে নিয়ে যাব, যদি ইচ্ছা করেন একদিনে সব সারিয়ে দিতে পারি!

সুরধুনী বললে, অত তাড়ার দরকার নেই বাবা! বৌমার এই সবে ন' মাস।

মোক্ষদা ধমক দিয়ে বললে, পিসি তুই থাম, বৌ-বৌ করিসনি—বৌ কত তোকে ধমলায় জানতে বাকি নেই! তোর জন্যে গভ্ভে তার ছেলে আটকে যাবে!

বিনোদিনী বললে, তা বলে নিজের একটা কর্তব্য তো আছে, শাশুড়ী-বৌ বলেছে তবে কেন! তোর সাত-কুলে কেউ নেই তুই বুঝবি কি? সব খেয়ে ব'সে আছিস্—

মোক্ষদা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, নেই মানে! মামাশ্বশুর, মামীশাশুড়ী এখনো বর্ত্তমান! তাঁদের ছেলেপুলে নেই? তোর কে আছে তাই শুনি!

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ না বেরোয়! দরকার কি ঘাঁটিয়ে! পরস্পরের কুলের খবর আর জানতে বাকি নেই।

স্বামী কবে মারা গিয়েছিল বিনোদিনীর স্মরণই হয় না, তারপর এই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর যে কি ক'রে কেটেছে ভাবা যায় না। পরের গলগ্রহ, মুখনাড়া আর লাথি-ঝাঁটা খেতে-খেতে জীবনটা বুঝি শেষ হয়েই যেত বিনোদিনীর। কি গুরুবল দু'চার পয়সা ওরি মধ্যে হাতে জমিয়েছিল বিনোদিনী—তাই নিয়ে গোপনে সুদের কারবার আরম্ভ করে নেহাৎ দুস্থদের মধ্যে। তাতেই এখন চলে যায়, ভালই! দু' পয়সা, চার পয়সা ক'রে সম্বচ্ছরের ভাতের সংস্থান ক'রে নিয়েছে বিনোদিনী। গাঁয়ের লোকে বলে, বিনো কায়েতিনী, সুদখাকী—এক পয়সায় মরে বাঁচে!

বললে তো বয়েই গেল! যারা বলে তারাই নিত্য আসে, হাত পাতে—দু' আনা সুদে টাকা ধার করে। বিনোদিনী স্বাবলম্বিনী!

সুরি পিসি বল্‌লে, তিথ্‌থে এসে একি ব্যাভার লো তোদের! কোথায় ঠাকুর-দেবতার নাম করবি, তা নয়, খেয়োখেয়ি লাগিয়েচিস। এমন জানলে কোন্ হারামজাদী আসতো তোদের সঙ্গে!

আচ্ছা আপদ জুটিয়েছে পীতাম্বর! তিন বুড়ি তিন অবতার! রামজী জানেন তার বরাতে কি আছে।

বুড়িদের শান্ত ক'রে পীতাম্বর বললে, আপনারা তোয়ের থাকবেন, দো ঘণ্টা বাদ্ আসবো! সব দেখাব!

কিন্তু দর্শন ব্যাপারেও সেই। গাড়িঘোড়ার ধার দিয়েও যাবে না, পয়সা-কড়ির ত্রিসীমানা মাড়াবে না! ঝুট্‌মুট্ এটা কি, ওটা কি—সাত সতের প্রশ্ন! আর এক জায়গায় পোঁছলে সেখান থেকে নড়বার নাম করবে না! দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে পাথরের মূর্তি যেন!

বুড়িদের ভক্তির বহর দেখে পীতাম্বর

চটে যায়। আচ্ছা যাত্রী এনে তুলেছে ধরমশালায়! চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশটি পয়সার মুখ দেখলে না পীতাম্বর। আফিঙের বাকি পয়সাটাও আদায় হ'লো না!

অথচ ছেড়েও যাওয়া যায় না! কোথায় বলতে কোথায় গিয়ে উঠবে, কার পাল্লায় পড়বে! অধর্মের ভাগী হ'তে হবে!

পীতাম্বর বললে, এই হ'চ্ছে বিশ্রাম ঘাট, এখানে শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পর এসে বিশ্রাম করেছিলেন। ওই যে দেখলেন কংসের কিল্লা, ওখানে বন্দী ছিলেন বসুদেব আর দেবকী, আর এই যমনা...... ওপারে গোকুল, মা যশোদার আলয়!

মোক্ষদা কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে, নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে!

বিনোদিনীর চোখে বুঝি জল দেখা যায়, ভগ্ন কণ্ঠে বললে, মথুরায় কৃষ্ণ রাজা হয়েছিলেন!

সুরধুনী আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক্! মনে মনে কৃষ্ণ নামে বুঝি হাঁপিয়ে উঠেছে। পাণ্ডার ডাকে সম্বিৎ ফিরতে সুরধুনী নিজের মনে সুর ক'রে বললে, যেদিন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকীর উদরে মথুরায় দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে!

পীতাম্বর বললে, আসুন, এবার দ্বারকাদীশের মন্দিরে যাবেন!

মোক্ষদা অনুনয় করলে, দাঁড়াও বাবা আর একটু দেখে নিই! হা কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণের চরণের ঠাই দিয়ো ঠাকুর!

পীতাম্বর বললে, এখন কি দেখছেন, আসবেন জন্মাষ্টমীর মেলায়, তখন দেখবেন! মথুরা তখন স্বর্গপুরী!

এতক্ষণে যেন মনের কথা জানাবার যোগ্য সাথী পেয়েছে! দেবদর্শনে পীতাম্বর আশ্চর্য আপনার হয়ে উঠেছে। ভাষারও এতটুকু দুর্বোধ্যতা নেই।

কে বলবে পীতাম্বর পরদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী!

সুরধুনী গদগদ কণ্ঠে বললে, আবার আসবো। জন্ম জন্ম যেন এখানে আসতে পারি!

ছেলেমানুষের মত মোক্ষদা বললে, হ্যাঁ বাবা, এই যমুনার ওপর দিয়ে কি গোকুলের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একটা শিয়াল? উঃ কি দুর্যোগ!

পীতাম্বর মাথা নাড়লে!

কে জানে মথুরায় আজো কৃষ্ণ জন্মায় কিনা! সে কবেকার কথা! ভক্তের মনে কি বিশ্বাসের চেতনা জাগে! বুড়ি তিনজন কথা কইতে পারে না।

দ্বারকাদীশের মন্দিরে এসে পীতাম্বর বললে, আপনাদের মনের বাসনা যা আছে ঠাকুরকে নিবেদন করুন!

মন্দিরের এক ধারে বুড়ি তিনজন গায়ে গায়ে জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে ঠায় চেয়ে আছে বিগ্রহের দিকে। কষ্টিপাথরের মূর্তি যেন তাদের চোখের মণি বিদ্ধ ক'রে জ্বল জ্বল করছে। মুহুর্মুহু পর্দা টেনে বিগ্রহের মুখ ঢাকা দিচ্ছে পূজারী! আশ মেটে না দর্শনে।

কত দুর্বোধ্য কলগুঞ্জন, কত ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধার নিবেদন, কত অচেনা, অপরিচিত মুখ! তবু কত যেন সব পরস্পর চেনা-জানা! দেবতার মন্দিরে স্থান-পাত্রের বুঝি বিভেদ নেই কোন! সব মুখ এক, সব হৃদয় এক, সব বিশ্বাস এক!

পাশ থেকে পীতাম্বর চুপি চুপি বললে, যো কুছ্ মানত্ করতে চান করুন! বড়িয়া জাগ্রত দেবতা আছেন দ্বারকাদীশ!

বুড়ি তিনজন বিহ্বল দৃষ্টিতে পাণ্ডার দিকে চাইলে। চাইবার যেন তাদের কিছু নেই আর! কি মানত ক'রবে? কার জন্য মানত করবে?—সব বাসনাই তো তাদের চরিতার্থ হ'য়েছে। একেবারে ভগবানের শ্রীচরণে তারা স্থান পেয়েছে!

পীতাম্বর যেন ধমকালে, মানত্ করিয়ে! মানত্ করিয়ে! যো কুছ্...

বুড়িরা চুপ, মুখ দিয়ে তাদের কোন কথা বেরল না।

পীতাম্বর রেগে গর-গর ক'রতে লাগল, আপ্‌লোক্‌কা বিশ্‌ওয়াস নেহি! কভ্‌ভি মোক্ষ নেহি মিলেগী! মথরায় এসে কিছু মানত করলেন না!

ভয়ে ভয়ে মোক্ষদা বললে, কি মানত্ করবো বাবা? তুমিই বল!

পীতাম্বর গম্ভীর স্বরে বললে, সোনা-চাঁদি যা-খুশী আপনাদের... মানতের আবার ভাবনা করছেন!

বুড়িরা স্পষ্ট কিছু বললে না। তেমনি বিমূঢ় দৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পীতাম্বর তাড়া দিলে, আসুন, বাইরে আসুন! হইয়েছে!

আবার সেই অচেনার মেলা, এ কোথায় তাদের পীতাম্বর নিয়ে এসেছে? যেমনি ভিড় তেমনি গণ্ডগোল! মন্দির না বাজার!

এখন ভালয়-ভালয় বিদেয় হ'লে যেন বাঁচা যায়। লাভ যা তা আর কহতব্য নয়। পাঁচ সিকে ঘরভাড়ায় কি রাজত্ব হবে! বড়জোড় দুটি কি তিনটি টাকা, তার জন্যে এত মেহনৎ! এখন চ'লে গেলেই অনেক লাভ, আর পাঁচটার সন্ধান করতে পারে পীতাম্বর! দু'দিন তো স্টেশনের মুখ দেখা হ'লো না বুড়িদের জন্যে। মুখে বড়-বড় ফিরিস্তি আছে, পয়সা বার করবার বেলায় শম্বুক! যাওয়া-আসার ভাড়াটা পর্যন্ত জুগিয়ে যাও, সেই কবে তীর্থ সেরে ও'রা দেশে ফিরবেন তখন সব এক সঙ্গে মিটিয়ে দেবেন। তখন এগার টাকায় বিশুকে যাত্রীগুলো ছেড়ে দিলেই হোত, তবু বিনা হেপায় সাড়ে পাঁচ টাকা লাভ!

এ এক জ্বালা মন্দ নয়! সাপের ছুঁচো গেলা। না, আজ পীতাম্বর অন্য যাত্রীর চেষ্টায় বেরবে! এদের মুখ চাইলে চলবে না।

সবে পীতাম্বর স্নান-আহ্নিক সেরে মাথায় গামছা চাপা দিয়ে দোরগোড়ায় পা দিয়েছে, পিছন থেকে এক বুড়ি ডাকলে, বাবা বেরুচ্ছেন? সেই কোথা থেকে আফিঙ্ যোগাড় করেছিলে আজ খানিকটা এনো না যোগাড় করে!

মুখে অশ্লীল, কটু কথাটা এসে আটকে গেল। পীতাম্বর কোন সাড়া করলে না।
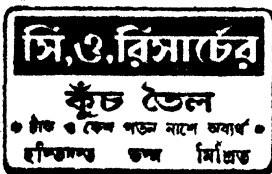
বুড়িটি পিছন পিছন রাস্তায় বেরিয়ে এল। অনুনয়ের সুরে বললে, না আনলে মরে যাব! দোহাই বাবা!

পীতাম্বর থমকে দাঁড়ালে, রোষ-কষায়িত চোখে বুড়ির দিকে চেয়ে বললে, পয়সা তো নিকালিয়ে!

পয়সা? বুড়ি যেন অবাক হ'লো। মথুরায় সব অমনিই যেন পাওয়া যায়!

কেয়া, হর চিজ্ মুফৎ সে মিলে গা? কেয়া মতলব? ব্যংগ ক'রলে পীতাম্বর!

বুড়ি বললে, তুমি আন বাবা—পয়সার ভাবনা নেই! আমরা পালাব না!

পালাবে না! থেকে কত রাজ্য করছেন যেন! পীতাম্বর হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গেল!

দিন দশেক পরে আবার মথুরা জংশন স্টেশনে দেখা।

কৈলাস, বিশ্বনাথ হৈ-হৈ ক'রে উঠলো ঃ আরে পুতম ভাই! মিলতা নেহি হর রোজ? কেয়া মতলব?

পীতাম্বর এগিয়ে এল বন্ধুদের ডাকে। একটু লজ্জিত বোধ ক'রলে সে। ক'দিন যেন কেমন ধারা কেটে গেল তার আচ্ছন্নের মত। ভূতে পেয়েছিল বুঝি!

কৈলাস জিজ্ঞেস ক'রলে, কাঁহা থা? মথুরা সে কাঁহা গিয়া?

মিয়োন সুরে পীতাম্বর বললে, কোথায় আর যাব ভাই!

বিশ্বনাথ প্রশ্ন করলে, যাওনি যদি দেখা হয়নি কেন? স্টেশনেও আর আস না। ব্যাপার কি?

পীতাম্বর তিন বুড়ি-যাত্রীর কথা বললে। দশ টাকায় যে যাত্রী সে মথুরা স্টেশনে দশদিন আগে কিনেছিল।

কৈলাস বললে, ওহো, তাই বল!... মোটা রোজগার হ'য়েছে!

পীতাম্বর চুপ ক'রে রইল।

বিশ্বনাথ বললে, দেখলে তো, তখন কেবল ঝগড়া করেছিলে...এক আধুলি তাও দিতে পারনি বন্ধুদের! ভাল! ভাল!

কৈলাস বললে, এস আজ 'ডাক' ধরা যাক! কল্‌কাতাসে তুফান মেল আত্রা দো ঘণ্টে বাদ!

সংগে সংগে বিশ্বনাথ হাঁক দিলে, পাঁচ!

পীতাম্বর চুপ ক'রে রইল। কৈলাস পীড়াপীড়ি ক'রলে, কই, ডাক দাও পুতম, চুপ করে আছ কেন?

পীতাম্বর বললে, নেহি, ও ঠিক নেহি!

কি ঠিক নেহি? কৈলাস, বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস ক'রলে বন্ধুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে। বলে কি লোকটা আজ?

কৈলাস বললে, তার মানে? সবাই মিলে ছেঁড়াছিঁড়ি ক'রবে তা হ'লে!

পীতাম্বর বললে, না।

আজ কোন যাত্রীর দরকার নেই তার।

বিশ্বনাথ ডেকে চলল, সাত! ন'! দশ্-শ্

পীতাম্বর চুপ। তেমনি নিষ্ক্রিয়। যেন মথুরায় যাত্রী আসা-যাওয়া নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই।

কৈলাস বললে, ঠারো-ও!

তারপর এগিয়ে এসে পীতাম্বরের হাত ধ'রে নাড়া দিয়ে বললে, কি হ'লো তোমার আজ! ডাকলে না কেন?

পীতাম্বর বললে, কিছু না, এমনি!

বিশ্বনাথ বললে, মোটা টাকা মেরেছে এখন থাক কিছুদিন! এস, এস, আমরা ডাকি! ছেড়ে দাও ওকে!

তার অনেককালের বন্ধু কৈলাস। অনেক সুখ-দুঃখের ভাগী হয়েছে সে পীতাম্বরের। কেমন মায়া হচ্ছে লোকটাকে দেখে। কেমন জড়ভরত মেরে গেছে!

কৈলাস বললে, ওর হয়ে আমি ডাকছি—এগার!

বিশ্বনাথ বললে, বার!

বন্ধুর দিকে চেয়ে কৈলাস হাঁকলে, তেরো!

বিশ্বনাথ হাঁকতে গিয়ে থেমে গেল। আরে পীতাম্বর চলে যাচ্ছে যে!

খানিকটা ছোটবার চেষ্টা করেছিল পীতাম্বর। কিন্তু বন্ধুদের সংগে পারলে না। ডাক দিয়ে পালিয়ে যাবার নিয়ম নেই—টাকা না মিটিয়ে রেহাই নেই!

দু'জনে পীতাম্বরকে চেপে ধরলো। ওসব চালাকি চলবে না! ফেলো টাকা!

পীতাম্বরের কামিজ আর ট্যাঁক হাতড়ে কিছুই মিললো না। নির্জনে হলে এ কাজকে রাহাজানি বলা চলতো স্বচ্ছন্দে। কিন্তু মথুরা জংশন স্টেশনে এর কোন নাম নেই।

বন্ধুদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগলো পীতাম্বর। বললে বিশ্বাস করে না এরা!

ঘণ্টা খানেক আগে বুড়িদের কলকাতার গাড়িতে তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিল পীতাম্বর। বুড়ো মানুষ কোথায় রাস্তা-ঘাটে পড়বে!

পাওনা তো কত, ট্রেন-ভাড়াটা পর্যন্ত যোগাতে হয়েছে বুড়িদের!

তিন টিপ-ছাপ-ওলা কাগজখানা পীতাম্বরকে ফিরিয়ে দিয়ে কৈলাস বললে, তুই যেমন বুদ্ধু, ঠিক হয়েছে! ও টাকা আর পেয়েচিস্!

বিশ্বনাথ হাসতে লাগল টেনে-টেনে, ছুঁচ গলে না, হাতি গলে যায়! আচ্ছা হয়েছে!

ছোঁ মেরে কাগজখানা বন্ধুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পীতাম্বর গোঁ ভরে এগিয়ে গেল। বেশ করেছে, ও-শালাদের কি!

তা বলে সাড়ে-আট-ভাই-এর সুনাম নষ্ট করতে পারবে না। তীর্থযাত্রীদের অত অবিশ্বাসও করতে শেখেনি সে।

আত্মীয় বন্ধুজনের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ এবং গল্প-সল্প করে আনন্দ পান না এমন লোক খুব কমই দেখা যায়। দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ-সুবিধা না ঘটলে অনেক সময় টেলিফোনেই কথা-বার্তা বলা হয়। কথা বলতে বলতে অনেক সময় চেহারাটা দেখার ইচ্ছা হয়। ইংলণ্ডের কোনও একটি কোম্পানী নতুন
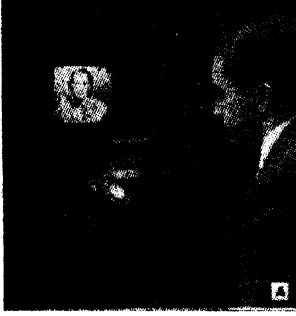
টেলিফোন-টেলিভিশন

রকম যে টেলিভিশন-টেলিফোন তৈরী করেছে, তাতে এই সুবিধাটা পাওয়া যাবে। টেলিফোনে যার সংগে কথা বলার জন্য ডাকা হবে, তার চেহারাটা টেলি-ফোনের সামনের পর্দায় প্রতিফলিত হবে। পর্দায় ছবিটি প্রতিফলিত করার জন্য টেলিভিশনের সংগে যে আলোটা ব্যবহার করা হয়, সেটা যাতে চোখে না লাগে, তার জন্য একটু আলাদা রকম ব্যবস্থা থাকে।

*

বর্তমান যুগকে প্লাস্টিকের যুগ বললে অতিরঞ্জন দোষ হয় না। আজ-কালকার জীবনযাত্রার বহু ক্ষেত্রেই প্লাস্টিকের ব্যবহার হয়। এমন কি চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও প্লাস্টিক তার বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। অ্যাক্রিলিক বলে যে বিশিষ্ট ধরনের প্ল্যাস্টিক তৈরী হয়েছে, এগুলো দিয়ে দেহের ভাঙা হাড়ের অংশ এবং হাঁত তৈরী করা যায়। আর এক রকম বিশিষ্ট ধরনের শোধিত প্ল্যাস্টিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত কৃত্রিম চোখ তৈরী হয়। স্বাভাবিক চোখের মণির মত এই চোখের মণিও ইচ্ছামত ঘোরান ফেরান যায়। মোটের ওপর কৃত্রিম চোখের সংগে আসল চোখের কোনও রকম

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

তফাতই প্রায় নেই। এখন অ্যাক্রিলিক দিয়ে চশমার বদলে একরকম লেন্স তৈরী হচ্ছে; এগুলো চোখের সংগে এঁটে রাখতে হয়। আজকালকার সাধারণ যে চশমা ব্যবহার করা হয়, সেগুলোতে চোখের সৌন্দর্য কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই অ্যাক্রিলিকের চোখে-সাঁটানো লেন্স-গুলোতে এরকম অসুবিধা হয় না বরং চোখগুলোকে খুব স্বাভাবিক দেখায়। গত মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই 'কনটাক্ট (চোখে সাঁটা) লেন্স'গুলো ও কৃত্রিম চোখ কাঁচ দিয়ে তৈরী হতো। জার্মানির মুলার পরিবার প্রায় একচেটে-ভাবেই সমগ্র জগতের জন্য কৃত্রিম চোখ তৈরী করে সরবরাহ করতো। এরা বংশানুক্রমে এই রকম চোখ তৈরী করার পদ্ধতিটি নিজেদের মধ্যে গোপন রেখে-ছিল। সেই কারণে যে সব দোকানে এই চোখ পাওয়া যেতো, তাদের অগণিত কৃত্রিম চোখ দোকানে রাখতে হত; কারণ চোখের অধিকারী বা অধিকারিণী দোকানে গিয়ে নিজেদের চোখের রং মিলিয়ে দেখে-শুনে এই চোখ কিনে আনতো। তাছাড়া আগেকার এই চোখগুলো একে-বারে নিখুঁত হতো না, একটু আধটু খুঁত থেকেই যেতো, কিন্তু তা নিয়ে খুঁত-খুঁত করা চলতো না, কারণ তৈরী মাল থেকে যা হোক কিছু বেছে নিতে হতো, নতুন করে তৈরী করা বা বদলে নেওয়া চলতো না। বাণিজ্যিকভাবে জার্মানীর জেইস কোম্পানী বলতে গেলে সর্বপ্রথম বাজারে কনটাক্ট লেন্স চালু করে। বর্তমানে অ্যাক্রিলিক প্ল্যাস্টিক থেকে যে কনটাক্ট লেন্স তৈরী হচ্ছে, সেটা কোনও দেশ বা কোনও কোম্পানীর এক-চেটিয়া ব্যাপার নয়। এটা প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই তৈরী হচ্ছে। ১৯৪৬ সালে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার মিলে ভারতবর্ষে অ্যাক্রিলিক থেকে কনটাক্ট লেন্স তৈরী করা সম্ভব কী না, তাই নিয়ে গবেষণা করেন। ছয় বৎসর কাজ করার পর ১৯৫২ সালে এঁরা ঘোষণা করেন যে, ভারতে অ্যাক্রিলিক থেকে বেশ ভালো কনটাক্ট লেন্স ও কৃত্রিম চোখ তৈরী করা হয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, বিদেশ থেকে আমদানী করে যা দাম হতো, তার চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ দাম কম হচ্ছে। বর্তমানে এঁরা অপ্টি প্লাস্ট কর্পোরেশন নাম দিয়ে বাজারে জিনিস চালু করেছেন। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে পদ্ধতিতে কনটাক্ট লেন্স তৈরী হয়, অপ্টি প্লাস্ট কর্পোরেশনেও ঐ একই পদ্ধতিতে তৈরী হয়। যার জন্য কৃত্রিম চোখ তৈরী হবে আগে তার চোখের একটা ছাঁচ নিয়ে তারপরে মধ্যিখানে মাপানুযায়ী একটি ছোট্ট পাওয়ার-ওয়ালা লেন্স লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে সমস্ত কনটাক্ট লেন্সটি চোখের যতটা অংশ বাইরে থেকে দেখা যায়, সেটা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে লাগান হয়। যে অংশে পাওয়ার থাকে, সেটার ব্যাস মাত্র ½ ইঞ্চি। সমস্ত লেন্সটি সাধারণ পোস্টকার্ডের মত পাতলা আর খুব হাল্কা। চোখের পাওয়ার বেশী হলেও ঐ লেন্সের ঘনত্ব বাড়ে না।

*

উড়িষ্যার মৎস্য বিভাগ মাছ থেকে একরকম প্রোটীন পাউডার তৈরি করেছেন। ঐ বিভাগের অভিমত, এই প্রোটীন পাউডারে শতকরা ৮৫ ভাগ প্রোটীন আর সব রকম বিশিষ্ট অ্যামাইনো এসিড এতে পাওয়া যায়। সাধারণত গুড়ো ডিমে শতকরা ৪৩.৪ আর পনীরে ৩৬.৪ ভাগ প্রোটীন থাকে। প্রোটীন মনুষ্যদেহের পক্ষে বিশেষ উপকারী পদার্থ। বিশেষত যক্ষ্মা রোগী, ডিওডোনাল আলসারের রোগী এবং অপুষ্ট দেহের পক্ষে প্রোটীন খুবই উপকারী। এই সমস্ত কারণে কোনও ভারি অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর রোগীকে প্রোটীনবহুল খাদ্য দেওয়া হয়। আপেক্ষিকভাবে অল্পব্যয়ে আদ্র বিশ্লেষণ করে মাছের ঝড়তি-পড়তি অংশ থেকে এই মৎস্য বিভাগ এক নতুন পদ্ধতিতে প্রোটীন পাউডার তৈরী করছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, হাঙ্গর ও শঙ্কর মাছের মাংসে খুব বেশী পরিমাণে প্রোটীন পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মৎস্য বিভাগ এখন এই সব মাছের ঝড়তি-পড়তি অংশ এবং হাঙ্গর ও শঙ্কর মাছকে প্রোটীন তৈরির কাজে লাগাচ্ছেন।

আন্দামানে সূর্যগ্রহণ

বেণু সেনগুপ্ত

গত ২০শে জুন ভারতীয় এলাকার অন্তর্গত আন্দামানে পূর্ণ সূর্য-গ্রহণ হয়ে গেল, এরূপ পূর্ণ গ্রাস ১২৫০ বৎসর পূর্বে আর একবার হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকদের মতে আবার ২১৩ বৎসর পরে হওয়ার কথা। চারটিখানি কথা নয়, বৃহত্তর ভূখণ্ডে ত রীতিমত হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। কুরুক্ষেত্রের গঙ্গায় এই গ্রহণ উপলক্ষে স্নান করে পাপক্ষয় করবার জন্য অগণিত জনসমাবেশ। বিদেশীদের কথা ছেড়ে দিন, ভারতীয় আবহাওয়া বিশারদ ও বিজ্ঞানীরা তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গ ও তল্পিতল্পা সমেত গিয়ে ঘাটি বাঁধেন লঙ্কা দ্বীপে, সূর্যগ্রহণ সেখান থেকেই নাকি সুষ্ঠুভাবে ও পরিপূর্ণভাবে পর্য-বেক্ষণ করবার কথা। রেডিওর সংবাদ থেকে অবশ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, পূর্ণগ্রহণ আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে দেখা যাবে এবং সবচেয়ে ভালভাবে। আন্দামানে পূর্ণগ্রহণ হয়েও গেল। দুঃখের বিষয়, কাউকেই দেখতে পেলাম না। কোন মহারথী তো দূরে থাক, ছোটখাট পদাতিক টাইপও কেউ পদার্পণ করতে আসেনি এই দ্বীপের কোনও অংশে; যানবাহন চলাচলের অভাব অথবা সমুদ্র পীড়ার ভয়েই কি এখানে আসার কথা কারও মনে উৎসাহ জাগায় নি; না এই নগণ্য সাগরপারের দ্বীপটির কথা কারও মনে উদয় হয়নি। অথচ এই মহা গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণের আদি-অন্ত সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের ফাঁকি দিয়ে দ্বীপ-বাসীদের সমক্ষে প্রকাশিত হল। তাই "ভগবানের মা'র দুনিয়ার বা'র" চলতি প্রবাদটির কথাই বারে বারে মনে হচ্ছে। উপেক্ষিত আন্দামানে আমাদের "সাদা" চক্ষে সূর্যগ্রহণের যে অপরূপ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য লাভ হল তার কণা-মাত্রও যদি ভারতীয় আবহাওয়া বিশারদরা ও বৈজ্ঞানিকরা লঙ্কা দ্বীপে গিয়ে দেখতে পেতেন, তবে তাঁদের ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা আংশিক সার্থক হত বৈকি। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর আবার সূর্য-গ্রহণ (বলয়গ্রাস) হবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাতে হলে এবার নিকোবর দ্বীপে ঘাটি বাঁধাই সমীচীন হবে।

১৯শে জুন রাত্রিতে আকাশবাণীর মারফৎ সূর্যগ্রহণের কথা শুনেছিলাম। মাসীমা এসে বললেন, "বেণু, কাল সকাল ৮টার পূর্বেই চা পর্ব শেষ করতে হবে, গ্রহণের মধ্যে কিছু যে খেতে নেই।" বয়স অনুপাতে আমি আবার একটু বেশী আরামপ্রিয়; অর্থাৎ চতুর বলে খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও ঘুম থেকে উঠতেই ৮টা বেজে যায় আমার। যা হোক, আন্দামানে আছি বলে তো আর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট করতে পারি না! তাই মাসীমার কথায় রাজী হতেই হল।
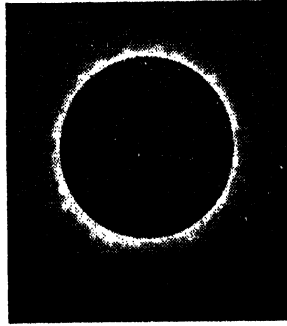
আন্দামানের কৃষ্ণবর্ণ আকাশে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ

সকাল বেলাকার নিয়মিত কাজগুলো সেরে তাড়াতাড়ি গিয়ে মাসীমার শরণাপন্ন হলাম। দেখি পরোটা, আলুর দম ও গরম চা খাওয়ার টেবিলে বিরাজমান। বসতে যাবো এমন সময় দেখি রবি, মিন্টু ও মিন্টু (সবাই বাবু) দুপ্ দাপ পায়ের শব্দে দোতালার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে কালি মাখা কাচের টুকরো। দিব্যি উঠোনে দাঁড়িয়ে কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যের দিকে নজর দেয় তারা। আকাশের অবস্থা বেশ পরিষ্কার, মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, যদিও পূর্ব রাত্রিতে প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল।

সূর্যগ্রহণের লগ্ন ঘনিয়ে এলো বলে প্রাতরাশ গোগ্রাসে শেষ করতে হয়। "লেগে গেছে, লেগে গেছে" বলে প্রথমে চীৎকার দেয় মিণ্টুবাবু, চায়ের পেয়ালায় দু-চার চুমুক দিয়েই আমিও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বের হই। রবির হাতের কাচের টুকরোটা টপ্ করে নিয়ে চক্ষের সামনে রাখতেই দেখি গ্রহণ লেগে গেছে। প্রখর তেজোময় সূর্যদেব মৃদুমন্দ গতিতে রাহুর গ্রাসে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সর্বভারতীয় সময় থেকে আন্দামান সময় ঠিক এক ঘণ্টা আগে চলে; তাই আফিসের দিকে রওনা হতে হয়। পূর্ণ-গ্রহণ ভাল করে দেখবার জন্য কালি-মাখা কাচের একটা টুকরো নিতে ভুল হয় না আমার। আফিসের দোরগোড়ায় যেতেই মুচ্ছুভাইয়া (একজোড়া গোঁফের মালিক) জলপূর্ণ একপাত্রের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে থেকে বলে আমায়, "খা লিয়া, বহুৎ খা লিয়া"। একটা কালো পদার্থের ভেতর দিয়ে আমিও যে সূর্যগ্রহণ দেখছিলাম তা দেখেই ছুটে আসে মুচ্ছু-ভাইয়া। "এ ক্যায়া চীজ্ হ্যায়—দেখাইয়ে না—পূরা দেখাই যাতা।" "জরুর, আধাসে য্যাদা খা লিয়া হ্যায়" উত্তর দিয়ে কাচের টুকরোটা ওর হাতে দিয়ে দেই। মুহূর্তে ওটা হাত থেকে হাত বদল হতে লাগলো।

পূর্ণগ্রাসের কিছু পূর্বে সূর্যকে দেখায় ঠিক ঈদের চাঁদের মত। চারদিকের আকাশ খানিকটা ছাড়া ছাড়া ধূসর মেঘে আচ্ছন্ন। একটা হালকা ও স্বচ্ছ মেঘের পর্দা প্রায় সব সময়েই সূর্যদেবের নীচে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। একবার একটা কালো মেঘ সূর্যকে ঢেকেই ফেললো। আমরা ত ভাবলাম হল [illegible]।
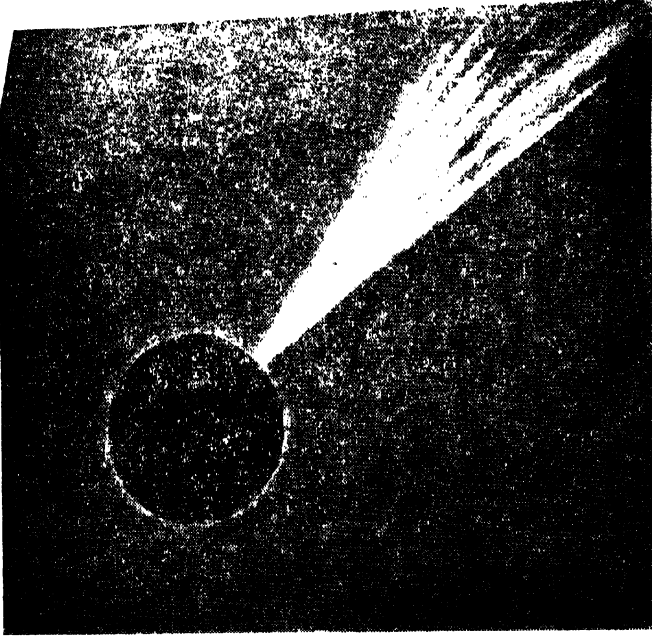
দিবা অন্ধকারে মোক্ষ আরম্ভের অপরূপ দৃশ্য

সৌভাগ্য আমাদের যে শীঘ্রই মেঘ কেটে গিয়ে পূর্ণগ্রাস কবলিত সূর্যকে দেখা গেল কৃষ্ণবর্ণ একটা সমতল গোল থালার মত। কালো থালার চারদিকে উজ্জ্বল একটা জ্যোতি। অপরূপ সে দৃশ্য। যে যেখানেই ছিল সকলেই বাইরে এসে আকাশের পানে তাকিয়ে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে রইল। হঠাৎ দিনের আলো নিভে গিয়ে আঁধারে ঘিরে ফেললো আমাদের। চার-পাঁচ হাত দূরের লোকজনদের মুখ চেনাই দুরূহ। কয়েক মিনিট আগেও পাহাড়ের চূড়াগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সব-কিছুই যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল। পাহাড়ী শহর। আঁকাবাঁকা উ'চু নীচু রাস্তার দুধারে লাইট পোস্টের মিটমিটে বাতি-গুলো জ্বলে উঠল; আকাশের সর্বত্র ফুটে উঠল নিশার নক্ষত্র। দিনে দুপুরে অগণিত তারা—স্বপ্ন দেখছি না তো? হঠাৎ রাত্রির আগমনে প্রাণীজগতেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। নিকটেই কতক-গুলো ছাগল ঘাস খাচ্ছিল; সেগুলো ম্যা-ম্যা শব্দ করে ঢুকলো গিয়ে একটা পুরনো শেড্-এ। রাত্রি হয়ে গেছে এই তারা মনে করছে। আফিসঘর সংলগ্ন উচ্চ আম্রবৃক্ষে কয়েকটি কাক বসে এদিক-ওদিক খাদ্যের অন্বেষণে তাকাচ্ছিল। তারাও কা-কা শব্দে ফিরে চললো তাদের নীড়ে রাত্রি হয়েছে মনে করে।

পাঁচ মিনিটের উপর আমরা এরূপ দ্বিপ্রহরের অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলাম। অদৃশ্য সূর্যের চতুর্দিকে একটা উজ্জ্বল আলোয় জ্যোতির্মণ্ডল ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাইনি। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছি গ্রহণ সম্বন্ধে নানা লোকের নানাবিধ উদ্ভট কিংবদন্তী, গল্প ও আখ্যায়িকার আলোচনা। রাহুর ভোজনশক্তি দেখে সবাই বিস্ময় বিমুগ্ধ। মাঝখান থেকে গ্রহণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হলাম। তারপর হঠাৎ সূর্য-দেবের মাথার ডানদিক হতে সার্চ লাইটের মত একটা প্রখর রশ্মি বেরিয়ে আসে, আর অন্ধকার এককালে দূরীভূত হয়ে যায়। পূর্ণগ্রাস শেষ হয়ে ক্রমে ক্রমে সেই প্রখর রশ্মিটি আয়তনে বৃহদাকার ধারণ করে। ফিরে আসি আমরা আবার চির-পরিচিত দিনের আলোয়।
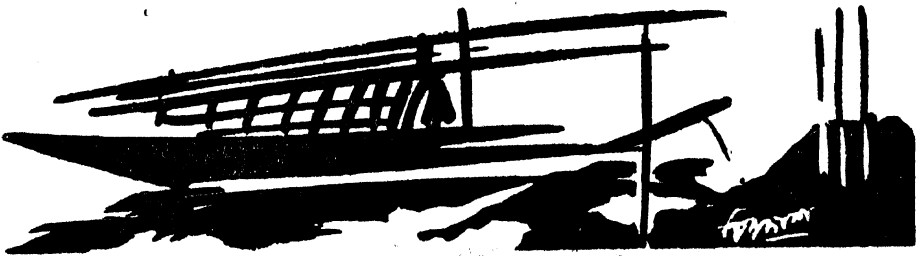
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও পূজা

শ্রীসরলাবালা সরকার

শ্রী **রামকৃষ্ণ** মিশন স্থাপিত হইল। যদিও 'রামকৃষ্ণ মিশন' এই নামই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু 'রামকৃষ্ণ প্রচার'ও বলা হইত, কেননা 'মিশন' শব্দটি বিদেশী।

'মিশন' স্থাপনের বিবরণ তিনিখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

প্রথম—উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত স্বামী-শিষ্য সংবাদ—১৯১২ খৃঃ। প্রকাশক ব্রহ্মচারী কপিল।

এই গ্রন্থের ৭৩—৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—স্বামীজী কয়েকদিন হইতে বাগবাজার 'বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি আজ একত্রিত হইতে আহবান করায় ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাড়িতে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও এখানে উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠন করা। (এটি প্রথম দিনের অধিবেশনের কথা)

দ্বিতীয় — স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ৩য় খণ্ড। এই জীবনী তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণের সংগৃহীত বিবরণ। ইহাতে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহার বাংলা অনুবাদ এইরূপ ঃ—"একটি সমিতি গঠন করবার উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হওয়ার জন্য স্বামীজী তাঁদের আহবান করায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ১লা মে বৈকালে বলরামবাবুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণ একত্রিত হয়েছিলেন।"

তৃতীয়—১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে বেলুড় মঠ হইতে মিশনের গভর্নিং বডি কর্তৃক প্রকাশিত রেজেস্ট্রি করা দ্বিতীয় সাধারণ রিপোর্ট, ১—৩ পৃষ্ঠা। ইহাতে আছে,—"একটি সমিতি স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হবার জন্য স্বামীজী তাঁদের আহবান করায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে কলিকাতা বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে 'বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণ এবং ভক্তগণ সমবেত হয়েছিলেন।"

এবং অরিজিন্যাল প্রসিডিং বুক অর্থাৎ মূল খাতায় আছে ঃ—

In pursuance to a call from Swami Vivekananda a meeting of the Grihastha desciples and followers of Sri Ramakrishna Deva was held on the evening of the 1st May, 1897, at the premises of late Babu Balaram Bose, No. 57, Ramkanta Bose's Street, Calcutta, several Sannyasis of the Alambazar Math favoured the meeting with their presence.

৫ই মে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইবার পর ৬ই মে স্বামীজী আলমোড়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার আলমোড়া রওনা হইবার আগেই মিস মুলার ও মিস্টার গুডউইন আলমোড়ায় চলিয়া গিয়াছেন।

৫ই তারিখে মিশন প্রতিষ্ঠা হইবার পর স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য দেশের এক শিষ্যাকে যে পত্র লেখেন সেই পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।......

"আমি কাল আলমোড়া যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও আর একটি শৈলনিবাস।

* * "কলিকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গিয়েছে। আমার বর্তমান অভিপ্রায় হচ্ছে, প্রধান তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার 'নর্মাল স্কুলস্' (সাধারণ বিদ্যালয়) হবে, ঐ তিন স্থান থেকে আমি ভারতবর্ষে অভিযান করতে চাই।

"আমি আর কয়েক বৎসর বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই রামকৃষ্ণেরই হয়ে গিয়েছে।

* * * "আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলাম, এখানে আর এক লোক হয়ে গিয়েছি। এখানে সমস্ত জাতিই আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি বলে মনে করছে—আর সেখানে ছিলাম একজন ঘৃণ্য প্রচারক মাত্র। এখানে রাজারা আমার গাড়ি টানে—আর সেখানে একটা ভাল হোটেলে পর্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্য এখানে এমন কথা বলতে হবে, যাতে সমস্ত জাতির—আমার সমস্ত স্বদেশবাসীরই মঙ্গল হয়, সেই কথাগুলি দু'চার জনের যতই অপ্রীতিকর হোক্ না কেন।"

এই পত্রে যেন একটি বিদায়ের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই সময় স্বামীজীর শরীর যে খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। তাই তিনি ভারতবর্ষের তিনটি স্থানে তিনটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার অবর্তমানেও প্রচারকার্যের কোন হানি না হয়। এই তিনটিকেই তিনি নর্ম্যাল স্কুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোনটিকেই প্রধান কেন্দ্র বলেন নাই।

আর সমস্ত দেশেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহাও তি[illegible] অনুভব করিয়াছেন।

এই মে মাসেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথ[illegible] রিলিফের কার্য আরম্ভ হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, অন্নাভাবে অনেক লোকই মারা গিয়াছে, সুতরাং সেখানে সাহায্য কেন্দ্র খোলা বিশেষ প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যতালিকার মধ্যে এই রিলিফের কার্য একটি বিশে[illegible] স্থান অধিকার করিয়া আছে। বন্যা দুর্ভিক্ষ বা মহামারী যাহাই হোক্ [illegible]

কেন রামকৃষ্ণ মিশনই অগ্রসর হইয়াছে সাহায্যদানের জন্য সর্বাগ্রে; এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার পরে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান সাহায্যদানের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং ইহাতে সমগ্র দেশে জন-সেবার একটি আবহাওয়া দেখা দেয়। ছেলেরা এইভাবে সৎকার্যে আগাইয়া যাইবার একটি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেশের নৈতিক উন্নতিও হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। একভাবে দেশের এই হাওয়া পরিবর্তনের রামকৃষ্ণ মিশনই কারণ স্বরূপ।

মুর্শিদাবাদে রিলিফ কাজের ভার পাইলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং তাঁহার সাহায্যকারী হইয়া স্বামীজীর দু'জন শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দও তাঁহার সহিত মুর্শিদা-বাদ রওনা হইলেন। এই ভাবে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা নামক গ্রামে রিলিফের কার্য আরম্ভ হইল। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম রিলিফের কাজ।

স্বামীজী আলমোড়া হইতে এই রিলিফ কাজ কিভাবে চলিতেছে তাহার খবর লইতেছিলেন। তিনি এই সময় লিখিয়াছেন—"অখণ্ডানন্দ মহুলায় অদ্ভুত কর্ম করেছে বটে, কিন্তু কার্যপ্রণালী ভাল বোধ হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে সে একটা ছোট গ্রাম নিয়েই তার শক্তি ক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণ কার্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচারকার্যও হচ্ছে,—কই এরূপ তো শুনতে পাচ্ছি না। লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হ'তে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান,—চরিত্র এবং বুদ্ধি-বৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষাবিস্তার। আমি সে সম্বন্ধে তো কোন কথাই শুনছি না—কেবল শুনছি এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

"ব্র'কে (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) বল বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরো, বোধ হচ্ছে ঐ কার্যে এ পর্যন্ত ফলত কিছু হয়নি, কারণ তারা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের ভিতর দেশবাসীর শিক্ষাবিধানের জন্য সোসাইটি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারেনি। ঐরূপ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হ'তে পারবে এবং বিবাহ-বন্ধনে জড়িত হবে না। এবং তা হলেই ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে আপনা-দের রক্ষা করতে পারবে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়, কিন্তু তার দ্বারা লোকের যথার্থ কল্যাণ হয় না, লোকের যথার্থ কল্যাণ যাতে হয় তারই চেষ্টা করতে হবে।

"সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে—একটা ছোট কুঁড়েঘর নিয়ে গুরুমহারাজের মন্দির কর,—গরিবরা সেখানে আসুক—তাদের সাহায্যও করা হোক্—আর তারা সেখানে পূজাও করুক। রোজ সকাল সন্ধ্যায় সেখানে 'কথকতা' হোক্। ঐ 'কথকতার' দ্বারা তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা কর, শেখাতে পারবে। ক্রমে ক্রমে স্থানীয় লোকেরা ঐ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হবে, তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ কুঁড়ে ঘরে স্থাপিত মন্দিরটি একটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণতও হ'তে পারে। যারা দুর্ভিক্ষ মোচন কার্যে যাচ্ছে তারা প্রথমে প্রত্যেক জেলার মাঝা-মাঝি একটা জায়গা ঠিক করুক এবং সেখানে এইরকম কুঁড়েঘরে মন্দির স্থাপন করুক—যেখান থেকে আমাদের সমস্ত কাজ সামান্যভাবে আরম্ভ হবে। * *

"যারা দুর্ভিক্ষ মোচনের কাজ করছে, তাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দান যেন উপযুক্ত পাত্রে পড়ে—জুয়া-চোরেরা যেন ঠকিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। ভারতবর্ষ এইরকম অলস জুয়া-চোরে পূর্ণ, আর মজা হচ্ছে এই, তারা কিন্তু না খেয়ে মরে না, কিছু না কিছু খেতে পায়ই। ব্র'কে বল যারা দুর্ভিক্ষে কাজ করছে, তাদের সকলকে এই কথা লিখতে—যাতে কোনও উপকার নেই এমন কাজে তাদের টাকা খরচ করতে দেওয়া হবে না, আমরা চাই যতদূর সম্ভব কম খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকাজ করতে।

(We want the greatest possible good work permanent from the least outlay).

"এখন তোমরা দেখছো, তোমাদের নূতন নূতন মৌলিক ভাব ভাববার চেষ্টা করতে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই সমস্ত কাজটাই চুরমার হয়ে যাবে। এইরকম করতে পার, তোমরা সকলে মিলে এই বিষয় আলোচনার জন্য একটা সভা কর—আমাদের হাতে যে অল্প স্বল্প সম্বল আছে তা থেকে কি করে সর্বাপেক্ষা ভাল স্থায়ী কাজ হ'তে পারে। কিছুদিন আগে থেকে সকলকে এ বিষয়ে খবর দেওয়া হোক্—সকলেই নিজের মতামত বক্তব্য বলুক—সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক্—বাদ প্রতিবাদ হোক্ তারপর আমাকে তার একটি রিপোর্ট পাঠাও।"

এই পত্রে স্বামীজীর প্রত্যেকেরই স্বাবলম্বন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ এবং স্থানীয় লোকের নিজ নিজ স্থানের সকল সমস্যা সমাধানের এবং সংগঠনের ভার নিজেদেরই লওয়া উচিত এইরকম মনো-ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আগেও বলিয়াছিলেন, "আমি বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের পক্ষপাতী।"

গঙ্গাধর মহারাজ মুর্শিদাবাদে মহুলা গ্রামে যখন দুর্ভিক্ষমোচন কার্য করিতেছিলেন তখন মুর্শিদাবাদের কলেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার লেভিঞ্জ তাঁহার কাজে সব সময় লোক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই উৎসাহ ও সাহায্যে সেখানে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ যতদিন জীবিত ছিলেন বরাবরই এই আশ্রমের কার্যভার বহন করিয়াছেন এবং এই আশ্রমটিই রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলাদেশে প্রথম স্থায়ী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজের 'ব্রহ্ম-বাদিন' নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি পত্র বাহির করেন, এই পত্রে মুর্শিদা-বাদের দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ ছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন এই পত্রখানি বাহির হয়। তাহার ভাবার্থ এইরূপঃ—"স্বামী অখণ্ডানন্দজীর দুর্ভিক্ষ রিলিফ

কার্য দেখে স্থানীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃপক্ষগণ এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, মুর্শিদাবাদের কালেক্টর মিস্টার লেভিঞ্জ তাঁকে অর্থ ও লোক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যেতেন এবং যখনই তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়া হত তিনি তাঁকে (অখণ্ডানন্দজীকে) পরামর্শও দিতেন। সে সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ অসহায় দুটি অনাথ বালককে—যারা অন্নাভাবে মরণাপন্ন—দেখ্‌তে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং সেই থেকে সেই পিতৃমাতৃহীন-দ্বয়কে পিতামাতার স্নেহে পালন করতে থাকেন।

"ঐ দুটি অনাথ বালকের দুরবস্থা মহৎ ও উচ্চমনা লেভিঞ্জের হৃদয়কেও স্পর্শ করে এবং তিনি অখণ্ডানন্দ স্বামীকে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপনের জন্য অনুরোধ করে বলেন যে, যদি তাঁর আপত্তি না থাকে তা হ'লে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে জমি দিতেও প্রস্তুত আছেন। ঐ প্রস্তাব অখণ্ডানন্দ স্বামীজীরও (যিনি তাঁর দেশবাসীর সেবার জন্য সকল সময়েও প্রস্তুত) মনে লাগ্‌লো এবং তিনি সম্মত হলেন। তিনি মত দেওয়ায় গভর্নমেণ্ট তাঁকে (অর্থাৎ অখণ্ডানন্দ স্বামীকে) পঞ্চাশ বিঘা জমি দেন এবং তথায় অনাথ বালকদের থাকবার জন্য একটি আস্তানাও নির্মিত হয়। মহুলা অনাথ আশ্রম স্থাপনের ইহাই ইতিহাস—যেখানে কোমল হৃদয় উন্নতমনা স্বামী অখণ্ডানন্দের অপত্যস্নেহে পালিত আটটি অনাথ বালক আশ্রয় পেয়েছে।"

এই পত্র থেকে বোঝা যায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জমিটি মহুলা গ্রামে যিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণের কার্যে ছিলেন সেই অখণ্ডানন্দ স্বামীকেই দিয়াছিলেন এবং এইভাবে জমিদানে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বা মিশনের সাধারণ সভাপতি ই'হারা কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বরং স্বামীজী এই সংবাদে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজকে উৎসাহ দিয়া পত্রও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ১৮৯৭ খৃঃ ২৯শে জুলাইয়ের একখানি পত্র এইরূপঃ—"কল্যাণবরেষু—তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হ'য়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লাম। অরফ্যানেজ সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় তা উত্তম ও শ্রীমহারাজ তা অচিরাৎ পূর্ণ করবেন ইহা নিশ্চিত। একটা স্থায়ী সেন্টার যাতে হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। * * টাকার জন্য চিন্তা নাই, কল্য আমি আলমোড়া থেকে প্লেনে (সমতলে) নামব, যেখানেই হাঙ্গামা হবে সেইখানেই একটা চাঁদা করব ফেমিনের জন্য, ভয় নাই। আমাদের কলকাতার মঠ যে প্রকার—ঐ নমুনায় প্রত্যেক জিলায় যখন এক একটি মঠ হবে তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" (পত্রাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ ৩৭নং পত্র)

এইভাবে প্রথমেই মুর্শিদাবাদে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু তখনও ঠাকুরের অস্থি সমাধি দানের জন্য গঙ্গাতীরের জমি ক্রয় করা হয় নাই। জীবসেবার মধ্য দিয়াই ভগবানের প্রকৃত সেবা, ইহাই ছিল স্বামীজীর উপদেশের সার মর্ম, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" এই বাণী যেন এই অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া মূর্ত্যরূপে প্রকটিত হইল।

স্বামীজীর প্রত্যেক ভাষণে প্রত্যেক পত্রে এই সুরটিই যেন প্রধান সুর। তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন ঃ—"বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ!' বলায় কোন ফল নাই, যদি গরীবদের জন্য কিছু করতে না পার। * * যদি মাংস খেলে লোকে অসন্তুষ্ট হয় তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করবে, পরোপকারের জন্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করাও ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নয়, গেরুয়া মহাকার্যের নিশান। কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' অঞ্জলি দিতে হবে। পড়েছ তো, 'মাতৃদেবো ভব' 'পিতৃদেবো ভব'—আমি বলি 'দরিদ্রোদেবো ভব' 'মূর্খদেবো ভব'।"

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে একখানি পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছেনঃ—"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে বেঁচে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ

গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক? সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য? দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ,—আমি ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি—এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মেলে কি?
'সর্বশাস্ত্র পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্য পুণ্যায় পাপায়
পরপীড়নম্।

"সত্য নয় কি?

"দাদা, এই সব দেখে বিশেষত দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না। একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম কেপ্ কমোরীন্ অন্তরীপের মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুক্‌রার উপরে বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি,—লোককে মেটাফিজিক্‌স (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে—তার কারণ মূর্খতা। আমরা চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি—আর দু'পা দিয়ে মাড়িয়েছি। * *

"যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিত-চিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়,—নানা উপায়ে নানা কথা ম্যাপ, ক্যামেরা ও গ্লোব প্রভৃতির সাহায্যে আচণ্ডালের উন্নতি করে বেড়ায় তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না?

"আমরা একটা জাতি হিসাবে আমাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি এবং তাই ভারতের সকল দুর্বলতার কারণ। জাতির ঐ হারানো ব্যক্তিত্ব আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে এবং জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses.

"এই জনসাধারণ,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই তাদের পদতলে দলিত করেছে। আবার তাদের পুনরুত্থানের শক্তি, তা তাদেরই ভিতর থেকে জাগ্রত করতে হবে—আর গোঁড়া হিন্দুদের এই কার্য করতে হবে। সকল দেশেই যে দোষসমূহ আছে, তা ধর্মের সংশিলষ্ট নয়, বরং ধর্মের বিরুদ্ধেই। সুতরাং ধর্মকে দোষী করা যায় না—দোষ মানুষের।

"এই কাজ করতে হলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই অর্থ। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে ১০।১৫টি লোক পাব, অর্থের চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!! তাই আমেরিকা এলাম, নিজে উপার্জন করবো, ক'রে দেশে ফিরবো।
and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.
এবং জীবনের শেষ কটা দিন এই একমাত্র উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গ করবো।

স্বামীজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দস্বামীকে লিখিয়াছিলেন, "মহোৎসব খুব ধুমধামে হয়েছে ভাল কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায় ততই মঙ্গল। তবে একটা কথা—মহাপুরুষগণ যখন আসেন, বিশেষ কোন শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নয়। কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁদের সেই উপদেশ বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে নামের জন্য মারামারি করে,—এই তো পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়—আমি কোন খাতিরে আনি না—তবে তাঁর উপদেশ, জীবন, শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে প্রস্তুত। আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর অবশ্য মন্দ নয়, তবে ঐটিই all in all (সর্বস্ব) করে ফেলবার tendency আছে লোকের, আমার তাই ভয়। আমি জানি তারা কেন ঐ পুরানো ছেঁড়া ceremonial

(অনুষ্ঠান পদ্ধতি) নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit চায় work, কোনও outlet নেই (অর্থাৎ অন্তরাত্মা চায় কাজ, বাহির হবার পথ পায় না), তাই ঘণ্টা নেড়ে energy খরচ করে।

"যে আত্মম্ভরী আপনার যশ খুঁজছে, আয়েস খুঁজছে—তার নরকেও জায়গা নেই। আর যে আপনি নরকে গিয়েও জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহাসন্ধিপুজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে সেই আমার ভাই,—সেই তাঁর ছেলে। এই টেস্ট (পরীক্ষা) যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণত্যয়েঽপি পরকল্যাণ চিকীর্ষবঃ' তাঁরা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়,—তারা তফাৎ যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়।"

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী আর একখানি পত্রে তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভাই-দের লিখিয়াছেন—"আমাদের জাতের কোন ভরসা নেই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মনে আসে না — সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে মিলে টানাটানি—"রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন—ত্যামন ছিলেন—" আর আযাঢ়ে গপ্পি,—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে! হরে! বলি একটা কিছু করে দেখাও যে, তোমরা কিছু অসাধারণ—তা নয়, খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হ'ল,—কাল তার উপর ভেঁপু হ'ল,—পরশু তার উপর চামর হ'ল,—আজ খাট হ'ল,—কাল খাটের ঠেংগে রুপো বাঁধানো হ'ল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে—আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প বিশ হাজার মারা হ'ল,—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ,—আর শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র ইত্যাদি। একেই ইংরেজিতে imbecility বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বোকামো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম দু'বার ঘুরবে, না চারবার—ঐ নিয়ে যারা তাদের মাথা দিন রাত ঘামাতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা। আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া, জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টা-গুলোকে গংগার জলে সঁপে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজা করবে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পুজা মানে তাঁরই সেবা—এরই নাম কর্ম —ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়,—ওর নাম পাগলাগারদ। ক্রোড় টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর-ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটা-দের গুষ্টির পিণ্ডি মাখছেন,—এ দিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা মরে যাচ্ছে।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী আলমোড়া হইতে ব্রহ্মানন্দ-স্বামীকে লিখিলেন—"কলকাতার মিটিং-এর খরচখরচা বাদে যা বাঁচে ঐ famineএ পাঠাও বা কলকাতার ডোম-পাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর। হল্ ফল্ ঘোড়ার ডিম থাক, প্রভু যা করবার তা করবেন। * * ঠাকুর পুজার খরচ দু' এক টাকায় মাসে করে ফেলবে; ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে আর কি না ক্ষীর, সর, মাখন ইত্যাদি ভোগ চড়ানো হচ্ছে। এ মহাপাপ, শুধু জল তুলসী দিয়ে ঠাকুরের পুজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দেবে—তা'হলে সব কল্যাণ হবে।"

'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' এই কথাটি স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন সাধনার মন্ত্রস্বরূপ। বৈষ্ণব-ধর্মে "জীবে দয়া" কথাটি আছে, কিন্তু পরমহংসদেব ঐ কথাটি আবৃত্তি করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "দয়া? না, না, দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

স্বামীজীর আলমোড়া থেকে সমতলে নামিবার সময় হইয়াছে জানিয়া আল-মোড়ার অনুরক্ত বন্ধুগণ ও ভক্তগণ যাওয়ার আগে তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেজন্য স্বামীজী জিলা স্কুলে একটি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সময় আলমোড়ার ইংরেজ বাসিন্দাগণ কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্বামীজীর একটি বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে স্থানীয় ইংলিশ ক্লাবে গুর্খা সৈন্যদলের কর্নেল কর্নেল পুলি সাহেবের সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় স্বামীজী আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মিস মুলার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ এইরূপ :—

"আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া স্বামীজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের একত্ব বিবৃত করিতে লাগিলেন। মুহূর্তের জন্য বোধ হইল—বক্তা, বক্তৃতা এবং শ্রোতৃগণ যেন এক হইয়া গিয়াছে। যেন আমি, তুমি বা উহা কিছুই নাই। যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য সেই আচার্যশ্রেষ্ঠের দেহ হইতে মহাশক্তিতে নিঃসৃত আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া এক একত্বের অনু-ভূতিতে আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত রহিলেন। যাঁহারা অনেকবার স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনে এইরূপ অনুভূতি হইয়াছে। ক্ষণ-কালের জন্য তিনি যেন আর দোষ-গুণ সমালোচক শ্রোতাগণের সম্মুখে বক্তৃতা-দাতা বিবেকানন্দ থাকেন না—সে সময়ের জন্য যেন সব বিভিন্নতা বা বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়, নামরূপ অদৃশ্য হয়, কেবল এক কৈবল্যমাত্র বিরাজিত থাকে—যাহাতে বক্তা, শ্রোতা ও বক্তব্য-বাক্য সবই এক হইয়া যায়।"

অনং আকাশে

অনিলকুমার রায়

এখানে ছায়ায় ঘাসে অবিন্যস্ত জোছনার আলো
আলেয়ার মতো জ্বলে জ্বলে যেই কথাকে ফুরালো
রাতের কবোষ্ণ তাপে প্রতীক্ষার সুমিত পুলকে
আকুল আকুতি ভরে। যেই নামে মন অপলকে

ফিরে ফিরে দু'চোখের কিনারায় মায়ার কাজলে
দখিনা বাতাস ছুঁয়ে কামনার শিখা হয়ে জ্বলে।
হৃদয়ের মধুমতী তীরে ফেনানিভ উচ্ছ্বাসে
আরো ঘন হয়ে বাঁধে যেই নীড় নিবিড় প্রয়াসে।

সে নামে এমনও দিন দেখেছি তো বেণীর মতোন
দুলেছিল পৃথিবীটা সময়ের। আজ সেই মন,
রূপসা নদীর বাঁকে আরো এক আকাশের তলে
ডুবে গেছে মুছে গেছে বিস্ময়ের লোনা লোনা জলে।

এখানে আরতো সেই কিচিমিচি পাখির প্রহর
উন্মনা করে না মন, ঠোঁটে নিয়ে কুয়াশার ভোর।

গ্রীষ্মের কবিতা

অমলকান্তি ঘোষ

স্বপ্নের দিন আর কত দেরী, আর কত দূরে......
ছলো-ছলো চোখ কৃষক-বধূরে।
আজো বৈশাখী দিগন্তে শুধু লেখা নীল-নীল।
আকাশের চোখ আজো অনাবিল।
বৃষ্টি নামে না,
এখনো আকাশ দেয়নি ফিরিয়ে
পৃথিবীর দেনা।

ঝিম্ ধরে আসে দুপুরের রোদে, বাড়ি-বন কাঁপে
সাদা উত্তাপে:
পৃথিবীর মনে অসহ্য জ্বালা......ছোঁয়া বিবাগীর।
তবু ত বাতাসে একটু আবীর
ছড়িয়ে দিয়েছে সুরকির পথ।
রঙিন বাতাস শাখায় শাখায়
তোলে নহবৎ।

কুমোর-বৌয়ের গান

শামসুর রাহমান

দ্রাক্ষামূর্চ্ছিত পথের সন্ধ্যায় নয়—
নয়, নয়।
তা'তে কী, দিন শেষে না-হয়
কচুরিপানার ফুলে
ভুলে
জুড়োলে ও-চোখ তুমি, না-হয় মাটির ঢেলায়
জরির আভার হাত রাখলে হেলায়।

জানো এই

শিল্পী-চাকা ঘোরালেই
পুতুলের শতেক গড়ন,
মাটির ঢেলায় সোনার বরণ।
তবু এইটুকু মহাসত্য ব'লে
যাবো শেষে চলে :
আকাশের সতর্ক তারা অজানা খেয়ালে
আসবেনা নেমে মাটির দেয়ালে।

নাকের নোলক নাড়ি, স্নান সেরে বেলাশেষে চুল বাঁধি,
শরীরে জড়াই ডুরে শাড়ি, হাসি, কান্নায় কাঁদি;
ভরা দুপুরে কামরাঙা
কামড়ানো, রোজ ঘুম ভাঙা
দুধ-দোয়ানোর সুরে, মাণিক বাজায়
আম আঁটির ভেপু, সাজায়
তালদীঘির পারে কেয়াপাতার নৌকো তা'র, ভোরে
দিনের প্রথম আলো লুটোয় দোরে;
কোলের শিশুকে বুকে টানি,
ঘরের মানুষ যায় হাটে, চিরকাল থাকবোনা—তা-ও জানি।

কে জানে কী অফুরন্ত আনন্দ
হাওয়ায় দোলানো কাঁচা শাকের গন্ধ,
বর্ষার জলে পা ডোবানো, কুয়োতলায় দাঁড়ানো,
মেঘে মন হারানো
আর মুখ দেখা
দু-আনার মেলার মুকুরে,
ঐ সবুজ, মজা পুকুরে॥

চিত্র প্রদর্শনী

চিত্রগ্রীব

গত ১৬ই জুলাই থেকে ভারত-চীন-মৈত্রী সংঘের উদ্যোগে ১ নম্বর সদর স্ট্রীট-এ একটি চীনা চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। প্রদর্শনীটি তেমন ব্যাপক নয় বটে, কিন্তু সত্যই উপভোগ্য।

চীনা চারু ও কারু শিল্পের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। শোনা যায়, চার হাজার বছরেরও আগে সেখানে কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্রাদির ব্যবহার ছিল। শাঙ রাজত্ব কালে (খৃষ্টপূর্ব ১৫৬২—১০৬৬ সন) বয়ন শিল্প এবং ব্রোঞ্জ শিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭৭০—২২১ সনে লাক্ষার ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে এবং সেই সময় থেকেই শিল্পকর্মের একটি মাধ্যম হিসাবে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

চীনারা নানাবিধ জিনিসের সাহায্যে শিল্পকর্মের সৃষ্টি করে থাকেন, সেজন্য এ'দের কারু শিল্প বহুবিধ—বয়নশিল্প, সূচিশিল্প, লক্ষাশিল্প, মৃন্ময়শিল্প, ভাস্কর্য, প্রস্তর খোদাই, কাগজ এবং শোলার শিল্পকর্ম, খড়কাঠি বা শনের বুনন ইত্যাদি। এ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিহ্‌পায়-শীহ এবং হসু পেই-হুঙএর কয়েকটি ছবি, সিল্কের উপর এম্ব্রয়ডারী, পোর-সেলেন, লাক্ষা শিল্পকর্ম, বাঁশ নির্মিত জিনিস, পাথর খোদাই, হাতীর দাঁতের কাজ, এনামেল-এর কাজ, কয়লা কেটে মূর্তি, শোলা নির্মিত ছবি এবং তারের ছবি।

যে দুজন চিত্রশিল্পীর ছবি রাখা হয়েছে, এ'রা দুজনেই আধুনিক। অবশ্য ইউরোপীয় আধুনিক শিল্প বলতে যে জাতের চিত্রকলা বোঝায় এদের চিত্রকলা সে ধরনের মোটেই নয়। এ'রা প্রথাগত চীনা শিল্পের বিষয়বস্তু এবং ফর্ম ত্যাগ করে সাদৃশ্য সত্যের সন্ধানে এগিয়েছেন—সেই হিসাবে এ'রা আধুনিক। হসু পেই-হুঙ-এর ছবিতে একটু একটু পাশ্চাত্য আঁচ এসে পড়েছে বটে, কিন্তু তা সাবলীল তুলির টান এবং ওয়াশ-এ চাপা পড়ে গেছে, যে তুলির টান এবং ওয়াশ চীনা ছবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সত্যই তাজ্জব বনে যেতে হয় এ'দের সূচিশিল্প দেখে। সিল্কের উপর এম্ব্রয়ডারী করে যেসব প্রাকৃতিক দৃশ্য তোলা হয়েছে, খুব কাছে না গেলে বোঝা মুশকিল যে, ওগুলি জল-রঙের ওয়াসের কাজ নয়। সূচিশিল্পে এ'রা যে উৎকর্ষে পৌঁছেছেন, পৃথিবীর আর কোনও জা[illegible] [illegible] পৌঁছান

সিল্কের উপর এম্ব্রয়ডারী

চীনদেশের একটি ঝুলন্ত সেতু (শিল্পির কর্ক দিয়ে তৈরী)

কালীঘাটের পট

তো দূরের কথা, তার অর্ধেক পথও অতিক্রম করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। চীনা চারু ও কারু শিল্পের প্রদর্শনী কলকাতায় এর আগে আরও কয়েকবার হয়ে গেছে, সুতরাং যাঁরা নতুনের সন্ধানে প্রদর্শনী দেখতে যান, তাঁরা এ প্রদর্শনীটি উপভোগ করতে পারবেন না, তবে যাঁরা শিল্পরসিক, তাঁদের কাছে সত্যিকার শিল্পকর্ম কখনও পুরানো হয় না। যাই হোক প্রদর্শনীটি ২৪শে জুলাই অবধি খোলা আছে, প্রতিদিন বেলা ১টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এবং রবিবার সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

কেম্ব্রিজে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি ভারতীয় চিত্রকলার একটি বিশেষ চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে কেম্ব্রিজ-এ। ছবিগুলি ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়াম-এর সংগ্রহ। ষষ্ঠদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের গোড়া অবধি ভারতীয় চিত্রধারার কি ধরনের অদল বদল ঘটে, সে সম্বন্ধে যাতে মোটামুটি একটা ধারণা হতে পারে, এইভাবে কিছু ছবি বাছাই করে এখানে প্রদর্শন করা হয়। বেশীরভাগই টেম্পারার কাজ। অপেক্ষাকৃত পুরান ছবিগুলির মধ্যে আকবরনামা থেকে কয়েকটি অতি চমৎকার নিদর্শন রাখা হয়েছিল। এগুলি সম্রাট আকবরের জীবনচরিত অনুসরণে রচিত; কোনটিতে সম্রাট শিকারে বেরিয়েছেন, কোনটিতে বিদ্রোহীর পিছনে ধাওয়া করেছেন, আবার কোনটিতে ধৃত চিতাবাঘ ফাঁদ থেকে তোলার সময় সাহায্য করছেন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলে প্রাকৃতিক ইতিহাস চিত্রণ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সেই সময়কার ফুল-লতা-পাতা খচিত বর্ডারের মধ্যে অতি উচ্চাঙ্গের দুইটি পাখির স্টাডী বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত পাহাড়ী লোকশিল্প এবং কিছু কিছু কালীঘাটের পট-শিল্পের নিদর্শনও রাখা হয়েছিল।

ট্রামে-বাসে

পাক-প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলি নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত নেহরুর পরবর্তী আলাপ-আলোচনায় যদি কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া

তাঁহাকে অন্য কোন "এভিনিউর" আশ্রয় লইতে হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তবে সেটা রাসবিহারী এভিনিউ কিংবা আমীর আলি এভিনিউ হবে, তা অবশ্য উজীর সাহেব স্পষ্ট করে বলেননি।"

* * *

শুনিলাম জনাব সুরাবর্দী নাকি মন্তব্য করিয়াছেন, তিনি "Sound principle"এ বিশ্বাসী। —"Sound-এর জন্যে শঙ্খ-ঘণ্টা পাকিস্থানে চলবে না, সুতরাং লড়কে লেঙ্গের মতো জিগিরই হবে মোক্ষম Sound" হট্টগোলের মাঝখানে সহযাত্রীদের কে যেন মন্তব্য করিলেন।

* * *

দান্তের "Inferno"-র উপর নাকি পাক সরকার নিষেধের ফরমান জারি করিয়াছেন।—"বোধ হয় তার চেয়ে বড় রকমের Inferno কেউ পাকিস্তানে রচনা করে থাকবেন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নারায়ণ আশা করেন যে, ১৯৫৫ সালের শেষাশেষি কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা এক কোটিতে দাঁড়াইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্যকারের সদস্যের বিচার করা হইবে তাঁর গুণ দিয়া, সংখ্যা দিয়া নয়। —"তাহলে সংখ্যাটি হয়ত দাঁড়াবে কোটিতে গুটি—Q. E. D."—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ধানভানা কমিটি কলের বদলে ঢেঁকির প্রচলনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।—"উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এর মধ্যে কেউ আবার ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত শুরু না করেন"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যরা বর্তমানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া।—"লোহিয়াজী

ডাক্তার হয়েও যদি হাতুড়ে চিকিৎসা করে থাকেন, তবে পক্ষাঘাত হবে, এ আর বিচিত্র কি?"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

ওয়ার্ধার এক সংবাদে জানা গেল যে, রাম মন্দির হইতে লাফাইয়া নামিতে গিয়া দুইটি বাঁদর বিজলীর তারে আটকাইয়া যায় এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া মৃত্যুবরণ করে। ইহার পর দুইশত বাঁদর মিলিয়া নাকি শোকসভা করে। ইহারও পর ওয়ার্ধার অধিবাসীরা শোভাযাত্রা সহকারে বাঁদর দুইটিকে শ্মশানে লইয়া গিয়া যথারীতি সংকার করে।—"রাম্য রাজ্যের ভূমিকা আগেই রচনা করা হইয়াছে, এবারে শুরু হলো প্রথম অধ্যায়। জয় হিন্দ"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

দিল্লীতে সম্প্রতি আম্র প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম, যাদবপুরে বিশুষ্ক আম্র চূর্ণ

সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছে।—"আমাদের কবিতা মনে পড়ছে—রসাল কহিল, উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে—এত তোয়াজের পর আমের মাথা ঠিক্ থাকলে হয়"—বলে শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু ও মার্শাল টিটো একযোগে আলাপ-আলোচনা করিয়া দুইজনেই একটি Common ground আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"সুসংবাদ সন্দেহ নেই, আমরা আশা করব, এটা যেন শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের Common ground হয়ে না দাঁড়ায়"—বলে শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, সরকার কলিকাতায় একটি স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন আছেন। (সাধু, সাধু)। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইবে, আর না হইলে শীতের অধিবেশনে হইবে। খুড়ো বলিলেন—"শীতেও যদি না হয়, তাহলে গ্রীষ্মে, তখন না হলে বর্ষা, তারপর হেমন্তও তো আছে"!!!

সস্তার ধর্ম

বাঙলা ছবির অসম্প্রসারিত বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে খরচের দিক থেকে যেমন সস্তায় ছবি তৈরির রেওয়াজ দেখা দিয়েছে, তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলও দেখা দিচ্ছে রুচির দিক থেকেও অতি খেলো জিনিস পরিবেশনে। সস্তা খরচ মানে গল্পের জন্য বেশী খরচ করতে না চাওয়া; অভিনয়ের জন্য

রূপজগৎ

—শৌভিক—

খরচের বাজেট কমিয়ে ধরা; সঙ্গীতাদি যাবতীয় কলাকৌশলের কাজ নমো নমো করে সেরে নেওয়া; এবং আঙ্গিক পরিসজ্জা ব্যাপারে পারিপাট্যের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে যাওয়া। এ অবস্থায় রুচির প্রশ্নকে জলাঞ্জলি দেবার মনোভাবও পরিস্ফুট না হয়ে পারে না। সস্তার এই হচ্ছে ধর্ম এবং টাস ফিল্মস তাদের 'জয় মা কালী বোর্ডিংয়ে' অতি নিষ্ঠার সঙ্গেই সে-ধর্ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। চেহারার দৈন্যদশা দেখলেই বোঝা যায় যে ছবিখানি অল্প খরচেই সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রুচির বালাইকেও গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবির কাহিনী রচয়িতা কে এই শৈলেশ দে জানা নেই, কিন্তু যে বস্তু তিনি পরিকল্পনা করেছেন, তার মধ্যে না আছে সাহিত্যভঙ্গী, আর না আছে এতটুকুও মার্জিত শিল্পদৃষ্টি। এমনিই এর ঘটনা পরিবেশ যাকে গানের ভাষায় খেউড় বলে অভিহিত করলে অসঙ্গত হবে না। ছবিখানি দেখতে দেখতে দু ঘণ্টা ভরে হাসিতে লুটোপুটি খাওয়া থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল, কিন্তু সে হাসির উপাদান এমনি, যা একান্তে বা বন্ধু-বান্ধব অথবা বড়জোর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অবলোকন করা যায়; ছেলেমেয়ে মা-বোনদের সঙ্গে বসে দেখা তো দূরের কথা, ওর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাও করা যায় না। সেন্সর বোর্ডের নিশ্চয়ই আলাদা অভিমত, তা না হলে ছবিখানিকে নিষ্কলুষতার প্রমাণচিহ্ন 'ইউ' অর্থাৎ সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য বলে মার্কা দিয়ে দিতেন না তারা। অথবা নতুন আঞ্চলিক অফিসার শ্রীভরদ্বাজ একটু বেশি উদারনীতিক!

* * *

চ্যাংড়া টাইপের পাঁচটি ইয়ারকে নিয়ে গল্প। রামকানাই, কল্যাণ, দিলীপ, অখিল ও শ্যামল। একজোট হয়ে থাকতো দি গ্রেট এশিয়া জয় মা কালী বোর্ডিংয়ে। হোটেলের মালিক গজানন হালদার কালীর নাম করে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে বোর্ডারদের সঙ্গে। বলে কয়ে ধমকে কোন ফল না পেয়ে পাঁচ ইয়ারে হোটেল ত্যাগের সংকল্প করলে। কিন্তু বাড়ি জোটানো মুশকিল। হঠাৎ একটা খোঁজ পাওয়া গেল। রায় বাহাদুর বি ব্যানার্জি তার বাড়ির একতলা ভাড়া দেবেন, কিন্তু সপরিবারে থাকতে হবে। রায় বাহাদুর ব্লাডপ্রেসার রুগী, নীচে নামেন না। তার স্ত্রী চোখে ঝাপসা দেখেন। এরা পাঁচজনে একটা ফন্দি ঠিক করে ঘর ভাড়া নিলে। ভাড়াটে আসতে দেখা গেল রামকানাইয়ের বৌ সেজেছে অখিল, আর কল্যাণের বৌ সেজেছে শ্যামল। বউ দুটিকে পেয়ে রায় বাহাদুর গৃহিণী খুবই খুশী। মুশকিল বাঁধলো রায় বাহাদুরের কন্যা শেফালি পশ্চিম থেকে চলে আসায়। শেফালি নীচের তলার বৌদুটির সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ করতে চায়, অথচ ওরা যেন কেমনধারা। কল্যাণ কিন্তু শেফালিকে দেখা থেকেই তার প্রেমে পড়ে গেল। শেফালির যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে থাকে সে, শেফালি তাতে রুষ্টা হয় এই মনে করে যে, ঘরে যার অমন 'স্ত্রী' তার এই উঞ্ছবৃত্তি কেন! দুপুরে নীচের কর্তারা অফিসে চলে গেলে রায় বাহাদুর গৃহিণী 'বৌ' দুটিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গল্প করেন। কোনদিন শেফালি হঠাৎ কলেজ থেকে এসে পড়লেই 'বৌ' দুটির অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে, কোনরকমে পালিয়ে নীচে নিজেদের ঘরে এসে বাঁচে তখন। অখিলের সদাই ভয়, তাছাড়া দিনরাত 'বৌ' সেজে থাকার কষ্টও ওর কাছে অসহ্য হলো। কাজেই রামকানাইয়ের 'স্ত্রী'কে চলে যেতে হলো বাপের বাড়ি! ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। রামকানাই সত্যিও বিবাহিত; দেশে তার স্ত্রী আছে। অনেক দিন তার খবর না পাওয়ায় দেশ থেকে লোক এলো তার খবর নিতে এবং সেই ব্যক্তি স্বচক্ষে রামকানাইয়ের আর
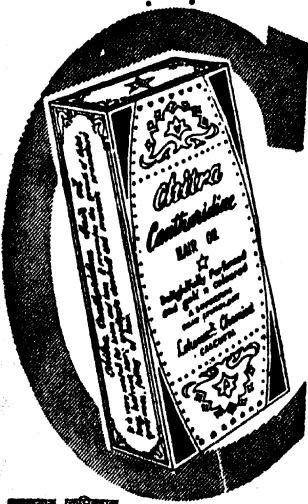
অগ্রদূত পরিচালিত "সবার উপরে"-র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও জয়শ্রী সেন

একটি স্ত্রী দেখে গেল। দেশে তাই নিয়ে কান্নাকাটি। এদিকে কল্যাণেরও অবস্থা শেফালি বিহনে অতিষ্ঠ। শেফালিকে পাওয়ার সুযোগ হবে ভেবে এক বিয়ের উপলক্ষ্য আবিষ্কার করে 'ছোট বৌ'রূপী শ্যামলকে তার কল্পিত দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একদিন তার হঠাৎ মৃত্যুর খবর রটিয়ে দেওয়া হলো। এরপর রায় বাহাদুর পড়লেন অসুখে। কল্যাণ তার শুশ্রূষা করে শেফালির মন জয় করে নিলে। এমনি সময়ে কল্যাণের খোঁজে তার বাবা এসে উপস্থিত। এসে কল্যাণের একটা বিয়ে এবং বৌয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে তো তার চক্ষুস্থির। কল্যাণের বিয়ের ব্যাপারেই তার আসা। অপরদিকে রামকানাইয়ের বাবাও এসে হাজির পুত্র-বধূকে সঙ্গে করে নিয়ে। বেগতিক দেখে রামকানাই তখন অখিল আর শ্যামলকে তাদের আগেকার মতো বৌ সাজিয়ে এনে সবার সামনে হাজির করে আসল ব্যাপার প্রকাশ করে দিলে। এরপর কথা প্রসঙ্গে কল্যাণের বাবা জানতে পারলেন তার পিতা কল্যাণের জন্য যে পাত্রী নির্বাচিত করে রেখেছেন, সে ঐ রায় বাহাদুরেরই কন্যা শেফালি। বলা বাহুল্য শেফালিকে পেয়ে কল্যাণের মনস্কামনা পূর্ণ হলো।

* * *

গল্পটির পরিকল্পনার মধ্যে অপরিণত মনের বিকারের লক্ষণই পরিস্ফুট। এর মধ্যে মৌলিকত্ব একটা আছে, কিন্তু তা হচ্ছে যেসব বস্তু ভাবতেও লোকের রুচিতে বাধে, তা-ই সামনে তুলে ধরার মৌলিকত্ব। শিশু বয়সের বৌবাটি খেলা নয়, বাড়ি ভাড়া পাওয়ার সুবিধে করে নিতে দুটি তরুণকে বৌ সাজিয়ে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা এবং তারই কারণে আমদানী করা হয়েছে যতোসব উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির অপরিচ্ছন্ন ইয়ার্কি। গল্প লেখাও একে[বারেই] কাঁচা। ঘটনার উপস্থাপনে[র] সাবলীলতার কথা না ভেবে যা ইচ্ছে এবং যখন যেখানে যেমন সুবিধে একটা ঘটনা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যুক্তি বিচারের কথা খেয়াল না রেখেই। বাড়ি-ওয়ালা রুগ্ন হবে এবং তার স্ত্রী হবে ক্ষীণদৃষ্টি, এমন একটি জায়গার ঠিকানা
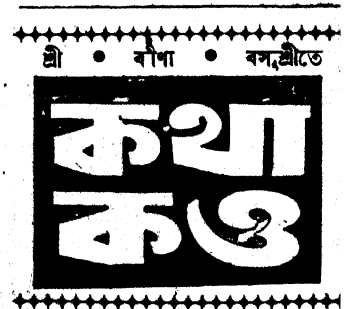
জন্য একটা উটকো দৃশ্য অবতারণা করা হলো; যে দৃশ্যের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে কাহিনীর কোন যোগ নেই। ছেলেদের বৌ সাজানো হবে, কাজেই তার ভনিতা স্বরূপ আগেই বেটাছেলের বেহুলা সেজে অভিনয়ের একটা উল্লেখ করা হলো। এইভাবে ঘটনার সূত্র দাঁড় করিয়ে করিয়ে শেষে রায় বাহাদুরকেই কল্যাণের পিতামহ-বন্ধু দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো যার কন্যা শেফালিই ছিলো কল্যাণের জন্য পূর্ব নির্বাচিত পাত্রী। এসব বলে-কয়ে নেবার ব্যাপার। রঙ্গ-কৌতুকের নামে বাড়াবাড়ি এতদূর গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দিলীপের জন্য পাত্রীর খোঁজে তাকে এমনকি তার আপন জেঠারই কন্যাকে দেখতে হাজির করে দেওয়াতে কুণ্ঠা জাগেনি। হাসির কান্ড খুবই, কিন্তু তাই বলে ইয়ার্কিতে পাত্র-পাত্রীর বিচার থাকবে না! এগুলো সব জোর করে চালিয়ে দেওয়া, তা নয়তো দিলীপ এতোকাল কলকাতায় রয়েছে, আর সে তার জেঠার বাড়ি চেনে না! গল্পের আগাগোড়া ভঙ্গিটাই অতি দুষ্প্রকৃতির।

* * *

সৌষ্ঠব কল্পনায় দীনতার ছাপই ছবিখানির সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। কি গল্পে, কি পরিচালনায় আর কি কলা-কৌশলের কোনদিকের কোন কাজে। খুবই কাঁচা হাতের কাজ। পরিচালক সাধন সরকার গল্পের নায়ক কল্যাণের চরিত্রে অভিনয়ও করতে নেমেছেন; কিন্তু তার অপটু পরিচালনা কাজের মতোই অভিনয়েও তাকে নেহাৎই বেমানান লাগে। রামকানাইয়ের চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঐ পাঁচ ইয়ারের মুখপাত্র। গোড়ার খানিকটা অংশই যা নিথর তারপর ভানু দলটিকে চালিয়ে নিয়ে যায় হৈ হৈ কান্ড বাঁধিয়ে তুলে। ওদের কান্ডতে হাসি রোধ করা দায়। এদের বৌ দুজন সেজেছেন অনুপকুমার ও সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। বিশেষ করে শেষোক্ত শিল্পীর মেয়েলিয়ানা দৃশ্য-গুলিতে হাসির জোয়ার এনে দেয়। এমেচার দলে স্ত্রী ভূমিকায় অবতরণ করার অভিজ্ঞতাটা সুধাংশু মুখোপাধ্যায় খাটিয়েছেন ভালো। ছবি বিশ্বাস শেষে একটি দৃশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন কল্যাণের পিতারূপে এবং ও অংশটাকে খুবই রগড়ে করে তুলেছেন। তেমনি রামকানাইয়ের পিতার চরিত্রে তুলসী লাহিড়ী এবং স্ত্রীর চরিত্রে তৃপ্তি মিত্রও কলকাতায় এসে দিব্যি হুল্লোড়ের সৃষ্টি করে দেন। তৃপ্তি মিত্র নতুন রকম চরিত্রে হাল্কা অভিনয়ে ঠিক মতো মাত্রাটা যেন

"ব্রতচারিণী"র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সাবিত্রী

রাখতে পারেননি। গুরুদাস ও রাণীবালা যথাক্রমে রায় বাহাদুর ও তদীয় পত্নীর চরিত্রে মন্দ অভিনয় করেননি। শেফালির চরিত্রে তপতী ঘোষকেও খারাপ লাগবে না। রামকানাইদের দেশে ওদের কারবারের সরকারের চরিত্রে জহর রায়কে চেনা যায় না, বেশ অভিনয়ও করেছেন হাসি ফোটাতে। আরও অনেকে রয়েছেন ছোট ছোট চরিত্রে ক্ষণিকের জন্য। তুলসী চক্রবর্তীর বোর্ডিংয়ের বকধার্মিক মালিকের চরিত্রে অভিনয়, ঐ পাচক চরিত্রে অজিত চট্টোপাধ্যায়, মেসের বোর্ডারদের মধ্যে নবদ্বীপ হালদার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, আশু বোস প্রভৃতি সকলেই এক একটা হাসির দমক নিয়ে আসেন। আর শিল্পীদের মধ্যে আছেন শ্যাম লাহা, সিধু গাঙ্গুলী, সুখেন, রেখা চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। এদিক থেকে বলা যায়, আগে কোন ছবিতে এখানকার এতোজন কৌতুক-শিল্পীর একত্র সমাবেশ আর হয়নি। সংগীতাংশের পরিচালনায় গায়ক শ্যামল মিত্রের নাম দেখা যায়, কিন্তু সে যোগ্যতা অর্জন করার কোন লক্ষণই নেই। কলা-কুশলীদের মধ্যে অন্যান্যরা হচ্ছেন আলোকচিত্র গ্রহণে বিজয় দে, শব্দ যোজনায় শিশির চট্টোপাধ্যায়, শিল্প নির্দেশে পাঁচু চক্রবর্তী ও সম্পাদনায় রমেশ যোশী।

সস্তামির আর এক রকম

"জয় মা কালি বোর্ডিং" এক ধরনের সস্তা জিনিস যা রুচিকে পর্যন্ত বিরক্ত করে, কিন্তু আর এক ধরনেরও সস্তামি আছে যা কুরুচির পরিচয় না দিলেও, মানুষের সংস্কার ও আত্মিক বৃত্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। ভগবান বলে কেউ কোথায় আছে কি না, তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। কিন্তু ভগবান আছে এবং অলক্ষ্যে থেকে সবায়ের জীবনের সব
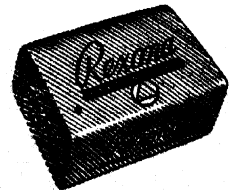
কিছুই ঘটিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং কারুর কিছু করবার নেই, কেবল বসে চোখ বন্ধ করে ভগবানের নাম জপলেই সব কাজ সিদ্ধ হয়ে যাবে এই রকম বিশ্বাস মানুষের মনে ধরিয়ে দেবার চেষ্টাকে কি বলে অভিহিত করা যায়? এই বিষয়ে মানুষের দুর্বলতাকে পণ্য করে শৈলজানন্দ তৈরী করেছেন রাঁধারাণী পিকচার্সের নবতম ছবি "কথা কও"। চিন্তার দীনতা এবং মানসিক সমতা হারানোর এমন দৃষ্টান্ত শৈলজানন্দের আগের কোন ছবিতেই পাওয়া যায়নি। "কথা কও" দেখে প্রকৃত-পক্ষে একজন প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যিকের মন ও হাত এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভেবে হতবাক হয়ে যেতে হয়। দেখে শুনে এই ছবিরই প্রতিপাদ্য ধরেই বলতে হয় "সবই তাঁর ইচ্ছা"। আর এ প্রতিপাদ্য টানতে শৈলজানন্দ একেবারে বর্তমানের প্রচ্ছদে এমন ঘটনাও কল্পনা করতে পেরেছেন যে পিতা মুমূর্ষু পুত্রকে আরোগ্য করতে চেষ্টা করছে বিগ্রহমূর্তির চরণামৃত খাইয়ে। অভাবের জন্য নয়, 'সবই তাঁর ইচ্ছা' এই বিশ্বাসেই ডাক্তারের হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়ার চেয়ে চরণামৃতের মাহাত্ম্যই পিতার কাছে বড়ো কথা বলে। কিন্তু ছেলেটি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেল না। জন্ম-মৃত্যুর ওপর হয়তো কারুর হাত নেই, কিন্তু তাই বলে রোগের চিকিৎসাও করানো হবে না, এ কোন ধরনের বিশ্বাস। এসব যে এখনকার দিনে কারুর ভাবনাতেও কি করে উদিত হতে পারে সেইটেই ভাববার কথা।

* * *

দুই ভাইকে নিয়ে গল্প। বড়ো ভাই বিশু বিগ্রহপূজায় দিন কাটায়; ছোট ভাই শিবু ঠাকুর-দেবতা আছে বলে বিশ্বাসই করতে চায় না। ভাইপো বিজু মেলাতে গিয়ে শিবুর কাছ থেকে কেষ্ট-ঠাকুর পুতুল চাওয়াতে শিবু ক্ষেপে গেল ছেলেটিকে খারাপ করে দেওয়া হচ্ছে বলে। হঠাৎ গ্রামে এক সাধুর আবির্ভাব হলো। বিশু তার সঙ্গে পরামর্শ করলে যাতে শিবুর মন ঠাকুর-দেবতার দিকে ফিরিয়ে আনা যায়। দাদা-বৌদির কথায় শিবু সাধুর সকাশে উপস্থিত হলো এবং ভগবানকে দর্শন করিয়ে দেবার জন্য নাছোড়-বান্দা হলো। বেগতিক দেখে সাধুবাবা এক অন্ধকার রাত্রে শিবুকে এক পোড়ো মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে চোখ বুজে ভগবানের নাম জপতে বলে চম্পট দিলে। পালাবার সময় তার পরচুলাটা শিবুর হাতে খুলে এলো। এর পর হলো বিজুর অসুখ। বিশু ছেলের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাতে রাজি না হয়ে তাকে কেবল চরণামৃত খাইয়ে যেতে লাগলো। অন্তিম সময়ে ডাক্তার এলো, অবশ্য বিশুর অমতেই, তবে বিজুকে বাঁচানো গেল না। বিজুর

জেমিনীর "ইনসানিয়াৎ" ছবির একটি দৃশ্যে বদরীপ্রসাদ, দিলীপকুমার, বীণা রায়, দেব আনন্দ প্রভৃতি

"দস্যু মোহন"এর দুটি চরিত্রে প্রদীপকুমার ও নীতিশ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত শিবু মদ খেয়ে বাড়িতে এসে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছড়ে ফেলতে উদ্যত হওয়ায় বিশু তাকে প্রহার করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। শিবু এলো কলকাতায় এবং একদিন এক মাতালের পাল্লায় পড়ে তার বাড়িতে নীত হলো। মাতাল ধনী ব্যক্তি; নাম রসরাজ। প্রায়ই সে রাত্রে ফেরার সময় একজন কাউকে বাড়িতে এনে খাতির যত্ন করে তাকে খাইয়ে শুতে দিয়ে তারপর সকালে তাড়িয়ে দেয় গলাধাক্কা দিয়ে। রসরাজের থাকবার মধ্যে স্ত্রী, আর অনূঢ়া কন্যা রাধারাণী। রাধারাণী আবার মাঝে মাঝে ঠাকুর ঠাকুর বলে ফিট হয়ে যায়। রসরাজের হাতে শিবুর দশা আর পাঁচজনের চেয়ে খারাপই হলো। সকালে রসরাজের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় রসরাজ শিবুকে ধাক্কা মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিলে, ফলে শিবু সাংঘাতিক আহত হলো। রাধারাণী ও তার মা শিবুর শুশ্রূষা করতে লাগলো। ক্রমে শিবু সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপরই শিবুর চেষ্টা হলো রসরাজকে মদের প্রকোপ থেকে বাঁচানো। প্রথমে কদিন দিনরাত মদ খাইয়ে এবং শেষে হঠাৎ দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে অদ্ভুত উপায়ে শিবু রসরাজের সুরাপান বন্ধ করিয়ে দিলে। রসরাজ ও তার স্ত্রীর ইচ্ছে রাধারাণীকে শিবুর হাতে তুলে দেওয়ার। কিন্তু শিবু তার পরিচয় বা বাড়ির ঠিকানা জানাতে রাজি নয়, তাছাড়া রাধারাণী ভগবানে বিশ্বাসী বলে শিবু তাকে বিয়েও করতে চায় না। এরপর শিবু চাকরি করতে চাইলে রসরাজ তারই পরিচিত একস্থানে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলে। কাজের প্রথম দিনেই শিবু ব্যাঙ্কে আড়াই হাজার টাকার চেক ভাঙাতে গেল। গুণ্ডারা তাক করে থেকে শিবুকে ধোঁকা দিয়ে শহরের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে হাজির হলো এবং মাথায় রড মেরে ওকে আহত ও অজ্ঞান করে ফেললে, কিন্তু সেই সময়েই একখানা গাড়ির আওয়াজ পেতেই গুণ্ডারা টাকাটা না নিয়েই পালিয়ে গেল। ওদিকে রাধারাণীর সেদিনই বিয়ে। শিবুর অফিসের মালিক রসরাজকে টাকা সমেত শিবুর অন্তর্ধানের কথা জানালে। রসরাজ শিবুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য চটে গেল। আহত অবস্থায় শিবু সামনে এসে দাঁড়াতেই রসরাজ তাকে চোর অপবাদ দিয়ে গালাগালি করলে। শিবু রসরাজের হাতে সম্পূর্ণ টাকাটা প্রদান করে নিঃশব্দে চলে গেল। এদিকে বর এসে উপস্থিত হতেই রাধারাণীর ফিট হলো। শুনে বরকে নিয়ে বরের মামা চলে গেল। শিবু পথ দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেলে। গাড়ি থেকে নামলো শিবুর দাদা বিশু আর শিবুর অফিসের মালিক। শিবুকে খুঁজতেই বেরিয়েছিল ওরা। শিবুকে পাকড়াও করে ওরা এলো রসরাজের কাছে এবং রসরাজের কাছে শিবুর সততার কথা শুনে অনুতপ্ত

হলো। সেই সঙ্গে রসরাজেরও মেয়ের বিয়ের ভাবনা দূর হলো। শিবুর সঙ্গেই রাধারাণীর বিয়ে হয়ে গেল। ফুলশয্যার রাত্রে শিবু রাধারাণীকে ভগবানে বিশ্বাস ত্যাগ করতে বললে। রাধারাণী রাজি না হওয়ায় শিবু এক ফাঁকে গৃহত্যাগ করলে। তারপর তীর্থে তীর্থে শিবু ঘুরতে লাগলো এবং অবশেষে ক্লান্ত বিশ্রান্ত অবস্থায় এক পার্বত্য মঠের ধারে উপস্থিত হলো। সেখানকার সন্ন্যাসীরা শিবুকে ভগবানে বিশ্বাস উৎপন্নের চেষ্টা করলে। তাদের কথায় শিবু রামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্তির সামনে বসে রইলো দিনের পর দিন। একদিন রামকৃষ্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে শিবুকে দীক্ষা দান করলেন। ভগবানে বিশ্বাস অর্জন করে শিবু গ্রামে ফিরে এলো।

* * *

অদ্ভুত গল্পের উপাদান। এখনকার সামাজিক পরিবেশের আবরণে পৌরাণিক প্রকৃতির আখ্যানবস্তু। আর তাও কেবলই গোঁজামিল দিয়ে ঘটনা সাজিয়ে যাওয়া। 'সবই তাঁর ইচ্ছা' কাজেই একধার থেকে কেবল দুর্ঘটনাই যতো সব। আর কি সব বিচিত্র কল্পনা! বিজু মারা যেতেই শিবু মদ খেয়ে বিগ্রহ ভাঙতে এলো; শিবুকে যেরকম ঠাকুর-দেবতার প্রতি অবিশ্বাসী দেখানো হয়েছে, তাতে বিগ্রহ ভাঙতে উদ্যত হওয়ার জন্য ওকে মদ ধরাবার কি প্রয়োজন ছিল! অর্থাৎ এমন কুমতি ওর হয়ই বা কি করে! কলকাতায় এসে শিবু পড়লো মাতাল রসরাজের পাল্লায়; অনেকটা 'সিটি লাইটের' সেই ধনী মাতালের মতো —রাত্রে বন্ধুত্ব করে, কিন্তু সকালের আলোয় চিনতেই পারে না। এই দেখা হওয়া একসিডেণ্ট। মার খেয়ে আহত হয়ে রসরাজের বাড়িতেই শিবুর থেকে যাওয়া আর এক একসিডেণ্ট। রসরাজকে সুরাপান ছাড়ানোর কি অদ্ভুত পদ্ধতি—তিন দিন দিনরাত ওকে মদ খাইয়ে চতুর্থ দিনে "ড্রাই ডে" বলে মদ পাওয়ার অসুবিধে জানিয়ে ওকে পানে নিবৃত্ত করা এবং সেই নিবৃত্তিই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে যাওয়া। কতো সহজ পন্থা! ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙাতে গিয়ে শিবুর গুন্ডাদের হাতে পড়াও এক একসিডেণ্ট, তারপর গুন্ডারা ওকে আহত করলেও টাকা না নিতে পারা, বা রসরাজের হাতে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে চলে আসতে পথে তার দাদারই গাড়িতে ধাক্কা খাওয়া প্রভৃতি সবই একসিডেণ্ট, অর্থাৎ শৈলজানন্দের কথায় "তাঁরই ইচ্ছায়" সম্পন্ন। রসরাজকে শিবু ঠিকানা না দিলেও তার গ্রাম কলকাতার অতি নিকটেই, তা বোঝা গেল টাকা সমেত শিবু অন্তর্ধান হওয়ার পর যখন সেই দিনই বিশুকে দেখা গেল কলকাতায় শিবুর অফিসের মালিকের সঙ্গে শিবুর খোঁজে। অথচ শিবুর বিয়ের একদিন পর ফুলশয্যা হলেও শিবু গৃহত্যাগ করে চলে যাবার পর বিশু ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে গ্রামে পৌঁছনর আগে পর্যন্ত বিশুর স্ত্রী বা ভগিনী অমন খবরটা জানতেও পারেনি। পরমহংসদেবকে প্রতিমূর্তি থেকে সশরীরে আবির্ভাব ঘটিয়ে দেওয়া, এ কি ধাষ্টামো! ও'রই জীবনীচিত্র হয়, সে এক আলাদা কথা, কিন্তু এখানে তাঁর আবির্ভাব ঘটিয়ে তো কেবল মানুষের দুর্বলতারই সুযোগ নেবার চেষ্টা হয়েছে। রসরাজকে মাতাল বলে ভালো করে প্রতিপন্ন করিয়ে দেবার জন্য একটা ক্যাবারে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, উদ্দেশ্য স্বল্প পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট নর্তকীর উচ্ছৃঙ্খল নাচ দেখানো।
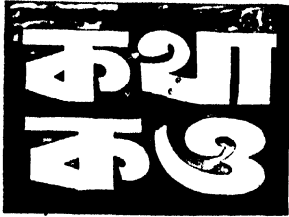
* * *

আবোল তাবোল সব কথাবার্তা এবং এলোমেলো সব চরিত্র। আবেগময় নাট্য-পরিণতি ফোটেনি একবারও। কেবলই কথার ঠেকা দিয়ে পুরনো আমলের মতো দৃশ্যান্তর। অভিনয় ও কলাকৌশলের দিকও বিশেষ জোর পায়নি। শিবুর চরিত্রে অসিতবরণকে মন্দ নয় বলা যায়। বাকি চরিত্রগুলি কেমন যেন নিস্তেজ; এক রসরাজের চরিত্রটি ছাড়া। এ চরিত্রে শৈলজানন্দ নিজে অভিনয় করেছেন; অভিনয় তার আসে তবে একটু অতি মাত্রায় এবং ক্যামেরার দিকে বারবার চোখ ফেরাবার ঝোঁক, এই যা। বিশুর চরিত্রে ছবি বিশ্বাস কেমন যেন নির্বিকার চরিত্র; হয়তো কাহিনীর ঐ রকমই প্রয়োজন ছিল। তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে মলিনা দেবী অবতরণ করেছেন। সাধুবাবার চরিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায় খানিকটা মজা উপভোগের সুযোগ দেন হিন্দীবিকৃতি কথা শুনিয়ে। রসরাজও মাতাল হয়ে এমন হিন্দীতে কথা বলে যা শুনে মনে হয়, হিন্দীকে নিয়ে ঠাট্টাই করা হয়েছে। শিবুর বোন জয়া এবং তার প্রণয়ী গোপীনাথের চরিত্রে আছেন তপতী ঘোষ ও প্রশান্তকুমার। রাধারাণীর চরিত্রে মিত্রা বিশ্বাস আড়ষ্টতায় ভরা। আর অভিনয়ে আছেন নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। রামকৃষ্ণের চরিত্রে অবতরণ করেছেন গুরুদাস।

* * *

কলা-কৌশলের দিকে উল্লেখ করার কৃতিত্ব কিছু নেই। খান চারেক গান আছে, তার মধ্যে গোড়ার দিকে ভিক্ষুকের মুখে মৃণাল চক্রবর্তীর গানখানিই বেশ। আর গানগুলির প্রয়োগও এলোমেলো এবং গাওয়াও তেমন নয়। আবহ-সঙ্গীত স্থানে স্থানে এমন বিকট যে বিজুর মৃত্যুর জন্যে আবহ-সঙ্গীতই দায়ী মনে হতে পারে। কলাকুশলীবৃন্দ হচ্ছেন আলোকচিত্র গ্রহণে ধীরেন দে; শব্দগ্রহণে গৌর দাস; সঙ্গীত পরিচালনায় শৈলেশ দত্তগুপ্ত; শিল্প-নির্দেশে নরেশ ঘোষ এবং সম্পাদনায় রবীন দাস।

খেলার মাঠে

একলব্য

ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের ভাবী অতিথিদের নামের তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হ'তে আরম্ভ করেছে। বিশ্বকবি 'ভারত তীর্থ' কবিতায় বলে গেছেন—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে তীর্থ নীরে; এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর সহ অস্তিত্বের নীতি এবং ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কবির কথার যেমন মিল দেখছি, ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন

বলটি গোলরক্ষকের হস্তগত, সুতরাং প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের তাঁকে আইন-সংগতভাবে চার্জ করবার অধিকার আছে

দেশের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রেও তেমন দেখছি একটা সঙ্গতি। ভারতের একটি হকি দল বর্তমানে নিউজিল্যান্ড সফর করছে, হাওয়াই পথে আর একটি দল ছুটছে ওয়ারসর দিকে এই সপ্তাহেরই শেষ দিকে দুই মাসকাল পোল্যান্ড ও বেলজিয়াম সফর করবার জন্য। বিশ্ব যুব উৎসবের ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান এদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের ফুটবল টিমের রাশিয়া যাত্রার দিনও ঘনিয়ে এলো। আর ভারতের টেনিস চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণণ এবং নরেশকুমার তো ইংলণ্ডেই খেলে বেড়াচ্ছেন।

এ বছর ভারতে যাদের আসবার পালা তাদের মধ্যে প্রথমেই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের নাম করা যেতে পারে। সম্প্রতি লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে নিউজিল্যান্ড দলের ভারত সফরের ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবেই স্থির হয়ে গেছে। এখন তোড়জোড় করে আসতে যা দেরি। সুতরাং ভারতের ক্রিকেট রসিকদের শীতের আমেজ এবার ক্রিকেট মাঠেই জমবার সম্ভাবনা। শীত মরসুম টেনিস রসপিপাসুদের মনেও কম উৎসাহ জাগাবে না। কলকাতার সাউথ ক্লাবে এশিয়ান টেনিস মহোৎসবে বিশ্বের বহু গণ্যমান্য কুলীন খেলোয়াড়ই পাত পাততে রাজী হয়েছেন। সুতরাং এশিয়ান টেনিস উপলক্ষে সাউথ ক্লাব ক্ষুদে উইম্বলডনের মর্যাদা পাবে বলে আশা করা যেতে পারে। দেশ-বিদেশের সব দিকপাল টেনিস খেলোয়াড়দের দিল্লীর জাতীয় টেনিস উৎসবে যোগদানও নিশ্চিত। ভারতের ক্রিকেট এবং টেনিস অতিথি ছাড়া সার্ভিস স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় তুরস্ক এবং অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল টিমেরও এ বছর ভারত সফরের কথা শোনা যাচ্ছে। ভারতে এবার শীত মরসুমে আর আসছেন টেবিল টেনিস ও এ্যাথলেটিকের দুই যুগ্ম অতিথি, রো ভগ্নীদ্বয় এবং জেটোপেক দম্পতি। রো ভগিনীদ্বয়ের টেবিল টেনিসে বিশ্বজোড়া নাম ডাক। এরা যমজ ভগ্নী, নাম ডায়না ও রেজিনাল্ড। দেখতে অবিকল এক রকম। গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের পূর্বে এরাই মেয়েদের বিভাগে ডাবলস চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। টেবিল টেনিস প্রতিভায় এরা এখনো ভাস্বর, আর যমজ দুই বোনের ডাবলসের খেলা দেখবার আকর্ষণও স্বাভাবিক।

খেলাধূলা সম্পর্কে যারা একটু খোঁজ-খবর রাখেন তাদের মধ্যে জেটোপেকের নাম

বলটি গোলরক্ষকের হাতে নেই, তিনি গোল এরিয়ার বাইরেও যাননি, কাউকে বাধাও দেননি—সুতরাং তাকে চার্জ করা আইন বিরুদ্ধ

কে না জানেন? দূরপাল্লার দৌড়বীর এমিল জেটোপেক, যিনি গত অলিম্পিকে 'মানুষ-যান' নামে অভিহিত হয়েছেন, তিনিই আসছেন ভারতে ভারতের তরুণ এ্যাথলীটদের শিক্ষা দেবার জন্য। একা নন, সস্ত্রীক। পাঁচ হাজার, দশ হাজার মিটার ও মারাথনের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এমিল জেটোপেকের যেমন বিশ্বজোড়া নাম ডাক, তেমন তার যোগ্যা সহধর্মিণী ডায়না জেটোপেকোভার

ফেয়ার চার্জ—এভাবে চার্জ করায় অন্যায় কিছুই নেই। ফুটবল মরদের খেলা, অপরের দেহের চাপ সহ্য করতেই হবে। হাত বা পা প্রসারিত করে চার্জ না করলেই হল

বর্শা ছোড়ায় অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হিসাবে সুনাম। চেকোশ্লোভেকিয়ার এই এ্যাথলীট দম্পতি ভারতে আসছেন রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনায় ভারতের তরুণদের শিক্ষা দিতে। সুতরাং ক্রীড়াক্ষেত্রের আতিথ্যের ক্ষেত্রেও 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবের' নীতি।

* * *

ফুটবল মাঠের গোলমাল লেগেই আছে। রেফারীদের উপর হামলা ফুটবল মাঠের যেন নিত্যকার ঘটনা। সিনিয়র লীগের ঘটনা-গুলির উপরই সাধারণের দৃষ্টি বেশী পড়ে। সংবাদপত্রে তার খবরও ফলাও করে ছাপা হয়, কিন্তু বিভিন্ন জুনিয়র লীগে রেফারী নিগ্রহের কত ঘটনা ঘটে তার খবর কে রাখে। অবশ্য কিছু কিছু কাগজে ছাপা না হয় এমন নয়। সেদিন তৃতীয় ডিভিশনের একটি খেলার পর অসন্তুষ্ট পক্ষের একজন খেলোয়াড় রেফারীকে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দেন। রেফারীর সৌভাগ্যক্রমে আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর দুইজন সদস্য মাঠে উপস্থিত থাকায় ব্যাপারটি বেশী দূর গড়াতে পারে না। খবরটিও

সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়। গত ১২ই জুলাই সিনিয়র লীগে মহমেডান স্পোর্টিং ও বি এন রেল দলের গোলশূন্য খেলার পর একজন সিনিয়র রেফারী দল বিশেষের সমর্থক দ্বারা প্রহৃত হয়েছেন। কয়েকদিন আগে এলেন লীগের খেলাতেও এই ধরনের রেফারী নিগ্রহের এক খবর পাওয়া গেছে। ময়দানে এমনি ধারা ছোট বড় ঘটনার অভাব নেই।

রেফারী নিগ্রহের এই সব ঘটনার সূত্র হিসাবে নানা কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ফুটবল আইন সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা, অন্য রেফারীর দুর্বল পরিচালনা। খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে রেফারীর ভুলচুক না হয় এমন নয়, কিন্তু এই ভুলের সংখ্যা সত্যই নগণ্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গোলমালের সূত্রপাত হয় রেফারীর নির্দেশ না বোঝার জন্য। রেফারী কি জন্য একজন খেলোয়াড় পরিস্কার অবসাইডে থাকা সত্ত্বেও তার অবসাইড

'আনফেয়ার চার্জ'—কনুইয়ের দ্বারা আঘাত করা খুবই অন্যায়

ডাকেননি এ সম্বন্ধে যদি আমার ধারণা থাকে তবে অবসাইড না দেবার জন্য রেফারীর উপর রাগেরও কারণ থাকে না। কিন্তু আমি যদি অবসাইড আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হই... তখনই আমার ধারণা হবে রেফারীর সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু আমার যদি অবসাইডের নিয়মগুলি জানা থাকে তবে রেফারীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই থাকে না। ফুটবল আইনের জটিল নিয়মগুলির মধ্যে অবসাইড আইন অন্যতম। পেনাল্টি এবং অবসাইড নিয়েই মাঠে যত গোলমালের সূত্রপাত। সাধারণ দর্শকের পক্ষে আইনের খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়, বিশেষ প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তাদের যদি অবসাইড আইনের মূল সূত্রটি জানা থাকে তাহলে অনেক সময় 'অবসাইড' 'অবসাইড' বলে চীৎকারের প্রয়োজন হয় না। অবসাইডের মূল নিয়ম হচ্ছেঃ—

যে মুহূর্তে বলটি খেলা হয় তখন কোন খেলোয়াড় বলের চেয়ে বিপক্ষ দলের গোল

কায়িক সংঘর্ষ বা ফেয়ার চার্জ। বল নাগালের মধ্যে থাকলে এভাবে কায়িক সংঘর্ষ অন্যায় নয়

লাইনের কাছে থাকলে অবসাইড হবেন যদি নাঃ—

(ক) তিনি খেলার মাঠের নিজ অর্ধাংশে থাকেন।

(খ) বিপক্ষ দলের দুইজন খেলোয়াড় তাঁর চেয়ে তাঁদের (বিপক্ষ দলের) গোল লাইনের নিকটে থাকেন।

(গ) বলটি প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে আসবার পর তিনি খেলেন।

(ঘ) তিনি বলটি গোলকিক, কর্নার কিক, থ্রো-ইন এবং রেফারীর ড্রপ থেকে সরাসরি পান।

অবসাইড অবস্থায় থাকাও দন্ডনীয় নয় যদি না রেফারীর বিবেচনা মতে, তিনি খেলার বা বিপক্ষ খেলোয়াড়ের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেন কিম্বা অবসাইড অবস্থায় থেকে কোন সুবিধা পাবার চেষ্টা করেন।

উপরের আইন থেকে বোঝা যাচ্ছে মাঠে নিজের অর্ধাংশে থাকলে, প্রতিপক্ষের দুইজন খেলোয়াড়ের পিছনে থাকলে বা বল প্রতিপক্ষকে স্পর্শ করে এলে অবসাইডের কোন বালাই নেই। গোল কিক, কর্নার কিক, থ্রো-ইন এবং রেফারীর ড্রপের সময়ও কেউ অবসাইড হয় না। এটা হচ্ছে আইনের কথা।

'অবস্ট্রাকশন'—বল খেলতে বাধা দিলে চার্জ করায় দোষ নেই

কিন্তু বিবেচনার কথা হচ্ছে যে মুহূর্তে একজন স্বপক্ষ খেলোয়াড় বলটি খেলেন বা পাস্ করেন তখন খেলোয়াড়ের (যার অবসাইড ধরা হবে) অবস্থান কোথায়? স্বপক্ষ খেলোয়াড় কর্তৃক বল পাসের সময় তিনি যদি অবসাইডে না থাকেন এবং পাসের পর তিনি যদি বলের আগেও দৌড়ে যান তবে অবসাইড হবেন না। অন্যদিকে পাস করবার পর অবসাইড থেকে দৌড়ে এসে অন-সাইডে বল ধরলেও অবসাইড হবেন। এখানে শুধু দেখবার বিষয় খেলোয়াড় আগে অর্থাৎ বল পাস্ করবার সময় কোথায় ছিলেন, কোথায় বলটি পেলেন সেটা বিবেচ্য নয়। ইংরাজীতে এই আইনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ— **The deciding factor is where the player WAS at the moment the ball was played by a member of his own side; Not, as is often thought, where he IS when he himself plays the ball.**

উপরোক্ত ব্যাখার was এবং is হচ্ছে অবসাইড আইনের মূল সূত্র। এই সূত্র জানা না থাকার ফলেই সাধারণ দর্শককে অনেক সময় অযথা 'অবসাইড' 'অবসাইড' বলে চীৎকার করতে শুনা যায়।

কলকাতার মাঠে অবসাইড আইনের দুইটি ব্যতিক্রমের ঘটনা হামেশাই চোখে পড়ে। মনে করুন মাঝ মাঠ থেকে কোন খেলোয়াড় খুব উঁচু করে একটি ফ্রি-কিক করলেন, উঁচু দিয়ে বলটি প্রতিপক্ষের গোলের মুখে পেঁছিবার আগেই তার দলের একজন ফরোয়ার্ড দ্রুতবেগে দৌড়ে গোলের মুখে উপনীত হলেন, যখনই তিনি বল ধরলেন তখনই মাঠে অবসাইডের চীৎকার আরম্ভ হ'ল আর রেফারীও অবসাইডের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবসাইড হয় না। কারণ মনস্তাত্বিক কারণেই কোন খেলোয়াড় ফ্রি-কিকের আগে অবসাইডে দাঁড়িয়ে থাকেন না, বলটি কিক করবার পর দৌড়াতে আরম্ভ করেন, আর উঁচু দিয়ে বল গোলের মুখে পেঁছিবার আগে প্রায় সবার পক্ষেই গোলের মুখে পেঁছান সম্ভব, হাওয়ার বিরুদ্ধে কিক হলে তো কথাই নেই। রেফারীরা এটা না বোঝেন, এমন নয়। কিন্তু অনন্যোপায় রেফারী অনেক সময় সমর্থকদের উৎকট চীৎকার এবং ইট পাটকেলের ভয়ে অবসাইডের নির্দেশ দেন।

অবসাইড আইনের অন্য ব্যতিক্রম দেখা যায় ফ্রি কিকের সময়ে গোলের মুখে লাইন বেঁধে দাঁড়াবার ব্যাপারে। পেনাল্টি সীমানার অদূরের কোন ফ্রি কিকের সময় প্রায়ই দেখা যায় গোলের মুখে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ খেলোয়াড় দ্বারা একটি লাইন বাঁধা হয়ে গেছে। এটি হচ্ছে প্রতিরোধ লাইন। উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের ফ্রি কিক লাইনের কারো গায়ে লেগে প্রতিহত হবে। কিন্তু এই লাইনের

মধ্যেই অপর পক্ষের খেলোয়াড়রা একটু স্থান করে নেন। তাদের উদ্দেশ্য থাকে নিজ খেলোয়াড়ের ফ্রি কিকের সময় তারা মাটিতে বসে বা শুয়ে পড়ে লাইন ভেঙে দেবেন এবং সেই ফাঁক দিয়ে বল গোলে প্রবেশ করবে। এক্ষেত্রে ফ্রি-কিক নেবার সঙ্গে সঙ্গেই অব্-সাইড হয়ে থাকে। কারণ লাইনের সামনে একমাত্র গোলরক্ষক ছাড়া কেউ থাকেন না, আর একই লাইনে দুই দলের খেলোয়াড় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকায় 'সেম লাইনের' আইনে অবসাইডের আওতায় পড়েন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় রেফারীরা অবসাইডের নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেন। এগুলি রেফারীর দুর্বলতা।

অবসাইড আইনের মত ফাউলের আইনও বড় জটিল। রেফারীকে এক নিমিষের মধ্যে সিদ্ধান্ত করতে হবে ফাউল ইচ্ছাকৃত কি

'ট্রিপিং'—ইচ্ছে করে পদস্খলন করা গুরুতর অপরাধ

অনিচ্ছাকৃত। বল হাতে লেগেছে কি বলে হাত লাগিয়েছে, এসব ক্ষেত্রে রেফারীর দুর্বলতা কিম্বা দ্বিধা প্রকাশ পেলে গোলমাল অনিবার্য পরিণতি। তাই দর্শকদের আইন সম্বন্ধে কিছু ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব আই এফ এ এবং ক্যালকাটা রেফারী এসো-সিয়েশনের। সাংবাদিকদেরও বটে। এ সপ্তাহে ফাউলের কয়েকটি চিত্র ছাপা হল। এর থেকে 'ফাউল' ও 'ফেয়ার প্লের' পার্থক্য বোঝা সহজ হবে। আগামী সংখ্যায় আরো কয়েকটি ছবি ছাপবার ইচ্ছে আছে।

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা
[১৯শে জুলাইয়ের খেলা পর্যন্ত]

মোহনবাগান ক্লাব অনেকদিন থেকেই প্রথম ডিভিশন লীগ কোঠায় শীর্ষস্থানে জেঁকে বসে আছে। কেউ তাদের সরাতে পারছে না; আর শেষ পর্যন্ত পারবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু মোহনবাগানের নীচের চারটি দল—ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, রাজ-স্থান আর এরিয়ান নিজেদের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলছে, কেউ উপরের দিকে মাথা তুলছে তো আর কেউ দুর্বলের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ব্যর্থতায় লজ্জায় আধোবদন হচ্ছে। প্রাণে এদের শঙ্কা, আবার দুর্বল টীমের কাছে

'আন্‌ইণ্টেনশনাল ট্রিপিং'—অনিচ্ছাকৃত ট্রিপিং অপরাধ নয়, তবে রেফারীর বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত। ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত এ সমস্যার একমাত্র বিচারক রেফারী

পয়েণ্ট হারাতে না হয়। এ কারণে মনে লজ্জাও আছে কিছুটা। আর মুখে আপসোস। আঃ কি হল! ঐ টীমটাকে হারালে আজ আমাদের কি অবস্থা হত, ওটা তো জেতা খেলা ছিল। এই অবস্থার মধ্যেই চলছিল চারটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকী তিনটি দলকে লীগ বিজয়ের আশায় একরকম জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের আশাও ক্ষীণ প্রদীপের শিখা। দুই প্রধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝড়ের মধ্যেই তা নিভে যাবার সম্ভাবনা। মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে ইস্টবেঙ্গলের ক্ষতির পরিমাণ ৩ পয়েণ্ট বেশী। দুই প্রধানের ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী হলেও মোহনবাগান এক পয়েণ্ট এগিয়ে থাকে। সুতরাং তাদের লীগ বিজয় একরকম অবধারিত। তবে যদি কিছু অঘটন ঘটে সে আলাদা কথা।

প্রথম ডিভিশন লীগের নীচের দিকের অবস্থাও কৌতুকপ্রদ। এখনে কালীঘাট ও অরোরা সমস্যার সম্মুখীন। দুটি ক্লাবই এক একটি পয়েণ্টের জন্য জীবন পণ সংগ্রাম করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কাকে ডিভিশনচ্যুত হতে হবে, কে জানে?

দ্বিতীয় ডিভিশন লীগের উপরের দিকের অবস্থাও বড় কৌতুকপ্রদ। হাওড়ার ইণ্টারনাশন্যাল, বালী প্রতিভা আর পোর্ট কমিশনার্স টীম সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলে সমান পয়েণ্ট অর্জন করেছে। তিনটি দলেরই আর দুইটি করে খেলা বাকী। সুতরাং প্রতি দলের কাছেই প্রতি পয়েণ্টের মূল্য অমূল্য। এই তিনটি দলের মধ্যে কে শেষ পর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর প্রথম ডিভিশনে খেলবার সুযোগ পাবে তার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে আছে। দ্বিতীয় ডিভিশনের নীচের দিকে অনেকগুলি টীমই ভয়ের মুখে। সার্ভিসেস, গ্রীয়ার, কুমারটুলি, ক্যালকাটা, বেনেটোলা, হাওড়া ইউনিয়ন সবারই নামবার ভয় আছে।

তৃতীয় ডিভিশনের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে ক্যালকাটা জিমখানা। এদের আর মাত্র দুইটি খেলা বাকী। ১৩টি খেলায় জিমখানা সংগ্রহ করেছে ২০ পয়েণ্ট, বাটা সমসংখ্যক খেলায় ১৭ পয়েণ্ট লাভ করেছে। কিন্তু কে এফ আর ১১টি খেলায় ১৫ পয়েণ্ট অর্জন করায় এখনও হাল ছাড়েনি। তৃতীয় ডিভিশন

'জাম্পিং'—লাফিয়ে উঠে হেড করায় দোষ কিছুই নেই, অপরের গায়ে ভর করে না লাফালেই হ'ল

থেকে নামবার সম্ভাবনা শ্যামবাজার ক্লাবের ১০টি খেলায় মাত্র ৪ পয়েণ্ট পেয়ে এরা সবার নীচে অবস্থান করছে।

চতুর্থ ডিভিশনের উপরের দিকে এক্স-সেলসিয়ার্স, মেসারার্স ও ঐক্য সম্মিলনীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর মধ্যে এক্সসেলসিয়ার্সই রয়েছে উপরে—তাদের
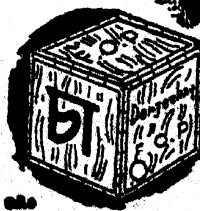
সুবিধাও বেশী। নীচের দিকে নিবেদিতা স্পোর্টিংয়ের অবস্থা খারাপ।

প্রথম ডিভিশন লীগের গত সপ্তাহের ফলাফল নীচে ছাপা হলঃ—

১৩ই জুলাই '৫৫'

পুলিস (২) এরিয়ান (১)
অরোরা (০) রেলওয়ে স্পোর্টস (০)

১৪ই জুলাই '৫৫'

ইস্টবেঙ্গল (১) মহঃ স্পোর্টিং (০)
রাজস্থান (৩) স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
খিদিরপুর (০) জর্জ টেলিগ্রাফ (০)

১৫ই জুলাই '৫৫'

উয়াড়ী (১) কালীঘাট (০)
বি এন আর (১) অরোরা (০)

১৬ই জুলাই—চ্যারিটি খেলা

রাজস্থান (১) মোহনবাগান (১)

'হোল্ডিং'—অপর খেলোয়াড়কে ধরে রাখা একটি বড় অপরাধ, তা তাঁর শরীরই হোক আর জামাই হোক

১৮ই জুলাই '৫৫'

খিদিরপুর (২) মহঃ স্পোর্টিং (১)
রাজস্থান (১) অরোরা (১)
রেলওয়ে স্পোর্টস (১) বি এন আর (০)

১৯শে জুলাই '৫৫'

মোহনবাগান (২) কালীঘাট (০)
ইস্টবেঙ্গল (১) পুলিস (০)
এরিয়ান (১) উয়াড়ী (১)

খেলাধুলোর খবরাখবর

ওয়ারস'র পথে ভারতের হকি টীম—বিশ্ব যুব উৎসবে যোগদানের জন্য ভারতের নির্বাচিত হকি টীম জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে ওয়ারস অভিমুখে যাত্রা করছে। যুব উৎসবের পর এরা দুইমাস ধরে পোল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম সফর করবে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এদের কয়েকটি খেলার সম্ভাবনা আছে। নীচে ভারতের যে সব

'পুসিং'—ধাক্কা মারা বা ঠেলে ফেলে দেওয়া অপরাধ—আর পেছন থেকে ধাক্কা মারা গুরুতর অপরাধ

খেলোয়াড় এই সফরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নাম দেওয়া হলঃ—

উধম সিং (পাঞ্জাব) অধিনায়ক, ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ) সহ অধিনায়ক, স্বরূপ সিং (সার্ভিস), বকশিস সিং (পাঞ্জাব), বালকিষেন (রেলওয়ে), হরবক্স সিং (সার্ভিস), বক্সি সিং (সার্ভিস), বনসোদ (সার্ভিস), জারনেল সিং (সার্ভিস), ভাস্করণ (মহীশূর), বলবীর সিং (ছোট) (রেলওয়ে), সুশীনাথন (মাদ্রাজ), ইন্দ্রজিৎ সিং (পাঞ্জাব), সি এস গুরুং (বাঙলা) ও চাবন (বোম্বাই)।

ডেভিস কাপ—গতবারের ডেভিস কাপ রানার্স অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় মেক্সিকোকে হারিয়ে আমেরিকা 'জোনের' সেমি-ফাইন্যালে ব্রেজিলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অস্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকোর খেলা চিকাগোতে অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে হ্যাভানায় ব্রেজিল হারিয়েছে কিউবাকে ৪—১ খেলায়।

'পুসিং'—এভাবে ঠেলে ফেলা আইন-বিগর্হিত

ইউরোপীয়ান 'জোনের' সেমি-ফাইন্যালে ইটালী ৫—০ খেলায় ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছিল। এই অঞ্চলের অপর সেমি-ফাইন্যাল খেলায় সুইডেন ৩—২ খেলায় চিলিকে হারিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ইউরোপীয় জোনের ফাইন্যালে ইটালী ও সুইডেনকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় হকি দলের সাফল্য—নিউজিল্যাণ্ড সফররত দিল্লী ওয়াণ্ডারার্স হকি টীম প্রথম বে-সরকারী হকি টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডকে ৩—২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে।

রাশিয়া সফরের জন্য ভারতীয় টীম—ভারতীয় ফুটবল দলের রাশিয়া সফরের জন্য নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতি ২২ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত করেছেন। ভারতীয় দলের আগামী ১৫ই আগস্ট রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করবার কথা। এরা একমাস রাশিয়া সফর করবে। নীচে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হ'লঃ—

গোল—সঞ্জীব (বোম্বাই), শেঠ (বাঙলা), অতিরিক্ত কুপ্পুস্বামী (মহীশূর)।

রাইট ব্যাক—আজিজ (হায়দরাবাদ), সোমান (বোম্বাই), অতিরিক্ত বি রায় (বাঙলা)।

লেফট ব্যাক—এস মান্না (বাঙলা) অধিনায়ক, লতিফ (হায়দরাবাদ), অতিরিক্ত জেসুদাস (মহীশূর)।

রাইট হাফ—চন্দন সিং ও রতন সেন (বাঙলা), অতিরিক্ত আমেদ হোসেন (হায়দরাবাদ)।

সেণ্টার হাফ—সালাম (বাঙলা), সালভি (বোম্বাই), অতিরিক্ত গোলাব সিং (বোম্বাই)।

লেফট হাফ—ক্রিস্টি (মহীশূর), নূর মহম্মদ (হায়দরাবাদ), অতিরিক্ত অমল দত্ত (বাঙলা)।

রাইট আউট—কানাইয়ান (বাঙলা), বর্মা (উত্তর প্রদেশ), অতিরিক্ত ময়িন (হায়দরাবাদ)।

রাইট ইন—আমেদ খাঁ (বাঙলা) সহ-অধিনায়ক, লাইক (হায়দরাবাদ), অতিরিক্ত ইয়ামানি (বাঙলা)।

সেণ্টার ফরোয়ার্ড—এস ঘোষ (বাঙলা), সাক্সবী (বোম্বাই), অতিরিক্ত থঙ্গরাজ (মাদ্রাজ)।

লেফট ইন—পূরণ বাহাদুর (সার্ভিস), এ রাঙ্গাপ্পা (বোম্বাই), অতিরিক্ত ধানিকাচলন (মাদ্রাজ)।

লেফট আউট—এস রায় (বাঙলা), জে এণ্টনি (মহীশূর), অতিরিক্ত অরোকীস্বামী (সার্ভিসেস)।

দেশী সংবাদ

৪ঠা জুলাই—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর কংগ্রেস কর্মিগণের নিকট আবেদন জানান যে, কংগ্রেস কর্তৃক গোয়ায় সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্নে তাঁহারা যেন সংযম অবলম্বন করেন এবং ২৩শে জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করেন।

ব্রহ্মপুত্র এবং তাহার উপনদী লোহিত, দিবং ও নোয়াডিহিংয়ে বন্যা দেখা দেওয়ায় ডিব্রুগড় মহকুমার এক বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে। ডিব্রুগড়ের সহিত ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরস্থ স্থানসমূহের সংযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বন্যার জল প্রবেশ করায় ডিব্রুগড় শহরের নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে।

৫ই জুলাই—আজ হাবড়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ৪৭তম দিবসে মোট ৬০ জন সত্যাগ্রহী কনস্ট্রাকশন বোর্ডের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিয়া গ্রেপ্তার বরণ করেন।

আজ পুণার নিকটস্থ লোহগাঁও বিমান ঘাটিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানি লিবারেটর বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়, উহার ফলে বিমান বাহিনীর পাঁচজন ক্রু নিহত হইয়াছেন।

৬ই জুলাই—কলিকাতা সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আজ হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

৭ই জুলাই—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো এক যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে মতামতের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অদ্য নয়াদিল্লী ও বেলগ্রেডে উহা যুগপৎ প্রচার করা হয়।

সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা এই প্রথম এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে সেচের জন্য এক লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করিবে। অদ্য এই পরিকল্পনা উহার রূপায়নের অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩০টি নূতন পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার জন্য মোট ২০৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

৮ই জুলাই—নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের কলিকাতাস্থ অফিসগুলি গোরক্ষপুরে স্থানান্তরের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া আজ

সাপ্তাহিক সংবাদ

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নাগরিকগণের এক বিরাট জনসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ ইস্টার্ন রেলওয়ের শিয়ালদহ-লালগোলা সেকশনে নবনির্মিত কালীনারায়ণপুর জংশন স্টেশনের উদ্বোধন করেন।

৯ই জুলাই—আজ ২০নং দমদম রোডে এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তৃতায় কংগ্রেসকর্মীদের ক্ষুদ্র দলাদলি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলিয়া দেশের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীঅশোককুমার সরকার সমাগত প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত সম্ভাষণ করিতে উঠিয়া নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত নবভারতের গঠনকার্যে সকলকে অগ্রসর হইবার আহ্বান জানান।

১০ই জুলাই—তিস্তা এবং মহানদীতে প্রবল বন্যার ফলে জলপাইগুড়ি জেলার বহু সংখ্যক গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়াছে। বন্যার ফলে কয়েকটি রেলওয়ে সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিলিগুড়ি এবং আসামের মধ্যে ট্রেন চলাচল স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আজ উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা, গোয়া মুক্তি-আন্দোলন ও অন্যান্য বিষয়ে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণান্তে মূল অধিবেশনের অবসান হয়।

১১ই জুলাই—আজ ২০নং দমদম রোডে উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলন মণ্ডপে অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীরূপে খ্যাতনামা মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে নারী সমাজের গুরুদায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং নিষ্ঠার সহিত আদর্শ মাতার ন্যায় সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহাদের নিকট আবেদন জানান।

ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের অষ্টম দলের ৫৩ জন আজ গোয়ায় প্রবেশ করেন। সংসদ সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

আজ শ্রীনগরে পুনর্বাসন মন্ত্রিসম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না জানান যে, পূর্ববঙ্গ হইতে প্রতি মাসে প্রায় ২৫ হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে আসিতেছে।

১২ই জুলাই—ইউরোপ সফর অন্তে অদ্য রাত্রে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, বিদেশে ৩৭ দিনব্যাপী সফরের সময় তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই শান্তি স্থাপন ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের একটা আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছেন।

নেহরু-নাসের যুক্ত বিবৃতি আজ নয়াদিল্লী এবং কায়রো হইতে একযোগে প্রচারিত হয়। এই বিবৃতিতে তাঁহারা এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রধান চতুঃশক্তির আসন্ন জেনেভা বৈঠক বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপন করিবে।

কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তিস্তা নদীর বন্যার জল কোচবিহারের মেকলীগঞ্জ শহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং উহার ফলে শহরের একটি বৃহৎ অংশ জলমগ্ন হইয়াছে।

১৩ই জুলাই—সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে পাঁচ সপ্তাহব্যাপী শান্তি পরিক্রমার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ বোম্বাই হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

দার্জিলিং-এর পর্বতারোহণ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মেজর এন ডি দয়াল ও তাঁহার সঙ্গীদল হিমালয়ের ২৫৪৫০ ফুট উচ্চ কামেট শৃঙ্গ জয় করিয়াছেন।

১৪ই জুলাই—নয়াদিল্লীতে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে (পাকিস্থান) এবং উত্তর (ভারত) রেলওয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ১লা আগস্ট হইতে হাওড়া ও লাহোরের মধ্যে সরাসরি ট্রেন চলাচল আরম্ভ হইবে।

দীর্ঘ ৫৭ দিবস সত্যাগ্রহ আন্দোলন

পরিচালনার পরে আগামীকল্য ১৫ই জুলাই হইতে হাবড়া উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহের অবসান ঘোষণা করিয়া উক্ত সত্যাগ্রহের কর্মী-সংসদের পক্ষ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৫ই জুলাই—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুকে মানব সমাজে শান্তি স্থাপনকল্পে বীরোচিত প্রচেষ্টার জন্য দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ এবং বি এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার বি এ পরীক্ষায় শতকরা ৪৪ জন এবং বি এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৫৭·৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

১৬ই জুলাই—নয়াদিল্লীতে এক বিরাট জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুকে পৌর-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেনেভায় চতুঃশক্তি সম্মেলনে ভারতের শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। শ্রী নেহরু বলেন, সর্বমানবের সহিত মৈত্রী ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূলতত্ত্ব।

গতকল্য সন্ধ্যা হইতে ব্রহ্মপুত্রের জল বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিব্রুগড় শহরের তিন-চতুর্থাংশ প্লাবিত হইয়াছে।

১৭ই জুলাই—রেলওয়ে দুর্নীতি অনুসন্ধান কমিটি তাহাদের রিপোর্টে জননেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিকট রেলওয়েতে দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে একটি সংস্কার আন্দোলন চালাইবার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান। উহাতে বলা হয় যে, ভারতীয় রেলওয়েতে এই দুর্নীতি আমাদের শাসন-ব্যবস্থার সুনাম কলঙ্কিত করিতেছে এবং লোককে আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করার সুযোগ দিতেছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই জুলাই—দক্ষিণ আদ্রিয়াতিকের ব্রিয়নী দ্বীপে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ভারত-যুগোশ্লাভ সম্পর্ক বিষয়ে নেহরু-টিটো আলোচনা সমাপ্ত হয় এবং তাঁহারা এক যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

৭ই জুলাই—আজ মরীতে পাকিস্থান গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। গভর্নর জেনারেলের এক নির্দেশবলে পাক পাঞ্জাবের গভর্নর মিঃ গুরমানি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ যুগোশ্লাভিয়া হইতে বিমানযোগে রোমে উপনীত হন।

৮ই জুলাই—রোমে পোপের সহিত কুড়ি মিনিটকাল আলোচনার পর অদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন, মহামান্য পোপ এ বিষয়ে আমার সহিত একমত যে, গোয়ার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক সমস্যা।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেনের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে আজ রাত্রে বিমানযোগে রোম হইতে লণ্ডনে পৌঁছেন।

৯ই জুলাই—জেনেভায় আসন্ন রাষ্ট্রনায়ক সম্মেলন এবং দূরপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে লণ্ডনে ভারত ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা অদ্য শেষ হয়।

১০ই জুলাই—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লণ্ডন বিমান বন্দর হইতে ভারতের পথে কায়রো যাত্রা করেন।

১১ই জুলাই—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু লণ্ডন হইতে বিমানযোগে আজ কায়রো পৌঁছিলে "শান্তি দূত"রূপে অভিনন্দিত হন।

১২ই জুলাই—পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করেন যে, লালকোর্তা নেতা খাঁ আব্দুল গফফর খাঁর গতিবিধির উপর হইতে সকল নিষেধাজ্ঞা আজ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা পূর্ব-বঙ্গের প্রাথমিক স্কুলসমূহে বাঙলা ভাষাভাষী ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু শিক্ষাদান অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন।

১৩ই জুলাই—আজ মরীতে পাক গণপরিষদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগ এবং যুক্তফ্রন্টের সদস্যগণ মুসলিম লীগ দল এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আনয়ন করেন।

১৪ই জুলাই—রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে প্রকাশ, এক বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৩॥ কোটি বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি ২৫২ কোটি ৮০ লক্ষ হইয়াছে।

১৫ই জুলাই—তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পাক-আফগান সীমান্ত বিরোধ মীমাংসায় তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী ও অস্থায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মেন্দারেস মধ্যস্থতা করিবেন।

ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বলেন যে, জেনেভায় চার রাষ্ট্র-নায়ক বৈঠকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত একটি সাধারণ কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে।

১৬ই জুলাই—ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেল গিলবার্ট গ্রাণ্ডভ্যাল অদ দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কাসাব্লাঙ্কায় সামরিক আইন জারি করিয়াছেন। গত ৪৮ ঘণ্টায় সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ২০ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়।

১৭ই জুলাই—আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকল্পে আগামীকল্য সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সহিত যে আলোচনা আরম্ভ হইবে, উহাতে পশ্চিমী ত্রিশক্তির অনুসরণীয় নীতি-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার স্যার এণ্টনী ইডেন ও মঁ এডগার ফোরে বৃহৎ ত্রিশক্তির এই তিন রাষ্ট্র-নায়ক অদ্য জেনেভায় এক বৈঠকে মিলিত হন।

সীমান্ত নেতা খাঁ আব্দুল গফফর খাঁ প্রায় সাত বৎসর পর নিজ প্রদেশে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, সীমান্ত প্রদেশ পাঠানদের মাতৃভূমি এবং পাঠানেরাই ইহা শাসন করিবে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩,
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
৩৯ সংখ্যা
দেশ
শনিবার
১৩ শ্রাবণ, ১৩৬২
DESH
SATURDAY, 30TH JULY, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম

পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক সম্পর্ক আগামী ৮ই আগস্ট হইতে ছিন্ন করা হইবে। ঐদিন হইতে নয়াদিল্লীস্থ পর্তুগীজ দূতাবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। লোকসভার প্রথম অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা জাতির জনমতের মর্যাদা রক্ষায় ভারত সরকারের জাগ্রত চেতনার পরিচয়স্বরূপে দেশের সর্বত্র আশা এবং উৎসাহ সঞ্চার করিবে। পর্তুগীজ সরকার জানাইয়া দিয়াছেন যে, গোয়ার অধিকার তাঁহারা ছাড়িবেন না। অধিকন্তু ভারতের পর্তুগীজ অধিকৃত স্থানসমূহের সার্বভৌম অধিকার যদি ভারতীয় ইউনিয়নের নিকট হস্তান্তরের প্রশ্নই হইয়া থাকে, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিশ্চয়ই তাহার সমাধান হইবে না। পর্তুগীজ সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে শাসানিও যথেষ্ট রহিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, বিদেশের স্বার্থবাহী মাত্র জনকয়েক লোক ছাড়া কেহই অন্যায় চাপের নিকট নতি স্বীকার করিলে পর্তুগীজ সরকার তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। পর্তুগীজ সরকারকে এই বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, গোয়ার অধিবাসীদের পক্ষে ভারত বিদেশ। পক্ষান্তরে পর্তুগালই তাহাদের স্বদেশ এবং পর্তুগীজ সংস্কৃতিই গোয়ার সংস্কৃতি। বস্তুত তাঁহাদের এই দাবীর মূলে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক কিংবা সাংস্কৃতিক কোন যুক্তিই নাই। গোয়া অখণ্ড ভারতেরই অংশ। কংগ্রেস বহুদিন হইতেই এই সত্য সম্বন্ধে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নয়াদিল্লীর অধিবেশনে গোয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে এ সম্বন্ধে জটিলতাই সৃষ্টি করা হইয়াছে। গোয়ার অধিবাসীদিগকে কমিটি যেন ভারতবাসী হইতে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনা করিবার দায়িত্ব প্রধানত গোয়াবাসীদের উপর, কমিটির প্রস্তাবের এই অংশ সেই ধারণাই সৃষ্টি করে। কমিটি গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস সদস্যদের যোগদানে আপত্তি করেন নাই; কিন্তু ব্যাপকভাবে এই কার্যে সংশ্লিষ্ট হইতে তাঁহাদের এখনও আপত্তি রহিয়াছে। এই আপত্তির মূলে উপযুক্ত কারণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। গোয়া যদি ভারতের অবিভাজ্য অংশ হয়, এবং গোয়ার মুক্তি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশস্বরূপই বিবেচিত হয়, তবে আদর্শ-নিষ্ঠার দিক হইতে গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের দায়িত্ব নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানস্বরূপে কংগ্রেসের উপরও গিয়া পড়ে। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ যদি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে পর্তুগালের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে সত্যাগ্রহে কংগ্রেস-প্রভাবিত রাষ্ট্রের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা কিভাবে ঘটে আমরা বুঝি না। পক্ষান্তরে ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহের ফলেই পর্তুগীজ বর্বরতার উৎখাত সাধিত হইবে এবং প্রকৃত শান্তির তাহা সহায়ক হইবে, আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী

মানব-মুক্তির মহান্ উদ্দেশ্যে আত্মদাতাদের শোণিতোৎসর্গ ব্যর্থ হয় না। মিথ্যার সকল গ্লানি অপসারিত করিয়া তাঁহাদের অবদানের মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ভারতের ইতিহাসে ঐ সত্য প্রদীপ্ত হইতে চলিতেছে। ১৯৫৭ সালে ভারতের সর্বত্র সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী প্রতিপালনে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত দেশবাসীদের দ্বারা আগ্রহের সহিত অভিনন্দিত হইবে। কমিটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম-স্বরূপে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী যাহাতে যথোচিতভাবে উদ্‌যাপিত হয় সেজন্য কর্মপঞ্জী নির্ধারণের নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, সিপাহী বিদ্রোহের ভিতর দিয়া বৈপ্লবিক যে বেদনা ভারতের বুকে বিপুল ঝঞ্ঝার আবর্ত তুলিয়াছিল তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ সুদীর্ঘ পরাধীনতার প্রভাবে অদ্যাপি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত আকারে উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহার পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ ইতিহাস আজও রক্ষিত হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আমরা এদিকে আকৃষ্ট করিতেছি। আমরা আশা করি, ১৯৫৭ সালের পূর্বেই তাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহের যথাযথ

ইতিহাস দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়া এদেশের মুক্তিসংগ্রামে আত্মদাতা বীরদের মহনীয় স্মৃতির প্রতি মর্যাদাবোধ জাতির অন্তরে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজনীতিক মহলে এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা-গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। ভারতের মত বিরাট এবং বিশাল দেশে গঠনমূলক এইসব পরিকল্পনার নানাদিক হইতেই জটিলতা রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে এদেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য; কিন্তু সেই সঙ্গে বেকার সমস্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই সমস্যা বর্তমানে প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবেই বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধানের দিকে গুরুত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও এই বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ এই সমস্যা সমাধানের সোজা উপায় বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার ফলে কুটীর-শিল্পগুলি যদি ধ্বংস পায় তবে বিপরীত ফল হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। সুতরাং যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহযোগী হিসাবে কুটীর-শিল্পসমূহের সমন্বয় সাধনেরও প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাসমূহ সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা একান্তভাবেই দরকার। ফলত সামাজিক স্বার্থের আদর্শে নৈতিক বোধকে যদি জাগাইয়া তোলা না যায়, তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্যক্‌রূপে সার্থক হইয়া উঠিবে না, আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীকে সম্প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গের অতিথি স্বরূপে কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত মেধী আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য কামনা করিয়াছেন এবং আসামের উন্নয়নকল্পে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আসাম এবং বাংলার মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বহুদিন হইতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেই সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুরাতন বলা যাইতে পারে। বর্তমানে আসামের এক শ্রেণীর মধ্যে যে বাঙ্গালী বিদ্বেষের ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার পর এই বিরোধের ভাব তীব্র আকার ধারণ করে। আমাদের মতে ভাষার বিভিন্নতা বা সংস্কৃতি এই বিদ্বেষের মূলে নাই। ইহার কারণ অনেকটা অর্থনৈতিক এবং আসাম সরকারের নাগরিক বিধান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করিতেছে। এই বিধান অনুসারে আসামের অধিবাসী হিসাবে সেখানকার শাসন-বিভাগে চাকুরির অধিকার লাভ করিতে হইলে অন্তত ১০ বৎসরকাল আসামে বাস করা প্রতিপন্ন করিতে হয়। শুধু সরকারী চাকুরিতেই নয়, আসামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশাধিকার, এমন কি ব্যবসা বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইতে হইলে অনুরূপ প্রমাণ দাখিল করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। এদেশের সংবিধানে ভারতের সর্বত্র ভারতের অধিবাসীদের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আসামে প্রচলিত স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবেই ভারতের শাসনতন্ত্রের বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এইসব বৈষম্যমূলক বিধান বহিরাগত হিসাবে বাঙ্গালীদিগকে আসামের অধিবাসীদের হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে ভেদ রেখা স্পষ্ট করিয়া দিতেছে। সহজে প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য একদল রাজনীতিক এই বিভেদকে সুযোগ স্বরূপে গ্রহণ করিতেছেন। ইঁহারা বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করিয়া উগ্র অসমীয়া স্বদেশপ্রেমিক স্বরূপে নিজদিগকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আসাম সরকারকে এজন্য অবশ্য পুরাপুরি দায়ী করা চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এজন্য ভারত সরকারই দায়ী। তাঁহারা ভারতীয় সংবিধানগত সর্বভারতীয় অধিকার সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দিতেছেন না। আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, বাসিন্দা সর্পর্কিত বিধানগুলি পরিবর্তন সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সাল হইতে ভারত সরকার এ পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। এই সম্পর্কে তাঁহাদের উদাসীনতার ফলে আসাম এবং অপরাপর কয়েকটি রাজ্যে প্রাদেশিকতার ভাব প্রশ্রয় পাইতেছে। ভাষাগতভাবে বিভিন্ন রাজ্য পুনর্গঠিত হইলেও এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সংখ্যালঘু ভাষা-ভাষীদের প্রশ্ন সেক্ষেত্রেও থাকিবে। অখণ্ড ভারতের অনুভূতিকে সংহত করিয়া তুলিতে হইলে ভারতের সর্বত্র সকল ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের সমানাধিকার অবিলম্বে প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। বৃটিশের রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতব্যাপী যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন তার অন্যতমা সংগ্রামী। ১৮৫৭ সালের ৪ঠা জুন থেকে ১৮৫৮ সালের ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ঝাঁসীতে বৃটিশরাজের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ তিনি করেছিলেন, অবশেষে ১৭ই জুন অবিচ্ছেদ্য বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের পর গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়।

সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত বীরশ্রেষ্ঠা ভারতীয় নারী লক্ষ্মীবাঈয়ের বহু নূতন তথ্যসংবলিত জীবনালেখ্য 'ঝাঁসীর রাণী' আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক 'দেশ'

বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রধানদের কনফারেন্স শেষ হবার পূর্বে গত সপ্তাহের বৈদেশিকীর কলমে যা লেখা হয়েছিল কনফারেন্স শেষ হবার পরে তার উপর বেশি কিছু লেখার আছে বলে মনে হয় না। যেমন হবে বলে আন্দাজ করা গিয়েছিল তাই হয়েছে। কোনো সমস্যার সমাধানও হয়নি, আবার সমাধান হয়নি বলে যে আন্তর্জাতিক অবস্থা খারাপের দিকে কিছু গেছে তাও নয়। ইউরোপের নিরাপত্তা, জার্মানীর ঐক্য সাধন, নিরস্ত্রী-করণ প্রভৃতি সকল বিষয়ে যে, যাঁর মত প্রকাশ করেছেন, কোনো প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়নি, মীমাংসা হবে বলে কোনো পক্ষ আশাও করেননি।

প্রকৃতপক্ষে কনফারেন্সে কারা কোন্ বিষয়ে কী প্রস্তাব করবেন তার মোটামুটি ভাব আগে থাকতেই প্রকাশ করা হয়েছিল। একমাত্র প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার একটা কথা বলেন যেটা পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, সারা আমেরিকায় কোথায় কী অস্ত্রের কারখানা আছে তা সমস্ত বিমান থেকে দেখে নেবার সুযোগ রাশিয়াকে দিতে মার্কিন গভর্নমেণ্ট রাজী আছেন যদি সোভিয়েট গভর্নমেণ্টও আমেরিকাকে অনুরূপ সুবিধা দেন। বোধ হয় কথাটাকে সোভিয়েট পক্ষ অথবা আমেরিকার মিত্ররা কেউই 'কাজের কথা' বলে মনে করেন নি। যাই হোক, প্রধানদের কনফারেন্সে বিভিন্ন বিষয়ে যে-সব কথা হয়েছে সেগুলির জের টেনে আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্য তাঁদের বৈদেশিক মন্ত্রীরা আদিষ্ট হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মন্ত্রীরা আগামী অক্টোবর মাসে আবার মিলিত হবেন।

কনফারেন্সের বাইরে খানাপিনার টেবিলে সোভিয়েট কর্তাদের সংগে আমেরিকান, বৃটিশ ও ফরাসী কর্তাদের যে আলাদা আলাদা দেখাশুনা হয় তাতে যে-সব কথাবার্তা হয়েছে তার হয়ত সব খবরের কাগজে বেরোয় নি। কনফারেন্সের কার্যবিবরণীতে সুদূর প্রাচ্যের সমস্যাবলী সম্বন্ধে কোনো আলোচনার উল্লেখ নেই। আগে থাকতেই আমেরিকা ঘোষণা করেছিল যে, কনফারেন্সে সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনার সুযোগ দেবে না। তবে কনফারেন্সের বাইরে যে-সব দেখা-শুনা হয়েছে তাতেও সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে একদম কোনো কথাবার্তা হয়নি এরূপ মনে করার কারণ নেই।

যাই হোক, প্রধানদের কনফারেন্স যেমন হবে বলে ভাবা গিয়েছিল তেমনি হয়েছে। এর পর যে বৈদেশিক মন্ত্রী-দের বৈঠক হবে তাতেও কোনো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এরূপ আশা করা সংগত হবে না। যথা, কোনো পক্ষই মনে করেন না যে, অক্টোবর মাসে যখন বৈদেশিক মন্ত্রীরা মিলিত হবেন তখন জার্মানীর ঐক্য সাধনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মতের একটা সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। আলোচনা চলবে—এইটাই হচ্ছে

বড়ো কথা। সমস্যা সমাধান না হলেও, দুই পক্ষের মতের মিল না ঘটলেও আলোচনা চালিয়ে যাওয়াই এখন কাজ এবং এটা যে সম্ভব হচ্ছে সেইটাই সফলতা বলে ধরে নিতে হবে। আগে থাকতেই জানা ছিল যে, প্রধানদের বৈঠকে এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না, এর চেয়ে কমও হবে না।

প্রধানদের কনফারেন্সে কোনো সমস্যার সমাধান না হলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে অথচ যুদ্ধের আশংকা বেড়ে যাবে—আদৌ এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে কনফারেন্স হয়নি। যে-পরিস্থিতিতে প্রথম চার্চিল সাহেব প্রধানদের মিলিত হবার কথা বলেন সে-পরিস্থিতিতে কনফারেন্স হয়নি। তখন একটা সংকটের অনুভূতি ছিল, সেই সংকট দূর করার জন্য প্রধানগণের মিলিত হওয়া আবশ্যক, এই ছিল চার্চিল সাহেবের প্রস্তাব। দুই পক্ষের মধ্যে যে "টেন্‌শন্‌" ক্রমশ বেড়ে চলছিল প্রধানগণ মিলিত হলে সেটা কমবে এবং সংগে সংগে যুদ্ধের আশংকাও কমবে, এই ধারণাই ছিল চার্চিল সাহেবের প্রস্তাবের ভিত্তি। কিন্তু প্রধানগণের মিলন যখন হ'ল তখন অবস্থা বদলে গেছে। মিলন যখন হ'ল তখন মিলন তত জরুরী ছিল না। "টেন্‌শন্‌" কমানো দরকার, প্রধানগণ মিলিত না হলে "টেন্‌শন্‌" এবং যুদ্ধের আশংকা বাড়তে থাকবে—এ অবস্থায় প্রধানগণের মিলন ঘটেনি। "টেন্‌শন্‌" এবং যুদ্ধের আশংকা কমেছে—এই অবস্থায় মিলন ঘটেছে, "টেন্‌শন্‌"—এবং যুদ্ধের আশংকা কমেছে বলেই মিলন ঘটেছে।

মিলনের ধরনটাও চার্চিল সাহেব যেমন চেয়েছিলেন তার মতো একেবারেই হয়নি। যুদ্ধের সময়ে রোজভেল্ট-স্টালিন-চার্চিল যেভাবে মিলিত হয়েছিলেন এই কনফারেন্সও কিছুটা সেই ভাবের হবে বলে চার্চিল সাহেবের ধারণা ছিল কিন্তু কি ধরন-ধারন, কর্তৃত্ববোধ অথবা তাৎপর্য—কোনো বিষয়েই যুদ্ধকালীন রোজভেল্ট - স্টালিন - চার্চিল মিলনের সংগে অধুনা সংঘটিত জেনেভা কনফারেন্সের তুলনা হয় না।

* * *

এক জেনেভা কনফারেন্স যখন হয়েছিল তখন এক বছর পূর্বের অনুষ্ঠিত আর এক জেনেভা কনফারেন্সের সুফল বিপন্ন হবার সংবাদে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। ইন্দো-চীন সম্পর্কিত জেনেভা চুক্তি অনুসারে ভিয়েৎনামে যে ইলেকশন হবার কথা সেটা না হবার সম্ভাবনাই যে বেশি তা কিছুদিন থেকেই বুঝা যাচ্ছিল। চুক্তি অনুসারে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের পূর্বে সারা ভিয়েৎনামে নির্বাচন হবার কথা যার ফলের উপর ভিয়েৎনামের ঐক্যসাধন নির্ভর করছে। চুক্তির শর্ত অনুসারে ইলেক্‌শনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গভর্নমেণ্টের মধ্যে এই জুলাই মাসেই আলোচনা আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্ট এরূপ আলোচনায় যোগ দিতেই রাজী নন। তাঁরা বলছেন, বর্তমান অবস্থায় ইলেক্‌শন হতে পারে না, উত্তর ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্টরা লোকদের স্বেচ্ছামতো ভোট দিতে দেবে না ইত্যাদি। তাছাড়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্ট জেনেভা চুক্তি মানতে বাধ্য নন, কারণ জেনেভা চুক্তি তাঁরা সই করেন নি, করেছেন ফরাসী গভর্নমেণ্ট।

মিঃ ডিয়েমের গভর্নমেণ্ট জেনেভা চুক্তি ও কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে কিছুদিন থেকে নানারকম বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছিলেন। কিন্তু ২৩শে জুলাই ডিয়েম গভর্নমেণ্টের সমর্থকগণ যে কাণ্ড করেছে তার চেয়ে নিন্দার্হ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক আর কিছু হতে পারে না। সেদিন বিক্ষোভকারীরা সাইগনে যে হোটেলে ইণ্টারন্যাশনাল সুপারভাইজরী কমিশনের সদস্যগণ থাকেন সেখানে ঢুকে কমিশনের সদস্যদের সমস্ত জিনিসপত্র ভেংগে চুরে নষ্ট করেছে। এই কমিশন ভারত (সভাপতি), পোল্যান্ড ও কানাডার প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত।

বর্তমান অবস্থায় কমিশন কেমন করে তাঁর বাকী কর্তব্য পালন করবেন বুঝা কঠিন। ঘটনার পরে ভারত সরকার ইন্দোচীন সম্পর্কিত জেনেভা কনফারেন্সের যুগ্ম-সভাপতি হিসাবে মিঃ মলোটভ এবং স্যার এণ্টনী ইডেনকে অবস্থা জানিয়েছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য ২৩শে জুলাইয়ের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কমিশনের সদস্যদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হয়ত অতঃপর রক্ষিত হবে কিন্তু জেনেভা চুক্তি অনুসারে ইলেক্‌শনের ব্যবস্থা হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

পশ্চিমী শক্তিরা অবশ্য মিঃ ডিয়েমকে ইলেক্‌শন সম্বন্ধে কথাবার্তায় যোগ দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন, কিন্তু ইলেক্‌শনে রাজী হতে নয়। মিঃ ডিয়েম শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌শন সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিবেন কিনা নিশ্চিত বলা যায় না, তবে আলোচনায় যোগ দিলেও ইলেক্‌শনে রাজী হবেন বলে কিছুতেই মনে হয় না। তবে প্রকৃতপক্ষে আলোচনা যদি চলে তাহলে সুপারভাইজারী কমিশনকে পাততাড়ি গোটাতে হয় না। তা না হলে মুশকিল। তবে ইন্দোচীনে পুনরায় বড়ো রকমের যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। জেনেভা চুক্তি অনুসারে ইলেক্‌শন সম্ভব না হলেই সহসা যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এ আশংকা বোধ হয় নেই।

* *

গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ নীতি ত্যাগ করবেন না। ভারত ইউনিয়ন এলাকা থেকে এক সংগে বহুসংখ্যক সত্যাগ্রহী গোয়ায় প্রবেশ করে, এটাও ভারত সরকারের ইচ্ছা নয়। তবে দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকার গোয়ার উপর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। ভারত সরকার ভারতভূমির কোনো অংশে কোনো বৈদেশিক কর্তৃত্ব বরদাস্ত করবেন না, একথা খুব জোরের সংগে ঘোষণা করা হয়েছে। দিল্লীতে পর্তুগালের যে দূতাবাস ছিল সেটা বন্ধ করে দেবার জন্য পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গোয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সবের ফলে কতদিনে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সুবুদ্ধির উদয় হবে তা অবশ্য বলা কঠিন

২৭।৭।৫৫

যখন নায়ক ছিলাম

ধীরাজ ভট্টাচার্য

মখমলের উপর সোনালী জরির বিচিত্র কারুকার্যখচিত পোশাক, মাথায় সোনার মুকুট, তাতে বহুমূল্য হীরে জহরৎ বসানো। সাদা ধপধপে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র চলেছেন কোন সে অজানা দেশের রাজকন্যার সন্ধানে। নীল আকাশে রুপালী মেঘের ছোট বড় পাহাড়গুলো চোখের নিমেষে পার হয়ে পক্ষীরাজ ছুটে চলেছে। নীচে অসংখ্য রাজ্য ও জনপদ, নদনদী ও অরণ্যপর্বত হাতছানি দিয়ে ডাকে; ঘোড়া বা ঘোড় সওয়ারের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা চলেছে দূরে বহুদূরে বুঝি বা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। যেখানে অচিন দেশের রাজকন্যা ময়নামতি মালা হাতে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছে রাজপুত্রের আশাপথ চেয়ে। পথ যেন আর ফুরুতেই চায় না। অবশেষে দেখা গেল বহুদূরে নীল সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ আর সমস্ত দ্বীপটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা সোনার অট্টালিকা। পড়ন্ত রোদের রক্তিম আভায় অপরূপ স্বপ্নের মায়াপুরীর মত দেখাচ্ছে। আনন্দে পক্ষীরাজ হ্রেষা রব করে উঠে দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটে চললো, রাজপুত্র ঘোড়ার পিঠে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। এমন সময় ঘটল এক অঘটন। কোন অদৃশ্য আততায়ীর এক বিষাক্ত তীর এসে বিঁধল পক্ষীরাজের গলায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে নীচে নামতে লাগলো পক্ষীরাজ, ভীত চকিত চোখে নীচের দিকে চাইতে লাগলেন রাজপুত্র। ভাবলেন নীচে ঐ অসীম অনন্ত সমুদ্রে পড়লে আর বাঁচবার কোনও আশাই নেই। প্রভুভক্ত পক্ষীরাজ রাজপুত্রের মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধ হয় শেষ নিঃশ্বাস নেবার আগে দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে পড়লো এসে ঐ সোনার অট্টালিকার ছাতে...

চোখ চেয়ে দেখি পড়ে গেছি ঘরের সিমেণ্টের মেজেয়। প্রথমটা বেশ অবাক হয়ে গেলাম, নজর পড়লো জামা কাপড়ের দিকে। পরনে শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গায়ে তালি দেয়া জামা, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল। সব মনে পড়ে গেল। 'কাল পরিণয়' ছবির বেকার দরিদ্র নায়ক মণীন্দ্রের রূপসজ্জায় শুটিং-এর অবসরে ম্যাডান স্টুডিওর মেক-আপ রুমে কাঠের বেঞ্চের উপর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে পড়ে গেছি কঠিন সিমেণ্টের মেজের উপর। ভাগ্যিস ঘরে কেউ ছিল না নইলে ভীষণ লজ্জায় পড়তাম। ডান হাতের কনুইটায় বেশ চোট লেগেছিল। হাত বুলোতে বুলোতে আরশির সামনে দাঁড়ালাম। নিজের চেহারা দেখে হাসি পেল আমার। কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্র আর কোথায় দারিদ্র্যের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত বেকার শিক্ষিত যুবক মণীন্দ্র! হোক, তবুত নায়ক! কতক্ষণ আরশির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই। শুটিং-এর ডাক পড়লো। সারা স্টুডিওটা জঙ্গলে ভর্তি, শুধু খানিকটা জায়গা চৌকো উঠোনের মত সিমেণ্ট করা। তার উপর ঠিক স্টেজের মত মোটা কাপড়ের উপর রং দিয়ে আঁকা সিন কাঠের ফ্রেমে এঁটে চারদিকে পেরেক আর পিছনে সরু কাঠ দিয়ে ঐ সিমেণ্টের মেজের খানিকটা জায়গায় আটকে তৈরি হয়েছে ঘর। তিন দিকে সিনের দেওয়াল, একদিক খোলা। উপরে সাদা কাপড় সামিয়ানার মত টাঙিয়ে সিলিং। পরে শুনেছিলাম সিলিং নয়, রোদের কড়া আলো খানিকটা কমিয়ে দেবার জন্যই ওটার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশি।

ঘরের মধ্যে টেবিল চেয়ার খাট আলমারি মায় দেওয়ালে ঠাকুর দেবতার ছবি পর্যন্ত টাঙানো। টেবিলের উপর দু-তিনটে ওষুধের শিশি, ওষুধ খাওয়ার ছোট্ট গ্লাস। পাশে কাগজের উপর খানিকটা বেদানা ও দু-তিনটে কমলা লেবু। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নেই।

খাটের উপর কাঁথা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে আমার তিন চার বছরের ছেলে। মাথার কাছে আধ-ময়লা একখানা শাড়ি পরে স্ত্রী সীতাদেবী একখানা পাখা হাতে বাতাস করছে ছেলেকে, এমনি সময় ঘরে ঢুকলাম আমি। ঐ শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়, গায়ে তালি দেওয়া জামা, মাথায় একরাশ তৈলবিহীন রুক্ষ চুলের বোঝা ও একমুখ

খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে আমি খাটের মাথার দিকে এসে দাঁড়ালাম। স্ত্রী পিছন ফিরে হাওয়া করছিল, প্রথমে দেখতে পাননি আমাকে। ছেলের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ কেমন আছে

খোকা?' তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়ে বিষণ্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে স্ত্রী বললেন—'দি সেইম, নো চেঞ্জ অব টেম্পারেচর।'

বললাম—'ওষুধটা ঠিকমত খাচ্ছে ত?'

উত্তরে একটা খালি শিশি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে আমার প্রায় নাকের উপর সেটা নেড়ে চেড়ে দেখিয়ে স্ত্রী বললেন—'ইট ইজ্ এম্‌প্‌টি সিন্‌স্ মরনিং। বাট্ হোয়ার ইজ্ দি মানি টু ব্রিঙ্ ফ্রেশ মেডিসিন্?'

শিশিটা রেখে স্ত্রী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলেন। মাথা নেড়ে বললাম—'নাঃ কোথাও কিছু হোল না। আমার মত অভাগার চাকরি কোথাও জুট্‌লো না।'

হঠাৎ জ্বরের ঘোরে ছেলেটা কেঁদে ওঠে। স্ত্রী তাড়াতাড়ি মাথার কাছে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করে।

সিনটা হল এই। ক্লোজ-আপ, মিড শট, লঙ্‌শট এইভাবে ভাগ করে সিনটা নিতে প্রায় চারটে বাজল। চা খাওয়ার জন্য খানিকটা সময় ছুটি পাওয়া গেল।

এখানে একটা কথা বলে রাখি—স্ত্রী সীতাদেবী ফিরিঙ্গি মেয়ে হলেও ভাঙা ভাঙা বাঙলায় কথা বলতে পারতেন, কিন্তু পরিচালক গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'না, তাতে এক্সপ্রেশন নষ্ট হবে।' কাজেই সীতাদেবী ইংরেজিতেই ডায়ালোগ্ বলতেন, আমি বাঙলায়। আর ছোটো ছেলেটা শুনেছিলাম কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের কোনো এক মুসলমান অভিনেত্রীর ছেলে। সে ব্যাটা কড়া উর্দু ছাড়া কথা বলতে বা বুঝতে পারতো না। রক্ষে যে তার কোনও সংলাপ ছিল না, খালি জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে উঃ আঃ বলা ছাড়া। নইলে টকীর যুগ হলে ব্যাপারটা একবার ভাবুন তো? বাঙলা উর্দু ও ইংরেজিতে ঐ সিনটা পর্দার উপর পড়লে আমাদের পারিবারিক দুঃখ দেখে লোকে কাঁদতো না হাসতো।

নির্বাক যুগের আরও অনেকগুলো সুবিধে ছিল। প্রথমত সিনারিও বা স্ক্রিপ্টের কোনও বালাই ছিল না। ছাপানো একখানা বই বা নাটক যা তোলবার জন্য মনোনীত হত, তাতে শুধু সংলাপ অংশ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নিলেই সিনারিও হয়ে গেল। পরিচালক শুধু সিনটা বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয় শিল্পীদের ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে ঐ লাল পেন্সিলের দাগ-কাটা লাইনগুলো আউড়ে যেতে বলতেন। কোনো অভিনেতার যদি কোনো লাইন আটকে যেত, অমনি স্টেজের মত প্রম্‌ট করে বলে দেওয়া হত। সব চাইতে বড় কথা অপচয় বলে কোনো কিছু নির্বাক যুগে ছিল না। অভিনয় করতে করতে কোনো অভিনেতা যদি হাঁদারামের মত হঠাৎ সংলাপ ভুলে পরিচালকের দিকে চেয়ে থাকতেন, তাতে তাঁর লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কিছু ছিল না। পরিচালক মশাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে 'কাট্' বলে চিৎকার করে ক্যামেরা থামিয়ে দিতেন না। বরং উৎসাহ দিয়ে বলতেন—'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।' ফিল্ম এডিট বা জোড়া লাগাবার সময় ক্যামেরা বা পরিচালকের দিকে হঠাৎ চেয়ে ফেলার ছবিটা কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে একটা জুৎসই টাইটেল জুড়ে দেওয়া হত, ব্যস্ সব দিক রক্ষে!

সব চাইতে নিরাপদ ও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল ভূমিকা নির্বাচন, যেটা বর্তমান টকির যুগে একটা মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ছবিতে। ধরুন আপনার চাই এমন একটি নায়িকা যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত সেক্স অ্যাপীলে ভর্তি। কিন্তু কোথায় পাবেন তেমন নায়িকা? অনেক খুঁজে-পেতে যদিও বা একটি পেলেন, দেখলেন সেক্স যদিও তার আছে, সেটা সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিজের মধ্যেই চেপে রেখে দিয়েছে। দশজনের কাছে তার আবেদন পৌঁছে দেওয়া দূরে থাক, কণা-মাত্র আদায় করতে পরিচালক বেচারীকে মদনদেবের আপীল আদালতে মাথা খুঁড়ে মরতে হয়। শেষকালে তিতিবিরক্ত হয়ে দিলেন ঐ ভূমিকা কোনো নাম-করা অভিনেত্রীকে, ঐ ভূমিকায় যাঁকে একদম মানায় না। আর সেক্স অ্যাপীল? কোন্ সে সুদূর অতীতে ও'র সেক্স অ্যাপীলে যাঁদের দেহে মনে শিহরণ জাগাতো, তাঁদের অনেকেই আজ অ্যাপীলের বাইরে বসে নিশ্চিন্ত-মনে নাস্তি-মার্জনি নিয়ে সুখে বন্ধ-সংসার

করছেন। কিন্তু তাতে কী হলো? মেয়েদের একটা অদ্ভুত সাইকোলজি, তাঁরা কিছুতেই বয়সের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে চান না, সব সময় পিছনে পড়ে থাকতে চান। ফলে হারিয়ে-যাওয়া যৌবনকে মেক-আপের মায়াজালে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টায় এমন সেক্স অ্যাপীল দেখাতে শুরু করেন, যার ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি বোম্বাইয়ের ছবিকেও লজ্জা দেয়, আর সত্যিকার রসিক দর্শক বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে ভবিষ্যতে বাংলা ছবি না দেখার সংকল্প করে বসেন। বাংলা দেশের নায়িকাদের সম্বন্ধে এই কথাটা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা চলে যে, যার নেই কিছু তারই দেবার ব্যাকুলতা। যার আছে, হয় সে কৃপণ, নয়তো দেবার ক্ষমতাই নেই।

এই তো গেল ভলাপ্চুয়াস্ নায়িকার কথা। সাধারণ নায়িকার ব্যাপারেও ফ্যাসাদ একটুও কম নয়। সত্যিকার নায়িকা হবার যোগ্যতা বাংলা ছবিতে মাত্র দু' তিনজন মেয়ের বেশি নেই। সব প্রডিউসার মিলে তাদের নিয়েই কাড়াকাড়ি। ফলে এক-একজন নায়িকা বারো তেরোখানা ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মোটা টাকা আগাম নিয়ে বসে আছেন। শুটিং শুরু করে আপনি দেখলেন, মাসে দু' তিন দিনের বেশি ডেট্ তিনি কিছুতেই দিতে পারছেন না, অগত্যা ছবির সময় ও খরচা দুই-ই বেড়ে গেল।

এইবার দৃষ্টিপাত করুন পঁচিশ ছাব্বিস বছর আগে নির্বাক যুগের দিকে। যে কোনো জাতের ভিতর থেকে অতি সহজে নায়িকা নির্বাচন করে ফেলুন যেমনটি আপনার চাই। তারপর স্টুডিওতে নিয়ে এসে শাড়ি ব্লাউজ পরিয়ে ছবি তুলে নিন। যার যে ভাষা সেই ভাষাতেই অভিনয় করে যাক, কোনও ক্ষতি নেই। বাংলা টাইটেল দিয়ে শুধু বুঝিয়ে দিন কী সে বলছে। নির্বাক যুগে খুব কম বাঙালী মেয়ের নায়িকা হবার সৌভাগ্য হত। বেশিরভাগ মেয়ে নেওয়া হত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়া থেকে। এ ছাড়া ইহুদি, জর্মান, ইতালিয়ান, মুসলমান প্রভৃতি সব দেশ ও জাতের ভিতর থেকে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের মনোনীত করা হত। তখনকার যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রীরা, যথা—সীতা দেবী (মিস রেনি স্মিথ্), পেশেন্স কুপার, ললিতা দেবী (মিস বনী বার্ড), সুব্রতা দেবী, ইন্দিরা দেবী (নির্বাক 'কপালকুণ্ডলা' ছবিতে নাম ভূমিকায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন) এঁরা সবাই ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। আরও একটি বিশেষ কারণে বাঙালী মেয়েদের পারতপক্ষে নেওয়া হত না। সেটা হল তাদের অত্যধিক জড়তা ও লজ্জা, যেটা অন্য জাতের মেয়েদের ছিলই না বলা চলে। আমি নিজে দেখেছি, অজ পাড়া-গেঁয়ে গরীবের ঘরের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে কিন্তু তিনি কিছুতেই খালি গায়ে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরতে রাজি হলেন না, পরলেন ফর্সা শাড়ি ব্লাউজ। তারপর অভিনয়। ধরুন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রণয়-নিবিড় দৃশ্য। স্বামী বেচারী হয়তো আদর করে একটু কাছে টেনে নিতে চান, স্ত্রী কিন্তু কাঠ হয়ে সেই এক হাত ব্যবধানে থেকেই তোতা পাখির মত বইয়ের কথাগুলো আউড়ে গেলেন। ফিরিঙ্গি মেয়েদের বেলায় ঠিক এর বিপরীত। শুধু বলে দিলেই হল যে, এটা প্রেমের বা রোমান্টিক সিন, তারপর বেচারী নায়কের প্রাণান্ত ব্যাপার।

আবার শুটিংএর ডাক পড়লো। এবারের দৃশ্যটি হচ্ছে, পরদিন সকাল-বেলা। ময়লা একটা গেঞ্জি গায়ে চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছি, ধীরে ধীরে স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়ালেন। কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলাম। 'ইজ্ দেয়ার এনি হ্যাপি নিউজ্?'

আমি—'নাঃ, যাও বা একটা ছিল, পাঁচ শো টাকা সিকিউরিটি জমা দিতে হবে।'

স্ত্রী—'ডোন্ট ওয়রি ডার্লিং। ভেরি সুন দি ক্লাউডস্ উইল পাস'।

গোয়ালা দুধের তাগাদায় বাইরে কড়া নাড়ল। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। রোদ্দুর কমে গেছে বলে শুটিং এইখানেই শেষ করতে হল। পরিচালকমশাই বলে দিলেন, কাল আউটডোর শুটিং, সকাল ঠিক ছ'টায় গাড়ি যাবে। মেক-আপ তোলার কোনো বিশেষ বালাই নেই'—কাপড়-চোপড় ছেড়ে বাড়ি চলে এলাম। (ক্রমশ)

মহারাষ্ট্রের মহানায়ক

অমিয়কুমার

॥ ১ ॥

এ বছর লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলকের ৯১তম জন্মবার্ষিকী ও ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। আগামী বছর তাঁর শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী সারা ভারতে উদ্‌যাপিত হবে। বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে বহু তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সরকারী উদ্যমও হয়তো দেখা যাবে। আশা করা যায়, জাতি এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে পালনের দ্বারা একটি মহৎ কর্তব্য পালন করবে এবং এর দ্বারা বর্তমান পুরুষের সঙ্গে টিলকের পরিচয়ও নতুন করে স্থাপিত হবে।

ভারতে গান্ধী-পূর্ব রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে যে দুই ব্যক্তি দুই যুগের প্রতীক, তাঁরা হলেন গোখেল ও টিলক। টিলকের মৃত্যু ও গান্ধীর অভ্যুদয় এ দুয়েরই ঘটনাকাল হিসেবে ১৯২০ ভারতের ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে একটি বিশিষ্ট বৎসর বলে গণ্য হবে।

গোখেল ও টিলকের দ্বারা রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দুটি অধ্যায় যে রচিত হয়েছিল তাই শুধু নয়, তাঁদের ভাবধারাও পরবর্তী আন্দোলনের আদর্শের অঙ্গীভূত হয়েছে। গোখেলকে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর দানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গোখেলের ভারত-সেবক-সমাজ আজও সক্রিয়। আবার টিলকের বিপ্লবী ভাবধারা অসহযোগ আন্দোলনে, তিরিশের যুগের সত্যাগ্রহে একভাবে ও বামপন্থী বিপ্লবীদের (যাঁদের মুকুটচূড়ামণি সুভাষচন্দ্র) কর্মে আর একভাবে প্রেরণা দিয়েছে। টিলকের 'স্বদেশী' ভাব আজও সজীব। প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রতি নিষ্ঠা ও সরকারী আধিপত্য থেকে মুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর মত মালব্যজীর জীবনে ও কর্মে রূপ নিয়েছিল।

আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর জীবনী ও আদর্শের মূল কথাগুলি স্মরণ করা।

॥ ২ ॥

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বালগঙ্গাধর টিলক বোম্বাই বিভাগের রত্নগিরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; ব্যাকরণ, গণিত ও প্রাচ্যবিদ্যায় তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম। এই অনুরাগ টিলক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডেকান-কলেজ থেকে অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আইনের ডিগ্রী লাভ করেন।

আইন পড়বার সময় তিনি আগারকরের সঙ্গে পরিচিত হন। উত্তরকালে আগারকর মহারাষ্ট্রে সমাজকর্মী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী ও মহারাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করতেন কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের দ্বারা সমাজের সেবা করা যায়। পরে ঘটনাচক্রে আরো কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত উৎসাহী কর্মীর সাহায্যে তাঁরা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে পুণা নিউ ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন। এই সময়েই টিলক সাংবাদিকতাতেও লিপ্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে টিলক ও তাঁর বন্ধুরা দাক্ষিণাত্য শিক্ষা-সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁদের স্কুলটি কলেজে পরিণত হল। টিলক ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ও বিজ্ঞানও তাঁকে পড়াতে হত। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন ছাত্রদের বিশেষ প্রিয়। পরে অবশ্য টিলকের সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক ছিন্ন হয়। পুণায় কিছুকাল তিনি আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে টিলক রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৩-তে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়, তা যে ব্রিটিশ ভেদনীতির ফল, তা তিনি স্পষ্টভাবে বলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শিবাজী-উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় ও মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয়। টিলক সেবাব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন শিবাজী-উৎসব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 'কেশরী'তে ছাপা হয়। ২২শে জুন সন্ত্রাসবাদীরা দুজন ইংরেজ রাজকর্মচারীকে হত্যা করে। সরকার এজন্যে টিলকের প্রবন্ধকেই দায়ী করে ও তাঁকে কারারুদ্ধ করে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্তি পান।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বারানসীতে একটি সভায় সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল—ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা। ঐক্যের অভাবই ভারতীয়-দের দুর্দশার মূল কারণ।

কংগ্রেসের সংগে টিলক গোড়া থেকেই জড়িত ছিলেন। লর্ড কার্জনের কাজের ফলে বিধিসংগত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর আস্থা শিথিল হল। একদিকে বংগভংগ আন্দোলন, অপরদিকে কঠোর দমননীতি। অর্ডিনান্স ও বেওনেট এ দুয়েরই ওপর তখন সরকারের ভরসা। সভাসমিতি নিষিদ্ধ। নির্বিচারে গ্রেপ্তার। এ অবস্থায় একদল কর্মী আবেদন-নিবেদনের নীতি ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। টিলক ছিলেন এ'দের নেতা। এ'রাই চরমপন্থী নামে খ্যাত হলেন। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি তাঁদের মত ঘোষণা করলেন,—

"আমাদের ব্যুরোক্রেসী যথেচ্ছাচারী, বিদেশী ও দূরদেশবাসী। কিরূপে এই ব্যুরোক্রেসীর চৈতন্য সম্পাদন করা যায়, তাই আমাদের এখনকার সমস্যা। এই ব্যুরোক্রেসীর মধ্যে আমাদের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকজন তেমন নেই; নিম্নস্থ পদ অধিকার করা ছাড়া আমরা ব্যুরোক্রেসীর সংগে কোনো সম্পর্কই রাখতে পাই না। এইখানেই তথা-কথিত মডারেটদের সংগে আমাদের মত পার্থক্য। মডারেটরা এখনও আশা রাখেন যে, তাঁরা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করে ইংরেজ জনসাধারণের মতিগতি ফেরাতে পারবেন। এদেশে যেসব ইংরেজ আছেন, তাঁদের সম্পর্কে আমরা কেউই আশা-ভরসা রাখি না। মডারেটরা ইংলণ্ডের জনসাধারণ সম্পর্কে এখনও আশা রাখেন, চরমপন্থীরা তাও রাখেন না। তাঁদের বিশ্বাস ইংলণ্ডের জন-সাধারণ ভারতের বিষয়ে উদাসীন।...লর্ড ক্রোমার সেদিন বলেছিলেন যে, ভারত-নীতি সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির একমত হওয়া উচিত। অর্থাৎ টোরীরা যেমন ব্যুরোক্রেসীর অন্ধসমর্থক, লিবারেলদেরও সেইরকম হওয়া উচিত।

এইভাবে হতাশ হয়ে আমরা, ভারতের চরমপন্থীরা অন্য পন্থা অবলম্বন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি। ...দেশের যৌবন-শক্তি আমাদের পক্ষে। আমাদের আদর্শ, আত্ম-নির্ভরতা ও ভিক্ষাবৃত্তির বিরোধিতা।... স্বদেশী আন্দোলন ছাড়া বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিকূলতা আমাদের অস্ত্র। ...ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হতে শিখছে। এই ঐক্য পূর্ণ হতে সময় লাগবে, কিন্তু আমরা লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাব, আমরা আর পিছু হটব না।"

টিলক তাঁর মত পুণায় একটি জন-সভায় আরো স্পষ্টভাবে বলেন। দেশপ্রেম, আবেগ, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও মহান নেতৃসুলভ মনোভাব কথাগুলিতে সুস্পষ্ট,

"কর্তব্যের পথ পুষ্পাস্তৃত হয় না। একথা সত্যি যে, আমরা যা অর্জন করার চেষ্টা করছি, তা বিদ্রোহের মতো মনে হতে পারে, কেননা, বর্তমান ব্যুরোক্রেসীর ব্যবস্থায় যে অবস্থা, তার সম্পূর্ণ পরি-বর্তনই আমাদের দাবী। তবে একথাও সত্যি যে, আমাদের এই বিদ্রোহ বিনা রক্তপাতেই অনুষ্ঠিত হবে। রক্তপাত হবে না বলেই দেশবাসীকে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে না তা নয়। বিনা রক্তপাতেই যেসব নিগ্রহ ভোগ করতে হবে, তার পরিমাণ অসামান্য হবে।"*

সুরাট কংগ্রেসের পর সরকারী দমন-নীতি যে পরিমাণ বাড়লো, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেল। বাংলা আগ্নেয়-গিরি হয়ে উঠলো। টিলক কেশরীতে বললেন, সরকারী অবিবেচনার জন্যেই এরকম হয়েছে এবং অচিরে সরকারী নীতির পরিবর্তন না ঘটলে সন্ত্রাসবাদ প্রসারলাভ করবে। সরকার টিলককে গ্রেপ্তার করলেন। বিচার-প্রহসনের পর টিলককে 'দেশের মংগলের জন্যে' দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল।

টিলকের এই বিচার শুধু গান্ধীজীর 'Great-Trial'-এর সংগেই তুলনীয়। টিলক যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, তাতে তাঁর গভীর আইন-জ্ঞান প্রকাশ পায়। আদালত প্রাংগণ জনারণ্যে পরিণত হয়। দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হবার পর টিলক ধীরভাবে বলেন যে, এক মহাশক্তি জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। হয়তো ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা যে, কারারুদ্ধ হওয়ার ফলেই টিলকের কাজ প্রসারলাভ করবে।

টিলকের নির্বাসনের সংবাদে দেশ-ব্যাপী বিক্ষোভের বন্যা শুরু হল। সর্বত্র টিলক মহারাজের জয়ধ্বনি। সরকার বুলেটের সাহায্যেও সে ধ্বনি স্তব্ধ করতে পারল না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে টিলক দেশে ফিরলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। টিলক এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সমর্থন করলেন। এমন কি পঁচিশ হাজারের একটি ভারতীয় ফৌজ গড়তে সরকারকে সাহায্য করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। বলা বাহুল্য সরকার বাহাদুর শেষোক্ত প্রস্তাবে রাজী হননি।

---

* উদ্ধৃতি দুটি ও পরবর্তী আর একটি উদ্ধৃতির জন্যে আমি দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থের বালগংগাধর তিলক-জীবনকথা (১৯২০?) বইটির কাছে ঋণী। ক্রিয়াপদগুলি আমি কথ্যভাষায় তর্জমা করে নিয়েছি ও কয়েকটি শব্দ, অর্থের হানি না ঘটিয়ে পরিবর্তন করেছি।—লেখক
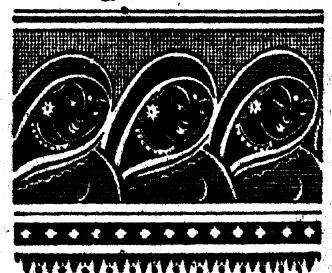
১৯১৫ খৃষ্টাব্দে টিলক প্রভৃতির চেষ্টায় কংগ্রেস পুনরায় ঐক্যবন্ধ হল। তারপর টিলক হোমরুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। জনসাধারণ টিলকের বাণী শোনবার ও তাঁর দর্শন লাভ করার জন্যে দলে দলে তাঁর সভায় উপস্থিত হতেন।

ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসী আবার টিলকের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। তাঁর আচরণের জন্যে চল্লিশ হাজার টাকা জামিন চাওয়া হ'ল। টিলক আইনের শরণ নিলেন। ব্যুরোক্রেসীর হার হ'ল। এ সময় তাঁর ৬১তম জন্মদিবস উপলক্ষে দেশবাসী তাঁকে এক লক্ষ টাকার একটি তোড়া দিয়েছিলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে টিলক হোমরুল লীগ স্থাপন করলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দেন। এই বৎসরই শাসন সংস্কারের আশ্বাস দেয়া হয়। মণ্টেগু ভারতে এলেন। টিলক তাঁর সংগে আলোচনা করে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ভারতীয়দের মনোভাব বোঝানোর জন্যে সেখানে একটি ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সরকার শেষ সময়ে তাঁর এ পরিকল্পনা বানচাল করে দেন।

সংস্কার আইন টিলকের সমর্থন পায়নি।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সার ভেলেণ্টাইন চিরোল তাঁর 'ভারতে অশান্তি' গ্রন্থে টিলকের বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ দিয়েছিলেন তার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে মকর্দমা করা। টিলক এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেননি কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণকে তিনি ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নির্ভয়ে জানালেন। প্যারিসেও তিনি প্রচারকার্য করলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনকেও সব কথা জানালেন। লালা লাজপত রায় তখন আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী প্রচার করছেন। টিলক তাঁকেও অর্থ-সাহায্য পাঠালেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন কিন্তু বিদেশে থাকায় এ পদ তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙে আসছিল। তবু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর কংগ্রেসে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও স্বদেশীর বাণী প্রচার করেন। পর বৎসর কংগ্রেস কমিটির কাশী অধিবেশনে যোগ দেন।

তাঁর ৬৫-তম জন্মবার্ষিকী উৎসব কোলাবায় অনুষ্ঠিত হয়। কোলাবা থেকে বোম্বাই ফিরেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৩১শে জুলাই ১৯২০ রাত্রি ১২-৪৫ মিনিটে গীতার বাণী আবৃত্তি করে কর্মযোগী টিলক সমাধি লাভ করেন।

॥ ৩ ॥

ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস এক মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস। এমন কি, ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বললে খুব বেশি ভুল বোধহয় হয় না। প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এ দেশের পত্রিকাগুলি যেভাবে কাজ করেছে তা ভাবীকালের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। ঠিকই বলেছেন জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিক,—

"...I am almost inclined to believe that our bureaucracy finds its deliverence in shackling the indigenous Press to its heart's content!...Indian journalism has survived this difficulty. It is true that many papers have fallen by the way side, and that many journalists have had, on occasion, to seek the hospitality of one or other of His Majesty's innumerable prisons. What of that? Indian journalism is still flourishing, and, let me hope, will go on flourishing for ever. It seems to bear a charmed life: like the camoile, the more it is trodden on the more it thrives." [Journalism, C. L. R. Sastri. Tacker & Co., Bombay, 1944, pp 176-177.]

এই ইতিহাসে টিলকের নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। টিলক দুটি পত্রিকার পরিচালক ছিলেন একটি মারাঠীতে অপরটি ইরেজীতে প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাদুটির নাম, বলা বাহুল্য, 'কেশরী' ও 'মারাট্টা'। সুরেন্দ্রনাথের যেমন 'বেঙ্গলী', মহাত্মাজীর যেমন 'হরিজন' টিলকেরও তেমনি এই দুই পত্রিকা। সেসময় এ দুটিই ছিল দাক্ষিণাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। মারাঠী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'কেশরীর' দান অতুলনীয়। বলা বাহুল্য, ইংরেজ সরকারের কৃপাদৃষ্টি থেকে এ দুই পত্রিকা কখনই বঞ্চিত হয়নি এবং একাধিকবার এ পত্রিকায় প্রকাশিত মতের জন্যে টিলককে যে মহামান্য ভারত-সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল পূর্বেই সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মারাঠী মুদ্রণশিল্পের উন্নয়নের জন্যেও টিলকের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। ১৯০৫-এ টিলক মারাঠীতে লাইনো প্রথা প্রবর্তনের একটি পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনাটি বিলেতে মুদ্রণশিল্পের বিশেষজ্ঞরা অনুমোদন করেন তবে দুঃখের বিষয় বিলেতের কোনো কারখানা শুধু একটি ঐরকম যন্ত্র ঢালাই করতে অস্বীকার করায় পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি।

॥ ৪ ॥

ইংরেজ সরকারের কাছে আমাদের একটি বিশেষ কারণে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে আমাদের নেতাদের কারারুদ্ধ ক'রে তাঁদের একটু অবকাশ সৃষ্টি করে দিতেন বলেই অনেক ভালো গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। গান্ধীজীর আত্ম-জীবনী ও অসংখ্য অনুপম পত্রাবলী,

নেহরুর আত্মজীবনী, বিশ্ব ইতিহাস-প্রসঙ্গ, ভারত সন্ধানে ও অন্যান্য অনেকের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারেরই দান।

টিলকের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মারাঠী ভাষায় রাজকীয় কর্তৃত্ব কিন্তু ছিল না অবসর। ইংরেজ সরকার তাঁকে মাঝে মাঝে যে অবসর রচনা করে দিতেন সেই অবকাশের ক্ষেত্রে টিলক পাণ্ডিত্যের ফসল বললে ভুল হয় মহাদ্রুম রচনা করেছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় টিলকের প্রথম গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ 'ওরায়ন্'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক বৈঠকে কয়েকটি প্রবন্ধাকারে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয় ও প্রশংসা লাভ করে। এই গ্রন্থে টিলক গ্রীক সভ্যতার চেয়ে ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন-তর এই মত উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপিত করেন এবং বেদচতুষ্টয়ের কালনির্ণয় সম্পর্কে তাঁর মত সন্নিবেশিত করেন। এই গ্রন্থটি অবশ্য কারাগারের বাইরেই রচিত হয়।

১৯০৩-এর মার্চে টিলকের পরবর্তী গ্রন্থ 'উত্তর মেরুতে বৈদিক নিবাস' প্রকাশিত হয়। ২৭-৬-১৮৯৭ থেকে ৬-৯-১৮৯৮ পর্যন্ত রাজকীয় আতিথ্যে থেকে টিলক এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে টিলক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রাচীন আর্যদের বেদোক্ত নিবাস উত্তর মেরুতে ছিল। এই মত যে সকলে মেনে নিয়েছিলেন তা নয় কিন্তু এ গ্রন্থও টিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১৯০৮-এ সদাশয় ইংরেজ সরকার টিলককে পুনরায় ছ' বছরের জন্যে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করেন এবং বায়ুপরিবর্তনের জন্যে একেবারে মান্দালয় পাঠালেন! এই সময়ের মধ্যে টিলকের সহধর্মিণী লোকান্তরিতা হন। নির্বাসন ও ব্যক্তিগত বিয়োগব্যথা, এর মধ্যে টিলক রচনা করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তাঁর প্রতিভার স্মরণীয় দান, 'শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র'।

গীতা সম্পর্কে টিলকের মত,

"গীতা নিবৃত্তিপ্রধান নহে; উহা কর্ম-প্রধানই। অধিক আর বলিব কি, গীতাতে একা 'যোগ' শব্দই 'কর্মযোগ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।" [গীতারহস্য, বঙ্গানুবাদ, ১৯২৪, প্রস্তাবনা, পৃঃ ১০।]

"তাঁহার (টিলকের) মতে, কর্মই গীতার মধ্যবিন্দু—মুখ্য উদ্দেশ্য। ...জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য পৃথকভাবে কীর্তিত হইলেও জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্মযোগের প্রাধান্যই যে গূঢ়ভাবে গীতাতে সূচিত হইয়াছে, ইহাই মহাত্মা টিলক গীতার সমস্ত উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের পোষকতায় সমস্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী শাস্ত্রকেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রের এত কথা আনুসঙ্গিকক্রমে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, একজন যদি মনো-যোগ সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করে, তাহার বেশ একটু শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে এবং সে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্মগ্রহণ করিতে পারে। এই গ্রন্থ রচনায় টিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও কর্মশক্তি দেখিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না।" [তদেব, অনু-বাদকের ভূমিকা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬।]

॥ ৫ ॥

টিলকের সঙ্গে বাংলাদেশের অতি ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। 'টিলকমহারাজ' নামে বাংলা দেশে তিনি পরিচিত ছিলেন এবং বাংলায় তাঁর জন-প্রিয়তা মহারাষ্ট্রের চেয়ে কিছু কম ছিল না। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা যে আঘাত পেয়েছিল পুরোনো সংবাদপত্রের ফাইলে ও তৎকালীন সাময়িক পত্রাদিতে তার পরিচয় আছে।

এতো গেল সাধারণের কথা। বাংলার তিনজন মনীষীর সংস্পর্শে এসেছিলেন টিলক। টিলকও যেমন এ'দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এ'রাও তেমনই টিলকের চরিত্রে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই তিন-জনের মধ্যে একজন হলেন, বলাই বেশি, অরবিন্দ। অপর দুজন,—স্বামিজী ও রবীন্দ্রনাথ।

অরবিন্দের সঙ্গে টিলকের যোগা-যোগের কথা সকলেই জানেন। এ'দের বন্ধুত্ব রাষ্ট্রিক সংগ্রামের একটি অধ্যায়

রচনা করে। সে যুগে যুক্তভাবেই তাঁরা সারা ভারতে পরিচিত ছিলেন। "লোকমান্য টিলক 'বড়দাদা' নামে পরিচিত ছিলেন এবং অরবিন্দ ছিলেন 'ছোটদাদা'।" [ভারতপথিক, সুভাষচন্দ্র বসু, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৭৬]

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে টিলকের পরিচয়ের কথা তেমন সুপরিজ্ঞাত নয়। স্বামিজী আমেরিকা যাবার পূর্বে টিলকের সঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনার মাধ্যমে পরিচিত হন। ঘটনাটির বর্ণনা স্বামিজীর জীবনী থেকে তুলে দিলাম,—

"১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে.. কয়েক সপ্তাহ বোম্বাইয়ে থাকিয়া তিনি (স্বামীজী) পুণায় গমন করিলেন। স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলেন। সেই গাড়িতে বালগঙ্গাধর টিলক ও আর কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া ঐ ভদ্রলোকেরা ইংরেজি ভাষায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীদের দ্বারাই ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, স্বামীজী ইংরেজী জানেন না, সেইজন্য খুব স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করিতেছিলেন, আর টিলক সন্ন্যাসীদের পক্ষ হইয়া তাঁহার সম্মান করিতেছিলেন। স্বামীজী প্রথমটা চুপ করিয়া ইঁহাদের বাদপ্রতিবাদ শুনিতেছিলেন, শেষে ইঁহাদের কথায় যখন যোগ দিলেন, তখন সকলে স্বামীজীর অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। টিলক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুণায় নিজ বাটিতে লইয়া গিয়া এক মাস রাখিলেন।

এই প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত বহু বিষয়ে আলাপ করিয়া স্বামীজী বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিয়াছিলেন।" [স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, প্রমথনাথ বসু, উদ্বোধন, ১৩৫৬ সালের সংস্করণ, পৃঃ ২৮৪—২৮৫]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও টিলকের পরিচয় ছিল। টিলক যে শিবাজী-উৎসব প্রবর্তন করেন সেই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ শিবাজী সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন। টিলকের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, নিচের পত্রাংশ থেকে তা প্রমাণিত হবে,—

"ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না বলে দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময় বাহিরের কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্মের বাণী স্পষ্ট শোনা যায় না। তখন 'কর্তব্য' নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হুঙ্কারে মন অভিভূত হয়ে যায়; ভুলে যাই যে, কর্তব্য বলে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই, আমার 'কর্তব্য'ই হচ্ছে আমার পক্ষে কর্তব্য। গাড়ির চলাটা হচ্ছে একটা সাধারণ কর্তব্য, কিন্তু ঘোরতর প্রয়োজনের সময়ও ঘোড়া যদি বলে, 'আমি সারথির কর্তব্য করব', বা চাকা বলে, 'ঘোড়ার কর্তব্য করব', তবে সেই কর্তব্যই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ডিমক্রেসীর যুগে এই উড়ে পড়া পড়ে-যাওয়া কর্তব্যের ভয়াবহতা চারিদিকে দেখতে পাই। মানবসংসার চলবে, তার চলাই চাই; কিন্তু তার চলার রথের নানা অঙ্গ—কর্মীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে। গুণীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে, উভয়ের স্বানুবর্তিতাতেই পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথের গতিবেগ; উভয়ের কর্ম একাকার হয়ে গেলেই মোট কর্মটাই পঙ্গু হয়ে যায়।

এই উপলক্ষ্যে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন-কো-অপারেশন আরম্ভ হয়নি বটে, কিন্তু পলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, 'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না।' তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি, সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পলিটিকাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এই জন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তারপরে, বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন; এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন, সে-কাজে তাঁর অধিকার ছিল; সেই অধিকার মহৎ অধিকার। [যাত্রী, রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক ১৩৫৩ সংস্করণ পৃঃ ১২—১৪]

টিলক প্রসঙ্গে বাংলা দেশের আরো দু'জন সুসন্তানের নাম উল্লেখযোগ্য। কর্মী, লেখক ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেযুগে টিলক, বিপিনচন্দ্র ও লালা লজপত এই তিনজনের নাম একসঙ্গেই উচ্চারিত হ'ত। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গীতারহস্যের অনুবাদের দ্বারা টিলককে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় করে গেছেন।

॥ ৬ ॥

১৯২০-তে টিলকের মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসরথের সারথ্য গ্রহণ করলেন। তারপর থেকে গঙ্গা-যমুনা-কাবেরীতে অনেক জল বয়ে গেছে। আজ পরশাসনমুক্ত নবীন ভারত নেহরুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নবীন ভারত এগিয়ে যাবে কিন্তু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। যাঁরা কর্মী তাঁদের কর্মপন্থা পরবর্তীদের কাছে ঐতিহাসিক কারণে গ্রহণযোগ্য নাও হ'তে পারে। বিরাট ইমারতের মাথা আকাশের দিকে যতই উঁচু হয়ে ওঠে ততই পথচারীদের দৃষ্টি ভিত্তি থেকে সরে যায়। অতীতের কর্মীরা বিস্মৃত হন সেই কারণেই। স্মরণীয় শুধু তাঁরাই হন যাঁদের চিন্তাধারা ও চারিত্রে সবকালেরই শিক্ষণীয় কিছু থাকে। টিলকের সেই চারিত্র ছিল। সেই চারিত্র ও তাঁর তেজস্বিতা এবং তাঁর কর্মযোগের মহান আদর্শ থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হবে।

দেশগঠনের কাজে আহ্বান জানিয়ে টিলক দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর ৬১-তম জন্মদিবসে যে বাণী দেন তা থেকেই কিছু উদ্ধৃত করে বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করি,—

"আমাদের সামনে বিশাল জাতীয় কর্মক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, তাতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমি যে-রকম উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়েছি তার চেয়ে দ্বিগুণ তেজে সকলকে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় কর্তব্য উপেক্ষণীয় নয়। ভারতমাতা আমাদের প্রত্যেককে কাজে নিযুক্ত হ'তে বলছেন। মায়ের সন্তানরা যে মায়ের ডাক শুনবেন না তা আমি মনে করি না। সকলেই আদর্শ কর্মী হওয়ার চেষ্টা করুন।"
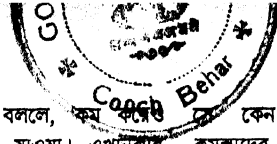
॥ ৭ ॥

কথাটা শুনেছিল বাসনা আগেই। কমলাই বলেছিল। সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুই বোনে বসে গল্প করছে, বীথি কলেজে, ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে, দুপদাপ করতে করতে কমলার সেই বালিগঞ্জের দেওর এসে হাজির। বছর কুড়ি বাইশ বয়স। ভীষণ চঞ্চল। নাম সন্তোষ। এল আর গেল। মিনিট দশেকও বসল না। আসল খবরটা এক নিশ্বাসে দিয়ে দিলে। আগামী সোমবার ওরা পুজোর ছুটিতে বাইরে যাচ্ছে, বাড়ি সুদ্ধ লোক, কমলা বৌদি আর বীথির যাবার কথা ছিল তাদের সঙ্গে, বাবা বলে দিয়েছেন তৈরি হয়ে থাকতে। মেজদা যেন কাল-পরশু একবার ও-বাড়ি যায়।

সন্তোষ চলে গেলে কমলা বললে, 'এই এক ছেলে। এক দণ্ড বসবে না। কি যে বললে হল্‌হল্‌ করে না আমি বুঝলাম না তাকে কিছু বলতে পারলাম। যাবো তো বলেছিলাম, কিন্তু যাবো বললেই কি যাওয়া যায়। কতো ঝঞ্ঝাট ঝামেলাই যে আছে।'

'কিসের তোর ঝামেলা। যাবি তো খুড়শ্বশুরের সঙ্গে।' বাসনা বললে, 'হাঁড়িকুড়ি চাল ডাল তোকে বাঁধাবাঁধি করতে হচ্ছে না। শুধু ছেলেমেয়ে দুটোকে আগলে নিয়ে যাবি। তা বীথিও তো রয়েছে।'

'কি যে বলো ছোড়দি।' কমলা এক পাশের ঠোঁট উল্টে বললে, কম করেও মাস দেড়েকের জন্যে যাওয়া। এখানকার সংসারের ব্যবস্থা আছে—ওখানের ব্যবস্থাও আছে বৈকি, হুট্ বলতেই কি হয়।'

'এখানকার সংসারের জন্যে তোর ভাববার কি আছে? আমি তো রয়েছি। সুধাময়ের কোনো অসুবিধেই হবে না।' গলায় খুব সাধারণ একটা সুর তুলে বললে বাসনা। এবং ভাবছিল, কমলাদের যাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহ দেখানো তার উচিত হবে না।

ভিজে চুলগুলো আঙুল দিয়ে ফাঁক করে পিঠের চারপাশে ছড়িয়ে দিতে দিতে কী যেন ভাবছিল কমলা। বাসনার দিকে বার কয়েক চাইল থেকে থেকে।

'আমি কি ভাবছি জানো, ছোড়দি। আমরা সবাই চলে যাবো, তুমি একা থাকবে। তোমারই বরং বাইরে যাওয়া উচিত। তুমিও চলো না।'

বাসনা মাথা নাড়ল। হাতের সেলাইয়ের কাজটার ওপর হঠাৎ ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে পড়ল। এবং ছুঁচের ফোঁড় তুলতে তুলতে মনে মনে বললে, একা থাকতেও মানুষ চায়, কমলা। কখন চায়, কেন চায়, সে তুই বুঝবি না।

'তা হয় না, কমলা। তুই যাচ্ছিস তোর খুড়শ্বশুরের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। আমার যাওয়া ভাল দেখায় না। আর ও-ভাবে গেলে, ওদের মধ্যে, তুই জানিস তো আমি স্বস্তি পাবো না।'

তা ঠিক, কমলা ভাবল। আর এ আগে থাকতেই জানত কমলা। ছোড়দিকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ও কিছুতেই যেতে রাজী হবে না। সুধাময়ের সঙ্গে যখন কথা হয়, কমলা বলেছিল বৈকি, ছোড়দিকে একা ফেলে আমরা সবাই হাজারিবাগ গিয়ে হাওয়া খাবো, সেটা ভালো দেখায় না। বরং ও-বেচারীরই বাইরে গেলে শরীরটা সারত।...জবাবে সুধাময় বলেছিল, থাক তবে তোমরা যেয়ো না। কাকাবাবুকে বলে দেবো, যাওয়া হবে না। ও'রা অবশ্য খুবই অসন্তুষ্ট হবেন।

কথাটা শুনে পর্যন্ত বাসনা বলেছে, হ্যাঁ, ঘোরতরভাবে আপত্তি তুলে বলেছে, ... কেন হবে, তার জন্যে কেন কমলাদের যাওয়া আটকাবে। এ কেমন কথা। বাসনা তো তাদের সংসারে একদিন কী এক মাসের জন্যে নয়, বরাবরের জন্যে, আর চিরটাকালই কমলারা তার জন্যে সব সুখসুবিধে আমোদ আহ্লাদ বেড়ানো বন্ধ করে বসে থাকবে, আত্মীয়দের সঙ্গে অযথা সম্পর্ক খারাপ করবে! না, তা হয় না।

আজ সন্তোষ আসার পর এই পুরনো কথাগুলো আবার নানাভাবে বললে বাসনা। এবং শেষে বললে, 'আমার জন্যে ভাবিস না। আমি তো ভালই আছি। সুধাময় থাকবে বাড়িতে, ঝি চাকর আছে; কোনো অসুবিধে হবে না আমার।'

কমলা খানিক ভাবল কী যেন। বললে শেষে, 'বেশ। তবে তোমার ভগ্নীপতি আসুক, দেখি কি মত করে।'

বোনের কাছ থেকে উঠে আসতে আসতে বাসনা ভাবছিল, সুধাময় অরাজী হয়তো হবে না। যদি হয়, বাসনা বলবে, কমলাদের হয়ে দুটো কথা অন্তত বলতে পারবে। এবং সুধাময় নিশ্চয় বাসনার কথা ঠেলতে পারবে না। কিন্তু বীথি! বীথি যদি যেতে না চায়! যদি

কোনো ছুতো ধরে বলে, না, কলকাতা ছেড়ে সে যাবে না।

তা বীথি বলতে পারে, বাসনা ভাবছিল। বাসনা আর অমলেন্দুকে কলকাতায় রেখে হাজারিবাগে গিয়ে দেড় মাস কাটাবে বীথি! মনে তো হয় না। এসব ব্যাপারে কুড়ি বছরের ওই একরত্তি মেয়ে খুব সায়না।

বীথি কমলা নয়। যদি না যায়, বাসনা কিছু বলতে পারবে না তাকে। কেননা, আর যার চোখকেই ফাঁকি দিক বাসনা, বীথিকে দিতে পারছে না, পারবে না।

নিজের ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল বাসনা। উঠোন ডিঙিয়ে দরজা ছাড়িয়ে খানিক বাসি রোদ ঘরে ঢুকে রয়েছে। আকাশটা নীল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক'টা চিল উড়ছে গোল হয়ে। লাল-বাড়ির ছাদের কার্নিশে একটা সাদা পায়রা বসেছিল। উড়ে এসে পাশে বসল আর একটা। বসতে না বসতে কী ভাব জমে উঠলো দুজনে দেখো। সাদাটা গা ফুলোলে, ডানা ঝাড়লে একবার, ধোঁয়া-রঙ পায়রাটা যেন নেচে নেচে একবার কাছে গেল, সরে গেল আবার। তারপর দুটিতে পাশাপাশি মুখোমুখি। ঠোঁট ঠোকাঠুকি।

ঠোঁট টিপে হাসল বাসনা। হাতের বইটা চোখের ওপর মেলে ধরল। কিন্তু না, বইয়ের অক্ষরে মন বসছে না। বইটা রেখে দিল বালিশের পাশে। দু হাতের তলায় মাথা রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আবার। দুপুরের মিষ্টি ছায়ায় কার্নিশে বসে জোড়া পায়রায় কী যে নিভৃত আলাপ করছে কে জানে! কতো তাড়াতাড়ি, মাত্র ক'টি পলকের মধ্যে ওরা কেমন এক হয়ে যেতে পারে! বাসনা ভাবছিল, অমনি পাখি টাখি হতে পারলে বেশ হতো।

তার দিন বয়ে যাচ্ছে, বাসনা মোটামুটি একটা হিসেব করছিল এবার মনমরা হয়ে, অপেক্ষা করার মত সময় আর নেই। ধরি-ধরি করেও এখনো লোকটাকে ধরতে পারেনি বাসনা। হাত বাড়িয়েছে, অমলেন্দুও নাগালের মধ্যে, তবু যাকে বলে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলা তা পারে নি বাসনা। আর যতদিন তা না-হচ্ছে, ততদিন ভরসা কি!

এর জন্যে তেমন সুযোগ দরকার এবং খানিক সময় যখন বাসনা সমস্ত কুণ্ঠা, সংকোচ, এমন কি প্রয়োজন হলে এই সংযমটুকুও সরিয়ে ফেলে মুখোমুখি হতে পারে অমলেন্দুর। তাকে বলতে পারে কী হয়েছে বাসনার, কে-বা দায়ী এর জন্যে আর কী সে চায়!

কমলারা চোখের আড়াল হয়ে গেলে, এই বাড়ি, এই ঘর, এতো সময় এবং নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়ে বাসনা সেই সব সুযোগ তৈরি করতে পারবে—সেই সব আবহাওয়া যার মোহ এবং আকর্ষণ ওই লোভী অমলেন্দুর সাধ্য নেই এড়িয়ে যায়। তারপর বাকি পথটুকু আশা করা যায়, অনায়াসেই অতিক্রম করে যেতে পারবে বাসনা।

কিন্তু বীথি কি যাবে?

অনেকক্ষণ ভাবল বাসনা। যাও, না-যাও : ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত স্থির করে ফেলল বাসনা এবং বীথিকেই বললে যেন, না-যাও তোমার চোখের সামনেই আমাকে আমার কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। আমি তোমায় গ্রাহ্যও করবো না।

যে-বীথিকে নিয়ে বাসনার এতো ভাবনা, সেই বীথি কিন্তু যাবার জন্যে সবার আগেই পা বাড়িয়েছিল। বীথির কথাবার্তা হাবভাব দেখে মনেই হলো না, কলকাতায় কে বা কারা থাকছে এই নিয়ে সামান্য মাত্র মাথা ব্যথা আছে তার। বরং কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে যেতে পারছে বলে সে খুশী। খুবই খুশী। শুনে পর্যন্ত যেন হাওয়ায় উড়ছিল বীথি, বাক্স শাড়ি ব্লাউজ গোছগাছ শুরু করে দিয়েছিল, দু চারখানা বইও। আর বলছিল, হ্যাঁ, বাসনার সামনেই কমলাকে বলছিল যে, বৌদি যদিবা আগে ভাগে ফিরে আসে, আসুক; ও ফিরবে না, কাকাবাবুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবে।

বীথির এই আগ্রহ যে লোক-দেখানো আতিশয্য, বাসনা তা বুঝতে পারছিল। আর বলতে কি, এতোটা ব্যগ্রতা বীথি যে কেন দেখাচ্ছে তাও বুঝতে পারছে বাসনা। হ্যাঁ, বাসনা-অমলেন্দুকে বীথি যে উপেক্ষাই করে, অন্তত উপেক্ষা করতে চাইছে—বীথি চোখে আঙুল দিয়ে যেন সেটা দেখাবার চেষ্টা করছিল।

বাসনা লক্ষ্য করেছে বীথি মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ্য করে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে শুরু করেছিল আজ ক'দিন। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে কী হাজারিবাগ যাওয়ার গল্প হচ্ছে যখন, তখন সকলের সামনেই অতি অক্লেশে বীথি বলত, বলছিল আজকাল, কলকাতার এই বাড়ি আর তার ভাল লাগে না, একঘেয়ে হয়ে গেছে, হাজারিবাগে গিয়ে ক'দিন মনের সুখে থাকতে পারবে, ফুর্তিতে।

শেষ পর্যন্ত যাবার দিন, বীথি কমলার সামনেই কি কথায় যেন বাসনাকে বললে, স্পষ্টাস্পষ্টিই বললে, 'তোমার খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, না ছোড়দি। এক কাজ করো, অমলদাকে বলে দিয়ো রোজ সন্ধেটা এখানে এসে গল্প-গুজোব করে যাবে।'

শুনে বাসনার চোখ, নাক, কান গরম হয়ে গিয়েছিল। রাগে কপালের শিরাটাও দপ্ দপ্ করে উঠেছিল। কিন্তু কিছু বলতে পারে নি বাসনা। কমলার সামনে কি-ই বা বলা যায়!

শয়তান, বেহায়া মেয়েটা এতেও থামে নি। আরও বলেছিল, 'কলকাতায় এখন পুজোর বাজার। খুব হৈ চৈ ব্যাপার। তুমি খুব একচোট বেড়াতে, থিয়েটার-সিনেমা দেখতে পার অমলদাকে সঙ্গে নিয়ে।'

বীথির চোখ দুটো চিক চিক করছিল। হাসিতে নয়, ক্ষোভে আক্রোশে। বাসনা অন্তত তাই ভাবল সেই চোখ দেখে। এবং মনে মনে বললে, ফিরে এসে তোমায় কাঁদিতে হবে বীথি, এই তাচ্ছিল্যের জন্যে তখন তোমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করবে।

কমলারা চলে গেছে। ওদের হাজারিবাগ পৌঁছনোর খবর পর্যন্ত এসে গেছে সুধাময়ের কাছে। বাসনাও চিঠি পেয়েছে একটা। ছোট্ট চিঠি। বার বার লিখেছে কমলা, তোমার জন্যে সব সময় ভাবনায় থাকবো। খুব সাবধান থেকো, ছোড়দি।

সাবধানেই আছে বাসনা। হ্যাঁ, খুব সাবধানে। সুধাময়ের মত মানুষ, সাদা-মাটা, নিরীহ লোক—অফিস আর অফিস ফিরে তাসের আড্ডা, কীই বা সে দেখছে, দেখতে পেতে পারে—তবু সেই সুধাময়কে পর্যন্ত দূরে দূরে রেখে, এড়িয়ে এড়িয়ে সাবধানে, অতি সতর্কভাবে বাসনা ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে।

পুজোর ক'টা দিন অমলেন্দু এক-রকম এ-বাড়িতেই থেকে গেল। বাসনাই বলেছিল। সুধাময়ও মাথা নেড়েছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—কী হোটেলের খাবার খেয়ে আর কড়িকাঠ গুনে পুজোর দিনগুলো কাটাবে, হে! খাওয়া দাওয়াটা এ-বাড়িতেই করো। ছোড়দিকে একটু ঠাকুর-টাকুর দেখিয়ে আনো।

অমলেন্দু এই প্রস্তাবে খুব যে অনুৎসাহ বোধ করলে তা মনে হলো না। দিনের বেশির ভাগ সময়টা এ-বাড়িতেই কাটিয়ে দিত। রাত্রে ফিরতো হোটেলে। আর ধীরে ধীরে অমলেন্দু বাসনার সেই একান্ত গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ছিল। বাসনার সম্পর্কে তার মন এবং ধারণা এবার বেশ স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারছিল।

বাসনা চাইছিল, তাই হোক। অমলেন্দু ভাবুক, ভাবতে পারুক, আঠাশ বসন্তের অসহায় এই নিষ্ফল তরুতে কোনো আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য মৌসুমী হাওয়ার স্পর্শ লেগেছে। সেই তরুতে এখন নতুন পাতা, কিছু কুঁড়িও ফুটেছে। আমার এই দেহ এবং মন—বাসনা যেন বলতে চাইছিল প্রকাশ্যেই, একটি শীর্ণ নদীর মতন বয়ে চলেছিল। হঠাৎ তুমি এসেছো, যেন দুরন্ত কোনো উপগ্রহ এবং সেই আকর্ষণে দেখো, জোয়ার জেগেছে। আমার কতো জল, কী আবেগ, দুঃসহ যৌবন—আর জ্বালা তুমি দেখছো তো।

অমলেন্দু একটু একটু করে তা দেখছিল। সাদা মিহি সিল্কের কী সুতোর দু' নোখ সমান চওড়া ম্লান-সোনালী-রঙ পাড় দেওয়া থান পরছিল বাসনা, গায়ের জামায় ছুঁচের কাজ, মাথার পুরো খোঁপা ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ছিল, আর চোখ মুখ প্রসাধনে পরিপাটি হচ্ছিল দিন দিন।

আর অমলেন্দুকে নিজের ঘরে বসিয়েই বাসনা সেই সব ভঙ্গিতে দাঁড়াত, বসত, কথা বলত, হাসত, চোখ তুলে চাইত যার মধ্যে স্পষ্টই নানা অনুরাগ লক্ষণ ফুটে থাকত, যা ভুল করার নয়।

খুব সহজেই এবং অনায়াসেই এখন কি-না পারে বাসনা। তাগাদা দিয়ে অমলেন্দুর গায়ের জামা খুলিয়ে সামনে বসেই বোতামটা সেলাই করে দিতে পারে, পাশে বসতে পারে অসংকোচে; হাত ধরতে, কিছু বলতেও জড়তা নেই। কখনো লজ্জার লাল আভাটুকু গালে লাগিয়ে কটাক্ষ, কখনো অভিমানে মুখ থমথম জোড়া ঠোঁটের নিরাসক্তি—আবার তেমন মুহূর্তে সেই সব নরম, মিষ্টি, স্নিগ্ধ হাসিতেও অমলেন্দুকে ও ঝির্ ঝির্ বৃষ্টির মত ধুয়ে দিতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যে প্রায় শেষ করে অমলেন্দু এল। সুধাময় কোনোদিনই এ-সময় বাড়ি থাকে না। তাসের আড্ডায় চলে যায়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল অমলেন্দু। বারান্দায় পর্যন্ত বাতি জ্বলছে না, ঘরগুলোর কপাট ভেজান। বাসনার ঘরেরও। মনে হ'লো না কেউ আছে। চুপচাপ, নিস্তব্ধ। চাঁদের আলোয় বারান্দা উঠোন ভরে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অমলেন্দু এই নিস্তব্ধ বাড়ি, চাঁদের গা-ছড়ানো আলোই যেন দেখল। তারপর আস্তে আস্তে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল।

ঠিক, যা ভেবেছিল অমলেন্দু। বাসনা আলসেয় পিঠ ছুঁইয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেলফুলের মত ধবধবে সাদা জ্যোৎস্নার সঙ্গে গা মিলিয়ে আর এক শ্বেত মর্মর-মূর্তি যেন। অমলেন্দু যে এসেছে বাসনা জানতে পারে নি। জানতে পারলে হয়ত ওর মাথা একটু নড়ত, হাতগুলো হয়ত চঞ্চল হতো সামান্য এবং চোখ ফিরিয়ে চাইত।

অমলেন্দু আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বাসনার তবু হুঁশ নেই। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে কার্তিকের তারা জ্বলা আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদকেই যেন দেখছে বাসনা।

হাওয়া দিচ্ছিল। মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া। ছাদের এক কোণে খানিকটা দলা পাকানো কাগজ সর্ সর্ করে মেঝে ঘষে ঘষে উড়ছিল, আর অমলেন্দুর নাকে খুব ফিকে একটা গন্ধ এসে লাগছিল।

বাসনা কি গায়ে সেণ্ট ছড়িয়েছে আজ? অমলেন্দু বুঝতে পারছিল না। হতে পারে। হওয়া আশ্চর্য নয়।

একটুক্ষণ সেই সুন্দর, আশ্চর্য মধুর, তন্ময়-মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অমলেন্দু ডাকল আস্তে গলায়।

চমকে উঠল বাসনা। মুখ ফিরিয়ে চাইলে। চেয়ে থাকল ক' মুহূর্ত।

'আমি ভাবলাম, তুমি আজ আর আসছো না।' মৃদুগলায় বললে বাসনা।

'পথে দেরি হয়ে গেল।' অমলেন্দু বাসনার মুখে চোখ রেখে কেমন একটু সংকোচের সঙ্গে বললে, 'এক চেনা ভদ্র-লোকের সঙ্গে দেখা, কিছুতেই ছাড়লেন না, চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে গেলেন। খানিকটা গল্পগুজব করতে হলো।'

'তোমাকে যে-সে যখন খুশি টানতে পারে!' বাসনা আলগা করে হাসল।

অমলেন্দু একটু সময় নিল কথাটার জবাব দিতে। বলল, 'কী জানি। তোমার মতন আমার খুঁটির জোর তো অতো নয়।'

বাসনা তাকাল। অমলেন্দুর এটা ঠাট্টা না আর কিছু ঠিক বুঝতে পারল না।

'আমার খুঁটির সম্বন্ধে তুমি কি জানো?'

'আরও জানতে হবে!' অমলেন্দু চোখ দুটো বড় করলে হাসিমুখেই, 'টাগ অফ্ ওয়ারে গো-হারান হারছি!'

একটু চুপচাপ। বাসনা মুখ ঘুরিয়ে আলসেয় বুক-ঝুঁকে তাকিয়ে থাকল।

অমলেন্দু সিগারেট ধরালে।

'কমলা বৌদিদের খবর কি?' শুধল অমলেন্দু। এই চুপচাপ ভাবটা কাটাতে।

'ভালোই। বীথি তোমায় চিঠি দেয় নি?' বাসনা অন্যদিকে মুখ ক'রে ঠোঁট টিপে হাসল।

'আমায়? না। বীথি কেন আমায় চিঠি দেবে!' অমলেন্দু বাসনাকে দেখবার চেষ্টা করছিল।

আর কোনো কথা নেই বাসনার ঠোঁটে। চুপ। একেবারেই চুপ।

'আমি দেখছি।' অমলেন্দু এবার বললে, 'বীথিকে নিয়ে তুমি বড় বেশী মাথা ঘামাও।'

বাসনা ঘুরে দাঁড়াল। অমলেন্দুর চোখে চাইল সোজাসুজি।

'তোমার বুঝি সেটা পছন্দ নয়?'

'তা, একরকম তাই।' অমলেন্দু সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'বীথির সম্পর্কে ভাববার জন্যে তার গুরুজনরা আছে। তুমি বা আমি তার কথা না ভাবলেও পারি।'

'না, আমি পারি না।' বাসনা হঠাৎ অন্য রকম এক সুরে বললে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র, চিকণ স্বর। এবং দৃঢ়।

'কেন?' অমলেন্দু বাসনার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হচ্ছিল। ওর গলায় ফুলে ওঠা একটি নীল শিরা এই চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট। কাঁপছে শিরাটা। সূক্ষ্ম ক'টি রেখা কুঁচকে উঠেছে কপালে-গালে।

'তুমি পারো না কেন?' অমলেন্দু আবার শুধলে।

কেন পারি না—? বাসনা অমলেন্দুর চোখে তাকিয়েছিল, পাতা পড়ছিল না। বলছিল মনে মনে, কেন পারি না তুমি কি জানোনা! না, কথাটা আমার মুখ থেকেই শুনতে চাও, অযথাই। তবে শোনো।

'বীথিকে আমি ভালো করেই চিনি।' বাসনা বললে চাপা, মৃদু গলায়; বীথির সম্পর্কে ঘৃণা ফুটে উঠছিল কথার সুরে।

'না চেনার কি আছে।' অমলেন্দু জবাব দিচ্ছিল, 'এক বাড়িতে রয়েছো দুজনে এতোদিন—!'

'তাই বলছিলাম।' অমলেন্দুর কথায় বাধা দিয়ে বাসনা খুব স্পষ্ট, ধীর গলায় বললে, গলার হারটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে, 'বীথি তোমায় অতো সহজে তাকে ডিঙিয়ে যেতে দেবে না।'

'ডিঙিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।' অমলেন্দু বললে, 'আমিই বা তাকে ডিঙিয়ে যাবো কেন। সে আমার পথ আটকাচ্ছে না।'

'আটকাচ্ছে না—?' বাসনা তাকিয়েছিল তেমনি ভাবেই।

'না। আমি কখনোই এ-সব ভাবি নি।' অমলেন্দু খোলাখুলি জবাব দিচ্ছিল।

বাসনা একটু চুপ। আস্তে আস্তে সামান্য দূরে সরে গেল। তাকাল আকাশের দিকে। সাদাটে নীল আকাশ। অজস্র তারা। চাঁদের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা ছোট্ট, পাতলা আলুথালু সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। হাওয়া দিচ্ছে। শির শির করছে গা।

'এ-কথা এখন শুনলে' বাসনা বলছিল, 'বীথির মন ভেঙে যাবে। কমলারাও কষ্ট পাবে।...তোমার উচিত ছিল মতামতটা আগেই জানিয়ে দেওয়া।'

'গায়ে পড়ে—' অমলেন্দু জবাব দিলে, 'মনে মনে কমলাবৌদিরা কি ভাবছে না ভাবছে তা আমায় জেনে নিয়ে গলা বাড়িয়ে বলতে হবে বীথিকে আমি বিয়ে করবো না।'

এও সত্যি, বাসনা ভাবল, কমলারা মনে মনে এতোদিন ধরে যা ভাবছে সেটা অন্তত একবার অমলেন্দুকে সরাসরি বলা উচিত ছিল।

অমলেন্দু আবার একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'এই বাজে ব্যাপারটা আর না-গড়াতে দেওয়াই ভাল। তুমি কমলাবৌদিকে আমার হয়ে, মানে আমার মনোভাবটা জানিয়ে দিয়ো।'

'বৈ কি!' বাসনা বললো, 'তারপর কমলা ভাবুক, আমাদের মধ্যে এইসব কথা হয়, এতো ভাব আমাদের! আর বীথি, তোমাদের বীথি আমায় ছিঁড়ে খুঁড়ে খাক।' হাসবার চেষ্টা করছিল বাসনা।

বাসনার কথাগুলো শুনতে শুনতে অমলেন্দু আজ, এখন, এই অবস্থায় অন্য এক কথা ভাবছিল। এবং মনে মনে কিছু একটা স্থির করে ফেলছিল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে, একটু ঝুঁকে, বাসনার মুখে চোখ রেখে স্পষ্ট সহজ গলায় বললে, 'তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'ইচ্ছে—, কিসের?'

'এই তোমার-আমার সম্পর্কের, তুমি কি কমলাবৌদিদের কাছ থেকে আমাদের মেলামেশা লুকিয়ে রাখতে চাও?'

বাসনা মুখ তুলে স্তব্ধ চোখে দেখছিল। অমলেন্দুর মুখ যেন বোঝা-পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

'কি যে বলো!' বাসনা বোকার মতন কথাটা হাল্কা করে হাসবার চেষ্টা করলে।

'তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না। কিছুতেই না।' অমলেন্দু বুঝি একটু অধৈর্য হল।

'পারছো না!' বাসনা ভাসা ভাসা গলায় বললে। মুখ তুলে, এক পলক চেয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। গাঢ়ো কালো ছায়ার মতন মাথাটা স্থির হয়ে আছে। ঘাড়ের ওপর ভেঙেপড়া খোঁপা; মুখের এক পাশটায় আলো পড়েছে। কেমন একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে বাসনাকে। মিহি ক'টি চুল গালে এসেছে নেমে। চোখের পাতা একটু কাঁপল যেন। সেই ফিকে গন্ধটা নাকে লাগছে। নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে চেপে চেপে রাখছিল বাসনা। হ্যাঁ, চাপছিল; নিশ্বাস শুধু নয়, কেমন এক ভয় এবং বিহ্বলতা।

'কেন?' খানিক অপেক্ষা করে বললে আবার অমলেন্দু, 'কিছু মনে করো না,

আমি সব ব্যাপারেই স্পষ্ট হতে পছন্দ করি।'

বাসনা মুখ ফেরাল। চক্ চক্ করছিল চোখ দুটো। এবং সামান্য ফ্যাকাশে মুখে একটা কাঠিন্য নামছিল এবার। ঠোঁটের আগা অল্প অল্প কাঁপছে। 'আমায় তুমি বুঝতে পারছ না! কিন্তু পারা উচিত তোমার।' কথাটা বলে একটু থামল বাসনা, যেন বুঝতে সময় দিলে অমলেন্দুকে, বললে আবার, 'তোমার, শুধু তোমার পক্ষেই সব বোঝা সম্ভব। আমি অন্তত তাই আশা করবো।'

আশ্চর্য, বাসনা আর দাঁড়াল না। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটু তাড়াতাড়িই যেন। আর ওর পা এতো কাঁপছিল, গা টলছিল যে অমলেন্দু ভাবছিল, বাসনার বোধ হয় মাথা ঘুরে গেছে, টলে পড়বে এখুনি।

সত্যিই বাসনা যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। দুলে পড়ছিল পাশ ঝুঁকে। হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিল কিছু।

অমলেন্দু এসে ধরে ফেলল। বাসনার ফিট হয়েছে আবার। চোখের পাতা তখনো আধবোজা, ঘোলাটে চোখ, ছলছল করছিল। জ্বরো রুগীর মতন ঠোঁট নড়ছিল। শক্ত মুঠোয় অমলেন্দুর বুকের কাছটায় জামার খানিকটা ধরে ফেলেছিল বাসনা। আর বিড় বিড় করে বলছিল। কী যে বলছিল অমলেন্দু বুঝতে পারছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছিল অমলেন্দুর, বাসনা তাকে এখন সব কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ছাদের ওপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল বাসনাকে। শরীরটা আরও সাদা দেখাচ্ছিল। বাসনার চোখ বুজে গিয়েছে ততক্ষণে। এবং ঠোঁট জুড়ে গেছে।

॥ ৮ ॥

কমলাদের শেষ চিঠি এল অগ্রহায়ণের গোড়ায়। আর ক'দিন পরেই ওরা ফিরছে।

অফিসের পোশাক গায়ে চড়িয়ে সুধাময় বলছিল বাসনাকে, 'শীতের শুরুতেই চলে আসছে। আরও ক'টা দিন থেকে এলে পারত। এই সময়টাই তো ঠিক চেঞ্জের সময়!'

চিঠিখানা হাতে করে নীচু মুখে দাঁড়িয়েছিল বাসনা। সুধাময় বললে আবার, 'আপনি কি বলেন ছোড়দি, লিখে দেবো নাকি ক'টা দিন আরও থেকে আসতে?'

'তাই কি ওরা থাকবে?' বাসনা বললে।

'কাকাবাবুরা ত থাকছেন আরও মাসখানেক। অসুবিধে কি!' সুধাময় পোর্টফোলিওটা হাতে তুলে নিল।

'কমলার বোধহয় ফেরার ইচ্ছে।' বাসনা চিঠিখানার দিকে চোখ রেখে বললে, 'তবু একবার লিখে দেখুন!'

বাসনা মুখে বললে কিন্তু মনে মনে চাইছিল ফিরে আসুক কমলারা। ফিরে আসুক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এবং বীথিও। আর দেরি সইতে পারছে না বাসনা। ধৈর্য থাকছে না আর।

তখন চাইছিলুম ওরা যাক্—আর এখন চাইছি ওরা আসুক—বাসনা সুধাময়ের ঘর গুছোতে গুছোতে ভাবছিল এবং নিজেকেই একটু যেন বিদ্রূপ করে ম্লান হাসছিল।

বিছানা ঝেড়ে ঝুড়ে বেড্‌কভারটা নিভাঁজ করে পেতে একটু বসল বাসনা। সমস্ত বাড়িটা কী নিস্তব্ধ। কাক চড়ুইয়ের ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। কমলার ঘরের দেওয়াল-ঘড়ির একটা শব্দ অবশ্য আছে, মৃদু একটানা মোলায়েম শব্দ। জানলা দিয়ে রোদ আসছে। কী স্বচ্ছ, উজ্জ্বল রোদ। এক মুঠো রোদ ড্রেসিং টেবিলের কাঠের ওপর যেন টপকে গিয়ে উঠে বসেছে। বাসনা সেই রোদের দিকে চেয়ে থাকল। এবং অল্পক্ষণ পরে যখন চোখ তুলল, নিজেকে, হ্যাঁ নিজের গোটা শরীরটাকেই দেখল বাসনা, আয়নার গায়ে একটা ছবির মতন নিশ্চল হয়ে ফুটে রয়েছে।

নিজের চোখ, কী চুল, কী মুখ—এমন কি বুক এবং গা দেখার আর তেমন কোনো আগ্রহ নেই। তবু একটুক্ষণ দেখল বাসনা। মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, এবার শরীরটা বেশ শুকিয়ে আসতে শুরু করেছে। কমলা থাকলে—এই পরিবর্তনটা তার চোখে পড়ত। সুধাময় পুরুষ মানুষ। সারাদিনে কতটুকুই বা দেখে বাসনাকে। তার পক্ষে এ-সব বোঝা সম্ভব নয়।

ফিরে এসে কমলা প্রথমেই হয়তো জানতে চাইবে, তুমি তো ভীষণ শুকিয়ে গিয়েছ ছোড়দি, কি হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে! বাসনা উঠে পড়ল। মনে মনে সেই দৃশ্যটা কল্পনা করলে, দুই বোন যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড়টা মাস পরে আর পাশেই বীথি, হয়ত বা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে।

কি হয়েছে কমলাকে বোঝাবার কি বলবার দরকার হবে না বাসনার। কেননা সত্যিই তো আর বাসনাকে বোনের কিংবা বীথির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে না, হবে না কোনদিনই। এ বাড়িতেই বাসনা তখন আর নেই। তার আগেই চলে গেছে ওর ঘর শূন্য, বিছানা শূন্য।

কমলা বিশ্বাস করতে চাইবে না বিশ্বাস করতে পারবে না, ভীষণ আঘাত পাবে, হয়ত কাঁদবে, হয়ত রাগে ঘৃণায় লজ্জায় মুখটা পাথরের মতন কঠিন করে ঘরে গিয়ে বসবে। বীথি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে কাঁদবে কুটি কুটি করে ছিঁড়বে বাসনাকে মনে মনে।......হ্যাঁ—বাসনা মোটামুটি ভবিষ্য দৃশ্য তো দেখতেই পারছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। একটা চিঠি অবশ্য কমলার নামে রেখে যাবে বাসনা। ইচ্ছে হলে সে-চিঠি পড়তে পারে কমলা। যদি পড়ে সব সমস্ত জানতে আর বুঝতে পারবে

আমি ভালবেসে বা এই শরীরটার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি অমলেন্দুর সঙ্গে, এ-কথা সত্যি নয় কমলা। এমনও নয় যে, আমি ঘর সংসার স্বামীর জন্যে তিলে তিলে মরছিলাম। আমার ভাগ্য, আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্তে আমি অসতর্ক হয়েছিলাম, ভুল করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম অমলেন্দুকে। সে আমার শনি। এক মুহূর্তের অসাবধানে সেই শনি আমায় গ্রাস করে ফেলেছে। এই কলঙ্ক পেটে নিয়ে আমি যদি মরতে চাইতাম হয়ত মরতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাইনি।

যে আমার সর্বস্ব নষ্ট করল তার সর্বনাশ আমিই বা না করব কেন! লোকটাকে আমি কী ভীষণ ঘৃণা করি আমিই শুধু তা জানি। তবু যাচ্ছি। যেতে হচ্ছে।

বাসনা মনে মনে চিঠির খসড়াটা যেন এখুনি করে ফেললে। এবং ভাবলে, মোটামুটি এ-সব কথা লিখলেই কমলা জিনিসটা বুঝতে পারবে।

সুধাময়ের ঘর গুছিয়ে বাইরে এল বাসনা। দরজাটা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিল।

এরপর একবার রান্নাঘরে যাওয়া দরকার। বাসনা ভাবছিল নীচে যাবে যাবে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছিল না।

নিজের ঘরেই এসে বসল বাসনা। খানিকটা চুপচাপ বসে জানলা দিয়ে আকাশ, রোদ, কাক আর চড়ুই দেখল। আর যেসব কথা মনে আসছিল, হঠাৎ যেন সব হুস করে উড়িয়ে দিয়ে আপন মনেই হাসল।

অমলেন্দুকে যা ভাবাতে চেয়েছিল ও—বোকা লোকটা তাই ভেবে নিয়েছে, বাসনা নোখ খুঁটতে খুঁটতে ভাবছিল আবার। অমলেন্দু ভেবেছে, বাসনা তাকে ভালোবেসেই ঘর ছাড়ছে।

ঘর অবশ্য ছাড়ছেই বাসনা, ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তোমায় ভালবেসে নয় বা তোমার ভালবাসা আমায় ভরে রাখবে এ-আশা নিয়েও নয়। বাসনা বলছিল, অমলেন্দুকে উদ্দেশ করে যেন, আমি তো জানি, যদিও মুখে তুমি বললে না, ভাবখানাও দেখালে যেন বাসনাকে কতোই ভালবেসে ফেলেছ, কিন্তু আসলে যা তুমি করেছো এবং যার চারা আর নষ্ট করবার কোনো উপায়ই নেই, শুধু তার ভয়েই এই সাধুতা তোমার। তা ভালোই করেছো। নয়তো আমাকেই মুখ ফুটে বলতে হত। সে কণ্টটুকুর হাত থেকে আমায় বাঁচালে এই যা! ভবিষ্যতে তুমিও আকাশ থেকে পড়বে না, আমিও না। কেউ কাউকে কিছু বলবো না, অথচ বুঝবো। আর তখনও যদি ন্যাকামি করে কিছু বলতে আসো অমলেন্দু, বাসনা পরম নিশ্চিন্তে তা উপেক্ষা করতে পারবে।

সেদিন অমলেন্দু এলে কমলাদের ফিরে আসার খবরটা দিলে বাসনা।

'তাই নাকি, কবে?' শুধল অমলেন্দু চা খেতে খেতে।

'দিন আটদশের মধ্যে।'

'তা ভালোই হলো।' অমলেন্দু বাসনার দিকে চেয়ে বেশ সহজ ভাবেই হেসে বললে, 'কমলাবৌদিরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত তো কাজটা হচ্ছে না আমাদের।'

'কাজ, কি কাজ?' বাসনা অবাক হচ্ছিল।

'শুভকাজ!' অমলেন্দু বোকার মতন জবাব দিয়ে হাসল।

অত্যন্ত কিম্ভুতকিমাকার দেখাচ্ছিল অমলেন্দুর সেই কালো গোল মুখের গাল-গলা ফোলান, মুখ হাঁ করা হাসি। বাসনার সারা গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

'মানে?' রুক্ষস্বরে, চোখ কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করলে বাসনা।

কোনো জবাব না দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল অমলেন্দু। এবং এখনও হাসছিল মুচকি মুচকি।

'মানেটা এমন কি কঠিন!' অমলেন্দু অতি তরল স্বরে বলছিল, 'কমলাবৌদিরা এলেই আমাদের রেজিস্ট্রির কাজটা সেরে নিতে পারি।'

কাথাটা কানে যেতেই বাসনার সারা বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি দিয়ে গেল। হাত দুটো কেমন অসাড় অসাড় লাগছিল। মুখটা শুকনো। ভুরু আর কপাল কুঁচকে উঠেছিল। অস্বস্তি বোধ করছে বাসনা, বিরক্তও হয়েছে খুব। অমলেন্দুর দিকে

অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'মনে মনে এসব বুঝি ভেবে রেখেছ?'

'হ্যাঁ। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি।'

'আমায় তো জিগ্যেস করনি।' বাসনা এমনভাবে বললে, এমন একটা কঠিন সুরে যার অর্থ বোঝাল, আমায় না-জানিয়ে এ-সব ঠিক করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

'করিনি মানে, বললুম যে সেদিন।' অমলেন্দু অবাক হচ্ছিল।

'না, সেদিনের কথা থেকে এসব বোঝায় না।' একটু থেমে, 'আমিও তো সেদিনই তোমায় বলে দিয়েছি কমলাদের কিছুই আমি জানাতে চাই না এখন। যা জানবার ওদের, যা জানাবার পরে ওরা জানবে। আমি চলে যাওয়ার পর, আগে নয়।'

অমলেন্দু চুপ করে শুনল কথাগুলো। জবাব দিলে খানিকটা পরে, 'লুকোচুরি করার কোনো দরকার ছিল না। সোজাসুজি, স্পষ্টাস্পষ্টিই কাজটা হতে পারত।'

'না, পারত না। কি তুমি সৎকাজ করছো!' কথাটা ঠোঁট থেকে ফস্ করে বেরিয়ে এল। বলে ভাবল বাসনা, একটু বেশিই বলা হয়ে গেছে বোধ হয়। অমলেন্দুর হয়ত ভাল লাগল না কথাটা কানে। একটু থেমে, একটু ভেবে—আগের কথার জের টেনে জিনিসটা হাল্কা করতে চেষ্টা করল বাসনা, 'তোমার কি, এদের সঙ্গে কতটুকু আর তোমার সম্পর্ক। কিন্তু আমার অবস্থাটা কেমন হবে ভেবে দেখেছ। কমলা শুনে পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে নেবে, সুধাময় ছি ছি করবে, বীথি বলবে—কী যে সে বলবে না-বলবে জানি না, তার পক্ষে সবই সম্ভব। আমার অতো দুঃসাহস নেই। যা করবার আড়ালেই আমি করতে চাই।' বাসনা ছটফট করছিল।

অমলেন্দু ভাবছিল। বাসনার এই মামুলি লজ্জা, আড়ষ্টতা এবং ভয় ভয় ভাবটা খুব বেশী। সে-দিনও বাসনা বলেছিল, সামনা-সামনি কিছুই সে কমলাদের জানাতে চায় না। চলে যাবার পর ওদের জানতে কিছুই বা আর বাকি থাকবে। তবু যা জানাবার পরে জানাবে বাসনা, চিঠিতে।

অমলেন্দুর এটা পছন্দ নয়। কিন্তু বাসনার কথা ভাবলে অবশ্য, ওর অবস্থাটা বুঝে এই লুকোচুরি না-করেই বা উপায় কি! 'এই লোকলজ্জাটা কাটাতে পারলেই কিন্তু ভাল হত।' বললে অমলেন্দু, 'অসৎ কাজই বা তুমি কি করছো!' একটু থেমে আবার, 'সুধাদাকে আমি চিনি। সোজাসুজি ব্যাপারটা বললে আর যাই হোক্ তার মনটাও খুঁত খুঁত করত না।'

জবাব দিল না বাসনা। ভাবছিল, লোকলজ্জা কাটাতে বলার উপদেশটা অমলেন্দুর মতন লোকের পক্ষে দেওয়াই সম্ভব যার সংকোচ-লজ্জার বালাই নেই। মনে মনে বলছিল বাসনা অমলেন্দুকে, তোমার মুখেই এ-সব কথা শোভা পায়, তোমার মতন চরিত্রের লোকের মুখে।

লোকলজ্জা আমার আছে, থাকবে। নাচতে নেমেছি বলেই যে আমায় আলগা গায়ে থাকতে হবে, তার কি মানে আছে! আমার রুচিতে এবং ইচ্ছেয় এ-সব বাধে। তাছাড়া, তুমি আর কতটুকু বুঝবে—যারা আমায় এতো বিশ্বাস করত, শ্রদ্ধা করত, যারা জানত, সিঁথির সিঁদুর মুছলেও আমার মধ্যে কোনো গ্লানি কী হতাশা-দুঃখ ছিল না, তাদের চোখের সামনে হঠাৎ এক পর-পুরুষের হাত ধরে ঘর ছাড়বার তেজ দেখালে কেউ আমায় বাহবা দেবে না। চোখের সামনে সেই কেলেংকারি হওয়ার চেয়ে আড়ালে হওয়াই ভাল। না আমি, না ওরা কেউ কারুর কথা শুনতে যাচ্ছি; ঘেন্না, জ্বালা, দুঃখ, কান্নাকাটি দেখতে পাচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত অমলেন্দু বললে, 'বেশ, তুমি যখন চাইছো তাই হবে। কিন্তু কমলাবৌদিরা আসার আগে তোমার যাওয়া হচ্ছে কই!'

বাসনাও ভাবল একটু। জবাব দিল, 'কমলারা আসার দিনই যদি চলে যেতে পারতুম! ওর কাছে আমি সব সময় এখন ভয়ে ভয়ে থাকব।'

'ক'টা দিন থাকতেই হবে, উপায় নেই।' অমলেন্দু একটু হেসে বাসনার হাতটা টেনে নিল।

'তাও থাকতে হয় না যদি ব্যবস্থা করো।' অমলেন্দুর মাথার কাছে মন হয়ে এসে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল বাসনা। তারপর সামান্য পাশে হেলে পড়ে, চেয়ারে বসা অমলেন্দুর মাথা-মুখের সঙ্গে ওর বুক ছুঁইয়ে অমলেন্দুর চুলে আঙুলে দিয়ে ইলিবিলি কাটতে লাগল। কখন মুখটা নীচুও করল খানিক, প্রায় কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'তুমি কিছু মনে করলে না তো!'

অমলেন্দু মাথাটা আরও যেন হেলিয়ে দিয়ে হাসল, 'না, মনে করবো কেন!'

অমলেন্দু চলে গেলে বাসনা চিঠি লিখতে বসল কমলাকে। দু'চারটে এ-কথা সে-কথার পর লিখল: সুধাময়ের ইচ্ছে তোরা আর ক'দিন থেকে আসিস। এখন নাকি শীত পড়ছে ওখানে, সময়টা খুব ভাল। আমিও ভেবে দেখলাম, আরও দিন আট-দশ অনায়াসেই তোরা থেকে আসতে পারিস। অমলেন্দুও সেদিন আমাদের কাছে বলছিল দিন সাতেকের জন্যে একবার ওখানে বেড়াতে যাবে। ওর যেতে অবশ্য দিন সাতেক দেরি হবে। তোরা যদি তখন চলে আসিস—অমলেন্দু যাবে না। যদি না আসিস হপ্তাখানেক তোদের সঙ্গে থেকে এক সঙ্গে সব ফিরতে পারবি। আমার মনে হয় তাই ভাল। ফেরার সঙ্গী পাবি, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অসুবিধে হবে না। কি করবি জানাস।

চিঠিটা খামে মুড়ে, কলম রেখে একটু চুপচাপ বসল বাসনা। গালে হাত দিয়ে ভাবল, আজ মঙ্গলবার—আগামী বুধবার আর একটা চিঠি লিখতে হবে কমলাকে: অমলেন্দুর যাওয়া বোধ হয় হল না। তোরা আগামী সপ্তাহে ফিরিস। আমার শরীরটা ভাল নেই।

কমলারা আসার আগেই রেজিস্ট্রি কাজটা সেরে রাখতে চায় বাসনা। আর যে-দিন ফিরবে কমলারা সে-দিন কী বড়জোর পরের দিনই এ-বাড়ি ছাড়তে চায়। কমলার চোখের সামনে একটা দিন কাটানোও এখন কী যে কষ্টে আর ভয়ের সে শুধু বাসনাই বুঝতে পারছে।

কিন্তু, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবছিল বাসনা—এই চিঠির পরও যদি কমলা জবাব দেয়, সে আগামী হপ্তাহে ফিরছে, তবে?

(ক্রমশ

চতুঃশক্তি সম্মেলনের প্রারম্ভে প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার নাকি পূর্ণ নূতন "spirit"-এর জন্য

আবেদন জানাইয়াছেন।—"টমাটোর রস ছাড়া অন্য ধরনের কোন নূতন spirit দরকার নেই। প্রাণভরে পান করুন, বে-সামাল হওয়ার কোন আশংকাই থাকবে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বিন্ধ্য প্রদেশের টিকমগড় জেলায় ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ডি ডি টি ছড়ানো হইলে গোঁড়া জৈন সম্প্রদায় নাকি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁদের মতে মশামারা জীবহত্যা এবং হিংসাত্মক কার্য। আমাদের জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ!!"

* * *

ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া একটি বৈদেশিক সংবাদ পাঠ করিলাম। আপাতদৃষ্ট কোন কারণ ছাড়া যে-সকল ব্যাপার ঘটে সে সম্বন্ধে উন্নত ধরনের পর্যালোচনার জন্য একটি পরিকল্পনারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আপাত দৃষ্ট কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও চতুঃশক্তির মাথায় জুজুর ভয় চেপে বসেছে। আশা করি এই ভৌতিক গবেষণায় জেনেভা সম্মেলন উপকৃত হবে।"

আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উচিত আসামকে ছোট ভাই-এর মত মনে করা। —"ভাই-ভাই সম্বন্ধ পাতাতে পশ্চিমবঙ্গ সব সময়েই প্রস্তুত কিন্তু আসামের অনেকেই যে তাকে গিন্নীর ভাই ছাড়া অন্য কোন নামে ডাকে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আমেদাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে জনৈক ব্যক্তি তার পত্নীকে তার এক সহকর্মীর প্রণয়ে আসক্ত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সহকর্মীর হাতে নির্বিচারে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে।—"পত্নী দান করে অনেক দাতাই হয়ত শতায়ু হতে পারতেন কিন্তু সৎসাহসের অভাবে তারা অকাল-মৃত্যুই শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছেন"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী। তাকে সৎ বলিতে পারিতেছি না কিন্তু সাহস তার সত্যই অসাধারণ!

* * *

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তর নাকি একটি প্রজাপতি দপ্তরের শাখা খুলিবেন অর্থাৎ তারা বিবাহযোগ্যা উদ্বাস্তু তরুণীদের ঘটকালির ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন—"কিন্তু পরিকল্পনাটি করিৎ-কর্মা লোকের অভাবে বানচাল হয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। স্বয়ং মুখ্য-মন্ত্রীই যেখানে অকৃতদার সেখানে"—খুড়ো কথাটা আর শেষ করিলেন না।

* * *

কলিকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণ সমাসন্ন—এই সংবাদ পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম সরকারের পরিকল্পিত মাঠ সংগ্রহে বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা সরকারী আশ্বাসে উৎফুল্ল হই নাই সুতরাং আশাভঙ্গেও মর্মাহত হইবার কোন কারণই ঘটে নাই। ইংরেজ কবির বিখ্যাত কবিতার পংক্তিটি রূপান্তরিত হইয়া আমাদের মনে স্থায়ী হইয়া আছে—Desire of the mass for the stadium!!

রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদ"

মন্মথনাথ ঘোষ

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদ" পড়লাম। এই কবিতাটি আগেও অনেকবার পড়েছি এবং এর প্রশংসাও অনেক শুনেছি, কিন্তু একদিন এমন একজনের কাছে শুনলাম যিনি সাধারণত রবীন্দ্রনাথের নামে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন না, এবং যাঁর মতামতকে আমি সমীহ ক'রে চলি। তিনি বলছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদে"র মত মহৎ কবিতা শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। শুনে কবিতাটি আর একবার পড়লাম। প'ড়ে কয়েকটি প্রশ্ন মনে হ'ল, তারই কথা এই প্রবন্ধে বলব।

কবিতাটি প্রথম থেকেই উচ্চসুরে বাঁধা। অতি প্রারম্ভেই মনে হয়, কোনও এক উদার উন্নত মানবাত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব। প্রত্যুষে যুদ্ধারম্ভ হবে। সায়াহ্নে কৌরবশিবিরের অদূরে জাহ্নবীতীরে কর্ণ স্নানান্তে সূর্যস্তব করছে। এমন সময় কুন্তী এসে উপস্থিত সেখানে। কর্ণ জিজ্ঞাসা করল,—

> পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার
> বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
> অধিরথ সূতপুত্র, রাধা গর্ভজাত—
> সেই আমি। কহো মোরে তুমি কে
> গো মাতঃ।

কুন্তী বললেন,—তিনিই কর্ণকে বিশ্বের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কর্ণ একথার রহস্যোদ্ঘাটন করতে পারল না। আরও জানতে চাইল। কুন্তী বললেন,

> ধৈর্য ধরু,
> ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
> আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
> আসুক নিবিড় হ'য়ে।

তার আগে তিনি তাঁর লজ্জার কথা বলতে পারবেন না। তারপর বল্লেন,—তিনি কুন্তী। কর্ণ অবাক হ'ল। তিনি কুন্তী! অর্জুনজননী! তিনি তার কাছে এসেছেন! কুন্তী বললেন,—অর্জুনজননী ব'লে কর্ণ যেন তাঁকে শত্রু মনে না করে। কারণ হস্তিনাপুরে অস্ত্র-পরীক্ষার দিন কর্ণ যখন নবোদিত অরুণের মত রণাঙ্গনে উদয় হয়েছিল তখন যবনিকার অন্তরালে যত পুরনারী ছিল তাদের কারও বক্ষ যদি স্নেহক্ষুধায় জর্জরিত হয়ে থাকে সে এক তাঁরই বক্ষ হয়েছিল, কারও নয়ন যদি সেই সময় তাকে আশিষচুম্বন দিয়ে থাকে সে এক তাঁরই নয়ন দিয়েছিল। তারপর বলেন,—

> যবে কৃপ আসি
> তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
> কহিলেন, "রাজকুলে জন্ম নহে যার
> অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার।"—
> আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
> দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা আভাখানি
> দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে,
> কে সে অভাগিনী। অর্জুন জননী সে যে।

কুন্তী আরও বল্লেন,—কৃপের কথায় দুর্যোধন যখন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করল তখন কেউ যদি আনন্দাশ্রু বিসর্জন ক'রে থাকে সে তিনিই করে-ছিলেন। তারপর যা ঘটেছিল তাতেও কেউ যদি কর্ণ সম্বন্ধে গৌরব বোধ ক'রে থাকে সেও তিনিই করেছিলেন।

> হেনকালে করি পথ
> রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
> আনন্দ বিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
> চারিদিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
> অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে
> সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।
> ক্রুরহাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
> ধিক্কারিল; সেইক্ষণে পরম গরবে
> বীর বলে যে তোমারে, ওগো বীরমণি,
> আশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

এতেও রহস্য ঘোচে না। তখন কুন্তী স্পষ্ট ক'রে বল্লেন,—

> পুত্র মোর ওরে,
> বিধাতার অধিকার লয়ে' এই ক্রোড়ে
> এসেছিলি একদিন—সেই অধিকারে
> আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে,
> সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃঅঙ্কে মম
> লহো আপনার স্থান।

কর্ণের কাছে একথা স্বপ্নের মত শোনায়। সে বল্লে,—

> শুনিয়াছি লোকমুখে,
> জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
> হেরেছি নিশীথস্বপ্নে, জননী আমার
> এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়;
> কাঁদিয়া কহেছি তারে কাতর ব্যথায়,
> "জননী গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ।"
> অমনি মিলায় মূর্তি, তৃষ্ণার্ত উৎসুক
> স্বপনেরে ছিন্ন করি। সেই স্বপ্ন আজি
> এসেছে কি পাণ্ডবজননীরূপে সাজি
> সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে।

ক্ষণকালের জন্য কর্ণ বিহ্বল হয়ে পড়ে। কুন্তীকে আবার বলতে বলে যে, তিনিই তার মা। কুন্তী আবার বলেন যে, তিনিই তার মা। হঠাৎ প্রশ্ন জাগে। কর্ণ জিজ্ঞাসা করে—

> কেন তবে
> আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে, অগৌরবে
> কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
> অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে।

এর উত্তর দেওয়া কুন্তীর পক্ষে কঠিন। তার লজ্জা কর্ণও বুঝতে পারে, তাই পরমুহূর্তেই বলে,—

> মাতঃ নিরুত্তর?
> লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
> পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
> মুদিয়া দিতেছে চক্ষু,—থাক থাক তবে।
> কহিয়ো না কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
> ....কহ মোরে,
> আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ মোরে।

এইবার কুন্তী বলেন,—

> ত্যাগ করেছিনু তোরে,
> সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে করে'
> তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন; তবু হায়
> তোর লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
> খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
> তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্তদীপ জ্বেলে
> আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
> বিশ্বদেবতার।

নিজের অপরাধের জন্য কুন্তী পুত্রের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান। পুত্র মায়ের পদধূলি নিয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে থাকে। মাতা পুত্রকে বক্ষে টেনে নেন। ক্ষণকাল পরে বল্লেন যে, তাকে বক্ষে ধারণ করার সুখের আশাতেই তিনি আসেননি, এসেছেন তাকে নিজের অধিকারে ফিরিয়ে নিতে,—তাকে তার পঞ্চভ্রাতাদের মধ্যে

স্থান ক'রে দিতে। হঠাৎ কর্ণের স্বপ্নভঙ্গ হয়। সে কুন্তীবাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বলে,—

মাতঃ সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা।
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

কুন্তী বলেন,—তা কেন? পঞ্চভ্রাতাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুমি তোমার বাহুবলে হৃতরাজ্য উদ্ধার ক'রে নাও। তুমি তোমার সিংহাসনে বসবে, যুধিষ্ঠির ধবল ব্যজন দুলাবে, ভীম ছত্র ধরবে, ধনঞ্জয় তোমার রথের সারথ্য করবে, ধৌম্য পুরোহিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করবে—এসব সে কেন পরিহার করবে?

কর্ণ বলে,—যে কিছুপূর্বেই মাতৃস্নেহপাশ প্রত্যাখ্যান ক'রে রাধাকেই মাতা ব'লে ঘোষণা করল, তার কাছে রাজ্যপ্রলোভন বৃথা।

একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায় দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূত জননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে' ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক মোরে।

কুন্তীর মুখে হতাশার ছবি ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,—

হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেই দিন কে জানিত হায়
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হ'তে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে—
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কি অভিশাপ।

কর্ণ কুন্তীকে অভয় দিয়ে বলে,—

মাতঃ করিয়ো না ভয়।
কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
অনন্ত আকাশ হ'তে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।

জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী,
দীপ্তিহীন, কীর্তিহীন পরাভব পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হ'তে ভ্রষ্ট নাহি হই।

যিনি এই কবিতাটিকে জগৎসাহিত্যে একটি মহত্তম কবিতা বলেছিলেন, তাঁর কাছে এর কি কি জিনিস ভাল লেগেছিল আন্দাজ করতে পারি। ভাল লেগেছিল পুণ্য ভাগীরথীর পূতস্নাত কর্ণের দীর্ঘ উন্নত রূপ, তার আত্মসমাহিত ধীর কণ্ঠস্বর, তার প্রকৃত সৌজাত্যপূর্ণ নারীসম্ভ্রমশীল মন—যে মনের পরিচয় তার কুন্তীসম্ভাষণের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে পাওয়া যায়। কৃপের কথায় তার মুখে যে লজ্জা আভা দেখা দিয়েছিল, বীরহৃদয়ের ওই লজ্জাস্পর্শও ভাল লেগেছিল। তারপর কুতুহলী জনতার মাঝে সূত অধিরথের আবির্ভাবে সে যখন সূতপদে সদ্যঅভিষিক্ত মস্তক অবনত করেছিল তখন তার আত্মাভিমানী পিতৃশ্রদ্ধাও ভাল লেগেছিল। নিশীথস্বপ্নে তার মাতৃস্নেহাতুর মনের মাতৃসন্ধানও একটা বেদনাতুর ভাললাগা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বোধ হয় সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তার সেই সর্বপরিশেষের ম্লানমুখচ্ছবি। তার হতভাগ্য জীবনের দিকে তাকিয়ে সে অনন্ত আকাশে একটা ব্যর্থতার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল, ঘনায়মান অন্ধকারে অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু সেই নৈরাশ্যময় ম্লানমুখেও বীরের সঙ্কল্প অটুট ছিল। কুন্তীচরিত্রে যে জিনিস ভাল লেগেছিল সেটা হচ্ছে কর্ণের প্রতি তাঁর অন্তর্গূঢ় মাতৃস্নেহ—যা কোনদিন বাইরে প্রকাশ পাওয়ার অবকাশ পায়নি; কর্ণ সম্বন্ধে তাঁর প্রচ্ছন্ন পুত্রগৌরব—যে গৌরব একদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল হস্তিনাপুরের অস্ত্রপরীক্ষার সময়; এবং তাঁর নিঃশব্দ অন্তর্দাহ—নিজের গর্ভজাত নিরপরাধ সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে যে অন্তর্দাহে তিনি প্রতিনিয়তই অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছিলেন। এইসব মহৎ ভাবের সমাবেশেই কবিতাটি পূর্বোক্ত পাঠকের কাছে জগতের মহত্তম কবিতা মনে হয়েছিল।

কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগে,—এই যে সব উন্নত মহদ্ভাব—মহৎ বেদনা, মহৎ পুত্রস্নেহকাতরতা, মহৎ মাতৃস্নেহব্যাকুলতা, মহৎ অনুশোচনা, মহৎ গাম্ভীর্য, মহৎ ঔদার্য, মহৎ সৌজন্য, মহৎ নৈরাশ্য, মহৎ স্থির সঙ্কল্প—এসব কি সত্যাশ্রয়ী মহদ্ভাব, না অসত্যাশ্রয়ী অলীক মহদ্ভাব? কথাটা পরিষ্কার করে' বলি। আমি একজনকে জানতাম যিনি পত্নীস্মৃতি-অনুরাগের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁকে কোনদিন হাসতে দেখিনি। —যদিও হাসলে তাঁকে ভালই দেখাত। বড় লোকের ছেলে ছিলেন, দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন, স্ত্রী আরও সুন্দর ছিল। সভাসমিতিতে আগের মতই যেতেন, কিন্তু মুখে এমন একটা বিষাদ লেগে থাকত যে সবারই চোখে পড়ত। সবাই জিজ্ঞাসা করত, কি হয়েছে? যখন শুনতো যে স্ত্রী-বিয়োগ হ'য়েছে, তখন সম্ভ্রমে তাদের মন ভরে' উঠত। তাঁর ওই সৌম্য, শান্ত, বিষণ্ণ মুখচ্ছবি দেখে তারা মুগ্ধ হ'ত এবং একটা অপূর্ব পবিত্রভাবে উদ্বুদ্ধ হ'ত। কিন্তু আমার ওরকম কোন ভাব হ'ত না, কারণ আমি জানতাম যে তাঁর স্ত্রী ভ্রষ্টা ছিলেন। যার জন্য শোক তার অযোগ্যতা, তাঁর শোককে আমার কাছে অযোগ্য করে' দিয়েছিল। তাছাড়া আমি আরও জানতাম যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর ভ্রষ্টাচারের কথা জানতেন না। তার ফলে তাঁর শোকই শুধু আমার কাছে অযোগ্য মনে হয়নি, তাঁকেও আহাম্মক মনে হয়েছিল। যদি জানতাম যে, তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীর কথা জানেন তাহলে হয়তো ভাবতে পারতাম যে তাঁর ভালবাসা এতই গভীর যে স্ত্রীর অযোগ্যতা সেই মহান ভালবাসাকে খর্ব করতে পারেনি। কিন্তু আমার পক্ষে সেরকম ভাবা সম্ভব ছিল না। যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তারা সত্য কথাটি জানত না বলেই সম্ভব হয়েছিল। তাদের অজ্ঞানতা দাম্পত্যপ্রেমের একটি অসত্যরূপ কল্পনা করে' সহজেই একটা মিথ্যা মহানতা উপভোগ করতে পেরেছিল। কিন্তু তারা যদি সত্য কথাটি জানতো তাহ'লে আমার বন্ধুর বিষাদ তাদের কাছেও মূর্খের বিষাদ বলে' মনে হ'ত

এবং মূর্খের স্বর্গের মত ওই মূর্খের বিষাদ হাসিরই উদ্রেক করত। কোন কোন ক্ষেত্রে,—অতিশয় কোমল চিত্তে,—যদিই বা করুণার উদ্রেক হ'ত তাহলেও সে করুণার মধ্যেও একটা বৈরীভাব থাকত, কারণ এ সন্দেহ সবার মনেই জাগত যে আমার বন্ধু যদি তাঁর স্ত্রীর প্রকৃত চরিত্র জানতেন তাহ'লে পত্নী-স্মৃতিস্মরণে তাঁর সৌম্য বিষণ্ণ মুখে সৌম্যের পরিবর্তে ভ্রূকুটিই দেখা দিত।

আমার মনে হয় যাঁরা 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' পড়ে একটা মহান ভাব বোধ করেন তাঁদের সেই মহানভাব আমার বন্ধুকে দেখে যারা মহানভাব বোধ করত তাদের সেই মহানভাবের সঙ্গে তুলনীয়। উভয়ক্ষেত্রেই মহানভাবটি অসত্যাশ্রিত। আমার বন্ধু সম্বন্ধে লোকে যেমন মিথ্যা কল্পনা করত কর্ণকুন্তী সম্বন্ধেও কবি তেমনি একটা মিথ্যা-কল্পনা করে একটা মিথ্যা মহানতা সৃষ্টি করেছেন, এবং যাঁরা ওই মিথ্যামহানতা দেখে মুগ্ধ হন তাঁরা ওই মিথ্যাকে সত্য বলে' গ্রহণ করেন বলেই মুগ্ধ হন। কিন্তু আমি কুন্তীর বেদনা, তাঁর অন্তর্দাহ, তাঁর অনুশোচনা কর্ণের জন্য তাঁর পুত্র-স্নেহকাতরতা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। তার কারণ এ নয় যে, আমি কুন্তী বা কর্ণ সম্বন্ধে এমন কোন গুপ্ত রহস্য জানি যা আর কেউ জানে না। আমি যা জানি তা যে কেউ মহাভারত পড়েছে সেই জানে, কিন্তু সবাই 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' পড়ার সময় তা মনে রাখে না। কুন্তী গিয়েছিলেন কর্ণকে ভুলিয়ে পান্ডবদের দলে আনতে পারেন কিনা তাই দেখতে। সেজন্য তাঁকে তাঁর মাতৃপরিচয় দিতে হয়েছিল এবং মাতৃ পরিচয় দিতে গিয়ে মাতৃস্নেহের ভানও করতে হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওই ভানটিকেই কুন্তী-হৃদয়ের সত্যিকারের ভাব বলে দেখিয়েছেন। এ তর্ক বোধহয় কেউ করবে না যে তিনিও তাকে ভান বলেই দেখিয়েছেন এবং পাঠকরা তাকে ভান বলেই দেখে। কুন্তীর মুখে তিনি যে ভাষা দিয়েছেন তা কপটভানের ভাষা নয়। কেউ যদি ভাবেন যে কুন্তীকে রবীন্দ্রনাথ এমনই ছলনাময়ী নারী হিসাবে কল্পনা করেছেন যে, তাঁর মুখের কথায় তাঁর অন্তরের কথা বোঝা যায় না, তাহলেও আমার বক্তব্য খণ্ডন হয় না। আমি বলতে চাই কুন্তী-চরিত্রের মহানতা সত্যিকারের মহানতা নয়। কুন্তী-চরিত্রে কেউ যদি কপটভান দেখে তাহ'লে মহানতার কথাই উঠে না, কারণ ভানের মধ্যে কোন মহানতা-বোধ নেই—যাকে ভান মনে হয় তাকে কখনই মহান মনে হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা কেউই কুন্তীর মধ্যে ভান দেখি না। আমরা সবাই তাঁর অন্তর্দাহকে সত্যি-কারের অন্তর্দাহ মনে করি, তাঁর পুত্র-গৌরবকে, তাঁর পুত্রস্নেহজর্জরতাকে সত্যিকারের হৃদয়াবেগ মনে করে' তাঁকে একটি গৌরব-বেদনাসমুজ্জ্বল মহীয়সী নারী মনে করি। কিন্তু কুন্তীচরিত্রে যে ওই ধরনের সত্যিকারের হৃদয়াবেগ সম্ভব নয় তা ভেবে দেখি না। যিনি কলঙ্ক-ভয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, যিনি কোনদিন সেই সন্তানকে লালনপালন করেন নি, স্তন্যদান করেন নি, সুতরাং তার সম্বন্ধে স্নেহবোধ করার অবকাশ পাননি, তিনি যখন বলেন,

> ত্যাগ করেছিনু তোরে
> সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে করে'
> তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন; তবু হায়
> তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
> খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।

তখন সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন মনে হয়। ভান হিসাবে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু সত্যিকারের হৃদয়াবেগ হিসাবে নিতান্তই মিথ্যা মনে হয়। আরও মিথ্যা মনে হয় যখন ভাবি কুন্তীর আরও পাঁচটি সন্তান ছিল যারা তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকত এবং যাদের দ্বারা তিনি তাঁর মাতৃস্নেহক্ষুধা নিঃশেষেই মিটাতে পারতেন। কুন্তীর অন্তর্দাহের যে কথা কবি বলেছেন তাও বিশ্বাস করা কঠিন। কুমারী জীবনের কলঙ্ক ঢাকতে তিনি একটি নিরপরাধ শিশুর প্রতি নিরতিশয় অবিচার করেছিলেন। সেই অবিচারের জ্বালা তাঁকে নিরন্তর দগ্ধ করছিল সে কথা বিশ্বাস করতে হ'লে এমন একটি বিবেক-গুঞ্জিত, সুকুমার কিশলয় মনের কথা ভাবতে হয়, যা কিনা অভিজ্ঞতা-বিদগ্ধ প্রৌঢ় বয়সে সাধারণত থাকে না এবং কুন্তী সম্বন্ধে সেকথা ভাবতে হ'লে শুধু তাঁর মুখের কথাতেই ভাবা যায় না, আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে হয়।

কর্ণমাহাত্ম্য সম্বন্ধেও আমার কোন সত্য প্রত্যয় হয় না। তার দৈহিক রূপ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। পুণ্য ভাগীরথী তীরে তার সদ্য-স্নাত দীর্ঘোন্নত উজ্জ্বল রূপ খুবই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে মনে হয় এ রূপ তার প্রকৃত রূপ নয়।—অপরূপারিত রূপ। নিশীথ-স্বপ্নে কর্ণ তার মাতার ছায়ামূর্তি দেখে কেঁদে বলে,—জননী গুণ্ঠন খোল, দেখি তব রূপ। কিন্তু স্বপ্নমূর্তি স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়। কর্ণকে এইভাবে মাতৃচিন্তাবিভোর, মাতৃ-তৃষাতুরভাবে কল্পনা ক'রে কবি কর্ণ-চরিত্রকে একটা করুণার্দ্রতা, একটা ব্যথাতুর কোমলতা দিয়েছেন। কিন্তু এই কোমল কারুণ্য আরোপ আমার কাছে সত্যারোপ মনে হয় না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে মাতৃপরিত্যক্ত হয়েছিল, রাধা তাকে সযতনে লালনপালন করেছিল, রাধাকেই সে মা ব'লে জানত। তার জীবনের অন্তত তের চোদ্দ বছর এই জ্ঞান নিয়েই কেটেছিল। তারপর অবশ্য একদিন সে শোনে যে, রাধা তার মা নয়। কিন্তু তার ফলে যে রাধার স্নেহ তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল, এবং সত্যিকারের মাতৃস্নেহের জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল একথা বিশ্বাস করা যায় না। একথা বিশ্বাস করতে হ'লে ভাবতে হয় যে, রাধা তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করত। পরগৃহাশ্রিত মাতৃহীন বালক গৃহস্বামিনীর অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে অনুক্ষণ মাতৃচিন্তা করছে, এবং স্বপ্নে তার মাকে দেখছে—এর মধ্যে বিচিত্র কিছু নেই। কিন্তু রাধা কর্ণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত এরকম ভাবার কোন কারণ দেখি না। কাজেই যে বালক মাকে কোনদিন দেখেনি, মাতৃস্নেহ কাকে বলে কোনদিন জানে নাই, যে স্নেহশীল অন্য একটি নারীর স্নেহকেই মাতৃস্নেহ ব'লে জেনেছে, সে যে তাকে মা নয় ব'লে জানা মাত্রই তাঁর বাস্তব প্রত্যক্ষ স্নেহ ভুলে গিয়ে তার কাছে যা অবাস্তব, অলীক সেই মাতৃস্নেহের জন্য হাহাকার ক'রে উঠবে—এ কল্পনা আমার কাছে মিথ্যা কল্পনা মনে হয়।

কর্ণের আরও যে রূপ দেখি—তার সলজ্জ নম্রতা, তার নিরহংকার উদার আত্মস্থতা, তার নারীসম্ভ্রমশীলতা—তাও আমার কাছে সত্য মনে হয় না। সত্য মনে হয় না এজন্য নয় যে, এরূপের নিজস্ব প্রকৃতির মধ্যেই কোন একটা আভ্যন্তরিক অসত্যতা রয়ে গেছে, যেমন আছে "পঞ্চপত্র বক্ষে ক'রে তবু মোর চিত্ত পত্রহীন" কুন্তীর এই চিত্রের মধ্যে, কিংবা আজন্মমাতৃহারা রাধাস্নেহলালিত কর্ণের মাতৃহাহাকারের মধ্যে। পরগৃহাশ্রিত মাতৃহীন বালক নম্রতা শিখেছে, উদার হয়েছে, নারীজাতিকে সম্মান করতে শেখেছে—এর মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই। কিন্তু তা না থাকলেও এর মধ্যে অন্য রনের একটি সত্যবিরোধিতা আছে। র্ণের এই রূপ মহাভারতের কর্ণের রূপ য়। এ রূপে বিশ্বাস করতে হ'লে হাভারতের কর্ণচরিত্রের অনেক কিছু লে যেতে হয়। ভুলে যেতে হয় কিভাবে া "বাহ্বাস্ফোট" করতে করতে, অর্থাৎ নারূপ বাহু-আস্ফালন করতে করতে স্তিনাপুরের অস্ত্রপরীক্ষার দিন রণাঙ্গনে বতীর্ণ হয়েছিল, কিভাবে সে দ্রৌপদীর স্ত্রহরণের সময় নির্লজ্জ ব্যঙ্গপরিহাস রেছিল এবং আরও কত ব্যাপারে সে ত দম্ভ করেছিল এবং কতরকম কুমন্ত্রণা য়েছিল। কর্ণের এই রূপই যে সত্য প এবং রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত রূপ যে থ্যা, একথা বল্লে অনেকেই হয়তো বজ্ঞার হাসি হাসবেন। কিন্তু আমার ন হয়, একটু চিন্তা ক'রে দেখলে থাটা তত হাস্যকর মনে হবে না। এ র্ক ক'রে লাভ নেই যে, যেহেতু কর্ণ-রত্র একটি কাল্পনিক চরিত্র এবং স্বয়ং াসদেবও ও চরিত্রকে কল্পনাই করেছেন ই হেতু যে কোন কবির ওই চরিত্র বন্ধে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী নের্বার কল্পনা করার অধিকার আছে। ই যদি থাকে তবে কেউ যদি কর্ণকে ম্বাদর ঔদরিক রূপে কল্পনা করে তেও দোষ নেই, কিংবা কেউ যদি ন্তীকে অসিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে বীর-ণীরূপে কল্পনা করে তাতেও দোষ ই। ওই দুই কল্পনার মধ্যে কোনটাতেই ভ্যন্তরিক কোন অসম্ভাব্যতা নেই। ন্তু তা'হলেও ওদের যেমন কর্ণ বা কুন্তীর প্রকৃত রূপ বলা যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কর্ণ বা কুন্তীর চরিত্র সম্বন্ধেও বলা যায় না যে, তারা তাদের প্রকৃত রূপ। তারা অধিকতর মনোরম একথা বলেও কোন লাভ নেই। কর্ণ বা কুন্তীর থেকে অধিকতর মনোরম হওয়ার তাদের কোন অধিকার নেই। বস্তুত কোন প্রতিমূর্তিরই মূর্তির থেকে অধিকতর সুন্দর হওয়ার অধিকার নেই। তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সত্য হওয়া এবং বর্তমান ক্ষেত্রে সত্য হওয়া মানে হচ্ছে কর্ণ বা কুন্তীর মত হওয়া। তা যদি না হয় তাহলে তারা যত সুন্দরই হোক না কেন তাদের সৌন্দর্য কর্ণ ও কুন্তীর সৌন্দর্য নয়, অন্য কোন তৃতীয় সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং সে সৌন্দর্যকে কর্ণ কুন্তীর সৌন্দর্য বলার কোন মানে হয় না, বল্লেও তার মানে হয় কর্ণ কুন্তীর মিথ্যা সৌন্দর্য।

পূর্বসূরীদের কোন সুপরিচিত চিত্রকে এইভাবে বিচিত্রিত করার দৃষ্টান্ত অনেক কবির মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমি এর মধ্যে মিথ্যাকল্পনার অলসলাস্য ছাড়া আর কিছু দেখি না। কর্ণকে কর্ণ থাকতে দিলে ক্ষতি কি আমি বুঝি না, কর্ণকে সুকর্ণ করে আঁকার মধ্যে কি কাব্যগৌরব আছে ভেবে পাই না। এরকম অপরূপায়ন আমার কাছে খুবই সহজ কাজ মনে হয়। আমার স্ত্রী প্রতিনিয়তই এইরকম অপরূপায়ন করেন। তিনি ভাবেন, তাঁর ছেলের মত সুবোধ বালক আর হয় না। সে হরদম মিথ্যা কথা ব'লে যাচ্ছে কিন্তু তিনি ভাবেন সে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। সে যে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায় তা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, পকেটে সিগারেটের গন্ধ ধ'রে দেখালে তিনি বলেন তা চকোলেটের গন্ধ। যে প্রতিবেশিনী সদাই তাঁর নিন্দা ক'রে বেড়ায় তাঁকেই তিনি তাঁর পরম বন্ধু মনে করেন। যদি বলি, সে তাঁর পরম শত্রু, তিনি বলেন,—আমার কৃষ্ণপক্ষের মন, সব জিনিসই আমি নাকি কৃষ্ণকায় দেখি। এইভাবে যে যা নয় তাকে তাই ভেবে তিনি শুক্লপক্ষের চন্দ্রালোকে বাস করেন। কিন্তু আমি দিবালোকে দেখি, এই মিথ্যাবিলাসের পিছনে আছে একটা ভীরু মন যা কিনা জীবনের সত্যরূপের মুখোমুখি হ'তে ভয় পায়। নিজের ছেলে মিথ্যা কথা বলে সিগারেট খায় এ সত্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। বন্ধু বন্ধু নয়—এ চিন্তার মধ্যেও একটা পীড়া আছে। তাই তিনি মিথ্যা কল্পনা দিয়ে ওই পীড়া এড়িয়ে যান। সাহিত্য ক্ষেত্রেও যাঁরা মিথ্যা-কল্পনার বিলাসলাস্য করেন এবং জীবনের অপরূপ ছবি আঁকেন তাঁদের মধ্যেও রয়েছে ওই ভীরু মন—জীবনের মুখোমুখি হ'তে তাঁরা ভয় পান। সাহস ক'রে তার মুখের দিকে তাঁরা যদি তাকাতে পারতেন তাহ'লে ওই মুখ যা তারই মধ্যে একটা সৌন্দর্য দেখতে পেতেন। মসীচিহ্নিত, সীমালাঞ্ছিত, বহুকলঙ্কিত ওই মুখ—কিন্তু তারই জন্য একটা মায়া মমতা বোধ করতেন, করুণা বোধ করতেন। কিন্তু যে ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা, উদারতা থাকলে সাহস ক'রে জীবনের শতছিদ্রিত রূপের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায়, তাই তাঁদের নেই। কাজেই তাঁরা তার রুদ্র-রূপে চোখ বোঁজেন, তার দৈন্যে লজ্জিত হন, তার অসম্পূর্ণতায় ক্ষুব্ধ হন। মৃত্যুকে স্বীকার ক'রে নিলে যে আর মৃত্যুভয় থাকে না, দৈন্যকে স্বীকার ক'রে নিলে যে আর মলিন বস্ত্রে লজ্জা হয় না, অসম্পূর্ণতাই যে জীবনের পূর্ণরূপ এবং সে রূপ স্বীকার ক'রে নিলে তাই যে সুন্দর দেখায়—কাফ্রির কাছে কাফ্রিনীর কৃষ্ণরূপই যেমন সুন্দর দেখায়,—এ জ্ঞান তাঁদের নেই কারণ স্বীকার করার মধ্যেই থাকে এই জ্ঞান, কিন্তু ওই স্বীকারই তাঁরা করতে চান না।

রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদে"র মধ্যেও আমি ওই অস্বীকার দেখি। কর্ণের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, দম্ভ, যে দুর্বিনীত অসৌজন্য, যে উত্তুঙ্গ অহং-পূর্বিকা আছে তা তিনি স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। তার মধ্যে যে নারী-জাতির প্রতি একটা অশ্রদ্ধা আছে, তার চিত্তে যে একটা তিক্ততা আছে, তার রসনায় যে বিস্বাদ আছে, বিষ আছে, সে যে স্বভাবতই রুক্ষ, রূঢ়, অনার্দ্র, অদ্রাব্য, সে যে কুন্তীর কথায় গ'লে না গিয়ে বরং তাঁর মাতৃস্নেহের ছল দেখে রুষ্ট হয়ে তাঁকে দুটো কড়া কথাই শুনিয়ে

দিয়েছিল—এসব অস্বীকার ক'রে তিনি তাকে বিনয়াবনত, লজ্জারক্ত, সুকোমল-চিত্ত, শুদ্ধ, সমাহিত উদার, উজ্জ্বল অপরূপ আদর্শ পুরুষ ক'রে এ'কেছেন। কিন্তু কর্ণের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে যে একটা কারুণ্য আছে সেটা অনুভব করার জন্য তাকে এভাবে অপরূপায়িত করার কোন প্রয়োজন হয় না। আজন্মমাতৃ-পরিত্যক্ত যে, সে যদি কোন সংকটমুহূর্তে সেই মাকেই মাতৃস্নেহের ছল করতে দেখে তাহ'লে তার যে মর্মপীড়া তা হীনতম ব্যক্তির মধ্যেও অনুভব করা যায়। তার জন্য সেই হতভাগ্যকে মহানুভব মহা-পুরুষ ভাবতে হয় না। গদাঘাতে দুর্যোধন যখন ধরাশায়ী হয় তখন মহাভারতের কবি ধরণীর একেশ্বর অধিপতির এই দশা দেখে একটা গভীর দুঃখ বোধ করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনকে দুর্যোধন ভেবেই তিনি ওই দুঃখ বোধ করেছিলেন, তাকে কোন শুদ্ধজন ভাবতে হয়নি। দ্রৌপদী-লাঞ্ছনা তখনও তাঁর মনে ছিল।

> দুর্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
> ওরে মূঢ় কুরুপতি, মূঢ় দুর্যোধন॥
> যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
> তার ফল ভুঞ্জ এবে শুনরে অজ্ঞান॥
> এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি।
> উরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি।

"স্তব্ধ কুরুপতি" ব'লে কাশীরাম সত্যিকার মৃত্তিকার মানুষের প্রতি, তার পাপবিদ্ধ অসম্পূর্ণ জীবনের প্রতি যে সমবেদনা দেখিয়েছেন, যে ক্ষমা, তিতিক্ষা, করুণা, ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদে" পাই না। তিনি কর্ণকে কর্ণ রেখে তার সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা ক'রে তাকে ভালবাসতে পারেন নি। তাঁকে কল্পনা করতে হয়েছে একটি মনগড়া, রংচঙা, মিথ্যা কর্ণ। যে ভালবাসার উপলক্ষ্য মিথ্যা সে ভালবাসাই মিথ্যা মনে হয়। কর্ণের তিক্ত মন, রূক্ষ স্বর, শুষ্ক কঠিন আচরণের মধ্যেই তিনি যদি তার নির্মম ভাগ্যে দুঃখ বোধ করতে পারতেন তাহ'লেই তাঁর ভালবাসা সত্যিকারের ভালবাসা মনে হ'তে পারত এবং কবিতাটিকেও সত্যিকারের মহৎ কবিতা বলা যেতে পারত। কিন্তু যে কবিতায় এই মৃত্তিকার পৃথিবীর মানুষ দেখি না, দেখি একটা দূরাকাশের রঙগীন ফানুস, একটা ফাঁকা আদর্শ এবং তারই জন্য যত দরদ, যত ব্যাকুলতা তাকে আমি কিছুতেই মহৎ কবিতা বলতে পারি না।

তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে, যে জন্য এই কবিতাটিকে মহৎ আখ্যা দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। কর্ণ-চরিত্র যদি আমার কাছে সত্যও মনে হ'ত, তাতে মিথ্যা ব'লে যদি কিছুই না দেখতাম, তাহলেও কবিতাটি আমার কাছে মহৎ মনে হ'ত কিনা সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় যাঁরা কর্ণচরিত্রকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেন তাঁরাও ঠিক 'মহান' ভাব অনুভব করেন না। কারণ কোন কিছু মিথ্যা শুধু এই উপলব্ধিই মহান্ ভাবের বিরোধী নয়। কতগুলি জিনিস আছে যা সত্য মনে হ'লেও 'মহান্' মনে হয় না। অত্যন্ত কোমল, নরম, তুলতুলে, অত্যন্ত নম্র বিনয়ী, অত্যন্ত স্নেহাতুর ব্যথাতুর, অত্যন্ত সিক্ত বিগলিত,—এইসব আর্দ্র, আর্ত ভাবের মধ্যে কোন মহান্ ভাব-বোধ নেই। মহান্ বলতে আমরা আরও একটু অনবনত, অনমনীয়, অনার্দ্র, অদ্রাব্য কিছু বুঝি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কর্ণ-চরিত্রকে বিনয়াবনত, লজ্জারক্ত, মাতৃতৃষ্ণার্ত, মাতৃনাম বিগলিত, সুকোমলচিত্ত দেব-শিশুটি ক'রে এ'কেছেন তাতে ওই শক্ত কঠিন ভাব জাগে না। সে হিসাবে মহাভারতের তিক্ত, গর্বিত, উদ্ধত কর্ণের মধ্যেই মহান্ ভাবের বেশী সম্ভাবনা আছে।

আমার এই প্রবন্ধটি প'ড়ে কেউ কেউ হয়তো বলবেন,—"মোট কথা, তোমার এই কবিতাটি ভাল লাগেনি, তাই তুমি সত্য নয়, মহৎ নয়, নানা কথা বলছ। কিন্তু কারও কারও এ কবিতাটি খুবই ভাল লাগে। তোমার ভাল না লাগাতে তুমিই ঠকেছ, কারণ ভাল লাগাটাই একটা লাভ। যে পরিমাণে তোমার ভাল লাগেনি সেই পরিমাণে যাদের ভাল লেগেছে, তাদের থেকে তুমি নিঃস্ব।"—এরকম কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। ভাল না লাগায় যে বাহাদুরি নাই সে কথা আমি বুঝি। কিন্তু মিথ্যাকে ভাল লাগার যে কি বাহাদুরি তা আমি বুঝি না। যাঁরা এই কবিতা প'ড়ে আনন্দ পান তাঁরা যে আনন্দধনে আমার থেকে অনেক বেশী ধনবান্ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমিও একদিন ওইরকম ধনবান্ ছিলাম। এ কবিতাটি একদিন আমারও ভাল লেগেছিল। যৌবনারম্ভে প্রথম যখন এই কবিতাটি পড়ি তখন যে কি আনন্দ পেয়েছিলাম এখনও ভুলি নাই। যৌবনের সেই ভাল লাগার ক্ষমতা এখ আর নাই। শুধু যৌবন কেন, তার আগে—*শৈশবে*—যে ভাল লাগার ক্ষমতা ছিল তার শতাংশের একাংশও *এখন আ নাই। পুতুলগুলিকেই সত্যিকারের মানুষ ভেবে কি আনন্দই না পেতাম। যৌবনের তুলনায়, শৈশবের তুলনায় এখন আমি আনন্দধনে নিতান্তই নিঃস্ব।* কিন্তু তাই ব'লে কি খেদ করার খুব বেশী কিছু আছে? যৌবনের আনন্দ গেছে, শৈশবের আনন্দ গেছে, কিন্তু তা যৌবনেরই আনন্দ ছিল, শৈশবেরই আনন্দ ছিল। যৌবন, শৈশবের সঙ্গে তাদেরও যেতে হয়েছে। কিন্তু বয়সেরও একটা আনন্দ আছে, তা অত মাতোয়ারা নয়, কিন্তু তাহ'লেও তাই-ই বয়সের আনন্দ। আমি বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদে" পরিণত বয়সের সে আনন্দ নাই।

অম্বুবাচী

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ তিনদিন হল সূর্য নেই দিগন্ত আকাশে,
আজ তিনদিন হল বর্ণ তুলি পড়েনিকো ঘাসে,
আজ তিনদিন হল ঘন কালো গুন্ঠনের তলে
অম্বুবাচী পৃথিবীর চক্ষু দুটি কামনায় জ্বলে।

এই তিনদিন আমি নুয়ে পড়া প্রাবৃট ছায়ায়
কত পথ চলে আসি ক্লান্তপদে দিনান্ত সীমায়,
এই তিনদিন আমি আত্মমাঝে আকুল সন্ধানে
ফিরেছি তাহার পিছে মায়ামৃগী ধরা নাহি মানে।

সব ভুল হয়ে গেছে,—মুক্তা তাই অশ্রু হয়ে ঝরে
ঐশ্বর্যের উপহাস কেঁদে ওঠে মনের প্রান্তরে,
কত তৃপ্ত বসুধার বর্ষাশ্বাসে কাঁপে স্বপ্নাতুরা
শঙ্খে শস্যে ফলে ফুলে পূর্ণ হবে মাতৃত্ব মধুরা।

আজ তিনদিন হ'ল ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত উপবাসী
মানস গুহার ছায়ে শেষবার ফিরে বুঝি আসি।

একটি কথা

শ্রীআশিস দত্ত

একটি জীবন আছে যে জীবনে হিমঘুম নেই
একটি আকাশ আছে যে আকাশে এক তারা জ্বলে
একটি প্রদীপ আছে যে শুধু চিনেছে আলোকেই
তেমনি একটি কথা চিরদিনই স্মৃতি হয়ে দোলে।

একটি কুসুম আছে যে কুসুমে নেই ঝ'রে যাওয়া
একটি শ্রাবণ আছে যে শ্রাবণে শুধু বরিষণ
একটি হৃদয় আছে যে হৃদয় একই সুরে ছাওয়া
তেমনি একটি কথা চিরদিনই রাঙায় জীবন।

একটি আগুন আছে যে আগুন নেভেনা কখনো
একটি সাগর আছে যে সাগরে কেবলি জোয়ার
একটি আবেগ আছে যে আবেগে বাঁধা নেই কোনো
তেমনি একটি কথা খুঁজে খুঁজে চিরঅভিসার।

মনের গুহায় কতো রাত আসে হিংস্র কুটিল
কতো অসহায় দিন ভীরু পায়ে ফেরে কাছে এসে
একটি আশার ডানা চিরদিন তবু ঝিলমিল
বিদিশার পথে ছোটে একটি কথার উদ্দেশে।

জালে

অরুণ সরকার

প্রকান্ড এক মাকড়সা তা'র
চারদিকে জাল বোনে,
জড়িয়ে গেছি আমরা ক'জন
এ কোণে ঐ কোণে।
তার ভিতরেই নাচা-গাওয়া,
তার ভিতরেই থাকা,
তার ভিতরেই মাঝে মাঝে
ভগবানকে ডাকা।
ভগবান? হ্যাঁ, মাকড়সাটার
নাম দিয়েছি ওই;
তারি দোলায় দুলি, আবার
তারি আঘাত সই।

পাখী

জগন্নাথ চক্রবর্তী

এত যে পাখী আকাশে ওড়ে এত যে পাখী বনে
কোথায় সেই পাখী যে রয় মনে?
অন্ধকার ছায়ার ঘোর সন্ধ্যা ঘেরা ঘেরা—
কতো না প্রাণ বারংবার আঁধারে বাঁধে ডেরা
কতো যে নদী প্রবহমানা আপন কলতানে
বসুন্ধরা কতো যে যাদু জানে!

সমুদ্রের নীলাভ ঢেউ ঝিনুক দেয় ঢেলে
মাছেরা দেখে অবাক চোখ মেলে।
চিল্কা হ্রদে মেঘলা দিনে মেঘের সমারোহ
কি জানি মন-কেমন-করা কে জানে কোন মোহ।
জেলেরা জানে জলের টান, জালের টান কেউ
জানে না হায়, জানে না কোনো ঢেউ।

বেদনাভরা কাজলচোখ নীরবে খোঁজে দীপ
অন্ধকারে আকাশ পরে তারায় জ্বলা টিপ,
ঝড়ের রাতে বারংবার প্রদীপ দিশাহারা
কোথায় সেই চতুর্দশী কোথায় সেই তারা?
বনের কোণে পুঞ্জীভূত জোনাকি দেয় সাড়া
বন্ধ দ্বারে হঠাৎ লাগে নাড়া।

গভীর টানে কে যেন টানে, কে যেন কয় কথা
কি যেন সুখ, কি যেন এক ব্যথা
কিছুটা তার অনুচ্চার কিছুটা তার ভাষা
নিরাশা ঘেরা বুকের তলে অন্তহীন আশা
কতো না পাখী আকাশে ওড়ে কতো না পাখী বনে
তবুও খুঁজি যে-পাখী রয় মনে।

লালপরী নীলপরী

আশরাফ সিদ্দিকী

পরীরা কোথায় আজ? কত পরী লাল নীল পরী—
দিদিমার ছড়া থেকে ঘুমের চোখের পাতা জুড়ে'
প্রজাপতি পাখা মেলে গুন্ গুন্ ছড়িয়েছে সুর!
কৈশোর চোখের নীলে ফাগুনের ডালা ভরা ফুল
ঢেলে দিয়ে অকস্মাৎ আকাশের রামধনু মেঘে
একটি সোনার কাব্য রূপকথা অবাক নূপুর
সহসা শুনিয়ে গেছে! এতো ফুল এতো পাখী গান
সে সব পরীর সাথে দিনে দিনে হয়েছে অম্লান!
সে সব পরীরা কই? একদিন হিসেবী যৌবনে
জ্যামিতির পাঠ নিতে অকস্মাৎ হেসেছি খানিক!
প্রাজ্ঞ হাসি! যে হাসিরা বয়সের বাট্‌খারা ধ'রে
অঙ্কের চাবুক দিয়ে মেপে মেপে করেছে শাসন
আমার বিষয়ী মন! তবু চাঁদ জ্বলা কোন রাতে—
নেবেছে আশ্চর্য রঙ! এসেছে স্বপ্নের প্রজাপতি!
কুটিল কঠিন রোদ! রোগ শোক দুঃখ ভারাতুর
হতাশ মনের নীরে তবু এক আশ্চর্য তরণী
কখনো কখনো ভাসে! সেই নায়ে কুঁচের বরণ
কেশবতী চুল বাঁধে! গান গায়। সুরভি ছড়ায়।

বস্তুবাদী হে জীবন, ঘাসের শিশিরে কভু তুমি
দেখনিকি মণিপান্না রূপছন্দা আশ্চর্য কবিতা!!

বেড়ানো

নিজন দে চৌধুরী

এবার পথটুকু নিঝুম নিরালায়,
এবারে এসো, হাতে হাত মেলাইঃ
গানের মেঘে-ঢাকা দুপাশে ঝাউবন—
চলোনা, কিছুদূর বেড়াতে যাই!

ভুরুর মত বাঁকা কাঁকুরে মেঠোপথ,
এখানে ঘুম-ঘুম ঘুম-পাহাড়;
চাঁদের কৌটোটা, এখনো বন্ধই—
সিঁদুর পরেনিত' অন্ধকার।

রিক্সা-ট্রাম-বাস, নগর-কোলাহল
এখানে আজ তারা সব বিলীনঃ
এখানে শিরিশিরি পাতার মর্মর...
আকাশ লালে লাল, গোধূলি দিন।

সময় একটুইঃ জীবন কতটুক?
ঘড়ির কাঁটাটাও বন্ধ থাক।
চলোনা, গোটাকয় কথার স্বাক্ষর
চলার পায়ে পায়ে জড়ানো থাক।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

আজকাল যেন 'বৈদ্যুতিক ঘড়ি' নিতান্ত মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে 'বেতার-ঘড়ি' বলতে কিছু নতুনত্ব পাওয়া যায়। এই ঘড়ি বিনা তারে চলে। বাতাসের মধ্যে যে তড়িচ্চুম্বকীয় স্পন্দন জাগে তারই সাহায্যে এই ঘড়ি নির্ভুলভাবে চলে। বাতাস থেকে ঐ
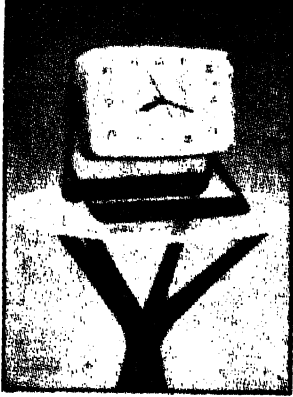
বেতার ঘড়ি

তড়িচ্চুম্বকীয় স্পন্দন সংগ্রহ করে, যে পদ্ধতিতে রেডিওর শব্দতরঙ্গ বর্ধিত করা হয় ঠিক সেই পদ্ধতিতেই এই ঘড়ি নির্ভুল সময় দিতে থাকে।

*

প্যারিসের যাদুঘরের অধ্যক্ষ প্রফেসর জ্যাক্‌স্ বেরলিওস্ দুমাসের জন্য ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে বন্য পশুপক্ষীদের বন্য জীবন ধারার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আসেন। আসার পথে করাচীতে একটি পাখী, তার জাহাজের চারিদিকে শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পান। ঐ পাখীটি তিনি সংগ্রহ করেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখেন যে, এটি একটি নতুন ধরনের সামুদ্রিক পক্ষী অর্থাৎ সাধারণভাবে যাকে 'সী গাল্' বলা হয়। এক বৎসর আগে আর একটি ফরাসী অভিযাত্রী দল এডেনের কাছে সমুদ্রের ওপর ঠিক এই রকম আর একটি পাখী উড়তে দেখেন এবং তাঁরাও এটি সংগ্রহ করে প্যারিসের যাদুঘরে পাঠিয়ে দেন। পাখীগুলো কালো রঙের আর খুব শান্ত, এদের কলকাকলি বেশী শোনা যায় না। পক্ষীতত্ত্ববিদেরা আজ পর্যন্ত এদের ডিম পাড়ার স্থানের কোনও হদিস পাননি। প্রফেসর বেরলিওস্ বলেন যে, এই জাতীয় পাখী প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু এ পর্যন্ত এগুলোকে ভারত মহাসাগরে "পেট্রেল" পাখী মনে করায় এদের কখনও ধরা হয়নি। এখন ইনি এই নতুন 'সী গাল্'কে আরবীয় 'পেট্রেল' বলে মনে করেন।

*

আধুনিক 'শিশুপালন শাস্ত্রে' 'লাঠ্যৌষধি' কথাটি নেই। দুরন্ত দুর্দান্ত অবাধ্য শিশুকেও মারধোর করার রীতি আজকাল চলে না। অবশ্যই শিশুর স্বভাবের পরিবর্তন চাই। মনস্তত্ত্ববিদগণ এসম্বন্ধে নতুন নতুন ব্যবস্থা দিচ্ছেন। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারি একরকম নতুন অষুধের সাহায্যে দুর্দান্ত ছেলেকে দমন করা হচ্ছে। লাঠির পরিবর্তে শিশু দমনের নতুন অষুধটির নাম দেওয়া হয়েছে "ক্লোরোম্যাজিন"। দেলাওয়ার শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৪৫টি উৎপাতকারী দুর্দমনীয় শিশুকে ক্লোরোম্যাজিনের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং এতে যা ফল পাওয়া গেছে তাতে দুরন্ত শিশুর পিতামাতার মনে বেশ আশার সঞ্চার হয়। থোরাজিন নামক একরকম অষুধ দিয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করা হতো তার থেকেই ক্লোরোম্যাজিন অষুধটি আবিষ্কার করা হয়। ডাক্তারেরা বলেন যে, যে ৪৫টি শিশুর ক্লোরো-ম্যাজিন চিকিৎসা হয় এই শিশুগুলি নিতান্ত দুর্দান্ত ছিল এবং তাদের সংযত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল এবং মনে হতো যে, এরাই বয়সকালে চোর, ডাকাত, খুনে ধরনের হতে পারে। এদের মানসিক চিকিৎসাতেও সংযত করা যায়নি। ক্লোরোম্যাজিন দিয়ে এদের মধ্যে ৩৯ জনের এক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ উপকার পাওয়া যায়। এমনি করে ধীরে ধীরে তারা ক্লোরোম্যাজিনের সাহায্যে শান্ত শিষ্ট হয়ে ওঠে। তারা বেশ মিলে মিশে থাকতে শেখে, ক্রমে সামাজিক ব্যবহারাদিও বেশ শিখে যায়। এখন শাসনে দমন করা সম্ভব হয়। এর পর থেকে মানসিক চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় তাদের সংযত করা সম্ভব হয়।

*

জল আমাদের একটি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। জল ছাড়া কোন কাজই সম্ভব নয়। জলকে বিশ্ব-জনীন কাঁচা উপাদান বলা চলে। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু তৈরি করতে কি পরিমাণ জলের দরকার হয়, তার কয়েকটির মোটামুটি হিসাব বার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য এই সব বস্তু তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি থাকায় জলের প্রয়োজনও এক রকম হয় না। তবে একটা মোটামুটি হিসাবে এই রকম দাঁড়ায়।

এক টন বস্তু তৈরী করতে		**এত গ্যালন জল লাগে**
বিশুদ্ধ ইস্পাত	...	৬৫,০০০
চটচটে র‍্যায়ন	...	৩৫০,০০০
সাংশ্লেষিক রবার	...	৬০০,০০০
,, অ্যামোনিয়া	...	৯৪,০০০
ক্যালসিয়াম কারবাইড	...	৩০,০০০
ইথিল এ্যালকোহল	...	৪,২০০
সালফেট পাল্প	...	৭০,০০০
সোডা পাল্প	...	৬০,০০০
এক ব্যারেল বস্তু তৈরী করতে		
শোধিত তেল	...	৭৭০
সাংশ্লেষিক ইন্ধন (বিভিন্ন বস্তু থেকে)	...	১১,১৫০ থেকে
	...	৮৭৩

চাওয়া ও পাওয়া

অবাক হলেন। অবাকই শুধু নয়, থমকে দাঁড়ালেন হরিপদ মাস্টার। অবাক হবারই কথা বটে। তবু অবাক হতেন না, আজ থেকে কয়েকটা বছর আগের কথা হলে। তখন এই ডাক কানে বাজতো অহরহই। সেই পৃথিবী ছেড়ে এসেছেন হরিপদ মাস্টার। সেই জীবন ফেলে এসেছেন। মাস্টারির খাতা থেকে নাম কেটে ফেলেছেন হরিপদ মাস্টার। হরিপদ নামের পেছনে আজ আবার জুড়ে রয়েছে বাপের পদবী হরিপদ হাজরা। হরিপদ মাস্টার নয়। ছোটো-বড়, দুষ্টু-ভালো অগুনতি প্রাণবন্ত ছেলেদের দেয়া শ্রদ্ধা আর ভালবাসার ডাক মাস্টারমশাই। এই অনেক চেনা, অনেক শোনা ডাক কবেই তিনি হারিয়ে এসেছেন। তাই অবাক হলেন। অবাকই শুধু নয়, থমকে দাঁড়ালেন হরিপদ মাস্টার। এ-ডাকে অনেকদিনের পর হঠাৎ আজ ডাকল কে আবার?

ফিরে তাকালেন হরিপদ মাস্টার। এক গাদা ভিড় ট্রাম স্টপেজে। ট্রামের আর মানুষের। একগাদা আওয়াজ ট্রাম স্টপেজে। ট্রামের আর মানুষের।

সামনের ট্রাম থেকে নেমে এলো কোটপ্যাণ্ট পরা একজন। একমুখ হেসে এগিয়ে এলো হরিপদ হাজরার দিকে।

চিনতে পারছেন মাস্টার মশাই? আমি কিন্তু আপনাকে ট্রাম থেকে দেখতে পেয়েই চিনেছি।

মাস্টারির খাতায় নাম কাটাবার সঙ্গে সঙ্গে চেনার চোখও হারিয়ে ফেলেছেন হরিপদ মাস্টার। তবু ভালো ক'রে তাকালেন। চশমার গোল কাঁচ দুটোর ভেতর দিয়ে অনেক চাওয়া ঢেলে দিলেন। পনের বছরের মাস্টারিতে কত ছেলে কাছে এসেছে, তার হিসেব নেই। তার হিসেবও করেন নি হরিপদ মাস্টার। চেনা কি সবাইকে যায়! মনে কি রাখা যায়ও ওদের সবাইকে! তবু স্মৃতির অতলে অবগাহন ক'রে খুব তাড়াতাড়িই খুঁজে পেলেন ছেলেটিকে। এতো তাড়াতাড়ি খুঁজে পেয়ে খুশীই হয়ে উঠলেন হরিপদ মাস্টার।

তুমি সুকুমার না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুশী হয়ে উঠল সুকুমার। মাথা নীচু ক'রে হাত দুটো পায়ে ছোঁয়ালো।

ভালই লাগল ওর এই ভক্তি হরিপদ মাস্টারের। গুরুভক্তি আজকাল পৃথিবী থেকে উঠেই গেছে একরকম। ছেলেরা বড় হলে প্রায়ই ভুলে যায় মাস্টারকে। দেখা হলেও চিনতে চায় না। পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলেই যেতে চায়। ওদের দলে এ ছেলে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ভারি ভালো লাগল সুকুমারকে হরিপদ মাস্টারের।

তারপর, কেমন আছ সব? ভালোতো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘাড় নাড়ল সুকুমার। আপনি ভাল আছেন স্যার?

আছি এক রকম। চলে যাচ্ছে কোন-রকমে। হাসলেন হরিপদ মাস্টার। ছোট্ট একটু। বিষণ্ণতায় জড়ানো হাসি। আর কটাই বা দিন।

বারে, আর কটা দিন মানে! প্রতিবাদ করল সুকুমার। কি আর এমন বয়েস হয়েছে আপনার।

জানতেন হরিপদ মাস্টার। প্রতিবাদ করবে সুকুমার। তার জীবনে সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী এই ছেলের দল। এরাতো প্রতিবাদ করবেই। জবাব দিলেন হরিপদ মাস্টার। আর একটু দীর্ঘায়িত

চ্ললেন বিষণ্ণ হাসিটাকেই। এতো বড় য়েছে, তবু আগের মত বোকাই রয়ে গছে সুকুমার। বোকাই রয়ে গেছে। াঁচবার হিসেব কি শুধু বয়েস দিয়েই য়? অভাবের হিসেব কি শুধু চোখের লেই হয়?

সুকুমার একটু ইতস্তত ক'রে প্রশ্ন রল, আপনার কি তাড়া আছে স্টারমশাই?

তাড়া? না, তাড়া কিসের আর।

তবে চলুন না, ওই হোটেলটায় বসি। খানে এভাবে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর গল্প রা যাবে?

বেশ, চলো।

টেবিলের সামনে ওর মুখোমুখি সলেন হরিপদ মাস্টর। অনেকদিন াগের হারিয়ে যাওয়া সেই ছেলেটা। াজ এতদিনের পর হঠাৎ ডাক দিয়ে াছে এসে ছিঁড়ে আনল সুকুমার ফেলে-াসা সেই জীবনের দুরন্ত সুরগুলো। 'রে দিল হরিপদ মাস্টারকে হঠাৎ লোমেলো।

কি খাবেন স্যার?

কি আবার, চা আনাও।

শুধু চা?

আর কি খাব?

বারে, কত জিনিস পাওয়া যায়।

খাবার বয়েস এখন কি আর আছে আমাদের? সে কবেই পেছনে ফেলে এসেছি।

না না, ওসব বললে শুনব না স্যার।

শুনবে না। জানতেন হরিপদ মাস্টার। সেই ছোট্ট সুকুমার তো আর এখন নেই। অনেক বড় হয়েছে সে। বড়ই শুধু নয়, জ্ঞানবুদ্ধিও হয়েছে। শুনবে কেন?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুধালেন হরিপদ মাস্টার, কি করছো আজকাল?

বার্মা শেলে ভালো একটা চাকরি পেয়েছি স্যার।

ভালো। এখানে তো মাইনে টাইনে বেশ ভালোই দেয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেকে কামড় দিল সুকুমার। আমি এখন প্রায় সাড়ে পাঁচ-শো পাচ্ছি।

ভালো ভালো, খুব ভালো। বুকটা ভরে উঠলো মাস্টারের অনেক দিনের পর। ভরবে না? তারই তো ছাত্র সুকুমার। তারই হাতে গড়া। সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনে পাচ্ছে সুকুমার। কিন্তু টাকার অংকটাই বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় হল জীবনে প্রতিষ্ঠা। ভালো ভালো, খুব ভালো। তারপর পড়াশোনা কদ্দুর করেছিলে?

কোনরকমে বি এ-টা পাস করলাম। পড়াশোনা আমার সয়না। আপনি জানেনই তো স্যার। বলতে গিয়ে লজ্জাই পেল একটু সুকুমার। আর গ্র্যাজুয়েট না হলে আজকাল চাকরি পাওয়াই শক্ত।

সুকুমারের এই লজ্জাটুকু আজ ভারি ভালো লাগল হরিপদ মাস্টারের। আজ বড় হয়েছে সুকুমার। ছেলেবয়েসের কুকর্মের কাহিনী শোনাতে লজ্জা তো পাবেই। কিন্তু সেদিন ওর লজ্জা ছিল না একেবারেই। ওই বয়েসে কারই বা থাকে। আর ওরা তখন কতটুকুই বা। একটুও পড়ায় মন বসত না সুকুমারের। খালি দুষ্টুমি, খালি খেলে বেড়ানো। কতদিন কান মলে দিয়েছেন, কতদিন বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

জানেন বৈকি হরিপদ মাস্টার। জানেন না? সেই দুরন্ত দুষ্টু ছেলেটা আজ কত বড় হয়ে গেছে, কত শান্ত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন করল সুকুমার, আপনি কলকাতায় কদ্দিন এসেছেন স্যার?

আমি। তা বছর তিনেক হবে।

বলেন কি, এদ্দিন? জানতাম না।

জানাইনি কাউকে। ইচ্ছে করেই। হাসির বিষণ্ণতায় একটু বুদ্বুদ ছড়ালেন হরিপদ মাস্টার।

আর সত্যিই তাই। জানানিনি কাউকে। তবু জানাবার মত কাছে ছিল না কেউ। জানবার মত উদ্গ্রীবও কাছে ছিল না কেউ। কোথাকার কোন স্কুলের কোন মাস্টার চাকরি ছেড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল, এ খবর রাখবে কে? এ খবরে কোন রোমাঞ্চ নেই, বৈচিত্র্য নেই। ছিল না সেদিন, আজও নেই। পনের বছরের মাস্টারি। এই পনের বছরে কত ছাত্রই না পড়িয়েছেন তিনি। কত হবে? পনের হাজার? হয়তো তারও বেশী। এদের মধ্যে কত ছেলে কত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। জানেন না তিনি। জানা সম্ভবও নয় সকলের সব খবর। তবু আশা বেঁচেছিল মনের কোণে এই পনের হাজারের একজনও কোনদিন বার করবে না খুঁজে মহানগরীর জনারণ্যের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া নামহীন নগণ্য হরিপদ মাস্টারকে?

আপনি এখন কোন স্কুলে কাজ করছেন স্যার? আবার প্রশ্ন করল সুকুমার।

স্কুল আর নয়। মাথা দোলালেন হরিপদ মাস্টার।

মানে? স্কুল মাস্টারি আর করেন না? সুকুমার অবাক।

অবাক হবারই কথা। জানতেন তিনি জবাবটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভালো হ'ত। কিন্তু পারলেন না। আজ না হয় হরিপদ মাস্টার আর মাস্টার নন, কিন্তু পনের বছর ধরে তো মাস্টারি করেছেন। ছাত্রের সামনে হঠাৎ মিথ্যে বলতে আটকে গেল বলাটা। আটকে গেল গলাটাও। আস্তে বললেন, না।

তবে কি করছেন আজকাল?

বুড়ো বয়েসে একটা চাকরি পেয়েছি। বললেন হরিপদ মাস্টার। দেশের স্কুলে চাকরি করলাম পনের বছর। বাকী ক'টা দিনও ওই স্কুলে কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। আশ্চর্য মায়া পড়ে গিয়েছিল। পনের বছরের ভালবাসা কাটানো কী শক্ত! তবু কাটাতে হ'ল। সবাই পালালো একে একে। টিঁকে ছিলাম শেষ পর্যন্ত। তবু পালাতে হল। হয়ত থাকতে পারতাম। কিন্তু মজা আর পেতাম না পড়ানোতে। সেই আনন্দ, সেই পরিবেশ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। স্কুলের চারপাশে প্রাণবন্ত জীবনের দুরন্ত চঞ্চলতায় কেমন যেন ঘুণ ধরল। থামলেন হরিপদ মাস্টার। পেয়ালার শেষ চা-টুকু এক চুমুকে শেষ করলেন। এখানে মাস্টারি একটা পেয়েছিলাম। মাইনে বড় কম। এ মাইনেতে দেশে চলে যেতো, কলকাতায় তা বলে চলতে পারে না। অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে একটা চাকরি পেলাম। মন্দ নয়। অন্তত মাস্টারির চাইতে ভালো।

একটুও ভালো নয়। বলে উঠল সুকুমার। মাস্টারি ছাড়া আর কিছুতে আপনাকে মানায় না মাস্টারমশাই। আর কিছু আপনি পারবেন না। যে লোক পনের বছর ধরে এক কাজ ক'রে এসেছে, নতুন কোনো কাজে তার মন বসতেই পারে না। এ আপনি বললেও আমি বিশ্বাসও করব না মাস্টার মশাই।

বিশ্বাস করবে না সুকুমার। জানতেন হরিপদ মাস্টার। জানতেন বৈকি। তার জীবনে সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী এরাই তো। এই ছেলের দল। এদের মত আর কেউ জানে না তাঁকে, চেনে না তাঁকে। এরা অবাক হবে না তো হবে কারা? পনের বছরের মাস্টারিতে এদের পেয়েছেন তিনি। হরিপদ মাস্টারের মাস্টারি ছাড়াতে দুঃখ পাবে বৈকি এই সুকুমারের মত অসংখ্য ছেলের দল যারা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। যাদের তিনি ভালবেসেছেন, বকেছেন, ধমকেছেন পনেরটা বছরের প্রত্যেকটা দিন। যারা আজও দেখতে পেলে মাস্টার মশাই বলে কাছে আসবে। মাথা নীচু ক'রে পায়ের ধুলো নিতে আজও যাদের সম্মানের হানি হবে না। পনের বছর ঘর করেও যা আজও বোঝে নি কল্যাণী। বুঝবেও না কোন দিন। ও আক্ষেপ ক'রে এলো চিরটা কাল। সেই আক্ষেপ আজও। মাস্টারি ক'রে কি যে তুমি পেলে ঘোড়ার ডিম। না কোনদিন সুখের মুখ দেখলাম, না টাকার। অন্য চাকরিতে ঢুকলে এতদিনে কিছু না কিছু হতই। মাস্টারিতে হ'ল না কিচ্ছুই। কি যে তোমার হয়েছিলো ভীমরতি বাপু, জানি না। জবাব দেন নি হরিপদ মাস্টার। কোনদিনই দেন নি। আজও দেন না। কি জবাবই দেবেন বা? তবু কল্যাণীকে কোনদিনই দোষ দেননি হরিপদ মাস্টার। কোনদিনই না।

সুকুমারের কথায় বুকটা টনটন ক'রে উঠল। চোখ দুটো ভরে এলো জলে। ছাত্রের সামনে আর বসে থাকতে কেমন যেন অস্বস্তিই লাগল। উঠে দাঁড়ালেন হরিপদ মাস্টার।

এবার যাই তাহলে। কাজের লোক তুমি, অনেকক্ষণ তোমার সময় নষ্ট করলাম সুকুমার।

না না, সময় নষ্ট কি। এদ্দিন বাদে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি আনন্দ হ'ল স্যার।

হাসলেন হরিপদ মাস্টার। প্রশান্তির হাসি। আনন্দ কি আমারও কম হয়েছে সুকুমার।

একদিন কিন্তু আমার ওখানে আপনাকে যেতে হবে স্যার।

যাব বৈকি, নিশ্চয় যাব।

কবে যাবেন? এই রোববার আসুন না।

এই রোববার? দেখি।

এতে দেখাদেখির কিছুই নেই স্যার। আপনার ঠিকানাটা দিন, বিকেলে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দোব।

না না, গাড়ি কেন? গাড়ির দরকার নেই। তার চেয়ে বরং তোমার ঠিকানাটা দাও, আমি পৌঁছে যাব।

ঠিক আসবেন। মনে থাকবে তো?

থাকবে। ঠিকানা লেখা কাগজটা মুড়তে মুড়তে হাসলেন হরিপদ মাস্টার। হাসির বিষণ্ণ ছায়ায় রোদের একটু ঝিকিমিকি।

সুকুমারকে তোমার মনে আছে? বাড়িতে ফিরে জামাটা ছাড়তে ছাড়তে শুধালেন হরিপদ মাস্টার।

কোন সুকুমার? রান্নাঘরের কোণ থেকে মুখ বাড়ালো কল্যাণী।

সেই যে দুষ্টুমি ভরা দস্যি ছেলেটা। আমাদের দেশের বাড়িতে বার কয়েক এসেছিল।

কি জানি বাপু মনে নেই। তোমার ছাত্রতো আর একটা নয়, পাল পাল। মনে রাখবার যো কি।

মনে নেই কল্যাণীর। মনে থাকবারও কথা নয়। ওর দোষ কি। তিনিও তো ভুলে গিয়েছিলেন। পনের বচ্ছরের সুদীর্ঘ মাস্টারি জীবনে কতই না ছেলে কাছে এসেছে। মনে কি রাখা যায়! মনে কি রাখা সম্ভব! তবু ভালো ছেলে ছিল না সুকুমার। ভালো ছেলেদের নামের তালিকায় কখনো সুকুমারের নাম ওঠেনি। তাই কি ওকে সহজে মনে পড়েনি? তাই কি? কিন্তু এ পক্ষপাত উচিত নয়। সব ছাত্রই মাস্টারের কাছে সমান। তা সে ভালোই হ'ক বা মন্দ।

কেন, হয়েছে কি সুকুমারের? এবার প্রশ্ন তুলল কল্যাণীই।

না না, হবে আর কি। আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তাই বলছিলাম। কদ্দিন বাদে দেখা। খাটের কোণটায় পা ছড়িয়ে বসলেন মাস্টার। কতটুকুই বা ছিল তখন। এখন কত বড়ই না হয়ে গেছে। ছোটবেলায় কি দুরন্ত ছিল ছেলেটা। কত মারধোরই না করেছি। আর এখন কত শান্তই না হয়ে গেছে।

যে ছেলে বাচ্ছাবেলায় যত দস্যি থাকে, বড় হলে সে তত শান্ত হয়ে যায়। কল্যাণী জানালো।

হয়ত হয়। হয়ত তাই। মনে মনে ভাবলেন হরিপদ মাস্টার। পুরানো দিনের একগাদা রঙগীন ছবিতে ঝিমিয়ে গেলেন হঠাৎ যেন। তারপর বললেন, দেখা হল, সুকুমারের সঙ্গে আজ হঠাৎ। আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু ও ঠিক দেখতে পেয়েছিল আমায়। কাছে এসে মাস্টার-মশাই বলে ডেকে পায়ের ধুলো নিয়ে ও আমাকে অবাকই করে দিল। কদ্দিন বাদে দেখা। আমিই বরং ভুলে গিয়ে-ছিলাম মুখটা ওর, কিন্তু ও ঠিক দেখেই চিনতে পেরেছে আমায়। ভারি ভদ্র হয়েছে ছেলেটা এখন।

বারে, কি যে বল। কল্যাণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মাস্টারকে চিনতে পারবে না।

কল্যাণীর মুখে একথা শুনে ভারি ভালো লাগল মাস্টারের আজ। একটু হেসে বললেন, শুধু দেখাই নয়, জোর করে টেনে নিয়ে গেল একটা হোটেলে। বললে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর গপ্প করা যায়, হোটেলে বসে খেতে খেতে কথা কইব। তাইতো এতো দেরি হ'ল।

গুচ্ছের খেয়ে এসেছো বুঝি?

জোর করেই খাওয়ালো সুকুমার। বললাম, খাওয়ার বয়েস কি আমার আছে। তা কথা শুনলেতো।

কাজটাজ কি করে ও?

ভালো চাকরিই করে। বার্মাশেলের একজন অফিসার। প্রায় সাড়ে পাঁচ শোর মত মাইনে পায়। মটরও আছে।

তবেতো বেশ বড়লোকই।

তা বলতে পার। হরিপদ মাস্টার গর্বের হাসি হাসলেন। কিন্তু কি ছিল সেদিন ছেলেটা। পড়াশোনায় একটুও ভালো ছিল না। খালি দস্যিপনা আর মারধোর করে বেড়াতো। বেশ মনে আছে।

ওই রকমই হয়। বলে উঠলো কল্যাণী। ছেলেবেলায় যারা খারাপ ছেলে থাকে, পড়াশোনায় মন না দিয়ে খেলে বেড়ায়, বড় হলে ভালো চাকরি তারাই পায়। পড়ে পড়ে ছেলেরা শুধু কুনো হয়ে পড়ে। ওদের দিয়ে কিছু হয় না।

মনে মনে হাসলেন হরিপদ মাস্টার। হয়তো সত্যি কল্যাণীর কথা, কিন্তু সব সত্যি নয়। পড়াশোনা একেবারে বাদ

দিলেই কি সত্যিকারের ভালো ছেলে হওয়া যায়? যায় না। তারপর আবার সুকুমারের প্রসঙ্গেই নামলেন। ভালো চাকরি করছে, কিন্তু দেমাক নেই একটুও।

তাইতো দেখি। কিন্তু এসব শুনে কি হবে। আসল কাজের কাজ কিছু করতে পারলে?

আসল কাজের কাজ। একটু অবাকই হলেন মাস্টার। কি কাজ?

বড়লোক ছাত্র গুরুদক্ষিণা দিল কিছু?

গুরুদক্ষিণা আবার কিসের। হো হো করে হেসেই উঠলেন হরিপদ মাস্টার।

হেসো না। তোমার ন্যাকরা দেখলে গা জ্বলে যায়। পনের বচ্ছর ধরে কি করে যে তুমি ছেলে পড়িয়েছো এই বুদ্ধি নিয়ে ভাবলে আশ্চর্যই লাগে।

একথা তুমিই শুধু বল।

বলব না? কল্যাণী কণ্ঠে ঝাঁঝ ফোটালো। এক বড়লোক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল কদ্দিন বাদে, ও যেচে তোমার সঙ্গে আলাপ করল, আপ্যায়ন করল— আর এমন একটা সুযোগ পেয়ে কাজের কাজ কিছুই করতে পারলে না তুমি।

কাজের কাজটা কি শুনি?

কি আবার। ন্যাকরা দেখলে গা জ্বলে যায়। কিছু টাকাকড়ি তো চাইতে পারতে। ছেলেটাকে ছোটবেলায় তুমি মানুষ করেছো। ও যখন খেলে বেড়াতো, পড়ায় মন দিত না, তখন ওকে তুমি বকেছো মেরেছো। আদরও করেছো। সেতো ওর ভালোরই জন্যে।

তা করেছেন তিনি। অস্বীকার করেন না হরিপদ মাস্টার। তিনি নিজের কর্তব্যই করেছেন। সে কর্তব্যের দাবী তো কিছু নেই। তবু চাইতে তিনি পারতেন। অবশ্যই পারতেন। দিতে পারতো বৈকি সুকুমার। এখন অনেক বড় হয়েছে। ভালো উপায় করছে।

কি, চুপ করে কেন? চেয়েছিলে?

না, মানে, সময়ই হল না। মানে।

জানি। তোমায় নিয়ে সংসার করা এক ঝকমারি। কবে যে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে তোমার। ছাত্র এসে পায়ের ধুলো নিল, দু'চারটে মিষ্টি কথা বলল, আর অমনি তুমি গলে গেলে। বলি নিজের কথা কিছু কি শুনিয়েছিলে, না ছাত্র পেয়ে আনন্দে বিভোরই হয়ে পড়েছিলে?

না, না, শুনিয়েছি তো। ওইতো নিজের থেকে সব জিজ্ঞেস করলে আমি কি করছি না করছি।

তা শুনে কি বলল?

আমি আর মাস্টারি করি না শুনে অবাক হয়ে গেল। হবেই তো। সত্যি কারের যদি কেউ আমাকে ভালবেসে থাকে তো এই ছেলেরই দল। আমি আর মাস্টার নেই শুনে ওরা দুঃখ না পেয়ে পারে।

দুঃখ পেয়ে করলটা কি শুনি ঘোড়ার ডিম? গরীব মাস্টারকে দিল কি দু' দশ টাকা? ওরা ভালো চাকরি করে টাকা রোজগার করুক আর মাস্টার এদিকে মরুক না খেয়ে। ওদের আর কি।

না, না, তা নয়। মানে...

থামো দিকি। বলতে দিল না কল্যাণী। ধমকেই উঠল। যা হবার তাতো হয়েইছে। যাকগে। বলি ঠিকানাটা নিয়ে এসেছো তো না ও বুদ্ধিটাও ঘটে আসেনি?

না, ঠিকানা দিয়েছে।

তবু ভালো। শোনো, আর একদিন বাড়ীতে যাও। নিজেদের অবস্থা বুঝিয়ে বল। সাহায্য কিছু চেয়ে নিয়ে এস। আর অরুণের একটা চাকরির কথাও বলে এস। বড় অফিসার হয়েছে, কোথাও যদি ঢুকিয়ে দিতে পারে। তা কি পারবে না।

চুপ করে শুনে গেলেন হরিপদ মাস্টার।

কি, বুঝলে কিছু?

হুঁ। ঘাড় নাড়লেন হরিপদ মাস্টার। এই রোববারই যাব। আমায় নেমন্তন্ন করেছে সুকুমার। বার বার করে আসতে বলেছে।

তবেতো আরোই ভাল হল।

ও মটর পাঠাবে বলছিল। আমিই বারণ করলাম। কি দরকার। বাসেই চলে যাব। কতটুকুই বা রাস্তা।

তা বারণ করবে না কেন। কল্যাণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। মটর আর কি সহ্য হবে তোমার। তুমি যে এরোপ্লেনে যাওয়া-আসা কর।

না, না, সেজন্যে নয়। সুকুমার কাজের লোক, গাড়ির সব সময়েই দরকার— আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে কাজের ক্ষতি করবে কেন। তাই বললাম।

থামো। ওর কাজের কথা ও বুঝবে। তা নিয়ে তোমার অতো মাথা ব্যথা কেন? ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, কিন্তু তোমার মত—

আসুন স্যার। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল সুকুমার। বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল ও। বাড়ি খুঁজে বার করতে কষ্ট হয়নি তো?

না না। হাসলেন হরিপদ মাস্টার। আর কষ্ট হলেও তিনি কি বলতেন নাকি।

চলুন স্যার, ভেতরে চলুন।

ভেতরে নিয়ে গেল সুকুমার মাস্টারকে। বাড়ির সব ঘরগুলো দেখালো। অনেকগুলো ঘর। প্রত্যেকটা ঘরই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চমৎকার সাজানো।

ভারি ভালো লাগল মাস্টারের। জিজ্ঞেস করলেন, নিজের বাড়ি বুঝি?

আজ্ঞে না, কোম্পানীর কোয়ার্টার। আসুন।

তারপর সুকুমার একটা ঘরে বসাল মাস্টারকে নিয়ে। ওপরে ফ্যান ঘুরছে, ইলেকট্রিকের আলোয় নীলাভ-জ্যোতি। গদি-আঁটা স্প্রীংয়ের নরম সোফায় ডুবে যেতে কেমন যেন অস্বস্তিই লাগছিল মাস্টারের।

সাড়া পেয়ে ঘোমটা টানা এক মেয়ে ঘরে ঢুকল। মাথার কালো চুলের মাঝখানে সিঁদুরের লাল দাগ। হাসি-খুশি জড়ানো, চঞ্চলতা ছড়ানো মিষ্টি মেয়ে।

এই আমার স্ত্রী শ্যামা, মাস্টার-মশাই।

নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল শ্যামা। বললেন হরিপদ মাস্টার, সুখে থাকো মা।

সামনের সোফায় বসে শ্যামা বললে, আপনার নাম আমি অনেকবার শুনেছি।

হাসলেন হরিপদ মাস্টার। একটু। কি বলেছে সুকুমার? আমার খুব নিন্দে করেছে বুঝি?

নাতো।

বলেনি যে আমি খুব মারধোর করতুম?

নাতো। কেন মারধোর করতেন? পড়াশোনা কিচ্ছু করত না, কিচ্ছু পারত না—দিনরাত শুধু খেলে বেড়াতো, তাই না?

তাই। হাসলেন হরিপদ মাস্টার।

কই, এসব তুমিতো আমায় কিচ্ছু বলনি। শ্যামা সুকুমারের দিকে তাকাল।

বারে, এতে আর বলাবলির কি আছে। ছোটোবেলায় স্কুলে কেনা মার খায়! তুমিও কি খাওনি? বলল সুকুমার।

একটুও না। সংগে সংগে প্রতিবাদ করল শ্যামা।

বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস না হয়, আমাদের দিদি-মণিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। ছোটোবেলায় আমি খুব শান্ত ছিলাম।

শান্ত না হাতি। জানেন স্যার, এর মত দস্যি মেয়ে দুটো নেই। এখন কি লক্ষ্মী দেখছেন।

ওমা, কি মিথ্যুক। শ্যামা কালো চোখ দুটোর কালো কাজলে দুরন্ততার ছায়া নামালো। দিননা মাস্টার মশাই, ছাত্রটির কান দুটো আচ্ছা করে মলে।

ভারি ভালো লাগছে। ভারি আমোদ পাচ্ছেন এদের দুজনের এই মিষ্টি ঝগড়ায় হরিপদ মাস্টার। দুঃখ, কান্না, অভাব, অত্যাচারের বাইরে এ যেন এক নতুন পৃথিবী।

জানেন মাস্টার মশাই, আপনার এই ছেলেটি আগের মতই আছে। আগে পড়া করত না, এখন সংসারের কাজ কিচ্ছু করে না।

কেন সুকুমার? হরিপদ মাস্টার তাকালেন।

বারে, করিনা মানে? করিতো।

না মাস্টার মশাই। কোনদিকেই দেখে না। খালি অফিসটা করেই খালাস। দিনতো মাস্টারমশাই, আচ্ছা করে বকে। শ্যামার চোখেমুখে কৌতুকের ছায়া।

হয়তো বকতেই যাচ্ছিলেন হরিপদ মাস্টার। হঠাৎ বাইরে কলহাসির ঢেউ উঠল। একটু বাদেই সে ঢেউ ঘরে এসে আছড়ে পড়ল। দুটো ছোট ছেলে দৌড়ে ঘরে ঢুকল। কালো দুষ্টুমিভরা চোখ, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল। ঘরে নতুন অচেনা একজনকে দেখে কলরবের উচ্ছ্বসিত ঢেউ হঠাৎ থমকে গেল।

এ আমার বড়ছেলে রাহুল আর ও হ'ল তারপরের। নাম কুনাল।

বাঃ, ভারি চমৎকার নামতো এদের।

ওদের মা রেখেছে।

এ প্রশংসায় শ্যামা লজ্জা পেলো। পাবেইতো।

যাও, প্রণাম কর মাস্টারমশাইকে। ওদের আদেশ করলো সুকুমার।

প্রণাম করতে আসতেই ওদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন হরিপদ মাস্টার। ভারি প্রাণবন্ত ছেলে দুটো। রাহুলের দিকে তাকালেন। ঠিক সুকুমারের মতই দেখতে। সেদিন সুকুমার ঠিক এতো বড়টাই ছিল।

জিজ্ঞেস করলেন ওকে, কোন ক্লাসে পড় তুমি?

ক্লাস থ্রি।

মন দিয়ে পড়াশোনা কর তুমি?

হুঁ। ঘাড় নাড়ল রাহুল।

মন দেয় না হাতি। শ্যামা বলে উঠল। পাঁচ মিনিটও বই নিয়ে বসলেতো। খালি খেলা। ওই বাপেরই তো ছেলে।

হো হো করে হেসে উঠলেন হরি-পদ মাস্টার।

রাহুল আর কুণাল ফিরে গিয়ে মায়ের পাশে কোল ঘেঁষে বসল। আর ভয় আর কৌতূহল নিয়ে ওই নতুন আগন্তুকের দিকে তাকাতে লাগল বার বার।

সুকুমার বললে, জানেন মাস্টারমশাই, আমাদের দেশ দেখতে শ্যামার খুব ইচ্ছে। আর আমাদের স্কুলটাও ও দেখতে চায়।

বেশতো।

কিন্তু দেখুন না, ও কিছুতেই নিয়ে যেতে চায় না।

কেন সুকুমার?

ওখানে যাবার হাঙ্গামা কি কম। বললেই তো ঝট করে আর বেরিয়ে পড়া যায় না।

তা বটে। তবু নিয়ে যেও। তারপর উদাস হয়ে গেলেন হরিপদ মাস্টার পুরোনো কথা মনে আসতে। কিন্তু কি আর দেখবে মা? সেদিনের সে আনন্দ সেখানে কি আর আছে।

মার কোল ঘেঁষে লক্ষ্মী হয়ে বসে আছে রাহুল আর কুণাল। এক সময় ওদের দিকে তাকিয়ে হরিপদ মাস্টার বললেন, বাঃ, ছেলে দুটি বেশ শান্ত তো।

শান্ত না হাতি! হেসে উঠল শ্যামা। দিনরাত দুটোতে যুদ্ধ করে বেড়ায়। আপনাকে দেখে শান্ত হয়ে বসে আছে মাস্টারমশাই। নইলে এতক্ষণ লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকবার ছেলে নাকি ওরা।

হাসলেন হরিপদ মাস্টারও। দুষ্টুমি করবার এইতো বয়েস মা। এইতো বয়স।

এদের দুষ্টুমিকে সাপোর্ট করলেন তো। ব্যাস্, এর পর আর রক্ষে নেই। শ্যামা জানাল।

হো হো করে হেসে উঠলেন হরিপদ মাস্টার।

তারপর খাবার ঘরে। ব্যবস্থা দেখে অবাকই লাগল।

এ কি কাণ্ড করেছো সুকুমার।

আজ্ঞে আমি নয় স্যার, শ্যামার কাজ। ও যা করে, এই রকম কাণ্ড করেই করে।

কিন্তু মা, এতো ব্যবস্থা করবার কোন দরকার ছিল না। খাবার বয়েস আর কি আমার আছে।

শ্যামা বলে উঠল, বয়েসের দোহাই দিয়ে যদি সব ফেলে রাখেন, তবে আমি কিন্তু খুব রাগ করব মাস্টারমশাই।

তাহলে তো মুশকিল।

শ্যামা সব নিজের হাতে রেঁধেছে স্যার। খেয়ে একটা সার্টিফিকেট দিতেই হবে আপনাকে।

যাও। শ্যামা সুকুমারের দিকে লজ্জার ধমক দিল।

তবে তো সব খেতেই হবে। হাসলেন হরিপদ মাস্টার। এবং খেতে খেতে বললেন, সবক'টা রান্নাই চমৎকার হয়েছে মা।

বলিনি, সার্টিফিকেট আপনাকে দিতেই হবে।

কিন্তু আমার সার্টিফিকেটে কি কাজ হবে? রান্নার তো আমি কিছুই জানি না।

খুব হবে স্যার, খুব হবে।

খাবার টেবিলে ভাব করে ফেলল রাহুল আর কুণাল।

আপনি বুঝি মাস্টারমশাই? কুণাল জিজ্ঞেস করল।

হুঁ।

আমাদের পড়াবেন? তাকাল রাহুল।

না।

তবে?

তোমার বাবাকে পড়াতাম।

বাবাকে? অবাক হল ওরা দুজনেই।

হ্যাঁ। তোমার বাবা যখন তোমাদের মত ছোট্টটি ছিল।

ও। মাথা নাড়ল রাহুল।

আচ্ছা, পড়া না পারলে বাবাকে বকতেন? কুণাল জিজ্ঞেস করল।

হো হো করে হেসে উঠলেন হরিপদ মাস্টার। শুনেছ সুকুমার, তোমার ছেলের কথা শুনেছ।

রাস্তায় নেমে মনে হল মাস্টারের, যেন আলো থেকে অন্ধকারে নামলেন। সত্যিই তাই। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তাইতো, কিছুই যে চাওয়া হল না। এতক্ষণে মনে পড়ল। ইস কত করে বলে দিয়েছিল কল্যাণী। এতক্ষণে একবারও মনে পড়ল না। আশ্চর্য। ওখানে একগাদা হাসি, একগাদা খুশি। ওই হাসিখুশির অফুরন্ত ভিড়েই হারিয়ে গিয়েছিলেন মাস্টার। সত্যি এতো আনন্দ কোথাও দেখেননি তিনি। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা মাস্টারের। তাই কি এতক্ষণ ভুলে ছিলেন চাওয়ার কথা সব? তাই। তাই হবে। নইসে এতক্ষণ মনে কেন পড়ল না? মনে পড়ল আবার রাস্তাতেই নামতে।

এগোলেন মাস্টার। থোকো থোকো অন্ধকার রাস্তায়। গ্যাস পোস্টের তলাতে আলোর ধোঁয়া। কিন্তু মনে পড়লেও চাইতেন কি মাস্টার? চাইতে কি পারতেন? নিশ্চই। চাইবেন না কেন? অভাব তো তাঁর। কে না জানে। আচ্ছা, তিনি না চাইলেও বুঝতে কি পারেনি সুকুমার? জানতে কি পারেনি অভাবের কথা? তখন না হয় ছোটো ছিল সুকুমার। এখন বয়েস হয়েছে, বড় হয়েছে। ও কি জানে না দেশের মাস্টারদের আর্থিক অবস্থার কথা? জানতে কি পারেনি? জানতে কি পারেনি পনের বচ্ছর আধপেটা খেয়ে কি কষ্টে মাস্টারি করেছে হরিপদ মাস্টার? কি কষ্টে মানুষ করেছে হাজার হাজার অশান্ত ছেলেদের? জানে না কি পনের বচ্ছর মাস্টারির পর কি দুঃখে সে কাজ ছেড়ে দিল হরিপদ মাস্টার? দিতে তো পারত্যে কিছু। না চাইলেও। মাস্টারের কুঞ্চিত মুখে অভাব আর অত্যাচারের রুক্ষ দাগ। চোখে কি পড়েনি সুকুমারের? না চাইলেও ওরাই তো সাক্ষ্য দিচ্ছে। জানতে কি পারেনি?

হয়ত পারেনি। হয়ত কেন, সত্যিই। কতই বা বয়েস হয়েছে সুকুমারের। মাস্টারের কাছে ও এখনও আগের মত ছোট্টই। পৃথিবীকে চেনবার, পৃথিবীকে জানবার এখনও অনেক ওর বাকি। সত্যিই তো, অভাবকে জানবে ও কি করে, চিনবে ও কি করে। ওর সংসারে শুধু হাসি আর আলো—কান্নার ছায়া নেই কোথাও। তাই ও চেনে না অভাবকে, চেনে না দারিদ্র্যকে। ওর দোষ নেই। দোষ নেই।

ভালই হয়েছে, চাননি কিছু মাস্টার। ভালই হয়েছে দেয়নি কিছু সুকুমার। ও চেনে না অভাবকে, চেনে না দুঃখকে। কোনদিনই যেন না চেনে। তাড়াতাড়ি পা চালালেন হরিপদ মাস্টার। রাস্তায় কালো অন্ধকার। কান্নার মত কালো। তাড়াতাড়ি পা চালালেন হরিপদ মাস্টার। তাড়াতাড়ি। কোনদিনই যেন অভাবকে না চেনে সুকুমার।
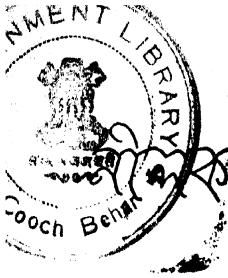
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে ভগিনী শ্রীমতী সরলাবালা সরকার লিখিয়াছেন: স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যে দিন কলিকাতায় উপনীত হন—

"এই দিন আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তখনকার দিনে ঘটা অসম্ভব ছিল। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ এমন পর্দানশীন ছিলেন যে, গঙ্গাস্নানে যাইতে হইলে পাল্কিতে করিয়া তাঁহাদের গঙ্গাগর্ভে নামিয়া স্নান করিতে হইত। কিন্তু সে দিন সেই প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া বিডন স্ট্রীটের চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর পুরমহিলাগণ প্রকাশ্য রাজপথে স্বামীজীকে ধূপদীপ দিয়া আরতি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, স্বামীজীর আগমন সেদিন লোকের মনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

শোভাবাজার "রাজবাড়ীতে" কলিকাতাবাসীরা স্বামীজীকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন—সেই বাড়ীর অধিকারীদিগের সুখচরের বাগানবাড়ীতে পুরমহিলাদিগের স্নানের যে ব্যবস্থা আজও আছে, তাহা উল্লেখিত প্রথার সাক্ষ্য দেয়। বাড়ী হইতে যে সোপানশ্রেণী গঙ্গাগর্ভে নামিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে একটি ঘর। জোয়ারের সময় তাহাতে গঙ্গার জল প্রবেশ করিত (হয়ত এখনও করে), তখন মহিলারা তথায় গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্যার্জন করিতেন।

প্রবন্ধে যে চারুচন্দ্র মিত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম। তখন কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে স্বামীজীর মত লোকের সম্বর্ধনা এবং বহু প্রসিদ্ধ পরিবারে বিবাহ উৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান চারুবাবুর কর্তৃত্ব ব্যতীত অঙ্গহীন হইত। অনেক অনুষ্ঠানে তিনি ব্যবস্থায় মৌলিকতার পরিচয় দিতেন। সেই জন্য তাঁহাকে প্রায়ই এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিতে হইত। তখনও এলাহাবাদই তাঁহার কর্মক্ষেত্র এবং তথায় তাঁহার প্রভাব ও প্রতাপ অসাধারণ ছিল। সেই প্রভাব ও প্রতাপ তিনি তাঁহার পিতা নীলকমল মিত্রের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন।

নীলকমলবাবু হেয়ারের স্কুলে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন।

নীলকমলবাবুর সময়ে বহু বাঙ্গালী কলিকাতায় ব্যবসায়ী ছিলেন। তখনও বাঙ্গালীর ব্যবসাবিমুখ অপবাদ ছিল না এবং বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ—নানা স্থানে বাঙ্গালীরা চাকরি লইয়া, ব্যবসাব্যপদেশে অথবা ডাক্তার, মাস্টার বা উকিল হইয়া যাইতেন, যশ ও অর্থ অর্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বঙ্গমাকে ভুলিতেন না। সেই জন্যই নীলকমলবাবুর কর্মক্ষেত্র এলাহাবাদ হইলেও কলিকাতা (বিডন স্ট্রীটে) তিনি বাড়ী করিয়াছিলেন, আপনার বাসগ্রামকেও ভুলেন নাই। যুক্তপ্রদেশের প্রায় সকল প্রধান শহরে নীলকমলবাবুর ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। এলাহাবাদে তাঁহার গৃহেই তাঁহার সমৃদ্ধির পরিচয় সুপ্রকাশ ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

দেওয়ান রামকমল সেন যখন কোন কার্যোপলক্ষে অযোধ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন কলিকাতা ভবানীপুরের রামধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। রামকমলবাবুই রামধনবাবুকে প্রয়াগে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। "শুনা যায়, প্রথমে তিনি 'ওভারসিয়ারের' কর্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের 'বারিক মাস্টার' এবং শেষে ফোর্টের 'কনট্রাক্টর' হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। রামধনবাবুর ন্যায় ধনীর কথা এলাহাবাদে অল্পই শুনা যায়। **** গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের নিকট তাঁহার ১২ মহল প্রাসাদ ছিল। *** কীডগঞ্জের যমুনার ধারে যে সর্বপ্রথম প্রস্তর নির্মিত সুপ্রশস্ত ঘাট নির্মিত হয়, তাহা রামধনবাবুই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ ঘাটের নাম ছিল 'বাবুঘাট'। দেশবিশ্রুত 'যমুনা-লহরীর' কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় ঐ ঘাটে বসিয়া 'নির্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও' প্রভৃতি প্রাণোন্মাদকারী স্বর্গীয় সঙ্গীতে যমুনপুলিন প্লাবিত করিতেন। *** কথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি (রামধনবাবু) প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। এক্ষণে এলাহাবাদে দুর্গের সম্মুখস্থ 'লালকুঠি' তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে মাত্র। ঐ কুঠি পরে প্রয়াগবাসী চারুচন্দ্র মিত্রের অধিকারে আসিয়াছিল। চারুবাবুর পিতা এলাহাবাদের বিখ্যাত নীলকমল মিত্রের নাম স্থানীয় সকলের নিকট সুপরিচিত। কলিকাতার ইডেন উদ্যানের ন্যায় সুবিস্তৃত গবর্নমেণ্টের উদ্যান 'আলফ্রেড পার্কের' মধ্যস্থলে

স্থানীয় জনগণের সান্ধ্য ভ্রমণ এবং বিশ্রামের জন্য যে পুষ্পবৃক্ষবেষ্টিত ভূমির মধ্যস্থ প্রস্থরবেদী দেখিতে পাওয়া যায় (এক্ষণে যাহা ব্যান্ডস্ট্যান্ড হইয়াছে), তাহা নীলকমল মিত্র মহাশয়ের কীর্তি। ***এ প্রদেশে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার এবং স্কুল কলেজের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, বাবু নীলকমল মিত্র তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন।"

নীলকমলবাবু যেমন অর্থার্জন করিতেন, তেমনই ব্যয় করিতেন। তাঁহার মিত্রালয় তখন সর্বদাই অতিথি সংকারের জন্য প্রস্তুত থাকিত।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যখন এলাহাবাদে গমন করেন, তখন তিনি নীলকমলবাবুর আতিথ্য সম্ভোগ করেন। তিনি পূর্বেই নীলকমলবাবুর পুত্র চারুচন্দ্রের কথা জানকীনাথ ঘোষালের নিকট শুনিয়াছিলেন এবং চারুচন্দ্রের কথা প্রশংসা সহকারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন—

"এলাহাবাদে আমার হেয়ার সাহেবের স্কুলের সমাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাঁহার পুত্র সপ্তদশবর্ষীয় যুবক চারুচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন। তিনি নামেও চারু, কর্তব্যেও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্যজন্য ঐ নামের উপযুক্ত এমত নহেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌজন্য ও অতিথি সেবাজন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকিতে প্রধান আচার্য মহাশয়ের জামাতা জানকীনাথ ঘোষালের মুখে তাঁহার বিবিধ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি অসাধারণ স্নেহভাবের উদয় হয়। পিতৃস্নেহের ন্যায় স্নেহ উদিত হয়। ইঁহার গুণের কথা দেবেন্দ্রবাবুকে লেখাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'চারু যেমন দেখিতে চারু, কর্তব্যেও চারু।' নীলকমলবাবুর বাটীর নাম 'লালকুটী' ছিল। 'লাল কুটীতে' অবস্থিতি কালে পাঁচটি বস্তু আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথম একটা প্রকাণ্ড কাকাতুয়া পাখী। এত বড় কাকাতুয়া পাখী কখনও দেখি নাই। কাকাতুয়া মহারাজ সর্বদা রেগেই থাকিতেন। দ্বিতীয় একটি ভদ্রলোক। ইনি এলাহাবাদের কটোয়াল ছিলেন। তিনি কোন বিপদে নীলকমলবাবুর প্রাণ বাঁচাইয়া দেওয়াতে তাঁহাকে নীলকমলবাবু তাঁহার কর্মচ্যুত অবস্থায় নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় হরিবোল ব্রাহ্মণ। তিনি একটি নামাবলী গায়ে দিয়া সর্বদা 'হরি হরি বোল' 'হরি হরি বোল' বলিয়া বেড়াইতেন। চতুর্থ একটি ঘর যাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম জাওয়ানো থাকিত। পঞ্চম একটি ঘর, যেখানে একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, নীলকমলবাবুর পরিবার তাহা শুনিতেন।"

নীলকমলবাবুর অতিথি সংকার ব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভাগ্যকুলের সীতানাথ রায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পরে তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, বৃন্দাবনে যাইবেন। পথে প্রয়াগ দেখিবার জন্য তিনি ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া যখন কোথায় যাইবেন ভাবিতেছিলেন, তখন একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি ত বাঙ্গালী। এলাহাবাদে এসেছেন, চলুন আমাদের বাড়িতে যাইবেন।" লোকটির আহ্বানে তিনি যাইয়া তাহার ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি নীলকমলবাবুর বাড়িতে আসিল। তথায় তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। স্নান ও আহারের সব আয়োজন ছিল। রাত্রিতে আহারের পূর্বে কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন, তিনি বাঙ্গালীর খাবার খাইবেন, কি য়ুরোপীয় খানা খাইবেন'—উভয় ব্যবস্থাই আছে। তিনি বাঙ্গালীর খাদ্যই খাইবেন—তাহারও বিরাট আয়োজন। তাহার পরে কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি মদ্য পানের অভ্যাস আছে?" তিনি 'নাই' বলিলে কর্মচারী বলিলেন, 'কুণ্ঠিত হইবেন না।—অতিথিদের জন্য আমাদের সব রকম ব্যবস্থা আছে।' নীলকমলবাবুর বাড়ীর ব্যবস্থায় এলাহাবাদ দেখিয়া ও প্রয়াগ-কৃত্য শেষ করিয়া যে দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, সেদিন বিদায় লইয়া আসিয়া ঘোড়ার গাড়িতে স্টেশনে যাইবার জন্য উঠিবার পূর্বে তিনি ভৃত্যদিগকে ১০

টাকা পুরস্কার দিয়া গাড়িতে উঠিলেন। একজন ভৃত্য আসিয়া গাড়ি চালাইতে নিষেধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নীলকমলবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হাতে তাঁহার প্রদত্ত ১০ টাকার নোট। তিনি আসিয়া সীতানাথবাবুকে বলিলেন, 'তুমি যাহাদের ১০ টাকা বকশিশ দিয়েছ, দেখ ছোকরা, তোমার টাকা আছে, তুমি চাকরদের বকশিশ দিলে—কিন্তু এতে ওরা যাঁরা বকশিশ দিবেন না, তাঁদের তেমন যত্ন করবে না। এমন কাজ আর কর না।' নোটখানি গাড়ীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তিনি যানবাহনকে স্টেশনে যাইতে নির্দেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

যুক্তপ্রদেশে ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্যে নীলকমলবাবু অকাতরে সাহায্য করিতেন। যে সভায় এলাহাবাদে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, সেই সভাতেই নীলকমলবাবু সেই কার্যের জন্য এক হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। যুক্তপ্রদেশে ভারতীয়গণের প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র 'দি রিফ্লেক্টর' প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলকমল মিত্র দুইজনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুক্তপ্রদেশে উর্দুর স্থানে হিন্দী আদালতের ব্যবহার্য ভাষা করিবার জন্য যে আন্দোলন হয়, তাহাতে সৈয়দ আমেদ উর্দুর পক্ষ অবলম্বন করেন। যাঁহারা হিন্দীর পক্ষ অবলম্বন করেন, নীলকমল মিত্র প্রমুখ বাঙ্গালী তাহাদিগের মধ্যে ছিলেন। দুই দলে তর্ক যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন তৎকালীন ছোটলাট উভয় দলের প্রতিনিধিদিগকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করেন। সেই আমন্ত্রণে নীলকমলবাবুও গিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত বিচার বিভাগের কর্তা কেম্পশন বলিয়া উঠেন, 'দেখিতেছি, আপনারা বাঙ্গালী; চাকরিব্যপদেশে যুক্তপ্রদেশে আসিয়াছেন, কার্যকাল শেষ হইলে বাঙ্গালীরা ফিরিয়া যাইবেন। আদালতে উর্দু ভাষার ব্যবহার থাকিলে আপনাদের তাহাতে ক্ষতি কি?' শুনিয়া বাঙ্গালী রামকালীবাবু উঠিয়া বলেন, 'যে স্থানে বাস করা যায়, সেই স্থানের অধিবাসীদিগের কল্যাণ চিন্তা ও দুঃখ মোচন করাই মানুষের কর্তব্য। বাঙ্গালী এমন স্বার্থপর নহে যে, সেই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবে।' এই নীতি কেম্পশনের পক্ষে কশাঘাতের মতই হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তখন বাঙ্গালীদিগের দাবী রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু পরে হইয়াছিল।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যে ১৭জন ভারতীয় মাদ্রাজে দাওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে সমবেত হইয়া কর্তব্য স্থির করায় পর-বৎসর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, চারুচন্দ্র মিত্র তাঁহাদিগের মধ্যে একজন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহার চতুর্থ অধিবেশন এলাহাবাদে হয়। তাহার পূর্বেই বড়লাট লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং যিনি রাণা উদয়প্রতাপ সিংহের নামে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন—'গণতন্ত্র ভারতের উপযোগী নহে', সেই সার অকল্যাণ্ড কলভিন তখন যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট। কলভিনের দ্বারা বাধা সৃষ্টির ফলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে অধিবেশনের জন্য উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ গোপনে টাকা দিয়া লক্ষ্ণৌবাসী কোন নবাবের গৃহ ভাড়া লইয়া কলভিনের হীন চেষ্টা ব্যর্থ করেন। সেই অধিবেশনে যখন মুসলমান প্রতিনিধি পাওয়া দুর্ঘট হয়, তখন অযোধ্যাবাসিগণ সে-কথা চারুবাবুকেই বলেন। উপস্থিত বুদ্ধি চারুবাবু এক শত মুসলমান এক্কাবাহককে একটি করিয়া টাকা ও একটি করিয়া নূতন তাজ দিয়া কংগ্রেসে হাজির করিয়া দিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে চারুবাবুর প্রভাব অসাধারণ ছিল। লোক তাঁহার পত্নীকে 'বৌ-রাণী' বলিত।

নীলকমলবাবুর নানা লাভজনক ব্যবসার মধ্যে ছিল—দেশী মদ্য প্রস্তুত করিবার একচেটিয়া অধিকার। চারুবাবু মদ্যপানবিরোধী ছিলেন, একদিনে সেই লাভজনক ব্যবসা বর্জন করেন। তিনি পিতার অন্যান্য ব্যবসায়েও আবশ্যক মনোযোগ দিতেন না—রাজনীতিক, সামাজিক নানা জনকল্যাণকর কার্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ফলে আয়ের পথ সংকীর্ণ হয়। কিন্তু অতিথি সৎকার ব্যবস্থা সংকুচিত করা হয় নাই; প্রতি বৎসর সপরিবারে স্বতন্ত্র রেলগাড়ীতে ভারত ভ্রমণ বন্ধ হয় নাই—ব্যয় সংকোচ করা হয় নাই। কিরণচন্দ্র দের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া চারুবাবু জামাতাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া সিভিল সার্ভিসে চাকরিয়া করিয়া আনিয়াছিলেন।

আয় হ্রাস, কিন্তু ব্যয় সমান—এই কারণে চারুবাবুর জীবদ্দশাতেই সঞ্চিত অর্থ শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এলাহাবাদে যেমন কলিকাতাতেও তেমনিই সমাজে চারুবাবুর বিশেষ সম্মান ছিল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজের নেতারা তাঁহাকে বিশেষ সমাদর দিতেন। আমেরিকায় ও য়ুরোপে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ দেখাইয়া ভারতের অধ্যাত্ম শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া দেশবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে কলিকাতায় যে সম্বর্ধনা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিকল্পনা রচনার ও তাহা কার্যে পরিণত করিবার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, চারুবাবু তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও মৌলিক এবং তাহা সর্বতোভাবে জাতীয় ভাবপ্রসূত।

চন্দ্র অভিযান

বিজ্ঞান ভিক্ষু

(১)

রোমক উপাখ্যানে কথিত আছে চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লুনা সুন্দরী। হিন্দু পুরাণ মতে চন্দ্রের দেবতা শ্রীমান সোম রূপের জোরে দক্ষ-রাজের অশ্বিনী ভরণী ইত্যাদি সাতাশ কন্যার পাণি গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য ফল ভাল হয় নাই। এদিকে গ্রীক উপাখ্যানেও আছে চন্দ্রের দেবী শিলেনা (Selene) অপূর্ব সুন্দরী। উপাখ্যান-কাররা বোধ হয় ভাল করিয়া চন্দ্র-মুখের দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই, দেখিলে শিহরিয়া উঠিতেন আর সেই যোগ্য উপমা খুঁজিতে আর্ট এমপোরিয়ামে বা কমল বনে না গিয়া তাঁদের ছুটিতে হইত হাসপাতালের সেই কক্ষে যেখানে সবচেয়ে মারাত্মক রকম আগুনে-পোড়া রোগিণী-দের রাখা হয়। চন্দ্রের সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যাহা বলেন, সে যদি কোন নব্য উপাখ্যানকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে আমরা হয়ত শুনিব যে, সুন্দরী লুনা একদা এই পৃথিবীতেই ছিলেন, অবশ্য ইতালীতে নয়, এখন যেখানে প্রশান্ত মহাসাগর সেই অঞ্চলে। ডাকসাইটে সুন্দরী বলিয়া তার খ্যাতি ছিল কিনা জানা নাই, কিন্তু তার দেহ ছিল খাঁটি সোনার মতই নমনীয়, তপ্ত সোনার চেয়েও উজ্জ্বল ছিল তার অঙ্গের জ্যোতি। তারপর একদিন দেবতারা কি কারণে তার উপর রুষ্ট হইলেন, অগ্নি-দেহ এক বিপুলকায় দৈত্যকে তারা পাঠাইলেন। সে আসিয়া জননী বসুন্ধরার বক্ষলগ্না লুনাকে ছিনাইয়া নিয়া মহা-শূন্যে নিক্ষেপ করিল। বুঝি সেই ক্ষোভে একদা লুনা তাঁর সমস্ত দেহে আগুনে ধরাইয়া দিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। সেই অতীত দগ্ধতার চিহ্ন আজও তার সমস্ত দেহে, তাই অপরিসীম স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা তার সমস্ত অঙ্গজ্যোতিতে, আজও তাই মহাশূন্যে সেই কলঙ্কমুখী জননী বসুন্ধরার দিকে একদৃষ্টিতে অহর্নিশি তাকাইয়া আছে।

এইত গেল রূপকথা। কিন্তু চন্দ্র কি লুনা? রূপকথাকার যাহা বলিলেন, চন্দ্র সম্বন্ধে তার কতটা সত্য? লুনা কি ধরিত্রীর দুহিতা না সহোদরা? চন্দ্র কি পৃথিবী থেকে উদ্ভূতা কিংবা উভয়ে

চন্দ্র-অভিযানের প্রথম পর্বে পৃথিবীর মানুষ শূন্যে এক মানব-নির্মিত উপগ্রহ সৃষ্টিতে যাত্রা করেছে
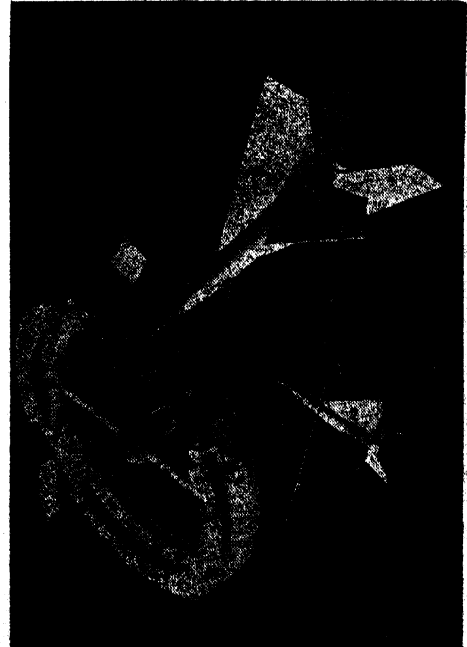
যান্ত্রিক উপগ্রহ বা শূন্যে বিরামস্থান (স্পেস্ স্টেশন) তৈরি প্রায় শেষ হয়েছে : এখান থেকে চন্দ্রে অভিযানের আসল পর্ব শুরু

একই দেহের দুইটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গমাত্র? উপাখ্যানকার লুনাকে চিরকুমারীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কি চিরকুমারী না চিরবন্ধ্যা? চন্দ্রে কি তবে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই? কোন কালেই কি ছিল না? চন্দ্র দেহে যেসব বিশাল ক্ষত-চিহ্ন আছে, যেগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলা হয়, সেগুলি কি? কেহ বলেন সেগুলি আগ্নেয়গিরির মুখ। আবার কাহারও কাহারও মতে চন্দ্রের উপর দিন-রাত অসংখ্য উল্কাপাত হইতেছে। অতীতে বোধ হয় ভীমবেগে পতনশীল পর্বতপ্রমাণ কোন কোন উল্কার সহিত সংঘর্ষের ফলে এইসব বিরাট গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছিল। শিলিনোগ্রাফাররা (যাঁরা দূরবীন সাহায্যে চন্দ্রের জমি জরীপ করেন) চন্দ্রপৃষ্ঠে এরকম ৩০,০০০ গহ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাদের কোন কোনটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল পর্যন্ত আর গভীরতাও কয়েক মাইল। তবে ত' এইসব উল্কাপাত আণবিক বোমার চেয়েও ভীষণ! আর যদি এগুলি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখ হয়, তবে এইসব অসংখ্য আগ্নেয়-গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্রোতই কি একদা লুনার সমস্ত দেহকে দগ্ধ করিয়াছিল? এই দুই তত্ত্বের কোনটি সত্য? সৃষ্টির আদিতে লুনা কি নমনীয় ছিলেন, না দ্রবীভূতা? সৃষ্টির সময়ে চন্দ্রদেহ কি কঠিন ছিল, না তরল? এইরূপ কত শত প্রশ্ন আজও অজানা রহিয়াছে তার অন্ত নাই। উপাখ্যান-কাররাই যে শুধু নীরব তাই নয়, বিজ্ঞানীরাও সন্দিগ্ধ। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, চন্দ্রে যদি যাওয়া যায়, যদি ভূ-বিজ্ঞানীরা সেখানকার মাটি আর পাথর নিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন, সিসমো-গ্রাফাররা (যাঁরা ভূকম্প সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন) যদি সেখানে গিয়া চন্দ্রের গর্ভের ভিতর ডিনামাইট ফাটাইয়া চন্দ্রকম্প সৃষ্টি করিয়া সেই কম্পনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করিতে পারেন, যদি রাসায়নিক চন্দ্রদেহের উপাদান বিশ্লেষণ করেন আর পদার্থবিদরা যদি চন্দ্রপৃষ্ঠে দুষ্প্রাপ্য য়ুরেনিয়ম উপাদানের সন্ধান ও স্বতঃ-স্ফুরিত রশ্মিগুলি বিশ্লেষণ করিতে পারেন, তবেই এইসব প্রশ্নের কিছুটা উত্তর মিলিতে পারে। তাই কৌতূহলী মানুষের আজ শান্তি নাই। শুধু কৌতূহল কেন, আরও স্বার্থ আছে; ইন্দ্রজিতের মত আকাশ থেকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা, দুষ্প্রাপ্য খনিজের সন্ধান লাভ, বহির্বিশ্বের জমি দখল, সব মিলাইয়া অনেকেই আজ চাঁদের দিকে হাত বাড়াইতেছেন। আশা করা যায়, শীঘ্রই 'বামন হইয়া চাঁদে হাত' কথাটি অচল হইয়া যাইবে। কিন্তু সেজন্য চাই সংশপ্তক বাহিনী—মৃত্যু যাঁদের পণ; সেজন্য চাই বিজ্ঞানী, যন্ত্রশিল্পী, বিজ্ঞানকর্মী আর রাষ্ট্রের সম্মিলিত অভিযান।

চন্দ্রে অভিযান এককালে শুধু উপ-কথার বিষয় ছিল, কিন্তু আজ আর উপকথা নয়। সহস্র মাইল দূরে থেকে রেডিওযোগে কণ্ঠস্বর শোনা, টেলিভিশন যোগে বহুদূর থেকে প্রিয়জনের মূর্তিকে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা; এ যেমন কল্পনার অতীত ছিল অথচ এগুলি আজ একটি শিশুকেও বিস্মিত করে না, ঠিক তেমনি ১৯০৩ সালে আমেরিকার রাইট (Wright) ভ্রাতৃদ্বয় যখন প্রথম আকাশে উড়িলেন, তখন তাঁরা ভাবিতে পারেন নাই যে, এই সামান্য ভেলা আশ্রয় করিয়া মানুষ একদিন মহাশূন্যে যাত্রা করিবে। তখনও মনে হয় নাই যে, এই বিরাট পৃথিবী মৃত্যুভয়হীন মানুষকে ধরিতে পারিবে না। তখনও ভাবা যায় নাই যে, 'সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী' দুর্দমনীয় জীবনকে 'ভরিতে' পারিবে না। এই রোমাঞ্চকর অভিযানের আয়োজন শুরু হইয়া গিয়াছে। দেশে দেশে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মরণ-যুদ্ধের জন্য যাত্রীরা প্রস্তুত হইতেছে। গবেষণাগারে তার জন্য সাধনা চলিতেছে। এমন কি এই অভি-যানের পরিকল্পনা পর্যন্ত খাড়া হইয়া গিয়াছে। যাত্রাপথের খবর জানা আছে। তাই যাত্রীদের অধীরতার সীমা নাই। অনেকে ত' আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে চন্দ্রে শুধু পৌঁছান নয়, রীতিমত আন্তর্জাতিক লুনার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস চালু হওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

(২)

চন্দ্রে যাওয়ার একাধিক দুস্তর বাধা। তার মধ্যে সর্বপ্রধান হইল মহাকর্ষণ, যার বলে পৃথিবী সমস্ত বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখে। কবির ভাষায় 'এ বিশাল বিশ্বে দশদিক হতে প্রতিকণা মোরে টানিছে' ইহা শুধু ভাবের কথা নয়, প্রকৃতই চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর উপর একটা বিরাট টাগ অব ওয়ার চলিতেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, আর সব প্রতিপক্ষরা এত দূরে যে আমাদের অভিযাত্রীদের নিয়া টানাটানি প্রধানত পৃথিবী আর চন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চন্দ্রের আকর্ষণ যদিও শক্ত জমির উপর বুঝা যায় না, কিন্তু আজকাল অনেকেই জানেন, সমুদ্রে যে জোয়ার-ভাটা হয়, তার কারণ চন্দ্রের আকর্ষণের বৃদ্ধি ও হ্রাস। এই হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে আকর্ষণকারীর কলেবরের আয়তন, ঘনত্ব ও নৈকট্য যত কম বা

চন্দ্রের ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তার ছবি তোলা হচ্ছে ভাসমান অবস্থাতেই

মানুষ চন্দ্রে তার উপনিবেশ স্থাপন করেছে

বেশী, তার উপর। কাজেই পৃথিবীপৃষ্ঠে আমাদের উপর সমগ্র আকর্ষণের প্রায় ষোল আনাই পৃথিবীর দখলে। চন্দ্রের ভাগে অতি সামান্য। অবশ্য যতই ঊর্ধ্বে উঠা যায়, পৃথিবীর দখল ততই কমিতে থাকে; ভাগাভাগিটা ক্রমে কমিতে কমিতে দশ আনা ছয় আনায়; শেষে বিশেষ এক সীমান্তে গিয়া আধাআধিতে দাঁড়ায়। এই সীমানাকে বলা হয় নিউট্রাল লাইন বা নিরপেক্ষ রেখা। এই নিরপেক্ষ সীমানা পৃথিবী আর চন্দ্রের ঠিক মাঝখানে নয়। সর্বত্রই যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি সীমানাটি দুর্বল প্রতিপক্ষের একেবারে গা ঘেঁষিয়া। সুতরাং যদিও পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব গড়ে ২,৩৮,৮০০ মাইল, নিরপেক্ষ সীমানাটি একেবারে চন্দ্রের ঘাড়ের উপর। অর্থাৎ চন্দ্র থেকে ২৩,৬০০ মাইল এদিকে। এই ব্যবস্থার কারণ হইল চন্দ্রের দেহ পৃথিবীর দেহের পঞ্চাশভাগের একভাগ। আবার অনেকের যেমন মেদবহুল দেহের গুরুত্ব কম, চন্দ্রেরও উপাদানের গুরুত্ব পৃথিবীর উপাদানের গুরুত্ব অপেক্ষা প্রায় ১½ গুণ কম। এই নিরপেক্ষ অঞ্চলে যদি কোন বস্তু রাখা যায়, তবে তার অবস্থা হইবে ন যযৌ ন তস্থৌ! ত্রিশঙ্কুর অবস্থা আর কি!

কোন কোন রাশিয়ান পণ্ডিত বুর্জোয়া বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের পাল্টা একটি বিজ্ঞান খাড়া করার চেষ্টা করিতেছেন, কারণ বুর্জোয়া বিজ্ঞানের (!) মধ্যে জগতের কল্যাণ (!) নাই, সুতরাং একজন রাশিয়ান নিউটন* ও একজন রাশিয়ান কলম্বস আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরাও তেমনি ত্রিশঙ্কু থেকে নিউট্রাল লাইন, সেই থেকে মহাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ এমনকি মায় চন্দ্রে অভিযান পর্যন্ত যদি আর্যকীর্তি বলিয়া দাবী করি, তবে ঠেকায় কে? এই ত্রিশঙ্কু অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছিতে রকেটগুলির এখনও কিছুটা দেরি আছে। মানুষের তৈয়ারী রকেট আজ পর্যন্ত মাত্র ২৫০ মাইল ঊর্ধ্বে গিয়া মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং চন্দ্র অভিযানকে সফল করিতে হইলে প্রথম চাই এই মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করা।

পৃথিবীর আকর্ষণের বাধা কাটাইয়া যদি কোনরকমে একবার এই নিউট্রাল লাইনে পৌঁছান যায়, তবে তার পরের পথটুকুর জন্য আর ভাবনা নাই। গাছ থেকে যেমন ফল মাটিতে পড়ে, তেমনি সেই মহাশূন্য থেকে আমাদের যাত্রীরা চাঁদের আকর্ষণে আপনিই চাঁদের দিকে নামিতে থাকিবে। অবশ্য এই অবতরণ মোটেই সুখের নয়। কারণ যাত্রীরা যতই চন্দ্রের কাছাকাছি যাইবে, তাদের গতিও ততই প্রচণ্ড হইতে থাকিবে। ভাগ্যিস চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণের মাত্র ছয়ভাগের ১ ভাগ। তথাপি চন্দ্রের

---

* চেকোশ্লোভাক জার্নাল অব ফিজিক্স, ৪র্থ খণ্ড, সেপ্ট, ১৯৫৪, ২৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কাছাকাছি গিয়া আমাদের রকেট ঘণ্টায় ৬০০০ মাইল বেগে চন্দ্রের দিকে ছুটিতে থাকিবে। চন্দ্রে গিয়া প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দেওয়ার আগেই যদি এই গতি রোধ করা না যায়, তবে ধ্বংস অনিবার্য। পৃথিবী পৃষ্ঠে যেসব বিমান দুর্ঘটনা হয়, তাদের কোনটিই মাটিতে ধাক্কা দেওয়ার আগে ঘণ্টায় ৪০০ মাইলের বেশী বেগে নামিয়া আসে না। সেই তুলনায় চন্দ্র-পৃষ্ঠে আমাদের রকেট দুর্ঘটনা যে কত প্রচণ্ড হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথম চাই পৃথিবীর আকর্ষণকে পরাস্ত করা আর চন্দ্রাকর্ষণকে প্রতিরোধ করা।

যাত্রাপথে তার পরের বাধা আমরা নিজেরাই। কারণ একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা যে দম্ভভরে মাটিতে পা ফেলিতে পারি, তার কারণ মাতা বসুমতী স্নেহভরে আমাদের পা দুখানা টানিয়া তার বুকের উপর চাপিয়া রাখেন, তাই। এক মুহূর্ত যদি এই মাধ্যাকর্ষণ শিথিল হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মহাশূন্যের মধ্যে ইন্দ্রধনুর মত মিলাইয়া যাইবে। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের বুক যতই স্ফীত হউক, তার মধ্যেকার হৃৎপিণ্ডটির অক্সিজেন না হইলে এক মুহূর্ত চলিবে না। প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য অন্তত তিন পাঁউণ্ড পরিমাণ অক্সিজেনের ব্যবস্থা চাই। আবার, আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তার কারণ এই পৃথিবীটা একটা বিরাট Cryostat (তাপ-সাম্য কক্ষ)। আবহাওয়া অফিসে যে থার্মোমিটারের পারদ স্তম্ভটি দয়া করিয়া সীমা ছাড়াইয়া ওঠানামা করে না, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। নতুবা মুহূর্তে হয় অঙ্গার নয়ত আইসক্রীম বনিয়া যাইব। এই বায়ুমণ্ডল অন্ধ কুরুরাজের মত সর্বদা আমাদের যে কঠিন আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে যে ১৫ পাউণ্ড ওজনের পরিমাণ চাপ দিতেছে, আমাদের ভিতরকার চাপের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া বন্ধ রাখিতে হইলে বাহিরের এই বায়ুর চাপ চাইই চাই। নয়ত এখনই নাক কান মুখ দিয়া রক্ত ছুটিতে থাকিবে। এই বায়ু যে শুধু আমাদের শ্বাসরক্ষা করিতেছে তাই নয়, আমাদের প্রতি রোমকূপের উপর ইহার সতত স্বেদ সন্তাপহারী প্রবাহ বাঁচিয়া থাকার পক্ষে সমান অপরিহার্য। ইহার উপর আছে আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সর্বোপরি আছে আমাদের অন্তরের দুর্বোধ্য আকুলতা, বুকভাঙ্গা অন্তরের আবেগ; আছে এই 'তৃণপুলকিতা অবলুণ্ঠিতা এই ধরিত্রীর মায়ার বন্ধন! এই সমস্ত দুর্জয় বাধাকে অতিক্রম করিয়া যাত্রীদের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

শুনিলে অবাক মনে হয়, যেখানে ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল দূর থেকেও সূর্য আলো ও তাপ পাঠাইয়া দিয়া জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, নিকটতম নক্ষত্র সাড়ে চারি আলোকবর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ পথের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রতি রাত্রে আমাদের আলোর বার্তা পাঠাইতেছে, লক্ষাধিক আলোক-বর্ষ দূরের নীহারিকার অপসারণের ফলে আলোকের লোহিতায়ন (reddening) আমাদের যন্ত্রে আসিয়া ধরা দিতেছে, আমাদের কানে বিশ্বসৃষ্টির কত রহস্যময় বার্তা আর ইঙ্গিত পেঁাছাইয়া দিতেছে, সেই কল্পনাতীত বিরাট (অনন্ত?) বিশ্বের আর কোথাও আমাদের জন্য এক তিল স্থান নাই! এক বিন্দু ক্ষমতা নাই! আমরা যে এই বহির্বিশ্বে শুধু অবাঞ্ছিত অতিথি তাই নয়, আমাদের জন্য নিষ্ঠুর মৃত্যু সর্বত্র সমান উদ্যত হইয়া আছে। যদিও বায়ুর শেষ ক্ষীণস্তর ১২০ মাইল ঊর্ধ্বে মহাশূন্যতার মধ্যে শেষ হইয়াছে, তথাপি মাটি থেকে মাত্র দশ মাইল উপরেই অনন্ত মহাশ্মশান। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া প্রাণের উপযোগী আর কিছুই নাই। অক্সিজেন নাই, বায়ুর চাপ নাই, বায়ুর প্রবাহ নাই। অধিকন্তু মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মত আছে জীবননাশকারী নানা জাতীয় অদৃশ্য রশ্মি, যাহা বিষাক্ত তীরের মত শূন্যতলে ইতস্তত প্রচণ্ড গতিতে নিত্যকাল বিচরণ করিতেছে। ইহাদের সর্বপ্রধান হইল অতি-বেগুনী আলো (ultra violet ray) সূর্যের শুধু সাতটি রঙের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, যখন ইন্দ্রধনু আমাদের চোখ জুড়াইয়া দেয়! কিন্তু কে জানিত যে, ঐ সাত রঙা নয়নাভিরাম মুকুটের তলায়, ঐ বেগুনী রেখার ঠিক নীচেই পরীক্ষিতের শিরে ধৃত তক্ষকের মত যে অদৃশ্য রশ্মি লুকাইয়া আছে, সে ত অনায়াসে সমস্ত প্রাণীদেহকে মৃত্যু বিষে জর্জরিত করিয়া দিতে পারে। এই অতি-বেগুনী আলো এত মারাত্মক যে, আজকাল প্রায় সমস্ত অগ্রসর শহরগুলিতে পানীয় জল বীজাণুমুক্ত করার জন্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই আলোর ব্যবহার চালু হইয়া গিয়াছে। এমন কি যেসব বীজাণু ফুটন্ত জল অথবা পরিমিত ক্লোরিনকে উপেক্ষা করিতে পারে, তেমন মারাত্মক বীজাণুও অতি-বেগুনী রশ্মির সামনে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী দাঁড়াইতে পারে না। তবে যে আমাদের দেহ এখনও পুড়িয়া যায় না, তার কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুর স্তরে স্তরে এই রশ্মির প্রায় সমস্তটা শোষিত হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যাত্রীরা যখন সেই বায়ুর স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকিবে, তখনই আত্মরক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত হওয়া চাই। শুধু অতি-বেগুনী কেন আরও নানা রশ্মি যাকে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) বলে, সেগুলিও আমাদের চারিদিকে অজস্র ধারায় নামিতে থাকিবে। অবশ্য আমরা মাটির উপরেও দিনরাত এই মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে ডুবিয়া আছি। অজস্র তীক্ষ্ম শরের মত শূন্য তল হইতে এইসব রশ্মি আমাদের চারিপাশে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, আমাদের দেহ বিদীর্ণ করিয়া যাইতেছে, মাটির স্তর ভেদ করিয়া বহুদূর পর্যন্ত এই তীব্র রশ্মি নিক্ষিপ্ত হইতেছে। খনির অন্ধকার তলদেশে, সমুদ্রের গভীরেও প্রতি মুহূর্তে এইগুলি অজস্র গিয়া পেঁাছিতেছে। কিন্তু আমরা সঠিক জানি না, এই রশ্মির কোন উপাদানকে বায়ুস্তর সরাইয়া রাখিতেছে, প্রাথমিক (Primary) রশ্মিগুলির সত্যিকারের ধর্ম কি? সেগুলি কি পৃথিবীতলের যে

মহাজাগতিক রশ্মির সহিত আমাদের পরিচয়, সেগুলি কি ঠিক তাদেরই মত নির্বিবোধ? কিংবা কে জানে নিউট্রন প্রভৃতি কণা প্রচণ্ড তেজে আমাদের দগ্ধ করিয়া দিবে কি? এইসব অজানা রশ্মির সামনে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি থাকা চাই। ইহা ছাড়াও আছে আবার উল্কাপাত! কখন কোনদিক থেকে প্রচণ্ডবেগে কোন উল্কাপিণ্ড আসিয়া যে আমাদের ধাক্কা দিবে, আমাদের যন্ত্রকে বিকল করিয়া দিবে, তাহার স্থিরতা কি? কেননা মহাশূন্যে সহস্র সহস্র উল্কাপিণ্ড দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চতুর্দিকে সর্বদা ধাবিত হইতেছে। শিলাবৃষ্টির মত অজস্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি ত' প্রতি ঘণ্টায় শত শত আসিয়া আমাদের রকেটের গায়ে ধাক্কা দিবে। আর পর্বতপ্রমাণ বিরাট উল্কা যেগুলির চন্দ্রপৃষ্ঠে ধ্বংস সম্বন্ধে আগেই বলিয়াছি, তেমন প্রচণ্ড সংঘর্ষের সম্ভাবনাও উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বস্তুত সেরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আমাদের শহরের রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনার চেয়ে কম আশঙ্কিত নয়। ইহাতেও শেষ নাই, সর্বোপরি মহাশূন্যতলের সর্বত্র উত্তাপের মান অচিন্তনীয় রকম ক্ষীণ, হিমাঙ্কেরও ১০০ ডিগ্রী নীচে। ফুটন্ত জলের তুলনায় বরফ যতটা ঠাণ্ডা, বরফের তুলনায় শূন্যতলের সর্বত্র প্রায় তার দ্বিগুণ ঠাণ্ডা, যার স্পর্শমাত্র জীবনের সমস্ত চাঞ্চল্য নিমেষে স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

সুতরাং মৃত্যুকে মুখামুখি নিয়া যাদের যাত্রা করিতে হইবে, তাদের সেই দুর্ধর্ষ যাত্রার প্রারম্ভেই মানুষের যা সাধ্য, তার জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা, সাবধান পদক্ষেপ, দীর্ঘ বর্ষব্যাপী প্রস্তুতি চাই।

এই ত' গেল পথের খবর! ইহার পর তৃতীয় বাধা হইল চন্দ্র নিজে। যেখানে আমরা যাইতে চাই সেই চন্দ্রলোক সপ্তলোকের কোনটি? সেখানে কি স্বর্গের সৌন্দর্য না নরকের বীভৎসতা? সে কি আগুনের কুণ্ড না তুষার কক্ষ? সে কি আগ্নেয়গিরির মুখ না যমপুরীর দ্বার? সেই তথ্য ত আমাদের জানা চাই। কিন্তু সেকথা প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য।

মুর্শিদাবাদের আম

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদী আমের নামেরও যেমন বাহার, খ্যাতিও তেমনি। আর আমই কত রকমের? বড় ছোট মাঝারি সব রকম আকারের আমই আছে এখানে। কোনোটা লম্বা, কোনোটা বা গোল। কোনোটার নাক আছে। কোনোটার সে সব বালাই নেই। আম তৈয়ারী হয়ে গেছে, অথচ ছিল্‌কে একেবারেই সবুজ, কোথাও রং বদলায় নি বলে বুঝবার উপায় নেই। কোনোটার রং সোনালী লাল, কিন্তু তৈয়ারী হয়নি। বোঁটার কাছে চিঁতি পড়বে, খোসবু উঠ্‌বে ঘর ভরে, তখন সেই আম খাওয়া চলবে। মুর্শিদাবাদী আমের বহুতর ব্যাপার! আম খানে-ওয়ালাদের কান্ডটাই কি কম! আমের মরসুমে ছোটখাটো নবাবেরা স্বচ্ছন্দে সাইকেল গ্রামোফোন সব বিক্রি করে দিয়ে আম খেতেন। ভাবটা এই যে সাইকেল গেলে সাইকেল হবে, কিন্তু আমের মরসুম চলে গেলে আর আম খাওয়া যাবে না।

নামের জন্যে কোনো নার্সারীর ক্যাটালগে আমের কলমের লিস্ট দেখার দরকার নেই। আমের মরসুমে বহরমপুরে লালবাগ ও জিয়াগঞ্জের বাজারে বসে আমের নাম শুধু সংগ্রহ করলেই হবে। মুর্শিদাবাদী আমের তালিকায় এখন চল্‌তি নামের মধ্যে আছেঃ—আগাবেল, আনানাস, অনুপান, অবাক, আমীর খাঁ, কালা পাহাড়, কোহিতুর, কোপাহাড়ী, কৃষ্ণভোগ, খাস সিন্দুর, গোলাপ খাস, গোপাল ধোবা, গোপাল ভোগ, গৌরজিৎ, গৌরভোগ, গোবিন্দভোগ, জগন্নাথ ভোগ, ছোল ভাদুই, ছোট সিন্দুরে, ছোট সাহি, জাবা, তোয়া সেখ, দাদভোগ, দাউদি, দিল পছন্দ, দুর্গাখাস, দুধিয়া, নবাবপছন্দ, নাজিম পছন্দ, বেনারসী ন্যাংরা, ফিমেল ভোগ, ফুকল বয়ান, বাণ্ডাজ্জাল, বেলী, বিমলী, বীরা, বেগমপছন্দ, ভবানী চৌরাজ, ভুবনপছন্দ, ভুতো বোম্বাই, বড় সাহী, বড় সিন্দুরে, সরিখাস, মিছরি কন্দ, মীর্জা পছন্দ, রোগনি, রাণীপছন্দ, লাজুক বদন, শ্যামলা, ভাদুই, সাহপছন্দ, সাবুজা, হাজিপুরী, ন্যাংরা, হিম সাগর, হিলসাপেটি ও ক্ষীরসাপাতি। এই তালিকার মধ্যে মুর্শিদাবাদী আম ছাড়া অন্য কোনো আমের ঠাঁই নেই। আমের নাম দেখে তাই ঘাবড়ালে হবে না। নামী আমের দীর্ঘ তালিকা দেখে নয়, চুপড়ি ভরতি নানান্ রং-এর ও রূপের আম দেখে সব লোকেরই উৎসুক্য জাগে, জিভে জল আসে।

তাও তো এই লিস্টের মধ্যে মুর্শিদাবাদের অন্যতম সরেস আম মোলায়েম জামের নাম দিই নি। অনেক খানদানী রাইয়াস এখনও আছেন এই জেলায়, যাঁরা মোলায়েম জাম ঘরে এনে তৈয়ারী করে খেয়ে থাকেন। অন্য আম খেতে চান না। আর তার আয়োজনই কি কম। গাছপাকা আম তো মানুষে খায় না। বাদুড়ের ভোগ্য সে আম। কাজেই দানা ঠিকমত বাড়লে বোঁটার কাছ থেকে ভেঙে আনা হলো আধপাকা মোলায়েম জাম। তারপর পরিষ্কার মেজের উপর তোশক বিছিয়ে তার উপর কাগজ পেতে আলতোভাবে সাজিয়ে রাখা হল আমগুলো। প্রতিদিন তাদের পরীক্ষা ক'রে ক'রে উলটে দিতে হবে। মোলায়েম জাম তৈয়ারী হলে গোলাবী গন্ধে ঘর ভরে যাবে। কিন্তু তখনও খাওয়া চলবে না। যখন একটু একটু চিঁতি পড়বে বোঁটার কাছে, তখন জানতে হবে আম খাওয়ার সময় হয়েছে। আর একটা আম কালাপাহাড়, নবাব সাহেবরা বলেন কালাকন্দ। এই আমকে তৈয়ারী করতে বহুৎ হুঁশিয়ারী চাই। কাঁচাতেও এই আম যেমন টক, বেশী পেকে গেলেও তেমনি। কাজেই তার তাক জানা দরকার। বড় সিন্দুরে আমের রং সিন্দুরের মত হলেও, খেতে অম্লমধুর। সাহেবরা মুর্শিদাবাদী আমের মধ্যে বড় সিন্দুরে বেশী পছন্দ করতেন। কারণ পানীয় বিশেষের সংগে নাকি অম্লমধুর বড় সিন্দুরে আম খেতে অতুলনীয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর পূর্ব তীরের বেশীর ভাগ যায়গায় বহুকাল থেকে বড় বড় আমের বাগান ছিল। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ শহরের পাশে চুনাখালির আমের নামডাক ছিল খুব বেশী। কয়েক বছর আগে এই এলাকার আম বাগানের পুরানো আমগাছগুলো কেটে ফেলা হতে থাকে। যত না গাছ কাটা হচ্ছিল, তত নতুন কলম লাগানো হচ্ছিল না। অনেক নামকরা আম বাগান প্রায় ফাঁকা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গত বছর থেকে নতুন গাছ লাগানো চলছে। এবছরে তো নতুন আমগাছ লাগানো এত বেশী হচ্ছে যে টাকা পয়সা খরচা করলেও আমের কলম পাওয়া কঠিন ব্যাপার। মধ্যে আম গাছ কাটার হিড়িক দেখে মনে হচ্ছিল, মুর্শিদাবাদী আমের নামটাও বুঝি শেষ পর্যন্ত মুছেই যাবে জেলা থেকে। এখন আশা হয়েছে।

একদা জেলার রাজা-রাজড়া, নবাব, জমিদারদের আমের বাগান করার শখ ছিল। তখন থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর এবং অন্যান্য জমিদারদের খাস বাগানে নামজাদা আমের গাছ বহুযত্নে রক্ষা করা হতো। আমের মরসুমে ভালো ভালো আম খাওয়ার জন্যে তারা টাকা খরচ করতেন সারা বছর ধরে। আর গাছ বানানোর জন্যে তম্বিরই কি কম হতো? অনেক জমিদার নিজে প্রতিদিন বাগানে হাজিরা দিতেন। বিঘার পর বিঘা জমিতে নতুন নতুন আমের কলম লাগানো হতো এবং গাছগুলোর পরিচর্যা চলতো পুরোদমে। এখনও সে সব বাগান আছে, মাত্র বাবুদের নাম নিয়েই আছে। গাছের যত্ন নেই, নতুন কলম লাগানোর ব্যবস্থা নেই। আমের মরসুমে জমিদারদের বর্তমান ওয়ারিশান কিছু টাকা নিয়ে ফলকরের বন্দোবস্ত দিয়ে থাকেন। পছন্দমত দুচার গাছ খাসে রাখেন, যার আম তাঁরা নিয়ে আসেন

নিজেদের জন্যে। বড়লোকদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেও আমের বাগান করতো। লালবাগে একটা ভালো আম বাগানের নাম গরীব কসাই-এর বাগান। লালবাগের কোনও কসাই এই আম বাগান তৈয়ারী করেছিল, এখন তিনবার হস্তান্তরের ফলে সে বাগানের মালিক বহরমপুরের লোকে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেও অনেক সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেও ছোট ছোট আমের বাগান করেছে। কাজেই এখন মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় সব জায়গাতেই আছে আমের বাগান। মুর্শিদাবাদী আমের সেরা বাগান বলে যে কটা আছে, তাদের মধ্যে সৈয়দ রাইয়স মীর্জার বাগান একদিক দিয়ে বিখ্যাত। এখান থেকে সব রকম মুর্শিদাবাদী আমগাছের কলম কিনতে পাওয়া যায় এখনও। রাইয়স বাগের আম গাছের কলমের ব্যবসা গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে। রাইয়স বাগে একশোর উপর রকমারী আম গাছ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে নাম করা হচ্ছে:—কোহিনুর, চম্পা, লস্কর সিকন, লজ্জত বক্স, নসরত পছন্দ, সাফদার পছন্দ, তালবী, ফরদৌস পছন্দ, হাউজ-এ-কাইসার, ঝমকা, কাসারু, খানম পছন্দ, পাঞ্জা, সাদোল্লা, সাবজা, সরবতী, সাহপছন্দ, দশেরী, গোয়া, জালিবন্ধ, জনসন্, কিসনবুগ, মাদ্রাস, মহারাজ পছন্দ, মানেকজী রুস্তমজী, মোহন ঠাকুর, মিঠুয়া, সীরাখাস, সুরাত, তাই-মুরিয়া, আলেম পছন্দ, আলীবক্স, অনু-পাম, অত্তাই, দিলশাদ, জাহানারা, খুদপছন্দ, খরবুজা, লোহাজঙ্গ, নাদের পছন্দ, সুরাইয়া, রুমালী ও রাহুমণ্ডা। মাত্র নামই নয়, ইচ্ছে করলে আমের মরসুমে আপনারা ল্যাংড়া, বোম্বাই, আলফোন্সো ছেড়ে মুর্শিদাবাদী এই অষ্টোত্তরশত আম খরিদ করতে পারেন, কিম্বা আমের কলম কিনে নিয়ে গিয়ে নিজস্ব বাগান বানাতে পারেন। বাগানের যত্ন নিলে চাই কি পাঁচ বছরে নিজের হাতে লাগানো আম গাছের আম খেয়ে খুশী হওয়ারও পুরো সম্ভাবনা আছে।

আমের ইতিহাস বলে, বহু যুগ হ'তে আম মাত্র ভারত ও বর্মা অঞ্চলেই ফলতো। তাই আমের বোটানিক্যাল নাম "ম্যাঙ্গোফেরা ইণ্ডিকা" (Mangofera Indica)। শেষটুকু স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে আম ভারতের ফল। এখন কিন্তু আম হয় পৃথিবীর অনেক দেশে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সব দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার অনেক যায়গা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং হাওয়াই দ্বীপে আমের চাষ চলছে। এসব দেশে প্রায় ক্ষেত্রেই আমের গাছ এসেছিল ভারত থেকে। তবে একথাও সত্যি কোনও দেশে ভারতের মত এত চমৎকার আম হয় না। তাই না ভারতের আম বলতে ব্রিটেন ও আমেরিকার লোক পাগল। হিন্দুস্থানীরা আমকে বলে শ্রীফল। আমার ধারণায় বেলকে শ্রীফল না বলে সে সম্মানটা আমকেই দেওয়া উচিত। আমগাছের সব কিছু কাজে লাগে। পাতা, ছাল, ফুল, ফল এমন কি ঝড়ে পড়ে গেলে গোটা আম গাছটাই যখন কাজে লেগে যায়, তখন শ্রীফল হওয়ার সম্মান আম গাছেরই প্রাপ্য।

আবার ভারতের মধ্যে মুর্শিদাবাদী আমের খ্যাতি সবচেয়ে বেশী। বর্ণে, গন্ধে ও আস্বাদনে মুর্শিদাবাদী অষ্টোত্তর শত আমের তুলনা নেই। কোহিতুর আর কোহিনুর আম ফলে কম। একটা গাছে বিশ দানা থাকলেই অনেক ফললো। আকারে বেশ বড় এই আমের ভারে ডাল নুয়ে পড়ে। কাজেই আমের চারিদিকে তুলোর প্যাড দিয়ে জালের টুসীর মধ্যে রেখে মোটা ডালের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। আমের গায়ে চোট লাগলে, সে আমের আর কিছুই থাকে না। বিশেষ করে কোহিতুর। গাছ থেকে আধ-পাকা আমটি খুব যত্নে ভেঙে এনে বোঁটার উপর মোম লাগিয়ে তবে তুলোর উপর রাখতে হয়। মুর্শিদাবাদী নবাবদের এক বুলি আছে যে, ছেলে মানুষ করার চেয়ে ভাল আম তৈয়ারী করা কঠিন। যারা আম তৈয়ারীর ব্যাপারটা চোখে দেখেছে, সে কথা তারা নিশ্চয় স্বীকার করবে। তা ছাড়া আমের ছিলকে ছাড়ানোও একটা আর্ট। সাহেবরা কিউলিনারী আর্টের (Culinary art) কথা বলে থাকেন। মুর্শিদাবাদী আম ছাড়িয়ে কেটে খাওয়ানোর কেরামতির তুলনা তার সঙ্গে কবা চলে না। আঙুলের একটু চাপ পড়েছে কি না, আমটাই জল হয়ে গেল! নইলে মাত্র আম কেটে খাওয়ানোর জন্যে মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমেরা কখনও ভাল মাহিনা দিয়ে লোক রাখতেন? আম ছোলার এই আর্ট নাকি বংশানুক্রমেই শেখানো হতো। বাইরের কোনো লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

কাজেই আম খেতে চাইলেই হয় না। আম খেতে জানাও দরকার। মুর্শিদাবাদের জমিদারেরা এককালে জেলার কালেক্টর আর অন্যান্য সাহেবদের 'ম্যাঙ্গো পার্টি' দিতেন। ডিনার নয়, স্রেফ আম খাওয়ার নেমন্তন্ন। আর সে ব্যাপারটা যে কেমন হতো তা যাঁরা পার্টিতে গিয়েছেন, তাঁরাই বলতে পারেন। তা ছাড়া আমের মরসুমে ছোট বড় মাঝারি সব শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেক জমিদার রাজা-মহারাজা আমের ডালি দিতেন। রুপোর পরাতে নামজাদা আম সাজিয়ে কিংখাপের খনচাপোশ দিয়ে ঢেকে আমের ডালি নিয়ে আসতো পোশাক পরা চোবদার হরকরার দল। সেও ছিল এক এলাহি কাণ্ড। এখন আর সে দৃশ্য চোখে পড়ে না। সব বদলে যাচ্ছে ঠিকই, বদলায়নি মুর্শিদাবাদের আম আর তার গন্ধ, বর্ণ ও আস্বাদ।
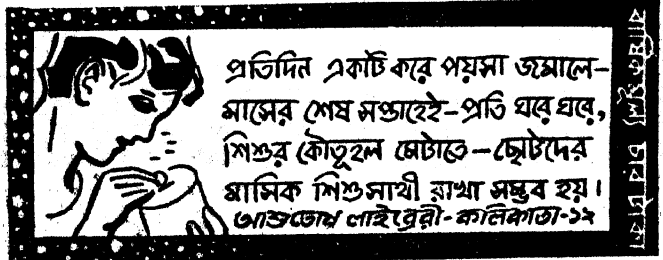
প্রবন্ধ সংকলন

নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল : যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ, ৪১এ, বলদেওপাড়া, কলিকাতা—৬ : মূল্য ছয় টাকা।

বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র শুধু ওজস্বিনী ভাষায় অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা করেই জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন নি, তাঁর বক্তৃতার মূলে ছিল সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা, নবজাতীয়তাবাদের দার্শনিক মন্ত্র। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। সাময়িক উচ্ছ্বাস অথবা সুলভ সাধুবাদের স্রোতে কখনও নিজেকে নিমজ্জিত হতে দেননি। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাগর মন্থন করে যুক্তিবাদের শক্ত কাঠামোয় নির্ভর করে তিনি তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতা যুক্তিসহ আর বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে তুলেছিলেন। ঠিক এই কারণেই তাঁর বক্তৃতাবলী শুধু তাঁর রাজনৈতিক মতামতের প্রকাশ মাত্র নয়, দেশের মনন সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজনা।

আলোচ্য গ্রন্থের রচনাগুলি অধুনালুপ্ত বঙ্গবাণীতে 'বাংলার নবযুগের কথা' নাম দিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। দেশের ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা যে এতদিন পুস্তকাকারে এমন সুদুর্লভ রচনা লোকচক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশক বাংলা ভাষাভাষীর ধন্যবাদার্হ।

এ বক্তৃতাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিলো জনজাগরণ। বাঙালীকে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। পুণ্যশ্লোক মনীষীদের আত্মব্রতের ফলস্বরূপ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারতবাসী আজ মুক্ত। কিন্তু আজও বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতাবলীর মূল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি। এ সবের আবেদন শাশ্বত, এ সবের প্রভাব চিরকালীন।

আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে মোট সতেরোটি বক্তৃতা সংযোজিত হয়েছে। 'বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র' এই বক্তৃতাটি বিপিনচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ। বক্তৃতাগুলি পাঠ ক'রে বিপিনচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ও বিভিন্ন বিষয়ে সমধিক পাণ্ডিত্যে বাস্তবিকই মুগ্ধ হতে হয়। রাজনীতির কণ্টক বহুল ভূমি থেকে সাহিত্যের বেলাভূমিতে তাঁর অবাধ বিচরণ। বিজ্ঞান ও দর্শনে তাঁর অধিকার অসামান্য।

লঘু জনপ্রিয়তা আর আত্মস্তুতির এই যুগে এ জাতীয় রচনার মূল্য অসীম। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ শোভা পাক এইটুকু কামনা করা আশা করি অযৌক্তিক নয়।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ অলংকরণ অনবদ্য।

২২৩।৫৫

গল্প সংকলন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭। মূল ৪৲ টাকা।

একটা মৃদু প্রসন্ন কৌতুকরস বিভূতিভূষণের লেখার উপর যেখানেই সিঞ্চিত হয়েছে, যেখানেই কিশোর-কিশোরীর লাজুক প্রেমের উপর তাঁর সহাস্য প্রণয়-স্নিগ্ধ আভা ফেলেছে কিংবা অহিংসেবী অব্যবসায়ী প্রাচুর্যে যৌবন যেখানেই বিচিত্র লীলায় উচ্ছল হয়ে তাঁর লঘু হাসির আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে, সেখানেই সমালোচককে তিনি অনায়াসে নিরস্ত্র করেছেন।

বিভূতিভূষণ যৌবনের কবি। তাঁর জগতে সূর্যের আলো সংসারের কালি লেগে মলিন হ'য়ে যায়নি, যেদিকেই তিনি ফিরেছেন পৃথিবীর মায়াপ্রপঞ্চ সেই আলো লেগে তাঁর চোখে ঝকমক করে উঠেছে। যে চোখ নিয়ে রেল গাড়ীর জানালায় শিশু অবাক হ'য়ে চলন্ত কলাগাছ, গরু, কুঁড়ে ঘর পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই চোখে তিনি গোবিন্দ মাসীর কোঁদল দেখেছেন, দেখেছেন গড়ের বাদ্যির দাপট।

কিন্তু এই কিশোর সুলভ কৌতুকপরায়ণতার একটু বিপদও আছে। তাঁর যাতে কৌতুক, পাঠকের তা হাসির কারণ না হতে পারে। যেমন এই সংকলনের ঘৃত-তত্ত্ব শীর্ষক গল্পে বরপক্ষকে ঠকিয়ে ছোট-বোন যমুনার জায়গায়, কি ক'রে বড় বোন বোবা সরযুকে পার ক'রে দেওয়া গেল সেই নির্মম ছলনার কাহিনীতে যে রসের সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র মতে তা হাস্যরসের বিরুদ্ধ।

আরও অনেক গল্পে, অনেক জায়গায় পাঠকের রসজ্ঞান লেখকের রসজ্ঞানের কাছে হঠে যায়, অনেক জায়গায় মনে হয়, কল্পনা এবং উদ্ভাবনাতে দৈন্য একটু প্রকট হ'ল। তবু নিজের অধিকৃত ভূমিতে, ভাষার পরকলায় পলায়নমান অনুভূতির নানা বর্ণের বিচ্ছুরণে, কথোপকথনের বিচিত্র নর্তনে, বিভূতিভূষণ অদ্বিতীয়। এই সংকলনে অনেক আনন্দের মুহূর্ত সংকলিত হয়েছে।

২৪৪।৫৫

মাধবীর জন্য:—প্রতিভা বসু। নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩। আড়াই টাকা।

প্রায় বারো বছর আগে 'মাধবীর জন্য' নামে শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর যে গল্পসংগ্রহ ছাপা হয়েছিল, বর্তমান বইখানি তার নতুন সংস্করণ মাত্র নয়। একমাত্র নাম গল্পটি ছাড়া মোট সাতটি গল্পের বাকি ছ'টি গল্পই নতুন।

গল্পের ঘটনাপ্রবাহে, চরিত্রের পরিবর্তনে-পরিণতিতে অভাবিতপূর্ব বিস্ময় ফোটাতে পারেন নিপুণ শিল্পী। প্রতিভা বসুর এই গল্পগুলির মধ্যেও অপ্রত্যাশিত উপসংহারে পৌঁছোবার সাধনা আছে। কলেজে-পড়া অবস্থাপন্ন ছেলেমেয়ের প্রেমরঙ্গ ('কাঁচা রোদ'), নিম্নবিত্ত শিক্ষিত মেয়ের প্রতি ঐশ্বর্যক্লান্ত, সুখী, সুশ্রী, শিক্ষিত যুবকের অনুরাগ ('মিসেস্ পালিতের গার্ডেনপার্টি'), পাড়াগাঁয়ের সরলা কিশোরীর সঙ্গে কুমিটোলা ইস্কুলের তরুণ এক শিক্ষকের বিবাহ, প্রণয়ভঙ্গ, পুনর্মিলন ('নতুন পাতা') ইত্যাদি ইত্যাদি প্রসঙ্গ থেকে এই গল্পসংগ্রহের বস্তুপ্রকৃতিটির বিশেষত্ব বোঝা যাবে। শেষের গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্পষ্ট নয়। তবু প্রতিভা বসু যে বিশেষ ব্যক্তিত্ববতী লেখিকা, তাতে সন্দেহ নেই। 'পথে হলো দেরি', 'বিয়ের তারিখ' এবং 'মাধবীর জন্য'—এই তিনটি গল্পেই বিবাহিত জীবনে অথবা বাগ্‌দত্তার সম্পর্কে জটিল প্রণয়-ঘটিত মনান্তরের কথা আছে। পারিপার্শ্বিক দেশ কালের অন্যান্য দিক ছাপিয়ে এই সাতটি গল্পেই প্রধানত যে বিষয়টি গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে সেটি হলো, নরনারীর প্রণয়ের বিচিত্রতা। মূল্যবান শাড়ি, গহনা, উচ্চবিত্ত সমাজের বিচিত্র আভরণ, আসবাব, সাঙ্গোপাঙ্গ,—এমন কি লেখিকার অত্যল্প-পরিচিত বিলেতের মেয়ে হিলডার জন্য দামী কোট, নেকলেস ইত্যাদি উপহারের ছটায় এই গল্পজগৎ বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় যে, বইখানি একটি মহিলার লেখা। 'সুর-সরস্বতী' কিন্তু অন্য জাতের গল্প। সত্য-সাধকের গভীর অন্তর্জীবন ফুটতে চেয়েছে এই গল্পে। রক্তমাংসের বাধা কাটিয়ে উঠলো নিত্য-আনন্দের অভিসার। 'শকুন্তলা'র জীবনে ফুরিয়ে গেল 'নয়নেন্দু'র প্রয়োজন। এই শোচনীয় সত্যের বেদনা,—এই আনন্দময় সত্যের শান্তি প্রতিভা বসুর একটি প্রিয় প্রসঙ্গ বলেই মনে হয়। এই সূত্রে অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর 'গুণীজনোচিত' গল্পটি মনে পড়া খুবই সঙ্গত। জীবনের প্রকাশ্য বহির্লোক থেকে গভীর অন্তর্লোক অবধি তাঁর আগ্রহের বিস্তার। কয়েকটি 'ইডিয়মের' ত্রুটি ছাড়া তাঁর ভাষার মসৃণতাও সত্যিই প্রশংসনীয়।

বইখানির ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ চমৎকার।

২৪৬।৫৫

অপরিচিতার চিঠি : নীলরতন মুখোপাধ্যায়; অগ্রণী প্রকাশনী, ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬ : মূল্য দু টাকা।

আধুনিক লেখকদের শ্রম ও সাধনায়

ইদানীন্তন বাংলা গল্প-সাহিত্য যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। শুধু আঙ্গিক, বিষয়বস্তু নির্বাচন, রচনা শৈলীতেই নয়, দেশ দেশান্তরের কাহিনী ও চরিত্র আহরণ করে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটির পরিপুষ্টি সাধন প্রয়াসের চিহ্ন প্রায় সর্বত্র। পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধি মর্জিত, রুচি-স্নিগ্ধ গল্পের সংখ্যা উপেক্ষার নয়, এমন কি এর মধ্যে অনেক গল্প বিশ্ব-সাহিত্যের গল্পের দরবারে আসন পাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

এত কথা বলার প্রয়োজন এই কারণে যে, কোন গল্প গ্রন্থের সমালোচনা গল্প-সাহিত্যের এই উন্নত-মানের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

আলোচ্য গল্প সংকলনের লেখক সাহিত্যে নবাগত। তাঁর রচনা গতানুগতিক। নিছক গল্প বলে যেতে শিখেছেন লেখক, কিন্তু বলার ঢং আয়ত্ব করতে এখনও পারেননি এবং বলিষ্ঠ আঙ্গিকের মাধ্যমে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশলও এখনও তাঁর করায়ত্ব নয়। মাঝে মাঝে 'প্রগতিশীল' হওয়ার মোহে বাস্তবপন্থী বিষয়বস্তুর অবতারণাও হাস্যকর।

ছাপা, বাঁধাই মনোরম, কিন্তু প্রচ্ছদ চিত্রণ আরো পরিচ্ছন্ন হলেই শোভন হতো।

১৬০।৫৫

উপন্যাস

সুবর্ণাঃ—সুশীল রায়। ক্যালকাটা পাবলিশার্স; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দু'টাকা বারো আনা।

দুর্ভিক্ষের দিনে রামেশ্বরের মেয়ে লবঙ্গর লাঞ্ছনা দেখে শিবলা গাঁয়ের নবাগত লাহিড়ী-ইস্পাহানি কোম্পানির কুলির সর্দার রাজারাম এক ঘুঁষিতে হত্যা করেছিল গাইগার-সাহেবকে। সেই অপরাধের দণ্ডভোগ করে পাঁচ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে সোজা শিবলা-ধানকোড়া মহাদেবপুরে এসে হতাশ হতে হলো তাকে। গ্রাম প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে তখন। পুরোনোকালের একমাত্র সাক্ষী মহাপাত্র বললে,—দুর্ভিক্ষের ধাক্কাটা প্রায় সামলে নিয়েছিল সকলে, এমন সময়ে এলো স্বাধীনতা, দেশ তিন টুকরো হলো, ইত্যাদি। রাজারাম নিজেও তখন উদ্বাস্তুমাত্র। তারপর, লবঙ্গকে খুঁজতে খুঁজতে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলো রাজারাম আহির। হরবিলাস নামে এক পকেটমারের শিষ্য হলো সে। মহাদেবপুরের চেনা মেয়ে মধুমালার সঙ্গে দেখা হলো তার। মধুমালা এখন শান্তনু লাহিড়ীর আশ্রিতা রূপোপজীবিনী। এমন সময়ে একদিন তার চোখে পড়লো লবঙ্গর মুখ। লবঙ্গ তার দলের সঙ্গে আন্দামানে গেল। রাজারাম অবশেষে মধুমালাকে খুন করে গরু-মহিষ চাষ-আবাদের সরঞ্জাম নিয়ে নতুন ঘর বাঁধবার সুখস্বপ্ন মনে নিয়ে আন্দামানের জাহাজে উঠলো।

এই হলো 'সুবর্ণা'-র গল্প। নানা ঘটনার জটলায় কিছু কিছু উত্তেজনা আছে বটে, সুশীলবাবুর দক্ষ হাতের ভাষাও মসৃণ; এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি নাম,—বিচিত্র ঘটনার বৈচিত্র্য, রুক্ষ এলাকার, কঠোর জীবিকার মানুষ রাজারামের মানসিক প্রবণতার কোমলতা এবং অদ্ভুত হনন-ক্ষমতা, সব মিলিয়ে যে আবেদনটি মুখ্য হয়ে উঠেছে, সে হলো অদ্ভুত সমাবেশের আবেদন। অবশ্য, গল্প গেঁথে তুলেছেন সুশীলবাবু। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশ-বিভাগের দুঃখকষ্টের ছায়া পড়েছে 'সুবর্ণা'য় ইতস্তত।

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাটি চমৎকার।

২১১।৫৫

ত্রিবেণী : অনুরূপা দেবী : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

অনুরূপা দেবী সাহিত্য সম্রাজ্ঞী। এক-কালে সাহিত্য জগতে তাঁর আসন ছিল একচ্ছত্র। আজ যুগের হাওয়া পরিবর্তিত, মানুষের রাষ্ট্রজীবন, সমাজ জীবন সব কিছুই ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সংবেদনশীলতার আবেদনও সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজও অনুরূপা দেবীর রচনা পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দলোকের সন্ধান দেয়, তাঁদের সুখ-দুঃখের মায়াকাঠির স্পর্শে বিমুগ্ধ করে রাখে। এর একমাত্র কারণ অনুরূপা দেবীর রচনা কোন এক বিশেষ কালের মধ্যে সীমায়িত নয়, তাঁর রচনার আবেদন সর্বকালীন।

আলোচ্য উপন্যাসটি গৌড় বংশের উত্থান পতনের ইতিকথা। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে জ্বলে উঠল বিদ্রোহানল। গৌড়েশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করে রামপালের সিংহাসন প্রাপ্তিতেই এই কাহিনীর উপসংহার। বহু ঘটনার শাখা-প্রশাখায় কাহিনী ব্যাপ্তি লাভ করেছে, কিন্তু রচনার প্রসাদ গুণে কোথাও গতিবেগ স্তিমিত নয়, চরিত্র চিত্রণও অস্পষ্ট নয়।

গ্রন্থটি যে জনসমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে একাধিক সংস্করণই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ চিত্রণ প্রকাশকের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখবে। ১৮৯।৫৫

কবিতা

লগ্ন গোধূলি—রবীন্দ্র বিশ্বাস, বিকল্প সাহিত্য ভবন, ৭, হিন্দুস্থান রোড, কলকাতা—২৯, দু টাকা।

কোনো বিশেষ মত বা পথ, ধারণা বা বিশ্বাস মাত্র প্রচারের সজ্ঞান কর্তব্যবোধ থেকে উঁচু দরের কবিতা লেখা হয়তো সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। এমন কবিও হয়তো আছেন, যিনি তাঁর প্রচারণীয় বিষয়টিকে কল্পনার বলে রসানুভূতির সামগ্রী হিসেবে অন্তত সাময়িকভাবেও গ্রহণ করতে অসমর্থ নন।

কিন্তু রবীন্দ্র বিশ্বাস ঠিক সে রকম মানুষ নন। "কাব্যে ও জীবনে আমি মার্ক্সপন্থায় বিশ্বাসী"—এই হলো তাঁর আত্মপরিচয়। সংসারের নানান যন্ত্রণার তালিকা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, "স্বপ্ন এক কুহকী ছেনাল"। মাঝে মাঝে কবি-জনোচিত উপলব্ধির কিনারা ঘেঁষে গিয়েও তিনি কবিত্বের গভীরতায় পৌঁছুতে পারেননি। বিষাদ, ব্যর্থতা, ক্রোধ—এই তিনটি শব্দেই 'লগ্ন-গোধূলি'র মর্মার্থ নিহিত। অসংখ্য ছাপার ভুল, প্রতি কবিতায় উৎসর্গের আয়োজন এবং বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে এক একজন পুরুষ বা মহিলার নাম,—তারপর কবিতার মধ্যে অদ্ভুত সব উক্তি বইখানিকে নিরন্তর কণ্টকিত করে রেখেছে। নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন,

একুশের সম্মোহন বাইশের অস্ত্রে গেলো ছিঁড়ে
সে স্বপ্নসম্ভব ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন কংগ্রেসী প্রহারে।

এও না হয় বোঝা গেল। কিন্তু "চম্পাহত সর্পিণী" মানে কি (সংজ্ঞা)? এক একটি চরণের শুরুতেই বিস্ময় চিহ্নিত বিন্দু ধারারই বা (...!) আয়োজন কেন? 'তিনি নাবিক' নামক লেখাটিতে 'তিনি'-ই বা কেন?

—'নাবিক'-ই বা কিসের প্রতীক? প্রতীক যদি না হয়, তবে ও-কবিতার মর্মার্থ কি?

'লগ্ন-গোধূলি' বাংলা দেশে স্বল্পায়ু হাজার হাজার কবিতার বইয়ের মধ্যে একখানি চটি বই মাত্র। তবু যে এতো কথা ভাবতে হলো, তার কারণ, এ বইয়ের লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বিশ্বাসের মধ্যে শক্তির সম্ভাবনা আছে। নিজেকে এবং পাঠককে তাক লাগাবার খেয়াল পরিত্যাগ করে তিনি অদূর ভবিষ্যতে যথার্থ কবিতা লিখবেন, এই আমাদের অন্তরের আশা। ২৩৬।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

নওজোয়ান : আলেকসান্দর ফাদেইয়েভ : অনুবাদ : বরুণ চক্রবর্তী; মডার্ন পাবলিশার্স, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২; মূল্য চার টাকা।

কোন দেশের সাহিত্য শুধু মৌলিক রচনাতেই পরিপুষ্টি লাভ করে না, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারাও এর শ্রীবৃদ্ধি সাধন অবশ্য কাম্য।

আশার কথা, ইদানীং বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ রচনার জোয়ার এসেছে। খুবই স্বাভাবিক, এই জোয়ারের স্রোতে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত বস্তুও ভেসে এসেছে, কূট রাজনীতিবাদের উদ্দেশ্যমূলক রচনা।

আলোচ্য গ্রন্থটি আলেকজান্ডার ফাদেইয়েভের "ইয়ং গার্ড"এর অনুবাদ। জার্মাণ নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাহিনী এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। অনুবাদ স্বচ্ছ নয়, ভাষা আড়ষ্ট, সাবলীলতার যথেষ্ট অভাব। সেই কারণেই রসাস্বাদনের পক্ষে বহু স্থানে বাধা সূচিত হয়েছে।

ভাষান্তর সেখানেই সার্থক যেখানে দেশান্তরের কথা ঘরের কাহিনীরূপে প্রতীয়মান হয়।

তবু স্বীকার করবো এ জাতীয় অনুবাদের আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। দেশের সাহিত্যকে উর্বরা করার জন্য এই সব রচনা পলিমাটির কাজ করে।

ছাপা চলনসই, প্রচ্ছদ অলংকরণ চোখের পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক। ২২০।৫৫

লাল ফুল—ব্যারনেস ওর্জি; কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। বাণীপীঠ গ্রন্থালয়, ৩১।১, রামতনু বসু লেন, কলিকাতা—৬, তিন টাকা।

ব্যারনেস ওর্জি-র 'স্কারলেট পিম্পারনেল' অবলম্বনে লেখা এই বইখানিতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় সামর্থ্যের পরিচয় আছে। অবশ্য মূল কাহিনীর উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে প্রশংসার বা নিন্দার ভার অনুবাদকের প্রাপ্য নয়। মূল বইখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্বাচনটি ভালো হয়েছে। আর তাঁর বাংলা গদ্যের গুণে মূল লেখার চমক, আড়ম্বর, কৌতূহল ইত্যাদি বজায় আছে।

মূল গ্রন্থমালায় ঐতিহাসিক সত্য, ঐশ্বর্যময় আড়ম্বর, কল্পনার সমারোহ এবং গোয়েন্দা-গল্পের উত্তেজনা পরস্পর অবিভাজ্য-ভাবে মিশে গেছে। বর্তমান বাংলা সংস্করণে সেই বিশেষ স্বাদটি যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, এইটিই হলো বড়ো কথা।

বাঁধাই এবং মলাটের ছবি ভালো হয়েছে, কিন্তু বিস্তর ছাপার ভুল চোখে পড়লো। ২৩৭।৫৫

কিশোর সাহিত্য

নবভারতের বিজ্ঞান-সাধক: শ্রীযামিনী-মোহন কর। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম: এক টাকা বারো আনা।

বর্তমান কিশোর মানসই আগামী ভারতের বনিয়াদ। এই কিশোর মনটির সংগঠনে তাই সব চেয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি কিশোর মনে দেশ ও দশকে জানার আগ্রহ, দেশের মনীষার পরিচয় পাওয়ার কৌতূহল উদ্রেক করতে হবে। ভারতের আটত্রিশ জন বিজ্ঞান-সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য এই ছোট গ্রন্থটিতে উপস্থিত করা হয়েছে। কিশোর পাঠক এর মধ্যে ভবিষ্যৎ রচনার প্রেরণা খুঁজে পাবে। ১৫৩।৫৫

মহাকবির গল্প: জোনাকি। প্রকাশক: সাহিত্যায়ণ, ২৩-ডি, কুমারটুলি স্ট্রীট, কলি: ৫। দাম: এক টাকা চার আনা।

মহাকবি কালিদাসের গল্প। কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য মনোরম ভাষায় পরিবেষণ করা হয়েছে। মুশকিল আসান, এই আর সেই, সেয়ানে সেয়ানে, জয় পরাজয়, স, সে, মি, রা, ইত্যাদি শিরোনামায় যে কাহিনীগুলো তুলে ধরা হয়েছে, গল্প বলার গুণে সেগুলো পাঠক-পাঠিকাদের মনে কৌতূহল সঞ্চার করবে। মহাজীবন কাহিনী নিয়ে এই জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন আছে। (১৮৮।৫৫)

খোকাখুকুর ছড়া: মীরা রায়। প্রকাশক: রায় ব্রাদার্স। ১৬, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯। দাম: এক টাকা।

অত্যন্ত আটপৌরে রচনা। তা সত্ত্বেও আন্তরিকতার একটি স্বচ্ছন্দ আমেজ আছে। বর্ণাঢ্য চিত্রে চিত্রে পুস্তিকাটি লোভনীয়। একটি কথা লেখিকার জানা উচিত, এই রচনাগুলির অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, সত্যেন দত্ত এবং উত্তর-রবীন্দ্র অনেক শক্তিমানের উপাদেয় ছড়া আমাদের ক্ষুদে পাঠকেরা উপহার পেয়েছে। শব্দচয়ন, ছন্দোবয়ন সব দিকেই আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। ১৪৭।৫৫

সাহিত্যালোচনা

বলাকা কাব্য-পরিক্রমা—ক্ষিতিমোহন সেন। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক: এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য চার টাকা।

কাব্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রায়শ নিষ্প্রয়োজন, বিরক্তিকর এবং কবির পক্ষে পরোধর্ম একথা সাধারণভাবে সত্য। ক্ষিতিমোহন সেনের গ্রথিত এই কবিকৃত আলোচনা-মালাও বলাকা কাব্যের রসের উপভোগে কত সাহায্য করবে সে প্রশ্নের বিভিন্ন রসিক বিভিন্ন উত্তর দেবেন। কিন্তু এই আলোচনা প্রসঙ্গে নানা দার্শনিক তত্ত্বের যে কাব্যধর্মী বিবরণ এই গ্রন্থে কবির মুখ থেকে শুনে লেখা হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণে তার সমাদর কমবে না আশা করা যায়। ২০১।৫৫

নূতন পত্রিকা

গ্রন্থবাণী। সম্পাদক: সমীর ঘোষ ও প্রিয়নাথ জানা। পঁচিশে বৈশাখ সংখ্যা: ১৩৬২। দাম: বারো আনা।

পত্রিকাটি গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। সাগরপারের দেশ-গুলোর মত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষ ব্যাপক নয়। অথচ গণ-শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্ব-পূর্ণ। গ্রন্থাগার পরিচালনা তাই সুষ্ঠু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেদিক থেকে 'গ্রন্থবাণী' একটি সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যাটিতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মুলকরাজ আনন্দ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার দত্ত, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাতনামারা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোক-পাত করেছেন। পত্রিকাটির সঙ্গে এ বৎসরের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, পুস্তক ও সাময়িক পত্রের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

যুগ ও জীবন—সম্পাদক: শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। বৈশাখ সংখ্যা: ১৩৬২। দাম: ছয় আনা।

এ দেশে পত্র-পত্রিকার জন্মের হার যেমন বিস্ময়ের সঞ্চার করে; অকালমৃত্যুর হারও তেমনি ভয়াল। এ বৎসর অজস্র নবজন্মের মধ্যে 'যুগ ও জীবন' অন্যতম। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়—সবই আছে। কিন্তু যে মশলার অভাবে পত্রিকাটি সুস্বাদু হয়ে উঠতে পারেনি, তা হলো রচনার উৎকর্ষ। দু একটি রচনা ছাড়া সবই অপাঠ্য।

তোডরমল

কর কমিশন

পূর্ব প্রবন্ধে জাতীয় পরিকল্পনায় করনীতির ভূমিকা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৩ সালে একটি কর-কমিশন গঠিত হইয়াছিল এবং এই কমিশনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে কর সম্পর্কে উক্ত কমিশনের সুপারিশ সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

আয়কর কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব-সংগ্রহের একটি প্রধান অংগ। 'আয়' বলিতে কি বোঝায় এবং কিভাবে তাহার উপর কর স্থির করিতে হইবে এই সম্পর্কে এ পর্যন্ত সুচিন্তিত নীতি অনুসৃত হইয়াছে। তবে কতকগুলি আয় এখন পর্যন্ত উক্ত করের গোচরীভূত হয় নাই। যাহাতে ঐসব আয়ও করের আওতায় আসিতে পারে সেই বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ জমি বন্দোবস্ত বাবদ উপরি পাওনা, পুস্তকের কপিরাইট বা কোন ঔষধের পেটেণ্ট রাইট বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ম্যানেজিং এজেন্সী অবসান বাবদ ক্ষতি-পূরণের অর্থ বা অন্যায়ভাবে চাকুরী গেলে ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষতিপূরণ দান প্রভৃতি আয়করের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অভিমত দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পুস্তকের কপিরাইট বা ঔষধের পেটেণ্ট রাইট বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর আয়কর বসাইলে যে কোন গ্রন্থকার বা আবিষ্কারক ক্ষুণ্ণ হইবেন। স্মরণ থাকিতে পারে, বার্নার্ড শ'র জীবিতকালে পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর গুরু করভার চাপান ব্যাপারে তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কথার ধাঁধা শুদ্ধ করিয়া সমাধান করিবার জন্য পুরস্কার লব্ধ অর্থ এবং লটারীর টাকার উপর কর বসানর যৌক্তিকতাও দেখান হইয়াছে। এমন দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন কোম্পানীতে ব্যক্তিবিশেষকে নিজেদের মাহিনা ছাড়াও এমনসব সুবিধা দেওয়া হইয়াছে যে, যাহা অতিরিক্ত আয়ের পর্যায়ে পড়ে—যথা বাড়িভাড়া কোম্পানী কর্তৃক দেওয়া, গৃহ সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত চাকরদের মাহিনা কোম্পানীর বহন করা ইত্যাদি। এইসব প্রচ্ছন্ন অতি-রিক্ত আয়ের উপর কর নিরূপণ করার যথেষ্ট সংগত কারণ রহিয়াছে। তবে আপাতত যেসব কর্মচারী উপরোক্ত অতিরিক্ত আয় সহ বৎসরে ২৪০০৲ টাকার উপর পান তাঁহারা ও কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এই করের গণ্ডিতে পড়িবেন বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে। বর্তমানে কৃষি আয় ও অকৃষি আয় এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কর নিরূপণের দিক হইতে এই পার্থক্য থাকার কোন অর্থ নাই। যে পর্যন্ত না এই পার্থক্য দূর করা হয় সেই পর্যন্ত দুগ্ধ সরবরাহ, শাকসব্জী উৎপাদন প্রভৃতি কৃষিজাত আয়করভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাওনাদার দয়াপরবশ হইয়া প্রাপ্য টাকার কিছু অংশ যদি ছাড়িয়া দেন এবং দেনাদারের আয়কর হইতে উক্ত পরিমাণ দেনা যদি পূর্ব বৎসর বাদ দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহা পরবৎসর দেনাদারের আয় বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি কোন মাহিনা কোন কর্মচারী দাবি না করেন এবং তাহা কোম্পানীর খাতায় জমা পড়িয়া থাকে তবে তিন বৎসর অন্তে উক্ত মাহিনার উপর কোম্পানীকে কর দিতে হইবে।

যদি কোনো কোম্পানী যন্ত্রপাতি কেনে তবে প্রতি বৎসর ক্ষয়বাবদ কিছু অর্থ উক্ত যন্ত্রপাতির দাম হইতে বাদ দেওয়া হয়। এই ক্ষয়বাবদ মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ বাদ দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগের স্থলে ২৫ ভাগ করিবার জন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। বিভিন্ন শিল্পোন্নয়নের জন্য অন্ততঃ ছয়বৎসর যাহাতে ঐসব শিল্পকে কর না দিতে হয় সেই বিষয়েও অভিমত দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে দেখিতে হইবে উক্ত শিল্প জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার সহায়ক কিনা। এ পর্যন্ত সমবায়

বীমা কোম্পানীগুলির লাভের অংশ আয়-কর হইতে অব্যাহতি পাইতেছিল। কিন্তু কর কমিশন তাহার উপর কর বসাইবার সুপারিশ করিয়াছেন। সমবায় সমিতি-গুলি সরকারী ঋণপত্রের উপর যে সুদ পায় এবং অন্যান্য সম্পত্তি হইতে যাহা আয় করে তাহার মোট পরিমাণ ২০,০০০ টাকার নীচে হইলে আয়কর দিতে হইবে না বলিয়া কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন। দশবৎসর অন্তে এই সুবিধা দানের কি প্রতিক্রিয়া ঘটিল সেই বিষয়ে অনুধাবন করা যাইতে পারে। উত্তরাধিকার কর হইতে অব্যাহতির সীমা-রেখা ১ লক্ষ টাকায় টানিয়া দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর অন্তত পাঁচ বৎসর পূর্বে কোন সম্পত্তি দানপত্র করিয়া যান তাহা যাহাতে উত্তরাধিকার করের অন্তর্ভুক্ত হয় এইরূপ অভিমত দেওয়া হইয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন কর ব্যতীত আমদানী রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইয়া সরকারের আয় বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। তবে কমিশনের মতে আমদানী শুল্ক বসাইয়া সরকারকোষে অর্থাগমের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ। বর্তমানে আমদানী নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করিলে হয়তো কিঞ্চিৎ রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। রপ্তানী শুল্ক মারফৎ রাজস্ব বাড়াইবার কিছুটা সম্ভাবনা আছে। তবে রপ্তানী শুল্কে বাবদ অর্থ আভ্যন্তরিক নিত্যব্যবহার্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত হওয়া উচিত। কমিশন মনে করেন যে, আবগারি শুল্কের সাহায্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহাদের মতে কফির উপর শুল্ক কমাইবার কোন যৌক্তিকতা নাই। অথচ কেরোসিনের উপর শুল্ক বাড়াইবার সংগত কারণ রহিয়াছে। চিনির উপর শুল্কে বৃদ্ধিরও সুযোগ আছে। দিয়াশলাই প্রভৃতিও এই পর্যায়ে পড়ে। চায়ের উপর কর বৃদ্ধির সংগত কারণ আছে। সেলাইর কল ও বৈদ্যুতিক পাখার উপর কর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইয়াছে। তবে বর্তমানে বহু উদ্বাস্তু পরিবার সেলাইর কলের সাহায্যে নানা পরিচ্ছদ তৈরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। সেইজন্য এই বৎসরের বাজেটে সেলাইর কলের উপর কোন শুল্ক ধার্য করা হয় নাই। ইহা ছাড়া গরম কাপড় (যাহা দরিদ্রা সাধারণত ব্যবহার করেন না) বিস্কুট, বৈদ্যুতিক বাতি, কাঁচের সৌখিন তৈজস-পত্র, নানাপ্রকার রঙিন দ্রব্যের উপর কর বসাইবার বা বাড়াইবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

বিক্রয়কর প্রাদেশিক সরকারের অর্থাগমের একটি প্রধান উপায়। এই করের সাহায্যে অনেক ব্যক্তিকে একই সংগে জড়িত করা যায় এবং তাহাতে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। কমিশনের মতে এই করের হার সামান্য হওয়া উচিত যাহাতে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের অসুবিধার কারণ না হয়। যে সব ব্যবসায়ীদের বাৎসরিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ৫০০০, টাকার উপর তাহা-দিগকেও এই করের আওতায় টানিয়া আনা উচিত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষকেই এই কর দিতে হয় এবং অন্যান্যদের দিতে হয় না সেই ক্ষেত্রে যাহাদের ব্যবসায়ের পরিমাণ বৎসরে ৩০,০০০, টাকার উপরে তাহাদের উপব এই বিক্রয়কর চাপান সংগত। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয় তাহার উপর কর বসাইবার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকা উচিত। ভবিষ্যতে কেনা-বেচার জন্য অগ্রিম যে ব্যবস্থা করা হয় তার উপর বিক্রয়কর বসাইবার জন্য অনেকে বলিয়া থাকেন। কমিশনের মতে এইসব কাজে বিক্রয়কর না বসাইয়া স্ট্যাম্প ডিউটি বসান উচিত। বিক্রয়কর বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশে যতটা সম্ভব একই নীতি যাহাতে অনুসৃত হয় সেইজন্য আন্তঃপ্রাদেশিক কর কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রদেশে মোটরযান ইত্যাদি চালনার উপর হুইল ট্যাক্স দিতে হয়। কয়েক জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটিও অনুরূপ ট্যাক্স আদায় করে। কমিশন শেষোক্ত ট্যাক্স বিলোপ করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু কোন নগরের পৌরসভা যদি ঐ ট্যাক্স বসাইয়া থাকে তাহার যাহাতে অবসান না হয় সেইদিকেও কমিশন অভিমত দিয়াছেন।

স্ট্যাম্প ডিউটি বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশে একই হার থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। চেক ইত্যাদির উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বসাইবার বিরুদ্ধে কমিশন অভিমত দিয়াছেন। তবে সামুদ্রিক বীমার উপর স্ট্যাম্প ডিউটি বসান অনুমোদন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়টি বিবেচনা করিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

আমোদ প্রমোদের উপর একই হারে কর না বসাইয়া শতকরা ভিত্তিতে উক্ত কর নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিশেষ বিশেষ প্রদেশে সর্বনিম্ন টিকেটের উপর করের হার কথঞ্চিৎ হ্রাস করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভূমি রাজস্ব ব্যতীত কৃষি আয়কর প্রাদেশিক সরকারের অর্থাগমের অনেক-খানি সহায়তা করিতে পারে। কমিশনের মতে কৃষি আয়ের পরিমাণ বাৎসরিক ৩০০০, টাকার উপর হইলেই তার উপর কৃষি আয়কর বসান উচিত। ভবিষ্যতে যাহাতে কৃষি আয়কর এবং অন্যান্য আয়কর একীভূত করা হয় এই সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। তাহা না হইলে কৃষি আয়কর প্রাদেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং অন্যান্য আয়কর কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করিবেন—ইহাতে নানাপ্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে পারে। যে পর্যন্ত কৃষি আয়কর ও অ-কৃষি আয়কর একত্রীভূত না হয় তদবধি অ-কৃষি আয়ের অনুপাতে কৃষি আয়ের উপর অতিরিক্ত কৃষি আয়কর নিরূপণ করার যুক্তি কমিশন দিয়াছেন।

আলোচনা

'কীর্তনের প্রবর্তক কি ওরাওঁ উপজাতি?'

মহাশয়,—

৯ই জ্বলাই তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শার্ঙ্গদেব লিখিত 'কীর্তনের প্রবর্তক কি ওরাও' উপজাতি?' নামক আলোচনাটির ('গানের আসর' পৃঃ ৮৩৮-৪০) প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই বিষয়ে আমার 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে আমি যে অভিমত প্রকাশ করেছি, লেখক তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।' তাঁর মন্তব্য সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য আছে, তা' আমি এখানে অতি সংক্ষেপে নিবেদন করব।

কীর্তন গানকে কোনও কালে বাংলায় 'কীর্তি' কিংবা 'কীর্তিগান' বলা হ'তো, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যেতে পারে না। গান সম্পর্কিত কীর্তন কথাটি 'কীর্তি' থেকে আসা সম্ভব নয়; কারণ, একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, কীর্তন গান মূলতঃ প্রেমবিষয়ক খণ্ডগীতি (lyric) ছিল, এবং এখনও তাই আছে,—ইহা কোনদিনই ব্যক্তিবিশেষের কীর্তিপ্রচারক আখ্যায়িকা-গীতি (narrative song) ছিল না, কিংবা এখনও নেই। চৈতন্যধর্ম প্রচারের সময় থেকেই বাংলার এই শ্রেণীর লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম এসে যুক্ত হয়েছে। কীর্তন গানের প্রাচীনতম লৌকিক রূপের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নামগন্ধ ছিল না; অতএব তার ভিতর দিয়ে কারুর কোনও কীর্তি প্রচারেরও কোনও অবকাশ হয় নি'। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৃত্তান্তকে 'লীলা' বলা হয়, এই সম্পর্কে 'কীর্তি' কথাটি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুমোদিত নয়। 'কীর্তি' কথাটির মধ্যে একটু ঐশ্বর্যের গন্ধ আছে; বাংলার বৈষ্ণবধর্ম মাধুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রেই 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র 'গীত-কীর্তি'কেও বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি নিজের আধ্যাত্মিক আদর্শে রসায়িত ক'রে নিয়েছেন।

'কীর্তন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়েই লেখক সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কৃৎ+অন্ হলো কীর্তন'। কিন্তু কৃৎ+অন্ হ'লে শব্দটি হয় কর্তন, কীর্তন নয়। কীর্তন এবং কর্তনে যে রাতদিন তফাৎ, সে কথা বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও লিখেছেন, 'কৃৎ+তি হলো কীর্তি'। এ কথাও মারাত্মক রকমের ভুল। কীর্তি+ক্তিন্ (তি) হলো কীর্তি। সংস্কৃতে কীর্তি একটি স্বাধীন ধাতু। আধুনিক কোনও কোনও বাংলা অভিধানকার কীর্তি+অন্ প্রত্যয় করে কীর্তন কথাটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এ ব্যুৎপত্তি নির্দেশ যে কষ্টকল্পিত, তা' যে কেউ স্বীকার করবেন। যেখানে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কষ্ট-কল্পিত, সেখানে শব্দের মৌলিক পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। সে' জন্যই শব্দটি অনার্য কোনও ভাষা থেকে এসেছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তারপর দ্রাবিড় ভাষী ওরাওঁদিগের মধ্যে শব্দটি প্রায় অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখে এটি বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে ওরাও' জাতির দান বলেই আমার মনে হয়েছে। আমি আমার 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে ওরাও' প্রমুখ উপজাতির সাংস্কৃতিক উপ-করণের আরও সন্ধান দিয়েছি।

কেবলমাত্র শ্রীযুত W. G. Archer-এর গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই যে আমি আমার মতবাদ গঠন করেছি, তা' সত্য নয়। আমি বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ বৎসরে প্রায় তিন মাস করে পালামৌ, রাঁচি ও যাশপুর এলাকার সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি ওরাও' অঞ্চলে ভ্রমণ করে নিজের কানে তাঁদের উচ্চারিত 'কীর্তন' শুনেছি। তারাও শব্দটি আমাদের মতই 'কীর্তন' বলেই উচ্চারণ করে থাকে। তারপর শ্রীযুক্ত আর্চার সাহেব গুমলা মহকুমা শহরের মহকুমা হাকিম থাকাকালীন যাদের সাহায্যে ওরাও' লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁর প্রদত্ত তথ্যসমূহের সত্যতা নির্ধারণ করেছি। অতএব গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের আমার যে সুযোগ হয়েছিল, তার উপরই আমি আমার মন্তব্য প্রকাশ করেছি।

শ্রীযুক্ত আর্চার ওরাও' কীর্তনের সঙ্গে বাংলা কীর্তনের কোনও সম্পর্ক স্থাপন করতে যান নি' সত্য, কারণ, তা' তাঁর আলোচ্য প্রসঙ্গের বহির্ভূত ছিল।

প্রবন্ধ লেখক একটি কথা সত্যই অনুমান করেছেন যে, 'আমাদের যাত্রাগানও ওরাও'দের কাছ থেকে এসেছে।' এ বিষয়ে এখন আমার আর কোনও সংশয় নেই। এ' সম্পর্কে আমি আমার 'বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস' (পৃঃ ২৭-৪০) গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। কারণ, যাত্রা কথাটিকেও সংস্কৃত 'যা' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন পদ বলে মনে করা যায় না। বাংলা যাত্রাগানের মধ্যেও কারুর যাওয়া বা না-যাওয়ার কোনও প্রসঙ্গ নেই। কীর্তন কিংবা যাত্রা কথাগুলো যে বাংলা ভাষা থেকে ওরাও' ভাষায় যায় নি', তা'র প্রমাণ এই হলো যে, ওরাও' অধ্যুষিত অঞ্চলের যে অংশে এই কথাগুলোর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, সে অংশে ওরাও'দের মধ্যে হিন্দুধর্মের আর কোনও প্রভাবই কার্যকরী দেখতে পাওয়া যায় না। আমি মানভূম কিংবা সিংভূম জিলার সংলগ্ন অঞ্চলের ওরাও'দের কথা বলছি নে,—তাদের মধ্যে স্বভাবতঃই বাংলার প্রভাব কতকটা কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু আমি যে সব অঞ্চল থেকে এই কথাগুলোর ব্যবহার সংগ্রহ করেছি, সে সব অঞ্চলের ওরাও'গণ এখনও হিন্দু প্রভাবের অধীন হয় নি।

তারা এখন পর্যন্ত নির্বিচারে হিন্দুর সকল প্রকার নিষিদ্ধ খাদ্য এমন কি গোমাংস পর্যন্ত আহার করে থাকে। সামাজিক জীবনে কোন হিন্দু আচার তারা স্বীকার করেনি। বিশেষতঃ কীর্তন এবং যাত্রা কথাগুলো তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে এমনভাবে অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে যে, সেগুলো যে কখনও বাইরে থেকে ধার করা হয়েছে তা' কিছুতেই মনে হতে পারে না। যাঁরা জাতির সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে থাকেন, তাঁরা জাতির জীবনে কোন্ উপকরণটি ধার করা এবং কোন্ উপকরণটি সহজাত, তা' সহজেই বুঝতে পারেন।

'কীর্তন মূলতঃ নৃত্যানুষ্ঠান নয়, গীতানুষ্ঠান' এ কথা লেখক কেমন করে জানলেন? আদিম সমাজের সঙ্গীত মাত্রই নৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। কীর্তন আগেও তাই ছিল, এখন পর্যন্ত তাই আছে। ওরাও' কীর্তন এবং বাংলার কীর্তনে এ বিষয়ে যা তফাৎ তা কেবল মাত্র নৃত্যের প্রণালীর মধ্যে। লেখক যে 'করণ-প্রবন্ধ'কে কীর্তনের আদিরূপ' বলে অনুমান করেছেন, তাতেও যে নৃত্যের ব্যবহার হতো, তা' তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

ওরাও' কীর্তনের সঙ্গে আধুনিক বাংলা কীর্তনের যে তফাৎ হবে, তা'ত নিতান্তই স্বাভাবিক—এ কথা আমিও আমার গ্রন্থে বলেছি। তবে এই সম্পর্কে এই কথাটির উপরই আমি জোর দিয়েছি যে, উভয়েরই ভিত্তি এক। যেমন, সাঁওতালী ঝুমুর এবং বাংলা ঝুমুরের উৎপত্তি একই ক্ষেত্র থেকে, তথাপি বহিরঙ্গে এদের মধ্যে এখন পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ওরাও' কীর্তন থেকে বাংলা কীর্তন কথাটির উদ্ভব হয়েছে বলে যেমন আমি মনে করি, তেমনই ওরাও' প্রমুখ আদিবাসীর মাদল নামক বাদ্যযন্ত্রটি থেকেই যে বাংলার কীর্তন গানের প্রধানতম বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গের উদ্ভব হয়েছে, আমার এমন কথাও মনে হচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে বাঙ্গালীর কীর্তনের সঙ্গে আদিবাসীর মৌলিক সম্পর্কের কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। —শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

শার্ঙ্গদেবের উত্তর

মহাশয়,

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর পত্রে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তাতে কীর্তন সম্বন্ধে আমার পূর্বাভিমত কোনদিক থেকে খণ্ডিত হয়েছে এমন মনে হয় না।

যথেষ্ট প্রমাণ সহযোগে দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন কীর্তন গানকে কোনও কালে "কীর্তি" বলা হ'ত এমন কোন্ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সংগীত রত্নাকর বা অপরাপর সংগীতশাস্ত্র যদি প্রমাণ বলে গণ্য না করা যায়, তবে আর কি গণ্য হ'বে ভেবে পাইনে। লেখক সংগীতের শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেভাবে চলা যায় সংগীতের ক্ষেত্রে তা হবার উপায় নেই। সংগীতের একটা বিরাট শাস্ত্র আছে এবং সংগীতালোচনার ক্ষেত্রে সেই শাস্ত্রোক্তিকেই আমাদের মেনে নিতে হবে। সমগ্র উত্তর ভারতেই "কীর্তি" প্রবন্ধ প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ সংগীতশাস্ত্রেই মিলছে। কিন্তু ওরাওঁদের "কীর্তন" থেকেই যে এই শব্দটি বাংলায় এসেছে তারই কি প্রমাণ আছে কিছু? কোনও মধ্যযুগের সাহিত্যে এমন উল্লেখ পাওয়া যাবে না। "কীর্তি" থেকে কীর্তন স্বভাবতই অনুমান করা যায়, কিন্তু ওরাওঁদের নৃত্যানুষ্ঠান থেকে কীর্তন কথাটি এসেছে এমন ব্যাপার সহজে কল্পনা করা যায় না। কীর্তন গান মূলত প্রেমবিষয়ক খণ্ডগীতি ছিল বলেই যে তার সংগে পূর্ববর্তী কীর্তি প্রবন্ধের যোগ নেই একথা কোনক্রমেই বলা চলে না। আসলে গুণকীর্তনের সংগে লীলাগানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এটি একটি ক্রমপরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ধ্রুপদও তো প্রেমসংগীত ছিল, কিন্তু পরে তা প্রধানত ভক্তিভাবকে আশ্রয় করেছে। সংগীত এই রকমই সঞ্চরণশীল। টপ্পা প্রধানত প্রেমসংগীত বলে কি ভক্তিমূলক গান কিছু কম রচিত হয়েছে।

কীর্তন শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বাঙ্গলা ভাষার অভিধান" থেকেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি। কেননা, লেখক এই অভিধানের কথাই তাঁর "বাংলার লোকসাহিত্য" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

"কীর্তন—কৃত্ (কীর্তন করা) + অন (ভা)। গ্রা—কেত্তন] বি, গুণকথন, যশঃখ্যাপন। ২ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সংগীত। ৩ কথন; বর্ণন।

"কীর্তি [কৃত্ (প্রশংসা করা) + তি (ভা) কৃত্=কীর্ত। (প্রাকৃ—কিত্তি) বি, সুখ্যাতি; যশঃ, সুনাম। ২ প্রসাদ। ৩ মৃতলোকের প্রশংসা; খ্যাতি।"

এ ছাড়া হাতের কাছে প্রকৃতিবোধ অভিধান রয়েছে। তাতেও যা আছে উদ্ধৃত করছি ঃ—

"কৃৎ (সকর্মক) ছেদন বেষ্টন—কর্তন, কৃত্ত, কৃৎস্ন, কর্তনী, কর্তরী, কৃত্তিকা, কৃত্তি কৃৎ (সক) সংশব্দ করা—কীর্তন, সঙ্কীর্তন, প্রকীর্তন, কীর্তি,=কীর্তক, প্রকীর্তিত।

কীর্তন (কৃৎ + অনট) বর্ণন, কথন, গুণকথন, যশোবর্ণন।"

Monier Williams-এর মতেও কীর্তন কথাটা কীর্ৎ বা কৃৎ ধাতু থেকে এসেছে। তিনিও এই ধাতুর অর্থ celebrate, glorify বা praise করেছেন। শব্দকল্পদ্রুমেও এ শব্দ কৃৎ ধাতু থেকে এসেছে, তাই বলা হয়েছে এবং এই অভিধানে "কীর্তয়ন্তি চ গোষ্ঠী যদ্ গুণানপ্সরোগণঃ" এ রকম বলা হয়েছে।

অতএব মারাত্মক ভুল করেছি এমন কথা কি ক'রে স্বীকার করি? যাঁরা অভিধান সংকলন করেন তাঁরা সকলেই কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এমন মন্তব্য করলে তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। এই উপলক্ষে কীর্তন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অভিমতও উদ্ধৃত করছি ঃ—

"কৃৎ ধাতুর অর্থ প্রশংসা।......কীর্তি এবং কীর্তন একই ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কীর্তন বলিতে যে সংগীত-বিশেষ বুঝায়, তাহা এই কীর্তি—বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি—গান করিবার পদ্ধতি হইতে আসিয়াছে।"

(কীর্তন—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী "কীর্তনের তাৎপর্য"—অধ্যায়)

কীর্তন কিম্বা যাত্রা এই কথাগুলি যে বাংলাভাষা থেকে ওরাওঁ ভাষায় যায়নি পত্রলেখকের মতে তার প্রমাণ হ'ল এই যে, ওরাওঁ অধ্যুষিত অঞ্চলের যে অংশে এই কথাগুলির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, সে অংশে ওরাওঁদের মধ্যে হিন্দুধর্মের কোন প্রভাবই কার্যকর দেখতে পাওয়া যায় না। সেই সব ওরাওঁদের সংগে যদি হিন্দু তথা বাঙালীর কোন সংযোগই না ঘটে থাকে, তবে বাঙালীরাই বা তাদের কাছ থেকে এই কথাগুলি সংগ্রহ করলেন কি উপায়ে? দুই জাতির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হ'লে তবেই তো এই রকম শব্দের আদান-প্রদান সম্ভব? অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বাংলায় কীর্তন কথাটি ওরাওঁদের কাছ থেকে আসেনি। মানভূম, সিংভূম অঞ্চলের ওরাওঁরাই এই সব কথা বাঙালীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। কেননা, পত্রলেখক স্বীকার করেছেন যে, তাদের মধ্যে বাংলার প্রভাব পড়েছে এবং এদের মধ্য দিয়েই এই শব্দটি দূরাঞ্চলের ওরাওঁদের মধ্যে প্রবেশ করে থাকবে। নতুবা এটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের ভাষায় সৃষ্ট হয়েছে।

কীর্তন মূলত নৃত্যানুষ্ঠান নয়, গীতানুষ্ঠান—একথা আমি আমাদের বাংলার কীর্তন সম্বন্ধেই বলেছি, আদিম সমাজের কীর্তন সম্বন্ধে নয়। বাংলার কীর্তনের সংগে যে নৃত্যের ব্যবস্থা আছে তা ভাবাতিশয্যের প্রকাশমাত্র। খোলের সংগে কীর্তনের যেমন চমৎকার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, নৃত্যের সংগেও কীর্তনের সেই সম্পর্ক। রথযাত্রায় শ্রীচৈতন্য যে উদণ্ড নৃত্যানুষ্ঠান করেছিলেন সে নৃত্যের সংগে আদিম সমাজের নৃত্যের প্রভেদ বিস্তর।

মৃদংগ সম্বন্ধে পত্রলেখক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মৃদংগ-মুরজ-মর্দল একই জিনিস। মর্দল থেকে মাদল কথাটি এসেছে। এই বাদ্যটি প্রকারভেদে পৃথিবীর সব দেশেই আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। মানবের দিকবিদিক অভিযানের সংগে সংগে এই ধরনের নানা শ্রেণীর চর্মবাদ্য পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। মর্দলের প্রচুর বর্ণনা অতি প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের বহু সংগীতশাস্ত্রে রয়েছে। ভারতীয় সভ্যতায় মর্দল ওরাওঁ উপজাতির কাছ থেকে ধার করা বস্তু নয়। মর্দল যে শুধু কীর্তন গানে ব্যবহৃত হ'ত এমন নয়। এসব বাদ্যের ব্যবহার সাধারণভাবে গানের সংগে সংগত হিসাবে ছিল।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁরা ব্যবহারিক সংগীত বা সাংগীতিক বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা সংগীতের কোন্ পদ্ধতিটি কিভাবে গড়ে উঠেছে সেটি সহজেই বুঝতে পারেন। বাংলায় প্রচলিত কীর্তনের সংগে ওরাওঁদের কীর্তনের কোন সম্বন্ধ নির্ণয় এ পর্যন্ত কোন সংগীতজ্ঞ করবার চেষ্টা করেন নি। এই সম্বন্ধে সংগীততত্ত্বাভিজ্ঞ গবেষক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে যে পত্রটি লিখেছেন সেটিও উদ্ধৃত করা গেল। ইতি—শার্ঙ্গদেব। ২২।৭।৫৫

২৪শে আষাঢ়ের "দেশ" পত্রিকায় (পৃঃ ৮৩৮) "কীর্তনের প্রবর্তক কি ওরাওঁ উপজাতি" গঠনমূলক সমালোচনা পড়ে আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। এ ধরনের স্বাস্থ্যকর সমালোচনার সর্বদাই আবশ্যকতা আছে।......আপনার অনুমান তথা সিদ্ধান্তই ঠিক। প্রবন্ধ গান (সূড়) করণ, কীর্তি থেকেই পরবর্তী কীর্তন প্রবন্ধের সৃষ্টি। ভাগবতের মূল উৎস নারদ পঞ্চরাত্রেও-এর ইঙ্গিত আছে, ভাগবতে তো আছেই। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাংগোপাংগ, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ক্লাসিকাল প্রবন্ধ গানের (যা থেকে ধ্রুপদের সৃষ্টি) সাধক ছিলেন। মহাপ্রভুর নামকীর্তন প্রবর্তনের উৎসব প্রবন্ধ গান (চর্চরী চর্যা, মংগলাদি প্রবন্ধ গীতি, করণ প্রবন্ধ) কীর্তনের সমগোষ্ঠীভুক্ত। ইতি, আপনার—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

লণ্ডনে নেহরু

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বদনাম আছে তিনি নাকি সময়ের আগে চলেন। লোকে তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। কাউকে সেজেগুজে বোকা হতে হয়, কেউবা অপ্রস্তুতে পড়ে। এ বছরের প্রথমে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে আসার সময়ও তাই হয়েছিল—নেহরু নির্দিষ্ট সময়ের দু'ঘণ্টা আগে লণ্ডনের বিমান ঘাটিতে এসে হাজির। যারা অভ্যর্থনা করতে আসবে তারা সবাই যে এখনও হাজির হয়নি!

লণ্ডনের লর্ড মেয়র বোধহয় আগে থেকে আঁচ করেছিলেন, নামার সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন অভ্যর্থনা জানাতে। এবং সময়ের আগে আসা নিয়ে হাস্যরসের অবতারণা করতে ছাড়লেন না। নেহরু জানালেন, সারা ভারতকেই আজ এমনি আগে চলতে হচ্ছে, না হলে দেশ গড়ে উঠবে কি করে?

৮ই জুলাই বিকেলে খবর নিয়ে জানা গেল নেহরু লণ্ডনে এসে পৌঁছবেন সন্ধ্যে ৭-৫৫ মিনিটে। তবু সন্দেহ হয়, সময়ের ওলটপালট হতে কতক্ষণ। ঠিক তাই! তাঁর প্লেন আসছে সাতটায়। হাতে যে আর সময় নেই। এসময় লণ্ডনের রাস্তায় যা গাড়ির ভিড়, ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে। মনে হয় আহা যদি একটা হেলিকপটার থাকত।

বিমান ঘাটিতে পা দিয়ে আশ্বস্ত হওয়া গেল। আবার সময়ের পরিবর্ত হয়েছে, তবে পেছিয়ে যায়নি আসছে সাড়ে সাতটায়।

পুলিসের বেড়া ডিঙিয়ে আবার বেড়া—তবে তা বাধা দেবার জন্যে না সাংবাদিকদের আশ্রয় দেবার জন্যে। বহু সাংবাদিক আগে থেকে জড়ো হয়েছে, বড় বড় মুভি ক্যামেরা বসিয়েছে চতুর্দিকে আর স্টিল ফটোগ্রাফারদের সংখ্যা সংগ্রহ করতে হলে সংখ্যাতত্ত্ববিদকে ডেকে আন প্রয়োজন।

সামনে উড়ছে ভারতীয় ও বৃটিশ পতাকা। পাশে বিমান ঘাটির রেস্তরাঁ তার সীমানায় কাঁচের বেড়া, সেখানেও ভেঙে পড়েছে লোক। সবাই উদ্গ্রীব কখন আসবে নেহরু।

এই অবসরে মন চলে যায় কয়েক-দিন আগের ঘটনায়। মস্কোয় নেহরু পেলেন অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা। রাজপথের

লণ্ডন বিমানঘাটিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইডেন শ্রী নেহরুকে অভ্যর্থনা করছেন

...র মাইল ভরে গিয়েছিল লোকে। মহা...স্কোর ইতিহাসে এ সম্বর্ধনা অদ্বিতীয়।

১৯৩৪ সালে পাপানিন উত্তর মেরু বিজয় করে ফিরেছিলেন। মস্কোবাসীর কেবল সেদিনকার আবেগ ও উত্তেজনার সঙ্গে নেহরু-সম্বর্ধনার তুলনা করা যায়।

বিলেতের সংবাদপত্র যেন ক্ষুণ্ণ হল এ সংবাদে। দুদিন আগে যে আমাদের জেলে ঘানি ঘুরিয়েছে তার এত সম্মান! তাই কেউ কেউ নিতান্ত না-দিলে-নয় মনোভাব নিয়ে কাগজের এক কোণে ছাপাল। কিন্তু বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্টনি ইডেন বুঝলেন নেহরুর গুরুত্ব। আমন্ত্রণ জানালেন ফেরার পথে লণ্ডন ঘুরে যাবার জন্যে।

নেহরু রাজি হলেন। সময় পেলে দু-এক দিন ঘুরে যাবেন বিলেত। আর তা যদি বিশ্বশান্তির পক্ষে সহায় হয়, করবেন না কেন?

আবার ঘুরল সংবাদ। বৃটিশ প্রেস প্রচার করল, নেহরু বিলেতে আসছেন ইডেনের কাছে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের বিবরণ দিতে। সাধারণ লোকে আরও এক কাঠি ওপরে উঠল; বলল, নেহরু রাশিয়ার সঙ্গে অত মাখামাখি করে তা নাকি ইডেনের পছন্দ নয়, তাই ডেকেছে বিলেতে ...বক্তার মনোগত ভাব, ইডেন নেহরুকে একটু বকে দেবে।

তারপর অবশ্য তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করলেন। নামকরা কাগজে বেরোতে লাগল নেহরু সম্বর্ধনার বিবরণ ও তাঁর বিবৃতি। এমনকি যে বি বি সি পারতপক্ষে ভারতের নাম মুখে আনে না সেও সংবাদের মধ্যে নেহরুর পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণের ছবি দেখাতে লাগল।

দু-একটা কাগজ তবু খোঁচা দিল। কেউ তুলল গোয়ার কথা কেউবা কাশ্মীর। এক ভারত বিরোধী বৈকালীন পত্রিকা ভাড়া করল কোন ভারতীয় সাংবাদিককে। তার নামে ছাপাল নেহরু-বিরোধী প্রবন্ধ। সবার বড় বিস্ময়, কন্সারভেটিভ পার্টির নেতা স্যার এন্টনি ইডেন নেহরুকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন অথচ সেই দলের মুখপত্র 'ডেলি টেলিগ্রাফ' কাদা ছুঁড়ছে মাননীয় অতিথির গায়।

লর্ড বিভারব্রুকের কাগজ ডেলি-এক্সপ্রেস' শুরু থেকে খাম্বাজরাগে সুর তুলেছে—নেহরুকে না দেখেই সপ্তম সুরে গাল পাড়তে লেগেছে...যা ইংরেজের কানেও ঠেকেছে। এ বিষয়ে লর্ড বিভারব্রুকের ট্র্যাডিশন আছে, সুতরাং তার ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু স্যার ইডেনের কাগজ ডেলি টেলিগ্রাফের কথাগুলো ভারতীয়দের সহজে হজম হয় না। অম্লরোগগ্রস্ত বাঙালী হলেত কথাই নেই।

কবিরাজ মশাই-এর কাছ থেকে হজমীগুলি চেয়ে নিয়ে ডেলি টেলিগ্রাফের সম্পাদকীয় স্তম্ভের অংশমাত্র গলাধঃকরণ করতে পারেনঃ

"There is more hope" he (Sri Nehru) says, "for peace and for peaceful settlement than ever before"—except of course, in Goa, the ancient Portuguese enclave in India which he continues to threaten to swallow with increasingly menacing gulps. This tendency of his towards the precept "Do as I say, but don't do as I do in my own country" is repugnant.

ভালোর মধ্যে দেশবাসীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নেহরুর কথা শুনতে বলেছে।

অবশ্য এরাই সব নয়। 'টাইমস' নিজস্ব ধারায় সংযত সংবাদ ছেপেছে। 'ম্যাঞ্চেস্টার গারডিয়ান' প্রথম সম্পাদকীয় স্তম্ভে সুখ্যাতি করেছে। 'ডেলি মেল' পাতা ভরে নেহরুর জীবনী ছাপিয়েছে, তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। শেষে যা বলেছে তার ভাবার্থ; তিনি বিশ্বে শান্তি আনতে চান কারণ জানেন যুদ্ধের পথ ভুল। তার বৃটেনে আসার উদ্দেশ্য

"ক...
1) কৃত...
খ্যাতি; যশঃ
চলোকের প্রশংসা;
এ ছাড়া হাতের

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বোঝাপড়া করা—আগামী জেনেভা সম্মেলনকে সফল করা।'

'নিউস ক্রনিক্‌লে' নেহরুর জীবনী ছাপা হয়। লেখক শুরুতে বলেনঃ 'কোটি কোটি মানুষের মন জয় করতে পেরেছে এমন লোক জগতে দু'জন ছিলেন—গান্ধী এবং লেনিন, আর বর্তমানের দু'জন হলেন নেহরু এবং চৌ-এন-লাই—উভয় ক্ষেত্রেই একজন ভারতীয় অপর-জন কমিউনিস্ট।'

আর ভাববার অবসর মেলে না, প্লেন এসে হাজির হয়। তার মাথায় ভারত ও বৃটেনের জাতীয় পতাকা। প্লেন মাটিতে নামার আগেই নেহরুর সহগামী সাংবাদিকরা হাত নেড়ে জানালেন,—আমরা এসেছি।

শুদ্ধ ভারতীয় পোশাকে এসে দাঁড়ালেন নেহরু, তাঁর পেছনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ইডেন ততক্ষণে এগিয়ে গেছেন অভ্যর্থনা জানাতে। এদিকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভাইকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন।

কৃষ্ণ মেনন চীন আমেরিকা ঘুরছেন দু'পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া করবেন বলে। সে বিষয়ে কতদূর কি সুরাহা হল নেহরুকে জানাবার জন্যে, আমেরিকা থেকে বিলেত পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু বিমান-ঘাটিতে নেহরুর সংগে একটা কথা বলার সুযোগ মেলে না।

ফটোগ্রাফার বাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে নেহরু চলে এলেন সাংবাদিকদের সামনে, মাইকে বললেন দু-চার কথা। মাইক বিকল, একটা কথাও শোনা গেল না। খাতা পেন্‌সিল বের করাই সার হল, একটা আঁচড় পড়ল না।

সবার ইচ্ছে নেহরু আর একবার বলেন। কিন্তু সাহস করে কেউ এগোতে পারে না। শেষে সাংবাদিকদের সহায় হলেন স্বয়ং ইডেন, বললেন, এরা কিছু শুনতে পায়নি, তাই ঘিরে ধরেছে। ততক্ষণে সত্যি নেহরুকে ঘিরে ফেলেছে—ভারতীয় এবং ইংরাজ, পুরুষ ও মহিলা সাংবাদিকের দল।

তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন—পাঁচ সপ্তাহ আগে আমি যে যাত্রা শুরু করি, এটা তার শেষ পর্ব। এই ক'দিনে ইয়োরোপ ও এশিয়ার বহু জায়গা ঘুরেছি এবং বিলেতেও আসতে পেরেছি সেজন্য আনন্দিত। এখানে পুরোনো বন্ধুদের সংগে সাক্ষাৎ করতে পারব, সেজন্যে আনন্দিত।

এর মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। এ… কয়েকটা সৌজন্যপূর্ণ কথা নিয়ে নেহরু…

রিপোর্ট এনেছি বলে সাংবাদিকরা দাঁড়াবে কোন্ মুখে। একজন অগত্যা বলে—বেগুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে কিছু বলুন।

নেহরু হেসে উত্তর দেন—যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে ত আগেই অনেক বলেছি। আর কি বলব। আমি সেখানে যেতে পেরেছি সেজন্যে আনন্দিত।

এবার তিনি যাবার পথ খোঁজেন। এমন সময় বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এসে তাঁর হাত ধরেন, ভিড়ের হাত থেকে ভাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

আর একজন সাংবাদিক মরিয়া হয়ে বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, ততক্ষণে তিনি প্রায় গাড়িতে উঠে পড়েছেন। সোজা চলে যাবেন চেকার্স—প্রধানমন্ত্রী ইডেনের সপ্তাহের শেষ দুদিনের বিশ্রামকুঞ্জ—লণ্ডন থেকে ৩০ মাইল দূরে।

নিতান্ত হতাশ হয়ে ইংরেজ সাংবাদিকরা ভারতীয়দের কাছে আসে, জিজ্ঞাসা করে কে কে ছিল সংগে—হাই-কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, পণ্ডিত নেহরুর বোন? পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হয় দুই পণ্ডিতের পার্থক্য। আরও বলতে হয়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী পছন্দ করেন না এই পণ্ডিত-সূচক সম্বোধন, তিনি নিজেকে ভাবেন সাধারণের একজন তাই তাঁর ভালো লাগে শ্রী নেহরু ডাক।. সংগে এসেছেন ও'র মেয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—হ্যাঁ মহাত্মা গান্ধীর আত্মীয়কে বিয়ে করেননি কিন্তু। ...মৌলানা আজাদ এখানে আছেন, তিনি এসেছেন কি? —ঠিকত? তিনি এলেন না কেন? অসুস্থ বলে আসতে পারেননি।
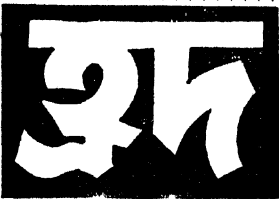
আমরা বাড়ি ফিরে ভাবলাম, অনেক পরিশ্রম হয়েছে হাত-পা মেলে শুতে পারলে বাঁচি। নেহরু ভোর থেকে ছুটেছেন—রোমে পোপের সংগে দেখা করেছেন, সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছেন, মধ্য ইউরোপ থেকে প্রান্তে এসেছেন, গাড়িতে আরও ৩০ মাইল পথ গেলেন তবু ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। তখনই দুই প্রধানমন্ত্রীতে বসলেন বিশ্ব-পরিস্থিতি আলোচনা করতে—মধ্য রাত্রি পর্যন্ত চলল পরামর্শ। সামনে যে বহু সমস্যা ও প্রভূত সম্ভাবনা। জেনেভা সম্মেলন, ফরমোসা নিয়ে টানাপড়েন, ইন্দোচীন ও ভিয়েটনাম সমস্যা, লাওসের নতুন উপদ্রব।

তবে একটা বিষয়ে নেহরু ইডেনকে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—রাশিয়ায় লেনিনের যুগ চলে গেছে। এখন সত্যি তারা বিশ্বের সংগে সদ্ভাব রাখতে চায়, বন্ধুত্ব করতে চায়। সেই সংগে পশ্চিমেরও অসংগত জেদ বজায় রাখলে চলবে না। চীনকে রাষ্ট্র সংঘে আসন দিতে হবে, চীন ও আমেরিকার মধ্যে ফরমোজা বিরোধের মিটমাট করতে হবে।

চৌ-এন-লাই তাঁর কথা কান পেতে শুনবে। কিন্তু ডালেস যে মেননের কথায় কান দিচ্ছে না। যাই হোক জেনেভা সম্মেলনে সব বিবাদ মিটিয়ে ফেলে বিজয়ার কোলাকুলি করতে হবে।

পরদিন আবার শুরু হল আলোচনা। লাঞ্চের আসরকে ইন্ডোবৃটিশ ক্যাবিনেট মিটিং বলা যায়। নেহরু ইডেন ছাড়া ছিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণ মেনন, রাঘবন পিল্লাই ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী জেনারেল। ইডেনের পক্ষে ছিলেন ফরেন সেক্রেটারী ম্যাকমিলান, কমনওয়েলথ সেক্রেটারী লর্ড হোম, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, দিল্লীতে নবনিযুক্ত হাইকমিশনার। বিরোধী পক্ষের নেতা এটলিও ছিলেন, আর বোধহয় বিজয়লক্ষ্মীকে ব্যালেন্স করার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল এটলির ড্রাইভার-কাম-সেক্রেটারী মিসেস এটলিকে।

বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে নেহরু এলেন উইণ্ডসর ক্যাসেলে—মহারাণী আপ্যায়িত করলেন।

ওদিকে ভারতের বন্ধু লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন হ্যামশায়ারের প্রাসাদে অপেক্ষা করছেন নেহরুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। এবার নেহরু তাঁদের অতিথি হবেন।

পরদিন সকাল না হতেই আবার সাংবাদিকদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নেহরু এবার নিশ্চয় ফাঁকি দিয়ে উড়ে যাবেন না। তিনি কিন্তু তার আগেই উড়তে শুরু করেছেন—তবে লম্বা পাড়ি নয়, সামান্য দু-এক-পা এগোন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ফার্স্ট সী লর্ড হয়েছেন, তাই বোধহয় রয়াল নেভির হেলিকপ্টারে চড়িয়ে নেহরুকে লিফ্‌ট দিলেন সাউথ ব্যাঙ্ক এয়ার স্টেশন পর্যন্ত।

বিমানঘাটির ছোট ঘরে বসল সাংবাদিক সম্মেলন। এবার খাতা ভরে গেল তাঁর কথায়—মন ভরল আশায়। এ তো মুখের কথা নয়, অন্তরের প্রেরণা। এতে আছে শান্ত সংযত আবেগ। তিনি বললেন—বিশ্বের ইতিহাস পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে—এ পরিবর্তন বিশ্বকে যুদ্ধের পথ থেকে নিয়ে চলেছে শান্তির দিকে, সংগ্রাম থেকে সংগঠনের দিকে। জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না চায় শান্তি, সে আবেগ আজ নেতাদেরও প্রভাবিত করেছে। তবে একদিনেই আমূল পরিবর্তন আশা করা যায় না। আসবে—ধাপে ধাপে আসবে, ধীর গতিতে আসবে। তবে এ তার নিশ্চিত পদক্ষেপ।

১ বাড়ীর সবরকম পোকামাকড় ধ্বংস করে

পোকা মারবার ছ'রকম শক্তিশালী উপাদান বিজ্ঞানসম্মতভাবে মিশিয়ে তৈরী ব'লে ফ্লিট দুর্দান্ত কাজ দেয়। বাড়ীর কোনো পোকামাকড়ই এর হাত থেকে রেহাই পায় না।

২ খরচার তুলনায় অনেক বেশী পোকা মারে

কোন জিনিসের গায়ে একবার ফ্লিট স্প্রে ক'রলে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত পোকামাকড় তার কাছে ঘেঁষলেই মরে যায়—ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্লিট আপনাকে নিরাপদে রাখবে। বাড়ীর সবার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ফ্লিট ব্যবহার করুন।
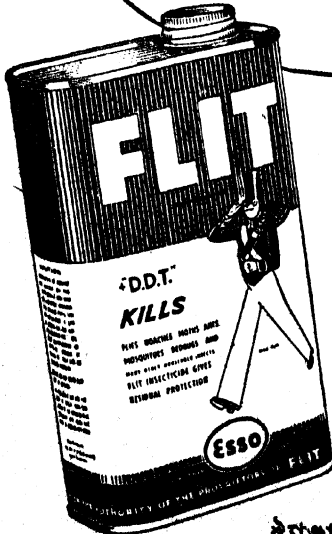
পোকা মারবার একটিমাত্র উপাদান দিয়ে ফ্লিট তৈরী হয় না, এতে অনেকগুলো উপাদান একসঙ্গে মেশানো থাকে এবং প্রত্যেকটি উপাদান অন্যগুলোর কার্যকরী শক্তি বাড়িয়ে দেয়। এই 'সুসম' কাজ পাওয়া যায় ব'লে ফ্লিট পোকা মারবার সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস অথচ এতে খরচা কম পড়ে।

ফ্লিট মানুষ কিংবা গৃহপালিত জীবজন্তুর কোন ক্ষতি করে না। আজই এক টিন কিনুন—এর কাজ দেখে আশ্চর্য হবেন।

লাল, সাদা ও নীল রঙের টিনে পাওয়া যায়

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (কোম্পানীর সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

V. 1329

প্রাসাদের বদলে কুঁড়ে

দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে মানুষকে এনে না ফেললে বোধ হয় গল্প জমানো যায় না। অন্তত বাঙলা ছবির চহারা থেকে তো তাই-ই মনে হয়। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণটা যে কি বস্তু তা বাঙলা ছবির নির্মাতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে যতো না থাকুক, অধিকাংশেরই ছবি দেখে এ বিষয়ে তাদের এক্সপার্ট মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ, এমন বাঙলা ছবি চট্ করে মনে করা যাবে না যার গল্পের ভিত্তিটা আর্থিক দরিদ্রতার ওপর নিবদ্ধ নয়। সেই দরিদ্র

রূপজগৎ

—শৌভিক—

অভাবগ্রস্ত সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রেমের সমস্যা। যেন দরিদ্র, প্রায় ভিক্ষুকের অবস্থায় না পড়লে প্রেমের প্রসঙ্গ আনা যায় না, বা কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারা যায়, বড়োলোকদের কথা বাদ দিলেও যে, কেবলমাত্র যারা খাওয়া-পরার সংস্থান করে যাওয়ার মতো সচ্ছল অবস্থায় রয়েছে তেমন মানুষদের নিয়েও গল্পতে প্রেম ঘটিয়ে দেওয়া যায় না। বাঙলা ছবির এ যেন একটা বৈশিষ্ট্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবের কথা তুলতে গেলে দারিদ্র্য যে আমাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্টে ছেয়ে রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই; তাই সব কথাতেই দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠাও এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। কিন্তু তাহলেও সমাজে আরও স্তরের মানুষ আছে যারা বড়লোক নয়, তাদেরও তো গল্পের মধ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের "প্রশ্ন" ছবিখানির কথাই উল্লেখ করা যাক। এরও কাহিনী রচয়িতার দরিদ্রতা প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, এ কাহিনীর নায়ক ছিল বড়লোক, কিন্তু বড়লোক করে তাকে রেখে দিলে হৃদয়-বেত্তা, মানবিকতা ও আদর্শনিষ্ঠাকে ফুটিয়ে তোলার অসুবিধে অনুভব করেই যেন তাকে একেবারে দরিদ্র মানে প্রায় ভিখিরীর মতো অবস্থায় টেনে এনে ফেলতে হয়েছে।

* * *

এমনিতে সমগ্রভাবে "প্রশ্ন"-র গল্পটির মধ্যে জমিয়ে তোলার মতো কিছু জোরালো উপাদান ছড়িয়ে আছে। একটা বেশ নতুন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির আভাস রয়েছে, অবশ্য সেটা উপলব্ধি করা যায় ছবিখানি শেষ হয়ে গল্পটি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হবার পর। তা নয়তো মামুলি উপাদানও যথেষ্ট, এবং অসঙ্গত বিষয়ও বড় কম নেই। গল্পটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগবে যে ভাবটা তা হচ্ছে দরিদ্রতাকে মেনে নিয়ে কাৎরে না পড়ে দরিদ্রতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন ও দৃষ্টির দীনতাকে পরাস্ত করে মাথা উঁচু করে চলার বলিষ্ঠতা। ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্ক নিয়ে অনেক পুরানো কথা নতুন করে বলা রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে নতুন চোখের দৃষ্টিপাতও রয়েছে। যে চোখ মনুষ্যত্বটা কেবলমাত্র দরিদ্রেরই একচেটে না দেখে অন্যান্য স্তরেও প্রকৃত হৃদয়বান মানুষ দেখতে পেরেছে। "নতুন ইহুদী"-র লেখক সলিল সেনের এই ব্যাপ্টিসম্ই "প্রশ্ন"-কে গল্প হিসেবে কিয়দংশে জনগ্রাহ্য সৃষ্টিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। পরিচালনাও যদি সেই তালটা রক্ষা করে যেতে পারতো তাহলে "প্রশ্ন"-র একটা জনপ্রিয় সৃষ্টি হয়ে ওঠার মতো জোর ছিল, একটু অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য ছিল।

* * *

একেবারে অতি হাল আমলের পরিবেশের ওপর গল্প। মূল সুরটা প্রেম নিয়েই ভাঁজা, কিন্তু তার মধ্যে ধনী-দরিদ্রের অবস্থা নিয়ে নানা তান তোলা হয়েছে। বড়লোকের ছেলে অজয় বি এ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হতেই ওর বিলেত যাওয়া স্থির হয়ে যায়। আর এক ধনী মিঃ মিত্রের একমাত্র সন্তান সুমিত্রা অজয়কে ভালোবাসে; বস্তুত কোন একদিন ওদের বিয়ে হয়ে যাওয়া একরকম ঠিকই ছিল। কনভোকেশনের পর ওদের প্রিয় অধ্যাপক বসুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে এসে সুমিত্রা অজয়ের হাতে পরিয়ে দিলে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়। ঠিক তার পরই ঘটলো দুর্যোগ। বাড়ি ফিরে অজয় দেখলে শেয়ারের বাজার দারুণ পড়ে যাওয়ার শোকে তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। এর পরই আরম্ভ হলো অজয়ের জীবন সংগ্রাম। সততা ও নিষ্ঠার আদর্শে উদ্বুদ্ধ অজয় সর্বস্ব বিক্রী করে পিতার দেনা মিটিয়ে মা ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে বাসা বাড়িতে এসে উঠলো। সুমিত্রা বুঝতে পারলে অজয়ের অবস্থা এবং তার বাবাকে বললে অজয়ের একটা চাকরি করে দেবার জন্যে। মেয়ের

কথায় মিঃ মিত্র তাঁর বন্ধুর কাছে সুপারিশ-পত্র দিয়ে অজয়কে পাঠালেন। চাকরি হয়তো হয়েও যেতো, কিন্তু মেয়ের সামনে কিছু বলতে না পারলেও মিঃ মিত্র আর তখন কপর্দকহীন অজয়ের প্রতি স্নেহাসক্ত ছিলেন না এবং তাই তাঁর বন্ধুর কাছে এমন ভাব দেখালেন যাতে অজয়ের চাকরি না হয়। অজয় মিঃ মিত্রের এই কপটতা জানতে পেরে গেল। মিঃ মিত্র তাঁর ধনী ব্যবসায়ী বন্ধুপুত্র মণিময়ের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে দেওয়া ঠিক করলেন। সুমিত্রার জন্মোৎসবে অজয় এসে অলক্ষ্যে থেকে দেখে গেল, মণিময় সুমিত্রার কণ্ঠে মূল্যবান হার পরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এটা সে জানতে পারলে না যে, মণিময় তারপর সুমিত্রাকে একান্তে পেয়ে যখন 'এনগেজমেণ্ট' আঙটি পরাতে চাইলে তখন সুমিত্রা তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। এরপর আর সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় না। অজয় চাকরির খোঁজে দিনরাত ঘুরতে থাকে। হয়রান হওয়াই সার; চাকরি কোথাও জোটে না। পথের ধারে থমকে দাঁড়িয়ে অজয় ভাবে বুটপলিস ছোকরাদের মতো সেও ঐ কাজে নেমে পড়বে কিনা। ওদিকে বাড়ি ভাড়ার তাগাদা, দুবেলার অন্ন জোটাও কঠিন। হঠাৎ এক সতীর্থ একটা চাকরির খোঁজ দিলে, কিন্তু জমা চাই আড়াই হাজার টাকা। কোথায় টাকা পাবে! বংশানুক্রমে যার কাছে রক্ষিত মূল্যবান হার বিক্রী করে হলো দু হাজার। বাকি পাঁচশোর জন্যে অজয় গেল তার বোন অতসীর কাছে। অতসীর স্বামী সমরের একটা সন্দেহ অজয় তাদের সম্পত্তি থেকে ফাঁকি দিয়েছে। তাছাড়া, তার বাবার ব্যবসায়ে অতসীর নামে আড়াই হাজার টাকা খাটছিল, সেটাও ডুবে যাওয়ায় অতসীকে এবং অজয়কে কম কথা শুনতে হয় না। অজয় তার চাকরির জমা বাবদ বাকি পাঁচশো টাকার জন্য যখন অতসীর কাছে গেল, সে সময়ে সমরকে ক'টা অপমানজনক কথা বলতে শুনলে অজয়। চুপিচুপি বেরিয়ে গিয়ে অজয় সুমিত্রার দেওয়া হীরের আঙটি বাঁধা দিয়ে পাঁচশো টাকা জোগাড় করে আগের দু হাজারের সঙ্গে মিলিয়ে সমরকে দিয়ে এলো। চাকরি আর হলো না। কোঠা বাড়ি থেকে অজয়রা বস্তীতে ঘরভাড়া নিয়ে উঠে এসেছে। কেউ আর ওদের খোঁজ পায় না। অধ্যাপক বসু অজয়ের জন্য ভালো চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। সুমিত্রা দেখা করতে এসে ফিরে যায়। সুমিত্রার বাবা মণিময়ের সঙ্গে বিয়ে পাকা করে ফেলেছেন; পিতার রূঢ় আচরণের কাছে সুমিত্রাকে হার মানতে হয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো অজয় চাকরির খোঁজে পথে পথে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় স্কুলের বন্ধু শিবুদার সঙ্গে। রাজ্য পরিবাহন বিভাগে ড্রাইভারির কাজ করে। পুরনো বন্ধু অজয়কে পেয়ে শিবু খুশী হলো; অজয়ের দুঃখের কথা শুনলে এবং চেষ্টা করে একটা কণ্ডাক্টারির কাজ জোগাড় করে দিলে। কয়েকদিন পর অজয় গিয়েছিল সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মিঃ মিত্র তাকে জানিয়ে দেন যে, এক বাস কণ্ডাক্টরের সঙ্গে তাঁর কন্যার হৃদ্যতাই তিনি পছন্দ করেন না, তা বিয়ের কথা তো দূর। অপমানিত হয়ে অজয় ফিরে এলো এবং শিবুদার সহায়তায় পাঁচশো টাকা ধার জোগাড় করে আঙটিটা ছাড়িয়ে আনলে সুমিত্রাকে ফেরৎ পাঠাবার ইচ্ছায়। হঠাৎ বাসে দেখা হলো সুমিত্রার সঙ্গে। চমকে উঠলো সুমিত্রা। মাঝপথে অজয় নেমে পড়লো। কিন্তু সুমিত্রা পরিবহন দপ্তরে গিয়ে অজয়ের ঠিকানা জোগাড় করলে। অধ্যাপক বসুও অজয়ের বাসার ঠিকানা জোগাড় করলেন। সন্ধ্যায় অজয় সুমিত্রাকে চিঠি

[দে]খতে বসেছে আঙটিটা ফেরৎ দেবে [ব]ল, হঠাৎ সুমিত্রাই এসে হাজির। অজয় [ব]ঝলে যে, অজয়ের এই অবস্থান্তর [সু]মিত্রার মন থেকে তার প্রতি প্রেমকে [মু]ছে করে দিতে পারেনি। সুমিত্রা
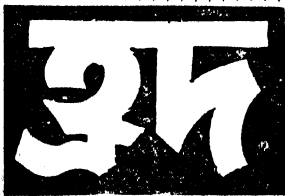
যে অহোরহ তাকেই কামনা করে আসছে। তবুও অজয় সুমিত্রাকে প্রত্যাখ্যান করলে। ব্যর্থ সুমিত্রা ফিরে চললো কান্নায় ভেঙে পড়ে। মণিময়ের সঙ্গে এসেছিল সুমিত্রা। ফেরার পথে মণিময় সুমিত্রার কান্নার সূত্রটা জানতে চাইলে। সুমিত্রার প্রেমের কাহিনী শুনলে মণিময় এবং বুঝলে সুমিত্রাকে বিয়ে করলেও সুমিত্রার হৃদয় সে পাবে না। এদিকে সুমিত্রা চলে আসার পরই অধ্যাপক বসু অজয়ের কাছে উপস্থিত। সুমিত্রা যে অজয়কে সত্যিই কতো ভালোবাসে অধ্যাপক বসু তা জানালেন। অধ্যাপক বসু জানতেন এদের দুজনের নিবিড় প্রেমের কথা এবং এদের মিলন না হলে দুটি জীবনই যে কিভাবে ব্যর্থ হবে তাও তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ছুটে গেলেন সুমিত্রার বাবার কাছে। তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, অর্থটাই বড় কথা নয়, মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে তার হৃদয়বানতার জন্য, মানবিকতার জন্য, আদর্শনিষ্ঠার জন্য। মিঃ মিত্রের কাছে এসবই অসার কথা। অর্থ যার নেই সমাজে তার প্রতিষ্ঠাও নেই আর সমাজে যার প্রতিষ্ঠা নেই তার হাতে তিনি মেয়েকে তুলে দিতে পারেন না। ওদের বিতর্কের মাঝে এসে উপস্থিত হলো মণিময়। সে জানালে, সুমিত্রাকে বিয়ে করতে গিয়ে সে একটা মস্ত ভুলই করতে যাচ্ছিল, কারণ অজয় দরিদ্র হলেও শিক্ষায় দীক্ষায় সব বিষয়েই তার চেয়ে বড়ো। এবং সেই ভুল সংশোধন করতেই সে সুমিত্রাকে অজয়ের কাছেই পৌঁছে দিয়ে এসেছে। মিঃ মিত্র যেন ক্ষেপে উঠলেন। অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে তখনই হাজির হলেন অজয়দের বস্তীতে। দেখলেন, কি স্নেহের বন্ধনেই না সুমিত্রা অজয়ের মায়ের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে। এই দৃশ্যই মিঃ মিত্রের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে এলো। এই স্নেহের বন্ধনটি চিরস্থায়ী করে রাখতেই রাজী হলেন তিনি।

* * *

নায়ক অজয়কে প্রাসাদ থেকে কুঁড়েতে টেনে আনা হলেও কাহিনী রচয়িতা অজয়ের কাহিনী নিয়ে একটা প্রাসাদ গড়ে তোলার মতোই সম্ভার আহরণ করে দিয়েছেন; কিন্তু বিন্যাস ও পরিচালনার দুর্বলতায় অত সম্ভারও একটা কুঁড়ের বেশী কিছু গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। এর সঙ্গে প্রযোজক একটা মস্ত ঝুঁকি নিতে গিয়েছেন নায়ক চরিত্রে একেবারে একজন নতুন ব্যক্তিকে অবতরণ করিয়ে। ছবির নিষ্প্রভতার এও একটি প্রধান কারণ। বেশ একটা নতুন পরিবেশ পাওয়া যায় গল্পের মধ্যে। অবশ্য অনেক ঘটনা মামুলি ধরনের। সেই বাজার পড়ে যাওয়ায় ধনী অবস্থা থেকে অজয়দের একেবারে ভিখিরি হয়ে পড়া। তবে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য আছে। বর্তমান সমাজের কাঠামোকে নাড়া দেবার একটা চেষ্টা রয়েছে। যে কাঠামোর মধ্যে মানুষের গুণ, মানবিকতা ও সততার চেয়ে মূল্য বেশী চটকদার সাজ-পোশাকের, যে সমাজে শ্রমের মর্যাদার চেয়ে আর্থিক আয়টাই বেশী মর্যাদার বলে গণ্য হয়। অজয় বাস কণ্ডাক্টর বলে সে সুমিত্রাকে পেতে পারে না, বিশেষ করে অজয়ের মতো শিক্ষিত ও নিষ্ঠাবান সৎ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, এ যুক্তিকে ভুলে গিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করবার কথা কাহিনীটিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তত্ত্বেরই অবতারণা করতে কাহিনীর মধ্যে "শকুন্তলা"-র প্রসঙ্গটির উত্থাপন করা হয়েছে অধ্যাপক বসুর কথার মধ্যে দিয়ে। তা হচ্ছে "আশ্রমবাসিনী বনবালাকে যত খুশি দের দেওয়া যায়—গোপনে তাকে বিয়েও করা চলে, কিন্তু রাজসিংহাসনে বসে সামাজিক মর্যাদায় নীচু অর্থ-কৌলীন্যে অসমকক্ষকে মানুষ নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করতে পারে না।" এখানে শকুন্তলার স্থানটা নিয়েছে অজয়, আর দুষ্মন্তের সিংহাসনে সুমিত্রা। অর্থ-কৌলীন্যটাই যে মনুষ্যত্বের বিচারের এবং মানুষের মর্যাদা নির্ণয়ের শেষ কথা নয় গল্পটিতে সেইটেই বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। সংলাপ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী; অনেক সময়ে পাকামো প্রকাশ হয়ে পড়েছে কথার মধ্যে এবং বেশী বলে অবান্তর কথাও ঢের।

* * *

আধা-মামুলি জোরালো গল্প, কিন্তু বিন্যাসটা কেমন যেন মিউমিউয়ে। জোরটা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি পরিচালক

চন্দ্রশেখর বস্। উপরন্তু দৃশ্যাবলী গুছিয়ে উপস্থাপনের ত্রুটিতে কোথাও কোথাও কৃত্রিমতাও এসে গিয়েছে। কেমন যেন একটা সাজানো সাজানো ভাব। আরম্ভই ধরা যাক—মিঃ মিত্র অজয়কে টেলিফোন করছেন সময় মত উপস্থিত না হতে পারার জন্য, ওদিকে রিসিভার রাখতেই অজয়ের আবির্ভাব। কিংবা, তারপর অজয় ওপরে যেতেই দেখা গেল, সুমিত্রা দাঁড়িয়ে গান গাইছে। বড় ছে'দো বিন্যাস; এমনধারা পরেও আছে আরো। এমন ধারা বিন্যাস যাতে আবেগকে আলতো-ভাবেই ছ'ুয়ে যায়, উদ্বেলিত করার মত গভীরে গিয়ে পে'ছিয় না। পরিণতিতে সুমিত্রাকে অজয়ের মায়ের স্নেহপাশে আবদ্ধ দেখা মাত্রই মিঃ মিত্রের মনের পরিবর্তন যে রকম চমকপ্রদ ঘটনা সেটা ঠিকভাবে বিন্যস্ত হয়নি। আচমকার চমকটা মনে ধরে না, জোড়াতালি দিয়ে শেষ করার মতো মনে হয়। দোষত্রুটির অনেকখানি চাপা পড়তে পারতো যদি নায়কের চরিত্রে একজন নবাগতের ওপরে অনেকখানি দায়িত্বের ভার না চাপানো হতো। তার ওপর সংলাপের অতি-শয়তা। নবাগত প্রবীরকুমার অভিনয়ে অযোগ্য বলা যায় না, কিন্তু ঠিক যেরকম ব্যক্তিত্ব অজয়তে মানায় সেইটেই তাঁর নেই। অথচ এই অজয়ের ওপরেই গল্পের যাবতীয় ঝোঁক রেখে দেওয়া হয়েছে।

তেমনি সুমিত্রার চরিত্রেও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় মণিময় তাকে 'এনগেজমেণ্ট' আঙটি দিতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কোন ছাপই দিতে পারেননি এবং তারপরও তাঁর অভিনয় চলনসই পর্যায়ের ওপরে ওঠেনি। অভিনয় ভালো লাগবে অজয়ের হিতকারী বন্ধু শিবুদার চরিত্রে অসিতবরণকে। ছোট চরিত্র এবং একটু জোর করে অভিনয়ের ভাবও আছে, তবুও বেশ একটা খুশি উচ্ছল জীবনসংগ্রামী ব্যক্তিত্ব তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। রূঢ় পিতার চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ও নাটক জমতে সহায়তা করেছে। কিছু ভাল লাগবে পাহাড়ী সান্যালকে আত্মভোলা এবং ছাত্রদের কাছে বন্ধু প্রতীম অধ্যাপকের চরিত্রে। দীপক মুখোপাধ্যায় মণিময়ের চরিত্রে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুমিত্রাকে লাভ করায় অজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও শেষে ওদের ভালোবাসার কথা জেনে স্বার্থত্যাগ করে মানবতার পরিচয় দেওয়ার জন্য। বড়লোক, তবুও মানবতার মর্যাদা দিয়েছে মণিময়। তপতী ঘোষ অজয়ের বোন অতসীর বেদনাভরা চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর স্বামী সমরের চরিত্রে বিকাশ রায় একঘেয়ে ভিলেন। ছোট্ট বিভূর দাদার সঙ্গে 'প্রাইভেট' কথা বলা যেমন আমোদ দেয় তেমনি মা ও দাদাকে লুকিয়ে চানাচুর বেচে নিজের স্কুলের মাইনে জুগিয়ে যাওয়ার ঘটনায় একটা বিমর্ষমাখানো সহানুভূতি টেনে আনে। বাস কণ্ডাক্টরদের দলের একজন জহর রায় এবং যেজন্য তাঁকে নামানো হয়েছে তাতে তিনি সফলতা দেখিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন পদ্মা দেবী, রেখা চট্টো-পাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, অজিত চট্টো-পাধ্যায়, হরিধন, ছবি ঘোষাল, নরেশ বসু, রবি রায়, অমর বিশ্বাস, ধীরাজ দাস, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এবং এ'রা থাকায় ছোট ছোট চরিত্রগুলি খুলেছে ভালো। গান তিনখানি। লেখা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং সুর শচীন গুপ্তের। কোনটিই কোন কাজে আসার মত হয়নি। অন্যান্য কাজে আছেন আলোকচিত্র গ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী, শব্দগ্রহণে সুশীল সরকার এবং শিল্পনির্দেশে সুনীল সরকার। শিল্পনির্দেশের কাজ মন্দ নয়, অন্যান্য কাজ চলনসই।

খেলার মাঠে

একলব্য
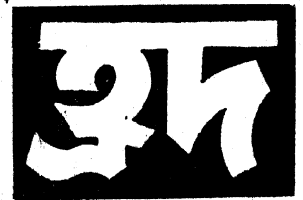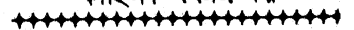
গত মঙ্গলবার মোহনবাগান ও এরিয়ানের গোলশূন্য খেলার শেষে ক্যালকাটা মাঠের প্রেস বক্সের সামনে কথা হচ্ছিল। এখন তো মোহনবাগান ক্লাবকে লীগ 'চ্যাম্পিয়ন' বলা যেতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উঠলো কি করে? কেন, মোহন-বাগান যে পয়েণ্ট অর্জন করেছে কারো পক্ষেই তো আর সে পয়েণ্ট পার হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল, রাজ-

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন দলের পুরস্কার

স্থান এবং এরিয়ান—তিনটি দলের যে কেউই তো মোহনবাগানের অর্জিত পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে পারে, অবশ্য যদি মোহনবাগান বাকী দুইটি খেলায় একটি পয়েণ্টও না পায়। এ অবস্থায় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের জন্য পুনরায় খেলার আয়োজনের প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু তা কি সম্ভব! মোহনবাগান দুইটি খেলায় একটি পয়েণ্টও পাবে না। আর ইস্টবেঙ্গল অথবা রাজস্থান বা এরিয়ান সব খেলায় পুরো পয়েণ্ট লাভ করে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আবার মোহনবাগানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হবে? এমন-ধারা কথোপকথনের মধ্যে এক সাংবাদিক বললেন সম্ভব হয়তো নয়, কিন্তু মোহন-বাগান একটি পয়েণ্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিম্বা মোহনবাগানের নিকটতম তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল একটি করে পয়েণ্ট নষ্ট না করা পর্যন্ত তো মোহনবাগানকে 'চ্যাম্পিয়ন' বলে ঘোষণা করা যাচ্ছে না। ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার রাজস্থান ক্লাবের কাছ থেকে কিম্বা শনিবার স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছ থেকে মোহনবাগানের লীগ বিজয়ের প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনাতিরিক্ত পয়েণ্ট লাভের সম্ভাবনা। একটি মহা অঘটন ছাড়া মোহনবাগানের লীগ বিজয়ের গৌরব হাত-ছাড়া হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আঠাশ তারিখের আগে আমাকেও লেখা শেষ করতে হচ্ছে বলে এভাবেই মোহনবাগানের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হল।

নীচে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের কিছু কিছু পরিচয় দিচ্ছি।

এস চ্যাটার্জি—গোলে খেলবার পক্ষে দেহের উচ্চতা যতটুকু প্রয়োজন, মোহন-বাগানের গোলকিপার সরোজ চ্যাটার্জির দেহের উচ্চতা তার চেয়েও বুঝি বেশী। বাস্তবিকপক্ষে এস চ্যাটার্জির মত এমন দীর্ঘদেহী গোল-কিপার ভারতে আর আছেন কিনা সন্দেহ। সরোজ শ্রীরামপুরের অধিবাসী। শ্রীরাম-পুরেই এর খেলার হাতেখড়ি। পরে জর্জ টেলিগ্রাফ টীমে খেলে সুনাম অর্জন করেন।

মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ এস চ্যাটার্জির ক্রীড়ানৈপুণ্যে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৫২ সালে লীগ খেলার পর আই এফ শীল্ডের খেলার সময় এস চ্যাটার্জিকে নিজেদের ক্লাবে টেনে নেন। সেই থেকে মোহনবাগান ক্লাবেই খেলে আসছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় এস চ্যাটার্জি কয়েকটি অবধারিত গোল বাঁচিয়ে অশেষ প্রশংসা অর্জন করেছেন। এস চ্যাটার্জি ডবলিউ বি জি প্রেসে চাকরি করেন।

আর গুহ—রবীন গুহ মোহানবাগান ক্লাবের দ্বিতীয় গোলরক্ষক। ইনি মিলন সমিতিতে প্রথম খেলা আরম্ভ করেন। তারপর যান উয়াড়ী ক্লাবে, উয়াড়ী থেকে ভবানীপুর এবং ভবানীপুর থেকে এই বছরই মোহান-বাগানে এসেছেন। গোলকিপার হিসেবে আর গুহকে কিছুটা খর্বাকৃতি বলা যেতে পারে। কিন্তু ইনি উঁচু বল 'ফিস্ট' করতে খুবই ওস্তাদ। এ বছর কয়েকটি খেলায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল বলে মনে হয়। আশুতোষ কলেজের ছাত্রাবস্থায় আর গুহ ১৯৫২, ৫৩ ও ৫৪ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রবীনের আদি বাড়ী ফরিদপুরের ইদিল-পুরে। ব্যবসায়ের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় আছেন।

এস গুহ—মোহনবাগান ক্লাবে গুহ উপাধির বড় বাহুল্য। সুশীল, রবীন, শুভাশিস, সত্য—সবারই উপাধি গুহ। অবশ্য সত্য গতবার পোর্ট কমিশনার্সে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। তবুও তিন জন। সুশীল গুহ মোহনবাগানের রাইট ব্যাক। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পড়বার সময়ই এস গুহর মধ্যে ফুটবল প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তিনি কুমার-টুলী ক্লাব হয়ে কালীঘাট ক্লাবে যোগদান করেন। কালীঘাট ক্লাবে তাঁর অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫২ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ডুরাণ্ড কাপে গুহর সাহায্য গ্রহণ করলেও পরের বছর মোহনবাগান ক্লাব সমস্ত খেলায় গুহর সাহায্য পাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে। আজ তিনি মোহনবাগান রক্ষণভাগের অনতম স্তম্ভ। মোহনবাগানের ডুরাণ্ড জয় এবং লীগ ও শীল্ড বিজয়ে গুহর দান অনেকখানি। মোহনবাগানের আর পাঁচজন খেলোয়াড়ের মত বার্ড কোম্পানী এস গুহকেও তাদের কর্মী হিসেবে টেনে নিয়েছে।

এ মুখার্জি—মোহনবাগানের তৃতীয় গোলরক্ষক এ মুখার্জি এবার ই আই রেলের বিরুদ্ধে মাত্র একটি খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। অমর মুখার্জি হাওড়ার ছেলে। হাওড়ার ওরিয়েণ্টাল ক্লাবে এর খেলা শুরু হয়, পরে আই এফ এ শীল্ডের খেলায় হাওড়া ইউনিয়নের পক্ষে কলকাতার মাঠে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং নির্ভরশীল গোলরক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই বছরই মোহনবাগানে এসেছেন। ক্রিকেটেও এর বেশ হাত আছে।

এস মান্না—মোহনবাগানের অধিনায়ক এস মান্না বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড়। প্রাক্তন দিকপাল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের পর মান্নার মত এতখানি জনপ্রিয়তা অন্য কোন ফুটবল খেলোয়াড় অর্জন করেছেন কিনা সন্দেহ। শুধু খেলাই নয়, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ভদ্র ব্যবহার এবং শিষ্ঠাচারে মান্না শত্রু-মিত্র সকলেরই হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর ফুটবল জীবনের সাফল্যের খতিয়ান এবং মোহনবাগান, বাঙলা ও ভারতের অধিনায়কত্ব করবার গাণিতিক হিসেব দিতে গেলে অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন, তাই সে প্রচেষ্টায় বিরত থাকতে হচ্ছে। শৈলেন মান্নার আদি বাড়ি হুগলী জেলার রমানাথপুর গ্রামে। কিন্তু মান্না মানুষ হয়েছেন হাওড়ার ব্যাটরায়। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সবই এখানে। হাওড়ার মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুলের পড়া শেষ করে মান্না সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হন। এই সময়েই ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর কিছু সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ সুনাম ছিল কলেজ ছাত্রমহলে সীমাবদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবে খেলে ১৯৪২ সালে তিনি মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেন এবং আজ পর্যন্ত মোহনবাগানের প্রধান স্তম্ভ হিসেবেই দাঁড়িয়ে আছেন। লেফট ব্যাক মান্না রাইট ব্যাকেও সমপারদর্শী। দুখানা পায়ে যেমন কিক, হেডেও তেমন জোর। ফ্রি-কিক থেকে মান্না জীবনে কত গোল করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মান্নার প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নেবার কৃতিত্ব ছিল অপূর্ব। ১৫।১৬ বছর ধরে মান্না ফুটবল খেলছেন—গতিসম্পন্ন ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে তাল রাখতে এখন বেশ অসুবিধে বোধ করেন। মান্না জিওলজিক্যাল সার্ভের চাকুরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এস মান্না দু'বার অলিম্পিক খেলেছেন। এর মধ্যে ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের অধিনাকত্ব করেন।

পি বড়ুয়া—একাধারে ব্যাক ও হাফব্যাক পি বড়ুয়ার সমস্ত খেলাই এবছর কৃতিত্বে উজ্জ্বল। বড়ুয়া কোনো খেলায় সমর্থকদের হতাশ করেননি, অধিকাংশ খেলাতেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। নামের পদবীর জন্য বড়ুয়াকে অনেকে আসাম প্রদেশের লোক বলে মনে করে থাকেন। আসলে বড়ুয়ার আদি বাড়ী চট্টগ্রামে।

পুরো নাম পূর্ণেন্দু বড়ুয়া। ১৯৪৫ সালে বড়ুয়া প্রথম এরিয়ান ক্লাবে খেলেন। পরে ভবানীপুর ক্লাবে খেলার সময় এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরো খ্যাতি অর্জনের জন্য ইনি মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পি বড়ুয়া রাইট ব্যাক হিসেবে খেলেছেন, ১৯৫৩ সালে খেলেন লেফ্‌ট ব্যাক হিসেবে, এখন বাঁ দিকের ব্যাক ও হাফব্যাক হিসেবে এর সমান প্রতিষ্ঠা। বড়ুয়া বি আই এস এন কোম্পানীর কর্মী।

আর সেন—'রোবাস্ট' অর্থাৎ বলদৃপ্ত ফুটবল খেলার পক্ষে উপযুক্ত বলে যে কয়জন বাঙালী খেলোয়াড়ের নাম করা যেতে পারে, রতন সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এতদিন মোহনবাগানের রাইট হাফেই এ'র স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাশিয়া সফরের জন্য আজ ভারতীয় দলেরও রাইট হাফে স্থান পেয়েছেন। কলকাতায় রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে 'স্টপার' হিসেবে খেলে রতন যথেষ্টই সুনাম অর্জন করেছিলেন। রাশিয়া সফরে তাঁর মনোনয়ন সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতি বলা যেতে পারে। আর সেন ইতিপূর্বে ভবানীপুর, মহমেডান স্পোর্টিং ও রাজস্থান ক্লাবে খেলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মোহনবাগানে যোগ দেবার পর সেই প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেনের জন্য আমাদেরও একটু গর্ব আছে, কারণ তিনি 'আনন্দবাজার' সংস্থারই কর্মী। ইনি হাওড়া জেলার বাগনানের অধিবাসী।

এ মিত্র—এরিয়ান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এ মিত্র এই বছরই মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। এরিয়ান ক্লাবে রাইট হাফ হিসেবে খেলবার সময়ই এ মিত্রের খেলার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইনি জাতীয় ফুটবলে বাঙলার পক্ষ সমর্থন করবারও সুযোগ পান। অশোক মিত্রের ফুটবল খেলার প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল শ্যামবাজার ক্লাবে। ১৯৫৪ সালে এরিয়ান থেকে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন। মোহনবাগান ক্লাবে এসেছেন এই বছর। অশোক ব্যবসায় নিয়োজিত। এ'র অমায়িক ব্যবহার সকলকেই আকৃষ্ট করে।

এস শেঠ—মোহনবাগানের লেফট হাফ এস শেঠ এ বছর এক-আধটি গেম খেলবার সুযোগ পেয়েছেন। মোহনবাগান ক্লাব চন্দননগরে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়ে এ'কে আবিষ্কার করে। শেঠ চন্দননগরেরই অধিবাসী। ওষুধের ব্যবসায় নিয়োজিত।

এস সর্বাধিকারী—এস সর্বাধিকারী কৃষ্ণনগরের ছেলে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র থাকা সময়েই এর খেলোয়াড়জীবন শুরু হয়। কলকাতায় সর্বাধিকারী প্রথম বি এন আর দলে যোগদান করেন। পরে রাজস্থান ক্লাবে এ'কে খেলতে দেখা যায় এবং এখানেই তার প্রতিভার বিকাশ হয়। কিন্তু রাজস্থান ক্লাব এ'র কদর বুঝতে পারেনি। কাছের চেয়ে দূরের প্রতিই রাজস্থানের দৃষ্টি ছিল বেশী। ফলে সর্বাধিকারী এরিয়ান ক্লাবে যোগদান করে একজন কৃতী সেণ্টারহাফ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মোহনবাগানের প্রাক্তন সেণ্টারহাফ অলিম্পিক অধিনায়ক টি আওয়ের শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্য মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ সর্বাধিকারীকে যোগ্য খেলোয়াড় বিবেচনা করেন। ফলে ১৯৫২ সালে এর মোহনবাগানে যোগদান। অফুরন্ত দম। দুখানি পা ও মাথায় সমান জোর। সুভাষ সর্বাধিকারী এখন ভারতের কীর্তিমান সেণ্টারহাফদের অন্যতম।
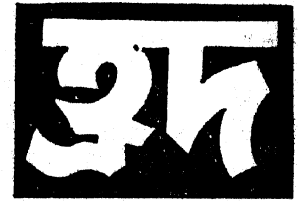
চাকুরি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বার্ড কোম্পানীর অন্তর্গত ল্যান্সডাউন জুট মিলের 'ওয়েলফেয়ার অফিসার'।

শুভাশিস গুহ—শুভাশিস গুহ মোহনবাগান ক্লাবের লেফ্‌ট হাফ। এস সর্বাধিকারীর অনুপস্থিতিতে কয়েকটি খেলায় সেণ্টারহাফেও ঠেকা দিয়েছেন। এর আদি বাড়ী ঢাকা জেলায়, তবে খড়্গপুরই ছিল এর শৈশবের বাসস্থান। এখানকার স্কুলেই লেখাপড়া শিখেছেন এবং খড়্গপুরের সূত্রেই এর বি এন রেলে চাকরি। এলবার্ট স্পোর্টিংয়ে শুভাশিসের খেলার হাতেখড়ি হয়। কালীঘাট ও বি এন আর ঘুরে এই বছরই মোহনবাগানে এসেছেন। ভারতের ফুটবল 'কোচ' ম্লাটলে এর খেলা খুবই পছন্দ করতেন। তার প্রচেষ্টাতেই শুভাশিস রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে খেলবার সুযোগ পান। বয়স কুড়ি পার হয়েছে। সুতরাং এর খেলোয়াড়জীবনে সাফল্য আশা করা যায়।

এস ঘোষ—মোহনবাগানের লেফ্‌ট হাফ শম্ভু ঘোষ এবছর অবশ্য এক আধটি খেলাতেই খেলবার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু গত বছর মোহনবাগানের লীগ ও শীল্ড বিজয়ে শম্ভুর দান কম নয়। ইনি ঢাকা জেলা হতে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে কলকাতায় এসেছেন এবং ১৯৫২ সাল থেকে মোহনবাগানে খেলছেন।

পি খাঁ—পি খাঁ মোহনবাগানের তরুণ খেলোয়াড়দের অন্যতম। লীগের সূচনায় রাইট আউটে কয়েকটি ম্যাচ মন্দ খেলেননি। মোহনবাগান ক্লাবেই গতবার থেকে খেলা আরম্ভ করেছেন। উত্তর ব্যাটরার অধিবাসী এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

এ চ্যাটার্জি—মোহনবাগানের অন্যতম রাইট আউট এ চ্যাটার্জি চন্দননগরের অধিবাসী। ইনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম এরিয়ান ক্লাবে খেলে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বছরই মোহনবাগানে যোগ দিয়েছেন।

ভেংকটেশ—বাঙ্গালোরের যেসব কৃতী খেলোয়াড় এপর্যন্ত কলকাতার ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছেন, ভেংকটেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। ভেংকটেশকে প্রাক্তন সুনিপুণ খেলোয়াড় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্ত্রশিষ্য বলা যেতে পারে। তার কাছেই এর খেলার প্রথম হাতেখড়ি। ১৯৪৮ সালে অলিম্পিক টীমে উপেক্ষিত রাইট-আউট ভেংকটেশ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করে প্রমাণ করে দেন তাকে ভারতের অলিম্পিক দলে নির্বাচিত না করা কত বড় ভুল হয়েছে। ক্ষিপ্রপদ রাইট আউট ভেংকটেশের বল নিয়ে এগুবার ধারা ছিল যেমন অনবদ্য, ডান পায়ে শটও ছিল তেমন প্রচণ্ড, কিন্তু ভেংকটেশের মারণাস্ত্র লুকানো থাকতো বাঁ-পায়ে। ডানদিকে প্রতিপক্ষকে টেনে নিয়ে চট করে বাঁ-পায়ে বল এনে তিনি যে মোক্ষম শট করতেন, তা আটকানো সত্যই দুঃসাধ্য হতো, কিন্তু ভেংকটেশ তার মারণাস্ত্র হারিয়ে ফেলেছেন, গতিও হয়েছে মন্থর। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে ভেংকটেশের দান অনেকখানি। ভারতের সমস্ত প্রধান প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন ছাড়া ভেংকটেশ ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে খেলেছেন। দূরপ্রাচ্য এবং রাশিয়াও সফর করেছেন। মোহনবাগান ক্লাবে ভেংকটেশ যোগ দিয়েছেন গতবার। এর পুরো নাম পদ্মোত্তম ভেংকটেশ। পদ্মোত্তম বার্ড কোম্পানীর চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ধনরাজ—কে পি ধনরাজ অর্থাৎ কাঁদের পাম্নু ধনরাজ। বড় আপনভোলা লোক। খেলার মধ্যে মার খেয়েও রাগ করবে না, পা টেনে উঠে দাঁড়িয়ে আবার মরদের মত খেলতে আরম্ভ করবে। সেণ্টার ফরোয়ার্ড ধনরাজের খেলার মাধুর্য ছিল চলতি বলে শট করায়। দেওয়া নেওয়া করে আক্রমণ রচনায়ও যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। ধনরাজ এখন ফুটবল জীবনের সায়াহ্নে উপনীত। ধনরাজ সেকেন্দ্রাবাদের (হায়দরাবাদ) অধিবাসী। বাঙ্গালোর মার্স ক্লাবে প্রথম ফুটবল খেলা আরম্ভ করেন। ১৯৪৮ সালের অলিম্পিকে দ্বিতীয় সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে নির্বাচিত হন এবং পরের বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যে বছর ইনি অধিনায়ক, সেই বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বুখারেস্ট ও রাশিয়া সফর করে, কিন্তু সফরকারী দল থেকে ধনরাজ বাদ পড়ায়, এই আপনভোলা লোকও মনে ব্যথা পেয়ে পরের বছর রাজস্থান ক্লাবে যোগদান করেন। মোহনবাগান ক্লাবে এসেছেন এবছর। ইনি সি পি ডবলিউ ডি-র কর্মী।

এস ব্যানার্জি—পরিচিত মহলে এস ব্যানার্জি 'বদরু' নামে অভিহিত। ভাল নাম সমর ব্যানার্জি। বালীর অধিবাসী। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বালী প্রতিভা ক্লাবে বদরুর খেলোয়াড়-জীবন আরম্ভ হয়। ক্যালকাটা মাঠে দ্বিতীয় ডিভিশনের একটা খেলায় 'জাল-ছেঁড়া' শট করে এস ব্যানার্জি প্রথম সুনাম অর্জন করেন। পরে একে বি এন রেল দলে খেলতে দেখা যায়। ১৯৫২ সালে লীগ সমাপ্তির পর আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগান ক্লাবকে সাহায্য করেন এবং তারপর মোহনবাগানের সঙ্গেই সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়। এস ব্যানার্জি রাইট ইনে খেলতে অভ্যস্থ, তবে প্রয়োজনমত সেণ্টার ফরোয়ার্ডেও খেলে থাকেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে এস ব্যানার্জির একটু পারিবারিক ইতিহাস আছে। 'রাজা শীল্ড' নামে যে শীল্ড খেলা হয় সেটা ব্যানার্জি পরিবারেরই এক স্মৃতি। রাজা ব্যানার্জি খেলার সময় আঘাত পেয়ে প্রাণ হারাণ। ইনি ছিলেন এস ব্যানার্জির জ্যেষ্ঠ সহোদর।

সি গোস্বামী—চুনী গোস্বামী মোহনবাগান ক্লাবের সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। ১৮ বছর এখনো পার হয়নি। ইনি আশুতোষ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্র। আর ফুটবলের ছাত্র প্রাক্তন খেলোয়াড় শ্রীবলাই চ্যাটার্জির। তীর্থপতি স্কুলে পড়বার সময় বয়েজ মোহনবাগান ক্লাব থেকেই চুনীর ফুটবল পাঠ আরম্ভ হয়। শুধু ফুটবলেই চুনীর সুনাম নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট 'ব্লু'ও বটে। ফুটবল ও ক্রিকেটে এর প্রায় সমান

দক্ষতা। মোহনবাগানের রাইট ইনে এবছর চমৎকার খেলেছেন। শুকনো মাঠ থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় মনের কোণে একটু অভিযোগ আছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের নির্ভরযোগ্য রাইট ইন এম গোস্বামী চুনীর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

কে পাল—ভবানীপুর ক্লাবের সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খ্যাতি অর্জনের পর কে পালের উপর মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে। কে পাল শ্যামনগরের অধিবাসী এবং এখানকার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জুট মিলে চাকরি করেন। সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল দুই পা অপেক্ষা মাথার উপর বেশী আস্থাশীল এবং হেড করেই গোল করেন বেশী।

সত্তার—ফুটবল প্রতিভার ভাস্বর লক্ষ্মীনারায়ণ ও মুর্গেশের পায়ের যাদু দেখে ব্যাঙ্গালোরের যে ছেলেটি বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে থাকতো, পরবর্তী কালে সেই ছেলেটিই সত্তার নামে ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

লেফ্‌ট ইন সত্তারের পায়ের চামড়া আর বলের চামড়ার সঙ্গে যেন লোহা আর চুম্বকের সম্বন্ধ। বল তার পায়ে বাধ্য শিশুর মত খেলা করে। গতবার এশীয়ান চতুর্দলীয় ফুটবলের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক ম্যাচে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সত্তারের খেলা যেন আজও চোখের উপর ভাসছে। ব্যাঙ্গালোরের ফুটবলে সত্তার যখন কীর্তিমান ছাত্র, তখন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ডাকে সাড়া দেন। কয়েক বছর মহমেডান দলে খেলে কাস্টমসে চাকরি গ্রহণ করে কাস্টমসের হয়ে এক বছর দ্বিতীয় ডিভিশনেও খেলেন। ১৯৪৯ সালে আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগানকে সাহায্য করেন। তারপর থেকে মোহনবাগানের সঙ্গে পাকাপাকি সম্বন্ধ করে নিয়েছেন। ১৯৫২ সালের অলিম্পিক খেলোয়াড় সত্তার দুবার ভারতীয় দলের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য সফর করেছেন। এশীয়ান গেম এবং এশীয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলারে ভারতীয় দলে সত্তারের দান কম নয়। ইনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্সের চাকরি ছেড়ে বার্ড কোম্পানীতে চাকরি নিয়েছেন।

বি মজুমদার—মোহনবাগানের লেফ্‌ট ইন, এবার মাত্র একটি খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। বিশ্বনাথ মজুমদার বহরমপুরের অধিবাসী। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন। প্রথম খেলা আরম্ভ করেন সুবার্বান ক্লাবে। জর্জ টেলিগ্রাফে খেলে মোহনবাগানে আসেন, আবার উয়াড়ী ক্লাবে চলে যান, এবছর আবার মোহনবাগানে এসেছেন। বিশ্বনাথ স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করেন।

এস দত্ত—মোহনবাগান দলের সমস্ত খেলোয়াড়ের মধ্যে লেফ্‌ট আউট এস দত্তকে সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রপদ খেলোয়াড় বলা যেতে পারে। এর পায়ে চমৎকার শট আছে। একটি ভাল শটের মূল্য যে কতখানি, তা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খেলায় প্রমাণিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে এস দত্তের দর্শনীয় তীব্র শটের ফলে মোহনবাগান ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথমে যে গোলটি করে, তাতেই খেলার মোড় ঘুরে যায়। পরের গোলের ক্ষেত্রেও এর কৃতিত্ব কম নয়।

এস দত্ত ২৪ পরগণার সরশুনার অধিবাসী। আলীপুর ক্লাবে প্রথম ফুটবল খেলতে আরম্ভ করেন। এরিয়ানে প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ১৯৫৪ সালে মোহনবাগান ক্লাবে অংশ গ্রহণ করেছেন, তবে প্রথম ক্লাব আলীপুরের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। এখনো আলীপুরে ক্রিকেট খেলেন। এস দত্তই বোধ হয় একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি রাশিয়ান ফুটবল দলের ভারত সফরে সবকটি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ইনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের চাকুরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিচিত মহলে 'কেণ্ট' নামে অভিহিত।

দলজিত সিং—দলজিত সিং বাঙ্গলা দেশে নবাগত খেলোয়াড়। তবে একেবারে নবাগত বলা যায় না। আই এফ এ শীল্ড ও জাতীয় ফুটবলে উত্তর প্রদেশের হয়ে কয়েক বার এখানে খেলে গেছেন। ইনি বেনারসের একটি কলেজের লেকচারার। মোহনবাগান ক্লাবে খেলবার আশায় কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলেন। পায়ে চোট থাকায় দুই তিনটির বেশী ম্যাচ খেলতে পারেননি। লেফ্‌ট ইন এবং লেফ্‌ট আউটে মন্দ খেলেন না।
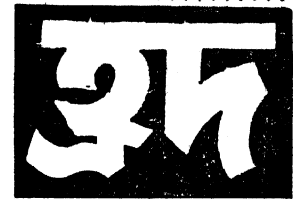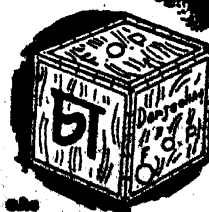
দেশী সংবাদ

১৮ই জুলাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীতে ঘোষণা করেন যে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এবং পঞ্চশীল বিশ্বের সর্বত্র বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। কারণ, ইহা দ্বারা বর্তমান যুগ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

আজ মাদ্রাজে ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রেস কমিশনের সুপারিশসমূহ অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য দাবী জানান হয়।

শ্রী আর কে নেহরু চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯শে জুলাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন যে, গোয়া সম্পর্কে কাহারও মাতব্বরী ভারত সহ্য করিবে না।

গত কয়েকদিন যাবৎ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-পাতের ফলে উত্তর বিহারের নদীগুলি স্ফীত হইয়া পাঁচটি জেলায় ১২ শত বর্গমাইল পরিমিত স্থান প্লাবিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে দশ লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২০শে জুলাই—দ্বিতীয় পাঁচসালা পরি-কল্পনার অন্তর্ভুক্তিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে মোট ২৬৫ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা রাজ্য মন্ত্রিসভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইয়াছে। ইহা রাজ্যের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থ অপেক্ষা সাড়ে তিন গুণেরও বেশী। এই পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে এই রাজ্যে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

কানপুরের বয়নশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট আজ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই ধর্মঘট ৮০ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

২১শে জুলাই—আজ প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের জাতীয় কর্মপরিষদ ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে সাময়িকভাবে দল হইতে বহিষ্কৃত করেন।

কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী এক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং দুই রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য-পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মেধী এইদিন কলিকাতায় ৬নং সুতারকিন স্ট্রীটে আনন্দ-বাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন করেন।

২২শে জুলাই—নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে বে-সরকারী শিল্প প্রচেষ্টায় ৭৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা সাধারণভাবে অনুমোদিত হইয়াছে।

বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত মেয়র সম্মেলনে ভারতের ছয়টি প্রধান শহরের উন্নয়নকল্পে মোট ১৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নিকট একটি যুক্ত স্মারকলিপি পেশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

২৩শে জুলাই—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ওয়ার্কিং কমিটি সত্যা-গ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে বাহির হইতে গোয়া প্রবেশের প্রচেষ্টা সমর্থন করেন না। কমিটি অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা যথাসম্ভব শীঘ্র গোয়া সমস্যা সমাধানের জন্য পর্তুগীজ সরকারকে অনুরোধ জানান।

২৪শে জুলাই—নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ৪,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্য মোট ২২.৫ কোটি টাকার নূতন ঋণ সংগ্রহের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঋণ লব্ধ অর্থ প্রধানত উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে।

ডিব্রুগড়ের সংবাদে জানা যায় যে, গত তিন দিন যাবৎ প্রবল বর্ষণ হইতে থাকায় গতকল্য হইতে ডিব্রুগড়ে ব্রহ্মপুত্রের জল দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বন্যাস্ফীত ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে ডিব্রুগড় শহরের ৬টি ওয়ার্ড প্লাবিত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই জুলাই—আজ জেনেভায় পৃথিবীর বৃহৎ চতুঃশক্তির রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্বে শান্তি স্থাপনের উপায় উদ্ভাবনকল্পে প্যালেস দ্য নেশনের সুপ্রশস্ত কক্ষে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্যকার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

১৯শে জুলাই—জেনেভায় রাষ্ট্রনায়ক সম্মেলনে আলোচনার জন্য চার দফা বিশিষ্ট একটি কর্মসূচী সম্পর্কে চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ অদ্য একমত হন। সে চারটি বিষয় হইতেছে এই ঃ (১) খণ্ডিত জার্মানীর পুনর্মিলন, (২) ইউরোপীয় নিরাপত্তা, (৩) নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা ও (৪) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন।

১৯শে জুলাই—আজ সীমান্ত প্রদেশে সর্দার বাহাদুর খাঁর নেতৃত্বে গঠিত এক নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গতকল্য সীমান্তের গভর্নর সর্দার আবদুর রসিদের মন্ত্রিসভা বাতিল করেন।

২০শে জুলাই—বেলুচিস্থানের শাসন কর্তৃপক্ষ আজ হইতে 'বেলুচিস্থানের গান্ধী' খাঁ আবদুস সামাদ খাঁর উপর আরোপিত চলাচল সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

২১শে জুলাই—"সহ-অস্তিত্বের বিকল্প সহবিনাশ"—শ্রী নেহরুর এই সিদ্ধান্ত জেনেভায় চতুঃশক্তি সম্মেলন পরোক্ষভাবে মানিয়া লইয়াছে।

অদ্য সায়গনে কম্যুনিস্ট বিরোধী হাঙ্গামাকারীরা শহরের বৃহত্তম হোটেল ম্যাজেস্টিকে প্রবেশ করিয়া ইন্দোচীন যুদ্ধ-বিরতি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভারতীয় ও পোলিশ সদস্যদের বাসকক্ষ তছনছ করিয়া দেয়। প্রকাশ, হাঙ্গামাকারীরা যুদ্ধবিরতি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভারতীয় প্রেসিডেণ্ট শ্রী এম জে দেশাইকে নিপীড়ন করে এবং তাঁহাকে কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করে। সায়গনে অদ্যকার হাঙ্গামায় ৬১ জন আহত হইয়াছে।

২৩শে জুলাই—জেনেভায় চতুঃশক্তি রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্ব উত্তেজনা প্রশমনে ভবিষ্যৎ আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন। চতুঃশক্তি রাষ্ট্রপ্রধানদের গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠক আজ সমাপ্ত হয়। জার্মানী ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানের জন্য চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ আগামী অক্টোবর মাসে জেনেভায় মিলিত হইবেন বলিয়া বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আজ চতুঃশক্তি প্রতিনিধিগণের চূড়ান্ত প্রকাশ্য অধিবেশনে সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন বলেন যে, দূর-প্রাচ্যের বিষয়, চীনা জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং ফরমোজার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা না হওয়ায় রাশিয়া নিরাশ হইয়াছে।

পর্তুগীজ সরকার গোয়া বিরোধ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের পর্তুগীজ অধিকৃত স্থানসমূহের সার্বভৌম অধিকার যদি ভারতীয় ইউনিয়নের নিকট হস্তান্তরের প্রশ্নই হইয়া থাকে, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উহার সমাধান নিশ্চয়ই হইবে না।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩,
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

২২শ বর্ষ

(৪০শ সংখ্যা হইতে ৫১শ সংখ্যা পর্যন্ত)

২২ বর্ষ
৪০ সংখ্যা
দেশ
শনিবার
২০ শ্রাবণ, ১৩৬২
DESH
SATURDAY, 6TH AUGUST, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্লাবন-পীড়ন

উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্যাপক অঞ্চল বন্যার ফলে বিপন্ন হইয়াছে। বিহার এবং আসামের প্লাবন-পীড়ন সর্বাধিক ভয়াবহ। ব্রহ্মপুত্রের জল পরিস্ফীত হইয়া আসামকে ভারতের অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় বন্যার ফলে বিপদ সবচেয়ে বেশী দেখা দেয়। ব্যাপক অঞ্চলের কুড়ি হাজার নরনারী অসহায় অবস্থায় পতিত। সুখের বিষয় এই যে, বর্তমান বৎসরের বন্যা গত বৎসরের মত ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই এবং গত বৎসর হইতে জলপাইগুড়ি, আলীপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, মাথাভাঙা প্রভৃতি স্থানকে বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার হইতে যেসব প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহার ফলে এই স্থানগুলি এবার বন্যার তোড় হইতে অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। বন্যার তোড় এখন হ্রাস পাইয়াছে। বন্যার ফলে পশ্চিম-বঙ্গে কাহারও প্রাণহানি ঘটে নাই; কিন্তু শস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই-রূপ অবস্থায় বিপন্ন নরনারীদিগকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে; কিন্তু শুধু আর্থিক কিংবা খাদ্য সরবরাহের দ্বারা সাহায্য দানই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, বন্যার জল অপসারিত হইবার পর বিপন্ন অঞ্চলে নানারূপ ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দেয় এবং তাহার ফলে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। এমন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যস্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সংবিধান-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার, এজন্য ঔষধপত্রসহ চিকিৎসার বন্দোবস্তও সরকারকে করিতে হইবে। বে-সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্গত নরনারীর সেবা-কার্যে আগাইয়া আসিবেন এবং সহৃদয় দেশবাসীরা আর্তসেবার এই মহান্ ব্রতে সর্বতোভাবে সহায়তা করিবেন, আমরা ইহাই আশা করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজি কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করিয়াছি। কলিকাতা কর্পোরেশন এতদুদ্দেশ্যে যাদবপুর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে সম্প্রতি ৯২ বিঘা জমি ব্যবহার করিবার অধিকার মঞ্জুর করিয়াছেন। যাদবপুরের শিক্ষায়তনটির সহিত বাঙলার অগ্নি-যুগের গৌরবময় ঐতিহ্য বিজড়িত রহিয়াছে। প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সংকল্প লইয়াই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পুণ্যশ্লোক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাস-বিহারী ঘোষ প্রমুখ বাঙলার মনীষিবর্গের অবদানে এই প্রতিষ্ঠান তৎকালে বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভিনব প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকস্বরূপে বাঙলার বুকে শ্রীঅরবিন্দ মাতৃপূজার হোমানল-শিখা প্রজ্বলিত করেন এবং যাদবপুরের শিক্ষায়তন ত্যাগময় সাধনার অন্যতম পুণ্য পীঠে পরিণত হয়। পরাধীনতার প্রতিকূল অবস্থায় বাঙলার মনীষিবর্গের সেই সাধনা তৎকালে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই এবং শিক্ষায়তনের কাজ ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাঙলার সাধক, চিন্তাশীল এবং শিক্ষাব্রতী মনীষী-বৃন্দের আরব্ধ সেই ব্রত আজ উদ্‌যাপিত হইতে চলিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দ এবং গর্বের বিষয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তৃগণ এজন্য সমগ্র জাতির ধন্যবাদ ভাজন। আমরা আশা করি, প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে তাঁহারা অবহিত থাকিয়া কাজে অগ্রসর হইবেন।

উদ্বাস্তু সমাগমের সংকট

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে লোক-সভায় সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সচিব এবং ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী সচিবের যুক্ত সফরের ফলে এপ্রিল এবং মে মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমাগম কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু জুন এবং জুলাই মাসে এই সংখ্যা

উত্তরোত্তর কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, শিয়ালদহ স্টেশনে গেলেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শাসন-বিভাগের ঊর্ধ্বতন স্তরে সফর প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা সামাজিক কিংবা অর্থ-নীতি প্রতিবেশের বিশেষ কোনই পরিবর্তন ঘটে না, একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। সেই দিক হইতে পূর্ববঙ্গের অবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে যে পরিবর্তিত হয় নাই, ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তথাকার প্রতিবেশ সংখ্যালঘুদের নিরুদ্বেগে সেখানে থাকার পক্ষে উপযোগী নয়, তাঁহার এমন উক্তির তাৎপর্য সুস্পষ্ট; কিন্তু কথাটা তিনি ভাঙিয়া বলেন নাই। পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্র বলিয়া এইরূপ প্রতিকূল প্রতিবেশের উদ্ভব ঘটিতেছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন, ঐসলামিক রাষ্ট্র' এই সংজ্ঞাটির জন্য কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। সংজ্ঞার মধ্যে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কোন দোষ না থাকিতে পারে, কিন্তু সংজ্ঞাটির কোন স্থলে যে মনস্তাত্ত্বিকতা রহিয়াছে, পূর্ববঙ্গের সামাজিক এবং অর্থনীতিক প্রতিবেশে তাহা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। বস্তুত দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের পক্ষে বিধি-বিধানের অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিকতাই প্রত্যক্ষ-ভাবে কাজ করে। রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মগত সংস্কার যতদিন পর্যন্ত মানুষের মৌলিক অধিকারকে আড়ষ্ট করিবে, ততদিন পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম বন্ধ হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন সচিব শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় সেদিন এই আশঙ্কা খোলা-খুলি ভাষাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, অশান্তির সময় যে কৃষকশ্রেণী জমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছিল, এখন তাহারাও দলে দলে পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে ছুটিতেছে। পরানুগৃহীতের দৈন্যময় জীবন মানুষের পক্ষে এতই দুঃসহ।

গোয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর্যায়

রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সমাজের ধর্মগুরু পোপ গোয়ার সমস্যা সম্পূর্ণ-ভাবে রাজনীতিক, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ভারত এবং পর্তুগাল উভয় পক্ষকে এই সম্পর্কে হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতের পক্ষে এই উপদেশের কোনই প্রয়োজন ছিল না; কারণ ভারত এই সম্পর্কে আগাগোড়াই অহিংস নীতি অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে; অধিকন্তু এই সম্পর্কে ভারত সরকার এবং কংগ্রেসের আগ্রহ অনেকটা আতিশয্যের আকার ধারণ করিয়াছে এবং কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে আদর্শনিষ্ঠ কর্মীদের মধ্যেও এজন্য অসন্তোষের কারণ ঘটিয়াছে। তাঁহারা ব্যাপক সত্যাগ্রহের পক্ষে নীতি-নিষ্ঠার দিক হইতে আপত্তির কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে গোয়ার পর্তুগীজেরা অহিংস সত্যাগ্রহীদের প্রতি যে বর্বর এবং নৃশংস অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে জগতের অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না, অথচ মানব-সভ্যতার এই কলঙ্ককর অধ্যায়ের প্রতি সভ্য সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। পক্ষান্তরে সভ্যতাভিমানী বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য শক্তি পর্তুগীজ বর্বরতার অনুমোদন করিয়া চলিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর জলদস্যুসুলভ বর্বর প্রবৃত্তির দ্বারা যাহারা প্রভাবিত, খৃষ্টধর্মের আদর্শের সম্বন্ধে পোপের উপদেশ তাহাদিগের চৈতন্য সম্পাদনে সহায়ক হইবে, এমন আশা বৃথা বলিয়াই আমরা মনে করি। ফলত অকুণ্ঠ আত্মদানের পথে ভারতকেই এক্ষেত্রে গোয়া হইতে পর্তুগীজ-দের প্রভুত্ব উৎখাত করিয়া মানবতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা সেই বৃহৎ আদর্শে জাতির আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। ইহাতে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হইলে ভারতের বৃহত্তম জন-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

হাসুবানু

পূর্ব-পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের হাসুবানু নামক উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। বিগত চার বৎসর পূর্বে হাসুবানু 'দেশ' পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত হয়। ঐ সময় পূর্ববঙ্গের সংখ্যাতীত মুসলমান পাঠক ও পাঠিকা উক্ত উপন্যাসখানির অজস্র সুখ্যাতি করিয়া গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিয়া-ছিলেন। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে এযাবৎ সমগ্র হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক লইয়া সে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, হাসুবানু তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই উপন্যাসখানিতে কোনও প্রকার পাকিস্থানবিরোধী প্রচারকার্য নাই। প্রবোধবাবুর মত পাকা ঔপন্যাসিকের লেখনীতে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই ধরনের কাঁচা কাজ হওয়াও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে তাঁহার রচনায় পাকিস্থানের প্রতি কল্যাণবোধ এবং উহার উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ববঙ্গে সম্প্রতি জনাব ফজলুল হকের প্রভাবিত মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বাংলা ভাষাকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা এই সরকারের অন্যতম নীতি। তাঁহারা ইতোমধ্যেই বাংলা ভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে মর্যাদা দানের নীতি অবলম্বন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা 'হাসুবানু'র ন্যায় সময়োপযোগী পারস্পরিক সম্প্রীতিমূলক একখানা উচ্চাঙ্গের উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব-পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সায়গনের ২০ জুলাই তারিখের হাঙ্গামা সম্পর্কে লোকসভায় প্রশ্নোত্তর কালে প্রশ্নকারীরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের (উচ্চারণ ভুল হল কি?) প্রধান মন্ত্রীর নাম (Mr. Diem) মিঃ দিয়েম বলে উল্লেখ করলে শ্রী নেহরু তাঁদের ভুল শুধরে দিয়ে বলেন যে, Diem-এর উচ্চারণ "দিয়েম" নয়, Diem-এর উচ্চারণ হবে "এম্"। জানি না মিঃ এম্-এর নামের অপর অংশগুলি "Ngo Dinh"-এর উচ্চারণ কী হবে! রোমান অক্ষরে লেখা সব কিছুরই আমরা ইংরেজি ভাষার উচ্চারণরীতি অনুসারে যেরূপ সম্ভব মনে হয়, সেই রকম উচ্চারণ করি এবং বাংলায় অথবা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় লিখতে হলে তদনুযায়ী অক্ষরে রূপান্তরিত করি। ফলে "এম্"কে "দিয়েম" বলা বা লেখার মতো কত যে বানান এবং উচ্চারণ-বিপর্যয় ঘটছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় পার্লামেণ্টে দু-একটা উচ্চারণ-ভুল শুধরে দিয়ে আর কী করবেন? সব বৈদেশিক নামের শুদ্ধ উচ্চারণ তাঁরও জানা আছে কি না কে জানে।

যাই হোক, এ বিষয়ে কিছু করতে হলে আগে খবরের কাগজগুলোকে ধরতে হয়, কারণ বিদেশী নামের শুদ্ধাশুদ্ধ উচ্চারণ খবরের কাগজের মারফতই বিশেষ করে প্রচলিত হয়। সুতরাং খবরের কাগজের পাঠকেরা কাগজে উল্লিখিত বিদেশী নামের মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণ কী সেটা যাতে জানতে পারে তার চেষ্টা করা দরকার। এ বিষয়ে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছ থেকে সংবাদপত্রগুলি এবং সংবাদ সরবরাহকারী এজেন্সীগুলিও সাহায্য আশা করতে পারে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের কূটনৈতিক ও অন্যাবিধ অনেক রকম সম্বন্ধের প্রসার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সংবাদপত্রে প্রায়ই নূতন নূতন বিদেশী নাম দেখতে পাওয়া যায়। যখনই এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নূতন বিদেশী নাম কাগজে উঠে, যার রোমান অক্ষরে লেখা বানান থেকে ইংরেজি ভাষায় অভ্যস্ত লোকের পক্ষে প্রকৃত উচ্চারণ ধরা কঠিন, তখনই পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তব্য হওয়া উচিত সংবাদপত্রগুলিকে জানিয়ে দেওয়া প্রকৃত উচ্চারণ কী হবে। আসলে সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিরই উচিত এরূপ ক্ষেত্রে সংবাদ সরবরাহ করার সময়েই উচ্চারণ সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়ে দেওয়া। যেখানে ঠিক জানা নেই বা সন্দেহ আছে, সেখানে এজেন্সীগুলি পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছ থেকে জেনে নিতে পারে। যে সব দেশের রাষ্ট্রদূত বা কনসালের অফিস এখানে আছে তাদের সম্পর্কিত কোনো নামের উচ্চারণ জানতে হলে তাদের রাষ্ট্রদূত বা কনসালের অফিসে জিজ্ঞাসা

করলেও জানা যেতে পারে। সংবাদ পাঠানোর পূর্বেই যেখানে সম্ভব জেনে নেওয়া উচিত।

বলা বাহুল্য, যার উচ্চারণে গোলযোগ সম্ভব, এরকম বিদেশী নামের সংগে জড়িত সংবাদ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনই উচ্চারণের ইংগিত দিয়ে দেওয়া দরকার। Mr. Diem-এর নাম যখন প্রথম সংবাদে আসে, তখনই যদি সংবাদ সরবরাহকারী এজেন্সীগুলি Diem-এর পাশে (pronounced "Em") যোগ করে সংবাদটি সরবরাহ করত এবং দু-একবার এইভাবে ছাপা হতো, তবে ভুলটা চালু হতো না।

অবশ্য পররাষ্ট্র দপ্তর আর একটি কাজ করতে পারেন। যে-সব দেশের নামের উচ্চারণে এদেশে এরকম ভুল হবার সম্ভাবনা সেই সব দেশের উচ্চারণের সাধারণ নিয়মাবলী এক একটি করে তৈরী করে পররাষ্ট্র দপ্তর বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহকারী এজেন্সীগুলিকে দিতে পারেন। এগুলি কেবল সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহকারী এজেন্সীগুলির কাজে লাগবে না, বিদেশযাত্রীদেরও কাজে লাগতে পারে।

* * *

যাই হোক, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধান মন্ত্রীর নামের উচ্চারণের চেয়ে তাঁর কাজের ফলাফল নিয়েই এখন ভাবনা বেশি। ২০ জুলাই তারিখের হাঙ্গামাকারীদের দ্বারা ইণ্টারন্যাশনাল সুপারভাইজরী কমিশনের সদস্যদের জিনিসপত্র নষ্ট হওয়ার দরুণ এম্ সরকার দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কমিশনের সদস্যদের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই প্রতিশ্রুতি যে পালিত হবে, তার গ্যারাণ্টী মিঃ এম্-এর কাছ থেকে পেয়ে কমিশন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। কমিশনের সভাপতি হচ্ছেন ভারত গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি। ভারত গবর্নমেণ্ট জেনেভা (গত বছরের) কনফারেন্সের যুগ্ম সভাপতি মঃ মলোটভ এবং স্যর অ্যাণ্টনী ইডেনকে (তখন তিনি বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন) অবস্থা জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এঁরা ফ্রান্স ও আমেরিকাকে দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গবর্নমেণ্টের উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমেরিকার সাহায্যের উপর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গবর্নমেণ্ট একান্ত নির্ভরশীল। সুতরাং আমেরিকার পরামর্শ মিঃ এম্ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্ন যদি ওঠে অর্থাৎ যদি এম্ সরকারের উপর নির্ভর করতে ভরসা না হয়, তবে ফরাসী সৈন্যের উপর নির্ভর করার কথা উঠে। এস্থলে প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বা আস্থা প্রদর্শনের অবসর থাকে না, ফরাসী বা মার্কিন শক্তির শর্ত পালন করিয়ে নেওয়ার কথা উঠে। ভারত সরকারের পক্ষে এই ভাব অবলম্বন করা নীতিসম্মত হবে কি না সন্দেহ। অথচ আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গবর্নমেণ্টের উপর নির্ভর করাও সম্ভব নয়। কোরিয়াতে রী সরকারকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল, কারণ কোরিয়াতে কার্যত ও আইনত ইউ-এন নাম ব্যবহারকারী মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের সংগে কারবার করলেই চলত। কিন্তু এখানে উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—এই দুই গবর্নমেণ্টকেই দুই আসল পক্ষ, principal বলে ধরতে হবে, তা না হলে চলবে না। এখানে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যদি যৌথ ইলেকশন ব্যবস্থা করতে রাজী না হয়, তবে জোর করে করানো সম্ভব হবে না। অবশ্য পশ্চিমা শক্তিরা মিঃ এম্‌কে উত্তর ভিয়েৎনাম গবর্নমেণ্টের সংগে ইলেকশন সম্বন্ধে যৌথ আলোচনায় যোগ দেবার পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু ইলেকশন তাঁরাও চান না, কারণ বর্তমান অবস্থায় ইলেকশন হলে নাকি সারা ভিয়েৎনাম ভিয়েৎমিনের দখলে চলে যাবার সম্ভাবনা। তবে চুক্তির শর্ত অনুসারে কথবার্তা আরম্ভ না করা খারাপ হবে, এই জন্যই আমেরিকা পর্যন্ত মিঃ এম্‌কে যৌথ আলোচনায় যোগ দিতে বলছেন। মিঃ এম্ তাতে রাজী হলেও যে ইলেকশন হবে তার আশা নেই। বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইলেকশন করিয়ে দিয়ে তাঁদের কাজ চুকিয়ে দিতে পারবেন, এ ভরসা তাঁরাও বোধ হয় করেন না। তবে ইলেকশনের কথাবার্তা অন্তত চললে সংকটের বেগটা বিলম্বিত হবে। কিছুটা মুখরক্ষাও হবে।

* * *

মার্কিন সরকার ও চীনের কম্যুনিস্ট সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনার পথ একটু একটু করে খুলছে। প্রেসিডেণ্টের সংগে চেয়ারম্যানের বা পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে কথাবার্তার স্তর পর্যন্ত ব্যাপারটা এখনো এগোয় নি, তবে রাষ্ট্রদূতের স্তর পর্যন্ত এগিয়েছে। ১লা আগস্ট থেকে জেনেভায় দুই পক্ষের রাষ্ট্রদূতের মর্যাদাসম্পন্ন দুই প্রতিনিধির মধ্যে আলাপ চলছে। এই আলোচনা আরম্ভ হবার আগের দিন চীন সরকার ১১ জন মার্কিন বৈমানিকের মুক্তি ঘোষণা করেন। কোরিয়া যুদ্ধের সময়ে এদের বিমান চীন এলাকায় ভূপাতিত করা হয় এবং তখন থেকে এদেরকে চর বলে আটক রাখা হয়েছিল। অবশ্য মার্কিন সরকার কখনও স্বীকার করেন নি যে, এরা চর, মার্কিন সরকার বরাবর বলে আসছিল যে, এরা যুদ্ধবন্দী, কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির চুক্তির পরে এদের ধরে রাখা পিকিং গবর্নমেণ্টের অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। অন্য পক্ষে পিকিং গবর্নমেণ্ট ছেড়ে দেবার সময়েও বলছেন যে, এরা চর এবং গুরুতর অপরাধী ছিল, চীন সরকার দয়া করে এদের এখন ছেড়ে দিচ্ছেন। যাই হোক, লোকগুলো ছাড়া তো পেলো। এখনও অসামরিক কয়েকজন আমেরিকান চর হিসাবে চীনে বন্দী আছে। অন্যদিকে চীনের অভিযোগ হচ্ছে বহু চীনা ছাত্রকে মার্কিন গবর্নমেণ্ট আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরতে দিচ্ছেন না। যাই হোক, এ ব্যাপারগুলো বোধ হয় নিষ্পত্তির মুখে। জেনেভায় বর্তমানে দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের যে আলোচনা চলছে সেটাতে আরো গুরুতর বিষয়—যথা ফরমোজার সমস্যা স্থান পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২।৮।৫৫

ঝাঁসীর রাণী ○ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
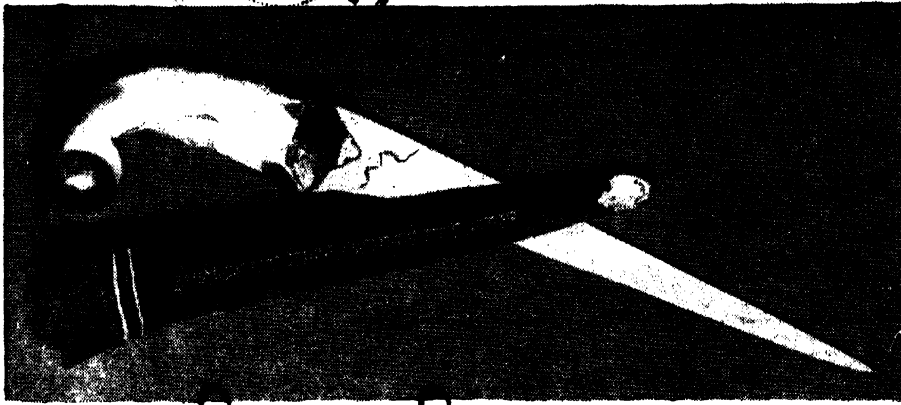
অমর হ্যায় ঝাঁসী কী রাণী

বুন্দেলখণ্ডে একটি মাঘের সন্ধ্যা। পর্বতাকীর্ণ লালমাটির প্রান্তরের শেষে, প্রত্যহের মতো সেদিনও সূর্য গেল অস্তাচলে। আদিগন্ত আকাশ সোনালী লালে মিশ্রিত ইমনকল্যাণ গলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা চলল বাসরঘরে। প্রতি গোধূলিতে চিরস্বয়ম্বরা সন্ধ্যার বধূবেশে এই প্রিয়াভিসার। তখন গরু চরিয়ে ফিরছে কিষাণী মেয়েরা। কাঁপাগলার ডাক বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ছোট ছেলে ডাকছে পথ-হারানো মহিষকে। ক্লান্ত, চিরন্তন, একটি দিনের অবসান।

কাঠকুটো শুকনো পাতা জ্বালিয়ে পথের পাশে বসেছে লোধী ছেলেমেয়ে মজুরদের দল। ওদের জীবনের প্রারম্ভে ও অবসানে কোনো নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নেই। তাদের জননী বুন্দেলখণ্ডের মতোই তাদের পাথুরে কপাল। সে কপালে ফুল ফোটেনা, ফল ধরে না। নবজন্মে আনন্দ নেই, মৃত্যুতে শোক আছে। তবু তারা বাঁচে, কাজ করে, গান গায়। মেলার দিনে প্রিয়াকে চুড়ি পরায় পুরুষ, জননী শিশুকে ঘুম পাড়ায়। এই যে মানুষ, তাদের মাঝখানে সন্ধ্যা-বেলা গিয়ে বোস, শুনবে তারা বলছে ঝাঁসীর রাণীর কথা। আমার তোমার কাছে ঝাঁসির রাণী ইতিহাসের একটি পাতা মাত্র। তাদের কাছে যদি বলো, রাণী তো কবে মারা গেছেন, তখন সেই সব মানুষ তোমার দিকে তাকাবে। যুগযুগান্তের বোঝা বয়েছে তারা, ধৈর্য তাদের রক্তে। তাই তারা প্রতিবাদে ছটফটিয়ে উঠবে না। সরল, এবং সহজাত বিশ্বাসে বলবে—"রাণী মরগেই ন হোউনী, অভি তো জীন্দা হোউ।" তারা বলবে, রাণীকে লুকিয়ে রেখেছে বুন্দেলখণ্ডের পাথর আর মাটি। অভিমানিনী রাণীর পরাজয়ের লজ্জা ঢেকে রেখেছে জমিন, আমাদের মা। ঝাঁসীতে লছমীতাল হ্রদের পাশে এসে দাঁড়ালে তুমি দেখবে, লছমী-তালের জলে কালোছায়া ফেলে অপেক্ষা করছে এক ভাঙা মন্দির। অবহেলায় অনাদরে, একান্ত জীর্ণ তার দেহ। সর্বত্র আগাছা জন্মেছে। তার পাশে, জলে কাপড় কাচে বুন্দেলখণ্ডের গরীব মানুষ যতো। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও তুমি শুনবে ঝাঁসীর রাণীর কথা। তারা বলবে—

পত্থর মিট্টিল ফৌজ বনাই,
কাঠ সে কটোয়ার;
পাহাড় উঠাকে ঘোড়া বনাই,
চলি গোয়ালিয়ার।

আমার তোমার চোখে রূপকথা নেই। তুমি বলবে এ কার কথা বলছ। তারা বলবে ঝাঁসীর রাণীর কথা। তারা বলবে, রাণী যদি হাতে মাটি তুলে নিতেন তো সেই মাটি ফৌজ বনে যেত, কাঠ তাঁর হাতের স্পর্শে হয়ে যেত উদ্যত তরবারি। পাথর ছুঁয়ে তাকে ঘোড়া বানিয়ে তিনি গোয়ালিয়ার চলে গিয়েছিলেন।

কাল্‌পীর পথে চল্‌তে বুড়ো কিষাণের সঙ্গে যদি দেখা হয়, সে বলবে : এই কাল্‌পীর মাটিতে রাণী লড়াই করেছিল, এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে, হয়তো এই মাটির বুকেই। তার দিন চলে গেছে, তার মোক্ষ আর নেই। তাই সে মানুষকে মুখ দেখায় না।

ঝাঁসী, কাল্‌পী, গোয়ালিয়ার, সর্বত্র সাধারণ মানুষ বলবে রাণী মরেনি।

ভাণ্ডীরের ও ঝাঁসীর মাঝখানের পথে মানুষ বলবে, এখনো মাঝরাতে কখনো কখনো দেখা যায় বাঈসাহেবকে সারেংগী ঘোড়ী ছুটিয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি চলেছেন। স্বল্পজ্যোৎস্নায় বাঈসাহেবের গলার মোতির মালা তরবারি, সব স্পষ্ট দেখা যায়।

ঝাঁসী কেল্লার নীচে যে অশীতিপর

বৃন্ধ টাংগাওয়ালাদের ঘাস বিক্রী করে, সে পরমবিশ্বাসের সংগে বলবে, কত শরতে গভীর রাত্রিতে সে নিজের চোখে দেখেছে, দুর্গপ্রাকারে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছেন একলা রাণী লক্ষ্মীবাঈ। অবিশ্বাসী বলবে, তা হয়না। সে বলবে, কেন তা হবে না। রাণী তো আর মরেনি। 'বাঈসাহেব জরুর জীন্দা হাউনী।'

তবে কোথায় রাণী লক্ষ্মীবাঈ? তাঁকে যদি পেতে চাও তো সেই সব জায়গায় যেতে হবে, সেই সব মানুষকে জানতে হবে যারা আজো মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাদের বাঈসাহেব মরেনি। কোথাও না কোথাও আছে সে। তখন এই সব অশিক্ষিত, দরিদ্র, কিষাণ-কিষাণী মানুষের মনের বিশ্বাস থেকে আস্তে আস্তে প্রতিভাত হবে এক অপূর্ব নারী, এই ভারতবর্ষের এক হারানো দিনের মেয়ে। আমাদের দেশের নারীদের অন্তরের সবটুকু সত্য নিঙড়ে যদি একটি আধারে ধরা যায়, তো সে আধার রাণী লক্ষ্মীবাঈ। একটি মেয়ের সম্পর্কে যদি শতবর্ষ ধরে জনসাধারণ জেনে থাকে মাটি তাঁর হাতে সংগ্রামী সৈনিক হয়ে উঠত, কাঠ তাঁর হাতের স্পর্শে হয়ে যেত তরবারি, পাহাড় হয়ে যেত গতি-চঞ্চল ঘোড়া, তবে সে মেয়ে কিরকম-? শক্তিরূপে দুর্গাকে আমরা আবাহন করি বছরে একবার। কিন্তু গল্পে, গানে, গাথায়, নানাভাবে বহু মানুষের মধ্যে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের নিত্যপূজা, নিত্য-আরাধনা।

এই যে মানুষের শ্রদ্ধা, একি শুধু ভাবপ্রবণ মনের উচ্ছ্বাস? এর কি কোন ভিত্তি ছিল না?

সেই সব কথা জানতে হলে চলে যেতে হবে একশো বছর আগেকার বুন্দেলখণ্ডে। জানতে হবে ঝাঁসীকে। আর যেতে হবে তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে। কেননা রাণী লক্ষ্মীবাঈ তো একটি বিচ্ছিন্ন এবং একক চরিত্র নয়। ছিয়ানব্বই বছর আগে ভারতবর্ষের বুকে বুটভরা পা রেখে মাড়িয়ে দিয়েছিল ইংরেজ। ভারতবর্ষের পাঁজর ভেঙে আর্তনাদ উঠেছিল। সেই আর্তনাদ মুখর হয়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদের সমুদ্র-গর্জনে। তাতে শাসকের সিংহাসন কেঁপে গিয়েছিল। সমুদ্রপারের রাজ প্রাসাদে অর্ধপৃথিবীশ্বরী মহারাণীর মনে শান্তি ছিল না, চোখে ছিল না ঘুম। সেই দিনের ভারতবর্ষের মনের কথা হচ্ছেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। সেদিনের অসংখ্য ভুল, ত্রুটি, অক্ষমতা, পরাজয়, সব ছাপিয়ে একটি কথা সত্যি ছিল। সেটি হচ্ছে বিদেশী নাগপাশের বিরুদ্ধে প্রথম সচেতন বিদ্রোহ। সেই চেতনা যতদিন থাকবে ততদিন রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম থাকবে আমাদের দেশে। যাঁর নামে সমগ্র বুন্দেল-খণ্ডের নামকরণ হ'তে পারত, তাঁর আজও কোন যোগ্য স্মৃতিসৌধ নেই।

অবশ্য তাতে রাণীর স্মৃতির এতটুকু অসম্মান হয়নি। হাজার হাজার মানুষ তাঁর কথা নিত্য স্মরণ করে। নিত্য গল্প বলে শিশুদের কাছে ঘুম পাড়াবার সময়। ঝাঁসীর মাটিতে বনস্পতি বৃদ্ধ হয়। তার শিকড় থেকে মাথা তোলে নতুন গাছ। এমনি করে চলেছে যে চিরন্তন জীবন-প্রবাহ, তাতে রাণীর স্মৃতি নিয়ত পূজা

পাচ্ছে। সৌধ তাঁর অমর হয়ে নিত্য-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ইঁট কাঠ পাথরে নয়, মানুষের মনে। ঝাঁসীর সেই দুর্ধর্ষ কেল্লা আজও রয়েছে। যার দক্ষিণবুরুজ থেকে একদা যুদ্ধের রক্তনিশান উড়িয়ে দিয়েছিলেন রাণী। বিশাল কালো দেহ নিয়ে জং ধরে পড়ে আছে রাণীর দুই প্রিয় কামান ভবানীশঙ্কর ও কড়কবিজলী। ইংরেজের গোলার আঘাতগুলি আজও ঝাঁসী নগরীর প্রাচীর গাত্রে সুস্পষ্ট। সবচেয়ে উপরে রয়েছে মানুষ। যাদের জন্য তিনি লড়েছিলেন জীবন পণ রেখে, আর বাজি হেরে গিয়ে সেই বাইশ বছরের জীবন আহুতি দিয়েছিলেন গোয়ালিয়ারের রণক্ষেত্রে।

যতদিন মানুষ জোর করে বলবে, 'রাণী মরগেই ন হৌউনী', ততদিন রাণীর মৃত্যু নেই। ১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন তাঁর মরদেহ ভস্ম হয়ে গেছে সত্য। তবু তিনি অমর। ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর মৃত্যু স্বীকার করেনি, কাজে—

'অমর হোউ ঝাঁসী কি রাণী।'

॥ পূর্বাভাস ॥

আজকের মানচিত্রে ঝাঁসী যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা মাত্র। ১৮৫৮ সালের পর থেকে তার সমগ্র পরিচয় বিলুপ্ত। কিন্তু সময়ের নৌকোকে মুখ ঘুরিয়ে দাও, ভেসে যেতে দাও তাকে সেই দিনের ঘাটে।

বুন্দেলখণ্ডের রূপ রয়ে গেছে অপরিবর্তিত। ভারতবর্ষের একেবারে মধ্যস্থানে এক টুকরো রুক্ষ দেশ। প্রকৃতি সেখানে কৃপণা। পূবে, দক্ষিণে, উত্তরে অজস্র অঞ্জলিতে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষ্মী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা। সুজলা, সুফলা মলয়জশীতলা, সুখদা বরদা জননী। বুন্দেলখণ্ডে তার ভৈরবী মূর্তি। সেখানে পাথর পাহাড় আন্দোলিত ভূমি আর ক্ষীণতোয়া নদী।

বহুদিন আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বাল্যে, সেখানে অরণ্য ছিল, জনপদ ছিল। মানুষ নির্মমভাবে অরণ্য উচ্ছেদ করে বুন্দেলখণ্ডকে মেঘের প্রসাদ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করেছে। এই দেশের বুক দিয়ে বয়ে গেছে দশার্ণ এবং বেত্রবতী, কিন্তু তারা আজ ক্ষীণতোয়া।

কুলে কুলে তাদের প্রফুল্ল জম্বুপুঞ্জ ফলভারে আনত হয়ে নেই। কোনো বিস্মৃত যুগে সেই পথ দিয়ে যে নীলাকাশ ছায়াবাহী মেঘ গিয়েছিল, নির্বাসিত প্রেমিকের অশ্রু বহন করে অলকাপুরীর পথে, আজকে তার দর্শন একান্ত দুর্লভ।

কখনো সখনো মেঘ সেখানে দাঁড়ায়। জল দেয় প্রসন্ন হয়ে। তখন চাষীরা তুলো বোনবার স্বপ্ন দেখে। গম, জোয়ার, অড়হর আর বাজরার বীজ প্রাণের অংকুর মেলে ধরতে চায়।

ঝাঁসীর কথা জানবার আগে বুন্দেলখণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা প্রয়োজন। কেননা বুন্দেলখণ্ডে মারাঠা বংশ স্থাপনের প্রাক্কালে ঝাঁসীতে এসেছিলেন নেবালকর বংশ। এই নেবালকর বংশের বধু হয়ে ঝাঁসীতে এসেছিলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

বুন্দেলখণ্ড ছিল বুন্দেলাদের দেশ। মহাভারতের যুগে বুন্দেলখণ্ড, চিদি, দশার্ণ ও বিদর্ভ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চন্দেল্ল রাজপুতদের সময় ঝাঁসী জেলাটি সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। চন্দেল্ল রাজপুতগণ ঝাঁসী ও বুন্দেলখণ্ডের সর্বত্র প্রস্তর জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। তার কিছু কিছু আজও বিদ্যমান।

চন্দেল্ল রাজপুতদের পরে হাতবদল হতে হতে মোগল অধিকারে এল বুন্দেলখণ্ড।

সেই বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী ছিল অরছা। ষোড়শ শতাব্দীতে, বুন্দেল রাজা মলখান সিংহের মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্র প্রতাপ। অরছা নগরী তাঁরই কীর্তি। নামেমাত্র জনপদটিকে তিনি সুসমৃদ্ধ করলেন। অরছার রাজারা দিল্লীর বাদশাহকে নিয়মিত কর দিতেন না। মাঝে মাঝে কিছু নজরাণা দিয়ে খুশী রাখতেন মাত্র।

রুদ্রপ্রতাপের দ্বিতীয় পুত্র মধুকর শাহের কাছ থেকে বড়োনী জায়গীর নিয়েছিলেন বুন্দেলাবীর বীরসিংহ দেব। অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীরসিংহ দেব নিজস্ব সেনাদল গঠন করলেন। অধিকার করলেন মোগলাধিকৃত নরোয়ার, মৈনা, জাট, কড়েরা ও ভাণ্ডীর। আকবর, অরছার রাজা রামসিংহ ও গোয়ালিয়ারের খাসকরণের সংগে যে বাহিনী পাঠালেন, বীরসিংহ তাকে পরাভূত করলেন।

ইতিমধ্যে মনান্তর ঘটেছে পিতা ও পুত্রে। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম রুখে দাঁড়িয়েছেন পিতা আকবরের বিরুদ্ধে। তাঁকে দমন করবার পরোয়ানা নিয়ে আবুল ফজল আসতে লাগলেন মধ্যভারত অভিমুখে। সশঙ্কিত সেলিম চললেন বীরসিংহ দেবের সংগে বন্ধুত্ব পাতাতে।

সেলিমের মূল্যবান বন্ধুত্ব, সেলিমের যৌবনে ও মধ্যাহ্নে কিনেছেন মহামূল্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি। ইতিমধ্যে আনারকলির মৃত্যুদণ্ড কাজে পরিণত হয়েছে। তরুণজীবন তাঁর কুঁড়ি থেকে ফুলে বিকশিত হবার আগেই পিষে গেছে পাষাণ সমাধির অতলে। উত্তরজীবনে বীরকেশরী শের আফঘান নিহত হয়েছিলেন এবং দুনিয়ার আলো নুরজহা স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন স্বামীর হত্যাকার্যের পরোক্ষ নিয়ন্তাকে। বীরসিংহ স্বীয় কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই রাজকীয় বন্ধুত্ব ক্রয় করলেন।

প্রয়াগধামে সাক্ষাৎ হল দুজনের। সেলিমের সাহায্য প্রার্থনায় রাজি হলেন বীরসিংহ দেব। শর্ত রইল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সেলিম বীরসিংহ দেবকে রাজ্য গঠনে সাহায্য করবেন। অতঃপর সৈয়দ মুজফ্‌ফরের সংগে প্রয়াগ থেকে তিনি এলেন বড়োনী। এসেই জানলেন, ইতিমধ্যে

মোগল সেনাসহ আব্দুল ফজল নরোয়ায় পেণছে গেছেন। পরাইছে' গ্রামে আছেন তিনি। এখানে বীরসিংহ দেবের সঙ্গে আবুল ফজলের ভয়াবহ যুদ্ধ হল। প্রবল সংগ্রামের পর পরাজিত আব্দুল ফজলের মাথা কেটে নিলেন বীরসিংহ দেব। লাল রেশমের পুলিন্দায়, রুপার থালায় প্রয়াগধামে সেলিমের কাছে পাঠালেন সেই ছিন্নমস্তক। আনন্দে আত্মহারা হলেন সেলিম। বীরসিংহ দেবকে বড়োনীর জায়গীরে তিলক নিয়ে বসবার অনুমতি দিয়ে দূত করে পাঠালেন চম্পৎরাওকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সঙ্গে সঙ্গে বীরসিংহ দেবের জন্য উপঢৌকন হিসাবে রত্নখচিত তলোয়ার, ছত্র, চামর ও ডঙ্কা নিয়ে গেলেন। মহাধুমধামে বড়োনীতে বীর-সিংহ দেবের রাজতিলক হল।

এদিকে আবুল ফজলের মৃত্যুতে আকবর তখন শোকাহত। দুইদিন অন্নজল গ্রহণ করলেন না তিনি। আবুল ফজল ছিলেন অসাধারণ গুণী, বুদ্ধিদাতা ও প্রিয়মিত্র। সেলিমকে তিনি শৈশব থেকে স্নেহ করেছেন। বাদশাহের অনুরোধে তাঁকে পাঠশিক্ষা দিয়েছেন, গল্প বলেছেন ছোটবেলা। স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই আবুল ফজলকে হত্যা করাতে এতটুকু বাধল না সেলিমের?

মর্মাহত বাদশাহকে সান্ত্বনা দেবার জন্য খান আজম, রাজারাম কছবাহা, শেখ ফরিদ, রাজা ভোজরায়, দুর্গাদাস প্রভৃতি একত্রিত হলেন। সেলিমের মাতুল মানসিংহ অনুরোধ করলেন—'জাঁহাপনা, সেলিমকে ক্ষমা করুন। তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না।' আকবর বললেন—'দিল্লীর তখ্‌ত কখনো উত্তরাধিকারীর জন্য খালি থাকবে না। কিন্তু হায়, আবুল ফজলের স্থান চিরদিনই খালি থাকবে।'

মহাদুঃখ প্রশমিত হল, কিন্তু পর-ক্ষণেই নিদারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন বাদশাহ্‌। ধরে আনতে হবে হত্যাকারী বীরসিংহ দেবকে।

সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল। বীরসিংহ দেবের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন বিভিন্ন বুন্দেল সামন্তগণ। গোয়ালিয়র থেকে এলেন সুজানরাও পঁওয়ার, প্রতাপ রায় ও সুজানশাহ্‌।

বীরসিংহ দেব বড়োনী থেকে দতিয়া, দতিয়া ছেড়ে এরছ, এরছ থেকে দুনী এবং দুনী থেকে আবার দতিয়া এসে, শাহজাদা সেলিমের সঙ্গে মিলিত হলেন। বাদশাহী সৈন্য চরম হয়রাণ হল। নিরুপায় আকবর পরাজয় স্বীকার করলেন। সেলিমকে আগ্রায় আহ্বান করলেন পুনর্মিলনের জন্য। সেলিমের পিছন পিছন সমস্ত মোগলসৈন্য চলে গেল আগ্রায়। বীরসিংহ দেব নিশ্চিন্ত হলেন।

সেলিমের মাতা যোধপুরী বেগম সাহেবার এই সময় মৃত্যু হল। তারপর পুনর্বার আকবর বীরসিংহ দেবের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠালেন। অরছার সীমান্তে যুদ্ধে বীরসিংহ দেব বিজয়ী হলেন। এবার তিনি সমগ্র অরছা রাজ্যে স্বাধিকার ঘোষণা করলেন। সুশাসক, জনপ্রিয় রাজা বীরসিংহ দেব দতিয়া, ধামৌনী ও ঝাঁসীতে তিনটি কেল্লা বসালেন। বললেন—ধমৌনী গড়এ ফৌজ থাকবে, দতিয়ার গড় হবে মনোহর ও রমণীয়, ঝাঁসীর গড় হবে সিংহ ও হাতীর সঙ্গে মোকা নেবার যোগ্য। জনশ্রুতি এই, বার্ধক্যের প্রান্তে উপনীত হয়ে তিনি দতিয়া থেকে ঝাঁসীর দিকে তাকিয়ে কেল্লা দেখতে পাননি। বলে-ছিলেন, 'আঁখমে পুরা ঝাঁসী দিখাই যাতি।' সেই থেকে স্থানের নাম হল 'ঝাঁসী'। (ক্রমশ)

চিত্রগ্রীব

ইউনেস্কো এবং অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর যৌথ উদ্যোগে জাপানী উকিয়ো-এ কাঠখোদাই চিত্র-শিল্পের একটি অতি মনোরম প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতায়।

জাপানী কাঠখোদাই শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা আগেই শুনেছি এবং

কিছু কিছু নমুনাও দেখেছি, কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে এ চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় ঘটার সুযোগ এর আগে আর কখনও হয়নি। কাঠখোদাই বলতে আমরা বুঝি মোটা কাজ কিন্তু এ'দের কাঠখোদাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলির টানকেও হার মানায়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় দু শ' বছরের মধ্যের প্রধান প্রধান শিল্পীদের ১০০টি রচনা এ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। যাই হোক, চৈনিক চিত্রকলার সঙ্গে এ চিত্র-কলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট হলেও প্রতিটি ছবি থেকে জাপানীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। জাপানীরা স্বভাবত চীনাগণ অপেক্ষা অনেক চটপটে এবং পুরুষোচিত, তবে চিন্তাশীলতায় তারা অবশ্যই কিছুটা কম। এ'দের ছবিতে ধর্ম বা আদর্শবাদ বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে, বাস্তব জগতের যা কিছু সুন্দর, এ'রা নজর রেখে গেছেন কেবল সেইদিকে। এক সময় বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু প্রভাব জাপানী শিল্পীদের উপর পড়ে ছিল, কিন্তু পরে কোনও অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে এ'দের চিত্রকলা সম্পূর্ণ ধর্মভাবমুক্ত সাধারণ জীবনযাত্রায় ফিরে আসে। তখন শিল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা দিল কখনওবা প্রকৃতির শোভা, কখনওবা অভিনেতা, অভিনেত্রী, নর্তকী, পরিচারিকা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সাধারণ মানুষ। প্রবহমান এই জীবনযাত্রা চিত্রণকেই জাপানী ভাষায় বলা হয় 'উকিয়ো-এ'। এ প্রদর্শনীতে যা ছবি ছিল তা সবই এই উকিয়ো-এ জাতীয়। এই কাঠখোদাই উকিয়ো-এ চিত্রধারাই সম্ভবত শিল্প জগতে জাপানের সবচেয়ে বড় দান। ফ্রান্স-এ গোড়ার দিকের ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরগণ এই উকিয়ো-এ ছবির কিছু ছাপা আবিষ্কার করেছিলেন এক দোকান থেকে এবং এ'দের প্রথাগত শিল্পধারার গণ্ডির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার মূলে ছিল এই উকিয়ো-এ চিত্র-ধারার প্রভাব। ক্লোদ মনের মাথায় হয়তো কোনদিনই সূর্যালোকের বিভিন্ন অবস্থায় 'রুয়ঁ' কাথেড্রাল'-কে বার বার আঁকার খেয়াল চাপতো না যদি না তিনি হকুসাই-এর একই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন চিত্ররূপ দেখতে পেতেন। আবার হিরোসিজের ছবি থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মার্কিন শিল্পী হুইসলার। হিরোসিজের সান্ধ্য নাগরিক দৃশ্যগুলির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে হুইসলারের ছবিতে।

যে দু শ' বছরের ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল সেই দু শ' বছর ধরেই জাপান-এ উকিয়ো-এ চিত্রধারা প্রচলিত ছিল। তার পর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে পড়ে জাপানী চিত্রধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে এগিয়ে গেছে। বিশেষভাবে কোনও ছবির বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল না কারণ এ ১০০টি ছবিই প্রায় সমান আকর্ষণীয় ঠেকেছে আমার কাছে।

যাই হোক, এ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ইউনেসকো অবশ্যই জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

ঢেউ : হকুসাই

॥ ৯ ॥

হাতটা কাঁপছিল। কলমটাকে শক্ত করে ধরতে গিয়ে মনে হল, সব অসাড় হয়ে গেছে, বরফে হাত রেখে বসে থাকলে যেমন হয়। ঘামে ভিজে গেছে। বুকটা কেমন এক উত্তেজনায় ধক্ ধক্ করছিল। কিসের আঁচ লেগে চোখ যেন জ্বালা করছে, গরম। নিশ্বাসও উষ্ণ।

তবু কাঁপা হাতেই বড় বড় করে সইটা করে ফেলল ও; বাসনা সেন। ইংরিজীতেই। অক্ষরগুলো কেঁপে অসম হয়ে রইল। থাকুক। একটি পলক সেই কাগজটির দিকে চেয়ে থাকল বাসনা, নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে। তারপর আস্তে আস্তে কলমটা টেবিলে নামিয়ে রাখলে।

একটি কী দুটিবার চোখ তুলেছে বাসনা সারাক্ষণে। নয়তো মুখ নীচু করেই বসে। কাঠের পার্টিশান দেওয়া এই ছোট্ট ঘরে কে আছে, কারা আছে তা দেখবার যেন দরকার নেই। সত্যিই নেই। কাউকেই চেনে না বাসনা, এক অমলেন্দু ছাড়া। কিন্তু সেই অমলেন্দুর দিকে তাকাতেও পারছে না বাসনা। অদ্ভুত এক সঙ্কোচ। বাসনা জড়সড় হয়ে বসে। অমলেন্দু বাদে আর চারজোড়া চোখ যেন দেখছে, হাসছে, ঠোঁট টিপে টিপে, এবং ভাবছে, ভাবাই স্বাভাবিক—এই মেয়ে, বাসনা সেন যা করল, হ্যাঁ তা একটা কীর্তিই বৈকি! বিধবা একে বলা যায় না, বেহায়া-বিধবা, কাঁচা বয়সের জ্বালায় জ্বলছিল, আর তারপর যা হয়—প্রেমেই পড়েছিল অমলেন্দুর সঙ্গে। লুকিয়ে লুকিয়ে কত রঙ্গই করেছে। এখন চোরের মতন দেখো, ওয়েলিংটনের এই কাঠের পার্টিশান দেওয়া ছোট্ট এক ফালি ঘরে তার বৈধব্যকে খস্ খস্ কলমের সইয়ে আর বিড়বিড় মুখের কথায়ঃ (আমি বাসনা সেন শ্রীঅমলেন্দু মিত্রকে আজ থেকে বৈধ স্বামীরূপে গ্রহণ করিলাম—) বাসি কাপড়ের মতন আড়ালে খুলে ফেলে দিলে।

শপথ করতে গিয়ে গলা যেন আর ফুটছিল না। নেশার ঘোরে কোনরকমে ঠোঁট নেড়ে সাপ চলার সুরে কথাগুলো আওড়ে গেল বাসনা। কিন্তু মনে মনে একবার থেমেছিল। বৈধ স্বামী! স্বামী...

আর এক স্বামী, এক ফোঁটা বৃষ্টির মতন টুপ্ করে যেন চোখের পাতায় পড়ে একটু বুঝি ভিজিয়ে দিলে, অস্পষ্ট করে তুলল দৃষ্টি। বাসনা খুব অস্পষ্ট, ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মতন ফিকে খাপছাড়াভাবে দেখছিল—পরিমলকে, সামনে বসে, গায়ে সাদা পাতলা চাদর, খালি গা, হাতে বাঁধা হলুদ সুতো... হাল্কা দুটি ভুরুর নীচে অত্যন্ত নিরীহ লজ্জাভরা দুটি চোখ নিয়ে বসে আছে।

...বৈধ স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিলাম। হ্যাঁ, কথাটা—ঠোঁট বেঁকিয়ে কাঠের মত শক্ত করে শেষ করে ফেলল বাসনা। কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছিল।

মনে হচ্ছিল বাসনা ঘুমের মধ্যেই বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুম চোখেই নিশির ডাকে কোথাও চলে এসেছে। এখানে সব অন্ধকার, আবছা। বাতাস নেই, আলো নেই। পুকুর পাড়ের স্যাঁতসেঁতে অনুভূতি, কতকগুলো ঝিঁঝিঁ ডাকছে কানের কাছে, গাছ পাতা লতায় ফিস্ ফিস্। খস্ খস্।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার একটা শব্দ হল। চমকে উঠল বাসনা। বুকটা আবার ধক্ ধক্ করে উঠল।

ভদ্রলোক হাসছেন। নমস্কার করলেন। এবং বললেন—।

কী বললেন বাসনার কানে গেল না। আড়ষ্ট হাতে বাসনাও প্রতিনমস্কার করলে।

তারপর বাইরে। সেই তিনজন। এরা কে—? বাসনা চেনে না। অমলেন্দুর বন্ধু, পরিচিত সব। সিঁড়ি নামতে নামতে সিগারেট ধরাল। কথা বলছিল হেসে। তরল সুরে।

ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছিল সিঁড়ির। বাসনার পা কাঁপছিল, ভর পাচ্ছিল না।

কোথায় নামছে বাসনা, কতটা নেমে এসেছে, কোথায় নেমে যাচ্ছে?

রাস্তায়।

'আমরা যাই অমলেন্দু, তুমি ট্যাক্সি নাও। উইশ ইউ বোথ্ এ ভেরী ভেরী হ্যাপি কন্‌জুগাল লাইফ!' বাসনা তাকাল, একজন বলছে, সেই তিনজনের একজন। এবার বাসনার দিকে চাইল, হাসল একটু, 'পরে আলাপ হবে আপনার সঙ্গে, বৌদি। এই তিন নাপিতের পাওনাটা কিন্তু থেকেই গেল। পরে আদায় করে নেবো। নমস্কার।'

হাত তুলে তুলে বাসনাকে তিনটি নমস্কার করতে হল। দম দেওয়া পুতুলের মতনই। মুখের কোথাও একটু হাসি ফুটল না, রেখা কাঁপল না।

ট্যাক্সিতে এক পাশ ঘেঁষে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল বাসনা। ভীষণ অন্যমনস্ক।

সিগারেট ধরাল অমলেন্দু। কী যেন বললে একটা, বলে তাকাল বাসনার দিকে। কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

হাত বাড়িয়ে বাসনার গা ছুঁয়ে যেন তাকে জাগাল অমলেন্দু, 'কি ব্যাপার, চুপচাপ যে!'

অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে বাসনা যেন নিশির ঘোর কেটে জেগে উঠছিল।

'ভয় হচ্ছে?' অমলেন্দু বললে আবার হাসিমুখে।

'ভয়!' মাথা নাড়ল বাসনা, 'না।'

'লজ্জা?' অমলেন্দু একটু সরে এল।

'লজ্জা' ঠোঁটে দাঁত ছুঁইয়ে ফিস ফিস গলায় জবাব দিলে বাসনা, 'লজ্জা হবে কেন?'

'তবে—?'

'কি?'

'একেবারে চুপচাপ যে! মনে হচ্ছে তুমি যেন মনমরা হয়ে রয়েছ।'

'পাগল!' বাসনা একটু হাসবার চেষ্টা করলে। অমলেন্দুর হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়ে, হঠাৎ কী যেন খেয়াল হল, আস্তে করে নিজের হাতখানা রাখল ওর হাতের ওপর।

'কি ভাবছো?' শুধলো অমলেন্দু একটু থেমে।

কি ভাবছে বাসনা, সেটা এখন—বিকেল চারটের পর আর বলা যায় না। এখন আমার বৈধ স্বামী, বাসনা যেন মনে মনে নিজেকে এবং অমলেন্দুকে ভেঙচি কেটে বলছিল, এখন আমার বৈধ স্বামী তুমি—অমলেন্দু মিত্র। আর আমি বাসনা সেন—পরিমল সেনের বিধবা স্ত্রী—অক্টোবরের তেইশে বিকেল চারটের পর বাসনা মিত্র হয়ে গেছি।

তোমার স্ত্রী হওয়ার পর আমার আর ভাববার কি থাকতে পারে? আমি যদি এখন বলি যে, আমি—হ্যাঁ আমি তেইশে অক্টোবরের বিকেল চারটের পর যে বাসনা মিত্র হয়েছে—সেই মেয়ে বাসনা সেনকে ভাবছে, এবং পরিমলকে, তুমি কি খুশী হবে? হবে না—। নিশ্চয় নয়। পরিমলও হতো না, হয়তো হয়নি, যদি ধরে নেওয়া যায় কোনো সূক্ষ্ম বায়বীয় অস্তিত্ব নিয়ে সে বেঁচে থাকে, বেঁচে ছিল, বেঁচে আছে এখনও।

বাসনা মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল। হুস্ করে একটা বাস পেরিয়ে গেল। ট্রামের ঠং ঠং ঘণ্টা বাজছে। রাস্তায় লোক। জুতোর দোকান। একটা কুলি ঝুড়ির মাথায় লাল রঙের এক ট্রাই সাইকেল চাপিয়ে চলেছে। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়াও বুঝি বয়ে গেল।

পরিমল আমাকে ভালবাসত। সাধারণত স্বামীরা স্ত্রীকে যেমন ভালবাসে। হ্যাঁ, তেমনি। আমরা ঘর করেছি এক সঙ্গে। এক বিছানায় শুয়েছি। একই বালিশে মাথা দিয়ে। মুখে মাথায় এক হয়ে। গায়ে গায়ে তফাৎ থেকেও না-থেকে। আর তার কাছেও আমার লজ্জা ছিল না। কোনখানেই নয়। আমার সব তারই ছিল। যদি বলো তবে, তুমি ভাবতে পারো তার হাতে তার চোখে আমি মনে-শরীরে নগ্নই ছিলাম।

পরিমলের জন্যে আমার সময়কে আমি একদিন খরচ করেছি কত সুখে। ওর ঘুম ভাঙিয়েছি সকালে, ওর জন্যে হাত পুড়িয়েছি উনুনে, শাড়ি জামায় সেজেছি ওর চোখে যাতে ভালো লাগে। তার জন্যে আমি ভাবতাম। বাধ্য স্ত্রী, বৈধ স্ত্রীর মতনই এ-সব ভাবনা, স্বামীর

সুখ-দুঃখের ভাবনা ভাবা আমার কর্তব্য ছিল। এবং আমি ভেবেছি। পরিমলের মুখ কালো দেখলে ভেবেছি কি হয়েছে, কি হয়েছে ওর, শরীর খারাপ হ'লে ভেবেছি—অসুখটা তাড়াতাড়ি সেরে যাক।

যাকে ভালোবেসেছিলাম—সে মরে গেলে কেঁদেছি বৈকি। আঘাত পেয়েছি। দুঃখ বেজেছে। কতদিন মনে হয়েছে আমার সর্বস্ব পরিমল তার চিতার ছাইয়ের সঙ্গে পুড়িয়ে উড়িয়ে বিলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। মনে হতো লোকটা কী নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর। এতো যন্ত্রণা কেন সে দিল আমাকে।

তারপর এখন সেই পরিমলকে আমি ভাবছি তোমার স্ত্রী হয়ে। বৈধ স্ত্রীদের এ-সব ভাবার অধিকার অবশ্য নেই। তবু ভাবছি। যেমন তোমার কথাও আমায় ভাবতে হয়েছে বাসনা সেন থেকেও।

অমলেন্দু কথা বলছিল। বাসনা যেন চমকে উঠে চাইল।

'এতোদিন তবু ছিলাম একরকম। এখন থেকে খুবই খারাপ লাগবে।' অমলেন্দু বলছিল।

'কেন?' বাসনা চোখ তুলে তাকাল।

'তুমি এক জায়গায়, আমি অন্য জায়গায়।' অমলেন্দু হাসবার চেষ্টা করলে।

'ও!' বাসনার বুকের মধ্যে কেমন একটু শির শির করে গেল। অমলেন্দুর চোখে চোখে চেয়ে, একটু চুপ করে থেকে মৃদু গলায় বললে, 'আমারও ভাল লাগবে না। কিন্তু আর ক'দিনই বা। দিন চারেক।'

'কমলা বৌদিরা সত্যিই শুক্রবার ফিরবে তো?'

'তাই তো লিখেছে।'

'লিখেছে, কিন্তু যদি না এসে পেঁছোয়!' অমলেন্দু সুস্থির হতে পারছিল না।

'না এলেই বা।' বাসনা এবার, প্রথম ঠোঁট মেলে হাসল, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আর কিসের ভয় তোমার।'

'ভয় না। তবু—!' অমলেন্দু বাসনার হাত তুলে নিল, 'আমি ঘর ভাড়া করেছি জানো তো।'

'জানি। বলেছো আগেই।'

'কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনেছি।'

'না কি!' বাসনা বুক চেপে নিশ্বাস ফেলল।

'হ্যাঁ, বিছানা, বাসনপত্র—'

'খুব সংসারী তো তুমি।'

'কয়েকটা শাড়ি কিনেছি তোমার জন্যে। নিজের চোখে যে রঙ ভালো লেগেছে তাই দেখে দেখে।'

'শাড়ি।' বাসনার গলার কাছে খানিকটা বাতাস হঠাৎ যেন মুঠোর মতন শক্ত হয়ে আটকে গেল।

উজ্জ্বল গাছপাতা-রং শাড়ি পরিয়ে চেহারাটা যেন মনে মনে একবার দেখলে বাসনা। তারপর খুব সহজেই তার মনে এল, এরপর অমলেন্দু চাইবে বাসনার এই সাদা সিঁথিতে সিদুঁর উঠুক, কপালে টিপ, পায়ে আলতা। আরও হয়তো অনেক, অনেক কিছুই।

এমন নয় যে অমলেন্দু চাইলেই বাসনাকে এই বয়সে আবার নতুন করে টিপ্ আলতা পরতেই হবে। কোনো ছুতোয় এসব হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু সিঁদুর!

বাসনার শুকনো, সাদা, নরুনের আগার মত সরু সিঁথিটা কিরকির করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন অনেক ধুলো-বালি ময়লায় সিঁথিটাই হারিয়ে গেছে।

আলগোছে হাতটা মাথায় আস্তে আস্তে টেনে বুলিয়ে নিল বাসনা। নিয়ে কপাল ধরে থাকল।

'কি, মাথা ধরেছে?' অমলেন্দু কোমল স্বরে শুধালো।

মাথা হেলাল বাসনা। হ্যাঁ, ধরেছে। যদিও মাথা ঠিক ধরেনি, ঝিম ঝিম করছিল।

'তুমি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছো।' খানিক থেমে বললে অমলেন্দু, 'এ-সব হাঙ্গামা একটু সহ্য করতে হবে বৈকি! তবু তো, রেজিস্ট্রির ব্যাপারটা কতো ইজি!' অমলেন্দু একটু হাসল।

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল। 'কটা বেজেছে?' শুধলো বাসনা। সুধাময়ের অফিস থেকে ফেরার কথা বার বার মনে পড়ছিল।

'প্রায় সোয়া পাঁচ।' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললে অমলেন্দু।

ততক্ষণে সদরে এসে দাঁড়িয়েছে বাসনা। ঘাড় ঘুরিয়ে বললে অমলেন্দুকে, 'তুমি এসো, আমি যাচ্ছি।'

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সন্ধ্যেটা কেটে গেল। রাত হল। অমলেন্দু চলে গেছে। সুধাময় তাসের আড্ডা থেকে ফিরে এসেছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করলে। বাসনা সারাটা সন্ধ্যে এবং রাত জোর করে নিজেকে রান্নাঘরেই আটকে রাখল। অমলেন্দু অনেকক্ষণ একা একা বসেছিল। কদাচিৎ বাসনা ওপরে উঠেছে। আজকের দিনে এতোটা দূরে দূরে থাকা অমলেন্দুর বোধ হয় ভাল লাগে নি। প্রতিবারই সে বলেছে, বসোনা একটু, এতো কি তোমার রান্নাঘরে কাজ?

'বই কি, তোমার গা ঘেঁষে বসে এখন গল্প করি!' জোর করে বিচিত্র এক হাসি ফুটিয়ে কটাক্ষ করেছে বাসনা। যেন নিছক এক লজ্জায় সে সরে সরে পালিয়ে পালিয়ে থাকছে।

অমলেন্দুকে আজ যতোই দেখেছে বাসনা, ততই মনে হয়েছে, এই ক' ঘণ্টার মধ্যেই লোকটা যেন কত বদলে গেছে। এখন আর বাসনা যেন অন্য কেউ নয়, অন্য কোনো মেয়ে। অমলেন্দু তার নিজের সম্পর্কের চোখ দিয়েই দেখতে শুরু করে দিয়েছে বাসনাকে। এবং সেই হিসেবে তার দাবী আর অধিকারটাও ক্রমশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। জালের মতন। বাসনাও আস্তে আস্তে সেই জালের তলায় এসে পড়ছে, এসে পড়েছে।

যাবার সময় অমলেন্দু আড়ালে পেয়ে বাসনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। ওর চোখে এবং ঠোঁটে তখন আর এক ভীষণ লোভ ছিল। হ্যাঁ, বাসনা গোড়াতেই তা বুঝতে পেরেছিল। নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টাও করেছে বাসনা। পারেনি। লোকটা এমন শক্ত হাতে তাকে আঁকড়ে ছিল। অবশ্য অমলেন্দু যা চাইছিল, তাও পায়নি। সব বুঝে, বুঝতে পেরে—মুখটা আর কিছুতেই তুলতে পারেনি বাসনা। ঘাড় মুখ যেন গুঁজেই ছিল কাঠ হয়ে। অমলেন্দু ভেবেছে, এও আর এক লজ্জা কী সংকোচ। বাসরঘর কী ফুলশয্যার দিন যে ধরণের লজ্জা কিছুক্ষণ মানায়, সুন্দর আর মিষ্টি মনে হয়।

কিন্তু, এ লজ্জা বা সঙ্কোচ কোনোটাই নয়—বাসনা ভাবছিল কথাটা এখন মনে পড়ে যাওয়ায়। বরং বলা যায়, কেমন এক বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, অসাড়ত্ব। বাস্তবিক বাসনা তখন সাড়া দিতে পারছিল না। বিশ্রী লাগছিল, অস্বস্তিতে গা-মন ঘিন ঘিন করছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটা নিছক একটা সইয়ের দাবিতে যা খুশি তাই জোর করে নিতে চাইছে।

শেষ পর্যন্ত অমলেন্দু যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েই ওকে ছেড়ে দিয়েছে। আর তখন, ঠিক তখনই—বাসনা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু বলতে হয়েছে, 'দু'দিন সবুর সইছে না আর।'

বেশ বড় মতন এক নিশ্বাস ফেলে অমলেন্দু জবাব দিল, 'তোমারই তো সবুর সইছিল না। এখন আর আমার দোষ কি!' কথাটা বলে হাসবার চেষ্টাই করেছিল অমলেন্দু, যদিও হাসতে পারেনি ঠিক।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাসনা একে একে নীচের বাতি নিভলো। সদরে তালা দিল। চাবিটা হাতে নিয়ে উঠে এল দোতলায়। সুধাময়ের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে! হয়তো ঘুমোবার আগে বই টই কিছু পড়ছে সুধাময়। বীথির ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

একটু দাঁড়াল বাসনা। বীথির ঘরের সামনে। তাকাল। মনে হল, বীথি যেন আড়াল থেকে দেখছে। সবই দেখছে।

অকারণেই ঠোঁট উল্টে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল বাসনা। সরে গেল ঘরের সামনে থেকে—যেতে যেতে বললে, আমি তো আগেই বলেছিলুম, বীথি।

বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল বাসনা। আলো জ্বালল। টাইমপিস ঘড়িটা দেখল। এগারোটা বাজে প্রায়।

একটুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাসনা, ছিটকিনি তুলে। দিয়ে দাঁড়াল। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কিংবা কিছুই হয়ত দেখছিল না—আবছা, অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দেওয়াল, বিছানা, টেবিলে চোখ রেখে রেখে কিছু ভাবছিল।

খানিকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বাতি নিভিয়ে দিল বাসনা। আস্তে পায়ে এগিয়ে এসে আলনার কাছে দাঁড়াল।

কাপড় বদলে বিছানায় এসে শুলো। জানলা দিয়ে এবার বেশ ঠাণ্ডা আসছে। গলাটা খুস্‌খুস্ করছিল বাসনার। হাত বাড়িয়ে জানালাটা একটু ভেজিয়ে দিল।

না, চোখের পাতা বুজলেও ঘুম আসছিল না। ঘুম যে আসবে না এখন, বাসনা যেন তা জানত। না আসুক ঘুম, সারাদিন পরে এতক্ষণে নিজের চার দেওয়ালের মধ্যে একেবারে একা হতে পেরেছে যে, এতেই স্বস্তি পাচ্ছিল বাসনা। এবং এই ঘন অন্ধকার তার ভাল লাগছিল। এখন এই অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেলেছে। নিজেকে নিজেও দেখতে পাচ্ছে না বাসনা। আর ঠিক এ-সময়, এই অবসরে, কেউ যখন দেখছে না, দেখতে পাবে না—তখন মনটাকে যতটা পার, পারা সম্ভব—এলিয়ে ছড়িয়ে, পেঁজা তুলোর মত বিছিয়ে ভাবতে পারা যায়।

বাসনাও ভাবছিল। কী যে হয়ে গেল হুস্ করে। এখনো যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না। কিংবা বিশ্বাস করলেও মনে মনে ঠিক সয়ে নিতে পারা যাচ্ছে না। এমনি হয়েছিল মনের অবস্থা পরিমল যখন হঠাৎ দু'দিনের অদ্ভুত এক অসুখে চোখের পাতা বন্ধ করে নিল চিরকালের মতন। সহজ, সুস্থ মানুষ। জ্বর নিয়ে এল অফিস থেকে দুপুরে। চোখ জবা ফুলের মত টকটকে লাল। কাঁপতে কাঁপতে এসে বিছানায় শুলো। তার গা কাঁপছিল, ঠোঁট কাঁপছিল, হাত পা থর থর করছিল। সেই যে শুলো, আর উঠল না—এমন কি উঠে বিছানায় পর্যন্ত বসেনি। হু হু করে জ্বর বেড়ে চলল। ডাক্তার, ওষুধ, টেলিগ্রাম। কমলা ছুটে গেল। সবে তার বিয়ে হয়েছে তখন। সুধাময়ও এল।

পরিমল কত নিঃসাড়ে চলে গেল। বাসনা দেখল, শুনল, বুঝল—তবু বিশ্বাস করতে পারছিল না। ঘর, বিছানা শূন্য হয়ে গেল, বাসনা থান পরল—অবিশ্বাসের কোনো কারণ ছিল না, তবু যেন এই সত্য সওয়া যায় না। বাসনা সইতে পারছিল না। মনে হয়েছে তখন, পরিমল এখুনি পাশের ঘর থেকে ডাক দেবে, কিংবা হুট্ করে ঘরে এসে দাঁড়াবে।

ধীরে ধীরে সব সয়ে নিল বাসনা। পরিমল যে আর কখনোই আসবে না—একদিন তাও এতো স্পষ্ট করে বুঝল, যার পর পরিমলকে শুধুই একটা স্মৃতির মতন মনে হয়েছে, ফিকে কোনো গন্ধের মতন, এই আছে—তারপর নেই।

তারপর আর কি? পরিমলের ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যে প্রণাম করেছে বাসনা গলায় কাপড় জড়িয়ে। একটা অভ্যাসের মতন হয়ে

গিয়েছিল এই প্রণাম। মনে মনে তখন যা বলত, যা বলেছে তা, বলতে কি, কোনো আশায়, কোনো দৃঢ় বিশ্বাসে, কোনো আকর্ষণে বলেনি। হ্যাঁ, যেমন দিন যেমন রাত্রি, যেমন সূর্য আর আকাশ, চাঁদ আর তারা—আর এই বাতাস জল—সব আছে সব তুমি দেখছ—সবই স্বাভাবিক, নিয়মিত, অভ্যস্থ—তেমনি পরিমল তার কাছে একটি অভ্যস্ত, নিয়মিত, স্বাভাবিক আত্মীয় হয়ে ছিল যার স্বতন্ত্র কোনো আকর্ষণ, অনুরাগ, স্পর্শ কী অনুভূতি পাওয়া যেত না। বাস্তবিকই যেত না। বাসনা চাইত, এবং বলত, তুমি আমার সর্বস্ব হয়ে আছ—আমার দিনে রাত্রে, স্বপ্নে ঘুমে, শরীরে মনে। কিন্তু সত্যিই কি পরিমল তাই ছিল, না থাকতে পারে?

তবে আর মৃত্যু কি? যদি জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে তফাৎ না থাকে! তুমি কি আমায় ডাকতে পরিমল নাম ধরে? তুমি কি কখনো চুপি পায়ে এসে আমার কানে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়েছো? না, অফিস থেকে কোনো সন্ধ্যেতে ফিরে এসে ডাক দিয়ে বলেছো, তাড়াতাড়ি চা দাও তো, বড় খিদে পেয়ে গেছে আজ। যেমন সুধাময় বলে, সুধাময় আসে। সেই সুধাময়ের মতন বা আর কারো, অন্য কারুর মতন।

পরিমল, আমি এই ঘরে একলা—এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত বর্ষা, শরৎ, শীত কাটালাম। কত বসন্ত। কতদিন সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে, কত রাত সারাক্ষণ আকাশে চাঁদ জ্বলে জ্বলে ভোরের আলোয় মুছে গেল, আমি হাত বাড়িয়ে এই বিছানায় একটা খসখসে চাদরই শুধু ছুঁয়েছি। তুমি তো আসো নি। কোথাও তুমি ছিলে না।

এই না-থাকাই মৃত্যু। কিন্তু আমি ছিলাম—আমি আছি। তুমি কি জানো না, এই থাকা, এই জীবন নিয়ে আমি বেঁচে রয়েছি। আর শুধু কি নিশ্বাস নেওয়ার মধ্যেই জীবন, না আরও অনেক, অনেক কিছু জড়িয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে থাকাই জীবন!

তবু দেখো, আজো, এখনও অমলেন্দুকে বৈধ স্বামী হিসেবে স্বীকার করেও তোমার কথা ভাবছি, শুধু তোমার কথাই। সারা সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে তোমাকেই শুধু ভাবলাম। অমলেন্দুকে কি ভেবেছি? না। ওর গা পর্যন্ত আমি ছুঁই নি ইচ্ছে করে। ওকে এড়িয়ে গিয়েছি, অবহেলাও করেছি। এখনও তোমার কথা ভাবছি, পরেও ভাববো। কিন্তু তুমি শুধু সেই ভাবনাতেই থাকবে, ফিকে গন্ধের মতন।

অমলেন্দু যাই হোক্—তবু এখন তার এবং আমার স্বার্থ এক হয়ে গেছে। এই ছেলে, কিংবা যদি মেয়ে হয়—তবে মেয়ের সে অর্ধেক, আমি অর্ধেক। আমরা সম্পূর্ণ হতে চাইছিলাম। আজ অন্তত সেদিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ হয়েছি।

বাসনা বালিশে মুখ গুঁজে নিল হঠাৎ। মনে হল, পরিমল যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, বাসনা মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর মুখ গুঁজে নিশ্বাস রোধ করে ফাঁকা গলায় বললে, তুমি যাও, তুমি যাও।

॥ ১০ ॥

শুক্রবার ভোরের ট্রেনেই কমলারা এসে পেঁছিল। সুধাময় গিয়েছিল স্টেশনে। কোন্ ভোরেই উঠেছে বাসনা। সারারাত ঘুম হয়নি। চোখে কালি পড়েছিল, মুখটাও শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ভোরে উঠেই আয়নায় নিজের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে বাসনা। আর দেখে ভয়ে আরও আড়ষ্ট, কাঁটা হয়ে গেছে।

অমলেন্দুকে চা করে খাইয়ে স্টেশনে পাঠিয়েই কলঘরে গিয়ে ঢুকেছিল বাসনা। এই কালিমা, সারা শরীর জুড়ে ভয় আর উদ্বিগ্নতার এই স্পষ্ট লক্ষণ ওকে মুছে ফেলতেই হবে কমলারা বাড়ি ঢোকার আগে।

শীত করছিল। তবু সাবান ঘষে ঘষে মুখ থেকে যেন এ-ক'দিনের সমস্ত কালো তুলে ফেলতে চায় বাসনা—অন্তত একটা দিনের জন্য। কমলার কাছে কিছুতেই ধরা পড়তে দেবে না নিজেকে সামনা-সামনি। শীত করছিল, বুক ব্যথা করছিল, কোমর পেট যেন ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাচ্ছিল—তবু সারা গায়ে সাবান মেখে, মাথায় তেল দিয়ে স্নান করলো বাসনা অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ঘরে এসে কাপড় বদলালো। মুখে খানিক পাউডার ছিটলো। চোখের কোলে কোলে পাউডার দিয়ে কালো মুছল।

পাউডারের কৌটোটা বাক্সে লুকিয়ে ফেলল বাসনা। কমলারা যাবার পর বের করেছিল। ওরা আসতে আবার লুকোলো। আরও কিছু টুকিটাকি—যা কমলার চোখে পড়লে অন্য কিছু মনে হতে পারত।

কমলাদের পথ চেয়ে দুরু দুরু বুকে তৈরি থাকল বাসনা। ঠাণ্ডাটা লেগে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। বার কয়ক হাঁচল। চোখ করকর করছিল এবং খুসখুস করছিল গলা।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই বাসনার দুটো পা হঠাৎ পাথর হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এসে ধক্ ধক্ করতে লাগল। সারা গা কাঁপছিল এবং হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, জিব ঠোঁট শুকনো।

কোনো রকমে সদরে এসে দাঁড়াল বাসনা।

কমলারা ততক্ষণে নেমে পড়েছে। সুধাময় মালপত্র নামাচ্ছে। বীথি এগিয়ে আসছিল, ডান হাতে ঝোলান বেতের হাল্কা টুকরি। কমলার ছেলের হাত ধরেছে অন্য হাতে। কমলার কোলে মিণ্টু।

কাছে আসতেই হাত বাড়িয়ে কমলার কোল থেকে মিণ্টুকে টুপ্ করে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরল বাসনা। যেন

কোনো রকম একটা সহায়-সম্বল জুটে গেছে—অন্তত এই ফাঁকা ফাঁপা ভীরু বুকের স্পন্দনকে সে উপস্থিত সামলাতে পারবে।

'সাবধানে এনেছিস তো গাড়িতে মেয়েটাকে—!' বাসনা বললে বোনের প্রায় গা-ঘেঁষে এগুতে এগুতে।

মাথা হেলাল কমলা। ঢাকাঢুকি দিয়ে সাবধানেই এনেছে। বলছিল ও, 'কী শীত ছোড়দি, শুধুই তো শুরু, কিন্তু এর মধ্যেই যেন মাঘের কন্‌কনানি।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কমলাই বললে আবার, 'গরম জামা-কাপড় দু'চার-খানা নিয়ে গিয়েছিলাম, কে জানতো এতো শীত পড়বে। পালাই পালাই করছিলাম কবে থেকেই। বীথির জন্যেই যা—নয়তো চলে আসতুম আমি। অমলঠাকুরপোর শেষ পর্যন্ত হলো কি ছোড়দি, গেল না যে!'

'কী জানি!' বাসনা ঘাড় হেঁট করে ছোট্ট জবাব দিল, মিণ্টুর মুখে মুখ ঠেকিয়ে আড়াল করতে চাইছিল নিজের ফ্যাকাশে চেহারা।

কথাটা পাল্টাতেই যেন হঠাৎ বীথির দিকে আড়চোখে চেয়ে বললে বাসনা, 'কই তোর শরীর তো তেমন সারে নি বীথি!'

'সারে নি মানে। আমি তিন দিন অন্তর মাল-গুদোমে গিয়ে ওজন নিতাম যে, ছোড়দি—' বীথি বেতের টুকরিটা নাচের ভঙ্গিতে হাত বেঁকিয়ে কোমর-পিঠের মাঝ পর্যন্ত তুলতে তুলতে হাসল, 'ছ' সের ওজন বেড়েছে আমার, তা জান!' বেণী দুলিয়ে খিল খিল করে হাসল বীথি।

কমলার ঘরে ঢুকে কেমন এক খাপ-ছাড়াভাবে কেউ বসল, কেউ দাঁড়িয়ে থাকল, বীথি টুকরিটা নামিয়ে রেখে বিছানার ওপর এলিয়ে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিল।

কমলার ছেলে মাসীর হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে। টুক্ টুক্ করে পাঁচমেশালি কথা বলছিল। মিণ্টুকে বিছানায় নামিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল বাসনা।

'তোমার শরীর কেমন, ছোড়দি?' কমলা শুধলো এতোক্ষণে বোনের দিকে চেয়ে।

'ভালোই!' জানলার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে জবাব দিল বাসনা বুকটা কাঁপছিল আবার।

একটু চুপচাপ। বাসনাই বললে, 'তোরা একটু জিরো, আমি চা করে আনি।' এগিয়ে যাচ্ছিল কমলা, দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, ভাবল কী-একটা বলবে। কিন্তু বলল না, একটু দাঁড়িয়ে, একবার পিছু তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সকাল দুপুর কাটল। বাসনা যা ভেবেছিল তা নয়। বাসনাকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার অবসর নেই ওদের এখন। কমলার নিজের কথা, বেড়ানোর গল্প, বীথির নানান কীর্তি-কাহিনী এতো বেশি জমা হয়েছিল যে, সকাল দুপুর ওরা দুজনে বক্‌বক্ করেও শেষ করতে পারছিল না। আর এতো হাসিই বা কি করে জমে ছিল, জমে থাকে—ভাবছিল বাসনা—মনদ-ভাজে হাসছে তো হাসছেই, গল্পেরও শেষ নেই, হাসিরও।

এ-সব গল্প কী হাসির মধ্যে গা ঢেলে মন ডুবিয়ে বসে থাকার অবস্থা বাসনার নয়। তার অন্য ভাবনা আছে। কিন্তু কমলা-বীথির গল্প-হাসির কাছ থেকে ও সরে যেতে পারে না। বরং এই যে ওরা দুটিতে নিজেদের কথা নিয়েই মশগুল রয়েছে, এতেই বাসনার লাভ।

দুপুরে খাওয়ার পর থেকেই বাসনার শরীরটা খারাপ লাগছিল। এমনিতেই তো ঠান্ডা লেগে গেছে ভোরে স্নান করতে গিয়ে। সর্দি চেপে বসছিল। গলা ব্যথা করছে। চোখ জ্বলছে। একটু যেন জ্বর জ্বর। খাওয়া-দাওয়ার পর তলপেটটাও হঠাৎ কেমন যেন মুচড়ে কনকন করে গেল। বমি-বমি লাগছিল। কোনো রকমে তা সামলে নিল বাসনা।

শীতের দুপুর। দেখতে দেখতে দুটো বেজে গেল। কমলাদের ঘুম পাচ্ছিল, সারা রাত ট্রেনের ধকল গেছে। বীথি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কমলারও চোখের পাতা বুজে আসছিল। বাসনা উঠে গেল এই ফাঁকে।

নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল বাসনা। শরীরটা সত্যিই বড় খারাপ লাগছে।

কেমন একটা বিশ্রী রাগ হচ্ছিল বাসনার নিজের ওপরেই। আজকের দিনেই কি-না যতো গণ্ডগোল, বাধা-বিঘ্ন। কি ক্ষতি হতো আর একটা দিন সবুর করে শরীরটা যদি একেবারে বিছানাতেই এলিয়ে পড়ত। কি যেত আসত তবে!

একটায় হল না, পর পর দুটো বালিশ তাল পাকিয়ে পেটের মধ্যে আঁকড়ে চেপে ধরে চোখ বুজে পড়ে থাকল বাসনা বিছানায়। একবার ভাবল, এ-সব কিছু নয়, এই শরীর খারাপ। আসলে হয়তো এটা ভয় আর দুশ্চিন্তার জন্যেই হচ্ছে। হ্যাঁ, তা হওয়া স্বাভাবিক।

চোখ বন্ধ করে কেমন এক ঘোরের মধ্যেই ভাবছিল বাসনা, কাল এতোক্ষণ কোথায় ও?

কোথায় যে, বাসনা তা জানে না। তবে এই কলকাতারই আর এক পাড়ায়। নিরিবিলি ফাঁকা ঘরে। হয়তো সে-ঘরেও এমনি হলুদ রঙ রোদ এসে গেছে এতো-ক্ষণে, বাইরে ক'টি কাক চড়ুই উড়ছে, বসছে, দুপুর থমথম সময়, রাস্তা দিয়ে রিকশা চলেছে ঠুং ঠুং। আর ঘরে—সেই নতুন ঘরে বাসনা একা, একেবারেই একা। অমলেন্দু কি থাকবে এমন দুপুরে! থাকতেও পারে।

কেমন যে লাগবে সেই বাড়ি কে জানে! নতুন চুনের গন্ধ শুঁকেই হয়তো বাসনাকে সারা দুপুর কাটাতে হবে এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কমলাদের কথা ভেবে ভেবে, ফাঁকা ফাঁপা বুক বালিশে চেপে। চোখের জলে গাল ভিজিয়ে।

কমলারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারছে না—কি হবে আজ, আর খানিকক্ষণ, আর কয়েক ঘণ্টা পরে। বাসনা ভাবছিল। আজই এ-বাড়ি আমি ছেড়ে যাচ্ছি, কমলা ঃ বাসনা মনে মনে আকুল হয়ে বলতে চেষ্টা করছিল, আমি চললাম, কমলা। আজ। আজই। অমলেন্দুর সঙ্গে। তোর ঘর-দোর এতোকাল আগলে ছিলাম। এবার ভাই, তোর হাতে তুলে দিয়ে চললাম।

ছলছল করছিল বাসনার চোখ। বুকটা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। কী অসহ্য শূন্যতা! যেন সামনে এক দুরন্ত অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে, আর বাসনা সেই অন্ধকারে, অসহায়ের মত একা—একাই নেমে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিকেলে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছিল বাসনার। ইচ্ছে হচ্ছিল বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকে। চুপ করে। পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা, যেন করাত দিয়ে চিরছে কেউ। মাঝে মাঝে ব্যথাটা উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সারা গা গুলিয়ে বমি উঠতে চাইছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কলঘরে গিয়ে একবার বমিও করে এসেছে বাসনা। মাথাটা ভার, ঝিমঝিম করছে। চোখ যেন আর চাইতে পারছিল না। ওপর পা দুটো ভারে, ব্যথায় টনটন্ করছে। দাঁড়াতেও পারছে না বাসনা।

তবু দাঁত চেপে সব—সমস্ত সহ্য করে বাসনা বিকেলের চা-জলখাবার তৈরি করতে বসল। বীথি কাছে এসে বসল একবার। কী যে নিজের মনে বললে খানিক—বাসনা শুনতেই পেল না। কোনো কথা তার কানে যাচ্ছিল না।

অমলেন্দু এবার আসবে! বিকেল পড়ে এল…! ক'টা বেজেছে? বাসনা থেকে থেকে খালি ভাবছে। অমলেন্দুর আসার সময় হয়ে এল। এবং তাদের যাওয়ার।

প্রথম শীতের বিকেল পড়ে এল। আলো মুছল কখন। উঠোন ভরে ছায়া। ছায়া ঘন হচ্ছিল। সুধাময় ফিরল অফিস থেকে। কমলাদের কাপড় কাচা শেষ হয়ে কলঘর ফাঁকা হয়ে গেল। বাতি জ্বলল। রান্নাঘরের উনুনে আঁচ গনগনে হয়ে উঠেছে। টিকটিকিটা নেমে এসেছে দেওয়াল গড়িয়ে নীচে।

বাসনা হাঁটুতে মুখ নামিয়ে তরকারি কুটে চলেছে। আর যেন ও চোখ তুলবে না, তুলতে পারবে না।

বুকটা হঠাৎ কেঁপে গেল। ধক্ ধক্ করে উঠল। অমলেন্দু এসে গেছে।

বাসনা মুখ তুলল। টিকটিকিটা আলপিনের মতন চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আর পারছে না, সত্যিই পারছে না—বাসনা—ভীষণ এক যন্ত্রণা পেটের ক'টা নাড়িতে যেন জট পাকিয়ে গেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুকের হাড়ের খাঁজে খাঁজে পর্যন্ত সেই ব্যথা খুঁচিয়ে উঠেছে।

আস্তে আস্তে, কোনো রকমে দেওয়াল আর রেলিং ধরে ধরে বাসনা দোতলায় উঠে এল। কমলাদের ঘরে জটলা বসেছে। অমলেন্দুও সেখানে। খুব হাসছে। বিন্দুবিসর্গও ধরাছোঁয়ার উপায় নেই। কে বুঝবে, বুঝতে পারবে—লোকটা কেন এসেছে এ-বাড়িতে আজ।

বাসনার মনে হল এবার কমলাকে

ডেকে বলে, আমার মাথাটা বড় ধরেছে রে, সর্দিতে। একটু ঘরে গিয়ে শুলাম।

কিন্তু না, কমলাকে ডাকল না বাসনা। কাউকেই নয়। আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বাতিও জ্বালল না।

তারপর এক ফাঁকে কমলাই এল খোঁজ নিতে।

'সন্ধে বেলায় ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রয়েছো?' টুক্ করে বাতি জ্বালিয়ে দিল কমলা। তাকাল।

বাসনা তাকাতে পারছিল না। ভাঙা অস্পষ্ট গলায় বললে, 'ভীষণ মাথা ধরেছে। বাতিটা নিভিয়ে দে।

বাসনার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু সন্দেহ হল কমলার। কাছে এসে কপালে হাত দিল।

'একটু গরম গরম লাগছে। জ্বর-জ্বালা হবে নাকি!'

'না, কিছু না। সর্দির ম্যাজমেজে ভাব।'

'সাত সকালে বাসি জলে কি যে দরকার ছিল তোমার চান করার!' কমলা যেতে যেতে বলছিল, 'শুয়ে থাকো, উঠতে হবে না আর। আমরা রান্নাঘরে যাচ্ছি।' বাতি নিভিয়ে কমলা চলে গেল।

সারাটা বিছানায় লুটোপুটি খাচ্ছিল বাসনা। ব্যথাটা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। কেমন এক আচ্ছন্নতা নামছিল।

টুক্ করে বাতি জ্বলে উঠল আবার। বালিশ থেকে মুখ তুলে কোনো রকমে চাইল বাসনা। অমলেন্দু।

'কি হলো?' অমলেন্দু একটু কাছে এসে খুব আস্তে গলায় বললে।

'শরীরটা কেমন করছে।' আরও আস্তে গলায় বাসনা জবাব দিলে।

'ও কিছু না, নার্ভাসনেস!' অমলেন্দু আরও একটু সরে এল।

'ওরা কোথায়?'

'নীচে।'

'বীথি?'

'বীথিও নীচে গেছে!'

'সুধাময়—?'

'তাসের আড্ডায় চলে গেছে, অনেকক্ষণ।'

একটু চুপচাপ।

'আমি তৈরি হয়েই এসেছি!' অমলেন্দু বললো চাপা গলায়।

খানিকটা সময় নিয়ে জবাব দিল বাসনা, 'আজ থাক। কাল।'

'কাল?' অমলেন্দু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। অবাক চোখে।

'শরীরটা আজ বড্ড কেমন করছে। কি করে যাবো?'

'কতোক্ষণ আর?' অমলেন্দু জোর করবার চেষ্টা করছিল, 'আমি না হয় কমলা বৌদিকে কিছু একটা বলছি। কোনো অজুহাতে একবার বাড়ির বাইরে বেরুনো!'

'না, না। থাক। আজ থাক।' কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল বাসনার।

অমলেন্দু আরও একবার চেষ্টা করলে। বাসনা তবু মাথা নাড়ছিল। না, না, আজ নয়। আজ নয়।

'তবে থাক!' অগত্যা মনমরা হয়ে বললে অমলেন্দু, 'কিন্তু কি হলো তোমার হঠাৎ?'

'কী জানি!' বাসনা বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ল আবার।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অমলেন্দু বিছানার কাছে এসে খুব কোমল গলায় বললে, 'কিছু না। মনটা হয়তো খারাপ লাগছে খুব। ভয় করছে তোমার। চুপ-চাপ শুয়ে থাকো। সেরে যাবে। কাল আসবো। কাল আর ফিরিয়ে দিয়ো না।' আলগা হাতে একটিবার বাসনার মাথায় হাত রেখে অমলেন্দু চলে গেল। বাতি নিভিয়ে দিয়েই।

আবার অন্ধকার।

বাসনা কিছুই আর ভাবতে পারছিল না। কেমন যেন অসাড় হয়ে আসছে পা-হাত। মাঝে মাঝে একটা বরফ-ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে সারা গা দিয়ে। যন্ত্রণাটা সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে আর নামছে।

দাঁতে দাঁত চেপে, ঠোঁট কামড়ে, চোখ বুজে, হাত মুঠো করে, কুঁকড়ে, গা গুটিয়ে এই অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করবার চেষ্টা করছিল বাসনা। আর কেমন এক জ্বরের ঘোর নেমে আসছিল আস্তে আস্তে।

তখন বুঝি বেশ রাত। কমলা এল খেতে ডাকতে। আলো জ্বালিয়ে প্রথমটায় অতো বুঝতে পারে নি কমলা। একবার নয়, বার তিনেক ডাকল, ছোড়দি।

বাসনা একটুও নড়ল না। সারা বিছানার মধ্যে বালিশ চাদর লুটোপুটি করে হাত মুখ পেট দুমড়ে গুঁজে অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে শুয়ে রয়েছে। ঘুমিয়েই পড়েছে বোধ হয়।

বিছানার কাছে এগিয়ে এল কমলা। পা দুটো মাটির সঙ্গে জুড়ে গেল হঠাৎ। ভীষণভাবে চমকে উঠেছে কমলা। ভয়ে, বিস্ময়ে ওর গলা ফুটছিল না।

বাসনা কি বেঁচে আছে? মনে হচ্ছে না। বিছানার একটা পাশে রক্ত. বাসনার কাপড়েও রক্ত মাখামাখি। বিষ খাওয়া একটা মানুষ না এমনিভাবে পড়ে থাকে। চোখ বন্ধ। ঠোঁট জোড়া। দাঁতে দাঁত লাগা। শক্ত মুঠোয় খানিকটা চাদর খিমচে ধরেছে।

কমলা ভীষণভাবে কঁকিয়েই উঠেছিল। বীথি ও-ঘর থেকে ছুটে এল। অদ্ভুত কলরব। ভীত বিহ্বলতা। সুধাময়ও এসে দাঁড়াল।

তারপর ছুটোছুটি, কান্নাকাটি, হুড়োহুড়ি। কমলা কাঁদছিল। বীথি পাথর হয়ে গেছে। বাসনার ঘর কনকন করছিল, এতো ঠাণ্ডা। বাতিটা হঠাৎ হলুদ-চোখ বিকার রুগীর মত তাকিয়ে।

সুধাময়ের সঙ্গে ডাক্তার এলেন। পাড়ার ডাক্তার।

না, বিষ খায় নি বাসনা। ফেন্ট হয়ে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণায়। হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন এখুনি। কিছু বুঝতে পারছি না। আলসার ছিল নাকি পেটে? না। জানেন না। মনে হচ্ছে না আমারও। অন্য কিছু। ভীষণ হেমারেজ হয়েছে। আমি একটা ইনজেকশন করে দিচ্ছি আপাতত। কিন্তু এখুনি হাসপাতালে রিমুভ করুন।

হাসপাতাল। বাসনা এখনও অজ্ঞান।

সুধাময় নাম-ঠিকানা লেখাচ্ছিল ডাক্তারের মুখোমুখি বসে ঃ বাসনা সেন। উইডো। বয়স আঠাশ। ঠিকানা।......

বাসনা সেনের নামটা খস্‌খস্ করে লিখে চলেছিল এক ছোকরা ডাক্তার।

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

অনেকের অনেক রকম বাতিক থাকে। কারো কারো ঘড়ি বাতিক থাকে। এই সব বাতিক গ্রস্তদের জন্য যেসব ঘড়ি তৈরী হয়, সেগুলি সবই সুইজারল্যাণ্ডের মণিকারের তৈরী। বস্তুত সুইজারল্যাণ্ডের মণিকারের তৈরী ঘড়ি আজকের জগতের চতুর্দিকে ম্যাজিকের মত কাজ

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ঘড়ির ছবি। এতে ১৫টি জুয়েল লাগান আছে। ½ ইঞ্চি লম্বায় আর ¼ ইঞ্চি চওড়া। এই ধরনের ঘড়ি আংটি অথবা ব্রেসলেটে বসান হয়।

দিচ্ছে এবং দিনে দিনে এদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাণী এলিজাবেথ সময় দেখার জন্য জগতের মধ্যে যে ক্ষুদ্রতম ঘড়িটি ব্যবহার করেন সেইটি সুইজারল্যাণ্ডের তৈরী। ঘড়িটি আকারে একটি এক সেণ্ট মুদ্রারও অর্ধেক। রাণী এলিজাবেথ তার বিবাহ উৎসবে সুইজারল্যাণ্ড রাজতন্ত্রের কাছ থেকে এই ছোট্ট ঘড়িটি উপহার পান।

খুব দ্রুতবেগে মোটরগাড়ি চালালে পুলিসের হাতে পড়তে হয় আর যে সব পুলিশ দ্রুতগতি মোটর গাড়িকে ধাওয়া করে তারা মোটরের গতির বেগ যথাযথ নির্ধারণ করার জন্য যে ঘড়ি ব্যবহার করে তাও সুইজারল্যাণ্ডেরই তৈরী।

বিমান চালক বিমান থেকে বোমা ফেলার সময় যে ঘড়ি ব্যবহার করেন সেটি উল্টো দিকে চলে, সেও সুইজারল্যাণ্ড থেকেই আসে।

কোনও পুলিসের লোক যখন খুনে বা ডাকাতের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই করে তখন ডাকাত ও নিজের মধ্যে দূরত্ব নির্ধারণের জন্য একটি টেলিমিটার ঘড়ি ব্যবহার করে। বন্দুকের আলোর ঝলক আর আওয়াজ থেকেই দূরত্ব নির্ধারিত হয়। এও সুইজারল্যাণ্ডের তৈরী।

নদী বা হ্রদের ওপর যখন নৌকার বাইচ হয় তখন নৌকাগুলি যে ঘড়ি দেখে ছাড়া হয় সে ঘড়িটার ওপরে একটা লাল চাকতি থাকে আর প্রতি মিনিটে ঐ চাকতিটা একবার করে অদৃশ্য হয়ে আবার দেখা দেয়। বলা বাহুল্য এটিও সুইজারল্যাণ্ডের তৈরী।

সুইজারল্যাণ্ডের জীন জ্যাকেস রুশোর পিতামহ একটি অদ্ভুত জটিল ঘড়ি তৈরী করেছেন। ঘড়িটি একটি ছোট্ট রুপার তৈরী মাথার খুলির মত আর আর ঘড়ি দেখার জন্য ডায়ালটা উন্মোচন করতে হলেই ঐ খুলিটা হাঁ করে ওঠে।

জানা যায় যে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর স্ত্রী জোসেফিনের সঙ্গে জেনেভার দোকানে দোকানে অদ্ভুত ঘড়ি সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াতেন। সাম্রাজ্ঞী জোসেফিন একটি সুইস মণিকারকে ভাড়া করে এনেছিলেন তার হাতের একটি ব্রেসলেট করার জন্য—সেই ব্রেসলেটে একটি ছোট্ট "রিস্ট ওয়াচ" থাকবে। অবশ্য শুধু নেপোলিয়ন কেন এই রকম রাজা বাদশারাই জেনেভা কিংবা রানী প্রভৃতি সুইচ ঘড়ি তৈরীর শহরগুলিতে এই ধরনের ঘড়ি সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়ান। রাজা ফারুক, মাইকেল রুমানিয়ার আগেকার রাজা, আগা খাঁ, সম্রাট হেলে সেলাসি, ইথোপিয়ার রাজাকে ঘড়ি অন্বেষণে এ দেশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ইরাকের মহারাজার লণ্ডনে বেড়াতে এসে ওয়েস্ট মিনিস্টার এবির ঘড়ির বাজনা শুনে ঠিক ঐ রকম একটি ঘড়ি সংগ্রহের শখ হয় এবং তৎক্ষণাৎ জেনেভার কোনও ঘড়ির কারখানায় ফোন করে জানতে পারেন যে, ঠিক ঐ রকম ঘড়ি তাঁর জন্য নতুন করে তৈরী করতে হবে না তৈরী করাই আছে।

এ পর্যন্ত যত মূল্যবান ঘড়ি তৈরী হয়েছে হায়দ্রাবাদের নিজামের ঘড়িটি তার মধ্যে সব চেয়ে অধিক মূল্যবান। বহুদিন আগে এই রকম দু'টি ঘড়ি কেনা হয়। মূল্যবান 'জুয়েলসহ' বিশিষ্ট ধরনের ঘড়িটির মূল্য ৫০,০০০ ডলার।

সুইজারল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক হ্যানস উইলসডর্ফ জল ও আঘাত প্রতিরোধক একটি ঘড়ি তৈরীর চেষ্টা করেন। ইনি ১৯১০ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত কাজ করার পর একটি স্বয়ংচালিত ঘড়ি তৈরী করেন।
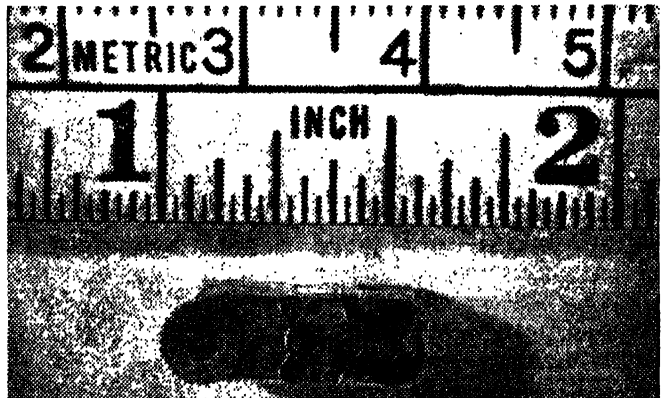
পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ঘড়ির কলকব্জা : বর্ধিত করে দেখান হচ্ছে।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ দুই ॥

ভোরে উঠে স্নান সেরে গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছি, গাড়ি এল ঠিক সাতটায়। উঠতে যাব দেখি গাড়ির ভিতর অর্ধেক জায়গা জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো রঙ বেরঙের ঘুড়ি আর সুতো ভরতি প্রকাণ্ড একটা লাটাই। গাঙ্গুলীমশায়ের অ্যাসিস্টান্ট মুখার্জি'র দিকে চাইতেই সে বল্লে—'ঐ জন্যই ত আসতে একটু দেরি হয়ে গেল'। বললাম —'কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

সব কথায় একটু রহস্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেওয়া মুখার্জি'র স্বভাব। বললে—'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। একটু পরেই সব বুঝতে পারবে।' অগত্যা কৌতূহল চেপে চুপচাপ বসে রইলাম। গাড়ি রসা রোড ধরে উত্তরমুখো চলতে শুরু করলো। একটু পরেই হঠাৎ ডাইনে জাস্টিস্ দ্বারকানাথ রোডে ঢুকে পড়ে একটু গিয়েই নর্দার্ন পার্কের আগে দাঁড়াল। কিছু দূরে আর একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আর তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন পরিচালক গাঙ্গুলী মশাই ও ক্যামেরাম্যান যতীন দাস। নামতে যাব মুখার্জি হাত চেপে ধরে বললে—'যেমন আছ অমনি চুপ করে বসে থাক।' কিছু বলবার আগেই মুখার্জি গাড়ির দরজা খুলে নেমে তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিন জনে কি যেন পরামর্শ হল—তারপর গাঙ্গুলী মশাই দেখলাম আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন।

কাছে এসে বাইরে থেকে গাড়ির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে চুপি চুপি বললেন—'শোন ধীরাজ! সিনটা একটু মাথা খাটিয়ে চালাকি করে নিতে হবে।'

একটা সিন নিতে কী এত মাথা খাটানো বা চালাকির দরকার আমার অল্প ক'দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝে উঠতে পারলাম না। গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'সিনটা নেওয়া হবে নর্দার্ন পার্কের ভিতর। দৃশ্যটা হল তোমার শ্বশুর জোর করে তোমার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে, একমাত্র আদরের মেয়ে কিশোরী তোমার মত অপদার্থের হাতে পড়ে চরম দুঃখ দৈন্যের মধ্যে দিন কাটাবে এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। তুমি বাড়িতে এসে যেদিন শুনলে, তোমার স্ত্রী পুত্রকে জোর করে শ্বশুর নিয়ে গেছেন তখন তুমি পাগলের মত ছুটলে শ্বশুর বাড়িতে ওদের ফিরিয়ে আনতে। শ্বশুর-মশায়ের অবস্থা খুব ভাল। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, গেটে লাঠি হাতে হিন্দুস্থানী দারোয়ান। দারোয়ানের উপর কড়া হুকুম ছিল তাই তুমি ভিতরে ঢুকতে পারলে না। তারপর দু'তিন বছর কেটে গেছে। অনেকবার শ্বশুর বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করেও কোনও ফল হয়নি। অনেক কষ্টে আশে পাশের লোকের কাছ থেকে খবর নিয়ে তুমি জানতে পারলে রোজ বিকেলে বেয়ারার সঙ্গে তোমার ছেলে এই পার্কে বেড়াতে আসে।'

চারিদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললাম —'কিন্তু আমার ছেলে কোথায় আর সাজবেই বা কে!'

নর্দার্ন পার্কের ঠিক উত্তরে একটি প্রকাণ্ড বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন—'ছেলে ঐ বাড়ির।

বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম— 'কিন্তু আগে যে ছেলেটা স্টুডিওয় দেখে-ছিলাম—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'ভুলে যাচ্ছ কেন? তার পর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। এখন চাই একটি বড়লোক বছর সাতেকের ছেলে আর চেহারাটাও বেশ নাদুস নুদুস হওয়া চাই। ধনী দাদা মশায়ের ওখানে ঘি দুধ খেয়ে খেয়ে বেশ—'

হঠাৎ চুপ করে উত্তর দিকের ঐ বাড়িটার দিকে চাইলেন গাঙ্গুলী মশাই —ও'র দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি সদর দরজা খুলে একটি চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কি কথা হল গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে শুনতে পেলাম না। তক্ষুনি গাড়ির দরজা খুলে চকিতে একবার চারদিক দেখে নিয়ে গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'চট্ করে এর সঙ্গে ঐ বাড়িটায় ঢুকে পড়।' কার বাড়ি, আমি কেন ঢুকবো, এই সব সাত পাঁচ ভাবছি— একরকম ঠেলে দিয়ে গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'যাও দেরি কর না, কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হবে।'

এদিকে আমার মুশকিলটা গাঙ্গুলী মশাই দেখলেন না। ছেঁড়া ময়লা কাপড় জামা পরে একমুখ দাড়ি আর রুক্ষ চুল নিয়ে অত বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার দাখিল। শেষ চেষ্টার মত ক্ষীণ আপত্তির সুরে তবুও একবার বললাম—'আমি না হয় গাড়িতেই থাকি।'

গর্জন করে উঠলেন গাঙ্গুলী মশাইঃ 'না। যা বলছি তাই কর।'

রাশভারি লোক, তার উপর প্রকাণ্ড, জোয়ান চেহারা। রাগলে ভয়ানক দেখায়। আর দ্বিরুক্তি করবার সাহস হল না। যা থাকে কপালে, চাকরটার সঙ্গে ঐ অজানা রহস্যপুরীতে ঢুকে পড়লাম।

ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করে দিলে চাকরটা। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে দেখি বেয়ারার পোশাক পরে মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে মুখার্জি। সামনে আর একটা সোফায় বসে আছে একটি বছর ছয় সাতের আবলু-গাবলু ছেলে, দেখলেই মনে হয় বড়লোকের ঘি দুধ খাওয়া আদুরে ছেলে—বোকা-বোকা মুখখানা। ম্যাডান স্টুডিওর খাটে শোওয়া জ্বরে ভোগা মুসলমান ছেলেটার তিন চার বছরের মধ্যে এ রকম বিস্ময়কর পরিবর্তন একমাত্র সিনেমাতেই সম্ভব। দেখলাম ওর মেক-আপ হয়ে গেছে। প্রথমে

মুখে খানিকটা ভেসলীন মাখিয়ে নিয়ে তার উপর পাউডার, তারপর ভুসো কালি দিয়ে চোখ ভ্রূ আঁকা। সব শেষে আলতার শিশি থেকে একটুখানি আঙুলে লাগিয়ে নিয়ে ঠোঁটে দেওয়া। বলা বাহুল্যে অধুনা বিখ্যাত ম্যাক্স ফেক্টরের মেক-আপ, লিপস্টিক্, ব্রাউন ব্ল্যাক পেনসিল এসবের সৃষ্টি তখনও হয়নি, আর হলেও আমেরিকা থেকে সুদূর কলকাতায় সবে-ধন নীলমণি ম্যাডান স্টুডিওতে তার অস্তিত্ব তখনো আমাদের অজ্ঞাত ছিল। মেক-আপ ম্যান আর্সেনি, মুখার্জিই ছেলেটিকে মেক-আপ করে দিয়েছে। ছেলেটির কিছুদূরে ঈষৎ অন্ধকারে আর একখানা সোফায় দেখলাম ছোট ছেলেটির বৃহৎ সংস্করণ প্রিয়দর্শন একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ভদ্রলোক বসে বসে পা দোলাচ্ছেন আর পরম তৃপ্তিতে গড়গড়া টানছেন। মুখার্জি আলাপ করিয়ে দিলে --'ধীরাজ ইনিই এই বাড়ি আর এই ছেলেটির মালিক, নাম শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল। রাজসাহী জেলার পুঠিয়া স্টেটের ছোট তরফের বড় বাবু আর এটি ওঁরই ছোট ছেলে শ্রীমান দীপ্তেন সান্যাল। সিনেমার ছোঁয়াচ লেগে কিনা জানি না, পরবর্তী জীবনে এঁরা দুজনেই স্বনাম-ধন্য। সুধীরবাবু অধুনা বিখ্যাত প্রচার-সচিব ও শ্রীমান দীপ্তেন 'অচল পত্রের' মাধ্যমে বিখ্যাত।

পরস্পর নমস্কারান্তে বসতে যাবো, কানে এল—'কামাননি কদ্দিন?' বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম,—'আজ্ঞে?'

তেমনি গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানতে টানতে সুধীরবাবু বললেন,—দাড়ি গোঁফ কামাননি কত দিন হল?'

বললাম—'তা প্রায় মাস দুই হবে।'

'—তা ওরকম উজবুকের মতন এক-গাল দাড়ি গোঁফ আর মাথায় একঝুড়ি রুক্ষ চুলের বোঝা নিয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে মেক-আপের চুল দাড়ি নিলেই ত হয়।'

মনে মনে সত্যিই রেগে গেলাম। প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতেই ভদ্রলোক এমন মেজাজে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যেন উনি মনিব আর আমি ও'র খাস তালুকের প্রজা। উত্তর দেব কিনা ভাবছি—প্রাণখোলা হাসির আওয়াজে মুখ তুলে চেয়ে দেখি গড়গড়ার নল হাতে ভুঁড়ি দুলিয়ে সোফায় বসে হাসছেন সুধীরবাবু। চোখে চোখ পড়তেই বললেন—'রাগ কোরো না ভাই, এটা আমার একটা বিশেষ দোষ। চেষ্টা করেও আমি বেশিক্ষণ গম্ভীর হতে পারিনে। সেইজন্য দেখ না জমিদারী দেখাশুনা করে ছোট ভাই। সে বেশ গম্ভীর আর রাশভারি ছেলে আর আমি সেই টাকায় তোফা খেয়ে দেয়ে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি।'

সত্যিই ভাল লাগল সুধীরবাবুকে। বড়লোক হয়েও এমন সহজ সাদাসিধে রসিক লোক কমই দেখেছি। মনের মেঘ কেটে গেল। বললাম—মেক-আপ সম্বন্ধে কি বলছিলেন?'

'—ও হো হো, এই দ্যাখো আসল কথাটাই ভুলে গেছি। বলছিলাম যে, অত কষ্ট করে দাড়ি না রেখে তৈরি করে নিলেই ত হয়।'

বললাম—আমাদের ছবির এখন যাকে বলে শৈশবাবস্থা। মেক-আপ্ জিনিসটার আইডিয়াই ভাল করে নেই। যা দুই-একখানা ছবি দেখেছি তাতে পরচুলো আর তৈরি দাড়ির যা নমুনা দেখিছি—তার চেয়ে কষ্ট করে দাড়ি রাখা অনেক ভাল।' আমাদের এই আলোচনার মধ্যেই একটি তেইশ চব্বিশ বছরের ফর্সা মহিলা এসে সুধীরবাবুর কাছে দাঁড়ালেন। পরনে লাল পাড় গরদের শাড়ি, এলো চুল। সৌম্য স্নিগ্ধ মুখে তৃপ্তির হাসি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। বুঝলাম সদ্য পুজোর ঘর থেকে আসছেন। সুধীরবাবু বললেন—'ইনি হলেন এই বাড়ির যথার্থ কর্ত্রী। শুধু বাড়ি কেন, এ বাড়িতে যে ক'টি প্রাণী বাস করে তাদেরও, ইনক্লুডিং মী, ইনি হচ্ছেন—'

বললাম—'বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।' উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললাম, 'নমস্কার, বৌদি।'

সেদিনের সেই সামান্য শুটিংকে উপলক্ষ্য করে এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম পরবর্তীকালে তা গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আজও তা অটুট আছে, শুধু ছন্দ পতনের মত সাত বছর আগে বৌদির অকাল মৃত্যু একটা বিষাদের ছায়া এনে দেয়।

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে হাসি মুখে বৌদি বললেন,—'বসুন বসুন। আজ আপনাদের শুটিং দেখব, কখনো দেখিনি। ওমা, কেলুধনের মেক-আপ্ হয়ে গেছে দেখছি।'

শ্রীমান দীপ্তেনের ডাক নাম কেলু বা কেলো। বাপ মায়ের চেয়ে গায়ের রং বেশ দু তিন ডিগ্রী কম বলে, না অন্য কারণে ঠিক বলতে পারব না।

আমার দিকে ফিরে বৌদি বললেন—'ও কিন্তু ভীষণ নারভাস্। শেষকালে আপনাদের ছবি না নষ্ট করে দেয়।'

প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে কেলু বলে উঠল—'তুমি কিন্তু কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে মা, নইলে আমি ছবিতে প্লে করব না।

চৌকশ মুখার্জি অনেক বোঝালে, কোনো ফল হল না। অগত্যা ঠিক হল শুটিং-এর সময় সামনের পার্কে কেলোর সামনে, মানে ক্যামেরা রেঞ্জের বাইরে বৌদি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

মুখার্জি আমায় দৃশ্যটা যা বুঝিয়ে দিলে তা হ'ল এই—আমার শ্বশুর বাড়ির বেয়ারার সঙ্গে ছেলে রোজ বিকেলে পার্কে খেলা করতে আসে, ছেলেবেলা থেকেই ঘুড়ি আর লাটাইয়ের উপর ওর অদম্য ঝোঁক। তাই অনেক কষ্টে পয়সা যোগাড় করে তা দিয়ে কয়েকখানা ঘুড়ি আর লাটাই কিনে চোরের মত ছেলের সঙ্গে পার্কে দেখা করতে এসেছি আমি। গাড়ির মধ্যে ঘুড়ি লাটাই-এর রহস্য এতক্ষণে পরিস্কার হল। একটা জিনিস তখনও পরিস্কার হয়নি, বললাম—'ছবি তুলবে তা এত লুকোচুরির হাস্ হাস্ কেন?'

বেয়ারার পোশাকে বেমানান হলেও বিজ্ঞের হাসি হেসে মুখার্জি বললে—'ভাই ধীরাজ, মাত্র ক'দিন এ লাইনে এসেছ তাই বুঝতে পারছো না, আমি আর গাঙ্গুলী মশাই কত মাথা খাটিয়ে এ সিনটা নেবার ব্যবস্থা করেছি। শোন—যদি পার্কে প্রকাশ্যে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুলতে শুরু করি দেখতে দেখতে ভিড়ে ভিড়াৎকার হয়ে যাবে আর সেই অগুন্তি জনতাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজেদের ইচ্ছা মত ছবি তোলা অসম্ভব। এই সিনটা হলো বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ও ইমোশন্যাল সিন্। যাক্, তোমায় যা করতে হবে শোন। গাড়ি করে আমরা তোমায় পার্কের দক্ষিণ দিকের গেটের কাছে নামিয়ে দেব। ছেলেটি উত্তরের গেটের কাছে ফুটবল নিয়ে খেলা করছে—

—ফুটবল? ফুটবল আমি খুব ভাল খেলতে পারি, না মা?' বুঝলাম কেলুর একমাত্র সাক্ষী ও সমঝদার হোলো মা।

মুখার্জি বললে—'দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে ঢুকে চার দিক তুমি খুঁজে দেখছো তোমার ছেলেকে। হাতে রয়েছে দু'তিন খানা রঙিন ঘুড়ি আর সুতো ভর্তি লাটাই।'

সবে এসে-যাওয়া ঘুমের মাঝখানে ছারপোকার কামড়ের মত কুট্ কুট্ করে বলে উঠল কেলো—'ঘুড়ি লাটাই সব আমায় দিয়ে দেবে ত মা?'

বিরক্ত হয়ে বৌদি ধমকে উঠলেন—'আঃ সব কথায় কথা কইতে তোমায় না মানা করিছি কেলু?'

মুখার্জি বলে চলল—'ঘুড়ি আর লাটাই-এর লোভ দেখিয়ে ওকে নিয়ে বসবে তুমি উত্তর দিকের পাঁচিলের গা ঘেঁষে যে কাঠের বেঞ্চিখানা পাতা রয়েছে তার উপর।'

কৌতূহল বেশ বেড়ে গিয়েছিল, বললাম—'তারপর মুখুজ্যে?'

সিনেমা সম্বন্ধে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করার এরকম সুযোগ ছাড়তে মুখার্জি মোটেই রাজি নয়। ঘরশুদ্ধ সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুরু করলে—'তারপর? তারপর ঐ বেঞ্চিতে বসে খোকার হাতে ঘুড়ি লাটাই সব দিয়ে ওকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলবে—খোকা, তুমিও যেন আমার মত পলকা সুতোয় ঘুড়ি উড়িও না বাবা—। ঠিক এমনি সময় দূর থেকে খোকার উড়ে বেয়ারা মানে আমি দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে খোকার হাত

থেকে ঘুড়ি লাটাই ছুঁড়ে ফেলে দেবো মাটিতে, তার পর তোমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে খোকাকে কোলে করে বাড়ি চলে যাব।'

'আর ফুটবল। বারে, ফুটবলটা ফেলে যাবো নাকি? অবাক হয়ে বলে উঠল কেলো।

সবাই হেসে ফেললাম। মুখুজ্যে বললে—'সত্যিই খোকা আমার একটা ভুল ধরেছে। ফুটবলটা মাটি থেকে আমিই কুড়িয়ে নিয়ে যাব।'

দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দিতেই দেখলাম স্টুডিওর গাড়ির ড্রাইভার রামবিলাস, মুখুজ্যেকে চুপি চুপি বললে—'ধীরাজবাবুকে গাঙ্গুলী মশাই ডাকছেন।'

রামবিলাস চলে যেতেই দরজা ঈষৎ ফাঁক করে উটের মত গলা বাড়িয়ে মুখুজ্যে বাইরে রাস্তার এ-ধার ও-ধার দেখে নিয়ে আমায় বললে—'যাও, চট করে গাড়িতে উঠে পড়, রাস্তা একদম ফাঁকা।'

কোনো দিকে না চেয়ে একরকম ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। পিছনের সীট্-এ ঘুড়ি লাটাই-এর মধ্যে একরকম লুকিয়ে বসে আছেন গাঙ্গুলী মশাই আর ড্রাইভারের সীট-এর পাশে হাতে ঘোরানো ডেব্রি ক্যামেরা নিয়ে সামনের কাঁচ তুলে রেডী হয়ে বসে আছে ক্যামেরাম্যান যতীন দাস। গাড়ি ঘুরে চললো নর্দার্ন পার্কের দক্ষিণ দিকের গেট মুখো। গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'মুখুজ্যের কাছে সিনটা সব শুনে নিয়েছ ত?' সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়লাম। দক্ষিণ গেটের একটু দূরে এসে গাড়ি থামলো। দু'তিনখানা ঘুড়ি আর লাটাইটা আমার হাতে দিয়ে গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'চারদিক দেখে নাও আগে। লোকজন বেশি থাকলে নেমো না।'

বেলা প্রায় এগারোটা, পথ জনবিরল। গাড়ি থেকে নেমে পার্কে ঢুকে পড়লাম। আমাকে ফলো করে গাড়িখানা আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো পার্কের গা ঘেঁষে। বুঝলাম যতীন ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। দু'চারজন চাকর-বেয়ারা-ক্লাসের লোক আর কতকগুলো স্কুল পালানো ডানপিটে ছেলে ছাড়া পার্কে বিশেষ লোকজন নজরে পড়ল না। ছেলের খোঁজে ওদেরই মধ্যে দিয়ে চারদিক চাইতে চাইতে ঘুড়ি লাটাই হাতে এগিয়ে চলেছি। পার্কের মাঝ বরাবর গিয়ে উত্তর দিকে চেয়ে দেখি কেলুধন ওর সমবয়সী চার পাঁচটি ছেলের সঙ্গে দিব্বি ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছে। কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন বৌদি, আর বেশ খানিকটা দূরে দু'তিনটে চাকরের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে মুখুজ্যে।

বেশ একটু উৎসাহের মাথায় সামনে এগিয়ে গেলাম যেখানে কেলুরা ফুটবল খেলছে। একটু দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলটাকে হাতে তুলে নিতেই ছেলেগুলো ভয়ে ভয়ে আমার চার পাশে ভিড় করে দাঁড়াল। কোনো কথা না বলে খপ করে কেলুর একখানা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম পূর্বনির্দিষ্ট বেঞ্চির দিকে। কেলু শুধু বলে চলেছে—'বারে, ফুটবলটা নিয়ে নিলে ঘুড়ি লাটাই দাও?'

কোন জবাব না দিয়ে বেঞ্চের উপর দু'জনে বসলাম, তারপর ফুটবলটা মাটিতে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ঘুড়ি লাটাই কেলুর হাতে দিলাম। মুখ দেখে বোঝা গেল ও বিশেষ খুশী হয়নি। বার বার লোলুপ দৃষ্টিতে নীচে ফুটবলটার দিকে দেখতে লাগল। এই অবসরে আড়চোখে দেখে নিলাম ক্যামেরাসুদ্ধ গাড়িটা এসে গেছে উত্তরের রেলিং ঘেঁষে একেবারে আমাদের সামনে। মহা উৎসাহে যতীন হাতল ঘুরিয়ে চলেছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। কেলোকে হঠাৎ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বেশ ইমোশন্ দিয়ে বলে উঠলাম—'খোকা, তুমি যেন আমার মত পলকা সুতোয় ঘুড়ি উড়িও না বাবা।'

শেষের কথাটা বলেছি কি বলিনি দড়াম করে পড়লো এক লাঠি আমার পিঠে। যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি পাঁচ ছ' জন জোয়ান ছেলে লাঠি হাণ্টার আর হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁষি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার ঠিক পিছনে।

একজন বললে—'জানিস রতা, ব্যাটা যখনই ঘুড়ি লাটাই হাতে নিয়ে চোরের মত চাইতে চাইতে পার্কে ঢুকেছে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা বার করে সবাইকে খবর দিয়ে এসেছি। ওরা এল বলে।'

কিছু না বুঝতে পেরে অপরাধীর মত করে ভয়ে ভয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ওদের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে ভিড় বেড়ে উঠল। একটা ষণ্ডামার্কা ছেলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার চুলের মুঠো ধরে বেঞ্চি থেকে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর সবলে গালে এক চড় মেরে বললে—'রোজ রোজ ঘু ঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। আজ ব্যাটাকে মেরেই ফেলব।'

মেরেই ফেলতো যদি না হঠাৎ ভিড় ঠেলে মুখুজ্যে এসে আমায় আড়াল করে দাঁড়াত। মুখুজ্যে ওদের একজনকে উদ্দেশ করে বললে—'ব্যাপার কি? আপনারা হঠাৎ একে মারধোর করছেন কেন?'

ওদেরই মধ্যে একটু বেশী বয়সের একটা ছেলে ভেংচি কেটে বলে উঠল—'তুই ব্যাটা উড়ে মোড়লি করতে এলি কেন? বড় লোকের বাড়ির বেয়ারা—কাজেই মেজাজ দেখ না!'

তাড়াতাড়ি মাথার পাগড়িটা খুলে মুখুজ্যে বেশ নরম সুরে বললে—'ভাই বেয়ারা আমি নই, সেজেছি।'

আর যায় কোথা। সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো—দেখলি পানু? আমি বলেছি ওরা একা আসে না দলবল নিয়ে আসে।'

দু'তিনটে ছেলে একরকম মুখুজ্যেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমার শতচ্ছিন্ন তালি দেওয়া জামাটার কলার চেপে ধরল। ঠিক এমনি সময়ে ত্রাণকর্তার মত দামী গরম স্যুট পরা, লম্বা সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘকায় গাঙ্গুলী মশাই দু'হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের দলকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হয়েছে কি, এত ভিড় কেন?'

প্রায় দু'তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল—'আপনি বিচার করুন তো মশায়। আজ দু'তিন দিন ধরে আমাদের পাড়ায় ছেলেধরার উৎপাত শুরু হয়েছে, দুটো ছেলে এই পার্ক থেকে চুরি গেছে। একটা পাওয়া গেছে, আরেকটার কোনো পাত্তাই নেই। তাই আমরা, পাড়ার ছেলেরা, ঠিক করেছি পালা করে পাহারা দেব—দেখি ছেলেধরার উৎপাত বন্ধ করতে পারি কি না। আজও সকাল থেকে ঘরের খড়-খড়ি তুলে পলটু সাতটা থেকে ডিউটি দিচ্ছিল, হঠাৎ ও দেখে ছেলে ভোলাবার জন্যে দু'তিন খানা রঙিন ঘুড়ি ও লাটাই নিয়ে এই ব্যাটা চোরের মত চারদিক চাইতে চাইতে পার্কে ঢুকে যেখানটায় ছেলেগুলো ফুটবল খেলছে সেইদিকে এগোচ্ছে। ব্যাস্, ও তখনি সাইকেলে করে দলের সবাইকে খবরটা দিয়ে দেয়। আজ যখন হাতে নাতে ধরেছি, তখন আগে মেরে ব্যাটাকে আধমরা করব তার পর পুলিসে দোব।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হৈ হৈ করে সবাই মারবার জন্য এগিয়ে এল। হাত তুলে থামিয়ে দিলেন গাঙ্গুলী মশাই। তারপর বললেন—'তোমাদের ভুলটা ভেঙে দিতে আমার সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছে কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই। যাকে তোমরা ছেলেধরা মনে করে মার-ধোর করছ সে হচ্ছে আমার 'কাল পরিণয়' ছবির নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছবিতে ঠিক এমনি একটা ঘটনা আছে—তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি সিনটা নিচ্ছিলাম যাতে খুব ন্যাচারাল হয়। সিনটা আমার প্রায় তোলা হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলেই—'

পাশ থেকে মুখুজ্যে বললে—'আর এখানে নয়। বাকি সিনটা স্টুডিওতে একটা বেঞ্চি দিয়ে ক্লোজ-শটে নিলেই চলবে। চলুন যাওয়া যাক।'

ছেলের দলের সন্দেহ তখনো পুরো-পুরি যায়নি বুঝতে পেরে ক্যামেরা শুদ্ধ যতীনকে ডেকে ওদের দেখিয়ে সমস্ত সিনটা বলে গেলেন।

হঠাৎ মুখুজ্যে বলে উঠল—'কেলু? কেলো কোথায়? আর ঘুড়ি, লাটাই, ফুট-বল, এগুলোই বা গেল কোথায়?

চেয়ে দেখলাম নিজেদের বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে ফুটবল ঘুড়ি লাটাই সব দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিট মিট করে হাসছে কেলুধন, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সুধীর ও বৌদি।

বেশ বুঝতে পারলাম ছেলের দল খুব নিরুৎসাহ হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে আমায় ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে পথ করে ভিড় ঠেলে সবাই গাড়িতে গিয়ে বসলাম। স্টুডিওতে মালপত্র ক্যামেরা নামিয়ে গাঙ্গুলী মশাইকে বাড়িতে ছেড়ে গাড়ি আমার বাড়ির কাছে চলে আসলো। নামতে নামতে মুখুজ্যেকে বললাম—'তুমি আর গাঙ্গুলী মশাই অনেক মাথা খাটিয়ে যে ফন্দিটা করেছিলে তাতে আমার পৈত্রিক মাথাটা যেতে বসেছিল।'

কিছুমাত্র দুঃখিত বা লজ্জিত না হয়ে মুখার্জি জবাব দিলে—'ছবির নায়কের পক্ষে এসব কিছুই নয়, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।'

কোনও উত্তর দেবার আগেই দেখি গাড়ি বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। অবাক হয়ে চলমান গাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

(ক্রমশ)

ইতিহাস ও ৬ই আগস্ট

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান শতাব্দীর এক কলঙ্কময় ঘটনার দশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে হিরোসিমা আর নাগাসাকির বুকে আহূত হয়েছে শান্তি সম্মেলন। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট, ঠিক এমনি একটি দিনেই আণবিক অস্ত্রের পৈশাচিক ব্যবহারের প্রথম পরিচয়ে সমগ্র জগৎ আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সর্বনাশের একি ভয়ঙ্কর রূপ! আত্মরক্ষার্থে মানবাত্মা উঠলো ক্রন্দন করে, বিবেচক চিন্তানায়কেরা মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে দানবিক মনোবৃত্তির সম্বরণ ঘটিয়ে সভ্যতার অকালমৃত্যু রোধের জন্য কাতর আবেদন জানালেন।

তারপর এক এক করে কেটে গেছে আরও দশটি বছর। বিজ্ঞানের অনুশীলনে মানুষ বর্তমানে আরও ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের অধিকারী। এই অস্ত্র কেবলমাত্র শত্রু বিনাশ করবে না, সমগ্র জগতের সংহার ঘটিয়ে বিধাতা পুরুষকে তাঁর কঠিন কর্তব্য থেকে দেবে রেহাই। এই অস্ত্রের অকল্যাণকর প্রতিক্রিয়ার করাল কবল থেকে স্বয়ং প্রয়োগ কর্তারও নিস্তার নেই।

তাই হিরোসিমা আর নাগাসাকির শান্তি সম্মেলনে আণবিক শক্তির কল্যাণকৃৎ রূপকে আবাহন জানান হবে। মানুষের আজ শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাই সে বাঁচতে চায়, সম্মিলিতভাবে উপভোগ করতে চায় মঙ্গল আলোকময় এই সুন্দর ধরিত্রীকে।

এই স্মরণীয় অনুষ্ঠান চলবে দশ দিন ধরে, যোগদান করবেন সমগ্র পৃথিবীর পঞ্চাশজন শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা। আসবেন শিল্পী পিকাসো, আসবেন পার্ল বাক ও দার্শনিক রাসেল। ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। অবশ্যম্ভাবী অপমৃত্যুর হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা সর্ব-শক্তি প্রয়োগের শপথ গ্রহণ করবেন। হিরোসিমা নাগাসাকির দগ্ধ প্রান্তরের প্রতিটি অংশে লুকিয়ে আছে সেই দুঃস্বপ্নের অশ্রুভরা অজস্র কাহিনী তাই সাম্প্রতিক শান্তি যজ্ঞের এই হলো উপযুক্ত স্থান।

আণবিক শক্তিকে আয়ত্বে আনবার সাধনায় মানুষ একদিনে সিদ্ধিলাভ করেনি। বেকরেল তাঁর গবেষণাগারে যে-দিন সর্বপ্রথম তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পেলেন, অনেকের মতে সেই দিনই আণবিক যুগের 'যাত্রা হলো শুরু', আবার কেউবা মনে করেন জ্ঞান সমুদ্রের ইতালীয় নাবিক এনরিকো ফার্মিই এই যুগের প্রথম পথিকৃৎ।

সে এক স্মরণীয় ঘটনা, ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর বিজ্ঞানী দল 'চেন রিঅ্যাকসনের' মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এক যুগান্তকারী পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন, বিজ্ঞানীদের ধারণা গ্রাফাইট নির্মিত অ্যাটমিক পাইলের মধ্যে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ধাতুর অবস্থিতি সম্মতিসূচক করা সম্ভব হলে এরা 'চেন রিঅ্যাকসনের' আবির্ভাব ঘটাবে। অ্যাটমিক পাইল নির্মাণ করা হয়েছে, অধ্যাপক এনরিকো ফার্মি এই পরীক্ষার প্রধান হোতা। সহকারীর সংখ্যাও খুব কম। পাইলের মধ্যে সংযোজিত রয়েছে কয়েকটি ক্যাডমিয়াস দণ্ড, এরা নিউট্রন গ্রহণ করতে সক্ষম বলে রিঅ্যাকসনের কোন প্রকার উপস্থিতি প্রকাশ পাচ্ছে না। এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে বাইরের লোকের মধ্যে কেবলমাত্র উপস্থিত আছেন মিঃ ক্রফোর্ড গ্রীণবোস্ট। অ্যাটমিক পাইলের প্রথম কার্যকারিতা স্বচক্ষে অবলোকন করবার জন্য বিজ্ঞানী কম্পটন সরকারী নিরাপত্তার প্রাচীর ভঙ্গ করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পরীক্ষা শুরু হলো, ফার্মির কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ, ফলাফল অনিশ্চিত। অ্যাটমিক পাইলের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনজন বিজ্ঞানী, হাতে তাঁদের ক্যাডমিয়াস সল্যুসন। যদি কোনরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা হলে তাঁরা এই সল্যুসন ছাড়িয়ে দিয়ে পাইলের মধ্যে আণবিক প্রতিক্রিয়া রোধ করবার চেষ্টা করবেন। অজানা এই গবেষণার ফলাফল কি হবে, তা কেউই বলতে পারে না, তবু, বিজ্ঞানীত্রয় জানেন যে কোন মুহূর্তেই তাঁরা মারা যেতে পারেন। কিন্তু মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, এক পরম কল্যাণকর সত্যের আবরণ উদ্ঘাটনের আনন্দে মন তাঁদের ভরপুর।

ফার্মি আদেশ দিলেন, একটি ছাড়া আর সব ক্যাডমিয়াস দণ্ডগুলিকে পাইল থেকে বার করে আনবার জন্য। কেবলমাত্র ঐ একটি দণ্ডই 'চেন রিঅ্যাকসন' বন্ধ করতে সক্ষম।

করা হলো তাই। একটি মাত্র দণ্ড এখন 'চেন রিঅ্যাকসন'কে বাধা দিচ্ছে—তাকে টেনে বার করতে হবে। এখন মাত্র একজন বিজ্ঞানী পাইলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, হাত তাঁর দণ্ডটির উপর। পাইলের ওপর ক্যাডমিয়াস সল্যুসন নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী বিজ্ঞানীত্রয় অধীর আগ্রহে সময় গুণছেন—আর সকলে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে করছেন পর্যবেক্ষণ।

পরিচালকের নির্দেশ মতো শেষ দণ্ডটির অনেকখানি আস্তে আস্তে টেনে বার করা হলো, এখন মাত্র আর ১৩ ফুট পাইলের মধ্যে আছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই অপেক্ষা করছে পরম সত্যের

প্রকাশের জন্য। সাফল্যের আনন্দ আর পরাজয়ের গ্লানি উভয়েই তখন অনিশ্চিত আশঙ্কায় দোদুল্যমান।

হিসাব মতো মাত্র আর এক ফুট দণ্ডটিকে টেনে বার করলেই শুরু হবে রিঅ্যাকসন। করা হলো তাই—

কাউণ্টারে শোনা গেল শব্দ, কাঁটা নড়ছে, শুরু হলো প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া। অধীর আগ্রহে উপস্থিত সকলে মানুষের জয়যাত্রার এক নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

পাইলের ওপরকার বিজ্ঞানীত্রয় যে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আর ভয় নেই। প্রত্যাশিত ফলাফল গবেষণার সাফল্যের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করছে।

আনন্দ আর ধরে না, বিজ্ঞানী কম্পটন পাগলের মতো ছুটে গিয়ে হারভার্ডের বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে কোনাণ্টকে ফোন করলেন, 'ইতালীয় নাবিক এক নতুন রাজ্যে পেঁৗছেছে!'—

কোনাণ্ট প্রশ্ন করলেন—'অধিবাসীরা কেমন?'

উত্তর এলো—'অত্যন্ত বন্ধুত্বভাবাপন্ন।'

আমাদের গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। গবেষণাস্থলে হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার পেছনের পকেট থেকে একটা মদের বোতল বার করে ফার্মিকে উপহার দিলেন। এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে উদ্‌যাপন করতে হবে, তাই এই ব্যবস্থা। কি করে যে উইগনার এই বোতল দীর্ঘ সময় পেছনের পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা কেবলমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আণবিক যুগের হলো জন্ম, সকলে পরমানন্দে এই নবজাতকের স্বাস্থ্যপান করলেন।

খালি বোতলটির উপর সবাই করলেন স্বাক্ষর এবং তরুণ পদার্থবিদ্ ওয়াটেমবার্গ সযত্নে সংগ্রহ করে রাখলেন আণবিক যুগের জন্মক্ষণের আনন্দ পরিবেশনের এই নিদর্শনটিকে।

এর পর এক এক করে কেটে গেল দীর্ঘ দশ বছর। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এই স্মরণীয় দিনটির দশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। ওয়াটেমবার্গ তখন ম্যাসাচুটেকসে। উদ্যোক্তারা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন স-বোতল উপস্থিত হবার জন্য। সেদিনের ঐ ঐতিহাসিক শুভক্ষণের নীরব সাক্ষি ঐ মদের বোতল।

ছোট্ট ওয়াটেমবার্গের আবির্ভাবের জন্য বিজ্ঞানী ওয়াটেমবার্গ ঐ অনুষ্ঠানে
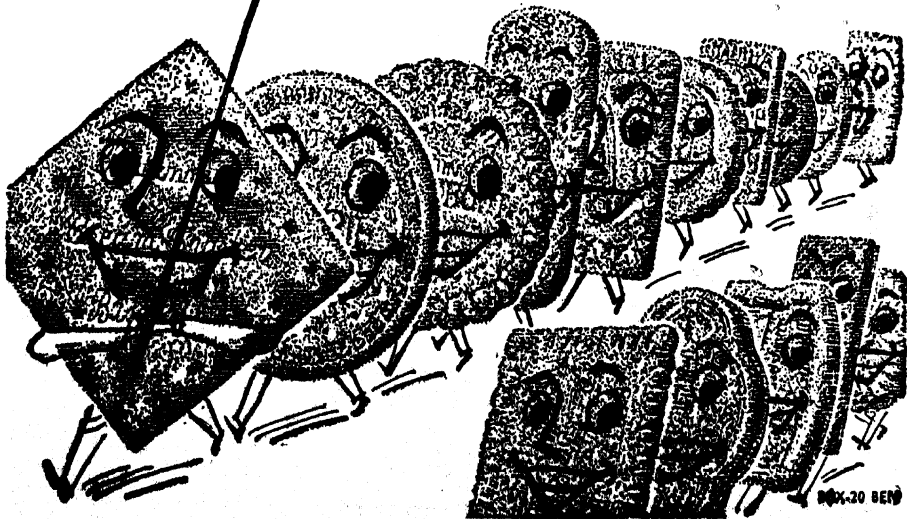
উপস্থিত হতে পারেননি, কিন্তু বোতলটিকে তিনি পার্শেল করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রেরণের সময় একে এক হাজার ডলার মূল্যে ইন্সিওর করে দেওয়া হয়েছিল! ইতিহাসে আর কোন শূন্য মদের বোতল এতো মহামূল্যবান সম্পত্তি বলে কখনও পরিগণিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

বোতলটিকে শিকাগোতে সাদর সম্বর্ধনা জানান হয় এবং সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশ করে তার সচিত্র জীবনী।

আণবিক যুগের আর একটি ঐতিহাসিক দিন ৬ই আগস্ট। যে পরিমাণে আনন্দ ফার্মি তাঁর গবেষণার সাফল্যের জন্য পেয়েছিলেন, ৬ই আগস্টে সংঘটিত এক নিদারুণ বিপর্যয় মানবাত্মাকে তার শত গুণে ব্যথিত করে তুলেছে। গৌরবময় আবিষ্কারের লজ্জাজনক পরিণতির কথা যদি বিজ্ঞানী সমাজ পূর্বকালে জানতে পারতেন, তাহলে ভগবানের এই চরম অভিশাপকে তাঁরা কখনই বহন করে আনতেন না।

আণবিক শক্তি দ্বারা বোমা নির্মাণের গবেষণার জন্য ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মানহাটন অঞ্চলের সৃষ্টি হয় এবং তার ঠিক তিন বছর পরে ঐ বোমা নিক্ষিপ্ত হলো হিরোসিমা-নাগাসাকিতে। ফার্মির সঙ্গে নীলস বোর, এডওয়ার্ড টেলার, এমিলিও সেগ্রে প্রভৃতি খ্যাতনামা বিজ্ঞানীবৃন্দ গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু গবেষণার গুপ্ত উদ্দেশ্য এবং কার্য প্রণালীর ধারা, এমনকি তাঁদের পরিবারবর্গের কাছেও ছিল অজানা!

বিজ্ঞানী এমিলিও সেগ্রি একবার ফার্মির স্ত্রীর সঙ্গে শিকাগোতে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'বিধবা হতে ভয় পাবেন না। এনরিকো যদি উড়ে যায়, তবে আপনিও অনেক উঁচুতে উঠে যাবেন।' এই রহস্যময় কথার তাৎপর্য লোরা ফার্মি (ফার্মির স্ত্রী) বুঝতে পারলেন ১৯৪৫ সালের ৭ই আগস্ট। এই দিনই সর্বপ্রথম ঘোষিত হলো জাপানে বর্ষিত প্রতিটি আণবিক বোমা কুড়ি হাজার টন T. N. T-এর সমকক্ষ।

আণবিক বোমার পরীক্ষা সর্বপ্রথম হয় ১৫ই জুলাই। সর্বসাধারণ খবরটা জানতো 'ট্রিনিটি' পরীক্ষা বলে, কিন্তু এর পরিচয় সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণাই তাদের ছিল না। অবশ্য এটা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গোপনীয় পরীক্ষা তা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা এতে যোগদান করতে যাত্রা করলেন এবং পরদিন বৈকালে যখন তাঁরা ফিরে এলেন, তখন তাঁদের দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। তাঁরা জানতে পেরেছেন, অসাধারণ মৃত্যুবান আজ তাঁদের করায়ত্ত।

সাধারণ মানুষ এবিষয়ে তখনও অজ্ঞ। কেবলমাত্র লস অ্যালামস শহরের হাসপাতালে একজন নিদ্রাহীন রোগী ১৬ই জুলাই ভোরবেলা অসাধারণ এক উজ্জ্বল আলো দেখতে পেয়েছিল। নিউ মেক্সিকোর একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন, তারা এমন এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলোর ঝলক পর্যবেক্ষণ করেছেন যা, একজন অন্ধ লোকও দেখতে পারে! বোধ হয় কোন নতুন বিস্ফোরকের পরীক্ষাকার্য চলছে, তাঁরা এই মতামত প্রকাশ করলেন।

তারপর এলো ৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধাস্ত্ররূপে সর্বপ্রথম আণবিক বোমা বর্ষিত হলো জাপানের বিরুদ্ধে, সমগ্র জগৎ এই দানবীয় অস্ত্রের প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার পরিচয় লাভ করলো। প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ সভ্যতার ইতিহাসে সংযোজনা করলো এক মহাকলঙ্কময় অধ্যায়।

দশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই শান্তি সম্মেলনে তাই আনন্দের লেশমাত্র নেই। এই দিনে কোন স্মারকচিহ্ন ২রা ডিসেম্বরের মতো দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করবে না, নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের সুতীব্র পরিহাস মাথা লজ্জায় নত করে দেবে। ধিক্কার, ঘৃণা আর অনুতাপানল তার অন্তরের পাশব প্রবৃত্তিকে করবে দগ্ধ।

শান্তিকামী মানুষ আর ভুল করতে চায় না, তাই এই আন্দোলন। অনুশোচনার উত্তাপে যে দোষের স্খালন শুরু হয়েছে, আণবিক শক্তির মঙ্গলদায়ক ব্যবহারই একমাত্র তাকে সম্পূর্ণ করতে সক্ষম।

যে মানুষ সর্বপ্রথম আগুন জ্বালাতে পেরেছিল, তার হাত হয়তো গিয়েছিল পুড়ে, হয়তো বা ঘটনাচক্রে সৃষ্টি হয়েছিল দাবানলের কিন্তু পরবর্তী কালে সভ্যতার ক্রমবিকাশে আগুনই সহায়তা করেছে সবচেয়ে বেশী। আণবিক শক্তির প্রথম প্রয়োগের বিভ্রান্তিই ইতিহাসের পাতায় চিরকাল তাঁর নাম মসিলিপ্ত করে রাখবে না। সেই শক্তি মঙ্গলদায়ক প্রাচর্যের প্লাবন ঘটিয়ে সমৃদ্ধশালী নতুন পৃথিবীর পরিকল্পনায় সহায়তা করবে।

সারা দুনিয়ার জ্ঞানীগুণীরা একত্র হয়ে এই দশদিনে তারই পান্ডুলিপি রচনা করছেন।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। নিঃশব্দে খুলবে মনে করেছিল হরিদাস। কিন্তু শব্দ হল। অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ একবার গার্ভিনী মার্জারীর চাপা অথচ তীব্র গোঙানির মত। অনেক চেনা আর শোনা শব্দ। তবু একবার দাঁত খিঁচোল হরিদাস। রেগে নয়, অপ্রস্তুত হয়ে। তারপর মুখটা বাড়িয়ে দিল ঘরে। যেন অতর্কিতে আক্রমণের পূর্বে সতর্ক আততায়ী এসেছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। তার পোকা খাওয়া চোখের পাতা আর রক্তাভ ছোট ছোট চোখ মেলে দেখে নিল ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস।

এবড়ো-খেবড়ো মেঝে আর পলেস্তারা খসা দেয়াল। এখানে সেখানে কয়েকটা হাড়ল গর্ত। ঘরটার উদ্দীপ্ত চোখে চেয়ে থাকা তারার মত গর্তগুলি কালো। সারাটা ঘর স্যাঁতসেঁতে, ভেজা ভেজা। নোনা নোনা গন্ধ। মেঝেটা একদিকে বেশী ঢালু। যেন গড়িয়ে পড়ে ঠেকে আছে। একটা দড়িতে কয়েকটা শাড়ি, সস্তা আর রঙীন। সায়া আর ব্লাউজ। সব এলোমেলো অবিন্যস্ত। একটা নড়বড়ে টেবিলের উপর ছড়ানো অল্পদামী প্রসাধন-সামগ্রী। স্নো, পাউডার, কাজল-দানি, সাবান। আরো খুঁটিনাটি, নানা-রকম। মেঝের উপর লুটিয়ে আছে একটা শাড়ি। টেবিলের পাশে, তক্তার উপরে হারমোনিয়ম। তার উপরে গোলাপী সায়া ঢাকা ডুগিতবলা। দুই ছড়া ঘুঙুর, একটা মাটিতে, আর একটা তবলার উপরে। ঘরের মাঝখানে, মেঝেয় একটা বই। লেখা রয়েছে, নাটক, ছত্রপতি শিবাজী। মলাটে শিবাজীর ছবি।

সবটা মিলিয়ে কেমন যেন বেহায়া, উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু করুণ। তারপর, ঘুরে ফিরে, এক কোণে কেন্নোর মত যাট পায়ে হরিদাসের দৃষ্টি এগিয়ে গেল। আধো আলো, আধো অন্ধকার ঝাপ্‌সা কোণটা। দুপুরেও ওইরকম থাকে। ওইখানে বিছানা, ঢালুতে ঢলে পড়েছে। শুয়ে আছে তিনজন জড়াজাড়ি করে। গায়ে গায়ে গুটিসুটি হয়ে।

তিনটি রং মাখা মুখ। খানে খানে রং উঠে গেছে। ঠোঁটের রং গালে লেগেছে। কাজলের কালি লেপে গেছে চোখের কোলে। একজনের বেনী আর একজনের কাঁধে পেঁচিয়ে ধরেছে সাপের মত। কারুর শিথিল খোঁপা কারুর বুকের তলায় পড়েছে চাপা। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে তিনজন। বিস্রস্ত, অবিন্যস্ত। চোখে লাগে, এত অগোছালো। নির্লজ্জ বলা যেত। কিন্তু তিনজনই মেয়ে। লজ্জার অবকাশ নেই।

সব মিলিয়ে বিছানাটাও বেহায়া। রাতভর মাতামাতির উৎকট বেহায়াপনা, চটকানো বকুল ফুলের মত ছড়ানো। নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহায় করুণ, গলা থেকে ফেলে দেওয়া উৎসব শেষের তিনটি মালার মত। কিংবা ভাঙ্গা খেলা-ঘরের অগোছালো তিনটি রং-ওঠা পুতুলের মত।

হরিদাস যেন গুনে গুনে দেখল, এক, দুই, তিন। টায়টিকে, গোনাগাঁথা, এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। এক, দুই, তিন, পায়ে পায়ে হরিদাস এসে দাঁড়াল

ঘরের মাঝখানে। খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা গোঁফ দাড়ি। কাঁচা পাকা লম্বা লম্বা চুল। যাত্রার দলের অধিকারীর মত। গোদা গোদা হাত পা, মোটা মানুষ। বুক খোলা আধময়লা সার্ট। যেমন তেমন করে কোঁচা দেওয়া এলোমেলো কাপড়। বয়স হয়েছে প্রায় পঞ্চান্ন, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ, মনে হয় এখনো। এই বেলা ন'টাতেই তার পুরু ফাটা ঠোঁট পানের পিকে প্রায় কালো হয়ে উঠেছে। চোখের পাতা নেই প্রায়। সব মিলিয়ে রাতজাগা নেশাখোরের মত চেহারা হরিদাসের। তার উপর রক্তাভ চোখের চাউনি সবসময় অনুসন্ধিৎসু, সন্দিগ্ধ। নাকের পাটা ফুলিয়ে যেন অষ্টপ্রহর জীবন্ত বিষের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।

হরিদাস হাসল কিনা, বোঝা গেল না। চাপা খুশির আভাস দেখা গেল তার গালের ভাজে। মেঝেয় লুটানো শাড়িটা তুলে ছুঁড়ে দিল দড়িতে। পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলে দিল সশব্দে। দিয়ে ফিরে তাকাল বিছানার দিকে। কোন সাড়া শব্দ নেই। দক্ষিণের জানালাটা তেমনি করে দিল খুলে। সার্সিগুলি নেড়ে দিল ঘটাং ঘটাং করে। ঘুম ভাঙল না তিনজনের।

দক্ষিণের জানালার ধারে বারান্দা। তার নীচে উঠোন। সেখানে হাট-বাজারের গণ্ডগোল। চারদিকে স্বামী-পুত্রের হুঙ্কার, ছেলে বউয়ের কান্না। খুন্তি বেড়ি হাতার ঠন ঠন ঝন্ ঝন্। বাড়িটা ছিল এককালে রাজবাড়ি। এক রাজার বাড়ি। এখন বাইশ রাজার রাজ্য। চৌত্রিশ ঘরে বাইশ ভাড়াটের আস্তানা।

তার মধ্যে এক রাজা হরিদাস। হরিদাস মুখুটি। দোতলায় পশ্চিমের প্রান্ত ঘেঁষে তার সীমানা। জায়গা একটু বেশী পেয়েছে, কেননা এইদিকটা নড়বড়ে, ভাঙাচোরা। সারা বাড়িটা টাল খেয়েছে পশ্চিমে। চাপা পড়লে, এরা সবার আগে। সেইজন্য ভাড়াও কম। সাড়া শব্দও কম এদিকটায়। লোক কম আছে বলে নয়। গুটি ছয়েক ছোট-মাঝারি ছেলেমেয়ে আছে আরো। আছে হরিদাসের স্ত্রী স্নেহলতা। হরিদাসের কড়া শাসনে সবাই জুজুবুড়ি। পা টিপে টিপে চলে। ছয় ছেলেমেয়ের খেলাঘরে ভুতুড়ে বাড়ির ফিস্‌ফিসানি। ইশারায় চোখে চোখে কথা। শব্দ হলেই সর্বনাশ। তৎক্ষণাৎ সেখানে হরিদাসের দাঁত খিচনো ভয়ঙ্কর মূর্তি আর উদ্যত থাবা। ছিঁড়ে ফেলবে যেন।

কড়াকড়ির বাড়াবাড়ি ততক্ষণ, যতক্ষণ ঘুম না ভাঙে এ ঘরের। এ ঘর, লোকে বলে, রাজা হরিদাসের রংমহল। ঘুম ভাঙলে শাসন একটু শিথিল হয়। কিন্তু ঘুম ভাঙছে না। পশ্চিমে হেলে-পড়া বারান্দা। ভাঙা তার রেলিং। তার ওপারে ঘন বন। বন শিউলীর অরণ্য। মাঝে মাঝে বেঁটে ঝাড়ালো রাং চিতের বিস্তার। সেখানে পাতার বুকে রোদ সওয়ার হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, হুটোপুটি খেলছে। আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ছায়া পড়ছে। শরতের সবুজ কালো হয়ে উঠছে। আরো পশ্চিমে টালি-খোলা ছাওয়া পাড়ার মাথা। তারো পশ্চিমে ধোয়া মাজা ঝকঝকে নীল আকাশ। অনেক দূরের একখানি হাসকুটে উজ্জ্বল মুখের মত। সব মিলিয়ে বোঝা যায়, বেলা তার লাগাম ছেড়ে দিয়েছে।

অসহ্য, অস্থির হয়ে উঠল হরিদাস। মেঝে থেকে তুলে ঘুঙুরের ঝুঁটি ধরে দিল নেড়ে। নড়েচড়ে উঠল বিছানাটা। ঘুমন্ত আড়মোড়া ভাঙল দু' একজন। ঘুম ভাঙল না। দুম্ করে হরিদাস ডুগিটার উপর ছুঁড়ে দিল ঘুঙুরের গোছা আর তবলার উপর এক চাটি। দিয়েও মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে রইল লাল ভ্যাবভ্যাবা চোখে।

চম্‌কে উঠে বসেছে একজন। তার কাজল ল্যাবড়ানো ঘুমন্ত চকিত চোখ। আর একজন উঠতে গিয়ে আধশোয়া হয়ে জোর করে তাকিয়েছে মাতালের মত। তৃতীয়া শুয়ে শুয়েই চোখ পিটপিট করছে। কয়েক মুহূর্ত। আবার ঢলে পড়ার উপক্রম করল তিনজনেই।

হা হা করে উঠল হরিদাস, 'না না। না, আর না। অনেক বেজেছে। দশটা এগারটা, বারোটা......

দশটা, এগারোটা, বারোটা? তিন-জনেই আড়ষ্ট হয়ে রইল তেমনি। হরিদাস আঙুল নেড়ে নেড়ে, চাপা মোটা গলায় বলতে লাগল, 'গেট্ আপ্, গেট্ আপ, গেট আপ. ....ঠাট্টা নয়, হাসি নয়, হরিদাসের সোহাগ কণ্ঠের ওইটি হুকুম। তবু পারুল বোধ হয় সর্বকনিষ্ঠ, বড় করুণভাবে আধবোজা চোখে বলল, 'প্রায় ভোর চারটেয় শুয়েছি, আর পনর মিনিট......

'আরে বাপ্‌রে বাপ্!' প্রায় আদরের চমকানিতে লাফিয়ে উঠল হরিদাস, হলধর এলো বলে। রামকানায়েরও দেরি নেই। পাবলিক নিয়ে কারবার। সব টিপটাপ্ তৈরী হয়ে নিতে হবে। সময় নেই, সময় নেই। পনর মিনিট নয়, এক মিনিট নয়......

প্রায় সুর ক'রে বলতে বলতে চীৎকার ক'রে উঠল, 'একটুও নয়।' তেমনি গলায় দরজার দিকে ফিরে বলল, 'বড় বউ—চা, তাড়াতাড়ি। বীণা, বিছানা তুলে দিয়ে যা, ঘর ঝাঁট দে'......

ঘরটা যেন এতক্ষণ ঘুমের ঢলুনিতে ঢালু হয়েছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। হরিদাস একা-ই একশো। অন্ধকার এ ঘর ছেড়ে যাবার নয়। কিন্তু ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই আর এ ঘরে। উঠতে উঠতে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়েছে তিনজন।

তিনজন বেলা, জুঁই, পারুল। বেলা আর জুঁই হরিদাসের মেয়ে। বাপ-মা-হারা মেয়ে পারুল। বেলা, জুঁইয়ের

মাসতুতো বোন। হরিদাসের মৃতা শালীর কন্যা।

রংমাখা মুখে তাদের রূপ ধরা কঠিন। তবু বোঝা যায়। বেলা ফর্সা, দোহারা, একটু খাটো। আলুথালু খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কোমর ভরে। পারুল অন্য ঝাড়ের। তবু মিল আছে বেলার সঙ্গেই। কম বয়সের ছাপ রয়েছে চোখে মুখে গায়ে। তার খোঁপা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। জুঁই শ্যামাঙ্গিনী। একটু লম্বা, একহারা। তার দুপাশে দুই শিথিল বেণী।

তারা চোখেমুখে হাতে পায়ে ঠিক রূপসী নয়। একটি আটপৌরে মেয়েলী চটকে তারা হঠাৎ যেন অনেকখানি সুন্দরী হয়ে উঠেছে। শাণিত দীপ্তি সেই রূপে, হঠাৎ খানিকটা ভালোলাগা, চোখ সওয়া বেলা যাওয়া মিঠে রোদের মত আলো ছড়ায়। দ্যুতি নেই, জ্যোতি আছে। একটি অনাড়ম্বর প্রাণের সুরের মত।

ভার লেগেছে বয়সের। ধারটুকুনি জীবন্ত, উঁকি দিয়ে আছে এখনো। বাইশ চব্বিশ ছাব্বিশ হতে পারে। হতে পারে ছাব্বিশ আটাশ ত্রিশ। কিন্তু জল না পাওয়া চারা গাছের মত ঠেকে আছে যেন আঠারোতে। মরেও বেঁচে আছে অষ্টাদশীর ঝিলিকটুকু।

কারুর আঁচল লুটোচ্ছে। কাঁধ থেকে খসে পড়েছে জামা। রং ওঠা ওঠা তিনটি পুতুল। আঁকা ভ্রূ তুলে, কাজল কালো চোখে, চোরা দৃষ্টিতে তিনজনে দেখলে হরিদাসকে। পরস্পরকে তারপরে। তারপরে সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাসের কোরাস।

সারা রাত্রির গ্লানি সারা গায়ে। ঘুম জড়ানো চোখে, টলে টলে দড়ির কাছে গিয়ে, তিনজনের ছ'টি হাত টান দিল শাড়ীতে। শাড়ী টানতে ব্লাউজ, ব্লাউজ পাড়তে সায়া। যা পেল, তা-ই নিয়ে গায়ে গায়ে হেলান দিয়ে বেরিয়ে গেল তিনজনে।

সেইদিকে একবার দেখে চকিতে ফিরে তাকাল হরিদাস। কুটিল ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলালো চারদিকে। অতবড় চেহারাটা নিয়ে দ্রুত নিঃশব্দে গেল টেবিলের কাছে। সারা উঠিয়ে দেখল বাঁয়া তবলা। ঢাকনা খুলে দেখল হারমোনিয়ম রীডের। ভয়ে ভয়ে সন্দেহে কী যেন খুঁজছে। খোঁজে রোজ সকালে বিকালে সন্ধ্যায়। বড় বড় চকিত উদ্দীপ্ত চোখে, ইঁদুরের মত আনাচে কানাচে।

এ যেন রূপকথার রাক্ষসপুরী। দৈত্য তার হরিদাস। তিন মেয়ে, বন্দিনী তিন রাজকন্যা। রাক্ষসপুরীর গচ্ছিত সোনা, জীবন ও যৌবন। ওরা জানে হরিদাসের মরণ ভোমরার সংবাদ। হরিদাস খোঁজে ওদের অদৃশ্য রাজপুত্রের অন্ধিসন্ধি; যে ওদের নিয়ে উধাও হবে, ভোমরার প্রাণ টিপে মারবে হরিদাসকে। তা দেবে না হরিদাস। প্রাণ থাকতে নয়। ওরা-ই হরিদাসের জীবন সংসার-সুখ-আনন্দ।

খোঁজে আর ফিসফিস করে, কিছু নেই, কিছু নেই। খুশিতে নিঃশব্দ উল্লম্ফনে ঝাঁপ দেয় বিছানায়। বিছানার ওয়াড়, বালিশের তলা সব খোঁজে। চুলের কাঁটা, ফিতে, টুকিটাকি জিনিস। হঠাৎ এক টুকরো কাগজ।

ধক করে ওঠে বুক। ফেটে বেরোয় চোখ। বিনবিন করে ঘামে সারা মুখ। ফিসফিস করে পড়ে রুদ্ধনিশ্বাসে, প্রেয়সী নিশিদিন সতর্ক চোখ ঘিরে থাকে তোমাকে। আমি ফিরি ছায়ার মত। অসহ্য! মনে হয়, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি সহস্র চোখের সামনে। হৃদয়ের এ বিরহ যাতনা...

চাপা মোটা স্বরে আতঙ্কে আর্তনাদ ওঠে হরিদাসের গলায়। পর মুহূর্তেই হেসে ওঠে গোঙা সুরে। নিশাচর রক্ত চোখে বহে খুশির বন্যা। পার্ট! থিয়েটারের পার্ট, নায়িকার প্রতি নায়কের আকুতি। গতকাল রাত্রে যে নাটক করে

এসেছে। বেলার প্রেমপত্র নয়, জুঁইকে ছিনিয়ে নেওয়ার চিঠি নয়, পারুলকে আলিঙ্গনের ডাক দেয়নি কেউ। শুধু পার্ট!

চাপা নিশ্বাসের শব্দে চমকে ফিরে তাকায় হরিদাস। বিষাদ মূর্তি স্নেহলতা। হরিদাসের বড় বউ। হাতে চায়ের কেৎলী আর গেলাস। বেলার মত দোহারা, তার মত ফর্সা। আটচল্লিশে বাঁধুনি ঢালা-ঢালা, মাথার চুল রূপালী। যেন রূপালী দুই বালুচরের মাঝখানে শ্রাবণের লালজল, গাঁদার মত চওড়া সীঁথিতে লেপা সিঁদুর।

তার দিকে ফিরে খুশির আবেগে বলে উঠল হরিদাস, পার্ট!

পরমুহূর্তেই তার গালের ভাঁজগুলি কড়া হয়ে উঠল। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। কঠিন অপলক হল রক্তাভ চোখ। আর আরক্ত ছলছল চোখে, কেৎলী গেলাস টেবিলে রেখে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল স্নেহলতা।

স্বামী-স্ত্রীর এমনি ভাব চলে আসছে আজ ছ বছর। যবে থেকে দেশ ছেড়ে এসেছে, দেশ ভাগাভাগির পর। ধলেশ্বরীর ওপারের শ্রীনগর ছেড়ে আসার এক বছর পর থেকে শুধু এমনি চাওয়া। এমনি চোখ ছলছল করা। আর একদিকে পাথুরে কাঠিন্য, প্রস্তরবৎ চাউনি, অবিচল ও নিষ্ঠুর।

তবু মুখ তোলে স্নেহলতা। বলে, 'আর কতদিন?'

হরিদাস বলে, যতদিন চলে।

ব্যাকুল গলা কেঁপে ওঠে স্নেহলতার, 'ওরা যে মেয়ে! তোমার ছেলে নয়।'

ঃজানি।

ঃতবে আর কতদিন? ওরা যে মেয়ের বয়স পার হয়ে গেল। মা হওয়ার বয়সে এসে ঠেকে আছে খালি কলসীর মত। চেয়ে দেখনা, হাতে পায়ে কোমরের গোছ। জন্মো বিধবার মত লক্ষ্মীছাড়ী গলার কাঁটা করে রেখেছ। মনেও কি পড়ে না, ওই বয়সে মুখুটি বাড়ির বড় বউকে?...

ঃচুপ! 'চু-প'। চাপা মোটা গলায় ধমকে ওঠে হরিদাস। যেন কোন অবৈধ কথা উচ্চারণ করেছে স্নেহলতা। যে কথা নির্বাসিত হয়েছে বহুদিন হরিদাসের বন্ধপুরী থেকে। খোঁচা খাওয়া জানোয়ারের মত চোখ দুটো তার আরো গর্তে ঢোকে, জ্বলে অঙ্গারের মত ধুকধুক। বিশাল বপু, মূর্তি তার ভয়ঙ্কর দেখায়। শির-ফোলা গলায় বলে চিবিয়ে চিবিয়ে 'জানি জানি। তারপর? এই রাজবাড়ির ভাড়া, তোমার চুলোর আগুন, হাঁড়ির পিন্ড, আরো ছ'টি ছেলেমেয়ে, তুমি, আমি, আমরা? আমরা কি করব? আমাদের দিন, রাত্রি, গতর, পেট—

বলতেও ভয়। আতঙ্কে যেন কাঁপে হরিদাসের পুরুষগলা।

স্নেহলতা বলে, 'তার জন্যে বলি হবে ওরা?'

ঃকিসের বলি?

ঃওদের প্রাণ, মন, দুঃখ। ওদের মেয়ে প্রাণ! তুমি বাপ, মেসোমশায় হয়ে পার না রক্ষা করতে। ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ...

ঃথাক। ঢের শুনেছি, অনেক হয়েছে। হরিদাসের তিক্ত তীব্র স্বর চাবুক মারে স্নেহলতার মুখে। যুক্তিহীন আক্রোশে ফুলে যেন উদ্যত হয় হিংস্র আঘাতের জন্য। থতিয়ে গিয়ে স্নেহলতা ঝুঁকে পড়ে কাজে।

সরে আসে হরিদাস। আবার খোঁজে। কোথায় না জানি আছে কোন অন্ধিসন্ধি। দৈত্যপুরীতে শত্রু স্বয়ং দৈত্যপত্নী। বিশ্বাস কি! কখন সর্বনাশ আঘাত করবে বজ্রের মত। দিবানিশি পাতার শিরে শিরে পোকার মত ফিরছে সে মেয়েদের পিছনে পিছনে। কাছ ছাড়া করে না কখনো।

যত ভাবে, তত আরো অসহায় ক্রোধে জ্বলে হরিদাস। অসহায় ক্রোধ শুধু নয়, যেন ধুকুধুকু স্পন্দন যাবে বন্ধ হয়ে হৃৎপিন্ডের।

মনেও কি পড়ে না সেইদিন! ছ' বছর আগের দিন! ভাগাভাগি হল দেশ। শ্রীনগরের মুখুটি বাড়ির বড় শরিক পালিয়ে এল দেশ ছেড়ে। সেখানে দুধে-ভাতে ছিলনা। ছিল মোটা ভাত কাপড়ে। বিলে ছিল শাপলা, কলমি, জঙ্গলে ছিল কচু। বুক দিয়ে হিঁচড়েও চলা যেত। বুঁধির দৌড়েও ভাগচাষীর কাছে জেতা যেত দু' কাঠা লাল চাল।

আর এখানে! এত কঠিন, বুক হিঁচড়েও চলা যায় না। ফেটে ফেটে রক্ত বেরোয়। প্রাণ যায়। একটা বছর পাগলের মত ঘুরেছে হরিদাস। অফিসে আদালতে সেকরা আর মুদী দোকানে। হিসাব লেখক হয়েও যদি ঢোকা যায় কোথাও। আর দিনে দিনে ভেঙেছে পুঁজি। হায়রে পুঁজি! তাঁবার তারে লেপা সোনা। চামড়ার ঘসটানিতে শুধু ক্ষার। ফুটো পয়সা নিয়ে ছেলেমানুষ হামলা করে খাবারের দোকানে। দোকানী হাসে নির্বিকার। সংসারে বুড়ো মানুষের সেই পুঁজি যে শুধু অপমান।

সেই সময়, বৈশাখের ক্ষুধার দাহ নিয়ে ফিরতি পথে দেখা দিল পাড়ার বখাটে ছেলেটা। দল বখাটের শিরোমণি। আড্ডা দেয় রকে বসে। একে তাকে কাটে টিপ্পনী। গান গায়; কখনো, বিশ্বজয়ী

গাণ্ডীবের মত চ্যালেঞ্জ করে ভীষ্ম কর্ণকে। কখনো ষড়যন্ত্রী কণ্ঠে হাসে শকুনি হয়ে কিংবা অট্টহাসে পাড়া কাঁপায় কেদার রায়ের গোলন্দাজ কার্ভালোর বীরত্বে। হরিদাস ভাবত, এই রকবাজ-গুলির হতভাগ্য বাপেদের কথা। মেয়ের চেয়েও গলার কাঁটা, এই জন্মবেকারগুলিকে গিলতে দেয় কে? তারই নেতা, নাম শিবনাথ। ডাকে সবাই শিবে নয়তো শিবু। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কথা বলে নাটুকে ঢংএ। কিন্তু বোকা বোকা চাউনি ও হাসি।

হরিদাসকে ডাকল, 'এই যে কাকা-বাবু।'

কাকাবাবু? ফিরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত হা হয়ে গেল হরিদাস। একে ক্ষুধার দাহ। তার উপরে বিরক্তি ও বিস্ময়। কথা বলতে পারেনি। একেবারে কাকাবাবু। যেন কত কালের!

শিবু বলল, "আপনার মেয়ে গান করতে পারে। আমাদের ক্লাবের একটা ফাংকসানে যদি গাইতে দেন, এই পাড়াতেই...

হাত কচলে কচলে হাসিতে একেবারে বিগলিত। কিন্তু গান গাইতে পারে? কে, কোন্ মেয়েটা? ও হ্যাঁ, জুঁই, জুঁইটা দিনরাত্রিই গুনগুন করে। সে খবরও জানে এরা? হুঁ পাড়ার নাড়িনক্ষত্র না জানলে অতক্ষণ রকে কাটে কি করে। খেঁকিয়ে উঠতে গিয়ে থমকে গেল হরি-দাস। থাক, চটানো ঠিক হবে না। জানা-শোনা হওয়া ভাল। সম্মান! হিন্দুস্থান, কলকাতার এ মফঃস্বলে আজকে কে কার সম্মান দেখছে খতিয়ে। রাজবাড়ির একুশ ভাড়াটের সংবাদতো আর অজানা নেই। মত দিয়ে ফেলল সে।

সেই শুরু। জুঁই একলা নয়। পারুলও একটু আধটু গাইতে পারে। চেষ্টা করলে নাকি নাচতেও পারে। বেলার আবৃত্তির দিকে ঝোঁক আছে। জানত না শুধু হরিদাস। স্নেহলতার ঘোরতর আপত্তি। কে শোনে। যা তা হলেই হল। হরিদাস সঙ্গে নেই? হরিদাসকেও ডেকে নেয় নিমন্ত্রণ করে। খাওয়ায় এটা সেটা। খাতির করে। বিরক্তও যে না হয় হরিদাস, তা নয়। ভয় পায়। কিন্তু খাওয়াটা! খাতিরটা! ওটা নেশার মত ধরে যাচ্ছে।

আর ওই তিন জুটির তো কথাই নেই। হঠাৎ যেন মাঝে মাঝে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অগণিত ভক্ত ঘুরঘুর করে কাছে কাছে। মন ভোলাবার সব পেখম খোলা গোলা পায়রার দল। তিন বোন হাসে খিলখিল করে।

প্রথম প্রথম একটু আধটু গান আবৃত্তি। তারপরে আর একটু, ছোট-খাটো পার্ট। আস্তে আস্তে আড় ভেঙেগ যায় লজ্জার। একদিকে ধিক্কার দুর্নাম। আর একদিকে প্রচুর নাম। পাড়ার, বে-পাড়ার ছেলেদের ভিড়। হাফ প্যাণ্ট থেকে গোঁফ কামানো, সকলের বেলাদি, জুঁইদি, পারুলদি আর কাকাবাবু।

হঠাৎ শিবু একদিন বলল, 'কাকাবাবু এমনিতে আর নয়।'

হরিদাস বলল, 'কিভাবে?'

শিবু বলল মাথা ঝেঁকে, 'পয়সা চাই। টাকা দিতে হবে, ওসব ফোকটে আর হবে না, বুঝলেন। স্টেজ ভাড়া করতে তিন শ টাকা দেবে, আর শালা পার্টের জন্য টাকা দেবে না? তাও আবার মেয়েমানুষ।

শালা বলে একটু থতিয়ে গেল শিবু। কিন্তু মানিয়ে নিল ঠোঁট বাঁকিয়ে। বলল, আমার বাবা ওসব নেই! ভদ্দরলোক তো কি! কাজ করে টাকা নেওয়া যায়, নাটক করে টাকা নেওয়া যায় না? আরে, আমি যে আমি শিবে গাঙ্গুলী, শালা রাতপিছু পাঁচ টাকা না দিলে শিবে গঙ্গোর অর্জুন, কার্ভালো আর শকুনি দেখতে হবে না। শিশির ভাদুড়ি না হতে পারি, শিবে গঙ্গো তো!'

টাকা! টাকা? একেবারে সোজা হৃৎপিণ্ডে এসে বিঁধল কথাটা। একে বলে মরমে পশিল গো! সেই হল পাকা-পাকি বন্দোবস্ত।

বাতাসে বাতাসে গেল সংবাদ। কাছে কাছে, দূরে দূরে, দূরান্তরের ক্লাব আর অ্যামেচার দলগুলি ছুটে এল মেয়ে অভি-নেত্রীর জন্য। প্রথম প্রথম বাহন শিবু। দরাদরির ভার শিবুর। ভদ্রলোকের মেয়ে, সেটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ভারও তার। খবর্দার! বে-ইজ্জৎ না হয়।

কী বিচিত্র নগদ মূল্য! হরিদাসের লুব্ধ চোখ হল সতর্ক। মূলধন তিনটি, তিনটি মেয়ে। ওখানে না হাত পড়ে কারুর। টাকা, সত্যি টাকা! অনায়াসলভ্য। অভাবের দুর্গম্বারে ধরেছে ফাটল। বিচিত্র-বেশিনী লক্ষ্মী দিয়েছে দেখা। মেয়েদের মন নিয়ে কথা। যদি একটু এদিক ওদিক হয়, দূর হয়ে যাবে লক্ষ্মী।

হরিদাস কাছছাড়া করে না শুধু নয়। উইংসের পাশ থেকে গ্রীনরুম পর্যন্ত নিঃশব্দে ভূতের মত ঘুরে ঘুরে ফেরে। সিরাজদ্দৌল্লা যখন গ্রীনরুমে লুৎফাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাদের বাড়িটা কোথায়?'

মাঝখানে ছুটে এসে দাঁড়ায় হরিদাস। ও তো লুৎফা নয় এখন, পারুল। যা বলো, আমায় বলো। স্টেজের বাইরে যদি ঘোরে চন্দ্রগুপ্ত হেলেনের পেছনে কিংবা কর্ণ দাঁড়ায় মাতা কুন্তীর পাশে, হরিদাসের পোকা খাওয়া চোখের পাতা অপলক নির্নিমেষ সেখানে। কুন্তী-হেলেন-লুৎফা নয়, বেলা-জুঁই-পারুল। যা কর, তা মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে। মূল্য তার গুণে গুণে নেবে কড়ি হরিদাস।

তারই প্রথম সোপান হিসাবে, লুব্ধ সন্দিগ্ধ চোখের কামান নিঃশব্দে ফিরল শিবুর মুখোমুখি। আর এক পাও নয়।

তা বললে কি হয়! শিবু ওসব বোঝে কম। সে আসে কামানের তলা দিয়ে, এপাশ ওপাশ দিয়ে। এ এক নিঃশব্দ গাদি খেলার মত। পথ যত আটকায় হরিদাস, শিবু আসে অবলীলাক্রমে। মুখে কিছু বলে না হরিদাস, মায়াবী দৈত্যের মত ছায়া হয়ে ফিরে। শিবু অত বোঝে কি বোঝে না, কে জানে। সে বলে, আসুন বেলাদি, ঘসেটির পার্টটা আপনার একটু দেখি।' কিংবা 'জুঁইদি, আমি কৃষ্ণ, ট্রাই করতো সুভদ্রার পালানোটা।' বলে পারুলকে, 'দক্ষ-ভীতি করিও না সতী। রুদ্র এ বক্ষমাঝে বীণাসম বাজিবে যে তুমি!'

মনে মনে হরিদাস বলে, 'শয়তানের বাচ্ছা!' চোখ রাঙগায় তিন মেয়েকে। চোখ রাঙগায় সর্বত্র, পথে ঘাটে গাড়িতে, গ্রীন-রুমে, উইংসের ধারে। ড্যাবা ড্যাবা চোখে চায় উত্তেজিত অন্ধকার মঞ্চে।

আজ ছ' বছর ধরে পাকাপাকি হয়েছে ব্যবস্থা। বর্ষা শেষ থেকে মরসুম শুরু হয়। শারদ উৎসবের মাতামাতি থেকে, কালবৈশাখী পর্যন্ত, প্রোগ্রামের ইতি নেই। প্রায় প্রতি রাত্রে নাটক, হরিদাসের সারা বছরের খরচ। এসময়ে তার চোখ আরো উদ্দীপ্ত হয়, আরো সন্দিগ্ধ, অনুসন্ধিৎসু।

কাল রাত্রে নাটক গেছে। আজো রাত্রে আছে। দুদিন বাদেই, পুজোর দিন পুরোপুরি। তারপরে আবার, আবার...

ক্রুদ্ধ চোখে ফিরে তাকাল সে স্নেহ-লতার দিকে। বড় বউ মানে না তার কালা-কানুন। বেআইনী কথা বলে আইন রচয়িতার ঘরে। ঘর ঝাঁট দেওয়া থাক, ফিরে যাক স্নেহ তার কাজে। এ ঘরে আসছে তার তিন মেয়ে, এখানে স্নেহলতার ওই চোখের চাউনিও নিষিদ্ধ।

তাই যায় স্নেহলতা।

তিন মেয়ে আসে। সদ্যস্নাতা, এলানো চুল। ঘাড়ে পিঠে চোখে মুখে চূর্ণ কুন্তল। তেল নিষিদ্ধ অভিনয়ের দিনে। সস্তা শাম্পুতে তিন এলো-কেশিনী। মুক্তা বিন্দুর মত ঝিকিমিকি জলকণা চুলে। রঙগীন শাড়ির ফেত্তাতেও যেন তিন বৈরাগিনী। এখনো যেন ঘুম ঘোরে আঁচল লুটোয়, জামার বোতামে বিরাগ।

গায়ে গায়ে ঢলে ঢলে হেসে হেসে আসে তিন বোন। চাপা একটি সুগন্ধের সঙ্গে বিচিত্র একটু হাসির নিক্কণ। সব থেমে যায় ঘরে এসে, হরিদাসের কাছে। হরিদাসের এ বিচিত্র রংমহল। আধো অন্ধকার ঘরটায় হাওয়া ঢোকে না। অদৃশ্য দৈত্যের থাবা যেন ঘিরে আসে চারদিক থেকে। হাসতে ইচ্ছে করে না।

রং ধোয়া তিনটি মুখ। তবু ভোরের তাজা ফুল নয়। ধুয়ে ধুয়েও গ্লানি কাটে না চোখের কোলের। বৃন্তহীন ফুলদানির গুচ্ছ। অনেক হাতের পেষণের ও গন্ধের কলঙ্ক কাটে না সারা গায়ের। আজ শুধু অবসাদ।

একদিন ছিল খেলা খেলা। কিছুটা ভালো লাগা। আজ মেসিনের ডায়ামেটারে ঘূর্ণন শুধু কর্তব্যের খাতিরে। একটু এদিক ওদিক নয়। প্রাণ খুলে হাসলেও নিষ্পলক সর্পচোখ দেখা দেয় সামনে।

স্নেহলতা মা ও মাসী। কিন্তু কথা বলে না তিনজনের সঙ্গে। যেন হরিদাসের ব্যবসার দাসী ওরা সেধে হয়েছে।

তিন বোন এল। এসে চা ঢেলে নিল গেলাসে।

তারপর শুরু হয় রাত্রের প্রস্তুতি। প্রথম উদ্যোগ নেয় হরিদাস নিজেই। পণ্ডিত মশাইয়ের ভূমিকা। রুক্ষ মূর্তি নয়, হেসে ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আজ কি প্লে? চাণক্য?'

নিজেই খুঁজে পেতে বের করে বই। মুরার পার্ট নিয়ে বসে বেলা, ছায়া নেয় পারুল, জুঁই করে পায়চারী হেলেনের ভূমিকায়।

বোঝে কতটুকু কে জানে। সমঝদারের
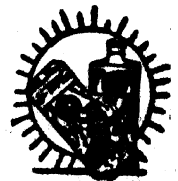
মত খুশি রক্ত চোখে দেখে হরিদাস। মাথা নাড়ে, বলে, বাঃ! তারপর গান, নাচ, রিহার্সেলের পর রিহার্সেল।

পাঠে বসিয়ে পণ্ডিতমশাইই যায় সংসারের অন্য কাজে। অমনি ছড়িয়ে পড়ে ঘরময় পার্টের কাগজ। পায়ের নূপুর যায় ছিটকে। হারমোনিয়মটা নিঃশব্দে পড়ে থাকে শাদা রীডের দাঁত বের করে।

তিন বোন হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয়। বলে, নিকুচি করেছে চাণক্যের।'

আর একজন, 'মাইরি আর পারিনে চন্দ্রগুপ্তের সংগে প্রেম করতে।'

পারুল বলে ঠোঁট ফুলিয়ে, 'আর আমাকে যে কেঁদে কেঁদে গাইতে হয়?'

হেসে ওঠে তিনজনে। বুঝি নিজে-দেরই বিদ্রূপ করে ওরা হাসে। ওইটুকু অবাধ স্বাধীনতা ওদের।

হেলে পড়া, বেঁকে পড়া রাজবাড়ির এ ঘরটা হঠাৎ সত্যি রংমহল হয়ে ওঠে। হাড়ল গর্তগুলি এবার হাসে মিটিমিটি চোখে। দৈত্যপুরীর মন্ত্রে-মরা রাজপুত্তেরা যেন।

পশ্চিমের ভাঙ্গা অলিন্দের ওপারে বন শিউলীর বনে রোদ খেলা করে। রাংচিতের ঝাড়ে লাগে ধীরি ধীরি নাচ। রংপাখা মেলে ওড়ে ফড়িংএর ঝাঁক। দূর আকাশের হাসকুটে মুখখানি অলিন্দের ধারে এসে ভিড়ে যায় এই তিনজনের সংগে। তিনজন হয় চারজন।

পারুল বলে ফিসফিস করে, 'জানিস ভাই, যে লোকটা কালকে আমার স্বামীর পার্ট করছিল, সে লোকটা কি পাজী! হাত দুটো টিপে টিপে মাইরী ব্যথা করে দিয়েছে।

জুঁই বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে, 'বোধ হয় সত্যি স্বামী হতে চেয়েছিল।'

পারুল চিমটি কেটে বলে, 'তোর মুখপুড়ি।'

তারপর ছোট্ট মেয়েটির মত বলে গাল ফুলিয়ে, 'যা হাবলা চেহারা।'

সেতারের প্রথম আলাপের মত হাসি শুরু হতে থাকে। এদিকে ওদিকে ছোট ছোট ভাই বোনগুলি শুরু করে উঁকি-ঝুঁকি মারতে।

বেলার লজ্জা করে। বড় কি না। তবু বলে থেমে থেমে, 'কেন, যে লোকটা আমার বাবুর পার্ট করলে? সে ব্যাটা তো দু' দুবার গায়ের উড়নীই ফেলে দিল আমার গায়ে। আবার বলে কিনা,—

ব'লে বেলা দেখায় নকল ক'রে— 'মাইরী, এরপরে কারুর সংগে আর নাটক করতে পারব না জানেন বেলাদি।'

জুঁই বলে টেনে টেনে চোখ ঘুরিয়ে, 'মা-ই-রী!'

তারপরেই হাসি। আলাপের পরে হাসি ওঠে গমকে। এ শুধু হাসি নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে হাসির চেয়েও তীব্র কান্না, তাদের মেয়ে জীবনের অপমানের।

তারপরে জুঁই বলে, 'আর সেই পাঁচটাকার নোট?'

ঃ কোন্ পাঁচ টাকা?

ঃ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সিরাজদ্দৌলা নাটকে? বিশ্বাসঘাতক মির্জাফর, দাড়ি নেড়ে পাঁচটাকার নোট ফেলে দিয়ে গেল আমার পায়ের কাছে। দিয়ে আবার দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল, আলেয়া নোট তোলে কি না তোলে।

ঃ তারপর?

ঃ আমি অমনি গ্রীনরুমের এক জায়গায় লুকিয়ে দেখতে লাগলাম, মির্জাফরের কীর্তি। আর নোটটা মাইরী, চোখে পড়্‌তো পড়্ পেণ্টারের চোখে। সে বেচারী কুড়োতে যাবে, মির্জাফর লাফিয়ে হাজির, 'আমার, আমার, পড়ে গেছে হেঁ হেঁ......

আঁড়িতে এসে হাসি মাতাল হয়ে ওঠে। দৈত্যের ছম্‌ছমে মায়াপুরীতে এক মানুষিক মোহের ছড়ায় রং। হাসি শুনে রান্নাঘরে বসে, গায়ে কাঁটা দেয় স্নেহলতার। যেন ঘাড় মটকাবার উল্লাসে হাসে সর্বনাশী প্রেতিনীরা।

এমনি সময়, চকিতে আবির্ভাব হয় হরিদাসের। ফিরে দেখে না মেয়েদের দিকে, কথাও বলে না। যেন হঠাৎ এসে পড়েছে। পোকা খাওয়া নিশাচর চোখে তাকায় দক্ষিণের উঠোনে, নয়তো পশ্চিমের বনে।

হঠাৎ হাসি বন্ধ। যেন কোন মুখ খোলা পাতালের নির্ঝরের কল্‌কল্ শব্দ উঠেছিল সপ্তমে। পাথর চাপা প'ড়ে সে শব্দ হঠাৎ হারায়। রুদ্ধশ্বাস বাতাস আবর্তিত হয় নড়বড়ে ঘরের কোণে কোণে। কিম্ভূতাকৃতি মাকড়সার ঝুলে-গুলি মাথা নাড়ে জুলজুলে চোখে।

ছত্রাকার ছড়ানো পার্ট চটপট কুড়োয় আবার তিনজনে। ব্যস্ত হয়ে বলে বেলা, 'হে পুত্র, দাসীপুত্র নহে শুধু তোর পরিচয়।'

বেলার দিকে আড়চোখে দেখে জুঁই বলে, 'কী আশ্চর্য দুখানি নয়ন সেই মৌর্য রাজপুত্রের।'

পারুল বলে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, 'সখী, গ্রীক-নন্দিনীর নীলচক্ষু যে হৃদয়

করেছে জয়, সে হৃদয় কালোচক্ষু দেখিতে না পায়।'

হরিদাস হেঁড়ে গলায় স্নেহ ঢেলে বলে, 'বাঃ! আজ নির্ঘাৎ তিন বোনের তিন মেডেল!'

তারপর আসে আধবুড়ো রামকানাই আর বুড়ো হলধর। রামকানাই অপেশল ডিগডিগে ঝাকড়া চুলো, দন্ত বিকশিত নিয়ত। কোনকালে ছিল সে এক যাত্রার দলের ম্যানেজার। লোকে বলে রামকানাই অধিকারী। আর অপুরোদন্তী মাজা-ভাঙ্গা বুড়ো হলধর ছিল তার ড্যান্স মাস্টার। লোকে বলে, নাটুয়া হলধর।

রামকানাই লিকলিকে হাতে ধরে হারমোনিয়ম। নাটুয়া হলধর কোমর ঘুরিয়ে এবড়ো খেবড়ো মেঝেয় গুণে গুণে পা ফেলে বলে, 'এক্-দুই-তিন্, এক-দুই-তিন-চার...

শুরু হয় নাচ ও গানের রিহার্সেল। নাচের চেয়েও তিন বোনের শরীর কাঁপে থরো, থরো, আধা কান্না আধা হাসিতে। ঢিলে স্ক্রু নড়বড়ে মাজা হলধরের যে পরিমান দোলে, চারবার পা ফেলতে তার অনেক বেশী সময় লাগে। আর তিন মেয়ের শরীরের কাঁপুনি দেখে সে ভাবে, এরা খাঁটি নৃত্য-পটীয়সী। নইলে এমন পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপায় কি করে।

তা ছাড়া চোখও ধাঁধায় একটু। তিন মেয়ের লুটনো আঁচল আর শিথিল জামার সুডৌল বাঁকের দোলায়, শীর্ণ নালীকণ্ঠে শ্বাস-রুদ্ধ হতে চায়। রামকানাই বলে ওঠে, 'উ হুঁ হুঁ হল না। চোখে একটু ঝিলিক হান্‌তে হবে।

বেলা বলে, 'কেমন করে?'

পারুল বলে, 'এমনি ক'রে।' ব'লে চোখ ঘুরিয়ে হাসে।

জুঁই বলে, 'হল না। এই দ্যাখ্', বলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, বুকে এক বিচিত্র কাঁপন দিয়ে, ভ্রূ বাঁকিয়ে ছোট চোখে চায়।

রামকানাই ও হলধর যুগপৎ বলে ওঠে, 'এ্যাই, এ্যাই ঠিক।'

আর কোনক্রমে যদি হরিদাস কাছ-ছাড়া হয়, তবে তো কথাই নেই। তিন বোন ঘিরে বসে দুজনকে।

পারুল বলে, 'রামকানাইদা'—

রামকানাই সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, 'উহুঁ, দাদা নয়। তোমার বাবা বারণ করেছে। কাকা বল।'

জুঁই বলে, 'রামকানাইকাকা—

ঃ বল।

বেলা বলে, 'বল' বললেন কেন? বলুন, 'বল মা!'

হাসতে গিয়ে হাসি আটকায় রামকানাইয়ের গলায়। বোকা বোকা হেসে বলে, 'হেঁ হেঁ', নিজের মা'কে ছাড়া, মানে, কখনো কাউকে, মানে—

মানে'র মানে সব চাপা পড়ে যায় হঠাৎ তিন মেয়ের গলার উচ্ছ্বসিত খিল-খিল হাসিতে।

আবার আবির্ভাব হরিদাসের। কী ষড়যন্ত্রে মাতলো তিন মায়াবিনী!

তারপর আসে শিবু। অমনি বাকী তিনটি পুরুষের মুখে নামে অন্ধকার। দেখা দেয় বিরক্তি, বিকৃতি। মনে মনে ফোঁসে হরিদাস। মনে মনে সুতীক্ষ্ম নখে নখ ঘষে আর বলে, 'শুয়োরের বাচ্চা!'

আর তিন মেয়ে এবার সত্যি সত্যি চোখে হানে ঝিলিক। তিন বোনের নয়ন-জ্বলিতে নিঃসৃত ঢল খাওয়া দেহ সরোবরে, লাগে ঢেউ টাবুটুবু পূর্ণ অষ্টাদশীর। এতক্ষণের বিদ্রূপ বেহায়া-পনার পরে লজ্জা এসে ভারি করে ছয়টি চোখের পাতা। গালে ফোটে বিচিত্র রং, ঠোঁটে হাসি নাম-না-জানা। আড়ে আড়ে দেখে শিবুকে আর চোখোচোখি করে পরস্পর তিন বোনে।

শিবু যেন নেশার ঘোরে মাতাল। না এসে পারে না একবার। সে এলে, হাওয়া বহে অন্যদিকে। পশ্চিমের বনশিউলী মেঘলাভাঙ্গা রোদের টোপর পরে যেন মুখ বাড়িয়ে ধরে অলিন্দে। দক্ষিণের উঠোনের ছাতিমের আয়ত-চোখ পাতা মাথা নাড়ে রহস্যময়ীর মত। শিবুর কথা শুনেই পরিবেশ যায় পাল্টে। বলে, 'শালা, পড়তা খারাপ এ বছরের, বুঝলেন কাকা-বাবু। মাত্তর দুটো বায়না মিলেছে, পৃথিবরাজ-সংযুক্তার পৃথিবরাজ আর অর্জুন। তাও অনেক কুতিয়ে কাঁতিয়ে। তবে পৃথিবরাজটা নতুন, সংযুক্তা হরণের সিন্‌টা শালা যদি মাৎ করতে পারি, ফের বায়না জুটবে।'

তিন বোন নিঃশব্দ হাসিতে গড়িয়ে পড়ে গায়ে গায়ে। হরিদাস দাঁতে দাঁত ঘষে হাসে। বলে, 'তা ঠিক।'

প্রতিধ্বনি করে দুই মাস্টার, 'হেঁ হেঁ!'

শিবু বলে, 'নইলে মাইরী, মন-মোহিনী অপেরার সঙ্গে চলে যাব পাড়াগাঁয়ে।'

বেলা বলে উদ্বেগ চাপা গলায়, 'পাড়াগাঁয়ে?'

শিবু বলে, 'হ্যাঁ। কি করব, বেকার তো থাকতে হবে না। আর পাড়াগাঁয়ের লোকগুলির ভাল লেগে গেলে, একটু খেতে টেতে দেয় ভাল।'

অমনি তিন বোনের চোখে নামে অসময়ের মেঘ অন্ধকার। হরিদাস বলে, 'সেই ভাল।' তবুও জুঁই বলে ঠোঁট উল্টে, 'আমরা বোধহয় চান্স পাব পাবলিক স্টেজে।'

পারুল বলে, 'নয় তো ফিল্‌মে।

পরমুহূর্তেই বারুদের প্রথম জ্বালা নীল ঝিলিকের মত তীব্র বিদ্রূপ হাসি ফোটে তিন বোনের ঠোঁটে। হরিদাসের রক্ত-জ্বলন্ত চোখ শাসায় নিঃশব্দে। যেন আরো কোণ্ ঘেঁষে ওৎ পাতে, শানায় নখর।

কিন্তু অবাক ব্যাপার! জ্বলন্ত চোখের শাসন, মেয়ে তিনটে দেখেও দেখে না এখন। টেরে টেরে দেখে শিবুকে। হরিদাসের বুক কাঁপানো-হাসি কেন যে হাসে ওরা থেকে থেকে। যেন ওদের নিজেদের মধ্যে কি একটা জানাজানি আছে। দৈত্যের প্রাণ-ভোমরার খবরটা বলাবলি করে নাকি ওরা।

আরো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে হরিদাস। শিবু তখন বলে, 'আজ কি? চাণক্য?'

ব'লে বেলার সঙ্গে করে চাণক্যের অভিনয়। বেলা করে মুরা। তখন কেমন একটা চাপা চাপা ব্যথা ও জ্বালা দেখা দেয় জুঁই ও পারুলের চোখে। সে খুবই ক্ষণিক।

তারপরেই শিবু চন্দ্রগুপ্ত হয়ে প্রেম করে হেলেনের সঙ্গে। কর্তব্যরত প্রেমিক চন্দ্রগুপ্তের মত কাঁদায় ছায়াকে। পারুলের চোখে তখন সত্যি জল দেখা দেয়।

এ সময়ে বোঝা যায়, অভিনয়ে দক্ষ কতখানি তিন বোনে। কিন্তু, শিবুর মত

বোধহয় কেউ পারে না সেই সোনারকাটি ছোঁয়াতে।

তারপরেও শিবু বলে, কাল কি? কিছু নয়? পরশু? তারপরে? দেবলা-দেবী? মীরকাশিম? অদ্ভুত মুখস্থ তার। খিজির, কাফুর, আলাউদ্দীন, নয়তো মীরকাশিম, পিদ্রুস, মির্জাফর, তিন বোনের সঙ্গে সবগুলি প্রক্সি সে একা একা দেয়।

প্রক্সি দেওয়ার জন্য কি না কে জানে। কৃতজ্ঞতা ফোটে তিন বোনের চোখে। কৃতজ্ঞতা যেন অনেকখানি অনু-রাগে ভরা। তার ফাঁকে ফাঁকে ওই বন-শিউলীবনের রোদে ছায়ার মত ব্যথার আনাগোনা। হঠাৎ মনে পড়ে, বোতাম খোলা বুকের। আঁচল অগোছালো। সাবান ঘষা মুখটা রয়েছে খস্খসে।

বেলা সন্তর্পণে চুল-ওঠা কপাল ঢাকে। জুঁই লুকিয়ে দেখে তার বুকের অন্তর্বাস। দেখে পারুলও।

শিবু দেখে একে একে তিনজনকে। হঠাৎ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বাবা বলেছে, আমি নাকি শালা আইবুড়ো বোনটার চেয়েও বড় কাঁটা। ঘাড় ধরে বার করে দেবে।'

তারও চোখে ব্যথার ছায়া।

রান্নাঘরে বসে, শ্রীনগরের মুখুটি বাড়ির বড় বউয়ের ভয়ে হাত পা কাঁপে থরথর করে। শুধু ডাল পোড়ে উনুনে।

তারপর, বেলা না গড়াতেই সাজো সাজো রব। তাড়া দেয়, হরিদাস। ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বায়নার টাকা। কখনো পঁচিশ মাইল, কুড়ি মাইল, দশ মাইল দূরে। পাড়ার পাশের পাড়াতেও কখনো বা। সে এক বিচিত্র জগৎ। মানুষ যে কতরকম! কেউ গায়ে পড়ে চেহারা দেখায়। লোভ, রেষারেষি, অতি ভদ্রতার নাটুকেপনা। কোথাও বা অমুক জায়গার বিখ্যাত অ্যামেচার সামন্দেশ, মদ না খেয়ে পারেন না পার্ট করতে। শুধু ঢলে ঢলে পড়েন ভাড়াটে অভিনেত্রীর ঘাড়ে।

হরিদাস এসব দেখে অন্য চোখে। তার যে এক ভয়। তাই সে, মেয়েদের প্রতিই মনে মনে রোষে। টাকা নেয় হেসে।

রং মেখে ঢুলতে ঢুলতে রাত্রিশেষে ফিরে আসে তিন বোন। রাত্রি-সন্ধ্যার গলায় সাজানো সতেজ, শেষরাত্রির পিষ্ট তিনটি মালা।

ভাবে, যদি থাকত শুধু এই ঢুলুনি। এমনি নেশা নেশা ভাব। তবে তরে যাওয়া যেত, কিন্তু হয় না তা।

সব পেরিয়েও সময় আসে, যখন হাসতে গিয়েও হঠাৎ থেমে যায় তিন-জনে। হঠাৎ যেন অন্ধকার কোথা থেকে আসে ঘনিয়ে, বাতাস হয় রুদ্ধ একেবারে।

হয়তো চুল বাঁধতে বসে হঠাৎ চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে বেলার। ঠোঁটে চেপে ধরে চিরুনী। জল দেখা দেয় চোখের কোণে।

হঠাৎ কী যে হয়। হাতের স্নো মুখে না মেখেই, রুদ্ধগলায় ফিস্ফিস্ ক'রে বলে জুঁই, 'তোর পায়ে পড়ি বড়দি, চোখ মুছে ফেল্।'

বলে সে নিজে স্নো ভরা হাত চাপা দেয় চোখে।

আল্তার বাটি থেকে আল্তা পড়ে চল্কে। বেলার পায়ের কাছে মুখ চেপে ফুলে ফুলে ওঠে পারুল। বলে, 'কেন যে কাঁদিস্ তোরা।'

কী যে হয়। কেন যে হয়! অনেক সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলতে চলতেও এড়াতে পারে না এটুকু। অকস্মাৎ শক্ত শিলায় কখন চিড় খেয়ে যায়। এ ওকে সামলাতে গিয়ে ফুটিফাটা হয় তিনজনার।

পশ্চিমের শিউলী বনটা তখন রৌদ্র-হারা, ঘন ছায়া বিষণ্ণ বাতাসে হু হু করে। দক্ষিণের গোলাকৃতি ছাতিম সরে গিয়ে পুরনো রাজবাড়ির কোণে মুখ গোঁজে।

নিশ্বাস ঝরে বেলার। বলে, 'কী যে হয়!'

জুঁই বলে, 'পোড়ে মনের মধ্যে।'

পারুল বলে আলুথালু বেশে, 'আমার সারা গায়ের মধ্যে যেন কী পাক দিয়ে ওঠে।' বেলা বলে, 'কিছু যেন মনে পড়ে?'

কী? কাকে মনে পড়ে? তিনজনে তাকায় তিনজনের চোখের দিকে। কাকে যেন খোঁজে পরস্পরের চোখে।

তবু আবার হাসে তিন বোনে। ভাসে নিত্য জীবনে। ধনুকের ছিলার মত বেঁকে ওঠে ঠোঁট। চোখের বিদ্যুতে, হাসির বজ্রে জ্বালাতে চায় সংসারটাকে। কখনো কখনো জ্বলে ওঠে নির্দয়ভাবে।

হয় তো অন্ধরাত্রে, বিছানায় পাশা-পাশি দেহলগ্ন হয়ে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। নেমে আসে নড়বড়ে ছাদটা। অন্ধকারকে পিষে অন্ধকার। দম বন্ধ হয়ে আসে।

এই দেহ যেন পিন্ ফোটা শির। রক্ত ঝরে অহর্নিশ। প্রাণ-স্রোত গলে গলে অবসাদে হয় শীর্ণ শব। নিত্য জোয়ারে প্লাবিত গঙ্গায়ও, সুদীর্ঘ সময়ের নামে ভাঁটা।

পাতালবাসিনীর মত হয় তো চাপা গলায় গর্জে ওঠে বেলা, 'কেন, কিসের জন্য? আর কিছু কি নেই এ জীবনে?'

দুর্জয় বিদ্বেষে পারুল হিসিয়ে ওঠে, 'আর কোন সুখ দুঃখ বুঝি নেই সংসারে? শুধু এই রং মাখা মুখে?'

নিজেদেরই মনের ভাষাকে আরো শাণিত করতে, পাল্টা যুক্তি দেয় জুঁই 'এই দুর্দিন। বাবা, মা, ভাই, বোন—

বেলা বলে, 'এই কি রীতি সংসারের! চিরদিন সেইজন্য রং মাখতে হবে মুখে শুধু ভাই বোন মা? মেয়েমানুষের আ[র] কেউ থাকে না সংসারে? থাকে না আ[র] কিছু?'

পারুল বলে, 'আমরা বুঝি মেয়ে ন[ই] বাবা মায়ের? শুধু তারা-ই বাপ মা আমাদের দেবে না কিছু?'

কিছু কী? জুঁই অন্ধকারে চো[খ]

থাকে নির্বাক হ'য়ে। তারও মনে জ্বলে। তারপর তিনজনেই চুপ হয়ে যায়। চোখ জ্বলে, আর ভিজে ভিজে ওঠে। দক্ষিণের ছাতিমে ঝিঁঝি টেনে টেনে কাঁদে। অন্ধকার মনে মনে বলে, বোঝে না, রিক্ত মাঠের বুকে অসহ্য বেদনা জাগে সৃষ্টি-হীন অপমানে। আরো কত মানুষ সংসারে! কত দূর ব্যাপ্ত ছোটখাটো সুখে দুঃখে, মহান হাসি ও কান্নায় সম্পূর্ণ সংসারটি ছড়ানো স্তরে স্তরে। কে না চায় নিজেরে ছড়াতে, ছাড়াতে? বনলতাও সর্বশক্তিমান মানুষের বেড়া টপকে বাড়ে অবিরত। এই তো নিয়ম।

নেমে আসে ছাদ। চাপা দেয়, পিষ্ট করে। বুকে মুখে পড়ে থাকে তিনজনে।

সকালে হরিদাস গোণে, 'এক, দুই, তিন...। পোকা খাওয়া চোখে দেখে দক্ষিণে পশ্চিমে। মরসুম। মরসুম।

স্নেহলতা রাগে ভয়ে পোড়ে।

মরসুম! মরসুম! বহু রাত্রি ভোর হয়। আবার রাত্রি ভোর হয়।

দরজা ঠেলে হরিদাস। দরজা ক্কঁকিয়ে ওঠে, ব্যথা জাগা গর্ভিনী মার্জারীর মত। হরিদাস গোনে, এক দুই, তিন—

অভ্যাসে গুনেছে। হঠাৎ থেমে গোনে আবার, এক, দুই......দুটি রং মাখা মুখ। অসাড় নিদ্রায় মগ্ন।

নিশাচর রক্ত চোখ ঘষে হরিদাস দেখে, একজন নেই। কে? জুঁই। কোথায় গেল। দেখে এদিক ওদিক। পশ্চিমে বন-শিউলী বনে থোকো থোকো তাজা ফুল হাসছে রোদ ঠোঁটে নিয়ে। মাথা চাড়া দেওয়া রাংচিতে উঠেছে আকাশে।

জুঁই কোথায়। উপরে-নীচে নেই, আশেপাশে নেই। হরিদাস ডেকে তোলে দুজনকে। জুঁই কোথায়?

রং ওঠা-ওঠা দুটি মুখ, ভাবলেশ-হীন। কাজল-অন্ধ রাতজাগা চোখে তাকায় বিছানার দিকে। যেখানে শুয়েছিল আর একজন, ছিল তিনজন দেহলগ্ন হয়ে। হঠাৎ যেন মাটি আর বিচুলি বেরিয়ে পড়ে রংমাখা পুতুলের মুখে। চোখ নেই, দেয়ালের গর্তের মত শুধু কালো কালো ফুটো চারটে চোখ। বিস্মিত কান্নায় তারা দুজনেই পাল্টা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায়, কোথায়?'

আচমকা টনক নড়ে দৈত্যের। ডানা খসা প্রাণ-ভোমরা গোঙায় রাগে ও ভয়ে। কঠিন শিকলে বাঁধা অনায়াস জীবনে ধরেছে ফাটল। ওপড়ানো-শিকড় বৃদ্ধ বট টলমল করে। আতঙ্কে ও ঘৃণায় চীৎকার করে ওঠে হরিদাস, কোথায়? কোথায়?

পলাতকার পদচিহ্নের মত, এক-টুকরো কাগজ বেরোয় বালিশের তলা থেকে। বিস্মিত আক্রোশ-জ্বলন্ত চোখে কাগজটি পড়ে বেলা। পড়ে দেয় পারুলের হাতে। আচমকা আগুন লাগে পারুলের গায়ে কাগজটি পুড়ে। অভিশাপের আগুনে পুড়িয়ে দেয় সে হরিদাসের হাতে। হরিদাস পড়ে, 'খুঁজোনা অকারণ। চলে গেলাম শিবুর সঙ্গে।'

ঘরটা যেন টাল খেয়ে গেল। নীরবতা কয়েক মুহূর্ত। চায়ের গেলাস কেৎলী হাতে দরজার কাছে বোবা ছবি স্নেহ-লতা। বাদবাকী ছেলেমেয়েগুলি উঁকি দেয় নানান্ ঘুলঘুলি দিয়ে।

হরিদাসের রক্তচোখ সাঁড়াশীর মত নেমে আসে বাকী দুটি মুখের উপর।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, ফিরে তাকায় বেলা। চোখ জ্বলে তার। গলায় অজস্র ঘৃণা ঢেলে বলে, 'জানো বাবা, আরো কি বলত জুঁই?'

ছিন্নসূত্র খুঁজে পাওয়া চকিত সন্ধানী গলায় বলে হরিদাস, 'কি?'

কি? সত্যি, আরো কি বলত জুঁই, বেলা কি জানে? সে কি মিথ্যাকথা বলছে! তবু অসহ্য ঘৃণাভরে বলে, 'জানো বাবা, বলত, চিরদিন কি রং মাখব মুখে? যদি মাখি, আর কি আমার নেই কিছু প্রাণে?'

হরিদাস রুদ্ধগলায় বলে, 'আর? আর কি?'

আর? হঠাৎ যেন ভুলে যায় সব কথা। অমনি মনে হয়, জুঁই যেন তার কানে কানে বলছে, এমনিভাবে বলে, 'আর? আর বলত, না হয় খাবো দুঃখের ভাত, পরব ছেঁড়া কাপড়, তবু সে তো আমারি দুঃখের ঘরে।'

পারুলও বলে ওঠে তিক্ত ঝাঁজ গলায়, 'আরো কি বলত, জানো মেসোমশাই?'

হরিদাসের চোখ ফেটে পড়ে। শির ছেঁড়ে গলার, 'কি? কি?'

পারুলের মনে হয় না, একটুও বানিয়ে বলছে। বলে, বলত, আমার ঘর হবে, স্বামী হবে, ছেলে হবে। রাতভর নাটক করে, ফিরে এসে, রাঁধব, খাওয়াব ওকে, ঘুম পাড়াব...

কণ্ঠরুদ্ধ হয় পারুলের। তবু বলে, 'আর বলত, বাবা যদি চায়, তবে বাবাকেও দেব। তবু এখানে আর পারিনে। এবার চলে যাব।'

এখনো গর্জন করে হরিদাস, 'চলে যাব।'

বেলা পারুল দুজনেই ঘাড় নাড়ে, 'হ্যা, বলত।'

হরিদাস বলে, 'তোরা কি বলতিস?'

আমরা? হঠাৎ দুর্জয় জ্বলন্ত চোখ ফেটে জল আসে দুজনেরই। রং ধুয়ে যায় গালের। দুজনেই বলে 'আমরা? আমরা বলতাম, না না, কখনো না।'

হরিদাস চীৎকার করে প্রতিধ্বনি করে, 'না না কখনো না।'

ছোট হয়ে আসে ঘরটা, ভারি হয়ে আসে অন্ধকার। ঝুলগুলি নেমে আসে কড়িকাঠ থেকে মেঝেয়।

তবু বনশিউলী বনে ফোটা দৃপ্ত সতেজ ফুলগুলি রোদে হাসে, মাথা দোলায় বাতাসে। রাংচিতের নরম ডাঁটা আকাশকে ছাড়াতে চায় তরতর করে।

তারপর নজর ফেরে হরিদাসের স্নেহলতার দিকে। ভয় ঘৃণা কান্না, কিছুই ছিল না তার চোখে। ভাবলেশ-হীন চোখ দুটি তার। যেন চেয়েছিল নিজের হাতের পঁচিশ বছরের পুরনো, জল লাগা, ধুলো লাগা, তেল লাগা শাঁখার দিকে। হরিদাস দেখে তার সিঁদুর লেপা মধ্যসিঁথি।

তার রুদ্ধ চোখ হঠাৎ চমকায়। যেন চোখ দুটি অন্ধ হয়ে যায়। ফিরে চায় নতুন সন্দেহে। মনে হয়, সামনে দাঁড়িয়ে ওটা জুঁই। স্নেহলতা নয়।

ডাক্তারের ডায়েরী

—ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

(৭)

ডাক্তারী পাশ করে হাসপাতালের আউটডোরে ক্লিনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্টের একটা কাজ পেয়ে গেলাম। কাজটির কোন বেতন নেই, কিন্তু মর্যাদা আছে। নতুন তৈরি স্যুট পরে সকাল আটটায় ডিউটিতে যাই, বেলা দেড়টা-দুটোয় ফিরে আসি।

আউটডোরে নতুন পাশকরা ডাক্তারের তখন প্রধান কাজ ছিল খাতা লেখা। টিকিটের নাম, নম্বর, ঠিকানা, বয়েস, ধর্ম, পুরুষ কি স্ত্রী—এই সব বড় খাতায় তুলতে হবে। তারপর নতুন টিকেট ভিজিটিং চিকিৎসকের জন্য আলাদা করে রেখে পুরনো কেস সব দেখতে হবে। ভিজিটিং চিকিৎসক আসার আগেই পুরনো টিকেট সব বিদায় করা চাই। এইটেই হল কাজ। বেশ কঠিন কাজ।

আউটডোরে পুরনো কেসই রোজ বেশী আসে। আমার কাজ এই সব রুগী দেখা। দেখা মানে শুধু চোখেই দেখা। রুগী পরীক্ষা করা নয়। পরীক্ষা করে বোঝার মত বিদ্যে কোথা? পরীক্ষা করার দায়িত্বও আমার নয়। আমার যিনি বস্ তাঁর। ভিজিটিং চিকিৎসকের। একবার তিনি দেখে দিয়েছেন, খুব বেশী গড়বড় না হলে আর তিনি দেখবেন না। আমার কাজ তাঁর-দেওয়া ওষুধ দিয়ে এই সব কেস বিদায় করা।

মনে করুন একশ'টি মাত্র পুরনো টিকেট টেবিলের ওপর জমা হয়েছে। লম্বা কিউ পড়েছে। দারোয়ান দরজার গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আটটার সময় নতুন তৈরি স্যুট পরে, গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে আমি আউটডোরে ঢুকলাম। দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিল। লম্বা কিউ-এ ডাক্তার এসেছে, ডাক্তার এসেছে বলে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। যে ক্লার্কটি টিকেট লিখছিলেন তিনি হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমি বেশ একটু গর্ব বোধ করে হেসে প্রতি নমস্কার করে গট্‌গট্ করে এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলাম।

বসে ঐ একশটি পুরনো টিকেট একটি একটি করে খাতায় এণ্ট্রি করব এবং নাম ডাকব। দারোয়ান কিউ থেকে রুগী ছেড়ে দেবে। ততক্ষণে টিকেটে দেখে নেব কি রোগ, কতদিন থেকে ভুগছে, কি কি পরীক্ষা হয়েছে। রুগী কাছে এলে জিজ্ঞাসা করব—কেমন আছ?

রুগী বলবে—ভাল নেই। ব্যথা বেড়েছে। অথবা বলবে—জ্বর ছাড়ছে না।

তখন ভাবছেন টেবিলে শুইয়ে তাকে পরীক্ষা করব? মোটেই তা করব না। খস্ খস্ করে টিকেটের পেছনে রিপিট লিখে ছেড়ে দেব। পরের কেস ডাকব। নইলে এত রুগী ম্যানেজ করব কি করে?

এই রিপিট লেখা মানে হল : রুগী আগে যে ওষুধ পাচ্ছিল আজও তাই আবার পাবে। রিপিট লিখে না দিলে ওষুধ পাবে না। দশটার মধ্যে পুরনো টিকেট সব ডিস্‌পেন্সারীতে জমা হওয়া চাই। নইলে কম্পাউন্ডার ওষুধ দেবে না। তাই তাড়াতাড়ি সব সারতে হবে।

এই রকম রিপিট লিখতে লিখতে চেহারা দেখে অথবা কথা শুনে হঠাৎ কিছু সন্দেহ হলে হয়ত একবার রুগীর চোখের পাতা টেনে বলব জিভ দেখাও। কিম্বা পেটটা একটু টিপে পিলে লিভার দেখে নেব। খুব বেশী হলে জামা ওঠাও বলে স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক পিঠটা একবার দেখব। ব্যস! তারপর টিকেটে রিপিট লিখে বিদায় করব। কঠিন কিছু সন্দেহ হলে ভিজিটিং-এর জন্য আলাদা করে টিকেটখানা রেখে দেব। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ওষুধ বদলে বিপত্তি ঘটাব না।

একদিন একটি রুগী দেখে ভিজিটিং বললেন—পিঠে ডানদিকের কাঁধের নীচে একটা প্যাচ্ পাচ্ছি। বেশ সাস্‌পিশাচ্। একটা ছবি তুলিয়ে নাও।

প্যাচ্‌টার ওপর স্টেথিস্‌কোপ্ বসিয়ে নিঃশ্বাসের উনিশ-বিশ তফাৎ কিছুই বুঝলাম না। কোথায় প্যাচ্ তা মালুম হল না। তবু রুগীকে বললাম—একটা ফটো তুলতে হবে। কাল আসবেন। ছ' টাকা লাগবে।

রুগী জিজ্ঞাসা করলে—বাইরে থেকে করলে হবে না?

বল্‌লাম—কেন হবে না? ভাল

জায়গা থেকে করালে নিশ্চয়ই হবে। দেখবেন, ছবি কিন্তু ভাল হওয়া চাই।

বলে একে বিদায় করে অন্য কেস্ ডাকলাম।

দিন দুই পরে রুগীটি পাস্‌পোর্ট সাইজের আটখানা আবক্ষ ফটোগ্রাফ নিয়ে হাজির হল। গর্বভরে হেসে ছবিগুলি আমার হাতে দিয়ে বললে—আপনাদের এখানে ছ' টাকা লাগবে বলেছিলেন। এই দেখুন এক টাকায় আটখানা তুলে এনেছি। আট রকমের পোজ্। কেমন হয়েছে বলুন দেখি?

এই দেখে কার মেজাজ ঠিক থাকে? গম্ভীর হয়ে বল্‌লাম—বেশ হয়েছে। ভিজিটিং এলে দেখাবেন।

ভিজিটিং এসে দেখে কিন্তু আমার ওপরই চটে গেলেন। বল্‌লেন—তোমারই অন্যায় হয়েছে। ভাল করে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল।

চুপ করে ঢোঁক গিলে গেলাম।

দেখতাম, দুটি একটি রুগী কতদিন থেকে যে আউটডোরের অষুধ খাচ্ছে তার যেন আর হিসেব নিকেশ কিছু নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর ধ'রে অষুধ খেয়ে চলেছে। রিপিট লিখে লিখে টিকেট ভরে গেছে, আবার নতুন টিকেট গাঁথা হয়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য হাসপাতালের সব ডিপার্টমেণ্টে ঘুরে এসেছে। সব রকম পরীক্ষা হয়েছে। মলমূত্র রক্ত থুথু এক্‌স্-রে সব করা হয়েছে। কিন্তু রোগ নির্ণয় হয়নি। মাসের পর মাস হয়ত ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হচ্ছে। টিকেটে ডায়োগ্-নোসিস্ লেখা হয়েছে—পি, ও, ইউ। পাইরেক্‌সিয়া অফ্ আন্‌নোন্ অরিজিন্। কি জন্য জ্বর হচ্ছে তা জানি না। যখন ছাত্র ছিলাম তখন এসব কেস্‌কে আমরা বলতাম—জি, ও, কে। গড্ ওন্‌লি নোজ্। কি রোগ তা ঈশ্বর জানেন।

আবার দুটি একটি রুগী দেখতাম যেন অষুধ খাবার জন্যই হাসপাতালে আসে। রোগ কিছুই বিশেষ নেই। ঘিয়ে ভাজা পুরনো নোংরা টিকেট। হাস-পাতালের সব ডিপার্টমেণ্টের ছাপ মারা। শরীরে কোথাও কোন দোষ নেই। চেহারাও খুব রুগ্ন নয়। কষ্টও বিশেষ কিছু নেই। জ্বর নেই, জ্বালা নেই, পেট খারাপ নয়, কাসি নেই। কি হয়েছে? না, পেটে ব্যথা। কি রাতে ঘুম ভাল হয় না। কিম্বা অম্বল। নয়ত গায়ে ব্যথা।

এমনি একটি রুগীকে একদিন বলে-ছিলাম—অনেকদিন তো অষুধ খেয়ে দেখলেন রোগ সারল না। এইবার কয়েকদিন অষুধ বন্ধ করেই দেখুন না?

শুনে রুগীটি ফস্ করে বল্‌লে—আমি তো আর আপনাকে দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছি না। করাচ্ছি এখানকার ভিজিটিংকে দিয়ে। দু' বছর ধরে তিনিই দেখছেন। অষুধ দিচ্ছেন। অষুধ বন্ধ করতে হলে তিনিই করবেন। আপনি তো শুধু রিপিট লিখে দেন। ডাক্তারবাবু আসুন, তিনি যা বলবেন তাই হবে।

দেখুন দেখি আস্পর্ধা! আমাকে বলে কিনা আমি শুধু রিপিট লিখে দি, চিকিৎসা করি না। চিকিৎসা করেন ভিজিটিং। কাজেই তিনি ডাক্তারবাবু। আমি তাহলে কি? রিপিটবাবু?

শুনে রাগে গা জ্বলতে লাগল। কান বেগুনী হয়ে উঠল। লোকটা ভিজিটিং-এর নাম করেছে তাই আর দ্বারওয়ান দিয়ে ওকে বার করে দিতে সাহস হল না। নিষ্ফল আক্রোশে ভেতরে ভেতরে গজরাতে লাগ্‌লাম।

ওর দিকে একবার কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বল্‌লাম—বেশ, তাই হবে।

বলে অন্য টিকেট ডাকলাম। ভাবলাম, ভিজিটিং এলে এর একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার করতে হবে। তাক্ বুঝে এমন করে লাগাতে হবে যাতে উনি ক্ষেপে গিয়ে দূর করে ওকে তাড়িয়ে দেন। শুধু তাড়িয়ে দিলেও বুঝি এ জ্বালা যায় না! দেখুন, সত্যি কথার কি সাংঘাতিক তেজ! কান দিয়ে ঢুকে সোজা গিয়ে মর্মমূলে ঘা দেয়। সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। ইলেক্-ট্রিক্ শক্ ছাড়া কড়া কোন ইন্‌জেক্-শনেও বুঝি এত দ্রুত ফল হয় না। চট্‌পট্ টিকেটের পর টিকেট ডাকতে লাগলাম আর খস্ খস্ করে রিপিট লিখে ছেড়ে দিলাম।

পুরনো টিকেট শেষ হতে না হতেই ভিজিটিং এলেন। আমি নমস্কার করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এইবার উনি এই চেয়ারে বসবেন আর আমি বসব পাশের টুলে। আমি নতুন রুগীর নাম ডাকব, ইনি পরীক্ষা করবেন, অষুধ বলে দেবেন। আমি তা টিকেটে লিখব, বড় খাতায় তুলে নেব।

আজকে কিন্তু ভিজিটিং আসতেই ঐ লোকটি এসে হাত জোড় করে নমস্কার করে দাঁড়াল। ভিজিটিং হেসে ওকে জিজ্ঞেস করলেন—কিহে? কি খবর?

লোকটি বল্‌লে—আজ্ঞে রাতে ঘুম হচ্ছে না তাই অষুধ নিতে এসেছিলাম। ইনি রিপিট লিখে দিলেন না। বল্‌লেন দরকার নেই।

কোথায় আমিই ওর নামে লাগাব, না ওই এসে আগে ভাগে আমার নামে নালিশ ঠুকে দিল! দেখুন কেমন উল্টো প্যাঁচে পড়ে গেলাম।

ভিজিটিং যেন একটু বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—কি ব্যাপার? অষুধ দাও নি কেন?

ততক্ষণে আমার কান আবার বেগুনী হয়ে উঠেছে। একটু আমতা আমতা করে বল্‌লাম—অনেকদিন ধরে অষুধ খাচ্ছে, কিছুই তো হচ্ছে না। তাই বলছিলাম, কয়েকদিন অষুধ বন্ধ করে দেখতে।

ভিজিটিং বল্‌লেন—না না, অষুধ না খেলে ওর ঘুম হয় না। রিপিট লিখে ছেড়ে দাও।

দেখুন আমার প্রেস্‌টিজ্‌ কি রকম ঢিলে হয়ে গেল। আবার সেই রিপিট লিখতে হল। শুনে লোকটা আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল। আমি ঘেমে উঠ্‌লাম।

লোকটি চলে গেলে ভিজিটিং বল্‌লেন—অষুধ খাওয়াই ওর বাতিক। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের চেনা লোক। যতদিন আসবে অষুধ লিখে দেবে। আমার কাছে আর ওকে আনবে না। ওকে দেখলেই মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বল্‌লাম—আচ্ছা স্যার।

আমার মেজাজও খারাপ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে রইলাম। ভিজিটিং-এর সঙ্গেও ভাল করে কথা কইলাম না। হ্যাঁ স্যার, না স্যার বলে কাজ সেরে দিলাম। সেদিন নতুন রুগী বেশী ছিল না। শীগ্‌গীরই কাজ শেষ হয়ে গেল।

আউটডোর থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে কাগজখানা টেনে নিয়ে বসলাম। এমার-জেন্সীতে যে নতুন ডাক্তারটির ডিউটি সে এসে পাশে বসে বল্‌লে—তোর দেখছি অনেক আগেই কাজ শেষ হল,. আমার ডিউটিটা একটু করে দিবি ভাই?

কাগজ থেকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম—কেন রে? কোথায় যাবি? বাণিজ্যে?

ডাক্তার বল্‌লে—দূর! কোথায় বাণিজ্য? এখন শুধু লসের বাজার। যাব শেয়ালদা স্টেশনে। আসাম মেল্‌ অ্যাটেণ্ড্‌ করতে হবে।

বল্‌লাম—ও বুঝেচি। বউ আসছে। বেশ, ডিউটি করে দেব যদি চায়ের সঙ্গে কাট্‌লেট আর রসগোল্লা খাওয়াস্‌।

ডাক্তার বল্‌লে—আচ্ছা, তাই খা। আমি আর এস-কে বলে আসি। বলে দোকানে অর্ডার দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সকালের এমারজেন্সী ডিউটি বেলা আটটা থেকে দুটো। তারপর যে ডাক্তার আসবে সে থাকবে রাত দশটা পর্যন্ত। তখন বেলা বারোটা। বিনা পয়সায় কাট্‌লেট এবং রসগোল্লা সহযোগে চা খেয়ে মনে আবার ফুর্তি এল।

ডাক্তারটি ফিরে এসে বললে—সব ঠিক করে এলাম। তুই ভাই এবার বসগে যা।

বললাম—কি রকম কেস্‌ আসছে রে?

ডাক্তার বল্‌লে—আজ কোন কেস্‌ নেই। গোটা দুই ছড়ে যাওয়া আর একটা পা মচ্‌কানো। সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি।

বল্‌লাম—এখন তো বারোটা বাজল। দু' ঘণ্টায় আর ক'টা কেস্‌ আসবে? ডাক্তারের তখন পালাবার তাড়া। বল্‌লে—না না এখন আবার কেস্‌ আসে নাকি? আসবে সেই সন্ধ্যেবেলা। তুই ভাই তাহলে চার্জ নিলি। আমি চল্‌লাম। আরও দেরি হলে ট্রেন ঠিক মিস্‌ করব।

বল্‌লাম—ঠিক আছে। তুই যা।।

ডাক্তার টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখনকার দিনে আমরা স্যুট, বুট আর টাই পরতাম। ডাক্তার আর ছাত্রদের মধ্যে এইটেই ছিল আসল তফাৎ। পাশ করলে স্যুট পরা যাবে। স্যুট করাতে গিয়ে বুঝলাম, পাশ করে খরচাই শুধু বাড়ল। আজও দেখছি, খরচাই শুধু বেড়েছে, রোজগার তেমন হয়নি।

এমারজেন্সীতে গিয়ে দেখি, সত্যি কোন কেস্‌ নেই। বিনা পয়সার চা কাট্‌লেট খেয়ে মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল, রুগী নেই দেখে গলা দিয়ে গুন্‌ গুন্‌ করে গান বেরিয়ে এল।

নার্স বললে—ডাক্তারের আজ দেখছি খুব ফুর্তি! ব্যাপার কি?

বল্‌লাম—একে তো অপরের ঘাড় ভেঙে খেয়ে এলাম, তারপর দেখছি কেস্‌ নেই। ফুর্তি হবে না?

নার্স বল্‌লে—কেস্‌ আসার কিছু ঠিক আছে নাকি? ঐ দেখুন, বলতে না বলতেই অ্যাম্‌বুল্যান্স এসে গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, সত্যি অ্যাম্‌-বুল্যান্স এসেছে। স্ট্রেচারে করে রুগী নাবাচ্ছে। সঙ্গে পুলিস।

পুলিস দেখে অবশ্য ভয় হল না। এমার্‌জেন্সী রুমে পুলিস হামেশাই

আসে। জুতোয় খট্ করে অ্যাটেন্‌শনে দাঁড়িয়ে সেলাম করে। পুলিস রিপোর্ট জমা থাকলে নিয়ে যায়। অসুখ ছাড়া, কাটা, ছেঁড়া, হাড়ভাঙ্গা, মার খাওয়া, বিষ খাওয়া যে কেস্‌ই আসুক, হাসপাতালের নিয়ম, সব টিকেটে 'পুলিস' ছাপ মেরে দিতে হয়। আলাদা খাতায় কি চিকিৎসা হল, রুগী কি বলল, কেমন করে আঘাত পেল, অবস্থা কেমন সব লিখে রাখতে হয়। রোজ থানায় রিপোর্ট পাঠাতে হয়। থানা থেকে পুলিস এসে এই রিপোর্ট নিয়ে যায়।

কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে যখন পুলিস আসে তখন বুঝতে হয়, মারপিট, খুন জখম কিছু একটা হয়েছে, পুলিসে ধরেছে। স্ট্রেচারে করে যাকে নাবানো হল একবার তাকিয়েই বোঝা গেল, তার কি হয়েছে। কপালটা একটা বড় নৈনিতাল আলুর মত ফুলে উঠেছে। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে গাল বেয়ে জামা কাপড়ে পড়ে শুকিয়ে রয়েছে। সর্বাঙ্গ জল কাদায় মাখা। কাছে যেতেই ভক্ করে দিশি মদের পচা গন্ধ নাকে এল।

টেবিলে উঠিয়ে মাথার ক্ষত দেখে মনে হল, হাড় টাড় কিছু ভাঙে নি। চামড়াটা ইঞ্চিখানেক ফেটে গিয়েছে মাত্র। কিন্তু যেরকম হাঁ করে আছে তাতে মনে হল, গোটা দুই সেলাই দেওয়া দরকার।

বেয়ারাটাকে মাথার চুল ক্ষতের চারদিকে গোল করে কামাতে বল্‌লাম। নার্সকে বল্‌লাম—সেলাই-এর সরঞ্জাম সব রেডী করুন।

নাড়ী দেখলাম বেশ ভাল। হাঁটু, কনুই আর হাতের তেলোয় এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। মাথার ক্ষতের রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু চামড়াটা ফাঁক হয়ে আছে। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ঠেলেঠুলেও জাগান গেল না। দেখা গেল, অজ্ঞান হয়নি। দেহ অসাড় হয়নি। চোখের পাতা টেনে দেখলাম, দুটি রক্ত চক্ষু।

পুলিসের কাছ থেকে জানা গেল, লোকটা মদ খেয়ে মাতলামো করছিল বলে পাড়ার ছেলেরা আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছে। মার খেয়েই হোক কি হোঁচট্ খেয়েই হোক ফুটপাথের পাশে নর্দমায় পড়ে ছিল। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে দেখে রাস্তার একজন লোক থানায় খবর দেয়। কি হয়েছে জানবার জন্য এসে দেখা গেল, লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা ফুটপাথের কোণে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে দেখে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

সত্যি কেউ মেরেছে কিনা, দোষীই বা কে, সে সব খোঁজে আমার দরকার কি? আমার কাজ রুগী যা বলবে তাই রিপোর্টে লিখে দেওয়া। রুগীর যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে লিখব, রুগী অজ্ঞান। কি করে আঘাত পেল, জানা নেই। সঙ্গে লোক থাকলে সে যা বলবে তাই লিখে দেব। তারপর লিখব, আঘাতের বর্ণনা এবং চিকিৎসা।

রুগী অজ্ঞান; পুলিস সঙ্গে নিয়ে এসেছে, রিপোর্টে লিখে দিলাম। পুলিস যা বলেছে তা লিখে দেখি, সেলাই করার জিনিস সব রেডী। নার্স আর বেয়ারা দুজনে মিলে লোকটার মাথা কামিয়ে পরিষ্কার করেছে। যন্ত্রপাতি রেডী করেছে।

আমি উঠে এপ্রন পরে হাত ধুয়ে স্পিরিট দিয়ে দু হাত স্টেরিলাইজ্ করে নিলাম। রবারের দস্তানা পরলাম। ফরসেপস্ দিয়ে গজ নিয়ে তাতে আয়োডিন মাখিয়ে মাথার ক্ষতে লাগালাম। এইবার মাতালের ঘুম ছুটে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে টেবিলের ওপর উঠে বসল। ঘোলাটে রক্ত চক্ষু দুটি মেলে চারদিক তাকিয়ে দেখে বল্‌লে, এসব কি? আমাকে এখানে আনলে কে? বলে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল।

আমার তখন দুটি হাতই আটকা। স্টেরিলাইজড্। এক হাতে ফরসেপ্‌স্ আর এক হাতে সূঁচ সুতো। তবু ডান হাতে তর্জনী দিয়ে পুলিসটিকে দেখিয়ে বল্‌লাম—মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে খানায় পড়ে ছিলে। পুলিস ধরে এনেছে।

এইবার মাতালটি দু' হাতে ভর করে অপারেশন টেবিল থেকে নেবে টলতে টলতে কনস্টেবলটির দিকে এগিয়ে তার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—আমি নিজের পয়সায় মদ খেয়েছি তা'তে তোর কি রে শালা? তোর পয়সায় খেয়েছি? আমাকে ধরে আনবার তুই কে? কার কাছে ঘুষ খেয়ে আমায় ধরেছিস্ বল্?

পুলিসটি মাতালের এই কাণ্ড দেখে হকচকিয়ে গেল। আমি ফরসেপস্ নিড্‌ল্ সব ফেলে দস্তানা খুলে পর্দার বাইরে এসে মাতালটিকে পেছন থেকে ধরলাম। বল্‌লাম—অনেক মাতলামো হয়েছে; আর নয়। আমার সঙ্গে এসো। মাথাটি ফেটে গেছে; সেলাই দিতে হবে।

লোকটি পুলিসকে ছেড়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে ক্ষতের চারদিকে বার-কয়েক আঙুল চালিয়ে কামানো হয়েছে বুঝে আমার দিকে কট্ মট্ করে তাকিয়ে বল্‌লে—আমার মাথা কামালে কে?

ওর ঐ ঘোলাটে চোখে চোখ রেখে গম্ভীর হয়ে বল্‌লাম—আমি।

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার মাথায় হাত বুলিয়ে এইবার মাতালটি ভ্যা করে কেঁদে ফেল্‌ল। বলল—এইরকম আধ-কামানো মাথা নিয়ে আমি বেরুব কি করে?

বুঝলাম, বলে কয়ে ধমক্ ধামকে একে দিয়ে কাজ হবে না। পেটে যে বস্তু আছে তা বার করতে হবে। স্টমাক্ পাম্প লাগাতে হবে। নইলে নেশা কাটবে না।

বেয়ারাকে বল্‌লাম—দ্বারওয়ানকে ডেকে দে। সবাই মিলে একে টেবিলে তোল্।

নার্সকে বল্‌লাম—স্টমাক টিউব আর বাই-কারবনেট লোশন রেডী করুন।

দ্বারওয়ান এলে, দুটি বেয়ারা আর পুলিস এই চারজনে মিলে ওকে চ্যাঙ-দোলা করে টেবিলে শুইয়ে চেপে ধরে রাখল। অনেক ধস্তাধস্তি করে নাক দিয়ে স্টমাক্ টিউব ঢোকান হল। টিউবের মুখের ফানেলের ওপর বাই-কারবনেট লোশন ঢেলে বালতির ওপর ফানেলটা উপুড় করে নাবাতেই পেট থেকে পচা দুর্গন্ধ ভরা ঘোলাটে তরল জিনিস সব বেরুতে লাগল। দু' পাইণ্ট লোশন দিয়ে পেটটা ধুইয়ে সেই জল ফানেল দিয়ে বার করে স্টমাক্-টিউব উঠিয়ে নিলাম। প্রথমে খানিকটা চেঁচামেচি, গালাগালি, ধস্তা-ধস্তি করে লোকটা শেষে চুপ করেই ছিল। টিউব বার করবার পর বল্‌লে—পাম্পু

দিয়ে পয়সার মাল সব বার করে নেশাটা নষ্ট করে দিলেন স্যার?

বল্‌লাম—এইবার একটু চুপ করে সহ্য করে থাক। মাথায় দুটো সেলাই দিয়ে দি।

এই বলে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে স্পিরিট মেখে কাটা জায়গাটায় আবার আইডিন লাগিয়ে চট্‌পট্‌ সেলাই করে দিলাম। লোকটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চুপ করে সহ্য করল। একটুও ছট্‌ফট্‌ করল না।

কাজ শেষ হতে না হতেই 'জ্বলে গেল', 'জ্বলে গেল' বলতে বলতে দুপাশে দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোক বেশ মোটাসোটা। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়স। সাড়ে পাঁচ ফুট মত লম্বা। ঠোঁট দু'টি ফোলা। মুখের দু' পাশ বেয়ে কি যেন গড়িয়ে থুত্‌নির দু'দিক পুড়ে শাদা হয়ে গেছে। থক্‌থকে দেখাচ্ছে। বুকের ওপর শার্টে বড় বড় গর্ত। হাঁটুর নীচে কাপড়ে ও কোঁচায় বড় বড় ছেঁদা। কি পড়ে যেন খেয়ে গেছে। কাছে যেতে এ'র মুখ থেকেও মদের দুর্গন্ধ পাওয়া গেল।

ভদ্রলোককে ধরাধরি করে টেবিলে শোয়ান হল। ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌তে লাগলেন—গলা বুক পেট সব জ্বলে গেল। শিগ্‌গির কিছু একটা দিন।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঠোঁট মুখ সব পুড়ে গেছে দেখছি। কি খেয়েছেন?

খস্‌খসে গলায় ভদ্রলোক বল্‌লেন—নাইট্রিক এসিড। কন্‌সেন্‌ট্রেটেড।

বল্‌লাম—সে কি? কেন?

ভদ্রলোক বল্‌লেন—ভুল করে মশাই; স্রেফ ভুল করে। দশ বছর ধরে মদ খাচ্ছি, এরকম মারাত্মক ভুল হয়নি কখনও। ফটোগ্রাফারের কাজ করি। স্টুডিওর আলমারীতে হাইপো, এসিড সব থাকে। তারই এক কোণে এক বোতল রাম্‌ রাখি চিরদিন। এই রেখে আসছি আজ দশ বছর। আজ সকাল থেকেই গা'টা কেমন ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করছিলো। এমনি সময় এক বন্ধুলোক এল। হাতে এক বোতল রাম্‌। দু'জনে বসে বসে দিলুম ঐ বোতল ফাঁক করে। বারোটা কাজতেই বন্ধু উঠে গেল। আমিও টুকিটাকি দুটি একটি কাজ সেরে স্টুডিয়ো বন্ধ করে যাবার আগে ভাবলুম—নিই আর এক মাত্রা চড়িয়ে। জল কি সোডা মিশিয়ে রাম্‌ আমি খেতে পারি না। বোতল তুলে মুখে খানিকটা ঢেলে নি;। ঢক্‌ করে গিলে ফেলি। আজও আলমারী খুলে বোতলটি বার করে ছিপি খুলে মুখে ঢেলে যেই ঢক্‌ করে গিলেছি অমনি সব যেন জ্বলে গেল। থু থু করে খানিকটা বাইরে ফেল্‌লাম। কিছু গাল বেয়ে মুখের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি, হাতে রামের বোতলের বদলে স্ট্রং নাইট্রিক এসিড খুলে ধরে আছি।

বলেই ভদ্রলোক দুই হাতে পেটটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—উঃ ছিঁড়ে গেল সব, জ্বলে পুড়ে গেল।

দেখলাম হাত পা ঠাণ্ডা। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। তাড়াতাড়ি একটা মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন করে আর এস-কে খবর পাঠালাম।

এ অবস্থায় আমাদের করবার আর আছেই বা কী? স্টমাক্‌ টিউব দেওয়া যাবে না একে। নাইট্রিক এসিড পাকস্থলীর দেয়াল খেয়ে পাতলা করে দিয়েছে। টিউব ঢোকাতে গেলে ছিঁড়ে যাবে। বাই-কারবনেট অফ সোডা কি অন্য কোন অ্যালকালিও খাওয়ান চলবে না। এসিডের সংগে মিশে পেটে গ্যাস হবে। এসিডে খাওয়া পাকস্থলীর পাতলা দেয়াল ফেটে যাবে।

নাড়ীর অবস্থা দেখে মনে হল, এসিড বোধ হয় স্টম্যাক্‌ ফুটো করে সমস্ত পেটে ছড়িয়ে গেল। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন।

মরফিয়া দেবার কিছুক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বল্‌লেন—যন্ত্রণাটা একটু যেন কমেছে মনে হচ্ছে। এসিড খাবার পরই যখন চেঁচিয়ে উঠলুম, চীৎকার শুনে পাশের দোকান থেকে ২।৩ জন ছুটে এলেন। একজন বল্‌লেন, —এসিড খেয়েছেন, শিগ্‌গির খানিকটা সোডা খেয়ে ফেলুন। দুটোয় মিশে জল হয়ে যাবে। আলমারীতে বাই-কারবনেট অফ সোডা ছিল তাই খানিকটা জল দিয়ে খেয়ে ফেল্‌লুম। তাতে যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। পেটটা ফুলে উঠল। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করবার চেষ্টা করলাম। বমি হল না। গলা চিড়ে রক্ত বেরুলো। হাঁস ফাঁস করছি দেখে শেষটায় এরা এখানে নিয়ে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, সমস্ত পেট বুঝি জ্বলে গেল

হঠাৎ আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে বল্‌লেন—ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান। এ যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারছি না।

আমি আর কি করব? কতটুকুই বা আমাদের ক্ষমতা? তবু ভরসা দিয়ে বল্‌লাম—ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি, যন্ত্রণা তো অনেকটা কমেছে। এইবার দেখবেন আরও কমে যাবে। আর এস-কে খবর দিয়েছি। এক্ষুণি এসে পড়বেন।

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে ভদ্রলোক এক সময় চুপ করে গেলেন। দেখলাম, গা বরফের মত ঠাণ্ডা। নাড়ী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম লাগছে?

ফিস্‌ ফিস্‌ করে ভদ্রলোক বল্‌লেন—ভাল।

আর এস এলেন। আমার চেয়ে বছর দশেকের সিনিয়র। দেখে বল্‌লেন—মরফিয়া দিয়ে খুব ভাল করেছ। আর

কিছু আমাদের করবার নেই। নাউ হি ক্যান ডাই পিস্‌ফুলি ইন্‌ দিস্‌ বেড। বলতে বলতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। একখানা হাত মাথার নীচে রেখে ভদ্রলোক দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর এস বল্‌লেন—পুলিসকে বল, বডি মর্গে নিয়ে যাক্‌। বলে আর এস চলে গেলেন। আমি ঐ পলকহীন খোলা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বেলুড় মঠের জমি ক্রয়

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়া ত্যাগ করিয়া ৯ই আগস্ট বেরিলি আসিয়া পৌঁছিলেন। যেদিন আসিলেন সেদিনই জ্বর। কিন্তু সেই জ্বর লইয়াই পরদিন তিনি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত 'অনাথ আলয়' দেখিতে গেলেন। ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে বেদান্ত চর্চা হয় এজন্য একটি ছাত্র-সমিতিও প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইভাবে তিন চারিদিন চলিল কিন্তু ১২ই তাঁহার জ্বর প্রবল হইয়া দেখা দিল। সেইদিন রাত্রেই তিনি বেরিলি হইতে আম্বালায় চলিয়া আসিলেন।

আম্বালায় তিনি প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন। এই সময় মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ার সিমলা থেকে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

আম্বালায় অনেক আর্যসমাজী আছেন। স্বামীজী যে কয়দিন এখানে ছিলেন প্রত্যহ ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য আসিতেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্বনাম ছিল মূলশঙ্কর। গুজরাটের এক সাম-বেদী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পিতা সম্পত্তিশালী এবং অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আট বৎসর বয়সেই পুত্রকে উপনয়ন দেন এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। কিন্তু দয়ানন্দের মন স্বভাবতই বিচারশীল ছিল, সেইজন্য যে সকল অনুষ্ঠান তাঁহাকে পিতৃনির্দেশে পালন করিতে হইত সেই সকল অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বালক বয়সেই তাঁহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইত। অবশেষে এক শিবরাত্রির রাতে শিবমন্দিরে পূজার জন্য যখন তিনি রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি ছোট ইঁদুর আসিয়া শিবের জন্য নিবেদিত নৈবেদ্য হইতে চাল খাইয়া যাইতেছে অথচ শিব তাহার কোন প্রতিবিধানই করিতে পারিতেছেন না। এই দৃশ্য দেখিয়া সেই মুহূর্তেই তাঁহার মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস হইল। কেবল তাহাই নয়, হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের উপরও তাঁহার আর শ্রদ্ধা রহিল না।

এই বিদ্রোহী মনোভাব লইয়াই মূলশঙ্কর উনিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং পনেরো বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার কাছেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই ছিলেন মহা তেজস্বী এবং সামাজিক কুসংস্কার ও লোকাচারের অনুসরণকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করার বিরুদ্ধে উভয়েই মনে মনে বিদ্রোহী ছিলেন। এই বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য এবং তাহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার জন্য তিনি অনেকেরই অপ্রীতি-ভাজন হন এবং অনেকবার তাঁহাকে হত্যা করিবারও চেষ্টা করা হয়। অবশেষে হত্যাকারীর হস্তেই তাঁহার প্রাণ যায় কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মতবাদ সমস্ত পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়া-ছিল। লালা লাজপৎ রায় আর্যসমাজী ছিলেন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন প্রচারের জন্য নিজ জীবন আহুতি দিয়াছেন।

একদিক দিয়া যদিও তাঁহারা বহু জনহিতকর কার্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতিতে সকল সময় সেবার কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, বলিতে গেলে আর্যসমাজীরাই এইভাবের সেবা-কার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের পথপ্রদর্শক,—স্ত্রীজাতি যাহাতে সুশিক্ষিত হয় এবং সামাজিক পীড়নে পীড়িত না হয় সেজন্যও তাঁহারা সকল সময়েই সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু তথাপি অতিরিক্ত বিদ্রোহী মনোভাবের জন্য অনেক সময় তাঁহারা একদেশদর্শিতা দোষের কবলে পড়িতেন। এজন্য আর্যসমাজের নেতাগণের সহিত স্বামীজীর মাঝে মাঝে বিতর্কও হইয়া-ছিল। একবার লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজের সহিত তাঁহার বেদের তাৎপর্য লইয়া বিতর্ক হয়। আর্যসমাজের মতে "বেদের কেবল একরকম অর্থই হইতে পারে", এই মতবাদের স্বামীজী প্রতিবাদ করেন এবং এই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "লালাজী, আপনারা যেভাবে কোন বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমরা fanaticism বা গোঁড়ামি আখ্যা দিযা থাকি। সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সাধনে যে ইচ্ছা বিশেষ সহায়তা করে তাহাও আমি জানি। * * * আমার গুরুদেব রামকৃষ্ণ

পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমিই ঐরকম প্রচারের বিরোধী। কারণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজের বিশ্বাস ও ধারণার সাহায্যে উন্নতি করিতে দিলে যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয় কিন্তু সে উন্নতি দৃঢ়মূল হয়।

(ভারতে বিবেকানন্দ—৪৮১ পৃঃ)

আর্যসমাজিগণের সঙ্গে "শ্রাদ্ধ" সম্বন্ধেও স্বামীজীর একবার বিতর্ক হইয়াছিল। "শ্রাদ্ধ" ব্যাপারটি আর্যসমাজিগণ একেবারেই 'বাজে' বলিয়া মনে করেন, স্বামীজী হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াই অবশ্য এই বিতর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে যদি এই 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের ভিতর যে গভীর একটা আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা আছে সে সম্বন্ধে অনুভূতি না থাকিত তাহা হইলে কখনই তিনি তর্কে যোগ দিতেন না। তিনি একাধারে ছিলেন যোদ্ধা ও সন্ন্যাসী। সেজন্য যাহা যুক্তিসঙ্গত নয়, যাহা পল্লবগ্রাহী মনোভাব হইতে উদ্ভূত যে সকল আত্মম্ভরিতা প্রসূত মতবাদ তীক্ষ্ম যুক্তি অস্ত্রে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিতেন, অথচ বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার মোহ অথবা বিদ্বেষ ছিল না।

২০শে আগস্ট স্বামীজী আম্বালা হইতে অমৃতসর যান, সেখানে নিকটবর্তী ধর্মশালা নামক স্বাস্থ্যনিবাসে কয়েকদিন থাকিয়া আবার অমৃতসরে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে দুইদিন মাত্র অবস্থান করিয়া রাওলপিণ্ডি যাত্রা করেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে মরি বা বারমুলা। ৮ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী বারমুলা পৌছান এবং সেখান হইতে নৌকায় শ্রীনগরে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় শ্রীনগরের চীফ জাস্টিস্ ছিলেন, তিনি স্বামীজীকে মহা সমাদরে নিজের বাড়ি লইয়া গেলেন।

শ্রীনগর কাশ্মীরের অন্যতম রাজধানী। রাজা রাম সিং ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে রাজভবনে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং স্বামীজীকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজে অন্য সকলের সহিত নিম্নে আসন গ্রহণ করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর জন্য একটি হাউসবোটের ব্যবস্থা করা হয়, কেননা হাউসবোটে থাকিলে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া দেখাও হইবে।

২০শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী পামপুর নামক স্থানে যান। ২২শে তারিখে অনন্তনাগে গিয়া বিজবেরার মন্দির ও অনন্তনাগ দর্শন করেন এবং ২৪শে তারিখে মার্তণ্ড ধর্মশালা ও সেখান হইতে অক্ষয়বল যান। এই সকল স্থান কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অক্ষয়বল থেকে উলার হ্রদ দিয়া তিনি প্রথমে বারমুলা ও তাহার পর মরিতে ফিরিয়া আসেন। এখানে সেভিয়ার দম্পতি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

মরিতে চারদিন থাকিয়া ১৬ই অক্টোবর তিনি আবার রাওলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসেন। স্বামীজীর 'মরি'তে অবস্থান করিবার সময়ে সেখানকার পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালিগণ ১৪ই তারিখে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দান করেন, সেই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী একটি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

রাওলপিণ্ডিতে স্বামীজী তথাকার উকীল হংসরাজের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনগণ সেখানে সর্বদাই তাঁহাকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত আলোচনার জন্য আসিতেন। এখানে আর্যসমাজের একজন নেতা স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার আলাপ ও আলোচনা হয়, এই আলোচনায় স্বামীজী প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। এই আলোচনার সময় জজ নারায়ণ দাস ও ব্যারিস্টার ভক্তরাম এবং আরও অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই তারিখে তিনি সর্বসাধারণের অনুরোধে ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল 'হিন্দুধর্ম'। ইহার পর তিনি স্থানীয় কালীবাড়িতে ১৯শে তারিখে আর একটি বক্তৃতা দেন।

২০শে অক্টোবর তিনি জম্মু রওনা হন। কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুর এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে জম্মু যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জম্মুতে স্বামীজী পৌছিলে রাজকর্মচারিগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার জন্য যে বাসগৃহ ঠিক করা ছিল, সেখানে লইয়া যান। পরদিন তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে রাজপরিবারের সকলে এবং রাজকর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। এখানে একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। মহারাজ নানা বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন এবং স্বামীজী তাহার উত্তর দেন।

মহারাজ যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যে ছিল 'সন্ন্যাস' কাহাকে বলে, পাপই বা কি এবং পুণ্যই বা কি, সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় কি না ইত্যাদি। চারি ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই প্রশ্ন ও উত্তর চলিয়াছিল। সামাজিক বিধিনিষেধগুলির উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলেন, অনেক স্থলে এই সকল বিধিনিষেধের কোন মানেই হয় না, যেমন সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করা। বাস্তবিক সমুদ্রযাত্রা না করিলে বিদেশ সম্বন্ধে কোন
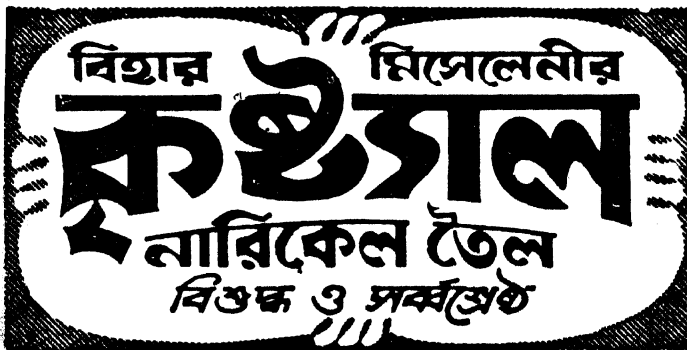
অভিজ্ঞতাই হয় না এবং সেই অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ মূল্য আছে। ইহা ছাড়া হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্ম কি, তাহা প্রচার করিবার জন্যও সমুদ্রপারে গমন একান্ত প্রয়োজন। পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন যে, যেগুলি যথার্থ পাপ, যেমন ব্যভিচার, সুরাপান, পরের অনিষ্ট সাধন, ধর্মের নাম লইয়া কতকগুলি নির্দোষীকে শাস্তি দান, মিথ্যাচরণ—এগুলি অনেক সময় পাপ বলিয়াই ধরা হয় না, ইহাতে পুরুষেরা কোন সামাজিক শাস্তি পায় না বা সমাজচ্যুত হয় না, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার খুঁটিনাটি এবং সমুদ্রযাত্রা কিম্বা ঐ রকম কোন সংস্কার লঙ্ঘনের অপরাধই সমাজচ্যুতির কারণ হয়। বস্তুত ধর্মের নামে কতগুলি কুসংস্কার ও প্রথাকেই মর্যাদা দেওয়া হয়।

২৯শে অক্টোবর স্বামীজী জম্মু হইতে শিয়ালকোটে যান। শিয়ালকোটে তিনি দুটি বক্তৃতা দেন, এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করেন। স্বামীজীর এই প্রস্তাব অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগস্বরূপ একটি কমিটি স্থাপিত হয় এবং স্বামীজীর ভক্ত স্থানীয় উকীল লালা মুলচাঁদ ইহার সেক্রেটারী হন।

৫ই নবেম্বর স্বামীজী লাহোরে আসেন, লাহোরে সনাতন ধর্মসভার সভ্য-বৃন্দ এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন এবং 'রাজা ধ্যানসিংহের হাবেলী' নামক প্রাসাদে লইয়া যান। ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সেখান হইতে তাঁহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া যান।

আমরা স্বামীজীর বিভিন্ন দেশে পর্যটনের সময় দেখিতে পাই, সকল স্থানেই তাঁহার বঙ্গদেশবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। লাহোরেও তাঁহার ছেলেবেলার এক বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া যায়। ইনি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু। বোসের সার্কাস তখনকার দিনে একটি বিখ্যাত সার্কাস ছিল, ভারতবর্ষের সর্বত্রই এবং ভারতের বাহিরেও এই সার্কাস কোম্পানী খেলা দেখাইতে যাইত। স্বামীজী যখন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন সেই সময় একদিন মতিবাবু সেখানে যান; তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ছেলেবেলায় একই আখড়ায় কুস্তি করিতেন এবং দুজনে দুজনকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন।

মতিবাবু দূর হইতে স্বামীজীকে দেখিলেন কিন্তু কাছে যাইবার সাহস পাইলেন না; তাঁহার মনে হইল, এই তেজপুঞ্জ সর্বজনপূজিত সন্ন্যাসীই কি তাঁহার সেই ছেলেবেলার খেলার সাথী নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বামীজী যখন কাছে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মতি, তুই এখানে আছিস?" তখন আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তবুও তিনি প্রথমে সংকোচ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাই স্বামীজীকে বলিলেন, "ভাই, এখন আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?" তখন স্বামীজীর কণ্ঠে সেই ছেলেবেলার কৌতুক ও আত্মীয়তার সুরই শুনিতে পাইলেন, "হ্যাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস? আমি কী হয়েছি? আমিও সেই নরেন আর তুইও সেই মতি।" এই কথায় মতিবাবুর সংকোচ দূর হইয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইল।

স্বামীজী লাহোরে এগারো দিন ছিলেন এবং ইহার মধ্যে পাঁচ ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। "আমাদের সমস্যাগুলি", "ভক্তি", "হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি-সমূহ" এবং আরও দুইটি বক্তৃতা। "ভক্তি" বক্তৃতাটি সার্কাস প্রাঙ্গণে দেওয়া হয়। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে "বেদান্ত" নামক বক্তৃতাটিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছিল, সেই বক্তৃতায় স্বামীজী বেদান্তের বহু তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বেদান্ত সমদর্শী। স্বামীজী ভারতবর্ষের বহু দেশে পদব্রজে পর্যটন করিয়াছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের ভিতর মিশিয়াছেন। তিনি রাজপ্রাসাদে ও কুটীরে বাস করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ধনী ও দরিদ্রদের জীবনযাত্রায় কতখানি পার্থক্য। দেশ যে অজ্ঞতা ও অন্ধ সংস্কারে ধ্বংসের পথে যাইতে বসিয়াছে তাহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। একদিকে প্রবলের শোষণ ও শাসন, অন্যদিকে দুর্বলের ক্লৈব্য। আবার ইহার মধ্যে সংস্কারক নাম ধারণ করিয়া এক-দলের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামীজীর মতে ইঁহাদের সংস্কার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"প্রায় শতাব্দিকাল ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজ সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই।"

কেন হয় নাই? ইহার অনেকগুলি কারণই আছে। প্রথম কারণ উচ্চ ও নীচের ভিতর সমস্ত উপলব্ধির অভাব। স্বামীজী বলিয়াছেন, "দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, সমাজ সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে বর্ণিত ব্যক্তিগণ 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন ও হইতেছেন সেই

শোষিত শ্রেণীর জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।"

স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন, এই সংস্কারকগণের কার্যের মধ্যে "আমিও ইহাদেরই একজন" এইরূপ মমত্ববোধ নাই, আছে উদ্ধারকর্তার অহমিকা। পাশ্চাত্য লোকহিতবাদের অনুকরণে কতকগুলি স্কুল কলেজ কি হাসপাতাল করিলেই সংস্কার কার্য সার্থক হয় না। পদমর্যাদা বিভেদ রচনা করিতেছে মর্যাদা-হীনদের সঙ্গে, ধনের অধিকার বিভেদ রচনা করিতেছে নির্ধনের সঙ্গে এবং বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের অহমিকা বিভেদ রচনা করিতেছে অজ্ঞানী ও মূর্খের সঙ্গে। সর্বত্রই এই বিভেদ বোধ, কোথাও বা স্থূলভাবে আবার কোথায়ও বা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন, "গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাস তোমাদেরই উপর।"

একমাত্র উপায় বেদান্ত। বেদান্তই সমস্ত আপাতদৃশ্যমান ভেদের মধ্যে অভেদত্ব স্থাপনের মন্ত্র স্বরূপ; দুর্বলকে বলীয়ান করিবার বেদান্তই তেজস্কর ঔষধস্বরূপ। স্বামীজী তাই বেদান্ত প্রচারকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছিলেন।

স্বামীজীর লাহোরে এমন একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় যাঁহাকে তিনি বেদান্ত প্রচারের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তিনি লাহোর কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামী। এই তীর্থরাম গোস্বামী স্বামীজীর প্রেরণায় বেদান্ত প্রচারকার্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী রামতীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৬ই নভেম্বর স্বামীজী দেরাদুন চলিয়া যান এবং দেরাদুন হইতে সাহারানপুর এবং তাহার পর দিল্লী আসিয়া কয়েকদিন তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ি অবস্থান করেন।

দিল্লী হইতে আলোয়ার, এই আলোয়ারে আমেরিকা যাইবার পূর্বে পরিব্রাজকরূপে স্বামীজী একবার আসিয়াছিলেন, এখানে তাঁহার পূর্ব-পরিচিত অনেক বন্ধু এবং ভক্ত ও শিষ্যের সঙ্গে দেখা হয়। এখানে এক দরিদ্রা ভক্তিমতী মহিলার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রস্তুত 'চাপাটি' ভক্ষণ করিয়া স্বামীজী পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

আলোয়ার হইতে স্বামীজী জয়পুর গেলেন। এখানে তাঁহার অনেক পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজী খেতরির রাজার বাংলোয় রাজ-অতিথিরূপে ছিলেন। রাজা তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বামীজী সেই সময় তাঁহার সঙ্গিগণকে বলিয়াছিলেন, "এখানে একদিন আমি ফকিরের বেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। রাজার রাঁধুনি তখন নিতান্ত অশ্রদ্ধায় আমাকে দিনান্তে একবার খাদ্য দিত, আর এখন? এখন সেবার জন্য কতই আয়োজন, পালকের গদিতে শোবার বিছানা। জোড়হাতে সর্বক্ষণ কত লোক দাঁড়িয়ে আছে, কখন আমার কি দরকার হবে সেই আদেশের অপেক্ষায়। এ কথাটি অতি সত্য যে—'অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরীণং।'"

জয়পুর থেকে খেতরি ৯০ মাইল। স্বামীজীকে আনিবার জন্য রাজা বাহাদুর নানাপ্রকার যানবাহন পাঠাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং বারো মাইল পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।

১৭ই ডিসেম্বর স্কুল বাড়িতে এক সভা আহ্বান করা হইল। সেই সভায় নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বামীজীকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। রাজা বাহাদুর সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকেও অভিনন্দন দিবার আয়োজন করা হইল। রাজাকে অভিনন্দন দিবার দিন নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে অভিনন্দন পাঠানো হইয়াছিল।

স্বামীজী খেতরির যে বাংলোতে ছিলেন সেখানে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় রাজা বাহাদুর সভাপতি ছিলেন এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ইউরোপীয়ও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। স্বামীজী "বেদান্ত" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া 'হিন্দুধর্ম' এখন যে কেবল আচার অনুষ্ঠানেই পরিণত হইয়াছে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি এতই অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া তাহার পর আবার বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

খেতরিতে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি জয়পুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় আজমীর, যোধপুর, কিষেণগড় ও ইন্দোর এবং খাণ্ডোয়াতেও তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল; খাণ্ডোয়ায় স্বামীজীর শরীর বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় গুজরাট, বরোদা এবং বোম্বাই হইতে বার বার আহ্বান আসিলেও তিনি সেখানে যাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

স্বামীজী ইতিপূর্বে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিয়া যেভাবে সর্বত্র বক্তৃতার মধ্য দিয়া দেশবাসীকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন উত্তর ভারতেও সেই-ভাবেই প্রচার করেন। এই প্রচারের প্রথম বিষয় ছিল, "বিবাহের মাধ্যমে যতটা সম্ভব জাতি-বিভেদ তুলিয়া দেওয়া, কেননা, এই অসংখ্য জাতি-বিভেদেই দেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়ত বিবাহ সম্বন্ধে সংযত হওয়া। এই দরিদ্রের দেশে যতটা কম বিবাহ হয় তাই মঙ্গল। ইহা ছাড়া, শিক্ষার দ্বারা ধনীর ব্যবধান দূর করা, শিক্ষার দ্বারা সর্বসাধারণের ভিতর জ্ঞান ও ধর্মের আলোকপাত, অন্ধ কুসংস্কার এবং গোঁড়ামি যে কতদূর অনিষ্টকর সে সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা। সর্ব-বিষয়ে দুর্বলতা পরিহার, মতবিরোধের মধ্যেও ঐক্য ও সংহতি স্থাপন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি সর্বত্রই বলিয়াছেন।
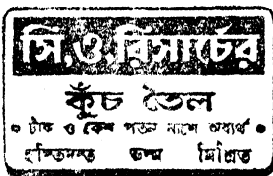
এই সকল বক্তব্যের মধ্যে তাঁহার যেটি বিশেষ বক্তব্য ছিল সেটি ভারতবর্ষের যুবকগণকে তাহাদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে সচেতন করা, তাহাদের জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করা। 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় তিনি অতি জ্বলন্তভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন,—"আগামী পঞ্চাশ বৎসর ইহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় হবে, আমাদের মহিমময়ী জননী ভারতবর্ষ। * * * আমাদের জাগ্রত দেবতা, আমাদের স্বজাতি! সর্বত্র তাঁর হস্ত, সর্বত্র তাঁর চরণ, সর্বত্র তাঁর কর্ণ। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন। * * * সকল পূজার প্রথম হ'ল বিরটের পূজা। আমার—* * চারদিকে যাঁরা আছেন তাঁদেরই পূজা। * * 'পূজা' এই সংস্কৃত কথাটিই উপযুক্ত কথা, অন্য ইংরাজী কথায় ঠিক ভাব প্রকাশ হবে না। * * আমার দেশবাসিগণই আমার উপাস্য দেবতা, তাঁদেরই পূজা কর্তে হবে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাতুর বা সংগ্রামপরায়ণ হওয়ার পরিবর্তে।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস আসিল, স্বামীজী জানুয়ারীর মাঝামাঝি কলিকাতা ফিরিলেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ ও সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের দু'টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে মাদ্রাজ পৌঁছান। তখন রেলপথ ছিল না সেজন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে জাহাজে যাইতে হইয়াছিল।

প্রথমে তিনি আইস হাউস রোডে একটি ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। বাড়ির নাম ছিল 'ফ্লোরা কটেজ'। আলমবাজারে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পূজা লইয়া ছিলেন, এখানে আসিয়াও তিনি প্রথমেই একটি ঘরে একটি বেদীর উপর ঠাকুরের একখানি ছবি রাখিয়া সেই ঘরটিকে ঠাকুর ঘর করিলেন। এইভাবে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা হইল।

ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ হইতে আসেন তখন মাদ্রাজে যে বাড়িতে কয়েকদিন ছিলেন সেই বাড়িতেই জুন মাসে এই মঠ উঠিয়া গেল। এই বাড়িটি একটি আমেরিকান কোম্পানী বরফের গুদাম করিবার জন্য করিয়াছিলেন, সেজন্য নীচের তলার ঘরগুলি খুব বড় বড় ছিল এবং দেওয়ালও খুব পুরু ছিল। বাড়িটি সমুদ্রের ধারে এবং দেওয়াল পুরু, এইজন্য মাদ্রাজের দারুণ গরমেও এই ঘরগুলি ঠাণ্ডা থাকিত। স্বামীজী এই নীচের তলার ঘরেই ছিলেন এবং মঠও সেইখানেই স্থানান্তরিত হইল।

বাড়িটি ছিল খুব বড় এবং তিনতলা, এস বিলাগিরি আয়েংগার নামে একজন অ্যাটর্নি এই বাড়ির মালিক ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তিনি নীচের তলাটি মঠের জন্য বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দেন এবং তিনি তাঁহার উইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে প্রতি মাসে বারো টাকা করিয়া দিবার জন্যও লিখিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের মিশনের কার্য দিনে দিনে প্রসার লাভ করিতেছিল। এই সময় স্বামী শিবানন্দ স্বামীজীর ইচ্ছাক্রমে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সিংহল রওনা হন। স্বামীজী তাঁহার যাত্রার পূর্বে ৯ই জুলাই তারিখে তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"একেবারে শিক্ষকের আসন নিতে যেও না, বিনয়ের সংগে সব কাজ করবে, নইলে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। মাদ্রাজে শশীর কাজে কোনরকম আপত্তি, তিরস্কার বা বাধা দেবে না। কারণ, যে কেউ যেখানে যাক, সে যেই হোক্ না কেন, তাকে সেখানে যে আছে তার কথামতই চলতে হবে। যদি শশী সিলোনে যায় তা'হলে সেখানে সে তোমার কথামতই চল্‌বে।" * * *

সিংহলের কার্যবিবরণী মিসেস পিকেট (শ্রীমতী হরিপ্রিয়া) ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় যাহা পাঠাইয়াছিলেন তাহার বাংলা অনুবাদ এইরূপঃ—'শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী শিবানন্দ, যিনি মানবজাতির প্রতি মাত্র ভালবাসার বশবর্তী হয়ে কয়েক সপ্তাহ সিলোনে এসেছেন, তাঁর কার্যবিবরণী সম্বন্ধে আপনাদের অতি মূল্যবান ও সর্বজনসমাদৃত পাক্ষিক পত্রে কয়েকটি কথা জানাবার সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি।

"ভারতবর্ষীয় বন্ধুগণের মাধ্যমে তিনি এখানকার কয়েকজন ইউরোপীয়ান ছাত্রের সংগে এবং সেই সংগে কয়েকজন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতার সংগেও পরিচয় লাভ করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐ সকল নেতা ইংরাজী ভাষায় উচ্চশিক্ষিত। * * *

"যদিও স্বামীজী সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যার সময় ক্লাস করছেন কিন্তু এই সকল ক্লাসে আশানুরূপ লোক হচ্ছে না। তবে কয়েকটি ইউরোপীয়ান ছাত্রের মধ্যে তাঁর কাজ করার অধিকতর সুবিধা হয়েছে। * * * তাঁর এই ক্লেশকর কার্য পরিচালনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি কয়েকজন ছাত্রের বাড়ি গিয়ে তাদের বেদান্ত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। * * *

"স্বামীজী মনে করেন যে, তাঁর এদেশে এখন আসা ভবিষ্যতে আরও উত্তম ও অধিক ফলপ্রদ কাজের প্রথম সোপান মাত্র। যদিও তাঁর ভবিষ্যৎ কাজের সফলতা সম্বন্ধে এখন সঠিক কিছু বলা যায় না কিন্তু তিনি যে কর্মপ্রণালী অবলম্বন করেছেন তা'তে করে মনে হয়, কাজ ভালই হবে। * * *

"ইত্যবসরে আমরা আমাদের সকল শুভেচ্ছুগণের কাছে যাচ্ঞা ও প্রার্থনা করছি—তাঁরা শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজীর কাজের প্রতি এমনভাবে সহানুভূতি করুন যা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর হিন্দু ভ্রাতাগণ তাঁর সহায় আছেন। তিনি যে সৎকাজ অক্লান্তভাবে করছেন, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁরাও সেই সৎকাজের ফলভাগী হবেন।"

এই আবেদন করিয়াছেন একজন ইউরোপীয়ান ছাত্রী, স্বামী শিবানন্দের তিনি শিষ্যা এবং স্বামী শিবানন্দই তাঁহাকে 'হরিপ্রিয়া' নাম দিয়াছিলেন। আবেদনটি পড়িয়া মনে হয়, সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকার্য সে সময় তেমন সফল হয়

নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমেই স্বামী শিবানন্দ সিংহল কেন্দ্রের কার্য বন্ধ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কেন তাঁহাকে এত অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরে যা জানা যায়, তাহার তাৎপর্য এই যে, তামিল ভাষা তিনি জানিতেন না সেইজন্য জনসাধারণের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তখনকার দিনে সিংহলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই ইংরেজী জানিত।

এই সময় বিদেশের প্রচারকার্যের ভার ছিল আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দের উপর এবং ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দের উপর, কিন্তু আমেরিকার কার্য এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে একা সারদানন্দজীর পক্ষে তাহা সম্পাদন করা সম্ভব হইতে-ছিল না। সেজন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় যান, লণ্ডনের কার্যভার তখন মিস্টার স্টার্ডি ও তাঁহার সহকারিণী মিস মার্গারেট নোবলের উপর রহিল।

বাংলা দেশে এই সময় দিনাজপুরেও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। বহরমপুরের দুর্ভিক্ষ তখনও চলিতেছিল, এই দুই জায়গাতেই সাহায্য করার দরকার হইয়াছিল, সেজন্য রামকৃষ্ণ মিশন হইতে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়, এর নাম দেওয়া হইয়াছিল 'আলমবাজার দুর্ভিক্ষ সাহায্য পর্যৎ'। এই সাহায্য ভাণ্ডারে আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতেও স্বামীজীর অনুরাগী ভক্তেরা সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতকে (সারদা মহারাজ) রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দিনাজপুর পাঠানো হয়। দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার এন বনহ্যাম কার্টারও এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে সাঁওতাল পরগণাতেও অন্নকষ্ট দেখা দেয়, সেখানেও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী বিরজানন্দকে পাঠানো হয়। দেওঘরের সাব-ডিভিশনাল অফিসার মিঃ এইচ এইচ হার্ড রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকার্যের সহিত সহযোগিতা করেন।

এইভাবে নবস্থাপিত রামকৃষ্ণ মিশন সাত মাসের মধ্যেই বাংলার দুটি জেলায় এবং সাঁওতাল পরগণার একটি জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবাকার্য সম্পাদন করে এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ গভর্নমেণ্টেরও শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ করে।

স্বামী সারদানন্দজীও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার জন্য 'টিউটনিক' নামক জাহাজে ১২ই জানুয়ারী আমেরিকা ত্যাগ করেন এবং ইংলণ্ড ও প্যারিস হইয়া নেপলস্ হইতে ব্রিন্দিসিতে 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পেঁছিলেন।

স্বামীজী উত্তর ভারত হইতে জানুয়ারী মাসে কলিকাতা ফিরিয়াই জমির সন্ধান করিতেছিলেন, ঠাকুরের জন্মোৎসব আগতপ্রায়, জন্মোৎসবের আগেই একটি স্থায়ী আস্তানা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ভগিনী নিবেদিতাও এই বৎসর ২৮শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে আসেন।

জমির জন্য দু' তিন জায়গায় চেষ্টা করিয়া অবশেষে বেলুড় গ্রামে একটি জমি পাওয়া গেল এবং জমিটি স্বামীজীর পছন্দ হইল। এই জমির অধিকারী ছিলেন একজন বেহারী ভদ্রলোক, তাঁহার নাম বাবু ভগবৎনারায়ণ সিংহ। তাঁহাকে বায়না স্বরূপ ১০০১ টাকা দিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল।

তখন পর্যন্ত ঠাকুরের সন্তানগণ আলমবাজারেই ছিলেন, কিন্তু আলম-বাজার হইতে গঙ্গা পার হইয়া এতদূর আসা সুবিধা হইবে না বলিয়া তাঁহারা জমির কাছেই 'নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি বাগানবাড়িতে উঠিয়া গেলেন।

এই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীও একটি উইল করেন। স্বামীজী ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে যত টাকা সংগৃহীত ছিল সমস্তই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দিয়া-ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যদি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর লোকান্তর হয় তাহা হইলে টাকা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে গোলমাল হইতে পারে এবং সেই গোলমালের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে উইল করেন তাহার বাংলা প্রতিলিপি এইরূপঃ—

লিখিতং স্বামী ব্রহ্মানন্দ—দক্ষিণেশ্বর নিবাসী পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, সন্ন্যাসী, সাকিম আলমবাজার মঠ, আলম-বাজার, জেলা চব্বিশ পরগণা কস্য চরম-পত্রমিদং—আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আমার ত্যক্ত আমার স্বনামী বা বেনামী নগদ অর্থ, গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি এবং অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমার অভাবে উক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য উক্ত আলমবাজার মঠ নিবাসী তুরীয়ানন্দ স্বামী ও সারদা-নন্দ স্বামী সন্ন্যাসীদ্বয় পাইবেন এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ও অধীনে থাকিবে এবং আমি তাঁহাদিগকে এই উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলাম এতদর্থে স্বেচ্ছায় এই শেষ উইল বা চরম সম্পাদন করিলাম।

ইতি ১৮৯৮ খৃঃ ১৯শে জানুয়ারী

(স্বাক্ষর) স্বামী ব্রহ্মানন্দ

এই উইলের সাক্ষী ছিলেন প্রমথনাথ কর, সলিসিটার এবং ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ বেলুড় মঠের জমি কেনা হইল। ২২ বিঘা জমি এবং তাহার মূল্যের বায়না ১০০১ টাকা আগেই দেওয়া হইয়াছিল, বাকী ৩৮৯৯৯ দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জমিটি ক্রয় করিয়া লইলেন। মিস্ হেনরিয়েটা মুলারই প্রায় সমস্ত টাকাটা দিয়াছিলেন। বিক্রয় কোবালাখানি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ বেলা ১২টা থেকে একটার মধ্যে হাওড়া সাব-রেজেস্ট্রী আফিসে রেজেস্ট্রী হয়।

আলোচনা

ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা

॥১॥

মাননীয়েষু,—আপনাদের ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। একটা অনুরোধ আছে। আমরা যারা সাধারণ পাঠক, তারা বিদেশী ভাষার মধ্যে একমাত্র ইংরিজীই অল্পবিস্তর জানি। কাজেই অন্যান্য বিদেশী ভাষা এবং সাহিত্য, যেগুলি রসসমৃদ্ধ তাদের এই ধরনের "সংস্কৃতি সংখ্যা" প্রকাশ করুন না। উর্দু আছে; ফার্সী আছে; রাশিয়ান, ইতালীয়, জার্মান—এরাও আছে। ইংরাজীর উপরও এ ধরনের সংস্কৃতি সংখ্যা বের করা যায়। এতে করে সাধারণ পাঠক আমরা অনেক কিছু জানতে পারব। আপনার পত্রিকার অন্যান্য পাঠক-পাঠিকার মত, আশা করি, আমার প্রতিকূল হবে না। আপনি কী বলেন? পরিশেষে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই ১৬ই তারিখের সংখ্যাটির জন্য। নমস্কারান্তে—কল্যাণকুমার ঘোষ, কলিকাতা।

॥২॥

মহাশয়,—'দেশে'র ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে শুনে একটা আনন্দময় উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, বিশেষ সংখ্যাটি পড়ার পর, 'দেশে'র কাছে আমাদের ঋণের যে পরিমাণ, মনে হল তা যেন বেশ কিছুটা বেড়ে গেল। পৃথিবীকে দু'হাতে বিলিয়ে দেবার মত রত্নভাণ্ডার যে অল্প কয়েকজনের আছে ফ্রান্স তাদের একজন, আর সে রত্নভাণ্ডারের প্রায় সব কটি কোণের আলোই ঠিকরে পড়েছে বিশেষ সংখ্যাটির পাতায় পাতায়। এ কাজে সাহায্য যাঁরা করেছেন তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধেও অনায়াসেই নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। এ বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনাকারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রথমেই প্রচ্ছদপটে মাতিসের ছবিটি মন খুশীতে ভরে দেয়। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই সুলিখিত। মঞ্চ ও পর্দাসংক্রান্ত রচনাটি আরও উচ্চাঙ্গের হওয়ার সুযোগ ছিল এবং ঐ সম্বন্ধে বিশেষ করে ফরাসী সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও একটি রচনা দেওয়া চলত মনে হয়। অনূদিত ফরাসী কবিতাগুলির সংকলন সত্যই আকর্ষণীয়। অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায় (তাঁর 'ময়ূরকণ্ঠী'তেও এ প্রসঙ্গ আলোচিত) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত গ্রন্থ তালিকা থেকে, বর্তমান অনুবাদ সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির দিনে তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ফরাসী থেকে অনূদিত সমুদয় বাংলা গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ কি অসম্ভব ছিল? লা মার্সাইয়ের অনুবাদ ও স্বরলিপিটিও ভাল লাগল, বিশেষ সংখ্যাটির দাম যে বাড়ান হয়নি এটাও আনন্দের কথা। ইতি—অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৪।

॥৩॥

মহাশয়,—দেশ পত্রিকার 'ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যায়' অহিভূষণ মল্লিকের লেখা 'ফরাসী চিত্রে ইমপ্রশনিজম্' পড়ে সত্যিই আনন্দ পেয়েছি। আনন্দ পাবার মূল কারণ হলো—লেখকের বলবার ভঙ্গি সহজ এবং স্বচ্ছ। এ লেখার মধ্যে দিয়ে শ্রী মল্লিক যতটা জানাতে পেরেছেন ততটা জানাবার আগ্রহ সম্প্রতি অনেকেই সাময়িক পত্র-পত্রিকায় দেখিয়ে থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয়—তাঁদের বলবার ভঙ্গি জটিল এবং আমাদের কাছে তা দুর্বোধ্যও বটে,—সেদিক দিয়ে অহিভূষণ কৃতকার্য হয়েছেন, তাই আমার কাছে তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভবিষ্যতে দেশ পত্রিকা মারফৎ শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ আরো কিছু জানবার ইচ্ছে রইলো। নমস্কার জানবেন, ইতি—অরুণকুমার দাস, কলিকাতা ২৫।

॥৪॥

সবিনয় নিবেদন,—'দেশ' ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যাখানা হাতে আসার পর আমি মন ও চোখ খুলে তার প্রতিটি বিষয়বস্তু পড়েছি, বুঝেছি এবং আনন্দ পেয়েছি। বিশেষ করে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'ফরাসী-বাঙলা', কিরণকুমার রায়ের 'ইতিহাস সমুদ্র সফেন', ও শিবনারায়ণ রায়ের 'ফরাসীর জীবনবোধ ও বাঙালী লেখক'। অবশ্য তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় কি সতীনাথ ভাদুড়ী কিংবা রঞ্জন কি রূপদর্শী এ'দের লেখা আমার বরাবরই ভালো লাগে। কাজেই এ'রাও যে আমায় ফাঁকি দেননি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কার নাম রেখে কার নাম করি! যে সমস্ত রচনা চয়ন করে করে এমন একটি সাংস্কৃতিক-মালা গেঁথেছেন সেই মালাটি তার আপন রূপ রস ও গন্ধ নিয়ে আমার চিত্ত মন হরণ করে নিয়েছে। সেজন্য আপনাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেশ-বিদেশের সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের জীবনবেদ সম্বন্ধে জানতে। 'দেশ' পত্রিকায় মাঝে মাঝে এমন ধরনের লেখা যে একেবারেই পাইনে তা নয়, কিন্তু নিতান্তই কম সে কথা অস্বীকারের উপায় নেই। মাঝে মাঝে 'দেশ'-এর পাতায় পাতায় এমন সব লেখা পেলে একজন অতি সাধারণ পাঠিকা হিসেবে আমি খুব খুশী হবো। ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে তবু যাও-বা কিছু কিছু জানি বা জানবার সুযোগ পাই, কিন্তু ফরাসী, জর্মন, পোলিশ ইত্যাদির ত' কিছুই জানিনে। সোভিয়েট শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধেও আমার প্রচুর আগ্রহ আছে কিন্তু কোন বিশেষ রাজনৈতিক প্রচার সাহিত্য আমি চাইনে। তাছাড়া চীন বা জাপান এই দু দেশের সাহিত্যের রূপ ও রেখা কি রকম? বাংলা দেশ থেকে মাঝে মাঝে কিছু সাহিত্যিক নানা দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়িয়ে আসেন, দেখি এবং এসেই একটা না একটা অভিজ্ঞতার বইও লেখেন। কিন্তু, আমি যা খুঁজি, সেই সব দেশের সাহিত্য, সাহিত্যিক, পাঠক এবং তাঁদের রুচি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারিনে।

শ্রীযুত শেখর সেনের "সংস্কৃতির রাজধানী প্যারিস" রচনার এক জায়গায় পড়লাম "য়ুরোপে যেখানেই গেছি দেখেছি ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে খবর রাখে অতি অল্পসংখ্যক লোকই। সাধারণ লোকের কথা থাক, যারা সাহিত্য অনুরাগী বা সাহিত্যসেবী তারাও রাখে না তেমন খবর।......উপযুক্ত অনুবাদের অভাবও কম নয়। 'টেগোর' ছাড়া য়ুরোপীয়রা আর কোন কবি সাহিত্যিককেই বড় বেশি জানে না। মুলুকরাজ আনন্দ অবশ্য কিছুটা পরিচিত হয়েছেন কোন কোন মহলে।" এই সত্য কথাগুলি পড়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছি।

এ কথাও ঠিক যে বিদেশে বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের একমাত্র পথই হোল অনুবাদ করে তার প্রচার করা। এতে মূল সাহিত্য রসের অনুভব কিছু ব্যাহত হবেই সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে খুব বেশি আসে যায় কি! উপযুক্ত অনুবাদকের অভাব আমি স্বীকার করি না। আসলে অভাব হোল আমাদের প্রচেষ্টার, আমাদের ইচ্ছার। দেশে-বিদেশে বাংলা সাহিত্যের প্রচারের জন্য তেমন কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে কি না জানিনে। কিন্তু বাংলা দেশে যে P E N প্রতিষ্ঠানের শাখা ছিলো জানতেম তাঁরা কি করেন—তাঁদের কাজ কি? তাঁরা এবং আধুনিক সাহিত্যিকরা এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে আমার মনে হয় বাংলা সাহিত্যের প্রচারের কিছুটা সুরাহা হোত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিদেশের যে কোন সাহিত্যের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবার মত যোগ্যতা বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট আছে, বিশেষ করে ছোট-গল্পে, কিন্তু অবহেলা ও চেতনাহীনতার জন্যেই আমরা সেই অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারাতে বসেছি। এটা অত্যন্ত বেদনার কথা—

ঃখের কথা। 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে তেমন ান আন্দোলনের সূত্রপাত করলে কেমন ? প্রীতি নমস্কারান্তে—দীপিকা দাশ-প্ত, জামশেদপুর—৫।

॥৫॥

মহাশয়,—ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যা "দেশ" াঠ করে আনন্দিত ও উপকৃত হলাম। এখানে ুযোগ, অভাবে অনেক ফরাসী বই সংগ্রহ রতে পারি না এবং অনেক লেখক ও তাঁদের ই সম্বন্ধে সংবাদও পাওয়া যায় না। দেশে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পাঠে এমন অনেক সংবাদ পাওয়া গেল যা আমার কাছে নূতন—সে কারণে উপকৃত হলাম আর সৈয়দ মুজতবা আলী, সুনীতিবাবু প্রভৃতি পন্ডিতদের লেখা পাঠ করে কেই বা আনন্দিত না হয়!

"ফরাসী বাংলা" নামক প্রবন্ধের শেষাংশে সৈয়দ সাহেব প্রশ্ন করেছেন "ফরাসীর উপর বাংলা কোন প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?" উত্তরে তিনি অনেক সংবাদ পরিবেশন করেছেন যথা লেভিকৃত বলাকার অনুবাদ, শ্রীমতী কারপেলেজ প্রণীত ক্যই দ্য ল্যাঁদ, বেনওয়ার মুক্তধারার অনুবাদ "লা মাশিন" ও অন্যান্য অনুবাদ। এ সম্বন্ধে তিনি আরও দুখানি অনুবাদের নামোল্লেখ করতে ভুলেছেন। জিদ-কৃত রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের অনুবাদ "অমল এ লা ল্যাৎর দ্যু রোয়া" ও গীতাঞ্জলির অনুবাদ "লফ্রাঁস্ লিরিক্"। আমি নিজে অবশ্য একখানিও পড়িনি তবে আমার সংগ্রহের অন্তর্গত জিদ্-এর জর্নাল (১৯৩৯-১৯৪২) বইখানির মলাটে যে বিজ্ঞাপন আছে তাতে জিদ্ লিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে এই দুখানির নাম দেখলাম। সৈয়দ সাহেবের নিকট আমার একটি প্রশ্ন "Celui qui me lira dans le siecle an soir" কবিতাটি কার রচনা?

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে হ্যুগোর কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন—মূল কবিতাগুলি Contemplations নামক বই-খানিতে পেলাম। একটু লক্ষ্য করলে হ্যুগোর অনেক কবিতার ছায়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন কবির—

"আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে
সে সুধা ছড়িয়ে গেল লোকে লোকে" এবং হ্যুগোব—

Aimons toujours! aimons encore!
Quand l'amour s'en va, l'espoire fuit.
L'amour, C'est le cri de l'aurore
L'amour, C'est l'hymne de la nuit.

* * *

Ce que la flot dit aux rivages
Ce que le vent dit aux vieux monts
Ce que l'astres dit aux nuages
C'est le mot ineffable: "Aimons".

কবিতা দুইটির মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের "পড়ুয়ার নোট থেকে" প্রবন্ধও অনেক সাহিত্যিক সংবাদে পূর্ণ। তাঁর অভিযোগ "ফরাসী বই এত আক্রা কেন?" আমিও সমর্থন করি। কলকাতায় মাত্র একখানি ফরাসী বই-এর দোকানের কথা আমার জানা আছে সেখানেও দেখেছি Exchange rate অপেক্ষা বেশী দাম চায়। বাঙালী পাঠকের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, কাজেই অনেক সময় সাধ থাকলেও বই সংগ্রহ ও পাঠ সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে Marcel Pagnol-এর Topaze নাটক-খানির দাম লেখা আছে ৩০০ ফ্রাঁ। আজ-কালকার Exchange rate-এ দাম হওয়া উচিত ৪্ টাকার মত। আমাকে দিতে হয়েছে ৫্ টাকারও বেশী। তবে আশার কথা অধুনা প্রকাশিত "Livres de poche" সংস্করণের দাম অপেক্ষাকৃত কম এবং অনেক প্রখ্যাত লেখক যথা Saint Exuperi, Sartre, Proust, Colette, প্রভৃতির কিছু কিছু লেখা এই সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে।

নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীত—শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম

দেবদাস পাঠক

এ কোন আগুনে আমি দগ্ধ হই, এ কোন অঙ্গার
আমার সমস্ত দিন রাত্রির নিভৃত দণ্ড পলে
আতপ্ত দুবাহু তার মেলে দেয়, অহরহ জ্বলে;
আমাকে জ্বালায়। এই জীবনের সকল সম্ভার
আহুতি নিয়েও তার তৃপ্তি নেই; স্বপ্নের কুসুম
নিষ্ঠুর দুহাতে সব ছিঁড়ে নেবে, দেবে না রেহাই।
প্রাণের নিভৃত বৃন্তে যে-কুঁড়িটি ফোটে তাও চাই;
এ-কোন দুরন্ত অগ্নি কেড়ে নিল স্বপ্ন, নিল ঘুম।

তুমিও কি জ্বল সখি সে-জ্বালায় রাত্রি আর দিন,
প্রশান্ত সন্ধ্যায় কিংবা অন্ধকার নিভৃত শয়নে
অব্যর্থ সায়কে তার পূর্ণকাম চতুর শবর
তোমাকেও বিদ্ধ ক'রে নেপথ্যে সে হয়েছে বিলীন।
বিদীর্ণ হৃদয় তবু ক্ষান্তি নেই দারুণ দহনে;
এ-কোন দুরন্ত অগ্নি জ্বালে সখি দুজনার ঘর।

রূপালি জলের নদী

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লা

বায়ুর ডানার নীচে ভিজে মেঘ এনেছে আকাশ
সোনালী নদীর তীরে, ফিনফিনে কুয়াশার মতো—
রূপালী জলের রেখা নীচে বয়ে যায় অবিরত
মসৃণ শাড়ির ভাঁজে; জলস্রোতে নেই কলোচ্ছ্বাস
নারীর দেহের ভঙ্গি, তবু যেনো তার চারিপাশ
কী এক রহস্যে ঘেরা; ভিজে বাড়ি হলুদ রোদ্দুরে
যেমন ঝিলিক দিয়ে দীপ্ত হয়, হেমন্তের ভোরে
তেমনি গোলাপী আলো দীর্ণ করে প্রশান্ত-বাতাস!

এমন সোনালী নদী কতকাল যায় একা বয়ে
কতকাল দেহে তার সকালের আলোর কাঁপন;
কুয়াশা রেখেছে ঘিরে সে নদীর স্নিগ্ধ ভালবাসা
ষোড়শী তন্বীর মতো, কখনো বা পরম-প্রত্যাশা
সে পায় দিগন্তে খোঁজে, অকস্মাৎ হয়েছে উন্মন
রূপালী জলের নদী, আকাশের একান্ত বিস্ময়ে!

তমসী

আরতি দাস

নাম দাও,
যতই আঘাত হানো, যতনা কাঁদাও
ক্ষতি নেই, যদি তার পরিচয় দাও।
এই যে জানিনে কিছু এ দুঃখের
ছেদ নেই, অন্ত নেই এর।

সারাদিন
বিষন্ন মলিন
কাকে যেন দেখা যায়
সন্ধ্যার আঁধার মেখে সর্ব অঙ্গে, একা জানালায়।

কেনই বা, কেই বা সে
জেনেছি কি তার কোন কিছু?
তবু মুখ নীচু
অচেনা এ কার ছবি পরিশ্রান্ত ঘুমের ছায়ায়
চোখে পড়ে দিনান্তের প্রান্ত জানালায়!

বিচ্ছিন্ন আমার মন, নিরুদ্দেশ সমস্ত ভাবনা
কোনদিন জানবে না, জানাবে না
কেই বা সে, কি তার ঠিকানা!

আমার সময়
দিয়েছে অনেক দুঃখ
ক্ষয় ক্ষতি যন্ত্রণার ভয়
দুঃসহ অনেক গ্লানি। তার ওপর এ অপরিচয়
মৃত্যুর উপেক্ষা নিয়ে
আর এক মৃত্যুর বিস্ময়।

দিনের সমস্ত পাখি
ফিরে আসে রাত্রির শাখায়
প্রসারিত জটায়ু পাখায়
নেমে আসে স্তব্ধতার
ঘন অন্ধকার,

সব কিছু মেনে নিয়ে শুধু দণ্ড কয়
অত্যন্ত নির্ভয়
বসে থাকা জীবনের প্রান্ত জানালায়,
কাকে দেখি সারাদিন,
মুখ যার বিষন্ন মলিন,
কি ঔদাস্যময়
চোখে তার, প্রত্যহের অশ্রুর সঞ্চয়!

পাক্ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন যে, "লালকোর্তা" কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না। —"বুশ্-হাওয়াই কোর্তার সঙ্গে আগেই দোস্তির চুক্তি হয়ে গেছে কি না, হয়ত তাই"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদে প্রকাশ যে, ১লা অক্টোবর হইতে মেয়েরা কোন গহনা বা লিপস্টিক জাতীয় প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না, এই মর্মে একটি ফরমান্ জারী করা

হইয়াছে। জামা-কাপড় কি কি পরিতে পারিবেন, তা-ও সরকারী আদেশে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিল—"শুনিতেছি, অতঃপর 'প্রেমের প্রণালী' নামক একখানি পুস্তিকাও বিতরণ করা হইবে। পুস্তিকাখানি আপাতত যন্ত্রস্থ"!

* * *

শুনিলাম, ঢাকাতে নাকি আবার 'মসলিন' প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। —"নিঃসন্দেহে এটা সুসংবাদ। কিন্তু মসলিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে কি না, সে খবর না পাওয়া পর্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারছিনে"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাক্-ভারত চিত্রবিনিময় চুক্তি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"আশা করি, এক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নেই, কায়ার চেয়ে ছায়ার মায়া বেশি তো"—বলেন খুড়ো।

* * *

জেনেভার চতুঃশক্তি সম্মেলনের পর চার শক্তিমানেরাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' অবসান হইল। শ্যামলাল বলিল—"আশা

করি, এর অর্থ এই নয় যে, অতঃপর কুসুম গরম বা গরম যুদ্ধ শুরু হবে"!!

* * *

ভগবানগোলার এক সংবাদে শুনিলাম যে, ওয়াগনের অভাবে হাজার হাজার ঝুড়ি আম পচিয়া নষ্ট হইতেছে। —"মনে হয়, এটা ঠিক ওয়াগনের অভাব নয়, বিমান সফরের পর আমেরাই হয়ত আর ওয়াগনে ভ্রমণ করতে রাজী নয়"—বলিলেন এক সহযাত্রী।

অনেকে অভিযোগ করিতেছেন, কলিকাতার বর্তমান টেলিফোন ডাইরেক্টরী হইতে নম্বর ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। —"ব্যাপারটা এমন জটিল কিছু নয়, ডাইরেক্টরীর একখানা

ডাইরেক্টরী ছেপে দিলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রেলওয়ের সাবেক Servants' Compartment-এর নূতন নামকরণ হইয়াছে Attendants' Compartment। —"লালবাহাদুরজীকে বাহাদুরি দিই। তিনি নিশ্চয় সেক্সপীয়র পড়েছেন এবং জানেন যে, নাম-বদলের সঙ্গে গাড়ি বা তার সুখ-সুবিধে বদলের দায় নেই; সুতরাং সাপ মরল, লাঠিও ভাঙল না"—বলেন খুড়ো।

* * *

কটকের এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে কোন একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর তার আত্মীয়স্বজন কাঁদিতে কাঁদিতে যখন মৃতার সৎকারের ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকটির দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসে। জনৈক সহযাত্রী বলিয়া উঠিলেন—"সেই জন্যেই তো রসরাজ অমৃতলাল লিখেছিলেন—ইস্তিরিকা পরাণ কৈ মাছ কা পরাণ হ্যায়, ওকি সহজে মরবার গা?" —সহযাত্রীর পারিবারিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করার ইচ্ছা হইল। কিন্তু একটা ভদ্রতা আছে তো, তাই নীরবে ট্রাম হইতে নামিয়া গেলাম।

ছোট গল্প

কাচঘর—বিমল কর। প্রকাশক—ক্লাসিক প্রেস, ৩।১-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—দু টাকা।

উত্তর মহাসমর যুগটি অত্যন্ত গ্রন্থিময়। তার মানস-জিজ্ঞাসা জটিল, তার বহিরঙ্গের সমস্যার চেয়ে মনোকেন্দ্রিক উপপাদ্যগুলি জটিলতর। এই উপপাদ্যগুলির সমাধানের পথ আবার জটিলতম। সমাধানের পথ-সন্ধান মনোবিজ্ঞানীর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। কথাশিল্পীর অন্যতম কঠিন দায়িত্ব সেই যুগ-মনকে নিখুঁত 'ডকুমেণ্টারী' হিসাবে ভাষা-বন্দী করা। বর্তমান যুগমন এত প্রক্ষিপ্ত, যার ফলে তার সঠিক নির্ণয়, তার মূল্যোমান স্থিরী-করণে অসামান্য শক্তির প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রচুর আত্মস্থতার; প্রয়োজন অনুভূতিকে একটি সংস্কারমুক্ত শিল্পদৃষ্টির বিন্দুতে কেন্দ্রিত করা। নিঃসন্দেহে বিমল কর এই বিরল গুণগুলির সার্থক অধিকারী। তাই তাঁর রচনার খ্যাতি পরিমাণবাচক নয়, গুণবাচক। এই জটিল কালকে তার নিজস্ব বর্ণে, তার নিজস্ব স্টাইলে যে ক'জন মুষ্টিমেয় কথাকার ধরতে চেয়েছেন, বিমল কর তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রনায়ক। বিমল করের রচনায় রঙের যথেচ্ছাচার নেই। আশ্চর্য সংযমের পাহারায় অপ্রয়োজনীয় কথার, বর্ণনা-বাহুল্যের প্রবেশ তাঁর রচনায় নিষিদ্ধ। তাঁর মিতবাক্ গল্পগুলি নিখুঁত। শুক্তিমুক্ত শুভ্র মুক্তার মত নিটোল। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি কখনো বেদনায় ইন্দ্রনীল, খুশিতে কখনো হীরকদীপ্ত, মাধুর্যে কখনো একখণ্ড পান্নার মত ঝলমলে, কখনো বিষণ্ণতায় মেদুর প্রবাল-খণ্ড। নানা রঙের এই যে অজস্র অভিজ্ঞতা তাদের বিশেষ কোন এক 'মুড' বা মেজাজের প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেছেন লেখক। অবশেষে পরিচ্ছন্নভাবে একক একটি অনুভূতির রঙকে ধরেছেন। তাই তাঁর রচনার সার্থকতম বৈশিষ্ট্য 'হোমোজিনিয়িটি'। তাঁর যে কোন গল্পের যে কোন প্রত্যঙ্গে এই গুণটি স্পষ্টত বর্তমান।

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে হৃদয়ের অন্ধিসন্ধিতে আজ মানুষের পদচারণা। স্নেহ, প্রীতি, মমতা—এইসব সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের শিল্প-সাহিত্যে এই মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং পরীক্ষা। এই প্রয়োগে দু'টি লক্ষণ প্রকাশিত। প্রথমত, এতকালের সংস্কারগুলিকে বিশ্লেষণের 'স্ক্যাল্‌পেল' দিয়ে ফালা ফালা করে বিচারের মধ্যে তিক্ততা জমে। দ্বিতীয়ত, জানার পরিধি প্রসারিত হয়। বিমল করের রচনা এই দুই লক্ষণমুক্ত।

বিমল করের সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ 'কাচ-ঘর'। গ্রন্থখানি মোট আটটি ছোট গল্পের সংকলন। 'তিল-তুলসী', 'দুই বোন', 'ভয়', 'হাত', 'যক্ষ', 'মশারি', 'পার্ক রোডের সেই বাড়ী' আর 'কাচঘর'। শেষ গল্পটির নামানুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ করা হয়েছে।

প্রথম গল্প 'তিল তুলসী' এই সংকলনটির অন্যতম সফল সংযোজক। মহাযুদ্ধের ভয়াল বাহু একটি সুকুমার শিল্পীমনের ওপর কি নির্মম পরিণতি টেনে আনে, তারই মেদুর উপলব্ধি। তুলসী চরিত্র অনেক কারণেই 'সিম্বলিক'। 'দুই বোনের' মনোনিরীক্ষা অপরূপ। কোমল সহানুভূতির উত্তাপে গল্পটি মনের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এ'কে দেয়। 'ভয়' গল্পটি মানসবিশ্লেষণের এক সফলতম উদাহরণ। শোভার ভয়ের পট-ভূমিতে একটি কুৎসিত অতীত কয়েকটি নিপুণ অথচ হ্রস্ব আঁচড়ে ফুটে উঠেছে। 'হাত', হীরালালের ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত প্রতিরূপ। এ গল্পটিও লেখকের সমবেদনায় মনকে আচ্ছন্ন করে আনে। 'মশারি' গল্পে তরু, মণিমাসি আর কনককে নিয়ে মনের ত্রিকোণ সমস্যা। কেন্দ্রবিন্দুতে প্রেম। চরিত্রের দিক থেকে মণিমাসির ঈর্ষা তাকে 'টাইপ' অথচ তরু-কনকের আকস্মিক বিচ্ছেদের নেপথ্যে কুৎসিত রহস্য করে রেখেছে। 'পার্ক রোডের সেই বাড়ী' চন্দনার রাশি রাশি রঙীন অনুভবের এক বিচিত্র যাদুঘর। মাসী চরিত্রের ওপর পাঠকের বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক নিয়মে এসে পড়ে।

গ্রন্থখানির অঙ্গসজ্জা নয়নলোভন।

২৩৪।৫৫

রক্তগোলাপ: কিরণকুমার রায়। প্রকাশক—গল্পভবন। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দু টাকা।

মোট আটটি গল্পের সংকলন। গোলাপ-কীট, তিমির তারা, কোন ক্ষতি নাই, দ্বিতীয় পুরুষ, অনুরাগ, ইনসাফ, ঈদের চাঁদ ও রক্তশিখা।

কিরণকুমার রায় সম্প্রতি পরিচিত নাম। তাঁর রচনায় তীব্রতীক্ষ্ণ চমকের চেয়ে একটি শান্ত হৃদয়বোধের উত্তাপ অনেক বেশী পরিমাণে উপস্থিত। তাঁর গল্পগুলির কেন্দ্র-বিন্দু প্রেম। এ প্রেম কখনো পতঙ্গধর্মী। দুর্বার বেগে মৃত্যুশিখামুখী। কখনো এ প্রেম স্নিগ্ধ। একটি মনোরম করস্পর্শের মত অনুভূতিতে শিহরণসুখ ছড়িয়ে যায়। আর এই প্রেমের চারপাশে পটভূমির মত ছড়িয়ে রয়েছে লেখকের আশ্চর্য-সচেতন সমাজবোধ।

এ সংকলনটির প্রথম গল্প দুটিতে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য উপস্থিত। 'গোলাপ-কীটের' প্রদীপ মজুমদার সামাজিক ট্র্যাজেডির এক হতভাগ্য নায়ক। সুন্দরের মধ্যে যে

সুধার আস্বাদে সে সংসার-সম্মান ত্যাগ করেছিল, সে সুন্দর তাকে দিয়েছে দাহন। আত্মঘাতনের ও রোজকে হত্যার মধ্যে প্রদীপ তার পতঙ্গদেহ আর মনকে নিশ্চিহ্ন করলো। 'তিমির তারা' একটি অখ্যাত শিল্প প্রতিভার তিল তিল অপমৃত্যু। ভিনসেণ্ট অনাদি বসু সহানুভূতি আকর্ষণ করবে নিঃসন্দেহে। তার জীবনের পরিণতি পাঠকের করুণ আক্ষেপে ভারাতুর। গল্প দুটি সুন্দর। তা সত্ত্বেও অভিযোগ আছে। সংবাদধর্মী ভাষাকে আরও ইঙ্গিতধর্মী করতে হবে। আরও পরিমিতবাক্ হতে হবে। 'কোন ক্ষতি নাই' গল্পে প্রেমই নায়িকা, প্রেমই দয়িতা। বিশেষ কোন নারীর বস্তুদেহে প্রেম পরীক্ষিত সত্য নয়, প্রেম হৃদয়ের ধর্ম। যে কোন নারীকে সে আকর্ষ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। গল্পটি সুলিখিত।

অবশিষ্ট গল্পগুলি সম্ভবত লেখক-জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যুগের। তাই পরিণত শিল্প-নৈপুণ্য সেখানে অনুপস্থিত। ছোট গল্পের ঘনীভবনের চেয়ে সাংবাদিক প্রক্ষেপ সেখানে বেশী। লেখকের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। সে অভিজ্ঞতাগুলি শিল্পবোধের মধ্যে যত বেশী 'ফোটো সিনথেসিস' হবে, লেখক তত উৎকৃষ্ট ছোটগল্প উপহার দিতে পারবেন। ২৫৩।৫৫

রুল অফ থ্রিঃ ভাস্কর। প্রকাশকঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩-১-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—দু টাকা আট আনা।

মোট সতেরোটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্পের অনুসরণে গ্রন্থখানির নামকরণ করা হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে 'ভাস্কর' নামটি চঞ্চল্যকর না হলেও অশ্রুত নয়। ভাস্করের রচনায় এই জটিল যুগের সমাজ, তার মনোনিরীক্ষা অনুপস্থিত। ভাষার উজ্জ্বল প্রসাধনও নেই, নেই স্টাইলের অভাবিত চমক। নিষ্কলুষ হাস্যরসের আবেদনে তাঁর রচনা মনকে স্নিগ্ধ করে দেয়। বর্তমানের সমাজ গুরুগর্জিত সমুদ্রের মত উদ্বেল, বর্তমানের জীবন গহন অরণ্যের মত দুর্গম। তাই এই সমাজ, এই জীবন সাহিত্যের আয়নায় ছায়া ফেলেছে। এই জটিল, এই দুর্লঙ্ঘ্য জীবনের বাইরে মিঠে জলের ছোট ছোট হ্রদের মত যে অমলিন হাসির সংকেত আছে, সেই হাসিকেই মিতবাক গল্পে ধরে রেখেছেন ভাস্কর। প্রত্যেক দিনের খনিতে ছোট ছোট হীরককণার মত হাসির যে আলো জ্বলে, বিভিন্ন চরিত্রের শুক্তিতে মুক্তার মত প্রসন্ন হাসিভরা বেদনার যে ইশারা, এই গ্রন্থের সতেরোটি গল্পে তাদের ধরে রেখেছেন লেখক। এ সত্ত্বেও ভাস্করের রচনা সামান্য ত্রুটিচিহ্নিত। বিশেষত, অনেক সময় তিনি অপ্রাসঙ্গিক কথার আয়োজন করেন। অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের জটলা দু একটি গল্পকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ২৫৯।৫৫

উপন্যাস

মেঘলা প্রহরঃ আশা দেবী। প্রকাশকঃ ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৩। দাম—আড়াই টাকা।

লীলা, নিশীথ আর অমিতা। দুটি নারী, একটি পুরুষ। তিনটি চরিত্রের কেন্দ্রে প্রেম নামে একটি বিন্দু রয়েছে। মূলত এই তিনজনকে নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ত্রিভুজ রচনা করা হয়েছে। লীলার অবজ্ঞার মধ্যে নিশীথ আবিষ্কার করলো একটি নিবিড় আকর্ষণ। অমিতার স্নিগ্ধ ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত অচরিতার্থই রইলো। উপন্যাসখানি প্রেমভিত্তিক এবং এর অন্তে নিশীথ-লীলার মিলন। এই মিলনটি সরাসরি কোন রাজপথ বেয়ে মসৃণ নিয়মে আসে নি। এর মধ্যে দেশসেবার ছদ্মনামে এসেছে ভয়ালচরিত্র সমর। সমরই এ কাহিনীর ভিলেন। সে-ই নানা ছলনায় নীলার নিশীথমুখী মনকে বারবার বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। অবশেষে অনেক ভ্রান্তির অগ্নিসমুদ্র পাড়ি দিয়ে, অনেক বিকর্ষণের বাধা পেরিয়ে সফল হলো নিশীথ-নীলার অন্তর্লীন প্রেম।

'মেঘলা প্রহর' লেখিকার প্রথম উপন্যাস। প্রথম উপন্যাসের শিথিলতা এ গ্রন্থে নিশ্চয়ই বর্তমান। অনেক সময় ঘটনা-গ্রন্থন শ্লথ এবং আকস্মিক। কাহিনী কোন কোন স্থানে দুর্বার গতিতে অগ্রসর, আবার কোন কোন স্থানে আড়ষ্ট মনে হয়। তা সত্ত্বেও লেখিকার ভাষা চিত্রময়। কাব্যধর্মী। একটি সচেতন কৌতূহলে পাঠক মনকে শেষ পর্যন্ত তিনি ধরে রাখতে পেরেছেন। নিঃসন্দেহে এ গুণ কৃতিত্বের নিদর্শন। সংলাপে মাঝে মাঝে আশ্চর্য উজ্জ্বল, পরিণত শিল্প নৈপুণ্যের সংকেত আছে। তবু উপন্যাসটির রচনারীতি কোমল নারীমন নয়, মনে হয় সক্রিয় পুরুষালি ভঙ্গিতে চিহ্নিত। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুরুচিশোভন। ২৬৫।৫৫

বেহাগঃ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। প্রকাশকঃ রূপায়নী। ১৩-১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম—দু টাকা।

অসফল প্রেমের কাহিনী। স্বামী, স্ত্রী আর স্ত্রীর দয়িত। তিনটি চরিত্র। তাদের হৃদয়মনের সেই চিরকালীন ত্রিকোণ সমস্যা। পটভূমি চা-বাগান। আখ্যানভাগ এইরূপ। প্রাক্‌বিবাহ জীবনে মমতা কমলেশকে ভালবেসেছিল। কমলেশ আত্মহারা চিত্রকর আর সঙ্গীতশিল্পী। তার জীবন নির্বাধ। খরধার। সে জীবনকে চার দেওয়ালে কয়েদী করতে চেয়েছিল মমতা। বাবা-মার প্রতিকূলতা ও তার বন্ধন থেকে কমলেশের ঊর্ধশ্বাস পলায়ন মমতাকে জীবনের আর এক আবর্তে আমন্ত্রণ করে আনলো। জীবনে স্বামী নামে আবির্ভাব হলো বিকাশের। বিকাশ নিস্পৃহ; তার ব্যবসায়ে সদাব্যস্ত। বাণিজ্যই তার দয়িতা। মমতা বিকাশের জীবনে নিজের ছন্দ হারালো। বহু বছর পর আবার দেখা কমলেশের সঙ্গে। কমলেশ আসাং নামে একটি নেপালী নারীর দুর্বার প্রণয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। মমতার কাছে তা অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা। সে প্রার্থনা করলো, কমলেশ আবার ফিরে আসুক তার জীবনে। ব্যর্থ হয়ে কমলেশকে গুলী করে হত্যা করলো মমতা। প্রেম, হত্যা, বিচার, চরিত্র এবং আনুষঙ্গিক সবই আছে গ্রন্থটিতে। তা সত্ত্বেও ঘটনার শিথিল গ্রন্থনের জন্য কাহিনী জমতে পারে নি। ভাষা মোটামুটি। কখনো 'ক্রাইম ড্রামার' কখনো সামাজিক আচরণের মিশ্রণে উপন্যাসের গতি বার বার ব্যাহত হয়েছে। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদচিত্রটি পরিণত শিল্পবোধের পরিচায়ক। ২৪২।৫৫

ফুটবলে ইতিবৃত্ত

কলকাতার ...ফুটবল—আরবি রচিত। শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী কর্তৃক ইস্ট লাইট বুক

হাউস, ২০ স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; দাম—তিন টাকা চার আনা।

'আরবি' রচিত কলকাতার ফুটবল এদেশের ফুটবল খেলার ইতিবৃত্ত রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। শুধু প্রথম প্রচেষ্টাই নয়, সার্থক প্রচেষ্টাও বটে। গত একশ বছর ধরে অনেক গৌরবময় ও রোমাঞ্চকর পথ বেয়ে ফুটবল আজ কলকাতার সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এই একশ বছরের ফুটবল কাহিনী রচনা করা কম কষ্টসাধ্য নয়। প্রথম যুগে ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র 'নেটিভদের' খেলাধুলো নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতো না। আর ভারতীয় সংবাদপত্রও খেলাকে স্বীকৃতি দিয়েছে অনেক পরে। তাই লেখককে পুরানো সংবাদপত্রের উইয়ে কাটা ছেঁড়াপাতা, প্রাচীন নথিপত্র আর প্রবীণদের স্মৃতি ও শ্রুতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রবীণদের স্মৃতি ঝাপসা হবার আগে এই ইতিহাস রচনা খুবই সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় হয়েছে সন্দেহ নেই।

'আরবি' এক ক্রীড়া সাংবাদিকের ছদ্মনাম। লেখক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন এবং ভাবের উৎকর্ষ এবং ভাষায় মাধুর্যে খেলার বর্ণনায় সৃষ্টি করেছেন সাহিত্য। প্রথম যুগে ব্রিটিশ সামরিক ও বে-সামরিক দলের খেলা তারপর মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়, কলকাতার ফুটবলে বাঙালী খেলোয়াড়দের অবস্থা এবং পরাধীনতার গ্লানি, ইস্ট বেংগল ক্লাব গঠনে পূর্ববংগবাসীদের অনুপ্রেরণা, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিজয় অভিযানে মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণসহ পুরানো খেলোয়াড়দের কীর্তিকাহিনী বইখানিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রচ্ছদপটে ১৯৩৬ সালে ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত ভারত ও মহাচীনের প্রদর্শনী খেলার এক সামগ্রিক চিত্র বইখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। ২৭৭।৫৫

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

সূর্যকরা—মরিসিও ম্যাগ দা লে নো অনুবাদক—অশোক গুহ।
মেঘলা মন—শ্রীবাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়।
লুইত পারের গাথা—অমলেন্দু গুহ।
পলাশের কাল—অরুণাচল বসু।
মণিকুন্তলা—লীলা মজুমদার।
মণি বিজ্ঞানে ভাগ্য-পরীক্ষা—শ্রীশিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
নাটক নয় নভেল নয়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
পরাধীন প্রেম—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রবন্ধাবলী ৫ম ভাগ—মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ।
পাকা ধানের গান—সাবিত্রী রায়।
বাগার্ড শ'—শ্রীসত্যনারায়ণ লাহিড়ী।
কন্যা ও কুমার—কল্যাণী কার্লেকর।
পলাতকা—সুবোধচন্দ্র মজুমদার।
আমার বন্ধু—বুদ্ধদেব বসু।
চারদৃশ্য—বুদ্ধদেব বসু।
পুনর্ভব—সুবোধ বসু।
শ্রীঅরবিন্দের যোগ—শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী।
আশি দিনে পৃথিবী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক—ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার।
আকাশ প্রদীপ—শ্রীবুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়।
নিউদিল্লীর নেপথ্যে—শ্রীঅমিয়া সেন।
বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য (সাধন ভাগ)—শ্রীগুণদাচরণ সেন।
উপাসনা মন্দিরে—শ্রীমতিলাল রায়।
শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব — শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
আবাদি সোস্যালিজম্—নরেন্দ্রনাথ দাস।
বাগদত্তা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
ঐশ্বর্য তোমার হাতের মুঠোয়—শ্রীপতি চক্রবর্তী।
সুনন্দার প্রথম প্রেম—দেমুখৎ।
আধুনিকা—শ্রীমোহিতকুমার চক্রবর্তী।
বাংলা নাটকের ইতিহাস—শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ।
SANTINIKETAN SAHITYA-MELA—Lila Roy.
PEACEFUL CO-EXISTENCE—Sri Kshitis Chandra Chakrabarti.
পৃথিবী চলো—১ম খণ্ড আকাশ—শ্রীকালীপ্রসাদ বসু।
সংগীত সোপান—শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ।
প্রত্যাবর্তন (১ম খণ্ড)—আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার অনুবাদক—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী।
পরিচয়—হিরণ্ময়ী বসু।
পাথেয়—প্রভাবতীদেবী সরস্বতী।
আরাত—শ্রীগৌরহরি বিদ্যাবিনোদ।
সাজান বাগান—ধীরাজ ভট্টাচার্য।
আলেয়া—নিরুপমা দেবী।
ফুটলো কুসুম—হং জীয়ং সুং।
গাঁয়ের মাটির গান—শ্রীশান্তি পাল।
কেন আমি মার্ক্সবাদী নই?—শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ।

—শৌভিক—

সচরাচর থেকে আলাদা

বিমল করের উপন্যাস "হ্রদ"-কে চিত্রে রূপায়িত করে একটা অস্বাভাবিক কিছু বাঙলার চিত্রামোদীদের সামনে তুলে ধরার ঝোঁক দেখিয়েছেন রূপমায়া পিকচার্স। গল্প অস্বাভাবিক প্রকৃতিরও এবং বেশ জটিলও। এতে ক্রাইম-ড্রামার রহস্যের সঙ্গে নিবিড় হয়ে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। খুনের প্রকৃত আসামীকে ধরে ফেলার চেষ্টার মধ্যে রয়েছে একটা আতঙ্কবিহ্বল ভুলো মনকে সম্বিতের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। অভিনবত্ব আছে কাহিনীটির মধ্যে এবং এই সচরাচরের বাইরেকার জিনিস বলেই তা নজরকেও আকৃষ্ট করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে প্রশংসার বিষয় হচ্ছে চেষ্টাটাই। অবশ্য এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, মূল কাহিনীতে নাট্য-সম্ভাবনা যতটা নিহিত ছিল, ছবিতে তার অল্পই সন্নিবেশিত পাওয়া যায় বা এনে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দর্শকমনকে নিবদ্ধ রাখার মতো বৈচিত্র্যের লক্ষণগুলো আগাগোড়া স্পষ্টভাবে সামনে ফুটিয়ে তোলায় নবাগত পরিচালক অর্ধেন্দু সেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীটি যথেষ্ট জটিল হওয়া সত্ত্বেও দর্শক-মনের কৌতূহলকে উদ্‌গ্রীব রেখে দিয়ে কাহিনীর পরিণতিতে এগিয়ে যেতে যেভাবে বিন্যাস সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে বেশ একটা নতুন মনের সন্ধান পাওয়া যায়।

* * *

ছবিতে গল্পের আরম্ভ এক পাগলা হাসপাতালের অঙ্গন থেকে। ওদেরই একজনের মনোজ রায়। ডাক্তার প্রণব তার কাছ থেকে আর কোন খবরই বের করতে পারেনি। স্মৃতিবিভ্রান্ত মনোজ। অথচ পুলিসের কাছে মনোজ এক খুনী। বছর দুই আগে দেওঘরে ডাঃ দিব্যেন্দু চক্রবর্তীকে পিস্তল দিয়ে হত্যা করার অপরাধ চেপে রয়েছে মনোজের ঘাড়ে। মনোজ কিন্তু কোন কথাই মনে করতে পারে না। ডাক্তার প্রণব মনোজের কোন পরিচয়ও জানতে পারলে না, শুধু ওর পকেট থেকে পেয়েছে একটা গানের স্বরলিপি, তাতে নাম সই করা রয়েছে সুদক্ষিণা বলে, একটা ঠিকানাও রয়েছে। প্রণব সেই ঠিকানা ধরে একদিন হাজির হলো সুদক্ষিণার কাছে।

"পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে অনেক সময় অনেক অতি-পরিচিতও অজানা হয়ে ওঠে, তাই ডাক্তার প্রণব দাসগুপ্তের হাতে সুদক্ষিণা তারই রচিত গানের স্বরলিপিতে নিজেরই নাম সই করা দেখতে পেয়ে অনেক দিনের বিস্মৃত একটা অধ্যায় যেন স্পষ্ট ফিরে পেলো তার স্মৃতিকোঠায়। কিন্তু সে তো মনোজ নয়? সে বাণীব্রত, খুনী বাণীব্রত। ডাক্তার প্রণব দাসগুপ্ত কিন্তু পকেট থেকে মনোজের একটা ফটো বের করে দেখালেন। এবার চিনতে পেরে হঠাৎ থমকে গেল সুদক্ষিণা। বাণীব্রত! পুরনো দিনের কথাগুলো মনে এলো তার। দেওঘরে দাদার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে পরিচয় হলো দাদার বন্ধু বাণীব্রতের সঙ্গে। সেও বেড়াতে এসেছে দেওঘরে। চমৎকার বেহালা বাজাতে পারতো বাণীব্রত আর ভালো গানের স্বরলিপি তোলার একটা আগ্রহও ছিলো তার মধ্যে। একদিন সুদক্ষিণার রচিত একটা গান শুনে বাণীব্রতের খুব ভালো লাগে, তাই বাণীব্রতের অনুরোধে সুদক্ষিণা সেই গানেরই স্বরলিপি লিখে দিয়েছিল নিজের নাম সই করে। ঘনিষ্ঠতাটা কিন্তু পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এগুলো এবং সেই ঘনিষ্ঠতা থেকেই ক্রমে দুজনার মনে আসে মন দেওয়া-নেওয়ার শুভক্ষণ। কিন্তু সব যেন কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেলো। একদিন রাত্রিতে সুদক্ষিণার বৌদির অসুখে তাঁকে দেখতে এলো ডাক্তার দিব্যেন্দু। আর সেই ডাক্তারকে
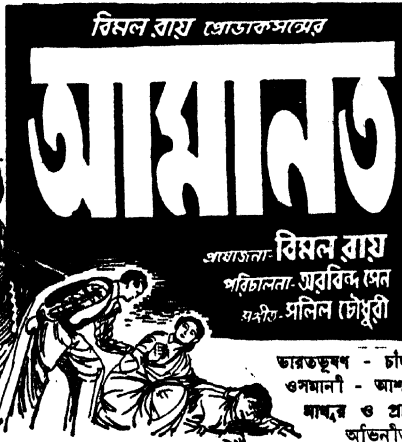
"দেবী মালিনী"-তে কাবেরী বসু ও রবীন মজুমদার

দেখেই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো বাণীব্রত। পরদিন বাণীব্রতকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না—সে নাকি সুদক্ষিণার দাদার রিভলবার নিয়ে ডাক্তার দিব্যেন্দুকে খুন করে পালিয়েছে। সেই বাণীব্রত পাগল! সুদক্ষিণার মনের জগৎটা যেন হঠাৎ ওলোট-পালোট হয়ে গেলো একটা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবাত্যার দাপটে। বাণীব্রতকে দেখতে যাবার জন্য প্রণব দাসগুপ্তের আন্তরিক অনুরোধ তাই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না সুদক্ষিণা; কিন্তু অন্তরের যে যোগাযোগ রয়েছে তাকে কেমন করে উপেক্ষা করবে সুদক্ষিণা? তাই তাকে আসতেই হলো পরেশনাথ মেণ্টাল হস্পিটালে। বাণীব্রত কিন্তু চিনতেই পারলে না সুদক্ষিণাকে এবং যেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লো। সুদক্ষিণা ফিরে এলো, কিন্তু তাকে পর পর কয়েকবারই আসতে হলো এই হস্পিটালে। বাণীব্রতের পুরনো দিনের কথা কিছু কিছু জানতো সুদক্ষিণা। প্রণবও কিছুটা আবিষ্কার করলো। তাতে জানা গেল যে, নীলা নামে একটি মেয়েকে প্রথমে ভালোবেসেছিল বাণীব্রত। ক্রমে সেই খবরটা বাণীব্রতের দূর সম্পর্কের ভাই দিব্যেন্দু ডাক্তার জানতে পারে এবং সেই সুযোগে দিব্যেন্দু বাণীব্রতকে দমিয়ে রেখে নীলাকে হস্তগত করে এবং একদিন তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। সেই থেকেই দিব্যেন্দুর ওপর একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আসে বাণীব্রতের। ভাগ্যের নির্দেশ তাই দেওঘরে থাকাকালীন সুদক্ষিণার বৌদির অসুখের ঘটনাতে দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা
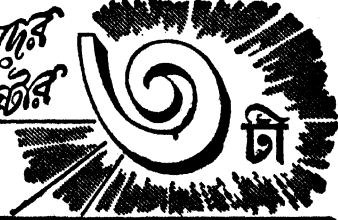
চলচ্চিত্র জগতের
জনপ্রিয় তারকা সমন্বয়ে
জেমিনীর
গৌরবময় অবদান...
ইনসানিয়ৎ
ভূমিকায়
দিলীপ কুমার
দেব আনন্দ·বীণা রায়
বিজয়লক্ষ্মী·জয়ন্ত·জয়রাজ·শোভনা
সমর্থ·কুমার·আগা·বদ্রীপ্রসাদ·মোহনা
আর হলিউডের জীপ্পি
সারা ভারতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে
জেমিনী
রিলিজ
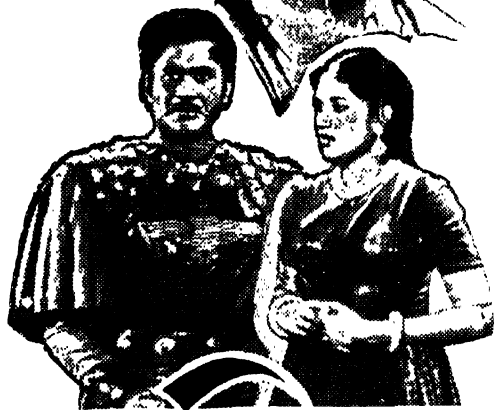
"দস্যু মোহন"-এর দুটি চরিত্রে অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়

হয় বাণীব্রতের। সেই রাত্রেই রিভলবার নিয়ে দিব্যেন্দুকে শাসাতে যায় সে আর সেখানেই রিভলবারের গুলীতে দিব্যেন্দু মারা যায়। সেখান থেকে পালিয়ে এসে প্রণবের এক ডাক্তার-বন্ধুর ডিসপেন্সারীতে চাকরি করতে থাকে বাণী। কিছুদিনের মধ্যেই প্রণবের বন্ধু আবিষ্কার করে যে, বাণীব্রত কিছুতেই "আই" শব্দটা লিখতে পারে না। বার বার "আই" লিখে তা কেটে দিয়ে "এ" লেখে। এরপর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ পেয়ে প্রণবের বন্ধু বাণীব্রতকে রেখে যায় এই মেণ্টাল হস্পিটালে।"

"একদিন রাত্রিতে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে, এই হস্পিটালেরই নার্স ডোরা দত্ত বাণীব্রতকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই তামসী-রাত্রির মধ্যপ্রহরে বাণীব্রতকে উদ্ধারের অভিযানে ডাঃ গুপ্ত, প্রণব, সুদক্ষিণা আর ডাঃ গুপ্তের কুকুর সিরাজ এসে উপস্থিত হয় নির্জন প্রান্তরের এক পোড়ো বাড়িতে। সেখানে সিরাজ হঠাৎ আক্রমণ করে ডোরাকে এবং ডোরার মৃত্যু হয় সেখানেই। সেই নির্জন প্রান্তরের মধ্য রাত্রিতে ডোরার মৃত্যু, কুকুরের আক্রমণ সব মিলিয়ে সেই রাত্রিতেই বাণীব্রতের স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে।"

■ ■ ■

বাণীব্রত একে একে বলে যেতে লাগলো অতীতের ঘটনা। ছেলেবয়সে ছাদে একদিন কুকুর নিয়ে খেলা করবার সময় ওর মা সেখানে উপস্থিত হন। কুকুরটা মায়ের দিকে এগিয়ে যেতেই পিছু হটতে গিয়ে মা সিঁড়ি দিয়ে পড়ে মারা যান। সেই থেকেই বাণীব্রতের ধারণা, মায়ের মৃত্যুর জন্য ও নিজে দায়ী। এই খুনাতঙ্কটা ওকে পেয়ে বসে। তারপর দেওঘরে দিব্যেন্দুকে দেখার পর বাণীব্রতের মনে আশঙ্কা হয়, দিব্যেন্দু হয়তো সুদক্ষিণাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। এই ভেবে বাণীব্রত উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দিব্যেন্দু যাতে অমন কিছু না করে, সে বিষয়ে ওকে শাসিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে পিস্তল নিয়ে মধ্যরাত্রে ওর সঙ্গে দেখা করতে যায়। দিব্যেন্দুর সঙ্গে তর্কাতর্কি চলার সময় বাণীব্রত পিস্তল উঁচিয়ে ধরে, কিন্তু পিছনে পর্দার আড়াল থেকে একটা গুলী এসে

"কঙ্কাবতীর ঘাট"-এর একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী ও চন্দ্রাবতী

দিব্যেন্দুকে ধরাশায়ী করে দেয়। ভয়ে বাণীব্রত রিভলবারটা ফেলে পালিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনের ঝোপে লুকিয়ে পড়ে এবং সেখানে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পায় এক নারী মূর্তি কুয়াতে কি একটা ফেলে চলে গেল। এর পর আর বাণীব্রত কিছু জানে না। বাণীব্রতর বিবৃতি অনুসারে পুলিস উক্ত কুয়া তল্লাস করে একটি পিস্তল পায় যে রিভলবারের গুলী দিব্যেন্দুর দেহে বিদ্ধ হয়েছিল। তারপর নীলার কাছ থেকেও একটা স্বীকারোক্তি পায় যে, তারই পিস্তলের গুলীতে দিব্যেন্দু নিহত হয়েছে। খুনের দায় থেকে অব্যাহতি পেলে বাণীব্রত। সুদক্ষিণা আর বাণীব্রত নতুন জীবনের পথে যাত্রা করলে।

* * *

কাহিনীর যা উপাদান, তাতে একটা সস্তা এবং খুব খারাপ ক্রাইম-ড্রামা হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পরিচালক সে ঝোঁক কাটিয়ে একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ছবি পরিবেশনেই মনোনিবেশ করেছেন। তবে নাটক ঠিক-ভাবে জমিয়ে তোলার দিক থেকে যথেষ্টই ফাঁক থেকে গিয়েছে। রহস্যমূলক কাহিনী বলেই সব ব্যাপারটাতে একটা আবছা ভাব রক্ষা করে যাওয়ার অর্থ হয় না। এখানে দৃশ্যকে সামনে তুলে ধরার চেয়ে মৌখিক বিবৃতিকে কাজে লাগানো হয়েছে বেশী। সংলাপ অবশ্য ভালোই শুনতে লাগে, কিন্তু তাহলেও বিবৃতিমূলক কাহিনীর ক্ষেত্রে যা অনিবার্য সেই একঘেয়েমিকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। মাঝে ছবি চলতে চলতে বেশ খানিকটা ঝিমুনে ভাব পাইয়ে দেয়। সেই সুদক্ষিণা আর প্রণবের মধ্যে বাণীব্রতকে নিয়ে আলোচনা আর আলোচনা, নয়তো পাগলাখানায় বাণীব্রতর সঙ্গে ডাক্তারদের কথাবার্তা। দর্শকের কৌতূহলী মন একটা কিছু দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে, কিন্তু তার বদলে হয়তো শুনতে হয় বাণীব্রত সম্পর্কে কিছু বিবরণ। বাণীব্রতর স্বপ্নকে দৃশ্যাদির সঙ্গে বাণীব্রতর মনের কার্যকারণ সম্পর্কটাও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। তা না হওয়ায় কাহিনীটির মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিটা যেমন স্পষ্ট হতে পারেনি তেমনি সেই সঙ্গে নাটকও ঘন হয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। গল্পের গতিপথে একটা বিচ্ছিন্নতা এসে পড়েছে।

* * *

ছবিখানি নিবিষ্ট মনে দেখবার পক্ষে বাণীব্রতর চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয় মস্ত সহায়ক হয়েছে। ভিন্ন ধরনের চরিত্র এবং উত্তমকুমারও অভিনয় দক্ষতায় কৌতূহলী দর্শক-মনে চরিত্রটির বৈচিত্র্য ধরিয়ে প্রভাব বিস্তার করে রাখেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এমনও হয়ে দাঁড়ায় যে, বাণীব্রত যে দৃশ্যে অনুপস্থিত সে দৃশ্য যেন বেকার বলে মনে হয়। অবশ্য খানিকটা সে অভাব পূরণ করেছে সুদক্ষিণা যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী। সুদক্ষিণার বাণীব্রতের প্রতি টান একদিকে, অপরদিকে প্রণবের সুদক্ষিণাকে পাবার একটা ক্ষীণ আশা মিলে প্রণয়ের দিকটা রক্ষা করে গিয়েছে। প্রণব ডাক্তারের চরিত্রে অসিতবরণ ছবির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আছেন, কিন্তু কেমন একটা থমথমে অভিনয়। এক বিশেষজ্ঞ মনস্তত্ত্ববীদের চরিত্রে কয়েক মিনিটের জন্য ছবি বিশ্বাসকে অবতরণ করানো হয়েছে, কিন্তু তিনি অভিনয় করে গেলেন যেন এক ফিরিঙ্গী ব্যারিষ্টারের চরিত্রে। প্রণব বাণীব্রতর স্বপ্নের কিনারা করতে তার সঙ্গে আলোচনা করতে গেল, কিন্তু যে আলোচনা হলো তাতে না যোগ হলো গল্পেতে কোন নতুন তত্ত্ব বা

স্বারা দর্শকের কৌতূহল মিটতে পারে, আর না হলো প্রণবের কোন সংশয়ের নিরসন। একটু হাল্কা রস যোগ করার জন্য প্রেমাংশু বসু, জহর রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নানারকমের পাগল সাজিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে। পাগলামি দেখানো এদের পক্ষে মুশকিল আর কিইবা। ওদের দু তিনবার আবির্ভাবে হাসবার সুযোগ পাওয়া যায়। নার্স ডোরা দত্তের ভূমিকা ছোট হলেও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাণীব্রতর স্মৃতি ফিরে আসার উপলক্ষ্যই হচ্ছে ডোরা দত্ত, কারণ বাণীব্রতর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পোড়োবাড়ীর ছাদ থেকে পড়ে যাবার পরই বাণীব্রতর মনে পড়ে যায় তার মায়ের মৃত্যুর ঘটনা এবং সেই সূত্র ধরে দেওঘরের ঘটনা। কিন্তু সুমনা ভট্টাচার্যের অভিনয়ে সে গুরুত্ব মোটেই ফোটেনি চরিত্রটিতে। এরা ছাড়া আর অভিনয়ে আছেন শিশির মিত্র, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্তা রায় প্রভৃতি।

* * *

কলাকৌশলের দিক, বিশেষ করে ক্যামেরার কাজে কাহিনীর বৈচিত্র্য ও প্রকৃতিটা যথাযথই ধরা পড়েছে। এর জন্যে সন্তোষ গুহ রায় প্রশংসিত হবেন। দু-এক জায়গাতেই একটু নিরেস কাজ। শব্দগ্রহণ স্পষ্ট; যোজনা করেছেন গৌর দাস। সঙ্গীত বলতে এ ধরনের কাহিনীতে বৈচিত্র্য নিয়ে আসার যে সুযোগ ছিল, মানব মুখোপাধ্যায় তার খুব সামান্যই কাজে লাগাতে পেরেছেন। বরং একই ধরনের যন্ত্র ও সুরের বার বার যোজনা একটা একঘেয়েমি সৃষ্টি করে দেয়। মাঝে যে ছবির মধ্যে একঘেয়েমি আসে, তার জন্য আবহ সঙ্গীতও খানিকটা দায়ী। তিনখানি গান গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা দাশগুপ্ত ও মানব মুখোপাধ্যায়। গানগুলির প্রয়োগ গল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। শেষে পাগলখানায় রেডিওর একখানা গান প্রণব আর বাণীব্রত দাঁড়িয়ে শুনলে, কিন্তু গান শেষ হতে রেডিও বন্ধ করা হলো না অথচ কোন ঘোষণাও শোনা গেল না কেন? ঠিকে ভুল খুঁজলে অনেকগুলিই উল্লেখ করা যায়। তার মধ্যে প্রণব ডাক্তারের মুখে 'সেন্সোরিয়াম টেস্ট'কে 'সেন্সেটিভ টেস্ট' বলে চালিয়ে দেওয়াও আছে।

খেলার মাঠে

একলব্য

পশ্চিম বাঙলা রাজ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে বাঙলার ৭ জন কৃতী সন্তানকে সম্মানিত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। কর্ম-প্রেরণার উৎস রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যিনি প্রবীণ নাগরিকদের অন্যতম এবং যিনি শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ-সেবা এবং গঠনমূলক কর্মক্ষেত্রেও মহা-সাংগঠনিক হিসাবে দেশ বিদেশে খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে তাকে জানান হবে প্রথম সম্বর্ধনা। তারপর বিভিন্ন দিনে সম্বর্ধনা পাবেন আর ৬ জন কৃতী বাঙ্গালী—যারা সঙ্গীত সাধনায়, শিক্ষায় দীক্ষায়, শিল্প নৈপুণ্যে এবং বীরত্বে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। এর মধ্যে আছেন সঙ্গীত সাধক কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, হিমালয় বিজয়ী তেনজিং, শিল্পী যামিনী রায় আর শিক্ষাবিদ ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী। যদিও কোন ক্রীড়াবিদকে সরাসরি সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হয়নি তবুও আমরা জেনে সুখী হয়েছি, হিমালয় বিজয়ী বীর তেনজিংয়ের সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য ডাকা হয়েছে ব্রিটিশ যুগের অমিতবিক্রম ফুটবল বীর গোষ্ঠ পালকে। সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য আহ্বান করাও পরোক্ষ সম্বর্ধনা বটে। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ একটি পৃথক সভায় গোষ্ঠ পালকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি টাকার তোড়া উপহার দেবেন বলেও সিদ্ধান্ত করেছেন। খেলোয়াড় জীবনে পরিপূর্ণ সাফল্য, যশ মান এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও আর্থিক দিক দিয়ে অতীতের এই দিকপাল খেলোয়াড়ের নিরহঙ্কার জীবন ব্যর্থতার ইতিহাসে পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই নিরভিমানী খেলোয়াড়কে সম্মান দানের ব্যবস্থা করে সমগ্র খেলোয়াড়কুলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী প্রথম একাদশ বাঙ্গালী, যাদের কীর্তিগাথা দেশের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে সাগরপারের সাহেবদের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল তাদের প্রতি রাজ্য কংগ্রেস, পৌর-সভা, খেলোয়াড়কুল তথা ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বাঙলার মাটিতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিভূ সামরিক শক্তিকে খেলার মাঠে প্রথম পরাজিত করেছিল যারা, তাদের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি।

* * *

ফুটবল খেলার বল নিয়ে এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও আই এফ এর কর্তৃপক্ষকে এখন পর্যন্ত এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি, তবে আমাদের ধারণা সেদিনের আর বেশী দেরি নেই, যেদিন আই এফ এ'কে এর সমাধানের জন্য রীতিমত মাথা ঘামাতে হবে।

ফুটবলের আইন বইয়ে 'বলের' সংজ্ঞায় পরিষ্কার লেখা আছে:—

LAW 2—THE BALL

The ball shall be spherical; the outer casing shall be of

তিন মাইল দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী দূরপাল্লার দৌড়বীর ক্রিশ চ্যাটওয়ে। ১৩ মিনিট ২৩·২ সেকেন্ড সময়ে চ্যাটওয়ে নূতন রেকর্ড করছেন

leather and no material shall be used in its construction which might prove dangerous to the players. The circumference of the ball shall not be more than 28 in. nor less than 27 in. The weight of the ball at the start of the game shall not be more than 16 oz. nor less than 14 oz.

অর্থাৎ বল গোলাকার হবে। বাইরের আবরণ হবে চামড়ার এবং বল প্রস্তুত করতে এমন কোন জিনিস ব্যবহৃত হবে না যা খেলোয়াড়দের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বলের পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম এবং ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন ১৬ আউন্সের বেশী বা ১৪ আউন্সের কম হবে না।

উপরোক্ত মূল আইনের সঙ্গে ১৯৫৪ সালের জুন মাসে যোগ করা হয়েছে—"রেফারীর অনুমতি ছাড়া খেলার মধ্যে বল কোন সময়েই বদল হবে না।"

পরিবর্ধিত আইন সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই; কিন্তু মূল আইনে যেরূপ বর্ণিত আছে সেই বর্ণনা মত এখানকার কোন বল আইন-সিদ্ধ কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ বলেরই পরিধি কম। ওজনেও হাল্কা। বহুদিন আগে এ সন্দেহ মনে জেগেছিল। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় বল মেপে দেখা গেল আমাদের সন্দেহ অমূলক নয়। মোহন-বাগান ও ইস্টবেঙ্গলের পাল্টা খেলায় আবার বল মাপা হল। এইদিন ৪টি বল মাঠে আনা হয়েছিল। দুটি এনেছিল মোহনবাগান, দুটি ইস্টবেঙ্গল। ৪টি বল মেপে দেখা গেল কোন বলেরই পরিধি ২৭ ইঞ্চি নয়। পঁচিশ থেকে আরম্ভ করে সাড়ে ছাব্বিশের মধ্যে। খেলা হল সব চেয়ে কম পরিধির বলটিতে। অর্থাৎ যার পরিধি মাত্র ২৫ ইঞ্চি—ন্যূনতম পরিধির চেয়েও দুই ইঞ্চি কম। ২ ইঞ্চি পরিধির হেরফের কম কথা নয়। অথচ এদিকে না খেলোয়াড়, না রেফারী, না খেলাধুলো সরঞ্জাম বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, কারোই দৃষ্টি নেই।

যে বল আইন সম্মতভাবে তৈরী নয় সে বলে যদি কোন ক্লাব খেলতে আপত্তি করে তবে রেফারীর পক্ষে সেই ক্লাবকে ম্যাচ খেলতে বাধ্য করানোর অধিকার আইন রেফারীকে দান করেনি। আবার আইন-বিগর্হিত বলে রেফারী খেলা পরিচালনা করতে অসম্মত হলেও কর্তৃপক্ষের বলবার কিছু নেই। আইন বিগর্হিত বলে এতদিন রেফারীদের আপত্তি করা উচিত ছিল। কেন যে আপত্তি ওঠেনি তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কারণ ফুটবল কলকাতা, বাঙলা বা ভারতের আইন কানুনে খেলা হয় না। ফুটবল এসোয়িশেনের আইন যা আন্তর্জাতিক ফুটবল এসোসিয়েশনের অনুমোদিত সেই আইনে খেলা হয়ে থাকে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এবং তার অন্তর্গত ইণ্ডিয়ান

লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব। গত ২৩শে জুলাই ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলায় পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জিকে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখা যাচ্ছে

ফুটবল এসোসিয়েশন সংক্ষেপে আই এফ এ আন্তর্জাতিক সংস্থারই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এখানে ফুটবল খেলার আইনও কিছু আলাদা নয়। আর সব বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যও আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। খালি-পায়ের বদলে পায়ে পরেছি 'বেড়ি'। নগ্নপদ ক্রীড়াচাতুর্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে বুটরপ্ত হতে চেষ্টা করছি। বুট এখন ফুটবলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বলের বেলাই বা আইন লঙ্ঘন হবে কেন? তা ছাড়া 'বুটেড' ফুটবলে বলের আকার এবং ওজন বিশেষভাবেই বিবেচনার বিষয়। তবে যদি আইনসম্মত বল সংগ্রহ করা বা ভারতের খেলাধুলা সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তৈরী করা একান্তই অসাধ্য হয়, তবে আই এফ একে বল সম্পর্কীয় মূল 'আইনের' রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে একটা 'নিয়মে' দাঁড় করাতে হবে, যেমন করা হয়েছে খেলার স্থিতিকাল সম্পর্কে।

খেলার স্থিতিকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে:

The duration of the game shall be two equal periods of 45 minutes, unless otherwise mutually agreed upon, [LAW-7 —Duration of the game].

অর্থাৎ পরস্পর অন্যরূপ চুক্তি না হলে খেলার স্থিতিকাল ৪৫ মিনিটে করে দুটি সমান অংশ হবে।

এর অর্থ দাঁড়ায় বিশ্রাম সময় বাদে খেলার স্থিতিকাল ৯০ মিনিট; কিন্তু এর চেয়ে কম সময় খেলাবার ব্যবস্থা করবার অধিকার আইনই এসোসিয়েশনকে দান করেছে—'অন্যরূপ চুক্তি না হলে' —এই কথা দ্বারা। কিন্তু বল সম্পর্কীয় আইনের কোনো হেরফের করবার অধিকার কোনো এসোসিয়েশনের আছে কিনা সন্দেহ।

তবে উপায়? আগে অধিকাংশ খেলা হত বিলেতী বলে। টম্‌লিন্‌সনস্‌, ম্যাগ্রেগার, ইমপ্রুভড্‌ 'টি' প্রভৃতি বলের দামও কম ছিল, বলও ছিল সহজ লভ্য। এখন বিলেতী বল পাওয়াও দুষ্কর দামও বেশী। আনন্দবাজার পত্রিকার নূতন ভবনের উদ্বোধন দিনে পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্বলিত একখানি পুস্তিকা হাতে এলো। প্রথম পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ল তেত্রিশ বছর আগে মুদ্রিত 'আনন্দবাজারের' প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যে সেখানে খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রেতা একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন—'কার এণ্ড মহলানবিশ'। প্রকাণ্ড দোকান ছিল চৌরঙ্গীর উপরে। খেলাধুলার দ্রব্য সম্ভারে দোকানটি সব সময়ই ভরা থাকতো। আজ তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত। দেশে খেলাধুলা যথেষ্টই বেড়েছে। কিন্তু কার এণ্ড মহলানবিশের দোকানের মত খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রেতা একটা ভাল দোকান পাওয়াও এখন দুর্ঘট। যাই হোক এখন কথা হচ্ছে ভারতে প্রস্তুত বলের আকার ও ওজনের এই হেরফের কেন? সত্যই কি এদেশে আইন মাফিক বল প্রস্তুত করা যায় না? না, বাজারে বল থাকা সত্ত্বেও ক্লাব কর্তৃপক্ষ ছোট আকারের বল সংগ্রহ করেন। কলকাতার এক বিশিষ্ট ক্লাবের ট্রেনারের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলাপ হয়েছিল। তিনি নাকি যথেষ্ট চেষ্টা করেও আইনমাফিক বল সংগ্রহ করতে পারেননি। তাঁর অভিমত ক্লাব কর্তৃপক্ষ আপত্তি করে না, ফলে বল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানও দেদার ছোট আকারের বল তৈরী করে যায়। আবার খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের অভিমত—ভারতে চামড়া উত্তমরূপে 'ট্যানিং' করবার অসুবিধা আছে। ফলে ছোট আকারে বল তৈরী করলেও চামড়া প্রসারণের ফলে তা বেড়ে অনেক বড় হয়ে যায়। চামড়া প্রসারণের জন্যই ফুটবল আইনে বলের ন্যূনতম ও ঊর্ধ্বতন পরিধির মধ্যে এক ইঞ্চি পার্থক্য রাখা হয়েছে, ওজনের ক্ষেত্রেও দুই আউন্সের পার্থক্য। এ সত্ত্বেও যদি আইনমাফিক বল প্রস্তুত করা না যায় তবে কিভাবে আইন-

আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাবে রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলে বাংলার নির্বাচিত খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা সভায় শ্রীপংকজ গুপ্তকে বক্তৃতা করতে দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিক থেকে বসে আছেন—এস রায় (মুখের সম্মুখ ভাগ), এস ঘোষ, রতন সেন, এস শেঠ, অধিনায়ক এস মান্না ও আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাবের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার
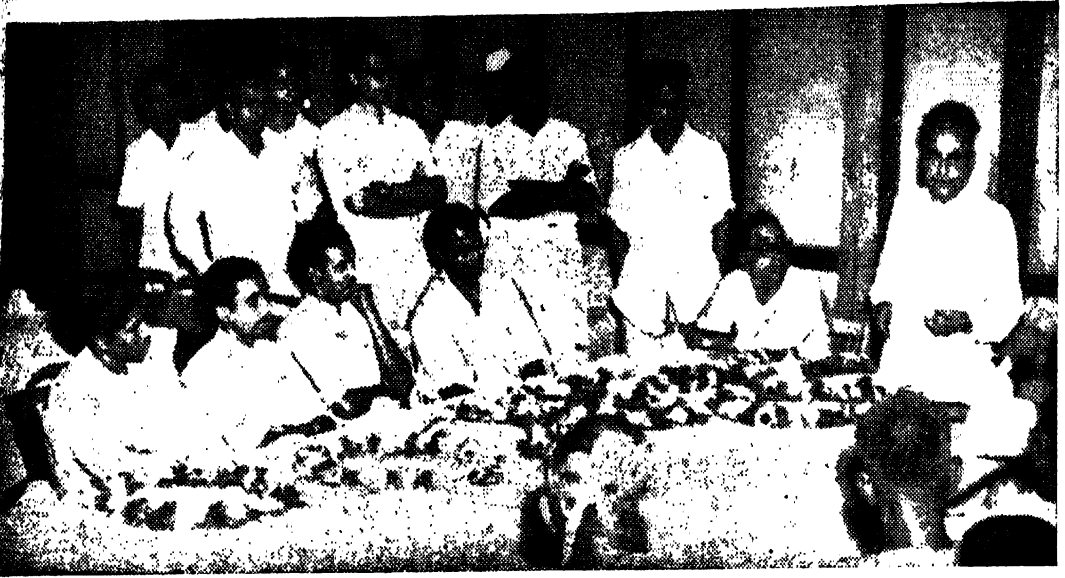
সংগত বল তৈরী হতে পারে তা ভেবে দেখবার বিষয়। সত্যই কি ভারতে আইনমাফিক বল প্রস্তুত হতে পারে না? না, এর মধ্যে কোন ব্যবসায়িক কারচুপি আছে?

ফুটবল লীগের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

প্রথম ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ানশিপ মীমাংসার পর লীগের খেলা স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে। তবুও রেলিগেশন ও রানার্স-এর মধ্যে খেলার আকর্ষণ কিছুটা বিদ্যমান ছিল। রেলিগেশন অর্থাৎ অবতরণের প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে গেছে। বাকী রানার্সের প্রশ্ন। তাও এক রকম নিষ্পত্তির মধ্যে। দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে কোন্ দল চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ ক'রে আসছে-বার প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে এ নিয়েও উৎসাহ উদ্দীপনা কম ছিল না। কিন্তু এ প্রশ্নেরও ফয়সালা হয়ে যাবার পর লীগ খেলার অবস্থা দাঁড়িয়েছে বৃহৎ যজ্ঞের পর কাঙালী বিদায়ের অবস্থার মত। এমনি নিগিডিগি অবস্থার মধ্যেই জুনিয়র লীগ ও বিভিন্ন নক আউটের খেলা চলতে থাকবে। প্রায় দেড়মাস পরে রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দল দেশে ফিরে এলে আই এফ এ শীল্ডের খেলায় আবার মরা গাঙ্গে জোয়ার আসবে।

যদিও প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে লীগ কোঠার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের অর্জিত পয়েন্টের মধ্যে ৩ পয়েন্টের পার্থক্য তবুও বলতে হবে মোহনবাগানের লীগ বিজয় কষ্টার্জিত সাফল্য। কারণ শেষ দিকে পাঁচটি ক্লাবের সম্মুখেই ছিল লীগ বিজয়ের রঙীন হাতছানি। পাঁচটি ক্লাবের সমর্থকদেরই এবার আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। লীগ কোঠার উপরের দিকে চলেছে লুকোচুরি খেলা। কখনো মোহনবাগান কখনো রাজস্থান কখনো মহমেডান স্পোর্টিং আবার কখনো ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ কোঠায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। এরিয়ান ক্লাব অবশ্য কখনো শীর্ষে স্থান পায়নি, তবে সব সময়ই মাথা তুলবার হুমকি দিয়েছে। তাই বন্ধুর পথে উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এবার মোহনবাগানের লীগ বিজয়। খেলার মধ্যে ভাগ্যের অদৃশ্য হস্তকে অনেকেই স্বীকার করেন না। তাদের অভিমত যেখানে শক্তির পরীক্ষা, নৈপুণ্যের বিচার সেখানে আবার ভাগ্য কি? কিন্তু খেলার মাঠে এমন ঘটনা বিরল নয়, যেখানে দেখা যায় একদল সারাক্ষণ আক্রমণ চালিয়েও কোন গোল করতে পারলো না, একাধিক শট পোস্টে বা বারে লেগে ফিরে এলো আর প্রতিপক্ষ একটি সুযোগ থেকেই গোল করে খেলায় বিজয়ী হলো। এখানে একের প্রতি অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস আর অপরের প্রতি ভাগ্যদেবীর অকৃপণ করুণার কথা স্বীকার করতে হবে বৈকি? এবারকার লীগে এমন ভাগ্যের খেলাও কম প্রত্যক্ষ করা যায়নি এবং সত্য কথা বলতে কি এদিক দিয়ে মোহনবাগান ক্লাবকে কিছুটা ভাগ্যবান বলা যেতে পারে। অপরদিকে রাজস্থান ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান দলের উপর ভাগ্যদেবীর ছিল বক্র দৃষ্টি। নতুবা একাদিক্রমে ৪টি ক'রে খেলায় হার স্বীকার করবে রাজস্থান বা ইস্টবেঙ্গল এমন শক্তিহীন টিম ছিল না। বরং সবদিক বিবেচনা করলে বলা যায় রাজস্থানই ছিল এবার সবদিকের সামঞ্জস্য-পূর্ণ শক্তিশালী ফুটবল টিম। মহমেডান দলের সম্মুখে যখন লীগ জয়ের রঙীন হাত-ছানি তখন তাদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং নিপুণতম খেলোয়াড় মাসুদ ফাকরীর অসুস্থ হবার ঘটনাও দুর্ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। যাই হোক বহু শক্তিশালী দলের মধ্যে প্রাধান্যের লড়াইয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কম কৃতিত্বের কথা নয়। গতবারের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব এ বছরও এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এবার নিয়ে মোহনবাগান ক্লাব লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে ৬ বার আর

লীগে ১০ বার করেছে রানার্সের পুরস্কার লাভ।

এ সপ্তাহের লেখার সময় পর্যন্ত এ বছরের রানার্সের প্রশ্ন মীমাংসিত হয়নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩৫ পয়েণ্ট পেয়ে লীগ শেষ করেছে। এই পয়েণ্ট সংগ্রহের আর সুযোগ আছে একমাত্র এরিয়ান ক্লাবের। এরিয়ান ক্লাব বাকী দুটি খেলায় পুরো পয়েণ্ট পেলে ৩৫ পয়েণ্ট লাভ করবে। তখন দুই দলকে যুগ্ম রানার্স বলে ঘোষণা করা হবে, না গোল 'এভারেজে' রানার্সের প্রশ্নের মীমাংসা হবে, কি দুই দলের মধ্যে পুনরায় খেলার ব্যবস্থা হবে এ প্রশ্ন আই এফ এর বিবেচনাধীন। আর এরিয়ান একটি পয়েণ্ট নষ্ট করলেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রানার্স টিম বলে ঘোষিত হবে। ৬ বারের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইতিপূর্বে আরও ৭ বার লীগ রানার্সের পুরস্কার লাভ করেছে।

গত বছর দ্বিতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে অরোরা ক্লাব এ বছরই প্রথম ডিভিশনে খেলবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সব চেয়ে কম পয়েণ্ট সংগ্রহ করায় অরোরাকে আবার দ্বিতীয় ডিভিশনে অবতরণের বিধানে পড়তে হয়েছে। সুতরাং অরোরাকে 'এক বরষকা সুলতান' বলা যেতে পারে। গতবার দ্বিতীয় ডিভিশনের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে অরোরা যে সময় প্রথম ডিভিশনে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে তখন আর তাদের দলকে শক্তিশালী করে প্রথম ডিভিশনের উপযোগী করবার সুযোগ ছিল না। তাই অরোরার এই ভাগ্য বিপর্যয়।

দ্বিতীয় ডিভিশন লীগের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে বালী প্রতিভা ক্লাব। এখানে বালী প্রতিভার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল স্পোর্ট কমিশনার্স ও ইণ্টার ন্যাশনালের সঙ্গে। সবারই ছিল লীগ বিজয়ী হবার সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত ত্রিমুখী অভিযানে বালী প্রতিভা জয়যুক্ত হয়ে আসছে-বারে প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

নীচে মোহনবাগানের লীগ জয়ের খতিয়ান এবং আগে যারা লীগ পেয়েছে তাদের হিসাব দেওয়া হলঃ—

বিভিন্ন দলের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলার ফলাফল

পুলিশ ৭—১, ১—০; খিদিরপুর ১—০, ১—০; জর্জ টেলিগ্রাফ ১—০, ০—০; বি এন আর ৩—১, ১—০; অরোরা ৩—০, ৩—২; রেলওয়ে স্পোর্টস ০—১, ১—০; মহঃ স্পোর্টিং ০—০, ১—২; কালীঘাট ২—০, ২—০; স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৪—০, ১—১; এরিয়ান ০—০, ০—০; উয়াড়ী ০—১, ২—০; ইস্টবেঙ্গল ১—১, ২—০; রাজস্থান ১—১ ও ১—১।

মোহনবাগানের গোলদাতা

মোট—৩৯; এস দত্ত—১০, কে পাল—৭, সি গোস্বামী—৬, সত্তার—৪, ধনরাজ—৪, এ চ্যাটার্জি—১, এস ব্যানার্জি—১, আর সেন—১' দলজিৎ—১, এস মান্না—১, ভেঙ্কটেশ—১, অমল দত্ত (ইস্টবেঙ্গল—নিজ গোল) ১, অনিল দে—১।

আগে যারা লীগ পেয়েছে

১৮৯৮—প্রথম গ্লসেস্টারস
১৮৯৯—ক্যালকাটা এফ সি
১৯০০—১৯০১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস
১৯০২—কে ও এস বি
১৯০৩—হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪—১৯০৫—কিংস ওন ল্যাংকাস্টার
১৯০৬—হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি
১৯০৭—ক্যালকাটা এফ সি
১৯০৮—১৯০৯—গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১০—ডালহৌসী এ সি
১৯১১—৭০ কোং আর জি এ
১৯১২—১৯১৩—ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৪—হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১৫—দশম মিডলসেক্স
১৯১৬—ক্যালকাটা এফ সি
১৯১৭—প্রথম ব্যাটালিয়ান লিনকলনস
১৯১৮—ক্যালকাটা এফ সি
১৯১৯—স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটালিয়ন
১৯২০—ক্যালকাটা এফ সি
১৯২১—ডালহৌসী এ সি
১৯২২—১৯২৩—ক্যালকাটা এফ সি
১৯২৪—ক্যামেরন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯২৫—ক্যালকাটা
১৯২৬—১৯২৭—নর্থ স্ট্যাফোর্ড
...১৯২৮—১৯২৯—ডালহৌসী এ সি
১৯৩০—রয়্যাল রেজিমেণ্ট
১৯৩১—১৯৩৩—ডারহামস এল আই

ভারতীয় যুগের চ্যাম্পিয়ান দল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল							
মহঃ স্পোর্টিং	২০	১০	৭	৩	৩৬	১৯	২৭
মহঃ স্পোর্টিং	২২	১১	৮	৩	৩৭	১৭	৩০
মহঃ স্পোর্টিং	২২	১৫	৬	১	৪৫	৮	৩৬
মহঃ স্পোর্টিং	২২	১৪	৬	২	৪৭	১৮	৩৪
মহঃ স্পোর্টিং	২২	১১	৮	৩	২৯	১৯	৩০
১৯৩৯ সাল							
মোহনবাগান	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
১৯৪০ ও ১৯৪১ সাল							
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	১৭	৬	১	৪২	৭	৪০
মহঃ স্পোর্টিং	২৬	২০	৩	৩	৫৩	১৩	৪৩
১৯৪২ সাল							
ইস্টবেঙ্গল	২৪	২০	৩	১	৬৪	৯	৪৩
১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সাল							
মোহনবাগান	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
মোহনবাগান	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সাল							
ইস্টবেঙ্গল	২৪	১৬	৭	১	৫৭	৮	৩৯
ইস্টবেঙ্গল	২৪	২০	৩	১	৭০	১১	৪৩
(১৯৪৭—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খেলা বন্ধ)							
১৯৪৮ সাল							
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	২০	৪	০	৩৬	৭	৪৪
১৯৪৯ ও ১৯৫০ সাল							
ইস্টবেঙ্গল	২৬	২২	১	৩	৭৭	১০	৪৫
ইস্টবেঙ্গল	২৬	১৯	৭	০	৫৮	৯	৪৫
১৯৫১ সাল							
মোহনবাগান	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫২ সাল							
ইস্টবেঙ্গল	২৬	১৭	৬	৩	৩০	৫	৪০
(১৯৫৩—লীগ মধ্যপথে পরিত্যক্ত)							
১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সাল							
মোহনবাগান	২৮	১৮	৮	১	৩৮	১	৪৬
মোহনবাগান	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮

সাপ্তাহিক সংবাদ
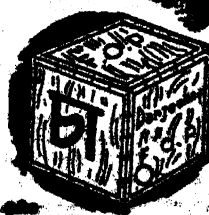
দেশী সংবাদ

২৫শে জুলাই—আজ লোকসভায় তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, তিনি দিল্লীর পর্তুগীজ দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিবার জন্য নির্দেশ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ৮ই আগস্ট হইতে দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী পি বি গজেন্দ্রগড়করকে লইয়া গঠিত ব্যাঙ্ক-রোয়েদাদ কমিশন আজ বোম্বাইয়ে রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পাঁচ শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্টটি ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

পুনর্বাসন অর্থসংস্থা ১৯৫৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া সংস্থার রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে।

অদ্য লোকসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে অধুনা বাতিল হিন্দু সংহিতার সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক বিধান হিন্দু সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিল সংসদের উভয় সভার যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়।

২৬শে জুলাই—নূতন পণ্ডিচেরী রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভয়াবহ বন্যার ফলে তিনটি স্থানে রেলপথ বিধ্বস্ত হওয়ায় আসাম আজ সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

আজ লোকসভায় প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গোয়ায় পর্তুগীজদের অবস্থিতি ভারতে প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর পক্ষে স্থায়ী অন্তরায়স্বরূপ।

২৭শে জুলাই—হিমালয়ের সানুদেশবর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রবল বারিবর্ষণের ফলে কয়েকটি নদী প্লাবিত হওয়ায় ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিহার, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সহস্র সহস্র লোকের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে।

আজ লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, গত ২০শে জুলাই সায়গনে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্ট আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরতি কমিশনকে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে কমিশনই যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিদেশে নীলামের জন্য প্রেরিত চায়ের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস করা উচিত বলিয়া চা নীলাম কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছে, ভারত সরকার তাহা সাধারণভাবে অনুমোদন করিয়াছেন।

২৮শে জুলাই—আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, পূর্ববঙ্গে অনুকূল পরিবেশ বর্তমান না থাকাই পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগমের মুখ্য হেতু।

গত ১২ই মার্চ নাগপুরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রাণনাশের চেষ্টার অপরাধে রিক্সা-চালক বাবু রাও আজ ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

২৯শে জুলাই—আজ লোকসভায় অর্থ-মন্ত্রীর ভারতীয় মুদ্রামাণ (সংশোধন) বিলটি গৃহীত হওয়ায় বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তে দশমিক পদ্ধতি স্বীকৃত হইল।

৩০শে জুলাই—আসামে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ভ্রমণরত পি টি আই-এর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে অনুমান কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ছয়টি জেলায় অনুমান ১,৫০০ বর্গমাইল স্থান প্লাবিত হইয়াছে। কুড়ি হাজার গৃহ জলমগ্ন হইয়াছে। ডিব্রুগড় শহরের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শতকরা ৭০ ভাগ প্লাবিত হইয়াছে।

৩১শে জুলাই—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না ঘোষণা করেন যে, গত ছয় মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমাগম বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি উদ্বাস্তুদিগকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নিয়োগ করিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সাহায্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের নিকট আবেদন জানান।

আজ নৈহাটিতে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনের অধিবেশনে শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বিভিন্ন কলেজে অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণ সম্পর্কে বাধা নিষেধ আরোপ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কলেজে কলেজে যে সার্কুলার প্রেরণ করা হয়, তাহাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়, এবং অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণ সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখিবার দাবি জানান হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে জুলাই—লালকোর্তা নেতা খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁ পেশোয়ারে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, পাক গণ-পরিষদ প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান নহে। পরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লালকোর্তা নেতা অবিলম্বে নির্বাচনের আদেশ দিবার চ্যালেঞ্জ জানান।

২৮শে জুলাই—বুলগেরিয়া অদ্য স্বীকার করিয়াছে যে, গতকল্য একখানা ইসরাইলী কনস্টেলেশন যাত্রীবাহী বিমানকে কামানের গোলায় ভূপাতিত করা হইয়াছে এবং উহাতে ৫৮ জন প্রাণ হারাইয়াছে।

২৯শে জুলাই—আজ প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ারের হস্তে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর এক লিপি অর্পণ করা হয়।

৩০শে জুলাই—আজ পিকিংএ ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে চীনের পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা প্রদানকালে প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রজাতন্ত্রী চীন, এসিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের মধ্যে এক বিরাট শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করেন।

পৃথিবী প্রদক্ষিণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং-চালিত উপগ্রহ নির্মাণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিকল্পনা করিয়াছে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাহা অনুমোদন করিয়া পরিকল্পনা রূপায়নে দ্রুত অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন।

৩১শে জুলাই—পাক সরকার আজ ভারতীয় মুদ্রার পর্যায়ে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—৷৵ আনা, বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০,

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, লিমিটেড, ৬ ও ৮, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩,

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ

দেশ

শনিবার

৪১ সংখ্যা

২৭ শ্রাবণ, ১৩৬২

DESH

SATURDAY, 13TH AUGUST, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

অমর স্মৃতি

এক বৎসর ঘুরিয়া গেল। গত বৎসর ১২ই আগস্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে আমরা হারাইয়াছি। সুরেশচন্দ্র শুধু 'দেশের' প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবর্তকই ছিলেন না। তাঁহাকে একান্ত সুহৃৎ এবং উপদেষ্টা-স্বরূপে পাইবার সৌভাগ্য আমরা লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের কর্তব্য উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে, সুখে, দুঃখে তিনি আমাদের পাশে থাকিতেন এবং সদা-সর্বদা আমাদিগকে সাহায্য করিতেন। সুরেশচন্দ্র অনন্যসাধারণ কর্মী, আদর্শ-নিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিকস্বরূপে স্বীয় প্রতিভা এবং সাধনার বলে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিপ্লবীর আগ্নেয় বীর্যে উদ্দীপ্ত তাঁহার অবদান, সুদীর্ঘ নির্যাতন, লাঞ্ছনা, কারাবরণ জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে; বাঘা যতীন এবং সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী সুরেশচন্দ্রকে জাতি বিস্মৃত হইবে না। বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমুন্নতি সাধনে তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সর্বতোমুখী তৎপরতা বাঙলার বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁহার মর্যাদাবুদ্ধি জাতির আদর্শস্বরূপে গণ্য হইবে। বাঙলা লিনো টাইপের আবিষ্কর্তা হিসাবে সুরেশচন্দ্র সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন এবং এদেশের মুদ্রণ-শিল্পে নবযুগের উদ্বোধকরূপে তিনি পূজা পাইবেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'গোষ্ঠী সংবাদপত্র-সাধনার ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রের জীবনের বিস্ময়কর সাফল্যের বিজয় ঘোষণা করিবে। দারিদ্র্যের দুর্গমপথে সুদৃঢ় সংকল্পশীলতা এবং অধ্যবসায় সহযোগে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত তাঁহার বিচিত্র কর্মময় জীবন উদ্ভাসিত করিয়া সবার

দরদে দরদী, নিরহঙ্কৃত, সরল হৃদয় সুরেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট রহিবে। তিনি তাঁহার মানবতাময় মঙ্গল মূর্তিতে আমাদের দৃষ্টিতে জাগিবেন। ফলত সুরেশচন্দ্রকে হারাইয়া শুধু আমরাই অভাবগ্রস্ত হই নাই, সমগ্র জাতিই তাঁহার অভাব একান্তভাবে উপলব্ধি করিবে এবং সেই অভাববোধের ভিতর দিয়া আমরা সুরেশচন্দ্রের প্রভাব উপলব্ধি করিব; তিনি আমাদের স্মৃতিপথে সঞ্জীবিত থাকিবেন। এই হিসাবে তিনি অমর। সুরেশচন্দ্রের তিরোভাব দিবসে আমরা তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শহীদের শোণিতোৎসর্গ

পর্তুগীজশাসিত গোয়ার মাটি ভারতের এ পর্যন্ত চারজন বীর সন্তানের শোণিতোৎসর্গে সিক্ত হইল। মধ্য-প্রদেশের শ্রী থোরাট এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রীনিত্যানন্দ সাহা—এই দুইজন তরুণ যুবক কিছুদিন পূর্বে পর্তুগীজ পুলিশের গুলীতে গোয়ায় প্রাণ দিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকা হইতে আনীত নিগ্রো সৈনিকেরা নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের প্রতি গুলী চালাইতে অস্বীকৃত হয়। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে শ্বেতাঙ্গ পর্তুগীজ বর্বরদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ এই নিগ্রোরা সভ্য হিসাবে যে কত উপরে, এই একটি ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। এই সব নিগ্রো সৈনিকের মানবতা এবং মহত্ত্বের প্রতি আমাদের অন্তর স্বভাবতঃই শ্রদ্ধিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতাগর্বী পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিরুদ্ধে মনে প্রবল বিক্ষোভ জাগ্রত হয়। অহিংসার মূল্য আমরা বুঝি। গান্ধীজীর নীতি এবং আদর্শবাদের আমরাও অনুরাগী, কিন্তু গোয়ার সম্বন্ধে ভারত সরকার এবং কংগ্রেস যেরূপ নীতি লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে গান্ধীজীর

আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শান্তিপূর্ণ পথে আন্তর্জাতিক সকল সমস্যার সমাধান অবশ্যই কাম্য, কিন্তু দুর্বলতা ও অহিংসা এক বস্তু নয় এবং দুর্বলতার পথে কোন বৃহৎ আদর্শের মর্যাদাও রক্ষিত হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে গোয়ার সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংসার প্রতি প্রাণপূর্ণ নিষ্ঠার আদর্শকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। জনগণের আন্তরিক সমর্থনে সত্যাগ্রহের শক্তি উত্তরোত্তর বলিষ্ঠ আকার ধারণ করিতেছে। ভারতের বীর সন্তানদের শোণিতোৎসর্গ সেই শক্তিতে অদম্য গতিবেগ সঞ্চার করিল। জাগ্রত জনগণের এই শক্তি ভারত হইতে পর্তুগীজ প্রভুত্বের শেষ চিহ্ন উৎখাত করিবে। ভারতের সহস্র সহস্র বীর সন্তান আত্মদাতা বীরদের উত্তপ্ত শোণিতের মর্যাদা রক্ষার জন্য আগাইয়া আসিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বন্দুক-বেয়নেটের মুখে বুক পাতিয়া দিতে যাঁহারা কম্পিত হয় নাই, ক্ষুদ্র পর্তুগালের স্পর্ধা বিচূর্ণ করিতে তাঁহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই বিলম্ব ঘটিবে না। বীরের রক্ত ব্যর্থ হইবার নয়। ১৫ই আগস্টের পূর্বাহ্নে আমরা এই সত্য একান্তভাবেই অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি।

মিত্রতা-কী-যাত্রা

ভারত সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগ ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের ইউরোপ ভ্রমণের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর সফরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সম্প্রতি কলিকাতায় প্রদর্শিত হইতেছে। এই বিষয়ে কলিকাতা বোম্বাই, দিল্লী এবং মাদ্রাজের উপরে গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে; কারণ প্রথমে প্রদর্শিত হইল এবং এখানেই কলিকাতার পৌর জনগণ সেই সুযোগ সর্বাগ্রে লাভ করিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রতিক ইউরোপ, বিশেষভাবে রাশিয়া পরিভ্রমণের বিবরণ সংবাদপত্রের মারফতে অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু সংবাদপত্রের বিবরণ এবং চিত্রে দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ইউরোপ এবং রাশিয়ার জনসাধারণ ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে সর্বত্র কিরূপ বিপুলভাবে অভিনন্দিত করিয়াছে এবং সেই অভিনন্দনের ভিতর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাহাদের চোখে-মুখে কেমনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলে সত্যই আমাদের মন গর্বে ভরিয়া উঠে। দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের শহর এবং পল্লীর জনসাধারণ পণ্ডিত নেহরুকে একান্ত আপন করিয়া পাইয়াছে। তাহারা শান্তি এবং মানব-কল্যাণের বিগ্রহ-স্বরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছে। শুধু শাসন-বিভাগে উচ্চস্তরে সমাসীন ব্যক্তিদের দ্বারাই তিনি সম্বর্ধিত হন নাই এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনা রাষ্ট্রগত রাজনীতিক মামুলি সৌজন্যের পরিচায়ক নয়, এ বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এই চিত্র দেখিবার জন্য সর্বত্র আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। সরকার হইতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিনা-মূল্যে ইহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

মুদ্রণ শিল্পের উন্নয়ন

ভারতের মুদ্রণ শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এদেশে এই শিল্পের ঐতিহ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এক্ষেত্রে কিরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ভারত সরকার এই শিল্পকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতের তথ্য এবং প্রচার বিভাগ ১৯৫৫ সাল হইতে উচ্চ শ্রেণীর ছাপা ও ডিজাইনের জন্য প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতার সাহায্যে পুরস্কার দানের একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে যেসব পুস্তক, ডায়েরী, দেওয়াল পঞ্জী প্রভৃতি ছাপা এবং ডিজাইনের কাজ করা হইয়াছে, সেইগুলিই পুরস্কার প্রতিযোগিতার পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উজ্জীবন ক্ষেত্রে মুদ্রণ শিল্পের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। এই শিল্পের উন্নয়নকল্পে ভারত সরকারের এই উদ্যমকে দেশবাসীমাত্রেই সম্বর্ধিত করিবেন। কিন্তু উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে এই শিল্পের যাঁহারা প্রতিনিধি তাঁহাদের অধিকার থাকা একান্তভাবেই আমরা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমরা জানিতে পারিলাম, প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে সরকার এবং এই শিল্পের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইবে। উপযুক্ত ব্যক্তিরা যাহাতে এক্ষেত্রে শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ লাভ করেন, এদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

ভিক্ষু শীলভদ্রের সমাধি লাভ

ভিক্ষু শীলভদ্রের পরলোকগমনে দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অভাব সকলেই অনুভব করিবেন। তিনি ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার সহিত দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষভাবে সংশিলষ্ট ছিলেন। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি তত্ত্বচিন্তা এবং সাংস্কৃতিক গবেষণার পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বাঙ্গালী ভিক্ষু শীলভদ্রের প্রখর মনীষার পরিচয় পাওয়া যাইত। নির্বাণ অভিলাষী ভিক্ষুর পার্থিব জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে। সাধকের মহাসমাধি লাভে আমরা শোক করিব না। এদেশের সাধনা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলভদ্রের অবদান উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

বিদেশিকী

পর্তুগীজ পুলিসের প্রহারের ফলে পূর্বে একজন গোয়া সত্যাগ্রহীর মৃত্যু হয়েছিল। গত ৩রা আগস্ট আরো দুজন প্রাণ দিয়েছেন, এ'দের মধ্যে একজন বাঙালী— শ্রীনিত্যানন্দ সাহা—পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হয়েছিলেন। এ'দের দল পর্তুগীজ সীমানার ভিতর প্রবেশ করলে পর্তুগীজ পুলিস গুলী ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ফলে দুজনের মৃত্যু ঘটে ও আরো তিন-চারজন আহত হন।

ভারত থেকে সত্যাগ্রহীর দল গোয়ায় প্রবেশ করার চেষ্টা করবে, প্রবেশ করলে পর্তুগীজ পুলিস নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালিয়ে লোক হতাহত করবে এবং ভারত সরকার কেবলমাত্র পর্তুগীজ সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাবেন—এরকম অবস্থা কি আর চলতে পারে? ভারত সরকার পর্তুগীজদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সংঘর্ষ ঘটাতে চান না, সেই জন্য বড়ো রকমের সত্যাগ্রহী দল গোয়ায় প্রবেশ করে, এটা ভারত সরকার চাননি। কারণ বড়ো দলের উপর পর্তুগীজদের হামলা হলে অনেক লোকের হতাহত হবার সম্ভাবনা এবং সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের পক্ষে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কঠিন হবে। কিন্তু ছোট ছোট সত্যাগ্রহী দলকে যেতে দিতে ভারত সরকার আপত্তি করেন নি। পরন্তু একথা মনে করা হয়ত ভুল হবে না যে, সত্যাগ্রহের মতো আন্দোলন কিছু চলে, এটা ভারত সরকারের অনভিপ্রেত নয়। কারণ পর্তুগীজদের উপর এরূপ আন্দোলনের চাপ ভারত সরকারের নীতির পক্ষে কেবল সহায়ক নয়, বোধ-হয় প্রয়োজনীয়ও বটে। ভারত সরকার পর্তুগীজদের উপর অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ দেওয়ার নীতি অনুসরণ করছেন। কিন্তু কেবলমাত্র সেই চাপের দ্বারা কাজ হবে কি না সন্দেহ, তার সঙ্গে পর্তুগীজ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় গণ-আন্দোলনও আবশ্যক, একথা ভারত সরকার নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। তা না করলে ভারত থেকে ছোট সত্যাগ্রহীর দলের গোয়ায় প্রবেশও ভারত সরকার হয়ত বন্ধ করে দিতেন। সেটা ভারত সরকারের পক্ষে অসাধ্য ছিল না। কিন্তু আসলে একেবারে বন্ধ করে দিতে ভারত সরকার নিজেই চান নি। যদিও বড়ো রকমের কিছু ঘটে যাতে ভারত সরকারকে বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাও সরকার চান নি।

যাই হোক, পর্তুগীজদের হাতে সত্যাগ্রহীদের কী হাল হয়, সে বিষয়ে ভারত সরকার উদাসীন থাকতে পারেন না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সরকারের

নৈতিক দায়িত্ব আছে। তিনজন সত্যাগ্রহীর মৃত্যুর পরে এই দায়িত্বের প্রশ্ন খুবই জরুরী আকার ধারণ করেছে। বিশেষত সামনে ১৫ই আগস্ট। ঐদিন বিরাট সত্যাগ্রহী দল গোয়ার প্রবেশ করার চেষ্টা করবে—তার আয়োজন চলছে। সেটা নিবারণ করা কি সরকারের পক্ষে এখন সম্ভব, যেরূপ গত বছর সম্ভব হয়েছিল?

ওদিকে পর্তুগীজরাও নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের উচিত ছিল, পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া যে, তাঁরা যদি অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যা মিটাতে প্রস্তুত না হন, তবে ভারত সরকারের পক্ষে বলপ্রয়োগ দ্বারা পর্তুগীজ নীতির বিরুদ্ধতা করা অনিবার্য হয়ে উঠবে।

ভারত সরকারের কাছ থেকে এরূপ চরমপত্র পেলে পর্তুগীজ সরকার ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক যদি কেউ থাকেন, তাঁদের সুবুদ্ধির উদয় হতে পারে। ভারত সরকার গোয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট আছেন সন্দেহ নেই। দিল্লীতে পর্তুগীজ দূতাবাস বন্ধ করিয়ে দিয়ে কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধির চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু তাতে কাজ হবে কি? পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট অবিরাম ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্টকে একটি নোট পাঠিয়েছেন, তাতে ভারতীয় এলাকা থেকে গোয়ার ভিতর প্রবেশার্থী সত্যাগ্রহ অভিযাত্রীদের বাধা দেবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছে। যদি ভারত গভর্নমেণ্ট তা না করেন, তবে ব্যাপারটা ইউ-এন-ওর নিকট উপস্থিত করা হবে বলে পর্তুগীজ সরকার ভয় দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারত গভর্নমেণ্ট এতদিন পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকে একটা ভিন্ন রকম চরমপত্র না পাঠিয়েই ভুল করেছেন। যাই হোক, এখনো হয়ত কাজ হতে পারে, যদি ভারত গভর্নমেণ্ট পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট এবং তাঁদের বন্ধুদের জানান যে, পর্তুগীজরা যদি অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা মিটাতে অর্থাৎ গোয়ার ভারতীয় ইউ-নিয়নের অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে আপোষ-মীমাংসার আলোচনায় যোগ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহলেই ১৫ই আগস্টের সত্যাগ্রহ যাত্রা বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে, তা না হলে সত্যাগ্রহ বন্ধ করা সম্ভব নয় এবং সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার হলে ভারতীয় জনমত ভারত সরকারকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেবে না। আমাদের বিশ্বাস যে, এই ধরনের কথা যদি খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, তবে পর্তুগালের বন্ধুগণ পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকে সুপরামর্শ দেবেন এবং আসন্ন সংকট নিবারণের একটা উপায় হবে।

* * *

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। মিঃ গোলাম মহম্মদ শারীরিক অসুস্থতার দরুণ দু মাসের ছুটি নিয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা অস্থায়ীভাবে গভর্নর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। মিঃ গোলাম মহম্মদ দু মাস য়ুরোপ ছিলেন চিকিৎসার জন্য। যখন তিনি দেশের বাইরে ছিলেন, তখন তাঁর জায়গায় অস্থায়ীভাবে কারো নিয়োগের প্রয়োজন হোল না, অথচ তাঁর দেশে ফেরার পরে সেই প্রয়োজন হোল। আর মিঃ গোলাম মহম্মদের শরীরের অবস্থার জন্য যদি তাঁর বিশ্রামের আবশ্যক হয়ে থাকে, তবে তাঁর পদত্যাগের কথাই উঠা উচিত ছিল। তা না হয়ে 'ছুটির' ব্যবস্থা কেন হোল? হয়ত তিনি আর কাজ করবেন না, কিন্তু সে সংবাদ এখন প্রকাশ করা উচিত হবে না অথবা তাঁর জায়গায় স্থায়ীভাবে কে বসবেন, তা ঠিক করতে পারা যাচ্ছে না বলেই এই 'ছুটির' ব্যবস্থা হয়েছে। এমন হতে পারে যে, ইসকান্দার মির্জা সাহেবই শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হবেন। ভিতরে ক্ষমতার খেলা কী রূপ নিচ্ছে, তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না।

মিঃ মহম্মদ আলির প্রধানমন্ত্রিত্বেরও অবসান হয়েছে। কন্‌স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টিতে মিঃ মহম্মদ আলীর স্থলে পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের অর্থমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী দলপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু চৌধুরী মহম্মদ আলী নূতন প্রধানমন্ত্রী হবেন না। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের সংগে সমঝোতা হয়েছে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা মিঃ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে গঠিত হবে বলে সংবাদে প্রকাশ। আওয়ামী লীগের শর্ত ছিল মিঃ সুরাবর্দীকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। মুসলিম লীগ এই শর্ত মেনে নিয়েছে কারণ অন্যদিকে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানকে এক 'ইউনিট' করার প্রস্তাব সমর্থন করতে একরকম বিনা শর্তেই রাজী হয়েছে।

মিঃ ফজলুল হকের ইউনাইটেড ফ্রণ্টের সংগেও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন করার কথাবার্তা হয়েছিল। মিঃ মহম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রী থাকায় ইউনাইটেড ফ্রণ্টের আপত্তি ছিল না। ইউনাইটেড ফ্রণ্টের সংগে কোয়ালিশন হলে মিঃ মহম্মদ আলীই প্রধানমন্ত্রী থাকতেন। কিন্তু ইউনাইটেড ফ্রণ্ট পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট করার প্রস্তাবে এই একটি শর্তে রাজী ছিল যে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রানিয়ন্ত্রণ এই তিন বিষয় ছাড়া উভয় ইউনিটের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য—autonomy—থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানী লীগপন্থীরা এতে রাজী হয় নি, তার চেয়ে মিঃ সুরাবর্দীকে প্রধানমন্ত্রী করতে রাজী হয়েছে।

আওয়ামী-মুসলিম লীগ কোয়ালিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। দুই দল মিলেও যে জোর হবে তার দ্বারা মন্ত্রিত্বের স্থায়িত্ব বজায় রাখা খুব সহজ হবে না। তাছাড়া মুসলিম লীগের ভিতরের ঝগড়া কখন কীরূপে আত্মপ্রকাশ করে কে জানে। পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট করার ব্যাপারেও যথেষ্ট গোলমাল সামনে আছে। এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য এহেন অপকৌশল নেই যা প্রয়োগ করা হচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা যায় না।

পূর্ব পাকিস্তানে ইউনাইটেড ফ্রণ্টের মন্ত্রিত্ব, আওয়ামী লীগ বিরোধী দল, আবার কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্বের ভাগীদার এবং ইউনাইটেড ফ্রণ্ট প্রধান বিরোধী দল। এই বিচিত্র দ্বন্দ্বের পরিণতি কী হবে সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। ৮।৮।৫৫

পনেরই আগস্ট

পনেরই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিবস। সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই দিবস ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের এই স্বাধীনতা লাভও জগতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করিয়াছে। জগতের প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিকেই রক্তপাতবহুল সংগ্রামের সাহায্যে বিদেশীর প্রভুত্বকে উৎখাত করিতে হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহামানবের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত অহিংস নীতি অবলম্বনে স্বাধীনতা অর্জন করে। ইহার ফলে জেতৃ-বিজেতৃর মধ্যে স্থায়ী বিরোধের ভাব ভারতের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় নাই। অহিংস উপায়ে ভারতের স্বাধীনতালাভ বিশ্ব মানব সভ্যতার অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই দিক হইতে নূতন আশার আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ শুধু ভারতের নহে, সমগ্র মানব জাতির অগ্রগতির মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। ভারত মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে সমুন্নত মহিমা দিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের অষ্টম বার্ষিকী স্মৃতিদিবস ১৫ই আগস্টের বিশ্ব মৈত্রীর ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের অবদানের কথা সর্বাগ্রে আমাদের মনে পড়িতেছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বিগত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। ভারতের প্রতিষ্ঠার মূলে সামরিক শক্তি নাই। আণবিক অস্ত্র পুঞ্জীভূত করিয়া ভারত এই প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নাই। জগতের কয়েকটি প্রধান শক্তির তুলনায় ভারতের নৌবল এবং সৈন্যবলও সামান্য বলিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জগতের প্রবল শক্তিসমূহকেও ভারতের দিকে তাকাইতে হইতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকাকে ভারতের অভিমতকে মর্যাদা দান করিতে হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর পারস্পরিক

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার নীতিকুশলতা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে বিশ্বমানব-সমাজের প্রশংসদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। শান্তি এবং মানব মৈত্রীর কল্যাণময় বিগ্রহস্বরূপ তিনি সর্বত্র আদৃত এবং সম্পূজিত। পণ্ডিত জওহরলালের ন্যায় পুরুষকে আমরা দেশের এবং জাতির পরিচালক-স্বরূপে পাইয়াছি ইহা আমাদের পক্ষে সর্বাধিক গর্বের বিষয়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী-স্বরূপে দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে অবসন্ন জাতিকে বিশ্বব্যাপী সংকট সন্ধিক্ষণে তিনি অভ্রান্তভাবে বহু বাধা-বিঘ্ন এবং অন্তরায়ের ভিতর দিয়া শান্তি ও প্রতিষ্ঠার পথে লইয়া চলিয়াছেন। লোকস্মরকর তাঁহার ক্ষমতা, এ সম্বন্ধে কাহারো প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ কোন দিক হইতেই নাই

বিচ্ছিন্ন ভারতকে অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শে সংহত করিয়া তোলা এদেশের রাষ্ট্রীয় সাধনায় প্রধান সমস্যা। ঐক্য এবং সংহতি বোধের অভাবে ভারতের ন্যায় বিরাট এবং বিশাল দেশকে বারংবার বিদেশীর পদানত হইতে হইয়াছে। সামরিক শক্তি, সমর নৈপুণ্য কিংবা অস্ত্র-বলের অভাবের জন্য ভারতের এমন পতন ঘটে নাই, ইতিহাস এই সাক্ষ্য প্রদান করে। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সামন্ত রাজ্যসমূহের বিলোপ সাধনের দ্বারা কেন্দ্রীয় শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত এই দিক হইতে এই কয়েক বৎসর অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই দেশ ত্যাগ করিবার পর ফরাসীরা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র শক্তি পর্তুগাল এখনও বর্বরোচিত নীতির দ্বারা ভারতের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। শক্তিগোষ্ঠী বিশেষের আনুকূল্য তাহাদিগকে এই কার্যে প্রশ্রয় দিতেছে। মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেসের উক্তিতে স্পষ্টভাবেই এই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত কিছুতেই ভারতের মাটিতে বিদেশী শক্তিগোষ্ঠীর ঘাটি বসাইবার সুযোগ রাখিবে না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই কথা দৃঢ়তার সহিতই জানাইয়া দিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা দিবসে গোয়া সম্বন্ধে ভারতের ভবিষ্য-নীতি যাহাতে এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উপযোগী হয়, তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট থাকিবে।

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিক হইতেও সাত বৎসরে ভারতের উন্নতি সামান্য নহে। কেহ কেহ এই সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করিবেন, ইহা বিচিত্র নয়; কিন্তু দীর্ঘ দিনের বিরোধ এবং বিদ্বেষের প্রতিবেশে শান্তি ও মৈত্রীর শক্তিকে সংহত এবং জাগ্রত করিয়া তুলিবার পথে ভারত উন্নত-মস্তকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জগতের প্রবল শক্তিসমূহকে ভারতের আন্ত-র্জাতিক নীতিকে উত্তরোত্তর সর্মাধক মর্যাদার সহিত স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলালের এই কৃতিত্ব অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

পরাধীনতার পর ভারতের মত বিরাট বিশালদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা রাতারাতি সম্ভব নয়। বিশেষভাবে সেইরূপ উন্নতি সাধন করা দেশের ঐতিহ্য এবং সামাজিক প্রতিবেশের উপর নির্ভর করে। সেদিকে অবহিত না হইলে সংস্কার বা পরিবর্তন করিতে গেলে তাহা সর্বতোময় প্রভুত্বের ধারার মধ্যে গিয়া পড়ে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া জাতিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিবে, এই আশংকারও কারণ সৃষ্টি হয়। আভ্যন্তরিক অগ্রগতির সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে মোটামুটিভাবে এই সত্য অস্বীকার করা চলে না যে, এই কয়েক বৎসরে ভারতের কৃষক এবং শ্রমিক সমাজের মধ্যে যে জাগরণ সাধিত হইয়াছে, বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও তাহা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংক্রান্ত বিধানের সংস্কার সাধিত হইয়াছে এবং কৃষকেরা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জমির মালিকানা স্বত্ব পাইয়াছে। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, ইহার ফলে এ পর্যন্ত আর্থিক দিক হইতে দেশের আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলেও সে পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য। খাদ্যাভাবের সমস্যা স্বাধীনতা লাভের পর দেশে দারুণ সংকটস্বরূপে দেখা দিয়াছিল, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই সংকট আশানুরূপভাবে, এমন কি, অনেকটা আশার অতিরিক্তভাবেই নিরাকৃত হইয়াছে। খাদ্যের অভাব বর্তমানে দেশে নাই, পক্ষান্তরে এই সম্পর্কে বিদেশে রপ্তানি করিবার মত সুযোগও দেশে আজ আসিয়াছে। কয়েকটি নদী ও উপত্যকা পরিকল্পনা এই সম্ভাবনাকেই সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু দেশের সম্মুখে এখনও অনেক সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই সমস্যাগুলি সমাধানের পথে জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইয়াছে, কিন্তু বেকার সমস্যা অত্যন্তই গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবেই বলা চলে। এই সমস্যার সমাধান করিতে গেলে যন্ত্রচালিত বড় বড় শিল্পের সম্প্রসারণের কথা অনেকেরই মনে পড়ে; কিন্তু সেই সঙ্গে কুটীরশিল্পগুলির উন্নয়ন সাধন করার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ যন্ত্রশিল্পের চাপে কুটীরশিল্পগুলি যদি নষ্ট হয় এবং কৃষকেরা কারখানার দিকে ছুটে, তবে গ্রামগুলি ধ্বংস হইবে, শহরের দাবী

মিটাইতে গ্রাম উজাড় হইবে। ভারতের প্রাণকেন্দ্র গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত এবং এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক। এরূপ অবস্থায় কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের অবসরকালে শিল্প সাধনের দ্বারা অর্থাগমের সুযোগ পায়, এদেশের শিল্পোন্নয়ন নীতির লক্ষ্য সেই দিকেই থাকা প্রয়োজন।

যন্ত্রচালিত শিল্পের সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মালিকানার প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। যন্ত্রশিল্পের মালিকেরা ব্যক্তিগত লভ্যাংশের দিকেই শুধু দৃষ্টি দিবেন, এমন দিন চলিয়া গিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূর করাই দ্বিতীয় পঞ্চসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য যাহাতে সার্থকতা লাভ করে, এদেশের শিল্পপতি-দিগকে সেজন্য অবহিত হইতে হইবে। তাঁহারা যদি তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্যভাবে সচেতন না হন, তবে তাঁহাদিগকেই সমধিক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িতে হইবে। স্বাধীন
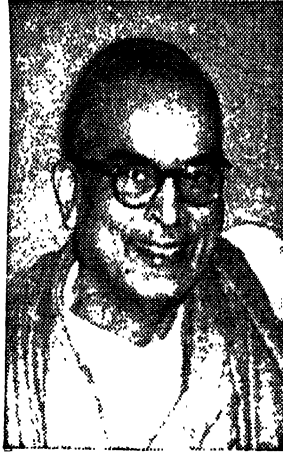
ভারতের নীতি সর্বজনীন, বিশেষভাবে জনগণের স্বার্থের দিকেই তাহা নিয়ন্ত্রিত হইবে। আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শ এই বিষয় সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। দেশের উন্নতির অর্থই সকল শ্রেণীর, বিশেষভাবে দেশের বিপুল বিত্তহীন দরিদ্র সমাজের আর্থিক উন্নতি, এ সত্য আজ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি; কিন্তু দেশের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি ব্যতীত এই স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য কিছু নাই। আমাদের ব্রত এই দিক হইতে আজও অনুদ্‌যাপিত রহিয়াছে। ১৫ই আগস্ট আমরা প্রত্যেকে এই ব্রত প্রতিপালনে যেন সংকল্পবদ্ধ হই এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া দেশবাসী প্রত্যেক নরনারীর সেবাব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করি। আমাদের প্রত্যেকের কর্মে, শ্রমে এবং সাধনায় দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হোক এবং জাতির মহান্ ঐতিহ্য মহত্তর হইয়া উঠুক, শ্রীভগবানের নিকট স্বাধীনতা দিবসে আমাদের এই প্রার্থনা।

'কল্যাণময়ী তুমি ধন্য'

॥ সমুদ্রগুপ্ত ॥

পর্বত পরিবেষ্টিত ময়ূরাক্ষী বাঁধের জলাধার। পাহাড়ের কোলে ৩০ বর্গমাইল জুড়ে জল ধরে রাখা হয়েছে

কল্যাণময়ী ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর এ-রূপ দেখে বিস্মিত হতে হয়। সেই বিমুগ্ধ-বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি সেদিন, এই ৩০শে জুলাই, সাঁওতাল পরগণার মসানজোরের বাঁধ দেখে।

স্বাধীনতার অষ্টম বৎসরে পশ্চিম বাংলার পঞ্চবার্ষিকী সর্বোন্নয়ন পরিকল্পনার সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হচ্ছে মসানজোরে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ নির্মাণ সমাপ্তি। এটাও একটা কারণ ত বটেই তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল, যে জন্যে এই ময়ূরাক্ষীর বাঁধ স্বচক্ষে দেখে আসার বাসনা মনের মধ্যে সযত্নে লালন করে এসেছি। ময়ূরাক্ষীকে আমি শৈশবকাল থেকেই চিনি। ঋতুপর্যায়ের সংগে তার রূপ পরিবর্তন দেখেছি, আর দেখেছি এই নদীর খামখেয়ালী মেজাজের সংগে বীরভূমের চাষীদের ভাগ্য কী নিষ্ঠুর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

বীরভূমের প্রতি করুণাময়ী প্রকৃতির এই কৃপণতা কখনই আমার ভাল লাগত না। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি চাষীদের দুর্দশা। লাল কাঁকরের উঁচুনিচু জমি, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আন্দোলিত। আর আছে দিগন্ত-বিস্তৃত কঠিন-রুক্ষ মাটির ডাঙা জমি যার উপর তৃণগুচ্ছও শিকড় গাড়তে পারে না। বৃষ্টি হলেই এলোমেলো জলধারা এঁকেবেঁকে ছুটে চলে, মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে খোয়াইয়ে পরিণত হয়। বর্ষার জল কোনোরকমে আল বেঁধে চাষীরা তিনমাস মাঠে চাষ করে, বাকি নয় মাস ম্যালেরিয়া রোগ-জর্জর দেহ নিয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকে। বীরভূমের চাষীদের দুঃখের দিনের অবসানের সূচনা করল এই ময়ূরাক্ষীর বাঁধ।

ময়ূরাক্ষীর উৎসস্থল দেওঘরের ত্রিকূট পর্বতের চূড়া। সেখানকার শৈল-শিখরের স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরনার জল দুমকার পর্বতশ্রেণী পরিক্রম করে বীরভূমের লাল মাটিতে এসে রক্তাম্বরী রূপ ধারণ করেছে। বর্ষায় ময়ূরাক্ষীর পট্টবস্ত্রধারিণী প্রলয়ংকরী ভৈরবী রূপ, শীতে শীর্ণদেহা তপস্বিনী উমা ঝিরি-ঝিরি শব্দে একই জপমন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে ক্ষীণপ্রায় প্রাণটুকু নিয়ে যেন বয়ে চলেছে। এই ময়ূরাক্ষীরই আরেক রূপ, চির কল্যাণময়ী রূপ দেখে সেদিন বীরভূম জেলা-বোর্ডের একজন বৃদ্ধ মুসলমান সদস্য সেই বাঁধের পরে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন— 'ময়ূরাক্ষীর এই রূপ জীবনে দেখে যেতে পারব স্বপ্নেও ভাবিনি।

বাঁধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। পশ্চিমদিকে পাহাড় বেষ্টিত সুদূরপ্রসারী জলধারা অস্তগামী সূর্যের আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে। পূবে সেই বিরাট বাঁধের একটিমাত্র কপাট দিয়ে সেই জল ময়ূরাক্ষীর বুকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নানা আকারের পাথরের উপর দিয়ে সেই লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে-চলা জল-স্রোতের দিকে
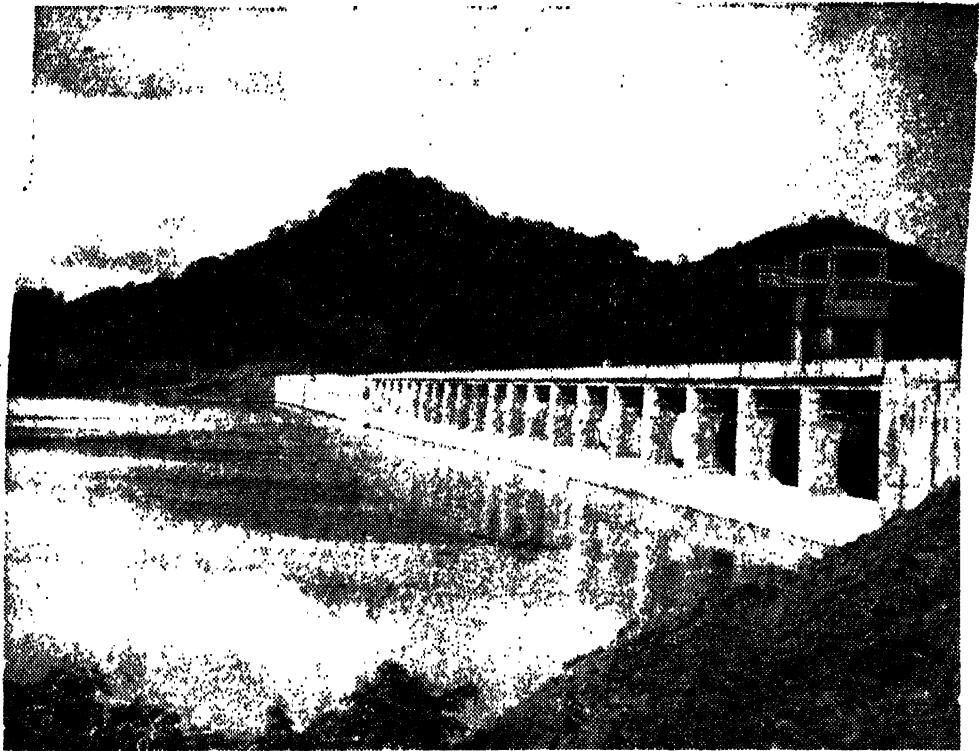
দু'পাশে দুই পাহাড় মাঝখানে ২৫৫ ফুট দীর্ঘ বাঁধ দিয়ে ময়ূরাক্ষীর জল বেঁধে রাখা হয়েছে

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধ আবার বললেন—'কত দুঃখের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে এই ময়ূরাক্ষীর জলের তলায় ঐ পাথরগুলির মত। আষাঢ় মাসে হাল গরু নিয়ে মাঠে গিয়ে দিনের পর দিন বসে আছি, বৃষ্টি নাই, বৃষ্টি নাই। আল্লার কাছে কত দোহাই পেড়েছি, ফল হল না। ফসলের অভাবে আকাল দেখা দিল।'

বৃদ্ধ থামলেন। চোখ দুটি মুছে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন জল-ধারার দিকে। অনুমান করলাম আর পাঁচজন চাষীর মত কোনো বড় ক্ষতি তাঁরও সংসারে ঘটে গিয়েছে সে-বারের দুর্ভিক্ষে। আজকের এই আনন্দের দিনে সেই দুঃখের কাহিনী হয়তো আর উত্থাপন করতে চান না। আমিও আর প্রশ্ন না করে চুপ করেই আছি।

একটু পরে তিনি নিজেই আবার বলে চললেন—'কিন্তু যে-বছর বৃষ্টির ঢল নামে সে-বছরও কি চাষীদের দুঃখের অন্ত আছে? সবে ধানের চারা গাছগুলিতে শীষ দেখা দিয়েছে, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ময়ূরাক্ষীর দুকূল উপচে জল ঢুকে পড়লো ক্ষেত-খামারে, দু'পাশের গ্রামের ভিটে পর্যন্ত জলে থৈ থৈ। সাতদিন পর সে জল যখন নামল ধানগাছের গোড়া গিয়েছে পচে।'

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। পাহাড়ের গায়ে আষাঢ়ের ঘনকৃষ্ণ মেঘ জমাট বেঁধে আছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে। বৃদ্ধ ও তাঁর দলবল বিদায় নিলেন, এখুনি তাঁদের সিউড়ি যেতে হবে, তা না হলে ট্রেন ধরা যাবে না।

সেই নিস্তব্ধ নির্জন বাঁধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধের কথাই ভাবছিলাম। জীবনের সায়াহ্নে এসে সে তার ভবিষ্যৎ বংশীয়ের জন্য নিশ্চিন্ততার পরিতৃপ্তি নিয়েই ফিরে গেল। গ্রামে ফিরে গিয়ে যখন সে তার নাতি-নাতনীদের কাছে কল্যাণময়ী ময়ূরাক্ষীর বর্ণনা দেবে তখন বীরভূমের রুক্ষ কঠোর ধরিত্রীর একযুগ পরের ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা ছবিটি তার চোখে ভেসে উঠবে। বৃদ্ধের সেই স্বপ্ন বিহ্বল দৃষ্টি এখান থেকেও যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

ঘন অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ের গা বেয়ে বাঁধানো শড়ক উঠে গেছে উপরের দিকে। সেই পথ ধরে ধীরে ধীরে চলেছি নব-নির্মিত ময়ূরাক্ষী ভবনের দিকে—সেখানেই আমাদের রাত্রিবাসের

জন। সিউড়ি থেকে জেলা স্ট্রেট ও ময়ূরাক্ষীর অ্যাডমিনি- শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছেন। সংগে এসেছেন ডক্টর পি কে ইউনাইটেড নেশনের খাদ্য ও কৃষি ক গবেষণাকার্যে ইনি নিযুক্ত। নগরেই এ'কে থাকতে হয়; ল্যান্ড ও আমেরিকা ঘুরে ভারতের উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিন্ন কাজ দেখ্‌বার জন্যে এসেছেন, াবার তাঁকে রোমেই ফিরে যেতে হবে' পাহাড়ের যে অংশ জলাধারের পর ঝুঁকে এসে পড়েছে তারই উপর তলা বাড়ি ময়ূরাক্ষীভবন, যে- কানো টুরিস্টের কাছে এটি একটি বর্গরাজ্য। তিনদিক জলে পরিবৃত এই ভবনের বারান্দায় বসে গল্পগুজব লেছে, শুক্লপক্ষের অস্পষ্ট চাঁদের মালোয় বহুদূরবিস্তৃত পাহাড়-ঘেরা জলাধারের মধ্যে গাছগাছালিভরা ছোট ছাটো দ্বীপ মোহনীয় পরিবেশ রচনা রেছে। আসরে উপস্থিত রয়েছেন ময়ূরাক্ষী বাঁধের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র মিঃ চ্যাটার্জি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বয়সে খুবই তরুণ, চশমার আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি উজ্জ্বল চোখে ব্যক্তিত্ব স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। রঘুনাথবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন —'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বাঁধ নির্মাণ কাজ ১৯৫৫ সালে সমাপ্ত করার কথা ছিল; ঠিক সময়েই তা সমাপ্ত হয়েছে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব চ্যাটার্জির ও কয়েকজন উৎসাহী কর্মঠ তরুণ বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের। কোনো বিদেশী টেক্‌নিশিয়ন বা ইঞ্জিনীয়ারের সাহায্য না নিয়েই এ'রা নিখুঁতভাবে এ'দের কাজ সম্পাদন করেছেন।' চ্যাটার্জি নতমস্তকে নীরবে বসেছিলেন। ভাল লাগল ভাবতে যে, বাঙালী ছেলেরাও সুযোগ পেলে মহৎ কাজ ও মহৎ কাজ আজও করতে পারে। এই অরণ্যসংকুল পাহাড়ে বহু কৃচ্ছ্র-সাধন ও বিপদ বরণ করে যে-কীর্তি এ'রা আজ রচনা করে গেলেন আধুনিক- যুগে বাঙালীর কাছে এ-স্থান তীর্থ- ক্ষেত্রের সামিল, অন্তত আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র দর্শনের পুণ্য অর্জনের চেয়ে কোনো অংশে কম ব'লে মনে হল না।

নির্মীয়মান বাঁধের দৃশ্য

কথা হচ্ছিল সেই সব কুলী-কামিনদের সম্বন্ধে যারা জঙ্গল পরিষ্কার ক'রেছে, পথ তৈরী করেছে, মাটি কেটেছে, পাথর বয়েছে আর ১৫৫ ফুট উঁচু আর ২০৬৭ ফুট দীর্ঘ বাঁধ সিমেণ্ট কনক্রীট দিয়ে গেঁথে তুলেছে। মিঃ ব্যানার্জি বললেন 'আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার শ্রমিক এই বাঁধের কাজ

করেছে কিন্তু একদিনের জন্যেও শ্রমিকদে নিয়ে কোনো গোলোযোগে পড়ু হয় নি।'

আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন তুললে রাজনৈতিক দলগুলি গোলমাল বাঁধাবা চেষ্টা করেছিল কি না। উত্তরে মি ব্যানার্জি বললেন—'তা আর করে নি তবে তা সম্ভব হয় নি এইজন্যেই যে এই সব বাঙালী ইঞ্জিনীয়াররা শ্রমিকদের দিয়ে কাজও যেমন করিয়ে নিয়েছেন তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা আমোদ-প্রমোদ ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি সমান নজরও তাঁরা রেখেছিলেন। এমন কি রেড্ ক্রসের সাহায্যে একটি হাসপাতালও খোলা হয়েছিল এখানে।'

এর পর মিঃ ব্যানার্জি একে একে ভবিষ্যতে এই জলাধার ও তার চারি-পাশের পাহাড়ের কি চেহারা হবে তার একটি মনোরম বর্ণনা দিয়ে গেলেন। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাংলো তৈরী হবে—ধার দিয়ে চলে যাবে বৈদ্যুতিক ট্রেন। বিদ্যুতের তো আর অভাব হবে না। ঘরে ঘরে ছোটো ছোটো যন্ত্রপাতি বসিয়ে বিদ্যুতের সাহায্যেই কতরকমের কুটীরশিল্প গড়ে উঠবে। আর বিরাট হ্রদের মতো পর্বতবেষ্টিত ৩০ বর্গ-মাইলব্যাপী এই জলাধারে ছোট ছোট পালতোলা নৌকো আর ইয়াট্ ভেসে বেড়াবে। পাহাড়ের গা কেটে মাছ ধরার জায়গা তো থাকবেই হুইল বঁড়শী নিয়ে বসে গেলেই হল। আগামী বছর থেকেই মাছের চাষ এখানে শুরু হয়ে যাবে।

কথায় কথায় রাত নটা বাজলো। বৃদ্ধ সোহনলাল এসে জানালে খাবার তৈরী। খাবার টেবিলে বসেও ময়ূরাক্ষীর আলো-চনাই চলছে। ডাঃ পি কে রায় বললেন এবার বিদেশে ফিরে গিয়ে বেশ গর্বের সংগেই আমাদের দেশের এই সব উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলতে পারব।

আহারান্তে বসবার ঘরে গদি আঁটা নরম সোফায় বসে কফি খেতে খেতে গল্প চলেছে, যথারীতি এবারেও বক্তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রঘুনাথবাবু, আমরা সবাই শ্রোতা। বলছিলেন আশে পাশের পাহাড়ি জংগলে শিকার-কাহিনী। নরখাদক বাঘের উৎপাতে এ অঞ্চলের সাঁওতালেরা কিরকম

বাঁধ নির্মাণ কাজে সাঁওতাল রমণীটির অংশ রয়েছে

বিব্রত হয়েছিল এবং সেই বাঘকে কীভাবে পরে শিকার করা হল তার রোমাঞ্চকর কাহিনী বলে গেলেন রঘুনাথবাবু। শুধু একটা নয় একাধিক। সব শেষে বললেনঃ এখনো যে দু-একটা চিতে বা রয়েল বেঙ্গল আশেপাশের জঙ্গলে নেই তা কে বলতে পারে। ̍

গা ছমছম করে উঠল। রাত তখন বারোটা। চারিদিক নিঃস্তব্ধ নিঝুম। শহরে মানুষ, বাঘ ভালুকের গল্প শুনতেই ভাল। ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে মিঃ ব্যানার্জি উঠে পড়লেন, বললেনঃ এবার আমাকে বিদায় দিন, এই রাত্রেই আমাকে আবার সিউড়ি ফিরে যেতে হবে।

পরদিন সকাল সাতটায় আমাদের বেরোতে হবে পুনর্বাসন ব্যবস্থা দেখবার জন্যে, তাই কালবিলম্ব না ক'রে যে-যার ঘরে শুয়ে পড়লাম। শেষ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল পাখির তীব্র ডাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চেয়ার পেতে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আকাশে হাল্কা সাদা মেঘ দ্রুত ছুটে চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পাহাড় জল গাছপালা শান্ত স্নিগ্ধ আবেশে যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। ওপারের পাহাড়টাকে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট অতিকায় ভাল্লুক হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে জল খাবার জন্য। কতরকমের পাখি উড়ে চলেছে জলের উপর দিয়ে, কত বিচিত্র কণ্ঠের কাকলি।

আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে চুপচাপ একলা বসে আছি, নেশা-ধরানো পরিবেশ। চোখের সামনে জেগে আছে

তিলপাড়া ব্যারাজঃ মসানজোর বাঁধ থেকে জল এই ব্যারাজের জলাধারে এসে জমা হয়। দ্'পাশের বড় খাল বেয়ে প্রয়োজনান্রূপ জল সেচের জন্য ছাড়া হয়

জাপানী ছবির ল্যান্ডস্কেপ। এমন কি কংক্রিটের তৈরী বিরাট বাঁধটাকেও মনে হচ্ছে যেন এই প্রকৃতির শোভার শোভন-সংগত অংশ। মান্ষের তৈরী এই বিরাট বাঁধকেও যেন প্রকৃতি সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনার করে নিয়েছে।

সকাল হতে না হতেই শ্রীয্ত জয়-শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এসে উপস্থিত। তিনিই আমাদের নিয়ে যাবেন যে-সব অঞ্চলে রিক্লেমেশন ও পোস্ট-রিক্লেমেশনের কাজ চলেছে এবং ময়্রাক্ষী বাঁধ ও তিলপাড়া ব্যারাজ নির্মাণের জন্য যাদের উম্বাস্তু হতে হয়েছে তাদের প্নর্বাসনের ব্যবস্থা ঘ্রে দেখাবার জন্যে। দেখলাম অমান্ষিক কাজ করছেন তাঁরা। বিহারের রুক্ষ পাথ্রে মাটি যা কাঁকর আর বালিতে ভর্তি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে তাতে নতুন ধানের চারা রোপন করা হয়েছে। জয়শংকরবাব্ বয়সে তর্ণ কিন্তু অভিজ্ঞ এগ্রিকোনমিস্ট। সংগে রয়েছেন দশ পনেরোজন আরো তর্ণ বয়সের ছেলে। তাঁরাও কৃষিবিদ্যার পাঠ সমাপ্ত করে জংগলের ধারে মাঠ-কোটা বাড়িতে থেকে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মাঠে মাঠে ট্র্যাকটর চালিয়ে চাষের উপ-যোগী জমি তৈরী করছেন। অদম্য উৎসাহ জয়শংকরবাব্র। বললেনঃ বিহার সরকার সাড়ে তিন হাজার একর জমি দিয়ে বলেছে যে সে-জমি চাষবাসের উপ-যোগী করে বিহারী উম্বাস্তুদের বসতের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। তথাস্তু। কিন্তু কী জমি তারা দিয়েছে একবার নিজের চোখেই দেখ্ন। তব্ যদি এক জায়গায় সব জমিটা পেতাম। তা নয়, খাবলা খাবলা, এখানে পঞ্চাশ একর, ওখানে একশ একর। মহ্য়াগাছে ভর্তি জমি কিন্তু গাছ কাটা চলবে না, তাদের কড়া হ্কুম।

সত্যিই অবাক হলাম দেখে যে দিগন্তবিস্তৃত অনাবাদি ফাঁকা জমি পড়ে থাকা সত্ত্বেও খণ্ড খণ্ড জংগ্লে আর খোয়াই জমি চাষের জন্য দেওয়া হয়েছে আর কী অনর্থক সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়ে চলেছে এই কারণে।

জয়শংকরবাব্ বললেনঃ প্রথমে পশ্চিম বাংলা সরকার বিহারী উম্বাস্তুদের জন্যে সিউড়ির কাছে বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান রাজনগরে প্নর্বাসনের সব আয়ো-জন করেছিলেন, কিছ্দিন তারা ছিলও সেখানে। হঠাৎ বিহার সরকার জানালেন যে, বাংলা দেশে ওরা থাকতে নারাজ স্তরাং বিহারের জমিতেই প্নর্বাসনের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। আবার ওখানকার পাট গ্টিয়ে যন্ত্রপাতি ঘাড়ে

করে বিশ মাইল উত্তর-পূবে সরে আসতে হল। যে-কাজ এতদিনে শেষ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারতাম এখন সে-কাজ কোন না আরো তিন বছর লাগবে শেষ করতে।

মাঠে মাঠে আড়াই ঘণ্টা ধরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরবার মতলব আঁটছি, জয়শংকরবাবু নাছোড়বান্দা। নিয়ে চললেন উদ্বাস্তুদের বসতি দেখাতে, তাদের সংগে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে। দুধারে দিকে লাল মাটির রাস্তা চলে গিয়েছে তারি দুপাশে নতুন ঘর উঠেছে সাঁওতাল উদ্বাস্তুদের।

জয়শংকরবাবু বললেনঃ যে ঘরগুলোতে এখন আমরা রয়েছি সেগুলি এই সব সাঁওতালদের জন্যেই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ঐ-সব ঘরে তারা থাকতে চাইলে না; নিজের হাতে নিজেদের সুবিধামত ঘর তৈরী করেই তারা থাকবে। অবশ্য সরঞ্জামপত্র সবই আমরাই ওদের দিচ্ছি।

আরো খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি বাঙালী পরিবারের সংগে দেখা হল, যাদের কারো ছিল তাঁতবোনার ব্যবসা, কারোর বা ঘানি আর কারুর ছিল মুদির দোকান। বৃদ্ধদের চোখে অজানা অনিশ্চিতের আশংকা দেখেছি—সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। বাপ-ঠাকুরদার আমলের ভিটে ছেড়ে যাদের আসতে হয়েছে তাদের মনে বিক্ষোভ না থেকেই পারে না। সব কিছুই ছেড়ে আসতে হয়েছে তাদের। আবার নতুন করে ঘর গড়ে তোলার বয়সও তাদের নেই, সময়ও তারা পাবে না। কিন্তু উপায় কি। হাজার হাজার গ্রামের সর্বাংগীণ মংগলের জন্য দশ বারোটি গ্রামের অধিবাসীদের এ-ত্যাগ স্বীকার করতেই যে হবে।

বেলা বেড়ে চলেছে। এবার আমাদের ফেরার পালা। পুনরায় ময়ূরাক্ষীভবন, বিকেলে আরেকবার বাঁধ ঘুরে দেখে নেওয়া তারপর রাত্রিকালীন আহারান্তে জীপ্‌গাড়িতে ছাব্বিশমাইল অতিক্রম করে সিউড়ি এসে রাত নয়টার ট্রেনে চড়া।

দুপুরের আহারাদি সেরে বিশ্রাম করছি, কয়েকটি তরুণ যুবক এসে উপস্থিত। এরা সবাই বাঁধের কর্মী। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও সাহিত্যচর্চা আর সাহিত্য আলোচনা এরা নিত্যনিয়মিতই করে থাকেন। এ'দের একটি লাইব্রেরীও আছে আর আছে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা, 'ময়ূরাক্ষী' তার নাম। তিনটি সংখ্যা আমার সামনে তুলে ধরলেন। গল্প কবিতা প্রবন্ধ যথারীতি আছে আর দেখলাম এ'দেরই মধ্যে একজনের পাকা হাতের কয়েকটি স্কেচ্, স্থানীয় সাঁওতাল তরুণ-তরুণীর। পাতা উল্‌টে চলেছি, ময়ূরাক্ষী বাঁধ সম্পর্কে একটি ছোট নিবন্ধ চোখে পড়ল। লেখকের নাম বিমলেন্দু দেব। শুনলাম লেখক নিজে ইঞ্জিনীয়র, এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় জলপাইগুড়িতে সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের কাজ নিয়ে চলে গেছেন। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে ময়ূরাক্ষী বাঁধ পরিকল্পনার মোটামুটি পরিচয়টুকু রয়েছে বলে তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নদী উপত্যকা উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ। উহা আমন শস্যের সময় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার ৬,০০,০০০ একর এবং রবিশস্যের সময় ১,২০,০০০ একর জমিতে জল সেচ করিবে। বিহারের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলেও ২৫,০০০ একর জমিতে উক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে আমন শস্যের সময়ে জল সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অঞ্চলের সাধারণ বৃষ্টিপাত গড়পড়তা ৫৫ ইঞ্চি। ধান চাষ করার পক্ষে এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত হইলেও যে যে সময় চাষের জন্য জলের প্রয়োজন তখন হয়ত বৃষ্টি হয়না এবং কোন কোন বৎসর হয়ত খুব কম বৃষ্টিপাত হওয়াতে ফসল নষ্ট হয়। পরিসাংখ্যিক (স্ট্যাটিসটিক্যাল) গণনায় দেখা গিয়াছে যে এই অঞ্চলে প্রতি চার বৎসরে একবার ফসল নষ্ট হয়। ১৯২৭ সালে এই অঞ্চলে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন হইতেই বংগ সরকার এক 'বহু উদ্দেশ্যসাধক' পরিকল্পনার (মাল্টিপারপাস) জন্য কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪১ সালে ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়। ইহাতে জলসেচ ছাড়া আকস্মিক বন্যা রোধ করার ব্যবস্থা এবং ২,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাও আছে। তাহা ছাড়া মৎস্য চাষ ও অবসর বিনোদনের জন্য জলাধারে ভ্রমণের ব্যবস্থাও আছে।

এই পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ মশানজোর বাঁধ ও জলাধার (রিজারভয়ার)। কারণ ইহার কার্যকারিতার উপরেই সমস্ত জলসেচ নির্ভর করিবে। এই কাজ

আরম্ভ হয় ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে। বর্তমানে শতকরা ৯৯ ভাগ 'কাজ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায় যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য সব কাজ ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। এই বাঁধের গভীরতম ভিত্তির সর্বাধিক উচ্চতা ১৫৫ ফুট, দৈর্ঘ্য ২০৬৭ ফুট। তন্মধ্যে ৭৪০ ফুট জায়গায় অতিরিক্ত জলনিকাশের (স্পিল্‌ওয়ে) ব্যবস্থা থাকিবে। এই বাঁধের জলে জলাধারে ৩৯৮ সমতল পর্যন্ত জল দাঁড়াইবে। এই জল প্রায় ৩০ বর্গমাইল স্থানে ব্যপ্ত হইবে। মোট সঞ্চিত জলের পরিমাণ হইবে প্রায় ৬০০,০০০ একর ফুট। ৩৮৩ সমতলে ৩০´×১৫´ মাপের ২১টি অতিরিক্ত জল নিষ্কাশক ফটক (স্পিল্‌ওয়ে রেডিয়াল গেট্) থাকিবে। সেচের জল সরবরাহ করার জন্য ৬টি ৮´—৬´´×৪´—৬´´ মাপের কপাট (স্লুইস্) আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জল সরবরাহের জন্য ২টি ৬ ফুট ব্যসযুক্ত নালী আছে।

অবরোধক বাঁধের শীর্ষদেশ ৪০৮ সমতল। উহার ১৮ ফুট পরিসরের উপর দিয়া একটি রাস্তা থাকিবে।

এখানকার উৎপাদিত বিদ্যুৎ ডি, ভি, সি সরবরাহ লাইনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সিউড়ী, মহম্মদ বাজার, দুমকা প্রভৃতি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবে। এই জলাধার নির্মাণের ফলে প্রায় ১৯০০ পরিবার গৃহচ্যুত হইবে এবং ১০,০০০ একর জমি চাষের অনুপযোগী হইবে। তাহাদের পুনর্বসতির জন্য নিকটস্থ রাণীশ্বর এলাকায় অনেক পতিত জমি যন্ত্র-সাহায্যে আবাদযোগ্য করা হইতেছে। মশানজোর জলাধার হইতে এই সব জমিও সেচের জল পাইবে। বাঁধ, জলাধার, বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র এবং পুনর্বসতির জন্য সর্বসমেত ৫,৪০,৮০,০০০, টাকা ব্যয় হইবে।

জলসেচ ব্যবস্থার জন্য সিউড়ীর সন্নিকটে 'তিলপাড়া'য় একটি বড় বাঁধ (ব্যারাজ) উত্তর সেচ এলাকায় দ্বারকা ও ব্রহ্মাণী নদীর উপর দুটি ছোট বাঁধ (পিক-আপ ব্যারাজ) এবং ফুলিয়া ও ত্রিপিতা নদীর উপর দুইটি পুল সমন্বিত পয়োবাহন (অ্যাকুইডাক্‌ট) আছে। দক্ষিণ এলাকায় বক্রেশ্বর ও কোপাই নদীর উপর দুটি ছোট বাঁধ এবং চন্দ্রভাগার উপর একটি অ্যাকুইডাক্‌ট আছে।

...টি বড় খালের দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইল এবং ...খালের দৈর্ঘ্য ১০১০ মাইল। সর্বসমেত ...২০০ ক্যানাল স্ট্রাক্‌চারস্‌ আছে। ... সালের প্রথম তিলপাড়া এবং দক্ষিণ ...র খাল খননের কার্য আরম্ভ হয়। সকল ... সম্পূর্ণ হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ...। সেচ কর একর প্রতি সাড়ে ... টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। এই সেচের ফলে জমির উৎপাদনশক্তি প্রায় এক কোটি মণ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহার ফলে রাষ্ট্রের আর্থিক আয় প্রায় ৪ কোটি টাকা বর্ধিত হইবে। বাঁধ (ব্যারাজ) এবং খালের সমুদয় কাজ শেষ করিতে প্রায় ১০,৭০,০০০্‌ ব্যয় হইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার সুফল চারিদিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং কঠোর শ্রমে দেশ এবং জাতি সামগ্রিক কল্যাণ এবং ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। দীর্ঘ পরাধীনতাজনিত তামসিক জড়তা কাটাইয়া অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষতা অর্জনের সাধনায় এই সবল পদক্ষেপ সকল দিক দিয়া জয়যুক্ত হউক, ইহাই কামনা।

চক্রদত্ত

প্ল্যাস্‌টিক আজ নিত্য প্রয়োজনীয় ...। এই প্ল্যাস্টিক তৈরীর জন্য ...লিস্টাইরিনের গুড়োর প্রয়োজন। এই ...চা মাল এতদিন বিদেশ থেকে ...আমদানী করে আমাদের দেশে প্ল্যাস্টিকের ...জিনিস তৈরী করা হোত। বর্তমানে ...ভারতবর্ষে এই পলিস্টাইরিন গুঁড়ো ...তৈরী করবার জন্য একটা কল বসান ...হচ্ছে। আমেরিকার একটি কোম্পানী ...এখানকার এক দেশী কোম্পানীর সঙ্গে ...সহযোগিতা করে এই কারখানাটি ...খুলছেন। এর জন্য বিদেশী কোম্পানীটি ...মূলধনের শতকরা ২৫ ভাগ টাকা দেবে ...আর তাছাড়া এখানে কাজ করবার জন্য তারা অনেক অভিজ্ঞ লোক পাঠাবেন। এই কারখানাটি এসিয়াতে প্রথম পলিস্টাইরিন উৎপাদনের কারখানা বলা যায়। কারখানাটির কাজ খুব শীঘ্র আরম্ভ হবে এবং আশা করা যায় যে, একবছর চার মাসের মধ্যে এরা কাঁচা-মাল তৈরী করে বাজারে ছাড়তে পারবেন। প্রথমদিকে এই কারখানা থেকে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ পাউন্ড করে কাঁচা মাল তৈরী করা যাবে। এর পর আস্তে আস্তে এর উৎপাদন আরো বাড়ান হবে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পলিস্টাইরিনের উৎপাদন বাড়াবার জন্য সরকারের চোখ আছে দেখা যায়। এবং সরকার আশা করেন যে ৪০০০ হাজার টন থেকে ৬,০০০ হাজার টন পলিস্টাইরিন তৈরী করলেও ভারতবর্ষে এর চাহিদা বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে মিটবে না। দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে তৈরী প্ল্যাস্‌টিকের জিনিষ বর্মা, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া এবং আফ্রিকার বাজারে খুব চাহিদা আছে। সাধারনত ভারতবর্ষে চিরুণী, বিভিন্ন মাপের পাত্র এবং খেলনা তৈরী হয়। এ ছাড়াও কিছু পরিমাণে ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ কলের মাকু ইত্যাদিও এখানে তৈরী করা হয়।

*

একটু লক্ষ্য করলেই আমাদের আশেপাশে কত যে ছোট খাট পোকা মাকড় দেখতে পাই তা বলে শেষ করা যায় না। ইচ্ছে হলেও আকৃতি ছোটর জন্য আমরা সেগুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে পারি না। কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদরা এত সহজে এদের রেহাই দেন না। এরা এদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অথবা ভাল অতসী কাঁচের নীচে ফেলে পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করেন। পরীক্ষা করবার সময় সবচেয়ে বড় অসুবিধা দেখা দেয় এদের নড়েচড়ে বেড়ানর দরুন। এই অসুবিধা খুব সাধারণভাবে দূর করা যায়। পোকাটিকে যে কোন পরিস্কার স্বচ্ছ সেলোফিন কাগজের মধ্যে মুড়ে নিয়ে অতসী কাচ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায়। এতে পোকাটি নড়তে চড়তে পারে না, অথচ জীবন্ত অবস্থায় পরীক্ষক উল্টেপাল্টে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

*

টোম্যাটো থেকে এক নতুন অ্যাণ্টিবাওটিকস্‌ পাওয়া যাচ্ছে। দেখা গেছে যে এই নতুন অ্যাণ্টিবাওটিক্‌স মানুষ, পশু এবং গাছপালার অনেক রোগ সারাতে সাহায্য করছে। ১৮২০ সাল পর্যন্ত টোম্যাটোকে বিষাক্ত ফল বলে ধরা হোত, আর আজ টোম্যাটো পৃথিবীর সব্জীর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে টোম্যাটো গাছের ডাল এবং পাতা থেকে এক ধরনের অ্যাণ্টিবাওটিক আলাদা করলেন। তার পরে দেখা গেল এই নতুন এ্যাণ্টিবাওটিক ফিউজেরিয়াম নামক এক ধরনের ছত্রকের বৃদ্ধি বন্ধ করতে সাহায্য করে। এই ছত্রকে টোম্যাটো গাছে এক ধরনের রোগ হতে সাহায্য করে যার ফলে গাছগুলো কুঁকড়ে গিয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। এই অ্যাণ্টিবাওটিকের নাম দেওয়া হয় টোম্যাটাইন অথবা টোম্যাটিন। বৈজ্ঞানিকরা এটা আবিষ্কার করবার পর এই টোম্যাটিন দিয়ে টোম্যাটো গাছের ছত্রক রোগ প্রতিরোধের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। পরে দেখা গেল যে এই টোম্যাটিন যে শুধু গাছের ছত্রক প্রতিরোধ করছে তা নয়—মানুষের এবং পশুর শরীরের কোন কোন ছত্রকের বৃদ্ধি বন্ধ করতে সাহায্য করে। তখন এই টোম্যাটিন থেকে বিভিন্ন চর্মরোগের এবং শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের কঠিন রোগের জন্য বাণিজ্যিকভাবে ঔষধ তৈরী করা আরম্ভ হোল। এর থেকে যে ওষুধগুলো তৈরী করা হচ্ছে সেগুলোর কোনরকম গন্ধ নেই এবং প্রদাহজনক নয়। আরো গবেষণা করতে করতে এই টোম্যাটিন থেকে আর একটি নতুন বস্তু পাওয়া গেল যার নাম টোম্যাটিডিন। আর টোম্যাটিডিন থেকে কোরটিজোন পাওয়া যায় দেখা গেল। কোরটিজোন বিভিন্ন ধরনের গেঁটে বাতের এক মহৌষধ। এ ছাড়াও টোম্যাটিডিনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় স্টেরোলস্‌ পাওয়া যাচ্ছে। আশার কথা যে এই সব বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরীর জন্যে কাঁচা মালের কোনদিনই অভাব হবে না।

ট্রামে-বাসে

মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ কুমারী মেয়েদের দুইটি ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—একটি হইল বিবাহ, অন্যটি রন্ধন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা শ্রীপ্রকাশজীর পরামর্শ সমর্থন করি। কিন্তু মুশকিল এই যে, বিয়ের

ব্যাপারে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা নৃত্যগীত পটীয়সী"—কুমারীর চাহিদা'ই দেখি বেশি। তারপর আছে—পণের প্রশ্ন নেই, তবে যৌতুক সাধ্যমত। তারপরেও আছে—যৌতুক প্রদানে অপারগ হলে পাত্রের উচ্চশিক্ষার্থ বিলেত গমনের অন্তত রাহা খরচ। বরের সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রশ্নটা অবশ্য উহ্যই থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে ওঠ ছুঁড়ি, তোর বিয়ে, বললেই বিয়ে হয় না।

তারপর রান্নার প্রশ্ন। সাধারণ গেরস্থ ঘরের মেয়েরা রান্না বান্না শিখতে আপত্তি সাধারণত করেন না বলেই জানি। কিন্তু কথায় বলে—মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা। রাঁধবেন কি? সংবাদ-পত্রে মাঝে মাঝে যে ধরনের রান্নার খবর পড়ি তাতে দেখা যায়,—একসের মাংস, একপো ঘি, দই একপো, পেঁয়াজ, রশুন, আদা, গরম মশলা......কিন্তু তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। মাংস রান্নার আগেই চোখ ছানাবড়া!!

আর শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের রান্নার পরামর্শটা যদি বড় ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে হয়ে থাকে তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবো, বৃটিশ আমলে আইন সভায় রেলওয়ের বিতর্কে তিনি নিজেই বলেছিলেন—যারা ফার্স্ট ক্লাশে ভ্রমণ করেন তারা হলেন "লেডি, যাঁরা ইণ্টারে যাতায়াত করেন তাঁরা হলেন "ওমেন্" আর থার্ডের মহিলা যাত্রীরা হলেন "জেনেনা"। শ্রীপ্রকাশজীর সে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আশা করি। আর তিনি নিশ্চয়ই জানেন রান্নাবান্নার কাজটা জেনানারাই করেন, লেডীস্‌রা ন'ন।"

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, প্যারিসে নাকি নিরামিষ ভোজীদের একটি কনফারেন্স হইবে।—"অথচ নিরামিষ-ভোজীর সংখ্যার বিচারে কনফারেন্সটা হওয়া উচিত ছিল এখানে, এই পশ্চিম-বঙ্গে। বিশ্বাস না হলে, আমাদের মৎস্য দপ্তরে খোঁজ নিতে পারেন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

অন্ধ্রের সহকারী মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সেই রাজ্যের জন্য এখন হইতে আর মহিলা পুলিস সংগ্রহ করা হইবে না। কারণ স্বরূপ মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, মহিলা পুলিসদের নিরাপত্তার জন্য আবার পুরুষ পুলিস মোতায়েন করিতে হয়।—"কিন্তু মহিলা পুলিসকে রক্ষা করতে গিয়ে পুরুষ পুলিস সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকেন, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে কি? গিয়ে থাকলে বলতে হবে—অন্ধ্রে পুলিসগুলি শুধু পুলিস"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

শুনিলাম রাশ্যা এবং আমেরিকা দুইজনেই নাকি পৃথিবীর একটি নূতন উপগ্রহ নির্মাণ করিবেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আশঙ্কার কথা; আমরা ভেবেছিলাম Summit আলোচনার পর গ্রহ দোষ কেটে যাবে"।

* * *

প্রসংগত আমেরিকার নূতন চন্দ্র-লোক নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও শুনিলাম।—"কিন্তু আমরা জেনে এসেছি এক চন্দ্রই তমো হরণের পক্ষে যথেষ্ট এবং চন্দ্রাহত হওয়ার পক্ষেও চাঁদের আর সুগ্রীব দোসরের প্রয়োজন নেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সত্য

হরপ্রসাদ মিত্র

তারপরে একদিন পরীদের দিকে চেয়ে বললুম
তোমরা এবার এসো, উঠে এসো আরো উঁচু ঘরে;
নিচে বড়ো ঝঞ্ঝাট, ওখানে কেবলই ভিড় থাকে,
কেবলি পেয়াদা এসে শমনের বাহানা লাগায়;
আমি আছি ভিন্-হাওয়া-শিহরিত তুঙ্গ-পথিক
যেখানে পূর্ণ চাঁদ খুবই কাছে, হয়তো হাতেই!

পরীরা এসেছে উঠে
রাঙা, চাঁপা, খয়েরী, সবুজ।
কানে কী লেগেছে মিঠে
তালে তালে বেজেছে নূপুর।
হাওয়া দিলো কী আরাম!
পরী দিলো বাসনা গভীর!

বাসনাকে দেখে-দেখে কী যে উঠেছিলো জেগে
এই বুকে জেগেছে সে তারপর।
তা দেখে সবাই গেল! প্রেমে কাঁটা ঈর্ষা।
প্রেম ভারি হিংস্র ও বর্বর!
রাঙা চাঁপা খয়েরীরা,—সবুজ, সোনালী হীরা
ছিলো সবই সেই মীনাবাজারে।
কারণ, সবাই তারা বাসনারই মণিমালা—
তারাই দিয়েছে আলো আঁধারে।

নিভেছে সে রূপ। ফের জীবনের নানা গত সত্যে—
পুন পুন গতাগতি স্মৃতির শোচনা করে তীক্ষ্ণ।
কে নব জন্ম নেবে? কে দেবে নতুন চোখ দেখবার?
কে দেবে সরিয়ে এই নিজেরই অহংময় বিঘ্ন?

এই তো অহর্নিশ শিরদাঁড়া কুরে বিষ
দিয়েছে বিষিয়ে সুখী স্বত্ব
হেনকালে ম্লান হেসে শুচি সেবিকার বেশে
কপালে রেখেছে হাত—সত্ত্ব!

তারপরে দেখি এক অপূর্ব ছায়া-মায়া-আলো-অবতমসার মধ্যে
চলেছে নিরঙ্কুশ—
সে যেন নিখিল-রূপ!
সে কি প্রেম?
সে কি নির্লিপ্ত?

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনার কাঠামো

সুশীল দে

আগামী মার্চ মাসে আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার নক্শা তৈরি করার কাজ অনেকদিন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি এই নিয়ে অনেক মতামতের প্রচার হচ্ছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি কি হবে তাই নিয়ে ঘোর বিতর্ক চলছে; যাঁরা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন তাঁরা নিশ্চয় একথা জানেন। এই পরিকল্পনার মারফত আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পত্তন হবে। প্রথম পরিকল্পনাতেই তার সূচনা হয়েছে সত্য, কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে আগে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তা ছাড়া, গতবারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কি কাজ হাতে নেওয়া হবে সে বিষয়ে নতুন ক'রে ভাববার অবকাশও ছিল কম। স্বাধীনতালাভ ও দেশবিভাগের আগে থেকেই অনেকগুলো গঠনমূলক কাজের সূত্রপাত হয়েছিল, সেগুলোকে চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। শুধু নতুন পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে স্কীম-বিশেষের কিছু এদিক ওদিক অদল-বদল করা গেছে। আবার ঘটনার চাপে কিছু নতুন স্কীমেরও যোগ হয়েছে। আমাদের প্রথম প্ল্যানের চেহারায় তাই অনেকখানি জোড়াতালির ছাপ পড়েছে।

ইতিহাসে কোনদিনই সম্পূর্ণ সাদা পাতার উপর ইচ্ছামত পুরোপুরি নতুন ক'রে নক্শা আঁকার অধিকার কারুর নেই। প্রথম পরিকল্পনার অনেক অসম্পূর্ণ কাজের জের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও এসে পড়তে বাধ্য। কিন্তু সেগুলো শেষ করতে পারলেই তো আমাদের কর্তব্য ফুরবে না, সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন প্রচেষ্টার প্রবর্তন করতে হবে নিশ্চয়ই। দেখতে হবে, যাতে এই নতুন ও পুরানোর সমাবেশ করতে গিয়ে কোথাও অসঙ্গতি না ঘটে, বেখাপ্পা হয়ে না দাঁড়ায়। তার জন্য পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চেতনা থাকা দরকার। সমাজ-উন্নয়ন বাইরে থেকে আরোপ করার প্রয়াস নয়, এর একমাত্র অর্থ নিহিত প্রাণশক্তির ক্রমবিকাশ। এই ক্রমবিকাশ তার নিজের নিয়মে চলে, আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের পরিকল্পনার জায়গা তা হ'লে কোথায়? এর একমাত্র সার্থকতা হ'ল আত্মস্ফূর্তির প্রয়োজন বুঝে বাড়ার ও এগিয়ে যাওয়ার পথ সজ্ঞানে সুগম ক'রে দেওয়া। অর্থাৎ আমরা, যারা প্ল্যান তৈরি ও তার পরিচালনা করি, তাদের মনে এ অহঙ্কার থাকা উচিত নয় যে, আমরা এগিয়ে যাবার শক্তি সৃষ্টি করছি; আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু পথের বাধা দূর করতে সাহায্য করা। তার জন্য সর্বপ্রথম উপলব্ধি করা দরকার যে, মানুষের বিকাশ জীব-জগতের নিয়ম মেনে চলে, প্রাণহীন যন্ত্রের মতো নিয়ন্ত্রণ করার জিনিস তা নয়।

জৈবিক বিকাশের ধর্ম বহুমুখী। বাড়বার প্রয়াস শুধু একদিকে নয়, এক সঙ্গে সবদিক দিয়ে বিকাশের পথ খোঁজে। আবার প্রত্যেক দিকের বৃদ্ধি অন্য সবদিকের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলে। আমাদের পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য এই পূর্ণ বিকাশের পথ সহজ ক'রে দেওয়া। আর্থিক উন্নতি তার একটা দিক মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে কায়িক ও মানসিক বিকাশের পথও প্রশস্ত করা চাই। যেসব দেশ একটা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় পৌঁছে গেছে, তাদের পক্ষে এই বহুধা বিকাশের খোরাক সংগ্রহ করার জন্য সজ্ঞান প্রচেষ্টার তত প্রয়োজন হয় না। সেসব সমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থনীতি-ঘেঁষা হওয়া বিচিত্র নয়, আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই অন্যদিকও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আমরা প'ড়ে আছি অনেক তলায়। বহুযুগের বিপর্যয়ের ফলে সবদিকের বাড়বার ক্ষমতাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এ অবস্থায় আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ ক'রে সর্বাঙ্গীণ ও সর্বমুখী হওয়া দরকার। আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই হীনবল, নিজের জোরে বাড়বার খোরাক জুটিয়ে নেবার সামর্থ্য তাদের আছে ব'লে ভরসা করা চলে না। তাই এ কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে হবে যে, আমাদের অবস্থায় বিশেষ ক'রে যুগপৎ সর্বদিক দিয়ে স্ফুরণের পথ খুলে দেওয়া চাই। আমাদের পক্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথার্থ স্বরূপ হবে তাই।

আমরা খুবই গরিব। তাই জানি, ধনোৎপাদনের জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় কি? পুঁজি বাড়িয়ে, সেই পুঁজি কলকবজায় রূপান্তরিত ক'রে, শ্রমশক্তিকে

বেশি ক'রে ফলপ্রসূ করা। পুঁজি বাড়ানো যায় কি ক'রে? বর্তমানে যেটুকু সম্বল আছে, আপাতভোগে তা সবটুকু ব্যয় না ক'রে তা থেকে বাঁচিয়ে সঞ্চয় করলেই পুঁজি বাড়ানো সম্ভব। আবার বলি, আমরা নিতান্ত গরিব, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সম্বল যৎকিঞ্চিৎ। কোনরকমে প্রাণধারণের জন্য তা খরচ হয়ে যায়। শরীর ও মনের বিকাশের জন্য যেটুকু না করলে নয় তার সংগতিও আমাদের অতি সামান্য। এই অবস্থায় নতুন সঞ্চয়ের অবকাশ আমাদের কতটুকু?

এই দোটানার কথা মনে রেখে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী স্থির করতে হবে। একদিকের প্রবল আকর্ষণ, বহুমূলধনসাপেক্ষ, আধুনিক পদ্ধতিতে বড় বড় বুনিয়াদী শিল্পের গোড়াপত্তন করার—তার জন্য চাই বেশি ক'রে খনিজ পদার্থের আহরণ, লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ম, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেণ্ট প্রভৃতি উৎপাদনের বহুগুণ প্রসার, যেসব ভারি ও জটিল যন্ত্রের সাহায্যে কলকবজা তৈরি হয়, সেইসব যন্ত্র নির্মাণের জন্য নতুন কারখানা স্থাপন। অন্যদিকে খাবার, পরবার, থাকবার, সব-রকমে একটু ভাল ক'রে বাঁচবার নির্মম তাগিদ। প্রশ্ন ওঠে, জীবনযাত্রার মান বাড়াবার জন্যই কি ভারি শিল্পের প্রবর্তন চাই না? যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে বড় ক'রে কারবার যদি ফাঁদি, তবেই জীবন-যাত্রা নির্বাহের নিত্যব্যবহার্য খোরাকি মাল বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। একথা সত্য। কিন্তু মূলধন খাটানোর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহারের উপযোগী মাল পাওয়া যায় না। খনি থেকে লোহা তুলে, সেই লোহা গালিয়ে ইস্পাত ক'রে, তাই দিয়ে যন্ত্র গ'ড়ে, নতুন কারখানাবাড়িতে সেই যন্ত্র বসিয়ে, যন্ত্র চালাবার জন্য দক্ষ কারিগর নিয়োগ ক'রে, বেশি ক'রে কাঁচা-মাল এনে সেই যন্ত্রে ঢালা চাই; তবেই ভোগে আসবার মতো তৈরি মালের আমদানি বাড়বে। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ। এ ব্যবস্থা পাকা ক'রে কায়েম করার চেষ্টায় যত গোড়ার দিকে যাবো, যেমন তৈরি বিদেশী যন্ত্রের ওপর নির্ভর না ক'রে যন্ত্রখানাই নিজেরা

াড়তে চাইব, তার জন্যে যে মালমশলা াই, সেসবও নিজেরাই উৎপাদন করতে বৃত্ত হব, তত খোরাকি পাকামাল হাতে আসতে সময় লাগবে বেশি। ইতিমধ্যে যেটুকু সম্পদ বর্তমানে ভোগে আসছে তাতে টান পড়বে, কারণ উপস্থিত ভাণ্ডার থেকে সরিয়ে সঞ্চয় না করলে নতুন মূলধনী শিল্প গড়ব কি দিয়ে? আবার সে শিল্প যত গোড়ার দিকে ঝুঁকবে, অর্থাৎ, যত যন্ত্রনির্মাণ, লোহার কারখানা খনি স্থাপনের কাজে নামব, তত মূলধন, তথা সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানর প্রয়োজন হবে, অর্থাৎ বর্তমান ভোগ্য সম্পদের ওপর টান পড়বে তত বেশি।

এ অবস্থায় বিদেশী মূলধনের সাহায্য নেওয়া যায় না কি? তাতে খানিকটা সাশ্রয় হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু বাইরে থেকে দান বা ঋণের পরিমাণ বেশি হবার সম্ভাবনা নেই। প্রথমত, আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা বাঁচিয়ে চলতে হ'লে বিদেশী ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া সমীচীন নয়। দ্বিতীয়ত, দান বা ঋণ হিসাবে শিল্পসংগঠনের জন্য বিদেশ থেকে যে যন্ত্রপাতি বা মালমশলা পাওয়া যায়, সেগুলো কাজে লাগাতে হ'লে তার সঙ্গে স্বদেশজাত রকমারি সম্পদের সংযোগ করা দরকার। দেখা গেছে, এইসব অনিবার্য দেশী যোগানি মালের দাম বিদেশী আমদানি মালের চেয়ে কম নয়, অনেক ক্ষেত্রে বেশিই। আমাদের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় কানাডা থেকে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করবার একটা যন্ত্র উপহার পেয়েছি, কিন্তু সেটা বসিয়ে চালু করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের তহবিল থেকে খরচ করতে হচ্ছে বিস্তর। বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে যেসব স্কীম করা হয়, তার প্রত্যেকটি হিসাব করার সময় বিদেশী ডলার বা স্টার্লিং বা অন্য যে-কোন মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় টাকার সংস্থান করতে হয়। এই টাকাটা আমাদের নিজেদের সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণ। আমাদের বর্তমান সম্বল সামান্য হওয়ার তাৎপর্য এই যে, বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করার ক্ষমতাও আমাদের পরিমিত। একথা যে কেবল বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যের বেলাই খাটে তা নয়, বিদেশী মূলধনের ব্যক্তিগত আমদানি সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অনটনের কারণে বাইরের সাহায্য উপেক্ষা করা চলে না, ক্ষেত্রবিশেষে সাহায্যলাভে উপকারও পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু নিজস্ব সংগতি অল্প হওয়ার দরুণ গ্রহণের শক্তিও আমাদের বেশি নয়। যে নিঃস্ব, তাকে হাতি উপহারের প্রস্তাব করলে তার উৎফুল্ল না হয়ে বিব্রত বোধ করাই স্বাভাবিক।

তবে কি মূলধন বাড়িয়ে শিল্পপ্রসারের চেষ্টা থেকে নিরস্ত হব? তা হ'লে দারিদ্র্য ঘুচবে কি ক'রে। মূলধন বাড়িয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ ক'রে সম্পদ বৃদ্ধি করা ছাড়া যে আমাদের গতি নেই, একথা সুনিশ্চিত। কিন্তু জীবনযাত্রার মান যাদের এমনিই খুব নিচু, তাদের উপস্থিত ব্যয়সংকোচ ক'রে, সঞ্চয় বাড়িয়ে, তাই দিয়ে নতুন মূলধন সৃষ্টি করার ক্ষমতা খুবই সামান্য। এই কারণে, প্রথম অবস্থায় তাদের কাছে এই সামান্য সঞ্চয়ের বেশি আশা করা অনুচিত। ভবিষ্যতে সম্পদবৃদ্ধির আশায় তারা হয়তো বর্তমানে এইটুকু ব্যয়সঙ্কোচের ক্ষতিস্বীকার করতে পারে, তাও যদি সে ভবিষ্যৎ খুব সুদূরপরাহত না হয়। অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত সম্পদ যদি এমনসব শিল্পে লাগানর প্রস্তাব করা হয়, যা থেকে ভোগের উপযুক্ত ফল পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে, তা হ'লে তাদের পক্ষে ধৈর্য অবলম্বন করা হয়ে উঠবে কঠিন, সঞ্চয় করতে তারা হবে অনিচ্ছুক। তখন সরকার থেকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হ'তে পারে, নতুন নতুন কর হয়তো বসানো যায়, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে, তাদের আয়ের বাস্তব মূল্য কমিয়ে দিয়ে তাদের হাতের বাকি সম্পদ সরকারী কবলে এনে, তাই দিয়ে মূলধন সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু তার ফল হবে কি? সাধারণ মানুষের উৎপাদনের স্পৃহা ক্রমে

যাবে; শরীর ও মনের সাবলীল বিকাশের জন্য যেটুকু আশু ব্যয়ের প্রয়োজন সে সামর্থ্যটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। পরিকল্পনার কাজে গণ-সহযোগের আবেদন হবে মিথ্যা। যে সুদিনের আশায় এই কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্তন, তা যদি বাস্তবিকই কখনও আসে, তবে ভোগ করবার জন্য সেদিন ক'জন মনের কি অবস্থা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনার আরম্ভে নতুন সঞ্চয়ের মাত্রা ও নতুন মূলধনের পরিমাণ অল্প হবে ব'লেই ধ'রে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। আবার সে মূলধন বেশির ভাগই এমনসব শিল্পে নিয়োগ করা উচিত যার ফল পাবার জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। একথা বুঝলে সাধারণ লোকে স্বেচ্ছায় মূলধন সৃষ্টির কাজে সহায়তা করবে, তার জন্য যেটুকু ট্যাক্সবৃদ্ধির প্রয়োজন, তার ভার বইতেও আপত্তি করবে না। এই প্রাথমিক মূলধন প্রয়োগের ফলেই কিছু সম্পদ বাড়বে। তখনই প্রশ্ন উঠবে, এই বাড়তি সম্পদ দিয়ে কি করব? দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নতির মোহে যাঁরা আচ্ছন্ন, তাঁরা সবটাই বাঁচিয়ে নতুন মূলধনে লাগাতে চাইবেন। তখন মনে রাখতে হবে বহুধা বিকাশের প্রয়োজন। মানুষের জন্যেই শিল্পের সৃষ্টি, শিল্পপ্রসারের তাগিদে মানুষ জন্ম নেয় নি। মনুষ্যত্বের সর্বদিক দিয়ে সুসমঞ্জস উন্মেষের জন্য কেবল আর্থিক সমৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়; স্বাস্থ্যোন্নতি, চলাচলের ব্যবস্থা, বাসগৃহ নির্মাণ, মনোবৃত্তির অনুশীলন—এসব কাজেও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। এইসব ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সম্পদের কিছু অংশ দিয়ে সঞ্চয়ের পথ আগের চেয়ে প্রশস্ত করা সংগত। এমনি ক'রে মূলধন ও সম্পদের উত্তরোত্তর চক্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলে দেওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনার রূপায়ণই আমাদের পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে।

আরও একটা আশার কথা আছে। আশু ব্যয়সংকোচই মূলধন সৃষ্টির একমাত্র উপায় নয়। এর চেয়েও বড় একটা উপায় খোলা রয়েছে। যেটুকু মূলধন আমাদের বর্তমানে মজুদ আছে তার সবটাই পুরোমাত্রায় কাজে লাগানো হয় না। নতুন কারখানায় নতুন কল না বসিয়েও বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিতেই বেশি শিফ্‌ট চালিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। যেসব কল আরও বেশি ক'রে চালালেও নষ্ট হবার ভয় নেই, বেকার অথচ কার্যক্ষম লোক নিয়োগ ক'রে, সেসব কল থেকে বেশি কাজ আদায় করা যায়। ছোট, বড় সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই খানিকটা উদ্বৃত্ত উৎপাদনশক্তি অকেজো হয়ে প'ড়ে আছে। তার সবচেয়ে বিরাট দৃষ্টান্ত আমাদের গ্রামের ক্ষেতে ও জাতব্যবসায়ীদের কুটিরে। গ্রামের চাষী, মজুর, শিল্পী একেবারে বেকার না হ'লেও প্রায় প্রত্যেকেই আংশিকভাবে বেকার; অর্থাৎ তারা যতটা খাটতে পারে ততটা খাটবার সুযোগ পায় না, বহু সময় নিষ্কর্মা হয়ে ব'সে থাকতে বাধ্য হয়। আবার পল্লী-সমাজের যে বর্তমান মূলধন, যথা—চাষের ক্ষেত, পুকুর, বাগান; বলদ, লাঙল ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র; তাঁতী ছুতোর, কামার, কুমোরের ব্যবসায়ের ছোটখাট যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম—এর কোনটাই ষোল আনা কাজে লাগানো হয় না। নতুন মূলধন না নিয়োগ ক'রেও এইসব আংশিক ব্যবহৃত কাজের উৎপাদনগুলি পুরোদমে চালিয়ে এখনই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তারপর সেই বাড়তি উৎপাদনের খানিকটা বাঁচিয়ে নতুন মূলধন সৃষ্টির কাজ শুরু ক'রে দেওয়া যায়।

পাঁচ মাসের ওপর হ'ল বাঙলাদেশের গ্রামে একাজ শুরু হয়ে গেছে। যাঁরা সে খবর রাখেন না, তাঁদের অবগতির জন্য এই নতুন প্রচেষ্টার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভেবে দেখা যাক, গ্রামবাসীরা তাদের সামান্য মূলধন যে জমি, পুকুর, বাগান ও শিল্পের হাতিয়ার, তা পুরোপুরি খাটিয়ে আরও উৎপাদন করে না কেন? তার কারণ, তারা জানে, আরও বেশি মাল বাজারে আনলে তারা যে দাম পাবে তাতে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। যে দাম জুটবে, তাতে মেহনত পোষাবে তো নয়ই, এমন কি তৈরি করতে যে কাঁচামাল খরচ হয়েছে, হয়তো সে খরচটুকুও উঠবে না। বাজারে সব জিনিসপত্রের দাম ধার্য হয় অল্প মেহনতে

খানায় তৈরি চকচকে মালের মানদণ্ড
। কুমোরের মাটির হাঁড়ির সঙ্গে
খানার অ্যালুমিনিয়মের ডেকচির
াসুজি প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই বটে, কিন্তু
লুমিনিয়ম, এনামেল ও কাঁচের বাসন
ছ ব'লে মাটির বাসন অনেক নিচের
স্তুতে প'ড়ে থাকে, যার একটু সংগতি
ছ সে মুখ তুলে তার দিকে চায় না।
শিল্পের স্থলে পণ্যের চাহিদা সামান্য
াতিপন্ন গ্রামেরই অন্য লোকেব কাছে,
রাও হয় কৃষিজীবী, নয়তো অন্য কোন
শিল্পের কারিগর। এদের প্রত্যেকেরই
াবের অন্ত নেই, সেসব খুব মোটা
নিসেরই অভাব, গ্রামের মধ্যেই যে
ভিন্ন উৎপাদনের উপাদান মন্দাবাজারের
য় অকেজো হয়ে প'ড়ে আছে, তাই
টিয়ে সেসব অভাব মিটিয়ে নেওয়া যায়।
ন তা হয় না, কারণ প্রত্যেকে বাজারের
া ভেবে অল্প ক'রে মাল তৈরি করে।
অবস্থায় যদি প্রত্যেকে অন্যজনের
য়াজনমত যুগপৎ বেশি উৎপাদন করে,
ব তখনই একটা নতুন ঘরোয়া বাজার
ষ্টি হ'তে বাধ্য। দৃশ্যত এটা হবে
নিময়ের বাজার, লোকে তার নিজের
রি মাল দিয়ে অন্যের মাল কিনবে।
ন্তু এ বাজার চালু করতে গেলে হাত
লাবার আগে প্রত্যেকটি পণ্যের সঠিক
ল্য নির্ধারণের দরকার। তা স্বভাবতই
যর হবে অনুরূপ জিনিসের বাইরের
জারে যা চলতি দর, সেই অনুযায়ী।

অবসর সময়ে খাটলে যে উৎপাদন
ড়ানো যায় এটা একটা নতুন আবিষ্কার
। গ্রামের বেকারশক্তিকে কাজে নিয়োগ
রে দেশকে সমৃদ্ধ করার উপদেশ আমরা
রকাল শুনে আসতে অভ্যস্ত। কিন্তু
ান একটি শ্রমিক যদি এককভাবে তার
জের উৎপাদন বাড়ায়, সেই সঙ্গে যদি
র অভাব পূর্ণ করার মতো অন্য
নিসের উৎপাদনও অন্য কেউ না বাড়ায়,
ব বাড়তি খাটার পারিশ্রমিক উদ্যোগী
াকটির জুটবে না, বাজারে সে ঠ'কে
বে। শুধু এই কারণেই আজ অবধি
শনেতাদের উপদেশ কার্যকরী হ'তে
রে নি। পরস্পরের চাহিদা মিটানো
য়, এক সঙ্গে একাধিক এমন জিনিসের
ৎপাদন না বাড়ালে একটিমাত্র জিনিসের
ৎপাদন বৃদ্ধি বজায় রাখা অসম্ভব, এই
সত্যটিই আমাদের নতুন আবিষ্কার।
একথা যে শুধু গ্রামশিল্পের বেলাই খাটে
তা নয়, যে-কোন পণ্য কাটতির সম্বন্ধেই
প্রযোজ্য। বড় কারখানাশিল্পের ক্ষেত্রেও
যদি কোন একটি শিল্পবিশেষ তার
উৎপাদন বাড়িয়ে চলে, অন্যসব শিল্প যদি
তাদেরও উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম না হয়,
তবে শেষ পর্যন্ত প্রথমোক্ত শিল্পটির
অতিবৃদ্ধিজনিত লোকসান হ'তে বাধ্য।
একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে,
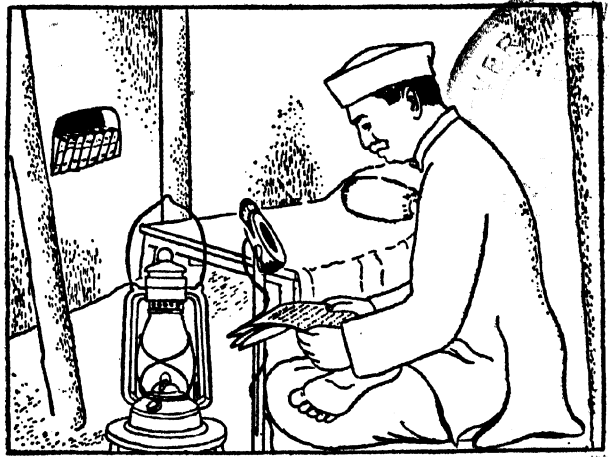
সমতা রেখে বহুধা উৎপাদনের এই সিদ্ধান্ত সমাজ-উন্নয়নের কাজে সুষম বহুধা বিকাশের যে মূলনীতি, তারই একটি বিশেষ রূপ। গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জটিল নয়, তার পরিধিও ছোট, তাই এ সত্য সেখানে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে, সেই সত্যের নির্দেশ মেনে অবচেতন সৃজনক্ষমতার পুনরুজ্জীবনও সম্ভব হয়েছে। গ্রামের শ্রমশক্তি মূলধনের অভাবে অপটু; প্রগতিশীল অর্থজগতের দরবারে তার জায়গা নেই, সে অপাংক্তেয়। অথচ এই অপটু শক্তির তৈরি অবহেলিত পণ্যের প্রসার আগে না ঘটলে সম্পদবৃদ্ধি ক'রে মূলধন সৃষ্টির আরম্ভ হবে কি ক'রে?

আমরা তার উপায় খুঁজে পেয়েছি। এই সভ্যজগতের অপাংক্তেয় অপটু শ্রমিকরা গ্রামের পড়শী, তাদের একত্র করা শক্ত নয়। একবার সজাগ মনে আলোচনা প্রবৃত্ত হ'লেই প্রত্যেকে বুঝতে পারে, তা বাড়তি সময়ের বাড়তি মোটা জিনিসে কদর আছে; শৌখিন পয়সাওয়ালা লোকে কাছে নয়, তারই কপর্দকহীন প্রতিবেশী কাছে। সেই প্রতিবেশীও বেশি থে তুল্যমূল্যের পণ্য বা পরিশ্রম দিয়ে তা জিনিস নিতে রাজী। সব ক্ষেত্রে দামে সমতা ঘটে না, একজনের অন্যের কাছে পাওনা থেকে যায়। যত বেশি কারিগর চাষী আর মজুর এসে এই ব্যবস্থায় যোগ দেয়, যত দিনের পর দিন হিসাবের জে টেনে তারা চলে, ততই দেনাপাওনা কাটাকুটি হয়ে যায়। এই পাঁচ মাসে পশ্চিম বাঙলার পাঁচশ'র বেশি গ্রামে এ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে, দু' হাজারে ওপর গ্রামবাসী ন' হাজার টাকা মূল্যের নতুন সম্পদ সৃষ্টি করেছে। এ সম্পদ কেবল যে তৈরি হয়েছে তা নয়, ক্রেতার অভাবে প'ড়ে থাকে নি, কোনরকমে বিশেষ সাহায্যের প্রত্যাশা রাখে নি, উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্গতি হয়েছে। শুধু তাই নয়। এই ব্যবস্থার মধ্যস্থতায় এমনসব নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর আদানপ্রদান হয়েছে, যা এদের পয়সা দিয়ে কিনতে হ'ত। সে পয়সা তাদের বেঁচে গেছে। তাই দিয়ে তারা তাদের নিজের নিজের শিল্পপ্রসারের জন্য কাঁচামাল ও নতুন যন্ত্রপাতি কিনেছে। এমন ঘটনার খবর প্রত্যহ আসছে। এর তাৎপর্য কি? এতদিনকার প'ড়ে-থাকা অকেজো কার্য-ক্ষমতা ফলপ্রসূ ক'রে, উৎপাদন বাড়িয়ে, তার কিছু অংশ সঞ্চয় ক'রে নতুন মূল-ধন সৃষ্টি হচ্ছে। সেই মূলধন প্রয়োগ ক'রে গ্রামের উৎপাদনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের পথ খুলে গেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা গঠনের প্রসঙ্গে এ বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল কি? আমরা চেয়েছি, আমাদের কাজের মূল সূত্রটি ধরতে। পরিকল্পনা সর্বাঙ্গীণ; অর্থাৎ, মানুষের বিকাশের কোন দিকই তার বিবেচনার বহির্ভূত নয়, সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি স্তর, প্রতি শ্রেণী ও সবরকমের বৃত্তির মধ্যে যাতে নতুন উদ্যমের সঞ্চার হয় তাই আমাদের লক্ষ্য। ক্রমবিকাশের এই বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন নয়, পরস্পর

রিশীল। আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট না ও আমরা জানি যে, প্রাণশক্তির এ খ্য বৈচিত্র্যের আড়ালে এক নিবিড় সূত্র বিদ্যমান। এই যোগসূত্রের ন দরকার। জীবনের নিয়ত গতি- ও বহুরূপী বিকাশের মধ্যে যে দ্য সম্পর্ক আর অখণ্ড রূপের স পাওয়া যায়, তা উপলব্ধির জন্য ন্তর চেষ্টা চাই। আমাদের উদ্দেশ্য স্ফূর্তির সম্ভাবনাকে মনগড়া মোর মধ্যে আটকানো নয়, তার চর্যা করা। সেজন্য নিরহংকার মনে স্বরূপ ও স্বধর্ম আমাদের অনু- নের বিষয়।

হয়তো ভাষার দোষে কথাটা কবিত্বের শোনাচ্ছে। কিন্তু যে অনুশীলনের য়াজন, সেটা আধ্যাত্মিক নয়, নিছক াজবিজ্ঞানের। সেই দৃষ্টি দিয়ে বিচার তে গেলে একটা কথা বোঝা যায়। াদের বর্তমান জীবনের নানা দিকের া স্তরের বহুবিধ বিকাশের আদিম স রয়েছে গ্রামে। সেইখানে বেশির া মানুষের বাস। তারা আমাদের ার যোগায়, কারখানার কাঁচামাল বরাহ করে। এই সম্বল ক'রে শহর- ীর শিল্প বাণিজ্য ও অন্য সবরকমের ত্ত গ'ড়ে উঠেছে। শহরে তৈরি যে ্য, তার কাটতির উত্তরোত্তর প্রসারও ভব গ্রামে। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার াড়া খুঁজতে হয় সেইখানে। সেই ধান করতে গিয়ে সমাজবিকাশের লমন্ত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গ্রাম- বনের অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে, তারই থমিক প্রয়োজনবোধে পূর্ণাঙ্গ সমাজ- গঠনের ভিত রচনা করতে হয়।

সে প্রয়োজন কৃষি ও শিল্পের মধ্য রে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, নির্দোষ পানীয় জলের, স্তাঘাটের, পুষ্টিকর খাদ্যের, মানুষের তো হয়ে বাড়বার সবরকম উপাদানের। ারম্ভে আমাদের সম্বল সামান্য, রাস্তা- াতি সব অভাব মিটবে না। যেটুকু াধ্য তা নানা অভাবের পরস্পরসম্বন্ধ বেচনা ক'রে তাদের প্রতিকারে 'সমপ্রসভাবে' নিয়োগ ক'রে ক্রমোন্নতির াথ খুঁজে নিতে হবে। গ্রামীণ জীবনের র্বাঙ্গীণ উন্নতির ন্যূনতম প্রয়োজন কি, তার মোটামুটি একটা নিশানা পাওয়া যায় পল্লী-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কার্যসূচীর মধ্যে। গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গের ৫,৬৫২ গ্রামে এই কাজের প্রবর্তন ক'রে সুফল পাওয়া গেছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ৬২টি থানার ৯,০০০ গ্রামে এই প্রচেষ্টার প্রসার হবে ব'লে আশা করা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করবার সময় আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাকি ১৮১টি থানার ২৬,০০০ গ্রামের মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের এই আরব্ধ কর্মসূচীর বিস্তার করা। তাই স্থির হয়েছে। তার থেকে আমরা হিসাব পাই, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বছর বছর আমাদের কি করা প্রয়োজন।

শুধু কৃষির উন্নতির কথাই ধরা যাক। তার জন্য নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নত বীজ, নানাপ্রকার সার, যন্ত্রপাতি, সেচব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা চাষীর কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। আরও চাই, এইসব সুবিধা যাতে চাষীরা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে তার জন্য বিচক্ষণ উপদেষ্টা। এইভাবে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও গ্রাম-উন্নয়নের পরি- কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রসদ ও বিশেষজ্ঞের পরিবেশন দরকার। এইসব নিয়ে হ'ল গ্রামের কাজের নানাদিকের টার্গেট বা নির্ধারিত লক্ষ্যনিচয়। কিন্তু যেমন খাবার পরিবেশন করতে হ'লে তার জন্য হিসাব ক'রে রান্নার আয়োজন করতে হয় তেমনি প্রত্যেকটি কাজের এক-একটি সামান্য লক্ষ্যে ঠিকমত পৌঁছতে হ'লে তার পেছনে স্তরে স্তরে সারি সারি ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভাল বীজ দিতে হ'লে উন্নত বীজ উৎপাদনে পৃথক্ ক্ষেত্র চাই, যাতে বিশুদ্ধ বীজের সঙ্গে অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে। কোন্ মাটিতে, কোন্ আবহাওয়ায়, কোন্ জাতের বীজের ফলন বেশি, রোগ হয় কম, তা নিরূপণ করতে গবেষণার ও পরীক্ষার উপযুক্ত সরঞ্জাম চাই। গবেষণার ঘর করতে চুন, সুরকি, ইঁট, কাঠ, সিমেন্ট, লোহা সংগ্রহ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে পারদর্শী লোক নিয়োগ করতে হয়, অনেক সময় শিক্ষা দিয়ে নতুন ক'রে লোক তৈরি

ক'রে নিতে হয়। এমনি ক'রে গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ছোট ছোট কাজও ঠিকভাবে ঠিক সময়ে সম্পাদনের দায় পালন করতে গেলে তার জের টেনে চলতে হয় বহুদূর পর্যন্ত।

এইখানে আর-একটা বিষয় ভাল ক'রে নজর করা দরকার। গ্রামের কাজ সম্পাদনের দায় কেবল গ্রামেই আবদ্ধ থাকে না, তার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন পেশার ঘনিষ্ঠ সংযোগ অনিবার্য। অর্থাৎ, গ্রামমুখী পরিকল্পনার অর্থ গ্রামের বাইরের যে জগৎ তাকে অবহেলা করা নয়। তার অর্থ, সমাজের অন্য সব যায়গায় কার কোন্ কাজের ভার নিতে হবে, গ্রামের কাজের হিসাব ক'রে তার নির্ধারণ করা। গ্রাম-উন্নয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক টার্গেটকে করতে হবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অন্য সব টার্গেটের নিয়ামক। আমরা যে বলি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তলার থেকে গ'ড়ে তুলতে হবে, এই হ'ল তার একমাত্র পদ্ধতি ও উপায়। পরিকল্পনার পুরোপুরি রূপ যখন স্পষ্ট হবে, তখন দেখা যাবে, নানা কাজের লক্ষ্য থাকে থাকে পিরামিডের আকারে মাটি থেকে শিখর অবধি সন্নিবিষ্ট, সমাজের কোনো অংশই কর্তব্যপালনের দায় থেকে মুক্তি পায় নি, সংগে সংগে তার সুফল থেকেও বঞ্চিত হয় নি। একাজে ছোটবড়, গরিব-ধনী, শিক্ষিত-মূর্খ, প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট স্থান আছে। একথা কেবল ব্যক্তি সম্বন্ধেই সত্য নয়, সামাজিক সংস্থা ও শিল্পের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সত্য। গ্রামে কামারশাল উৎকর্ষ করার যে প্রচেষ্টা, তার পিছুটান লোহার খনিতে গিয়ে পেঁছয়। কিন্তু তাই ব'সে কত নতুন খনি খুঁড়ব, ক'টা নতুন লোহার কারখানা গড়ব, তা কামারশাল ও ছোট, বড়, মাঝারি বর্তমানে যত লোহাব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের উপস্থিত ও পরিকল্পিত চাহিদা হিসাব ক'রে করা উচিত। নিচে থেকে উপরে ওঠা, ছোট থেকে বড় গ'ড়ে তোলা প্রকৃতির নিয়ম।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই দৃষ্টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করতে হবে। শুধু তাই দিয়ে পরিকল্পনা সম্পূ[র্ণ হবে] না, কারণ আমাদের কতকগুলি সমস্যার বিশেষ সমাধানের চেষ্টা থেকেই করা দরকার। তার জন্য [...] বুকে বাঁধ নির্মাণ, দুর্গাপুরে কয়লা গ্যাস ও অন্যান্য রাসায়নিক [...] আহরণের ব্যবস্থা, কলকাতার উ[...] নোনা জল থেকে আবাদী ও বাস[...] বহুমূল্য জমির উদ্ধার—এই [...] কয়েকটি বড় স্কীমের কথাও ভাবতে [...] গ্রাম-সংস্কারের কাজে এসব স্কীমে[র] কোন সার্থকতা নেই, তা নয়। মজে[...] গঙ্গার পুনঃপ্রবাহ সারা দেশকে সঞ্জী[বিত] করবে। গ্রামের উন্নতি সাধনই যে [...] কাজ তা ঠিক; কিন্তু তা থেকে যে [...] সম্পদের সৃষ্টি হবে তার সুফল শহ[...] জীবনে পেঁছতে সময় লাগবে। ইতি[...] মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা ভয়[...] হয়ে উঠেছে, তার অচিরে উপশ[ম] প্রয়োজন। বাড়ির ভিত শক্ত করা দর[কার] আছে ব'লে আপাতত জীর্ণ ছা[...] সংস্কার স্থগিত রাখা সমীচীন [...] ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির প্রয়াস করতে হ[...] বর্তমানে প্রাণরক্ষা হওয়া চাই। [...] গেছে, গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্[পনা] প্রবর্তনের সংগে সংগেই অন্যসব ক্ষে[ত্রে] সেই পরিকল্পনার সহায়তার জন্য [...] নতুন কাজের উদ্ভব হবে। কি[...] উপস্থিত সঙ্কটমোচনের জন্য তা য[...] হবে কিনা সন্দেহ। তাই এমন আ[...] কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ [...] প্রয়োজন, যা থেকে সম্পূর্ণ ফল পে[...] বিলম্ব হ'লেও বর্তমান কষ্ট কিছু লা[ঘব] হওয়া সম্ভব। গ্রাম-উন্নয়নের মূল কা[...] যাতে শহরবাসীর অসহিষ্ণুতা [...] বিক্ষেপের ফলে বিঘ্নের সৃষ্টি না [...] সে বিষয়েও সতর্ক হওয়া বিধেয়।

এইসব কথা বিবেচনা ক'রে দ্বিত[ীয়] পরিকল্পনা সংগঠনের কাজ এগি[য়ে] চলেছে। সে কাজ শুধু সরকারের এ[কার] নয়, দেশবাসীর সকলের। তার [...] পরিকল্পনা গঠন সম্পর্কে সব প্রশ্ন স[...] সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত আলো[চিত] হওয়া উচিত। আশা করা যায়, এ প্র[...] সেই কাজে সাহায্য করবে।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

॥ তিন ॥

কাল পরিণয়' ছবির আর একদিনের আউট-ডোর শ্যুটিং-এর কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দৃশ্যটা হ'ল, সারাদিন চাকরির চেষ্টায় এ-আফিস সে-আফিস ঘুরে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বাড়িতে এসে শুনি, আমার স্ত্রী-পুত্রকে ধনী শ্বশুর একরকম জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তখনই হে'টে চললাম শ্বশুর বাড়ি। শেয়ালদার মোড় থেকে সোজা পশ্চিম মুখো হ্যারিসন রোড ধরে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত ঐভাবে জোরে হে'টে যেতে হবে।

মুখার্জি বলে দিলে—'তুমি কোনদিক না চেয়ে সোজা ভিড় ঠেলে ডান দিকের ফুটপাথ বেয়ে চলে যাবে, আমরা গাড়ির মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথের গা ঘে'ষে তোমায় ফলো করে যাবো। কেউ জানতেই পারবে না যে, ছবি তোলা হচ্ছে।'

সেদিনের পিঠের ব্যথাটা তখনও মিলিয়ে যায়নি বললাম—'মুখুজ্জো—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্জ্যে বললে—'সেদিনকার দৃশ্য আর আজকের দৃশ্যে অনেক তফাৎ। সেদিনকার দৃশ্যটা তোলায় বিপদ ছিল। আজ শুধু ভিড় ঠেলে রেগে জোরে জোরে হে'টে যাওয়া।'

অগত্যা তাই ঠিক হল। একে ঐ রকম পাগলের মত পোশাক পরিচ্ছদ তায় উপর রেগেছি। দুহাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি, দু' একজন বিরক্ত হয়ে বেশ শক্ত দু'চার কথা শুনিয়েও দিলে। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু সামনে এগিয়ে চলা।

আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হতেই কানে এল—'কে? ধীরাজ না?'

মনে মনে প্রমাদ গণলাম। কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এবার বেশ কাছ থেকেই প্রশ্ন হল—'ঠিক দুপুরবেলা এমনভাবে কোথায় চলেছিস?'

কোনও দিকে না চেয়েই জবাব দিলাম—'শ্বশুর বাড়ি।'

'—শ্বশুর বাড়ি? তুই আবার বিয়ে করলি কবে? বেশ বাবা, তিন মাস কলকাতায় ছিলুম না, এই ফাঁকে বিয়ে করে আমাদের ফাঁকি দিলি ত?'

প্রশ্নকর্তা আমার সহপাঠী নির্মল বোস। মাস তিনেক হল এলাহাবাদে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, দিন দুই হল কলকাতায় ফিরেছে। নির্মল নাছোড়বান্দা। বে'টে লোক, আমার সঙ্গে অত জোরে হে'টে পারবে কেন। একরকম ছুটেই সঙ্গে সঙ্গে চলল। —'কই জবাব দিচ্ছিস না কেন?'

'—কী জবাব দেব? বড়লোক শ্বশুর জোর করে আমার স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে গেছে। সেইখানে একটা হেস্ত-নেস্ত করতে যাচ্ছি।'

বিস্ময়ে দু' চোখ কপালে তুলে হাত ধরে আমায় একরকম জোর করে দাঁড় করিয়ে নির্মল বললে—'ছেলে? তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে তোর ছেলে হয়েছে? গাঁজা টাঁজা খাচ্ছিস নাকি? তা চেহারাখানা যা করেছিস তাতে ত' তাই মনে হয়।'

কলেজ স্ট্রীটের মোড় তখনো খানিকটা বাকি আছে, হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম, আজ গাঙ্গুলীমশাই আর মুখুজ্জ্যের কাছে নির্ঘাত বকুনি খাব। দৃশ্যটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল!

সামনের গাড়ি থেকে গাঙ্গুলীমশাই আর মুখুজ্জ্যে হাসতে হাসতে নেমে এলেন। আমি ত' অবাক। গাঙ্গুলী মশাই কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বললেন—'ভেরী গুড। আজকের সিনটা খুব ভাল হয়েছে। আমি এতটা আশা করিনি।'

অবাক হয়ে বললাম—'কিন্তু আমার এই বন্ধুটি প্রায় সারা পথটা প্রশ্ন করতে করতে এসেছে।'

মুখুজ্জ্যে বললে—'সেটা আরও ভাল হয়েছে। তোমরা যদি ক্যামেরার দিকে চেয়ে ফেলতে তাহলে সব মাটি হয়ে যেত। ছবির নায়ক মণীন্দ্র কলেজে পড়া শিক্ষিত ছেলে। তাকে রাস্তা দিয়ে ওভাবে পাগলের মত হাঁটতে দেখে তার দু-একজন সহপাঠী বা বন্ধুর প্রশ্ন করাটাই স্বাভাবিক। বরং পাবলিক কারুর সঙ্গে দেখা না হলে সেইটেই আন-ন্যাচারেল হ'ত।' বাঁচা গেল। বেচারি নির্মল। সব শুনে সে এমন বোকা বোকা চোখে আমাদের দিকে চেয়ে রইল যে, না হেসে পারলাম না।

এই ঘটনার পর মাসখানেক কি কারণে জানি না 'কাল পরিণয়' ছবির শ্যুটিং বন্ধ

ছিল। এরই মধ্যে একদিন ৫ নম্বর ধর্মতলাস্ট্রীট, নিউ সিনেমার সামনে ম্যাডান কোম্পানীর অফিসে গিয়ে শুনি, জার্মানী থেকে ফিল্ম শিল্পে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন মধু বোস। ম্যাডান কোম্পানীর হয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'মানভঞ্জনে' চিত্ররূপ দেবেন কিন্তু নায়ক গোপীনাথের ভূমিকা কাকে দেবেন এই নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছেন। আফিসের সর্বময় কর্তা রুস্তমজী মধু বোসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, আমিই নায়ক গোপীনাথের ভূমিকায় মনোনীত হলাম। আমার বিপরীতে নায়িকা গিরিবালার জন্যে নির্বাচন করা হল একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে, নাম মিস্ বনি বার্ড। বাংলা নাম, অর্থাৎ ছায়াচিত্রের হল ললিতা দেবী।

মহা সমারোহে সিনারিও দেখবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। দেখলাম, মধু বোস ছাপার বই-এ ডায়ালোগের নিচে লাল পেনসিলে দাগ টেনে সিনারিও করার পক্ষপাতী নন। সপ্তাহ দুই-এর মধ্যেই সিনারিও শেষ হয়ে গেল, ডাক পড়ল রিহার্সালের। প্রথমে চমকে উঠলাম—নির্বাক ছবিতে আবার রিহার্সাল কিরে বাবা! জার্মান ফেরতা ডিরেক্টার, প্রতিবাদ করবে কে? রোজ রিহার্সালে যাই, বেলা চারটে পাঁচটা পর্যন্ত বসে বসে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর সংলাপ আওড়ে, সিনের পর সিন রিহার্সাল দিয়ে, চা-টোস্ট-ডিমের সদ্ব্যবহার করে বাড়ি চলে আসি। হঠাৎ শুনি, ছবির নাম পালটে গেছে, নায়িকার নামানুসারে ছবির নাম হয়েছে 'গিরিবালা'।

একদিন সন্ধ্যেবেলা রিহার্সাল দিয়ে ফিরতেই বাবা ডেকে পাঠালেন। কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, বাবা বললেন—'ধীউ বাবা, দুখানা ভাল ছবিতে তুমি নায়কের ভূমিকা পেয়েছ, ভাল কথা। কিন্তু ও'রা এর জন্যে পারিশ্রমিক কি দেবেন না দেবেন সে সম্বন্ধে কোনও কথা হয়েছে কি?'

ভারি লজ্জা পেলাম। সত্যিই নায়ক হবার স্বপ্নে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে, ওদিকটার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। বললাম—'না বাবা, 'কাল পরিণয়' ছবিতে নামবার সময় টাকার প্রশ্নই ওঠেনি। কেননা, আমি ভাবতেই পারিনি যে, অত সহজে মুলাণ্ড সাহেব আমার রেজিগ্‌নেশান অ্যাক্‌সেপ্ট করবেন। তারপর 'গিরিবালা' ছবিটাও হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। আমি কালই গাঙ্গুলী মশাই আর মিঃ বোসকে জিজ্ঞাসা করবো।'

পরদিন আফিস মানে ৫ ধর্মতলা স্ট্রীটে যেতেই গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রুস্তমজী সাহেবের কাঁচের পার্টিশন দেওয়া ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। নমস্কার করে আমার বক্তব্য বিষয় তাঁর কাছে নিবেদন করলাম।

একটু চুপ করে থেকে গাঙ্গুলী মশাই বললেন—'শোন ধীরাজ, একটা কথা তোমার জানা দরকার। ছবিতে নেমেই নায়কের চান্স পাওয়াটা ভাগ্যের কথা, পারিশ্রমিকের প্রশ্নই ওঠে না। বহু সুশ্রী

ড়লোকের ছেলে নায়কের জন্য লালায়িত, এমন কি তার জন্য বেশ কিছু আমাকে অফারও করেছে। সে সব চিঠিপত্তর, কটো আমার আফিস ঘরের ড্রয়ারের মধ্যে য়েছে। দেখতে চাও?'

বেশ একটু দমে গিয়ে বললাম, 'না া, আপনার কথাটাই যথেষ্ট।'

—'তবুও তোমার সব কথা মুখুজ্জের কাছে শুনে আমি সমস্ত ছবিটার জন্যে তোমার পারিশ্রমিক ঠিক করে দিয়েছি দেড় শ' টাকা। এইমাত্র সাহেবের সঙ্গে সেই কথাই পাকা করে এলাম।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। এত বড় বিরাট চেহারার মত হৃদয়টাও বড় না হলে মানুষ সত্যিই বড় হতে পারে না।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে পেন্সিল দিয়ে তাতে কি লিখলেন গাঙ্গুলী মশাই, তারপর কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—'এইটে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে গেলেই তিনি তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেবেন। পরে দরকার হলে কিছু কিছু করে নিও।'

দেহে মনে একরকম লাফাতে লাফাতে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে রিহার্সাল রুমে ঢুকে পড়লাম। মধু বোস তখনও এসে পৌঁছন নি।

ঘর ভর্তি অভিনেতা অভিনেত্রীর দল—তারই মধ্যে দিব্যি আরামে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন অধুনা বিখ্যাত পরিচালক অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র। একটু অবাক হয়ে বললাম—'নরেশদা আপনি?'

এখানে বলে রাখা দরকার, 'কাল পরিণয়' ছবিতে একটি দুর্ধর্ষ ভিলেন চরিত্রে রূপ দিচ্ছিলেন নরেশদা এবং অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় শিক্ষার ভারও ছিল নরেশদার উপর। আমার অভিনয় শিক্ষার হাতে খড়ি নরেশদার কাছ থেকেই।

জবাব না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে মিট মিট করে হাসতে লাগলেন নরেশদা। একটু পরে ঘর শুদ্ধ সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন—'ধীরাজ তুমি মদ খাও?'

স্তম্ভিত বজ্রাহত হয়ে গেলাম। এ কি প্রশ্ন? মদ খাওয়া দূরের কথা—যারা খায় তাদের পর্যন্ত মনে মনে ঘৃণা করি তখন। সব জেনেও এ কী প্রশ্ন করলেন নরেশদা? জবাব দিলাম না, দেবারও কিছু ছিল না।

আবার প্রশ্ন—'অস্থানে-কুস্থানে, মানে মেয়েমানুষের বাড়ি যাওয়া-টাওয়া অভ্যাস আছে?'

গুরুর মত শ্রদ্ধা ও মান্য করি নরেশদাকে। তাছাড়া, অল্প কয়েকদিনের মাত্র আলাপ, ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি তখন। সত্যিই ব্যথা পেলাম।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধ হয় নরেশদা কাছে ডেকে বসালেন, তারপর বললেন—'নাহে, অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। 'গিরিবালা' ছবিতে আমাকে মিঃ বোস দিয়েছেন তোমার একটি বন্ধুর ভূমিকা। আমার একমাত্র কাজ হল তোমাকে মদ খেতে শেখান, মেয়েমানুষের বাড়ি নিয়ে যাওয়া আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে না দেওয়া। যে সৎ গুণগুলি না থাকলে সমাজে বড়লোক কাপ্তেন বলে পরিচয় দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।'

এতক্ষণে নরেশদাকে বোঝা গেল। গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং আমার 'কালপরিণয়' ছবির পারিশ্রমিকের কথা সব নরেশদাকে বললাম। শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন নরেশদা। বললেন—'পারিশ্রমিকটা একটু কম হয়ে গেল না? দেড় বছরে মাত্র দেড় শ' টাকা......'

বাধা দিয়ে বললাম—'দেড় বছর? 'কাল পরিণয়' ছবি শেষ হতে দেড় বছর লাগবে?'

'হ্যাঁ, যতদিন না 'গিরিবালা' শেষ হয়, ধর মাস তিনেক, গাঙ্গুলী মশায়ের শুটিং বন্ধ থাকবে। তারপর শুরু হয়ে শেষ হতে তাও তিন চার মাস। হরে দরে সেই দেড় বছরের ধাক্কা।'

বললাম—'আচ্ছা নরেশদা, এই যে 'গিরিবালা' ছবিতে মিঃ বোস আমাকে নিয়েছেন এর জন্যেও কিছু দেবেন তো?'

—'নিশ্চয়, তুমি মিঃ বোসের সঙ্গে কথা বলনি?'

বললাম—'না।'

একটু চুপ করে থেকে নরেশদা বললেন—'আজই কথা বলে নিও। আর যদি পারমান্যাণ্ট্ মানে মাস-মাইনে করে নিতে পার তো কথাই নেই। এই দ্যাখো না, তোফা মাসের তিন তারিখে এসে মাইনে নিয়ে যাই। ছবি তোমার দেড় বছরে হোক আর দু' বছরে হোক, বয়েই গেল।'

স্বপ্নের সেই সোনার পাহাড়টা চোখের সামনে ভেসে উঠতে না উঠতেই কোথায় মিলিয়ে গেল। বললাম—'কাকে বলবো নরেশদা?'

'—কেন, গাঙ্গুলী মশাই ইচ্ছে করলে অনায়াসেই করে দিতে পারেন। উনি তো শুধু পরিচালক নন, এলফিনস্টোন পিক্‌চার প্যালেসের (অধুনা মিনার্ভা থিয়েটার) ম্যানেজার। তা ছাড়া, মনিবরা কোম্পানীর আরও অনেক জটিল বিষয়ে ও'র পরামর্শ নিয়ে থাকেন।'

পরিচালক মধু বোস ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে সিল্কের শাড়ি পরিহিতা অপূর্ব সুন্দরী একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। বুঝলাম, ইনিই নায়িকা বনি বার্ড ওরফে ললিতা দেবী।

আমার আর নরেশদার সঙ্গে পরিচয়

দিয়ে মধু বোস বললেন—
রা বসে আলাপ করুন, আমি
রুস্তমজী সাহেবের ঘর থেকে
।'

তিনজনে চুপচাপ বসে আছি। মনে
আকাশ পাতাল ভাবছি, কি কথার
ধরে কথা আরম্ভ করা যায়। আমারই
কা, কিছু একটা না বলাও অশোভন।
নরেশদাই শুরু করলেন—মিস্ বার্ড,
উ লাইক্ ইওর হিরো?'

ললিতা দেবী আমার আপাদ মস্তক
করে নিরীক্ষণ করে বললেন—'হি
ভেরি হ্যান্ড্সাম্ নো ডাউট্।'

দুষ্টুমিভরা একটা হাসির কটাক্ষ
ার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পরম কৌতুকে
পা দোলাতে লাগলেন নরেশদা।
ক্ষণ ধরে মনে মনে যা বলব বলে ঠিক
রেখেছিলাম সব তালগোল পাকিয়ে
। ক্লাস ভর্তি ছেলের সামনে পড়া-
ত-না-পারা ছেলের মতন লজ্জায় মুখ
করে সামনের কাঠের টেবিলটার
টা কোণ নখ দিয়ে খুঁটতে লাগলাম।
আমার দিকে একটু ঝুঁকে নরেশদা
লেন—'আলাপ হতে না হতেই এত
াস হয়ে পড়ছো ধীরাজ, এর পর
চুরচুরে মাতাল হয়ে জোর করে
এর কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি কেড়ে
এক রাশ গয়না নিয়ে বেরিয়ে
বে, তখন কি করবে?'

অবাক হয়ে বললাম—'গিরিবালায়'
ার এইসব সিন আছে নাকি নরেশদা'

'—শুধু এই? আমার অমোঘ
কার গুণে তোমার মতো মুখচোরা
ুক ছেলে হয়ে উঠেছ একেবারে
কশ নামকরা কাপ্তেন। লবঙ্গ নামে
টি মেয়েকে বাঁধা রেখে রাতদিন তার
ানেই পড়ে থাকো মদে চুরচুরে হয়ে।
ু টাকার দরকার হলেই বাড়ি এসে
কে মারধোর ক'রে যা পাও নিয়ে
রয়ে যাও।'

ললিতা দেবীর দিকে চাইতেও সাহস
ছল না, ফ্যাল ফ্যাল করে নরেশদার
ক চেয়ে বসে রইলাম।

নরেশদা বলেই চললেন—'একদিক
য় তোমার উপর হিংসে হয় ধীরাজ।
নমায় ঢুকতে না ঢুকতেই সীতা দেবী
র ললিতা দেবীর মত স্ত্রী পাওয়া
সত্যিই ভাগ্যের কথা।' মনে হল ফোঁস
করে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও যেন ফেললেন
নরেশদা। আড় চোখে চেয়ে দেখলাম—
ললিতা দেবী আমাদের দিকে চেয়ে
আছেন একাগ্রভাবে। হয়তো আমাদের
আলোচনাটার মর্মোদ্ঘাটন করবার চেষ্টা
করছেন। ঘরের মধ্যে আরও দু' চারজন
অভিনেতা যাঁরা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে
আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরাও
উৎকর্ণ হয়ে আমাদের কথাগুলো
শুনছেন। ভারি লজ্জা করছিল। ইচ্ছে
হচ্ছিল, নরেশদাকে থামিয়ে দিয়ে অন্য
প্রসঙ্গ পাড়ি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।
নরেশদা যেন আজ সভাপতির ভাষণ
দিচ্ছেন। সে ভাষণ যত দীর্ঘ, যত
নীরসই হোক, শেষ না হলে সভাভঙ্গের
কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আবার তেড়ে শুরু করলেন নরেশদা
—'বয়েস ও অভিজ্ঞতায় তোমার চেয়ে
আমি বড়। সেই অধিকারে একটা কথা
তোমাকে বলে রাখি। মন দিয়ে শোনো,
ভবিষ্যতে ভাল হবে। না শোনো, দুদিনেই
পাঁকে তলিয়ে যাবে।'

ভূমিকা শুনেই বুক কেঁপে ওঠে।
চুপ করে নরেশদার পরের কথাগুলো
শোনবার জন্য বসে রইলাম।

পেশাদার যাদুকরের মত দর্শকের
কৌতূহল পুরো মাত্রায় জাগিয়ে দিয়ে
কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন নরেশদা।
তারপর ধীরে সুস্থে পকেট থেকে এক
প্যাকেট ক্যাভেন্ডার সিগারেট বের করে
তা থেকে একটা ধরিয়ে দু' তিনটে টান
দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে
ছাড়তে বললেন—'এ লাইনে বড্ড বেশী
প্রলোভন। বিশেষ করে তোমার মত
অল্প বয়েসের ছেলের পক্ষে। সুন্দরী
মেয়ে দেখলেই এ বয়সে সাধারণত প্রেমে
পড়বার একটা ঝোঁক আসে, আর সেটা
স্বাভাবিক। বাইরে থেকে সে ঝোঁকটা
চেষ্টা করলে সামলে নেওয়া যায়, কিন্তু
এ লাইনে সেটা সামলে নেওয়ার সুযোগ
খুব কম। ধরো, সীতা দেবী বা ললিতা
দেবীর মত মেয়ের সঙ্গে তুমি বেশ
জড়াজড়ি করে প্রেমের অভিনয় করে
রাতদিন তাদের কথাই ভাবতে শুরু
করলে। তোমার আহার নিদ্রা গেল।
এই যে কড়া মনোবিকার এর একমাত্র
প্রতিকার হ'ল দৃঢ় মনোবল আর স্টুডিওর
বাইরে গিয়ে ওসব স্মৃতি মন থেকে
একেবারে মুছে ফেলে দেওয়া। খুব শক্ত,
তবে এ ছাড়া বাঁচবার উপায়ও আর নেই।
তাছাড়া, এইসব মেয়ে—সীতা ললিতা, এরা
—মাকাল ফল। ঐ বাইরে থেকে দেখতেই
যা ভিতরে বিষের ছুরি। ভালবাসা বলে
কোনো জিনিস ওদের মধ্যে নেই, শুধু
দু' হাতে টাকা লুটতে আর তোমার মত
সুন্দর কাঁচ ছেলেদের হাড় মাস চিবিয়ে
খেতেই ওরা এ লাইনে ঢুকেছে।'

নিস্তব্ধ ঘরে বাজ পড়লেও যেন।
সশব্দে চেয়ারখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে

উঠে দাঁড়িয়েছে ললিতা দেবী। চোখ নাক মুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। *নরেশদাও দেখি আমার মত বেশ ভড়কে গেছেন।*

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ললিতা দেবী বললেন,—

Mr. Mitter, I think you are going too far, I am sorry to let you know that though I cannot speak properly I can understand Bengali.

(মিঃ মিত্র, আমার মনে হয়, আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনাকে অত্যন্ত *দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে,* যদিও ভাল *বলতে পারি না,* বাংলা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি।)

মঞ্চ ও পর্দার পাকা ঝানু অভিনেতা নরেশদা। অনেক রকম অভিব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন ভূমিকায় দেখেছি। কিন্তু সেদিনকার ঐ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া অভিব্যক্তি—তুলনা নেই। চেষ্টা করেও কোনো ভূমিকায় আর কোনোদিন দিতে কিনা সন্দেহ।

কথা শেষ করে দমকা হাওয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল 'গিরি নায়িকা ললিতা দেবী, মনে হ'ল ব আমার জীবন থেকেও। শুধু ছিল জুতোটার খট্ খট্ আওয়াজ খানি পর্যন্ত সিমেণ্টের মেঝেয় প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তে চুপ করে গেল।

(ঃ

ঝাঁসীর রানী ০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

॥ ২ ॥

বীরসিংহদেবের পর ইতিহাস সময়ের পাখায় ভর দিয়ে
চন্ত নির্ভয়ে গড়িয়ে গেল।
কজন অনুল্লেখ্য রাজার পর, রাজা
ন, মহোবার জায়গীরদার চম্পৎ-
য়ের ছেলে, বুন্দেলখণ্ডের মুকুটমণি
সাল। বুন্দেলখণ্ডকে মোগল শাসন
ক স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছিলেন
সাল। বুন্দেলখণ্ডের গৌরব তিনি।

মহোবা জায়গীর বর্তমান ছত্রপুর
নায়। চম্পৎরাওয়ের সঙ্গে মহোবার
ধকার নিয়ে মোগল দরবারের ঝগড়া
গেই ছিল। চম্পৎরাও ঘোষণা করলেন—
ন্দলাকো বুন্দেলারাজ, মোগল অধিকার
ব না। শুরু হল লড়াই, এই ধৃষ্ট
াবের উত্তরে। নিহত হলেন সম্মুখ
রে, চম্পৎরাওয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, কিশোর
রবাহন। শোকাতুরা স্ত্রীকে নিয়ে চম্পৎ-
ও মোর পাহাড়ের জঙ্গলে আত্মগোপন
র, যুদ্ধ চালাতে লাগলেন।

কটেরা গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে,
ার পাহাড়ের জঙ্গলে বিক্রমসংবৎ ১৭০৫
লের জ্যৈষ্ঠ্য মাসে ছত্রসালের জন্ম হল।
শব থেকে ছত্রসাল পাহাড় ও জঙ্গলে
ন্দুর হতে লাগলেন। মোগলসৈন্য চম্পৎ-
রাওকে কতবার পরিবেষ্টন করে ফেলেছে এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে চম্পৎরাওকে তখন দুর্গমতর অঞ্চলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। এরকম ঘটনা বারবার ঘটেছে। এমন কি একদিন নিদ্রিত ছত্রসালকে অরক্ষিত ফেলে তাঁরা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিশুকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাবেন বলে ভরসা ছিল না চম্পৎ-রাওয়ের। কিন্তু ভাগ্যক্রমে নিরাপদে পাওয়া গেল ছত্রসালকে। সেইদিনই রাণী নৈহার চলে গেলেন শিশুকে নিয়ে। কালে-ক্রমে ছত্রসাল মহাবলী ও চতুর হয়ে উঠলেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি স্বপ্ন দেখলেন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনার। সেদিন সুদূর মহারাষ্ট্র, সহ্যাদ্রি পর্বতের শিখরে শিখরে দুরন্ত ঘোড়াকে বশ মানাতে মানাতে, একটি যুবকও সেই স্বপ্নই দেখছিলেন। তিনি শিবাজী।

দিল্লীর তখ্‌তে তখন আওরংগজেব। সংগীত, শিল্প ও কাব্যের ওপর 'মৌত্‌-কা-পরোয়ানা' লিখে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি-ভূষণ। কানপুরের সমীপবর্তী তিকবাঁপুর গ্রামে, বিক্রমসংবৎ ১৬৭০-এ তাঁর জন্ম। বীররসে সঞ্জীবিত তাঁর কাব্যে বুন্দেল-খণ্ডী ও ব্রজবুলি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

কথিত আছে, আওরংগজেব একদা বিদ্রূপ করলেন কবিদের। বললেন—'তোমাদের কাব্য শুধুমাত্র রাজা-মহারাজার স্তবস্তুতি। তাতে সত্য নেই।' তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন কবিভূষণ। যুক্তকরে নিবেদন করলেন যে, বাদশাহ তাঁকে লিখিতভাবে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি একটি কবিতা শোনাতে পারেন। আওরংগজেব প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভূষণ বললেন—

কিবলে কে ঠৌর বাপ বাদশাহ শাহীজ'হা
তাকো কয়েদ কিয়ো মানো মকেক আগি
লাই হ্যায়॥
বড়ো ভাই দারা য়াকো পকড়ি কৈ কুয়েদ কিয়ো
মেহরহু নহী য়াকো জায়ো সগে ভাই হ্যায়॥
বন্ধু তৌ মুরাদবক্‌স বাদি চুক করিবে কো
বীচ লৈ কুরাণ খুদা কি কসম খাই হ্যায়॥
ভূষণ সুকবি কহৈ সুনৌ নবরংগজেব
এতে কাম কীন্‌হে কেরি পদশাহী পাই হ্যায়॥

কোরানে পূজ্য পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃ-তুল্য দারাশুকোকে ও সন্তানতুল্য মুরাদ-বক্সকে হত্যার উদ্দেশে, প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে ক্রোধে অন্ধ হলেন আওরংগজেব।

ভূষণ অগত্যা রাজরোষ মাথায় নিয়ে পলায়ন করতে লাগলেন দক্ষিণে। সন্ধান করতে লাগলেন একটি স্বাধীন ও নির্ভীক হিন্দুরাজার। মহারাজা ছত্রসাল সাদরে

স্থান দিলেন ভূষণকে। ভূষণ রচনা করলেন ছত্রসাল দশক। সেই সময় বুন্দীর হাড়া-রাজা ছত্রসালও বিদ্রোহী হয়েছিলেন ঔরংগজেবের বিরুদ্ধে। ভূষণ এ'দের যুগ্ম প্রশস্তিতে গাইলেন—

ইক হাড়া বুন্দী ঘনী মরদ মহেবা বাল
সামত নৌরংগজেবকো য়ে দোনোঁ ছত্রসাল॥
ঐ দেখো ছত্তা পতী ঐ দেখো ছত্রসাল
ঐ দিল্লী কি ঢান ঐ দিল্লী ঢাহনবাল॥

ছত্রসালের কাছে বিদায় গ্রহণ করে ভূষণ গিয়েছিলেন শিবাজীর কাছে। শিবাজীর সন্ধান করতে করতে ভূষণ পুণার প্রান্তে পেশছলেন এক সন্ধ্যায়। দেখলেন, তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছেন খর্বাকৃতি, সুঠাম দেহ এক অশ্বারোহী। নিস্পৃহভাবে তিনি মকাই খাচ্ছেন। ভূষণের উদ্দেশ্য শুনে তিনি শিবাজীকে নিন্দা করলেন। বললেন—"সে গাঁওয়ার মানুষ। যুদ্ধ লড়ে। যুদ্ধ বোঝে। কবিতার সে কি বোঝে? তার সম্বন্ধে কি কোন কবিতা রচনা সম্ভব?" ভূষণ তখন শিবাজী প্রশস্তিতে যে কবিতা রচনা করলেন, তা আজও হিন্দী পাঠক-মহলে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। তিনি বললেন—

ইন্দ্রজীমে জম্ভা পর বাড়বল অম্ভা পর
রাবণসে দম্ভ পর রঘুকুল রাজ হ্যায়॥
পবন বারিবহপর শম্ভু রতি নাহ পর
তোঁ সহস্র বাহুপর রামধিজ রাজ হ্যায়॥
দাবাগ্নিমে দন্ডপর চিতামৃগ ঝুন্ডে পর
ভুখান বিতুন্ডপর যৈসে মৃগরাজ হ্যায়॥
তেজতম অংস পর কানাজী মে কংস পর
তেঁও ম্লেচ্ছবংশপর শের শিবরাজ হ্যায়॥

অশ্বারোহী আনন্দিত হলেন। পরদিন দরবারে প্রকাশিত হল সেই সওয়ারই শিবাজী স্বয়ং। ভূষণ ও শিবাজীর যোগাযোগে রচিত হ'ল অনুপম কাব্য শিবাবাহনী ও শিবরাজ-ভূষণ। হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের এক অনুপম সম্পদ।

বুন্দেলা ছত্রসাল কবি-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রশস্তিতে কাব্যরচনা করে অমর হয়েছেন অন্যান্য কবি। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ভূষণের দুই ভাই মতিরাম, চিন্তামণি এবং লালকবি, নেবাজ, পুরুষোত্তম, পঞ্চম ও অনন্যর নাম উল্লেখ্য। বান্দা, গড়াকোটা প্রভৃতি স্থানে আজও ছত্রসাল সম্বন্ধীয় রচনাগীতি শোনা যায়।

ছত্রসালের বত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু হ'ল শিবাজীর। তারপর দীর্ঘদিন বাঁচলেন ছত্রসাল। বার্ধক্যের প্রান্তে, তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন মহম্মদ খাঁ। স্তিমিত শক্তি, হীনবল ছত্রসাল, উদীয়মান মরাঠা বীর প্রথম বাজীরাও পেশবার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন মোগল আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে। স্বয়ং লিখলেন—

যো গতি ভয়ী গজেন্দ্র কি, সো গতি পহুঁচি আজ,
বাজী জাত বুন্দেল কী, রাখো বাজী লাজ।

বুন্দেলখণ্ডের লজ্জারক্ষার ভার গ্রহণ করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাও এলেন। দমন করলেন মুসলমান আক্রমণ। মোগল সাম্রাজ্যে তখন ফাটল ধরেছে। মধ্যভারতে মরাঠা আধিপত্য বিস্তারের এই যোগ্য সময়।

কিন্তু ছত্রসালের ছাপ্পান্ন পুত্রের অংশ ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে তাঁর ভাগ্যে কি থাকবে ভেবে চিন্তিত বাজীরাও ছত্রসালের দরবারে দাঁড়িয়ে রইলেন উৎসবের দিন।
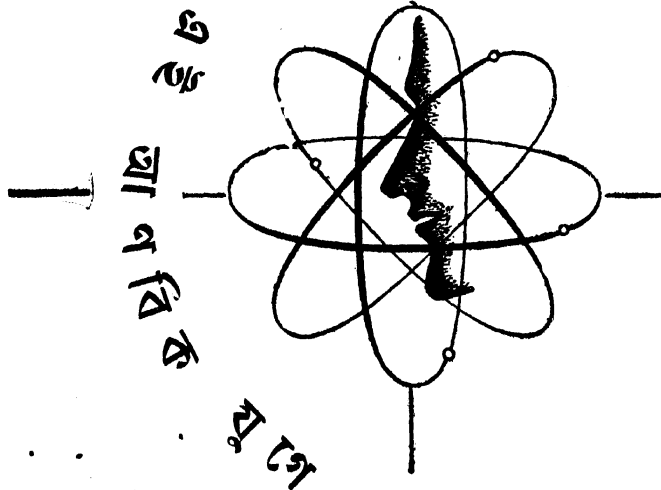
ছত্রসাল তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বললেন—"মহারাজ, আপকে ছাপ্পান্ পুত্র হ্যায়, ইন্‌মেঁ ম্যয় ক'হা বৈঠুঁ?" এই উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে ছত্রসাল বললেন—

"মেরে পহ্‌লে পুত্র হৃদয়সাহ্, দুসরে জগতরাজ, ঔর তিসরে আপ হ্যায়। আপ ইনকে হী সমীপ বৈঠিয়ে।"

আশ্বস্ত বাজীরাও আসন গ্রহণ করলেন।

অতঃপর ছত্রসাল তাঁর বিস্তৃত রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করবার সংকল্প করলেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল চম্বল, তমনা, যা তোঁসা, যমুনা ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। তার মধ্যে ছিল কাল্‌পী, জালৌন, কুঁচ, এরছ, ঝাঁসী, সিরৌজ, গুণাহ্, গড়াকোটা, সাগর, দামোহ্, মই-হার এবং অন্যান্য রাজ্য।

প্রথম পুত্র হৃদয়সাহ্ পেলেন বার্ষিক বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর পান্না, মৌ, গড়াকোটা, কালিঞ্জর, সাহ্‌গড় ও অন্যান্য এলাকা।

মেজো ছেলে জগতরাজ পেলেন—জৈতপুর, অজয়গড়, চরখারী, বিজাবর সরীলা, ভূরযগড়।

প্রথম বাজীরাও পেশবা পেলেন, কাল্‌পী, হটা, হৃদয়নগর, জালৌন, গুর-সরাই, ঝাঁসী, সিরৌজ, গুণাহ্ ও সাগর।

বাজীরাও পেশবা এই নবলব্ধ সাম্রাজ্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করলেন। পরাক্রমী বীর সর্দার গোবিন্দবল্লাল খেরকে দিলেন সাগর ও জালৌনের ভার। হরি বিট্‌ঠল ডিংগারকার পেলেন কাল্‌পী ও হামিরপুর পরগণার কিয়দংশ। কৃষ্ণাজী অনন্ত তাম্বে পেলেন বান্দা এবং হামির-পুরের কিয়দংশ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি অতি অল্পদিনই সুবেদারী করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বান্দারাজ্যের ভার পেয়েছিলেন শমসের বাহাদুর, বাজীরাও পেশবা ও মস্তানীর প্রণয়জাত সন্তান। বান্দার নবাববংশের উৎপত্তি এই শমসের বাহাদুর থেকে। এই বংশ আজও বিদ্যমান। ঝাঁসীর ভার পেলেন নরোশংকর মোতিবালে।

নরোশংকর মোতিবালে ঝাঁসীর কেল্লা ঘিরে নগরী স্থাপনা করলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল জনপদ।

নরোশংকর মোতিবালের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বাসরাও লক্ষণ হলেন ঝাঁসীর শাসক। সেই সময় একদা এক ব্যক্তি এসে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, তিনিই হচ্ছেন পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের মৃত বীর সদাশিবরাও, যাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক, বিশ্বাসরাও এই ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করলেন। পুণাতে খবর গেল, জাল সদাশিবরাও ও বিশ্বাসরাও ঝাঁসীতে ব'সে মিত্রতা করছেন। ফলে বিশ্বাসরাও পদচ্যুত হলেন। পুণা থেকে পেশবা প্রথম মাধব-রাও, রঘুনাথহরি নেবালকরকে পাঠালেন বিশ্বাসরাও সম্পর্কে তদন্ত বিবৃতি দাখিল করবার জন্য। এই বিবরণীটি দেখে রঘুনাথ হরি নেবালকর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা হ'ল পেশবা প্রথম মাধবরাওয়ের। অতএব, ১৭৭০ সালে ঝাঁসীর সুবেদার নিযুক্ত হলেন রঘুনাথহরি নেবালকর।

রঘুনাথহরির পিতা, হরিদামোদর নেবালকর, ১৭৪০ সালে, খান্দেশে অবস্থিত পারোলার সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের কেন্দ্রে পারোলা ছিল মরাঠা বাহিনীর একটি বিশিষ্ট সামরিক ঘাটি। নেবালকরদের আমলে পারোলা উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে একটি বিশিষ্ট জনপদে পরিণত হ'ল। পারোলার সম্বন্ধে মরাঠা বাহিনী বলতেন —"পুণাতে যা মেলে না, পারোলাতে তা-ও মেলে।" পারোলার বর্তমান অবস্থিতি জলগাঁও ও ধুলিয়া এবং আমালমীর ও নাদীরাবাদের কেন্দ্রস্থলে।

পারোলার উন্নতি দেখেই হয়তো পেশবা প্রথম মাধবরাও নেবালকরদের কর্ম-দক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

রঘুনাথহরি বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে চব্বিশ বৎসর কাল ঝাঁসীতে সুবেদারী করলেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য মরাঠা রাজ্যগুলির মত ঝাঁসী ও প্রতিবেশী রাজপুত সামন্তদের নিরন্তর বিরাগভাজন ছিল। রাজপুত রাজন্যবর্গের চোখের সামনে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের পরেও মধ্যভারতে মরাঠাশক্তি খর্ব হয়ে গেল না। বাজীরাও
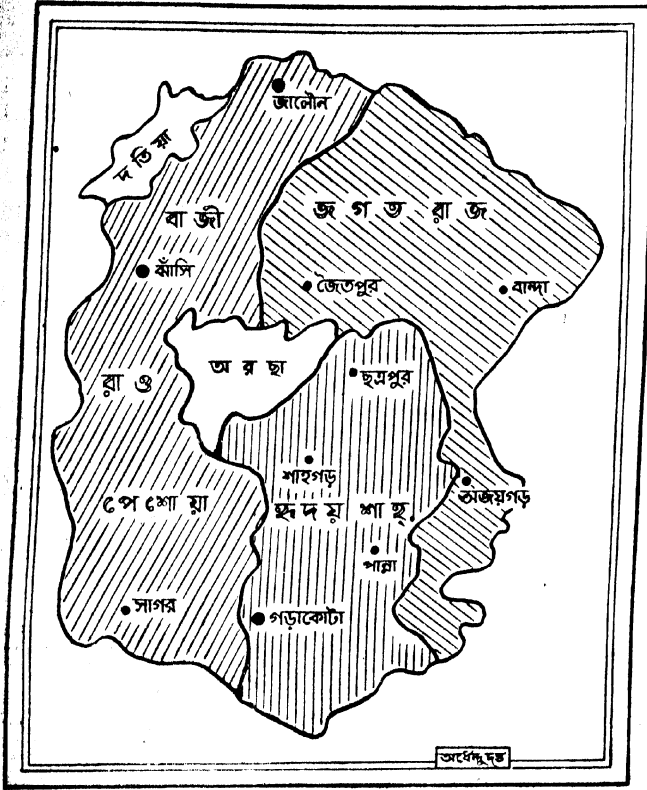
পেশবার অধিকৃত অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে ঝাঁসী হয়ে উঠল সমৃদ্ধতর।

রঘুনাথহরি স্বীয় অর্থব্যয়ে ঝাঁসীকে সুসমৃদ্ধ করলেন। ভালো ভালো কামান ঢালাই করে কেল্লাতে বসালেন। শিল্প ও ব্যবসার একটি কেন্দ্র হ'ল ঝাঁসী। রঘুনাথ-হরি ঝাঁসীর সম্পর্কে নিয়মিত বিবৃতি পেশ করতেন পুণাতে। পুণার দফ্তরের সেই কাগজগুলি আজও তাঁর কর্মপটুতার প্রমাণ দেয়।

রঘুনাথহরির চরিত্র থেকে বোঝা যায় এই রকম কয়েকজন দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তিই মহারাষ্ট্রকে একদিন অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যোৎ-সাহিতা, শ্রমে ধৈর্য, সহজ সরল জীবন-যাপন, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, চিন্তাকে কাজে পরিণত করবার সাহস, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অতি সহজে স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ, চরিত্রের দৃঢ়তা, মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত এই যে চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি বিদ্যমান, রঘুনাথহরি তার সবগুলিরই অধিকারী ছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা পরিধান করেন আঠারোহাত শাড়ি। বুন্দেলখণ্ডের মেয়েদের পোশাক ঘাঘ্রা। সেখানকার স্থানীয় তাঁতীরা শাড়ি বুনতে জানতেন না। অতএব রঘুনাথহরি দক্ষিণ থেকে তাঁতীদেব আনিয়ে ঝাঁসীতে বসত করালেন। ছত্রপুর ও পান্না থেকে বিশিষ্ট বুন্দেলখণ্ডী ধাতুশিল্পীদের আনিয়ে পত্তনী দিলেন মোরাণীপুর ও ঝাঁসীতে। ঝাঁসীর দুর্গ-প্রাসাদে স্থাপনা করলেন একটি শৌখীন গবেষণাগার। গড়ে তুললেন একটি সুন্দর গ্রন্থাগার। নদীয়া, কাশী ও তাঞ্জোর থেকে ভালো ভালো সংস্কৃত বইয়ের অনুলিপি করিয়ে আনলেন সুদক্ষ লিপিকারদের দিয়ে। বাঁধাই করলেন বই রেশম ও জরীর বহুমূল্যবান আচ্ছাদনে। ভাগবৎ গীতার বহু সংস্করণ করালেন। কাব্য, সাহিত্য, দর্শনে ভরে উঠল এই গ্রন্থাগার। নেবাল-করবংশের উত্তরপুরুষরা এই গ্রন্থাগারটিকে সবিশেষ যত্ন করে রেখেছিলেন। গঙ্গাধর-রাওয়ের আমলে ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। সেখানে আনা হয় এই গ্রন্থাগার। রাণী লক্ষ্মীবাঈও এই গ্রন্থাগারটিকে সবিশেষ রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। ১৮৫৮ সালে, রাণী যখন যুদ্ধশেষে ঝাঁসী ত্যাগ করেন, তখন ব্রিটিশ ফৌজ প্রাসাদ লুণ্ঠন করবার সময় এই গ্রন্থাগারটিকে ধ্বংস করেন। মূল্যবান সোনা ও রেশমের আচ্ছাদনগুলি ছিঁড়ে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করেন গ্রন্থাগারে। একদা জুলিয়াস সীজারের রোম্যান সৈন্যরা, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই বর্বর কাজ, আজও ঐতিহাসিক বলে গণ্য হয়ে থাকে। অতীব বিশিষ্ট এক একটি কাজকে ঐতিহাসিক বিশেষণ দেওয়া হয়। সেই অর্থে রোম্যানদের সেই বর্বরতা ঐতিহাসিক। কেনন তার তুলনা খুব বেশী নেই। ইংরেজ সৈন্যদের এই কীর্তিও তেমনই বর্বর।

১৭৯৪ সালে এই সুযোগ্য শাসক অবসর গ্রহণ করে ধর্মকর্মে জীবন উৎসর্গ করেন। রঘুনাথহরির পরবর্তী ভ্রাতা শিবরাও ভাও তখন ঝাঁসীর সুবেদারী গ্রহণ করলেন।

শিবরাও ভাও জ্যেষ্ঠের যোগ্য ভ্রাতা ছিলেন। ঝাঁসী শহর ঘিরে যে বর্তমান প্রাচীর রয়েছে, তা তাঁর সমসাময়িক।

শিবরাও ভাও দুই বিবাহ করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ১৭৮৮ সালে জন্ম হয় কৃষ্ণচন্দ্র শিবরাও নেবালকরের। কৃষ্ণরাওয়ের স্ত্রী ছিলেন সখুবাঈ। ১৮০৬ সালে কৃষ্ণরাওয়ের পুত্র রামচন্দ্ররাওয়ের জন্ম হয়। ১৮০৯ সালে জন্ম হয় একটি মেয়ের।

শিবরাও ভাওয়ের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দুটি পুত্র হয়েছিল। ১৮০৩ সালে রঘুনাথ এবং ১৮১৩ খৃঃ অব্দে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করলেন।

১৮০৪ সালে শিবরাও ভাওয়ের সঙ্গে একটি শর্ত অনুষ্ঠিত হ'ল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। পারস্পরিক সামরিক

সাহায্য ও মৈত্রীর চুক্তিতে সাতটি শর্ত-সম্বলিত এই খরীতাটি শিবরাও ভাও বুন্দেল খণ্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি জন বেইলীর মারফত গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠালেন। এই শর্ত অনুমোদন করে স্বাক্ষর করলেন গভর্নর জেনারেল।

কতকগুলি শর্ত এখানে অনুল্লেখিত রয়ে গিয়েছিল ব'লে ১৮০৬ সালে শিবরাও ভাও আর একটি নতুন শর্ত দাখিল করলেন। কোঠ্রাতে জন বেইলী গভর্নর জেনারেল জর্জ বার্লোর হাতে এই শর্ত দিলেন। এই শর্ত দুখানির বিশদ বিবরণী পরে জানাব। এখন এই বললেই চলবে যে, শিবরাও ভাওয়ের ব্রিটিশ আনুগত্যের পরিবর্তে, কোম্পানি তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের ঝাঁসীর সিংহাসনের উপর অধিকার স্বীকার করে নিলেন। রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁদের স্বাধীনতা থাকলো।

১৮১১ সালে কৃষ্ণরাও মারা গেলেন। মর্মাহত হলেন শিবরাও ভাও। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর তাঁর যে পক্ষপাতিত্ব ছিল, তার ফলে পৌত্র রামচন্দ্ররাওকে তিনি উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন। ১৮১৪ সালে মহা ধুমধামে রামচন্দ্ররাওয়ের 'জনাও' বা পৈতা হয়ে গেলে পরে তিনি উইল করলেন। রামচন্দ্রের বিধবা মাতা সখুবাঈয়ের সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার তাঁর কারণ ঘটেছিল। কাজেই রাজ্যশাসন বিষয়ে সখু বাঈয়ের কোন কর্তৃত্ব তিনি মানলেন না। গোপালরাও বালকৃষ্ণ আম্বের্দারকরকে নিযুক্ত করলেন নাবালক রামচন্দ্রের অভিভাবক।

দ্বিতীয়া পত্নীজাত রঘুনাথ ও গঙ্গাধরকে বার্ষিক বারো হাজার টাকা করে বৃত্তি দিলেন। অন্যান্য সম্পত্তি দিলেন। সখুবাঈকে ধর্মকর্মের দিকে অধিক মন দিতে বললেন। রাজ্যের সমস্ত অধিকারে বিচ্যুত হয়ে সখুবাঈ অপমান ও হিংসায় জ্বলতে লাগলেন। এমন কি শিশু রামচন্দ্রকেও তাঁর শত্রু বলে বোধ হতে লাগল। এই বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ফলে উত্তরকালে ঝাঁসীতে গভীর বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল।

শিবরাও ভাও এই রমণীর গতিবিধি দেখে আশঙ্কিত হলেন। অশান্তি এবং দুর্ভাবনার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। ১৮১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

১৮১৭ সালে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও শর্ত ক'রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত অধিকার দিয়ে দিলেন। ১৮১৭ সালে একাদশবর্ষীয় নাবালক রামচন্দ্ররাওয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত শর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঝাঁসীর সিংহাসনে রামচন্দ্র-রাওয়ের অধিকার স্বীকার করলেন, মঞ্জুর করলেন তাঁর সুবেদারী।

দরিদ্র ঘরে মাতা ও পুত্রের সম্বন্ধে কোন বিরোধ নেই, সেখানে সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য এই সহজাত মধুর সম্বন্ধের মধ্যে কোন ছায়াপাত করে না। কিন্তু যেখানে ঐশ্বর্যের বাসা, যেখানে রাজকোষে সঞ্চিত থাকে মণিমুক্তা ধনরত্ন, সেখানে মাতার স্নেহসিঞ্চিত খাদ্যপানীয়ে কখনো কখনো কালকূট থাকে, বিরামকক্ষের যবনিকার আড়ালে কখনো কখনো ঘাতক অপেক্ষা করে। ঐশ্বর্য শুধু আশীর্বাদ নয়। সময়ান্তরে সে অভিসম্পাতও বহন করে। ঐশ্বর্যের মোহে সখুবাঈ বিস্মৃত হ'লেন তাঁর কর্তব্য। অন্তরে তাঁর ফণিনী গর্জন করতে লাগল। তার বিষক্ষরণে বিষিয়ে গেল তাঁর সমস্ত মন।

সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন সখুবাঈ। (ক্রমশ)
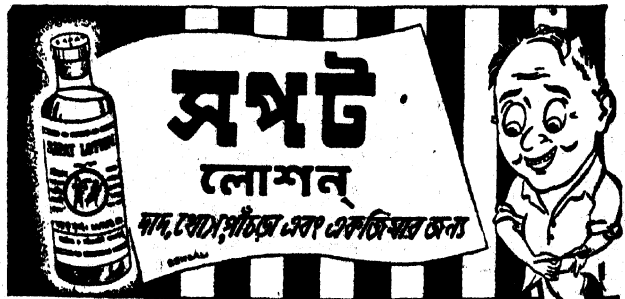
পুরনো হয়ে এসেছে শীত। ঝরে পড়ার সময় এসে গেছে।

সকালের রোদটা মিষ্টি-মিষ্টি লাগে তবু। একটু বেলা বাড়লেই কড়া লাগে। ঝিম ঝিম করে মাথা, কড়া তামাকের ধোঁয়া নাকে গেলে যেমনটি হয়।

বাঁ পাশে একটানা চলে-যাওয়া শাল বন। নামেই বন। কতকগুলো শাল গাছ, ঝোপঝাপ ছাড়া আর কিছু নেই। গভীর বন কিছুতেই বলা যায় না। বনের ভেতর জন্তু জানোয়ারের মধ্যে এক শেয়াল ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না; আর পাওয়া যাবে খরগোশ—অসংখ্য খরগোশ। তা ছাড়া বুনো তিতির আর বনফুল ঃ এ দুটি বিখ্যাত এখানে।

বনের ডান পাশে সাপের মতো কাঁকুরে পথ। পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার কল্যাণে ন্যাশনাল হাইওয়েতে রূপান্তরিত হতে চলেছে।

কিছু দূরেই ডুলুং নদী। ছোট্ট মেঠো ঝর্ণার গর্ভে তার জন্ম। তবু তার ওপরেই সাঁকো তৈরী হচ্ছে। তাঁবু পড়েছে সারি সারি। কুলিকামিনের দল ব্যস্ত হয়ে আছে। ফেল্টহ্যাট মাথায় ইন্‌জিনীয়ার-ওভারসিয়ারের দল ছুটোছুটি করছে; এটা ওটা করতে আদেশ দিচ্ছে। সব কিছু মিলে একটা কর্মব্যস্ততা ছাড়া অন্য কোন কথা মনেই পড়বে না এখানে।

অনতিদূরে সাঁওতাল বস্তি আর মাহাতোদের গ্রাম।

দুটি সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করার ফলে বেশ একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। সাঁওতালরা মাটি কাটে, কাজ করে ক্ষেতে-খামারে। মাহাতোরা লাঙল চালায়, ফসল ফলায়।

সেদিন মুর্গী-লড়াই চলছিল।

গোটা শীতকালটা মুর্গীর লড়াই নিয়ে মেতে থাকে এ অঞ্চলের আদিবাসী আর তপশীলী জনতা। প্রত্যেক হপ্তায় বিশেষ একটি নির্দিষ্ট দিনের সকাল-বেলাটা কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হাজির হবে। বেশ মিষ্টি রোদ।

বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশটি পর্যন্ত মুর্গী জুটবে। ডিম পাড়া মুর্গী নয়,—কোঁকর-কোঁ ক'রে গলা ফুলিয়ে ডাকতে পারে, মাথায় আর ঠোঁটের নীচে লাল মাংসল ফুল নাড়তে পারে—আর পারে বাঁধা হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে—এমন মুর্গী।

পায়ে দড়ি বাঁধা মুর্গীগুলোকে মাঠের শক্ত ঘাসের শেকড়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। গলা ফুলিয়ে ডাক ছাড়ছে যথাসম্ভব আত্মগরিমা প্রচার ক'রে। সোনালী রোদ এসে পড়েছে তাদের গায়ে। ঝলমল করছে পালকগুলো। রঙ-বেরঙের পালক। গলায় রঙীন ঝালর। উচ্ছ্রিত পুচ্ছ। রাজমহিমায় দীপ্ত। যাত্রাদলের রাজার পোশাকের মতো পালক।

খানিকটা জায়গা চেঁছে-পুঁছে রঙ্গ-ভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। গোল করে সবাই ঘিরে বসবে ওই জায়গাটিকে। তারপর—রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হবে দু'

ন যোদ্ধা। মুর্গীর পায়ে ঝক্‌ঝকে রালো ছুরি।

পাঁচজনে মিলে আগের থেকেই জোড় ক করে দেয়। যার মুর্গী মরবে অথবা ুটে পালাবে তারই হবে হার। বিজয়ী ুর্গীর পালক-প্রভু বিজিত মুর্গীকে র্পের সংগে নিয়ে যাবে—ঘরে। বলা াহুল্য, মাংসটাকে কাজে লাগানো হবে; সনাকে পরিতৃপ্ত করা হবে।

মোহন টুডু প্রবল পরাক্রান্ত একটি ৃষ্টপুষ্ট দম্ভী মুর্গী নিয়ে অবতীর্ণ হল রঙ্গমঞ্চে। নিজের চেহারাটাও দশাসই। মুকুন্দরামের বর্ণিত কালকেতুর মতো চেহারা। মোহন টুডুর নাম আছে মুর্গী-লড়ুয়ের মহলে। অনেকে বলে, মোহন নাকি সাঁওতালী মন্ত্রতন্ত্র জানে। যার ফলে কোনদিন সে খালি হাতে ফিরে যায় না, জোড়া মুর্গী নিয়েই ফেরে। পারতপক্ষে কেউই মোহনের মুর্গীর সংগে নিজের মুর্গীকে লড়াতে চায় না। জেনে-শুনে কে চায় মান খোয়াতে? মুর্গী যদি হারে তাহলে মাথা নীচু হয়ে যায় মুর্গী-পালকের। মনে হয়, এ পরাজয় তার মুর্গীর নয়, তার নিজের।

এ পর্যন্ত এই বছরেই পনেরটি মুর্গীকে ঘায়েল করে বিজয়ী হয়েছে মোহন টুডুর মুর্গী। 'ঝিঁঝুরিয়া' মুর্গী বল্লে মোহন টুডুর মুর্গীকেই বোঝায়। অঞ্চলসুদ্ধ লোক মোহনকেও চেনে, মুর্গীটাকেও চেনে।

সকালেই হাঁড়িয়া খেয়ে আধ-মাতাল হয়ে এসেছে মোহন। লড়ুয়ে মুর্গীটাকে দুহাতে তুলে ধরে বুক ফুলিয়ে চাঁছা-ছোলা পরিষ্কার জায়গার ওপরে এসে দাঁড়ালো। শেষ শীতের রোদ তার নগ্ন কৃষ্ণ দেহে চিক্‌চিক্ করে উঠলো, যেন কালো পাথরের ওপর আলোর কণা ঠিকরে পড়ছে। জোয়ান চেহারায় অদ্ভুত এক বুনো দীপ্তি। জনমণ্ডলী থেকে একটা চাপা প্রশংসার গুঞ্জন আস্তে আস্তে মাঠের চারধারে হাওয়া হয়ে গেল।

মুর্গীর পিঠে হাত বুলতে লাগলো মোহন। বীরপুচ্ছে টান দিলো আঙুল দিয়ে।

রঙ্গমঞ্চে নামলো হিমল মাঝি। হাতে মুর্গী, গায়ে গেঞ্জি। মাথার চুল জবজব করছে তেলে। হাতের বাঁশি ঝুলছে কোমরে। বাঁশিতে দড়ি বেঁধে পৈতের মতো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে সে। সুন্দর চেহারা, কেষ্ট ঠাকুরের মতো।

হিমলকে দেখেই তার দিকে কট্‌মট্ করে তাকালো মোহন। হিমলও তার ঠোঁটের ডগায় একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়ে তুললো। দুজনেই অগ্রসর হলো দুজনের দিকে সোজাসুজি। তারপর মুর্গী দুটোকে তুলে তাদের ঠোঁটে ঠোঁটে ছুঁইয়ে আবার সরে গেল যে যার এলাকায়।

এ হচ্ছে লড়াইয়ের ভূমিকা।

এবারে দুজনেই ছেড়ে দিলো মুর্গী দুটোকে। ছাড়া পাওয়া মাত্রই মুর্গী দুটো এগিয়ে গেল পরস্পরের দিকে। পায়ে বাঁধা ধারাল ছুরিগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো।

ই-হি রে বেটা আমার— ঃ টান দিয়ে তুলে নিলো মুর্গীটাকে মোহন।

হিমলও তুলে নিয়েছে মুর্গীটাকে; বীরপুচ্ছে টান দিচ্ছে। টান দিলে রাগ বাড়ে।

আবার ছাড়া পেলো দুটি মুর্গী। হিমলের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে নিল মোহন।

হুঁশিয়ার বেটা— ঃ হাঁক ছাড়লো হিমল মুর্গীটার দিকে তাকিয়ে।

হিমলের মুর্গীটা ছুরি দিয়ে মোহনের মুর্গীর ডানার তলায় ঘা দিয়েছে। এর পরে ঘনিয়ে উঠলো যুদ্ধ। মুর্গী দুটো লাফিয়ে উঠে ডানা ছড়িয়ে পরস্পরের পেটে-বুকে, গলায় আঘাত হানবার চেষ্টা করলো। জ্বল জ্বল করে উঠছে হিমল আর মোহনের চোখ—আশায়, আনন্দে, হতাশায়, দুঃখে।

ছোঁ মেরে তুলে নিল মুর্গীটাকে হিমল। মোহনের মুর্গীটা ধুঁকছে। আর বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারবে না হয়তো। ডানার তলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। শেষবারের মতো মোহন তার মুর্গীটাকে উত্তেজিত করতে লাগলো। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে চুমু খেলো একবার।

আবার লড়াই। হিমলের মুর্গীর ঝাপটে হাতিয়ার চালালো অন্য মুর্গীটা। মুর্গীটা ভয় পেয়ে পালাতে চাইলো। মোহন আবার

সাদা দাঁতগুলো আনন্দের আতিশয্যে ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো।

সাবাস বেটা ঃ মোহন টুডু হাঁক পাড়লো।

হিমল ততোক্ষণে তার মুর্গীটাকে ধরে নিয়েছে।

এইবার শেষ। যায় তো যাক্, জেতে তো আমার ভাগ্য।—হিমল বলে।

বেশ ঃ মুখ বিকৃত করে জবাব দিল মোহন।

এবার মরিয়া হয়ে উঠলো মুর্গী দুটি। হিমলের মুর্গীটার ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জয়লাভের কোন আশা নেই। হিমলের সমর্থক দলটি হতাশায় ভেঙে পড়েছে প্রায়। মোহন টুডুর সমর্থকদের মুখে বিজয়ীর হাসি।

ইস্—গ—! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো মোহন।

তার সাধের মুর্গী অন্তিম চীৎকার ছেড়ে লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর। হিমলের মুর্গীর ছুরি তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গেছে।

ছোঁ মেরে তুলে নিল হিমল তার অর্ধ-মৃত মুর্গীটাকে। বিজিত মুর্গীটা ছট্-ফট্ করছে তখনো। বিজয়ী বীরের মতো বুক ফুলিয়ে হিমল রঙ্গভূমি ত্যাগ করলো।

হিমলের একজন সাকরেদ, মোহন মাঝির মরা মুর্গীটাকে তুলে নিয়ে এলো।

মোহনের বহু-বিজয়ী মুর্গীর বিজয়-লাভ করা শেষ হয়ে গেল চিরতরে। কিছু-ক্ষণ পরে হিমলের মুর্গীটাও নিথর হয়ে গেল।

যুদ্ধ কিন্তু শেষ হলো না।

আসল যুদ্ধটা তো মুর্গী-লড়াই নয়! আসলটা অন্য কিছু।

বাঁশী বাজাতে বাজাতে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে হিমল। মরা মুর্গী দুটো হাতে ঝুলিয়ে তার পেছনে চলেছে ছোট একটি দল। হিমলের গানের সাথী ওরা। হো হো করে হেসে উঠলো দলটা—হঠাৎ মোহনকে দেখে। মোহন ফিরে যাচ্ছিল শূন্য হাতে, একা।

ভ্রূকুটি করলো মোহন। হাতের পেশী-গুলো হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠলো তার। হিমলের দলটাকে একাই সে দেখে নিতে পারে।

একটা মরা মুর্গীকে দুহাতে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল হিমলের সঙ্গীরা। বোধ হয় বোঝাতে চাইল মোহনকে যে, তাকেও এমনি করে তারা ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতে পারে।

অপমানটা হজম করতে পারলো না মোহন। আজ এখানে হেরে গেলে কুঙারীর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না সে। একে তো কুঙারী তাকে গ্রাহ্যই করতে চায় না তার গায়ের জোরটাকে শুধু সমীহ করে চলে। সেদিন শালবনের পাশে একা পেয়ে কুঙারীকে জড়িয়ে ধরেছিল সে। কুঙারী এক ঝটকায় দূরে ঠেলে দিয়েছিল তাকে। তারপর ইস্—রে বলে খিলখিল করে হেসে ছুটে পালিয়েছিল। কুঙারী তাকে ভালোবাসে কি না—একথা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি মোহন। কুঙারীকে দেখলেই তার দেহের সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে একটা পিণ্ডের মতো হয়ে যায়। এমন জোয়ান লোকটাও দুর্বল হয়ে পড়ে।

আর হিমল।

মোহন জানে, হিমল কুঙারীকে বাঁশী বাজিয়ে শোনায়। কুঙারী গান গাইলে সুরে তান মিলিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দেয় সে।

পাশাপাশি গাঁ। ও গাঁয়ের মেয়ে রূপ-কুমারী। সবাই ডাকে কুঙারী বলে। আগুনের ফুল্‌কির মতো যৌবন নিয়ে সারা গাঁ ময় ছুটে বেড়ায় সে। এ পর্যন্ত কেউই মন পায় নি তার। কুঙারী কিন্তু জানে, তার মন পেয়েছে দু'জন। এক মোহন আর দুই—হিমল।

মোহনকে দেখলেই কুঙারীর দেহ চঞ্চল হয়ে ওঠে আর হিমলকে দেখলে তার মন বনের ময়ূরের মতো নেচে ওঠে।

কুঙারীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দু'জনেরই আছে।
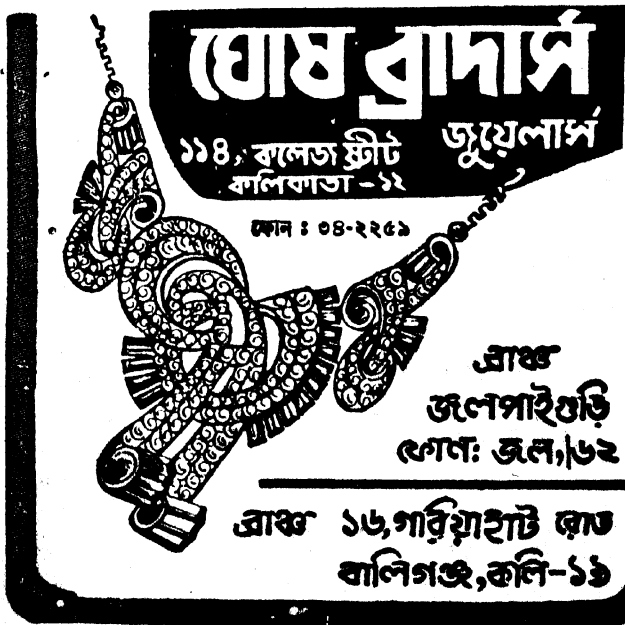
হিমল স্বপ্ন দেখে—সে বাঁশী বাজাচ্ছে আর কুঙারী নাচছে তালে তালে।

মোহন স্বপ্ন দেখে—সে দৃঢ় আলিঙ্গনে বিস্রস্তবাসা কুঙারীর দেহটাকে পিষে ফেলছে আর কুঙারী সমস্ত চেতনা হারিয়ে কাদার দলার মতো নরম হয়ে যাচ্ছে।

কুঙারীও স্বপ্ন দেখে—হিমল বাঁশী বাজাচ্ছে আর নাগড়ায় ঘা দিচ্ছে মোহন।

আশ্চর্য! কুঙারী দু'জনকেই চায়। মোহন আর হিমল তার কাছে যেন আধ-আধখানা মানুষ। গোটা একটা মানুষ কেউই নয়।

দু'জনেই কুঙারীর কাছে এলে নিজেদের দুর্বল মনে করে।

সেই কুঙারীর কাছে মুখ দেখানো যাবে না, মোহন যদি অপমানটা হজম করে।

আজ। একে তো হিমলকে চোখে
তে পারে না সে। তা'র প্রতি-
ন্দ্বিতাকে বিলুপ্ত না করে দিলে
ছুটতেই স্বস্তি পাবে না সে। আজই
য় করে দিতে হবে তা'র দম্ভ।

বেড়ে হাসছিস যি—? আমার
ঝাঁরিয়াটা মরল বলে?—মোহন
াচ্ছিল্যের সংগে জিজ্ঞেস করে।

হাসব নাই ত কাঁদব নাকি! না তুকে
রি? হিমলের দলীয় কেউ একজন
ম্পান কাটে।

কি বুললি? কটমট করে তাকায়
াহন।

আঃ কি হচ্ছে তুদের। হিমল ধমক
য় তা'র সংগীদের।—যেতে দে না
াস্তার লোককে, রাস্তায়। বলেই—
শীতে ফুঁ দিল।

মাথা ঠিক রাখতে পারলো না মোহন।
শেষ ক'রে হিমলের বাঁশীটার ওপরই
ার রাগ বেশী। ওই বাঁশীটাই তো যাদু
রে রেখেছে কুণ্ডারীকে। বাঁশী শুনলেই
াপের মতো মুগ্ধ হয়ে যায় মেয়েটা।

হঠাৎ কোত্থেকে কি হয়ে গেল। এক
টকায় হিমলের হাত থেকে বাঁশীটা কেড়ে
য়ে মড়াৎ করে ভেঙে ফেললো মোহন।
ংগে সংগে হিমলের একটা ঘুষি এসে
াগলো মোহনের নাকে।

তারপরেই খণ্ড প্রলয়। শালবনের
রে সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে চুলোচুলি,
াতাহাতি, আঁচড়াআঁচড়ি শুরু হয়ে গেল।
াহন একা, তা'র বিরুদ্ধে জনপাঁচেক।
বু-ও মোহনকে কাবু করা সম্ভব হয়নি
ট্ করে।

হিমলের বাঁ হাতটা মুচড়ে দিয়েছে
াহন। একজনের তলপেটে লাথি মেরে
সিয়ে দিয়েছে। অর একজন ঘুষি
খয়ে কাৎরাচ্ছে।

মাথার ওপরে সিং বোঙা, নীচে ধরতি
াতা, মনের মধ্যে রূপকুমারী।

মোহন মরিয়া হ'য়ে এলোপাথাড়ি
াথি ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছে। এক ফাঁকে
খন সরে গিয়ে একটা পাথর কুড়িয়ে
পলো হিমল। ডান হাতে পাথরটা তুলে
াক্ করে সজোরে ছুঁড়ে মারলো সে।
াথরটা এসে লাগলো মোহনের মাথায়।
াগে সঙ্গে এক ঝলক রক্ত ফিনকি দিয়ে
উঠে গেল আকাশের দিকে। যন্ত্রণায়

চীৎকার করে বালির ওপর লুটিয়ে
পড়লো মোহন হতচেতন হয়ে।

পালা, পালা, পালা সব। ছুটতে
ছুটতে হিমলের দলটা অদৃশ্য হয়ে গেল
শালবনের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত মধু সাঁওতালের জংলী
শেকড়ের গুণে বেঁচে উঠলো মোহন।

বার বার খোঁজ নিতে গিয়েছে
কুণ্ডারী, মোহন কেমন আছে। মোহনকে
দেখে ফেরবার পথে কোন কোন দিন
হিমলের সংগেও দেখা হয়েছে পথে।

হিমল বলেঃ কি গ, বাঁচল তুর
মোহন?

কুণ্ডারী মুখ ভেংচায়। বলে, বাঁচবেক
নি কেনে। উ মরলে ত তুর মনটায়
খুশী হবে। তক্ষুণি কথা ঘুরিয়ে অন্য
কথায় এসে যায় কুণ্ডারী। বলে,—আজ
সাঁঝে তুর বাঁশী শুনবো—উই শালগাছের
তলায়, কেউ জানতে পাবেক নি। বলেই
দ্রুতকটাক্ষপাত ক'রে ছুটে পালায়
কুণ্ডারী।

কেউ কিছু মনে করে না। কুমারী
মেয়ের ভালোবাসার লোক থাকবে এতে
আপত্তি করবার কি আছে! সবাই জানে,
একদিন না একদিন হয় মোহন, নয়
হিমলই কুণ্ডারীকে বিয়ে করে ঘরকন্না
পাতবে। তখন কোথায় খুঁজে পাওয়া
যাবে এই চপলা চঞ্চলা প্রেমবিহ্বলা
কুণ্ডারীকে। তা'র পরিবর্তে পাওয়া যাবে
আর এক কুণ্ডারীকে, যে স্বামীর জন্য
পান্ত ভাত নিয়ে যাবে মাথায় করে হাঁড়ি-
ভাঙার মাঠে—যেখানে ঘোষবাবুরা মাটি
কাটায় ইঁট তৈরীর জন্য। যে-কুণ্ডারী
তখন ক্ষেতে-খামারে-বনে-জংগলে স্বামীর
সংগে ঘুরে বেড়াবে স্বামীর কাজের
অংশীদার হয়ে। কুটুম বাড়িতে যেতে
হলে যে কুণ্ডারী আগে আগে চলবে
'হাঁড়িয়া'-র হাঁড়ি মাথায় করে; পেছনে
থাকবে স্বামী, কাঁধের ওপর লাঠির ডগায়
পুঁটলি বেঁধে।

বসন্তের হাওয়ায় শালবনে ফুল
ফুটলো। সন্ধ্যের দিকে যখন দক্ষিণ
বাতাস মাথা নাড়ে, শালফুলের গন্ধে ভরে

যায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। দূরের পাহাড়ে আগুনের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে— পলাশ গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা দিল। মহুয়ার সোনালী ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়লো পথে প্রান্তরে।

সাঁওতাল পাড়ায় বেজে উঠলো মাদল-কাঁসি নাগড়া।

শালোই পূজোর সময় এসে গেছে।

প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামের পাশেই 'শালোই থান' থাকে। জঙ্গলের ধারে অথবা গাঁয়ের পাশে একটা জায়গায় রক্ষিত থাকে কয়েকটি বৃহৎ শালগাছ—ঃ বৃক্ষ-দেবতা। ঘটা করে পূজো হয় ওখানে। মুর্গী বলি হয়; পাঁঠা বলি হয়। ফুল-সিঁদুর-তেল-হলুদ দিয়ে গাছের গোড়ায় পূজো করে পাহান—সাঁওতালদের পুরোহিত।

দোলপূর্ণিমার দিনে শালোই পূজো হ'লো। এ গাঁয়ের শালোই থানের মহিমা আছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু সাঁওতাল জড়ো হয় এখানে প্রতি বছর। নাচে-গানে-মাদলের তানে, নাগড়ার গর্জনে গমগম করে ওঠে জায়গাটা। মেলা বসে যায়। সন্ধ্যের দিকে দোকান-পাট উঠে যায়, থাকে সাঁওতাল ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ীর দল। ছোকরারা উন্মাদ হয়ে মাদল বাজায়, বাঁশী বাজায়, নাগড়া বাজায়। মেয়েরা তালে তালে পা ফেলে নাচে আর গান গায়। খোঁপায় গোঁজা শালফুল জ্যোছনা রাতে হাসতে থাকে কালোচুলের কোল ঘেঁষে।

মোহন খুঁজছিল কুঙারীকে। কোথায় গেল কুঙারী! কোন নাচের দলেই পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। মোহন নাগড়া বাজাচ্ছিল। কিন্তু চোখ ছিল অন্যদিকে। কুঙারীকে যে-কোন উপায়ে চাই তার। না হয় টেনে নিয়ে যাবে তাকে বিয়ে করার জন্য। হরণ ক'রে বিয়ে করাতেই তো চরম বীরত্ব। কিন্তু কোথায় গেল সে!

খুঁজতে খুঁজতে বিভিন্ন নাচের দলে উঁকি দিয়ে গেল। একটা দলে হিমল বাঁশী বাজাচ্ছে। আশ্চর্য, কুঙারী সেখানেও নেই।

মাতাল হয়ে নাচছে সকলে। কিন্তু মাতলামী নেই। সুশৃংখল নাচের তালে তালে সুন্দর একটি প্রশান্তি। মোহন কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার শিরায় বসন্তের আগুন। এতোদিন ধরে যা' পাওয়া যায় নি, তাই-ই পেতে হবে আজ। এমন কি, প্রাণ দিয়েও পেতে হবে। কুঙারীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে সে। সাঁওতাল সমাজে এমন রাক্ষস-বিবাহের প্রথাই তো গৌরবের। কিন্তু কোথায় কুঙারী!

হিমলের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে এখানেও সে ফণা দোলাচ্ছে না তো?

ডুডুম্-ডুডুম্-ডুডুম তাং—, তাং ডুডুম্ ডুডুম্ তাং—। নাগড়া আর মাদল। সঙ্গে কাঁসিও বাজছে তালে তালে।

সাঁওতাল মেয়েদের পা'গুলি তালে তালে এগুচ্ছে আর পিছিয়ে আসছে।

মোহন তীব্রদৃষ্টিতে প্রত্যেকটি দলের মধ্যে চোখ চালিয়ে দেয়। কোথাও নেই। কুঙারী কি গাঁয়ে ফিরে গেছে?—না, রাতে গাঁয়ে ফিরে যাওয়া নিয়মের বাইরে।

তবুও একবার দেখে আসা দরকার। আধ মাইল তফাতে গ্রাম। নিঝুম নিঃসাড়। খড়ো চালের ওপর চাঁদের আলো। রাস্তায় চালের ছায়া। একটা কুকুর ঝিমুচ্ছে। সাড়া পেয়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো একবার। তারপর মোহনকে দেখে আবার ঝিমুতে লাগলো।

কুঙারীর বুড়ী মা দাওয়ায় পড়ে আছে। মোহনের পায়ের শব্দে চকিত হয়ে বল্লো—কে?

আমি মোহন। কুঙারী কুথা?

কুঙারী? কেনে উ যায় নাই শালোই থানে? বুড়াও অবাক হয়। বলে, উ ত ঘুরে আসে নাই। উখানেই নাচছে। আমিও সনঝের দিকে ফিরেছি। গতরটা খারাপ লাগছে।

হতাশ হ'য়ে ফিরলো মোহন। আবার খুঁজলো চারদিকে।

হিমলের দলে এসে দেখলো, হিমল নেই।

জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে মোহন ক্ষোভে, দুঃখে, উত্তেজনায়, রাগে, বুনো মোষের মত ভয়ংকর হয়ে উঠছে ক্রমশ।

এগিয়ে গেল আনমনা হয়ে মরা পুকুরটার দিকে। জঙ্গলের পাশেই মাহাতোদের ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝখানে মরা পুকুর। পুকুর থেকে একটা নালি বেরিয়ে গেছে। বর্ষার সময় ওই নালার বুক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়।

হিমলও খুঁজছিল কুঙারীকে। কিন্তু মোহনের মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি সে।

কুঙারীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

ভোরের দিকে ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইলো। টুপটাপ্ করে ঝরে পড়লো মহুয়ার ফুল। বাড়ির দিকে ফিরছে সবাই।

হিমল এগিয়ে গেল মরা পুকুরটার দিকে। নালার দিকে তাকিয়ে দেখলো মোহন টুডু কি যেন দেখছে। দূরের থেকে হিমল দেখলোঃ কে যেন পড়ে আছে নালায়। এগিয়ে গেল কৌতূহল নিয়ে। কে ওখানে?

মোহন দেখছে দাঁড়িয়ে। নিস্তব্ধ নির্বাক হ'য়ে।

পড়ে আছে রূপকুমারী। মরে নীল হয়ে গেছে। একপাশে একটা রক্তাক্ত মাংস পিণ্ড। ভালো ক'রে না দেখলে নর-শিশু ব'লে চেনার উপায় নেই। তখনও অর্ধ-গঠিত। তবে কি, হিমল—!

হিমলও দেখলো। দেখে থমকে দাঁড়ালো। তবে কি মোহন—!

দু'জনেই দু'জনের দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকালো। দু'জনের দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রশ্ন। কেউ কারুর দিকে এগিয়ে গেল না যুদ্ধবাজ মোরগের মতো।

দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'জনেই এগিয়ে গেল। মুর্গী-লড়ায়ের আসরে দু'জনেই হেরে গেছে।

দি গ্লোব নার্শরী

প্রদর্শনী গৃহ—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (টাওয়ার ব্লক) কলিকাতা।

—গ্লোব নার্শরীর উৎকৃষ্ট বীজ—

—সবে মাত্র আমদানী হইয়াছে—

নাম — আউন্স

বাঁধাকপি

নাম	আউন্স
গ্লোব গ্লোরী	২৷৷০
মাউণ্টেন হেড	২৷৷০
নারিকেলি	২৷৷০

ফুলকপি

নাম	আউন্স
স্নোবল লেট	৯৲
স্নোবল আর্লি	৯৲
গ্লোব বেটার	৪৲
প্রাইজকুইন	৩৲
ওয়ালচিরাণ	৩৲
কাশীর জলদি ও নাবি	২৲

ওলকপি

নাম	আউন্স
লাল ও সাদা	১৲

বীট

নাম	আউন্স
লাল গোল	১৲
ইজিপসিয়ান	১৲
ইক্লিপস	১৲

গাজর

নাম	আউন্স
লং অরেঞ্জ	১৲
অক্সহার্ট	১৲
রাক্ষুসে	১৲

শালগম

নাম	আউন্স
সাদা	১৲
লাল	১৲
রাক্ষুসে	১৲

লেটুস

নাম	আউন্স
বিগবোষ্টন	১৷৷০
টমথাম্ব	১৷৷০
বারমেসে	১৷০

লঙ্কা

নাম	আউন্স
চাইনিজ জায়েণ্ট	২৲
পাটনাই	৷৷০
সূর্য্যমণি	২৲
কামরাঙ্গা	১৲

মূলা

নাম	আউন্স
বোম্বাই ১নং (সের ১২৲)	৷৷০
কাঁথির (সের ৬৲)	৷/০
লাল লম্বা, সাদা লম্বা	৷৵০
লাল গোল	৷৷০
চাইনিজ রোজ	৷৷০
রাক্ষুসে (জাপানি)	১৷৷০
নেপালের	৷/০
রামজিৎ	৷/০
মগরী	৷৷০

বেগুন

নাম	আউন্স
মুক্তকেশী	১৲
কুলি	১৲
বারমেসে	১৲
মাকড়া	১৲
রামনগর	২৲
৴৬ সেবা	৩৲
ব্ল্যাক বিউটী	২৲

পেঁয়াজ

নাম	আউন্স
রাক্ষুসে	১৷৷০
আর্লিরেড	১৷৷০
বোম্বাই (সের ৮৲)	৷৵০
পাটনাই (সের ৮৲)	৷৵০

মটর

নাম	আউন্স
ওলন্দা (সের ৫৲)	৶০
দার্জ্জিলিং (সের ৩৲)	৶০
আমেরিকান (সের ৫৲)	৶০

বীন ফ্রেঞ্চ

নাম	আউন্স
লাল (সের ৩৲)	৶০
সাদা (সের ৩৲)	৶০
হলদে (সের ৩৲)	৶০

সয়াবীন

নাম	আউন্স
পুষ্টিকর (সের ৩৲)	৶০

টম্যাটো

নাম	আউন্স
এক্সিলেণ্ট	২৲
ম্যাচলেশ	৸০
লার্জ রেড	৸০
পারফেকসন	২৲

খরমুজা

নাম	আউন্স
লক্ষ্ণৌ	৷৷০
রাক্ষুসে	১৷৷০
সর্দা	১৷৷০

খেঁড়ো

নাম	আউন্স
বীরভুমের	১৲

তামাক

নাম	আউন্স
হিংলী	১৲
মতিহারী	১৲
আমেরিকান	২৲

তরমুজ

নাম	আউন্স
রাক্ষুসে	১৲
আইসক্রিম	১৲
গোয়ালন্দ	৷৷০
ভাগলপুর	৷৷০

পাম্‌কিন

নাম	আউন্স
রাক্ষুসে	১৷৷০
ক্রুকনেক	১৲
ম্যামথ কিং	১৷৷০

রাই

নাম	আউন্স
চাইনিজ	৷৷০

পেঁপে

নাম	আউন্স
রাঁচি	৪৲
লঙ্কাদ্বীপ	৪৲
সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্গালোর	৪৲
বোম্বাই	১৲
আফ্রিকান ওয়াণ্ডার	৮৲

স্কোয়াস

নাম	আউন্স
রাক্ষুসে	২৲
ম্যারো	১৲
বুস	২৲

সিলেরী

নাম	আউন্স
সাদা, লাল	১৷০

সীম

নাম	আউন্স
আলতাপাটী	৷৷০
সবুজ	৷০
সাদা	৷৷০
হাতিকান	৷৷০

নাম	আউন্স
উচ্ছে	৷৵০
করলা দেশী বড়	১৲
কাঁকুড়	৷০
কাঁকড়ি	২৲
কুমড়া মিষ্টি	৷০
খেঁড়ো	১৲
গুড়মি (কাচরা)	৷০
চিচিঙ্গা	১৲
চালকুমড়া	৷০
ঝিঙ্গা পালা	৷৷০
টেঁপারী	২৲
ঢেঁড়স	৷৵০
ধুন্দুল	৷০
ফুটি	৷০
বরবটি	৷৷০
লাউ লম্বা	৷৷০
লাউ গোল	৷৷০
শশা পালা	১৲
ঐ ভুয়ে	১৲
ঐ আমেরিকান	২৲
শাঁক আলু	৷০
শাক পালম (সের ৩৲)	৶০
ঐ ঝাড় পালম	৶০
ঐ টক পালম	১৲
ঐ কাটোয়ার ডাঁটা	১৲
ঐ চাঁপানটে	৸০
ঐ পদ্মনটে	৷৷০
ঐ লাল শাক	৷৷০
ঐ কনকানটে	৷৷০
ঐ পুঁইশাক	৷৷০
দূর্বা ঘাস পাউণ্ড	৩৷৷০
বেড়ার বীজ পাউণ্ড	২৷৷০

আলু ও পটল মূল্যের জন্য কার্তিক মাসে লিখিবেন।

মরশুমী ফুলবীজ ১২ রকম ১২ প্যাকেট—

গারো উপজাতির দেশে

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

গারো, খাসী-জয়ন্তিয়া, লুসাই, মিকির-উত্তর কাছাড় এবং নাগা পাহাড়—এই পাঁচটি আসামের স্বায়ত্ত-শাসিত পার্বত্য জেলা। প্রত্যেকটি এলাকাই বিভিন্ন আদিবাসীদের বাস-ভূমি। এই কয়টি জেলার মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে সব থেকে ভাগ্যবান গারো পার্বত্য জেলা, আবার এই অঞ্চলের বাসিন্দারাই অন্য উপজাতিদের তুলনায় সব থেকে বেশি গরীব। দেশবিভাগের ফলে নতুন আন্তর্জাতিক সীমারেখার বাধা গারো, খাসী-জয়ন্তিয়া এবং লুসাই পাহাড়ের উপজাতিদের জীবনে বহু বিপর্যয় নিয়ে এসেছে কিন্তু গারোদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সংকটের গভীরতাই সব থেকে বেশি।

গারো পাহাড় এলাকার উত্তরে ও পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জেলা, দক্ষিণে ময়মনসিংহ এবং পূর্বে খাসী পাহাড়। আয়তন তিনহাজার বর্গমাইলের কিছু বেশি। '৫১ সালের জনগণনায় লোকসংখ্যা দুলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার—প্রায় সবই গারো উপজাতির লোক। কামরূপ, গোয়ালপাড়া, খাসী-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বহু গারোর বাস এবং ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত অঞ্চলে বহু গারো গ্রাম গড়ে উঠেছিল। '৪৯-'৫০ সালের গোলযোগ ও জবরদস্ত পাকিস্তানী শাসনের উপদ্রবে অধিকাংশ গারোদের আর পাকিস্তানে থাকা সম্ভব হয়নি, সীমান্ত অতিক্রম করে বাস্তুহারা গারো ভারতবর্ষে চলে এসেছে।

গারোদের দেশ পাহাড়ে ঘেরা। সব থেকে বড় শৈলশ্রেণী উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত। সাড়ে চার হাজার ফিট উচ্চ নোকরেক শৃঙ্গ এই পাহাড়ের সব থেকে উঁচু শিখর এবং গারো পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশ। সোমেশ্বরী নদীর পূর্বে কৈলাস এবং প্রায় খাসী পাহাড়ের সীমান্তে বলপাকুরম আর দুই উঁচু শিখর। গারো পাহাড় অঞ্চলের শাসন-কেন্দ্র তুরার পাঁচ মাইল উত্তরে অনুন্নত আরবেলা শৈল শ্রেণী। এদেশে বড় কোনও নদী নেই। সব থেকে উল্লেখ-যোগ্য নদী সোমেশ্বরী বড় স্রোতস্বিনী মাত্র। নোকরেক শিখরে তার জন্ম এবং আরবেলা পর্বত ও রঙ্গাদি উপত্যকার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের গা কেটে পথ করে সুসঙ্গ পরগণায় এসে সোমেশ্বরী সমতলভূমিতে পড়েছে। পাহাড়ের পথে নদীতে নৌকা চালানো অসম্ভব। নদী পারাপারের জন্যে বর্ষাকালে গারোরা বেতের ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করে। তবে, নির্মাণকলায় আবর সেতুর তুলনায় এ অনেক নিম্নস্তরের। পাহাড়ের গা বেয়ে নদী যেখানে সমতলভূমিতে নেমেছে সে

সন্তান সহ গারো কৃষক রমণী
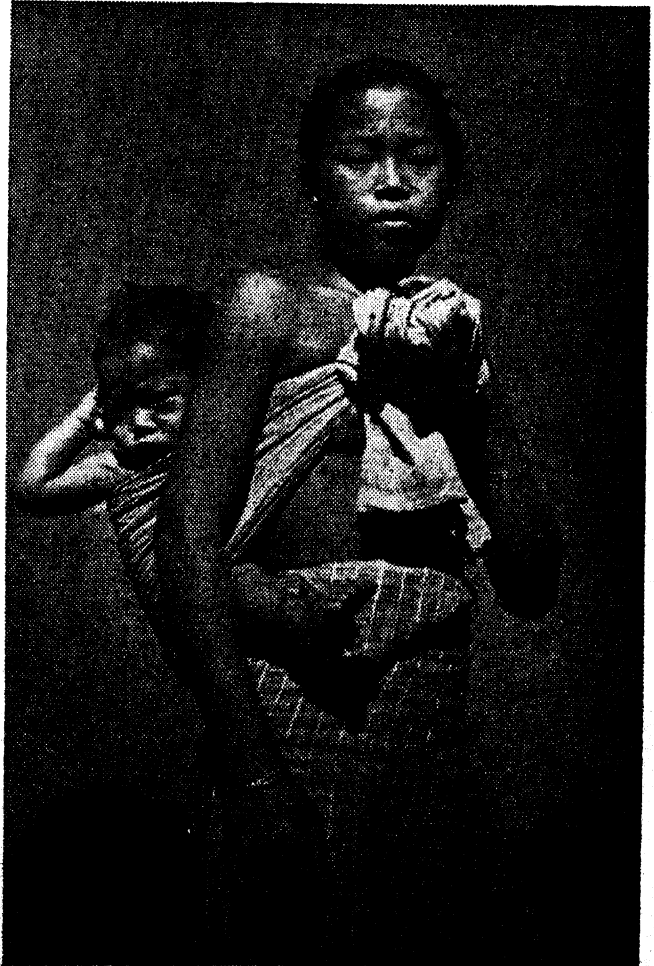
হাটুরে গারো কৃষক

অঞ্চলের গারোরা নৌ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

গারো পাহাড়ে অনেক রকম খনিজ সম্পদ আছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচুর কয়লা এবং চুন পাথর পাওয়া যায়। সিমেণ্ট তৈরির কারখানাও এখানে গড়ে তোলা সম্ভব। অতীত যুগে এবং বর্তমান সময়েও ঝুম প্রথায় চাষবাস করায় অমূল্য বনসম্পদ অযথা অকারণে নষ্ট হয়েছে। তা সত্ত্বেও গারো পাহাড়ে বিরাট শালবন আছে। বাঁশ, বেত, ছন ও অন্যরকম ভাল কাঠ যথেষ্ট পাওয়া যায়। ২৯ হাজার একর জমিতে তুলোর চাষ হয়। তুলো চাষের উপযোগী আরও বিস্তৃত কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। সরষে, পাট, কমলা-নেবু, আনারস প্রভৃতিও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তা সত্ত্বেও গারোদের দেশে অভাব, অন-টনের চিত্র চারদিকেই চোখে পড়ে। স্থানীয় নেতাদের মত যে যাতায়াত ব্যবস্থার অবিলম্বে উন্নতি প্রয়োজন। রেল পথ দিয়ে গারো পাহাড়কে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযুক্ত না করতে পারলে ধরিত্রীর বুক থেকে কোনও খনিজ সম্পদকেই কাজে লাগান যাবে না। হিসেবপত্র করে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, রেলপথ তৈরি হবার ৫-৭ বছরের মধ্যেই ৫ লক্ষ টন মালপত্র প্রতিবছর পরিবহন করার মত অবস্থা হবে। তিন লক্ষ টন কয়লা আসামের শিল্প-প্রসারের পথেও সহায়ক হবে। সম্প্রতি ভারত সরকার এ সম্বন্ধে কিছু করবেন বলে মনস্থ করেছেন। অতীতে বহু দরবার করে গারো নেতা ও আসাম সরকার কেবল ব্যর্থকাম হয়েছেন বলে প্রতিশ্রুতির উপর তাঁরা আর বিশেষ ভরসা করেন না।

দেশ বিভাগের পর ব্যবসা বাণিজ্যের পুরাতন পথ সমস্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আগে জঙ্গলের কাঠ থেকে আরম্ভ করে অনারস, পান, মরিচ প্রভৃতি ময়মনসিংহ জেলার হাটে বিক্রী হত। আবার সমতল-ভূমি থেকে চাল, শুকনো মাছ, হাঁস মুরগি, কাপড়, সরষের তেল প্রভৃতি গারোদের দেশে আসত। আগেকার হিসেবে এখন লেন-দেন হয় খুব কম। ভারতবর্ষের অন্যত্র এসব জিনিস বিক্রী করা সম্ভব কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য, মোটরের বেশি ভাড়ার হার প্রভৃতি কারণে ব্যবসা এ দিকেও ভাল করে গড়ে উঠতে পারে নি। নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও দাম কমে গিয়েছে এবং বাইরের থেকে অতি প্রয়ো-জনীয় খাদ্য ও পরিধেয় আমদানি করতে অনেক বেশি দাম দিতে হচ্ছে। ফলে উপজাতির অতি প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনীতি বিপর্যস্ত, দারিদ্র্য তার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় জীবন-ধারার উৎসকে বহু পরিমাণে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামত, দ্বেষ, বিদ্বেষও গারো জীবনে নতুন বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। অগ্রসর, বুদ্ধিমান মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারা আদি-বাসীদের জীবনে কোথাও শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি, উপরন্তু আরও নতুন এবং গভীরতর অশান্তির বীজ বপন করেছে। বহু উপজাতি অধ্যুষিত আসাম রাজ্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র-নায়কগণকে একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে। গারো জাতির জীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানের প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রকে করতে হবে। ব্যর্থ আক্রোশে রাজনৈতিক কলহ-বিবাদের আবর্তের মধ্যে গেলে, তাতে অকল্যাণের আশঙ্কাই বেশি। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য জেলায় একটি নির্বাচিত পরিষদ আছে। উপজাতিদের চিরাচরিত প্রথা

অনুযায়ী এই পরিষদ দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজকর্ম দেখাশোনা করে। কাগজে কলমে যে ক্ষমতাই থাকুক না কেন গারো পাহাড়ে শিক্ষিত অধিবাসীদের ধারণা যে এ অধিকার অতি সীমিত এবং মূল সমস্যার সমাধানে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। সীমানা নির্ধারণ কমিশনের সামনে এ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

এই অঞ্চলে আলাপ আলোচনায় শুনলাম যে সরকারী কর্মচারীদের মালপত্র বইবার জন্যে গ্রামের নোকমার (মাতব্বর) উপর আদেশ জারি করা হয় মুটে সরবরাহ করার। শিক্ষিত গারো যুবক আজ এভাবে কুলি সংগ্রহের ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে সরকার স্থায়ী এক শ্রমিক বাহিনী নিয়োগের কথা চিন্তা করছেন। এইরকম ছোটখাটো আরও বহু জিনিস আছে যাতে আদিবাসীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে এবং আমরা যদি নিজের আচরণ সম্বন্ধে একটু সচেতন হই, তাহলেই এরকম বহু অঘটন ঘটে না।

গারো উপজাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। গারো পাহাড়ের পশ্চিম পর্বতমালা এবং মধ্যভাগের অনুচ্চ শৈলশ্রেণীর সানুদেশের নিবাসী আবেঙ্গ শাখা সংখ্যায় গারো উপজাতিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। এ ছাড়া আতঙ্গ, আকাওয়ে, চিয়াস্ক, দুয়াল, মাঘি, মাতজানচিস, কোঘু, অতিআগ্রা প্রভৃতি আরও বিভিন্ন বিভাগের সন্ধান পাওয়া যায়। আসামের অন্য আরও উপজাতিদের মতই গারোরা কখন, কিভাবে, কোন স্থান থেকে বর্তমান আবাসভূমিতে এসেছে তার কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। পণ্ডিতদের মতে গারোরা বোড়ো আদিম জাতির এক শাখা এবং বর্তমানে স্বতন্ত্র উপজাতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রতিবেশী খাসীদের থেকে গারোদের রং কালো। শারীরিক গঠনভঙ্গী অনুযায়ী গারোরা তিব্বত-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

গারো রমণী

গারো নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও মতাভেদ আছে। পার্বত্য এলাকার দক্ষিণ অঞ্চলে সোমেশ্বরী ও নিতাই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গারা বা গানচিঙ্গ নামে গারো উপজাতিদের এক শাখার বাস। এ অঞ্চল ময়মনসিংহ জেলার সংলগ্ন। সম্ভবত গারোদের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে সভ্য মানুষের প্রথম যোগাযোগ এইখানেই ঘটে। বহিরাগতেরা শাখা-জাতির নামে সমস্ত উপজাতির নামকরণ করেছে। আবার অনেকে বলেন যে, তিব্বতের আদি বাসস্থান থেকে আসার পথে অভিযাত্রিদলের অন্যতম নেতার নাম ছিল গারু। তাঁরই নামে গারোদের নামকরণ হয়েছে। নিজেদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গারো নামের ব্যবহার উপজাতিরা কিন্তু করে না। তাদের ভাষায় তারা হচ্ছে আচিক (পাহাড়ী), মাণ্ডে (মানুষ) অথবা আচিক মাণ্ডে (পাহাড়ী মনুষ্য)।

কর্নেল প্লেফেয়ার গারো উপজাতিদের সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বহুদিন আগে লেখা হলেও তাঁর বই গারোদের সম্বন্ধে আজও সব থেকে প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি গারোদের আদিবাসস্থান তিব্বতের তরুয়া প্রদেশ থেকে আসার সম্বন্ধে এক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। জাপ্পা-জালিনপা ও সুকপা-বাঙ্গপার নেতৃত্বে এক দল অতীতে কোনও এক দিনে নতুন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। অভিযাত্রী দল রাঙ্গামাটি হয়ে ধুবড়ীতে আসে কিন্তু স্থানীয় রাজা ধোবানী তাদের বসবাস করায় অনুমতি দিলেন না। আবার
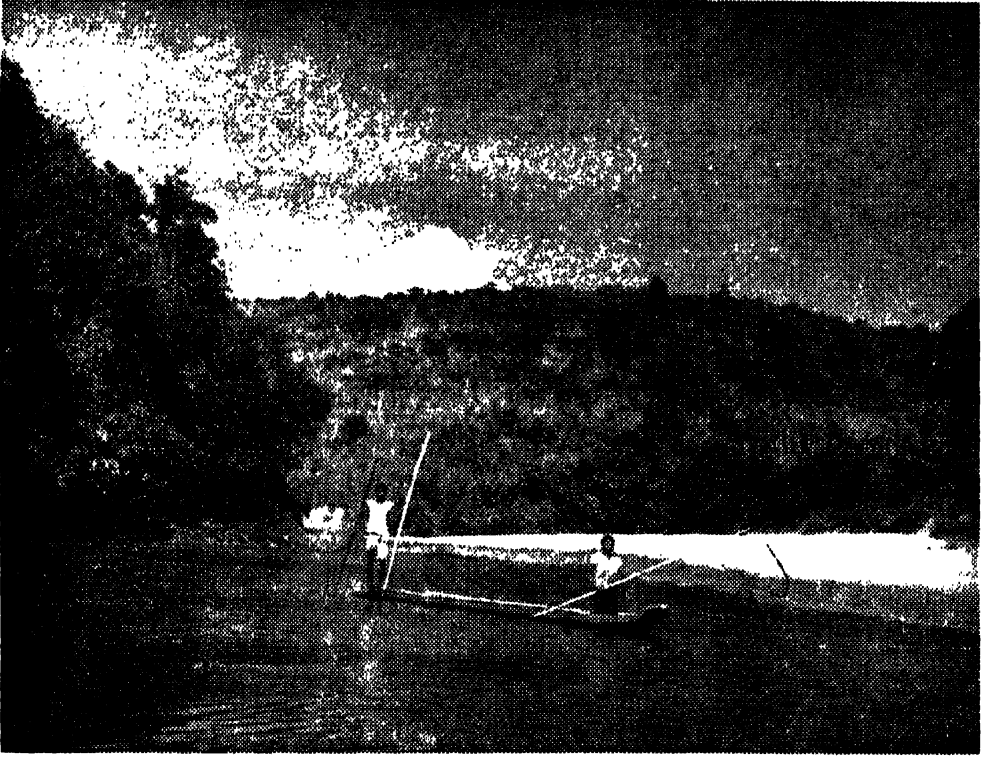
সোমেশ্বরী নদীতে গারো দম্পতী নৌকো বইছে

যাত্রা শুরু হল। এবার পথে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হলো। মানস নদীর ধারে এক রাজা তাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে এবং কিছুদিন বন্দী অবস্থাতেও কাটাতে হয়। এমনি বহু দুঃখ, কষ্ট ভোগ করে গারোরা তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে এসেছে। গারো কাহিনীতে ইয়াক সুপরিচিত জন্তু, অথচ ইয়াক তারা কখনও দেখেনি। পুরাতন এক গাথায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সোংগদু নদীর উৎপত্তিস্থান থেকে এদেশে এসেছে। গারো ভাষায় সোংগদু অর্থ ব্রহ্মপুত্র।

গারো দেশে প্রথম যখন যাই তখন হাজং গ্রাম লেংগুড়া থেকে সোমেশ্বরী নদীর ধার দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হয়েছিল। সেদিন অবশ্য হাজং ও গারো এলাকার মাঝে দুই দেশের দুর্লংঘ্য বাধার প্রাচীর গড়ে উঠে নি। আসাম ও বাংলার সীমারেখা কোন্ দিক দিয়ে গিয়েছে তা জানতে সাধারণ যাত্রীর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না। বহুদূর পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে প্রথম গ্রামের সীমারেখার কাছে পেঁছিলাম। সামনে বিস্তৃত কাঁঠালবাগান। তার মাঝখান দিয়ে ছোট সরু পায়ে হাঁটা পথ। ছোট পাহাড়ে ঝরণা ঝিরঝির করে বয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে ফাঁপা বাঁশের নল দিয়ে জল নিয়ে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে। তারই নিচে বসে গারো তরুণী পরমানন্দে স্নান করছিল। আগন্তুকের দলকে দেখে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়! সেইখানে এক বৃদ্ধাও ছিলেন। আমাদের পরিচয় পাবার পর তিনি আবার তরুণীকে ডেকে নিয়ে এলেন। অঙ্গাবরণ ও বস্ত্রাভরণের আধিক্য বড় বেশি করে চোখে পড়ল। গারো মেয়েদের চিরাচরিত বস্ত্র রিকিঙ্গ কোমরকে পেটিকোটের মত বেষ্টন করে পরতে হয়। অনেক সময় নীল ও শাদ তুলোর শাল দিয়ে উপরের অংশ আবৃ করে। তবে, বাঙালী ও অসমী কৃষকদের সংস্পর্শে এসে বহু গারো প্রতিবেশীর সাজ পোশাকে নিজে সজ্জিত করেছে। মিশনারি সাজকরা পরিচ্ছদ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি দেন আগেকার দিনে এরকমও দেখা যেত ধর্মপ্রচারকের অনুশাসনের ফলে গা রমণী ব্লাউজ প্রভৃতি পরেছে। বাড়ি থেকে ক্ষেতের কাজে যাচ্ছে। কিছুদূরে যাবা পরই অনাবশ্যক ব্লাউজ উঠল মাথার মো ঘাট বইবার জন্যে মাথার উপরে আবরণ রূপে। আজ যে এ আচরণ সম্পূ পরিত্যক্ত হয়েছে তা জোর করে বলতে পারব না।

গারো গ্রামের অধিকাংশই দু' তিন কুটীরের সমষ্টিমাত্র। জনসংখ্যা ১৫।২০ সেই জন্যই সমস্ত গারো জেলার গ্রা

সংখ্যা ২২৫৭। গ্রাম সাধারণত পাহাড়ের গায়ে স্রোতস্বিনীর ধারে তৈরি হয়। বড় গ্রামে বিরাট লম্বা ঘর আছে। কোনও কোনও ঘর দৈর্ঘ্যে একশ ফুটের উপর। উঁচু উঁচু মজবুত খুঁটির উপর লম্বা বাঁশের ও ছনের ঘর। ঘরের মাঝে ছোট ছোট বাঁশের বেড়া দিয়ে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রান্নাঘর বলে আলাদা কিছু নেই। এরই মধ্যে প্যাথর বিছিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের প্রবেশ পথে নোকপানে অথবা অবিবাহিত যুবকদের বাসস্থান।

ভিন্ন গ্রাম থেকে কোনও লোক বা বহিরাগতের রাত্রিবাস করার প্রয়োজন হলে তারও শোবার ব্যবস্থা এখানেই হবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সভার বৈঠকও এখানে বসে। গ্রামের মাঝখানে একটা বড় আঙিনা—তার না আটেলা। তারই চারদিকে বিভিন্ন বসতবাটি। ঘরে উঠার জন্যে সাধারণত লম্বা কাঠের গুঁড়ি, তারই উপর মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা। এর উপর দিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অবলীলাক্রমে হেঁটে পার হচ্ছে। আমাদের কিন্তু এভাবে উঠতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। শস্যের গোলা বাড়ি থেকে একটু দূরে। আগুন লাগলে যাতে শস্যের ক্ষতি না হয়, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। তবে, হাতী এসে মাঝে মাঝে এখানে হানা দেয় এবং ধান খায়. নষ্ট করে।

গারো পাহাড় হাতী, বাঘ, ভালুক, বাইসন, হরিণ, চিতা প্রভৃতি জন্তুতে ভরা। হিংস্র বন্য কুকুরের দলও বড় ভয়ানক। তাদের দলবদ্ধ আক্রমণে অনেক সময়ে হিংস্র ও শক্তিশালী পশুকেও হার মানতে হয়। বাঘ সম্পর্কে গারোদের স্বাভাবিক ভীতি। বাঘের হাতে মরলে সেই শবদাহ দিনের বেলাতেই কেবল করা যাবে। মৃত ব্যক্তির নাম করাও বিপজ্জনক। ভোজনের ব্যাপারে গারোদের বাছবিচার বিশেষ নেই। প্রধান খাদ্য ভাত। তার সঙ্গে যে কোনও জন্তু-জানোয়ারের মাংস বা মাছ অথবা বনের মূল, কন্দ, পাতা শাকসব্জি প্রভৃতি। কুকুর, বেড়াল, সাপ, গিরগিটি প্রভৃতিও উৎসাহের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা হয়। গ্রামের হাটে কুকুর রীতিমত বেচা-কেনা হয়। কিন্তু আবর উপজাতিদের যেমন বাঘের মাংস খেতে দেখেছি, এমন আর কোথাও দেখিনি।

গারো সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সব-থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, সম্পত্তির অধিকারিণী পুরুষ নয় স্ত্রী। একমাত্র স্বোপার্জিত সামান্য কিছু সম্পদ ছাড়া পুরুষের নিজস্ব কিছুই নেই। পুরুষের পক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও কিছু পাওয়া অসম্ভবই তবে, খাসী সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে গারোদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। গারো পরিবারে সম্পত্তির দেখা-শুনা, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে স্বামীর।*

খাসী সমাজে সর্বময় কর্তৃত্ব স্ত্রীর। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীকে সম্পত্তির উপর অধিকার রাখতে গেলে স্ত্রীর মাহারি (কুলের) কোনও রমণীকে বিবাহ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে গারো বিবাহব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিবাহের পর কন্যার ঘরে জামাইকে আসতে হয় এবং শ্বশুরের পরিবারভুক্ত হয়েই তাকে থাকতে হবে। জামাই দুই রকমের ঃ নোক্রম এবং চাওয়ারি। চাওয়ারি বিবাহের পর শ্বশুরের গ্রামে এসে বসবাস করে এবং সেই মাহারির পরিবার হিসেবে পরিগণিত হয়। তার ঘর-বাড়ি কিন্তু স্বতন্ত্র। সে সব বানানোর সময় শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে সাহায্য বা অন্যভাবেও সাহায্য সে পাবে, কিন্তু সম্পত্তিতে চাওয়ারির কোনও অধিকার নেই। নোক্রম—প্রথম পর্যায়ের জামাতা এবং তার স্ত্রীর মারফত বিষয়-আশয়ের দেখাশুনা সে-ই করবে। কোন কন্যার স্বামীকে নোক্রম করা হবে তা পিতামাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে, সাধারণত সর্বকনিষ্ঠার স্বামীই নোক্রম হয়। বিবাহের পর নোক্রম অথবা 'ঘরের খুঁটি' এসে স্ত্রীর বাড়িতেই বসবাস করবে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর চিরাচরিত গারো প্রথা অনুযায়ী নোক্রমকে শাশুড়িকেও বিবাহ করতে হবে। তা না হলে সম্পত্তির অধিকার থেকে কন্যা-জামাতা বঞ্চিত হবে। শাশুড়ী আবার যাকে বিয়ে করবে (স্বামীর ভাই বেঁচে থাকলে তাকে অথবা সে বিবাহিত হলে সেই কুলের কাউকে) তার কন্যা সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। নোক্রম হয় সাধারণত মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে। ফলে মামা হয় শ্বশুর এবং নোক্রমকে দ্বিতীয়বার নিজের মামীমাকে বিবাহ করতে হয়। অধিকাংশ সময়ই অবশ্য বিবাহ অর্থে সাধারণ একটা অনুষ্ঠান মাত্র হয়, স্ত্রীর কোনও অধিকারই শাশুড়ী দাবী করে না।

গারো বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগ বিধি-সম্মত। তবে, নোক্রম করা স্থির হলে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হবেই, এ অনুশাসন ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দুই পক্ষেরই আছে। সেক্ষেত্রে বিধি ভঙ্গকারীকে আর্থিক দণ্ড দিতে হবে। আবেঙ্গ ও মাতাবেঙ্গ শাখার মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে যুবক জঙ্গলে পালিয়ে যাবে। আত্মীয়, বান্ধবেরা আবার তাকে খুঁজে এনে বিবাহ দেবে। কিন্তু তিনবার এভাবে পালিয়ে গেলে বুঝতে হবে যে, যুবকের এ বিবাহে বিশেষ আপত্তি আছে। অনেক সময় ভাবী বধূ জামাতার ঘরে এসে বিবাহের পূর্বে কিছুদিন বসবাস করে যাতে সকলের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ-পরিচয় জানা-শোনা হতে পারে। যুবক কিন্তু সে সময়ও অবিবাহিত যুবকদের বারোয়ার ঘরে থাকবে। কন্যা প্রেমিকের জন্যে অনেক সময় সুখাদ্য প্রস্তুত করে নিজের ভগ্নীর হাত দিয়ে নোকপাণ্টেতে পাঠিয়ে দেয়। যুবক যদি সে উপহার গ্রহণ করে, তবে বুঝতে হবে যে, বিবাহের প্রস্তাবে সে সম্মত।

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু গ্রামবৃদ্ধ বা নিজেদের কুলের বৈঠক করে সেখানে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে সম্মতি নিতে হবে। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত করে নিয়ে জানালে সাধারণত

•

কোনও ক্ষতিপূরণ কোনও পক্ষকেই দিতে হয় না। ব্যভিচারের অপরাধে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে, তবে দোষী পক্ষকে খেসারত দিতে হবে। একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত, কিন্তু খুব বেশি হয় না। যে কোনও অবস্থাতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে গেলে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে। একাধিক স্ত্রী থাকলে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে প্রথম স্ত্রীই সর্বপ্রথম আসন পাবে। তাকে জিক মামুংগ বলে বলা হয়। অন্য স্ত্রীকে জিক গিতে বা দাসী বলে অভিহিত করা হয়।

মৃতদেহ দাহ করার প্রথা প্রচলিত। শবের ভস্ম ও অস্থি সাধারণত ঘরের সামনে আঙিনায় পুঁতে রাখে। তার উপরে বাঁশের এক বেদি নির্মাণ করা হয়। মৃতের আত্মার উদ্দেশে কয়েকদিন ধরে খাদ্য ও পানীয় ঢেলে দেওয়া হয়। গারোদের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আত্মার আশ্রয়স্থল তুরা পাহাড়ের চিকমাংগ শিখর। আগেকার দিনে নোকমার (গ্রাম-বৃদ্ধের) মৃত্যুতে নরবলি দেওয়ার রীতি ছিল। এখন কেবল কুকুর বলি দিয়েই উৎসব সুসম্পন্ন হয়। অনেকে মনে করেন যে, নরবলি দেওয়ার প্রয়োজনেই গারোরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ময়মনসিংহে ও গোয়ালপাড়া জেলার সমতলভূমি আক্রমণ করত। ১৮৬৬ খৃঃ লেঃ উইলিয়ামসনের নেতৃত্বে এক সামরিক বাহিনী স্থায়ীভাবে গারো পাহাড়ের এলাকায় ঘাটি স্থাপন করে এবং সেই সময় থেকেই ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা এখানে চালু হয়। সে সময়কার ইতিহাস আলোচনা করলে মনে হয় যে, এ ব্যাপারে গারোদের উপরে যথেষ্ট জুলুম জবরদস্তি করা হতো। সমতলভূমির অধিবাসীদের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক তাদের বহুদিনের এবং ময়মনসিংহের জমিদাররা অন্যায়ভাবে গারোদের উপর থেকে নানারকম ওসুল আদায় করত। গারো পাহাড়ের একাংশে জমিদারী পত্তনও করা হয়েছিল। নরমুণ্ড সংগ্রাহক এবং অত্যন্ত হিংস্র নরঘাতক বলে গারোরা যে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল তার মূলে কতটা সত্যি ছিল বলা শক্ত। ১৮৭০ সাল নাগাদ ইংরাজ রাজকর্মচারীর রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় যে, তখনও অনেক গ্রামে নরমুণ্ড দেখা যেত এবং গ্রাম-বৃদ্ধেরা মিলে রাজকর্মচারীর সামনে প্রতিজ্ঞা করত যে নরহত্যা থেকে তারা বিরত থাকবে। তারপর আর এরকম কোনও ভয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় না।

আদিবাসীদের জীবনে নানারকম কাহিনী অদ্ভুত এক মায়াজাল সৃষ্টি করে থাকে। সভ্য মানুষ প্রতিটি ঘটনার মধ্যে যেখানে কার্যকারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, আদিবাসীরা সেখানে শিশুর কল্পনার রাজ্যে বাস করে। কল্পনার রঙীন আলোকে অজ্ঞাত নৈসর্গিক ঘটনা আরও রহস্যময় হয়ে উঠে। কথায় কাহিনীতে দেবতা, অপদেবতা, পরী, দৈত্য, দানব, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, নদী সব কিছু জীবন্ত রূপে নিয়ে মানুষের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরের জগতের ভাবধারা যে গারো গ্রাম-বৃদ্ধকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেয় নি সে সহজে কারুর নাম বহিরাগতের কাছে বলবে না। বহু কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে না বললেও, তা হবে অসম্পূর্ণ—অমুকের পিতা। ছেলে বা মেয়ে যদি সম্প্রতি মরে গিয়ে থাকে, তখন তার নামকরণ হবে প্রেতাত্মার পিতা। গারোদের কাছে গাছপালা, জীবজন্তু সবারি সম্বন্ধে কত বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত। সৃষ্টির দেবী নাস্তু, তার আবির্ভাব হয়েছিল নিজের তৈরি এক ডিম থেকে। দেবীর শরীর থেকে বারিধারা নদীর সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে নদনদীতে ঘাস, শেওলা, নলখাগড়ার সৃষ্টি। তারপর এল নানারকমের মাছ, অন্য জলচর জীব, সরীসৃপ, পাখি ও জীবজন্তু।

গারো নাচের মধ্যে বীরত্বব্যঞ্জক ভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তা দেখে মনে হয় যে, অতীতে একদিন তলোয়ার, ঢাল, বর্শার ব্যবহার তারা ভাল রকমই করত। রুগা ও চিবাক শাখার গারোরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কেবল নাচে, উৎসবে আনন্দে নৃত্যের কোনও প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করে না। কোনও গ্রামের নোকমা যেদিন পদমর্যাদার পরিচায়ক বাহুবন্ধনী পরিধান করে, সেদিন এক বিশেষ নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনার ভার নেন স্বয়ং কামাল—পুরোহিত মহাশয়। তাঁর পেছনে আশেপাশের গ্রাম-বৃদ্ধ ও সেই গ্রামের নোকমা কয়েকবার নাচতে নাচতে গ্রাম-বৃদ্ধের বাড়ি থেকে গ্রামের আঙিনা পর্যন্ত যাতায়াত করেন। এ নাচে গ্রামবৃদ্ধ ছাড়া অন্য কারুর যোগ দেওয়ার অধিকার নেই। প্রতিটি নাচ ও উৎসবে ভূরিভোজন ও অপর্যাপ্ত পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ গারো-খাওয়ার খুবই সামান্য—ভাত এবং মাছের বেশি আর কিছু জোটে না। কিন্তু উৎসবের দিন প্রতিটি অতিথির পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনও রকম কার্পণ্য করলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। গারোদের চোলাই করা মদ চু-বিচি অত্যন্ত সাংঘাতিক জিনিস। সামান্য একটু পানেই বহু খ্যাতিসম্পন্ন পানীয়ের স্বাদ সংগ্রাহককে বেহুঁশ হয়ে যেতে শোনা গিয়েছে। আগেকার দিনে গরুর দুধ গারোরা একেবারেই খেত না এবং দুধকে ঘৃণার চক্ষেই দেখত। এখন সভ্য মানুষের সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের এই বিতৃষ্ণা নেই।

সেবার গারোদের দেশে গিয়েছিলাম গৌহাটি হয়ে। কলকাতা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত আমাদের যাত্রা আকাশপথে। বাংলার সীমান্ত ছাড়ালেই চোখে পড়ল সবুজ গারো পাহাড়। এরোপ্লেন তখনও অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠছে লোকালয়ের। গৌহাটির যত কাছে আসতে লাগলাম, ততই এরোপ্লেন আরও নিচে নামতে আরম্ভ করল। পরিষ্কারভাবে গভীর বনে জঙ্গলে ঘেরা ছোট ছোট গারো গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি বুঝতে পারলাম। আর গারো পাহাড় যেখানে ব্রহ্মপুত্রের কোলে গৌহাটির সমতলভূমিতে গিয়ে মিশেছে, সেখানে হাওয়াই আড্ডা। এইখান থেকে নেমে গৌহাটি যেতে হয়। গৌহাটি থেকে আবার ফিরে এলাম মোটরের পথ ধরে গারোদের দেশে। এবার দেশ বিভাগের ফলে গভীর সঙ্কটের কথা, সীমানা নির্ধারণ কমিশন এমনি আরও কত কি শুনলাম।

হয়ত এ সমস্যার সমাধান অদূর ভবিষ্যতে হবে। গারো পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে রেলপথ তৈরি হবে, কলকারখানা গড়ে উঠবে। দারিদ্র্যের সমস্যা তাতে দূর হবে, কিন্তু উপজাতি জীবনে আরও বহু নতন সমস্যা সৃষ্টি করবে।

আর্থিক জগৎ

তোডরমল

স্টেট্ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া

মহাকবি শেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "নামেতে কি আছে? গোলাপকে যদি অন্য নাম দেওয়া হয় তাহাতে কি গোলাপ ফুলের গন্ধ ও বর্ণের কোন হানি ঘটে?" সম্প্রতি ১লা জুলাই হইতে যে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াতে নামান্তরিত হইল তাহাতে উক্ত ব্যাংকের ব্যবসায় নীতির কিংবা ক্রিয়াশীলতার কোন পরিবর্তন ঘটিবে কি না এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। শেক্সপীয়রের উদ্ধৃত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে খাটে। ব্যাংকের নাম পরিবর্তন হইল বলিয়াই যে ইহার ব্যবসায় নীতিও পরিবর্তিত হইবে এরূপ আশংকার কোন যথাযথ কারণ নাই। নাম ছাড়াও ব্যাংকের একটি রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এতদিন ব্যাংকটি ছিল বিভিন্ন অংশীদারের কাছে দায়ী। বর্তমান অবস্থায় ব্যাংকের প্রধান অংশীদার হইল রিজার্ভ ব্যাংক। বিভিন্ন অংশীদারকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিয়াই এই অধিকার অর্জিত হইয়াছে—কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া নয়। কাজেই এই বিষয়ে কোন অংশীদারের অভিযোগ করিবার মত কারণ নাই। সংক্ষেপে বলা যায় এতদিনে ব্যাংকটি রাষ্ট্রাধিকারে আসিল।

রাষ্ট্রাধিকারে আসিল বলিয়াই যে সরকার উক্ত ব্যাংকের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সর্বদা হস্তক্ষেপ করিবেন এমন কোন কারণ নাই। বরঞ্চ যাহাতে সরকারের সংস্পর্শে আসিয়াও ব্যাংকের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে এই উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে এবং উক্ত মণ্ডলীর সভাপতি ও সহসভাপতি হইয়াছেন যথাক্রমে ডাঃ জন মাথাই ও শ্রীবৈকুণ্ঠলাল মেটা। যাহাতে কোন রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে না আসিতে হয় এই উদ্দেশ্যে এরূপ বিধি গৃহীত হইয়াছে যে লোকসভা বা রাজ্যসভার কোন প্রতিনিধি ঐ ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান পাইবেন না। যে কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে জড়াইয়া পড়িলে ব্যাঙ্কের যে স্বাধীন ব্যবসায়-নীতি ব্যাহত হইতে পারে এই আশংকাতেই উক্ত বিধি প্রণীত হইয়াছে। এই পরিচালকমণ্ডলী স্বাধীনভাবেই চিন্তা করিবেন এবং সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের সুবিধানুসারেই ব্যবসায়নীতি অনুসরণ করিবেন। রিজার্ভ ব্যাংক রাষ্ট্রাধিকারে আসিবার পরেও সরকারানুমোদিত পরিচালকমণ্ডলী স্বাধীনভাবে কার্য নির্বাহ করিতেছেন এবং তাহাদের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সরকার কদাচ হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিয়া প্রকাশ। রাষ্ট্রাধিকারে থাকিয়াও রিজার্ভ ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠান কিভাবে সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া বরং সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশের আর্থিক নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেছে ইহার চাইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর নাই। কাজেই রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে যদি স্বাধীননীতি অবলম্বন করা সম্ভব তবে অধুনা নামান্তরিত ও রূপান্তরিত স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার পক্ষে অনুরূপ নীতি গ্রহণ করা কেন সম্ভব হইবে না? বরং স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার পক্ষে স্বাধীনতর নীতি অনুসরণ করা আরও সহজতর। ইহা ছাড়া এমন বিধিও আছে—যদি জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোন কারণে সরকারকে ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ দিতে হয় তবে তাহা রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে পরামর্শ করিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের মারফৎ করিতে হইবে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের রোটারী ক্লাবের এক সভায় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর বলিয়াছেন যে, গত ছয় বৎসরের মধ্যে সরকারের পক্ষে এই বিষয়ে নির্দেশদানের কোন কারণ ঘটে নাই এবং ব্যাংকের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সরকার কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের এই স্পষ্ট ভাষণে সরকারী হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে তাহার নিরসন ঘটিবে। কাজেই স্টেট ব্যাংকের সম্বন্ধে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। বিগত ৩৪ বৎসরে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক

ব্যাঙ্কিং জগতে যে সাফল্য ও সুনাম অর্জন করিয়াছে তাহার জাতীয়করণে মুহূর্তে উক্ত ঐতিহ্য ধূলিসাৎ হইবে এরূপ আশংকা অমূলক। স্টেট ব্যাঙ্কে পূর্বতন অভিজ্ঞ কর্মচারীমণ্ডলী ও বিচক্ষণ পরিচালকমণ্ডলী রহিয়াছেন তাহারাই পূর্ব গৌরবের ধ্বজাধারক ও বাহক। তাহাদের এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা, ব্যবসায় বুদ্ধি ব্যাঙ্কিং কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য যে সহসা রাষ্ট্রীয়করণের সাথে সাথে বিলোপ পাইবে এ ধারণা করাই ভুল। বরং এই ব্যাঙ্কই বৃহত্তর দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য চিহ্নিত আছে এবং উপযুক্ত প্রাণশক্তি ইহার পেছনে নিহিত। "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।"

এই স্টেট ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শ্রীরামা রাও বলেন যে, ভারতের আর্থিক কাঠামোর প্রধান দুর্বলতা—বড় বড় শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র ব্যতীত পল্লী অঞ্চলের ব্যাঙ্কিং সুবিধার অভাব। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় মান দ্রুত উন্নয়নের যে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পূর্ণ করিতে হইলে গ্রামাঞ্চলগুলিকে অচিরেই সমুন্নত করিতে হইবে। অথচ ব্যাঙ্কিংএর সুবিধা ও প্রসার না ঘটিলে পল্লী অঞ্চলগুলি অনুন্নতই থাকিয়া যাইবে। পল্লীঅঞ্চলের শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত কিংবা সংস্কার না করিলে দেশের ব্যাপক শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবে। যাহাতে বৃহদাকার শিল্প ও কুটীর শিল্পের মধ্যে মাঝারি শিল্প-গুলি গড়িয়া উঠিতে পারে সেইজন্য পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং-এর ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ছয় বৎসর পূর্বে Rural Banking Enquiry Committee গঠিত হইয়াছিল। উক্ত কমিটির সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং প্রসারের জন্য কমিটি এরূপ সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অন্যূন ২৭৫টি শাখা খোলা উচিত। কিন্তু কার্যকালে

উক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে ৮০টি শাখার বেশী খোলা সম্ভব হয় নাই। কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে উক্ত ব্যাঙ্ক অংশীদারের কাছে দায়ী এবং পল্লীঅঞ্চলে শাখা অফিস খুলিলে উহারা কতিপয় বৎসর লাভজনকভাবে চলিবে না। ফলে ব্যাঙ্কের লাভের অঙ্ক কমিয়া গেলে অংশীদারগণকে পূর্ববৎ লভ্যাংশ বণ্টন করা সম্ভব হইবে না। কাজেই অংশীদারের স্বার্থ দেখিতে গেলে উক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে আশু ক্ষতি স্বীকার করিয়া গ্রামাঞ্চলে অফিস খোলা সম্ভবপর নয়। অথচ জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে আপাতক্ষতি স্বীকার করিয়াও ঐসব অনুন্নত অঞ্চলে শাখা খোলার উপযোগিতা রহিয়াছে। আবার অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিকে পল্লীঅঞ্চলে শাখা অফিস খুলিবার কথা বলিলেই তাহারা যুক্তি দেখান যে কর্মচারীবৃন্দের বেতন বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পক্ষে লাভজনকভাবে ঐসব অফিস চালান সম্ভব নয় এবং তাহাদের ক্ষতিপরিপূরক অর্থ যদি সরকার পক্ষ অর্পণ করিতে সম্মত হন তাহা হইলে তাহারা এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে পারেন, কাজেই অংশীদার ব্যাঙ্কের পক্ষে যখন উপরোক্ত ঝুকি নেওয়া সম্ভব নয়, তখন সরকারকেই অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। এইদিকে সকলেই অবগত আছেন যে সম্প্রতি All India Rural Credit Survey Committeeর যে তথ্যবহুল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, ভারতের সুদূর পল্লীঅঞ্চলে ঋণ দানের জন্য রাষ্ট্র-পুষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গঠন প্রয়োজন। সেই প্রতিষ্ঠান মারফৎ গ্রামের যেসব কৃষি-সমবায় সমিতি আছে তাহারা যাহাতে প্রয়োজনানুসারে ও অতিদ্রুত ঋণ পাইতে পারে সে ব্যবস্থা অবিলম্বে সম্পন্ন করা উচিত। ঐ প্রতিষ্ঠান অনুন্নত অঞ্চলে শাখা অফিস খুলিয়া গ্রামবাসীদের সঞ্চিত অর্থ জমা নিবে এবং উপযুক্ত কালে ব্যাঙ্কিংএর অপরাপর সুবিধা দিবে। এইরূপ একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার কথা উঠিলেই—সর্বাগ্রে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রসঙ্গ উঠে। এই ব্যাঙ্কটির বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শাখা অফিস আছে এবং উহা সরকারী তহবিল সংরক্ষণের যাবতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। কাজেই একটি নব-প্রতিষ্ঠান না গড়িয়া পূর্ব ব্যাঙ্কটিকেই নামান্তরিত করিয়া এবং তার সাথে কতগুলি পূর্বেকার রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান মিলিত করিয়া স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া চালাইবার সুপারিশ করা হইয়াছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে দেশের সর্বাঙ্গীণ শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য প্রচুর ঋণদানের প্রয়োজন যাহা কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া দেশে যে বেকার সমস্যা প্রকট হইয়াছে তাহার আশু সমাধান করিতে হইলে সরকার সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজন। কাজেই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রাধিকারে আনা হইয়াছে। ঐ ব্যাঙ্কটিকে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৪০০ নূতন শাখা অফিস খুলিতে হইবে। এই গুরুদায়িত্ব বহন করা কি কোন অংশীদার ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হইত? তাহা ছাড়া পল্লীঅঞ্চলের সঞ্চিত অর্থ জমা দেওয়া একটি সমস্যা। বিগত মহাযুদ্ধের পর দেখা গিয়াছে যে পল্লীঅঞ্চলে অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে। কিন্তু ঐ অর্থ নিরাপদে জমা রাখার কোন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে নাই। কাজেই ঐ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন সেই দিক মনে করিলে গ্রামাঞ্চলে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করার গুরুদায়িত্ব সরকারের রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগে এই দায়িত্ব সম্পন্ন করা সহজ হইবে।

অনেকেরই মনে এরূপ আশংকা হইতে পারে যে এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রাধিকারে আসার ফলে হয়তো আমানতকারীদের হিসাব সম্বন্ধীয় গুপ্ততা রক্ষা হইবে না। সোজা কথায় বলিতে গেলে আয়-কর বিভাগের জুজুর ভয় অনেকেরই মনে জাগিতে পারে। কিন্তু এরূপ ভয়ের কোন সংগত কারণ নাই। আইনত এই ব্যাঙ্কটি হিসাব সম্বন্ধীয় গুপ্ততা সংরক্ষণ করিতে বাধ্য। সুতরাং আয়-করে জুজুর ভয় সম্পূর্ণ অলীক। আমানতকারীদের হিসাব যে সরকারের কাছে ফাঁস হইয়া যাইবে এরূপ ভাবার কোন ভিত্তি নাই। কাজেই যেখানে আমানতকারীদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য আইন সহযোগে এতগুলি বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেখানে রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সব কিছুই বিলোপ হইবে এরূপ আশংকা কল্পনা-প্রসূত। দেশের আর্থিক মান উন্নয়নের যে মহৎ ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, ইহাতে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অন্যতম ঋত্বিক। গুরুদায়িত্ব ইহার স্কন্ধে। সকল সংশয়ের যবনিকা ভেদ করিয়া দেশবাসীর শুভেচ্ছাধারায় অভিষিক্ত হইলেই এই প্রতিষ্ঠান জয়যাত্রায় অগ্রসর হইতে পারিবে। আশা করা যায়, সুদিন আসিতে আর বিলম্ব নাই। 'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।'

কীর্তনের প্রবর্তক কি ওরাওঁ উপজাতি?

মহাশয়,

৩০শে জুলাইর 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীশার্ঙ্গদেব লিখিত আমার আলোচনার উত্তরটি পাঠ করে বুঝতে পারলুম যে, তিনি আমার মূল বক্তব্য বিষয়টিই বুঝতে ভুল ক'রেছেন। কারণ তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থন করতে গিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের যে চিঠিখানি প্রকাশ করেছেন, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ক্লাসিক্যাল কীর্তনের কথা বলছেন, কিন্তু আমি কীর্তনের এ'র পূর্ববর্তী লৌকিক (folk) রূপের কথাই বলেছি। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখছেন, 'শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ক্লাসিক্যাল প্রবন্ধ গানের সাধক ছিলেন' এবং তা' 'কীর্তনের সমগোষ্ঠীভূত।' যদি তাই হয়, তবে তাঁর সঙ্গে ত আমার যে কোনখানে বিরোধ তা' বুঝতে পাচ্ছিনে! লৌকিক কীর্তন উচ্চতর সঙ্গীত শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েই যে 'উচ্চতর সঙ্গীতের স্তরে উন্নীত হয়েছে', সে কথা ত আমিও আমার 'বাংলা লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে উল্লেখ ক'রেছি (পৃষ্ঠা ১৭৪)। শ্রীশার্ঙ্গদেব যে সব কথা ব'লেছেন, তা' ক্লাসিক্যাল কীর্তন সম্পর্কে মেনে নিতে ত কারুরই কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু আমার আলোচনার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কীর্তনের আদি ও লৌকিক রূপই আমার আলোচনার বিষয়। সেই জন্য আমি আমার 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের 'গীতি'-অধ্যায়ে আধুনিক কীর্তন সম্পর্কে কোনও আলোচনা করি নি'। কারণ, চৈতন্য-সমসাময়িককাল থেকেই কীর্তন লোক-সঙ্গীতের স্তর অতিক্রম করে গেছে। কীর্তনের আদি ও লৌকিক রূপেরও বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব আমি আমার গ্রন্থে কীর্তনের উৎপত্তি নির্দেশ করা ব্যতীত আর কোনও আলোচনা করতে পারিনি'।

প্রত্যেক দেশেই আদিম জাতির সঙ্গীত (tribal song)ই লোক-সঙ্গীতের ভিত্তি হয়ে থাকে। কীর্তন নামে পরিচিত বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট রূপ থেকেই ক্লাসিক্যাল কীর্তনেরও যে বিকাশ হয়েছে, এ'কথা সকলেই স্বীকার করবেন। বাংলার লোক-সঙ্গীতের যতগুলো নাম পাওয়া যায়, যেমন টুসু, ঝুমুর, ভাজো, ভাদু, গম্ভীরা (সংস্কৃত গম্ভীরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই), ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, কুষাণে, জারি, সারি, ঘাটু, ঘেঁটু এ' সব কোনও নামই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয়—এ'গুলো দেশজ শব্দ, সেজন্য বাংলাদেশের বাইরেও এ নামগুলো অপরিচিত। কীর্তন গানও যদি এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত থেকেই বিকাশ লাভ ক'রে থাকে, তবে কীর্তন কথাটিরও ব্যুৎপত্তি সন্ধান করবার জন্য সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হ'বার কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না। বিশেষত দ্রাবিড়ভাষী অঞ্চলে অনুরূপ অর্থে শব্দটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমি আমার 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে ব'লেছিলাম,

'ওরাওঁগণ দ্রাবিড়ভাষী, অতএব কীর্তন কথাটি সঙ্গীত অর্থে ওরাওঁদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিয়া ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে হইতে পারে (পৃঃ ১৭৫)।'

এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, 'বাংলার কীর্তন গানের প্রবর্তক যে ওরাওঁ উপজাতি', একথা এখানে বলা হয়নি'; তবে কীর্তন শব্দটি যে দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে, এই অনুমান করা হয়েছে মাত্র। এ সম্পর্কে তারপরও একবার উল্লেখ করা হ'য়েছে,

'ইহার অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উত্তর ভারতের কোনও স্থানে কীর্তন কথাটি সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত না থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষী অঞ্চলে ইহা এই অর্থে বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে।......এ কথা বুঝিতে পারা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কোনও অঞ্চলে উক্ত ওরাও' কিংবা অন্য কোনও অনুরূপ সংস্কৃতির অধিকারী উপজাতির প্রভাব বশতঃ কীর্তন গান সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল (পৃঃ ১৭৫—৭৬)।'

এখানেও প্রত্যক্ষভাবে যে বর্তমান ওরাওঁদের কাছ থেকেই কীর্তন কথাটি বাংলায় নেওয়া হয়েছে, তা'ও বলা হয়নি'। তবে ওরাওঁ কিংবা ওরাওঁদের মত কোনও দ্রাবিড় ভাষী উপজাতির কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এই মাত্র বলা হয়েছে। বীরভূম জিলার পশ্চিম সংলগ্ন অঞ্চলে এখনও দুই দ্রাবিড় ভাষী উপজাতি বাস করে—তারা মালে ও মাল পাহাড়ী নামে পরিচিত। সাঁওতাল পরগণা জিলার রাজমহল পাহাড় ও পাকুর মহকুমার পাহাড় অঞ্চলে এদের বাস। অতএব এখনও যখন বাংলার প্রতিবেশিরূপে দ্রাবিড়-ভাষী দুইটি উপজাতি বসবাস করছে, প্রাচীনকালে এদের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এই সূত্রেও বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে কীর্তন শব্দটি প্রবেশ ক'রে থাকতে পারে।

কীর্তন শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীশার্ঙ্গদেব তাঁর আলোচনায় যে সকল অভিধানিক নজির উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে যে ঐক্য নেই, এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখছেন, কৃত ধাতু, Monier Williams লিখছেন, কীর্ৎ ধাতু অথবা কৃৎ ধাতু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষে লিখেছেন কীর্তি ধাতু। একই শব্দ তিন চার রকম ধাতু থেকে যে জন্মলাভ করতে পারে না, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। যদি শব্দটি সংস্কৃত থেকেই আসত, তবে এই সম্পর্কে এত অনিশ্চয়তা থাকত না; অতএব সহজেই মনে হতে পারে, শব্দটি অনার্য ভাষা থেকে এসেছে এবং এ সকল ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কষ্ট কল্পনার ফল। তবে কৃৎ + অন্ ক'রে যে কর্তন ছাড়া কীর্তন কিছুতেই হতে পারে না এবং কীর্তি + অন্ ক'রেও যে কীর্তয়ন ছাড়া কীর্তন হতে পারে না, একথা যাঁদের সাধারণ একটু সংস্কৃত জ্ঞান ও ভাষাতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন।

তারপর শ্রীশার্ঙ্গদেবের প্রশ্ন হ'লো ওরাওঁ জাতি যদি বাঙালীর প্রত্যক্ষ সংস্রবে না আসবে তবে বাঙালীই-বা যাত্রা কিংবা কীর্তন কথাগুলো তাদের কাছ থেকে পাবে কি করে? এ'র জবাব একবার উপরে দেওয়া হয়েছে। তারপরও আরও বলা যেতে পারে যে, বাঙালী যাত্রা এবং কীর্তন কথা ওরাওঁদের কাছ থেকেই যে পেয়েছে, একথা নির্দিষ্ট করে কোথাও বলা হয়নি'—এই মাত্র বলা হয়েছে যে, দ্রাবিড় ভাষা থেকে শব্দ দুটো বাংলায় এসেছে। তার প্রমাণ স্বরূপই মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্রাবিড় ভাষী ওরাওঁ ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শব্দ দুটি প্রায় অনুরূপ অর্থে প্রচলিত আছে। বাংলা ভাষায় বহু দ্রাবিড় শব্দ প্রচলিত রয়েছে, একথা সকলেই জানেন; কিন্তু সেগুলো কবে কিভাবে বাংলা ভাষায় এসে প্রবেশ লাভ করেছিল, তা' কেউ বলতে পারেন না। অতএব কীর্তন এবং যাত্রাও যে কিভাবে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছে, তা কেউ বলতে পারবেন না। তবে বাংলায় দ্রাবিড় ও আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই যে আর্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, একথা সকলেই আজ স্বীকার করেন। সেই সূত্রেই কথাগুলো একদিন এদেশের ভাষায় স্থান লাভ ক'রেছিল ব'লে মনে হয়।

তারপর শ্রীশার্ঙ্গদেব আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন, বাঙ্গালীর কাছ থেকেই দূরবর্তী অঞ্চলের ওরাওঁগণই যে এ'কথাগুলো ধার করেনি', তার প্রমাণ কি? এ' প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। তবে এ' সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন যে, বাঙালী তার জাতীয় সংস্কৃতির বহু উপকরণের জন্য তার অনার্য প্রতিবেশীদের নিকটই ঋণী—অনার্য প্রতিবেশীদের মধ্যে এখনও যাদের সামাজিক সংহতি সুদৃঢ়, তারা কোনদিক দিয়ে বাঙালীর কাছে ঋণী নয়। প্রসিদ্ধ জাতি

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত H. H. Risley অনুমান ক'রেছিলেন, বাঙালীর মেয়েরা যে সিঁথিতে সিঁদুর পরে, সে জন্য তারা তাদের ছোট নাগপুরের দ্রাবিড় ভাষী অনার্য প্রতিবেশীর নিকট ঋণী, তারা এ'জন্য বাঙালীর নিকট ঋণী নয় (Castes and Tribes of Bengal, 1891, Vol II, P230)। পরবর্তী অনুসন্ধান দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়েছে। স্বর্গীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রতে' বলেছিলেন, বাংলার মেয়েরা যে কুক্কুটী ব্রত করে থাকে তা 'ছোট-নাগপুরের পার্বত্য জাতির ব্রত, কুক্কুটী হলেন তাদের দেবী (পৃঃ ১৭)।' অতএব দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়েও বাঙালীই ঋণী, ছোটনাগপুরের আদিবাসী বাঙালীর নিকট ঋণী নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের অনুমান বিশিষ্ট পণ্ডিতগণই করেছেন, কেবলমাত্র আমিই যে প্রথম করেছি তা নয়। এই অনুমানের গূঢ় কারণ আছে, তা বিস্তৃত বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ।

সর্বশেষে মৃদঙ্গ ও মাদল। আমি বলেছিলাম, আদিবাসীর মাদল থেকে বাঙালীর মৃদঙ্গের পরিকল্পনা হয়েছে। সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে শ্রীশার্ঙ্গদেব লিখছেন, মৃদঙ্গ ও মাদল 'একই জিনিস।' কিন্তু মৃদঙ্গ ও মাদল 'একই জিনিস' কি না, প্রমাণিত করবার জন্য শাস্ত্রীয় নজীরের চাইতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য বেশী বলেই আমি মনে করি। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় কোথাও মাদল বাজিয়ে যেমন কীর্তন গাইতে শুনিনি, তেমনই মৃদঙ্গ বাজিয়ে কোথাও ঝুমুর গাইতে শুনিনি। অতএব এ দুই-ই যে 'একই জিনিস' স্বীকার করি কেমন করে?

শ্রী শার্ঙ্গদেবের শেষ কথা এই যে, 'বাংলায় প্রচলিত কীর্তনের সঙ্গে ওরাওঁদের কীর্তনের কোন সম্বন্ধ এ পর্যন্ত কোন সঙ্গীতজ্ঞ করবার চেষ্টা করেন নি।' তার অর্থ অবশ্য এই হতে পারে না যে, সে-চেষ্টা ভবিষ্যতেও কেউ করতে পারবেনে না। আমাদের দেশে যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে কয়জন ভারতীয় লোক-সঙ্গীত ও আদিবাসীর সঙ্গীত (tribal song) সম্পর্কে সংবাদ রাখেন? এসব সম্পর্কে সংবাদ রাখবার প্রধান অসুবিধা এই যে, এসব সঙ্গীতের কোনও লিখিত শাস্ত্র কিংবা সংগ্রহ নেই—এর বিপুল ঐশ্বর্য আদিম ও লোক-সমাজের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে, সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করতে না পারলে এ রত্ন ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায় না। সে যোগ স্থাপন করবার প্রয়াস কয়জন পেয়েছেন?

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(শার্ঙ্গদেবের উত্তর)

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল বক্তব্য বিষয়টি বুঝতে আমার কিছুমাত্র ভুল হয়নি। কীর্তনের পূর্ববর্তী রূপের কথাই আমি আলোচনা করেছি এবং শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য শুধু "কীর্তন" শব্দটিই নয় উক্ত গীত-পদ্ধতিটিই যে ওরা ও'দের কাছ থেকে এসেছে এইটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলবার নেই কেননা এবিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অপর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু সঙ্গীতাংশ সম্বন্ধেই আমার শেষ বক্তব্য নিবেদন করি।

মানুষ আদিম অবস্থা থেকেই ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় এসে পেঁচেছে। সুতরাং সুদূর অতীতে অনুসন্ধান করলে আজকের বহু জিনিসের একটা আদিম আকৃতি ধরা পড়বে—এটা খুব সহজ কথা। কিন্তু, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা নয়। এক একটা স্তরে এসে মানুষ তার সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপকে নতুনভাবে সংগঠিত করেছে; তখন এই সুসংস্কৃতরূপটিই একটি বিশেষ সূত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে মধ্যযুগে এসে কীর্তনের আদিরূপটি যেভাবে ধরা পড়বে সেই রূপটিই হ'বে আমাদের প্রত্যক্ষ আলোচনার বিষয়, কেননা এই রূপটি থেকেই আমরা পরবর্তী রূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাচ্ছি। আমার পূর্ববর্তী রচনায় আমি এইভাবেই বিচার করেছি।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য দক্ষিণ ভারতের কীর্তনের উল্লেখ করেছেন। কর্ণাটক-পদ্ধতিতে রচিত "কীর্তনম্"-এর সঙ্গে ওরাওঁদের কীর্তনের যোগসূত্র স্থাপন করা অসম্ভব ব্যাপার বলেই আমার মনে হয় কেননা দক্ষিণ ভারতীয় কীর্তন অনেকটা ধ্রুপদের অনুরূপ। দক্ষিণ ভারতেও "কৃতি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রচলিত ছিল এবং "কীর্তন"-এর সঙ্গে এর সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। "কৃতি" এবং "কীর্তন"-এ প্রভেদ মাত্র এই যে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে মিশ্রণের যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং এর নিবন্ধরূপের মধ্যে বেশীরকম কড়াকড়ি নেই। দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট ভক্ত-সঙ্গীতকার ত্যাগরায় এই "কৃতি" প্রবন্ধেই বহু পদ রচনা করেছেন, সেই সঙ্গে কীর্তনও। অতএব দক্ষিণ ভারতেও কীর্তনের আদিরূপ "কৃতি" প্রবন্ধ বলেই স্বীকার করতে হয়। এই "কৃতি" এবং "কীর্তি" প্রবন্ধ মূলতঃ একই বস্তু।

"কীর্তন" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যা বলবার পূর্বেই বলেছি। কৃৎ ধাতু সম্বন্ধে বিশেষ মত-বৈষম্য নেই এবং প্রায় সকলেই এবিষয়ে একমত বলেই মনে হয়। কীর্ত্তি ধাতু সম্বন্ধে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি। আমার "ভাষাতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি" এমন নেই যে তার জোরে প্রচুর আভিধানিক প্রমাণকে কষ্ট কল্পনা বলে উপেক্ষা করতে পারি।

মৃদঙ্গ বা মাদল সম্বন্ধে যা বলেছি তার বিচার মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতেই হওয়া উচিত,—যে সময়ে কীর্তনের অভ্যুদয় হ'চ্ছে। সে যুগের প্রত্যক্ষদর্শী শাস্ত্রকারগণ এসব যন্ত্রের মধ্যে বড় একটা তফাৎ দেখেননি। এযুগে মৃদঙ্গ ও মাদলের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে আমার অথবা শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন তা দিয়ে মধ্যযুগের সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুমান করা বিশেষ সঙ্গত হ'বে না।

ইতি—শার্ঙ্গদেব।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'

মহাশয়,

গত ১৩ই শ্রাবণের দেশে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" প্রবন্ধটি পড়লাম। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'কে মহৎ সাহিত্য বলে প্রমাণ করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই, কিন্তু প্রবীণ সমালোচকের রসবিচারে যে নির্বিচার অপযুক্তির প্রয়োগ দেখলাম তাতে নির্বিকার থাকা চলে না।

কোন লেখা আমার ভাল লাগে নি—এই-টাই সম্ভবত সাহিত্যবিচারে শেষ কথা। এমন উক্তির উপর জবরদস্তি চলে না। কিন্তু রসজ্ঞ পাঠক যখন ভালো না লাগার কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে বসেন, তখন সেগুলি যাচাই করে দেখতে ক্ষতি নেই, বরং লাভ আছে। কারণ তাতে অনেক অকারণ মোহ ভেঙে যায় এবং রসবিচারে বৈজ্ঞানিকবোধ গড়ে উঠতে সাহায্য করে। শ্রীযুত ঘোষ 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এর অপকর্ষতার কারণ নির্ণয়ে যা যা বলেছেন, তাকে সাজিয়ে নিলে এই দাঁড়ায়—

(১) এর চরিত্রগুলির মহত্ত্ব এক অলীক প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথ এদের যেমনভাবে এঁকেছেন, এরা আদৌ সেইরূপ চরিত্রের লোক নন। সুতরাং এদের উপর আরোপিত মহত্ত্ব কবিতাটির উৎকর্ষের হেতু হতে পারে না।

(২) কোন চরিত্র তার আকর গ্রন্থে যেমন আছে তার থেকে পরিবর্তিত, এমন কি মহত্তর করে আঁকবার অধিকার লেখকের নেই। তিনি তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে উপমা দিয়ে বলেছেন, "বস্তুত কোন প্রতিমূর্তিরই মূর্তির থেকে অধিকতর সুন্দর হওয়ার অধিকার নেই। তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সত্য হওয়া।"

(৩) কর্ণের উদ্ধত, অসম্পূর্ণ, পাপবিদ্ধ চরিত্রকে বজায় রেখে তার ভাগ্যবিড়ম্বনার কারুণ্যকে ফুটিয়ে তুলে কবি যদি তার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ভালবাসার পরিচয় দিতে পারতেন, তবেই কবিতাটি সত্যকারের মহৎ কবিতা হোত।

(৪) মহান বলতে যে অনমনীয়, অনার্দ্র, অদ্রাব্য, দৃঢ় চরিত্র বোঝায় মাতৃনাম বিগলিত লজ্জারক্ত, কোমলচিত্ত কর্ণচরিত্রের মধ্যে তা দুর্লভ, বরং মহাভারতের রূঢ়, উদ্ধত, তিক্ত কর্ণ-চরিত্রের মধ্যেই তার সম্ভাবনা বেশী ছিল।

প্রথমত লেখকের অধিকারগত দু নম্বর প্রশ্নটির বিচারের প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য প্রশ্নগুলি অল্পাবিস্তর তার যথার্থতার উপর নির্ভরশীল। এখানে শ্রীযুত ঘোষ যে উপমা ব্যবহার করেছেন, তাতে গলদ আছে। কারণ প্রতিমূর্তি রচয়িতা এবং শিল্পী এক পর্যায়ের লোক নন। প্রতিমূর্তি রচয়িতা মূলের অনুরূপ মূর্তি গঠন করিতে চুক্তিবদ্ধ। তার প্রতিকৃতি সাদৃশ্যব্যঞ্জক না হলে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তা নয়। শিল্পীর রচনা আদর্শের চেয়ে উৎকৃষ্ট না অপকৃষ্ট কেউ তা যাচাই করতে বসে না। শিল্প হিসাবে তা উতরিয়েছে কি না, তাই বিচার করে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসার মডেলের মুখে স্বর্গীয় সুষমা ছিল কি না, তা কারো গবেষণার বিষয় নয়। কিন্তু গান্ধীর মূর্তিটি গান্ধীর মতই হওয়া চাই। শিল্পের ক্ষেত্রে আদর্শ তুচ্ছ শিল্পই সব, প্রতিকৃতিতে নিজস্ব মহিমা কিছুই নেই যা মহিমা সবটুকু আদর্শের। প্রতিকৃতি রচয়িতা নকলনবীশ, শিল্পী স্রষ্টা, তিনি তাঁর চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য কাউকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন।

প্রশ্ন উঠবে, তাহলে সাহিত্যে যে সব বিখ্যাত চরিত্র আঁকা হয়েছে তাকে বিকৃত করার অধিকার সকলের আছে?—নিশ্চয়ই আছে, যদি তিনি শিল্পী হন। গ্যেটে তাঁর 'ফাউস্ট' চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য কাউকে কৈফিয়ত দেন নি, মিল্টন দেন নি তাঁর 'শয়তান' চরিত্রের জন্যে; শেক্সপীয়র অভিযুক্ত হন নি অজস্র চরিত্র বিকৃত করার দায়ে, ভবভূতি হন নি 'রাম' চরিত্রের আদর্শ-স্খলনের অজুহাতে; কালিদাস অপাংক্তেয় হন নি 'মহাদেব' চরিত্রের সঙ্গে পুরাণের বৈসাদৃশ্যবশত। আধুনিক কালে মাইকেলের 'রাবণ' চরিত্রের উল্লেখ না করাই শ্রেয়। এঁদের ক্ষেত্রে অসত্যাশ্রয়ী অলীক মহত্ভাবের অভিযোগে এঁদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির ফলশ্রুতি ব্যর্থ হয়নি; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ যুক্তি হাস্যকর।

উৎসের অনুভূতি নিয়ে কোন নবসৃষ্ট সাহিত্যকে বিচার করতে বসলে এ বিপর্যয় ঘটবেই। কারণ প্রত্যেক স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ আলাদা, জীবন সম্পর্কে বোধ পৃথক। মাইকেলের রাবণ চরিত্রের প্রতি যে দরদ ছিল, রামায়ণের কবির তা ছিল না। ছিল না বলেই তিনি রাবণকে আপনার খুশিমতন এঁকেছিলেন। যদি বলা হয়, যেহেতু রাবণের প্রতি বাল্মীকির কোন সহানুভূতি ছিল না, সুতরাং মাইকেলের সে সহানুভূতি থাকবার অধিকার নেই, যেহেতু বাল্মীকি রাবণ চরিত্রের অন্তরে অনুপ্রবেশ করেন নি, সুতরাং আর কেউ তা করবে না, তাহলে আর মেঘনাদ বধ রচনার কোন প্রয়োজন বা অবকাশ থাকে না। মূল রামায়ণ অভ্রান্ত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে চিরকাল বিরাজ করে, অথবা মঙ্গলকাব্যের মত সেই একই কাহিনীর একঘেয়ে অনুবর্তনে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতম হয়ে ওঠে!

কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি অনুবৃত্তি নয়। সেখানে স্রষ্টার হাতের যাদুস্পর্শে নতুন কোণ-কাটা হীরকখণ্ডের মত নতুন আলো বিকীর্ণ হয়। নতুন নতুন ভাবে চরিত্র বেঁচে ওঠে, প্রাণ পায়। তার সাথে মূল চরিত্রের জীবনধর্মেই প্রভেদ থাকে। সেক্ষেত্রে প্রাচীন কাব্যের বাসনা নিয়ে তার সাথে পরিচিত হতে যাওয়া মূঢ়তা। এখানে সমালোচকের বিচার্য হওয়া উচিত—এই যে নতুন কবিতায় নতুন চরিত্র গড়ে উঠল তার মাঝে অন্তঃসঙ্গতি আছে কি না, তা আপনার জীবনধর্মে স্বাভাবিক বা স্বচ্ছ কি না। "কর্ণ-কুন্তী সংবাদে'র এ কুন্তী মহাভারতের কুন্তী নয়, এ কর্ণ মহাভারতের কর্ণ নয়। কিন্তু ঐ যে নতুন কর্ণ, নতুন কুন্তী এদের আভ্যন্তরিক কোন অসম্ভাব্যতা আছে কি? সে ক্ষেত্রে কর্ণের অপরাধকে, তার খল স্বভাবকে রবীন্দ্রনাথ ভুলে গেছেন বলে আপসোস করার কারণ নেই।

তবু ঠিক এই স্বতঃসিদ্ধকেই শ্রীযুত ঘোষ ব্যঙ্গ করে ওড়াতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "তবে কেউ যদি কর্ণকে লম্বোদর ঔদরিকরূপে কল্পনা করে তাতেও দোষ নেই, কিম্বা কেউ যদি কুন্তীকে অসিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে বীর রমণীরূপে কল্পনা করে তাতেও দোষ নেই।" নিশ্চয়ই নেই, যদি সে শিল্পী হয়। অর্থাৎ যদি তার জীবনবোধের জন্য, তার সৃষ্ট সাহিত্যের রসের পূর্ণতার জন্যে তেমন কল্পনা অপরিহার্য হয়। বীরাঙ্গনার সূর্পণখাকে রাক্ষসী কল্পনা করলেই রসাভাস ঘটবে, সেখানে তার সুন্দরী প্রেমময়ী তরুণী মূর্তি কল্পনা অপরিহার্য। তাতে পাঠকের প্রাগ্‌প্রস্তুত বাসনা যতই আহত হোক, সেই প্রাক্তন বাসনাকে ভুলতে হবে, তবেই 'সূর্পণখা পত্রিকার' রসাস্বাদন সম্ভব হবে। নইলে শ্রীযুত ঘোষের মত মধুসূদনকে দোষারোপ করে সাহিত্যের থেকে দূরে সরে থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না।

এবার শ্রীযুত ঘোষ মহাভারত অবলম্বনে কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার আলোচনায় আসা যাক্। তিনি বলেছেন কুন্তী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে যে কর্ণকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন, সে তাঁর ভান মাত্র। তিনি অন্যান্য ছেলেদের বাঁচাবার জন্যেই কর্ণকে মাতৃস্নেহের অভিনয় করে স্বদলে আনতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এ একটি ডিপ্লোম্যাটিক ট্যাকটিক্স। একথা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। মহাভারত পড়ে আমার যা মনে হয়েছে তা হলো সহোদর ভ্রাতৃবিরোধ বন্ধ করার জন্যে, ছ'টি পুত্রকেই বাঁচাবার জন্যে কুন্তী এই সাক্ষাৎ করেছিলেন। কর্ণের প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহের কিছু কমতি ছিল এমন ইঙ্গিত সেখানে নেই।

কর্ণের চরিত্র বিশ্লেষণও লেখক একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তার খলতা ক্রূরতা এবং দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ অংশটুকু স্মরণে রেখে তাঁর মহত্ত্ব ও ঔদার্যকে বেমালুম বিস্মৃত হয়েছেন। মূল মহাভারতে কর্ণ চরিত্র আরো মহত্তর ছিল বলে জানি, কাশীদাসী মহাভারতেও তা মহত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় আছে। তার সৌজন্য বহুবিশ্রুত, ব্যক্তিগত ব্যবহার ত্রুটিহীন। দ্রৌপদীর প্রতি অসম্মানের ঘটনায় সে যে বিদ্বেষপ্রসূত অবিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, নীচ বন্ধুগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে তাকে নারীবিদ্বেষী কল্পনা করার কি কারণ আছে বুঝলাম না। আলোচ্য ঘটনা অর্থাৎ কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথনের অংশে কাশীরাম দাস কুন্তীর প্রতি তার সৌজন্য প্রকাশে ত্রুটি ঘটিয়েছেন মনে হয় না। "রুষ্ট হয়ে তাঁকে দুটো কড়া কথাই শুনিয়ে দিয়েছিল" এ তিনি কোথায় পেলেন? শিশু অসহায় পুত্র ত্যাগের জন্যে যে ভর্ৎসনা কর্ণ মাকে করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। তথাপি আরো কতখানি দুর্বিনীত এবং রূঢ় হলে লেখক মূলানুগ হতো বলে মনে করেন? কর্ণের মাতৃস্নেহাতুরতাকে তিনি অস্বাভাবিক বলে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণটি যথার্থ ও মনস্তত্ত্বসম্মত। কিন্তু কাব্যে সৌন্দর্যের প্রয়োজনে সত্যকে অনেক সময়েই পথ ছেড়ে দিতে হয়। ঘটে যা তা কাব্যের সত্য নয়, যা ঘটলে সুন্দর হতো তাই কাব্যের সত্য; অন্তত রোমাণ্টিক কাব্যের সত্য। সুতরাং বস্তুতান্ত্রিক সত্য দিয়ে কাব্য-নির্ণয় করলে তার কতটুকু বাকি থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কি লিখলে কাব্যটি মহৎ হতে পারতো, চরিত্রের কোন উপাদান মহত্ত্বের ধারক সে বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু তা আমার আলোচনার পরিধির বাইরে। কর্ণ-কুন্তী সংবাদ হয়তো মহৎ সাহিত্য নয়, কিন্তু মহৎ সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিও শ্রীযুত ঘোষ যেমনভাবে দেখিয়েছেন, তেমন নয়। যেখানে প্রস্তুত কাব্যের অন্তঃসঙ্গতি; প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির সুষ্ঠু মধুর সমন্বয়; ভাব-ভাষা-ছন্দের অপরিহার্য যোগাযোগ অনাস্বাদিতপূর্ব রস-নির্ঝর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, সেখানে কাব্যের কাব্যত্ব নিহিত। সেই রসকেন্দ্রেই কর্ণ-কুন্তী সংবাদের সার্থকতা অন্বেষণ করতে হবে। নতুবা রসহীনতার অভিযোগ বাতাসে ওড়ানো অভিমত মাত্র। ইতি—

অম্বুজ বসু, কলিকাতা

॥ ১১ ॥

ঘন কুয়াশার মতনই অনেকটা। এক আশ্চর্য গভীর আচ্ছন্নতায় তনা কোথায় যেন তলিয়ে ছিল তোক্ষণ, অনুভূতির সেই বিচিত্র পথ। বার অল্পে অল্পে সেই কুয়াশা বুঝি ছঁড়াচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল। তবু স্পষ্ট নয় খনো। ঘুম-ভাঙার-আগের কেমন এক নায়ু-আবিলতা এবং অস্পষ্ট অদ্ভুত কছু রেখাচিত্র। যেন ঢেউয়ের মাথায় াথায় পলকের মত উঠছে আবার হুস রে তলিয়ে যাচ্ছে।

অস্ফুট চেতনায় বাসনা দেখছিল: ং ঠুং রিক্‌শ চলে গেল, কাঠের সিঁড়ি য়ে ধুপ্ ধাপ্ কারা নামছে যেন, একটা বতের টুকরি ফুলের মতন ফুটে রয়েছে, এগিয়ে আসছে অমলেন্দু। আ, কী ন্দর একটা ছড়ি তার হাতে। বাসনার ায়ে পানের পিচ ফেলে সরে গেল কমলা। বাক্স হাতড়াচ্ছে বাসনা। ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো। কী খুঁজছে বাসনা। হঠাৎ খুব শীত শীত লাগছিল। কে যে আলগা হাতে গরম শাল জড়িয়ে দিচ্ছে গায়......

আচমকা যেন আলো জ্বালিয়ে দিল কেউ এই অন্ধকারে। চোখ খুলল বাসনা। সাদা দেওয়াল। বড় বেশি সাদা। একটু-ক্ষণ কেমন এক পঙ্গু আবিল অনুভূতি নিয়ে সেই দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকল। চোখের পাতা বন্ধ করলে আবার খুলল।

ভীষণভাবে চমকে গেছে এবার বাসনা। প্রথমটায় বিহ্বল। কিছুই বুঝতে পারছিল না। এ কোথায় শুয়ে রয়েছে সে? তার ঘর কই, তার খাট, সেই জানলা, আলনা, টেবিল! কমলা, বীথি, সুধাময়—কোথায় তারা! কারুর গলার সাড়া ত পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি এখনো ভোর হয় নি। এ কি স্বপ্নে দেখা ভোর!

কিন্তু না, ভোরই। সকালের আলোয় ঘর ফরসা। রোদের রঙ ধরছে দেওয়ালে।

এই তবে তার নতুন ঘর, নতুন সংসার। অমলেন্দু সাজিয়েছে। কোথায় গেল অমলেন্দু! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবার বাসনা ঘাড় ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে এই ঘর দেখছিল।

দেখতে গিয়ে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি দিয়ে গেল। হিম হয়ে গেল হাত-পা। বুকের মধ্যের সেই ধুকধুক যেন ঠেলে গলা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। নিজের কানেই বাসনা সেই অতি দ্রুত স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে।

এবার খুব অস্পষ্টভাবে সারা রাতের একটি দুটি অর্ধ-সম্বিত মুহূর্ত মনে পড়ল।

মনে মনে সেই সব দুঃস্বপ্নের মুহূর্তকে ভালো করে মনে করবার চেষ্টা করছিল বাসনা। আর দেখছিল শূন্য চোখে—সামনে দেওয়াল, উঁচু ছাদ। পাশে কাঠের পার্টিশান। গা তুলতে পারছিল না। মাথার দিক থেকে আলো এসে পড়েছে ভোরের। কেমন এক অস্ফুট গুঞ্জন, পায়ের শব্দ, অ্যাসিড অ্যালকালির বিচিত্র গন্ধ, ঝাঁঝালো, কটু।

আস্তে আস্তে হাত নামিয়ে বাসনা পেটের তলায় তার কনকনে প্রায়-অসাড় আঙুল দিয়ে কী যেন অনুভব করবার চেষ্টা করছিল।

তারপর হঠাৎ, একেবারেই আচমকা সমস্ত বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠা এক গুমরনো কান্নায় কেঁদে উঠল অদ্ভুত এক শব্দ তুলে।

একটা সকাল আর দুপুর যে কী করে কাটল বাসনা যেন ভালো করে বুঝতেই পারল না। কারা এসে কোথায় তুলে নিয়ে গেল। সে কেমন এক ঘর। কিসের যেন গন্ধভরা। বিছানা তো নয়, অদ্ভুত এক লম্বা টেবিল। কারা যেন ছিল—দুটি কি তিনটি মানুষ। সিস্টার, ডাক্তার।

তারপর? ছি, ছি—বাসনা যেন ভাবতেও পারে না আর। গা কাঠ, চোখ বন্ধ করে পড়েছিল। জবাব দিতে হয়েছে কথার। কেমন করে লাগলো? কেমন করে আর, বাসনার কি হ্ুঁশ ছিল তখন—সেই অসহ্য যন্ত্রণা যখন করাতের মতন চিরে দিচ্ছিল ভেতর পেটের তলায়, মনে হচ্ছিল একটা যদি ছ্ুরি পায় নিজের হাতেই ছ্ুরিটা বসিয়ে দেয় বাসনা। কী আক্রোশ তখন সেই ব্যথার ওপর। ব্যথাটাই যেন স্বতন্ত্র কোনো মান্ুষ। তাকেই ছ্ুরি দিয়ে চিরে দেওয়া চলে।

হ্যাঁ, আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। কমলাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। পারি নি। সামনে চেয়ার ছিল। চেয়ারের মাথার কোণায় ব্ুঝি লাগল। তলপেটের তলায়, একেবারে ম্ুখটাতেই। টাল সামলে ফেলেছিলাম। কিন্তু মনে হল কেউ যেন বঁটির কোপ দিয়েছে। বিছানায় ল্ুটিয়ে পড়েছি কোনোরকমে।

বলতে পারছিল না বাসনা। থেমে থেমে, অস্পষ্ট ফিস-ফিস গলায়, কোনোরকমে বলেছে। প্রায় এ ধরনের সব কথা।

এ ব্যথা কত দিনের?

মাস চার পাঁচের।

তার আগে?

না।

আরও সাত সতেরো প্রশ্ন। নানা পরীক্ষা। বাসনার শরীরটা যেন তার নিজের নয়, অন্তত তখনকার মতন। বাসনার মনে হচ্ছিল এর চেয়ে যদি বিষ খেত! এতো বড় লজ্জার কথা অন্তত কানে শ্ুনতে হতো না। যদিও সে-কথা বলল না কেউ। বাসনা অন্তত শ্ুনল না।

তবে কি সে মরেই গেল পেটের মধ্যে? বাসনার ম্ুখ ফ্ুটে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল আর একট্ু হলে। অনেক কষ্টে ঠোঁটের আগায় কথাটা আটকে ফেলেছে বাসনা।

আবার সেই কাঠের পার্টিশান ঘেরা এক চিলতে খোপের মধ্যে। দ্ুপ্ুরে বাসনাকে তুলে নিয়ে আসা হল—এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায়। এবার আর কাঠের আড়াল-তোলা এক চিলতে খোপ নয়। সত্যিই ছোট্ট এক কামরা। অনেক ঝকঝকে, তকতকে। কেবিন। বাসনা একট্ু স্বস্তি পেল।

ভাবতে পারছিল না বাসনা—এর পর কি হবে? কি কি হতে পারে? আগাগোড়া এক হেঁয়ালির মধ্যে যেন পড়ে রয়েছে। কি হয়েছে তার? পরে কি হবে? ডাক্তার কি বললে! কাকে বললে! একট্ু একট্ু শ্ুনেছিল বাসনা, স্ুধাময় সকালেও এসেছিল হাসপাতালে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেছে, কেবিনের ব্যবস্থা করে চলে গেছে।

ভাবছিল বাসনা, হয়তো এতোক্ষণে সব জানাজানি হয়ে গেছে। স্ুধাময়কে কি আর ডাক্তার না বলেছে? কমলাও জানতে পেরেছে।

স্ুধাময় আর কমলার ম্ুখ যেন দেখতেই পাচ্ছিল বাসনা। কালো, কঠিন হয়ে গেছে। ঘেন্নায় কুঁচকে উঠেছে সারা ম্ুখ। ওরা ভাবছে, এই সেই বাসনা, তাদের ছোড়দি যার ওপর, যার স্বভাব চরিত্রের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস অট্ুট ছিল। হ্যাঁ, সেই ছোড়দিও শেষ পর্যন্ত এমন কেলেঙ্কারী করলে যার পর আর যাই হোক কমলা হয়তো এই বোনকে আর বোন বলে স্বীকার করতেই চাইবে না।

ওরা ব্ুঝতেও পারছে—এ-সবের সঙ্গে আর কে জড়িয়ে রয়েছে। অমলেন্দ্ু। এতো ঘোরাঘ্ুরি, বেড়ানো। কমলাদের অবর্তমানে কলকাতার বাড়িতে দ্ুটিতে রোজ দেখা-সাক্ষাৎ, গল্পগ্ুজোব। তারপর আর কি? যা ভাবা যায় নি, তাই। দ্ুই সমান। কাল সাপ।

অমলেন্দ্ু এখন কোথায়? সে কি এখনো কিছ্ু জানতে পারে নি? শোনে নি কিছ্ু! না শোনাই সম্ভব। আজও সে আসবে বিকেল বেলায় বাড়িতে। এবং স্ুধাময় হয়ত বলবে......

কি বলবে?

না, কালই অমলেন্দ্ুর সঙ্গে চলে যাওয়া উচিত ছিল। অন্তত তা হ'লে এই কলঙ্কের একটা আড়াল থাকত।

হ্যাঁ, বাসনা এখানে এট্ুকুও শ্ুনেছে—বিছানা বদলাবার সময়, এই হাসপাতালে তার নাম বাসনা সেন......বাসনা মিত্র নয়। কে বলবে, কাকে বলবে, কেমন করে বাসনা সেন বাসনা মিত্র হয়েছিল, হয়ে রয়েছে!

হয়তো আর যায় না।

আস্তে আস্তে একট্ু পাশ ফিরে শ্ুল বাসনা। চোখ ছাপিয়ে জল এসেছে। ব্ুকটা কী ভীষণ ভার।

আমি কি মরতে পারি না! এখ্ুনি। হঠাৎ!

বিকেলের রোদ যাই-যাই বেলায় ঘণ্টা পড়ছিল। হাসপাতালের ঘণ্টা। বাসনা চমকে উঠেছিল শব্দটা কানে যেতে। ব্ুক কাঁপছিল আবার, হাত পা অসাড়।

শেষ পর্যন্ত চোখ ম্ুছে পাশ ফিরল বাসনা। শ্ুকনো ম্ুখে বসে কমলা মাথার

কাছে। কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল। বীথি পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। টুলের ওপর বসে রয়েছে সুধাময়।

চুপচাপ। সময় খানিকটা কাটল।

'আজ কি খেয়েছ ছোড়দি, সারাদিনে?' কমলা কথা পাড়লো।

'দুধ!' বাসনা ছোট্ট করে জবাব দিল।

'আজ বোধ হয় আর কিছু দেবে না।'

সুধাময় বলছিল, 'ভয় পাবার কিছু নেই, আপনি ঘাবড়াবেন না, ছোড়দি। ডাঃ ব্যানার্জি তো খুবই বড় ডাক্তার। তিনিই দেখেছেন। তাঁর পেশেণ্ট আপনি।'

কেমন যেন লাগছিল এই সব কথা-বার্তা। কমলাদের হাবভাব। বাসনা বুঝতে পারছিল না। যা ভেবেছিল ও তার সঙ্গে এর কোথাও মিল নেই। বাড়ি সুদ্ধ সবাই দেখতে এসেছে হাসপাতালে। তাদের কথায় চোখে মুখে কোথাও একটু ঘেন্না কী বিরক্তি কী বিদ্রূপ কিছুই যে নেই। এমন কি বীথিও নরম চোখে কেমন ভাবে তাকিয়ে রয়েছে!

তবে?

ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল বাসনা। কি হয়েছে আমার? কি হয়েছে? প্রশ্নটা গলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত উঠে এসেও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কিছুতেই প্রশ্ন করতে পারছে না।

'তুমি না কোন্ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে বলছিলে?'

'হ্যাঁ, যাই।' সুধাময় টুল ছেড়ে উঠল।

'রাত্তিরে কেউ থাকবে কি না—' কমলা বলছিল।

'তুমি পারবে কি? ছেলেটাকে না হয় সামলালাম। কিন্তু মেয়েটা—!'

'সেই তো ভাবনা। কিন্তু যদি দরকার হয়—!'

'দেখি, কথা বলি। তেমন হলে নার্সের ব্যবস্থা করতে হয়।' সুধাময় চলে গেল।

একটু চুপ।

'এখনও কি ব্যথা আছে, ছোড়দি?' বীথি শুধলো।

'হ্যাঁ, খানিকটা কম।' বাসনা কেমন অবশ গলায় বললে।

'যা গেছে আমাদের কালকে। সারারাত ঠায় জেগে কেটেছে।' কমলা বলছিল, 'খুব অবহেলা করা হয়েছে, ছোড়দি।

তোমার শরীর। আমরা পারি না পারি, তোমার তো কিছু অন্তত বোঝা উচিত ছিল। তখনই যদি তেমন বলতে কিছু, একজন বড় ডাক্তার দেখানো যেত।' একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'কষ্ট-ভোগ আছে কপালে, কি-ই বা করবে তুমি।'

বুক দুরু দুরু করছিল বাসনার। অনেক কষ্টে সাহস করে বললে, 'ওরা কি বলছে? কি অসুখ আমার?'

কমলা ভাবছিল। কি যেন নাম বললে সুধাময়।

'টিউমার।' বীথি বললে।

বাসনা চমকে উঠল। বিস্ময়টা যেন সাপের ফণা হয়ে চোখের সামনে ছোবল তুলে দাঁড়িয়েছে।

'টিউমার তো বটেই, কিন্তু কি যেন নাম তার—। কটমটে কী একটা নামও যে বললে বাপু।' কমলা কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। এবং বীথিও বলছিল না, যদিও নামটা ওর মনে এসেও আসছে না। সীস্ট্—কী সীস্ট্ যেন ওভা—ওভারিয়ান সীস্টই বোধ হয়। যেন এই নাম শুনলে বাসনা ভয়ানক ভয় পেয়ে যাবে।

চোখের পাতা আস্তে আস্তে মুছে ফেলল বাসনা। মুখটা পাশ করে বালিশে গুঁজে নিল। সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে অদ্ভুত এক নাগরদোলার ঘুরন। উঠছে, নামছে। দুলে দুলে, টলে টলে। বাসনার বোধ নেই। সব বুঝি এক জলের ঘূর্ণির মুখে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ আর কিছু ভাবতেই পারল না বাসনা। চোখের সামনে অন্ধকারের ঘন বেড়া উঠেছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেই অসাড়ত্ব কেটে গেল। চোখের পাতা মেললে বাসনা। মেলতেই বীথির কালো রোগা রোগা মুখটা চোখে পড়ল।

অন্যমনস্ক চোখে সেই মুখটাই দেখছিল বাসনা।

হঠাৎ কমলা কথা বললে। 'তোমাকে বেশ ভোগাবে ছোড়দি।' কমলা খানিক ঝুঁকে পড়ে বলছিল, 'তুমি বাপু ভয়-টয় পেয়ো না যেন, হয়তো কাটাকাটি করতে হবে।' সাহস যোগাবার চেষ্টা করলে কমলা। বৌদির এই হুট্‌হাট কথা একেবারেই ভাল লাগছিল না বীথির। ইশারায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কমলার চোখে চোখে তাকিয়ে, একটুক্ষণ কি যেন দেখল বাসনা। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ভয় হচ্ছিল বাসনার হয়তো কাটাকুটির কথা শুনে। এবং সেই ভয়ে মুখটা আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

কমলা আরও কি বলতে যাচ্ছে, ও এল। নার্স। জুতোর খুট্ খুট্ শব্দ তুলে। গোলগাল আধ-ফরসা একটি মেয়ে। গম্ভীর মুখ। সটান মাথার কাছে এসে থামল। ওষুধ খাওয়ালে। তারপর বললে, কমলাদের দিকে চেয়ে, 'আপনাদের বাইরে যেতে হবে। একটু পরে আবার আসবেন।'

বাইরে যেতে হবে। কেন? কমলা চোখে প্রশ্ন তুলছিল। তার আগেই বীথি আস্তে আস্তে কেবিন ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ক্ষুব্ধ মনে কমলাকেও উঠতে হল।

ওরা বেরিয়ে গেলে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দিলে নার্স।

সুধাময়রা চলে গেল। সন্ধ্যের অন্ধকার তখন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবিনের মধ্যে যেন অনেক রাতের নিস্তব্ধতা। মিটমিটে আলো। গন্ধ আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ফাঁকা ফাঁকা ছমছম।

চুপ করে শুয়েছিল বাসনা চোখ বন্ধ করে। ভাবছিল, ভালো করে গুছিয়ে এবার ভাববার চেষ্টা করছিল, সব তাল-গোল পাকিয়ে ওলটপালট হয়ে গেল কি করে! বাসনা এক ভেবেছিল, হলো আর-এক। এতো বড় ভুল কি করে করল বাসনা! আশ্চর্য!

এই ভুল আমায় কোথায় টেনে এনেছে জানিস, কমলা? : বাসনা মনে মনে বলছিল যেন, অনুশোচনা আর গ্লানি জমছিল; তুই ভাবতেও পারবি না কী সব করেছি আমি, কোথায় এসে পড়েছি। মিথ্যেই আমি রাত জাগলাম, ভাবলাম আর ভাবলাম, অমলেন্দুকে ভুলোলাম, তার কাছে আর-এক বীথির মতনই হ্যাংলামি করলাম। আর হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত বিয়ে, আবার বিয়ে। আমি অমলেন্দুর বউ, একথা ভাবতেই এখন আমার গা কেমন করছে। তোরা জানিস না এসব কথা। জানতেও পারবি না যদি আমি এই অসুখে মরে যাই, যদি অমলেন্দু না বলে—

অমলেন্দুর কালো নির্বোধ মুখটা এবার বাসনার চোখের সামনে ভাসছিল। খুব স্পষ্ট। ওর চোখ, ঠোঁট, সবই যেন দেখতে পাচ্ছে বাসনা এবং দেখছে।

(ক্রমশ)

সমালোচনা সাহিত্য

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা—১২। দাম—দশ টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সহৃদয় সামাজিক ও বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধার্জনে সমর্থ হয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যে এবং ইংরেজির মাধ্যমে য়ুরোপীয় সাহিত্যে তিনি বহুশ্রুত। তীর্থদেবতার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবান পরিব্রাজকের মত তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কথারম্ভে 'রবীন্দ্র-নাট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের নাট্য-রচনাবলীকে আট ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর নাটক ও নাটিকার বিচার করেছেন। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি, রূপক-সাংকেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, কৌতুকনাট্য, ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য—এই অষ্টাধ্যায়ী আলোচনায় রবীন্দ্র-নাট্য-সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও শিল্পসৌন্দর্য বিশ্লেষণে অধ্যাপক ভট্টাচার্য অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অসামান্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বতন্ত্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা খুব বেশি হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রথম করেছেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ দুখণ্ডে। প্রমথনাথের পরেই এলেন উপেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের রূপ ও রসকে পৃথকভাবে পাঠকসমাজের নিকট উপস্থাপিত করে বাঙলা-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, গল্প-উপন্যাস, গান ও গদ্যরচনা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্যক্ রসাস্বাদনে তাঁর নাট্যরচনাবলীর সঙ্গেও যেমন অন্তরঙ্গ পরিচয় অত্যাবশ্যক, তেমনি কবির সমগ্র মানসক্ষেত্রটিকে সর্বদা দৃষ্টিপথে না রাখলে তাঁর নাট্যসাহিত্যের পরিপূর্ণ রসাস্বাদনও একেবারেই সম্ভব নয়। উপেন্দ্রনাথের আলোচনায় তাই একদিকে যেমন পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকখানি নাটকের মর্মকথা উদ্ঘাটিত হয়েছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সমগ্র রবীন্দ্র-কবিমানসের অন্তর-রহস্যও উন্মীলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কল্পনালোকে সুগভীর অনুপ্রবেশের ফলেই উপেন্দ্রনাথ এই দুরূহ ব্রতে সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমার সূচনা অংশটি বিশেষ মূল্যবান। 'রবীন্দ্র-নাট্যের স্বরূপ' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এখানে গ্রন্থকার স্বল্প পরিসরে নাটকের স্বরূপ, বিভিন্ন দেশে নাটকের ক্রমবিবর্তনের ধারা, বিশেষ করে প্রতীচ্য খণ্ডে রূপক ও সাংকেতিক নাটকের স্বরূপ-বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে মেটারলিংক,
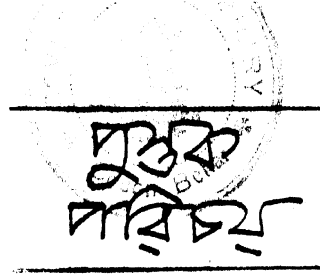
ইয়েটস, হাউপট্‌ম্যান ও আঁদ্রিভের কয়েকখানি রূপক ও সংকেতধর্মী নাটকের যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ উপাদেয় হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে সেই পর্যায়ের নাটকের সাধারণ আলোচনাও যেমন তথ্যাশ্রয়ী তেমনি তত্ত্বান্বেষী হওয়ায় অনুবর্তী আলোচনা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রন্থখানির প্রায় অর্ধেক অংশ ব্যয়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের আলোচনায়। উপেন্দ্রনাথের মতে এই শ্রেণীর নাটক 'বাঙলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অভিনব শিল্পসৃষ্টি—কবির একান্ত নিজস্ব দান।'

৩৫৯।৫৫

কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা : ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী। প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩—১—১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। **দাম :** দুই টাকা।

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসমালায় হীরক দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। এই

উপন্যাসখানি সমসাময়িক সমাজ জীবনের অপূর্ব কথালেখ্য। হিন্দু রমণীর পতি-কেন্দ্রিক জীবন, জীবনাদর্শের জন্য ত্যাগের পরিচয়, অসংযমের বিষময় পরিণতি ও

প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে আত্মশোধন। বাঙালী হিন্দু সমাজের পটভূমিতে বঙ্কিম অনেক-গুলি চিরকালীন সমস্যা ও অনুভূতিক এই উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের কাহিনী উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ বহু বৎসর ধরে বাঙালী লেখক পাঠকের চেতনায় উপন্যাসখানি অন্তরঙ্গ চিহ্ন রেখেছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনায় পণ্ডিত প্রাবন্ধিক অপূর্ব নিষ্ঠায় উপন্যাসটির নাম-করণ, সামাজিক পটভূমি, চরিত্র বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। পরিশিষ্টে কৃষ্ণকান্তের উইলের ভাষা ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করেছেন। গ্রন্থখানি নিষ্ঠাবান সাহিত্যরসিক ও ছাত্রদের প্রভূত উপকারে আসবে। (১৫১।৫৫)

ছোট গল্প

বনহরিণী—ভবানী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: নবভারতী; ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা: ১২। দাম: দু টাকা আট আনা।

'বনহরিণী' মোট দশটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্প 'বিদ্যুৎ-বহ্নি' রম্য কারু-নৈপুণ্যে চিহ্নিত। কৃষ্ণা চরিত্রের আয়নায় বহু নাটকের নায়িকা বিভাবতীর মরু-জীবন ছায়াপাত করেছে। বর্ণময় জীবনের জীবাশ্ম দেখতে দেখতে উপলব্ধি করতে করতে বিভাবতী শেষ পর্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি ডিক্রী করে তার স্বপক্ষে টেনে নিয়ে যায়। সংযমের সার্থকতম নির্বাচন এই গল্পটি। 'বাতায়ন' গল্পটি মনোরম। জীবনের বাতায়ন পথে একটি কিশোরমনে মালতী মাসিমা নামে একটি রূপকথার অভিজ্ঞতা ছায়া-ফেলেছিল। মোহভঙ্গের মধ্যে একটি সফল ইঙ্গিতে গল্পটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'অভিনয়' গল্পটি পাঠকমানসে একটি দীর্ঘস্থায়ী করুণ আক্ষেপের ছাপ রাখে। 'রজনীগন্ধা'র পরিণতি বিস্ময়কর। করুণ রসাশ্রয়ী। অভিনেত্রী শ্রীমতী রজনী-গন্ধার শুভ্র গুচ্ছে জীবনের করুণতম ট্র্যাজেডির সন্ধান পায়। গল্পটি অভিনব। আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'দাগ'। এ গল্পটি পাঠকের সমবেদনার গভীর রেখায় খোদিত থাকবে। ক্ষুদু মিঞার প্রতীক্ষা আর মিরিয়মের অনুসন্ধান মিশ্রিত হয়ে এক নিবিড় উপলব্ধিতে মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। শেষ গল্পটির নামানুসারে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুরুচিশোভন। প্রচ্ছদ-পটটি খ্যাতনামা শিল্পী অন্নদা মুন্সী অলংকৃত করেছেন। (২৫৭।৫৫)

কিশোর সাহিত্য

রাশিয়ার রূপকথা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রূপায়নী বুকশপ, কলকাতা। আড়াই টাকা।

আটটি সুনির্বাচিত, সুলিখিত, সুচিত্রিত গল্পের এই গল্পসংগ্রহে রূপকথাপ্রিয় কিশোর-পাঠকদের মনোহরণ করবার সার্থক আয়োজন ঘটেছে। সৌরীন্দ্রমোহনের অভিজ্ঞ কলমের সঙ্গে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ পাল ও সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তুলির সহযোগিতা তৃপ্তিকর হয়েছে যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঈশপের গল্পে, জাতকের গল্পে পশু-পক্ষীর বহু কীর্তি আছে। মানুষের কল্পনায় বৃহৎ, বিচিত্র প্রাণিজগৎ দেখা দিয়েছে মানুষের আত্মস্বীকার দর্পণ হিসেবে। সৌরীন্দ্রমোহনের লেখা এই 'রাশিয়ার রূপকথা'তেও সেইসব চিরপ্রিয় কথা-উপকথার চিত্তাকর্ষণী ক্ষমতা আছে। তাছাড়া বাঙলা দেশের কিশোর পাঠক-পাঠিকার কথা মনে রেখে সৌরীন্দ্র-মোহন এইসব গল্পে বাঙলা দেশের পটভূমিকা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। বিদেশী শিক্ষার গুণে মানুষ তার মাতৃভূমি ভুলে যায়, স্বজাতির সম্মান ভুলে যায়—এই সহজ কথাটি বলা হয়েছে 'সিংহ শবকের শিক্ষা' গল্পে। অনুরূপ অন্যান্য স্মরণীয়, পালনীয়, চিন্তনীয় সত্য-কথা ফুটেছে বইখানির অন্যান্য গল্পে।

ছাপা, বাঁধাই, ছবি, মলাট কোনোটিই নিন্দার নয়। ২৩৮।৫৫

ছুটির দিনে মেঘের গল্প: শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশক: শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ। ৩২-এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। দাম—দেড় টাকা।

মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়—শিশু মানসের বিমুগ্ধ চেতনায় এরা চিরকালের বিস্ময় হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কাল থেকে কালান্তরে এরা অপরূপ সব রূপকথার ঝাঁপি খুলে দিয়েছে। তাই পৃথিবীর সমস্ত শিশু সাহিত্যে মেঘমালার রাজ্য, বর্ষার নহবৎ, ঝড় দানবের হুঙ্কার নানা রূপকের সওয়ার হয়ে শিশু কল্পনাটির উপাদেয় উপকরণ হিসেবে ধরা পড়েছে। ঝড়-বৃষ্টি-মেঘের সঙ্গে শিশুমানসের আজন্ম মিতালি, চিরকাল সই পাতানোর পালা।

'ছুটির দিনে মেঘের গল্প' এক নিবিড় স্বপ্নের আকাশে মনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে। ঘন মেঘের সমুদ্রে একটি শ্বেতপদ্মের মত দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাবে শিশুর অপরিণত কল্পনালোকে। চিরজানা জগতের মধ্যে একটা নিরুদ্দেশের ঠিকানা পাওয়া যায়। বৃষ্টির চিকের ওপারে, মেঘমালার রাজ্যের তেপান্তর ডিঙিয়ে কোথায় যেন সেই নিরুদ্দেশের হাতছানি।

'ছুটির দিনে মেঘের গল্পে' একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে লেখক স্নিগ্ধ মমতার রূপকথার সোনারকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন। নদীসমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে মেঘ জমে আকাশে, সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে তৃষ্ণাদীর্ণ পৃথিবীকে স্নান করায়। সেই পৃথিবী ফসল দেয়

হাসি আনে কৃষাণের মুখে। এই কাহিনীকে রূপকে রূপ দিয়েছেন লেখক।

শ্রীযুত শশিভূষণ দাশগুপ্ত খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক। শিশু মানসের দরবারে তাঁর এই উপহার আর একটি দিগন্তে তাঁর পদক্ষেপকে সানুরাগ আমন্ত্রণ জানালো। শিল্পী সূর্য রায়ের আঁকা ছবিগুলি 'ছুটির দিনে মেঘের গল্পে' রহস্যময় বিস্ময়ের জগৎ সৃষ্টি করেছে। ১২৩।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

অনেক আশা ঃ ডিকেন্স। অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত। প্রকাশক ঃ তুলি কলম। ৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম ঃ দেড় টাকা।

পৃথিবীর সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্স অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর পরিচয় বাহুল্যের অপেক্ষা রাখে না। 'গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স' ডিকেন্সের বহু পঠিত উপন্যাস। বাঙলাতে অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র দত্ত। অনুবাদ তারই ভাষান্তর হয়েছে 'অনেক আশা' নামে। অর্থে ঠিক হুবহু ভাষানুসরণ নয়। অনেক স্থলে কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। 'অনেক আশা' পাঠ করে 'গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স' এর পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে অনুবাদের আদর্শ অগ্রাহ্য নয়। কল্লোল যুগের সার্থকনামারা শুধুমাত্র একাধিক নয়, বহু বচনের পর্যায়ে পড়েন। অনুবাদ ক্ষেত্রে আরও সতর্কতার প্রয়োজন। কারণ, এই অনুবাদই বহু সংখ্যক পাঠকের মনে বিদেশী সাহিত্যেরপটভূমি রচনা করে।

(২১৮।৫৫)

মুক্তিদাতা আইজেনহাওয়ার ঃ আঁদ্রে মরওয়া। অনুবাদ—শ্রীবিভূতিভূষণ সাহা। প্রকাশক ঃ বলাকা পাবলিশার্স লিমিটেড। ৪৫, মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—এক টাকা।

বর্তমান পৃথিবীর ভারকেন্দ্রকে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত করছেন, ডুইট আইজেনহাওয়ার নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম অগ্রনায়ক। রাজনীতিক্ষুব্ধ পৃথিবীর দিক থেকে দিগন্তে তাঁর নাম একপক্ষের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়; অপরপক্ষ নানা অভিযোগে তাঁকে আক্রমণ করেন। মোট কথা, এই শ্রদ্ধা-অভিযোগের মধ্যেও আইনজেনহাওয়ার সম্বন্ধে কৌতূহল অন্তহীন। 'মুক্তিদাতা আইজেন-হাওয়ার' তাঁর আজন্ম জীবনকথা। সন্ধানী পাঠকের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ। বইয়ের কাগজ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ২৪৮।৫৫

সেই আশ্চর্য রাত ঃ স্টিফান জাইগ। অনুবাদ ঃ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ [illegible] পাবলিশার্স। ১৪,

বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম : দু টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদ শাখাটি বর্তমানে রীতিমত পুষ্টাঙ্গ। ইকোয়েডরের ওপারে যে বিশাল পৃথিবী—তার আশা-আনন্দ, মনন-মানস আজ আমরা উপলব্ধি

করি। বাঙলা সাহিত্যের ভোজে আজ পৃথিবীর প্রায় কোন দেশই অনিমন্ত্রিত নেই।

এদেশে স্টিফান জাইগের খ্যাতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের। ইতিমধ্যেই সে খ্যাতি নিষ্ঠাবান পাঠক মন জয় করেছে। স্টিফান জাইগের সর্বশেষ অনুবাদ 'সেই আশ্চর্য রাত'। Transfiguration গ্রন্থটি থেকে ভাষান্তরিত করা হয়েছে। মানস মৃত্যুর অন্ধকার থেকে কেমন করে একটি মানুষ আবার কুসুমিত হয়ে উঠতে পারে তারই আত্মময় কাহিনী Transfiguration.

বর্তমান কালের অনুবাদ ক্ষেত্রে শান্তি-রঞ্জন খ্যাতিমান। তাঁর অনুবাদের ভাষা মমতাময়। ফল্গুর মত একটি কবিমনের আভাষ পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। 'সেই আশ্চর্য রাত' তাঁর অনুবাদের খ্যাতিকে আরোও ব্যাপক করবে বলেই বিশ্বাস। গ্রন্থখানির অঙ্গভূষণ মনোরম। (১১৫।৫৫)

সাধক চরিত

শ্রীশ্রীপ্রবণানন্দ স্মৃতি চয়ন—স্বামী আত্মানন্দ প্রণীত। প্রথম পর্যায়। লেখক কর্তৃক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

স্বামী আত্মানন্দ বহু শাস্ত্রবেত্তা সুপণ্ডিত, সাধক এবং সুলেখক। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। লেখক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দের স্মৃতি চয়নের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন এবং জ্ঞানগর্ভ তাঁহার মধুর বচনের উজ্জ্বল চমক আমাদের মনের উপর ফেলিয়াছেন। ইহা উন্নত জীবন লাভে মনকে উদ্দীপ্ত করে এবং আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সমুন্নত করিয়া তোলে। এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়গুলি প্রকাশের প্রতি আমরা আগ্রহান্বিত থাকিলাম।

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম—শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত। শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী কর্তৃক ৫এ, বারাণসী ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

গ্রন্থকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। বহু শাস্ত্র, বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। সর্বোপরি তিনি আদর্শ ভক্ত এবং সাধক। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সরসভাবে পরিস্ফুট করিবার দক্ষতার ক্ষেত্রে তাঁহার লেখায় প্রভূত মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যুক্তির বিন্যাসভঙ্গী জটিলতাবর্জিত এবং সহজ ও সরল। আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ বাংলার চিন্তাশীল জগতের সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি—শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত। শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী কর্তৃক ৫এ, বারাণসী ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি বাংলা সাহিত্যে দার্শনিকতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ স্বরূপে ইতিপূর্বেই প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছে। নাম ও নামী যে তত্ত্বতঃ অভেদ এই সত্য সুপণ্ডিত এবং সাধক গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে আলোচ্য গ্রন্থে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তরাজী সন্নিবেশ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিস্তৃত এই আলোচনা সর্বত্র সহজ, সরল এবং সুমধুর। এই অমূল্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে সমাজের একটি বিশেষ অভাব দূর হইল।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

শতাব্দীর সাধনা—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

প্রাচীন বাঙলার কাব্য কাহিনী—শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

মালভা—ম্যাকসিম গর্কী অনুবাদক শঙ্কর সেন।

মাটীর ঘরের মানুষ—মিখাইল সাদোভেন অনুবাদক শঙ্কর সেন।

অভিন্ন হৃদয়েষু—মনোতোষ সরকার।

নয়া ইতিহাস—অন্নপূর্ণা গোস্বামী।

আদিম রিপু—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বয়ম্বরা—মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসা-যাওয়ার পথের ধারে—শিবতোষ মুখোপাধ্যায়।

বিস্ফোরণ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাইকমল—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষের ধোঁয়া—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জননী—গুণময় মান্না।

অন্যদেশ—নিখিলরঞ্জন রায়।

সে ও আমি—বনফুল।

দূরের মিছিল—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

মুখর লণ্ডন—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

চক্রী—নীহাররঞ্জন গুপ্ত।

Worship of Sri Ramakrishna—Swami Suddhasattwananda.

কাদামাটির দুর্গ—প্রবোধকুমার সান্যাল

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬ই জুলাই 'ফরাসী সংস্কৃতি সংখ্যায়' 'স্তোত্র' নামক শার্ল বোদলেয়ারের অনুবাদ কবিতা ও 'এ প্রেম এ কবিতা' নামে পল এলুয়ারের অনুবাদ কবিতা যথাক্রমে বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। —সম্পাদক, দেশ

সংবাদ-চিত্রে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব

আজ পর্যন্ত এদেশে কখনো কোন সংবাদ-চিত্র আলোচনার আসরে ঠাঁই পায়নি। তেমন যোগ্য সংবাদ-চিত্র হয়নি বলেও বটে, তাছাড়া সংবাদ-চিত্র নিয়ে আলোচনা করার থাকতেই বা পারে কি! উপেক্ষা যদি নাও হয়, তো প্রয়োজনও দেখা দেয়নি কোনদিনই। কিন্তু ফিল্মস ডিভিশনের তোলা 'মিত্রতা কী যাত্রা' বা সোভিয়েট ক্যামেরাম্যানদের তোলা 'পণ্ডিত নেহরুর রাশিয়া ভ্রমণ'এর রঙীন চিত্রখানি সম্পর্কে উপেক্ষাকে পাশে সরিয়ে না রেখে উপায় নেই। এর আগে কোন একজনের একটি সফরের এমন পূর্ণ-দৈর্ঘ্য সংবাদ-চিত্র তোলা হয়েছে বলে শোনা যায়নি; আর পূর্ণ দৈর্ঘ্য মানে দস্তুর মতো লম্বা দুটি ঘণ্টার দীর্ঘ ছবি। রাজনীতিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ছবি। শান্তি ও মৈত্রীর রাখিডোরে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির পরস্পরকে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধবার এমন বাণী নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কেউ কখনও এমন দেশে দেশে যাত্রা করেননি। এই অভূতপূর্ব ঘটনার এমনিই অভূতপূর্ব দলিল প্রস্তুত করে রাখার দরকার ছিল এবং ফিল্মস্ ডিভিসন একাজটি সম্পন্ন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। অবশ্য এই সঙ্গে রাশিয়ার চলচ্চিত্র বিভাগও প্রশংসার্হ।

* * *

দুখানি ছবির মধ্যে পার্থক্য আছে। রাশিয়ার তোলা ছবিখানিতে প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া ভ্রমণের অংশই কেবল আছে। আর 'মিত্রতা কী যাত্রা'তে আছে দিল্লী থেকে যাত্রা করে রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লোভিয়া, রোম, লণ্ডন, কায়রো হয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে রামলীলা ময়দানে দেশবাসীর কাছে বিবরণ পেশ করা পর্যন্ত ঘটনাবলীর দৃশ্য। 'মিত্রতা কী যাত্রা' বিষয়বস্তুর দিক থেকে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সেটা গেলো রাজনীতির পর্যায়ে, এখানে তা নিয়ে আলোচনার কথা নয়। ছবিখানি তোলায় যে একটি চমকপ্রদ কৃতিত্ব রয়েছে সেদিকটার উল্লেখ করা খুবই দরকার।

—শৌভিক—

রাশিয়ার ছবিখানি তুলতে একশো চল্লিশ-জন ক্যামেরাম্যানকে নিয়োজিত করা হয়। আর সে জায়গায়, আশ্চর্য লাগবে শুনতে যে, 'মিত্রতা কী যাত্রা' তোলায় কাজ করেছেন মাত্র একজন ক্যামেরাম্যান। ফিল্ম ডিভিশন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পাঠিয়েছিল মাত্র একজন ক্যামেরাম্যান—শ্রী এন এস থাপা। ছোট্ট বেঁটেখাটো লোকটি মস্কোতে গিয়ে হাজির হতে তখন ওকে দেখে ওখানকার ক্যামেরাম্যানের দল কি মনে করেছিল জানা নেই, কিন্তু থাপা যখন রাশিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে তখন সবাই ওকে অদ্ভুত করিৎকর্মা কুশলীরূপে আখ্যাত করে। দশ সের ওজনের আইসো ক্যামেরাটি নিয়ে থাপা পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম গতিতে পঁয়তাল্লিশ দিন কেবল ছবি তুলে গিয়েছেন। কাঁধে থলিতে ঝোলানো সাত-আট সের ভারি ফিল্ম ম্যাগাজীন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে শ্রী থাপা তাঁর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জানান ভোর থেকে প্রতিদিন মধ্যরাত্র পর্যন্ত, তাঁকে কাজ করে যেতে হয়েছে এবং মাঝে মাত্র দু'তিন ঘণ্টা সময় পেয়েছেন ঘুমিয়ে নেবার। ভোর সাড়ে চারটেয় উঠেই সেদিনকার কার্যসূচী ঠিক করে নিয়েই তাকে বেরিয়ে পড়তে হতো। প্রধানমন্ত্রীর যে জায়গায় যাবার কথা শ্রী থাপাকে তার অনেক আগে থেকেই হাজির হয়ে থাকতে হতো। সন্ধ্যের সময় তোলা ফিল্ম প্যাক করে মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে পাঠানো হতো ভারতে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। তারপর বসে গৃহীত শটগুলির শব্দাংশ তৈরী করা এবং তারপর আবহবিবৃতির জন্য তোলা প্রত্যেক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা। এইভাবে কাজ করে শ্রী থাপার হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল।

* * *

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী থাপা বলেন যে, ক্যামেরা হাতে উঠলে তখন আর কোন দিকে তার খেয়াল থাকতো না, ছবি তোলাই তখন একমাত্র লক্ষ্য। আইসোতে একবারে একশ ফিট ফিল্মের রোল লাগানো হতো। সবশুদ্ধ শ্রীথাপা একুশ

•

পৃথিবীটা কার? টাকার না ভালবাসার?

মানুষে-মানুষে যত মিল, গরমিল বোধ করি তার চেয়ে অনেক বেশী। তবু বাইরে থেকে দেখলে সব মানুষের চেহারাই প্রায় এক। তাদের স্বভাবের আনন্দে তাদের খুসীর এবং দুঃখে তাদের বেদনার বহির্অভিব্যক্তিতে বৈষম্য কম। আবার ভেতরে এবং বাইরে কোথাও আর পাঁচ জনের সঙ্গে একটুকু মিল নেই এমন লোক বেশী নেই।

আমাদের কাঙ্গালীচরণ সেই বিরলতম মানুষদের একজন। একথা বুঝতে দেরী হয়নি অধ্যাপক অশোকের যখন সে কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিল, স্ত্রী এবং চাকর ভোলাকে নিয়ে।

কাঙ্গালীচরণের সংসার বলতে সে নিজে এবং তার একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণা। রোজগার বলতে বাড়ী ভাড়ার মাসিক পঞ্চাশ টাকা। এই কটা টাকাকে যক্ষের মত আগলাতে গিয়ে সে নিজে খায় না, মেয়েকেও খেতে দিতে পারে না। আলুভাতে-সেদ্ধই একমাত্র রান্না এবং তার মধ্যে আলু সেদ্ধটুকু বাবাকে দিয়ে শুধু ভাত চোখের জল ফেলতে ফেলতে খেত কৃষ্ণা। গায়ে কাপড় নেই, পেটে খাবার নেই, সংসারে সব কাজ নীরবে করতে তবু এতটুকু বিরক্তি নেই সে-মেয়ের।

অশোকের স্ত্রী অভিযোগ করে মেয়েটাকে মেরে ফেলবে কাঙ্গালীচরণ। কৃষ্ণা এরই মধ্যে কখন শুধু অশোকের স্ত্রীকে বৌদি ডাকে নি, তাদের সংসারের একজন হয়ে গেছে। অশোক অভিযোগ শুনে বলে, কী করবে ভদ্রলোক। আমাদের এই পঞ্চাশ টাকাটাই ত' শুধু সম্বল। অশোকের স্ত্রী কৃষ্ণাকে ডেকে নিজেদের খাবারের ভাগ দেয়।

এদিকে এত দুঃখের মধ্যেও কৃষ্ণার কালো চোখ কীসের আনন্দে চিক চিক করে, সে কথা তার বৌদি—অশোকের স্ত্রী বুঝেও বুঝে উঠতে পারেন না। ধরা পড়ে যায় কৃষ্ণা তবুও একদিন। ছেলেটির নাম সুনীল। ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র। কিন্তু অধুনা বইয়ের পাতায় মন নেই। পড়তে চায় কৃষ্ণার চোখে কি লেখা—সেই রোমাঞ্চিত রচনা।

অধ্যাপক ও তার স্ত্রী, দুহাত এক করে দেওয়ার জন্যে উপযাচক হয়ে নিজেরাই কথা পাড়েন কাঙ্গালীচরণের কাছে। কাঙ্গালীচরণ জানায় টাকার কি হবে, অশোক শোনে না। যায় সুনিলের বাবার কাছে। তিনি বলেন, আর কোন দাবী-দাওয়া নেই, শুধু লোক খাওয়ানোর খরচা বাবদ দেড় হাজার টাকার মধ্যে হাজার টাকা মাত্তর চান তিনি। কাঙ্গালীচরণ কিন্তু কিন্তু করেন। অশোক জানায় জোগাড় হয়ে যাবে।

বিয়ের ক'দিন আগে কাঙ্গালীচরণ বলেন এ বিয়ে হবে না। কারণ, কারণ টাকা জোগাড় হল না। অশোককে তার স্ত্রী গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা আনতে দিল। ওদিকে সুনীলের মার কঠিন তিরস্কারে সুনীলের বাবা বলেন, হাজার টাকারও দরকার নেই, এমনিই মেয়ে নেব।

অশোক যখন এসব কথা জানালো, কাঙ্গালীচরণ বল্লে, উপায় নেই। মেয়ের বিয়ে তিনি অন্যত্র ঠিক করে ফেলেছেন। পাত্র, সুপাত্র। কলকাতায় বাড়ী আছে দু'খানা। লেখাপড়া পাকা হয়ে গেছে বিয়ের। অশোক প্রশ্ন করে: লেখাপড়া সই-সাবুদ করে বিয়ে হয় নাকি?

অশোক কোথা থেকে জানবে? এ-বিয়েতে কাঙ্গালীচরণ নিজেই হাজার টাকা নিচ্ছে যে, সই সাবুদ লাগবে না? অগ্রিম তিনশত টাকা নেওয়া হয়ে গেছে, বাকী সাতশো টাকা পাওয়া যাবে বিয়ের রাতে।

বিয়ের লগ্নে জানা গেল পাত্র পাগল নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করছে না পিসীমার ভয়ে বিয়ে করতে বসেছে আগের বিয়ে করা এক স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে তার।

অশোক দিল বিয়ে ভেঙ্গে অগ্রিম টাকা ফেরত দিল নিজের পকেট থেকে। আনতে গেল সুনীলকে। সুনীল কৃষ্ণাকে পাবে না জেনে চলে গেছে বোম্বাইতে। সেখানে কাকার বাড়ীতে থেকে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবে।

সুনীল কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় ব্ল্যাঙ্ক খাতা দিয়ে উঠে এল। ষাট টাকা মাইনের চাকরী জোগাড় করে, চাকরীতে যোগ দেবার জন্যে শেষবারের মত এল কলকাতায়।

কৃষ্ণা পাগলের মত পথে বেরিয়ে মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে হাসপাতালে গেল। এদিকে কাঙ্গালীচরণ মৃত্যু-শয্যায়।

তারপর গল্পের শেষে কী হ'ল? আর একটু বাদেই জানতে পারবেন। কিন্তু একটা অনুরোধ গল্পটা জানবার পর সেটা পাঁচজনকে বলুন ক্ষতি নেই; কিন্তু গল্পের শেষটা এক-জনকেও নয়।

বাণী চিত্রমের
নিবেদন

শুক্রবার ২২শে থেকে!

মিনার - বিজলী

০ ছবিঘর ০

(বিজ্ঞাপন)

হাজার ফিট ফিল্ম ব্যবহার করেছেন। সংগে তিনি ষোল হাজার ফিট ফিল্ম নিয়ে গিয়েছিলেন বাকি পাঁচ হাজার ফিট ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্যে সংগ্রহ করে নেন। শ্রীথাপা সোভিয়েট ক্যামেরাম্যানদের কাছ থেকে প্রভূত সহায়তা লাভের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীথাপাকে তারা আগে থেকে সংগে করে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত জায়গা ঠিক করে দিয়ে ওর পক্ষে কাজ করা অনেক সহজ করে দিয়েছে। অনেক জায়গায় ওরা ক্যামেরায় ফিল্ম পরিয়ে দিয়েও সাহায্য করেছে।

* * *

পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রতিদিনই কোন-না-কোন ফাঁকে একবার করে শ্রী থাপার সংগে দুচারটে কথা বলে নিতেন ও খুব উৎসাহ দিতেন তাঁরা। এই প্রসংগে শ্রী থাপা ম্যাগনিটোস্কির একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ওখানকার এক কারখানায় ছবি তোলার সময় পিছু হঠতে গিয়ে শ্রী থাপা এক মোটরে ধাক্কা লেগে পড়ে যান। এক বৃদ্ধা মহিলা দেখতে পেয়ে তাঁকে কাছাকাছি এক ডাক্তারখানায় নিয়ে যান এবং মুখের কয়েক জায়গায় কেটে যাওয়ায় ওপরে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আবার ছবি তুলতে ফিরে আসতেই দুজন রুশ ক্যামেরাম্যান ওকে ঐ অবস্থায় দেখামাত্র পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজির করে এক হাসপাতালে। সেখানে ওর ক্ষতস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে তবে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সামান্য আঘাত এমন গুঞ্জন তোলে যে শেষে শ্রীমতী গান্ধীকে স্বয়ং থাপার হোটেলে এসে খবর নিতে হয়। ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে ভাইভাই ভাবটা শ্রী থাপা সর্বত্রই লক্ষ্য করেছেন। রোমের বিমান বন্দরে পণ্ডিত নেহরুর অবতরণ দৃশ্য তোলার সময় হঠাৎ শ্রী থাপা দেখলেন যে ফিল্ম একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে। কাজেই একজন ইতালীয় ক্যামেরাম্যান ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শ্রী থাপা তার কাছে জানতে চাইলেন ফিল্ম কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে। উত্তরে সে শ্রী থাপার হাতে বিনামূল্যে প্রয়োজনমতো ফিল্ম গুঁজে দিয়ে নিজের কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলো যে শ্রী থাপা তাকে একটা ধন্যবাদ জানানোরও অবকাশ পেলেন না। শ্রী থাপার তোলা এই 'মিত্রতা কী যাত্রা' সংবাদ-চিত্রের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় কৃতিত্ব হয়ে রইলো।

কঙ্কাবতীর ঘাট

প্রবীর আর শিলা একই কলেজে পড়ে। প্রবীর শহরে ছেলে নয়, শহরে সে পড়তে এসেছে মাত্র, ছুটি হলেই গাঁয়ে ফিরে যায়, সেখানে তার ছোটখাট জমিদারী, বাপের মৃত্যুর পর তারই ওপর পড়েছে তার দেখাশুনার ভার।

গাঁয়ের ছেলের মত সে স্বভাবতই শহরকে ভয় করে। কলেজে তাই তার সহপাঠীরা তাকে ভাল ছেলে বলে ঠাট্টা করে। শিলাও বড় একটা কারুর সংগে মেশে না।

প্রবীর কিন্তু নীরবে শিলাকে লক্ষ্য করে। বুঝতে পারে, এই মেয়েটির নীরব ম্লান মুখের আড়ালে কোথায় যেন আছে একটা বৃহৎ বেদনা।

প্রবীর লক্ষ্য করে, অর্থের অভাবে শিলা কলেজের কোন দামী বই কিনতে পারে না, অবসর সময়ে লাইব্রেরীতে বসে তাই বইটা নকল করে নেয়। প্রথম প্রণয়ীর ভীরু মন নিয়ে প্রবীর এগিয়ে আসে।

যথাসময়ে মাইনে দিতে না পারায় শিলার নাম কলেজ রেজিষ্টার থেকে কাটা যায় দেখে প্রবীর শিলার হয়ে মাইনে দিয়ে দেয়। সেই অছিলায় শিলাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে শিলার মা চামেলীদেবীর সংগে পরিচয় হয়।

চামেলীদেবীর সংগে কথায় প্রবীরের বুঝতে দেরী হয় না, নিদারুণ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই শিলাকে পড়তে হচ্ছে এবং সেই দারিদ্র্যের মূলে আছে একটা মস্ত বড় ট্রাজেডী, শিলার বাবা, মিঃ মুখার্জি নাকি উন্মাদ হয়ে বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন।

সহানুভূতিতে গলে যায় প্রবীরের মন, শিলার আড়ালে চামেলীদেবীর কাছে প্রবীর জানায়, তার টাকার অভাব নেই, তিনি যদি কিছু মনে না করেন তাঁদের সংসারের সব ভার নিতে সে আনন্দে প্রস্তুত। চামেলীদেবী রাজী হলেন, শুধু একটা সর্তে, শিলা যেন এই সাহায্যের কথা এখন না জানতে পারে। অবশ্য একদিন তো শিলা সব জানতে পারবেই কারণ প্রবীরের মত ছেলের হাতে তিনি শিলাকে তুলে দিতে পারলে সৌভাগ্যই মনে করেন। প্রবীর কিন্তু তখন জানতো না, চামেলীদেবী তার আড়ালে, ঠিক এমনিভাবে শহরের সেরা লৌহ-ব্যবসায়ী লালমোহন আঢ্যির কাছ থেকেও চোখের জল ফেলে ঠিক এই সর্তেই নিয়মিত মোটা টাকা আদায় করেন।

হঠাৎ এই সময় সহসা অর্দ্ধউন্মাদ মিঃ মুখার্জি ছিন্ন মলিন বেশে দীর্ঘ প্রবাস-অন্তে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন শিলার জন্মতিথি উপলক্ষে মিঃ আঢ্যি এক বিরাট পার্টির আয়োজন করেছেন। উৎসব-মত্ত বাড়ীর ভেতর চোরের মতন সংগোপনে মিঃ মুখার্জি প্রবেশ করলেন এবং আড়াল থেকে যে সব কথাবার্তা শুনলেন তাতে তাঁর অর্দ্ধ-শুষ্ক চেতনা আবার সজীব হয়ে উঠলো...ভাগ্যবিধাতার মতন অতর্কিতে তিনি প্রবেশ করলেন প্রবীর ও শিলার জীবন-নাট্যে, ব্যর্থ করে দিলেন লালমোহন আর চামেলীদেবীর চক্রান্ত,......মুহূর্তের প্রেরণায়, ঘটনার অনিবার্যতার আদেশে, প্রবীর স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করলো শিলাকে, তার গলাতে পরিয়ে দিল সতী কঙ্কাবতীর মালা।

শহর ছেড়ে ঘটনার ধারা চল্লো, অতসী গাঁয়ে, যে গাঁয়ের জমিদার হলো প্রবীর এবং যে-গাঁয়ে কিছুদিন আগে সতী কঙ্কাবতী অসুস্থ মুমূর্ষু স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্যে সেই গাঁয়ের নদীর জলে আত্মবিসর্জন করেছিলেন। প্রবীরের মা পুণ্য-স্মৃতি স্বরূপ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, সতী কঙ্কাবতীর গলার মালা আর হাতের কাঁকণ, তাঁর ভাবিষ্যৎ পুত্রবধূর জন্যে। অতসী গাঁয়ে সেই নদীর ঘাটকে বলে কঙ্কাবতীর ঘাট।

স্বামী গর্বে গর্বিতা শিলা সতী কঙ্কাবতীর মালা গলায় নিয়ে যেদিন প্রথম যাবে স্বামীর ভিটেয়, সেদিন তার জীবনে নেমে এলো মহা-দুর্যোগ, নারীত্বের চরম-লজ্জার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রবীর তাকে ত্যাগ করে ফিরে গেল অতসী গাঁয়ে। তখন শিলার গর্ভে রয়েছে প্রবীরের সন্তান।

শিলাকে ত্যাগ করে চলে যাবার সময় প্রবীর তাকে শুনিয়ে গেল, সতী কঙ্কাবতীর মালার অপমান সে করেছে...

কিন্তু ঘটনার দ্রুত নাটকীয় ধারা সেই কঙ্কাবতীর ঘাটেই জ্বলন্ত প্রদীপের আলোয় প্রবীরকে টেনে নিয়ে এলো এবং সেই জ্বলন্ত প্রদীপের আলোয় প্রবীর নতুন করে চিনলো শিলাকে...

কিন্তু শিলা তখন কোথায়?............